"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম

(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য রচনা

আবদুল জব্বারের

বাংলার চালচিত্র ১০৲

[ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত]

এই বই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশকালে পাঠকমহলে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
রবীন্দ্র জীবনভাষ্য

ভাগবতী তনু ১০৲

কাজী নজরুল ইসলামের
জীবন-সন্ধ্যার অবদান

সন্ধ্যামালতী ৪৲

মানসী মুখোপাধ্যায়ের

গ্রীনরুম ৪৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সেই মরুপ্রান্তে ৯৲

প্রমথনাথ বিশীর

শাহীশিরোপা ৬॥

বিমল মিত্রের

কুমারী ব্রত ৫৲

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

ঈশ্বরের আবাস ৬৲

আশাপূর্ণা দেবীর
নয় ছয় ৫॥০

উমাপ্রসাদের
মণিমহেশ ৬॥০

প্রফুল্ল রায়ের

বাতাসে প্রতিধ্বনি ৭॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

একই পথের দুই প্রান্তে ৪৲

॥ নূতন মুদ্রণ ॥
প্রমথনাথ বিশী

কেরী সাহেবের মুন্সী ১০৲

শঙ্কু মহারাজের

গহন গিরি কন্দরে ৬৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
মনে ছিল আশা ৪॥০ নারী ও নিয়তি ৩॥০
আমি কান পেতে রই ১৪৲ দহন ও দীপ্তি ৬৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
গঙ্গাবতরণ ৫৲ হিমালয়ের পথে পথে ৭৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **চন্দনবাঈ ৫॥**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

মুখোশ ৬৲ ঝড় ১০৲ মেঘ কালো ৪৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **ভক্ত বিবেকানন্দ ৫৲**

তারাশংকরের **না ৩৲ রাধা ৮৲**

সৈয়দ মুজতবা আলীর

টুনিমেম ৮৲ শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ৭৲

আশাপূর্ণা মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপনগর ১৮৲ কাল, তুমি আলেয়া ১২॥
শিলাপটে লেখা ৮৲ অলকাতিলক ৫৲ চলাচল ৭৲ নবনায়িকা ৫৲
পঞ্চতপা ৭৲ রাত্রির ডাক ৪৲ স্বয়ংসিদ্ধা ৬৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
সাত পাকে বাঁধা ৫৲ বাজীকর ৮৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অমৃত

১০ম বর্ষ
২য় খণ্ড

১৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 7th August, 1970 শুক্রবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ **40 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম

চিঠিপত্র

শান্তিনিকেতনের বর্তমান সমস্যা

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ লিখিত 'বিশ্বভারতীর বর্তমান সমস্যা' শীর্ষক আলোচনাটি পড়লাম এবং এতদিন ধরে অনেকেই দলের সঙ্গে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যে কথা বলছেন সেকথা যে সত্য তাও বুঝতে পারলাম। শান্তিদেব দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জড়িত, এমন কি কবিগুরুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেছেন। তাই কবিগুরুর শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যে মনোভাব ছিল, সেকথা তিনি ভালভাবেই জানেন বলে তাঁর সেকথা প্রকাশ করবার অধিকার রয়েছে। গুরুদেবের ভাবে ভাবিত এবং তৎকালীন আশ্রমবাসী যে কোন ব্যক্তিই শান্তিনিকেতনের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে দুঃখিত হবেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিশ্বের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করা বা অন্যান্য পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে শান্তিনিকেতনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শের মধ্যে যেমন মৌলিকতা ছিল তেমনি ছিল সম্পূর্ণতা। মানুষকে পূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলার শিক্ষা-প্রদানের চেষ্টা করেছিলেন গুরুদেব। মানুষের হৃদয় ধর্মের বিকাশলাভে এই শিক্ষা সাহায্য করতে পারত।

আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা অন্যান্য সংস্থার উচ্চ বেতনের চাকরি ছেড়ে বিশ্বভারতীতে খুব কম বেতনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তাঁরা কেন বিশ্বভারতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন? এর উত্তরে বলতে হয়, তাঁরা বিশ্বভারতীর তৎকালীন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ঐ স্বল্প বেতনেও যে আনন্দে দিন কাটিয়েছেন এখনকার উচ্চ বেতনের অধ্যাপকরাও ঠিক সেরূপ আনন্দে ও শান্তিতে থাকবার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। বিশ্বভারতীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে, গুরুদেবের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে বিশ্বভারতীর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। আর যাঁরা উপরোক্ত আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী নন তাঁদের বিশ্বভারতীতে স্থান পাওয়ার অধিকার নেই।

এবার 'শোকের কথা' নিয়ে আলোচনা করা যাক। একজন সহকর্মীর মৃত্যুতে শোক স্বাভাবিক, তাই বলে শোককে প্রাধান্য দিয়ে আনন্দকে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। গুরুদেব বিশ্বের সর্বত্রই আনন্দের প্রকাশ উপলব্ধি করতেন। ('আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি')। গুরুদেবও উপনিষদের ঋষিদের মতই বিশ্বাস করতেন, 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'—অর্থাৎ এই আকাশ আনন্দময় না হলে কেই বা শ্বাস গ্রহণ করত আর কেই বা বেঁচে থাকত। আসলে, গুরুদেব মৃত্যুকে মহানরূপে, মুক্তির সোপানরূপে জীবনের পূর্ণতাসাধনকারীরূপে দেখেছেন বলে তিনি পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেও এক উদার শান্তি ও আনন্দ লাভ করেছেন এবং তাঁর কাছে জগৎটা আরও মধুররূপে প্রতিভাত হয়েছে। কাদম্বরী দেবী, শমীন্দ্রনাথ, মৃণালিনী দেবী, নীতীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আত্মীয় ও পুত্র কন্যার মৃত্যুতে কবি যে-সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন (মৃত্যুশোক, ছিন্ন পত্রাবলী ২২২ সংখ্যা ও 'চিঠিপত্র' দ্রষ্টব্য) তার মধ্যে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তাই যাঁরা কবিগুরুর আদর্শকে অবহেলা করে জন্মোৎসব ব[ন্ধ] রেখেছিলেন তাঁদের অপরাধের শেষ নে[ই]। আমরা, যারা শান্তি নিকেতনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যু[ক্ত] ছিলাম এবং যে শান্তি নিকেতনকে আমরা এখনো মনে প্রাণে ভালবাসি আজ তারা শান্তি নিকেতনের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জেনে গভীর বেদনা অনুভব করছি এবং বিশ্বভারতীর অনুরোধ করছি কবিগুরুর আদর্শে ও[ই] পথে চলার জন্য।

শিশিরকুমার সিংহ, [illegible]
অধ্যাপক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

বৈকুন্ঠের খাতা

গত ১৪ আষাঢ় ৯ম সংখ্যা অমৃত পত্রিকায় বৈকুন্ঠের খাতা ভাগে 'গ্রন্থদর্শী' শংকর সম্বন্ধে যে [illegible] লিখেছেন, সেই রচনায় শংকরের প্রথম লেখা 'কত অজানারে' উপন্যাসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'রূপোলি পর্দায় দেখেছি উপন্যাসটির চিত্ররূপ।'

কিন্তু আমি যতদূর জানি ঐ উপন্যাসের চিত্ররূপ রূপোলি পর্দায় কোনদিনই আত্মপ্রকাশ করেনি। তবে চেষ্টা চলছিল এবং কাজও কিছু দূর এগিয়ে ছিল, প্রধান একটি চরিত্রের জন্য স্বনামধন্য অভিনেতা শ্রীকালী ব্যানার্জী নির্বাচিত হয়েছিলেন। যে কোন কারণেই হোক, কাজ কিছুদূর এগিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই আমার মনে হয় গ্রন্থদর্শীর ঐ উক্তিটি ভুল।

সুনীলরঞ্জন দত্ত
কিণ্ডারডিজক, হল্যান্ড

'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' প্রসঙ্গে

আপনাদের ২৪ জুলাই তারিখে শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিঠির বক্তব্যের সহিত আমি একমত। আমিও অন্যান্য পাঠক পাঠিকাদের ন্যায় অমৃত পত্রিকার একজন আগ্রহশীল পাঠক। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' রচনার মধ্যে কোন কিছু বৈচিত্র্য বা সাহিত্যের স্পর্শ পাই না। এ যেন নিছক নিজস্ব দিনপঞ্জী নকল ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে। কয়েক বছর আগে এই পর্যায়ে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল আপনাদের পত্রিকায়। সেই রচনার মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমান রচনা শুধু নিরর্থকই নয় একেবারে স্বাদহীন। আর এই সব অসার বৈচিত্র্যহীন দিনপঞ্জী পড়ে কার কতটা লাভ হবে জানি না, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমার লাভের ঘরের অঙ্ক শূন্য। পুরানো দিনের কথা শুনতে বা পড়তে সবারই ভাল লাগে, যদি তার মধ্যে অতীত দিনের পারিপার্শ্বিক সব রকম ঘটনা থাকে। এখানে অহীন্দ্রবাবু নিজের প্রাধান্য খুব বেশীই দিয়েছেন। তাঁর সমকালীন আর যে সব দিকপালেরা বাংলা রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করেছিলেন অভিনয় সম্ভারে তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর রচনায় কিছুই এযাবৎ প্রকাশ পায়নি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর রচনায় 'অহম' ভাবটা খুবই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। বিগত যুগের বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতিদের স্থান তাঁর রচনায় খুবই কম। আর শিশিরকুমারের নাম উল্লেখ এমন ভাবে করেছেন যাতে মনে হয় তিনি যেন বর্তমান পাঠকদের (যাদের বয়স এখন ২৫।৩০ বছরের মধ্যে) বোঝাতে চান যে শিশিরকুমার সেই সময় শুধু মাত্র সাধারণ অভিনেতার স্তরেই ছিলেন। কিন্তু অহীন্দ্রবাবু হয়ত জানেন না, যারা শিশিরকুমারের অভিনয় অন্তত জীবনে একবার স্বচক্ষে দেখেছেন, তারা ভুলতে পারবে না।

অসিতরঞ্জন বসু, ভাণ্ডুপ, বোম্বাই

চিঠিপত্র

নিকটেই আছে

'নিকটেই আছে' বিভাগের 'টোপ' আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক মনের একটি গোপন জায়গায় আঘাত করেছে লেখাটি। নাট্যজগতের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বছর সংশ্লিষ্ট আছি। সাময়িকভাবে নয়, বরং অহোরাত্র বলা যায়। আমাদের এই নাট্য প্রয়াস এক বিচিত্র ব্যাপার। জীবনের অনেকখানি সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্ভাবনা ব্যয় বা অপব্যয় করে আমরা এটা চালিয়ে যাচ্ছি তবু কতজনের কাছেই বা আমাদের এই চিন্তা নিয়ে পৌঁছতে পারলাম! কতজনই বা জানল। আগে যা ছিল নেহাৎ অপেশাদার, এখন তার অনেক সংস্থাই আধা-পেশাদার হতে বাধ্য হয়েছে। এই ইউনিটগুলি একনিষ্ঠ নাট্য স্বপ্নচারীদের শ্রম ও সাধনায় বেঁচে আছে তা এর কাছাকাছি না গেলে দেখা যায় না।

উল্লিখিত রচনায় বর্ণিত 'দাদা'দের সংখ্যা আগে যথেষ্ট ছিল, এখন নগণ্য। তদপেক্ষা 'বংশকুমার'দের সংখ্যাই অধিক। এই বংশকুমাররা বরং আজকাল এত পাকা ও পোক্ত হয়ে উঠেছেন যে চলতি ড্রামা ইউনিটগুলিকেই অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অনেক ধাক্কা সামলাতে হয়। বিশ্বাস করুন বা না করুন, [illegible] নাট্য-সংস্থা থেকে [illegible] অনেক শাখা, ফেঁকড়া হয়েছে। তাই তারা বিভিন্ন ইউনিটে আসেন। এঁদের মধ্যে অনেকে 'বস-স্টার'। এবং এঁদের মধ্যে অনেকে ড্রামা-ইউনিটগুলিতে তথাকথিত 'দাদা'দেরই খুঁজে বেড়ান। কিছু না হয় হয়েছে এবং কোন কালে কিছু হবার নয়—এমন অনেক 'বংশকুমারের' কীর্তি কাহিনী অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় জমা হয়ে আছে।

ভবেন্দু ভট্টাচার্য
কলকাতা-৬।

(২)

অমৃতে সন্ধিৎসু মহাশয়ের 'নিকটেই আছে' শীর্ষক রচনাগুলি সাধারণ মানুষের খুবই উপকার করছে। স্কুল, কলেজ, অফিস, হাটবাজারে সর্বত্রই যে লোক ঠকানোর ফন্দী চলছে তা জীবন্ত রূপে 'সন্ধিৎসু' আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই, তিনি দেশের সমগ্র সাধারণ নিরীহ ব্যক্তির ধন্যবাদার্হ। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা না উল্লেখ করে পারলাম না, যার সঙ্গে সন্ধিৎসু মহাশয়ের রচনার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

আমার এক বন্ধু কলকাতার কাছেই এক কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। এই বছর পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছে। গত ৫ জুন ছিল তাদের কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা। শুনলাম, এই পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন একজনকে ১৫ টাকা করে দিতে হয়েছে। এর ফলে সেই ব্যক্তি সমস্ত কিছুই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যদি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০ জন হয় তবে এই ধরনের ব্যক্তিদের মোট প্রাপ্য হবে ৩০০০ টাকা। এর পর ফিজিক্স প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়েছে। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে আরেক দল লোকেরা কি পরিমাণ টাকা দাবী করেছেন (গত বৎসরে ছিল ৫ টাকা) তা লজ্জায় এবং ঘৃণায় জিজ্ঞাসা করিনি। শুনেছি ঐ বহুল পরিমাণ অর্থ এক স্থানে জমা হয় এবং পরে সকলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

শুধু আমি যে কলেজের কথা বললাম সেখানেই নয়, সমস্ত কলেজেই নাকি এই একই ধারা চিরন্তন স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে। ছাত্রদের দুর্বলতার সুযোগে এই আর্থিক দাবী ঘৃণ্য এবং অন্যায়ও বটে। কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিষয় কি অজ্ঞাত? 'সন্ধিৎসু' এবং দেশের শিক্ষিত লোকজনকে জানাবার জন্য এই ঘটনার উল্লেখ করলাম।

বিমলচন্দ্র সাউ
চন্দননগর, হুগলী।

'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে'—প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বর্তমান অমৃতে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আমার কাছে। উপন্যাসটি যেভাবে এগোচ্ছে, যে গতি চঞ্চল ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি বিভিন্ন চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছে, তাতে লেখকের মুন্সিয়ানার প্রশংসা না করে পারছি না। কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আর কি বিচিত্র তার অনুভূতি!

যে গতি এবং ঘটনা সংঘাত নিয়ে এ পর্যন্ত উপন্যাসটি এগিয়ে এসেছে, হঠাৎ ছন্দপতন না ঘটলে তা মনে দাগ কাটবে বলে আশা রাখি।

চরিত্র চিত্রণে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জটিল ট্র্যাজেডি মনে হয় পাগল ঠাকুর। এটি অনবদ্য একটি নির্বাক চরিত্র যে তার মনের একটা কথাও কাউকে বলতে পারছে না অথচ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত—শুধুমাত্র ঘটনাবিন্যাসে তার দমকা অভিব্যক্তি—এ নজির, এ কুশলতা খুব বেশী একটা মেলে না।

অভিজ্ঞতার এই নিপুণ অভিব্যক্তিকে ভালো না লেগে পারে না। দেখতে গিয়ে লেখক কিছু এড়িয়ে যাননি, আর যা দেখেছেন সেটা লিখতে গিয়ে কিছু বাদ রেখে যাননি।

সজল দাশগুপ্ত
বহরমপুর,
মুর্শিদাবাদ।

'কবিতার অনুবাদ' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক অমৃতের ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় শ্রীআশিস সান্যালের 'কবিতার অনুবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটি সুলিখিত। ইতালীয় সেই শ্লেষাত্মক প্রবাদ 'traduttore traditore' যার হুবহু ইংরেজি হল translator is a traitor —এ কথা অংশত সত্য হলেও অনুবাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বিশ্বসাহিত্য অনুবাদের মধ্যস্থতায় সর্বাঙ্গ হতে পারে। তবে একজন পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে বাঙলা ভাষায় বিদেশী কবিতার অনুবাদ যত বেশি হয়েছে, তার তুলনায় এ দেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কবিতার অনুবাদ অনেক কম হয়েছে। অর্থাৎ আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, একজন বাঙালী পাঠক রিলকে, বোদলেয়রের কবিতার বাঙলা ভাষান্তর সম্পর্কে যতটুকু পরিচিত, আমাদের প্রতিবেশী হিন্দী, ওড়িয়া, অসমিয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য কবিতার ব্যাপারে তা নয়। এজন্য স্বদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতাগুলিরও পরস্পরের ভাষায় অনুবাদ একান্ত প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে একটা গুরুদায়িত্ব পালনে অসমসাহসী হয়েছি। আমাদের পরিকল্পনা আছে অদূরভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন ভাষার উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতার সার্থক বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষক বা অভিজ্ঞদের সহৃদয় সহযোগিতা ভিন্ন আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে না। আমরা উৎসাহী, যোগ্য অনুবাদক ও লেখকদের নিচের ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

নিখিল বসু
সম্পাদক : পান্ডুলিপি
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

শাদা চোখে

অবশেষে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভেঙে দিলেন। ফলে এই রাজ্যে একটি বিকল্প জনপ্রিয় সরকার গঠনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে একটি অনিশ্চিতকর রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান ঘটল। এখন সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নটি নিয়েই তোলপাড় চলবে। কবে, কখন পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এখনি তা বলা মুশকিল। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী যেমন ছ মাসের মধ্যে নির্বাচন করার নিয়ম আছে তেমনি রাজ্যপালের শাসনকে দীর্ঘায়িত করার সাংবিধানিক ক্ষমতাও আছে। যা হোক এখন থেকে পশ্চিম বাংলায় নির্ভেজাল গভর্নর শাসন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসন চালু হল।

শ্রীশান্তিস্বরূপের ঘোষণা আচমকা হলেও রাজনৈতিক মহলে বিধানসভা বাতিল হওয়ার ফলে একটি আপাততঃ শান্তির ভাব দেখা গেছে। সকল রাজনৈতিক দলই এখন একাগ্রচিত্তে নির্বাচনী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য পাঁয়তারা কষতে পারবেন, এবং সবকায় শক্তি বৃদ্ধির জন্য জোট বাঁধার কৌশল আঁটবেন। এবারকার রাজনৈতিক দলগুলির সংহতি কি রকম হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা এখন থেকেই শুরু হবে। তবে বাংলা কংগ্রেস অষ্টবামে যোগদান না করার সংকল্প ঘোষণা করায় পরিস্থিতি একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে। কাজেই রাজনীতি ক্ষেত্রে যে নয়া রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হল তা পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সংহতকরণের এক নতুন দরজা খুলে দিল বলেই মনে হয়।

এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে বিধানসভা বাতিলের নেপথ্য কাহিনীটা লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই। কেননা—রাজনীতির ইতিহাসের একটি অধ্যায় তা না হলে অলিখিতই থেকে যাবে।

বিধানসভা এতদিন জীইয়ে রাখা হয়েছিল শুধু মাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেটা হচ্ছে শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার গঠন। অবশ্য নিভৃতেই এই সরকার গঠনের পরিকল্পনা চলছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কেননা ডান কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নয়াদিল্লী বৈঠকের পর ঘোষণা করল যে, "বাম কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলায় সরকার গঠনের প্রচেষ্টা আর নয়"। ডান কম্যুনিস্টদের এই সিদ্ধান্তের পর শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে ঐ দলের নেতাদের অনেক গোপন বৈঠক হয়েছে। উদ্দেশ্য, শ্রীমুখার্জির বাংলা কংগ্রেসকে অষ্টবামের জোটে ভিড়িয়ে মজবুত এক জোট গঠন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। বরঞ্চ, অন্যদিকে শ্রীমুখার্জি জনপ্রিয় সরকার গঠনের যে পরিকল্পনা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাতে বাধা দেওয়ার ফলে শ্রীমুখার্জির দল একটি আদর্শগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু করলেন। প্রথমে শ্রীমুখার্জি অষ্টবামের 'কাছাকাছি' এসেছিলেন বলে যে ঘোষণা করেছিলেন, তারও একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য যে ছিল সেটা এখন বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে। বাংলা কংগ্রেসের ভয় ছিল যদি অষ্টবামের বিরুদ্ধে সহানুভূতিমূলক মনোভাব না থাকে তবে যে কোন মুহূর্তেই অষ্টবামের কিছু শরীক ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি রাতারাতি একজোট হয়ে বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়েও সরকার গঠন করে ফেলতে পারেন। শ্রীমুখার্জির এমন কি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরও আশা ছিল ডান কম্যুনিস্টরা যখন তাঁকে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে সমর্থন জানাচ্ছেন, তখন পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রেও যদি সম্মতি দেন তবে সরকার গঠন মোটেই অসম্ভব হবে না। সেই সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকও আসবে এই ধারণা তাঁদের ছিল। কিন্তু বিগত রাজ্যসভার নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীঅমর চক্রবর্তী পরাজিত হওয়ার পর থেকেই ঐ দল বাইরে প্রকাশ না করলেও অন্তরে অন্তরে বাংলা কংগ্রেসকে একটি সমুচিত শিক্ষা দেবার প্রতিজ্ঞা পোষণ করে আসছিলেন। কাজেই ডান কম্যুনিস্টরা ফরওয়ার্ড ব্লককে সঙ্গে না পাওয়ার ফলেই নয়াদিল্লী বৈঠকে সরকার গঠন না করার পক্ষে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। অন্যদিকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরাও আর একবার মরীয়া হয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। এমন কি খবরে জানা যায় তাঁরা নাকি ইন্দিরাজীর কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিলেন যে সরকার গড়তে পারলে নকশালী উপদ্রব তাঁরা রাতারাতি বন্ধ করে দেবেন। ইন্দিরাজী তাতে কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। একদিকে ডান কম্যুনিস্টদের পররাষ্ট্র ভাব আর অন্যদিকে সি পি এম-এর সরকার গঠনের প্রচেষ্টা এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে শ্রীঅজয় মুখার্জি রাজ্যপালের সঙ্গে দু'দিন নিভৃতে আলোচনার পর জানিয়ে দিলেন যে সরকার গঠন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। অতএব বিধানসভা বাতিল করাই ভালো। সেটা [illegible] কারণও বটে।

সহৃদয় পাঠকরা সকলেই জানেন, ৩০ ও ৩১ জুলাই বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক কর্মপরিষদের বৈঠক ছিল এবং সেই বৈঠকে বাংলা কংগ্রেসের অষ্টবামে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন নিয়ে একটি [illegible] সিদ্ধান্তের আসার কথাও ছিল। শ্রীমুখার্জি রাজ্যপালকে বিধানসভা বাতিলের পরামর্শ দিয়ে রাজভবনের ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন। ঘোষণা হওয়ার মুহূর্তে মধ্যেই বাংলা কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁরা আর অষ্টবামে যোগ দেবেন না। সরকার গঠনের প্রচেষ্টা [illegible] হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অষ্টবামে যোগদানের উপযোগিতা যে শেষ হয়ে গেছে বাংলা কংগ্রেস একথা উপলব্ধি করেছিলেন।

শ্রীমুখার্জির বাংলা কংগ্রেসের অষ্টবামে যোগ না দেওয়ার ঘোষণা যদি কোন দলকে বিশেষভাবে অসুবিধায় ফেলে থাকে তবে তা হচ্ছে ডান কম্যুনিস্ট পার্টি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডান কম্যুনিস্টরা সারা ভারতে এক নীতি আর পশ্চিম বাংলায় অন্য নীতি অনুসরণ করছে কেন? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁরা চান শাসক কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করে ইন্দিরাজীর সংগঠনকে নিজেদের উদ্দেশ্যমত কাজে লাগাতে। এবং সেটা সহজ পন্থাও বটে। আর অন্যদিকে তাঁদের লড়াই বাস্তবপক্ষে বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে। কাজেই কেরালায় তাঁরা যে নীতি অনুসরণ করে সাফল্য লাভ করবেন [illegible] ছেন পশ্চিম বাংলায় সে কৌশল খাটছে না। কেননা, এই রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থাটা একটু ঘোরালো। কেরালায় বামপন্থী আন্দোলন জমাটভাবে থাকলেও পশ্চিমবাংলায় এই আন্দোলন আরও জটিল। কাজেই ডান কম্যুনিস্টরা মনে করেছেন এখানে যদি সরকার গঠনে তাঁরা কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন তবে তাঁদের রাজনৈতিক সমাধি হওয়ার আশংকাই বেশী। অধিকন্তু নকশালপন্থীরা যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে যদি পরোক্ষ মদৎ দেওয়া যায় তবেই তাঁরা বাম কম্যুনিস্টদের এই রাজ্যে ঘায়েল করতে পারেন, নতুবা নয়। সেই ধারণা থেকেই সারা ভারতে শাসক কংগ্রেসের সহযোগী [illegible] এই রাজ্যে একটু বেশী বামপন্থা অনুসরণ করতে গিয়েই তাঁরা ফাঁদে পড়ে গেলেন বলে মনে হয়। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, এই রাজ্যেই নাকি শাসক কংগ্রেসের চরিত্র ভিন্নরূপ। এখানে নাকি [illegible] বড় বড় বুর্জোয়া ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রক্ষাকর্তা। এই কৌশল করে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁদের বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুণ্ণ আছে। আর এই ধারণার বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ভূমি দখলের আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে। এতে কিছু সংখ্যক জোতদার ডান কম্যুনিস্টদের [illegible] হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। এবং সি পি-এম এদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সমর্থন না করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। নকশালপন্থীরা জোতদার মারছেন। অবশ্য তাঁরা [illegible]। আর সি পি আই-এর গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলনের ফলে [illegible] জোতদার প্রাণ হারাচ্ছে। অতএব, কৌশলের দিক থেকে বা [illegible] দিক থেকে এক না হলেও তাঁরাও যে নকশালদের কাছাকাছি এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে গিয়েই ডান কম্যুনিস্টরা বিপাকে পড়লেন, সব সময় কৌশল যে অভীপ্সিত ফললাভের অনুকূল হয় না—ডান কম্যুনিস্টরা বোধহয় এবার সেই তথ্যটা খানিকটা উপলব্ধি করলেন। তাঁদের দুর্দশা দেখে যে সি পি এম হাসছে তা পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়। সি পি এমকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে তাঁরা বর্তমানে যে অসুবিধায় পড়লেন—এর থেকে মুক্তি পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

তবু আশার কথা এই যে, বাংলা কংগ্রেস অষ্টবামে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত কর-

লেও একেবারে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করে নি। তাঁদের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীমুখার্জি ও সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে যে কোন দলের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। তবে বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে নৈব নৈব চ। এই যে-কোন দলের সঙ্গে আলোচনা করার ছাড়পত্রই নয়া সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত শুধু ডান কম্যুনিস্ট পার্টি নয় অষ্টবামের জোটের উপরই প্রত্যক্ষ আঘাত হানল। কেননা বাংলা কংগ্রেস যোগ না দিলে নির্বাচনে অষ্টবাম [illegible]গরিষ্ঠতা লাভ করা ত দূরের কথা, বর্তমান সদস্য সংখ্যা বজায় রাখাই কঠিন হয়ে যাবে। এমন কি নিদেনপক্ষে নির্বাচনী সমঝোতা হলেও সে জোর অষ্টবামের থাকবে না। ফলত অষ্টবাম মরীয়া হয়ে বাংলা কংগ্রেসকে জোটে আনবার চেষ্টা করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সম্ভাবনা তিরোহিত হতে শুরু করলেই অষ্টবামও ভাঙতে শুরু করবে। শুধু [illegible]চা আপন প্রাণ বাঁচা' এই ধারণার বশবর্তী হলে নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতির চাপে পড়েও অষ্টবামে ফাটল দেখা দিতে বাধ্য। কাজেই শ্রীমুখার্জি সরকার গঠন করতে না পারার জন্য বাংলা কংগ্রেসের মনে যে ক্ষোভ জমেছে সেটা নিরসন করবার জন্য অষ্টবামকে বিশেষ করে ডান কম্যুনিস্ট পার্টিকে বহু [illegible] দিতেই হবে।

অন্যদিকে আর একটি সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে, যে কংগ্রেসের পশ্চিম বাংলায় বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটেছিল সেই কংগ্রেস [illegible] শাসক [illegible] পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠবে। শ্রীমুখার্জি যেমন কংগ্রেসকে প্রায় সমাধিস্থ করেছিলেন তেমনি পুনরুজ্জীবনের পথও তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন। আগেই বলেছি, সরকার গঠিত না হলেও ইন্দিরাজীর লোকসানের কিছু নেই। সেই কথার পুনরুল্লেখ করে বলছি, ইন্দিরাজী পুরোপুরি লাভের খাতে জমা নিয়ে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে নতুন করে হিসাব খুললেন। বাংলা কংগ্রেসের যে কোন দলের সঙ্গেই আলোচনা করার সিদ্ধান্তই ইন্দিরাজীর সেই লাভের অঙ্ককে ফাঁপিয়ে দেবে বলে মনে হয়, আদর্শগত দিক থেকে বিচার করলে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের কোন পার্থক্য নেই। তাঁরা সমব্যথায় ব্যথী ও একই পথের পথিক। ইতিপূর্বে কম্যুনিস্ট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে যে সখ্য গড়ে উঠেছিল শ্রীসুশীল ধাড়া ও তাঁর দলের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের আদর্শগত মূল্যায়ন সে বন্ধুত্বের সূত্র ছিন্ন করতে সাহায্য করল। শ্রীঅজয় মুখার্জি যখন কংগ্রেস ছাড়বার উদ্যোগ আয়োজন করছিলেন তখন শ্রীঅতুল্য ঘোষ নাকি অজয়বাবুকে বলেছিলেন, "অজয়দা আমি কি আপনার কাছে আপনার সুশীলের চাইতে কম?" ইতিহাস সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। এবার হয়ত স্বয়ং শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি'ও তাঁর ছোড়দার কাছে একই প্রশ্ন করবেন। এবারও ইতিহাস সেই একই উত্তর দেবে বলে মনে হয়। কারণ শ্রীসুশীল ধাড়া আগের 'সুশীলের' চেয়ে অনেক বেশী বলবান। এবং শাসক কংগ্রেস ও পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসার এই সুযোগ হেলায় হারাবেন বলে মনে হয় না। অতএব জোট বাঁধার রাজনীতি যেভাবে শুরু হয়েছিল তার পরিণতি ভিন্নভাবে ঘটবে বলেই আশঙ্কা করবার সঙ্গত কারণ দেখা যাচ্ছে।

ডান কম্যুনিস্ট পার্টি শাসক কংগ্রেসের প্রতি যতই বন্ধুভাব দেখান না কেন, শাসক কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের ধারণা তাঁদের [illegible] যে মোটেই ভাল নয়—একথা পরিষ্কার বোঝা যায়। বাংলা কংগ্রেস একেবারে [illegible] এই বক্তব্য পরিবেশন করেছে। কাজেই বাংলা কংগ্রেস কোনমতে আর চাইছে না যে অষ্টবামের সঙ্গে মিলে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের আর একটি নির্বাচনে কিছু বেশী সিট পাইয়ে দেয়। কারণ একথা ঠিক শ্রীমুখার্জির বাংলা কংগ্রেসের সহায়তা না পেলে ডান কম্যুনিস্টদের মেদিনীপুরের দুর্গ ভেঙে পড়তে বাধ্য। কাজেই আবার মিতালি করে যদি অষ্টবামের সঙ্গে সরকার গঠন করতে হয় তবে পুরোনো যুক্তফ্রন্টের নাটক পুনঃ অভিনীত হওয়ার আশঙ্কা সমধিক। এই ভাবনা শ্রীমুখার্জিকে খুবই ভাবিত করেছে। বর্তমানে সরকার গঠন না করতে পারায় তাঁর সেই আশঙ্কা আরও দৃঢ়তর হয়েছে বলে মনে হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে বাংলা কংগ্রেস [illegible] করেছে। এবং সেজন্যই যে [illegible] শাসক কংগ্রেসের দিকে পাল্লা [illegible] বলা যায়। তবে [illegible] ও অষ্টবাম [illegible] আশঙ্কাই সে ক্ষেত্রে যে একেবারে থাকছে না—এ সম্ভাবনা বাংলা কংগ্রেস উড়িয়ে দিয়েছে বলে একেবারে মনে হয় না। তাই অস্পষ্টভাবে প্রস্তাবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব ও তাঁদের নেতাদের ভাষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁরা চান বামপন্থী জোটের লড়াই চালু থাকুক। আর তৃতীয় শক্তি হিসাবে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই ফাঁকে লালদীঘির দপ্তর তাঁরা দখল করুন। বাংলা কংগ্রেসের এই ধারণা পোষণ করবার মুখ্য কারণ হচ্ছে শ্রীমুখার্জির জনসভায় অগণিত মানুষের উপস্থিতি।

ইন্দিরাজী যদি কল্যাণমূলক কাজ করে পশ্চিম বাংলায় একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তবে ত শ্রীমুখার্জির বর্তমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হলে একটি শক্তিশালী নেতৃত্বের সম্ভাবনা থাকে দিতে পারে। বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস দুই দলই এটা বুঝতে পারছেন। আবার ইন্দিরাজী সম্পর্কে ত বামপন্থীরাই একটি ইমেজ সৃষ্টি করেছেন। অতএব এমন একটি সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়, একথা তাঁরা যদি বিশ্বাস করে থাকেন তবে ভুল করেছেন বলে মনে হয় না।

কাজেই যদি আশু নির্বাচন হয়—তবে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে বুদ্ধির খেলা জমজমাট হয়ে উঠবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াল তা থেকে অনুমিত হয় অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নই অনেক দলের বিশেষ করে ডান কম্যুনিস্টদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেবে। [illegible] এবার খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে। না হলে এবারেই শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

মাঝখানে কিছুদিন পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব তোলা একটা মামুলি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও বিরোধী দলগুলি সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনত। ইদানীং কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব আনার ঝোঁক কতকটা কমেছিল।

অথচ, নিছক অঙ্কের দিক থেকে দেখতে গেলে, ভোটের জোরে সরকারকে হারিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা এখন বিরোধী দলগুলির হাতের মুঠোয় এসে গেছে। কেননা, কংগ্রেস ভাগ হয়ে যাওয়ার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পক্ষে শুধু তাঁর নিজের দলের সমর্থনের ভরসায় ক্ষমতায় টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। তবু যে বিরোধী দলগুলি অনাস্থা প্রস্তাব আনার ব্যাপারে উৎসাহী হচ্ছে না এবং ভোটের জোরে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সুযোগ নিতে পারছে না তার কারণ হল, প্রথমত, বিরোধী দলগুলি এমন কোন 'ইস্যু' পাচ্ছে না যার উপরে সকলে একমত হতে পারে এবং, দ্বিতীয়ত, কোন কোন বিরোধী দল ইদানীং এভাবে ঘন ঘন মামুলি অনাস্থা প্রস্তাব আনার বিরোধিতা করছিল।

তবু কিন্তু এবার লোকসভায় বর্ষা অধিবেশনের সূচনাতেই অনাস্থা প্রস্তাব এল। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিই প্রথমে অনাস্থা প্রস্তাব তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। তারা ঐ প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কেরলে তাড়াহুড়ো করে নির্বাচন করার জন্য সরকারের সমালোচনা করতে চাইল এবং পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে নির্বাচনের দাবী তুলতে চাইল। কিন্তু এ সম্পর্কে অন্যান্য বিরোধী দলকে বুঝিয়ে দেখতে গিয়ে দেখতে পেল যে, এভাবে সুবিধা হবে না। প্রথমত, প্রধান দুটি বিরোধী দল স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘ জানিয়ে দিল যে, পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে নির্বাচনের দাবীতে তাদের সায় নেই। বিরোধী কংগ্রেস দলও এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাল না। দ্বিতীয়ত, এভাবে বার-বার মামুলি রীতিরক্ষার মতো অনাস্থা প্রস্তাব এনে ব্যাপারটার জাত নষ্ট করার বিরুদ্ধে বিশেষ করে স্বতন্ত্র পার্টি তাদের নীতিগত প্রতিবাদ জানাল। আবার কোন কোন পার্টি বলল, কেরলে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার এবং পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে নির্বাচন করার দাবী একই সঙ্গে চলতে পারে না।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি যখন দেখল, তারা অনাস্থা প্রস্তাব আনলে এই প্রস্তাব তোলার অনুমোদনের জন্য যে কয়টি ভোট দরকার তাও তারা সংগ্রহ করতে পারবে কিনা সন্দেহ তখন অন্য একটা চেষ্টা শুরু হল। সেই চেষ্টার উদ্দেশ্য হল, পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু কেরলের প্রসঙ্গে একটা মুলতুবী প্রস্তাব তুলে সেই প্রস্তাবের পিছনে যথাসম্ভব বেশী সমর্থন সংগ্রহ করা। বিরোধী কংগ্রেস ও সি পি এম, দুই দলই যখন ঐ ধরনের মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়ার উদ্যোগ করছে তখনই জানা গেল যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর কেরলে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছেন। এই অবস্থায় মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করতে স্পীকার অনুমতি দেবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল। নির্বাচনের তারিখ স্থির করার সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের। সুতরাং পার্লামেন্টে ঐ তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার কোন দাবী উঠলে সে ব্যাপারে সরকারের করার কিছুই নেই।

এই [illegible] অবস্থায় তখন অন্যান্য দলকে সোস্যালিস্ট পার্টির শ্রীমধু লিমায়ে আগে থেকে যে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়ে রেখেছিলেন সেটি সমর্থনের সিদ্ধান্ত করা ছাড়া মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দলের সামনে আর কোন পথ খোলা থাকল না। শ্রীলিমায়ের প্রস্তাবে কেরলের নির্বাচন সম্পর্কে কারচুপির ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার অভিযোগ করা হয়েছিল।

এই অনাস্থা প্রস্তাবের সূত্র হাতে নিয়ে এবার লোকসভায় বিরোধী দল, শ্রীইন্দিরা গান্ধীর সরকারের [illegible] একটা চক্রান্তের মধ্যে [illegible] বিরোধী কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জনসংঘের [illegible] জোটটি তৈরী [illegible] ভোট নামে না হলেও [illegible] শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে জোটেই [illegible] কি এস এস পি ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও তার সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের এবারকার চ্যালেঞ্জটা বেশ জোরালো হয়েছিল।

কিন্তু সেই তুলনায় বলতে গেলে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অপেক্ষাকৃত সহজেই পার পেয়ে গেছেন। শ্রীমধু লিমায়ের অনাস্থা প্রস্তাব ১৩৭—২৪৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে ২৪৩টি ভোট পড়েছে তার মধ্যে ১৮৯টি শাসক কংগ্রেস দলের। বাকী ভোটগুলি এসেছে সি পি আই, ডি এম কে, অকালী, মুশ্লিম লীগ প্রভৃতি দল থেকে। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, সি পি আই যদিও তাদের ভোটগুলি দিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে বৃহৎ সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করতে সাহায্য করেছে তাহলেও ঐ দলের ২১টি ভোটের জন্যই এই সরকার ক্ষমতায় রয়ে গেলেন, এমন দাবী তারা করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, মোট যে ৩৮০ জন সদস্য ভোট দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ১৮৯ জনই হলেন শাসক কংগ্রেস

দলের সদস্য। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যতগুলি ভোট দরকার প্রায় ততগুলিই শাসক কংগ্রেস দলের নিজেদের পকেটে ছিল।

শ্রীমতী গান্ধীর এই বিপুল জয় কি করে সম্ভব হল? পর্যবেক্ষকরা কেউ-কেউ লক্ষ্য করেছেন যে, বিরোধী দলগুলোর অনেক সদস্যই ভোট দিতে আসেন নি। শাসক কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যেও প্রায় ৩৩ জন ভোট দিতে আসেন নি। কিন্তু তাঁরা [illegible] দিল্লীতে ছিলেন না। অপরপক্ষে, বিরোধী কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য দিল্লীতে উপস্থিত থেকেও লোকসভার বৈঠকে ভোট দিতে আসেন নি। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অনাস্থা প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যাবেই জেনে এই সদস্যরা আর ভোট দিতে আসতে উৎসাহ বোধ করেন নি। কিন্তু তার চেয়েও আর একটি গুরুতর কারণ সম্ভবত ছিল। সেটা সম্ভবত এই যে, বৃহত্তর শক্তি সমাবেশ করতে গিয়ে বিরোধী দলগুলি এমন একটি বিষয় বেছে নিয়েছিল যেটাকে প্রধান-প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা একটা অনাস্থা প্রস্তাব আনার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারেন নি। বিরোধী কংগ্রেস দলের একজন সদস্য ভোট গ্রহণের সময় সভায় উপস্থিত থেকেও যে ভোট দেন নি সেটা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার মতো একটা ঘটনা।

*

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেরলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ এমনভাবে নির্দিষ্ট করেছেন যাতে সেখানকার বর্তমান সরকার [illegible] নতুন বিধানসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। যদিও কেরলের বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাহলেও সংবিধান অনুসারে সেখানকার মন্ত্রিসভা বিধানসভার সর্বশেষ অধিবেশনের শেষ দিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, বিধানসভার সামনে হাজির না হয়েই সরকার চালিয়ে যেতে পারেন।

সি পি এম নেতাদের এই দুই ব্যাপারেই আপত্তি। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরও শ্রীঅচ্যুত মেননের মন্ত্রিসভা গদীতে থাকুন, এটা তাঁদের মনঃপূত নয়। তাঁদের মনঃপূত নয় সেপ্টেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচন। সি পি এম নেতা শ্রীগোপালন বলেছেন যে, ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করে সরকারকে টিকিয়ে রাখা যায় কিনা সেটা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দেখার বিষয় নয়। তিনি আরও বলেছেন যে, যদিও তাঁরা রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষপাতী নন তাহলেও অল্প সময়ের জন্য কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করায় তাঁরা ক্ষতি কিছু দেখেন না। সি পি এম ও অন্যান্য কোন-কোন দল মনে করে যে, সেপ্টেম্বরে নির্বাচন হলে সেটা ন্যায্য ও অবাধ নির্বাচন হবে না। কারণ, প্রথমত ভোটার তালিকায় অনেক ভুল-ত্রুটি আছে, চূড়ান্ত মুদ্রিত ভোটার তালিকা এখনও পার্টিগুলিকে দেওয়া হয় নি, এবং

কমনওয়েলথ গেম' সমাপ্তি!
(একে একে নিভিছে দেউটী?)

দক্ষিণ আফ্রিকা

যেহেতু সামনে বর্ষা সেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি অভিযানে নামার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাবে না; দ্বিতীয়ত, কয়েক হাজার মার্কসবাদী কর্মীকে মামলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

এই সব অভিযোগের উত্তরে সি পি আইয়ের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, কেরলে গত জানুয়ারী মাসে ভোটার তালিকা তৈরী হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে উপ-নির্বাচন হয়ে গেছে। ঐ উপনির্বাচনের সময় যখন ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি হয় নি তাহলে এখনই বা হচ্ছে কেন? সি পি আই আরও বলেছে যে, আসলে মার্কসবাদীরা আগামী নির্বাচনে হেরে যাবে বুঝতে পেরেই এসব সোরগোল তুলছেন।

সি পি এম অবশ্য সোরগোল তুলেই ক্ষান্ত হন নি। তারা আদালতেরও শরণাপন্ন হয়েছে। তারা সুপ্রীম কোর্টে রিটের আবেদন করেছে।

*

বদ্রীনাথ যাওয়ার পথে গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে একটি শান্ত জনপদ। নাম বেলাকুচি। পাশ দিয়ে কুল-কুল করে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গার উপনদী অলকানন্দা।

সেই বেলাকুচি আজ ধ্বংসস্তূপ। আর অলকানন্দা বয়ে যাচ্ছে তার পুরানো খাতের তিনশ ফুট উপরে নতুন এক খাত দিয়ে। বিপর্যয় বয়ে গেছে বেলাকুচির উপর দিয়ে-এবং উত্তর প্রদেশের চামোলি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার উপর দিয়ে।

সেই ভয়ংকর সন্ধ্যায় বেলাকুচিতে অপেক্ষা করছিলেন হাজার খানেক তীর্থ-যাত্রী। বদ্রীনাথের দর্শন সেরে তাঁরা নীচে নামছিলেন। অপেক্ষা করছিল তাঁদের বাস ও ট্যাক্সিগুলি।

এমন সময় শোনা গেল একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণের মত আওয়াজ। দেখতে-দেখতে অলকানন্দা ফুলতে লাগল। তার জল লাল হয়ে উঠল। পাথর ভেঙে-ভেঙে এখানে-সেখানে পড়তে লাগল। পুরুষরা দিশাহারা হয়ে ছুটতে থাকল, মেয়েরা চিৎকার করতে লাগল, শিশুরা কাঁদতে আরম্ভ করল। দেখতে-দেখতে জলের তোড়ে ভেসে গেল রাস্তার উপর দাঁড় করান ৩১ খানা গাড়ী। আর সেই সঙ্গে ভেসে গেলেন মারোয়াড়ী শেঠজী, যিনি তাঁর সঙ্গের ৫০ হাজার টাকার মায়ায় গাড়ী থেকে নামেন নি, ভেসে গেলেন সেই বাঙালী বাবু যিনি ভিজে যাওয়ার ভয়ে ঐ বৃষ্টিতে গাড়ী থেকে নামেন নি এবং ভেসে গেলেন এমনি আরও অনেকে।

বাঁচলেন শুধু তাঁরা যাঁরা জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঁচুতে উঠতে পেরেছিলেন।

সারা রাত্রি কাটল ঐভাবে। পরদিন শুধু অলকানন্দার জল সরলে ক্ষতির পরিমাণ টের পাওয়া গেল। আড়াইশর বেশী মারা গেছে, হাজার-হাজার একর চাষের জমি বিলকুল বরবাদ, চামোলি ও যোশীমঠের মধ্যে কমপক্ষে দশটি পুল নিশ্চিহ্ন, বদ্রীনাথে যাওয়ার পথের একটি বড় অংশ বেপাত্তা ইত্যাদি।

১৮৯৪ সালের পর এই এলাকায় এত বড় বিপর্যয় আর হয় নি। সেই বিপর্যয়ে তৈরী হয়েছিল গোহনা লেক, উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম হ্রদ। এবারকার বিপর্যয়ে সেই হ্রদ টন-টন কাদা, বালি আর পাথরে ভর্তি হয়ে গেছে।

এমন একটা কাণ্ড ঘটল কি করে? প্রাথমিক অনুসন্ধানে যেটুকু জানা গেছে তা হল, অলকানন্দার দুই উপনদী পটল গঙ্গা ও বিরহী গঙ্গায় একই সঙ্গে বান দেখা দিয়েছিল। বিরহী গঙ্গায় বানের কারণ অতিবৃষ্টি। পটল গঙ্গায় অবশ্য অন্য কারণ। কাঠের শিলপার এই নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে ভাটি এলাকায় চালান করা হয়। এই শিলপারগুলি জমে-জমে কিভাবে যেন নদীর পাড়ে বাধার সৃষ্টি করেছিল। সেই বাধা ছাপিয়ে পটল গঙ্গার জল যখন অলকানন্দায় পড়ল ঠিক সেই সময়ে বিরহী গঙ্গায় ঢল নামল। ফলে, এক শতাব্দীর মধ্যে এই অঞ্চলে বৃহত্তম বিপর্যয়।

৩১-৭-৭০ —পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

বিধানসভা ভাঙবার পর

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার সদস্যরা তাঁদের কর্তব্য করতে না পারায় গত সপ্তাহে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মার্চ মাসে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করায় বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও এই মন্ত্রিসভা বাংলা দেশের মানুষকে পুরো পাঁচ বছর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দিতে পারল না। চার মাস অপেক্ষা করা হল। যদি প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসেন বিকল্প সরকার গঠন করতে। প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিত্ব চলাকালেই নিজেদের মধ্যে তীব্র কলহে বহুধাবিভক্ত হয়ে যায়। কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মূলনীতি অস্বীকার করে সংখ্যাধিক্যের অহমিকা কোনো কোনো শরিক দলকে এতটা পেয়ে বসেছিল যে, শেষ পর্যন্ত কোয়ালিশনের মান-মর্যাদা রক্ষা করাই হয়ে ওঠে দুষ্কর। মুখ্যমন্ত্রী শুধু পদত্যাগই করলেন না তিনি তাঁর প্রাক্তন সহযোগী ও বিধানসভার একক বৃহত্তম দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করলেন মন্ত্রিসভাকে দলগত রাজনীতির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনে তদানীন্তন রাজ্যপালের হাত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনে কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হাত ছিল না। চৌদ্দ শরিক নিজেদের মধ্যে বনিবনা করে চলতে না পারাতেই মন্ত্রিসভার পতন হল। তারপরেও রাজ্যপাল চার মাসের সময় দিয়েছিলেন বিধানসভাকে জীইয়ে রেখে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগের অপেক্ষায়। প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল আট পার্টি এবং ছয় পার্টি জোটে। আট পার্টি জোটের মুখ্য অংশীদার সি পি আই। ছয় পার্টি জোট গঠিত হল সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে। বাংলা কংগ্রেস কোনো পক্ষে যোগ দিল না। ছয় পার্টি জোটে তার যোগ দেবার কোনো প্রশ্নই নেই। কারণ তার আসল বিরোধিতা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। কিন্তু আট পার্টি জোটের সঙ্গেও বাংলা কংগ্রেসের চলা সম্ভব হল না। কারণ আট পার্টির সদস্যরা কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থনেও কোনো প্রকার বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনেও অসম্মত ছিল। শেষ পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেস আশা করেছিল আট পার্টি জোট বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনে বাংলা কংগ্রেসের শর্তে রাজী হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় বাংলা কংগ্রেস আট পার্টি জোটে যোগ দেয় নি। তার ফলে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের কোনো সম্ভাবনা রইল না। কারণ সি পি আই, সি পি আই (এম) একত্র হয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের কোনো প্রশ্নই বাংলা দেশে আর নেই।

কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাংলা দেশের মানুষ বিপুল সংখ্যাধিক্যে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। পাঁচ বছর তাঁরা স্বচ্ছন্দে রাজ্য শাসন করতে পারতেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করলে কোনো দেশের মানুষই তা সহ্য করে না। দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত হয়ে গিয়েছিল। সংবিধানকে ভেতর থেকে ভাঙার সংকল্প নিয়ে যাঁরা রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢোকেন তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক তত্ত্বের স্ব-বিরোধিতা আজ উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার। পার্লামেন্টারি প্রথায় গণতান্ত্রিক মুক্তি সম্ভব, এই তত্ত্ব স্বীকার করে নিলে এই ধরনের কলহ শুধু অপ্রাসঙ্গিক নয়, অশোভনও। আজ সকল বামপন্থী দলের মধ্যেই চলছে সশস্ত্র কলহ। সমাজ-বিরোধীদের এখন পোয়াবারো। রাজনৈতিক মারামারির নাম করে এই দুর্বৃত্তেরা শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। এদিকে স্কুল-কলেজগুলোতেও পড়াশোনা ব্যাহত। ছাত্রদের মধ্যে আজ এক চরম বিভ্রান্তি। জনজীবনের এই সংকটময় কালে পশ্চিম বাংলায় বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হল। এতে সকল রাজনৈতিক দলই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বন্ধ্যা রাজনীতির জন্যই যে নির্বাচিত বিধানসভা ভেঙে দিতে হল সে কথা তাঁরা স্বীকার করবেন না। আবার নির্বাচনের জন্য তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দাবী জানিয়েছেন। নির্বাচন নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু নির্বাচনের আগে রাজ্যের শান্তি ফিরিয়ে আনা দরকার। রাজনৈতিক দলগুলো আবার আসরে নামবার জন্য প্রস্তুতি চালাবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, তার মধ্যে সুস্থ চিন্তা ও গণতান্ত্রিকবোধ ফিরিয়ে না আনলে নির্বাচনের দ্বারা এই রাজ্যে স্থায়ী সরকার গঠনের সম্ভাবনা খুবই কম।

দশই মে ॥

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনের ঘাটে ঘাটে
ফুল কুড়োই নি,
পাতার সবুজ দেখি নি,
যা পেতে চেয়েছিলাম
তা পাই নি,
কী পেতে চেয়েছিলাম
তা-ও জানি না :
কোন অন্ধকার অতল গহ্বরে
যেন মিলিয়ে গিয়েছে,
সব জানা-অজানা অনুভূতির বাইরে
অতীতের আর বিস্ময়ের
স্বপ্নের আর সম্ভোগের
সব রিক্ত স্মৃতির অনুরাগ :
নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়ার
হতাশ হাহাকারে,
এক স্তব্ধ রাত্রির
নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে
একটি উজ্জ্বল আলোকশিখার মতো
আমার জীবনে উজ্জ্বলতম একটি দিন

কত বিগত যুগের ওপার হতে
ভেসে আসা,
হারিয়ে যাওয়া বাঁশীর সুরের মতো
ভাস্বর একটি দিন,

স্বপ্নের নূপুর-পরা পায়ে
আলতো ছোঁয়ায়
রিম ঝিম স্মৃতির অনুরণনে
মর্মর মুখর একটি দিন

অনন্ত পথ-চলার
চির অভিযাত্রীর সামনে
অমানিশার কৃষ্ণ বিভীষিকার
ভয়াল বিহ্বলতার মধ্যে
বিদ্যুৎ চমকের মতো একটি দিন
দশই মে।

উৎসব ॥

গণেশ বসু

ঢের হলো আর নয় শব্দের বিস্তার
দরকার নেই আর বালিচর স্বপ্নের
দুর্দশা সময়ের কাছে নেই নিস্তার
তোলপাড় বাসভূমি, উজ্জ্বল লগ্নের
কণ্ঠেও ফসলের উৎসব।

কানামাছি খেললাম, আর নয় যৌবন
বিভেদের মেঘচর, দুর্জয় ঐক্যের
মুঠোতেই দিন-রাত, এ যুগের মন্থন
আর নয় নোনা জল খোড়ো-হাওয়া স্বপ্নের
উচাটন মন্ত্র বা শৈশব।

দেশজোড়া আমাদের দুঃখের বল্লম
শ্বাপদের সন্ত্রাস, ঝলকায় হাতিয়ার,
ভাঙা-বুকে, ভাঙা চিড় এ সময় প্রিয়তম
বাঁচবার সংগীত উদ্বেল দুর্দশায়
তরতাজা যৌবনমন সব।

ঢের হলো আর নয় সেই বাগবিস্তার
দরকার নেই আর সংশয়ী স্বপ্নের
দুর্দশা সময়ের কাছে নেই নিস্তার
বজ্রের হাঁক শুনি মঞ্জরী লগ্নের
সামনেই মুক্তির উৎসব
দুঃখের কান্নার উৎসব।

সেই অচেনা পাখী

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

কাউকে কাউকে নাকি
ভালবাসতে ইচ্ছে হয়
ফুটন্ত রক্তের বেগে
উচ্ছল ধারায়।
অথচ মোমের মত গলে পড়ে
সর্বাঙ্গ আগুনের ছোঁয়ায়।
কাউকে কাউকে নাকি
ভালবাসতে ইচ্ছে হয়
একান্ত আপন করে নিজের মতন।
অথচ অন্ধকার আড়ালে মুখ ঢেকে কাঁপে
বিষাদের করুণ ছায়ায়।

বুকের পাঁজরে নাকি সেই বাসা
আজো রেখেছি গড়ে সযত্নে
টুকরো টুকরো খড়কুটো দিয়ে
অনেক আশায়—
সেই অচেনা পাখীর সন্ধানে
যদি কোন দিনও তাকে পাওয়া যায়।

প্রতিমার প্রতিবিম্ব

কনিষ্ক

ওর গল্প লিখতে হবে, ভাবি নি। সত্যি কথা বলতে কি আমি জোর করে ওকে মন থেকে মুছে ফেলেছিলাম। প্রথম প্রথম দেখতাম আমি যত জোর করে, সচেতনভাবে, ওকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছি, ততই ও যেন আরো বেশি করে আমাকে অধিকার করছে। মনের এই সাপ-নেউলের [illegible] আমি কিন্তু উপভোগ [illegible]ম। বেশ নিস্পৃহভাবে, নিরাসক্ত-ভাবে ওই খেলা দেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমার মনের মধ্যে একটা নাটক অভিনীত হচ্ছে এবং আমি সেই নাটকে একসঙ্গে অভিনেতা ও দর্শক।

তারপর কখন যে তাকে ভুলে গেছি, মনে নেই। কি করে ভুলতে পেরেছি, তাও আজ মনে পড়ে না। হয়তো [illegible]ই-ই হয়। ট্রেন এগিয়ে যায়। স্টেশনগুলো [illegible] পিছনে পড়ে থাকে। পলিমাটি জমে। নতুন করে চাষ-আবাদ হয়। হয়তো এই-ই প্রাণধারণের নির্দেশ।

অথবা, সে লুপ্ত নগরী। অথবা, কোন স্তূপ। যা ছিল একদিন তাকে আবার পাওয়া যায় অকস্মাৎ। পুরাতনকে আবিষ্কার করি। আবিষ্কারের বিস্ময়ে মন ঝিমঝিম করে বাজে।

অফিস থেকে ফিরছি। বাদুড় ঝোলা হয়ে যেতে হয়। ফেরার পথে জীবন-গতি ইঁদুরের মতো পড়িমরি ছুটে ট্রাম ধরতে গা কেমন করে। তাই হাঁটি। যতক্ষণ পারি হাঁটি। সহকর্মীরা বলে, দাদা ঠিক বাড়ি করবে। ওদের কাছে মনের কথা বলা যে কতদূর বোকামি তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি বলে পাশ কাটিয়ে হাসিমুখে বলি, ইট পোড়াতে দিয়েছি। মনে মনে বলি, গাড়োল, জীবনে তেল নুনের হিসেব ছাড়া আরও যে কিছু থাকতে পারে তা তোদের কে বোঝাবে!

চিত্তরঞ্জনের বাঁকে পা দিতেই মনে হল, সে!

বজ্রাঘাত হলেও আমি এতখানি বিচলিত হতাম না। সমস্ত রক্ত মুখে ছুটে এল। কেমন যেন একটা অবাক্ত ধ্বনি কলকাতার বাস ট্রাম, গাড়ি বাড়ি, মানুষ মাছির অবিরল ধ্বনির সঙ্গে মিশে গেল।

প্রতিমা? ও কি প্রতিমা? সহসা আমার মনে দশ বারো বছর আগের এক সুগঠিত নারীর মুখ ভেসে উঠল। আমি তার সর্বাঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলাম। তার শরীরের খুঁটিনাটি, তার হাবভাব, চলা-ফেরা, হাসি, কথা বলা, কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে উদভ্রান্ত অপরাধী হওয়া—সব, এবং নিমেষে পর্দায় সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠলো।

লুপ্ত নগরী আবিষ্কৃত হল। অথবা যাকে আবিষ্কার করি সে লুপ্ত নগরী নয়, লুপ্ত নগরীর আদলে অন্য এক নগরী মাত্র, উৎস যার স্মৃতিতে, স্থিতি যার বুদ্ধিতে?

আমি স্তম্ভিত হলাম। তাকিয়ে থাকলাম।

আমার উল্টোদিকের ফুটপাতে সে। রাস্তা পার হবে। আমি ওর দিকে ফিরে আছি। বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ।

প্রতিমা! আমি ডাকবো? প্রতিমা কি আমাকে চিনতে পারবে? আমার মত প্রতিমাও কি স্মৃতির অপরূপে বর্ণায় বিদ্ধ হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তুঙ্গ কালের শিখরে দূরে! তা কি হয়? তাই যদি হতো তবে প্রতিমা আমাকে ত্যাগ করে যাবে কেন? আমাকে ছেড়ে সে চলে গেল। আমি যে—

প্রতিমা পার হতে পারছে না। পার হতে যাবে ঠিক সেই সময় ট্রাফিক সিগন্যালের বাতি সবুজ হয়ে উঠলো।

বিকেলবেলা ট্রাফিক জ্যাম হয়-ই। রাশি রাশি গাড়ি পিঁপড়ের মতো থমকে থমকে গুটি গুটি চলে। এটা যেন নিয়ম। কলকাতার নিয়ম। ট্রাম যদি আড় হয়ে পড়ে, ইদানীং যা প্রায়ই হচ্ছে, তবে আর রক্ষে নেই। অন্যদিন হলে আমি উৎসাহিত হতাম না, বিরক্ত হতাম না। কিছু ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার কিংবা চরিত্রহীন অর্থপুষ্ট ভদ্রলোক, এরা ছাড়া কলকাতায় আজকাল কারা-ই বা গাড়ি পোষে! সমাজের এই সব মহামান্য সজ্জন ব্যক্তি, আটকে পড়ুক, অথবা উড়ে যাক, তাতে আমার কি! ওরা আমার কাছে অর্থহীন, আবিলতা, জড়পুঞ্জ ছাড়া আর কিছু না। আমি ওদের সম্পর্কে উদাসীন। আজও উদাসীন থাকতে পারতাম যদি না ওকে দেখতাম। আজ আমি ট্রাফিকের মত্ততার কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রতিমা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। আমি ওকে স্পষ্টভাবে তখনও দেখতে পাচ্ছিলাম না। গাড়ির শরীর, মানুষের দেহের ছায়া, ওকে চাপা দিচ্ছিল। আর ও, মেঘের তলা থেকে চাঁদের মতো, বারবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উদ্ভাসিত হতে চাইছিল।

প্রতিমা তুমি আমাকে চিনতে পারলে না? আমি। আমি। মেয়েরা এই-ই হয় প্রতিমা। ওদের স্মৃতি বলে কিছু নেই। ওদের স্মৃতিহীন হতে হয়-ই। প্রকৃতির নিয়ম এই। তোমার কোন অপরাধ নেই। প্রতিমা এইবার নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারলে। প্রতিমা, প্রতিমার মতই একটু হেসে, চিবুকে একটা হাত রেখে, বাঁ দিকের চোখটা একটু ছোট করে, কারণ আমার যতদূর মনে পড়ে, বিস্ময় প্রকাশের এই ছিল প্রতিমার ভঙ্গি, বলবে, ও মা, তুমি! আমি অভিমান করে বলবো—যদিও জানি, প্রতিমা তুমি আমার ভালবাসা অথবা অভিমান, আমার সব আবেগ, অনুভব, সত্তা, আমার সব কিছুকে উপেক্ষা করে চলে গেছো—দেখলে তো আমিই তোমাকে চিনলাম। কি হয়েছে প্রতিমা তোমার? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

আমার মনের মধ্যে অতীত কথা বলছে। এক নিমেষে কত নির্মাণ পুনর্নির্মাণ হয়ে গেল। হরপ্পা মোহেনজো-দারো তার বিস্মৃতবিভূতি নিয়ে উপস্থিত। প্রতিমা, আমার লুপ্ত নগরী। আমি তাকে উদ্ধার করেছি।

গাড়ি, গাড়ি। এত গাড়ি আছে? এত নিদান আছে? সিঁথির কাঁচা ড্রেন যেন। কদর্য মালিন প্রবাহের বুঝি আর শেষ হবে না।

গাড়ির স্তিমিত গতির ফাঁক দিয়ে, দক্ষ মাঝির মতো নিজের শরীরকে নৌকোর মতো চোরা ঘাই পার করে, যে মেয়েটি ঠিক আমার মুখোমুখি এল, আমার চোখের দিকে সটান তাকিয়ে, নিতান্ত অনাবশ্যক হলেও বুকের কাপড় আড়ম্বর করে টানতে টানতে রাস্তার রেলিং-এর পাশে দাঁড়াল, সে মেয়েটি কিন্তু প্রতিমা নয়।

অথচ অবিকল প্রতিমা। কোথায় যেন কেমন একটা মিল রয়ে গেছে। মিলটা যে ঠিক কোথায় তাও আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি ওর দিকে তাকালাম। ও রেলিং-এ হাত দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বুকের কাপড় ঠিক করতে করতে সোজা আমার চোখের দিকে তাকালো। ওর দৃষ্টিতে কি ছিল তখন বুঝতে পারি নি। আমার সর্বাঙ্গে শিরশিরে ঢেউ জাগলো এক মুহূর্তের জন্যে। আমি চোখ নামালাম তাড়াতাড়ি। হঠাৎ আমার যেন খুব ভয় লাগলো। ভয় বা ভয়-জাতীয় একটা অনুভব।

নারী সম্পর্কে আমি [illegible] আনাড়ি নই। আমাদের স্থবির অচলায়তনের [illegible] যৌবনের চূড়ান্ত বিদ্রোহ তো নারীকে কেন্দ্র করে হবেই। আমাদের নাটক নভেল তো প্রেম ছাড়া হয়-ই না। নানা রকমের স্বাদ, কখনো কান্নার কখনো সুখের। মেয়ে-মানুষ, যৌনতা এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরুষ মানুষ এবং যৌন স্পৃহা—এই তো চরম। সেই ছলাকলা আজ আমাদের জীবনের চূড়ান্ত বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ ভারি মজার। চারদিকে গেল-গেল রব ওঠে। অথচ কিছুই যায় না। বরং আসে। আসে যশ আর অর্থ। থাকে ও সব। আমি মেয়েমানুষ সম্পর্কে একেবারে গবেট নই। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে এবং চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি এ সব কিছুই ভাবি নি। ও সব মনেও আসে নি। ওর চাহনি বোঝার মত অভিজ্ঞতা আমার আছে। তবু ও যে প্রতিমা নয় এই হতাশা আমাকে আকুল করেছিল বলে ওই দৃষ্টির অর্থ তখন আমার কাছে অর্থহীন।

ও যদি প্রতিমা হতো তাহলেও সে আমার কি হতো? আমার জীবন কি অন্যরকম হতো? আমি কি সত্যিই এমন কিছু পেতাম যা আমার জীবনকে দিতে পারতো কোন [illegible]? অনেকখানি বয়স হয়ে গেল। [illegible] প্রতিশ্রুতি ছেড়ে ফেলে [illegible] দরকার।—আমার [illegible] করার জন্যে, মনে আছে আমি এই [illegible] ধরে বেশ কিছুক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছিলাম। অথচ আমার চোখ দুটো ঐ মেয়েটিকে, যে প্রতিমা নয়, প্রতিমার প্রতিবিম্ব, তাকে অনুসরণ করছিল।

মেয়েটি আমাকে ভীত ও [illegible] করেছিল। ওর চলার ভঙ্গি প্রতিমার মতই। আমিও চলতে আরম্ভ করলাম। সমান দূরত্ব রেখে ভিড়ের মধ্যেও আমার চোখ দুটোকে ওর ওপর আটকে দিয়ে আমি অনুসরণ করতে থাকলাম।

বলতে কি আমার তখন জ্ঞানবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আমি কিছু ভাবছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমি যে বাড়িতে বাস করতাম সেই বাড়িটা যেন অকস্মাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে। আমি সেই বাড়ির ইট কাঠ চুন সুরকির ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে বার হতে আমার চেষ্টা করছি। আমার সর্বাঙ্গ ব্যথা বেদনায় ভারি হয়ে আসছে। ক্লান্তি লাগছে।

জ্ঞান বুদ্ধি সঠিকভাবে কাজ করলে আমি কিছুতেই ওই চায়ের দোকানে ঢুকতাম না। আমি আজ প্রায় বিশ বছর উত্তর কলকাতায় আছি আমি এই অঞ্চলের সব জানি। এই বিশ বছরের মধ্যে আমি একবারের জন্যেও এখানে আসি নি। আজ এলাম।

এলাম, কারণ, ওই মেয়েটি, প্রতিমার প্রতিবিম্ব, ওই মেয়েটি, এই চা-খানায় ঢুকলো। আমি অবাক হলাম। মোটামুটি-[illegible] ছিমছাম বলতে হবে তাকে। জামা-কাপড়ে চোখ ধাঁধানো প্রখরতা না থাকলেও শ্রী ছিল। গায়ের রঙ কালো হলেও সুগঠিত শরীর। অত্যন্ত সুগঠিত। সমতাপূর্ণ। কোথাও কোন শিথিলতা নেই। উদ্ধত-কোমল। ওই মেয়েটি যখন এই চা-খানায় ঢুকলো তখন আমি বেশ জোরে পা চালিয়ে ওখানে এলাম।

খুবই দরিদ্র দোকান। ময়লা। কয়েকটা কাঠের টেবিল আর বেঞ্চি পাতা। ডান দিকে তিনটে খুপরি, মহিলাদের জন্য। পর্দা ঝুলছে! পাতলা পর্দা। তারের ওপর গোটানো। পশ্চিম দিকের কুলুঙ্গিতে পর পর কয়েকটা সিঁদুর চন্দন লেপা গণেশ-মূর্তি। পশ্চিম দিকের এক পাশে ভেতরে যাবার পথ। মালিকের দু পাশে আরও একটা বড় টেবিল। পুব দিকে, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর দিকে [illegible] দিয়ে কাঠের পার্টিশানের মাঝখানে [illegible] কাউন্টারের কোণে মালিক বসে আছে। ডান দিকে ক্যাশ বাক্সো।

মালিকের বয়স হয়ে গেছে। পঞ্চাশ তো হবেই। হয়তো ষাট হবে। গায়ে জামা নেই। বুকের ওপর [illegible] পাকা পাকা লোমে মাছি বসে আছে। [illegible] ভুঁড়ি, গলায় কণ্ঠি। চোখ দুটো [illegible] লাল।

চা-খানায় পা দিয়ে আমার মনে হল এখানে না এলেই ভাল হতো। মনে হল জায়গাটা ভাল না। কিন্তু ফিরে যেতে মন চাইলো না। আমি মধ্যবিত্ত, সৎ জীবন সম্পর্কে নির্মোহ হয়েছি অনেকদিন আগে থেকেই। পরিচিত কেউ আমাকে এখানে দেখে বিদ্রূপ করতে পারে, আমার চরিত্র সম্পর্কে নানা রসালো আলাপ করতে পারে, এমন সম্ভাবনায় আমি বহুকাল বিচলিত বোধ করি না। বস্তুত পক্ষে আমি ওই সব কুকুরের ডাককে আদপে আমল দি না।

তবু আমার বোধহয় সংকোচ ছিল।

মালিক আমাকে তখনও লক্ষ্য করেনি। ওই যে মেয়েটি আমার আগে আগে এই চা-খানায় ঢুকলো এবং যে তখনও আমার দিকে পিছন করে দু বছরের এক শিশুকে বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে, যার মোটা বিনুনী নিয়ে সেই শিশুটি কামড়াতে যাচ্ছে, তাকে লক্ষ্য করে মালিক বলছে, মালতী তোর কি আক্কেল হবে না? সেই যে গেলি আর এখন এলি? তোর বাচ্চাকে

আমি কি দেখবো? আমি সোজা বলে দিচ্ছি মালতী, আসছে মাস থেকে তোকে পথ দেখতে হবে। আমি আর পারবো না। এখুনি ওই—" আমার দিকে নজর পড়তেই থামলো মালিক। একেবারে ভিন্ন স্বরে বললে, 'আসুন, আসুন।'

সেই মেয়েটি যার নাম প্রতিমা নয়, এখন জানলাম মালতী, সে আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, বাঁ দিকের বড় কেবিনে আরও দুটি মেয়ে বসেছিল। টেবিলে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল বোধহয়। তার মধ্যে একজন বাইরে এসে দুই হাত তুলে আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলতে তুলতে আমার টেবিলের কাছে এল। আমি মালিকের মুখের দিকে তাকালাম। ভাবলেশহীন মড়ার মুণ্ড যেন তার ধড়ের ওপর বসানো।

আমি বসে আছি তো বসেই আছি। সেই মেয়েটি কোন সাড়া শব্দ না দিয়ে ডান দিকের কেবিনে বসে পড়লো। আমি অপ্রতিভ হইনি। কিন্তু ভাল লাগে নি। আমার তখনও মনে হচ্ছিল এই মালতী আর সেই প্রতিমা—এদের মধ্যে কোন যোগ-সূত্র নেই। অথচ শুধু মাত্র মনে হওয়ার জন্যে, মনের মধ্যে এক মোহ সঞ্চারিত হবার জন্যে, এরা দুজনেই আমার কাছে সত্য হয়ে উঠলো।

আরও দুজন এল। সহজ ব্যবহারে মনে হল এরা এখানে অতি পরিচিত। ওরা একটা কেবিন অধিকার করতেই দেখলাম বাঁ দিকের কেবিনে টেবিলে মাথা রাখা সেই মেয়েটি বেড়ালের মত তড়াক করে উঠে হাসতে হাসতে ওই কেবিনে গিয়ে বসলো। পর্দা ফেলে দিল। এই মেয়েটিও প্রায় মালতীর সমবয়সী। সুদেহী।

ডান দিকের কেবিনে যে মেয়েটি বসে ছিল সে এবার উঠে রান্নাঘরের দিকে গেল।

আমি বসে আছি। ভাবলেশহীন মালিকের মুখ। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে সন্ধ্যা নামলো।

কিছুক্ষণ পরে মালতী এল। এর মধ্যে তার বেশভূষায় একটু পরিবর্তন হয়েছে। তাতে তার রূপ বাড়েনি। বরং কুৎসিৎ হয়েছে।

মালতী বললে,—কি দেবো?

চা।

শুধু চা?—টেবিলের ওপর আঙুল মটকাতে মটকাতে বললে মালতী। আমি তাকালাম। মালতীর চোখে মুখে হাসি। 'আর কিছু খাবেন না?'

আর কি আছে?

যা খেতে চাইবেন।

যা খেতে চাইবো? পোলাও কালিয়া—

কথা শেষ করতে পারিনি। পাশের কেবিনের সেই মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়ে পর্দার ওপার থেকে বলছে, 'ও মালতী দি' তোর খদ্দেরের সোহাগ যে আর ধরে না—

কান গরম হল। মালতীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। হঠাৎ সে ধমক দিয়ে বললে, 'থাম, অত ঢলানি ভাল নয় নন্দা।'

মালিকের ধ্যান ভাঙলো যেন এইবার। একটু নড়ে চড়ে বসলো। গলা থেকে একটা আওয়াজ বার হল, 'হুম।'

এই সেই মালতী। মালতী, যে প্রতিমার প্রতিবিম্ব।

ওই দিন মালতীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই রকম মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আগে হয়নি। আমি অন্য জাতের মেয়েদের জানতাম। কিন্তু মালতীর সঙ্গে প্রতিমার কোথাও একটা মিল খুঁজে যদি আমি না পেতাম, মালতীকে দেখে যদি আমার অতীত, আমার স্মৃতি, আমার সুন্দর ক্ষত যদি অকস্মাৎ জেগে না উঠতো, আমি কিছুতেই এই দোকানে আসতাম না। এখানে খেতাম না, যদিও, সত্যি বলতে কি, এখানে খেতে আমার ঘেন্না করছিল।

আমি মালতীর জন্যে এসেছিলাম। তারপর থেকে প্রায়ই আসি। মালতী তা বুঝতে পেরেছিল। মালতী তাই আমার টেবিল থেকে ওঠেনি। আমার ঠিক উল্টো দিকে বসেছিল। সারাক্ষণ বসে ছিল। দোকানে খদ্দের ছিল না। খদ্দের আসার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন। কলকাতা ভেসে যাচ্ছিল।

আমি মালতীকে বলেছিলাম, আমি খাব আর তুমি আমার সামনে বসে থাকবে, এ কেমন কথা?

এই তো ভাল।

আর ওরা তো খাচ্ছে, তোমাদের নন্দা আর—

ওদের কথা আলাদা। নন্দারা যাদের সঙ্গে বসে খাচ্ছে তাদের আমরা আর খদ্দের বলে মনে করি না।

ওরা কি আপনার লোক হয়ে গেছে?

মালতী হাসতে হাসতে বললে, ঠিক তাই। ওরা এখানে এত আসে যে ওরা প্রায় এই দোকানের লোক হয়ে গেছে। আপনিও যদি রোজ রোজ আসেন—

রোজ রোজ?

কেন? আসতে নেই নাকি? আমরা কি এত খারাপ? বদনাম হবে? এই তো আপনার ফেরার রাস্তা।

আমার ফেরার কোন বাঁধা-ধরা রাস্তা নেই, মা, মা—

মালতী।

মালতী বলেই ডাকবো? আমার যথেষ্ট সংকোচ ছিল।

মালতী হেসে গড়িয়ে পড়লো। অনুমতি চেয়ে আমি যেন বোকার মত কাজ করে বসেছি।

অপ্রতিভ হলাম। মালতী সত্যিই প্রতিমার প্রতিবিম্ব। প্রতিমা ঠিক এইভাবে কত লোকের সামনে কতবার আমাকে হাসতে হাসতে পথে বসিয়েছে। আমি রাগ করেছি, লজ্জা পেয়েছি, অপমানিত হয়েছি। প্রতিমা কিন্তু কোন দুঃখ প্রকাশ না করে পরম ঔদাসীন্যে বলতো—ওমন বোকার মত কথা বল কেন?

আমি মালতীর মুখের দিকে তাকালাম। মালতী বাইরের অবিরল বৃষ্টিপাতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে গেল, এর জন্যে আমি অবশ্য কিছু মনে করিনি। এখানে ভদ্রলোক বড় একটা আসে [illegible] তাদের কাছে—

কিছু মনে করো না মালতী।

পাগল নাকি! আপনি যদি আর না আসেন তবেই মনে করবো। মনে করবো আপনি ঘেন্না করে পালিয়ে গেলেন।

আমি ছাড়া আরও বহু খদ্দের আসবে—

দোকান চলছে। খদ্দের তো আসবেই। তবে—

মালতী কথা শেষ না করে উঠে গেল। আমি মালিকের মুখের দিকে তাকালাম। একভাবে বসে আছে। অবাক লাগলো।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একজন এল। মালিক চঞ্চল হল। কাউন্টার ছেড়ে বাঁ-দিকের কেবিনের দিকে গেল। যে লোকটা ভিজতে ভিজতে এসেছিল সে এক তাড়া নোট বাড়িয়ে দিল। মালিক নোটের বান্ডিল নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজলো।

খেঁকিয়ে উঠলো লোকটা, [illegible] রাখ, হারামজাদা মাগী মারায় যম। দেখে, আমার সামনে গোন।

তিন হাত জুড়ি নাচিয়ে খেক খেক করে হাসলো মালিক।

লোকটার গলার আওয়াজ পেয়ে ছিটকে বাইরে এল কেবিনের বসা বুড়ো লোক। ওরা যেন এতক্ষণ এরই প্রতীক্ষা করছিল। ওকে ঘিরে দাঁড়াল।

তুই মাইরি এত ভাবনায় ফেলিস—

হায়রে শালা, নন্দাকে যে ভাবতে ভাবতে হেদিয়ে গেল—

নন্দা খিল খিল করে হাসলো।

মালিক ট্যাঁকে হাত দিয়ে ওদের দিকে চেয়ে চোখ নাচাল। ওরা এক নিমেষে রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যে এসেছিল, সে এবার বললে, আটাশ নম্বর ভাল তো? বাইরে যাবে।

ভাল মানে—মালিক থামলো।

লোকটা আমাকে লক্ষ্য করলো এইবার। আমি ওর দিকে তাকালাম। চোখে চোখ রাখতেই আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল।

ওরা কেবিনের ভিতর বসে নিচু গলায় কি যেন বলছে। আমি উঠবো-উঠবো করেও বসলাম। এই বৃষ্টিতে বার হয় কার সাধ্য! আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরালাম। ওই লোকটার দৃষ্টি এড়াতে আমার এত খোঁজ! আমার বুঝতে কষ্ট হল না যে, এই চায়ের দোকান গোপনে

গোপনে বেআইনী কারবার চালায়। আমি কোন বেয়াড়া জায়গায় এসে পড়েছি।

দোকানের মালিক উঠে গেল।

কেবিনের ভিতর থেকে সেই লোকটা এবার চিৎকার করে বললে 'ও মালতী, গরম গরম এক কাপ লাগাও। শীতে যে কাঁপুনি এল।'

রান্না ঘরের ভিতর থেকে মালতী জবাব দিল, 'তোমার শীত চায়ে যাবে না রাজুদা। যাতে যাবে তা নিয়ে যাচ্ছি।

সত্যি মালতী তোমায় এই জন্যই এত

একটু পরে দোকানের মালিক ওই কেবিনের কাছে গিয়ে চুপি চুপি কি যেন বললো। মালতীর রাজুদা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। এক মিনিট বসলো না। যাবার সময় আমার দিকে তাকালো না। মালিক আবার কাউন্টারে বসলো। যারা রান্নাঘরের দিকে গেল তারাও আর এল না। দোকানে জনপ্রাণী নেই যেন। সবুজ টিউব লাইট দপ্ দপ্ করছে।

মালতী আমার জন্যে এক কাপ চা হাতে করে আনলো।

কি করে যে বাইরে জড়তা কাটাতে আমি বললাম।

বাইরে রাস্তায় তো [illegible] নিশ্চয় [illegible] না [illegible] —মালতী আমার পাশে বসতে বসতে নিচু গলায় বললে, খারাপ লাগছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

বাজে কথা। মিথ্যে কথা। বললে মালতী। আপনারা এই মিথ্যে কথা বলেন কেন?

মিথ্যে নয় মানে—

মানে প্রশংসা না দিয়ে পারলে বাঁচেন। আর কোনদিন এ মুখো হবেন না। তাই না— মালতী মুখ নিচু করে বললো।

সত্যি বলছি, মালতী। আমি তো প্রায়ই আসবো রোজ রোজ।

আসবেন? মালতী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো। মালতীর চোখ বড় দেখিনি। মালতীর চোখের তারা হরতর করছে। সহসা চোখ নামিয়ে ধরা গলায় বললে, জানেন আপনি কি ভাবছেন। নানা কথা ভাবতে পারেন। আপনাকে সত্যি কথা বলি। এই দোকানে আমি ছ মাস আছি। অথচ এই ছ মাসের মধ্যে এমন একজনও এল না যে ঠিক আমার জন্যেই এখানে আসে। এরকম হলে এ সব লাইনে থাকা যায় না। মালিকও আমাকে রাখবে না।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম চা দিকি বরে তো আর এ দোকান চলে না। আমি সামলে নিলাম। স্বাভাবিক গলায় বললাম, তোমার জন্যে কেউ আসে না?

মুখে কালো হল মালতীর। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, কেউ না। নন্দারা তাই আমার নামে কত কি বলে।

ওদের জন্যে অনেকেই রোজ রোজ আসে বুঝি?

যারা আসে তাদের আমার পছন্দ হয় না।

আমাকে পছন্দ হয়?

মাথা নেড়ে মালতী জবাব দিল, জানি না।

বড় মিষ্টি লাগলো। এইখানে কি প্রতিমা মালতীর মুখে নেমে এল? আমি ভাল করে দেখলাম না। কোথাও প্রতিমার ছায়া নেই। প্রতিমা বলেছিল, আমি কিছুই অস্বীকার করতে চাই না। আমি তোমাকে ভালবাসি একথা আমি অস্বীকার করতে যাবো কেন? কার ভয়ে?

প্রতিমা অস্বীকার করলো শেষ পর্যন্ত। কার ভয়ে? এই প্রশ্নের উত্তর আমার অজানা। প্রতিমার সঙ্গে কোন দিন দেখা হলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম—কার ভয়ে তুমি অস্বীকার করলে আমাকে?

মালতী আমার দিকে তাকিয়ে। অসহায় চোখ। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। পকেট থেকে দু টাকার নোট টেবিলের ওপর রেখে আমি উঠে বললাম, আসবো।

বৃষ্টি মাথায় আমি নিচে নামছি। আমাকে ধাক্কা দিয়ে আমারই সমবয়সী সুদর্শন একজন টলতে টলতে আসছে। বোঝা যাচ্ছে সে আর নিজেকে সামলাতে পারছে না। এক মুখ দাড়ি। অনেকটা চে গুয়েভারা টাইপের। ঝাঁকড়া চুল। গায়ের রঙ ফর্সা। নাক বেশ তীক্ষ্ণ। দেখেই মনে হয় চেহারার মধ্যে ধার আছে। চুল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। দাড়িতে জলের কণা। তার ওপর আলো পড়েছে। ঝিকমিক করছে।

আমি সরে গেলাম। মালতী আমার চেয়ারের পিঠ শক্ত করে ধরে নিজেকে সামলে নিচ্ছে। যে মালতী আমার মুখের দিকে তার চোখ মেলে দিয়ে বসেছিল এ যেন সেই মালতী নয়। ও এক অন্য মালতী। সব কিছু ছাপিয়ে ওই এক নিমেষে ফুটে ওঠা মালতীর মুখ আমার স্মৃতিতে বিদ্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু সে কথা ভাবার সময় ছিল না আমার। আমি পথে নেমে এলাম। আসবার সময় মালিকের কথা কানে এল, মালতী, আমি ওকে টাকা দিতে পারবো না।

মালতীর সঙ্গে এইভাবে আমার পরিচয়। এই পরিচয়ের সূত্র ধরে আমি এগিয়ে গেছি। কাছে এসেছে মালতী। কয়েক দিন যাওয়ার পর আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমি ওদের একজন হয়ে গেছি। একদিন না এলে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে ওরা যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। আর ওরা বুঝে নিয়েছে যে, ওদের গোপন ব্যবসা সম্পর্কে আমার উৎসাহ নেই। আমি যদি সহযোগী নাও হই, ওদের ক্ষতি করবো না।

ব্যাপার কি জানেন? থানার সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে। তবে ওদের খাঁইয়ের তো অন্ত নেই। টাকার দরকার পড়লো তো চালাও 'রেড'। তখন ছাড়াতেই পাঁচ সাত শ' জল। দোকানের মালিক হরিদাস বাবু আজকাল এইসব কথাও বলে।

মালতী আসে। মালতী বুঝতে পেরেছে আমি তার জন্যেই রোজ রোজ আসি। নন্দা সহ্য করতে পারে না। একদিন মালতী রান্নাঘরে ছিল। নন্দা আমার জন্যে চা এনে কানের কাছে মুখ রেখে বললে, আমি তো আপনার চা আনলাম। আজ আমার বরাতে আছে।

কি আছে? চায়ের কাপটা কাছে টেনে বললাম। আজকাল আমি জড়তা বোধ করি না।

মালতীদির হাতে আজ—

মালতী কি তোমাকে মারে নাকি?

হিংসেয় মরে। আপনি ছাড়া ওর জন্যে আর কেউ আসে না তো। তাই সব সময় আপনাকে আগলে রাখে। ভাবে এই বুঝি আমি ছোঁ মেরে নিয়ে গেলাম। আপনিই বলুন তো কে ওর কাছে আসবে? এক ছেলের মা তুই, তোর বয়সের গাছ-পাথর নেই। তাই না? নন্দার চুল আমার মুখে লাগছে।

নন্দা তোমার আর কে আছে?

মা বাবা ভাই বোন সবাই আছে।

তুমি কতদিন এই খানে, এই দোকানে আছো?

আপনাকে বলতে যাবো কেন? আপনি কি আমাকে বিয়ে করবেন? নন্দার ভ্রূ কুঁচকে এল।

হাসতে হাসতে বললাম, ধর, যদি করি—

আমি বিয়ে করবো না। মরে গেলেও না। এই বেশ আছি। বিয়ে করে এই মালতীর মতো মরবো নাকি?

মালতী কি মরেছে?

এর চেয়ে মরণ ভাল। মালতীদির মতো ছেলেপিলে হবে আর জ্বলে-পুড়ে মরবো। ছেলেপিলে হরিদাসদা পছন্দ করে না। দিন-রাত ভ্যা ভ্যা করে কাঁদে। আর মালতীদির স্বামী রোজ আসবে। টাকা দাও মদ খাবো। এমন বিয়ের মুখে আগুন।

তুমি বিয়ে করবে না একেবারে?

করবো, তেমন যদি পাই। তখন [illegible]ব করতে হবে না। গাড়িতে হেলান দিয়ে -

রোজ রাতে তো বারে যাও। কাউকে পাওনি?

ওরা থাকে না কণিষ্কদা। বেশ্ত আছে ঐ বড়লোকদের ছেলেগুলোর। ওরা বাবা বড় সেয়ানা। বেহুঁস হয় না।

মালতী আসতেই নন্দা চলে গেল। যাবার আগে পিঠের বিনুনি বুকের কাছে ফেলে হাসতে হাসতে বললে, নাও, নাও, তোমারটিকে আমি খাইনি। দ্যাখো—

নন্দা ইয়ার্কি করার চেষ্টা করলেও সহজভাবে নিতে পারলো না মালতী। ওর মুখ কালো।

আমি বললাম, বসো।

মালতী বসলো না।

খাস কলকাতার বুকে বট গাছের ছায়ার ভিতরে এমন নির্জনতা আছে, তা কখনও বুঝতে পারিনি।

আমার কথা কানে যাচ্ছে না মালতীর। বাধ্য হয়ে চুপ করলাম।

হঠাৎ মালতী বললে, টাকা আছে?

কত?

যা হয়।

পকেটে একরাশ কাগজের ভাঁজে প্রায় লুকিয়ে রাখা জীর্ণ দশ টাকার নোট বার করতেই আমার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে রাস্তার দিকে গেল মালতী।

আমি বোকার মতো বসে থাকলাম। সব দেখেছে নন্দা। আমার চেয়ারের পিঠে বুক ঠেকিয়ে বললে, স্বামীকে মদ গেলাতে চললেন সতী। ওমন বিয়ের মুখে মারো ঝাঁটা। মুড়ো ঝাঁটা। নন্দার কণ্ঠ চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ছে। হরিদাসদা বলে দিয়েছে এক পয়সা দেবো না। খোরাকিতে কাজ করতে চাও তো করো। না পোষায় তো পথ দ্যাখো। এই বাজারে খোরাকি! তাই বা মন্দ কী! তারপর যোগাড় করে নাও—

মালতীর সঙ্গে সম্পর্কটা এমন সহজে গিয়েছে যে এক কথায় দশ টাকার নোট বার করে দিতে আমার কিছু মনে হয়নি। আগেও দিয়েছি, তবে দু এক টাকা। মালতী বলেছে শোধ দেবে। শোধ দিতে পারেনি। আমিও চাইনি। প্রতিবার টাকা নেবার সময় আগের দাবগুলোর কথা বলতো মালতী, আর আমিও বলতাম, থাক ও পরে হবে।

মালতী প্রতিমা নয়। প্রতিমা কখনো মালতী হতে পারে না। তবু আমি কিন্তু মালতীকে প্রতিমার সত্তা থেকে আলাদা করতে পারিনি। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, এ কি আত্মপ্রবঞ্চনা? মালতীর সঙ্গে সহজভাবে মিশতে সংকোচ হচ্ছে বলে কি আমার মন এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছে?

জানেন কত বড় শয়তান ওই লোকটা? বলছে নন্দা।

কোন্ লোকটা? আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

কার ধ্যান করছেন? মালতীদির? কোন্ লোকটা? ওই স্বামীটা গো।

আমি নন্দার দিকে তাকালাম।

লোকটা মালতীদিকে বলেছিল সে নাকি নাম-করা লোক। মস্ত বড় লোক। টাকা পয়সাও আছে। আর তুই, তুই তোর বৌকে দিয়ে এইসব কাজ করাচ্ছিস? বিষ খেয়ে মরতে পারিস নে। তোর বৌ গতর ঘামাবে তোকে খাওয়াবার জন্যে? মরণ? মরতে পারিস নে!

নন্দার মুখ ঘৃণায় কুঁচকে এসেছে। আশ্চর্য, মালতী তো এমনভাবে ভাবে না! মনে হল যে কষ্ট পাচ্ছে সে মালতী নয়, নন্দা।

মদের দোকানে নিয়ে গেলাম। যেতে কি চায়? জোর করে টেনে নিয়ে গেলাম। ওমা, সেখানেও গোমড়া মুখি হয়ে বসে থাকলো। পুরুষ মানুষ খেটেখুটে একটু আমোদ আহ্লাদ, ফুর্তি করতে এল। তোকে তো সে রকম হতে হবে। ও রকম মুখ দেখলে লোকে ঘেঁসবে কেন? বড় ঘরের কয়েকজন আমাকে বললে, নন্দা, এক রাত্তিরের জন্যে কাউকে যোগাড় করে দিতে পার? আমি যেতে পারবো না। তা মালতীদিকে দিলাম। কি করলে জানেন?

কি?

কুইনিন-গেলা মুখ করে তো গেল। ওমা, ওরা বললে, নন্দা তুমি যেতে যদি না পারো, যেও না। কিন্তু ও রকম মেয়ে মানুষ আর পাঠিও না। আমি বললাম, কেন? কি হল? ওরা বললে, গিয়ে অবধি ছেলে আর ছেলে। সব সময় উসখুস, উসখুস। কেন, কি ব্যাপার? না ছেলে কাঁদছে হয়তো। ছেলেকে কে খাওয়াবে। তা এত স্বামী পুত্তুরের শখ তা এখানে কেন? ও দিকে হরিদাসদা আর বসে থাকবে না। রাজুদার মনটাও ভাল। মালতীদির অবস্থা দেখে রাজুদা বাচ্চাটার জন্যে ওষুধ এনে দিয়েছে। আসকালে যাওয়ার আগে মালতীদি তাই ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে যায়।

কেন হরিদাস বাবুর আবার কি হল? ওষুধের কথা শুনে আমি ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলাম। কিন্তু ও কথা আমার কানে যায়নি এমন ভান করলাম।

ও মা, ওর স্বামীর আবার সব গুণ আছে। হরিদাসদার কাস ভেঙেছিল যে। হরিদাসদা জেলে পাঠাতো। মালতীদি পা ধরে কত সাধ্য সাধনা করলে। এদিকে হরিদাসদার মনটা বাপু বড় ভালো। গলে গেল। মালতীদি বললে, দাদা যা পাবো তার থেকে দিয়ে দিয়ে তোমার টাকা শোধ করে দেবো। তা যাই বলুন, মালতীদি কথার মানুষ। কিছু কিছু দিচ্ছে।

মালতী এসব কথা আমাকে কখনও বলে নি। আমি জিজ্ঞাসাও করতাম না। এই সব কথা ওর মুখ থেকে শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি ওর মধ্যে প্রতিমাকে খুঁজে পাই। আর আমার স্মৃতির কবরে যে প্রতিমা শায়িতা সেও কিন্তু লাঞ্ছিত হয়। তবু আমি যাই। আমি নিয়মিত যাই। আমি ওদের একজন।

একদিন বিকেল নাগাদ যেতেই চঞ্চল হয়ে মালতী বললে, 'তুমি এসেছ? ভাল হয়েছে। আমার একটা উপকার করতে হবে, লক্ষ্মীটি। না করতে পারবে না। বলো, বলো' আকুল হয়ে আমার হাত ধরলো মালতী।

নন্দা চোখ দিয়ে ইশারা করলো। কি বলতে চাইলো আমি বুঝতে পারলাম না। মালতী যে খুবই বিব্রত তা বুঝতে পারছি। বেশভূষাও করেছে। কানের কাছে এক গাদা সস্তা পাউডার। গিল্টি করা হার চিক-চিক্ করছে।

আমার কথা বলার আগেই নন্দা বললে, ওই জন্যে তোমাকে কাজ দিতে নেই মালতীদি। যাও, যাও, বেরিয়ে পড়। এখুনি অফিসের ভিড় আরম্ভ হবে। ট্যাকসি করতে হবে। গোটা চারেক টাকা [illegible] পারে।

আমার হাত ধরে তখনও মালতী বলছে, কথা দাও।

দিল তো বাবা! ঝংকার দিল নন্দা। বল তো কাণ্ডকদা।

বেশ তো, বল না কি করতে হবে।

আমি বলছি সব। তুমি যাও। নন্দা প্রায় টেনে বার করছে মালতীকে।

নন্দা, সোনার বোন, খোকন উঠলে খেতে দিস। ওষুধ খাইয়ে গেলাম। খাইয়েছি। উঠবে না। তবু যদি ওঠে দেখিস ভাই।

ওখানে গিয়ে আবার খোকা-খোকা করো না। ওখানে গিয়ে এমন ভাব দেখাবে যেন ওদের ছাড়া তুমি আর কিছু জানো না।

মালতী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো। শেষ ট্রেনে না হয় যাবো। তোমাকে নিয়ে যাবো। এত রাতে একা যাই যদি ওরা ভাববে—কানাকানি হয়েছে তো। সত্যি নাকি নেই। তবু—'

মালতী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো। এর চেয়ে মালতী যদি কাঁদতো ভাল হতো। মালতী নেই। মালতীকে গিলে নিয়েছে কলকাতা।

তুমি না করো না দাদা।

কিসে না করবো না বল? আমি বিরক্তি চাপতে পারলাম না। এরা কি ভাবে আমাকে? আমিও পুরুষ মানুষ সে কথা এরা বোধ হয় ভুলে গেছে।

কি আবার! বিপদের সময় যদি—

কার বিপদ? কি বিপদ?

কার আবার! ওই হতভাগীর। খবর এল মা মর-মর। বাপের পক্ষাঘাত। বাড়ি যাবে তা কি নিয়ে যাবে? তাই দুর্যোধনকে বলে কয়ে ঠিক করা হল।

কে দুর্যোধন?

তাতে আপনার কি দরকার! একটা লোক। —একটু ঢোক গিলে বললে, 'ওইসব খোঁজ-খবর আনে। যোগাড় করে দেয়। ও সব আপনি বুঝবেন না।

অন্তরঙ্গ হল নন্দা। নিচুগলায় বললে, 'এসব লাইনের লোক। ওকেও দিতে হয়। একশ টাকা দেবে বলেছে। তাও কি দেবে? ত্রিশ-চল্লিশ বড়জোর। দুর্যোধন কম করে দশ টাকা নেবে। ওর নাম দুর্যোধন না। আমরা ওই বলে ডাকি।

কোথায় গেল?

কোথায় আবার? ফেলাটে। যে বাবুদের বাইরে যাবার ধক নেই অথচ পাপ করার শখ আছে, তাদের কাছে। তিন চারজন ভদ্দরলোক মদ খাবে আর ফুর্তি করবে। আমি ওদের ওখানে গেছি। ওদের দুজন আবার কলেজে পড়ায়। একজন কাগজে লেখে। একজন মাছের আড়তদার। বৌ আছে। তবুও—

বেশ। এ আর নতুন কিছু নয়। এখন আমাকে কি করতে হবে।

মালতীদিকে পৌঁছে দিতে হবে।

মালতীর বাড়ি! সোদপুরে নেমে আরও তিন মাইল—

আপনাকে যেতেই হবে।

কেন? একা যেতে পারবেন না? পথে কি কেউ ওর অপমান করবে? আমার ভিতরে আচমকা আক্রোশ ফুটে উঠছে। ওসব কথা শুনলে—

আমি আরও কিছু বলতাম। এই সময় ওদের গোপন কারবারের কয়েকজন এসে হাজির হল। ব্যস্ত হয়ে পড়লো নন্দা আর হরিদাস। আমিও চলে এলাম।

মেসে শান্তি পেলাম না। বুঝলাম অকারণ আক্রোশ যত অশান্তির কারণ। অনুশোচনা হয় নি। বিরক্তি লাগছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত বিশ্ব সংসারকে লাথি মেরে কাত করি। সিনেমায় ঢুকলাম। হিন্দি বই। সবই আছে। তবু তৃপ্তি নেই। আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না। মালতীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? কিছুই না। তবু আমার ওপর ওর যেন অধিকার জন্মে গেছে।

আমি আবার গেলাম সেই চায়ের দোকানে। দোকান বন্ধ। বুঝলাম কোন বিন্দু পেয়ে নন্দা গেছে অন্য কোথাও। পিছনের পথ দিয়ে গেলাম হরিদাসের পাশের ছোট খুপরিটায়। এটাই ওদের ঘর। সাড়ার ... যখন দরকার পড়ে সেই বারান্দার কাছে একটা চৌকি পাতা। তারপরে আর পা ফেলার জায়গা থাকে না চৌকির ওপর থাকে মালতীর শিশু। এর জন্যে অবশ্য হরিদাসদাকে টাকা দিতে হয়। মালতীর শিশু সন্তানকে তখন চালান করা হয় রান্না-ঘরে। ঘুমিয়ে থাকলে রাখা হয় চৌকির তলায়। আমিও এই ঘরে এসেছি। আত্মীয়তা হবার পর আমি এখানে বসেই গল্প করি। যেহেতু আমি কোন দিন এখানে হাত-পা ছাড়িয়ে গল্প-গাছা করি নি, তাই আমাকে কোন দিন টাকা দিতে হয় নি। হরিদাসদা জানে বলে আমাকে বলে, বাবাজী।

মালতী তখনও ফেরেনি। মালতীর শিশু সন্তান ঘুমাচ্ছে। কয়েকটা হাড়। সাদা মুখ। কোথাও এক বিন্দু রক্ত নেই যেন। কপালে গালে কয়েকটা মাছি বসে আছে। আমি ওর পাশে বসলাম। ওর বাবার কথা ভাবছিলাম।

মালতী এল। আমি ওর দিকে তাকালাম। মালতী যেন নড়া পুড়িয়ে এসেছে।

তোমার ওপর অত্যাচার করছি। আমার তো কোন অধিকার নেই। তুমিও বা কেন আমার অত্যাচার সহ্য করছো? তুমি যদি আমার কাছে কিছু চাইতে তবে আমার এত গ্লানি থাকতো না। মালতী মুখে আঁচল চাপা দিল।

কেন আমি তোমার কাছে কিছু চাইতে পারি না? আমি মাথা নিচু করে ভাবলাম। সংকোচ জড়তা আসে কেন? আমি ব্রহ্মচারী নই। তবু কেন এই ক্ষেত্রে আমি উত্তেজিত হতে পারি না?

কত লোকের মন রেখে টাকা রোজগার করতে হয়। তোমার মন তো রাখি নি। তবু সেই তোমার কাছেই আমার ধার শুধু যাট সত্তর। এই ধার আমি শোধ করবো কি করে? আমি কি এতই—মালতী কথা বলতে পারছে না।

ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকে তুলে বললাম, চল মালতী।

শিশুটির দুর্বল ফুসফুসের ধ্বনি আমার বুকে ধাক্কা খাচ্ছে। আমার সর্বাঙ্গ টলে উঠছে। মাতালের মতো লাগছে।

ওর বাবা আজ আট-দশ দিন কোথায় যে গেল—

তোমাকে বলে যায় নি?

ও এরকম করে। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। টিনের সুটকেশের তলা থেকে নোট বার করতে করতে বললে মালতী।

শিশুকে বুকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমি বললাম, তাহলে আর ভাবনা কিসের?

না, ভাববো আর কি! ওর বাঁচা-মরা আমার কাছে এক কথা।

এই নাকি।

আমার কণ্ঠের বিদ্রূপ আর অবিশ্বাস বুঝতে পারে নি মালতী। তাই নিজের মনেই বললে, আমি সেদিন জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

তুমি? আমি স্থাণু।

সেদিন এসে বললে। তোমাকে যেতে হবে মালতী। আমি আগেই টাকা নিয়ে নিয়েছি। না গেলে আমার মান-সম্মান সব যাবে। বোঝ, নিজের বৌকে নরকে পৌঁছে দিচ্ছে, তার আবার মান-সম্মান! আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ও আবার হাসতে হাসতে বললে, তোকে তো দুর্যোধনকে টাকা দিতে হয়। সেই টাকা তুই না হয় আমাকে দিলি। আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। এই চটি দিয়ে বেশ ঘা কতক দিলাম।

শিশুটির দুর্বল ফুসফুস আমার বুকে হাতুড়ির ঘা মারছে।

তারপর থেকে ওর আর পাত্তা নেই। নন্দা বলে, তুমি কি ভেবেছো ওই আপদ এত সহজে যাবে? এত পুণ্যি তুমি করো নি। দ্যাখো জুয়ার আড্ডা থেকে হয়তো গিয়ে উঠেছে বৌবাজারের লক-আপে। অথচ এর হাত ধরে ঘর-সংসার ত্যাগ করেছিলাম। তখন ও কাজ করতো কারখানায়। যাকগে চল।

এই দুঃখে আমি কেন জড়িয়ে পড়লাম? হাসি এল নিজের কথায়। এই কম্মাস আমি

তবু কোথাও বসতে পারছি। নিজেকে ছাড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি। এরা না থাকলে আমি কি করতাম? কলকাতার মেসের সেই নির্বান্ধব জীবন, আতঙ্কিত রাত্রি আর বিরক্তিকর দিন, আমার বিভীষিকা।

রাত্রির কলকাতা। ফাঁকা পথ। কতটুকু বা শিয়ালদা? আমরা হাঁটছি। আমার বুকের ওপর ঘুমন্ত শিশুর হৃদপিণ্ডের ধ্বনি অপরূপ যন্ত্রের মতো বাজছে।

তোমাকে কষ্ট দিলাম। এমনিতে তো মনে থাকতো না। তবু মনে থাকবে। কি বল? মালতী আমার পাশাপাশি যেতে যেতে বলছে। মুখের দিকে চোখ মেলে দিচ্ছে।

প্রতিমার মতো তুমি প্রতিমা নও। আমি মনে মনে বলি। তুমি যদি প্রতিমা হতে আমার এই রাত্রি অবিনশ্বর হয়ে থাকতো। তোমার ওপর আমি প্রতিমার সত্তা আরোপ করতে পারছি না। মিথ্যা হবে। তবু মালতী তুমি প্রেমিকার ভূমিকায় এসো না। তার চেয়ে এই আছি, আমার সাধ্য মত এই যে তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি, এই কি অনেক নয়? জানি কালো স্রোত, স্রোতের ঘূর্ণি আমাদের ডুবিয়ে দেবে। হাজার অদৃশ্য হাত আমাদের গলা টিপে টেনে নিয়ে যেতে থাকবে আরো অন্ধকার পাতালের দিকে। সেই দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে, ক্ষিপ্র জলের অরাজক আবর্তে, গর্জনে, আমাদের অন্তিম কণ্ঠস্বর যদি পরস্পরের নাম ধরে ডাকে। তাই কি যথেষ্ট নয়? সেই উত্তরবিহীন ডাক দিগন্তের দিকে হেঁটে যাবে। আমরাও মুছে যাবো। এই তো, মন্দ কী!

তোমার কথা আমি কিছুই জানি না। কত লোক নিজের কথা বলে। দুঃখের কথা। মালতী হাসলো।

নির্জন পথে মালতীর হাসি আমাকে যেন ছুরি মারলো। অথবা মালতী নিজেই নিজেকে। ছুরিকাবিদ্ধ করছে?

আমাদের কাছে মনের কথা! তুমি যদি আমার কাছে কিছু চাইতে আমি

বাঁচতাম। তোমার কাছে এলে মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। তুমি এমন কেন? মালতীর কণ্ঠে অভিযোগ।

আমি তোমার কাছে কি চাইতে পারি মালতী?

কিছু কি নেই?

শরীরের ওপর আমার খুব বেশি আকর্ষণ নেই।

মালতী মুখ নিচু করলো। আমি অবাক হলাম আমি সত্যিই ওকে এত ঘৃণা করি? কেন আমি ঘৃণা করবো? ওর সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই।

সত্যি? মালতী মুখ নিচু করে কুণ্ঠিত স্বরে বলছে।

আমি সামনের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছি। মালতীর শিশু আমার বুকে। এ কি ঘুমন্ত না মৃত? মনে হচ্ছে মালতীর কঙ্কালসার শিশু যেন অপরিমিত ভারী। আমি যেন বইতে পারছি না। তোমাকে আমি কি সত্যিই চাই? না। কি চাই? চাই বোধহয় এক প্রচণ্ড কলরব। আমি বেঁচে আছি এই বোধ হারাতে চাই বোধহয়। চারপাশে বাড়ি দোকান মনে হচ্ছে পাথরের। মনে হচ্ছে কোথাও প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই। কোথাও কোন অনুভব অনুষঙ্গ নেই। অথচ অনুভূতির বিজ্ঞাপন চোখ ধাঁধায়।

তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে?

কেন?

সারাপথ খোকাকে বুকে করে নিয়ে এসেছো তো—

তোমার ছেলে বড় ঘুমকাতুরে। কিছুতেই জাগে না। এ এত ঘুমায় কেন?

মনে হল মালতী হঠাৎ চমকে উঠে চারপাশ ভাল করে দেখে নিল।

এমনি। বড় রূপেন তো। ও বাবা, ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে। মালতী শব্দ করে হাই তুললো। 'যাদের কাছে গিয়েছিলাম তারা সবাই নামকরা লোক। ওরা কত কথা বলে।

অবান্তর আবর্জনা। হাইড্রান্ট খোলা জল টগবগ করছে।

তুমি ঘড়ি কেনো না কেন?

টাকা নেই।

কি চাকরি কর?

হো হো করে হেসে বললাম, 'জামা কাপড়, ট্যাঁকের অবস্থা দেখে তুমি এখনো আন্দাজ করো নি?

মালতী চুপসে গেল। কিন্তু হাসি যেন আমাকে পেয়ে বসেছে।

এমনভাবে হাসছো কেন? তুমি ভাবছো জেনে নিচ্ছি সব যেন ভাল ভাবে দুয়ে নিতে পারি? এই কথা ভাবছো তো? আমার যদি অন্য কোন উপায় থাকতো— মালতী রাগের মাথায় অনেক কথা বলে যাচ্ছে।

বড় দেরি হল আসতে। কোন ট্রেন নেই।

চল ফিরে যাই। আমার আর দেখা হল না। মৃত্যুর সময় মার মুখে জল দিতে পারলাম না। হয়তো আমার মত পাপীর জল মুখে নেবে না বলে এমন হল। মালতী আত্মকরুণায় পূর্ণ।

কাল যেও।

হ্যা। তাই করবো।

মালতী, আমি তোমার মতো একটা মেয়েকে ভালবাসতাম। তার নাম প্রতিমা।'

তাই বুঝি? সেও কি এই কাজ করে? সে কোথায়?

সে এ কাজ করে না বোধহয়। বহুযুগ আমি তার খবর রাখি না। সে বোধহয় মারা গেছে।

আমাকে দেখে তোমার বুঝি তার কথা মনে পড়লো?

মালতী তুমি প্রতিমা হলে না কেন?

দূর! তা কি করে হবো?

ভাল হতো। আমি হয়তো বাঁচতাম।

তুমি বিয়ে কর না কেন?

তুমিও তো বিয়ে করেছো।

আমার কথা আর তোমার কথা। তুমি কত বড়।

বড়?

বড় না? তা ভিন্ন কেউ কি এমন করে—। আজকাল স্বামী তার বৌ-এর খোঁজ রাখে না। তুমি আমার যা উপকার করছো—

সেই হাসি আবার আমাকে পেয়ে বসলো।

তুমি ওমন করে হেসো না। আমার ভয় করে। তুমি তো নিষ্ঠুর নও।

আমি চেষ্টা করে হাসি থামাতে পারছি না। আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে মালতী চাপা স্বরে বললে, চুপ করো না গো। লোকে কি ভাববে বল তো?

লোক? লোক কোথায়? লোক নেই আর। এখন কলকাতায় সব সরীসৃপ। কথা-বলা, তর্ক করা, ভান-করা, মিছিল-করা সরীসৃপ।

দাও ওকে দাও। মালতী জোর করে তার শিশুসন্তানকে কেড়ে নিল। সংগে সংগে মনে হল আমার বুক বড় হালকা। বড় শূন্য। সেই শূন্যতায় ঘূর্ণি উঠেছে। আমি চমকে থেমে গেলাম।

কলকাতা। আমার জীবন। রাত্রি। পাথর। চৌমাথার মোড়ে একটা পাগলী কাপড় খুলে পতাকার মতো হাওয়ায় মেলে দিয়েছে। আমার যেন অকস্মাৎ দিকভ্রান্তি হল। বললাম,—কোথায় যাবো বল তো?

মালতী বুঝতে পারলো না। সহজ ভাবে বললে, মেসে না যেতে চাও আমাদের ওখানে চল।

তোমাদের ওখানে?

চল না।

রাত কত? জানি না। আমি সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার পাশে মালতী। আমি চোখ খুললাম। রান্নাঘরের পাশে সেই খুপরি। সেই তক্তপোষ। মালতীর বিছানা। মালতী অভ্যাস মত তার শিশুসন্তানকে মাটিতে শোয়াতে চেয়েছিল। আমি তাকে আমাদের মাথার কাছে রেখেছিলাম। সেই শিশু কি এখনো ঘুমচ্ছে? মালতী বলেছিল, তুমি এত ভাল, তুমি এত ভাল কেন? আমি ভাল হতে চাই না। মালতীকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম। আকাশে নক্ষত্র ছিল। আমি পচা কাঠের হিম গন্ধ পাচ্ছিলাম। মালতীর বুকে হাত দিয়ে প্রতিমার কথা ভেবেছিলাম। মালতীর বুকে নষ্ট পদ্মের মতো। আমি মালতীকে ভাবি নি। আমি প্রতিমাকে ভেবেছিলাম। সেই মালতী আমার পাশে শুয়ে আছে। আবার সংগে সংগে আমি ঘৃণা করেছিলাম। মনে হচ্ছিল ও পাংশু মৃত বেড়াল। মেসের চৌবাচ্চায় [illegible] ডুবে, বাঁচার জন্যে মরীয়া হয়ে, চেষ্টা করতে করতে, ডুবে মারা গিয়েছিল, সেই বেড়াল। আমি তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিলাম। হাত নয় যেন ঠাণ্ডা হিম মাংসপিণ্ড। মালতী ঘুমের ঘোরে আমার হাত তুলে নিল। আমি মাথা উঁচু করে দেখলাম মালতীর মুখ। পাংশু, নির্জন, বিবর্ণ। ভূতে পাওয়া মাঠ। মাঠে হাওয়া নেই। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কলকাতা ঘুমোচ্ছে। দরজা খুললাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস মুখে থাবা মারলো।

ঘুম ভেঙে গেল মালতীর। আমি বাইরে। ছাই-এর গাদা ডিমের খোলা, চায়ের গুঁড়োর পাশে হাঁফাচ্ছি। পাঁচ ফলার একটা নক্ষত্র আমার মুখের কাছে জ্বলে জ্বলে করছে।

ভোর হল নাকি? এর মধ্যে ভোর হল?

না। তুমি ঘুমাও।

চল, এখনি বেরিয়ে পড়ি।

কোথায়?

ওঠো, [illegible] যাবো না? তোমার [illegible] না। [illegible] তুমি তুলে নিও।

আমাকে আকাশ চাপা দিচ্ছে। নক্ষত্র বড় কাছে। আমি তাকাতে পারছি না। ঠাণ্ডা হাওয়া আমার মুখ ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে—রাস্তার মরা ইঁদুরকে কাক যেমন ঠুকরে ঠুকরে খায়। আমার বুকে কোন উত্তাপ নেই।

খোকা এত ঠাণ্ডা কেন? ওগো দে[illegible] এত ঠাণ্ডা কেন? তোমার পায়ে পড়ি [illegible] বার দেখে যাও!' মালতী চিৎকার করে উঠলো। স্পিডোমিটারের কাঁটার মতো হরহর করে উঠলো পাঁচ ফলার নক্ষত্র। আমার পায়ে শিকড় গজিয়েছে।

পরশু দিন খোকা বড় কাঁদছিল। আজ তাই বেশি করে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলাম। তাই কি—। ওরে খোকা রে— মালতী আছড়ে পড়লো।

আমি এক লাফে বাইরে এসে পড়লাম। মনে হল গলি খাওয়া বাঘিনী আমাকে তাড়া করছে। আমি প্রাণপণে দৌড়তে থাকলাম। আমাকে তাড়া করছে। সেই চিৎকার আমাকে তাড়া করে ছুটে আসছে। রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়লাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আবার আমি ছুটছি কলকাতার হৃদয়ের দিকে—বাকসর্বস্ব ক্রোধ, চিৎকার, হল্লা, মিছিল, বিপ্লব, সংস্কার সংস্কৃতির পচা কচ্ছপের খোলের ভিতরে।

সুখের মেলা

বেদেনীর ফাঁদ

'দাত ভাল, ব্যথা ভাল, কানের পুঁজ ভাল।'

বেদেনী দুটো মেয়ে দীর্ঘলয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে পাড়ার পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কিছু দূরের সামনের মাঠে তারা তাঁবু গেড়েছে কদিন হল।

আনন্দ দেখলে মেয়ে দুটির মধ্যে একটির গড়ন চমৎকার। চোখ দুটো বড় বড়। কালো শামলা রঙ। গায়ে লাল খাটো একটা কুর্তা। নাভির গর্ত সমেত সুডৌল পেটটা বেরিয়ে আছে। পরনে একটা ঘাগরা। বুকের ওপর দিয়ে কোমরে জড়ানো একটা পাতলা চেলি। অন্য মেয়েটির দেহ খাটো—ঈষৎ পাতলাটে। লালচে কটা চুল। তার পরনে একখানা খাটো ধুতি। গায়ে ব্লাউজ নেই। দুটো ডাণ্ডার মধ্যে ঝলানো দুজনের পিঠের দিকে দুটো করে তালপাতার ঝাঁপি। তার মধ্যে ওদের শিকড়-বাকড়, ওষুধপত্তর।

আনন্দ বললে, 'এই, আমাদের বাড়ি যাবি? আমার মায়ের পায়ে বাত আছে, সারিয়ে দিবি?'

'হাঁ বাবু, কেনো নাই যাবে? তু কেতনা পইসা দিবি?' যৌবনপ্রমত্তা বেদেনীর চোখের তারায় যাদু আছে। সে নাগিনীর মতন হেলে-দুলে কোমর নাকায়।

আনন্দ চাষীর ছেলে হলেও সভ্যশান্ত, লেখাপড়া জানে। দেখতেও তাকে ভাল। যুবতী বেদেনীর চোখের দৃষ্টির মধ্যে লোলুপতার নেশা দেখে আনন্দ বুঝতে পারে কম পয়সাতেই ও যাবে। তাই বলে,

'তুই কত দিবি তাই বল।'

'এক রুপিয়া দিব।'

'ধুৎ হবে না, যা শালী।' আনন্দ চলে আসবার ভান করে।

'গালি না দিবি বাবু! ভদ্দর আদমী আছিস তু? হামারে দিবি তো দুরুপিয়া লাগবে, হাঁ! বেদেনী রহস্যময়ীর মতন চোখের হাসি, মুখের হাসি মিশিয়ে যেন আহ্বান জানালে আনন্দকে।

বললে, 'তবে আয়। মায়ের বাত সারাবি এক রুপিয়া পাবি আর তোর চেহারা দেখাবি আর এক রুপিয়া পাবি।' বেদেনী দুজন সঙ্গে সঙ্গে এল আনন্দর। বড়টাকে শুধোলে, 'তোর নাম কি?'

'হামার নাম ইংলি, অ্যার নাম বি আছে মুংলি।'

'ইংলি! বেশ নাম। তোর সাদি হয়েছে।'

'নাই বাবু। মরদ নাই।'

ওরা আনন্দর বাড়িতে এল। আনন্দ মাকে তার গেঁটে বাত দেখাতে বললে। তার মা দাওয়ায় পা মেলে বসতে ইংলি পা দুটো টিপে-টাপে দেখলে। আনন্দর মা সারদা দাসী উ-আ করে চেঁচাতে লাগল যন্ত্রণার জায়গায় হাত পড়াতে।

ইংলি তার ঝাঁপির মধ্যে থেকে একটা কালো মতন তেলের শিশি বার করে তেল ঢেলে মালিশ করতে লাগল আর তাদের দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব মন্তর আওড়াতে লাগল।

পাড়ার সমস্ত ছেলেমেয়ে, বউ-ঝিউড়িরা জুটেছিল বেদেনীদের দেখতে। আধঘণ্টা ধরে মালিশ করা আর মন্তর পড়ার পর সত্যই নাকি বাতের উপশম হয়ে গেল সারদা দাসীর।

একটা মেয়ের কানের পাঁজও টেনে বার করে ওষুধ লাগিয়ে দিলে। দুজনকে দুটো শিশিতে করে ওষুধ দিলে।

ইংলি বললে, 'হামারা নাচ দেখাব—তুরা পইসা দিবি? 'ঝাপু' খেলাব—পইসা দিবি?'

সবাই রাজি। সবাই মিলে আরো আট আনা পয়সা দেবে বললে।

তখন নাচ শুরু হয়ে গেল দুজন বেদেনীর। পিঠে ছড়ি মেরে আর একটু এগিয়ে যায় আবার পিছু হাঁটে। মাঝে মাঝে কোমর দোলায়। অশ্লীল ভঙ্গি করে। সায়া তোলে খানিকটা। সবাই তখন খিলখিল করে হাসে।

আনন্দ ঘরের মধ্যে লুকিয়ে জানালা দিয়ে সেই নাচ দেখছিল। তারা ঝাপু খেলছিল অদ্ভুতভাবে ডিগবাজি খেয়ে। দুজনে জড়াজড়ি করে। তাদের অশ্লীল নাচ দেখে সারদা দাসী বলল, থাক বাবা, তোদের উড়োন খামটা রাখ!'

কিন্তু বেদেনীরা এবার গান ধরলে!

'ঝাংলি গাঙ কেরায়া ভাঁট
আদমী বনশী বজায়া রে
কানাই তুহার ডেরা কাঁহা রে!...
দি-দি দি-দি হুম তারিয়া হুম তা
ছা-ঘিন ঘিন খাড়ুয়া ঝুমেঝুমা...
নাগ টিলা নাগ টিলা
জাঁখন্দুরে জান নিলা
বেউলা রাণ্ডী আঁসু গিরা রে...
ঝাংলি গাঙ...বনশী বাজায়া রে'

ওদের নাচ থামল যখন সন্ধ্যা হয় হয়।

সারদা একটা নারকোল, একসরা চাল, দুটো আলু, একটা সুপুরি, চারটে পান আর একটা টাকা দিলে। ওরা খুব খুশী। পুঁজ সারানো মেয়েটির জন্যে তার মা একটা টাকা আর একখোরা মুড়ি দিলে। নাচের জন্যে আট আনা পয়সা দিলে সবাই চাঁদা তুলে।

দাওয়ায় বসে সারদা দাসীর পা দুটো আবার দেখবার ছল করে ঘরের মধ্যে কি কি জিনিসপত্র আছে দেখছিল। পান সেজে দিতে ওরা খেলে। তারপর ওরা চলে গেল।

হাতে টর্চ নিয়ে আনন্দও ওদের পিছু নিলে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত। সন্ধ্যার মুখেই থালার মতন চাঁদ উঠছে পুব-আকাশ আলো করে।

ওরা মাঠের পথে নামল। দূরে মাঠের মাঝখানে ওদের তাঁবু। মশালের আলো জ্বলছে সেখানে। ওদের গায়ে একবার টর্চ মারলে আনন্দ। ইংলি ফিরে তাকালে। আনন্দ ডাকলে তার নাম ধরে।

ওরা দাঁড়িয়ে গেল।

কাছে এল আনন্দ। হঠাৎ সে কিছু বলতে পারলে না। ইংলি তার হাত ধরলে। বললে, 'আয় বাবু ডেরামে।'

'তোর সাদা গোঁফঅলা বাপ আছে, তাকে আমার ভয় করে!'

ইংলি আর মুংলি দুজনেই হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। ইংলি বললে, 'হামার বাপ উ বহুত ভালা আদমী আছে রে বাবু! চল্ চল্ চল্ না।'

ওদের মনে কি ছিল কে জানে, ইংলি আমনধানের শূন্য ক্ষেতের সবুজ ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে আনন্দর গলায় একটা হাতে বেড় দিয়ে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলল। মুংলি চলেছে এগিয়ে এগিয়ে। তার হাতে বোঝা। দুটো খুঙি, ইংলির চোলতে বাঁধা চাল নারকেল, আলু। ইংলি শুধু একটা সায়া আর খাটো কুর্তা পরে আছে।

আনন্দ উত্তেজিত হয়। ওর শরীরে হাত দেয়। ইংলি বলে, 'রুপিয়া দে।'

আনন্দ পকেট থেকে আর একটা টাকা দেয়।

ইংলি তখন দাঁড়ায়। চাঁদের দিকে মুখ করে। আনন্দকে হাত দিয়ে খানিকটা পুব-দিকে পৌঁছিয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে।

কিন্তু এর বেশি নয়। ইংলি বলে, 'যা, শালা বাবু! কুত্তা হাঁকরে দিব।' তারপর হাসলে ইংলি।

তবু পায়ে পায়ে গেল আনন্দ ওদের তাঁবুর কাছে। নারী দেহের দুরন্ত এক আকর্ষণ তার মাথা গোলমাল করে দিয়েছে।

একটা মশাল জ্বলছে। গোটা ছয়েক শুয়োর শুয়ে পড়ে আছে গায়ে গায়ে। দুটো মোষ। একটা কুকুর। দুটো ভেড়া। কতকগুলো হাঁস-মুরগী একটা খাঁচার মধ্যে। কয়েকটা গিনিপিগ। একটা মুখ কোঁচকানো অথর্ব বুড়ী হুঁকোয় তামুক টানছে। গোঁফ-সাদা গলায় পেতলের তক্তি-বাঁধা খাটো মোটা মজবুত চেহারার বুড়োটা ইংলিদের আনা চাল নারকোল-গুলো খুলে দেখে খুশী হয়। মুড়িগুলো খেতে আরম্ভ করে গাল গাল করে সকলে। আর একটা মাঝারী বয়েসের লোক—তার দুটো কানে চারটে মাকড়ি—সে একটা বঁটি পেতে বসে ইঁদুর না কি যেন কাটছে। তার গালে মুড়ি দেয় মুংলি।

আর একটা বাচ্চা ছেলে নারকোলের মালায় করে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চুপ করে একটা ভোড়িতে বসে রইল আনন্দ। শুধু সাপের ভয় তার। বৈশাখ মাস। সারাদিন গরমের পর এই সন্ধ্যার বাতাসে সাপগুলো বেরুবে এবার।

কুকুরটা ডেকে উঠল আনন্দকে লক্ষ্য করে।

ছুটে আসতে লাগল। ইংলি আতু-আতু শব্দ করে কুকুরটাকে ডেকে নিলে। ইংলি তো হলে জানে আনন্দ এসেছে। তখন আনন্দ পায়ে-পায়ে ওদের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়াল। কী আর করবে বেটারা।

ওরা সবাই একচোখ দেখলে।

ইংলি তার বাপ আর দাদীকে বললে যে, ওদেরই বাড়ি থেকে চাল আর টাকা এনেছে। বাবু খুব ভাল লোক। আর কি সব যেন ফুসফাস করে যুক্তি করলে।...

বুড়োটা বসতে বললে। বসে পড়ল আনন্দ। সিগারেট দিলে তাকে। বুড়ী একটা চাইলে। তারপর ইংলি মুংলিও নিলে। যে লোকটা ঝলসানো ইঁদুরের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কুঁচো ছিল তাকে মুংলি সিগারেট খাওয়াতে লাগল চিৎ হয়ে পড়ে। বোঝা গেল, লোকটা মুংলির স্বামী। আর বাচ্চা ছেলেটা ওদেরই। ইংলির বোধহয় স্বামী নেই।

ওরা ভাত রান্না করলে মাটির ঢেলার ওপরে মাটির হাঁড়ি বসিয়ে। তারপর একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বসিয়ে তাতে একটু সর্ষের তেল ঢেলে, পিঁয়াজ লঙ্কা কুচোনো আর নুন দিয়ে ইঁদুরের মাংস কষতে লাগল ইংলি। আশ্চর্য! কলকল করে দুটো ইঁদুরের মাংসের তেল বেরিয়ে পাত্রটা ভরে গেল। তারপর তাতে আলু কুঁচিয়ে ফেলে দিলে। নারকোলটা ভেঙে একটা যন্ত্র দিয়ে কুরে কুরে দিতে সেই তরকারীর মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর দুটো শশা। দুটো বেগুন। তারপর জল ঢেলে দিলে। তরকারী ফুটতে লাগল। উনুনের আগুনে ইংলির খোলা সুডৌল বুক আর পুরুষ্ট মুখ দেখা যাচ্ছিল। সে বারবার আনন্দর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। হেসে হেসে কটাক্ষ হানছিল। আবার সকলকে সিগারেট দিলে আনন্দ। তারা খুব খুশী। বুড়ো দাড়ি ধরে চুমো খেল। আর হাতে একটা সিকি দিলে আনন্দ। বুড়ী তামুক কিনবে, বেবাক খুশী।

তরকারী রান্না হলে সেগুলো সবই ভাতের মধ্যে ঢেলে দিলে ইংলি। তাদের তাহলে পোলাও রান্না হচ্ছে! ভাতের মধ্যে আবার ডালও দিয়েছিল আগে।

বুড়ো বললে, 'হামারা বেদিয়া আছি বাবু। ঘর নাই, ডেরা নাই। সিথল গাঁয়ে হামাদের আদি বাস ছিল। রাজা বিক্রমা-দিত্যের সময়ে হামারা ভোজবিদ্যা দেখাতুম। এখন হামারা দ্যাশে দ্যাশে ঘুরি। মহিষ শুয়ার চরাই বিক্রি করে দিই। বাত, বেদনা, সাপে কাটার ওষুধ বিক্রি করি। মইয়ার সাদি দিলাম, সাপে কাটল উ বি মারা গেল। ও বি জামাই আছে—মুংলির বর। শালা, কানে কালা আছে। ও বুঢ়ী হামার মাই আছে। এ লেড়কা মুংলির।'

এরা ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে পালায় বলে শুনেছে আনন্দ। কিন্তু সেকথা মনে হলেও কিছু আর বললে না। বললে, 'তোমরা সাপ খাও?'

'হাঁ বাবু, দাঁড়া-সাপ খাই। ব্যাঙ, চুয়া মানে ইঁদুর, গোসাপ, খরগোস, বোঁজ, কাঠবেরালী, ভাম, বাদুড়, পাখী—ইসব হামারা খাই।'

একাঙ্ক্ষীর গন্ধ পেলে আনন্দ। খানিকটা নিয়ে তাদের 'পলান্নের (পলান্ন) সংস্কৃত) উপর ছড়িয়ে দিলে। তারপর ডোবা থেকে ইংলি আর মুংলি চান করে এল। কাপড় ছেড়ে রেখেই চান করে এসেছে, কেন না আগের সায়া আর কুর্তাই ইংলি আর মুংলি পরেছে আবার।

ওরা খেতে বসে গেল। অনেকটা করে খায় সবাই।

ইংলি খেতে খেতে বললে, 'আয় বাবু— তু খাবি আয়।'

আনন্দ হাসলে। বললে, 'তোমরা খাও।' ওদের খাওয়া হতে পান সাজতে বসল।

ইংলির বাবা শুয়ে পড়ল। শুয়োর-গুলো মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে। বুড়ীও শুয়ে পড়ল। তাঁবুর মধ্যে শুলে মুংলি আর তার বর আর ছেলেটা। একটা খেজুরপাতার চাটি পেতে বাইরে বসল বেদেনী ইংলি একটা তালপাতার বিরাট ছাতার নিচে। আনন্দকে ডাকলে, 'আয় বাবু বসু, হামার কাছে।'

আনন্দ চটিটাতে চেপে বসল। আস্তে শুধোলে, 'তোমার বাপ কিছু বলবে না?'

'না। হামারা স্বাধীন আছি। তু হামার বনশী শুনবি বাবু?' বলে তাঁবুর মধ্যে থেকে একটা আড়বাঁশি বার করে এনে চাঁদের দিকে মুখ করে বসে পিঠে চুল এলিয়ে বাঁশি বাজাতে লাগল ইংলি।

অপূর্ব সে বাঁশীর সুর! কি তার কথা!...তার বাঁশির সুরে সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল। সুরের মধ্যে বেদনার মূর্ছনা যেন গভীর। স্বামীর কথা কি ভোলেনি ইংলি!

চাঁদ যখন আকাশের মাথায় উঠে এসেছে তখন ইংলি আনন্দর হাত ধরে সোজা মাঠ পার হয়ে একটা জাঙালের এপারে চলে এল। তারপর আনন্দকে ধরল নাগিনী বেদেনী আর মেতে উঠল যেন মাতঙ্গিনীর মতন। ভোর পর্যন্ত তাকে যেন পাগল করে রেখে দিলে। বচের মতন কি একটা শিকড় তাকে খাইয়ে দিয়েছিল ইংলি, তারপর যেন নেশা ধরে গেল!... হঠাৎ ইংলির বাপ হাঁক মারতে ইংলি ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল তাদের তাঁবুর দিকে। বললে, 'বাবু মনে রাখিস।'

চাঁদ যখন ডুবু-ডুবু—একটু পরেই সকাল হবে, আনন্দ বাড়িতে ফিরে মায়ের কান্না শুনে বোকা বনে গেল।

সারদা বললে, 'ওরে বাবা, তুই সারা-রাত কোথায় ছিলি? ঘরে সিঁদ দিয়ে সব সোনাদানা টাকা কড়ি চোরে নিয়ে গেছে!'

ঘর দেখে গাল হাঁ হয়ে গেল আনন্দর। হঠাৎ তার সন্দেহ হল বেদেদের। ইংলি কেন তাকে সরিয়ে রেখেছিল অতক্ষণ? তখন কি মুংলি, তার বর আর ইংলির বাপ এসে সিঁদ কেটে মাল-জাল টাকা সোনা বার করে নিয়ে গেছে?

সে তখনি মাঠের দিকে পা বাড়ালে।

গিয়ে দেখলে বেদেরা সেখানে নেই। গত রাতের রান্নার উনুন পড়ে আছে। পড়ে আছে কলাপাতা আর মহিষ শুকরের নাদি।

কোনদিকে তারা গেছে?

ইংলির দুরন্ত যৌবনের ফাঁদে পড়ে তাহলে কি আনন্দকে সব হারাতে হল! চোখের হাসিতে কেন কেউটে খেলা কর-ছিল বেদেনীর এখন বুঝতে পারলে আনন্দ। তারা কোন দিগন্তের ওপারে চলে গেছে এখন কে জানে।

—আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বন্ধুর চোখে সুভাষচন্দ্র

পার্লামেন্টের সদস্য এবং ভূতপূর্ব আই সি এস গোষ্ঠীভুক্ত বিখ্যাত চিন্তা-নায়ক শ্রীযুক্ত সি সি দেশাই একদা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। তখন তিনি বয়সে তরুণ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তখনই বেশ খ্যাতিমান। দেশাই এবং সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিন বছর একত্রে কাটিয়েছেন। কেম্ব্রিজের কাল সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠনের প্রস্তুতির কাল, সেই কারণে এই বিশেষকাল সম্পর্কিত যে কোনো রকম তথ্যই অতি মূল্যবান মনে হয়। শ্রীযুক্ত দেশাই সম্প্রতি লিখেছেন "কর্মযোগী সুভাষ"। এই রচনাটি নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুভাষচন্দ্রের জীবনের সেই এক সংকটময় মুহূর্তে, তাঁর চিত্তে জেগেছে দেশ স্বাধীন করার উন্মাদনা, আই সি এস পরীক্ষায় সম্মানের আসন পেয়ে তা তিনি ছিন্ন পাদুকার মতো ত্যাগ করেছেন। এই যে সিদ্ধান্ত এর পিছনের ইতিহাসও চমকপ্রদ। শ্রীযুক্ত দেশাই 'কর্ম-যোগী সুভাষের' মধ্যে সেই সব কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে 'সুভাষচন্দ্র'কে অবলম্বন করে অনেকগুলি বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের জনপ্রিয়তা অসীম। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের অসীম আগ্রহ আছে জানি তাই শ্রীযুক্ত দেশাই লিখিত 'কর্মযোগী সুভাষ' থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

'সে এক দিন, ভবিষ্যৎ যুগের নেতার জীবনের উন্মেষকাল। আমি তাকে সেই কালে যেমনটি দেখেছি এবং পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে তিনি যা প্রমাণ দিয়ে গেছেন তা থেকে বলতে পারি সুভাষচন্দ্রের যদি ১৯৪৫-এ অকালে শোচনীয় তিরোধান না ঘটত তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা ভিন্ন পথে পরিচালিত হত, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আজ ঘোর অরাজকতা।...

পণ্ডিত নেহরুর তুলনায় সুভাষচন্দ্র এক প্রচণ্ড আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে জনচিত্তে সুগভীর রেখা-পাত করতেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অনু-পস্থিতিতে নেহরু সুযোগ পেয়ে আঠারো বছরকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়ে গেলেন। নেতাজী অনেক দিক থেকে পণ্ডিত নেহরুর বিপরীত ছিলেন। নেতাজীর পদযুগল ছিল মাটিতে আর পণ্ডিত নেহরু ছিলেন আকাশচারী। শূন্যে উড্ডীন থাকতেই আগ্রহ। নেতাজী বাস্তব-বাদী, পণ্ডিতজী স্বপ্নবিলাসী।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের কালে আমরা নেহরুর চেয়ে নেতাজীর মত একজন বলিষ্ঠ মানুষই কামনা করেছিলাম। সদার প্যাটেলের উপস্থিতির সুযোগ ছিল স্বল্প-কালিক। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্যাটেল সাহেবের লোকান্তরের পর নেহরু নিরঙ্কুশ হয়ে তাঁর ঘরে ও বাইরে অবাস্তব নীতির যথেচ্ছ প্রয়োগ সুরু করলেন। সমকক্ষ আর কোনো ভারতীয় নেতা না থাকায় তিনি অপ্রতিহত ভঙ্গীতে নিজের খেয়াল মাফিক কাজ করেছেন।

নিজস্ব মনোভংগী অনুসারে ব্যবহারিক বাস্তবতা বিবর্জিত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন তার ফলে তার স্বদেশ অর্থনীতির দিক থেকে এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নেতাজী ছিলেন এক নির্মলচরিত্র দেশ-প্রেমিক, তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান স্বাভাবিক উদ্বেগ হল ইংরাজকে স্বদেশ থেকে হটানো। এই প্রাথমিক লক্ষ্য সফল করার প্রয়োজনে নেতাজীর কাছে কোনো রকম ত্যাগ স্বীকারই অসম্ভব ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামে মন-প্রাণ নিয়োগ করার জন্য তিনি বিরাট সম্ভাবনাময় আই সি এস থেকে পদত্যাগ করলেন।

আই সি এস ছাড়ার সময় ৩৫০ পাউণ্ড যা তিনি ষ্টাইপেণ্ড হিসাবে পেয়ে-ছিলেন তা ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন উঠল: তাঁর পরিবারভুক্ত কেউ এই টাকা দিতে রাজী নয়, কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন সুভাষ-চন্দ্র চাকরীতে যোগ দিক। আমরা তখন একত্রে থাকি, সুভাষ আমাকে টাকার কথা বললেন। আমার টাকা ছিল আমি দিলাম, আমিও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করতাম, কিন্তু সুভাষচন্দ্র এমনই অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁর মনোভংগী এতই স্পষ্ট যে টাকাটা দিতে এতটুকু ইতস্ততঃ বোধ করিনি। আই সি এস ত্যাগ করে ভারতে ফিরেই সুভাষ আমাকে এই টাকা ফেরৎ দিয়েছিলেন।

সাধারণ বিচারে এই ঘটনাটি অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে। কিন্তু নেতাজীর ক্ষেত্রে সেই সংকটের কালের অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনের এক প্রাথমিক সংকল্পপূরণেও কত বাধা, তাঁর দৃঢ়তার মধ্যে স্বদেশসেবার জন্য আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের গোড়ার দিকের ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করলে স্বাভাবিক এবং সমীচীন মনে হবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত।'

এরপর শ্রীযুক্ত দেশাই সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন এবং ওটেন-পর্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিপ্লবী কিশোর হিসাবে সেই কালেই সুভাষচন্দ্র বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে চিহ্নিত হয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত দেশাই লিখছেন—

'আমি বোসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য কিনা। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই। সুভাষচন্দ্র স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন, তাঁর কোনোরূপ স্খলন হলে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি সদাই প্রস্তুত। অনেক মানুষ সুবিধার জন্য মিথ্যাকেও সত্য বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু নেতাজী অন্য মানুষ।

এরপর সুভাষচন্দ্রের বিলেতযাত্রা এবং আই সি এস পর্ব সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেশাই বলছেন—

'সুভাষচন্দ্রের জনক জননী তাঁকে এই আশীর্বাদ করিয়ে দেন যে, তিনি ভালো করে পড়াশোনা করবেন এবং আই সি এস পাশ করবেন। সুভাষচন্দ্র আই সি এস পাশ করে পারিবারিক প্রতিশ্রুতি পালন করলেন। কিন্তু নির্বাচনের কালে তাঁর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগল। আই সি এস শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় যে প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করতে হয় সেই স্বাক্ষরদান কালে তাঁর মন বিদ্রোহ করল। তাঁর বিবেচনায় এটা দাসত্বের প্রতিশ্রুতিদান এবং সেই কারণেই তিনি পদত্যাগ করলেন। বাড়ির সবাই অসন্তুষ্ট হবেন জেনেও তিনি সংকল্পে অটল রইলেন।'

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেশাই বলছেন—

'ইংলণ্ডে আমরা একত্রে আহার করতাম। সময় কাটাতাম, একত্রে থাকতাম। আমি দেখেছি সুভাষ বসু অল্পকথার মানুষ, স্পোর্টস বা পাঠসূচী বহির্ভূত কাজকর্মে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। এমনকি পড়াশোনার ব্যাপারেও কঠোর শ্রম করতে দেখিনি। তথাপি তিনি যে অত বেশী নম্বর পেয়ে আই, সি, এস পাশ করলেন, এ তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি ও দৃঢ় মানসিক গঠনের জন্য সম্ভব হয়েছিল। সবাইকার সঙ্গে যে তিনি অবাধে মেলামেশা করতেন তা নয়। তাঁর পছন্দ করা একটি নির্বাচিত গোষ্ঠী ছিল। আমি এই গোষ্ঠীর নামকরণ করেছিলাম—

"the famous foursome"

আমাদের গোষ্ঠীতে ছিলেন দিলীপকুমার রায়, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আমি এবং সুভাষ। আমাদের অনেক রকম আলোচনা হত, কিন্তু সুভাষ যখনই ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কোনো কথা বলতেন, তাঁর কথায় এমনই আন্তরিকতা ভরা থাকত যে, সে সব বাক্য ম্যাজিকের মত কাজ হত। আমি যদিও আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে আই, সি, এসের কাঠামোর ভিতর রয়ে গেলাম। দিলীপকুমার রায় এবং ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সুভাষের প্রভাবে আই, সি, এস-এ পদাঘাত করলেন। দিলীপকুমার রায়ের সংগ্রহে আমাদের বন্ধু চতুষ্টয়ের একটি সুন্দর ফটোগ্রাফ আছে।'

শ্রীযুক্ত দেশাই এরপর স্বদেশে ফিরে সুভাষচন্দ্র যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার কথা বলেছেন—

'স্বদেশে ফিরে সুভাষ তাঁর প্রাণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কর্ম অর্থাৎ স্বদেশ সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। বক্তৃতা দিয়ে, মিছিলে যোগ দিয়ে, বয়কট ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি অহিংস অসহযোগী হিসাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন এবং বৃটিশের দমননীতির শীকার হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে তার ক্লেশ ভোগ করেছেন। কিন্তু তিনি বুঝলেন যে অহিংস নীতিকে একটা দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যুক্তিসংগত নয়, এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য একটা সশস্ত্র বাহিনী সংগঠন করা দুর্নীতি নয়। যে সব দেশের জনগণ বিদেশী শাসকদের হাত থেকে স্বদেশকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে সফল হয়েছেন তাঁদের ইতিহাস ভালোভাবে পাঠ করেছেন এবং বুঝেছেন 'ভারতবর্ষ একটি ব্যতিক্রম নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন এবং মহাত্মা গান্ধী সুভাষের মত সমর্থন না করায় সুভাষ মহাত্মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীযুক্ত দেশাই নেতাজীর অকাল তিরোধানের ফলে দেশের কি দুর্দশা ঘটেছে তার বিশদ বিশ্লেষণ করে নেহরু ও নেতাজী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সেই অংশটুকু তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি—

"Had he (Netaji) lived longer, he would have put Nehru to shade, for Panditji never had his feet on the ground Pandit Nehru, a megalomaniac, relished soaring high without his moorings while Netaji not only had a ground but also knew his ground He would never had agreed to the partition of India and partition would not even have been necessary because Muslim leaders had complete faith in Subhas Chandra Bose, which they did not have in Nehru"

তিনি বলেছেন, যেভাবে নেতাজী আই-এন, একে এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত করেছিলেন, তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে যে, অখণ্ড ভারতকে একসূত্রে বাঁধবার শক্তি তাঁর ছিল। আই, এন, এর মানুষেরা তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা করত। এখনও আই-এন-এর লোকের সঙ্গে দেখা হলে নেতাজীর কথা বলতে তাদের চোখে জল এসে যায়।

—অভয়ংকর

KARMAYOGI SUBHAS—By C. C. Desai, M.P., ICS (Retd.)—Bharat Jyoti, (Bombay).

সাহিত্যের খবর

ব্রাসেলস পুস্তক প্রদর্শনীতে ফরাসী প্রকাশক সম্মানিত ।। ব্রাসেলসে সম্প্রতি যে আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বেলজিয়ান সরকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন শ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রদর্শকের জন্য। এই পুরস্কার পেয়েছেন একজন ফরাসী পুস্তক প্রকাশক।

উক্রেন সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় কোষগ্রন্থ ।। সতের খণ্ডে সমাপ্ত সোভিয়েত কোষগ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় এক খণ্ডে সমাপ্ত এক কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে উক্রেন সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি সম্পাদনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বিদেশের পাঠককে উক্রেনের প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির, তার প্রাকৃতিক সম্পদ, সোভিয়েত ব্যবস্থায় প্রজাতন্ত্রটির বিকাশের সংক্ষিপ্ততম প্রক্রিয়ার পরিচয় দেওয়া। বহু মানচিত্র ও চিত্র সম্বলিত এই গ্রন্থে প্রচুর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

গুনথার গ্রাস বলেন ।। জর্মন সাহিত্যে একালে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক বোধ হয়, গুনথার গ্রাস। জার্মানীতে তাঁর বই এখন সবচেয়ে বেশি বিক্রী হয়। সম্প্রতি তিনি সমস্ত জার্মান লেখকদের ন্যায্য অধিকারের সপক্ষে এক বিবৃতি প্রচার করেন। কয়েকদিন আগে ডুসেলডর্ফ-এর হান্স বখলার হাউসে ট্রেড ইউনিয়ন সদরদপ্তরে সেগ ফ্রেন্ড, পল শাল্লুক, যোয়েরেনজ এবং আর কয়েকজন জার্মান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসহ তিনি জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের চেয়ারম্যান হেইনজ ভেটার ও প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পেপার

বইকুণ্ঠের খাতা

ভারতকোষ এবং অন্যান্য

'ভারতকোষ'-এর চতুর্থ খণ্ডটি সম্প্রতি বেরিয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা আগের চেয়ে কম। দাম অর্ধেক। প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল পাঁচ বছর আগে, ১৩৭১-এর আশ্বিনে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ'-এর পর 'ভারতকোষ'-এর প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ গিয়েছিলাম এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে। বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : 'ভারত-কোষ'-এর পরিকল্পনাটি প্রথম কার মাথায় আসে? মানে, প্রস্তাবটি প্রথম কে দেন?

কিছুটা দ্বিধা বোধ করতে থাকেন সোমেনবাবু। বলেন, বলা মুস্কিল। অনেকেই দাবীদার। সজনীবাবু (সজনী-কান্ত দাস) তখন বেঁচে ছিলেন। বিনা বিতর্কে বলা যায়, তৎকালীন পরিচালকদের মাথাতেই পরিকল্পনাটি আসে। তাঁরাই একে কার্যকর করতে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন।

পরিষদের নথিপত্র ঘেঁটে তিনি বলেন : ১৯৫৮ সালের ২৫ আগস্ট তৎকালীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী পরলোকগত হুমায়ুন কবীর পরিষৎ দেখতে আসেন। তখন তাঁর সঙ্গে বাংলায় একটি কোষগ্রন্থ তৈরীর কথা আলোচনা হয়। তিনি পরামর্শ দেন, আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশসহ একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা যেন তাঁর দপ্তরে পাঠানো হয়। ঐ একই তারিখে কালবিলম্ব না করে ৪১।৬৫ সংখ্যক চিঠিতে 'জ্ঞানকোষ' নাম দিয়ে দু খণ্ডে একটি কোষগ্রন্থ প্রকাশের পরি-কল্পনা ও আনুমানিক ব্যয় ১৯০৯২০ টাকার একটা হিসেব দাখিল করা হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরে।

আপনারা সরকারের কাছে কত টাকা সাহায্য চেয়েছিলেন?

—এক লক্ষ টাকা। তদনুসারে ১৯৫৯ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার সমহারে মোট ৭৯৫০০ টাকা সাহায্য দিয়েছিলেন। অর্ডার নম্বর ৩১২৯—এডুকেশন ।৯।প—৪১৫।৫৮।

'জ্ঞানকোষ' কি ভাবে 'ভারত কোষ'-এ পরিবর্তিত হল?

—বোধহয় দু খণ্ডে সমগ্র বিষয়ের স্থান সঙ্কুলান হবে না ভেবেই পরি-কল্পনাটিকে নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে থাকেন কর্তৃপক্ষ। 'জ্ঞানকোষ' নামকরণের মধ্যে যে ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল, তাকে সীমায়িত করা হলো নাম বদলের মধ্য দিয়ে। পরিষৎ-এর দলিলপত্র থেকে জানা যায়, ১৭ আগস্ট ১৯৫৯ তারিখের ৪৯।৬৬ সংখ্যক চিঠিতে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে এই পরিবর্তনের কথা জানান এবং দুই খণ্ডের 'জ্ঞানকোষ' প্রকাশের পরিবর্তে চার খণ্ডের 'ভারত-কোষ' প্রকাশের প্রস্তাবসহ একটি সংশোধিত হিসেব পাঠানো হয়। পরিষৎ আবেদন করেন, মোট সাহায্যের পরিমাণ যেন ৭৯৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭৪২০০ টাকা দেওয়া হয়।

শুনতে মন্দ লাগছিল না। অঙ্কুর থেকে কিভাবে মহীরুহ সৃষ্টি হয়, তারই ইতিহাস যেন। একটু নীরস, একটু কর্কশ মনে হতে পারে সাধারণ পাঠকের কাছে। কিন্তু যাঁরা এ জাতীয় পরিকল্পনা নেন কিম্বা নেবার কথা ভাবেন, তাঁদের কাছে এই নেপথ্যকাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

সোমেনবাবু বলেন, এর পরেও সরকারের সঙ্গে অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে। কখনো কেন্দ্রীয় সরকার, কখনো পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানানো হয়েছে বিভিন্ন স্তরের সুবিধা-অসুবিধার কথা। ১৯৬৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে সাহিত্য পরিষৎ-এর কর্মীরা তৎকালীন শিক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় ৩৭৫০০০ টাকা ব্যয়ের ভিত্তিতে সরকার সাহায্য দেবেন ২২৫০০০ টাকা। এই সাক্ষাৎকারের কথা রাজ্য সরকারের ২ মার্চ ১৯৬৩ সালের ডি ও এল নম্বর ২৭৯ এডুকেশন (পি)-সহযোগে সাহিত্য পরিষৎ-এ পাঠানো হয়।

বললাম, এতে বিভিন্ন মহলে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি? বার-বার হিসেব-নিকেশের পরিবর্তন, পরিকল্পনার অদল-বদল কি অনিবার্য ছিল?

—অনিবার্য তো ছিল-ই। অদল-বদল না করে উপায় কি? বই লেখার আগেই তার হিসেব-নিকেশ চূড়ান্ত করা যায় না। যে-বই লেখা হবে, তার আয়তন আগে জানা যায় কি? লেখার পরিমাণ কমিয়ে আয়তন ঠিক রাখতে গেলে উদ্যমটি মূল্য-হীন হয়ে পড়ত, ত্রুটি থেকে যেত নানা দিকে। তার ওপর অন্য একটি অসুবিধার কথাও উল্লেখ করা দরকার। যে-কোনো পরিকল্পনার ব্যাপা-রেই তা স্মরণীয়। যে-তারিখে পরি-কল্পনাটি নেওয়া হয়, আনুষঙ্গিক খরচা-পাতির ব্যয়টাও সেই তারিখের বাজার দরের নিরিখেই করা নিয়ম। কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে দেখা যায়, (ভারতকোষের ব্যাপারে তাই ঘটেছে), যে-সময়ে হিসেবপত্র করে বাজেট স্থির করা হয়েছে, তার অনেক পরে—কখনো দেড় বছর দু বছর পরে—তার আসল কাজের সূত্রপাত। তখন কাগজের দাম বেশী, প্রেসের খরচা বেশী, আনুষঙ্গিক ব্যয়ও ক্রমবর্ধমান। ফলে, সময়-ব্যবধানে দাখিলীকৃত হিসেব-নিকেশকে পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে বার-বার। সরকারী সাহায্য পেতে কখনো দেরী হয়েছে, কখনো সম্পাদনার কাজ শেষ করতে। প্রেস-কপি তৈরী করতেও তো কম সময় লাগে না।

এখন পরিকল্পনাটির অবস্থা কি? চার খণ্ড তো বেরিয়েছে। শেষ হতে আর কত বাকি? কদিনে শেষ হবে?

—কাজ চলছে। ভেবেছিলাম চার খণ্ডেই শেষ হয়ে যাবে। হল না। এক খণ্ডে প্রকাশ করতে গেলে খণ্ডটি অনেক বড় হয়ে যেত। তাছাড়া বেরুতেও সময় লাগত আরও বেশ কিছুকাল। পঞ্চম খণ্ড শেষ হতে আরো প্রায় দেড় বছর লেগে যাবে। ইচ্ছে আছে, আর-একটি পরিশিষ্ট বা সংযোজনী খণ্ড বের করার। সরকারী সাহায্য পেলে তা কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

এখন আর্থিক সঙ্গতি কেমন?

পুরনো প্রসঙ্গের জের টেনে সোমেন-বাবু বললেন, গত ১৩৭৫ সালের ৮ বৈশাখ তারিখে সরকারের কাছে পরিষৎ-এর আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়েছিলাম একটা চিঠিতে। তাতে পুরো ছবিটাই তুলে ধরার চেষ্টা করে-ছিলাম। তখন পর্যন্ত সরকার-প্রতিশ্রুত ২২৫০০০ টাকার মধ্যে মোট ১৯৬৮৭৫ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অংশের বাকি ২৮১২৫ টাকা পেলে তাঁদের প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ (২২৫০০০) পূর্ণ হত। ১৯৬৩ সালে অনুমান করা গিয়েছিল ১৯৬৫ সালের মধ্যে চার খণ্ডে ভারতকোষ প্রকাশ সম্পূর্ণ করা যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহু বাধাবিঘ্নের ফলে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তিন খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হল।

বাকীগুলো প্রকাশ করা সম্ভব হল না কেন?

—কারণ, ইতিমধ্যে অর্থসঙ্গতি যে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়েছিল তাই নয়, পরিষদ প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আমাদের সেই দুর্গতির কথা জানিয়েছিলাম। তখন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত টাকা খরচ করে, পরিষদ তহবিল থেকে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শ উননব্বই টাকা পঁচিশ পয়সা ব্যয় করেও তৃতীয় খণ্ডের জন্য বাজারের দেনা দাঁড়িয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। সেই অবস্থায় সরকারী সাহায্যের বাকি অংশ পেলেও ঋণ শোধ হয় না। তখন আমরা আরো তিন লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা পেশ করি। এখন সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলছে। নির্ভর করছে সরকারী সাহায্যের ওপর।

সোমেনবাবুর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন পাশেই ছিলেন পরিষৎ-এর কর্মী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক দেবজ্যোতি দাশ, মিউজিয়ামের ইনচার্জ হিতেশ সান্যাল এবং সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২

পরের দিন গেলাম ভারতকোষের বর্তমান কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বললেন, কাজ শুরু হয়েছে ১৯৫৮ সাল নাগাদ। প্রথমদিকে আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দ, প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে সময় গেছে বেশ কিছুকাল।

জিজ্ঞেস করলাম : লেখা এবং লেখক সংগ্রহ করেন কিভাবে? এই কোষগ্রন্থের লেখক কারা?

অত্যন্ত সহজ, সরল ও আন্তরিকভাবে কথা বলছিলেন তিনি। বললেন, লেখার ব্যাপারে পরিষদের কর্মী এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁদের কথাই হয়তো প্রথম দিকে ভাবা হয়েছিল। কেননা, প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই এবং অন্যান্য সাহায্য রয়েছে তাঁদের হাতের কাছে। পরে 'ভারতকোষে'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্যরা যোগাযোগ করেছেন লেখকদের সঙ্গে। প্রত্যেক বিষয়েই আলাদা সাব-কমিটি আছে। তাঁরাও লেখক-দের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

এডিটরিয়েল বোর্ডে কে কে আছেন?

—অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, আদিত্য ওয়াহেদদার, কালিদাস ভট্টাচার্য, গোপাল-চন্দ্র ভট্টাচার্য, চিন্তামণি কর, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, নির্মলকুমার বসু, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিনয় দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আগে ডঃ সুশীলকুমার দে সম্পাদক-মণ্ডলীতে ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ায় চতুর্থ খণ্ড থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়েছে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে?

—বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে বলেই আমার ধারণা। কেউ শিল্পী, কেউ সাহিত্যিক, কেউ ঐতিহাসিক, কেউ ভাষাতাত্ত্বিক। অবশ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন অনেকে। বহু কবি-সাহিত্যিক পরোক্ষে এর সঙ্গে জড়িত। যেমন আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে সাহায্য করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য ও চিত্তরঞ্জন দেব, ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে দীপংকর দাশগুপ্ত ও সুহাস চট্টোপাধ্যায়। এমনিভাবে সাহিত্য, আইন, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও খেলা সম্পর্কে সাহায্য করেছেন নানাজন।

লেখকদের কোনো টাকা দেন কি?

—সামান্য দক্ষিণা দিই। টোকেন বলতে পারেন। তবে লেখকদের মধ্যে কেউ গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ সেট দেওয়া হয় ৭০ টাকার পরিবর্তে ৪০ টাকায়।

'ভারতকোষ'-এর কোনো অসম্পূর্ণতা আছে কি?

—ছোটখাট কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে। বিষয় নির্বাচনে হয়তো কোনটায় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কোনটায় কম। ভারসাম্যের এই অভাবটাই বড় দুর্বলতা। অথচ কোন একটি সংস্করণে তা কাটানো মুশকিল।

লেখার অভাবে কখনো ছাপার কাজে বিলম্ব ঘটেছে কি?

—হ্যাঁ। হয়েছে অনেকবার। কেননা, লেখার সমস্যা একটা মস্ত বড় সমস্যা। কাউকে লিখতে বলেও ঠিক সময়ে লেখা পাইনি। এমন লেখাও এসেছে যা কোষ-গ্রন্থের পক্ষে অনুপযুক্ত। ফলে ফেরত দিতে হয়েছে কিংবা নতুন করে লেখাতে হয়েছে।

অফিসের ব্যয় কি রকম? কর্মী কজন?

—সাহিত্য পরিষদের কিছু কর্মী সাহায্য করছেন। তাঁরা কাজ করেন পার্ট-টাইম। তা ছাড়া ডেস্ক-ওয়ার্ক দেখছেন ৯ জন কর্মী। তাঁদের কাজ হলো যোগাযোগ করা, হিসেবনিকেশ রাখা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি। মাসিক খরচ চৌদ্দ পনেরো শ টাকা।

৩

নিচে নেমে আসতেই দেখা হল আবার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সহ-সম্পাদক দেবজ্যোতি দাশও ছিলেন। ভদ্রলোক একটি সরকারী কলেজের অধ্যাপক।

জিজ্ঞেস করলাম : সাহিত্য পরিষৎ-এর নতুন উদ্যম কি?

উত্তর দিলেন বিশ্বনাথবাবু। বললেন : সাহিত্যসাধক চরিতমালার প্রকাশ বন্ধ ছিল দীর্ঘকাল। আবার বেরুতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বেরিয়েছে তিনটি বই—ব্যোমকেশ মুস্তাফী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশের চরিতমালা। লিখেছেন দেবজ্যোতি দাশ।

আরো একটি বই প্রকাশের উদ্যম চলছে। চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'বাংলা সাহিত্য সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ' হয়তো বেরুবে শীঘ্রই। সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসম্পর্কিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা তৈরী করছেন কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

এ ছাড়া পরিষৎ পরিচয় আগে লিখে-ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৫৭ থেকে ১৩৭৫ পর্যন্ত পরিচয় লিখছেন সহকারী সম্পাদক। পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বিষয়ানুগ সূচীও তৈরী করা হয়েছে। এখন প্রেসে আছে, পরিষৎ-এর পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিতব্য একটি স্যুভেনির।

কথায় কথায় বিশ্বনাথবাবু বললেন, ইদানীং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা আবার বেরুতে শুরু করেছে। সম্পাদক সোমেন্দ্র-চন্দ্র নন্দী। মাঝখানে যা বেরুচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক ভাল। প্রায় নিয়মিত হয়ে এসেছে এর প্রকাশন। ১৩৭৪ বেরিয়ে গেছে, ১৩৭৫ প্রেসে।

বললাম : পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি কি? সমকালের উত্তাপ-উত্তেজনার স্পর্শ তো লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। পেলে ভালো হত না কি?

সহ-সম্পাদক দেবজ্যোতি দাশ উত্তর দিলেন, পত্রিকাটি মূলত গবেষণামূলক। আগে যেমন চণ্ডীমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের উপরই কেবল আলোচনা বেরুত, এখন আর তেমন বেরোয় না। আধুনিক সাহিত্যের ওপরেও আলোচনা হচ্ছে। একটি কথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্য পরিষদের গঠনতন্ত্র পুরোপুরি ধরাবাঁধা ব্যাপার। কিছুটা আইন বাঁচিয়ে চলতে হয়। এককালে পরিষদের সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। তখনই ঠিক করা হয়ে-ছিল, জীবিত লেখক সম্পর্কে কোনো আলো-চনা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বেরুবে না। সে নিয়মকে এখনো মেনে চলবার চেষ্টা হচ্ছে।

—[illegible]দর্শী

তুষার ভেজা রাত

পারিজাত মজুমদার

টেলিফোনটা বেজে উঠলো হঠাৎ—কুয়াশামগ্ন পার্বত্য রাত্রির গভীর স্তব্ধতাকে চিরে।

ঘড়িতে এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। শহর থেকে দূরে, ঝোপজঙ্গলে ঘেরা এই নির্জন পাহাড়ের মাথায় এই সময়টার চেহারা কলকাতাবাসীদের চেনা সেই সন্ধ্যার আমেজমাখা, মুখর আলোকোজ্জ্বল প্রথম রাত্রির নয়, বরং গাঢ়-তমসামগ্ন সুষুপ্ত রাত্রির। তবুও অফিস খোলা আছে এখনো বিশেষ প্রয়োজনে।

'হ্যালো!' রিসিভার তুলে নিলো সোনালী।

'মে আই স্পীক্ টু মিস্টার রয়, প্লীজ্?' টেলিফোনের ও-প্রান্তে বেজে উঠলো ভরাট গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ।

'মিস্টার রয়? তিনি তো এখানে নেই এখন। তিনি ডিরেকটরের ঘরে।'

'আই সী। তা আপনি কে কথা বলছেন জানতে পারি কি?'

'মিস্ সিনহা, এখানকার হাউস-জার্নালের এডিটর।'

'ওয়েল, মিস সিনহা, আপনি দয়া করে মিস্টার রয়কে বলে দেবেন যে, মেজর ইন্দ্রজিৎ ফোন করেছিল।'

'কি নাম বললেন?'

'মেজর ইন্দ্রজিৎ!'

ও-প্রান্তে টেলিফোন ছেড়ে দেবার শব্দ শোনা গেল। এ-প্রান্তে সোনালীও রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

সারা অফিসবাড়ীটার দুই প্রান্তে দুটি মাত্র ঘরে এখন আলো জ্বলছে। এই ঘরে, আর ডিরেকটরের ঘরে। মাঝখানে অনেকগুলো ঘর আর প্রকাণ্ড চাতাল জুড়ে অন্ধকার—নীরেট, নিশ্ছিদ্র। এই পরম নিভৃতির মাঝখানে উপরওয়ালা আলোকেন্দু রায়ের ঘরে একা বসে বসে সোনালী ভাবতে লাগলো, মেজর ইন্দ্রজিৎ লোকটা কে? এখানে এসে পর্যন্ত যেসব বাইরের লোককে সে অফিসে যাতায়াত করতে দেখেছে, তাদের প্রায় সকলকেই সে চেনে। তাদের মধ্যে কারোর তো ও নাম নেই। তাছাড়া, নামটা কেমন অদ্ভুতও। মেজর ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ কি ওর নাম, না পদবী?'

'আপনি বোধহয় আমার ওপর খুব রেগে গেছেন, মিস সিনহা?' —বলতে বলতেই ঘরে এসে ঢুকলো আলোকেন্দু রায়। তারপর যোগ করলো: 'আপনাকে এতক্ষণ একা বসিয়ে রাখার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু কি করব বলুন? কাজ না শেষ হলে তো আর—'

কথা শেষ না করেই সোনালীর দিকে তাকিয়ে নিজের বহু-অভ্যাসিত কায়দা-দুরুস্ত হাসিটি হাসলো আলোকেন্দু।

'আপনি এত অ্যাপলজাইজ করছেন কেন?'—বললো সোনালী— 'আমাকে

বাসায় পৌঁছে দেয়া তো আপনার কাজ নয়। এত অন্ধকারে একা একা যেতে ভয় করবে বলেই আপনার জন্য বসে আছি তখন থেকে। এ তো আমার নিজেরই স্বার্থে।'

'তা হলেও—আপনি এখানে নতুন। আপনার প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে তো।'

মেয়েটার সমস্ত শরীরের কানায় কানায় কি উপছানো যৌবন! টেবিলের ওপর ফাইল আর কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে ভাবছিলো আলোকেন্দ্র। ভিতরকার লোভ কিন্তু তার চোখে প্রকাশ পেলো না।

'জানেন, এইমাত্র একটা ফোন এসেছিল।' —আলোকেন্দ্রর দিকে তাকালো সোনালী— 'মেজর ইন্দ্রজিৎ বলে কে এক ভদ্রলোক আপনার খোঁজ করছিলেন।'

'ইন্দ্রজিৎ?'—মুখ তুললো আলোকেন্দ্র —'কি বলছিল?'

ওর গলার স্বরে বোঝা গেল মেজর ইন্দ্রজিৎ ওর সুপরিচিত কেউ।

'বিশেষ কিছু বলেননি উনি।' —উত্তর দিলো সোনালী— 'শুধু বললেন, ওঁর ফোনের কথা যেন আপনাকে জানিয়ে দিই।'

'আচ্ছা।'

কাগজপত্র সব গুছিয়ে রেখে উঠে পড়লো আলোকেন্দ্র, তারপর বললো ঃ 'চলুন [illegible]।'

অফিসের শেষ আলোটিও নিবে গেল। চারদিকের নীরেট, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে আলোকহীন এই অফিসবাড়ীটিও একেবারে ডুবে গেল, হারিয়ে গেল। মাথার ওপরে অগণিত জমাট মেঘে ঢাকা, অন্ধ আকাশ। চারদিক দিয়ে পাইন, ফার, বার্চ আর [illegible] সার। ...এই গভীর অন্ধকারে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত দেখা যায় না। শুধু মুখেচোখে আর কানে এসে লাগে বরফের মত হিম, জমাট কুয়াশার ঠান্ডা ঝাপটা।

উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ—অজস্র ছোট-বড় নুড়িতে আকীর্ণ। মাঝে মাঝে দুপাশের ঝোপ এগিয়ে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে পথের ওপর। বনো লতা আর আগাছার ঝাড় ঠেলে, পাথরে পাথরে হোঁচট খেতে খেতে, প্রায় অন্ধের মতই চলতে থাকে সোনালী—আলোকেন্দ্রর পাশে পাশে।

এটা সত্যিই পথ নয়, জানে সোনালী। এ পাহাড়ে চলাচলের জন্যে পাকা, বাঁধানো রাস্তা আছে একটাই। তবে শর্ট-কাটের জন্যে কেউ কেউ দিনের বেলায় এদিক দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু এখন, এই গাঢ় অন্ধকারে চলার জন্যে এ পথ কেউ বেছে নেয়?

আলোকেন্দ্র হাঁটছে বেপরোয়া ভঙ্গিতে —লম্বা লম্বা পা ফেলে। এ পাহাড়ে নাড়ীনক্ষত্র ওর জানা, এখানকার প্রতিটি নুড়ির অবস্থান পর্যন্ত বোধহয় ওর মুখস্থ। ও কি করে বুঝবে সোনালীর অসুবিধা?...

'সাবধানে চলুন।'

একটা বড় পাথরে হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো সোনালী, ওকে ধরে ফেলে সামলে দিলো আলোকেন্দ্র।

'রাস্তাটা বড় খারাপ।' মৃদু স্বরে বললো সোনালী।

'আমার হাত ধরে চলুন।' বলে নিজেই ওর হাত ধরলো আলোকেন্দ্র।

একটু লজ্জা। একটু অস্বস্তি। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ সোনালী করতে পারলো না এই মুহূর্তে। এইটুকু সাহায্যের ওর প্রয়োজন ছিল।

এত ঠান্ডাতেও নিজের হাত, পা, শরীর গরম হয়ে উঠছে ক্রমশ, টের পেলো আলোকেন্দ্র। এই একটু আগে যখন পাথরে ঠোক্কর লেগে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো সোনালী, তখন ওকে প্রায় জাপটে ধরেই বাঁচিয়ে দিয়েছিল আলোকেন্দ্র। সেই মুহূর্তে সোনালীর প্রায় সমস্ত শরীরটারই স্পর্শ পেয়েছিল সে—নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। একটি রেখাঙ্কিত নারীদেহের ব্যঞ্জনাময়, সজীব স্পর্শ!

ঘুমিয়ে থাকা রক্ত এখন জেগে উঠেছে। বুকের তটে আহত শোণিত-তরঙ্গের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ এখন কান পেতে শুনতে পায় আলোকেন্দ্র।

কিন্তু—কিছু করবার উপায় নেই।

এপর্যন্ত সোনালীকে যেটুকু চিনেছে আলোকেন্দ্র, তাতে মনে হয় ও বড় ঠান্ডা, উত্তাপবিহীন মেয়ে! বরফের মত ঠান্ডা! —মনে মনে বললো আলোকেন্দ্র।

ওর হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা— সব কিছু দেখেই আলোকেন্দ্রর বারবার মনে হয়েছে, মেয়েটা যেন ঠিক সচেতন নয় নিজের প্রস্ফুটিত যৌবন সম্পর্কে।

...আচ্ছা, হঠাৎ যদি একটা আঘাত দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া যায় ওর ঘুমন্ত চেতনাকে? বেশী কিছু নয়, একটি উত্তপ্ত আলিঙ্গন, একটি দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন...

কিন্তু—ওসব কিছু করতে হলে প্রথমটা তো একটু জোর করেই করতে হবে। আর তারপর, যদি ও চীৎকার করে ওঠে এই অপ্রত্যাশিত পুরুষ-আক্রমণের প্রতিবাদে? যদি কাল অফিসে গিয়ে নালিশ করে দেয় ডিরেকটরের কাছে?

নাঃ, ওসব এক্সপেরিমেণ্ট করার মত দুঃসাহস আলোকেন্দ্রর নেই। এই যে এখন সোনালীর হাত ধরেছে সে, এটুকুও সম্ভব হয়েছে শুধু সামনে একটা অজুহাত ছিল বলেই। নইলে—ওর আঙুল কি চুলের ডগা ছোঁবার সাহসটুকু পর্যন্ত আলোকেন্দ্রর নেই।

কিন্তু, বাইরে কিছু না করা গেলেও, কল্পনার রাজ্যে সম্ভোগবিলাসে মত্ত হতে বাধা কি?

তাই, নিজের মানস-জগতে এই মুহূর্তে আলোকেন্দ্র সোনালীকে চুম্বন করলো। নিবিড় আলিঙ্গনে ওকে বেঁধে ওর কুমারী ঠোঁটে বসিয়ে দিলো নিজের দশন-চিহ্ন।

ঠক করে বুট জুতোর ঠোকা লাগলো একটা বড় পাথরের সঙ্গে। চট করে নিজেকে সামলে নিলো আলোকেন্দ্র। সেই সঙ্গে নিজের কল্পনার গতিকেও সংযত করলো। এত অনামনস্ক হয়ে রাত্রিবেলা পাহাড়ী রাস্তায় চলা যায় না।

'এ পথটা বড় খারাপ! এদিকে আসা আমাদের ঠিক হয়নি।' এবার একটু স্পষ্ট গলায়, একটু জোর দিয়েই বললো সোনালী।

'আর তো এসে গেলুম। ঐ তো সামনেই গেট!' উত্তর দিলো আলোকেন্দ্র।

সামনেই গেট! বললো আলোকেন্দ্র। কিন্তু সেটা চোখে দেখে বলেনি সে। কেননা, এত অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। সোনালী বুঝলো, এ পথের প্রতিটি ইঞ্চি আলোকেন্দ্রর চেনা বলেই শুধু অনুভব দিয়ে ও বুঝতে পেরেছে, নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গেছে ওরা।

আরো কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আলোকেন্দ্র।

সামনেই গেট। এবার সোনালীও দেখতে পায় নজর করে।

ছোট, নীচু গেট। তালা-টালার বালাই নেই, শুধুমাত্র ভেজানোই আছে। সুতরাং কাউকে ডাকাডাকি করার দরকার হল না।

ভিতরে ঢুকেই সর্পিল, পাথরে বাঁধানো পথ, প্রশস্ত বাগানের মাঝখান দিয়ে। পথের শেষে দুটি কটেজ পাশাপাশি, গায়ে গায়ে লাগানো।

এ দুটি কটেজের একটিতে থাকে আলোকেন্দ্র, আরেকটিতে থাকে অফিসের আরেকজন প্রবীণ অফিসার—এস, বি, সেনগুপ্ত। এই এস, বি, সেনগুপ্তের কটেজেই একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে আছে সোনালী, সাময়িকভাবে। অবশ্য এই ভাড়া-দেয়া-নেয়ার সবটাই বে-আইনী, কারণ এই একতলা বাড়ীটা সেনগুপ্ত অফিস থেকে পেয়েছে কোয়ার্টার হিসেবে। তবে অফিসের সব লোক, এমনকি ডিরেকটর পর্যন্ত, সোনালীর বাসস্থান-সমস্যার কথা জানে বলেই সমস্ত ব্যাপারটাকে সমর্থন করছে।

সোনালীকে সেনগুপ্তের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো আলোকেন্দ্র। আর সোনালী এগিয়ে গিয়ে আঙুল রাখলো কলিং বেলের বোতামে।

বেল বেজে উঠতেই খুলে গেল সামনেকার ভারী দরজাটা। এস, বি, সেনগুপ্ত নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চাশের ওপর বয়স। ভারী মোটা শরীর, কপালে গালে চিবুকে বয়সের কুঞ্চন। ধূসর অথচ তীব্র দুটি চোখে ক্ষুধার্ত শকুনির লুব্ধতা। এই হচ্ছে এস, বি, সেনগুপ্ত।

শুকনো ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে সেনগুপ্ত বললে ঃ 'আপনার কথাই ভাবছিলুম। চিন্তা হচ্ছিল অচেনা অজানা জায়গায় কোথাও গিয়ে পথটথ হারিয়ে ফেললেন নাকি—'

'আমি অফিস থেকেই সোজা আসছি। কাজ ছিল বলে দেরী হল।'

কথাটা মিথ্যা নয়। প্রায় পৌনে সাতটা পর্যন্ত আজ অফিসে কাজ করতে হয়েছে

সোনালীকে। তারপর অবশ্য বাসায় চলে আসতে পারতো সে। কিন্তু একা একা অন্ধকার পাহাড়ী পথে হেঁটে আসতে তার সাহসে কুলোয়নি। তাই সে অপেক্ষা করেছিল আলোকেন্দুর জন্যে।

'আপনাদের সব তরুণ প্রাণ, কত উচ্ছল উদাম, কাজ করবেন বৈকি!' —সোনালীর পিছন পিছন এলো সেনগুপ্ত —'আপনারাই তো সব এক্জাম্পল সেট করবেন মানুষের সামনে!'

এ সমস্ত কথার ভিতরেই যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা বুঝতে মুহূর্তমাত্র দেরী হয় না সোনালীর। এই মাসখানেকের পরিচয়ে লোকটাকে সে অনেকখানিই চিনেছে।... সেনগুপ্তের মনের গঠনটাই এমন বাঁকা যে কোনো ব্যাপারকেই সোজা চোখে দেখতে সে পারে না। আজ যে অফিসের কাজের জন্যেই সোনালীর ফিরতে দেরী হয়েছে, একথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষ করে মেয়েটি যেখানে সুদর্শনা তরুণী এবং তার বন্ধু হচ্ছে আলোকেন্দু রায়। যে আলোকেন্দু চল্লিশ পেরিয়েও পঁচিশ বছরের যুবকের মত তাজা, এবং স্বভাবে ডন্ জুয়ানের একটি ভারতীয় সংস্করণ বললেই হয়।

সেনগুপ্ত হয়তো আরো কিছু বলতো। কিন্তু তাকে সে সুযোগ দিলো না সোনালী। গট্ গট্ করে এগিয়ে গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে, একবারও পিছনদিকে না চেয়ে বন্ধ করে দিলো ঘরের দরজা।

উঃ! কবে যে এই ঘুঘু লোকটার আশ্রয় থেকে পালিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবে সে! তার দুর্ভাগ্য যে অফিস থেকে কোয়ার্টার পায়নি সে। কারণ তার পোস্টটা নতুন ক্রিয়েট করা হয়েছে, এ পোস্টের জন্যে কোনো কোয়ার্টারের ব্যবস্থা এখনো হয়নি। তাছাড়া, অফিসের অনেক পুরনো কর্মচারীই যেখানে কোয়ার্টার পায়নি এখনো পর্যন্ত, সেখানে তার মত নতুন লোকের জন্যে ব্যবস্থা হতে নিশ্চয়ই বহু দেরী।...

সুতরাং বর্তমানের জন্যে মাথা গোঁজবার একটা জায়গা সোনালীকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে। এসে থেকেই অবশ্য চেষ্টাচরিত্র সে কম করছে না। এখন দেখা যাক কি হয়...

জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধোবার জন্যে কল খুললো সোনালী। উঃ, কি ঠাণ্ডা জলটা! হাড়ের ভিতর পর্যন্ত যেন কনকনিয়ে দেয়। কেউ যদি কাছে থাকতো, জলটা গরম করে দেবার জন্যে!... কতজনকে বলেও তো একটা রাতদিনের আয়া পাওয়া গেল না এখন পর্যন্ত!

হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় এসে বসতেই দরজায় টোকা পড়লো: টক্ টক্ টক্!

এখন দরজায় টোকা দেবার একটি লোকই আছে। সে হচ্ছে সেই নেপালী ছোকরাটি যে কাছাকাছি একটা ছোট হোটেল থেকে নিয়ে আসে সোনালীর রাতের খাবার।

দরজাটা শুধু ভেজানোই ছিল। তাই বিছানা থেকে না উঠেই সোনালী বললে: 'ভেতরে চলে এসো।'

ওর সাড়া পেতেই কপাট ঠেলে ভিতরে ঢুকলো নেপালী বয়টি, হাতে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে।

'ঐখানে রাখো।' টেবিলের তলাটা দেখিয়ে দিলো সোনালী।

যথাস্থানে টিফিন কেরিয়ার রেখে দিয়ে চলে গেল ছেলেটা।

আজ কি দিয়েছে কে জানে! উঃ, খিদেয় যেন নাড়ী হজম হয়ে যাচ্ছে!... উঠে গিয়ে কেরিয়ারের ঢাকনা খুললো সোনালী, একেক করে নামাতে লাগলো বাটিগুলো।

মোটা মোটা গোটাকতক পালোয়ানী রুটি, আধসেরটাক পেঁয়াজ আর একরাশ লঙ্কা দিয়ে জমাট করে রাঁধা ডিমের কারি, আর একমুঠো বীনসেদ্ধ! এই তার আজকের রাতের বরাদ্দ।

পেটে অসম্ভব খিদে থাকা সত্ত্বেও ঐ খাবারের সদ্ব্যবহার করতে পারলো না সোনালী।... আজ প্রায় একমাস ধরেই এমনি ব্যাপার চলছে। এই একমাসের মধ্যে একটি দিনের জন্যেও বোধহয় পেট ভরে চারবেলার খাওয়া জোটেনি তার। পয়সা দিলেও এখানে ভালো জিনিস পাওয়া অসম্ভব।

পেটে খাণ্ডবদাহন নিয়ে রাজশয্যায় শুলেও মানুষের ঘুম আসে না। সোনালীরও এলো না।...

নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হচ্ছে এখন। কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল দার্জিলিং-এ এই কাজ নিয়ে আসতে? তাও আবার অফিসটা শহরের ভিতরে নয়, মাইল তিনেক দূরে জঙ্গল-ঢাকা নির্জন পাহাড়ের মাথায়।

ঝোঁকের মাথাতেই এখানে একলা চলে এসেছে সোনালী, কারও কথা না শুনে। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ আর নতুন কাজের আকর্ষণে। কলকাতার কোনো মেয়ে-কলেজে একটা প্রোফেসারি সে অনায়াসেই পেতে পারতো। কিন্তু ওকাজ সে করতে চায়নি। কলকাতা তাকে ভীষণ ক্লান্ত করে তুলেছিল। বহু-পরিচিত পরিবেশ, জনতার কোলাহল আর বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে সে যেতে চেয়েছিল দূরে।...

কিন্তু এখন—এই আশ্চর্য নিঃসঙ্গ, আরণ্য রাত্রির হিমার্ত আলিঙ্গনের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে সোনালীর কান্না পেলো।

দুই

নিজের হাতে লাইব্রেরীর বইগুলো নতুন করে সাজাচ্ছিলো সোনালী, একটা একটা করে।

এ কাজ ওর নয়। ওর অ্যাসিস্ট্যান্টের। কিন্তু ছোকরা এত ফাঁকিবাজ আর অলস যে ওকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে একদিনের জায়গায় দশদিন লাগিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় নিয়ে কাজ শেষ করার পরেও দেখা যাবে অনেক গলদ অনেক ত্রুটি। গাফিলাতি জিনিসটা ছোকরার স্বভাবে একেবারে গোড়ে বসে গেছে। আর বসবেই বা না কেন। এতদিন এ ডিপার্টমেণ্টে কাজকর্ম প্রায় কিছু হত না বললেই হয়।

যাই হোক, এসব নিয়ে খুব একটা অভিযোগ নেই সোনালীর মনে। নিজে অনেক খেটেও যাতে লাইব্রেরীটাকে সুন্দর করে তুলতে পারে, অফিসের জার্নালটিকে করে তুলতে পারে আকর্ষণীয় সেইটেই এখন তার রাতদিনের সাধনা। তাই শুধু অফিসেই নয়, ঘরে বসেও সে কাজ করে অফিসেরই জন্যে।

'এই নিন।' গোটাকতক বই এনে সোনালীর সামনে একটা টুলের ওপর নামিয়ে দিলো অ্যাসিস্ট্যাণ্টটি।

নেহাৎ চক্ষুলজ্জাবশেই তাকে একটু আধটু কাজ করতে হচ্ছে। নইলে তার নিজের মতে এসব কাজ হচ্ছে শুধু পণ্ডশ্রম। গোটা লাইব্রেরীটার সমস্ত বই আলমারির থেকে নামিয়ে আবার নতুন করে গোছানো, নম্বর দেয়া, লেবেল আঁটা, একি সহজ কাজ? আর এর প্রয়োজনই বা কি? এতদিন ধরে যে বইগুলো সব এলোমেলো হয়ে ছিল, বিষয় অনুযায়ী ভাগ-টাগ কিছু করা ছিল না, যার যখন খুশি এসে বই বার করে নিয়ে যেতো তাতে কি অফিস চলছিল না?

'তখন যে চিঠিটা দিলুম সেটা টাইপ হয়েছে আপনার?'—
—জিজ্ঞেস করলো সোনালী।

'এখনো হয়নি।' বলেই ছোকরা কৈফিয়ত দিলো একটা — 'এত রকমের কাজ একসঙ্গে করা, একি একটা মানুষের কর্ম! টাইপিস্টকে টাইপিস্ট, আবার লাইব্রেরীর কাজও রয়েছে।'

'লাইব্রেরীর কাজ আর আপনি করছেন কোথায়? সবতো আমিই করছি।' বলেই আর কথা বাড়ালো না সোনালী, মুখ ফিরিয়ে বই ঘাঁটতে লাগলো নিজের মনে।

ছেলেটা কি স্বার্থপর আর নির্লজ্জ!— না ভেবে পারলে না সোনালী। সোনালী যে ওর চাইতে অনেক বেশি খাটছে, একই সঙ্গে হাউস-জার্নাল আর লাইব্রেরী দুটো দিক ম্যানেজ করছে, তা কি দেখতে পাচ্ছে না ও চোখের সামনে?...

'গুড মর্নিং, মিস সিনহা!'

হঠাৎ কার চেনা গলা শুনে চমকে মুখ ফেরালো সোনালী। সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলো অফিসের পার্ট-টাইম এমপ্লয়ী এবং আর্টিস্ট দেবব্রত মিত্র ঢুকে পড়েছে লাইব্রেরী রুমে, এক অচেনা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে।

আগুনের মত রং, পাথর-কোঁদা চেহারা, শক্ত হাঁটার ভঙ্গি।...আবার তার ওপর ঠোঁটের দুদিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া অদ্ভুত ঐতিহাসিক ছাঁদের গোঁফ। ঠিক এই ধরনের পুরুষমূর্তি আর কখনো কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়লো না সোনালীর। তার মনে হল, ইতিহাসের পাতা থেকে রাণা উদয়সিংহের কোনো

বংশধর যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে দেবব্রত যখন বললে, এই হচ্ছে মেজর ইন্দ্রজিৎ তখন সোনালীর মনে হল, একি আশ্চর্য যোগাযোগ! গতকাল সন্ধ্যেবেলা তবে এই-ই ফোন করেছিল, আর সুষুপ্ত রাত্রির স্তব্ধতা চিরে এরই কণ্ঠস্বর তার সর্বসত্তায় ছড়িয়েছিল এক অনাস্বাদিত-পূর্ব মাদকতা? এ কণ্ঠের অধিকারীকে দেখবার একটা অস্পষ্ট ইচ্ছাও কি কালকের সেই মুহূর্তটিতেই সঙ্গোপনে জেগে ওঠেনি তার মনের গভীরে—জলের তলায় পদ্মের কুঁড়ির মত?...

মেজর ইন্দ্রজিৎও এই মুহূর্তে ঐ সোনালীর মতই ভাবছিলো, একি আশ্চর্য যোগাযোগ। এমন ভাবগভীর চোখ, এমন পবিত্র সুকুমার মুখশ্রী, এমন মহিমান্বিত গিরিচূড়ার মত উদ্ধত অকলঙ্ক যৌবন, সে কি আর কোথাও দেখেছে?

'ইটস এ প্লেজার টু মীট ইউ'—বলতে বলতে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো মেজর।

সোনালী সাধারণত কোনো পুরুষের সঙ্গে করমর্দন করতে চায় না। কিন্তু এখন সে হাত বাড়িয়ে দিলো প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই।

'আপনার জার্নালের জন্যে তো আপনি নানা ধরনের আর্টিকেল্ নিচ্ছেন।'—সোনালীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুখ খুললো দেবব্রত—'ইন্দ্রকে কিছু লিখতে বললে না, ওর কোনো হিমালয়ান একসপীডিশন নিয়ে? হি ইজ এ গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার!'

'আঃ দেবু! তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ!'—সোনালী কিছু বলবার আগেই বলে উঠলো ইন্দ্রজিৎ—'তুমি খুব ভালোই জানো, ওসব লেখাটেখা আমার আসে না। আয়াম এ ম্যান অব দি টাফ প্রোজেক্টেড ওয়ার্লড!'

তারপর সোনালীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো: 'আপনাদের জীবনই সার্থক। জ্ঞানের রাজ্যে বাস করছেন! আর আমরা? লেখা দূরে থাক, পড়াশুনোও হয়ে ওঠে না কিছু।'

'ওসব আপনার বিনয়।'—উত্তর দিলো সোনালী—'এইতো এখুনি মিস্টার মিত্র বললেন, আমাদের জার্নালের জন্যে একটা লেখা আপনি অনায়াসেই দিতে পারেন। এখন বলুন তো, কবে লেখা দিচ্ছেন, এবং কোন্ একসপীডিশন সম্পর্কে?'

'মাই গড্! ওসব সাহিত্য টাহিত্যকে আমি বাঘের মত ভয় করি। আমি যদি লেখা দিই, সেটা হবে মুদীর হিসেবের খাতার মত। শুধু ফ্যাক্টস্ই থাকবে, আর কিছু থাকবে না! সে ছেপেই বা কি হবে বলুন?'

'এসব আপনি বাড়িয়ে বলছেন।'

'একটুও বাড়িয়ে বলছি না মিস সিনহা। মিলিটারী লাইফ সম্পর্কে যদি আপনার অভিজ্ঞতা থাকতো তবে বুঝতে পারতেন সেখানে মানুষের শিল্পীসত্তার বিকাশের সুযোগ কতটুকু! তার ওপর আবার আমাদের মত লোক যাদের মধ্যে কোনো স্পার্ক নেই—'

নাঃ, এদের কথা এখনি থামবে এমন কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না দেবব্রত।

এবার অনেক দিনের ব্যবধানে এ অফিসে এসেছে ইন্দ্রজিৎ, অফিশিয়াল প্রয়োজনেই। এবং আমার পর লাইব্রেরী আর জার্নালের জন্যে নতুন মানুষ এসেছে শুনে দেবব্রতকে সে অনুরোধ করেছিল সেই মানুষটির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে। অনুরোধটা মোটেই অসংগত নয়। কারণ এখানে এলেই লাইব্রেরীতে একবার দুবার আসেই ইন্দ্রজিৎ, বই কিংবা ম্যাপ-ট্যাপ খুঁজতে। ডিপার্টমেণ্টাল হেডের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এসব কাজে সুবিধে হয়। কিন্তু এখন—

এখন ইন্দ্রজিতের ভাব দেখে মনে হচ্ছে না শুধুমাত্র কাজের কথা মনে রেখেই এত কথা চালিয়ে যাচ্ছে ও। এই একটু আগে দেবব্রতকেও বলেছিল, ওর সঙ্গে এক জায়গায় যাবে। কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন এখন সেকথা ওর মনেই নেই।

দেবব্রতর সঙ্গে ইন্দ্রজিতের বন্ধুত্ব তো শুধু অফিসের প্রয়োজনগত নয়। অফিসের বাইরেও ওদের বন্ধুত্ব বহুদূর প্রসারিত। তবু, এই মুহূর্তে, দেবব্রতর উপস্থিতির কথাটুকুও কি ইন্দ্রজিতের মনে আছে?

আর, শুধু কি ওই? সোনালীও তো দেবব্রতর উপস্থিতি ভুলে গেছে বোধ হচ্ছে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা হাসছে, কথা বলছে, শুধু পরস্পরকেই ওরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয়। দেবব্রত এখানে গৌণ। সে এখানে অবাঞ্ছিত তৃতীয়জন, যে শুধু ভিড় বাড়ায়...

দেবব্রতর বুকটা হঠাৎ কেমন ব্যথায় টনটন করে ওঠে যেন। আজ প্রায় একমাস হতে চললো সোনালীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার। কিন্তু ঐরকম চাহনি, ঐরকম হাসি, সে কখনো সোনালীর চোখেমুখে ফুটে উঠতে দেখেনি তার সঙ্গে কথা বলার সময়। মাত্র পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে ইন্দ্রজিৎ যা পেয়েছে সে তো পায়নি এই দীর্ঘ একমাসের বন্ধুত্বে। শুধুমাত্র বাইরের চেহারাটা উজ্জ্বল নয় বলেই কি তার ভিতরকার ঐশ্বর্য সোনালীর মত মেয়ের চোখেও পড়লো না?...

'একসকিউজ মী, ইন্দ্র।'—ওদের কথার মাঝখানেই হঠাৎ বলে ওঠে দেবব্রত—'আমার একটু কাজ আছে, আমি এখন যাচ্ছি। তুমি কিছু মনে কোরো না, পরে আবার দেখা হবে। গুডবাই।'

'চলুন ওখানে বসা যাক।'

লাইব্রেরী হলের একান্তে কাঠের পার্টিশন দিয়ে তৈরী করা, নিজের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটার দিকে এগিয়ে যায় সোনালী। ইন্দ্রজিৎ তাকে অনুসরণ করে।

সোনালীর টেবিলের সামনে মুখোমুখি গুছিয়ে বসে ইন্দ্রজিৎ। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে 'আচ্ছা মিস সিনহা, আপনি তো হিন্দু?'

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'তাহলে আপনি জানেন, আমাদের হিন্দুধর্মে বলে—মানুষের জীবনে সবকিছুই প্রি-ডেস্টিণ্ড। আমি এটা বিশ্বাস করি। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা তো কতই হয়, কিন্তু একেকটা সাক্ষাৎকার এমন আসে মানুষের জীবনে, যেটাকে মনে হয় একটা ইভেণ্ট। শুধু তাই নয়, মনে হয় যেন এই দেখাটা না ঘটেই পারতো না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ হতেই হত একদিন না একদিন যেভাবে হোক যেখানে হোক।'

কোন্ সাক্ষাৎকারের কথা ইঙ্গিত করছে মেজর, তা বুঝতে দেরী হয় না সোনালীর। মিলিটারী লাইনের লোক যে এমন সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে, এই প্রথম জানছে সে।

'আচ্ছা, আপনার পুরো নাম কি?' জিজ্ঞেস করে সোনালী।

'ইন্দ্রজিৎ দত্ত। তবে পদবীর বোঝা বয়ে বেড়াতে আমি ভালোবাসি না।'

এই জন্যেই কাল ও ফোনে নিজের পরিচয় দিয়েছিল শুধু 'মেজর ইন্দ্রজিৎ' বলে। এখন বুঝতে পারছে সোনালী।

কথায় কথায় ইন্দ্রজিতের সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানতে পারে সোনালী। মেজর নাকি সাউথ প্যাসিফিক এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরেও অনেক ঘুরেছে, আর হিমালয়ের তো কথাই নেই। সামনের বছর সে নাকি আবার যাচ্ছে একটা রিসার্চ টীমের সঙ্গে গাড়োয়াল—হিমালয়ের পার্বত্য বৈচিত্র্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে।

'আপনার ছুটিগুলো তবে এমনিভাবেই কাটে?'—বললে সোনালী—'কখনও বিশ্রাম নেন না?'

'আমার ডিকশনারিতে লীজার বলে কোনো শব্দ নেই!'—দূরের দিকে তাকালো ইন্দ্রজিৎ—'চুপচাপ বসে সময় আমার কিছুতেই কাটে না। নিরালায় একটু বসলেই আমি শুনতে পাই সমুদ্রের কলরোল, অরণ্যের মর্মর, বরফঢাকা গিরিচূড়ার নিঃশব্দ আহ্বান।'

আশ্চর্য! এমন একটি ঘরছাড়া মানুষের সঙ্গে যে তার দেখা হবে এমন কথা সোনালী কি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল?...

'আপনি অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসেন না?' জিজ্ঞেস করলো ইন্দ্রজিৎ।

'খুব ভালোবাসি। কিন্তু সুযোগ কোথায়? ছেলেবেলায় ইচ্ছে ছিল সাইক্লিং, রাইডিং, সুইমিং এসব শিখি। অ্যাডভেঞ্চার করতে গেলে এসব এলিমেণ্টারি ট্রেনিং-গুলো দরকার। কিন্তু আমার বাবা এত গোঁড়া ছিলেন যে কোনো সুযোগই আমি জীবনে পাইনি। কোনো দলবলের সঙ্গেও বাবা আমায় কোথাও কোনোদিন যেতে দেননি। আর এইভাবে মানুষ হয়ে উঠে, এখন যেন মনে হয় আমার আসল সত্তাটাই কেমন পাথর-চাপা পড়ে গেছে।'

ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন একটা বেদনা বোধ করলো ইন্দ্রজিৎ। সহানুভূতির সুরে বললো: 'আর কিছু না হোক ছুটিছাটায় খানিকটা ট্রেকিং তো অন্তত করে আসতে পারেন কোনো দলের সঙ্গে। এইসব পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগবে দেখবেন। কত রকমের নুড়ি, কত রকমের গাছপালা, পাখী দেখতে পাবেন তার ঠিক নেই।'

'লম্বা ছুটি না হলে তো এসব ট্রেকিং ফেকিং সম্ভব নয়। কিন্তু সেরকম ছুটি তো পাওয়া যাবে না, অনেকদিন কাজ না করলে।'

এই সময় খোলা দরজা দিয়ে সোনালীর অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে দাঁড়ালো। বললে: 'আমি খেতে যাচ্ছি। রেস্তোরাঁর বয়কে কি বলবো এখানে চা দিয়ে যেতে?'

অতিথি-টতিথি এলে অনেক সময়েই এখানে চা-টা আনিয়ে নেয় সোনালী, তাই এই প্রশ্ন। এছাড়া, আরেকটা উদ্দেশ্যও অবশ্য ছিলো অ্যাসিস্ট্যাণ্টটির। সেটা হচ্ছে, সোনালীকে মনে করিয়ে দেয়া যে এটা টিফিন আওয়ার। এই একমাস ধরে লক্ষ্য করে কিছুটা চিনেছে সে তার উপরওয়ালা ভদ্রমহিলাটিকে। অফিসের ফাইল-পত্রই ঘাটুক, বই-ই পড়ুক, কিংবা কারো সঙ্গে কথাই বলুক, কিছু একটা করতে গেলেই একেবারে তার মধ্যে ডুবে যায় মিস সিনহা। খাবার কথা ভুলে যায়। টিফিন আওয়ার পেরিয়ে গেলে হঠাৎ মনে পড়ে।

ছোকরাটির দিকে তাকিয়ে সোনালী বললে: 'থাক, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি এখনি।'

ছোকরা বেরিয়ে যেতেই ইন্দ্রজিৎ বললে: 'পসিবলি আই শুড্ গো নাউ। অনেক সময় নষ্ট করেছি আপনার—'

ইন্দ্রজিতের ভদ্রতা দেখে মনে মনে হাসলো সোনালী। মুখে বলছে 'এখন আমার বিদায় নেয়া উচিত', কিন্তু ওর চোখে ফুটছে আবেদন: 'আমায় যেতে বোলো না। আমায় তোমার সঙ্গে আরেকটু থাকতে দাও।'

এ অবস্থায় একটি মাত্র কথাই বলা যায় কোনো ভদ্রলোককে। এবং সেই কথাটিই বললো সোনালী: 'আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তবে চলুন দুজনে এক-সঙ্গে গিয়ে চা খাওয়া যাক।'

'উইথ প্লেজার।' বলে উঠে দাঁড়ালো ইন্দ্রজিৎ।

অফিস্-গ্রাউণ্ড থেকে খানিকটা উঁচুতে, একেবারে ঠিক পাহাড়ের মাথায় পাইন্ উড্ কেবিন। এখানেই টিফিন সারে অফিসের সমস্ত লোক। কিন্তু কেবিনে খরিদ্দারদের বসবার জন্যে আছে মাত্র একখানি ছোট ঘর। তাতে জন-আষ্টেক লোকও একসঙ্গে ধরে কি ধরে না। তাই অনেকেই বাইরে খোলা আকাশের তলায় বসে খায়। সেইজন্যে কিছু চেয়ার-টেবিল

কেবিনের সামনেকার প্রায়-সমতল জায়গাটাতে পাতা হয় এই টিফিন আওয়ারে।

'ভেতরে বসবেন না বাইরে বসবেন?' জিজ্ঞেস করলো ইন্দ্রজিৎ।

'ভেতরে বসতে গেলে এখন অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ।'—উত্তর দিলো সোনালী—'দেখছেন তো কি ভিড়! তার চেয়ে বাইরেই বসা যাক। রোদটাও পোয়ানো যাবে একটু।'

'আসুন তবে, এখানটায় বসা যাক।' বলে একটা খালি টেবিলের দিকে এগোলো ইন্দ্রজিৎ।

'নভেম্বরের এই রোদটা ভারী মিষ্টি লাগে আমার।'—বসতে বসতে বললো সোনালী—'দেখা যায় না তো সহজে। তবে—এ আর কতক্ষণ। এই একটু বাদেই তো অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে সমস্ত পাহাড়টা ঘিরে।'

'দার্জিলিং ইজ কাইন্ড টু ইউ।'—মাথার ওপরে প্রসারিত উদার আকাশটার দিকে তাকালো ইন্দ্রজিৎ। নইলে মিড্-নভেম্বরের আকাশ কখনো এত নীল হয়? ঠিক যেন স্যাফায়ারের মত নীল।'

সত্যিই কি ঘন নীল আর উঁচু দেখাচ্ছে আজকের আকাশটা। তবু সে দিকে চেয়েই সোনালী বললে: 'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হ'য়ে বলতে পারছি না, দার্জিলিং ইজ কাইন্ড টু মী। এখানে এসে পর্যন্ত এত রকম অসুবিধেয় পড়েছি যে বলবার নয়। ভালো ঘরই একটা পেলুম না এখন পর্যন্ত।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! রয়, দেবব্রত, এরা কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারছে না? এরা তো বহুদিন এখানে আছে, চেনেও অনেককে। একটা ঘর ঠিক করে দেয়া এদের কর্তব্য।'

'ওঁরা চেষ্টা করছেন যথেষ্ট। শীত-কালের জন্যে ঘর পাওয়াও যাচ্ছে। কিন্তু বারো মাসের জন্যে ঘর পাওয়াই মুশকিল। পুজো সীজনে কি সামার টাইমে সাধারণ ভাড়ায় ভালো ঘর দিলে তো হোটেল-ওয়ালাদের ভীষণ লোকসান কিনা!'

'আই সী।' গম্ভীর হল ইন্দ্রজিৎ।

'পেয়িং গেস্ট অ্যাকোমোডেশনের চেষ্টাও অনেক করেছি। কিন্তু একটু ডিসেন্ট ব্যবস্থা খুঁজতে গেলেই চার্জ যা চাইবে তা প্রায় আমার মাইনের অর্ধেক। দ্যাটস্ টু মাচ্।'

'এখন তাহলে আছেন কোথায়?'

'আছি তো সেনগুপ্ত সাহেবের কোয়ার্টারে।'

'সেনগুপ্ত? ওখানে আপনার সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

'ইউ আর রাইট। দেখি, ভালো ঘর না পাই তো যেমন তেমন ঘরে না-হয় উঠে যাবো দু'দিন বাদে। আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।'

'কি ব্যাপার, বয়টা যে এদিকে আসছেই না?' এদিক-ওদিক তাকালো ইন্দ্রজিৎ।

'একটা মাত্রই তো লোক।' হাসলো সোনালী—'কতদিক আর করবে বলুন: তাছাড়া, যা বুঝতে পারছি, রান্না ওদের এখনো হয়নি, তাই এদিকে ঘেঁষছে না। আমি তো দুপুরে এখানে ভাত খাই কিনা। কিন্তু—আপনার চা-টা তো এখনি দিতে পারে।'

'আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনার কথাই ভাবছি। এসব ঠাণ্ডা জায়গায় খাওয়া-দাওয়া ঠিক সময় মতন না হলে শরীরের ভীষণ ক্ষতি হবে।'

কথার ফাঁকেই বয়টা হঠাৎ এসে দাঁড়ালো। হাতের ট্রেতে গরম ভাতের প্লেট আর চীনা-মাটির বাটিতে ধোঁয়া-ওঠা মাংস।

'আপনি কি খাবেন বলুন তো?' ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালো সোনালী।

'কি পাওয়া যাবে দেখুন আগে। আমি তো ভেজেটেরিয়ান কিনা।'

ভেজেটেরিয়ান! প্রায় আকাশ থেকে পড়ে সোনালী। এই পুরুষ শার্দূলটি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী!

বয়ের দিকে চেয়ে সোনালী বলে: 'আজ কি পাওয়া যাবে বলো তো। মাছ মাংস ডিমের জিনিস ছাড়া?'

'টোস্ট, মাখন আর বিস্কিট।'

'আর?'

'আর কিছু নেই।'

'তাহলে শোনো। চারখানা মাখন লাগানো টোস্ট, চারখানা বিস্কিট, আর দু'কাপ চা এনে দাও।'

'আচ্ছা মেমসাব।'

বয়টা চলে যেতে ইন্দ্রজিৎ বললে: 'আপনি খেতে সুরু করুন।'

'তাই কি হয়? অতিথিকে বসিয়ে রেখে কি খাওয়া যায়?'

'সে হবে না। ঐ চালের মত ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মুখেই দিতে পারবেন না আর। এখনি শুরু করুন।'

পীড়াপীড়ি করতে লাগলো ইন্দ্রজিৎ। অগত্যা সোনালী একাই আরম্ভ করে দিলো খেতে।

একটু বাদে টোস্ট-বিস্কিট এল। সেই সঙ্গে চা।

কাপে চুমুক দিয়ে ইন্দ্রজিৎ বললে: 'আপনার চা-টা তো দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খেতে খেতে।'

'আমি হট-টী খেতে পারি না। ওয়াম' টী খাই। ওয়াম' অ্যাজ দিস্ নভেম্বর সান-সাইন্!' বলে হাসলো সোনালী। হাসির সঙ্গে ওর উজ্জ্বল চোখের আভা ঠিকরে পড়লো।

ইন্দ্রজিতের মনে হল, এমন হাসি সে আর কাউকে হাসতে দেখেনি কখনো। এ-হাসিতে যা বিচ্ছুরিত হয় তা শুধুই কৌতুক নয়, তা হচ্ছে ভালোবাসা। আকাশের নীল, বনের সবুজ, দিনের সূর্য, রাতের তারা—সবকিছুর দিকে নিত্য প্রবহমান এক আশ্চর্য, প্রদীপ্ত ভালোবাসা।

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনি যখন ভাতের প্লেট্ শেষ করে চায়ে চুমুক দেবেন, তখন ওটা আর ওয়ার্ম থাকবে না। ইট উইল বী অ্যাজ কোল্ড অ্যাজ দ্য আইসি নাইট অব ডিসেম্বর!' ইন্দ্রজিৎ কথা বলতে জানে।

ওর বলার ভঙ্গি দেখে জোরে হেসে উঠলো সোনালী।

খানিক বাদে বয়কে ডেকে আরেক কাপ গরম চায়ের অর্ডার দিলো ইন্দ্রজিৎ।

'আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'—সন্তর্পণে বললো সোনালী।

'স্বচ্ছন্দে!' —হাসলো ইন্দ্রজিৎ —'যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'আচ্ছা এত লাইন থাকতে আপনি মিলিটারী লাইনে এলেন কেন?'

এক মুহূর্ত ওর দিকে দীপ্ত চোখে তাকিয়ে থেকে ইন্দ্রজিৎ বললে: 'দেশকে ভালোবাসি বলে। বিপদে-আপদে আমার দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবো বলে। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি বাঙালী ভীরু, বাঙালী লড়াই করতে জানে না, বাঙালী গালে চড় খেয়ে পাঁচশ ভল্যুম মিলসন্দি আওড়ায়। তাই ইচ্ছে ছিল আমার জীবন হবে এই চিরাচরিত ধারণার জীবন্ত প্রতিবাদ। হয়েছেও তাই।' এমন অপ্রত্যাশিত দৃপ্ত উত্তরের সামনে সোনালীকে মাথা নীচু করতেই হল।

খেতে খেতে কথা বলতে বলতে টিফিন আওয়ার শেষ হয়ে এল। এবার বিদায় নেবার পালা ইন্দ্রজিতের। অফিস আওয়ারে আর সোনালীকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তাছাড়া তার নিজেরও কাজ রয়েছে।

'আজই বিকেল পাঁচটার সময় আমি জীপে স্টার্ট করছি কলকাতার দিকে।'—বিদায় নেবার মুহূর্তে জানালো ইন্দ্রজিৎ—'সামনের মাসে আবার আসবো।'

একটু থেমে বললো: 'কলকাতায় আপনার কেউ থাকেন?'

'বাঃ, আমার বাড়ীই তো ওখানে। মা বাবা সবাই আছেন।'

'তাহলে—কোনো খবর দেবার থাকে তো বলুন। আমি নিজে সে খবর পৌঁছে দেবো ওঁদের কাছে।'

একটু কি ভাবলো সোনালী। তারপর বললো: 'থাক।'

যাবার সময় আর কর-মর্দন করলো না ইন্দ্রজিৎ। শুধু বললো: 'গুড বাই।'

মিলিটারী চালেই হেঁটে চলে গেল বটে ইন্দ্রজিৎ, কিন্তু সোনালী বেশ বুঝতে পারলো, আজই এমন করে বিদায় নিতে ওর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মিলিটারী-জীবনে বসিয়ে বসে প্রেম করার সময় নেই। জীপে করে ও কলকাতা যাবে—নিশ্চয় জরুরী কোনো কাজেই। এক মাসের আগে আর এদিকে আসতে পারবে না।...রেস হর্সের দুরন্ত গতিতে ওরা চলে, সেখানে থামার অবকাশ কোথায়?

ক্রমশঃ

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮)

মেলার দাঙ্গা মেলাতেই শেষ হয়ে গেল। ঈশম বাড়ি ফিরে এসেছিল সকালের দিকে। শীর্ণ চেহারা, দুর্বল। দেখলে মনে হবে, শরীর থেকে প্রাণপাখি ওর উড়ে গেছে। সে সেই যে ডাকছিল মাঠে মাঠে, নদীর পাড়ে পাড়ে, ডাক আর থামেনি। কেমন চোখ ঘোলা ঘোলা—যেন সে কোন নাবালককে চুরি করে ফিরছে। কে খবর বলল, ঈশমকে দেখে এসেছে বিলের পাড়ে বসে বিড় বিড় করে কি বকছে। শচীন্দ্রনাথ আর দেরি করেননি। মেলার দাঙ্গা এদিকে ছড়ায়নি। রাতে রাতে শেষ হয়ে গেছে। নুলিয়াঙ্গ থেকে একদল পুলিশ, নারানগঞ্জ থেকে সঙ্গে একদল আর্মড পুলিশ এসে শেষপর্যন্ত দাঙ্গা আয়ত্তে এনেছে। মাতব্বর মানুষেরা আবার সকলকে মিলে-মিশে থাকতে বলে গেলেন—যাক এবারের মতো ফয়সালা হয়ে গেল। সামু খবর পেয়ে ঢাকা থেকে ছুটে এসেছে। বিলের পাড়ে যাবার সময় সামুর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের দেখা। সামু বলল, কর্তা কৈ যান?

—যামু ফাওসার বিলে।

—এই সকাল সকাল!

—ঈশমটা ত ফিরে নাই। দাঙ্গায় ঈশম বুঝি গ্যাছে মনে হৈল। এখন শুনতাছি ঈশম বিলের পাড়ে দুই দিন ধইরা বইসা আছে।

শচীন্দ্রনাথ ঈশমকে প্রায় বিলের পাড় থেকে ধরে এনেছিল। চোখমুখ দেখলে আর বিশ্বাসই করা যায় না এই সেই ঈশম। সোনা লালটু, পলটু, ঈশমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের দেখে ওর কেমন শরীর কাঁপছিল। সে হাসতে পারল না। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না—ওরা ফিরে আসতে পারে। সে নাবালকদের মাথায় মুখে হাত দিয়ে বলল, বাবু আপনেরা বাইচা আছেন! বাবুগ বলে তার ভিতর থেকে কেমন এক কান্নার আবেগ উঠে আসছিল।

শচীন্দ্রনাথ এবার ধমক দিল।—এই ওঠ। যা এখন, স্নান কইরা খা। তারপর ঘুমাইবি। তরমুজ খেতে আইজ আর যাইয়া যাইতে হইব না। তোমরা যাও। আরে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। বলে সোনা, লালটু, পলটুকে বৈঠকখানা ঘর থেকে নেমে যেতে বলল। ওরা নেমে না গেলে ঈশম সারাদিন ওদের সামনে বসে থাকবে এবং পাগলের মতো হাউ মাউ করে আবেগে সুখের কান্না কাঁদতে থাকবে।

মেলা থেকে মালতীও ফিরে এসে কেমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে থাকল। রাত হলে সে ঘরের বার হত না। কুপি জেলে বসে থাকত। রাত হলে শোভা আবুকে বুকে নিয়ে কেবল দুঃস্বপ্ন দেখত। এক একদিন বলার ইচ্ছা হত, ঠাকুর আর পারি না। রাইতে ঘুম নাই চোখে, মনে হয় কারা যান রাইতে বাড়ির উঠানে ফিস ফিস কইরা কথা কয়। তোমারে ঠাকুর বুঝাইতে পারি না পরানে কি জ্বালা। সেই যেন জালালির মতো জ্বালা সহে না প্রাণে। জ্বালা মরে না জলে, ঠাণ্ডা হাত, কিছু উষ্ণ স্পর্শের জন্য মালতীকে কাতর দেখাচ্ছে। অথবা যেন বলার ইচ্ছা, ঠাকুর আমারে নিয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায় চইলা যাও। কিন্তু সকাল হলে, যখন সোনালী বালির মাঠে মোরগেরা ডাকে, সূর্য গাব গাছটার ফাঁকে উঁকি মারে তখন কিছু আর মনে থাকে না। তখন মনটা পাগল পাগল লাগে, কোনো ফাঁক-ফিকির খোঁজা, কি করে মানুষটারে দ্যাখা যায়।

একদিন সে রঞ্জিতকে বলল, আমারে একটা চাকু দিবা ঠাকুর?

—চাকু দিয়া কি করবে?

—আমারে দ্যাওনা। কাঠের চাকু দিয়া আর খেলতে ইচ্ছা হয় না।

—হাত তোমার এখনও ঠিক হয়নি মালতী। ঠিক হলে এনে দেব।

মালতীর বলার ইচ্ছা হত, আমার হাত ঠিক নাই কে কয়! তুমি আমারে আইনা দাও, দ্যাখ একবার কি খেলাটা খেলি। বুঝি মরণ খেলার সখ। অমূল্য বড় বেশি বাড় বাড়ছে। রঞ্জিত আসার পর থেকেই অমূল্য কেমন মরিয়া—সে ফাঁক ফিকিরে আছে, পেলেই ঘাড়টা মটকে, ঝোপে জঙ্গলে, অথবা কবিগান হলে, যাত্রা গান হলে, যখন কেউ বাড়ি থাকে না, মালতী বাড়ি পাহারা দেবার জন্য শুয়ে থাকে, থাকতে থাকতে দরজায় শব্দ, কে তুমি! আরে কথা কওনা ক্যান, দরজা খুইলা চইলা আস, দ্যাখ একবার চাঁদের লাগান মুখখানা, বলেই ভিতরে ভিতরে মরণ খেলার জন্য মালতী প্রস্তুত হতে থাকে। তখনই মনে হয় যেন জব্বর দাঁড়িয়ে আছে গাছতলাতে, ইস্তাহার বিলি করছে। বলছে, মালতী দিদি আইলেন। ওর পাশের মানুষগুলি দাঁত বের করে মালতীকে দেখছে। ঠিক এমন একটা ছবি ভাসলেই, ওর বায়না রঞ্জিতের কাছে, ঠাকুর দ্যাও না, বড় একটা চাকু, দিবা আমারে, সূর্য ডুবলে আমার বুকে জল থাকে না।

দাঙ্গার পর থেকে এই লাঠি খেলা ছোরা খেলা রাতের আঁধারে অথবা অন্য কোথাও ডে-লাইট জেলে এবং বড় মাঠের বাড়ির মাঠকোঠা পার হলে যে নির্জন জায়গা—গ্রামের মানুষেরা সেখানে জমা হত। এখন আর রঞ্জিত এ-সব দেখে বেড়ায় না। সে দূরে দূরে চলে যায়, কোথায় যায় কেন যায় কেউ জানে না। কবিরাজ এবং গোপাল দেখাশোনা করছে। ফাল্গুন চৈত্র গেল। বোশেখ মাস বড় গরম। গরমে জ্যোৎস্না উঠলে ডে-লাইট জ্বালা হত না। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় খেলা হত। মুখগুলো তখন ভাল করে যেন চেনা যেত না। মালতী শোভা আবুকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর-বাড়ি চলে আসত। ধনবৌ, বড়বৌ থাকত। পালবাড়ি থেকে সুভাষের মা আসত। হারান পালের বৌ আসত। চন্দনের বড় বড় দুই মেয়ে মতি এবং পর্ণা আসত। ধীরে ধীরে খেলা জমে উঠলে, সোনাদের নতুন মাস্টারমশাই শশীভূষণ সকলের হাতে ছোরা তুলে দিতেন। এই দেশে কোথায় কবে গুরুত্বপূর্ণ বোধে যাবে—তিনি ইতিহাসের কথা, যখন স্বাধীনতা আসে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সময় যায়, বোধে গেলে এইসব লাঠি খেলা ছোরা খেলা আপন প্রাণ রক্ষার্থে কাজে আসে।

কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। ঠিক এ-অঞ্চলে বাস করলে টের পাওয়া যায় না। সুজলা সুফলা দেশ। অভাবে অনটনে মানুষ চলে আসছিল, শশীভূষণ এই দলের বুঝি। সে চাকুরি নিয়ে চলে এল। মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সোনা শশীভূষণের পায়ের কাছে বসে ইতিহাসের গল্প শুনেছে, ট্রয় যুদ্ধ, ট্রয়ের সেই কাঠের ঘোড়া। শহরের দরজায় কাঠের ঘোড়াটা কারা রেখে গেল! এত বড় ঘোড়া! নগরীর শিশুরা সেই কাঠের ঘোড়ার চারপাশে ঘুরে ঘুরে গান গাইছিল। শিশু বয়সে এই কাঠের ঘোড়া সোনাকে সমুদ্র, সমুদ্রে ঝড়, পাল তোলা জাহাজ অথবা হেলেন নামক রাজার এক অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী আরও কি যেন সব স্বপ্ন দেখাতে সোনা ভালবাসত, সেই কাঠের ঘোড়া সমুদ্রের বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে আছে—কি বড় আর উঁচু! এবং ভিতরে হাজার হাজার সৈন্য সেই ট্রয়ের নগরী এবং সমুদ্রের বালিয়াড়ির কথা মনে হলেই সোনার মনে হয় রাজার এক দেশ আছে,

বাবার কাছে সে গল্প শুনেছে, বাবুদের বাড়িতে, মুড়াপাড়ার বাবুদের বাড়ি নদীর পাড়ে পাড়ে প্রাসাদের মতো অট্টালিকা, আর নদীর চরে কাশফুল এবং বড় চর পার হলে পিলখানার মাঠ, মাঠে সব সময় হাতিটা বাঁধা থাকে, বাবুদের মেয়ে অমলা কমলা, কমলা ওর বয়সী মেয়ে, ওরা কলকাতায় থাকে, পুজোর সময় ওরা আসে। কেন জানি সোনার প্রিয় নগরীর কাঠের ঘোড়াটার কথা মনে হলে, নদীর চরে হাতিটার কথা মনে হয়, অমলা কমলার কথা মনে হয় আর মনে হয় সেই অট্টালিকার মতো প্রাসাদের কথা। বড়দা মেজদা পুজো এলেই যায়। সে যেতে পারে না। মেলা থেকে এসে এবার কেন জানি তার মনে হল, দাদাদের মতো সেও এবার মুড়াপাড়া যেতে পারবে। বাবুদের হাট শীতলক্ষ্যা নদী, পিলখানার মাঠ এবং নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই স্টিমারটা দেখতে পাবে। কি আলো, কি আলো! সারা নদী উথাল পাতাল করে আলোটা গ্রামের দু পাশে, মাঠের ঘাসে ঘাসে, নদীর চরে কাঁশবনে কিছুক্ষণের জন্য স্থির উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সোনা মেলা থেকে এসেই কেন জানি ভাবল সে বড় হয়ে গেছে। সে এবার মুড়াপাড়া দুর্গাপুজো দেখতে যেতে পারবে।

এই শশীভূষণ ভোর হলে তক্তপোষে বসে থাকত। দুলে দুলে কি সব বই পড়ত। সোনা চেয়ারে বসে পা দোলাত এবং মনোযোগ দিলে ওর পড়া শিখতে বেশি সময় লাগত না। তারপর এদেশে বর্ষাকাল এলে নৌকায় করে স্কুল। মাস্টারমশাই কাঠের পাটাতনে মাঝখানে বসে থাকতেন। ঈশম লগি বাইত। ওরা তিন ভাই, গ্রামের অন্য চার পাঁচজন ছেলে একসঙ্গে মাস্টারমশাইকে নিয়ে বিদ্যালয়ে চলে যেত।

বর্ষা এলেই কত শালুক ফুল ফুটে থাকে চারিদিকে। তখন এ-সব অঞ্চলে আর হাতি ঘোড়া উঠে আসতে পারে না। কেবল জল আর জল। ধানের জমি, পাটের জমি। জলে জলে দেশটা ডুবে থাকে মাছ, ছোট বড় রুপোলি মাছ জলের নিচে। স্ফটিক জল। ধান খেতে পাট খেতে কত রাজ্যের সব পোকামাকড়। ছোট বড় নীল সবুজ রঙের, কাচপোকার মতো আবার হলুদ রঙ কোন পোকার, সূর্য উঠলে এইসব পোকামাকড় পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। সোনা নৌকায় উঠলেই কৌটায় যত সোনা-পোকা ধরে আনে। একবার সে একটা আশ্চর্যরকমের পোকা পেয়েছিল---সোনালি রঙের কাঁচপোকা। টিপ দেবার মতো। সে খুব যত্ন করে পোকাটাকে, পোকাটাকে পোকা বলে চেনাই যায় না, মুক্তো বিন্দুর মতো মাঝখানে উজ্জ্বল, চারিদিকে তার সোনালি রঙ, কালো একটা বর্ডার দেয়া হয়ত পা কিছু নেই। যেন জীবন্ত এক কাঁচপোকা। সে ফতিমার জন্য সেই কাঁচ-পোকা কৌটার ভিতর রেখে দিয়েছিল। কবে ফতিমা আসবে, এখন দেখা হয় না, বর্ষা এলে এ-গ্রামে হুট করে চলে আসতে পারে না ফতিমা। সে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গোপনে কাঁচপোকাটা ওর সুটকেশে তুলে রাখল। বর্ষা শেষ হলে সে ফতিমাকে কপালে টিপের মতো পরিয়ে দেবে।

সোনা এইসবের ভিতর বড় হতে হতে একদিন দেখল, মেজ-জ্যাঠামশাই নৌকা পাঠিয়েছেন। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। ছোটকাকা বললেন, সোনা তুমি যাইবা দুর্গা ঠাকুর দ্যাখতে! কান্দাকাটি কইর না কিন্তু। সোনা এবার দূরদেশে যাবে। আকাশে বাতাসে পুজোর বাজনা বেজে উঠল। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে। আলিমদ্দি বড় একটা মাছ তুলে আনল। সোনা, লালটু পলটু মাছটাকে টেনে রান্নাঘরে তুলছে। কত বড় মাছ! ওরা তিনজনে নাড়তে পারছে না। বড়বৌ, ধনবৌ মাছটা দেখে তাজ্জব। চাইন মাছ! পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ এত বড় মাছটা দেখে উঠোনের উপর নাচতে থাকল।

সোনা বলল, আমি মুড়াপাড়া যামু দাদা।

—কে কইছে তুমি যাইবা?

—কাকায় কইছে।

লালটু ভেবেছিল মা হয়ত বলেছেন। মা বললে এ সংসারে কিছু হয় না। মার কিছু বলার কোন অধিকার নেই। ছোট কাকা যখন বলেছে, তখন যথার্থই যাবে সোনা। কেউ বাধা দিতে পারবে না। লালটু কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, জ্যাক কইরা কাইন্দা দিলে হইব না, আমি বাড়ি যামু—বলে লালটু সোনাকে মুখ ভেংচে দিল। এই অভ্যাস লালটু পলটুর। সোনাকে ওরা সহ্য করতে পারে না। এ-বাড়িতে সোনা সকলের ছোট বলে ওর আদর বেশি। এতদিন সে মুড়াপাড়া যেতে পারেনি—এটা একটা সান্ত্বনার মতো ছিল। সেই সোনা ওদের সঙ্গে যাচ্ছে।

সোনা অন্যদিন হলে ভেংচি দিত উল্টে। কিন্তু সে দুর্গা ঠাকুর দেখতে যাবে। ওর প্রাণে কি যে আনন্দ। সে দূর-দেশে যাবে। কতদূর! একদিন লেগে যাবে যেতে। কত নদী বন মাঠ পড়বে যেতে। সে লালটুকে মন প্রফুল্ল থাকলে দাদা বলে ডাকে। পলটুকে বড় দাদা। সে এখন মোটামুটি স্কুলের ভাল ছাত্র। সে এখন দূরের মাঠে একা নেমে যেতে পারে। যব গম খেতে লুকোচুরি খেলতে আজকাল আর ভয় পায় না।

ধনবৌ সোনার মুখ দেখতে থাকল। বড় করে কাজল টেনে দিয়েছে চোখে। সুন্দর মুখ। যত লাবণ্য চোখে। বয়সের অনুপাতে লম্বা বেশি। একটু মাংস থাকলে শরীরে এ-লাবণ্য সবুজ দ্বীপের মতো। সোনার চোখ বড়। কাজল দিলে সে চোখ আরও বড় দেখায়। কপালের এক পাশে কড়ে আঙুলে ধনবৌ লম্বা করে কাজল টেনে দিল। বাঁ পা থেকে সামান্য ধুলো নিয়ে সোনার মাথায় দিল এবং সামান্য থুথু ছিটিয়ে দিল শরীরে। তারপর সোনাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেল কপালে। সোনার কেমন সুড়সুড়ি লাগছিল—কাতুকুতুর মতো। সোনা খিল খিল করে হাসছিল।

সোনা একেবারে পুরোপুরি পাগল মানুষের মুখ পেয়েছে। শরীরের গড়ন দেখলে বোঝা যায় তেমনি লাবণ্যময় শরীর তার, বয়সকালে উঁচু লম্বা হবে খুব। ধনবৌ সোনাকে কোলে নিয়ে আদর করতে চাইল। কিন্তু সোনার সংকোচ হচ্ছে। সে লজ্জা পাচ্ছিল। বলল, আমার লজ্জা করে। আমি কোলে উঠমু না মা।

দূরদেশে যাবে ছেলে। সাত আটদিন ধনবৌ এই ছেলে বুকে নিয়ে শুতে পারবে না। বুকটা কেমন টনটন করছিল। বলল, কও তোমারে নৌকায় দিয়া আসি। এই বলে জোরজার করে কোলে তুলে নিতে চাইল।

সোনা কিছুতেই উঠল না।

ধনবৌ বলল, আমার যে ইচ্ছা করে তোমারে একটু কোলে লই। বলে ফের ছেলেকে দুহাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেল।

—ধ্যাৎ তুমি কি যে কর না মা! আমারে তুমি কোলে নিবা ক্যান! আমি বড় হই নাই!

—অ—মারে! আমার সোনা বড় হইছে। বড়দি শুইনা যান, কি কয় সোনা! সোনা নাকি বড় হইছে। কোলে উঠতে লজ্জা!

নৌকা ঘাটে বাঁধা। ওরা তিনজন যাবে মুড়াপাড়া। দুর্গা ঠাকুর দেখতে যাবে। গ্রামের পুজো প্রতাপ চন্দ করে। কত বছরের এক মামলা আছে। কেউ সে-বাড়ি ঠাকুর দেখতে যেতে পারে না। ছোট বালকদের মন মানবে কেন! পুজোর সময় হলেই ভূপেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠিয়ে দেন।

সুতরাং সোনা লালটু পলটু যাচ্ছে মুড়াপাড়া। ঈশম নিয়ে যাচ্ছে। এ-কদিন আলিমদ্দি বাড়ির কাজ করবে। ঈশমেরও যেন কদিন ছুটি। সে এই দলবল নিয়ে

বেশ হৈচৈ করে ফিরে আসবে। সে সকলের আগে গিয়ে নৌকায় উঠে বসে আছে। ভালো লগি নিয়েছে। বৈঠা নিয়েছে। অন্যের লগি বৈঠা ওর পছন্দ নয়। পালের দড়িদড়া ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছে। খুটিনাটি কাজ। দূর দেশে যাবে। একদিন লেগে যাবে। সে সব কিছু, এমন কি হুকো কলকি ঠিক করে নিল। দশ ক্রোশের মতো পথ। এখন এই সকালে রওনা হলে পৌছাতে রাত হয়ে যাবে। ঘুরে ফিরে যেতে হবে। নদীতে এবং বিলে বাতাস পেলে, স্রোতের মুখে তুলে দিতে পারলে তবে সকাল সকাল যেতে পারবে।

সোনা ঠাকুর্দাকে প্রণাম করল তখন, দাদু আমরা মুড়াপাড়া পূজা দ্যাখতে যাইতাছি।

বুড়ো মানুষটি খুজে পেতে চিবুক ধরে বলল, তাই বুঝি!

লালটু বলল, দাদু দশরায় আপনের লাইগা কি কিনমু?

বুড়ো মানুষটা কোন উত্তর দেবার আগেই পলটু ঠাট্টা করে বলল, ঝুমঝুমি বাঁশি কিনমু।

—দ্যাখছ, দ্যাখছ বড়বৌ—কি কয় তোমার পোলা! আমারে ঝুমঝুমি বাঁশি কিনা দিব কয়।

ঠিকই বলেছে। আপনি ছেলেমানুষের মতো কাঁদেন। আপনাকে কেউ খেতে দেয় না বলেন।

—আমি কই বুঝি!

—বলেন না!

—আমার কিছু মনে থাকে না বৌ।

পলটু নৌকায় উঠে দেখল, পাগল মানুষ গলুইতে বসে আছে চুপচাপ। সে কখনও মামা বলে ডাকে না। এই মানুষ বড় অপরিচিত তার কাছে। এই মানুষের পাগলামি কেমন বিরক্তিকর। সে যত বড় হচ্ছে, এক পাগল মানুষ তার অনেক ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। দূরে দূরে থাকার একটা স্বভাব গড়ে উঠেছে পলটুর ভিতর। কিছুটা যেন শাসনের ভঙ্গী। এই মানুষের কোনো অসম্মান ওকে পীড়া দেয়। নানাভাবে সে-সব অসম্মান থেকে মানুষটাকে রক্ষা করার বাসনা। কিন্তু সে আর কি মানুষ যে—এই পাগল মানুষকে ধরে বেঁধে রাখবে।

নৌকার গলুইয়ে চুপচাপ বসে আছেন তিনি। পাটাতনের উপর পদ্মাসন করে বসে আছেন। পলটু নৌকায় উঠেই বলল, আপনে নামেন। কৈ যাবেন আপনে।

পাগল ঠাকুর পলটুর কথায় কোন জবাব দিল না। কেমন ফিক্ ফিক্ করে হাসছেন। পলটু এবার রেগে গিয়ে বলল, আপনে নামেন। নামেন কইতাছি।

মণীন্দ্রনাথ এতটুকু নড়ল না। কথা বলল না। বরং কাপড়টা বেশ যত্ন নিয়ে পাট করে পরলেন। পোশাকে কোন অশালীন কিছু আছে, এই ভেবে কাপড়টা বেশ গুটিয়ে পরলেন যেন। হাতকাটা সার্ট গায়ে। সার্টটা টেনেটুনে দিলেন। মাথায় চুল হাতেই পাট করতে থাকলেন। দ্যাখো এই চুল আমার, এই বসনভূষণ আমার—এবার আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি। বলে ধ্যানী পুরুষের মতো ফের পদ্মাসনে বসে পড়লে পলটু হাত ধরে টানতে আরম্ভ করল, নামেন আপনে। মা। মা—আ! সে চিৎকার করতে থাকল। যেন বড়বৌ এলেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু বড়বৌর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঈশম কিছু বলছিল না। সে বেশ মজা পাচ্ছে। সে চুপচাপ ছইয়ের ওপাশে বসে আছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মতো বসে বেতের ঝোপে বোলতার চাক খুজছে!

পলটু বলল, নামেন এখন। নৌকা ছাইড়া দিব।

কে কার কথা শোনে! এমন শরৎকালের সকাল, ঠাণ্ডা হাওয়া ধানখেত থেকে ভেসে আসছে, কোড়ার ডাক ভেসে আসছিল। নদীতে নৌকায় পাল দেখা যাচ্ছে। পাল তুলে নদীতে গ্রামোফোন বাজাতে বাজাতে কারা যেন যায়। সোনালি বালির নদী

থেকে সব বড় বড় মাছ ধান খেতে শ্যাওলা খেতে উঠে আসছে। কত শস্যক্ষেত্র দুপাশে অথবা স্ফটিক জল—কারণ পাট কাটা হয়ে গ্রাম মাঠ দ্বীপের মতো। চারপাশে যেন দীঘির জল টলটল করছে। বিশাল জলরাশি নিয়ে এইসব ঘর জমি এবং নদী ভেসে রয়েছে। মণীন্দ্রনাথের কতদিন থেকে কোথাও যাবার বাসনা। বর্ষা এলেই তিনি বন্দী রাজপুত্রের মতো শুধু অর্জুন গাছটার নিচে বসে থাকেন। মুড়াপাড়া থেকে নৌকা এসেছে শুনেই ওঁর দূরদেশে যাবার ইচ্ছা হল। সকালের আগে এসে যা কিছু পরনে ছিল, তাই নিয়ে, যেন তিনি এই কাপড় কত সুন্দর করে পরেছেন—চুল কি সুন্দরভাবে পাট করেছেন, ভদ্র মানুষের মতো চুপচাপ, একেবারে এক ভেই সরল বালক যেন—পলটু যত এ-সব দেখছিল তত ক্ষেপে যাচ্ছিল। সে এবার ভয় দেখাবার জন্য বলল, ডাকমু ছোট কাকারে?

মণীন্দ্রনাথ খুব অনুনয়ের চোখে পলটুর দিকে তাকালেন। যেন বলার ইচ্ছা—বাছা আর ডেকো না, আমি তোমাদের পাশে চুপচাপ বসে থাকব। মণীন্দ্রনাথের বড় অবজ্ঞা জীবের মতো চোখ। চোখে এক অসামান্য অসহায় দুঃখ ভেসে বেড়াচ্ছে—আমি যে এক পাগল মানুষ। কতকাল ধরে হাঁটছি। তবু সেই দুর্গের মতো প্রাসাদে পৌঁছাতে পারছি না। তিনি তার আতঙ্কে এমন কিছু বুঝি বলতে চাইছেন।

লাফাতে পলটু উঠে এল। ছোট কাকা ঘাটে এসেই বললেন, ভিতরে কে বইসা আছে রে?

সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ ছই-এর ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে যেন কত বাধ্যের ছেলে বের হয়ে পাটাতনে দাঁড়ালেন। ধনবৌ বড়বৌ এসেছে ঘাটে। ওরা নৌকা ছেড়ে দিলে চলে যাবে। তখন মণীন্দ্রনাথ পাড়ে উঠে আসছেন। চোখমুখে কি ভয়ংকর উদাসীনতা! নৌকার গলুইয়ে জল দিয়ে ঈশম ঘাট থেকে দড়ি ছেড়ে দিলে পাগল মানুষ ছুটে যেতে চাইলেন।

বড়বৌ এখন ঘাটে। সুতরাং কোন ভয় নেই। সে যেমন দুহাত ছড়িয়ে অন্যান্যবার আগলে রাখে এবারেও আগলে রাখল। বলল, এস, বাড়ি এস। বড়বৌর সেই এক বিষণ্ণ মুখ। কত আর বয়েস এই বড়বৌর। ত্রিশ হতে পারে তেত্রিশ হতে পারে। বড়বৌর বয়স মুখ দেখে ধরা যায় না। বড়বৌর দিকে তাকিয়ে পাগল মানুষ আর নড়লেন না। সোনা ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল, বড় জ্যাঠিমা, জ্যাঠামশাইকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। সোনার বড় কষ্ট হতে লাগল। সে এবার গলা ছেড়ে হাঁকল, জ্যাঠামশয়!

মণীন্দ্রনাথ কেমন দুহাত উপরে তুলে দিলেন। আশীর্বাদ করার মতো ভঙ্গীতে দুহাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সোনা এবার চিৎকার করে বলল, দশরা থাইকা কি আনমু?

পারতো আমার জন্য কপিলা গাইর দুধ এনো—যেন এমন বলার ইচ্ছা। আর যদি পার, শীতলক্ষার চরে এখন যে সব কাশফুল ফুটে থাকবে, বাতাসে তা আমার নামে উড়িয়ে দিও। সেই এক মেয়ে, পলিন যার নাম, পারতো তার নামে কিছু কাশফুল জলে ভাসিয়ে দেবে।

সোনা দেখল জ্যাঠামশাই কিছুই বলছে না। জ্যাঠিমা চুপচাপ। ক্রমে নৌকা ভেসে যেতে থাকল। ক্রমে ধানখেত পার হল সোনালি বালির নদী। নদীতে নৌকা নেমে গেলে আর কিছু দেখা গেল না। সোনাও এবার ছইয়ের ভিতর চুপচাপ বসে থাকলে ঈশম বলল, কি দ্যাখছেন সোনাবাবু?

বিলের জলে নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল ঈশম। সোনাকে এমন চুপচাপ দেখে কথা না বলে পারছিল না।

সোনা অপলক শুধু দেখছিল। এমন অসীম জলরাশি, পারাপারহীন জলরাশি—কত দূর চলে গেছে—বুঝি আর এই নাও এবং মাঝি বিল পার হবে না— জল শুধু জল। সোনা বিস্ময়ে হতবাক। সোনা কিছু বলল না। এই বিলে আবেদালির বৌ ডুবে মরেছে। এই বিলের জলে এক ময়ূরপঙ্খী নাও আছে—সোনার নাও, পবনের বৈঠা। সোনার বলতে ইচ্ছা হল ঈশমকে—এই যে জল, জলের নিচে যে নাও, সোনার নাও পবনের বৈঠা—পারেন না আপনে সেই নাও তুলে আনতে। আমি, আপনে আর পাগল জ্যাঠামশাই সেই নাও নিয়ে বিল পার হয়ে চলে যাব। যেন এমন নাও মিলে গেলেই ওরা সেই রেসপার্ট চলে যেতে পারবে। চোখ নীল, সোনালি চুল মেয়ের—আহা বড় ডুব দিতে ইচ্ছা করছিল বিলের জলে। ডুব দিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকাটা তুলে আনতে ইচ্ছা হচ্ছিল সোনার।

ভোরবেলা উঠে মালতী যেমন অন্যদিন সে তার হাঁস কবুতর খোঁয়াড় অথবা টঙ থেকে ছেড়ে দেয়, যেমন সে অন্য কাজগুলো করে চুপচাপ কিছুক্ষণ উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি সে আজও দাঁড়িয়ে থাকল। হাঁসগুলো জলে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে। রাতে ভাল ঘুম হয় নি মালতীর। কারা যেন সারা রাত অন্ধকারে ফিস ফিস করেছে। দাঙ্গার পর থেকেই মালতীর প্রাণে অহেতুক ভয়। নরেন দাসের বৌ বলেছে, তর যত কথা! কে তরে আর নিতে আইব।

সুতরাং সকালবেলা রাতের সেই ফিসফিস শব্দের কথা কাউকে সে বলতে পারল না। ভয়ে সে যথার্থই রাতে দরজা খুলে বের হয় নি। দু-একবার ওঠার অজ্ঞান রাতে। সে সব চেপেচুপে সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।—কে কে! এমন কি সে রাতে দু-তিনবার কে কে বলে চিৎকার করে উঠেছিল।—কারা কথা কয় গাছের নিচে। সে এবার ঝাঁপ তুলে দেখবার চেষ্টা করেছে। কখনও মনে হয়েছে—সেই দাঙ্গা, দাঙ্গার আগুনে চোখের উপর জ্বলছে। সে এসব দেখলেই আঁৎকে উঠত—তারপর মনে হত, না স্বপ্ন। জব্বরকে মালতী দুদিন উত্তরের ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। নরেন দাস রেগে গেছে, তুমি এখানে ক্যান মিঞা! তারপর বলত তর বাপ আইলে না কইছি ত...। জব্বর হাসত। হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে হাত বুলাত। বড় দাঁড়ি গোঁফ, চেনা যায় না—জব্বর এখন মাতব্বর মানুষ যেন। সে ওর মায়ের মৃত্যুর পর এদিকে অনেক দিন ছিল না। কোথায় কোন গঞ্জে সে এখন তাঁত কিনে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে। আবেদালির সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই। আবেদালি আবার নিকা করে ভাঙা ঘরে মন দিয়েছে। বিবির জন্য আনারেতো দিয়েছে। আবেদালির হাওলা করা বৌ মঙ্গল বাড়িতে এখন ঘরের ভিতর শুয়ে বসে থাকে। আবেদালিকে জব্বর আর পরোয়া করে না। এমন কি সেদিন বাপ-বেটাতে বচসা। লাঠালাঠি। সেই জব্বর এখন এদিকে এলে আর বাপের কাছে ওঠে না। সে ফেলু শেখের বাড়ি এসে ওঠে। এবং যে কদিন থাকে, ফেলুর বিবিকে আতর কিনে দেয়। সুগন্ধ তেল কিনে আনে হাট থেকে এবং বড় ইলিশ মাছ কিনে এনে দু-চার রোজ প্রায় যেন জব্বর এক নবাব—পয়সার উপর উড়ে বসে বেড়ায়। ফেলুর বিবি তো জব্বর এলেই উল্লাসে আর বাঁচে না। ফেলু সব বোঝে। সেই এক উক্তি তার—হালার কাওয়া! ভয় ডর নাই! তারপর কব্জিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ডান হাতটাতে সামান্য নিরাময়ের চিহ্ন ফুটে উঠছে। বাঁ-হাতের কব্জি তেমনি ফুলে ফেঁপে আছে। কালো রং, কুমীরের চামড়ার মতো খসখসে। মরা চাম উঠছে কেবল। কালো তারে সাদা কড়ি এবং আলকাতরার মতো চ্যাট চ্যাটে তেল মাখতে মাখতে হাতটা আর হাত নেই। জব্বর এলে বিবি তার নাচে গায়, ফুরফুরে বাতাসে উড়ে বেড়ায় আর কি সব শলা পরামর্শ—ফেলু তখন ছেঁড়া মাদুরে জামগাছটার নিচে শুয়ে থাকে। নিদেন যখন চক্ষে তার সয় না, বাগি বাছুরটা নিয়ে মাঠে নেমে যায়। তারপর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার—হালার কাওয়া

আমারে ডরায় না! সেই বিবি পর্যন্ত কিছু দিন হল জব্বরের সঙ্গে কথা কয় না, কি এমন ঘটনা—ওর বড় জানার ইচ্ছা ছিল, কি এমন ঘটনা ওদের দুজনকে মাঠের মতো বোবা বানিয়ে রেখেছে। সে আর আসে না, সে না এলে ফেলুর এখন আহার জোটা দায়।

কোন কোন দিন জব্বর সোজা উঠোনে উঠে আসত। তারপর মালতীকে ডেকে বলত, দিদি আছেন।

মালতী বাইরে এলে জব্বর বলতো, দিদি আপনের শ্বশুরবাড়ি যাইতে ইচ্ছা হয় না! আপনে শ্বশুরবাড়ি আর যাইবেন না?

—নারে কৈ যামু! কে আর আছে আমার। কি আর আছে আমার!

—কি যে কন দিদি, কি নাই আপনের?

মালতীর চোখে তখন জ্বালা ধরে যেত। মালতীর চেয়ে ছোট এই জব্বর। কিছু ছোট হবে। কত ছোট হতে পারে—সকালের হাওয়া মুখে লাগবার সময় এমনি ভাবল। আর দেখল এক কদর্য মুখ, মুখে এখন জব্বরের কি যেন লালসা! সে বুঝি ঘুর ঘুর করতে ভালবাসছে। সময় অসময় নাই সে জোক নিয়ে উঠোনের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। এইসব দেখলেই মালতীর ভয়টা বাড়ে। কেবল যেন বলার ইচ্ছা, তোমার ঠাং ভাইঙ্গা দিমু। অথবা সেই মানুষটার কাছে চলে যেতে ইচ্ছা হয়—ঠাকুর দিবা আমারে, একটা বড় চাকু আইনা দিব।

জব্বরের কথা মনে আসতেই মালতীর শরীর কেমন শক্ত হয়ে গেল। সে আর দাঁড়াল না। ছোট ছোট দীনবন্ধুর ডেফল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সে একটু আড়ালে দেওয়া জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সে মানুষটাকে খুঁজছে। না, নেই মানুষটা। সে দুটো লেবুপাতা ছিঁড়ল, যেন সে এখন এখানে পাতা তুলতে এসেছে। মানুষটার বদলে সে শশীভূষণকে বৈঠকখানা ঘরে দেখতে পেল। তিনি গোছগাছ করছেন—স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু সে গেল কোথায়। এ সময়ে মানুষটা জানালায় বসে থাকে। টেবিলের উপর গাদা গাদা বই। কেবল বইয়ের ভিতর মানুষটা ডুবে থাকে। সে গেল কোথায়! মালতী আর অপেক্ষা করল না। কাঁখে জলের কলসী থাকলে এত ভয়ের কারণ থাকে না। একটা অছিলা থাকে। তবু যখন ভাবতে ভাবতে ঠাকুরবাড়ির উঠোনে উঠে এসেছে তখন আর ফেরা যায় না। সে ভিতর বাড়িতে ঢুকলে দেখতে পেল, ঘাট থেকে বড় বৌ ধনবৌ উঠে আসছে। মালতী এ-বাড়ীর সকলকেই দেখতে পেল। কেবল রঞ্জিত নেই। রঞ্জিতকে কিছু বলা দরকার। একমাত্র মানুষ এই সংসারে যাকে সব বলা যায়। সে সোনাকে অনুসন্ধান করল। সে থাকলে তাকে বলা যেত, সোনা তোমার মামা গ্যাছে কোনখানে? কিন্তু সোনা, লালটু, পলটু কেউ নেই।

বড় বৌ মালতীকে দেখেই যেন ওর ভিতরের ভয়টা ধরে ফেলল। বলল, তোর মুখ এমন কালো কেন রে? কিছু হয়েছে! কেউ কিছু বলেছে?

—কি হবে আবার!

—সারা রাত, চোখ দেখলে মনে হয় না ঘুমিয়ে আছিস।

মালতী এবার লজ্জা পেল। সে বলতে পারত, অনেক কিছু—না ঘুমিয়ে সে থাকবে কেন, সে ত বিধবা মানুষ, তার আর কার জন্য রাত জেগে থাকা। সুতরাং সে যা—ও ভেবেছিল, রঞ্জিত কই বৌদি, অরে দাখতাছি না এমন কথায় সে তাও বলতে পারল না।

মালতী উঠোন পার হয়ে এল। ঠাকুর-ঘরের পাশে সেই শেফালি গাছটা, সে গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। ফুলে-ফুলে গাছের চার পাশটা সাদা হয়ে আছে। খুব ভোরে যারা ফুল তুলে নেবার নিয়ে গেছে। এর পরও ফুল ফুটেছে এবং ফুল ঝরে পড়েছে। মালতী কি ভেবে কোঁচড়ে ফুল তুলতে বসে গেল। কিছু কাজ ছিল না হাতে অথবা এও হতে পারে, কি করে এই উঠোনে কোন অছিলায় দেরী করা যায়—যদি রঞ্জিত কোথাও গিয়ে থাকে, তবে এক্ষুনি চলে আসবে। ফুল তুলতে-তুলতে সে হঠাৎ চলে আসবে। সে রঞ্জিতের জন্য গাছের নিচে ফুল তোলার অভিনয় করছে। মালতীর খোঁপা খুলে গিয়েছিল—খালি গা মালতীর—সাদা থানে মালতীকে এই সকালে সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছে। কি পুষ্ট তার বাহু। এমন পুষ্ট বাহু আর শরীর নিয়ে সে কি করবে। রঞ্জিতের কাছে সে বুঝি এমন একটা প্রশ্ন করতেই এসেছে—আমি কি করি! আমি কি যে করি! তখনই উঠোনে পায়ের শব্দ। বুঝি রঞ্জিত। সে চোখ তুলে দেখল, ছোট কর্তা। পিছনে ঈশম। ঈশমকে নিয়ে তিনি যজমান বাড়ি যাচ্ছেন। পূজা-পার্বনের সময় এটা। দুর্গা পূজার সময় — সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, দশমীর পর ফাঁকা-ফাঁকা ভাবটা পূর্ণিমাতে এসে ভরে যায়। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা—রাতে কোজাগরী জ্যোৎস্না। কি সাদা! কত ইচ্ছা তখন মালতীর। নদীর চরে সাদা জ্যোৎস্নায় তরমুজ খেতে চুপচাপ রঞ্জিতকে পাশে নিয়ে বসে থাকে। অঞ্জলিতে দুই হাত তুলে বলে, আমি বড় দুঃখিনী। তুমি আমারে নদীর পাড়ে নিয়া যাও—অথবা যেন বলার ইচ্ছা জলে নাও ভাসাওরে। মালতীর কেবল রঞ্জিতকে নিয়ে সাদা জ্যোৎস্নায় সোনালি বালির নদীর জলে নিভৃতে সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হয়। জলে নাও ভাসাতে ইচ্ছা হয়।

সে রঞ্জিতের প্রতীক্ষাতে বসে থাকল। সে এল না। দুবার বড়বৌদি এদিকে এসে-ছিল, দুবারই বলবে ভেবেছিল, বৌদি রঞ্জিতরে দাখতাছি না! কিন্তু বলা হয় নি। সংকোচে সে বলতে পারে নি। বৌদি-বৌদি, মনের ভিতর আকুতি তার, বৌদি-বৌদি আমি ফুল নিতে আসি নাই বৌদি আমি...।

বড় বৌ বলল, কিছু বলবি আমাকে?

—বৌদি রঞ্জিতকে দাখতাছি না!

—ও ঢাকা গেছে।

ঢাকা গ্যাছে! কেমন বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

—হ্যাঁ গেল। সন্ধ্যায় দেখি তোর এক মানুষ এসে হাজির। বাউল মানুষ। এ বাড়িতে ত তোর মানুষের শেষ নেই। বৈরাগী বাউল লেগেই আছে। খাবে-দাবে-শোবে, রাত কাটাবে। ভোর হলে যেদিকে চোখ যাবে সেদিকে নেমে যাবে। ভাবলাম সেই বুঝি। অমা রাতে দেখি কি সব ফিস-ফিস করে কথা! আমাকে বলল, দিদি ঢাকা যাচ্ছি কবে ফিরব ঠিক নেই, ফিরব কিনা আর তাও বলতে পারি না। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল বড়বৌ।

মালতী আর বড়বৌর সামনে দাঁড়াতে পারল না। সে বুঝি ধরা পড়ে যাবে। সে ছুটে বের হয়ে গেল। তুমি এমন মানুষ রঞ্জিত! সে যেন আর পারছে না। কোথাও ছুটে গিয়ে বুঝি ঝাঁপ দেবার ইচ্ছা। সে তেঁতুল গাছটা পার হয়ে গেল এবং বড় যে জাম গাছটা পুকুর পাড় ছায়াস্নিগ্ধ সুশীতল করে রেখেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে সে হাউ-হাউ করে বুঝি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারবে। কেউ টের পাবে না। সে ফুলগুলি এবার জলে ফেলে দিল। এবং দাঁড়িয়ে থাকল। ফুলগুলি জলে ভেসে কত দূরে যায়! রাতের অন্ধকারে ফিস-ফিস করে কথা বলে! আমি কই যাই ঠাকুর! মালতী সহসা চিৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু পারল না। অভিমানে চোখ ফেটে শুধু জল নেমে আসছে তার।

(ক্রমশঃ)
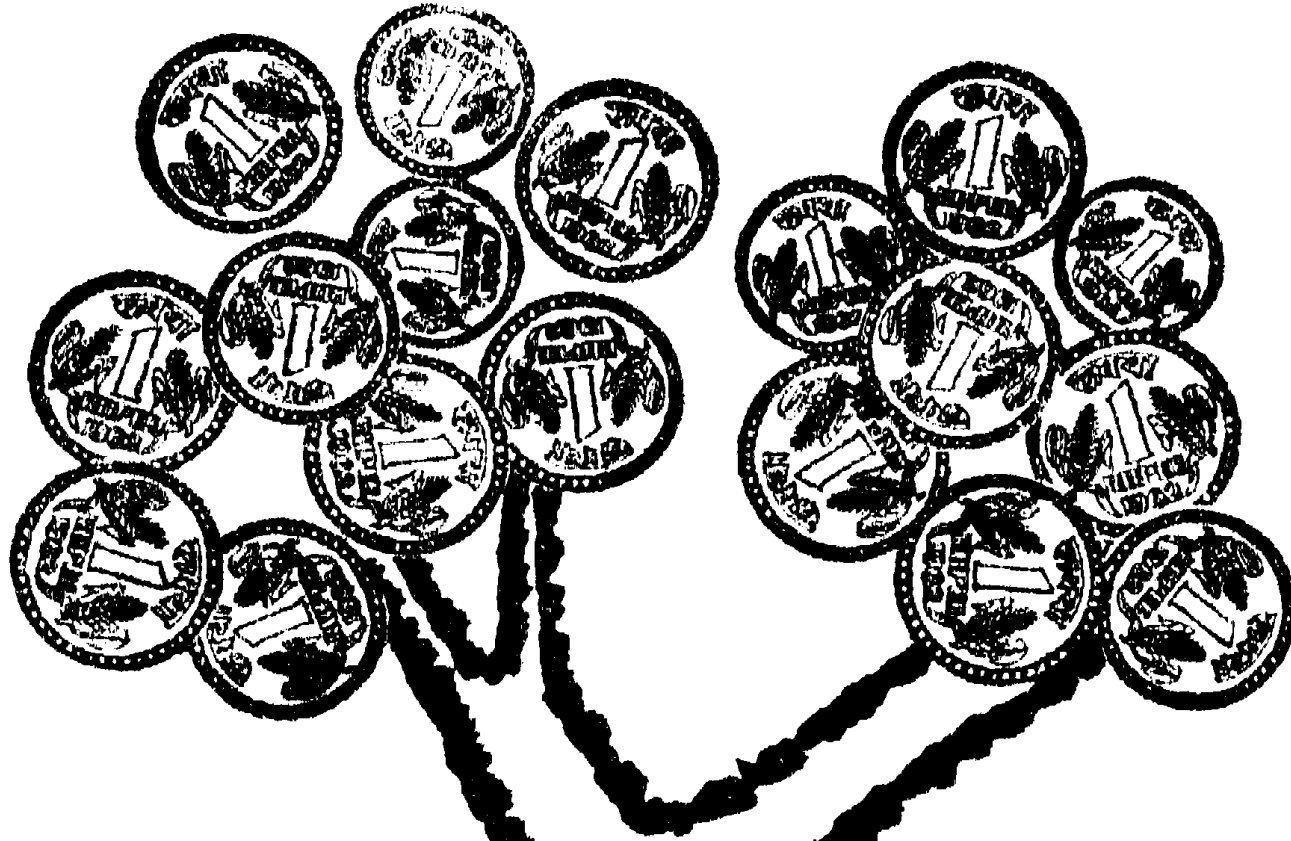
নিকটেই আছে

দোকানটা কিসের— চা না চোলাইয়ের?

খস খস করে শাদা প্যাডের কাগজে খান কয়েক ওষুধ আর ইনজেকশনের নাম লিখে কলমটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন ডাক্তারবাবু। পারফোরেশনের দাগ ধরে এক-টানে প্রেসক্রিপসনটা ছিঁড়ে নিয়ে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এই ওষুধটা এখুনি খেতে শুরু কর। সঙ্গে দুবেলা ইনজেকশন চলবে। অন্ততঃ তিন মাস। আর ওটা ছেড়ে দে ভানু। পেটের তো আর কিছু নেই। আর বাড়াবাড়ি করলে হাসপাতালে যেতে হবে।

কানকাটা ভানু ঠোঁট দুটো পাশে ঠেলে দিয়ে দাঁত বার করল। নিঃশব্দ হাসির রেখাটা দুপাশের জুলফি ঠেলে কানের লতিতে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু বাঁ-কানের লতিটা বহুদিন হল মিসিং। দুর্গাপুরে ব্রীজের ওপর টাকাসওয়ালাটা একহাতে পেটের নাড়িভুঁড়ি সামলাতে সামলাতে অন্য হাতে যেভাবে ভোজালিটা খেঁচিয়েছিল তাতে যে শুধু কানের লতি-টুকুই গেছে, জানটা যায়নি, সেটাই ভানুর ভাগ্য। বাপ অবনী চাটুজ্জে ছিলেন অ্যাংলিনের বন্ধু, আগেই গত হয়েছিলেন তাই রক্ষা। তাঁকে কপাল গুণে ছেলের বাহুবলের পসার ও রোজগার দেখে যেতে হয়নি। দেখতে হচ্ছে গর্ভধারিণীকে। ভানু বড় ছেলে। ওর ওপরেই সব নির্ভর করছে—তাঁর ও অন্য তিনটি ছেলেমেয়ের। তাই মুখ বুজে সব সহ্য করেন। রিকসা-ওয়ালাদের ঠেঙিয়ে পাড়ায় মস্তানী করে বাজারের ব্যাপারীদের চোখ রাঙিয়ে, শেষ-মেষ চোলাই মদ সাপ্লাইয়ের ঠিকেদারী করে যে পয়সা ছেলে ঘরে আনছে ছুঁতে ঘেন্না হলেও না নিয়ে পারেন না। কিন্তু সেই একমাত্র রোজগেরে ছেলেটাই কেমন দিন দিন নেতিয়ে পড়ছে। রোজই ঘুসঘুসে জ্বর হয়। তলপেটের ডানদিকটায় প্রচণ্ড ব্যথা, যেন ফোঁড়া টাটিয়ে উঠেছে। যা খায় তাই বমি হয়ে যায়। হজম হচ্ছে না কিছু। মাসখানেকেই জোয়ান ছেলেটা শুকিয়ে আমসি মেরে গেছে।

গোড়ায় ভানু নিজেকেই লুকোচ্ছিল। পুরোনো প্রেসক্রিপসনটা দেখিয়ে বড়ি আর মিকশ্চার ধারে চেয়ে এনেছিল ডিসপেনসারী থেকে। কিন্তু পর পর কয়েক দিন খেয়ে উঠে হড় হড় করে বমি উগরে টের পেল এবার ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সন্ধ্যেবেলায় কেষ্টর দোকানে হাজিরা দেওয়ার আগে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের কথা শুনে ব্যথাটা যেন আরো চাগাড় দিয়ে উঠল। নেহাৎ কম্পাউন্ডার রাধাকান্ত কেষ্টর দোকানের পুরোনো খদ্দের, তাই ধারে গোটা কয়েক বড়ি আর এক বোতল মিকশ্চার খাতির করে দিয়েছিল। খাতিরটা অবিশ্যি ভানু কেষ্টকে লুকিয়ে কয়েক গ্লাস বিনে পয়সায় মাল সাপ্লাই দিয়ে রাধাকান্তর সঙ্গে বজায় রেখেছিল। কিন্তু এই তিন মাসের বড়ির আয়োজন কোথা থেকে জোটাবে? কেষ্টকে বলে লাভ নেই। বরং খবর পেলে খুশীই হবে। ব্যাটা অনেকদিন ধরে ভানুকে কাটানোর তালে আছে। এই সুযোগে জানে ভানুর কবজিতে আর জোর নেই, কাটিয়ে দেবে। বানসাটা ফেঁপে ফুলে উঠেছে। হামলাবাজি বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কেষ্ট আর ভানুকে রাখতে চায় না। আজকাল সব পাড়াতেই এই কারবার চলছে। লুকোছাপার ব্যাপার নেই। তাই ভানুর প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

সেটা কেষ্টর কথাতেই মালুম হয়। কোনদিন ডিউটিতে যেতে দেরী হলে কেষ্ট যাচ্ছেতাই করে গাল পাড়ে। চায়ের দোকানে তখন পাড়ার সব পরিচিত ভদ্রলোক, ছেলে ছোকরারা আড্ডা মারে। তাদের সামনেই কেষ্ট যা নয় তাই বলে দেয়। আর গাল তো দেবেই। মালের অভাবে খদ্দের ফিরে গেলে সে তো কেষ্টরই লস।

নাইট শো শুরু হওয়ার মুখে মুখেই উনুনে জল ঢেলে চায়ের কাপ, ডিশ, ভাঁড় সরিয়ে দিয়ে দোকানের ঝাঁপ একটুখানি খোলা রেখে ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকে কেষ্ট। তখন শুরু হয় সাইড বিজনেস। চায়ের গ্লাসে গ্লাসে চোলাইয়ের চালান শুরু হয়ে যায়। পাড়ার বাবুরা বাড়ীর ডিউটি শেষ করে খেয়ে দেয়ে উঠে একটা পান বা সিগারেটের অছিলায় ছুটে আসবেন এক ঢোক চাখতে। বকাটেগুলো আর একটু বাদে, বড়রা চলে যেতে, নাইট শো মেরে সোজা এসে হামলে পড়বে—কেষ্টদা এক পাত্তর দাও মাইরী। সবশেষে আসবে রিকসাওয়ালারা। ওরা চলে গেলে ঝাঁপ ভেতর থেকে বন্ধ করে কেষ্ট কড়ি গুণতে বসবে। বাইরে পাহারা দেবে ভানু। তারপর রাত জেগে চোলাই মালের ফলাও কারবারে কেষ্টকে সাহায্য করার বখরা হিসেবে দশটা টাকা পকেটে গুঁজে যখন বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় ভানুর ততক্ষণে মর্নিং ট্রামের ঘন্টি প্রায়ই ওর কানে এসে পৌঁছোয়। ডাক্তারবাবু এত কথা না জানলেও এটুকু জানেন চোরাই কারবারের তলানি আর গাদে ভানুর পেটটা ফেঁসে গেছে। আগেরবারই সাবধান করে দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু সামলাতে পারেনি ভানু।

তার জন্য চিন্তা করে না ভানু। দু গ্লাসের জায়গায় খানিকটা জল মিশিয়ে তিন গ্লাসই না হয় রাধাকান্তকে খাওয়াবে। তাতে মিকশ্চার বড়ি আর ইন-জেকশনের দামটা নিশ্চয়ই উঠে আসবে। এদিকে যেমন কেষ্ট টের পাবে না ওদিকে তেমনি ডিসপেনসারীর মালিকও জানতে পারবে না। ওষুধের জন্য পরোয়া করে না ভানু। বন্দোবস্ত জানা আছে।

কিন্তু ভাবনাটা আরো গভীরে। পুরোনো ব্যথাটা আবার চাগাড় দিল। ডাক্তার বলেছে এভাবে আর বেশীদিন চলবে না। বাড়াবাড়ি করলে হাসপাতালে নাম লেখাতে হবে। তাহলে তো সব বরবাদ হয়ে যাবে। মাসখানেক শুয়ে থাকলে চাকরী নট হয়ে যাবে। শুয়ে থাকতে পারলে ভালই হোত। ব্যথাটা তবু খানিকটা কম থাকে। এমনিতেই সারাক্ষণ তলপেটে টাটানো ব্যথা। সাইকেল চালাতে গিয়ে আজকাল প্রায়ই মনে হয় ফট করে সোডার বোতলের মত মুখ উজিয়ে ফেটে যাবে জায়গাটা—খানিকটা গ্যাঁজলা-ওঠা রক্ত পুচ করে বেরিয়ে আসবে। একহাতে ব্যালান্স রাখতে রাখতে তলপেটটা চেপে ধরে ভানু। এখনো দু মাইল বাকী।

ডাক্তারখানা থেকে ফিরে যখন দোকানে এল তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। কেষ্ট চা বানাচ্ছিল। উনুনের ধারে বড় বড় দুটো রেশনের ব্যাগ, গোটা কয়েক খালি টিন আর বোতল সাজানো ছিল। দোকানের সামনে কর্পোরেশনের হাতল ভাঙা স্ট্রীটলাইট পোস্টের গায়ে কেষ্টর সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখা ছিল। ব্যাগের ভেতর টিন, বোতল ঠেসে নিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেলে

ঝুলিয়ে, টাকা কটা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভানু। পথটা তো কম না। যেতে আসতে ঝাড়া আড়াইঘণ্টা টাইম লাগে। অন্যদিন ইভনিং শোটা শুরু হতে না হতেই বেরিয়ে পড়ে ভানু। আজ শুধু শুধু আধ ঘণ্টা লেট হয়ে গেল—ডাক্তার যেন আমলই দিতে চায় না। একদিন বাগে পেলে......। উফ!

অসহ্য যন্ত্রণায় কাকিয়ে উঠল ভানু। তড়িঘড়ি ট্রাম ডিপোর মোড়ে রিকসা স্ট্যান্ডের গায়ে সাইকেলটা ঘষিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল। পাশেই একটা চায়ের দোকান। লম্বা লম্বা দুটো টানা বেঞ্চ। একটা খালি পড়ে আছে। ইচ্ছে হল খানিকটা শুয়ে নেয়। কিন্তু শুলে পাছে ব্যথা আরো বাড়ে, যদি উঠতে না পারে, পকেটে ষাটটা টাকা। ভয়ে ভয়ে তলপেটটা চেপে ধ'রে পিচরাস্তার ধারে কাঁচা ড্রেনটার পাশে উবু হয়ে বসল—লোকে ভাববে পেচ্ছাব করছে। কেউ আর আহা উহু করতে আসবে না। যত শালা চোর ছ্যাঁচোর ঐ করেই পকেট হাতড়ায়। এখন কোনরকমে মালটা কেষ্টর দোকানে পৌঁছে দিতে পারলে বাঁচি!

খানিকটা বসে, একবার বমি করে কিছুটা সুস্থ হল ভানু। তারপর বর্ষার ভেজা বাতাসে সাইকেলটা টানতে টানতে হাঁটতে লাগল। ঠাণ্ডা লাগছে। বেশ বুঝতে পারছে জ্বরটা আবার ঠেলে আসছে। এরপর যদি বৃষ্টি নামে তাহলে আর দেখতে হবে না। দুদিন বিছানায় ঠেসে রেখে দেবে। আর তাহলেই বংশী ডিউটিতে বহাল হয়ে যাবে।

লাইনে লোকের অভাব নেই। ও বসলেই বংশী বা বংশীকে না পেলে নীলুকে রাখবে কেষ্ট। কারণ ওরা না থাকলে দূর বাদা অঞ্চল বা শহরের দু-দশ মাইল দূরে থেকে সন্ধ্যের আলো আঁধারিতে পুলিশকে ভাঁওতা মেরে মাল কে বয়ে নিয়ে আসবে? কেষ্ট তো এখন কেষ্টবাবু। সাইড বিজনেসে দু পয়সা কামিয়ে গলির ভেতর দোতালা বাড়ী কিনেছে। পাড়ার পুজো কমিটির মেম্বর। সবাই খাতির করে। সেই খাতিরের উৎস ঐ চায়ের দোকান। ভানুকে তো আর কেষ্ট বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে না বা দুদিন বিজনেসটা বন্ধও রাখবে না। মাল না পেলে যে খদ্দের ভেগে যাবে। কারণ পাড়ায় চায়ের দোকানের কোন অভাব নেই। আর প্রায় সব দোকানীই জানে সকাল সন্ধ্যে চা বেচে যা নীট লাভ হয় তার দশগুণ প্রফিট ঐ রাতকাবারী ব্যবসাতে। তাই প্রায় সব পাড়াই, যার ত্রিসীমানাতে কোথাও কোন দিশী-বিলাতি দোকান নেই, সন্ধ্যে না পেরোতেই আজকাল মাতাল হয়ে ওঠে। সবই ঐ কেষ্টদের কৃপায় সম্ভব।

কিছু টাকা পেলে ভানুও ব্যবসাটা শুরু করে দিত। হিসেব করে দেখেছে হাজার ছয় সাত লাগবে। একটা ছোট দোকান ঘরের ভাড়া আর কত? লাইট-ফ্যান নিয়ে মাস গেলে বড় জোর এই এলাকায় ষাট-পঁয়ষট্টি। সেলামীটাই যা একটু বেশী। বড় রাস্তায় হলে কম করেও চার হাজার। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ সব নতুন বাজারে সস্তায় মিলবে। চায়ের জন্য চিন্তা নেই। দুধ, চিনি, চা দিন গেলে বড় জোর টাকা তিরিশেকের হলেই চলবে। ওটাতো ওপর ওপর। ছোট ভাইটাকে দোকানে বসিয়ে দেবে। নিজে মাল কিনে আনবে। তাতে লাভ বেশী। কেষ্ট জানেনা যে দিন পঞ্চাশ টাকার মালে অন্তত পাঁচটা টাকা ভানু গাপ করে। জল মিশিয়ে দিলে কার বাপের সাধ্যি যে ধরে। তার ওপর কেষ্ট আবার বেশী লাভ রাখতে গিয়ে জল মেশায়। গোড়ায় ব্যবসাটা ধরানোর জন্য অল্প স্বল্প মেশাবে ভানু। খদ্দের ভিড় করে আসবে। আখেরে লাভ তাতেই বেশী। ঝামেলা বিশেষ কিছু নেই। ঐ পেয়াদা-গুলোর হুজ্জোতি ছাড়া। তাও মাস গেলে দু-তিন শো পেন্নামী দিলে নীলটুপিওয়ালা নামিয়ে ব্যাটারা সেলাম জানিয়ে যাবে। কিন্তু টাকা কোথায় পাবে ভানু?

বাপ ভদ্দরলোক সেই কোন সাতে সকালে কেটে পড়লেন, ঝুট-ঝামেলা সব ভানুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে। পার্টিশন ইস্তক ক্যাম্প ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে, কোথাও না থিতুতে পেরে, ছেলেমেয়েদের কোন ভবিষ্যৎ নেই জেনে একদিন আপনা-আপনি টুপ করে খসে গেলেন। কুমিল্লায় স্কুলে পড়াতেন অবনী চাটুজ্যে। অংকটা নাকি ভালই জানতেন। কিন্তু দেশ-গাঁ ছেড়ে এসে এপারের কোন অংকই আর মেলাতে পারেননি।

অবনী চাটুজ্যে চলে গেলেন, ভানুকে পথ দেখানোর আর কেউ রইল না। যারা ছিল তারা ওর লম্বা চওড়া চেহারাটা কাজে লাগানোর পথ বাৎলে দিল। সহজেই যদি কাঁচা পয়সা হাতে আসে তাহলে আর মাথা মিথ্যে খেটে কি লাভ? ভানুও দলে ভিড়ে গেল।

ঠিক সেই সময় কেষ্ট নিজে ডেকে এনে এই চাকরীটা দিল। সবে সাইড বিজনেসটা শুরু করেছে কেষ্ট। বেপাড়ার মস্তানদের হেকোড়বাজিতে কিছুতেই জমাতে পারছিল না। রোজ রাতে ওরা এসে হল্লা করে দাবী জানায়— মিনি মাগনা জল খাওয়াও, নইলে দোকান তুড়ে দেব। চেঁচামেচিতে পাড়ার ভদ্দরলোকদের রাত্তিরে ঘুম হচ্ছিল না। তাঁরা থানায় রিপোর্ট করলেন। চক্ষুলজ্জার খাতিরে পুলিশ বার দুয়েক রেড করল দোকান। ছাপার চার্ট জড়ানো চোলাইয়ের বোতল সমেত কেষ্টকেও তুলে নিয়ে গেল। সাইড

বিজনেস চালাতে গিয়ে তখন আসল চায়ের কারবারটা টিকিয়ে রাখাই দায় হয়ে উঠেছে। তাই ভেবে চিন্তে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ফিকির হিসেবে কেষ্ট ভানুকে এনে তোয়াজ করে দোকানে বসাল। ততদিনে দুর্গাপুর ব্রীজের ঘটনাটা পাড়ায় রটে গেছে—স্কুল মাস্টার অবনী চাটুজ্যের ছেলে তখন রীতিমত এস্ট্যাবলিসড মস্তান কানকাটা ভানু।

সেও তো প্রায় আট বছর হতে চলল। সদ্য তখন চোলাই, পচাই, তাড়ির পার্থক্য চিনতে শুরু করেছে ভানু। বোতল বোতল গলায় ঢেলেও ছুরি চালাতে গিয়ে হাত একটুও কাঁপত না। সবাই ভয় পেত, খাতির করত। বয়সে দশ বছরের বড় কেষ্ট উঠতে বসতে ভানুদা বলতে অজ্ঞান হোত। আর এখন?

ধুর শালা। কি সব আবোল-তাবোল চুলকোচ্ছে আপন মনে। কানে এল—এখন খবর পড়ছি...। রাস্তার ওপারে পান-বিড়ির দোকানে রেডিওটা বাজছে। ওরে ব্বাস! এরই মধ্যে সাতটা পঞ্চাশ। বাঁ-পায়ে একটা প্যাডেল চেপে ডান পাটা উড়াল দিয়ে সিটের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে একটা পেল্লায় চাট ঝাড়ল ভানু অন্য প্যাডেলে। তর-তর করে খানিকটা হাওয়া কেটে এগিয়ে চলল সাইকেল।

সাউথ সেকশনের ট্রেনটা এই স্টেশনে আধ মিনিটও থামে না। সামনে পেছনে বড় বড় দুটো ইঞ্জিন—মাঝখানে আগাগোড়া বুনো মোষের মত ওরা চলে এই স্টেশনটার প্যাসেঞ্জার খুবই কম। হুইসিলের রেশ ফুরাতে না ফুরোতেই ফের বেজে ওঠে। ব্রীজের তলা দিয়ে যেতে যেতে ভানু টের পেল আটটা দশের গাড়ী ছাড়ছে। আজ বড় দেরী হয়ে গেল। কেষ্ট গালাগালি করবে।

অন্ধকারে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ব্রীজটা পেরিয়ে পিচরাস্তা ছেড়ে বাজারের দিকে মেঠো পথে নেমে এল ভানু। বাঁহাতে ধানের ক্ষেত যে কদ্দূর ছড়িয়ে গেছে অন্ধকারে ঠাহর হয় না। শুধু দূরে দূরে লণ্ঠনের আলো মাঠের সীমানা হয়ে রাত ভোর জেগে থাকে, চাষীরা জমি আগলাচ্ছে। উল্টোদিকে বাজার। বিকেল বিকেল আনাজ, শাক-সব্জী, চুনো মাছ, কচ্ছপ বিক্রী করে ব্যাপারীরা ঘরে ফিরে গেছে। এখন শুধু ছোট ছোট খোলার ঘরে হ্যাজাক বা লণ্ঠন জেলে দর্জিরা জামা-কাপড় সেলাই করছে। সেলাইকলের সামনে জড়ো করা প্যাণ্ট, সার্ট, ফ্রক, ব্যাউজ—পেছনে অন্ধকারে জালাভর্তি পচাই, হাঁড়ি বোঝাই তাড়ি, বোতল টাপুটুপু কার-বাইডের চোলাই।

ভানু বাজারের মাঝামাঝি দর্জির দোকানের সামনে বাঁশের খুঁটিতে সাই-কেলটা ঠেসান দিয়ে রেখে দাঁড়াতে দুটো কান বাঁচিয়ে মাথা চালে ঠেকবে না যাতে তাই মাথাটা নীচু করে ঘরে ঢুকে চাপা গলায় ডাকল—রজনী। সামনে বসে যে সেলাই করছিল সে একবারও মুখ তুলল না, যেন কেউ ঘরে আসেনি। আপন মনে সেলাই করে চলল। ভেতর থেকে একটা সরু গলার আওয়াজ পাক খেয়ে উঠে এল—কে ভানুবাবু? এত দেরী হল যে আজ?

আর বল কেন, তুমি শালা মালের দাম নিয়ে নর্দমার জল খাওয়াচ্ছ, তাতে পেটটাই গেল পচে। ডাক্তারখানায়—

কে বলে রজনী নর্দমার জল বেচে?—ভানুর বাকী কথা কটা আর বলা হল না! এক লাফে মূর্তিমান অন্ধকারের ভেতর থেকে ছিটকে লণ্ঠনের আলোয় এসে দাঁড়াল। চাঁছা বাখারীকেও প্রস্থে হার মানায় রজনী, উঁচুতে ঘরের সাইজ মাফিক। মিশকালো চামড়ায় ঢাকা হাড়কখানার মাঝখানে একটুকরো কাপড় পুরুষের লজ্জা ঢেকে ঝুলেছে। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় চোখের হলদেটুকু ঘোরালো লাল হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় ডিগডিগে পেটটা ফুলে ফুলে উঠছে। অ্যাজমার টান সামলাতে সামলাতে রজনী বুকে আঙুলে ঠুকে বলে—যদি জল মেশাই তো আমি বেজম্মার বাচ্চা। ভগমানের কিরে ভানুবাবু আমি বাদার মাল ছাড়া আর কিছু বেচি না। বিশ্বাস না হয় এক ঢোক চেখে দেখুন। ভাল না লাগে, কিনবেন না। দোকানের তো অভাব নেই। পর পর নাইন দিয়ে রয়েছে। যার কাছ থেকে খুশী নেন। মাইরী বলছি বদনাম দেবেন না।—বলে ভানুর হাত থেকে থলে দুটো প্রায় কেড়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেল রজনী। পেছন পেছন ভানুও টক টক গন্ধের ঝাঁঝটা শুঁকতে শুঁকতে অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেল।

মালটা সত্যিই আজ খুব খাঁটি দিয়েছে রজনী। দু গ্লাসেই পেটের ব্যথা-টেথা কখন দূর হয়ে গেছে। জ্বর-ফর, গাগুলোনা কিসসু নেই। সমানে আধঘণ্টা প্যাডেল ঘুরিয়েও টের পাচ্ছে না ভানু যে কোন পরিশ্রম হয়েছে। সামনেই বেঙ্গল-

কালকাটা বর্ডার। নালার ওপর কাঠের সাঁকোটা পেরুলে আর ঝঞ্ঝাট নেই। ভানু সাইকেল থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। সাঁকোটার মুখে এসে দেখল সেই কানা ভিখারীটা ঠিক বসে আছে। আসার সময় খেয়াল হয়নি, তাই চোখে পড়েনি। একটা পাঁচ টাকার নোট ভিখারীটার কোঁচড়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল ভানু, এধার-ওধার তাকিয়ে দেখল তেরপলের ক্যাম্পের বাইরে টুল পেতে দুই বাগাজী বসে আছে। একজন ভানুকে দেখে ফিক করে একটু হাসল। ভানুর চোখের ইসারায় ভিখারীটাকে দেখিয়ে দিয়ে সাঁকোয় উঠে এল। ব্যস আর কোন হুজ্জুতির ভয় নেই।

এপারে এসে দেখল নীলু একটা পানের দোকানের দড়িতে সিগারেট ধরাচ্ছে। ওর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে দুটো বড় বড় ব্যাগ ঝুলছে। কেরিয়ারে একটা টিন দড়ি দিয়ে বাঁধা। নীলুর বড় সাহস বেড়েছে। যেন ঘিয়ের টিন নিয়ে যাচ্ছে। নীলু সুশীলের পার্টনার, যেমন ভানু কেষ্টর। সুশীলের দোকানে কাটতি বেশী। একেবারে মোড়ের ওপর, সিনেমা হলের লাগোয়া। ওপরে পান, বিড়ি, সিগারেট বেচাকেনা চলছে, তলায় খুপরীর অন্ধকারে থরে থরে সাজান টিন, বোতল, গ্লাস। চাঁদু খদ্দের পান কেনার আগে জল খেতে চাইলে, সুশীল হাঁকে—নেলো, বাবুকে এক গ্লাস জল দে।

নীলু তখন থেকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে—ছোট গ্লাসে দেব না বড় গ্লাসে?

হাটুর কাছ বরাবর ফিসফিসানির সাড়া পেয়ে বাবুই জবাব দেন প্রয়োজন মাফিক—শরীরটা ভাল নেই, ম্যাজ-ম্যাজ করছে। একটা বড়ি খাব। দাও বড় গ্লাসের এক গ্লাসই দাও।

তারপর কয়েক ঢোকে গ্লাসটা ফিনিশ করে জর্দা-সুরতির গন্ধে ভুর-ভুর ডবল পান গালে ঠেসে দুটো টাকা সুশীলের হাতে গুঁজে দিয়ে বাবুরা চলে যান, চেঞ্জ ফেরৎ চান না। একটা পানের দাম কখনো এক টাকা, কখনো দু টাকা। বেশী রাতে যেসব বাবুর শরীর বেশী খারাপ হয় তারা আবার ম্যাজম্যাজানি মারতে আরো দামী পান খান—ডবল গ্লাসের ওপর ছোট গ্লাস চড়ান তারা। ঘরে ভাত না জুটলেও জলের ব্যাপারে বাবুদের কোন হ্যাংক্যাৎ নেই। ঠিক দামটাই তারা সুশীল বা কেষ্টর হাতে তুলে দেন।

এক একদিন ভানু পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে টাকা, আধুলি, সিকি, দশ নয়া, পাঁচ নয়া রেজগী মিলিয়ে কম করেও কেষ্ট সোয়া শ টাকা গুণে গেঁথে তুলেছে এক এক রাত্তিরে। এর মধ্যে মালের দাম বড় জোর পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। কানা ভিখারীর বরাদ্দ পাঁচ। আর ভানুর বখরা দশটা টাকা। মাস গেলে ফেলে ছড়িয়েও এই সাইড বিজনেস থেকে কেষ্ট হাজার দেড়েক টাকা ঘরে তোলে। অথচ এর জন্য কোন লাইসেন্স লাগে না। ঘর সাজানোর খরচ নেই। শুধু নীলটুপীদের বরাদ্দ যথাশয় মিটিয়ে দিলেই আর কোন চিন্তা নেই। তারাই তখন পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এই সব দোকান। উঠে গেলে তো ওদেরই ক্ষতি।

মনে মনে গুণে দেখে ভানু এরকম কটা দোকান পাড়ায় আছে। তিনটে। মোড়ের মাথায় সুশীল, গলির ভেতরে কেষ্ট আর বস্তির মুখে বিপিনের। পাশের গলিতে মহাদেব হালদার। ওদিকে ব্যায়াম ক্লাবের লাগোয়া অবনী সাহার দোকান। লম্বায় দুটো ট্রাম স্টপ, চওড়ায় আরো কম জায়গায় পাঁচ-পাঁচটা দোকান। তাহলে এই শহরে আর 'বারে'র দরকার কি? মিথ্যা-মিথ্যা লাইসেন্সড শপ আর ধর্মতলা, কপালী-টোলা, ওয়েলিংটনের বারগুলো ট্যাকস গুণছে। তার চেয়ে একটা ছোট চায়ের বা পান-বিড়ির দোকান সাজিয়ে বসলেই তো কাজ মিটে যায়। ক্যাপিটাল সিকির সিকিও লাগবে না অথচ প্রফিট ডবলেরও ডবল। পেট ফেটে হাসি পায় ভানুর। গবমেন্ট একেবারে বোকা বুদ্ধু। কত রকম চেক-পোস্ট আর লাইসেন্সের তাবিজ-মাদুলি সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে, সাপ কিন্তু ঠিকই ছোবল মেরে যাচ্ছে। গোটা শহরটাই যেন আজ কেষ্টর দোকান। শহরের গাঁটে-গাঁটে গর্ত খুঁড়ে কেষ্ট, সুশীল, ভানু, বংশী, নীলু বসে আছে। ছেলে-বুড়ো, জোয়ান-মদ্দ, ফুলবাবু আর রিকসাওয়ালা, সদ্য গোঁফের রোঁয়া গজানো কলেজের ছেলে থেকে পাড়ার মান্য-গণ্যরা সবাই সন্ধ্যে থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত গর্তে মুখ ঢুকিয়ে চুক-চুক করে রজনীর পেসাদ চাটছে। আর ডাক্তারবাবু, কিনা সবাইকে ছেড়ে শুধু তাকেই—

মুহূর্তে হাসিটা ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেল ভানুর। একটানা সাইকেল চালিয়ে এসে এতক্ষণ বাদে টের পাচ্ছে কষ্ট হচ্ছে। ঘামে-ভেজা সার্টটা হাওয়ায় সপ সপ করছে। কুল-কুল করে মুখ, গাল, ঘাড়, গলা, বুক ভাসিয়ে একটা ঘামের স্রোত নেমে যাচ্ছে তলপেটের দিকে। আর চিন-চিনে ব্যথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উল্টো মুখে ঠেলে উঠছে। গোত্তা মারছে। গা গুলোচ্ছে। পিচ কেটে রাস্তায় ফেলতে গিয়ে টের পেল একবার সাইকেল থেকে নামা দরকার। ডাক্তারের কথা না শুনে যা গিলেছে তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তলপেটের ভেতরে ফোঁড়াটা ভীষণ টাটিয়ে উঠেছে। ভানু সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার ধারে নর্দমার ওপর কোমর ভেঙে দাঁড়িয়ে খানিকটা বমি করল। কানে আসছে ট্রামের টুং-টাং—সামনেই ডিপো। কে যেন দূরে সুর করে সাবানের গান গাইছে। পাশ দিয়ে ধোঁয়া উগরে ঢাউস-ঢাউস বাসগুলো গাঁক-গাঁক করে ছুটে চলেছে। সাইকেল রিকসাগুলো একের পর এক সওয়ারী নিয়ে চলেছে। ভানু সাইকেলটা ধরে থর-থর করে কাঁপতে লাগল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। চালানোর ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছে জ্বর আসছে হু-হু করে। ডাক্তারের কথা মনে পড়ল — ওটা ছেড়ে দাও ভানু। কিন্তু ছাড়বে কি করে? খাঁটি মাল না পেলে কেষ্ট খাঁকাবে, হয়তো তাড়িয়ে দেবে। তখন খাবে কি? কে ওকে চাকরী দেবে? বয়স হয়ে গেছে, অন্য কোন কাজ জানা নেই। গায়ে-গতরে যদ্দিন সত্যিই ক্ষমতা ছিল তদ্দিন পাড়ার লোকে গোপনে টাকা জুগিয়ে ওকে মস্তানী করতে উস্কানী দিয়েছে। ভাড়াটে তুলাতে হবে? ভানুকে ডাক। বাড়ীওয়ালাকে ঠ্যাঙাতে হবে? ডাক ভানুকে। পাড়ার ইজ্জত কে বাঁচাবে?—কেন ভানু। আর ভানুর ইজ্জত? ভা[illegible] ফ্যামিলির ইজ্জত? — কেউ নেই, কেউ নেই।

টপ-টপ করে বড়-বড় দানায় বৃষ্টি পড়ছে। ভয়ে, ব্যথা, বেদনায় পাড়ার এক-কালের ভয়ানক অশান্ত দুর্দান্ত ভানু বেপরোয়া বর্ষায় ভিজতে-ভিজতে টের পেল গাল বেয়ে গড়ানো জলে বড় বেশী নুন। কেষ্টকে তো অনেকবার ভানু বাঁচিয়েছে, সেই উপকার কি ভুলে যাবে কেষ্ট? কটা দিন বিছানায় পড়ে থাকলে কি সাহায্য করবে না? সত্যিই ওকে ছাড়িয়ে দেবে? যন্ত্রণায় পা থেকে তলপেট পর্যন্ত সব অসাড় হয়ে গেছে। এবার ব্যথাটা বুকের দিকে ঠেলে-ঠেলে উঠছে। আর ঠিক ঐ জায়গাটাতেই যত রাজ্যের ভয় ভাবনা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ভানু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজতে-ভিজতে ব্যথার নেশায় পাগল হয়ে উঠল।

—শান্তিরঞ্জন

পাখি

লীলা মজুমদার

(৮)

বাড়িতে ঢুকলাম বটে, কিন্তু সদর দরজা দিয়ে নয়, খিড়কি দিয়ে। তবে সে খিড়কি দিয়ে আগে আটজন পাল্কি বেহারা দাদামশায়ের মার রুপো বাঁধানো পাল্কি নিয়ে ঢুকত। কাজেই সে অন্যান্য বাড়ির সদর দরজারও দেড়া। পাল্কিটা দাদামশাই এক সময় দেনার দায়ে কোথাকার মিউজিয়মে এক হাজার টাকা নিয়ে বেচে দিয়েছিলেন, সে কথা ওঁর নিজের মুখেই শুনেছি। নিচে ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে পাল্কি ঘরও ছিল। সারি সারি গুদোমঘর ছিল। এখন সেগুলোর ভিতরের দিকে দেয়াল তুলে এদিকটা বন্ধ করে, রাস্তার দিকে দরজা ফুটিয়ে সারি সারি দোকান ঘর হয়েছে, সব ভাড়া খাটে। দাদামশাই নিজেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। ছোটবেলায় মনে আছে এতে আমার প্রবল আপত্তি ছিল। দেয়াল তুলে দিলে পরে আমাদের যখন দোকান ভাড়া জমিয়ে জমিয়ে আবার গাড়ি ঘোড়া হবে সেসব থাকবে কোথায়? দাদামশাই বলেছিলেন, 'গাড়ি ঘোড়া কেউ চড়ে নাকি? মটর হবে। তোর শ্বশুরে কিনবে; তার বাড়িতে থাকবে!'

টিকলি বলল, 'কি, অত ভাবছ কি? খিড়কি-দোরটাও বেশ, না মালামাসি? তাছাড়া সামনেই তেলে ভাজার দোকান।' খিড়কি দোর দিয়ে ঢুকে অন্দর মহলে যেতে হবে। দোতলায় তিনতলায় যাবার আলাদা অন্দরের সিঁড়ি। আগে নিচে বসবার ঘর, খাবার ঘর, আপিস ঘর, মুহুরী-দের ঘর, হুঁকোর ঘর, বাবুর্চিখানা, গুদামঘর, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, পুজোর ঘর এই সব ছিল। দেখলাম শেষের তিনটি ছাড়া সব এখন ভাড়াটেদের এলাকা। বড় উঠোন, ছোট উঠোন, গোয়ালঘর। ছোট উঠোনে খিড়কি দোর পড়েছে। বড় উঠোন ভাড়াটের। পুরনো বাড়িটাকে কেমন নতুন লাগছিল। ছোটবেলায় অবিশ্যি এদিক দিয়ে ঢের যাওয়া-আসা করেছি। স্কুল কলেজ ফেরত নিত্যি করেছি। দাদামশাই খুচরো পয়সা দিতেন, তাই দিয়ে কত তেলেভাজা কিনে খেয়েছি। টিকলি ভাগ বসিয়েছে। এখন ও কিনলে রাগ করি।

ছোট উঠোনের দুদিকে চওড়া রোয়াক। রান্নাঘরের সামনে বিষণ্ণ মুখ করে সাদু আর গঙ্গাধর পাশাপাশি বসে। আমাদের দেখে যেন হাতে চাঁদ পেল। 'কি হবে দিদিমণি, মা তো স্নানও করেনি, রাঁধে-বাড়েও নি।' 'তোমরা?' 'আমাদের ভাত আমরা করেছি। টিকলি খায়নি। মাও খায়নি। খাই কি করে? আর আপনি কি খাবেন?' টিকলি এক গাল হেসে টিফিন-ক্যারিয়ার তুলে ধরল। আমার হাতেও হাঁড়ি ক্যাংগারি। অনি-মাসি দোকানের রান্না ভাত খাবে না জানি, তাই দই, মিষ্টি, গজা। সাদু কেঁদে ফেলল। 'তোমাকে দেখেই বুঝেছি, দিদি, আর কোনো ভাবনা নেই।' গঙ্গাধর বলল, 'শেষটা কি বুড়ি পাগল হয়ে গেল?'

আমি বললাম, 'তোমাদের কোনো ভয় নেই। যখন হাসছে গাইছে, তখন নিশ্চয় বেজায় খুশি হয়েছে বুঝতে হবে। এত খুশি যে রাঁধা খাওয়াও ভুলেছে। নিশ্চয় কোনো ভালো খবর পেয়েছে' টিকলি বলল, 'কিম্বা লুকোনো মোহরগুলো খুঁজে পেয়েছে।'

অন্দরের পাথরের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠলাম। শুনলাম এক-তলায় ভাড়াটেদের গন্ধ তেল এসেন্সের কারখানা, দোতলায় তারা থাকে। মাঝখানের দু-একটা দরজা বন্ধ করে দিলে অন্দরের সিঁড়ির সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধ থাকে না। আমরা সোজা তিনতলায় উঠে গেলাম। দেখলাম ইতিমধ্যে অনি-মাসি সামলে উঠে স্নান করে, পুবের বারান্দায় বসে চুল শুকোচ্ছে। বয়স হলে কি হবে, এখনো তার এক ঢাল কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল। আমি জানি আমার চব্বিশ বছর বয়স, আমার মা যদি এখনো বেঁচে থাকে, তার ছেচল্লিশ বছর বয়স হয়েছে আর অনিমাসি তার থেকে পনেরো বছরের বড়। কাজেই অনিমাসির একষট্টির কম নয়। আগে মনে হত একাত্তর। আজ কিন্তু দেখাচ্ছে এক-চল্লিশ।

বেজায় অবাক হয়ে গেলাম। টিকলিও হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইল। একটু অসহিষ্ণু গলায় অনিমাসি বলল, 'কি, দেখছিস কি?' বলে ফেললাম, 'দেখছি তোমার কুড়ি বছর বয়স কমে গেছে। বুঝতে পারছি এককালে তুমি সত্যি সুন্দরী ছিলে। দাদামশাই যখন বলতেন, আমার বিশ্বাস হত না।' ভেবেছিলাম হয়তো রেগে যাবে, অনিমাসি কিন্তু একটু হাসল। হেসে বলল, 'টিফিন-ক্যারিয়ারে কি? তোর হাতে কি?' বললাম, 'শুনলাম তুমি রাঁধ-বাড়নি, তাই আমাদের জন্য ভাত আর তোমার জন্য দই মিষ্টি কিনে আনলাম।'

অনিমাসি বলল, 'তুই দাম দিলি?' বললাম, 'নিশ্চয়ই' অমনি টিকলির দিকে ফিরে হাত পেতে বলল, 'কই, সেই টাকাটা?' টিকলি এমনি অবাক হয়ে গেল যে খিল-খিল করে হেসে টাকাটা দিয়ে দিল। সেটাকে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে অনিমাসি বলল, 'অত হাসি কিসের, শুনি। আমাকে কর্পোরেশন ট্যাক্স দিতে হয় না, সাদু গঙ্গাকে মাইনে দিতে হয় না, আমরা খাই পরি না? তোর পড়ার খরচ নেই?'

টিকলি রেগে বলল, 'সে তো আমার মা-ই দেয়। বেশিই দেয়। তুমি তো আজকাল মাংস কেনা বন্ধ করে দিয়েছ। মালামাসি মাছ-মাংস কিনেছে। বংকুদা—।' এই বলে টিকলি মুখ লাল করে থেমে গেল। আমি ঠকাস করে পালিশ ওঠা গোল টেবিলটাতে হাঁড়ি-কুঁড়ি নামিয়ে রেখে বললাম, 'কি? বংকুদা কি? থামলি যে বড়?' টিকলি বলল, 'বংকুদা বলেছে ওদের বাড়িতে রোজ মাংস হয়। ওদের বাড়ির বৌদের সোনার গয়না দিয়ে গা মুড়ে দেওয়া হয়।' অনি-মাসির চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোতে লাগল। আসল কথা বাদ দিয়ে বলল, 'ওর ঠাকুরদা তেজারতির ব্যবসা করে টাকার কুমীর হয়েছে। পেটে একদানা বিদ্যে নেই। ওর বাপটিও তাই ছিল: মরেছে, বাঁচা গেছে। ওকে আর দেমাক দেখাতে মানা করিস।'

আমি হতাশ হয়ে বললাম, 'তোর কি হবে বল তো, টিকলি? ঐ হতভাগা ছাড়া কথা নেই? জানিস ওদের বাড়ির মেয়েরা একেবারে মুখ্যু, বাইরে বেরুতে পায় না আর খুব সম্ভবত মাংসও খেতে পায় না।'

এমন নিদারুণ সংবাদে টিকলি ধপ করে ছেঁড়া বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। হতাশভাবে বলল, 'সত্যি খায় না? তবে বংকুদা কেন বলে ওকে বিয়ে করলে রোজ রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে চপ-কাটলেট খাওয়াবে, সিনেমা দেখাবে, ট্যাক্সি চড়াবে।' কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'তাহলে বুঝতেই পারছিস ব্যাটা ক্যারসা মিথ্যাবাদী। ঘরে বন্ধ করে রাখবে, গয়নাও দেবে না, কোথাও

খাওয়াবেও না।' টিকলি একটু ফোঁৎ-ফোঁৎ করে কেঁদে নিয়ে বলল, 'দিদিমাই তো বলেছে সুন্দরী মেয়েদের বরের অভাব হয় না। দিদিমার তেরো বছর বয়স থেকে উনত্রিশটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। তুমিই তো বলেছিলে।' এই সময় হঠাৎ টিফিন-ক্যারিয়ারের দিকে চোখ পড়তেই, টিকলি দুঃখ ভুলে লাফিয়ে উঠল। 'যাই, হাত-মুখ ধুয়ে, বাসনপত্র বের করি। আজকাল আমাদের রান্না কর্তাদাদুর পড়ার ঘরে স্টোভে হয়, জান মাসামাসি?'

টিকলি উঠে গেলে, অনিমাসিকে বললাম, 'দেখ অনিমাসি, টিকলির সর্বনাশ যদি না চাও তো ওর একটা ব্যবস্থা কর। হয় বিয়ে দিয়ে দাও। নয়তো ওর মার কাছে পাঠিয়ে দাও। চারুদির বড় কোয়ার্টার, বেশ মেয়ে নিয়ে থাকতে পারবে। স্কুলটাও ভালো। তবে তুমি একলা পড়বে।'

অনিমাসি হেসে বলল, 'আমার একলাই ভালো। তাই করব, ওর মাকেই লিখব। আমার কি আর মেয়ে আগলাবার বয়স আছে? কিন্তু সে নিলে তবে তো! তাছাড়া কর্পোরেশন থেকে বাড়ি ডিমলিশ করার নোটিশ দিয়েছে, তোকে বলিনি।'

ঠিক সেই সময় হাত-মুখ ধুয়ে টিকলি ফিরে আসাতে প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা পড়ে গেল। আমিও উঠে হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। অনিমাসিও দই মিষ্টির সঙ্গে ঘর থেকে লুচি এনে তার সদ্ব্যবহার করল। বাড়ি ডিমলিশ করতে হবে শুনেও কেন এত নিশ্চিন্ত ভেবে পেলাম না। খাওয়াদাওয়ার পর টিকলি একটু শুতে গেল। অমনি আমি অনিমাসিকে চেপে ধরলাম। 'কই, দেখি কর্পোরেশনের নোটিশ।' অনিমাসি বলল, 'আমার হাঁটুতে ব্যথা, বার বার উঠতে পারব না।' আমি বললাম, 'ভালো হবে না, অনিমাসি, আজ যদি আমাকে দাদা-মশায়ের উইল আর কর্পোরেশনের নোটিশ না দেখাও, আমি ঐ উকীলবাবুদের দিয়ে

তোমার নামে কেস করাব। নিজের মেয়ে, নাতনীকে কিছু দাও না। তাছাড়া জেনে-শুনে পোড়ো বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়েছ। ভাড়াটেদেরও বলে দেব দিদিমার মোহর খুঁজে নিতে। তা না হলে ডিমলিশ করবে যারা তারাই দেয়ালের ফোকর থেকে মোহর বের করে নেবে—।' এমনি ধরনের যা-তা বলতে লাগলাম অনিমাসিকে ভয় দেখাবার জন্যে।

খানিক পরে লক্ষ্য করলাম অনিমাসি হাসছে। রেগে বললাম, 'এও বলে দেব যে তুমি দাদামশায়ের উইল লুকিয়ে রেখেছ।' এবার অনিমাসি উঠে বসে বলল, 'তুই ঠিকই সন্দেহ করেছিস। এই পোড়ো বাড়িটার অর্ধেক তোর। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 'তবে না যদ্দিন ইচ্ছা থাকতে পারি, বাইরে কাজ নিয়ে চলে গেলে, কিম্বা বিয়ে হলে আমার কোনো অধিকার থাকবে না?' অনিমাসির পাতলা নাক একটু ফুলে উঠল। 'ও আমি এমনি বলেছিলাম। যা, আমার ঘরের টেবিলের টানার মধ্যে সবই পাবি।' অনিমাসি ঝনাৎ করে টেবিলের উপরে চাবিগাছি ফেলে দিল। জীবনে এই প্রথম ওটা আমি হাতে পেলাম। অনিমাসির মধ্যে রাতারাতি যে একটা ভয়ংকর পরি-বর্তন হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভেবে ভেবে কি সত্যিই মস্তিষ্কটা গুলিয়ে গেছে নাকি? আমার পুরনো ঘরটাই এখন অনিমাসির ঘর হয়েছে। টেবিলের টানা চাবি দিয়ে খুলে দেখি বাড়ির দলিল ইত্যাদি দরকারী কাগজপত্রের সঙ্গে কর্পো-রেশনের নোটিশটা আর দাদামশায়ের উইল।

নিয়ে এলাম অনিমাসির কাছে। নোটিশটার তারিখ এক মাসেরও বেশি আগের। আমি তখনো এ-বাড়িতে ছিলাম। ছয় মাসের নোটিশ। বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করতে বলেছে। নইলে কর্পোরেশনেরই বিশেষ বিভাগ বাড়ি ভাঙার ভার নেবে। ঐ গলিতে পর পর তিনটে বাড়িকে ঐ রকম নোটিশ দিয়েছে অনিমাসি বলল। অন্যরা নাকি সারিয়ে নিয়ে মামলা করবে। এসব নোটিশ এলেও বছরখানেকের মধ্যে নাকি কোনো কাজ হয় না। একটা বাড়ির তিনতলার চিলেকোঠা ভেঙে নিচে পড়ে গেছিল। গলির ঠিক ঐখানে একটা ভিখারি বসেছিল, তার প্রাণটি গেল।

অনিমাসি মন্তব্য করল, 'তোর দ্যাখ একবার, যদ্দিন বাটা বেঁচেছিল কেউ সহজে একটা পয়সা দেয়নি। দৈবাৎ মরে গেলে, কোথায় আপদ গেছে বলে সবাই খুশি হবে, না, তিন-তিনটে বাড়ি ভেঙে ফেলতে হবে। অবিশ্যি আমার কোনো আপত্তি নেই নিউ বিল্ডার্স সিন্ডিকেট থেকে জমিশুদ্ধ কিনে নিতে চাইছে। তা হলে আর আমার কোনো দায়িত্ব নিতে হয় না।'

উইলটা দেখছিলাম। দাদামশাই অনি-মাসিকে আর আমাকে সমান ভাগিদার করে গেছেন। যদি বাড়ি বিক্রি করা হয় বা বন্ধক দেওয়া হয় তা হলে সাদুকে আর গঙ্গাধরকে হাজার টাকা করে দিতে হ

অনিমাসি বলল, 'বুড়োর মাথা খার হয়েছিল। গঙ্গা আর সাদু তো আর বি পয়সায় কাজ করেনি। রাজার হালে এখা ওদের জীবন কেটেছে। মাইনের প্র সবটাই বোধ হয় জমিয়ে রেখেছে। ওে কিছু দেবার কোনো মানে হয় না। বরি তো উইলটা ছিঁড়ে ফেলে, তুই অর্ধে আর আমি অর্ধেক নিই।'

আমার হাসি পেল, মাথা নে বললাম, 'তা হয় না অনিমাসি। উই ছিঁড়ে ফেললে, আমার কোনো অধিক থাকে না। অর্ধেক ভাগ আমার মারে হয়ে যায়।'

'কিন্তু সে তো ইচ্ছা করেই নিখোঁ বেঁচে আছে কিনা কে জানে।' 'তা হে তো আরো মুস্কিল। একজন ওয়ারিশকে বাদ দিয়ে তুমি বাড়ি বিক্রি করতে পার না।'

শুনে অনিমাসি অনেকক্ষণ চুপ কা থেকে বলল, 'তাহলে বাড়ি বিক্রিতে তো আপত্তি নেই?' হাসলাম। 'তা নেই। কিন আমার সই ছাড়া কিছু করা বে-আইনী দাদামশাইয়ের উইলের প্রোবেট নিয়েছিলে 'না, তা নেব না। তোর গার্জিয়ান হে দুজনার কাজ করেছি। তার জন্য কতটুকু কৃতজ্ঞতা পেয়েছি তোর কাছ থেকে?'

আমি বললাম, কৃতজ্ঞতা না পেলে দোকান ভাড়া শুনে তো পেয়েছ কিন্তু এই নতুন ভাড়াটেদের নোটিশ তার কথা জানিয়ে দিও।' অনিমাসি কোনো উত্তর দিল না। কথাটা বোধহয় পছন্দ হল না। সকাল বেলার ব্যাপার নি কিছু না বলাই ভালো মনে হল?

চারটের সময় টিকলি উঠে এল 'দিদিমা চা কর। লুচি-মিষ্টি কি আ দাও।' আমিই চা করলাম। তারপরে গাড়ি এল। গঙ্গাধরকে নিচে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, নইলে ভাড়াটেরা [illegible] হতে পারে। টিকলিকে বারবার [illegible] ান কর দিয়ে, অনিমাসিকে বলে বিদায় হলাম। মন মনে ভাবলাম অনিমাসির একজন উকী দরকার হবে। সিংহ সরকারকে বলতে হবে

(৯)

নেমে দেখি গাড়িতে বাসব সরকার বেশ নাম বাসব। আমি কাছে গেলে বললেন, 'কিছু নতুন ব্যবস্থা হয়েছে বুঝি? গতবার তো সদর দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা হয়েছিল।' ভাড়াটেদের কথ বললাম। বাসব সরকার বললেন, 'সে কি পি-পি প্রডাক্টসের নামে যে মস্ত ব মামলা কিছুদিন আগে শেষ হল। পাঁ বছর বাড়ি ভাড়া দেয়নি। আপনার মাসি কি কোনো খবর না নিয়েই বাড়ি ভাড় দিয়ে দিলেন নাকি?' হেসে বললাম, 'ওরা খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে না, কার কর্পোরেশন থেকে ডিমলিশনের নোটি দিয়েছে। কিন্তু অনিমাসি ভাড়াটেদে সেকথা জানায়নি।' মিঃ সরকার বললেন 'কি সর্বনাশ! বিপদে পড়বেন যে ভদ্র
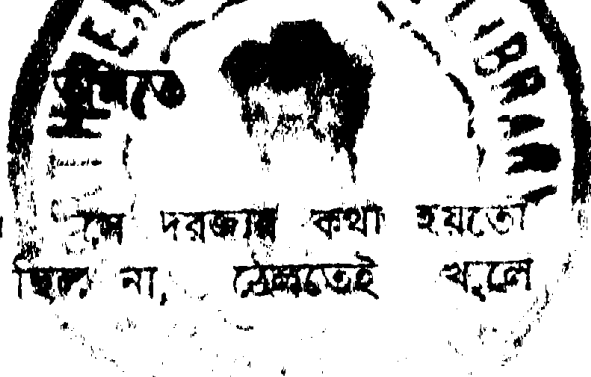
মহিলা।' আমি আরো বললাম, 'বলছেন নাকি কোন বিল্ডার্স সিণ্ডিকেট জমি শুদ্ধ বাড়ি কিনতে চাইছে। ভেঙে ফেলে দশ-তলা বাড়ি তুলবে। সামনে জমি ছেড়ে দিলে নাকি গলির মধ্যেও উঁচু বাড়ি করা যায়।'

মিঃ সরকার বললেন, 'তা সম্ভবত যায়। ঐ বিল্ডার্স সিণ্ডিকেট খুব ভালো কোম্পানী। আপনার মাসিমা ওদের দিলে ভালোই হবে। উনিই বোধ হয় একলা মালিক?' কান দুটো একটু গরম হয়ে উঠল। বললাম, 'দাদামশাই আমাকে অর্ধেক দিয়ে গেছেন।' শুনে মিঃ সরকার অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ভাড়াটেদের ঐ নোটিশটার একটা কপি পাঠিয়ে দিতে বলবেন, তা হলেই হবে। তারপর যারা বাড়ি কিনবে তারা যা হয় করবে। অন্তত আমার এই রকম মনে হয়।'

কেন জানি মনটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে গেল। দাদামশাই গিয়ে অবধি আমার ভাবনা-চিন্তার ভাগ কাউকে কখনো দিই নি। কেউ চায়ও নি। মনে আছে একদিন কলেজ থেকে এসে কুকুর বেড়াল খুঁজে পাইনি। অনিমাসিও কিছু বলেনি। তার-পর যখন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে রান্না-ঘরের দোড়ায় বসে কেঁদে ফেলেছিলাম, তখন গঙ্গাধর কর্কশ গলায় বলেছিল, 'কেন খুঁজছ? তাদের বিদায় দিয়েছে। খাওয়াতে পয়সা লাগে না? টিকলির ময়নাটাকেও উড়িয়ে দিয়েছিল। তবে সে সায়নি ঐ দেখ।' চেয়ে দেখি রান্নাঘরের ঘুলঘুলিতে ময়না বসে পালক পরিষ্কার করছে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাও ম্যাও করতে করতে ল্যাজ খাড়া করে মেনি নামক হুলো বেড়ালও এসে উপস্থিত। তিনজনেই হেসে ফেললাম।

অনিমাসি আর ওদের তাড়াবার কথা বলেনি। গঙ্গাধররাই যা হক করে ওদের খাওয়াত, অনিমাসি পয়সা দিত না। খালি কুকুরটাকে আর কখনো দেখিনি। হঠাৎ বাসব সরকার বললেন, 'এত কি ভাবছেন?' কেন জানি আরেকটু হলেই মুখ দিয়ে টিকলির সমস্যা বেরিয়ে পড়ছিল, অনেক কষ্টে সামলিয়ে নিলাম। ততক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছি, প্রশ্নটাও চাপা পড়ে গেল। নেমেই বুঝলাম একটা কিছু হয়েছে। অ্যানি পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্মী সিঁড়ির উপরের ধাপে বসে। দোতলা থেকে সায়নের তারস্বরে কান্না শোনা যাচ্ছে। মা কই—মা কই—মা কই। মনটা তোলপাড় করে উঠল।

সিঁড়ির দিকে দৌড়লাম। হয়তো পড়েই যেতাম, মিঃ সরকার ধরে ফেলে বললেন, 'অমন অন্ধের মতো ছুটতে হয় না।' তাঁর গলাটাকে বড়ই গম্ভীর মনে হল। দুজনে দোতলায় উঠলাম। বড়-মার ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতর থেকে সায়নের কান্না শোনা যাচ্ছে। বাসব ডাকলেন, 'বড়-মা, দরজা খুলুন।' অমনি সায়নের কান্না থেমে গেল। কিন্তু দরজা খুলল না। তখন আরেকটা দরজার কথা আমার মনে পড়ল। সেদিকে ছুটলাম। মিঃ সরকারও পিছন পিছন এলেন। সে দরজার কথা হয়তো বড়মার মনে ছিল না, ঠেলতেই খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকেই দেখি বড়মা কোলের উপর সায়নকে চেপে ধরে বসে আছেন। কেঁদে কেঁদে তার গলা শুকিয়ে গেছে, থেকে থেকে সমস্ত গা কেঁপে উঠছে। বিস্ফারিত নয়নে আমাদের দিকে সে চেয়ে রইল। বড়মাও তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমে জ্বলছে। মুখটা কাগজের মতো সাদা।

আমি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মিঃ সরকার ভিতরে ঢুকে বড়মার পিঠে একটা হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'দিন, আমার কাছে। এরকম উত্তেজনা আপনাদের দুজনার কারো পক্ষে ভালো নয়। এর ফলে আপনার কিছু হলে, ওকে কে মানুষ করবে?'

কাঁপা কাঁপা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বড়মা সায়নকে ছেড়ে দিলেন। সে বাসবের গলা জড়িয়ে ঘাড়ে মুখ গুঁজল। বাসব বললেন, 'বড়মা, আপনার ছেলে আপনারই থাকবে, কেউ নেবে না। কিন্তু ভালোবাসা কি জোর করে হয় কখনো? ধৈর্য ধরতে হয়।'

বড়মা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভগ্ন-কণ্ঠে বললেন, 'কুড়ি বছর কি অপেক্ষা করিনি? অপেক্ষা করার আর কি আমার সময় আছে?' বাসব সরকার বললেন, 'বড়মা, আড়াই বছর বয়স ওর, ও কি আর অত বোঝে। মা-মণিকে আদর কর, মাণিক।' সায়ন অমনি মাথা নিচু করে বড়মার কপালে কপাল ঠেকাল। বড়মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমাকে বললেন, 'নেতো, অ্যানিকে ডাক। আমার দুর্বল লাগছে।'

অ্যানি দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিল, অমনি বড়মার কাছে এল। আমিও সুযোগ বুঝে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিঃ সরকারের কোল থেকে সায়ন ঝাঁপিয়ে আমার বুকের উপর পড়ল। আমার গলা টনটন করছিল। ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলাম। স্বাভাবিক গলায় ওকে বললাম, 'মামণির কাছে গিয়ে কাঁদতে হয় না। মামণি ভালো।' সায়ন তার পকেট থেকে রুপোর তৈরি ছোট একটা মোষের গাড়ি বের করে বলল, 'মামণি দেছে! পঁ পঁ।' বলে বেজায় হাসতে লাগল। ভাবলাম যাক, একটা ফাঁড়া কাটল। কাল আবার কি হয় কে জানে।

রাতে সায়ন টিনের ফুড দিয়ে দুধ খায়। তার ঘরেই সব সরঞ্জাম থাকে। আমিই করে দিই। কান্নাকাটির ফলে খেয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি বড় আলো নিবিয়ে ছোট আলো জেলে, মশারি ফেলে, বাইরে এলাম। চারদিকে এমন আবেগের আবর্তন দেখে দেখে আমারো দুর্বল লাগছিল। আমার ঘরের সামনে পৌঁছে যেন মিঃ সিংহের গলার আওয়াজ পেলাম। নিচে কাউকে বকাবকি করছেন। ঠাণ্ডা মানুষটি, গলা তুলে কখনো কথা বলতে শুনিনি। জানলার কাছে গিয়ে দেখি নিচে জোনাসের সঙ্গে আরেকটি লোক দাঁড়িয়ে। ফরসা রোগা চিমড়ে, কোটরে ঢোকা চোখ, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। জোনাস আর সেই লোকটি পরস্পরকে ঠেকা দিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। কাউকেই খুব প্রকৃতিস্থ মনে হল না। মিঃ সিংহ রাগে ফুলছেন।

তার মধ্যে সম্ভবত বড়মাকে খাইয়ে শুইয়ে রেখে, অ্যানি গিয়ে উপস্থিত হল। কোনো কথা না বলে সোজা গেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল। জোনাস সটাং হাঁটু গেড়ে বসতে গিয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ল। অ্যানি তাকে টেনে তুলে, একরকম টেনে নিজেদের কোয়ার্টারের দিকে নিয়ে গেল। অন্য লোকটি ফ্যাল-ফ্যাল করে একবার তাদের দিকে, একবার মিঃ সিংহর দিকে তাকাতে লাগল। এমন সময় মিঃ সরকার বেরিয়ে এসে, গাড়ির দরজা খুলে একরকম জোরজার করে লোকটিকে তুলে দিলেন। মিঃ সিংহও উঠলেন। ওঁরা চলে গেলে আমি হাসব না কাঁদব ঠিক করতে পার-ছিলাম না। সেকালের নির্বাক চিত্র বোধহয় এই রকম হত। হঠাৎ বড় ক্লান্ত লাগল। নিজের ঘরে গিয়ে, আরাম কেদারায় পা উঠিয়ে বসে, সারা দিনের ঘটনাগুলোকে মনের মধ্যে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। পাখিরা যে গাছে যখন থাকে, সে গাছটা কিছু তাদের নিজেদের অধিকারে রাখে না। দরকার মতো একটা আশ্রয় পেলেই হল। বাচ্চা তোলার সময় ছাড়া তারা বাসাও বাঁধে না। দাদামশাইয়ের বাড়িতে বাসা বাঁধিনি, এখানেও বাঁধব না। তবু বুকটা ভারি হয়ে ওঠে কেন?

খাওয়া-দাওয়া সেরে লক্ষ্মীকে, অ্যানিকে ছুটি দিতে হবে। উঠতে হয়। ঠিক তখনি দরজার বাইরে থেকে অ্যানি ডাকল। তার হাতে বড় ট্রে। সেটা আমার টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'ডার্লিং, যদি অনুমতি দাও তো তোমার সঙ্গে বসে খাই।' আমি বললাম, 'সে কি অ্যানি, রোজ একা খাই, তুমি থাকলে তো ভালো কথা।' অ্যানি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'ওর অবস্থা দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ জোনাস আজ রাঁধেনি। তার রাঁধার মতো অবস্থা নেই।' তারপর কেঁদে বলল, 'পৃথিবীতে কি একজনও সুখী মানুষ আছে? বড়মা, সায়ন, তুমি, আমি, জোনাস, মিঃ সিংহ কেউ সুখী নয়, মালা। বড়মার কথা ছেড়েই দিলাম।'

আমি ট্রের উপরকার ডিসগুলোর ঢাকনি খুলে ফেললাম। মাংসের কাটলেট, আলু ভাজা, রুটি, মাখন, আপেল। হেসে বললাম, 'কে বলেছে আমি সুখী নই, অ্যানি?' অ্যানি ম্লান হেসে, প্লেট সাজাতে লাগল। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললাম, 'মিঃ সিংহ কেন সুখী নয়, অ্যানি?'

অ্যানি বলল, 'গত বছর ওঁর একমাত্র ছেলে মারা গেছে। এখন বাসব সরকারকে আঁকড়ে ধরেছেন। ওঁর কপালে আরো

দুঃখ লেখা আছে।' 'কিসের দুঃখ?' 'কেন, মতলবী লোককে ভালোবাসলে যে দুঃখ পেতে হয়। জোনাসকে বিয়ে করে আমি যে দুঃখ পাচ্ছি। মাস্টারকে ভালোবেসে বড়মা যে দুঃখ পেয়েছেন। এবার সায়নকে ভালোবেসে যে দুঃখ পাবার ব্যবস্থা করছেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ কি হয়েছিল বলতো!' অ্যানি বলল, 'এই এক জ্বালা হয়েছে, ছেলের মুখে কেবলি মা-মা-মা। খাইয়েছি, কাপড় ছাড়িয়েছি, খেলনা দিয়েছি, বড়মার ঘরে যেই নিয়েছি, বলে কি না—চাই না, মা কই? বড়মা কত ভোলালেন, তা ওর ঐ এক কথা মা কই? বড়মা রেগে বললেন, মরেছে, তোর মা মরেছে। এখন আমি তোর মা। অমনি উঠে ঘর থেকে দৌড়! লক্ষ্মীকে দিয়ে ধরিয়ে আনিয়ে কোলে চেপে ধরে বসে রইলেন। ছেলে ভয়ে সিঁটকে গেল। তারপরেই সে কি কান্না। আমরা নিতে গেলাম, দিলেন আমাদের তাড়িয়ে। তাই নিচে গিয়ে বসেছিলাম। এলেও বাপু বড্ড দেরি করে। ভাবছিলাম ছেলেটার বুঝি ফিট হবে।'

না বলে পারলাম না, 'বড়মার ভালোবাসাটা কিন্তু বেজায় হিংস্র।' অ্যানির হাত থেকে কাঁটাটা পড়ে গেল। কাষ্ঠ হেসে সে বলল, 'হিংস্র? কাল সরকারের কাছে বড়মার ইতিহাসটা জেনে নিও। তারপর তাকে বিচার কর।'

(ক্রমশঃ)

মনের কথা

প্রক্ষোভের প্রকৃতি
শীলা-ইলা-কাহিনী

একই ধরনের মানসিক সংকটে দুজনের দু' রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। শীলা আর ইলা; প্রায় একই বয়সের দুটি মেয়ে, বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসার জন্যে এসেছিল; দুজনের মধ্যে কোনো পরিচয় ছিল না। প্রায় একই রকমের আঘাত তাদের উচ্চ মস্তিষ্ককে আলোড়িত করেছিল। ফল হয়েছিল দু রকমের। শীলা জীবনের আকর্ষণ হারিয়ে বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত হল, আর ইলার মনে ঢুকল ফুসফুসের যক্ষ্মাভীতি। শীলা আঘাত পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল, ইলা যেন আরো বেশি সক্রিয়, কর্মতৎপর হয়ে উঠল। শীলা বি-এ পরীক্ষায় পরপর তিনবার ফেল করল; ইলা পরীক্ষা পাশ করে স্কুলমাস্টারী করতে করতে বি-টি পাশ করল। শীলা এল অনেক টনিক, ভিটামিন ইত্যাদির একগাদা ব্যবস্থাপত্র নিয়ে, মায়ের হাত ধরে; আর ইলা এল এক রকম একলা কয়েকখানা এক্স-রে প্লেট আর থুথু পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে নিয়ে। এইবার দুজনের জীবন ও রোগ-ইতিহাসের বিবরণ জানাচ্ছি।

শীলার বয়স বাইশ, দেখতে সুশ্রী, বেশ-ভূষা অবিন্যস্ত, চোখে-মুখে হতাশা ও বিরক্তির চাপ। খুবই দুর্বল, তিন বছরে প্রায় ১৪।১৫ পাউন্ড ওজন কমেছে, হাঁটতে চলতে কষ্ট হয়। খিদে আর ঘুম একেবারেই নেই বললে চলে। নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খেয়েও রাত্রে তিন ঘন্টার বেশি ঘুম হয় না। দিনরাত প্রায় সব সময়েই শুয়ে থাকে, না হয় বসে বসে ডায়েরী লেখে। মা জোরজার করে ওষুধ না খাওয়ালে খায় না। কয়েক গ্রাস ভাত মুখে পুরলেই পেট ভরে যায়, বমি আসে, চেষ্টা করেও খেতে পারে না। খুব হাসিখুসী, আমুদে, মিশুকে ছিল; এখন একেবারে বদলে গেছে। অল্পেতেই রেগে ওঠে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, বন্ধু-বান্ধবীরা দেখা করতে এলে অল্প দু-চার কথার পরই মাথা ধরার ওজুহাতে শুয়ে পড়ে। তাই আজকাল কেউ আর বড় একটা দেখা করতে আসে না। এর মধ্যে পরীক্ষায় বসেছে দুবার, কোনো রকম তৈরী না হয়েই। আই-এ পরীক্ষায় উঁচু ফার্স্ট ডিভিশন ছিল, ম্যাট্রিকেও ভাল ফল দেখিয়েছিল। অধ্যাপকরা ভেবেছিলেন অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম দু-চার জনের মধ্যে অনার্স লিস্টে ওর নাম থাকবে। কিন্তু তাঁদের নিরাশ করেছে, পাশ-কোর্সেও পাশ করতে পারে নি।

আমার কোন প্রশ্নেই উত্তর ভাল করে দিল না; দায়সারা গোছের হাঁ, না,—বলে চালিয়ে দিল। রক্তচাপ খুব কম, নাড়ীর গতিও শ্লথ, এছাড়া পরীক্ষায় আর কোনো অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ল না। চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনো রকম উৎসাহ নেই, ওর ভুরু কোঁচকানো আর নীরস কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল।

ইলা আমার পরামর্শ নিতে আসে তেইশ বছর বয়সে। শীলার মত সুশ্রী তন্বী না হলেও দেখতে মোটামুটি ভাল। লম্বা, কালো, স্বাস্থ্যবতী। হাই-পাওয়ারের চশমার ফাঁকে উজ্জ্বল চোখ দুটিতে উৎসাহ-অনুসন্ধিৎসার চাহনী। স্কুলে মাস্টারী করে, টিউশানী করে, বোর্ডের পরীক্ষার খাতা দেখে। বোর্ডিং-এ থাকে। সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল আগ্রহের সঙ্গে। প্রাইভেট এম-এ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মিষ্টি একটু হেসে নিজে থেকেই আমাকে এই রকম অনেক কিছু খবর দিল। ঘুম হয়, খাওয়া দাওয়াতে অরুচি নেই। শারীরিক দুর্বলতাও কোনো-কিছু অনুভব করে না। তবে সকালবেলায় ঘুম ভাঙার পর বুকের কাছটায় একটা ব্যথা অনুভব করে; আর এই সময় তার মনে হয় কাশির সঙ্গে রক্ত বের হয়। অনেকবার থুথু পরীক্ষা করিয়েছে, এক্স-রে ছবি তুলেছে; বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছে। সবাই একবাক্যে বলেছেন বুকের কোনো দোষ নেই। তবু তার মন থেকে সন্দেহ কিছুতেই যাচ্ছে না। বোর্ডিং-এ একটা ছোট ঘর নিয়ে একলা থাকে। কাপড়-জামা নিজের হাতে কাচে। থুথু ঘরের বাইরে ফেলে না, কাগজে বা শিশিতে জমিয়ে রেখে রাত্তিরে স্পিরিট ঢেলে পুড়িয়ে ফেলে। নিজের অসুখের ভয়ের থেকে অন্যকে সংক্রামিত করার ভয়টাই তার বড়। এই ভয়েই বাড়ীতে না থেকে বোর্ডিং-এ থাকে। বাড়ীতে গেলে অল্পবয়সী ভাই-বোনদের সঙ্গ যতটা পারে এড়িয়ে চলে। এখন বুঝতে পেরেছে তার টি-বি হয় নি; কিন্তু ভয় যাচ্ছে না; সাবধানতার অভ্যাসগুলোও ছাড়তে পারছে না।

শীলা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। শহর-তলীতে নিজেদের বাড়ী আছে। বাবা মোটা মাইনের অফিসার। বাবা, মা, মেয়ে আর ঝি-চাকর নিয়ে সংসার। শীলা একমাত্র সন্তান। আদর প্রশ্রয়ের মধ্যে বড় হয়েছে। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন না থাকলেও হৈ-চৈ আমোদ আহ্লাদের কমতি ছিল না কোনো দিন। সন্ধ্যায় রোজ আসর বসত, গানের কিম্বা তাসের। বাবা মা খুবই মিশুকে, ছোট বড় সবার সঙ্গেই আড্ডা জমাতে পারতেন। শীলা শৈশব থেকেই এইসব আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। নাচ দেখাত, আবৃত্তি শোনাতো; আর চা-বিস্কুটে আপ্যায়িত আড্ডাধারীদের প্রশংসাধন্য হয়ে গর্ব বোধ করত। কিশোর-বয়সেই শীলা বুঝতে পারল সে সুন্দরী, আসরের এক রকম প্রধান আকর্ষণ সেই। যুবা, প্রৌঢ় সকলেই তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়, তার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। স্কুলে শিক্ষকশিক্ষিকারা তার বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করতেন। সতীর্থাদের ঈর্ষার উদ্রেক হত, শীলা উপভোগ করত। বাবা আসরে বসে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতেন, শীলা নীরবে বসে শুনত। শীলাকে তিনি অক্সফোর্ডে পাঠাবেন, ওখান থেকে ডকটরেট হয়ে আসবে। বিলাতি ডিগ্রী না থাকলে স্বদেশে সম্মান মেলে না, একথা তিনি জানতেন। শীলার প্রাইভেট টিউটর ওর অসাধারণ মেধার নজির হাজির করে শ্রোতাদের চমৎকৃত করে দিতেন। এইভাবে নিজের রূপগুণ সম্পর্কে প্রশস্তি শুনতে শুনতে শীলা আই, এ পাশ করল। আড্ডার যুবকদের ও রাস্তাঘাটের অচেনা ছোকরাদের মুগ্ধ চাহনী রীতিমত ও উপভোগ করত। নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে আরো সুন্দর করে তোলার দিকে ওর ঝোঁক বেড়েই চলল। কলেজেও তরুণ অধ্যাপকরা ওর দিকে তাকিয়েই বক্তৃতা দিতেন, ছুটির পরে ওর লেখা সংশোধন করে দিতেন, সেই অবকাশে ও-যে খুব সুন্দরী সেই কথাটি শুনিয়ে দিতেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী যেত শুধু প্রশংসা শুনতে। কোথাও প্রশস্তির জোয়ারে ভাটা পড়লে, সেদিকে শীলা আর ঘেঁসত না। রূপগুণের স্তুতি শোনা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেল। আড্ডার একজন ছেলে শুধু স্তুতি করে ওর হৃদয় জয় করল। সতেরো বছরে শীলা ছেলেটির প্রেমে পড়ল। তার বাপের ব্যাংক-

ব্যালান্স ছিল মোটা রকমের, আর প্রশস্তি-বিদ্যায় ছেলেটি ছিল পারদর্শী। মাত্র এই দুটি গুণে শীলাকে জয় করে ফেলল। অন্য যুবকরা হতাশ হয়ে পথ ছেড়ে দিল। বাবা-মা উৎসাহ না দিলেও ওদের অবাধ মেলা-মেশায় বাধা দিলেন না। প্রেমের বন্যায় ভেসে চলল শীলা। বি. এ পাশ করার পরই বিয়ে হবে দুজনের মধ্যে এই রকম অলিখিত একটা চুক্তি হয়ে গেল আংটি বদল করে। বি. এ পরীক্ষার আগেই কিন্তু সব কিছু ভেস্তে গেল। ছেলেটির দিদি ও বাবা শীলাকে পছন্দ করলেন না। আড্ডাবাজ জেদী আদুরে মেয়েকে দূর থেকে প্রশংসা করা চলে, আপন করে ঘরে আনা চলে না। এই রকম বোঝালেন তাঁরা শীলার ভাবী-স্বামীকে। ছেলেটি শীলার সুন্দর দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল; ওর মনমেজাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি। শীলা ছাড়া আরো কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে ও প্রেমের খেলা খেলছিল। শীলার গর্ব তাকে অন্ধ করে রেখেছিল। শীলা যাকে জয় করেছে, তার অন্যদিকে নজর থাকতে পারে, —একথা ও ভাবতেই পারে নি। নিশ্চিন্ত মনে বাবা মা ও একজন আত্মীয় যুবকের সঙ্গে পুজোর ছুটিতে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। মাসখানেক পর ফিরে এসে শুনল তার ভাবী স্বামীর বিয়ে হবে অঘ্রাণের প্রথম দিকে তারই অতি-পরিচিত এক মেয়ের সঙ্গে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ছুটে দেখা করতে গেল ওদের বাড়ীতে। ছেলেটির দিদি মাঝপথে পাকড়ে নিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে জানিয়ে দিলেন যে, ভিনজাতের সঙ্গে বিয়েতে ওঁদের মত নেই। তার ভাই ছেলেমানুষী করে আংটি বদল করেছে বলেই শীলার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তাঁরা মানতে রাজী নন। শীলাকে তার আংটি আর সঙ্গে ভাইয়ের লেখা একখানা চিঠি দিয়ে ওর মুখের ওপরই সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন। পাগলের মত দরোজায় ধাক্কা দিতে লাগল শীলা। ওর চীৎকার ও কান্নায় লোক জমে গেল। খবর পেয়ে মা এসে এক রকম জোর করে ওকে বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন। সেই থেকে শীলা অসুস্থ। আড়াই বছর ধরে ভুগছে। প্রথম দিকে সবাই ভেবেছিল, ডাক্তাররাও আশা দিয়েছিলেন যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভাল হয়ে উঠবে। এ ধরনের আঘাত সামলে উঠতে দেরী হয় না। কিন্তু অসুখ ওর বেড়েই চলেছে। আত্মসংযমের চেষ্টা করেছে স্বাভাবিক হতে চেয়েছে; পারে নি। বাবা ওকে নিয়ে মাস কয়েকের জন্য বাইরে যেতে চাইলেন, ও রাজী হল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিয়েবাড়ীর সানাই শুনল, নিজেকে জোর করে টেনে পরীক্ষার কেন্দ্রে নিয়ে গেল, প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে সারাক্ষণ কি যেন চিন্তা করল, তারপর নিয়ম-মাফিক খাতা জমা দিয়ে বাড়ী ফিরে এল। প্রেমিকের শেষ চিঠির লাইন কটা ওর মনের মধ্যে কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল। 'বাবা মাকে অন্য জায়গায় রেখে অনন্তপুরমে তুমি দূর-আত্মীয়ের সঙ্গে এক হোটেলে রাত্রিবাস করেছ, তোমার সঙ্গে হোটেলে রাত কাটানো চলে, তোমাকে বিয়ে করা চলে না' —এই রকম লেখা ছিল চিঠিতে।

এই ইতিহাস শীলার মা আমাকে শোনালেন। মামুলী হলেও শীলার প্রক্ষোভ-জনিত রোগব্যাখ্যায় এই কাহিনীর গুরুত্ব আছে মনে করেই বিশদভাবেই বিবৃত করতে হল।

ইলার জীবনকথা সংক্ষেপেই বলব। পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। দুখানা ঘরে ঠাকুমা, পিসীমা, বাবা মা চার ভাইবোন মিলে গাদাগাদি করে বাস করেছে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য দিনরাত ঠাকুমা পিসীমার কাছে ধিক্কৃত হয়েছে। ভাইবোনদের মধ্যে সেই জ্যেষ্ঠা। ছেলে হলে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারত, বড় হয়ে রোজগার করে সংসারের অভাব মেটাতে পারত। মেয়ে হয়ে জন্মেছে, আবার যেন পরের বাড়ী যাবার মহলেই অযত্নে অবহেলায় ধুক ধুক করে বেড়েই চলেছে। পড়াশুনো ছাড়িয়ে নিয়ে দেবার পরামর্শ এসেছে হিতৈষীদের কাছ থেকে। মায়ের উৎসাহে ইলা কারুর কথায় কান না দিয়ে নিজের স্টাইপেন্ডের আর টিউশানীর টাকায় ফোর্থ ইয়ার অবধি পড়া চালাল। গোলমাল বাধল পরীক্ষার বছর। যে বাড়ীতে টিউশানী করত, সেই বাড়ীর বড় ছেলে অতীন এই গোলমালের নায়ক। ডক্টরেটের থিসিস তৈরী করতে করতে ইলাকে নানাভাবে সাহায্য করে, বই নোট ইত্যাদি জোগাড় করে দিয়ে, ইলার হৃদয় সিংহাসনটি দখল করে বসেছিল। ব্যাপারটা অনেক দূর অবধি গড়িয়েছে। চিঠিপত্রে অতীন ইলাকে অনেক-বার জানিয়েছে, মন্ত্রপড়া ছাড়া আর সব দিক থেকেই তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ইলা তাই বিশ্বাস করেছে। নির্জন বাড়ীতে দুজনের কয়েকবার দেখা হয়েছে। ইলা অতীনকে বাধা দিতে পারে নি। গন্ধর্ব মতে বিয়ে হয়ে গেছে মনে করে অতীনের আদর, স্বামীর আদর জ্ঞান করেছে। পরীক্ষার পর মা-বাবাকে জানিয়ে ব্যাপারটা পাকাপাকি করবে ভাবছে। এমন সময় দিল্লী থেকে অতীনের চিঠি এল। একটা চাকরী নিয়ে সে কানাডা যাচ্ছে, বছর পাঁচেকের আগে ফিরবে না। বিয়ে করে যাবার উপায় নেই, চাকরির শর্ত নাকি ঐ রকমের। ইলা যেন তাকে ভুলে যায় ও ক্ষমা করে। চিঠিটা উনুনে চালান করে দিয়ে রাতটা না ঘুমিয়ে ছটফট করে কাটাল ইলা। পরদিন থেকে পড়াশুনোর মধ্যে একেবারে ডুবে গেল। পরীক্ষা দিল এবং বেশ ভালভাবেই পাশ করল। এই সময় সকালে কাশির মধ্যে রক্ত দেখতে পেল। বেহালার দিকে একটা স্কুলে চাকরী নিয়ে বোর্ডিং-এ বাসা বাঁধল। সেখান থেকেই বি. টি পাশ করে গভীর মনোযোগ দিয়ে চাকরী ও লেখাপড়া করতে লাগল। এখন থেকে বাবাকে একশ টাকা করে মাসে মাসে সাহায্য করছে। বাড়ীতে পিসীমা-ঠাকুমা একেবারে অবাক। মা-বাবা অনেক চেষ্টা করেও বাড়ীতে থাকতে রাজী করাতে পারেন নি। সকালের দিকে তার জ্বর হয়, থুতুতে রক্ত দেখা যায়, একথা সে ডাক্তারদের ছাড়া আর কাউকে জানায় নি। ঠাকুমা-পিসীমার নিন্দের প্রসঙ্গে নীরব থেকেছে।

দুটি মেয়েরই অসুস্থতার মূলে প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান। ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা, অপমান এবং ব্যর্থতার বেদনাভারে দুজনেই পীড়িত। একজন আঘাতের ফলে জীবন-বিমুখ, বিষাদগ্রস্ত; অন্যজন নিজের ভয় অথবা অন্যকে সংক্রামিত করার ভয়ে আবেশ-গ্রস্ত (অবসেসড)। দু বছর ধরে প্রেমের প্রক্ষোভ এদের মনে জাগা সদর্থক আলোড়ন এখন ব্যর্থতার বেদনায় নঞর্থক প্রভাবে রূপান্তরিত।

দুজনের মানসিকতা ও স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের ফলে রোগ লক্ষণের এই বিশিষ্টতা। বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পূর্বে প্রক্ষোভ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অগ্রাধিকারের দাবী করতে পারে।

প্রক্ষোভ-বিষয়ক প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করেন চার্লস ডারুইন। জেমস ল্যাং ও ক্যানন শেরিংটন প্রক্ষোভের শারীরবৃত্তির ব্যাখ্যা জানান। বেকটেরেভ মনে করলেন প্রক্ষোভ সহজাত প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়েও উচ্চমস্তিষ্ক-প্রভাবিত। শর্তাধীন রিফ্লেক্স দ্বারা প্রক্ষোভ সৃষ্টি করা সম্ভব। উচ্চমস্তিষ্ক থেকে প্রক্ষোভ (ইমোশন) স্রোত নিম্নমস্তিষ্কে পৌঁছে জৈব-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রগুলোকে উত্তেজিত করে। এইভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, পরিপাক ক্রিয়া এবং এন্ডোক্রিন গ্রন্থিগুলো প্রক্ষোভ-তাড়িত হয়। পাভলভ ও তাঁর সহযোগীদের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে প্রক্ষোভ সম্পর্কিত আরো অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হল। বিকফ দেখালেন যে জীবের আন্তরযন্ত্র উচ্চমস্তিষ্কের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট।

উচ্চমস্তিষ্কে আন্তরযন্ত্রের উদ্দীপনা প্রভাবিত করে, আবার উচ্চমস্তিষ্ক আন্তযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই উচ্চমস্তিষ্কের তীব্র আলোড়নে জীবের আন্তরযন্ত্রগুলোও বিশেষভাবে আলোড়িত হয়। প্রক্ষোভকালীন আন্তরযন্ত্রের আলোড়ন উচ্চমস্তিষ্কের তীব্র আলোড়নের প্রতিক্রিয়া: এই মত প্রকাশ করলেন বিকফ। প্রক্ষোভ শর্তহীন ও শর্তাধীন রিফ্লেকসের এক জটিল সমাহার। প্রক্ষোভে বিষয়ীগত ও বিষয়গত, দু ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়ীগত পরিবর্তন বলতে বুঝি ব্যক্তির ভালমন্দের অনুভূতি: আনন্দ-নিরানন্দ; ঘৃণা-ভালবাসা; সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ইত্যাদি। আর বিষয়গত পরিবর্তন বলতে বুঝি শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, তাপ নিয়ন্ত্রণ, পরিপাকক্রিয়া, ইত্যাদি সর্ববিধ জৈবক্রিয়ার হ্রাস বৃদ্ধি। প্রক্ষোভকালে এই দুই ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে (মানসিক ও দৈহিক) আলাদাভাবে বিচার করা যায় না। প্রক্ষোভের বশবর্তী মানুষ অনেক সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অসামাজিক কাজ করে বসতে পারে। আক্রান্ত হতে পারি, এই ভয়ের বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো সময় শান্ত প্রকৃতির মানুষও অন্যকে বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করে বসতে পারে। এ সময় তার নিম্ন মস্তিষ্কের (সাব-কর্টেকস) অতি উত্তেজনার দরুণ উচ্চমস্তিষ্ক (কর্টেকস) নিস্তেজিত হয়ে যায়। সাময়িকভাবে যুক্তিবুদ্ধি: বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা (এগুলো উচ্চ মস্তিষ্কের ধর্ম) লোপ পায়। অভিভাবন মানুষের ক্ষেত্রে সব থেকে শক্তিশালী প্রক্ষোভ-উদ্দীপক। সুবক্তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানুষকে অভিভাবনের সাহায্যে প্ররোচিত করতে পারেন। আমাদের সমাজে বর্তমানে ভয়ের অভিভাবন, খুব সহজেই কার্যকর, কেন না আমরা সবাই নিরাপত্তার অভাবে কমবেশী পীড়িত, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় শঙ্কিত। ভয়ের অভিভাবনে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিকে অতিমাত্রায় উদ্দীপ্ত করে মানুষকে নিষ্ঠুর হত্যায় প্ররোচিত করা যায়। প্ররোচিত করা হয়ে থাকে এবং হচ্ছেও। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলে কৌশলী প্ররোচকের অভিসন্ধিমূলক অথবা অজ্ঞাতসূচক অভিভাবন অনেক সময়েই দায়ী।

প্রক্ষোভ দু রকমের। 'স্থেনিক ও অ্যাস্থেনিক'। বাংলায় বলা চলে সুস্থ, অসুস্থ; অথবা সদর্থক, নঞর্থক। আনন্দ আশা, উদ্দীপনা—স্থেনিক প্রক্ষোভের দৃষ্টান্ত। সুস্থ প্রক্ষোভ পরিপাক ক্রিয়াকে সাহায্য করে, উচ্চমস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত করে। অপর পক্ষে অসুস্থ বা অ্যাস্থেনিক প্রক্ষোভ পরিপাকক্রিয়াকে ব্যাহত করে, উচ্চ মস্তিষ্ককে নিস্তেজিত করে নিম্নমস্তিষ্ক বা সাবকর্টেকসের ক্রিয়াকে শক্তিশালী মানুষকে প্রবৃত্তির প্রভাবাধীন করে ফেলতে পারে। ভয়, বেদনা, বিষাদ, অসুস্থ প্রক্ষোভের নিদর্শন।

শীলা, ইলা দুজনেই অ্যাস্থেনিক প্রক্ষোভের প্রভাবে অসুস্থ। নানাভাবে অসুস্থ প্রক্ষোভের উন্মেষ ঘটতে পারে। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের সংঘাত থেকে অতি সহজেই এই ধরনের প্রক্ষোভের সঞ্চার হয়। বাঁধা-ধরা জীবনযাত্রায় আকস্মিক বড় রকমের পরিবর্তনের ফলে মানুষ নঞর্থক প্রক্ষোভ-প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে। প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত আত্মীয়-বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু এই রকমের পরিবর্তন। পাভলভের ভাষায় 'ডইনামিক স্টেরিওটিপির', অথবা চলমান জীবনছকের পরিবর্তন। বন্ধুটিকে কেন্দ্র যে সব শর্তাধীন রিফ্লেক্সগুলি গড়ে উঠেছিল, সেগুলো ভেঙ্গে পড়াতে উচ্চমস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে যায়। জৈবপ্রক্রিয়াতেও নানারকম পরিবর্তন ঘটে। যুক্তিবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তি নানা রকমের অর্থহীন কথা বলে, বিসদৃশ ব্যবহার করে। শীলা, ইলা, দুজনেই চলমান জীবনছকের আকস্মিক গুরুতর পরিবর্তনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এইটেই একমাত্র না হলেও, প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, প্রেমের মত মহাশক্তিশালী 'স্থেনিক' ইমোশনকে অস্বীকার করতে হচ্ছে। বাস্তবে যতই কারণ থাকুক;—উদ্দাম প্রেমের বন্যাকে প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন। সেই প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা ওদের উচ্চমস্তিষ্কে বিশেষ ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় কারণ, নিজের মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণাতে প্রচণ্ড আঘাত। আমার একটা সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্য আছে, যার জন্য আমি অন্যের কাছে প্রেয়, সমাজের পক্ষে আবশ্যক;—এ ধারণা আমাদের সকলের পক্ষেই আবশ্যক। যখন প্রেমিক আমাকে অনায়াসে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে চলে গেল, তখন আমার কাছে আমি দীনের চেয়ে দীন হয়ে যেতে বাধ্য। সমাজের কাছেও আমি বোধ হয় মূল্যহীন। এ চিন্তা দুজনের মনেই এসেছে। এই জায়গায় শীলার আঘাত অনেক বেশী গুরুতর। কেন না, ইলার তুলনায় নিজের মূল্য সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন, অত্যধিক গর্বিত। শীলা তার পরিবার, আত্মীয়স্বজনের কাছে শুধু দাবী করেছে, তার প্রাপ্য অনেক সময়েই পেয়েছে। তার কিছু দেয় আছে, একথা তার কোনো দিন মনে হয় নি। তার কাছে কোনো দিন কিছু প্রত্যাশা করে নি কেউ। বিগ্রহের মত স্তুতি চেয়েছে আর পেয়েছে। কাজেই সে আঘাত সামলে নেবার তাগিদ অনুভব করেনি। সে সুস্থ কার্যক্ষম হয়ে না উঠলে কারুর কোনো ক্ষতি হবে না। শীলার পারিবারিক পরিবেশের স্নেহ, প্রশ্রয়, স্বাধীনতা তাকে আত্মকেন্দ্রিক, অহংকারী ও একগুঁয়ে করেছে। সহাশক্তি একেবারেই জন্মায় নি। তাই তার আঘাতের ফলে সে জীবনবিমুখ, কর্মবিমুখ, বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রেমিককে যদি উল্টে আঘাত করতে পারত, তার কোনো দৈহিক ক্ষতি সাধন করতে পারত: তাহলে হয়ত খানিকটা তৃপ্তি পেত। অহংকারী অপমানের জ্বালায় অনেক দিন অবধি কষ্ট পায়। শীলা তাই পাচ্ছে। ইলার গর্ব করার কিছু ছিল না। না রূপে, না বিশেষ কোনো গুণে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে শৈশব থেকে গঞ্জনা সইতে হয়েছে। পড়ার জন্য চেষ্টা, তদ্বির, তদারক করতে হয়েছে প্রচুর। অতীনের প্রেম তার কাছে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সূচনার সম্ভাবনা। অতীনের প্রেমের সে যোগ্য নয়, এ সৌভাগ্যে তার দাবী নেই; এই রকমই মনে হয়েছে। পথ চলতে কুড়িয়ে পাওয়া সোনার থালা হারালে যে নৈরাশ্যবোধ জাগে, লটারীতে টাকা পাওয়ার খবর মিথ্যে হলে যেটুকু হতাশার উদ্রেক হয়, তার বেশি নিরাশা-হতাশা তাকে পীড়িত করতে পারে নি। এছাড়া পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ ও আনুগত্য তার বেশী। পরিবারের কেউ কেউ তাকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু সে ত তাঁদের সংস্কার থেকে। তাঁরা মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছেন, তাই ওকে ভালবাসেন বলেই ঐভাবে ওকে সহানুভূতি জানিয়েছেন। নিজের আঘাতকে গ্রাহ্য করলে চলবে না, তাকে বাঁচতে হবে, অন্যকে বাঁচাতে হবে। অনেক দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে। তাই আঘাত মস্তিষ্কের কয়েকটা কোষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে; ইলা 'অবসেশন' বা আবেশের রোগীতে পরিণত হয়েছে। টি-বির ভয় বা অন্যকে সংক্রামিত করার ভয় দেখা দিল কেন? অন্য ধরণের 'অবসেশন' হল না কেন? এর কারণ মনে হয় দুটো। এক, পিসীমা-ঠাকুমা তথাকথিত গঞ্জনাকে সে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে যতই লঘু করতে চেষ্টা করুক, পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত (রিজেকশন) হবার ভয় তার থেকে মনে ঢুকেছে। বিয়ে হলেও পরিবার ছাড়তে হবে, এক ধরনের রিজেকশন, আবার টি-বি হলেও পরিবার ছাড়তে হবে, অন্য ধরনের রিজেকশন। অন্যকে সংক্রামিত করার 'অবসেশন' তাকে বাড়ী থেকে সরিয়ে বোর্ডিংবাসী করেছে। এছাড়া, অতীনের স্পর্শে দেহ অশুচি হয়েছে। পরিবারে অপবিত্র দেহ নিয়ে প্রবেশ করা উচিত হবে না: এই রকমের চিন্তাও তার মনে উঁকি দিয়েছে। শীলার আর একটি মানসিক আঘাতের কারণ এখনও বলা হয় নি। প্রেমিকের শেষ চিঠিতে তার চরিত্রকে মসীলিপ্ত করার চেষ্টা, তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার হীন কৌশল ছিল। এই চিঠিই তাকে বিশেষভাবে অসুস্থ করেছে।

অসুস্থ অভিভাবন যেমন 'অ্যাস্থেনিক ইমোশন' সৃষ্টি করতে পারে, সুস্থ সুচিন্তিত অভিভাবন তেমনি 'স্থেনিক ইমোশন' জাগ্রত করে অসুস্থতা নিরাময় করতে পারে। প্রক্ষোভ দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের প্রভাবকে বেশি দিন অগ্রাহ্য করতে পারে না। শীলার মস্তিষ্ক ইলার থেকে শক্তিশালী; যদিও প্রথম আঘাতের প্রতিক্রিয়া থেকে সেটা বোঝা যায় নি। আজ থেকে প্রায় ১৫।১৬ বছর আগে এরা চিকিৎসার জন্যে এসেছিল। দুজনেই এখন সুস্থ, স্বাবলম্বী হয়েছে। তবে এরা কেউই বিবাহ করে নি।

—মনোবিদ্

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯ ফেব্রুয়ারী তুলসী চক্রবর্তী রঙমহলে প্রথম অভিনয় করলেন।

পরদিন মাদ্রাজ প্রবাসী জীতেন মুখার্জী এবং বেস্ট মুখার্জী এলেন থিয়েটারে আমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেক দিন পর ওঁদের দেখে আনন্দ হলো। ওঁরা আবার ১৩ তারিখে ভোলা মাস্টার অভিনয় দেখতে এলেন।

রাণীবালা অনেক দিনই রঙমহলে ছিল। একই সঙ্গে অনেক দিন অভিনয় করেছি। কিন্তু ১৩ ফেব্রুয়ারীর অভিনয় তার রঙমহলের শেষ অভিনয়। অভিনয় শেষে সে আমাকে প্রণাম করতে এলো।

মতিলাল সেন এককালে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে নলিনী সরকার তাঁকে কাজ দিয়েছিলেন হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে। তারপর যোগ দেন শ্রীরঙ্গমের অন্যতম অফিস কর্মী হিসেবে. সেখান থেকে রঙমহলে। রঙমহলের সকলেই মতিলাল সেনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। সেই মতিলালবাবু মারা গেলেন ১৯ ফেব্রুয়ারী সকালে।

এর কয়েক দিন পরেই বন্দনা রঙমহল ত্যাগ করলো।

ঐ সাতাশ তারিখেই গিরীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো রঙমহলে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন মন্মথ বসু।

অনেক দিন পর পি-ডব্লু-ডি'র পুনরাভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। অভিনয় হলো ২ মার্চ। নাট্যভারতীর শিল্পী সত্যবালা যোগ দিয়েছে রঙমহলে। পি-ডব্লু-ডিতে সে অভিনয়ও করলো। পি-ডব্লু-ডি'র আকর্ষণ আগের মতো না থাকলেও, আছে। সেদিনের অভিনয়ে দর্শক সংখ্যা থেকে সেটা প্রমাণিত হলো।

কিন্তু চলতি নাটক 'সানি ভিলা' পড়তির দিকে। অথচ ভোলা মাস্টার যথারীতি চলছে।

৯ মার্চ তারিখে ছিল দোলযাত্রা। ঐদিনে রঙমহলে অভিনীত হলো কর্ণার্জুন আর দোললীলা। আমি অংশ নিতে পারি নি অসুস্থতার দরুণ।

নিজে তো অসুস্থ, কিন্তু সুধীরার অসুস্থতা আরো বেড়ে চললো। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি তার অন্য উপসর্গও বাড়লো। যেমন জ্বর, তেমনি বমি। এদিকে কাশি তো আছেই।

একেবারে শয্যাশায়ী হলো সুধীরা। এতো ডাক্তার, এতো চিকিৎসা—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমার অভিনয় বন্ধ। আমার জায়গায় রঙমহলে সানি ভিলায় অভিনয় করছে সন্তোষ দাস।

বাড়িতেই থাকি। তবে থিয়েটারে মাঝে মাঝে যাই না এমন নয়। বাইশে মার্চ তারিখে খবর পেলাম, শান্তি গুপ্তা আর অমল ব্যানার্জী রঙমহলে যোগ দিয়েছে। রঙমহলে আরো একজন যোগ দিলে, তার নাম পূর্ণিমা। ৭ এপ্রিল তারিখে সে ভোলা মাস্টারে উল্কার চরিত্রে অভিনয় করলে। পরদিন আরো একজন অভিনেত্রী বেলা, সে-ও রঙমহলের শিল্পী তালিকায় নাম লেখালো। অভিনয় করলে ঐ তারিখের নাটক চরিত্রহীনে, জগত্তারিণীর ভূমিকায়।

আমি বাড়িতেই আছি। না থেকে উপায় কি! আট এপ্রিল সুধীরার জ্বর উঠলো ১০৫-৩০ ডিগ্রি। কুইনিন প্রয়োগ করলেন ডাক্তার।

তিন দিন পর জ্বর ছাড়লো। কিন্তু জ্বর ছাড়লে কী হবে, অতিরিক্ত মাত্রায় কুইনিন প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সে আর এক দুশ্চিন্তা। ডাক্তার জে এন রায়কেও রীতিমতো চিন্তিত দেখলাম। বেলা বারোটা নাগাদ অবস্থা এমনই হলো, যে কী হবে ভেবে পেলাম না! দেখে যা মনে হলো, তাতে মনটা মুষড়ে গেল। আর বোধ হয় ধরে রাখা গেল না সুধীরাকে। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার এইচ সি বোসকে ফোন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এলেন। সুধীরাকে দেখে তাঁরও মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো! ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে নিজে বসে রইলেন। বাড়ি থেকেই ভবানীপুরে রাইমার কোম্পানীকে ফোন করলেন, একটি দুষ্প্রাপ্য ওষুধের জন্যে। বাড়ি থেকে পাণ্ডে ছুটলো। ওষুধ নিয়ে এলো। এক মাত্রা প্রয়োগ করে ডাক্তার বোস বসে রইলেন প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ডাক্তার সুধীরার নাড়ির স্পন্দন পেলেন। তবুও বসে রইলেন ডাক্তার। আরো আধ ঘণ্টা কাটলো। তারপর ডাক্তার যেন কিছুটা ভরসা পেলেন। বললেন, আর ভয় নেই।

বলে ডাক্তার ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে দিলেন। ডাক্তার বোস থাকতে থাকতে ডাক্তার রায় ওষুধ নিয়ে এলেন। কিন্তু তার ওষুধ আর কাজে লাগলো না।

যাই হোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আজকের বিপদ থেকে তিনিই যেন উদ্ধার করেছেন।

সুধীরা ক্রমশঃ সুস্থ হতে লাগলো।

আরো একটি সুখবর, জহর গাঙ্গুলীর রঙমহলে যোগ দেওয়া। বারো এপ্রিল রঙমহলের "সরলা" নাটকে নীলকমলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো সে।

যদিও রঙমহলে একটির পর একটি পুরোনো নাটক অভিনীত হচ্ছে, কিন্তু চিন্তাটা রয়েছে নতুন নাটকের জন্যে।

বাংলা নববর্ষের ইংরেজী তারিখ ছিল চোদ্দই এপ্রিল। দিনটি কিন্তু শুভ বার্তা নিয়ে আসে নি। ঐদিনে বোম্বাই বন্দরে মাল বোঝাই জাহাজে পর পর দুবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। যার ফলে হাজার খানেক বাড়ি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অসংখ্য নর-নারী গৃহহীন তো হয়ই, এ-ছাড়া কিছু মৃত্যুও ঘটে। ঐ বিস্ফোরণে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার বাড়িটিও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

আমার বাড়িতে সিঁড়িতে ওঠার মুখে দোতলায় একটি জানালার ধারে যে পাথরের গণেশ মূর্তিটি রয়েছে, মূর্তিটি হাওড়া স্টেশনে এসেছিল রেলওয়ে পার্সেলে। ১৭ এপ্রিল তারিখে গণেশ মূর্তিটি বাড়িতে আনা হয়।

জানিনা কেন, গণেশ মূর্তিটি বাড়িতে আনার পরেই বেশ কিছুদিন আমার কর্মক্ষেত্রে কেমন যেন ভাটা পড়েছিল। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাস—নির্দিষ্ট কোন

কাজ ছিল না বলতে গেলে। তবে রঙমহলে যেতাম আসতাম এই পর্যন্ত। কখনো রঙমহল থেকে ফেরার পথে ময়দানের কোন নির্জনে বসে থাকতাম, কিম্বা ঘোড়ায়ে বেড়াতুম।

দিনগুলো ছিল একরকম বন্ধ্যা। আমার দিন যাই হোক, অন্যদিকে কিন্তু নতুন খবর ছিল। ২৫ মে তারিখে মিনার্ভায় একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন হলো। নাটকের নাম পুরোহিত, নাট্যকার কৃষ্ণদাস। অভিনয়ে ছিলেন নির্মলেন্দু, রাণীবালা, রতীন, মনোরঞ্জন, বন্দনা ছাড়া মিনার্ভার নিয়মিত শিল্পীরা।

অনেক দিন পর শাজাহান নাটকের একটি বিশেষ অভিনয় হলো মিনার্ভায়। তারিখ ৩০ মে। তবে ঐ দিনে শাজাহানে আমি অংশ নিই নি। শাজাহানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল ছবি বিশ্বাস। নির্মলেন্দু, রবি রায়, সরযূবালা, রাণীবালাও ছিল সেদিনের অভিনয়ে।

রঙমহলে তারাশঙ্করের দুই পুরুষ নাটকের নতুন করে অভিনয় শুরু হয় ৪ জুন তারিখে। শুনেলাম, নাটকের আকর্ষণ কখনো কমেনি।

ডায়েরীর পাতায় শুধু কি নাটক আর অভিনয়েরই খবর, কতো খবরই কালির আঁচড়ে ধরে রেখেছি। ৫ জুন রোমের পতন হলো মিত্রশক্তির হাতে, সে খবরও ডায়েরীর পাতা ওল্টালে পাই।

যুদ্ধের খবরের সঙ্গে নাটকের খবরও থাকে। ৭ জুন শ্রীরঙ্গমে শাজাহান অভিনীত হলো। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নেমেছিলেন ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায়, শাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় কে করেছিল নাম মনে নেই।

নিজের খবর না থাক, অন্য খবর কিন্তু আছে। ৯ জুন তারিখে সরযূবালার সম্মানে মিনার্ভায় অভিনীত হলো চন্দ্রশেখর। নির্মলেন্দু, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রতীন, রাণীবালার সঙ্গে সরযূবালাও নাটকে অংশ নিয়েছিল।

চুপচাপ ঘরে বসে থাকি, নয়তো কখনো-সখনো থিয়েটারের দিকে যাই। এতোদিন হলো, তবু শরীরটা আমার ঠিক হলো না।

১৬ জুন তারিখটির কথা মনে আছে। বাংলার বিশিষ্ট মনীষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঐ দিন পরলোকগমন করলেন। আচার্য রায়ের মৃত্যুতে সারা দেশে শোকের ছায়া নামলো। আমিও ব্যক্তিগত ভাবে সেই শোকের অংশীদার। আচার্য রায়ের সঙ্গে সঙ্গে একজন খাঁটি বাঙালীকে আমরা হারালাম।

২২ জুন ছিল রথযাত্রা। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের রামের সুমতির নাট্যরূপ দিয়েছে দেবনারায়ণ গুপ্ত। সেই নাটকের উদ্বোধন হলো রথযাত্রার দিনে। রঙমহলের এই নাটকে শিল্পী তালিকায় ছিল, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, সুহাসিনী ছাড়া আরো অনেকে। নাটকটির পরিচালক ছিল সতু সেন।

রামের সুমতি সে-সময়ের একটি সফল নাটক।

এতো নাটক, এতো অভিনয়, আমি কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে বাড়ি বসে আছি। আমি তো অসুস্থ—তারপর আমার স্ত্রী-ও দারুণভাবে হাঁপানীতে আক্রান্ত হয়েছে।

তারিখটা ছিল ১২ জুলাই—হাঁপানীর আক্রমণে সুধীরা অস্থির হয়ে পড়লো। তার রোগ-যন্ত্রণা দেখে আমিও ভয় পেলাম। একে ভাঙা শরীর, তারপর হাঁপানীর বাড়াবাড়ি—কী যে হবে। ডাক্তার গোবিন্দ মিত্র এলেন। ডাক্তারের মুখে চোখেও দুশ্চিন্তার চিহ্ন, যদিও মুখে তিনি অভয় দিলেন। শেষে ডাক্তার গোবিন্দ মিত্র নিজে ভরসা না পেয়ে ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তকে ডাকলেন। ডাক্তার সেনগুপ্ত এলেন। পরীক্ষা করলেন সুধীরাকে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও করলেন। পরে এলেন ডাঃ রাম অধিকারী।

সুধীরা যাও-বা একটু ভালোর দিকে, এদিকে আমারো আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরলো। কিন্তু আমার জন্যে ভাবি না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি, সুধীরা যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। সে-ই তো আমার লক্ষ্মী।

এর মধ্যে সুধীরাকে ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম পরীক্ষা করানো হলো। রিপোর্টে অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরপরেই ২৪ জুলাই ডাক্তার রাম অধিকারী এবং গোবিন্দ মিত্রের সঙ্গে ডাক্তার শিব ভট্টাচার্য-ও এলেন সুধীরাকে দেখতে। নতুন করে প্রেসক্রিপসন করলেন। ওষুধে সুধীরার যন্ত্রণার আরো উপশম হলো। কিছুক্ষণ বেশ সহজেই ঘুমোলো।

মনে হলো, হয়তো এবারে সুস্থ হয়ে উঠবে সুধীরা।

হেমন্ত গুপ্ত একজন নামকরা চিত্র-পরিচালক, তার মৃত্যু সংবাদ পেলাম ২৭ জুলাই। একজন উদীয়মান চিত্র-পরিচালকের অকাল মৃত্যুতে মনে ব্যথা পেলাম। কিন্তু মৃত্যু তো কারো হাত ধরা নয়, পরদিন ২৮ জুলাই আরো একটি মৃত্যু সংবাদ অপেক্ষা করছিল। অভিনেতা ক্ষেত্রমোহন মিত্রের মৃত্যু পরিণত বয়সে হলেও, সংবাদটা নিশ্চয়ই শোকাবহ।

জুলাই মাসের বাকি কটা দিন কাটলো। ২ আগস্ট ছিল ভোলা মাস্টারের 'দ্বি' শততম অভিনয় রজনী। যে নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আমি, অসুস্থতার জন্যে আমিই অভিনয় করতে পারছি না সেই নাটকে। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। যাই হোক দুইশত রজনীর স্মারক অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ জানাতে এলো শরৎ। শুনেলাম, ফজলুল হক সাহেব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। শরৎ-কে বললাম, ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছি না। তোমরা দুঃখ কোরো না।

শরৎ চলে গেল।

আজ ভোলামাস্টারের দুইশত রজনীর স্মারক উৎসব। আর আমি বসে রইলাম ঘরে।

রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা সেনোলা কোম্পানী রেকর্ড করালেন ৩ আগস্ট। পরদিন ৪ আগস্ট মিনার্ভায় উদ্বোধন হলো শচীন সেনগুপ্তের রাষ্ট্রবিপ্লব নাটকটি। ঐ নাটকের শিল্পী তালিকায় যুক্ত ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরী, রতীন ব্যানার্জী, জীবেন বসু, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূবালা, রাণীবালা, লাবণ্য এবং বন্দনার নাম।

আমি তখনো অসুস্থ শরীরে একরকম বাড়িতেই আছি। এরই মধ্যে ১২ আগস্ট তারিখে আমার ছোট ভাই পণ্টু চৌধুরীর বিয়ে হলো। পরদিনই আবার নতুন করে ম্যালেরিয়া চেপে ধরলো। যথারীতি ডাক্তার গোবিন্দ মিত্রও এলেন আমাকে দেখতে।

বাড়িতেই আছি অসুস্থ শরীর নিয়ে। বাড়িতে বসেই যেটুকু খবর পাই, তাই দিয়েই ডায়েরীর পাতা ভরিয়ে রাখি। নানা খবরের মধ্যে দেশ-বিদেশের খবরও থাকে। আগস্টের শেষ সপ্তাহে ফরাসী দেশপ্রেমিকরা প্যারী মুক্ত করলেন। একটি দেশ রাহুমুক্ত হলো, এখবরটা নিঃসন্দেহে সুখের।

এদিকে নাটকের খবর বলতে মিনার্ভায় 'রাষ্ট্রবিপ্লব' তেমন সুবিধে করতে পারলো না। নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছ থেকেই খবরটা পেলাম। আরো শুনেলাম, হাবুল গিয়েছিল মন্মথবাবুর কাছে নতুন নাটকের জন্যে। শরৎবাবুও নতুন নাটকের জন্যে মন্মথবাবুর কাছে গিয়েছিল।

মন্মথবাবু আমার সঙ্গে দেখা [illegible] এলে তাঁর মুখ থেকেই একথা শুনেছিলাম।

কলকাতার চলতি থিয়েটারের মধ্যে স্টারের অবস্থা ভালোই। ২৫ আগস্ট স্টারে মহেন্দ্র গুপ্ত'র ঐতিহাসিক নাটক টিপু সুলতানের ৫০ অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ দিনেই নতুন বাংলা ছবি 'সমাজ' মুক্তিলাভ করলো মিনার, বিজলী এবং ছবিঘরে। নিউ টকীজের এই ছবিটির পরিচালক হেমন্ত গুপ্ত কিন্তু নিজে তার ছবিটির মুক্তি দেখে যেতে পারলো না। কদিন আগেই সে মারা গেছে। একেই বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস।

ঘরে বসে ভালো মন্দ কতো খবর পাই। উদীয়মানা অভিনেত্রী ঊষা দেবীর মৃত্যু সংবাদ পেলাম ১১ আগস্ট। এদিন সকালেই সে মারা গেছে। ঊষা দেবীর প্রথম মঞ্চাবতরণ রঙমহলে স্বামী-স্ত্রী নাটকে। ঊষা দেবীর মৃত্যুতে মনটা খারাপ

দক্ষিণ ভারত সফরকালে
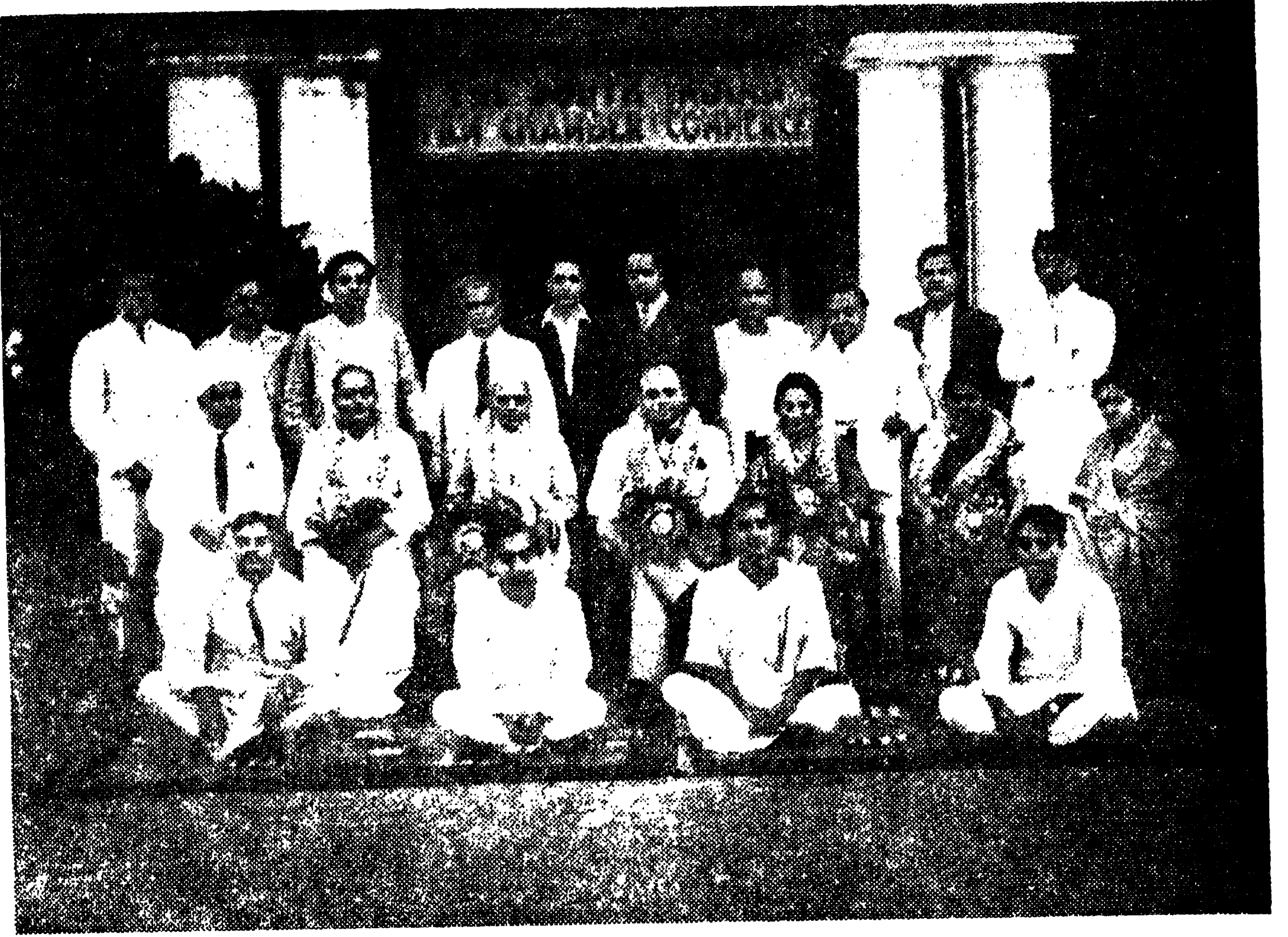
হলো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, সে যেন চিরশান্তি স্বর্গে স্থান পায়।

ঐ দিনেই রঙমহলে অভিনীত হলো শাজাহান। শাজাহানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎ চাটুজ্যে নামলেন ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায়। শান্তি গুপ্তা, সুহাসিনী, আর জহর গাঙ্গুলী ছিল যথাক্রমে পিয়ারা, জাহানারা এবং দিলদারের ভূমিকায়।

'রাতকাণা' প্রহসনটির কথা জানা নেই এমন মানুষ কম আছেন এ-দেশে। 'রাতকাণা'র রচয়িতা রায় বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ছাড়া আরো অনেক সফল নাটকের রচয়িতা। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করলেন ২ সেপ্টেম্বর।

ঐ দিনে বাংলা চলচ্চিত্রের যুগান্তকারী চিত্র নিউ থিয়েটার্সের বিমল রায়ের উদয়ের পথে মুক্তিলাভ করলো চিত্রা এবং রূপালীতে। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এই ছবিটি। শুধু তাই নয়, বাংলা চলচ্চিত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হলো উদয়ের পথের পর।

৩ সেপ্টেম্বর তারিখটি ভালো কি মন্দ জানি না, তবে ঐ তারিখটি চিহ্নিত ছিল বিশ্বযুদ্ধের স্মারক দিবসরূপে।

রঙমহলে শাজাহান অভিনীত হয় ৭ সেপ্টেম্বর। বলা বাহুল্য তখনো আমি ঘরে বসে। তবে শরীরের দিক থেকে আগের চেয়ে অনেক সুস্থ আমি।

১০ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় শরৎ চাটুজ্যে, সন্তোষ সিংহ, সন্তোষ দাশ, আর আশু বোস এলো আমার কাছে। নানা কথার মধ্যে কথা তাদের একটাই, আমি যাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিই।

বললাম, ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

শরৎ নাছোড়বান্দা। বললে, ও-সব জানি না, আপনাকে কথা দিতেই হবে।

বললাম, আজ এই পর্যন্ত থাক। আমি আসছে মঙ্গলবারে যাবো তোমাদের ওখানে। তখনই আমার কথা জানাবো।

সেদিনের মতো ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরদিন বিকালে মিনার্ভার দিলোয়ার হোসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। তার বক্তব্য, আর কিছু নয়, আমাকে মিনার্ভায় যোগ দেওয়ার কথা বলতে এসেছে সে। এর আগেও সে এসেছিল, বলেছিল মিনার্ভায় যোগ দেওয়ার কথা। তখনো যে উত্তর দিয়েছিলাম, এবারেও সেই একই উত্তর দিলাম। বললাম, পার্ট টাইম হোক, আর ফুল টাইম হোক—আমি খুব সম্ভবত পারবো না মিনার্ভায় যোগ দিতে। তাছাড়া রঙমহলের শরৎকে না জিজ্ঞাসা করে আমি কিছু বলতে পারবো না।

দিলোয়ার নাছোড়বান্দা। বলে, দোস্ত; আপনাকে কথা দিতেই হবে।

বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, আমার পক্ষে এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।

এবারে দিলোয়ার আমার হাতে পাঁচশ টাকা গুঁজে দিলে। বললাম, এ-টাকা কি হবে?

—রাখুন না।

—না, না—এ টাকা তুমি নিয়ে যাও।

—আরে রাখুন না দোস্ত! পরে যাহোক হবে। বলে সেদিনের মতো বিদায় নিলে দিলোয়ার।

১২ সেপ্টেম্বরের প্রভাতী সংবাদপত্রে দেখলাম, মার্কিনী সৈন্য জার্মান এলাকার দশ মাইল ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ভাবলাম, তবে কি এবারে যুদ্ধের অবসান ঘটবে?

ঐ বারো তারিখেই রঙমহলে 'মন্ত্র মায়াকরের' সম্মান রজনীর নাটক ক্রিয়া

অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। নাটকে অংশ নিতে রতীন, রাণীবালা, বন্দনা প্রমুখ মিনার্ভার শিল্পীরাও এলো। শরৎ অভিনয় করেছিল বক্তিয়ারের ভূমিকায়।

আমন্ত্রিত হয়ে আমিও গিয়েছিলাম অভিনয় দেখতে। আমি এসেছি শুনে দেখা করতে এলো বন্দনা, রতীন, সুহাসিনী, রাণীবালা ছাড়া আরো মেয়েরা। সবারই এক কথা, আমি কেমন আছি।

শচীন সেনগুপ্ত রঙমহলেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো অনেকে দেখা করতে এলেন। তার মধ্যে বিমল ঘোষ, সন্তোন ঘোষাল, হাবুলে, সতু সেন এবং ডাক্তার রাম অধিকারীও ছিলেন। প্রত্যেকেই এসেছেন, আমার খবর জানতে। দীর্ঘদিন অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘরে বসে থাকার পর, এই থিয়েটার দেখতে আসা।

অয়স্কান্ত বকসীর নাটক অধিকার, পরিচালনা সতু সেনের, নাটকে অংশ নিলে সন্তোষ সিংহ, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, শান্তি গুপ্তা, সুহাসিনী, পূর্ণিমা ছাড়া আরো অনেকে। এই নাটকের উদ্বোধন হলো রঙমহলে ১৪ সেপ্টেম্বর। ভেবেছিলাম, শরত নিশ্চয়ই দেখা করবে, কিন্তু দেখা করেনি। কেন সেই জানে।

যাই হোক দিলোয়ারের ব্যাপারটার একটা ফয়সলা হওয়া দরকার। ১৪ তারিখেই সে আমাকে ফোন করে জানালো, যে আমার কাছে সে আসছে।

বললাম, ঠিক আছে, তুমি এসো। আমি আজই শরতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাহোক ঠিক করবো।

রঙমহলে শরতকে ফোন করলাম? সন্তোষ ব্যানার্জি ফোন ধরলে। বললে, শরতবাবু থিয়েটার দেখছেন!

শুনে আশ্চর্য হলাম! থিয়েটারের মালিকরা সাধারণত দর্শকের আসনে বসে থিয়েটার দেখেন না।

পরে শরৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। তার সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় দিলোয়ারের ফোন পেলাম! সামনা-সামনি বসে শরৎ, এক্ষুনি কিছু বলা সম্ভব নয়, সুতরাং 'পরে কথা হবে' বলে ফোন ছেড়ে দিলাম।

দিলোয়ারের সঙ্গে আমার যা যা কথা হয়েছে, সবই বললাম শরতকে! জিজ্ঞাসা করলাম, এবারে বলো, তুমি কি বলবে? দিলোয়ার তো এখুনি পুজোর সময়ের অভিনয়ের জন্যে তারিখ নিতে চায়।

শরৎ একটু চিন্তা করে বললে, ঠিক আছে, আপনাকে আমি ছাড়ছি না।

শরতের সঙ্গে যখন কথা চলছে, তারই মধ্যে দিলোয়ার আমাকে দু'বার ফোন করেছিল। কোন রকমে তাকে নিরস্ত করেছিলাম। কেন না, শরতের সামনা-সামনি তাকে কী বলবো।

যাই হোক, বিকেলে দিলোয়ার ফোন করতে তাকে জানিয়ে দিলাম, আমার পক্ষে মিনার্ভায় যাওয়া আপাততঃ সম্ভব নয়। কারণ শরৎ আমাকে ছাড়ছে না।

শুনে দিলোয়ার চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বেশ একটু সুর টেনেই বললে, ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করবো।

সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত নন্দিতা ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম। রূপশ্রীর এই ছবিটি মুক্তিলাভ করলো ১৬ সেপ্টেম্বর।

ঐ দিনেই বিকেল পাঁচটায় রঙমহলের গাড়ি এলো আমাকে নিতে। রঙমহলের সেদিনের নাটক রামের সুমতি। অভিনয় শুরু হবে সাড়ে ছটায়। নাটক আরম্ভ হবার পূর্বমুহূর্তে পৌঁছেচি। আমি এসেছি শুনে সুহাসিনী, বেলা এবং অন্যান্য শিল্পীরা দেখা করতে এলো।

অভিনয় শেষে শরৎ এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারাশংকর-বাবুর নতুন নাটক 'বিংশ শতাব্দী' আমাকে পড়বার জন্যে দিতে চাইলো। নিজের পারি-বারিক ঝঞ্ঝাট ঝামেলার কথা জানিয়ে বললাম, এখন কি আমার নাটক পড়ার মতো মন আছে?

শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, আবার কি ঝামেলা হলো আপনার?

বললাম, তুমি তো জানো এ্যামেচার অভিনেতা মনীন্দ্র মিত্র আমার মামাতো ভাই। সে-তো আজ দু-বছর চলে গেছে। সেই ভাই-এর স্ত্রী আর তার মেয়ে মঞ্জু এসেছে আমার বাড়িতে। মঞ্জু অসুস্থ। কী যে হয়েছে কেউ-ই ধরতে পারছে না। এতো ডাক্তার বদ্যি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। এই অবস্থায় কী যে করবো বুঝতে পারছি না। তাছাড়া মঞ্জুর যা শরীরের অবস্থা, তাতে মন আমার স্বস্তি পাচ্ছে না।

এতো কথা শোনার পরেও শরৎ আমাকে বিংশ শতাব্দী' না দিয়ে ছাড়লো না। নিয়েও এলাম শেষ পর্যন্ত।

যা মনে হয়েছিল, তাই বুঝি ঘটতে চললো। মঞ্জুর অসুখ আরো বাড়লো। ডাঃ কনক সর্বাধিকারী মঞ্জুর নিকট সম্পর্কের মামা—তিনি তো দেখছেনই, তাছাড়া আরো কত ডাক্তার। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপসম হলো না।

মঞ্জুর মায়ের দিকে তো ফিরে তাকানো যায় না। দু বছর আগে ওর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। মঞ্জুর আর এক ভাই ছিল, সে-ও চলে গেছে, আর মঞ্জুর তো এখন-তখন অবস্থা।

সেদিন ছিল ১৮ সেপ্টেম্বর। সারাদিন ধরে চলেছে যমে-মানুষে টানাটানি।

সারাদিন গেল, সন্ধ্যে হলো। সন্ধ্যে গড়িয়ে এলো রাত। বাড়ির কারো চোখে ঘুম নেই। আমি তো অস্থিরভাবে ঘর-বার পায়চারি করছি। মাঝে মাঝে দেখছি মঞ্জুর রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে। মঞ্জুর দৃষ্টিতে কেমন যেন শূন্যতা। সবারই মুখের দিকে বোবা দৃষ্টিতে ফিরে চাইছে।

মঞ্জুর ওই শূন্য দৃষ্টির ভাষা আমি যেন শুনতে পেলাম।

আমার শুনতে পাওয়াটাই সত্যি হলো। রাত ২টা ৫৫ মিনিটে মঞ্জুর শেষ নিঃশ্বাস পড়লো।

একটি ফুল না ফুটতে ঝরে গেল।

আশ্চর্য অমলা! তার চোখে কিন্তু জল ঝরলো না। তার এই নীরবতা যেন এই মুহূর্তের ব্যথাটাকে আরো গভীর করে তুললো।

সবাই কাঁদলো, কিন্তু অমলা কাঁদলো না।

আমার দু-চোখে জলের ধারা। নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। শেষ রাতের আকাশে তখন নক্ষত্রগুলো জ্বলছে। চেয়ে রইলাম, নিঃসীম শূন্যতার দিকে।

সব ফুরিয়ে গেল। পরদিন অমলা চলে গেল তার আত্মীয়ের সঙ্গে বাড়িতে। সে-তো গেল, কিন্তু এখানে আমাদের জন্যে রেখে গেল মঞ্জুর স্মৃতি। আর সেই সঙ্গে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হলো, কেন আমি ওদেরকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম!

এদিকে আমার স্ত্রীর অসুস্থতাও বাড়লো। নতুন করে আরম্ভ হলো তার হাঁপানীর টান।

সারাদিন বাড়িতে রইলাম। বিকেলে চলে এলাম রঙমহলে। সেখানেই দেখা হলো তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে, নাটক নিয়ে খানিক কথাবার্তাও হলো। কিন্তু বেশি সময় থিয়েটারে থাকতে পারলাম না। ট্যাক্সী নিয়ে চলে এলাম বাড়ি।

বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়া দুঃখটাই আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

কতো দিন হবে?

মনে মনে হিসেব করলাম। দীর্ঘ সাত মাস হবে মঞ্চে অবতীর্ণ হইনি। এই সাত মাসের কথা তো আগেই বলেছি। যাইহোক, এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ এমন কথা বলি না। তবুও ২১ সেপ্টেম্বর রঙমহলে শাজাহান নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করলাম। সেদিনের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শরৎ, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলি, সুহাসিনী এবং শান্তি গুপ্তা। সেদিনের অভিনয় শেষে বুঝলাম, শাজাহানের জন-প্রিয়তা ঠিক আগের মতোই আছে।

সন্ধ্যা নামে অরোরার বাংলা ছবিটি মুক্তিলাভ করলো উত্তরায়, তেইশে সেপ্টে-ম্বর। মণি ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

পঁচিশে সেপ্টেম্বর অভিনয় হলো চরিত্রহীন। আমি ঐ নাটকে শিবপ্রসাদের ভূমিকায় অভিনয় করলাম।

অভিনয় যদিও করছি, কিন্তু শরীর ঠিক মতো চলছে না। শেষ পর্যন্ত ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ডাক্তার ডবলিউ, এইচ চাও নামে একজন চীনা ডাক্তারকে দেখলাম। অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী সবই তো হয়েছে, এবারে দেখি চীনা ডাক্তারের দাওয়াই কী বলে।

চীনা ডাক্তারের দাওয়াই চলতে লাগলো।

পুজোর দিনগুলো এবারে এমন করেই গেল। এক মহাষ্টমীর দিন ছাড়া অন্যদিন অভিনয় করিনি।

অকটোবরের আট তারিখে আবার শাজাহান নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হলো রঙমহলে। সেদিনেও প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটলো। শিল্পী তালিকাও আগের মতোই ছিল, শুধু জহর গাঙ্গুলি সেদিন ছিল না। জহর যোগ দিয়েছে মিনার্ভায়।

ঐ রাত্রে অভিনয় শেষে অশোক শাস্ত্রী এবং বাণীকুমার আমাকে ঘরের বাইরে নিভৃতে ডাকলেন। তাঁরা গোপনে আমাকে জানালেন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের কথা। সরকারের কাছ থেকে আনন্দ মঠ অভিনয়ের অনুমতি মিলেছে। তবে নাটকে 'সন্তান' নামটাই থাকবে। নাট্যরূপ দিয়েছেন বাণী-কুমার।

এর পরেই সংবাদপত্রে এবং পোস্টারে বিজ্ঞাপিত হলো 'সন্তানের' সম্ভাব্য উদ্বোধনের দিন। ২০ অকটোবর ছিল বিজ্ঞাপিত দিন।

এদিকে ১৫ অকটোবর 'বিজয়া' নাটকটির পুনরভিনয়ের আয়োজন করা হলো। ঐদিন বিজয়া নাটকে আমি নেমেছিলাম রাসবিহারী চরিত্রে। নরেনের ভূমিকাটি ছিল অমল ব্যানার্জীর। বিলাস চরিত্রে ছিল মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ ছিল দয়ালের ভূমিকায়, নাম ভূমিকার শিল্পী ছিল শান্তি গুপ্তা। নলিনীর চরিত্রে ছিল রমা ব্যানার্জী আর রাধা নেমেছিল দয়ালের স্ত্রীর ভূমিকায়।

সেদিনের বিজয়া নাটকে আশাতীত দর্শক সমাগম ঘটেছিল।

২৬ অকটোবর শ্রীরঙ্গমের পাদপ্রদীপের আলোয় এলো একটি নতুন নাটক। নাটকটির নাম 'বন্দনার বিয়ে', নাট্যকার ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

ঐদিনে চিত্ররূপার ছবি 'সন্ধি' মুক্তি-লাভ করলো মিনার, বিজলী এবং ছবিঘরে। ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

দুদিন না যেতেই মলিনার অসুস্থতার জন্যে শ্রীরঙ্গমে বন্দনার বিয়ের অভিনয় বন্ধ হলো।

কিছুদিন আগে থেকে একটি নাটকের কথা শুনে আসছিলাম। নাটকটি হলো বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন। শুনেছি চলতি

রাজকুমারের নির্বাসন চিত্রে
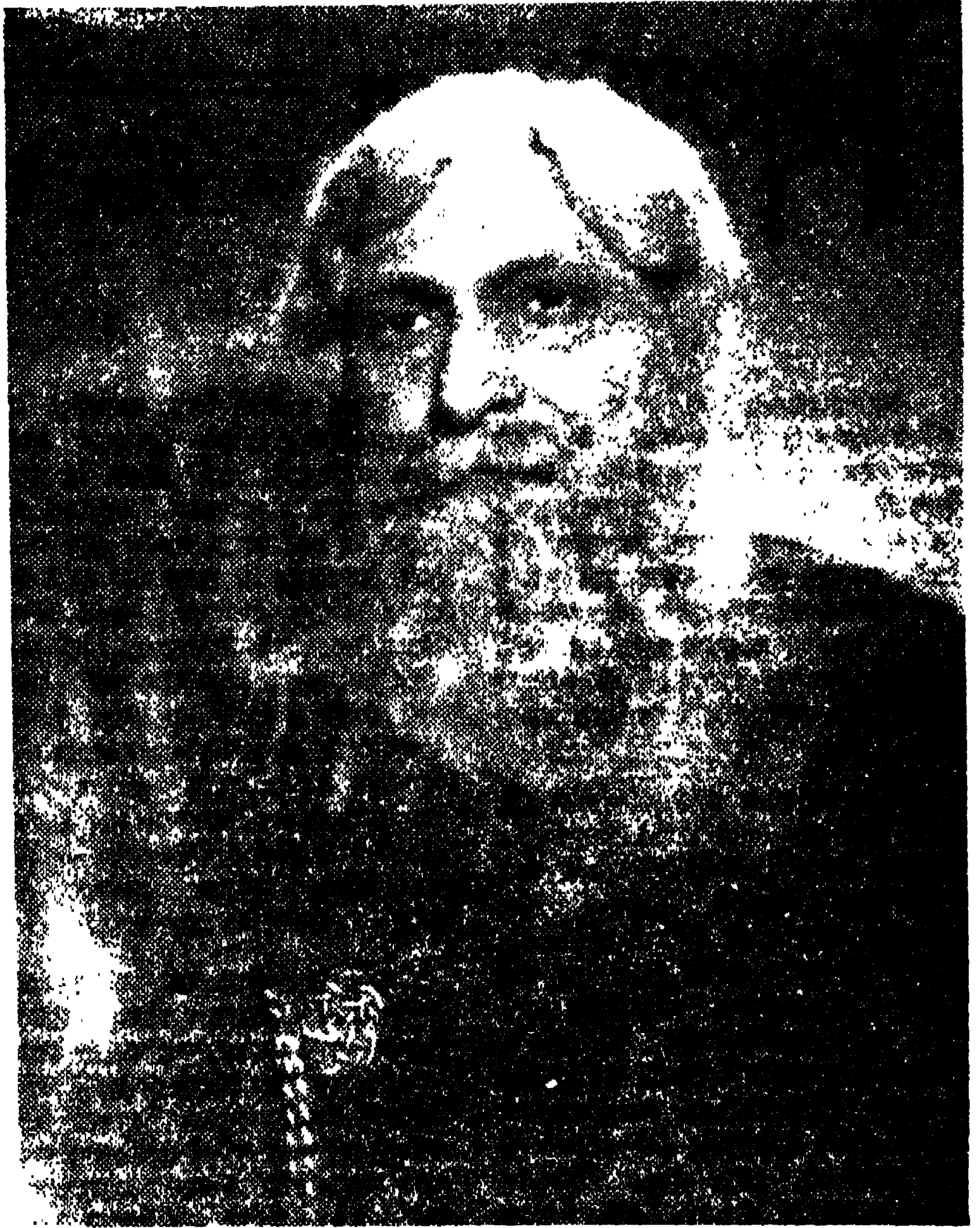
ধারা থেকে এ নাটকটি স্বতন্ত্র। একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নিয়ে নবান্নকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

নবান্ন নাটকটি বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ করছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেই সময়কার বাংলার তরুণ সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকার, গায়ক এবং গায়িকা—আজ অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

যাইহোক, নবান্ন সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম। নাটকটি দেখলামও শেষ পর্যন্ত। রঙমহলেই সেদিন নবান্নের অভিনয় হলো।

সত্যি বলতে মিথ্যা নেই, নাটকটি আমার ভালোই লেগেছিল। আরো ভালো লেগে-ছিল নাটক এবং তার অভিনয় ধারা। এবং যে অভিনয় ধারার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও নতুনত্ব ছিল।

নবান্ন সে সময়ে যথেষ্ট প্রভাব রেখে-ছিল মানুষের মনে।

রাণীবালার সম্মান রজনী হিসেবে ৩ নভেম্বর মিনার্ভায় মিশর কুমারী অভিনয় হলো। নাটকে আমার সঙ্গে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জহর, রতীন, সন্তোষ সিংহ, শৈলেন চৌধুরী, রঞ্জিত রায়, সরযূবালা, বন্দনা তো ছিলই, তারপর রাণীবালা নিজেও নাটকে অংশ নিয়েছিল।

যে আনন্দমঠ নিয়ে এতো আলোচনা, সেই আনন্দমঠের নাট্যরূপ 'সন্তানের' রিহার্সাল আরম্ভ হলো ১০ নভেম্বর। বন্দেমাতরম্ গানে নতুন করে সুর দিলেন পঙ্কজ মল্লিক।

'সন্তানের' ওপর আমাদের অনেকেরই অনেক প্রত্যাশা।

সন্তান রিহার্সাল চলছে। এর মধ্যে এ নাটক, সে নাটক অভিনয়ও হচ্ছে। কখনো মিশর কুমারী, কখনো ভোলা মাস্টার, কখনো অন্য নাটক। অভিনয়ও করছি।

শ্রীরঙ্গম কদিন বন্ধ ছিল। শিশির-বাবুও অনেক দিন অভিনয় করেন নি, অনেকদিন পরে শ্রীরঙ্গমে আবার পুরোনো নাটকে অভিনয় শুরু করলেন ২৫ নভেম্বর তারিখ থেকে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

চাঁদে কি নেই—কি আছে

অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ অভিযানের পরে চাঁদ সম্পর্কে নতুন কী জানা গেল সে প্রশ্ন এতদিনে আমরা নিশ্চয়ই তুলতে পারি। অ্যাপোলো-১২ অভিযানের সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণ শেষ হয়নি, সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু অ্যাপোলো-এগারোর বিশ্লেষণের ফলাফল 'সায়েন্স জার্নাল' পত্রিকার সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের ওপরে ভিত্তি করে বিষয়টি উপস্থিত করতে চাই।

গোড়াতেই জেনে রাখা দরকার যে চাঁদ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের ইতিহাস খুব বেশিদিনের কথা নয়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে চাঁদকে প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন গ্যালিলিও, ১৬০৯ সালে। তার আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল চাঁদ এক নিখুঁত জ্যোতিষ্ক। গ্যালিলিওই প্রথম অন্য কথা বললেন—চাঁদের উপরিতলকে তিনি তুলনা করলেন পৃথিবীর উপরিতলের সঙ্গে। পৃথিবীর উপরিতল যেমন অসমতল চাঁদেরও তাই! গ্যালিলিওর এই পর্যবেক্ষণের কথা ধর্মজগতে তুমুল একটা আলোড়ন তুলেছিল। তেমনি আজকের দিনেও কোনো কোনো গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী চাঁদে মানুষের পা দেওয়ার ঘটনাকে এই বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল যে এ-চাঁদ নাকি সে-চাঁদ নয়!

গ্যালিলিওর হাতে ছিল প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন একটি আবিষ্কার : দূরবীক্ষণ যন্ত্র। পরবর্তীকালে এই যন্ত্রটি অনেক উন্নত হয়েছে এবং চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের গড়ন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গিয়েছে। কাজেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি ছিল এক্ষেত্রে চাঁদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তোলবার মূলে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

আজকের দিনে তেমনি আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা হচ্ছে রকেটবিদ্যা ও মহাকাশ-অভিযান। এই ঘটনাও চাঁদ ও সৌরজগত সম্পর্কে নতুন ধারণা সৃষ্টি করছে। দু-দুটি সফল অ্যাপোলো অভিযান হয়ে গিয়েছে চাঁদের মাটিতে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা চাঁদের পাথর হাতে পেয়েছেন। শুধু আমেরিকান নয়, বহু দেশের বিজ্ঞানীরা মিলিতভাবে চাঁদের পাথর বিশ্লেষণ করছেন এবং চাঁদ সম্পর্কে অনেক নতুন কথা জানতে পারছেন।

চাঁদের মাটিতে গিয়ে নভশ্চররা কী দেখেছেন, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কী দেখেন নি। দেখেন নি প্রাণের কোনো চিহ্ন, আদিমতম ধরনেরও নয়। দেখেন নি জল, সন্ধান পাননি এমন কোনো জৈব উপকরণের যা থেকে মনে হতে পারে চাঁদের মাটিতে এককালে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। অ্যাপোলো অভিযানের ফলে চাঁদের দেশে যে ব্যাপক অনুসন্ধান-কার্য চলেছে তার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে চাঁদের এই প্রাণহীনতা। চাঁদের পাথর বিশ্লেষণ করবার সময়ে এজন্যে সমস্ত রকমের সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল, বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল যাতে পৃথিবীর আবহাওয়ার ছোঁয়াচে কোনো রকম জীবাণুর সংক্রমণ না হতে পারে।

পৃথিবীর আবহাওয়ার ছোঁয়াচ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচিয়ে চাঁদের পাথরকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন গবেষকদের যোলটি পৃথক পৃথক দল। তাঁদের সকলেরই অভিন্ন সিদ্ধান্ত—চাঁদের পাথরে পাওয়া যাচ্ছে কতকগুলো সরল অজৈব কার্বনজাত পদার্থ মাত্র। বহুলাংশেই কার্বন মোনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন, সঙ্গে উচ্চতর আণবিক ভরবিশিষ্ট কিছু পদার্থ। নানাভাবে বিশ্লেষণ করার পরেও এমন কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি যা প্রাণের অস্তিত্বের সপক্ষে যেতে পারে।

অতএব অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত : চাঁদের মাটিতে প্রাণের সামান্যতম অস্তিত্বও নেই, কখনো ছিল না।

চাঁদের পাথরে যে কার্বনজাত পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে—তার ব্যাখ্যা কী? এই কার্বনজাত পদার্থগুলো এল কোথা থেকে? বিজ্ঞানীরা চারটি সম্ভাব্য উৎসের উল্লেখ করেছেন। এক, সৌর বায়ু থেকে। দুই, চাঁদের মাটিতে উল্কাপাত থেকে। তিন, কোনো এক সময়ে চাঁদকে ঘিরে হয়তো বায়ুমণ্ডল ছিল—তা থেকে। চার, চাঁদের উপকরণ থেকে নির্গত গ্যাস থেকে। বিজ্ঞানীদের কাছে প্রথম ও চতুর্থ কারণ দুটি গ্রাহ্য হয়েছে, দুটির মধ্যে চতুর্থটি অধিকতর। সৌর বায়ুর জন্যে চাঁদর কার্বন উপাদানের পুঁজি সামান্য পরিমাণে অবশ্যই বাড়তে পারে, এমনকি হয়তো বা উল্কাপাতের ফলেও, তবে সহজ সিদ্ধান্ত এই যে চাঁদ গড়ে ওঠার সময় থেকেই তার উপকরণের মধ্যে কার্বনজাত পদার্থ ছিল এবং নির্গত গ্যাসের আকারে তা ক্রমেই খোয়া যাচ্ছে।

চাঁদের পাথরের বয়স হিসেব করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছেন। দানা-বাঁধা পাথরের বয়স প্রায় ৩৭০ কোটি বছর কিন্তু চাঁদের ধুলোর বয়স ৪৬০ কোটি বছরের কাছাকাছি। ব্যাপারটা কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি করেছে। সাধারণত ধুলো তৈরি হয় পাথর গুঁড়ো হয়ে যাবার ফলে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ধুলোর বয়সই বেশি। চাঁদের উপরিতলের গড়ন সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে হলে এই ধুলোর বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি মনে রেখে তা করতে হবে। ব্যাপারটি সহজ নয়। চাঁদের সমুদ্র-এলাকা থেকে যে আগ্নেয় শিলা পাওয়া গিয়েছে তার বয়স আরো কম। ধুলোর বয়স বেশি, পাথরের বয়স কম—তাহলে সমুদ্রের এই গহ্বর সৃষ্টি হল কি করে! বলা বাহুল্য, কোনো একটা ব্যাখ্যায় পৌঁছতে হলে আগে অনেক তথ্য হাতে পাওয়া দরকার।

চাঁদের পাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা যে-সব উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন তার বিন্যাসগত বিশ্লেষণ থেকে এমন ধারণাই হয় যে চাঁদে কোনো স[illegible] বায়ুমণ্ডল ছিল না।

অন্যদিকে চাঁদের পাথরের ভৌতিক বিশ্লেষণের খবরও কম চাঞ্চল্যকর নয়। লুনিক-একের সময় থেকেই জানা ছিল চাঁদে চৌম্বকত্ব নেই। কিন্তু চাঁদের পাথরের ভৌতিক বিশ্লেষণ থেকে জানা গিয়েছে যে এক সময়ে চৌম্বকত্ব ছিল। এ থেকে অনুমান করা হচ্ছে, চাঁদের গোলকের কেন্দ্রে যে সামান্য গলিত লৌহ থাকার দরুন যে-বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে চাঁদে এক সময়ে চৌম্বকত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্তমানে লুপ্ত। সম্ভবত ৩৭০ কোটি বছর আগে চাঁদের চুম্বকত্ব ছিল।

এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু এখনো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছেন না চাঁদের উদ্ভব কি-ভাবে। চাঁদের উপরিতলের গহ্বরের দুটি ব্যাখ্যা আছে। একদল বলেন গহ্বরগুলো সৃষ্টি হয়েছে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। অর্থাৎ চাঁদের

অভ্যন্তরটি এক সময়ে পৃথিবীর মতোই উত্তপ্ত ছিল, সম্ভবত জন্মের সময় পুরোপুরি তরল অবস্থাতে। অপর দলের মতে গহ্বরগুলোর কারণ উল্কাপাত। চাঁদ তৈরি হয়েছে পৃথিবীর মতোই ঠাণ্ডা ধুলোর মেঘ থেকে।

অ্যাপোলো অভিযানের ফলাফল কোনো একটি বিশেষ মতের পক্ষে রায় দেয়নি। উভয় মতই কিছুটা সমর্থিত। ফলে চাঁদের জন্ম এখনো পর্যন্ত রহস্যই থেকে যাচ্ছে। যাঁরা বলেন, পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকা থেকে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদের জন্ম, চাঁদের মত এক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। গণিতের সাহায্যেই প্রমাণ করা গিয়েছে যে এ এক অসম্ভব ব্যাপার। বরং নাকি এমনটি হওয়া সম্ভব যে বিরাট একটি গ্রহ ভেঙে দু টুকরো হয়ে গিয়ে দুটি গ্রহ হয়েছে—একটি পৃথিবী, অপরটি মঙ্গল। আর এই ভাঙচুরের সময়েই ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া একটি ফোঁটা হচ্ছে পৃথিবীর এই চাঁদ।

মহাকাশে আঠারো দিন

দুজন নভশ্চর সমেত সয়ুজ-৯ মহাকাশে পরিক্রমা করেছে ১৮ দিন (মোট ৪২৪ ঘণ্টা)। সময়ের মাপে এই অভিযান এখনো পর্যন্ত দীর্ঘতম। মহাকাশ অভিযানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির মহাকাশ-সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি আকাদেমিসিয়ান আনাতোলি ব্লাগোনরাভভ সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কয়েকটি কথা বলেছেন। 'নিউ টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে কিছু অংশ এখানে উপস্থিত করছি।

মহাকাশ অভিযানে দু-একটি বিপত্তি ঘটে যাবার পরে অনেকের মুখেই মন্তব্য শোনা যাচ্ছে যে মহাকাশ-অভিযান স-মনুষ্য না হয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেই চালিত হোক। আকাদেমিসিয়ান আনাতোলি স-মনুষ্য অভিযানের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন।

মহাকাশ-অভিযান চলছে গত বারো বছর ধরে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী চাঁদ ও সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কেও এই সমস্ত গ্রহের মহাকাশ সম্পর্কে প্রচুর খবর জানা গিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। তবুও একথা স্বীকার্য যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যতোই উন্নত ও সুদক্ষ হোক মানুষের মস্তিষ্কের স্থান নিতে পারে না। মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রকৃতির সবচেয়ে নিখুঁত সৃষ্টি।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সূর্যের ঝলককে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। সূর্যের ঝলক হতে পারে যে-কোনো আকারের ও একসঙ্গে একাধিক। মস্তিষ্কবিশিষ্ট মানুষ যতো সহজে এই ঝলকের অপটিকাল কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণের ও বিশ্লেষণের যন্ত্র স্থাপন করতে পারবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে তা সম্ভব নয়। একাধিক ঝলক ঘটলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বড়ো জোর একটা গড় অবস্থানে দাঁড়াতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

সূর্যের উত্তাপ পৃথিবীর কোন অংশ কতখানি পাচ্ছে কতখানি ছেড়ে দিচ্ছে—পৃথিবীর আবহাওয়া ও ঋতুর পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা করতে হলে এই খবরটি জানা দরকার। উত্তাপ চলাচলে প্রধান বাধা হচ্ছে পৃথিবীর মেঘাবরণ। অতএব মেঘাবরণ সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানা দরকার। এ-কাজটি করা হয়ে থাকে আবহ উপগ্রহের সাহায্যে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মেঘাবরণের টেলিভিশন ও ইনফ্রা-রেড আলোকচিত্র প্রচুর সংখ্যায় নিয়ে থাকে—কিন্তু সব ধরনের মেঘের নয়। কতকগুলো মেঘ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে ধরতে পারা প্রায় অসম্ভব, কতকগুলো একেবারেই ধরা পড়ে না। এ ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষক যদি হয় একজন মানুষ তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

মহাকাশে এমন আরো অনেক ক্ষণস্থায়ী প্রক্রিয়া ঘটে থাকে যার অনেক কিছুই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার নাগালের বাইরে।

অন্য কোনো গ্রহে কি জীবন আছে? এ-প্রশ্নের জবাবও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে নির্ভরযোগ্যভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক মঙ্গলগ্রহের কথা। মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে কি? মঙ্গলগ্রহের পরিস্থিতি যে-রকম তাতে থাকারই সম্ভাবনা। মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহকে পাক খাইয়ে এ-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিস্তৃততর তথ্যের জন্যে মঙ্গলগ্রহের মাটিতে আলতোভাবে অনুসন্ধানী ব্যোমযান নামানো যেতে পারে। কিন্তু এভাবে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যাবে না। সুনির্দিষ্ট জবাব পেতে হলে মঙ্গলগ্রহের মাটিতে স-মনুষ্য ব্যোমযানের উপস্থিতি চাই।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে স-মনুষ্য মহাকাশ-অভিযান চালিয়ে যেতেই হবে।

অন্যদিকে স-মনুষ্য মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে বিপদ ও বিপত্তিও অনেক।

গোড়াতেই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হয় সম্ভাব্য সকল বিপদ ও বিপত্তি দূর করার দিকে। বাইরের মহাকাশের অবস্থা একেবারেই অন্য রকমের, পৃথিবীর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন, মহাজাগতিক শূন্যতার কথাই ধরা যাক। এই শূন্যতায় ব্যোমযানের বহিরাবরণে অনবরত ক্ষয় হতে থাকে, সংরক্ষণমূলক গ্যাস ও অকসিজেনযুক্ত স্তরটি অপসৃত হয়। [illegible] বিকীরণ, [illegible] ও প্রতিফলনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে এবং ব্যোমযানের বিভিন্ন অংশে উত্তাপের চলাচল ব্যাহত হয়। সূর্যের অতিবেগুনী বিকীরণ ও মহাজাগতিক রশ্মির প্রোটোন কণা ব্যোমযানের উপাদানে রাসায়নিক ও ভৌতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এসব কারণে অনেক কিছু বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা। মার্কিন দেশে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় সে-দেশে ডজনখানেক মহাকাশ-অভিযান এই কারণে অসার্থক হয়েছে।

মহাশূন্যে আছে অতি ক্ষুদ্র উল্কা কণা। মাত্র এক গ্রাম ওজনের একটি কণাও ব্যোমযানের আবরণে ফুটো করে দিতে পারে। এজন্যে মহাকাশ-অভিযান শুরু করার আগে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট মহাশূন্যের অবস্থায় ব্যোমযানটিকে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। সম্ভাব্য সকল বাধা ও বিপত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরেই মহাকাশ-অভিযান শুরু করা যেতে পারে।

মহাকাশ-যাত্রী যাতে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালাতে পারে ব্যোমযানে তার ব্যবস্থা করাটা আরো অনেক বেশি জটিল ব্যাপার। ব্যোমযানে একটি দানাও বাড়তি ওজন নেওয়া চলে না, যন্ত্রপাতি হওয়া চাই ক্ষুদ্রতম আকারের, বিদ্যুতের খরচ হওয়া চাই যথাসম্ভব কম, তার ওপরে চাই মহাকাশ-যাত্রীদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা, সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠনের বাতাস, ঠিক ঠিক মাত্রার চাপ ও উত্তাপ, পানীয় জল ইত্যাদি।

ব্যোমযানের মধ্যে জীবন কাটাতে হয় ভরহীনতার মধ্যে। এর ফলে ভয়ানক একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। মহাকাশ-অভিযান যদি দীর্ঘ সময়ের হয় তাহলে ব্যোমযানের মধ্যে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। এখনো পর্যন্ত নভশ্চররা সবকটি অভিযানেই ভরহীনতার মধ্যেই জীবন কাটিয়ে এসেছেন। এজন্যে অবশ্য কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন হয়েছে।

খাবার সম্পর্কেও একই জটিলতা। এখনো পর্যন্ত পুরো সময়ের খাবার নিয়েই নভশ্চররা যাত্রা করেছেন। কিন্তু অভিযান যদি দীর্ঘ সময়ের হয় তাহলে ব্যোমযানের মধ্যেই গাছগাছড়ার ফলনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন, মঙ্গলগ্রহে একবার গিয়ে আবার ফিরে আসতে সময় লাগার কথা প্রায় তিন বছর। এই তিন বছরের আয়োজন নিয়ে যাত্রা করতে হলে অকসিজেন জল ও খাবারের ওজনই দাঁড়াবে প্রায় ৭০ টন। কাজেই একই জল বারবার ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে, খাদ্য ফলিয়ে নিতে হবে, বাতাস বিশুদ্ধ করে নিতে হবে।

আঠারো দিনের সয়ুজ-৯ এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রারই সফল প্রস্তুতি। সয়ুজ-৯ থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভবিষ্যতের স-মনুষ্য অভিযান অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হবে।

—অয়স্কান্ত

আর এক মানুষ

নির্মল সান্যাল

১

হাঁপাচ্ছে শাজাহান মিঞা।

দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এক একটা গ্রামে সে আসছে,—তাকাচ্ছে। দেখছে। আর হাঁপাচ্ছে।

বুনো মোষের শক্তি যার কব্জিতে, শত সূর্যের আগুন হাতে তুলে নিয়ে যে হাসতে পারে অনায়াসে,—কী করুণভাবেই না সে এখন তাকায়! দীর্ঘশ্বাস ফেলে! আর হাঁপায়!

চলে গেলি! কেউ বিশ্বাস করলি নে শাজাহান মিঞার কথায়?

রাতের অন্ধকারে এক একটা গাঁয়ে ছায়ার মতো নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় শাজাহান মিঞা। আলগোছে, অত্যন্ত সন্তর্পণে এক একটা বাড়ীতে কান পাতে। মানুষের একটু সাড়া পাওয়ার জন্যে আকুলি-বিকুলির অন্ত থাকে না তার।

কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত চুপচাপ সব! মানুষ নামে কোনো প্রাণীর সামান্য একটু গন্ধও আসে না কোনোখান থেকে।

কামারের হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করে শাজাহান মিঞার বুক; নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দই শুধু তার কানে আসে।

শাজাহান মিঞা তাহোলে মিথ্যেবাদী! সে তাহোলে শুধু মিছে কথা কয়।

হাতুড়ী দিয়ে কে যেন ঘা মারে শাজাহান মিঞার বুকে। লোহার বুকও যেন চিড় খেতে শুরু করে।

কেউ বিশ্বাস করলি নে? আমারেও দুষমন ভাবলি?

লোহার বুকও চিড় খেয়েছে বলে গলার স্বরও ভেঙে আসে শাজাহান মিঞার।

ভাল করেছিস, খুব ভাল করেছিস। আমি দুষমন। দুষমনের কথা শুনতে নাই।

রাতের অন্ধকারে একা একা গাঁয়ের পর গাঁয়ে ছুটে বেড়ায় শাজাহান মিঞা।

দু' একটা কুকুর তার পিছু নেয়। ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। দু' একটা শেয়াল এপাশ-ওপাশ দিয়ে ছুটে পালায়।

ও ছিদাম ভাই, ও দীনু মাহাতো, ও পাঁচু মোড়ল! আরে তোমরা সব গেলে কোহানে শুনি। ডাকতে ডাকতে আমার যে গলা ফাইটে গেল।

আরে ও ভুমন, ভুমন! সব ঘুমোয়ে আছো, না, মরে গেছো শুনি!

চীৎকার করে শাজাহান মিঞা। চীৎকার করে ডাকে গাঁয়ে গাঁয়ে সবাইকে।

কোথাও কোনো শব্দ হয় না। কেউ সাড়া দেয় না। রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে তার নিজের চীৎকারই শুধু প্রতিধ্বনি তোলে।

আকাশে তারা জ্বলছে।

শাজাহান মিঞা তাকাচ্ছে। দেখছে তারাগুলোকে। ভাবছে ঃ তারাগুলোর পর্যন্ত চোখ টিপ্‌টিপ করে; আর মানুষের কিনা চেতন আসে না এতো হাঁকডাকে।

রাগে দুপদাপ করে পা ফেলতে ফেলতে শাজাহান মিঞা এবার সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

চামচিকেগুলো নিশ্চিন্ত মনে ঝুলেছিল ঘরের চালে। মেজের গর্তে ব্যাঙগুলো বসেছিল মুখ উঁচু করে।

শাজাহান মিঞার উপস্থিতিতে তাদের ভেতর সাড়া পড়ে যায়। সারা ঘরময় চামচিকেগুলো ফরফর করে উড়তে শুরু করে। ব্যাঙগুলো ডাকে কটকট করে।

শাজাহান মিঞা দাঁড়িয়ে থাকে আড়ষ্ট হোয়ে।

দেবীপুর - নরসিংপুর - খিদিরপুর-রায়না,—সব জনশূন্য। গাঁয়ের কোনো ঘরে না জ্বলে কোনো তেলের প্রদীপ, না শোনা যায় কোনো গলার স্বর। ভয়াল রাত্রির আঁচলে জড়ানো এসব এখন এক মৌন জগৎ। শুধু—

শুধু দল ছাড়া দু'একটা কুকুর এসব জায়গায় ছুটে এসে একটু ঘেউ ঘেউ করছে; ভয় পেয়ে ওরাও যেন ছুটে পালাচ্ছে। তারপর।—মানুষের বসতি জনশূন্য হোলে কী ভয়ংকরই না দেখায়। শ্মশানও যেন ভাল এর চাইতে। শ্মশানে তবু মৃত্যু বলে অন্ততঃ একটা জিনিষ বাস করে। বসতি জনশূন্য হোলে মৃত্যুও বিদায় নেয়। যেখানে মৃত্যু নেই সেখানে আর কী থাকে। শ্মশানের চেয়েও এসব যেন তাই আরো ভয়ংকর জায়গা।

ভয়ংকরই মনে হয় দেবীপুর, নরসিংপুর, খিদিরপুর, রায়নাকে এখন দেখলে।

আর থাকা যায় না বলে এসব গ্রামের সবাই চলে গেছে একে একে।

শুধু মোহনপুর যায়নি। মোহনপুরের কেউ যাবে না বলেই ঠিক করেছিলো। কিন্তু তা আর হোলো না। আশেপাশের সবাই চলে গেল দেখে তারাও আর কেউ থাকতে চায় না।

শাজাহান মিঞা পায়ে ধরে ধরে অনুরোধ করে সবাইকে,—আপনারা কেউ যাবেন না কত্তা। শাজাহান মিঞার জান থাকতে মোহনপুরে আগুন কেউ জ্বালাতে পারবি নে কোনোদিন।

লাঠি ঠ্যকে বুক চিতিয়ে শাজাহান মিঞা দাঁড়ায় সকলের সামনে' সব্বাইকে সে সাহস দেয়।

শাজাহান মিঞার কথায় সাহস পাওয়ারই কথা। একটা মানুষ একশো মানুষের শক্তি ধরে। অনেকবার অনেক ব্যাপারে শাজাহান মিঞার শক্তির পরিচয় পেয়েছেও সকলে।

বয়েস কম হয়নি। প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু মানুষটিকে চোখে দেখলে কে বলবে তা। ইস্পাত গলিয়ে ছাঁচে ফেলে কে যেন তৈরী করেছে তাকে। এখনও এতোটুকু মরচে পড়েনি কোথাও। আর কোনোদিন পড়বেও না। হাত-পা একটু নাড়লে সাগরের ঢেউ যেন সব ওঠানামা করে।

ইস্পাতে গড়া মানুষটা মোহনপুরের সবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনুরোধ-উপরোধ করে : শাজাহান মিঞার কথাটা রাখো তোমরা। আমারে মিথ্যেবাদী ভাইবে কেউ চলে যাইও না। আমার দ্যাহের ভিতর যতোক্ষণ রক্ত চমকাবে ততোক্ষণ কারো ক্ষ্যামতা হোবিনে তোমাদের গায়ে হাত দিবার।

বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ছাড়ে সে। হাতের লাঠিটা যখন মাটিতে ঠোকে তখন বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে যেন সারা গায়ের সব মাংসপেশীগুলো।

শাজাহান মিঞা মিথ্যে কথা কয় না কখ্যো। শাজাহান মিঞার জিবের ডগায় মিথ্যে কথা কখনও আইসে না।

মোহনপুরের লোক চলে যাবে ব'লেই ঠিক করেছে। তাই তার কথা শুনেও একে একে সবাই চলে যেতে শুরু করে। দেবীপুর, নরসিংহপুর, রায়নার মতো মোহনপুরও একদিন আস্তে আস্তে শূন্য হোয়ে আসে।

কেউ বিশ্বাস করলো না তার কথায়। সবাই মিথ্যেবাদী ভাবলো তাকে। এই মনে ক'রে চোখ ফেটে জল আসে, শাজাহান মিঞার অভিমানে নাকের পাতা কেবলি ফুলে ফুলে ওঠে।

আমি মিথ্যেবাদী! আমি মিথ্যে কথা কই?

মেঠোমাটির পথ ধরে যে মানুষগুলো চলে যাচ্ছে প্রতিদিন তাদের দিকে কী করুণভাবেই না তাকায় সে! বুকের ভিতরটা ভীষণভাবে যেন ধকধক করতে থাকে।

ইস্পাতে গড়া মানুষ শাজাহান মিঞা। চোখের জল হাতে নিয়ে এক সময় সে চমকে ওঠে। একি! পানি পড়ে কোহান থেকে?

চোখের উপর হাত রাখতেই বিস্ময়ের সীমা থাকে না শাজাহান মিঞার।

আমার চোখে পানি আইলো কোহান থ্যাকে! আমি কী তয় কাঁদত্যাছি?

বিস্ময়ের ঘোরে হাসতে শুরু করে দেয় শাজাহান মিঞা। হাসতে হাসতে নিজের মনেই আবার বলতে শুরু করে, আমি কাঁদবো ক্যান! কী হোইছে আমার যে আমার চোখ থেকে তাই পানি গড়াবি?

হাত দিয়ে চোখ দুটো সে রগড়াতে শুরু করে। হাত নামিয়ে যখন আবার সে তাকায় তখন সব যেন কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগে।

হালা চোখ দুটোর না কিছু কইছি! চলে যাওয়া মানুষগুলোকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না ব'লে ভীষণ রাগ হয়, তার চোখ দুটোর উপর। ও দুটো টেনে উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

হালা, পানি ফ্যালাবার তোরা আর সময় পাইলি না! চোখ দুটো কচলে কচলে একেবারে ছাল তুলে ফেলে সে। তবু কিছু দেখা যায় না। বরং আরো যেন বেশী ঝাপসা।

পিতাম্বর বাউল একেবারে তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাকে ঠেলা দিলো বলে কোনো রকমে তাকে সে চিনতে পারলো।

তুমিও চললে বাউল? যাও-যাও শাজাহান মিঞা দুষমন। তার কথার উপর বিশ্বেস রাখা ঠিক না।

পীতাম্বর শুধু মাথা নাড়ে। তার মাথা নাড়ার অর্থ প্রথমে বুঝতে পারে না শাজাহান মিঞা। বোঝার পর তার রগড়ানো-কচলানো ঐ চোখ দুটোতে সন্দেহের চিহ্ন উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করে।

কী কও তুমি? মোহনপুর ছাইড়ে তুমি যাবা না?

পীতাম্বর আবার মাথা নাড়লে তাকে এক ঝটকায় একেবারে শূন্যে তুলে নেয় শাজাহান মিঞা।

পীতাম্বরকে কাঁধে ফেলে একেবারে পাঁড় কী মরি করে ছোটে সে। ছোটো ছেলের মতো অসহায়ভাবে পীতাম্বর হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে আর বলে, ও শাজাহান, এ-কি করতিছিস! ছাড়, ছাইড়ে দে আমারে!

শাজাহান মিঞা কানেও তোলে না তার কোনো কথা। পীতাম্বরকে কাঁধে ফেলে সে ছুটতে ছুটতে পীতাম্বরেরই বাড়ীতে এসে ওঠে। দাওয়ার উপর তাকে বসিয়ে সে বসে তার সামনে।

শাজাহান মিঞার তুমি মুখ রাখিছো ভাই। আর কেউ বিশ্বেস করলো না আমার কথা। সবাই ভাবলো শাজাহান মিথ্যে কথা কয়। তুমি সাক্ষী। আমি যদি মিথ্যে কথা কইয়ে থাকি তাহোলি আল্লা যেন আমার জিবেটারে টাইনে ছিড়ে ফ্যালায়।

ন্যাও, ইবার তুমি একখানা গান গাও দেখি বাউল।

পীতাম্বর হাসে। মুখের দু পাশ থেকে লম্বা চুলগুলো সরিয়ে নিয়ে মাথার উপর সে চুড়ো করে বাঁধে।

আর গান! তোমার ঝাঁকানি খাইয়ে খাইয়ে আমি এখনও কিমন হাঁপাইতিছি দেখতিছো না?

হয়, তোমার যা কথা। আমি তো কাঁধে কইর‍্যা তোমারে বাড়ী লইয়া আইলাম। ছুটলাম আমি, আর হাঁপালে কিনা তুমি?

তোমার সঙ্গে কথায় কী পারার জো আছে।

ব'লেই হাসতে হাসতে ঘরে গিয়ে খঞ্জনি নিয়ে আসে বাউল। গুন গুন ক'রে একটু সুর ভেঁজেই সে গান শুরু করে:

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন কয়, জেতের কী রূপ দেখলাম
না এ নজরে।

ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কী হয় বিধান?
বামন যিনি পৈতার প্রমাণ
বামনী চিনি কী ধরে ।।
কেউ মালা, কেউ তসবী গলায়
তাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ।।

চোখ বন্ধ করে নিজের মনে গেয়ে চলে বাউল। আর শাজাহান মিঞা তন্ময় হোয়ে শোনে। গান শেষ হোতেই সে বাউলের হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে, আহা, বড় ভাল গান গাইছো বাউল! হালা, জাত আর জাত শুনেতি শুনেতি কান ভোঁতা হোয়ে গেলে। কোন হালার ব্যাটা হালা ইসব জাত তৈরী করিছে কও দেখি!

শাজাহান মিঞার কথা শুনে মিটি মিটি হাসে বাউল।

ঐ পীতাম্বর বাউল গেল না মোহনপুর ছেড়ে। পীতাম্বরের দেখাদেখি আরো দু-চারজন যাই-যাই করেও গেল না শেষ পর্যন্ত।

সন্ধ্যে হোলে মোহনপুরের কয়েকটা ঘরে তাই প্রদীপ জ্বলে। মানুষের গলা শোনা যায়। দেবীপুর, নরসিংপুর, রায়নার দশা মোহনপুরের হোয়েও হোলো না।

তার কারণ, ঐ শাজাহান মিঞা। শাজাহান মিঞা ভীষণ খুশি। মোহনপুরের কিছু লোক তার মান রেখেছে। আর সকলের মতো তারা অন্ততঃ তাকে মিথ্যে-বাদী ভাবেনি।

রোজই একবার ক'রে শাজাহান মিঞা সবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে ঘুরে আসে। পীতাম্বরের ওখানে গিয়ে তো সে উঠতেই চায় না।

বাউল গান গায়, সে শোনে। বাউলের গানের ব্যাখ্যা করে মনে মনে সে আনন্দ পায়, খুশি হয়। সেই সঙ্গে শাজাহানের মন উড়ে চলে। হাল্কা নয়, ভারি।

মনে পড়ে। মনে পড়ে ফেলে আসা, হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো। ছেলেবেলার খেলার সাথীরা নেই, নেই যৌবন দিনের বন্ধুজন। তবু আছে, এমন কয়েকজন যারা মাটির সঙ্গে মিশে আছে। মিশে আছে শাজাহান মিঞার আত্মার আত্মীয় হয়ে।

শাজাহান ভাবে—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মনটা কেমন করে! সেই গল্প করার সঙ্গী সাথী নেই। নেই ঘরে ঘরে আলো। আর পাল-পার্বণে পাড়ায় পাড়ায় হৈ হুল্লোড়। মানুষজন যেন মরে গেছে। মাঠের মাটি শুকিয়ে আগাছায় ভরে উঠেছে দিনকে দিন।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ঘরের বাইরে পা দিতে চায় না শাজাহান। সামনের মাটি তো মাটি নয়—ওযে হৃদয়ের মানুষ। ভোলা যায় না, ভুলে থাকা যায় না। যাদের সঙ্গে পাশাপাশি হাল ধরে সোনার ফসল ফলিয়ে-ছিল—তারা আজ কোথায়?

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

রতনলালের বিবরণ ...

দেখলাম সিঁড়ির নিচের ধাপে লছমী লুটিয়ে পড়ে আছে।

লছমীকে তাড়াতাড়ি তুলে ওপরে নিয়ে গিয়ে

তার বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

লছমী! লছমী! কি হয়েছে বলো কোথায় গিয়েছিলে?

লছমীর তখন জ্ঞান নেই। তার কাপড়ে রক্ত দেখলেও গুলির কথাটা ভাবতে পারিনি। লছমীর সাড়া না পেয়ে

নিচে ছুটে গেলাম। কিন্তু সোফারকেও পেলাম না। হাঙ্গামার ভয়েই নিশ্চয় সে তখন নিরুদ্দেশ।

মোহন সিং! মোহন সিং!

হঠাৎ শিউপ্রসাদজির কথা মনে পড়ল। তাকে ফোন করলাম।

লছমী! লছমী কি খানিক আগে আপনার ওখানে গিয়েছিল?

শিউপ্রসাদজি স্বীকার করলেন না ত?

না, স্বীকার তিনি করলেন, বোধহয় মোহনসিং-এর সাক্ষ্যের কথা ভেবেই। কিন্তু আর যা বললেন ...
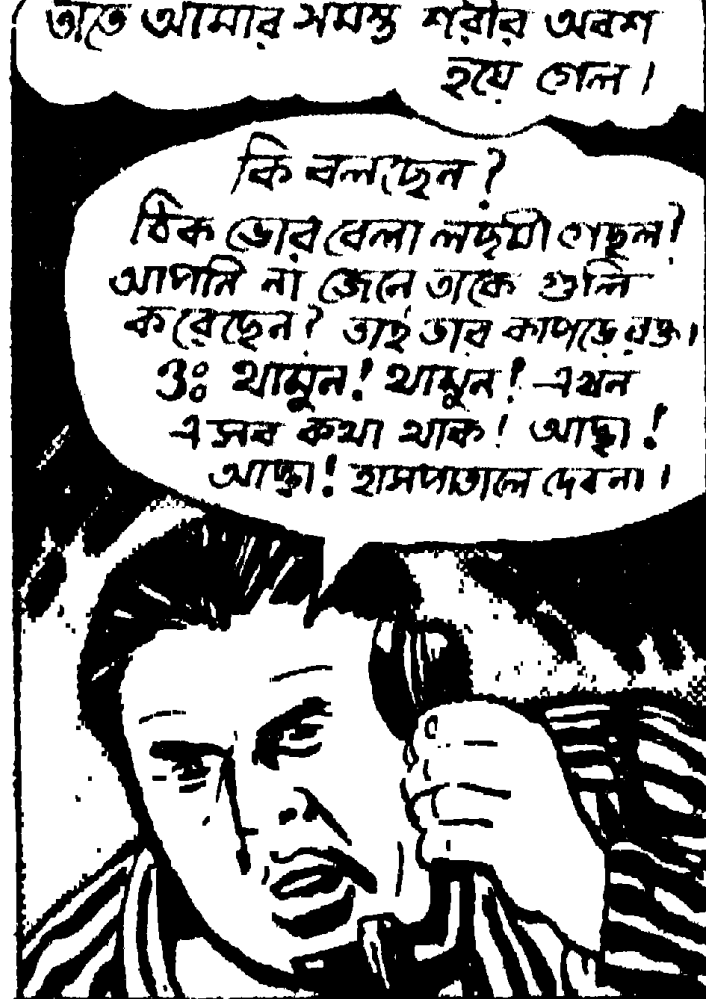
তাতে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল।

কি বলছেন? ঠিক ভোর বেলা লছমী গেছল! আপনি না জেনে তাকে গুলি করেছেন? তাই তার কাপড়ে রক্ত। ওঃ থামুন! থামুন! এখন এসব কথা থাক! আচ্ছা! আচ্ছা! হাসপাতালে দেবনা।

ফোন ছেড়ে লছমীর কাছে ছুটে গেলাম। এখন একটু ফিরে সে তখন চোখ খুলে তাকিয়েছে।

লছমী! লছমী! বলো কোথায় গুলি লেগেছে? আমায় না বলে কেন তুমি ও বাড়িতে গিয়েছিলে?

চাচাজি ডেকেছিলেন। একলা যেতে বলেছিলেন।

অঙ্গনা

ফ্যাশানে অস্থিরতা

জানা ছিল, নদীর জল সদাই অস্থির। এখন দেখছি স্থিরতা অনেক কিছুর মধ্যেই নেই। আজ যা চোখের সামনে সত্য, কাল তাই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে নতুন কিছুর উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে সূর্যের দিক পরিবর্তনের মতো কোন বৈজ্ঞানিক আলোড়ন নেই। তবু এর বেগ কম নয়। অনেককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বয়সের বাছবিচার নেই। সকলেরই শখ হয়। সবাই চায় চলতি স্রোতে টুপ করে একটা ডুব দিতে। মোক্ষলাভ তো আর উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র একটু আমেজ।

কেউ কেউ মনে করেন, আমেজ। আবার আরো অনেকে আছেন, তাঁরা চান শুধু আমেজ নয়, সবাইকে টেক্কা দিতে হবে। টেক্কা দেবার অবশ্য অনেক দিক আছে। যার অন্যতম একটি হলো লেখাপড়া। কিন্তু তা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। গুণের সমারোহও হতে পারে। তার চেয়েও বড়ো হচ্ছে রূপ। রূপে অসাধারণ হয়েও টেক্কা দেওয়া যায়। হাতের কাছেই উদাহরণ প্রচুর। রাণী পদ্মিনী ও ক্লিওপেট্রা। একদিনের রূপে ঘনিয়ে এসেছিল মেবারের দুর্দিন। বীরত্বের নতুন ইতিহাস সেদিন লেখা হয়েছিল রক্তের আলপনায়। জহর-ব্রতের শিখা লেলিহান হয়ে অসংখ্য রাজপুত রমণীকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। আর ক্লিওপেট্রা। মিশর সাম্রাজ্ঞীর রূপ অভিভূত করেছিল রোমক বীর জুলিয়াস সীজারকে পর্যন্ত। এই রূপের দৌলতেই তিনি সেদিন প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করেছিলেন বৃহত্তর শক্তির সংযোগিতা লাভ করে।

রূপ কোথাও অভিশাপ, আবার কোথাও আশীর্বাদ। কার জীবনে তার কি প্রভাব হবে তা জন্মলগ্নে কেউ জানে না। তবুও রূপ কামনা আপামর মানুষের। রূপবঞ্চিত কেউ হতে চায় না। আর নারীর যদি রূপ না থাকে তো ষোল আনার মধ্যে বার আনাই মাটি। চার আনা যা রইলো তারই জন্য শুরু হলো চর্চা। আর যার রূপ আছে সেও চুপ করে বসে নেই। শুধু রূপ নিয়েই সে সন্তুষ্ট নয়। সে নিজেকে আরো সাজাতে চায়। আসলে, রূপচর্চার জন্ম তো রূপবতীর জন্যই।

সাজগোজের দিকে সকলের তাই স্বাভাবিক ঝোঁক। কেউ এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। সবাই এগিয়ে যেতে চায়। এবং জোর কদমে। কদম যত জোর হয় আজকের পোশাকে তত বৈচিত্র্য খোলে। কত নতুন নতুন রূপ। প্রতি-যোগিতা না থাকলে আর রূপসী সাজানোর ইচ্ছা না থাকলে বোধহয় এসব কল্পনা কোনদিনই রূপ পেতো না। তারপর অঙ্গের পোশাক আস্তে আস্তে খবরের কাগজের পাতায় সংবাদ হয়ে প্রকাশ পেলো।

প্রথমে ছোট সংবাদ। কিন্তু তাতে গুরুত্ব যথাযথ প্রতিফলিত হলো না। অর্থাৎ সমাজ-সংসার যে, রূপসীদের ফ্যাশানবিলাসে কিঞ্চিৎ বিব্রত সেকথা ঠিক ঠিক বোঝানো গেল না। তাই ছোট সংবাদ ক্রমে বড়ো হতে থাকলো। ভেতরের পাতা ছেড়ে প্রথম পাতায় বেশ বড়সড় আকারে প্রকাশিত হলো। তারপর শুরু হলো হৈ-হুল্লোড়। তখন আর কান পাতা যায় না। মা-বাবারা সতর্ক হবার চেষ্টা করেন। মেয়েদের সংযত করেন। কিন্তু সবই সাময়িক। সে চেষ্টা সফল হবার নয়। আর কিছুতে না হোক, ফ্যাশানে সবাইকে পাল্লা দেওয়া চাই। এ হচ্ছে আজকের যুগধর্ম। তাই সেখান থেকে মেয়েদের কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়!

সত্যি কথা বলতে, কয়েক বছর আগে ফ্যাশানের দৌড়টা আমরা বুঝতে পেরেছি! স্লীভলেশ আর লো-কাট নিয়ে বাজার তখন সরগরম। রূপসীরা সযত্নে তাই অঙ্গে ধারণ করেছে। এদিকে ছেলেদের পোশাকেও একটা বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে। কাউবয় প্যান্ট আর পয়েন্টেড স্যুয়ের দৌলতে নওজোয়ানরাও তখন মেয়েদের সঙ্গে সমানে ম্যারাথন দৌড় শুরু করেছে। সে প্রতিযোগিতা হয়তো আরো ভালো জমতো যদি না পুলিশী হস্তক্ষেপ মাঝখানে নেহাত বেরসিকের মতো না করতো। তাঁরা রুচিহীন পোশাক ব্যবহারের অপরাধে কিছু কিছু যুবককে গ্রেপ্তার করলো। আর একই অপরাধের মেয়েদের অভিভাবকদের থানায় ডেকে নিয়ে কড়া স্বরে ধমকে দেওয়া হলো। সেদিন থেকে সবাই জানলেন, পোশাকের আসল উদ্দেশ্য অশ্লীলতা নিবারণ হলেও কার্যত তার সেটা সম্ভব হচ্ছে না। পোশাকের মাধ্যমেই এখন শ্লীলতাহানি চলছে। সহসা এর জের খবরের কাগজের পাতা থেকে উধাও হয়নি। তারপরও বেশ কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়েছে। এখন আর কাগজে প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই। আধুনিক পোশাক সম্বন্ধে আমরা এমনিতেই কিছু চিন্তা করতে পারছি।

পোশাকে শ্লীল-অশ্লীল ভাবনা সেদিন থেকেই দানা বেঁধেছে। কিন্তু তা বলে

ফ্যাশানের চিন্তা থেমে নেই। মিনি স্কার্টের বহুল প্রচলনই সেকথা প্রমাণ করেছে। তাছাড়া একথাও সত্যি, জামাকাপড়ে সারা গা ঢেকে দেওয়া অর্থহীন। তাহলে রূপের প্রকাশ হবে কিভাবে? শুধু তাই নয়, আজকের বিশাল কর্মব্যস্ততার মধ্যে সেরকম পোশাকের প্রয়োজনীয়তাও আর নেই। তাই পোশাকে নতুন চিন্তা আসতে বাধা।

তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতা দখলের পর আইন করে বোরখা প্রথা বিলোপ করেন। অনেক মুসলিম দেশেই আজ এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধছে। অধিকাংশ মুসলমান প্রধান দেশেই মেয়েরা বোরখা পরিত্যাগ করছে। তাদের বক্তব্য, এই পোশাকে লোকলোচনের বাইরে থেকে সংসারের কাজ করা যায় বটে কিন্তু বাইরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা সম্ভব নয়। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানেও বোরখা প্রথার প্রচলন কমে আসছে। এই আন্দোলন আমাদের দেশেও জোরদার হচ্ছে। বোরখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মেয়েরা আজ বেরিয়ে আসছেন।

ঘুরেফিরে বারে-বারে একই কথা এসে পড়ে। নানা রূপে, নানা রসে। আর এই রূপ-রসকে মনের মাধুরী মিশিয়ে অপরূপ করে তোলাই হলো ফ্যাশানকারের কাজ। সেই ফ্যাশানে যেই বরতনু শোভিত হয় অমনি তা সকলের মন কেড়ে নেয়। এবার আর খবরের কাগজের পাতা নয় মুখে সুখবর রটে যায়। হৈ-হল্লা আর পুলিশী হানা এখন অতীতের পৃষ্ঠা। মনে হয় সেখান থেকে তারা আর উঠে আসবে না।

মেয়েরা আবার তাদের ফ্যাশান বদলেছে। এবার শ্লীভলেস, লো-কাট নয়। আবার মিনি স্কার্টের বাড়াবাড়িও নয়। ফ্যাশানে কখন যে কি বাজার মাত করে বোঝা মুস্কিল। লুঙি আর কামিজ এখন মেয়েদের প্রিয় ফ্যাশান। শুধু বাড়ির জন্য নয়, বাড়ির বাইরেই এর বেশি মনোহারিত্ব। দিব্যি চলছে। প্রথম বোম্বাই শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ চৌহদ্দি ডিঙোতে শুরু করেছে। কলকাতা শহরেও ঢেউ এসে লেগেছে। এখন দেখা যাচ্ছে দু-চারজনকে। এর পর হয়তো দেখা যাবে অসংখ্য। এই ফ্যাশানও হয়তো বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করবে। তবে শ্লীল-অশ্লীল অভিযোগমুক্ত এই পোশাক। অশ্লীল তো নয়ই বরং পুরোপুরি শ্লীল।

এই ফ্যাশান এখন বাজার রেখেছে। এবং ততদিনই চলবে যতদিন না নতুন কিছুর প্রবলতর জোয়ার না আসছে। তবে পুরনো ফ্যাশানের ভাঙচুরই নতুন ফ্যাশান। পুরনো লুঙি আর পুরনো কামিজ। এই দুয়ে মিলে এবার নতুন ফ্যাশান এবং মেয়েদের।

পুরনো ফ্যাশান যাবে। নতুন আসবে। কিন্তু যাই যাই করেও পুরনোর কিছু অবশেষ থেকেই যাবে। যেমন, টিঁকে গেল শ্লীভলেস ব্লাউজ। এটা যেন অনেকটা জেদের বশেই রয়ে গেল। একটু খোলা-মেলা দরকার। পোশাক-আশাকে একেবারে জবর-জং হয়ে থাকা একেবারে বেমানান। বিশেষ কিছুটা দেহের প্রকাশ পোশাক সত্ত্বেও বাঞ্ছনীয়। এটা সব মেয়েই চায়। আর সে অনুযায়ী এখন তৈরি হচ্ছে ফ্যাশানসূচী।

এই সূচীরই অন্যতম হচ্ছে চোখ-জোড়া গগলস। কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিল চোখের মাপে গগলস। দীর্ঘদিন তাই চলছিল। মাঝে ঈষৎ বাঁক নিয়েছিল। হরিণাক্ষী নারী। তাই সে রকমই হয়েছিল রোদের তাপ থেকে চক্ষুরত্নকে বাঁচানোর এই বস্তুটি। তারপর গগলসের [illegible] ঘটে গেল কত না বিপ্লব। সে বিপ্লব আর থামতে চায় না। এটা থেকে ওটা মেয়েদের পছন্দ আর থৈ পায় না। সে পছন্দ আজো চলছে।

কিন্তু ফ্যাশানকাররা অতটা সময় দিতে নারাজ। এবার তাদের অবদান চোখের চেয়ে বড়ো গগলস। উপর আর নীচে দু পাশেই উপচে যায়। গগলসে এটাই হলো সর্বশেষ ফ্যাশান।

ইদানীং ফ্যাশানবিলাসীদের চোখে-চোখে এই চশমা। আর সব বাতিল হয়ে গেছে। এই গগলসে মানান-বেমানানের প্রশ্ন অনেক পরের, যখন নতুন ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়বে। আপাতত, এই হচ্ছে 'আউট আব দি ডে।'

অপেক্ষা করা যাক, যতদিন না নতুন কিছু আসে।

—প্রমীলা

আলোকচিত্রে : নন্দিতা বসু।

বেতারশ্রুতি

অনুষ্ঠান-পর্যালোচনা

গত ২২ জুলাই তারিখের কাগজে খবর ছিলঃ 'জলপাইগুড়ি শহরের কাছে সদরগঞ্জে তিস্তায় বাঁধের উপর দিয়ে হুহু করে জল ঢুকছে। গতকাল ১৫০ ফুট এলাকা দিয়ে জল ঢুকছিল, আজ তা বেড়ে ২০০ ফুট হয়েছে। ১০ হাজার কিউসেক জল ঢুকছে। সেচ শাখার ইঞ্জিনীয়াররা নৌকোতে পাথর নিয়ে গিয়ে বাঁধ মেরামতের চেষ্টা করছে। তবে মেরামতের আশা কম বলে সেচ দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সামরিক বাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে। সামরিক বাহিনীর লোকেরা আজ বিকেল থেকে ভাঙ্গন মেরামতের কাজে নেমে গেছেন।'

খবরটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের কাছে। কারণ, এই বর্ষায় এই বন্যায় অন্ততঃ দু লক্ষ লোক গৃহহারা হয়েছে, হয়তো হবে আরও; মারা গেছে পাঁচজন, যাবে হয়তো আরও। তাই তা বাংলার খবরের কাগজগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো করে ছাপা হয়েছে।

কিন্তু আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রের কর্তাদের কাছে বাঙ্গালী শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত সংবাদে এই খবরটা অত্যন্ত নগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই ঐদিনকার সকাল সাড়ে ৭টার খবরে এই খবরটি সবশেষে বলা হয়েছে। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের কাছে ঐদিন এই পূর্বাঞ্চলের সংবাদে সবচেয়ে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল পশ্চিমাঞ্চলের গোয়ার শাসক দলের চারজন সদস্যের বহিষ্কারের খবর। তাই সেই খবরটাই সবচেয়ে আগে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহিষ্কৃত সদস্যদের নাম বলাও তাঁদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে তাই বহিষ্কৃত সদস্যদের প্রত্যেকের নাম বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে হরিয়ানার খবর, যে খবর জানার জন্য কর্তৃপক্ষ হয়তো ভেবেছিলেন পূর্বাঞ্চলের অগণিত শ্রোতা উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন। তাঁরা হয়তো আরও ভেবেছিলেন, বাঙ্গলার মতো একটা 'তুচ্ছ' জায়গায়, প্রতি বছরই বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়, অনেকে মারাও যায়, সেখানকার পচাপুরনো খবর শোনার জন্য কার আর আগ্রহ আছে! তাই তাঁরা সবশেষে এই খবরটি প্রচার করেছেন।

এরপরেও বলবেন, তাঁদের 'নিউজ সেন্স' নেই?

২৪ জুলাই বেলা ২টো ২৬ মিনিটে আবহাওয়ার খবর বলতে গিয়ে ঘোষক 'বঙ্গোপসাগর' উচ্চারণ করলেন 'বঙ্গোপ্-সাগর।' বঙ্গোপসাগর সন্ধি বিচ্ছেদ করলে নিশ্চয় দাঁড়ায় বঙ্গ+উপ্‌সাগর। কিন্তু বাংলায় আমরা কি সাগর-উপ্‌সাগর বলি? কিংবা মন্ত্রী উপ্‌মন্ত্রী? হিন্দীতে বলে। এবং বাংলা উচ্চারণে কেমন করে হিন্দীর অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে, এ তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দী যে বাংলাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পোষ্য একদল বাঙ্গালীই যে তাতে সাহায্য করছেন, এ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

২৬ জুলাই বেলা ২টোয় 'মালঞ্চ' অনুষ্ঠানে 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের কয়েকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গান' শোনানো হল। গানগুলো শুনতে শুনতে মনটা সত্যিই সেযুগে ফিরে গিয়েছিল, যে যুগে বাংলার সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে নাটক একটা মস্ত স্থান অধিকার করেছিল, বাংলার বহু নর-নারী ও শিশুকে সমানভাবে মাতিয়ে তুলেছিল।

এই অনুষ্ঠানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশ চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জনপ্রিয় নাটকের জনপ্রিয় গানগুলি শোনানো হয়েছে। আধুনিক শিল্পীদের কণ্ঠে পুরনো দিনের গানগুলি বেশ মানিয়েছিল, বেশ শোনাচ্ছিল। গানগুলি গেয়েছেন শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমতী ইলা বসু, শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামল মিত্র ও শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গানগুলি প্রচারের আগে সেকালের নাটক ও নাটক-দেখার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলেন গ্রন্থক শ্রীদিলীপ ঘোষ তা বেশ তথ্যপূর্ণ ও মনোগ্রাহী।

২৭ জুলাই সকাল ৯টা ১০ মিনিটের কাছাকাছি শ্রীমতী ছন্দা সেন খবর পড়া শেষ করে অনুচ্চ কণ্ঠে, দু-চারটি শব্দে কী যেন বললেন। মনে হল, কাউকে কিছু জিজ্ঞেসা করলেন। হয়তো নিউজ-রুম থেকে কেউ এসে ঢুকেছিলেন তখন খবর পড়ার স্টুডিওর ভিতরে, কিংবা আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর পাশে। শ্রীমতী সেন না হয় নতুন এসেছেন খবর পড়তে, স্টুডিওর ব্যাপার-স্যাপার সব ভালো করে জানেন না, কিন্তু যিনি ছিলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তো পুরনো লোক! তিনি মাইক্রোফোন চালু রেখে অপ্রচার্য কথাগুলো প্রচার করালেন কোন হিসাবে?

এইদিন সকাল সাড়ে ৯টায় ছিল মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী সম্পর্কে সংবাদ বিচিত্রা। মহারাজ কিছুদিন হল কলকাতায় এসেছেন, তাঁর পুরনো বন্ধু-বান্ধব আর গুণগ্রাহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁকেও নানা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই রকম কিছু সংবর্ধনা নিয়ে এই সংবাদ বিচিত্রা আরম্ভ হল রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি' গানটি দিয়ে। তারপর গ্রন্থক বললেন, 'মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভীক যোদ্ধা।' গ্রন্থক মহারাজের কিছু পরিচয় প্রদানের পর সংবর্ধনা উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ও আরও কয়েকজন প্রাচীন বিপ্লবীর ভাষণের কিছু কিছু অংশ শোনালেন। তাতে মহারাজের বিপ্লবী জীবনের একটা স্পষ্ট ছবিই পাওয়া গেছে, মহারাজকে চেনা গেছে তাঁর স্বরূপে। বক্তারা অকুণ্ঠ চিত্তে মহারাজের বৈপ্লবিক কর্মকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রশস্তি করেছেন।

মহারাজ একটি সংবর্ধনার উত্তরে যে ভাষণ দিয়েছেন তা বড়ো মর্মস্পর্শী—এবং চিন্তনীয়ও। তিনি তাঁর এই ভাষণে বলেছেনঃ 'পরলোক থেকে আমাদের ডাক এসেছে। আমাদের চলে যাবার সময় হয়েছে। এখন আর আমাদের কিছু করার নেই। এখন ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবে।'

তাঁর এই উক্তির মধ্যে ফল্গুধারার মতো একটা বেদনার আভাস পাওয়া গেছে, আর বর্তমান কালের নানা হতাশার মধ্যে একটুখানি আশা—যা মনকে আস্তে করে দোলা দিয়ে যায়। এই যে এখন ভাঙ্গনপর্ব শুরু হয়েছে, এ সেই গড়ার ইঙ্গিত তো?

এইদিন রাত সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে বলা হল, 'উড়িষ্যা বান্ধ এ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আছে।' এই একবার নয়, বহুবারই সংবাদ-পাঠক বান্ধ্ বললেন। প্রথমবার একটু চমকে উঠতে হয়েছিল, কারণ বান্ধ্‌কে বাঁধ বলে মনে হয়েছিল— অর্থাৎ 'উড়িষ্যা বাঁধ এ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আছে'—এবং মনে হয়েছিল, উড়িষ্যার কোনো বাঁধ বুঝি হঠাৎ কোনো কারণে 'অশান্তিপূর্ণ' হয়ে উঠেছিল, তারপর একটা কিছুর পর এখন 'শান্তিপূর্ণ' আছে। কিন্তু পুরো খবর শুনে বোঝা গেল, ওটা 'বান্ধ্' নয়, 'বন্ধ্'—বাংলায় যাকে 'বন্ধ' বলে।

২৮ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছোটোদের আসরে 'ভারতের সাধক' এই পর্যায়ে গোস্বামী তুলসীদাসের কথা শোনালেন শ্রীমতী গায়ত্রী ভট্টাচার্য। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের কথিকাটি এমনিতে মন্দ হয়নি, কিন্তু তিনি পড়েছেন বড়ো ঢিমে তালে, নিস্তেজ ভঙ্গিতে। ফলে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি।

এই কথিকায় তুলসীদাসের অলৌকিক কাণ্ড এমনভাবে বলা হয়েছে যেন ছোটোরা তা সত্যি বলে গ্রহণ করে তার উপর নির্ভর করে। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে, এই কঠিন সংগ্রামের দিনে সেটা কি খুব কল্যাণকর হবে? শ্রোতাদের পক্ষে, সমাজের পক্ষে?

—শ্রবণক

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রে নবাগতা অভিনেত্রী কৃষ্ণা বসু এবং জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে শ্রীরায়

প্রেক্ষাগৃহ

সু-উত্তম এবং কু-উত্তম

অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় উত্তমকুমার ডি এম পাল নিবেদিত এবং এস এস ফিল্মস্ প্রযোজিত 'দুটি মন' ছবির যমজ ভাইয়ের যে-দুটি চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন, তার একটি হচ্ছে সুজন এবং অপরটি হচ্ছে কুজন বা দুর্জন। দেখানো হয়েছে যে, যমজ ভাই হওয়া সত্ত্বেও রুদ্রকান্ত ও তাপস দুই ভিন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়ায় বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। একজন অর্থই জীবনের একমাত্র কাম্য—মামার কাছ থেকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হবার পরে জীবন শুরু করে পায়ের জুতোর তলায় দশমিক মুদ্রার সবগুলোকে পিষে ফেলে, অপরজন তার জীবনের শুভ সূচনা করে তার গানের দ্বারা অসংখ্য হর্ষোৎফুল্ল শ্রোতার কাছ থেকে করতালি আদায় করে। অবশ্য যেহেতু এই গায়ক-নায়ক তাপস রায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন স্বয়ং উত্তমকুমার, সেই কারণে গ্রামের স্থানীয় গায়ক হয়েও তিনি ভক্ত অনুগত জনের হয়েছেন গুরু এবং তাঁর স্বাক্ষর পাবার জন্যে বহু তরুণ-তরুণী লালায়িত। আর্থিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বড়ো ইন্ডাস্ট্রিয়া-লিস্ট হবার স্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রুদ্রকান্ত পিতৃপরামর্শকে অগ্রাহ্য করে ভুয়ো শেয়ার জমা রেখে অন্তত বারোটি ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট নিয়ে নিজেকে যখন ফাঁপিয়ে তুলেছে, সেই সময়ে সে তার একদা-বন্ধুদের হীন চক্রান্তে ধরা পড়বার উপক্রম হল। রুদ্রকান্ত চক্রান্তের কথা জানতে পেরে যে-মেয়েটি এই চক্রান্তের সহায়ক সেই নীলিমা সমেত চার বন্ধুকে হত্যা করে ফেরার হল। আর তার পরিবর্তে ধরা পড়ল একই চেহারা-বিশিষ্ট তার যমজ ভাই তাপস, যে সংগীতের ক্ষেত্রে খ্যাতনামা হওয়ায় কলকাতার রেডিও স্টেশনের ডাকে সাড়া দিতে চলেছিল। এরপর কেমন করে প্রকৃত রুদ্রকান্ত তার যমজ ভাই তাপসকে আসামীর কাঠগড়া থেকে মুক্তি দিয়ে নিজে স্বেচ্ছায় অপরাধের শাস্তি বরণ করে নিল, তাই নিয়েই ছবির উত্তেজক শেষাংশ রচিত হয়েছে।

উত্তমকুমারকে নানাভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই ছবিটির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সে-উদ্দেশ্য ছবির নির্মাতারা শতকরা একশো ভাগই সিদ্ধ করেছেন। যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে শুরু করে একজনের পিতৃগৃহে স্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পুজ্যতে'রূপে চাণক্য শ্লোক শিক্ষালাভ এবং অন্যজনের গ্রামে নিষ্ঠাবান, সংগীতজ্ঞ ও পালকপিতা-স্বরূপ রমণীমোহনবাবুর কাছ থেকে কেন মাথা দাও তাও বুঝি না-গান শিক্ষালাভের পর্যায় পেরিয়ে ছবিতে যখন প্রথমে তরুণ গায়ক তাপস রায় বেশে উত্তমকুমারের দর্শন মেলে এবং পরে উদ্দাম, চঞ্চল, আর্থিক প্রতিষ্ঠা-লাভে সমুৎসুক রুদ্রকান্তরূপী উত্তমকুমার আবির্ভূত হন, তখন থেকে শেষপর্যন্ত দর্শক দেখে শুধু উত্তমকুমার আর উত্তমকুমার, আর উত্তমকুমার। এবং দেখে যে সকলেই যারপরনাই খুশি হন, সে-কথা বলাই বাহুল্য। ছবিতে উত্তম-কুমারের আবির্ভাবের আগেই যাঁদের দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে নিষ্ঠাবান, সংগীতজ্ঞ রমণীমোহনের ভূমিকায় অসিতবরণ, তাঁর সন্তানহীনা স্নেহময়ী স্ত্রীর ভূমিকায় ছায়া দেবী ও জমিদার চন্দ্রকান্তরূপী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের নাট্যনৈপুণ্যের দ্বারা দর্শকদৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেন। রুদ্রকান্তের প্রতি মোহ বিস্তারকারিণী নীলিমাবেশে কণিকা মজুমদার মদিরামত্তের অভিনয়টুকু ভালোভাবেই করেছেন। তাপসের প্রণয়িনী সোমার ভূমিকায় নবাগতা সুপর্ণা সেন সর্বদিক দিয়েই অচল। অপরাপর ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য, সুব্রত সেন, এন বিশ্ব-

পবিত্র পাপী/অজয় সাহানী এবং আই এস জোহর

নাথনু, শ্যামল ঘোষাল, মাঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ছবির পাঁচখানি গানের মধ্যে রমণীমোহনবেশী অসিতবরণের মুখে এবং তাঁর উত্তরসাধক তাপস রায়-বেশী উত্তমকুমারের কণ্ঠে মার্গ-সঙ্গীতের বেশ কিছুটা আলাপ শুনতে পেলে খুশী হতুম।

উত্তমকুমার অভিনয়দীপ্ত 'দুটি মন' যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

মানুষকে বড় করে উচ্চকুলে জন্ম নয়, কর্মই

সম্প্রতি হিন্দী ছবির রাজ্যে যে-আদর্শপ্রবণতা দেখা দিয়েছে, তারই এক গরিষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে **পঙ্খী আর্টস ইণ্টারন্যাশনাল নিবেদিত ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রঙীন ছবি 'সত্যকাম'।**

যিনি সত্যাশ্রয়ী হন, তিনি মহৎ, তিনি দ্বিজোত্তম—এই বাণী-প্রচারক, রবীন্দ্র-রচিত সেই বহুজনপঠিত 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি যে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে এই চিত্রনির্মাণে অনেকখানি প্রেরণা জুগিয়েছে, ছবির নায়িকা রঞ্জনা যে জবালারই স্বগোত্রীয়া, এ-অনুমান মিথ্যা নয়। গুণ ও কর্মধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই চার বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সৃষ্টি হলেও সমাজ-জীবন বহুদূর অগ্রসর হয়ে ব্যাপক রূপ ধারণ করবার পর কারুর বর্ণনির্ণয়ে উত্তরাধিকারকেই গণ্য করা হত; তাই ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। কিন্তু ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দুসমাজে অবক্ষয় শুরু হয় এবং ক্রমে দেখা যায়, একজন ব্রাহ্মণ সন্তান যেখানে শঠ, প্রবঞ্চক, মদ্যপ ও লম্পট, ঠিক তারই পাশাপাশি একজন নমঃশূদ্র শিক্ষায়, দীক্ষায়, সত্যনিষ্ঠায়, এক আদর্শ চরিত্ররূপে প্রতিভাত। কাজেই আজ বংশমর্যাদা ধূলায় লুটোচ্ছে তার পরিবর্তে কর্মই মানুষকে মহত্ত্বে উন্নীত করছে।

আলোচ্য ছবি 'সত্যকাম'-এর নায়ক সত্যপ্রিয়ও সত্যাশ্রয়ী; তার ঋষিতুল্য দাদুর শিক্ষা তাকে সত্যাশ্রয়ী করে তুলেছে। সে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার পরে কিছুদিন কাজ করতে না করতেই ভারত স্বাধীন হয়। তার বিশ্বাস ছিল, ভারত স্বাধীন হবার পরে দেশ থেকে অনাচার, উৎকোচ গ্রহণ, বঞ্চনা, অনাহার, উৎপীড়ন প্রভৃতি চিরকালের জন্যে দূর হয়ে যাবে। কিন্তু বহু শত বৎসরের অধীনতা যে-দেশের লোকের চরিত্রকে কলুষিত করে তুলেছে, তাদের লোভী ও ক্ষমতাপ্রিয় করে তুলেছে, সে-কথা সে ভুলে গিয়েছিল। তাই কঠোর সত্যাশ্রয়ী হতে গিয়ে তাকে পদে পদে পেতে হল বাধা। এই সত্যাশ্রয়তাই তাকে অপরদিকে এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীকে তার সহধর্মিনীরূপে বরণ করতে এবং অন্যের সন্তানকে নিজের পিতৃত্বের পরিচয় দিতে উদ্বুদ্ধ করল। এই সত্যাশ্রয়িতাই হয়ত শেষপর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সত্যপ্রিয় স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিচলিত হয়ে প্রবঞ্চক কণ্ট্রাকটরের অন্যায় বিলে সমর্থনসূচক স্বাক্ষর দিয়ে যে সত্যভ্রষ্টতার পরিচয় দিয়েছে, তাকে আমরা আদৌ সমর্থন করি না। স্ত্রী তাকে অধঃপতিত হতে দেবে না এবং ঐ বিল ছিঁড়ে ফেলবে, এই বিশ্বাস তাকে স্বাক্ষর করতে প্রবুদ্ধ করেছিল, এই যুক্তি সত্যাশ্রয়ী সত্যপ্রিয়র চরিত্রোপযোগী নয়। এটা নিছক মেলোড্রামা এবং অসঙ্গত।

ছবিটিতে আশ্চর্য অভিনয় করেছেন রঞ্জনারূপিণী শর্মিলা ঠাকুর। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের চরিত্রের গভীরে ধর্মেন্দ্র যেন প্রবেশ করতে পারেননি। তবে তিনি অন্যান্য ছবির তুলনায় যে প্রচুর সংযত অভিনয় করেছেন, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। হিন্দী ছবিতে নবাগত বাংলার রবি ঘোষ অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় সুন্দর হাল্কা অভিনয় করেছেন। দাদুর ভূমিকায় অশোককুমারের সু-অভিনয়কে পরিস্ফুট হতে দেয়নি তাঁর রূপসজ্জা; কি প্রয়োজন ছিল তাঁর চরিত্রকে ঋষিকল্প প্রতিপন্ন করবার জন্য ঐ অদ্ভুত চুল-দাড়ির? অপরাপর ভূমিকায় যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন সপ্রু, ডেভিড, তরুণ বসু এবং বেবী সারিকা।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটামুটি প্রশংসনীয়। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময়ে এবং কোনো দৃশ্যকে 'ফেড-আউট' করবার সময়ে বর্ণের সমতা রক্ষা করতে না পারা আজকের দিনে অন্যায়। ছবিতে কায়ফী আজমী রচিত যে তিনটি গান আছে, সেগুলিকে সুন্দরভাবে সুরসমৃদ্ধ করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

'সত্যকাম' একটি জীবনাদর্শমূলক ছবি হিসাবে অভিনন্দিত হবে।

স্টুডিও থেকে

বেশ কিছুদিন বাদে আবার নির্মলকুমার ব্যস্ত হয়েছেন ছবির কাজ নিয়ে। তাঁর হাতে এখন নির্মীয়মান ছবির সংখ্যা তিনটি—আর আগামী ছবির সংখ্যা আরও কিছু বেশী। নির্মীয়মান ছবি তিনটের মধ্যে তপন সিংহের 'এখনই' প্রায় শেষ বলা চলে। গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ানে এক বিরাট কনভোকেশন অনুষ্ঠানের দৃশ্য চিত্রিত হোল। আগামী সপ্তাহে আবার কাজ হবে। নির্মলকুমার সেই পর্যায়ের স্যুটিং-য়ে অংশ নেবেন। তা হলেই কাজ শেষ। দু' নম্বর ছবি অরুন্ধতী দেবীর 'পদী পিসির বর্মি বাক্স।' আউটডোরের কাজ প্রায় কমপ্লিট। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইনডোরের কাজ শুরু হবে শুনলাম।

আর তিন নম্বর ছবি হোল সলিল সেনের 'সংসার।' নির্মলকুমার এ ছবিতে নায়ক অবশ্য নন, কিন্তু তাঁর চরিত্রটি বেশ ইন্টারেস্টিং। এ-ছবির নায়ক সৌমিত্র আর নায়িকা সাবিত্রী। এ-সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু হচ্ছে নিয়মিত এ ছবির। নির্মলবাবুও তাই ব্যস্ত। নির্মলকুমারের আগামী ছবির তালিকায় যে কটি নাম আছে তার মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হোল সাংবাদিক শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্তের একটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি, নাম 'গাধা'। শ্রীদাশগুপ্ত এখন প্রথম গল্প 'রক্ত' নিয়ে ছবি করছেন। এর পরে একই সঙ্গে প্রায় শুরু করবেন 'গাধা' ও 'ষাঁড়' গল্পের চিত্রায়ন। 'ষাঁড়' গল্পের নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়। নির্মলকুমার জানালেন—'ও-দুটো ছবিতেই আমাদের (নায়ক চরিত্র) কাজ কম। তাই একই সঙ্গে কাজ হবে দুটো ছবির।' আগস্টের শেষ এবং সেপ্টেম্বর মাসে নির্মলবাবুর একই সঙ্গে তিনটে ছবির (সংসার, পদীপিসির বর্মি বাক্স ও গাধা) কাজ চলবে। সুতরাং তাকে অতি ব্যস্তই বলা চলে।

* * *

সর্বশেষ সংবাদে জানলাম বিশ্বজিৎ 'রক্ততিলক' নামে যে বাংলা ছবিটি করবেন মনস্থ করেছিলেন এবং প্রস্তুতি পর্বের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, তখনই তিনি ঐ ছবির কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখছেন। 'রক্ততিলক' অবশ্য একেবারেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। বাংলায় না হয়ে হচ্ছে হিন্দীতে, আর হিন্দীতে যখন হচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবেই রঙীন হবে ছবি, বাজেট বাড়বে অনেক, কারণ অল ইণ্ডিয়া মার্কেটের জন্য হবে সে ছবি। অল্প বাজেটে অল্প সময়ের মধ্যেই একখানা বাংলা ছবি করার কথা ভাবছেন, গল্পও মোটামুটি পছন্দ করা আছে। শিল্পী হিসাবে তিনি নিজে ছাড়াও সম্ভবতঃ সন্ধ্যা রায় থাকবেন সে ছবিতে। পরিচালক এখনও অনির্দিষ্ট। 'রক্ততিলক' হিন্দীতে হলেও কাস্টিং-এর খুব একটা হেরফের হবে না। নায়িকা চরিত্রে হেমা মালিনীই কাজ করবেন, আর নায়ক তো বিশ্বজিৎ নিজেই। পরিচালক অজয় বিশ্বাস। আর অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা অংশ নেবেন তাঁদের অনেকেই বোম্বাই প্রবাসী বাঙালী। বাজেট বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাজও বেড়েছে অনেক ছবির প্রস্তুতি পর্বের জন্য। কাজেই দেরী আছে কিন্তু ছবির আসল কাজ শুরু হতে। সেই অবসরেই বাংলা ছবিখানার কাজ শেষ করতে চান। এবং সে বাংলা ছবির যাবতীয় কাজ এই কোলকাতাতেই হবে। এখনও পর্যন্ত সে-রকম কথাই শুনেছি।

* * *

ঋত্বিক-তপন-মৃণাল নিজের নিজের ছবি নিয়ে ব্যস্ত। ঋত্বিক বাবু এখনও পূর্ণাঙ্গ চিত্র 'আনন্দ বেদনা'র কাজ শুরু করতে পারেন নি। করবেন শিগ্গির। এখন করছেন একটা ছোট ছবি 'গুপ চুপ'। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ল্যাবে সে ছবির

সংসার/পরিচালনা : সলিল সেন/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মলকুমার। ফটো : অমৃত

ডাবিং-এর কিছু টুকরো কাজ ছিল। সেখানেই দেখা ঋত্বিকবাবুর সঙ্গে। কিছু বলার আগেই স্বভাবসিদ্ধ ভংগীতে জানালেন 'এসব (ছোট) ছবি করে আনন্দ আছে, বড় ছবির চাইতে ছোট ছবিতে সুযোগ কম থাকলেও বেশ গুছিয়ে কথা বলা যায়।'

মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ'র কাজ শেষ। সেদিনই দেখা হল ইণ্ডিয়া ল্যাবের এডিটিং রুমে। মুভিওয়ালায় সম্পাদনার কাজ করছেন। উনি আগামী ছবির (গোত্রান্তর) কাজ ফাইনালাইজেশনের জন্য বম্বে যাচ্ছেন এ সপ্তাহে, আবার দিন দুই বাদেই ফিরবেন। 'গোত্রান্তরের' প্রধান ভূমিকায় থাকবেন বম্বের অমিতাভ বচ্চন। বাংলা ভার্সান হবার কথা শুনেছি, তবে পাকাপাকি কিছু হয়নি এখনও। বম্বে থেকে ফিরে উনি ঠিক করবেন সে ব্যবস্থা। 'ইন্টারভিউ' মৃণাল সেনের অন্যতম পরীক্ষামূলক ছবি। 'ভুবন সোমের' চাইতেও কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে চমকের পরিচয় আনবে এ ছবি।

তপন সিংহ 'এখনই'র কাজ করে চলেছেন পুরোদমে। গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ানে এক নাগাড়ে কয়েকদিন চিত্রগ্রহণ করলেন। এ সপ্তাহেও করছেন। আউটডোরের কাজ এখনও কিছু বাকি। সারা আগস্ট মাস তপনবাবু ব্যস্ত থাকবেন; এবং সেপ্টেম্বরেই কাজ শেষ হবে ছবির। তারপর দুটো প্রোগ্রাম তাঁর হাতে আছে। কোনটা আগে করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। এক নম্বর হোল সমরেশ বসুর (কালকূট) 'কোথায় পাবো তারে'র চিত্রায়ন, দু'নম্বর হোল হিন্দী ছবির কাজ শুরু করা। এখন 'এখনই' নিয়ে ব্যস্ত বলেই এখন ও ব্যাপারে যথেষ্ট মনযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে তপনবাবুর খুব ইচ্ছে আগে 'কোথায় পাবো তারে'র কাজ করার।

●

নলদময়ন্তী : গোপালকৃষ্ণ রায় পরিচালিত জে এস ফিল্ম প্রোডাকসন্সের 'নলদময়ন্তী' ছবিটি সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বীণা, বসুশ্রী, মিত্রা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত মহাভারতের অমর প্রেমকথা 'নলদময়ন্তী'র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—প্রাণ বর্মা, সংগীতাংশ ছবিটির অন্যান্য অনেক আকর্ষণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। কালীপদ সেনের সুরে ছবিটিতে

তালাশ / রাজেন্দ্রকুমার এবং শর্মিলা ঠাকুর

কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, সতীনাথ মুখার্জি, আরতি মুখার্জি, নির্মলা মিশ্র, গীতা দাস ও গঙ্গা দে। প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করেছেন— অসীমকুমার ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—রবীন ব্যানার্জি, জহর রায়, কালিপদ চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, দীপিকা দাস, রেণুকা রায়, মণি শ্রীমানি, জয়-নারায়ণ মুখার্জি, গীতা দে, লীলাবতী দেবী, পদ্মা দেবী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি ইন্দিরা দে, মীনা চক্রবর্তী, সুস্মিতা দে, সীমা ভৌমিক, ধীরাজ দাস, গোপী চক্রবর্তী, রত্না ঘোষাল, নবাগতা জয়ন্তী, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, অজিত ব্যানার্জি, তপন চ্যাটার্জি, সুমন মুখার্জি, জীবন কুমার, ঋষি ব্যানার্জি, শৈলেন গাঙ্গুলী, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, কল্পনা দাস, ঋতা চক্রবর্তী ও শতাধিক শিল্পী। পারফেক্ট ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর প্রাঃ লিঃ ছবিটির পরিবেশক।

মহাকবি কৃত্তিবাস : রামায়ণ চিত্রমের প্রথম নিবেদন বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের পুণ্যময় জীবন-কাহিনী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিনশ্বর সৃষ্টি। কৃত্তিবাস লোকপ্রিয় জনগণের কবি। তাঁর সহজ সরল কাব্যগাথা বাঙালীর ঘরে ঘরে যে আনন্দ-সুধা ভরে দিয়ে গেছে, তা মহাকালের স্পর্শ বাঁচিয়ে আজও আমাদের জাতীয় জীবনকে বেঁধে রেখেছে ভাব, ভাষা ও প্রেমের বন্ধনে। আদি-কবির রস-মধুর জীবন কাহিনীকে চিত্রে রূপ দিয়েছেন 'লবকুশ' খ্যাত চিত্র-পরিচালক অশোক চ্যাটার্জি। এই সংগীত-বহুল ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন বিজন ঘোষদস্তিদার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রসূন ব্যানার্জি, আরতি মুখার্জি, চন্দ্রাণী মুখার্জি, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, মাধবী ব্রহ্ম, অধীর চ্যাটার্জি, অমর পাল, শিবানী পাল। কৃত্তি-বাসের জন্মস্থান ফুলিয়া, রাজা গণেশের রাজধানী গৌড় এবং অযোধ্যায় 'মহাকবি কৃত্তিবাস' ছবিটির বহু বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন--অসীমকুমার, অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করে-ছেন—লিলি চক্রবর্তী, সুমন মুখার্জি, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সুধা সরকার। ছবিটি খুব শীঘ্রই শহর ও শহরতলীর বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

মঞ্চাভিনয়

শৌভনিক : শৌভনিক সংস্থা এই মাসের প্রথম সপ্তাহে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করছেন—এডওয়ার্ড এ্যালবি-র 'হু'জ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ' অনুপ্রাণিত পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'মলাটের রঙ মুহূর্ত'। নাট্যকারের নির্দেশনার দায়িত্বে এবং প্রধান ভূমিকায় আছেন কৃষ্ণ কুণ্ডু। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, ভূপাল মুখোপাধ্যায়, সিপ্রা চক্রবর্তী ও কাজল মুখোপাধ্যায়। মঞ্চ উপদেষ্টা। হিসাবে আছেন সুরেশ দত্ত। আবহ-সংগীত পরিকল্পনায়--পার্থপ্রতিম চৌধুরী আলো ও মঞ্চ সজ্জায় যথাক্রমে স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ও শংকর গুপ্ত।

ফাঁস : সম্প্রতি অবকাশ নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের চতুর্থ বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠানে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর ফাঁস নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে নতুন চিন্তাধারায় শ্রী-শিক্ষায়তন মঞ্চে অভিনয় করেন। ভূমিকা দৃশ্যটিতে পরিচালক নাট্যচিন্তায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্য-নির্দেশনা ও আবহসংগীত পরিচালনায় ছিলেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সামগ্রিক দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীমতী রাণী ব্যানার্জি, শ্রীঅসীম চৌধুরী, শ্রীজীবন মিত্র ও শ্রীসুহৃৎ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া ভাস্কর

মিত্র, উদ্ধব দত্ত ও মোতি সর্বাধিকারীর অভিনয়ও সুন্দর। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ অশোক-কুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সভাপতি নাট্যকার পরিচালক ও অভিনেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

মমতাময়ী হাসপাতাল ঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক্সরে (ডায়গনস্টিক) রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা সম্প্রতি রঙমহল মঞ্চে প্রথম নাট্যপ্রয়াস হিসাবে অভিনয় করলেন মন্মথ রায়ের প্রখ্যাত নাটক 'মমতাময়ী হাসপাতাল'। প্রযোজনা সুন্দর। দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, নিশীথ ভট্টাচার্য, স্বপন চৌধুরী। পরিচালক সত্য রায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আবহ-সংগীত ও স্বরচিত গানটি 'কী করি করছে আমার পাগলা-মন...' সুগীত। উদ্বোধক ডাঃ হীরালাল সাহা এবং প্রধান অতিথি ডাঃ দেবব্রত রায় মহাশয় সংস্থার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

কৌশিকী ঃ আগামী ১৮ আগস্ট কৌশিকী সংস্থা 'প্রেমতত্ত্ব বোধিনী সংঘ', 'বিস্ফোরিত বিবর'—এ দুটি নাটক মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করবেন। সমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেমের হুক্কাপাঙ্গার' ছায়া অবলম্বনে প্রথমোক্ত নাটকটি রচনা করেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় নাটকটির রচয়িতা সিরাজ চৌধুরী। নাটক দুটি পরিচালনা করবেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন অরবিন্দ সেনগুপ্ত, গৌতম মুখোপাধ্যায়, নীতিন বিশ্বাস, অমল মণ্ডল, শিশির মুখার্জি, দীপক দাস, বলরাম গঙ্গোপাধ্যায়, কমল বর্মণ, শংকর চক্রবর্তী, মন্টু চক্রবর্তী দত্তা মুখার্জি, সর্বাণী বিশ্বাস ও আরতি ঘোষ। আবহ-সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুবোধকুমার পাল।

বিনয়-বাদল-দীনেশ ঃ যাদবপুরের 'পলাতকা' গোষ্ঠী সম্প্রতি বালীগঞ্জ শিক্ষা-সদন মঞ্চে উপস্থিত করলেন 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' নাটকটি। নাটকের প্রারম্ভে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এই তিন শহীদকে স্মরণ করে এক মনোজ্ঞ ভাষণ উপস্থিত করেন। নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীঅপরাজিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশনা সর্বাংশ সার্থক নয়। অভিনয়াংশে শ্রীচট্টোপাধ্যায় ছাড়াও আর যাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে চরিত্রগুলি উজ্জ্বল করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে বিরাজ মিত্র, সমীর ভট্টাচার্য, সলিল আচার্য, কনক বসুঠাকুর, বাচ্চু গুহ-ঠাকুরতা, শশাংক, দ্বিজ, তমাল ও মাধুরী

বিশ্বরূপায় নাট্য ভারতীর উদ্যোগে আয়োজিত প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষের সম্বর্ধনার একটি দৃশ্য। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে শ্রীপঙ্কজ সেনের কাছ থেকে মানপত্র গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। পাশে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমন্মথ রায়।

দে উল্লেখযোগ্য। আলোক সম্পাতের কাজ সুষ্ঠু।

বীণাপাণি সংগীত সমাজ ঃ বীণাপাণি সংগীত সমাজের সভারা সম্প্রতি 'সিরাজ-দ্দৌলা' ও 'মাটির ঘর' নাটক দুটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। এই সংস্থার আগামী প্রযোজনার জন্য মনোনীত হয়েছে 'মিশরকুমারী' ও 'বিজয়া' নাটক দুটি। প্রকাশ চ্যাটার্জি ও অতুল চক্রবর্তীর পরিচালনায় এই নাটক দুটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেবেন সুনীল ভট্টাচার্য, প্রভাত ব্যানার্জি, মানিক গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ রায়, সুপ্রকাশ ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ পাল, প্রবোধ ব্যানার্জি, হারাধন চ্যাটার্জি ও পরিচালক-দ্বয়।

অবকাশ ঃ আগামী ১৪ আগস্ট শুক্রবার 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে' সন্ধ্যায় অবকাশ সংস্থার সভারা বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও পরিশেষে শ্রীব্রজেন্দ্র-কুমার দে রচিত 'নবীন মাস্টার' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন শ্রীলক্ষ্মণ-চন্দ্র দে ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নাটকটি পরিচালনা করবেন শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী ও আবহ-সঙ্গীতে শ্রীআনল ভদ্রা।

পথিকের লেনিন স্মরণোৎসব ঃ ৫ আগস্ট 'পথিক' আয়োজিত লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণোৎসব অনুষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশন। এ দিনের অনুষ্ঠানে থাকছে লোকমঞ্চ শাখা কর্তৃক গণসংগীত, 'শিক্ষা

ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও লেনিন' পর্যায়ে আলোচনা করবেন রবীন গুপ্ত, অরুণেন্দু দাশগুপ্ত ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আবৃত্তি করবেন অমল গুহ। এ দিনের নাটক অপসংস্কৃতি বিরোধী মৌল সৃষ্টি 'ইতিহাসের পাতায়'। নাট্যকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশনায় জ্যোতিপ্রকাশ। বিশ্বরূপায় অনুষ্ঠান শুরু সন্ধ্যা ছ'টায়।

বিবিধ সংবাদ

মার্টিন বার্ন ই, ই, ডি রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'ফাঁস' : গত ২৯ জুলাই স্টার রঙ্গমঞ্চে মার্টিন বার্ন ই. ই. ডি, রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি অতীব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। একক ও দলগত অভিনয়ে শিল্পিবৃন্দ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখেন। 'ফাঁস' নাটকে সাফল্য আনতে হলে দলগত অভিনয় বিশেষ প্রয়োজন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই শিল্পীরা সেদিকে কোন কার্পণ্য করেন নি। অফিস ক্লাবে এত সুষ্ঠু অভিনয় খুব কমই দেখা যায়। নাট্য-পরিচালক বিমল গুপ্ত, দক্ষ পরিচালনা ও সুন্দর কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত রচনা করে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দেন। অভিনয়ে সর্বাগ্রে নাম উল্লেখ করতে হয় শান্তি রায় (বিমান বা মাধাই)। শিল্পীর অপূর্ব বাচনভঙ্গী ও অভিব্যক্তি উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ডি এস পি), অশোক দে (সুভাষ), সোমনাথ রায়চৌধুরী (নবীনকুমার), মুকুল দে (তপন), দিলীপ ভট্টাচার্য (অশোক)। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন দেবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সোমনাথ), মানিক চক্র (কপিল), প্রদ্যোৎ পাল (কমলেশ), রমেন ভট্টাচার্য (জনার্দন)। স্ত্রী-চরিত্রে সবিতা মুখোপাধ্যায় (তরলা) সুন্দর অভিনয় করলেও কিছুটা অতি-অভিনয়দুষ্ট। বেবী সেনগুপ্তা (সোনালী) চলনসই। আবহ-সঙ্গীতের কাজ উচ্চামানের, ক্ষেত্র বিশেষে চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগ নাটকটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। আলো, রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা মোটামুটি।

বহুকাল বাঙলা হিন্দী—উভয় সংস্করণে একটি কাহিনী চিত্রায়িত হবার কথা শোনা যায় নি। তার ওপর আবার হিন্দী কাহিনীর বাংলা চিত্ররূপ দেওয়া রীতিমত বিরল। প্রায় বছর বারো আগে ১৯৫৯ সালে মহাদেবী বর্মার রচনা থেকে নির্মিত হয়েছিল 'নীল আকাশের নীচে'। তাই গেল রবিবার ২ আগস্ট যখন হোটেল হিন্দুস্থান ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিপ্রাহরিক ভোজসভার প্রাক্কালে ঘোষিত হল যে, প্রযোজক দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া প্রতিষ্ঠিত পূর্বাচল চিত্রমন্দিরের হয়ে পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য বিখ্যাত হিন্দী লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ লিখিত ছোট গল্প 'পঞ্চ পরমেশ্বরে'র হিন্দী ও বাংলা চিত্ররূপ এক সঙ্গে দেবেন, তখন যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে মনটা ভরে গেল। ছবিটি হবে বহির্দৃশ্যপ্রধান। শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা করবেন যথাক্রমে নন্দ ভট্টাচার্য ও কানু রায়। দুজনেই পরিচালক শ্রীভট্টাচার্যের পুরাতন সহকর্মী। আমরা ছবি দুটি সাফল্যমণ্ডিত হোক এই কামনাই করি।

বিদায় চিপ্‌স !

'লস্ট হরাইজন', 'নাইট উইদাউট আর্মার', 'উই আর নট অ্যালোন' প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের লেখক জেমস হিলটনকে 'বৃটিশ উইকলি'র অন্যতম সম্পাদক '১৯৩৩-এর 'খৃস্টমাস সাপ্লিমেণ্ট'-এর জন্যে একটি বড়ো আকারের ছোট গল্প লিখে দেবার ফরমাস করেন: এরই ফলে জন্মগ্রহণ করে 'গুডবাই মিঃ চীপস'। ১৯৩৭ সালে বইটি নাটকাকারে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং ১৯৩৯-এ মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার কোম্পানী রবার্ট ডোনাট ও গ্রীয়ার গার্সনকে মুখ্য ভূমিকা দিয়ে যে-অনবদ্য চিত্র দর্শকদের উপহার দেন, তার স্মৃতি আজও আমাদের অভিভূত করে। ব্রুক ফিল্ড স্কুলের অপর পার্শে মিসেস উইকেট-এর কটেজ বাংলোতে স্কুলের কাজ থেকে অবসরগ্রহণ করবার পরে মিঃ চীপস বাস করেছিলেন ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে পঁচাশি বছর বয়সে মারা যাবার দিনটি পর্যন্ত। ঐ বাংলোয় বাস করবার সময়ে তিনি ব্রুকফিল্ড স্কুলে ১৮৭০-এ তাঁর যোগদানের দিন থেকে ১৯১৩-তে পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে অবসরগ্রহণের দিন পর্যন্ত এবং তার পরেও প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমরের সময়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে সাময়িকভাবে হেড মাস্টারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘটনা সমেত স্কুলের ছেলেদের তাঁর বাংলোয় এসে পরিচয় স্থাপনের প্রয়াসে তাঁর আনন্দলাভ ইত্যাদি জড়িয়ে মুখ্যত স্মৃতিচারণের আকারে এই কাহিনীটি লিখিত।

সম্প্রতি **আর্থার পি জ্যাকব-এর** প্রযোজনায় যে নতুন গুডবাই মিঃ চীপস' নির্মিত হয়ে মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার দ্বারা পরিবেশিত ও কলকাতার মেট্রো সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে, তাতে মিঃ চীপস-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পিটার ওটুল এবং তাঁর বিপরীতে ক্যাথারিন ব্রীজ-এর চরিত্রে আছেন পেটুলা ক্লার্ক। বর্তমান সংস্করণের চিত্রনাট্যকার টেরেন্স র‍্যাটিগান মূলের কাহিনীর সারাংশটুকু বজায় রেখে চিত্র-কাহিনীটিকে যুগোপযোগী করবার উদ্দেশ্যে বহু পরিবর্তন-পরিবর্জন-পরিবর্ধন করেছেন; এমন কি সমস্ত ঘটনাটিকেই ১৮৭০ থেকে ১৯১৩র মধ্যে না রেখে এগিয়ে এনেছেন উনিশশো তিরিশ ও চল্লিশ দশকে। মূল-কাহিনীর মতো চীপসের শিক্ষকতা সংক্রান্ত ঘটনাগুলির ওপর থেকে গুরুত্বকে সরিয়ে নিয়ে আর্থার চীপিং ও ক্যাথারিণ-এর প্রেম, বিবাহ ও বিবাহোত্তর দাম্পত্য জীবনে স্বামীর ওপর স্ত্রীর প্রভাবটিকে বড়ো করে দেখিয়েছেন। এমন কি চীপসের মুখের কথা 'আমার ছেলে নেই, কে বললে? হাজার-হাজার ছেলে আমার আছে'—একেও ক্যাথারিণ-এর মুখে তুলে দিয়েছেন। চীপসের ওপর তাঁর স্ত্রীর প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছিল এবং সে-প্রভাবের ফলেই চীপসের মনের সংকীর্ণতা চলে গিয়েছিল। কিন্তু 'গুড বাই মিঃ চীপস' ছবিতে সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক, শিক্ষকে-শিক্ষকে সম্পর্ক এবং সবচেয়ে বড়ো যা, সে হচ্ছে মিঃ চীপসের সঙ্গে সমগ্র

গুডবাই মিঃ চীপস / ক্যাথারীন ব্রীজ চরিত্রে পেটুলা ক্লার্ক

ব্রুকফিল্ড-জীবনের সম্পর্ক। তাই যখন নতুন ছোকরা হেড-মাস্টার তাঁকে ষাট বছর বয়সে অবসরগ্রহণ করবার পরামর্শ দেবার ছলে তাঁর শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁর পুরাতন পদ্ধতির নিন্দা করেছিল, তখন সমগ্র স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা হেড-মাস্টারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল; শুধু তাই নয়, স্কুলের পরিচালক-সমিতির চেয়ারম্যান সার জন রীভার্স চীপসকে বলেছিলেন ঃ আমাদের হেড-মাস্টারটি বড্ড বেশী চালাক দেখছি। তিনি যদি আবার আপনাকে অবসর গ্রহণের কথা বলতে আসেন, তাঁকে বলে দেবেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ চান না যে, আপনি অবসর-গ্রহণ করেন। আপনি না থাকলে ব্রুকফিল্ড আর ব্রুকফিল্ড থাকবে না, এ-কথা সবাই জানে এবং আমরাও জানি। আপনি যদি মনে করেন, আপনি একশো বছর এই স্কুলে থাকবেন — সত্যিই আমরা আশা করি, একশো বছর বয়স পর্যন্ত আপনি কর্মক্ষম থেকে এই স্কুলের সেবা করবেন।'

কিন্তু এ-সব ঘটনা বর্তমান সংস্করণে উপেক্ষিত হয়েছে এই কারণে যে, বর্তমান চিত্র-কাহিনীটিকে মাত্র ভাবালুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না করে যতদূর সম্ভব যুক্তিগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যিই পিটার ওটুল-এর অভিনয়ও তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি-দীপ্ত এবং সমস্ত ছবিটিই অত্যুজ্জ্বলভাবে পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত। কিন্তু একথা মানতেই হবে, মূল-কাহিনীর অনেকখানিই বর্তমান ছবিতে অনুপস্থিত।

কুমারী কারেন মোরাস (মাঝখানে) ৮০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড সময়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তাঁর বাঁদিকে রৌপ্য পদক বিজয়িনী হেলেন গ্রে এবং ডানদিকে ব্রোঞ্জ পদক বিজয়িনী র্‌নন রিসন (তিনজনেই অস্ট্রেলিয়ার)

এগিয়ে চলেছে। অনাগত কালেও এর যাত্রা ভঙ্গ হবে না যদি না বিশ্বযুদ্ধ আবার বাঁধে, যা কমনওয়েলথ ভেঙ্গে যায় অথবা **পূর্বোক্ত** আশংকা অনুযায়ী রাজনীতি এসে **এই** প্রতিনিধিমূলক খেলাধূলোর আসরের টুঁটি চেপে ধরে। পালের হাওয়ার হদিশ **যা পাওয়া** গেছে তাতে শেষের আশংকাটি **এক** বাস্তব ও অনতিক্রম্য সমস্যায় রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়।

ক্রীড়াগত উৎকর্ষের নিরিখে কমন-**ওয়েলথ** ক্রীড়ানুষ্ঠানের ঐশ্বর্য অলিম্পি-**কের** মতো নয়। তবে ১৯৩০ থেকে **১৯৭০,** চল্লিশ বছরের ফাঁকে অনেক বিশ্ব-বিশ্রুত ক্রীড়াবিদকে কমনওয়েলথ ক্রীড়া-**ভূমিতে** পাওয়া গিয়েছে।

১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলীয় তরুণী **ডেসিমা** নর্ম্যান একাই এই আসরে অ্যাথ-**লেটিকসের** পাঁচটি বিভাগের স্বর্ণপদক **পেয়েছিলেন।** ১৯৫০ সালে অকল্যাণ্ডে **আর এক** অস্ট্রেলীয় তরুণী মারজোরি **জ্যাকসন স্বল্প** পাল্লার দৌড়ে বিশ্বের **রেকর্ড** ভেঙ্গে দেন। ভ্যাঙ্কোভার ক্রীড়ায় **মাইল** দৌড়ে বৃটেনের রোজার ব্যানিস্টার **বনাম অস্ট্রেলিয়ার** জন ল্যাণ্ডির প্রতি-**দ্বন্দ্বিতার** কাহিনী তো অ্যাথলেটিকসের **ইতিহাসে** এক স্মরণীয় উপাখ্যানই হয়ে **আছে।** কিপচো কিনো, নাফতালি তেমু **প্রমুখ** আফ্রিকান অ্যাথলিটদের নিউজ-**ল্যাণ্ডের** পিটার স্নেথের আবির্ভাবও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অস্ট্রেলীয় সাঁতারু ডন ফ্রেজার, মারে রোজ, কনরাডস ভাই-বোনদের চেষ্টায় কমনওয়েলথ ক্রীড়ার সাঁতার প্রতিযোগিতার মান ঊর্ধ্বমুখী, এই গতিকে ধরে রাখার চেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ার কারেণ মোরাস ও মাইক ওয়েনডেনেরা সত্তরের দশকে সক্রিয়।

ভারত কমনওয়েলথ ক্রীড়ার প্রথম স্বর্ণ-পদক পেয়েছিল 'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিংয়ের কৃতিত্বে। ১৯৫৮তে কার্ডিফে ৪৪০ গজ ৪৬-৬ সেকেণ্ডে দৌড়ে মিলখা প্রথম স্বর্ণপদক পান এবং কুস্তিগীর লীলারাম হেভিওয়েটে অনুরূপ সাফল্য লাভ করায় ভারতের সংগ্রহশালায় দ্বিতীয় স্বর্ণপদক জমা পড়ে। আর এক ভারতীয় মল্লবীর **লক্ষ্মী** পান্ডে সেবার ওয়েল্টার ওয়েটে রৌপ্য পদক পেয়েছিলেন।

লীলারাম, **লক্ষ্মী** পান্ডের সাফল্যের ধারা ভারতীয় কুস্তিগীরেরা ১৯৬৬-তে ধরে রেখেছেন। সেবার কিংসটনে বেশ বড়সড় **মল্লবীর দল** পাঠানো **হলে একজন** কুস্তিগীর ছাড়া বাকী সবাই-ই কোনো না কোনো পদক নিয়ে ফেরেন। তাঁদের মধ্যে তিন-তিনজনের **স্বর্ণপদক** জুটেছিল। সব মিলিয়ে কিংসটন থেকে নটি পদক (তিনটি করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) নিয়ে ভারতীয় প্রতিযোগীরা দেশে ফেরেন।

তবে কিংসটনের **কৃতিত্বকেও** এবার **ডিঙ্গিয়ে** যেতে **যথাযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন** আমাদের মল্লবীরেরাই। মূলতঃ তাঁদের সাফল্যেই ভারত এবার মোট এডিনবরায় আয়োজিত নবম কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় পেয়েছে এক ডজন পদক। তার মধ্যে সোনার মেডেল পাঁচটি।

সোনার পদকগুলি পেয়েছেন ভারতীয় মল্লবীরেরা। তাঁরা সোনা ছাড়া আরও তিনটি রূপো ও একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করায় নবম কমনওয়েলথ ক্রীড়ার কুস্তিতে ভারতই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে শীর্ষ-স্থানে। যে খেলায় ভারতীয় ঐতিহ্য অবিস্মরণীয় তাতেই আজ ভারতীয় ক্রীড়া-বিদেরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মান পাচ্ছেন, এটা আনন্দেরই কথা। এডিনবরায় কুস্তি ছাড়া ভারতের হাতে আর যে তিনটি ব্রোঞ্জ পদক এসেছে তা এক ভারোত্তোলক, একজন মুষ্টিযোদ্ধা ও একজন অ্যাথ-লিটের সাফল্যের সূত্রে।

এডিনবরা থেকে এবার যাঁরা পদক নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন সেই সব ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের নাম আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে **স্মরণ** করছি। ওঁরা হলেন—মল্লবীর বেদ-প্রকাশ, সুদেশকুমার, উদে চাঁদ, মুক্তিয়ার সিং হরিশচন্দ্র (স্বর্ণপদক), সজ্জন সিং মারুতি মানে, বিশ্বনাথ সিং (রৌপ্য), রণধাওয়া সিং (ব্রোঞ্জ), ভারোত্তোলক নেভিস (ব্রোঞ্জ), মুষ্টিযোদ্ধা শিবাজী ভোঁসলে (ব্রোঞ্জ) ও অ্যাথলিট মাহিন্দর সিং (ব্রোঞ্জ)।

খেলাধূলা

দর্শক

রাশিয়া বনাম আমেরিকা

রাশিয়া বনাম আমেরিকার ৯ম দ্বৈত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ এবং মহিলা—উভয় বিভাগেই সর্বাধিক পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে রাশিয়ার পয়েণ্ট ১২২ এবং আমেরিকার ১১৪। মহিলা বিভাগে যেখানে রাশিয়া পেয়েছে ৭৮ পয়েণ্ট সেখানে আমেরিকার ৫৯ পয়েণ্ট দাঁড়ায়। চূড়ান্ত পয়েণ্ট তালিকায় রাশিয়া মোট ২০০ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। আমেরিকা পেয়েছে ১৭৩ পয়েণ্ট। প্রথম দিনে রাশিয়া ১০২-৭৮ পয়েণ্টে এগিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, গত বছর আমেরিকা উভয় বিভাগেই সর্বাধিক পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম হয়েছিল।

অলিম্পিক গেমসে রাশিয়া প্রথম যোগদান করে ১৯৫২ সালে। সেই সময় থেকেই তারা আমেরিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৫২ সালের অলিম্পিক গেমসের বে-সরকারী পয়েণ্ট তালিকায় রাশিয়া এবং আমেরিকা যুগ্মভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী চারটি অলিম্পিক গেমসের বে-সরকারী পয়েণ্ট তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে রাশিয়া এবং দ্বিতীয় স্থান আমেরিকা। সুতরাং রাশিয়া বনাম আমেরিকার এই দ্বৈত অ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক আসরে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই দুই দেশের মধ্যে প্রথম অ্যাথলেটিক্স আসর বসেছিল মস্কোর লুজনিকি স্টেডিয়ামে, ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে। সেই সময় থেকে এপর্যন্ত যেখানে এই দুই দেশের মধ্যে ১৩বার অ্যাথলেটিক্স আসর হওয়ার কথা সেখানে ৯বার আসর বসেছে। ৪ বছর (১৯৬০, ১৯৬৬-৬৮) আসর বসেনি।

বিগত ৯টি আসরের ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : পুরুষ বিভাগে আমেরিকা ৭বার এবং রাশিয়া ২বার প্রথম স্থান পেয়েছে। মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে রাশিয়া ৮বার এবং আমেরিকা ১বার। চূড়ান্ত পয়েণ্ট তালিকায় রাশিয়া ৭বার এবং আমেরিকা ২বার শীর্ষস্থান পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। একই বছরে উভয় বিভাগেই প্রথম স্থান পেয়েছে রাশিয়া ২বার (১৯৬৪ ও ১৯৭০) এবং আমেরিকা ১বার (১৯৬৯)।

ভ্যালেরি ব্রুমেল (রাশিয়া) : রাশিয়া-আমেরিকার অ্যাথলেটিকস আসরে চারবার স্বর্ণ-পদক জয়ের সূত্রে তিনবার বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন।

এই দুই দেশের অ্যাথলেটিক্সে ১৭বার বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রান্ত হয়েছে। রাশিয়ার ভ্যালেরি ব্রুমেল হাই-জাম্পে তিনবার বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছিলেন। রাশিয়ার ইয়ানিস লুসিস উপর্যুপরি ৫টি আসরে জ্যাভেলিন নিক্ষেপে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে এক অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া অপর কেউ আজ পর্যন্ত কোন একটি বিষয়ে মোট পাঁচবারও স্বর্ণ পদক পাননি, উপর্যুপরি স্বর্ণ পদক জয় দূরের কথা।

কমনওয়েলথ গেমস প্রসঙ্গে

দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফর বাতিল করার ফলেই অশ্বেতকায় দেশগুলির এডিনবরার ৯ম বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমস বর্জন করার আন্দোলন থেমে যায় এবং বিক্ষুব্ধ দেশগুলি শেষ পর্যন্ত কমনওয়েলথ গেমসে অংশ গ্রহণ করে। তবে শ্বেতকায় এবং অশ্বেতকায় অ্যাথলীটদের মধ্যে বিদ্বেষ যে ছাই চাপা আগুনের মত এখনও জ্বলছে একাধিক ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বৃটিশ এবং জামাইকার অশ্বেতকায় অ্যাথলীটরা একই বাসভবনে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে প্রায়ই ঠোকাঠুকি বেধে যেত। এসব অপ্রীতিকর ঘটনা শেষ পর্যন্ত চাপা থাকেনি, যদিও কোন পক্ষই সরকারীভাবে
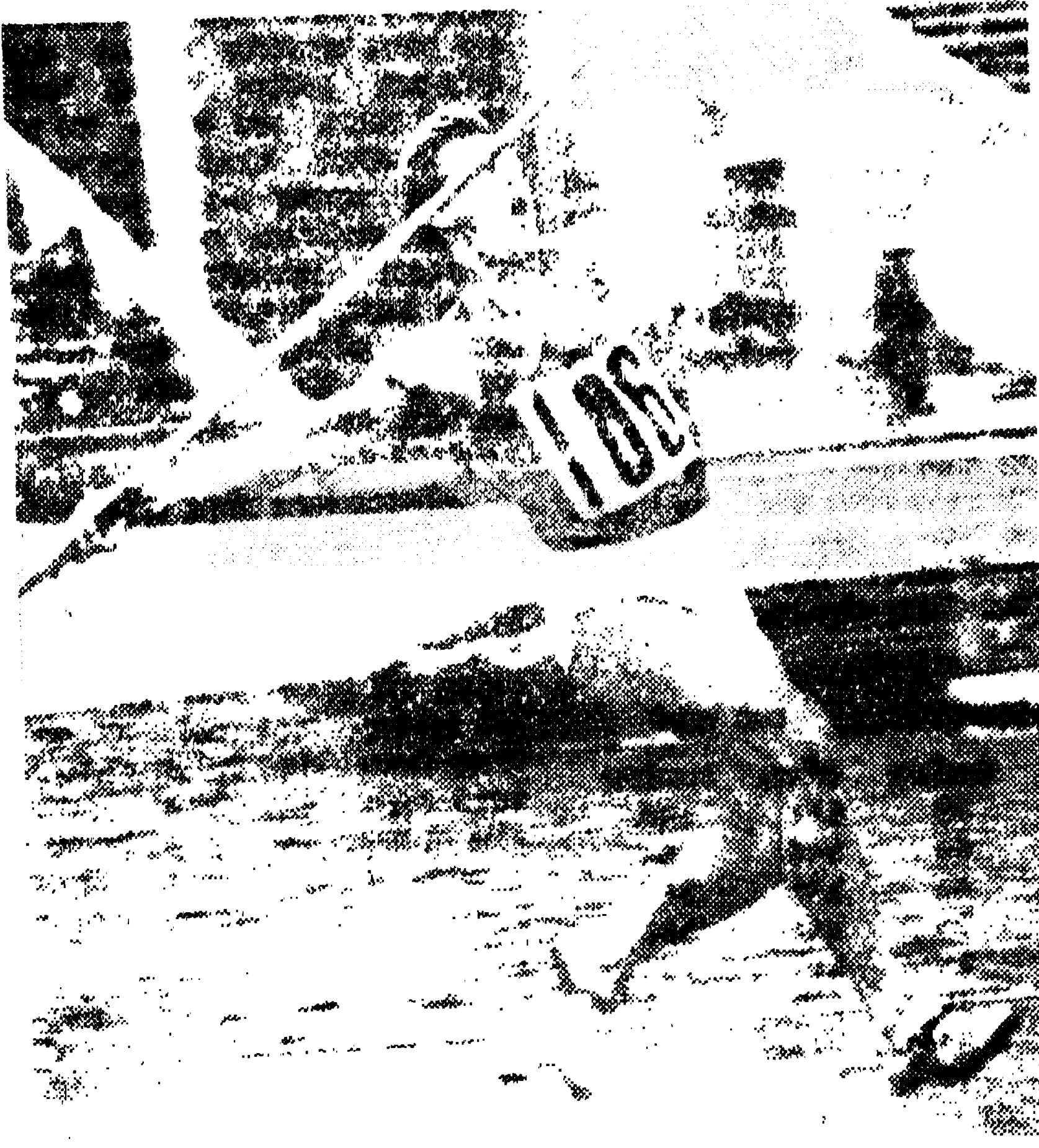
রাশিয়া বনাম আমেরিকার দ্বৈত অ্যাথলেটিকসের জ্যাভেলিন অনুষ্ঠানে ইয়ানিস লুসিস (রাশিয়া) উপর্যুপরি ৫টি আসরে স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে একই বিষয়ে সর্বাধিক বার স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেছেন।

ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করেনি। মেকসিকোর মতই এডিনবরার কমনওয়েলথ গেমসে পদক বিজয়ী অশ্বেতকায় অ্যাথলীটকে কৃষ্ণ মুষ্টি মাথার ওপর তুলতে দেখা গেছে। অনেকে মৌন প্রতিবাদ করে আসর ত্যাগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কুমারী মার্লিন নফভিলের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তিনি গত দশ বছর ইংল্যাণ্ডে বসবাস করে বৃটেনের পক্ষেই এতদিন খেলাধুলোর আসরে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ৯ম কমনওয়েলথ গেমসে তিনি তাঁর স্বদেশ জামাইকার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর এই দল পরিবর্তন উপলক্ষ করে বৃটিশ অ্যাথলেটিকস মহলে তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। কুমারী মার্লিন নফভিল কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েও মনে সুখ পাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি অভিমানে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে স্বদেশে চলে গেছেন। সুতরাং কমনওয়েলথ গেমসে খেলাধুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে—সৌহার্দ বা ভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধন সম্ভব হয়নি।

বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমসের পূর্বনাম ছিল বৃটিশ এম্পায়ার গেমস। গত ২৪ বছরে বৃটিশ শাসনাধীন অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে; ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি আগের মত বিরাট নয়, আজ অনেক ছোট। ফলে সময়োপযোগী করার উদ্দেশ্যে 'বৃটিশ এম্পায়ার গেমস'—এই নাম থেকে 'এম্পায়ার' কথাটা বাদ দিয়ে নতুন নামকরণ হয়েছে 'বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমস।' অর্থাৎ বৃটেনসহ কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ক্রীড়ানুষ্ঠান। কিন্তু 'বৃটিশ' কথাটা নিয়ে অনেক অশ্বেতকায় স্বাধীন দেশ থেকে প্রবল আপত্তি উঠেছে। এডিনবরার ৯ম কমনওয়েলথ গেমসের সময়েই বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের বিশেষ অধিবেশনে 'বৃটিশ' কথাটা বাদ দেওয়ার জন্যে প্রস্তাব উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত কোনয়ার এই নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবটি সামান্য ১৯—১৮ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। জানা গেছে, এই নাম পরিবর্তন প্রস্তাবের পক্ষে ছিল আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশ। প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিল বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং কানাডা। ক্যারিবিয়ান দেশগুলি দুদিকেই ভোট দিয়েছিল।

বৃটেনের দীর্ঘদিনের কুক্ষিগত 'ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স' থেকে যেখানে 'ইম্পিরিয়াল' কথাটা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সদস্য দেশগুলির ভোটাধিকারের বৈষম্যও দূর করা হয়েছে। সেখানে 'বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমস' থেকে 'বৃটিশ' কথাটা বাদ দিতে যাঁদের প্রবল আপত্তি তাঁরা মোটেই দূরদর্শী নন।

রাশিয়া বনাম আমেরিকা

রাশিয়া বনাম আমেরিকার দ্বৈত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলে এক বিশেষ আকর্ষণ। এই দুই দেশের অ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়েছে ১৯৫৮ সালে। প্রতি বছর আসর বসার কথা; কিন্তু এ পর্যন্ত ৯বার অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রতি বছরের পয়েন্টের চূড়ান্ত খতিয়ান নীচে দেওয়া হল।

পয়েন্টের খতিয়ান

	পুরুষ বিভাগ		মহিলা বিভাগ		মোট পয়েন্ট	
বছর	আমেরিকা	রাশিয়া	রাশিয়া	আমেরিকা	রাশিয়া	আমেরিকা
১৯৫৮	১২৬	১০৯	৬৩	৪৪	১৭২	১৭০
১৯৫৯	১২৭	১০৮	৬৭	৪০	১৭৫	১৬৭
১৯৬১	১২৪	১১১	৬৮	৩৯	১৭৯	১৬৩
১৯৬২	১২৮	১০৬	৬৬	৪১	১৭২	১৬৯
১৯৬৩	১১৯	১১৪	৭৫	২৮	১৮৯	১৪৭
১৯৬৪	১৩৯	৯৭	৫৯	৪৮	১৫৬	১৮৭
১৯৬৫	১১২	১১৮	৬৩·৫	৪৩·৫	১৮১·৫	১৫৫·৫
১৯৬৯	১২৫	১১০	৬৭	৭০	১৭৭	১৯৫
১৯৭০	১১৪	১২২	৭৮	৫৯	২০০	১৭৩

ক্রীড়ারত পশ্চিম জার্মানীর ক্রিশ্চিয়ান কুনকে ঃ ইনি উইলহেলম বুংগার্টের সহযোগিতায় ডেভিস কাপের ইন্টার জোন সেমি-ফাইনালে ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে স্বদেশকে জোন ফাইনালে তুলেছেন।

ডেভিস কাপ

পুণার ডেকান জিমখানা কোর্টে আয়োজিত সেমি ফাইনালে পশ্চিম জার্মাণী ৫-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন ফাইনালে স্পেনের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। গত মে মাসে বাঙ্গালোরে আয়োজিত পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩-১ খেলায় প্রবল শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে এই ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে দিল্লীতে ১৯৬৬ সালে এবং মিউনিকে ১৯৬৮ সালে ভারতবর্ষ দুবারই ৩-২ খেলায় পশ্চিম জার্মাণীকে পরাজিত করেছিল।

এশিয়ান স্কুল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত প্রথম এশিয়ান স্কুল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয়া ৫টি খেতাব জয়ের সূত্রে (মোট ৬টি খেতাবের মধ্যে) বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া বালকদের দলগত খেতাব ছাড়া ব্যক্তিগত বিভাগে বালকদের ডাবলস এবং মহিলাদের সিংগলস ও ডাবলস খেতাব জয়ী হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া পেয়েছে বালকদের সিংগলস খেতাব।

বালকদের দলগত বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়া ১ম, ইন্দোনেশিয়া ২য়, ভারতবর্ষ ৩য় এবং সিংগাপুর ৪র্থ স্থান লাভ করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 14th August, 1970 শুক্রবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপাঁচুগোপাল দে

চিঠিপত্র

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর আত্মস্মৃতি 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' রচনাটি পড়ে বেশ ভাল লাগছে। অতীতের এই স্মৃতিচারণে ভেসে আসা মুখ ও চরিত্র একত্রে সমাবেশ রচনাটিতে নতুনত্ব এনে দিয়েছে। বস্তুত শ্রীচৌধুরীর এই রচনাটি নাট্যসাহিত্যের একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। কত অজানা তথ্য কত না-জানা ঘটনা আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের অনেক কিছু জানতে সাহায্য করছে। বহুদিন আগে অহীনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল, আজ আবার নতুন করে তাঁর আত্মস্মৃতি পড়ে আনন্দ পাচ্ছি। অহীনবাবু দীর্ঘজীবী হোন। থিয়েটার ও সিনেমা জগতে তাঁর অবদান তুচ্ছ নয়। 'অমৃত'র প্রতিটি পাঠকই আমার সঙ্গে একমত হবেন নিশ্চয়ই।

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়
রাঁচি ৪

নিকটেই আছে

গত দশম বর্ষ অষ্টম সংখ্যার 'অমৃত'তে প্রকাশিত 'নিকটেই আছে' গল্পের বাবসাটা দুধের অধ্যায়ের জন্য সন্দিহসু মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাবেন।

এই প্রসঙ্গে বহুদিনের সঞ্চিত কয়েকটি চিন্তা সম্পাদক মহাশয়কে নিবেদন করছি।

নারাণ ঘোষের দুধের ব্যবসার মত আমাদের এই পোড়া দেশে আরও অনেক ব্যবসা জমজমাট আশা করছি সন্দিহসু মহাশয়ের সোনদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাবো।

গরীবের কণ্ঠরে দুবেলা ভরপেট অন্ন জোগাবার সামর্থ্যেই যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সার্থকতা—আশা করি ভরপেট নেতা এবং সুধীবৃন্দকে এ তথ্যটি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আমরা শুনেছি এজন্য নাকি তাঁরা একদা আটক চাল উদ্ধারের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু তাতে কটা রুই-কাতলা ধরা পড়েছে? স্বল্প-সম্বল লোকেরাই শুধু নিঃসম্বল হয়েছেন। ঘুঘু মজুতদার আরও সতর্ক হয়েছেন।

প্রাক স্বাধীনতাকালে অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা যখন প্রায় চল্লিশ কোটির মত ছিল তখন দেশের খাদ্যাভাব এত তীব্র ছিল না। স্বাধীনতার বাইশ বছর পরে দেখি, উন্নত চাষের ব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদন শতকরা আশী ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে—এবং আর চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টন খাবার আমদানী করাও হচ্ছে। ইতোমধ্যে লোকসংখ্যা বেড়ে নিশ্চয়ই এখনও আশী কোটি হয়নি। তাহলে খাদ্যাভাব হয় কোন যুক্তিতে? আসলে নারাণ ঘোষের দল সেগুলি গায়েব করে দিচ্ছে এবং মদৎ দিচ্ছে শামলদের দল।

পাঁচ সিকে দর দিতে চাইলে মাথা খুঁজেও এক কেজি চাল বাজারে নেই বলে হতাশ হবেন। অথচ পাঁচ টাকা দর দিন, যত গাড়ী চাই এই নারাণ ঘোষ আপনার বাড়ী বয়ে দিয়ে আসবে। অভাব তবে কিসের?

এদের খবর রাজনৈতিক নেতা আর সরকারের লোকেরা জানেন না, একথা কে বিশ্বাস করবে? দুর্বলতা কোথায় কে জানে।

রবীন দাস
জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প
দার্জিলিং।

মুখের মেলা

আবদুল জব্বারের 'মুখের মেলা' অমৃত-এ প্রকাশের পর থেকেই দারুন কৌতূহল নিয়ে পড়ছি। সত্য কথা বলতে কি, চরিত্র চিত্রণে লেখকের মুন্সিয়ানা আছে এবং ক্ষমতাও অনস্বীকার্য। মুখের মেলায় তিনি এমন সব মুখ এঁকেছেন যা আমাদের অনেকের কাছেই ছিল অজানা। সেসব চরিত্র তাঁর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে আমাদের অন্তরে ঘা দিচ্ছে। শুধু চরিত্রই নয়, খাল, বিল, নালা, বন, বাদাড় অর্থাৎ গ্রাম বাংলার সম্পূর্ণ চিত্রটিও তিনি এঁকেছেন একই সঙ্গে। শহরসর্বস্ব জীবনে যখন গ্রামকে ভুলতে বসেছি তখন তিনি আমার মতো অসংখ্য পাঠকের একটি মস্ত উপকার করলেন।

মুখের মেলা যত পড়ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। জমিনের গোলামে মস্তান, পীরিনী বুড়ি, সুরমী বিবি, কাছিম শিকারী, বলাই চাকদার সবাইকে জব্বার সাহেবের লেখার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করেছি। তেমনি, ভাবেই এসেছে পীর আলী মীর। একই আগ্রহে তাঁকেও আপন করে নিতে চেয়েছি। পড়েছিও। কিন্তু এক জায়গায় এসে খটকা লাগলো। তিনি পীর আলীর বকলমে এমন একটি উক্তি করেছেন যা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত। রাঢ় অঞ্চলের লোকেরা 'খড়ের বন' বলে এটা তিনি কিছুতেই মানতে চাননি। এবং বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালীতে সবুজ খড়ের বন লিখেছেন তাও তিনি মানতে চাননি। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক। তাঁকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। 'খড়ের বন' কই কক্ষনো তো শুনিনি মশায়! কোথাও গজিয়েছে নাকি?'

কিন্তু এটুকু জানবার জন্যে তাঁকে এত দূর যেতে হতো না। বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালীতে এক জায়গায় বলেছেন, 'ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বন রেখার ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে (১১৭ পৃঃ প্রথম লাইন, দশম মুদ্রণ, মিত্র ঘোষ সংস্করণ)। এটুকু তিনি দেখে নিলেই পারতেন। জব্বার সাহেবের নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই। থাকলে এরকম অধৈর্যের পরিচয় তিনি দিতেন না। তাছাড়া, সাহিত্যিকের প্রত্যাশিত বিনয়বোধও তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। তিনি বিভূতিভূষণের খড়ের বন ব্যবহারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর জানা উচিত না জেনেশুনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে প্রিয় লেখক সম্পর্কে পাঠকের মোহভঙ্গ ঘটতেও দেরি হয় না। বিনীত

মোহম্মদ তাহের,
মেমারি, বর্ধমান।

অলিখিত কাব্য

টুরে গিয়েছিলুম, অবসর সময়ে চোখ বুলিয়ে নেব বলে, খানকয়েক বই ও মাসিক সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা সংগে ছিল। ১৩৭৫ বাংলার কার্তিক মাসের প্রথম সংখ্যা শারদীয় 'কথা সাহিত্য'খানাও এর মধ্যে ছিল। তাতে শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মশায়ের 'মিলন-মূর্চ্ছনা' শীর্ষক কবিতাটি পড়েছিলাম। মফঃস্বল থেকে ফিরে এসে এই দুদিন হলো ১৪ই শ্রাবণ ১৩৭৭ বাংলার সাপ্তাহিক অমৃত পেলাম। অমৃতের প্রথম দিকেই শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'অলিখিত কাব্য' নামে যে কবিতাটি পড়লাম, আশ্চর্য হলেও সেই একই কবিতা বছর দুই আগে শারদীয় কথা সাহিত্যে 'মিলন মূর্চ্ছনা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু নাম পাল্টে' একই কবিতার একাধিক বার প্রকাশ কি করে সম্ভব হতে পারে? একবার ছাপা হয়ে যায়, তাতো কাগজে আবার ছাপা উচিত নয়।

দিলীপ পুরোকায়স্থ,
কলেজটিলা, আগরতলা।

শা[illegible]চোখে

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা অবলুপ্তির পর জোট বাঁধার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য পাঁয়তারা দেখলে মনে হবে ফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নে কোন দল কোন দিকে যাবে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু আসলে তা নয়। মানসিক প্রস্তুতি বলতে গেলে সম্পূর্ণই হয়ে গেছে। তবে আদর্শের ভূমিকা এ ব্যাপারে খুবই গৌণ। মুখ্যত কিভাবে সংহতিকরণ হলে বেশী আসন লাভ করা যাবে সেটাই হচ্ছে চিন্তার মূল বিষয়।

অনেকেরই ধারণা ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেসের একাধিপত্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিগুলির আদর্শগত সংহতিকরণ ঘটবে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তা ঘটবার সম্ভাবনা খুবই কম। বরঞ্চ আসনের লোভে দলগুলির মধ্যে আরও ভাঙন ধরবে বলেই মনে হয় এবং তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আগে বামপন্থী দলগুলির কাছে আসল প্রশ্ন ছিল যেন তেন প্রকারেণ নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে একটি মোর্চা তৈয়ার করা। যাতে নির্বাচনে কংগ্রেসের মোকাবেলা করা যায়। ১৯৬৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর সেই চিন্তা তিরোহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে বামপন্থীদের ভাবনা হচ্ছে ক্ষমতার লড়াইয়ে কে কাকে পর্যুদস্ত করে গদী দখল করতে পারবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাকেও ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন।

অষ্টবামের যে জোট বর্তমানে আছে তাঁদের ঐক্য অদ্যাবধি দুটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগপৎ দুদিক সামাল দেবার বাসনা নিয়ে তাঁরা বলছেন, সকল বর্ণের কংগ্রেসকে কবর দিতে হবে আর বাম-কম্যুনিস্টদের আগ্রাসী ও বিভেদপন্থী নীতিকে পরাস্ত করে নির্বাচনী রণসাধ মিটিয়ে দিতে হবে। এই জন্য তাঁরা জানাচ্ছেন, বাংলার মানুষকে এই দুই গোষ্ঠীর হাত থেকে বাঁচতে হলে অষ্টবামকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অন্যদিকে বাম কম্যুনিস্ট পরিচালিত ছয়-পার্টি জোট কলেবর বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট ও বাংলা কংগ্রেস ছাড়া পূর্বতন ফ্রন্ট শরীকদের অন্যান্যদের সম্বন্ধে তেমন গরম কিছু বলছেন না। অবশ্য মাঝে মাঝে এস ইউ সিকে তাঁদের "আগ মার্কা" মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভূমিকার জন্য কটাক্ষ করলেও—বাম কম্যুনিস্টরা একেবারে কাঁধে গদা নিয়ে এস ইউ সি'র বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন না। হালফিল সি পি এম অবশ্য শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রণ-হুঙ্কার দিচ্ছেন। তবে শাসক কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে এখনও পুরোপুরি জেহাদে নামেন নি। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দিরাজীকে তাঁরা এখনও অসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সাহস পাচ্ছেন না। অতীতে নন্দজী ও চাবনজীর বিরুদ্ধে (অবশ্য যখন তাঁরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন) কতই না বিষোদ্গার করা হয়েছে। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব না এনে শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বিশেষভাবে সমালোচনা করা হত। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সি আর পি তুলে নেওয়ার জন্য হুমকী দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ইন্দিরাজীর পুলিশ কি নির্যাতন করছে সে কথা বলা হচ্ছে না। এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে হয়ত সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তবে মনে হয়, এখনও সরাসরি ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সি পি এম প্রস্তুত নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইন্দিরাজী যে প্রগতিশীল একথা পরোক্ষভাবে তাঁরা স্বীকার করে চলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য লাগে তখনই যখন সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, আদি কংগ্রেস সম্বন্ধে ভাববার কিছুই নেই। কেননা তাঁদের যে শক্তি আছে আর একটি নির্বাচন হলেই তা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস যখন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মশায়ের আছে তখন মহাজোটের শক্তির কাল্পনিক চেহারা সৃষ্টি করে এত হৈ-চৈ করা কেন? শ্রীদাশগুপ্তের এই নতুন কথার পেছনে কোন রাজনৈতিক কৌশল কাজ করছে কিনা এই প্রশ্ন স্বভাবত মনে আসতে পারে। বক্তব্যের ধরণ দেখে কেউ যদি বাঁশ বনে ডোম কানার মত ভাব দেখেন সে আলাদা কথা। তবে বোঝা যাচ্ছে সি পি এম-এর কৌশলের পরিবর্তন হচ্ছে। মহাজোটের এক শরিকের সম্বন্ধে অন্তত ধারণা পাল্টাচ্ছে। সি পি এম-এর এই কৌশলভিত্তিক উক্তির পেছনে তাঁদের জোটের যে দুর্বলতা রয়েছে সেকথা পরিষ্কার বোঝা যায়। বস্তুত পক্ষে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া ঐ জোটের অন্যান্য দলগুলির অস্তিত্ব প্রায় শূন্য বলেই ধরা যেতে পারে। সে জন্য তাঁরা আগে ভাগেই বলতে শুরু করেছেন, আরও কয়েকটি দল তাঁদের জোটে ভিড়বেন এবং কিছু দলের ভগ্নাংশও তাঁদের সঙ্গে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তাঁদের অনুমান যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, আর এস পি নেতা শ্রীমাখন পাল ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষের কথোপকথন। পাঠকরা অবশ্যই জানেন আর এস পি অষ্টবাম কি ষড়বাম কোন জোটেই অদ্যাবধি যোগ দেন নি। তাঁরা এখনও পর্যন্ত সক্রিয় নিরপেক্ষতার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যদি বিগত যুক্তফ্রন্টের একটি [illegible] ব্যবহার বিধি থাকত তবে সি পি এম তার আগ্রাসী নীতি চালাতে পারতো না। আর ফ্রন্টকে যদি সংগ্রামের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা হোত তবে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন আসত না। অতএব বর্তমানে যদি নতুন করে এই দুই নীতির উপর নির্ভরশীল একটা ফ্রন্ট হয় তবে পশ্চিম বাংলায় বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আর এখন থেকেই জোটে ভাবতে বিকল্পের [illegible] ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে। শ্রীপাল নাকি মনে করেন অষ্টবাম যে নীতি নিয়ে চলছেন তাতে শুধু সি পি এম-এর বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভিকরণ ও বিদ্বেষমূলক আবহাওয়াই তৈয়ার করা হচ্ছে মাত্র। তাই শ্রীপাল নাকি অষ্টবামের সঙ্গে মিতালী কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি অবশ্য বাংলা কংগ্রেসের সম্বন্ধেও কথা বলেছেন। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আর কিছু নয় [illegible] করা। কেননা বামপন্থী সহকর্মীদের সঙ্গে যেখানে মিলন হবে সেখানে বাংলা কংগ্রেসকে কি প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে তিনি সহযোগিতা করে তুলতে পারেন। শ্রীপালের বক্তব্যের পিছনের দুটি উদ্দেশ্য। তার মধ্যে একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে সি পি এম-এর প্রতি যে বিরূপ মনোভাব আছে তা নিরসন করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইতিমধ্যে আর এস পি'র রাজ্য কমিটির দুটি বৈঠক হয়ে গেছে। সেখানে সি পি এম-এর দিকে যাওয়ার প্রস্তাবটি পাশ করানো যায় নি। কারণ, যাঁরা সক্রিয়ভাবে মাঠে ময়দানে কাজ করছেন সেই সমস্ত আর এস পি কর্মীরা সি পি এম এর আসল চেহারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বিশেষ করে সর্বশেষ কাড়-মাঝ গ্রামের ঘটনা সি পি এম-এর ভয়াল

ভয়ঙ্কর রূপ নাকি তাঁদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। এমন কি অতীতে আর এস পি নেতা শ্রীবাণী চক্রবর্তী যিনি শরিকী ঘটনার মার্কসীয় ব্যাখ্যা দিয়ে র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলকে মোহাবিষ্ট করে রাখতেন তিনিও স্বয়ং এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে সি পি এম-এর সঙ্গ আর নাই একথা বলে শপথ গ্রহণ করেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, মাঠে ময়দানে এমনকি কোল-কাতায় জনসভা করে সি পি এম-এর ভয়ঙ্কর রূপ জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। এইসব তথ্যের বিরুদ্ধে শ্রীপালের বক্তব্য হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে এই যে, তাঁরা ইস্যুর উপর নির্ভর করেই সি পি এম-এর বিরোধিতা করেছেন। সার্বিক বিরোধিতা তাঁদের নেই। শ্রীপাল ও শ্রীঘোষের কথোপ-কথন থেকে যদি কোন সিদ্ধান্ত করা হয় তা হচ্ছে আর এস পি ষড়বামের প্রতি ইতিমধ্যেই ঝুঁকে গেছে। শুধু কালক্ষেপণ করে ক্যাডারদের ও কিছু নেতার মনে সি পি এম সম্বন্ধে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব আছে তা দুর্বল স্মৃতিপট থেকে মুছে দিতে চাইছেন। যাতে মিলনটা অনায়াসে ঘটতে পারে। অবশ্য পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, আর এস পি-র কাছে কেরালার মার্কসবাদীরা পরম শত্রু আর পশ্চিম বাংলায় পরম মিত্র এ কোন ধরনের রাজ-নীতি? রাজনীতিটা আর কিছুই নয়; কেরলের রাজনীতির ইতিহাস যাঁরা জানেন না তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঐ রাজ্যের আর এস পি বরাবরই সি পি এম বিরোধী। অর্থাৎ সি পি এম জন্মলাভের পর থেকেই ঐ রাজ্যে সি পি এম-এর সঙ্গে আর এস পি-র মিলন ঘটেনি। তবে যে মিলনের আভাস আসেনি একেবারে, তা নয়। সেটা হচ্ছে টগর বোষ্টমী ও নন্দ মিস্ত্রির ঘর করার মত। একসঙ্গে ঘর করেছে কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেয়নি। আর এ রাজ্যে বরাবরই আর এস পি নেতৃবৃন্দ মার্কসবাদী-দের অনুগামী। উপরে উপরে ঝগড়ার ভাব থাকলেও আসল সময়ে এক। কেরলের আর-এস-পি আসনধর্মী রাজনীতি করেনি বলে একবার রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছিল। তাই সেখানকার আর-এস-পি নেতা বেবী জন সম্পর্কে শ্রীপ্রমোদ দাশ-গুপ্ত কটাক্ষ করলেও এই রাজ্যের নেতৃবৃন্দ মুচকি হেসে জবাব দেওয়া থেকে নিরস্ত থাকেন। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার আসন শক্তির চাবিকাঠি মার্কসবাদী কম্যু-নিস্টদেরই হাতে। তাই 'ধীরে রজনী ধীরে' বলে শ্রীপাল নিজের ক্যাডারদের একটু খেলিয়ে নিয়ে বাম কম্যুনিস্টমুখী করে তুলছেন। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, বর্তমান অবস্থা যদি বজায় থাকে তবে আর এস পি মানসিক দিক থেকে ষড়বামে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

এবার লোকসেবক সঙ্ঘের কথা ধরা যাক। এই পুরুলিয়ার দলটি পূর্বতন ফ্রন্টের অংশীদার ছিল। ফ্রন্ট সরকার গদীতে থাকাকালীনই এই দলের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি ও এস ইউ সি-র সঙ্গে এঁদের মত-বিরোধ গভীর হয়ে উঠে। পুরুলিয়ায় এল-এস-এস একম্ অদ্বিতীয়ম্ ছিল। কিন্তু অধুনা অন্য দলের সংগঠন গড়ে ওঠার ফলে এল-এস-এস তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ফলে, অষ্টবামের দিকে ঝোঁকবার আশা নেই। এবং মতান্তর এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে যে 'আগস্ট বিপ্লব দিবস' উদযাপনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছে সেই কমিটি থেকে পর্যন্ত লোকসেবক সঙ্ঘ নিজেদের সরিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ এস-ইউ-সি এই কমিটির এক অংশীদার। কাজেই সরাসরি সি পি এম জোটে না গেলেও ওদের সঙ্গে আসন ভিত্তিক সম-ঝোতা করেই থেকে যাবেন তাঁরা, এটা স্থির নিশ্চয়।

আর বাকী রইল বাংলা কংগ্রেস। এই দল বলছেন তাঁরা 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' চান। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলতে তাঁরা পরোক্ষে বোঝাতে চাইছেন যে এই ফ্রন্টে তাঁদেরই কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব থাকবে। বস্তুতপক্ষে তত্ত্ব-গত দিক থেকে বিচার করলে অষ্টবাম ও ষড়বাম দুটি 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টি হালে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা 'বামপন্থী গণ-তান্ত্রিক ফ্রন্ট' গড়ে তুলবার জন্য চেষ্টা করবেন। এর অর্থ তাঁদের এই ফ্রন্টে বাম-পন্থীদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব থাকবে। আর অষ্টবামের মধ্যে যেহেতু ডান কম্যুনিস্টরা বড় দল অতএব নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই তাদের হাতে থাকবে। বাংলা কংগ্রেস জোটে এলেই একটি আনুষ্ঠানিক বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি সবার উপরে উপবিষ্ট থাকবেন, বাংলা কংগ্রেস এ অবস্থা এবারে মেনে নিতে রাজী নয়। কারণ গতবারে যে যুক্তফ্রন্ট ছিল তাকেও বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলা যায়। কিন্তু শ্রীমুখার্জির অভিজ্ঞতা মনে হয় এবার তাঁকে আগেই সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য মসলা জুগিয়েছে। শ্রীসুশীল ধাড়া বলেছেন : বাম কম্যুনিস্ট, জনসঙ্ঘ ব্যতীত

(অবশ্য মুশ্লিম লীগও আছে) আর সকল দলের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন তাঁর পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে রূপ দেবার জন্য। উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে যাতে বাংলা কংগ্রেস সমর্থ হয়। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসকে নিয়ে একটি অঘোষিত জোট বেঁধে থাকবে। আর অন্টবামের কাছ থেকে কিছু শর্ত আদায় করে নেবে। আদি কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দেবে না। কারণ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইন্দিরাজীর প্রতি যদি তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটে—তবে শাসক কংগ্রেস এই রাজ্যে যে নয়া সংহতি গড়ে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে তাতে আদি কংগ্রেস মদৎ দেবে না। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গের আদি কংগ্রেস একান্তভাবে শ্রীঅতুল্য ঘোষের অনুগামী। তাঁর সম্মানের অমর্যাদা ঘটিয়ে তাঁরা কোন সমঝোতায় যেতে পারে না। তাতে ফলাফল যাই হোক না কেন। কাজেই বাহ্যত ধোঁয়াটে মনে হলেও আসলে তা নয়। তিনটি ফ্রন্টের রূপ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বড়বাম যা আছে তার সঙ্গে যোগ হবে আর-এস-পি আর সম্ভবত এস-এস-পি'র ভগ্নাংশ, অর্থাৎ যাঁরা নারিকুল গোষ্ঠী নামে পরিচিত। বাম-কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যেই সেই অংশটাকে একটু সুনজরে দেখতে শুরু করেছে। আর লোকসেবক সঙ্ঘ আসলে আঁতাত করে ঐ জোটের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে। আর অন্টবামে যোগ হবে পশ্চিম বাংলার প্রগ্রেসিভ মুশ্লিম লীগ। রাজনৈতিক হাওয়া যেভাবে বইছে অন্টবামের শরিকদের মরীয়া হয়ে বর্তমান ঐক্যকে আরও জোরদার করবার চেষ্টা করা হবে। কারণ, সি পি এম-এর প্রতি বর্তমানে যে বৈরীভাব এই জোটের প্রত্যেক শরিক পোষণ করছেন তাতে ওঁদিকে ভিড়বার চেষ্টা করলেই ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন ছাড়া তাঁদের আর কিছু পাবার আশা থাকবে না। শাসক কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও প্রজা সমাজতন্ত্রী দল আর একটি অঘোষিত জোটে আঁতাতবদ্ধ হয়ে থাকবে। ইন্দিরাজীর প্রতি বাংলা কংগ্রেস ও ডান কম্যুনিস্টদের আস্থা থাকার ফলে হয়ত বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের তাঁদের সঙ্গে একটি অলিখিত চুক্তি থাকতে পারে, যাতে ক্ষেত্রবিশেষে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটানো যায়। উদ্দেশ্য বাম কম্যুনিস্টদের খায়েল করা। অবশ্য, বাম কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যেই বলেছেন—শাসক কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টিকে পরাজিত করবার জন্য কৌশল হিসাবে তাঁরা কিছু কিছু কেন্দ্রে প্রার্থী নাও দাঁড় করাতে পারেন। কিন্তু এত নিন্দার পাত্র হয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি ধন্যবাদার্হ। কারণ তাঁদের মুখপাত্র বলেছেন, কংগ্রেসকে হারাবার জন্য তাঁরা দরকার হলে বাম কম্যুনিস্টদের সাহায্য করতেও দ্বিধা করবেন না।

এখন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য প্রতীক্ষা। অনেকে মনে করছেন, কেরালার ফলাফল না দেখে এখানকার নির্বাচনের দিন ধার্য করা হবে না। তা না করেই বা উপায় কি? একে একে যেভাবে প্রায় প্রতি রাজ্যে অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠছে তাতে একমাত্র সর্বভারতীয় নির্বাচনের কথা বলেই পশ্চিম বাংলার নির্বাচন আটকানো যেতে পারে। নতুবা ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে কনসেনসাস্ প্রায় হয়েই গেছে।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

গত ১ আগস্ট বিকাল সাড়ে চারটায় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ছয়জন সহকর্মী ত্রিবান্দ্রমে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথের কাছে মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দিয়ে আসেন। ঐদিন সন্ধ্যাবেলাতেই রাজ্যপালের একজন বিশেষ বার্তাবহ বিমানে দিল্লী উড়ে গেলেন রাজ্যপালের রিপোর্ট নিয়ে। রাষ্ট্রপতি শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কট-গিরির হাতে রাজ্যপালের রিপোর্ট গিয়ে পৌঁছল পরদিন। রাষ্ট্রপতি সেই রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথন লিখেছেন, তিনি আর একজন মুখ্যমন্ত্রী খুঁজে পাচ্ছেন না এবং নতুন একটা মন্ত্রিমণ্ডলীও গঠন করতে পারছেন না। তিনি আরও লিখলেন যে, সংবিধান অনুসারে সরকার চালান অসম্ভব হয়ে উঠেছে, এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন।

৪ আগস্ট তারিখে প্রচারিত হল রাষ্ট্রপতির ঘোষণা। সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হল। ১৪ বছর আগে যেদিন প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য এবং মালাবার জেলার কিছু অংশ নিয়ে কেরল রাজ্য গঠিত হয়েছিল, তারপর থেকে এই পঞ্চম-বার সেখানে প্রবর্তিত হল দিল্লীর শাসন।

শ্রীঅচ্যুত মেননের সরকার নয় মাস চলার পর ও বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ছয় সপ্তাহ পর এল এই রাষ্ট্রপতির শাসন। এই নয় মাস কেরলের মিনি ফ্রন্ট সরকারকে একদিকে সি পি এম-এর প্রবল বিরোধিতা আর একদিকে ফ্রন্টের ভিতর গোলযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পর যে ছয় সপ্তাহ শ্রীঅচ্যুত মেনন তাঁর মন্ত্রিসভা টিঁকিয়ে রেখেছিলেন সেই ছয় সপ্তাহ ধরে সি পি এম ক্রমাগত মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করে এসেছে।

২৬ জুন রাজ্যপালকে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মেনন পদত্যাগ করেননি কেন এবং এখনই বা করলেন কেন? সংবিধান অনুযায়ী অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে পদত্যাগ করতে বাধ্য নন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ব্যাপারে কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। পদত্যাগ করে চলে গেলে সেটা সম্ভব হত না। অবশ্য নির্বাচন কমিশনার আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর কেরলের মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করার পর এখন আর তাঁর বিদায় দিতে বাধা নেই। 'মিনি-ফ্রন্ট সরকারের উপস্থিতি অবাধ ও ন্যায্য নির্বাচনের পক্ষে বিঘ্নকর', এই অভিযোগ তাঁরা উঠতে দিতে চান না বলেই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন।

অবশ্য এই ব্যাপারে একটা ভিন্ন ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে মেনন মন্ত্রিসভায় জোট ভেঙে পড়ছিল এবং এই ভাঙনের চেহারাটা যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে, সেজন্যই তিনি তাড়াতাড়ি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। যাঁরা এই ব্যাখ্যা দেন তাঁরা নিশ্চয়ই আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন যে, মেনন মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের পদত্যাগ পত্র দেওয়ার আগেই আই এস পি দলভুক্ত মন্ত্রী শ্রীকোরান মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর দল থেকেই তাঁকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, দু'একদিনের মধ্যে যখন গোটা মন্ত্রিসভাই ইস্তফা দিচ্ছেন, তখন তিনি একা যেন আর আলাদাভাবে পদত্যাগ না করেন। কিন্তু শ্রীকোরান তাঁর সেই অনুরোধ রাখেননি। যদিও সে সময়ে শ্রী কোরান বলেছিলেন, তাঁর এই পদত্যাগের অর্থ এই নয় যে, তাঁর দল যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে দিল, তাহলেও পরে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এই ধারণাই সৃষ্টি হচ্ছে যে, আই এস পি ফ্রন্টের সঙ্গে সংস্রব বর্জন করেছে।

এই আই এস পি-ই দলের বিদ্রোহীদের নিয়ে গঠিত পি এস পি-কে ফ্রণ্টে নেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিল এবং সেই কারণেই গত জুন মাসের শেষের দিকে মেনন মন্ত্রি-সভায় সংকট ঘনিয়ে এসেছিল।

যদিও সি পি এম এবং (তার সঙ্গে সঙ্গে এস এস পি-ও) আগামী সেপ্টেম্বরে কেরলে নির্বাচন করার তীব্র বিরোধিতা করছে এবং এই নির্বাচন ঠেকাবার উদ্দেশ্যে তারা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেছে আবার রাষ্ট্রপতির কাছেও দরবার করছে, তাহলেও সি পি এম সমেত সকল দলই আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখেই কেরলের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ভোট নেওয়া হবে ধরে নিয়ে তৈরী হচ্ছে।

সি পি আই কেরলে আসন বণ্টনের ভিত্তিতে শাসক কংগ্রেস দলের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে খুবই উদ্‌গ্রীব। তারা এই বিষয়ে তাদের আগ্রহও প্রকাশ করেছে। কিন্তু শাসক কংগ্রেস দল এখন পর্যন্ত এ-বিষয়ে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসতে চাইছে না।

সম্প্রতি শাসক কংগ্রেস দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়ে গেল। বৈঠকে নাকি মোটামুটি এরকম একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, কেরলের আসন্ন নির্বাচনে আসন বণ্টন সম্পর্কে একটা সম-ঝোতায় আসার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পরই দলের পার্লামেণ্টারি বোর্ডের যে অধিবেশন হল, সেখানে কিন্তু সিদ্ধান্তটা একটু অন্য রকম হল। স্থির হল যে, দলের হাই-কম্যাণ্ডের একজন প্রতিনিধি কেরলে গিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যা-লোচনা করে আসবেন। তাঁর সেই সফরের ফলাফল জানার পর পার্লামেণ্টারি বোর্ড এবিষয়ে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। প্রকাশ, বোর্ডের একজন সদস্য উল্লেখ করেন যে, গত নির্বাচনে কংগ্রেস কেরলে শতকরা ৩৬টি ভোট পেয়েছিল এবং যুব কংগ্রেসের চেষ্টায় সেখানে দলের জনপ্রিয়তা এখন আরও বেড়েছে। সুতরাং, তিনি মনে করেন, কংগ্রেস নিজের চেষ্টায় কত বেশী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে সেটাই বিবেচনা করে দেখা উচিত।

দলের সভাপতি শ্রীজগজীবন রামও এ-বিষয়ে একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা যখন নির্বাচনে লড়ি,

তখন আমরা ক্ষমতা দখল করতেই চাই।' তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হল কংগ্রেস নিজের জোরে ক্ষমতা দখল করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন কিনা, তখন তিনি জবাব দেন, 'সেটা যাচাই করে দেখতে হবে।'

ত্রিবান্দ্রমে শ্রীঅচ্যুত মেননকেও একই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, শাসক কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভ করার জন্য যুক্তফ্রণ্ট ভবিষ্যৎ সরকারের নেতৃত্ব শাসক কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছে কিনা। উত্তরে শ্রী মেনন বলেন যে, কংগ্রেস যদি সেটা চায়, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই তার বিরোধিতা করবেন। তবে, শাসক কংগ্রেস যদি কেরলে শক্তিশালী হতে চায়, তবে এই ধরনের কোন দাবী করবে না। তাঁর একান্ত আশা এই যে, শাসক কংগ্রেস দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোয়ালিশন-কেই সরকার গঠনে সাহায্য করবে।

শাসক কংগ্রেসের আর একটা দ্বিধা আছে মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা করার প্রশ্নে। শাসক কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীএইচ এন কাশ্তেন অবশ্য কেরল সফর করে এসে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন, কেরলে কোন দলই মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক বলে মনে করে না। ঐ রাজ্যের শাসক কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীহেনরি অস্টিনও ওয়ার্কিং কমিটিকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পাঞ্জাবে অকালী দলের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে গিয়ে কংগ্রেস হাই-কম্যান্ডকে দলের ভিতর বেশ কিছু কথা শুনতে হয়েছে। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম মজলিস ও মুসলিম লীগ যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাতেও শাসক কংগ্রেস দলে নেতাদের উদ্বেগের কারণ ঘটছে। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটিতে সম্প্রতি যে নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে মুসলিম লীগ দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। খাস দিল্লীতে মুসলিম মজলিস গঠিত হয়েছে এবং শাসক কংগ্রেসের একজন সদস্য দলত্যাগ করে দিল্লীতে মুসলিম লীগ গঠন করেছেন এবং তার সভাপতি হয়ে বসেছেন।

●

হিমাচল প্রদেশে ভারতের অষ্টাদশ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। লোকসভায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে এই অঞ্চলকে একটি পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র বিল আনা হবে।

ভারত সরকার ঐ ঘোষণার দ্বারা এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের একটি দাবী মেনে নিলেন। হিমাচলীদের পৃথক সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলি যে অর্থনৈতিক অবিচার করছে তা থেকে হিমাচলবাসীদের রক্ষা করার জন্য তাঁরা পৃথক রাজ্যের দাবী জানিয়ে এসেছেন। হিমাচলের নেতারা বলেছেন যে, সেখানকার জমির উপর প্রতিবেশী হরিয়ানা ও পাঞ্জাব যে ক্রমাগত দাবী জানিয়ে আসছে সেটাও বন্ধ করা যাবে যদি হিমাচল প্রদেশকে একটি পূর্ণ মর্যাদা-সম্পন্ন রাজ্যে পরিণত করা যায়। তাঁরা আরও বলেছেন যে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার চেয়েও হিমাচল প্রদেশ আয়তনে বড় এবং তার প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। অঞ্চলটিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়। ভাঙরা ও পঙ্গা বাঁধ তৈরী করতে গিয়ে হিমাচলের লক্ষ লক্ষ একর উর্বর জমি জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ তার ফলে যারা উৎখাত হয়েছে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়নি। এইসব পরিকল্পনায় এবং যোগীন্দ্র-নগর ও যমুনা বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় যে বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে তার ন্যায্য ভাগও কিন্তু হিমাচল পাচ্ছে না। প্রতিবেশী যে রাজ্যগুলি তার জল ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে তাদের কাছ থেকে সে দশ কোটি টাকা রয়্যালটি পেতে পারে; কিন্তু তা থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

হিমাচল প্রদেশ পৃথক রাজ্যে পরিণত হলে সরকারী বাজেট প্রতি বছর অনুমান প্রায় দশ কোটি টাকা ঘাটতি হবে। এই ঘাটতি কি করে মিটবে সে বিষয়ে হিমাচল প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসারদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের অফিসারদের বক্তব্য হচ্ছে, সেখানকার সরকার প্রতি বছর যে ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করেন সেটা হচ্ছে ঐ অঞ্চলের মোট উৎপাদনের অর্ধেক। সুতরাং, স্থানীয় সম্পদ থেকে বাজেটের ঘাটতি মেটান সম্ভব নয়।

যে বিল আনা হচ্ছে তার মধ্যে সম্ভবত এমন একটা সর্ত থাকবে যে, আগামী দশ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হিমাচল প্রদেশের ঘাটতি মেটাবার দায় বহন করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার হিমাচল প্রদেশের দাবী মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকগুলি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল থেকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই দাবীতে মণিপুরে 'বন্ধ' পালন করা হয়েছে এবং ত্রিপুরা ও দিল্লীকেও পৃথক রাজ্য পরিণত করার দাবী নূতন করে তোলা হয়েছে।

●

পশ্চিম এশিয়ায় তিন মাসের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব দিয়েছে ইজরায়েল সেটা মেনে নিয়েছে। এর আগে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং জর্ডানও এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে।

কিন্তু এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ফলে পশ্চিম এশিয়ার দুই যুদ্ধ শিবিরেই ভাঙন দেখা দিয়েছে। ইজরায়েলের ভিতরে দক্ষিণ-পন্থী জাতীয়তাবাদী দল গহল পার্টি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে। এ দল শ্রীমতী গোল্ডা মেইয়ারের কোয়ালিশন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। তেল আভিভের পার্লামেন্টে শ্রীমতী মেইয়ারের অবশ্য এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।

অপরপক্ষে, আরব শিবিরেও এই প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। ইরাক অভিযোগ করেছে যে, এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে সংযুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্র ও জর্ডান প্রকৃতপক্ষে প্যালেস্টিনিয়ান শরণার্থীদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে চলেছে।

৭-৮-৭০ —পুন্ডরীক

আমার কথা ঃ ত্রৈলোক্য মহারাজ

"আমাদের পুরোন বিপ্লবীদের সকলেরই পরপারের ডাক এসেছে.....নতুন ভারত গড়ে তোলার দায়িত্ব যুবকদের নিতে হবে। বিপ্লবীদের সংগ্রামে স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু যে স্বাধীনতার কল্পনা করে তাঁরা জীবনপণ লড়াই করেছেন, তা এখনও স্বপ্ন।.....ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন ইতিহাস এযাবত রচিত হল না, এটা গুরুতর অপরাধ। সরকারের এই অবহেলার জন্যই দেশের যুবকরা দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হওয়ার মত কোন ইতিহাস বা আদর্শ তাদের সামনে পাচ্ছে না।"

*

স্বাধীনতা লাভের পর জাতি গঠনের বা জাতীয় চরিত্র গঠনের কোন চেষ্টা হয় নাই। আমাদের ছেলেরা শৈশব হইতে দেখিতে পায়, দুর্নীতির আশ্রয় না নিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না, ঘুষ না দিলে কোন কাজ হয় না, প্রচুর অর্থ উপার্জন হয় না। যাহার প্রচুর অর্থ আছে তিনিই বড়-লোক তিনিই দেশের গণমান্য নেতা, তিনিই সুখী। যাহারা সৎলোক, সাধারণতঃ তাহারা গরীব, কেহ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না।

বর্তমানে প্রয়োজন সমাজ-সংস্কার। দরকার দূষিত আবহাওয়ার পরিবর্তন করিয়া নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা। তাহার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। দেশপ্রেম থাকিলে প্রত্যেকেই মনে করিবে আমি জাতির সেবা করিতেছি, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইবে, তখন সরকারী কর্মচারীরা ঘুষ লইতে সাহসী হইবে না, লজ্জা বোধ করিবে। ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিবে না, মনে করিবে আমার জাতি দুর্বল হইয়া পড়িবে। যাঁহারা সমাজ সংস্কার করিবেন, ভবিষ্যৎ জাতি গড়িয়া তুলিবেন, তাঁহাদের প্রথমে আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে, নতুবা কেহ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না। অবশ্যই বর্তমান অবস্থার মধ্যেও কারাসংস্কার চলিতে পারে এবং সংস্কারের প্রয়োজনও আছে। তবে জেলের কয়েদীদের চরিত্র সংশোধনের পূর্বে, জেল কর্মচারীদের এবং দেশের নেতাদের চরিত্র সংশোধন প্রয়োজন।

*

এই দেশ, পূর্ববঙ্গ বা পাকিস্থান আমার দেশ, আমার পিতৃ-পিতামহের দেশ। এই দেশে আমার জন্মগত অধিকার। আমার মাতৃভূমি, আমার পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি জড়িত সোনার বাংলা, কেন আমি ছাড়িয়া যাইব? আমি কি এতই ভীরু? আমি কেন নিজ দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যাইয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিব? আমার অধিকার আমায় রক্ষা করিতে হইবে। আমার অধিকার যদি আমি রক্ষা না করি, তবে সে দোষ আমার নিজের, অপরের নয়। পশুর মত বাঁচিয়া লাভ কি? ভীরুর কোন স্থান নাই। ভীরু পদদলিত হইবে লাঞ্ছিত-অপমানিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। শক্তিমানকে সকলেই ভয় পায়। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা নিজ দেশে অপরের অনুগ্রহের উপর থাকিবে না।—জিম্মি হিসাবে থাকিবে না, তাহারা থাকিবে তাহাদের প্রতিভার উপর, বাহুবলের উপর।

*

আমার জীবন সফল হয় নাই।.....যে উদ্দেশ্য লইয়া জীবন প্রভাতে ঘরের বাহির হইয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হয় নাই—আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারি নাই। আমার যৌবনে যখন আমার ২৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, ডাণ্ডাবেড়ী পায়, ক্ষুদ্র নির্জন কক্ষে দিনরাত্রি যখন আমি আবদ্ধ, তখন মনে করি নাই আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনও আমার মনে এই ধারণাই ছিল যে, ২৫ বৎসর আর কয়দিন, দেখিতে দেখিতে ২৫ বৎসর কাটিয়া যাইবেই।......

আমার স্বপ্ন সফল হয় নাই, —আমি সফলকাম বিপ্লবী নই।......

বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, বিপ্লবীরা ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে পারে নাই।.....বৈপ্লবিক নেতৃত্বের পতনের কারণ বিপ্লবীদের অসফলতা এবং মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ প্রভাবশালী নেতাদের নূতন মতবাদসহ আগমন। বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় দেশের জনসাধারণ মহাত্মার নূতন আন্দোলনে মাতিয়া উঠিল। কোন কাজ একবার ব্যর্থ হইলে লোকের আকর্ষণ বা বিশ্বাস থাকে না, তাহার পুনরাবৃত্তি চলে না....

বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, ইহার কারণ এই নয় যে, বিপ্লবীরা কপট ছিল। বিপ্লবীরা ফাঁসি, দ্বীপান্তর দণ্ডের মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছে তাহারা কপট ছিল না, ভীরু ছিল না। বিপ্লবীদিগকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

সম্পাদকীয়

মহারাজের জীবনাবসান

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের অবসান ঘটল বলা চলে। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক মহারাজ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশের মৈত্রীর জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি ভারতে এসেছিলেন পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে। ভারতে তাঁর আত্মীয়স্বজন, অগণিত গুণগ্রাহী ও বন্ধুবান্ধবের কাছে তিনি এই কথাই বলে গেছেন যে, পাকিস্তানের জনগণ ভারতের জনগণের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। পাকিস্তানে নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে এই দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বের পথ হবে প্রশস্ত। মহারাজ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যে-সংগ্রাম করেছেন এবং যে-স্বপ্ন দেখেছেন তাকে সার্থক করতে পারলেই তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান জ্ঞাপন করা হবে। মহারাজ আমাদের কাছে শুধু বিপ্লবেরই প্রতীক নন, তিনি শান্তি ও মৈত্রীরও প্রতীক। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

জাতীয় গ্রন্থাগারে অশান্তি

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে অশান্তি বাসা বেঁধেছে। জ্ঞানচর্চার এই কেন্দ্রটিতে কেন আজ স্বস্তি নেই তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দুটি তদন্ত কমিটি এবং একটি পর্যালোচনা কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট কোনটিই পুরো প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু অশান্তি যেমন ছিল তেমনি আছে। সাম্প্রতিক সরকারী নির্দেশের যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায় যে, জাতীয় গ্রন্থাগারে একটা বড় রকমের রদবদল আসন্ন। প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান শ্রী বি এস কেশবনকে ডাইরেকটর পদের মর্যাদা দিয়ে আবার আনা হচ্ছে। বর্তমান লাইব্রেরিয়ান, যাঁকে কেন্দ্র করে এই অশান্তি, তাঁকে দিল্লীতে একটি সুখকর পদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং বর্তমান ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান যিনি স্থানীয় বিদ্বৎসমাজে জনপ্রিয় তাঁকে প্রকারান্তরে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। অতি চমৎকার ব্যবস্থা! আমলাতন্ত্র আজ কী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান দুরবস্থা তার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

স্বাধীনতা লাভের পর গ্রন্থাগারটিকে নতুন করে পুনর্গঠিত করা হয়। বেলভেডিয়ারে প্রশস্ততর স্থানে একে নিয়ে যাওয়া হয়। গত দুই দশকে নতুন প্রজন্মের অনেক গবেষক, পড়ুয়া এবং লেখক এই গ্রন্থাগারের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তবুও মাঝে মাঝেই কথা উঠেছে, জাতীয় গ্রন্থাগারকে দিল্লীতে সরিয়ে নেবার। যুক্তি হল এই যে, বিদেশীরা নাকি কলকাতায় এসে এই গ্রন্থাগার দেখা এবং ব্যবহারের সুযোগ পান না। রাজধানীতেই সবকিছু থাকতে হবে—এ যুক্তি যেমন হাস্যকর তেমনি অর্থহীন। রাজধানীর প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় একটি গ্রন্থাগার সেখানে গড়ে তোলা যায়। এবং বিদেশীরা যদি ভারতেই আসতে পারেন তাহলে গবেষণার জন্য কলকাতায় আসতেই বা দোষ কী?

যাই হক, জাতীয় গ্রন্থাগারকে দিল্লী স্থানান্তরের হাত থেকে রক্ষা করা গেলেও একে আভ্যন্তর গলদ থেকে মুক্ত করা যায়নি। শ্রীকেশবনের আমলে এই গ্রন্থাগারের প্রসার ঘটেছিল এবং তখন মোটামুটি গ্রন্থাগারের কাজ নির্বিঘ্নেই চলছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রীমুলের সময়েও জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনা নিয়ে নানা গলদ ও দুর্নীতির খবর পাওয়া গেছে। এবং বর্তমানে শ্রীকালিয়ার আমলে তা চরমে ওঠে। জাতীয় গ্রন্থাগার যাঁরা নিয়মিত ব্যবহার করেন তাঁদের একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, গ্রন্থাগারের সার্ভিস খারাপ হয়ে গেছে। বই চাইলে পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও অনেক দেরী হয়। বইয়ের সংরক্ষণ ব্যবস্থারও অবনতি ঘটেছে। তাছাড়া কর্মী অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। এই সব ঘটনার মধ্যে আবার নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল গ্রন্থাগারিক বনাম সহ-গ্রন্থাগারিক বিরোধ। সরকার নিযুক্ত ঝা কমিটি ও খোসলা কমিটি পরস্পরবিরোধী রিপোর্ট দিয়েছে বলে প্রকাশ। সরকার খোসলা কমিটির রিপোর্ট মেনে নিয়ে সহ-গ্রন্থাগারিককে সরাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে প্রকাশ। গ্রন্থাগারিককেও অবশ্য সরানো হচ্ছে তবে তা শাস্তি নয়, প্রকারান্তরে উন্নতি। কারণ এই ব্যক্তি এখনও এই পদে ছিলেন 'প্রবেশনার'। অন্যদিকে সহ-গ্রন্থাগারিক একজন প্রবীণ ব্যক্তি। সকল শ্রেণীর বিদ্বান মানুষ তাঁর যোগ্যতার প্রশংসা করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে কোনোরূপ বিবেচনার আশ্বাস দেননি। তাঁর এই ব্যবহার খুবই অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর!

এই সমস্ত বিষয়টির মধ্যে এক সংকীর্ণ গোষ্ঠীচক্রান্ত, প্রাদেশিকতা এবং আমলাতান্ত্রিক একদেশদর্শিতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে জাতীয় গ্রন্থাগারের আভ্যন্তর শান্তি, সুপরিচালনা এবং মর্যাদা নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার দলাদলির জায়গা নয়। গ্রন্থাগারের কর্মীরাও আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মতো ব্যবহার করতে পারেন না। এঁরা শিক্ষাব্রতীরূপেই গণ্য। এত বড় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যিনি হবেন তিনি শুধু একজন বড় আমলা হলেই চলবে না, তাঁর বিদ্যাবত্তা, উদারতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা সকলের মনে প্রেরণা জাগানো চাই। বর্তমানে তার অভাব ছিল বলেই জাতীয় গ্রন্থাগারের এই দুরবস্থা। নতুন কর্মাধ্যক্ষ এসে যদি সরকারী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে কর্মীদের মনে সত্যিকারের কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানানুসন্ধানে আগ্রহ জাগাতে পারেন তাহলেই জাতীয় গ্রন্থাগার তার হৃত মর্যাদা ফিরে পেতে পারে।

আভঙ্গ মূর্তি ॥

বিষ্ণু দে

তুমি আবির্ভূত হলে আকস্মিক, সেকালের দেবী,
নাকি নব্য ভাস্করের বিমূর্ত শিল্পের হৃদয়-ঈশ্বরী
মানবকন্যাই কেউ প্রস্তরিত?
কৃষ্ণ কটিতে আঘাতে আঘাতে অবধূত
গৌরবে উত্তীর্ণ, যে গরিমা
প্রাচীন দীঘির কর্দমাক্ত জলে জলে
আলো-অন্ধকারে আন্তরিক
চিরাগত ধ্যানকম্প্র সংগঠনবলে
শৈবালছায়ায় খর রৌদ্রে পরীক্ষায় অবিরত
বিচ্ছুরিত আভা দেয় ক্ষয়হীন
সময়ে ও জলে জলে রাত্রিদিন জেগে প্রতীক্ষায় মসৃণ শর্বরী,
যেন রামলীলা ভরে শ্রবণে-দর্শনে চৈতন্যের অতল মায়ায়।

কার শিল্পসৃষ্টি এল সৌভাগ্যের আকস্মিকে পাওয়া
পায়ে ধাক্কা হাতে স্পর্শ লেগে?
ঈষৎ আভঙ্গে স্মিত স্থির দৃষ্টি,
অক্ষির তারকাহীন শতেক ব্যঞ্জনা আলোর কৌণিকে,
নীলাকাশে চঞ্চল ছায়ায়,
দেবী মূর্তি? নাকি কারো মানবিক প্রেমের মঞ্জরী
স্নায়ুতে হৃদয়ে চেনা পদাবলী ভাস্কর্যের ঈপ্সিত মায়ায়?
নাকি তুমি ত্রিকালের ঈশ্বরী পাটনী মনপবনের নায়ে
মনেরই গঙ্গায় অতীতে ও ভবিষ্যতে দিকে দিকে
বরাভয় মেলে বর্তমানে ধাবমান
নিজেই নিজেতে স্থির নিশ্চিত কায়ায়?

ঝোরো বর্তমান ॥

শান্তনু দাস

এখনো বহাল আছি তোমার বাগানে
আমি মালী।
ভিজে ঘাস, পান্থপাদপ, সাজানো যা রাখা ছিল
তাই আছে
তাই আছে রঙে বোনা অতীতের পাশাপাশি ঝোরো বর্তমান।
বর্তমানের পাশে ঝোরো ভবিষ্যৎ

যেন দীর্ঘ চৈত্রের শালবনে পাতা গোনবার সাথে
পাতাঝরা গান,
একই সঙ্গে মৃত্যুর পিঠে চেপে
বর্তমান বাজায় দামামা।
হৃদপিণ্ড নড়েচড়ে
শব্দ শুনি তোমার বাগানে।

মাঝরাতে শবযাত্রা যেন :
উরুভাঙা বৃদ্ধ পিতা বইছে কিছু উন্মাদ যুবক,
ডান হাতে ছোপোরূপী, নড়বড়ে পায়া,
বাঁ হাতে মা-কালী মার্কা লেবেল ওঠানো শিশি মাল।
সামান্য সামাল ......
কার হরিধ্বনি শব্দ নড়েচড়ে ওঠে।

খুরপী হাতে মাটি খুঁড়ি,
জল ঢালি তোমার বাগানে,
স্মৃতি ভেজে,
সাঁঝের গোলাপ হয়ে ফোটে :
অতীতের পিঠে চেপে আবার ভবিষ্য কিছু বোনা,
বেঁচে থাকে ঝোরো বর্তমান।

নিজেকেই নিজের দর্শক হতে হয় ॥

হৃষীকেশ বিশ্বাস

আজকাল যখনি হতাশায়
অথবা একটা কঠিন আঘাতে
ভেঙে পড়ি
মনে হয়, আত্মঘাতী হই
অথবা ফিরে যাই আবার মাতৃক্রোড়ে
—ছোট্ট শিশুটি হয়ে।
অথচ ফিরি বললেই ফেরা যায় না,
শেষ অঙ্কটুকুর জন্য নিজেকেই
নিজের দর্শক হতে হয়।

সওয়াল

নিখিলচন্দ্র সরকার

হিমাংশুবাবু রীতিমতন ভয় পেয়েছেন। ঘুমের ঘোরেই গোঙাচ্ছিলেন তিনি। থেমে থেমে কাঁদছিলেনও। নীলুর ঘুম ভেঙে গেছে সহসা, তড়াক করে উঠে বসেছে, তাড়াতাড়ি করে গায়ে মৃদু ঠেলা দিল সে, 'বাবা, বাবা, কি হয়েছে, কাঁদছেন কেন, পাশ ফিরে শোন।'

একে একে এঘরের সবারই ঘুম ভেঙে গেছে। সাকুল্যে দুটি মাত্র ঘর। এঘরে খাটে হিমাংশুবাবু আর নীলু শোয়, মেঝেয় চিনুবালা আর সুজাতা। বিছানা পড়লে জায়গা ছোট হয়ে যায়। জিনিসপত্তরে ঘর আরো গুমোট। আলো-বাতাস এখানে কৃপণভাবে চলাফেরা করে। অন্য ঘরে শিবু তার স্ত্রী রেবা ও সাত বছরের মেয়ে পম্পা থাকে। শিবু ও রেবা ওরা দুজনেই চাকরি করে। ফলে এতবড় সংসারটা কার্যত ওদেরই টানতে হয় বলে, ভীত বিরক্ত অবুঝ অসহিষ্ণু। চিনুবালা হিমাংশুবাবুর বিধবা বোন, সুজাতা ছোট মেয়ে, একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, অন্যজনের চব্বিশ কি পঁচিশ। হিমাংশুবাবু চিনুবালার তিন বছরের বড়, কিন্তু দেখলে আরো বেশী মনে হয়। প্রায় বছর পনেরো হলো হিমাংশুবাবুর স্ত্রী সরলাদেবী গত হয়েছেন, সুজাতার বয়েস তখন সবে নয় কি দশ, আর নীলুর পাঁচ। চিনুবালাই এসময় এদের কোলে পিঠে করে বড় করে তুলেছেন।

তখনও কাঁদছিলেন হিমাংশুবাবু, নীলু আবার ঠেলা দিল, 'বাবা, কি হয়েছে?'

'হুঁ' হিমাংশুবাবু উঠে বসেছেন। চোখে তখনও ঘোর। আর কোন কথা বললেন না তিনি। আসলে স্বপ্নের ভয় এখনও যেন পুরোপুরি কাটেনি তাঁর। কপালে তখনও রেণু রেণু স্বেদকণা, বুক ভেজা, গলা শুকিয়ে এসেছে। স্বপ্নে যেন অনেক ধস্তাধস্তি করেছেন, দম ফুরিয়ে গেছে, ক্লান্ত অবসন্ন এখন। কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, দম বন্ধ হয়ে আসছিল, গলা টিপে বুঝি মেরেই ফেলত, একটু ব্যথা অনুভব করছিলেন এই মুহূর্তে।

চিনুবালাও উঠে পড়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়েছেন। সুজাতা [illegible]। ওঘরে শিবু রেবা উঠেছে। 'কতদিন বলেছি বুকে হাত রেখে ঘুমোস না, বোবায় পায়।' বলতে বলতে চিনুবালা হিমাংশুবাবুর পাশে এসে বসলেন, পরে চোখে চোখে চেয়ে সুধোলেন 'কাঁদছিলি কেন?'

হিমাংশুবাবুও এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছেন, ঘোর কেটেছে, এবার যেন সামান্য লজ্জা পেলেন তিনি। সুজাতার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এক গ্লাস জল আন আগে।'

পর পর দু গ্লাস জল খেলেন হিমাংশুবাবু, এবার স্বস্তি বোধ করছেন। চিনুবালাকে ভাল করে দেখে নিলেন একবার, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আজো সোনাদাকে স্বপ্ন দেখছি রে চিনু। কিছুতেই ভাবতে পারছি না, সোনাদা আর নেই।' গলাটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠেছে তাঁর, কেমন আর্দ্র ভেজা ভেজা মনে হলো। সামান্য অন্যমনস্কও। খানিক নীরবতার পর আবার বললেন হিমাংশুবাবু, 'ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি রে, অথচ কোন মানেই হয় না এর, সোনাদার সঙ্গে তো দেখা নেই আজ একযুগেরও ওপর।' একটু থামলেন হিমাংশুবাবু, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,

কি ভেবে ফের বলতে লাগলেন, 'কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখলাম, কতগুলো ষণ্ডামার্কা লোক আমাকে আর সোনাদাকে ঘুম থেকে তুলে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল, জায়গাটা দেখেই চিনেছি, কুখ্যাত গাবতলি, দিনের বেলায়ই এখানে আসে না কেউ, আসতে ভয় করে, বহু খুনটুন হয়েছে এখানে। আমি কাঁপছিলাম ভয়ে, ওদের হাতে রামদা, টাঙিগ, কি নিয়ে ওদের কথা কাটাকাটি হচ্ছিল সোনাদার সঙ্গে, 'রমা' নামটা হঠাৎ কানে যেতেই চমকে উঠেছিলাম, সোনাদার একমাত্র মেয়ে, ডাগর-ডোগর নম্র সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা যেন, বলে কিনা ওকে ফুটকা মিঞার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। সোনাদা ক্ষেপে গেছে, তারপরই চীৎকার, আমার সামনেই ওরা কুপিয়ে কুপিয়ে মারল সোনাদাকে, রক্ত ছিটকে এসে আমার গায়ে পড়ল, এবার আমার পালা, গলা টিপে ধরেছিল একজন...আর ঠিক তক্ষুনি ঘুম ভেঙে গেল; দেখ দেখ এখনও আমার শরীরে কাটা দিচ্ছে।'

'ভাল দেখেছিস, কিন্তু সোনাদা তো অসুখে মারা গেছে।' চিনুবালা যেন অন্য কিছু ভাবছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বললেন না হিমাংশুবাবু, খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরিতোষের চিঠিতেই তিনি জেনেছেন, সোনাদা অসুখে ভুগে ভুগে মরেছেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে চোখে জল এসে গিয়েছিল তাঁর, পরিতোষ রমা সোনা বউদি, গোটা পরিবারের দুঃখ যেন বয়ে এনেছে চিঠিটা। পরিতোষ কত দুঃখ করে লিখেছে, '...ধনকাকা, কি আর লিখিব, চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, আমাদের মায়া মমতা ছাড়িয়া বাবা চির-দিনের মত চলিয়া গিয়াছেন...কয়েকদিন আগে হইতেই শুধু আপনাদের নাম করিয়াছেন, একবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য খালি ছটফট করিয়াছেন, ধনকাকা, আমাদের মাথার ওপর এখন আর কেহ রহিল না, আপনিও কতদূরে, চিনুপিসী, শিবুদা, সুজাতা নীলু সকলের নাম করিয়াছেন বাবা, আর শিশুর মতন কাঁদিয়াছেন। জানি না, আর কখনও আপনাদিগের সহিত দেখা হইবে কিনা। রমার এখনও বিবাহ হয় নাই, কি যে করিব ভাবিয়া পাইতেছি না।...' চিঠির এ অংশ-টুকু বার বার পড়েছেন হিমাংশুবাবু, বিচলিত হয়েছেন পড়ে। কিছুতেই তখন সামলাতে পারতেন না নিজেকে, বুকটা হু-হু করত, চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে আসত।

তারপর কয়েকবারই স্বপ্ন দেখেছেন হিংমাংশুবাবু। বাড়ি-ঘর, মা-বাবা, ঠাকুর-কাকা, ভাই-বোন, পুকুর, উৎসব, গাছপালা, তরুলতা, পাখি, মানুষজন সব, সব ভিড় করে আসত মনের চারপাশে। ঘুমের মধ্যেই তিনি কতবার কেঁদেছেন ওদের কথা ভেবে। অথচ এসব স্মৃতি ধীরে ধীরে বিবর্ণ মলিন হয়ে আসছিল তাঁর জীবনে। প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন অনেক, ঘুমোতে পারতেন না তখন, পরে সয়ে এসেছিল; কেবলই মনে হয়েছে তাঁর, এসব ভাবনা নিরর্থক, শরীর স্বাস্থ্য নষ্ট করা শুধু। সব থিতিয়ে এসেছিল একদিন। কিন্তু পরিতোষের এই চিঠি আবার এলোমেলো করে দিয়েছে সব। হিমাংশুবাবু যেন ভেঙে পড়েছেন। মনে মনে আগেই ক্ষয় শুরু হয়েছিল, এবার তা ফুটে উঠেছে শরীরে। এ অবস্থায় তিনি ওদের জন্যে কি করবেন, কতটুকু করতে পারেন, কথাটা নিজেকেই মনে মনে শুনিয়ে-ছেন বারকয়েক, পছন্দসই কোন জবাব খুঁজে পাননি। অস্থিরতা বোধ করেছেন। স্বপ্নের কথারাই তাঁকে জাগ্রত অবস্থায়ও বিব্রত, বিমর্ষ করে। কিন্তু সোনাদার সঙ্গে কুপিয়ে মারার ব্যাপারটা এই প্রথম। এতে আশ্চর্য হননি হিমাংশুবাবু, কি ভেবে চিনাবালাকে একবার দেখলেন তিনি, আস্তে আস্তে বললেন, 'ও দিনটার কথা আজো ভুলতে পারি না রে চিনু।' দেখে মনে হচ্ছিল, হিমাংশুবাবু চোখের সামনে যেন সেদিনের বীভৎস ভয়ংকর ছবিটা এখনও আর একবার দেখছেন; ভীত সন্ত্রস্ত, অসহায়।

'আমিই কি পারি?' চিনুবালা দুঃখে বেদনায় দৃষ্টি আনত করেছেন।

আসলে এখানে আসবার কিছুদিন আগে চিনুবালারা দাঙ্গার মুখে পড়ে-ছিলেন। ওঁর স্বামী আর শ্বশুরকে চোখের সামনে কেটেছিল গুণ্ডারা, সমস্ত সম্ভ্রম ইজ্জত লুঠ করে নিয়েছিল ওরা, তারপর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল; সেই আগুনে অনেকের সঙ্গেই চিনুবালাও আত্মাহুতি দিয়ে সব গ্লানি লজ্জা ঢাকতে চেয়েছিলেন চিরতরে। হিমাংশুবাবু বাধা দিয়েছিলেন; তিনি তখন ওখানে। অনেক কষ্টে শেষপর্যন্ত তিনি সহোদরাকে বাঁচিয়ে এনেছিলেন। তারপর থেকে ভাইয়ের সংসারেই চিনুবালা আছেন। এ-ঘটনার অনেকদিন পরও হিমাংশুবাবু কিম্বা চিনু-বালা দুজনের কেউই ভাল করে ঘুমোতে পারেননি, খেতে পারেননি।

শিবু দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে, তাকে বেশ বিরক্ত ও অসহিষ্ণু দেখাচ্ছে। একটু রুক্ষ গলায় এবার বলল, 'ওসব ভেবে কোন লাভ নেই। এবার ঘুমোন তো, রাতদুপুরে যত্তো ঝামেলা।' বলতে বলতে শিবু পাশের ঘরে চলে গেল।

'বাতিটা এবার নেবাও না পিসী!' নীলু পাশ ফিরে শুলো।

'নেবাচ্ছি রে নেবাচ্ছি, ঘুম যেন পালিয়ে যাচ্ছে।' বলে ক-পা এগোলেন চিনুবালা, তারপর হিমাংশুবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'শুয়ে পড় দাদা, এবার আর বুকে হাত রাখিস না।'

'আমার এখন ঘুম আসবে না, তোরা শো, আমি বরং বারান্দায় গিয়ে বসি একটু।'

আলো নিবে গেছে, আবার সব চুপ-চাপ। হিমাংশুবাবু বারান্দায় হাতলভাঙা একটা চেয়ারে এসে বসলেন। এখানেও জায়গা বড় ছোট। বারান্দার এখানে-ওখানে টুকরি, জলের ড্রাম, গুলের ঝুড়ি, টুকরো কাঠের বস্তা, ভাঙাচোরা টিন, বোতল, ছাতার ডাঁটি, আরো টুকি-টাকি সব আবর্জনা। পচা একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। কিছু আর-শোলা উড়ছিল, কটা ইঁদুর ছুঁচো আবছা অন্ধকারে দৌড়চ্ছে। এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না, গাছপালা নেই কোথাও, পাখি আসে না। দম যেন প্রতি মুহূর্তে বন্ধ হয়ে আসে এখানে। তবু, তবু এর বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই তাঁর।

হিমাংশুবাবু আজকাল কাউকেই আর কিছু বলেন না। তাঁর ধারণা, বলবার অধি-কারও তিনি হারিয়েছেন। শিবুর কথাবার্তা রুক্ষ, অমার্জিত বাঁকা। আচরণেও, ইদানীং লক্ষ করছেন তিনি, বেশ অশিষ্ট, অবিনীত। প্রথম প্রথম ভীষণ ক্ষুব্ধ রুষ্ট হতেন হিমাংশুবাবু, আজকাল হন না। ভেবে দেখেছেন, কোন লাভ নেই এতে, বরং অশান্তি, ঝামেলা। সুজাতার জন্যেই তাঁর ভাবনা সবচেয়ে বেশী। মেয়েটা দিন দিনই শুকিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাঁর করণীয় কিছু নেই। ওদের ওপরই তাঁকে পুরোমাত্রায় নির্ভর করতে হয়। তারপর চিনুবালা, তাঁর জন্যেও হিমাংশুবাবুর দুশ্চিন্তা। এখানে কারো আসনই সম্মানের নয়। অথচ এক ধরনের গ্লানি পরাজয় নিয়েই তাঁকে চিনু-বালাকে থাকতে হবে এখানে। তিনি ওদের জন্যে কিছুই করতে পারেননি, মাথা উঁচু করে ভদ্রভাবে বাঁচবার মতন করে তৈরী করেননি ওদের, থাকবার মতন ছোটখাটো একটা বাড়িও করলেন না, এরপরও কি করে তিনি আশা করেন, ওরা তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করবে, একান্ত বাধ্য অনুগত হবে, মাসের মাইনা তাঁর হাতে তুলে দেবে? অথচ প্রথম প্রথম তিনি তাই ভাবতেন, আশা করতেন। শিবুর অভিযোগ, সন্তানের প্রতি পিতার যে কর্তব্য, তা তিনি পালন করেননি। সুতরাং কিছু বলার অধিকারও আজ তাঁর নেই। তারপর থেকেই হিমাংশু-বাবু নিজেকে ধীরে ধীরে গোপন করেছেন। আজকাল সংসারে থেকেও তাঁর না থাকার ভূমিকা। ছেলেমেয়েরা তাঁর সম্পর্কে যে-ধারণা নিয়ে আছে, তা খণ্ডন করার কোন সাধ বা ইচ্ছে হিমাংশুবাবুর নেই। তবু কয়েকটি কথা তিনি বারবার ওদের শোনাতে চেয়েছেন : বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি তোদের সুখেই রাখতে চেয়ে-ছিলাম, চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। ছেলে-মেয়ে কষ্টে থাকুক, এটা কোন বাপই চায় না। আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই সব হারাতে হয়েছে আজ। এখন না হয় সাবালক হয়েছিস, রোজগার করছিস, এতদিন আমিই তো তোদের প্রতিপালন করেছি। আমিও কি কোনদিন ভেবেছিলাম, এখানে এভাবে পশুর মত বাঁচতে হবে আমাকে? তোদের এই দুর্ভাগ্যের জন্যে কি শুধু আমিই দায়ী? সম্পত্তি ভিটেমাটি ছেড়ে কেন চলে আসতে হলো? এ-কাদের পাপ, এ-কথা কি কেউ ভাববে কখনো?

কিন্তু এসব কথা কোন সময়ই ওদের বলেননি হিমাংশুবাবু। শুধু নিজেকেই শুনিয়েছেন কথাগুলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। এসব একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তিনি এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করেন। মাথাটা ধরেছে তাঁর। চোখদুটোও জ্বালা করছে। এখানে এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে একটা কথা এই মুহূর্তে মনে হলো তাঁর, এই সরু সরু অন্ধগলি, ঘিঞ্জি বাড়ি, ছোট ছোট ঘরদোর, নোংরা পরিবেশ ওদের সকলের কাছ থেকেই অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে, কে জানে, হয়ত আরো বহু কিছু এখনো নেবে। কিন্তু দেবার মতন আর কোন সম্পদ কি তাঁর আছে? নিজেকে এই দণ্ডে বড় নিঃস্ব, দীন মনে হলো তাঁর।

এসব দুঃখের কথা অকপটে যাকে জানাতে পারতেন, জানিয়ে কিছুটা হাল্কা হতেন, সেই সোনাদাই আর নেই।

হিমাংশুবাবুরা তিন ভাই। সীতাংশুবাবু, সুধাংশুবাবু আর হিমাংশুবাবু। সীতাংশুবাবুই বাড়ির সব ভাই-বোনের মধ্যে বড়। তারপর সুধাংশুবাবু। বড়জনকে 'রাঙাদা', সুধাংশুবাবুকে 'সোনাদা' বলে সবাই ডাকে। একান্নবর্তী পরিবার, জেঠতুতো, খুড়তুতো ভাই বোন মিলে বাড়ি গমগম করত, সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। হিমাংশুবাবুর নিজের বোন দুটি, গিরিবালা আর চিনুবালা। গিরিবালা বিয়ের বছর ফুরোতে না ফুরোতেই মারা গেল। এই জেনারেশনের প্রথম বলি গিরিবালাই, এ-শোক অনেকদিন ধরেই এ-পরিবার বহন করেছে। সন্ধ্যা, চামেলী, বেলা জেঠতুতো বোন, টগর, সুধা খুড়তুতো বোন। মহীতোষ, নিবারণ রাঙা-জেঠার ছেলে, হরিু আর সুবল ঠাকুরকাকার ছেলে। মোট কথা হিমাংশুবাবুদের বেশ বড় সংসার। পুজোপার্বনে আরো অনেক আত্মীয় আসত। বাড়িবর খুশিতে আনন্দে তখন ঝলমল করত। হিমাংশুবাবুর অনেকগুলো বছর এই সুখ প্রাচুর্যের মধ্যে বেটেছিল। তারপর একটা সময়ে প্রচণ্ড ঝড়ে কে কোথায় যেন ছিটকে পড়েছে, অনেকেই যেন হারিয়ে গেল, আর মিলতে পারল না পরস্পরে। অনেকের সঙ্গেই এ-জীবনে আর দেখা হলো না তাঁর। এ-দুঃখ নিয়ে তাঁকেও একদিন চলে যেতে হবে।

হিমাংশুবাবু এসময় নিজেকে খুব অসহায় বোধ করছিলেন। এখন থেকে মাথার ওপর আর কেউ থাকল না তাঁর। এমন নিঃসঙ্গ আর কখনো মনে হয়নি। চোখদুটো করকর করছে। এবার উঠে গিয়ে কলতলায় চোখে-মুখে ভাল করে জল ছিটোলেন তিনি। একটু পরে আবার এসে চেয়ারে বসলেন। এখন অস্বস্তি ভাবটা অনেকখানি কেটেছে। দু-একটা মশাও কানের কাছে শব্দ তুলে উড়ছে। কয়েকটা কামড়েওছে। এর আগে অনেকবারই হিমাংশুবাবু মনে মনে যখন অস্থির কাতর হয়েছেন, দুর্ভাবনায় ক্ষত-বিক্ষত, নিজের মাটিতে ফেরার জন্যে তীব্র আকুলতা বোধ করেছেন, তখন সোনাদাকে সব জানিয়ে অন্তত স্বস্তি অনুভব করেছেন। কোন কোন সময় তাঁকেও এখানে চলে আসার জন্যে লিখতেন তিনি। ওভাবে স্বজন-বান্ধব পরিত্যক্ত পরিবেশে আর কতকাল কাটাবেন? সোনাদাও কত কি লিখতেন! চিঠি পড়তে পড়তে মনে হতো হিমাংশুবাবুর, সোনাদা যেন সামনে বসে আবেগভরা গলায় কথাগুলো তাঁকে শোনাচ্ছেন। মনে হচ্ছিল, হিমাংশুবাবু এই নির্জনে মনে মনে একটার পর একটা চিঠি যেন পড়ে যাচ্ছেন।

'...তোমাদের কথা আমার সব সময়ই মনে পড়ে। পুরাতন কথা মনে পড়িলে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। তুমি চলিয়া আসিবার জন্য লিখিয়াছ, আমিও কতবার ভাবিয়াছি যাইব। কিন্তু বাপ-পিতামহের ভিটা, গাছপালা, পুকুর, সম্পত্তি, পুজার মণ্ডপ ফেলিয়া কি করিয়া আসিব। তোমরা পারিয়াছ, আমিও চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখনও পর্যন্ত পারিলাম না। এই বাড়ির সঙ্গে যে আমাদের অনেক অনেক স্মৃতি জড়াইয়া আছে! এত বড় বাড়িতে আমরা কতগুলি ভাইবোন ছিলাম, আর এখন আমিই শুধু পড়িয়া রহিলাম। সেই দিনগুলির কথা ভাবিলে আমি ঠিক থাকিতে পারি না। কার্যোপলক্ষে এক সময় আমরা সব ভাই-ই দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলাম, আবার বছরে দুই-তিনবার মিলিতও হইতাম। সেই আনন্দের দিনগুলি কি তোমার মনে আছে...?'

হিমাংশুবাবুরও সব মনে আছে। কিছুই ভোলেননি। এ-কষ্ট তো খালি সোনাদারই নয়, তাঁরও।

সীতাংশুবাবু কাজ করতেন জামালপুরে জমিদারীতে, হিমাংশুবাবু বাড়িতেই থাকতেন, সুধাংশুবাবু ঢাকায়, মহীতোষ নিবারণ পাবনায়, সুবল রংপুরে, এভাবেই চাকরি, কেউ বা পড়াশুনোর জন্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন সকলে।

মনে নেই আবার হিমাংশুবাবুর! গ্রীষ্মের আম-কাঁঠালের দিনে, পুজোর সময় সবাই এসে জড়ো হতেন। আসবার আগে রাঙাদা সবার কাছেই লিখতেন, নির্দেশ থাকত, '...আমি আশ্বিনের দুই তারিখ, রওনা হইব, তিন তারিখ সন্ধ্যায় গিয়া পৌঁছাইব। তোমরাও ওই তারিখে অবশ্যই পৌঁছাইবে, মহীতোষ, সুবল তাহাদের কাছেও চিঠি দিয়াছি। ঠাকুরকাকাকেও সব লিখিয়া দিলাম। আসিবার সময় তুমি কিছু ফুলকপি ও ভাল পাঁপড় লইয়া আসিও।...' তারপর হইচই, পুকুর থেকে মাছধরা, কলাকাটা, পাঁঠা খাসি মারার ধুম। কলগীতিতে ভরে যেত বাড়ি। যাত্রার

আসর বসত, নিজেরা থিয়েটার করতেন। অভিনয়ে রাঙাদার খুব সুনাম ছিল। কেদার রায়, বঙ্গেবর্গী, সাজাহান, ভীষ্ম, চাণক্য, প্রফুল্ল, সব ধরনের নাটকই তাঁরা করেছেন। সোনাদাও অভিনয়ে কমতি যান না, দশ গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে নামগুলো ঘুরত।

'...অথচ আর কখনো আমরা এক হইতে পারিব না। চিরদিনের মতন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে এখন হাজার লক্ষ কোটি মাইলের ব্যবধান। কেন এমন হইল, তাহা কি কখনো ভাবিয়াছ? আমি ভাবিয়াছি, কোন কিনারা করিতে পারি নাই। কি অপরাধে আমাদের এই সর্বনাশ হইল তাহা কে বলিবে? ইহাতে কাহার কতটা অপরাধ, তাহা ভবিষ্যতই বিচার করিবে। তুমি কি মনে কর না, এই অভিশাপ একদিন সকলকেই স্পর্শ করিবে? আমি কিন্তু করি। এখানেই শেষ হইয়া যায় নাই, তুমি দেখিও, ইহার জন্য আরো বহু মূল্য দিতে হইবে। আমি জোরের সঙ্গে বলিতেছি, পরবর্তী বংশধরগণ কখনই ইহা ক্ষমা করিবে না। আমাদের পরিবারের কথাই একবার ভাবিয়া দেখ না, ইংরাজদিগকে বিতারণের অপরাধে আমরাই কি কম নির্যাতন সহিয়াছি? তাহাদের রোষবহ্নি, নিষ্ঠুর অমানুষিক অত্যাচার পীড়ন হইতেই কি আমরা রেহাই পাইয়াছিলাম? ইহার ফল কি এই-ই?...'

হিমাংশুবাবুর কাছেও এ এক জিজ্ঞাসা। কোন উত্তর মেলেনি। যেদিন ঠাকুরকাকাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, সেদিন গোটা বাড়িতে কি কান্না! হিমাংশুবাবুরাও দেখেছেন, ভেতর বাড়িতে পুবের ঘরে আরো কিছু কিছু লোক আসতেন, ঠাকুরকাকার সঙ্গে কি নিয়ে সব কথাবার্তা বলতেন তাঁরা, লুকিয়ে আসতেন, কখন যেতেন টেরও পেত না কেউ। তাঁদের চোখেমুখে, উত্তেজনায় উদ্দীপনায় যেন আগুন জ্বলত। ঠাকুরকাকা একদিন সবাইকে ডেকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, এ-বাড়িতে কারা আসে যায়, কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন কিছু না বলে। তবু সব জেনে গিয়েছিল পুলিশের লোকেরা। মা, রাঙা-কাকিমা সব গয়নাগাটি ঠাকুরকাকার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। নিবারণ, বীরু পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হিমাংশুবাবুরও আর পড়াশুনো হলো না।

আজ যখন এসব কথা মনে হয় তাঁর, দুঃখে বেদনায় বুক ফেটে যায়। হিমাংশুবাবুর আজকাল প্রায় সময়ই মনে হয়, সেই আগুনে শুধু তাঁরাই নয়, সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। এবং এ-ক্ষতির পরিমাণ যে কত গভীর দীর্ঘ ও অপূরণীয় তা কেউই বলতে পারে না। শেষপর্যন্ত সোনাদাও চলে গেলেন। তাঁর ওপরে আর কেউ রইল না এখন, এটা কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, কেমন স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছে সব। এর আগেও তো অনেককেই হারিয়েছেন তিনি, কিন্তু সোনাদার চলে যাওয়াটা যেন তাঁর জীবনে মস্তবড় এক দুর্ভাগ্য। এত রিক্ত অসহায় আর কখনো বোধ করেননি নিজেকে। আসলে সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে আসার পরও একটা বিশ্বাস বা অনুভবকে দীর্ঘকাল তিনি লালন করেছেন, সর্বহৃত হওয়ার এক গভীর কারুণ্য ও নিঃসঙ্গতাকে এই ভেবে জয় করতে চেয়েছেন যে, তিনি আবার দেশে ফিরে যাবেন, দেশে ফেরার জন্যে তখন তীব্র এক উন্মাদনা আবেগ অনুভব করতেন যেন। চিঠিতেও মনের এই অনিঃশেষ আকুলতা সোনাদাকে জানিয়েছেন বহুবার। হয়ত, সোনাদা সেখানে ছিলেন বলেই এভাবে ভাবতে পারতেন তিনি। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতন যেন অনেকটা। কিন্তু আর কোনদিনও তা পারবেন না।

'...তুমি দেশে ফিরিবার জন্য যাহা লিখিয়াছ, তাহা আমিও বুঝিতে পারি। কিন্তু, নির্মম হইলেও একটা কথা তোমায় লিখিতেছি। দেশের পূর্বের সেই শ্রী আর নাই। তুমি এখন দেখিলে কষ্ট পাইবে। মা কি হইবেন বলিতে পারি না, মা কি হইয়াছেন দেখিলে চোখে জল আসে। যাহাদের একদিন চিনিতে জানিতে, তাহাদের সকলেই প্রায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর যাহারা পড়িয়া রহিল, তাহারাও দেখিতে দেখিতে কেমন বদলাইয়া গিয়াছে, চিনিতে পারিবে না। রায়-বাড়ি, ঘোষ-বাড়ি, নন্দী-বাড়ির কেহই নাই। তুমি তাহেরালি মিঞাকে ত চেন, সেই-ই ঘোষ-বাড়ি কিনিয়াছে, রসিদ সিরাজুল ছমীর মুন্সী উহারাই এখন আমার প্রতিবেশী। তুমি আসিবে লিখিয়াছ, যেভাবেই হউক একবার আসিও, নিজের চোখেই আর একবার দেখিয়া যাইও, সোনার বাংলাদেশের কি হাল হইয়াছে! দেখিলে মনে হইবে, শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আর কি কখনো আমাদের দেখা হইবে? বহুদিন সুবল-বীরুদের কোন চিঠি পাই না, তাহাদের কোন খবর থাকিলে জানাইও। সকলের কথাই খুব মনে পড়ে। আর একবার জন্মের মতন তোমাদের দেখিবার বড় সাধ ছিল।...'

সত্যই সোনাদা অনেক দুঃখ ও ক্ষোভ নিয়ে পৃথিবী থেকে সরে গেছেন। এই অতৃপ্তি অসন্তোষ নিয়ে তাঁদের যেতে হবে। শুধু সোনাদাই নয়, হিমাংশুবাবুও সুবলদের কোন খবর পান না। যোগাযোগ ছিন্ন। অনেক কাল আগে একবার জেনেছিলেন, ওরা মধ্যপ্রদেশের কোন একটা ছোট শহরে থাকে। আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। ভেতরে ভেতরে হিমাংশুবাবু এই মুহূর্তে কি এক কষ্ট বোধ করছিলেন। গলার কাছে কি যেন একটা আটকে গেছে তাঁর। শরীরের ভেতরে অস্বস্তি, অস্থিরভাব। এবার চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন, দু-তিনবার অন্ধকারের ভেতরেই এদিক-ওদিক করলেন, তারপর আবার চেয়ারে এসে বসলেন, ভীষণ যেন তেষ্টা পেয়েছে তাঁর। সব কেমন স্তব্ধ, নেশার ঘোরে ডুবে আছে। হিমাংশুবাবুর চোখেও এখন আচ্ছন্নভাব। কত কথাই না মনে পড়ছে এখন! বাড়িঘর, খাল-বিল-নদী, গাছপালা, লোকজন আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, ছেলেবেলা, যৌবন, দাঙ্গা, ঈর্ষা, ধর্মোন্মত্ততা, আগুন সব যেন মুহূর্তের মধ্যে জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছে, আবার পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যাচ্ছে, এখানকার অন্ধ ঝাপসা গলিটাও যেন চোখের সামনে দুলছে, আবার অন্য কথা মনে পড়ছে: ছবিগুলো ভাবনাগুলো সব কেমন এলোমেলো বিশৃঙ্খলভাবে আসা-যাওয়া করছে, একটাকে ধরতে না ধরতেই অন্যটা এসে পড়ছে, ছুটতে ছুটতে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। এবার হিমাংশুবাবু চোখের সামনে আর একটা দৃশ্য স্পষ্ট হতে দেখলেন, এখনো কত লোক উদ্বাস্তু হয়ে এখানে আসছে, আসছে শুধু আসছেই, কত কষ্ট তারা সইছে, তবু ভাবছে, এখানে সহানুভূতি ভালবাসা নিরাপদ আশ্রয় মিলবে। হিমাংশুবাবু এবার অসহিষ্ণু হলেন, চোখেমুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটেছে সামান্য, তারপর মনে মনে তাদের উদ্দেশ করে বললেন: তোমরা কি ভেবেছো, এখানে এলেই শান্তি সুখ মিলবে, এ যে কত বড় প্রবঞ্চনা, একদিন তা টের পাবে। উপেক্ষা ঘৃণা আর অবহেলার ভেতরেই আমরা বেড়ে উঠব। কোন প্রতিকার নেই এর। একটা হীন ষড়যন্ত্র, রাজনীতি আমাদের নরকে ঠেলে দিয়েছে, অশুভ বুদ্ধির শিকার হয়েছি আমরা, দাবার ঘুঁটির মতন আমাদের যত্রতত্র ব্যবহার করবে কুশলী যাদুকর। তবু, তবু আমাদের কিছুই করার নেই।

হিমাংশুবাবু ঘামছেন, চোখে মুখে অসহ্য এক জ্বালা যেন ছড়িয়ে রয়েছে। নিজের সন্তানের কাছেও অপদস্থ হয়েছেন বহুবার তিনি। আর বেশী দিন নয়। মনে মনে ওদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: সোনাদা চলে গেছেন, এবার আমি, এক বছর দু বছর...যেতেই হবে আমাকে। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমরা আরো আরো এক গভীরতর আগুনের ভেতর দিয়ে চলেছো। দাউ দাউ করে সব পুড়ছে, জ্বলছে, আজ হোক কাল হোক এই আগুন একদিন সবাইকেই স্পর্শ করবে।

হিমাংশুবাবু অন্ধকারের মধ্যে বেহুঁশের মতন এই ছবিটাই দেখছিলেন এখন।

কলকাতাকে বাঁচাও

আজকে যে আর্ত ধ্বনি উঠেছে 'কলকাতাকে বাঁচাও' বলে, ১৯৪২ সালে জাপানের যুদ্ধে নামার আগে পর্যন্ত তার কোনো রেশও কারুর কানে পৌঁছোয়নি, কারণ, তখন পর্যন্ত কলকাতা যে মৃত্যুমুখী হতে পারে এই কল্পনাও কারুর মাথায় আসেনি। সেই সহজ জীবনযাত্রা—যখন ট্রামে দুপুরবেলা যাত্রী আকর্ষণের জন্য সস্তায় মিড-ডে টিকিট দেওয়া হতো, রাস্তা দুবেলা নিয়মিত ঝাঁট দেওয়া হতো, অপরাহ্নে রাস্তা ধোয়ানো হতো, অতি বর্ষায়ও কালীঘাট এবং এই রকম দু-একটা অতি নীচু এলাকা ছাড়া জল দাঁড়াতো না, এখনকার কোনো কোনো রাস্তায় সর্বসময়ে যে ভীড়, কলকাতার সকালকার বাজারেও সে ভীড় হতো না, ট্রেনযাত্রার আগে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও হৃৎকম্প হতো না—কিভাবে ধীরে ধীরে অনেক সময়ে লোকচক্ষের অজ্ঞাতে সেই সহজ জীবন দুঃস্বপ্নের বাহিরে রূপান্তরিত হলো তার খুঁটিনাটির ভেতর না গিয়েও মোটামুটি একটি কারণ নির্ণয় করা যায়। তা হচ্ছে অস্বাভাবিক জনবৃদ্ধি, যা দুটো ঢেউ-এ এসেছে—প্রথম ১৯৪২ সাল থেকে কলকাতা সমরশিল্পের একটা বিরাট কেন্দ্র রূপান্তরিত হওয়ায় এবং দ্বিতীয় ১৯৪৬-এর দাঙ্গা থেকে পরবর্তী দেশবিভাগ যা আশ্রয় প্রার্থীদের ঢেউ-এর পর ঢেউএ পঃ বঙ্গে বিশেষভাবে কলকাতা অঞ্চলে এনে ফেলেছে এবং ফেলছে। জনবৃদ্ধির এই অস্বাভাবিক চাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারী স্তরে অপরিসীম উদাসীনতা এবং মিউনিসিপ্যাল স্তরে আন্তরিকতার একান্ত অভাব, অযোগ্যতা—যাকে রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব আরো ঘোলাটে করে তুলেছে।

ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, ভারতবর্ষের এককালের সুন্দরী নগরী—শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বহু মানুষের মনোরঞ্জনের কেন্দ্র কলকাতা ধীরে ধীরে আবর্জনার নগরীতে পরিণত হয়েছে, যার বহু পথে দুর্গন্ধে হাঁটা যায় না, বহু রাস্তায় জলজমা প্রায় চিরন্তন, যান-বাহনে আরোহণ দুঃস্বপ্ন, ফুটপাথ-আশ্রয়ী হকারদের দ্বারা পথচারীরা রাস্তায় বিতাড়িত এবং ভারতের অন্য যে কোনো নগণ্য শহরের সঙ্গে কলকাতার তুলনায়ও স্বর্গ-নরকের পার্থক্যের কথা নিতান্ত স্বভাবতই এসে পড়ে।

এর ভেতর শ্বাসরুদ্ধ এই নগরীর রক্ষার উপায় নিয়ে আলাপ-আলোচনা-ভাষণের চূড়ান্ত হয়েছে, জনসংখ্যার চাপ হ্রাসের জন্য আরো বহু উপনগরী নির্মাণ, decentralisation নিয়ে বহু বাগাড়ম্বর বারবার নিরুপায় এই জনসমুদ্রকে কখনো আশান্বিত, কখনো আশাহত করেছে—এবং এরই অন্তরালে খাস কলকাতার জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষে পৌঁছে গেছে এবং বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা বোধহয় ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

এর ভেতর অবশ্য কাজ যে কিছু হয়নি তা নয়, কিন্তু সমস্যার বিপুলতার তুলনায় তা অতি সামান্য। দমদম হাইওয়ে নির্মাণ, পলতা থেকে টালা পর্যন্ত জলের মেন লাইন স্থাপন, সল্ট লেক উপনগরীর জন্য জমি উন্নয়ন, শহরতলীর কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটিকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং বর্তমানে শিয়ালদহ স্টেশনের পুনর্বিন্যাস ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। কিন্তু শহরের যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা—যানবাহনের অপ্রতুলতা তাতে মোটে হাত দেওয়া হয়নি, বরং রাষ্ট্রীয় পরিবহন এবং ট্রামওয়ে সার্ভিসের অবনতির ফলে তা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

সুধীরকুমার সেন

তবুও আশার কথা, কলকাতায় চক্র রেল আকাশ না পাতাল রেল হবে তা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক বোধহয় মিটেছে এবং এখন যা স্থির হয়েছে তাতে সম্ভবতঃ স্থল আকাশ এবং পাতাল এই তিন রকম রেলপথ দ্বারাই কলকাতায় পরিবহন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। বর্তমান পরিকল্পনা যা এবং যে অনুযায়ী ইতিমধ্যেই মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্টের (রেলওয়েজ) অধীনে সমীক্ষা শুরু হয়ে গেছে তা এইঃ সার্কুলার রেলের জন্য যে পরিকল্পনা হয়েছে তা দমদম স্টেশন থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে উল্টাডাঙ্গা রোড পার হয়ে নিউ কাট ক্যানালের দক্ষিণ তীর বরাবর চিৎপুর পোর্ট কমিশনার্সের লক গেট ব্রীজ পর্যন্ত যাবে। এইখান থেকে স্থল রেলপথ আকাশে উঠবে এবং যাবে ইডেন গার্ডেন পর্যন্ত। স্থলে গেলে এখানকার পোর্ট কমিশনার্সের পুরোন রেলপথ ব্যবহার করা যেতো কিন্তু এই পথে ৪৪টি লেভেল ক্রসিং আছে, কাজেই দ্রুতগতি রেলের এখানে আকাশে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। চক্র রেলের মোট ১২ মাইল পথের ১০ মাইলই যাবে মাথার ওপর দিয়ে।

আর রেলপথের পাতাল অংশের জন্য সমীক্ষা চলছে দু জায়গায়—কলকাতার উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে। উত্তর-দক্ষিণের প্রস্তাবিত রেলপথ যাবে দমদম থেকে পাইকপাড়া, শ্যামবাজার, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, এসপ্ল্যানেড, গড়ের মাঠ, আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো হয়ে বেহালা পর্যন্ত। আর পূর্ব-পশ্চিম সাড়ে তিন মাইল পাতাল রেলপথ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শুরু হয়ে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট বরাবর বাবোর্ন রোডের মোড় পর্যন্ত অথবা বিকল্প পথে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ধরমতলা স্ট্রীট, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, ডালহৌসি স্কোয়ার, স্ট্রাণ্ড রোড পর্যন্ত তারপর হুগলী নদীর তলদেশ দিয়ে হাওড়া স্টেশন। এই দু প্রস্থ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে সাড়ে ষোল মাইল। ঘণ্টায় অনুমান এই রেলপথে ৬০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

হুগলী নদীর ওপর যে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা [illegible] তার জন্যও [illegible] করা হয়েছে [illegible] ব্যবস্থা অনুযায়ী [illegible] প্রকল্পটি [illegible] হবে চতুর্থ পরিকল্পনা [illegible]।

রেল ও সেতু নির্মাণ ছাড়া কলকাতা মেট্রোপলিটান [illegible] কলকাতা ছাড়া, ২৪ পরগণা হাওড়া ও হুগলী জেলার [illegible] উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করা [illegible] তাতে চতুর্থ যোজনায় পাঁচ বছরে মোট খরচ ধরা হয়েছে [illegible] কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো [illegible] পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর বিস্তার, জলনিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তা ও গৃহনির্মাণকে কেন্দ্র করে। এই [illegible] যে সব প্রকল্পগুলো স্থান পেয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

জল সরবরাহ

কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় জল সরবরাহ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, কলকাতা ও সংলগ্ন মিউনিসিপাল এলাকায় জরুরী জল সরবরাহ ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, গার্ডেনরীচ, গার্ডেন-শহর, ভাটপাড়া ও সাউথ সাব আর্বান প্রকল্প—৩২ লক্ষ টাকা, মানিকতলা, তপসিয়া ও টাংরায় জল সরবরাহ—১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, কলকাতায় জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতির জন্য বিবিধ প্রকল্প—৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, গার্ডেন-

রীচ ওয়াটার ওয়ার্কস থেকে জল সরবরাহ—৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, বৃহত্তর কলকাতার অ-মিউনিসিপ্যাল শহর এলাকায় জল-সরবরাহ—৬ কোটি টাকা, হাওড়ায় ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণ—৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

পয়ঃনালী

কলকাতায় তবুও যাহোক একটা পয়ঃনালী ব্যবস্থা আছে যদিও তা মান্ধাতার আমলের বলে এবং সংস্কার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবের দরুন আজ প্রায় বিকল হয়ে পড়েছে। কিন্তু কলকাতার ঠিক অব্যবহিত বাইরে সমগ্র মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্টের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা অনেকাংশে গ্রামাঞ্চলের স্বয়ংসম্পূর্ণ জল নিঃসরণ ব্যবস্থার চেয়েও নিকৃষ্ট। চতুর্থ যোজনায় মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্টে পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের জন্য যেসব প্রকল্প করা হয়েছে তা মোটামুটি এই : কাশীপুর-দমদম পয়ঃনালী নির্মাণ—৫২ লক্ষ টাকা, পাতিপুকুর টাউনশিপ—১৫ লক্ষ টাকা, হাওড়ায় পয়ঃনালী নির্মাণ—১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, কলকাতার পয়ঃনালী হীন এলাকা—১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, টালিগঞ্জে পয়ঃনালী নির্মাণ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা—২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, মানিকতলা—১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা, কাশীপুর-চিৎপুর এলাকা—১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, চন্দননগর অঞ্চলে পয়ঃনালী নির্মাণ—৭৫ লক্ষ টাকা, ভাটপাড়া-টিটাগড় অঞ্চলে নর্দমার আবর্জনা শোধন কারখানা—৩০ লক্ষ টাকা ও দমদম এলাকায় পয়ঃনালী নির্মাণ—৩৫ লক্ষ টাকা।

জলনিকাশী ব্যবস্থা

কলকাতায় ড্রেনেজ আউটফল সংস্কার ও জলনিকাশী—৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, টালিগঞ্জ—পঞ্চান্নগ্রাম জলনিকাশ—৩৭ লক্ষ টাকা, মানিকতলা-খড়দহ-বৈঁচিতলা-কেওড়াপুকুর জলনিকাশী প্রকল্প—৬৪ লক্ষ টাকা, হাওড়া—১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, উত্তর-পূর্ব টালিগঞ্জ—৬৬ লক্ষ টাকা, উত্তরপাড়া-কোতরং—২০ লক্ষ টাকা, বরানগর-কামারহাটি—৭০ লক্ষ টাকা, কোন্নগর জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন—৭৮ লক্ষ টাকা, কৃষ্ণপুর খাল সংস্কার—৫৯ লক্ষ টাকা, মনিখালি বেসিন জলনিকাশী নালা—৫৫ লক্ষ টাকা, খড়দা বেসিন জলনিকাশী নালা—২৫ লক্ষ টাকা, চুড়িয়াল বেসিন জলনিকাশী ব্যবস্থা—২০ লক্ষ টাকা, কলকাতা ও হাওড়ায় প্রস্রাবাগার নির্মাণ—১০ লক্ষ টাকা।

রাস্তা, ব্রীজ

নতুন জায়গায় বাকল্যান্ড ব্রীজ পুনর্নির্মাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, মধ্য হাওড়া একসপ্রেস সড়ক—১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, ভি আই পি রোড—রাসবিহারী অ্যাভিনিউ সংযোগ—২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, কলকাতা ও হাওড়ায় রাস্তা সংস্কার ও আলোক ব্যবস্থা—৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, দেশপ্রাণ শাসমল রোডের উন্নয়ন—২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা।

বিবিধ উন্নয়ন প্রকাশ

বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের যেগুলো ৪র্থ যোজনায় স্থান পেয়েছে তা হচ্ছে কলকাতা ও হাওড়ায় আবর্জনা অপসারণ ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, কলকাতা, হাওড়ায় বস্তী উন্নয়ন—১১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা, কোণা ও কল্যাণী উপনগরীর বিস্তার—১৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, কলকাতা, হাওড়ায় হাসপাতালের উন্নয়ন—৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য গৃহনির্মাণ—৬ কোটি টাকা, কল্যাণী ব্রীজ—২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, ব্যারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ে—১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ট্রাম লাইন নবীকরণ—১ কোটি টাকা।

এ বছরে

চতুর্থ যোজনার ৫ বছরের জন্য ক্যালকাটা মেট্রোপলিটনে ডিস্ট্রিক্টের উন্নয়ন বাবদ যে ১৪৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার মধ্যে চলতি বছরে ব্যয় হবে ২২ কোটি টাকা। প্রকল্পগুলো এই : জল সরবরাহ—৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, পয়ঃনালী নির্মাণ ও জল নিকাশ—৭ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, যানবাহন—৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, আবর্জনা পরিষ্কার—৮১ লক্ষ টাকা, বস্তী উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি—১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের জন্য স্বল্পব্যয়ে গৃহনির্মাণ—১০ লক্ষ টাকা, গ্যাস সরবরাহ প্রভৃতি অন্যান্য বিশেষ প্রকল্প—৯৯ লক্ষ টাকা।

বস্তী উন্নয়ন

বস্তী উন্নয়নের যে প্রকল্প নিয়ে কলকাতা পৌরসভা চলতি বছরে কাজে নামতে চলেছেন তাতে তাঁদের হিসেব মতো ব্যয় হবে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। পুরো টাকাটাই কেন্দ্রীয় সরকার দেবে—অর্ধেক সাহায্য আর অর্ধেক ঋণে। এই অর্থে চলতি বছরে প্রতি ওয়ার্ডে ৩শ' থেকে এক হাজার অধিবাসী সমন্বিত একটি করে বস্তীতে হাত দেওয়া হবে। কাজ হবে খাটা পায়খানার বদলে ড্রেণ পায়খানা নির্মাণ, বস্তীর রাস্তা সংস্কার ও আলোর ব্যবস্থা, নর্দমা তৈরী ও সংস্কার ও জলসরবরাহ। ওয়ার্ড পিছু টাকারও একটা বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

কলকাতা এক দীর্ঘকালের অবহেলিত নগরী যেখানে বছরের পর বছর ধরে সমস্যার সংযোজনই হয়েছে, কিনারা হয়নি। যেসব সমস্যা সার্বজনীন, তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে বহু ব্যক্তিগত সমস্যা যেমন, বাসস্থানের অভাব, স্কুলে-কলেজে স্থানাভাব, বেকারী ও অর্ধবেকারী, দ্রব্যমূল্যের ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগতি। অপরপক্ষে, এইসব সমস্যায় হস্তক্ষেপ করতে হলে যে আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং তার চেয়েও বড়ো কথা—যে অনমনীয় সংকল্প ও যোগ্যতার একান্ত প্রয়োজন, সরকার ও পৌর-শাসন পর্যায়ে তার অভাব আজ অতিমাত্রায় পরিস্ফুট। শিল্প সম্পর্কের অবনতি এবং রাজ্যের রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা এর সমাধান দিনের পর দিন আরো জটিল করে তুলেছে। গড়ার চেয়ে ভাঙার আকর্ষণ যেখানে প্রবল, রাজনীতি যেখানে দলীয় স্বার্থের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে সেখানে প্রকল্প ও সাফল্যের মধ্যে দুস্তর প্রতিবন্ধক থাকে। কলকাতার উন্নয়নে এইখানেই সব চেয়ে বড়ো বাধা। রাজ্যের রাজনীতি যতদিন পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে মুক্ত না হবে ততদিন ব্যর্থতার আশঙ্কা থাকবে প্রতিপদেই।
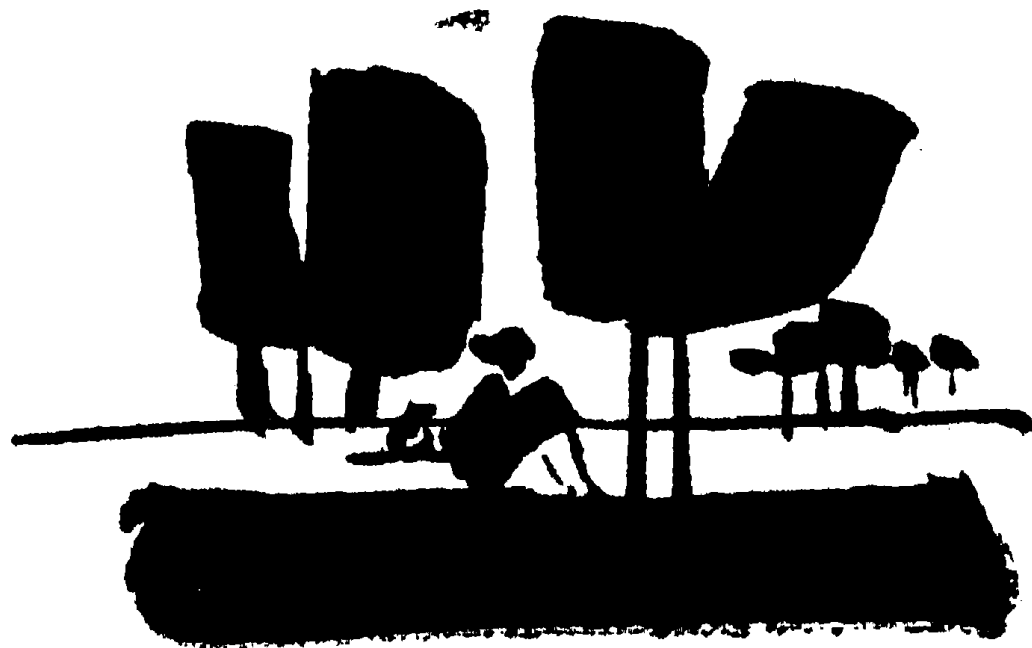
এই আমাদের দেশ

তারকেশ্বর কামারপুকুর জয়রামবাটি রাধানগর চলুন

রোজ কল টানছি, যাঁতা ঘোরাচ্ছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকছি পা গলাবার মত একটা বাসের অপেক্ষায়। প্রতিদিন কত ইচ্ছার সমাধি ঘটছে—হাজার মানুষের সঙ্গে পথ হাঁটছি অথচ কারো হৃদয়ের কাছাকাছি এক চিলতে জায়গা করতে পারছি না। ক্রমশ বিরত বিরক্ত হচ্ছি—কোথাও এক চিমটে জায়গা নেই নিঃশ্বাস নেবার কি দুদন্ড নিজের কাছে ফিরে দাঁড়াবার।

সব সময়েই মনে হয় বেরিয়ে পড়ি, এই শহর ছেড়ে পিচ বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথে অরণ্য ছায়ায় দুদণ্ডের অমন শান্তি, পিছু ফিরে দেখার দায় নেই, খবরের কাগজের উত্তেজনা নেই কিংবা অফিস হাজিরা দিতে জান খোয়াবার ঝুঁকি নেই।

বেরিয়ে পড়লেই বেরিয়ে পড়া হয়। খানিকটা অভ্যাস, খানিকটা ইচ্ছা। সুতোয় বাঁধা ফড়িংয়ের মত পতপত উড়তে উড়তে যখন ঝিমুনি আসে তখনই সুতো ছিঁড়ে দু-চার দিনের মুক্তির নেশা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা সবাই অল্পবিস্তর একটু ঘুরে আসার ইচ্ছে মনে মনে পুষে রাখি—সময় সুযোগ কি যোগাযোগের অভাবে ঘটে ওঠে না। বেড়াতে বেরোনোর কথা মনে হলেই বাংলা দেশ বাদ দিয়ে দূরান্তরের ইতিহাস-লিপিবদ্ধ জায়গাগুলি চোখের সামনে ভাসে। কয়েকদিনের একটানা ছুটি, এককালীন বেশকিছু টাকার গোছ না করতে পারলে দূরের পাড়ি জমে ওঠে না। সেরকম সবদিক থেকে গোছগাছ যখন হয়ে উঠবে তখন না হয় ভারতবর্ষকে চোখ মেলে দেখা। আপাতত বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র যে-সব দেখার জিনিষ ছড়িয়ে রয়েছে টুক-টাক করে সেগুলো আগে মেরে নেওয়া যাক। একদিন বা দুদিনের ছুটিতে বাংলা-দেশের অনেক কিছু দেখা যেতে পারে।

প্রথমে তীর্থ দিয়েই সুরু করছি। চলুন তারকেশ্বর জয়রামবাটি-কামার-পুকুর-গড়মান্দারণ - রাধানগর। ছোট্ট ট্রিপ। খরচও কম। যে কোন রোববার বা একটা দিনের ছুটিতে ঘুরে আসা যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে ভোরের তারকেশ্বর লোকালে চড়ে বসে নেমে পড়ুন তারকেশ্বরে। বোচকা বুচকি কিচ্ছু নেবার দরকার নেই। খাবার কিছুও না। ট্রেনেই সব পাবেন। সিঙ্গুর থেকে কলাওলা উঠবে, পাঁউরুটি সিটে বসেই পাবেন। ভাঁড়ের চা তো আছেই। মুখ বদলাতে ভেরিয়াস ভাজা খান বা বাসন্তী চানাচুর। ফল খাওয়া অভ্যেস থাকলে তাও পাবেন। ন্যাসপাতি উঠেছে, আপেলের বড় দাম। বড় সাইজের পাকা পেয়ারা নিতে পারেন। গরমকাল হলে ঝালনুন দেওয়া কচি শশা খেতে পারতেন। তারকেশ্বর স্টেশনে নেমে হেঁটে বা রিকসায় মন্দিরে চলে যেতে পারছেন। স্টেশনের গেট থেকেই পান্ডারা আপনাকে ধরে নেবে। পুজো দেবেন কিনা থাকতে চান নাকি। অন্যসব তীর্থস্থানে যেমন কামড়া-কামড়ি ঠিক তেমনটা নয়। ইচ্ছে করলে ওদের কাউকে সংগে নিতে পারেন না হলেও কোন অসুবিধে নেই। মন্দিরের পাশের পুকুরে স্নান সেরে দর্শন করলেন, পুজো দিলেন। কাছেই হোটেল আছে দুপুরের খাওয়াটা চটপট মিটিয়ে বাজারটা একচককর ঘুরে নেওয়া যায়। মন্দিরের সামনেই ছোট ছোট প্রচুর দোকান পাবেন টুকিটাকি কেনার থাকলে কিনতে পারেন।

তারকেশ্বর সেরে কামারপুকুর-জয়রামবাটি যাওয়ার আগে তারকেশ্বরের একটু পরিচিতি দিয়ে দি। তারকেশ্বর বাংলাদেশে রাঢ়ের দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ। যদিও মঠের স্থাপনা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য নয়, এ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে উত্তর ভারতীয় শৈব সম্প্রদায়ের। এমনকি মোহান্ত কালচারও বাইরে থেকে তাবাড়া-লীরা আমদানী করেছেন। শঙ্করাচার্য ভারতের বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করে, নানা মত খণ্ডন করে বেদান্তশাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রচারের উদ্দেশ্যে চারটি মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গাগিরিতে শৃঙ্গাগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ এবং বদরিকাশ্রমে জোসী মঠ। শঙ্করাচার্যের আদেশে তাঁর শিষ্যরা নানা দেশের স্থানীয় পণ্ডিতদের সংগে আলোচনা করে বিচার করে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি আকার দেবতার উপাসনা প্রচার করেন। তাঁর

শিষ্যদের মধ্যে চারজন প্রধান—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য, তীর্থ ও আশ্রম; হস্তামলকের দুই শিষ্য, বন ও অরণ্য, মণ্ডনের তিন শিষ্য, গিরি, পর্বত ও সাগর। তোটকের তিন শিষ্য, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। এই চারজন মঠাচার্যের দশজন শিষ্য থেকেই পরবর্তীকালে প্রচলিত দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। রাঢ়ে শৈবধর্মের প্রাধান্য বরাবরই ছিল। ধর্মপূজা ও শিব-পূজা লোকায়ত শৈবধর্মে মিলে-মিশে গেছে। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন হয়েছে রাঢ়ের অন্যতম লৌকিক অনুষ্ঠান।

তারকেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় মায়াগিরি ধূম্রপান বা সমুদ্রনাথ গিরি হলেন মঠের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২৯ সালে তারকেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠা হয়।

তারকেশ্বরের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রাজা ভারা-মল্লের গোরক্ষক ছিলেন মুকুন্দ ঘোষ। গভীর জঙ্গলের মধ্যে স্বয়ম্ভু শিব তাঁর কাছেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। মুকুন্দই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে পূজা করবার আদেশ পান। ব্রাহ্মণপূজারী পরে নিযুক্ত হন। দেবতা যার কাছে প্রথম দেখা দিলেন সেই গোরক্ষক মুকুন্দকে সরিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণপূজারী নিযুক্ত হলেন। কথিত আছে এই সময়ে হাওড়া জেলার সিংটি শিব-পুরের চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী স্বপ্ন দেখে তারকেশ্বরের ও রামনগরে গিয়ে ভারামল্লের কাছে পুরোহিতের কাজ পেলেন। মোটা-মুটি তারকেশ্বর পরিচিতি এই রকম।

স্টেশনের পাশেই আরামবাগ যাবার বাস। অহল্যাবাঈ রোড ধরে সোজা তারকেশ্বর। পিচঢালা রাস্তা। দুপাশে ফাঁকা মাঠ। এখন বর্ষার সময়। মাঠে ছাল কষকষে পাটগাছ মাথা দোলাচ্ছে। খানিক-দূর এগোলেই চাপাডাঙা। বাস থামবে কয়েক মিনিট। তারপর দামোদর নদীর ওপর বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে একটানা বাস চলবে। হরিনখোলায় এসে হয়ত বাস বদল করতে হতে পারে। হয়ত বলছি কারণ মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর পাকা ব্রীজ এখনও শেষ হয়নি। কাজ চলছে। অস্থায়ী কাঠের সেতু রয়েছে—সেটার ওপর দিয়ে বছরের সব সময়েই বাস যেতে পারে। কেবল বর্ষার সময় নদীর জল বাড়লে সেতুটি খুলে নেওয়া হয়। তখন নৌকোয় পারাপার। ওপারেই আবার বাস আছে আরামবাগ যাবার। মায়াপুরের ওপর দিয়ে আরামবাগে পৌঁছলেন। মায়াপুরে প্রতি রবিবার গরুর হাট বসে। দূর দূরান্তর ব্যাপারীরা আসে গরু-ছাগল-মুরগী কেনাবেচা করতে। আরামবাগ পৌঁছে হয়ত আর সময় পাবেন না ছোট্ট শহরটা ঘুরে দেখতে। কারণ কামারপুকুরের বাস অপেক্ষা করছে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

বাসে প্রথমে কামারপুকুর তারপর জয়রামবাটি। কামারপুকুরে ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণের জন্মস্থান। ফাঁকা মাঠের মধ্যে মন্দির, পরিচ্ছন্ন। খোলামেলা নির্জন জায়গাটা আপনার ভালই লাগবে। পাশেই বড় একটা পুকুর। কাকের চোখের মত তকতকে জল। দেখলেই স্নান করতে ইচ্ছে করবে। মন্দিরের পাশেই ছোট্ট একটা মাটির বাড়ি। পলিমাটি দিয়ে সুন্দর করে নিকানো এখানে রামকৃষ্ণদেব থাকতেন। তাঁর ব্যবহৃত টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র এখনও আছে। পাশেই গেস্ট হাউস। দূরের যাত্রীরা আগেভাগে যোগাযোগ করলে থাকার জায়গার ব্যবস্থা হতে পারে। এমনকি কর্তৃপক্ষের সংগে কথা বলে নিলে দুপুরে প্রসাদও খেতে পারেন। কামার-পুকুর থেকে জয়রামবাটি কয়েক মিনিটের পথ। বাসেই যাবেন। জয়রামবাটি শ্রীমার জন্মস্থান। এখানের মন্দিরটিও ভাল। মন্দির সংলগ্ন লনে বসে বেশ খানিকটা হাঁফছেড়ে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। তীর্থ দর্শনে যাঁরা যাবেন তাঁদের তো ভাল লাগবেই যাঁরা বেড়াতে যাবেন তাঁদেরও গাছপালা ঘেরা সবুজ চত্বরটা মুগ্ধ করবে। খানিক দূরেই মান্দারণ গ্রাম। এখানে গড় ছিল। এখন প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী বলতে শুধু মাটি চাপা গড়ের ওপর কিছু গাছপালা।

এবার রাধানগর। রাজা রামমোহনের জন্মস্থান। বাসে আরামবাগ ফিরলেন। আরামবাগ থেকে আবার বাসে মায়াপুরের মোড়। মায়াপুর মোড় থেকেই রাধানগর যাবার বাস পাবেন। একেবারে রামমোহন স্মৃতিসৌধের সামনে এসে নামবেন।

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রামমোহনের জন্ম-স্থানে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। রামমোহন স্মৃতিসৌধ, তারই সামনে কয়েকখানা ইটের ওপর সিমেণ্টের পলেস্তারা দিয়ে রাজার ভূমিষ্ঠ হওয়ার জায়গাটি চিহ্নিত করা আছে। বিরাট একটি ব্যক্তিত্বের সামনা-সামনি দাঁড়াতে যেমন মাথাটা এমনিতেই শ্রদ্ধায় নিচু হয়ে আসে বেদীটির সামনে দাঁড়ালে তেমনি একধরনের অভিব্যক্তি আপনার মনে জাগবে। পাশেই রাজা রাম-মোহন রায় কলেজ। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানকার কিছু উৎসাহী অধ্যাপকের সাহচর্য আপনার ভাল লাগতে পারে। রাজা রামমোহনের জন্মের থেকে প্রায় দুশো বছর কেটে এল, অথচ এই যুগস্রষ্টার স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থাই সরকারী তরফ থেকে করা হয়নি—হয়ত এই দেনা ঢাকতেই তারা এগিয়ে আসেন পর্যটকদের কাছে আর রামমোহনের জীবনের উল্লেখ্য ঘটনা বিবৃত করেন। পাশের গ্রাম কৃষ্ণনগর। ইচ্ছে করলে তিন-চার মিনিটের মধ্যে এখানকার দুই জাগ্রত বিগ্রহ গোপীনাথ ও রাধাবল্লভ দেখে নিতে পারেন। স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে রাধাবল্লভের মন্দিরটি খুব প্রাচীন। এছাড়া রাধানগরে শ্মশানের ওপর আগমবাগীশ পরিবারের জাগ্রত কুলদেবী আনন্দময়ী কালীও একবার ঘুরে আসবার মতো। মন্দিরটি ত্রিকোণ। প্রতি অমাবস্যায় খুব ধুমধাম করে কালীর পুজো হয়।

এরপর ফেরার পালা। রাধানগর থেকেই ফেরার বাস পাবেন—প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসতে পারছেন।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখের মেলা

গওশল পালোয়ান

সৃষ্টিবৈচিত্র্যে খোদাতায়ালার রসবোধের তুলনা হয় না। গওশল পালোয়ানকে মনে হয় তিনি নিজের হাতেই গড়েছিলেন একটু উদার-হাতে বেশি মাল-মশলা দিয়ে। গওশলের চেহারা, 'লাখে না মিলয়ে এক'! লম্বায় সে সাড়ে সাত ফুট, চওড়াতেও ফুট পাঁচেকের কম নয়। ন-গজ কাপড় লাগে তার জামা করতে। সাত গজ কাপড়ের লুঙ্গি। পায়ের জুতো তব কোথাও পাওয়া যায় না। মুচির কাছে অর্ডার দিয়ে একবার দু-খানা নিউকাট জুতো তৈরি করিয়েছিল, খড়ের নৌকোর মতন বড়—দু' মাসেই তা ফেঁসে গেল। টিনিং করা ভাগলপুরী গাইগরুর চামড়া হওয়া সত্ত্বেও—বিনা নজরানায় প্রায় প্রতিদিন তাপ্পি মেরে মেরে মুচির বাপের নাম ভোলালেও বচ্ছর দুই তবু তো তা চলেছিল নিতান্ত চামড়ার জিনিস বলে, কিন্তু মেয়েমানুষ একটাও টিকল না গওশলের কপালে। বার সাতেক পবিত্র কলেমা পাঠ করে সাদী করা সাত সাতটা ডাগড়াই যুবতী মুসলমান রমণীকে ঘরে আনলেও।

মাত্তর তিন দিন কেঁদে কেটে ঘর করে কনে বউগুলো সেই যে তাকে 'বাপ' বলে পালায় আর আসে না। গওশল পালোয়ান হতে পারে, একশোজন মানুষকে সে একাই একটা লাঠি নিয়ে পায়তারা কষে দৌড় করাতে পারে বটে, কিন্তু মেয়ে মানুষের সঙ্গে কি সে লড়াই করবে? আর মুসলমান মেয়েগুলো বড় ধড়িবাজ! পুরুষরা মেয়েদের তালাক দিতে পারে শরিয়তের একচেটিয়া অধিকারে, কিন্তু বেশরিয়তি ফতোয়ায় মেয়েরাও তালাকের অধিকার বা হক আদায় করতে পারে—সোজা সোয়ামীকে 'বাপ' বলে দিলে—বাস সব শরিয়ত, আইন, ফতোয়া ভুণ্ডুল! মানে তালাক হয়ে গেল! আর তার সঙ্গে ঘর-সংসার চলবে না!

গওশল পালোয়ানের দাপট সহ্য করতে না পেরে সাত সাতটা ভরযুবতী মেয়ে নাকি তাকে 'ধরম বাপ' বলে পালিয়ে গেছে।

তাই গওশল একক, নির্বংশ।

চারটে পাঞ্জাবী গাইগরু পোষে সে, একটা রাখাল রেখেছে। গাইগরুর দুধ থেকেই তার ভরণ-পোষণ হয়ে যায়। তাছাড়া বাইরের উপায় আছে। দাঙ্গা, জমি দখল, ক্ষমতার প্রদর্শনী, রাতের মোহিনীদের থেকে প্যালা-পানি ইত্যাদি পায় সে।

দু' সেলের টর্চের মতন বড় পিতলের 'সাপী' বাঁধানো অর্ডারী কল্কেতে এক ভরি গাঁজা ধরিয়ে সশিষ্য মজলিস বসিয়ে হুগলী নদীর তীরে তিন ফটকের পুলের পাশে তিন কাঠা জায়গা জুড়ে বসে কোলজে ফাটানো মিনিটখানেক চোঁচা দম মারে গওশল—আর তারপর হু হু করে নীলচে ঝাঁঝালো কটুগন্ধ ধোঁয়া ছাড়ে যখন, নদীর নৌকোগুলো আড়াল হয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত শিষ্যদের চোখ থেকে। সাধারণ সরু কল্কে যতই পাকা পোড়ামাটির হোক না কেন গওশল, বাবা গুনুজের মাল্লেকের নাম নিয়ে মাত্তর একটা দম মারলেই চড়াং করে ফেটে যায়! গাঁজা পবিত্র শৈব নেশা, একশো টাকার নোট পুড়িয়ে সেই নেশায় অগ্নি-সংযোগ করতেও নাকি কসুর করে নি গওশল পালোয়ান—এমনি দিলদার মানুষ সে।

দক্ষিণে খালের পারে বেশ্যাপট্টি। তার সামনে হুগলী নদীর বেটমনির রাস্তার দু-বগলে দোকান-'পাসাণী' ফেরি ঘাট—পল্লাণ কাঠের আড়ত—উত্তরে বিড়লা কোম্পানীর বিরাট চটকল, লিনোলিয়াম, স্টেবল ফাইব্রো, অ্যাসিটিলিন প্লান্ট, অক্সিজেন প্লান্ট, ক্যালসিয়াম কারবাইড ফ্যাকটরী—পাওয়ার হাউস। পশ্চিমে নদী। পুব দিকে কিছু দূরে কারখানার বাবুদের স্টাফ কোয়ার্টার। শিব মন্দির। সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং—ঢং ঢং। বনঝামা, নল-খাগড়া, হরকোচ, গেঁওয়া, ভেকাঁটালের বন-ঝোপ খালের ধারে। ফেরি নৌকোর মাঝিরা দরিয়ার ওপর থেকে কারখানা শ্রমিকদের পারাপারের উদ্দেশে চিৎকার করে 'যাবে—বাগাণ্ডা—বুড়ুল—নলবাড়ি...' তাদের দীর্ঘ-স্বরের স্বর বাতাসে ভেঙে ভেঙে যায়। রাতের মোহিনীরা মুখে ছাই-পাঁশ মেখে যে যার খুপরির দোরে দোরে লম্ফ জেলে বসে আছে। কেউ বা শিকারের ধান্দায় অনর্থক চা-দোকানগুলোর হ্যাসাকের আলোর সামনে এসে বিড়ি-পান বা চা খাবার অছিলায় ঘোরাফেরা করছে। শনিবার হলে কারখানার 'হপ্তা' পাওয়া মানুষদের ভিড় হয়। আম, কাঁটাল, ইলিশ, আনাজ কেনে তারা। কেউ কেউ একটু 'নেশা' করে, তাড়ি-মদ খায় তারপর মোহিনীরা 'বাঘের খেলা' দেখাবার জন্যে হাত ধরে টানলেই ভগবানের নাম স্মরণ করে নরকের অন্ধকারে ঢুকে পড়ে। ভগবানের নাম করতেই হয়। নইলে সখের 'বাড়ী', হঠাৎ সোডার বোতল মাথায় ফাটলেই হল! এই অন্ধকারেই ইষ্ট নাম জপার রেওয়াজ একান্ত দরকার।

তবে গওশল পালোয়ানকে যে বেটা কিছু 'চেকারা' বা 'ভেড' দিয়ে যায় তার বিপদ কম।

অন্ধকারে গওশল বসে থাকে বটে, কিন্তু তার ভীমের মতন বিশাল পাটল চক্ষু সব দেখতে পায়। কিছু গণ্ডগোল বাধলেই গওশল হাঁক মারে—'কোন শালা রে... সব ঠাণ্ডা।

কিন্তু আড়াই ফুটে বামন ভজহরির গায়েন গওশল পালোয়ানকে কেয়ার করে না! সে তার গোপাল ভাঁড়। নাকটা উঁচু, কান দুটো বড় বড়। পিঠে একটু কুঁজ। সে বলে, 'শালা, তুই পালোয়ান হলে কি হবে, আমার মতন এমনি ছোট হতে পারবি? তোর অতবড় শরীলকে কুঁকড়ে বেঁকে-দুমড়েও আমার মতন বামন-অবতার হতে পারবি নি। একবার আমার মাথায় চাঁটি মারলি 'ভগবান তোকে শালা ঘোড়ার আণ্ডা থেকে পয়দা করেছে নাকি রে' বলে, আর আমি অপমানে রাগে তোর কাপড় ধরে ঝুলে পড়তেই তুই শালা আমাকে একটা ঘন্টার মতন একহাতে শূন্যে তুলে ধরলি—সেই আমার আকাশে ওঠা—তারপর তুই ছুঁড়ে ফেলে দিলি তিন ফুটকে পোলের জলে—জল শালা ভীমবেগে ছুটেছে! আমি এসে পোলের পাল্লার কাঠে পড়নু। একটা হালা ধরে ঝুলে রইনু। তখন ওপরে সব চেঁচামেচি। গওশল তুই নিজেই ছুটোছুটি করলি। কেউ দেখছে জলের তোড়ে পোলের ওপারে বেরিয়ে গেল কিনা! তুইও কেঁদে ফেললি। তখন আমার যেন প্রাণে মায়া হল তোর জন্যে! লোকটা সখ করে আমার মতন মিনি-দামের লোককে ফেলে দিয়ে মজা করেছে বটে কিন্তু আমার কি উচিত ওর মতন মহারাজ ভীমসেনকে কাঁদানো! তাই 'চিৎকার' করে সাড়া দিনু, 'ভজহরি এখানে! ভজহরি বামন অবতার—তাকে মারা যায় না।'

গওশল হেসে উঠল। ভজহরির পায়ের ধুলো নিয়ে তার মাথাতেই বুলিয়ে দিয়ে বললে, সোনা আমার! তোকে তখন একটা বাঁশ দিয়ে তবে তুলি। তাও আবার মজা শোন। বাঁশ কোথা পাই, মনে পড়ে গেল সরলা বেউশোর উঠোনে কাপড় শুকোবার জন্যে একটা বাঁশের ভারা আছে বটে, ছুটে যেয়ে বাঁশ খুলতেই ওদের ঘরে ঘরে যত হাঁড়ি-মারা হুলো বেড়ালরা ছিল শালা আমাকে দেখেই সবাই বেরিয়ে পড়ে মার খেঁচে দৌড়! তারপর মেয়েগুলো সবাই এসে অভিযোগ করলে, লোকগুলো সব পালাল—এবার টাকা দেবে কে? তখন এই 'সোনা'কে দেখিয়ে বললুম, এই যে, একে নিয়ে যা! তারা তখন খিল-খিল করে কী হাসি। সরলা ওকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল। শরীর গরম করে দিলে। ওকে ওরা সবাই পেতে চায় অতিথিরা চলে গেলে অবসর রাত্তিরে। গোঁড়া গুটকে লোকের ক্ষ্যামতা নাকি দেখার মতো।

গওশলের গা-গতর উলছিল জাবেদ আলী-পাতলো তালপাতার সেপাই—মাথায় ফুট পাঁচেক—সে গায়ের জোরে ঘুঁষি কীল মারছিল কিন্তু গওশলের কিছুই হচ্ছিল না। পূর্ণিমা অমাবস্যায় যখন গতর বেশি কামড়ায় তখন সে শুয়ে পড়ে আর সবাই তার গায়ে চেপে মাড়ায় চটকায়, এক চড়ের মামলা নয়, সামান্য টুনটুনি পাখি জাবেদ আলী তার কি করবে!

চা আসছিল। গাঁজা চলছিল। চাকার মতন গোলাকার ভুঁড়িদার চেহারার একটা লোক এসে বললে, 'গওশল সাহেব, আপনাকে কি আজ রাত্তিরে পাওয়া যাবে?'

সবাই তখন চুপচাপ।

গওশল মাথার উড়ুনীর পকড়টা খুলে ফেলে গম্ভীর মেজাজে বলে, 'কোথায়, কত-দূর, কি ব্যাপার?'

লোকটা উবু হয়ে বসল। হাতের চারটে আঙুলে সোনার আংটি। মালদার লোক মনে হয়।

লোকটা বললে, 'আমার দোতলা পাকা-বাড়ি। ভগবানের আশীর্বাদে অবস্থা খারাপ নয়। আমার বাড়িতে আজ রাত্রে নাকি ডাকাত পড়বার সঠিক যুক্তিযাক্তা হয়েছে। ডাকাত দলের কথাবার্তা যে চা-দোকানে গোপনে চলে তার পাশের পঞ্চাননদের চাতালের বেদীতে পড়ে ঘুমোচ্ছিল একটা ভিখারী। সে একসময় জেগে যায়। কান পেতে তাদের কথা শোনে। তারা দোকানের মধ্যে মদ খায়। ভিখারীটি পরদিন সকালে এসে আমাকে সব জানায়। বলে, তারা বলেছে বোশেখ মাসের আট তারিখ রাত দুটোর সময়। দশ জায়গার দশজন অমুক মাঠে মিট্ করবে। বন্দুক থাকবে একখানা। বলেছে, বামুনগাছির দক্ষিণামোহন দত্তের বাড়িতে। আজ আট তারিখ। যেতেই হবে আপনাকে।'

ভজহরি বলে, 'ওরে বাপ! বন্দুক আছে—যেও না।'

জাবেদ বলে, 'অচেনা জায়গা।'

আরো চারজন শিষ্য, তাদের প্রত্যেকেরই বউ নেই, কেউ কানা, কেউ খোঁড়া, কেউ তোতলা, কেউ কালা, কেউ বেটপ—সবাই যেন একটা বিশাল বটগাছের তলায় আশ্রয় পেয়েছে—তাদের নেশা ভাং খাবার মায় মোহিনীদের প্রসাদ পর্যন্ত এমনি এমনিতেই লাভ হয়, কাজেই বিপদে পড়ে সর্দার দেহত্যাগ করলে তখন আর কার জন্যে সবাই মিলে গলা জড়িয়ে কাঁদবে।

তাই সবাই বলে, না, তুমি যেও না। দিনের বেলার দাংগা নয় যে মানুষেদের দেখতে পাবে—সাত গেরাম তাড়া করে দিয়ে আসবে।'

এবাদত তোতলা বলে, 'শা-শা-শা-শা-লা, জ্রী-জ্রী-জ্রী-জ্রী বন নি-নি-নিয়ে খে-খে-লা!'

বন্ধ কালা বিরিঞ্চিরাম চৌকি, মনে করে লোকটা বুঝি নরক দর্শনার্থী, তাই সে বলে, 'রেণুবালা, 'ফাস কেলাস' মেয়ে আছে, যাকে বলে পানতুয়া!'

গওশল কিছুক্ষণ যেন কত কি ভাবলে। তারপর বললে, 'কত দেবেন?'

'আপনি কত চান সেটা বলুন।' লোকটা হাত কচলাতে লাগল।

'আপনার সাধ্য কতখানি আমি কেমন করে জানব বলুন। যদি ডাকাতরা আপনার স্ত্রীকে নষ্ট করে, ছেলেমেয়েদের আছড়ে মেরে ফেলে, যদি সব টাকা সোনা লুটে নিয়ে যায় আর আপনাকে জবাই করে রেখে যায় তো তখন মিছে টাকার মায়া করে কি করবেন?'

ভজহরি কি যেন বলতে যায়। গওশল এক তাড়া মারে 'থাম শালা!'

লোকটা ভয় পায়। চা-দোকানের স্বল্প আলোয় তার বিহ্বল চোখ দুটো দেখতে পায় গওশল।

লোকটা, মানে দক্ষিণা দত্ত বলে, 'আপনি চলুন—একশো টাকা দেব।'

সাঁশয়া সবাই তখন অট্টহাস্যে হঠাৎ ফেটে পড়ে গওশলরা। বলে, 'একশো টাকা! তাহলে তো কোম্পানীর মিলের তিনশো টাকায় বাঁধা মাইনের হেড দরোয়ান কিম্বা বডিগার্ড থাকলেই পারতুম। আপনি পাঁচশো টাকা দিতে পারবেন?'

'পাঁচ শো!'

'আজ্ঞে হাঁ। পাঁচশো। এক্ষুনি একশো দিতে হবে—পরে কাজ ফতে হলে বাকি চারশো। আমার জীবনটাও তো যেতে পারে? জীবন গেলে আর আপনার টাকা লাগবে না।'

ভজহরি বলে, 'উনিই বা তখন আছেন কোথায়?'

লোকটা তখন বললে, 'দুশো কিম্বা তিনশো টাকাতে হয় না?'

চটে গেল গওশল। বললে, 'কিছু মনে করবেন না দত্ত মশায়, আপনি বোকা, তাই লেবু কচলাচ্ছেন। আপনারা যখন ব্যবসার সময় লোককে ঠকান, তাদের গলা ধারালো ছুরি দিয়ে কাটেন? আমি চিংড়ি মাছ নয়, বেশি দর-দস্তুর করবেন না—আমার এককথা।'

তখন লোকটা একশো টাকার একখানা নোট বার করে দিলে। গওশল সেটাকে লম্বা করে পাকিয়ে কানের ওপরে গুঁজে নিয়ে 'আসছি' বলে চা-দোকানটাতে চলে গেল।

বেঞ্চিটাতে বসতেই সেটা মড় মড় করে উঠল। গওশল ট্যাকসির পা-দানির ওপরে দাঁড়ালেই অন্যদিকে 'যাই' লোক থাকুক, গাড়ি তার দিকে অবনত স্বীকার করে। এক বিয়ের দিনে তার শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়েছিল সে। তার খাওয়া দেখতে লোক জুটে গিয়েছিল। চার কোড়া লুচি আর দুমালসা মাংস—সের তিনেক মিষ্টি তিন ভাঁড় দই খেয়ে তবে উঠল গওশল। ছোট জলের ঘড়াটা সে একহাতে ধরেই গলায় জল ঢাললে আর সব খেয়ে ফেললে! নতুন ময়রা কেউ বসলেই সে তর্ক করে তার দোকানের সমস্ত মিষ্টি নিয়ে নেয় আর তাকে দুমাসের মধ্যেই দর্জিমে ঘুড়ি গুটোবার জন্যে উদারভাবে সহায়তা করে।

গওশল বসলে তার অধিকতর অনুরাগভাগিনী রেণুবালা (আসল নাম গহর-জান) এসে কানের ওপর থেকে নোটখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরে দেখে। বিস্ময়ে বলে, 'কে দিলে গা? একশো টাকা!'

গওশল বলে, 'তবে তোদের মতন পাঁচ-সিকে? যা, এখন একটা শুভ কাজে বেরুচ্ছি, অপয়া মাগী সরে যা।'

তখন রেণুবালা হঠাৎ তার কোলের ওপরে বসে পড়ে। গওশল তাকে জোরে একটা চিমটি কেটে দিতেই সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। উরুতে, যেখানটাতে গওশল চিমটি কেটেছিল সে হাত বোলাতে থাকে। তখন গওশল ঠাট্টা করে তাকে একটা হালকা লাথি মারে। মেয়েটা পড়ে যায় দুটো বেঞ্চির মাঝখানে। আকাশ ফাটিয়ে হা-হা করে হাসে তখন গওশল। লোকজনের হাতের চা পড়ে যায় রেণুবালার গায়ে মুখে। মেয়েটা তখন ফণা তোলে। উঠে

পড়ে নোটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গালাগালি করে।

গওশল হাসে। পরে তেড়ে যাওয়ার একটা ভঙ্গি করতেই রেণুবালা তার অন্ধকার কুটরীর দিকে পালিয়ে যায় দেহ দোলাতে দোলাতে।

গওশল দক্ষিণা দত্তের সঙ্গে চলে এসে ভাড়াটে নৌকোয় ওঠে। অন্ধকার নদী। কেউ কোনো কথা বলে না। জলের শব্দ। ঘন্টাখানেক পরে তারা এসে একটা ঘাটে ওঠে। টর্চ জেবলে জেবলে একটা গ্রাম তারপর বিরাট একটা মাঠ পার হয়ে এসে একখানা পাকাবাড়ির সামনে দাঁড়ায়।

গওশল ভেতরে যায়। দেখেশুনে নেয়। ঘরদোর খুবই ভাল। কয়েক লাখ টাকার মালিক দক্ষিণা দত্ত। পাঁচ কন্যার জনক। জোয়ান ছেলে নেই কেউ।

খাওয়া-দাওয়া করার পর একটু আরাম করে নিলে গওশল। আরো যারা দু-চারজন থাকবে তাদের দেখে চিনে রাখলে। একটা ঘাইঝোড়া আর ইট যোগাড় করলে।

দত্তবাড়ির বুড়ী মা তার দুখানা হাতে ধরে কান্নাকাটি করে গেল। বউ, সোমত্ত মেয়ে তিনটে আর ছোট দুটো—সবাই কাতর চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। দত্তবউ কাঁদতে লাগল কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে।

গওশল বললে, 'ভগবানকে ডাকুন। সব ভয় কেটে যাবে। মিথ্যে সংবাদও তো হতে পারে!'

রাত একটার সময় কিন্তু সত্যিই সামনের মাঠে একটা বিরাট হৈ মেরে উঠল ডাকাত দল!

নিঝুম নিশুতি রাত। ঝিল্লী, ব্যাং, উইচিংড়ি, ঘুরেঘুরে, সাপ ডাকছে ঐকতানে।

বিষম ভয়ের রাত।

হাতে বন্দুক নিয়ে ছাদে উঠে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল দক্ষিণা দত্ত।

ঘরদোর সব বন্ধ।

গওশল রইল কিন্তু বাইরে! সামান্য দূরের খিড়কীর দিকের এক বাগানে। নিবিড় অন্ধকার। দেবদারু না কি যেন গাছের ঝোপ।

ডাকাত দল এল। সাড়া শব্দ নেই।

হঠাৎ ফায়ার হল। ডাকাত দলেরই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ। দক্ষিণা দত্তর সাড়া নেই। বোধহয় মুর্ছা গেছে। একজনের কাঁধে আর একজন উঠে ওরা পাঁচিল টপকালো। সদরের হাঁসকল খোলা হল। তখন সবাই ভেতরে ঢুকে গেছে। দোর-ভাঙ্গার শব্দ।

মেয়েদের কান্নাকাটি।

গওশল ঝাঁকা হাতে নিয়ে সুট করে ঢুকে পড়ল। হাঁক মারলে জোরে, 'দুশো লোক—সবাই ঘিরে ফ্যাল! মার শালা হাত বোমা!'

সামনে একজন ছুটে আসতেই দিলে জোরে এক লাথি।

তারপরেই গুলি! নীল আলো জবলে ওঠে। ঝড়াৎ করে শব্দ হয় ঝোড়ার ওপরে পড়ে! গুলি ভরবার আগেই লোকটাকে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে বন্দুক কেড়ে নিয়ে তারই বাড়ি মাথায় মেরে শুইয়ে দিলে। একটা বল্লমের ফলা এসে উরুতে বিঁধল গওশলের। বল্লমটা ধরে সে ঠেলে নিয়ে গেল লোকটাকে। অন্য পায়ে তাকে লাথাতে লাগল আর বল্লম টেনে তুলে নিয়ে তাকে গেঁথে সাবাড় করে দিলে। হু-হু করে তখন পালাচ্ছে সবাই। তাদের পেছনে ধাওয়া করলে সে। বন্দুকের আঘাত খাওয়া লোকটা তখন অন্ধকারে কোথায় ছিল কে জানে পিছন থেকে ছুটে এসে গওশলের পিঠে কি যেন মারলে। গওশল ঘুরে পড়ে তাকে ধরে ফেললে। লোকটার শক্ত সমর্থ চেহারা। দলের সরদার মনে হয়। মাথায় চোট খেয়ে জখম হয়েছিল আগেই। তার মাথাটাকে আবার পাকা দেওয়ালে ঠুকে দিলে ঝুনো নারকোল ঠোকার মতন বেশ করে। মেরে ফেললে চলবে না। হাত-পা মড়াস মড়াস করে ভেঙ্গে দিলে। লোকটা আর্তনাদ করতে লাগল।

গওশল হাঁক দিলে, 'ইয়া আলী!'

তার সেই হাঁক শুনে গোটা গ্রাম যেন কাঁপতে লাগল। গ্রামের চারদিকে কোলাহল। আলো জবলে উঠল। সরদারের জ্যান্ত দেহটা ভেতরে টেনে এনে দোর বন্ধ করে আগল তুলে দিলে সে।

'দুটি লাস ঘায়েল হয়েছে। আলো জবালো! দক্ষিণাবাবু কই? আর কোনো ভয় নেই। আল্লা বাঁচানেওয়ালা।'

কিন্তু কে আলো জবালবে!
অন্ধকার!...
লোকটা কাতরাচ্ছে।
পাড়ার লোকজন কেউ এল না ভয়ে!

গওশলের উরু থেকে রক্ত গড়াচ্ছে! কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে। ভীষণ কনকন করছে। সেঁটে বাঁধলে জায়গাটা। তার শরীরটা যেন ঝিম করছে। বসে রইল কিছুক্ষণ মাথা গুঁজে। তারপর গালাগালি শুরু করলে সে : 'খানকীর বাচ্চারা কেউ বেরোয় না কেন? আলো আনো, জল আনো। ডাকাতরা খুন হয়েছে, পালিয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণ পরে জানালা খুলে টর্চ মেরে দেখলে কে যেন। দক্ষিণা দত্তর কুমারী যুবতী বড় মেয়ে বোধহয়। দৃশ্য দেখে সে সাহস করে বেরিয়ে এল। তার হাত থেকে টর্চ নিয়ে সরদারকে আর পেটে বল্লম গাঁথা মরা লোকটাকে দেখলে গওশল। গাদা বন্দুকটা পড়ে আছে। মেয়েটাকে দেখলে সে। থরথর করে কাঁপছে এখনো।

গওশল বললে, 'একঘটি জল আনো মা! আর ভয় নেই। তোমার বাবাকে ডাকো।'

তারপর আলো জবলল।

দক্ষিণা দত্ত নেমে এল। ঠক-ঠক করে কাঁপছে সে। ছাদের ওপরের দিকে ডাকতেরা গুলি চালাতেই নাকি দত্তমশায় লেগেছে মনে করে পড়ে যায়। কিন্তু তার লাগেনি। তবু সে অজ্ঞান হয়ে যায়!

শুনে গওশলের এত দুঃখ-কষ্টের সময়ও হাসি পায়। তার পা-টা খুলে দেখাতেই সবাই আঁতকে ওঠে। ডেটল দিয়ে বেঁধে ফেলে।

সকাল হলে পাড়ার লোকজন আসে।

ডাক্তার আসে গওশলের জন্যে। পুলিশ আসে থানা থেকে।

কালো পাথর চেহারার জুলপী বড় সরদার জুলজুল করে চেয়ে আছে। হাত-পা ভাঙা তার। বার কয়েক সূঁচ ফোটাতেই পুলিশ তাদের নিয়ে চলে গেল। গোটা দলের নামধাম বলে দিলে।

দুদিন পরে টাকা নিয়ে ফিরে এল গওশল পালোয়ান। ভজহরি এক কলকে গাঁজা সেজে বললে, 'আর যদি কোনোদিন শালা তুমি ডাকাতি রদ করতে গেছ তবে তোমার একদিন কি আমার একদিন। মই ঠেকিয়ে উঠে যদি না তোমার গালে চড় মারি তো আমার নাম ভজহরি নয়।'

গওশল হাসে। কিছু না বলে গাঁজা টেনে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে রেণু-বালার ঘরে ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। তার সাত সাতটা বউয়ের কেউ একটা নেই তো, কেই বা এখন আর দেখবে? রেণু-বালা তাকে পাখার হাওয়া দেয়। যত্ন করে। আর গাল দেয়: 'মুখ লুকুনে মিনসে আমার, ঘাটের মড়া—জ্বালাতে এল! মড়ার মতন এবার পড়ে থাকবে রাতদিন—আমার খদ্দের-পত্তর গেল!...'

গওশল পাশ ফিরে শোয়, তক্তাপোষটা মড় মড় করে আর তারপর তার নাক ডাকতে থাকে ঘড়র ঘড়র! আস্ত যেন কুম্ভকর্ণ!

—আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ফরাসী লেখিকা মাদাম সারোৎ
রবীন্দ্রানুরাগী ডাঃ ম্যাসকারনহাস
এজরা পাউণ্ড

মাদাম নাথালী সারোৎ বর্তমান ফরাসী ভাষায় একজন প্রথম সারির উপন্যাস-লেখিকা, বয়স প্রায় আটষট্টি বছর। ১৯০২ খৃস্টাব্দে রাশিয়ায় জন্মেছিলেন তারপর দু বছর বয়সেই চলে এসেছিলেন ফ্রান্সে, সেই থেকে ফ্রান্সই তাঁর দেশ। পড়াশোনা করেছেন সরবোন এবং কিছুদিন অকসফোর্ডে। ইংরাজী বেশ ভালোই জানেন। জাপান থেকে বক্তৃতা সফর সেরে এক সপ্তাহের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, এখান থেকে গেছেন দিল্লীতে সেখানে হয়ত মাসখানেক থাকবেন। মাদাম সারোৎ-এর সাহিত্যিক স্বীকৃতি একটু বেশী বয়সেই এসেছে। ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে তাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠ করে এলাইন রবে-গ্রিলে প্রীত হন। তিনিই তাঁকে ত্রিশের দশকে প্রকাশিত 'টপসিমে' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থটি নতুন করে সম্পাদনা করার সুযোগ করে দেন। যে প্রকাশন সংস্থা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তাঁরাই ন্যুভে রোমান বা ফ্রান্সের নব্য-রীতির উপন্যাস আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই কাল থেকেই মাদাম সারোৎ যা লিখেছেন তার জন্য তিনি স্বদেশে ও বিদেশে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। স্লাজবুর্গের ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে। পরবর্তীকালে রবে-গ্রিলের ধারা যাঁরা অনুসরণ করেছেন তিনি তাঁদের সঙ্গে একই সারিতে থাকতে রাজী হন নি। রবে-গ্রিল বুর্জোয়া বা ব্যালজাকীয় উপন্যাসের প্রতি বিরূপ, মাদাম সারোৎ বালজাকের অনুরাগিণী। কিন্তু এই অনুরাগ সত্ত্বেও মাদাম সারোৎ প্রথাগত রীতির বিরোধী।

মাদাম কলকাতায় এসে যা কিছু দেখার, শোনার জেনেছেন এবং নবীন ও প্রবীণ লেখকগোষ্ঠী, ছাত্র-ছাত্রী, সিনেমা-পরিচালক, প্রকাশক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। সাংস্কৃতিক কলকাতার প্রায় সব কিছু এক নজরে দেখে নিয়েছেন। আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবে নূতনত্বের প্রতি তিনি আগ্রহী।

গত সপ্তাহে সাহিত্য আকাদেমির পুরোধা আচার্য সুনীতিকুমারের হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবনে এক সান্ধ্য মজলিশে মাদাম ও মঁসিয়ে সারোৎ-এর সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন বাংলা দেশের দশ-বারোজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ। বিশুদ্ধ ফরাসীতে সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য। ওদিকে তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী ফ্রাঁস ভট্টাচার্য, যিনি ফরাসীতে 'পথের পাঁচালী' অনুবাদ করেছেন তিনি অনবদ্য ভঙ্গীতে অনর্গল বাংলা ভাষায় কথা বলছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে. মাঝে-মাঝে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই উপস্থিত অতিথিদের কোনো-কোনো বক্তব্য ফরাসীতেই মাদামকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

মাদাম সারোৎকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ যথা — এবসার্ড নাটক, এ্যান্টি-হীরো, এ্যান্টি-প্লে ইত্যাদি নিয়ে। নতুন রীতির রচনার ভাষা এবং আঙ্গিক নিয়েও কিছু আলোচনা হল। আলোচনাসূত্রে প্রাক্তন চীফ জাস্টিস ফণীভূষণ চক্রবর্তী, গোপাল হালদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কিছু কিছু প্রশ্ন করেন। অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীমতী লীলা রায়, বিষ্ণু দে, অসীম রায়, ক্ষিতীশ রায় প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই বর্তমান ফ্রান্সের উপন্যাসশৈলী এবং আঙ্গিক নিয়ে প্রশ্ন করলেন। গৃহস্বামী আচার্য সুনীতিকুমার যেমন বহুভাষাবিদ তেমনই চমৎকার তাঁর বাকপটুতা। বৈঠকী গল্পের সঙ্গে দেশ-বিদেশের নানা ধরনের দৃষ্টান্ত উত্থাপনে তিনি বোধকরি দ্বিতীয় রহিত। আচার্য সুনীতিকুমার সমগ্র আলোচনাটির মধ্যে নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সেই সন্ধ্যার মিলন বাসরটি প্রাণরসে উচ্ছল করে রেখেছিলেন। সেদিন একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা উপভোগ করে আমরা বিশেষ প্রীত হয়েছি।

মাদাম সারোৎ রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে। তাঁর মতে প্রতিটি কল্পনাকুশল লেখকেরই রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পাঠ্য। তিনি বেশ কয়েক বছর আগে 'পথের পাঁচালী' দেখেছেন ছায়াছবির মাধ্যমে এখন অনুবাদ পড়ছেন। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বেশী নেই তবে শুনেছেন অনেক বেশী এবং তাঁর প্রত্যাশাও অনেক। উপন্যাসে মানুষের বহির্জাগতিক ক্রিয়াকাণ্ডের চেয়ে অন্তর্মুখী জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনেই মাদাম সারোৎ সমধিক উৎসাহী। তাঁর নতুন উপন্যাস "Vous Les Entendez" বা তুমি কি শুনেছ ওদের? প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল। প্রাণে তারুণ্যের জোয়ার নিয়ে এই আটষট্টি বছর বয়সেও মাদাম সারোৎ বিশ্বাস করেন যে, আগামীকালের লেখকের মধ্যে আছে প্রচণ্ড সম্ভাবনা, এবং তাঁর অন্তরে আছে নবীনের সেই উৎসাহ ও আবেগ যা সাহিত্যকারকে শেষ পর্যন্ত প্রাণবন্ত করে রাখে।

•

রবীন্দ্রানুরাগী মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ টেলো দ্য ম্যাসকারনহাস ২রা আগস্ট তারিখে তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছেন। আজ তাঁকে তাঁর স্বদেশ এক মহানায়কের সম্মানে সম্বর্ধনা করছেন। ডাঃ ম্যাসকারনহাস পর্তুগাল ও ভারতে যথেষ্ট খ্যাতিমান। ডাঃ সালাজারের কারাগারে বন্দী হওয়ার দশ বছর আগে তিনি ভারতে ছিলেন, আর যৌবনের প্রারম্ভে ছিলেন গোয়ায়। মার্মাগোয়া তালুকের ভেলসাম গ্রামে ম্যাসকারনহাসের জন্ম। গোয়ায় উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ম্যাসকারনহাস পর্তুগালে আইন পাশ করে সেইখানেই একটি কাজ নিয়ে বসবাস করেন।

কিন্তু এই পর্তুগালে কাজ করার সময় ডাঃ টেলো ম্যাসকারনহাস অনুভব করেন যে, তিনি বিদেশে আছেন। তাঁরা অন্য শ্রেণীর ও অন্য জগতের মানুষ। এই সময় থেকে শুরু হল জন্মভূমির ইতিহাস পাঠ। তিনি লিখেছেন—

"The nationalist ideal took hold of me and a group of Goans studying in Portugal, thanks to the knowledge of Indian history and of our traditions and of our glorious past."

কৈফিয়তের উপরই আমাদের ভীষণ রাগ। সেই রাগ, বিশ্বাস করুন, ব্যাপক লাথি ঝেড়ে পাশাপাশি শ্মশান কিংবা অক্ষম তরুণীর কাছে বৈরাগ্য ও অশ্রু পেড়ে ফেলে।"...অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার কবিতা। কবিতাই আমাদের সেই অমৃতময় পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবার একক মাধ্যম। আর তাবৎ মনুষ্য জাতিই কৌরব। এই হল কৌরব-ইজম।"

এঁরা তাঁদের কবিতার নিদর্শন হিসেবে একটি সংকলনও বের করেছেন। কয়েকজনের কবিতা খুবই প্রতিশ্রুতিময় বলে মনে হল। এঁদের লেখায় আর একটা জিনিস খুবই প্রশংসার দাবী রাখে, তা হল জামসেদপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের কথ্য ভাষার প্রচুর ব্যবহার। প্রসঙ্গতঃ কমল চক্রবর্তীর একটি কবিতা তুলে ধরা যাচ্ছে।—

"টাটা বাবা, আগুন দিলে
লোহা লিলে
দুখার মায়ের বুকের থিকে
মহুয়া গাছের ছায়া লিলে কেন?
বিয়ান বেলায় উঠে দেখি
পালক মেলা পইড়ে আছে
কুকড়া দুটা নাই সেঠিনে কেন?

স্বদেশ সেন, নিমাই দত্ত, সমীর মজুমদার প্রমুখের কবিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে বাংলা কবিতা নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্যই প্রশংসনীয়।

এবারের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ।। এবার 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত উর্দু কবি ফিরাক গোরখপুরী তাঁর 'গুল-এ-নগমা' গ্রন্থটির জন্য। ১৯৫৯ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং ১৯৬১ সালে 'সাহিত্য আকাদমি' পুরস্কারে সম্মানিত হয়। গত ২ আগস্ট এই সংবাদ ঘোষিত হয়। নির্বাচন সমিতির সভাপতি উত্তর-প্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ বি গোপাল রেড্ডি। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন ডঃ আর আর দিবাকর, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ করণ সিং, ডঃ কে জি সৈয়াদি, ডঃ এ এন ঝা, ডঃ হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী, শ্রীমতী রমা জৈন ও শ্রী এল সি জৈন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে কবিকে এক লক্ষ টাকাসহ ব্রোঞ্জ নির্মিত সরস্বতীর মূর্তি প্রদান করা হবে। এর আগে এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাশঙ্কর যোশি, সুমিত্রানন্দন পন্থ ও পুট্টাপ্পা।

রচনা প্রতিযোগিতা ঃ ক্ষুদে পাঠকদের ক্ষুদে পত্রিকা ঝুমঝুমির উদ্যোগে কে জি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের লেখা রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় 'স্কুলে তোমার প্রথম দিন'। রচনাটি খাতার পাতার চার পাতা হবে। তবে ২৫০টি শব্দের বেশী যেন না হয়। আর কাগজের এক দিকে প্রতিযোগীকে নিজ হাতে লিখতে হবে। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা—১২ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। রচনাটির সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মনোনয়নপত্র পাঠাতে হবে। তিনটি পুরস্কার ঃ প্রথম পঁচিশ টাকার, দ্বিতীয় পনেরো টাকার ও তৃতীয় পুরস্কার দশ টাকার বই। এ ছাড়া আরও থাকছে সাতটি সান্ত্বনা পুরস্কার। রচনা পাঠাবার খামের ওপর 'স্কুলে তোমার প্রথম দিন' প্রতিযোগিতার লেখা লিখতে হবে।

—চাণক্য

নতুন বই

সবার প্রিয় সুভাষ (জীবনী)—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। তুলিকলম। ১ কলেজ রো। কলকাতা—৯। দাম দশ টাকা।

সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে।" অদম্য তারুণ্য আর দুর্নিবার প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত এই নায়ক ভারতের রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি তাঁর দুর্ধর্ষ কার্যকলাপে বার বার বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সে আজ ইতিহাস। সম্প্রতি সুভাষচন্দ্রের জীবনকথা ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থাদি কিছু কিছু প্রকাশিত হোচ্ছে। এমন কয়েকজনের রচনা প্রকাশিত হয়েছে যাঁরা সুভাষচন্দ্রের নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বাংলায় সুভাষচন্দ্রের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থের অভাব ছিল। সম্ভবত সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 'সবার প্রিয় সুভাষ' বইখানি লেখা হয়েছে।

গ্রন্থারম্ভ ১৮৯৭ খৃঃ ২৩ জানুয়ারি কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্মকাল থেকে। বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে তাঁর কর্মময় জীবন। আপোষ এবং তোষণের যে সুলভ রাজনৈতিক চিন্তাধারা দেশের নেতাদের পেয়ে বসেছিল সুভাষচন্দ্র ছিলেন তার থেকে অনেক দূরে। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মতানৈক্য এবং সংগ্রামী মনোভাব তাঁকে যে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি বিদেশে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন। নেতাজীর দুঃসাহসিক ভারতমুক্তি অভিযানের তথ্যনির্ভর বিবরণ, পূর্ব ভারতের মণিপুর অঞ্চলে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ, ভারতীয়দের আনুকূল্য এবং আন্তরিক সহযোগিতা, আজাদ হিন্দ ফৌজের মরণপণ লড়াই, জাপানীদের অসহযোগিতা ও পশ্চাদপসরণ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অসহায় অবস্থা থেকে নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ও তদন্ত অনুষ্ঠান পর্যন্ত লেখক নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। উপন্যাসোপম বাগ্‌বিস্তার বা কল্পনার জাল না ছড়িয়ে লেখক সমগ্র বইখানিতে তথ্যের ওপর নির্ভর করেই লিখেছেন। সেজন্য বইটির প্রামাণ্যতাও বেড়েছে। বহুরঙা প্রচ্ছদ, ত্রিশখানি মূল্যবান আলোকচিত্র এবং সুভাষচন্দ্রের শেষ হুকুমনামার প্রতিলিপি বইটির বড় আকর্ষণ।

সাক্ষী (উপন্যাস)—কাশ্যপ। জি জি বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং, কলিকাতা—১২। দাম—নয় টাকা।

ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের যুগ অস্তমিত, কোন কোন সমালোচকের এরকম সোচ্চার মতবাদ শুনতে পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রকাশিত অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকালে ব্যাপারটা অন্য রকম মনে হয়। গল্প উপন্যাসে জমাট কাহিনীর আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান আলোচ্য উপন্যাসটি ঘটনাপ্রধান। ছদ্মনামের আড়ালে যিনিই হোন, তিনি প্রথম উপন্যাসেই যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটিতে অসংখ্য চরিত্র। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্র লেখকের লিপিকুশলতার গুণে উজ্জ্বল। বিশেষ করে সুবালার চরিত্র। বাধ্য হয়ে পরিবারে বিবাহ হলেও স্বামী শাশুড়ির নিদারুণ ব্যবহারে তার দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নি। মিথ্যা অপবাদে তাকে স্বামীগৃহ ছেড়ে পিত্রালয়ে ফিরে আসতে হোল। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার ভিতর দিয়ে তার দুর্বিসহ জীবনের অবসান ঘটল। কর্তব্যপরায়ণ যুবক [illegible] দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে জ্যাঠামশাই শিবনাথকে বৃদ্ধ বয়সে পরিচর্যা এবং [illegible] কোন শৈলবালার [illegible] আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। [illegible] [illegible] স্ত্রী জয়া [illegible] এই সবের কার্যকলাপে অসুখী। সুযোগ পেলেই সে দুই ননদ সুবালা ও শৈলবালাকে কটূক্তি করতে ছাড়ে না। এমন কি বৃদ্ধ শিবনাথকেও অপমানসূচক কথা বলতে দ্বিধা [illegible] না। সংসারে জয়ার মত সংকীর্ণমনা নারীর সংখ্যা বিরল নয়। শৈলবালার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন নয়। কেননা এমন একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হোল যে বাকি ফাঁক পেলেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শৈলবালার স্বামী অতুল কোন রকম কাজকর্ম করে না। [illegible] বালাও সুবালার মত সন্তানের [illegible] কামনায় স্বামীগৃহ ছেড়ে ভাইয়ের সংসারেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

এই বিরাট উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত লেখবার সুযোগ নেই। এটুকু বলা যায় যে, লেখকের আন্তরিকতায় কোন চরিত্র অস্পষ্ট থাকে নি। লেখকের ভাষা অনাড়ম্বর।

ফলে উপন্যাসের কোথায়ও অযথা জটিলতার সৃষ্টি হয় নি। বইটির সাজসজ্জা মন্দ নয়। প্রচ্ছদ শোভন।

চটর-পটর (শিশুকাব্য)—বিজনকুমার আচার্য। শরৎ বুক হাউস, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম ঃ দু টাকা।

ছড়াই বই নয়, ছোটদের উপযোগী কবিতার সংকলন হলো 'চটর-পটর'। প্রথম কবিতার নাম অনুসারেই সংকলনটি ঐ নামে চিহ্নিত হয়েছে। বলা যায়, বইটির ভূমিকা হিসেবেই লেখা হয়েছে প্রথম কবিতাটি। দ্বিতীয় কবিতা 'রেলের গান' সত্যেন দত্তীয় ছন্দোবন্ধের অনুগামী। তবু ভালো লাগে 'ঘটেছে যা', 'বুঝতে হলে' 'গাজনের দল', 'বাগবাজারি গল্প', 'খবরদার' 'অন্যমনা বাহিনী', 'ভাবের অনুপান' প্রভৃতি কবিতাগুলি। ছড়ার ছন্দে বিজনবাবুর দখল আছে। শিশু মনস্তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি জানেন তিনি ভালো করেই। বিষয় উপযোগী চিত্রের উপহার দিয়ে তিনি তাঁর পাঠকদের চিত্ত জয় করবেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বর্তিকা (পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক মনীশ ঘটক। গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। দাম ষাট পয়সা।

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে পত্রিকাটি বেরিয়ে আসছে। লেখক-লেখিকাদের অধিকাংশই দূর মফঃস্বল শহরের। তবু এতটুকু নিম্নমানের মনে হয় না। এ সংখ্যায় লিখেছেন মনীশ ঘটক, কিরণ চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কুমারনাথ চৌধুরী, তপতী চ্যাটার্জি, সাগর চক্রবর্তী, পুলকেন্দু সিংহ, কল্পনা দে, অরুণকুমার মজুমদার, জয়ন্ত সাহা এবং আরো অনেকে।

আগাছা (জুন ১৯৭০) — সম্পাদক ঃ দেবাশিস সেনগুপ্ত। ১৯০ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৬। দাম—পঁচিশ পয়সা।

গল্প কবিতা নাটক লিখেছেন তরুণকুমার চৌধুরী, দীপক কুশারী, কানাই চক্রবর্তী, তরুণ ঘোষাল, দেবাশিস সেনগুপ্ত সঞ্জয় সেনগুপ্ত, প্রদ্যোৎ ঘোষ, নীরেন্দ্র গুপ্ত। পত্রিকার প্রচ্ছদটি বেশ আকর্ষণীয়।

চতুর্ভাস (শ্রাবণ ১৩৭৭)—সম্পাদক অরূপ কর। ১৩ প্যারী রো, কলকাতা—৬। দাম ঃ ষাট পয়সা।

নতুন পত্রিকা। ঈর্ষা করার মতো সুন্দর ছাপা ও সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গী। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সমালোচনায় সমৃদ্ধ। প্রতিটি লেখাই উন্নতমানের। কবিতা লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, শান্তিকুমার ঘোষ, তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, শিশির সামন্ত ও রাণা বসু। গল্প ও অন্যান্য লেখার লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন আশাপূর্ণা দেবী, বাদল সরকার, আবদুল জব্বার, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক (সুকান্ত প্রসঙ্গে), মণীন্দ্র গুপ্ত (পদ্মার পাহাড়), কানাই সেনগুপ্ত (আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি), দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত লিওপোল্ড সেডার সেনগরের তিনটি কবিতা উল্লেখযোগ্য। কামুর নোটবই প্রসঙ্গে লিখেছেন সুধাংশু ঘোষ। আমরা পত্রিকাটির সুপ্রচার কামনা করি।

অধুনা সাহিত্য (আষাঢ় ১৩৭৭)—সম্পাদক সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়। হালিশহর, ২৪-পরগণা। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

আইনগত কারণে কখনো-কখনো পত্রিকার নামবদল করতে হয়। বাংলা দেশে এরকম উদাহরণ প্রচুর। পূর্ববর্তী 'অধুনা' বর্তমান সংখ্যা থেকে 'অধুনা সাহিত্য'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। স্বভাবতই এটি পত্রিকার নতুন নাম-অনুসারে প্রথম সংখ্যা। এ সংখ্যায় প্রবন্ধ ছাপা হয় নি একটিও। সবই কবিতা। লিখেছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পরেশ মণ্ডল, গণেশ বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, দীপেন রায়, শিশির সামন্ত, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন দাস, প্রভাত চৌধুরী, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, রবীন সুর, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ এবং আরও অনেকে। প্রচ্ছদ এবং সম্পাদকীয় রুচি উন্নত মানের।

দেয়ালা (শ্রাবণ ১৩৭৭)—সম্পাদক ঃ শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। ১১।৪ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—২৬।

ছোটদের জন্য মিনি পত্রিকা 'দেয়ালা'র এটি প্রথম সংখ্যা। সাধারণ যে কালিতে ছাপা হয় বই-পত্র-পত্রিকা এটি সম্পূর্ণ রঙীন কালিতে ছাপান হয়েছে। এই সংখ্যায় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, মহাশ্বেতা দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এ সি সরকার, শিবরাম চক্রবর্তী, অজয় রায়, শৈল চক্রবর্তী। ছবি এঁকেছেন শৈল চক্রবর্তী এবং অজিত দাস। পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয় এবং সম্পাদকের সুরুচির পরিচায়ক।

কাটুম-কুটুম (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭০)—সম্পাদক ঃ শ্যামাপ্রসাদ সরকার। ২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত কাটুম-কুটুম অঙ্গসজ্জা এবং মুদ্রণ পারিপাট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনায়ও সুরুচির পরিচয় স্পষ্ট। যাঁদের রচনায় বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ, কৃষ্ণ ধর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তুষার রায়, কানাইলাল চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, জীবন সরকার, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, বলরাম বসাক, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, শুভাশিস গোস্বামী, ভবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলশেখর মিত্র, সন্দীপ রায়, লীলা মজুমদার এবং অপূর্ব মুখোপাধ্যায়। সংখ্যাটির একটা বড় আকর্ষণ কবি অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি।

প্রত্যয় (শ্রাবণ ১৩৭৭) — সম্পাদক ঃ শম্ভু মিত্র। এল-৬, সি এম ই আর আই কলোনী, দুর্গাপুর।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন শম্ভু মিত্র অমিতাভ চৌধুরী, সমরেশ দাশগুপ্ত, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার বসু এবং আরও কয়েকজন।

সময় (জুলাই ১৯৭০) — সম্পাদক ঃ উৎপলকুমার গুপ্ত। ৩ গোয়ালপাড়া লেন, বহরমপুর। দাম এক টাকা।

সুদৃশ্য এই পত্রিকাটির ছাপা বেশ সুন্দর। গল্প এবং কবিতা লিখেছেন কবিরুল ইসলাম, অমিতাভ দাশগুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, মনীষীমোহন রায় এবং আরও কয়েকজন।

ছোট গল্প (১) জার্মানি

ছোট গল্প বলতে আমাদের সামনে মপাঁসা, চেকভ, হেমিংওয়ের যে-মডেল উপস্থিত হয় সেই মানদণ্ডে জার্মানীর ছোটো গল্পকে বিচার করা মুশকিল। অন্তত যুদ্ধপূর্ব পর্যন্ত তো নয়ই। যদিও কাফকা বা টমাস মানের আবির্ভাব এ দেশেই ঘটেছে। একথা স্বীকার করতে হয় যে টমাস মান বা কাফ্‌কার গল্পগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায়ই ছোটো গল্পের প্রচলিত অনুশাসনকে মানে না। এগুলিকে 'নভেলা' বললেই ভালো হয়।

বস্তুত সমালোচক মহলেও এতাবৎ ছোটো গল্প সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ এবং অশ্রদ্ধা দৃঢ়মূল ছিল। তাঁরা সাহিত্যের এই

বিভাগটিকে হালকা চটুল জিনিস বলে মনে করতেন।

সদর্থে জার্মান ছোটো গল্পের প্রতিষ্ঠা হল যুদ্ধোত্তর পর্বে।

সেটা ১৯৪৫ সাল। যুদ্ধোত্তর সমাজ-জীবনের মনোভঙ্গির রিক্ততা, অবিশ্বাস, ধ্বংসরতা আধুনিক ছোটো গল্পের ভাবাকাশ তৈরি করে দিল। অধিকৃত মিত্র পক্ষের তরফ থেকে এটি একটি উত্তম উপঢৌকন।

এই পর্বেরই বিখ্যাত গল্পকার হানস বেনডার লিখেছেনঃ 'যুদ্ধের পর আমাদের যে মনোভঙ্গি অবশিষ্ট ছিল ছোটোগল্প সঠিকভাবে সেখানে লক্ষ্যবিদ্ধ করল। ভয়ানক সংকটের পর জার্মান সাহিত্যকে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হল ছোটো-গল্পের মাধ্যমে। উপরন্তু আমাদের বিজেতৃ-গণ একে সঙ্গে করে এনেছিল। প্রথমদিকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে কেতাব ও ম্যাগাজিন-গুলি এল সেগুলি মার্কিন এবং ইংরেজি ছোটো গল্প...'

শান্তির প্রথম মাসগুলিতে জার্মান লেখকেরা কোন পরিস্থিতিতে জার্মানিতে ফিরে এলেন? স্বদেশে ফিরে এসে দেখলেন তিনি কাউকে চেনেন না, তাঁর কিছু বলার নেই, যেটুকু কথা আছে তা বেদনাদায়ক স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে না।

বিগত বারো বছর, জার্মান সাহিত্য দূষিত হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক অপঘাতে পংগু।

১৯৩৩-এ প্রেসিডেন্টের ডিক্রি জারিতে কালো খাতায় নাম উঠল। পুস্তকের বহ্ন্যুৎসব শুরু হল। চলল ইহুদি লেখক ও প্রকাশকদের ওপর নির্যাতন। লেখকেরা পালিয়ে গেলেন সুইজারল্যান্ড, আমেরিকা, মস্কো। যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁদের লেখনী স্তব্ধ। যাঁরা তবু লিখতে চাইলেন তাঁরা আত্মবিক্রয় করলেন। এমন কি ভাষার ক্ষেত্রেও। যেমন চিন্তার বাজো তেমনি জার্মান গদ্যে হিটলারের তল্পিবাহকেরা এক বিকারের নজির সৃষ্টি করল।

জার্মান ঐতিহ্য বিরোধী অর্থহীন শ্রুতিগত শব্দের একঘেয়ে উচ্চারণে এক কিম্ভূত অবস্থার সৃষ্টি হল।

এই রকম পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ফেরত লেখকেরা স্বদেশে পা দিলেন। পাঠকদের বই কেনার সামর্থ্য নেই। তদুপরি কেতাবী শব্দে তাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

সরকারী চেষ্টায় সাহিত্যের পুনর্বাসন শুরু হল। কিন্তু মিত্র রাষ্ট্রীয় চেষ্টাও তেমন কার্যকর হল না। লেখকেরা সরকারী প্রয়াসে আরেক ধরনের জাঁতাকলে আটকা পড়লেন। একদিকে নাৎসিবাদের প্রেত, সেনসারশিপ, আমূলে গণতান্ত্রিক চেতনাই বিধ্বস্ত।

এ যুগের লেখকেরা বুঝলেন এ পথ নয়। আরো অধিক কিছু চাই।

সাহিত্যে নতুন আন্দোলন শুরু হল। সেটা ১৯৪৭-এর ঘটনা। আন্তরিক ভাষা চাই, জনপ্রিয় অকেতাবী প্রবচন, বিষয়ের শুদ্ধতা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিতে হবে। এই আন্দোলনের উদগাতা ৪৭-এর গোষ্ঠী, অবশ্য একটি অনানুষ্ঠানিক সভা, তথাকথিত নির্দিষ্ট কার্যসূচী বা সভ্য হবার নিয়মমাফিক কোনো ব্যবস্থা নেই।

৪৭-এর গোষ্ঠীর সূত্রপাত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মার্কিন সামরিক সরকার একটি পত্রিকার সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে বাজেয়াপ্ত করে দিল।

এরি প্রতিক্রিয়ায় ৪৭-এর গোষ্ঠীর আন্দোলনের জোয়ার এল। অধিকাংশ লেখক এই আন্দোলনের শরিক হলেন।

কিন্তু কোন আঙ্গিকে সত্যিকার ছোটোগল্প লিখব? হাতে এসে পৌঁছেছে হেমিংওয়ের ছোটোগল্প। হেমিংওয়ে লেখক-দের স্টাইলের উপর প্রভাব বিস্তার করলেন। বিষয়বস্তু লেখকদের নিজস্ব, সেখানে যুদ্ধোত্তর জার্মানির সমাজ ও ব্যক্তি মানসিকতাই ফুটে উঠেছে।

এই পর্বের অগ্রণী ও সবিশেষ খ্যাতি-মান লেখক হাইনরিশ্ বোল। জন্ম ১৯১৭। বিশ এবং ত্রিশের মুদ্রাস্ফীতি, ধর্মঘাট, সংঘর্ষ, হত্যার স্মৃতি পরবর্তীকালে বোলের স্মৃতিকে মেদুর করে রেখেছে। তিনি লিখেছেনঃ 'বয়স্ক লোক আমরা দুঃখকে মুক্ত করতে অভিলাষী, কিন্তু আমাদের হাতে চাবি নেই। দুঃখের দাম অত্যন্ত বেশি তাদের কাছে, যাদের দোষ যৎসামান্য, এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে, সেগুলো এখনো কারুর উপর নির্ধারিত হয়নি।'

বোল প্রচুর ছোটোগল্প লিখেছেন। ১৯৫০-এর মধ্যেই তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা নয়। সতেরোটি ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে।

তাঁর বিখ্যাত গল্পত্রয়ী 'দি ম্যান উইথ দি নাইফস' 'পেল আনা' 'ডেথ অব এলসা বাসকোলাইট' বিভিন্ন সময়ে অনূদিত হয়েছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালের নিশ্চিন্ততার বেদনারসে গল্পগুলি অভিষিক্ত। ঘরফেরা মানুষ সব খুঁজে পাচ্ছে না, দরজার বাইরে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জার্মানি। মানুষ নিজবাসভূমে পরবাসী।

হবল্‌ফগাং বরশার্ট আরেকজন প্রতিভা-ধর গল্পকার। জন্ম ১৯২১, মৃত্যু যক্ষ্মারোগে ১৯৪৭। জীবন সায়াহ্নে মাত্র দু বছর তাঁর লেখকজীবন। যুদ্ধ, বন্দীদশা, রক্তশূন্যতা, ডিপথেরিয়া, অনশন-অর্ধাশন এবং পরিণামে ক্ষয়রোগের মর্মন্তুদ শিকার। বন্দীজীবনের পর ১৯৪৫-এ হামবুর্গে ফিরে এলেন ভগ্নস্বাস্থ্য, মুমূর্ষু; বন্ধুরা সুইজারল্যান্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করে-ছিলেন, কিন্তু দেরি হয়ে গেল। তাঁর চোদ্দটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৪৯-এ।

অধিকাংশ গল্পে যুদ্ধ বিধ্বস্ত হাম-বুর্গের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান ভূমিকা জুড়ে আছে। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা ও হাহাকারকে তিনি এক প্রতীকধর্মী কাব্যময় সুরে ফুটিয়ে তুলেছেন; তাঁর কণ্ঠ কোথাও উচ্চ নয়, কিন্তু তার অতলস্পর্শী পেথস তাঁর যুদ্ধবিরোধী ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তোলে।

তাঁর নাটকের মুখবন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে সেই কথাই প্রযোজ্য। বরশার্টের দৃষ্টিতে এই নাটক হল: 'এমন একজন লোককে নিয়ে সে জার্মানিতে ফিরছে যে তাদেরি একজন। যারা নিজের ঘরে ফেরে, আবার ঘরে ফেরেনাও বটে, কেননা তাদের ঘরের লোক বলতে কেউ নেই। তাদের ঘরের লোক দরজার বাইরে ওই ওখানে রয়েছে, রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে বাইরের রাস্তার ওপর তাদের জার্মানি। এই হচ্ছে তাদের জার্মানি।'

বরশার্টের দুটি প্রতিনিধিমূলক গল্প রাত্রে ইঁদুরেরাও ঘুমোয় এবং 'পাঠ্য-পুস্তকের গল্প' কিছুকাল আগেই একটি গল্পপত্রে অনূদিত হয়েছে।

ইলসে আইখিংগারের জন্ম ভিয়েনায় ১৯২১-এ। যুদ্ধের সময় লেখিকা পরিবার-সমেত অভিযুক্ত হন। ভিয়েনায় ডাক্তারি পড়া শেষ করে লিখতে শুরু করেন। বর্তমানে আপার ব্যাভেরিয়ার অধিবাসী। বিখ্যাত কবি নাট্যকার গুন্টার আইক তাঁর স্বামী। তিনি রচনার জন্য কয়েকবার পুরস্কৃত হন। এর বিখ্যাত গল্প 'বাউন্ড ম্যান' শুকসারী গল্পপত্রে অনূদিত হয়েছে।

হানস বেনডারের জন্ম ১৯১৯। গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৬-তে। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বংশধরদের নিয়ে, নাৎসি আঘাতে ভেঙে পড়া সমাজের হৃত-নৈতিকতা পুনরুদ্ধারে তিনি উৎসুক। 'ঘোস্ট' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

গেট্রুড ফুসেনেগার অস্ট্রিয়ান অফি-সারের দুহিতা। জন্ম ১৯১২। বোহেমিয়ার পারিপার্শ্বিকে বড় হয়ে উঠে নিসর্গ প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রতি তীব্র অনুরাগী হয়ে পড়েন। স্বামী ভাস্কর অ্যালয়স ডোরান। বর্তমানে হল-এ বাস করেন। 'ওমান ড্রাইভার' তাঁর বিখ্যাত গল্প। ব্যক্তিমানসের বিকার এবং আত্মহনন তাঁর গল্পের বিষয়।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন গোর্ট গাইস্যার (জন্ম ১৯০৮), হবল্‌ফডীটরিস, স্নুরেরে (জন্ম ১৯২০), রাইনহার্ট লেট্টাউ (জন্ম ১৯২৯), হাইনস হিউবার (জন্ম ১৯২২), হানস এরিক নোসাক (১৯০১) হবল্‌ফগাং হিলডেশাই-মার (জন্ম ১৯১৬) প্রমুখ।

—শোভন আচার্য

তুষার অভেজা রাত

পারিজাত মজুমদার

শ্যামাপদবাবু এই হোটেলের দোতলায় একখানি ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করেন সপরিবারে। সোনালীর ঘরখানাও দোতলায়। তাই প্রথমটা সে আশান্বিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে সে একেবারে একা পড়বে না তাহলে। দুদিনেই আলাপ পরিচয় করে নিতে পারবে শ্যামাপদ আচার্যের পরিবারের সঙ্গে।

কিন্তু তার সে আশায় ছাই পড়লো। শ্যামাপদবাবু জানালেন, তার পরিবার নভেম্বরের মাঝামাঝিই চলে গেছে কলকাতায় এবং মার্চের আগে তাদের ফিরবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আলফ্রেড গুরুং-এর পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করতেও ঐ একই ধরণের উত্তর পাওয়া গেল। তারা নাকি প্লেনস-এ ট্যুর করতে গেছে, দিনকয়েক বাদে আলফ্রেড নিজেও গিয়ে যোগ দেবে তাদের সঙ্গে।

যা বোঝা যাচ্ছে, শীতকালটা সবাই দার্জিলিং-এর হাত এড়াতে চায়। এমনকি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারাও।

অথচ, সোনালীকে এ সময়টা এখানে কাটাতেই হবে।

আলফ্রেড গুরুং আর শ্যামাপদ আচার্য বিদায় নেবার পর নিজের ঘরখানাকে একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করতে লাগলো সোনালী।

ঘরটা হোটেলবাড়ীর সামনের দিকে নয়, একটা সাইডের প্রায় শেষ প্রান্তে। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে দুটো সিঙ্গল-বেড খাট

(৩)

শেষ পর্যন্ত ঘর পাওয়া গেল।

আহা-মরি কিছু না হলেও চলনসই। তবে ঘরের মধ্যে হিটার-পয়েন্ট নেই, এই যা অসুবিধে। শীতকালটা কষ্ট হবে।

নভেম্বরের এই শেষ সপ্তাহে 'মহাকাল' হোটেল প্রায় জনশূন্য বললেই হয়। এই ফাঁকা হোটেলে একা একখানা ঘর নিয়ে থাকতে যেকোনো অল্পবয়সী মেয়ের কিছুটা ভয়-ভয় করে বৈকি। কিন্তু সেই ভীরুতাকেও আমল দিলো না সোনালী।

এক রবিবারের সকালবেলা বাকস-বিছানাপত্তর নিয়ে ট্যাক্সি করে এসে উঠলো হোটেলে। খৃষ্টান নেপালী-প্রোপ্রাইটর কাম ম্যানেজার আলফ্রেড গুরুং নিজে এসে আপ্যায়ন করে তাকে নিয়ে গেলেন ওপরে, শ্যামাপদ আচার্য বলে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিলেন।

গদিশূন্ধ, একটা ফোল্ডিং চেয়ার, একটা ছোট টেবিল। ঘরের সংলগ্ন বাথরুম বেশ বড় আর পরিচ্ছন্ন।...পঞ্চাশ টাকায় এর চাইতে ভালো থাকার ব্যবস্থা দার্জিলিং শহরে সম্ভব নয়। বরং মনে হয়, সে যেন একটু সস্তাতেই পেয়ে গেছে ঘরখানা। আলফ্রেড গুরুং দেবব্রত মিত্রের পরিচিত লোক। হয়তো সেই কারণেই...

'মেমসাব!'

বাইরে থেকে কে ডাকলো।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। সুতরাং সোনালীকে উঠতে হল না। বিছানায় বসেই দেখতে পেলো দরজার বাইরে একটি নেপালী চাকর দাঁড়িয়ে আছে চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে।

'এসব কি?' অবাক হল সোনালী।

'ম্যানেজার সাহেব আপনার জন্যে পাঠালেন।' উত্তর দিলো চাকরটি।

'আচ্ছা, ঐখানে রাখো।'

ঘরের ভিতরদিকে একটা জায়গা আঙুলে দিয়ে দেখালো সোনালী।

এ হোটেলে সোনালী শুধু থাকার ব্যবস্থাই করেছে, খাওয়ার ব্যবস্থা করেনি। শীতকালে এখানে রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা থাকেও না, কারণ হোটেল তখন খালি পড়ে থাকে। চাকর-বাকরও সব লম্বা ছুটি নেয় ঐ সময়টায়। আলফ্রেডকে সোনালী বলেছিল, বারোমাসের খাবার ব্যবস্থা যদি এখানে সম্ভব না হয় তবে শুধু সীজনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট দরকার নেই।

তবু, চুক্তির বাইরে গিয়ে এই যে আজ একটুখানি অতিরিক্ত ব্যবস্থা করেছে আলফ্রেড, বেশ একটি হেভি ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিয়েছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, এতে তার সৌজন্যবোধই প্রকাশ পায় শুধু। বোঝা যায়, প্রথমদিন বলেই এটুকু ভদ্রতা সে করেছে, যা গেস্ট-এর প্রতি হোস্টেল কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে, হোটেল-মালিকের করণীয়ের মধ্যে পড়ে না......

টেবিলের সামনে এসে প্রাতরাশ শেষ করতে করতে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালো সোনালী। আলফ্রেড যদি এখন এসব না পাঠাতো, তবে এখনি সোনালীকে আবার ছুটতে হত বাইরে কোনো রেস্তোরাঁয়। দিনের মধ্যে এতবার করে বাইরে খেতে কি ভালো লাগে? তাও আবার একা!

খাওয়া শেষ করে বাইরে এসে একবার দাঁড়ালো সোনালী—বারান্দার রেলিং ঘেঁষে।

উঃ, কি বিশ্রী আবহাওয়া! এক ফোঁটা রোদ দেখা যায় না কোনোখানে। সারাটা আকাশ নিবিড় কুয়াশায় থমথম করছে। দূরের পর্বতশ্রেণী, গাছপালা সবকিছু ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে।

হোটেলের পূর্বদিক ঘেঁষে যে দীর্ঘ সুন্দর পথটা নেমে গেছে নীচের দিকে, তার ধারে ধারে ছবির মত সাজানো আকাশছোঁয়া গাছগুলো এখন সম্পূর্ণ নিষ্পত্র বললেই হয়। আকাশে মাটিতে সর্বত্র এক বর্ণহীন, রুক্ষ রিক্ততা।

চারদিকে তাকিয়ে সোনালীর মন অবসন্ন হয়ে আসে। এই তো শীতের প্রথম পদচিহ্ন পড়েছে মাত্র হিমালয়ের বুকে, এরই মধ্যে এই! ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে তবে কি হবে?

'কেমন লাগছে এ জায়গাটা?'

হঠাৎ শ্যামাপদবাবু এসে দাঁড়ালেন। হোটেলের চারদিকে ঘেরা লম্বা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে সোনালীকে দেখতে পেয়েছেন হঠাৎ, তাই কর্তব্যের খাতিরে এগিয়ে এসেছেন দুটো কথা বলতে।

'কেমন আর লাগতে পারে বলুন?' বিবর্ণ হাসি হাসে সোনালী।

'খুব খারাপ লাগছে, না? বুঝতে পারছি। আমি এখানে আজ দশ বছর আছি, তবু প্রতি বছর এই শীতের সময়টা ভারী কষ্ট হয়। যাকগে, এই কটা মাস একটু কষ্ট করুন, তারপর মার্চ এলেই দেখবেন দার্জিলিং-এর আলাদা চেহারা। হোটেলের ঘরগুলোও সব ভরে উঠবে তখন, এমন শূন্য-পুরী হয়ে থাকবে না।'

কেমন যেন নীরেট-নীরেট চেহারা শ্যামাপদবাবুর। থপথপে দেহ, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, মুখে একটুকুও বুদ্ধির দীপ্তি নেই। দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত স্থূল, অল্পে-সন্তুষ্ট গোছের লোক। কথাবার্তার ধরনও কেমন যেন আলগা আলগা। মনে হয়, শুধু বলার জন্যেই বলছেন, অন্যের ভালো-মন্দ সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্টও নেই। শুধু নিজের খাওয়া আর ঘুমটা ঠিক মতন হলেই হল...

তবু ভদ্রতার খাতিরে কথা চালিয়ে যেতে হয় সোনালীকে।

শ্যামাপদবাবু বলেন, 'আপনার কিন্তু সাহস আছে বলতে হবে। একলা থাকছেন ঘর নিয়ে, তার ওপর আমার এ হোটেলের তো গেট বলেও নেই কিছু। সোজা রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে যে কেউ ওপরে উঠে আসতে পারে।' বলতে বলতে খ্যা-খ্যা করে হাসতে থাকলেন শ্যামাপদবাবু। ভিতরে ভিতরে গা রী-রী করে ওঠে সোনালীর। তবু মুখে বলে 'শুনেছি এখানকার লোকে নাকি চুরিচামারি প্রায় জানেই না!'

'হ্যাঁ, আগে সেরকমই ছিল বটে। কিন্তু এখন আর ততটা অনেস্টি নেই এখানে। এই সেদিন শুনলাম একজনের বাড়ীতে চুরি হয়েছে রাত্রিবেলা দরজা ভেঙে।'

একটু থেমে শ্যামাপদবাবু যোগ করলেন, 'যাইহোক, আমি কখনো রাত্রিবেলা একা থাকি না এখানে। আমার এক ব্যাচিলর কলিগ আছে, সে এখন রোজ শুচ্ছে আমার সঙ্গে।'

এমন লোকের কাছে কোনো আশ্বাস, কোনো উপকারই পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না সোনালীর। ভালো একটি প্রতিবেশী জুটেছে যাহোক।

'যাই, ঘরটা একটু গুছিয়ে নিইগে।'

একটা অজুহাত দেখিয়ে সোনালী চলে আসে নিজের ঘরে।

আজ আর সারাদিনের মধ্যে বাইরে বার হল না সোনালী। বই পড়েই কাটিয়ে দিলো সারাটা দিন ঘরের মধ্যে। ভগবানের দয়ায় বইয়ের অভাব এখন তার নেই। একটা গোটা লাইব্রেরী তার হাতে। যখন যা খুশি বই নিয়ে এসে পড়তে পারে।...

বিকেলের দিকে দেবব্রত এল খোঁজ নিতে। দেখে শুনে বললেঃ

'আলফ্রেড আমায় বলেছিল আপনাকে একটা ভালো ঘর দেবে। এখন তো শীত-কাল, গোটা হোটেলটাই ফাঁকা পড়ে আছে। তবে আপনাকে এরকম ঘর দিলো কেন বুঝতে পারছি না।'

'ওর দোষ নেই।'—উত্তর দিলো সোনালী—'আমি ওকে বলেছিলুম, আমায় এমন ঘর দিন যেটাতে বারোমাস থাকতে পারবো। বছরে দু'বার করে ঘর বদল করতে আমি পারবো না।'

'তাহলে—ঠিকই আছে। আচ্ছা, এখন কাজের কথা শুনুন। আপনার জন্যে একটা ঠিকে আয়া ঠিক করে ফেলেছি আমি। কাল থেকে রোজ সকালবেলা এসে ঘন্টা দেড়েকের মত কাজ করে দিয়ে যাবে। এতেই চলবে তো?'

'যথেষ্ট। আর দুধের কি করলেন?'

'সে ব্যবস্থাও হয়েছে। আমাদেরই দুধওয়ালা রোজ সকালবেলা আপনাকে একসের করে দুধ দিয়ে যাবে এখানে।'

একটু থেমে বললো, 'রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও ঠিক করেছেন কি?'

'হ্যাঁ, কাছের এক বাঙালী হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি। রোজ রাত্তিরে ওরা লোক দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেবে এখানে আর ছুটির দিনে দুপুরের লাঞ্চটাও ওরাই পাঠাবে।'

'আজ দুপুরে খাবার পাঠিয়েছিল তাহলে?'

'হ্যাঁ।'

'রান্না কেমন?'

'রান্না খারাপ নয়। কিন্তু ভাতটা শক্ত শক্ত ছিল।'

'কোন হোটেল বলুন তো? মালিককে আমি বলে দেবো ভাতটা যেন একটু নরম করে দেয়।'

হোটেলের নাম বললে সোনালী। তারপর হেসে যোগ করলেঃ আপনাকে খুব ব্যাগার খাটাচ্ছি, না?'

'কি যে বলেন! এটুকু তো আমাদের কর্তব্য!'

কর্তব্য! শুধু শুকনো কর্তব্যের খাতিরেই এত করছে দেবব্রত? কে জানে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেবব্রত হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টায়, 'চারদিকে তো বইপত্তর ছড়ানো দেখছি: খুব পড়াশুনো করছেন বুঝি?'

'খুব আর কোথায়?' —নৈরাশ্যভরা গলা সোনালীর—'পৃথিবীতে কত জানবার আছে! অথচ কত সামান্য জানি আমরা!'

'এদিকে তো ডবল এম-এ, ব্রিলিয়ান্ট স্কলার। এখানে এসে থেকেও তো রাতদিন পড়াশুনোয় ডুবে আছেন দেখতে পাচ্ছি। এতেও তৃপ্তি নেই?'

'ভূমৈব সুখম্! নাল্পে সুখম্ অস্তি!'

কথাটা সোনালীর একান্ত মনেরই কথা। তবু আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্যে কথাটা বলেই হেসে উঠলো সে।

দেবব্রত কিন্তু হাসলো না। বললো, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। ভূমার সাধনাই সুখ। অল্পে মানুষের তৃপ্তি নেই। নইলে আমিই বা সর্বস্ব পণ করে এমন ছবি আঁকার সাধনায় মেতেছি কেন? হোল-টাইম চাকরী পর্যন্ত নিলুম না পাছে আঁকার ব্যাঘাত হয়।'

'অফিসে আপনি যা করেন সেও তো এই আঁকারই কাজ।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওখানে আপনি আমার সত্যিকার শিল্পিসত্তার প্রকাশ দেখতে পাবেন না। অর্ডার মাফিক, কমার্শিয়াল কাজ তো! শিল্পীর যথার্থ আত্মপ্রকাশ হয় সেখানেই যেখানে সে স্বাধীনভাবে কাজ করে।'

একথাটার ভিতরের ইঙ্গিত কি, সোনালী জানে। দেবব্রত তাকে অনেকবার বলেছে, 'যদি আমার মধ্যেকার আর্টিস্টকে জানতে চান, তবে আসুন আমার স্টুডিওয়।' কিন্তু এ পর্যন্ত কোনোদিন সেখানে যাবার সময় করে উঠতে পারেনি সোনালী।

'আচ্ছা, আপনার চায়ের নেশা নেই, না?' আকস্মিকভাবেই প্রসংগ পরিবর্তন করে দেবব্রত।

আর্টের সম্পর্কে উচ্চ আলোচনা থেকে লাফিয়ে পরে হঠাৎ একেবারে চায়ের কথায়। দেবব্রতর ভাব দেখে হাসি পেয়ে যায় সোনালীর।

কিন্তু মুখে বলে, 'আপনাকে চা দেয়া

উচিত ছিল, না? কিন্তু কি করবো বলুন? ঘরে কোনো ব্যবস্থাই নেই। সত্যিই খুব লজ্জার কথা—থাকগে, কাল থেকে সবই হবে।'

'আপনার এখানে ব্যবস্থা নেই তা আমি বিলক্ষণ জানি।' —হেসে ফেলে দেবব্রত—'আজই তো এলেন সবে। আমি ভাবছিলুম চায়ের নেশা থাকলে আপনি নিশ্চয় এখন বাইরে গিয়ে চা খেয়ে আসতেন।'

'মাঝে মাঝে খাই না যে তা নয়। তবে খুব একটা নেশাও নেই।'

'আমার কিন্তু খুব নেশা আছে। চলুন না, একসঙ্গে কোথাও গিয়ে চা খাওয়া যাক। আপনার একটু বাইরে বেরোনোও তো হবে। এই শীতের সময় হাত-পা না নড়ালে ঠাণ্ডাটা বেশি চেপে ধরে।'

কথাটা খুব সত্যি। চুপচাপ ঘরে বসে থাকলে শীত বেশি করে। আর, সোনালী ভাবে, বাইরেই যদি যেতে হয়, একজন সঙ্গী নিয়ে যাওয়াই ভালো। দেবব্রতর প্রস্তাবটা সবদিক থেকেই সুবিধের। একটু হাঁটা-চলার ব্যায়ামও হবে, আবার রেস্তোঁরায় গিয়ে বেশ দু-তিন কাপ গরম-গরম চা-ও খাওয়া যাবে। চায়ের সঙ্গে আরো কিছু...। ইস্, খিদেও তো খুব পেয়েছে। এতক্ষণ খেয়ালই করেনি সোনালী।

চলুন।' উঠে পড়ে আলনা থেকে ওভারকোটটা টেনে নেয় সোনালী।

ওভারকোট সঙ্গে নিলেও কিন্তু সেটা গায়ে দেয় না সোনালী। পথে নেমে দেবব্রত বলে: 'আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?

'নাঃ, এখনো তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না। তবে ফিরবার সময় বেশি ঠাণ্ডা পড়বে তো। তাই এটা সঙ্গে নিলুম।'

সোনালীর গায়ে শুধু একটা নীল পশমের ব্লাউজ। ওতেই হয়ে যাচ্ছে ওর? ভেবে অবাক হয় দেবব্রত।

'লাইব্রেরীর বইগুলো কবে ফেরৎ দিচ্ছেন বলুন তো?' কয়েক পা এগোনোর পরই জিজ্ঞেস করে সোনালী। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চললো একগাদা বই নিয়েছে দেবব্রত লাইব্রেরী থেকে, কিন্তু ফেরৎ দেবার নাম নেই।

'ওঃ সেই বইগুলো? কালই দিয়ে দেবো, বিশ্বাস করুন।'

'আপনার সে কাল কবে দেবব্রতবাবু?' —হেসে ওঠে সোনালী—'যে কাল কোনোদিনও উদয় হবে না এ পৃথিবীতে?'

'না, অতোটা নয়। দু-তিন দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন।'

খানিক হাঁটবার পরই হঠাৎ থমকে পড়ে সোনালী। বলে 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বলুন তো? বাজারের কাছে দু-তিনটে ভালো রেস্তোঁরা আছে, কিন্তু ওদিকে তো আপনি গেলেনই না। এদিকে এত ওপরে উঠবার দরকার কি কষ্ট করে? নীচেই যখন—'

'চলুন না। পৌঁছলেই দেখতে পাবেন কোথায় যাচ্ছি।'—ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে দেবব্রত—'ওপরে আরো ভালো রেস্তোঁরা আছে, সেখানে অনেক বেশি ভ্যারাইটি পাবেন।'

খুব বেশি অবশ্য হাঁটতে হয় না সোনালীকে। আরেকটু এগিয়েই দেবব্রত বলে: 'এসে গেছি।'

ভিতরে ঢুকে একটা কেবিনে এসে বসে ওরা।

'কি খাবেন বলুন।' চেয়ারে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে দেবব্রত, মেনুটা দেখতে দেখতে।

'এখানে কি পাওয়া যাবে, আগে শুনি।'

'কাটলেট, ফ্রাই, রোস্ট, মাটন-কারি, বিরিয়ানি, যা চাইবেন তাই।'

'মিষ্টি পাওয়া যাবে?'

'মিষ্টি? উহু। ও জিনিসটা তো পাওয়া যাবে না এখানে। আপনি কি ঝাল-নোনতা একেবারেই খান না নাকি?'—বিরত হয়ে পড়ে দেবব্রত।

'খাবো না কেন, খাই। তবে মিষ্টিটা একটু বেশি ভালো লাগে।'

'যাক, বাঁচালেন। আজ তাহলে নোনতাই খান। আরেকদিন পেট ভরে আপনাকে মিষ্টি খাওয়াবো।'

'এমনভাবে বলছেন যেন আমি একটা বাচ্চা মেয়ে।'

'আপনি তো বাচ্চাই।'

'কেন, বাচ্চার কি দেখলেন শুনি?'

'বিশেষ করে কোনটা বলবো? আপনার সবটাই তো ছেলেমানুষিতে ভরা। কথা বললে মনে হয়, দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি।'

'বেশ, আমি না হয় ছেলেমানুষ। আপনি তো পাকা, ঘাগী বুড়ো, তাহলেই হল।' এবার রেগে যায় সোনালী।

ওর ঐ রাগ-রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি পায় দেবব্রতর। ভালোও লাগে। কি সহজে রেগে যায় মেয়েটা! সেই জন্যেই যেন ওকে আরো রাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

কি তুলতুলে ওর গাল দুটো। স্পর্শ না করেও অনুভব করে দেবব্রত। মসৃণ, সুন্দর গাল একটুখানি ফুলো-ফুলো আর লালচে হয়ে উঠেছে রাগে। তাই আরো ভালো দেখাচ্ছে। কিন্তু সবচাইতে আকর্ষণীয় ওর চোখ আর চুল। এমন উজ্জ্বল কালো চোখ, এমন ঢেউ-খেলানো ঘন নরম চুল সহজে চোখে পড়ে না।

কিন্তু—বয়টা এসে দাঁড়িয়েছে। সোনালীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হল দেবব্রতকে।

খাবারের অর্ডার নিয়ে বয় চলে যেতে সোনালীর দিকে তাকায় দেবব্রত। বলে: 'যা বলেছি সব উইথড্র করে নিচ্ছি। এখন সব ক্ষমা করে নিয়ে এদিকে মুখ ফেরান তো।'

'কথা ফিরিয়ে নিলে আর কি হবে? ঐ তো আপনার মত।'—উত্তর দেয় সোনালী। এখনো তার রাগ সম্পূর্ণ যায়নি।

'দূর! মত্ ফত্ কিছু নয় ওসব। ঠাট্টাও বোঝেন না? আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না!'

আরো দু-চারটে কথার পর সহজ হয়ে যায় সব। কি ছেলেমানুষ! ভাবে দেবব্রত। ওর খেয়ালী প্রকৃতিটা যেন দার্জিলিং-এর আকাশ! এই মেঘ এই রোদ্দুর, এই ঝিমঝিম বৃষ্টি, এই মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না...

খাওয়া শেষ করে ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন চারদিক ঘিরে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নেমেছে। তবে জায়গাটা শহরের ভিতরে বলে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত।

এবার বাসায় ফিরবার পালা ওদের। কিন্তু নীচের দিকে না নেমে ওপরের দিকেই পা বাড়ায় দেবব্রত।

'একি, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' বিস্মিত গলা সোনালীর।

'আমার স্টুডিয়োয়।' স্মিতমুখে সোনালীর দিকে ফিরে তাকায় দেবব্রত।

'সেটা কোথায়, কতদূরে?'

'এই সামনেই। দু' মিনিটও লাগবে না যেতে।'

তবু পা ওঠায় না সোনালী। বলে, 'স্টুডিয়োর কথা তো বলেননি আগে? থাক না, আরেক দিন যাবো, দিনের বেলায়।'

'বেশিক্ষণ ধরে রাখবো না। এই এক মিনিটে একটু ঘুরে আসবেন। চলুন না, এত করে বলছি।' বলেই হঠাৎ মিনতির সুর ছেড়ে গলায় কৃত্রিম আত্মশ্লাঘার ভাব এনে বলে, 'একজন প্রতিভাবান আর্টিস্ট—দার্জিলিং শহরে যার এত নাম ডাক, যার ছবি বিদেশে পর্যন্ত বিক্রী হয়—তার ইনভিটেশনকে আপনি মূল্য দিচ্ছেন না?'

চোখেমুখে কৌতুক নিয়ে ঠাট্টার সুরেই কথাগুলো বলে দেবব্রত। কিন্তু ওর মধ্যে যে একবিন্দুও মিথ্যে নেই, সোনালী তা জানে।

আর আশ্চর্য, এই মুহূর্তে যেন একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি জাগে সোনালীর বুকের মধ্যে। অস্পষ্টভাবে তার যেন মনে হয়, দেবব্রতকে তার প্রাপ্য মূল্য সে দেয়নি এতদিন! সহজলভ্য বলেই ওকে যেন অবহেলা করেছে সে নিজের অজ্ঞাতসারে।

'চলুন।' বলে একটু উৎসাহ দেখিয়ে পা ফেলতে শুরু করে সোনালী। পূর্বের ত্রুটি যেন সে সংশোধন করে নিতে চায় নিজের ব্যবহারে।

শুকনো ঝরাপাতায় ছাওয়া সরু পথ। সেই পথের শেষে একটি ছোট কটেজ।

কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে দেবব্রত বললে, 'এই আমার স্টুডিয়ো।'

দুখানা মাত্র ঘর। তার মধ্যে একখানা ঘর ছবিতে ভর্তি। কতক ছবি সম্পূর্ণ কতক বা অসম্পূর্ণ। মেঝেয়, দেয়ালে, টেবিলের ওপর, যেখানে যেদিকে চাও, শুধু ছবি আর ছবি। আর আছে এদিকে-ওদিকে ছড়ানো ছবি-আঁকার সরঞ্জাম।

খুব সাবধানে পা ফেলে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো সোনালী, যাতে কোনো-কিছুতে পায়ের ঠোক্কর না লাগে। ওর পিছন পিছন দেবব্রতও এসে দাঁড়ালো।

সব প্রথমেই যে ছবিটি চোখে পড়লো সোনালীর, সেটির নাম 'তুষারবর্ষণ।' পাইনবনের ওপর তুষারপাতের দৃশ্য আঁকা হয়েছে নিপুণ তুলিতে। আরেকটি ছবির নামঃ 'চেরীগাছের ছায়ায়।' লালে-লাল হয়ে যাওয়া একটি ফলন্ত চেরীগাছ, তার তলায় একজোড়া ঘনিষ্ঠ নারী-পুরুষের ছবি। আরেকটি বড় ছবি—হিমালয়ের অরণ্যনীল পর্বতশ্রেণীর ওপর সূর্যোদয়ের। নীচে লং-ফেলোর দু লাইন কবিতা।

আরো কত যে ছবি—'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'ফ্রস্ট অ্যাট মিডনাইট', 'মুনলাইট', 'ক্লাউড', 'ঝড়' 'অ্যাট দি জার্ণিজ এণ্ড', 'অরণ্য', 'অলকনন্দা', 'রাজহংসী'...

ছবি আঁকার রাজ্যে সমঝদার নয় সোনালী। সুতরাং সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে এসব বিচার করা তার সাধ্য নয়। সে শুধু দর্শকের চোখ দিয়ে দেখলো—প্রত্যেকটি ছবিই যেন অসামান্য! আর এই আশ্চর্য চিত্র-জগতের আড়াল থেকে আরেকটি অস্পষ্ট ছবিও ভেসে উঠলো তার কল্পনার চোখে—সে এক ধ্যানমগ্ন শিল্পীর ছবি... আর ঠিক এই মুহূর্তে, দেবব্রত কি দেখছিলো?

সে দেখছিলো—ভাববিমুগ্ধা এক নারী, যার আয়ত কালো চোখে আরণ্য রাত্রির মায়া যার অর্ধস্ফুট ঠোঁটে গাঢ় পলাশফুলের রং, যার নীলশাড়ীঘেরা তনুদেহে কল্পলোকের সেই দুর্লভ নীলপদ্মের স্বপ্ন...

আর ঐ যে দুটি বুকের ওপর দিয়ে উঠে গেছে আস্বচ্ছ নীলাঞ্চলের আবরণ - দেখে মনে হয় যেন দুই উত্তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গকে ঘিরে ঘিরে সর্পিল গতিতে উঠেছে শরতের হালকা নীল কুয়াশা...

'চলুন এবার।'

সোনালীর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমক ভাঙেল দেবব্রতর।

'চলুন।' বলে দরজার দিকে পা বাড়ায় দেবব্রত।

ঘর তালাবন্ধ করে দুজনে আবার চলতে থাকে সেই শুকনো ঝরাপাতায় ছাওয়া সরু পথটা দিয়ে।

এখানে আলো নেই। জায়গাটা উঁচু বলে অল্প নীচেই যে আলোকবৃত্ত রয়েছে তার আভা এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি।

অন্ধকারে সোনালীর চুলের সৌরভ ভাসে বাতাসে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তার স্পর্শ পায় দেবব্রত। আর শুধু সোনালীর চুলই নয়, ওর সমস্ত দেহ থেকেই যেন উঠছে একটা আশ্চর্য, মৃদু সুবাস—মনে হয় দেবব্রতর। এখনো ওর বন্ধুর তনুদেহের ছবি ভাসছে চোখের সামনে...

পুরুষদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি ইন্দ্রিয় চিন চিন করতে শুরু করেছে নারী মাধুর্যের এত একান্ত কাছাকাছি এসে। বুকের মধ্যে কি একটা দুর্বোধ্য, অস্ফুট যন্ত্রণা অনুভব করে দেবব্রত—হৃৎপিণ্ডের তালে তালে শুনতে পায় কোন সুপ্তোত্থিত বন্য আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট পদধ্বনি...

আলোর মধ্যে এসে যেন বেঁচে যায় দেবব্রত। এই কড়া বিদ্যুতের আলো কত রূঢ়, কত সহজে ভেঙে দেয় সৌন্দর্যের স্বপ্নকে, তবু এ কত বাঞ্ছনীয়! কত সময় মানুষকে বাঁচিয়ে দেয় ভয়ংকর পরীক্ষার হাত থেকে!

এখন দেবব্রত লক্ষ্য করে দেখে ভারী ওভারকোটটা গায়ে চাড়িয়ে নিয়েছে সোনালী। এখন ঠাণ্ডাটা অনেক বেশি পড়েছে, দেবব্রতও সেটা অনুভব করে চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ কুয়াশার ঝাপটা খেয়ে। এই একটু আগে কিন্তু তার দেহ প্রায় অসাড় হয়ে পড়েছিল বাইরের প্রকৃতি সম্পর্কে। আর এইমাত্র, আলোর মধ্যে এসে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতেই সেটা খেয়াল হল।

'আপনার স্টুডিয়ো দেখে খুব ভালো লাগলো।' —মৃদুকণ্ঠে বললো সোনালী—'সত্যিই এতটা—আমি আশা করিনি।'

একথার কোনো জবাব দিলো না দেবব্রত। চুপচাপ হাঁটতে লাগলো ওর পাশে পাশে।

কথা বলা দূরে থাক, সোনালীর দিকে এখন যেন চোখ তুলে তাকাতেও পারছে না দেবব্রত। সে নাকি শিল্পী, অথচ এই একটু আগেই কি বিশ্রী, ভয়ংকর একটা ইচ্ছে জেগেছিল তার?...

দেবব্রতর মনে পড়লো ছোটবেলায় একবার সে তার বাবার সঙ্গে সমতলের এক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিল। সেই সময় একদিন অপরাহ্ণের আলোয় চিকচিক করা দীঘির জলে ফুটন্ত রক্ত-কমল দেখে বাবার কাছে আব্দার করেছিল, ঐ ফুলটা তার চাই। কাদা ভেঙে অনেক কষ্টে সেদিন ফুলটাকে বাবা এনে দিয়েছিলেন তার হাতে। আর কি অসহ্য আনন্দই না হয়েছিল তখন! কিন্তু তার একটু পরেই সে কি করেছিল? হ্যাঁ, আজও স্পষ্ট মনে আছে, খানিকক্ষণ ফুলটাকে নিয়ে খেলা করার পর সে ওটার পাপড়ি ছিঁড়তে শুরু করেছিল একটা একটা করে। সব কটি পাপড়িকে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে ফেলেও শান্তি হয়নি তার। প্রতিটি পাপড়িকে সে আবার টুকরো টুকরো করে মুঠোর মধ্যে সেগুলোকে নিয়ে দলে পিষে ফেলেছিল!

সেদিন ওর ভিতরকার কোন শক্তি ওকে সেই ধ্বংসলীলায় প্রবৃত্ত করেছিল, দেবব্রত আজ তা জানে। সে শক্তিটা আজো মরে যায়নি, ঘুমিয়ে থাকার ভান করে চেতনার গভীরে ওৎ পেতে আছে শুধু। সুযোগ পেলেই জেগে ওঠে।

এই আজ, একটু আগে, সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে করছিল, তার কাছাকাছি আসা ফুটন্ত পদ্মের মত নারী-দেহটাকে নিজের দুই মুঠোর মধ্যে সম্পূর্ণ অধিকার করে, আর তারপর দলে পিষে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়...

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, অনু-শোচনাতে ভরে যাচ্ছে দেবব্রতর সমস্ত মন। ছি-ছি-ছি! সে নাকি শিল্পী! সৌন্দর্যকে ধ্বংস করা তো তার কাজ নয়। সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করা আর তাকে বিকশিত করাই তার সাধনা...। তবু তার শিল্পী-সত্তার তলা থেকে এক মুহূর্ত আগেই মাথা তুলে উঠেছিল একটা দানব...

প্রায় নীরবেই হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পৌঁছয় 'মহাকাল' হোটেলের সামনে।

'অচ্ছা এবার চলি। কাল আবার দেখা হবে।' বলে বিদায় নেয় দেবব্রত।

কাল আবার দেখা হবে। এটা কোনো বিশেষ অর্থে বলেনি দেবব্রত। একই অফিসে ওরা কাজ করে। সুতরাং কাল কেন, রোজই ওদের মুখ-দেখাদেখি হবে। তবু এখন কটা দিন ওর থেকে দূরে দূরে থাকবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে দেবব্রত। মনকে বশে আনা দরকার।

সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই নিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় দেবব্রত। একবারও পিছন ফিরে দেখে না আর।

(ক্রমশঃ)

নিকটেই আছে

নয়া রিক্রুট

মাত্র সাত লাইনের ছোট্ট খবর, তাও অষ্টম পাতার অষ্টম কলমের নীচের থাকেই লুকিয়ে ছিল। চোখে পড়ার কথা নয়। নেহাৎ পে-কমিশনের লম্বা রিপোর্টের লেজটুকু ঐ বিশেষ কলমেই ছিল ঝোলানো, তাই পড়তে গিয়ে চোদ্দ পয়েন্ট হেডিংটাও চোখে আটকে গেল, 'প্রতারণার দায়ে ডাক্তার ধৃত।'

কি ব্যাপার? রসিকতা আর কৌতূহল কেউ কখনো চেপে রাখতে পারে না। মা-জননী ইভ থেকে শুরু করে কেউ-ই যখন পারেননি, তখন আমি কোন ছার! কাগজে খবরে কৌতূহল তো মিটলই না, বরং আরো চাগাড় দিয়ে উঠল। আরে এই সেন্টারের রিক্রুটিং অফিসার আমাদের আনন্দ না? খবরে দেখছি, ধরা পড়ার পর ডাক্তার পুলিশের কাছে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে ঐ সেন্টারের আরো কয়েকজন হোমরা-চোমরা ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত। সর্বনাশ! আনন্দও জড়িত না কি? সেটা জানব বলেই ফাইলে গোঁজা ইনল্যান্ড লেটারখানা টেনে নিয়ে লিখতে বসলাম বাল্যবন্ধুকে—কাগজে খবরটা দেখে ঘাবড়ে গেছি। তুই-ই তো ওখানকার রিক্রুটিং অফিসার। পুরো ব্যাপারটা যদি ডিটেলসে লিখে জানাস তো ভাল হয়। কারণ কফি হাউসে পুরোনো আড্ডার সব কটা কাপই চলকে উঠেছে। আমরা সবাই বমকে গেছি—আমি ছাড়া, অমিয়, নরেন, বণ্টু, বারীন ও সুকুমার। তুই কোন ট্রাবলে পড়িস নি তো?

মাথা খারাপ! আমি কোন দুঃখে ট্রাবলে পড়ব?—সাত দিনের মধ্যে আনন্দের জবাব এল। পেল্লায় চিঠি। আঙুলটেপা কালে ছাপানো। তলায় ব্লক লেটারে টাইপ করা পুরো নামের ওপর বাংলায় শুধু বহু পরিচিত ইনিসিয়ালটুকু বসিয়ে দিয়েছে—আদা। অর্থাৎ আনন্দ দাস। তোদের মাথায় লিখে গেছে—কাগজে পড়লি 'প্রতারণার দায়ে ডাক্তার ধৃত' আর ডাক্তার বলেছে আরো অনেকেই এই ব্যাপারে জড়িত, অতএব দুয়ে দুয়ে চার, আদা নিশ্চয়ই ঝামেলায় পড়েছে। বন্ধুর সম্বন্ধে কি উচ্চ ধারণা! না রে না, ঝামেলা টামেলার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যিনি জট প্যাকিয়েছেন তিনি এই সেন্টারেরই মেডিক্যাল অফিসার, ফ্লাইট লেফটেনান্ট জি ডি ভার্মা। ধরা পড়ার পর আমাকেও জড়াতে চেয়েছিলেন, দোষটা শেয়ার করতে পারলে শাস্তির বোঝাটা একটু হাল্কা হয় আর কি। কিন্তু আমিও বাবা কলকাতার ছেলে, হুঁ-হুঁ। ও যখন আড়াই চাল দিয়ে কিস্তি মাৎ করার তাল আঁটছে আমিও ঠিক তখুনি ওর দুপাশে গজ আর নৌকো ফিট করে মন্ত্রীকে একঘর বাড়িয়ে দিয়েছি—ব্যস, বাছাধন নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু। এখন মুস্কিল হয়েছে কাগজে ঐ ছোট্ট খবরটার ফলো আপ না বেরোনোয় তোদের মত অনেকেই ভাবছে এই রিক্রুটিং সেন্টারের সবাই বুঝি ঐ নোংরামিতে জড়িত। আসলে তা নয়। তুই তো কাগজে লিখিস। দয়া করে যদি গোটা ব্যাপারটা ফ্ল্যাশ করার একটা ব্যবস্থা করে দিস তো তোর কাছে ফর এভার কৃতজ্ঞ থাকব।

দেখবি একটু চেষ্টা করে?

তার আগে সব তোর কাছে খুলে বলা দরকার। কাগজে মাঝে মাঝে এয়ারমেন রিক্রুটমেন্টের বিজ্ঞাপন বেরোয়, হয়তো দেখেছিস। বুকের ছাতি নর্মাল ত্রিশ, ফোলালে বত্রিশ, হাইট পাঁচ পাঁচ, পড়াশোনা স্কুল ফাইন্যাল হলেই চলবে। এক একবারে এক-একটা সেন্টার থেকে পাঁচ-ছশো ছেলে নেওয়া হয়। এদের বলা হয় র‍্যাঙ্কার। র‍্যাঙ্কারদের দুটো গ্রুপ—টেকনিক্যাল, নন-টেকনিক্যাল। টেকনিক্যাল গ্রুপের স্কেলটা একটু বেটার, সাতানব্বই থেকে তিনশো সাতচল্লিশ। স্টার্টিং হয় সব মিলিয়ে একশ আশী থেকে। নন-টেকনিক্যালদের বেসিক স্যালারী সেভেনটি এইট টু টুফিফটি। শুরুতে এরা পায় দেড়শো।

এই দেড়শো বা একশ আশী টাকার

একটা চাকরী পাবার জন্য যা লাইন পড়ে তা না দেখলে বিশ্বাসই করতে চাইবি না। গোটা শহর ও শহরতলী ছাড়াও আশ-পাশের ও দূরের গাঁ থেকে দলে দলে ছেলে আসে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চ্যারিটির লাইনও এর কাছে শিশু। সব আঠার, উনিশ, বিশের ছেলে। কুড়ির বেশী হলে আমরা নিই না।

আগের দিন রাত থেকেই লাইন পড়ে যায়। হাজার হাজার ছেলে। এক-একদিন শুধু ফর্ম বিলি করতেই বিকেল গড়িয়ে যায়। তাও সবাই ফর্ম পায় না। প্রিলিমিনারি ফিজিক্যাল টেস্টে যারা উৎরোয় তারাই পায় ফর্ম। মানে বিজ্ঞাপনে হাইট, ওয়েট, চেস্টের যে মান চাওয়া হয়েছে, সেটুকু ছোঁয়ার ক্ষমতা যাদের নেই তারা গোড়াতেই বাতিল হয়ে যায়।

ফর্ম জমা দেওয়ার পর শুরু হয় আসল পরীক্ষা। পাঁচদিন ধরে চলে এই পরীক্ষা। অনেকটা হার্ডল রেসের মত। আছাড় খেয়েছো কি বাদ। প্রথম দিন নেওয়া হয় মৌখিক পরীক্ষা। ব্যাচ বাই ব্যাচ এই টেস্ট চলে। কারণ প্রিলিমিনারি ফিজিক্যাল টেস্টের পাঁচিল টপকে কম করেও হাজার পাঁচেক অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে। একসঙ্গে এতগুলো ছেলের ইন্টারভিউ নেওয়া সম্ভব নয় বলেই, ভাগ ভাগ করে ওদের পরীক্ষায় ডাকি। এক-একটা ব্যাচে থাকে গড়ে শ' দেড়েক ছেলে।

ওরাল টেস্টেই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছাঁটাই হয়ে যায়। আমাদের সিসটেম হল, প্রত্যেকদিন পরীক্ষার শেষে সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটদের লিস্ট বার করে দেওয়া। আগের দিন পরীক্ষায় যে ফেল করেছে, পরের দিন আর সে পরীক্ষা দিতে পারবে না। মৌখিক পরীক্ষার পর শুরু হয় রিটিন টেস্ট।

দুদিন ধরে চলে এই টেস্ট। প্রথমদিন অংক আর ইংরাজী। পরের দিন জেনারেল নলেজ। এতেও যারা ধোপে টিঁকে যায় তাদেরই ডাকা হয় চতুর্থ দিনের প্র্যাকটিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টে। নানা রকমের ধাঁধার সাহায্যে অ্যাপ্লিকেন্টের উপস্থিত বুদ্ধি যাচাই করা হয় প্র্যাকটিক্যাল টেস্টে। আর সাইকোলজিক্যাল টেস্ট মানে তো বুঝতেই পারছিস, মিলিটারী লাইনটা আদৌ ক্যান্ডিডেটের স্যুট করবে কিনা সেটাই যাচিয়ে নেওয়া।

চারদিনের পরীক্ষার শেষে এক-একটা ব্যাচে দেড়শো ছেলের মধ্যে টিঁকে থাকে বড়জোর ত্রিশ-বত্রিশ জন। অর্থাৎ হাজার পাঁচেক অ্যাপ্লিকেন্টের মধ্যে নশ, সাড়ে নশ জন শেষ হার্ডলটা পর্যন্ত ছুটতে পারে। এই হার্ডলটাই ফাইনাল ইন্টারভিউ। এই ইন্টারভিউ-এর শেষে পরীক্ষার ফলাফল দেখে ক্যান্ডিডেটদের গ্রেড বাছাই করা হয়। যেমন ধর কেউ যাবে আর্মারীতে, কেউ বা অ্যাকাউন্টসে, কেউ ইকুইপমেন্টে আবার কেউ বা মিলিটারী পুলিশে, যার যে রকম ন্যাক।

গ্রেড বাছাইয়ের কাজ মিটে যাওয়ার পর ক্যান্ডিডেটদের ডাকা হয় ফাইন্যালে মেডিক্যাল টেস্টে অ্যাপীয়র হওয়ার জন্য। এই গ্যাটটা পেরোলেই নিশ্চিন্ত। তারপর ভেকান্সি অনুযায়ী পজিশন মিলিয়ে ক্যান্ডিডেটদের কল করা হয় ট্রেণিং সেন্টারে। ট্রেণিং পিরিয়ডটা আবার গ্রেডের ওপর নির্ভর করে। কোথাও একবছর, কোথাও দেড় বছর। ট্রেনিং শেষে পোস্টিং। আর পোস্টিং মানেই খাওয়া থাকা ছাড়া মাস গেলে দেড়শ বা একশ আশী টাকা মাইনে। চাকরীর বাজার কি রকম টাইট তা তো জানিসই। বি-এ, এম-এরাই কোন চাকরী জোটাতে পারে না তো হাজার হাজার স্কুল ফাইন্যাল কি পাবে? গরীব বাপ-মায়ের কাছে ছেলের এই ব্যাংকারের চাকরীই আকাশের চাঁদ। আর সেই চাঁদে পৌঁছোতে হলে সবশেষে চাই ডাক্তারী পাসপোর্ট। আমাদের সেন্টারের এই পাস-পোর্ট দেবার মালিক ছিলেন ফ্লাইট লেফটেনান্ট জি ডি ভার্মা। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স ডাক্তার ভার্মার। চেহারায় রীতিমত সুপুরুষ। মাইনেটাও চেহারা মাফিক। বেসিক সাড়ে নশ। এছাড়া আছে নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাওয়েন্স ছশ পঞ্চাশ ডি-এ। সব মিলিয়ে প্রায় সতেরো শ। তবু খাঁই মেটে না।

মিটবে কি? জুয়ায় আর মদেই মাইনের অর্ধেক যায় উড়ে। তারপর যা পড়ে থাকে তাতে ব্যারিস্টার বাপের একমাত্র মেয়ে মিসেস ভার্মার প্রসাধনের খরচই কুলোয় না, তো সংসার চলবে কি? ম্যাডামের ওয়ার্ডরোব দেখলে হিন্দী ফিল্মের যে কোন নায়িকাই ভিরমি খাবে। মাঝখান থেকে আমাদের মত ছাপোষা অফিসারদের চোখ টাটিয়েই মরত। প্রবাদটা নিশ্চয়ই জানিস।

হিংসা সব করতে পারে,
হিংসা পুত বিয়োতে নারে।

ক্যাশ না থাকলে, শুধু হিংসা করে তো আর শাড়ি গয়নার ছেলেপুলে দিয়ে

ঘর ভরানো যায় না। তাই আমাদের গিন্নীরা দূরে থেকেই মিসেস ভার্মাকে হিংসা করে দীর্ঘনিশ্বাস আর সেই সংগে কবত আমাদের মুণ্ডপাত। তবে ভার্মা গিন্নী খুব ক্লেভার। সবই বুঝতেন। বুঝতেন বলেই হাউসী খেলার আসরে শাড়ি গয়নার জেল্লায় কেল্লা মাৎ করে কফি পার্টির কর্ণারে টুপ করে মিসেস কাপুর বা মিসেস আদভানি বা মিসেস দাসের কানে মোক্ষম বাণীটুকু তুলে দিতেন—সবই স্নেহশীল পিতার উপহার। মেয়ের কষ্ট দেখে, জামাতা বাবাজীর অক্ষমতা ঢাকার জন্য ফি মাসেই ব্যারিস্টার পিতাজী সামান্য কিছু হাত খরচ পাঠান। তাতেই অনেক কষ্টে মিসেস ভার্মার সৌখীনতাটুকু বজায় থাকে।

মিসেস ভার্মার কাছে এর জন্য আমরাও গ্রেটফুল। পিতাজীদের সহৃদয় সাহায্য ছাড়া যে জামাতা বাবাজীবনদের পক্ষে একলার আয়ে স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করা সম্ভব নয় এ তত্ত্ব পৃথিবীর তাবৎ স্বামীরাই চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছেন—আমিও করে থাকি। প্র্যাকটিক্যালি, তোদের মিসেস আদাকে তো আমি ঐ কথা বলেই ঠেকিয়ে বা ঠকিয়ে এসেছি এতদিন। অবিশ্যি এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কেন নেই সে কথাই বলি, শোন।

এয়ারের ব্যাপার, ফলে বুঝতেই পারছিস এখানে নাক কান চোখ মুখ সর্বদাই খোলা থাকা দরকার। সামান্য ত্রুটির ফলে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। তবে ডাঃ ভার্মার মত ফিজিশিয়ানরা যতদিন রিক্রুটিং সেন্টারের মেডিক্যাল অফিসার হয়ে থাকবেন, ততদিন ভারত সরকারের কোন চিন্তা নেই। সেন্ট পারসেন্ট ফিজিক্যাল ফিট এমন মানুষ পৃথিবীতে নিশ্চয়ই নেই, আর ভার্মা সাহেবও সব দোষ দূর না করে কাউকে ফিট সার্টিফিকেট দেবেন না।

লক্ষ্য করেছিস নিশ্চয়ই—'দূর না করে' শব্দকটা। হ্যাঁ। ব্যাপারটা ঠিক তাই। উনি শুধু ক্যান্ডিডেটদের ফিজিক্যাল ফিটনেসই পরীক্ষা করতেন না, সেই সংগে ফিট সার্টিফিকেট পাওয়ার পথের ছোটখাট কাঁটা দূর করার দাওয়াইও বাৎলে দিতেন। অবিশ্যি তার জন্য মোটা ফীজ আদায় করে নিতেন। আর ঐ ফীজ আদায় করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেলেন ভার্মা সাহেব।

কানে খোল জমেছে। তোমার ইয়ার-ড্রামটা কমজোরী। যদি র‍্যাংকার হতে চাও তো ইমিডিয়েটলি লিটলটন স্ট্রীটে ডক্টর চৌবের সংগে দেখা কর, উনিই তোমায় সব বলে দেবেন।—ডাক্তার ভার্মার ওর‍্যাল প্রেসক্রিপসনখানা মুখস্থ করে নিয়েই ছেলেটি ছুটল ডক্টর চৌবের চেম্বারে।

পুরোনো সাহেবপাড়ায় সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরটাই ডাক্তার চৌবের চেম্বার। কার্পেট, সোফাসেট, ভারী পর্দা ও দেয়ালজোড়া পেণ্টিং, সব মিলিয়ে রীতিমত ইম্প্রেসিভ। কিন্তু ডাক্তার চৌবের কথাবার্তা শুনে ছেলেটি শুধু হতাশই নয় রীতিমত অবাকও হয়ে গেল।

বাবাকে না জানিয়ে এয়ার ফোর্সে নাম লেখাতে এসেছে। বাবা দিনরাত পড় পড় বলে ছেলের পেছনে ট্যাক ট্যাক করে ফির-ছেন। ছেলের নেই মন। ইচ্ছা ছিল বাপকে লুকিয়ে চাকরী জুটিয়ে পিটটান দেবে। পরে ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে চিঠি লিখে বাবাকে বুঝিয়ে দেবে যে পড়াশোনার সঙ্গে গাড়ি-ঘোড়া চড়ার কোন সম্পর্ক নেই। মাত্র সতেরো বছরের উঠতি ডানপিটে ছেলে।

সবকটা পরীক্ষা পাশ করে এসে ঠেকে গেছে কানের দোরগোড়ায়। ডাক্তার ভার্মা বলেছেন খোলে বোঝাই হয়ে আছে কান। যতটা আওয়াজ শোনা উচিত তার অনেক কম ওর কানের পর্দায় ধরা পড়ে। খুবই স্বাভাবিক। গোটা স্কুল জীবনটা বাবা ও মাস্টার মশাইদের থাপ্পড়ের দাওয়াইয়ের গুণে কানের আর কিই বা বাকী থাকে। তাই ডাক্তার ভার্মার অ্যাডভাইজ মত পৈতেয় পাওয়া আংটিটা বেচে ই এন টি স্পেশালিস্ট ডকটর চৌবের ফীজ পকেটে পুরে লিটলটন স্ট্রীটের চেম্বারে হাজিরা দিল ছেলেটি। কিন্তু ডাক্তারবাবু না দেখালেন কান, না বাৎলালেন দাওয়াই। শুধু কানে কানে বললেন দুশোটা টাকা ছাড়তে পারবে বাপধন, তাহলে এখুনি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কোথাও কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে ছেলে শেষমেশ বাপেরই শরণাপন্ন হল। বাপ জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। তলে তলে ছেলে এদ্দূর এগিয়েছে শুনে বিরক্ত হলেও, ভেতরে ভেতরে রাগ চেপে রেখে বললেন—যা বল গিয়ে টাকা দেব। শুধু জেনে আয় কোথায় কবে কখন ডাক্তারবাবু টাকা নেবেন।

তারপর শুরু করলেন জাল ছড়াতে। রিক্রুটিং সেন্টারের ইনচার্জ বলে গোড়াতেই আমাকে সব জানান। কারণ সিভিল পুলিশের কক্ষে মিলিটারীর ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করার কতগুলো টেকনিক্যাল ঝামেলা আছে। আমিও খবর পেয়ে মিলিটারী পুলিশকে ইনফর্ম করলাম। তারপর নির্দিষ্ট দিনে ঐ লিটলটন স্ট্রীটে ডাক্তার চৌবের চেম্বারটা আগে ভাগেই সাদা পোষাকের পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। ফলাফল তো কাগজেই পড়েছিস।

ভার্মাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। চৌবের বিরুদ্ধেও পুলিশ মামলা আনছে। তবে জানমান বাঁচাতে নিশ্চয়ই ভার্মা সাহেব খরচ করতে পিছপা হবেন না। কারণ কম পয়সা তো আর উনি রোজগার করেননি এই পথে। তিন বছর এই সেন্টারে উনি অ্যাটাচড ছিলেন। তিন বছরে পাঁচবার রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। ফি-বারে নেওয়া হয়েছে পাঁচশো জন। এখন মাথাপিছু দুশো টাকা করে নিলে মোট কত আয় ওর হয়েছে একবার নিজেই হিসেব করে দেখ। অবিশ্যি এর থার্টি পার্সেণ্ট ডাক্তার চৌবে শেয়ার হিসাবে পেয়েছেন। ঘটনাটা কেমন অদ্ভুত, না?

—সন্ধিৎসু

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯)

ঈশম সহসা হেঁকে উঠল, কর্তারা ঠিক হইয়া বসেন। নৌকাটাকে খাল থেকে ঠেলে শীতলক্ষার জলে ফেলে দেবার সময় এমন হেঁকে উঠল। —স্রোতের মুখে পইড়া গ্যালেন। পানিতে পইড়া গ্যালে আর উজান যাইব না। সামনে বড় নদী, শীতলক্ষা নাম তার।

এত বড় নদীর নাম শুনে সোনা ছইয়ের ভিতর ঢুকে বসে থাকল। লালটু, পলটু ছইয়ের উপর বসে ছিল এতক্ষণ। বড় নদীতে পড়ে গেছে শুনেই লাফিয়ে পাটাতনে নামল। দেখল—বড় নদী তার দুই তীর নিয়ে জেগে রয়েছে। স্রোতের মুখে নৌকা পড়তেই বেগে ছুটতে থাকল। সারা পথ বড় কম সময়ে পার হয়ে এসেছে। পালে বাতাস ছিল। নদীতে স্রোত ছিল। উজানে নৌকা বাইতে হয় নি। আর কি আশ্চর্য, নদীতে পড়তেই ঢাক-ঢোলের বাজনা। পাড়ের বাজনা বাজছে। দুই পাড়ে গাছ-পালা-পাখি এবং গাছপালা পাখির ভিতর সোনা বড় অট্টালিকা আবিষ্কার করে কেমন মুহ্যমান হয়ে গেল। সারি-সারি অট্টালিকা। এত বড় যেন সেই বিল জুড়ে অথবা সোনালি বালি নদীর চর জুড়ে—গ্রাম মাঠ জুড়ে শেষ নেই বুঝি অট্টালিকার। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। সে আর ছইয়ের নিচে বসে থাকতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে বের হতেই দেখল জলে সেই সব ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদের প্রতিবিম্ব ভাসছে। যেন জলের নিচে আর এক নগরী। সে তার গ্রাম ছেড়ে বেশীদূরে গেলে মেলা পর্যন্ত গেছে। কোথাও সে এমন প্রাসাদ দেখে নি—ন এবার উঠে দাঁড়াল। নৌকার মুখ এবার পাড়ের দিকে ঘুরছে। সামনে স্টিমার ঘাট, ঘাটের পাশে বুঝি নৌকা লাগবে।

পাড়ে পাম গাছ। সড়ক ধরে পাম গাছের সারি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সড়কের ডাইনে নদীর চর এবং কাশ ফুল। উত্তরের দিকে পিলখানার মাঠ, মাঠ পার হলে বাজার এবং আনন্দময়ী কালিবাড়ি। ঘাটে রামসুন্দর পেয়াদা এসেছিল ওদের নিতে—সে পাড়ে উঠে যাবার সময় এমন সব বলল।

নদী থেকে যত কাছে মনে হয়েছিল, যেন নদীর পাড়েই এই সব অট্টালিকা—নদীর পাড়ে নেমে মনে হল সোনার, তত কাছে নয়। ঠিক সড়কের সঙ্গে হাঁটু-সমান পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় লোহার রেলিঙ। ছোট-বড় গম্বুজ। কোথাও সেই গম্বুজে লাল-নীল পাথরের পরী উড়ছে। দুপাশে সারি-সারি ঝাউ গাছ। গাছের ফাঁক দিয়ে দিঘিটা চোখে পড়ছে। দু পাড়ে বিচিত্র বর্ণের সব পাতাবাহারের গাছ, ফুলের গাছ, কত রকমারী সব ফুল ফুটে আছে, যেন ঠিক কুঞ্জবনের মতো, সাদা পদ্মফুল দিঘিতে—দু পাড় বাঁধানো এবং ঝর্ণার জল যেন পড়ছে তেমন কোথাও শব্দ শুনে সোনা চোখ তুলে তাকাল, দেখল পাশে ছোট্ট এক ফালি জমি, কি সব কাঁচ ঘাস, লোহার জাল দিয়ে বেড়া, ভিতরে কিছু হরিণ খেলা করে বেড়াচ্ছে।

লালটু-পলটু এই হরিণ- অথবা চিতা-বাঘের গল্প করেছে। সে মনে-মনে একটা বিস্ময়ের জগৎ আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল, কিন্তু কাছে, এত কাছে এমন সব হরিণশিশু দেখে সোনা হতবাক। রামসুন্দর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লালটু-পলটু পিছনে আসছে। সে ছুটে-ছুটে এতটা পথ এসেছিল। তারপর গেলেই বুঝি সেই চিতা-বাঘ এবং ময়ূর, ময়ূরের পালক সে যাবার সময় নিয়ে যাবে ভাবল। তখনই মনে হল ঘোড়ার খুরে শব্দ উঠছে। নুড়ি বিছানো রাস্তা, সাদা কোমল আর মসৃণ, সে দুটো-একটা নুড়ি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেলল। তারপর মুখ তুলতেই দেখল, খুব সুন্দর এক যুবা এই অপরাহ্নে ঘোড়ায় কদম দিতে-দিতে ফিরছেন। পিছনে ফুট-ফুটে একটি মেয়ে। সাদা ফ্রক। জরির কাজ ফ্রকে। ঘাড় পর্যন্ত মসৃণ চুল। সোনার মতো ছোট্ট এক মেয়ে—যেন সেই রেলিঙ থেকে একটা বাচ্চা পরী উড়ে এসে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে। সোনাকে পলকে দেখা দিয়েই সহসা উড়ে গেল। সদর খুলে গেছে ততক্ষণে। ঘোড়ার পিঠে সেই যুবা দিঘির পাড় বাচ্চা পরী নিয়ে উধাও হয়ে গেল। সোনা কেমন হতবাকের মতো তাকিয়ে থাকল শুধু।

তার মনে হল ছোট্ট এক পরী ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে চলে গেছে। যেদিকে ঘোড়া গেছে, সোনা সেদিক ছুটতে থাকল। ছুটতে-ছুটতে সেই সদর দরজা। লোহার বড় গেট, ভিতর একটা মানুষের গায়ে বিচিত্র পোশাক। হাতে বন্দুক, কোমরে অসি। মাথায় নীল রঙের পাগড়ি। দরজা বন্ধ বলে সোনা ঢুকতে পারছে না ভিতরে। ঘোড়াটা এত বড় বাড়ির ভিতর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! সোনার কেমন ভয়-ভয় করছে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল, রামসুন্দর, লালটু পলটু আসছে।

সোনা ছোট্ট এক প্রাণ পাখির মতো অট্টালিকার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। যেন সে এক রাজার দেশে চলে এসেছে। রাজবাড়ি। এই সদরে মানুষ-জন বেশি ঢুকছে না। দিঘির দক্ষিণ পাড় দিয়ে মানুষ-জন যাচ্ছে। এ-ফটক অন্দরমহলের। সোনা নিরিবিলি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে রামসুন্দর তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল।

মহলের এই ফটকে সকলে ঢুকতে পারে না। কেবল আপনজনেরা ঢুকতে পারেন। অথবা কিছু আমলা যারা এই পরিবারের দীর্ঘকাল ধরে আশ্রিত, আপন মহিমায় যারা আত্মীয়ের মতো—প্রায় নিকট-আত্মীয় বলা চলে, অন্দর-সদর যাদের কাছে সমান—বিশেষ করে ভূপেন্দ্রনাথ, যার সততার তুলনা নেই, পারিবারিক সুখ-দুঃখে যে মানুষ প্রায় ঈশ্বরের সামিল—তিনি সোনার মেজ-জ্যাঠামশাই, সে ঘোড়ার পিছু-পিছু ছুটে এসে ভিতরে ঢুকতে চাইলে মল্ল মানুষের মতো দুই বীরযোদ্ধা ফটক বন্ধ করে ছোট্ট এক প্রাণ পাখিকে ভিতরে ঢুকতে মানা করে দিল। সোনা প্রথম লোহার ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে দিল। সে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে। অনেক দূর থেকে যেন কি এক সুর ভেসে আসছে। কে গান গাইছে যেন। সামনে সারি-সারি থাম, কারুকাজ করা কাঠের রেলিঙ। মাথার উপরে ঝাড় লণ্ঠন। সে প্রায় ফড়িঙের মতো উড়ে-উড়ে ভিতরে চলে যেতে চাইছে।

তখন কোথাও এক নর্তকি নাচছিল। ঘুঙুরের শব্দ কানে আসছে। তখন কোথাও ঢাকের বাদ্য বাজছিল। ছাদের উপর সারি-সারি পাথরের পরী উড়ছে। ওরা যেন শরীরের সব বসনভূষণ আলগা করে ওড়াচ্ছে। অথবা পা তুলে হাত তুলে নাচছিল। চারপাশে সব মসৃণ ঘাসের চত্বর। কোমল ঘাসে-ঘাসে পোষা সব বুল-বুলি পাখি, ছোট-ছোট কেয়ারী করা গাছ, গাছে-গাছে ফুল ফুটে আছে। দক্ষিণ থেকে এ-সময় কিছু পাখি উড়ে এসেছিল। সে সব পাখি কলরব করছে। সে ফটকে মুখ রাখতেই দেখল—লাল অথবা হলুদ রঙের পোশাক পরে, ছোট-বড় মেয়েরা-ছেলেরা লুকোচুরি খেলছে। তখনই রামসুন্দর হাঁকল, ফটক খুলতে হয়। ভূঁইঞা কর্তার পরিজন আইছে। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাচ-

ক্যাঁচ শব্দ তুলে লোহার ফটক খুলে গেল। সোনাকে সেই মল্ল মানুষেরা আদাব দিল। লালটু, পলটু কি গম্ভীর। চাপল্য ওদের বিন্দুমাত্র নেই। ওরা জলের ফোয়ারা দেখতে পেল। সোনা যত দেখে, তত চোখ বড়-বড় হয়ে যায়। সেই মানুষ দুজন বন্দুক ফেলে সোনাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চাইলে, সোনা রামসুন্দরের পেছনে চলে গেছে। কিছুতেই ওরা সোনাকে কাঁধে তুলে নিতে পারল না। ভূইঞা কর্তার পরিজন, এই সোনা, ছোট্ট সোনা, যাদুকর-এর পালিত পুত্রের মতো মুখ চোখ, ওরা সোনাকে কাঁধে তুলে ভূপেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে চাইল। যেন নিয়ে গেলেই ইনাম মিলে যাবে তাদের—কিন্তু সোনা হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইছে, কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব, বেশি জোরজার করলে হয়ত সে কেঁদেই ফেলবে।

সোনা হেঁটে যেন এ-বাড়ি শেষ করতে পারছে না। সে যে এখন কোথায় আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। মাথার উপর বড়-বড় ছাদ। ছাদে ঝাড় লণ্ঠন দুলছে। লম্বা বারান্দা, জালালি কবুতর খিলানের মাথায় জাফরি কাটা রেলিঙের পর্দা কত দাস-দাসীর কণ্ঠ—এসব যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। রামসুন্দর হাত ধরে মহলার পর মহলা পার করে নিয়ে যাচ্ছে। আজ এ-সময় পাগল জ্যাঠামশাই থাকলে সোনার এতটুকু ভয়, সংকোচ থাকত না। দেয়ালে বড়-বড় তৈলচিত্র পূর্বপুরুষদের। তারপরই নাটমন্দির। এখানে এসেই সে প্রথম বারান্দায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ পর আকাশ দেখতে পেল। ওর যেন এতক্ষণে প্রাণে জল এসেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ কাচারিবাড়িতে বসে ছিল। পুজোর যাবতীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের হিসাবপত্র নিচ্ছিল। তখন কানে গেল—ওরা এসে গেছে। সে মোটা পুরো গদীতে বসে ছিল। সাদা ধবধবে চাদর বিছানো। মোটা তাকিয়া, মানুষজন, কিছু প্রজাবৃন্দ নিচে বসে রয়েছে। সে সব ফেলে ছুটে গেল। কারণ এবার কথা আছে সোনা আসবে পুজো দেখতে। শেষ পর্যন্ত শচি ওকে পাঠাল কিনা কে জানে। সকাল থেকেই মনটা উন্মনা হয়ে আছে। রামসুন্দরকে ঘাটে বসিয়ে রেখেছে দুপুর থেকে। কখন আসবে, কখন আসবে এমন একটা অস্থির ভাব। সে সব ফেলে ছুটে গেলে দেখল, নাটমন্দিরে সোনা দেবীপ্রণাম করছে। পরণে নীল রঙের প্যান্ট। পায়ে সাদা রাবারের জুতো, সিল্কের হাফসার্ট গায়। ক্লান্ত মুখ। সেই কখন খেয়ে বের হয়েছে! ভূপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে সোনাকে বুকে তুলে নিল। দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে যেন—কত কিছু চেয়ে নেবার ইচ্ছা এই বালকের জন্য। কিন্তু আশ্চর্য, কিছু বলতে পারল না। বড় বড় চোখে দেবী ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতে তাঁর বরাভয়। মা-মা বলে চিৎকার করে উঠল, ভূপেন্দ্রনাথ, সোনা সহসা এই চিৎকারে কেঁপে উঠল। ভূপেন্দ্র-নাথের চোখে জল।

দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি। যেন পুজো নয়, প্রাণের ভিতর এক বিশ্বাসের পাখি নিয়ে খেলা করে বেড়ায়। সোনাকে বুকে নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে দেবীর অপার মহিমা, মহিমা না হলে এই সব সামান্য মানুষ বাঁচে কি করে, খায় কি করে, প্রাচুর্য আসে কিভাবে, এই যে সোনা এসেছে, সেও যেন দেবীর মহিমা। নির্বিঘ্নে এসে গেছে, এবং এই দেশে মা এসেছেন, শরৎকাল, কাশ ফুল ফুটেছে, ঝাড় লণ্ঠনে বাতি জ্বলবে, চরের ওপর দিয়ে হাতি যাবে, ঘণ্টা বাজবে হাতির গলায়, হাতিটাকে শ্বেত চন্দনে, রক্ত চন্দনে সাজানো হবে, সবই দেবীর মহিমায়, দেবী এলেই সব হয়। দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে ভূপেন্দ্রনাথ—এই সব নাবালকের জন্য মঙ্গল কামনা করলেন। দেবীর বড়-বড় চোখ, নাকে লম্বা নোলক, হাতের শঙ্খ পদ্ম গদা সব মিলে যেন কোথাও এক বরাভয়। আনন্দময়ীর বাড়ির পাশের জমিতে নামাজ পড়বে মুসলমান চাষাভূষো মানুষেরা। ওটা মসজিদ নয়, ভাঙা প্রাচীন কোন দুর্গ, ঈশা খাঁর হতে পারে, চাঁদ রায় কেদার রায় করতে পারে, এখন সেই ভাঙা দুর্গে নামাজ পড়ার জন্য লোক ক্ষেপানো হচ্ছে। আজ সকালে এমন খবরই কাচারিবাড়িতে দিতে এসেছিল—মুসলমানরা বিশেষ করে বাজারের মৌলভিসাব, যার দুটো বড় সুতার কারবার আছে, যে মানুষের চরে লম্বা ধানের জমি, খাসে রয়েছে হাজার বিঘা, সেই মানুষ বাবুদের পিছনে লেগেছে। বোধ হয় এই যে দেবী, দেবীর মহিমাতে সব উবে যাবে—কার সাধ্য আছে দেবীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়! যেন হাতের শানিত তরবারি এখন সেই মহিষাসুরকেই বধে উদ্যত—ভূপেন্দ্রনাথের মনে বোধ হয় এমন একটা ছবি ভেসে উঠেছিল — সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার, মা-মা! তোর এত মহিমা! তোর এত মহিমার কথা সে উচ্চারণ করে নি। কেবল সোনা, জ্যাঠা-মশাইর চোখে জল দেখে ভাবল, মানুষটা ওদের কাছে পেয়ে কাঁদছে। মা মা বলে কাঁদছে।

সোনা এতটা পথ বাড়ির ভিতর হেঁটে এসেছে, অথচ সেই ছোট্ট মেয়ে বুঝি এই মেয়ের নাম কমল, কমলকে সে কোথাও দেখতে পেল না। কোথায় আছে এখন কমল! সে ভেবেছিল, ভিতরে ঢুকে গেলেই কমলকে দেখতে পাবে। কিন্তু না সে নেই। সে খেতে বসে পর্যন্ত সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। কত বালক-বালিকা ছুটোছুটি করছে, কেবল সেই মেয়ে যে ঘোড়ায় চড়া শেখে, ছোট্ট মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে গেলে বড় আশ্চর্য দেখায়। সোনা যতক্ষণ এই ভিতর বাড়িতে ছিল কমলকে দেখার আগ্রহে চারিদিকে যেন কি কেবল খুঁজতে থাকল।

শচীন্দ্রনাথ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত ছিল। ছেলেরা সব পুজো দেখতে চলে গেছে। দুপুরে মনজুর এসেছিল সালিশি মানতে। মনজুর এবং হাজি সাহেবের ভিতর বিরোধ ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। হাজি সাহেবের বড় ছেলে, মনজুরের যে সামান্য জমি আছে সেখানে গত গ্রীষ্মে কোদাল মেরে আল নামিয়ে দিয়েছে। বর্ষায় যখন পাট কাটা হয়, কিছু পাট জোর-জবরদস্তি করে কেটে নিয়ে গেছে। মনজুর একা। হাজি সাহেবের তিন ছেলে। হাজি সাহেবের বড় সংসার, পাটের এবং আখের বড় চাষ। অথচ সামান্য জমির প্রলোভনে একটা খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সারা বিকেল শচীন্দ্রনাথ হাজি সাহেবের বাড়িতে বসে একটা ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফয়সালা হলেই চলে যাবে। উঠোনের জলচৌকিতে সে বসে ছিল। পান-তামুক আসছিল। শচীন্দ্রনাথ কিছুই খাচ্ছে না। এখন আসতে পারে ইসমতালি, প্রতাপ চন্দ, বড় মিঞা আসবে পারে। তবু শচীন্দ্রনাথই সব। সে এক সময় হাজি সাহেবের মেজ ছেলেকে খোঁজ করল।—আমির কৈ গ্যাছে?

—আমির নাও নিয়া গ্যাছে বড় মিঞারে আনতে।

বড় মিঞা ঘাট থেকে উঠে এসে শচীন্দ্রনাথকে আদাব দিল। বলল, কর্তা ভাল আছেন?

—আছি একরকম। তা তোমার এত দেরি!

—কইবেন না, একটা বড় নাও নদীর চরে কেডা বাইন্দা রাখছে।

—নাও কার জান না?

—কার বোঝা দায় কর্তা। দুই মাঝি। আর আছে বড় একখানা বৈঠা। পাল আছে। নাওডারে দ্যাখতে গ্যাছিলাম।

—মাঝিরা কি কয়?

—কিছু কয় না। কৈ যাইব, কোনখান থাইকা আইছে কিছু কয় না।

—কিছুই কয় না!

—না। রাইতের বেলা আপনের গান শোনা যায় কেবল।

—কি গান!

—মনে হয় গুণাই বিবির গান। চরে সারা রাইত ঝম-ঝম শব্দ হয়।

—গ্যাছ একবার রাইতে?

—কর্তা ডর লাগে। রাইতের বেলা গান শুনতে গ্যাছিলাম। যত যাই তত দ্যাখি নাও জলে-জলে ভাইসা যায়। দিনের বেলাতে গ্যালাম দ্যাখি দুই মাঝি বইসা আছে। বোবা। কথা কয় ইশারায়।

—কার নাও, কি জন্য আইছে কিছুই জানতে পারলা না!

—না কর্তা।

—আশ্চর্য!

—হ কর্তা। বড় আশ্চর্য।

মনজুর আসতেই অন্য কথা পাড়লেন শচীন্দ্রনাথ। হাজি সাহেব মাদুরে বসে— প্রায় নামাজের ভঙ্গীতে, হাতে লাঠি, লাঠির মুখে মুখে চাঁদের বুড়ি— বুড়ো হাজি সাহেব সালিশ মেনে নিলেন। কথা থাকল, যে পাট কাটা হয়েছে, সেই পাট, কত হতে পারে, পাটের ওজন কত হবে—বিচার-বিবেচনা করে ওরা পাটের ওজন বলে দিল। এবং জল নেমে গেলে কথা থাকল জমির আল সকলে মিলে ঠিক করে দেবে।

শচীন্দ্রনাথ এবার মনজুরকে উদ্দেশ্য করে বলল, হারে মনজুর, নদীর চরে নাকি বড় নাও ভাইসা আইছে।

—আইছে শুনেছি।

—চরের কোনখানে!

—সে অনেক দূরে কর্তা। অনেক দূরে বলতে যথার্থই অনেক দূরে। নদী-নালার দেশ। বর্ষাকালে এইসব গ্রাম অন্ধকারে দ্বীপের মতো জেগে থাকে। তারপর জল শুধু জল। নদী-নালা তখন দু'পারের সঙ্গে মিশে যায়। বড় বড় বাগ, ফলের এবং আনারসের আর অরণ্য কোথাও জলে নাক ভাসিয়ে ভেসে থাকার মতো জেগে থাকে। দক্ষিণে শুধু গজারির বন। বনে বাঘ থাকে। ইচ্ছা করলে সেই নাও নিমেষে গজারি বনে পালিয়ে যেতে পারে, ইচ্ছা করলে এই নাও জলে জলে নিমেষে উধাও হয়ে যেতে পারে। টের পাবার জো নেই। প্রায় যেন এক লুকোচুরি খেলা। খালে বিলে, বিলের দুপাশে বড় গজারির অরণ্য—দশ বিশ ক্রোশ জুড়ে অরণ্য, সেই সব অরণ্যে এখন এ-সময় ভিন্ন ভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

ঘাটে ওঠার আগে শচীন্দ্রনাথ বলল, অলিমদ্দি ল একবার ঘুইরা যাই।

—কৈ যাইবেন?

—নদীর চরে। বড় নাও আইছে। অসময়ে বড় নাও!

অলিমদ্দি লগি মেরে মাঠে এসে পড়ল। এসব মাঠে জল কম। কম জল বলে অলিমদ্দি অনেক দূরে নৌকা বাইল। নদীর জলে পড়তেই সে বৈঠা বের করে পাল তুলে দিল। তারপর চারিদিকে চোখ মেলে বলল, কৈ গ কর্তা নাও ত দ্যাখতাছি না।

—চরে নাও নাই!

—কৈ আছে! থাকলে দ্যাখা যাইত না!

শচীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়াল। পাটাতনে দাঁড়িয়ে দেখল যথার্থই চরে কোন নৌকা নেই। বড় নৌকা দূরে থাকুক, হাটে-গঞ্জে যাবার কোষা নৌকা পর্যন্ত সে দেখতে পেল না। সে বিস্ময়ে বলল, আশ্চর্য!

ঘরে ঘরে এখন লণ্ঠন জ্বলছে। আশ্বিন মাস বলে রাতের দিকে শীত পড়ার কথা। কিন্তু গরমই কাটছে না। ঠিক ভাদ্র মাসের মতো ভ্যাপসা গরমে শচীন্দ্রনাথের শরীর ঘামছিল। অলিমদ্দি এসে গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিচ্ছে। গরুর ঘরে একটা বড় লম্বা, অনেক লম্বা মশারি টানানো। ধোঁয়া উঠে এলে অলিমদ্দি মশারি ফেলে দিল। তখন শচীন্দ্রনাথ বড় ঘরে ঢুকে বলল, বড় নদীর চরে শুনেছি একটা বড় নাও ভাইসা আইছে—

—কার নাও!

—তা কইতে পারমু না।

—দ্যাখ দ্যাখ, কার নাও! লক্ষ্মীর নাও হইতে পারে, আবার অলক্ষ্মীর নাও হইতে পারে! দ্যাখ একবার খোঁজখবর কইরা।

—সকাল হইলে ভাবছি বড় মিঞার নাও, হাজিদের নাও আর চন্দদের নাও নিয়া বাইর হমু—কোনখানে নাওটা অদৃশ্য হইয়া থাকে দেখতে হইব।

কারণ বর্ষাকাল এলেই ডাকাতের উপদ্রব বাড়ে। সুতরাং এই এক বড় নৌকা ভেসে এসেছে, এবং দিনের বেলা কোথায় অদৃশ্য হয় কেউ জানে না, রাত নিঝুম হলে সকলে ভয়ে ভয়ে থাকে। রাত হলে এইসব গ্রাম জলে-জঙ্গলে একেবারে নিঝুম পুরির মতো। কারণ গ্রামের বাড়ি সব দূরে দূরে। শুধু নরেন দাসের বাড়ি, ঠাকুর বাড়ি এবং দীনবন্ধুর বাড়ি সংলগ্ন। তারপর পালবাড়ি। হারান পালের দুই ছেলে, ভিন্নমুখি দুই ঘর এক উঠোনে করে নিয়েছে। রাত হলে সব কেমন নিঝুম হয়ে আসে। মালতীর আর তখন ঘুম আসে না। রঞ্জিত এতদিন ছিল বলে ভয় ভয় ভাবটা কম ছিল। রঞ্জিত চলে গেলে ওর আর কি থাকল, যা হবার হবে। সে জোর করে খুব একটা রাত না হতেই শুয়ে পড়বে ভাবল।

আশ্বিনের এই রাতে এমন গরম যে দরজা বন্ধ করলে হাসফাঁস লাগে। এখনও নরেন দাস জেগে আছে। তাঁত ঘরে কি যেন করছে নরেন দাস। আভারানী বাসন মাজতে ঘাটে গেছে। আবু গেছে হ্যারিকেন নিয়ে। সে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। দরজা খোলা রেখে একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য পাটি পেতে মালতী শুয়ে পড়ল। গরমে গরমে শরীর যেন তার পচে গ্যাছে। এই গরম, রাতের অন্ধকার সব মিলে মালতীকে নানা-রকম নৈরাশ্যবোধে পীড়িত করছে। কিছুই নেই আর। হায়, জীবন থেকে তার সব চলে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। গরমের জন্য সায়া সেমিজ শরীর থেকে আলগা করে দিতে দিতে এমন সব ভাবল। মানুষটা এখন কোথায় আছে, কি কাজ এমন সে করে বেড়ায়, যার জন্য নানা স্থানে তাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। এ-নামটা তার কেউ জানে না। ওর একটা ছবি সে দেখেছে, ছবিতে রঞ্জিতকে চেনাই যায় না। লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—যেন, এক প্রৌঢ় সন্ন্যাসি। মালতী কিছুতেই বিশ্বাস করে নি। এক-দিন তখন লাঠি খেলা জোরা খেলা হয়ে গেছে। যে যার মতো যার-যার বাড়ি চলে গেছে। মালতীকে জ্যোৎস্নায় সহসা পিছন থেকে এসে আঁচল টেনে ধরল—দেখল সেই সন্ন্যাসি। রুদ্র মূর্তি, মালতী ভয়ে মূর্চ্ছা যাবার মতো, রঞ্জিত তখন বলল, আমি মালতী। চিনতে পারছ না! মালতী কাপড়টা বুকের কাছে জমা করে রাখার সময়, সেই দৃশ্য মনে করে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠল সেদিনই কেবল রঞ্জিত একবার মাত্র ওকে দু হাতে জাপটে ধরে ভয় ভাঙিয়ে দিল, আমি রঞ্জিত, তুমি চিনতে পারছ না। মালতী এখন ভাবছে সে বোকা। ভালো করে মূর্চ্ছা গেলে মানুষটা নিশ্চয়ই পাঁজাকোলে তুলে নিত, ঘরে দিয়ে আসবার জন্য। সে খিল-খিল করে হেসে উঠে তখন দু হাতে জড়িয়ে ধরে সহসা অবাক করে দিতে পারত। আর মানুষটা নিজেকে বুঝি তখন কিছুতেই ধরে রাখতে পারত না। মনে হতেই ভিতরটা ওর উত্তেজনায় থর-থর করে কেঁপে উঠল। এবারে সে সায়া সেমিজ পুরোপুরি আলগা করে ঘাটের দিকে তাকাল। অন্ধকারের জন্য ঘাটের কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাব গাছটার নিচে জল উঠে এসেছে। সেখানে সে জলে মাছ নড়লে যেমন শব্দ হয় প্রথমে তেমন একটা শব্দ পেল। অমূল্য থাকলে এ-সময় বড়শীতে মাছ আটকেছে ভেবে ছুটে যেত। কিন্তু মালতী জানে—নরেন দাস কোন বড়শি জলে পাতে নি। একা মানুষ বলে সারা দিন খাটা-খাটুনি গেছে। এখনও রাত জেগে তাঁতঘরে সুতো ভিজাচ্ছে মাড়ে। কাল ফিরবে অমূল্য। চাপ তখন কমবে।

শোভা সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছে। শরীর ভালো নেই। জ্বর-জ্বর হয়েছে। আবু এসে ঘরে ঢুকলেই দরজা বন্ধ করে দেবে ভাবল মালতী। ঘাটে হ্যারিকেন তেমনি জ্বলছে। আবুকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু আলোটা সহসা নিভে গেল মনে হল এবং বাসন পড়ার শব্দ শোনা গেল। মালতী ভাবল, ঘাট বুঝি পিছল ছিল, উঠে আসার সময় বৌদি পা ঠিক রাখতে পারে নি, পড়ে গেছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁতঘরে ঢুকে কারা যেন ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। মালতী এবার উঠে বসল। এ-সময়ে চোর-ছেচোরের উপদ্রব বাড়ে। সে ডাকল, দাদা ও ঘরে লড়ালাড়ি ক্যান! কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার—না কোন শব্দ, না কোন চিৎকার। ফের সব নিঝুম। সে তাড়াতাড়ি সায়া সেমিজ ঠিক করে উঠে বসল। আলোটা জ্বালাবে এই ভেবে হ্যারিকেনটা টেনে আনার জন্য উঠে দাঁড়াতেই দুই ছায়ামূর্তি দু পাশে। সে চিৎকার করবে ভাবল—কিন্তু দুই ছায়ামূর্তি অন্ধকারে সাপ্টে ধরে মুখে কাপড় ঠেসে দিল। এই ঘরে এখন ধস্তাধস্তি। শোভা জেগে গেল। অন্ধকারে শুধু ফোঁস-ফোঁস শব্দ। কিল লাথি এবং মহামারীর মতো ঘটনা। সে ভয়ে ডাকতে থাকল, পিসি-পিসি! তারপর আর কোন শব্দ নেই। কারা যেন ভূতের মতো এই গৃহ থেকে যুবতী মেয়ে তুলে বর্ষার জলে ভেসে গেল।

(ক্রমশঃ)
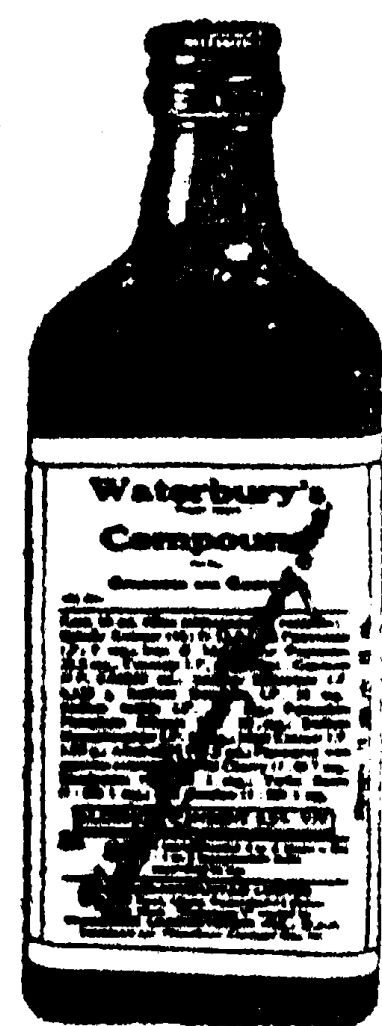
ব্যংগের সন্ধানে

মীরা অধিকারী

চলমান জগতে কেবলই চলেছে রূপ-বদলের পালা। এক যায় আর এক আসে। এই আসা-যাওয়ার অন্তর্বর্তীকালটা বড় দুঃসময়। সাহিত্যের জগতেও এই পরিবর্তন আসে। সাহিত্যের জগতে এক একটা সময় দেখা দেয় যাকে আমরা বলতে পারি Creative যুগ। এই যুগের সাহিত্য নানাভাবে নানারূপে উৎকর্ষ লাভ করে। ফসলে ফসলে ভরে ওঠে চারিধার। এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেন বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারের দল। এযুগ সমৃদ্ধির যুগ, স্থিরতার যুগ, আশার যুগ, বিশ্বাসের যুগ। এই আত্মপ্রত্যয়ী যুগেই উচ্চাংগের সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। বাংলা সাহিত্যে ঊনিশ শতক এমনি একটি সময়। আঠার শতক প্রাচীন (মধ্য) ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ এবং সে হিসাবে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের পক্ষে দুঃসময়। এ দুঃসময় প্রত্যেক দেশের সাহিত্য জগতেই দেখা দেয়। ইউরোপের আঠার শতক এই রকম একটি যুগ। প্রকৃতির নিয়মচক্রেই এ দুঃসময়ের পদধ্বনি। এ যুগটা সংশয়ের যুগ, নাস্তিক্যের যুগ। একে আমরা বলতে পারি Critical যুগ। এই Critical যুগেই রচিত হয় ব্যংগ সাহিত্য। অর্থাৎ এই যুগই ব্যংগ রচনার পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। এ যুগে অন্য সাহিত্য সৃষ্টি যে না হয়, একথা বলছি না, তবে ব্যংগই এ যুগের প্রধানতম শিল্প। মানুষের সমাজে এমন এক একটা যুগ আসে, ব্যংগ রচনার পক্ষে যা একান্তভাবে উপযোগী। আমাদের দেশেও আঠার শতকও এই রকম একটি কাল। এই যুগেই অন্যতম ব্যংগ সাহিত্যিক ভারতচন্দ্রকে আমরা পেয়েছি। ইউরোপে তেমনিই ভল্টেয়ার, সুইফট। এই রকম এক Critical যুগেরই কবি, পোপ, ড্রাইডেন। সাধারণত দেখা যায় যে কোন মহৎ আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবসান কালই ব্যংগের প্রাদুর্ভাবের সময়। রেনেসাঁসের ক্ষয়িত প্রভাবের যুগে ভল্টেয়ার, বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদনার পরে বিদ্যাসুন্দর, (য) রাধাকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার মাত্র।১ তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের মহৎ সৃষ্টির পরে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী সৃষ্টির অধিকাংশ ফসল ঘরে উঠবার পরে পরশুরামের আবির্ভাব।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগপ্রভাব যেমন একটা দিক, ঠিক তেমনি অপর দিকটি হচ্ছে বিশিষ্ট ব্যক্তিপ্রভাব। বিশিষ্ট ব্যক্তিপ্রভাব বলতে আমরা বিশিষ্ট কবিমানসকেই বুঝি। নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা নিরবচ্ছিন্ন মনন সংসারে নেই। মানুষ ভাল ও মন্দের মিশ্রণে সৃষ্ট জীব। তাই তার কার্যকলাপেও এই দুইএর প্রকাশ সূচিত হয়। তবে এক একটা বিশেষ যুগে এসে মানুষ যখন তার আদর্শের সুউচ্চ শিখর থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে তখন তার জীবনেও মন্দের প্রভাব বেশী হয়ে পড়ে। সব সময় এই অশুভ হাওয়া না বইলেও কখন কখন যে আসে তা আমরা দেখেছি। যাঁরা কবি, সাহিত্যিক তাঁরাও এই ভালমন্দ আবহাওয়ার মধ্যে থেকেই তাঁদের সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। এক একজন সাহিত্যিক এমনই আছেন যাঁরা সংসারের এই দুটো দিককেই সমানভাবে দেখেন। তাঁরা শিল্পী হিসাবে সুন্দর ও অসুন্দরকে সমান চোখে দেখেন। এঁদের শক্তি ও সাধনা অতি দুর্লভ। এটা তাঁদের পক্ষে যেমন সৌভাগ্যের কারণ তেমনি আমাদের পক্ষে। এইরূপ অনন্য প্রতিভাধর হলেন শেক্সপীয়ার। সকলে এভাবে সংসারের শুভ-অশুভকে সমানভাবে দেখতে পারেন না। অনেকের চোখে শুধুই জগতের কল্যাণরূপই প্রতিভাত হয়। তাঁরা এই কল্যাণরূপের সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জমান থেকে আর কিছু দেখবার বা বুঝবার অবসর পান না। এঁরা রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতনের অন্বেষণ করতে করতেই সমস্ত জীবন শেষ করে দেন।

তাই তাঁদের সৃষ্টি হয় সুন্দরের, প্রেমের, আনন্দেরই জয়গাথা। এই দলে হলেন রবীন্দ্রনাথ, গোয়েটে, শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেননি এমন নয়, কিন্তু তা তত সার্থক হয়নি। যুগধর্ম বা ব্যক্তিমানস কোনটিই যে সে-সৃষ্টির অনুকূল নয়। তাই স্বভাবগতভাবেই ব্যর্থতা এসেছে। কিন্তু আর এক ধরনের ব্যক্তিমানস প্রত্যক্ষ করা যায় যা জগতের প্রধানত অসুন্দর রূপকেই প্রত্যক্ষ করে। মানবের অকল্যাণী মূর্তিতে এই শ্রেণীর সাহিত্যিক আতংকিত, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের সেই আতংক, ক্ষিপ্ততা, জ্বালাই ব্যঙ্গের জন্ম দেয়। নিজ নিজ শক্তির প্রভাবে ক্রোধ বা জ্বালার তেজটুকু সরসতার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে, ব্যঙ্গ-শিল্পী অসুন্দরের প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করেন। এদিক থেকে ভাবলে তাঁদেরও সুন্দরের পূজারী বলা চলে। তাঁরা অসুন্দরের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে সুন্দরেরই আরতি করেন। এই শ্রেণীতেই পড়েন ভলটেয়ার। তাঁর ব্যঙ্গাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেকালের ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধিবিমূঢ়তার বিরুদ্ধে। তিনি বুঝেছিলেন ধর্মান্ধতা ও মূঢ়বুদ্ধিতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের ব্যক্তিমানস এমনভাবে গঠিত যে, তাঁদের ব্যঙ্গ-শিল্পী না হয়ে উপায় নেই।

এখন বোঝা গেল যে, ব্যঙ্গ [illegible] বিশেষ যুগে, বিশেষ ব্যক্তিমানস দ্বারা [illegible] হওয়া সম্ভব। কেননা ব্যঙ্গশিল্পী নিছক শিল্প সৃষ্টির আনন্দময় প্রেরণাতেই সাহিত্য রচনা করেন না, তাদের যে বড় দায়। মানুষকে ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে প্রতিষ্ঠ করাই তাঁদের কামনা। তাই কোন রূপ অনাচার, অত্যাচার ভণ্ডামি [illegible] মিথ্যাকে দেখলেই তাকে যে দূর করে দেওয়ার জন্যে তাঁরা অন্তরে অন্তরে অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁরা এ-পৃথিবীকে নিষ্কলংক, সুন্দর করে তুলতে চান। পৃথিবীর ক্লেশ-গ্লানিতে তাঁদের চিত্ত ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু রোমান্টিক লেখক বা কবির মতো তাঁরা এই ধূলামাটির পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে কোন কল্পনার লীলাময় লোকে উধাও হতে চান না, অথবা কোন মিস্টিক চেতনা দিয়ে জগৎ ও সংসারকে দেখতে পারেন না। তাঁরা যেন বড্ড বেশী স্থূল। হোক স্থূল, তবু তাঁরা মানবহিতার্থী, মানবদরদী। শুধু অকারণ পুলকে গান গাওয়া তাঁদের হয় না। কেননা ব্যঙ্গ-শিল্পীরা তাঁদের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

১। বাংলার লেখক — প্রমথনাথ বিশী।

হৃদয় বা emotion-এর প্রাধান্য না দিয়ে তাঁরা বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখেন। বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেন বলে যে তাঁদের রচনা নীরস, তা নয়। হাস্যরসই তাঁদের রচনার মুখ্যতম রস। ব্যঙ্গ যে হাস্যরস বিতরণ করে, তা থেকে আমরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করি। তবে হাসতে হাসতে, আনন্দ পেতে পেতে আমরা হঠাৎ থেমে যাই, ব্যঙ্গ-দর্পণের বুকের পরে যেন আমাদেরই নানারূপ অসঙ্গতির ছবি ফুটে ওঠে। এ ঠিক সুখ অনুভবের মায়াময় ক্ষণটিতে হঠাৎ দুঃখ অনুভব। সে যাই হোক, ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য হলেও, তা আমাদের যেমন ভাবায়, তেমনি হাসায়, আনন্দ দেয়।

তবে এই আনন্দদানের সঙ্গে তার অন্যান্য সাহিত্যের আনন্দদানের রীতি আলাদা। ব্যঙ্গ রচনার থেকে আমরা যে আনন্দ পাই তা আমাদের মনকে কোন সৌন্দর্যের অলকাপুরীর দ্বারে পৌঁছে দেয় না, অথবা কোন ঊর্ধ্বতম সত্য লোকের পথ দেখিয়ে বিশ্বসত্তার সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে না। সাহিত্যের জগতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে হলেও আমরা আমাদের বুদ্ধিসত্তার মুক্তি দিতে পারি। এমন এক জগতে মুক্তি দিতে পারি যেখানে দ্বেষ, হিংসা, লাভ-ক্ষতির টানাটানি নেই। কবির কবিতা আমাদের মনের যে উদার প্রসন্নতা, মুক্ত-আনন্দ এনে দেয় তা ব্যঙ্গ কখনই [illegible]বে না। ব্যঙ্গ সাহিত্যিক কেবল যা আছে, [illegible]ই-ই দেখান, যা নেই তা দেখাতে যান [illegible]। ব্যঙ্গ রচনার উদ্দেশ্যমূলকতার দিকটিই [illegible]ঙ্গকে সীমায়িত করে রেখেছে। এটা [illegible]কাধারে যেমন তার গুণ, তেমনি তার সীমাও। আমাদের কর্ম যখন কর্তব্যের প্রাচীরবেষ্টিত হয়, তখন তাতে সুবিধা অনেক থাকলেও আনন্দের ধারাটা ভোঁতা হয়ে আসে। ব্যঙ্গ শিল্পীও তেমনি কাউকে হাস্যকর করে তুলতে, তার ভুল-ভণ্ডামিগুলোকে প্রকাশ করে দিতে, জনসমাজের চোখের সামনে এই নগ্ন-প্রকাশের মধ্যে [illegible]য়েই তাকে শিক্ষা দিতে এগিয়ে যান। [illegible]দেশ্য সুস্পষ্ট, তাই তাঁর পথও সোজা। [illegible] বলতে গিয়ে আর একটা বলার তাঁর [illegible] নেই। নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট গতিতে [illegible]লক্ষ্যে তিনি অতি সহজে পৌঁছান। [illegible]ব্যঙ্গ-সাহিত্যের আনন্দও সুনির্দিষ্ট। [illegible]ধারা গতিতে ভেসে চলার তাঁর কোন [illegible]ও নেই। তিনি তা চানও না। ব্যঙ্গ-[illegible]তার সৃষ্টির দিক থেকে ও আনন্দ-[illegible] দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যঙ্গ [illegible] শ্রেণীর সাহিত্য হলেও আমরা [illegible]তেই তাকে উচ্চতম শ্রেণীর সাহি[illegible] পারি না।

ব্যঙ্গকে আমরা ইচ্ছে করলে প্রচার-[illegible]ক সাহিত্যও বলতে পারি। প্রচার কথাটা [illegible]ীর্ণভাবে কিম্বা কোন অবজ্ঞার্থে প্রয়োগ [illegible]তে চাইনি। প্রচার শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে [illegible]ন কতকগুলো মনোভাব জেগে ওঠে যার [illegible]ধ্যে অহমিকা, অহঙ্কার, কখনও বা মিথ্যা, অতিরঞ্জন ইত্যাদি জড়িয়ে থেকে যায়। কিন্তু এখানে প্রচারকে এরূপ অর্থে দেখাতে চাইনি। ব্যঙ্গের বিষয়ই হচ্ছে সকল প্রকার সামাজিক অনাচার অব্যবস্থা কিম্বা ব্যবসায়িক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা বা যে-কোন রকমের ভণ্ডামিকে Hypocracy আক্রমণ করা। তাই এ যে একপ্রকার প্রচার তাতে সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন জাগে প্রচার কেমন করে সাহিত্যের মহিমায় মণ্ডিত হল। এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। সাহিত্যিকদের শক্তিতেই প্রচার প্রচারের সীমা ছাড়িয়ে রসের সীমায় পৌঁছে যায়, এইখানেই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ। সাধারণের হাতে পড়লে যা শুধুই Propaganda হত, শক্তিধর সাহিত্যিকদের মায়াযাদু স্পর্শে তাই-ই হয়ে ওঠে রস পরিপূর্ণ! এই রসময়তায় ব্যঙ্গ সার্থক হয়ে ওঠে। তীব্রভাবে আক্রমণ করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে সেই আক্রমণাত্মক মনের ভাবটিকে শাসনে রেখে কৌতুক, রঙ্গ-ব্যঙ্গ করার রীতিটি কম শিল্প-কৃতিত্ব নয়। দোষীকে দোষী বলব, অথচ তাকেও রাগতে দেবো না, নিজেও রাগবো না, অতি সুচারুভাবে কার্যটি সম্পন্ন করতে হবে। ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক অতি সতর্কভাবে এই প্রচারকার্যে অগ্রসর হন। তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধও করেন, আবার রস সৃষ্টিও করেন। এ-প্রচার নিন্দার্হ নয়, প্রশংসার্হ। এ-প্রচার কল্যাণ আনে, শুভের প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যমূলকতা, ব্যঙ্গের প্রচারধর্মীতা, সীমা, সমস্ত কিছু সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-শিল্পী সচেতন। তিনি তাঁর ন্যূনতাকে বোঝেন, জানেন। একে তিনি অগৌরবের মনে করেন না। কেননা, নিজের জন্যে তো তার ভাবনা নয়। তাঁর ভাবা যে সকলকে নিয়ে। সকলের কিঞ্চিৎ মঙ্গলসাধনেই যে তাঁর সকল সাধনার সিদ্ধি। প্রত্যেক সৎ সাহিত্যেরই একটা না একটা মূল্যবান বাণী থাকে। আর সে-বাণী মানবকল্যাণমূলক। তবু অন্য সাহিত্যের সঙ্গে ব্যঙ্গের পার্থক্য এইখানে যে অন্য সাহিত্য যেখানে তার সুনির্দিষ্ট বাণীকে অতি সঙ্গোপনে রেখে ছবির পরে ছবি, বর্ণনার পরে বর্ণনা দিয়ে ভাবের থেকে ভাবনার দিকে পদচারণা করে জীবনসত্যের মর্মমূলে স্থিতিলাভ করে, ব্যঙ্গ সেরূপ করে না। ব্যঙ্গ এ' রেখেঢেকে চলবার ধার ধারে না। মানুষকে সংশোধন করে, তাকে ত্রুটি, দুর্বলতা, ভণ্ডামি থেকে মুক্ত করে, তার আদর্শ পথটিকে দেখিয়ে দেওয়াই যে তার কাজ। মূলতঃ ব্যঙ্গ-শিল্পী বিরাট কর্মী। কিন্তু কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে বলেই বোধ হয় তাঁরা শিল্প-মাধ্যম খুঁজে নেন। পৃথিবীর ব্যঙ্গ-শিল্পীদের জীবনী দেখলে এর সত্যতা নিরূপিত হয়ে যায়। আমাদের আলোচ্য লেখক ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম উভয়েই ব্যক্তিজীবনে কর্মীপুরুষ ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের ও পরশুরামের জীবনী-প্রসঙ্গে তাঁদের চরিত্রের এই কর্মময়তার দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু কর্ম-জগতে থেকেও তাঁদের যেন মনে হয়েছে সত্যিকারের (?) করা দরকার, তার অতি অল্পই যেন করা হয়েছে। তাই তাঁরা কর্মের পরিপূরকরূপে শিল্প-মাধ্যমকে বেছে নিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম উভয়েরই সাহিত্য-জগতে আবির্ভাব আকস্মিক। শারীরিক অক্ষমতা বা অসুস্থতার জন্যে বাইরের কাজে

যোগ দেওয়া যখন সম্ভব হল না, তখনই ত্রৈলোক্যনাথ সাহিত্য-মাধ্যমকে বেছে নিলেন। পরশুরাম অবশ্য কাজ করতে করতেই মানবস্বভাবের এমন সব দিক-গুলোকে দিনের পর দিন দেখতে পেলেন, সেগুলোর অকিঞ্চিৎকরতা, অসঙ্গতি, গ্লানি তাঁকে বিচলিত করে তুলতে লাগলো। বাধ্য হয়েই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁর কর্মসত্তার শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আসলে 'ব্যঙ্গ-শিল্প সাহিত্যিকের কর্মশক্তিরই যেন একটা প্রক্ষেপ।' (বাংলার লেখক -- প্রমথনাথ বিশী)।

ব্যঙ্গ-শিল্পীরা জানেন যা ব্যঙ্গের যোগ্য তার প্রতি ব্যঙ্গ প্রযুক্ত হওয়াতে অনিষ্ট নেই, বরং ইষ্ট আছে। তাই তাঁরা যেখানেই দুর্নীতি, অনাচার দেখতে পেয়েছেন, সেখানেই ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। তাঁরা মানব-দরদী। মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাঁদের কখন নির্মম করে তোলে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁরা বুঝি হৃদয়হীন। মানুষের দোষগুলোকে, অসঙ্গতিগুলোকে তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করেন। আর ব্যঙ্গের শাসনে নিপীড়িত করেন। মানুষের ত্রুটিতে তাঁদের হাসিকে অমানবিক বলে মনে হতে পারে। ব্যঙ্গ-শিল্পীদের যে নিষ্ঠুর হতেই হয়। emotion -এর প্রাধান্য দিতে গেলে তাঁদের চলে না। স্নেহাধিক্যজাত অন্ধতা থেকে ব্যঙ্গ-শিল্পীকে মুক্ত হতে হয়, তাদের শাসন যে সোহাগেরই অপর পিঠ। তাঁদের ভালবাসা মোহমুক্ত। এজন্যই তো তাঁরা ব্যঙ্গ করতে পারেন।

ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত হয়। তবে এ-বিদ্বেষ যদি ব্যক্তিগত হয়, তবে তা নিন্দার যোগ্য। কিন্তু যদি সমষ্টিগত হয়, তবে তা আমাদের দুঃখ দিলেও, প্রতিবাদের কিছু নেই। কেননা দুঃখ দিয়েই হয়তো এ-ধরনের ব্যঙ্গ আমাদের সমগ্র চেতনাকে জাগাতে চায়।

ব্যঙ্গের ভাষার প্রধান সম্পদ ঋজুতা। একমাত্র ভাষার ঋজুতাই বক্তব্যের ধারাকে তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট করে তুলতে পারে। নিরলংকারতাই এ-ভাষার প্রধান অলঙ্কার। ভাব প্রকাশের সুবিধার্থে যে উপমা প্রয়োগ করা হয়, তা হয় ঘনিষ্ঠভাবে বাস্তবনিষ্ঠ। বাস্তবনিষ্ঠ হলেও এ-ধরনের উপমায় কোন চরিত্র বা পরিবেশ অনেকখানিই আলোকিত হয়ে ওঠে। শব্দ প্রয়োগের দিক থেকেও এ একই কথা আসে। সহজ সরল শব্দ প্রয়োগই ব্যঙ্গকে অধিকতর স্বচ্ছ করে তোলে। তাছাড়া উদ্দেশ্য যেখানে স্পষ্ট, ভাষার জন্যে তো সেখানে ভাবনাই নেই। ভাবের ইঙ্গিতে ভূত্যবৎ ভাষার আগমন ঘটবেই। যদি তা না হয় তাহলে ব্যঙ্গের তীব্রতা যে মাঝপথেই অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়।

ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে। ভাবের ঋজুতা, ভাষার ঋজুতা এনে দেয়। তাই এই দুইয়ের পুষ্টির জন্যে ব্যঙ্গ-শিল্পীর থাকা চাই প্রচণ্ড পর্যবেক্ষণ শক্তি। এই পর্যবেক্ষণ শক্তি-প্রভাবেই ব্যঙ্গ-শিল্পী একই যুগে, একই সমতলে দাঁড়িয়ে সেই যুগের দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতাগুলোকে অতি স্পষ্ট করেই দেখতে পান। শুধু সেই যুগের দুর্বলতা নয়, সর্বকালের, সর্বযুগের দুর্বলতাকে নিয়েও ব্যঙ্গ-শিল্পী ব্যঙ্গ করতে পারেন এবং নির্মল হাস্যরস বিতরণ করতে পারেন। যেমন পরশুরাম তাঁর 'ভুশণ্ডির মাঠে'তে শিবুকে ও নিত্যকালীকে নিয়ে এবং তাদের তিনজন্মের স্ত্রী ও স্বামীকে নিয়ে লীলাখেলা দেখিয়েছেন। ব্যবসায়িক অসাধু শ্যামানন্দ বা গণ্ডেরিরাম তো আমাদেরই চারপাশে রয়েছে, কিন্তু তাদের তো আমরা এতদিন এমন করে দেখিনি, পরশুরাম যেমন নিখুঁত করে আমাদের মর্মে মর্মে তাদের এঁকে দিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যেও এই পর্যবেক্ষণ শক্তি সুতীব্রভাবে দেখা যায়। তাই তিনি ডমরুধরকে, নয়নচাঁদকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছিলেন। ব্যঙ্গ-শিল্পী তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি জগতের প্রতি উন্মুখ করে রাখেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ নিপুণ শিল্পীর। কাদা-জলে ভাসমান চরিত্রগুলোকে ঠিক যেমন তাঁরা দেখেন তেমনিভাবেই সাহিত্যজগতে প্রবেশাধিকার দেন। পরিমার্জনের কোন চেষ্টা করেন না। তাই চরিত্রগুলোর সর্বাঙ্গে জলের সঙ্গে সঙ্গে কাদার ছিটও লেগে থাকে। সযত্নে সেই কর্দমাক্ত স্থানগুলি ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করে দেন না। ব্যঙ্গের আঘাতে এ-কর্দমকে মুছিয়ে দেওয়াই যে তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং ব্যঙ্গ যে বহুলাংশেই পর্যবেক্ষণ শক্তিনির্ভর এ-সত্য অনস্বীকার্য। যাঁর যতখানি এই শক্তি আছে, তিনি ততখানি ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে সার্থক।

পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ-শিল্পীর প্রচুর কল্পনাশক্তিও থাকা দরকার। অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির মত ব্যঙ্গও অনেকাংশে কল্পনানির্ভর। 'সত্য কথা বলিতে কি, অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-শিল্পী উচ্চদরের কবিও বটে। যেমন মলিয়ের, অ্যারিস্টফেনিস, হায়নে।' (বাংলার লেখক — প্রমথনাথ বিশী) উচ্চ কল্পনাই আমাদের মনকে একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে পারে। কল্পনা ছাড়া কোন কিছুর চূড়ান্ত শেষ নির্ণয় করা যায় না। চোখের দেখার একটা সীমা আছে। এই সীমার রেখাকে অতিক্রম করতে হলেই চাই কল্পনা। কল্পনার দীনতা ব্যঙ্গকে কিছুটা ফিকে করে দিতে পারে। তাই শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গের বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনানিষ্ঠ হওয়াও একান্ত বাঞ্ছনীয়। জীবনের গভীরতর কোন সত্যের সন্ধান এই কল্পনাই এনে দিতে পারে। কবিতাতেও যেমন আমরা সেই সত্যকে পেতে পারি ব্যঙ্গতেও পাই। জীবনতত্ত্ব বা জীবনসত্য বা জীবনের সমালোচনা যেমন কবিতায় আছে, তেমনি ব্যঙ্গতেও আছে। কবির মত ব্যঙ্গ-শিল্পীও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে জীবন ও জগত দেখেন, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, জীবন-মৃত্যু—সবকিছুকেই সমমূল্যে বিচার করেন। তবে কবিতা ও ব্যঙ্গ এ[illegible] স্তরের সৃষ্টি নয়, একটি কালজয়ী, অপরটি কাল-বদ্ধ। তবে ব্যঙ্গশিল্পী যত বেশী কল্পনা-শক্তিপ্রবণ হবেন, ততই তাঁর শিল্প-যুগের গণ্ডী পেরিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ আ[illegible] সুইফট-এর লেখা গালিভারস্ ট্রাভেল এর নাম করতে পারি। সুইফট-এর এ[illegible] সৃষ্টি বহু যুগ পার হয়ে এসেও আ[illegible]র আমাদের কাছে সমান আবেদনধর্মী। রূ[illegible] রচনার আড়ালে মানব-মনের অহংভাব যেন ব্যঙ্গ করে গেছেন শিল্পী। সু[illegible] বলতে আর দ্বিধা থাকে না যে, কখ[illegible] কখনও কবি ও ব্যঙ্গ-শিল্পী উচ্চ কল্প[illegible] শক্তির প্রভাবেই সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে আবার কখনও বা কবি ও ব্যঙ্গ-শিল্প যেন একাত্ম হয়ে একের মধ্যে অপরজন একই সঙ্গে মিশে যান। এই একাত্ম হওয়া বা সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া সবই উচ্চ কল্পনাশক্তিরই ফল।

পাখি

লীলা মজুমদার

(১০)

সায়নের ঘরে কৌচে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম সত্যিই বড়মার অতীত জীবনের কাহিনীটা না শুনলেই নয়। নইলে মনটা দিনে দিনে যে রকম বিরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, শেষটা এখানে থাকাই মুশকিল হয়ে উঠবে। তাহলে সায়নকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। বুকটা মড়াস্ করে উঠল। সায়নকে কি করে ছেড়ে যাব? পৃথিবীতে ঐ একটি মানুষই আছে, যার আমাকে নইলে চলে না। অবিশ্যি যাব বললেই তো আর চলে যাওয়া যায় না। যাবটা কোথায়? একটা পুকুর থেকে এক ঘড়া জল তুলে নিলে যেমন একটুও ফাঁকা থাকে না, তেমনি ও বাড়ি থেকে আমি চলে এলেও একটুকু ফাঁকা রেখে আসি নি। না, সে কথা সত্যি নয়। টিবলি নিশ্চয় আমার অভাবটা বোধ করে। সাধু [illegible] পরামর্শ দেবার লোক পায় না। তাছাড়া ও-বাড়ির সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই বললেই তো আর হল না। ওর অর্ধেকটা আমার। দাদামশাই লিখে দিয়ে গেছেন। ভেবেও হাসি পেতে লাগল। অনিমাসির আরো চটা উচিত ছিল। কেন চটে নি?

দাদামশাই আমাকে স্থাবর সম্পত্তি কিছু দেন নি বলে এতদিন আমার একটুও দুঃখ ছিল না। আজ হঠাৎ যেই জানলাম আমাকে তিনি এতটুকু বঞ্চিত করেন নি, অমনি কণ্ঠ রোধ করে কান্না এল। বালিশে মুখ গুঁজে একটু কেঁদে নিলাম। আগুনের মতো গরম সে চোখের জল। বড় নোনতা। নাক বন্ধ হয়ে গেল। উঠে মুখে চোখে জল দিতে হল। এক গেলাস ঠান্ডা জল খেলাম। কাঁদা আমার অভ্যাস ছিল না। দাদামশাই বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে রাগ মাগ করে কাঁদতাম বটে। দাদামশাই হাসতেন, ডাকতেন 'কাঁদুনে-বুড়ি, এদিকে আয়।' অমনি মনটা ভালো হয়ে গেল। সায়নের গা থেকে [illegible] সরে গেছিল, সেটা গুঁজে দিয়ে, তাই শোয়া অমনি ঘুম। তবে সারা রাত ঘুমোই নি। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে বসেছিলাম। ভিতর দিকের দরজায় কে দাঁড়িয়ে। ক্ষীণ আলোয় দেখলাম বড়মা। কেমন যেন অস্বাভাবিক উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, বুকটা উঠছে পড়ছিল, চোখটা জ্বলছিল। একটু একটু ভয় করতে লাগল। এই রাত দুপুরে কে তাঁকে ঠান্ডা করবে? যার এক কথায়, একটু স্পর্শে তাঁর সব উত্তেজনা শান্ত হয়ে যায়, এখন তাকে কোথায় পাই।

আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। সায়নের দিক থেকে চোখ ফেরালেন। সোজা আমার দিকে তাকালেন। বুকটা ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। অ্যানি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে; এখন আমার সঙ্গে নিজের ঘরে গেলে হয়। কিন্তু হল তার উল্টো। আমাকে দেখে যেন আশ্বস্ত হলেন। 'কে, নেতা? তুই তাহলে পাহারা দিচ্ছিস? দেখিস্ যেন না পালায়। যেন উঠে চলে না যায়। এই ঘর থেকেই ওর বাবাও যেমন চলে যেত। এসে দেখতাম ঘর খালি। আমার বুকটাও খালি হয়ে যেত। আগে যদি পেতাম সায়নদেবকে, দেখে নিতাম কেমন সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। কারো জন্য সারা রাত অপেক্ষা করেছিস্, নেতা? কাউকে কখনো এমন ভালোবেসেছিস্ যে আর কোনো কিছুর কথা মনে থাকে নি? জানিস, ছাদের দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে যেত। ঘুনো-বাড়িতে আমাকে যেতে দিত না, তা জানিস্? কেন জানিস্? পাছে আমি—পাছে আমি—' বড়মার গলা কর্কশ হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বললেন, 'না, না, না, তাকে বাঁচতে দেওয়া যায় না। ভগবান তুমি কি সত্যি আছ? একে নিচ্ছ না কেন?' পড়ে যাচ্ছিলেন বড়মা। আমি দৌড়ে গিয়ে ধরলাম। গোলমাল শুনে সায়ন জেগে উঠল। 'মা, মা, মা।' বড়মার গায়ে অস্বাভাবিক রকম জোর। আমার হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'কাকে মা বলছে? নেতা, বল্ আমার ছেলে কাকে মা বলছে।' ততক্ষণে অ্যানি এসে পৌঁছেছে। 'আপনাকে ছাড়া আর কাকে মা বলবে, বড়-মা? মা বললে যথেষ্ট হয় না, তাই বলে মা-মণি। ওর ঘুমের ব্যাঘাত করলে, ওর কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে যাবে। চলুন ও-ঘরে। ওষুধ খেয়ে ঘুমোন। শরীর ভালো করতে হবে না? ওকে মানুষ করতে হবে না?'

মধুর মতো গলায়, একবার-ও না থেমে অ্যানি ইংরিজিতে অনর্গল বকে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কোমল বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বড়মাকে জড়িয়ে ধরে আবার তাঁর ঘরে নিয়ে গেল। আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না, তাকাল না পর্যন্ত। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সায়নকে কোলে তুলে চেয়ারে বসতেই, সে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজে, দু মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

খুট করে একটা শব্দ কানে এল। অ্যানি বড়মার ঘরের এদিককার দরজায় ছিটকিনি দিল। ঘুমিয়ে পড়েছেন নিশ্চয়। অ্যানির কাছে শুনেছি ওষুধটার এমনি গুণ, যে খাবার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে রুগী শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, স্বাভাবিকভাবে ঘুমোয়।

সায়নকে শুইয়ে দিয়ে নিজে আবার শুলাম। এযে কিসের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, কেন ফেলেছি, ভাবতে লাগলাম। মনের চোখে দুটি মুখ ভেসে উঠল। প্রথমটি সায়নের, আমাকে নইলে যার চলে না। দ্বিতীয়টি বাসবের, যার মতো দয়ালু একমাত্র দাদামশাইকে দেখেছিলাম। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে আট বছর দাদামশাইকে দেখি নি। আমার শেষ জন্মদিনে ছোট্ট একটা ইংরিজি কবিতার বই দিয়েছিলেন। ওঁর লাইব্রেরি থেকে নেওয়া পুরনো একটা বই। তার প্রথম পাতায় বাংলায় লিখে দিয়েছিলেন, 'সদাই মাটির মতো হবি খাঁটি, মন।' তার অল্প দিন পরেই দাদামশাই মারা গেলেন। আত্মীয়স্বজন কেউ যে আমাদের নেই, তাও নয়। তবে তারা আমাদের ব্যাপারে বেশি জড়াতে চাইল না। কেনই বা চাইবে? একটা অনাথ পরিবার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো তাদের কারো অবস্থা ছিল না। অনিমাসি অবিশ্যি রেগে গেছিল। 'এই বাড়িতে সারি সারি পাত পেড়ে যখন-তখন আজে-বাজে অছিলায় সব খেয়ে যায় নি? মফস্বলবাসীরা চিকিৎসার জন্য এসে এই পোড়ো-বাড়িতে মাসের পর মাস থেকে যায় নি? চন্দন-নগরের মুকুন্দ পিসিমা বাবার পিসতুতো বোন, তিনি ডাক্তারের টাকা না দিয়েই চলে গেলেন। আমি বললাম, ডাক্তার উকীলের চিঠি দিক। বাবা বললেন, আহা, ওদের বড় অভাব, ঘটি-বাটি বেচতে হবে, ছেলেটাও কাজকর্ম করে না, থাক, লিখে কাজ নেই। তারপর বাবা নিজের আংটি বেচে ডাক্তারের দেনা শোধ করেন নি? এখন সবাই হাত-গুটিয়ে বসলেই হল কি-না!'

আমি বলেছিলাম, 'কি দরকার, মাসি, এতেই আমাদের চলে যাবে। দাদামশাইয়ের তো আলাদা কোনো আয় ছিল না। এতদিন যে-ভাবে চলত, এখনো চলবে।'

অনিমাসি ফোঁস করে উঠেছিল, 'কি করে চলবে তার খবর রাখিস্? চার বেলা গেলা ছাড়া তো তোর আর টিকলির কোনো কাজ

নেই।' টিকলির হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে এইখানে সে উঠে পড়ল, 'যাই। আমসত্ত আছে খানিকটা।' সে গেলে আমি বললাম, 'একটা একটা করে ভালো জিনিস বেচে চলেছিল তো? তাতে আমাদের কি? ও'র জিনিস উনি বেচে গেছেন। তুমিও কিছু ঘর সাজিয়ে রাখছ না। তোমার হাতে পড়লে তুমিও বেচে দিতে। টাকাগুলো তোমার সেই লুকনো জায়গায় জমাতে।' অনিমাসি আৎকে উঠেছিলেন, "আমার গোপন জায়গার তুই কি জানিস?"

'কিছু না অনিমাসি। জানলেও তোমার ধন-রত্ন নিরাপদেই থাকত। তবে মনে রেখো, সব জিনিসপত্রের অর্ধেক আমার মায়ের। অর্থাৎ আমার।' তখন অনিমাসি আমাকে দাদামশাইয়ের উইলের কথা বলেছিল। নাকি ও-বাড়িতে থাকলে খাওয়া-পরা পাব, ব্যস্ আর কিছু না। মনে আছে কিছু বিচলিত হই নি। ভেবেছিলাম, আমার আর কি, এখানে থাকব, কলেজে পড়ব, আমার মার ভাগের গয়না বেচে আমার পড়ার খরচ ব্যাংকে রেখে গেছেন দাদামশাই। তারপর পাশ করব, চাকরি করব, তবু যদ্দিন পারি এখানে থাকব। নইলে আবার কোথায় যাব? আমি গেলে টিকলির কি হবে?

অমনি টিকলির কথা মনে পড়ল। সত্যি কি হবে তার? ঘর-কন্নার কাজ সে ভালোবাসে, রাঁধতে শিখেছে সাধু গঙ্গাধরের কাছে। সেলাই শিখেছে স্কুলে। ঘর গুছোতে ভালোবাসে, যদিও অনিমাসি কিছুতে হাত দিতে দেয় না। হয়তো ভয় পায় দৈবাৎ যদি দিদিমার লুকনো মোহরের ভান্ডার তার হাতে পড়ে।

এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে সে রাতে আর আমি ঘুমোই নি। বংকুর কথা মনে পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। টিকলির কপালে কি আছে। ভাবলাম বংকু হয়তো মনে করছে টিকলি অনেক টাকা পাবে। দাদামশাইএর ও-পাড়ায় খুব নাম-ডাক ছিল। নিশ্চয় ভাবে রাশি রাশি পুরনো গয়না-গাঁটি, বড় বড় কাঁঠাল কাঠের বাক্স ভরা রুপোর বাসন ওর আছে। ছিল এ-সবই। কিন্তু অনিমাসির কাছেই শুনেছিলাম মেসোর রেস্ খেলার দেনা শোধ করতে তার বেশির ভাগই গেছিল। বাকি দাদামশাই বেচে দিয়েছিলেন। গুণী লোককে কখনো খুব একটা সমাদর দেখাতে তাঁকে দেখা যেত না। কিন্তু দুর্বলতার প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি। কেউ নিজের বোকামির বা দুর্বলতার জন্য কষ্ট পাচ্ছে শুনলে তাঁর সহানুভূতির আর শেষ ছিল না। তাই হয়তো আমার উপর এত টান ছিল। কালো, রোগা, অনাথ অসহায়। তার উপর নাকি পেটে পিলে আর ঘায়ে-ভরা ন্যাড়া মাথা অবস্থায় এসেছিলাম। ঐ বিকট চেহারা দেখেই নিশ্চয় দাদামশাই আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমাকে অহরহ বলতেন, 'দুর্বল হোস্ নে, দুর্বলদের কেউ সহ্য করতে পারে না। গায়ে জোর করবি, মনে সাহস করবি। যা এক্ষুণি এই মোমবাতিটা নিয়ে চারতলার ছাদটা ঘুরে আয়।' কেউ যেত না আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার পর। খিড়কির গলিতে পর্যন্ত ঢুকতে চাইত না। আমি পরম নিশ্চিন্তে ছাদ অবধি ঘুরে আসতাম, কখনো কিছু দেখি নি, বা শুনি নি; কখনো একটুকু ভয় পাই নি। দাদামশাই বলতেন, 'মানুষের ঘাড়ে যে ভূত চাপে সে-ছাড়া অন্য কোনো ভূত তো কখনো দেখি নি। কিন্তু ঘাড়ের ভূত নামানো বড় শক্ত রে।'

এখন টিকলির ঘাড়ের ভূত নামায় কে? অনাদরে ছোট বেলাটা কাটিয়েছে, এখন স্নেহে ঘেরা শ্বশুরবাড়ির স্বপ্ন দেখে। শেষ অবধি ঐ বংকুকেই উদ্ধারের উপায় ঠাউরেছে। হঠাৎ একটা উপায় মনে এল। শুনেছিলাম বোম্বাইতে সিংহ-সরকারদের ছোট একটা আপিস আছে। সেইখানে যদি বংকুকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া যায়, ও হলেই তো সমাধা চোকে। অ্যানি বলে, মিঃ সরকার যতই মৎলবী হন না কেন, কারো দুঃখের কথা শুনলে গলে যান। অমনি কোনো প্র্যাকটিকেল উপায়ে সাহায্য করেন।

বংকুকে তার জন্ম থেকে চিনি। বাড়ির অবস্থা ভালো, কিন্তু বেজায় সেকেলে, বেজায় অশিক্ষিত। বংকুর চরিত্র মন্দ বলে কখনো শুনি নি, কিন্তু অনেক কষ্টে দু-তিনবার চেষ্টা করে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে অবধি ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পানের দোকান, চায়ের আড্ডা, খুব ভালো চরিত্রই বা থাকে কি করে? ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব নেই। দেখা হলেই টিপ করে প্রণাম ঠুকে বলে, 'মাসিমা, কেমন আছেন।' বেজায় রাগ হয়। হয়তো আমার চেয়ে বছর দুইয়ের ছোট। ছেলেবেলায় পাড়ার স্কুলে আমার চেয়ে দুই ক্লাস নিচে পড়ত। পাস করেছে আমার পাঁচ বছর পরে। এখন শিং ভেঙ্গে টিকলির সঙ্গী হবার শখ। ভেবেও রাগে গা জ্বলতে লাগল।

তারপর হয়তো একটু ঝিমিয়ে পড়ে থাকব, কারণ হঠাৎ সায়নের খিল-খিল হাসিতে চমকে জেগে গেলাম। সায়ন কখন উঠে এসে আমার পেটের উপর তার রুপোর তৈরি কটকি মোটর-গাড়ি চালাচ্ছে। আমি চোখ খুলতেই আহ্লাদে গদ-গদ হয়ে আমার গালে মুখ লাগিয়ে আদর করল। 'মা, মায়ো।' আমি ব্যাকুল হয়ে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। এ দুর্বলতার সঙ্গে কি দাদামশায়ের সহানুভূতি হত? মনে আছে কত সময় নোংরা পায়ে দাদামশাইয়ের আরাম-কেদারায় চড়ে, তাঁর বুকের উপর উঠে বসতাম। তাঁর পরিষ্কার গেঞ্জিতে পায়ের কাদা লেগে যেত। অনিমাসি হাঁ-হাঁ করে আসত। দাদামশাই বলতেন, 'থাক, থাক, গেঞ্জিটা এমনিতেই নোংরা।' অনিমাসি রেগে-মেগে গেঞ্জি কেচে দিত না। দাদামশাই সারা রাত সেটাকে খুদে বার্লাতির জলে ভিজিয়ে রাখতেন। সকালে ঘরের সামনের ছোট ছাদে মেলে দিতেন। আমি একটুও সাহায্য করতাম না।

অন্যমনস্ক থাকলে চলে না। উঠে পড়লাম। রোজকার করণীয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সায়ন বড় লক্ষ্মী ছেলে, কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই। শুধু মাকে ছাড়বে না। আমার আঁচলের কোণা আঙ্গুলে জড়িয়ে রাখবে। আমিও মায়ের আদর যত্ন পাই নি। কিন্তু মায়ের জন্য কখনো কাঁদবার দরকার হয় নি। দাদামশাই-ই আমার মা, আমার বাবা ছিলেন। আমরা তৈরি হতে না হতে, হাসি মুখে অ্যানি এসে হাজির। লক্ষ্মী আমাদের খাবার নিয়ে এসেছে। সকালের জল খাবার এ-বাড়িতেই হয়। দোতলাতেই রান্নার ব্যবস্থা আছে। একতলায় অ্যানিদের কোয়ার্টারের মাথার উপরে। রান্না ঘরের পাশে ছোট একটা বাসন-ধোয়ার ঘর আছে। সেখানে টেবিল চেয়ার পাতা আছে। আমি অনেক সময়ই সেখানে দুপুরের খাবার খাই। নিচে অ্যানিদের রান্নাঘর থেকে ছোট পাথরের সিঁড়ি দিয়ে খাবার তুলে এনে ঐখানে দেবার সুবিধা অনেক। সায়নের খাবার-ও ঐখানে একটা ছোট গ্যাস-রিং-এ হয় অ্যানি, নয়তো আমি করে দিই। মিঃ সিংহ বলেছেন সে আর কারো হাতে খাবে না। নাকি বড়মার কড়া হুকুম। তাছাড়া ও যা খাবে, ওর মুখে দেবার আগে যে রেঁধেছে তাকে অন্যদের সামনে এক চামচ করে খেতে হবে।

বড়মার বিশ্বাস তাঁর আদরের ছেলেকে বিষ খাইয়ে মারবার জন্য শত্রুদের চরের অভাব নেই। একবার অ্যানি হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কারা সেই শত্রু, বড়মা?' বড়মা চটে গেছিলেন। 'আহা, জান না যেন ঐ মেয়ে মানুষটা। তো তাই চায়। আমি, নির্বংশ হই আর সে আর তার বং[illegible]েরা সর্বস্ব চেঁচে-পুঁছে ভোগ করুক।'

মিঃ সরকারও ছিলেন সেখানে। কঠিন স্বরে বলেছিলেন, 'সে বাইশ বছর আগে মারা গেছে, তা তো আপনার অজানা নেই। তবে আর কেন?'

বড়মার মুখটা সাদা হয়ে গেছিল, 'ঠিক তো। ভুলে গেছিলাম। কিন্তু উকীল, তুমিও ভুলো না, সে একা যায় নি।' তার পরেই আগের কথা হলেই যেমন সর্বদা হতে দেখতাম, বড়মা বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব দেখা গেছিল, কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপর ওষুধ, ডাক্তার, ঘুম। এমনি করেই প্রত্যেকটি উত্তেজনার অংক শেষ হত। বড়মার হার্টের অবস্থা খুব ভালো নয়। তাঁকে সর্বদা প্রসন্ন রাখা দরকার। কিন্তু রাখা খুব সহজ নয়।

আজ অ্যানি বলল, 'কি সুন্দর শীতের সকাল দেখ, মালা। জান আর সাত দিন পরে খ্রীষ্ট মাস। আজ প্রেজেন্ট কিনতে যাব ভেবেছিলাম। তুমি যদি রাজি থাক।'

'সে কি, আমি রাজি থাকব না কেন, অ্যানি? কাল তো বেরিয়েছিলাম। সহজে

আর বেরুচ্ছি না। কিন্তু লক্ষ্মী কি বড়মার সব কাজ করতে পারবে? ওর কথা কি শুনবেন?' 'তার জন্য ভাবনা নেই মালা। ডাক্তার সাহেব এইমাত্র গেলেন। বড়মা দুধের সঙ্গে ওষুধ খেয়েছেন; এখন সারা দিন ঘুমোবেন। আমি তো বিকেলে চায়ের আগেই ফিরে আসব। বেবির খাবারটা তুমিই কর, কেমন? কিন্তু—' যেন লজ্জিত হয়ে অ্যানি থামল। 'কি হল, অ্যানি?' 'জোনাসকে নিতে চাই সঙ্গে। খ্রীস্টমাস শপিং কি একলা করতে আছে! তোমার দুপুরের খাওয়াটা আজকের মতো যদি বামুন ঠাকুরকে বলে দিই, তোমার অসুবিধা হবে? নিরামিষ খেতে হবে কিন্তু।'

হেসে ফেললাম, 'কি যে বল। ও আমার ভালোই লাগবে, মুখ-বদল হবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও। খালি বড়মাকে—অ্যানি বলল, 'আরে বলতেই ভুলে গেছি, মিঃ সরকার সারা দিন থাকবেন। জোনাস আমাকে বাইরে লাঞ্চ খাওয়াবে।'

(১১)

বেলা দশটার আগেই সেজে-গুজে অ্যানি চলে গেল। জানলা দিয়ে সায়ন আর আমি দেখলাম দিব্যি ফিটফাট হয়ে জোনাস সঙ্গে চলেছে। অ্যানির মুখে হাসি ধরে না। লক্ষ্মীকে বড়মার ঘরের পাশে অ্যানির ঘরে ঠায় বসিয়ে রাখলাম। বড়মা অকাতরে ঘুমোতে লাগলেন। সায়ন একবারও তাঁর কথা বলল না। কোনো দিন-ই বলত না। তার শিশু মন কেমন করে বুঝে নিয়েছিল রোজ কিছুক্ষণের জন্য তার উপর ঐ অদ্ভুত মানুষটির অধিকার আছে। সে-সময়টুকু কোনো মতে কাটাতে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু বড়মা তাকে বেশি জড়াতে গেলেই ভয়ে তার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠত। যতক্ষণ তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকত, বেশ খুসি মনেই থাকত। তার গায়ে হাত না দিলেই হল। বড়মা সেটা লক্ষ্য করতেন কি-না, কে জানে।

আজ ছাড়া পেয়ে ছেলে এ-ঘর ও-ঘর ঘুট-ঘুট করে বেড়াতে লাগল। সাড়ে দশটায় বাসব সরকার এলেন। হেসে বললেন, 'আজ আমার সারা দিনের ডিউটি, জানেন তো? আশা করি ঠাকুর আমার চাল নিয়েছে?' তারপর একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট সায়নের হাতে দিয়ে বললেন, 'মানিক, এই নাও লক্ষ্মী ছেলে লক্ষ্মী মেয়ের পুরস্কার।' সায়ন অমনি কাগজের মোড়কটা টেনে খুলে ফেলল। 'চকো! মা, চকো! মামু দেছে।' বাসব বললেন, 'তোমার একলার নয়, মানিক দুজনের।' মামুর কাছে সায়নদেব হয়তো অনেকবার অনেক চকোলেট পেয়েছে, তাই বাক্স দেখেই চিনতে পেরেছে। কিন্তু আমার জীবনে দাদামশাই ছাড়া এই প্রথম কোনো পুরুষ মানুষের কাছ থেকে উপহার পেলাম। টিকলির হাত থেকে মাঝে মাঝে খুদে চকোলেটের প্যাকেট পেয়েছি, বলেছে নাকি টিফিনের পয়সা জমিয়ে কিনেছে। বলা বাহুল্য তার একটা কথাও বিশ্বাস করি নি। বঙ্কুর দান আমার চিনতে বাকি থাকে নি। চকোলেটের দিকে চেয়ে একবার ভাবলাম বঙ্কুর ব্যাপার নিয়ে সিংহ-সরকার কোম্পানীর পরামর্শ চাইতে হবে। কিন্তু উকীলদের যে অনেক পয়সা দিতে হয়, সে আমি কোথায় পাব? সঙ্গে সঙ্গে মনটা খুশি হয়ে গেল; এখন আবার কিসের ভাবনা, মাসে মাসে দুশো টাকা পোস্টাপিসে না জমিয়ে মিঃ সিংহকে দিয়ে দেব। ব্যাস্ ল্যাঠা চুকে যাবে। বঙ্কুটাকে বোম্বাই চালান না করা অবধি আমার শান্তি নেই।

বাসব সরকার ততক্ষণ সায়নের সঙ্গে খেলা করছিলেন। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার উপর আমরা অন্যায় জুলুম করছি না তো, মিস্ চৌধুরী? বড় বেশি স্ট্রেন হচ্ছে না তো?'

আমি বললাম, 'মাঝে মাঝে কষ্ট হয় না বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু অসহ্য রকম নয়। আমি বুঝতে পারছি বড়মার মানসিক অবস্থাটা খুব স্বাভাবিক নয়। আগেকার কথা আমার জানা থাকলে, হয়তো ও'র উপর সুবিচার করতে পারতাম। এখন মাঝে মাঝে—।' থামলাম, বাসব সরকারের মুখখানাকে বড় বিষণ্ণ, বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, তাই হবে। মিঃ সিংহ আগাগোড়া প্রায় সমস্ত দুর্ঘটনাটাকেই দেখেছিলেন, তিনিই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন। আমার তখন মাত্র দশ বছর বয়স ছিল, শোনা কথা ছাড়া আমি আর কি বলতে পারব। যদিও—নাঃ, থাক। আচ্ছা, মানিককে একটু বেড়িয়ে আনি? কি রে যাবি প'-প'?' সায়নকে আর পায় কে! আগে আগে ছুটে চলল।

দুপুর বেলার খাওয়ার পর সায়ন ঘুমোলে লক্ষ্মীকে খেতে পাঠিয়ে আমি অ্যানির ঘরে বসলাম। বড়মা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বাসব সরকার একবার ঘুরে গেলেন, তারপর বড়মার কাগজপত্রের ফাইল নিয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন। যেই লক্ষ্মী ফিরে এল, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। 'একটা কথা ছিল।' শান্ত হাসি হাসলেন। 'কি হল? আবার মত বদলাল নাকি? চলে যেতে ইচ্ছা করছে? তাহলে মানিকের কপালটাই মন্দ!'

'তা নয়। একটা ব্যক্তিগত কথা বলব কি-না ভাবছি। আপনারা কাজের মানুষ—' 'কি মুশকিল, বলেই ফেলুন না!' কেন জানি সব দ্বিধা চলে গেল। টিকলি বঙ্কুর কথা আগাগোড়া খুলে বলতে কোনো অসুবিধা হল না। বঙ্কুকে বোম্বাই-যাত্রা করানোর পরিকল্পনা শুনে একটু হাসলেন। বললেন, 'এই কথা? ভাবছিলাম না জানি কি। একটা সুবিধে হয়েছে যে ওরাও আমাদের মক্কেল। এ-পাড়ার অনেকেই তাই। দেখি কি করা যায়। ওকে বোম্বাইতে আর টিকলিকে তার মার কাছে পাঠাতে পারলেই তো আপনি নিশ্চিন্ত মনে এখানে কাজকর্ম করতে পারবেন? সায়নদেবকে ছেড়ে যাবার কথা আর তুলবেন না তো?'

বললাম, 'এখনো তুলি নি, পরেও তুলব না। ওদের ব্যবস্থা না করলেও তুলব না। শুধু বড়মার কথাটা আমার জানা ভালো, নইলে আমিও ও'র উপর হয়তো অবিচার করব।' বাসব বললেন, 'বেশ, তাই হবে। কাকাকে বলব। সময় মতো সব আপনাকে বলা হবে।'

চায়ের অনেক আগেই অ্যানিরা ফিরে এল। ক্লান্তিতে আর আনন্দে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সায়নের কাপড় ছাড়াচ্ছিলাম, সেইখানে এসে কৌচে বসে পড়ল। 'উঃফ্, কি ভালোভাবে দিনটা কেটেছে কি বলব। ম্যাডাম তো দেখছি এখনো ঘুমোচ্ছেন, বলিহারি ওষুধের গুণ।' 'রেস্তোরাঁয় ভালো লাঞ্চ দিয়েছিল তো?' অ্যানি নাক সেঁটকাল। 'আরে দূর! ঐ পাঁচ টাকার লাঞ্চ! আমার জোনাস মাথাপিছু দু টাকা খরচ করে ওর চেয়ে শত-গুণে ভালো লাঞ্চ তৈরি করে। সত্যি ভারি গুণী লোক আমার স্বামী। ভেবে গর্ব হয়! কেন যে ভগবান মদের সৃষ্টি করেছিলেন! তবে আজ খায় নি। নাকি আজ থেকে ছেড়ে দেবে। এর মধ্যে কতবার ছাড়ল, পরদিন

আবার ধরল, মালা। ইচ্ছাটা আছে, শক্তিটা নেই। যাই কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসি। এক সঙ্গে চা খাব, কেমন? জোনাস তো ম্যাডামের কাজিনের সংগে খেলতে বসে গেছে।'

চমকে উঠলাম, 'বড়মার কাজিন এখানে আসে নাকি?' 'বাঃ, সেদিন দেখলে না, জোনাসের সঙ্গে? এদিকে সরকার সায়েব ওকে দেখতে পারে না। কিছুতেই বড়মার ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতে দেবে না। ঠাকুর চাকর আমাদের সকলের উপর কড়া হুকুম ওকে যেন একতলা থেকে বিদায় করা হয়। মিঃ সিংহও সেটা সাপোর্ট করেন। দেখলে না সেদিন চ্যাংদোলা করে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেল। সরকার তো ওকে ঢুকতে দিতে চাইবেই না, ম্যাডামকে যে-রকম মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে, আর কেউ বাগড়া দেয়, তা তো ওর পছন্দ হবেই না, কিন্তু মিঃ সিংহ কি করে মত দেন তাই ভাবি।'

বিরক্ত হলাম। বললাম, "জানি, মিঃ সরকারের এসবে কি এসে যায়? পয়সা-কড়ি কোম্পানির জিম্মায়, বড়-মা কিছু দেখেনও না। ও'র কাছ থেকে ও'র আত্মীয়কে দূরে রেখে তার কি লাভ?" "আহা, বড়-মা যদি ছেলের জন্য সব না রেখে, কাজিনকে কিছু দিয়ে দেন। নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ টাকা আছে। অন্ততঃ যেভাবে খরচ হয়, তাই থেকে তো ঐ রকম মনে হয়।
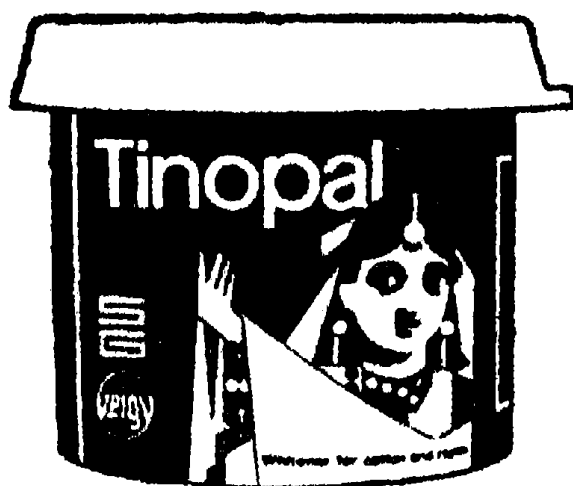
যাক্ গে, কাপড় ছেড়ে আসি। চায়ের জন্য কি এনেছি দেখো।"

অ্যানির কথায় মন খারাপ হয়ে গেল। ও মানুষটার এত টাকার লোভ, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করত না। দাদামশাই যাকে তাকে টাকা দিতেন। না থাকলেও দিতেন। একবার অনিমাসির কাঁসার জামবাটি একজন নাগরা জোচ্চোরকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সেবার শুধু অনিমাসি কেন, আমিও রেগে গেছিলাম। দাদামশাই বলেছিলেন, "আহা, দুঃখীকে দেব না তো কাকে দেব? ও জোচ্চোর হতে পারে, কিন্তু দুঃখী তো বটে? দুঃখী না হলে জোচ্চোর হয় নাকি? তোরাও যদি খেতে না পেতিস্, তোরাও জোচ্চুরি করতিস্।" কথাটা আমি মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু অনিমাসি এত গজ্-গজ্ করতে আরম্ভ করেছিল যে শেষ পর্যন্ত দাদামশাই তাঁর হাত থেকে, তাঁর ঠাকুরদার সরু হয়ে যাওয়া সোনার তাগা খুলে দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছিলেন। সে তাগাটিকেও আর দেখিনি। অনিমাসির নিশ্চয় একটা গোপন ভাণ্ডার আছে।

সে যাই হক, বাসব সরকার তো আর দুঃখী নয়। মিঃ সিংহ বলেছিলেন নাকি ...ইন পাশ করে, তারপর বিলেত থেকে ...রিচ নিয়ে, তারপর অ্যাটর্নিও হয়েছিল, ...ন্তু তাঁর পার্টনার হয়ে প্র্যাকটিস করে। ...কি ওকে ছাড়া ওঁদের আপিস চলত না, ...ন্দ সৎ, খুব বুদ্ধিমান। বিয়ে করে নি, কয়েকজন আত্মীয় পোষে। কোথায় থাকে, কি করে পয়সা করেছে সে বিষয়ে কিছু বলেনও নি, আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। একদিন মিঃ সিংহ বলেছিলেন, "বাসব যতদিন আছে মা, আমি না থাকলেও তোমার উপর কেউ কোনো অবিচার করবে না। ওর ...তো কর্তব্যপরায়ণ কেউ নেই। দেখ না ...পর্যন্ত ওর কথা না শুনে পারেন না।" ...ি অ্যানি বলে, "তা হতে পারে। কত ...সেও। আমি নিজেই দেখছি, কিন্তু ...মর টাকার উপর যথেষ্ট নজর আছে। ... আজকের মেয়ে নই। পঞ্চাশ ...য়েছি। হুঃ!"

...য়ের সঙ্গে অ্যানির আনা কেক খাওয়া হল। অ্যানি বলল "তাই বলে ...রকারকে আমি মন্দ লোক বলব না। ... আমার পাপ হবে। আজ সকালেই ...ক একশো টাকা দিয়ে বলেছিল—এই আপনার খৃস্টমাস শপিংএর চাঁদা। ... বা কাকে কি দেয়, বল মালা? উনি ...সন বলেই না আমি সকলের জন্যে কিছু কিছু কিনতে পারলাম। নইলে স্বামী ...বে, এতো আমার কপালে লেখা নেই। ...সেই সতেরো বছর বয়স থেকে কেবল কাজই করছি আর নিজের পেট নিজে চালাচ্ছি। তবু ঐ জোনাস্ ছাড়া নিজের বলতে কেউ নেই! তুমিও দুঃখ-কষ্ট পেয়েছ হয়তো, তবু তোমার নিজের আণ্টি আছে, কাজিন আছে, নিজের বলতে একটা বাড়ি-ঘর আছে। এরা আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে। তবে সরকার তা করবে না, সে বড় দয়ালু। জোনাসের জন্য সরকারি ক্যাণ্টিনে পার্ট টাইম কাজের চেষ্টা করছে। এত করে বললাম, তবু চা না খেয়েই চলে গেল।"

চুপ করে শুনে গেলাম। একটা মানুষের কত রকম পরিচয় হয়, ভাবতে লাগলাম। চায়ের পর অ্যানি বড়মার কাছে গেল। এতক্ষণে তাঁর ঘুম ভাঙল। আস্তে আস্তে প্রসন্ন মনে জেগে উঠলেন। গরম জলে গা ধুলেন, কাপড় ছাড়লেন, সাজলেন গুজলেন। নিজে চেয়ে গরম দুধ আর গাওয়া ঘিয়ের হালুয়া খেলেন। সায়নকে ডেকে একটু আদর করলেন, একটা ছোট খেলনা দিলেন। আজকাল হাতের কাছে তাঁর একটা স্টক থাকে। তারপর লক্ষ্মীর সঙ্গে তাকে নিচে পাঠিয়ে, অ্যানিকে কাছে বসতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন "সেই চুপচাপ বি-এ পাশ করা মেয়েটি কই, সে বড় লক্ষ্মী।" কাছে না গিয়ে পারলাম না। আমার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বেঁচে থাক। উকীল বলে তুমি আমার ছেলের যেমন যত্ন কর, আর কেউ হলে পারত না। মাঝে মাঝে এসো আমার কাছে, সেই প্রথম দিনের পর আর তো আসনি।" বললাম, "আসব"। বড় মায়া লাগল।

অ্যানিকে বললেন, "লক্ষ্মী বলছিল বড়দিনের বাজার করতে গিয়েছিলে? একটা খৃস্টমাস পার্টি করলে কেমন হয়? আমার সায়নের নিশ্চয় ভালো লাগবে। গাছ, গাছে আলো, মাথার উপরে পরী, ডালে ডালে খেলনা, গাছের চারদিকে নাচ গান-খেলা, তারপর সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া, উপহার দেওয়া। কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আনতে হবে, উকীলকে বলব। তুমিও এনো। মিস আ্যারাটুন দু-একবার ব্যবস্থা করেছিল এখানে। কোথা থেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে জোগাড় করেছিল, মনে আছে অ্যানি? মিস্ অ্যারাটুনকে মনে পড়ে? সেই যে আমাকে ইংরিজি শেখাত। অনেক শিখিয়েছিল, তারপর দেখি বাড়ির কর্তার দিকে নজর দিচ্ছে। এক কথায় তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—"

বিপজ্জনক প্রসঙ্গ উঠছে দেখে অ্যানি বাধা দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যাডাম, একটা দশ পাউণ্ড কেক বানাবে জোনাস্। বাড়িসুদ্ধু সবাই মিলে ঘুঁটব। তাই ঘুঁটতে হয়, তাহলে খুব পয় হয়। হাঁস রোস্ট করবে জোনাস্, মিন্স পাই করবে।" বড়মা একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "জোনাস্? জোনাস্ কে?" আমি বললাম, "ঐ যে চমৎকার বিলিতী রান্না করে।" বড়মা খুসি হয়ে গেলেন। "উকীল কোথায়, অ্যানি? তার কাছ থেকে যত টাকা দরকার, চেয়ে নিও। সে বড় ভালো। আমার ছেলের মতো। বেশ তো ঐ জোনাস-ই রাঁধবে।

জানো, উকীল আমাকে বলে, শরীর ভালো রাখুন, ছেলে মানুষ করতে হবে না? আমি জানি আমি মরেও যদি যাই, আমার ছেলে যত্নে থাকবে।"

অ্যানির ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে উঠল। বলল, "কবে পার্টি হবে?" "কেন ২৪শে ডিসেম্বর, বড়দিনের আগের দিন, সেই দিনই তো পার্টি দিতে হয়। ২৫শে সবাই গির্জা যায়। তোমাদের কাছে হীরাগঞ্জের হেনরি হোপের কথা বলি নি বুঝি

আমাদের বাড়ির কাছে গির্জা ছিল, হেনরি হোপ সেখানকার পাদ্রী। কি ভালো কেক বানাত মিসেস্ হোপ। আমার বাবাকে পাঠাত। বাবা ওদের গির্জায় মোটা চাঁদা দিতেন। পাদ্রী খুব কৃতজ্ঞ ছিল। বলত জমিদারবাবু, তোমার আত্মার মুক্তির জন্য আমি রোজ প্রেয়ার করি। ওরা সর্বদা বড়-দিনের আগেরদিন পার্টি দিত। বলত—আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন, তাই আনন্দ করতে হয়। এবার আমারো ত্রাণকর্তা এসেছে, আমি আনন্দ করব না? আরেকটু হলেই যে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।"

একটু একটু করে আমার মনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে একটা ছবি তৈরি হচ্ছিল। বড়মার ঘর থেকে বেরিয়ে অ্যানিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, বড়মার স্বামী কি আরেকটা বিয়ে করেছিলেন?" "কে বলেছে?" "কেউ বলে নি, নিজেই আঁচ করেছি।" "যে-কথা কেউ বলে না, সে-কথা মনের মধ্যে রাখতে হয়।" "তাই কি তুমি তোমার বোনঝির কথা আমাকে বল না?" অ্যানির মুখ সাদা হয়ে গেল। "তার কথা কে বলেছে তোমাকে? ম্যাডাম? না, তিনি কখনো বলেন নি। তাহলে মিঃ সিংহ বলেছেন? আমার গোপন কথা কি বলে তোমাকে বলেন তিনি! আমি—" আমি অ্যানিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "কি এমন সুখী আমি যে তোমার দুঃখ বুঝব না, অ্যানি?" অ্যানি কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে একটু হেসে বলল, "তুমি বড় ভালো, মালা।"

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

বিজ্ঞানী ও সংগঠক আলেকসান্দর ফন হুমবোল্ট

বার্লিনের ব্রান্ডেনবুর্ক তোরণ থেকে উনটের ডেন লিনডেনের চওড়া বুলভার ধরে হাঁটতে শুরু করলে লিনডেন বা লেবু গাছ চোখে পড়বেই, এখনো যতোই ছোট হোক। প্রশস্ত রাজপথের দুধারে বিশাল বিশাল অট্টালিকা—বিভাগীয় বিপণি, রেস্তোরাঁ ও কাফে, বিমান-কোম্পানীর দপ্তর, ইন্টার-হোটেল উনটের ডেন লিনডেন, ফুলের বাগান, ফোয়ারা ও আরো অনেক কিছু। ব্রান্ডেনবুর্ক তোরণ থেকে টেলিভিশন টাওয়ার পর্যন্ত হেঁটে পার হতে সময় খুব বেশি লাগার কথা নয়, কিন্তু দুধারের আকর্ষণ এত বেশি যে পায়ে পায়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, বিশেষ করে যেখানে একদিকে জার্মান স্টেট অপেরা অন্যদিকে জার্মান স্টেট লাইব্রেরি ও বার্লিন হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়। এইখানে দাঁড়িয়েই আজকের বিজ্ঞানের কথায় আজ থেকে দুশো-এক বছর আগে জন্মেছেন এমন একজন মানুষের দিকে আমরা তাকাব। তাঁর নাম আলেকসান্দর ফন হুমবোল্ট। বার্লিন হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দুটি মূর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আলেকসান্দর ফন হুমবোল্ট ও ভিলহেলম ফন হুমবোল্ট। দুই ভাই। প্রথমজন বিজ্ঞানী, দ্বিতীয় শিক্ষাবিদ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে হুমবোল্ট নামটি পরে যুক্ত হয়েছে।

আলেকসান্দর ফন হুমবোলটের নামটি আজকের দিনে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। দুরূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থেকেও এবং আর্থিক সংগতি সামান্য হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কী করা যেতে পারে তার একটি ভাস্বর দৃষ্টান্ত আলেকসান্দর ফন হুমবোলটের জীবন। জে জি ক্রাউথার তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ১৭৯০ থেকে ১৮৫০ সালের ঐতিহাসিক কালে আলেকসান্দর ফন হুমবোল্ট বিজ্ঞানের গবেষণা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তা তৎকালীন পরিস্থিতিতে অসম্ভব বলে বিবেচিত হতে পারত, সুতরাং এই মানুষটির জীবন সামনে রাখা দরকার যাতে আজকের দিনের পরিস্থিতিতেও বিজ্ঞানের গবেষণা ও সাফল্য সম্পর্কে আমরা আস্থা রাখতে পারি। ক্রাউথারের প্রবন্ধের ভিত্তিতেই এই অ-সাধারণ বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু পরিচয় আমরা নিতে চেষ্টা করব।

আমেরিকার আবিষ্কার যদিও ১৪৯২ সালে কিন্তু তারপরে তিনশো বছরেরও অধিক কাল ধরে আমেরিকার মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের বেশির ভাগটাই ছিল স্পেনের দখলে এবং বাইরের পৃথিবীর কাছে এই আশ্চর্য জগতটির দুয়ার ছিল একেবারে বন্ধ। এই অবস্থা চলে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত; আলেকসান্দর ফন হুমবোল্টের বয়স তখন উনত্রিশ। স্পেনের রাজার অনুমতি লাভ করে তিনি হাজির হলেন এই অজ্ঞাত এলাকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অনুসন্ধান-কার্য চালাতে। অভাবিতপূর্ণ এই ঘটনায় অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। তবে কোনো একটি রাজনৈতিক তৎপরতার ফলে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যদি সবচেয়ে সার্থকতার সঙ্গে সিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে এটি হচ্ছে তেমনি একটি ঘটনা।

আলেকসান্দর ফন হুমবোল্ট

এই নতুন জগতে হুমবোল্টের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান-কার্য অতিমাত্রায় ফলপ্রসূ হয়েছিল। তার চেয়েও বড়ো কথা, তাঁর এই দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানীদের কাছে হয়ে উঠেছিল বড়ো রকমের প্রেরণা। চার্লস ডারউইনের মতো বিজ্ঞানীও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন, "তাঁর (আলেকসান্দর হুমবোল্টের) ব্যক্তিগত 'ব্যক্তিগত ইতিবৃত্ত' ও ভ্রমণের বিবরণ আমার যুবা বয়সে আমি বারবার পড়েছি আর তারই ফলে আমার জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়েছে, একথা আমি কখনো ভুলব না।"

নতুন মহাদেশে প্রথম ইউরোপীয় অভিযাত্রী যিনি পা দিয়েছিলেন তাঁর নাম কলম্বাস, প্রথম বিজ্ঞানী হুমবোল্ট। কলম্বাসের ধারণা হয়েছিল তিনি এশিয়ার পূর্ব-উপকূলের সরাসরি সমুদ্র-পথ আবিষ্কার করেছেন। তারপরে তিনশো বছর সময় লেগেছিল উপযুক্ত আয়োজনসহ প্রথম শ্রেণীর একজন বিজ্ঞানীর এসে পৌঁছতে। স্পেনের পক্ষে এ-ঘটনা অস্বাভাবিক ছিল না। একালে কিন্তু চাঁদের দেশে প্রথম মানুষের পরে অনেক অনেক কম সময়ের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞানী পৌঁছে যাবেন আশা করা চলে।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-কার্যের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা থেকেই শুরু। তারপরে অনেকগুলো সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তিনি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন। ১৮২৮ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞানীদের একটি সাধারণ সম্মেলন, সভাপতিত্ব করলেন তিনি। একটি সম্মেলনে বিজ্ঞানীদের মিলিত হওয়ার ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রথম। এই সম্মেলনের আদর্শেই পরে ব্রিটেনে ও অন্যান্য স্থানে অনুরূপ বৈজ্ঞানিক সম্মেলন গড়ে ওঠে, এমনকি বিশ্বের এই প্রথম বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সাধারণভাবে যে-সব মন্তব্য করেছিলেন মোটামুটি সেই ধারা বজায় রেখেই পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলিতে সভাপতির ভাষণ দেবার রেওয়াজ চলে এসেছে। ১৮২৮ সালের সম্মেলনে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন মাত্র একজন: চার্লস ব্যাবেজ। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ব্রিটিশ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৩১ সালে)। আলেকসান্দর ফন হুমবোল্টের দৃষ্টান্ত তিনি অনুসরণ করেছিলেন।

এমনিভাবে আলেকসান্দর ফন হুমবোল্ট হয়ে উঠেছিলেন আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রধ প্রেরণা। তাঁর ধ্যানধারণাই রূপলাভ কর আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান ব বৈজ্ঞানিক ইউনিয়নসমূহের আন্তর্জা পরিষদ ধরনের বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলি

বিজ্ঞানের সংগঠক হিসেবে আ সান্দর ফন হুমবোল্ট ছিলেন অসাধ সৃজনশীল ক্ষমতাধর পুরুষ।

১৭৬৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তা আলেকসান্দর ফন হুমবোল্টের জন্ম। বাবা ছিলেন একজন প্রুসিয়ান অফি মা ছিলেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারি তৎকালীন বহু বিখ্যাত ব্যক্তির ঘ সংস্পর্শে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছি এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের একজন অবশ্যই ত বড়োভাই—সুপণ্ডিত ও বার্লিন বিশ্ববিদ লয়ের প্রতিষ্ঠাতা—ভিলহেলম ফন হু বোল্ট।

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব উত্তেজনা এই দুই ভাইয়ের মনেও ছড়ি

ছিল। ১৭৯০ সালে আলেকসান্দর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন প্যারিসে, বাস্তিলের পতনের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনের প্রাক্কালে। এই ঘটনার স্থায়ী প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপরে। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে তিনি মনে করতেন ১৭৮৯ সালের মানুষ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা অটুট ছিল। তাই ফরাসী বিপ্লবের উনষাট বছর পরে—যখন তাঁর বয়স উনআশি—১৮৪৮ সালের বার্লিন বিপ্লবে নিহত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের শোক মিছিলের সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

অথচ অন্যদিকে পঞ্চাশ বছরেরও অধিক কাল ধরে তিনি ছিলেন প্রুশিয়ার রাজাদের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি। প্রুশিয়ার রাজাদের কাছ থেকে তিনি সামান্য বেতনও পেতেন। এই বেতনের ওপরে নির্ভর করেই নিজের ব্যক্তিগত সংস্থানকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন বিজ্ঞানের গবেষণায়। এত বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে এত দীর্ঘকাল ধরে তিনি কি করে যে এমন ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলেন, তার পুরো ব্যাখ্যা এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য ঘটনা। তাঁর একজন জীবনীকার বলেছেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা তিনি বজায় রাখতেন সাদাসিধে জীবন কাটিয়ে, কখনও কারও কাছে হাত পাততেন না, ওপরওলার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা
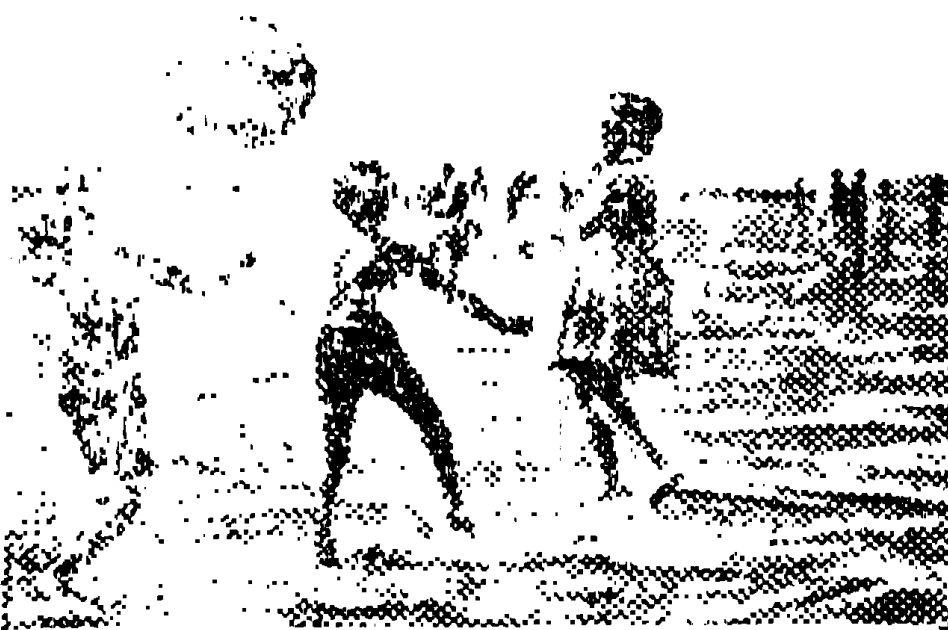
দেখাতেন, ওপরওলাদের পুরস্কারকে খুব একটা দাম দিতেন না।

ছেলেবেলায় দুই ভাইয়ের মধ্যে তাঁকে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভাবান মনে করা হত। ফলে তিনি বিজ্ঞানে যেতে পারেন নি, অর্থনীতি নিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ এসেছিল অনেক পরে।

১৭৮৯ সালে তিনি গোয়েটিঙেনে এলেন শিল্প-প্রক্রিয়া সম্পর্কে পড়াশুনো করতে। এখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন হ্যানোফারের ভবিষ্যৎ রাজা, সাসেকস-এর ডিউক ও প্রিন্স মেটারনিখ। এই পরিচয় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে কিছুটা কাজে লেগেছিল। এই সময়ে গ্রীক ও রোমান দেশে ব্যবহৃত তাঁত সম্পর্কে তিনি একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন।

ক্লাসিকস পড়তেন প্রফেসর হেন-এর কাছে। প্রফেসর হেন-এর জামাতা ছিলেন জর্জ ফরস্টার—ক্যাপটেন কুকের দ্বিতীয় বিশ্ব-পর্যটনের সঙ্গী প্রকৃতি বিজ্ঞানীর ছেলে। বাপের সঙ্গে ছেলেও বিশ্ব-পর্যটনে বেরিয়েছিল। জর্জ ফরস্টারের মুখে ক্যাপটেন কুকের অভিযানের বিবরণ শুনে আলেকসান্দর হুমবোল্টের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান-কার্য চালাবার জন্যে তিনিও একটি অভিযান শুরু করবেন—এমনি একটি ইচ্ছা তাঁকে একেবারে গ্রাস করে বসে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় প্রস্তুতি। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় পাঠ নেন, ভূতত্ত্ব ও খনিতত্ত্বের জ্ঞান বাড়িয়ে তোলেন, ফ্রাইবুর্গের বিখ্যাত খনিবিদ্যা অধ্যয়নের স্কুলে পড়তে যান। এই স্কুলে পড়াশুনো করাটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুরূহ অবস্থার মধ্যেও দীর্ঘ সময় ধরে প্রায়োগিক ও বৈজ্ঞানিক কাজে ডুবে থাকতে পারতেন।

১৭৯২ সালে নিযুক্ত হন খনিসমূহের পরিদর্শক। অদম্য অসাধারণ উৎসাহে নিজের কর্তব্য পালন করতেন। নিজে খাদে নামতেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারক করতেন। খনি-শ্রমিকদের জন্যে আবিষ্কার করেছিলেন সেফটি-ল্যাম্প ও গ্যাস-মুখোশ। ডেভি-র সেফটি-ল্যাম্প আরো পরের আবিষ্কার—ততোদিন পর্যন্ত এই সেফটি-ল্যাম্পটিই চলেছিল। পরীক্ষা কার্য চালাতেন নিজের ওপর দিয়েই। দাহ্য গ্যাস ভর্তি পরিত্যক্ত খাদে নিজেই নেমে যেতেন এই সেফটি-ল্যাম্প নিয়ে। বহুবার তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় খাদ থেকে তুলে আনতে হয়েছিল।

শারীরবিদ্যা নিয়েও গবেষণা চালাতেন। একটি পরীক্ষাকার্য ছিল পেশী ও স্নায়ু সম্পর্কে। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে স্নায়ুতে উৎপন্ন একটি পদার্থ পেশীতে প্রবেশ করলে পেশী সংকুচিত হয়ে থাকে। জীবজন্তুর ওপরে গ্যাসের প্রয়োগ করলে কী ফল হয়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেকে তার একটা হিসেব নেবার চেষ্টাও করেছিলেন। তাঁর অপর একটি আবিষ্কার : বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হলে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। পিঠের একটি ক্ষতে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করে তিনি পরখ করেছিলেন স্নায়ুকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত করলে যন্ত্রণার উপশম হয় কিনা।

গাছের গুঁড়িতে আগুন ও কুড়ুলের সাহায্যে খোদল করে বানানো নৌকোয় তিনি ওরিনোকো পাড়ি দিয়েছিলেন। সে এক আশ্চর্য অভিযান। নৌকোর আরোহী মোট চারজন, সঙ্গে একরাশ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং বই, পাখি ও বানর। দাঁড় টেনে টেনে পার হয়েছিলেন ডেঁয়েমশার দঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। খনি-ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় কষ্ট-সহিষ্ণু কিন্তু এই অভিযানের কষ্ট তাঁর পক্ষেও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর ডান হাতটি চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যায়। কিছু লিখতে হলে নিজের ডান-হাতটি বাঁ-হাত দিয়ে তুলে ধরতেন। হাতের লেখা হয়ে গিয়েছিল প্রায় দুর্বোধ্য। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই পঙ্গু হাতেই ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছিলেন মোট কুড়ি খণ্ড, 'কসমস' পাঁচ খণ্ড।

খনিতে কাজ করার সময়ে চৌম্বকত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। পাথরে বিপরীত চৌম্বকত্বের কেন্দ্র আবিষ্কার করেছিলেন ১৭৯৬ সালে, পরে চৌম্বক ঝড়। খনির বায়ুমণ্ডল ও খনিজ পদার্থের চৌম্বকত্ব নিয়ে গবেষণা করতে করতে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে প্রণালীবদ্ধভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও চৌম্বকত্ব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের নানা দেশে পর-পর পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাবও করেছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অভিযান চালাবার একটা সুযোগ পাবার জন্যেও অক্লান্তভাবে চেষ্টা চলেছিল। নেপোলিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচ বছরব্যাপী একটি ফরাসী বিশ্ব-অভিযান শুরু হবার কথা ছিল, তিনি অভিযানে যোগ দেবেন একটা কথাবার্তাও পাকা—কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর্থিক অনটনের জন্যে এই অভিযান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চেষ্টা করেছিলেন উত্তর আফ্রিকায় যেতে, পারেননি। গিয়েছিলেন স্পেনে, তুরস্কে পাড়ি দেবার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধানে। কাতালোনিকা থেকে যখন মাদ্রিদ যাচ্ছিলেন সারাটা পথ ব্যারোমিটারের রীডিং নিতে নিতে চললেন। তারই ফলে আবিষ্কার করলেন যে মাদ্রিদের অবস্থান একটি মালভূমির ওপরে। এ তথ্য আগে জানা ছিল না। এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলেই স্পেনের কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপরে সদয় হয়েছিলেন ও আমেরিকায় অভিযান চালাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

পরিক্রমাটি ছিল ৬০০০ মাইলের। সারাটা পথ তিনি পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের তীব্রতার মাপ নিয়েছিলেন। গাছগাছড়ার বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন (যা থেকে উদ্ভিদ-ভূগোলের সূত্রপাত), আগ্নেয় পর্বত পর্যবেক্ষণ করেছিলেন (যা থেকে আগ্নেয়-গিরির ভূমিকা ও মহাদেশের গড়ন সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি), সমুদ্র-স্রোতের তাপমাত্রার হিসেব নিয়েছিলেন (যা থেকে সমুদ্র-বিজ্ঞানের জন্ম ও বিকাশ)। এসব ছাড়াও তাঁর এই অভিযান থেকে পাওয়া গিয়েছিল ভাষা, প্রত্নতত্ত্ব এবং আজটেক ও ইনকা সভ্যতা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য।

এই আশ্চর্য অভিযানের নায়ক হিসেবে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৮০৭ সালে—যখন তাঁর বয়স আটত্রিশ—তাঁর ওপরে হুকুম হল যুবরাজের সঙ্গে প্যারিসে যাবার। তারপরের কুড়ি বছর তিনি প্যারিসেই ছিলেন ও রাজার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এ-কারণে কূটনৈতিক দৌত্যের কাজে তাঁকে প্রচুর সময় দিতে হত। তারপরেও রাত জেগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতেন। সারাদিনে ঘুমোতেন মাত্র চার ঘণ্টা।

তরুণ বিজ্ঞানীরা প্যারিসে এলে অবশ্যই একবার হুমবোল্টের সঙ্গে দেখা করে যেতেন। এই তরুণ বিজ্ঞানীদেরই একজন ছিলেন লীবিগ—জৈব রসায়নের জনক। লীবিগের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন হুমবোল্ট।

তারপরে ১৮২৯ সালে—ষাট বছর বয়সে—আবার একটি বড়ো রকমের অভিযানে বেরিয়েছিলেন। এবারের অভিযানের এলাকা রুশ দেশ ও মধ্য এশিয়া। তিনি ইতিমধ্যেই খ্যাতিমান পুরুষ, তাই এ অভিযানে প্রচার ও আনুকূল্যের কোনো ঘাটতি ছিল না। রুশ কর্তৃপক্ষ ও [illegible] ওপরে তাঁর প্রভাব ছিল খুবই বেশি। এর ফলে অনেকগুলো কাজ হয়েছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে রুশী উদ্যোগে গোটা সাইবেরিয়া ও আলাস্কা জুড়ে তৈরি হয়েছিল সারি সারি আবহ ও চৌম্বক পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র। একটি মহাদেশ জুড়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করার ঘটনা এই প্রথম। ১৮৩৬ সালে চিঠি লিখলেন তাঁর পুরোনো সহপাঠী সাসেকস-এর ডিউকের কাছে (ডিউক তখন রয়াল সোসাইটির সভাপতি)। চিঠিতে ডিউককে অনুরোধ করলেন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রের এই সারি-জাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত করা [illegible]। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা ও বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে রয়াল সোসাইটির আগ্রহের মূলে ছিল হুমবোল্টের এই চিঠি।

হুমবোল্ট প্রচুর লিখে গিয়েছেন। এমন ভাবে লিখতেন যেন পাঠকের কাছে বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপে উপস্থিত করা হয় এবং বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি বুদ্ধিসম্পন্ন একজন পাঠক বুঝতে পারেন। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'কসমস' তাঁর এই রচনাগুলোর কীর্তিস্মারক সাক্ষ্য।

মানুষটি ছিলেন আকারে ছোটখাটো, নিউটনের মতো। চেহারাটি বিশেষ চোখে পড়ার মতো ছিল না। কিন্তু মুহূর্তে কথা বলতে শুরু করতেন সম্পূর্ণ ছবিটি যেত বদলে। পুশকিনের ভাষায় আশ্চর্য উজ্জ্বল কথাগুলো তিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতেন ফোয়ারার, মার্বেল-পাথরের সিংহ থেকে নিঃসৃত ঝকঝকে জলের মতো। ১৮৫৯ সালের ৬ই মে তাঁর মৃত্যু হয়।

—অয়স্কান্ত

মনের কথা

সঞ্জীববাবুর সন্দেহ
দার্শনিকের চিন্তারোগ

সঞ্জীব সেনের অফিসের ডাক্তার আমাকে ফোনে এবং চিঠিতে রোগের আংশিক ইতিহাস জানিয়েছিলেন। সঞ্জীব সেন স্বয়ং এসে পুরোপুরি ব্যাপারটা জানালেন।

—আমি এ-কাজের উপযুক্ত নই। কাজটা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মনে হয়, আমার মাথার মধ্যে কিছু নেই। কোনো কর্মচারী আমার চেম্বারে ঢুকলে আমি ঘাবড়ে যাই। তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলব আমি বুঝতে পারি না। 'আপনি' না 'তুমি', 'বস' না 'বসুন'—কি বলে কথা আরম্ভ করব ধরতে পারি না। অন্য সবাই কেমন দু মিনিটের মধ্যে ফাইলের পাতা উল্টে ভাবনা-চিন্তা না করে নোট লিখে ফেলে; আমি পারি না। কেন পারি না? ভয় হয়, ভুল হবে। টেবিলের ওপর ফাইল জমতে থাকে। স্টেনোকে ডেকে পাঠাই চিঠি ডিকটেট করব বলে। সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি এক লাইনও ডিকটেট করতে পারি না। মুচকি হেসে স্টেনো চলে যায়। অফিসের সবাই আমাকে দেখে হাসে। আমাকে দেখলে নিজেদের মধ্যে কি সব যেন বলা-কওয়া করে। আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা কি আমি জানি। বড়-কর্তাকে আর ডাক্তারবাবুকে খুলে বলেছি। খুলে বলেছি বলা ঠিক হবে না; মানে ঠিকমত বলতে পারিনি। আমার ক্ষমতা কম। বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের অভাব, আমার মত লোকের পক্ষে কোনো দায়িত্বপূর্ণ চাকরী বজায় রাখা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। আমি নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করছি অনেকদিন ধরে, কিন্তু ঠিকমত বুঝতে পারছি না। আমি আমার পুরনো পোস্টে ফিরে যেতে চাই, এ-প্রমোশন আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি যে-কোনো সময় মারাত্মক রকমের ভুল করে বসতে পারি, যার ফলে অনেকের ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু সকলে বলছে পুরনো কাজে ফিরে গেলেও নাকি অনেকের ক্ষতি হবে। আমার প্রমোশন না হলে, আমার নীচের লোকেরও প্রমোশন আটকে যাবে। এই সুপারিন্টেন্ডেন্টের পোস্টে অন্য অফিস থেকে লোক আনা হবে। যদি চাকরী ছেড়ে দিই, তাহলে উপোষ করতে হবে। জমানো টাকা, হিসেব করে দেখেছি, পাঁচ মাসেই ফুরিয়ে যাবে। আমার পকেটে দুখানা চিঠি আছে; একখানা 'রেজিগনেশন-লেটার', অন্যখানা পুরনো পোস্টে ফিরে যাবার আবেদনপত্র। কোনটা যে বড়কর্তাকে দেব, বুঝতে পারছি না। আসলে কোনো কিছুই আমি আজকাল বুঝতে পারি না। কি করা উচিত, ঠিক করতে পারি না। অফিসে আসতে রোজই দেরী হচ্ছে, কেননা রাস্তায় বেরিয়েই চিন্তা হয়—বাসে যাব, না ট্রামে যাব? মন ঠিক করতে অনেকক্ষণ সময় চলে যায়। ছুটির পরও চিন্তা আসে—শেয়ারের ট্যাক্সিতে, না একলা একটা ট্যাক্সিতে? মোট কথা, কোনো কিছুই আমি নিজে ভেবে ঠিক করতে পারি না। কোনো ব্যাপারেই কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। মনের মধ্যে সব ব্যাপারেই উল্টোপাল্টা চিন্তা। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই চিন্তা আরম্ভ হয়। ঘুম ভাল হয় না, ঘুমের মধ্যেও আমি চিন্তা করি। কোনো কর্মচারীকে কোনো কাজ করতে বলতে আমার সঙ্কোচ হয়। চেনা লোক আমাকে এড়িয়ে চলে, আমিও পরিচিত লোক দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিই, অথবা রাস্তা পার হয়ে অন্য ফুটপাতে গিয়ে উঠি। চাকরী করতে চাই না, আবার চাকরী ছাড়তেও চাই না।

অফিসের রিপোর্ট থেকে জানলাম সঞ্জীব সেনের এই অবস্থা খুব বেশীদিনের নয়। মাস-আষ্টেক আগে তাঁর প্রমোশন হয়েছে। তখন থেকে এই ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এর আগে তিনি ভালভাবেই কাজকর্ম করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট নেই। তবে কোনোদিনই তিনি হৈ-চৈ, মেলামেশা, গল্প-গুজবের মধ্যে থাকতেন না। নিজের ফাইল-পত্র নিয়ে নিজের মনে কাজ করে যেতেন; অবসর সময়ে বই খুলে বসতেন। নাটক, নভেল, সিনেমা-থিয়েটারে তাঁর কোনোদিনই রুচি ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের এম-এ। রাজনীতি, দর্শন—এই নিয়েই ছিল তার যাকিছু পড়াশুনো। ছুটির দিনগুলো লাইব্রেরীতে কাটত। এখন বয়স পঁয়ত্রিশ। অবিবাহিত। খুড়তুতো ভাইদের পরিবারে একটা ঘরে একলা থাকতেন। অনেকটা 'পেইং গেস্টের' মত। ঝক্কিঝামেলা কিছু ছিল না। চৌরঙ্গী-পাড়ার স্টলগুলো ছাড়া অন্য কোথাও বড় বেশি যেতেন না, যাবার দরকারও হত না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা নেই, আবার অসদ্ভাব আছে তাও বলা চলে না। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুদিন না মিশলে তিনি মুখ খুলতেন না। পরিচিত মহলে 'বুক-ওয়ার্ম' বলে দুর্নাম ছিল, কিন্তু রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে কোনোদিন তর্কযুদ্ধে নামতে তাকে দেখা যেত না। দু'চারজন সহপাঠী, যাঁরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমড়া-চোমড়া অধ্যাপক, তাঁরাই শুধু ওর কাছে মাঝে মাঝে এসে অতি-আধুনিক রাজনীতিক দর্শন নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করতেন। নতুন বইয়ের সন্ধান নিতেন। তাঁদের একজনের কাছে সঞ্জীব সেনের সম্পর্কে অনেক কথা জানলাম। এই অসুস্থতার সময় একমাত্র তিনিই পূর্বতন সহপাঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। আমার কাছে প্রথম দিকে তিনিই সঞ্জীব-বাবুকে নিয়ে এসেছিলেন। ভদ্রলোক বললেন;—আমাদের ব্যাচে সঞ্জীবই ছিল সব থেকে 'বিলিয়ান্ট'। যেমন বেশি পড়ত, তেমনি সব কিছু মনে রখতে পারত। ওর কাছে আমরা অনেক কিছু নতুন কথা জানতে পারতাম। ওর একটা মস্ত বড় দোষ ছিল, যার জন্যে পরীক্ষায় বা জীবনে ও সফল হতে পারল না। কোন মতটা ঠিক কোনটা আঁকড়ে ধরলে সত্যে পৌঁছুনো যাবে—এই নিয়ে ছিল ওর চিন্তা। শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই ও আঁকড়ে ধরে নি সত্যও খুঁজে পায় নি। আসলে ওর হীনমন্যতার ভাব ওকে অসুখী করেছে অসুস্থ করেছে। সন্দেহ বাতিকের মূলে বোধ হয় ঐ হীনমন্যতা। কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না, কোনো কিছুই মেনে নিতে পারে না। দিন কতক একটা কলেজে চাকরী করেছে। ছাত্ররা ওকে পছন্দ করত না। কেননা অন্যকে 'ইমপ্রেস' করার ক্ষমতা ওর নেই। নিজেও কোনো কিছুতে 'ইম্প্রেসড' হয় নি কোনোদিন। আবেগহীন কণ্ঠে কান্ট, হেগেল, মার্কস আবৃত্তি করে গেলে ছেলেরা শুনবে কেন? তারা চায় উত্তাপ, তারা চায় রস। সেই উত্তাপ আর রসের অভাবের জন্য ও কলেজ ছেড়ে অফিসে ঢুকল। বেশ চলছিল। 'কেরিয়ার' তৈরীর তাড়া নেই, উচ্চাকাঙ্খার তাগিদ নেই, শুধু পড়া আর জানা। এমন কিছু

জানতে চায়, যা জানলে সন্দেহ চলে যাবে, মনে শান্তি আসবে। ভেবেছিল দর্শন যা দিতে পারে নি, ধর্মশাস্ত্রে যার সন্ধান মেলে নি, বোধ হয় বিজ্ঞান তা দিতে পারবে। আধুনিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে ও প্রচুর পড়াশুনো করল। আইনস্টাইন, প্ল্যাংক, হাইসেনবার্গ নাকি ওর সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'অনিশ্চয়তাবাদ' ও 'সন্দেহবাদ' ওকে আরো বেশি করে পেয়ে বসেছে। এখন ধারণা হয়েছে, ওর মানসিক কোনো গোলমাল আছে, যার জন্যে কোনো কিছুই গ্রহণ করতে পারছে না, মেনে নিতে পারছে না। আর গোলমালটা জন্মগত; সারবার নয়। মস্তিষ্কের 'ফাংশান'এর বিশৃংখলার ফলে ওর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে পারে নি। এ-অবস্থায় দায়িত্বের পদে ওর থাকা চলে না। কোনো একটা ভুল করে বসবে, মারাত্মক রকমের ভুল। অফিসের সকলে, এমন কি পরিচিত মহল্লের সবাই নাকি এই অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে, ওকে দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

—হীনমন্যতার কারণ কি? বিয়ে করে নি কেন? খুড়তুতো ভাইদের ছেড়ে হোটেলে উঠে এল কেন? ওর প্রথম জীবনের খবর, বাপ-মায়ের ইতিহাস কিছু বলতে পারেন কি?

ভদ্রলোক অক্ষমতা জানালেন। ইউ-নিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকে সঞ্জীবকে উনি চেনেন। তার আগের খবর জানেন না। সঞ্জীব জানায় নি, উনি জানতেও চান নি। উত্তর কোলকাতার ভাইদের আশ্রয় ছেড়ে মধ্য কোলকাতার হোটেলে উঠে আসা আর চাকরীতে প্রোমোশন প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। আর এই সময় থেকেই সঞ্জীববাবুর সন্দেহ বাতিক অনিশ্চয়তাবোধের বৃদ্ধি, এই সময় থেকেই তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ। খুড়তুতো ভাইদের আশ্রয় ছাড়ার কারণ জানলে বোধ হয় অসুস্থতারও কারণ বোঝা যাবে। কিন্তু সঞ্জীববাবু কোনো কিছুই বলতে চাইলেন না বা পারলেন না। অসহায়ের মত শুধু অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁকে ছেড়ে দিতে, চিকিৎসায় তাঁর কিছু ফল হবে না। আবার নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে আমার কাছে যাতায়াতও ছাড়লেন না। অবস্থাটা অফিসের ডাক্তারকে জানালাম। সম্ভব হলে সঞ্জীববাবুর খুড়তুতো ভাইকে আমার কাছে পাঠাতে বললাম। সম্মোহিত করার চেষ্টা করে কোনো ফল হল না। এই টাইপের রোগী-দের সহজে সম্মোহিত করা যায় না। জাগ্রত অবস্থায় অভিভাবন শুনিয়ে লাভ নেই বুঝলাম।

সঞ্জীব সেন 'ইনটেলেকচুয়াল' টাইপের মস্তিষ্কের অধিকারী। আবার সহ্যশক্তি কম, দুর্বল, নিস্তেজপ্রবণ। ভুগছেন 'সাইকেস্-থেনিয়া' রোগে। রূপরস গন্ধে ভরা পৃথিবী সঞ্জীব সেনদের কাছে অর্থহীন। গঙ্গার ঘাটে বসে ওরা সূর্যাস্ত দেখে না, রাজপথের দু-ধারে কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখাগুলো কখন মঞ্জরিত হয়ে ওঠে ওরা জানতে পারে না, সঙ্গীতের ঝংকারে ওদের মনোবীণার তার বেজে ওঠে না। খেলার মাঠে যখন হাজার হাজার দর্শক উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে, সঞ্জীব সেনরা তখন ইডেন গার্ডেনেরই বেঞ্চে বসে হয়ত চিন্তা করছে—মার্কস না মার্কিউস? কান্ট না হেগেল? বুদ্ধ না ক্রাইস্ট। পুঁথির বিদ্যা কম যাদের, তারা ভাবতে থাকে চা না কফি? কি দিয়ে তৃষ্ণা মেটাবে? গঙ্গার ধার দিয়ে খানিকটা ঘুরে আসবে না রেড রোড দিয়ে পায়চারী করবে। ভাবতে ভাবতে রাত বেড়ে যাবে, চা-কফি কোনোটাই হবে না; গঙ্গার ধার রেড রোড দুই-ই বাতিল হয়ে যাবে। সেদিন 'হেয়ার কাটিং সেলুনের' লোকটা অমন করে তাকিয়েছিল কেন? এর অর্থ খুঁজে বের করতে হয়ত তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে, কারণ তবুও খুঁজে পাবে না। দুনিয়ার সব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে, কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান মাথায় আসবে না। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এদের পক্ষে খুবই কঠিন। যে-কোনো সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রায় সমান জোরালো যুক্তি খুঁজে পায় বলে এরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কোনো কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া এদের পক্ষে অসম্ভব। অতিবেশী অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করার ফলে কোনো কাজই এরা সুসম্পন্ন করতে পারে না। এরা যদি দৈবাৎ হঠকারী বা উত্তেজনাপ্রবণ মস্তিষ্কের অধিকারী হয়ও, নাদির শাহের মত কোনো দুর্ধর্ষ সেনা দলের অধিনায়ক নয়; তবে সৈন্যদলকে আক্রমণের আদেশ দিয়ে কিছু-ক্ষণের মধ্যেই পশ্চাদপসরণের অর্ডার দিয়ে বসে। এইভাবে বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে এরা ওস্তাদ। দায়-দায়িত্ব নেই, চিন্তা-ভাবনা নেই, সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন নেই, নির্দেশ দেবার দরকার নেই, এমনি ধারা কাজকর্ম পেলে এরা নির্বিবাদে নিজেদের চালিয়ে নিতে পারে। অন্যথায় বিপদ ঘটে। যেমন সঞ্জীববাবুর ঘটেছে।

তবে সাধারণত অন্য কোনো মানসিক সংকটের মধ্যে না পড়লে, সঞ্জীববাবুর মত অতখানি বিপর্যস্ত হতে বড় বেশি কাউকে দেখা যায় না। কাজকর্মের অসুবিধা হতে পারে, অধস্তন কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে তাঁরা অক্ষম হতে পারেন, দু-একটা ভুল ত্রুটি দেখা দিতে পারে; কিন্তু একেবারে অচল হয়ে কেউ পড়েন না। কোনো রকমে এক পাশে হেলে পড়েও ভারসাম্য বজায় রেখে দিন কাটিয়ে দিতে পারেন। চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হয়েও চালিয়ে যেতে পারেন। সঞ্জীববাবুর অসুস্থতার মূলে অন্য কোনো মানসিক আঘাত আছে বলেই আমার মনে হল। কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে জানা গেল। সঞ্জীব সেনের খুড়তুতো ভাই আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বয়সে সঞ্জীবের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। প্রথম দিকটায় একটু ইতস্তত করে, তারপর পারিবারিক ইতিহাস বিশদভাবেই বিবৃত করলেন।

সঞ্জীব তিন বছর বয়স থেকেই আমার মার কাছে মানুষ হয়েছে। আমার জ্যাঠামশাই সন্দেহ বাতিকে ভুগতেন। জ্যাঠাইমাকে সন্দেহ করতেন। জ্যাঠাইমা খুব সুন্দরী ছিলেন, তাই বোধহয় সন্দেহ। মার কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে মার-ধোরও করতেন। রাত্তিরে ঘর থেকে বের করে দিতেন, জ্যাঠাইমা এসে আমাদের বাড়ীতে রাত কাটাতেন। পৈত্রিক বাড়ী পার্টিশান করে বাবা, জ্যাঠামশাই দুই অংশে থাকতেন। এক রাত্রে ঐ রকম জ্যাঠাইমাকে বাড়ী থেকে বের করে দেবার পর তিনি আর বাড়ী ফেরেন নি। সঞ্জীবের তখন তিন বছর বয়স। সেটা বোধহয় ২৬ সাল। হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা চলছিল। কেউ বলল তিনি দাঙ্গার বলী হয়েছেন, কেউ বলল তিনি গঙ্গায় ডুবে মরেছেন। এর-পর বাড়ীর অংশ বেচে জ্যাঠামশাই সাধু হয়ে চলে যান। তিনি নাকি তিব্বতে আছেন। আমরা সঠিক কেউ জানিনা। আমার মা মারা গেছেন বছর তিনেক আগে। তখন থেকেই সঞ্জীব বাড়ী ছাড়ার কথা বলতে থাকে, আমি এতদিন প্রায় জোর করেই টেনে রেখেছিলাম। কিন্তু বছরখানেক হল দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন করতে থাকে, তারপর থেকেই ও আরো বদলে গেল। কিছুতেই আমাদের কথা শুনল না। হোটেলে উঠে এল। আমরা অনেক চেষ্টা করেও ওর মত বদলাতে পারি নি।

—আপনারা ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি কেন?

—চেষ্টা অনেক করা হয়েছিল। মায়ের এক ভাইঝির সঙ্গে পাকা কথা পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওকে রাজি করানো গেল না।

—বাবা মায়ের গোলমালের ইতিহাস ও কতদূর জানে?

—পাড়াপড়শী, আত্মীয় স্বজনের কৃপায় জানতে কিছু বাকী নেই। তবে আমাদের কাছ থেকে জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমার ঝগড়া-ঝাঁটির কথা কোনোদিন শোনে নি। পাড়ার লোকেরা বোধ হয় জ্যাঠামশায়ের সন্দেহ-বাতিকের কথা সবটা জানে না।

সঞ্জীব সেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার অনেক সূত্র আমার হাতে এল। কয়েক দিনের চেষ্টার ফলে তার বিশ্বাসও খানিকটা বাড়ল। আমারও আশা হল যে রোগের মূলে কারণ, 'সাইকিকট্রমা'র খবর হয়ত রোগীর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। কোনো বিশেষ মানসিক আঘাতের ফলে যদি এই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে। আর যদি কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে রোগ

সারবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল আমার।

আলোচনা প্রসঙ্গে সাধন-ভজন, তন্ত্র-মন্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, সন্দেহ, বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হল। খুব জোর দিয়ে কোনো কথা বলা সঞ্জীববাবুর স্বভাব নয়। খুব ধীরে এবং অল্প কথায় তিনি যা বললেন, তা থেকে তাঁর পান্ডিত্যের পরিধি অনুমান করা গেল। পরোক্ষভাবে আমি অভিভাবন প্রয়োগ করতে সুরু করলাম। তাঁর মত নির্বিরোধী ভাল মানুষের কোনো শত্রু থাকতে পারে না। তিনি বয়স ও জ্ঞানে অনেকের থেকে বড়, কাজেই তিনি অফিস-সুপার-ইন-টেনডেন্ট হিসেবে যদি কোনো নির্দেশ দেন, সকলেই তা সানন্দে মেনে নেবে। তাঁর সহকর্মী ও অন্যান্য অফিস কর্মীদের কর্তব্য-জ্ঞান যথেষ্ট। তারা নিজেরাই অফিস-ডিসিপ্লিন বজায় রাখবে। তাঁর সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা দার্শনিক স্তরের, দৈনন্দিন অফিসের কাজে এ সন্দেহ কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা বোধ থেকে নতুন দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে, নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গোড়াপত্তন হয়েছে। প্রচলিত মতবাদকে সন্দেহ করা ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ মানুষ স্বভাব-অনুগামী, আর অসাধারণরাই অননুগামী।

খানিকটা কাজ হল। ভদ্রলোক মাস দুয়েকের মধ্যে অফিসের কাজকর্মে মন বসাতে পারলেন। সহকর্মী ও অধস্তন কর্মচারীদের সহযোগিতার নিদর্শন পেয়ে উৎসাহিত হলেন। চাকরী ছাড়া বা প্রমোশন নাকচের আবেদন নিয়ে কথা বলা বন্ধ করলেন। এখন থেকে উচ্চমার্গে চলতে লাগল আমাদের আলোচনা। জীবনের অর্থ কি? মানুষ কি নিয়ে বা কিসের জন্য বাঁচে, কাজ করে, নতুন নতুন সৃষ্টি করে? সাধন ভজনের আসল তাৎপর্য কি? মনকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে শান্তি ও শক্তি পাওয়া। সমাধি ত' এক রকমের আত্ম-সম্মোহন। সাধারণ মানুষ সাধন ভজন, আত্ম-সম্মোহন না করেই বাঁচার আনন্দ পায় কি করে? ভালবেসে? নিজেকে অন্যের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে? এই রকম নানা প্রশ্ন তুলতে লাগলেন এবং উত্তরও দিতে লাগলেন। আমি হাল ধরে রইলাম। তাঁর আত্ম-জিজ্ঞাসার স্রোত যাতে সন্দেহ-অবিশ্বাস-অনিশ্চয়তার খাতে না গিয়ে বিশ্বাস-আনন্দ জীবনাশ্রয়ী পথে প্রবাহিত হয়, সেই চেষ্টা করতে লাগলাম। সেই রকম 'সাজেশসন' দিতে লাগলাম। এইভাবে ক্রমশ বিবাহ ও নারী পুরুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সঞ্জীববাবু আবার নিজের কথায় ফিরে এলেন।

একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। রীতা খুব ভাল মেয়ে। আমার কাকীমার ভাইঝি। ওকে আমি কিছুদিন পরীক্ষার আগে 'কোচ' করেছিলাম। আমি কোনোদিন ভালবাসা জানাতে পারি নি। সে ক্ষমতা আমার নেই। রীতা আমাকে ভালবেসেছিল কি? মনে হয়, বাসে নি। আমাকে ভালবাসা যায় না। কেননা, আমি ভালবাসতে জানি না। অনেক দিন হয়ে গেল। ওর সঙ্গে আমার বিয়েও হয়ে যেত, যদি আমি মত দিতাম। কিন্তু আমি মত দিতে পারলাম না। ভয় হল। ওর একটা দোষ ছিল, তাই বিয়ে করতে সাহস হল না। ও অসাধারণ সুন্দরী। আপনি অবাক হয়ে গেলেন? অবাক হবারই কথা। সুন্দরী হওয়া কি অপরাধ। আমার মা নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন। সুন্দরী হয়ে তিনি অপরাধ করে-ছিলেন। নিজে অসুখী হয়েছিলেন, বাবাকে অসুখী করেছিলেন। তাই রীতার সঙ্গে বিয়েতে মত দিতে পারলাম না। ভালবাসা শান্তি আনে, সন্দেহ দূর করে; আবার ভালবাসা থেকে সন্দেহ জন্মায়। বাবার ভালবাসা তাঁর মনে সন্দেহ এনেছিল, তাঁকে অসুখী করেছিল। কিন্তু বাবা কি ভালবেসে-ছিলেন? মনে হয় না। তিনি বোধহয় আমার মত হনীমনাতায় ভুগতেন। তাই ভালবাসতে পারেন নি। বাবা আসলে ছিলেন সংসারে বিরাগী সন্ন্যাসী। সুন্দরী নারী তাঁর সাধন ভজনের পথে বাধা, তাই মাকে সন্দেহ নয়, ঘৃণা করতেন। মা ভালবাসতে চেয়েছিলেন, বাবাকে, সংসারকে, জীবনকে। ভাগ্য তাঁকে বিড়ম্বিত করল। আমি যদি ভালবাসা পাই, ভালবাসতে পাই, তাহলে বোধহয় সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু যদি ভাল না বেসে সন্দেহ করি?

এইভাবে ভালবাসা-বিশ্বাস - জীবন-বোধ সঞ্জীববাবুর মনের আকাশে উঁকি দিতে লাগল। সঙ্গে থাকত সন্দেহের কালো ছায়া। এই সময় আমি তাঁকে কিছু কিছু জীবনের কবিতা, বিশ্বাসের কবিতা, প্রেমের কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলাম। কবিতার জাদু ভদ্রলোকের মনে পরিবর্তন আনলো। তিনি কবিতা শুনতে ও পড়তে শিখলেন। আমার পরামর্শে অধ্যাপক বন্ধু সঞ্জীববাবুকে রেকর্ড বাজিয়ে জীবনের গান, প্রেমের সংগীত শোনাতে লাগলেন। সন্দেহের ছায়াগুলো ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে, মনে হল। একদিন বললেন যে তাঁর মুক্তির পথ এতদিনে বোধহয় দৃষ্টিগোচর হতে চলেছে: বৈরাগ্যসাধন বোধহয় তাঁর পথ নয়। তিনি বোধ হয় চেষ্টা করলে ভাল-বাসতে পারেন। ভালবাসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। জীবনের অর্থ যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। মানুষকে ভালবাসা, জীবনকে ভালবাসা, অন্যের সঙ্গে একাত্মীভূত হওয়া এই বোধহয় ব্যক্তি-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কাম্য। মানুষ জীবনকে ভালবাসে, সুন্দরতর করে গড়তে চায়—তাই মানুষ আনন্দের সঙ্গে বাঁচে, বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের শত্রুকে নিপাত করে। হ্যাঁ, এই জীবনের অর্থ।

পাঁচ মাস পরে সঞ্জীব সেনকে অভিভাবন দিয়ে হিপনটাইজ করা গেল। মস্তিষ্কের টাইপ অনড়, অপরিবর্তনীয় নয়। প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র উদ্বুদ্ধ হল: পঞ্চেন্দ্রিয়াভিত্তিক রূপ-রস-গন্ধের জগৎ তিনি ফিরে পেলেন।

—মনোবিদ

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুরোনো নাটকের মধ্যে মিশর কুমারীর অভিনয় দর্শক সাধারণকে রীতিমতো আকৃষ্ট করছে। মিনার্ভায় মিশর কুমারীর অভিনয়ে দর্শক সমাগমে উৎসাহিত হয়ে দিলোয়ার তো ১ ডিসেম্বরের অভিনয় শেষে বলেই বসলো, আগামী সপ্তাহে আবার মিশর কুমারী অভিনয়ের কথা।

বললাম, না, না ও-কাজ কোরো না। বরং দু'চার সপ্তাহ যাক, তারপর অভিনয় হবে। নয়তো আসছে সপ্তাহে এই মিশর-কুমারী অভিনয় হলে, এতো টিকিট বিক্রী হবে না। সব কিছু ভেবেচিন্তে করতে হয়। একমাস বাদে মিশরকুমারী অভিনয় হোক, দেখবে আজকের মতো টিকিট বিক্রী হয়েছে।

আপাততঃ শান্ত হলো দিলোয়ার।

১ ডিসেম্বরের আরও খবর, সন্তোষ সিংহের মিনার্ভায় যোগদান, আর শৈলেন চৌধুরীর মিনার্ভা ত্যাগ।

আসা-যাওয়ার পথ তো খোলাই আছে।

আনন্দমঠ নিয়ে এ-দেশের মুসলমান সমাজের একাংশের বিরূপ মনোভাবের কথা কারো অজানা নয়। বিশেষ করে বন্দে-মাতরম সঙ্গীতটি সম্পর্কে তাদের মনোভাব আরো কঠোর।

আনন্দমঠের নাট্যরূপ 'সন্তান' রিহার্সাল চলছে। এরই মধ্যে ৮ ডিসেম্বর আজাদ পত্রিকায় আনন্দমঠ এবং বন্দেমাতরম সম্পর্কে মুসলিম সমাজের প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশিত হলো। ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধেও সেই একই প্রতিবাদ।

আনন্দমঠ এবং বন্দে মাতরম মুসলমান-দের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানবে—সুতরাং এ নাটক অচিরেই বন্ধ হওয়া উচিত, এই হলো আজাদের মোদ্দা কথা।

ঐ দিনেই আমরা আজাদের প্রতিনিধি-দের আমন্ত্রণ করলাম নাটকের পাণ্ডুলিপি শোনার জন্যে। শোনানোও হলো। বলা-বাহুল্য শোনানোর দায়িত্বটা আমার ওপরেই পড়লো।

নাটকের সংলাপ বা অন্য কিছুর ওপর তাঁদের আপত্তি নেই—যতো আপত্তি 'বন্দে-মাতরম' সঙ্গীত নিয়ে।

বললেন, গানটা বাদ দিন।

বললাম, সে কী করে সম্ভব?

—কেন, ওর জায়গায় ওই রকম কোন গান লিখিয়ে নিন।

—আপনারাই বলুন না, সেটা কী করে সম্ভব। এই গানের পরিপূরক কি অন্য কোন গান হতে পারে?

আরো নানাভাবে বোঝানো হলো আজাদের প্রতিনিধিদের। কিন্তু তাঁদের এক কথা, এ গান রাখা চলবে না। তাঁদের কথা, নাটক সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দেমাতরম গান নাটক থেকে বাদ দিতে হবে।

কথার মধ্যে চা-পানের জন্যে অনুরোধ করলাম। সৌজন্যের খাতিরে চা-পানও করলেন না। জানালেন, এই অসময়ে তাঁরা চা-পান করবেন না।

আজাদের প্রতিনিধিরা চলে যেতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। কারো বক্তব্য, এ নাটক বন্ধ যাক আপাততঃ, কারো বক্তব্য, বিজ্ঞাপনে না জানিয়ে বন্দে-মাতরম গাইলেই হবে।

এই জোলো বক্তব্য শুনে বললাম, সে কী হয়—এই মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া ঠিক হবে না। বরং বন্দেমাতরম সঙ্গীত নাটকে থাকবে, এই কথাটাই জানিয়ে রাখা ভালো। তবে আমার মনে হয়, বর্তমানে এ ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। শেষটা থিয়েটারকে কেন্দ্র করে যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে, তাহলে কী ঘটবে, তাতো বুঝতেই পারছো?

দেখলাম, আমার কথা অনেকেরই মনে ধরলো না। যাই হোক, আমি পরে শুনলাম এই ব্যাপার, নিয়ে বাণীকুমার, শরত এবং অশোক শাস্ত্রী শেষ পর্যন্ত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে গেলেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তাঁর যোগ্য কথাই বলেছেন; নাটক চালিয়ে যাও—বন্দেমাতরম সঙ্গীতও গীত হোক। আজাদ প্রতিবাদ করেছে এবং করুন।

পরদিন আজাদে প্রকাশিত হলো একটি খবর, যেটি সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুললো। সংবাদে প্রকাশিত হলো, রঙ্গ-মহল কর্তৃপক্ষ নাকি বন্দেমাতরম সঙ্গীত বাদ দিয়েই সন্তান অভিনয় করবে।

সেদিনের রঙমহলের অভিনয় শেষে আমরা এক বৈঠকে মিলিত হলাম। অশোক শাস্ত্রী, বাণীকুমারও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা চললো। দেখলাম, অধিকাংশের মনোভাব একই। সন্তান অভিনয় হবে, বন্দে-মাতরমও থাকবে।

আমি বললাম, আমিও তাই চাই! কিন্তু অন্য দিকটা চিন্তা করা দরকার। এই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ধরে নেওয়া যাক, আমরা সন্তান অভিনয় করছি। অগণিত দর্শক এসেছে। তার মধ্যে নারী, বৃদ্ধ, শিশুও আছে। তারই মধ্যে থিয়েটার আক্রান্ত হলো। হবে না, একথা কি কেউ বলতে পারে? যদি তেমন অঘটন কিছু ঘটে, তখন কি হবে!

কথাটা সবাই ভাবলো। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, অনেকেই মত দিলেন, আপাততঃ বন্ধ থাক সন্তান অভিনয়।

তাই সাব্যস্ত হলো। ১২ ডিসেম্বর থেকে বিশ শতাব্দী নাটকের রিহার্সাল শুরু হলো। পরদিন ১৩ ডিসেম্বর সংবাদ-পত্র মারফত ঘোষণা করা হলো সন্তানের অভিনয় আপাততঃ স্থগিত থাকবে। কারণ, কিছুই বলা হলো না।

এর ফলে, আমাকে এক বিচিত্র অবস্থায় পড়তে হলো। আমার নামে বিরূপ মন্তব্য প্রচারিত হলো। আমিই নাকি সন্তানের অভিনয় বন্ধ হবার জন্যে দায়ী, আমিই নাকি বন্দেমাতরম বিরোধী। আর এই অপ-প্রচারের মূলে ছিলেন অশোক শাস্ত্রী এবং বাণীকুমার।

রঙমহল নতুন করে শাজাহান নাটকের অভিনয়ের কথা ঘোষণা করলো। কিন্তু নাটকে আমি অংশ নিতে পারলাম না। দুর্বল স্বাস্থ্যই এর কারণ।

পনেরোই ডিসেম্বর তারিখ রঙ্গ-জগতের কাছে নতুন খবর দিলো। দক্ষিণ কলকাতায় কালিকা থিয়েটারের উদ্বোধন নিঃসন্দেহে নতুন খবর। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী থিয়েটার হলের উদ্বোধন করেন।

কিন্তু কালিকা রঙ্গের পাদপ্রদীপের আলোয় প্রথম অভিনয় হলো ২২ ডিসেম্বর। প্রথম নাটক শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল।'

সব খবরই ভালো, কিন্তু আমাকে নিয়ে একটা শুরু হলো। রঙমহলের বাইরের দেয়ালে বাংলা ইংরেজীতে পোস্টার পড়লো, বন্দেমাতরম সংগীতকে অবমাননা করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, তাই পোস্টার পড়েছে বয়কট অহীন্দ্র চৌধুরী।

রঙমহলের দেয়ালের পোস্টার যদিও সন্তোষ ব্যানার্জী তুলে ফেললেন, কিন্তু উত্তর কলকাতার অন্যত্র যে পোস্টার পড়েছে সেগুলো তুলে ফেলা তো সম্ভব নয়। তবুও থিয়েটারের লোক গিয়ে যতদূর পারে তুলে ফেললো। আমার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের নেপথ্যে ছিলেন অশোক শাস্ত্রী এবং বাণীকুমার।

পোস্টার পড়ুক আর যাই হোক, রঙমহলে সেদিন অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বরের নাটক ছিল ভোলা মাস্টার। বুকিং অফিসে 'বয়কট অহীন্দ্র চৌধুরী'র কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নি। অভিনয় চলাকালীন কিম্বা তার আগে-পরে আমার সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্যও উচ্চারিত হয় নি। তবে রাত্রে অশোক শাস্ত্রী, বাণীকুমার এবং মাসিক বসুমতী সম্পাদক ভারতী পন্ডিত এলেন। তাঁরা অফিসে এসে জানতে চাইলেন, সন্তান কবে থেকে আরম্ভ হবে। শুনলাম, কর্মী ও আর যারা সবাই বলেছেন, আমরা তো বলতে পারবো না, আপনারা অহীন-বাবুর কাছে যান। তাঁরা কেউ-ই আমার কাছে আসতে রাজী হলেন না।

রঙমহল থেকে ফিরে তাঁরা শচীন সেনগুপ্তের কাছে গেলেন। সেখানে শচীনবাবুকে তাঁরা বললেন, আমার বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন যথারীতি চালিয়ে যাবেন। শচীনবাবুও নাকি আমার সম্পর্কে কিছুটা বিরূপ কথা বলেছেন শুনলাম।

আমি কেমন যেন বিব্রত বোধ করলাম এই 'বয়কট অহীন্দ্র চৌধুরী' আন্দোলনে। আন্দোলন বললে ভুল হবে, কজনের খাম-খেয়ালী ব্যাপার ছাড়া এটা আর কিছু নয়। তাছাড়া আমি তো এ-ব্যাপারের বাইরে। 'বন্দেমাতরম' আমার কাছেও দীক্ষার মন্ত্র, আমি ভাবতেই পারি না 'বন্দেমাতরম' সংগীতকে অমর্যাদা করার কথা—অথচ আমাকেই সেই দুর্ভাগ্যের অংশীদার করতে চাইছেন কয়েকজন। আশ্চর্য!

ঘটনা এর পর বেশী দূর এগোয় নি। অশোক শাস্ত্রী, বাণীকুমার এঁরা মিটিং করেছেন, কলেজ স্কোয়ার নিয়ে। উদ্দেশ্য অহীন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করা। সেখানে শরৎ গিয়েছিল। সে-ই শুনে আসে সভার বক্তব্য। তারপর শরৎ সমস্ত ব্যাপারটা বসুমতীর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কাছে প্রকাশ করে। হেমেন্দ্রবাবু সমস্ত ব্যাপার শুনে একটা মীমাংসার সূত্র বার করেন এবং শরৎকে বলেন, আমি যেন আসল ঘটনা বিবৃত করে স্টেটমেন্ট তৈরি করে দিই। দিলামও।

এই প্রসঙ্গে অসংকোচে সত্য প্রকাশ করলাম। শাস্ত্রী মহাশয়রা চেয়েছিলেন যে, আমরা মুখে বলবো, নাটক থেকে বন্দে-মাতরম বাদ দেব, কিন্তু মঞ্চে গাইবো। আমি বলেছিলাম, এ-ধরনের মিথ্যার প্রশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। যদি বন্দেমাতরম গাইতে হয়, তাহলে সে-কথা জানিয়ে রাখাই ভালো; তা নইলে ও-নাটক বন্ধ থাক।

হেমেন্দ্রবাবু আমার বিবৃতিটুকু পড়ে, শুধু একটি লাইনের পরিবর্তন করতে বলে-ছিলেন। নয়তো আর সবই ঠিক ছিল।

শেষপর্যন্ত হেমেন্দ্রবাবু আমাদের এই মিথ্যা বিরোধে বিচারকের ভূমিকা নিলেন। বিরোধ মিটিয়ে দিলেনও। শুনেছি, অশোক শাস্ত্রীকে নাকি তিনি বলেছিলেন, 'তুমি বাপু পন্ডিত মানুষ, অধ্যাপনাই তোমার কাজ। এই সব নাটকের ব্যাপারে তুমি মাথা গলিও না। এসব তোমার জন্যে নয়'।

কিন্তু ইতিমধ্যে 'ভগ্নদূতে' আমার বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। ফোনে সে-খবরটা আমরা পেলাম রঙমহলে বসে নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছ থেকে। শুনে আমি ভগ্নদূতের শিশির বোসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি এটা কী করলে, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

শিশির বললে, বেশ তো—তুমি বক্তব্য রাখো, আমি কাগজে ছেপে দিচ্ছি।

কিন্তু সে-সবের আর দরকার হলো না। হেমেন্দ্রবাবু সবকিছুর ফয়সালা করে দিলেন। আমি যে বিবৃতি লিখেছিলাম, সেটি লিখতে সাহায্য করেছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অহীন্দ্র চৌধুরীকে বয়কট করো' আন্দোলন শুরুতেই শেষ হলো। তার জন্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে ধন্যবাদ।

রঙমহলে এরপর আরম্ভ হলো 'বিজয়া'। আমি এ-নাটকের একজন অভিনেতা।

এই সময়ে শ্রীরঙ্গম দিন-দুয়েক বন্ধ ছিল। তারপর সেখানে আরম্ভ হলো শরৎ-চন্দ্রের বিন্দুর ছেলে। এ-নাটকে বিন্দুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সাবিত্রী (পলি)। এছাড়া প্রভা ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও ছিলেন। শিশিরবাবু এ-নাটকে অংশগ্রহণ করেননি। তিনিই ছিলেন পরিচালক।

বড়দিনের সপ্তাহে প্রতিটি মঞ্চে নতুন নাটকের আকর্ষণ। স্টারে 'অযোধ্যার বেগম' উদ্বোধন হলো ২১ ডিসেম্বর, ঐ দিনই মিনার্ভায় শুরু হলো তারাশংকরের 'দুই পুরুষ'। দুই পুরুষের বিশিষ্ট শিল্পী নির্মলেন্দু লাহিড়ী সেদিন অভিনয় করতে পারেননি অসুস্থতার জন্যে। তাঁর জায়গায় অভিনয় করলেন শৈলেন চৌধুরী।

পরদিন তেইশে ডিসেম্বর কালিকায় আরম্ভ হলো 'বৈকুণ্ঠের উইল'।

রঙমহলের প্রতীক্ষিত নাটক তারা-শংকরের 'বিংশ শতাব্দীর' শুভ উদ্বোধন হলো ২৫ ডিসেম্বর।

নাটক ভালোই জমলো। দর্শক সমা-গমও ভালো। তবে নাটকের কয়েকটি দৃশ্য যেন একটু পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে।

'বিংশ শতাব্দী'র নিয়মিত অভিনয় চললো। বড়দিনের আকর্ষণ হিসেবে এ-নাটক দর্শককে আকৃষ্ট করলো।

১৯৪৪-এর বিদায়ের দিন এগিয়ে এলো। পুরোনো দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালাম। আমার কাছে এই বছরটি যেন একটি দুঃস্বপ্নের বছর।

দুঃস্বপ্নের বছরের শেষ দিনটিও শেষ হলো।

'বিংশ শতাব্দী' যথারীতি চলতে লাগলো। অনেক আশা ছিল এই নাটকটির ওপর। তারাশংকরবাবু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নাটক সম্পর্কে অনেক আশা পোষণ করতেন, কিন্তু 'বিংশ শতাব্দী' সে-আশা পূর্ণ করলো না। তবে নাটক খারাপ—এ-কথা বলবো না এবং কেউ-ই বলেনি। বরং বিদগ্ধজনের প্রশংসাই পেয়েছিল 'বিংশ শতাব্দী'।

এর মধ্যে নতুন করে 'সন্তান'-এর কথা সবার মনে এলো। যে সন্তান নিয়ে এতো কাণ্ড আবার সেই নাটক অভিনয়ের আয়োজন শুরু হলো। বাণীকুমারের সংগে যোগাযোগও করা হলো, কিন্তু শরতের পক্ষে অসুবিধে হলো সন্তানের পাণ্ডুলিপি পেতে।

এদিকে রঙমহলে 'ভোলামাস্টার' অভিনয় হলো ৪ জানুয়ারী। ভালোই হয়েছে সবদিক থেকে। এই সময়েই ফরিদ-পুর থেকে আমন্ত্রণ এসেছে রঙমহলের কাছে। সে আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছে রঙ-

মহল। যদিও আমি প্রথমে ফরিদপুরে যেতে চাইনি। পরে অবশ্য রাজী না হয়ে পারিনি।

৫ জানুয়ারী শরত দেখা করালো বাণীকুমারের সঙ্গে। বাণীকুমার 'সন্তান' পড়ে শোনালো। কিন্তু সেদিনেই সে পাণ্ডুলিপি দিলে না শরতের হাতে।

এদিকে যথারীতি চলছে 'বিংশ শতাব্দী।' তেমন সুবিধে হচ্ছে না। সন্তানের পাণ্ডুলিপিও এখনো হাতে আসেনি। সন্তানের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাণীকুমার এলো থিয়েটারে। সেদিন ছিল ৭ জানুয়ারী। নিজে হাতে সে পাণ্ডুলিপি দিয়ে গেল। ভালোই হলো।

পরের দিন থেকেই সন্তানের রিহার্সাল আরম্ভ। রিহার্সাল দিতে বোঝা গেল, বাণীকুমার নাটকটির অনেক পরিবর্তন করেছে।

বাণীকুমারের সঙ্গে শরতের কথাবার্তা হয়েছে নাটক সম্পর্কে—সে-কথা বাণীকুমারই আমাকে বললো। কিন্তু শরৎ এখন নেই। কোন কাজে বেরিয়ে গেছে। নয়তো বাকি কথাও হতো এখানে।

পরদিন বাণীকুমার আবার থিয়েটারে এলো। কথা হলো সন্তান উদ্বোধনের তারিখ নিয়ে। ১৮ জানুয়ারী নাটকটি উদ্বোধন হবে। কিন্তু আমি আপত্তি জানাবো ভেবেছিলাম। কারণ, দল যাচ্ছে ফরিদপুরে। ফরিদপুর মুসলমান-প্রধান অঞ্চল—আমাদের দল সন্তান অভিনয় করবে এ-কথা যদি জানাজানি হয়, তবে সেখানে কিছু অঘটন ঘটা বিচিত্র নয়। দেশের এই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এ-চিন্তাটা খুব অমূলক নয়। সুতরাং ফরিদপুর থেকে না ফিরে কি সন্তান অভিনয় যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু চিন্তাটা আমার মনের মধ্যেই রয়ে গেল। এ নিয়ে কিছু বললাম না। কারণ, 'না' বলতেই এর আগে এই নাটকের ব্যাপারে আমাকে নিয়ে অনেক কিছু ঘটে গেছে। সুতরাং চুপ করে থাকাই ভালো।

৮ জানুয়ারী রঙমহলের কক্ষেই শরতের সঙ্গে বাণীকুমারের লিখিত চুক্তি হলো। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে অশোক শাস্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন।

'সন্তান' উদ্বোধন হলো ১৮ জানুয়ারী। এ-নাটক উদ্বোধন হবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সুধী দর্শকের মনে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। উদ্বোধন রজনীর অভিনয়ে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

নাটকে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সত্যানন্দের ভূমিকায়, মহেন্দ্রের ভূমিকা ছিল শরতের, জীবানন্দ ছিলেন অমল, আর ভবানন্দের ভূমিকাটি ছিল মিহির ভট্টাচার্যের, স্ত্রী ভূমিকার অন্যতম শিল্পী ছিলো শান্তি গুপ্তা আর সুহাসিনী।

নাটকে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি গাইতো মৃণালকান্তি ঘোষ। এই বন্দেমাতরম সঙ্গীত গীত হবার সময়ে দর্শক-সাধারণ উঠে দাঁড়াতেন। নাটকের মাঝখানে এ-গান, অথচ মৃণালকান্তি গাইবার সময়ে দু' হাত তুলে দর্শক-সাধারণকে উঠে দাঁড়াতে বলতো। দর্শকরা উঠে দাঁড়াতেন।

প্রথম দিনে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস আমাদেরকে উৎসাহিত করলো। প্রথম দিনের অভিনয় সর্বদিক থেকে সার্থক, শুধু 'আনন্দমঠের' দৃশ্যে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ-ব্যবস্থা কিছুক্ষণের জন্য বিকল হয়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলেছিল আমাদেরকে।

পরদিন সন্তানের দ্বিতীয় রজনীর অভিনয় শেষে অশোক শাস্ত্রী, বাণীকুমার, নিবারণ দত্ত প্রমুখ সঙ্গীতসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

বুঝলাম, 'সন্তান' একটি মঞ্চসফল নাটক। শুধু তাই নয়, এই নাটকের আবেদনও সর্বজনীন।

এরপর দু'দিন, ২০ এবং ২১ জানুয়ারী 'বিংশ শতাব্দী' অভিনয় হলো। সন্তান-এর পর এ-নাটকের ওপর আশা রাখা মিছে।

২২ জানুয়ারী আমাদের ফরিদপুরে রওনা হবার পূর্ব-নির্ধারিত দিন। ঐদিন ঢাকা মেলযোগে আমরা রওনা হলাম। এ-যাত্রায় আমার ভৃত্য নিলু আমার সঙ্গেই ছিল। আমি আর শরৎ একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ছিলাম। অন্য যাত্রীরা অপর কামরায়। কোন রিজার্ভেশন ছিল না।

সারারাত আমাদের জেগে কাটাতে হলো। ভোর ছ'টায় ফরিদপুর পৌঁছলাম। তখনো অন্ধকার ছিল।

ফরিদপুর শহরের একান্তে, কিছুটা জনকোলাহলের বাইরে আমাদের জন্যে আশ্রয় নির্দিষ্ট হয়েছে। সেখানে গেলাম। সারাদিনটা একরকম বিশ্রামের মধ্যে কাটলো। ঐদিনেই আমাদের 'শাজাহান' অভিনয় করতে হবে, মেলা-প্রাঙ্গণে।

প্রথম দিনের নাটক ছিল শাজাহান, দ্বিতীয় দিনের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল দু'টি নাটক। প্রথম নাটক কর্ণার্জুন অভিনয় হলো বিকেল তিনটায়। নাটকে তেমন দর্শক সমাগম হয়নি। দ্বিতীয় নাটক 'ভোলা-মাস্টার' মঞ্চস্থ হলো রাত আটটায়। অজস্র দর্শক সমাগম হয়েছিল। তিল ধারণের জায়গা ছিল না কোথাও।

ফরিদপুরের এরপরের দু'দিনের অনুষ্ঠানে আরো দু'টি নাটক অভিনীত হয়েছিল। মাটির ঘর এবং বিজয়া। শেষের দিন মেয়েরা মঞ্চে নৃত্যও পরিবেশন করেছিল। ফরিদপুরের অনুষ্ঠান শেষে আবার কলকাতায় ফেরার পালা। যথাদিনে ট্যাক্সী নিয়ে রাজবাড়ি স্টেশনে এলাম।

আমাদের প্রত্যাবর্তনের ট্রেন গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার।

কলকাতায় ফিরেছি। ফিরে আসার পরে বিংশ শতাব্দীর বিংশতিতম রজনীর অভিনয়ে অংশ নিলাম।

একটি দুঃসংবাদ পেলাম ৮ ফেব্রুয়ারী। অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত। কিছুদিন আগেও সে ছিল শ্রীরঙ্গমের শিল্পী। কিন্তু তার শ্রীরঙ্গমের কাজ চলে যায়। তারপর থেকে থিয়েটারে আর কাজ নেই। শুনেছি, মধ্যবর্তী সময়ে সে একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ নিয়েছে। কাজের সঙ্গে সে একটা থিয়েটার খোলার উদ্যোগ-আয়োজনেও ব্যস্ত। ঠিক এমনি সময়ে সে এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো। খবরটা আমার কাছে দারুণ দুঃখের।

১০ ফেব্রুয়ারী ছিল 'সন্তান'-এর সপ্তম অভিনয় রজনী। ঐ দিনেই রঙমহলে সন্তোষ ব্যানার্জির কাছে শুনলাম বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ।

বিশ্বনাথের মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন প্রিয়জন বিয়োগ-ব্যথায় কেঁদে উঠলো।

আজ থিয়েটার বন্ধ থাকলে আর বড়ো কথা কী! রঙমহলে ...নের দেব রইলো।

বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে-ব্যথা পেলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তাছাড়া বার বার মনে হলে শেষটা বড়ো কষ্ট পেয়েছে সে। তার মৃত্যুর সময়ে সে স্ত্রী আর পাঁচটি শিশু সন্তান রেখে গেছে—যাদের কথা মনে হ... দুঃখটা আরো বেশি করে বাজলো।

১১ ফেব্রুয়ারী ছিল শিবরাত্রি উৎসব। এদিন সারারাত্রব্যাপী নাটকাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল রঙমহলে। তবে ম্যাটিনি নাটক ছিল বিংশ শতাব্দী।

রঙমহলের সারারাতের অভিনয় শুরু হলো সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সে-রাতের নাটক ছিল সন্তান, শিবচতুর্দশী, রামের সুমতি আর কর্ণার্জুন।

(ক্রমশঃ)

খাঁচার ইতিহাস

সুভাষ সিংহ

NITAI GHOSH

হরিপদর নাক মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছিল। সে তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে বাইরে আসার চেষ্টা করল। ফলে কয়েকজনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। সে তাদের কটু কথা নিঃশব্দে হজম করে অতিকষ্টে মানুষজনের ভীড় ঠেলে রাস্তায় পা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর শক্ত হাতে বাজারেরথলি আঁকড়ে হন্‌-হন্‌ করে এগোল।

যখন হরিপদ কোন কারণে রেগে যায়, বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলা তার অভ্যাস। এবং তখন আত্মমগ্ন থাকার ফলে বাইরের কোন কিছু তাকে স্পর্শ করে না। পথ চলে অনেকটা নিশি-পাওয়া মানুষের মত। আর এইসব মুহূর্তে অধিকাংশ সময় সে পথ হারিয়ে ফেলে।

প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় সে যে প্রতি-নিয়ত অপমানিত হচ্ছে, এ বিষয়ে হরিপদর কোন সন্দেহ নেই। এবং মধ্য বয়সে পৌঁছে তার বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়তর হচ্ছে যে, মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করাই যত অপরাধ! সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত ফলভোগ তাকে করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

আজ, একটু আগে, বাজারে এক মেছোনী পর্যন্ত তাকে সকলের সামনে অপমান করল। মাছের দর নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে মেছোনী তার গায়ে নোংরা জল ছিটিয়ে মিশি দেওয়া কালো দাঁত বের করে কুৎসিতভাবে হেসে উঠেছিল। হরিপদ অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে পালিয়ে এসেছে।

হরিপদ একটা বিড়ি ধরাল। দু' একটা টান মারতেই নিভে গেল বিড়িটা। দূর শালা! সবেগে বিড়িটা সে দূরে নিক্ষেপ করল। উত্তেজনায় সে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটতে থাকে। ওদিকে অনুপমা মাছ না আনার জন্যে গজগজ করবে। বড় ছেলেটির বয়স দশ। ছোটটি মেয়ে। পাঁচ বছরের। না, আর কোন বাচ্চা-কাচ্চা...হওয়ার

সম্ভাবনা নেই কেননা গত বছর সোনাদানা বেচে এক রকম জোর করে অনুপমাকে অপারেশানে রাজী করিয়েছে। কিছুতেই হবে না। নানা রকম অসুবিধের কথা জানিয়েছে। কোন কথা শোনে নি হরিপদ।

মাস গেলে কেটেছেঁটে হাতে পায় আড়াই শো টাকা। বাড়ি ভাড়া দুধ গয়লা কয়লা কাঁচা বাজার অসুখ-বিসুখ ছেলে-মেয়েদের বই কেনা মাইনে ইত্যাদি... প্রতি মাসে মাইনে পাবার আগে হরিপদ বাজেট করে। মশার কামড় খেতে খেতে বিড়ি টানে আর খুক-খুক্ করে কাশে। প্রতি মাসে ধার করতে হয়। কেরানী বাবুদের কাছে ধার পায় না। বেয়ারাদের কাছে হাত পাততে হয়। উপায় কী? অনুপমার শরীরটা যে রোগের ডিপো। রোজই একটা না একটা লেগে আছে—পেট ব্যথা থেকে সুরু করে আমাসা...সব সময় ধৈর্য থাকে না হরিপদর। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেগে যায় তুমুল ঝগড়া। তুচ্ছ কারণে।

এ পাড়ায় নতুন এসেছে হরিপদ। কাউকে বিশেষ চেনে না। তাছাড়া মানুষ-জনের সঙ্গে মেলামেশায় সে তেমন অভ্যস্ত নয়। অফিস আর বাড়ি। ছুটির দিনে কদাচিত স্ত্রী আর ছেলেমেয়েসহ বেড়াতে বেরোয়। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি, বাদাম অথবা আইসক্রীম ছেলেমেয়েদের কিনে দেওয়া, অনুপমার জন্যে জরদা পান—এর বেশি এগোতে ভয় পায় হরিপদ।

বাঁদিকে একটা চায়ের দোকান। হরিপদ একটু থমকে দাঁড়াল। এক কাপ চা, সকালে একবার হয়েছে অবশ্য; একটু বেশি ভক্ত সে চায়ের—এ জন্যে কম কথা শোনায় না অনুপমা। চা এবং বিড়ির ওপর অনুপমার যত রাগ। মাঝে মাঝে তার মনে হয় ছেড়ে দেবে—কী হয় এসব না খেলে!

ছোঁড়াগুলি যেভাবে ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, প্রায় সবার মুখ চেনা, এ পাড়ার ছেলে, না, ঢুকবে না সে চায়ের দোকানে। হরিপদ এদের দূরে থেকে দেখলেই এড়িয়ে যায়। এদের জন্যে আরাম করে বসে একটু চা খাবার উপায় নেই! দিনরাত আড্ডা মারছে। যত সব! সে মুখ ফিরিয়ে তাড়া-তাড়ি হাঁটতে থাকে।

—এই যে বড়দা শুনুন।

থমকে দাঁড়াল হরিপদ। পিছন ফিরে তাকিয়েই সে চোখ ঘুরিয়ে নিল। হ্যাঁ, তাকেই ডাকছে। কেন? টের পেল শরীরে মৃদু কম্পন। বুকে ঢিবঢিব শব্দ।

—আপনার নাম হরিপদ নন্দী? ওই লাল বাড়িটার একতলায়...।

মাথা নাড়ল হরিপদ। হুঁ সব খবর এরা রাখে। সে একটু হাসার চেষ্টা করল। এক ফাঁকে হাতঘড়ি দেখে নিল। প্রায় আটটা বাজে। ইস্ আজ নির্ঘাৎ লেট্ হবে অফিসে পৌঁছতে।

এদের মধ্যে লম্বা ছেলেটি প্রথম থেকেই কথা বলছিল। পরনে টাইট শার্ট আর চোঙা প্যান্ট। বুকের বোতাম খোলা। কপালের ওপর একগুচ্ছি চুল কায়দা করে নামানো। লম্বা জুলপী। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

—আমার নাম শিবু। এরা আমার বন্ধু। বলে সে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চার পাঁচটি ছেলের পরিচয় দিল। সব পাড়ার ছেলে।

শিবু পকেট থেকে একটা রসিদ বের করে বলে, বড়দা, বেশি ধরিনি—মাত্র পঞ্চাশ। আজ দিতে পারলে ভাল হয়... হে-হে-হে বুঝতেই পারছেন স্যার, কত কাজ পড়ে রয়েছে। ঠাকুর বায়না দেওয়া, প্যান্ডেল মাইক...ঠিক আছে বড়দা, কাল সকালে বরং আপনার কাছে যাব।

বিল বই থেকে রসিদটা কেটে হরিপদর বুক পকেটে এক রকম জোর করে গুঁজে দিল শিবু। হরিপদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—তার মানে? হরিপদ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, পঞ্চাশ টাকা চাঁদা—ইয়ারকি নাকি! তোমরা ভেবেছো কী?

শিবুর মুখে রাগের কোন চিহ্ন নেই। বরং সে বন্ধুদের দিকে সহাস্যে তাকাল। অন্য ছেলেগুলি যেন খুব মজা দেখছে এমন ভঙ্গিতে হরিপদর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছিল। রাস্তায় পথচারীরা যে-যার হেঁটে যাচ্ছে। এদিকে কেউ তাকাচ্ছে না।

হরিপদ আর দাঁড়াল না। শিবুর দিকে একবার কট্‌মট্ করে তাকিয়ে এগিয়ে যায়। দু' চার পা এগিয়েছে তখন শুনল শিবুর অট্টহাসি। সেই সঙ্গে অন্য ছেলেগুলিও হো হো করে হেসে উঠল। ওদের সম্মিলিত হাসির ধাক্কায় হরিপদ কাঁপতে কাঁপতে এক রকম ছুটে বাড়ি পৌঁছল।

রান্নাঘরে বাজারের থলি রেখে হরিপদ তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে যায়। এখনও শরীর কাঁপছে। ইয়ারকি করছিল কী শিবু? অন্য দিনের তুলনায় আজ কয়েক ঘটি জল বেশি ঢালল মাথায়। শত তাড়া-তাড়ি করলেও শেষ পর্যন্ত দেরী হবে অফিসে পৌঁছতে।

—দেরী কর না। খেতে দাও।

হরিপদ মাথায় দ্রুত চিরুনি চালায়। তক্তপোষের ওপর বসে বড় ছেলে নান্টা জোরে জোরে বই পড়ছে। মেয়ে বুলা বড় বড় চোখে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে। বিছানার চাদর এলোমেলো। মেঝেতে একরাশ শাড়ি শায়া ব্লাউজ ফ্রক। মলিন দেয়াল। এখানে সেখানে আলতার দাগ। ড্রেসিং টেবিলের ওপর পাউডারের কৌটো স্নোর শিশি চুলের ফিতা অত্যন্ত অযত্নের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এ-সব দেখতে দেখতে হরিপদ দাঁতে দাঁত ঘষে স্বগতোক্তি

করল। তারপর হঠাৎ এগিয়ে বুলার চুলের মুঠি ধরে গালে একটা থাপ্পড় মারল। আকস্মিক আঘাতের জন্যে মেয়েটা প্রস্তুত ছিল না। সে সশব্দে কেঁদে উঠল। নান্টা পড়া থামিয়ে বাবার নিষ্ঠুর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করল।

—ওকে মিছিমিছি মারলে কেন? অনুপমার পরনে ময়লা শাড়ি ব্লাউজ। আঁচলে হলুদের দাগ। নাক চোখ মুখ মোটামুটি সুশ্রী। গায়ের রঙ হয়ত এক সময় ফর্সা ছিল। এখন কেমন বিবর্ণ ফ্যাকাসে। রোগা শরীরে সে দরোজার একটা পাল্লা ধরে হাঁফাতে থাকে।

হরিপদর মাথায় আগুন জ্বলে যায়। সে শার্টের বোতাম আটকাতে আটকাতে বলে, ভাত বেড়েছো?

বাজার দেখে অনুপমার মেজাজ ঠিক ছিল না। অযথা মেয়েটাকে মারা...এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন ভস্ম করে দেবে! হঠাৎ এমন পাষণ্ডের মত ব্যবহার সুরু করল কেন লোকটা?

—একটু দেরী হবে। ডাল রয়েছে উনুনে। অনুপমা ছেলের দিকে তাকিয়ে ধমক দিল, হাঁ করে কী শুনছিস?

ধমক খেয়ে নান্টা চিৎকার করে পড়া শুরু করল। বুলার হাত ধরে অনুপমা রান্নাঘরে এল। টের পেল পিছনে হরিপদর উপস্থিতি।

—এতক্ষণ কী করছিলে? একেই দেরী হয়ে গেছে...। হরিপদ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়।

হনহন্ করে হাঁটতে থাকে হরিপদ। দশটা পনেরোর ট্রেন যে-করেই হোক ধরতে হবে। এগারোটা বেজে যাবে অফিসে পৌঁছতে। অর্থাৎ এক ঘণ্টা লেট। বে-সরকারী অফিস। কড়া নিয়ম-কানুন। বিশেষ করে অফিস হাজিরার ব্যাপারে। এক পলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে প্রায় ছুটতে থাকে। কোনদিকে তাকায় না। কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। সে কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করল না।

স্টেশনে পৌঁছে হরিপদ দেখল ট্রেন সবে ছেড়েছে। সে লাফ দিয়ে এক হ্যান্ডেল ধরল। অসম্ভব ভীড় ও গাড়িটায়। ইলেকট্রিক ট্রেন। মুহূর্তে জোরে চলতে সুরু করেছে। ঢিবঢিব কর বুক। লোহার রড বারবার পিছলে যা প্রচন্ড হাওয়ায় চোখে অন্ধকার দেখল ও

—দাদা, একটু ভিতরে ঢুকতে দি কাতর কন্ঠস্বর হরিপদর, ও শুনছেন!

—কোথায় ঢুকবো। দেখছেন কিভাবে দাঁড়িয়ে আছি—মাছি ঢোকবা পর্যন্ত জায়গা নেই।

নিঃশ্বাস চেপে হরিপদ হ্যান্ডেল শক্ত হাতে চেপে ধরল। মিনিট পাঁচেক কোন

রকমে যেতে পারলে ... দিন দিন মানুষজন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কোন রকম দয়ামায়া নেই। সে দু'চোখ বন্ধ করে অফিসের কথা ভাবতে থাকে। খাওয়াই হোল না আজ। যাকগে অফিসে পৌঁছে কিছু আনিয়ে নেবে। অনুপমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে রাত্রে। এরকম বেয়াড়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে আর বেশী দিন বসবাস করতে পারবে না সে। হুঁ এর একটা বিহিত করা দরকার।

পরের স্টেশনে হরিপদ বসার জায়গা পেল। আশে পাশে কিছু চেনা মুখ। সে আয়েস করে একটা বিড়ি ধরাল। ফাল্গুনের মাস শেষ হতে চলেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পকেট হাতড়ে রুমাল খুঁজে পেল না। ধুতির কোঁচা দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটেছে। চামড়া পচা গন্ধ নাকে ভেসে এল। সে নাক কুঁচকে দু'চোখ বন্ধ করল।

—এই যে হরিপদ বাবু, ঘুমুচ্ছেন নাকি?

হরিপদ চোখ খুলে একটু সরে বসে বঙ্কুবিহারীকে জায়গা করে দিল। বঙ্কুবিহারী আর সে একই অফিসে কাজ করে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসার দরুন দু'একজন যাত্রী হরিপদর দিকে অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকাল।

—কবে থেকে আপনাকে ডাকলাম—তা আপনি শুনতেই পেলেন না। বঙ্কুবিহারী একটা পান মুখে পুরল। [illegible] পকেট থেকে চশমা বার করল। বঙ্কুবিহারীর চেহারাটা একটু ভারী। [illegible] মুখে [illegible] ঘাম জমেছে। [illegible] চোখ দুটোর দিকে তাকালে মনে হবে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

পার্ক সার্কাস স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে এগিয়ে ট্রেন হঠাৎ থেমে গেছে। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল ছাড়বার কোন লক্ষণ নেই। যাত্রীদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন। নানা রকম মন্তব্য ভেসে এল হরিপদর কানে।

—আপনার দেরী হোল কেন? হরিপদ একটু আড়চোখে দেখল বঙ্কুবিহারীকে।

—সকালবেলায় মেয়েটার হঠাৎ পায়খানা বমি শুরু হোল। বঙ্কুবিহারীর সমস্ত মুখে কান্নার আভাস। জানেন তো ফট্ করে অফিস কামাই করা ... এদিকে ট্রেনের অবস্থা দেখুন ... বুঝলেন হরিপদ বাবু, পাব্লিক অকারণে খেপে যায় না ... এই দেখুন কাগজে কী লিখেছে...।

হরিপদর চোখের সামনে কাগজ খুলে ধরল বঙ্কুবিহারী। বড় বড় হরফে হেডিং— বোমার আঘাতে তিনজন নিহত।

পড়ার সময় পেলনা হরিপদ—বঙ্কুবিহারী চট্ করে সরিয়ে নিল কাগজ। তারপর বলল, কী আর পড়বেন। মানুষের জীবনের কোন দাম নেই মশাই!

কয়েকজন যাত্রী এদিকে তাকিয়ে। তাদের চোখের দৃষ্টি বুঝতে পারল হরিপদ। সে বঙ্কুবিহারীকে চোখের ইসারায় চুপ করতে বলে। লোকটার এই এক বদভ্যাস। খালি বক্‌বক্ করবে। কখন কী বলতে হয় জানেনা। চুপ করুন মশাই! শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল হরিপদ।

—কী হোল? বঙ্কুবিহারী এক মুখ হেসে বলে, ভয় পাবেন না। আঃ ট্রেনটা ছাড়ল দেখছি! নিন একটা পান খান।

—থাক। হরিপদ গম্ভীর মুখে বঙ্কুবিহারীর দিকে তাকাল, কাগজটা দিন তো।

—আপনার হয়েছে কী মশাই? বুঝেছি, পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন।

বঙ্কুবিহারীর খ্যাক্‌খ্যাক হাসি দেখে হরিপদ রেগে যায়। আশেপাশের আরও দু' চারজন যাত্রীদের মুখে হাসি। না, লোকটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। সে গুম হয়ে বসে রইল। ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে মেলামেশাটা বন্ধ করতে হবে। হাসি ঠাট্টার একটা সময় আছে। খবরটা পড়তে পারল না। প্রকাশ্য রাজপথে নাকি বোমা নিক্ষেপ। উঃ মনে মনে শিউরে উঠল হরিপদ।

অন্য একজন যাত্রী বিড়ি টানতে টানতে বলছে, বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, শুধু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এই চাঁদাটাঁদা না কী ব্যাপার নিয়ে। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তা শেষ পর্যন্ত অপঘাতে মরল। অন্ধকার রেল লাইন দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। পেছন থেকে বোমাটা এসে লাগল ঠিক মাথায়—বস সব শেষ। আহা! ভদ্রলোকের মুখটা এখনও চোখের সামনে ভাসছে।

শুনতে শুনতে গা গুলিয়ে ওঠে হরিপদর। বিবর্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকায়। বঙ্কুবিহারী ঝিমুচ্ছে। গাড়ি স্টেশনে ঢুকতেই হরিপদ নিঃশব্দে উঠে পড়ল। দরোজার সামনে দাঁড়াল। পিছনে বঙ্কুবিহারী কী যেন বললে। ভালভাবে ট্রেন থামার আগেই সে লাফ দিয়ে নামল। তারপর প্রায় ছুটতে সুরু করল।

রীতিমত ঘেমে নেয়ে অফিসে পৌঁছল হরিপদ এগারোটা নাগাদ। সীটে বসতে না বসতেই হুকুম—আর কি, ম্যানেজার সাহেব ডাকছেন। হরিপদ একটু নার্ভাস হয়ে ওঠে। বেয়ারার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

—তাড়াতাড়ি যান নন্দীবাবু। সায়েব দু' তিনবার আপনার খোঁজ করেছেন।

—রাখ তোমার সায়েব! হরিপদ চেয়ারে আরাম করে বসল, এক গ্লাস ঠান্ডা জল দাও বিষ্টু। ট্রেন মাঝ পথে থেমে গেলে... তোমার সায়েবকে যদি আমাদের মত রোজ রোজ বাস ট্রাম ট্রেন ঠেঙিয়ে...। বলতে বলতে হঠাৎ সে চেয়ার থেকে উঠে ম্যানেজার সায়েবের চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায়।

বিষ্টু মুখ টিপে হাসল, উঃ যত বড় বড় কথা আমাদের সামনে...সায়েবের কাছে গিয়ে তো ভিজে বেড়াল বনে যায় বাবুরা!

যাক্ কোন রকম ঝামেলায় পড়ে নি—হরিপদ একটা ফাইল খুলে ধুতীর অগ্রভাগ দিয়ে ঘাড় গলার ঘাম মুছল। তারপর এক চুমুকে গ্লাসের সমস্ত জল পান করল। একবার চোখাচোখি হল বঙ্কুবিহারীর সঙ্গে। খচ্চরটা এল কখন? আবার দাঁত বের করে হাসছে। হরিপদ গম্ভীর মুখে ফাইলের ওপর চোখ বুলোয়। জরুরী ফাইল। ম্যানেজার সায়েব হাসি-মুখে কথা বলছিলেন। না, দেরী হওয়ার জন্যে কৈফিয়ত চান নি। ফাইলটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এই জন্যেই ডাকা।

কাজে মন দিতে পারে না হরিপদ। এতক্ষণ কী পড়ল কিছুই মনে পড়ছে না। বারবার মনে পড়ছে সকালের ঘটনা। শিবুর অট্টহাসি। রাজপথে বোমার আঘাতে তিনজন নিহত। ট্রেনের সেই ভদ্রলোক বলছিল... না, এখন কোন রকম কাজ তার দ্বারা হবে না। টের পেল বেশ খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে আঙ্গুল কাঁপছে।

—এই বিষ্টু। শুনে যাও। হরিপদ চিৎকার করে ডাকল। পাশের টেবিলে বসে কাজ করে এক ছোকরা। সীটে নেই। বাথরুমে গেছে হয়ত। বঙ্কুবিহারী খবর কাগজ খুলে লুকিয়ে পড়ছে। ব্যাটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ।

—বলুন। বিষ্টুর মুখের ভাব বেশ অপ্রসন্ন।

—রাগ করলে বাবা। হরিপদ একটু মোলায়েম হেসে বলে, তোমাদের দয়ায় বেঁচে আছি। কিছু খাবার এনে দাও। এই মুড়ি আর বাতাসা। আর এক কাপ চা। তুমি খাবে?

—না। বিষ্টু নিঃশব্দে হরিপদর হাত থেকে টাকা নিয়ে চলে যায়।

ব্যাপারটা কী? হরিপদ নিজেকেই একটা ধমক দিল। কোথায় কী হচ্ছে সে নিয়ে অত চিন্তা ... ফাইলের দিকে মন দাও, এটার গতি আজই যে করতে হবে। নইলে ম্যানেজার সায়েব রাগ করবেন। এই শহরে প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনায়, বোমার আঘাতে কত লোক মরছে—কে তার হিসেব রাখে! আর অত ভাবলে কী মানুষ বাঁচতে পারে?

মুড়ি বাতাসা চা খেয়ে হরিপদ কাজ সুরু করল। সীটে বসে কাজ করবার জো নেই—এই ফাইলটা চাই, অমুক রেফারেন্স খুঁজে বের কর। দূর শালা! এভাবে কী কাজ করা যায়?

—নন্দীবাবু, এখনও বসে আছেন? চলুন চা খেয়ে আসি।

—আপনি যান। পরে যাব।

—মশাই এত কাজ করলে খাবে কে! শুনেছেন নাকি খবরটা?

—কী? হরিপদ কলম রেখে একটা বিড়ি ধরাল। ওর টেবিলের সামনে চার পাঁচজন জড়ো হয়েছে। সবার চোখে মুখে উত্তেজনা।

ডেসপ্যাচের বনমালী কুন্ডু বলে, শিয়ালদার দিকে গন্ডগোল। গুলি চলেছে। দু' দলের মধ্যে বোমা মারামারি। দু'জন মারা গেছে আর পাঁচ সাতজন আহত।

—কী নিয়ে গন্ডগোল? হরিপদ বিড়িটা পর্যন্ত টানতে পারল না ভালভাবে। কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে।

—কে জানে! বনমালী চোখ বড় বড় করে বলে, একটা হলেই হোল।

—নন্দীদা সাবধানে বাড়ি ফিরবেন। পাশের টেবিলের ছোকরা শেখরের মুখ বিবর্ণ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ—মাঝখান থেকে আমাদের মত সাধারণ মানুষদের...। জানেন, বেকার সমস্যাই হচ্ছে এ-সবের কারণ।

—থাম হে ছোকরা! প্রবীণ মহেশ চাটুজ্জে বলেন, তুমি যা জান না, সে বিষয়ে কথা বলতে এসো না। এ হচ্ছে ঘোর কলিকাল—পাপের ফলভোগ করতে হবে। গীতায় কী বলেছে জান?

—চুপ করুন দাদু! বনমালী ভেংচি কাটল, আপনি আর গীতা-ফিতা আওড়াবেন না। বলে সে হনহন করে এগিয়ে যায়।

—দেখলে হরিপদ। বনমালীর কী উচিত আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলা?

হরিপদ কোন কথা না বলে বাইরে এল। মরুককে সব' সে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। ক্যান্টিনে ইচ্ছে করে গেল না। দেখা হলে আবার ওইসব খুন জখম... শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে! আর ভাল লাগে না—হচ্ছে হোক। অনেকটা ঐ শ্লোগানের মত ঃ চলছে চলবে।

উঃ দু' হাত দিয়ে কান চেপে ধরল হরিপদ। আশেপাশের মানুষজন সেই একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। আর কী বিষয় নেই আলোচনার? সে আধকাপ চা খেয়ে দাম মিটিয়ে বাইরে এল। তারপর সোজা অফিসে ঢুকে নিজের সীটে বসে ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

বিকেলের দিকে হরিপদ থমথমে মুখ নিয়ে সীটে বসে অস্থিরভাবে মাথার চুলে আঙুল চালায়। না, সামান্য একটা চিঠিও সে এতক্ষণের মধ্যে লিখতে পারল না। অথচ ছুটি হতে বেশি দেরী নেই। ম্যানেজার সায়েব একটু পরে ফাইল চেয়ে পাঠাবেন। কী জবাব দেবে সে? বারবার লিখতে গিয়ে ভুল হচ্ছে। কাগজ ছিঁড়ে ফেলছে। এতক্ষণ সে ভাবছিল কী?

বড়বাবুর টেবিলের সামনে হরিপদ ফাইল হাতে দাঁড়াল।

—স্যার। প্রায় কান্নার সুরে হরিপদ বলে, আমার গা বেশ গরম। কেমন বমি বমি লাগছে।

—বাড়ি চলে যাও।

—কী করে যাব স্যার। ম্যানেজার সায়েব এই ফাইলটা দিয়েছেন—আজই নাকি দিতে হবে। আপনি যদি একটু কাইন্ডলি দেখেন—লিখতে পারছি না, হাত কাঁপছে।

বড়বাবু একটু বিরক্তির সুরে বলেন, আগে দিলেই পারতে। যাকগে টেবিলের ওপর রেখে দাও। সাবধানে বাড়ি যেয়ো নন্দী—শুনলাম শিয়ালদার কাছে নাকি গন্ডগোল হয়েছে।

হরিপদ কৃতার্থের ভঙ্গিতে হাসল, ধন্যবাদ স্যার। একটু দেখবেন।

সীটে ফিরে কাগজপত্র গুছিয়ে হরিপদ এদিক ওদিক তাকাল। বঙ্কুবিহারী ফাইল খুলে ঝিমুচ্ছে। বিষ্টুটা আবার গেল কোথায়! নিশ্চয়ই করিডোরে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। দিনকাল পালটে গেছে। বেয়ারাগুলি পর্যন্ত কথায় কথায় আইন কানুন দেখায়। এক গ্লাস জল দিতে বললে পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়।

—চললেন নাকি নন্দীদা?

—হ্যাঁ ভাই। শরীরটা খারাপ—জ্বরটর হোল কিনা বুঝতে পারছি না।

শেখরের দিকে এক পলক তাকিয়ে হরিপদ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে করিডোরে এল।

—এই বিষ্টু শোন।

হরিপদ খানিকটা দূরে দাঁড়ায়। কেউ দেখে ফেললে নানারকম প্রশ্ন করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তায় বেরোতে পারলে ...বিষ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে একটু দমে যায়।

—কী? বিষ্টু ছটফট করে ওঠে, তাড়াতাড়ি বলুন নন্দীবাবু। ম্যানেজার সায়েবকে কফি দিতে হবে।

—বাবা বিষ্টু। হরিপদ কাতর চোখ মুখ করল, আস্তে ভাই। বড় বিপদে পড়েছি—গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে হবে। আহা, আগেই মাথা নাড়িয়ো না। তোমার প্রাপ্য সুদ পাবে।

—এখন হাতে টাকা নেই। খেয়াল আছে বাবু মাসের শেষ।

—তা জানি। হরিপদ এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। তারপর বাঁ হাতের ঘড়ি খুলে বিষ্টুর ডান হাতে গুঁজতে চেষ্টা করল, এটা রেখে দাও। টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেব। আমাকে বিমুখ কোর না বিষ্টু। বলে সে বিষ্টুর একটা হাত জড়িয়ে ছলছল চোখে তাকায়।

বিষ্টু অপ্রসন্ন মুখে বলে, কী করছেন নন্দীবাবু! হাত ছাড়ুন। না, না, ঘড়ি রাখতে পারবো না। ঠিক আছে—আপনি একটু অপেক্ষা করুন। দেখি কোথাও পাই কিনা।

—বাইরে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি এসো বিষ্টু।

হরিপদ অফিস থেকে বেরিয়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। কী হবে অত মান অপমানের কথা ভেবে? পারলে বিষ্টুই টাকা দেবে। বঙ্কুবিহারী দেবে না। ওপরে ওপরে সব মৌখিক ভদ্রতা। ও-সবের দাম কী!

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হরিপদ অধৈর্য হয়ে উঠল। এখন অফিসের সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা রীতিমত অস্বস্তি-জনক। বিষ্টু এত দেরী করছে কেন সে ভেবে পেল না। ওর কাছে টাকা আছে। ওর সুদের কারবারের কথা সকলেই জানে। ক্রমশঃ একটা সন্দেহ হরিপদর মনে খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। বিষ্টু শেষ পর্যন্ত ভাওতা দেবে না তো?

—মশাই আপনাকে খুঁজছি। এখানে কী করছেন?

বঙ্কুবিহারী দুটো জর্দা পান বানাতে বলে দোকানীকে। ওকে দেখে হরিপদর মুখ কালো হয়ে ওঠে। ফালতু বক্‌বক্‌ করবে লোকটা। নানা রকম প্রশ্ন।

—খুঁজছেন কেন?

—এমনি। বঙ্কুবিহারী বিরাট হাঁ করে পান মুখে পুরল, সাবধানে বাড়ি ফিরবেন ওদিকে শুনলাম গন্ডগোল হচ্ছে।

হরিপদ হঠাৎ চটে উঠল, থামুন! নিজের কাজে যান।

—চটছেন কেন? আহা, আমি অন্যায়টা কী বললাম।

—বলছি তো নিজের কাজে যান। হরিপদ আর কথা বাড়াল না। কেননা বিষ্টু দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে বঙ্কুবিহারীর দিকে একবার ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে যায়।

বিষ্টু একটা খাম হরিপদর হাতে গুঁজে দেয়, মাইনে পেয়েই টাকাটা শোধ করে দেবেন বাবু। অন্যের কাছ থেকে ধার করে এনে দিলাম।

—বাঁচালে বাবা! হরিপদ আর মুহূর্ত দেরী করল না। দ্রুত হাঁটতে স[illegible] করল। লাফিয়ে বাসে উঠল। চৌরঙ্গী [illegible] বাড়ি ফিরবে। শিয়ালদার দিকে [illegible] গন্ডগোল।

হরিপদ জানত কোথায় ওরা আ[illegible] মারে। কী যেন নাম ক্লাবটার? হ্যাঁ, [illegible] পড়ছে ঃ ইয়ং মেনস্‌ ক্লাব। ভেজানো দরোজার বাইরে সে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

ভিতর থেকে নানা রকম শব্দ ভেসে আসছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে ঘামতে থাকে। মাথা ঘুরছে। সারাদিন খাওয়া

হয়নি। কেমন যেন বমি বমি ভাব। বুকের ভিতর ঢিবঢিব শব্দ। সে অনেকটা আচ্ছন্নের মত দরোজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

ঘরে মোমবাতীর আলো। দশ বারজন যুবক গোল হয়ে বসে তাস খেলছে। সিগারেটের ধোঁয়া গল্ গল্ করে ওপরে উঠছে। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ। মুহূর্তেই দম বন্ধ হয়ে এল হরিপদর।

—কী চাই? একটা ছেলে হরিপদর সামনে এসে দাঁড়াল।

হরিপদ কোন কথা বলতে পারল না। ঠোঁট কেঁপে উঠল থরথর করে। সে স্থির দৃষ্টিতে শিবুর দিকে তাকিয়েছিল। মাথা নীচু করে শিবু তাসের দিকে তাকিয়ে।

—কী মোশাই, কথা বলছেন না কেন? কাকে খুঁজছেন?

এবার শিবু মুখ তুলে তাকাল। তারপর তাস ফেলে হরিপদর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জড়ান গলায় বলে, এই যে বড়দা। আসুন স্যর। এক হাত খেলবেন নাকি।

হরিপদ নিঃশব্দে শিবুর নাকের সামনে খাম তুলে ধরল, তোমাদের চাঁদাটা এনেছি।

খপ্ করে খাম খুলে শিবু আঙ্গুলে থু থু লাগিয়ে গুনতে থাকে টাকা, জবাব নেই দাদা! অনেক ধন্যবাদ। আপনার জন্যে জান লড়িয়ে দেব। যখনই দরকার হবে ডাকবেন। বসুন। এক কাপ চা খেয়ে যান।

—আজ থাক! হরিপদ খোলা দরোজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর ঝাপসা চোখে টলতে টলতে হাঁটতে থাকে।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

লছমী আর কিছু বলতে পারেনি। অত্যন্ত বিশ্বাসী ডাক্তার আর

পাগলের মত আমি শিউপ্রসাদজির কাছে ছুটে গেলাম।

কেন? কেন আপনি লছমীকে গোপনে ডেকেছিলেন? ডেকেও তাকে গুলি করলেন কেন?

কোন কৈফিয়ৎ তোমায় দেব না!

খুনের এই কবুলতি তোমায় দিচ্ছি। নিয়ে বিদায় হও!

কিন্তু কোথায় কেমন করে এ ব্যাপার ঘটল তা কিছুই বলবেন না?

না। গোয়েন্দাগিরি করতে চাও ত চিড়িয়ামহল

চিড়িয়ামহলে বৃথাই ঘুরে চলে আসার সময়··

হঠাৎ মেঝের ওপর শিউপ্রসাদজির পিস্তলটা পড়ে থাকতে দেখলাম।

সে পিস্তলে হাত দেন নি ত?

তাই দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কুড়িয়ে নিতে

হঠাৎ ভুলটা বুঝলাম।

না, এ পিস্তল ছোঁয়া উচিত নয়!

আড়ষ্টের মত ফিরে গেছি। মনের মধ্যে তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অসহ্য যন্ত্রণা!

পুলিশকে এখুনি জানাব? তাহলে এ কবুলতি ত তাদের

চেক দেশের মেয়েরা ফুলদানি, প্লেট, কাপ, নানা ধরনের ব্যবহার্য ও সৌখিন দ্রব্যে ফুল লতা-পাতার অলংকরণ করছেন। ওদেশের এটি বহু প্রাচীন শিল্পকলা। সারা ইউরোপব্যাপী কেবলমাত্র নয়, আমেরিকা, কানাডা, জাপান এবং বহু দেশেই এই সমস্ত শিল্পসম্ভার বিপুল ভাবে সমাদৃত।

নারী প্রগতি : দেশে দেশে

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকান নারীদের স্বাধীনতা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। এবং তিনি ভেবেছিলেন, আমাদের দেশের মেয়েদের জীবনে যদি এরকম স্বাধীনতা আসতো। আমাদের দুর্ভাগ্য, নারী জাগৃতির মহান রূপটি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে দেখতেন যে, ঘর ছেড়ে মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে অজানা-অচেনা পথে—পরকে আপন করার দুরন্ত নেশায়। পাহাড়ের শিখরে-শিখরে আমাদের মেয়েরা ছুটে বেড়াচ্ছে দর্পভরে। এ থেকেই তিনি আঁচ করে নিতে পারতেন যে, অধিকার আদায়ের লড়ায়ে আমাদের মেয়েরা এগিয়েছে অনেকখানি! এতে তিনি ভীষণ স্বস্তিবোধ করতেন।

কিন্তু পরক্ষণেই যারপরনাই অস্বস্তিতে তিনি নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে করতেন আর ভাবতেন, এ জাতটার কোন দিন কিছু হবে না। তিনি নিশ্চয়ই শুনতেন, উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদাধিকারী জনৈক শ্রীচরণ সিং ভারতীয় নারী সমাজের এই ব্যাপক অগ্রগতিতে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। শুধু তাই নয়, হাত-পা ছুঁড়ে এর বিরুদ্ধে জেহাদও ঘোষণা করেছেন। পরিশেষে তিনি ভারতীয় নারী সমাজকে তাঁর বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন, জায়া এবং জননীরূপেই নারীর মাহাত্ম্য। এর বেশি তাঁদের কাছ থেকে আর আশা করা যায় না। কোন উচ্চ পদে তাঁদের শোভা পায় না। আর সেরকম যোগ্যতাও তাঁদের নেই। তাঁর আস্ফালন কিন্তু এখানেও শেষ হয় নি। এর পরও তিনি শূন্যে অসি ঘুরিয়েছেন। তিনি বীরদর্পে বলেছেন, প্রয়োজনবোধে সংবিধান সংশোধন করেও মেয়েদের অধিকার সংকোচন করা দরকার।

এ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই ধৈর্য রাখতে পারতেন না। হয়তো তিনি শ্রীচরণ সিং নামধারী সেই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের নারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন হতো না। কারণ দেশে-দেশে নারী সমাজের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার বিরাট ধুম পড়ে গেছে। একে অপরকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত। আর ভারতীয় নারী সমাজও তার অন্যতম শরিকানা নিয়েছে। সেখান থেকে একজন শ্রীচরণ সিংয়ের পক্ষে তাঁদের ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। এরকম কোন

পরিকল্পনা একমাত্র মূর্খের স্বর্গবাসের সঙ্গেই তুলনীয়। আর স্বামী বিবেকানন্দও পৃথিবীর বিরাট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নারী সমাজের যোগাযোগ দেখে অত্যধিক মুগ্ধ হতেন এবং ভাবতেন, যে কোন আক্রমণের মোকাবিলা এরাই করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আমেরিকার মহিলারা বহির্জগতের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সংবিধান স্বাক্ষরিত হওয়ারও বহু আগে। ১৮৮৭ সালে আমেরিকান সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়। সে সময়ে দেখা যায়, অনেক মহিলা পোস্টমাস্টার হিসাবে ১৫ বছর কাজ করেছেন। সময় হিসাবে এটা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু ব্যাপক অগ্রগতির কোন নজীর তখন পাওয়া যায় না। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে এবং এরপরেও বহুকাল সরকারী চাকুরির ক্ষেত্র প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পুরুষদের দখলে ছিল।

সম্প্রতি তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪০ সালের মধ্যে মোট শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা ৬৫ ভাগই ছিল নারী শ্রমিক। সামগ্রিক হিসাবে দেখা যায়, এই বর্ধিত সংখ্যক নারী শ্রমিকদের নিয়ে এঁরা সমগ্র শ্রমিকদের এক চতুর্থাংশে দাঁড়ান। বর্তমানে এই সংখ্যা আরো বেড়েছে। নারী শ্রমিকের সংখ্যা এখন মোট শ্রমিক সংখ্যার প্রায় দুই পঞ্চমাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অবশ্য একথা উল্লেখ করতেই হবে যে, এঁদের মধ্যে শতকরা ৩৪জন হচ্ছেন করণিক। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কারিগরি ক্ষেত্রে নারীরা কাজকর্মের সবচেয়ে বেশি সুযোগ পাবেন।

স্বাভাবিকভাবে কাজকর্মে আমাদের বয়ঃসীমা ৫৮ বছর। এর বেশি বয়স্ক খুব কমই দেখা যায়। মেয়েদের তো নয়ই। কিন্তু আমেরিকার এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ এক হিসাবে দেখা গেছে যে, ৪৫ থেকে ৬৪ বছরের নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ। এই সময়ের মধ্যে সেদেশে ৪৫ থেকে ৬৪ বছরের সকল মহিলাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি নানা কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত মার্কিন শ্রমিকের সংখ্যা ১০ কোটিতে এসে দাঁড়াবে। আর তার শতকরা ৪০ ভাগ হবে নারী শ্রমিক।

অফিসে-আদালতে মেয়েদের প্রবেশাধিকার অবাধ হয়েছে। কিন্তু রণাঙ্গনে নয়। সৈন্যবাহিনীতে তারা এখনও অচ্ছুত। এরই মধ্যে সর্বপ্রথম মহিলা সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়োগের খবর এসেছে খোদ আমেরিকা থেকে। এলিজাবেথ পি হয়সিংটন এবং অ্যানা এথ-হেস মার্কিন সৈন্যবাহিনীর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন। বলাবাহুল্য, নিয়োগ কর্তা খোদ প্রেসিডেন্ট নিক্সন। মার্কিন সেনাবাহিনীর ১৯৩ বৎসরের ইতিহাসে এঁরাই সর্বপ্রথম মহিলা সেনাধ্যক্ষ।

একথা অবশ্য সত্য, আমেরিকার নারী সৈন্যবাহিনী রয়েছে। এবং এলিজাবেথ তাঁদেরই নেতৃত্ব করবেন। তিনি ১০০০ অফিসার এবং ১২০০০ নারী সেনা নিয়ে গঠিত বাহিনীর প্রধান। আর জেনারেল হেস ৭০০০ পেশাদার নার্স এবং ১০,০০০ আধা পেশাদার নার্স নিয়ে গঠিত আর একটি বাহিনীর নেতৃত্ব করবেন।

১৯৩ বছর ধরে নারীর ন্যায্য অধিকারকে উপেক্ষা করেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর সব দেশেই এমনি কত উপেক্ষা। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর বীরত্ব এখনো শিহরণ জাগায়। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক না কেন! সুলতানা রিজিয়া থেকে মহারাণী ঝান্সী এবং অযোধ্যার বেগমের বীরত্ব রক্ত অক্ষরে খোদাই করা রয়েছে প্রতিটি ভারতীয়ের বুকে। সে কোনদিন ভুলবার নয়।

ওমরাহদের চক্রান্তর বিরুদ্ধে সুলতানা রিজিয়ার অস্ত্রধারণ এবং রণাঙ্গনে আবির্ভাব, শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলায় চাঁদ সুলতানা আর রাণী দুর্গাবতীর অতুলনীয় বীরত্ব, ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে রাণী লক্ষ্মীবাই আর লক্ষ্ণৌর রাজপথে অযোধ্যার বেগমের অতুলনীয় সংগ্রাম আমাদের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সেই মহান অগ্রবর্তীদের পথ বয়ে আমরা চলেছি। অথচ প্রায় ঘরকুনোর পর্যায়ে পড়ে গেছি আমরা। আবার নতুন জাগরণ শুরু হয়েছে। তার ঢেউ সর্বত্র সমানভাবে প্রসারিত করে দেওয়াই হবে আমাদের কর্তব্য।

অফিস-আদালত থেকে রণাঙ্গন। বিজ্ঞানের গবেষণাগার পর্যন্ত প্রসারিত আমাদের কর্মকাণ্ড। মৌলিক গবেষণায় শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায় সারা বিশ্বের মনযোগ আকর্ষণ করেছেন। কৃত্রিম উপায়ে ধান তৈরির কৌশল আবিষ্কার করে শ্রীমতী ....বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে দেশে দেশে মহিলা বিজ্ঞানীদের সাফল্যের নানা চমকপ্রদ খবর নিত্যই আমাদের গোচরে আসছে।

এমনি একটি চমকপ্রদ খবর এসেছে আমেরিকার তরুণ মহিলা বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে। সেদেশের পাঁচজন মহিলা বিজ্ঞানী সমুদ্রগর্ভে অনুসন্ধানী প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করছেন। তাঁরা দু'সপ্তাহ সমুদ্রতলে অবস্থান করছেন। সমুদ্রগর্ভে পূর্ণ অনুসন্ধানী অভিযানে ইতিপূর্বে আর কোন মহিলা বিজ্ঞানী অংশ নেননি।

এসব মহিলা বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক বাস্তুব্যবিদ্যা এবং জীববিদ্যা বিশেষজ্ঞ। এই অনুসন্ধান অভিযান সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম সম্পর্কেও তাঁরা বিশেষ ওয়াকিবহাল সমুদ্রগর্ভে যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় সে বিষয়ে তাঁরা শিক্ষা নিয়েছেন। সাঁতারেও সকলেরই বিশেষ দক্ষতা আছে। তবে কেউ পেশাদার ডুবুরী নন।

সমুদ্রের ৫০ ফুট নীচে এই অভিযানে মহিলা অভিযাত্রী দলকে প্রথম তাঁদের সমুদ্রনিমজ্জিত গবেষণাগারের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। তাঁরা সাঁতার কেটে সেখানে পৌঁছান। তারপর যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমুদ্রগর্ভে তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে তা এঁটে নিয়ে দরকারি উপকরণসমূহ ভাল করে দেখে নিলেন। এই গবেষণাগারের দুটি ছোট ঘরে তাঁদের দু'সপ্তাহ কাটাতে হবে। আঠার ফুট উঁচু দুটি ঘরই দুপাশে তৈরি যার ব্যাস সাড়ে বার ফুট। দুটির মধ্যে যোগাযোগ হলো একটি সুড়ঙ্গপথ। আবার প্রত্যেকটি ঘর দুভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ এই গবেষণাগারে আছে মোট চারটি কামরা। মহিলা বিজ্ঞানীরা প্রতিদিন এই গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৫০০ ফুট পর্যন্ত তাঁদের সাঁতার কাটতে হবে। তাঁরা সামুদ্রিক ঘাস, বিভিন্ন প্রকার মাছের খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

এই মহিলা বিজ্ঞানীদের এজন্য বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়েছে। সমুদ্রগর্ভের গবেষণাগারের বাইরে থাকার সময় ৬০ পাউন্ড ওজনের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের বেশ ভারি ও জটিল যন্ত্রটি তাঁদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে থাকবে। এটির ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের বিশেষভাবে অভ্যস্ত হতে হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রগর্ভে গবেষণাগারের বাইরে তাঁরা ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাটাতে পারবেন।

—[illegible]

প্রেক্ষাগৃহ

যথার্থ প্রেমের সন্ধানে

বোম্বাইয়ে নির্মিত হিন্দী ছবির সাম্প্রতিক ধারা থেকে **ও, পী, রালহান প্রযোজিত, পরিচালিত এবং অভিনীত সাড়ম্বর রঙীন ছবি** 'তালাশ' আদৌ বিচ্যুত নয়। যদিও স্বীকার করতে বাধা নেই, দর্শক সমক্ষে আদর্শ উপস্থাপিত করার চেয়ে ছবিটিকে আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য করার দিকেই শ্রীরালহান মনোযোগ দিয়েছেন বেশী। এবং এই প্রচেষ্টায় তিনি যে শতাংশের সবটুকুই সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পেরেছেন, তা' প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীর মুহুর্মুহু সমবেত হর্ষধ্বনি থেকে অনুমান ক'রে নেওয়া কঠিন নয়।

'তালাস'-এর নায়ক গরীব বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। মা যথাসর্বস্ব পণ করে ছেলেকে শিক্ষিত ক'রে তুলেছেন এবং তার সামনে রেখেছেন সদা সত্যপথে চলবার মহান আদর্শ। এই পথে চ'লে রাজকুমার—এইই হচ্ছে ছেলেটির নাম—সামান্য টাইপিস্ট থেকে মালিকের কোম্পানীর অংশীদার পর্যন্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য তার এই উন্নতির মূলে মালিকের একটি বিশেষ স্বার্থ-চিন্তাও কাজ করেছিল। তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান সুন্দরী, বিদুষী মধুর ওই সৎ ছেলেটির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সব দিক রক্ষা করতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজকুমার মধুকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল; কারণ সে গৌরী নামে এক পল্লীবালাকে ভালোবাসে এবং কোনো প্রলোভনেই সে তাকে ছেড়ে মধুকে বিবাহ করতে পারে না। এক বিশেষ পূর্ণিমা রজনীতে ওদের বিবাহ হওয়ার কথা। কিন্তু রাজকুমারের পৌঁছুতে বিলম্ব হওয়ায় গৌরী হয়ত' আত্মহত্যারই পথ বেছে নিল। —এরপর আসন্ন বিপদ এড়িয়ে কি ক'রে সকল দিক রক্ষা হ'ল, তাই নিয়েই ছবির শেষ চমকপ্রদ অংশ গড়ে উঠেছে।

মূল এই কাহিনীর সঙ্গে রাজকুমারের বন্ধু ও শুভকামী লচ্ছুর প্রেমকাহিনী জুড়ে রয়েছে ছবিতে কিছুটা উত্তেজনা ও কিছুটা হাস্যরস সরবরাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রযোজক-পরিচালক রালহান আমাদের অনু-মানকেও পরাস্ত ক'রে যে-বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন, তার তুলনা নেই। কিন্তু পাঠক-দের কাছে গোপন তথ্য ফাঁস ক'রে আমরা সেই বিস্ময়ের সৌধ চূর্ণ করতে চাই না।

কাহিনীর ছকের মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে যথেষ্ট। গৌরীর সঙ্গে প্রেমের কথা রাজকুমার মধুর কাছে অত দেরীতে ব্যক্ত করল কেন? মেয়েকে গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করবার জন্যে শিল্পপতির আচরণ হাস্যকর।

জয়-জয়ন্তী/পরিচালনা : সুনিল বসুমল্লিক/অপর্ণা দেবী। ফটো : অমৃত

অভিনয়ে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শর্মিলা ঠাকুর দুই ভিন্নধর্মী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে। মধু ও গৌরী—প্রথম জন প্রায় আট ন বছর বয়স থেকে বিদেশে শিক্ষিতা, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, ধনী কন্যা; দ্বিতীয়জন পার্বত্য দেশের অশিক্ষিতা সরলা কিশোরী। উভয়ের চরিত্র-বিশেষত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি একই নায়কের কাছে প্রেম নিবেদনের ভূমিকাটিকে পর্যন্ত আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। কিন্তু যা সবচেয়ে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে ও দর্শকদের কাছে অসামান্যভাবে আকর্ষণীয় বোধ হয়েছে, সে হচ্ছে গৌরীর ভূমিকায় তাঁর সম্মোহনী নৃত্য; তাঁর লাস্যনৃত্য-লীলা যে কি চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে, তা দেখে উপলব্ধি করার বস্তু বর্ণনার নয়। নায়কের ভূমিকায় রাজেন্দ্রকুমার যথাসাধ্য সংযম ও সহজভাবে তাঁর নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশের প্রচেষ্টা করেছেন। নায়কের বন্ধু লচ্ছুবেশে প্রযোজক-পরিচালক ও, পী, রালহান তাঁর সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে ছবিতে বৈচিত্র্য এনেছেন। লচ্ছুর প্রেমিকা-বেশে নৃত্যপটিয়সী হেলেন অভিনয়েও অল্প কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। শিল্পপতির

ভূমিকায় বলরাজ সাহনী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় সপ্রু, সুলোচনা, সজ্জন, জীবন, রণধীর প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবিটি যে অজস্র অর্থব্যয়ে নির্মিত, তার প্রমাণ এর সর্বাঙ্গে। তুষারাবৃত পার্বত্য প্রদেশ এবং অন্যান্য মনোরম দৃশ্যাবলী, বিরাট বিরাট বর্ণাঢ্য অন্তর্দৃশ্য, প্রতিটি সেটে ব্যবহৃত আসবাবপত্রাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি দর্শককে সোচ্চারে বলছে—অকৃপণ অর্থব্যয়ের কথা। কুড়ি রীল দীর্ঘ ছবিটিতে নৃত্যগীতের দৃশ্য আছে অনেকগুলি এবং প্রতিটিই দর্শক মনোরঞ্জক।

মৃণাল সেন পরিচালিত ইচ্ছা পূরণ/শিল্পী ঃ সুরজিৎ নন্দী

কিন্তু এই যে অর্থব্যয়, এই যে আড়ম্বর, তার তুলনায় কাহিনীটি কতই না অকিঞ্চিৎকর!

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অজস্র প্রশংসা করতে হয় শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনার। বিরাট প্রাসাদের হলঘর, অন্যান্য কক্ষ, অলিন্দ, সোপানশ্রেণী প্রভৃতিতে যে বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্যই বিস্ময়কর। এবং সুদীর্ঘ ছবিটিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী টেম্পো বজায় রেখে সম্পাদকও তাঁর আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'তালাস'-এর সংগীতাংশ ছবির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। মজরু রচিত গীতগুলিতে শচীন দেববর্মণের সুর যোজিত হয়ে যে মাদকতার সৃষ্টি করেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল প্রেক্ষাগৃহে সমবেত বহু দর্শককে ছবির গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইবার প্রচেষ্টা করতে দেখে।

জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ও. পী [illegible]-কৃত বিরাট চিত্র 'তালাস' অবি[illegible]দীভাবে সার্থকতা লাভ করেছে।
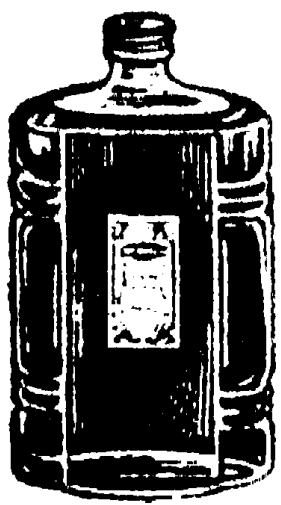
যাকে তুমি বল পাপ, ক্ষেত্রবিশেষে তাই হয়ে দাঁড়ায় পুণ্যকর্ম

পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়—সবই আপেক্ষিক। আজকের পৃথিবীতে সত্যে মিথ্যায় দ্বন্দ্ব নয়, সত্যের সঙ্গে সত্যের দ্বন্দ্ব—বৃহৎ সত্যের সঙ্গে ক্ষুদ্র সত্যের

বেচারা কেদারনাথ! আওরচাঁদ অ্যান্ড কোম্পানীর ঘড়ির দোকানে যে ঘড়ি মেরামতকারী হিসেবে যে-চাকরীটি পে[illegible] একটি গরীব পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী প্রৌঢ় পান্নালালকে অন্যায়ভাবে [illegible]সারিত করবার পরে যে সেই পদটি খাল[illegible] হয়েছিল, তা কি সে জানত? জানলে সে যে ঐ চাকরীটি কিছুতেই গ্রহণ করত না, পান্নালালের দুঃখব্যঞ্জক চিঠিটি পাবার পরে উদভ্রান্তভাবে তাকে খুঁজে বেড়ানোর মধ্যেই তার প্রমাণ সে দিয়েছে। চাকরী হারিয়ে অনন্যোপায় পান্নালাল নিশ্চয়ই আত্মহত্যা

করেছে—অন্তত এই ইঙ্গিতই ছিল তার চিঠিতে। অথচ যখন তার মেয়ে বীণা বাপের খোঁজে দোকানে এল, তখন এই নির্মম সত্য সে কি তার কাছে প্রকাশ করতে পারে? বেচারা পান্নালালের মৃত্যুর জন্যে সে যে নিজেই দায়ী। অতএব নিতে হল মিথ্যার আশ্রয়; বলতে হল, জরুরী কাজে মালিক তাকে বোম্বাইয়ে পাঠিয়েছেন। এবং নিতে হল তাকে পান্নালালের পরিবারের ভার। তার থাকার ঘর কাছেই ঠিক করে দিয়েছেন বীণার মা, পান্নালালের স্ত্রী। কেদারের জন্যে স্নেহশীলার স্নেহ যেন আর ধরে না। মেলামেশার মাঝে বীণাকে ভালোবেসে ফেলল কেদারনাথ। কিন্তু যখন সে শুনল, বীণার বিবাহ এমন এক জায়গায় ঠিক হয়েই আছে, যেখানে না হলে ওদের বিপদে পড়তে হবে, তখন কেদারনাথ মনকে সংযত করে বীণার সেই বিবাহকে সম্ভব করে তোলবার জন্যে আর একটি অন্যায়ের আশ্রয় নিল; মালিক যে টাকা দিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে জমা দিতে, তাই এনে তুলে দিল বীণার মায়ের হাতে মালিকের দান বলে। বিবাহ শেষে কেদারনাথ হল উধাও; তার ইচ্ছে অন্যত্র রোজগার করে সে মালিকের অর্থ ফেরত দেয়। অন্য এক শহরে দিনরাত বাড়ি মেরামতের কাজ করে সে যে-টাকা উপার্জন করছিল, মাত্র দুধ-চিনি ছাড়া চা এবং সস্তা দামের সিগারেট খেয়ে প্রায় সব টাকাই সে মালিকের নামে পাঠাল। এর পর এই আপাতপাপী চোখে যখন কম দেখতে লাগল, দেহে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন কেমনভাবে তার সম্বন্ধে সকল সত্য কথা উদ্ঘাটিত হল এবং সে কেমন করে আবার সুস্থ জীবনপথে প্রতিষ্ঠিত হল, তাই নিয়েই কিরণ প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং রাজেন্দ্র ভাটিয়া প্রযোজিত ও পরিচালিত 'পবিত্র পাপী' ছবিটির শেষ পর্ব রচিত।

ছবির বক্তব্যটি যে সুন্দর, এসম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না। একজন প্রৌঢ়ের চাকরী যাওয়ায় যে-চাকরী পাওয়া, সে-সম্বন্ধে অপরাধবোধটিও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। কিন্তু পান্নালাল বেঁচে থেকেও কেমন করে নিজের স্ত্রী-কন্যাদের সম্পর্কে উদাসীন হয়ে রইল, তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত। এবং বীণার যে-বিবাহের জন্যে ওর মা এত লালায়িত, সেই বিবাহের পর বীণা যে তার মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত স্বামী দ্বারা নিগৃহীত হবে, এ-খবর কি তাঁর জানা ছিল না? কেদারনাথের চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্যে বীণার ঐ অবাঞ্ছিত বিবাহের কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? দার্শনিক ফকিরের আবির্ভাব আমাদের যাত্রাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আধুনিক বহু হিন্দী ছবিতেই দেখা যাচ্ছে, দর্শকদের সামনে একটি সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপিত করবার সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েও ছবির নির্মাতারা কাহিনী বিস্তারে এমন কষ্টকল্পিত অবাস্তবতার আশ্রয় গ্রহণ করছেন যা ঐ উদ্দেশ্যকে করছে অনেকাংশে ব্যর্থ। একটি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয় সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে যে অহেতুকভাবে হাস্যকর হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ নানা ছবির মতো এ-ছবিতেও কিছু কিছু আছে। তবু বলব, বক্তব্যের গৌরবে 'পবিত্র পাপী' ছবিটি চিত্রামোদীদের কাছে সমুচিত আদর পাবার যোগ্য।

অভিনয়াংশে নায়ক কেদারনাথের ভূমিকায় অজয় সাহনী একটি অন্তরস্পর্শকারী দরদী অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। নায়িকা বীণার ভূমিকায় তনুজা প্রথম দিকে যে প্রাণোচ্ছল ও শেষ দিকে বেদনার্ত অভিনয় করেছেন, তা হচ্ছে ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ। শ্রীমতী নটনৈপুণ্যের শিখরে সুদৃঢ় পদক্ষেপে আরোহণ করেছেন। ঘড়ির দোকানের মালিকরূপে আই এস জোহর একটি জীবন্ত চরিত্রাভিনয় করেছেন। প্রৌঢ় পান্নালালবেশে বলরাজ সাহনী অত্যন্ত স্বচ্ছন্দস্ফূর্ত স্বাভাবিক অভিনয়ের নিদর্শন দেখিয়েছেন। কেদারনাথের হিতাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্যের অভিনয়ও হয়েছে স্বাভাবিক ও দরদী। মা মায়াদেবী রূপে অচলা সচদেব অত্যন্ত সুঅভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে ঘড়ির দোকান, রাস্তা, মহল্লা প্রভৃতি দৃশ্য শিল্পনির্দেশকের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার পরিচায়ক। বেদ রাহী লিখিত ছবির সংলাপ বহু স্থানেই উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে। ছবির সাতটি গানের মধ্যে বীণা ও তার সখীদের নাচ-গান প্রচুর উপভোগ্য। কেদারের মুখের 'তরে দুনিয়াসে হোকে মজবুর' গানটি আবহ-সঙ্গীতরূপে প্রয়োগ করলে ঢের বেশী অন্তরগ্রাহী হত।

কিরণ প্রোডাকসন্স নিবেদিত ও সোনানী ফিল্মস পরিবেশিত 'পবিত্র পাপী' ছবিটিও বক্তব্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট সার্থক এবং সুন্দর অভিনয়ের জন্যে দর্শক-হৃদয়কে জয় করবার ক্ষমতা রাখে।
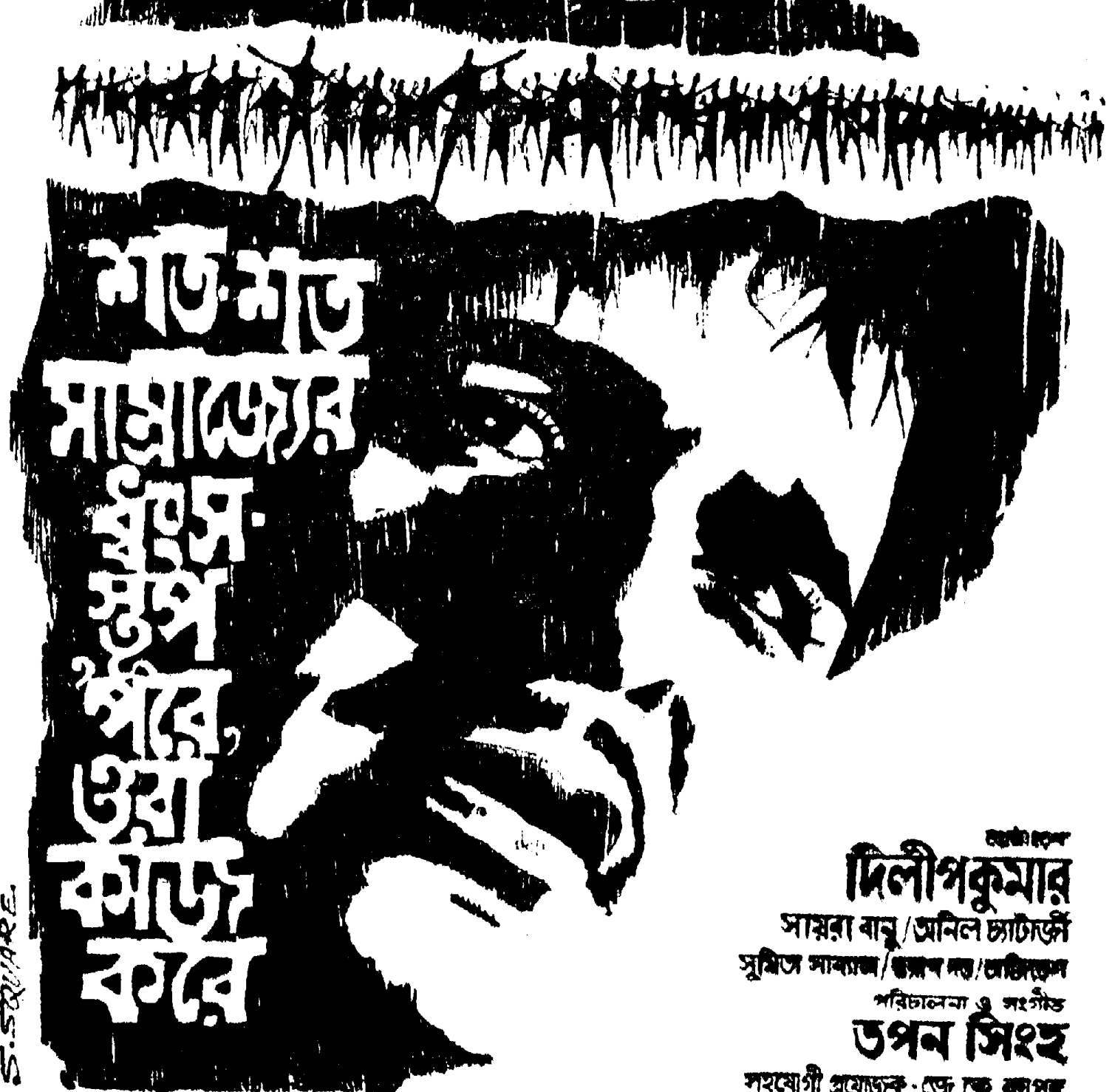
একালের নায়ক/পরিচালনা ঃ দীনেন গুপ্ত/জয়শ্রী রায় এবং মঞ্জরী মুখোপাধ্যায়।
—ফটো ঃ অমৃত

রবীন্দ্ররচনার সার্থক চিত্রায়ণ

'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লিখে প্রকাশ করেছিলেন আজ থেকে পাকা প'চাত্তর বছর আগে ১৩০২ সালে এবং গল্পটি বর্তমানের গল্পগুচ্ছের মাত্র সাড়ে চার পৃষ্ঠাব্যাপে মুদ্রিত। এই ছোট্ট গল্পটিকে আশ্রয় করে পরিচালক মৃণাল সেন কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির হয়ে ঐ সমান নামেরই যে-সাত রীল দীর্ঘ ছবিটি করেছেন, তা যেমন অভিনব, তেমনই ছোট-বড়ো সকলের পক্ষেই সমান উপভোগ্য। মূল কাহিনীর বক্তব্যটিকে সূত্র হিসেবে ধরে এবং রবীন্দ্র কাহিনী অন্তর্গত ছোট-ছোট ঘটনার উল্লেখমাত্রকে অবলম্বন করে শ্রীসেন প্রায় নতুন একটি ঠাস-বুনোন কাহিনী আমাদের উপহার দিয়েছেন, যে-কাহিনীর প্রতিটি পরিস্থিতি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়ে আমাদের হাসায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভাবায়। সুবলকে তিনি করেছেন স্কুল-শিক্ষক এবং সুশীলকে তিনি করেছেন ক্লাশের একজন পড়ুয়া। এবং ওদের দুজনের মাঝে রেখেছেন সুশীলের পক্ষাবলম্বিনী তার মাকে। এই তিনজনকে ঘিরে শ্রীসেন যে কী অসামান্য কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, তা না দেখলে তাদের উপভোগ্যতার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। শুধু বলব, চৌকিদারকে জলে ফেলে দেবার অভিযোগে বাপ ছেলের বিরুদ্ধে যে বিচারসভা বসিয়েছিলেন, সেটি যথেষ্ট সার্থক হয়ে ওঠে নি। বলা প্রয়োজন, শ্রীসেন যে বাপ-ছেলের ইচ্ছাপূরণের ফলে তাদের দেহের পরিবর্তন না দেখিয়ে মাত্র কণ্ঠস্বরের ও ব্যবহারের পরিবর্তনকে আশ্রয় করেছেন, সেটি অত্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ হয়েছে।

অভিনয়ে পিতা ও পুত্রের ভূমিকায় যথাক্রমে শেখর চট্টোপাধ্যায় ও সুরজিৎ নন্দী চলনে-বলনে, ভঙ্গীতে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন। দুজনের যখন কণ্ঠের পরিবর্তন হয়েছে, তখন উপভোগ্যতা যেন আরও বেড়েছে। সুশীলের মারূপে শোভা সেনও এ'দের সঙ্গে বেশ তাল রেখে চলেছেন। অন্যান্যরা ভূমিকানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগ-এর কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আরম্ভেই পাশাপাশি সাদা-কালোর দ্রুত পরিবর্তন ছবিটির বক্তব্যের সূচক। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও সুর-সংযোজনায় যথাক্রমে কে কে মহাজন, গঙ্গাধর নস্কর এবং অলোক দে ছবির পরিস্থিতিকে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করতে পুরোপুরি সাহায্য করেছেন।

'ইচ্ছাপূরণ' মৃণাল সেনের সার্থকতার মুকুটে আর একটি উজ্জ্বল মাণিক্য।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে ছবিটি সম্প্রতি প্রাচী সিনেমায় প্রদর্শিত হয়েছিল।

মঞ্চাভিনয়

পরশুরাম বিরচিত দুটি গল্পের নাট্যরূপ

তিরিশ চল্লিশ বছর আগে লেখা পরশুরামের (রাজশেখর বসু) হাল্কা হাসির গল্পগুলি যে আজও হাসির তুফান তুলতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন মুক্ত-অঙ্গনে প্রয়াসী-সংস্থা প্রযোজিত 'কচি-সংসদ' ও 'ভুশণ্ডীর মাঠে'র নাট্যরূপ দু'টির অভিনয় দর্শনকালে।

'কচি-সংসদ'-এর নাট্যরূপ [illegible]ছেন বীণা ভট্টাচার্য। মূল কাহিনীটিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে দৃশ্য রচনায় স্বাভাবিক পারম্পর্য রক্ষা করে নাট্যরূপ দানে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কচি-সংসদের সভ্যগণ ও নায়ক কেষ্টর রূপসজ্জা প্রশংসনীয়। সভ্যগণের মধ্যে ল্যালিমা পাল (পুং), হতাশ হালদার, দোদুল দে ও শিহরণ সেন রূপে যথাক্রমে সমর সেন, শ্যামল ভট্টাচার্য, আনন্দ ঘোষ ও চঞ্চল দাশগুপ্ত তাঁদের অঙ্গভঙ্গী ও বাচনে যথেষ্ট উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন। নায়ক কেষ্টবেশে সিতীন্দ্র রায়চৌধুরীর অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল হলেও কিছুটা আতিশয্যপূর্ণ। ব্রজেন্দ্র ও নকুড়-এর ভূমিকায় যথাক্রমে কিশোরীমোহন সিংহ ও শান্তনু বসুর বাচনে উন্নতির অবকাশ আছে। স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছে গিন্নীর ভূমিকাটি মধুমিতা সেনের দ্বারা; যথাযথ ভঙ্গী ও বাচনের সাহায্যে তিনি তাঁর গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। নায়িকা পদ্মর ভূমিকাতে পিংকী সেনকে চমৎকার মানালেও

তাঁর অভিনয়ে আন্তরিকতার অভাব ছিল। টুনির ভূমিকায় নীলা সেন চলনসৈ। কিন্তু কিছুটা ত্রুটি সত্ত্বেও 'কচি-সংসদ' সামগ্রিক-ভাবে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল।

'ভূশণ্ডীর মাঠে'র নাট্যরূপ দিয়েছেন সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী। তিনি প্রস্তাবনা ও দৃশ্যান্তরের মাঝে কাহিনীর পটভূমিকা ও পরিবেশ রচনা করেছেন ছড়া গানের সাহায্যে। এতে পালাটিতে বেশ নূতনত্বের আস্বাদ মেলে। তবে প্রস্তাবনার গান এবং অশরীরীদের নৃত্যগীতগুলি বড্ড বেশী দীর্ঘায়িত হওয়ায় পালাটি সামগ্রিক-ভাবে কিছুটা ক্লান্তিকর। নায়ক শিবুরূপে সমর সেন এক কথায় চমৎকার; তিনি সাজ-সজ্জায়, অংগক্ষেপেও বাচনে অত্যন্ত সার্থক। যক্ষ বেশে পরিচালক সোমেন রায়ের অভিনয়াংশ ভালো হলেও তাঁর রূপসজ্জা ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু পেত্নী, শাকচুন্নী ও ডাইনী বেশে যথাক্রমে কুমার আবির বসু, জয়দেব দাশগুপ্ত ও চঞ্চল দাশগুপ্ত পদ-ক্ষেপে ও কথায়-বার্তায় অবর্ণনীয় উপ-ভোগ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন। পালাটির সার্থকতার মূলে কিন্তু জুড়ি ও তুড়ি বেশে যথাক্রমে পিনাকী মুখোপাধ্যায় ও সুনন্দন সেনের অবদান অবশ্য স্বীকার্য; বিশেষ করে কবির গানের ঢংয়ে পিনাকী মুখো-পাধ্যায় দর্শকদের মোহিত করে দিয়েছিলেন।

জনমনজয়ী শিল্পী উত্তমকুমার বহু বছর পরে আবার মঞ্চে অভিনয় করবেন বলে জানা গেল। নাটকটির নাম 'আলিবাবা'। শিল্পী সংসদের প্রযোজনায় 'আলিবাবা' নাটকটি আসছে ২১ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র-সদনে অভিনীত হবে। 'আলিবাবা' নাটকে উত্তমকুমারের সঙ্গে আর যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদের মধ্যে আছেন—মলিনা দেবী, দীপক মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দো-পাধ্যায়, রূপক মজুমদার, অমর মুখো-পাধ্যায়, প্রভাত ঘোষ ও জয়শ্রী সেন।

দর্পণ নাট্যগোষ্ঠী : আজ শুক্রবার ১৪ আগস্ট 'মুক্তাংগন' মঞ্চে তাঁদের মঞ্চ সফল নাটক অজিত সেনের **'বসুন্ধরা জাগো'** পরিবেশন করছেন। অভিনয়ে অংশ নেবেন শিব ঘোষ, অশোক বসাক, তপন চাটুজ্যে, দীপক দত্ত, অসিত চক্রবর্তী, উৎপল দাস, তিমিরবরণ এবং উমা গুহ। সংগীত ও নাট্য নির্দেশনায় থাকছেন যথাক্রমে অশোক বসাক ও অজিত সেন।

১৪ আগস্ট বিশ্বরূপায় 'পথিক' আয়োজিত লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণ-উৎসবের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ অধিবেশন। এ দিনের বিশেষ আকর্ষণ দক্ষিণ-বাংলার ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের পট-ভূমিকায় কৃষক জীবন-ভিত্তিক সার্থক দলিল বিষ্ণু চক্রবর্তীর 'কাকদ্বীপ'। জ্যোতি-প্রকাশের নির্দেশনায় সংস্থার নিয়মিত শিল্পীবৃন্দ এ নাটকে অংশ গ্রহণ করবেন। গণ-সংগীত পরিবেশন করবেন গণ-নাট্য সংঘ, পাণিহাটী শাখা। অনুষ্ঠান শুরু সন্ধ্যা ছ'টায়।

অনুশীলন সম্প্রদায় আগামী উনিশে আগস্ট বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত-অংগনে সুব্রত নন্দীর নির্দেশনায় বহু প্রশংসিত নাটক জাঁ-এল-সার্ত্রের একদা সারা বিশ্বে আলোড় সৃষ্টিকারী 'ক্রাইম প্যাসনেল'এর ছায়া অবলম্বনে রচিত 'একা একা' মঞ্চস্থ করছেন।

জয়দেব : জনপ্রিয় নাট্য সংস্থা আর, পি, বি এস সাংস্কৃতিক শাখার সদস্যরা সম্প্রতি তাঁদের মঞ্চসফল নাটক 'জয়দেব'-এর ২৪তম রজনী অভিনয় করলেন রথযাত্রা উপলক্ষে শিয়ালদহের ছকু খানসামা লেনে। প্রারম্ভে নাটক রচয়িতা 'হরিপদ চট্টো-পাধ্যায়ের শততম বর্ষ বয়সের পূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। নাটকটি যাত্রায় রূপান্তর করেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত অভিনেতা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য নির্দেশিত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন আশীষ ভট্টাচার্য ও শর্মিষ্ঠা ঘোষ, শিবরঞ্জন ভট্টা-ভট্টাচার্য শর্মিষ্ঠা ঘোষ, শিবরঞ্জন ভট্টা-সুন্দর সিংহ, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিবনাথ ভট্টাচার্য, তারক ঘোষ, কালাচাঁদ ঘোষ, রবীন দে, রাধিকা মুখার্জি ও কার্তিক দাস, সুষম দাঁ, ঝুমু ঘোষাল, কৃষ্ণা দাস, পরেশ নন্দন, সুনীতি দাস, মন্টু দাশগুপ্ত, রীণা ঘোষ দিপালী দাস প্রভৃতি।

আধে অধূরে/বাসু ভট্টাচার্য/রিটা ব্যাস, অনুরাধা কাপুর ও দীনেশ ঠাকুর
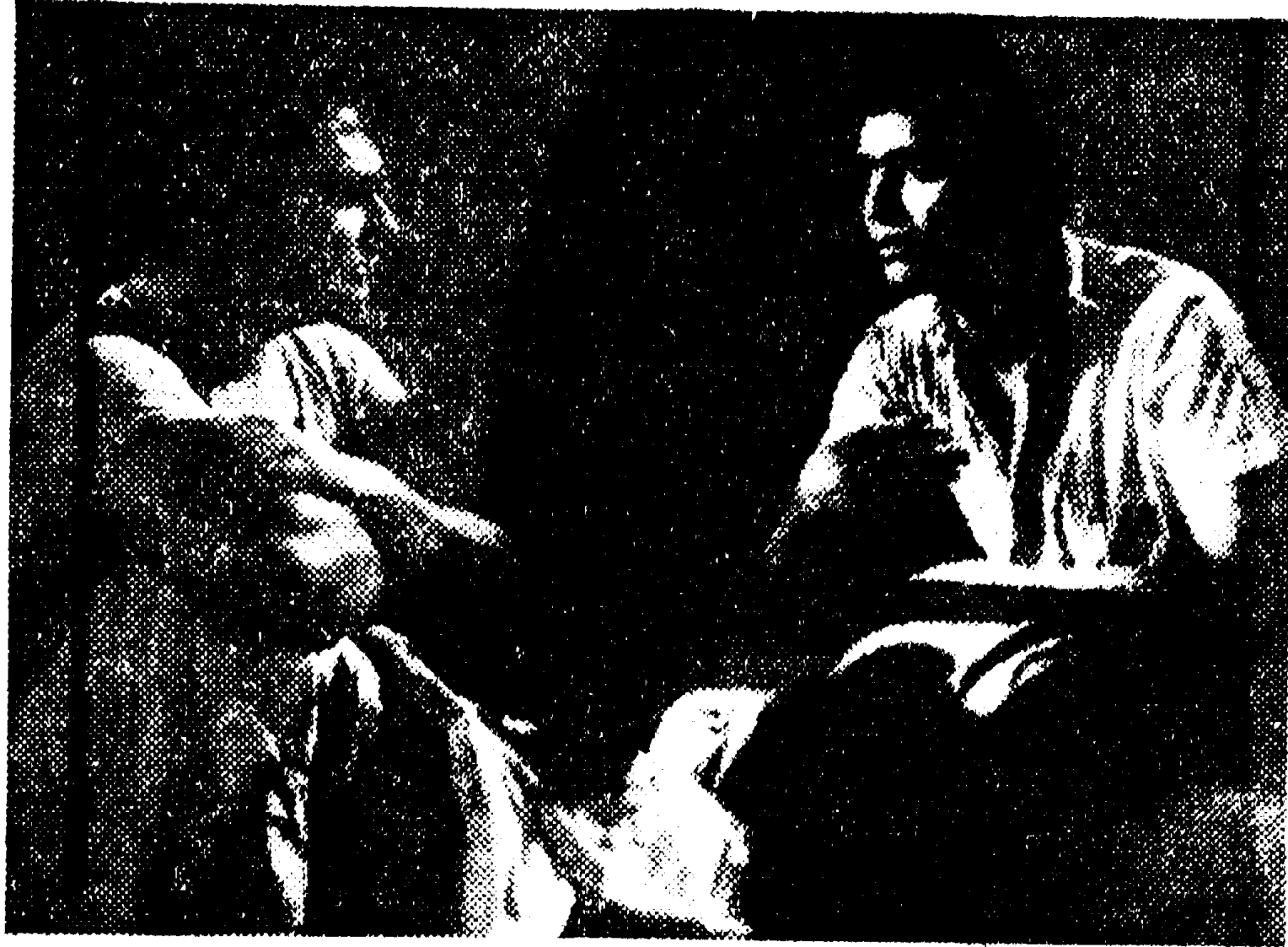
খুঁজে বেড়াই/পরিচালনা : সলিল দত্ত/অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সংসার/পরিচালনা : সলিল সেন/ মাঃ অরিন্দম, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

সোপান : এই নবগঠিত নাট্য সংস্থার শিল্পীরা যে নাটকটি নিয়ে সর্বপ্রথম দর্শকদের সামনে দাঁড়াবেন সেটি হচ্ছে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষের রাজনৈতিক পট-ভূমিকায় লেখা রূপক নাট্য—রাজার রাজা। নাটকটিতে রূপদান করবেন অনিতা দত্ত, সৌমিত্র চৌধুরী, যোগেশ দে, মৃত্যুঞ্জয় ভৌমিক, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, মদন মণ্ডল, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, রবিন দাস, দীনেশ সাহা, বিষ্ণু দে, শংকর মণ্ডল, নিখিল রায়, অরুণ দাস, সলিল মুখোপাধ্যায়, শোভন মুখোপাধ্যায় এবং গোবিন্দ গাঙ্গুলী মুখ্য ভূমিকায় ও পরিচালনায়। প্রথম অভিনয় দুই সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায় রঙমহলে।

বিবিধ সংবাদ

বার্লিন উৎসব মাঝপথে ভেঙে গেছে। ভারত থেকে প্রথমে ঐ উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দুটো ছবি পাঠাবার কথা হয়েছিল। এক—সত্যজিত রায়ের 'অরণ্যের দিন-রাত্রি', দ্বিতীয়—স্বপন রায় প্রযোজিত 'দিবারাত্রির কাব্য'। বার্লিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন শ্রীরায় বার্লিন যাবার জন্য, যথারীতি ভারত সরকার বিশেষ টালবাহনা না করেই তাঁকে যাবার অনুমতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু বার্লিনে গিয়ে তাঁর যে আশাতীত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে এক সাংবাদিক আসরে তিনি জানান—'আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না ও ধরনের ঘটনার জন্য।'

বার্লিনে গিয়ে অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে প্রথমেই তাঁর চোখে আসে যে উৎসবের প্রোগ্রামে 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির নাম কোথাও নেই—এমনকি রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগেও নয়। উৎসব পরিচালক শ্রীবাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করায় তিনি জানতে পারলেন ভারত সরকারের 'বিশেষ' নির্দেশে ছবিটা নাকি বাতিল করা হয়েছে। অথচ প্রযোজক শ্রীরায় বার্লিনে আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন ঐ ছবির প্রদর্শনীর জন্যই। দিল্লী কর্তৃপক্ষই তাঁর পাসপোর্ট অনুমোদন করেছেন বার্লিনে যাবার জন্য। শ্রীবাওয়ারের সঙ্গে বহু আলোচনার পর প্রতিযোগিতার বাইরেই প্রদর্শিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য।' সেখানকার কোনো কোনো পত্রিকাতে ছবির স্বপ্রশংস সমালোচনাও নাকি হয়েছে। শ্রীরায়ের আশা হয়তো বা ইউরোপের বাজারে ছবিটা বিক্রীও হতে পারে। যাই হোক শ্রীরায়ের অভিযোগ—'ভারত সরকারের সেই 'বিশেষ' নির্দেশ বা আপত্তিটি কি ও কেন? যার জন্য তাঁকে প্রবাসে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয়েছিল।'

আলোচনা সভা—আসছে ১৬ আগস্ট হাওড়ার প্রতিষ্ঠ সাহিত্য সংস্থা সাহিত্য-প্রয়াসী 'চলচ্চিত্র শিল্প ও সাহিত্য' পর্যায়ে এক আলোচনার আয়োজন করেছেন। আলোচনায় অংশ নেবেন শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য, শ্রীসমীক

বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সময় সন্ধ্যা ছ'টা। স্থান—শিবপুর ননীভূষণ সিংহ মেমোরিয়াল হল। সভায় প্রবেশাধিকার সবার।

অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর—সম্প্রতি আকাদেমি অব ফোকলোরের মাসিক অধিবেশনে ডকটর কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লোকশিল্প বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বাংলার লোকশিল্প সংগ্রহের ইতিহাস বিবৃত করে তিনি বলেন, লোকশিল্প যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা হলেও যে পরিপ্রেক্ষিতে লোকশিল্প গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়নি। কিন্তু বর্তমান সমাজ-জীবনের চাহিদা অনুযায়ী লোকশিল্পের নব-রূপায়ণ অনিবার্য। প্রসঙ্গক্রমে ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার পুতুল ও পটচিত্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী, শ্রীশংকর সেনগুপ্ত, শ্রীতুষারকান্তি মহাপাত্র ও ডক্টর দীপক বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ দুলাল চৌধুরী।

মূকাভিনয় : এই তো সেদিনের কথা, মূকাভিনয় বলে একটা শিল্প আছে তা আমরা অনেকেই জানতাম না। যোগেশ দত্তই প্রথম মূকাভিনয় সুরু করেন। আজ সেই শিল্প আমাদের দেশে পৃথক শিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। গত ১ আগস্ট কলামন্দিরে ভারতীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্তের একক মূকাভিনয় অনুষ্ঠিত হলো। শ্রীদত্তের এবারের মূকাভিনয়ের মান আরো উন্নত। তিনি কয়েকটি নতুন মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। শিল্পীর এই একক অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের মূকাভিনয় মানকে অনেক উন্নত করেছে। আলো ও মঞ্চ তাপস সেন ও সুবেশ দত্ত, আবহসঙ্গীতে হিমাংশু বিশ্বাস, পোশাকে খালেদ চৌধুরী, রূপসজ্জায় অনন্ত দাশ, এরা সকলেই নিজ নিজ সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে।   ন

বাণীবিতান : গত শনিবার ১১ জুলাইয়ের সন্ধ্যায় লাহাভবনে 'বাণীবিতান'-এর কর্মাধ্যক্ষ নির্মলেন্দু বসুর পরিচালনায় সংস্থার অষাঢ় মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপর আলোচনা। প্রারম্ভে ধ্রুপদীয়া জয়কৃষ্ণ সান্যালের 'শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র' গান এবং জাতীয়তাবাদী শিল্পী সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সংগীতের দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। পরে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতা পাঠসহযোগে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা, জীবনদর্শন, স্বদেশপ্রেম, সমাজচেতনা, মানবতাবোধ, আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা মণ্ডল, অপূর্বকুমার সাহা, মঞ্জুশ্রী দত্তগুপ্ত, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, কালীপদ দাস, রেণু ভৌমিক, তপনকুমার বসু, সুস্মিতা সাহা, প্রভাতকুমার দে, শিবানী বসু, দুর্লভ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা দে, সুনীল দাশগুপ্ত, শিবানী রায়, নির্মলেন্দু বসু প্রমুখ সাহিত্যিক, সাহিত্য-সমালোচক ও শিল্পিবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানান্তে একটি বর্ষা-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানও হয়। অংশ নেন সৌরেন্দ্রনাথ দে ও সহশিল্পিবৃন্দ।

শ্রীভাস্কর মেনন ই, এম, আই এর (লণ্ডন) ম্যানেজিং ডিরেকটর পদে উন্নীত :

ই, এম, আই এর ওভারসীজ গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেকটর মিঃ জে, জি, স্টানফোর্ড মিঃ ভাস্কর মেননকে গ্রামাফোন কোম্পানীর আন্তর্জাতিক জনক প্রতিষ্ঠান ই, এম, আই এর ম্যানেজিং ডিরেকটররূপে ঘোষণা করেছেন। ১৯৭০ অব্দের ১ অকটোবর থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। এই নতুন পদমর্যাদার ক্ষমতায় লণ্ডনে ২০ ম্যাঞ্চেস্টার স্কোয়ারের সকল ব্যাপার পরিদর্শন করবেন। মিঃ মেনন (৩৬) গত ছ বছর ধরে গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটর ছিলেন এবং ১৯৬৯-এর জানুয়ারীতে 'চেয়ারম্যান'-এর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। গ্রামোফোন কোম্পানীর অধিকর্তারূপে মিঃ মেনন ১৯৬৪-তে গ্রামোফোন কোম্পানীর ব্যবস্থাপকরূপে অসাধারণ ব্যবসায়িক সাফল্যই শুধু আনেন নি, বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়ের এ হেন পদে অধিষ্ঠান এই প্রথম।

রত্ন (বিলেৎ ফেরত-এর অন্তর্গত) / পরিচালনা ঃ চিদানন্দ দাশগুপ্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। ফটো ঃ অমৃত

স্টুডিও থেকে

কিছুদিন আগে রঙমহল মঞ্চে 'স্বীকৃতি' নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গত রথযাত্রার দিনে পরিচালক সলিল সেন 'স্বীকৃতি'র চিত্ররূপ দেবার জন্য শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান করেছিলেন। অবশ্য 'স্বীকৃতি' নাম সিনেমায় থাকছে না। নতুন নাম হয়েছে 'সংসার'। টেকনিসিয়ানে একটানা দশ/বারো দিন কাজ করার পর সলিল সেন জানালেন ছবির প্রায় সিকিভাগ কাজ শেষ। আগামী সপ্তাহ থেকে আবার প্রায় টানা দিন কুড়ি কাজ হবে। তাহলেই কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। সংগীত বহুল এ ছবির গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী। কিছু সংখ্যক গানও ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়ে গেছে। হেমন্ত ব্যানার্জী ও নীলন ব্যানার্জী প্রযোজিত এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সৌমিত্র, সাবিত্রী, সন্ধ্যারাণী, নন্দিনী মালিয়া, নির্মলকুমার, বসন্ত চৌধুরী, জহর রায়, অজয় গাঙ্গুলী, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিচালক শ্রীসেনের অপর ছবি 'রাজকুমারী' মুক্তি প্রতীক্ষায়। এ ছবির তিনটি প্রধান আকর্ষণ হেলেন বন্দের নৃত্য আর সংগীতকার রাহুল দেববর্মণ এবং নবেন্দুর হেলেন। 'রাজকুমারী' সলিলবাবুর নিজের লেখা গল্প। চিত্রনাট্যও তৈরী করেছেন তিনি। প্রযোজক দেবেশ ঘোষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ছবিতে যথোপযুক্ত গ্ল্যামার রাইজ করতে। তনুজার বিপরীতে আছেন উত্তমকুমার। কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছিল একমাত্র হেলেনের একটি নাচের দৃশ্য ছাড়া। সেটিও গৃহীত হয়েছে বোম্বাইতে। উত্তম-তনুজা ছাড়াও এ ছবির শিল্পী তালিকায় আছেন দীপ্তি রায়, অসিতবরন, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজয় গাঙ্গুলী প্রমুখ। আশা করা যাচ্ছে অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পাবে এ ছবি।

দক্ষযজ্ঞ ঃ বহু অর্থব্যয়ে গৃহীত এ বি কাহালী নিবেদিত শ্রীসুজাতা মুভিজের লোকপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী 'দক্ষযজ্ঞ' বালাজী ফিল্মস ইন্টারন্যাশনালের পরিবেশনায় শরৎ ও শংকরজীর একাধিক চিত্রগৃহে আজ শুক্রবার, ১৬ আগস্ট মুক্তি লাভ করবে। ছবির অভিনয়াংশ, সংগীতাংশ, নৃত্যাংশ এবং দৃশ্য পরিকল্পনা যেমন বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক বিস্ময় সৃষ্টি করবে, তেমনি দক্ষযজ্ঞ-নন্দিনী কিন্নরী রাজেশ নৃত্য ও গাওয়া সতীদেহ... মনকে ভরিয়ে দেবে এক অপার্থিব প্রেম রসে। প্রযোজনা ও সংগীত পরিচালনা, সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন যথাক্রমে রমেশ নাইডু, অরুণ রায় ও শ্যামল গুপ্ত। যুগল মিত্র ছবির পরিচালনা করেছেন।

রূপসী ঃ অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত এ আর-সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন 'রূপসী' সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়পত্র পাবার পরে এখন রাধা পূর্ণ ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তির অপেক্ষায়। অজিত গাঙ্গুলী ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা করেছেন। গীত রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর দিয়েছেন অনিল বাগচী। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, চিন্ময় রায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, সুলতা চৌধুরী, জুঁই চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ প্রভৃতি। বহিদৃশ্য প্রধান এই ছবিতে যেমন গ্রামের মাটির সোঁদা গন্ধ পাবেন, তেমনি দেখবেন ঝুমুর নৃত্য ও কবির লড়াই। ছবিখানির পরিবেশক ঃ এন এ ফিল্মস্।

শংকরবিজয় মিত্র

খেলার কথা

একটি জলছলছলাৎ দিন

অসংকোচ প্রাণ-প্রাচুর্যে জলে ঝাঁপা-ঝাঁপি করা, হাত পা ছেড়ে সাঁতার কেটে যাওয়া—এর মধ্যে যে সহজ ও আদিম আনন্দ আছে জীবনবোধে সচেতন অনেক বিশিষ্ট কবি তাকে ভাষা দিয়েছেন।

কিন্তু ভাষারূপে আর আনন্দের প্রত্যক্ষ উপভোগে অনেক পার্থক্য। কবিতা পড়ে আরব বেদুঈনের মত মরুভূমিতে ঘোড়া ছোটানো শয়ন গৃহের শয্যায়ও সম্ভব, কিন্তু সত্যিকার মরুতে ঘোড়া ছোটাবার উদ্দীপনার কাছে এই কাব্য পাঠের আনন্দ নেহাৎই খেলো।

মনের আনন্দও খেলো হয়ে পড়তে পারে, যদি তাতে অসংকোচ প্রাণ-প্রাচুর্যের উজ্জ্বল প্রকাশ না থাকে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তার সুযোগ কতটুকু মেলে? ইদানীং অবশ্য কলকাতা শহরে সাঁতারের উৎসাহ এবং সুযোগ দুই-ই বেড়ে চলেছে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে উৎসাহ বেড়ে চললেও, সুযোগ এখনও একান্তভাবে সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্র সরোবর বা লেক অঞ্চলের ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি, এবং ক্যালকাটা ক্লাব, স্যাটারডে ক্লাব, আর্ম্যান্স ক্লাব, কাশীপুর ক্লাব প্রভৃতি হাই সোসাইটি ক্লাবসমূহ ছাড়া কোথায় আছে, সেই একান্ত পরিবেশ যেখানে সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্য ভরা হাঁ করা দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ না হয়ে মেয়েরা যথেচ্ছ সাঁতার কাটতে পারে? কিন্তু ঐ সব ক্লাবেও মেয়েদের সাঁতার কাটার সময় নির্দিষ্ট আছে, যেমন নির্দিষ্ট আছে আজাদ হিন্দ বাগ (হেদুয়া) বা জনগণের জন্য খোলা পুকুরে।

সারাদিন ধরে প্রাচীর ঘেরা একান্ত পরিবেশে সাঁতার কাটার সুযোগ পেলে আমাদের সাধারণ ঘরের সব বয়সী মেয়েদের মধ্যে যে কি পরিমাণ অসংকোচ প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রকাশ পেতে পারে, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখে এলাম সেদিন সুভাষ সরোবর বা বেলেঘাটা লেকে অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুলে।

সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের পরিচালিকা শিক্ষাগুরুদের গৃহিণী পঞ্চাশোর্ধ্ব সদস্যা শ্রীমতী লীলা ব্যানার্জি'র নেতৃত্বে একটি পুরোদিন কাটিয়ে গেলেন ঐ পুলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে। সেই দলে সব বয়সীদের সমাবেশ ছিল, মা ও মেয়ের জুড়ি ছিল একাধিক। সেখানে শাসন যষ্টিকা তুলে ছুটে আসেনি, সেখানে অপরিচিত পুরুষদের কৌতূহলী দৃষ্টির ভিড় ছিল না। সেখানে সবাই যে কি পরিমাণ ঝাঁপাঝাঁপি ও মাতামাতি করেছে জলে, বল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করেছে, বারবার নিজেদের মধ্যে নানা ধাঁচের সাঁতারের প্রতিযোগিতা করেছে—তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলে তত্ত্বাবধায়কবৃন্দ মেয়েদের আগ্রহে ফিলট্রেশান প্ল্যান্টটি চালু রেখেছিলেন। সেখানে উঁচু নিচু তিনটি স্তরে বওয়া ফোয়ারাও অজস্র ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় স্নান করার অপরিসীম থ্রিল প্রত্যক্ষ করেছি মেয়েদের উজ্জ্বল হাসি-চীৎকারে, তাদের চোখেমুখে আনন্দদীপ্তির প্রকাশে।

কয়েকজন সাংবাদিকদের সঙ্গে আমারও সেখানে উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছিল। আমাদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় অবশ্য সাবালক হয়ে বয়সের বাধা অস্বীকার করে সব কিছু মাতামাতি ও প্রতিযোগিতায় সমানে যোগ দিয়ে আনন্দের পূর্ণ ভাগ নিয়েছিলেন। আমি এবং অন্য একজন বর্ষীয়ান অবশ্য বিবেক-বাধ্য হয়েই পুলের ধারে চেয়ার পেতে বসে সিগ্রেট টানতে টানতে জল ছলছলাৎ দিনটি উপভোগ করেছি। দেখেছি সত্যিকার সাঁতার টানার মত টানা সাঁতারু লীলা ব্যানার্জি'র। তাঁর মধ্যে ছিল পঁচিশ বছর আগেকার নৈপুণ্য, আগ্রহ, গতি ও উৎসাহ। পূর্বের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির গুণাবলীর কিছুই যেন হ্রাস পায়নি। সমবয়সীদের মত সমানে আনন্দ করেছেন মেয়েদের সঙ্গে। আবার সব বয়সী প্রায় পঞ্চাশেক মেয়ে—বিশেষ করে কিশোরী ও তরুণীদের অসংকোচ জল বিহারকে উচ্ছৃঙ্খল না হতে দেবার রাশ টানতে এবং সব দিকের তদারকীতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশেও বিস্মিত হয়েছি। প্রবীণদের মধ্যে অপর উপস্থিতি ছিল ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় ও ডাইভার আশু দত্তের। পুলের ডাইভিং বোর্ডের তলায় জল ছিল না বলে তিনি পুলেরই গভীর জলের অংশে স্টার্টিং প্ল্যাটফর্ম থেকে কয়েকটি বিস্ময়কর ডাইভিং দেখালেন। তাঁর দেখাদেখি তাঁর কয়েকটি ছাত্রীও ডাইভ খেলেন, ডাইভার আশু দত্তের নির্দেশ নিয়ে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে মেয়েদের ডাইভিং আজও প্রবর্তন হয়নি। নিজের সাঁতারের যুগে লীলা চ্যাটার্জি (বর্তমানে ব্যানার্জি) যে ডাইভিং করেছেন, তা ছিল একান্তই বে-সরকারী। আর তেমনি বে-সরকারী ডাইভ শুনেছি এই প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সেও লীলা ব্যানার্জিরূপে তিনি এখনও মাঝে মাঝে দিয়ে থাকেন। মহিলা সাঁতারুদের মধ্যে লীলা ব্যানার্জি এক সময়ে ছিলেন অনন্যা। নিজ বিভাগে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সন্তরণ পটিয়সী এই মহিলা সাঁতারু এক সময়ে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার ঝোঁক সামলাতে পারেননি। মনে পড়ে গঙ্গা বক্ষে ত্রিশ মাইল সাঁতারের কথা। বেশ কয়েকজন পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে তিনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। আর একবার বিস্ময়কর প্রতিভার অম্লান নিদর্শন দিয়েছিলেন তিনি বোম্বায়ের সাঁতারুদের বিরুদ্ধে। সাঁতারুরা নামে বোম্বাই মার্কা হলেও আসলে সকলে ছিলেন বিদেশিনী। কলকাতায় তখন মেয়েদের পৃথক ব্যবস্থা বলতে কিছু ছিল না। লীলা ব্যানার্জি তখন সাঁতার ছেড়ে সংসার পেতেছেন। সদ্য পুত্র সন্তান বিয়োগে জর্জরিত। আর কয়েকজনের মত তাঁরও ডাক পড়েছিল বোম্বাই মার্কা ইংরাজ তনয়াদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার। হেদুয়ার জলাশয় বয়স্কা মেয়েদের ব্যবহারের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাই সপ্তাহ দুয়েক তালিম চললো ঘরোয়া কোন এক পুকুরে। বাংলার মহিলারা কয়েকটি বিষয়ে হার মানলেন ইংরাজ তনয়াদের কাছে। কিন্তু দলগত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখলেন সেদিনকার সেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মিটে বেশ জয়ী হয়ে। এই লীলা ব্যানার্জি চল্লিশোর্ধ্ব হয়ে চ্যানেল পাড়ি দেবার অভিলাষও জ্ঞাপন করেছিলেন। সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেনও টাকা পয়সাও তাঁর চ্যানেল সাঁতারে যাওয়ার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার পার্লামেণ্টারিয়ান শ্রীহীরেন মুখার্জি আপ্রাণ চেষ্টা করেও ভারত সরকারের মন টলিয়ে সম্মতি আদায় করতে পারেন নি।

কিন্তু বাংলাদেশে মহিলা সাঁতারু হিসাবে লীলা ব্যানার্জির যে নাম ও যে প্রতিষ্ঠা, তার চেয়েও অনেক দীর্ঘতর প্রতি-যোগিতামূলক প্রতিষ্ঠা ডাইভার আশু দত্তের। সেদিক থেকে আজও তিনি অনন্য। তাঁর নাম যে কেবল বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। যেখানে সাঁতার সেখানে তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে শোনা যাবে। পঞ্চাশের কোঠা পার হলেও তাঁর ডাইভিং-এর কলা-কৌশল এখনও তাঁর জৌলুষ হারায় নি। তিনি যেভাবে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের মেয়েদের ডাইভিং শেখাচ্ছেন, কয়েকটি মেয়ের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তাতে, কলকাতায় মেয়েদের প্রথম ডাইভিং প্রতিযোগিতা অচিরেই অনুষ্ঠিত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

কলকাতায় মেয়েদের সাঁতার কাটার ও সাঁতার শেখার আগ্রহ প্রচুর বেড়েছে। লাইফ সেভিং সোসাইটির বাইরে আজাদ হিন্দ-বাগের তিনটি ক্লাবেই যা ব্যবস্থা আছে। ভবানীপুরে পদ্মপুকুরে ইয়ংমেনস এসো-সিয়েসন নামে মাত্র তিন বছর বয়সের সাঁতারের ক্লাবটি কংক্রিট ট্রেনিং-এর যে পুলটি তৈরী করেছেন, সেখানে মেয়েদের সাঁতারের ব্যবস্থা করার সদিচ্ছা ক্লাব সংগঠকদের থাকলেও এখনও পর্যন্ত তাঁরা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি।

মেয়েদের সাঁতারের ব্যবস্থার জন্য প্রথমেই তাদের দিতে হবে অসঙ্কোচ পরিবেশ, বিশেষ করে একান্ত নাবালিকা যাঁরা নন, তাঁদের শিক্ষণভার একজন মহিলার উপর থাকা অপরিহার্য। অথচ, মহিলা সাঁতার-শিক্ষকার একান্ত অভাব। আজাদ হিন্দ মহিলা সমিতিতে ইংলিশ চ্যানেল-খ্যাতা পদ্মশ্রী আরতি গুপ্ত প্রতি রবিবার সাঁতার শেখাতে আসেন। কিন্তু সপ্তাহে একদিন সাঁতার শেখবার ব্যবস্থা কি যথেষ্ট? সেদিক দিয়ে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবকে বলতে হবে ভাগ্যবান, কারণ বর্ষীয়সী লীলা ব্যানার্জি তাঁর মাতৃত্বভরা ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রতি-দিন আসেন এবং আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্বে মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পদ্মপুকুর ওয়াই এম এ যদি রাত্রে মেয়েদের সাঁতার শিখবার ব্যবস্থা করতে পারেন, ভবানীপুর ও বালীগঞ্জ অঞ্চলের প্রচুর মহিলা সে সুযোগ নেবেন নিঃসন্দেহে। তবে একজন যোগ্য মহিলা শিক্ষিকা সংগ্রহ করতে না পারলে, তাঁদের সার্থকতা-সীমিত থেকে যাবে। এককালে ভারতের শ্রেষ্ঠ মেয়ে সাঁতারু সন্ধ্যা চন্দ্র (বর্তমানে ব্যানার্জি) ভবানীপুর অঞ্চলের বাসিন্দা। দিনে তিনি রেলে চাকরী করলেও রাত্রে সাঁতার শেখানোর প্রস্তাব ঠিকভাবে করতে পারলে তিনি রাজী হবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সাঁতারের দৌলতে জীবনে অনেকে অনেক কিছু—খ্যাতি, প্রতিপত্তি, চাকরি পেয়েছেন। আজ সাঁতারের সেবার ডাকে নিশ্চয়ই লীলা ব্যানার্জি ও আশু দত্তের মত নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসবেন তাঁরা—যদি সংগঠকদের প্রকৃত আগ্রহ থাকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সাঁতার শিক্ষণ ব্যবস্থায় ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হচ্ছে এবং যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রী যোগ দিলে তাদের জন্য একজন অবৈতনিক শিক্ষিকার সন্ধান করা হবে, এমন ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং পুলের পরি-চালকের কাছে আমি শুনেছি। আশা করি, শিক্ষিকা নির্বাচন তাঁরা যথেষ্ট বিচার সহযোগেই করবেন, যদিও যোগ্য শিক্ষিকার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বেলেঘাটা অঞ্চলে যে পুলটি তৈরী করেছে সেটি সারা বাংলায় একমাত্র ওলিম্পিক মানের পুল। অসমাপ্ত অবস্থায়ই সেটি কল-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ইজারা দেওয়া হয়েছে। সেটির পূর্ণ ব্যবহারে প্রধান বাধা, তার অবস্থিতি শহরতলী বললেই হয় এবং ঐ এলাকায় বর্তমানে সর্বাঙ্গীন স্বন্দ্ব বিক্ষোভ প্রায় লেগেই আছে। সেখানে যেতে মেয়েরা নিজেরা যতখানি কিন্তু বোধ করবে, অভিভাবকরা তাদের পাঠাতে অনেক বেশি ভয় পাবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও ঝুঁকি নিতে না চাওয়াই স্বাভাবিক। রাত্রি-কালে সেটির ব্যবহার অবাঞ্ছিত, অথচ ছোট্ট অপরাহ্নযুক্ত গরম দেশে রাত্রিকালই সাঁতার পুল ব্যবহারের প্রকৃষ্ট সময়। সাঁতার পুল সংগঠনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিজ্ঞতা নেই, তবে আগ্রহ লক্ষ্য করে ভরসা পেয়েছি। সাঁতারানুরাগী অনেকের মালিকানা এবং লালফিতা তার দৌরাত্ম্য পরিচালকের উৎসাহে যে ঠাণ্ডা জল ফেলে নিভিয়ে দেবে তাই ভয় হয়। তবু সবেধন নীলমণি পুলটির পূর্ণ ব্যবহারে সাঁতার অনুরাগী সকলের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া গেলে বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সুফল ফলবে এই আশা পোষণ করতে চাই।

কলকাতার সাঁতারের ক্ষেত্রে আর একটি সমূহ বিপদ, সাঁতারের প্রধানতম দুটি কেন্দ্র মধ্য কলকাতার গোলদীঘি এবং উত্তর কল-কাতার হেদোর পুকুর কর্পোরেশনের অব-হেলায় আজ কাপড় কাচা, বাসন মাজা এবং আরও নোংরা বেওয়ারিশ কাজের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতির দাবীতে ক্লাবগুলি যতটা অসহায়, কর্পোরেশনের কর্মীরা যতটা অসহায়, তার চেয়ে বেশি উদাসীন। আর কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা প্রাপ্তবয়স্কের ভোট নির্ভর। ক্লাবের সদস্য সংখ্যার চেয়ে পুকুর নোংরাকারীদের পিছনে সংখ্যার জোর। তাঁরা ভোটারদের অনেক বেশি তোয়াজ করে।

মেয়েদের সাঁতার শেখার ও কাটার আগ্রহ বাড়ছে, কিন্তু মেয়ে সাঁতারু উঠছে না। কেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। বাণী ঘোষ, লীলা চ্যাটার্জির যুগ থেকে সন্ধ্যা-চন্দ্রের যুগ পর্যন্ত বাঙালী মেয়েদের সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠা আজ অস্তমিত। লাইফ সেভিং সোসাইটির মীরা ও শিখা দে-ই বোধ হয় শেষ শিখা এবং সে শিখাও আজ নিভু নিভু।

কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি
শুনিয়ে জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি

আমার যেটুকু সাধ্য তা করিব আমি এমন কথা বলার মত মাটির প্রদীপটুকুও যেন দেখতে পাচ্ছি না।

প্রথমতঃ সাঁতারের শ্রেষ্ঠ সময় কৈশোর। কৈশরে যার সম্ভাবনায় বিকাশ হল না, তার ভবিষ্যৎ সাঁতারের ক্ষেত্রে অনুজ্জ্বল। বর্তমানের সাঁতার শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে কিশোরীর সংখ্যা খুবই কম। প্রাণে বাঁচানো ও আনন্দ করার জন্য সাঁতার শিখতেই আসে বেশির ভাগ। আর প্রতি-যোগিতামূলক সাঁতারে প্রথম শ্রেণীর দক্ষতা শেখাতে পারে যে নিষ্ঠাবান গুরু, বোধ হয় শ্যামাপদ গোস্বামী ও বিমল দে-ই সে জাতের শেষ। একজন বৃদ্ধ ও নিরুৎসাহ এবং অপরজন মৃত। লীলা ব্যানার্জি ও সেই দলের। দৈনিক মাত্র এক ঘণ্টা মেয়ে-দের জন্যে হেদোয় সাঁতার কাটার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট। সেটুকু সময়ে সাধারণ শিক্ষা-র্থিনীদের সামনে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন মেয়েদের নিয়ে বিশেষ প্রয়াস করা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া শ্রীমতী ব্যানার্জির কাছে জেনেছি যে অধিকাংশ অভিভাবকের মধ্যে প্রবল অসহযোগিতার ভাবও বর্তমান। অভি-ভাবকদের অসহযোগিতার ফলে যেখানে অধিকাংশ মেয়ে নিজেদের প্রবল উৎসাহ সত্ত্বেও নিয়মিত রুটিন মাফিক হাজিরাই দিতে পারে না, সেখানে প্রতিযোগিতামূলক নৈপুণ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় অনু-শীলন সেক্ষেত্রে অসম্ভব। তবু উৎসাহ বৃদ্ধি ও সংখ্যা বৃদ্ধিকেও একজন সাঁতার অনুরাগী হিসাবে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তো আজ শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি, উৎকর্ষ বৃদ্ধি নয়, উৎকর্ষের কমতি—এটি এখন কায়েম হাত বসেছে।

ফিরে আসি সেই জল ছলছলাৎ একটি দিনের কথায়। আজকের গলা বুক চেপে ধরা পরিবেশে এমন নির্দোষ প্রাণময়তার সুযোগে ভস্ম হতে পুষ্পধনু যদি জেগে ওঠে! কে জানে??

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী ভারতীয় মল্লবীরগণ। কুস্তি দলের কর্মকর্তারাও উপস্থিত আছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম বিশ্ব একাদশ

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ড : ২২২ রান (ফ্লেচার ৮৯ এবং ইলিংওয়ার্থ ৫৮ রান। প্রোক্টার ৫৭ রানে ৩ এবং বার্লো ৬৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৭৬ রান (লাকহার্স্ট ৯২, বয়কট ৬৬, ফ্লেচার ৬৩ এবং ইলিংওয়ার্থ ৫৪ রান। বার্লো ৭৮ রানে ৫ এবং কাইহাই ৪৫ রানে ২ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ : ৩৭৬ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোবার্স ১১৪ এবং ডেরিক মারে ৯৫ রান।

ও ২২৬ রান (৮ উইকেটে। সোবার্স ৫৯ এবং ইন্তেখাব আলম ৫৪ রান। স্নো ৮২ রানে ৪ উইকেট)

লিডসে ইংল্যান্ড বনাম বিশ্ব একাদশ দলের চতুর্থ টেস্ট খেলায় বিশ্ব একাদশ দল নাটকীয়ভাবে ২ উইকেটে জয়ী হয়ে টেস্ট সিরিজে ৩-১ খেলায় 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। সুতরাং ওভালের পঞ্চম টেস্ট খেলার ফলাফল ইংল্যান্ডের অনুকূলে গেলেও বিশ্ব একাদশ দলের 'রাবার' জয়ের কোন হেরফের হবে না। জয়ের দূরত্ব যা হ্রাস পাবে।

বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স টসে জয়ী হয়ে ইংল্যান্ডকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। প্রথম দিনেই ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ২২২ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল—লাঞ্চের সময় ৬৯ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৭০ (৪ উইকেটে)।

বিশ্ব একাদশ দল প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে কুড়ি রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে বিশ্ব একাদশ দলের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩০৯ (৭ উইঃ)। তারা প্রথম ইনিংসের ৩টি উইকেট জমা নিয়ে ৮৭ রানে এগিয়ে থাকে।

তৃতীয় দিনে বিশ্ব একাদশ দলের ৩৭৬ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) অধিনায়ক সোবার্স প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ফলে বিশ্ব একাদশ দল ১৫৪ রানে অগ্রগামী হয়। সোবার্স ২০৩ মিনিট ব্যাট করে ১১৪ রান করেন (বাউন্ডারী ১৬ ও ওভার বাউন্ডারী ১)। টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে এই নিয়ে সোবার্স ২৩টি সেঞ্চুরী করলেন। তিনি আর ৭টি টেস্ট সেঞ্চুরী করলে অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরীর (২৯টি) বিশ্ব-রেকর্ড ভাঙবেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বর্তমান টেস্ট সিরিজে তিনি এপর্যন্ত দুটি সেঞ্চুরী করেছেন।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসের তিনটি উইকেট খুইয়ে ২০৪ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ৩৭৬ রানের মাথায় শেষ হয়। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ২৮১ (৭ উইকেটে)। এই সময় তারা মাত্র ১২৭ রানে অগ্রগামী হয়। সকালের দু' ঘণ্টার খেলায় ইংল্যান্ড ৪টি উইকেট খুইয়ে ৭৭ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২২৩ রান তুলতে বিশ্ব একাদশ দল ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং পাঁচ উইকেট খুইয়ে মাত্র পঁচাত্তর রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে লাঞ্চের ঠিক আগে ও পরে খেলায় মোড় নাটকীয়ভাবে ইংল্যান্ডের অনুকূলে ঘুরে যায়। সোবার্স (৫৯ রান) এবং ইন্তেখাব (৫৪ রান)—এই দুই নির্ভরশীল খেলোয়াড় ঠিক লাঞ্চের আগে খেলা থেকে বিদায় নেন এবং লাঞ্চের ঠিক পরে কানহাই মাত্র চার রান করে আউট হন। এই সময় বিশ্ব একাদশ দলের রান দাঁড়ায় ১৮৩, ৮ উইকেট পড়ে। তখনও জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২২৩ রান থেকে বিশ্ব একাদশ দল ৪০ রানের পিছনে এবং হাতে জমা মাত্র দুটি উইকেট। রিচার্ডস এবং প্রোকটার অসমাপ্ত নবম উইকেটের জুটিতে ৪৩ রান তুলে শেষ পর্যন্ত দলকে ২ উইকেটে জয়যুক্ত করেন। রিচার্ডস ২১ রান এবং প্রোকটার ২২ রান তুলে অপরাজিত থাকেন। পিঠের ব্যথার দরুণ আফ্রিকার বেরী রিচার্ডস প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামেননি।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কোয়ালালামপুরে আয়োজিত ত্রয়োদশ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় লীগ পর্যায়ের বাছাই খেলা শেষ হয়েছে। 'এ' গ্রুপের চূড়ান্ত লীগ তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে ব্রহ্মদেশ এবং দ্বিতীয় স্থান ভারতবর্ষ। 'বি' গ্রুপের চূড়ান্ত লীগ তালিকায় দক্ষিণ কোরিয়া প্রথম এবং হংকং

মোহনবাগান—বালী প্রতিভার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় বালী প্রতিভার গোলের সামনে মোহনবাগানের চন্দন গুপ্ত পড়ে গেছেন। এই খেলায় মোহনবাগান ২-০ গোলে জয়ী হয়ে বর্তমানে ১৬টি খেলায় ৩১ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে।

দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সূত্রে মূল প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে খেলবে ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ও হংকং। গত বছরের বিজয়ী ইন্দোনেশিয়া 'বি' গ্রুপের খেলায় ৩য় স্থান এবং রানার্স-আপ মালয়েশিয়া 'এ' গ্রুপের খেলায় ৩য় স্থান পাওয়াতে মূল প্রতিযোগিতায় উঠতে পারেনি।

'এ' গ্রুপের চারটি খেলার পর লীগ তালিকার শীর্ষ স্থান অধিকার করে ব্রহ্মদেশ (৭ পয়েন্ট)। এই সময় দ্বিতীয় স্থানে ছিল তাইওয়ান এবং তৃতীয় স্থানে মালয়েশিয়া (উভয়েরই পাঁচ পয়েন্ট)। ভারতবর্ষ চারটি খেলায় চার পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে চতুর্থ স্থানে ছিল। ব্রহ্মদেশ তার শেষ খেলায় ২-১ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে মোট নয় পয়েন্ট সংগ্রহ করে এবং অপরাজিত অবস্থায় 'এ' গ্রুপের লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান পায়। তাইওয়ান তার শেষ খেলায় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে ১-৩ গোলে হেরে যায়। ফলে মালয়েশিয়া এবং তাইওয়ানের পয়েন্টের কোন পরিবর্তন হয় না, উভয়েরই পাঁচ পয়েন্ট থেকে যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ তার শেষ খেলায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে ২-১ গোলে পরাজিত করে লীগ তালিকায় ২য় স্থান লাভ করে।

'বি' গ্রুপের চারটি খেলার পর লীগ তালিকার প্রথম স্থানে ছিল দক্ষিণ কোরিয়া এবং দ্বিতীয় স্থানে হংকং। দক্ষিণ কোরিয়া বনাম হংকংয়ের খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। ফলে দক্ষিণ কোরিয়া 'বি' গ্রুপের লীগ তালিকায় অপরাজিত অবস্থায় প্রথম স্থান এব হংকং দ্বিতীয় স্থান পেয়ে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

চূড়ান্ত লীগ তালিকা
(প্রথম চারটি দল)

'এ' গ্রুপের খেলা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ব্রহ্মদেশ	৫	৪	১	০	১০	৪	৯
ভারতবর্ষ	৫	৩	০	২	৭	৫	৬

'বি' গ্রুপের খেলা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
দঃ কোরিয়া	৫	২	৩	০	৭	২	৭
হংকং	৫	৩	১	১	৮	৬	৭

ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল

জয় ৩ : মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ৩-১, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২-০ এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপক্ষে ২-১ গোলে।
পরাজয় ২ : তাইওয়ানের কাছে ০-১ এবং ব্রহ্মদেশের বিপক্ষে ০-২ গোলে।

মালয়েশিয়ান অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা

ইপোতে (উত্তর মালয়) আয়োজিত ১৮তম মালয়েশিয়ান মুক্ত অপেশাদার অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় ১৮টি স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে মালয়েশিয়া প্রথম স্থান এবং ৮টি স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। এবছরের প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া ছাড়া এই সাতটি বাইরের দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল—ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থাইল্যাণ্ড এবং সিঙ্গাপুর।

ভারতবর্ষের পক্ষে ৮টি স্বর্ণপদক জয় করেছেন নীচের ৭জন অ্যাথলীট :

পুরুষ বিভাগ

৮০০ মিটার দৌড় : রাম সিং
১৫০০ মিটার দৌড় : এডওয়ার্ড সিকুইরিয়া
৫০০০ মিটার দৌড় : এডওয়ার্ড সিকুইরিয়া
৪০০ মিটার দৌড় : সুচা সিং
ট্রিপল জাম্প : কে রঘুনাথন
সটপাট : গুরুদীপ সিং

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার হার্ডলস : মঞ্জিৎ ওয়ালিয়া
৪০০ মিটার দৌড় : কমলজিৎ

এডওয়ার্ড সিকুইরিয়া ১,৫০০ মিটার দৌড় ৩ মিনিট ৫৪-৮ সেকেণ্ডে এবং ৫,০০০ মিটার দৌড় ১৪ মিনিট ৩০-৬ সেঃ শেষ করে প্রতিযোগিতায় নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।
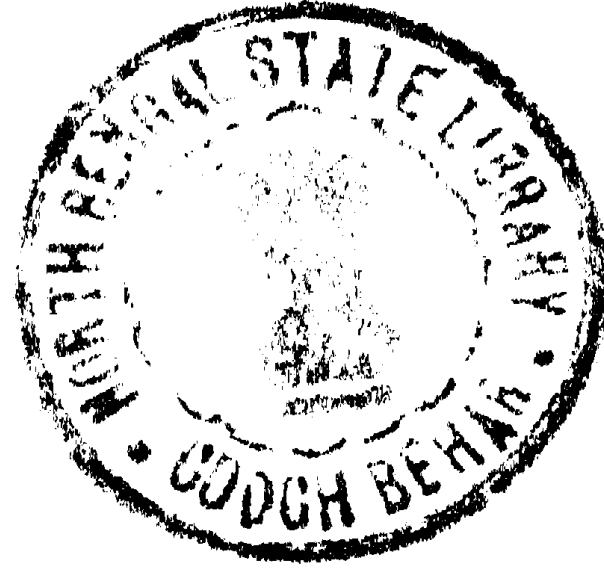
পুরো ভরসা রেখে আপনার ট্র্যানজিস্টারে লাগিয়ে নিন এভারেডী নং ১050

ট্র্যানজিস্টারকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে শক্তি যোগানোর জন্যে বিশেষভাবে তৈরী রাউণ্ড ব্যাটারী।

- ★ বহুক্ষণ ধরে চালু থাকার একটানা শক্তি যোগায়।
- ★ ট্র্যানজিস্টারের যন্ত্রপাতির ক্ষতি-নিরোধ করাই এর বিশেষত্ব।
- ★ এই ব্যাটারী লাগিয়ে বরাবর পরিষ্কার ও নিখুঁত আওয়াজ পাবেন।
- ★ যেমন এর কর্মকুশলতা তেমনি দীর্ঘ এর স্থায়িত্ব।

'এভারেডী' নং ১০৫০ লাগিয়ে আপনার ট্র্যানজিস্টার থেকে সবচেয়ে সুন্দর কাজ পাবেন।

SPECIAL EVEREADY TRADE MARKS LEAKPROOF TRANSISTOR BATTERY UNION CARBIDE

১ টাকা ১০ পঃ
কর আলাদা

সমস্ত রকম ট্র্যানজিস্টার রেডিওর জন্যই 'এভারেডী' ব্যাটারী পাবেন।

UC 5772A

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 28th August, 1970 শুক্রবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৭৭ **40 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম কররায়

চিঠিপত্র

বিশ্বভারতীর বর্তমান সমস্যা

গত ৭ই শ্রাবণ-এর 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'বিশ্বভারতীর সমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনার পত্রিকায় স্থান পেলে আনন্দিত হব।

বিশ্বভারতীর সকল সমস্যার মূলীভূত কারণ হোল, আমার মতে, সরকারী অর্থ-সাহায্য এর পরিপুষ্টি লাভ। বিশ্বভারতী যেদিন থেকে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এক 'কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত হোল, সেদিন থেকেই শুরু হোল এর ভুল পদক্ষেপ। সরকারী কৃপাদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের গণতান্ত্রিক শিক্ষানিকেতনের আদর্শে পড়ল ভাটা। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বভারতী নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়েছিল ততদিন এই প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ পুরোপুরিভাবে বজায় রেখেছিল। অর্থভারে পরিপুষ্ট হয়ে এর হোল পদস্খলন। শিক্ষার কর্মসূচী যা গড়ে উঠল, তার সবটাই নিঃসন্দেহে বলা যায় অর্থকেন্দ্রিক। এই অর্থকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কর্মসূচীকে দূরে ঠেলে দিল। সরকারী আইনকানুনের চাপে আজ উপাচার্যমহাশয় কি হাত-পা বাঁধা এক যন্ত্রবিশেষ নন? পার্লামেন্টের আইনে যে সব সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা উপাচার্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তাতে করে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে দায়িত্ববোধ, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠা স্বাভাবিক তা কি ব্যাহত হচ্ছে না? সরকারের হাতেই আজ বিশ্বভারতীর সকল পরিচালনাভার, আশ্রম-জীবন পরিচালন ব্যাপারে অন্যদের কোন ভূমিকাই নেই। এমন অবস্থায় কি ছাত্র, কি অধ্যাপক, কি কর্মীবৃন্দ—সকলের মধ্যেই একটা রুক্ষভাব আসা নিতান্তই স্বাভাবিক। আশ্রমবাসীদের মধ্যে এই রুক্ষতাভাবই আজ বিশ্বভারতীর সকল সমস্যার মূলে। এই সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করতে না পারলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী আদর্শভ্রষ্ট হবেই।

বারিদবরণ ঘোষ,
চুঁচুড়া,
হুগলী।

(২)

৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার সাপ্তাহিক অমৃতে প্রকাশিত অধ্যাপক শান্তিদেব ঘোষের 'বিশ্বভারতীর বর্তমান সমস্যা' সম্পর্কে একটি সময়োপযোগী আলোচনার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। অধ্যাপক ঘোষ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এককালের ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক। গুরুদেবের প্রবর্তিত শিক্ষাধারার বর্তমানে ধীরে ধীরে রূপ পরিবর্তন হওয়াতে তিনি সঙ্গত কারণে মর্মাহত। দু-একটি প্রশ্নে অধ্যাপক ঘোষের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। তিনি বলেছেন : 'বিশ্বভারতীর অনেক অধ্যাপকই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মত নিজের বিভাগটিকে নিয়ে মগ্ন। সময়ের সঙ্গে সমন্বয় করার চেষ্টা দ্রুতগতিতে কমে আসছে...দু-একটি বিভাগে এখানকার প্রাতঃকালীন ক্লাশ করার পুরোনো প্রথাটিকে বন্ধ করে বেলা ১০টা—৫টা পর্যন্ত ক্লাশ চালু করলেন।'

বিদ্যাভবন ও শিক্ষাভবনের পরিচালনার ব্যাপারে অন্যান্য ভবনের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সব ভবনের পরিচালনার দায়িত্ব যাঁরা নেন তাঁরা সব সময়ে চেষ্টা করেন নিজের বিভাগটি সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে। আর যে সমস্ত অধ্যাপক ঐ বিভাগে যোগ দেন তাঁরা নিজের ভবনের দায়িত্ব পালন করার পর অন্য বিভাগের সহযোগিতা করার প্রশ্ন ওঠে। হয়ত অনেক সময় সম্ভব হয় না। অতীতে হয়ত সম্ভব ছিল। কারণ অতীতের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানের কর্মপদ্ধতির বিরাট ফারাক। যাই হোক তা বলে সমস্ত বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে চলবার চেষ্টা তো বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম আদর্শ। অধ্যাপক ঘোষ ১০টা—৫টা ক্লাশ করার প্রতি অভিযোগ জানিয়েছেন। বিদ্যাভবন ও শিক্ষাভবনের যাঁরা ছাত্র তাঁরা সকাল-বিকাল ক্লাশ করার পরে সময় পান মাত্র সন্ধ্যাবেলা। শুধুমাত্র সন্ধ্যাবেলাতেই কি বিদ্যাভবন ও শিক্ষাভবনের ছাত্রদের পাঠ-প্রস্তুতি করা সম্ভব? তাছাড়া যেটা ঐ ভবনগুলির ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ লাইব্রেরী ওয়ার্ক, সেটা কখন হবে? বা বিজ্ঞানভবন ছাত্রদের লেবরেটারী ওয়ার্ক? তাই একবেলা (সকাল) পাঠ-প্রস্তুতি ও একবেলা (সন্ধ্যাবেলা) লাইব্রেরীর কাজ—এইভাবে সময়সূচী করাই শ্রেয়। ছাত্রসাধারণের সুবিধার জন্য এই নামমাত্র সময়সূচীর বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নেওয়া দরকার। গুরুদেব স্বয়ং জীবিত থাকলে এ ব্যবস্থা হোতই।

অধ্যাপকদের প্রমোশনের দাবীর ব্যাপারে তিনি অভিযোগ করেছেন : অধ্যাপকদের দাবী : 'প্রমোশনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতাসাপেক্ষে সিনিয়রিটি অগ্রাধিকার পাবে।' অর্থাৎ এঁরা চান না পাণ্ডিত্যের বা খ্যাতির কোন মূল্য থাকুক।' যে সমস্ত যোগ্য ব্যক্তি অনেক দিন ধরে গুরুদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহুদিন বিশ্বভারতীতে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন, প্রমোশনের ব্যাপারে তাঁদের দাবী অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কারণ, কোন বহিরাগত অধ্যাপক ঐ উচ্চপদে নিঃসন্দেহে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও গুরুদেবের শিক্ষাধারা বা আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা থাকা দরকার। তা আছে কিনা কয়েক মুহূর্তে ইন্টারভিউর মাধ্যমে তা ধরা পড়ে না, সম্ভবও নয়। তাছাড়া প্রমোশনের ব্যাপারে ন্যূনতম যোগ্যতাসাপেক্ষে সিনিয়রিটি পাওয়া ইউ জি সি'র নিয়মকে লঙ্ঘন করা হয় না। তবে তা বলে এ ঠিক নয় যে গুণী ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির আদর বিশ্বভারতীতে না থাকুক।

সবশেষে একটি কথা মনে রাখা দরকার। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বভারতীর মূল্যবোধকে বজায় রেখে গুরুদেবের আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলা প্রয়োজন।

শান্তিরূপম নন্দ
(প্রাক্তন ছাত্র)
মৌ পুর।

(৩)

বিশ্বভারতীর বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে অমৃতে (৭ই শ্রাবণ, ১৩৭৭) এক নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ শান্তিনিকেতনে অশান্তির কারণ কিছু নির্ণয় করেছেন। এ-বিষয়ে ভিন্ন মতের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পুরান প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমি এইটুকুই নিবেদন করব নতুন এবং পুরাতনের সমন্বয়েই শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে। আজকের যাঁরা নতুন তাঁরাও একদিন পুরোন হবেন।

শান্তিনিকেতনের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যটুকু বিসর্জন দিয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শান্তিনিকেতনকে শুধুমাত্র সাময়িক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করে রাখার কোন যুক্তি অবশ্যই নেই। শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রেখেই চলতে হবে।

আমি শান্তিনিকেতনের নতুন এবং পুরোন সকলকেই অনুরোধ করব শুধু শুধু পত্র-পত্রিকা মারফৎ শান্তিনিকেতনের

চিঠিপত্র

দোষত্রুটিগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরে যেন শান্তিনিকেতনকে হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়। দোষত্রুটি সকলকারই আছে এবং সেগুলিকে যথাসম্ভব বর্জন করে মিলিত-ভাবে সচেষ্ট হয়ে নিজেদের ভুল বোঝা-বুঝিগুলো মিটিয়ে ফেলা উচিত, তা না হলে আমাদের প্রিয় শান্তিনিকেতনে অশান্তি জমা হবে এবং তা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

অজিত বিশ্বাস,
রাজভবন, রাঁচি।

'প্রেমিকার প্রীতি' প্রসঙ্গে

অমৃতের আমি একজন নিয়মিত ও অনুরাগী পাঠক। নবীন লেখকদের রচনা-গুলি আমি মনোযোগসহকারে পড়ি। ১৪ই শ্রাবণের অমৃতে চণ্ডী মণ্ডলের লেখা গল্প 'প্রেমিকার প্রীতি' পড়ে ভাল লাগল। বাস্তবমুখী মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'প্রেমিকার প্রীতি' আমাদের প্রত্যেকের কল্পনার বাস্তব রূপ। আমরা প্রায় সকলেই এক-এক সময় একজন 'আনন্দে'র মত মানসিক কল্পনার জগতে বাস করি। সামান্য ঘটনাকে নিয়ে লেখক পাঠকের চিন্তার যে খোরাক জুগিয়েছেন তাতে লেখকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে আশাবাদী করেছে। শেষ কথা আমাদের প্রিয় অমৃতে আমরা আরও কিছু নতুন গল্প লেখকের কাছ থেকে পেতে চাই।

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়
বহরমপুর

(২)

অমৃত আজ একটি প্রখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই পত্রিকাতে যা সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তা হোল সাম্প্রতিক কয়েকটি ছোটগল্প। গত ৩১শে জুলাই, ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত চণ্ডী মণ্ডলের 'প্রেমিকার প্রীতি' ছোট গল্পটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই গল্পে এমন এক যুবকের জীবনবোধ চিত্রিত করা হয়েছে যার মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে বর্তমান যৌবনের নৈরাশ্যাত্মক উপসর্গগুলি থাকলেও শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে এক পবিত্র আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠেছে, এবং সে তার লুপ্ত সুস্থ সত্তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই ধরনের একটি বলিষ্ঠ গল্প প্রকাশের জন্য আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও লেখককে জানাই আমার সহৃদয় অভিনন্দন।

রঞ্জন চৌধুরী
কলকাতা—৩১

শাদা চোখে

ধর্মঘটের ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই আলোচনা প্রকাশিত হবার পূর্বে ও পরে হয়তো পশ্চিমবাংলাকে আরও অনেক ছোট-বড় "বন্ধের" সম্মুখীন হতে হবে। লক্ষ্য করা গেছে, সাধারণতঃ শারদোৎসবের আগে বোনাসের ইস্যুকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে অস্থিরতা আসে। ফলশ্রুতি—ধর্মঘট। অবশ্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্যাকে এড়ানো যায় না—এমন নয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের কর্মবিরতি ঘটে। কলম ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও, অনশন নানা-প্রকারের আন্দোলন চলে ফলে উৎপাদনের ওপর আঘাত আসে।

কিন্তু এবছর যেভাবে ঘটনার গতিবেগ মোড় নিচ্ছে তাতে মনে হয় শুধু খণ্ড সংগ্রামের মধ্যে আন্দোলন সীমিত থাকবে না। বোনাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রাজনৈতিক কারণগুলি সর্বাত্মক ধর্মঘটের যে রূপ নিতে পারে ইতিমধ্যেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শুধু বোনাস নয়, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ভোগদের সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের বলগাহীন উচ্চমানের সঙ্গে বেতনের সামঞ্জস্যবিধানের দাবীও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। কাজেই সমস্ত অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া রাজনৈতিক দাবীগুলির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বামপন্থী দলগুলি বিশেষ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সরকারের সঙ্গে একহাত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলায় ছোট ছোট "বন্ধ" সংগঠিত করে বৃহত্তর লড়াইয়ের ভিত্তিভূমি গড়ে তোলা হচ্ছে। দলীয় নেতারা মনে করছেন এর ফলে সংগঠন মজবুত হচ্ছে এবং দলের ক্যাডারদের মধ্যে লড়াকু ভাবটা প্রবলতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। ধারণাটা অমূলক নাও হতে পারে। কারণ, আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না থাকলে কর্মীদের মধ্যে জড়তা আসে। ফলতঃ সময়মত শক্তির প্রদর্শন অসম্ভব হয় পড়ে। দল তাতে আঘাত পায়। কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আখেরে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে যদি দলীয় সংগঠন বজায় রাখতে হয়—অন্ততঃপক্ষে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত—তবে ঐ দলের পক্ষে অন্য কোন পথ নেই বলেই মনে হয়। কাজেই ইস্যুর পর ইস্যু সৃষ্টি করে ক্যাডারদের কোন-না কোন কর্মসূচীর মধ্যে নিয়োজিত রাখতে হবেই। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঐদিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু পূর্বতন যুক্তফ্রন্টের অন্ততঃ আটটি শরীক এবার তাঁদের সঙ্গে নেই সেইজন্য তাঁদের এমনভাবে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে যাতে সরকার পর্যুদস্ত হয় আর আট পার্টির জোটও নাজেহাল হয়ে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে বাংলার "সংগ্রামী মানুষের" কাছে চিহ্নিত হয়। কেবলমাত্র সংগঠনের জোরেই এই অসাধ্য সাধনে সি, পি, এমকে মরীয়া হয়ে ব্রতী হতে হয়েছে।

এই সর্বাত্মক লড়াইয়ের ফল সি, পি, এমের পক্ষে খুব ভাল হবে একথা জোর করে বলা যায় না। তবে তাঁদের গত্যন্তরও যে নেই একথা সত্য।

আগেই বলেছি অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে রাজনৈতিক দাবীগুলি জুড়ে দিয়ে এতদিন লড়াই চলেছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল দুর্গাপুরে এর ব্যতিক্রম ঘটল। অর্থনৈতিক দাবীকে ভিত্তি করে যে লড়াই সংগঠিত করা হচ্ছিল, তা পরে কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেল। সি, পি, এম সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তড়িৎগতিতে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করে সমগ্র দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হল। মনে হয় এই প্রথম পশ্চিম বাংলায় একটি শ্রমিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করা হোল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগ্রামের কৌশল হিসাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার মাধ্যমে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতর করার জন্য শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। এবং ছোট ছোট লড়াইয়ের মাধ্যমে তাকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করতে হয়। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টরা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করে যে বক্তব্য রেখেছেন—সেই বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা কঠিন যে, এই দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে এমন এক সংগ্রামের হাতিয়ার করার মত অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। তাঁদের মতে এখনও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে রয়েছে রাজনৈতিক অবস্থা। তবে কেন হঠাৎ দুর্গাপুরে এরকম একটি মরণপণ রাজনৈতিক সংগ্রামে ঐ শিল্পনগরীর শ্রমিকদের লিপ্ত করলেন? মনে হয় উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের জন্য নয়—নিতান্ত শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্য। হয়ত বা এমনও হতে পারে যে, এতদিন ত অর্থনৈতিক লড়াই চলল, এখন রাজনৈতিক দাবীকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা লড়বার জন্য কতখানি মানসিকতা অর্জন করেছে তারই আঁচ করে নেওয়া। আরও একটি কারণ আছে, তা লড়াইয়ের কায়দা দেখে মনে হয়। সেটা হচ্ছে অহেতুক এই রাজনৈতিক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার ফলে শেষ রক্ষা করবার জন্য মৃত্যুপণ সংগ্রাম। নতুবা, মজুরদের সংগ্রামের অংশীদার করার প্রয়োজন হত না। দুর্গাপুরে যে লড়াই চলছে সি, পি, এমের পক্ষে, তাতে জয়ী হওয়া খুবই কঠিন। তাঁরা হয়ত আসল দাবী ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হবেন। এবং ইতিমধ্যে হয়েছেনও তাই। কিন্তু অনির্দিষ্ট ধর্মঘটের মূল কারণ বাম কম্যুনিষ্ট নেতা রামমূর্তির মতে "দুর্গাপুরের নেতৃবৃন্দের" বিনাসর্তে মুক্তি। এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বাম কম্যুনিষ্টদের অতীব পুরাতন সুহৃদ রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির যুগ্ম-আহ্বায়ক শ্রীযতীন চক্রবর্তী মহাশয় ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি শুধু নেতৃবৃন্দের মুক্তির উপর জোর দিতে চান না। বস্তুতঃ ঐ দাবীকে তিনি অনেকখানি লঘু করেই দেখতে চান। তিনি জোর দিতে চান সি, আর, পি প্রত্যাহার, শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যাহার ও পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরের ছয় শতাধিক সিকিউরিটি অফ শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগ না দেওয়ার অজুহাতে বরখাস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু কোন নেতা তাঁদের পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেন নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক স্তরে লড়াই হলেও মার্কসবাদীরা তাঁদের নেতৃবৃন্দের মুক্তির উপরই সবিশেষ জোর দিচ্ছেন। অথচ এক বাম কম্যুনিষ্ট নেতাই বলছেন তাঁরা সরকারকে অচল করে দেবেন। বেআইনী সরকারকে তাঁরা মানেন না। তাঁদের আদেশ মানার প্রশ্নও একেবারেই উঠে না। এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় সরকারের বিরুদ্ধে বাম কম্যুনিষ্টরা সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে শ্রীরামমূর্তি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চাইছেন বলে মনে হয়। একদিকে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা, অন্যদিকে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা দুটো একসঙ্গে চলে কি? সমস্ত দাবীদাওয়া তফাতে রেখে শুধু নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবীও রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায় থেকে বিচ্যুত বলেই মনে হয়। দুর্গাপুরে কার্ফু হওয়ার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। ফলে হয়ত বাম কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। কেননা, তাঁরা হয়ত মনে করবেন তাঁদের সরকার অচল করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু পুলিশী অত্যাচার যেমন জনতাকে সরকারের প্রতি

বিরূপ করে তুলে, তেমনি নাগরিক বা সমাজ-জীবনে অসহ্য অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য কে দায়ী জনতা তাও বিচার করতে সুরু করেছে। কাজেই দুর্গাপুরে যদি ধর্মঘট ব্যর্থ হয় তবে যে হতাশার ভাব আসবে সেই ধকল সামলাতে যে অনেকদিন লাগবে তার বহু নজীর আছে। দুর্গাপুরের লাগাতার ধর্মঘটের সমর্থনে সারা পশ্চিমবঙ্গে এক-দিনের হরতাল করবার জন্য মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা বাজার যাচাই করছেন। কিন্তু ২০শে আগস্ট পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি বা ১২ই জুলাই কমিটি এসম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ও ১২ই জুলাই কমিটি বর্তমানে সি, পি, এম-এর নিজস্ব সংস্থাই বলা চলে। কারণ ঐ দুই সংস্থায় ভিন্ন মতাবলম্বী রাজ-নৈতিক দলের প্রতিনিধি নেই বললেই চলে। তবুও ঐ দুই সংস্থার নেতৃবৃন্দ অদ্যাবধি এতবড় ঝুঁকি নিতে সাহসী হচ্ছেন না বলেই মনে হয়। শ্রীযতীন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের কাছে নাকি—অবশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ না করার শর্ত দিয়া—বলেছেন, "হরতাল ডাকলেই হল।" এইসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাম কম্যুনিস্টরা আবার রাজ্যের সমস্ত ইঞ্জি-নীয়ারিং শিল্পেও বনধ চালু করে দেওয়ার হুমকী দিয়েছেন দুর্গাপুরের সমর্থনে। এই প্রসঙ্গেও শ্রীচক্রবর্তী একই কায়দায় বলেছেন, "ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শ্রমিকরা কি ওদের পকেটে?" শ্রীচক্রবর্তীর সংগঠনের তেমন কোন জোর নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অন্য দলের সমর্থনেরও ত দরকার আছে। কাজেই শ্রীচক্রবর্তীর মতন একজন সুহৃদও যদি বেঁকে বসেন তবে ভাবনারই কথা।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা যতই সমস্ত শ্রেণী সংগঠনের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড লড়াই করে সর্বাত্মক সংগ্রামের রূপ দিতে চাইছেন ততই বাধা দুস্তর হয়ে উঠছে। সংগঠন-গুলিতে ভাঙনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষক সংস্থায় বিভেদ প্রকট হয়ে উঠেছে এবং এতদিনের নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি যাঁরা এককথায় পশ্চিম বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে ফেলতে পারতেন এখন তাঁদের প্রতিটি সংগ্রামের স্তরে সুচিন্তিতভাবে পদক্ষেপ দিতে হচ্ছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে কেন্দ্রীয় সংস্থা আছে তাতে বিভেদের সুর বেজে উঠেছে। এমনকি প্রস্তাবিত ধর্মঘটে কিছু কিছু ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়ার প্রস্তাবও এসেছে।

অন্যদিকে আট পার্টি জোট এবং কি শিক্ষক, কি সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট এমনকি প্রস্তাবিত সর্বাত্মক ধর্মঘটে বাধা দেওয়ার কথা এখনও ঘোষণা না করলে কি কৌশলে তা ব্যর্থ করে দেওয়া যায় তার পরি-কল্পনা প্রস্তুত করছেন। তাঁদের বক্তব্য হল সংকীর্ণতাবাদ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে ধর্মঘটের মাধ্যমে জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরাবার যে অপচেষ্টা চলছে তাকে রুখতেই হবে। কারণ, এহেন আন্দোলন জনগণের স্বার্থ বিপর্যস্ত করে এবং প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিকে জোরদার করে তুলতে সাহায্য করে। তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে কথাটা ঠিক। আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ-নৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে বক্তব্যের যৌক্তিকতা আছে। যদিও বা যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গনের ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে তবুও বৃহত্তর রাজ-নৈতিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে যেটুকু ঐক্য অবশিষ্ট আছে তাকে বিনষ্ট করা উচিত নয়। শক্তির দম্ভ ও প্রেষ্টিজের প্রশ্ন তুলে রাজনৈতিক লড়াই করা যায় না। প্রকৃত বিপ্লবী যাঁরা তারা সব সময় বৃহত্তর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করে সহযোগীতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। সেন্টিমেন্টের স্থান সেখানে নেই। কাজেই দুর্গাপুরের নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী করে সারা বাংলায় একদিন যদি "বন্ধ" অনুষ্ঠিত হয় তার পরিণতি খুব লাভজনক হবে বলে মনে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে "হরতালের" একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই প্রবণতা

ভয়-ভক্তির সংমিশ্রণ মাত্র। কারণ দেখা যাচ্ছে—যেকোন অছিলায় যেকোন দল "বন্ধের" ডাক দিচ্ছেন তাতে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কোন বিশেষ দলের "হরতাল" এখন আর "মনোপলি বিজ্‌নেস্‌" নয়। কাজেই বাধা সত্ত্বেও যদি ডাক দেওয়া হয় হয়ত হরতাল পশ্চিমবঙ্গে হবে। ট্রাম, বাস, রেল অচল করে দিলেই "হরতাল" হয়ে গেল ধরে নেওয়া যেতে পারে। ফলে, হয়ত আবার কিছু সংখ্যক লোক প্রাণ হারাবে। সেকথা থাক্‌। কিন্তু হরতাল হয়ে যাওয়ার পর প্রোগ্রাম কি? লাগাতর হরতাল সেই প্রশ্ন গণমনে আসছে। এবং নেতৃবৃন্দের এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দিনও সমাসন্ন বলে মনে হয়। হরতালের ফলে রাজ্যের বা জাতির কিম্বা খেটেখাওয়া মানুষের কি আর্থিক ক্ষতি হবে সেটার বিচার করতে চাই না। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য দরকার হয় মরণপণ সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে সংগ্রামের মানসিকতা ত প্রস্তুত করা হচ্ছে না। গণতান্ত্রিক অধিকার শুধু একশ্রেণীর লোকের বেতন বৃদ্ধি ও নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীর মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকে তবে অগণিত মানুষ তাতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে কি? শুধু বেকারের কর্মসংস্থানের দাবীতে ধর্মঘট হয়েছে কি? সমাজের অগণিত মানুষের যাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা নেই, বাসস্থানের সংস্থান নেই কিম্বা রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা নেই—শুধু তাঁদের দাবীর ভিত্তিতে অদ্যাবধি কোন ধর্মঘট হয়েছে কি? এহেন মানুষের দাবীকে গৌণ বিবেচনা করে অন্যদের অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের কাজে লাগানো হয়েছে মাত্র। এর ফলে জনতার মনে বিরূপ ভাব আসতে বাধ্য। নেতৃবৃন্দ এই দিকটা পর্যালোচনা করে দেখবেন এই আশা করা যায়।

অন্যান্যবার আন্দোলনের সময় জনতা থেকে সরকার বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু এবারকার অবস্থা তা নয়। এমন কি দুর্গাপুরের ধর্মঘটে এবং বর্ধমানের একদিনের বন্ধে তা প্রত্যক্ষ করা গেছে। বাম কম্যুনিস্টদের শক্তি নিশ্চয় এমন সীমাহীন নয় যে সমস্ত দলকে বিশেষ করে অন্যান্য বামপন্থীদের উড়িয়ে দিয়ে একক লড়াই করে এগিয়ে যেতে পারবেন। তা যদি হত তবে অন্য পাঁচ—প্রায় অস্তিত্বহীন দলের সঙ্গে জোট বেঁধে থাকার চেষ্টা নিশ্চয় করতেন না। একক শক্তি নেই বলেই ফ্রণ্টের কথা উঠে। কাজেই এবার ধর্মঘট হলে সরকার আর একা নয়। প্রত্যক্ষ সহযোগ না পেলেও জনতার একটি বৃহৎ অংশ যে পরোক্ষভাবে সরকারকে সমর্থন করবে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাই বলছিলাম—শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে এখনও একক শক্তির জোরে রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করবার সময় আসে নি। এই প্রচেষ্টা হঠকারিতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুবে বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বলে পারা যায় না। হালফিল দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ভূমি দখল আন্দোলনে নেমেছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকও কয়েকদিনের মধ্যে এই সংগ্রামের সাথী হচ্ছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই আন্দোলনের ফলে ভূমি সমস্যার সমাধান হবে কিনা তার বিচার বিশ্লেষণ না করেও বলা চলে যে ভূমি বণ্টনের প্রশ্নটা যে অতীব জরুরী একথা বাধ্য হয়েই আজ সকলকে স্বীকার করতে হচ্ছে। সি পি এম-এর রাজনৈতিক বক্তব্য হচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো "বুর্জোয়া লেণ্ডলর্ডিজম" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভূমি দখলের আন্দোলনের ফলে তাঁদেরই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এই লড়াইয়ে তাঁরা সামিল হচ্ছেন না। এই আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের লড়াইয়ের মধ্যে নিজেদের লিপ্ত রেখে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা কি জনগণের বৃহৎ অংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন না? অবশ্য, এর জবাব তাঁরাই দেবেন।

দেশে বিদেশে

স্বাধীনতা লাভের পর গত ২৩ বছরে আর কখনও ভারতবর্ষে এমন প্রশ্নসংকুল ১৫ই আগষ্ট এসেছে কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষে ওয়েষ্টমিনষ্টার-মার্কা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের দিন কি ফুরিয়ে এল? এর বদলে কি সেই সংবিধানের রাস্তা ধরাই শ্রেয় যেখানে ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতেই কেন্দ্রীভূত (যেমন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে), প্রধানমন্ত্রীর হাতে নয়? ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে কি নিজেদের পৃথক পৃথক পতাকা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে? স্বাধীন ভারতবর্ষ কি আইনের পথে তার ভূমিসংস্কারের কার্যসূচীর রূপায়ণ করতে পারবে? আইনের দীর্ঘ জটিলতায় অসহিষ্ণু হয়ে যারা সশস্ত্র বলপ্রয়োগ করতে চাইছে তাদেরকেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সংবিধানের ভিত্তি দুর্বল করে ফেলতে দেওয়া হবে?

১৯৭০ সালের ১৫ আগষ্ট, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ২৩তম বার্ষিকীতে, এইসব প্রশ্ন উঠেছে এবং যে বিভ্রান্তিকর জটিলতার মধ্যে আমরা এসে পড়েছি যেন তারই প্রতীক হিসাবে আমরা দেখলাম, দিল্লীর লালকেল্লায় তাড়াহুড়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন করলেন সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার, প্রধানমন্ত্রী নন।

এবারকার স্বাধীনতা দিবসে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রশ্ন ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টি, সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি ও প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির ভূমি দখল আন্দোলন। কম্যুনিষ্ট পার্টি বড় বড় ভূস্বামীদের ও বিড়লার মতো শিল্পপতিদের জমি দখল করতে নেমেছে আর অন্য দুটি পার্টি জোর দিচ্ছে শাসক কংগ্রেসের নেতাদের বা তাঁদের স্ত্রী-পুত্রদের জমি দখল করার উপর। ভারতবর্ষের দশটি রাজ্য জুড়ে এই আন্দোলন চলছে, এই সম্পর্কে ২০ হাজার লোককে বিভিন্ন রাজ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ৩০ হাজার একরের বেশী জমি দখল করা হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীএস এ ডাঙ্গে, শ্রীভূপেশ গুপ্ত প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট নেতা আছেন। যাঁদের জমি দখল করার চেষ্টা হয়েছে অথবা দখল করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভি পি নায়কের স্ত্রী শ্রীমতী বৎসলা নায়ক, হায়দরাবাদের নিজাম, ভূপালের বেগম শ্রীজগজীবন রাম প্রভৃতি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শাসক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম প্রভৃতি এই জমি দখল, আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন এটা সংবিধানবিরোধী ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় বলে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকারই দাবী করছেন যে, এই আন্দোলন ইতিমধ্যে স্তিমিত হয়ে গেছে।

রাজ্য সরকারগুলির এই দাবী কতটা সত্য তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে, এটা ঠিক যে জমি দখলের এই আন্দোলন শাসক কংগ্রেস দলকে নাড়া দিয়েছে। দলের একজন সদস্য শ্রীমোহন ধারিয়া প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক। দলের আরও কয়েকজন সদস্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় বলেছেন যে, জমি দখল আন্দোলনের মধ্যে তাঁরা অন্যায় কিছু দেখেন না।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও এই আন্দোলন সমর্থন করেছেন।

শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে যাঁরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন তাঁরাও একথা অস্বীকার করছেন না যে আইনের দ্বারা উদ্বৃত্ত জমি দখল করার এবং সেই জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার প্রতিশ্রুত কর্মসূচী রূপায়ণে যে বিলম্ব হচ্ছে তার ফলেই জোর করে জমি দখল করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। একথা সকলেই উপলব্ধি করছেন যে, ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী আর ফেলে রাখা যায় না। এক সময়ে শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রস্তাব হয়েছিল যে, কোন্ রাজ্যে ভূমি সংস্কারের কার্যসূচী কতটা পূরণ হয়েছে তা লক্ষ্য রাখার জন্য ও এবিষয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে তাগাদা দেওয়ার জন্য প্রতিটি রাজ্যের বাবদ একজন করে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রীদের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। তবে, বিষয়টির উপর নজর রাখার জন্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

•

এবারকার স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালেই কয়েকজন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতবর্ষে এখন যে ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে তার মধ্যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? এবং এর বদলে বরং রাষ্ট্রপতির প্রাধান্যযুক্ত সংবিধানই ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেয় কিনা?

আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছে 'দি ষ্টেটস' নামক একটি পত্রিকায়। আসামের রাজ্যপাল শ্রীবি কে নেহরু রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করে তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে পৃথিবীর ১৩২টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ২৫টি বৃটিশ পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির প্রয়োগ করে পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়েছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীনেহরু বলেছেন যে, তাঁর হিসাবে ১৯৬৭ সাল থেকে এযাবৎ ২০টি রাজ্য সরকারের পতন ঘটেছে, ১১বার রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়েছে এবং ছয় শ'র বেশী আইনসভা সদস্য দলবদল করেছেন. তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার একাধিকবার দলত্যাগ করেছেন।

শ্রীনেহরুর মতো শ্রীএম সি চাগলাও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আনতে হলে মন্ত্রি-মন্ডলীর হাত থেকে ক্ষমতা সরিয়ে এনে রাষ্ট্রপতির হাতে দিতে হবে।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীবি কে নেহরু যেমন একদা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন শ্রীচাগলাও সেই একই পদে ছিলেন। তাঁরা দুজনই সে-দেশের 'প্রেসিডেন্সিয়াল' শাসন পদ্ধতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁরা দুজনই এখন ভারতবর্ষে সেই শাসনপদ্ধতি অবলম্বন করতে চাইছেন।

অবশ্য এখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে এমন প্রস্তাব আসে নি। অতএব, ভারতবর্ষের সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের এই প্রস্তাব এখনকার মতো শুধু তত্ত্বালোচনার স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে হচ্ছে।

●

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি নজীর সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটি পত্র লিখে তামিলনাড়ুর জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রীয় পতাকা গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। রাজ্য পতাকাটির যে নমুনা তিনি প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে জাতীয় পতাকার তিনটি রংই থাকবে, তবে তার মাঝখানে থাকবে একটি গোপুরম এবং অশোকচক্র চিহ্নিত জাতীয় পতাকাটি থাকবে রাজ্য পতাকার এক কোণে। শ্রীকরুণানিধি নাকি লিখেছেন যে, তাঁরা জাতীয় পতাকার বদলে নয়, তার পরিপূরক হিসাবে এই পতাকা ব্যবহার করতে চান। কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাঁদের এই অনুমতি না দেন তাহলে ডি-এম-কে দল এই নিয়ে আন্দোলন করবে।

লোকসভায় কয়েকজন সদস্য প্রসঙ্গটি তুলে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এরকম করতে দেওয়া হলে বিচ্ছেদপ্রবণতা বাড়বে। তাঁরা এই সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা রক্ষার জন্য ডি-এম-কে দলের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল সেহেতু তিনি তামিলনাড়ুর এই প্রস্তাব সম্পর্কে দুর্বলতা দেখাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিরও পৃথক পৃথক পতাকা আছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেরলের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য শাসক কংগ্রেস দলের আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন। ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখেই ঐ রাজ্যের নির্বাচন হচ্ছে।

ইতিমধ্যে কেরলের সি পি আই নেতৃত্বাধীন মিনি-ফ্রন্টের সঙ্গে শাসক কংগ্রেস দলের আসন বন্টনের বোঝাপড়া পাকাপাকি হয়ে গেছে। মিনি-ফ্রন্ট অবশ্য ইতিমধ্যে মাত্র চারটি দলের ফ্রন্টে পরিণত হয়েছে। কেননা, ইন্ডিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি ঐ ফ্রন্ট ছেড়ে সি পি এম-এর নেতৃত্বাধীন ফ্রন্টে যোগ দিয়েছে। কেরল কংগ্রেস ফ্রন্টের ভিতরে না থেকেও শ্রীঅচ্যুত মেননের সরকারকে সমর্থন করছিল। তারাও এখন ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন।

বিরোধী কংগ্রেস বলছে তারা কেরল কংগ্রেস, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি এবং সম্ভবত জনসংঘ প্রভৃতি দলের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে নির্বাচন লড়বে। সংযুক্ত সোস্যা-লিস্ট পার্টি কি করে এক দিকে সি পি এম-এর ফ্রন্টে থাকবে, অন্যদিকে বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবে সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। তার মানে কি এই যে, বিরোধী কংগ্রেস সি পি এম-এর সঙ্গেও ভোটের লড়াই এড়িয়ে যাবে? কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কোরিয়ার যুদ্ধের সময় চীনা সৈন্যের 'মনুষ্যতরঙ্গ'-এর সঙ্গে কিছুতেই এঁটে না উঠতে পেরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক ধরনের মারাত্মক স্নায়ু গ্যাস তৈরী করেছিল। গত যুদ্ধের সময় জার্মানরা 'সার্বরন' নামে যে গ্যাস তৈরী করেছিল তারই অনুকরণে তৈরী এই গ্যাসের সাহায্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষের স্নায়ু বিকল করে মেরে ফেলা যায়। সৌভাগ্যবশত জার্মান 'সার্বরন' বা পরবর্তীকালে তার অনুকরণে তৈরী আমেরিকন 'জি-বি' গ্যাস কোনটাই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক যুদ্ধের অস্ত্র-ভান্ডারে এই ধরনের গ্যাস প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে।

সম্প্রতি 'জি-বি' গ্যাসভর্তি সাড়ে বারো হাজার পুরানো রকেট নষ্ট করে ফেলার প্রশ্ন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঘরে-বাইরে প্রচন্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই রকেটগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় বেশী দিন ফেলে রাখলে সেগুলি থেকে গ্যাস বেরিয়ে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন মার্কিণ প্রতিরক্ষা বিভাগ স্থির করলেন, অ্যালবামা ও কেন্টাকি রাজ্যের দুটি ডিপো থেকে ঐ রকেটগুলি মাল-গাড়ীতে বোঝাই করে নর্থ ক্যারোলাইনা রাজ্যের একটি বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর সেখানে জাহাজে উঠিয়ে আত-লান্তিক মহাসাগরে ১৬ হাজার ফুট জলের নীচে সেই জাহাজটি ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

এইভাবে বিস্তীর্ণ জনপদের মধ্য দিয়ে এমন বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে দেশব্যাপী দারুণ হৈ-চৈ উঠেছিল। জর্জিয়ার গভর্ণর লেস্টার ম্যাডকস বলেছিলেন যে, এভাবে নিয়ে যাওয়ায় যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই সেটা বোঝাবার জন্য তিনি নিজে মালগাড়ীতে যাবেন। কিন্তু আরও অন্তত একজন গভর্ণর ও একজন মেয়র এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন। সিনেট কমিটিতে এই বিষয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্রদের রীতিমত জেরা করা হয়েছে। বাহামা দ্বীপপুঞ্জ এই বলে আপত্তি করেছে যে, তার উপকূলের কাছে এই বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ ফেলে তাকেও বিপন্ন করা হচ্ছে, আইসল্যান্ড বলেছে, 'গাল্ফ ষ্ট্রীম' অঞ্চলে এই গ্যাস ফেলে তার মাছ ধরার ক্ষেত্রটি নষ্ট করা হচ্ছে।

দেশেবিদেশে এই আপত্তি সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ তাঁদের পরি-কল্পনা অনুযায়ীই 'জি-বি' গ্যাস রকেট-গুলিকে সলিল সমাধি দিয়ে এসেছেন। তবে আমেরিকান সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা এই ধরনের বিপজ্জনক পদার্থ নষ্ট করার প্রয়োজন হলে জলে না ডুবিয়ে পুড়িয়ে ফেলবেন।

পুণ্ডরীক
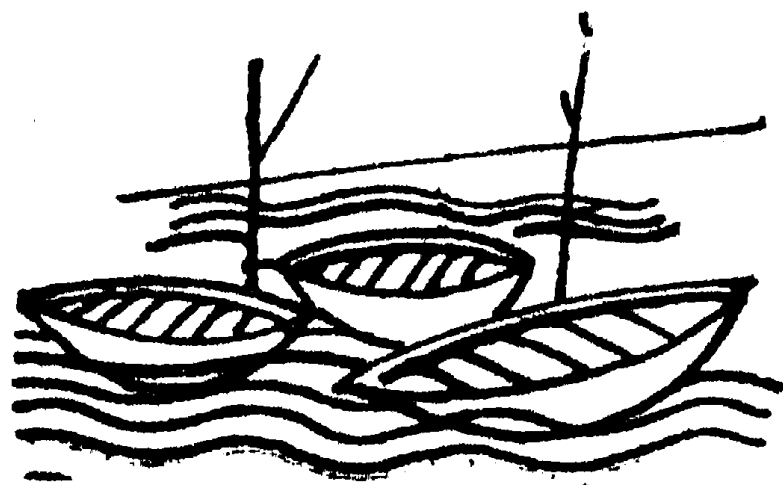
সম্পাদকীয়

অসহনীয় অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলার বর্তমান অবস্থা নিয়ে লোকসভার সদস্যরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা আজ প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন আজ নতুন নয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা অনেক সংগঠিত এবং এখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও বিশেষ শক্তিশালী। অপর দিকে ১৯৬৭ সালে এ রাজ্যে কংগ্রেসের যে পতন হয়েছে ক্ষমতা থেকে তার ধাক্কা এখনও কংগ্রেস সামলে উঠতে পারে নি। বামপন্থীদের মধ্যেও রাজনৈতিক চরিত্রের পার্থক্য পরস্পরের মধ্যে আজ খুবই লক্ষণীয়। এই সমস্ত কারণে এ রাজ্যে রাজনৈতিক চেতনা যেমন প্রখর তাদের মধ্যে বিরোধও তেমনি প্রচণ্ড। তার ফলেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বিক্ষোভ এমন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থীদের মধ্যেও একটি বৃহৎ অংশ আজ উপলব্ধি করতে পারছে যে, বোমাবাজী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ এ রাজ্যের সাধারণ মানুষকেই শুধু সন্ত্রস্ত করছে না, এখানে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনকেও পঙ্গু করে দিচ্ছে। বামপন্থীদের মধ্যে এক পক্ষে আছে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তার সহযোগী দুর্বল কয়েকটি দল, নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে যারা মার্কসবাদীদের সঙ্গ ছাড়ে নি। অন্যদিকে আছে সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি কয়েকটি দল যারা মার্কসবাদীদের বিরোধী। বাংলা কংগ্রেস এদের কোনো পক্ষেই নেই। কংগ্রেস (শাসক দল) একা এবং সিন্ডিকেট কংগ্রেসও একা। দক্ষিণপন্থী জনসঙ্ঘের অস্তিত্ব এ রাজ্যে অনুল্লেখ্য। মুসলিম সাম্প্রদায়িকরা আবার সংগঠিত হতে শুরু করেছে। তবে এদের কার্যসূচীর লক্ষ্য মূলত নির্বাচনে মুসলিম আসনগুলো দখল করা।

এই রাজনীতির বাইরে আরেকটি দল নিজেদের শক্তি জাহির করতে চাইছে যারা সি পি আই (এম-এল) নামে পরিচিত। প্রধানত এদের সঙ্গেই একদিকে পুলিশ ও অন্যদিকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের বিরোধ আজ প্রচন্ড এবং রক্তাক্ত। ছাত্র ও তরুণ সমাজের মধ্যে আজ অস্থিরতা এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। পশ্চিম বাংলার প্রধান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়—কলকাতা, যাদবপুর এবং উত্তরবঙ্গ প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভের ফলে এক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন। পড়াশোনার পাট প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। প্রেসিডেন্সী-র মতো প্রথম শ্রেণীর বহু দিনের ঐতিহ্যসম্পন্ন সরকারী কলেজে নিয়মিত ক্লাশ করা প্রায় অসম্ভব। অধ্যক্ষদের পক্ষে এই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মুখোমুখি হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। পুলিশ ও সি আর পি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর নজীর আর কোথাও আছে কিনা জানি না। তবে এটা নিশ্চিতই বলা যায় যে, অবস্থা স্বাভাবিক নয়। এভাবে কোনো দেশে পড়াশোনা চালানো সম্ভব নয়।

কলকাতায় এখন যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জায়গায় গোলযোগ হতে পারে, এটা ধরে নিয়েই অফিসযাত্রী, সাধারণ মানুষ ও অন্যান্যরা বাড়ি থেকে বের হন। যে কোনো সময়ে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এটাও সকলে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় থমথমে আবহাওয়া, মোড়ে মোড়ে পুলিশ এবং অন্ধকার গলিঘুঁজি থেকে আক্রমণ তো নিত্যদৃশ্য। অতর্কিতে পুলিশের ওপর আক্রমণ করে কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও কর্মী নিহত হবার পর পুলিশের একাংশের মধ্যে এক মারাত্মক প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। গত সপ্তাহে থানা-হাজতে পুলিশের নির্যাতনের ফলে একটি তরুণের মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে শহরে প্রচন্ড হাঙ্গামা হয়। উগ্রপন্থী রাজনীতিকে কোনোরকমেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু সন্দেহক্রমে ধৃত তরুণদের বিচারের সুযোগ না দিয়ে পুলিশ অত্যাচার করে পিটিয়ে মেরে ফেলবে, এটাও অরাজকতারই সামিল। হিংসা দিয়ে হিংসাকে রুখব বলে যারা প্রচার করছে, পুলিশের এই অন্ধ প্রতিশোধ স্পৃহা কার্যত তাদের হাতকেই শক্ত করছে। এভাবে হিংসার প্রতিশোধ নিতে গেলে পুলিশ জনসাধারণের সহানুভূতি হারাবে। সুতরাং সময় থাকতে তাদের সাবধান হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ আজ আগ্নেয়গিরির মুখে। যাঁরা বামপন্থী রাজনীতি করেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে জনসাধারণের কল্যাণ করতে চান তাঁদের আজ ভাবা উচিত যে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে কলহ করে শক্তিক্ষয় করবেন, না পশ্চিম বাংলার এই শোচনীয় অবস্থায় ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিরক্ষার জন্য কাজ করবেন। পরে যদি অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন সকলেরই সমূলে বিনষ্ট হবার আশঙ্কা। তাই এখনও রাজনৈতিক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে রাজনৈতিক দলগুলো পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারেন।

আমি খুঁজি আজ ॥

মণীন্দ্র রায়

যযাতি, তোমারই মতো আমারও সময়
পশ্চিম দিগন্তে, তবু পুত্রের যৌবন
কামনার হাহাকারে খুঁজে ফেরা
সে আমার নয়।

পৃথিবীর স্বপ্নগুলি, জ্যোৎস্না আর পাখির ডানার
নিরন্ত নীলের সাধ জানি নাকি আমি?
চিনি নাকি যুবতীর প্রেমের আকাশ—
শরীরে শরীর বাঁধা কিন্নরীর মন,
অথবা ঈশানী মেঘে চোখে তার দামিনী-বিলাস?
জ্বলন্ত মরুর মতো তৃষ্ণার জিহ্বায়
জানি নাকি সবুজের সাড়া খুঁজে খুঁজে
বেদনার ক্রূর ইতিহাস?

তবুও, যযাতি, আমি
পরের বাগানে ঐ ফুলের প্রহর
ছিন্ন ক'রে সাজাব না হৃদয় আমার;
আমি চাই বজ্র বৃষ্টি ঝড় বুকে নিয়ে
মাটিতে-শিকড়ে-বাঁধা প্রাণের উৎসার।

কেননা আমি-যে জানি
যৌবন, সে নয় শুধু উচ্ছল সুরার
কামনার, রমণীর, ছিনিমিনি গানের নূপুরে
কেননা আমি-যে জানি
চাপ-চাপ অন্ধকার কুপিয়ে, নিবিড়
কোদালে-লাঙলে-সেচে, বীজ বপনের
কাদায়-কাঁটায়-ঘামে পেশিতে মুঠোয়
তৃষ্ণা আর যন্ত্রণার ঢেউয়ে ঢেউ ঐ
সংঘর্ষের শিখরে শিখর
কেমন সোনার রঙে মাঠে মাঠে আলোকিত গান
ভ'রে তোলে গ'ড়ে-ওঠা ঘর।

আমি তাই বারে বারে, দু চোখে বিস্ময়,
ফিরে আসি আবাদে তাদের:
হৃদয়ের ভূমিক্ষয়ে যা ছিল খোয়াই—
কাঁকরে-বালিতে-এসে জীবনেরই শূন্যতা হাঁ-মুখ
যা ছিল বাদার পাঁকে জরদ্গব লালসার শ্বাস;
অথবা বাঘের গুল্মে নাগিনীর শাখার ভয়াল
অরণ্যের হিংস্রতার যা ছিল উল্লাস—
দেখি তারই দাপটের বুকে ওড়ে দুরন্ত জীবন।

যযাতি, যৌবন কী যে দ্যুতিময়, জানি তা আমিও।
তাইতো, কামনা নয়, আমি খুঁজি আজ
অনাবাদী মৃত্তিকার গৃহস্থিতে স্থির
সাহসে শাণিত ঐ মন।।

গোলাপের ঘুঙুর

প্রফুল্ল রায়

দুপুরবেলা ময়নাগঞ্জের বাজারে পা দিয়েই বেঁকে বসল গোলাপরাণী, 'একটা তবলচী আর একটা ফুলুটওলা না হলে আমি আজ আর আসরে উঠছি না।'

হরবিলাস অপেরার পরিচালক, অভিনেতা এবং একমাত্র প্রোপ্রাইটর ছাপ্পান্ন বছরের হরবিলাস কুণ্ডু আড়ে আড়ে একবার গোলাপরাণীর দিকে তাকাল। মেয়েটার গায়ের রঙ মাজা মাজা, ফর্সার ধার ঘেঁষে। চামড়া টান টান, মসৃণ। মুঠোয় বেড় পাওয়া যায় কোমরখানি এমনই সুঠাম। লম্বাটে মুখে সরু চিবুক। পাতলা নাকের দুধারে বাজ পাখির মতন চোখ; সে চোখে খর চাউনি। আঁটো বুক তার, সুছাঁদ গলা। চুলগুলো রুক্ষ এবং লালচে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছিপছিপে গোলাপকে ঘিরে ছুরির ধারের মতন দিবানিশি কী যেন ঝলকায়!

হরবিলাস বলল, 'আজ আর কাল, এই দুটো দিন কষ্ট করে কাজ চালিয়ে নে। তা'পর তবলচী ফুলুটওলা কেন, আকাশের চাঁদ চাস চাঁদই পেড়ে দেব।'

গোলাপ বলল, 'দু' মাস ধরেই এক কথা কয়ে আসছ। কিন্তু আর নয়। আগে তবলচী আনবে, ফুলুটওলা আনবে। তা'পর আসরে উঠব।'

মনে মনে দমে গেল হরবিলাস। কাঁচা-পাকা গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে হেসে বলল, 'আমার কথাটা বুঝিন বিশ্বাস হচ্ছে না? ভগমানের দিব্যি, এই তোর গা ছুঁয়ে কইছি, দু'দিন পর সব এনে দেব।'

'দু'দিন পরেই তা হলে আসরে উঠব।'

'তুই বড্ড আড়বুঝো (অবুঝ) মাইরি—'

'সে তুমি যা ভাবো—'

হরবিলাস অপেরা নামটা যতখানি ভারিক্কী, দলটা কিন্তু সেই ওজনের না। দক্ষিণ বাঙলার নিতান্ত ভ্রাম্যমান একটা যাত্রার দল। গোলাপকে বাদ দিলে হরবিলাসের দলে না আছে ভাল একটা গাইয়ে, না বাজিয়ে, না পালা-বলিয়ে অভিনেতা। এমন কি সাজসরঞ্জাম বাজনা-টাজনারও খুবই অভাব। দু' মাস ধরে বেলো-ছেঁড়া হারমোনিয়াম, করতাল আর বেহালা দিয়ে কোনরকমে কাজ চালানো হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি যাত্রাগানের কনসার্ট জমে! তবলচী আর ফুলুটবাঁশির জন্য গোলাপ যে ক্ষেপে উঠেছে তা অকারণে না।

হরবিলাস বলল, 'তোর মরণকালে হরিনাম! সন্ধ্যেবেলা পালা; এখন এই অচেনা জায়গায় কোত্থেকে তবলাওলা ফুলুট-ওলা যোগাড় করি! ভারি জ্বালায় পড়া গেল দেখছি।'

গোলাপ বলল, 'সে তুমি যেখেন থেকে পার।'

গোলাপকে চটানো কাজের কথা না। এ দলে আকর্ষণ বলতে গেলে সে-ই। লোকে যে হরবিলাস অপেরার পালা এখনও শুনতে চায়, সে ঐ গোলাপের জন্য। মেয়েটা বিগড়ে গেলে বিপদ।

ময়নাগঞ্জের আড়তদাররা একটা বড় গুদোম ঘর যাত্রা দলের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। রান্নাটান্নাও তারাই করিয়ে রেখেছিল। তাড়াতাড়ি নাকেমুখে গাট্টি গুঁজে কাঁধে একটা চাদর ফেলে হরবিলাস কুণ্ডু তবলচী আর ফ্লুটওলার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

।। দুই ।।

হরবিলাস যখন ফিরল, হেমন্তের বেলা হেলে গেছে। তার সঙ্গে পাতলা চেহারার একটি যুবক। তিরিশ বত্রিশের বেশি বয়েস হবে না। গায়ের রঙ চাপা হলেও নাকমুখ বেশ ধারালো। চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল; কতকাল যে মাথায় তেল আর চিরুনি পড়ে নি! খালি পা। পরনে ময়লা ধুতির ওপর ক্ষারে-কাচা পরিষ্কার হাফশার্ট। একপলক দেখেই বোঝা যায়, নিজের সম্বন্ধে সে ভারি উদাসীন। হাতে তার ক্যারিওনেটের বাক্স।

দুপুরবেলা হরবিলাস যখন বেরিয়ে পড়েছিল তখন চোখে পড়ে নি। এখন দেখা গেল ময়নাগঞ্জ বাজারের মাঝামাঝি খানে চট টট বিছিয়ে সামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। হ্যাজাকে তেল ভরা হচ্ছে। ছোটখাটো একটা জনতা সেখানে ভিড় করে আছে। সন্ধ্যের পর ওখানে যাত্রার আসর বসবে।

সামিয়ানার পাশ দিয়ে গুদোমঘরের অস্থায়ী আস্তানায় এসে উঠল হরবিলাস। এখনও বাইরে শেষবেলার মরা-মরা আলো রয়েছে কিন্তু গুদোমের ভেতরটা অন্ধকার। তাই এরই মধ্যে গোটা দুই ডে-লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাত্রা দলের গাইয়ে-বাজিয়েরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে ছিল। কেউ কেউ বড় বড় টিনের বাক্স খুলে পরচুলা সাজ-পোশাক নাড়াচাড়া করছে।

হরবিলাস ডাকল, 'গোলাপ কই রে—

এক কোণ থেকে গোলাপ উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, 'কী কইছ?'

'ফ্লুটওলা ফ্লুটওলা করে তো মাথা খেয়ে ফেলছিলি। এই নিয়ে এলাম। এখন দ্যাখ, তোর পছন্দ হয় কিনা—হরবিলাস তার সংগীকে টেনে এনে গোলাপের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

কোমর এবং ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখের তারায় চরকি ঘুরিয়ে যুবকটিকে দেখল গোলাপ। তারপর হরবিলাসকে জিজ্ঞেস করল, 'এই সাগর-ছেঁচা মুক্তো কুথায় পেলে গো কুণ্ডুমশাই?'

হরবিলাস বলল, 'ওকেই শুধিয়ে দ্যাখ—'

গোলাপ এবার সোজা আগন্তুকের চোখের দিকে তাকাল, 'আগে তুমার নামটা কও দিকিন—'

ছোকরাটিও একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন গোলাপকে দেখছিল। আস্তে করে বলল 'আমার নাম শ্যাম—শ্যাম গায়েন—'

'কী শ্যাম? বাঁকা শ্যাম নাকিন?'

শ্যামের মুখ লাল হয়ে উঠল। হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'না—না, শুধু শ্যাম—'

গলার ভেতর রিনরিনে শব্দ করে হঠাৎ হেসে উঠল গোলাপ। মনে হল, কেউ যেন এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টেনে যাচ্ছে। হাসির দমকে তার শরীর বেঁকেচুরে যেতে লাগল। হাসতে হাসতেই গোলাপ বলল 'তুমি যা-ই হও, আমি তোমায় বাঁকা শ্যামই কইব কিন্তুন—'

হরবিলাস অপেরার আর সবাই ততক্ষণে চারদিক থেকে উঠে এসে গোলাপদের ঘিরে ধরেছে। তারাও হাসতে শুরু করল।

শ্যাম আরক্ত মুখে কিছু বলতে চেষ্টা করল কিন্তু গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুল না।

হরবিলাস কপট ধমকের গলায় বলল, 'নোতুন লোক নিয়ে এলাম। আর তুই তার পেছনে লাগলি গোলাপ। এমনি করলে লোক থাকবে?'

হাসি থামিয়ে গোলাপ বলল, 'আর হাসব না বাপু, হল তো?' বলেই আবার শ্যামকে নিয়ে পড়ল, 'তা ঘর কুথায় গো তুমার?'

শ্যাম আধফোটা গলায় বলল, 'যখন যেখেনে থাকি।'

'এখন তো তুমি এই গুদোম ঘরে রয়েছ।'

'এখন এটাই আমার ঘর।'

'চোখ কুঁচকে শ্যামকে বুঝতে চেষ্টা করল গোলাপ। তারপর বলল, 'কাজকম্ম কী কর?'

শ্যাম জিজ্ঞেস করল 'কাজকম্ম কইতে?'

'রোজগার পত্তর কিসে হয়?'

'যখন যা পাই তাই করি। কখনও হাটে হাটে মনিহারি দোকান দিয়ে বসি, কখনও আড়তে ধানচাল মাপি, কখনও আবার ফড়েদের সঙ্গে জুটে যাই।'

'এখন কী করছ?'

'ময়নাগঞ্জের শেষ মাথায় বিনোদ মাইতির দোকানে বিড়ি বাঁধছি।'

'বে' (বিয়ে) করেছ?'

মাথা নীচু করে শ্যাম বলল, 'না; উটা এখনও হয়ে ওঠে নি।'

'পিছু টান কিছু নেই?'

'না। একেবারে ঝাড়া হাত-পা।'

'খুব ভাল। এই রকম মানুষই আমরা খুঁজছিলাম গো। তা আমাদের দলে আসবে?'

'এক্ষুনি কথা দিতে পারব না। এট্টুস পরামশ্য টরামশ্য করে নিই—'

দুই ঠোঁটের মাঝখানে ফুটিফুটি একটু হাসিকে টিপে ধরে গোলাপ বলল, 'বে' তো কর নি। পরামশ্য করার লোক জুটিয়ে ফেলেছ নাকিন?'

গোলাপের ইঙ্গিতটা গায়ে মাখল না শ্যাম। বলল, 'দু চারজন বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের শুধিয়ে দেখি।'

পাশ থেকে হরবিলাস বলল, 'নিশ্চয়ই শুধোবে। তা বাপু, আজ আর কাল, এই দুটো দিন অন্তত উৎরিয়ে দাও। তারপরে অন্য কথা ভাবা যাবে।'

শ্যাম বলল, 'আচ্ছা—'

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়াতে গোলাপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল 'তুমি তো বেশ লোক! আনতে কইলাম ফ্লুটওলা আর তবলচী। তুমি শুধু এট্টা ফ্লুটওলা ধরে আনলে!'

হরবিলাস বলল, 'তবলাওলা পাই নি। ফ্লুটওলা নিয়ে এখন খুশী হয়ে থাক গোলাপ। তা ছাড়া—'

'কী?'

'শ্যাম গায়েন ফ্লুটও বাজাতে পারে তবলাও বাজাতে পারে।'

চোখ গোল করে গোলাপ শ্যামকে দেখতে লাগল। রগড়ের গলায় বলল, 'ও বাবা, এ যে দেখছি গুণের সাগর। তা হ্যাঁ গো বাঁকা শ্যাম, তুমি এক সনগেই ফ্লুট আর তবলা বাজাও নাকিন?'

শ্যাম বলল, 'একসনগে দুই যন্তোর বাজানো গেলে ঠিকই বাজাতে পারতাম।'

'উরে বাবা, বলে কী গো!' এমনভাবে গোলাপ কথাগুলো বলল যাতে যাত্রা দলের সবাই হেসে উঠল।

হরবিলাস তাড়া দিয়ে বলল, 'হাসাহাসি রগড় থাক। সন্ঝে হয়ে যাচ্ছে; এট্টু পর আসরে উঠতে হবে। এখন শ্যামকে বাজিয়ে দ্যাখ, ওকে দিয়ে চলবে কিনা—'

বোঝা গেল হরবিলাস কুণ্ডু এ দলের প্রোপ্রাইটর হলে কি হবে। গোলাপের 'হ্যাঁ'—'না'র ওপর সব কিছু নির্ভর করছে।

গোলাপ বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঢের বাজে কথা হয়েছে। এখন ফ্লুটে একখানা গত বাজাও দিকিন বাঁকা শ্যাম—'

শ্যাম বুঝল, সে কী ওস্তাদের বাজনদার, আগেভাগে না বুঝে সোজা আসরে উঠতে

দেওয়া হবে না। পরীক্ষার জন্য মনে মনে তৈরী হল সে। বাক্স থেকে ক্ল্যারিওনেট বার করে বলল, 'তবলায় ঠেকো দেবার লোক পাওয়া যাবে?'

গোলাপ বলল, 'শুনলে তো আমাদের তবলাদার নেই। বিনা ঠেকোতেই বাজিয়ে যাও।'

আর কোন কথা না বলে ক্ল্যারিওনেট বাঁশিটা আড়াআড়ি ঠোঁটের ওপর রাখল শ্যাম। সকৌতুকে এবং কিছুটা অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল গোলাপ। হরবিলাস অপেরার অন্য সবাইও তাকিয়েই আছে।

শ্যাম বাঁশিতে ফুঁ দিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে ময়নাগঞ্জের এই গুদোম ঘর যেন অলৌকিক স্বপ্নের জগৎ হয়ে উঠল।

বাঁশি যখন থামল, গোলাপের মুখ-চোখের চেহারা বদলে গেছে। কৌতুক নেই অবজ্ঞা নেই। রীতিমত মুগ্ধ গলায় সে বলল, 'বেশ বাজাও তো তুমি!'

ওধার থেকে কে যেন চুমকুড়ি কেটে বলল, 'এ যে ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল রে বাবা—'

গোলাপ আবার বলল, 'ধ্যাধ্ধেরে ময়নাগঞ্জে তুমার মতন বাজনাদার পড়ে আছে, কে জানত!'

প্রশংসার কথায় ঘাড় ভেঙে মাথাটা যেন ঝুলে পড়ল শ্যামের। সে কোন উত্তর দিল না।

একটু কি ভেবে গোলাপ শুধোল, 'কুণ্ডুমশাই বলছিল, তুমি ভাল তবলা বাজাতে পার।'

শ্যাম বলল, 'ভালমন্দ জানি না। একটু-আধটু বাজাই; এই আর কি—'

'এট্টুস বাজাবে?'

'শুনবার ইচ্ছে হলে না বাজিয়ে পারি?'

তক্ষুনি ডুগি-তবলা এসে গেল। গুদোমঘরে চট বিছানো ছিল। তার ওপর তবলার আসর বসাল শ্যাম। বাজনা থামলে এবারও মুগ্ধ বিস্ময়ের সুরে গোলাপ বলল, 'তোমার হাতে জাদু আছে হে—'

অন্যরাও তারিফ করতে লাগল।

হঠাৎ হরবিলাস সবার ওপর গলা তুলে বলল, 'তাই তো হে—'

চমকে হরবিলাসের দিকে ফিরল গোলাপ, 'কী হল তুমার?'

'আমার কপাল বুঝিন পুড়ল—'

'কি রকম?'

গোলাপের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে হরবিলাস শ্যামকে বলল, 'খাল কেটে তুমায় বুঝিন কুমীর আনলাম। আমার দলে গোলাপরাণী হল আকাশের চাঁদ; ওকে ছাড়া দল কানা। পেত্থম দিনই তাকে যেমন বশ করে ফেলেছ তাতে ডরিয়ে যাচ্ছি গো ফলুটওলা—'

বিব্রতভাবে একবার গোলাপকে একবার হরবিলাসকে দেখতে লাগল শ্যাম।

হরবিলাস আবার বলল, 'দেখো বাপু, আমার ঘরে আবার সিঁদ চালিয়ে দিও না!'

বিপন্ন মুখে কী বলতে যাচ্ছিল শ্যাম, বাইরে থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, 'সন্ঝে হয়ে গেল। তৈরী হয়ে লাও গো যাত্রাওয়ালারা।'

হরবিলাস ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, সবাই তৈরী হয়ে লাও।'

।। তিন ।।

আজকের পালার নাম 'লবকুশ'। গোলাপ সীতার পার্ট করছিল। আশ্চর্য মিষ্টি গলা মেয়েটার; তার সঙ্গে কাঁচা বয়েসের সতেজ ভাবটা মাখানো। সুর যেন তার গলার ভেতর পাখির মতন খেলে বেড়ায়।

গোলাপ আসরে এসে গান ধরলেই শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর গাইতে গাইতে গোলাপের চোখ কিন্তু বার বারই এসে পড়ছিল শ্যামের ওপর। কনসার্টের দলে বসে অবাক বিস্ময়ে শ্যাম তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। সে চোখে পলক পড়ছিল না।

পালা শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গেল। আসর থেকে গুদোম ঘরের আস্তানায় সবাই ফিরে এসেছে।

গোলাপ বলল, 'বাব্বা, তুমি কী লোক গো বাঁকা শ্যাম—'

শ্যাম বলল, 'কেমন লোক?'

'খুব খারাপ। পালা চলবার সময় অমন ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে ছিলে যে?'

'তুমার গান শুনে—'

'আমার গান ভাল লেগেছে?'

'খুব। এমন গলা আমি আর কখনো শুনিনি নি। মন উদাস হয়ে যায়।'

হরবিলাস দুই হাত ঘুরিয়ে বলে উঠল, 'এর ফলুট শুনে ওর বাক্যি হরে যায় আর ওর গান শুনে এর বিবেগী হবার যোগাড়। আমার হয়ে গেল!'

তার বলার মধ্যে এমন একটা সকৌতুক রসালো ভঙ্গি ছিল যাতে যাত্রা দলের গাইয়ে-বাজিয়েরা হেসে ফেলল।

গোলাপ ঝংকার দিয়ে বলল, 'তুমার কী কথার ছিরি কুণ্ডুমশাই! ভাল লাগলে ভাল কইতে নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে।' হরবিলাস ঘাড় কাত করল, 'হাজারবার আছে।'

যাই হোক আরো কিছুক্ষণ রগড়-টগড়ের পর শ্যাম বলল, 'এবার আমি যাই—'

হরবিলাস একটু অবাক হয়ে বলল, 'যাবে কিরকম! সারারাত বাজালে, এখন চান-টান করে খাও; তারপর যাবার কথা।'

শ্যাম কিন্তু থাকতে রাজী হল না। বলল, 'না আমায় যেতেই হবে।'

'তা ও বেলা আসছ তো?'

'হ্যাঁ, আসব।'

ওধার থেকে গোলাপ গলা তুলে বলল, 'আসবে কিন্তুন—'

পরের দিন 'পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস' পালা হল।

আজকের পালা ভাঙল রাতদুপুরে। তারপর চলে যেতে চেয়েছিল শ্যাম। গোলাপ আর হরবিলাস তাকে কিছুতেই যেতে দিল না; একরকম জোর করে গুদোম ঘরে টেনে নিয়ে এল।

গোলাপ বলল, 'রোজ রোজ পালার শেষে চলে গেলে ছিরি হবে না। আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে।'

হরবিলাস বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, গোলাপ ঠিক বলেছে। না খেলে আজ ছাড়া পাবে না।'

শ্যাম হাসল, 'বেশ, তুমাদের য্যাখন এত ইচ্ছে।'

যাত্রা দলের খাওয়া-দাওয়া আর কি! গাবের দানার মতন মোটা মোটা রাঙা চালের ভাত, হড়হড়ে বিউলির ডাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি। তাই খেয়ে হরবিলাস, গোলাপ আর শ্যাম গুদোম ঘরের একধারে ঢালা চটের ওপর মুখোমুখি বসল।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গোলাপ ডাকল, 'কুণ্ডুমশাই—'
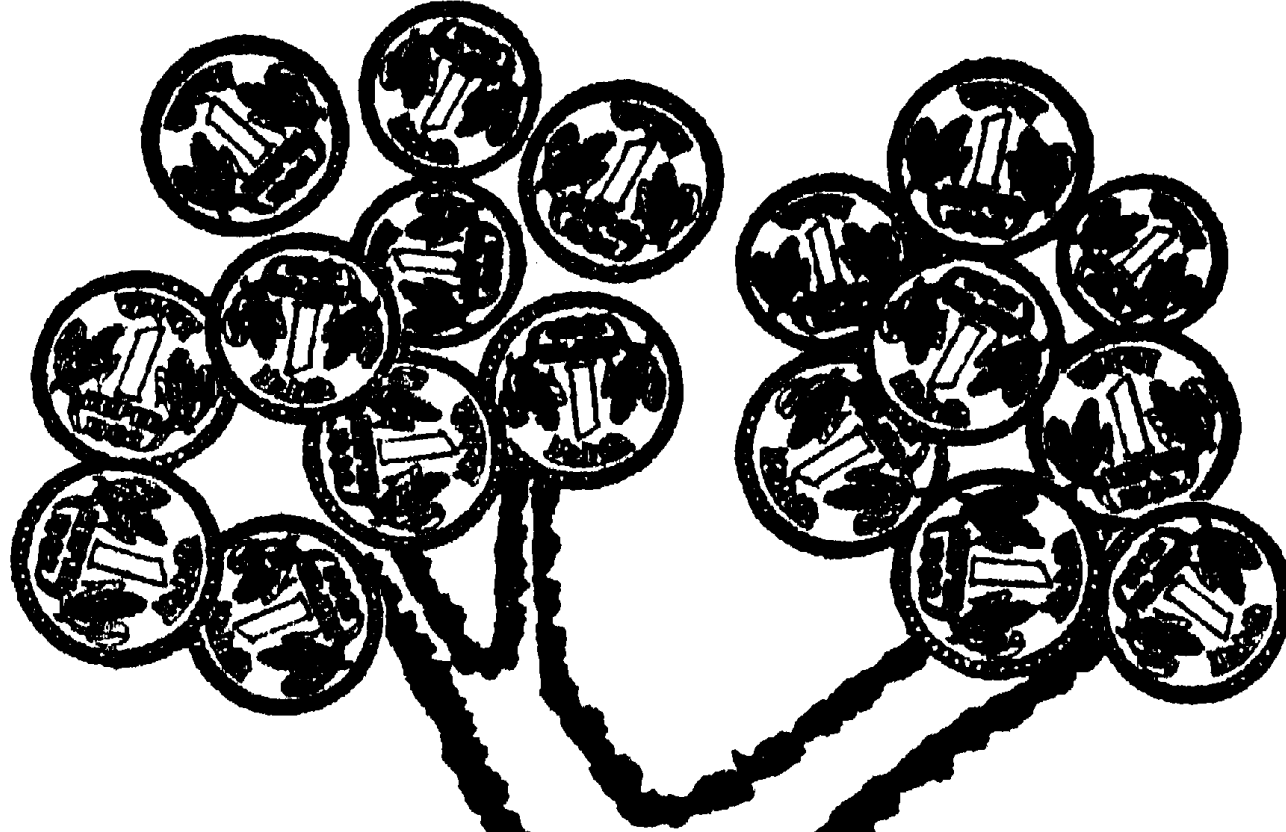
হরবিলাস অন্যমনস্কের মতন সাড়া দিল, 'কী কইছিস?'

'সেই সন্‌গে থেকে মাঝরাত্তির অবদি আসরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এট্টুস সুধা খাওয়াবে না মাইরি?'

'ডাক্তার না তুকে তাড়ি মদ গিলতে বারণ করেছে? তোর পেটে না ঘা?'

'তুমি দেখছি ডাক্তারের জাঠা হয়ে উঠলে! বাঁকা শ্যাম এয়েছে, তার খাতিরেও অন্তত একটা বোতল বার কর।'

হরবিলাস উঠে গিয়ে বড় টিনের বাক্স থেকে একটা দিশী মদের বোতল আর তিনটে কলাই-করা গেলাস নিয়ে এল। ছিপি খুলে গেলাসে গেলাসে উত্তেজক ঝাঁঝালো পানীয় ঢেলে শ্যাম আর গোলাপকে দিয়ে নিজে একটা নিল।

শ্যাম বলল, 'আমি খাব না।'

গোলাপ বলল, 'সে কী, অমৃতে অরুচি! তুমার জন্য বোতল ভাঙালাম, এখন কইছ খাবে না! ঢং কোরো না মিনসে—'

'আমি ওসব খাই না।'

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না গোলাপ। অবিশ্বাসের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'সত্যি খাও না?'

'সত্যি না—' শ্যাম বলতে লাগল, 'যে দিব্যি বলবে কইরে করছি।'

এবার হরবিলাসের দিকে ফিরে গোলাপ বলল, 'এ কোন্ দুধের খোকা জুটিয়ে আনলে গো কুণ্ডুমশাই—' বলেই শ্যামের গেলাসটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল। তারপর নিজেরটায় তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিতে লাগল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখল শ্যাম। এক সময় শিথিল কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি মদ খাও!'

হাতের গেলাসটা দেখিয়ে গোলাপ বলল, 'চোখে দেখেও বিশ্বেস হচ্ছে না?'

'তুমি না কাল রাত্তিরে সীতার পাট করলে? আজ করলে দৌপদীর?'

রাশি রাশি কাচের বাসন ভেঙে গেলে যেমন হয় সেইরকম শব্দ করে হেসে উঠল গোলাপ। তারপর বলল, 'তুমি আমায় সত্যিকারের সীতা আর দৌপদী ঠাউরেছ নাকিন?'

শ্যাম উত্তর দিল না; ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকল।

গোলাপ আবার বলল, 'যাত্রা দলের মেয়ে আমি। মদ না খেলে একদিনও কি আমাদের চলে!'

শ্যাম এবারও চুপ।

গোলাপ বলতে লাগল, 'মদ খাওয়া দেখে ডরিয়ে গেলে বাঁকা শ্যাম! আমার আরো নীলেখেলা (লীলাখেলা) দেখলে তো মরেই যাবে।'

আবছা গলায় শ্যাম শুধলো, 'কিসের নীলেখেলা?'

'মুখে শুনে কতটুকু আর বুঝতে পারবে? আমাদের দলে এস; ত্যাখন দেখতে পাবে।'

এই সময় হরবিলাস বলে উঠল, 'ভালো কথা ফুলুটওলা—'

শ্যাম জিজ্ঞাসু চোখে তার মুখের দিকে তাকাল।

হরবিলাস বলল, 'ময়নাগঞ্জে আমাদের দু রাত্তের বায়না ছিল। সে তো হয়েই গেল। কাল সকালে এখেন থেকে চলে যাব। তা আমাদের দলে আসার কী করলে?'

একটু কি ভাবল শ্যাম; ইতস্তত করল। মনে হল, তার ভাবনার মধ্যে তোলপাড় চলছে। তারপর সব দ্বিধা কাটিয়ে সে বলল, 'না, আমার যাওয়া হবে না।'

'এই তুমার পাকা কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা কিন্তুন বড্ড আশা করে-ছিলাম—'

গোলাপ বলে উঠল, 'ফুলুটওলার ঝ্যাখন আসবার ইচ্ছে নেই, সাধাসাধি করে আর কী হবে—'

হরবিলাস আর অনুরোধ করল না।

ভোরের আলো ফুটলে ক্ল্যারিওনেটের বাক্স কাঁধে ফেলে শ্যাম চলে গেল।

একটু বেলা হলে যাত্রা দলের লোকেরা চান-টান করে চা আর মুড়ি-তেলেভাজা খেয়ে নিল। তারপর একজন গিয়ে দুটো গরুর গাড়ি ডেকে আনল। ময়নাগঞ্জের বাজারে দুদিনের ঘর-গৃহস্থালি তুলে তারা অন্য দিগন্তে পাড়ি জমাবে।

মালপত্র তুলবার পর লোকজন গাড়িতে উঠতে যাবে, সেই সময় দেখা গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে শ্যাম আসছে। তার কাঁধে ক্ল্যারিওনেটের সেই বাক্সটা, হাতে গোলাপ ফুল-আঁকা টিনের স্যুটকেশ আর বগলে শতরঞ্চি-জড়ানো সামান্য বিছানা।

কাছাকাছি আসতে হরবিলাস বলল, 'কী ব্যাপার?'

শ্যাম বলল, 'আমায় আপনাদের দলে লিয়ে লিন।'

হরবিলাস অবাক। সে বলল, 'এ তো খুব ভাল কথা। কিন্তুন এট্টুন আগে কইলে যাবে না; হটাৎ কী হল যে মত বদলে ফেললে?'

'ফেললাম।'

'বেশ বেশ, তা এখন গাড়িতে ওঠ।'

গোলাপ, হরবিলাস আর শ্যাম এক গাড়িতেই উঠল। যেতে যেতে এক সময় ফিসফিসিয়ে গোলাপ শুধলো, 'সত্যি করে কও দিকিন, একবার 'না' করে আবার এলে কেন?'

সবার কান বাঁচিয়ে শ্যাম উত্তর দিল, 'ত্যাখন নীলেখেলার কথা কইছিলে না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমার একটা নীলে (লীলা) ত্যাখন দেখলাম, বাকিগুলোন দেখবার বড় সাধ হয়েছে।'

গোলাপ কিছু বলল না। তার মুখে বিচিত্র রহস্যময় একটু হাসি ফুটল মাত্র।

।। চার ।।

ময়নাগঞ্জের বাজার থেকে বেরিয়ে দুপুরের কিছু আগে আগে একটা ছোট-খাটো শহরে এসে থামল ওরা। শহরটার নাম নবীপুর। পরিত্যক্ত কাটা চালাঘর দেখে মালপত্র নামিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সংসার পেতে ফেলল। কজন ইঁটের উনুন বানিয়ে রান্না চাপিয়ে দিল।

শ্যাম শুধলো, 'এখেনে কী? বায়না-টায়না আছে?'

হরবিলাস বলল, 'না। আমাদের নিজের থেকে কেউ বায়না করে না।'

শ্যাম হতভম্ব, 'তা হলে?'

তার মনের কথাটা যেন পড়তে পারল হরবিলাস। সে যা উত্তর দিল, সংক্ষেপে এইরকম। তাদের দল তো আর কলকাতার চিৎপুরের দলগুলোর মতন বড় বা নামকরা নয়, যে লোকে আগে থেকে বায়না-টায়না দেবার জন্য ছোটাছুটি করবে। তাদের সামর্থ্য কম। হ্যান্ডবিল বিলিয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে যে নিজেদের প্রচার করবে, সেটুকু সাধ্যও তাদের নেই। হাটে গঞ্জে ঘুরে একে ওকে ধরে তারা নিজেরাই পালা গাইবার বায়না যোগাড় করে।

শ্যাম বলল, 'এভাবে দল ক'দ্দিন চলবে?'

হরবিলাস বলল, 'ক' বছর তো চলল। দেখি আর কদ্দিন চলে—'

খাওয়া-দাওয়ার পর হরবিলাস বায়না যোগাড় করবার জন্য দলের জন চারেককে শহরে পাঠিয়ে দিল। তারপর নিজেও বেরিয়ে পড়ল।

সন্ধের আগে আগে লোক তিনটে ফিরে এল; বায়না পাওয়া যায় নি। সন্ধের পর ফিরল হরবিলাস; তার সঙ্গে পাঁচ-সাতটি লোক। দেখেশুনে বেশ পয়সাওলা বলেই মনে হয়।

গোলাপ আর শ্যাম আলো জ্বালিয়ে একটা চালায় বসে ছিল। হরবিলাস শ্যামকে বলল, 'তুমি এট্টু ঘুরেটুরে এসো ফুলুটওলা—'

শ্যাম বুঝল, সে ওদের মধ্যে থাকে হরবিলাস তা চায় না। মনে মনে খুবই আহত হয় শ্যাম। নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেল সে।

বেরিয়ে গেল ঠিকই কিন্তু খুব একটা দূরে গেল না। যদিও অভিমান হচ্ছিল তবু দুরন্ত এক কৌতূহল শ্যামকে চালাটার কাছাকাছি যেন আটকে রেখে দিল। ঐ লোকগুলো কারা? শ্যামকে ভাগিয়ে দিয়ে ওরা কী করবে? হরবিলাস অপেরার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী?

কিছুক্ষণের ভেতর প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে গেল শ্যাম। দূরে থেকে সে দেখতে পেল, গোটা দুই কাচের লণ্ঠন ঘিরে হরবিলাস, গোলাপ আর সেই লোকগুলো গোল হয়ে বসেছে। তাদের হাতে হাতে তাস ঘুরছে, রেজগি পয়সার আওয়াজ আসছে। আর সব শব্দ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের মতন গোলাপ গা দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে উঠছে। গোলাপের হাসি শুনতে শুনতে, কোন কারণ নেই—নিতান্ত অকারণেই বুকের ভেতরটা যেন পুড়ে যেতে লাগল শ্যামের। তার মধ্যেই সে টের পেয়ে গেল, ওখানে জুয়া চলছে।

অনেক রাত্রে জুয়ার আসর ভাঙল। লোকগুলো চলে গেলে শ্যাম গিয়ে গোলাপের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, 'তুমার আরেকটা নীলে (লীলা) দেখলাম।'

খুব শান্ত গলায় গোলাপ বলল, 'দেখলে বুঝিন?'

'হ্যাঁ!'

'কি রকম লাগল?'

'চোমোৎকার। মেয়েমানুষের জুয়ো-খেলা এই পেথম আমার চোখে পড়ল।'

চকচকে চোখের তারা স্থির করে গোলাপ হাসল, 'জেবন তা হলে সাথক হয়ে গেছে, বল—'

উত্তর না দিয়ে শ্যাম বলল, 'তা জুয়েয় তুমরা জিতলে না ওরা জিতল?'

'ওরাই যদিন জিতে যাবে তবে আমি আছি কী করতে? আমি থাকতে কারোকে জিততে হবে না।'

একটু ভেবে শ্যাম বলল, 'জুয়ো আর মদ—তুমার দুটো নীলে তো দেখলাম। আর ক'টা দেখার বাকি আছে?'

'আর মোটে একটা।'

'কী সেটা?'

'আমি কইব না। থাকো না ক'দিন; তুমি নিজেই দেখতে পাবে।'

একটু চুপ।

তারপর গোলাপই আবার বলল, 'আমার ওপর খুব ঘেন্না হচ্ছে, না?'

শ্যামের বুকের ভেতরে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। অস্পষ্ট গলায় সে বলল, 'কী হচ্ছে, এক্ষুনি তুমায় কইব না।'

'কবে কইবে?'

'দেখি আর ক'দিন—'

হরবিলাস অপেরা তিন দিন নবীপুরে থাকল। এর মধ্যে তারা পালাগানের বায়না যোগাড় করতে পারে নি। তবে হরবিলাস নতুন নতুন লোক জুটিয়ে এনে সকাল-দুপুর-রাত্রি—প্রায় সারাদিনই জুয়ার আসর জমিয়ে রাখল। তারপর চতুর্থ দিন সকালে ঘর-সংসার গুটিয়ে তারা গরুর গাড়িতে উঠল।

সমস্ত দিন গাড়িতে গাড়িতে কাটিয়ে হরবিলাস অপেরা এবার একটা বিরাট গঞ্জে এসে নামল। এখানে গোলাপের নতুন লীলা দেখল শ্যাম।

হাটে নেমেই হরবিলাস কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। অনেক রাত্তিরে একটা লোক সঙ্গে করে ফিরল সে। লোকটার দাঁত সোনা-বাঁধানো, থলথলে ভুঁড়ি, চোখ ঢুলুঢুলু এবং ঘোলাটে লাল। পরনে কোঁচানো ধুতি আর ধবধবে পাঞ্জাবি, গলায় সোনার সরু চেন, দু'হাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি।

ফিরেই হরবিলাস লোকটার সঙ্গে গোলাপকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিল।

কোথায় গেল গোলাপ? শ্যাম বুঝতে পারল না। বাকি রাতটুকু সে ঘুমোতেও পারল না; বুকের ভেতর অদ্ভুত এক কষ্টের ভাব নিয়ে জেগে রইল।

ভোরবেলা টলতে টলতে গোলাপ ফিরে এল। তাকে দেখে চমকে উঠল শ্যাম। কাল বিকেলে পাতা কেটে চুল বেঁধেছিল গোলাপ; খোঁপা-টোপা ভেঙে সেই চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে। চোখের কোল কাজলে লেপ্টে গেছে; চোখ আরক্ত। গালে-গলায় এবং ঘাড়ের কাছে নখ আর দাঁতের দাগ। শাড়ি এবং জামা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে।

ভয়ে ভয়ে শ্যাম শুধলো, 'একী হাল হয়েছে তোমার? কী করে হল?'

গোলাপ সুর করে গেয়ে উঠল, 'প্রেম কালিয়া দংশাইছে (কামড়েছে) আমার গায়—'

বিমূঢ়ের মতন শ্যাম আবার বলল, 'কাল রাত্তিরে ঐ লোকটার সঙ্গে কুথায় গিয়েছিলে? কে ঐ লোকটা?'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল গোলাপ। তারপরেই তার খর চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। শ্যামের নাকের ডগায় একটা টুসকি দিয়ে সে বলল, 'কাঁচা খোকা, কিছুই বোঝে না! যাত্রাদলে তুমার আসা ঠিক হয় নি বাপু; মার কোলে শুয়ে থাকাই উচিত ছিল।' বলে শ্যামের পাশ কাটিয়ে সে চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ময়নাগঞ্জের বাজার থেকে শ্যাম সেই যে গরুর গাড়িতে উঠেছিল তার পর গোটা একটা মাস কেটে গেছে। এর ভেতর হরবিলাস অপেরার নাড়িনক্ষত্র জেনে ফেলেছে সে। পালার বায়না ওরা সামান্যই পায়। জুয়ার আয়ই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া দলের মেয়েরা বিশেষ করে গোলাপ পয়সা-ওলা খদ্দেরদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে কিছু রোজগার করে।

হরবিলাস অপেরার ভাল মন্দ নিয়ে বিশেষ দুর্ভাবনা নেই শ্যামের। একটা মাস ধরে সে শুধু গোলাপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মদ, জুয়া, মাতাল খদ্দের—এসব দিয়ে ঘেরা এক নরকের ভেতর ডুবে আছে মেয়েটা।

মাঝে মাঝে শ্যাম ভাবে, এ দল ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুভব করে, গোলাপ যেন অদৃশ্য কোন ফাঁদ পেতে তাকে আটকে রেখেছে।

দেখেশুনে একদিন শ্যাম বলল, 'এ তুমি কী করছ?'

গোলাপ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী করছি!'

'নিজেকে এভাবে তুমি মেরে ফেলছ কেন?'

আমুদে মেয়ে-পায়রার মতন বুক চিতিয়ে শ্যামের চারপাশে কিছুক্ষণ ঘুরল গোলাপ। তারপর চোখ গোলাকার করে খুব রগড়ের গলায় বলল, 'ব্যাপারখানা কী গো শ্যাম, আমার জন্যে তুমার এত ভাবনা যে?'

শ্যাম থতমত খেয়ে গেল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'একটা মানুষ চোখের সামনে মরে যাচ্ছে। ভাবনা হবে না?'

'খুব দরদ দেখছি!'

সেই শুরু। তারপর থেকে প্রায় রোজই এক গাওনা গাইতে লাগল শ্যাম, 'কেন তুমি আত্মঘাতী হচ্ছ?' কেন তুমি আত্মঘাতী হচ্ছ?' রোজই তার প্রশনটা হেসে আর রগড় করে উড়িয়ে দ্যায় গোলাপ।

মাঝে মধ্যে শ্যাম আর গোলাপের কথা-বার্তার সময় হরবিলাস কাছে এসে দাঁড়ায়। বাঁকা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করে। তার মনে কিসের যেন ছায়া পড়েছে।

যাই হোক, একটা লোক পেছনে লেগে থাকলে কতক্ষণ আর তাকে তুড়ি মেরে ওড়ানো যায়। একদিন গম্ভীর গলায় গোলাপ শুধলো, 'সত্যি সত্যি তুমি শুনতে চাও?'

শ্যাম বলল, 'না চাইলে তুমার পেছনে লেগে আছি কেন?'

একটু চুপ করে থেকে অন্যমনস্কের মতন গোলাপ বলল, 'না মরে আমার উপায় নেই। তাই নিজেকে এমন করে মারছি।'

'হেঁয়ালি ছাড়।'

'হেঁয়ালি লয় গো, হেঁয়ালি লয়। বারো বছর বয়েসে মা-বাপ মরল, তা'পর হরবিলাস কুণ্ডুর হাতে পড়লাম। কুণ্ডুমশাই আমায় এট্টু এট্টু করে তৈরী করলে। নাচ শেখালে, গান শেখালে, মদ-জুয়ো শেখালে, দাঁতাল-মাতালদের সঙ্গে শুতে শেখালে। সে আমার এ নাইনের দীক্ষাগুরু গো।'

'তা'পর?'

'তা'পর আর কি। এসব লিয়েই দশ-বারো বছর আছি।'

'কিন্তুন এমন অত্যাচার করলে বেশি দিন বাঁচবে না।'

'বেঁচে কী হবে?' গাঢ় উদাস গলায় কথা ক'টা বলে নিঃশব্দে বিষণ্ণ হাসল গোলাপ, একদিন মরে যাব। হরবিলাস ঠ্যাং ধরে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে চলে যাবে।'

হঠাৎ শ্যাম চেঁচিয়ে উঠল 'না।'

'কী হল গো?'

'তুমায় এমন করে মরতে দেব না।'

'কী করতে চাও তুমি?'

'তুমায় বাঁচাতে চাই।'

'কী করে?'

'এখেন থেকে তুমায় অন্য কুথাও লিয়ে যাব।'

'কিন্তুন—'

'আবার কী?'

'আমি যে মদ-জুয়ো আর মাতাল জন্তুগুলোন ছাড়া পিথিমীর আর কিছুই জানি না।'

'আমি তুমায় জানিয়ে দেব।'

গোলাপ উত্তর দিল না।

শ্যাম আবার বলল, 'আর দশজনার মতন তুমার কি সমসার ঘর-গেরস্থালী করতে ইচ্ছে করে না, হ্যাঁ গো মেয়েমানুষ—'

বুকের ভেতরে চাপা-পড়া ধিকি ধিকি একটা বাসনাকে শ্যামই প্রথম উস্কে দিয়েছে। গলার ভেতর থেকে ফিস-ফিসিয়ে সে বলল, 'করে—'

'তা হলে?'

'আমায় ক'দিন ভাবতে দ্যাও—'

'বেশ।'

দিন কয়েক পর গোলাপ বলল। 'আমি রাজী গো ব্যাটাছেলে—তুমার সনগেই চলে যাব। কিন্তুন—'

শ্যামের চোখ ঝকমকিয়ে উঠল, 'কিন্তুন কী?'

'কুন্ডুমশাইকে একবার কথাটা কইতে হবে।'

'যদিন বাগড়া দ্যায়?'

'তার বাগড়া শুনছে কে? আমি কি কুন্ডুমশাইর পায়ে দাসখত দিয়ে রেখেছি?'

'তবে চল—'

সেইদিনই তারা হরবিলাসের কাছে গিয়ে চলে যাবার কথা বলল। গোলাপরা যা ভয় করেছিল, যাবার কথায় বাধা পড়বে, তা কিন্তু হল না। অবশ্য ফস করে আলো নিভে যাবার মতন হরবিলাসের মুখটা কালো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে সে গোলাপকে বলল, 'মন যাখন ছুটেছে ত্যাখন আর কী করে আটকাব?' তুই চলে গেলে দলটা তুলে দিতে হবে, এই আর কী—' শ্যামকে বলল, 'শেষ অবদি তুমি আমার ঘরে সিঁদ চালালে ফুলুটওলা!'

শ্যাম বা গোলাপ, কেউ উত্তর দিল না।

হরবিলাস আবার গোলাপকে বলল, 'ঘর-গেরস্থালী করবার ইচ্ছে যখন হয়েছে ত্যাখন যা। যদিন ফিরবার ইচ্ছে হয়, আমার দুয়োর তোর জন্যে খোলা রইল।'

।। ছয় ।।

হরবিলাস অপেরা থেকে বেরিয়ে শ্যাম আর গোলাপ এদিক সেদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত ময়নাগঞ্জে ফিরে এল। একটা ঘর ভাড়া করে সংসার পাতল তারা; শ্যাম আবার বিড়ি বাঁধার কাজ নিল।

দু চারটে দিন মোটামুটি ভালই কাটল। তার পরেই তাল কাটতে লাগল। এই শান্ত ম্যাড়মেড়ে সংসারী জীবন থেকে অনেক অনেক দূরে আলোকোজ্জ্বল যাত্রা দলের আসর, দুলয়ে বেজে-যাওয়া কনসার্ট, জুয়োর আসর, পয়সাওলা মাতালদের সঙ্গে উত্তেজক নিশিযাপন—সব একাকার হয়ে পূর্ব জন্মের উত্তেজক স্মৃতির মতন গোলাপকে যেন হাতছানি দিতে লাগল। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপনে সে সব ভুলতে চাইল গোলাপ। কিন্তু রক্তের ভেতর বার বছরের অভ্যাস ধারাল নখে অবিরাম আঁচড়াতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, ঘুড়ির মতন জোরালো হাওয়ায় সে বহুদূরে উড়ে এসেছে; এখন সুতো ধরে কেউ টান দিতে শুরু করেছে।

একদিন শ্যাম যখন ঘরে নেই, পুরনো এক সেট তাস যোগাড় করে সে একা-একাই জুয়ার আসর বসাল। আরেক দিন গেলাসে জল ঢেলে মদ খাবার মতন তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিল। আরেক দিন ঘরের দেয়ালগুলোকে শ্রোতা বানিয়ে ঘুরে ঘুরে 'কর্ণকুন্তী' পালায় কুন্তীর গানগুলো গাইল। তারপর আরেক দিন শ্যামকে না জানিয়ে ঘরে শেকল তুলে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে সোজা গিয়ে উঠল হর-বিলাসের কাছে। বলল, 'চলে এলাম গো কুন্ডুমশাই—'

নির্বিকার ঈশ্বরের মতন হেসে হেসে হরবিলাস বলল, 'আমি জানতাম তুই ফিরে আসবি। দশ বছর যাত্রা দলে কাটিয়ে ঘর-গেরস্থালী কি ভাল লাগে রে?'

হরবিলাস কি হাত গুনতে জানে? লোকটা কি অন্তর্যামী? বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে রইল গোলাপ।

এই আমাদের দেশ

(৩)

বৈষ্ণবতীর্থ পাণিহাটি, শাক্ততীর্থ হালিশহর

চলুন রানাঘাট-বনগাঁ লাইনে। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে চড়ে নামবেন সোদপুর স্টেশনে। সোদপুরের আগে আগড়পাড়া এক চক্কর চোখ বুলিয়ে যাবেন? যেতে পারেন। এমন কিছু দেখবার নেই, আছে ছোট্ট একটা কিংবদন্তী। স্টেশনের কাছেই তারাপুকুরের পীরের আস্তানা ছিল। প্রায় তিনশো বছর আগে আজমীর থেকে একজন পীর এসে এখানের একটি বটগাছের তলায় তপস্যা শুরু করেন। নানান ধরনের অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। গ্রামের লোকেরা তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। একবার তিনি নাকি তাঁর এক ধনী শিষ্যের ব্যবহারের জন্য ইচ্ছেমত রুপোর জিনিসপত্র তৈরী করে দিয়েছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাবলে। পীরের সমাধির ওপর গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরী হয়েছিল। যে বটগাছের তলায় পীর বসে তপস্যা করেছিলেন সেটা এখনও বেঁচে আছে। পীর সাহেবের মৃত্যু তিথিতে এখানে বেশ বড় মেলা বসে।

যা হোক সোদপুর থেকে পানিহাটি মাইল খানেক। গঙ্গার ধারে। প্রায় সাতশো বছরের পুরনো বটগাছ, এই গাছটিকে ঘিরে নানা ইতিহাস তৈরী হয়েছে। এমনিতে গাছটি দেখতে আপনার ভাল লাগবে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ এই বট-গাছের তলায় বসেছিলেন। বটগাছের পাশেই প্রাচীন আমলের ঘাট ছিল। সেখানে পাথর ফলকের ওপর লেখা ছিল হিন্দু আমলে ঘাটটি তৈরী হয়েছিল এবং ১৫১৪ খৃঃ পুরী থেকে ফেরার পথে শ্রীচৈতন্যদেব এই ঘাটে নৌকা থেকে নেমেছিলেন। সপ্ত-গ্রামের রাজপুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটির এই বটগাছের তলায় নিত্যা-নন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে চিঁড়ে-দই খাইয়েছিলেন। এই ভোজন-উৎসব 'দণ্ড মহোৎসব' নামে পরিচিত। শোনা যায় নিত্যানন্দ পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের ঘরে বহু দিন থেকে গঙ্গার ধারের গ্রামগুলিতে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। পানিহাটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে একটি পবিত্র জায়গা। চৈতন্যদেবের সমাধি আছে। রাঘব পণ্ডিতের মদনমোহন বিগ্রহের পুজো খুব ধুমধামের সঙ্গেই আগে হোত। চৈতন্য চরিতামৃততে উল্লেখ আছে, রাঘব মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য আবির্ভাব হোত। বটগাছ, ঘাট, গঙ্গা সব মিলিয়ে জায়গাটির তন্ময় নির্জনতা মনকে টানে।

পানিহাটির কাছেই খড়দহ। এটিও বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে নিত্যানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম ছেড়ে গার্হস্থ্যধর্ম পালন শুরু করেন, তখনই নবদ্বীপের কাছে শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্যদাস সরখেলের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করেন। খড়দহ নামের উৎপত্তি নিয়ে একটা প্রবাদ আছে। বিয়ের পর নিত্যানন্দ এলেন খড়দহে এবং সেখানকার জমিদারের কাছে বসবাসের জন্যে খানিকটা জায়গা চাইলেন। জমিদার নাকি নিত্যানন্দকে বিদ্রূপ করেই এক টুকরো খড় গঙ্গায় ফেলে দিয়ে বলেছিলেন ওই তোমার বাসস্থান। সেকালের প্রবল স্রোতস্বিনী গঙ্গার মধ্যে নিত্যানন্দের প্রভাবে তখনই একটি চর দেখা দেয় এবং সেখানেই বাড়ি-ঘর তৈরী করে নিত্যানন্দ বসবাস শুরু করেন। নিত্যানন্দের ছেলে বীরভদ্র গোস্বামী খড়দহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন।

খড়দহ সেরে শ্যামনগর আসা যাক। এখানেও কিছু দেখার আছে। বিশেষ করে মুলাযোড়ের জাগ্রত কালীবাড়ি। স্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের পথ, প্রায় গঙ্গার ধারেই। পাথুরিয়া ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর এই কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ আছে, গোপীমোহনের সাত বছরের মেয়ে ব্রহ্মময়ী মারা গেলে তার মৃতদেহ গঙ্গার স্রোতে ভেসে এসে মুলাযোড়ের ঘাটে লাগে। সেই রাত্রেই গোপীমোহন স্বপ্ন দেখেন কালী তাঁকে আদেশ করছেন মুলাযোড়ে মন্দির তৈরী করে সেখানে ব্রহ্মময়ী কালী প্রতিষ্ঠা করতে। গোপীমোহন সে আদেশ পালন করেন।

এর পর চলুন নৈহাটি। নৈহাটির পাশেই কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। নৈহাটি এলে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনটি একবার দেখে না নিলে মন ভরে না। বঙ্কিম-তীর্থের পর যাওয়া যাক হালিশহর। এটিও প্রাচীন ঐতিহ্যের পুণ্যভূমি। শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষা-গুরু ঈশ্বরপুরী হালিশহরের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব গুরুর জন্মভিটে দর্শন করবার জন্যে একবার হালিশহরে এসেছিলেন এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এখানের এক মুঠো ধুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শোনা যায় শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত এখানে একটি বাড়ি তৈরী করে রেখেছিলেন, মাঝে-মাঝে এসে বাস করতেন।

হালিশহরেই যখন আসা গেল তখন রামপ্রসাদের জন্মভিটে দেখে নেবেন? অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত সাধক-সংগীত রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন জন্মেছিলেন। সংসার চালানোর জন্যে রামপ্রসাদ কলকাতার এক ধনীর সেরেস্তায় মুহুরির কাজ করতেন। তখন থেকেই তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন কালী-চিন্তায়। কখনও-কখনও হিসেবের খাতায় শ্যামাসংগীত লিখে ফেলতেন। একদিন সেটা চোখে পড়ল মনিবের। গুণগ্রাহী মনিব রামপ্রসাদকে চাকরী থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। এর ফলে রামপ্রসাদ মন-প্রাণ দিয়ে সাধনায় মগ্ন হতে পারলেন। পঞ্চবটী বেদীতে বসেই তিনি নাকি সাধনা করতেন। এটি দেখবার মতো। সে-সময়ে আজু গোঁসাই নামে এক বৈষ্ণব কবিও হালিশহরে বাস করতেন। তিনি রাম-প্রসাদের বেশ কিছু গানের প্যারডি গান রচনা করে প্রতিযোগিতা চালাতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দুই কবিকে একসঙ্গে বসিয়ে তাঁদের সঙ্গীত-যুদ্ধ উপভোগ করতেন।

রামপ্রসাদের সাধনা-শক্তি নিয়ে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। স্বয়ং ভগবতী নাকি মেয়ের রূপ ধরে রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধায় সাহায্য করেছিলেন। আজু গোঁসাই একবার গঙ্গাস্নান করে কমণ্ডলুতে গঙ্গা-জল নিয়ে আসছিলেন, পথে রামপ্রসাদ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেন। এতে আজু গোঁসাই দারুণ চটে যান এবং মনঃক্ষুণ্ণ রামপ্রসাদের স্পর্শে গঙ্গাজল অপবিত্র হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন। কমণ্ডলুর জল ফেলে দিয়ে তিনি নতুন করে গঙ্গার জল নিয়ে বাড়ি ফেরেন কিন্তু বাড়ি গিয়ে আহ্নিক করবার সময় দেখেন সে জল মদে পরিণত হয়েছে। আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের শক্তিতে বিস্মিত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আরও প্রবাদ আছে নবাব সিরাজদ্দৌলা বজরায় করে যাবার সময় রামপ্রসাদের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং বজরায় ডেকে নিয়ে এসে রামপ্রসাদের প্রশংসা করেন। কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকেও হালিশহর হেঁটে যায়, মাত্র মাইল দেড়েক দূরে।

কাঁচড়াপাড়ায় কৃষ্ণরায়ের মন্দির দেখে নিতে পারেন। সেন শিবানন্দ এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। কাঁচড়াপাড়ার প্রাচীন নাম কাঞ্চনপল্লী। শিবানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব কাঞ্চন-পল্লীতে শিবানন্দের বাড়িতে এসেছিলেন। তাছাড়া কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। কাঁচড়াপাড়া থেকেই কুলিয়ারপাট যাওয়া যায়। সামান্য দূর। এখানের একটি মন্দিরে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ আছে। প্রবাদ আছে কুলিয়ারপাটে গিয়ে পুজো দিলে সব পাপ ও অপরাধ দূর হয়। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামের বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেন। সেই থেকে অপরাধভঞ্জন পাট নামে এর পরিচিতি।

এর পরের বারে আমরা যাব কবিতীর্থ ফুলিয়া আর সংস্কৃত চর্চার প্রাচীন কেন্দ্র শান্তিপুর। —নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখের মেলা

তারাপদ ধাড়া

গাহিন রাত। রাতচরা পাখিটা ডাকছে ক্রমাগত ঃ চাউর—চাউর—চাউর! চাউর চাউর চাউর!...

পাকা গাব আর বটফল খেতে খেতে মাঝে মাঝে কর্কশ শব্দ করছে বাদুড়গুলো। কোয়াক—কোয়াক—দীর্ঘলয়ের কম্পিত স্বর তুলে আকাশপথে উড়ে চলে যায় মানিকজোড় পাখি।

শিয়াল ডাকে হুয়া-হুয়া স্বরে। শশাক্ষেতে তারা গড়াগড়ি খায় আর পিঠে শক্ত নোড়ার মতন শশা ঠেকলেই উঠে পড়ে হাঁক করে কামড় বসায়। বাঁশের চেরাকলের দাঁড় টেনে বাবুলাল মালিক বিকট শব্দ তুলে শিয়াল তাড়াতে থাকে। ক্ষেতের টোঙের মধ্যে বল্লম হাতে নিয়ে বসে বসে।

তারাপদ ধারার তিন সেলের টর্চের আলো পড়ে বার কতক তার বেগুনবাড়িটার ওপর দিয়ে। বেগুন, বরবটি, শশা, মুলো, কপি, সিম কলা, আলু—শত রকমের চাষ তারাপদর। ভীষণ চুরি হচ্ছে বলে তারাপদ নিজে চৌকি দিতে আসে রাত্রে।

সে হাঁক মারে, 'বাবুলাল আছিস?'

'হাঁ গো দাদা!'

পাশের ডাঙ্গায় এল একবার তারাপদ। টর্চ ফেলতেই দেখল কয়েকটা সজারু মানকচু খাওয়া ফেলে রেখে মানুষের সাড়া পেয়ে পালাচ্ছে ঝুমঝুম করে শব্দ তুলে। আট দশ কেজি করে বড় বড় মানকচু, খাবলে খাবলে খেয়ে ফেলেছে তিন-চারটে।

তারাপদ বলে, 'দাঁড়াও শালারা, কাল তোমাদের মজা দেখাব! কলাগাছের টুকু কেটে ফেলে রেখে গেলে শালা তোমরা কাঁটা ফুটে জখম হয়ে থাকবে। টানাটানি করলেই কলাগাছ গড়িয়ে গায়ে চাপবে! ভীষ্মের শরশয্যা হবে শালা সজারুদের। কাঁচা মানকচু খাস, শালা তোদের গালও কিটোয়নে!

বাবুলাল বলে, 'তারাদার ক্ষেতে চোর, 'সজারু', ইঁদুর, 'ইউঁচিংড়ি' আর পোকামাকড় লেগেছে আর আমার আখক্ষেতে লেগেছে শালার বুনো শুয়োর! আখের তেউড়গুলো শালারা মুখের হুদোর দিয়ে খুনে ফেললে! একটার ভুঁড়ি ফাঁসাতে পারলে শালার মাংস চাট করে খাই! যা মজা না, মাইরি!'

তারাপদ একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা ধরায়। টোঙের মধ্যে বসে, কোমরটা চাগিয়ে তুলে।

বাবুলাল বলে, 'নারকেল কটা দিলে না হাঁ দাদা?'

'কত দাম দিবি?'

'পঁয়তাল্লিশ টাকা। পেড়ে নোব গেছুড়ে দিয়ে!'

'তেমন ছোবড়া নিবি। শালা, ছোবড়াই ছ-টাকা শ। ছোবড়া পিষে এখন নারকেল দাঁড়, বোলেন, গদি, ব্রাস, আরো কত কি হচ্ছে: কলকাতায় একফালি নারকোল দশ পয়সা। কুড়িটা ফালি তুলতে পারলেই দু'টাকা। তার মানে দুশো টাকা পড়তা। তুই তো পয়তাল্লিশ টাকা নারকোল কিনে আমতলার হাটে বেচে আসবি সত্তর টাকা করে?'

'কাটা ফাটা আছে, কতো পচে যায়, কতো সাইজে মেলে না, জল মরে যায়। তারপর গেছুড়ের রোজ, দুটো মুসলমান মেয়ে নারকোলের বস্তা বয়—তাদের রোজ, সাঁড়াশী মেরে আমি ফেড়ে দিই, না হলে লহরজন পা ফাঁক করে বসে চেলা করে, সাঁড়াশী মেরে। তাদের রোজ আছে।'

'তুই লহরজানকে নিয়ে যাই কর আমার বলে টাকা চাই। পঞ্চাশ পর্যন্ত দিতে পারি। গতকাল শ-দুই নারকোল লববাবুর বাগান থেকে আমার চুরি করে নিয়ে গেছে রাত্তিরে। ক'টা সিঁদেল চোর জুটে বড় জ্বালাতন করছে। দিনের বেলা চা-দোকানে গাঁজা টানে, তাস পেটে, রেসের টিকিট কেনে আর রাত্রে কার কাঁটাল, কার কলা, বেগুন, পেঁপে, পটল তুলে নিয়ে পালায়।'

ঝিঁঝি ডাকছে ঐকতানে।

কররররর শব্দ তুলে একটানা ডাকছে ঝোপ জঙ্গল আর উলুকাশের বনটার মধ্যে কেউটে বোড়ারা।

আকাশে তারার ধুতরো ফুল ফুটে আছে যেন। দীর্ঘ ছায়াপথটা পাড়ি দিয়ে গেছে দিগ্বলয়ের ওপারে।

সপ্তর্ষির তারাগুলোর নাম মনে করে একবার তারাপদ। কবে সেই ক্লাস এইটে না নাইন-টেনে পড়েছিল সে। আই-এ পাস করে চাষবাস নিয়ে পড়ে রইল সে। চাকরি করেনি বলে কতলোক তাকে টিটকারী করত। কলেজে পড়বার সময়েই সে অবসর মতন বিয়াল্লিশ হাজার ইঁট কেটেছিল একাই। সেই ইঁটে ঘর হয়ে গেল। বাপকেলে মাত্র পাঁচ বিঘে ধান জমি, তিনটে পুকুর আর বিঘে তিনেক ডাঙ্গা জমি ছিল তাদের। বাবা মারা যায় তাকে তার মায়ের কোলে শিশু রেখে। নিজের চাষ তুলে হাল বেচত সে। পরের ক্ষেতে হাল করতে যেত। লোকে বলত, 'তারাপদটা লেখাপড়ার মর্যাদা আর

রাখলে না।' সে মনে মনে হাসত। তার একটা প্ল্যান ছিল। সে অমানুষিক পরিশ্রম করবে। মাটির সঙ্গে লড়াই করবে। তবে বোকার মতন নয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য নিয়ে। ভাগচাষের জমি করলে বছর সাতেক। তারপর ধান, পাট, উলু, কলা, নারকোল, বাঁশ, নানান ফসল বেচে টাকা জমিয়ে কয়েক বিঘে জমি কিনে ফেললে। পাকাবাড়ি গেঁথে ফেললে দোতলা।

লোক তো অবাক। তারাপদ অঙ্ক কষে বলে দিতে পারে এক বিঘে জমিতে কত সার দিলে কত মাদায় কত করে আলু হলে কত মণ বা কুইন্টাল আলু হবে। তার মুলোর গাড়ি, কপির গাড়ি, বেগুনের বস্তা বোঝাই গাড়ি যায় হাটে-বাজারে। পানের মোট যায় শিয়ালদায়।

এখন তারাপদ খাড়া লক্ষপতি লোক।

তবু পৌষ-মাঘ মাসের মোষের-শিং-নড়া হাড় কনকনে শীতের মাঝ রাত্তে এসে দেখ তারাপদ দমকল বসিয়ে কাঁপ ফেলে, মাঝো ডাঙ্গায় জল পাইয়ে দিচ্ছে নালার মুখ কেটে, কোদাল ধরে জল-পায়-যাওয়া ভাটির মুখ বন্ধ করে।

লোকটা যেন রাতচরা। নিদ নেই, ঘুম নেই।

দশ বারোটা জন কাজ করছে তার নাগাড়। তার সঙ্গে খেটে এঁটে ওঠে কার বাপের সাধ্যি! মরদা ছ'ফুট লম্বা হাড় পাকা জোয়ান চেহারা। বল্লম হাতে নিয়ে দাঁড়ালে ভয় করে! তেরিয়া মরদ! তারাপদ শুধোয়, 'বাবুলাল, তুই কি ডাঙ্গায় এখন থাকিস?'

'বাড়ি যাব দাদা, ক'রাত ঘুম নেই। গা-মাথা যেন ঘুরছে।'

'না, লহরজান ঘোরাচ্ছে?'

'কি যে বলো দাদা!'

'মেয়েটার ভাগড়াই চেহারা মাইরি! ভাতারের ঘর করে না কেন?'

'বর নাকি খোঁড়া। বিড়ি বাঁধে—উপায় নেই। মাথার তেল, পেটের ভাত দিতে পারে না ঠিক মতন।'

'ঠিক মতন আর কোন মেয়েকে কে দিতে পারে বল? যাহোক, দেড় টাকা রোজে তুই একটা মকেল মেয়েজন পেয়েছিস বটে। শালা, কালো আবলুস চেহারা! কোদাল পেড়ে পেড়ে গতর যেন পাথর হয়ে গেছে। রাত্রে এই টোঙে শশা-চৌকি দিতেও আনতে পারিস লহরীকে!'

'তা জানো দাদা, বললেই থাকবে, ওর মা-বাপের আমার ওপরে এমন বিশ্বাস না দাদা, কি আর বলব!'

হাসতে লাগল তারাপদ। বললে, 'পেটে বাচ্চা হলে কি করে বার করে দেয় লহরজান?'

বাবুলাল বললে, 'সে আর কি বেশি ভাবনার? ...তবে দাদা আমি ওসব পাপ কাজে যাই না, ঘরে কি আমার বউ নেই?'

তারাপদ বলে, 'সে তো শালা ছেঁড়া কাঁথা, কত হাজার বার আর গায়ে দিবি? নবাব, মহারাজ, ধনীরা তাই হাজার ধনি রাখেন, মনে নতুন বল পান। কর্মে অনু-প্রেরণা পান। ভেবে দেখ, একটা বউকে নিয়ে কোনো ভদ্দরলোক যদি পঞ্চাশ বছর 'ইয়ে' করে তো তার মধ্যে কোনো রুচি থাকে কিনা! একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম ভালবাসা থাকে বড্ড জোর বছর পাঁচেক। তারপর খোড়-বাড়ি-খাড়া— খাড়া-বাড়ি-খোড়! এর নাম সংসার! সমাজকর্তারা সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। তা না করলে আমদের মা-বাবা কে জানাই মুশকিল হতো! প্রবৃত্তির কাছে ক্রীতদাস হলে বাবুলাল, শালা তুই ছুঁচো হয়ে যাবি। আর কাম জিনিসটা যত কেনাবি সাবানের মতন ফেনিয়ে ফেনিয়ে তোকে সাফ করে দেবে!'

বাবুলাল নাকমলা, কানমলা খেয়ে জিব কেটে দিলো। গেলে নিজের সাধুত্বকে বার বার সমর্থন করে। তারপর সে টোঙা ছেড়ে চলে যায় বাড়িতে। বাড়িতে ও আজ যাবেই। শুধু বউকে দেখাবার জন্যে যা ডাঙ্গায় এসেছিল খানিকটা, পাছে বউ বলে বসে, যুবতী শালীকে দেখে যে ক্ষেতের ফসল চৌকি দিতে আজ একেবারেই বেরুলে না গো!'

বাবুলালের শালী এসেছে। যুবতী কুমারী শালী। আজ রাত্তিরে তার ঘরে না গেলেই নয়। একটা মাত্র ঘর। পাশাপাশি একটা মশারির মধ্যে শুয়ে থাকবে বউ আর শালী। তারা দুজনে ঘুমিয়ে পড়লে কোনটা বউ আর কোনটা শালী ঠিক করতে পারবে না বেচারা বাবুলাল! শালা, দে গরুর গা ধুইয়ে!

তারাপদ হাসে।

বাড়িতে চলে আসে সেও।

ডাক শুনে তার বউ পারুলরাণী এলো চুলে সাপের মতো বেড় পাকাতে পাকাতে হাই তাড়াতে তাড়াতে এসে দোর খুলে দিলে।

টলে টলে এসে আবার খাটের ওপরে শুয়ে পড়ল। তার নাকে সুড়সুড়ি দিলে সে বিরক্ত হয়। হাসে।

বলে, 'কি হল আজ তোমার বলো তো?'

'আজ আমার বোধহয় শেষ রাত!'

ধড়ফড় করে উঠে বসল পারুল। স্বামীকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'কেন! কি হয়েছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। একটা আতঙ্ক যেন। খুন-জখম কিছু হবে। হয় আমি মরব, নয়তো...'

'নয়তো! কে!'

'জানি না।'

চুপচাপ বসে রইল তারা কিছুক্ষণ জড়া-জড়ি করে। পারুল চুম্বন করতে লাগল অনর্থক। শোয়াতে চাইল তার বুকের ওপরে। কিম্বা বিছানায়। লোকটা মন খুলে কথা বলে না কোনো সময়। চারিদিকে শত্রু। জমির মামলা। কাউকে মানে না তারাপদ। একাই একশো। কেউ তর্কে তার সঙ্গে পারে না। ভোটের বাবুরা এলে সে যে দলই হোক ভীষণ রেগে উঠে তর্ক করে। তাদের অপমান করে। এক পয়সাও কোনো দলকে সে চাঁদা দেয় না। ঠাকুর-দেবতা মানে না। পারুলের মনে হয় হয়তো আজ তাদের বাড়িতে ডাকাত পড়বে কিম্বা ডাঙাতে চোর আসবে জানতে পেরে অস্ত্র নিয়ে তারাপদ ঘোরাঘুরি করছে কেবল রাত জেগে।

বললে, 'ওগো, তুমি শুয়ে থাকো, আজ কোথাও যেও না। আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে গো!'

'মাগকে নিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ে থাকব আর আমার ডাঙায় ফসল চুরি করবে শালারা রোজ? কাল শনিবার আছে। শ্যাম-গঞ্জের মিলের বাজারে মেলা আনাজ বিক্রি হবে। সেই আনাজ না যোগান দিতে পারলে চোরেদের আজ রাত্তিরে বড় লোকসান! যাই আমি ডাঙায় যাই।'

পারুল কিছু না বলে শুধু স্বামীকে ধরে একবার টানলে।

তারাপদ তাকে ছাড়িয়ে ফেলে দিলে!

ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমোচ্ছে অকাতরে। পারুলের বুকের যৌবনে এখন ভরা দুপুর। নিতম্বের ডৌল বেশ গুরু-গম্ভীর এবং আকর্ষণীয় তবু তারাপদ চোখ ফেরায়। পারুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দোরের অর্গল বন্ধ করলে তবে তারা-পদ চলে আসে ডাঙার দিকে। আদৌ টর্চের আলো মারে না সে। জমাট অন্ধকার। গাছপালা, আকাশ, জল সব আবছা দেখা যায়। সাপের ভয় প্রতিপদে। ঘাস বন। সরু আল পথ। সামনে পগার। পগারের জলে

খ‍ুঁটি পোঁতা। খ‍ুঁটির মাথায় বরবটি, পালা ঝিঙের ছাদলা। ছাদলার নিচে বিস্তর বরবটি আর ঝিঙে ফলে আছে। একহাত করে লম্বা হয়েছে প্রত্যেকটা। গাছগুলো সার পেয়ে ভীষণ সতেজ হয়ে ফসল দিতে শ‍ুর‍ু করেছে।

তারাপদ হঠাৎ যেন মানুষের নড়াচড়া ব‍ুঝতে পারলে। জল নড়ে উঠল। কে যেন বরবটি আর ঝিঙে তুলছে না।

টর্চ মারলে সে! বেগ‍ুনবাড়ির মধ্যে তিনজন। পগারের জলে একজন। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কোঁচকা না ঢেউ তোলা। কালো তার মতোই খাড়াই চেহারা। লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলে। গৌর সামন্ত।

ঝাঁ করে তার পেটে বল্লম বসিয়ে দিলে। 'বাবা গো!' বলে চিৎকার করে উঠল গৌর সামন্ত। বল্লমটা ধরে ফেলেছে সে। টর্চটা পড়ে গেল জলে—হাত থেকে খসে। জোরে হাঁক মারলে তারাপদ যখন দেখলে বেগ‍ুন-বাড়ির মধ্যে থেকে চোর তিনজন তাকে আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে আসছে।

'ছুটে আয় সব। ঘিরে ফেল। একশালা পড়েছে। সাবাড় করে দিইচি। জয় মা কালী!'

তারাপদর আকাশ ফাটানো হাঁক শ‍ুনে গ্রামের সবাই জেগে গেল। চারদিক থেকে হৈ মেরে চিৎকার করে সাড়া দিলে তারা।

লোক তিনজন আর না এগিয়ে অন্ধকারে উলুমাঠ ভেঙে দৌড় দিলে।

গৌর সামন্তকে ডাঙ্গার গায়ে চেপে শ‍ুইয়ে ফেলে দিলে তারাপদ অসুরে বিক্রমে। টেনে বল্লমটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ঘ্যাচ করে গাঁথলে গৌরের দেহে। তবু গৌর বল্লম টেনে নিতেই ছুটে এসে ধরলে তারাপদকে। লাথি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে আবার গাঁথলে, আবার গাঁথলে আবার গাঁথলে সে বল্লমের হাত খানেক ফলাটা। মানুষ মরে কি অতো সহজে! লোকটা গোঙাতে লাগল। শ‍ুয়োরের মতন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে শব্দ তুলতে লাগল শ‍ুধ‍ু তারাপদ! টর্চটা কোথায় পড়ে গেল জলের মধ্যে? পা দিয়ে একবার দেখলে। পেলে না। সমস্ত শরীর কাঁপছে থর-থর করে। উত্তেজনায়—এবং ভয়েও? লোকটা তখনো ঝাঁকাচ্ছে।

'বাবারে মা গো...'

'শালা! রোজ, বাবাকেলে মাল পেয়েছ!... বাবুলাল-হীরু-চক্রধর— এদিকে চলে এস।'

আলো নিয়ে লোকজন এল।

ভয়ংকর ব্যাপার।

মরে গেছে গৌর সামন্ত। ডাঙার পাড়ে, ছাদলার কোলে তাকে টেনে তুলে দিলে তারাপদ। রক্তে এক কোমর পগারের জল লাল হয়ে আছে তখনো। সতেরো জায়গায় খ‍ুঁচেছে কেবল গৌরের দেহে তারাপদ! সাদা দাগ ফ্যাক-ফ্যাক করছে। শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে গেছে!

তারাপদ ভাবছিল! এখন উপায়?

লোকটার কোঁচড়ে চারটি বরবটি আর ঝিঙে। উপরে একটা বস্তায় ভরেছিল চারটি। লোকজন সেখানে পাহারা দিতে থাকল। তারাপদ বাড়িতে চলে এসে গা-হাত ধ‍ুয়ে নিয়ে জামা-কাপড় পরল। পারুল বললে, 'কি হয়েছে গা?'

'তোর মাথা! ট্রাঙ্ক খোল, টাকা বার কর। হাজার খানেক টাকা দে তাড়াতাড়ি। থানায় যাব।'

টাকা নিয়ে সাইকেলে চেপে তক্ষ‍ুনি থানায় চলে গেল তারাপদ।

পাহারাকে দুটো টাকা দিয়ে ভোর রাত্রে থানার বড়বাবুকে ডেকে তুলে সব কথা বললে তারাপদ।

বড়বাবু বললেন, 'আপনি নিজে কোনো লোককে মেরে তাকে চোর সাজিয়েছেন, এমনও তো হতে পারে?'

'আজ্ঞে না স্যার। আমার ফসল রোজ চুরি যেত। আজ চৌকি দিতে যেয়ে এক শালাকে ঘায়েল করেছি। মারা গেছে। বাকি তিনজন পালিয়ে গেছে।'

'সাক্ষী আছে?'

'আজ্ঞে না, আমি একাই ছিলাম।'

'এই তো মুশকিল! খ‍ুনের কেস উল্টে আপনার ঘাড়ে চাপতে পারে। রাহী লোককে অথবা আপনার শত্রুকে মেরে আপনি চোর সাব্যস্ত করবার জন্যে কিছু ফসল গ‍ুঁজে দিয়েছেন— এমনও তো হতে পারে?'

হাত চেপে ধরলে তারাপদঃ 'বড়বাবু, আমি মিথ্যা বলছি না।'

'ব‍ুঝলাম। কিন্তু আইনের ব্যাপার তো। হয় এক তার মামলা সাজানো হয় অন্যভাবে। সাক্ষী ঠিক করুন গিয়ে। আর টাকা লাগবে।'

'কত স্যার।'

'হাজার পাঁচেক। না হলে কাল সকালেই আপনি অ্যারেস্ট হবেন। দালাল কেষ্টদয়াল থাকে আপনার পাশের গাঁয়েই। সে আপনার টাকা-পয়সা আছে জানে বলে গৌর সামন্তর পক্ষ নেবে। সাক্ষী সমেত আপনাকে আসামী দাঁড় করিয়ে গৌরের ভাই বা বউ যে কেউ থাকুক তাকে দিয়ে আজই কেস করে অ্যারেস্টের পরোয়ানা বার করে দেবে। কোর্ট-কাছারী তার নখদর্পণে।'

তখন হাজার খানেক টাকা—যা তারাপদ নিয়ে গিয়েছিল—গ‍ুঁজে দিলে বড়-দারোগার হাতে।

বড়বাবু তা মন দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে গ‍ুণে দেখলেন। সিগারেট ধরালেন। চিন্তা করতে লাগলেন যেন। হঠাৎ বললেন, 'ঠিক আছে, কনসিডার করলাম, তিন হাজার দেবেন।'

'না, স্যার দু হাজার।'

'পাঁচ শো দিতে হবে কেষ্টদয়ালকে। সে যে কেস আনে আমাকে দেয়। এক্ষ‍ুনি তার কাছে চলে যান। সকালেই আমি প‍ুলিশ নিয়ে নিজে যাচ্ছি। সাক্ষী ঠিক রাখ‍ুন তিন-চারজন। তাদের কিছু টাকা দিয়ে দেবেন। শ‍ুধ‍ু সঙ্গে ছিল—চুরি করতে দেখেছে এই বললেই হবে।'

তারাপদ কেষ্টদয়ালকে ডেকে নিয়ে এল। খ‍ুন দেখালে। কেষ্টদয়াল বললে, 'বাঃ! ঠিক করেছেন। শালা, মানুষ কত কষ্টে ফসল ফলাবে আর ফ‍ুঁকে গালে তুলবে এরা।'

গৌর সামন্তর বউ খবর পেয়ে ছেলে কোলে নিয়ে এসে ব‍ুক চাপড়ে, মাথা কুটে কাঁদছে। ছেলেটা কাদা-ধ‍ুলো মেখে কাঁদছে গড়াগড়ি খেতে খেতে।

কেষ্টদয়াল গৌরের বউকে বললে, 'কাঁদছ এখন? ভাতার রোজ 'আঁধেরে' বড্ড উপায় করে আনত না? উপায় বেরিয়েছে তো?'

'পাজীর পা-ঝাড়া' দালালকে তারা সশ্রদ্ধায় এনে বৈঠকখানায় বসিয়ে চা, মুড়ি, গুড়, নারকোল খেতে দিলে। পাঁচ শো টাকা দিলে।

তখন কেষ্ট দয়াল দয়ার অবতার হয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বললে, 'কোন শালা আপনার কি করতে পারে করুক তো দেখি!...'

বড় দারোগা এসে রিপোর্ট নিলেন। বাবুলাল, হীরু, চক্রধর আর ইসমাইল সাক্ষ্য দিলে। দারোগা প‍ুলিশদের খেদমত-বাদ তারাপদর পেটে ভাত পড়ল সেই বিকেলে। গৌর সামন্তর লাস চালান গেল থানায়।

তারাপদর কিছুই হল না আর। টাকা গেল শ‍ুধ‍ু হাজার পাঁচেক।

আর তার ফসল চুরি যায় না কোনো-দিন। তাকে দেখলে সবাই নমস্কার করে।

তারাপদ খাড়া একটা মানুষ বটে। যে নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়েছে। যে নিজেকে বাঘের মতন লড়াই করে বাঁচাতে পারে।

—আবদুল জব্বার
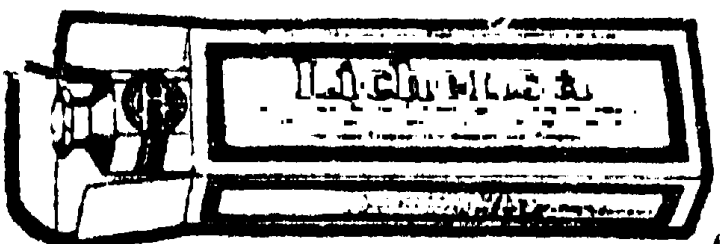
সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পণ্ডিতপ্রবর সখারাম গণেশ দেউস্করের এই বছর জন্ম-শতবার্ষিকী। সখারাম গণেশ দেউস্কর এ যুগে একটি প্রায় বিস্মৃত নাম; অথচ এখন যাঁরা পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে পৌঁছেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সখারাম প্রণীত সবুজ মলাটের একটি ক্ষীণকায় গ্রন্থ 'দেশের কথা' নিশ্চয়ই পড়েছেন। সখারামের সব কিছু বিস্মৃত হলেও 'দেশের কথা' বাঙালীর পক্ষে ভুলে যাওয়া সহজ নয়।

সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশ এককালে মহারাষ্ট্র হলেও, তিনি বাঙালীই ছিলেন। তিনি ১৮৬৯ খৃঃ ১৭ ডিসেম্বর তারিখে দেওঘরে ভূমিষ্ঠ হন। দেওঘর দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙালী প্রধান অঞ্চল ছিল এখনও সেখানকার অনেক স্থানীয় পরিবারে ভাঙা বাংলা বুলির প্রচলন আছে। প্রবাসী সম্পাদক স্বর্গতঃ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে সখারাম প্রসঙ্গে আলোচনা কালে শুনেছি যে বাংলাদেশে মহারাষ্ট্র আক্রমণের কালে কিছু মারাঠী এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা এদিকেই বিবাহাদি করে বিভিন্ন কর্মে ব্রতী হন। এই রকম একটি দল মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বসবাস করতেন। সখারামের পিতামহ সদাশিব এই দিককার মানুষ হলেও তিনি বৈদ্যনাথধামের সন্নিকটস্থ কারো নামক গ্রামটি বিবাহের যৌতুক হিসাবে পেয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম গণেশ এবং এই গণেশ সদাশিব দেউস্কর সখারামের পিতৃদেব। অনেকেই হয়ত জানেন যে, মারাঠী রীতি অনুসারে পিতৃ-নামের আদ্য অংশ পুত্রের নামের মধ্য অংশে যুক্ত হয় সেই রীতি অনুসারে গণেশের পুত্রের নামকরণ করা হল সখারাম গণেশ দেউস্কর। অতি অল্পবয়সে মাতৃবিয়োগের ফলে সখারামের পিসিমা তাঁকে মানুষ করেন। এই পিসিমার কাছ থেকেই তিনি দেশাত্মবোধের প্রেরণা পান।

সখারামের পিতৃদেব কাশীতে বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তিনিই তাঁকে বেদ পাঠে সহায়তা করেন। সখারাম যে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন মাইকেল জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু। সেই সময় দেওঘরে অনেক প্রখ্যাত বাঙালী বাস করতেন, এ ছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকেই দেওঘর, গিরিডি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় একটা উপনিবেশ গড়েছিলেন। মনীষী রাজনারায়ণ বসু থাকতেন দেওঘরে। সখারাম অতি অল্প বয়স থেকেই এই সব মহাজনের সংস্পর্শে আসেন।

সখারাম অর্থাভাবের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ হয়েই শিক্ষকতার কাজ নেন। এই সময় কলকাতায় 'হিতবাদী'-পত্রিকার একটি গৌরবময় আসন ছিল সাময়িক পত্রিকার জগতে, এ ছাড়া 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। কলকাতার সাহিত্য সমাজ স্বাদেশিকতার প্রাথমিক আমেজ কাটিয়ে প্রায় দ্বিতীয় পর্বে উপনীত। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রথম যৌবনে, অর্থাৎ উত্তর ত্রিশে।

সখারাম সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বাল্যকালে মহারাষ্ট্রের গৌরবময় ইতিহাস পড়েছেন এবং শিবাজী, বন্দী লক্ষ্মীবাঈ, আনন্দবাঈ প্রভৃতি যে তাঁকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, এ কথা বলা বাহুল্য। এর ফলে, ১৯০১ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর মহামতি রানাডে, বাজীরাও, আনন্দ বাঈ, 'ঝাঁসীর রাজকুমার' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী।

সখারাম নিয়মিতভাবে 'সাহিত্য' ও সমকালীন অন্যান্য সাময়িক পত্রাবলীতে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। এই সব পত্রিকাগুলির মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেও সখারামের অনেক রচনা ছড়ানো আছে। তাঁর বহু রচনা আজো এইভাবে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই রয়ে গেছে। তার সংকলিত প্রকাশ প্রচেষ্টা হয়নি।

সখারাম হিতবাদী সাপ্তাহিক পত্রের নিয়মিত লেখক শ্রেণীভুক্ত হন এবং দেওঘরের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট হার্ডি সাহেবের অত্যাচার সম্পর্কে 'হিতবাদী'তে যে সব নামহীন রচনা প্রকাশিত হয় সেই সব রচনাবলী যে সখারামের লেখনীপ্রসূত এই অনুমানে সখারামের কর্মস্থল দেওঘর স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি এই হার্ডি সাহেব চক্রান্ত করে তাঁকে বরখাস্ত করলেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তখন 'হিতবাদী'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। তিনি সখারামকে আমন্ত্রণ জানালেন 'হিতবাদী'তে যোগদানের জন্য। তখনকার কালে

ত্রিশ টাকা মাহিনা নেহাৎ অল্প নয়। সেই মাহিনা আবার অল্পকালে অনেক বেড়ে গেল, এর মূলে ছিল সখারামের অসামান্য নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা।

সখারাম কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশে এসে যেন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠলেন। তিনি শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন এবং শোনা যায় সখারামের আগ্রহাতিশয্যেই রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী' কবিতাটি রচনা করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'দেশের কথা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪২ এবং দেশের কথার সূচী থেকে পাঠকের পক্ষে অনুমান করা সহজ হবে কত-বিচিত্র বিষয় তিনি আলোচনা করেছিলেন। প্রধান পরিচ্ছেদগুলিতে ছিল (১) আমাদের দেশ (২) ইংরেজ শাসকের দোষগুণ (৩) দেশের অবস্থা (৪) মানসিক অবনতি (৫) কৃষকের সর্বনাশ (৬) রেল ও খাল (৭) বঙ্গীয় শিল্পীকুলের সর্বনাশ (৮) দেশীয় শিল্পের ধ্বংস (৯) দেশের আয় ব্যয় (১০) সম্মোহন—চিত্তবিজয় এবং পরিশিষ্ট অংশে আছে (ক) বিনিময়ে ক্ষতি (খ) আদমসুমারির তালিকা (গ) শিক্ষার তালিকা (ঘ) ভারতীয় কৃষকের অবস্থা (ঙ) দেশীয় রাজ্যের উৎকর্ষ (চ) বঙ্গে পাশ্চাত্য বর্গী (ছ) কৃষকের অবস্থা (জ) মিশনারিদের কুসংস্কার (ঞ) সামরিক ব্যয় (ত) দেশীয় রাজন্যবর্গ (থ) স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপাল (দ) লবণে রাজস্ব (ধ) দেশের আয় ব্যয়।

সম্ভবত এর অনেকগুলি 'হিতবাদী'র সম্পাদকীয় হিসাবে লিখিত হয়ে থাকবে। সংবাদপত্রের প্রয়োজনে লেখা, সুতরাং আয়তনে অনেকগুলি প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাময়িক ঘটনার প্রতিফলন। তথাপি এই কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তৎকালে বঙ্গভাষায় এই জাতীয় রচনাদি প্রকাশের রেওয়াজ ছিল না। এ ছাড়া উত্তরকালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি অনেক সাময়িক ও সংবাদপত্র সম্পাদক সখারামের প্রদর্শিত পথে সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করতেন। সখারামই সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি রচনা বাংলাভাষায় প্রবর্তন করেন।

আজ 'দেশের কথা' অনেক দিক থেকে অসাময়িক মনে হবে কিন্তু পথিকৃতের সম্মান সখারামের প্রাপ্য।

দেশের কথার মধ্যে অসামান্য দেশপ্রাণতার পরিচয় ছিল তাই স্বদেশীযুগের অনেককাল পরে অসহযোগ আন্দোলনের কালেও বাংলার বিপ্লবীদের এই গ্রন্থটি শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করতে দেখেছি। গ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় ছয় বছর পরে ইংরাজ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন এই গ্রন্থে সখারাম ভারতে বৃটিশ শাসন ও শোষণের কুফল সুস্পষ্ট ভাষায় এঁকেছিলেন। 'স্বরাজ' কথাটি তিনি এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থ সম্পর্কে ১৩১১ সালের শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে লিখেছেন—

'কোন সাধু পুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোন সুদর্শন বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনে যেরূপ অবস্থা হয় বর্তমান চিত্রে অংকিত ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে অথচ দেউসকর মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও ষ্ট্যাটিসটিক হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়—প্রভেদ এই যে ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই। ইহা আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে।"

দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থ পরিচয়টুকু এ যুগের পাঠকের কাছে 'দেশের কথা'র যে একটি পূর্ণ চিত্র প্রকাশিত করে একথা বলা বাহুল্য।

১৯০৭ খৃঃ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ স্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে জাপান যাত্রা করেন এবং সে দেশ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় জাহাজেই কালীপ্রসন্ন লোকান্তরিত হন, কালীপ্রসন্ন জাপান যাত্রা কালে সখারামকে 'হিতবাদী'র কার্যকরী সম্পাদক পদে বৃত করেন, কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর তিনিই হলেন এই পত্রিকার স্থায়ী সম্পাদক। কিন্তু বেশীদিন এই পদে তিনি থাকতে পারেন নি। তিলক মহারাজের নীতি নিয়ে মতভেদ হয় এবং সখারাম তিলকপন্থী হিসাবে 'হিতবাদী' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের নরমপন্থী নীতি সমর্থন করতে না পারায় পদত্যাগ করেন। এর পরের বছর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সখারামের 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিও সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

তিলক মহারাজকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করার মুখ্য ভূমিকা ছিল সখারামের। এই সূত্রে স্মরণযোগ্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিলক মহারাজের 'গীতা' অনুবাদের অনুমতি এই সময়ে নিয়েছিলেন।

রাজরোষে সখারামের নানাদিক থেকে বিপদ উপস্থিত হল এবং কলকাতায় জীবিকা সংগ্রহের সত্র নষ্ট হয়ে গেল। এর কিছু আগে নিষ্ঠুর মহামারীতে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র বিয়োগ হয়। ভগ্নস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যকে সম্বল করে সখারাম শেষ পর্যন্ত দেওঘরের সেই করো গ্রামে ফিরে গেলেন এবং সেইখানেই ১৯১২ খৃঃ ২৩ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

আজ জন্ম-শতবার্ষিকীতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের এই মহান সন্তানকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

সার্ধ জন্মশতবর্ষ ।। বর্তমানে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড় শত বৎসর চলছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই দুই মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। সম্প্রতি এরকম একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় জোড়াসাঁকোর সঙ্গীত ভবনে রবীন্দ্রভারতীর প্রেক্ষাগৃহে। এতে ডঃ সুকুমার সেন 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি কথা ও অক্ষয়-ঈশ্বর' বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি এই আলোচনায় বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তিত রূপ এবং বিদ্যাসাগরের গদ্যের বুনিয়াদের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন—'অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ধাপে ধাপে আর বিদ্যাসাগর গোড়া থেকেই সিদ্ধহস্ত।'

ভারত সভা হলেও অনুরূপ একটি সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীসেনশাস্ত্রী বাংলার নব জাগৃতিতে অক্ষয়কুমারের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীযোগানন্দ দাস ও শ্রীসৌরীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

শিবপুরের একদল তরুণ বিদ্যাসাগরের সার্ধ-জন্মশত দিবস উদ্‌যাপনে দীর্ঘ দু মাসের কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন। গত ১৫ অগাষ্ট থেকে এই কার্যক্রম সুরু হয়েছে। সর্বশেষ কাজটি সম্পন্ন হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রয়েছেন বলে জানা গেছে।

রুশ কবির ষাট বছর পূর্তি ।। প্রখ্যাত রুশ কবি আলেকসান্দর ত্ভারদোভস্কি সম্প্রতি তাঁর ষাট বছর পূর্তি উদযাপন করেছেন। বর্তমান রাশিয়ার প্রধান কবিদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। অথচ সমকালীন বহু কবির চেয়ে তিনি স্বতন্ত্র। কখনও মুক্ত ছন্দে তিনি লেখেননি। তথাকথিত আধুনিক শব্দ ব্যবহারেও তাঁর অনীহা। প্রচলিত কথায় যাকে স্টাইল বলা যায়, সে ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। তবু তাঁর কবিতার পাঠক অজস্র। কারণ তাঁর কবিতার

বিষয়। সমকালীন জীবন ও সমাজ তাঁর সাহিত্যে অনুরণিত হয়েছে। শুধু ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহিত্য ক্ষেত্রে কখনই স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। বিষয়ের বৈচিত্রই শিল্প সাহিত্য আন্দোলনে চিরকাল মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছে। ওডারদোভস্কির ষাট বছর পূর্তির সময়ে তাঁর অপরিসীম জনপ্রিয়তা একথাই প্রমাণ করে।

ইজিকিয়েলের নাটক ।। নিসিম ইজিকিয়েলকে প্রধানত কবি হিসেবেই আমাদের জানা আছে। ভারতে ইংরেজি ভাষায় যে কয়জন কবি কবিতা চর্চা করেন ইজিকিয়েল তাঁদের মধ্যেও অন্যতম। সম্প্রতি তাঁর তিনটি নাটিকা নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন কারণেই উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সভ্যতার বিভিন্ন দিকের প্রতি নাট্যকার এখানে তীব্র বিদ্রূপ নিক্ষেপ করেছেন। একটি একাঙ্কিকার নাম 'দি শিলপওয়ালাকারস'। এতে যে সব আমেরিকানরা ভারতে আসেন ভারতীয়তা সম্বন্ধে জানতে এবং যেসব ভারতীয়কে তারা জানেন, তাদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন। এই একাঙ্কিকার নায়ক হলেন মিঃ মরিস। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিমানে ভারতে অবতরণ করেন একটি ছবির পত্রিকার উন্নতির পরিকল্পনা নিয়ে। এই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে কেউ ভাবতে না পারে। শ্রীযুক্ত শাহের সঙ্গে মিঃ মরিসের সাক্ষাৎ হয়। শাহ তাঁকে জানান যে, এ ব্যাপারে ভারত প্রায় হাজার বছর সাধনা করেছে। যাই হোক, এরপর শ্রীমতী মরিস ভারতের সঠিক সাংস্কৃতিক পরিচয় জানবার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং শাড়ি পরিধান করলেন। যেন এতেই সব জানা হয়ে যায়। এইভাবেই পরিচয় হলো শ্রীমতী গাংগুলীর সঙ্গে। শ্রীমতী গাংগুলী পরিবার পরিকল্পনার উপর একটি বই লিখেছেন। মিঃ মরিস এ খবর পেয়ে বললেন, 'ভারতের প্রতিটি গ্রামে নাটকটি চালু করে দেবার জন্য আমাদের কোন ফাউন্ডেশান নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে।' শ্রীমতী গাঙ্গুলী অবশ্য ভেবে চিন্তিত হলেন, ভারত সরকার এতে রাজী হবেন কিনা। ইজিকিয়েলকে ধন্যবাদ—এমন একটি স্পষ্ট, বাস্তববাদী নাটক রচনার জন্য।

অস্ট্রেলিয়ান কবিতা ।। জন এফ ট্রানটার অস্ট্রেলিয়ার তরুণতম কবিদের অন্যতম। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'প্যারালাক্স এ্যান্ড আদার পোয়েমস'। ট্রানটারের বাল্য জীবন কেটেছে নিউ সাউথ ওয়েলসের সমুদ্রতীরে। তাঁর এই স্বল্প দিনের জীবনও বৈচিত্র্যময়। শ্রমিক চিত্রকর ইত্যাদি বিভিন্ন পেশা নিয়ে তিনি এশিয়া ও ইউরোপের বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। তারপর দেশে ফিরে এসে সিডনী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার এখন তিনি নিয়মিত লেখক। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। এই বইয়ের নামকরণ যে কবিতাটি নিয়ে হয়েছে, সেটি সিডনী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। **—চার্বাক**

নতুন বই

বিপ্লব সাধনায় নিবেদিতা। মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। প্রকাশিকা উমা চক্রবর্তী, ১৬২, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বস্তুত বাংলাদেশের উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল এক ধরনের আত্মার উল্লাস। শুধু সাহিত্য শিল্প নয়, ধর্ম, দর্শন, দেশ, সমাজ-সংস্কারে সেকালের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আত্ম-অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকের শেষ দিকে সংস্কৃতি বিপ্লবের ত্রিমুখী ধারায় তিনজনের আবির্ভাব—রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। রামকৃষ্ণের সূত্রে বিবেকানন্দ যে বিপ্লবের কথায় সোচ্চার হন, আইরিশ তরুণী ভগিনী নিবেদিতা সেই বিপ্লবের বাণী হৃদয়ে ওতপ্রোত করে স্বদেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশে আসেন। কালক্রমে ভারত সেবায় নিজেকে করেন নিঃস্ব।

লেখক শ্রীমৃণাল দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, 'স্বামীজীর ভারত-মুক্তির স্বপ্নকে সার্থক করে তোলাই ছিল নিবেদিতার সমগ্র জীবনের সাধনা।' এই বিরাট সাধনার কথা লেখক সুন্দরভাবে এবং তথ্যসমৃদ্ধ অথচ উপন্যাসোপম ভঙ্গিতে লিখে দিয়েছেন। এমন সহজ, সরস অথচ গভীর চিন্তার উদ্দীপক ভাষারীতি প্রয়োগের জন্যই গ্রন্থটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে। গ্রন্থটি প্রধানত প্রমাণ করে—নিবেদিতা যেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগের স্বচ্ছ দর্পণ। শুধুমাত্র ভক্তিরসাপ্লুত আবেগ নয়, বইখানি লেখক মননসমৃদ্ধ রীতিতে রচনা করায় বাংলা সাহিত্যে অন্যতম জীবনীকার হিসেবে নিঃসন্দেহে তিনি উল্লেখ্য।

বন্দী ফাল্গুন। কনক মুখোপাধ্যায় নবজাতক প্রকাশন, ৬ এন্টনিবাগান লেন, কলকাতা ৯। মূল্য আট টাকা।

রাজনীতিকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনার প্রয়াস প্রত্যক্ষত হলেও পরোক্ষভাবে বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই সুরু। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে তার বিস্তার। উত্তর-কল্লোল পর্বে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক রাজনীতিকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করেন। রাজনীতির সূত্রেই কারাজীবন বাংলা সাহিত্যে প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষভাবে 'কারাসাহিত্যে'র একটি ধারা বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে দেখা দেয়।

কোনো কোনো ঔপন্যাসিক বন্দী-জীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে বিশেষ কোন রাজনীতির মতাদর্শের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছেন। জেলখানা ও জেলখানার রাজনৈতিক ওয়ার্ডে দেখা রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মানুষদের সুন্দর চিত্র প্রথম এঁকেছেন 'জাগরী'র রচনাকার সতীনাথ ভাদুড়ী। তারাশঙ্করের জেল-জীবন বর্ণনা, জ্যোতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি-কেলাস', সমরেশ বসুর 'স্বীকারোক্তি' গল্প এই ধারারই পরিচায়ক। জরাসন্ধ লিখিত 'লৌহকপাট' যথার্থ অর্থে রাজনীতি-আশ্রিত জেলজীবন চিত্র নয়। শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দী ফাল্গুনে' এই ধারার উপন্যাস।

লেখিকা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় রাজনীতিতে একটি বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী এবং নিরলস কর্মী। অন্য দিকে তিনি কবি, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদিকা। ব্যক্তিগতভাবে উনিশ শ' বাষট্টি-তেষট্টি সালে প্রেসিডেন্সী জেলে বিনা বিচারে রাজবন্দী ছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসে সেই রাজবন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা ও পিছনে ফেলে আসা সুখ-দুঃখের স্মৃতি সূত্রে বহু জীবন্ত বন্দী-চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। লেখিকা ভূমিকায় জানিয়েছেন, আটচল্লিশ—পঞ্চাশ সালের জেল-জীবন অভিজ্ঞতাও এতে যুক্ত হয়েছে।

কাহিনীর নায়িকা রত্না সাম্যবাদী আদর্শের রাজবন্দী। রত্না জেলের মধ্যে স্মৃতি সূত্রে তার পূর্ব-পরিচিত পুরুষ-বন্ধু ও সহকর্মী মনীশ ও সুহাসের কথা বলেছে। এ ব্যাপারে রত্নার রাজনীতির আদর্শগত সংঘাতের কথা ব্যক্ত। কিন্তু এটাই উপন্যাসটির মূল লক্ষ্য নয়। লেখিকা নিপুণভাবে জেলের অভ্যন্তরে দেখা অন্যান্য বন্দিনীদের চিত্র এঁকেছেন। গোলাপ পাগলী, বিনোদিনী, সত্যবালা, অমিতা, বকুল, কুমারী মা মনসুরা ইত্যাদি চরিত্র-চিত্র অনবদ্য ভঙ্গিতে অংকিত।

উপন্যাসটির সবচেয়ে বড় গুণ লেখিকার অকৃত্রিম প্রেরণা ও আন্তরিকতা। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টি, সংবেদনশীল মন চমৎকার লিপিকুশলতায় উপন্যাসটিকে বাংলা 'কারাসাহিত্যে'র ধারায় বিশিষ্ট স্থানে বসিয়েছে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

শকুন্তলারী [বর্ষা সংখ্যা ১৩৭৭]—সম্পাদক মিহির আচার্য।। ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৪।। এক টাকা।।

এ সংখ্যার প্রথম লেখা 'মার্কিনী শতাব্দী' প্রসঙ্গে ম্যাকসিম লিবার' একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। বছর আগে 'মার্কিনী শতাব্দী' নামে আমেরিকান ছোটগল্পের যে সংকলনটি বেরোয়, তারই প্রাককথনের বঙ্গানুবাদ হলো এই প্রবন্ধটি। অনুবাদ করেছেন অমিতাভ ঘোষ। গল্প লিখেছেন অলোক সিংহ (জাদুকর), দিলীপ সেনগুপ্ত (আরোহী), দীপংকর দাশগুপ্ত (মৃত্যুকে অনুসরণ), রণেন চক্রবর্তী (স্বপনে জাগরণে), দীপংকর লাহিড়ী (রঙ্গ), দেবীপদ মুখোপাধ্যায় (আত্মপ্রতিকৃতি) ও বৈতালিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সেমিনার)। একালের জীবন জিজ্ঞাসা ও মননশীলতায় প্রায় প্রতিটি গল্পই অসাধারণ। সাহিত্য পাঠকের কাছে পত্রিকাটি ভালো লাগবে। সুসম্পাদিত এই কাগজটির জন্য আমরা সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই।

সীমান্ত [জুন ১৯৭০]—সম্পাদক তরুণ সান্যাল ও গণেশ বসু।। ৬০এ হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা ১০।। দাম এক টাকা।।

মাস কয়েক বিরতির পর 'সীমান্ত' বেরিয়েছে নতুন প্রচ্ছদ ও নতুন চরিত্র নিয়ে। আগেকার সেই কবিতা ও কবিতাবিষয়ক পত্রিকা আর নেই। এবার রূপ নিয়েছে নির্ভেজাল সাহিত্য-সাময়িকীর। পূর্বেও সীমান্তের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, এবারে তার পরিধি আরো প্রসারিত হলো। এ সংখ্যায় চারটি কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায় ও রাম বসু। অসাধারণ দুটি গল্পের লেখক যশোদাজীবন ভট্টাচার্য (পাপের বেতন) ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (বনভূমি)। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের মান এখন নিম্নমুখী। মনে হয়, সীমান্ত তার পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট। গ্রন্থ সমালোচনা-প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ, মিহির আচার্য ও তরুণ সান্যাল। গণেশ বসু লিখেছেন 'প্রসঙ্গত' শিরোনামে কয়েকটি সংস্কৃতি-সংবাদের আলোচনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন যে প্রগতিশীল সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে, তার একটি পর্যালোচনা থাকলে আরো ভালো লাগতো। বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে 'সীমান্তের' দ্বিতীয় জন্ম একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলেই বিবেচিত হবে।

অর্থনীতি বিভাগ পত্রিকা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।। প্রধান সম্পাদক : অশোক বর্মন।।

অর্থনীতি বিভাগের ম্যাগাজিন হলেও প্রকাশিত লেখাগুলি মূলত সাহিত্য রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক। চমৎকার ছাপা, চমৎকার প্রচ্ছদ। এ সংকলনে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ররাই লিখেছেন প্রধানত। লেখকদের মধ্যে আছেন তরুণ সান্যাল, অশোক বর্মন, মৃন্ময় ভট্টাচার্য, অমলেন্দু শেঠ, অভিজিৎ সেন, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস গোস্বামী, উৎপলকুমার মজুমদার, চিত্তব্রত চক্রবর্তী, পৃথ্বীপতি চক্রবর্তী, কিরীটি দত্ত, বিমল দে, হীরেন সিংহরায়, শক্তি বসু, অলোকরঞ্জন সিদ্ধান্ত ও অরুণোদয় সাহা। ইংরেজী বিভাগটিও সমান আকর্ষণীয়। এই বিভাগে লিখেছেন অম্লান দত্ত, কৃষ্ণলাল দত্ত, শক্তিনাথ সাহা, স্বরূপ চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু সামন্ত ও শ্যামল ঘোষ।

চতুরঙ্গ [মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬]—সম্পাদক দিলীপকুমার গুপ্ত।। ৫৯ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা ১৩।। দেড় টাকা।

দীর্ঘ একত্রিশ বছর ধরে চতুরঙ্গ বেরিয়ে আসছে নিয়মিত। এ সংখ্যাটা বেরিয়েছে কিছুটা দেরাতে। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতার ভাষা)। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন 'কল্লোল পর্বে বিদেশী প্রভাব' সম্পর্কে একটি আলোচনা। অন্যান্য লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর দাশগুপ্ত, অমলেশ চক্রবর্তী, অনন্ত দাস, কায়সুল হক, বিশ্বেশ্বর সামন্ত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুতপা ভট্টাচার্য (আধুনিকতা ও রবীন্দ্র সমালোচনা), গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, অজয়কুমার দাশগুপ্ত, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। রচনা নির্বাচনে, সম্পাদকীয় দৃষ্টিতে পত্রিকাটি শুধু তার পূর্বের ঐতিহ্য সংগ্রহযোগ্য সংকলনে পরিণত হয়েছে। সহ-সম্পাদক সুধাংশু ঘোষ।

এপার বাংলা ওপার বাংলা [শ্রাবণ ১৩৭৭]—সম্পাদক দুলাল চৌধুরী ও গৌরীপদ ভট্টাচার্য। পি ১১২ সি আই টি রোড, কলকাতা ১০। পঁচিশ পয়সা।

মূলত সংবাদ সাময়িকী হবে এ-বাংলার খবরাখবর যথাসম্ভব কম। প্রায় সবই পূর্ব বাংলার সংবাদ। [illegible] ভাগই শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ। এ বাংলার মানুষ এসব খবর জানেন না। ডঃ গৌরীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন পূর্ব বাংলার আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি সমীক্ষা। শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে সাগর [illegible] একটি কবিতা 'যতো দূরে চোখ [illegible]'। আমরা পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা [illegible]।

ছোটগল্প (৩) সোভিয়েত

উনিশ শ' সতেরোর বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা বুর্জোয়া মহলে প্রধান বিতর্কের বিষয় ছিল। এমন কি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও সোভিয়েট সাহিত্যের বিচারে ওদেশের সমাজবিন্যাস সম্পর্কে বিশেষ মনোভাবকে গোপন করতে পারেন নি। বিষয়টা এমনই যে, যেহেতু তোমার সমাজের কাঠামোটা খারাপ সেইহেতু তোমার সাহিত্যও বাজে।

ফলে সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচারশীল পর্যবেক্ষণ বাধা সৃষ্টি করেছে। মার্কসবাদে অবিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা সোভিয়েট সাহিত্যকে শিল্পগুণবর্জিত নিছক প্রোপাগান্ডা বলে প্রচার করেছেন। অপর পক্ষে মার্কসবাদীগণ সোভিয়েত সাহিত্যে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে' ঘোষিত নীতি বলে বিজ্ঞাপিত করেছেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের মতো বাঙালী পাঠকদেরও এই সাহিত্যের ব্যাপারে সংশয়ে পড়তে হয়। বাইরের অপপ্রচারকে বন্ধ করতে খোদ সোভিয়েত থেকে যে ধরনের কেতাবপত্র আসে তাতে 'সরকারী সোভিয়েত সাহিত্যকে' চেনা যায় সার্বিক সাহিত্যের চেহারাটা ধরা যায় না।

সাধারণভাবে রাশিয়ান এবং সোভিয়েত সাহিত্যকে দু ভাগে ভাগ করার একটা নজির আছে। বস্তুত সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা নূতন একটি সাহিত্যাদর্শ প্রচার করেছে। তার নাম প্রলেটেরিয়ান হিউম্যানিজম-ই হোক কিংবা সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমই হোক।

কিন্তু একথা কি করে অস্বীকার করা যায় যে, যে-গার্কি সোভিয়েত সাহিত্যের অবিসম্বাদী নেতা তিনি একাধারে রাশিয়ান লেখক এবং সোভিয়েত লেখকও বটে। বিস্ময়ের বিষয় সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা জন্ম নেবার আগেই গার্কির বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ দুটি ১৮৯৮য়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে। এবং 'ছাব্বিশজন পুরুষ ও একটি মেয়ে', 'চেলকাশ' প্রমুখ বিখ্যাত গল্পগুলি ইতিমধ্যেই সমাদৃত।

প্রাক-বিপ্লব গার্কির অনুসরণকারী লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুপ্রিন, বুনীন ও আন্দ্রায়েভ।

কিন্তু আমাদের এই আলোচনায় তাঁরা আসেন না।

বর্ষীয়ান সোভিয়েত লেখকদের মধ্যে, মাত্র গত বছর মারা গেছেন, কনস্টানটিন পাউস্তভস্কি এবং মিখাইল সলোখভ।

পাউস্তভস্কির জন্ম মসকোয় ১৮৯২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নানা রকম কাজের

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি সাংবাদিকতা গ্রহণ করেন। এবং ওডেসার সাহিত্য জগতের সভ্যপদ পান বিপ্লবের প্রথম বছরের মধ্যেই। সেখানে বেবেল-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব। আট বছর গর্কির জর্নালের উপর কাজ করেন। গর্কিই প্রথম তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে উৎসাহিত করেন।

২০—৫০-এর দশকের সোভিয়েত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের গীতধর্মিতা তাঁর রচনার প্রধান বিষয়।

পাউস্তভস্কি সাহিত্যে উদারনীতিতে বিশ্বাসী এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের বিরোধী। রাইটার্স ইউনিয়নে তিনি দুদিনৎ-সেভের 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন' গ্রন্থের পক্ষ নিয়েছিলেন।

সোভিয়েত সমাজকাঠামো সম্পর্কে পাউস্তভস্কির পর্যবেক্ষণ আত্মসমালোচনা-মূলক। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'টেলিগ্রামে' পুরনো ও নতুন যুগের প্রতিনিধিদের তুলনামূলক জিজ্ঞাসা রয়েছে। নতুন সোভিয়েত কর্মীরা কি নিজস্ব স্ট্যাটাস বজায় রাখতে পুরাতন মানুষদের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনকে নির্মমভাবে অস্বীকার করছে?

সালোখভের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা মূলত উপন্যাসের জন্যে। জন্ম ১৯০৫। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প 'মানুষের ভাগ্য' ১৯৫৭-এ লেখা। এই কাহিনী নিয়ে নির্মিত সোভিয়েত ফিল্মটি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। এ-গল্পে সুহত্তর মানবভাগ্য এবং আত্মোৎসর্গী প্রেমের কথা আছে।

ভেরা ইনবার বিখ্যাত মহিলা লেখক। জন্ম ১৮৯০ ওডেসায়। প্রথম দিকে এঁর লেখায় ডেকাডেন্টের সুর ছিল, গোষ্ঠীগত হিসেবে তিনি কন্সট্রাকটিভিস্টদের সঙ্গে ছিলেন। ১৯২৫ থেকে তাঁর রচনায় সোভিয়েত বাস্তবতা লক্ষিত হয়। ১৯৪৬-এ স্টালিন পুরস্কার পান।

'সুনার মৃত্যু' লেখিকার আত্মজীবনী-মূলক গল্প. রাশিয়ান মানবিকতাই এখানে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। অথচ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বিচ্যুত হন নি। অসোভিয়েত দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করেন তাঁরাও এই পরীক্ষামূলক গল্পটি পড়ে বিস্মিত হবেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার না-করেও কতদূর সার্থক হতে পারে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গল্পটি।

ইলফ্ ও পেট্রভ যুগ্ম লেখকের ছদ্ম-নাম। ইলফ্ হলেন ইলিয়া অর্নোল্ডভিচ ফেইনজিলবার্গ, পেটভ হলেন ইয়েভগেনি পেট্রোভিচ কাটায়েভ।

ইলফ-এর জন্ম ১৮৯৭ ওডেসায়। ব্যঙ্গরচনায় ইনি পারদর্শী। ১৯১৮ থেকে তাঁর লেখা পত্রিকায় বেরুতে শুরু করে। পরে তিনি মস্কোয় আসেন, সেখানে ১৯০৩-এ পেট্রভের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯২৭ থেকে তাঁরা উভয়ের রচনার অংশীদার। তাঁদের রচনাসংগ্রহ 'কি করে রবিনসন সৃষ্টি হল' (১৯৩৩) এবং 'টীন' (১৯৩৭) নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬-এ যুগলে আমেরিকার উপর কেতাব রচনার উদ্দেশ্যে মার্কিন দেশে আসেন। ফিরে এলে ইলফ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৭-এ মারা যান।

ইলফের বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর পেট্রভ নিবন্ধ, সিনারিও, নাটক লিখতে শুরু করেন। যুদ্ধ শুরু হলে যোগদান করেন. ১৯৪২-এ সেবাস্তোপল অবরোধের সময় নিহত হন।

আবির্ভাব-যুগ থেকে এই জুটির রচনা সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও দীর্ঘ-কাল সোভিয়েট ইউনিয়নে তাদের রচনার প্রকাশ বন্ধ থাকে। কর্তৃপক্ষ তাঁদের গঠনমূলক ব্যঙ্গগুলিকে সুনজরে দ্যাখেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালে আবার তাঁদের রচনাবলী সোভিয়েতে প্রকাশ পেয়েছে।

এই লেখক জুটির ব্যঙ্গ সোভিয়েত সমাজ কাঠামোর সর্বস্তরে স্পর্শ করেছে। আমলাতন্ত্রের বুজরুকির বিরুদ্ধেও এঁদের ব্যঙ্গ যথেষ্ট মর্মভেদী। 'অন দি গ্র্যান্ড স্কেল' গল্পটিই ধরা যাক। আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর অমিত বায় যথেষ্ট করা গেলেও সেই আমলা সাংসারিক জীবনে নিত্য-প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ছাঁটাই করতে ভয়ংকর নীতিবাগীশ হয়ে ওঠেন! সোভিয়েট আমলাচক্রের বিরুদ্ধে এই আত্মসমালোচনা করবার অধিকার লেখকের আছে কিনা পাঠকেরাই বিচার করবেন।

সেগেই আন্তোনভের জন্ম ১৯১৫, লেনিনগ্রাদে। বি-এ ডিগ্রি লাভ করবার পর তিনি রুশ-ফিনিশ যুদ্ধে যোগ দেন। ১৯৪৭-এ তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাঁর অনেক রচনাই ফিল্ম হয়েছে।

বিখ্যাত গল্প 'দরখাস্ত' আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার বিরুদ্ধে কটাক্ষ। চাকরির প্রার্থী যুবক দরখাস্ত করার পর দীর্ঘকাল কোনো জবাব না পেয়ে যখন অন্যত্র চাকরি নিয়ে ফেলেছে তখন তার আগের চাকরির অফার এল। অবশ্যই সে-চাকরি যুবকটি প্রত্যাখ্যান করল।

য়ুরী ওলিয়েশার জন্ম ১৮৯৯। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু। 'এ স্ট্রিক্ট ইয়ংম্যান' নাটকটির জন্যে তিনি সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেসে ১৯৩৪-এ অভিযুক্ত হন। পরিণামে স্বেচ্ছায় লেখা বন্ধ করে দেন। ১৯৩০-এর শোধন নীতির ফলে তিনি বন্দী হন। ১৯৫৬ পর্যন্ত সোভিয়েট প্রচারে তাঁর উল্লেখ ছিল না। অবশেষে ১৯৫৭-এ তাঁর রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হলে তিনি পুনর্বাসিত হন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬০-এ মারা যান। 'লিয়োমপা' তাঁর আশ্চর্য পরীক্ষামূলক গল্প। যে-পরীক্ষা-নিরীক্ষা আঙ্গিক সর্বস্বতার দোহাই-এ সোভিয়েটে একরূপ নিষিদ্ধ।

এ-ছাড়া অন্যান্য গল্প লেখক যাঁরা যথেষ্ট মনোযোগ দাবি করেন তাঁদের মধ্যে আছেন সেগেই নিকিতিন (জন্ম ১৯২৬), য়ুরী নাগীবীন (জন্ম ১৯২০), য়ুরী লাপতারেভ (জন্ম ১৯০৩), ভালেরি ওসিপভ (জন্ম ১৯৩০), য়ুরী কাজাকভ (জন্ম ১৯২৭) প্রমুখ।

—শোভন আচার্য

বৈকুণ্ঠের খাতা

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গো

পুজোর লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সবে ছোটদের লেখা শেষ করেছেন। এখনো লিখে উঠতে পারেননি একটা উপন্যাস। বিষয় ভেবে রেখেছেন। কেবল একটি ছোট উপন্যাস লিখেছেন 'তারা ফোটবার আগে'।

সেই পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি। চারদিক থেকে তাগাদা আসছে, সম্পাদকের ফোন। সেজন্যেই কিছুটা ব্যস্ততা, তাড়াহুড়ো। অনেকদিন আগে নারায়ণবাবুর মুখে শুনেছিলুম : বাইরের তাগিদ না থাকলে আমি লিখতে পারি না।

প্রথম লেখার কাহিনী

সেদিন গল্প হচ্ছিল নানা বিষয়ে। সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমকালের মানুষ থেকে শুরু করে তরিতরকারীর বাজারদর, ওষুধপত্রের দাম পর্যন্ত তাঁর আলোচনার পরিধি বিস্তৃত। এতটুকু ক্লান্তি কিংবা বিরক্তি নেই। বেশ অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর। চোখে মুখে উজ্জ্বলতা। যেন অতিরিক্ত একটা দীপ্তি আছে তাঁর চেহারার মধ্যে।

বললাম : আপনার জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোনটি?

হঠাৎ মনে না-পড়ার অস্বস্তি নিয়ে বললেন, কী যে বলবো, বুঝে উঠতে পারছি না। খানিকটা থেমে বললেন, 'তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। বয়স বেশি নয়। দেশ পড়তেম নিয়মিত। কি ঝোঁক হলো জানি না, একদিন একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলুম দেশ-এর ঠিকানায়। যথাসময়ে তা ছাপাও হলো। মনে পড়ে, বেশ উৎসাহিত হয়েছিলুম।

কয়েকদিন পরে পাঠিয়ে দিলুম আরেকটা কবিতা। কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে পত্রিকা দপ্তর থেকে চিঠি এল, আপনার লেখা মনোনীত হয়নি। দেশ খুলে দেখি আমার সেই অমনোনীত কবিতাটিই ছাপা হয়েছে সে-সংখ্যায়।'

আমি চুপ করে ছিলুম। নারায়ণবাবু বলছিলেন আরেকটা ঘটনার কথা। প্রথম গল্প লেখার কাহিনী।

তাঁর ভাষায় : 'দেশে ফিরে গিয়েছি : গাঁয়ের পথে-ঘাটে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই। একদিন দেখলুম, আমার এক সম্পর্কিতা ভগ্নী গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে উদাস হয়ে। তার মনের কথা জানা ছিল না। শুনেছিলাম বিয়ে ঠিক হয়েছে। কল্পনায় ও অনুমানে একটা কাহিনী দাঁড় করালুম, 'বর আসিতেছে'।

'বিচিত্রায়' এক বছরে লিখেছিলুম দুটো গল্প।

হঠাৎ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি পেলুম : আপনার গল্প আমরা মাঝে মাঝে ছাপি। কিন্তু গল্প বেশি লিখলে উপন্যাস লিখতে পারবেন না।'

সম্ভবত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐ চিঠিই তাঁকে উপন্যাস লেখায় উৎসাহিত করে। 'নীড় ও দিগন্ত' নামে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন ধারাবাহিকভাবে। কিন্তু শেষ হয়নি। ছ-সাতটা কিস্তি লেখার পর বিচিত্রা বন্ধ হয়ে যায়।

'উপনিবেশ'-রচনা

কথাপ্রসঙ্গে বললেন : 'দক্ষিণ বরিশাল আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল। ওখানকার নদী, মানুষ, প্রকৃতির সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ যোগ। আমার আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ ঐ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন নানা কাজে। তাঁদের মুখে শুনতুম ওখানকার গল্প। এককালে পর্তুগীজ জল-দস্যুরা ওখানে আড্ডা গেড়েছিল। অনেকে মিশে গেছে স্থানীয় বাঙালি সমাজের সঙ্গে। ডিসুজো অবাঙালি থাকেননি। এদের বিচিত্র জীবন আমাকে নাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে।

আমার প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' এই ভাবনার ফলশ্রুতি।

অবশ্য তার অন্য কারণও ছিল। একদিনে তা লিখিনি। একবারেও না।

আমরা তিনজনে থাকতুম একটা মেসে—আমি, নরেন (নরেন্দ্রনাথ মিত্র), আর তাঁর ভাই ধীরেন। এখনকার দিনের মেস নয়। মাসিক পাঁচ সিকে সিট-রেন্টের ঘর। কোনোরকমে দিন গুজরান করতুম।

একদিন ধীরেনের হল প্রচণ্ড জ্বর। রাত্রি জাগতে হল আমাকেও। কি আর করি, রাত জেগে পড়লুম একটা রাশিয়ান উপন্যাস, 'ভার্জিন সয়েল আপটার্ণড।' আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। বিপ্লবের পর রাশিয়ায় কালেকটিভ ফার্মিংয়ের জন্য যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেয়, তারই ভিত্তিতে লেখা। কোনো নায়ক নেই উপন্যাসটির। সমস্ত আন্দোলনটাই যেন তার নায়ক।

আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলুম উপন্যাসটি পড়ে।

পূর্ব বাংলার পটভূমিতে পর্তুগীজ কলোনী বিস্তারের কাহিনী লিখতে বসলুম। পনেরো-কুড়ি পৃষ্ঠার বেশি লেখা হলো না। উৎসাহ শেষ।

হয়তো আর লেখা হতো না।

মাঝে মাঝে গল্প লিখি। ছাপা হয়।

কলকাতার পাট চুকলো। এম-এ পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফিরে গেলুম। এবার চাকরী-বাকরী করা দরকার। আমার এক দাদা লিখলেন, বর্মায় যাবার জন্যে। রেঙ্গুনের বেঙ্গলী একাডেমিতে একজন শিক্ষক নেবে। মাইনে মাসে দেড় শ টাকা। তখনকার দিনে অধ্যাপনার চাইতেও ভালো চাকরী।

সেই সময়ে গাঁয়ে বেড়াতে গেল আমার এক বন্ধু। জানতো আমি লিখছি। একদিন সময় কাটাবার জন্যই হোক, বা অন্য কোনো কারণেই হোক, বললো, লেখাটেখা কিছু আছে? পড়। শোনা যাক!

বললুম, একটা উপন্যাস শুরু করেছিলুম। পনেরো-কুড়ি পৃষ্ঠা লিখেছি। শেষ করতে পারিনি।

ও তাই শুনতে চাইলো।

পড়ে শোনালুম।

শুনে বললো, ভারি ইন্টারেস্টিং। শেষ কর ফেল।

তখন আমি গাঁয়ের পথে ঘাটে, এখানে ওখানে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই। আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিই। আবার লেখা শুরু করলুম। 'উপনিবেশ' প্রথম খণ্ড শেষ করলুম গাঁয়ে বসেই।

তারপর কলকাতায় এসে যাঁর বাসায় উঠলুম, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল পবিত্রদার (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়)। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমারও পূর্বপরিচয় ছিল। একদিন পবিত্রদা ওখানে এসে হাজির। সঙ্গে 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পবিত্রদা বললেন, নতুন লেখা থাকে তো পড়ে শোনাও।

বললুম, একটা উপন্যাস লিখেছি। পড়তে অনেক সময় লাগবে।

—কতক্ষণ?

—ঘন্টা দেড়েক।

—পড়ো। ঘন্টা দেড়েক গল্প শুনেই কাটানো যাবে।

পবিত্রদা শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। ফণীবাবু উপন্যাসটি চেয়ে নিলেন ভারতবর্ষ-এর জন্য। আমি চলে গেলুম কয়েকদিন পরেই উত্তরবঙ্গের একটি কলেজে চাকরী নিয়ে।

কিন্তু মাসের পর মাস যায়। 'উপনিবেশ' আর ভারতবর্ষে ছাপা হয় না।

কি ব্যাপার?

খোঁজ নিয়ে জানলুম বইটিতে নাকি অশ্লীল ব্যাপার আছে। সেজন্যেই তাঁরা দ্বিধাবোধ করছেন। ছাপতে পারছেন না। আমাকে বললেন, কিছুটা কাটছাঁট করে দিতে।

দিলুম।

ভারতবর্ষেই ছাপা হলো 'উপনিবেশ'। এ ব্যাপারে যিনি উদ্যোগী ছিলেন, তাঁর নাম মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ একটি আশ্চর্য মানুষ। তিনিই তখন বলেছিলেন, এ উপন্যাস যদি ভারতবর্ষে না বেরোয়, তা হলে ছাপা হবে কোথায়?

প্রথম কিস্তি ছাপা বেরুবার পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে একটা চিঠি লিখলেন: 'এ উপন্যাস তোমাকে সাহিত্যের নতুন বন্দরে নিয়ে যাবে।'

'আলোক-পর্ণা'—প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর নতুন উপন্যাস 'আলোকপর্ণা'। বই আকারে বেরুবার আগে এটি ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল অমৃতে। বোধহয় লেখা শুরু করেছিলেন ১৯৬৮-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে, শেষ করেছেন ১৯৬৯-র সেপ্টেম্বরে।

আমি তখন উপন্যাসটি নিয়মিত পড়ে উঠতে পারিনি। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলাম। বহু চিঠি ছাপা হয়েছিল অমৃতের পাতায়। হয়তো অনেকের কাছেই উপন্যাসটি দর্পণের মতো মনে হয়েছিল, পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের মুখ দেখেছেন সেই দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে।

শিরোনামহীন ভূমিকায় তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন: 'আলোকপর্ণা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় যে-সব পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে লেখক দাক্ষিণ্য এবং উৎসাহ পেয়ে চরিতার্থ হয়েছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।'

কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ জানাবে কে?

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই মনে মনে তা জানাচ্ছেন।

সদ্য এবং বিগত অতীতের ঘটনা নিয়ে কিছু কিছু উপন্যাস তিনি লিখে থাকলেও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচনায় সমকালীন। অর্থাৎ ঘটমান বর্তমানের উত্তাপ-উত্তেজনা, আনন্দ-বিষাদ, এবং সুখ-দুঃখ তাঁকে আকর্ষণ করে বেশি।

তিনি বলেন, আমি আগে বিষয় ভেবে নিই। পরে চরিত্রগুলি আসে তার অনুষঙ্গী হয়ে। আমার চরিত্রগুলি একেকটা ভাবনার প্রতিনিধি। কখনো তারা আসে খণ্ডিতভাবে, কখনো পূর্ণ রূপে।

তাঁর এ উক্তি একান্ত আধুনিক মানুষের কথা। হৃদয়ের জটিলতম রহস্যের উদ্ঘাটন যিনি করেন, তাঁর পক্ষে চরিত্রের অভিব্যক্তি-আশ্রয়ী বর্ণনায় উৎসাহ না থাকায় সম্ভব। আধুনিকতার মৌলপ্রত্যয়ে নারায়ণ বাবু কখনো কখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই কাছাকাছি।

'আলোকপর্ণা'র বিষয়বস্তুটির কথাই ধরা যাক।

একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ক্রমশ তার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র হারিয়ে আধা-শহরে পরিণত হয়েছে। তার একদিকে নিয়োগীপাড়ার শেষ বংশধর শশাঙ্ক নিয়োগী, অন্যদিকে একালের ধনী ব্যবসায়ী কানাই পাল। নিয়োগীপাড়ায় বিদ্যুতের আলো যায়নি এখনো। পুরনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষে গম্ভীর অন্ধকার। চাপা একটি দীর্ঘশ্বাস যেন জমাট বেঁধে আছে নিয়োগীপাড়ায়। অন্যদিকে কানাই পালের মোটরগাড়ি ধুলো উড়িয়ে চলে যায় বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে। এখানে অনেক দোকান-পাট, বিদ্যুতের আলো, হাসপাতাল, ধান-চালের আড়ত ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর এ উপন্যাসের লেখক হলে শশাঙ্ক নিয়োগীকে কিছুটা মানুষের মতো মনে হতো। তাঁকে বাঁচাতে পারতেন না তারাশঙ্করও। কিন্তু মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে গড়ে তুলতেন তাঁকে। হয়তো পাঠক গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন তাঁর জন্যেও।

নারায়ণবাবু তাঁর প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নির্মম।

তিনি বলেন, শশাঙ্কবাবুরা মানুষ নয়। ওদের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই। ওরা পচে গেছে। একেবারে 'রট'। দীর্ঘকাল আত্মকলহ, মিথ্যাচার, প্রতারণা, জমিজমা নিয়ে রাহাজানি, গ্রাম্য ঝগড়াঝাঁটি করে সব দিক থেকেই নেমে গেছে নিচু স্তরে। এমন কোনো অপকর্ম নেই যা ওরা করতে পারে না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি এমন বহু চরিত্র।

আর কানাই পাল?

সে-ও এক নষ্টচরিত্র মানুষ। আভিজাত্যের পরিবর্তে অহংকার তার একমাত্র সম্বল। কেবল বিত্তের অহংকার, অর্থের অহংকার, ক্ষমতার অহংকার। শশাঙ্ক নিয়োগীর সঙ্গে তার বিরোধটা মূলত সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের লড়াই নয়, নেহাৎ-ই নিম্নস্তরের বিবাদ। কানাই পাল কলকাতায় পড়তে এসে জনৈক জমিদার-নন্দনের কাছে অপমানিত হয়েছিল ছাত্রজীবনে। সে রাগ তার যায়নি। ব্যবসা করে, বহু ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে তার যোগ্য উত্তর দিয়েছে।

কিন্তু এটাই কি তার একমাত্র কারণ?

কানাই পাল ও শশাঙ্ক নিয়োগী এ উপন্যাসের প্রায় প্রথম থেকে শেষ অবধি জুড়ে থাকলেও, তারা যেন উভয়ে মিলে একটি নিয়ত-বিবদমান সমাজের স্রষ্টা। প্রয়োজনবোধে তারা এক হয়ে যেতে পারতো। অন্তত তাতে কারো মর্যাদায় বাধতো না। শশাঙ্ক নিয়োগীর তো নয়ই।

নারায়ণবাবু বললেন: কলকাতার একটা সুবিধা আছে। একা থাকতে চাইলে এখানে কেউ বাধা দেবার নেই। কিন্তু গ্রামের অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ। ওখানে একা থাকবার উপায় নেই। কারু না কারুর সঙ্গে মিশতে হবে। মানে, দলাদলি করতে হবে। ছোট জায়গার ঐ এক বিপদ। শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়তে হয় সকলকেই।

কয়েক বছর আমি গ্রামে ছিলুম। দেখেছি, কলেজের কে প্রিন্সিপ্যাল বা ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হবে—তাই নিয়ে কী ঘোঁট পাকানো! মিথ্যা, কুৎসার কী ছড়াছড়ি!

মনে হল, শশাঙ্ক নিয়োগী আর কানাই পালদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি তখনই। সেদিনের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলি পরবর্তীকালের বহু ঘটনাসহ সংহত হয়েছে এই উপন্যাসে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গা কি এ উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে?

তিনি বললেন, কলকাতা থেকে একশ মাইল পরিধির মধ্যে যে-কোনো ছোট শহরকেই তাঁর বাস্তব পটভূমি বলে ধরে নিতে পারেন। পাশেই রেলস্টেশন, হিন্দী বই বেশি দেখানো হয় এমন একটি সিনেমা হল, ছোট্ট একটি বাজার, দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু দুই পা যেতে না যেতেই গ্রাম। গ্রামের পথ, এবং মানুষ। একই সঙ্গে শহুরে এবং গ্রামীণ মানসিকতার সহাবস্থান।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বারবার উপলব্ধি করছিলুম, শহর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গ্রামের দিকে। গ্রাম এগিয়ে আসছে শহরমুখী। ভারতের মিশ্র অর্থনীতির সঙ্কটটাও যেন দানা বেঁধে উঠছে জটিলতর অবয়বে। আধা শহরগুলিতেও বেড়ে উঠছে, রকবাজ বাউণ্ডুলে ছোকরার দল।

তাদের রুখবে কে?

গাঁয়ের কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ির চাকা ডুবে যায়। আর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে হাই টেনশান ইলেকট্রিকের তার। আধা-শহরের পরিবেশে চলছে সেজন্যেই উভয় মানসিকতার দ্বন্দ্ব এবং নিয়ত সঙ্ঘাত। শশাঙ্ক নিয়োগী নিজের মেয়েকে অন্য একটি যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করে বিনা অর্থব্যয়ে বিয়ের পাটটা চুকিয়ে দেওয়া যাবে—এই ভরসায়। একান্ত গ্রামীণ পরিবেশে কিংবা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা সম্ভব ছিল না।

এ উপন্যাসের অন্য একটি চরিত্র প্রভাকর দেখেছে এদের সবাইকেই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দেখেছে গ্রামের সেই সরল, দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষদের—যারা গভীর ভালোবাসায় ডাক্তারবাবুকে (প্রভাকর ডাক্তার মানুষ) নিজের গাইয়ের দুধ কিংবা ক্ষেতের তরিতরকারী দিতে আসে। তারা এই আধা-শহুরে এলাকার কেউ নয়। মাঠঘাট পেরিয়ে, জল-কাদা ভেঙে আসে দূর গ্রাম থেকে। আবার ফিরে যায়। তাদের কথা নারায়ণবাবু লেখেননি। আভাসে ইঙ্গিতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মাত্র।

এই পটভূমিতে কাহিনীর গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত।

নায়ক এবং অন্যান্য চরিত্র

বিকাশ এ উপন্যাসের নায়ক। কলকাতার ছেলে। যুবক। দূর মফস্বলের এই শহরে এসেছে ব্যাংকের চাকরী নিয়ে। পুরো একটি ব্রাঞ্চের দায়িত্বই তার। বুকে স্বপ্ন এবং সম্ভাবনার আলো। বাবার একমাত্র ছেলে না হলেও সংসারের পুরো দায়িত্বটাই তার ঘাড়ে।

নারায়ণবাবু বললেন: "এসেনসিয়্যালি আমরা বদলেছি কিনা, কোন সামাজিক স্তরে আছি—তাই বোঝাতে চেয়েছি বিকাশের মধ্য দিয়ে। গ্রাম সম্পর্কে তার একটা ইলিউসান ছিল। কোনোরকম ঝগড়া-ঝাঁটি, অন্তর্কলহ, গ্রাম্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু গ্রামে এসে সে ধারণা ভেঙে গেল। দু পক্ষই তার সমর্থন চেয়েছে। বিকাশ কোনো পক্ষই অবলম্বন করেনি—না কানাই পালের, না শশাঙ্ক নিয়োগীর। ফলে, সকলের শত্রু হয়ে উঠল সে। তাকে গ্রামছাড়া হতে হলো।"

একটু থেমে তিনি বললেন: 'বিকাশ তো আমরা সকলেই। আমরা বাঁচতে চাই, কোনো পক্ষে যোগ দিতে চাই না। কিন্তু সে কথা শুনছে কে? ছোট জায়গায় সংকীর্ণতাও অনেক বেশি।'

একবার বিকাশ তার এক অধস্তন কর্মীকে জিজ্ঞেস করেছিল, কাজটা হয়নি কেন?

তার উত্তরে কর্মীটি লজ্জিত কিংবা দুঃখিত হয়নি। উল্টে চোখ রাঙিয়ে ছিল, আপনি বলার কে? আমাদেরও মানসম্মান আছে। অর্থাৎ প্রেস্টিজে ঘা লেগেছিল তার।

বিকাশ ক্রমশ চিনতে পেরেছিল তাদের—তার সহকর্মীদের। প্রিয়গোপালের সঙ্গে তার বিরোধ তো ছিলই না, বরং একটা আন্তরিক মমতাই বোধ করতো তার প্রতি। প্রিয়গোপালরা যা চায়, বিকাশও তাই চায় হয়তো।

ঐ মফস্বল শহরেও ক্র্যাকার ফাটে, বোমা পড়ে।

বিকাশ চমকে উঠেছিল।

প্রদীপ বললো: "নিয়োগীপাড়া আর পালপাড়া—তাদেরই রেশারেশির ফল।...... এই দুটো পাড়াই হল রি-অ্যাকশনারীদের ঘাঁটি। একদল ফিউড্যাল, আর একদল ক্যাপিটালিস্ট।... এরাই দেশশুদ্ধ ছেলে-গুলোকে গুণ্ডা তৈরী করে নিজেদের স্বার্থে, ধেনো মদের পয়সা জুটিয়ে দেয়—খুন-জখম-দাঙ্গার উস্কানি দেয়।... এদের সঙ্গে হিসেবনিকেশ শেষ না হলে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের কোথাও নিয়ে যাবে না।"

হেড অফিসে বিকাশের বিরুদ্ধে অভিযোগ গেল। অর্থাৎ বদলীর ব্যবস্থা।

নিয়োগীপাড়ায় ফিরতে ফিরতে ধনঞ্জয় দত্তের কথা মনে পড়লো বিকাশের: "আমরা আপনাকে ঠিক বুঝিনি স্যার, অনেক অন্যায় করেছি, অকারণ অসম্মান করেছি। পারেন তো সেজন্যে আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলব। এখানে এসে আপনি কোনো দলে যোগ দেননি, নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। তাই সব দলের কাছ থেকে আপনি মার খেয়েছেন। এ যুগে কোথাও নিরপেক্ষতার জায়গা নেই, বাঁচতে হলে একটা দল তাকে বেছে নিতেই হবে।"

২

বিকাশ চরিত্রের অন্যতম দিক, তার মধ্যবিত্তের জীবন ও যন্ত্রণা। সে ভালো-বেসেছিল মনীষাকে—প্রেমে, মমতায় ও দায়িত্ববোধে এক অনন্যসুলভ মেয়ে। বারবার সে বিকাশের অভাব অনুভব করেছে, তবু তার ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। সংসারের দায়িত্ব নিয়ে তিলে তিলে জ্বলেছে পুড়েছে, দগ্ধ হয়েছে।

নারায়ণবাবু বললেন, মনীষার মতো মেয়েরা কলকাতার ঘরে ঘরে আছে। তাদের আমি দেখেছি, ট্রামে-বাসে, এখানে ওখানে, সর্বত্র।

মনীষা নিজের অবস্থাটা জানতো। বিকাশ চাকরী নিয়ে বাইরে চলে গেলে সে তাকে বিদায় দিয়েছে গভীর বেদনায়। মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখেছিল।

কেননা, সে জানতো তার নিয়তি। মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে ক্রমশ। ডাক্তার বলেছেন, তার রক্তে লিউকোমিয়ার লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। বিকাশ তা জানতো না। জেনেছিল অনেক পরে।

বিকাশ বেহালা বাজাতো।

নতুন জায়গায় এসে অনেকদিন বেহালা বাজায়নি সে। একদিন দেখলো: লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের ওপর বেহালাটা চিকচিক করছে। সেটা তুলে আনল সে।

দিনটা বিভ্রান্তিকর। মন আর চিন্তা এলোমেলো হয়ে আছে। আজ একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল মনীষাকে। কিন্তু হয়ে উঠল না। লিখতে হবে রাত্রে। এই বাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে—চারদিকে শীতের রাত নিথর হয়ে গেলে—সেই তখন মনীষাকে চিঠি লেখবার মতো মন তৈরী হবে তার।

আর মনীষার ভাবনাই একটা সুর গুনগুনিয়ে তুলল। বেহালার তারগুলো ঠিক করে নিয়ে ছড় টানল সে। চলে এল রবীন্দ্রনাথের গান: 'আমার গোধূলি গগনে এল বুঝি কাছে, গোধূলি লগন রে—'

তখন আলো-অন্ধকার দরজার ফ্রেমে দেখা দিল সুন্দু। সোনালি—সুবর্ণা। বেহালার সুরে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'বিকাশ চোখ তুলে তাকাতে তার মনে হল, অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের ছবি।"

নারায়ণবাবু এখানেই থামেননি।

লিখেছেন: "বিকাশ তাকে দেখছিল, তবু দেখতে পাচ্ছিল না। ঘনিয়ে-আসা শীতের সন্ধ্যার ভেতরে কোমল আর স্নিগ্ধ আবির্ভাবের মতো এই মেয়েটি মিশে

যাচ্ছিল তার সুরের সঙ্গে। বাইরে হাওয়া দিচ্ছিল, বাগানটায় পাতার শব্দ উঠছিল, ঘরে মশারা ভিড় করছিল, পোড়ো মহলে পায়রারা পাখা ঝাপটাচ্ছিল, চারদিকের জীর্ণতার সঙ্গে সোঁদা গন্ধ পাক খাচ্ছিল। কিন্তু বিকাশের মনে সুর ছিল, এই মেয়েটি ছবি হয়ে সেই সুরকে নিবিড় করছিল : 'বুঝি দেরী নাই, আসে বুঝি আসে— আলোকের আভা লেগেছে আকাশে—'। আর অনেক দূরের কলকাতায় মনীষা বসে আর একজন—"

ঠিক এই সময়েই সারা বাড়ি কাঁপিয়ে হুঙ্কার উঠলো কয়েকটা। একসঙ্গে খান্-খান্ হয়ে গেল—সুর, ছবি, মগ্নতা। সুনু বললো, পাগল জ্যাঠামশাই।

৩

নারায়ণবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সুনুর এই পাগল জ্যাঠামশাই, অর্থাৎ শশাঙ্ক নিয়োগীর মেজদার কথা। বললুম, এই অদ্ভুত পরিবেশে তাকে কি কিছুটা অসম্ভব মনে হয় না? 'আলোকপর্ণা'র ঘটনাপ্রবাহে তার আবির্ভাব কি অতি-নাটকীয় নয়?

—হতে পারে। আসলে সে ঐ পুরনো বাড়ির বিবেক। প্রায় প্রতিটি ঘটনার সূচনায় কিংবা সঙ্কটমুহূর্তে তার সতর্ক-বাণী শোনা গেছে। সে যেন একটি সংকেতের মতো। নিয়োগীবাড়িতে ঢোকার পরই সে শুনেতে পেয়েছিল তার কণ্ঠস্বর : 'কালী, কালী!! তোকে বলি দেবে।'

ঐ মেজদাই বিকাশকে বলেছিল নিয়োগীবাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে, সুনুকে বিয়ে করতে। অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা, আচরণ আর অভিব্যক্তিতে রহস্যময় এই চরিত্রটি।

সুনু যেন নিয়োগীবাড়ির ধ্বংসা-বশেষে ফুটে ওঠা একটি সন্ধ্যার ফুল।

বিকাশের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বটি ফুটে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে।

নারায়ণবাবু বললেন : যখনই বিকাশ মনীষার কথা ভেবেছে, তখনই মনে পড়েছে সুনুর মুখ। আবার সুনুকে দেখলেই বিকাশ অনুভব করেছে মনীষার ভালো-বাসা। অথচ সুনুকে ঠেকানো যায় না। বিকাশ তার মধ্যে সন্ধান পায় এক মমতাময় ভালোবাসার। সে মনীষাকে অতিক্রম করে ক্রমশ চলে আসে বিকাশের কাছাকাছি।

জিজ্ঞেস করলাম, সুনুর মতো কোনো মেয়েকে কি আপনি বাস্তবে কখনো দেখেছেন?

—দেখেছি। একবার বসিরহাট থেকে ফেরার পথে একটা মেয়েকে দেখেছিলুম। জায়গাটা বসিরহাটেরই কাছাকাছি। আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দেখি পথের ধারে একটি মেয়ে। ছেঁড়া, ময়লা কাপড় পরা। বয়েস পনেরো ষোল হবে। পড়ন্ত বেলার রোদে আমি তাকে দেখলুম, ঐ ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপের শেষ ঐশ্বর্য বুঝি। সুনু সেই মেয়েটিরই খণ্ডিত রূপ।

অন্যান্য চরিত্রগুলি?

—প্রত্যেককেই আমি দেখেছি। এক জায়গায় নয়, আলাদা আলাদাভাবে, নানা জায়গায়। বিকাশকে সেণ্টারে রেখে আলোকপর্ণায় ভিড় করেছে সকলেই।

তারপর, কিছুটা ব্যাখ্যা করে বললেন, বোধহয় একটা জিনিস আমার লেখায় আছে, তা হলো 'লাভ অব লাইফ'—জীবনকে ভালবাসা। কোনো ক্ষয়ক্ষতিকেই আমি মানি না, চূড়ান্ত বলে স্বীকার করি না। এ উপন্যাসের সুনুকে বলতে পারেন সিম্বল অব লাইফ। প্রভাকর কিছুটা সিনিক, তবু সে ঐ মফস্বলের মানুষকে ভালোবাসে অন্তর দিয়ে।

পুনরুক্তি করে বললেন, সুনু আসলে লাভ, লাইফ ও পার্সোনালিটির প্রতীক। মনীষার দাম আমাদের দিতে হবে। আমি অ্যান্টি-লাইফ, অ্যান্টি-হিউম্যান কিছু সহ্য করতে পারি না।

সুনু-মনীষার মতো আর কোনো চরিত্র আছে কি আপনার অন্য কোনো উপন্যাসে?

—আছে, 'ভস্মপুতুল'-এর বীথি। সেও আরেকটি প্রতীক চরিত্র। এমন একটি সংসারে তার জন্ম, যেখানকার প্রতিটি মানুষ হয় ভ্রষ্ট, নয় নষ্টচরিত্র। কেউ মাতাল, কেউ চরিত্রহীন, কেউ মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর। বীথি সেই পরিবারের একমাত্র মেয়ে, যে সকল বিপর্যয়ের মধ্যেও শান্ত, স্থির এবং নিষ্কলঙ্ক। রাজনীতি করতো জীবনের জন্য। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল একটি দুর্ঘটনায়।

বললেন, 'ভস্মপুতুল' আমার প্রিয় বই। প্রচুর ভুল ছাপা হয়েছে। সেজন্যে কারু কাছে বইটির কথা বলতে পারি না। আমার আরেকটি চরিত্র আছে 'উমা'—সেও যেন অনেকটা সুনুরই মতোই—'চাঁপার মতো গন্ধ' উপন্যাসের নায়িকা। বিকাশের সঙ্গে সামান্য মিল আছে 'মেঘের উপর প্রাসাদ'-এর প্রভাতের সঙ্গে। অবশ্য সে বিকাশের মতো ঘটনার সঙ্গে এতটা ইনভলভড্ নয়। তার ভূমিকা দর্শকের।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন, কোনো কিছু লিখেই আজকাল তৃপ্তি পাই না। গল্পে তৃপ্তি পেয়েছি। হেমিংওয়ের মতো একটা উপন্যাস লিখতে চাই। অনেকদিন ধরে লিখবো, অনেকবার কাটাকুটি করবো, আবার লিখবো। একটা পারফেক্ট উপন্যাস। সে লেখাই আমাকে লিখতে হবে।

একালের নায়ক এবং অন্যান্য

জিজ্ঞেস করলুম, এমন কোনো চরিত্র আপনি কি সৃষ্টি করেছেন, যাকে বলা যায় আপনারই চিন্তাভাবনার প্রতিনিধি?

—অনেকে মনে করেন 'শিলালিপি' 'লালমাটি'-র রঞ্জুর সঙ্গে আমার মিল আছে অনেকটা। কেউ কেউ বলেন, ঐসব লেখা আত্মজীবনীমূলক। আসলে কিন্তু তা নয়। তার মধ্যে আমার চিন্তাভাবনার প্রতিফলন আছে অবশ্যই। সেও আংশিক। কয়েকটি চরিত্র নিয়ে আমার একটা নিজস্ব ভাবনা গড়ে উঠেছে। তারা হলো ভস্ম-পুতুলের সত্যজিৎ, নির্জন শিখরের দেবনাথ ভট্টাচার্য, এবং শিলালিপির রঞ্জু। তিনজনে মিলে একটা সম্পূর্ণতা। তা ছাড়া, সব নায়কই তো লেখকের নিজস্ব ভাবনার প্রোজেকশান। যেমন রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিসতফ', সার্ত্রের 'ম্যাথু'।

একালের নায়ক চরিত্র কেমন হবে? কেমন হওয়া উচিত?

—লেখকের স্টাটাসের ওপর নির্ভর করে কার নায়ক চরিত্র কেমন হবে। যে-লেখক মধ্যবিত্ত তাঁর নায়ক-নায়িকারা সাধারণত সেই রকমই। আবার সে-লেখক হাই-সোসাইটিতে ঘুরে বেড়ান, বড়লোক, অর্থ-বিত্তে প্রতিপত্তিশালী—তাঁর নায়ক-নায়িকারাও দেখা যায় সেই সমাজেরই মানুষ। আবার একই চরিত্র নানাজনের হাতে নানারকম। যেমন সুবোধ ঘোষের নায়কনায়িকা এবং সমরেশের পাত্রপাত্রীরা। উভয়ের পরিবেশ আলাদা বলেই তাদের অভিব্যক্তিও ভিন্নরকম।

আমার মতে, লেখক যা চান, যা হতে পারতেন—তাই তাঁর নায়ক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মানিকবাবু যখন মর্বিড সাইকোলজি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর চরিত্রগুলি ছিল সেরকম। যেমন 'চতুষ্কোণ'-এর রাজকুমার। 'ছোট বকুল-পুরের যাত্রী'তে এসে তিনি অনেক পাল্টে গেছেন। তখন তাঁর নায়ক চরিত্রও আলাদা মানুষ।

আমি নায়ক তাকেই বলি, যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা আবর্তিত। যেহেতু আমি আগে চরিত্রের কথা ভাবি না, বিষয়ই আমার কাছে মুখ্য। সেজন্যেই বলতে পারি না, নায়ক কে হবে, তার নাম কি! কি করে বলবো, কাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হবে?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটাই আবার মনে পড়লো। উপনিবেশ লিখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যের এক নতুন বন্দরের সন্ধান দিয়েছিলেন। জীবনের পর্বে পর্বে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি সেই অনুসন্ধানের ফল। আলোকপর্ণায় তিনি একালের যন্ত্রণা এবং সম্ভাবনার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

—গ্রন্থদর্শী।

ভ্রম সংশোধন

[গত ৪ ভাদ্রের অমৃতে প্রকাশিত 'বইকুণ্ঠের খাতা'র শিরোনামটি মুদ্রণপ্রমাদ-বশত ভুল ছাপা হয়েছে। শুদ্ধ পাঠ হবে : 'সুফী-গাথা ও ভাববাদী জীবনদর্শন'।]

ফিরাক গোরখপুরী

এবার 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন প্রখ্যাত উর্দু কবি ফিরাক গোরখপুরী তাঁর 'গুল-এ-নগমা' গ্রন্থটির জন্য। তাঁর এ সম্মানে ভারতীয় সাহিত্য রসিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন।

ফিরাক গোরখপুরীর সঙ্গে কলকাতার পরিচয় সুদীর্ঘ দিনের। এখানে অনুষ্ঠিত বহু মুসায়ারা অনুষ্ঠানেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। মনে পড়ছে, গালিব জন্ম-শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সেবার যখন তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেমন লাগে আপনার এই শহর কলকাতাকে?' 'চমৎকার?'—উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। সদা শান্ত, সদালাপী এই মানুষটির সঙ্গে যে কেবল কলকাতার উর্দু সাহিত্য প্রেমিকদের যোগাযোগই ঘনিষ্ঠ, এমন নয়। বহু বাংলা সাহিত্যিকের সঙ্গেও গড়ে উঠেছে তাঁর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা।

ফিরাক গোরখপুরীর আসল নাম রঘুবীর সহায়। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে ১৮৯৬ খৃঃ ২৮ অগাস্ট তাঁর জন্ম এক কায়স্থ পরিবারে। শিক্ষা-জীবনের সূত্রপাত গোরক্ষপুরেই। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি এলাহাবাদে আসেন এবং সেখান থেকেই বি-এ পাশ করেন। আগ্রা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ। ১৯১৯ খৃঃ প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এবং পরে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ডেপুটি কালেকটারের কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী চাকুরী বিশেষ করে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী তাঁর মনঃপুত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯২০ খৃঃ এর জন্য কারাবরণ করেন। ১৯২৩-২৭ খৃঃ পর্যন্ত তিনি জাতীয় কংগ্রেসের আণ্ডার সেক্রেটারীর দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন। ১৯৩০ খৃঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৫৮ খৃঃ অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফিরাকের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের ছিল না। ১৯১৪ খৃঃ কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু এই বিবাহে যে তিনি খুব সুখী হতে পারেননি, তা তাঁর উক্তি থেকেই জানা যায়। এক জায়গায় তিনি বলেছে: 'এই বিবাহ আমার জীবনকে নরক করে তুলেছিল।'

ফিরাকের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত মোটামুটিভাবে যখন থেকে তিনি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, এই সময় একটা অদ্ভুত ধরনের উন্মাদনা তিনি অনুভব করতেন এবং তাই কাব্য রচনায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। এ পর্যন্ত তাঁর ৮টি কবিতাগ্রন্থ, ৪টি সমালোচনাগ্রন্থ, একটি চিঠিপত্রের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বহু গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে অবশ্য তাঁর রচনার পরিমাণ নির্ণয় করা খুব কঠিন। কারণ দেখা গেছে, তাঁর পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থের বহু কবিতা পরবর্তী গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ১৯২০ খৃঃ থেকে লিখতে আরম্ভ করলেও তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'রূহ্-ঐ কৈনাত' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খৃঃ। এর পর 'শবনামিস্তান' (১৯৪৫)

আশিস সান্যাল

'রূপ' (১৯৪৬), 'গুল-এ-নাগমা' (১৯৫৯), 'ধরতি কি কাভাত' (১৯৬৬), 'চার অংগন' (১৯৬৬), 'গুলবাগ' (১৯৬৭) প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। সমালোচনা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'উর্দু কি ইসকিয়ায় শায়রি' (১৯৪৫), 'আন্দাজে' (১৯৪৫), 'কম আনন্দ' (১৯৬২) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দিতে 'উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটিও বিশেষ অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে।

'জ্ঞানপীঠ' কর্তৃক সম্মানিত গ্রন্থটির জন্যই তিনি ১৯৬১ সালে 'সাহিত্য আকাদমি' পুরস্কার লাভ করেন। এই গ্রন্থে রয়েছে ৭০টি গজল ও ২০টি নজম। গ্রন্থটি উত্তর প্রদেশ সরকারের হিন্দি সমিতির পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। বর্তমানে তিনি এলাহাবাদে বসবাস করছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং পার্শী, হিন্দি সংস্কৃত ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর কাব্য চর্চায় এবং প্রবন্ধ সাহিত্যে এর অজস্র প্রমাণ আছে।

উর্দু সাহিত্যে ফিরাকের আবির্ভাব এক যুগসন্ধিক্ষণে। উর্দু কবিতা যখন অবক্ষয়ের পঙ্কে নিমজ্জিত, তখন ফিরাক তাতে নবীন মূল্যবোধ সঞ্চারে এগিয়ে আসেন। জাতীয়তা বোধের দ্বারা উদ্ভাসিত সংস্কার মুক্তির পর্যায়েই তাঁর কবিতা তখন আবদ্ধ ছিল। তাছাড়া আর একটি কারণেও তাঁর রচনা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উর্দু কাব্যে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দি শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন এবং কবিতা বিষয় হিসেবে ভারতীয় পুরাণ কাহিনীগুলি গ্রহণ করেন। 'রূপ' গ্রন্থটিতে তিনি একজন যথার্থ ভারতীয় চিত্র অংকন করেন। জাতীয়তা-বোধও ফিরাকের সাহিত্যের অপর বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৩ খৃঃ রচিত একটি গজলে তিনি বলেছেন—

> 'দাস জাতির লেখা দাসত্বসুলভ।
> তাতে জীবনের স্পন্দন
> সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।'

গণ-মানসের দুঃখ-বেদনা তাঁকে নিয়ত ব্যথিত করেছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও যে সাধারণের জীবনের উন্নতি হয় নি তার জন্য বহু রচনাতেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৯ খৃঃ রচিত একটি গজলে স্পষ্টতই বলেছেন—

> 'ভাবছি, এ কোথায় আমরা এলাম?
> বন্ধুগণ! এ হল আমাদের দারিদ্র্য:
> আমরা দেশেই আছি
> কিন্তু স্বদেশ ছাড়া।'

অনুরূপ অনুভূতির প্রকাশ তাঁর অন্যান্য বহু রচনাতেও প্রকাশিত হয়েছে। 'দেওয়ালির রাত্রে বাতিগুলো জ্বলছে' কবিতায় তিনি ভারতের হাজার-হাজার নিরন্ন মানুষের দুঃখ-বেদনায় ব্যথিত তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন—

> 'কোমল দীপশিখার জিভ
> লক লক করছে।
>
> যেন আবার ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে
> বাস্তুহীন মানুষের ক্রন্দন ধ্বনিতে
> সমস্ত চরাচর আন্দোলিত।

দেওয়ালির বাতিগুলো তবু জ্বলছে।'

একদিকে বাস্তুহীন মানুষের আকাশ-বাতাস মুখর, সমস্ত দিগন্ত জুড়ে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার আর অন্য দিকে এক শ্রেণীর মানুষ উৎসব আনন্দে মশগুল। সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা তাদের মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করে না। কবিতাটির উপসংহারে তাঁর কণ্ঠ আরো তির্যক হয়ে উঠেছে—

'জ্বলন্ত শিখাগুলি আরো
উজ্জ্বল হয়ে উঠলে

দেখা গেল, ভারতের সেই
পরিচিত ছবিই দীপ্যমান;

চতুর্দিকে ক্ষুধার্ত ও
নগ্ন মানুষের করুণ হাহাকার—

দেওয়ালির বাতিগুলো
তবু লকলক জ্বলছে।

'হিন্দোলা' কবিতাটিতে তিনি বলেছেন, একদিন ভারতের শক্তি ছিল, রূপ ছিল। মাঠে-মাঠে ছিল সোনালি ধান। ঘরে-ঘরে ছিল আনন্দের প্রসার। কিন্তু শক্তিহীন, দীপ্তিহীন এই ভারতবর্ষ। সর্বত্র অন্যায়, অবিচার আর দারিদ্র্য। কবি বলেছেন—

'এই ভূমিখণ্ডই হলো ভারতবর্ষ,
অতীতের দোলা এখন আর নেই;
সর্বত্র শত শত শিশুর মৃত্যুর
অগণিত শোক মিছিল চলেছে।'

প্রেমের কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও ফিরাক একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারেন। উর্দু কাব্যের ইতিহাসে তথাকথিত রোমান্টিকতার মধ্যে তিনি যেন কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে জীবন শুধু গুল-বাহার নয়। এখানে যেমন সুখ আছে, তেমনি দুঃখ। যেমন আছে আনন্দ, তেমনি বেদনা। এই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সমন্বয়েই জীবন গঠিত। জীবনের দ্বৈত চেতনাকে তিনি যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কারণে কোথাও তাঁর প্রেম চেতনায় একটা দার্শনিক প্রত্যয় অনুভব করা যায়। ব্যর্থ প্রেমিককে তাই তাঁর কাব্যে বলতে শোনা যায়—

'অনেক দিনের কথা
তোমার স্মৃতি দূরে সরিয়ে দিয়েছি'
কিন্তু সত্যিই কি আমি
তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পেরেছি।
যদি বলি

তাহলে তার চেয়ে মিথ্যা
আর কিছু বলা হবে না।'

আর এই কারণেই প্রেমিক নিজের কাছে জিজ্ঞেস করছে : 'নিজের মনকে আমি কতদূর বিশ্বাস করতে পারি?' কিন্তু তবুও ফিরাক ব্যর্থ প্রেমিকার উপসংহারে কোন আত্মবিসর্জনকে টেনে আনেন নি। বরং নিয়ে গেছেন যখন কেউ কাউকে মনে রাখে না এমন অনুভবের মধ্যে। সেখানে প্রেমিকের উক্তি—

'আজ অন্য কেউ
আমার আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ;

তবু মুহূর্তের জন্যও
আমি তোমাকে ভুলতে পারি না।'

এইভাবে ফিরাক তাঁর কাব্যে প্রেম চেতনায় বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। খুব একটা বিদ্রোহী হওয়া ফিরাকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ চিরাচরিতকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারেন নি। এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনেই তাঁর কাব্য সাধনা সমাহিত। প্রেম চিন্তাতেও এই দ্বৈত অনুভবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ফিরাকের কাব্য আলোচনায় একটি ব্যাপারে অধিকাংশ সমালোচকই একমত। তাঁর কাব্যে কোন স্বন্দ্ব নেই। কি সমাজ-সচেতন কবিতায়, কি প্রেমের কাব্য রচনায় তিনি যেন পূর্ব নির্দিষ্ট কোন ধারণার অনুসারী। তবে গজলগুলির মধ্যে তাঁর ব্যক্তি অনুভব লক্ষ্য করা যায়। সেখানে তাঁর কবিত্ব প্রতিভা যেন অনেক বেশী উৎসারিত।

ফিরাকের কবিতার শিল্পকৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি ছন্দ বা শব্দের ব্যবহারে স্বাভাবিকতারই অনুসারী। চেষ্টাকৃত ছন্দ, প্রতীক বা শব্দ ব্যবহারে কোন চেষ্টাকৃত প্রয়াসকে স্থান দেন নি। সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক শব্দ ও উপমার ব্যবহার করেছেন বলেই তা এত চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

ফিরাকের কাব্য আলোচনার উপসংহারে বলা যায়, যদিও ফিরাক ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেন নি, তবু নতুন মূল্যবোধকে তিনি সর্বদাই স্বাগত জানিয়েছেন। উর্দু সাহিত্যের তথাকথিত ভাবালুতার সঙ্গে যুক্তির সমন্বয়সাধন করে উর্দু সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি নানাভাবে উর্দু সাহিত্যের কাব্যোদ্যানকে সমৃদ্ধ করেছেন। সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। একালের উর্দু কাব্য সাহিত্যে তিনিই বোধ হয় উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। প্রখ্যাত উর্দু কবি নিয়াজ ফতেপুরী ১৯৫৩ খৃঃ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন — 'যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে; আজকের উর্দু কবিদের মধ্যে কার ভবিষ্যৎ সর্বাধিক উজ্জ্বল? আমার শুধু একটি নামই করার থাকবে—ফিরাক। তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে অতিক্রম দুঃসাধ্য।' বিখ্যাত গজল লেখক জিগার মুরাদাবাদীও অনুরূপভাবেই বলেছেন : 'যখন জনসাধারণ আমাদের ভুলে যাবে, তখনও ফিরাকের স্মৃতি থাকবে উজ্জ্বল।' এই উক্তির মধ্য দিয়েই উর্দু সাহিত্যে ফিরাক গোরখপুরীর অবদান সম্বন্ধে একটি ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব। ফিরাক এখন আর বেশি লিখবেন না। জানি না, এই পুরস্কার তাঁকে নতুনভাবে রচনায় অনুপ্রাণিত করবে কিনা?

তুষার ভেজা রাত

পারিজাত মজুমদার

(৬)

হঠাৎ মেয়েলি কন্ঠের একটা তীক্ষ্ন চীৎকার শুনে থমকে পড়লো দেবব্রত। বন্ধ দরজার পাশে আটকানো কলিং বেলটা টিপতে গিয়ে টিপতে পারলো না।

ছুটির দিনে আলোকেন্দুর বাসায় সন্ধ্যা কাটাতে মনস্থ করে এসেছিল দেবব্রত। দরজার বাইরে পর্যন্ত এসেই তাকে থেমে যেতে হল।

কপাটে কান পেতে শুনতে পেলো ভিতরে তুমুল তান্ডব চলেছে। পুরুষ কন্ঠের তর্জন-গর্জন, নারী কন্ঠের আর্তনাদ, এবং শিশুকন্ঠের কান্না মিলে যে প্রচন্ড মিশ্র কলরব ভেসে আসছে ভিতর থেকে তাতে বেশ বোঝা যায় কোনো অতিথিকে আপ্যায়ন করার উপযুক্ত পরিবেশ এই মুহূর্তে এবাড়ীতে নেই।

কিন্তু বাড়ী থেকে আড়াই-তিন মাইল পথ হেঁটে এতদূর এসে এখনি ফিরে যাবে দেবব্রত? এই শীতের সন্ধ্যায় একা একা? তার চাইতে—পাশেই সেনগুপ্তের কোয়ার্টারে একটু ঢুঁ দিলে কেমন হয়?

যা মনে হল তাই করলো দেবব্রত। সেনগুপ্তের কোয়ার্টারের সামনে গিয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপলো।

'হঠাৎ কি পথ ভুলে? আসুন, আসুন।'

ধূর্ত হাসি হেসে সেনগুপ্ত এসে দাঁড়িয়েছে। দেবব্রত সেনগুপ্তের চাইতে আলোকেন্দুর বাসায় বেশি ঘন ঘন আসে, তাই এই ইঙ্গিত।

'পথ ভুলে নয়, বলুন পথ খুঁজে। এত-দিন বরং পথ ভুলে বিজন অরণ্যে ঘুরে মর-ছিলুম।' হাসতে হাসতে উত্তর দিলো দেবব্রত।

'হ্যাঁ, তা দিগভ্রান্ত শিল্পীর মতই দেখাচ্ছে এখন আপনাকে।'—সোফায় বসতে বসতে বললে সেনগুপ্ত—'বসুন, একটু জিরিয়ে নিন। তারপর বলুন কোন্ অরণ্যে কোন স্বর্ণমৃগের সন্ধানে গিয়ে এতদিন পথ হারিয়ে ঘুরে মরছিলেন আপনি!' সেন-গুপ্তের তামাসা এবার অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, বুঝতে পারে দেবব্রত। সোনালীর প্রতি দেবব্রতের যে দুর্বলতা আছে তা এই গুপ্তচর-স্বভাব বন্ধুর অজানা নয়।

পাছে আরো কিছু ব্যক্তিগত কথা এসে পড়ে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফেরায় দেবব্রত। বলে: 'মিসেস সেনগুপ্ত কোথায়? মোগল হারেমের বেগমের মত তাঁকেও কি অসূর্যম্পশ্যা করে ফেলেছে নাকি?'

'আরে না ভাই না। তিনি এখন—কি বলব—মানে, পাশের বাড়ীতে কি হচ্ছে কিছু আন্দাজ পাচ্ছেন?'

'আন্দাজ ঠিক পাচ্ছি না, তবে আভাস পাচ্ছি। এত গোলমাল কিসের বলুন তো? কি হয়েছে কি?'

'কি হয়েছে সেটাই বুঝবার জন্যে আমার গিন্নী এখন জানলায় চোখ-কান পেতে রেখেছেন। আপনিও যদি চান তো এসে যোগ দিতে পারেন তাঁর সঙ্গে। চক্ষু-কর্ণের তৃপ্তি হবে কিঞ্চিৎ—আসুন।'

সেনগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গে দেবব্রতও উঠলো। কৌতূহল তারও কম ছিল না।

সেনগুপ্তের কোয়ার্টার আর আলোকেন্দুর কোয়ার্টারের মাঝখানে কমনওয়াল একটা দরজা এবং তার দু'পাশে দুটো জানলা আছে। আসলে এটা একটাই বড় কোয়ার্টার ছিল আগে। অফিসের প্রয়োজনে মাঝখানের এই দরজা আর জানলা দুটোকে পার্মেনেন্টলি-ক্লোজড করে দিয়ে এখন দুটো কোয়ার্টারে ভাগ করা হয়েছে।

কিন্তু এই দরজা-জানলা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিলেও জানালা দুটির মাথার দিকে দুটি করে ছোট গোল কাচ বসানো আছে, যা দিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকের ভিতরের ব্যাপার দেখা যায়, ইচ্ছা করলে।

ঐ কাচগুলির একটিতেই চোখ রেখে এতক্ষণ মিসেস সেনগুপ্ত দাঁড়িয়েছিল গোড়ালি উঁচু করে। এখন স্বামীর গলা শুনতে পেয়ে এদিকে ফিরে বললে: 'কি কান্ড, মাগো মা! দেখুন মিস্টার মিত্র, আপনার বন্ধুর কান্ড! বউকে ধরে চাবুক মারছে!'

'চাবুক মারছে? বলেন কি?' দেবব্রতর গলায় সুস্পষ্ট বিস্ময়। আলোকেন্দু মদ খায়, আলোকেন্দু নিত্য নতুন নারীর সঙ্গকারী এসব কথা জানে দেবব্রত। কিন্তু তাই বলে এত নিষ্ঠুর যে সে বউকে ধরে মারবে?

কথাটা শুধু কানে শুনলে বিশ্বাস করতে পারতো না দেবব্রত। কিন্তু জানলার কাঁচে চোখ রাখতেই সন্দেহের কোনো অবকাশ রইলো না আর।

শাদা চোখেই দেখতে পেলো, ওদিকের ঘরে আলোকেন্দু অগ্নিমূর্তিতে তার বউ মাধবীর চুলের মুঠি ধরেছে এক হাতে আর অন্য হাত দিয়ে চাবুক চালাচ্ছে তার পিঠে শপাশপ্। মাধবী হাউমাউ করে কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ছে, আবার তাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলছে আলোকেন্দু। অল্পদূরে দেয়ালে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বড় ছেলে আর বড় মেয়েটা তাদের বয়স বছর আট থেকে বছর দশেকের মধ্যে। ছোট ছেলে আর ছোট মেয়েটা ভয় পেয়ে গিয়ে কান্না জুড়েছে তারস্বরে।

আলোকেন্দুর চোখেমুখে যে অদ্ভুত জিঘাংসা ফুটে উঠেছে এই মুহূর্তে তা দেখে অবাক হল দেবব্রত। ও কি খুব মদ খেয়েছে? নাকি, রাগেই ওর কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেছে? আর রাগই যদি হয়ে থাকে, এত রাগ কিসের?

কিন্তু বেশিদূর জল্পনা-কল্পনা করতে হল না দেবব্রতকে। আলোকেন্দুর কথাবার্তাতেই সমস্ত ব্যাপারটার আভাস ফুটে উঠলো।

বিশ্রী কর্কশ গলায় সবাইকে সচকিত করে আলোকেন্দু চেঁচিয়ে উঠলো—'হারামজাদী! আর করবি? আর করবি অমন কাজ? লাথি মেরে দূর করে দেবো এখান থেকে এবার তোর বাপের বাড়ী যে যা খুশী তাই করবি? আমার খুশী আমি আয়াকে সিল্কের শাড়ী দেবো দুশো টাকা দামের কোট কিনে দেবো, তাতে তোর কি? তোর বাপের পয়সায় দিচ্ছি? বজ্জাত মাগী, তোর ঐ শুকনো পেত্নীর মত চেহারাটা নিয়ে আমি পড়ে থাকবো না? তোর মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না করে। যমের অরুচি, তাই তুই এখানে পড়ে থাকিস। চলে যা! চলে যা!' হুমড়ি-খেয়ে-পড়া স্ত্রীর দেহে লাথি মারলো আলোকেন্দু।

আর দেখতে পারলো না দেবব্রত, সরে এল জানলার কাছ থেকে।

'আচ্ছা আমরা কি কিছু করতে পারি না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙের মত সব দেখবো শুধু?' সেনগুপ্তের দিকে তাকালো দেবব্রত।

'স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার' —গুরুগম্ভীরভাবে বললো সেনগুপ্ত—'সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির মাথা গলানো ঠিক নয়। আর, যদি বলতে হয়তো বলি, বউটারই বা এখানে থাকবার দরকার কি? বাপের বাড়ীতে যদি নিতান্তই কোনো সংস্থান না থাকে, ঝি গিরি করে খাওয়াও ভালো এখানে এভাবে পড়ে থাকার চাইতে! আর যদি এখানে থাকতেই হয় তবে সব মেনে নিলেই হয়। জোর যেখানে নেই, সেখানে জোর খাটাতে যাওয়া কেন?'

সেনগুপ্তের সঙ্গে মোটেই একমত হতে পারলো না দেবব্রত। কিন্তু একা একা ঐ ক্রোধোন্মত্ত আলোকেন্দুর সামনে গিয়ে কিছু করতে পারবে কিনা, তাও বুঝতে পারলো না। আলোকেন্দু এখন মানুষ নয় পশু। যদি কুৎসিত গালাগালি দিয়ে বলে বসে: 'আমার স্ত্রীর জন্যে তোমার এত দরদ কেন? জানি জানি, সব ব্যাটাকেই চিনি! ব্যাটাচ্ছেলার কিনা, তাই পরস্ত্রীর জন্যে এত দরদ!' হয়তো বিশ্রী সন্দেহ করে তারপর আরো বেশি করে বউকে নির্যাতন করবে আলোকেন্দু। দেবব্রত তো আর এখানে আসে না। থাকে অনেক দূরে। প্রতি দিন-রাত্রির অত্যাচার থেকে কি করে আলোকেন্দুর বউকে বাঁচাবে দেবব্রত?

'আচ্ছা, এরকম ব্যাপার কি আজ এই প্রথম দেখলেন? না, এর আগেও ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করলেন দেবব্রত।

'ঝগড়াঝাঁটি মারামারি মাঝে মাঝেই হয়।' —উত্তর দিলো সেনগুপ্ত—'তবে এতটা এর আগে কখনো দেখিনি। অবিশ্যি, আমি তো এখানে এসেছি মাত্র বছরখানেক। তার আগে নাকি—' কথাটা শেষ না করেই স্ত্রীর দিকে তাকালো সেনগুপ্ত।

'আমাদের মালীর বউ বলছিল সেদিন,'—স্বামীর কথার খেই ধরে শুরু করলো মিসেস সেনগুপ্ত—'আগে নাকি প্রায়ই চাবুক কিংবা হান্টার দিয়ে বউকে মারতো রায়সাহেব। দু'বছর আগে নাকি বউ এখানে ছিলই না। মানে, রায়সাহেব ওকে এখানে রাখেনি আর কি। তার বদলে এক নেপালী বন্ধু আর তার বউকে রেখেছিল। সেই বউটার সঙ্গে নাকি রায়সাহেবের ইয়ে ছিল। তারপর রায়সাহেবের বাবা কি করে জানি খবর পেয়ে গ্রামের বাড়ী থেকে বউকে নিয়ে এসে এখানে রেখে দিয়ে যায়। তখন সেই নেপালী বন্ধু আর তার বউ চলে যায় বটে, কিন্তু তারপর থেকেই বউয়ের ওপর অত্যাচার করে প্রতিশোধ নিতে থাকে রায়সাহেব।'

'কিছুদিন হল, একটি সুন্দরী আয়া এসেছে ওবাড়ীতে।' —যোগ দিলো সেনগুপ্ত—'তারপর থেকেই গোলমাল বাড়তে শুরু করেছে। আর আজ তো দেখছি একেবারে তুমুল কাণ্ড!'

আলোকেন্দুর সম্পর্কে এত কথা জানতো না দেবব্রত। যদিও এদের চাইতে বেশিদিন ধরে সে চেনে আলোকেন্দুকে। আলগা স্বভাব সত্ত্বেও আলোকেন্দুর সুদর্শন চেহারা, শৌখীন বেশবাস, সুমার্জিত বাকভঙ্গি এবং দিলদরিয়া ভাবের ব্যবহার, টাকাকড়ির ব্যাপারে তার উদারতা এতদিন মুগ্ধ করেছে দেবব্রতকে। সে সবের তলায় যে এই বীভৎস পাশব প্রকৃতি তার লুকিয়ে ছিল, কে জানতো? এতদিন আলোকেন্দুর নারীঘটিত দুর্বলতাগুলোকে অনেকটাই প্রশ্রয়ের চোখে দেখে এসেছে দেবব্রত। সে নিজে শিল্পী। নারী সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য তাকে মুগ্ধ করে। একটিমাত্র স্ত্রীলোকের মধ্যেই জীবনের পরমার্থকে খুঁজে পেতে হবে, এ বিশ্বাস তার নেই। বহুসঙ্গকামী পুরুষও স্ত্রীর প্রতি স্নেহশীল এবং যত্নশীল হতে পারে, এই তার ধারণা। এবং তার বিশ্বাস ছিল, আলোকেন্দুর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ আছে, শালীনতা আছে বাদি আছে। আর রুচি যার আছে, সে হৃদয়হীন হবে কেমন করে?

কিন্তু দেবব্রতের সেই বিশ্বাস আজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো।

সেনগুপ্তের অনুরোধে চা-বিস্কুট শেষ করে যখন বাইরে বার হল দেবব্রত তখন আলোকেন্দুর তর্জন-গর্জন থেমে গেছে বটে, কিন্তু মাধবীর কান্না তখনো থামেনি। স্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে চিরে, থেমে থেমে বেজে উঠছে তার গোঙানি। অন্ধকারে পাহাড়ী পথে চলতে চলতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেবব্রতর মনে হতে লাগলো, সেই আর্ত কান্নাটাও যেন চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে।

আঃ, ঐ কান্নাটাকে ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না কিছুতেই। কিন্তু ফেলতেই হবে। নইলে আজ রাত্রিতে ঘুম হবে না তার। গলা দিয়ে খাবারও নামবে না। নির্যাতন জিনিসটা কোনোদিনই সহ্য করতে পারে না দেবব্রত। পারে না। পারে না। ওঃ হেট ইট। আই হেট ইট, অল!' বারবার মনের মধ্যে উচ্চারণ করলো দেবব্রত।

কিন্তু এখন—কোথায় যাওয়া যায়? কোথায় গেলে পাওয়া যায় একটু শান্তি আর সান্ত্বনার প্রলেপ—তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের ওপর?... সোনালীর নাম মনে পড়লো। কিন্তু না। ওর কাছে যাওয়া যায় না। হয়তো এখন ওর ঘরে গিয়ে বসে অশ্রু ইন্দ্রজিৎ। হয়তো ওরা এখন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে নীচু গলায়...

না, কোনো চিন্তাতেই, কোনো ভাবনাতেই, আজ এই মুহূর্তে শান্তি পাচ্ছে না দেবব্রত।

নিজের কাছ থেকে পালাতে চায় সে আজ। কিন্তু [illegible] কার কাছে? কে পারবে তাকে [illegible] ভুলিয়ে দিতে?

হঠাৎ একটি নাম মনে পড়লো। এঞ্জেলা টমাস! সে এঞ্জেলা প্রায় সর্বজন-বন্ধু বললেই হয়। দার্জিলিং-এ কিছুদিন যে বাস করে সেই এঞ্জেলাকে চিনে যায় ঠিক কোনো না কোনো ভাবে। এমনকি সোনালীর মত অমিশুক মেয়েও...

কিন্তু ঐ নামটা যে কেন বারবার মনে আসে? ঐ নামটাকে ঘিরে বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণা তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তো বন্ধুবান্ধবের বাড়ী আজকাল এত বেশি আসে দেবব্রত—নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাগুলোকে কাটিয়ে দিতে। আজ আলোকেন্দুর বাসাতেও সে এসেছিল ঐ জন্যেই। কিন্তু এসে দেখলো, সেখানেও তার জন্যে কোনো সান্ত্বনা অপেক্ষা করে নেই...

ম্যাথু আর্নল্ড মনে পড়ে।.. দি ওয়ার্ল্ড হুইচ সীমস টু লাইফ আস্ লাইক এ ল্যাণ্ড অব ড্রীমস, সো ভ্যারিয়াস, সো বিউটিফুল, সো নিউ, হ্যাথ রিয়েলি নাইদার জয়, নর লাভ, নর লাইট নর সার্টিচুড, নর পীস, নর হেল্প ফর পেইন......

অন্যমনেই হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দীর্ঘ পথ পার হয়ে এঞ্জেলার বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে, সে খেয়ালই ছিল না

দেবব্রতর। হঠাৎ চমক ভাঙলো পিয়ানোর টুং-টাং ড্রাং-ডাং শব্দে।

এঞ্জেলার বাড়ীর ভিতর থেকে পিয়ানোর শব্দ ভেসে আসছে বাইরে পর্যন্ত। আচ্ছা, ভিতরে কি এখন এঞ্জেলা একাই আছে? নাকি আরো কেউ...। যদি আর কেউ থাকে, আর হাবেভাবে যদি তাকে বিশেষ অতিথি বলে মনে হয়, তবে দু'পাঁচ মিনিট কথা বলেই চলে যাবে দেবব্রত। আর যদি......

কলিং বেল টিপতে নেপালী আয়া এসে দরজা খুলে দিলো।

দেবব্রতর ভাগ্য ভালো। এঞ্জেলাকে একাই পাওয়া গেল দোতলার ঘরে।

'অনেকদিন পর এলে!' —প্রাথমিক সম্ভাষণের পর বললে এঞ্জেলা, ফায়ার-প্লেসের গনগনে আগুনের দিকে চেয়ে।

দেবব্রত চুপ। কথা চালাবার মত মনের অবস্থা তার নয়। এই মুহূর্তে তার নিজেকে মনে হচ্ছে নিঃস্ব রিক্ত...

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো দেবু?' —দেবব্রতর চোখের দিকে বিস্ময়দৃষ্টিতে তাকালো এঞ্জেলা—'মনে হচ্ছে যেন তুমি আজ অনেক দুঃখ বয়ে এনেছ তোমার সঙ্গে! বলো তো, আমি ঠিক বুঝেছি কিনা?'

দেবব্রত কিছু একটা বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলে উঠতে পারলো না।

'থাক, থাক!' —বাধা দিয়ে বললো এঞ্জেলা—'কি দুঃখ, কিসের দুঃখ, আমি জানতে চাইনে। শুধু বলছিলাম, নিজে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি বলেই দুঃখের চেহারা চিনতে আমি কখনো ভুল করি না। আরো জানি, যে দুঃখ প্রকাশের পথ পায় না, পাথরের মত চেপে বসে থাকে বুকের ওপর, সে দুঃখই সবচাইতে সাংঘাতিক।'

আর কোনো কথা না বলে পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসলো এঞ্জেলা। তারপর ধীরে ধীরে এক গভীর বিষাদের সুর তুললো দীর্ঘ রীডের ওপর আঙুল চেপে—শী উইল নট্ কাম্ দিস্ ওয়ে এগেন্...

এ পথে সে আর আসবে না। আসবে না, আসবে না, আসবে না। সে চলে গেছে চিরদিনের জন্যে, আমার যৌবনের সমস্ত স্বপ্নকে সঙ্গে নিয়ে...। তার দেয়া অনেক হারানো চুম্বনের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে আমার জীবনের বালুবেলায়, যেমন শীতের ঋতুতে শুকনো ঝরা পাতায় আস্তীর্ণ হয়ে থাকে মৃত অরণ্যের বীথিপথ...

ব্যর্থ প্রেম কোনো নাম-না-জানা বিদেশী কবির আক্ষেপ মূর্ত হয়ে ওঠে গানের সুরে এবং ভাষায়। দেবব্রতর বুকের ভিতরে ঢেউ জাগে। একটা অব্যক্ত, অবোধ্য বেদনার ঢেউ...

গান শেষ হতেই অনুরোধের অপেক্ষা না করে আরেকটা গানের সুর তোলে এঞ্জেলা : লভ্ ইজ্ জাস্ট্ এ ওয়ার্ড, উইদাউট এনি মীনিং...

প্রেম শুধু একটা অর্থহীন শব্দমাত্র...

শুনতে শুনতে দেবব্রতর মনে হয়, এঞ্জেলা কি গান গাইছে, না কাঁদছে? না, কাঁদছে না এঞ্জেলা ঠিক, কিন্তু কান্নার তীরে তীরে কাঁপছে ওর গলা। গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে একটা বুকফাটা রোদন। এ রোদনের উৎস জীবনের গভীরে...

নিজের অজ্ঞাতসারে কখন দেবব্রতর চোখের কোল বেয়ে উষ্ণ অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে...

'তোমাকে কাঁদাতেই আমি চেয়েছিলাম, কবি!'

এঞ্জেলার গলার স্বরে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরলো দেবব্রতর। কখন যে এঞ্জেলার আঙুল থেমে গেছে পিয়ানোর রীডের ওপর, খেয়ালই ছিল না তার।

লজ্জা পেয়ে রুমাল বার করে চোখ মুছে ফেলে দেবব্রত। কিছু একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়ে এঞ্জেলা বলে :

'দীজ্ আর হেভ্‌নলি টিয়ারস্! এর জন্যে লজ্জিত হোয়ো না, কবি!'

দেবব্রত যে কোনো কালে কবিতা লিখতো, সেকথা আর সবাই ভুলে গেছে কিন্তু এঞ্জেলা ভোলেনি। সেই বিগত দিনের কিছু অপ্রকাশিত কবিতা আজো এঞ্জেলার বাক্সে আছে, হারায়নি।

একদিন দেবব্রত, যৌবনের প্রথম উন্মেষকালে, এঞ্জেলাকে ভালোবেসেছিল। এঞ্জেলাও কি ভালোবাসেনি তাকে? বেসেছিল বৈকি। আর বেসেছিল বলেই তো সেদিন নিজের সমস্ত আবেগকে সংযত করে বলতে পেরেছিল : 'তুমি ফিরে যাও দেবু! আমি তোমার থেকে দশ বছরের বড়। তা ছাড়া, আমার সমাজ আর তোমার সমাজ সম্পূর্ণ আলাদা। যতই নিজের সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি না কেন, তবু আপন আপন সমাজেরই সংস্কৃতির ঐতিহ্য আমাদের রক্তমাংসে, শিরায় শিরায়। আমাকে ভালোবেসে, আমাকে নিয়ে ঘর বেঁধে, তুমি সুখী হবে না। আমি একটা ব্যাংক্রাপ্ট্ সোল্! এমন কিছু নেই যে আত্মীয়-বন্ধু-সমাজ সমস্ত হারিয়েও তুমি আমার মধ্যে খুঁজে পাবে সম্পূর্ণতা। তা ছাড়া, তুমি একজন উদীয়মান চিত্রকর। বড় হবার জন্যে, বিখ্যাত হবার জন্যে, তোমার প্রতিষ্ঠিত পিতার সাহায্য এবং আনুকূল্য তোমার একান্ত প্রয়োজন। তাই বলছি, গো ব্যাক হোয়ার ইউ বিলঙ্‌! একদিন বুঝতে পারবে, জীবন প্রেমের চাইতে অনেক অনেক বড়, অনেক বেশিদূর প্রসারিত।'

সেদিন দেবব্রতকে ফিরিয়ে দিয়ে এঞ্জেলা যে কত বড় বন্ধুর কাজ করেছিল, আজ সেকথা বোঝে দেবব্রত। সেই তরুণ বয়সের মোহ আজ আর নেই। অনেক ঢেউ বয়ে গেছে তার জীবনের ওপর দিয়ে। এঞ্জেলার জীবনেও এসেছে অনেক পরিবর্তন, আবার চলেও গেছে। কিন্তু এসব কিছুর পরেও ওদের দুজনের মাঝখানে যা টিঁকে আছে সেটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত ধরনের বন্ধুত্ব। এ বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ নিখাদ, নিঃস্বার্থ। আর এই বন্ধুত্বকে এক অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করে রেখেছে কোনো-এক-কালের সেই ওদের ভালোবাসার স্মৃতি...

'তুমি আজো সুন্দর, এঞ্জেল!' এঞ্জেলার দিকে তাকিয়ে বললো দেবব্রত।

সত্যিই এঞ্জেলাকে বেশ আকর্ষণীয়া দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। কে বলবে ওর বয়স সাঁইত্রিশের প্রান্ত ছুঁয়েছে? দেহে এখনো ওর অনেকখানি যৌবন। মুখের রেখা মসৃণ, চোখের তারায় এখনো আছে দীপ্তি।

'বিউটি ইজ দ্য লাভার্স গিফ্‌ট!' —হাসলো এঞ্জেলা। কথাটা বললো ঠাট্টা হিসেবেই।

'যাই, তোমার জন্যে কফি আনতে বলি।' আয়ার উদ্দেশে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এঞ্জেলা। আবার ফিরে এল একটু পরেই।

ডার্ক গ্রীন কাশ্মিরী শালের তৈরী পদপ্রান্তস্পর্শী গাউনে চমৎকার দেখাচ্ছে এঞ্জেলাকে। দেবব্রত চেয়ে চেয়ে দেখলো ওর ঢেউ-খেলানো বাদামী চুল, মাসকারা-মাখানো কালো চোখ, ওর অনাবৃত হাতের ট্যান্ডস্কিন। আরো দেখলো ওর গাঢ় সবুজ জামার তলা থেকে ঊর্ধ্বতভাবে মাথা তুলে ওঠা পীবর বুক, শীর্ণ কটিদেশ, আর তারও নীচে সুগঠিত নিতম্বের রেখা...

আয়া কফি নিয়ে এল। সঙ্গে কিছু কেক, সল্টেড বাদাম, কিছু ক্রীম-দেয়া বিস্কুট।

'খাও।' দেবব্রতকে কফি এগিয়ে দিলে এঞ্জেলা, নিজের জন্যেও ঢেলে নিলো কাপে।

খেতে খেতে এঞ্জেলা বললো : এখন অনেক ভালো বোধ করছ না দেবু?

'করছি। তোমার সত্যিই আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, এঞ্জেল!'

'আই উইল কিশ অ্যাওয়ে ইওর গ্রিফ্‌স্! ইওর ওয়ারিজ্!' বলতে বলতে হঠাৎ উঠে এল এঞ্জেলা, আলতোভাবে চুমো খেলো দেবব্রতর মাথায়, গালে।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওকে বুকের ওপর টেনে নিলো দেবব্রত। উন্মত্তের মত চুম্বন করতে লাগলো ওর ঠোঁটে, চোখে, গালে, গলায়। তারপর ওর নরম বুকে মুখ গুঁজে তারই নিবিড় উত্তাপে ডুবিয়ে দিতে চাইলো সমস্ত না-পাওয়ার জ্বালা-যন্ত্রণা...

এই ঘনিষ্ঠ স্পর্শে কি শুধু দেবব্রতই আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছে?

তা নয়। এঞ্জেলাও পাচ্ছে এক গভীর, দুর্বোধ্য সুখের স্বাদ। মনে হচ্ছে যেন কতকাল ধরে তার হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়েছিল এই একজনেরই স্পর্শের জন্যে। যে স্পর্শে আছে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র...

অনেক, অনেক ক্ষণ পরে আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো দেবব্রত।

আঃ, অনেক হালকা হয়ে গেছে মাথা আর বুকটা। কেমন একটা মধুর ক্লান্তিতে চোখ বুজে বুজে আসছে যেন। ইচ্ছে করছে

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে নরম বিছানার কোলে...

কিন্তু অন্যের বাড়ীতে রাত কাটায় না দেবব্রত। কোনোদিনই না।

'আচ্ছা, আজ আসি, এঞ্জেলা। অনেক, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' বলে উঠে পড়লো দেবব্রত।

(৭)

কোথা দিয়ে যে কেটে গেল পাঁচটা দিন কে জানে। বিদায়ের মুহূর্ত যেন এসে গেল বড় তাড়াতাড়ি।

দার্জিলিং ছাড়বার দিন সকালবেলা সোনালীর বাসায় দেখা করতে এল ইন্দ্রজিৎ। বললে: 'আমি তোমায় চিঠি লিখবো। উত্তর দেবে তো?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো সোনালী।

'এপ্রিলের শেষদিকে আসবো। ততদিনে—আমাকে ভুলে যাবে না তো?'

'সেদিন রাতে যখন হঠাৎ আমার বাসায় এসেছিলে তখন তো এই ভেবেই এসেছিলে যে মাত্র একদিনের পরিচয় সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভুলে যাইনি! তবে আজ, যখন আমরা অনেক কাছাকাছি এসেছি, তখন তোমার এ ভয় হচ্ছে কেন?'

'সেদিন রাতে আমি কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি, সোনালী! এসেছিলাম শুধু তোমাকে দেখতে। আর আজ—জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, হায় ভীরু প্রেম হায় রে!'

শুনে হেসে ফেললো সোনালী। সংগে সংগে ইন্দ্রজিৎও হাসলো। কিন্তু পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে: 'এ-কথাটা কোনো সময়েই ভুলতে পারি না যে আমি সর্বদিক দিয়েই তোমার অযোগ্য। তাই সব সময়েই মনে হয় যেন তোমার সংগে আমার এই পরিচয়—এই দেখাশোনা বেড়ানো গল্প করা—এসব হঠাৎ স্বপ্নের মত, মরীচিকার মত, একদিন মিলিয়ে যাবে। একেক সময় সন্দেহ হয়, এসব যা ঘটছে এ কি সত্যিই বাস্তব?...বিশ্বাস হয় না যে তোমাকে আমি ধরে রাখতে পারবো। তবু, মানুষের আকাঙ্ক্ষা তো মরে না!' শেষের দিকে ইন্দ্রজিতের গলা বিষাদে আচ্ছন্ন হল।

'কে যোগ্য কে অযোগ্য জানিনে, ইন্দ্র!—সোনালীর গলাও ভারী শোনালো—'তবে তুমি জনারণ্যে হারিয়ে যাবার মত মানুষ নও এটুকু জানি। আর এইজন্যেই তুমি আমার এতখানি কাছে আসতে পেরেছ।'

একটু চুপ করে থেকে ইন্দ্রজিৎ বললে: 'তোমার জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনে-ছিলুম। কয়েকখানা বই।' বলতে বলতে হাতের বড় প্যাকেটটা তুলে ধরলো।

'কি বই আছে ওর মধ্যে?'

'এখন বলবো না। আমি যাবার পর খুলে দেখো।'

হ্যাঁ, ইন্দ্রজিৎ চলে যাবার পরই খুলে দেখলো সোনালী। এবং দেখে অবাক হল।

প্যাকেটের ভিতরে সোনালী ফিতে দিয়ে বাঁধা খানচারেক বই। ইস্কাইলাস আর হাইনীর অনুবাদ, একখানা উৎকৃষ্ট চিত্র-সঙ্কলন, আর একখানি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ—দি ব্যাট্‌ল্ অব্ স্ট্যালিনগ্রাড।

মনে মনে ইন্দ্রজিতের রুচির তারিফ না করে পারলো না সোনালী। এমন জিনিসই সে দিয়েছে যা সোনালী দেখবে এবং পড়বে, একবার নয় অনেক বার। যা কোনোদিনও পুরনো হবে না তার কাছে।

আরো একটা কথা মনে আসে। উপহার তো অনেক কিছুই দেয়া যায়। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ তাকে উপহার দিয়েছে বই। আর কোনো উপহার যে সোনালী গ্রহণ করতো না, তা ও বুঝলো কি করে? সোনালী যে অন্য মেয়েদের থেকে ভিন্নধাতুতে গড়া, অন্য কিছু দিলে যে সে নিতো না, সেটুকু বুঝবার মত সূক্ষ্মতা ওর আছে...

কিন্তু এই ভালো-লাগার অনুভূতিটুকু বেশিক্ষণ রইলো না। মানুষের জীবনে মাধুর্য যতটুকু, তিক্ততা আর চাইতে অনেক বেশি।

অফিসে পৌঁছেই একটা ধাক্কা খেতে হল সোনালীকে। সচকিত হয়ে জানতে হল, এ পৃথিবীতে শুধু প্রেমই নেই, আছে ঘৃণা বিদ্বেষ আক্রোশও।

সোনালীর টেবিলের নীচে আজ হীটার ছিলো না। প্রতিদিনকার ব্যবহার-করা হীটারটা আজ কেন অপসারিত হয়েছে তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারলো সেনগুপ্ত সাহেব ওটাকে সরিয়েছেন এই অজুহাতে যে ওটা নাকি আরেক ঘরের হীটার, লাইব্রেরী-রুমের জন্যে নয়।

সেনগুপ্তের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে সেনগুপ্ত বললে: 'ওটা অন্য একজন অফি-সারের। তিনি এতদিন এখানে ছিলেন না তাই তাঁর জিনিস আপনাকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি ফিরে এসেছেন, এখন তো ও হীটার তাঁর প্রয়োজন।'

'ঠিক আছে। আমার জন্যে অন্য হীটারের ব্যবস্থা করুন তাহলে। অফিস থেকে একটা হীটার তো আমার প্রাপ্য।'

'আচ্ছা আপনি যান, আমি ব্যবস্থা করছি।'

নিজের রুমে ফিরে এল সোনালী। অপেক্ষা করতে লাগলো হীটারের জন্যে। ঠাণ্ডায় তার হাত-পা জমে যাচ্ছে। লেখার কাজ করবে কি করে? সে তো পাহাড়ের মানুষ নয়, এখানকার আবহাওয়ায় অভ্যস্তও নয়।

কিন্তু এ যেন শবরীর প্রতীক্ষা! অফিসের ঘড়িতে এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো, একটা বাজলো, হীটারের দেখা নেই।

টিফিনের পর সেনগুপ্তের ঘরে তাগাদা দিতে গেল সোনালী। উত্তর শুনলে, একটা অতিরিক্ত পুরনো হীটার পাওয়া গেছে অফিসে, সেটা মেরামত করা হচ্ছে এখন তারই ব্যবহারের জন্যে।

'সকাল থেকে এখনো কি সেটা মেরামত করা হল না?' কোনোরকমে রাগ চেপে জিজ্ঞেস করলে সোনালী।

'আমি কি করব বলুন?'—ঔদার্য দেখালো সেনগুপ্ত—'সেই সকাল থেকে ছুটোছুটি করছি মেকানিকের জন্যে। কিন্তু অফিসের মেকানিক্ এখানে ছিল না, শিলিগুড়ি গিয়েছিল কাল, আজ এইমাত্র ফিরেছে। ফেরামাত্রই তাকে কাজে লাগিয়েছি। ভাবছেন কেন, উই আর্ অল্ অ্যাট্ ইওর সার্ভিস!'

বলা বাহুল্য, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত হীটারটা মেরামত হয়ে উঠলো না।

পরদিন অফিসে এসে সোনালী দেখলো তার টেবিলের তলায় হীটার রয়েছে। ভাবলে, এবার বুঝি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ততা তার কপালে লেখা ছিল না। ঘণ্টা দুয়েক বাদেই হীটারের তারে আগুন ধরে গেল হঠাৎ, সুইচ্ টিপে নিভিয়ে দিতে হল সংগে সংগে। অ্যাসিস্ট্যা-ন্টের কাছে খোঁজ করতেই সোনালী জানতে পারলো এটা অনেক দিনের পুরানো, অকেজো হীটার, এতদিন অফিসে পড়েছিল অব্যবহৃত হয়ে।

আবার সেনগুপ্তের কাছে গেল সোনালী। বললে: 'আমায় যে হীটার দিয়েছেন সেটাতে আগুন ধরে গেছে। ওটা একেবারে পুরনো, অকেজো, ও দিয়ে কাজ চলবে না।'

'কি বলেন! পুরনো হলেও ও হীটারটা মোটেই অকেজো নয়।'—উত্তর এল তৎক্ষণাৎ—'মেকানিক্ বলেছে ওটা ভালোই আছে। তবে আপনার আগুন ধরে যাওয়া—সে একেবারে নতুন হীটারেও হতে পারে। ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আচ্ছা আমি দেখছি কি করতে পারি।'

আবার মেকানিক এল। ঘণ্টা তিনেক ধস্তাধস্তির পরও কিছু করতে না পেরে আগামী কাল ঠিক করে দেবে বলে আশ্বাস দিলো। ও বেচারার দোষ নেই। বুঝছে সবই, কিন্তু সেনগুপ্ত যখন বলছে জিনিসটা ঠিক আছে, তখন তার মুখের ওপর বলে কি করে যে ওটা সম্পূর্ণ অকেজো?

...আলোকেন্দু থাকলে আজ এমন হত না। কিন্তু সে ছুটি নিয়েছে দিনকয়েক হল। তাই সীনিয়র অফিসার হিসেবে নবাগত সোনালীর ওপর সুযোগ নিচ্ছে সেনগুপ্ত। তার সুবিধে এই যে অফিসের ফার্নিচার এবং যাবতীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ভার তারই ডিপার্টমেন্টের ওপর।

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা নোংরা ষড়যন্ত্র আছে, তা বুঝতে পারে সোনালী। কিন্তু কেন এই ষড়যন্ত্র? সেনগুপ্তের কাছে কি অপরাধ করেছে সে?

ইন্দ্রজিতের সংগে তার মেলামেশাই কি এর কারণ? নাকি, তার প্রতি দেবব্রত যে একটু পক্ষপাত দেখায়, সেটাই ঐ সেন-গুপ্তের গাত্রদাহের কারণ হয়েছে? কিন্তু ঈর্ষা যে এমন অমানবীয় হৃদয়হীনতার রূপ নিতে পারে, তা কে জানতো? এ যে সোনালীর স্বপ্নেরও বাইরে ছিল।

আরো দিন কয়েক দেখার পর ডিরেক্-টরের কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য হল সোনালী। যদিও এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারে ডিরেক্টরকে বিরক্ত করতে তার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কারণ সেটা শোভন নয়।

ডিরেক্টরের কাছ থেকে সেনগুপ্তের কাছে অর্ডার এল, অবিলম্বে যেন সোনালীর জন্যে হীটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়।

এর পর আগুনের ব্যবস্থা হল। অফিসের একটি বড় ঘরের ফায়ারপ্লেস্

থেকে আগুন ধরিয়ে একটি বাল্তি উনুন দেয়া হতে লাগলো সোনালীর টেবিলের তলায়। কিন্তু ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরতেই রোজ সাড়ে বারোটা একটা বেজে যায়। তার থেকে আগুন নিয়ে অফিসের পিওন যখন আবার সোনালীর জন্যে উনুন ধরায়, তা ধরতে ধরতে টিফিন আওয়ার পেরিয়ে যায়। এত কান্ড করেও এই ফল? ভিতরে ভিতরে মুষড়ে পড়ে সোনালী। সামান্য বস্তুর জন্য এত লড়াই? আর ঐ সেনগুপ্ত লোকটা কি চালাক। অনায়াসেই একটা নতুন হীটার আনাতে পারতো অফিসে। পয়সা তো ওর গাঁট থেকে খরচ করতে হত না। কিন্তু ইচ্ছে করেই এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে সোনালীর কষ্ট লাঘব না হয় অথচ ডিরেক্টরের কাছে অনায়াসেই বলতে পারে: 'হ্যাঁ, হীটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট তো করেছি।' লোকটার পেটে পেটে এত ধুরন্ধরী বুদ্ধি জানলে একটা নতুন হীটারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে ডিরেক্টরকে চিঠি লিখতো সোনালী। কিন্তু তা সে করেনি। সে চেয়েছিল: 'সাম্ কাইন্ড অব্ হীটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট।' আর তারই পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে সেনগুপ্ত।

সুতরাং সোনালীকে আবার দরখাস্ত করতে হল ডিরেকটরের কাছে, একটা নতুন হীটারের জন্যে।

ডিরেকটরের নির্দেশ এল : হীটারের ব্যবস্থা কর। কিন্তু এবারেও কূট চাল চাললো সেনগুপ্ত। নতুন হীটার না আনিয়ে সে এক উচ্চ-পদস্থ অফিসারের ঘর থেকে তার জন্যে নির্দিষ্ট হীটারটি আনিয়ে দিলো সোনালীর ঘরে। ডিরেক্টরকে জানালো, আনকোরা নতুন হীটার দেয়া হয়েছে সোনালীকে। সে হীটার খারাপ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

হ্যাঁ, হীটারটা নতুনই বটে। কিন্তু এই হীটার ব্যবহার করতে গিয়ে নতুন এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হল সোনালীকে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। যে অফিসারের হীটার দেয়া হয়েছে সোনালীকে সেই অফিসারটি হচ্ছেন জাতিতে তিব্বতী। তিনি অসাধারণ স্বাস্থ্যবান এবং শীতকালেও হীটার বা ফায়ারপ্লেসের প্রয়োজন তাঁর হয় না। সেই অজুহাতে তাঁর হীটার সরিয়েছে সেনগুপ্ত। কিন্তু সেই তিব্বতী ভদ্রলোক মনে মনে চটে গেলেন সোনালীর ওপর। তাঁর মনের ভাবটা হচ্ছে, তিনি ব্যবহার করুন বা না করুন, তাঁর জিনিস অপরে নেবে কেন?

এ মনোভাব অস্বাভাবিক কিছুই নয়। মনে হয় সোনালীর। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক মুখ ফুটে কোনোদিন তো কিছুই বলেন না। তবে সোনালী কি করে জানাবে, এ-সব কিছুর জন্যে দায়ী সেনগুপ্ত, সে নয়? ঐ ভদ্রলোকের অনুপস্থিতিতেই হীটার সরানো হয়েছে, সুতরাং কাজটা কে করিয়েছে তা তিনি জানেন না। পরেও জানার চেষ্টা করেননি।

আবার কি ডিরেক্টরের কাছে দরখাস্ত করবে সোনালী? ভালো লাগে না কথায় কথায় তাঁর কাছে আবেদন করতে। এসব ছোটখাট ব্যাপার দেখা কি তাঁর কাজ?

আর শীতের ঋতু তো প্রায় শেষ হয়ে এল এই ধস্তাধস্তি করতে করতে। এখন ক'টা দিনের জন্যে আর কে করে এত?

হ্যাঁ, এই কথাই সেদিন দেবব্রতকে বলছিল সোনালী: 'ডিরেক্টরকে বারবার চিঠি লিখতে ভালো লাগে না। এবারের মত এতেই চালিয়ে দিই। পরের বছর নতুন হীটারের জন্যে চেষ্টা করা যাবে।'

তা' না হয় হল।'—উত্তর দিয়েছিল দেবব্রত—'কিন্তু মানুষ কত নীচ হতে পারে, আমি তাই শুধু ভাবছি। আপনি তো ও'র মেয়ের বয়সী, আপনার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে ও'র লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।'

একটু থেমে দেবব্রত যোগ করলো: 'ভাববেন না, শুধু আপনার সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করেছেন উনি। অফিসের প্রায় সমস্ত লোক ও'র ওপর অসন্তুষ্ট। কোথায় কিভাবে কাকে বিপদে ফেলবেন, এই ও'র রাতদিনের চেষ্টা।'

'তাই নাকি?' একটু আশ্চর্যই হল সোনালী। সে ভেবেছিল, সেনগুপ্ত শুধু তার পিছনেই লেগেছে।

'এই তো মাত্র মাস কয়েক হল এসেছেন উনি।'—বলতে লাগলো দেবব্রত—'এর মধ্যে উনি কি কি করেছেন শুনুন। দাওয়াবাবুর নামে কম্প্লেন করে তার তিন বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করেছেন। মহেন্দ্র রায় বলে এক ছোকরা আনকফার্মড্ পোস্টে কাজ করতো, তাকে ছাঁটাই করিয়েছেন। তারপর এখন অমল বিশ্বাসকে—বিশ্বাসকে আপনি চেনেন তো?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'ঐ বিশ্বাসের আজ কিছুদিন ধরে উনি এমন পেছনে লেগেছেন যে বেচারা আবার পাগল হয়ে যাবে মনে হয়।'

'আবার পাগল হয়ে যাবে মানে কি? আগে কি ও পাগল হয়েছিল নাকি কখনো?'

'হ্যাঁ, মাস কয়েক আগে হয়েছিল। আপনি কিছু শোনেননি কারো কাছে?'

'না।' ঘাড় নাড়লো সোনালী।

'বিশ্বাসের কথা ভেবে কষ্ট হয়।'—অনেকটা যেন আপনমনেই বললে দেবব্রত—'অ্যান্ড্রিউ সাহেবের দয়ায় কোনোরকমে সেরে উঠেছিল, তা এখন যা ব্যাপার দেখছি তাতে তো মনে হচ্ছে ওর কপাল পুড়েছে। সপ্তাহ দুয়েক হল অ্যান্ড্রিউ সাহেব ছুটিতে গেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে সেনগুপ্ত সাহেবের জুলুম। বিশ্বাস এই সেদিন মাত্র এসেছে মেন্টাল অ্যাসাইলাম থেকে, অ্যান্ড্রিউ সাহেব সেইজন্যে ওকে ভারী কোনো কাজই দিতেন না। আর উনিই অনেক চেষ্টা করে ওর জন্যে লম্বা ছুটির ব্যবস্থা করে ওর চাকরীটা টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিছু অর্থসাহায্যও করেছিলেন শুনেছি। কিন্তু সেনগুপ্ত সাহেব যেন উঠেপড়ে লেগেছেন বিশ্বাসের চাকরীটা খাবার জন্যে। ওকে ভারী ভারী কাজ দিচ্ছেন, স্ট্রিক্ট অফিশিয়াল ডিসিপ্লিনের মধ্যে ওকে রাখবার চেষ্টা করছেন, যাতে ও পদে পদে অযোগ্য প্রমাণিত হয়।'

'বিশ্বাস তো অন্য ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। সেনগুপ্ত ওকে কাজ দিচ্ছেন কি করে?'

'ঐখানেই তো ও'র সুবিধে।'—হাসলো দেবব্রত—'উনি এমন একটা পোজিশনে আছেন যে সব ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেই ও'র কিছু না কিছু যোগাযোগ আছে। তাছাড়া এখন অ্যান্ড্রিউ সাহেব নেই বলে ও'র ডিপার্টমেন্টটা তদারকি করবার ভার নিজে যেচেই নিয়েছেন সেনগুপ্ত। ডিরেক্টরকে সেখাচ্ছেন : দেখো, আমি কত কাজের।'

আরো অনেকের কথাই বললো দেবব্রত, যাদের পিছনে সেনগুপ্ত লেগেছে।

কিন্তু সব ছাপিয়ে বিশ্বাসের কথাটাই মনে লেগে রইলো সোনালীর। এমনকি ওর কথা ভাবতে গিয়ে নিজের অসুবিধার কথাও ভুলে গেল সে।

'আজই আমি ওদের বাড়ী একবার যাবো।'—বললে সোনালী—'বিশ্বাসের বউ শমিতার কথা ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছে। লেখাপড়া তো জানে না। বিশ্বাসের চাকরী গেলে ও কি করবে? আর ও একাই তো নয়। ছেলেপুলে নেই যদিও, ওর একটা হাবা ভাই আছে। তাকে দেখাশোনা করার আর কেউ নেই।'

সেদিন আর বেশিক্ষণ দেবব্রতর সঙ্গে কথা হয়নি সোনালীর। সোনালীর দরকারেই সে এসেছিল, এবং কাজ করে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তারও কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বিশ্বাসের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সোনালী। তখন শীত শেষ হয়ে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে দার্জিলিং-এর পথে পথে।

'আসুন, আসুন। অ্যাদ্দিন আসেননি কেন? আপনার কথা ভাবছিলাম ক'দিন ধরে।' সানন্দে সোনালীকে আপ্যায়ন করেছিল শমিতা।

'বড় শীত পড়েছিল তো, তাই আসতে পারিনি। যাতায়াতের অসুবিধে জানেন তো জানেনই। এখন আবার আসবো মাঝে মাঝে। কিন্তু আপনি তো কই যান না একদিনও।' উত্তরে বলেছিল সোনালী।

'এবার যাবো। এতদিন—বুঝতেই তো পারছেন, ঐ ঠান্ডায় সংসারের সব কাজকর্ম করতে হত, ঝি নেই চাকর নেই, জলে জলে কাজ করে পায়ে ঘা হবার উপক্রম হয়েছিল। এই দার্জিলিং-এ শীতকালে ঠান্ডা জলে কাজ করা কি সোজা? আমি ডাকাতে মেয়েমানুষ বলেই পারি।'

ডাকাতে মেয়েমানুষ! কথাটা খট্ করে কানে লেগেছিল সোনালীর। কিন্তু ঐ-রকম গ্রাম্য ভাষা প্রায়ই ব্যবহার করে শমিতা। ওর যে শুধু বিদ্যাই নেই তা নয়, সাধারণ শিক্ষাদীক্ষা এবং বুদ্ধিরও অভাব। নইলে কি ঐ কথার পরই আবার বলে বসে: 'একে তো এই একা হাতে সংসারের সব কাজ চালাতে হয়, তার ওপর আবার ঐ পাগলছাগল মানুষকে নিয়ে যে কি ঝঞ্ঝাট! বিয়ে না করে আপনি ভালোই আছেন।'

বিশ্বাস তখন সামনেই খাটের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে। ওর সামনেই

এত কথা বলছে শমিতা, জিভের বিন্দুমাত্র আগল না রেখে।

পাগলের সামনে যে তাকে পাগল বলতে নেই, এই সামান্য কথাটাও কি জানে না শমিতা? শুধু তাই নয়, বিশ্বাস ওর স্বামী তো বটে। ভালোবাসার পাত্রকে বাইরের লোকের সামনেই পাগল বললে যে ওর মনে আঘাত লাগবে, এটুকু জ্ঞানও কি শমিতার নেই? কিন্তু বিশ্বাসের সামনেই তো আর শমিতার মুখে হাত চাপা দিতে পারে না সোনালী।

'কেমন আছেন?' বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে নিজেই ওর সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে সোনালী। কারণ অন্যান্য বারের মতন এবার আর বিশ্বাস নিজে থেকে আপ্যায়ন জানায় না তাকে। কেমন একটা কিম্ভূতকিমাকার অর্ধজড় মানুষের মত গায়ে মাথায় চাদর জড়িয়ে বসে থাকে খাটের ওপর, চোখের দৃষ্টি কেমন অর্থশূন্য মনে হয়। মাত্র কিছুদিন আগেও তো লোকটা এমন ছিল না, অবাক হয়ে ভাবে সোনালী।

'কি গো, উনি জিজ্ঞেস করছেন কেমন আছ, তা উত্তর দিচ্ছ না কেন?' প্রায় ধমকের মত করে বলে শমিতা।

'কেমন আছি? কেমন আছি? কেমন আছি?' ওদের কারো দিকে না তাকিয়ে সোনালীর কথাটারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে বিশ্বাস, এদিকওদিক মাথা দোলায় আর মিটিমিটি হাসে।

'দেখছেন?' সোনালীর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকায় শমিতা।

'হুঁ।' ঘাড় নাড়ে সোনালী।

পাগল সে দেখেছে অনেক। কিন্তু চোখের সামনে সুস্থ মানুষ থেকে এমনি করে পাগল হয়ে যাওয়া—সে এই প্রথম দেখছে।

'খেয়ে দেখুন তো কেমন হয়েছে।' সাঁমাইয়ের পায়েশ এক বাটি এনে সোনালীর সামনে রাখে শমিতা। বিশ্বাসকেও এনে দেয় একবাটি।

নিঃশব্দে পায়েসের বাটি শেষ করে বিশ্বাস। তারপর বসে থাকে ঝিম মেরে।

'সব সময়ই কি উনি আজকাল এমন থাকেন?' পায়েস খেতে খেতে শমিতাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে সোনালী।

'সব সময় এমন থাকে না। মাঝে মাঝে বেশ সুস্থ স্বাভাবিক মতন কথা বলে, বাজার-টাজারও করে আনে। আবার মাঝে মাঝে এমনি হয়ে যায়। বেশ তো সেরে উঠেছিল, তারপর ঐ আপনাদের অফিসের সেনগুপ্তের লাগানির চোটে এমন হয়ে গেল! ডাক্তার বলেছিল, এখন বেশ কিছুদিন ওকে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে, কোনো উত্তেজনা যেন না হয়। কিন্তু সেনগুপ্ত রোজ ওকে নাকি ধমকায় শুনেছি। অর্নিশ্রুউ সাহেব থাকলে না হয় তাঁর পায়ে গিয়ে কেঁদে পড়তাম। কিন্তু তিনি তো নেই, এখন মুখ্যু মেয়েমানুষ আমি কি করব বলুন?'

'দিদ্দি! দিদ্দি!'

ওদিক থেকে ডেকে উঠেছিল শমিতার হাবা ভাইটা, যার নাম শান্টু।

'কিরে, কি বলছিস?' ছুটে গিয়েছিল শমিতা ওর দিকে।

প্রকাণ্ড ঘর, এল প্যাটার্ণের। তারই এক প্রান্তে স্বামী-স্ত্রীর শোবার খাট, আরেক প্রান্তে একটা চৌকি। সেই চৌকির ওপর শুয়েছিল শান্টু।

'আ-আ-সি বা-আ-আ-থ-রুম যাবো।' দশ বছর বয়সেও জিভের জড়তা কাটেনি ছেলেটার।

'এর আবার জ্বর ক'দিন থেকে।' শান্টুকে খাট থেকে নামিয়ে ধরে ধরে বাথরুমের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল শমিতা।

অসহ্য একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ! তবু এর থেকেও কত বেশি অসহায় অবস্থায় না থাকে মানুষ!

কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই, পথের ধারে পড়ে থাকা একটা মানুষকে দেখলে সে ততখানি চমকে ওঠে না, যতখানি সে ওঠে চেনাজানা কোনো মানুষের দুর্দশা দেখলে। তাই বিশ্বাসদের পারিবারিক পরিস্থিতির মাঝখানে বসে সোনালীর হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। অথচ এই সোনালীই কলকাতার ফুটপাতে ডাস্টবিনের পাশে সামান্য খাবারের টুকরো নিয়ে মানুষের সঙ্গে কুকুরের লড়াই দেখেছে। বিশেষ করে বিয়েবাড়ীর সামনে তো এমন লড়াই অহরহই ঘটে থাকে। তবু সে সব ব্যাপারকে দেখেও না দেখা করে এই সোনালীই কত নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে! আর আজ......

হ্যাঁ, আজ সোনালীর সমস্ত মনটা যেন অবসন্ন হয়ে পড়লো এই পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু সে কি করবে? সে কি করতে পারে?

বিশ্বাসদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিজের বাসায় ফিরতে ফিরতে সারাটা পথ এই কথাই বারবার নিজেকে বললো সোনালী: 'আই ক্যান্ট ডু এনিথিং! আই ক্যান্ট ডু এনিথিং!......'

(ক্রমশঃ)

নিকটেই আছে

জীবন সাঁতরা আসরে নেমেছে

সুনয় বাড়ী ফিরল রাত তখন প্রায় দশটা। বাবা, মা কাউকে বাড়ীতে না দেখে অবাক হয়ে ছোটবোন ঘুন্টিকে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় গেছে রে? ঘুন্টি হেসে বলল—তোমার বৌ আনতে। ঘুন্টির কথাকটা যখন কানে এল ততক্ষণে পাঞ্জাবীটা প্রায় অর্ধেক খুলে ফেলেছে সুনয়। দুহাতে দুপাশের খুট ধরে মাথাটা গলিয়ে আলতো ভাবে পাঞ্জাবীটা খুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ব্যাপার কী? আনন্দে উত্তেজনায় ঘুন্টির মুখ রীতিমত চকচক করছে। ঘরের এক কোণে জানালার ধারে খাটের ওপর স্তূপ করা বালিশ-বিছানাটা টেবিল বানিয়ে বই সাজিয়ে পড়ছিল শিবু। দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে শিবুও বই খাতা ফেলে ঘুরে বসে নির্বাক-সুখে জ্বল-জ্বল করছে। গোটা ঘরটা যেন থৈ থৈ করছে দুটো উৎফুল্ল মুখের আলোয়। কিছু একটা ঘটে গেছে। নিশ্চয়ই সুনয়ের অনুপস্থিতিতে। কি যে ঘটে, সেটা ধরতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে ঘুন্টির দিকে চেয়ে রইল সুনয়।

স্কুল, ট্যুইশানি আর ট্যুইশানি—সকাল সাতটা টু রাত নটা। সপ্তাহে ছ'দিন। রোজ চোদ্দ ঘণ্টার রুটিন বাঁধা জীবন। রুটিনটা সুনয় নিয়মিত মেনে চলে বলেই মাস শেষে সাড়ে তিনশো টাকা ঘরে আসে। ঐ টাকা কটাই বাবা, মা ও তিনটি ভাই বোনের সংসারের অক্সিজেন ট্যাংক। মানুষ কটা ঠুকরে ঠুকরে ঐ ট্যাংকে ফোকর খুঁড়ে দম নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

বাপ হরিমোহনের রোজগারের ট্যাংকটা বছর দুই আগে ফুটো হয়ে গেছে। রিটায়ারমেন্টের দিন সহকর্মীদের দেওয়া মানপত্র, গোড়ের মালা আর বিরানব্বই টাকা তেপান্ন পয়সা সরকারী পেনশনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যখন বাড়ী ফিরে এলেন হরিমোহন তখন নেবুতলার এই অন্ধ বন্ধ গলি জুড়ে নেমেছে শেষ শীতের ফ্যাকাসে অন্ধকার। সুনয় বাড়ী ছিল না। শিবুটা তখনো খেলার মাঠ থেকে ফেরে নি। ঘুন্টি গেছে রাস্তার কলে জল আনতে। স্ত্রীর হাত ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন হরিমোহন—বাণী এবার আমাদের কি হবে?

শেষ পর্যন্ত কি হবে, কোথায় গিয়ে ওরা দাঁড়াবে তা জানে না সুনয়, তবু নির্জন সন্ধ্যার দুটো ভীষণ ক্লান্ত জলে ভেজা করুণ মুখের অসহায় আর্তনাদ আজো ঘুরে ফিরে বার বার কানে এসে বাজে। মনে পড়ে যায়, সেদিন হঠাৎ অসময়ে বাড়ী ফিরে বাবাকে ঐভাবে মার হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখে বুকের ভিতরটা কোন-কিছু-করতে-না-পারার তীব্র বেদনায় পুড়ে খাক হয়ে গেছিল। তার পর পরই পাড়ার কাউন্সিলার সুধীরদা সব শুনেটুনে স্কুলের এই মাস্টারীর কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তাও হয়ে গেল দু' বছর।

দু' বছরে কতটুকুই বা সংসারের হাল বদলাতে পেরেছে সুনয়। নেবুতলার এই সাইডে বাড়ীভাড়ার রেট অনেক কম। রাস্তা আজো কাঁচা, সামান্য বর্ষায় নর্দমা উথলে ওঠে, সন্ধ্যেয় পাড়ার প্রদীপ জ্বলে না—করপোরেশনের লাইটিং ডিপার্টমেন্ট বোধহয় পাড়াটার কথা ভুলেই গেছে। বাসিন্দাদেরও বিশেষ অভিযোগ নেই কোন। কম ভাড়ায় শহরে থাকতে হলে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা চাওয়াটাই অপরাধ। লাইট-ফাইট এলে, রাস্তা পাকা হলে বাড়ীওয়ালারাও নির্ঘাৎ রেট চড়িয়ে দেবে—তখন সুনয়রা যাবে কোথায়? এখনই ঠিকমত সব মাসে ভাড়া জোগাতে পারে না। তাই নিয়ে প্রায়ই বাড়ীওয়ালা গজ গজ করে।

গজ গজ করে হরেন মুদি, সুশীল ডাক্তার, গয়লা নিতাই, খবরের কাগজ-ওয়ালা রামকিষুণ ঘুন্টি, শিবু, মা, বাবা সবাই। কারুর চাহিদাই মেটাতে পারে না সুনয়। সবাই রেগে থাকে। কেউ প্রকাশ করে, কেউ করে না। সারাদিনের খাটাখাটুনিতে শুকিয়ে দড়ি মেরে যাওয়া ঘুন্টি আহ্লাদে মাখো-মাখো হয়ে উঠছে? শিবুটাও দাদার সামনে মুখ খুলতে সাহস না পেলেও, ভেতরে ভেতরে চাপা সুখের সোয়াদে টগবগ করছে? কিছুই বুঝতে পারে না সুনয়। শুধু শুধু তাকিয়ে থাকে ঘুন্টির দিকে।

দাদা, এমাসে একটা কাপড় দিবি আমায়—ঘুন্টির আদরে জ্যাবড়ানো আবদার শুনে পিত্তি জ্বলে ওঠে সুনয়ের। কাপড় দিবি? কাপড় কিনতে গেলে যে রেশন তোলা বন্ধ হয়ে যাবে, তা জানো না? সবই জানে মেয়েটা। তবু জেনেশুনে আদিখ্যাতা করছে। ইচ্ছে হোল ঠাস্ করে একটা চড় লাগায় ঘুন্টির গালে। ঢং ন্যাকামি বেরিয়ে যাবে। সারাদিন স্কুল ট্যুইশানির বাড়ীতে পড়িয়ে পড়িয়ে মুখে ফেনা উঠছে, খিদেয় সারা শরীর ঝিম ঝিম করছে, এখন কি আর এসব আধো আধো কথা ভালো লাগে। ঘুন্টির কথার কোন জবাব না দিয়ে পাঞ্জাবীটা খুলে দেয়ালে টাঙানো দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে খাটের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল সুনয়। বন্ধ দুটো চোখের আড়ালে ভেতরে ভেতরে জমা বিরক্তির তাপটুকু লুকিয়ে রেখে নরম গলায় সুনয় জিজ্ঞাসা করল—আজ কি রান্না হয়েছে রে ঘুন্টি?

মাংস দাদা—মাত্র দুটি শব্দ। তবু মনে হোল যেন এই শব্দ দুটি বলবার জন্যই শিবু এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিল। ভারী ভারী সিসের গুলির মত গাল বেয়ে এক করে শব্দদুটি ঝরে পড়তেই সুনয় তড়াকসে উঠে বসল খাটে।

'তোমার বৌ আনতে', 'এমাসে একটা কাপড় দিবি', 'মাংস দাদা'—ছোট দুটি ভাই-বোনের টুকরো টুকরো কথাগুলো মাথার মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল। এক সন্ধ্যায়, ওর অনুপস্থিতিতে কি যেন একটা ব্যাপার এ বাড়ীতে ঘটে গেছে। যার ফলে বাবা, মা যারা কোনদিনই বাড়ীর বাইরে যায় না, তারাও আজ বেরিয়েছে. সর্বদা ক্লান্ত ন্যাতানো মুড়ির মত মিয়োনো ঘুন্টি ফর ফর করছে, খেতে না পেয়ে পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া শিবুও কেমন সরস তরতাজা হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা মাসের মাঝখানে মাংস এসেছে এই বাড়ীতে। এতদিনের রুটিনটা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। সবাই তা জানে, শুধু ওই জানে না। কি ব্যাপার বলতো ঘুন্টি—গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করে সুনয়।

দাদার মুখচোখের দিকে তাকিয়ে ঘুন্টির ভয় লাগে। মানুষটা ভীষণ ক্লান্ত। সারাদিন খেটেখুটে বাড়ী ফিরে এখনো এক গ্লাস জল পায় নি। জল সে চায়ও নি। শুধু জানতে চেয়েছে কি হয়েছে? এখুনি না বললে হয়তো চটে যাবে। ইচ্ছে ছিল, মা-বাবা ফিরলে পর সবাই খেতে বসলে, পাতে মাংস দেখে অবাক হয়ে দাদা যখন জিজ্ঞাসা করবে কি ব্যাপার মাংস কেন, তখন ব্যাপারটা ফাঁস করবে। কিন্তু শিবটা দিলে সব মাটি করে। খাটের কাছাকাছি এসে, দাদার সামনে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাটা সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে গিয়ে সব কেমন গুলিয়ে ফেলে ঘুন্টি। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে হয়ে যায়— আজ পুলিশ এসেছিল বাড়ীতে। তোমার চাকরী হয়ে যাবে। মা আমার বিয়ের জন্য যে হারটা এদ্দিন লুকিয়ে রেখেছিল, সেটাই বিক্রী করে বাবা সন্ধ্যেবেলায় টাকা এনেছে।

এক কিলো মাংসও এনেছে জানো দাদা—শিবু পাশ থেকে খলখল করে ওঠে।

তুই থাম। সব তাতেই তোর খাই খাই, যেন কিছু খেতে পাস না। তুই পড় তো। ধমক মেরে শিবুকে থামিয়ে দেয় ঘুন্টি। তারপর গলগল করে বলে চলে—তুমি মাস দেড়েক আগে কি একটা চাকরীর ইন্টারভিউ দিয়েছিলে না, তারই খোঁজ নিতে এসেছিল পুলিশ। বলল তুমি নাকি সিলেক্‌টেড হয়েছ। তাই খোঁজ খবর নিচ্ছে তুমি কেমন লোক। বলতে বলতে একটু থামে ঘুন্টি। দাদার মুখচোখ দেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছে কিনা? পুরোপুরি আন্দাজ করতে না পারলেও ফের খেই ধরে ঘুন্টি—পুলিশ হলে হবে কি, এমন ধুতি সার্ট পরে এসেছিল। আমরা বুঝতেও পারি নি যে লোকটা পুলিশ। কড়া নাড়তে বাবা দরজা খুলে দিল। মা ছিল রান্নাঘরে। আমি গিয়েছিলাম হরেন মুদির দোকানে দশ পয়সার নুন আনতে। ফিরে এসে দেখি লোকটা সদর দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে কি কথা বলছে। এমন মুস্কিল লোকটা সরে না গেলে তো আর ভেতরে ঢুকতে পারি না। দু-একটা কি কথা হোল বাবার সঙ্গে। তারপরই বাবা খুব খাতির করে লোকটাকে ঘরে এনে বসাল।

জানো দাদা, লোকটা সব জানে। তুমি যে কলেজে ইউনিয়ন করতে, তারপর এখন যে মাস্টারী কর, সুধীরদাই যে তোমাকে চাকরীটা দিয়েছে সব। এমন কি তুমি কোন বাড়ীতে কটা অঙ্ক টুইশানি কর তাও জানে।

কিন্তু হারটা কেন বিক্রী করল বাবা?—ঘুন্টিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সুনয়।

বারে পুলিশটা যে বলল কলেজে তুমি ইউনিয়ন করতে, সে খবরটা জানালে নাকি কিছুতেই তোমার এ চাকরীটা হবে না। তাই শুনে বাবা কত কাকুতি মিনতি করল। মাও অনেক করে বলল। কিন্তু লোকটা বলল তা নাকি সম্ভব নয়। লালবাজারে না কোথায় বলে তোমার নামে একটা ফাইল আছে। ঐ ফাইল থেকে রিপোর্টটা সরাতে না পারলে তুমি চাকরী পাবে না। আর ঐ রিপোর্ট সরাতে হলে কম করেও পাঁচশো টাকা লাগবে। বড় বড় অফিসারদের ঘুষ না দিলে, ঐ রিপোর্ট পাল্টানো মুস্কিল। তা আমরা পাঁচশো টাকা কোথায় পাব? বাবা বলল একটু অপেক্ষা করুন, আমার ছেলে ফিরুক ও নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে। তা ভদ্রলোক বললেন, তার সময় নেই একদম। আরো দুটো তিনটে জায়গায় আজ রাতেই তাকে যেতে হবে। এরপর আর আসতেও পারবেন না। তখন মা বাবাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঐ হারটার কথা বলল। তাই শুনে বাবা লোকটাকে কিছুক্ষণ বসতে বলে বেরিয়ে গেল হারটা নিয়ে। ভুবন স্যাকরার কাছে দেড়ভরির হার আড়াইশোতে

বেচে দিয়েছে বাবা। চেষ্টা করলে, আর দু-চারটা দোকান ঘুরলে হয়তো কিছু বেশী পেত বাবা, কিন্তু তখন তো আর সময় ছিল না মোটেই। তুমিও বাড়ীতে নেই। তা লোকটাকে বাবা দুশো চল্লিশ দিয়েছে আজ। আর বলে দিয়েছে, সামনের মাসের পয়লা আসতে। তুমি মাইনে পেলে বাকীটা দিয়ে দেবে। আচ্ছা দাদা তোমার এই নতুন চাকরীতে মাইনে কত? বাবা বলছিল তুমি নাকি শুরুতেই সব মিলিয়ে পৌনে সাতশো পাবে?

বোনের কথার কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে সুনয়—লোকটার নাম তোর মনে আছে? কেমন দেখতে?

হ্যাঁ। নাম বলেছিল জীবন সাঁতরা। পাতলা রোগা মতন। মাথায় টাক। চোখ দুটো গর্তে বসানো। মুখে বসন্তের দাগ। আমাদের এই থানা থেকেই এসেছিল খোঁজ নিতে।

দড়িতে ঝোলানো পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে স্যান্ডেলটা পায়ে গলিয়ে, অবাক হয়ে যাওয়া দুটো মুখের ওপর সদর দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে খুব ঠান্ডা শান্ত গলায় সুনয় বলল—বাবা ফিরলে বলিস, আমি থানায় গেছি, এখুনি ফিরব।

ঘণ্টাখানেক বাদেই ফিরে এল সুনয়। হরিমোহন, রাণী, ঘুন্টি শিবু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সুনয়কে দেখে প্রথম মুখ খুলল রাণী—রমার মাকে আজই বলে এলাম, তোর এই চাকরীটা হয়ে গেলে সামনের অঘ্রাণেই বিয়ে দেব। তুই কিন্তু আর অমত করিস না। তোর বাবা নিজে কথা দিয়ে এসেছে। অনেকদিন ধরে রমার মা ঝুলো-ঝুলি করছিল। এতদিন রাজী হইনি শুধু সংসারের কথা ভেবেই। তা তোর যখন এত বড় চাকরীটাই হচ্ছে, তখন আর ভাবনা কিসের।

চাকরীটা হচ্ছে তা তোমায় কে বলল?—জামাকাপড় ছেড়ে লুঙিগটা পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল সুনয়।

সে কি! তুই শুনিস নি? ঘুন্টি তোকে বলে নি? আজ পুলিশ এসেছিল বাড়ীতে। তোর বাবার সঙ্গে কথা কয়ে গেল।

হ্যাঁ। আর সেই সঙ্গে দুশো চল্লিশটা টাকাও নিয়ে গেল।—সুনয়ের গলায় বিরক্তি মেশানো ব্যঙ্গের সুরটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠতেই হরিমোহন অবাক হয়ে গেলেন। এতবড় একটা খুশীর ব্যাপারে ছেলে যে খুশী নয় সেটা বুঝতে পারেন। কিন্তু কেন? তাড়া-তাড়ি বলে ওঠেন—তা তো নেবেই। পুলিশ ভেরিফিকেশনে সামান্য খুঁতের জন্য কত ছেলের চাকরী হয় না তা জানিস? আমি তেত্রিশ বছর গভর্ণমেন্ট অফিসে কাজ করেছি। এসব আমার জানা। স্কুল কলেজে ছেলে-ছোকরারা অল্প বয়সে বুঝতে না পেরে ইউনিয়ন ফিউনিয়ন করে। তখন তো আর টের পায় না যে এর জন্যই পরে আর চাকরী বাকরী জুটবে না। পুলিশ রিপোর্টে সামান্য দাগ থাকলেই হয়ে গেল। আর দেখতে হবে না। তার আর ইহজন্মে চাকরী জুটবে না। তুই রিটিন টেস্টে অ্যালাও হয়েছিস ইন্টারভিউ ভাল হয়েছে। সিলেকটেড হয়ে গেছিস। আর ঐ সামান্য খুঁতটুকুর জন্য এত ভাল চাকরীটা হাতছাড়া হয়ে যাবে?—তাই তো হারটা বেচে দিলাম। এতে ভুল কি হয়েছে?

ভুল কি হয়েছে জানি না বাবা, থানার দারোগার মুখে শুনে এলাম, আমার নামে এনকোয়ারীর কোন চিঠি আজ পর্যন্ত লোক্যাল থানায় আসে নি। আর জীবন সাঁতরা বলে এই থানায় কেউ নেই। ও-সি বললেন, এরকম আরো দু-একটা রিপোর্ট নাকি তাঁর কাছে এসেছে যেখানে এইভাবে পুলিশ ভেরিফিকেশনের ছল করে মোটা টাকা হাতিয়েছে ঐ জীবন সাঁতরা। কিন্তু তাকে ধরা যাচ্ছে না।

একটা অদ্ভুত আনন্দের রেশ যা সন্ধ্যা থেকে এই অন্ধ বন্ধ গলির ঘরটাকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল, সুনয়ের কথা কটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন মুহূর্তে ছিঁড়ে খুঁড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর ঐ বুক চাপা ঘরের কোণে পাঁচটি মানুষ যে যার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, সুখ দুঃখের হাঁড়ি-পাতিল ফেলে ছড়িয়ে চুপ করে ঘাড় ধরে বসে রইল। কারুরই যেন আর কিছু করার নেই। শুধু শিবু থেকে থেকে ঘুমজড়ানো ক্লান্ত সুরে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল—মা খেতে দাও। দিদি দে না খেতে।

—সন্ধিৎসু

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২১)

ভয়ংকর অন্ধকার। গাছে গাছে পাতা নড়ছিল না। ক্রমে এই গ্রাম অন্ধকারে ডুবতে থাকল। বুঝি চরাচরে কেউ জেগে নেই। ভেসে ভেসে সেই নৌকা কোথায় যে যায়, কোথায় যে থাকে, কেউ জানে না। চরের বুকে রাতের গভীরে সেই নৌকা এসে হাজির। বড় দুই কোষা নাও। দু-পাশের মানুষেরা বাঁধাছাদা একটা জীবকে নৌকায় তুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহেন্দ্রনাথ তখন ডাকলেন, শচী শচীরে!

কোন সাড়া শব্দ নেই। তিনি ফের ডাকলেন, আলিমদ্দি, অ আলিমদ্দি!

কেউ সাড়া দিচ্ছে না। পুবের বাড়িতে হায় হায় রব। তোমরা ওঠ সকালে। কে কোথায় আছ! দীনবন্ধুর বৌ চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। দীনবন্ধু উঠানে নেমে চিৎকার করে উঠল, সকলে আপনেরা জাগেন। সর্বনাশ হইয়া গ্যাছে। শচীন্দ্রনাথ জেগেই মাথার কাছ থেকে একটা বর্শা তুলে নিল হাতে। আলিমদ্দি বলল, কর্তা আমি একটা সুপারির শলা নিলাম।

ভুজঙ্গ এল, কবিরাজ এল, কান্দা-পাহাড়, চন্দদের দুই বেটা এবং গৌর সরকার সদলবলে মুহূর্তে এসে হাজির।

—কি হইছে!

—কি আর হইব! তোমার আমার মান-সম্মান গ্যাছে।

সকলেই অন্ধকারে বের হয়ে পড়ল। মেঘলা আকাশ। গ্রহ নক্ষত্র কিছু দেখা যাচ্ছে না। নয়াপাড়াতে খবর দেওয়া হল। টোডার বাগ থেকে ছুটে এল মনজুর, আবেদালি আর হাজি সাহেবের তিন বেটা। বলল, কোনদিকে যাওয়ন যায়!

শচীন্দ্রনাথ বলল, চরের দিকে লও। রাইতে যদি সেই নাও জলে জলে ভাইসা যায়!

জয়, জয়মা, মঙ্গলচণ্ডির জয়। মাগ তর ছাওয়াল পাওয়াল—তুই যারে রাখস মা, তারে কে মারে! মাগ তুই অবলা জীবের প্রাণ, তর কাছে মা জিম্মায় থাকল দুঃখিনী মালতী।

শচীন্দ্রনাথ নৌকায় উঠে বলল, জব্বর কৈরে! সে গাঁয়ে আইছিল, সে নাই ক্যান।

এবার আবেদালি হাহা করে কেঁদে উঠল, কর্তাগ আমার জাতমান আর নাই। পোলার কসুরে আমি আয় কি দিয়া শোধ দিমু। সকলে থ।

একদল থানায় গেল। সাবিরুদ্দিন সাবকে খবর দিতে হয়।

শচীন্দ্রনাথ তখন বলল, জব্বরের কাম। তোমরা নৌকা ভাসাও জলে।

জলে নাও ভাসাওরে কিংবদন্তির নাও ভাসাও। সোনার নাও পবনের বৈঠা। নাওরে—জলে নাও ভাসাও। মানুষগুলি রাতের অন্ধকারে জয় জয়মালা, গন্ধেশ্বরী, ওমা তুই পটেশ্বরী, তর দেশে জলে স্থলে দুঃখ মা, আখেরে বনিবনা হবে কি হবে না কে জানে! শচীন্দ্রনাথ চিৎকার করে উঠল, তিনদিকে চইলা যাও। একদল কাওসার বিলে বিলে যাও। অন্যদল সোনালি বালির নদীর চরে। যারা পশ্চিমে যাবা সঙ্গে নিবা পালের নাও। পশ্চিমা বাতাসে পাল তুইলা দিবা।

নৌকা এখন না ছাড়লে নাগাল পাওয়া দায়। শচীন্দ্রনাথ বলল, আর আমি যাই, সঙ্গে নরেন দাস যাউক—সেই যেখানে চরে আলো জ্বলে সেইখানে। ওরা এবার সকলে নৌকায় উঠে বৈঠা মাথার উপর তুলে চিৎকার করে উঠল, মাগ তর এমন সুজলা সুফলা দ্যাশ, মাগ তুই ক্যান আবার জ্বইলা উঠলি। সংসারে বনিবনা হয় না—একি কাণ্ড মা সিদ্ধেশ্বরী। তুই মা ওর মুখ রক্ষা কর দিক ইবারে।

—আর কে যাইবা জলে? গজারীর বনে বনে অন্ধকার, আলো জ্বলে না, জোনাকি জ্বলে না। নিশুতি রাতে সাপ বাঘে বনাবনি হয় না। সেই বনের দিকে বড় নাও নিয়ে শচীন্দ্রনাথ ভেসে পড়ল। এতক্ষণ গ্রামের ভিতর যে চিৎকার চেঁচামেচি ছিল, বাড়ি থেকে বাড়িতে, গ্রাম থেকে গ্রামে নৌকার পর নৌকা ছুটে এসেছে, টৈবার দুইভাই ছুটে এসেছে, মেয়ে মহলে গুঞ্জন, চোখে মুখে ভয়ংকর ভীতির ছাপ—কি হল দেশটাতে এমন দেশ উচ্ছন্নে যায়—হায় আর সর্বনাশ হতে কি বাকি, সকলে চুপচাপ এখন জেগে বসে আছে। কেউ সে রাতে আর ঘুম যেতে পারল না।

শচীন্দ্রনাথ বড় মিঞা, মনজুর এবং নরেন দাস নিচের দিকের পাটাতনে। উপরের দিকের পাটাতনে আলিমদ্দি, গৌর সরকার প্রতাপচন্দের দুই ছেলে। সকলের হাতে বৈঠা। আর উপরে আকাশ। মেঘলা আকাশ ক্রমে কেমন পাতলা হয়ে আসছে। থেকে থেকে হাওয়া উঠছে। সবগুলি দাঁড় এক সঙ্গে উঠছে, নামছে। দ্রুতবেগে প্রায় ঘণ্টায় দশ বিশ ক্রোশ তারা পাড়ি জমাতে পারে এখন। হালে মনজুর শক্ত হয়ে বসে থাকল। এই অসম্মান এখন যেন শুধু নরেন দাসের নয়—একটা জাতির, মনজুর মুখচোখ রাঙা করে হাঁকল—জব্বইরা তুই মুখে চুনকালি মাখাইলি।

সেই বড় নৌকার সন্ধানে ওরা চরের মুখে এসে থামল। কোথায় নৌকা! কোন চিহ্ন নেই, নৌকার। চারিদিকে শুধু জল, চুপচাপ ওরা জলের উপর দাঁড় তুলে বসে থাকল। না নেই, কোথাও নেই। আদিগন্ত জলের ভিতর ইতস্তত মাছের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। ধানখেতে দুটো একটা বালি-হাঁসের শব্দ। শচীন্দ্রনাথ তখন বলল, নাও ইবারে দক্ষিণে ভাসাও।

অন্ধকারের ভিতর সেই বনে, জলে জলে বনের ভিতর প্রবেশ করা যায়—মাথার উপর গজারি গাছের অন্ধকার। নিচে জল, কোথাও বুক জল, কোথাও হাঁটু জল আর কোথাও ঝোপ জঙ্গল জলের নিচে অরণ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। নৌকা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জলের ভিতর ঢুকলে, ওরা প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। সমস্ত জলের ভিতর জোনাকিরা জ্বলছে। কত হাজার লক্ষ যেন এক আলো অন্ধকারময় জগত। এমন আলো অন্ধকারে ওরা কিছুই দেখতে পেল না। নরেন দাস বলল, আনধাইরে কারে খোঁজবেন।

কিছু পাখি ডাকল। চুপচাপ সকলে যেন আড়িপাতার মতো ভাব। এদিকটাতে কোন গ্রাম নেই, অনেক দূরে নৌকা বাইলে সুন্দরপুর গ্রাম। ওরা যত বন-জঙ্গলের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে তত ক্রমে সব শব্দ সরে আসছে। পাতার খসখস শব্দ হচ্ছে না। নিচে জল বলে, পাতা খসে পড়লে শব্দ হচ্ছে না। এত বড় গভীর বনে আগাছা নেই, বেতের ঝোপঝাড় চার-দিকে ছড়ানো, মাথার উপর হাজার রকমের লতা দুলছে। ভয়াবহ এই অন্ধকারে যদি কোন আলো জ্বলতে দেখা যায়, যদি অন্য কোন নৌকার শব্দ কানে ভেসে আসে! কারণ দ্রুত পালাবার মতো পথ এখানে নেই। বরং রাত কাটিয়ে দেবার জন্য এই গজারি গাছের বন—আঁধারে আঁধারে এই বন পার হলে মেঘনা নদী, নদীতে পাল তুলে দিলে ঠিক যেন আত্মীয়স্বজন যায় অথবা নদীতে কার নৌকা ভেসে যায়, কেবা তার খোঁজ রাখে। এই গজারির বনে ওরা তন্ন তন্ন করে খোঁজার চেষ্টা করল। ওরা ফিস ফিস করে বলছিল, দুটো একটা গজারির গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। জলে

●

জলে সেই পাতা অন্ধকারে নদীতে নেমে যাচ্ছে। ওরা সেই পাতা অথবা পাখ পাখালির ডাকের ভিতর নিজেদের আত্মগোপন রাখার বাসনা। ওরা এভাবে বনের ভিতর বড় নৌকার সন্ধানে থাকল।

না নৌকা না সেই গুনাইবিবির গান। এমন হারমাদ মানুষ কি করে মালতীর মতো এক জবরদস্ত যুবতীকে হাফিজ করে দিল।

শচীন্দ্রনাথ কেমন বিপর্যস্ত গলায় বলল, নাও নদীতে ভাসাইয়া দ্যাও। বড় নাও জলে জলে দূরে চইলা গ্যাছে।

—জববর যুবতী কি কয় !

—কিছু কয় না মিঞা

—কিছু না কইলে পার পাইব ক্যামনে ?

—ইটু সবুর করেন মিঞা।

—সকাল হৈতে আর যে দেরি নাই জববর।

জববর এবারে পাটাতনে উঠে দাঁড়াল। নৌকা এবার গজারি বন পার হয়ে নদীতে পড়েছে। মেঘনা নদী উত্তাল। ক্রমে নদীর সব বড় বড় বাউড় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নৌকা চালাবার নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। শুধু জলে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা এবং ধরে আনা যুবতীকে বশ করা। হিন্দু রমণী—সুন্দরী যুবতী মাইয়া মালতীরে বশ করে সহরে নিয়ে যাওয়া। সবুর সয়না পরানে—হেন কাজ কে করে। সবুর না সইলে জোর জবরদস্তিতে হেনস্থা করবে মিঞাসাব। কিন্তু ছইয়ের ভিতর যায় কার সাধ্য। মালতী এখন সাপ বাঘের মতো। ভিতরে গেলেই ছুটে কামড়াতে আসছে। কখনও হিক্কা উঠছিল। কখনও পাগলের মতো চিৎকার করছিল, আর ভয়ে দু কসে থুথু জমছে। গলা কাঠ। হাত-পা বাঁধা মালতীর। হাত-পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তবু এই যুবতী ছইয়ের ভিতর গড়াগড়ি দিচ্ছে। কখনও চুপচাপ পড়ে থাকছে। মনে হয় কেউ নেই। চার মাঝি মিঞাসাব তার দুই সাকরেদ আর জববর। জববর মাঝে মাঝে ঢুকে যাচ্ছে ছইয়ের ভিতর। বশ করার কথাবার্তা বলছে। আখেরে এই মহাজন মানুষ মালতীকে ঘরের বিবি করে ফেলবে। দুই চারদিন নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ানো, গায়ে পায়ে হাওরা বাতাস লাগানো, তারপর ঘরে ফিরে যাওয়া—এমন বর্ষা দেশে এসে গেলে মন আর মানে না, উথাল পাতাল কইরা মন নদীর চরে ছুইটা যায় কেবল। আর এমন শরীর নিয়ে জবলে পুড়ে থাক কে করে হয়। আর যা ধর্ম হিন্দুরে, মোতাবেক এই শরীর কালো জলে ডুবে মরবে। জব্বর এখন পয়সার লোভে মাতালের মতো রংদার বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে কানের কাছে—মালতী দিদি উঠেন, কথা কন, জলপানি খান। আসমান দ্যাখেন, কত বড় নদীতে নাইমা আইছি দ্যাখেন। গতরে দিদি আগুনে জ্বালাইয়া বইসা আছেন, ইবারে আগুনে পানি দ্যান। বলতে বলতে দড়াদড়ি খুলে দিচ্ছে। খুলে দিলেই যখন যুবতী মাইয়া ভালমাইনসের ঝি বইনা যাইব, আশায় আশায় জববরের এখন চক্ষু চড়কগাছ।

গলুইর দিকে তিনজন লোক। ডোরাকাটা লুঙ্গি পরনে, কালো গেঞ্জি গায়। পয়সার লোভে জববর, কারণ জববরের দুটো তাঁত না হলে চলছে না, পয়সার লোভে মালতীকে করিম শেখের নৌকায় তুলে আনল। করিম শেখ মেলায় মালতীকে দেখেছে। মেলাতে মালতীর রূপ দেখে তাজ্জব বনে গেছে। এখনত এই সময়—মেলাতে দাঙ্গা হয়ে গেছে। দাঙ্গার সময় মেলাতে করিম শেখ দলবল নিয়ে সারা মেলা ছুটে বেড়িয়েছে, মালতী কোথায় কোথাও সে মালতীকে খুঁজে পায়নি, সেই থেকে নেশার মতো জববর নারানগঞ্জের গদিতে সুতা আনতে গেলেই বলত, কিরে জববইরা তর দিদি কি কয় ?

—কেবল আপনের কথা কয়। পয়সা খসানোর তালে ছিল জববর।

—আমার কথা ক্যান কয়রে! আমারে চিনে।

—চিনব না আপনেরে! কয়, মালতী দিদি কয়, হারে জববইরা মেলাতে যে তর লগে সুন্দর মত মানুষটা দ্যাখলাম, মানুষটা কেডারে—

—তুই কি কইলি!

কইলাম খুব মেহেরবান মানুষ। জবরদস্ত আদমি। নাম করিম। নারানগঞ্জ সহরে তারে চিনে না এমন কেডা আছে!

—এত বড় কইয়া দিলি!

—দিমু না! আপনে কত বড় মানুষ কন!

—তার কি কইলি ?

—কইলাম সোনার মানুষ।

—শুইনা কি কয় ?

—কয় সোনার মানুষের বুঝি সখ থাকে না!

—তুই কি কইলি ?

—কইলাম সখ থাকে না কি কন! সখ সুখ সব থাকে।

তারপরই একরাতে গদিতে বসে করিম বলল, রাইতে আঁখিতে ঘুম থাকে নারে জববর! যান এক স্বপ্নের হুরী উইড়া উইড়া আসে।

—হুরী! কেমন চোখ বড় বড় করে দিল জব্বর। শুধু হুরী বললে যেন অসম্মান করা হয় মালতীকে। হুরী পরী বশ মানে। মালতী দিদি আমার আসমানের তারা। আসমানের তারা খসইতে ম্যাও লাগে। এই বলে জব্বর একটা বড় অঙ্কের টাকার আভাস দিতে চাইল।

—কত ম্যাও লাগে ?

জব্বর প্রথম চারখানা তাঁত কিনতে কত টাকা লাগতে পারে ভেবে নিল। তারপর বলল, হাজার টাকা।

—হাজার টাকায় হুরী পরী আসমানের তারা সব এক লগে কিনন যায় মিঞা।

একটা কিনতে কম লাগে তবে। জব্বর, বুঝি ফসকে গেল সব, সে ঢোক গিলে বলল, কম লাগে তবে!

—লাগে না ?

—তবে লাগুক। দ্যান যা মনে লয়।

জববর শেষ পর্যন্ত দর-দাম করে পাঁচ শত টাকা নিল। বাকি খরচপত্র করিমই সব করবে কথা থাকল। নৌকা, মাঝি, এবং রাতবিরাতের ফুর্তি সব করিম সেখের খরচে। প্রথম ভেবেছিল করিম নৌকায় নিজে থাকবে না, কিন্তু কেন জানি ওর অবিশ্বাস জন্মে গেল, হারমাদ জববর, কোনদিকে শেষে নাও ভাসাবে কে জানে—তবে তার আসমানের তারাও যাবে, নগদ টাকাও যাবে। শেষ পর্যন্ত সে নৌকায় পর্যন্ত উঠে এল।

জববর টাকার লোভে, দুই তাঁত করে তাঁতি হবার লোভে সময়ে-অসময়ে গ্রামে চলে আসত। খরচ করত দুহাতে, ফেলুকে নিয়ে সলাপরামর্শ করত, আর যাদের সে এ-অঞ্চল দেখাতে এনেছিল—কত বড় অঞ্চল দ্যাখেন মিঞারা, এই অঞ্চলে আমার মালতী দিদি বাড়ে দিনে দিনে, তারে লইয়া যান সাগরের জলে—মালতীকে দূরে থেকে দেখাবার সময় যাদের সে এমন বলত, তারা সবাই করিম সেখের লোক। দিনক্ষণ দেখে, সময় বোঝে—যখন রঞ্জিত গ্রামে নেই, যখন আনধাইর রাতে এবং যখন কেউ বলে না দিলে বোঝা যাবে না কার নৌকা, কেবা এল, নদীর চরে নাও ভাইসা থাকে তখন কাজটা হাসিল করতে সময় লাগবে না। সামসুদ্দিনও এখানে নেই। সে ঢাকা গেছে। সুতরাং এ-সময়েই কামটা হাসিল কইরা ফ্যালতে হয়, এমন পরামর্শ দিল ফেলু। ফেলু বিনিময়ে দুই কুড়ি দশ টাকা পেল। বিবি আন্নু তার ডুরে শাড়ি পেল। কথা ছিল ফেলুর বিবি সঙ্গে যাবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেলু রাজি হয়নি। তার সাহস হয়নি। ধরা পড়ার ভয়ে ফেলু এতটুকু হয়ে গেছিল।

এখন সূর্য উঠছে। মৃদুমন্দ বাতাস পালে খেলছে। ভোরের সূর্য নদীর বুক থেকে প্রায় ওঠার মতো। মেঘনা নদীর প্রবল ঘূর্ণির ভিতর নৌকা পড়ে না যায়—মাঝিরা খুব সন্তর্পণে বৈঠা চালাচ্ছে। হাল ধরে আছে। ছইয়ের দুদিকে কাঠের দরজা। ভিতরটা ঘরের মতো। ঠিক যেন এক পানসী নাও। ভিতরে কথাবার্তা হলে গলুই থেকে বোঝা দায়। ছইয়ের ভিতর মালতী ফোঁপাচ্ছে। জব্বর উবু হয়ে বসে আছে পাশে—এবং ঠিক সেই আগের মতো রংদার বাঁশি

বাজিয়ে চলছে। ফেলুর বিবি নৌকায় থাকলে এখন সুবিধা হত। দশ কুড়ি দশ টাকা দিতে রাজি, তবু বিবিটাকে ফেলু আসতে দেয়নি। যদি বশ না মানাতে পারে, বনের বাঘ খাঁচায় ঢুকে যদি হালুম-হুলুম করতে থাকে কেবল—কি যে হবে না, জব্বরের মুখ ক্রমে শুকিয়ে আসছে। সুতরাং জব্বর মরিয়া হয়ে পায়ের কাছে বসে বলল, দিদি ওঠেন। দুধ গরম কইরা দেই, দুধ খান। বল পাইবেন গায়ে গতরে।

কে কার কথা শোনে। মালতী এখন পাটাতনে ঝড়ো কাকের মতো। চোখে-মুখে কলঙ্কের ছাপ। চোখের নিচে এক রাতে কি ভয়ঙ্কর কুৎসিত কালো দাগের চিহ্ন। হাতে-পায়ে এখন দড়ি-দড়া নেই। দরজার ফাঁকে সকালের আলো ওর পায়ের কাছে এসে পড়েছে।

জব্বর ডাকল, মালতী দিদি উঠেন। মুখ ধুইয়া নাস্তা করেন।

মালতী ঘাড় গুঁজে বসে থাকল, যেন ফের বিরক্ত করলে গলা কামড়ে দেবে। জব্বর ভয়ে ভয়ে ছইয়ের ভিতর থেকে বের হয়ে এল। তেজ এখনও মরেনি। মুখ চোখ মালতীর পাগলের মতো লাগছে।

—কি কয়? করিম সেখ পাটাতনে বসে হুঁকো টানছিল।

কয় বুড়ো মাইনসের জান, সামলাইতে পারব ত'!

—কি যে কও! বয়েস কত আমার! এই দুই কুড়ি মোটে এক।

—তা যখন পারেন, তখন সব ঠিক হইয়া যাইব।

হুঁকো টানতে টানতেই বলল করিম, তুমি যে কইলা, তোমার দিদি আমার কথা কয় এহনে শুনাইছি, দিদি তোমার পাগলের মত বইসা আছে।

—আরে না মিঞা! বনের বাঘ খাঁচায় উঠাইলে তা ইট্টু এমন করে। বশ মানাতে সময় লাগে।

—বশ না মানাইতে পারলে নদী নালার কয় রাইত ঘুরবা? কবেগাদি ছাইড়া বাইর হইছ। বড় বিবি কয় কৈ যান মিঞা?

—কি কইলেন?

—কইলাম মৎস্য শীকারে যাই। নদী নালার দাম পানিতে ভাইসা গ্যাছে, যদি ম্যাঘনার পানিতে চাইন মাছ পাই। বলে একটু থেমে কলকের আগুন জলে ফেলে দিলেই ফস করে আগুনটা নিভে গেল। বলল, মাছ ত বঁড়শিতে আটকাইছে, এহনে মৎস্য ডাঙ্গায় তুলতে পারতেছ না—এডা ক্যামন কথা!

—ডাঙ্গায় তুইলা ফ্যাললে আর থাকলটা কি কন? দুই চারডা লম্ফঝম্ফ। তারপর খতম। পাঁজ দোয়ারে আপনের মিষ্টি কথা জাইসা বেড়াইব। বনের বাঘ বশ মানলে মিঞা তখন আবার ক্যান জানি সখ যায়—শিকারে গ্যালে হয়। ভাল লাগে না, পানিতে স্বাদ সোয়াদ নাই। মনটা তখন আপনের উড়াল দিতে চায় না মিঞা? বলে জব্বর বলল, তামুক সাজি।

সাজ। তামুক খাইয়া সুখ পাইলাম না।

এই খাল-বিলের দেশে করিম সেখ মুখটা ভোঁতা করে বসে থাকল। নৌকা কোন গঞ্জের পাশ দিয়ে যাচ্ছে না। খাদ্যদ্রব্য যা ছিল সব শেষ। ঘুরে-ফিরে—যতদিন না মালতীর প্রাণে বিশ্বাস জাগে ততদিন এই খালবিলে এবং নদীর মোহনাতে ঘুরে বেড়াতে হবে। এখন শুধু ভালো ব্যবহার, জবরদস্তির কাজ নয়। একমাত্র সরল অকপট ব্যবহারই মালতীকে আপনার করে নিতে পারবে। এই ভেবে করিম সেখ বলল, মনের ভিতর এক পঙ্খী বাস করে জব্বর।

—তা করে মিঞা।

—পঙ্খীটা উড়াল দিতে চায় মিঞা, কি যে চায় পঙ্খী, পঙ্খীরে তুমি কি চাও—নূতন বিবির জন্য মন কেমন উদাস হইয়া যায়। পানির স্রোতে বিড়াল ভাসে—অ মন তুমি এক মাঝি, মনে পড়ে জব্বর জবরদস্ত বিবি হালিমা—তারে বশ মানাইতে কয়দিন লাগছিল—তোমার মনে থাকনের কথা নারে, কি যে ভাব, সে যেন তার মাঝিদের উদ্দেশ্যে এসব বলতে চাইল। কেমন ছাড়া ছাড়া ছবি মনের কোণে জেগে উঠছে করিমের। এখন যেন সে কত উদার মোতাবেক মানুষ। সরল ব্যবহারের চিহ্ন ওর মুখে, দেখলে মনেই হবে না—করিমের ভিতরের মানুষটা বড় কুটিল, সর্পিল স্রোতের মতো। মুখে মনে এক ছবি এখন করিমের—যা খুশি মনে লয় কয়, গঞ্জের ঘাট থাইকা ইলিশ কিনা নেও। পদ্মার ইলিশ, মেঘনার ইলিশ। তারপর জলে জলে ভাইসা যাও। আর পাটাতনে বসে ইলিশ মাছের ঝোল, গরম ভাত এবং নদীর জলে ময়ূর পঙ্খীর নাও ভাসাও। বড় লোভ আমার, যেন বলার ইচ্ছা করিম সেখের। হিন্দুর মেয়ে, যৌবন যার বিফলে যায় এমন যুবতী মাইয়ারে লইয়া ঘর কর!—অ যুবতী পরানে তর কি কষ্ট, তুই ক্যামন কইরা যৌবন বাইন্দা কাইন্দা মরস, তরে লইয়া যামু সাগরের জলে। ভাবতে ভাবতে করিম সেখ ফুরুৎ ফুরুৎ করে দুবার ধোঁয়া ছেড়ে দিল আকাশে। তারপরে হুঁকোটা জব্বরকে দিয়ে বলল, টান মিঞা, পরান ভইরা সুখটান দাও। বলে কেমন হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাট পার হতে চাইলে জব্বর খপ করে দুই ঠ্যাং জড়িয়ে ধরল, আরে মিঞা সাব করতাছেন কি!

—কি করতাছি কি!

—সাপ লইয়া খেলা করতে চান?

—সাপের বিশ দাঁত ভাইঙা দিতে চাই।

—খুব সোজা মনে হইছে!

—তা মনে হইছে।

—সুতা বিচাকিনার মত মনে হইছে!

—হইছে।

—মিঞা এত সোজা না!

—সোজা কিনা দ্যাখি। বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে দরজা অতিক্রম করে ছইয়ের ভিতরে ঢুকে গেল। এবং লেজ গুটিয়ে শেয়াল যেমন তার গর্তের ভিতর নিরিবিলি বসতে চায়, সে তেমনভাবে একটু তফাতে নিরিবিলি বসল। মালতীকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাড় গুঁজে বসে আছে মালতী।

নৌকায় তুলে আনতে জোর জবরদস্তি করতে হয়েছিল বলে শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত। এবং রক্তের দাগ। অথবা কেউ যেন শরীরের সর্বত্র আঁচড়ে খামচে দিয়েছে। সে যেন ভালবাসা দিচ্ছে তেমন ভাবে হাত রাখতে গিয়ে দেখল, গলুইর মাঝি এদিকে তাকাচ্ছে। সে পাল্লাটা এবার ঠেলে ভেজিয়ে দিল। লালসায় এখন মানুষটার জিভ চুক চুক করছে। পদ্মফুলের মতো তাজা, গোলাপের মতো কোমল এবং স্নিগ্ধ অথবা লাবণ্যময় শরীরে যেন যৌবন কেবল নদীর উজানে যায়। করিম সেখ উত্তপ্ত লোহার উপর হাত রেখে দ্রুত সরিয়ে নেবার মতো বার দুই ছুঁতে চেষ্টা করল, বার দুই কপালে হাত রেখে ভালবাসা দিতে চাইল, মালতী এখন কেমন ভালমানুষের ঝি হয়ে গেছে। করিমকে কিছু বলছে না। এবার সাহস পেয়ে করিম একেবারে রাজা বাদশার মতো হাঁকল, চরে নাও বান্দ মিঞারা। ইলিশের ঝোলে ভাত খাইয়া লও। তারপরই পাটাতনে যুবতী মালতীর সঙ্গে করিম সেখ এক খেলায় মেতে যাবে এমন চোখ মুখ নিয়ে ছইয়ের বাইরে এসে নদীর চরে কাশবনের ভিতর বড় এক কুমির ভেসে উঠতে দেখল বুঝি। কুমিরটা ভিতরে ভিতরে এত বড় হাঁ খুলে রেখেছে ভাবতেই করিমের মুখে রক্ত এসে গেল।

চরে নাও বেঁধে ইলিশ মাছের ঝোল, ভাত। গাংও অনেক দূরে। নদীর দক্ষিণপারে, কাশবন পার হলে, আস্তানা সাহেব কবরখানা। কতদূরে এখন এই সব জমি এবং মাঠ চলে গেছে। সামনে হোগলার বন। জল ক্রমে কমতে কমতে ডাঙ্গার দিকে উঠে গেছে। সূর্য ক্রমে মাথার উপর উঠে আসছে। ওরা পাটাতনে বসে খেল। মালতী কিছু খেল না। চুপচাপ মালতী নদীর জল দেখছে, ওরা এখন অন্যমনস্ক, করিম নামাজ পড়ছে।

মালতী আর ফিরতে পারছে না, কোথায় ফিরবে, ওকে হারমাদ মানুষেরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, সে রঞ্জিতের অথবা অন্য কোন মুখ এ-সময় মনে করতে পারছে না। মাথার ভিতর কি জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে থেকে অসহায় আর্তনাদ, সে হায় কি করবে এখন, কোথায় যাচ্ছে, তার কি ইচ্ছা, সে কে, কেন এমন করে চুপচাপ বসে আছে, কিছু কি তার করণীয় নেই, এত বড় নদী, নদীর জল—এই অতল জলে ঠাঁই হবে না জননী, বলে সবাই যখন ঝোল ভাত খেতে ব্যস্ত, করিম যখন নিবিষ্ট-মনে নামাজ পড়ছে তখন মালতী জলে লাফ দিল, জয় মা জাহ্নবী, জননী মা তুই, তর বুকে ভেসে গেলাম। কোথায় কি করে স্রোতের মুখে পড়তেই নিমেষে দূরে গিয়ে ভেসে উঠল। মাঝিরা সকলে নাস্তা ফেলে হৈ হৈ করে উঠল। জব্বর প্রমাদ গুনে তাড়াতাড়ি জলে লাফ দিয়ে পড়ল। মাঝিরা দাঁড় খুলতে গিয়ে দেখল, গিট লেগে গেছে, ওরা তাড়াতাড়ি দাঁড় খুলতে পারছে না। মালতী স্রোতের মুখে ভেসে অনেকখানি চলে গেছে। মালতী কখনও ডুবে যাচ্ছে কখনও ভেসে উঠছে। করিম পাটাতনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, সেই এক হাঁক এ-অঞ্চলের, কে ডুইবা

যায়! করিম নৌকা স্রোতের মুখে ছেড়ে দিলে মালতী চরের বুকে হোগলার জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল।

নৌকাটা স্রোতের মুখে কচ্ছপের মতো ভেসে যাচ্ছিল। সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু জলের ঘূর্ণি। ডানদিকে চর, চরের বুকে ধানখেত। সকলে ভাবল, জলের নিচে বুঝি মালতী ডুবে গেছে। কিন্তু বর্ষায় মালতী সোনালি বালির চর পার হয়ে যেত, ঘূর্ণিতে মালতী ডুবে ডুবে বালিমাটি তুলে আনত নদীর বুক থেকে। সেই মালতী জলে ডুবে যাবে জব্বর বিশ্বাস করতে পারল না। সে নৌকায় উঠে চারদিকে তাকাল। পাশে শর বন। শরের মাথা ফাঁক করে যেমন মাছ নদীর জলে সাঁতার কাটে তেমন এক মানুষ যেন শর বনে সাঁতার কাটছে।

জব্বর চিৎকার করে উঠল, ঐ যায় দ্যাখেন!

মাঝিরা বলল, মাছ, মিঞা মানুষ না!

করিম বলল, হ মাছ, বড় মাছ। মাছের পিছনে এখন ছোটা ভাল না। করিম বরং সতর্ক দৃষ্টি রাখছে মাঝনদীতে। কারণ ভয় করিমের—একবার এই নদী পার হয়ে গেলে জেল হাজত করিমের। ঘরে তুলে না নিতে পারলে, নদীর জলে, শরবনে, যেখানে থাকুক, মাথায় মালতীর লগির বারি, তখন জলের তলায় ডুবে যাবে মালতী। খাল বিল নদীর জলে কে কবে ভেসে যায় কে জানে! বর্ষার জল, এমন জলে যুবতী নারী ডুবে মরলে আত্মহত্যার সামিল হবে। করিম বলল, কৈরে মিঞা যুবতী মাইয়া কৈ?

জব্বর কিন্তু সেই শর বনের দিকে তাকিয়ে আছে। বন ক্রমে ডাঙ্গার দিকে উঠে গেছে। সেখানে এতবড় নাও ভাসালে চড়ায় নাও আটকে যাবে। এবং সেখানে শুধু এখন কাদা জল, কি করবে এখন জব্বর! এই অসময়ে আল্লার বান্দা কে এমন আছে ধইরা আনে যুবতী মাইয়ারে—জব্বর রাগে দুঃখে এখন চুল ছিঁড়তে থাকল। এবং যেদিকে শরবন কাঁপছে অথবা নড়ছে সেদিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। আর সহসা দেখতে পেল, শরবন পার হয়ে মালতী অন্ধের মতো কবরখানার দিকে উঠে যাচ্ছে। করিম পাগলের মতো হাহা করে আসতে থাকল। পথ হারাইছে যুবতী মাইয়া, যুবতীর সন্ধানে চল। সে এবার লাফ দিল। জব্বর দেখাদেখি লাফ দিয়ে জলে ভেসে গেল। করিমের সাকরেদ পর্যন্ত লোভে লালসায় জল সাঁতরাতে থাকল। যতদূর চোখ যায় শুধু জল, মনুষ্যবিহীন এই বনে জঙ্গলে একটা শশকের পিছনে একদল নেকড়ে যেন দ্রুতবেগে ছুটছে। সামনে সেই ডাঙ্গা। আস্তানা সাবের দরগা, আর চারদিকে গভীর জল। দূরে কতদূরে গেলে যেন লক্ষ যোজন দূরে মানুষের বসতি। এই ডাঙ্গায় আটকা পড়লে নির্ঘাত মালতী পাগল হয়ে যাবে। অথবা ঝোপ জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে যদি কোন-রকমে পাঁচ সাত মাইল নদীর উজানে ভেসে গিয়ে লোকালয়ে উঠতে পারে তবে জব্বর, তোমার জেল হাজত। তোমার দুই তাঁতের বোনাবুনি শেষ। লোভ লালসা শেষ। যত দ্রুত পালাচ্ছিল মালতী তত দ্রুত ছুটে জব্বর, করিম, ওর সাকরেদ। শর বনের ভিতর দিয়ে ছুটছে। শরীর কেটে রক্ত পড়ছে। ওদের এখন অমানুষের মতো দেখাচ্ছিল। ভূতের মতো অথবা প্রেতের মতো যেন শ্মশানভূমিতে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

মানুষ জনের সাক্ষাৎ এ-অঞ্চলে চোখে পড়বে না। দু দশ ক্রোশের ভিতর প্রায় লোকালয় বিহীন এই অরণ্য, বন জঙ্গল এবং যে পরবে দরগায় মোমবাতি জ্বালানো হয়, সে পরব বাদে মানুষে এ-পথে কেউ আর আসে না। এই অরণ্যের ভিতর যেন মৃত এক জগৎ সংসার চুপচাপ প্রকৃতির খেলা দেখে চলছে। আর আসে দশ বিশ ক্রোশ দূর থেকে মানুষ, মৃত মানুষ। ইন্তেকালে মানুষ এসে এই কবর খানায়, অরণ্যের ভিতর আশ্রয় নেয়। এবং দরগার কবরে ইন্তেকালের সময় শোনা যায়—আল্লা এক, মহম্মদ তার একমাত্র রসুল।

এখন সূর্য আকাশে পশ্চিমের দিকে হেলে পড়তে সুরু করেছে। ওরা তিনজন হোগলা বনে ঢুকেই কেমন দিশেহারা হয়ে গেল। কারণ কোন শব্দ পাচ্ছে না। জলে কাদায় মানুষ ছুটলে একরকমের ছপ ছপ শব্দ হয়, সে সব শব্দ চুপচাপ কেমন মরে গেছে। ওরা সেই শব্দ শুনে এতক্ষণ ছুটছিল। বাতাসে শরবন কেঁপে যাচ্ছে। ঝোপে জঙ্গলে কত সব কীট পতঙ্গ এবং পোকামাকড়। বর্ষার জন্য সাপের ভয়। এই অঞ্চলে বিষধর সব সাপ, মাঠে এবং নদীর চরে গ্রীষ্মের দিনে যারা ঘুরে বেড়াতো তারা জলের জন্য সব উঁচু জমিতে উঠে যাবে। অথবা ঝোপে জঙ্গলে ঘাসের মাথায় জড়াজড়ি করে পড়ে থাকবে। আর জলজ ঘাস, জোঁক এবং এক ধরনের ফড়িংয়ের ভয় আর প্রায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই—এই এক যুবতী এসে ওদের তিনজনকে বনের ভিতর জলে কাদায় ঘুরিয়ে মারছে। যত ঘুরে মরছে তত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে জব্বর এবং পাগলের মতো চিৎকার করছে করিম, অশ্লীল সব কটূক্তি। দড়ি দড়া খুলে না দিলেই হত। এখন কি করা। হায় এমন পদ্মফুলের মতো যে মালতী সে এখন কোথায়। এখন প্রায় ফাঁসির আসামির মতো মুখ নিয়ে খোঁজাখুঁজি। সে ছুঁতে পারল না ভালো করে, সাপ্টে ধরতে পারল না, সাপ্টে ধরে সোহাগে কচুপাতার মতো নরম চুলে হাত ঢুকিয়ে হায় সে কিছুই করতে পারে নি। সব বিফলে গেল, ভাবতেই করিম নিজের মূর্তি ধারণ করল এবার। একেবারে জানোয়ারের মতো মুখ, বলল, হালা তুমি আমারে গরু ঘোড়া পাইছ। বলেই সে এক লাথি মারল জব্বরের পাছাতে। সঙ্গে সঙ্গে জব্বর ভয়ে ভয়ে বলল, আসেন মিঞা। মনে হয় উত্তরের ঝোপে জলে কাদায় মানুষ হাইটা যায়। আসেন।

না আর না! জব্বর মনে মনে কসম খেল। পেলেই সাপ্টে ধরবে। ইজ্জতের মাথা খাবে। করিম ভাবল, না আর না আর সোহাগ দেবে না। পেলেই জানোয়ারের মতো লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। টানা হ্যাঁচড়া, টানতে টানতে ঝোপের ভিতর ফেলে, করিমের চোখ মুখ নেশাখোরের মতো দেখাচ্ছে। যা হয় হবে, একবার মাটির ভিতর আবাদের চারা তুলে দিতে পারলে জমি তার, কার হিম্মত আর বলে, জমি তোমার না মিঞা, জমি আমার। সে এবং জব্বর সাকরেদ নাদির হন্যে হয়ে ছুটছিল এবং ছুটতে ছুটতে মনে হল সন্ধ্যায় মালতী ডাঙ্গায় উঠে গেছে। ওরা ডাঙ্গায় উঠে কবরখানায় ঝোপ জঙ্গলে ওৎ পেতে থাকল। মালতী একা একা এই সাদা জ্যোৎস্নায় অরণ্যের ভিতর পথের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ালে খপ করে ধরে ফেলবে।

মালতী অভুক্ত। সারাক্ষণ শরবনের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে অবসন্ন। সে এই অরণ্যের ভিতর ঢুকে দেখল দর দর করে রক্ত পড়ছে। গোটা শরীর কেটে গেছে। গায়ে কাপড় নেই। সেমিজ ছিঁড়ে খুলে গেছে। কোথায় কোন জঙ্গলের লতায় পাতায়, বেত ঝোপের ভিতর ওর কাপড় এখন নিশানের মতো উড়ছে কে জানে। ওর হুঁস ছিল না। সেমিজের একটা দিক ফালা ফালা। সে টলতে টলতে নির্জন বনভূমিতে ঢুকে আহত হরিণ যেমন তার শরীর ঝোপের ভিতর টেনে নেয়, সন্তর্পণে চুপচাপ পড়ে থাকে, মালতী তেমনি নিজেকে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য করে দিল। উপরে সাদা জ্যোৎস্না। সামান্য সময় এই জ্যোৎস্না আকাশে থাকবে। তারপর ক্রমে কেমন ক্ষীণ এক শব্দ উঠে আসছে মনে হল। নদীর জলে শব্দ। পাড়ে ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ। সহসা ঝোপে জঙ্গলে কোন অদ্ভুত শব্দ শুনলে সে আঁৎকে উঠছে। ক্লান্তিতে সে নিস্তেজ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল সে মরে যাচ্ছে—দূরে দূরে সে হরিণীর দ্রুত ছুটে যাওয়ার শব্দ পেল, দূরে দূরে আকাশে এক ভেলার মতো রঞ্জিতের মুখ, মুখের ছবি, দুই চোখ রঞ্জিতের ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে। মালতী ক্রমে এ-ভাবে সংজ্ঞা হারাচ্ছে বুঝতে পারছিল। আর ঠিক তক্ষুণি দেখল ওর পায়ের কাছে তিন যমদূতের মতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে তারা নিতে এসেছে। সে এবার যথার্থই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ভয়ে। কিন্তু খচমচ শব্দ, হরিণ হরিণীর দ্রুত পালানোর শব্দ এবং জলে ঢেউ ওঠার শব্দ— সারা-রাত সংজ্ঞাহীন মালতীর কোমল শরীরে পাশবিকতার সাক্ষ্য রেখে মালতীকে মৃত ভেবে কবর ভূমিতে ফেলে অন্ধকারে ওরা সরে পড়ল। সকাল হতে না হতেই শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে যুবতীকে। কেউ টের পাবে না, বনের ভিতর এক যুবতী মাইয়া মইরা রইছে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

পঁচিশ বছর আগে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ

পঁচিশ বছর আগে ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে নিউ মেক্সিকোর আলামোগোর্দোয় পারমাণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। সেদিন সেই বিস্ফোরণ যাঁরা দূরে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাঁদেরই একজন হচ্ছেন প্রফেসর অটো আর ফ্রিশ ও-বি-ই এফ-আর-এস। বর্তমানে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় তিনি সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উপস্থিত করেছেন। লেখাটির কিছু কিছু অংশ এখানে উপস্থিত করছি।

তিনি বলছেন, পঁচিশ বছর আগে মানুষের হাতে প্রথম যে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটেছিল শতাধিক বিজ্ঞানী তা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন—তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। কয়েক মাস আগেই একথা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যেই নিউক্লিয়র বোমা তৈরি হবার মতো যথেষ্ট উপকরণ হাতে এসে যাবে এবং একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্যে তা ব্যবহার করা হবে। সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্লুটোনিয়ম বা ইউরেনিয়ম—২৩৫ দ্রুত সন্নিবিষ্ট করা গেলে কয়েক হাজার টন টি-এন-টি সমতুল একটি বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। আর সেই চূড়ান্ত-নির্ধারক পরিমাণটি কী, তাও মোটামুটি সঠিকভাবেই জানা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটি বাস্তবে না ঘটা পর্যন্ত পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছিল না। অথচ গবেষণাগারের মধ্যে এমন একটি বিস্ফোরণ ঘটানো আদপেই সম্ভব নয়। বিদারণঘটিত প্রক্রিয়ার সময়ে ও উপকরণের পরিমাণের ব্যবহারে কোথাও কোথাও সামান্য সন্দেহ দেখা গিয়েছিল, গবেষণাগারের পরীক্ষাকার্যের মাধ্যমে মোটামুটি তার নিরসনও হয়েছিল—এসবের সকল পরীক্ষা কার্যের সত্যতা যাচাই করবার জন্যে বাস্তব একটি পরীক্ষাকার্যের প্রয়োজনটাই জরুরি।

কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। পরীক্ষাকার্যটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একটি মহাদেশের মধ্যে, এমনভাবে যেন কেউ আঘাত না পায় বা কেউ বিশেষ কিছু টের না পায়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড়ো গোছের মরুভূমি। তারই একটি (আলামোগোর্দো) পরীক্ষাকার্যের জন্যে নির্বাচিত হল। এই মরুভূমির অন্য একটি নাম খুবই অর্থবহ : জোর্নাদো দেল মুয়ের্তো (স্পেনীয় ভাষায় অর্থ—মৃত্যুর যাত্রা)। পাথুরে জমি, প্রায় চল্লিশ মাইল ব্যাপী বিস্তৃতি। উদ্ভিদ বলতে কিছু ক্যাকটাস ও ঘাস, প্রাণী বলতে কিছু বিষাক্ত কীট। ইতিপূর্বে বোমা ফেলার নিশানা ঠিক করার জন্যে এই অঞ্চলটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

পরীক্ষাকার্য অনুষ্ঠিত হবার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই এই মরুভূমির মধ্যে বিজ্ঞানীদের জন্যে বড়ো বড়ো তাঁবু পড়ল। শুরু হল পরীক্ষাকার্যের ব্যবস্থাপনা। প্রায় একশো ফুট উঁচু ইস্পাতের একটি টাওয়ার খাড়া করা হয়েছিল। অটো ফ্রিশ লিখছেন, ১৪ই জুলাই তারিখে সেই ইস্পাতের টাওয়ারের ওপরে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের ব্যবস্থাপনা (তিনি তখনো পর্যন্ত তাকে বোমা বলছেন না কারণ বিমানবাহিত হবার মতো চেহারা তখনো তার নয়) তোলা হচ্ছিল, তিনি ও ডঃ জর্জ কিস্টিয়াকোভস্কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। শেষোক্ত জন বিস্ফোরণ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত। অটো ফ্রিশের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন বিস্ফোরণ ঘটার সময়ে এক মাইল ব্যাসের মধ্যে যদি কেউ থাকে তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত। বিস্ফোরণের ব্যবস্থাপনাটিকে টাওয়ার থেকে মাটিতে ফেলার জন্যে একটি ক্রেনের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এতে ঠিকমতো কাজ হবে কিনা সে সম্পর্কে অটো ফ্রিশ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ক্রেনের সাহায্যে কাজ ঠিক মতোই হয়েছিল।

এই প্রথম নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ সম্পর্কে যতো বেশি সম্ভব জানার জন্যে অনেকগুলো পরীক্ষাকার্যের আয়োজন ছিল। একটি হচ্ছে সাধারণ ও উচ্চবেগসম্পন্ন ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন দূরত্ব থেকে বিস্ফোরণের চলচ্চিত্র তোলা। এক্স্‌পোজার খুব অল্প সময়ের জন্যে হওয়া সত্ত্বেও গোড়ার দিকের কয়েকটি ফ্রেমের ফিল্‌মে পোড়া দাগ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। অটো ফ্রিশ নিজে ফটো তুলতে চেষ্টা করেছিলেন মাটির তলায় পুঁতে রাখা একটি ক্যামেরার সাহায্যে। ক্যামেরার মুখটি ছিল বিস্ফোরণের দিকে আর মুখ বরাবর ছিল একটি সুড়ঙ্গ। সামনে ছিল একটি ছিদ্রবিশিষ্ট কয়েক ইঞ্চি পুরু সীসের আড়াল—যাতে এক্স-রে ও গামারশ্মির 'আলোকে' অগ্নিগোলকের ফটো ওঠে। কিন্তু এই চেষ্টাও সফল হয়নি। সমস্ত আড়াল সত্ত্বেও জোরালো বিকীরণে ক্যামেরার ফিল্‌ম কালো হয়ে গিয়েছিল।

একটি পরীক্ষা-কার্যের আয়োজন ছিল আরো অনেক বড়ো একটি ব্যাপার ধরবার জন্যে। তা হচ্ছে বিস্ফোরণ ঘটার পরে এক মাইক্রোসেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে বিকীরণ শুরু হওয়ার একটি মাপ নেবার চেষ্টা। এ থেকে বিকীরণের বৃদ্ধির হার সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারত। বিকীরণের অনুসন্ধান-যন্ত্রটিকে রাখা হল বিস্ফোরণের কাছেই, বিস্ফোরণ ঘটা মাত্র সেটি ধ্বংস হবেই। কিন্তু তার আগেই যন্ত্রের সিগন্যাল একটি কেব্‌ল-এর মাধ্যমে আলোর বেগে মাইলখানেক দূরে স্থাপিত সুরক্ষিত রেকর্ডিং-রুমে পৌঁছে যাবার কথা। এই পরীক্ষাকার্যটি সফল হয়েছিল। পারমাণবিক ধ্বংসকার্য ফেটে পড়বার আগেই সিগনাল নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল।

এ ছাড়াও মামুলি ধরনের কয়েকটি পরীক্ষাকার্যের আয়োজন অবশ্যই ছিল। যেমন ঝলকের চাপের মাপ নেওয়া, কিছু দূরে দূরে মাটির নিচে কাঠের খুঁটি পুঁতে রাখা (কোনটি কতখানি পোড়ে তা দেখার জন্যে) ইত্যাদি।

যতোদিন এইসব পরীক্ষাকার্যের আয়োজন চলছিল, আবহাওয়া ছিল শুষ্ক আর প্রচন্ড রকমের উত্তপ্ত একটা সূর্য আগুন ঢালছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের ঠিক আগেই আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং খানিকটা বৃষ্টিও হয়ে গেল। আবহাওয়া খারাপ থাকা মানেই পর্যবেক্ষণের অসুবিধা। তার ওপরে যদি বিদ্যুৎ চমকায় তাহলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে গোলমাল হয়ে যাবার আশঙ্কা, এমনকি সময় হবার আগেই বিস্ফোরণ ঘটার প্রক্রিয়াটি ভুল করে শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এ কারণে যে সব তারের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটার প্রক্রিয়াটি শুরু হবার কথা সেগুলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্যবস্থা হল। আর তার যুক্ত করা ও বিস্ফোরণ ঘটার মধ্যে এমন একটি সময়ের ব্যবধান রাখা হল যাতে সংযোগকারীরা নিরাপদ দূরত্বে যেতে পারে। অন্যান্যদের আগেই নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

অটো ফ্রিশ যে জায়গা থেকে বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তার নাম কোম্পানিয়া হিল, বিস্ফোরণ থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। তাঁদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মধ্যরাত্রির কাছাকাছি সময়ে আর বিস্ফোরণ ঘটার কথা ছিল ভোর চারটের সময়ে। মাঝখানের এই সময়টুকুতে না সুযোগ ছিল ঘুমোবার, না প্রয়োজন ছিল কিছু করার। লাউডস্পীকারে হালকা সুর শোনানো হচ্ছিল আর মাঝে মাঝে আবহাওয়ার খবর। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে আসছিল কিন্তু [illegible] যে ভোর চারটের আগে আবহাওয়া পুরো পরিষ্কার হবে এমন সম্ভাবনা থাকল না।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা করা হল যে, বিস্ফোরণটি ঘটানো হবে ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়ে। অর্থাৎ দিনের আলো ফুটে ওটার সামান্য কিছুক্ষণ আগে। দিনের আলোয় বিস্ফোরণ ঘটালে পর্যবেক্ষণের অসুবিধে, কাজেই বোঝা গেল সাড়ে পাঁচটার সময়েও আবার যদি বিস্ফোরণ স্থগিত রাখতে হয় তাহলে পুরো একটি দিন অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

তারপরেও লাউডস্পীকারে হালকা গানের সুর বাজতে লাগল আর মাঝে মাঝে ঘোষণা যে ঝোড়ো আবহাওয়া মিলিয়ে যাচ্ছে, বিস্ফোরণ স্থগিত রাখার আর কোনো কারণ সম্ভবত ঘটবে না। —

ভোর পাঁচটার সময়ে লাউডস্পীকারে শোনা যেতে লাগল এক ধরনের ফিরিস্তি। একটির পর একটি কাজ শেষ করা হচ্ছে ঃ ব্যবস্থাপনাটি এবারে সম্পূর্ণ সজ্জিত, বিস্ফোরণ ঘটাবার তার যুক্ত করা হল, সংযোগকারীরা নিরাপদ দূরত্বে চলে যাচ্ছে তারপরে—

'মাইনাস দশ সেকেন্ড'
'মাইনাস নয় সেকেন্ড'
'মাইনাস...'

শূন্যে এসে পৌঁছতেই মরুভূমি আর দূরের পাহাড়গুলি আলোয় আলোময় যেন একটা সুইচ টিপে সূর্যকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অটো ফ্রিশের সঙ্গে কালো চশমা ছিল না, তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন, তা সত্ত্বেও সেই হঠাৎ আলোয় চোখ ঝলসিয়ে গেল। সেকেন্ড দুয়েক পরে যখন মনে হল আলোর ঝলসানো ভাবটা আর নেই, অটো ফ্রিশ ফিরে তাকালেন। কিন্তু তখনো দিগন্তরেখায় অবিশ্বাস্য রকমের উজ্জ্বল একটি গোলক—ছোট আকারের সূর্যের মতো। কয়েক সেকেন্ড চোখ ধাঁধিয়ে গেল। গোলকটির উজ্জ্বলতা আরো একটু কমে টকটকে লাল হবার পরে তিনি পুরো চোখ মেলে তাকাতে পারলেন। গোলকটি দ্রুত ওপরে উঠছে কিন্তু ধোঁয়ার একটি স্তম্ভ গোলকটিকে যুক্ত রাখছে মাটির সঙ্গে। গোলকটি আরো উঁচুতে উঠলে চেহারাটি দাঁড়াচ্ছ ব্যাঙের ছাতার মতো। তারপরে যখন তিনি ভাবছিলেন আর কিছু ঘটার নেই তখন দেখলেন চূড়ো থেকে খানিকটা অংশ ঠেলে বেরিয়ে এল, প্রথম মেঘ থেকে তৈরি হল দ্বিতীয় মেঘ এবং এই দ্বিতীয় মেঘের নিচেও লম্বমান থাকল ধোঁয়ার স্তম্ভ। ততোক্ষণে লালরং মুছে গিয়েছে আর একটা লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে ওপরের মেঘে। বোঝা গেল তীব্র তেজস্ক্রিয়তার ফলে বাতাসও অগ্নিময়। এবারে আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার অটো ফ্রিশ দেখতে পেলেন। মেঘের একটা পাতলা স্তরে একটা সাদা দাগ ফুটে উঠল, তারপর দুধের কলসি ভেঙে দুধ ছড়িয়ে পড়ার মতো তা ছড়াতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পরে একই ব্যাপার ঘটল আরো উঁচুর একটি মেঘের স্তরে। বোঝা গেল, বিস্ফোরণের ফলে যে ঝটকা সৃষ্টি হয়েছে তার চাপ গিয়ে পৌঁছেছে মেঘের স্তরে। ফলে নতুন জলকণা সৃষ্টি হচ্ছে কিংবা যে-জলকণাগুলো ছিল তা ফেটে যাচ্ছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো শব্দ শোনা যায়নি। কিন্তু মেঘের রাজ্যে বিস্ফোরণের ঝটকা পৌঁছতে দেখে অটো ফ্রিশ বুঝতে পারলেন এই তরঙ্গ তাঁদের এখানে পৌঁছতেও আর বিলম্ব নেই, অতএব তৈরি হওয়া দরকার। মাটিতে শুয়ে পড়ে কান চেপে রইলেন। তবুও শব্দ শুনতে পেলেন— গুম গুম গুম। যেন পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। তেমনি তালে তালে।

অতঃপর ফেরার পালা। অল্পক্ষণের মধ্যে বিজ্ঞানীরা বাসে চেপে লস আলামোস-এ ফিরে চললেন।

বিস্ফোরণের সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল তবুও কিছুটা জানাজানি হয়ে গেল। দেড়শো মাইল দূরেও যাঁরা সে সময়ে জেগে ছিলেন তাঁরা আলোর ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন। মিনিট পনেরো পরে অনেকে শুনতে পেয়েছিলেন গুমগুম একটা আওয়াজ।

খবরের কাগজের সংবাদদাতাদের বলা হল যে আলামোগোর্দোয় বিস্ফোরক পদার্থের একটি গুদামে বিস্ফোরণ ঘটেছে। তারপরে সীসের পাতে মোড়া জীপে চড়ে একটি দল হাজির হল সেই মরুভূমিতে তেজস্ক্রিয়তার মাপ নেবার জন্যে। আগে যেখানে ছিল মরুভূমির বালি তখন সেখানে ফেনার মতো কাচের ত্বক। ইস্পাতের টাওয়ারটি ধোঁয়া হয়ে উড়ে গিয়েছে। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পিঁপড়ের দল আবার এসে হাজির। এই পিঁপড়েগুলো কি আগে থেকেই ছিল, নাকি নতুন? অটো ফ্রিশ বলছেন এ প্রশ্নের জবাব তাঁর জানা নেই।

তারপরে অটো ফ্রিশ বলছেন, বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি দল দরবার শুরু করলেন যে, নিউক্লিয়র বোমার ভয় দেখানো হোক কিন্তু ব্যবহার যেন না করা হয়। বিজ্ঞানীদের এই দরবার সফল হয়নি তা সকলেই জানেন। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ৬ই আগস্ট সকালে হিরোশিমার ওপরে নিউক্লিয়র বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তারপরে নাগাসাকির ওপরে।

অটো ফ্রিশ নিজেই স্বীকার করছেন, নিউক্লিয়র বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীমহলে যে তৎপরতা শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে তিনি কোনো রকম সম্পর্ক রাখেন নি। তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তিনি নিউক্লিয়র বোমা ব্যবহারের পক্ষেই থেকে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীর পক্ষে এই ভূমিকা খুব গৌরবের হল না।

বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমার গবেষণা, নির্মাণ, বিস্ফোরণ ও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের তৎপরতা (পরমাণু বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্যে) সম্পর্কে রবার্ট যুঙ্ক একটি আশ্চর্য সুন্দর বই লিখেছেন। নাম, 'ব্রাইটার দ্যান থাউজেন্ড সান্স।' কৌতূহলী পাঠকরা বইটি অবশ্যই পড়বেন।

পরমাণু বোমা নির্মাণের খরচ কত?

বর্তমান বিশ্বে নিউক্লিয়র শক্তি আছে পাঁচটি ঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন। এই পাঁচটি দেশ বাদে অন্যান্য যে সব শিল্পোন্নত বা উন্নতিশীল দেশ আছে তাদের নিউক্লিয়র শক্তি হবার সামর্থ্য কতখানি? এ-প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে জানা দরকার পরমাণু-বোমা নির্মাণের খরচ কত?

পরমাণু-বোমা নির্মাণের খরচ সবচেয়ে কম হয় প্লুটোনিয়ম ব্যবহার করলে। শক্তি-উৎপাদনের পারমাণবিক চুল্লিতে যখন ইউরেনিয়ম—২৩৮-এ নিউট্রন সংযোগ ঘটে তখন পাওয়া যায় প্লুটোনিয়মের একটি আইসোটোপ ঃ প্লুটোনিয়ম—২৩৯। এই আইসোটোপটিই সবচেয়ে কম খরচে প্রাথমিক ধরনের পরমাণু বোমা নির্মাণের মূল উপাদান। এ বছরে, যতদূর জানা গিয়েছে, পারমাণবিক চুল্লী থেকে উৎপন্ন প্লুটোনিয়মের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭,০০০ কেজি, ১৯৮০ সালে ১,০০,০০০ কেজি।

৫০ মেগাওআট (তাপবিদ্যুৎ) ভারী-জলের পারমাণবিক চুল্লীতে ৯৫ শতাংশ প্লুটোনিয়ম—২৩৯ বছরে প্রায় ৮ কেজি পরিমাণ উৎপাদন করতে হলে (যার সাহায্যে বছরে একটি ২০ কিলোটন অস্ত্র নির্মিত হতে পারে) যে-সব শিল্প থাকা দরকার তার জন্যে ব্যয়ের পরিমাণ মোট ২২-১ মিলিয়ন ডলার (লগ্নী) এবং চালু রাখার খরচ বছরে মোট ৪-৯ মিলিয়ন ডলার।

প্রথম বছরে একটি বোমা নির্মাণের খরচ ২৭ মিলিয়ন ডলার (এক ডলারে প্রায় সাড়ে সাত টাকা)। মোটামুটি হিসেবে কুড়ি কোটি টাকারও বেশি।

আর পরমাণু-বোমা তৈরি করা হয় প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখার জন্যে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ওপরে সেটি ফেলে আসারও আয়োজন থাকা চাই। এজন্যে অন্ততপক্ষে প্রয়োজন ৩০ থেকে ৫০টি ক্যানবেরা বা বি—৫৭ বোমারু বিমান। এই বিমানগুলো পেতে হলে খরচ করা দরকার ১২০ মিলিয়ন ডলার। এগুলো চালু রাখার খরচ বছরে ১৫ মিলিয়ন ডলার। আনুষঙ্গিক আয়োজনের জন্যে খরচ আরো ৬০ মিলিয়ন ডলার, বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ১০ মিলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে ২০৫ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ দেড়শো কোটি টাকারও ওপরে।

পরমাণু-বোমা নির্মাণের টেকনিকাল আয়োজন ভারতের অবশ্যই আছে। ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে ইউরেনিয়ম পাওয়া যায়, বেশ কিছু পরিমাণে থোরিয়ামও। ভারতের পারমাণবিক চুল্লীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে ২৪০ মেগাওয়াট, প্লুটোনিয়ম বিচ্ছিন্নকরণের প্লান্টও বর্তমান। ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীর সংখ্যা ৭,০৬,০০০ (১৯৬৪ সালের হিসেবে)। এই মুহূর্তেই ভারতে বছরে অন্তত ২৭টি ২০ কিলোটন পরমাণু বোমা নির্মিত হতে পারে।

ময়স্কান্ত

পাখি

লীলা মজুমদার

(১২)

কি আনন্দে যে সেই সপ্তাহটা কেটেছিল সে আর কি বলব। একটা হিন্দু বাড়িতে যে বড়দিনের প্রস্তুতি এত আনন্দের ব্যাপার হতে পারে, কে জানত। আমার কথা আলাদা। আমাদের বাড়িতে কাউকে কখনো খেতে বলা হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে না। খেতে বলা দূরে থাকুক, না-বলতেই যারা আসত, অনিমাসি তাদের তাড়াতে পারলে বাঁচত। একবার মায়ের এক মাসতুতো বোন আর তার স্বামী এসেছিল, দু-এক দিন থাকবে মনে করেছিল। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর কথা শোনে নি। ত্রিবান্দ্রামে থাকত ওরা, ভদ্রলোক রিটায়ার করে দেশে থাকতে চায়। কলকাতার কাছাকাছি কোথায় জমি কেনা ছিল। অনেকদিন দেখা হয়নি। রিটায়ার করবার বেশি বাকিও ছিল না, ভেবেছিল দু'দিন থেকে, দু-একজনের সঙ্গে দেখাটেখা করে বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করে যাবে। তা অনিমাসি আমাদের বাড়িতে থাকতে দিলে, তবে তো। তার উপর চিঠিপত্র পায় নি, ওরা অবিশ্যি বলেছিল যে, ডাকে চিঠি হারিয়ে থাকবে, অনিমাসি সে কথায় কান-ই দেয় নি। সঙ্গে সঙ্গে দিল বিদায় করে। ট্রাম রাস্তায় ফ্যামিলি হোটেল আছে, তার ঠিকানা দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারল না, সঙ্গে গঙ্গাধরকে দিয়ে, সেখানে পৌঁছে দিয়েছিল।

তারা হয়তো কিছু দুঃখ প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় ছাদের কার্নিশের খানিকটা ভেঙে ঝুপঝাপ করে ওদের খুব কাছেই পড়াতে আর কোনো বাক্যব্যয় না করে চলে গেল। অনিমাসি তাদের একবার চা খেতেও বলেনি। আমার তখন ষোল বছর বয়স, কেমন যেন মায়া লেগেছিল। অনিমাসিকে চায়ের কথা বলেছিলাম। সে রেগে গেল। 'রাখ্ তোর দয়া, যারা কলকাতার শহরতলীতে দশ কাঠা জমি কিনে দোতলা বাড়ি তুলতে পারে, গরীব আত্মীয়স্বজনের কাছে তাদের তিন পয়সার হোটেলের খানা আশা করতে লজ্জা করে না?' সেজায় রাগ হয়েছিল, 'রেখে দাও তোমার হোটেলের খানা, অবিশ্যি পাইস হোটেল বলতে পার।'

তখনো আমার কলেজের ক্লাস শুরু হয় নি, মাঝে মাঝে গিয়ে খবর আনতে হয়। গঙ্গাধর সঙ্গে যেত। তাকে নিয়ে বিকেলের দিকে গেলাম ফ্যামিলি হোটেলে। দেখলাম তারা বেজায় চটেছে, অবিশ্যি আমার উপরে নয়। নাকি দাদামশাই থাকতে অনেকবার এসেছে, খুব আদর পেয়েছে। তাই সাহস করে এবার এসেছিল; আর আসবে না। যেমন আমার মা, তেমনি আমার মাসি, তা নিজের মাসতুতো বোন হতে পারে, হক কথাই বলবে তারা। আমাকেও ছোটবেলায় দেখেছে। মাসির অভদ্রতা দেখেও একটি কথাও বললাম না দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেছে। দম নেবার জন্য মাসি থামলে মেসো নরম গলায় বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে, সে তো বুঝতেই পারছি। খেতে দেয় তো?' গলা টনটন করছিল, বলেছিলাম, 'টিকলি আর আমি পেট ভরে খাই।' 'টিকলি কে?' 'অনিমাসির নাতনি। ঐ যে সিঁড়ির পাশে বসেছিল। খুব সুন্দর দেখতে।'

মাসি খুব হেসেছিল। 'ঐ বুঝি নাতনি? আমি বলি ঝিয়ের মেয়ে! নানান কারণে ঝিয়ের মেয়েরাও অনেক সময় সুন্দরী হয়।' আর সহ্য হয় নি। উঠে চলে এসেছিলাম। দাদামশাই মারা গেলে পর আমাদের বাড়িতে কেউ খেতে আসত না। স্কুলের বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে যাওয়া অনিমাসি পছন্দ করত না। পাছে উল্টে তাদের কখনো বলতে হয়। স্কুলের মেয়েরা আমাকে দেমাকী, কিপ্টে, এইসব বলত। লুকিয়ে কাঁদতাম। কলেজে পড়ার সময়, কলেজ থেকে একটা দশ টাকার জলপানি পেতাম। যারা জলপানি পেত, তাদের কলেজের মাইনে দিতে হত না। টাকাগুলো জমত। কিছুতেই অনিমাসিকে দিতাম না! দরকারি জিনিস কিনতাম। বন্ধুদের জন্মদিনে বই, সেন্ট, সুগন্ধী সাবান কিনে উপহার দিতাম। তাদের বাড়িতে জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিতাম। বেজায় ভালো লাগত। কিন্তু তাদের কখনো নেমন্তন্ন করতে পারি নি। অনিমাসি যদি অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। তাই মাঝে মাঝে দোকান থেকে খাবার কিনে তাদের খাওয়াতাম।

কাজেই এই বড়দিনের পার্টি নিয়ে আমি উৎসাহিত হব না তো কে হবে? অ্যানিও মহা খুসি আর বড়মার কথা তো ছেড়েই দিলাম। আমাদের ঘরে পঞ্চাশজন অতিথি আসবে শুনলাম। তাদের জন্যে ছোট ছোট উপহার কেনা হল। রঙিন কাগজ কেনা হল, সরু রিবন কেনা হল। বড়মা নিজে বসে বসে ছোট ছোট প্যাকেট বানালেন। গাছে ঝোলানো হবে। গাছে সাজাবার জন্য রুপোলী কাঁচের বল, জরির ফিতে, লাল লাল গালার ফল, সবুজ কাগজের পাতা, আরো কত কি একটা কার্ডবোর্ডের বাকস বোঝাই করে অ্যানি নিয়ে এল। পুরনো জিনিস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অ্যানি নিজের থেকেই বলল, 'ম্যারিয়নের জন্য কিনেছিলাম। প্রত্যেক বড়দিনে তার পার্টি চাই। নিজে সাজাত, আবার নতুন বছরের পরদিন যত্ন করে খুলে রাখত। আবার পরের বছর বের করত। আমাদের কোয়ার্টারে এত অতিথি আসত যে জায়গা ধরত না। তখন বাড়ি আগলানো ছাড়া আমার কাজকর্ম ছিল না, কাজেই পার্টির ব্যবস্থা করবার জন্য এন্তার সময় পেতাম। আর কি ফুর্তি ছিল ঐ মেয়ের। এখন শুনি ছেলেমেয়ে দুটোকে পেট ভরে খেতে দেয় না। পুলিশে ভালো মাইনেই দেয় নিশ্চয়, কিন্তু ব্যাটা বোধ হয় সব উড়িয়ে দেয়; তাস, ঘোড়দৌড়। বুঝুক এখন। যেমনি বিছানা পেতেছে, তেমনি শোবে তো! সে যাক গে, আচ্ছা তুমি কাউকে নেমন্তন্ন করবে না, মালা?'

আমি বললাম, 'টিকলিকে বললে কেমন হয়? আমার মাসির নাতনি, বলেছি তো তার কথা। তুমি ম্যারিয়নদের বল না কেন? দাদামশাই বলতেন দুঃখীদের উপর কখনো রাগ করতে হয় না।'

অ্যানি বেজায় চটে গেল। 'তোমার গেস্টদের তুমি বল তো। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না। আমি পাদ্রীর পুওর স্কুলের বোর্ডিং-এর কুড়িজন ছেলেমেয়েদের বলেছি। ম্যাডাম প্রত্যেকের জন্য গরম জামা কেনার টাকা দিয়েছেন। ঐ আমার যথেষ্ট। পুওর স্কুলের দুজন গরীব টিচার আছে, ঐ বোর্ডিং-এই থাকে। পাদ্রীকে বলে এসেছি তারাও যেন আসে। এর বেশি চ্যারিটি করা আমার পোষাবে না, মালা।' অবাক হয়ে গেলাম। অ্যানির গলা থেকে এমন রুক্ষ কর্কশ স্বর যে বেরুতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

সেটি বুঝতে পেরে, কথা পালটিয়ে সে বলল, 'ও সব অপ্রিয় কথা বাদ দাও, মালা। তোমার নিজের শপিং করেছ? তোমাকে সবাই উপহার দেবে, তুমি কাউকে কিছু দেবে না?' তাইতো, একথা তো কখনো মনে হয় নি। কাকেই বা কবে উপহার দিয়েছি? সেই কলেজের মেয়েদের জন্মদিনে আর মাঝে মাঝে টিকলিকে সামান্য জিনিস দেওয়া ছাড়া, আর তো কিছু মনে পড়ে না। তবে দাদামশাই থাকতে, তাঁর মানিব্যাগ খুলে পয়সাকড়ি নিয়ে গঙ্গাধরের সঙ্গে পাড়ার দোকান থেকে রাজ্যের জিনিস কিনে আনতাম, দাদামশাইয়ের জন্মদিনে দিতাম। পুজোর সময় দাদামশাই ধুতি শাড়ি কিনে আনতেন, তাঁকে আর অনিমাসিকে দেব বলে।

অ্যানি বলল, 'মিঃ সরকারকে বলে কিছু আগাম নিয়ে নাও না কেন?' আমি বললাম, 'না, না, অ্যানি। তার দরকার নেই। একেবারেই যে আমার হাত খালি তা তো নয়। বড়দের কিছু দেব না, কিন্তু ছোটদের জন্য ছবিটবি কিনে আনব। একটা খুব ভালো দোকান আছে, আমার দাদামশাইয়ের বাড়ির কাছেই।'

সবাই উৎসাহিত, মিঃ সিংহ পর্যন্ত আর যার জন্য এত আয়োজন সেই সায়ন, সে এত রঙিন কাগজ, কাগজের ফুল, দড়ি, কাঁচি দেখে আহ্লাদে আটখানা। রাতে শুতে যেতে চায় না। দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে গেল। আগের দিন জোনাসের কেকের উপর সাজ বসল; অ্যানি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাল। আমি তো হাঁ। নিউ মার্কেটে ছোট ছোট বড়দিনের কেক দেখেই অবাক হতাম, এ তার দশগুণ তো বটেই। জোনাস যে একজন শিল্পী, তাতে সন্দেহ নেই।

দোতলার বসবার ঘর আর তার পাশের ঘরের মাঝখানে একটা নকসাকাটা পার্টিশন দেওয়া ছিল, সেটাতে দেখলাম কব্জা দেওয়া। দুদিকে ঠেলে দিয়ে, দুটো ঘরকে একটা বড় ঘরে পরিণত করা হল। তার মাঝখানে মস্ত বড় কাঠের টবে অ্যানি আর জোনাস খৃষ্টমাস ট্রি সাজাল। তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। চোখ ঝলসে গেল। বড়মা একটা উঁচু চেয়ারে বসে গাছ সাজানোর তদারক করলেন। সায়ন পাগলের মতো চারদিকে দৌড়ে বেড়াতে লাগল।

আমি কাজকর্মের ফাঁকে একবার এসে যেই দাঁড়িয়েছি, অমনি সে ছুটে এসে, 'মা, মামো, ফুল, বাতি!' বলে হেসে কুটোপাটি। বড়মা হঠাৎ ভ্রূকুটি করে, কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ওটা? কাকে মা বলছে? নেতাটাকে বিদায় না করলে চলছে না দেখছি!' আমি এত কথা শুনবার জন্য দাঁড়াই নি। বড়মার ভ্রূকুটি দেখেই সেখান থেকে সরে পড়েছি। উনি আমাকে বোধ হয় ভালো করে দেখতেই পান নি। সায়নকে বললেন, 'তোমার নতুন পঁ-পঁ কে দিয়েছে?' সায়ন হেসে বলল, 'মামণি দেছে। তুমি দেহ।' অমনি রাগের কথা বড়মা ভুলে গেছিলেন। আমি আর ওদিক মাড়াই নি। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। দিনটা ভালোয় ভালোয় শেষ হলে বাঁচা যায়।

অতিথিরা আসবার অনেক আগেই আমরা অর্থাৎ বাড়ির লোকরা যদিও তাদের কারো সঙ্গে কারো কোনো রক্ত-সম্পর্ক ছিল না—সেজেগুজে তৈরি হয়েছিলাম। মিঃ সিংহ আর মিঃ সরকার ও'দের আপিস থেকে দুজন পিওন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা না থাকলে কি করে সব হয়ে উঠত বলতে পারি না। তাদের মনিবরা নিজেরাও একটু আগেই এসেছিলেন। ঘরের এক ধারে লম্বা টেবিলে সাদা ধবধবে বিলিতী ড্যামাস্কের চাদর পাতা, তার ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় সাদা সাজ দেওয়া কেকটা তাজমহলের মতো শোভা পাচ্ছিল। সারি সারি কাচের আর রুপোর বাসনে নানারকম খাবার, ফল, মিষ্টি। ছোট ছোট ডিস-এ চকোলেট, টফি টেবিলে রঙিন পতলা কাগজের কুচি ছড়ানো, এখানে ওখানে লাল নীল সোনালি টেনে ফাটাবার ক্র্যাকার সাজানো। দুজনে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হয়, দুম করে একটা আওয়াজ হয়, ভিতর থেকে খেলনা কি ছোট একটা পুঁতির মালা, কি কাগজের মুখোশ বেরোয়। বাসব সরকার এগুলো এনেছিলেন। মজা দেখাবার জন্য গোটা দুই ফাটালেন। সায়ন চমকে উঠে প্রথমটা চোখ ঢেকেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহল রাখতে পারে নি। আর আমি তো জন্মে এ জিনিস দেখি নি, বইয়ে এক-আধবার পেয়েছি অবিশ্যি—একেবারে থ' মেরে গেলাম। বড়মার কথা ভুলে গিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে তাঁর সামনে এসে হাজির হলাম। বড়মা আমাকে ডাকলেন, 'এদিকে এসো, মালা। দেখি কেমন সেজেছ।' তারপর নিজের গলা থেকে একটা ছোট্ট ছোট্ট মুক্তোর মালা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মী মেয়ের পুরস্কার। সর্বদা আমার সায়নকে এমনি যত্ন করে দেখো।' আমার তো হাত-পা ঠান্ডা। চেয়ে দেখলাম মিঃ সিংহ, মিঃ সরকার, অ্যানি, লক্ষ্মী, সকলের মুখে প্রসন্ন হাসি। আমতা আমতা করে ধন্যবাদ দিতে গেলাম। আমার মাথায় হত রেখে বললেন, 'না, না, এর চেয়েও বেশি দেওয়া উচিত ছিল। বাঃ বেশ মানিয়েছে তো।' এই রকম একটা বড়মাই নিশ্চয় অ্যানির স্মৃতিতে বিরাজ করেন। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কান লাল হয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় সিঁড়ির নিচে অনেক গুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমাদের অতিথিরা এল। ছোট ছোট কুড়িটি মানুষ, কারো বয়স সাতের বেশি নয়। বারোটি খুদে মেয়ে, আটটি খুদে ছেলে। সবার পরনে ফিকে রঙের কাপড়-জামা। পাদ্রী নাকি চাঁদা তুলে করিয়ে দিয়েছেন। সবাই এত জাঁক-জমক দেখে একেবারে স্তম্ভিত। কারো মুখে কথা নেই। এত বড় বড় চোখ।

চেয়ে দেখতে লাগলাম রোগা রোগা কালো কালো মুখগুলোতে আস্তে আস্তে কেমন হাসি ফুটল। সবাই সারি বেঁধে বড়মাকে বলল—মেরি খৃষ্ট মাস, এভারিবডি! বড়মাও হেসে বললেন 'মেরি খৃষ্টমাস! —ও দুটি কে?' দেখি সবার পিছনে ছোট একটি ছেলে, একটি মেয়ে, ফুটফুটে সুন্দর, চোখেমুখে কান্নাকাটির চিহ্ন, কেবলি অন্যদের পিছনে লুকোতে চেষ্টা করছে।

ওদের সঙ্গে দুজন বেজায় রোগা টিচার, ব্যস্ত-সমস্ত ভাব, মুখে রক্তের লেশ নেই, বাড়িতে তৈরি গাউন পরা, খুব ভালো ফিট হয় নি, দুজনেরই হাতে বড়মার জন্য গোলাপ ফুলের তোড়া। গির্জার বাগানের গোলাপ। বড়মা প্রসন্ন মুখে গ্রহণ করে, আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ দুজনের মুখ এত বিষণ্ণ কেন?' 'ওরা নতুন এসেছে; এখনো বোর্ডিং-এ থাকা অভ্যাস হয় নি।' বড়মা নিচু গলায় জানতে চাইলেন, 'ওদের মা-বাবা নেই? কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই? অনাথ আশ্রমের মতো চেহারা নয় তো।' বাস্তবিকই গোল গোল নরম নরম গাল, দেখে মনে হয় আদরে মানুষ হয়েছে। মেয়েটির বয়স হয়তো সাত, ছেলেটির পাঁচ। টিচাররা ওদের বাড়ির খবর বলতে পারল না। পাদ্রী নাকি সব জানেন। দিন চারেক হল ওদের নিয়ে এসেছেন।

কাছে ডাকতেই দুজনার চোখ জলে ভরে এল। ওদের টিচাররা ওদের বড়মার সামনে ঠেলে দিতেই কচি কচি ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল। অমনি সায়ন ছুটে গিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছি, কাঁদে না। মা আবাল এসেছে।' বড়মা গলে গেলেন। আমি আস্তে আস্তে পিছনে সরতে লাগলাম। বড়মা বললেন, 'অ্যানি, ওদের খাবার দাও, এবার। তারপর গান-টান হবে, সবার শেষে উপহার দেওয়া আর কেক কাটা। এই দুটি স্কুলে নতুন এসেছে, ওদের একটু দেখো।'

এত ভালো ভালো এত খাবার দেখে ছেলেমেয়েগুলো হাঁ হয়ে গেল। ছোট ছোট কার্ডবোর্ডের প্লেটে ওদের খাবার সাজিয়ে দিলাম, লক্ষ্মী আর আমি। বাসব সরকারও কখন এসে জুটে ছোট ছোট কাগজের গেলাসে লেমোনেড, কোকাকোলা ঢেলে দিতে লাগলেন। ছেলেমেয়ে দুটির গলা দিয়ে খাবার নামে না। উনি তাদের ডেকে আলাদা করে বসিয়ে, গল্প করে করে খাওয়াতে লাগলেন। পকেট থেকে দুটো তারের ম্যাজিকের খেলনা বের করে ওদের অবাক করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা হেসে ফেলল। মেয়েটাও হাসতে গিয়ে বিষম খেল। মুখে গলায় কোকাকোলার স্রোত। 'মিসেস কস্টেলো, কাণ্ড দেখুন। একটা ন্যাপকিন ট্যাপকিন আছে নাকি?' অ্যানি হাসতে হাসতে ছুটে এল। তারপর মুখ মুছিয়ে, ফ্রক ঝেড়ে টেনেটুনে দিতেই, গলায় একটা কি চকচক করে উঠল। সরু একটা রুপোর চেন। টান খেয়ে সেটা খুলে মাটিতে পড়ে গেল। অ্যানি তুলে দেখে একটা মরা সোনার লকেট। [illegible]টা খুলে গেছে, ভিতরে দুটি ফটোতে দুটি মুখ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি 'মাই ড্যাডি, মাই মামি!' বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অমনি ভাইও কাঁদতে লাগল। সায়নও মা, মা, মামো, করে কান্না জুড়ল। বাকি আঠারো জন অতিথিও এ ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, কেউ জোরে, কেউ আস্তে কাঁদতে লাগল। সে এক ব্যাপার।

সবাই মিলে ওদের শান্ত করবার জন্য ছুটোছুটি করছি। বুদ্ধি করে বাসব সরকার পোঁ করে একটা বাঁশি বাজিয়ে ডেকে বলল, 'এবার সবাইকে প্রেজেন্ট দেওয়া হবে, গাছের চারদিকে ঘিরে দাঁড়াও। গান গাও। চোখে জল, ঠোঁটে হাসি গাছ ঘিরে তারা দাঁড়াল। সবাই মিলে বড়দিনের গান ধরল। প্রত্যেকটি উপহারের গায়ে একটা করে নাম লেখা। বাসব একটা একটা করে পেড়ে, নামটা পড়ে দিয়ে বড়মার হাতে দিতে লাগলেন। যার জিনিস সে বড়মার হাত থেকে নিতে লাগল। বাসব পড়লেন, 'টোবি লী, মেরি লী, অ্যাগনেস ডি সুজা— অ্যানি হঠাৎ 'ও মাই গড!' বলে ঘর থেকে দৌড় দিল। আমিও পিছন পিছন যাচ্ছি-

লাম, কিন্তু মিঃ সিংহ পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যেও না মা, এদিকে ঠেকা দিতে হবে।' একে একে সব উপহার পড়া হয়ে গেল। বড়মাকে একটা ছোট্ট পুতুল, মিঃ সিংহকে লাট্টু, বাসবকে মারবেল, আমাকে একটা গোলাপী রিবন পেতে দেখে সকলের কি হাসি।

চারদিকে আবার শান্তি স্থাপিত হয়ে গেছে দেখে সকলে নিশ্চিন্ত। অ্যানির দেখা নেই, কেক কাটতে তার সায়নকে সাহায্য করার কথা। লক্ষ্মীকে পাঠানো হল। সে ফিরে এসে বলল, অ্যানি মেমসাহেব তার কোয়ার্টারে চলে গেছে। বোধ হয় শরীর শরীর খারাপ। জোনাস সাহেব এসেছে।

এতক্ষণ জোনাস আড়াল থেকে সব দেখছিল। এবার সে এগিয়ে এসে সায়নের হাত ধরে আবার উপরের কেকটাতে সরু লম্বা ছুরটা দিয়ে একটা খোঁচা দিল। দেখা গেল ভেতরটা সুন্দর সমান মাপের তিনকোণা টুকরো দিয়ে তৈরি। সায়ন খিল খিল করে হেসে উঠল। একজন পিওন একটা ঝুড়ি এনে পাশে রাখল। ঝুড়ি ভরা ছোট ছোট গোলাপী কার্ডবোর্ডের বাকস। জোনাস একটা করে বাকসে এক টুকরো কেক ভরে আমার হাতে দিতে লাগল। আমি সেগুলো একেকজন অতিথির হাতে দিলাম। ওদের টিচাররা বুঝিয়ে বলল, এখন তোমাদের পেট ভরা, এখন তো খাবার জায়গা হবে না। তাই বাড়ি নিয়ে গিয়ে খেতে খেও।

ততক্ষণে সবাই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। আমার মনে হচ্ছিল পা দুটোতে আর জোর নেই। সায়নকে দেখা গেল বড়মার পা রাখার গদী মোড়া টুলে হেস দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বড়মা একেক বার সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছেন। অতিথিরা চকোলেট লজেঞ্জুসের ছোট ছোট পুঁটলি, একটা করে রঙিন লম্বা হাতা পশমি কোট, একটা করে ক্যালকাটা ইত্যাদি কোলভরা জিনিস নিয়ে বিদায় নিল। তাদের সঙ্গে ঝুড়ি ভরা বাড়তি খাবার নিয়ে লোক গেল। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, এমন সময় একবার দেখলাম অ্যানি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে আছে। তারপরেই আর দেখতে পেলাম না।

(১৩)

পার্টির জন্য ঝাড়বাতিতে লাল মোমবাতি লাগানো হয়েছিল, সেগুলো সব জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গেছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমার মনেও একটা রঙিন আলো জ্বলে জ্বলে ফুরিয়ে গেল। সায়নকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলাম। বড়মা লক্ষ্মীর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোলেন, যেন কত বয়স, শরীরটা যেন কত ভারি। দরজার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে, গম্ভীর মুখ করে অ্যানি এসে লক্ষ্মীকে সরিয়ে দিয়ে বড়মাকে ধরল। বড়মা একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার কাছে লুকিও না। একটা কিছু হয়েছে।" যেতে যেতে এইটুকু শুনলাম।

সায়নকে শুইয়ে দিয়ে এঘরে আসতেই দেখি মিঃ সিংহ আর বাসব সরকার বড় বসবার ঘরের দরজা বন্ধ করাচ্ছেন। আমার দিকে ফিরে মিঃ সিংহ বললেন, "আজকের মতো ক্ষান্তি দাও, মা। কালকের জন্য অনেক কাজ রয়েছে। জোনাস তোমার ট্রে সাজাচ্ছে, লক্ষ্মী তোমার ঘরে দিয়ে আসবে। যা হয় খেও, মা, শরীরটাকে ভালো রাখতে হবে। হয়তো আরো পরীক্ষা এগিয়ে আসছে।"

তাঁকে আশ্বস্ত করলাম। বাসব সরকার কিছু বললেন না, শুধু এক নজর তাকিয়ে দেখলেন। বড়মার ঘর থেকে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। হেসে বললেন, "এত উত্তেজনার পরেও ভালোই আছেন। তবু একটা মাইল্ড সেডেটিভ দিলাম। সারা রাত স্বাভাবিক ঘুম হবে। কই আমার ছাতা কই?" জোনাস তাঁকে দেখে এগিয়ে এসেছিল। বলল, "আপনার গাড়িতে তুলে দিয়েছি, স্যার। অ্যানিকে কেমন দেখলেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "সুন্দর ভালো। আসল রুগী তো সে নয়, আসল রুগী তুমি। মদ খাওয়াটা ছাড়, জোনাস, তাহলে অ্যানির আরো ত্রিশ বছর না বাঁচার কারণ নেই।" জোনাস তার উত্তর না দিয়ে বলল, "কিছু বলল নাকি আপনাকে?" "না তো, কিছু বলার ছিল নাকি?" জোনাস আমতা-আমতা করতে লাগল। মিঃ সরকার বললেন,

"আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান, ডাক্তারবাবু! জোনাস, এদিকের কাজ হয়ে গেল, তুমিও বাড়ি যাও। অ্যানির দুশ্চিন্তার কারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা দুজন আছি। তবু তোমার উদ্বেগ দেখে খুসি না হয়ে পারলাম না।"

ততক্ষণে ডাক্তারবাবু নিচে নেমে গেছেন। জোনাস বলল, "আমি—আমি কি আর জানি না স্যার, কত অযোগ্য আমি। অযোগ্য হতে পারি কিন্তু একেবারে অকৃতজ্ঞ নই। সত্যি বলছি অ্যানি যাতে সুখী হয় আমি তাই চাই।"

মিঃ সরকার বললেন, "এবার সেটার পরীক্ষা হবে, জোনাস। শুধু মুখের কথার খুব বেশি দাম নেই। ক্যান্টিনের কাজটা করতে হলে ভোর সাতটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত প্রকৃতিস্থ থাকতে হবে। পারবে?"

জোনাস বলল, "চেষ্টা করব।" "না, তাতে হবে না। পারতেই হবে। ২রা জানুয়ারী থেকে কাজ শুরু, তিন মাসের প্রোবেশন। চারশো টাকাতে আরম্ভ। ভালো কাজ করলে বাড়বে—"

জোনাস টলতে টলতে নিজের কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিল। মিঃ সিংহ বললেন, "আবার কি হল? এরই মধ্যে কিছু খেয়েছে টেয়েছে নাকি? এতক্ষণ তো বেজায় খাটছিল।" মিঃ সরকার হাসলেন, "না না, তা নয়, ওটা আবেগের আতিশয্য। চলুন পাদ্রীর কাছে। গেলাম, মালা।"

"গেলাম, মালা।" ঐটুকু একটুখানি অন্তরঙ্গতার সুর শুনেই একটা কোমল অনুভূতিতে আমার মনটা ভরে গেল। ডানা গুটিয়ে পাখি ডালের উপর বসল। ঘরে গিয়ে দেখি লক্ষ্মী কখন জোনাসের সাজানো ট্রে রেখে গেছে। হঠাৎ মনটা ভালো হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম বেজায় খিদে পেয়েছে। খাসা খাবার করেছিল জোনাস। খাওয়া হয়ে গেলেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কই, টিকালু তো আসে নি! বড়দিনের পার্টির এত বর্ণনা করে আসা সত্ত্বেও টিকালি কেন এল না ভেবে পেলাম না। তবে কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। অবিশ্যি অনিমেষের বাধা দেওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। আমারি উচিত ছিল ওকে আনা এবং দিয়ে আসা। মিঃ সরকারকে একটু বললেই হয়ে যেত। রাশি রাশি খাবার বাকি রয়েছে। কাল সকালে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। অ্যানির শরীর খারাপ, আমার আর বাড়ি থেকে বেরুনো উচিত হবে না। কিন্তু পাদ্রীর কাছে, এত রাতে উকীলদের যাবার কি মানে হতে পারে ভেবে পেলাম না।

সাধারণতঃ মনে দুশ্চিন্তা থাকলে আমার ঘুম হয় না, কিন্তু সেদিন বালিশে মাথা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। সায়নদেবও একবারও ওঠেনি, আমিও না। সকালে অভ্যাস মতো দেখি একটা খুদে নরম গরম শরীর আমার গায়ে লেপটে রয়েছে। আমি উঠে পড়তেই, ঘুমের ঘোরে একবার ডাকল, মাম্মা, তারপরেই আবার শান্ত হয়ে শুয়ে রইল। লক্ষ্মী খাবার নিয়ে আসা অবধি সে শুয়েই রইল। লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "আজ অ্যানি মেমসায়েব ভালোই আছে মনে হল। বড়মা উঠে শুধু খেয়ে, স্নান করে, আবার আরাম কেদারায় শুয়েছেন। কালকের পরিশ্রমের পর আজ ডাক্তারবাবু ঘর থেকে বেরুতে বা উঠতে মানা করেছেন। একবার পাঁচ মিনিটের জন্য সায়নকে দেখতে চেয়েছেন।"

বড়মা শুয়েই ছিলেন। আমাদের দেখে উঠে বসলেন। সায়নকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমো খেয়ে, আমার দিকে তাকালেন। মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। "ওকি নেতা, আমার হীরাগঞ্জের প্রজাদের দেওয়া হার তোর গলায় কেন? বদভ্যাস এখনো যায়নি দেখছি। তোর মাও—" কথা বলতে বলতে বড়মার গলাটা একটু একটু করে চড়ছিল। অ্যানি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট কাচের গেলাসে গোলাপী ওষুধ ঢালছিল। সে দুই দীর্ঘ পদক্ষেপে বড়মার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ধমকের মতো গলা করে বলল, "ওকি হচ্ছে, ম্যাডাম! ও নেতা হবে কেন? ওতো মালা, বেবিকে দেখে। বি-এ পাশ। ও হার তো কাল আমাদের সকলের সামনে আপনিই ওকে দিলেন। রাজার মেয়েরা উপহার ফিরিয়ে নেয় তা তো জানতাম না? তাছাড়া নেতা আবার কি? নেতা তো কোনকালে চলে গেছে। মালাকে রোজ রোজ অপমান করলে, সে-ই বা থাকবে কেন? ও চলে গেলে সায়নের দেখাশুনো কি মুখপু লক্ষ্মী করবে?"

অ্যানির গলায় দৃঢ় স্বর, কিন্তু চোখের নিচে গভীর কালি। বড়-মা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, মুখে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা গেল। "ঠিক বলেছিস, অ্যানি। অনেকদিন শরীরটা ক্লান্ত থাকলে কিরকম গোলমাল লাগে। ভালো করে সব কথা মনে করতে পারি না। বিশেষ করে যে-কথা মনে রাখা দরকার। নইলে সেই মেয়েমানুষটার বড্ড বাড় বাড়বে। তবু সব যেন কেমন অস্পষ্ট হয়ে যায়। কি বলছিলাম, অ্যানি "

অ্যানি কাছে এসে তাঁর পিঠে হাত রেখে, ওষুধের গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে ধরল। উনিও হাঁ করলেন, অ্যানি ওষুধ ঢেলে দিয়ে বলল, "বলছিলেন যে মালা বড় ভালো মেয়ে বলে খুশি হয়ে ওকে হীরাগঞ্জের প্রজাদের হারটা দিয়েছেন। ওর মতো লক্ষ্মী মেয়ের পক্ষে তাও যথেষ্ট হয়নি।" বড়মা ক্লান্ত স্বরে বললেন, "ঠিক তাই। মালা, তুমি বড় লক্ষ্মী!"

আমি চলে যাচ্ছিলাম, কারণ সায়ন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, মুখখানিকে বড় করুণ দেখাচ্ছিল। তাকে কোলে তুলে নিলাম। অ্যানি বলল, "তোমার সঙ্গে কথা আছে।" বাইরে দাঁড়ালাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যানি বেরিয়ে এসে বলল, "সায়ন লক্ষ্মীর সঙ্গে নিচে ঘাস জমিতে খেলতে যাক না। এই যে ওর নতুন বল, কাল মিঃ সরকার দিয়ে গেছেন।" প্রায় ফুটবলের মতো বড় রবারের মতো কিছু দিয়ে তৈরি রঙচঙে বল। সায়ন মহা খুসি।

সে নিচে গেলে অ্যানি আমার ঘরে গিয়ে বসল। "মালা, সব গোলমেলে লাগছে।" "কেন বলতো? অ্যানি, কাল কি হয়েছিল?" অ্যানি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। "ওরা দুজন আমার ম্যারিয়নের ছেলেমেয়ে। আমার নাতি নাতনি অর্ফানেজে থাকে। এও আমাকে দেখতে হল?"

"ঠিক জান, অ্যানি, ঠিক জান তো?" অ্যানি ম্লান হাসল। "গলার লকেটটা আমি ম্যারিয়নকে দিয়েছিলাম, ভিতরে দেখলাম ম্যারিয়নের আর তার স্বামীর ছবি। মালা, বাইবেলে আছে মেনি ওয়াটার্স ক্যানট কোয়েঞ্চ লাভ, বহু জল ঢাললেও ভালোবাসার আগুন নেবে না। আমার ম্যারিয়ন আর তার স্বামী নিশ্চয় মরে গেছে। আমার গ্র্যাণ্ড-চিল্ড্রেনরা।" বাধা দিয়ে বললাম, "সত্যি বল অ্যানি, ম্যারিয়ন তোমার নিজের মেয়ে নয়?"

অ্যানি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "আমার নিজের মেয়ে, মালা। আমার তখন বিয়ে হয়নি। পরে এখানে কাজে ঢুকেছি। ম্যাডামের কানে কথাটা যেতেই বললেন, অসহায় শিশুকে ফেলে দিলে পাপ হয়, অ্যানি। ওকে এখানে মানুষ কর। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। "লোকে কি বলবে ম্যাডাম?" রেগে গেলেন, "তোমার বোনের সন্তান তুমি যেখানে খুসি মানুষ করবে, কারো কিছু বলার নেই"—ছুটি দিলেন। পাহাড়ে একটা মিশনারী হাসপাতালে ম্যারিয়ন জন্মাল। তাকে নিয়ে ফিরে এলাম। সবাই জানে ও আমার বোনের মেয়ে। এখানেই মানুষ হল। ম্যাডাম ওর বাবার নামও কখনো জানতে চাননি। সে ছিল একজন ইংরেজ এবং বিবাহিত আমি জানতাম না। বাড়ির আবহাওয়া থেকে যেমন করে হোক পালাতে পারলে আর কিছু চাইতাম না। ভেবেছিলাম আমাকে বিয়ে করে বড়-মেমসাহেব বানিয়ে দেবে। হায়, ভগবান! আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী ছিল না।"

অ্যানি চোখ মুছে আমার দিকে চাইল। তারপর বলল, "কাল রাতে ঘরে এসেই বললেন, "ঐ না তোমার বোনের মেয়ে, অ্যানি? কিন্তু অর্ফ্যানেজে কেন? ছোট শিশুদের বুকে করে রাখতে হয়, তাও জান না। দেখ না, আমার ছেলেকে আমি কেমন করে আগলাই। ওঁর সময়ের হিসাব নেই, মালা তোরিকে মনে করছেন ম্যারিয়ন। ওঁর মনটা বাইশ বছর আগে বাস করে আমি এখন কি করি বলতো?"

বললাম, "কাল রাতে মিঃ সিংহ আর মিঃ সরকার বোধ হয় পাদ্রীর কাছে ওদের সন্ধান নিতে গেছিলেন। জোনাস কিছু বলে থাকবে।"

অ্যানির মুখ সাদা হয়ে গেল। "জোনাস? না, না, জোনাস এ বিষয়ে কিছুই জানে না, ও মনে করে ও বুঝি একজন নিষ্পাপ কুমারী বিয়ে করেছে, তার যতই বয়স হক

না কেন। আমার মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পেলে ও ক্ষমা করবে না।"

ভয়ানক রাগ হল, "ও আবার কেমন কথা। তুমি রোজ রোজ তার শত শত অপরাধ ক্ষমা করছ, যতদিন বেঁচে আছ করবেও। আর ও তোমার অল্প বয়সের দুর্বলতা ক্ষমা করবে না? তোমার জোনাসকে তুমি তাহলে চেন না।"

অ্যানির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "জান মালা, এই প্রথম কেউ জোনাসকে ভালো বলল। সবাই বলে ও একটা লক্ষ্মীছাড়া, নিজের গুণ নিজে নষ্ট করে ফেলছে। ঠিকই বলে তারা, সে কি আর আমি জানি না! তবু মনে হয় আরেকটা চান্স পেলে হয়তো ও শুধরে যেতেও পারে।"

আমি বললাম, "সে সুযোগ ২রা জানুয়ারির থেকেই পাবে। তখন দেখা যাবে।" অ্যানি তো অবাক! "কি বলছ, মালা?" "ঠিকই বলছি। কাল মিঃ সরকার আমার সামনেই ওকে বললেন। তিন মাস প্রোবেশন, চারশো টাকা মাইনে।" অ্যানি ঝুপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, হাত জোড় করে বলল, "গাছ থেকে পাখির ছানা পড়ে গেলেও তুমি দেখতে পাও। জিসু, তাই আমার জোনাসের উপর দয়া দয়া! তোমার ভালবাসার কৃতজ্ঞতা জেনো।"

তারপর উঠে বসে করুণ স্বরে বলল, "তাহলে জোনাস আর আমার সঙ্গে থাকবে কেন, বল মালা? ওদের কথা জানতে পারলে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে।" "কেন, তোমার বোনঝির ছেলে-মেয়ে কি দোষ করল?" অ্যানি চমকে উঠল। "কি বলছ, মালা? জোনাসের কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারব না। আমার যা হয় হবে। ওদের চোখের পাতায় জল দেখেছিলে, মালা? লকেটের উপর মেয়েটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে, মাই নানা মাই ড্যাডি বলে কেঁদে উঠেছিল শুনেছিলে? ওদের কি করে ত্যাগ করব, বলতে পার?"

ওর কথা শুনতে শুনতে আমার প্রাণটাও আঁকু-পাঁকু করে উঠেছিল। আমার বাবা যখন আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছিল, দাদা-মশাইয়েরও কি ঐরকম মনে হয়েছিল? লক্ষ্মী এসে বলল, উকিলবাবুরা অ্যানি মেমসায়েবকে ডেকেছেন। অ্যানি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে, তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

রোজ সকালে আমার কাজের অন্ত থাকে না। ভাঁড়ারের চাবি আমার কাছে থাকে; বামুন-ঠাকুর নিজের কাজ আমার চেয়ে ভালো বোঝে, তবু ভাঁড়ার খুলে দিয়ে একবার দাঁড়াতে হয়। কি হবে না হবে, কি ফুরোল, কি হারাল, তাও শুনতে হয়। তার উপর সেদিন আরো বেশি কাজ ছিল। রাতে জোনাস বাড়তি খাবার, ভাঁড়ার ঘরের প্রকাণ্ড পুরনো বিলিতী রেফ্রিজারেটরে পুরে দিয়ে চলে গেছিল। সে-সবের একটা বিহিত করতে হবে। তাতেই বাড়িসুদ্ধ সকলের দু' দিনের জলখাবার হয়ে যাবে। কার কার বাড়িতে যেন পাঠাতে হবে, অ্যানি বলেছিল। সিংহ-সরকারের আপিসের কেরাণীরা কেক ভালোবাসে। পিওন, দরোয়ান, ড্রাইভারকে কালকেই সব দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এ-সব খাবে না, তাদের বড়মা টাকা দিতে বলেছিলেন। কোথা দিয়ে সকালটা কেটে গেল। সায়নের স্নানের সময় উপরে এসে দেখি, বসবার ঘরের ঝাড়-পোঁছ হচ্ছে মাঝ-খানের পার্টিশন টেনে যথাস্থানে রাখা হচ্ছে, দামী গালচে গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে। এ-সব তোলা জিনিস। বোখারায় তৈরি। তার জায়গায় সাধারণ মির্জাপুরী গালচে পাতা থাকবে।

আর দেখলাম পার্টিশনের পিছনে বড় কৌচে টোবি লী আর মেরি লীকে বুকে জড়িয়ে ধরে অ্যানিও কাঁদছে, তারাও কাঁদছে। পাশে পড়ে আছে ছোট ছোট দুটি পুরনো ছেঁড়া সুটকেস। আমার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। পা টিপে টিপে চলে যাচ্ছিলাম, অ্যানি মুখ তুলে ডেকে বলল, "যেও না, মালা।" তোমাদের আন্টিকে গুড-মর্ণিং বলবে না, টোবি, মেরি?" মন্ত্রচালিতের মতো তারা সমস্বরে বলে উঠল, "গুডমর্ণিং, আন্টি।" একটা ট্রেতে দুটি বড় গ্লাসে দুধ আর একটা ছোট গ্লাসে ব্র্যান্ডি নিয়ে জোনাস ঢুকল। তার মুখে গোবেচারা-চোরের ভাব দেখে বুঝলাম তার আর কিছু জানতে বাকি নেই। আমাকে দেখেই অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "অ্যানির হার্টটা একটু দুর্বল কিনা, তাই ব্র্যান্ডি আনলাম। কাপবোর্ডে খাবার আছে। মিস গ্র্যান্ড-চিল্ড্রেনদের একটু দিই?" আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না।

সায়নকে মিঃ সরকার বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দিনটা ছিল রবিবার, ও'দের আপিস বন্ধ। অ্যানি বলল, 'মালা, মিঃ সরকারের জন্য এটা সম্ভব হল। এ ঋণ শোধ হয় না। অবিশ্যি দয়ার ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করাও পাপ।" কাছে গিয়ে বললাম, 'আর ওদের-ওদের-তোমার—?' জোনাস তড়বড় করে বলল, 'কাদের কথা বলছেন, মিস? ম্যারিয়ন আর জনির কথা? মোটর অ্যাকসিডেন্টে তারা বেজায় আহত হয়েছিল, মাদ্রাজে কোথায় ভালো হাসপাতাল আছে, মিশন থেকে সেখানে পাঠিয়েছে। পাদ্রী অ্যারেঞ্জ করেছে, বাচ্চাদুটোকে বোর্ডিং-এ রেখেছে। ওদের মামি ডাডি সেরে সুরে ফিরে এলে, আবার ওরা ম্যাক লেনের বাড়িতে গিয়ে থাকবে কেমন কি-না গুড গ্যাল গুড বয়?' এই বলে জোনাস টোবির পিঠে আস্তে করে চাপড় মারল। ওদের চারদিক ঘিরে এমন একটা পারিবারিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হল যে নিজেকে নিতান্ত একটা বাইরের লোক মনে হওয়াতে, অ্যানিকে বললাম, 'যাই, সায়নের স্নানের সময় হয়ে গেল। এরা স্নান করবে না?'

মেরি বলল, 'আমরা ঘুম থেকে উঠেই স্নান করেছি।' টোবি বলল, 'কনকনে ঠান্ডা জলে।' অ্যানি আবার ওদের জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাল তোমাদের জন্য গরম জল করে দেব।' জোনাস বলল, 'আপাততঃ কেক, পাউরুটি, স্যান্ডউইচ, টফি! চল, চল চল!'

একমাত্র চার্লস ডিকেন্স এই ধরনের গল্প লিখত। (ক্রমশঃ)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুপমার প্রেম নাটকটি রঙমহলে মুক্তিলাভ করলো। ২৭ সেপ্টেম্বর। নাটকটিতে আমি অবতীর্ণ হয়েছিলাম; সুহাসিনী, মিহির, রাজলক্ষ্মী (ছোট) ছাড়া রংমহলের নিয়মিত শিল্পীরাও ছিলেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না। সাজসজ্জাতেও কমতি কিছু ছিল না। কিন্তু নাটকের শেষাংশে শিল্পীরা নাটক ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন। তবুও নাটকটি প্রশংসা পায়নি এমন নয়।

এ সময়ে সাধারণভাবে শহরের যান-বাহনের সমস্যাটা খুব প্রকট হয়েছিল বাস ধর্মঘটের দরুণ। ২৬ তারিখে বাস ধর্মঘট যদিও প্রত্যাহৃত হলো, কিন্তু ট্রেন ধর্মঘট তখনো চলছে। অনুপমার প্রেম না চলার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল এই ধর্মঘট। তবুও বলবো, শিল্পীদের ব্যর্থতার দরুণ নাটক জমলো না। এ ব্যর্থতা আমারও। এই ব্যর্থতা যে শিল্পীর জীবনে কতখানি লজ্জার—আমি অভিনেতা, তা অনুভব করি। তাছাড়া পুজোর আগে, কোন নতুন নাটকের এভাবে মারখাওয়া ভালো কথা নয়।

পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন মঞ্চে নতুন নাটক অভিনয়ের তোড়জোড় চলছে। ১১ অকটোবর স্টারে উদ্বোধন হলো একটি ঐতিহাসিক নাটক। নাম 'পলাশী'। এর পরদিন মিনার্ভা উপহার দিলে শচীন সেন-গুপ্তের গৈরিক পতাকা। নাটকে শিবাজীর ভূমিকায় কমল মিত্র রূপদান করলে।

মহাসপ্তমীর দিনে একটা দুর্ঘটনার খবর পড়লাম। অরোরা ফিল্ম কর্পোরে-শনের নারিকেলডাঙার গুদামে আগুন লাগার খবরটা পড়েই অনাদি বসুকে ফোন করলাম। ফোন ধরলো, অনাদিবাবুর ছেলে 'ছোট'। তার কাছেই সব শুনলাম। তারপর, অনাদিবাবু ফোন ধরলেন। কথায় বুঝলাম, অনাদিবাবু খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ফিল্মের গুদামে আগুন লাগলে যে কতো ক্ষতি, তা বলা যায় না। কতো মূল্য-বান ছবি চলে যায়। যেমন এর আগে ম্যাডানের গুদামে আগুন লাগতে 'সোল-অব-এ-স্লেভ'-এর মতো ছবির নেগেটিভও পুড়ে যায়। অরোরার গুদামে আগুন লাগাতেও অনুরূপ কতো ছবি চলে গেল।

শিশির ভাদুড়ী আবার পুরোনো নাটকে অভিনয় আরম্ভ করলেন শ্রীরঙ্গমে। কখনো ষোড়শী, কখনো আলমগীর, কখনো আর কোন নাটক। যাই হোক, এই সব পুরানো নাটকের আকর্ষণ তখনো বিন্দুমাত্র কমেনি। তাছাড়া শিশিরবাবুর অভিনয় দেখার আগ্রহ তো আছে। ভালোই চলতে লাগলো শ্রীরঙগম।

এই সময়েই মধ্য কলকাতায় একটি চিত্র-গৃহের উদ্বোধন হলো। চিত্রগৃহটির নাম বীণা।

চন্দ্রশেখর এক সময়ের জনপ্রিয় নাটক। নাটকটি দক্ষিণ কলিকাতায় কালিকা থিয়ে-টারে অভিনয় হলো ২ নভেম্বর। আমি অভিনয় করেছিলাম বিশ্বাসের ভূমিকায়, নির্মলেন্দু সেজেছিল নবাব, ধীরাজ নেমে-ছিল প্রতাপের ভূমিকায়, নরেশ মিত্র ছিলেন ফস্টারের চরিত্রে। আর শৈবলিনীর চরিত্রে রূপ দিয়েছিল মলিনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবক্ষ মর্মর মূর্তির উন্মোচন হয়েছিল ঐ সময়ে। ঐ দিনের মূর্তির উন্মোচন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন শৈলপতি চাটার্জি, প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক মন্মথ বসু আর উৎসবে মঙ্গলাচরণ করেছিলেন অশোক শাস্ত্রী।

মানুষ যা ভাবে, তা হয় না, আর যা হয় তা ভাবার বাইরে। অমল ব্যানার্জী মারা যাবে এটা অভাবনীয় ঘটনা।

অমলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কেমন যেন বিস্মিত হলাম। মানুষটা কদিন আগেও ছিল, এই তো বিজয়ার পর সে আমাকে ফোনে শুভেচ্ছা জানালো, তারপর এ কথাও বললো, দিন কয়েকের জন্যে দেওঘর যাচ্ছে সে হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে। দেওঘর গেল, ফিরে এলো। ফিরে এসে আমাকে ফোন করলে। সবই তো কদিন আগের কথা। অথচ সেই মানুষটা আজ আর নেই।

অমলের মৃত্যুতে মঞ্চের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল সে। রংমহলের চলতি নাটক অনুপমার প্রেমেও সে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করতো। এখানেও তো তার অভাব পূরণ হবার নয়।

অমলের মৃত্যুতে সেদিন ৩ নভেম্বর কলকাতায় রঙমহল আর মিনার্ভায় অভিনয় বন্ধ ছিল।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজ-নীতিতে একটা আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছিল। বিশেষ করে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু, আজাদ হিন্দ ফৌজের কারাবরণ এবং তার বিচার—এই নিয়ে সমগ্র দেশের যুব-মানসে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

২১ নভেম্বর অপরাহ্নের স্মৃতি এখনো কলকাতার মানুষের মনে। সেদিন ছিল ছাত্রশোভাযাত্রার দিন। আজাদ হিন্দবাহিনীর মুক্তির দাবীতে সেদিন কলকাতার ছাত্রসমাজ মিছিল করে আসছিল রাজভবনের দিকে। সে মিছিলের গতি ছিল দুর্বার। এসপ্লানে-ডের কাছে ম্যাডান স্ট্রীট আর ধর্মতলা স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে পুলিশ সে মিছিলের গতিরোধ করে। মিছিল তবু এগিয়ে যেতে চায়। তারপর যা হবার, তাই হলো। শুরু হলো পুলিশের গুলিচালনা। এই গুলি-চালনার ফলে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়, তাছাড়া সেদিনের আহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন বাইশে নভেম্বর কলকাতা শহরে হরতাল প্রতি-পালিত হলো। সেদিনও পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে। সেদিনও বেশ কিছু লোক হতাহত হলো। এ-ছাড়া গতদিনের ঘটনায় আহত অবস্থায় যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যেও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে এ সংবাদও পেলাম।

সারা দেশে ঝড়ের পূর্বাভাস। পরদিনও গোটা শহরে হরতাল প্রতিপালিত হলো। এমন হরতাল বোধহয় এর আগে হয়নি। কোন যানবাহন নেই, কোন কিছু নেই—এমন কি রাস্তার আলোগুলো জ্বলে নি। সারা শহরে সে যেন এক অভাবনীয় অবস্থা। যুবশক্তির এমন উত্তাল তরঙ্গ এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

সারা শহরে সেনাবাহিনীর টহল, তবুও ছাত্রদের মধ্যে সে কী উন্মাদনা। সেনা-বাহিনীর খালি ট্রাকে তারা অগ্নিসংযোগ করলো। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তারা এগিয়ে গেল রাইফেল আর মেসিনগানের সামনে।

ঐদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ছাত্রসভায় ভাষণ দিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রদের শান্ত এবং সংযত থাকতে বললেন। এ-ছাড়া ঐদিন রাত্রে বাংলার গভর্নরও বেতার ভাষণ দিলেন।

পরদিন ২৪ নভেম্বর। কলকাতায় তখনো স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি। তবুও আগের দিনের চেয়ে আজ যেন কিছুটা শান্তি বজায় রইলো। সেনাবাহিনীর অবিরাম টহলের মধ্যে, দু' চারখানি ট্রাম বাস চললো। তবে তা না চলারই সামিল। এদিনের সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী কদিনের ঘটনায় মোট নিহতের সংখ্যা ৫৪ আর আহতের সংখ্যা ১৩২ জন।

২৫ তারিখ থেকে কলকাতা কিছুটা স্বাভাবিক হলেও কর্পোরেশনের ধর্মঘট তখনো অব্যাহত রইলো। কিন্তু এর পরের দিনে কর্পোরেশন ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হলেও সেদিনেও কিন্তু কর্মীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কাজে যোগ দেয়নি।

কলকাতা শহরের স্বাভাবিকতা ধীরে ধীরে ফিরে এলেও একটা চাপা বিক্ষোভ জমা হয়ে রইলো ছাত্র এবং যুবসমাজে। যে কোন মুহূর্তে এই বিক্ষোভ আবার চূড়ান্ত আকার ধারণ করতে পারে।

এ-ছাড়া দেশের রাজনীতিতেও একটা চাপা উত্তেজনা—তারও প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা যায় না এমন নয়। ঘটনার গতি কোন দিকে যাবে, ভবিষ্যতই তা প্রমাণ করবে.

নিশিকান্ত বসুরায়ের বঙ্গে বর্গী নাটকটি পুরোনো হবার নয়। রঙমহলে এই নাটকটির পুনরাভিনয় তা প্রমাণ করলো। ১৩ ডিসেম্বরের এই অভিনয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, আর আমি নেমেছিলাম আলীবর্দির ভূমিকায়। শরৎ অভিনয় করেছিল জানোজীর চরিত্রে। সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ভূপেন চক্রবর্তী। স্ত্রী-চরিত্রে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাবালা, মমতা, পদ্মা এবং আরো অনেকে। তুলসী চক্রবর্তী এবং আশু বোস ছিলেন সেদিনের ভূমিকা-লিপিতে।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের গৃহলক্ষ্মী ছবিতে আমিও অভিনয় করেছিলাম। ছবিটি মুক্তি লাভ করেছিল ১৪ ডিসেম্বর।

১৭ ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখলাম মিনার্ভায় আসছে ২১ তারিখ থেকে অভিনীত হবে 'মেবার পতন'।

'মেবার পতন' যেদিন মিনার্ভায় নতুন করে অভিনয় শুরু করলে, সেই দিনই কালিকা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের মেজদিদির উদ্বোধন হলো। মেজদিদির নাট্যরূপ বিধায়ক ভট্টাচার্যের। আবার ঠিক ঐ দিনেই ষ্টার মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন ঐতিহাসিক নাটক উপহার দিলে। নাটকটির নাম শতবর্ষ আগে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা।

প্রমথেশ বড়ুয়ার 'আমিরী' ছবিটিও ঐ একই তারিখে মুক্তিলাভ করেছিল।

২১ ডিসেম্বর যদিও মিনার্ভায় মেবার পতন অভিনয় শুরু হলো, তবুও আমরা রংমহলে ঐ নাটক অভিনয় আরম্ভ করলাম ২৯ ডিসেম্বর। আমি ঐ দিনের অভিনয়ে গোবিন্দ সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। এ-ছাড়া নির্মলেন্দুবাবু ছিলেন সাগর সিংহের ভূমিকায়, শরৎ অভিনয় করেছিল রাণা সমর সিংহের চরিত্রে। এ ছাড়া অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিল সুহাসিনী, ছোট রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী। সেদিন অভিনয়ে আশাতীত দর্শক সমাগম হয়েছিল।

এবারে মেবার পতন নাটকটিকে নতুন করে পরিমার্জিত করার দায়িত্ব ছিল আমার হাতেই। এই কাজটি করেছিলাম যাগ-আঁচড়ায় থাকতে।

১৯৪৫ সালের শেষ রজনীর নাটক ছিল 'মেবার পতন আর চরিত্রহীন। দুটিই পুরোনো নাটক। কিন্তু দর্শকদের কাছে নাটক দুটির আকর্ষণ তখনো কমেনি।

সে রাত্রে অভিনয় শেষে বাড়ি ফিরছি। ফিরতি পথে দেখলাম আলোয় আলোয় ভরে গেছে চৌরঙ্গী অঞ্চল।

বাড়িতে এলাম। প্রতি দিনের নিয়মে সে রাত্রেও আহারাদির পর শয্যা গ্রহণ করেছি। পিছন ফিরে তাকাতে চাই না, তবু পিছন দিকে ফিরে চাই। ফিরে চাই ফেলে আসা পুরোনো ছরটির দিকে।

নানা ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে মনের অঙ্গন-প্রাঙ্গণ জুড়ে।

স্বাগত জানালাম, ১৯৪৬-এর প্রথম দিনটিকে।

নববর্ষের নাটক ছিল মেবার পতন আর বাঙ্গাবগী। দুটি নাটকই দর্শকবৃন্দকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সে দিক থেকে নতুন বছরের সূচনা ভালোই। এরই মধ্যে রাণীবালার সম্মানে মিনার্ভায় মিশর-কুমারী অভিনয় হলো ৪ঠা জানুয়ারী। বলাবাহুল্য, সেদিনের অভিনয়ে আমি নেমেছিলাম আবনের ভূমিকায়। এ-ছাড়া সে রাতে শিল্পী ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, কমল মিত্র, সরযূবালা, শান্তি গুপ্তা এবং রাণীবালা।

জানুয়ারী মাসে নতুন খবর তেমন নেই। যেমন চলছিল, তেমনই চললো। শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত উল্কা নাটকটি শ্রীরঙ্গমে প্রথম অভিনয় হলো ৮ ফেব্রুয়ারী।

অনেকদিন শান্ত ছিল কলকাতা শহর। নভেম্বরের সেই ছাত্র আন্দোলনের পর থেকে আর তেমন কিছু ঘটেনি। কিন্তু ১১ ফেব্রুয়ারী এক ছাত্র মিছিলে পুলিশের লাঠি-চার্জের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো।

এই উত্তেজনা চরমে পৌঁছলো পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারী। বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হলো। এই বিক্ষোভ অন্যান্য স্তরেও ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ এই সব বিক্ষোভকে উপলক্ষ্য করে গুলি চালালো, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়লো। ফলে বিক্ষোভ আরো ছড়িয়ে পড়লো।

চার পাঁচ দিন ধরে এই বিক্ষোভ, অশান্তি সমানে চললো। তারপর কলকাতা শহরে কিছুটা শান্তি ফিরে এলো। অবস্থা একেবারে স্বাভাবিক না হলেও কিছুটা স্বাভাবিক হলো বৈকি!

কিন্তু কলকাতা স্বাভাবিক হয়ে এলেও সুদূরে বোম্বাই-এ নৌ-বিদ্রোহ দেখা দিল ২০ ফেব্রুয়ারী। এই নৌ-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক। হয়তো, ইংরেজ শাসনের শেষ দিনটিকে নিকটবর্তী করে, বোম্বাই-এর এই ক্ষণস্থায়ী নৌ-বিদ্রোহ।

২০ ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ ঘটে, আর ২৩ তারিখে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু সেইটাই বড়ো কথা নয়। সেদিন বিদ্রোহের বাণীটাই ছিল চরম সত্য।

এই সময় কলকাতাতেও অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। শিয়ালদা' এবং হাওড়া স্টেশন থেকে কোন ট্রেন চলাচল করে নি একদিনের জন্যে।

কলকাতা থেকে বোম্বাই এই যে অস্থিরতা, এই অস্থিরতা যে কোন মুহূর্তে চরম বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে। এ-ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুণ ইংরেজ সরকারও বেসামাল হয়ে পড়েছেন। এদিকে ভারত তখন স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার— এ দাবী তখন ভারতের কোটি কোটি নর-নারীর কণ্ঠে।

একটা একটা করে দিন যায়। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ দেবার আগেই ভাবতে হয়, না জানি কি নতুন খবর পড়বো।

নানা খবরের মধ্যেও অভিনেতার জীবনে অভিনয়ের খবর থাকেই। ১২ মার্চ তারিখে আনন্দ মঠ এইচ এম ভি রেকর্ডে গৃহীত হলো এটাও একটা খবর বৈকি! রেকর্ডে আনন্দমঠে আমি ছাড়া শিবকালী, মধু গাঙ্গুলী, শান্তি গুপ্তা, সুহাসিনীও অভিনয় করেছিল। নাটকটির পরিচালক ছিলেন মন্মথ রায়।

এর পরেই আবার নাটকের কথায় ফিরে আসি। ২০ এপ্রিল আবার আমরা রিজিয়া নাটকের পুনরাভিনয় করলাম। ভালোই হলো ফল। সেদিন নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিল রাণীবালা।

অনেক দিনের ব্যবধানে চিরকুমার সভার অভিনয় হলো ৮ মে। ভূমিকালিপিও দুর্বল নয়। তুলসী লাহিড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে আমিও অভিনয় করেছিলাম কিন্তু সহ-অভিনেতাদের ব্যর্থতার জন্যে অভিনয় জমলো না।

অভিনয় যদি ভালো না হয়, তাহলে যে অভিনেতা সে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়। চিরকুমার সভার মতো নাটক— কতো সার্থক অভিনয় হয়েছে, অথচ সেদিন

দর্শকরা আশা করে এসেও নিরাশ হয়ে গেল—এ লজ্জার অংশ আমাকেও নিতে হলো বৈ কি!

যদিও এমন ঘটনা নতুন নয়, কতো বার নিজেকে ব্যর্থ অভিনয়ের সামিল করেছি, তার হিসেব নেই।

আমার সঙ্গে দিলোয়ার হোসেনের বন্ধুত্ব কী আজকের। অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু সে। ১৯৩০-এর আগেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপরেই রীতি-মতো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দিলোয়ার আমাকে ডাকতো 'দোস্ত' বলে।

সেই দিলোয়ার হোসেনের মতো অকৃত্রিম বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনে দারুণ মর্মাহত হলাম। উচ্চ রক্ত চাপ ছিল দিলোয়ারের। মৃত্যুটা তারই জন্যে।

দিলোয়ারের মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, কী যেন হারিয়ে গেল, যা ছিল একান্তভাবে আমার। অথচ এই হারিয়ে যাওয়াটাই সব চেয়ে সত্যি! চোখের সামনে দিয়ে কতো লোক চলে গেল—আমি দেখলাম, শুনলাম। তারপর দুঃখ পেয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললাম। এ ছাড়া আর কী আছে।

কিন্তু দিলোয়ারের মৃত্যু আমার মনে গভীর রেখাপাত করে গেল।

দিলোয়ারের নামে কতো মানুষ কতো কথা বলতো। কিন্তু আমি তো জানি সে ছিল একজন খাঁটি মানুষ। একদল বলতো, দিলোয়ার হলো গুন্ডার সর্দার। কিন্তু মিথ্যে কথা। সে ছিল দুঃসাহসী—তাই তো সে গুন্ডাদের ওপর সর্দারী করতেও ভয় পেতো না। আমি তো দেখেছি, নিজের এলাকায় কোন অশান্তি ঘটলে সে ছুটে যেতো। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব শান্ত। তাছাড়া দিলোয়ারের মতো মদাপকেও দেখেছি রমজানের মাসে কী নিষ্ঠা নিয়ে সে রোজা করছে। ওই এক মাস সে মদ স্পর্শ করতো না। এই যে মানসিকতা এটা দিলোয়ারের মতো মানুষেরই থাকা সম্ভব।

যাই হোক, আমার একটা আক্ষেপ রয়ে গেল দিলোয়ারের দেহ সমাধিস্থ করার সময় যেতে পারি নি বলে। আমি খবর পেয়েছিলাম দেরীতে। তখন সব হয়ে গেছে। রঙমহল থেকে শরৎ, বিজয়, ইন্দুবাবু সবাই গেল, শুধু আমি যেতে পারলাম না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম। ভাবলাম, বন্ধুর দেহ সমাধিস্থ হবে, এ দৃশ্য নাই বা দেখলাম।

দিলোয়ারের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতে চিত্রজগতের আর একজন দিকপাল গেলেন চিরবিদায় নিয়ে। ইনি হলেন রায়বাহাদুর সুখলাল কারনানী। বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রশিল্পের সূচনা থেকে কারনানী সাহেব এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন।

এ-বছরটা যেমনই হোক, বৈচিত্র্য দম। অর্ধেক তো চলে গেল, জানিনা বাকি ক'মাস কেমন যাবে।

প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর স্মৃতি তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে মধু বসু মিনার্ভায় মিশর-কুমারী অভিনয়ের আয়োজন করেন। মধু বসু হলেন প্রমথনাথ বসুর ছেলে।

এই রজনীর মিশর কুমারীর অভিনয় শিল্পী তালিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, ভূমেন রায়, সন্তোষ সিংহ, সরযূবালা, রাণীবালার সঙ্গে আমারও নাম যুক্ত ছিল।

সেদিন মিনার্ভায় এসে বার বার একটি মানুষের কথা মনে হয়েছিল, সে মানুষটি হলো আমার বন্ধু দিলোয়ার হোসেন।

পরদিন ১৩ জুলাই রঙমহলে নাটক ছিল চরিত্রহীন। ঐ রাত্রে অভিনয় শেষে বাড়িতে ঢুকেই দেখলাম, দোতলায় দালানে আলো জ্বলছে। কিছু ব্যস্ত কণ্ঠও শুনলাম।

ভালো খবর থাক না থাক, মন্দ খবর যেন লেগেই আছে। ১৭ জুলাই শরতের বাবা যামিনী চ্যাটার্জীর মৃত্যুর খবর পেলাম। শরৎ বাড়ি নেই। কলকাতার বাইরে আছে। খবর পেয়ে কি চুপ করে বসে থাকা চলে? তখুনি ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম। এটা আমার কর্তব্য।

শরৎ পরের দিনেই বহরমপুর থেকে ফিরে এলো। রঙমহলেই দেখা হলো। সেদিন রঙমহলে নাটক ছিল কর্ণার্জুন।

রঙমহলের নিয়মিত শিল্পী হলেও আমাকে অন্য থিয়েটারেও মাঝে মাঝে যেতে হয়। ১৯ জুলাই কালিকা থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হোল। নাটকে নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মলিনা, রাণীবালার সঙ্গে আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

২৪ জুলাই। বেলা সাড়ে দশটা। স্টুডিও স্যুটিং চলছে হিন্দী ছবি গিরিবালার। সেখানেই হঠাৎ খবর পেলাম, অভিনেতা শৈলেন চৌধুরী মারা গেছে। শৈলেন নেই—খবরটা শুনে শুধু আমি নই, আমরা যারা স্টুডিও-য় ছিলাম, কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মধু বোস, ধীরাজের সঙ্গে এলাম কেওড়াতলায় শৈলেনের অন্তিম শয্যা দেখতে

শৈলেনকে দেখলাম। চিতা শয্যায় শায়িত তার দেহ। সর্বাঙ্গ শ্বেত বস্ত্রে ঢাকা। শুধু তার সুন্দর মুখখানি অগ্নিস্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

মৃত্যুর পরেও এতো প্রশান্তি? দূরে দাঁড়িয়ে আছি, দৃষ্টি আমার শৈলেনের মুখের দিকে। দেখছি—চিতার আগুন এসে স্পর্শ করছে শৈলেনের সুন্দর মুখখানি, অথচ কতো শান্ত সে।

ভাবলাম, এই তো জীবন—এমনি করে নিঃশেষে সবাইকে তো শেষ হয়ে যেতে হবে!

তবু মনে ব্যথা বাজে। কতোই-বা বয়স হয়েছে শৈলেনের, মাত্র উনপঞ্চাশ, অথচ এরই মধ্যে চলে গেল সে।

ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল সপ্রতিভ, অভিনয় ছিল তার সাধনার ধন। একই সঙ্গে মঞ্চে কতো বার নেমেছি, কাজ অভিনয় করেছি—অথচ সে-ই চলে গেল জীবনের মঞ্চ ছেড়ে, সবার অলক্ষ্যে।

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম। প্রার্থনা জানালাম ঈশ্বরের কাছে, শৈলেন যেন তার ঈপ্সিত স্বর্গে স্থান পায়।

অশান্তির শেষ নেই। আজ হরতাল, কাল বিক্ষোভ—একটা কিছুই লেগে আছে। আগস্ট মাস পড়তে অশান্তির আগুনটা আরো ছড়িয়ে পড়লো, পোস্টাল ধর্মঘট চলছিল, সেটা যদিও মিটলো, কিন্তু কলকাতা শহরের মানুষের মনে নতুন দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।

ব্রিটেনের ক্যাবিনেট মিশন এসেছিল ভারতে—ভারতের স্বাধীন শাসনের দরজাতে সাড়া দিতে। তারা একটি সিদ্ধান্তও বাতলে, তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখা কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলায় হরতালের আহ্বান জানালো, ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট। সেই সঙ্গে তারা জানালো, ঐদিন থেকে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে।

কিন্তু ১৬ আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপটা যে এমন ভয়ংকর হবে, কলকাতা শহরের মানুষ স্বপ্নেও ভাবে নি।

১৬ আগস্ট। সাধারণভাবে হরতাল সফল হলো। কিন্তু দুপুর থেকে কলকাতায় আরম্ভ হয়ে গেল ভয়াবহ দাঙ্গা।

সমস্ত শহরটা যেন মৃত্যুপুরীর আকার ধারণ করলো। শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হলো। সিনেমা-থিয়েটার যে বন্ধ থাকবে এ আর আশ্চর্য কথা কি

দিল্লী থেকে ছুটে এলেন তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল। দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা সরেজমিনে দেখে আবার দিল্লীতে ফিরে গেলেন ২৬ আগস্ট। এর দু' তিন দিন বাদেই দিল্লী থেকে ঘোষিত হলো অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা। মন্ত্রীদের নামও জানানো হলো এবং সেই দিনই দিল্লী থেকে বেতারে কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কেও অনেক কথা বলা হলো।

গোটা আগস্ট মাসটাই থিয়েটারগুলো বন্ধ ছিল। কেবল ৩১ আগস্ট স্টার খুললো এবং পরদিন ১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার কালিকা থিয়েটারের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হলো। ঐ তারিখে রঙমহল যদিও

শাজাহান অভিনয়ের কথা বিজ্ঞপ্তিতে জানালো, কিন্তু অভিনয় অনুষ্ঠান হলো না শেষ পর্যন্ত।

এতোদিন কলকাতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলেও মোটামুটি অবস্থা তখন ভালো। শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এলেও তখনো মানুষের মন থেকে দাঙ্গার দুঃস্বপ্ন মুছে যায় নি। হিন্দু এলাকায় মুসলমানেরা আসে না, আর মুসলমান এলাকার ত্রি-সীমানায় হিন্দুরা যায় না। রাজনৈতিক অবস্থাও ঘোরালো হয়েছে। কংগ্রেসের অখন্ড ভারতের সাধনা যায় যায়—লীগপন্থী মুসলমানেরা পাকিস্তানের দাবীতে সোচ্চার।

আমরা অভিনয় জগতের মানুষ, রাজনীতির মার-প্যাঁচ বুঝি না—কিন্তু এটুকু তো বুঝতে পারি যে অদৃষ্ট আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে।

এদিকে এক-এক করে থিয়েটারগুলো আবার চালু হলো। রঙমহলে আবার সেই সন্তান চলতে লাগলো, মিনার্ভাও খুললো, শ্রীরঙ্গমেও চলতে লাগলো বিন্দুর ছেলে। কিন্তু চলা মানে, কোন মতে খুঁড়িয়ে চলা। না আছে তেমন দর্শক, না আছে তেমন উদ্যম। সব কেমন যেন শিথিল হয়ে গেছে।

তবে সিনেমার কাজ কিছুটা চলছে। আমাকেও প্রায়ই স্টুডিও-য় যেতে হয় স্যুটিং-এ। রাধা ফিল্মসে এমনি একদিন স্যুটিং চলাকালীন খবর পেলাম, অনাদি বোস মারা গেছেন। সেদিন তারিখ ছিল ২১ সেপ্টেম্বর। ঐদিন দুপুর দেড়টায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়েই আমি স্টুডিও থেকে অনাদি বসুর বাগবাজারের বাড়িতে এলাম।

অনাদিবাবু ছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু, জীবনে অনেকখানি জড়িয়ে ছিলাম তাঁর সঙ্গে। তাঁর মতো আপনজনের বিয়োগে ব্যথা পাওয়াই স্বাভাবিক।

সেদিন কাশী মিত্র ঘাটে অনাদিবাবুর শেষ কৃত্যেও যোগ দিয়েছিলাম।

তারপর উত্তর কলকাতায় দাঙ্গার বিভীষিকা জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি সপরিবারে অনাদিবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের দুঃখের অংশ নিতে।

ঐদিনেই আমি বেচুকে কথা প্রসঙ্গে বললাম আমার কথা। বললাম, আর এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার শহরে নয় ভাবছি পুরী যাবো।

১৫ সেপ্টেম্বর, রঙমহলে অভিনয় হচ্ছে মাটির ঘর। দর্শক সমাগম হয় নি বললেই হয়। অভিনয়ের অবস্থা দেখে হতাশ হলাম। শরৎকে ডেকে বললাম, এভাবে থিয়েটার চালিয়ে কী হবে? আমাকেই বা কী দেবে! টিকিট বিক্রীর তো এই অবস্থা।

শরৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললাম, ঠিক করেছি পুরী যাবো। তুমি আর আপত্তি কোরো না।

শরৎ কোন কথাই বললে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে চলে গেল।

পুরী যাওয়া ঠিক হলো। পুরীতে ডাক্তার কণক সর্বাধিকারীর বাড়িতে উঠবো ঠিক করলাম। সেই মতোই ব্যবস্থা হলো।

কোলকাতার বাইরে এসে যেন স্বস্তি পেলাম। শহরে থাকতে দম আটকে এসেছিল—কতোদিন পর সাগর থেকে আসা বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলাম।

সাগর বেলায় পুরীর চক্রতীর্থের ডাক্তার সর্বাধিকারীর বাড়িটিও সুন্দর।

পুরীতে দুদিন বিশ্রামের পর ভুবনেশ্বর এলাম। বিন্দু সরোবরের ওপর ধর্মশালাতেই উঠলাম। চা-পানের পর পায়ে হেঁটে কেদর গৌরীকুন্ডের দিকে চললাম। গৌরীকুন্ডে একটি জলের প্রস্রবন। স্বতঃ উৎসারিত এ জলের খ্যাতি সর্বিদিত। স্বাস্থ্যের পক্ষে দারুণ উপযোগী।

গৌরীকুন্ডের ওপরেই কয়েকটি মন্দির। প্রত্যেকটির কারু-কার্য দেখবার মতো। কিন্তু কুন্ডের পথে মুক্তেশ্বর মন্দিরের তুলনা নেই। আকার বৃহৎ না হলে মুক্তেশ্বর মন্দিরের সূক্ষ্ম কারু কাজের তুলনা পাওয়া যায় না। বিন্দু সরোবরের তীরে অনন্তদেবের আরো একটি মন্দির, যেটি সত্যি দেখবার মতো, সেটিও দেখলাম কুন্ডের আশ-পাশে ঘুরে বেড়িয়ে এবারে এলাম ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দিরে। মন্দিরে দেবতার দিকে আমার যতো না আগ্রহ, তার চেয়ে বেশি আগ্রহ এর কারু কাজ দেখার। কিন্তু আমার স্ত্রী বিপরীত স্বভাবের। তার লক্ষ্য দেবতা।

লিঙ্গরাজ মন্দির দেখলাম। আশপাশে ছোট বড়ো আরো কতো মন্দির। কিন্তু সর্বত্র কেমন যেন শূন্যতা ছড়ানো।

এবারে বসুধারা, উদয়গিরি, খন্ডগিরি দেখার পালা। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই সঙ্গে আছে। সবাই মিলে উঠেছি উদয়গিরি খন্ডগিরির ওপরে। হিন্দু এবং জৈন গুহা দেখেছি। হাজার হাজার বছর আগেকার গুহা—অতীতের কোন এক যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ হয়তো এই গুহা মুখ নীরব—কিন্তু দূর-অতীতে এই গুহায় কতো জ্ঞান-তাপস হয়তো তপস্যা করেছেন। তখন হয়তো এইসব পাহাড় ছিল শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে পরিবৃত।

সেদিন নাই। কিন্তু সেদিনের স্মৃতি এখনো ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে এইসব শূন্য গুহার পাথরের নীরব দেয়ালে।

গুহা মুখে দাঁড়িয়ে অতীত দিনের কথা চিন্তা করি।

সকাল থেকে দুপুর ভুবনেশ্বরেই কাটালাম। বিকেলের গাড়িতে আবার পুরীতে ফিরে আসা। আবার সেই সাগর বেলায় বিশ্রাম শেষে সন্ধ্যের পর বেড়াতে যাওয়া। বেড়াতে বেড়াতে সেদিন সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে এলাম।

কদিন খবরের কাগজের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ছিল না বলতে গেলে। ১ অক্টোবর একখানি স্টেটসম্যান সংগ্রহ করলাম। স্টেটসম্যান ছাড়া কলকাতা থেকে আর কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে না। প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ। দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে এই জরুরী অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ করা।

দিনের খবরটুকু রেডিও মারফতে শুনতাম জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে। রেডিও-র খবরে যেটুকু জানতাম, তাতে বুঝতাম শহরের অবস্থা মোটামুটি শান্ত হলেও এখানো অশান্তির আগুনটা ছাই চাপা রয়েছে।

কিন্তু বেড়াতে এসে একী অশান্তি ১১০০্ টাকা হারালো কি করে। আমি কি জানতাম। প্রথমটা আমাকে কেউ কিছু বলে নি। শেষটা পরস্পরের কথা শুনে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে—কি বলছো তোমরা?

এবারে আসল কথা শুনলাম। ১১০০্ টাকা খোয়া গেছে। সবারই সন্দেহ রঘুয়ার ওপর। সে স্থানীয় মানুষ, এখানে এসেই তাকে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সে বোবা সেজেই রইলো। অগত্যা পুলিশে খবর দিলাম। রঘুয়াকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশের লোক। অনেক রকমে চেষ্টা চললো, কিন্তু হারানো টাকা আর ফিরে পাওয়া গেল না।

বাইরে এসে এ আবার এক ঝামেলা। কলকাতার বাড়িতে টেলিগ্রাম করলাম রঘুনাথ পান্ডেকে। যেন সে তার পাওয়া মাত্রই পাঁচশ টাকা পাঠায়, টি, এম, ও করে। সেই মতো টাকা পাঠালো সে।

কিন্তু হারানো টাকা পাওয়া গেল না। যদিও পুলিশ থেকে নানা ভাবে চেষ্টা করেছিল।

•

পুরীর অস্থায়ী বাসাও জম-জমাট হলো। আমি তো এসেছি সপরিবারে, তারপরে কলকাতা থেকে আমার বেয়াই বেয়ানও এলেন। সেদিন ছিল ৩ অক্টোবর। স্থানীয় অন্নপূর্ণা থিয়েটারে নিমন্ত্রণ ছিল ওড়িশী নাটক "কবিসূর্য" অভিনয় দেখার। সবাই মিলে গেলাম। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ আমাকে মঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দর্শক বৃন্দ ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্বতঃ-স্ফূর্ত প্রীতি মেশানো অভিনন্দন পেলাম।

(ক্রমশঃ)
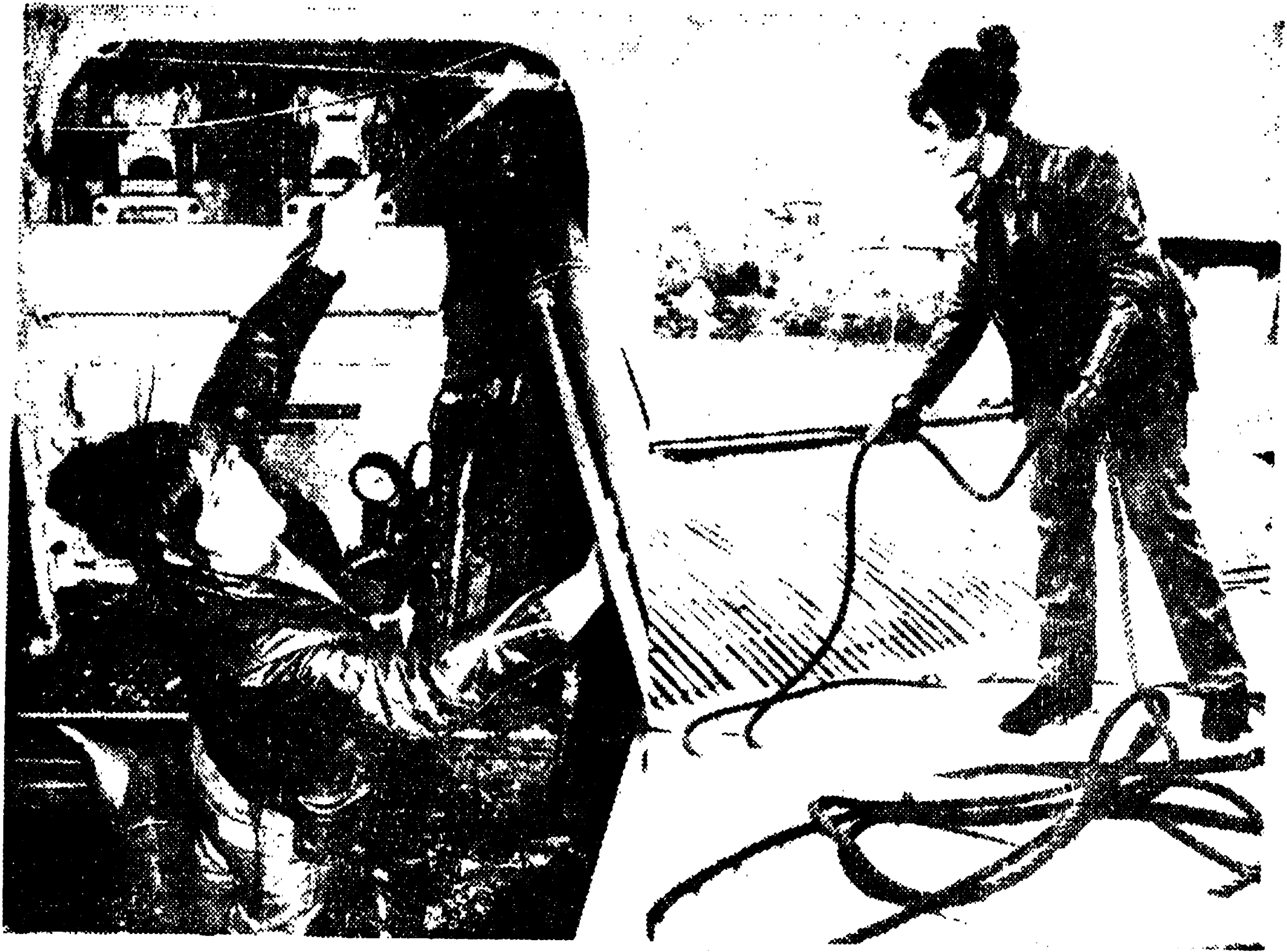
কেবিন বয়, ক্যাপ্টেনের স্ত্রী ও মা ।। হিলডে গার্ড সাইটতজ্—বয়স মাত্র তেইশ। কিন্তু একাই একশ। মালবাহী স্টীমারের ক্যাপ্টেনের স্ত্রী হলেও সে ওই স্টীমারেই কেবিন বয় হিসাবে কাজ করে। একটি মেয়েও আছে। আসছে বছর সে পুরো নাবিক হবে।

অঙ্গনা

জীবিকার সন্ধানে

জীবিকার লড়াই। জীবনধারণের লড়াই।

বাঁচার অধিকার তো একজনের নয়, সকলের। তাই সবাইকে আজ পথ খুঁজে নিতে হচ্ছে। পথ বেছে নেবার দিন সেই কবে ফুরিয়ে গেছে। সেসব কথা এখন গল্পের সামিল।

হাতের কাছে কোন পথ ছিল না। তাই মান-সম্মান শিকেয় তুলে বসে গেলুম ফুটপাথে। কিন্তু সেই যে বলেছিলাম, পথ পেলেও তার উপযুক্ত ব্যবহার আমাদের জীবনে এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। সেই করতেই কেটে গেল কতোদিন। তারপর শুরু হলো আমার ব্যবসা।

কোনদিন ভাবি নি জীবিকার সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত ফুটপাথে এসে বসবো। কিন্তু এছাড়া আমার আর কি-ই বা করার ছিল। আমার যা যোগ্যতা তাতে চাকরি হবে না। হয় না যে এমন নয়। কিন্তু আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবার কেউ নেই। এদিকে সংসারের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। কোন পথ নেই। আত্মীয়স্বজনের দরজায়-দরজায় ধর্ণা দিয়েছি। তাঁদের কেউ মুখ ভার করে থেকেছেন, কেউ নীরব আবার কেউ-বা পরে দেখা করতে বলে দায়িত্ব এড়িয়েছেন। তাই তাঁদের ওপর আর ভরসা রাখতে পারি নি। নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিতে চেয়েছি।

অথচ আমারও সম্ভাবনা ছিল। বাবা চাকরি করতেন। ভাল মাইনেই পেতেন। কারণ অভাব কখনো বুঝি নি। জানতেও পারি নি দুঃখ-কষ্ট কাকে বলে। স্কুলে পড়তাম। বাবার বড় মেয়ে আমি। পাছে কষ্ট হয় সেজন্য তিনি স্কুলের বাসে আমাকে স্কুলে পাঠাতেন। খুব মজা করে বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে যেতাম। খাওয়া-দাওয়া আর পোশাক-আশাকের কথা এখন আর মনে না করাই ভাল। তাতে কষ্ট আরো বাড়ে। নিত্য-নতুন জামা পরে স্কুলে যেতাম। সহপাঠী বন্ধুরা আমাকে হিংসা করতো। দিদিমণিরা বলতেন, বাবার আদুরে মেয়ে। প্রাইভেট টিউটরও ছিলেন। তবে বাবার কাছেই পড়তাম। তিনি অফিস থেকে ফিরে আমার আবদারের কাছে এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করতেন না। সব আবদার হাসিমুখে সইতেন। তখন আত্মীয়স্বজনের আনা-গোনায় আমাদের বাড়ি ভরে থাকতো। প্রতিটি ছুটির দিনে আমাদের বাড়িতে যেন উৎসব লেগে যেতো। সেদিন মায়ের আর হেঁসেল থেকে ছুটি মিলতো না। সারা-দিন ওখানেই কাটতো। আত্মীয়স্বজনের এরকম অত্যাচারে আমার খুব রাগ হতো। মায়ের কথা ভেবে যতটা না তারচেয়ে বেশি বাবাকে কাছে না পাওয়ার জন্য। বাবা ওঁদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে থাকতেন।

ওঁরা সবাই চলে গেলে বাবা আমার রাগ ভাঙাতেন। আমি রাগ করে দূরে সরে থাকতাম। তারপর বাবার আদরে গলে গিয়ে তাঁর কোলে মুখ লুকোতাম। এমনি-ভাবে কাটছিল আমার দিন। হেসে-খেলে আর আনন্দ গানে।

কিন্তু সুখ আমার ভাগ্যে নেই। বাবার এত সোহাগে হঠাৎ একদিন ছেদ পড়লো। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি। এসে দেখি আমার এত দিনের অভিজ্ঞতা নতুন রূপ নিয়েছে। বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। শুনেই দারুণ আনন্দ হলো। ছুটে বাবার কাছে চলে গেলাম। গিয়েই একেবারে অবাক। বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন। আর

মা বাবার মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে আছেন। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। আস্তে-আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

ঝিয়ের কাছে শুনলাম, বাবা জ্বর নিয়ে অফিস থেকে ফিরেছেন। জ্বর এখন আরো বেড়েছে। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গেছে। ঝি আর কিছু বলতে চাইলো না। ছোট ভাইকে নিয়ে আমি পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে রইলাম। বিকেল গড়িয়ে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে সে খেয়ালই ছিল না। ভাই আর আমি চুপচাপ বসেছিলাম। একটা অশুভ আশঙ্কায় মনটা দুরু-দুরু করে উঠছিলো।

রাত একটু বাড়তেই আবার ডাক্তার এলেন। ভয়ে-ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম বাবার ঘরের দরজার বাইরে। আর মুখ দেখলাম ডাক্তারেরও। এক ছুটে পড়ার ঘরে চলে এলাম। এবার ছোট ভাইকে সান্ত্বনা দিতেও ভুলে গেলাম। এসেই মুখ গুঁজে দিলাম বালিশে। ঝি কত ডাকাডাকি করলো খাবার জন্যে। কিন্তু সেদিন খেতে উঠি নি। সারা রাত বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছি। আর মনে-মনে ভেবেছি, এই অন্ধকার নিশ্চয়ই ক্ষণিক। রাত পোহালেই সব দুর্যোগের অবসান হবে। বাবাকে আবার হাসি ঝলমলে দেখবো।

এমনি করে কেটে গেল তিন দিন। বাবার শরীর ক্রমেই খারাপের দিকে। তার পরদিন ভোরে উঠেই শুনলাম দুর্ঘটনা যা হবার তা হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। বিছানা থেকে উঠতে পারি নি। কাঁদতেও যেন ভুলে গেছি। বাবার কাছে যাওয়ার কথাও মনে ছিল না। চুপচাপ বসে আছি। আর রাগ হচ্ছে ডাক্তারের উপর। পায়ে-পায়ে ভায়ের হাত ধরে এসে দাঁড়ালাম বাবার ঘরের দরজায়। চোখ জলে ভরে এলো।

বাবা আর নেই। এবার মায়ের পুরো-পুরি তত্ত্বাবধানে। কোন অসুবিধা ছিল না। বাবার অফিস থেকে পাওয়া টাকায় আমাদের সব খরচ বেশ ভালোভাবেই চলে-ছিল। আত্মীয়স্বজনের যাতায়াতও অব্যাহত ছিল। সবাই এসে মাকে সান্ত্বনা দিত। আমাকে আর ভাইকে মানুষ করতে বলতো। তাহলেই তো দুঃখের অবসান। বাবাকে হারিয়েও আত্মীয়স্বজনের এসব কথায় বেশ ভরসা পেতাম। মনে-মনে ভাবতাম, একবার মানুষ হতে পারলে মায়ের আর কোন কষ্ট রাখবো না।

এদিকে কিন্তু জমানো টাকায় রীতিমত টান পড়ছে। মা সেকথা কাউকে বুঝতে দেন নি। হঠাৎ একদিন তিনি আমার স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন। বললেন, এবার থেকে বাড়িতেই পড়াশোনা কর। আর তোমাকে স্কুলে পড়াতে পারবো না। বেশ কয়েক মাসের মাইনে বাকি পড়েছিল আমার এবং ভাইয়ের। আমাকে স্কুল ছাড়ানো হলেও ভাইয়ের পড়া চলতে থাকলো। মাসখানেক পড়ে তারও স্কুলের পাট চুকিয়ে দেওয়া হলো।

অবস্থা ক্রমেই আরো খারাপের দিকে। আমাদের বাড়িটা ছিল ভাড়াবাড়ি। কোন দিন সেকথা ভাবি নি। ভাড়ার দায়ে যেদিন সে বাড়ি ছেড়ে আসতে হলো সেদিনই প্রথম জানলাম এ বাড়ি আমাদের নয়। এসে উঠলাম একটা বস্তিবাড়িতে। আত্মীয়-স্বজনরা তার অনেক আগে থেকেই আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এতদিন তাঁরা আমাদের বাড়ি আসতেন। এবার আমরাই তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলাম। প্রথম দিকে অতটা না বুঝলেও আস্তে-আস্তে বুঝতে পারলাম, আমাদের যাতায়াত ওঁরা পছন্দ করছেন না। বস্তি-বাড়ি আর পাকাবাড়িতে আত্মীয়তা বজায় রাখা অসম্ভব। আসল কথা, আমাদের আর আগের অবস্থা নেই।

সংসারে একেবারে অচল। ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে তাকানো যায় না। মা যেন এই কয়েক বছরে একেবারে বুড়ি হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে আমার মাথায় নানা চিন্তার আনাগোনা শুরু হয়েছে। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি অফিসের বাইরেও কতো মেয়ে জীবিকা অর্জনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাতের সামনে এমন কিছু নেই যে উঠে দাঁড়াই। অবশেষে ফুটপাতে রেডিমেড জামা-কাপড়ের দোকান করাই ঠিক করলাম। মাকে কথাটা বলতেই তিনি কি রকম শিউরে উঠলেন। অনেক করে বোঝালাম। তবু তিনি সম্মতি দিতে চান না। আত্মীয়স্বজনের কথাও উঠলো। আমিই বললাম, ওঁরা আমাদের দেখছেন না আর আমরাই বা ওঁদের কেন ভাববো? মা আমার সঙ্গে সহমত হলেন।

তখন আবার আর এক সমস্যা, টাকা। টাকার অভাবে বোধহয় সব প্ল্যানই ভেস্তে যায়। মা ভরসা দিলেন। আমার ও মায়ের অবশিষ্ট গয়নাগুলো বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল। তারপর একদিন সেই টাকায় মালপত্র কিনে বসে গেলাম ফুটপাতে। আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন আমাদেরই প্রতিবেশী এক ফুটপাত-ব্যবসায়ী। মালপত্র কেনাকাটায় আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তিনি কয়েক দফা মাল কিনে দিয়েছেন। এখনো আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

সব কথা শেষ করে মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকালো। সেখানে এক স্থিরপ্রতিজ্ঞার উজ্জ্বল আভাস। সব বাধা তুচ্ছ করে জীবনসংগ্রামে সে জয়ী হবেই।

—শীলা

রূপচর্চা

রূপচর্চা সম্বন্ধে একটা সত্যি কথা যে, এ সম্বন্ধে সবাই অল্পবিস্তর আগ্রহী কিন্তু স্পষ্ট পথনির্দেশ অনেকেরই অজানা। তাই দেখা যায়, মূল্যবান গয়না, দামী শাড়ি আর অজস্র প্রসাধনে সাজার পর তার মালিন্য ঘোচে না। আবার মাত্রাজ্ঞানের অভাবে প্রসাধনেও অনেকে সুসজ্জিতা। পথে-ঘাটে এ অভিজ্ঞতা আমার আপনার প্রায় নিত্যকার। অথচ সৌন্দর্যচর্চার একটি বিরাট ঐতিহ্যের পথ ধরে আমরা চলেছি। মাঝপথে আমরা সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে আপাদমস্তক শাড়িতে আবৃত করে রূপ চর্চার পাট চুকিয়ে দিয়ে বসেছি। দীর্ঘদিন সংস্কারের ভয়েই তা ছাড়তে পারি নি। ইদানিং সে অবস্থা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। সাজগোজের দরজা প্রায় খুলে গেছে। তবুও এ সম্পর্কে সবাই সচেতন নন। কেউ কেউ নিজের চেহারা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে আবার কেউ কেউ হা-হুতাশ করে। অথচ ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় করে চেহারার পরিচর্যা করে রূপ বদলাবে না কিন্তু খোলতাই হবে। এজন্য প্রয়োজন যত্ন প্রয়াস আর প্রসাধনে-পোশাকে-অলংকরণে মাত্রাজ্ঞান। সেইসঙ্গে সমস্ত দেহের প্রতি সমান মনযোগ। শুধু মুখ নয়, দেহের প্রতি অঙ্গ রূপচর্চায় হবে প্রাণবন্ত।

আমাদের দেশে রূপচর্চার পথ-নির্দেশের অভাব দীর্ঘদিনের। এই অভাব পূর্ণ সম্প্রতি 'রূপচর্চা' নামক পত্রিকার প্রকাশনায়। শুধু মেয়েদের রূপচর্চা বিষয়ক পত্রিকার ক্ষেত্রে এটি পথিকৃৎ বলা চলে। প্রতিটি অঙ্গের চর্চার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে এই পত্রিকায়। ত্বক, চুল, চোখ, ঠোঁট, হাত, পা এই নিয়েই তো দেহ। তাই রূপচর্চা শুধু মুখে বা চুলে সীমাবদ্ধ রাখলে তা হবে অসম্পূর্ণ। আবার অঙ্গের চর্চাতেই শেষ কথা নয়। এর পর আছে ব্যায়াম, আহার, ভঙ্গিমা। তবেই দেহ হবে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। সবশেষে প্রসাধন। রূপচর্চা এবার সম্পূর্ণ। আপনার মধুর সুবাসে সবাই সুবাসিত। অত্যন্ত সুন্দরভাবে ছবি এঁকে এবং মডেলের সাহায্যে রূপচর্চার সম্পূর্ণ তত্ত্বটি বিবৃত হয়েছে। পত্রিকাটি শুধু রূপবিলাসী নয় প্রত্যেক মহিলারই প্রয়োজনীয়। * রূপচর্চা: চিত্ররথ দত্ত সম্পাদিত এবং কিঙ্কক পাবলি-কেশন, ২০২, রাসবিহারী এভেনিউ কল-কাতা-২৯ থেকে প্রকাশিত। দাম— ৪-৫০ টাকা।

অপারেশন ডায়মন্ড

তপন দাশ

'শেষ পর্যন্ত আমাদের এই রাস্তাই বেছে নিতে হলো। এর জন্য আমরা মোটেই দুঃখিত নই। বিবেকের কোন দংশন আমরা অনুভব করছি না।'

সুভাষদা চোখ টিপে আমাদের ইশারা করলেন। আমরা তখন যথারীতি খবরের কাগজের মনোযোগী পড়ুয়া বনে গেলাম। অতনু বেশ চিৎকার ক'রে হাঁকলো—'একটা ডবল হাফ্।'

সুভাষদা বললেন খুব নিচু গলায়—'এখানে বিশদ আলোচনা হবে না। অন্যত্র যেতে হবে। সময় খুব অল্প। আর রাত সাড়ে আটটার সময় হেরম্ব পাকা খবর নিয়ে আসবে।'

'কোথায় ?'

'সেটা বাইরে গিয়ে বলবো—তোরা আয় আমি এগোচ্ছি। বাস স্টপের সামনে ক্ষেত্রর পানের দোকানের সামনে আছি।'

সুভাষদা বেরিয়ে যাবার পর অতনুর চা এলো। যদিও অতনুর চা খাবার দরকার মোটেই ছিল না। শুধু সিচুয়েশনটা ডাই-ভার্ট করবার জন্যেই এটা।

অতনু কাপটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললো 'তুই খেয়ে নে—চা-টা।'

আমি ফু' দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চায়ের পেয়ালাটা শেষ ক'রে বললুম—'চল এবার।'

দূর থেকেই দেখা গেল ক্ষেত্রর পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সুভাষদা এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।

এই সময় গিয়ে ওঁর সামনে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে কিনা ভাবছি—দেখি সুভাষদাই আমাদের দেখতে পেয়ে ডাকলেন—'এদিকে আয়।'

আমি আর অতনু গিয়ে হাজির হতেই

সুভাষদা পরিচয় করিয়ে দিলেন—'আমার রাণুদি।'

আমরা নিচু হ'য়ে পায়ের ধুলো নিতে গেলে উনি বাধা দিলেন—'ইশ্—কি করছো তোমরা। আমাকে প্রণাম করতে নেই।'

রাণুদি তারপর আমাদের দুজনের দিকে ফিরে বললেন 'কি করো তোমরা—পড়াশোনা করছো তো?'

আমরা কোন জবাব না দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে থাকার সময় সুভাষদাই বললেন—'না, ওরা ওসব পাট চুকিয়ে ফেলেছে। এখন পুরো বেকার। সার্টিফিকেট বগলে ক'রে ঘুরে ঘুরে জুতোর তলা ক্ষয়ে গিয়ে এখন পায়ের চামড়ায় মলম লাগাবার জোগাড়।' ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেললেন।

রাণুদিও হাসলেন। আমি চুরি ক'রে দেখলুম—হাসলে রাণুদিকে খুব চমৎকার দেখায়।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ নানা কথাবার্তা হলো ওঁদের মধ্যে। সবই অতীতের গল্প। অনেক সাংসারিক, ব্যক্তিগত কথা। যার আগাগোড়া কোনটাই আমাদের বোঝার কথা নয়।

শেষকালে রাণুদি চ'লে যাবার সময় ব'লে গেলেন 'তুই তো আসিসনি বহুকাল। একদিন আয়।'

তারপর আমাদের দিকে বললেন—'তোমরাও এসো একদিন। ভালো ক'রে আলাপই হলো না।'

বললুম—'সুভাষদার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবো একদিন।'

একটা ট্রাম এসে পড়ায় রাণুদি সেটায় উঠে গেলেন। সেই মিষ্টি হাসি দিয়ে আবার মনে করিয়ে দিলেন—'যেয়ো কিন্তু—সুভাষ ঠিকানা জানে।'

সুভাষদা এবার আমাদের দিকে ফিরে বললেন—'সব কথা এবার থেকে আর ননীর দোকানে হবে না। অন্য একটা আড্ডা বাছতে হবে। অপারেশানের কোন খবর কেউ ধরতে পারলেই সব মাটি।'

সুভাষদাই ঠিক করেছিলেন। কোড শব্দটা আমাদের মনে রাখতে হবে 'অপারেশান ডায়মণ্ড'। যদিও ডায়মণ্ড বা হীরকের কোন প্রসঙ্গই নেই।

সুভাষদা বলেছিলেন—'এটা জাস্ট একটা নাম'।

'অপারেশান ক্রশবো' অথবা 'অপারেশান সিসিরা' আমার মনে ছিল—তাই নামটা আমার ভালোই লেগেছিল। অপারেশান ডায়মণ্ড। সুভাষদা আমাদের হিরো, আমাদের সেনাপতি। অতএব সমস্ত ব্যাপারটা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে বিনা প্রশ্নে কা'র যাওয়াই চরম কর্তব্য।

সুভাষদা নিজেই বলেছিলেন 'যদি দেখিস আমিই কোনরকম উল্টো-পাল্টা করছি, তাহলে বিনা নোটিশে আমার ওপর গুলি চালাবি।'

আমরা অবাক হ'য়ে চেয়ে আছি দেখে সুভাষদা তেমনি স্বভাবসুলভ হেসেই বলেছিলেন—'এটাই কাজের নিয়ম। বিশ্বাস-ঘাতকের একটাই শাস্তি। আর সেটা হলো মৃত্যু। বুঝলি?' আন্তর্জাতিক আইন-কানুনও তাই।

সুভাষদা যেন আমাদের সম্মোহিত করেছিলেন। সে সময় আমরা যে-কোন একটা নির্দেশ পেলেই যেন ম'রে যেতে পারি।

'বুঝলি, এর চেয়ে আমাদের অন্য কোন ভাবে বেঁচে থাকার উপায় নেই। কারণ, আমরা সুস্থ ভাবে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে দেখেছি। শুধু বঞ্চনা ছাড়া কিছু পাইনি। এই-তো এত লেখাপড়া শিখলুম। কয়েক লক্ষ শব্দ মুখস্থ ক'রে প্রশ্নপত্রের নির্ভুল উত্তর লিখে যা অর্জন করলুম, মানে সেই ডিগ্রিগুলো,—কোন কাজে লাগছে? অনেক নীতিবাদী শ্লোক অহোরাত্র শুনে শুনে কানের পোকা বেরিয়ে গেল—। সৎ হও। বিবেক জাগ্রত করো। শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা দরজার গোড়ায় এসে গেছে—শুধু কড়া নাড়তে বাকি। সব বোগাস। ভাঁওতা। সেই হ্যাভস আর হ্যাভ-নটসদের ফারাক পুরোনো ইতিহাসেও ছিল এবং ভবিষ্যতের ইতিহাসেও থাকবে অতএব—যখন এর কোন রদবদল হচ্ছে না— তখন আমাদের মাথায় বুদ্ধি আছে— সাহস আছে। কয়েক লক্ষ লোক ভিত্তি নিরেট টাকার কুমীর আছে—তাদের ভাঙাও আর খাও। ঠিক মিনিমাম বাঁচবার জন্য আমাদের চরম বাঞ্ছনীয় উপায় কার্যকরী করতে হবে'—

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছি। আমাদের ভেতরে ধমনীতে রক্তের প্রবাহে আগুন ছুটছে। অসহিষ্ণু হ'য়ে বললুম—'কবে হবে? সুভাষদা, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়—অপারেশান ডায়মণ্ডের প্রথম কিস্তি সুরু হোক—দেরি সইছে না।'

এতক্ষণ কথা বলতে বলতে সুভাষদার চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠেছিল। আমার কথায় থার্মোমিটারের পারা শীতলতায় নিম্নগামী হবার মতো সুভাষদা অনুত্তেজক ভঙ্গীতে বললেন—হাবেরে পাগল, অতো হুড়বড়ের কাজ নয়। অনেক প্রিপারেশান বাকি। আর্মস যোগাড় করতে হবে, এ্যামুনেশান।

ঠিক-ঠাক সমস্ত মাল-মশলা অর্থাৎ আর্মস জোগাড় হ'য়ে গেলেই তখন পাকা খবরাখবরের জন্যে খবরদারী চলবে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে সেই অপারেশান। সুভাষদা বলেছিলেন—'আরো লোক দরকার, আরো কিছু সাহসী ছেলে।'

অতনু বলেছিল—'অনেক বেশি লোক হলে শেষ পর্যন্ত সিক্রেসী মেনটেন হবে তো? যদি কেউ...'

'বিট্রে করে। এই তো?' সুভাষদা বললেন—'সে-সব যে একেবারে ভাবিনি তা নয়। তবে এমন সব লোক ইনক্লুড করবো যারা সত্যিই কাজের লোক। মানে এ-কাজের এ্যাডভেঞ্চারটুকুই যাদের লক্ষ্য। ব্যাপারটা বোঝা গেল না?

'শুধু এ্যাডভেঞ্চারের লোভে এরকম ঝুঁকি নেবে অথচ মালে ভাগ বসাবে না। এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে নাকি?'

শুধু ঘটে না। ঘটছে। তোমাদের মাথায় ঠিক আসবে না এখন, আগামী কাল বুঝিয়ে দোব। কাল ঠিক দুপুর আড়াইটের সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বালিগঞ্জে। তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে। ঠিক দুটো নাগাদ চৌরঙ্গী রোড আর থিয়েটার রোডের বাস স্টপে দাঁড়াবে।'

তারপর সুভাষদা আর আমরা বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলুম। কোন কথা হলো না। আমার মাথায় টোটাল ব্যাপারটা কি হবে তারই নানারকম সম্ভব অসম্ভব ছবিগুলো ভেসে বেড়াতে থাকলো।

অতনু জিজ্ঞেস করলো—'তুমি কি বাসায় ফিরবে?'

ওই বাসায় ফেরার কথা মনে হ'তেই আমি কি রকম যেন মিইয়ে গেলুম। এক মুহূর্তে দাঁত খিঁচোনো একটা রূঢ় বাস্তব আমার কিছুক্ষণ আগের সমস্ত উত্তেজক চিন্তা-ভাবনাগুলোকে লাথি মেরে ভেঙে-চুরে দিয়ে হাসতে লাগলো। আমি সেই সময় কি বলবো, কি করবো, কিছু ভেবে না পেয়ে হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লুম।

'কি ভাবছো?' সুভাষদা যেন ভাবলেন আমার সম্বিত হারাচ্ছে বুঝি—তাই কাঁধ ধ'রে ঝাঁকানি দিলেন।

সত্যিই আমি ভাবনার একটা কালো গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছিলুম তখন। চটকা ভেঙে শিরদাঁড়া সোজা ক'রে নিজেকে সহজ ক'রে নিয়ে বললুম—'না কিছু না—সুভাষদা একটা কথা ছিল—মানে, কয়েকটা টাকা হবে আপনার কাছে?'

'এই তা অতো ইতস্ততঃ করার কি আছে? উই আর কমরেডস।' বেশি নেই এখন, তবে কাজ চ'লে যাবার মতো হ'তে পারে।' ব'লে একটা দশ টাকা আর একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে সুভাষদা দশ-টাকার নোটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—পাঁচটা আমার কাছে থাক—চলবে তো?'

এরকম ঘটনায় চোখে জল এসে যায়, আমারও এসে গেল। সত্যিকার সিংহের মতো হৃদপিণ্ড না হলে এমনটা হয় না। দলের নেতা হ'তে গেলে এমন মানুষ ছাড়া কাউকে মানায় না।

অতনু বললে—'আরে, আমার কাছেও কিছু ছিল। দোব?'

আমি ওদের দুজনের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ।

'আরে' অতো ভাবপ্রবণ হবার মতো কিছু ঘটেনি। আমাকে অবতার বা দেবতা-টেবতা ভাববার মতো কোন মহৎ কাজ করিনি। আমার আছে,—তোমার কাজে লাগলো—ব্যাস। এখন বাড়ি যাও! এখন থেকে নিজেদের ভেতর লুকোছাপা রেখো না কিছু—কেমন?' ব'লে সুভাষদা কিছুটা এগিয়ে গেলেন—।

'কাল ঠিক দুটো—টপ সিক্রেট।'

আমরা বললাম, 'ঠিক আছে।'

সুভাষদা একটা দোতলা বাসে উঠে গেলেন। সেই বাঁশদ্রোণীতে থাকেন। অনেকটা দূর।

অতনু বললে—'আমিও চলি—ট্রেনের টাইম।'

ও হেঁটেই চলে গেল শেয়ালদা। সোদপুর যাবে।

তারপর যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছিলুম। মাথার ভেতরে 'অপারেশান ডায়মন্ড'-এর ব্যাপারটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সত্যিই তো, এরকম একটা ডিসিশান নেওয়া ছাড়া কি উপায় হতে পারতো। কিছু না। পি সি রায় বেঁচে থাকলে—বাঙালীর ছেলেকে খেটে-খুটে একটা কিছু ব্যবসা সুরু করবার মতলব দিতেন। ক্যাপিটাল নেই তো কি হবে? মোট বও। কোনরকম পরিশ্রমকে অসম্মানজনক ভাবলেই ভাবা যায় না হলে কিছু নয়। সেই পরিশ্রমলব্ধ অর্থের কিয়ৎ পরিমাণ সঞ্চয় কর। সেই সঞ্চয়ের টাকায় কিছু মাল কেনো। সেই মাল লাভে বেচে দাও। সেই লাভ থেকে মূলধন বাড়াও। তারপর সেই মূলধন বিন্দু বিন্দু বারি থেকে অকূল মহাসাগর হয়ে যাবে। ইণ্ডাস্ট্রী হবে। তোমার একক প্রচেষ্টার খুদ-কুঁড়ো দিয়ে একদিন সুদূরপ্রসারী কিছু ঘটে যাবে। তখন তোমার নামে রাস্তা বানানো হবে। তোমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে সংবাদপত্রের সাপ্লিমেন্ট ছাপা হবে।

সৎ আর ন্যায় উপায়ের এইসব আকাশকুসুমে মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই সেই পুরোনো গলিটার মুখে এসে গেছি খেয়াল নেই।

মনে মনে পি সি রায় মশাইকে আমার প্রণাম জানালাম। ভদ্রলোক একালে জন্মালে বুঝতেন বাঁচা কাকে বলে।

খুব চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো—অপারেশান ডায়মণ্ড জিন্দাবাদ! আমাদের পথই একমাত্র বাঁচার পথ। বুদ্ধি আর শক্তির প্রপার ইউটিলাইজ করতে জানলে মানুষ এভাবে মরতো না। আসলে তা নয়, মানুষ ভয়ানক ভিতু হয়ে গেছে ইদানীং। একটা অদৃশ্য অদ্ভুত ভয়ের মুখব্যাদান সব সময় মানুষের চোখের সামনে ঝুলে আছে।

আমরা সেই ভয়কে জয় করেছি। মনে মনে বললুম—'সুভাষদা, আমাদের দেরি সইছে না।'

তারপর আমাদের বাসার ভাঙা নড়বড়ে সিঁড়ি ভেঙে যখন ঘরের দরজায় পৌঁছুলাম তখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে। তখনো বাবা ফেরেননি। মা বসেছিলেন মেঝেয়। বাকি ভাই-বোনগুলো মর্গের লাসের মতো পড়েছিল এদিক-ওদিক। সবাই ঘুমুচ্ছে।

লণ্ঠনটাকে উস্কে দিয়ে মা বললেন—'এতো রাত অবধি কোথায় থাকিস?

সাধারণত বাসায় ফিরলেই আমার কথাবার্তা কেমন কটু হয়ে যায়। কর্কশ। বললুম—'আমি তো বেশ সকাল সকালই ফিরছি—কিন্তু বাবা! তিনি তো সেই মাঝ রাত্তিরে আসবেন রাস্তার উত্তর-দক্ষিণ জরীপ করতে করতে। তার বেলা?'

মা কোন জবাব দিলেন না। খাবারগুলো দেখিয়ে দিয়ে বললেন—'খেয়ে নে।'

মা নিচে নেমে গেলেন। আমি জানি মা এখন বাইরের দরজায় পিঠ দিয়ে বসে ঢুলবে। যতক্ষণ না বাবা ফেরে।

এই আমাদের সংসার। অথচ ছেলেবেলা থেকে বাবাকে সৎ আর ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক হিসেবেই জেনে এসেছি। কোনদিন কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। অথচ কি যে হলো—কে জানে, বাবার পুরোনো চাকরিটা চলে গেল। কারণ গোটা কোম্পানীটাই উঠে যাচ্ছে। বেশ কিছু টাকা নিয়ে বাবা নতুনভাবে ব্যবসা করবেন ঠিক করলেন। আমাকে অনেক পড়াশোনা করিয়ে বিদেশ পাঠানো হবে এরকম পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু সৎ আর ভালোমানুষেরা চিরকালই একসপ্লয়েটেড হয়ে থাকে। তেমনি এক দুষ্ট চক্রের আওতায় পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে বসলেন আমাদের সেই একদা আদর্শ আর ন্যায়পরায়ণ বাবা। এতদিনে আমারও ভাই বোনের সংখ্যা আরো কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব দুঃখ আর দারিদ্রের তীব্রতা বেড়ে গেল। আমিও কনভোকেশানের ছবি পর্যন্ত আটকে গেলুম। একটা চাকরি চাই। হন্যে হয়ে শহরের ছোট বড় মাঝারি প্রতিষ্ঠানের দরজায় ধর্ণা দিয়ে সেই অমোঘ নোটিশ লটকানো দেখা গেল—নেই, চাকরি খালি নেই। ছারপোকার মতো সহস্র বেকার। ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। আর পরমারাধ্য পিতৃদেব শেষ পর্যন্ত চিনেবাজারে কাগজওলাদের দালালী করে যৎসামান্য রোজগারে ঠেকনা দিচ্ছেন। ভাইবোনগুলো স্কুল পাঠশালা ছেড়েছে। বুড়ো বয়েসের ফ্রাস্ট্রেশান এড়াতে বাবা দিশি মদ খান রোজ। আর মাঝরাত্তিরে মায়ের হাত ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদেন। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে রোজ শুনতে পাই।

বেলা প্রায় তখন দেড়টা। খাঁ খাঁ রোদ্দুর মাথায় নিয়ে থিয়েটার রোডের মোড়ে হাজির হয়ে গেলুম। অন্যরা তখনো কেউ আসেনি। নিজের ভেতরে দারুণ উৎসাহ বোধ করলুম।

একটা দারুণ ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা। হয়ত বিরাট একটা বিপদের গর্ত সামনে এসে যাবে। হয়ত রক্তপাত ঘটবে। অপারেশানের সময় এ্যাটিচুডটা খুব নির্মম হতে হবে। বাধা এসে পড়লে নির্বিচারে গুলি চালাতে হবে। আমি কোনদিন পিস্তল-বন্দুক হাতে করিনি। সুভাষদা একটা ক্যাটালগের ছবিতে নানারকম অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা বুঝিয়েছেন আমাদের। কেমন করে ম্যাগাজিনে গুলি ভরতে হবে। ট্রিগারে আঙুলের চাপ কেমন করে দিতে হবে। কতো ক্যালিবারের পিস্তলে বা রিভলবারের গুলি ঠিক কতোটা দূরত্বে আঘাতটা মারাত্মক হবে তার বিশদ আলোচনা করেছেন মাঝে মাঝে। অপারেশানের আগে হাতে কলমে একদিন-দুদিন তালিম দেওয়া হবে। আমার সেই মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছিল হাতে একটা পিস্তল পেলে আমি দারুণ বিক্রমে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারি।

'কতক্ষণ এসেছ?' মেয়েলি গলার স্বরে চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি, রাণুদি।

আমি খুব অবাক হয়ে গেছি।

রাণুদি ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে বললেন,—'খুব অবাক হয়েছ—তাই না। তুমিই তো অশোক?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওরা? সুভাষদা, অতনু?'

'বলছি, চলো হাঁটতে সুরু করি, বাসে বড্ড ভীড়; ওঠা যাবে না।'

রাণুদি আর আমি থিয়েটার রোড ধরে হাঁটতে সুরু করলাম। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, সুভাষদা তো কখনো কথার খেলাপ করেন না। কিন্তু রাণুদি মেয়েছেলে—? সেটাও ঠিক ভালো লাগছিল না আমার। রাণুদিও কি অপারেশানের খবরাখবর রাখেন! কে জানে।

কেন জানি না আমার একটা ব্যাপার যাচাই করতে ইচ্ছে হলো। চলতে চলতে রাণুদির দিকে ফিরে বললাম—'অপারেশান'—

সঙ্গে সঙ্গে রাণুদি প্রতিধ্বনি করলেন—'ডায়মণ্ড।'

তারপর রাণুদি বললেন—'এবার বিশ্বাস হলো? সুভাষ ঠিক ছেলেই বেছেছে! এমনি ভাবে যাচাই করাই আসল। চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও—ঠিক সাড়ে তিনটেয় মিটিঙ।'

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটবার পর একটা আধুনিক ধরণের বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছুলুম আমরা। রাণুদি বললেন, 'এটাই হলো—ডাঃ স[illegible] রায়চৌধুরী—এফ আর সি-এস-এর বাড়ি। নিজের নার্সিং হোম আছে। তাছাড়া তিনটে অষুধ কোম্পানীর ডিরেক্টার। প্রচুর পয়সা। ওঁর ছেলে সন্তোশ আমাদের দলে কাজ করবে। ঠিক প্রত্যক্ষ নয়। তবে আর্থিক সাহায্য করবে পেছন থেকে। তাছাড়া এটাই এমারজেন্সী আস্তানা। এখানেই আজকের মিটিঙ। আসলে ব্যাপারটা একটা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আলোচনা সভার ছদ্মবেশে হবে।'

আমি সন্তোশকে এর আগে কখনো দেখিনি। গেটে লটকানো 'কুকুর হইতে সাবধান' ফলকটায় দৃষ্টি পড়তে আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে রাণুদি বললেন—'ভয় নেই—আজ সব কটাকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' তারপর উনি গেটের ভেতর দিয়ে আমাকে নিয়ে পোর্টিকোয় এসে কলিঙ বেলে চাপ দিলেন।

একটা প্রশস্ত হলঘরে মিটিঙ বসেছিল। সন্তোশের সঙ্গে রাণুদি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সন্তোশ বেশ চমৎকার ছেলে। খুব ফর্সা রঙ। লালিত্য ঝরে

পড়ছে। মুখে চাপ দাড়ি। বেশ হাসি-খুশী ভাব। তবে চোখ দুটোয় কি যেন একটা বন্য সঙ্কল্প খেলা করছে বোঝা যায়।

সত্যেশ, রাণুদি আর আমি ছাড়াও আরো দুজন ছিল ওখানে। হেরম্ব বা সুভাষদাকে দেখতে পেলুম না। অন্য দুজন অচেনা। আমার সঙ্গে ওরা নিজে-রাই পরিচয় করলো—'আমার নাম রঞ্জন মজুমদার, আর এর নাম কল্যাণ বসু। আমি বেকার, কল্যাণ এখনো ছাত্র—শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, হোস্টেলে থাকে।'

পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর রাণুদি বললেন—'এবার কাজের কথায় আসা যাক। অনেকে হয়ত অবাক হয়েছে—সুভাষ নেই বলে। কিন্তু ওরা আজ অন্য কাজে ব্যস্ত আছে। হেরম্ব সমস্ত ইনফরমেশান নিয়েছে—আর্মসও যোগাড় হয়েছে। ওয়াট-গঞ্জের আবু আতাহার তিনটে ওয়েবলি স্কট রিভলবার আর একটা পিস্তল দিয়েছে। দাম পড়েছে সর্ব সাকুল্যে সাড়ে তিন হাজার। এই টাকাটা দিয়ে সত্যেশ আমাদের সাহায্য করেছে। (কথার মাঝখানে সত্যেশ বলে উঠলো—'ওটা সাহায্য নয়,—আমি দিয়েছি ওটা আমার দেওয়া কর্তব্য বলে) রাণুদি ভ্রম সংশোধন করলেন—"ঠিক, আমি সাহায্য কথাটা ব্যবহার করেছি ভুল করে। তারপর যা বলছিলুম'—

একটু থেমে রাণুদি সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন। আমার তখন

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। সেই রাণুদিকে এমনিভাবে একজন নেত্রীর মতো কথা বলতে শুনে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

আরম্ভ করলেন রাণুদি—'আমরা কেন এবং কি ভাবে কোন কাজ করতে উদ্যত হয়েছি—আশাকরি তার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন শুধু হেরম্বর দেয়া খবরের ভিত্তিতে সব প্ল্যান চকাউট করে এ্যাকশনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া। প্রথম অপারেশানের জন্যে কারা মনোনীত হয়েছে তারও লিস্ট তৈরী করেছে সুভাষ। আমাদের প্রথম অপারেশানের নেতা অশোক দাশগুপ্ত। সহযোগিতা করবে সন্তোশ, হেরম্ব আর রঞ্জন।

সেই সময়, আমার রক্তের ভেতরে আগুন ধরে গেল। আমার [illegible] চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে [illegible] অথচ আমি সেসব কিছুই করলাম [illegible] শুধু নিজের মুখের ভাবটাকে খুব গম্ভীর করে তুললুম।

সন্তোশ, কল্যাণ আর রঞ্জন আমাকে অভিনন্দন জানালো। আর রাণুদি তাঁর ছোট্ট ব্যাগ থেকে একটা ব্লেড বের করে দ্রুত আঙুলের ডগাটা কেটে রক্তের তিলক পরিয়ে দিলেন।

যদিও আমার অভিভূত হবার কথা কিন্তু তাও সম্বরণ করলুম আমি। যেহেতু এখানে ইমোশানের কোন ব্যাপার নেই।

অপারেশানের আগের দিন দলের দ্বিতীয় জরুরী মিটিঙ বসলো ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে। আজ সুভাষদার পরণে মিলিটারী পোষাক। বেশ ভালো লাগছিল। সুভাষদা সকলকে উদ্দেশ্য করেই বললেন—অপারেশানের মাত্র দুদিন বাকি। সকলেই এক ধরণের পোষাক পরবে। যেমন আমি পরেছি। মোটামুটি একটা মাপ অনুযায়ী পোষাকগুলো ইতিমধ্যে তৈরীও হয়ে গেছে। নিউ মার্কেটে আসগর আলীর দোকানে গেলেই পাবে। ওখানে আমাদের কোড—'অপারেশান'—বললেই আসগর আলী জবাব দেবে 'ডায়মণ্ড'—ব্যাস তাহলেই বোঝা যাবে। সব আলাদা আলাদা প্যাকেটে মোড়া থাকবে। আসগর আলীও দলের সমর্থক।'

তারপর সুভাষদা ওর টিউনিকের পকেট থেকে বের করলেন বড় এক খণ্ড কাগজ। একটা নক্সার মতো।

'এটাই হলো—মাস্টার প্ল্যান, ডায়মণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের যে শাখাটায় আমাদের অ্যাকশন হবে ওতে তারই বিবরণ আছে।—এটা হলো—মেন গেট, এবার এই ডট লাইনটা হচ্ছে কাউন্টার। বাঁ দিকে যে ক্রশটা, এটা হলো ম্যানেজারের ঘর। আর এই ত্রিভুজটা হলো সেপাইদের বসার জায়গা। ওর হাতে দোনলা একটা সট গান থাকে সব সময়। সব থেকে উত্তর দিকের এই বিয়োগ চিহ্নটার জায়গাটাই হলো ক্যাশিয়ারের ঘর। এখানেই—ক্যাশ জমা হয়।'

তারপর সুভাষদা আমাকে বললেন—'অশোক, তোমার ওপর সমস্ত কাজের পয়লা সাকশেস নির্ভর করছে, আশাকরি তুমি সফল হবে। আর একটা কথা; বিনা প্রয়োজনে প্রাণহানি ঘটাবে না। দরকার পড়লে পায়ের দিকে তাক করে গুলি চালিয়ে জখম করবে। জীপ গাড়িটায় পুরো ট্যাঙ্ক তেল ভরবে। পর পর তিনখানা গাড়ি থাকবে। একটা থেকে একটায় বদল করে নেবে। সকলের ঘড়ি একসঙ্গে মিলিয়ে নেবে। যে ভাবে প্ল্যানিং করা আছে তাতে মোটমাট বারো থেকে চোদ্দ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। বাইরে তোমাদের কভার করবার জন্যে আমি আর রাণু থাকবো। রাণু সে সময় ফুটপাতে গান গেয়ে ফুল বিক্রী করবে। সব ঠিক আছে?'

দলনেতা হিসেবে আমিই জবাব দিলুম—'ঠিক আছে।'

'তাহলে আগামী পরশু, সময়—সকাল দশটা পনেরো।' সুভাষদা বললেন—'অপারেশান'—

আমরা বললুম—'ডায়মণ্ড'।

আজ সেই বিশেষ দিন। গতকাল রাতে ঘুমোমতে পারিনি। মা আর বাবাকে বলেছি—'ওদের দুঃখের দিনের অবসান ঘটতে আর বেশি দেরি নেই।' বোনটাকে বলেছি—'কিছু ভাবিসনি—আবার নতুন করে বাঁচবো আমরা।'

সবাই অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে। বাবা মাকে বলেছেন—'তোমাকে বলিনি বউ, যে তোমার ছেলে একদিন ঠিক বড় হবে। সকলের দুঃখ ঘোচাবে।'

খুব ভোরে উঠে সন্তোশদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবার কথা। ওখানে ও জীপ নিয়ে অপেক্ষা করবে। ওখান থেকে খিদিরপুর। আতাহার আর্মসগুলো বুঝিয়ে দেবে। বেলা আটটার সময় হেরম্বর বাসার কাছে চা-জলখাবার খাওয়া হয়ে গেলে ন'টা নাগাদ স্পটের কাছে রাস্তার উল্টো দিকে ফুটপাতে থেকে জীপটা দাঁড়িয়ে থাকবে। মিলিটারী জীপের আরোহীরাও পোষাক আসাকে মিলিটারী, অতএব কেউ সন্দেহ করবে না।

আমি বাসা থেকে বেরোলুম ঠিক সকাল সাড়ে ছটায়।

সকাল পৌনে দশটা। আমাদের জীপ রাস্তার বাঁদিকের ফুটপাত ঘেষে দাঁড়িয়ে গেল। যেন গাড়িটায় হঠাৎ কোন যান্ত্রিক গোলোযোগ। সন্তোশ নেমে বনেট খুললো। সকলেরই ফৌজি পোষাক। কোমরে পিস্তল। সময়টা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। উল্টোদিকের বাড়িটার দেয়ালে পিতলের ফলকে ঝকমক করছে—ডায়মণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আর মাত্র দশ কি বারো মিনিট পরেই দরজা খুলবে। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু অফিস বেয়ারারা ঘোরাফেরা করছে—। দরজা খুললেই চেক জমা দেবে। ফার্স্ট ক্লিয়ারিঙ ধরাতে হবে। কাঁচা টাকা জমা দিতেও এসেছে কেউ কেউ। লোকগুলোর পোষাক দেখে বোঝা যাবে না অথচ কোমরের গেঁজে থেকে বেরোবে দশ বিশ হাজার। আমাদের উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়ছে। ও ফুটপাতে গেটের সামনেই রাণুদির ফুলওয়ালী সেজে গান গাইবার কথা, ওদের এখনো দেখা যাচ্ছে না। অথচ আমরা ঠিক সময়েই এসে গেছি। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটা। আর মাত্র পনেরো মিনিট। ঠিক সে সময়েই একটা দারুণ শ্লোগানে সমস্ত জায়গাটা মুখর হয়ে উঠলো। কিসের মিছিল? আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখবার চেষ্টা করলুম—একটা দাবি সম্বলিত ফেস্টুন নিয়ে বিরাট মিছিল উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই—কি করে হবে আমাদের অপারেশান। ওপাশের ফুটপাতে সুভাষদাকে দেখা গেল। বুকে হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে ফুটপাতের গায়ক সেজেছে। সঙ্গে রাণুদির সলমা চুমকির পোষাক। সবকিছু এদিকে চাপা পড়ে গেল দীর্ঘ মিছিলের সমবেত চিৎকারে। কে জানতো আজই সেই বিশেষ দিন যে দিনটায় সমস্ত মানুষ দল বেঁধে মিছিল করে ময়দানের দিকে যাবে তাদের ন্যায় সঙ্গত বাঁচার দাবী রাখতে। কিন্তু আমাদের অপারেশান? আমার জীবনের প্রথম সুযোগ। আমাদের বাঁচার শেষ সুযোগ। ইস্‌ শরীরের ভেতরটা একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠলো। যাক, তবে হবেই আজকের অপারেশান। দশটা পনেরো না হলে আরো একটু পরে হবে। মিছিলের শেষ হলে তারপর। কিন্তু এই অগণিত মানুষের মিছিল কখন শেষ [illegible] শেষ আর হতে চায় না। একটার পর একটা দল যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কতো মানুষ। কতো বিচিত্র ধরণের মানুষ। সকলেই বাঁচতে চায়। একটাই দাবী। শুধু ফেস্টুন নয়। মানুষগুলোর হাতে হাতিয়ারও আছে। কোদাল, কুড়ুল, লাঠি, কাস্তে, লাঙলের ফালা, আদিবাসী রমণীর পিঠে বাচ্চা। পুরুষদের হাতে তীর ধনুক। কারো হাতে লণ্ঠন। শুধু মানুষ আর মানুষ। রাস্তার ওপারে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাও বেরিয়ে এসে মিছিল দেখছে। বন্দুক হাতে দারোয়ানটাও মিছিল দেখছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। আমার ধমনীতে রক্তের স্রোত তখন দারুণ দ্রুতবেগে প্রবাহিত। আমি ওপাশের ফুটপাতে সঙ্কেত জানাবার জন্যে চিৎকার করলুম—'অপারেশান!' বুঝতে পারলুম সুভাষদা আমার গলা শুনতে পাননি, তবে আমার কানের পাশে সহস্র মানুষের মিলিত কণ্ঠ ধ্বনিত হলো—'ডায়মণ্ড—ডায়মণ্ড'—তারপর বোধ হয় আমার সম্বিত হারিয়ে গেল।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

পুলিশে খবর দেবার উপায় ছিল না? কেন?
শিউপ্রসাদজির জন্যে।
শিউপ্রসাদজিকে বাঁচাতে আপনি নিজের ঘাড়ে বিপদ নিয়েছেন। তাঁর প্রতি অত টান ত আপনার নয়!
না, তাঁর ওপর টান নেই। কিন্তু পরিবারের ইজ্জতের কথা ভেবে শিউপ্রসাদজি ফোন ছেড়ে দেবার পর আপনার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছিলাম।
আমার পরামর্শ তখনো যা হত এখনো তাই। যা সত্যি জানেন পুলিশকে এখুনি
ক্রীং-ক্রীং
এখন ফোন আবার কার?
হ্যাঁ ঠিকই করেছেন ছাড়া আর কি বলব। আচ্ছা রাখছি!
যাক, পুলিশের ভাবনা আর আপনাকে ভাবতে হবেনা। শিউ-প্রসাদজি নিজেই লালবাজারে ফোন করেছেন।
তিনি নিজেই জানিয়েছেন? তার মানে, খুনের কথা স্বীকার করেছেন।
পুলিশ নিশ্চয় এখন আমার বাড়িতে। আমাকেও যেতে হবে। জানাজানির আর কিছু বাকি রইল না।
যা সত্য তা আপনি ঢেকে রাখবেন কি করে?
উপায় জানলে পরামর্শের জন্যে আসব কেন।
রতনলাল দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে যা বললে তা সত্যি অবাক করবার মত।
শিউপ্রসাদজি আমার সর্বনাশ চান, তবু তাঁকে বাঁচাবার জন্যে যা খরচা লাগে আমি করব।

ঊনিশ শতকের একজন বাঙালী

ঊনিশ শতকের প্রথমে প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বে রামমোহন এবং দ্বারকানাথ ছিলেন সমধর্মী কীর্তিমান পুরুষ। দ্বারকানাথের অন্য কীর্তি বিস্মৃতপ্রায় এবং এখনকার একমাত্র পরিচয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা।

দ্বারকানাথের জন্ম ১৭৯৪ খৃঃ। চিৎপুরে শেরবোর্নো স্কুলে লেখাপড়া শুরু। দ্বারকানাথ রামমণি ঠাকুরের পুত্র। তাঁর দুই সহোদর ভাই রাজা রমানাথ ঠাকুর এবং রামলোচন ঠাকুর। রামলোচনের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না বলে তিনি দ্বারকানাথকে দত্তক নেন। রামলোচনই বিস্তর জমিদারী সম্পত্তি কিনে বংশের পদমর্যাদা, মানসম্ভ্রম বাড়িয়েছিলেন।

রামলোচনের মৃত্যুর পর তের বছরের বালক দ্বারকানাথ তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হন। দ্বারকানাথের গুণ ছিল অতুলনীয়। তিনি মাতৃভাষা ছাড়া পার্শী, আরবী, ইংরাজী, সংস্কৃত ভাষা জানতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ছিল অসামান্য দক্ষতা। আইন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর কাছে অনেকেই ভূসম্পত্তি এবং নানা আইনগত পরামর্শ নিত। এমন কি বৃটিশরাজও প্রশাসন ব্যাপারে তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। অসামান্য প্রতিভা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য বাংলাদেশে ছিল তাঁর অতুলনীয় জনপ্রিয়তা।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ হলেও তিনি সংসারী ছিলেন। নিজের আভিজাত্য সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। পদমর্যাদা অনুযায়ী চলাফেরা করতেন। আমোদ-প্রমোদে তাঁর অর্থব্যয় কিংবদন্তী হয়ে আছে।

ছেলেবেলায় দ্বারকানাথের জীবন ছিল উচ্চমধ্যবিত্তের। প্রচুর বিলাসিতায় তাঁর জীবনপ্রভাত কাটেনি।

পরবর্তী জীবনে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন অপরিসীম অধ্যবসায়, সততা চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও তাঁদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিতে পেছপা হতেন না।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ ঠাকুরের অপরিসীম গুণাবলী এবং তাঁর অকুতোভয়তার জন্য মুগ্ধ হয়ে তাঁর জীবনী লিখতে চেয়েছিলেন। অনিবার্য কারণে তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর ছিল দ্বারকানাথের গভীর আস্থা। বিলেতে একবার ম্যাক্সমুলার বিদেশী ও বাংলা গান শোনেন দ্বারকানাথের কাছ থেকে। তিনি অভিভূত হন। দ্বারকানাথ তাঁকে বলেন, আপনারা যদি দয়া করে আমাদের প্রাচীন শিল্প সঙ্গীতকলা বোঝবার চেষ্টা করতেন তা হলে আপনাদের স্পষ্টই উপলব্ধি হোত ভারতীয় সংস্কৃতি, বেদ-বেদান্ত, শাস্ত্র, পুরাণ, উপনিষদ কত ঐতিহ্যময় কত মহৎ। তা অবজ্ঞার নয়। আপনাদের বোঝা উচিত ভারতীয় সঙ্গীতকলা উচ্চস্তরের সুর-তাল-লয়সম্পন্ন।

নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়

দ্বারকানাথ কোটিপতি হয়েছিলেন অধ্যবসায়ে। কিন্তু মানুষকে শোষণ করার ছিল তাঁর তীব্র অনীহা। তিনি নানাভাবে গরীবকে সাহায্য করতেন। ইংরেজ সরকারের ছিল তাঁর ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধা। এমন কি বহু গুরুত্বের বিষয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করতেন। ইংরাজের কাছে কোন ব্যাপারে কোন কিছুর প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না। দেশের এবং দশের যাতে অমঙ্গল হয় এমন কোন ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর বিরাম ঘটেনি। তিনি ছিলেন বাঙ্ স্বাধীনতার পূজারী। দেশানুরাগ এবং বলিষ্ঠ আত্মমর্যাদাবোধ। অদম্য কর্মশক্তি ও প্রগাঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল তাঁর চিত্তের পরম সম্পদ। এই সম্পদ তাঁর পুত্র-পৌত্ররা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন।

তিনি বিলাতে থাকাকালীন দেশী পোশাক পরতেন। এমন কি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আতিথ্যে বাকিংহাম প্যালেসে স্বদেশী প্রথায় আলবোলায় ধূমপান এবং নাগরাই জুতো ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে ইংরাজ বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর স্বদেশের নিন্দা করতেন, তিনি তা কোনমতেই সহ্য করতেন না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাতেন এবং তিনি বিদেশীদের স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন তাঁর জাতির চেয়ে ইংরাজ বড় নয়। সরকার তাঁকে বোর্ড অফ কাস্টম সল্ট অ্যান্ড রেভিনিউ-এর দেওয়ান করেন। যোগ্যতার সঙ্গে তিনি একাজ করেন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম জাস্টিস অফ পিস্। তখনকার দিনে এ ছিল সবথেকে উচ্চ সম্মান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে লবণের ইজারা নেন। রানীগঞ্জের কয়লার খনি ব্যবস্থা, কুমারধুলিতে রেশমের ব্যবসা, সামুদ্রিক জাহাজের আমদানি ও রপ্তানি ছাড়াও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ছিল তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তাছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিপুল জমিদারী পরিচালনায় অপূর্ব কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর জমিদারী যশোহর, খুলনা, সন্দীপ পাবনা, রাজসাহী এবং কলকাতায় ভূ-সম্পত্তি ছিল। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ইংরাজ সরকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন। দ্বারকানাথের বদান্যতার পরিচয় আছে বিভিন্ন সময়ে দানের তালিকায়। তিনি আর্ত, দুঃখী, দরিদ্র, বিত্তহীন সম্প্রদায়ের জন্য চ্যারিটেবল সোসাইটিতে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। একবার কলকাতার একজন বিচারপতি দেনার দায়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অথচ দেশে যাওয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তিনি দ্বারকানাথের শরণাপন্ন হলেন। দ্বারকানাথ সেই বিচারককে এক লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন বিনা দলিলে। পরে অবশ্য ঐ বিচারপতি সে ঋণ শোধ করে দিয়েছিলেন।

কি স্বদেশে, কি বিদেশে তিনি থাকতেন রাজার হালে। তাঁর বিলেত থাকাকালে পকেট খরচার জন্য এক লক্ষ টাকা প্রতি মাসে পাঠান হত।

বিলাত যাত্রাকালে দ্বারকানাথকে কলকাতার শেরিফ বিদায় সম্বর্ধনা জানান। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। জাহাজঘাটেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

মিশরের রাজধানী কায়রোতে উপস্থিত হলে মিশরের অধিকর্তা খাদিভ মহম্মদ আলি পাশা তাঁকে সৌধ রাজপ্রাসাদে বিপুল অভ্যর্থনা জানান। ভাইসরয় তাঁর ব্যবহারের জন্য নয়টি জিন লাগানো ঘোড়া, সোনার ঘোড়া লাগামসমেত এবং জন ছয় তুর্ক পদাতিক সৈন্য দেন। দ্বারকানাথের ফরাসী ভাষায় জ্ঞান থাকায় অধিকর্তার সংগে সোজাসুজি কথাবার্তা বলতে পারতেন। দ্বারকানাথকে রাজা প্রাসাদের একেবারে অন্দরমহলে যেখানে হারেমের বেগমরা স্নান করতেন সেই নিষিদ্ধ স্থানও দেখান। খাদিভ দ্বারকানাথকে স্বর্ণপাত্রে কফি পরিবেশন করতে নির্দেশ দেন। এখান থেকে তিনি মাল্টা দ্বীপ অভিমুখে রওনা হন। তাঁকে মাল্টা বন্দরের বাইরে এক পক্ষকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল সংক্রামক ব্যাধির জন্য। যখন তিনি মাল্টা নগরীতে পদার্পণ করেন তখন গভর্ণর তাঁকে রাজভবনে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। দ্বারকানাথ মহামান্য অতিথিরূপে রাজভবনে ছিলেন। বিদায়-কালীন মুহূর্তে রাজ্যপাল দ্বারকানাথকে নৈশভোজনে আপ্যায়িত করেছেন। তাঁর নেপলস শহর পরিদর্শন উপলক্ষে তিনি এবং অ্যাডমিরাল স্যর লেসলি কার্টিস নেপলস পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি রণতরী দেন। দ্বারকানাথ যখন নেপলস বন্দরে পৌঁছলেন তখন তাঁর আগমনে তোপধ্বনি করা হয়; রণতরীর বুক থেকে কামান দাগা এই প্রথম দেখল। নেপলস-এ তাঁরা ছিলেন সেখানকার রয়েল ভিক্টোরিয়া হোটেলে। ব্রিটিশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন। ব্রিটিশ রাজদূত স্যর উইলিয়ামস টেম্পল দ্বারকানাথকে নেপলস-এর মহামান্য রাজার সংগে পরিচয় করিয়ে দেন।

দ্বারকানাথ নেপলস থেকে ট্রেনযোগে সরাসরি রোমে যান। এখানে মহামান্য পোপ তাঁর ভ্যাটিকান প্যালেসে বিপুল সম্বর্ধনা জানান।

রোম থেকে দ্বারকানাথ এবার এলেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে। এখানে তিনি ফরাসী নৃপতি লুই ফিলিপের আতিথ্য গ্রহণ করেন। লুই ফিলিপ এই মহামান্য অতিথি আগন্তুকের প্রতি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

একদিন রাজা প্রদত্ত নৈশভোজের সময় একটি বেশ কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে। যে সমস্ত লোক দূর-দূরান্তর পল্লী অঞ্চল থেকে এই উৎসব দেখতে এসেছিল তারা সকলেই উৎসুক হয়ে উঠলেন এবং জানতে চাইলেন রাজা যে এই মহামান্য অতিথিকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন তিনি কে? খোস মেজাজের মাথায় বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর সচিব বলে উঠলেন, এই মহামান্য বিশিষ্ট রাজ-অতিথি হলেন "সর্ব রাজ্যের রাজা"। এই খবর জেনে সেই বিপুল জনতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন এবং এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করেন।

প্যারী থেকে দ্বারকানাথ এলেন লণ্ডনে। এখানে এসে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে একে একে রাজকীয় বংশের সকলের সংগে পরিচিত হন।

মহারাণী ভিকটোরিয়া এবং তাঁর স্বামী অ্যালবার্ট দি প্রিন্স কনসর্ট এই মহামান্য ভারতীয় অতিথির সম্মানার্থে বাকিংহাম প্যালেসে একটি রাজভোজের আয়োজন করেন। সেই ভোজসভায় ইংলণ্ডের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডনের মেয়রও দ্বারকানাথের সম্মানে এক নৈশ-ভোজের আয়োজন করেন। মহারাণী ভিক-টোরিয়া হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত এক সামরিক কুচকাওয়াজের সমাবেশে দ্বারকা-নাথ ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানান।

দ্বারকানাথ প্রিন্স অ্যালবার্টের সংগে দাবা খেলে সময় কাটাতেন। তিনি বহু প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাক্ষেত্র দর্শন করেন। তিনি লণ্ডনে থাকাকালীন রাজা রাম-মোহনের সমাধিস্থান ব্রিস্টলে একটি স্মৃতিসৌধ নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করান। সেই সময়কার একটা বেশ কৌতুক-প্রদ ঘটনা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি একদিন এক উচ্চ অভিজাত মহল থেকে এক শিকার পার্টিতে আমন্ত্রিত হন। কথা ছিল তাঁকে তাঁর হোটেল থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থা মোটেই ভাল নয় বলে যেতে অক্ষমতা জানান। কিন্তু তাঁরা একান্তই নাছোড়বান্দা। এই নিমন্ত্রণ এবং অশেষ অনুরোধ এড়াতে না পেরে যেতে সম্মত হলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজে ঘোড়ায় চেপে যেতে পারলেন না। তাঁকে একটা সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই গাড়ীর চালক ছিলেন একজন হিন্দু।

দ্বারকানাথের বিলাতযাত্রার একটা উদ্দেশ্য ছিল। যে পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বিলাত গিয়েছিলেন সে পরিকল্পনাটি যদি কার্যকরী হোত তবে দেশের অনেক পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্থায়ী ইজারা নিতে চেয়েছিলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন আপত্তি টিকত না। নিজের তত্ত্বাবধানে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা পরিচালনা করবার দক্ষতা তাঁর ছিল। কিন্তু দুঃখের কথা যে সময়ে এই সব কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, সেই সময় সন্ধিক্ষণে তাঁর অকাল এবং ঘোর রহস্য-জনক অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে। তাঁর এই ঐতিহাসিক পরিকল্পনা অংকুরেই বিনষ্ট হয়।

১৮৪৬ খৃঃ ৩০ জুন এক নৈশভোজ-সভায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সামান্য সুস্থ হয়ে তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রসৈকতে যান। কিন্তু শরীর ভেঙে পড়ায় আর সুস্থ হতে পারলেন না। মাত্র ৫১ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর নশ্বর দেহ রাজকীয় সম্মানে সমাহিত করা হয়। ইংলণ্ডের অতি উচ্চ অভিজাত মহলে এবং রাজকীয় বংশের লোকেরা তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শবানুগমন করেন।

জলসা

ইমরাৎ খাঁ

•

ইউরোপ প্রত্যাগত ইমরাৎ খাঁ: ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই অবধি দীর্ঘ ছমাস ব্যাপী ইউরোপে এক সাংস্কৃতিক সফরের পর তরুণ শিল্পী ইমরাৎ খাঁ দেশে ফেরার পর শ্রীকালিদাস সান্যালের ব্যবস্থাপনায় শিল্পীর পার্ক-সার্কাসস্থিত বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। কলকাতার অসুস্থ পরিস্থিতির কারণে এই সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি বলে 'অমৃতে'র প্রতিনিধিকে বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে শিল্পী আকর্ষণীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করেন।

ছমাসব্যাপী সফরকালে লিবারপুল, কেম্ব্রিজ অকসফোর্ড, ব্রিস্টল, সেন্ট মার্টিন চার্চ (বার্কিংহাম) এবং আরও বহু শহরে ও দেশের শ্রেষ্ঠ ইম্প্রেসারিও আয়োজিত অনুষ্ঠান বাজিয়েছেন। তবলা সংগতে ছিলেন লতিফ আহমেদ খান। ইমরাৎ খাঁ সাহেবের আগের বারের টেলিভিশন অনুষ্ঠান সংগীতরসিক মহলকে এমনভাবে অভিভূত করেছিলো যে এ বছর বি বি সি প্রোগ্রামে ইহুদী মেনুইন, জুলিয়ান ব্রীম, অপর একজন সুবিখ্যাত পিয়ানোবাদকের সংগে মাস্টার মিউজিশিয়ান' ফিচারে ইমরাৎ খাঁকেও একটি একক সেতার বাদনের অনুষ্ঠানে দেওয়া হয়।

এ ছাড়া ইমরাৎ সেন্ট স্মিথ চার্চে বি বি সি লাঞ্চ কনসার্টেও অংশ গ্রহণ করেন। শিল্পীর প্রাচ্য মন চার্চের আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুপ্রাণিত হয়েছিলো বলেই এখানে বাজিয়ে তিনি নিজে যেমন আনন্দ পেয়েছেন তেমনই আনন্দ দিয়েছেন শ্রোতাদের।

অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলো বুর ফেস্টিভেল, হল্যাণ্ড কনসার্ট, ফেস্টিভেলস ডি এস্প্যানা লা করুণা, বার্মিংহাম আর্ট ফেস্টিভেল, ব্রিস্টল এসেকস য়ুনিভার্সিটি, আমস্টারডাম, সুইজারল্যাণ্ড, বাসাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল—লণ্ডন রয়াল হলে চ্যারিটি প্রোগ্রাম।

শেষোক্ত অনুষ্ঠানের পর উৎসবের ডিরেকটর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ডেভিড এল প্র্যাটসের উদ্যোক্তা মাইকেল জীনসকে লিখিত এক অভিনন্দনপত্রে ইমরাৎ সম্বন্ধে মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: 'হি ইজ দি মোস্ট ইনটারেস্টিং অফ অল দি আর্টিস্টস দ্যাট অ্যাপিয়ারড ইন দি ফেস্টিভেল। শুধু তাই নয় ১৯৭২ সালে পুনরায় ইমরাতের অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তি করেছেন।

প্যারিসের Salle Pleyell প্রেক্ষাগৃহে চার হাজার দর্শকপরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ইমরাৎ খাঁর অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা তৎক্ষণাৎ আরো তিনটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

ভারতীয় শিল্প ও সংগীত শিক্ষালয় জার্টিংটন কলেজে ইমরাৎ খাঁ সেতার শিক্ষাদান করেন এবং প্রতি বছর ছমাস ওদেশে থেকে এই অধ্যাপনার কাজ চালাবেন এই রকমই কথা আছে।

ইমরাৎ খাঁ লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি, ব্রাইটন, ব্র্যাণ্ডার ফোর্ড, লিভারপুল এবং রয়েল আকাদেমি অফ লণ্ডন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাজিয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন।

ভারতীয় রাগসংগীতকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর সাংস্কৃতিক ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলে ইমরাৎ খাঁ জানাচ্ছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ: বৎসরব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রে সস্ত্রীক বিদেশ সফরের পর স্বদেশে প্রত্যাগত শিল্পী ও সংগীতবিদ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের অভিজ্ঞতালব্ধ ওদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রের খবর জানবার সুযোগ হয়েছিলো কদিন আগে শ্রী ও শ্রীমতী এ সি লাল ও অদ্রিজা মুখোপাধ্যায় আয়োজিত ৮নং ডোভার লেনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে। ওদেশে পেনিসিলভিয়া ও আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কণ্ঠসংগীত ও তবলা শিক্ষাদানার্থে শ্রীঘোষ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। 'শিক্ষক হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতা কি?'—অমৃতের প্রতিনিধির এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঘোষ বলেন, 'ওরা বুদ্ধিমন্ত, পরিশ্রমী, শিক্ষাকালে নিয়মনিষ্ঠ, আগ্রহী ও গ্রাহিষ্ণু। অর্থাভাব এদেশের মত ওদেরও আছে। তবে উপার্জনের নানা পথ উন্মুক্ত থাকায় একাধারে—উপার্জন ও শিক্ষাগ্রহণ কাজেই ওঁরা আত্মনিয়োগ করতে পারেন।' আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোলো এই সার্বজনীন 'জ্ঞানদা'র শিক্ষার্থীগোষ্ঠীর মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ্বা এক মহিলাও ছিলেন। ভারতীয় সংগীতের প্রতি আকর্ষণ কত গভীর এই একটি উদাহরণই তার প্রমাণ। কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের মধ্যে যন্ত্রসংগীত শিক্ষার দিকেই ওদের আগ্রহ বেশী। তার অন্যতম প্রধান কারণ হোলো 'বোল'-এর অন্তরায়। বাণীর অর্থ না বুঝলে তার রসগ্রহণ ও পরিবেশন করা—এবং উচ্চারণ যথাযথ না হলে সংগীতের যথার্থ রাগটি ফুটে ওঠা মুস্কিল। এই জন্য আমি চেষ্টা করতাম পঙক্তিটি বাংলা কথা ইংরাজী অক্ষরে লিখে উচ্চারণ ও অর্থ বোঝাতে এবং এতে

সরগমে অংশগ্রহণকারী শিশু শিল্পীরা

অসফল হই নি।' উদয়শঙ্করের অন্যতম সংগীতপরিচালক পন্ডিত লালমণি মিশ্রও (সেতার, তবলা ও বিচিত্র বীণবাদক), এই সময়ে ওদেশে ছিলেন এবং সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ে একত্রে কাজ করেছেন।

উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণভারতীয় সংগীতধারার মধ্যে দক্ষিণভারতীয় সংগীতধারার প্রতি ও'রা সমধিক আকৃষ্ট। তার কারণ দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের ধরা-বাঁধা নিয়মবন্ধ পদ্ধতি কতকটা ওদেশের নোটেশনবন্ধ সংগীতের সমধর্মী। পক্ষান্তরে উত্তর ভারতীয় সংগীতে নিয়মবন্ধতা সত্ত্বেও সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশের মত 'ইম্প্রোভাইজেশন'এর বিস্তৃত সম্ভাবনা ওদের বিস্ময়ে হতবাক করে বলেই হয়ত দুর্লভ মনে হয় (এটা অবশ্য জ্ঞানদা আহরিত তথ্য থেকে আমার সিদ্ধান্ত)।

শ্রোতা হিসাবে—'ওদেশের প্রতিটি টেলিভিশন আমি নিয়মিত শুনেছি। বহু কনসার্ট, সিম্ফনী মিউজিক ইত্যাদিতে গেছি। রিদমের ওপর ওদের ঝোঁক বেশী। তবে ওদের তালপদ্ধতিতে আমাদের মত চক্রধার পরিক্রমার অথবা সোমে ফেরার মজা নেই। হয়ত সেইজন্যই আমাদের মেলডির ঐশ্বর্য ও রিদমের বৈচিত্র্য ওদের এমন অভিভূত করে। 'পপ-সংগীত ওদেশের বর্তমান সংগীতজগতের একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এ সংগীত ওদের ক্ল্যাসিক্যাল কনভেনশন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এ সংগীতে উন্মত্ত উল্লাসেরই প্রাধান্য এবং আমার ভারতীয় সংগীতের 'নাদে' অভ্যস্ত কান এ সংগীত থেকে কোনো রসগ্রহণ করতে পারিনি।

ওদের কর্মবেগাক্রান্ত দ্রুতগতি জীবন আজ ক্লান্ত বলেই ভারতীয় সংগীতের তপোধর্মী গভীর সম্পদের মধ্যেই যেন মনটা আশ্রয় খুঁজছে। আমিনুদ্দিন ডাগার ও মহিনুদ্দিন ডাগারের ধ্রুপদ ওদের ভালো লেগেছে।' এবার একটি একক সংগীতের আসরে শ্রীমতী ললিতা ঘোষ গীত কাজরী দাদরা, ভজন শুনে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। এই সব উচ্চাংগ লঘু সংগীতের যথেষ্ট 'স্কোপ' ওদেশে আছে বলে জ্ঞানদা মনে করেন। পরিশেষে বলেন, 'এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই ওদেশবাসীর ভারতীয় সংগীতের প্রতি এমন অনুরাগ শ্রদ্ধা শোনবার ও [illegible] রবিশঙ্কর ও আলি আকবরের অবদানপ্রাপ্য। এবং তাঁদের কাজে সাহায্য করবার জন্য আরো বহু শিল্পীর ওদেশে যাওয়া উচিত। ওরাও কিন্তু এদেশের শিল্পীদের [illegible]।'

"সরগম" প্রতিষ্ঠানের সংগীতোৎসব : গত ১৯ জুলাই রবীন্দ্র সদনে 'সরগম' সংগীত প্রতিষ্ঠানের সভাবৃন্দ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে এক সুদীর্ঘ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সকল অনুষ্ঠান সমান উপভোগ্য না হলেও নিষ্ঠার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠানের শতাধিক ছাত্রী সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন [illegible] অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। [illegible] রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের পরিচালনায় সমবেতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান, দিনেন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় সমবেত লোকগীতি, এবং সুবিখ্যাত সুরকার ও সংগীত-পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত পরিচালিত সংগীত আলেখ্য সু-সংবদ্ধ হওয়ায় দরুণই সু-শ্রাব্য হয়ে উঠেছিল। সমবেত যন্ত্রসংগীত পরিচালনার ছিলেন অভিজিৎ নাথ ও লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সবচেয়ে আনন্দদায়ক মণিশংকরের তত্ত্বাবধানে শিশু-শিল্পীদের 'ভারত নাট্যম' অনুষ্ঠান। একক অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, প্রতিষ্ঠান সম্পাদিকা সীমা দাস, সুবিনয় রায়, চন্দ্রপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র ও সাগর সেন। আপনাপন বৈশিষ্ট্যে এ'দের সকলের অনুষ্ঠানই উপভোগ্য হয়েছে।

উদয়ন আলয়ের নটরাজ : নটরাজের নৃত্য ছন্দের প্রতিটি চরণাঘাতে আহৃত হয় 'ঋতুরঙ্গশালা'র বৈচিত্র্য বিভব এবং নৃত্যগীতের ভাষায় বিভিন্ন ঋতুর সৌন্দর্যলোক উন্মোচিত করবার এক অভিনব প্রয়াসেই 'উদয়ন' আসর রবীন্দ্র সদনে 'নটরাজ' নৃত্যনাট্যের আয়োজন করেছিলেন। রুদ্র তাপস বিশ্বাসের দাবদগ্ধ তপস্যা দিয়ে সুরু করে বর্ষা, হেমন্ত, শীতের পথ বেয়ে বসন্তে এসে ঋতু উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। প্রতি ঋতুর আবির্ভাবের আগে 'নৃত্যের তালে তালে' গানের সংগতে নৃত্য দিয়ে আগমন-বার্তা ঘোষিত হয়। কবিগুরুর অন্তহীন সংগীত ভান্ডার থেকে সংগৃহীত গানগুলি রবীন্দ্রসংগীতের আকর্ষণীয় শিল্পীদের কণ্ঠে সৌন্দর্য আবেদন অংশটাই সৃষ্টি করেছে। সন্তোষ সেনগুপ্তের কণ্ঠে 'ওকে বাঁধিবে কেরে' নীলিমা সেনের 'এসো শরতের অমল মহিমা, বনানী ঘোষের 'আলোর অমল কমলখানি' ঋতু গুহ-ঠাকুরতার 'বন্ধু রহ সাথে'—সুরে সুরে রূপময় করেছে ঋতুর অন্তর্বাণীকে। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে মায়া সেনের 'শারদশ্রী হে ভুবন মোহিনী'।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুমি কেন দিয়ে যাও' গানটিতে 'যে মোর [illegible] হাসিতে লীন'—মনের মধ্যে এমন এক অনপণেয় রেশের ব্যঞ্জনা রেখেছে যার কাঁপন উৎসব শেষেও থামে নি।

সুচিত্রা মিত্রের "নাই রস নাই" "তাই হোক হে নির্মম" তে "নির্মম" নির্মমত্বের প্রতি সোহাগ আবেগের কোমল উত্তাপ আমাদের কান এড়ায়নি। কিন্তু উপরোক্ত উচ্চমানের গানগুলির সৌন্দর্য মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে ঠিক ততখানি নিম্নমানের নৃত্য। কাজি সব্যসাচীর আবৃত্তি সংগতে ধ্যান নিমগ্ন নীরব নগ্ন বালকের [illegible] নৃত্য ছাড়া আর কোনো নৃত্যই পরিবেশনার উপযুক্ত নয়। পশ্চাৎপটে নটরাজের ছায়াছবি অবান্তর। 'নৃত্যের তালে' নাচই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। এই উৎসব অপূর্ব ব্যঞ্জনায় হৃদয়গ্রাহী হোতো যদি নৃত্য বর্জন করে শুধু সংগীত শিল্পীদের মঞ্চে উপস্থিত করে ঋতুর ক্রম-পর্যায়ানুসারে গানগুলি গাওয়ানো হোতো।

—চিত্রাঙ্গদা

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত জননী। জয়া ভাদুড়ী। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

শ্রমিক নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে

'আমরা এদেশে যতই শ্রমিকের নেতৃত্ব বলে চেঁচাই না কেন, বরাবর দেখেছি, নেতৃত্বটি মধ্যজীবীদের হাতের মুঠোয় শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। আর মজদুর ভাইরা কলে কারখানায় যেমন মনিববাবুর হুকুম তামিল করে, তেমনি ইউনিয়নে তামিল করে কমরেডবাবুর হুকুম।... লেবর ফ্রন্টে কাজ করতে এসে দেখি নেতৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে শুধু মধ্যবিত্তের। যে পাতি (পেটি) বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর আস্থা না রাখবার তালিম পেয়ে এসেছি পার্টি সাহিত্যে, দেখি লেবার মুভমেন্টের তাবৎ লীডার তারাই।'—বলিয়েছেন গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী) জনৈক পার্টি কর্মীকে (যার ডাক নাম গোরে) দিয়ে তাঁর 'সাগিনা মাহাতো' কাহিনীতে।

পশ্চিমী দেশের মতো আমাদের ভারতেও ট্রেড ইউনিয়নের বা শ্রমিক সমিতির জন্ম হয়েছে মালিকদের অন্যায় অত্যাচার ও বঞ্চনা থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোরদার করবার জন্যে। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমিক সমিতিগুলি যথার্থভাবেই শ্রমিকদের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার পথে আছে অন্তত দুটি উত্তুঙ্গ বাধা: এক, আমাদের দেশের 'লেবার-ল' বা শ্রম-আইনগুলি এমনভাবে রচিত হয়েছে, যাতে কোনো এক বিরোধ বা দাবি-দাওয়ার মীমাংসা কোনো মতেই চট করে হবার নয়, প্রচুর চিঠি চাপাটি, দ্বি-পাক্ষিক বা ত্রি-পাক্ষিক মীমাংসা বৈঠক, শ্রম-আদালত প্রভৃতি গড়িয়ে ধীর পদে এগোতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয় এবং দুই, আমাদের দেশে শ্রমিক বা মজদুর ভাইদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য বলে শ্রমিক সমিতিগুলির কর্তৃত্ব বর্তায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের উপর যাঁরা শ্রমিকদের স্বার্থ থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পার্টির স্বার্থকে বড়ো করে দেখতে অভ্যস্ত। নিরক্ষর শ্রমিকদের এই মধ্যবিত্ত বা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তারা যা বোঝান এবং যে পথে চালান, তারা গড্ডালিকার মতোই তাই বোঝে এবং সেই পথেই চলে।

—হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ব্রিটিশ মালিকাধীন এক কারখানার কর্মী সাগিনা মাহাতো তার কথায়, বার্তায় ও কাজে তার সহকর্মীদের এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিল যে, শহুরে লেখাপড়া জানা বাবুরা তাদের দুঃখে হয়ত মদত দিতে পারেন, কিন্তু তাদের হতাশাচ্ছন্ন জীবনে আশার আলোক ফোটাতে হলে তাদের দাবিকে জোরদার ও কায়েম করতে হলে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধকে শক্তিশালী করতে হলে, তাদের নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঙ্ঘশক্তি অর্জন করতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সকলে মিলে পরামর্শ করে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে আরও বুঝেছিল এবং তার সাথী-

দেরও বুঝিয়েছিল, আবেদন-নিবেদনে মালিকরা কর্ণপাত করেন না, তাঁরা একমাত্র শক্তির কাছে মাথা নত করেন।

অসুরের মতো শক্তিশালী, মদ্যপ ও রোমান্টিক প্রকৃতির সাগিনা জানত, কোম্পানীর যত শক্তি তা হচ্ছে অর্থে এবং সেই অর্থ আসে চালু কারখানা থেকে। কাজেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে কাজ বন্ধ করে কারখানাকে অচল করলেই কোম্পানীর বিষদাঁত ভেঙ্গে যাবে। সেই পথেই সে চলছিল; এমন সময়ে সংগঠন-কর্মী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অমল ওর কাছে এল ওর সহকর্মীদের দৃঢ়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করবার কাজে সাহায্য করবার জন্যে 'এ দুনিয়ায় সব মানুষ এক', এই সাম্যের বাণী নিয়ে। সাগিনা খুশীই হল অমলকে পেয়ে।

কারখানার ফোরম্যান যখন এক শ্রমিকের তরুণী স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতে গিয়ে তার হস্তে প্রহৃত হয় এবং পরে তারই মিথ্যা সাক্ষে শ্রমিক যুবকটি পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তার হয়, তখন সাগিনার নির্দেশে কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। অমলের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এল মিঃ দত্ত, অনিরুদ্ধ ও বিশাখা কর্মী ও মালিকপক্ষের মধ্যস্থতা করতে। কিন্তু মধ্যস্থতা উপলক্ষে মালিকপক্ষের কানিংহাম-এর সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করল অনিরুদ্ধ শ্রমিক দলপতি সাগিনা মাহাতোর বিরুদ্ধে। সে দেখেছিল সাগিনা থাকতে সে শ্রমিকদের উপর নেতৃত্বের অছিলায় নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে না। তাই সাহেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে সাগিনার জন্যে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের পদ সৃষ্টি করে সকলকে বুঝিয়ে দেয়, শ্রমিকদের জন্যে সুখ-সুবিধা আদায় করবার কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি সাগিনারই এই পদ প্রাপ্য। সাগিনার গায়ে উঠল প্যান্ট, সার্ট, কোট, নেকটাই, চকচকে জুতো, তার বাড়ীর পার্টিতে বিলিতী মদের ফোয়ারা ছুটল। সাগিনা তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়ে পড়ল শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাকে আরও দূরে টানবার জন্যে একটি অছিলা করে তাকে কলকাতায় সরিয়ে আনা হল। অনিরুদ্ধ প্রমাণ করতে চাইল তার অকর্মণ্যতা। কিন্তু পাশা উল্টে যেতে অনিরুদ্ধ যখন দল থেকে বহিষ্কৃত হল, তখন সে তার অনুবর্তীদের নিয়ে সাগিনার সহকর্মীদের মাঝে এল নিজের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টায় এবং জনস্বার্থের বিরোধী বলে সাগিনাকে অভিযুক্ত করল গণ-আদালতের সামনে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই অভিযোগকারী অনিরুদ্ধ নিজেই অভিযুক্ত হল ক্ষমতা-লোলুপতার দায়ে এবং সকলের সামনে তার মুখোশটি খসে পড়ে তার কদর্যরূপ প্রকাশে উত্তেজিত হয়ে যখন সে তারই সহকারী অমলের প্রতিবাদকে সহ্য করতে না পেরে উন্মত্তের মতো তাকে হত্যা করে, তখন জনতা আবার সাগিনা মাহাতোকে তাদের নেতৃত্বে বরণ করে প্রকৃত সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

রূপশ্রী ইন্টার ন্যাশনাল-এর পক্ষে হেমেন গাংগুলী ও জে কে কাপুর প্রযোজিত 'সাগিনা মাহাতো'র কাহিনীর চুম্বকটি উপরে দেওয়া হল। কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক তপন সিংহ জানিয়েছিলেন যে, রূপদর্শী লিখিত সাগিনা মাহাতো কাহিনীর মূল চরিত্রটি তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং ঐ চরিত্রটি অবলম্বন করে একটি ছবি তৈরী করবার ইচ্ছা তিনি মনে মনে বহুদিন ধরেই পোষণ করছিলেন। ঐ সাগিনা চরিত্রটিকে তাঁর নিজের মনের মতো করে ফোটাবার জন্যে তিনি রূপদর্শীর কাহিনী থেকে কোনো কোনো ঘটনা ব্যবহার করলেও রূপদর্শী লিখিত কাহিনীটিকে তিনি কখনই হুবহু অনুসরণ করেননি। আমরাও বলব, শ্রীসিংহ হিমালয়ের কোলের ঐ দামাল ছেলেটির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত রূপটিকে উপভোগ্য ও জীবন্তভাবে প্রকাশ করবার জন্যে রূপদর্শী লিখিত কাহিনীর অন্তর্বর্তী কতকগুলি ঘটনাকে ব্যবহার করেছেন মাত্র এবং ঐ সঙ্গে কোন পথে অগ্রসর হলে যথার্থ শ্রমিক-কল্যাণ সাধিত হয়, তার ইঙ্গিতটি তাঁকে দিতে হয়েছে সাগিনার সমষ্টিগত রূপটিকে সার্থকভাবে প্রকাশের জন্যে।

সাদামাঠাভাবে সোজাসুজি স্ট্রেট স্টোরি টেলিং-এর মাধ্যমে সাগিনার জীবন-কাহিনীটি পর্দায় উপস্থাপিত না করে শ্রীসিংহ শেষ থেকে শুরু করেছেন এবং গণ-আদালতে সাগিনার বিচারের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তার ও তার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অতীত জীবনে বারে বারে ফিরে গেছেন যতক্ষণ না সাগিনার নির্দোষিতা এবং অনিরুদ্ধের ক্ষমতালোলুপতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে, ছবিটি হয়েছে প্রতি পর্যায়ে আকর্ষণীয় এবং সময় সময় যথেষ্ট উত্তেজনা-পূর্ণ। অবশ্য ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে সাগিনাকে বসিয়ে অনিরুদ্ধ কর্মীদের সঙ্গে তার যে বিভেদের সৃষ্টি করল, অনিরুদ্ধের গোপন চক্রান্তে সে ওই পদে থেকেও কর্মীদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কোন-রকমই সুরাহা করতে অক্ষম হওয়ায় কর্মী-দের মধ্যে তার প্রতিবিরূপতার সঞ্চার হচ্ছে, এমন ঘটনাবলী দেখাতে পারলে ছবিটি আরও বাস্তবধর্মী হতে পারত বলে আমাদের বিশ্বাস।

ছবিটিকে অসাধারণত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রভূত সাহায্য করেছে নাম-ভূমিকায় দিলীপকুমারের অভিনয়। সাগিনা মাহাতোর চরিত্রচিত্রণ দিলীপকুমারের নটজীবনের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। বিশেষ করে একটি বাংলা ছবির মুখ্য ভূমিকায় চলনে-বলনে-ভঙ্গীতে, বসা-দাঁড়ানো-শোওয়ায়, ললিতার সঙ্গে প্রেম ও পরিহাসে, সহকর্মীদের সঙ্গে কর্মবিরতির ঘোষণায় ও মদ্যপানের উল্লাস-প্রকাশে, সাহেবের সঙ্গে অন্যায়ের বোঝা-পড়ায়, লেখাপড়া জানা সংগঠন কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ও মতানৈক্য প্রকাশে— এমন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত অভিনয় আর কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

বাংলা সংলাপগুলি বলবার সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বরের বিচিত্র উত্থান-পতন অবর্ণনীয়। সত্যিই 'সাগিনা মাহাতো'য় দিলীপকুমারের অভিনয় দর্শন এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা। পাহাড়ী মেয়ে লালিতা বেশে সায়রা বানুর অভিনয়ে আছে চুম্বকের আকর্ষণ: সাগিনার প্রতি লালিতার আকর্ষণবোধ ও তার প্রতি সম্পদে বিপদে সাগ্রহ ব্যবহার তিনি চমৎকারভাবে প্রকাশিত করেছেন। বয়স্ক গুরুর ভূমিকাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের দক্ষ অভিনয় মাধ্যমে। স্বার্থসর্বস্ব সংগঠনকর্মী অনিরুদ্ধের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় সাগিনা মাহাতোর প্রতি বিশ্বাসঘাতককে স্বার্থহীনরূপে চিত্রিত করেছেন। নির্মলচিত্ত কর্মী অমলরূপে স্বরূপ দত্তের অভিনয় আন্তরিকতাপূর্ণ। অপরাপর ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংগঠনপ্রধান মিঃ দত্ত), কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় (বাদল), সুস্মিতা সান্যাল (বিশাখা), তোদ কোহেন (বিলাস) এ সি কোহেন (আর্চার), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (আর্চারের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট), রোমী চৌধুরী (লছমী), কে এল লিডল (কানিংহাম), অসীম চক্রবর্তী (পুলিশ অফিসার) প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বহিদৃশ্যপ্রধান এই বিরাট ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে চিত্রগ্রহণে, বহিদৃশ্য নির্বাচনেও সুপ্রযুক্ত অন্তদৃশ্য রচনায় এবং সম্পাদনায় যথাক্রমে বিমল মুখোপাধ্যায়, সুনীতি মিত্র ও সুবোধ রায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ছবির দুখানি গানই ছবির আবহ-সৃষ্টিতে এবং উপভোগ্যতাবর্ধনে সাহায্য করেছে এবং ওরই মধ্যে 'ঝির ঝির ঝোরা তির তির নাচেরে তির তির নাচে' গানখানি যে মাধুর্য রচনা করে, তার তুলনা নেই। আবহ-সংগীত ছবির বিভিন্ন পরিস্থিতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

রূপশ্রী ইণ্টার ন্যাশনাল নিবেদিত ও তপন সিংহ পরিচালিত 'সাগিনা মাহাতো' সর্বাংশে একটি বিরাট ছবি। নিম্ন হিমালয়ের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বুকে নিয়ে ছবিখানি নাম ভূমিকায় হিন্দী চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠতম নায়ক দিলীপকুমারের আশ্চর্য প্রাণবন্ত অভিনয় দ্বারা সমৃদ্ধ। এবং এই উভয় কারণে ছবিটি বাংলা চিত্রজগতে যে একটি নূতন ইতিহাস রচনা করবে, এ-সম্পর্কে আমরা দৃঢ়নিশ্চয়।

হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'এই তো!' একদা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে হাসির নাটক হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু ঐ রচনাটিকেই অবলম্বন করে শ্রীভট্টাচার্য দ্বারা চিত্রনাট্যাকারে গ্রথিত 'এই করেছো ভালো' দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া প্রযোজিত ও লাইট অ্যান্ড শেড প্রাঃ লিমিটেড নিবেদিত বাংলা চলচ্চিত্ররূপে দর্শকদের মধ্যে যে-হাসির সঞ্চার করতে পেরেছে, তার অনেকখানিই অন্যতম নায়ক আশীষবেশী অনুপকুমারের বিশেষ অভিনয় ও বাচনভঙ্গীর ওপর নির্ভরশীল। এখানে বলা কর্তব্য, আমরা যেসব বিদেশাগত হাসির ছবি দেখি, সেগুলির হাস্যোদ্রেককারিতা পরিস্থিতি-নির্ভর (সেগুলি হচ্ছে 'সিচুয়েশন কমেডি')। কিন্তু আমাদের দেশে আগেকার যুগের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' এবং বর্তমান যুগের (প্রায় বছর পাঁচ-ছয় আগে নির্মিত) 'একটুকু বাসা' ছাড়া সিচুয়েশন কমেডির সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। আমাদের যা-কিছু হাসানো, তা সংলাপ আশ্রয় করে এবং বিশেষ বিশেষ অভিনেতার বাচনভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।

প্রথম তো 'এই করেছো ভালো'য় যেই শোনা যায়, কৃপণ যদু বা মদন গাঙ্গুলী দুটি 'ডিভোর্সড' মেয়েকে বিবাহ করতে

'আবিরে রাঙানো'/পরিচালনা : অমল দত্ত/সুচন্দ্রা ও মন্মথ

হবে, এই সর্তে দুই ভাগ্নের নামে তাঁর বিরাট বিষয়সম্পত্তি উইল করে গেছেন, অমনই মনে হয়, কাহিনীটি নিশ্চয়ই কোনো বিদেশী রচনার ছায়া অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। আবার যেই দেখা যায়, দুটি অবিবাহিতা মেয়ে তাদের বান্ধবীর পরামর্শে, আসন্ন বিবাহবিচ্ছেদোদ্যতারূপে ভাগ্নেদুটির সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তখনই মনে হয় যথার্থ বিবাহবিচ্ছেদের পরে দুটি মেয়ে ঐ ছেলেদুটির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করত, সেই বিরল অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বঞ্চিত হলুম। এবং শেষপর্যন্ত যখন দেখা যায়, মেয়েদুটি অবিবাহিতা জানা সত্ত্বেও ছেলেদুটির সঙ্গে ওদের বিবাহ হওয়ায় অ্যাটর্নীর দিক থেকে কোনো বাধা এল না, যেহেতু উইলের সর্তগুলি কল্পিত, তখন মনে হয়, এই কণ্টকিত হাঙ্গামার সত্যিই কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা? নতুন পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো বলিষ্ঠ কাহিনী নির্বাচন করলে ভাল করতেন।

না, কাহিনী রচনায় কোনো হাস্যকর পরিস্থিতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি। তবু যে আমরা হেসেছি, সে হচ্ছে অনুপকুমার (আশীষ), বঙ্কিম ঘোষ (যদু গাঙ্গুলী), রবি ঘোষ (ভজহরি), জহর রায় (মাস্টার), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (অভয়ংকর), নৃপতি চট্টোপাধ্যায় (লালমোহন) প্রভৃতি বাচন ও ভঙ্গীসহ অভিনয়গুণে। স্ত্রী-চরিত্রগুলিতে লিলি চক্রবর্তী (তাপসী), শমিতা বিশ্বাস (সেবা), যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় (রেবা) ও সরস্বতী চট্টোপাধ্যায় (মঞ্জু) চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মধ্যমানের। ছবির সংগীতাংশ অত্যন্ত দুর্বল। একখানি নারীকণ্ঠের গানের সময় দর্শকবৃন্দকে বিদ্রূপ করতেও দেখা যায়।

নাইট অ্যান্ড শেড নিবেদিত এই কারেন্সা ভাজো' অভিনয়গুণে হাস্যরস পরিবেশনে সমর্থ হয়েছে।

মঞ্চাভিনয়

পত্রিকা ভবনে বামনাবতার : শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে ২৬ আগস্ট, সোমবার রাত্রে বাগবাজারস্থ 'অমৃতবাজার পত্রিকা ভবনে' বাংলার সুপ্রাচীন সৌখীন নাট্য-সংস্থা আর পি বি এস সাংস্কৃতিক শাখার সভ্য অগণিত ভক্তদর্শকমন্ডলীর মাঝে মঞ্চস্থ করেন ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর অমর অবদান মঞ্চ সফল নাটক 'বামনাবতার'। প্রত্যেকটি চরিত্র, কি গানে-কি নাচে-কি অভিনয়ে, সুঅভিনয়ের জন্য সত্যই সমগ্র দলটি বিশেষ প্রশংসনীয়। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রশংসা করতে হয় নাট্য পরিচালক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা সংগীতজ্ঞ প্রভাতকুমার ঘোষের, সংগীত ও নৃত্য শিক্ষক হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের, সংগীত পরিচালক নলিনীকান্ত করণের। আজও নাট্য জগতে বাগবাজারের অবদানের সাক্ষ্য দেয় রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি সাংস্কৃতিক শাখার শিল্পীর তাদের পুরোন ঐতিহ্যকে বজায় রেখে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন নারায়ণ—সুনীতি দাস, নারদ—কার্তিক দাস, শুক—ঝুমা ঘোষাল, বিশ্বাস—প্রভাত ঘোষ, উপেন্দ্র (বামন)—দীপালি দাস, শুক্রাচার্য—অজিত সাহা, বলি—সুবোধ সরকার, প্রহ্লাদ—শিবরঞ্জন ভট্টাচার্য, অনুহ্লাদ—শিবসুন্দর সিংহ, বিরোচন—কানাইলাল ঘোষ, ব্রাহ্মণ—রাধিকা মুখার্জি ও সত্যনারায়ণ ঘোষাল, লক্ষ্মী—কৃষ্ণা দাস, পৃথিবী—রেণুকা ভৌমিক, ভক্তি—সুষম দাঁ, মীমাংসা—দীপালি দাস, দিতি—পান্না দাস, বিন্ধ্যা—রবী ঘোষ, পুষ্প—শর্মিষ্ঠা ঘোষ, কালিন্দী—সাধনা দত্ত, দেববালা ও সখিগণ—মন্দিরা, জয়া, রীণা, শিপ্রা, বুলা, কল্পনা ও শিখা। যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন মুরলীধর মল্লিক, গদাধর মল্লিক, লক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীমানী, পরেশ ভট্টাচার্য, সুবোধ নট্ট হরিচরণ দাস, হেমচন্দ্র দাস। গ্রন্থনায়—শশাঙ্ক ভট্টাচার্য।

কৌশিকী : সিরাজ চৌধুরীর 'বিস্ফোরিত বিবর' বিতর্কিত বিষয়ের ওপর রচনা। আজকের আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্যিক ও আশ-পাশের ঘুনধরা সমাজ ব্যবস্থার শিকার এমন কিছু সাধারণ চরিত্র নিয়েই নাটকের পাত্র-পাত্রী একদিনের প্রগতিশীল সাহিত্যিক আজ বিকৃত ও বিক্রীত। প্রকাশক আজ অর্থলোলুপ। নাট্যকার শ্রীচৌধুরী শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাহিত্যিকের আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উত্তরণ ঘটিয়েছেন নাটকের। অতি পরিচিত কৌশিকী নাট্যসংস্থা সিরাজ চৌধুরীর এই একাঙ্ক নাটিকাটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন গত মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) মিনার্ভা মঞ্চে। পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সুনিপুণ দক্ষতায় প্রতিটি চরিত্রকে বিশ্বাস্য ও দর্শনীয় করে তুলেছেন। পাশ্চাত্য ঢংয়ের দৃশ্যবিন্যাসে নাট্যকারের সঙ্গে পরিচালকেরও কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। প্রধান তিনটি চরিত্রে মণ্টু চক্রবর্তী, অরবিন্দ সেনগুপ্ত ও গৌতম মুখোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয় মনে রাখার মত। দু-একটি দৃশ্যে শ্রীচক্রবর্তী কিছু মাত্রায় অতি

নাটকীয় ও অ-নাটকীয়। অপর তিনটি চরিত্রে শংকর চক্রবর্তী, আরতি ঘোষ ও অমল মন্ডল চরিত্রানুগ। শ্রীমতী ঘোষের সুযোগ ছিল, তবে তার সদ্ব্যবহার হয়নি। ঐ সন্ধ্যায় আরও একটি একাংক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। শ্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ছক্কা পাঞ্জা' অবলম্বনে 'প্রেম তত্ত্ববোধিনী সংঘ?' নামকরণ থেকেই অনুমেয় নাটকটি কৌতুক রসের। মূল গল্পের কৌতুকরস নাট্যরূপায়ণে (নাট্যরূপ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়) কিছু মাত্রায় ব্যাহত। রবি ঠাকুরের চিরকুমার সভার ছাপ আছে সারা নাটক জুড়ে। প্রেমের মৃত্যু বিবাহে আর বিবাহেই মৃত্যু ঘটেছে 'প্রেমতত্ত্ব বোধিনী সংঘে'র কৌতুক-রসের এ নাটকে কুশলীদের সুযোগ বিশেষ নেই, কারণ স্বল্প পরিসর। এ ব্যাপারে নাটক বিস্তারের প্রয়োজন আছে। ত্রিরিশ মিনিটের এই হাসির একাংক নাটকে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতিন বিশ্বাস, গৌতম মুখোপাধ্যায়, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল মন্ডল, দীপক দাস, দত্তা মুখোপাধ্যায়, আরতি ঘোষ, সর্বাণী বিশ্বাস প্রমুখ।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মিহির ভট্টাচার্য

গেল ১৮ আগস্ট মঞ্চ, চলচ্চিত্র, বেতার ও যাত্রাজগতের খ্যাতিমান অভিনেতা মিহির ভট্টাচার্য কিছুদিন রোগভোগের পরে মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি অন্তত শতাধিক বাংলা চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে প্রদর্শিত 'প্রথম কদম ফুল' চিত্রেও তাঁকে সাফল্যপূর্ণ অভিনয় করতে দেখা গেছে। তাঁর প্রথম ছবি হচ্ছে সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত 'রাজকুমারের নির্বাসন'। তিনি মঞ্চে প্রথম অবতরণ করেন 'ভটিনীর বিচার' নাটকে। শিশিরকুমার পরিচালিত শ্রীরঙ্গমে তিনি শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' নাটকে দ্বিজদাসের ভূমিকা অভিনয় করে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। [illegible] সংস্থার তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। কিছুদিন তিনি এই সংস্থার সহকারী সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি কিছুদিন 'অভিনেতৃ সংঘ'-এরও সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র এবং তিন কন্যাকে রেখে গেলেন। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন জানাচ্ছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

যাদুশ্রেষ্ঠ পি সি সরকার জুনিয়ার নেপাল সফরে : যাদুশ্রেষ্ঠ পি সি সরকার জুনিয়ার যাদুজগতের একটি অতি সুপরিচিত ও বিখ্যাত নাম। যিনি নেপাল সরকারের আমন্ত্রণে সদ্য নেপাল সফর শেষ করে ভারতে ফিরে এসেছেন।

রাজা মহেন্দ্রর ৫১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় সেখানে যাদুকরী পি সি সরকার জুনিয়ারের আবির্ভাব এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ক্রমাগত একের পর এক সপ্তদশ খেলায় যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উপস্থিত অন্যান্য দেশের জ্ঞানী ও গুণীরা উচ্চ-প্রসংশায় তাঁকে বার-বার সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি খেলাই উপভোগ্য। বিশেষত ভৌতিক বাকস, নারীদেহ দ্বিখণ্ডিত, শূন্যে ভাসমান বালিকা, মাদার অফ নেপাল প্রভৃতি উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে। তিনি উপস্থিত দর্শকের দ্বারা বার-বার অভিনন্দিত হয়ে তাঁদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করতে পেরেছেন।

সুরদাস সংগীত সম্মেলন : সুরদাস সংগীত সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর আকাদমি অফ ফাইন আর্টস হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে যোগদানকারী শিল্পীদের মধ্যে আছেন কণ্ঠে-ওস্তাদ নিসার হোসেন খান, বিজয় চক্রবর্তী, শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী সবিতা দেবী, শিপ্রা বসু, শ্রীদিনকর কৈকিনী ও কুমার মুখার্জি এবং আরতি বাগচী। যন্ত্র-সংগীতে—হালিম জাফর খান, নিখিল ব্যানার্জি, ভি জি যোগ ও আলি আমেদ হোসেন, সুব্রত রায়চৌধুরী। এছাড়া আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ওস্তাদ বাহাদুর আলি খান (হাফিজ আলি খাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলা দেশে সর্বপ্রথম সরোদ বাজাবেন)। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে আছেন শ্রী ভি রাঘবন (বীণ), শ্রীমতী নিরজা দেবী ভারতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করবেন। কথক নৃত্যে শ্রীমতী রুবি দত্ত ও মালশ্রী সেন।

যুবকের অনুষ্ঠান : গত ২২ আগস্ট 'শিক্ষণ পরিষদ' স্টাডি সেন্টারে 'যুবক' সাংস্কৃতিক শাখার দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্যের ব্যবস্থাপনায় ঐদিন শিল্পী ছিলেন সুরসাধক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক দীপক ঘোষ। সভাপতির ভাষণে তিনি নাটক এবং গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এর পর অধিবেশনের একক শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় টপ্পা, ভজন, নজরুল, শ্যামাসংগীত এবং আগমনী সংগীত পরিবেশন করেন। তবলায় সহযোগিতা করেন শুকদেব গোস্বামী। অনুষ্ঠান-শেষে সংসদ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ কৈলাশনাথ ভট্টাচার্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। চিত্র-পরিচালক অমিয় সান্যালের তত্ত্বাবধানে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হয়।

আগামী সপ্তাহে—**"নল দময়ন্তী" : জয়দেব চক্রবর্তী ও সমীরণ মজুমদার** প্রযোজিত জে এস ফিল্মস প্রোডাকসন্সের "নল দময়ন্তী" ছবিটি আগামী শুক্রবার ২৮ **আগস্ট বীণা, বসুশ্রী, মিত্রা ও অন্যান্য চিত্রগৃহের** অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত মহাভারতের অমর প্রেমকথাটি পরিচালনা করেছেন—গোপালকৃষ্ণ রায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—মণি বর্মা। সংগীতাংশ ছবিটির অন্যান্য অনেক আকর্ষণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলি কালীপদ সেনের সুরে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, আরতি মুখার্জি, সতীনাথ মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, গীতা দাস, গঙ্গা দে ও সুবোধ রায়। বিশ্বনাথ নায়ক ছবিটির প্রধান সম্পাদক। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন—অসীমকুমার ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—রবীন ব্যানার্জী, কালীপদ চক্রবর্তী, জহর রায়, অজিত ব্যানার্জী, গঙ্গাপদ বসু, জ্ঞানেশ মুখার্জী, শ্যাম লাহা, সুমন মুখার্জী, সুশীলেশ ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ মুখার্জী, মণি শ্রীমানী, রেণুকা রায়, দীপিকা দাস, বন্দনা চৌধুরী, কল্পনা দাস, সীমা ভৌমিক, লীলাবতী দেবী (কলালী), জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, রত্না ঘোষাল, শিখা ভট্টাচার্য, ইন্দিরা দে, লীলা চক্রবর্তী ও ছন্দা চ্যাটার্জী প্রমুখ শতাধিক শিল্পী। স্পেশাল এফেক্ট ফিল্ম ডিপ্টি এউস প্রাইভেট লিঃ ছবিটির পরিবেশক।

ত্রিনয়ণী মা—ছবির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত [illegible] চিত্রের [illegible] চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন [illegible]। সংগীতাংশ ছবিটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। অনিল বাগচীর সুরে ছবিটিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী, [illegible] ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখার্জী ও অশোক বাগচী। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনা আছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত, অমিয় মুখার্জী ও সুবোধ দাস। চরিত্র চিত্রণে আছেন কমল মিত্র, অসিতবরণ, গুরুদাস ব্যানার্জী, অজিত ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, মণি শ্রীমানী, শমিতা বিশ্বাস, আনন্দ মুখার্জী, শচীন মল্লিক, সীমা দেবী, অমরেশ দাস, কালীপদ চক্রবর্তী, অলোক বাগচী, দিলজু ভাওয়াল, সন্ধ্যা দে, তাপস চ্যাটার্জী, মধুমিতা এবং নবাগতা রূপা।

সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ভূতপূর্ব সম্পাদক হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয়ে গেল ১০ আগস্ট ম্যাজেস্টিক সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মনোরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে। এই উপলক্ষে ভূতপূর্ব সম্পাদকের কর্মপ্রচেষ্টা ও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রকর্মীদের জন্য প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যনিবাস সম্পর্কে বক্তৃতা দেন জনাব সইদ, সুধীপ্রধান, সভাপতি মহাশয় এবং আরও অনেকে।

খেলার কথা

কমল ভট্টাচার্য

ল্যাংচা মিত্র প্রসঙ্গে

প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর কেটে গেলেও এস. মিত্রের (ল্যাংচা) নাম আজও বাংলা ফুটবলরসিকরা ভুলে যাননি। বলতে দ্বিধা নেই, এঁর মত চৌকস খেলোয়াড় আজও আমার নজরে পড়েনি।

১৯১৯ সালে এস. মিত্রের জন্ম। বালিতে তাঁর বাড়ি। বড় হয়ে জানলেন ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড হোল্ডার মোহনবাগান দলের অন্যতম খেলোয়াড় মনমোহন মুখার্জি তাঁর প্রতিবেশী। মোহনবাগানেই খেলবেন এই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। আর সেই আকাঙ্খা পূরণ করতে তাঁকে কম কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। মোহনবাগান ক্লাব বলে কথা! সহজে সে স্থলে ঠাঁই মিলবে না এই ভেবেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রথমে হাওড়া ইউনিয়নে চার বছর, জর্জ টেলিগ্রাফে এক বছর, ভবানীপুরে দু' বছর খেলবার পর তবে তিনি মোহনবাগান ক্লাব থেকে ডাক পেলেন। প্রথম পদক্ষেপে তিনি ক্লাব কর্তৃপক্ষদের কাছে যে ব্যবহার পেলেন তাতে তাঁর বুক কেঁপে উঠেছিল। প্রথম দুটো ম্যাচে তিনি দলে জায়গা পেলেন না। বাদ পড়ার কোন অজুহাতও তিনি খুঁজে পাননি। তখন এস মিত্রের অনেক নামডাক। কম করে আধডজন খেলা ভারতীয় দলের হয়ে তিনি বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন। গোলও অনেক দিয়েছেন; আর ড্রিবলিং-এ তাঁর জুড়ি সে সময়ে ছিল না বললেই চলে। তাঁর ভলি সটের বাহার দেখে দর্শকরা পঞ্চমুখ হতেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও এস. মিত্রের মোহনবাগান দলে জায়গা হয়নি কেন?

সেবার মোহনবাগানের তৃতীয় ম্যাচ পড়ে দুর্ধর্ষ কাষ্টমস দলের বিরুদ্ধে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এস মিত্রকে এবার দলভুক্ত করলেন। তবে এই সর্তে যে, নিজের অভ্যস্ত জায়গা ছাড়তে হবে। অর্থাৎ লেফট্ ইন্ থেকে রাইট ইন্-এ খেলতে হবে। কেননা এস মিত্র যদি তাঁর নিজস্ব জায়গা না ছেড়ে দেন তাহলে আর একজনের খেলা মাঠে মারা যায়। কারণ মোহিনী ব্যানার্জির মত খেলোয়াড়কে কর্তৃপক্ষরা কিছুতেই দল থেকে বাদ দিতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু এস মিত্র তাতে বেঁকে বসলেন। এতদিনের অভ্যস্ত জায়গা তিনি ছাড়বেন কি করে? আর খেললেও তাঁকে কম অসুবিধে ভোগ করতে হবে না। সাফ জবাব দিলেন অন্য জায়গায় খেলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষরা বললেন, দশ মিনিট খেলেই দেখ না, তেমন অসুবিধে হলে নিজের জায়গায় খেলবে। ভেবে কূল পেলেন না এস মিত্র। দু'জনেই ভবানীপুর ছেড়ে মোহনবাগানে এসেছেন। অথচ মোহিনী ব্যানার্জির জন্যে তো তাঁকে এর আগে একবারও জায়গা ছাড়তে হয়নি। সাত পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত তিনি অনভ্যস্ত জায়গাতেই খেলতে রাজী হলেন। দেখাই যাক্ কি হয় এই ভেবে তিনি মাঠে নামলেন। বলার মত কথা, প্রথম দশ মিনিটের মধ্যেই এস মিত্র দুর্ধর্ষ কাষ্টমস দলের বিরুদ্ধে দুটি গোল দিয়ে বসলেন। সকলেই হতবাক হয়ে তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখলেন। তবে মোহনবাগান দলের কর্তৃপক্ষরা সেদিন চালে ভুল করেননি। তাঁরা আন্দাজ করেছিলেন এ অসাধ্য কাজ হয়ত এস মিত্রের দ্বারাই সম্ভব। সেই বদলী জায়গাতেই তিনি বরাবরের মত বহাল হলেন। এত কথা আমার জানবার কথা নয়। তবু এটুকু বলতে পারি, সেকালে দুই ইনসাইড ফরোয়ার্ডের পজিসনে মোহিনী ব্যানার্জি এবং এস মিত্র যে চটকদার খেলা দেখিয়েছিলেন তা একালের বাদও ভুলতে পারিনি।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় মোহনবাগানের প্রথম লীগ জয় ১৯৩৯ সালেই। এই কীর্তিতে এস মিত্রের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। আর সেই গৌরবের দিনটি এস মিত্রের জীবনে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বলেই ফেললেন, "জানেন জন্মলগ্নে মোহনবাগানের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে। ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের অন্যতম খেলোয়াড় মনমোহন মুখার্জির কথা বলছিলাম না, তাঁরই ছেলে বিমল মুখার্জি ছিলেন আমাদের প্রথম ফুটবল লীগ বিজয়ী দলের নেতা। সবই যেন এক সূত্রে বাঁধা। ভাবলেও কেমন লাগে।" উনষাট বছরের এস মিত্র কেমন হয়ে গেছেন। কাঁর সেই কথাই ভাবছিলেন। বয়সে এস মিত্র আমার চেয়ে বছর চারেক বড়ই হবেন। আর বয়সে বড় হলেও কি হবে চেহারায় সব-ভাবে তিনি আমার চেয়ে অনেক কমতি। অনেক বাস্তবের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এ দেশের ফুটবলের শিক্ষকতার কাজ তিনি অনেক দিন থেকেই নিয়েছেন। মাস্টারি কাজে তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেউ আছেন কিনা জানি না। তবে এ কাজে তিনি আত্মস্থ হতে পেরেছেন কিনা সেটা বলা শক্ত। অন্ততঃ তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হল যে, তিনি যেন এই শিক্ষকতার কাজে তেমন ভরসা আজও পাননি, আর কিছুটা হতাশও হয়েছেন বলে মনে হল।

এই প্রসঙ্গেই তাঁর কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু তিনি কথাটা পাড়লেন আরএকভাবে। মোহনবাগানে তিনি খেলেছেন মাত্র দু' বছর। একটা দুর্ঘটনা কি করে তাঁকে খেলা ভুলিয়ে দিল সেই কথাই তিনি বলবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন। ১৯৪১ সালের ২৪শে মে সেই দুর্ঘটনা ঘটল। খেলা মোহনবাগানের সঙ্গে এরিয়ানের। লীগের পঞ্চম খেলা। পেনাল্টি সীমানায় ভলি সট নিলেন এস মিত্র। খুব কাছে না হলেও পাশাপাশি এরিয়ানের দুই রক্ষণভাগের খেলোয়াড় দাসু মিত্র এবং এস তালুকদার দাঁড়িয়েছিলেন। সট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ একজন এগিয়ে এসে পা বাড়ালেন। পায়ে পায়ে সংঘর্ষ হল, দুজনেই আছড়ে পড়লেন। কিন্তু এস মিত্র আর উঠতে পারলেন না। কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর আঘাত সাংঘাতিক। হাড় ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। হাসপাতালে ভর্তি হলেন। হাড় আর কিছুতেই জোড়া লাগে না। দুর্ভোগ আর কাকে বলে। ডাক্তার বদ্যি করতেই বছর দুই কেটে গেল। স্বাভাবিক চলাফেরা কোনরকমে সম্ভব হলেও দৌড়ঝাঁপ একেবারে বন্ধ। খেলার মাঠে এস মিত্র নীরব দর্শক মাত্র। চোখের জল উপচে পড়ল। খেলা কি একেবারেই অসম্ভব? কিন্তু ভরসা দেবে কে? বুড়ো হাড় আবার ভাঙে যদি?

কিন্তু অবাধ্য মন কিছুতেই বাগ মানল না। লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আধটু ছোটাছুটি সুরু করলেন এস মিত্র। কখনও সখনও সাইকেলের পেছনে ধাওয়া করেন, আবার চলন্ত রিকসার পেছনের রড ধরে পায়ের স্টেপিং মিলিয়ে ছুটে চলেন। কদিনেই বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। তারপর মাঠে বল ঠেলাঠেলিও চলল। দেখে-শুনে অনেকেই আফশোষ করলেন; অনুকম্পা দেখিয়ে বললেন—আহা, ও কি আর খেলা ফিরে পাবে? বেচারা! কিন্তু এস মিত্র অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখলেন না। ধাপে ধাপে এগিয়ে চললেন। কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁর খেলার উৎসাহটাকে খুব একটা আমল দেননি। ধরেই নিয়েছিলেন তাঁর দ্বারা উন্নত পর্যায়ের ফুটবল খেলা আর সম্ভব নয়। বেগতিক দেখে ক্লাবের সেক্রেটারী, অভিলাষ ঘোষকে তাঁর খেলার কথা অকপটে বললেন এস মিত্র। কিন্তু অভিলাষবাবুর সাফ জবাব খেলা তুমি বন্ধ কর ল্যাংচা। তোমার সর্বনাশ হোক এটা আমি চাই না। যে ভীষণ আঘাত তুমি

পেয়েছে তাতে খেলা আর সম্ভব নয়। আমার এখানে ত' নয়ই। অন্য কোথাও যদি খেলো তাহলেও আমি বাধা দেব। আশাকরি আমার কথা কেউ অগ্রাহ্য করে তোমায় খেলার মাঠে নামাবে না।' শেষ পর্যন্ত এস মিত্রের সমস্ত অনুরোধ নিষ্ফল হল। তখন তিনি মরিয়া। দেখাবেন আজও তিনি অটুট রয়েছেন। খেলা তিনি ভুলে যাননি। চুপি চুপি পুরোন ক্লাব ভবানীপুরে ফিরে গেলেন। ল্যাংচার কথাও যে তখন অনেকেই ফেলতে পারতেন না। পা ভেঙে তাঁর জাত নষ্ট হয়েছে কিনা একবার যাচাই করে দেখতে দোষ কি? প্রথমে হেস্টিংসের সঙ্গে ফ্রেন্ডলী ম্যাচ। বাহবা পেলেন এস মিত্র। কর্তৃপক্ষও ভরসা করে প্রথম লীগ ম্যাচ কালীঘাটের বিরুদ্ধে এস মিত্রকে নামালেন। এতকাল বাদে, এত দুর্ভোগ সয়েও এস মিত্র ভাল খেলা দেখিয়ে প্রমাণ করলেন খেলার মাঠে বেঁচে থাকার মত রসদ তাঁর ফুরিয়ে যায়নি। খবরের কাগজে ফলাও করে এস মিত্রের নাম ছাপা হল। দুর্ভাগ্য মোহন-বাগানের, এ হেন খেলোয়াড়কে তারা হেলা ভরে ছাড়লেন কি করে? পরের দিন—অভিলাষবাবু ভবানীপুর ক্লাবের নানিবাবুকে বললেন—'করো কি? ছেলেটাকে মারতে চাও? ওর ভাল চাওতো আর খেলতে দিও না।' কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে, অভিলাষবাবুর কথা অমান্য করেন। এস মিত্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছুটলেন অভিলাষবাবুর কাছে—'একি করলেন? আমার এত সাধের খেলা আপনি বন্ধ করে দেবেন না। আপনার পায়ে পড়ি।' অভিলাষবাবুরও চোখ ছলছল করে উঠল। বুঝিয়ে বললেন, 'ল্যাংচা, তোর ভাল আমার চাইতে কেউ বেশি বুঝবে না। তুই ভুল বুঝিসনে। তোর কোন বড় সর্বনাশ হয়, এ আমি চাই না। প্রাণ থাকতেও তা আমি সহ্য করব না। তোর পরম হিতাকাংখী আমি। খেলার মাঠ ছাড়া তোর পক্ষে খুবই কষ্টের, তা আমি জানি। তাই একটা বুদ্ধি মাথায় খেলছে। ছোটদের খেলা শেখানোর কাজে তুই হাত পাকাতে আরম্ভ কর। এরমধ্যে থেকেই শান্তি পাবি। একটা মহৎ কাজও হবে; একজন নামজাদা কোচও হয়ে যেতে পারিস।"

এস মিত্র বলে চললেন, 'সেই মাষ্টারির কাজই ধরেছিলাম। আজও ছাড়িনি। কেউকেটা হতে পারিনি। তার জন্যে আফশোষ নেই। তবে কি জান, দেখে-শুনে ক্রমশঃ যেন ছোট হয়ে যাচ্ছি। জগতের অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধান দেখে হতাশ হয়ে পড়ছি। শক্ত হাতে হাল ধরব, যত শিথিলতাই আসুক না কেন শেষদিন পর্যন্ত লড়ব—এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু আমার চোখের দিকে চেয়ে এখন ব্যর্থতার কথাটাই কি বেশি করে মনে পড়ছে না? এমন কিন্তু ছিলাম না, এঁরা যে আমায় চায় না সেটা বুঝতে পেরেছি বলেই আজ আমার এত হতাশা। পারলাম না।'

এস মিত্রের জবাবে আমার কিছু বলা হয়ত উচিৎ ছিল, কিন্তু আমিও পারিনি। বাংলার ফুটবল খেলার ভবিষ্যৎ কি ভাবে গড়বে, কি ভাবে উন্নতি হবে সে দেখা হয়ত আমাদের ভাগ্যে আর জুটবে না।

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম বিশ্ব একাদশ

পঞ্চম টেস্ট খেলা

ইংল্যান্ড : ২৯৪ রাণ (কাউড্রে ৭৩, ইলিংওয়ার্থ ৫২ এবং এ্যালান নট ৫১। ম্যাকেঞ্জি ৫১ রানে ৪ এবং ইন্তিখাব ৯২ রানে ২ উইকেট)।

ও ৩৪৪ রান (জিওফ বয়কট ১৫৭ এবং কেন ফ্লেচার ৬৩ রান। সোবার্স ৮১ রানে ৩ এবং লয়েড ৩৪ রানে ৩ উইকেট)।

বিশ্ব একাদশ : ৩৫৫ রান (জি পোলক ১১৪, সোবার্স ৭৯ এবং প্রোক্টার ৫১ রান। লেভার ৮৩ রানে ৭ এবং স্নো ৭৩ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৮৭ রান (৬ উইকেটে। কানহাই ১০০, লয়েড ৬৮ এবং সোবার্স নট আউট ৪০ রান। স্নো ৮১ রানে ৪ উইকেট)।

ওভালে ইংল্যান্ড বনাম বিশ্ব একাদশ দলের শেষ ৫ম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব একাদশ দল ৪ উইকেটে জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত ৪—১ খেলায় 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ড ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২২৯ রাণ সংগ্রহ করে। ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায়—লাঞ্চের সময় ৬৬ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৫০ (৫ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ঠিক আগে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ২৯৪ রানের মাথায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাকি পাঁচটা উইকেটে ইংল্যান্ড মাত্র ৬৫ রাণ সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় বিশ্ব একাদশ দল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৩১ রাণ তুলে দেয়। ৫ম উইকেটের জুটি পোলক ১০৪ রাণ এবং সোবার্স ৫৫ রাণ করে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে বিশ্ব একাদশ দলের ১ম ইনিংস ৩৫৫ রাণের মাথায় শেষ হলে তারা ৬১ রাণের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। ৫ম উইকেটের জুটি পোলক এবং সোবার্স দলের মূল্যবান ১৬৫ রান তুলে দেন। পোলকের ১১৪ রানে ছিল ১৭টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী। সোবার্স তাঁর ৭৯ রানে ১২টা বাউন্ডারী করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার পিটার লেভার (ল্যাঙ্কাসায়ার কাউন্টি) তাঁর ২৯ বছর বয়সে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। (ওভার ৩২-৫, মেডেন ৯, রান ৮৩ ও উইকেট ৭টা।) তিনি বিশ্ব একাদশ দলের তিনজন খ্যাতনামা ন্যাটা খেলোয়াড়—সোবার্স, পোলক এবং লয়েডকে আউট করেন। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ৩৪৪ রানের মাথায় শেষ হয়। বয়কট এবং ফ্লেচারের ৩য় উইকেটের জুটিতে ইংল্যান্ডের ১৫৪ রান উঠেছিল। বয়কট সেঞ্চুরী (১৫৭ রান) করেন—টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই ৭ম সেঞ্চুরী।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৮৪ রান তুলতে বিশ্ব একাদশ দল ২য় ইনিংস খেলতে নেমে ১ উইকেট খুইয়ে ২৬ রান সংগ্রহ করে। হাতে জমা থাকে একদিনের খেলা এবং ২য় ইনিংসের ৯টা উইকেট। জয়লাভের জন্যে আরও ২৫৮ রান।

খেলার শেষ ৫ম দিনে বিশ্ব একাদশ দল জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৪ উইকেটে জয়ী হয়। তাদের ২য় ইনিংসের ২৮৭ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

বিশ্ব একাদশ দলের জয়লাভের জন্যে ২৮৪ রানের প্রয়োজন ছিল। দলের ২৮৩ রানের মাথায় সোবার্স ইংল্যান্ডের পেসবোলার লেভারের বল বাউন্ডারীতে পাঠালে বিশ্ব একাদশের ২৮৭ রান দাঁড়ায়—প্রয়োজনের থেকে ৩ রান বেশী। কানহাই এবং লয়েডের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ১২৩ রান উঠেছিল। কানহাই তাঁর শত রানে ১২টা বাউন্ডারী করেছিলেন।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৫৮৮), এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান (১৮৩) এবং সর্বোচ্চ গড় রান (৭৩.৫০) করার গৌরব লাভ করেন। তাছাড়া তিনি উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট উইকেটও (৪৫২ রানে ২১টি) পেয়েছেন। এক কথায় তিনি যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 'অল রাউন্ডার' তা বর্তমান সিরিজের খেলাতেও অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছেন।

ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন জিওফ বয়কট (গড় ৬৫) এবং সর্বাধিক মোট রান (৪৭৬) করেছেন ইংল্যান্ড দলের অধি-

দর্শকদের সামনে বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স গিনেস ট্রফিটি তুলে ধরেছেন। ইংল্যাণ্ড বনাম বিশ্ব একাদশ দলের টেস্ট সিরিজে বিশ্ব একাদশ দল ৪—১ খেলায় জয়লাভের সূত্রে এই ট্রফিটি পেয়েছে।

নায়ক রে ইলিংওয়ার্থ। ইংল্যাণ্ডের বোলিংয়ের গড় তালিকায় স্নো-র স্থান প্রথমে (১১টি উইকেট এবং গড় ২৬-৮৮)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক মোট উইকেট নিয়েছেন জন স্নো (৬৮১ রানে ১৯টি ও গড় ৩৫-৮৪)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

কলকাতা শহরের বর্তমান অবস্থা খেলাধুলোর পক্ষে মোটেই সুস্থ পরিবেশ নয়। বোমা, টিয়ারগ্যাস, গুলি, অগ্নিকাণ্ড, যানবাহন চলাচলে অনিশ্চয়তা প্রভৃতি ঘটনা সহর জীবনে যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গড়ের মাঠের ফুটবল খেলা দেখার উৎসাহ, উদ্দীপনা আপাততঃ লোকের অনেক কমে গেছে। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার শেষ খেলা হয়েছে গত ১৭ই আগস্ট। তারপর ১৮ই থেকে ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত প্রথম বিভাগের লীগের কোন খেলা হয়নি। মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের অসমাপ্ত লীগ খেলাটি গত ২৮শে আগস্ট তারিখে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সহরের বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই নির্দিষ্ট খেলাটি স্থগিত রাখা হয়েছে। উক্ত খেলা ৩০শে আগস্ট তারিখে হওয়ার কথা আছে।

এদিকে প্রথম বিভাগের সুপার লীগ খেলার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সুপার লীগ খেলা আরম্ভ হবে ৩১শে আগস্ট এবং শেষ হবে ২৬শে সেপ্টেম্বর। সুপার লীগে খেলবার যোগ্যতালাভ করেছে এই ৫টি দল : মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, বি এন আর এবং রাজস্থান।

ডেভিস কাপ

১৯৭০ সালের ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৪—১ খেলায় স্পেনকে পরাজিত করে আমেরিকার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলা এই প্রথম। অপরদিকে স্পেন দুবার (১৯৬৫ ও ১৯৬৭) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে পরাজয় বরণ করেছে।

আমেরিকা বনাম পশ্চিম জার্মানীর চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলার আসর বসবে এই তিনদিন—আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০শে আগস্ট ওহিয়োর ক্লেভল্যাণ্ডে। এখানে উল্লেখ্য, আমেরিকা এ পর্যন্ত মোট ২১ বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে এবং ১৯৬৮ সাল থেকে আমেরিকাই ডেভিস কাপ পেয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭০ বছরের ইতিহাসে (১৯০০—৬৯) আমেরিকাই সর্বাধিকবার (৪৫ বার) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে এবং এপর্যন্ত

পূর্ব জার্মানীর কারিন বালজার (ডানদিক থেকে দ্বিতীয়) মহিলাদের ১০০-মিটার হার্ডালস ১২·৭ সেকেন্ড সময়ে অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক হার্ডালসে কারিন বালজার স্বর্ণ-পদক পেয়েছিলেন।

ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে মাত্র এই ৪টি দেশ—অস্ট্রেলিয়া ২২ বার, আমেরিকা ২১ বার, গ্রেট-বৃটেন ৯বার এবং ফ্রান্স ৬ বার।

সন্তোষ ট্রফি

আগামী অকটোবর মাসে ২৭তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসছে পাঞ্জাবের জলন্ধরে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর পাঞ্জাবের মাটিতে এই প্রথম। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ২১টি দল অংশ গ্রহণ করবে। গত বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের প্রথম খেলা হবে ১৬ই অকটোবর, মধ্যপ্রদেশ বনাম হরিয়ানার বিজয়ী দলের সঙ্গে। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলার (মোট ২০ বার) এবং সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয়ের (মোট ১২ বার) রেকর্ড বাংলারই।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি

আগামী অকটোবর মাসে ১৬ জন খেলোয়াড়পুষ্ট এম সি সি দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে। এই সফর তালিকা অনুযায়ী তারা প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ২৮শে অকটোবর, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এবং সফরের শেষ খেলা শুরু হবে ১৯৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬ষ্ঠ টেস্ট। সফর তালিকায় মোট খেলার সংখ্যা ২৬টি, এর মধ্যে আছে ৬টি টেস্ট খেলা। এম সি সি'র ১৯৭০-৭১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর তালিকা কয়েকটি ব্যাপারে নজির সৃষ্টি করেছে। আগের সফরগুলিতে এম সি সি তাদের সফরের প্রথম ম্যাচ খেলেছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে। কিন্তু এবারের সফরে তাদের প্রথম খেলা পড়েছে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার একটা টেস্ট সিরিজে ৬টা টেস্ট খেলার নজির এইবারই প্রথম। মেলবোর্ণের তৃতীয় টেস্ট খেলা বাদে বাকী পাঁচটি টেস্ট খেলায় রবিবারও যে খেলার দিন হিসাবে ধার্য করা হয়েছে তা আগে কখনও হয় নি। তালিকা অনুযায়ী পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার আসর বসবে। আগে কখনও পার্থের মাটিতে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা হয় নি।

আগামী অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দলে যে ১৬ জন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র দলের ২য় উইকেট-কিপার বব টেলর (ডার্বিশায়ার) বাদে সকলেই ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছেন। ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট লীগ খেলায় যোগদানকারী কাউন্টি ক্রিকেট দলের মোট সংখ্যা ১৭টি এবং অস্ট্রেলিয়া সফরকারী বর্তমান এম সি সি দলে মাত্র ৯টি দলের মোট ১৬ জন খেলোয়াড় এইভাবে নির্বাচিত হয়েছেন—কেন্টের ৪ জন, ইয়র্কশায়ারের ৩ জন, দুজন করে ল্যাঙ্কাশায়ার এবং ডার্বিশায়ার দলের এবং একজন করে খেলোয়াড় লিস্টারশায়ার, ওরস্টারশায়ার, সারে, এসেকস এবং সাসেক্স দলের। গত বছরের (১৯৬৯) কাউন্টি ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ান গ্লামর্গ্যান কাউন্টি ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড়ও দলভুক্ত হন নি।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

রে ইলিংওয়ার্থ (লিস্টারশায়ার)—অধিনায়ক, কেন্টের কলিন কাউড্রে (সহ-অধিনায়ক), এ্যালান নট, ব্রায়ান লাকহার্স্ট এবং ডেরেক আন্ডারউড, ইয়র্কশায়ারের জিওফ বয়কট, জন হ্যাম্পশায়ার এবং ডন উইলসন, ল্যাঙ্কাশায়ারের পিটার লেভার এবং কেন সাটলওয়ার্থ, ডার্বিশায়ারের বব টেলর এবং এ্যালান ওয়ার্ড, বেসিল ডি ওলিভেরা (ওরস্টারশায়ার), জন এডরিচ (সারে), কিথ ফ্লেচার (এসেকস) এবং জন স্নো (সাসেকস)।

টেস্ট খেলার স্থান ও তারিখ

১ম (ব্রিসবেন) : নভেম্বর ২৭—ডিসেম্বর ২।

২য় (পার্থ) : ডিসেম্বর ১১—১৬।

৩য় (মেলবোর্ন) : ডিসেম্বর ৩১—জানুয়ারী ৫।

৪র্থ (সিডনি) : জানুয়ারী ৯—১৪।

৫ম (এডিলেড) : জানুয়ারী ২৯—ফেব্রুয়ারী ৩।

৬ষ্ঠ (সিডনি) : ফেব্রুয়ারী ১২—১৮।

সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল

বৃটেনের ৩১ বছর বয়সের সাংবাদিক কেভিন মারফি সাঁতারে উভয় দিক থেকে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। ইংল্যান্ডের উপকূল থেকে ফ্রান্সে উপকূলে পৌঁছাতে তাঁর ১৫ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় লাগে। সেখানে ১০ মিনিট বিশ্রাম নিয়েই তিনি ইংল্যান্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। ফিরতি সাঁতারে তাঁর ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করতে ১৯ ঘণ্টা ২৫ মিনিট লেগেছিল। এইভাবে দুই দেশের উপকূল থেকে ইংলিশ চ্যানেল দু'বার অতিক্রম করতে তাঁর মোট ৩৫ ঘণ্টা দশ মিনিট সময় লাগে। তাঁর আগে বৃটেনের আর কোন সাঁতারু এইভাবে এক যাত্রায় দুদিক থেকে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করেননি।

কেভিন মার্ফির আগে মাত্র এই দুজন সাঁতারু এক যাত্রায় দু'বার ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করার গৌরব লাভ করেন—১৯৬১ সালে এ্যান্টোনিও এবার্টোনিও (আর্জেন্টিনা) এবং ১৯৬৫ সালে টেড এরিকসন (আমেরিকা)। এক যাত্রায় দু'বার ইংলিস চ্যানেল পার হতে টেড এরিকসনের মোট তিশ ঘণ্টা তিন মিনিট সময় লেগেছিল যা আজও বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে গণ্য।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

হিংসায় নয়, প্রেমে

আজ কি ঘটেছে?

বাংলাদেশ আজ আত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। এ সংকট দেশজোড়া সংকটের একটা অংশ। মানব-আত্মার সংকট, বাস্তবিকই, বিশ্বজোড়া সংকট।

প্রশ্ন হচ্ছে : হিংসা দিয়ে কি এ কাজ করা সম্ভব?

বাংলাদেশে বা অন্য কোথায়ও, যদি কিছু অধৈর্য লোক, বাড়ীঘর ও অফিস-আদালত বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়, শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে যদি হিংসা কেন্দ্রে পরিণত করে, এবং আমাদের যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভ বিকৃত করে, তাহলে কি একটি সমাজগঠন সম্ভব?

মনে হয়, কিছু তরুণের মনে প্রেমের তুলনায় হিংসার অনেক তাড়াতাড়ি আবির্ভাব ঘটে।

আমরা এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ চাই, যেখানে প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান স্থান থাকবে, যেখানে কাজ ও সমৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ থাকবে, এবং যেখানে আমাদের সচেতন প্রেরণা সৃজনশীল ও যৌথ প্রয়াসের প্রতি উদ্দিষ্ট।

নিরাপত্তাহীনতা ও হিংসার আবহাওয়ার মধ্যে এই সমস্ত মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিপ্লব।
অনুকরণের ভেতর দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না। আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসা বা বিশৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে নয়, কেবল শৃঙ্খলা, শুভবুদ্ধি এবং শান্তির ভেতর দিয়ে এই পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে।

সব সময়ই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জনগণ সমস্ত দলের ঊর্ধ্বে। মাঠে, কারখানায় এবং অফিসে খেটে-খাওয়া মানুষ, সুন্দরী তরুণী, দীপ্তচক্ষু শিশু, প্রাণোচ্ছল তরুণ, সদাসতর্ক বুদ্ধিজীবী, এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এঁরাই সকলে বাংলাদেশের জনগণ।

নিজেদের স্বার্থের জন্য লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেন তাঁদের স্বার্থকে বিপদগ্রস্ত না করি।

আমার মনে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা সঞ্চিত রয়েছে। তাঁদের কর্মক্ষমতা এবং তাঁদের শক্তি ও সৃজনপ্রতিভার ওপর আমার আস্থা আছে। বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করার জন্য তাঁদের এই সমস্ত গুণের ওপরই নির্ভর করতে হবে। তাঁরা যেন ফাঁকা শ্লোগান সর্বস্ব না হন, যে সমস্ত গুণের ফলে বাংলাদেশ মহান ও আমাদের জাতীয়তাবাদের উৎসে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ধ্বংস করতে চায়, তারা যেন তাঁদের বিপথে পরিচালিত করতে না পারে। তাঁরা যেন ভীতিপ্রদর্শন বা বলপ্রয়োগের সম্মুখে নতিস্বীকার না করেন বরং সাহসের সঙ্গে এগুলিকে প্রতিরোধ করেন। পথ বিপদসংকুল। কিন্তু আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, এবং যদি বাংলাদেশের অমর ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হই, তবে সফল হবই।

ইন্দিরা গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১৭ জুলাই, ১৯৭০

বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর বেতারভাষণ থেকে : আকাশবাণী, কলকাতা।

পু, ব, (তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ) বি, ২৫৮২/৭০

১০ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 4th Sept. 1970. শুক্রবার, ১৮ই ভাদ্র, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম কর রায়

চিঠিপত্র

জাতীয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

'অমৃতের' সম্পাদকীয় কলমে "জাতীয় গ্রন্থাগারে অশান্তি" (১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা) পড়লাম। লেখাটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। আমি এর জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থাগারিককে সরানোর ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য নেই, তবে সহ-গ্রন্থাগারিককে কেন্দ্রীয় রেফারেন্স লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিয়োগ করে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে! আমি তাঁর অগণ্য ছাত্রদের মধ্যে একজন। ছাত্র হিসাবে তাঁর সান্নিধ্যে আমরা গৌরব লাভ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি যে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রধান স্তম্ভ হিসাবে বিরাজ করছেন। তাই তাঁকে কেন্দ্রীয় রেফারেন্স লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগারিক না করে জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক করলে যোগ্যতার সমাদর করা হত।

তবে ডাইরেকটর পদে শ্রীকেশবনের নিয়োগ গ্রন্থাগারিক পদটি রেখেও করা যেত। প্রশাসনিক কাজে গ্রন্থাগারিককে মুক্তি দিয়ে ডাইরেকটরের হাতে দিলে কর্মীদের মনে সত্যিকারের কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানানুসন্ধানে আগ্রহ জাগাতে কর্তৃপক্ষ সমর্থ হতেন।

শ্রীঅচিন্ত্য চৌধুরী
রাউরকেল্লা।

নিকটেই আছে প্রসঙ্গে

গত ২১ শ্রাবণ অমৃতে সন্ধিৎসু মহাশয়ের "দোকানটা কিসের—চা না চোলাইয়ের" পড়ে খুব ভাল লাগল। এত ভাল লাগল যে এ সম্বন্ধে কিছু না বলে এবং লেখককে আমার অশেষ শুভেচ্ছা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। এই সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুধু (কলকাতা) শহরে কেন, বলতে গেলে গ্রামাঞ্চলেরও প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই এখন এমনি কমবেশী কয়েকজন 'কেষ্ট'র আবির্ভাব ঘটেছে। এবং স্বচ্ছন্দেই তাদের চায়ের (?) দোকানগুলো, যাকে বলে ফুল-স্পীড-এ চলছে। আর চলবে নাই বা কেন? দোকানের সামনের দরজার খদ্দের না থাক, পিছনের দরজার তো আছে। তার ওপর নীলটুপির আশীর্বাদকে 'সিঁথির সিঁদুর' হিসেবে ব্যবহার করলে তো কোন আশঙ্কা থাকারই কথা নয়। এই কেষ্টরাই পুরুষানুক্রমে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হয়ে উঠবে, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে মানুষটাকে নিয়ে শুধু আমার কেন অনেকেরই মনে দুর্ভাবনা জাগবে সেই 'ভানু'র কি হবে? গায়ে জোর থাকতে পাড়ার সব ঝামেলাতেই নাক গলাতে, হয়েছে তাকে, এমন কি মস্তানী পর্যন্ত করতে হয়েছে। কিন্তু রোগগ্রস্ত ভানুর এই নিঃসম্বল অসহায় অবস্থায় কে তার জন্যে এগিয়ে আসবে? ভানু তো এখন আখের ছিবড়ে। কাজেই বর্জনীয়।

এম, মাহফুজ
জামপুর
পুইনান (হুগলী)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির নামকরণ

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির নামকরণ' প্রবন্ধে (অমৃত, ১০ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৬শ সংখ্যা পৃঃ ১৮৫-১৮৭) রসিদের সম্পূর্ণ এবং শুদ্ধ পাঠে (পৃঃ ১৮৬, ৩য় 'কলাম') তিনটি মুদ্রণপ্রমাদের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মুদ্রিত 'স-ন্ত', 'প-র্য-ন্ত' এবং 'হু-জ্-র'কে যথাক্রমে 'স-ও', 'প-র্যা-ন্ত' এবং 'হ-জু-র-কে' হবে।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়,
কলকাতা।

(২)

'অমৃত' (৪ঠা ভাদ্র) পত্রিকায় তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নামকরণ' প্রবন্ধটি পড়লাম। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বহু বিতর্কিত কাব্য, তার সবই সমস্যা-সংকুল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম সমস্যাটি তন্মধ্যে অন্যতম। এই নাম সম্পর্কীয় বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত আমাদেরও বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান তথ্য সম্বলিত গবেষণাটি 'নাম সমস্যা' সংকট কাটিয়ে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির মধ্যে প্রাপ্ত রসিদটিকে কেন্দ্র করে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে রসিদে কথিত ৯৫-১১০ পাতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যে অসংলগ্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তার পরিচয় দিয়ে, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে রসিদটির যে কোন সম্বন্ধ নেই তা প্রমাণ করেছেন। এবং জীব গোস্বামী কৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের সঙ্গে রসিদটির সম্বন্ধের কথা বলেছেন। রসিদটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের সম্বন্ধ আছে জানবার পর স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল হয়, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের প্রাচীন পুথির ঐ পাতাগুলিতে কোন সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কি না। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এই সম্পর্কে আলোচনা করলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের সঙ্গে রসিদটির সম্বন্ধ স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত না।

দেবনারায়ণ রায়
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

'অমৃত'-র চিঠিপত্র বিভাগের পরই বোধহয় সবচাইতে আকর্ষণীয় বিভাগ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'। বিশেষতঃ বাংলা দেশের সাহিত্যরসিক পাঠক ও সাহিত্যপিপাসু ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই বিভাগের মূল্য অপরিসীম। বাংলাদেশে সাহিত্য সমালোচনা করে এমন পত্রপত্রিকার একান্ত অভাব, বেশীরভাগ পত্রপত্রিকাগুলিই দায়সারা গোছের কর্তব্য সম্পাদন করে আত্মতুষ্টিতে মগ্ন। অথচ ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানীতে সাহিত্য নিয়ে যেমন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে অন্যদিকে তেমন তার উপযুক্ত সমালোচনা করেও চলেছেন বহু পত্রিকা। ইংলন্ডে এদের মধ্যে অগ্রগণ্য টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট ও টাইমস এডুকেশনাল সাপ্লিমেন্ট। আমাদের দেশেও এই ধরনের পত্রিকার প্রচলন হলে সাহিত্যঅনুরাগী পাঠকপাঠিকার বহু-সুবিধা হয়। 'অভয়ঙ্কর' ও 'চার্বাকের' সাবলীল যুক্তিবাদী ও বলিষ্ঠ সাহিত্য আলোচনা, সমালোচনা ও অন্যান্য আকর্ষণীয় ফীচারে (যেমন শোভন আচার্যের ছোট গল্প (১) জার্মানী) বিরত ঘটকের ছোটগল্পের সমস্যা) শুধু আমার নয় বহু পাঠক পাঠিকার আনন্দের কারণ হয়েছে। অনেকবার লেখাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যে বাংলা ভাষায় টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টের অনবদ্য সাহিত্য আলোচনা পড়ছি। এই আকর্ষণীয় বিভাগটি আমাদের উপহার দিয়ে সম্পাদক মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সুব্রত সেনগুপ্ত
কলিকাতা-১৬

এই আমাদের দেশ

গত দশম বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যার 'অমৃত' সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এই আমাদের দেশ' শীর্ষক প্রবন্ধটির জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ। বর্তমান কলকাতার নাগরিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন অসন্তোষ ও আন্দোলনের ঢেউ দানা বেঁধে উঠেছে তখন দেশভ্রমণ সমস্যা-জর্জরিত মানুষের মনের ভার বহুলাংশে লঘু করবে। পথনির্দেশনার অন্তরালে লেখক তারকেশ্বর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও রাধানগরের যে স্বল্প ইতিবৃত্ত দিয়েছেন তা সত্যই চমকপ্রদ। বাংলাদেশের এই ধরনের দর্শনীয় স্থানগুলিতে ভ্রমণে সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে উৎসাহিত করতে এরকম প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে।

অরূপকুমার ঘোষ
(ইলেকট্রোনিক ইঞ্জিনীয়ার)
মাদ্রাজ

শা[illegible]চোখে

দুর্গাপুরের পতনের পর মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি তাঁদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেসন ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে আর দুটি ক্ষণস্থায়ী সংগ্রামকে অবলম্বন করে নিজেদের সংগঠনগুলিকে মজবুত ও হতাশামুক্ত করার চেষ্টা করলেন। দুর্গাপুরের পতনকে তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ বলে বর্ণনা করে কলকাতায় এক হাত দেখে নেবার হুমকি দিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে দেখেও নিয়েছেন। কারণ রাজ্যশক্তির উৎস মহাকরণ অচল ছিল। কর্মচারীদের হাজিরার সংখ্যা যাই থাকুক না কেন কাজকর্ম কিছুই অন্তত কলকাতা ও আশেপাশের শহরাঞ্চলে হয়নি। দুর্গাপুরে মার খাওয়ার পর সি-পি-এম ক্যাডাররা হয়ত একটু কোমরে জোর পাবেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে এই ধর্মঘটগুলি সহায়ক হবে কি?

পারিপার্শ্বিকের মূল্যায়ন ভিন্ন হতে বাধ্য। এবং সেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে ভিন্নকর্মসূচীও গড়ে উঠতে বাধ্য। ফলে, কাজ করার সময় যখন আসে কৌশলের অনেক তফাৎ ঘটে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনে যে ধরণের নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করছেন তাকে মুখ্যতঃ রণডিভে লাইন বলা চলে। শ্রীরণদিভে দীর্ঘদিন ধরেই পার্টির অভ্যন্তরে একটি 'মিলিটান্ট' নীতি গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল জঙ্গী শ্রমিক শ্রেণীকে আরও জঙ্গী করে তুলতে হলে সি-পি-এম-এর পুরোপুরি নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনের উপর থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। তা না হলে অর্থনৈতিক সংগ্রামের স্তর থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হবে না। ফলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের পথে বাধা সৃষ্টি হবে। আর শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন 'যুক্তফ্রন্টের নীতি' অনুসরণ করলে আন্দোলন একটি সীমিত ক্ষেত্রে অর্গলবদ্ধ হয়ে যাবে। তবে যুক্তফ্রন্টের নীতি একেবারে পরিহার করার কথা তাঁরা মনে হয় ভাবেননি। যুক্তফ্রন্ট তাঁরা করতে চান সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই—তবে সে যুক্তফ্রন্ট মুখ্যতঃ হবে তাঁদের নেতৃত্বাধীন সহযাত্রী অথচ শক্তিহীন দল বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তি বা দলের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে না কেননা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সহযোদ্ধা একমাত্র একচেটিয়া পুঁজিপতি বা জমিদার শ্রেণীর লোকদের না হলেই হল। কাজেই সেদিক থেকে জনগণের বৃহত্তম অংশকে বিপ্লবের শ্রেণী সৈন্য করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। শ্রীরণদিভের তত্ত্বগত বক্তব্য শেষ পর্যন্ত দলের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করার ফলশ্রুতি হিসাবেই এ আই টি ইউ সি-তে ভাঙ্গন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল। 'সংশোধনবাদীদের' সঙ্গে একই সংগঠনে থেকে দলীয় চিন্তাধারা সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়িত করা যে বাস্তবিকই কঠিন প্রত্যেক সি পি এম নেতা একথা উপলব্ধি করেছিলেন। বিশেষ করে শক্তিশালী ভিন্ন পন্থাবলম্বী দলের সঙ্গে ত একেবারেই চলে না। এ আই টি ইউ সি-তে নিশ্চয় কম্যুনিস্ট পার্টি যথেষ্টই শক্তিমান। তাই এই বিচ্ছেদ। তাই এই ভাঙ্গন।

শ্রীরণদিভে সিটুর কর্ণধার হওয়ার পরই দুর্গাপুরে তাঁর অনুসৃত 'মিলিটান্ট' লাইনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এবং সেই জঙ্গী লাইনের সকল অনুশীলনের জন্য শ্রমিকদের কিভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াই লড়তে হবে তার ট্রেনিং প্রমাণও রণডিভে সাহেবের ক্যাডাররা দিয়েছেন। রাষ্ট্রশক্তিকে সার্থকভাবে মোকাবেলা করার জন্য দুর্গাপুরের রিপোর্টে প্রকাশ, গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড করা হয়েছিল। রাস্তায় গর্ত খুঁড়ে যানবাহনের গতি স্তব্ধ করার জন্যও জঙ্গী কর্মীরা প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এমনকি সর্বশেষ মেয়েদেরও প্রতিরোধ করার কাজে সামিল করেছিলেন। এককথায় একটি সর্বাত্মক লড়াই লড়েছেন, সি-পি-এম ক্যাডাররা। নেতারা বলেছেন, পুলিশি নির্যাতন এত চরমে উঠেছিল যে, তাঁদের পক্ষে ঐ অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার আর সামর্থ্য ছিল না। এমনকি মহল্লায় মহল্লায় পুলিশ 'বুলডজার' নিয়ে গিয়ে প্রতিরোধী বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। 'বুলডজার' দিয়ে কি কাজ হয় দরদী পাঠকেরা সকলেই জানেন। কাজেই সি পি এম নেতাদের বক্তব্য থেকেই একথা পরিষ্কার হয় যে, তাঁদের সহকর্মী ও যোদ্ধারা 'বুলডজার' নিয়োগ করার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। ভারত সরকারের এতই দৈন্য অবস্থা নয় যে, 'বুলডজার' ট্যাংক হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল। একথা বলতে চাই না রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা, গাছ কেটে ও রাস্তা খুঁড়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অগণতান্ত্রিক। কিন্তু এহেন কাজ করলে রাষ্ট্রশক্তিও যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে মোকাবিলা করবে একথাও ত ঠিক। এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকে যে আঘাত আসবে সেকথা আন্দাজ না করতে পারাটা যে নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাব এই বক্তব্য স্বীকার করতে আপত্তি কি?

কিন্তু সি পি এম-এর রাজনৈতিক নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন, তাঁরা ধর্মঘট করতে চাননি। ধর্মঘট তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তাঁরা বাধ্য হয়েই লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ট্রেড ইউনিয়নের ফ্রন্ট থেকে একবারও সেকথা বলা হয়নি। অধিকন্তু ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একথা বলা হয়েছে দুর্গাপুরে কর্তৃপক্ষের অত্যাচার যেভাবে বেড়ে চলেছিল সেখানে লড়াই একমাত্র পথ। অন্য আর একজন সি পি এম নেতা—যিনি আর একটি শ্রেণী সংগঠনের মুখপাত্র—সেই শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন, দুর্গাপুরের লড়াইয়ে তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করেছেন মাত্র। উদ্দেশ্য হল—যাতে সংগঠনের বিশেষ কোন ক্ষতি না হয়। আর ঐ যুদ্ধে পশ্চাদপসরণের মত যে আংশিক পরাজয় ঘটেছে তার ফলশ্রুতি হিসাবে যে হতাশার ভাব সৃষ্টি হবে তাকে সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও ছাত্র ধর্মঘটের সাফল্যের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠা যাবে। শ্রীকোঙার একথাও বলেছিলেন দুর্গাপুরের পতনের মূলে রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েকটি অসুবিধা। শহরটি বিভিন্ন সেকটরে বিভক্ত থাকার ফলে নাকি কর্মীরা সেখানে ঠিকমত লড়াই করতে পারেননি। তাই তিনি বলেছিলেন, কলকাতার ক্ষেত্রে সেই অসুবিধা দেখা দেবে না। অতএব পুলিশি অত্যাচার যদি হয় তবে কলকাতার বুকে তার সার্থক মোকাবিলা সম্ভব হবে আর অন্যান্যরা যাঁরা বাধা দেবেন তাঁদের সেই বাধা চূর্ণ করাও সহজ হবে। যাহোক স্বয়ং রণদিভে সাহেবও বলেননি যে দুর্গাপুরের ধর্মঘট তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর বলেনই বা কি করে? যদি বলেন তবে ত তাঁর তত্ত্বগত ভুল হয়। 'মিলিটান্ট' লাইন থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে হয়। প্রমোদবাবু বললে ত কিছু এসে যায় না। কারণ তিনি রাজনৈতিক নেতা।

সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট কতটুকু সফল হয়েছে কিম্বা শিক্ষক ধর্মঘটের সাফল্যও বা কতটুকু এই নিয়ে সাধারণভাবে বিচারবিবেচনা করতে চাই না। এ সমস্ত চিন্তার বিষয় আজ জনতার জন্য নির্দিষ্ট করা রইল।

দুর্গাপুর, সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকদের ধর্মঘটের পটভূমিকা ছিল ভিন্ন। দুর্গাপুরের ধর্মঘট ছিল অনির্দিষ্টকালের এবং রাজনৈতিক দাবী সম্বলিত। অপরদিকে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট তিন দিনের ও শিক্ষকদের সাত দিনের। বেশীরভাগ দাবীই অর্থনৈতিক। এখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের আরও বেশী সমর্থন পাওয়া উচিত ছিল। কলকাতা ও হাওড়ার সরকারী অফিস কিম্বা আরও কয়েকটা জেলায় কাজ অচল হয়ে গেলে সরকারের কিছু যায় আসে

না। আর জনসাধারণ ত কাজ না পেতেই অভ্যস্ত। শুধু ভাই-ভাতিজারা কাজ করে বলেই অনেকে নীরব থাকেন। নতুবা কর্মচারীদের সেবা সম্পর্কে জনসাধারণের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। শুধু তাই নয় বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনেক মন্ত্রীকেই তাঁদের নির্ভেজাল বামপন্থীই বলা চলে—এমনকি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিরও একজন মন্ত্রীকে কর্মচারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা নেই বলে মন্তব্য করতে শুনেছি। যাক সেকথা। অতীতে দেখা গেছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে সমস্ত বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারীরা অকুতোভয়ে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু এবারের তিন দিনের এই ধর্মঘটে ভিন্নচিত্র দেখা গেল। যতদিন যুক্তফ্রন্ট যুক্ত ছিল এবং কংগ্রেসের আমলে যখন বামপন্থীরা ঐক্যে বাক্যে অভিন্ন ছিলেন—ততদিন সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু এবার তা হয়নি। প্রকাশ্যভাবে বিরোধিতা না থাকলেও অনেক বামপন্থী দল এবারের ধর্মঘট সমর্থন করেনি। ফলে ধর্মঘট আংশিক সফল হয়েছে। এবং সেই সাফল্য কলকাতা ও আশেপাশের শহরতলীতেই অনেকটা সীমাবদ্ধ। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের কথা যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কলকাতায় যিনি অফিস করতে যাবেন—তাঁকে তাঁর দল দেখে নেবে তবে বলতে হয় মার্কসবাদীরা কর্মচারীদের ধর্মঘটের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের বাহুবলের উপরই বেশী আস্থাবান ছিলেন। এই ধর্মঘটের ফলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কিছু রাজনৈতিক লাভ হলেও কর্মচারীদের মধ্যে যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হল সেই ভাঙন ক্রমশঃই যে ব্যাপ্তিলাভ করবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি এই ধর্মঘট তিন দিনের না হয়ে দুর্গাপুরের মতই অনির্দিষ্টকালের জন্য হত তবে এখানেও দুর্গাপুর নাটকেরই যে পুনরাবৃত্তি ঘটত তার যথেষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান ছিল। জানি বাম কম্যুনিস্টরা এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলবেন বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির এটা নির্জলা মিথ্যা প্রচার যেমন নাকি তাঁরা করেছিলেন দুর্গাপুরের ক্ষেত্রে। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। যেটা বাস্তব সত্য তাকে স্বীকার করাই ভাল। নতুবা ভুল সিদ্ধান্তের ফলে আবার রণদিভে সাহেবকে এবার মনুমেন্টের বদলে শহীদ মিনার ময়দানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অর্থাৎ আগে যেমন করেছিলেন। তেমনি নীতির ত্রুটি হয়েছে বলে প্রকম্পিতকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে। রণদিভে সাহেব ও তাঁর দলীয় নেতারা হয়ত মনে করছেন তাঁদের রাজত্বকালে দলের সংগঠন যেভাবে এলোপাথাড়ি বেড়ে গিয়েছিল সেই হঠাৎ বর্ধিত কলেবরকে কর্মক্ষম করতে হলে কিছু ব্যায়ামের প্রয়োজন এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে সেই ব্যায়ামই হচ্ছে। আর কলেবর থেকে অহেতুক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মেদ যদি খসে যায় তবে ত শরীরটা খাঁটি হয়ে উঠবে। কাজেই সংগ্রামের মাধ্যমে দলের যাঁরা নিষ্ঠাবান কর্মী তাঁরা আগুনে পুড়ে আরও খাঁটি হয়ে উঠবেন। যে কোন দলই অবশ্য এ হেন ছোটখাট ব্যায়াম করে থাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই চর্চা [illegible] এমন না হয় যাতে গোটা শরীরটাই [illegible] যায়। বাম কম্যুনিস্টরা মনে হয় শরীর শক্ত করতে গিয়ে আখেরটাই বরবাদ করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই ব্যায়াম চর্চা তারই সর্বনাশ ঘটছে। জনতার মধ্যে বিভেদ প্রকট হয়ে উঠছে। অবশ্য যদি বাম কম্যুনিস্টরা মনে করেন তাঁদেরই বেছে নেওয়া প্রফেসানেল বিপ্লবীদের নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পত্তন করবেন তাহলে আলাদা কথা। আর সেটাই যদি তাঁদের আসল লক্ষ্য হয় তবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের উপর জোর না দেওয়া উচিত। কেননা তাতে লক্ষ্য ও পথের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হবে। ফলে আখেরে দিশেহারা হতে বাধ্য।

ঠিক অনুরূপভাবে শিক্ষকদের মধ্যেও বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের পক্ষে যেটুকু সমর্থন আছে সেটুকু হয়ত আরও সংগঠিত হবে। কিন্তু যে বিভেদের বীজ ক্রমেই প্রোথিত হচ্ছে সেগুলি যে কালে এক-একটা মহীরুহে পরিণত হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়।

কি সরকারী কর্মচারী কি শিক্ষক বা

দুর্গাপুরের শ্রমিক শ্রেণী যাঁরাই এই ধর্মঘটগুলি সমর্থনও করেছেন তাঁরা সকলেই যে বাম কম্যুনিস্টদের মত ও পথের সমর্থক একথা ঠিক নয়। এই কর্মচারীদের একটি বৃহৎ অংশ সত্যিকারের কোন দলের নয়। সাধারণত যে দল একটু শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন সেদিকেই তাঁরা থাকেন। প্রশাসনিক দিক থেকে যে চাপের সৃষ্টি হবে বলে আশংকা করা যাচ্ছে সেই অবস্থার যখন মুখোমুখি হবেন তখন এঁরা সবাই ভিন্নপথ নেবেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুর্শিদাবাদের সরকারী কর্মচারীদের কথা। সেখানে কয়েক মাস আগে জিলা শাসককে কেন্দ্র করে সরকারী কর্মচারীরা যে আন্দোলনে নেমেছিলেন তার ফল বিরূপ হওয়ার ফলে এবার সেখানে ধর্মঘট কার্যত চলেই না। যে সমস্ত দাবী নিয়ে এবার তিনদিনের ধর্মঘট হল সে সব দাবী যদি সরকার এবার না মানেন এবং তদুপরি খাঁড়ার ঘা দিতে থাকেন এখন বাম কম্যুনিস্টদের সাধ্য আছে কি সরকারী কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে নামাতে? পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাঁদের অনুকূলে থাকার কথা নয়। কারণ, সংগঠনে বিভেদ। হয়ত মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তখন আবার 'বাংলা বন্ধের' ডাক দিতে পারেন। কিন্তু তা সফল করতে যে পারবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? যদি নিশ্চয়তা থাকত তবে ২৮শে আগস্টের 'বাংলা বন্ধ' প্রত্যাহৃত হত কি? দুর্গাপুরের সমর্থনে যে ডাক দেওয়া হয়েছিল সেখানে সি আর পি, আই এস এফ ইত্যাদি তুলে নেওয়ার দাবী ত ছিল আর আশু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার কথাও ছিল। একটি দাবীও সরকার মানেননি। দুর্গাপুরের কমিটি বিনাসর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে ঠিক। কিন্তু বাম কম্যুনিস্ট দল, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ২১২ই জুলাই কমিটিও ত এই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে একদিনের 'বাংলা বন্ধ' ডাক দিয়েছিলেন। তাঁরা তা প্রত্যাহার করলেন কেন? ঠিক অনুরূপভাবে সরকারী কর্মচারীদের দাবী যদি সরকার না মানেন তখন কি হবে? অবশ্য আরও শক্ত সংগ্রামের কথা নেতারা বলেছেন, কিন্তু প্রশাসনের খড়্গ যখন কিছুসংখ্যক কর্মীর উপর নেমে আসবে তখন গোটা আন্দোলনটাই 'বাঁচাও' আন্দোলনে পর্যবসিত হয়ে যাবে। আসল ছেড়ে দিয়ে ফ্যাকড়া নিয়ে সংগ্রাম চলবে। এই হচ্ছে অভিজ্ঞতা। অতীতেও দেখেছেন সহৃদয় পাঠকরা—কোন বুনিয়াদী বিষয়ে আন্দোলন শুরু করে অবশেষে বন্দীমুক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। এইখানেই ভয় হয়। একে বিভেদ তারপর আবার যদি প্রশাসনিক আঘাত আসে তবে যে অমিতবিক্রম এতদিন দেখা যাচ্ছিল সেটা আবার দীর্ঘদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। একথা ঠিক আবার তা পুনরুজ্জীবিত হয়। কিন্তু কতদিন পরে তা হবে বলা মুশকিল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ও সঙ্কীর্ণতাই আন্দোলনে ছেদ আনে বেশী। রণদিভে সাহেবের মিলিটান্ট লাইন সেদিকে যাচ্ছে না কি?

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

আগে শোনা যাচ্ছিল যে, প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা ও বিশেষ সুযোগসুবিধা লোপের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের বিল লোকসভার এই অধিবেশনে আনা না-ও হতে পারে। এর আগে আরও দুবার এই বিল লোকসভায় আনার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইতিমধ্যে প্রাক্তন রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রশ্নটির কোন মীমাংসায় আসা যায়নি। সেই কারণে অনেকে অনুমান করছিলেন যে, এবারও হয়ত প্রাক্তন রাজন্যদের জন্য শেষের সেদিন বিলম্বিত হবে।

এই অনুমানের দ্বিতীয় আর একটি কারণও উল্লেখ করা হচ্ছিল। সেটা এই যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি জানিয়েছিল যে, তাদের সদস্যরা জমি দখল আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন বলে সংবিধান সংশোধন বিলের আলোচনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন না। অথচ, এই বিল সম্পর্কে যে প্রচন্ড বিরোধিতা হবে, তাতে এটিকে লোকসভার ভিতর দিয়ে বার করে আনতে হলে সরকার পক্ষকে কম্যুনিস্ট ভোটের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অকস্মাৎ ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা ১ সেপ্টেম্বর তারিখেই সেই বহু-প্রতীক্ষিত বিলটি আনছেন। এই ঘোষণায় অধিকাংশ বিরোধী দল বিস্মিত হয়েছে, 'প্রিন্স'রাও বিস্মিত হয়েছেন।

রাজ্যহারা রাজারা নিজেদের অবশিষ্ট অধিকারগুলি বাঁচাবার জন্য পার্লামেন্টের বাইরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের কাছে সর্বশেষ যে-কথা দিয়েছিলেন, তাতে তিনি নাকি বলেছেন যে, প্রাক্তন রাজাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছানর উপর মূল্য দিতে হবে। প্রাক্তন রাজারা এখন বলছেন যে, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর ঐ কথার উপর ভরসা করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, প্রশ্নটি যাতে 'শান্ত পরিবেশে' আলোচনা করা যায় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধনের বিল আনার হুমকি তুলে নেবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলালেন কেন সে-বিষয়ে কিছু বিছু জল্পনাকল্পনা শোনা গেছে। বলা হচ্ছে যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশীয় রাজাদের ভাতা লোপ করতে যত দেরী হচ্ছে, শাসক কংগ্রেস দলের সাধারণ সদস্যরা ততই অধৈর্য হয়ে উঠছেন। দ্বিতীয়ত, আইনের দ্বারা ভাতা লোপ করার খড়্গ এই সব প্রাক্তন রাজার মাথার উপর ঝুলিয়ে না রাখলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশ্নটির কোন ফয়সালা করা যাবে, সরকার পক্ষ আর এমন ভরসা করতে পারছেন না।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের একটা বিল সরকারপক্ষ সংসদে পাশ করিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা। প্রশ্নটির উত্তর অনেকাংশে নির্ভর করছে বিরোধী কংগ্রেস দল ও ডি এম কে দল কি করে তার উপর। প্রাক্তন দেশীয় রাজাদের বিশেষ ভাতা লোপ করার দাবী অবিভক্ত কংগ্রেসের দাবী, বিভাগের পর বিরোধী কংগ্রেস সেই দাবী ছাড়েনি। সুতরাং নীতিগতভাবে সংসদে তাদের এই বিল সমর্থন করারই কথা। কিন্তু শাসক কংগ্রেস দলকে অপদস্ত করার এরকম একটা সুযোগ তারা ছাড়তে চাইবে কিনা সন্দেহ আছে। অন্ততপক্ষে, কোনদিকেই দৃষ্টি না দেওয়ার জন্য একটা ছুতো খুঁজে নিতে তাদের খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ডি এম কে দল এখনও পরিষ্কার বলেনি যে তারা এই বিল সমর্থন করবে।

বিরোধী পক্ষের যেসব বামপন্থী দলের সমর্থনের উপর শ্রীমতী গান্ধী ভরসা করতে পারেন, তারাও রাজন্য ভাতা লোপের বিনিময়ে খেসারত দেওয়ার প্রস্তাবের বিরোধী। এই খেসারতের পরিকল্পনাটি এখনও সরকার পক্ষ থেকে বিশদভাবে প্রকাশ করা হয়নি। করলে বামপন্থী দলগুলি এই ব্যাপারে সরকার পক্ষের পিছনে কতখানি এসে দাঁড়াবে বলা কঠিন।

প্রাক্তন রাজন্যরা এতদিন পার্লামেন্টের বাইরে যে লড়াই চালিয়েছেন তাকে তাঁরা ভিতরে নিয়ে যেতে অবশ্যই কসুর করবেন না। তাঁদের আশা, ভারতীয় ক্রান্তি দলের সব সদস্য, ২০ জন নির্দলীয় সদস্য, এমনকি জন-দশেক শাসক কংগ্রেস সদস্য এই বিলের বিরোধিতা করবেন এবং তাছাড়া আরও অন্তত জন-কুড়ি শাসক কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য ভোট দেবেন না।

●

উত্তরপ্রদেশে টানাপোড়েন

ভারতীয় ক্রান্তি দলের চতুর নেতা শ্রীচরণ সিং 'সংযুক্তি'র টোপ ফেলে উত্তরপ্রদেশের শাসক কংগ্রেস দলকে এমন এক জায়গায় টেনে নিয়ে গেছেন যেখানে তারা ভারতীয় ক্রান্তি দলকে না পারছে সইতে, না পারছে ছাড়তে।

দিনকয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং তাঁর কোয়ালিশন সরকারের বড় শরিক (সংখ্যার দিক দিয়ে, যদিও গুরুত্বের দিক দিয়ে নয়) শাসক কংগ্রেস দলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, হয় তারা নিজেদের আচরণ শুধরে নিক আর না-হয় মন্ত্রিসভা ছেড়ে দিক। শাসক কংগ্রেস দল ঐ হুঁশিয়ারীকে গায়ে মাখছে না। বরং তারা উল্টো হুমকি দিয়েছে যে, কোয়ালিশন সরকারের জন্য তারা যে পথনির্দেশ করে দেবে, শ্রীচরণ সিংহের সরকারকে তা মেনে চলতে হবে। দুই দলের সংযুক্তির প্রস্তাবটা ইতিমধ্যে প্রায় চাপাই পড়তে চলেছে।

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের উদ্যোগে যখন উত্তরপ্রদেশে বি কে ডি ও শাসক কংগ্রেসের কোয়ালিশন গঠনের পরিকল্পনা তৈরী হয় তখনই নাকি এই পরিকল্পনার একটা সর্ত হিসাবে স্থির ছিল 'উপযুক্ত সময়ে' দুই দলের সংযুক্তি ঘটবে। 'উপযুক্ত সময়' বলতে কি বোঝায় তা তখনও কেউ পরিষ্কার করে বলেননি। তবে বহুলপ্রচারিত ধারণা এটাই যে, 'উপযুক্ত সময়' বলতে বোঝায় এমন এক সময় যখন উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেসের নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীকে ঐ রাজ্যের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিয়ে শ্রীচরণ সিংহের ক্ষমতার আসন নিষ্কণ্টক করা যাবে। আপাতত বলাবলি যা হচ্ছে তা এই যে, নয়াদিল্লীতে ত্রিপাঠীর জন্য একটা জায়গা করা হবে এবং তারপরে সংযুক্তির কথা উঠবে।

শ্রীচরণ সিং হয়ত এক সময় সত্যি সত্যি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে বি কে ডি-র সংযুক্তির কথা ভেবেছেন। তাঁর দলের মধ্যে যাঁরা এভাবে রাজনৈতিক আত্মবিলোপ করতে রাজী হননি তাঁদের সঙ্গে তাঁর লড়াইটাও হয়ত আন্তরিক ছিল। কিন্তু এখন শ্রীচরণ সিং-এর এই সংযুক্তির ব্যাপারে বিশেষ কিছু আগ্রহ আছে কিনা সন্দেহ।

এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় ক্রান্তি দল এই কোয়ালিশনের ছোট শরিক হলেও, রাজনৈতিক ক্ষমতার ফয়দাটা তারাই বেশী করে ওঠাচ্ছে। মন্ত্রিসভায় শাসক কংগ্রেস দলের মন্ত্রীরা সংখ্যায় বেশী হলেও ব্যক্তিত্বে ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাঁদের অন্য মন্ত্রীদের তুলনায় খাটো দেখাচ্ছে। ভারতীয় ক্রান্তি দলের ছোট বড় নেতাদের কথায় সরকারী অফিসার বদল হচ্ছে, শাসক কংগ্রেসের নেতাদের কথায় তো হচ্ছে না।

উত্তরপ্রদেশের শাসক কংগ্রেস দলের ফ্যাসাদ এই যে, কোনখানে তাদের আসল জ্বালা সে-কথাটা তারা খুলে বলতে পারছে না। যে অভিযোগগুলো তারা শ্রীচরণ সিংহের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তুলে ধরছে সেগুলির জবাব দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে খুব কঠিন হচ্ছে না। শাসক কংগ্রেস দলের তরফ থেকে প্রধানত রাজ্য সরকারের তিনটি সিদ্ধান্তের

সমালোচনা করা হচ্ছে। এই তিনটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঃ নিবারণমূলক আটকের অর্ডিনান্স জারী, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলিতে ইউনিয়নে যোগ দেওয়া বা না দেওয়ার স্বাধীনতা ও একাধিক ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেওয়ার জন্য অর্ডিনান্স জারী এবং চিনিকলগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা। শ্রীচরণ সিং বলেছেন যে, এই সব সিদ্ধান্তই মন্ত্রিসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভায় শাসক কংগ্রেস দলের যেসব মন্ত্রী আছেন তাঁরা নিজেদের দলের ভিতরেও এই সব সরকারী সিদ্ধান্ত সমর্থন করছেন।

ভারতীয় ক্রান্তি দলের পক্ষে এ-কথাও শুনিয়ে দেওয়া সহজ হচ্ছে যে, অন্ধ্রপ্রদেশে শাসক কংগ্রেস দলের সরকারও নিবারণমূলক আটক আইন জারী করেছেন এবং বিহারে শাসক কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারও চিনিকলগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করেননি।

ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেস দলের ভিতরে আর একটি হাওয়া উঠছে যার ফলে শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর নেতৃত্বের আসনে আঘাত লাগার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। শ্রীচরণ সিংহের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়গুলির প্রভাব বাড়ছে। শ্রীচরণ সিং নিজে একজন জাঠ। তথাকথিত উচ্চবর্ণের যেসব নেতা রাজনীতিতে আধিপত্য করে এসেছেন তাঁদের সরিয়ে তথাকথিত নিম্নবর্ণের নেতাদের সামনে এগিয়ে আনার এই ঝোঁক ইদানীং কালে হরিয়ানা এবং বিহারেও দেখা গেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে উত্তরপ্রদেশের শাসক কংগ্রেস দলের ভিতরে কিছু লোক দলের নেতৃত্ব থেকে ব্রাহ্মণ শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর অপসারণের কথা তুলছেন। কথাটা যদিও এখনও বেশীদূর এগোয়নি তবে এ-ধরনের কথা যে উঠেছে সেটাই লক্ষ্য করার মতো ঘটনা।

●

শ্রীমতী সোনিয়া দুগেল নামে একজন ভারতীয় শিক্ষিকা ঘটনাচক্রে ইতালীতে একজন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর সংস্পর্শে আসেন। সন্ন্যাসিনীটির বাড়ী ভারতবর্ষের কেরলে। তাঁর কাছ থেকেই শ্রীমতী দুগেল ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক কনভেন্টগুলির জন্য কেরল থেকে তরুণীদের কিনে নিয়ে যাওয়ার কাহিনী শোনেন।

সম্ভবত সেই সূত্রেই কাহিনীটি ‘সানডে টাইমস’-এর কাছে আসে। আর পত্রিকায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে এই নিয়ে একটা দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যায়। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যেমন ফ্রান্স, ইতালিতে স্পেনে ও পশ্চিম জার্মানীতে কনভেন্টগুলিতে সন্ন্যাসিনী হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য কেরল থেকে দুই হাজার মেয়ে কিনে আনা হয়েছে। ভ্যাটিকান থেকে, ত্রিবান্দ্রম

থেকে ও নয়াদিল্লী থেকে বিবৃতি দিয়ে ক্যাথলিক গির্জার নেতারা স্বীকার করেছেন যে, ভারতবর্ষ থেকে, বিশেষ করে কেরল থেকে গত কয়েক বছরে মেয়েদের ঐসব দেশের কনভেণ্টে পাঠান হয়েছে; কিন্তু এর মধ্যে টাকা-পয়সার লেনদেনের অথবা জোর করে নিয়ে যাওয়ার কোন ব্যাপার আছে এ-কথা তাঁরা অস্বীকার করেছেন।

এই অস্বীকৃতি সত্ত্বেও শ্রীমতী দুগল বি বি সি টেলিভিশনের পর্দার সামনে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেছেন যে, কেরলে অনেক পাদ্রী প্রতিটি মেয়ে পাঠিয়ে প্রায় ২৭০০ টাকা করে মুনাফা রেখেছেন।

সন্ন্যাসিনী চালান দেওয়ার এই অভি-যোগ সম্পর্কে তদন্ত করার দাবী তোলা হয়েছে পার্লামেণ্টে। ইতিমধ্যে, ভ্যাটিকান থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ থেকে সন্ন্যাসিনী আনা বন্ধ থাকবে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, অভিযোগটি উঠেছে ইংল্যাণ্ডে। সেখানে রোমান ক্যাথলিকরা সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে তাঁদের সদ্ভাব নেই। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্টাণ্টদের সংঘর্ষ আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মতো ঘটনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'লণ্ডন টাইমসে'র রিপোর্ট সে-দেশের সংখ্যালঘুদের হেয় করার একটা চেষ্টা বলে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২৭-৮-৭০ —পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

দেশের চিত্র বিদেশীর চোখে

ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেও এদেশ সম্পর্কে তাঁদের উন্নাসিক ঔপনিবেশিক মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আমরা অবশ্য রক্ষণশীল ইংরেজদের কথাই বলছি। বৃটেনে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ইংরেজ অনেক আছেন। বার্নার্ড শ, রাসেল, ফেনার ব্রকওয়ে, লর্ড সোরেনসেন কিংবা কিংসলী মার্টিনের মতো ভারতবন্ধুর কথা আমরা সব সময়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। কিন্তু বৃটেনে এবং ইয়োরোপে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে। শ্বেতাঙ্গরাই এশিয়া-আফ্রিকার বোঝা বহন করে এসেছে এবং তারাই এদের সভ্য করেছে। এ-ধরনের অনৈতিহাসিক ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি শুধু কিপলিং সাহেবেরই নয়, অনেক শিক্ষিত ইংরেজ এবং ইয়োরোপীয় এ-কথা বিশ্বাস করে থাকে।

বৃটেনের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মনে এই আফশোষ যে, শ্রমিক দল ক্ষমতায় থাকার সময় ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। ওরা থাকলে কিছুতেই ভারত সাম্রাজ্য এত সহজে ছাড়া হত না। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এ-সত্য লুকোবার নয়। কিন্তু এই দারিদ্র্যের একটি কারণ যে দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং যা ইংরেজদেরই সৃষ্টি এ-কথা ইংরেজরা এখন স্বীকার করতে চায় না। তাই যখনই সুযোগ পায় তখনই তারা ভারতের দারিদ্র্য নিয়ে, তার সমাজ নিয়ে নানা কুৎসিত প্রচারে মেতে ওঠে। ভারত সম্পর্কে এই বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণ কী? শুধু কি ভারত দরিদ্র বলে? দরিদ্র দেশ তো আরও আছে। এর আসল কারণ, ভারত স্বাধীন হবার পর বৃটিশ-মহিমা আর তাকে আচ্ছন্ন করে না। বৃটিশের সাহায্য বা অভিভাবকত্ব ছাড়াই ভারত স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ পরবর্তী দুঃসময় কাটিয়ে উঠেছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বৃটিশ-ঘেঁষা নয় এবং ভারত তার নিজস্ব ধারায় এই দেশে গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা বজায় রাখতে পেরেছে।

রক্ষণশীল ইংরেজের আসল ক্রোধ এখানেই। দেশভাগ ওদেরই কীর্তি। অথচ দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু যখন এল তখন তাদের ছবি তুলে দুনিয়াকে দেখানো হল ভারতের মানুষের কী দুরবস্থা। সাম্প্রদায়িকতাকে ওরাই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে ব্যর্থ করার জন্য কাজে লাগিয়েছে। তারই জের হিসাবে যখন এদেশে কুচক্রীরা দাঙ্গা বাধায় তখন আমাদের প্রাক্তন শাসকরা জোর গলায় চেঁচায়, দ্যাখো ভারতে কী হচ্ছে দারিদ্র্য বা সাম্প্রদায়িকতা খুবই দুঃখের ও লজ্জার। এর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একেই যখন কেউ বড় করে দেখায় এবং দেখিয়ে বলে যে, এই হল ভারতের হাল অবস্থা তখন আমরা এই বিকৃতির প্রতিবাদ না করে পারি না।

সম্প্রতি লণ্ডনের বি বি সি-র টেলিভিশানে একজন ফরাসী পরিচালক লুই ম্যালের তোলা ভারত সম্পর্কে কতকগুলি চিত্র সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে দেখানো হচ্ছে। চিত্রগুলির নাম খুবই অর্থবহ—'ক্যালকাটা', 'ঘোস্ট অব ইণ্ডিয়া' এবং 'দি বিউইলডার্ড জায়েণ্ট'। শেষোক্ত ছবিটি তোলা এমন এক ব্যক্তির যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয়। তাঁর নাম ডোম মোরেস। চিত্রগুলি নিতান্তই কুৎসামূলক। এতে ভারতের মানুষের দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তার সামাজিক রীতিনীতির কুব্যাখ্যা করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং তার রাজনৈতিক অস্থিরতাকে বিকৃত করে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, ভারতের আর কোনো আশা নেই। ভারত সরকার অবশেষে এসম্পর্কে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়। বৃটিশ সরকার নিজের দায়িত্ব এড়াবার জন্য জানান যে, বি, বি, সি একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এ-ব্যাপারে তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। বি, বি, সি-র উত্তর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় রচিত। ওঁরা যে একদিন ভারতের শাসক ছিলেন সেই গরম এখনও ওঁদের শরীর থেকে যায়নি। তাই ভারত সরকারের কাছে চিঠি লিখতে একটি সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বি বি সি-র ভাষা এমন শিষ্টাচারবহির্ভূত। ভারত সরকার বাধ্য হয়ে বি, বি, সি-র প্রতিনিধিকে ভারতে তার অফিস গুটোবার নির্দেশ দিয়েছেন।

দীর্ঘকাল ধরে বিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর ছিদ্রান্বেষী অপপ্রচার চালিয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকায় ও ইয়োরোপের কোনো কোনো জায়গায় একটি কুৎসিত নাটক দেখানো হচ্ছে যার নাম 'ওহ্ ক্যালকাটা'। নাটকের বিষয়বস্তুতে কলকাতার নামগন্ধও নেই। কিন্তু কলকাতাকে হেয় করবার জনাই একটি কুৎসিত ফরাসী শব্দের ধ্বনিসাম্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাটকটিকে ওই নামাঙ্কিত করা হয়েছে। কলকাতা সম্বন্ধে তো হামেশাই বিদেশী কাগজে নিন্দা প্রচার হচ্ছে। এসম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তাঁরা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি সর্বত্র। বি, বি, সি-র ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত খুবই সঙ্গত ও সময়োপযোগী হয়েছে। বিদেশীরা সব সময়েই ভারতে আসতে পারেন। গণতান্ত্রিক সমাজে কোনো কিছুই গোপন রাখা হয় না। কিন্ত একটি দেশের সামগ্রিক চিত্র তলে না ধরে যারা শুধু তার দুর্বল জায়গাগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তাদের প্রতি সরকারকে কঠোর হতেই হবে।

সুবর্ণ জয়ন্তী

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের সাংবাদিক জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি কার্টুন স্কেচের প্রতীক উপহার দিচ্ছেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ আজ শুধু একটি নাম নয়, ইতিহাস। 'সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র,' 'এক মহান পরিবারের সুসন্তান'—এই পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। মানুষ হিসাবেও তাঁর যে পরিচয়, তার নজির বিরল। আটাশে আগস্ট কলামন্দিরে এক মনোজ্ঞ স্মরণীয় সন্ধ্যায় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর সাংবাদিক জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধিত হন। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যাঁকে সাংবাদিকতার আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে সম্বর্ধিত করেন সেদিন, উত্তর দিতে উঠে তুষারবাবু একটি দাবীই জানান—আমি কর্তব্য সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যতদূর সম্ভব সততা রক্ষা করেছি, যা সত্য বলে জেনেছি, তা প্রকাশ করেছি। যখন তা প্রকাশ করা সাধ্যাতীত হয়েছে, সে সম্বন্ধে নীরব থেকেছি, মিথ্যা বলিনি।

ইংরেজ আমলে সাংবাদিকতার কাজ ছিল দুরূহ, আজ তা দুরূহতর। এর মধ্যেও তুষারকান্তি তাঁর হাসিটি বজায় রাখতে পেরেছেন। এ তাঁর কম কৃতিত্ব নয়।—বলেন প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

স্যর বীরেন মুখার্জি বলেন, নাইটের বেশে শক্তিশালী কলম নিয়ে যিনি দীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল সংগ্রামরত, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ সামান্য নয়, সাধারণ নয়, তা অনন্যসাধারণ। সাংবাদিকতায় তাঁর জীবনকাল আরও পঞ্চাশ বছর সম্প্রসারিত হোক।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর মুখ্য সম্পাদক মিঃ ফ্রাঙ্ক মোরেস বলেন, ভারতবর্ষে এমন কোন সংবাদপত্র নেই, এমন কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান নেই, যার সঙ্গে তুষারকান্তি কোন-না-কোন-ভাবে যুক্ত। ভারতের বাইরেও তিনি ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট, কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের সঙ্গে সভাপতি হিসাবে যুক্ত। দেশে এবং বিদেশে তিনি সম্মানিত। তুষারকান্তির কাছে দেশের মঙ্গল সবচেয়ে বড়। সাংবাদিকতায় তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের মানবিক গুণ অসাধারণ। অমৃতবাজার পত্রিকার একশ' দুই বছরের ইতিহাসের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের সঙ্গে শ্রীঘোষ জড়িত। আজকের জটিল যন্ত্রণাপূর্ণ এই সমাজে সবকিছু বিপদ থেকে বাঁচিয়ে এবং হাজার হাজার কর্মীর সঙ্গে মানিয়ে তুষারবাবু দক্ষ কাণ্ডারীর মত কাগজ পরিচালনা করছেন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তুষারকান্তিকে একজন সার্থক লেখক এবং সাহিত্যব্রতী বলে অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন, শ্রীঘোষ একজন প্রকৃত সাহিত্যদরদী। ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, একজন সাংবাদিককে নগ্ন, নীরস, রুক্ষ, অসুন্দর বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়। সে-বাস্তবে রয়েছে হিংস্রতা, মলিনতা, সংকীর্ণতা, অশিব, অসুন্দর। এর মধ্য থেকে সত্যকে তুলে ধরা কঠিন কাজ। এই কাজ করে তুষারবাবু মহিমময়, মঙ্গলময় মহত্তাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নবাব স্যর কে জি এম ফারুকি বলেন, অমৃতবাজার পত্রিকার যোগ্য উত্তরাধিকারী তুষারকান্তি সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এক আশ্চর্য অবদান রেখেছেন। তিনি যুগান্তর, অমৃত ও নর্দার্ন ইণ্ডিয়া পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

অনুষ্ঠানের সভাপতি, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকার শতাধিক বর্ষব্যাপী জাতির সেবাব্রত এবং তুষারকান্তির পঞ্চাশ বছর সাংবাদিকতার অমর কাহিনী স্মৃতিচারণ করেন এবং পত্রিকার ট্র্যাডিশনের পটভূমিকায় তিনি তুষারকান্তির সফল জীবনের উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, তুষারবাবুর প্রতিষ্ঠিত 'অমৃত' একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্র, এবং দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। এই উৎসবের দিনে জাতীয় অধ্যাপক স্মরণ করেন তুষারকান্তির যোগ্য সহধর্মিণীকে। জীবনের পথে তিনি তুষারকান্তির একনিষ্ঠ সহযাত্রিণী।

ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে আমাদের অতীতের যা-কিছু সবই হারানো চলবে না। কেননা, পায়ের তলায় কিছু শক্ত মাটি থাকা দরকার। তা না হলে আকাশে মাথা তোলা যায় না। অমৃতবাজার পত্রিকা তার গতিশীলতার সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। একে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন, একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সম্বর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে রচিত মানপত্রে মহাত্মা শিশিরকুমারের যোগ্য উত্তরাধিকারী তুষারকান্তি ভারতীয় সাংবাদিকতায় যে অমর অধ্যায় সংযোজন করেছেন, তার উল্লেখ করে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। রুচি ও সজ্জায় সম্পূর্ণ মঞ্চোপরি তাঁকে শক্তিশালী লেখনী স্কন্ধে যোদ্ধাবেশে অবতীর্ণ তাঁর এক ব্রঞ্জের মূর্তি, গত পঞ্চাশ বছরের পত্রিকার সম্পাদকীয়ের এক সংকলন, যা 'পত্রিকার কণ্ঠ' নামে উৎসৃষ্ট, তা এবং বিভিন্ন সময়ে কৃতী ব্যক্তিদের সঙ্গে তোলা ছবির একখানি এলবাম উপহার দেওয়া হয়। এই উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রেরিত দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ও সংস্থার পক্ষ থেকে প্রেরিত শত-সহস্র শুভেচ্ছাবাণীর কথা সভায় উল্লেখ করা হয়।

ধরা পড়া

মানবেন্দ্র পাল
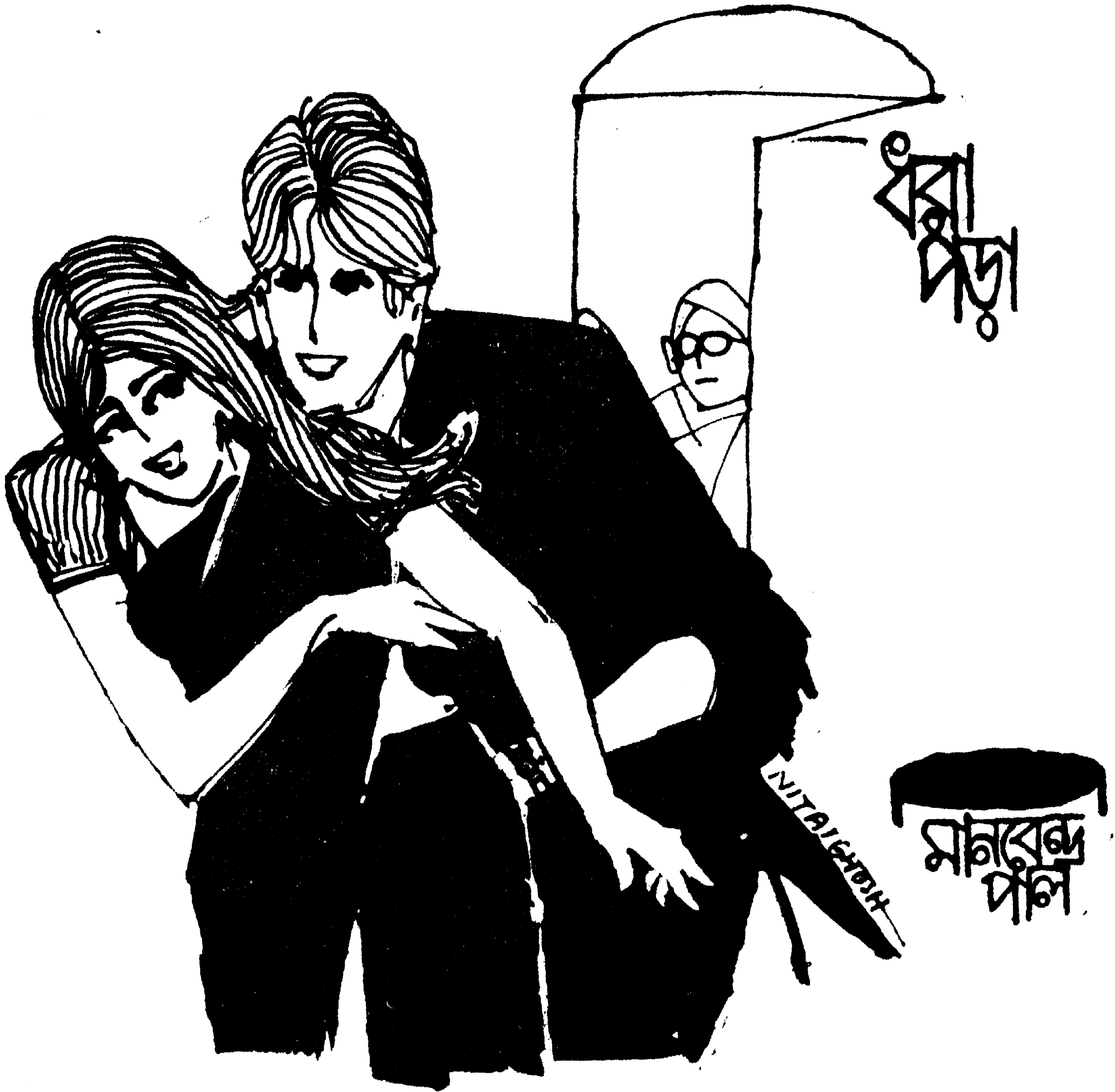
ওর এই অতর্কিত আক্রমণের সময় আমি কোনো কথা বলব কী এমন হয়ে যেতাম যে মনে হত আমি এখুনি মরে যাব। আমার হাতগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যেত, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করত আর পা দুটো যেন কিছুতেই দেহের ভার সহ্য করতে পারত না। মনে হত যেন এখুনি পড়ে যাব—পড়ে যাব মাটিতে নয়, ডিভানটার ওপরে, কিম্বা সোফায় কিম্বা খাটের ওপরে। আর এ পড়াটা, আমি বুঝতে পারতাম, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়া নয়—এ যেন ঠিক শুয়ে পড়া। আমি শুতে চাচ্ছি না, তবু কে যেন জোর করে শুইয়ে দিচ্ছে। অথচ সে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে শরীরে তো নয়ই মনেও যেন জোর পাচ্ছি না। মনে হয়—যা হচ্ছে হোক, আমি আর তো পারি না বাপু। আর তো নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি না, আর তো নিজেকে ধরে রাখতে পারি না, আর তো নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। মাথাটাথা সব ঘুলিয়ে যায়। কী বলব, কী করব কিছুই ঠিক করতে পারি না। তবু সেই সঙ্গীণ মুহূর্তেও কোনো কোনো দিন ভ্রুকুটি করে পাশের ঘরের দিকে তাকাই। ছোড়দাদাবাবু তখনকার মতো ভয় পেয়ে ছেড়ে দেয় বটে কিন্তু পরক্ষণে বলে ওঠে—এমন শুধু শুধু ভয় দেখাও তুমি! ও ঘরে তো মা ছিল। মা ভালো করে চোখে দেখতেও পায় না।

হ্যাঁ, কর্তা-মা চোখে ভালো দেখতে পায় না জানি—কিন্তু আমার তবু কেমন যেন ভয় করে। অন্ধ তো নয়। ঝাপসা দেখে। কতদূরের জিনিস ঝাপসা দেখে তা কে জানে! আর যেটুকু ঝাপসা দেখে সেটুকুই যথেষ্ট। ওই ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে দিব্যি ওপর-নীচ করছে—রাঁধুনীকে মেপে মেপে চাল দিচ্ছে, বাজার এলে আনাজগুলো যাচাই করে দেখছে, টাকার নোট হাতে এলে চোখের খুব কাছে ধরে জাল কিনা পরীক্ষা করছে।

কিন্তু ঝাপসা দেখলেই যে অন্ধ নয় তার আরও প্রমাণ আছে। কর্তামা আমাকে ভালো করেই দেখে নিয়েছে। আমি জানি কেন যেন বাড়ির মধ্যে উনিই আমাকে দেখতে পারেন না। আমাকে দেখলেই উনি কিছু ফাই-ফরমাস করবেনই। তা করুন আমি যখন এ বাড়িতে কাজ নিয়েছি তখন ছেলে রাখার কাজ ছাড়াও অন্য কাজও একটু-আধটু করিয়ে নিতে পারবেন বৈকি। বৌদিরা সকলেই নেন।—ও অতসী, একটু জল দে না রে!—ও অতসী, চা-টা ওপরে দিয়ে আয় না ভাই।

আমি তো হাসিমুখে এসব কাজ করি। কিন্তু কর্তামা যখনই কিছু বলেন তখন এমন বিরক্ত হয়ে হুকুম করেন যে আমার রাগ হয়ে যায়। একদিন হঠাৎ পরনের সায়াটা ছেড়ে দিয়ে হুকুম করলেন—এই, এটা কেচে দে তো তাড়াতাড়ি।

আমি যেন ঝি! কী বলব, ভেবেছিলাম বলি পারব না। কিন্তু বলতে পারলাম না। কারণ এ বাড়িতে আর-সবাই জানে আমি বড়ো ভালো মেয়ে, সাত চড়ে আমার রা বেরোয় না, আমি খুব বাধ্য। আর আমিও

জানি যদিও এ বাড়ির সকলেই (এক কর্তামা ছাড়া) আমায় ভালোবাসে তবু কর্তামায়ের কথার অবাধ্য হলে—কী জানি যদি চাকরিটাই চলে যায়?

মুখ বুজেই কাপড় কেচে দিই। কিন্তু কর্তামা তবু আমার ওপর প্রসন্ন নন। তিনি তাঁর ঘোলাটে চোখের ছায়া-ছায়া দৃষ্টি নিয়ে কেবলই শনির মতো আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ান আমার দোষ ধরবার জন্যে। আমি তাই তাঁকে এড়িয়ে চলি—অনেক তফাতে তফাতে চলি।

আমাকে একটু নিরিবিলিতে পেলেই ছোড়দাদাবাবু বলবে, অতসী, তুমি আমার সঙ্গে একটা কথাও তো বল না! একবার ভালো করে চোখ তুলেও দেখ না! আশ্চর্য

বলেই একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে হাত দিয়ে আমার থুতনিটা ধরে মুখটা তোলবার চেষ্টা করবে। তখন আমার যে কী ভয় করে তা বোঝাতে পারব না। ওর তো কাণ্ডজ্ঞান নেই—বাড়িতে লোক গিসগিস করছে—এ পাশে ঘর, ও-পাশে ঘর, ছাত বারান্দা—কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কে কখন এসে পড়বে। তার ওপর থুতনি ধরেই তো ছোড়দাদাবাবু ক্ষান্ত নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও কতরকম কাণ্ড যে শুরু করবে!

আমি তাই থুতনি শক্ত করে থাকি। কিছুতেই মুখ তুলি না। ছোড়দাদাবাবু চাপা গলায় করুণ স্বরে বারে বারে বলে, অতসী একটা কথা বলো—শুধু একটা কথা! অন্তত আমায় একবার গালও দাও!

ছোড়দাদাবাবু বড়ো লোকের ছেলে, চেহারাটিও সুন্দর, বয়েসেও ছোকরা—সে যখন আমার মতো দীনদুঃখী ঘরের সামান্য একটা মেয়ের জন্যে এমন করে বলে, সত্যিই তখন আমার মন টলে যায়।

কিন্তু তবু আমি কথা বলতে পারি না। সেটা রাগে বা ঘেন্নায় নয়, লজ্জায়। আমি একটু বেশি ভীরু প্রকৃতির—ভাগ্যি ছোড়দাদাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারি না। নইলে কি রক্ষে থাকত?

আমার এক বন্ধু ছিল—তার এখন বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে না ছাই! সে যা-তা কাণ্ড! বিয়ের নামে যা হোক করে গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে আর কি! সে বলত, দেখ, ছেলেদের কাছে সহজে ধরা দিবি নে। যদিও বা ধরা দিস কখনো জড়িয়ে ধরবি নে। ওরা অনেক কথা বলবে, শুনবি, কিন্তু নিজে একটা কথা কইবি না। একবার কথা কয়েছিস তো মরেছিস!

তখন আমি ছোটো ছিলাম। এসব কথা শুনতে ভালোই লাগত, কিন্তু বুঝতে পারতাম না কিছুই। আজ বুঝতে পারছি—মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি।

কিন্তু তবু কথা বলতে হয়েছিল একদিন। কথা বলা নয়—মুখ থেকে যেমন থুতু ছিটকে যায় তেমনি একটা কথা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল।

ছোড়দাদাবাবু যখন কিছুতেই আমাকে কথা বলাতে পারলে না তখন হঠাৎ একদিন সিঁড়ির মুখে নিরিবিলিতে পেয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে একটা জঘন্য খারাপ কথা বলেই চাপা হাসি হেসে উঠল। সে এত যা-তা অসভ্য কথা—আর সে যে কোনো ভদ্রলোকের ছেলে উচ্চারণ করতে পারে আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি। আমি তখন সব ভুলে গিয়ে দুহাতে কান চাপা দিয়ে জিব কেটে বলে উঠেছিলাম—ছি ছি ছি!

ওই হল আমার ছোড়দাদাবাবুর সঙ্গে কথা! ওই হল ছোড়দাদাবাবুর কানে-কানে কথার উত্তর।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি একরকম ছুটে খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

তাও যে ওটুকু পথ নিরাপদে যেতে পেরেছিলাম তা নয়, ছোটদাদাবাবুর কাছ থেকে সরে আসতেই একেবারে কর্তামার সামনে।

কর্তামা ভুরু কুঁচকে ধমকে উঠলেন—কে রে?

কোনোরকমে বললাম—আমি?

—এমন দাপাদাপি কেন!

আমার গলা তো শুকিয়ে কাঠ! কোনো-রকমে পাশ কাটিয়ে পালালাম।

কর্তামা তখন চেঁচাচ্ছেন, ওপরে কে?

আমি বুঝলাম, কর্তামা নির্ঘাত সন্দেহ করেছে। এবার বুঝি ধরা পড়লাম।

ছোড়দাদাবাবু বড়োলোকের বেকার ছেলে। বাপের টাকায় আজ এক জোড়া কাল এক জোড়া নতুন নতুন সুট বানাচ্ছে। হরদম সিনেমা দেখছে। মুখ ছুঁচলো করে শিস দিয়ে দিয়ে হিন্দি গান করে। আমি এই বয়েসেই এই ধরনের ছেলেদের চিনে নিয়েছি। ছোড়দাদাবাবু এই যা সব আমার সঙ্গে করে বা করবার চেষ্টা করে, আমি জানি, এ আমার প্রতি তার ভালোবাসা নয়। আমি যদিও লেখাপড়া মোটামুটি জানি, যদিও আমি ভদ্রবংশের মেয়ে তবু আমার এমন রূপ নেই যে ছোড়দাদাবাবু আমার প্রেমে পড়বে। এটা আর কিছুই নয় উঠতি বয়সী একটা মেয়েকে হাতের কাছে পেয়েছে—অমনি তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা। এটা তো রীতিমতো অপমানকর ব্যাপার। বুঝি—সব বুঝি। তবু তো আমি কিছু বলতে পারি না। ঐ যে লজ্জা! শুধুই কি লজ্জা? না, তা নয়। তার সঙ্গে আর একটা ব্যাপার আছে। সবাই জানে আমি খুব ভালো মেয়ে—ভদ্রঘরের মেয়ে—খুব বিশ্বাসী! এখন আমি যদি কোনোদিন লজ্জার মাথা খেয়ে ছোড়দাদাবাবুর মুখের ওপর তেড়েফুঁড়ে উঠি তাহলে? তাহলে কি বাড়ির সকলে একা ছোড়দাদাবাবুকেই দুষবে? তারা কি বলবে না, আমিই হয়তো লোভ দেখিয়েছি? মেয়েরাই নাকি বরাবর ছেলেদের মাথা খায়! তখন কি আর এ বাড়িতে আমার এই পনেরো টাকার মাইনের চাকরিটা থাকবে?

কিন্তু আমি তেড়েফুঁড়ে না উঠলেও ভয় করত—যদি কোনোদিন ধরা পড়ে যাই? আর আমি নিশ্চিত জানি ধরা যদি পড়ি তাহলে ঐ কর্তামার ঝাপসা দৃষ্টিতেই ধরা পড়ব। কারণ ছোড়দাদাবাবু আর সকলের কাছেই সাবধান কেবল পাশের ঘরে কর্তামা থাকলে কেয়ার করে না। বলে, মায়ের চোখে ছানি!

বাড়িতে শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবি, আর আমার কিছুতেই ঘুম হয় না। বড় ভয় করে।

এদিকে ছোড়দাদাবাবুর দুঃসাহস ক্রমেই বাড়ছে। আমার কাজ বড়োবৌদির ছেলেটাকে নিয়ে থাকা। যখনই ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াই অমনি কোথা থেকে ছোড়দাদা-বাবু এসে বলবে, দেখি একবার আমার কোলে দাও তো।

ছোড়দাদাবাবু ছোটো ছেলেমেয়ে মোটেই পছন্দ করে না। তার ওপর সদাই পরনে ঐ দামী সুট! পাছে কিছু অঘটন ঘটে তাই ছোড়দাদাবাবু খোকাকে কোলে নেয় না। কিন্তু যখন কাছেপিঠে কেউ থাকে না তখন হঠাৎই তাঁর ছেলে কোলে করার ইচ্ছে হবে। উদ্দেশ্য তো বুঝি। আমিও অমনি খোকাকে মাটিতে নামিয়ে দিই। নাও, এবার কোলে তুলে নাও!

ছোড়দাদাবাবু রেগে চটি ফটফট করে চলে যায়। তার ঐ রাগ দেখে আমার ভয়ানক হাসি পায়।

একদিন ছোড়দাদাবাবু আমায় খুব বাগে পেয়েছিল। আমি অন্যমনস্কভাবে একা বড়োবৌদির ঘরে দাঁড়িয়ে দূরে ট্রেন দেখছিলাম, হঠাৎ পিছন থেকে ছোড়দাদা-বাবু এসে একেবারে জড়িয়ে ধরল। সে এমন-ভাবে জড়িয়েছে যে আমার আর নিষ্কৃতি নেই। আমি যতই ছটফট করছি ও ততই ওর সমস্ত দেহ দিয়ে আমায় চেপে ধরে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর ফেলবার চেষ্টা করছিল। ও বারে বারে আমার মুখে চুমু খাবার চেষ্টা করছিল আর আমি কেবল এদিক ওদিক মাথা নেড়ে ওর চেষ্টা ব্যর্থ করছিলাম।

শেষে ছোড়দাদাবাবুর সঙ্গে যখন আর যখন আর কিছুতেই পেরে উঠছিলাম না তখন পা ছুঁড়তে লাগলাম। আর পায়ে লেগে একটা কাঁচের গ্লাস অমনি ঝনঝন করে ভেঙে গেল। নীচের ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই কর্তামার গলা—কী ভাঙল? কী ভাঙল?

ছোড়দাদাবাবু তো ছুট! কর্তামা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে দুপ দুপ করে। আমি তাড়াতাড়ি ভাঙা কাচগুলো কুড়োতে লাগলাম।

কর্তামা ঠিক জায়গাটিতেই এসে হাজির হলেন। ঠিক অপরাধীটিকেই ধরলেন। বল-লেন, গেলাসটাকে ভাঙলে কাজের মেয়ে! বলি মনে মধ্যে কী হচ্ছিল?

বুক কেঁপে উঠেছিল। ধরা পড়লাম নাকি?

সেইদিনই বিকেলে—উঃ কি নির্লজ্জ—ছোড়দাদাবাবু আমায় একা পেয়ে বললে, রাগটাগ করো না অতসী, সোজাসুজি বলি। এ বাড়িতে দেখছি বিশেষ সুবিধে হবে না। বেজায় ভিড়। তার চেয়ে বলো তো তোমার বাড়িতেই যাই।

উঃ কী অপমান! কী লজ্জা। আমার বাড়িতে যাবে। আমার বাড়ি কি ভদ্রলোকের বাড়ি নয়? আমার বাড়িতে কি আমার মা নেই? আমার দিদি নেই? ভাই নেই? আমার বাড়ি কি ভদ্রপাড়ায় নয়? আমার বাড়ি কি—?

কেঁদে ফেলেছিলাম সেদিন। ঠিক করে-ছিলাম এত অপমানের পর আর এবাড়িতে

চাকরি করা উচিত নয়। শুধু মান সম্মানেই নয় শুধু ধরাপড়ার ভয়ই নয়—এবার নতুন ভয়—কে জানে হয়তো কোনদিন বিপদ ঘটবে।

কিন্তু—

তবু চাকরি ছাড়তে পারলাম না বাড়িতে বড়ো অভাব।

তবু ও বাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে পারলাম না। ছোড়দাদাবাবুর ওপর কেমন যেন নেশা ধরে যাচ্ছে।

এখন, ছোড়দাদাবাবু একদিন কাছে না এলে একদিন কিছু না হোক গাটা একটু না ছুঁলে মনে হয় দিনটা বৃথা গেল। ভয় হয় বুঝি বা আমার ওপর ওর যেটুকু আকর্ষণ ছিল তাও কেটে গেল। কিম্বা বাড়ির সবাই হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে তাই ছোড়দাদাবাবু এড়িয়ে চলছে।

আমার সেদিন কাজে উৎসাহ থাকে না, মুখে হাসি দেখা যেত না। পায়রাগুলোকে ঠেলতে ঠেলতে কেবলই বাগানে ঘুরপাক খেতাম। আর ভাবতাম—বোধ হয় ধরা পড়ে গেলাম বৌদিদের কাছে—কর্তামার কাছে—ছোড়দাদাবাবুর কাছে!

এ বাড়িতে আমি জানি, এক কর্তামা ছাড়া আর সকলেই আমায় খুব ভালোবাসে (ছোড়দাদাবাবু বাসে কিনা জানি না, বাসলেও সে ভালোবাসা আলাদা)। তারা আমায় ভালোবাসে কারণ, আমি নাকি খুব ভালোমানুষ। আমি কখনো কারো অবাধ্য হই না। আমি কখনো কারো মুখের দিকে চোখ তুলে চাই না, আমি লাজুক, আমি কম কথা বলি, আমি সোনামণিকে ঠিক নিজের ভাইটির মতো ভালোবাসি তাকে যত্ন করি—আর আমি বিশ্বাসী, আমার কোনো লোভ নেই।

এর মধ্যে কতগুলো এদের ধারণা আর কতগুলোই বা আমার সত্যিকার স্বভাব তা অবশ্য আমি নিজেও কখনো ভেবে দেখি নি। কিন্তু আমি যে লোভী নই তা আমি জানি।

উৎসবে পালা-পার্বণে এ বাড়িতে এখনো 'পার্বণী' দেবার ব্যবস্থা আছে। পুজোর সময় বাড়ির ঝি রাঁধুনী কাপড় পায়। বৌদিরা আমাকেও দেয়। তাঁরা হাসাহাসি করে বলেন, অতসী এবার তোকে ভাল শাড়ি দেব কিন্তু। পরতে পারবি তো?

আমার মুখ নিচু হয়ে পড়ে। লজ্জায় নয়, দুঃখে। শাড়ি আবার কোন মেয়ে পরতে পারে না? কিন্তু ভাল শাড়ি কেনার পয়সা তো নেই মায়ের। সে দুঃখের কথা বৌদিরা কি কল্পনাও করতে পারে?

আর তা ছাড়া ঝি-রাঁধুনীদের সঙ্গে এই কাপড় পাওয়া আমার বড্ড খারাপ লাগতে, আমি কি ওদের দলে? আমি গরিব হতে পারি কিন্তু আমি তো ভদ্দরলোকের মেয়ে! আমি এই অল্পবয়সেই চাকরি করতে পারি কিন্তু সব অপমান সইতে পারি না।

একদিন বিন্দুর মা মাছ কুটতে কুটতে বললে, হ্যাঁ লা, অতসী চড়কের পার্বণী নিয়েছিস?

আমি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লাম।

বিন্দুর মা অবাক হয়ে বললে, ওমা সে কী! যা-যা চেয়ে নেগে!

আমার এমন রাগ হয়েছিল যে ইচ্ছে করছিল ওই আঁশ বঁটি দিয়ে বিন্দুর মাকেই কাটি। কিন্তু ওই যে আমি ভালোমানুষ। সাত চড়ে আমার রা বেরোয় না। চাইব না বা নেব না এমন কথাটুকুও আমি মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। নিঃশব্দে চলে গেলাম।

আমার দৃঢ় ধারণা, বিন্দুর মা ভাবল, আমি বৌদিদের ওপর অভিমান করেই বুঝি ফিরে গেলাম।

আমার যে লোভ নেই—আমি যে কখনো কোনোদিন কিছু চাই না বৌদিরা তা ভালো করেই জানেন। তাই তাঁদের সবার ঘরে আমার অবাধ যাওয়া-আসা।

খুকুকে খাওয়াতে আসা? সেজোবৌদি বললে, ও অতসী ঘরে আমার হাত-ব্যাগটা আছে নিয়ে আয় না। আর ওপরে উঠতে পারি না।

ঐ হাত-ব্যাগে কী আছে আমি জানি। গোছা গোছা নোট তো আছেই, সময়ে সময়ে চুড়ি আংটিও দু-একটা থাকে। হয়তো স্যাকরাকে দেবে বলে খুলে রেখেছে।

বড়োবৌদি বললেন ও অতসী খোকার জন্যে একটা [illegible] কিনে আন না। বলে দশ টাকার একটা নোট বের করে দিলেন। তারপর বাকি টাকা নেবার কথা আর মনেই থাকে না।

আমি হয়তো তখনি ফেরত দিতে গেলাম, বড়োবৌদি বললেন আমি এখন স্নান করতে যাচ্ছি তুই বাপু ঘরে রেখে দিয়ে আয়।

একবার জিজ্ঞেসও করে না কত দাম নিল কাসমেয়ো দেখি বা পয়সা কত ফিরল। আমি বাড়ির কথা বলি। তবু তো বৌদিরা জানতেন না আমি কত বড়ো ঘরের মেয়ে।

আমার বাবা কমল হাজরা ছিলেন একজন বড়ো উকিলের মুহুরি। মাও ভালো ঘরের মেয়ে লেখাপড়াও জানে। কিন্তু অবস্থার বিপাকে মাকে আজ রাঁধুনীগিরি করতে হয় দুবেলা খাওয়া পায় আর কুড়ি টাকা মাইনে। ভাঙা বাড়িটা নিজেদের, তাই বাড়ি ভাড়া লাগে না। বরং ওরই মধ্যে থেকে একটা ঘর ভাড়া দিয়ে কিছু টাকা পাওয়া যায়। বাড়িতে আমরা তিন ভাই-বোন। ছোটো ভাই ইস্কুলে পড়ে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে আমার পড়া বন্ধ করে ভাইয়ের পড়া চালিয়ে যাওয়া হল। আর আমার দিদি? সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে। পেটে ক্যানসার হয়েছে। দিদিও লেখাপড়া করেছে। সবাই জানে বাঁচবে না। অথচ বাঁচার কী মর্মান্তিক ইচ্ছে।

মা রাঁধুনীগিরি করে বলে আমার কোনো লজ্জা ছিল না। আমার মতে বাঁচার জন্যে কাজ করতে হবে। যত ছোটো কাজই

শোক করব—কিন্তু হাত পাতব না। কাজেই মা ভদ্রঘরের মেয়ে হয়েও যে রাঁধুনীর কাজ করে তাতে আমার এতটুকু সংকোচ ছিল না। কিন্তু একদিনের একটা ব্যাপারে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

মা কাজে যায় সঙ্গে সঙ্গে একটা টিনের থালা আর টিনের বাটি নিয়ে যায়। মা ওখানে ভাত খায় না। বাড়িতে নিয়ে আসে। একটু বেশি ভাতই নিয়ে আসে, তাতে করে দিদিরও খাওয়া হয় আর কি।

একদিন দেখি মা ওবাড়ি থেকে একটা কাঁসার বাটি নিয়ে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—এ বাটি কেন?

মা বললে, আমাদের বাটিটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু কাঁসার বাটি আর ফেরত যায় না। মাকে রোজই বলি, মা রোজই উত্তর দেয়, ঐ যাঃ ভুলে গেছি।

শেষে একদিন মা কাজে বেরোবার সময় আমি নিজে হাতে বাটিটা দিতেই মা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল—বাটিটা কী এত কামড়াচ্ছে যে কেবল বাটি-বাটি করছিস? ফেরত দেব না, যা। বলি বাবুদের কি বাটির অভাব আছে?

—তা বলে তুমি চুরি করে আনবে।

—যাদের অনেক আছে, জিনিসপত্তরের যাদের হিসেবনিকেশ নেই তাদের দু একটা জিনিস নিয়ে এলে তাকে চুরি বলে না। সব সময়ে এটা নাও গো ওটা নাও গো, তো বলতে পারে না। নিয়ে নিতে হয়। তুই কি মনে করিস বাড়ির লোকে টের পায় না? খুব পায়। তারাও বোঝে। তাই কিছু বলে না।

মা একটু থেমে বললে, এই যে বাটিটা এনেছিলাম এতো বড়োবৌয়ের চোখের সামনে দিয়েই নিয়ে এলাম। একবারও জিজ্ঞেস করলে না, ওগো আনছ তো? আজ পর্যন্ত তো ফেরত দিই নি—একবারও কি বলে, ফেরত দিয়ো।

মা আমার মাথায় এ এক নতুন যুক্তি ঢুকিয়ে দিল।

তবে এই যে বৌদিরা আমার কাছ থেকে টাকার হিসেব নেয় না, এই যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে পয়সা ছড়িয়ে রাখে তা কি আমাকে সাহায্য করবার জন্যে?

কিন্তু না না, তা সম্ভব নয়। শুধু শুধু সাহায্যই বা নেব কেন? আমি পরিশ্রম করব তার বদলে পারিশ্রমিক নেব। কারো দয়া চাই না—সাহায্য চাই না—ভিক্ষে চাই না।

ছোড়দাদাবাবু কিছুদিন থেকে আমাকে যেন এড়িয়ে চলছে। কিছু না করুক অন্তত চোখে চোখেও তো ইশারা-ইঙ্গিত করতে পারে। তাও করছে না।—যেন হঠাৎ একেবারে চরিত্রবান পুরুষ হয়ে গেছেন। এটা আমার ভালো লাগছিল না। আমি জানি ছোড়দাদাবাবু আমাকে এমন ভালোবাসে না যে আমায় বিয়ে করবে। এ শুধু তার খেলা। মুশকিল হয়েছে সেই খেলার নেশা আমাকেও পেয়ে বসেছে। ভয় রোমাঞ্চ লজ্জা সব মিশিয়ে সে একাকার অবস্থা হয় তখন আমার। আমি আমার মুখ দেখতে পেতাম না বটে কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারতাম আমার দু কান লাল হয়ে উঠেছে, মুখ থমথম করছে।

আমি বুঝতে পারতাম আমার সেই লাল থমথমে মুখ দেখে ছোড়দাদাবাবু ভয় পেত। ভাগ্যি ওইটুকু ভয় পেত নইলে কবে এতদিনে আমার পুরোপুরি সর্বনাশ হয়ে যেত। কারণ এবাড়িতে যেমন লোকের ভিড় তেমনি আরো মাঝে মাঝে হঠাৎ বাড়ি খালি হয়ে যেত। সেইসব দিনই ভয়ংকর। আমায় খুব সাবধানে থাকতে হত।

তেমনি একদিন পরিস্থিতি শিগগিরই ঘটল। কাদের বাড়ি যেন অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন। বাড়িসুদ্ধ সবাই গেল নেমন্তন্নে। অন্য অন্যবার এইসব দিনে বড়োবৌদি বলে দিতেন আমার আসতে হবে না। এবার বড়োবৌদি ভুলে গিয়েছিলেন, আমিও ইচ্ছে করে মনে করিয়ে দিই নি। কারণ আমার সেদিন সেই নির্জন বাড়িতে আসার ইচ্ছে ছিল। কারণ আমি শুনেছিলাম (আমি নিশ্চয় জানি ছোড়দাদাবাবু আমায় শুনিয়েই বলেছিল যে ছোড়দাদাবাবুর পেটের অসুখ—নেমন্তন্নে যাবে না।

এ আমার মরবার বুদ্ধি। কিন্তু তবু আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমি ঠিক পায়ে পায়ে বাড়ি থেকে বেরোলাম। আমার মনে হল মা—এমন কি রোগশয্যা থেকে দিদিও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আমার ভয় করছিল হয়তো ওরা আমার মনের কথা টের পাচ্ছিল।

শূন্য বাড়িতে আমি একরকম চোরের মতোই চুপি চুপি এসে গেলাম। রোজই তো এ বাড়ি আসি, কিন্তু আজ বুকটা কেমন ঢিপঢিপ করছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন কী ভয়ংকর কাজ করতে এসেছি।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। চারিদিকে ছাড়া কাপড়, সায়া, ব্লাউজ। বৌদিরা কেউ নেই ঐটেই তার প্রথম প্রমাণ। সিঁড়ির মুখে উঠতেই সার সার স্লিপার চোখে পড়ত। আজ এক জোড়া স্লিপারও নেই। আমি তরতর করে ওপরে উঠলাম। এতক্ষণ খোকামণির গলা পাওয়া যেত কিন্তু আজ কারো সাড়াশব্দ নেই।

কিন্তু ছোড়দাদাবাবু? ছোড়দাদাবাবু আছে তো?

এই যে তুমি এসেছ!

আমি চমকে তাকাতেই দেখি ছোড়দাদাবাবু একটা ঢিলে পায়জামা আর একটা গেঞ্জি প'রে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে।

—আমি জানতাম তুমি আসবে।

বলেই ছোড়দাদাবাবু খপ্ করে আমার হাতটা চেপে ধরল।

ঠিক এমন ঘটনাই ঘটবে আমি জানতাম। তাই আমি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম—তখন আমি বলব—হ্যাঁ, মুখ ফুটে বলব—একটু ছাড়ুন আমি আসছি। বলে আমি নীচে নেমে এসে আগে দরজাগুলো বন্ধ করব। কারণ আমার ধারণা, এইসব সময়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই বেশী সাবধানী হতে হয়।

কিন্তু ছোড়দাদাবাবু যখন সত্যিই আমার হাত চেপে ধরল তখন আমার মুখ থেকে এতটুকু কথাও বেরোল না। আমি আগের মতো কাঁপতে লাগলাম।

ছোড়দাদাবাবু তখন হাত ছেড়ে দিয়ে সাপটে আমাকে বুকে চেপে ধরে বারে বারে চুমু খেতে লাগল। আমার মন তখন নীচের খোলা দরজার দিকে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছি না। সে এক অস্বস্তি। এদিকে ছোড়দাদাবাবু তখন আমাকে ওপরের ঘরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বেশি চেষ্টার দরকার হত না, কারণ আমার শরীর তখন অবশ হয়ে গেছে। আমার মনের অবস্থা তখন এইরকম—যা ইচ্ছে হয় করো। তোমার দয়া!

এমনি সময়ে ওপরে ঠাকুরঘরে কার যেন কাশির শব্দ পেলাম। চমকে উঠলাম।

ছোড়দাদাবাবু ততক্ষণে আমাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে। আমার ভয়টুকু তার চোখ এড়াল না। যেন কিছুই নয় এমনিভাবে শুধু বললে, ও কেউ নয়—মা।

মা! কর্তমা! সেই ছানিপড়া চোখ!

ছোড়দাদাবাবু তার মা সম্বন্ধে যতই নিশ্চিন্ত হন আমি মোটেই নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আমার কেমন ভয় করে কর্তামাকে। আমার ধারণা উনি আমায় মোটেই বিশ্বাস করেন না। শনির মতো পেছনে লেগে থাকবেই। আর—আর হয়তো শেষ-পর্যন্ত ওঁর হাতেই ধরা পড়ব।

আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। একে নীচে দরজাগুলো সব খোলা তার ওপর ঠাকুরঘরে স্বয়ং কর্তামা। আমার সাহসে কুললো না। আমি প্রাণপণ জোরে ছোড়দাদাবাবুর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই উত্তেজনায় আমার মুখটা আরও লাল আরো থমথমে হয়ে গেল। আমার মনে হল ছোড়দাদাবাবুও যেন ভয় পেল। সে আর শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না। ওপরে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। আমিও তাড়াতাড়ি আত্মরক্ষার জন্যে নীচে নেমে এলাম।

একটু পরেই—চমকে উঠলাম। ছোড়দাদাবাবু নেমে এসেছে। কোনো কথাবার্তা নেই হঠাৎ আমার হাতে দুটো এক টাকার নোট গুঁজে দিয়ে হাসতে লাগল।

ছোড়দাদাবাবুর এই টাকা দেওয়া, আর হাসির উদ্দেশ্য আমার বুঝতে বাকি রইল না। ছোড়দাদাবাবু নিশ্চয় ভেবেছিল টাকা না দিলে আমি বোধহয় রাজী হব না। আমি যেন বেশ্যা!

এই কথা মনে হতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। নোট দুখানা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারলাম ছোড়দাদাবাবুর মুখের ওপর।

ছোড়দাদাবাবু যেন এরকমটা আশা করেনি। এক মুহূর্তে তার মুখটা ফ্যাকাশে তারপর লাল হয়ে উঠল। দাদা-

বাবুর অমন ভয়ানক মুখ আমি এর আগে কখনো দেখিনি। আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। মুখ নিচু করে রইলাম।

কয়েক মুহূর্ত গেল। আমি প্রতি মুহূর্তেই ভাবছিলাম ছোড়দাদাবাবু এইবার আক্রোশে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর আমিও, নিশ্চয় জানি, বাধা দিতে পারব না—বাধা দিতেও ইচ্ছে নেই। একটা মুহূর্তের উত্তেজনায় ছোড়দাদাবাবুর মুখের উপর টাকাটা ছুঁড়ে মেরেছি—টাকাটা এমনি ফেলে দিলেই হত—অনুতাপ হচ্ছে এখন। আর এই অনুতাপের জন্যেই আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম ছোড়দাদাবাবুকে একটুকু বাধা দেব না। যা হবার হোক, ধরা পড়ি মরব, ধরা না পড়েও যদি অন্য বিপদ ঘটে ঘটুক। আমি এখন মরিয়া।

কিন্তু ছোড়দাদাবাবু এক পাও এগিয়ে এল না। শুধু দাঁত চিপে হিস্‌হিস্ করে কেমন যেন শব্দ করতে লাগল। তারপর একটা তীক্ষ্ণ তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি আমার মুখের ওপর ফেলে ছোড়দাদাবাবু ওপরে উঠে গেল।

আমি তারপরও অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম। আহা এমন নির্জন বাড়ি—এমন সুবিধে আর কি পাওয়া যাবে? ছোড়দাদাবাবু যদি কোনো উদ্দেশ্য না নিয়েও এখানে আসে—শুধু একটিবার আসে, আমি পায়ে লুটিয়ে পড়ব।

কিন্তু ছোড়দাদাবাবু আর এল না।

টাকাটা অমন করে ছুঁড়ে মেরে অন্যায় করেছিলাম এর জন্যে অনুতাপের শেষ ছিল না। কিন্তু পরে মনে হল ছুঁড়ে মারাটাই নয় টাকা ফেরত দেওয়াটাও অন্যায়। শুধু শুধু টাকা ফেরত দেওয়া কেন? একদিকে ছোড়দাদাবাবুদের প্রাচুর্য আর একদিকে আমাদের কী মর্মান্তিক দারিদ্র্য। একজন যদি স্বেচ্ছায় টাকা দেয় (আমি তো চাইতে যাইনি) তাহলে সে টাকা না নেব কেন (আমি তো ভিক্ষে চাইনি?) বারে বারে তখন মায়ের কথাটাই মনে পড়ছিল। মা বলে, ও টাকায় আমাদেরও অধিকার আছে। আমরা ওদের আত্মীয় নই কিন্তু পরও তো নই। যে-বাড়িতে কাজ করা যায় সে-বাড়ির লোক বলেই গণ্য হতে হয়। কাজেই তাদের কাছ থেকে সিকিটা আধুলিটা টাকাটা নিতে দোষ নেই। তারা নিজে থেকে দিতে এলে তো কথাই নেই।

আমার মনে হল, আমি এক নম্বরের বোকা তাই দু দুটো টাকা ছেড়ে দিলাম। ওই দুটো টাকা বাড়ি নিয়ে গেলে মা কত খুশী হত, দিদিটা কমলালেবু খেতে চাচ্ছিল পেটভরে কমলালেবু খাইয়ে দেওয়া যেত।

মন খারাপ অবস্থাতেই বাড়ি ফিরে এলাম। প্রথমেই আজ চোখে পড়ল মা তার মনিববাড়ি থেকে যে কাঁসার বাটিটা নিয়ে এসেছিল (চুরি করে?) সেটা কেমন মেজে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা হয়েছে। কে বলবে পুরনো বাটি? মাজাঘষা একেবারে নতুনের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। আমি জানি ওটা বিক্রির জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি ধীরে ধীরে বাটিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এতদিন পর আজ কী খেয়াল হল বাটিটা ভালো করে দেখতে লাগলাম। ইচ্ছে করল বাটিটা একবার ছুঁয়ে দেখি। ছুঁতে যাচ্ছিলাম এমনি সময়ে দিদি ভাঙা খন্‌খনে গলায় ডাকল—কে রে? অতু?

—হ্যাঁ।

শোন্।

আমি খুব অনিচ্ছায় দিদির কাছে গেলাম। দিদির কাছে যেতে আমার মন চাইত না। বড্ড কষ্ট হত। জানতাম দিদি আর বাঁচবে না। তাই কাছে যেতে ইচ্ছে হত না—মায়ায় জড়াতে চাইতাম না।

কিন্তু অনেকদিন পর দিদি আজ স্পষ্টভাবে ডেকেছে। কাজেই না গিয়ে উপায় নেই।

আমি পায়ে পায়ে দিদির কাছে গেলাম। দিদি একবার ঘাড় উঁচু করে আমার দিকে তাকাল। বললে, বোস।

বসলাম। দিদি তার হাড়-বেরকরা হিম হাতখানা দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল। চাপা গলায় বললে, আমি বুঝতে পারছি আমি আর বাঁচব না। এ রোগে কেউ বাঁচে না। কিন্তু—

দিদি একটু থামল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু বাঁচাবার জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করবি না?

শেষ চেষ্টা বলতে কী বোঝাতে চাইছে আমি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। দিদি তখন পরিষ্কার করে বললে, আমাদের ভাড়াটে বলছিল কলকাতায় নাকি ক্যান্সারের হাসপাতাল আছে। সেখানে অনেকে ভালো হয়েও যায়। শুধু কলকাতা যাতায়াতের ভাড়াটা পেলেই ওরা নিয়ে যাবার ভর্তি করবার সব ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বললাম, তা আমাকে বলছ কেন? মাকে বলো।

—মাকে বলেছিলাম। মা বললে, টাকা নেই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তা আমিই বা টাকা কোথায় পাবো? আমি তো যা পাই সব মায়ের হাতে দিয়ে দিই।

দিদি যেন কেমন হতাশ হয়ে পড়ল। ক্লান্ত ঘাড়টা বালিশে ফেলে দিয়ে কোনো-রকমে বললে, তা তো জানি। তবু ভাবলাম যদি কোনোরকমে কটা টাকা জোগাড় করতে পারিস।

বলেই পাশ ফিরে চোখ বুজল। যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

কেন জানি না আমি সেদিন বিকেলে তাড়াতাড়িই ওদের বাড়িতে গেলাম। মনে মনে ক্ষীণ আশা হয়তো বা ওরা তখনো নেমন্তন্নবাড়ি থেকে ফেরেনি। কিন্তু বাড়ি ঢুকতেই দেখলাম নীচের তলা সরগরম। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। কিন্তু আমি তখন বেপরোয়া। কী যেন করতে চাই—কিসের জন্যে যেন প্রবল একটা ইচ্ছে আমায় টানছে—কেবলই টানছে। আমি একনজর দেখে নিলাম। সকলেই নীচে রয়েছে—কর্তামাও। অমনি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেলাম। এ বাড়ির সব ঘরে আমার অবাধ প্রবেশ-অধিকার। কিন্তু সব ঘরে ঢোকার আমার দরকার নেই। আমার এখন লক্ষ্য একটি মাত্র ঘর—ছোড়-দাদাবাবুর ঘর। এ ঘরে আমি কম ঢুকি। এ ঘরের প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ বলেই এ ঘরে ঢুকতে আমার পা কাঁপে। কিন্তু এখন আর আমার মধ্যে কোনো সংকোচ নেই। শুধু একটি ইচ্ছা—ছোড়-দাদাবাবু যেন এখন ঘরে থাকেন। মনের সব শক্তি একত্র করে ছোড়দাদাবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। না, ছোড়দাদাবাবু নেই। চারদিকে সব ছড়ানো বিছানাটা যেন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে আছে। আলনা থেকে প্যান্টটা মাটিতে লুটোচ্ছে কোটটা রয়েছে খাটের ওপর। মেঝেময় সিগারেটের টুকরো।

ছোড়দাদাবাবু ঘরে নেই—কেমন যেন হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। [illegible] ছোড়দাদাবাবুর প্যান্টটার ওপর [illegible] আমি কী [illegible] ছোড়দাদাবাবুর যে [illegible] [illegible] যে কোনো সময়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকবে না।

আমি এগিয়ে গিয়ে [illegible] সেই প্যান্টটা তুললাম। [illegible] উত্তে-জনা। কিন্তু এখন আর ইতস্তত করবার সময় নেই। আমি একবার পিছন ফিরে [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] না। কিন্তু [illegible] বিশ্বাস নেই। একটা মুহূর্তে [illegible] [illegible] এসে উপস্থিত হন।

আমি আবার পিছনে ফিরে তাকালাম। না, কেউ নেই। যতটা সম্ভব কান খাড়া করে রইলাম [illegible] সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ নেই। এখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে, চোখ বুজিয়ে পকেটে হাত চালিয়ে দিলাম। আমার এই পর্যন্ত মনে আছে, অনেকগুলো নোট আমার হাতে ঠেকল! কিন্তু ওই পর্যন্ত! সেগুলোর একটাও টেনে আনতে পারিনি। কারণ ঠিক সেই সময়েই কোথা থেকে ছোড়দাদাবাবু এসে হাজির! মুহূর্তের জন্যেই ছোড়দাদাবাবু যেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর পরক্ষণেই তার ঠোঁটের ওপর নিঃশব্দে ভেসে উঠল এক-টুকরো বিদ্রূপের হাসি।

আমি বুঝলাম আমি হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছি।

ধরা হয়তো পড়তামই একদিন। কিন্তু এমন একা-একা ধরা পড়ার লজ্জা বিধাতা লিখেছিলেন আমারই কপালে।

কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ ।। ফুলিয়া

এই আমাদের দেশ

কবিতীর্থ ফুলিয়া বৈষ্ণবতীর্থ মন্দিরময় শান্তিপুর

কবিতীর্থ ফুলিয়া। গাছ-গাছালি ঘেরা ছোট্ট গ্রাম। শান্তিপুর লাইনে রানাঘাট থেকে নয় মাইলের মত। মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। জন্মস্থান হিসাবেই নয় দুনিয়ার প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজের সেকালে খুব রবরবা ছিল। এখন অবশ্য সেদিন নেই, সব গ্রামের মতই এটাও পড়তির দিকে। মহাকবি কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করেন ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে। এই বংশের নবাবের দেওয়া উপাধি ছিল 'ওঝা', মুখুটি ব্রাহ্মণ। মায়ের নাম মালিনী দেবী, বাবা বনমালী। কৃত্তিবাসের সময়ে ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। কৃত্তিবাসের পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। তিনি যে স্বভাব-কবি ছিলেন এটাও সকলের জানা। রাজপণ্ডিত হবার ইচ্ছাতেই তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে হাজির হন এবং স্বরচিত পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক রাজার কাছে পেশ করেন। তারপর থেকেই রাজসভায় তাঁর যোগ্য সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌড়েশ্বর তাঁকে রামায়ণ রচনায় উৎসাহিত করেন। গৌড়েশ্বরের পরিচিতি নিয়ে নানান মতভেদ আছে। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে পরিচিতি দিয়েছেন তা নির্ভর করেই কেউ কেউ বলেন, তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণই গৌড়েশ্বর, আবার কারো মতে রাজা গণেশ ও গৌড়েশ্বর একই লোক। প্রায় আশী বছর আগে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে জয়গোপাল তর্কালংকার নামে এক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কৃত্তিবাসের আমলের প্রাচীন ভাষাকে সাধারণের উপযোগী সহজ ভাষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের আমূল সংস্কার করেছিলেন।

কৃত্তিবাসের জন্ম ভিটেয় একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। প্রতি বছর জন্মদিনে এখানে কৃত্তিবাস স্মরণসভা হয়। এই স্মৃতি স্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্যার

জলেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য ।। শান্তিপুর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে ঃ

মহাকবি কৃত্তিবাসের,
আবির্ভাব—১৪৪০ খৃষ্টাব্দ, মাঘ মাস,
শ্রীপঞ্চমী, রবিবার।

হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাংলার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম
ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে সুরভিত সুকবিত্বে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রনম।

কৃত্তিবাসের জন্মভিটের পাশেই হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণনা আছে 'যবন' হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বেনাপোল ছেড়ে গিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের সংগে মিলিত হন এবং ফুলিয়ার গঙ্গাতীরে 'গোফা'য় ভজন সাধন করতে থাকেন। মুসলমান হয়ে হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান করার অপরাধে কাজির অভিযোগে তখনকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়, বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বধর্মে আনার চেষ্টা করে। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে পর পর বাইশটি বাজারে ঘুরিয়ে বেত্রাঘাত করার আদেশ দেন। কিন্তু ভক্ত শিরোমণি হরিদাস বাইশ বাজারের বেত্রাঘাত খেয়েও জীবিত রইলেন এবং যারা বিনা দোষে তাঁকে নির্যাতন করেছে তাদের হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন ক্ষমা করার জন্যে। হরিদাসের মতে, ওরা অবুঝ তাই অন্যায় করেছে। প্রেম দিয়ে ওদের হৃদয় জয় করতে পারলে ওরাই মহৎ কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারে। মানুষের প্রতি এই অগাধ ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রেমের আদর্শ বৈষ্ণব ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। অনেকে বিশ্ব-প্রেমিক যীশু খৃস্টের সঙ্গে ভক্ত হরিদাসের তুলনা করে থাকেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে 'পৃথিবী-শিরোমণি' বলে বর্ণনা করেছেন।

আশানন্দ ঢেঁকির স্মৃতি স্তম্ভ ।। শান্তিপুর

ফুলিয়ায় কোন থাকার জায়গা পাচ্ছেন না। ফুলিয়া সেরে চলে যেতে হচ্ছে শান্তি-পুর। শান্তিপুরে দেখার জায়গা প্রচুর। সারা দিনেও কুলোবে না। ফুলিয়া, শান্তি-পুর একদিনে দেখা যদি সম্ভব না হয় তবে শান্তিপুরে থেকে যেতে পারেন। সরকারী কোন ব্যবস্থা নেই, নিজেদের ঠিক-ঠাক করে নিতে হবে। চলনসই হোটেল পাবেন।

শান্তিপুর বহু প্রাচীন জায়গা। প্রায় আটশো বছরের প্রাচীন গ্রাম। আগে শান্তিপুরের তিন দিক দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এখন দূরে সরে গেছে। শান্তিপুর বৈষ্ণবদের শ্রীপাট। নামের উৎপত্তি নিয়ে ভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

অনেকে বলেন, শান্ত নামে জনৈক মুনির বাসস্থান ছিল বলে শান্তিপুর নাম হয়েছে। আবার কেউ বলেন, গঙ্গার ধারে অবস্থিত বলে মুমূর্ষু পিতামাতাকে অনেকে গঙ্গাযাত্রা করাতে এখানে নিয়ে আসতেন। যাঁরা বেঁচে উঠতেন তাঁরা বাড়ি ফিরে না গিয়ে এখানেই শান্তিতে বসবাস করতেন। সেই থেকেই এর নাম শান্তিপুর হয়।

অদ্বৈত আচার্য বারো বছর বয়সে শাস্ত্র পাঠের জন্যে শান্তিপুরে আসেন এবং শিক্ষা শেষে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বহুবার অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে এসেছিলেন। ১২৫ বছর বয়সে অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরেই দেহত্যাগ করেন। প্রাচীন আমলের অনেকগুলি মন্দির আছে দেখবার মতো। স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের দলিল নিয়ে এখনও মন্দিরগুলি টিঁকে আছে। তার মধ্যে শ্যামচাঁদের মন্দির, গোকুল চাঁদ ও জলেশ্বর মহাদেবের মন্দির উল্লেখ্য। শ্যামচাঁদের মন্দিরটি নির্মাণ করেন শান্তিপুরের রামগোপাল খাঁ চৌধুরী মশাই। তখনকার দিনে প্রায় দু লক্ষ টাকা খরচ হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি দূর-দূরান্তরের ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। নদীয়ার মহারাজকে এক লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে অনিয়েছিলেন। গোকুলচাঁদের মন্দির ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। জলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণের মা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। জলেশ্বরের মন্দিরের গায়ে বহু পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে, সূক্ষ্ম কারিগরী তারিফ করার মতো।

মুসলমান আমলেও শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭০৫ খৃঃ ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ শান্তিপুরের তোপখানায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। শান্তিপুর প্রাচীনকাল থেকেই বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার মিহি কাপড় আগে বিদেশে রপ্তানী হোত। ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বড় কুঠি ছিল। এখনও শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়ের সুনাম আছে।

নবদ্বীপের মত শান্তিপুরও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল। শ্রীরাম গোস্বামী, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, রামনাথ তর্করত্ন এখানকার অধিবাসী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড় এখানকার লোক। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় নামে এক বীর-পুরুষ এখানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রভূত শক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে এক রাত্রির অতিথি হয়েছিলেন। সে রাত্রেই বাড়িতে ডাকাত পড়ে। আশানন্দ একাই ডাকাতদের ঠেকিয়েছিলেন একটি প্রকান্ড ঢেঁকি দিয়ে। এই বীরত্বের কাহিনী থেকেই তিনি আশানন্দ ঢেঁকি নামে পরিচিত। আশানন্দের স্মৃতি রক্ষায় তাঁর বাসভবনে একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বহু লোক এখনও সেই স্মৃতি স্তম্ভে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।

এ যুগের অন্যতম সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন এবং কলকাতায় এসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রয় নেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের জন্যে গয়ায় গিয়ে এক সিদ্ধ যোগীর সাক্ষাত পান এবং মত পরিবর্তন করে তিনি আবার সনাতন হিন্দু-ধর্মে ফিরে আসেন। তাঁর অলৌকিক যোগপ্রভাব নিয়ে বহু কাহিনী আছে।

শান্তিপুরের কাছাকাছি ছোট ছোট গ্রামে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বাগ আঁচড়ায় বাগ্দেবীর বিগ্রহ। বাগ আঁচড়ার পাশেই ব্রহ্মশাসন গ্রামে চারশো বছরের পুরনো শিব মন্দির আছে। এক সময়ে ব্রহ্মশাসনের শিব মন্দির নদীয়ার গৌরব ছিল। চাঁদ রায় নামে জনৈক ব্যক্তি নাকি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের চূড়া ছিল না। ভেতরে মন্দিরের গায়ে নানা রকমের মূর্তি খোদিত ছিল। এ ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক মন্দির। যাওয়া আসার তেমন সুবিধে নেই। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একটু উৎসাহী হলে এ মন্দিরগুলি এখনও সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখের মেলা

বেতাল-ভৈরব

'আমি স্বার্থপর মানুষের কোনো আইন মানি শালা!'

কোমরের তাবিল খুলে টাকা-পয়সা ঢেলে সাত বোঝা প্যাকাটির দাম ফেলে দিয়ে লম্বা কাপড়ের তাবিলটা আবার কোমরে জড়িয়ে বেঁধে নারকোলের বস্তা কটা ঠিকঠাক করে রেখে মানিক বাগ গজগজ করতে থাকে: 'আমার বাপ ভগবানের নাম করত। আর গাড়োয়ান পাইকেরদের যাখন খড়, উলু, নারকোল গুনে দিত, কম দিত, হুড়োত, মিথ্যেকে সত্যি বলে চালাবার জন্যে হাজারটা দিব্যি গালত। দুধে জল দিত। কি মিষ্টি-মধুর মুখের বাণী ছিল মাইরি, শুনলে পাষাণ গলে যায়! কিন্তু সেই লোক শালা ঘর-জ্বালানী কেসে অনুমতী মণ্ডল—দালাল—শালা অত্যাচারী পাপিষ্ঠের পক্ষ নিয়ে 'সত্য বৈ মিথ্যা বলব না' বলে শপথ করে ডাহা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এল! একটা বিচার সালিশী বসুক, ডাকো সেই বেণীমাধব বাগকে। চুলচেরা বিচার করে দিত নাকি আমার বাবা। কিন্তু আমি তার বড় ছেলে, তাকে আমি যতখানি জানি আর কোন্ শালা জানবে? যে আগে তাকে ডাকতে যেত সে অপরাধী হলেও বাবা কিন্তু তার পক্ষ নিত। গ্রামে সেটাই রেওয়াজ। চুল যা চেরে একেবারে উকুন বার করে ফেলে। বাবার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই. রোজ শালা তিন-চার বোতল করে চোলাই ঢালতুম গলায়, কিন্তু কোনোদিন বাবা আমাকে প্যাঁদায়নি! শুধু ছোটবেলায় একবার মেরে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল মান্নাদের তরমুজ চুরি করে এনেছিলুম বলে। মদ খেতুম, জোয়ান ছেলে, আমাকে না শাসিয়ে মাকে গালাগালি করত। মা ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গালাত। কিন্তু মা কিম্বা বাবা তো জানত না মদের নেশা কি জিনিস—একবার খেয়ে অনুশোচনা হলে ফের খেতে হবে। তবু বাবার কথা বলছি এই জন্যে যে, যে-লোকটার সমাজে এত সুনাম ছিল তার চরিত্র যদি এই হয়, তাহলে আমাদের তো কথাই নেই। আমাদের মতন হাঁড়িমারা হুলো বেড়ালদের চরিত্রের ছবি আঁকতে বেটা চিত্রগুপ্তই তো চিত্‌পাত। ভালটা কে শুনি? ওই বাইরে চকচকে। সবাই সাধু। শালা ইন্দ্র বাকুলী তার জীবনের প্রেমের গল্প বলছিল কাল। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে মেয়ের পীরিতে সে হাবুডুবু খেলে অথচ বলে, তবে ভাই 'খারাপ কাজটা' করিনি। 'পবিত্র ভালবাসা' ছিল!—পবিত্র ভালবাসা কি জিনিস অধম তা ভাল বোঝে না। ইন্দ্রকে যেই বললাম, তাহলে তাদের সঙ্গে তোর মা-ছেলের সম্পর্ক ছিল? সে বেটা ক্ষেপে গেল!'

হা হা করে হাসতে লাগল মানিক বাগ। চাবুস চাবুস করে পান চিবানো কালো দাঁত, রাঙা ময়লা ঝোলা ঠোঁট। খানিকটা ভুঁড়ি ঝুলছে পেটে। তলপেট বার করে ময়লা ধুতি-পরা সেঁটে-সাঁটে, বড় বড় গোঁফ। দাড়ি কামানো। মাথায় বিশৃঙ্খল চুলের গোছা। চোখদুটো কটা, রক্তাভ। মদের গন্ধ বার হচ্ছে মুখ থেকে ভকভক করে। ফরসা গোলগাল দোহারা চেহারা। ঘাম ঝরে পড়ছে এলো গা থেকে। মাথায় হাত বেঁধে বুদ্ধিদীপ্ত ট্যারচা চোখে একটা পায়ের ওপরে অন্য পা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানিক বাগ কথা শুনছিল প্রহ্লাদ প্রামাণিকের। তাকে নাকি সুদাম মান্না ধানের বীজতলা না দিয়ে সব ঝড়া-ধানের চারা দিয়েছিল—তিন বিঘে

জমি ঝড়া-ধান পড়ে বেবাক বরবাদ হয়ে গেছে।

মানিক বাগ বলে, 'তা তুমি কি রকম বাবুচাষী, ঝড়ার গাছও চেনো না? ফাঁকি তো সবাই দেবে, জগৎটাই তো ফাঁকিবাজির আখড়া। তোমার চোখ নেই। তুমি শালা ঠকলে, তোমার নামেই তো কেস দায়ের করা উচিত। কেননা বোকা লোক। সংসারে অচল। লোকে কুমোরবাড়ি হাঁড়ি কিনতে গিয়ে বাজিয়ে দেখে খানখান করে শব্দ উঠলেই তাকে রেখে দেয়। কেউ নেয় না। ফাটা হাঁড়ি। তুমি দেখেশুনে [illegible] দোকান থেকে [illegible] আবার গিয়ে বলো, [illegible] [illegible] টাকা। [illegible] লোক। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার [illegible]'

[illegible]

[illegible]

'হ্যাঁ। এই রকম করে কেন ঠকালে তাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি?'

হাসলে মানিক বাগ। [illegible] ডাক্তার সুধাংশুভূষণ পালরাজ মশায়ের ডিসপেনসারীর দোরগোড়াতে এসে বসল।

ডাক্তার বললেন, 'আসুন মানিকবাবু। আপনার জন্যে একটু চা বলব কি?'

মানিক বাগ বললে, 'বলুন। আমার কোনো কিছু খেতেই নিরামিষ নেই। অখাদ্য কুখাদ্য সুখাদ্য সব খাই। মরবার সময় 'প্রায়শ্চিত্ত' করলেই হবে।'

ডাক্তারটি রোগা লম্বাটে কালো লোক। টুকরো টুকরো কাগজে [illegible] গ্লোবিউল দিয়ে মুড়ে পুরিয়া পাকিয়ে নিয়ে আড় ঘোমটা দেওয়া মেয়েটার হাতে দিলেন। সবুজ শাড়ি-পরা মাঝ-বয়সী মেয়েটা গুরু নিতম্ব দোলাতে দোলাতে চলে গেল। বলে গেল, 'সন্ধ্যার সময় তুমি তাহলে একবার যাইও।'

মানিক বাগ বললে, 'মেয়েটি কে ডাক্তার?'

'আমার এক গ্রাম-সম্পর্কিত খুড়ী। বড় দুঃখিনী ওরা। কাকাটা পাগল হয়ে নানান রোগে জলে ডুবে মারা গেছে। খুড়ীর তিনটে বাচ্চা। এখন বিড়ি বেঁধে পেট চালায়। মেয়েটার বুকের দোষ আছে। ওষুধ খাচ্ছে মাসখানেক। সারছে না। টাকা-পয়সা দিতে পারে না।'

মানিক বাগ বললে, 'একটা কথা বলব ডাক্তার? আমি আবার একটু 'মুখফোঁড়'। টাকা পয়সা দেয় না, অথচ খুড়ীর বুকের ব্যথা সারাচ্ছেন ছ'মাস ধরে, এরকম সমাজ-সেবা না দরিদ্রনারায়ণের ওপরে ভক্তি কি না [illegible] নয়? আপনার এই পবিত্র খুড়ী-[illegible] নিয়ে কিন্তু সবাই ঠাট্টা করে, নিন্দে করে। [illegible] হলেও আপনি ভাল [illegible] চক্রবর্তীর [illegible] নিয়ে [illegible]। [illegible] হওয়া সত্ত্বেও—[illegible] জন্মাল না কেন [illegible] আপনি ছেলেমেয়ের ঘরের [illegible] মুখ দেখছেন। আর কেন?'

ডাক্তার সুধাংশু পালরাজ বললেন, '[illegible] একটা কথা শুনেছেন? নিজে [illegible] একমাত্র [illegible]। মানুষ তার বিচার করতে পারে না। [illegible] সঙ্গে প্রেম [illegible] কিন্তু আমিও কি এক-[illegible]?'

মানিক বাগ বললে, 'মানুষ পশু ছাড়া [illegible] না থাকে পশু [illegible] থাকে? আর [illegible] কঠিন আমি এক্ষুনি [illegible] করতে পারি। আপনি বাজি রাখুন। কেউ কেউ দেখেছে আপনি দোরের পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড়ের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মেয়েটির বুক দেখেন অনেকক্ষণ ধরে।'

'তা করি। বুকে ওঁর ব্যথা। ডাক্তারের এসব করার অধিকার আছে। রোগিণী কি আপনাদের কারো কাছে এ নিয়ে কোনো নালিশ বা অভিযোগ করেছে?'

'এই তো মুশকিল! ডাক্তার, এটা যে গ্রাম! যাক গে, সাবধান করে দিলাম, বন্ধু লোক। লোকজন আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। আমাকে বলেছে, ওই ভদ্দর-লোকটাকে আর বাড়িতে ঢুকিয়ে মেয়েদের 'চিকিচ্ছে' করাবেন না।'

ডাক্তার বললেন, 'সে আপনাদের খুশী। আমি তো কারো পায়ে ধরছি না, রোগী দেখাও, রোগী দেখাও বলে।'

মানিক বাগ রেগে উঠল। বললে, 'পায়ে ধরছেন না ঠিকই, কিন্তু মাথায় চাঁটি মারছেন। আমার বউকে আপনি দেখতে গেছিলেন, তার হল আঙ্গুল হাড়া—আপনি তাকে শুইয়ে পেটে ব্যথা কিনা, বুকে দরদ কিনা—মায় স্বামীর সঙ্গে বিছানার সুখ কেমন হয়—এসব জিগেস করেছেন। আপনি ভদ্দরলোক, আপনার সাচ্চা মনের খবর ভগবান জানেন! সমাজের আপনারা মাথা, এই তো আপনাদের চরিত্র। [illegible] রাগ করে বেরিয়ে চলে এল মানিক বাগ।

নিজেই মাথায় করে নারকোলের বস্তা, প্যাকাটির বোঝা বইতে লাগল একটা ছোঁড়ার সঙ্গে মানিক বাগ দুপুর পর্যন্ত।

মঙ্গলবারে সে সারা সপ্তাহের [illegible] নারকেল বস্তায় ভরে নিয়ে যাবে হাটে। প্যাকাটিগুলো সাজাবে তার পর বারোজ, পানগাছ ওঠার কাজে। রোজ বিকালে তার হাট-বাজারে কাঁচা আনাজ নিয়ে বাজরা মাথায় করে যাওয়া চাই-ই। রোদ ঝড় বাদল

যাই হোক। এখন বাস, লরি হওয়াতে অনেক সুবিধা হয়েছে। বাজরা এসে গাড়িতে তুলে দেয়। চারদিকে যতগুলি হাট আছে সব হাটেই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পাকা মর্তমান কলা, বেল, পুঁইশাক, মুলো, পালং, কাঁচকলা, পটল, পান, নারকেল, শাকালু, আখ, গুড়, পাটালী—শত রকমের জিনিস তার ক্ষেতে-ডাঙায় ফলন হয়। মানিক বাগ নামকরা চাষী। দোষ তার শুধু রোজ মদ খাবে। আর মনে যা ইচ্ছে ভাবনা এলেই মুখে তা ব্যক্ত করবে। পাঁচ ভাই সবাই আলাদা। সবার বউ ছেলে আছে। বুড়ো মা তার ভাগে আছে চিরকাল। চারটে গাই-গরু। দুটো হেলে গরু। বাপ-কেলে পেয়েছে দশ বিঘে ধানজমি আর পাঁচ বিঘে ডাঙা জমি। সাতটা পোনা পুকুর অবশ্য এখনো যৌথয় আছে।

দুপুরে বাড়িতে এসে মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরের পাকা দাওয়ায় ঘর্মাক্ত শরীরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। বড় বউ মন্দিরা এসে এক ঘটি জল মাথার কাছে রেখে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করে। আঁচলে দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয়। অন্য জায়েরা তা দেখে। এসব নিত্যকার ব্যাপার। বড় বউয়ের স্বামী-ভক্তি সংসারে নাকি বিরল। মানিক বাগ চিৎ হয়ে পড়ে থাকে চোখ বন্ধ করে হাত-পা ছড়িয়ে কতক্ষণ। ভুঁড়িও আছে পেটে। ছোট ঠাকুরপো বড় বৌদিকে ইসারা করে দেখায়, জিব বার করে দেখায় দাদাকে। অন্য বউরা সব হাসে।

পাখা দোখিয়ে ঠাকুরপোকে শাসায় মন্দিরা। ঘটির জল আঁচলে ঢেলে ভিজিয়ে নিয়ে মানিকের মুখ গা-হাত মুছিয়ে দিয়ে হাওয়া করে।

মানিক ইচ্ছে করেই খচরামি করে 'বড়-বউ গো, পরাণ যায়!' বলে হঠাৎ সে চিৎকার করে ওঠে মাতালের মতন, জড়ানো গলায়। আর হাত দিয়ে বড়বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে!

ভাদ্দর বউগুলো লুকিয়ে পড়ে ঘোমটার আড়ে জিব কাটে। এ মা! ছি ছি!

মন্দিরা বলে, 'দেখ কাণ্ড!' কোমরের কাপড়ও খুলে গেল। কি মিনসে তুমি গা! চান করে এস—ওঠ!'

'উঠব? কোথায় উঠব? কদ্দুরে উঠব? স্বর্গে? সেখানে তো বাবা আছে। বললে, মানকে রে, তুই এখনো মদ খাওয়া ছাড়লি নি বাবা? তখন পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলব, বাবামশায় গো মদ আমি খাইনি, মদ আমাকে খেয়েছে। বাবামশায় আমি স্বর্গে এলাম কি করে?' গানের সুরে টেনে টেনে গলার স্বর বিচিত্র করে এমন জোরে কথা বলতে লাগল মানিক বাগ—যেন বাড়ির সবাই শুনতে পায়।

'আমি তো অনেক পাপ করেছিলাম, চিত্রগুপ্ত তাহলে ফাঁকিবাজ হয়েছে, মানুষের নিত্য পাপের বোঝায় সে চাপা পড়বার ভয়ে পালিয়েছে কৈলাসে। বেটা দুর্যোধন পাপীর উরুভঙ্গ হল, আমার বাবা ধর্মের কথা বলে খড়, নারকোল উলু, পান কম দিত পুরোহিতে, দুধে জল দিত—তার কেন ইয়ে ভঙ্গও হল না। তাহলে আমরাও জন্মাতুম না। মদও খেতুম না। পাপ কাজও করতুম না! শালা, সব ভণ্ডামী! নট গিলিট বঁটির বাঁট, চুবড়ি আলু, কই মাছ!... বলো হরি হরিবলো হরি!' উঠে বসে মানিক বাগ। তার মাথার চুলে একপলা তিলের তেল ঘষে দেয় মন্দিরা। গামছা আর খড়ম দিতে বড়পুকুরে চান করতে চলে এল মানিক বাগ। জলে নেমে হঠাৎ খেয়াল হল তার কোমরের টাকার গেঁজিল খোলা হয়েছে তো! হাত বুলিয়ে দেখলে। না, কোমরে বাঁধা নেই। মন্দিরা তাহলে খুলে নিয়েছে। গেঁজিলের মধ্যে সকালে সাতশো টাকা নিয়ে গিয়েছিল সে। কত মাল কিনেছে হিসেব করলেই মিলে যাবে। ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে উঠে তবে হিসেব করবে। নইলে সাতে চয়ে পাঁচলো আর পাঁচ বাইশ আর সাতে একত্রিশ আর নয়ে একাশ। শালা, অনেক টাক 'সট' হল কেন?'

হাসলে মানিক বাগ। কানে আঙুল গুঁজে শতখানেক ডুব দিতে তবে শরীরটা 'শেতল' হল তার।

সাতটা তরকারী না হলে ভাত খায় না মানিক বাগ। ঘি, শাক, আলু, পিঁয়াজ, কাঁচা পেঁয়াজ, ডাল, আলু, বেগুন, কলমী শাক ভাজা, চিংড়ি মাছের ঝাল, পুঁইশাক দিয়ে চিংড়িমাছ রান্না, পোনামাছ দিয়ে বেগুন আলু রান্না, কলা ছেঁচকি, কুমড়ো ক্যাপসিকাম অম্বল, শেষকালে পাটালী দিয়ে দুধভাত খাওয়া। ভুরিভোজন চাই মানিকের। নইলে ভুঁড়ি হবে কেন তার? ঘরের আমন-ফসল, খাবে না কেন? চামরমণি, দুধেশ্বর, দাদখানি, রাঁধুনীপাগল, কাটারীভোগ, গোপাল-ভোগ, বাস-কামিনীর চাল থেকে তাদের ভাত হয় প্রতিদিন। মোটা চাল বীজ করে দেয়। মোটা চালের ভাত তার গলায় নাকি বাধে। বলে ঃ গাড়ল্লা!

শুধু ভাবনা তার মেয়েটা বড় হয়ে গেছে। বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে। দেখাশোনা চলছে। কোনো ছেলেই পছন্দ হচ্ছে না তার। মেয়েটা ক্লাস টেনে পড়ছে। পাস করার পর দেখা যাবে।

মন্দিরা এসে বসল স্বামীর পাশে। পা টিপতে টিপতে বললে, খুকীকে নিয়ে আজ বিকালে তার মামার বাড়ি যাব হাঁ-গা?'

'আমাকে কে দেখবে? আমি শালা মাতাল লোক, যদি একটা বউ এনে ফেলি?'

মন্দিরা স্বামীর মুখে মুখ চেপে ধরল। বললে, 'বলো না গো।'

'বলছি তো গো! আচ্ছা, জানো তো তুমি, আমি কতখানি মন্দিরাগত প্রাণ! আমি শালা জগতে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না। তোমার বাপকেও না! বয়েস হল, সেই কচি খুকীটির মতনই রইলে। এখনো পায়ে হাত দিয়ে বাবার বাড়ি যাবার জন্যে কাকুতি-মিনতি। তুমি জানো, আমি মাল খাই! বেঘোরে কোথায় শালা পড়ে থাকব এসে কে জানে! একরাত তোমাকে না পেলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়! আমাকে জব্দ করবার মতলব, না?'

'ওগো তোমার পায়ে ধরি!'

'আমিও তোমার পায়ে ধরি!'

'ছি ছি-ছি!' স্বামীর পায়ে মাথা ঠুকে গড় করে ক্ষুব্ধ মনে উঠে চলে গেল মন্দিরা। দাওয়ায় বসে সুপুরি কুঁচোতে কুঁচোতে অভিমানে দু'চোখের জল ঝরাতে লাগল নীরবে। মানিক বাগ তা দেখলে। কেন মন্দিরা যেতে চায়, কেন ওকে পীড়া-পীড়ি করছে, ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতেই সে নাক ডাকাতে শুরু করলে।

তারপর [illegible] ঘুম।

বেলা চারটের পর খুকী [illegible] থেকে এসে [illegible] খুলে বললে, 'বাবা, আমরা মামারবাড়ি যাব।'

মানিক বাগ উঠে বসে মেয়ের দিকে তাকিয়ে [illegible] কণ্ঠে [illegible] মতন বললে, 'কেন মা?'

'মা যাবে।'

'তোমার মা যাবে—কেন তুমি কি তা জানো?' মাথা নাড়লে খুকী। না।

'জানো না। জানলে [illegible] [illegible] মেয়েদের শুধু [illegible] [illegible] [illegible] নাকি [illegible] [illegible] [illegible] ভালো ভাই নিয়ে [illegible]!'

'যাও!' বলে [illegible] পালাল।

তারপর উঠে মুখে জল দিয়ে কোমরে গামছা আর টাকার গেঁজিল বেঁধে সেগুনের বাজরা মাথায় তুলে নিয়ে হাটে যাবার সময় বললে, 'বড়বউ, তবে যেও গো বাপের বাড়ি যেও। আমি আজ আর বাড়িতে ফিরব না। রায়পুরের বেউশোদের দু কোঁড় বেগুন দিয়ে পড়ে থাকবখন।'

মন্দিরা রেগে উঠে বললে, 'তাই থেকো।' তার রাগের কারণ খুকীকে আর নিয়ে যাওয়া যাবে না। সে পালিয়ে গেছে পাড়ার দিকে। সখা-সখীদের সঙ্গে কারাম খেলে-টেলে ফিরবে সেই মুখ-অ-ধারী সন্ধ্যায়।

গরুর খড় কুঁচোতে বসে স্বামীর কথা মনে পড়ল মন্দিরার—মন্দিরাকে এক রাত দেখতে না পেলে মহা বেচাল হয়ে পড়বে। ওই লোককে ছেড়ে কোথাও গিয়ে মন্দিরারও এক দণ্ড সুখ নেই।

—আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারতীয় ভাস্কর্য

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রখ্যাত শিল্প, রসিক গবেষক ডঃ চার্লস ফ্যাবরীর মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী রত্না মাথুর ফ্যাবরী বলেছেন যে, মৃত্যুর চার মাস আগে তিনি তাঁর শেষতম গ্রন্থ রচনা করেছেন, ভারতীয় শিল্পরীতি বিষয়ক তাঁর এই সর্বশেষ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ভারতীয় স্থাপত্য। এতদিন পরে তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। ফ্যাবরী ভারতীয় চিত্রশিল্প, নৃত্যরীতি, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি বিষয়ে একজন বিদগ্ধ রূপদক্ষ হিসাবে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

ডাঃ চার্লস ফ্যাবরী ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের অন্যতম, যাঁরা ভারতীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আগ্রহশীল এবং এই মহান দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য আবিষ্কারে সহায়ক' বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে এই সব মনীষী যেমন সহায়ক তেমনই আবার ভারতীয়দের পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারে এই পণ্ডিতকুলের অনন্যসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ডাঃ চার্লস ফ্যাবরী এই দিক থেকে এক মহান অবদান রেখে গেছেন। সুন্দর মনোহর ভাষায়, অনবদ্য ভঙ্গীতে রচিত ভারতের প্রাচীনতম কাল থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ক তথ্য সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটিকে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা বলা যায়।

বলা বাহুল্য এই বিষয়ে ইতিপূর্বে আরো অনেক গবেষক এবং শিল্প বিচারক বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই গবেষকগণ বিশেষ কোনো মূর্তিকে বিশেষ কোনো দেবতা বা সমকালীন কোন সম্রাট বা রাজপুরুষের মূর্তি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য নানাবিধ সম্ভাব্য ও অসম্ভব যুক্তি-তর্ক উত্থাপনা করে নিজস্ব ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ফ্যাবরী সেই জাতীয় পদ্ধতি পরিহার করেছেন, তাঁর কাছে একটি শিল্পবস্তুর শিল্পগত মূল্যই সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছে। একটি সৌন্দর্যময় বস্তু চিরন্তন আনন্দের উৎস–ফ্যাবরী এই নীতিতে বিশ্বাসী। গ্রীসের একটি পানপাত্র যেমন কাব্যিক প্রেরণা জাগায় তেমনই ভারতীয় ভাস্কর্যের শিল্পগত রূপ ফ্যাবরীকে আকুল করেছে। মূর্তি—তাঁর কাছে মূর্তি, সেই মূর্তিটি কার এবং কি কারণে তারই মূর্তি হওয়া সম্ভব এই সব প্রশ্ন তাঁকে আকুল করেনি। ভাস্কর্যের শিল্পগত প্রকাশ এবং তার শিল্পগত সৌন্দর্যই তাঁকে অধিকতর আনন্দ দিয়েছে। তিনি এই সব ভাস্কর্যের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্য রীতির ক্রমবিকাশের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। শিল্পগত বিচারকে ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মগত শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধায় তিনি চঞ্চল হননি। শিল্পকে তার শিল্পগত মূল্য ও মানানুসারে তিনি বিচার করেছেন।

গ্রন্থটি আকারে অতি ক্ষুদ্র। মাত্র চুরাশী পৃষ্ঠার গ্রন্থের মধ্যে বাহান্ন পৃষ্ঠায় ফটো-প্লেট আছে—তথাপি প্রকাশ পদ্ধতি এমনই অভিনব যে চোখের খোরাক হিসাবে এই গ্রন্থ এক অপরূপ আকর্ষণের বস্তু।

ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ে অনেক প্রচলিত ধারণাকে তিনি নস্যাৎ করেছেন। এই জাতীয় একটি ধারণা হল যে, ভারতীয় ভাস্কর্য মূলত এবং মুখ্যত ধর্মীয় প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। ডাঃ ফ্যাবরীর মতে তা নয়, এবং এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভারতীয় ভাস্কর্য সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক প্রভাব মুক্ত। তিনি বলেছেন—

> "The Greeks Pearnt the art of Sculpture from the Egyptians, the Assyrians and the Minoan Cretans The Romans learnt it from the Greeks and the Sculpture of the Christians of Byzantium was a development of that of Rome".

কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর্য এমনই এক বিচিত্র ধারায় গড়ে উঠেছে যে, তার মধ্যে এতটুকু বৈদেশিক ছাপ নেই।

প্রথম যুগের পারসিক ভাস্করবৃন্দ বা যে সব পাথর খোদাইকারকদের সম্রাট অশোক আমদানি করেছিলেন তাদের কর্মের মধ্যে নিজস্ব পদ্ধতি এবং নিজস্ব চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায় বটে তবে সেই হেলেনীয় ভঙ্গীর অনুপ্রবেশ সাময়িক মাত্র। এই সব প্রভাব ডাঃ ফ্যাবরীর মতে অতি অল্পকালই টিঁকে ছিল। ভারতীয় ভাস্করগণ যে নিজস্ব ধারা গড়ে তুললেন তা নয়, বর্মা, বালিদ্বীপ, যবদ্বীপ, কম্বোদিয়া, শ্যামদেশ এমন কি চৈনিক ভাস্কর্যের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রভাব প্রবাহিত হল। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও স্মরণীয়। তিনি যখন বালিদ্বীপ, যবদ্বীপ, কম্বোদিয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করেছিলেন তখন সেই সব অঞ্চলের ভাস্কর্য এবং মন্দির গাত্রের কারুকার্য সম্পর্কে অনুরূপ উক্তিই করেছিলেন।

ডাঃ ফ্যাবরী ভারতীয় ভাস্করদের সম্পর্কে একটি চমৎকার উক্তি করেছেন,' তিনি বলেছেন—

> "The Indian Sculptor was very much interested in life around

him especially the joys and delights of daily life".

এছাড়া নারীদেহের অপরূপ রূপলাবণ্যও ভারতীয় ভাস্করদের মনে দোলা দিয়েছে, তাই তাঁরা তাঁদের ভাস্কর্যের মাধ্যমে দেখিয়েছেন—

"ever-growing skill and delight in the female form".

এমন কি এই সব নারীদেহের ভাস্কর্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য বর্তমান তার তুলনা ক্লাসিকাল গ্রীক ভাস্কর্যেও অনুপস্থিত। বিশেষত উত্তর প্রদেশের গারহওয়া অঞ্চলের মন্দির গাত্রে তিনি এই জাতীয় ভাস্কর্যের সন্ধান পেয়েছেন।

গান্ধার শিল্পে হেলেনীয় প্রভাব আছে এই উক্তির খণ্ডনে তিনি বলেছেন যে এই প্রভাব—

"Superficial and only of passing importance in the history of Indian Art".

ডাঃ ফ্যাবরী তাঁর নিজস্ব ধারণাকে যুক্তি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করে ভারতীয় ক্লাসিকাল ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে বলেছেন –

"It was a stylistic development that grew by its own inner logic — from earlier indigenous beginnings. —"

এবং এই কারণে স্টাইল বা ভাস্কর্য আঙ্গিকের দিক থেকে সমগ্র ভারত এক অখণ্ড শিল্প স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। ভারতীয় শিল্প ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সম্পূর্ণভাবে মৌলিক।

ডাঃ ফ্যাবরীর মতবাদ নিয়ে পণ্ডিতগণ হয়ত তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল জাতীয় সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হবেন, কিন্তু ডাঃ ফ্যাবরীর যুক্তি হৃদয়গ্রাহ্য এবং বুদ্ধিগত বিচারে তাঁর মন্তব্যই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করার যথেষ্ট হেতু বর্তমান।

ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ে অধিকারী অনেক দেশী এবং বিদেশী লেখকের মতে ভারতীয় ভাস্কর্যের উদ্ভব গান্ধার ভাস্কর্যের কাল থেকে। গান্ধার ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়, এবং এই গান্ধার শিল্পই ভারতীয় ভাস্কর্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। গান্ধার ভাস্কর্যের মধ্যে আছে গ্রীক-বৌদ্ধ প্রভাব এবং এই প্রভাব গ্রীকদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সংযোগের ফল বলে ডাঃ ফ্যাবরী মনে করেন না। তিনি মনে করেন ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হেলেনীয় এশিয়গণের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁদের দ্বারাই হেলেনীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়া সম্ভব। ডাঃ ফ্যাবরী বলেছেন যেসব ভাস্কর্যের আকৃতি কিঞ্চিৎ গ্রীক-ঘেঁষা সেগুলিকে প্রাচীনতম এই সিদ্ধান্ত করার একটা প্রবণতা দেখা যায়, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বরং এই মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের হওয়াই সম্ভব। পঞ্চম শতাব্দীতে হেলেনীয় আদর্শ ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে মিশে এক দেহে হল লীন। আর ততদিনে পাশ্চাত্য জগতে গ্রীক শিল্পাদর্শ অচল হয়ে গেছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই ভারতীয় ভাস্কর্যে একটা নূতন রীতি প্রবর্তনের লক্ষণ দেখা যায়, গান্ধার রীতি পরিহার করে ভারতীয় ভাস্করবৃন্দ একটা নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তাঁরা এই বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভাস্করগণ মানবিক মূর্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গাছ, লতা, পাতা, জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতি রচনায় অধিকতর মনোযোগ দিলেন, অলংকরণের প্রতি অত্যধিক আগ্রহের অর্থ শিল্প থেকে পিছন ফিরে কারুকার্যে মনোনিবেশ করা। শিল্পী ও কারুকৃৎ এক বস্তু নয়। ভাস্কর তাঁর মৌলিক চিন্তার রূপায়ণে কঠিন পাথর কেটে প্রতিমা নির্মাণ করেন কিন্তু যিনি কারুকৃৎ তাঁর চিন্তা শিল্প বস্তুকে প্রাণবন্ত করা নয়, অলংকরণের খুঁটিনাটির প্রতিই তাঁর অধিক অনুরাগ। এর ফলে শিল্পীসত্তার লোপ ঘটে।

ডাঃ চার্লস ফ্যাবরীর এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভ নতুন দৃষ্টিকোণে ভারতীয় ভাস্কর্যের বিচারে সহায়ক হবে। আর্ট প্লেটগুলি পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে অসমর্থ। প্লেটগুলি সুমুদ্রিত এবং সুনির্বাচিত হলে ভালো হত।

—অভয়ংকর

DISCOVERING INDIAN SCULPTURE

By Dr. Charles L. Fabri; published by Messrs Affiliated East-West Press (P) Ltd, New Delhi. —price rupees twenty five only.

সাহিত্যের খবর

শান্তিনিকেতনে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনাঃ গত ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিশ্বভারতীর উদ্যোগে একটি সাহিত্য সভার ব্যবস্থা হয় চীনা ভবনে। আলোচনার বিষয়ঃ 'আধুনিকতা ও একালের বাংলা সাহিত্য'। কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত—সভার প্রধান বক্তা এবারের আকাদমি পুরস্কৃত কবি মণীন্দ্র রায়।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রায় বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ও যন্ত্রযুগের প্রসারের ফলে বাঙালীর জীবনে নেমে আসে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ। আজকের সাহিত্যে চলছে সেই বোধেরই অনুবর্তন। প্রধান ধারাটি উদ্দেশ্যহীনতায় বিষাদময়। তার পাশাপাশি আছে আরেকটা ধারা। আমার ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে এই দ্বিতীয় ধারাটিই প্রধান হয়ে উঠবে। সাহিত্যিকরা দায়িত্বশীল হয়ে উঠবেন পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে। তাঁরা নিজের সঙ্গে সমাজের কথাও বলবেন। সেদিনও মানুষের জীবনে থাকবে অন্তর্দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থাকবে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের—সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির। তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যিকরা গড়ে তুলবেন প্রগতিশীল মানুষের নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।'

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ উপেন্দ্রনাথ দাস, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দেন মণীন্দ্র রায়। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ ও বক্তাদের ধন্যবাদ জানান অনুপম গুপ্ত।

গুজরাটি কবিতার অনুবাদ।। প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তেমন স্বচ্ছ নয়। অথচ আজকের আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই অপরিচয়ের বন্ধন ছিন্ন করা। এ ব্যাপারে 'বেঙ্গলী লিটারেচার' পত্রিকার পরিচালক অগ্রণী হয়েছেন জেনে খুশি হলাম। 'ভারতীয় কবিতা' নামে ১৬ খণ্ডে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার আধুনিক কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশের তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথম খণ্ডটি হচ্ছে আধুনিক গুজরাটি কবিতার। এর কাজ শুরু হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এই খণ্ডটি সম্পাদনা করছেন শ্রীশিউকুমার যোশি, শ্রীমতী জ্যোতি ভেলোরিয়া, শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী ও শ্রীআশিস সান্যাল। প্রচেষ্টাটি সার্থক হলে তাঁরা যে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

একটি আলোচনা সভা।। গত ১৫ অগাস্ট বোলপুরে "বর্তমান অশান্ত সমাজে সাহিত্যিকের ভূমিকা" বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ। মূল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী মনোজ বসু, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তরুণ সান্যাল ও আরো কয়েকজন। আলোচনা সভাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী।। কলকাতা পুলিশ সম্প্রতি কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এক পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনের আয়োজন করেন। এই পাণ্ডুলিপিগুলির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ ১৮৯১ - ১৯৪৭ এর মধ্যবর্তী সময়ে যে সব নাটক অভিনয়ের অনুমতি চেয়ে পুলিশের দপ্তরে জমা পড়েছিল, তার থেকে কয়েকটি নির্বাচন করে এখানে প্রদর্শিত হয়। যাঁদের নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, হেমেন্দ্রনাথ রায়, অমৃতলাল বসু, [illegible] দে, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলিকে যথার্থ পাণ্ডুলিপি বলা যায় কিনা? যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'দেবীচৌধুরানী'র মহেন্দ্র গুপ্ত কৃত নাট্যরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। একে বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি বলা যায় কিনা? আবার প্রদর্শিত বইগুলো কোন কোন গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা।। বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ বিদ্যাসাগরের সার্ধ জন্মশতবার্ষিকী এবং চিত্তরঞ্জনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধের বিষয় "দেশপ্রেমিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" ও "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর"। ৮০০ শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ দুটি লিখতে হবে। সাধারণের জন্য ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ "সমকালীন রাজনীতি ও দেশবন্ধুর আদর্শ" ও "সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর" বিষয় দুটি নির্ধারিত হয়েছে। কবিতা "দেশবন্ধু" বা "বিদ্যাসাগরের" উপর লিখতে হবে ৩০ লাইনের মধ্যে। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১ অগাস্ট। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদ, কালীতলা, বাঁকুড়া।

একটি অসমীয়া কাব্যগ্রন্থ।। একালের তরুণ অসমীয়া কবিদের মধ্যে শ্রীপ্রেশমন বড়ুয়া একটি বিশিষ্ট নাম। অতি সম্প্রতি তাঁর "সোনালী সংগম" নামে একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে কবির বিশিষ্ট অনুভূতি এবং প্রগতিশীল মনোভাব লক্ষণীয়। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে, 'লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রুশ-ভারত সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে'। এই বইয়ের কয়েকটি কবিতাই লেনিনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবি লিখেছেন ঃ—

"লেনিন, লেনিন,
বঙ্গালা ভূমি
মেদিনী কঁপোরা বীন!
মেহনতী ভূমি
জ্বলে উমি উমি
খোজে খোজে তপ্ত চিন।"

উনিশ শতকের আমেরিকান চিত্রকলা।। উনিশ শতকের আমেরিকান চিত্রকলার উপর একটি সুন্দর বই প্রকাশ করেছেন প্রেইজার পাবলিশার্স। বইটি লিখেছেন প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক বারবারা নোভাক। বইটিতে আলোচনা ছাড়াও রয়েছে উনিশ শতকের বিভিন্ন চিত্রকলার নিদর্শন। ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন যে, আলোচনার জন্য তিনি কেবল সেই সব চিত্রশিল্পীদের নির্বাচন করেছেন, যাঁরা তাঁর শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে পেরেছে। যাই হোক, বইটিতে তিনি উনিশ শতকের চিত্রকলার প্রাসঙ্গিক সমস্ত দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁদের কাছে বইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হবে।

নতুন বই

উপনিষৎ প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)—অনির্বাণ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ধমান। দাম পাঁচ টাকা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংস্কৃত প্রসার গ্রন্থমালায় ইতিপূর্বে অনির্বাণের উপনিষৎ প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। আলোচনা করেছিলেন ঈশোপনিষদ। বর্তমান খণ্ডে ঐতরেয়োপনিষৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বেদের অন্তভাগ উপনিষদ। সেই উপনিষদের আলোচনা বেদের আলোকে ঘটলেই তার যথার্থ রহস্য উপলব্ধি সম্ভব। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদ। উপনিষৎ তারই পরিপূরক। অনির্বাণ তাঁর আলোচনায় সেই যোগসূত্রটিই স্থাপিত করেছেন। ঐতরেয় উপনিষদের আলোচনায় আরণ্যকের গভীর রহস্যে যে আলোকপাত করেছেন, তা ছিল অজ্ঞাত। জগৎসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টির বিস্ময়কর রহস্য উদঘাটন করেছেন অনির্বাণ। তিনি লিখেছেনঃ বৈদিক ভাবনায় কর্ম ও জ্ঞানে কোনও বিরোধ নাই। ব্রাহ্মণে যে কর্ম প্রপঞ্চিত হয়েছে আমরা তার রহস্যাখ্যান পাই আরণ্যক আর তাদৃক বেদান্ত উপনিষদে। উপনিষদের সঙ্গে আরণ্যকের যোগ তাই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ঋগ্বেদের ঐতরেয়। তার সাধনার পারিভাষিক নাম হল উকথ—যাকে বলতে পারি বাকের সাধনা। এমনি করে বেদান্তরে অন্যান্য সাধন পদ্ধতি হল উদ্গীথ, যজথ এবং বিদথ।

ঋগবেদের বেলায়, উকথ কি করে সাধককে আত্মজ্ঞানে তথা ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছে দেয়, তা বোঝা যায় আরণ্যকের সঙ্গে উপনিষদকে মিলিয়ে পড়লে পর। বইখানি পড়বার পর উপলব্ধি হয় বেদের কত বড় সুপণ্ডিত অনির্বাণ। উপনিষদের আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি যেন নতুন করে বেদবিদ্যায় প্রাণ সঞ্চার করলেন। ভাষা অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং সাবলীল। এই ধরণের দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় সাধারণত রচনারীতির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। আশা করব, অনির্বাণ উপনিষৎ প্রসঙ্গ আলোচনা সম্পূর্ণ করবেন।

বঙ্কিম অভিধান—অশোক কুণ্ডু। ভারতী বুক স্টল। রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম পনের টাকা।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধরনের কোষ-গ্রন্থ বা অভিধানের অভাব যে কত বেশী, তা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন। আজও পর্যন্ত অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, বিষয়ের কোন অভিধান প্রকাশিত হোল না। দীর্ঘকাল আগে সুপ্রকাশ রায়ের পরিভাষা অভিধান বেরোয়। এখন পাওয়া যায় না। সুধীরচন্দ্র সরকার জীবনী অভিধান ও পৌরাণিক অভিধান রচনা করেন। সমার্থবোধক শব্দের অভিধান লেখেন প্রাণতোষ ঘটক। দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বিজ্ঞান অভিধান একটি বড় অভাব মিটিয়েছে। এগুলি প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে প্রশংসাযোগ্য হলেও, সম্পূর্ণ অভিধান নয়। লেখক সম্বন্ধে অভিধান রচনার প্রচলন অতি সাম্প্রতিক। সৌমেন্দ্রনাথ বসুর রবীন্দ্র অভিধান কয়েক খণ্ড বেরিয়েছে। এই ধরনের অভিধানে থাকে লেখকের জীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং সাহিত্যের খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোকপাত। নিরপেক্ষভাবে বাঁচতে হওয়ার আলোচনার সূত্র ধরে নিজস্ব দৃষ্টিতে পূর্ণ সৃষ্টি ব্যাখ্যা সম্ভব। সম্প্রতি তরুণ গবেষক অধ্যাপক অশোক কুণ্ডুর 'বঙ্কিম অভিধান' বেরিয়েছে।

বঙ্কিম গবেষণা, বঙ্কিম সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধীয় তথ্য বইখানির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নেই। বর্তমান প্রথম খণ্ডে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের আভিধানিক আলোচনা। বঙ্কিম সম্বন্ধে গবেষণায় বইখানি অপরিহার্য। বিষয় অনুযায়ী তথ্যগুলি আলোচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও জীবনী সংক্রান্ত তথ্য—এ তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তির স্থানের বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বর্ণানুক্রমে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থালোচনায় রচনা কাল, প্রকাশ কাল, প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র সংস্করণভেদ, সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও অন্যান্য আলোচনা স্থান পেয়েছে। বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা বিস্তৃত অধ্যায় যুক্ত। এই জাতীয় বই বাংলায় নেই। প্রাথমিক প্রয়াস হলেও শ্রীকুণ্ডু অনেকখানি ত্রুটিমুক্ত থাকতে পেরেছেন। লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয়। পরে প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় খণ্ড। এই দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।

রঙ্গিনী দুহিনা : (উপন্যাস) মানস গুহ। করুণা প্রকাশনী : দাম দশ টাকা।

বাংলা দেশের হালফিলের শহর জীবন, নাগরিক জীবনযন্ত্রণাই যখন সাহিত্যের একমাত্র বিষয় হয়ে উঠছে, তখন মানস গুহের 'রঙ্গিনী দুহিনা' - আমাদের স্বাদ বদলের সুযোগ দেবে। 'রঙ্গিনী দুহিনা' - খাঁটি জীবনধর্মী উপন্যাস : যার পটভূমি প্রকৃতি আর মানুষ, এবং সেই জীবন যা সভ্যতার ছোঁয়া বাঁচাতে চেষ্টা করেও এক সময় আত্মদান করে অথচ তার রিক্ত হাহাকারটুকুও বাতাস ভারি করে রাখে।

সুতরাং বলা বাহুল্য লেখক শ্রীগুহ একটি সংঘাতময় ক্লাসিক বিষয় নিয়ে উপন্যাসের চালচিত্র রচনা করেছেন। লেখক আমাদের নিয়ে গিয়েছেন অরণ্য-আদিম জীবনের গভীরে। লালকুঁয়োর বাওয়া পুরুষ আর বাওয়া রমণীর যে জীবন আরণ্যক বিশ্বাস আর উপলব্ধির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রঙ্গিনী দুহিনার মতই যে বুনো জীবন আপনাতে আপনি মত্ত ছিল হঠাৎ একদিন সেখানে দেখা দিল কল-জানোয়ার'। (বুয়েনের ভাষায়) এল সভ্যতা। বাঁধ তৈরির মানুষ। যন্ত্র আর লালজীয়ুর সিং, মিশিরনাথ, ম্যানেজার সন্দীপ রায়ের মত সব মানুষ। যারা এই প্রকৃতি-লালিত জীবনকে কিনে নেয়, নিতে চায় কাঞ্চন মূল্যে আর সদারি ডমরু, প্রচনী বাওয়া জীবন ধর্মের প্রতীক, একাই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয় সে চোখের সামনে দেখতে পায় গাঁ লালকুঁয়োয় ভোল পাল্টাতে থাকে, রোপওয়েতে বাকেট ভর্তি পাথর চলতে থাকে বেড়-বাঁধের নোকরী নিতে দলে দলে সবাই মিশিরনাথের কাছে নাম লেখায় অসহায় ডমরুর আর্তনাদ মথিত করে বাতাস : ধরমের ডর নাই তুয়াদির পাপের ডর নাই? টাকার লোভে বেটা হয়্যা মার উপর অত্যাচার করবি গ। কিন্তু বাঁধ এগিয়ে আসে ডমরু হেরে যায়।

কিন্তু লেখক একই সঙ্গে জীবনের বহু বিচিত্র রূপও আমাদের উপহার দিয়েছেন। মেয়ে-সাপ্লায়ার হারুলোর ফি মেয়ের জন্য যার এক বোতল পাউরা আর পাঁচ টাকা প্রাপ্য, নারী-বিলাসী ম্যানেজার সন্দীপ রায় সুধনা, গর্দিন বরেন রঙ্গিণী রঙলা জীবনরসের সন্ধানী পঞ্চানন যে গান গায় নদীর জল হে জীবন এমন কী বাওয়া সমাজের ধর্মবিশ্বাস, বিবাহ সমাজনীতি সব তুলে ধরেছেন। আর সবার উপরে লাছলী আর হাসনার আরণ্যক প্রেম, লাছলী বাওয়া যুবতী যে ভালবাসার টানে সতীত্ব দান করতে পর্যন্ত পিছপা নয়—সব যেন আদিম জীবনেরই সামগ্রিক ছবি। লাছলী যেন বইয়ের শেষে দুহিনারই বিকল্প। লেখকের পরিশ্রমকে সাধুবাদ জানাই।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সুপর্ণ (আষাঢ় ১৩৭৭)—সম্পাদিকা ঐন্দ্রিলা চৌধুরী। ১৬২।৪ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা—৪৫। পঞ্চাশ পয়সা।

'শুভেন্দু' লেখক গোষ্ঠীর মুখপত্র এই পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আটত্রিশ। লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, অসিত পাল, রঘুনাথ সিংহ, ঐন্দ্রিলা চৌধুরী, অসিতকুমার ভট্টাচার্য, নীতা সেন, অপর্ণা দেবী বাগচী ও নচিকেতা। ভেতরের লেখায় তেমন বানান-বিপ্লব না করলেও সম্পাদিকা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সূচীপত্রের বানানে। যেমন কবিতা হয়েছে 'কোবিতা' সূচীপত্র হয়েছে 'সূচীপত্তর' ইত্যাদি।

সাহিত্য সেতু (চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক শুভেন্দু সেনগুপ্ত। বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডু গলি, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রিকাটির দাম সস্তা। ছাপা ভাল। চরিত্রের দিক থেকে পাঁচমিশেলী। অর্থাৎ গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, নিয়মিত বিভাগ, ছোটদের আসর প্রভৃতি সবই আছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন গোলক সাঁতরা, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন সুর, বাসন্তী দেবনাথ, শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, কমারেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সলিল মিত্র, রূপালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ভাল লাগবে।

সপ্তর্ষি সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৭]—ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়।। কাঁচরাপাড়া, ২৪-পরগণা।। এক টাকা।।

প্রচুর বিজ্ঞাপনসহ শোভন প্রচ্ছদে বেরিয়েছে সপ্তর্ষির এ সংখ্যাটি। 'চিন্তানায়ক বেদুদ' সম্পর্কে লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'পদ-গদ্যের নির্বিরোধ সাধন ও বাঙালি লেখক' নিঃসন্দেহে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সম্রাট সেনের উপন্যাস 'নিহত গোলাপ' মন্দ নয়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন দিব্যেন্দু পালিত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং আরো দু'একজন।

রাণার [জুন-আগস্ট ১৯৭০]—সম্পাদক মিলন দাস।। লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণ সমিতি ১৪বি, বড স্ট্রীট, কলকাতা ১৯। দাম পঁচিশ পয়সা।।

এই মাগ্‌গীগণ্ডার বাজারে দু ফর্মার কাগজ মাত্র পঁচিশ পয়সায় ভাবাই যায় না। বেশ সস্তা। প্রচ্ছদ ভালো। এ সংখ্যায় লিখেছেন শিবশম্ভু পাল, রত্নেশ্বর হাজরা, অলোককুমার ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা সিংহ, প্রত্যুষ-প্রসূন ঘোষ, মায়া বসু, ইন্দ্রজিৎ বসু, বেদুইন, অর্চনা মিত্র, মিলন দাস, দিলীপ পাল ও অ. সি।

ছোটগল্প (৪) আইরিশ
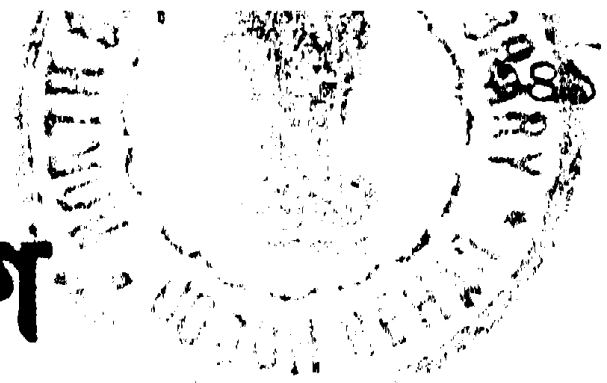
বিজেতা ইংরাজ এবং তার সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের নাগপাশের বাইরে ছোট্ট দেশ আয়ারল্যাণ্ড যে তার সাহিত্যে দেশজ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে পেরেছে, এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আয়ারল্যাণ্ডেরই দুজন সাহিত্যিক বার্ণার্ড শ' এবং ইয়েটস পরম যোগ্যতায় নোবেল পুরস্কারের অধিকারী হন।

বিশ্বের সেরা গল্পের সংগ্রহে এমন কোন সম্পাদক আছেন যিনি কোন অজুহাতে জেমস জয়েসকে বাদ দিতে পারেন!

পারেন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার দিগ্বিজয়ী আইরিশ সাহিত্যিকদের অস্বীকার করতে—সিনজে, বেকেট, এলিজাবেথ বোয়েন কিংবা গোল্ডস্মিথ বা অস্কার ওইল্ডকে!

সকল দেশের ছোটগল্পের মতোই লোকগাথা আইরিশ ছোটগল্পের উৎস। এবং লোকগাথার বৈশিষ্ট্যকে আজও সচেতন পাঠক এদের ছোটগল্পে খুঁজে পাবেন। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের প্রবণতায়। অতীন্দ্রিয়তা, উদ্ভট রস, কথকতার ভঙ্গি এবং সংলাপের প্রতি ঝোঁক দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

আইরিশদের নিজস্ব একটি ভাষাও আছে—গেলিক ভাষা, লাতিনের পর এটি একটি য়ুরোপীয় অগ্রজ ভাষা যা নিজস্ব সাহিত্য গড়ে তুলেছে। খৃস্টানধর্ম গ্রহণের সঙ্গে তারা রোমান লিপি আয়ত্ত করে লেখ্য-সাহিত্যের জন্ম সম্ভব করেছে। লাতিন এবং গ্রীক সাহিত্যের অবদান গেলিক ভাষার উপর কম নয়!

আগেই বলা হয়েছে মৌখিক কাহিনী-কথনের রীতির সঙ্গে আইরিশ লেখ্য-গল্পের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

বড় গল্প এবং ছোটগল্প সমান্তরালে চলেছে। বড় গল্পে উপকথা এবং পরীর গল্প যেমন দখল করে ছিল ছোটগল্পে তেমন এল বাস্তবতা অতীন্দ্রিয়তার ছিটে-ফোঁটা সমেত।

আধুনিক ছোটগল্পকাররা অবশ্য অতীন্দ্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন : খাঁটি আইরিশ মানুষকে চাই। কিন্তু প্রাচীন আঙ্গিকের আঁচল সহজে ছাড়তে চাইলেন না। ফ্রাঙ্ক ও' কুনার বললেন : ছোটগল্পে কথক মানুষের জ্যান্ত কণ্ঠস্বর চাই। অর্থাৎ কথকতার ভঙ্গিতে তৃতীয় ব্যক্তি গল্প বর্ণনা করে যাক।

জেমস জয়েস এই কথকতার রীতিকে ভঙ্গ করে নিজস্ব একটি স্টাইল আমদানি করলেন। যদিও তিনি ঐতিহ্যকে পুরোপুরির বর্জন করতে পারেন নি।

সংক্ষেপে কথকতার ভঙ্গি, সংলাপ বহুলতা, নাটকীয়তা আইরিশ ছোটগল্পের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

পুরনো যুগের গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উইলিয়াম কারলেটন (১৭৯৪—১৮৬৯), জর্জ মুর (১৮৫২ -- ১৯৩৩), সমারভিল এবং মারটিন রস (১৮৮৫—১৯৪৯) এবং (১৮৬২—১৯১৫), লিন ডয়েল (১৮৭৩ — ১৯৬১), ডানিয়েল করকারি (১৮৭৮—), সিউমাস ও' কেলি (১৮৮১—১৯১৮), পেডরেইক ও কনাইর (১৮৮১ — ১৯২৮), জেমস স্টিফেন্স (১৮৮২—১৯৫০) প্রমুখ।

আমরা এখানে পুরনো নতুন নির্বিশেষে কয়েকজন গল্পকারদের সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমে নাম করতে হয় জেমস জয়েস-এর। ১৮৮২-তে ডাবলিনে জন্ম, মৃত্যু ১৯৪১-এ। 'ডাবলিনার্স' জয়েসের একমাত্র গল্পসংগ্রহ। গ্রন্থে পনেরোটি গল্প আছে। 'মৃত্যু' গল্পটি সবিশেষ আদৃত।

লিয়াম ও' ফ্লার্টির জন্ম ১৮৯৬ আরান দ্বীপে। নানারকম জীবিকার পর তিনি পাকাপাকি আয়ারল্যাণ্ডের বাসিন্দা। ১৯২২ থেকে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। ১৯৫৩-এ তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ গেলিক ভাষায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ইংরেজি তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'ডিসায়ার'। 'লাভারস' এবং 'ব্লা' তাঁর বিখ্যাত দুটি গল্প।

ফ্রাঙ্ক ও' কুনারের জন্ম কর্ক শহরে ১৯০৯-এ। মা গৃহস্থের বাড়িতে দাসীবাঁদী করেছেন। বাবা মদ্যাশক্ত শ্রমিক। পড়াশোনা করতে পারেন নি। প্রতিযোগিতায় তুর্গেনেভের উপর নিবন্ধ লিখে পুরস্কৃত হন। পরবর্তীকালে তিনি ডাবলিনে লাইব্রেরীয়ানের পদে ব্রতী হন। থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ তাঁকে অ্যাবে থিয়েটারের ডিরেক্টার পর্যন্ত করে। অবশ্য ১৯৩৯-এ তিনি সে-পদ পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গেসটস অব দি নেশন' ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গল্প-গ্রন্থের মধ্যে 'স্টোরিস অব ফ্রাঙ্ক ও' কুনার' ১৯৫২-এ এবং 'মোর স্টোরিস' ১৯৫৪-এ প্রকাশিত। আইরিশ সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি উচ্চ প্রতিষ্ঠিত।

সিয়ান ও' ফাওলেন-এর জন্মও কর্কে, ১৯০০-তে। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডে অধ্যাপনার পর তিনি সম্পূর্ণ লেখার পেশা বেছে নেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মিড সামার ম্যাডনেস' ১৯৩২-এ প্রকাশিত। 'ফাইনেস্ট স্টোরিস অব সিয়ান ও' ফাওলেন' ১৯৫৭-এ প্রকাশিত। 'আই রিমেববার! আই রিমেববার!' ১৯৬১-এ প্রকাশিত।

আইরিশ সংস্কৃতির জগতে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্ত্রী এলিনও একজন লেখিকা, তনয়া পর্যন্ত 'দি নিউ ইয়রকার' পত্রিকায় লেখা শুরু করেছেন। বিদেশী শরণাগতদের প্রতি তাঁর দরদ অপরিসীম।

এলিজাবেথ বোয়েনের জন্ম আয়ারল্যাণ্ডে। ১৯২৩-এ বি বি সি'র অ্যালান ক্যামেরনকে বিবাহ করেন। 'দি ক্যাট জাম্পস' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

সাম্প্রতিক কালের গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন মাইকেল ম্যাকলাভার্টি (জন্ম ১৯০৭), ব্রিয়েন ম্যাকমাহোন (জন্ম ১৯০৯), মেরী লেভিন (জন্ম ১৯১২), জেমস প্লাংকেট (জন্ম ১৯২০), ব্রিয়েন ফ্রেইল (জন্ম ১৯২৯) প্রমুখ।

ম্যাকলাভার্টির প্রথম ছোটগল্প ১৯৩৩-এ প্রকাশিত। 'দি গেম কক অ্যাণ্ড আদার স্টোরিস' গল্পগ্রন্থটি ১৯৪৮-এ প্রকাশিত। তাঁর গল্পগুলি অত্যন্ত উঁচু মানের। 'নিকস উইকস অন অ্যাণ্ড টু অ্যাশোর' এবং 'পিজিয়নস' তাঁর সেরা গল্প-গুলির মধ্যে দুটি।

ব্রিয়েন ম্যাকমাহোনের প্রচুর গল্প সিয়ান ও' ফাওলেনের পত্রিকা 'দি বেল' বেরিয়েছে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'দি লায়ন-টেমার অ্যাণ্ড আদার স্টোরিস' বেরিয়েছে ১৯৪৮-এ। তিন মাসের মধ্যে গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ লেখকের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তাই সূচিত করে। তাঁর অন্য গল্পগ্রন্থ 'রেড পেটিকোট' ১৯৫৫-এ প্রকাশিত।

লেখিকা লেভিন ডাবলিন ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন। এম-এ-তে তাঁর থিসিস ছিল জেন অাস্টেন, ভার্জিনিয়া উলফের ওপর তাঁর পি-এইচ-ডি। এই সময়েই তাঁর প্রথম গল্পের জন্ম। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'টেলস ফ্রম বেকটিভ ব্রিজ' ১৯৪২-এ, 'সিলেক্টেড স্টোরিস' ১৯৫৯-এ 'দি গ্রেট ওয়েভ অ্যাণ্ড আদার স্টোরিস' ১৯৬১-এ প্রকাশিত।

জেমস প্লাংকেট যন্ত্রসঙ্গীতে, বিশেষ করে, ভায়োলিনে কৃতিত্ব অর্জন করেন। আয়ারল্যাণ্ডের ওয়ার্কার্স য়ুনিয়নের কর্মী হন ১৯৪৫-এ। ১৯৫৫-এ তিনি সোভিয়েট পরিদর্শন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি আইরিশ কৌতুক ম্যাগাজিন 'ব্যারাব ভ্যারাইটি'-তে লিখতে শুরু করেন। পরে 'দি বেল' ও 'আইরিশ রাইটিং' পত্রে ছোট-গল্প লেখেন। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'দি টার্সটি অ্যাণ্ড সেমড' ১৯৫৫-এ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়।

ব্রেইন ফ্রেইল ১৯৬০ থেকে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। গল্পগ্রন্থ 'দি সস্যার অ লাকর্স' ১৯৬২-এ প্রকাশিত হয়।

—শোভন আচার্য

বৈকুণ্ঠের খাতা

স্বদেশ, আমার স্বদেশ

কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত

১৫

কবি-চেতনায় বাংলা দেশ

পাশ্চাত্যে সংকলন সম্পাদনার অন্য রীতি। নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক কাজ হয় ওখানে। একজন সম্পাদকের অধীনে কাজ করেন অনেক মানুষ। তথ্যসংগ্রহ, রচনা-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণে সাহায্য করেন তাঁরা।

আমাদের দেশে সে রীতি নেই। সুযোগও কম। এ পর্যন্ত যা কিছু সংকলিত হয়েছে, তার বেশির ভাগই একক প্রয়াসের ফলশ্রুতি। বড় প্রকাশকেরা সাধারণত এসব বিষয়ে উদ্যম নিতে চাননা। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেও বেরুচ্ছে না সমকালীন কোনো রচনার নির্ভরযোগ্য সংকলন।

সেজন্যেই ভালো লেগেছিল। প্রত্যাশিত বইয়ের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ।

কৃষ্ণ ধরের সম্পাদনায় বেরিয়েছে বাংলাদেশের ওপরে লেখা কবিতার একটি বিরাট সংকলন, —'স্বদেশ, আমার স্বদেশ।'

সেই আবেগ মথিত একটি- নামঃ 'বাংলাদেশ!' — যন্ত্রণার, উপলব্ধির এবং ভালোবাসার।

সাতচল্লিশের পর যে তরুণ জন্মেছে (সীমান্তের এপারে কিংবা ওপারে), সে দেখেছে দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের মানচিত্র—পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ব পাকিস্তান। রাজনৈতিক কারণে এই দুটো যুগপৎ স্বদেশ ও বিদেশের অনুষঙ্গে উচ্চারিত।

অখন্ড বাংলার ভাবমূর্তি কি তাদের অন্তরেও আবেগ সঞ্চার করে?

এ সংকলন বেরুবার পর জনৈক তরুণ কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাংলাদেশের ওপর কি আপনি কোনো কবিতা লেখেননি?

অসংকোচে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি, 'ফরমায়েসী লেখা আমি লিখতে পারি না, লিখি না। বাংলাদেশ কখনো কোনো কবিতার বিষয় নয়।'

কৃষ্ণ ধরের মুখে শুনেছিলাম, অন্য একজন কবি তাঁকে বলেছিলেন: 'আমার সমস্ত কবিতাই বাংলাদেশকে উদ্দেশ্য করে লেখা। আমার সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে আছে এদেশের মানুষ এবং প্রকৃতি।'

পূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান গত ডিসেম্বর মাসে ঢাকার এক জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন: 'এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হবে শুধু মাত্র বাংলাদেশ।'

তাঁর আশঙ্কা: 'এদেশের বুক থেকে—মানচিত্রের পাতা থেকে—'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নও মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া ভবিষ্যতে আর কোনো কিছুর সঙ্গে 'বাংলা' নামের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।'
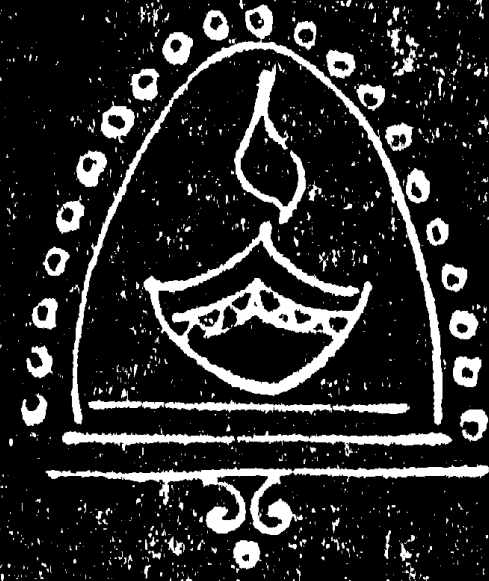
সীমান্তে অন্ধকার

কৃষ্ণ ধর অবশ্য সে আশঙ্কা করেননি। তাঁর দুঃখবোধের চেহারা আলাদা।

মনে পড়ে, বছর কয়েক আগে নিরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে যুগ্ম-ভাবে একটি বই লিখেছিলেন তিনি—'সীমান্তের অন্ধকার' নামে। তার ভূমিকায় তাঁরা লিখেছিলেন:

'মানচিত্রের রেখা টেনে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যেদিন ভারতবর্ষে নতুন সীমান্ত সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিন আমাদের দেশের নেতারা অনেকে ভেবেছিলেন ও আশা করেছিলেন, এই সীমান্ত শুধু দেশের ব্যবধান নয়, কালের ব্যবধানও রচনা করবে। হয়তো সেদিন অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। হতাশায় সেই অন্ধ মুহূর্তে আমরা উজ্জ্বল বিশ্বাসের একটা অবলম্বন চেয়েছিলাম।'

আর আজ? সেকথা থাক।

দেশভাগের সতেরো বছর পরে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন: 'সেই সীমান্ত আজও আমাদের মনের মধ্যে গভীর ক্ষতের চিহ্ন হয়ে রয়েছে। যন্ত্রণা ও হতাশার সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করেছি, সীমান্তের দেয়াল শুধু আমাদের মাতৃভূমিকেই খণ্ডিত করেছে বেদনাবিদ্ধ স্মৃতিকে চাপা দিতে পারেনি। আত্মপ্রতারক বিশ্বাসে এবং অলীক আশায় এই সেদিন পর্যন্ত আমরা তাকে ভুলবার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস সেই বিশ্বাসঘাতকতার শোধ তুলেছে। দরজার ওপার থেকে যখন কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে থাকল, তখন আমাদের ভুলের ঘোর ভাঙল। দেখলাম, সীমান্তে অন্ধকার নেমে এসেছে। পুঞ্জীভূত অশ্রুর বন্যা ভেদ করে অন্যপারের মানুষগুলিকে

দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাদের কোলাহল শোনা যায় এবং দুইদিককার মানুষের মনের তার এমন একসূত্রে বাঁধা যে ওপারের হাসিকান্না এপারেও হাসিকান্নার ঢেউ তোলে।'

তাঁরা যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকান, তখন সীমান্তের সবটাই অন্ধকার মনে হয় না। একটা অস্ফুট আলোর রেখাও নজরে পড়ে। ওপারে যে নতুন মানুষ জাগছে, তার আভাস সুস্পষ্ট। তারা বাঙালিত্বের জন্য গৌরববোধ করে।

'স্বদেশ, আমার স্বদেশ'-এর অন্তঃ-প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে আরেকটা ঐতিহাসিক দিনের স্মৃতি। 'সীমান্তে অন্ধকার'-এর লেখকদ্বয় সেই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন :

'দুঃসাহস বাঙালির। পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ তার দুর্মর বর্বরশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঢাকায়, চট্টগ্রামে। এ সীমান্তে কারা বলল, বাংলাভাষা। অপর সীমান্তে তার প্রত্যুত্তর মিলল, দীর্ঘজীবী হউক।

বাংলার হৃদয় তাতে বিভক্ত হয়নি।

পূর্ব বাংলার বিদ্রোহ ও স্বাতন্ত্র্যের দাবীর পদক্ষেপ বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন। ২১ ফেব্রুয়ারী পূর্ববাংলার শপথ গ্রহণের পুণ্যদিন। বাংলাভাষী হিসেবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তরাধিকারী হিসাবে এ সীমান্তের মানুষও এই দিনটির জন্য গৌরবান্বিত বোধ করতে পারে। তারা প্রমাণ করল, রক্ত জলের চেয়ে গাঢ়তর। ধর্মের বন্ধনের চেয়ে ভাষার বন্ধন, সংস্কৃতির ঐক্যবোধ অনেক গভীর, অনেক স্থায়ী। পশ্চিমীরা এ আশংকা বরাবরই করেছিল। বাঙালিদের তারা বিশ্বাস করত না কোনদিনই। পূর্ববাংলার মুসলমানরা জবাব দিল, তাদের কালচার বাংলার কালচার। হিন্দু ও মুসলমানের যুক্তসাধনায় এই কালচার গড়ে উঠেছে।'

স্বদেশ, আমার স্বদেশ'—প্রসঙ্গে

বইটি বেরুবার পর একদিন কৃষ্ণ ধরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ সংকলন সম্পাদনার প্রথম পরিকল্পনা আপনি নিয়েছিলেন কবে ? এবং কেন ?

আদি ইতিহাস শোনালেন তিনি : 'ট্রামলাইনের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে ক্রমে চলে এলাম সাহিত্যের আলোচনায়। খুবই এলোমেলো কথা। বন্ধু প্রস্তাব দিলেন, বাংলাদেশের ওপরে লেখা কবিতার একটা সংকলন বের করলে হয়। আমি সম্মত হলাম। ট্রাম-বাস ছোটাছুটি করছে রাস্তা দিয়ে। একঝলকে আমি যেন হাজার বছরের বাংলাদেশ ও সাহিত্যকে দেখতে পেলাম। ক্রমাগত নানা নাম, নানা ছবি ভেসে আসতে লাগলো। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রকৃতি চেতনার আলোকে বাংলাদেশকে দেখতে চেষ্টা করলাম। এই সংকলনে সেই দেখার আলো পড়েছে।'

আপনার ইচ্ছা কি এ সংকলনে পূর্ণ হয়েছে ?

—হয়নি বলাই ভালো। সে সম্ভাবনাও নেই। ইচ্ছে ছিল আদিকাল থেকে অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কবি চেতনায় বাংলাদেশের বিবর্তন কিভাবে ঘটেছে—তা দেখাতে পারবো। কিন্তু প্রথমদিকের লেখায় ও মধ্যযুগের লেখাতেও বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে পাইনি। অস্পষ্টভাবে পেয়েছি নিশ্চয়ই। চর্যাপদ, বৈষ্ণব কবিতা—সবই বাংলাদেশের নিসর্গলালিত মানুষের অভিব্যক্তি।

আপনি বাংলাদেশকে কি ভাবে দেখেন ?

—বাংলাভাষার প্রতি আমার যে আনুগত্য ও ভালোবাসা—তারই হাত ধরে আমি দেশের কাছে পৌঁছই। সাহিত্যের দর্পণেই দেশচেতনার প্রতিফলন পড়ে সবচেয়ে বেশি। নিসর্গ, মানুষ—সবই আসে সামগ্রিকভাবে তারই হাত ধরে।

আপনার কল্পনায় অখন্ড বাংলাদেশের রূপ কি ?

—বঙ্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পরিমন্ডলে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের নিয়েই আমার অখন্ড বাংলাদেশ। তার জলবায়ু, তার নিসর্গ তো আছেই।

তারপর কিছুটা থেমে, স্মৃতি থেকে রামনিধি গুপ্তের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন :

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পূরে কি আশা ?

কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষ্ণা ?

বললেন : এই কবিতাটি দিয়েই সংকলন শুরু করেছি। ছোটবেলায় আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিলেন রামনিধি গুপ্ত। হয়তো বড়রকমের কোনো কবিত্ব নেই, কিন্তু একটি সরল সত্য আছে কবিতাটির মধ্যে। সেদিন বইটি উপহার দিলাম তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনিও ঐ কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ। তারাশংকরবাবু আরেকটা কবিতা পড়েছিলেন—মাইকেলের 'রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।'

স্বাদেশিকতা ও প্রাদেশিকতা

এধরনের সংকলনের বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে কৃষ্ণ ধরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখন তো সবাই চারদিকে জাতীয় ঐক্যের কথা বলে বেড়াচ্ছেন। আর আপনি সম্পাদনা করছেন, বাংলাদেশের ওপর লেখা কবিতার সংকলন ! কেউ যদি আপনাকে প্রাদেশিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন, তাহলে কি উত্তর দেবেন ?

অত্যন্ত সহজ, অবিচলিতকণ্ঠে জবাব দিলেন তিনি।

স্মিত হেসে বললেন : 'আমার মনে সে সন্দেহ কখনো জাগেনি। যে মানুষ নিজেকে ভালো করে জানে না, সে অন্যের সম্পর্কেও সমান অজ্ঞ এবং অনুদার হতে বাধ্য। অঞ্চল-বিশেষের প্রভাব মানুষের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপরে পড়বেই। তাকে অস্বীকার করা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমরা যখন ভারতবর্ষের কথা বলি, তখন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই বলি। মাটির সঙ্গে যোগ না থাকলে কোনো কিছুই সত্য হয় না।'

একটু থেমে, ইতিহাসের নজীর টেনে বললেন : 'বহুবিচিত্র ন্যাশনালিটির পরীক্ষাগার এই বিশাল ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ—এক ও অভিন্ন। উনিশ শতকের বাঙালি মনীষীরা 'ভারতপথিক' হয়েছিলেন বাংলাদেশকে চিনেই। বাংলাদেশের প্রতিমা সঙ্গীতের রূপ নিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমে। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের তাই হয়ে উঠল অন্যতম মূলমন্ত্র — ভারতবর্ষের প্রথম আনঅফিসিয়েল ন্যাশনাল এনথেম। এর আগে ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধের চেতনা স্পষ্ট কোনো ভাষা পায়নি। রামমোহন রায়কে, ইতিহাসের আলোকে আজ আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ। সেই চিন্তার প্রবাহকে খরগামী করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যাঁদের সর্বোত্তম পরিণতি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও কর্মে। বাংলাদেশকে জানতে হলে উনিশ শতকের এই উজ্জ্বল ইতিহাসের পদক্ষেপকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। শুধু বাংলাদেশের হৃদয়ই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয় এই

আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। দেশকে জননীরূপে ভালোবাসতে শ্রদ্ধা করতে শেখালো বাংলাদেশ।'

বাঙালির এই দেশাত্মবোধের ধারণা কি একেবারে নিজস্ব কোনো মৌলিক ভাবনা বলে আপনার মনে হয় ?

—না, একেবারে মৌলিক, নিজস্ব—বলি কি করে ? বাংলাদেশ প্রথম বিদেশের পদানত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কৌশলে। স্বভাবতই বিদেশী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছিল সবার আগে। দেশাত্মবোধের নতুন চেতনা বাংলাদেশ আহরণ করেছিল ইউরোপ থেকে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলন বাঙালির সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছিল।

অবশ্য প্রথমদিকে ছিল কিছুটা জাতি বৈরিতার লক্ষণ। কেউ কেউ বলেছিলেন 'বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুর'কে আদর করার কথা। ক্রমে তা আরো উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাইকেলের কবিতাই আমাকে সব চাইতে বেশি প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর মতো আন্তর্জাতিক মানুষ বাংলাদেশকে নিয়ে লিখেছেন অবিস্মরণীয় কবিতা। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেনঃ

আমরা দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে
পরাধীন, হা বিধাতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?

এই আক্ষেপ ক্রমশ গভীর মমতায় মহিমান্বিত হয়ে উঠল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেনঃ 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?' সেরূপ আরও বিচিত্র বিচিত্রতায় আলোকিত হল রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ঃ

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি
না ফিরে।'

কৃষ্ণ ধর মন্তব্য করলেনঃ রবীন্দ্রনাথের এ কবিতা কি প্রাদেশিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন ? না একটা সাবলাইম—মহৎ হৃদয়ের আকুতি ? পরবর্তীকালে কত মহৎ কবিতার প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর এই লেখা! এখানে যখন স্বদেশী আন্দোলন হয়েছে, তখন বাংলাদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেননি কেউ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—তেমনি একটা জাতীয় আন্দোলন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'মেবার পতন' নাটকে যে গানগুলি লিখেছেন, তা বাংলাদেশের কথা মনে রেখেই।

আসলে, বাংলাদেশ কখনো প্রাদেশিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে বারবার—সংস্কৃতি ও সাহিত্য চিন্তায়। বিহারের অধিবাসীরা বিহারকে জেনেই ভারত দর্শনে বেরুবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

ভূমিকায় লিখেছেনঃ 'জন্মের ঋণে আবদ্ধ আছি বলেই আমাদের চেতনায় স্বদেশের উপস্থিতি অবিরল। দেশ বলতে তার মাটি, তার ভাষা, তার মানুষ সব একসূত্রে জড়ানো একটি স্নিগ্ধ ভালোবাসার মালা। বাংলা দেশের ইতিহাস ও তার ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই আমরা বাংলাদেশের মানুষ। সে কারণেই স্বদেশ, আমার—স্বদেশ এই আন্তরিক উচ্চারণে এই গ্রন্থের শিরোনাম অলংকৃত করি।'

ভূগোল, ইতিহাস ও প্রকৃতি-চেতনা

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, দেশভাগকে কি এ সংকলনের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা বলা যায় ?

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ওপরে লেখা কবিতা আছে অনেকগুলি। বারবার বাংলাদেশের সীমানা বদল হয়েছে। এ আঘাত কবি প্রাণেও কম বেদনা সঞ্চার করেনি। আধুনিক কবিরাও দেশভাগের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন নানাভাবে। অনেকে ভৌগোলিক সীমাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। অবশ্য রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এ আকুলতার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দুই বাংলা এক হোক—এই কামনা হয়তো কেউ-ই করেন না—সেটা কাম্যও নয়। কিন্তু দুই বাংলার মানুষই চায় পরস্পরের সান্নিধ্য এবং ভালোবাসার উত্তাপ।'

বললাম, মানে? আর একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।

—'আমরা যাকে বাংলাদেশ বলে জানতাম, তার ভূগোল বার বার বদলেছে। বদলায়নি তার অন্তরের সীমানা। সেজন্যেই বাংলাদেশ বলতে আমি বুঝি বঙ্গ সংস্কৃতির পরিমন্ডলে যে-ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাভূমি তাকে। রাজনৈতিক সীমারেখায় তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। আমাদের মনের জগতে বাংলাদেশের প্রতিমা চিরকালই অম্লান ও উজ্জ্বল। সেজন্যেই বাংলা সংস্কৃতির দর্পণ তার সাহিত্য, তার ইতিহাস, তার রাজনীতিবোধ—সবই আমাদের চেতনাকে উজ্জীবিত করে রাখে।'

প্রাচীন ইতিহাসে বাংলাদেশকে কিভাবে পাওয়া যায় ?

—'দশম শতাব্দীতে কবি শ্রীধর দাস তাঁর 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে গঙ্গার স্রোতোধারার সঙ্গে বাংলাভাষাকে তুলনা করেছিলেন ঃ

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ!
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল বাণী চ।।

ব্রাত্য ও বিদ্রোহী বাংলাকে আর্যরা প্রথম স্বীকৃতি দিতে চাননি। পরে ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বাঙালিকে বলা হয়েছে 'বগদ' বা মগধের প্রতিবেশীরূপে। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক বঙ্গ শব্দের উৎস সন্ধান করেছেন। অস্ট্রিক 'বোঙ্গা' শব্দে। আমাদের আদিবাসী মানুষ সাঁওতাল, মুন্ডা, হো জাতির কাছে বোঙ্গা একটি সর্বার্থসাধক শব্দ, যার অর্থ আশ্রয়দাতা বা আশ্রয়স্থান।

জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' রচনা করলেও তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায় আমরা পাই বাংলাদেশেরই অপরূপ শ্যামল চিত্র। রবীন্দ্রনাথ যার ব্যাখ্যা করে লিখেছেনঃ

যেথা জয়দেব কবি কোন বর্ষাদিনে
দেখেছিলো দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া পূর্ণমেঘে মেদুর অম্বর।।

দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা বাংলার প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থ চর্যাপদে এই নদীমাতৃক দেশের স্নিগ্ধরূপই ফুটে উঠেছে। বাংলার নদীধারা, নৌকাযাত্রা, বাণিজ্য, দস্যু হার্মাদের হানা—এ সবই বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছবি। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার একটি বাস্তব চিত্র চর্যার দোহাকারগণ উৎকীর্ণ করে গেছেন উত্তরকালের জন্য। বাঙালির গানে দেশের যে রূপে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা নিশ্চিতরূপেই এই শ্যামলিম বাংলাদেশ।'

কৃষ্ণ ধর বলেন, বাংলাদেশের আকাশ বাতাস কার প্রাণে বাঁশি বাজায় না? নদনদী প্রকৃতি আশ্রিত এই বাংলাদেশ এমনিতেই ভাবপ্রবণতার উৎসভূমি। গ্রামের রাস্তাঘাট, রাঙামাটির পথ, অশ্বত্থতলা, চণ্ডীমণ্ডপ,—সবই মনের ওপরে ছায়া ফেলে।

কবিতা-নির্বাচন ও অন্যান্য

কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি কবিতা নির্বাচন করেছেন?

—বাংলাদেশের নিসর্গ, প্রকৃতি কিংবা অতীত-বর্তমানের সঙ্গে জড়িত এমন সব কবিতাকে একত্রে সংকলন করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সেজন্যেই কবিতা হিসেবে সংকলিত রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিনি। আমি যখন কবিদের কাছে কবিতা চাই, তখন অনেকে ভেবেছিলেন, বুঝি দেশবন্দনামূলক কবিতা দিতে হবে। আসলে, আমি তাও চাইনি। কবির ভালোবাসায় দেশের চেতনা কিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসেছে, সেটা জানাই ছিল [illegible] অন্যতম লক্ষ্য। এ সংকলনে তাই বাংলার উপলব্ধিই যুগপরম্পরায় কিভাবে বিকশিত হয়েছে তা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

একটু থেমে বললেনঃ 'মাইকেল মধুসূদনকে মহাকাব্যের কবিরূপে জানলেও তাঁর কবিতাতে বাংলাদেশের প্রতি মমতা নানারূপে নানা সুরে এক অলৌকিক বিস্ময়তায় আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। আমি এ সংকলনে তাঁর তিনটি কবিতা ছেপেছি। তিনটিই বিখ্যাত এবং বাঙালির মুখে মুখে শতাব্দীকাল ধরে উচ্চারিত। স্বদেশের অস্তিত্ব, জন্মভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি এমন আন্তরিক অনুরাগ এর আগে অন্য কোনো কবির কবিতায় এমন সুমহান ইতিহ্যের প্রতীকরূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়নি। এমন সুগভীর স্পর্শকাতরতায় তাঁর কবিতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে যে তাঁকে সমসাময়িক কবি বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের স্বর্ণহৃদয় উন্মোচিত করে রেখে গেছেন উত্তরকালের জন্য।'

রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের দেশাত্মবোধক কবিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি রকম?'

—"রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে এককালে বাঙালির হৃদয় জয় করেছিলেন। শব্দ চয়নের ঐশ্বর্যে ও সুর সংযোজনায় তাঁর গানগুলি অপূর্ব। রবীন্দ্র যুগে স্বাদেশিক কবিতায় বৈচিত্র্য ও বিদ্রোহের সুর এনেছিলেন নজরুল ইসলাম। প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় সংগ্রামের অংশীদার ছিলেন তিনি। সেজন্যেই তাঁর কবিতা এমন জীবন্ত, এমন উত্তপ্ত, এমন দ্বিধাহীন। যেহেতু বাংলা দেশ বিষয়ে আমাদের সঙ্কলন সীমাবদ্ধ, তাই আমি তার একটি অনতি পরিচিত কবিতাই এতে দিয়েছি। বাংলার দেশজ রূপটি এতে চমৎকার ফুটেছে।

অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের কবি। অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত গান 'আ মরি বাংলা ভাষা'র সহজ আত্মীয়তা কাকে না মুগ্ধ করে? সত্যেন দত্তের কবিতা বর্ণনামূলক। ছন্দের চাতুর্যে ও শব্দের লালিত্যে তাঁর কবিতা বাঙালি পাঠকের প্রিয়।"

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় বাংলা দেশের রূপ কেমন?

—স্বদেশ প্রেমের আধুনিক রূপ আমরা পাই জীবনানন্দ দাশের অনন্য কবিতাবলীতে। তিনি বঙ্গপ্রকৃতির নিবিড় চিত্রকর। তাকে নিছক প্রকৃতি বর্ণনা বললে ভুল হবে। বাংলার হৃদয়, তার লোককথা, পুরাণ, ইতিহাস ও সমসাময়িকতার প্রবাহকে তিনি নিপুণ চিত্রকরের মতো আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করেন। তাঁর 'রূপসী বাংলা'র সব কবিতাই বাংলাদেশকে উৎসর্গীকৃত। বাংলার মাটির গন্ধ, তাঁর সোনালি শ্যামল উদ্ভাস তার স্রোতস্বিনীর জলধারার সঙ্গে কবি একাত্ম হতে পুনর্জন্ম প্রার্থনা করেন এ দেশে।

তিনি বলেন—

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির
তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল
শালিখের বেশে।"

আমি চুপ করে তাঁর বক্তব্য শুনছিলাম। কৃষ্ণধর হঠাৎ যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন: 'এ যুগের পৃথিবীর আর কোনো দেশে আধুনিক মননে স্বদেশের উপস্থিতি এত অনিবার্য, এত অন্তরঙ্গ, এত ব্যাকুল? আমরা বাংলা দেশকে প্রতিদিনের অস্তিত্বে অনুভব করি বলেই তরুণতম কবিরা পর্যন্ত কখনো না কখনো এই দেশকে তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু করেছেন।

স্বদেশকে বিষ্ণু দে, কিংবা সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা মণীন্দ্র রায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য নিজ জীবনের, সংগ্রামের গতিশীলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিয়ে দেন। বিষ্ণু দে-র কবিতায় বাংলা দেশ ব্যাপক চেতনার অঙ্গ হিসেবে উপস্থিত। বাংলা দেশে ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের যুগে মার্কসবাদে দীক্ষিত প্রগতিশীল কবিরা স্বদেশ চেতনাকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে তোলেন। বাংলা দেশ তখন হয় বিশ্বপ্রতিমা, বাংলার দুঃখ বেদনা রূপান্তরিত হয় সর্বহারার বেদনায়। বিষ্ণু দে-র ভাষায় 'দেশব্যাপী ইমারত রাত্রিদিন স্বাধীন সমাজ, সচ্ছল আকাশ/সাগরসংগমে দিনভোর বিনিদ্র নির্মাণ।' সুকান্তর দুর্জয় প্রাণশক্তি মন্বন্তর পেরিয়ে আসা বাংলা দেশের মাটিতে 'আনে ফসলের ডাক' — মানুষের মৃত্যুঞ্জয় বাসনার প্রতীক।"

সাতচল্লিশের দেশ ভাগ প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললেন: "সাতচল্লিশের পর বাংলা দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। কবিতায় বেজে উঠল মোহমুক্তির স্বর। এপার বাংলা ওপার বাংলার বেদনাসিক্ত অস্তিত্ব বাংলার কবিদের অস্তিত্বকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেল। আজ তাই দুই বাংলার কবিতাতেই এক অপূর্ব আকুলতা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনবদ্য ভাষায় সেই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেন।

তুমি আমার ভাষা বলো
আমি আনন্দকে দেখি
আমি তোমার ভাষা বলি
তুমি আশ্চর্যকে দেখ
এই ভাষায় আমাদের আনন্দে
আশ্চর্যে সাক্ষাৎকার।

বাংলা দেশ অনেকের কাছে এক গভীর ট্র্যাজেডি ও আশাবাদের প্রতীক। বিপন্ন অস্তিত্বের কান্নায় উদ্ভাসিত আধুনিক কবিতাবলীতে আমরা বাংলা দেশকে নতুন করে পাই।'

মণীন্দ্র রায় লিখেছেন

"জরিপের ফিতে মাপা নির্দিকার
কয়েক মাইল
যা দেখ সে রাজস্বের সীমা।
আমাদেরই ঘাম রক্ত প্রেমের মন্দিরে
দেখ এক আশ্চর্য প্রতিমা!
আমরা রেখেছি তাকে
স্মৃতি দিয়ে ঘিরে।

কৃষ্ণ ধরকে জিজ্ঞেস করলাম: এ সঙ্কলনের ত্রুটি কোথায়? সে সম্পর্কে কি আপনি সচেতন?

—এ সঙ্কলনের বড় ত্রুটি পূর্ববাংলার কবিতা দিতে পারিনি। যোগাযোগের অভাবেই এ অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। ইচ্ছে আছে, স্বতন্ত্র একটি সংকলন করার। তাতে কেবল পূর্ববাংলার কবিতাই থাকবে। তা ছাড়া কোনো সংকলনই ত্রুটিমুক্ত হতে পারেনা। যথা সময়ে সব কবিতা হাতে না পাওয়ায় কবিতার কালানুক্রমিকতা সব ক্ষেত্রে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অনেক অগ্রজ কবিকেই অনুজের পাশাপাশি দেখা যাবে। সংকলনটি প্রকাশের মুখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা পেয়েছি।

সার্থকতা, বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য

'স্বদেশ, আমার স্বদেশ' বেরুবার পর নন্দগোপাল সেনগুপ্ত যুগান্তরে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন 'স্বদেশ ভুবনপ্রিয়' নামে। তাতে তিনি মন্তব্য করেছেন:

'স্বদেশ প্রেমের কবিতার সঙ্কলন এ পর্যন্ত চোখে পড়েছে একাধিক। পড়েছি বহু সাম্প্রতিক কবিতার সংকলন। কবি কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত 'স্বদেশ, আমার স্বদেশ' সদ্যপ্রকাশিত সঙ্কলন হিসেবে অগ্রজদের সঙ্গে একাসনভুক্ত হলেও, তার নিজস্ব একটা সৌন্দর্যের দাবী আছে। বলা যেতে পারে বিশেষ একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে। কি সেই দৃষ্টি? বাঙালি কবির কলমে বাংলাদেশ, বাঙালি সংস্কৃতি, বঙ্গ-মানস কিভাবে দেবমাহাত্ম্য পরিকল্পিত বাংলা সাহিত্যে এসেছে দেশমহাত্ম্য, তা দেখাতে চেয়েছেন তিনি শতাধিক বর্ষের অনতিদীর্ঘ পথে কাব্য পরিক্রমা করে।'

অবশেষে মন্তব্য করেছেন: 'কবি কৃষ্ণ ধর প্রত্নবিদের সন্ধানী চোখ ও জহুরীর রত্নজ্ঞান নিয়ে খুঁজে খুঁজে মণিরত্ন আহরণ করেছেন এবং তাদের গ্রন্থিবদ্ধ করে সেকালে একালে সেতু বন্ধন করে সারা দেশের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বইটির ভূমিকাটি বাহুল্যবর্জিত সুলিখিত এবং উচ্চ সাহিত্য গুণসম্পন্ন।'

আমি অন্য একটা বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবছিলাম।

এই সঙ্কলনে রামনিধি গুপ্ত থেকে শুরু করে দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ বিগতকালের কবিরা যেমন জায়গা পেয়েছেন, তেমনি অবলীলাক্রমে আসন গ্রহণ করেছেন রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, যুগান্তর চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল, সত্য গুহ, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, রত্নেশ্বর হাজরা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পঞ্চাশ-ষাটের কবিরা। তুলনায় তরুণদেরই প্রাধান্য।

কৃষ্ণ ধরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তরুণদের এই প্রাধান্যের কারণ কি?

তিনি বললেন, 'আমাদের দেশে সংকলন প্রকাশের সময় সাধারণত দেখা যায় সমকালীন তরুণ কবিরা উপেক্ষিত। আমার মনে হয়, এ রীতি বদল হওয়া দরকার। তরুণদের বাদ দিলে সাম্প্রতিক মেজাজকে অস্বীকার করা হয়। তাঁদের চিন্তা ভাবনার স্বাক্ষর তো কবিতার মধ্য দিয়েই পাওয়া সম্ভব। আমি দেশচেতনায় তরুণদের মানসিকতাকে বুঝতে চেয়েছি তাঁদের কবিতাকে গ্রহণ করে। মনে হয়, একালের পাঠকের কাছেও সংকলনটি এ কারণেই অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হবে।'

জনৈক পাঠকের অভিমত: এই সংকলনটি সম্পাদনা করে কৃষ্ণ ধর শুধু যুগসন্ধিকালের চেতনাকে তুলে ধরেননি, জাতীয় কর্তব্য পালনে গভীর দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন।

—গ্রন্থদর্শী

অমরতীর্থ

জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশারাধ্যা দেবী মা করুণাময়ী কালীর মন্দির। সেই বৃহৎ মাতৃমন্দিরের অন্তরালে লুকিয়ে আছে একটি অবিস্মরণীয় রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আজ পর্যন্ত যেখানে যত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, খোঁজ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে কিছু না কিছু ধর্মীয় অনুজ্ঞা বা অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে সে মন্দির যদি প্রাচীন হয়, তাহলে তো কথাই নেই। মন্দিরটি বহু পুরোন। মায়ের শিলাময়ী মূর্তিটি প্রায় চারশত বছরের পুরোন হবে। মাঝখানে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মায়ের মূর্তিটি অপূর্ব শ্রীতহামণ্ডিত। পদতলে রক্তজবার দল যেন মায়ের চরণ ঘিরে হাসছে। কলকাতার কাছে আদি গঙ্গার তীরে এই দ্বাদশ শিবমন্দিরযুক্ত মায়ের মন্দিরটি অবস্থিত। টালিগঞ্জের চার নম্বর সরকারি বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে সামান্য পথ হেঁটে গেলেই মন্দিরে পৌঁছান যায়। অথবা বেসরকারী চল্লিশ নম্বর রুটের একেবারে শেষপ্রান্তে নামলেও দেখা যাবে সামনেই মন্দির।

আজ থেকে প্রায় চার শো বছর আগেকার কথা। কলকাতার নিকটবর্তী বড়িষার বিখ্যাত জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরীরা সে সময় এই বাংলাদেশে এক অন্যতম ভূ-পতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং ধনসম্পত্তির মালিক ছিল এই সাবর্ণরা। এক কথায় বলতে গেলে কোন কিছুরই অভাব ছিল না এই বৃহৎ জমিদার পরিবারে। এই জমিদার বংশের গোড়াপত্তনের সময় একজন বিশিষ্ট শক্তিমান সাধকের জন্ম হয়। যিনি পরে একজন মহান সিদ্ধপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়ে এই সাবর্ণ বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। এক সময় এই সাধকের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। রূপে ও গুণে অতি অতুলনীয়া, ছিল সেই কন্যা। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে একদিন দেখা গেল, সেই কন্যা অকস্মাৎ সকল আত্মীয়স্বজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে অকালে এই ভবসংসার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কন্যার এই শোচনীয় মৃত্যুতে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়ে পড়লেন সাধক। কাঁদতে কাঁদতে দিশেহারা হয়ে একাকী পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কন্যার এই করুণ বিয়োগ ব্যথাকে ভোলবার কোন সান্ত্বনা তিনি সেদিন খুঁজে পেলেন না। এইভাবে যখন তিনি পাগলের মত হয়ে বিভিন্ন স্থানে একাকী ঘুরে ঘুরে কাটাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় একদিন গভীর রাতে একটি অপ্রত্যাশিত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন, তার সদ্য মৃতা কন্যা স্বপ্নে এসে তাকে বলছেন, বাবা আমি তোমায় ছেড়ে চলে এসেছি বলে তুমি দিন দিন এই
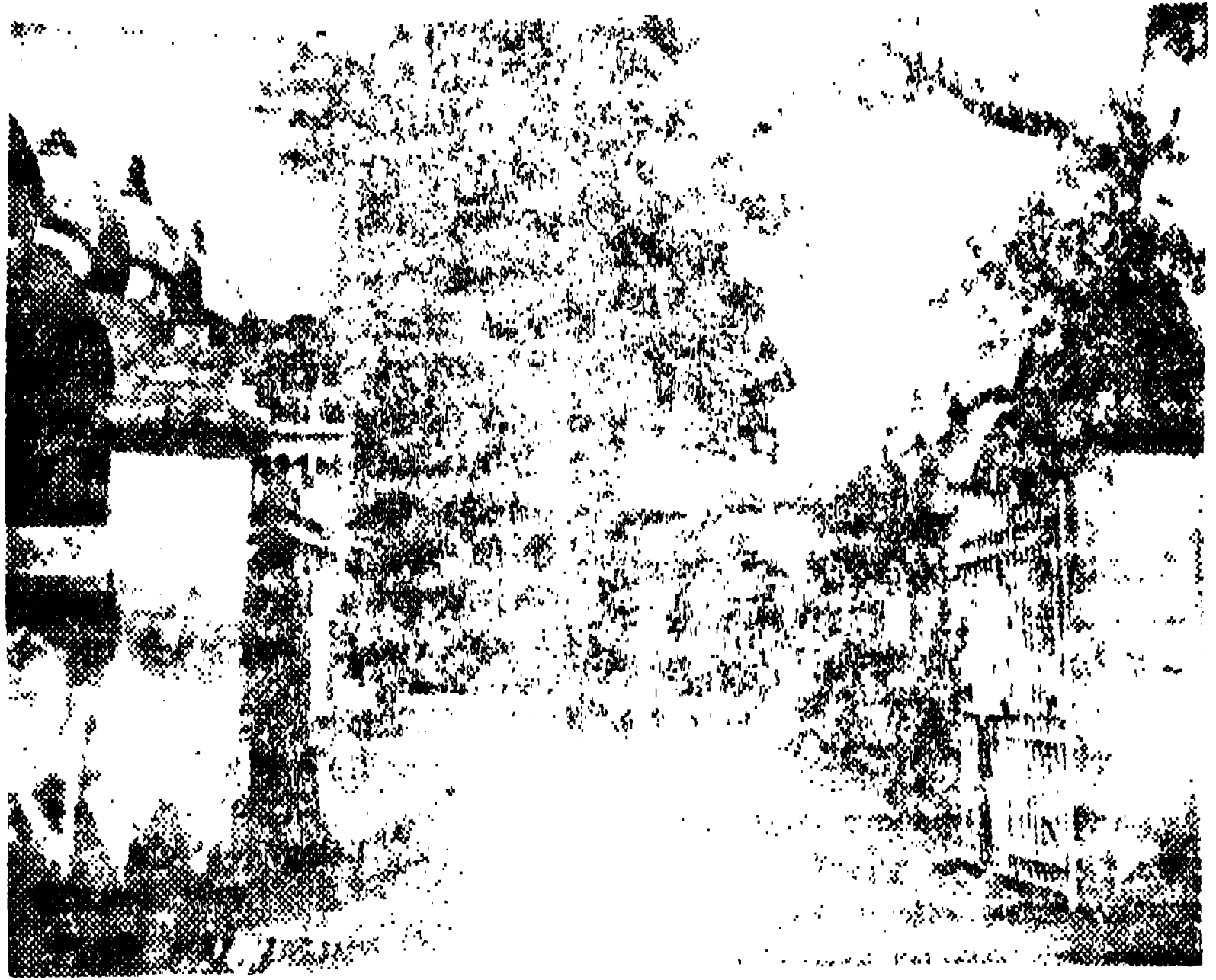
বিমলকুমার ভট্টাচার্য

ভেবে কেন মিছে মনে দুঃখ করছ? আমি তোমায় ছাড়া কি কখন এক দণ্ড থাকতে পারি, না পেরেছি কোন দিন? শোন, তুমি আমায় তোমার স্বকন্যারূপেই আবার ফিরে পাবে। আজ থেকে আবার আমি তোমার কন্যারূপেই চিরদিন বাঁধা হয়ে থাকব। আজ এই রজনী অবসান হবার পর, তুমি সোজা চলে যেও আদি গঙ্গার মুখে। সেখানে কূলবর্তী একটি বৃক্ষের তলায় দেখতে পাবে একটি কষ্ঠী পাথর। পরম ভক্তি ভরে সেই পাথর দিয়ে তুমি সেখানেই নির্মাণ করো তোমার ইষ্টদেবীর প্রতিমূর্তি। জেনো, তোমার গড়া সেই প্রস্তর মূর্তির মধ্যেই আমি সদা চিন্ময়ী হয়ে চিরদিন বিরাজ করব। এই কথাকটি বলেই তার সেই মৃতা কন্যা সহসা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর সাধকের এই অলৌকিক স্বপ্ন দর্শনে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল। আনন্দে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। স্বপ্নের মাধ্যমে এই শুভ সংবাদ পেয়ে সাধক অত্যন্ত অধীর হয়ে রাত প্রভাত হতেই ছুটে এলেন সেই নির্দিষ্ট আদি গঙ্গার তীরে। এসে তিনি সত্যি সত্যি দেখলেন, গঙ্গার তীরে পড়ে রয়েছে তার সেই স্বপ্ন নির্দিষ্ট কষ্ঠি শিলা। যে শিলা দর্শনের জন্য তিনি আজ পাগলের মত ছুটে এসেছেন এই আদি গঙ্গার তীরে। সেই পবিত্র শিলা দর্শন হওয়ার পর আনন্দে পুলকিত হয়ে সাধকের দুনয়ন দিয়ে অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়ল আবার আনন্দ অশ্রু। মা, মা বলে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাধক সেই পাথর শিলার উপর। একদা যে প্রস্তরীভূত ঐ শিলার মধ্যে অনাদিকাল থেকে লুকিয়ে-ছিল তার ইষ্ট দেবীর মহাপ্রাণ। সেই জাগ্রত শিলা পেয়ে সেই দিনই সাধক মায়ের অভিষ্ট মূর্তি নির্মাণের শুভ সংকল্প করলেন। পরে অতি অলৌকিক উপায়ে সফল হয়েছিল তার সেই শুভ সংকল্প। শোনা যায় সাধকের প্রতি মায়ের স্বপ্নাদেশ হবার পর, মা তার মূর্তি গঠনের জন্যে তাঁকে ভক্তকে পুনরায় স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই ভক্ত শিল্পীই নির্মাণ করে-ছিলেন মায়ের এই করুণাময়ী মূর্তি। এক শুভ সন্ধিক্ষণে সাধক মা করুণাময়ীর সেই শিলাময়ী মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মাকে জাগিয়ে তুললেন। আর সেই থেকে মাও কন্যারূপে জাগ্রত হয়ে সেই মহাশিলায় হয়ে রইলেন চিরআবদ্ধ। চিরদিনের তরে হারিয়ে যাওয়া সেই আদরিণী কন্যাকে এইভাবে পুনরায় মায়ের মধ্যে ফিরে পেয়ে সাধক যেন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। প্রতিদিন তিনি তার অন্তরের ভক্তি অর্ঘ দিয়ে প্রাণ-

ভরে করতে লাগলেন কন্যারূপী মা করুণাময়ীর পূজা। এইভাবে কিছুকাল মহা আনন্দে কাটবার পর হঠাৎ একদিন সাধক মায়ের চরণে আশ্রয় নিলেন। বংশের প্রাণ পুরুষ সেদিন এইভাবে চিরবিদায় নিয়ে গেলেন সত্য কিন্তু তিনি আমাদের এই দেশ ও দশের জন্যে রেখে গেলেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অমর কীর্তি। যা আজও তার পুণ্য-স্মৃতিকে বহন করে চির অমর হয়ে আছে।

গঙ্গার পশ্চিম কূলবর্তী সাবর্ণদের এই মন্দিরের চারিপাশে একদা গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকলে গ্রামবাসীরা কেউ সচরাচর এই শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থানে বড় একটা যেত না। মায়ের এই মন্দিরকে নিয়ে এ অঞ্চলে অলৌকিক কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। সে সকল অলৌকিক কাহিনী আজও এখানকার প্রতিটি মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। শোনা যায়, নিত্য নির্ধারিত সময়ে যথারীতি মায়ের পূজা সমাপন হয়ে যাওয়ার পর, মন্দির যখন গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেত, তখন মধ্যরাত্রির দিকে এই মন্দিরের চুপাশ থেকে অকস্মাৎ এক অদ্ভুত আলোর জ্যোতিকে বিচ্ছুরিত হতে দেখা যেত। আবার কিছুক্ষণ পরে দেখতে দেখতে সেই জ্যোতির শুভ্র আলোক ছটায় সমস্ত মন্দির অপূর্ব আলোময় হয়ে উঠত। আর সেই উজ্জ্বল আলোময় মন্দিরের বন্ধ কপাটের অন্তরাল থেকে সশব্দে কাঁসর ঘণ্টা ও শাঁখ বেজে উঠত। এমন কি পবিত্র ধূপ ধুনোর সুগন্ধ পাওয়া যেত বলে শোনা যায়। সেই মনোরম অলৌকিক পরিবেশ দেখে গ্রাম-বাসীদের মনে হত, যেন মায়ের কোন একনিষ্ঠ ভক্ত বুঝি সেই নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একাগ্র মনে মন্দিরে বসে মায়ের পূজা করে চলেছেন। কিন্তু কেউ যদি কখন কৌতূহলবশতঃ সেই উজ্জ্বল আলোকে লক্ষ্য করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেত, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই আলোক রশ্মিকে গভীর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখা যেত। আর সেই কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনিকে সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখা যেত। মন্দির প্রাঙ্গণে এই ভৌতিক ঘটনাকে হামেশাই ঘটতে দেখে গ্রামবাসীদের মনে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হল। কেউ কেউ কখন মায়ের প্রত্যক্ষ লীলার কথা স্মরণ করে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে দূর থেকে মায়ের উদ্দেশ্যে গড় হয়ে প্রণাম করত। এই-সব ঘটনাগুলি খুব একটা বেশী দিনের কথা নয়। আজ থেকে মাত্র পঁচিশ/তিরিশ বছর আগেকার কথা।

এক সময় এই অঞ্চলে অধর নামে এক ঢুলী বাস করত। সে মায়ের মন্দিরে বিভিন্ন পূজা উৎসবে মাঝে মাঝে ঢাক বাজাত। ঢুলীটি ছিল ভক্তিমান। একবার সে, তার গাছের প্রথম নতুন এক কাঁদি পাকা কলা কালীঘাটের মাকালীকে দেবে বলে নিয়ে চলেছিল। রাত্রি তখনও ফরসা হয়নি। ভোর হয়ে আসছে এমন সময় হাঁটতে হাঁটতে সে যখন করুণাময়ী মায়ের ঘাটের কাছে এসে পৌঁছল। তখন হঠাৎ সে দেখল, একটি ছোট্ট কিশোরী বালিকা অতি দ্রুত পায়ে তাকে লক্ষ্য করে যেন এগিয়ে আসছে। মেয়েটিকে দেখে সে খুবই অবাক হয়ে গেল। কারণ, মেয়েটিকে সে কখনও এ অঞ্চলে কোন দিন দেখেনি। তা ছাড়া সে এত ভোরে একাকী এইখানে এসেছে। এতে সেই ঢুলীটি খুবই আশ্চর্য বোধ করল। যাই হোক, পরে মেয়েটি তার কাছে এসে হঠাৎ তার হাতের কলার কাঁদিটি দেখিয়ে তাকে অতি নম্রভাবে বললে, ওগো, আমার বড় কলা খেতে ইচ্ছে করছে। তোমার ঐ কাঁদি থেকে দাওনা আমায় এক ছড়া কলা। তোমার ভাল হবে। অতি আগ্রহসহকারে এই কথাকটি বলে মেয়েটি সেই ঢুলীটির দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিন্তু দেখা গেল, কলা দেওয়া তো দূরে থাক, ঢুলীটি মেয়েটিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বললে, সরে যা এখান থেকে, আমি তো এ কলা তোকে দেবার জন্যে নিয়ে আসিনি। আমি নিয়ে যাচ্ছি কালীঘাটে, আমার মাকালীকে দেবার জন্যে। কাজেই মিছে আর আমার বেলা বসে দিসনি। অনেক দূরে যেতে হবে, পথ ছাড় আমি চলে যাই। ঢুলীটি এই কথা বলতেই হঠাৎ দেখা গেল, মেয়েটি আর সেখানে নেই। সে যেন মুহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটি ঢুলিটির চোখের সামনে থেকে এই রকম অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে যাওয়ায় ঢুলীটি খুবই হতভম্ব হয়ে গেল। যাই হোক পরে শোনা যায় যে, সেদিন কালীঘাটে পৌঁছে মাকে কলা নিবেদন করে গৃহে ফিরে এসে রাতে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। সে দেখল, করুণাময়ী ঘাটের কাছে দেখা সেই মেয়েটি যেন তাকে অভিমানের সুরে বলছে, ওরে, আমি নিজে আগ বাড়িয়ে তোর কাছে কলা চাইতে গেলাম। আর তুই কিনা তাচ্ছিল্য করে আমায় ফিরিয়ে দিলি। ওরে মূর্খ আমি কি শুধু ঐ কালীঘাটের মন্দিরে আছি ? আমি যে তোদের এই মন্দিরেও বিরাজ করছি, তা কি তোরা জানিস না ? এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ দেখা গেল, সেই ছদ্মবেশী মেয়েটির পরিবর্তে সেখানে স্বয়ং মা করুণাময়ী, দাঁড়িয়ে আছেন। এই অলৌকিক স্বপ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ সেই ঢুলীটির সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে তখনই ঘুম থেকে উঠেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল মা করুণাময়ীর কাছে। পরে মায়ের চরণে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে সে তার গাছের প্রথম নতুন ফল প্রতি বছর মাকে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। আর সেইদিন সে তার সাধ্যানুযায়ী মাকে ফলমূল ও কলা দিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা দেয়।

ছলনাময়ী মা যে কখন কাকে কিভাবে কৃপা করেন, তা কেউ কখন বলতে পারে না। এই অধর একজন সামান্য ঢুলী হলেও সেও তো মায়ের করুণা সেদিন পেয়েছিল। কাজেই সবই মা করুণাময়ীর ইচ্ছা। তিনি যা করবেন তাই হবে।

আর একবার এই মন্দির সংলগ্ন সাবর্ণদের স্থাপিত পুকুরঘাটে মায়ের পায়ের একজোড়া নূপুর পাওয়া যায়। সেবারের এই চমকপ্রদ ঘটনাটির পর থেকে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় মায়ের এই মহিমার কথা ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে চারদিক থেকে প্রতিদিন মায়ের এই স্থানে অসংখ্য ভক্ত সন্তানের দল সব সত্বর আসতে শুরু করে। সেবারের ঘটনাটি হল এই, একদিন স্থানীয় এক ভক্তিমতি স্ত্রীলোক খুব ভোর থাকতে উঠে মায়ের ঐ স্থাপিত পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। যখন সে যথারীতি স্নান সেরে ঘাট থেকে উপরে উঠে আসছিল, তখন হঠাৎ সে দেখল, সেই পুকুরঘাটের এক কোণে পড়ে রয়েছে মায়ের চরণের একজোড়া রূপোর নূপুর। কিন্তু সেই নূপুর দুটিকে দেখে তার কেমন জানি সন্দেহ হল, সে ভাবল হয়ত বা কোন দুর্বৃত্ত মায়ের এই অঙ্গ আভরণ অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় ভুলক্রমে এই ঘাটের নিকটে ফেলে রেখে গেছে। যাই হোক সে তৎক্ষণাৎ সেই নূপুর দুটিকে সযত্নে বুকে করে নিয়ে মায়ের মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত ভট্টাচার্য ঠাকুরের কাছে এসে হাজির হল, এবং পরে তাকে সবিস্তারে সকল ঘটনা একে একে বলল। মায়ের পূজারী ঘটনাটি শুনে বিস্মিত হলেন। সত্বর মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে দেখেন সত্যি মায়ের দুটি পায়েতে কোন নূপুর নেই। কিন্তু তিনি চিন্তা করে পেলেন না, যে এত সাবধান থাকা সত্ত্বেও মায়ের পায়ের নূপুর কি করে ঐ পুকুর ঘাটে গেল। ফলে মায়ের অযাচিত লীলার কথা স্মরণ করে উভয়ের মনের মধ্যে এক অজানা রোমাঞ্চ এসে বারংবার দোলা দিতে লাগল। শোনা যায়, পরে মা উভয়কেই নাকি স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে ছিলেন যে, তিনি নাকি নিজে স্বয়ং স্বেচ্ছায় সেদিন ঐ পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ভুলক্রমে তার পায়ের নূপুর দুটিকে ঘাটেতে ফেলে এসে-ছিলেন। কাজেই তারা যেন এই ঘটনাকে কোন রকম অপহরণমূলক ঘটনা বলে মনে না করে। সেদিনের এই চরম অলৌকিক ঘটনায় এই অঞ্চলের সকল অধিবাসীরা মুগ্ধ হয়ে যায় এবং পরে তারা সকলে মিলে মাকে একদিন মহা ধুমধামসহকারে পূজা দেয়।

মায়ের যে মন্দির আজ দাঁড়িয়ে আছে, তা হয়ত চারশো বছরের নয়। কিন্তু মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মায়ের ঐ শিলাময়ী মূর্তিটি দীর্ঘ চারশো বছরেরও অধিক প্রাচীন বলে জানা যায়। দ্বাদশ শিবমন্দিরযুক্ত মায়ের এই সুরম্য মন্দির সোপান আজ বাংলা-দেশের একটি স্মরণীয় তীর্থক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে এর সকল পূর্ণ গৌরবের একমাত্র অধিকারী হলেন মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত শ্রীঅসিত রায়চৌধুরী। সাবর্ণ বংশোদ্ভূত ভক্তপ্রাণ এই সেবায়েত তার নিঃস্বার্থ সেবা ও আন্তরিকতাপূর্ণ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বর্তমানে মন্দিরের সকল পূজানুষ্ঠান নির্বাহ করে চলেছেন।

তুষারে ভেজা রাত

পারিজাত মজুমদার

আট

শ্যামাপদ আচার্য ঠিকই বলেছিল। মার্চ-এপ্রিলে দেখবেন দার্জিলিং লোকে লোকারণ্য! হোটেলে তিলধারণের জায়গা নেই।

শীতের দিনগুলোতে সমস্ত হোটেলটার জনশূন্যতা ভারাক্রান্ত করে তুলতো সোনালীর সঙ্গ-পিয়াসী মন। আর এখন সেই হোটেলেরই ঘরে ঘরে আর বারান্দায় মানুষের ভিড় আর কোলাহল উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললো তাকে, অথচ এতদিন এই জন-সমাবেশ দেখবার জন্যেই কি ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি সোনালী?

আশ্চর্য! মানুষ নিজেকে কতটুকু জানে! যেসব মুহূর্তে সোনালী একান্ত-মনে জনারণ্যের প্রার্থনা করছিল, ঠিক সেই-সব মুহূর্তেই তার চেতনার গভীরে গড়ে উঠেছিল ভালোবাসা—নির্জনতার জন্যে, নিঃ-সঙ্গতার জন্যে। এখন, এই ভিড় আর হট্টগোলের মাঝখানে বসে সোনালী অনুভব করতে পারলো, বিগত শীতের মৃত্যুহিম মাতগুলিতে যে নিঃসঙ্গতা তার অন্তর-বাহির পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছিল তা ছিল সাবলাইম। হ্যাঁ, সাবলাইম! অনেক খুঁজেও ওটার যথোপযুক্ত বাংলা পরিভাষা খুঁজে পেলো না সোনালী।

তবে হ্যাঁ, হোটেলের এই জনসমাগমে একটা লাভ হয়েছে সোনালীর। প্রতি-বেশিনী হিসেবে মিসেস্ আচার্যকে অর্থাৎ অনুপমাকে সে পেয়েছে।

শ্যামাপদ আচার্যের মত পুরুষের যে এমন একটি স্ত্রী থাকতে পারে তা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি সোনালী। একগা সোনার গয়নাপরা, দাঁতে পানের ছোপ ধরা, তিরিশেই-বুড়ী গোছের একটি গিন্নীবান্নী মহিলাকেই আশা করেছিল সে। কিন্তু অনুপমা তার এই কাল্পনিক মিসেস আচার্যের একেবারে বিপরীত।

অনুপমা হচ্ছে এমন একটি মানুষ যে ভিড়ের মধ্যে আনতে পারে নির্জনতার প্রশান্তি, আর নির্জনতার মধ্যে দিতে পারে সঙ্গ।

বড় বড় টানা-টানা চোখ, শ্রীমণ্ডিত মুখ অনুপমার। তার ওপর সব সময়েই সে থাকে সুবেশা সুসজ্জিত হয়ে। অথচ আশ্চর্য এই, তাকে দেখলে উগ্র আধুনিকা কখনোই মনে হয় না। সে যেন সেই সেকালের কোনো পটে আঁকা ছবি! তার ঘনকুঞ্চিত কেশদামও যেন সেই পটুয়াদের তৈরী প্রতিমার মতই।

কিন্তু অনুপমার যা বৈশিষ্ট্য তাতো শুধু তার চেহারায় বা বেশবাসেই নয়! বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য আছে তার সমগ্র চরিত্রে। রন্ধনকলায় সে নিপুণ (সোনালীকে নিজের হাতের রান্না প্রায়ই খাওয়ায় অনুপমা), অথচ রান্নাবান্না সারে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। গান জানে কিছু কিছু, কথা বলে চমৎকার। বাংলা হিন্দী নেপালী তিনটে ভাষাই বলতে পারে অনর্গল। এমনকি বহু উর্দু শের্‌ও তার মুখস্থ। সবচাইতে বড় কথা, যে যেমন তার সঙ্গে তেমনভাবে মিশতে পারে অনুপমা। এহেন মহিলাকে প্রতিবেশিনী হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তবু প্রতিবেশিনী তো প্রতিবেশিনীই। তাকে দিয়ে মানুষের সব চাহিদা মেটে না।

পাহাড়ের কোলে কোলে অপর্যাপ্ত ফুলের সমারোহও আনে না পূর্ণতার অনুভব। বরং জাগিয়ে দেয় মনের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা একটা অভাববোধকে।

তাই বসন্তের উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হিমা-লয়ের কোলে বসেও সোনালীর মনে একটা ফাঁক থেকেই গিয়েছিল।

সে ফাঁক ভরিয়ে দিলো ইন্দ্রজিৎ এসে।

এমন বসন্ত আর কখনো এসেছে কি সোনালীর জীবনে? মনে পড়ে না। আর আশ্চর্য, ইন্দ্রজিৎও ঠিক ঐ ভাবেরই প্রতিধ্বনি করলেঃ 'জানো সোনালী, মনে হচ্ছে যেন বসন্ত এই প্রথম এল আমার জীবনে! হ্যাভ্ আই লিভ্‌ড্ অল্ দীজ্ ইয়ারস্? নাকি, রিপ্-ভ্যান্-উইঙ্কল্-এর মত ঘুমিয়ে ছিলাম এতদিন?'

'তুমি ঘুমিয়ে ছিলে?'—ডাগর চোখের পূর্ণদৃষ্টি মেলে ধরলো সোনালী ইন্দ্রজিতের দিকে—'বরং বলো, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম এতদিন! তুমি তো জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বেঁচেছ বাঁচার মত করে। লাইফ্

ইজ্ অ্যান্ অ্যাড্ভেঞ্চার! তুমি তা উপলব্ধি করেছ রক্তের অণুতে পরমাণুতে।'

'ইয়েস্, লাইফ্ ওয়াজ্ অ্যান্ অ্যাডভেঞ্চার ফর্ মী। কিন্তু এতদিন যেন আমার অভিযান চলছিল একটা রুক্ষ, ধূসর পার্বত্য পথে, যে পথে শুধু মৃত্যুশীতল বরফের রাজ্য...। আজ হঠাৎ সে পথে চলতে চলতে এসে পড়েছি এক অপ্রত্যাশিত ল্যান্ড্স্কেপের সামনে—যেখানে নীল সরোবরের ধারে ধারে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, আর জলের বুকে ফুটন্ত লাল পদ্মের পাপড়িতে ঠিকরে পড়ছে সোনালী সূর্যালোক...'

'তুমি কবিতা লেখো না কেন, জিৎ?' হাসলে সোনালী।

'তুমিই তো মূর্তিমতী কবিতা। তুমি যখন সামনে রয়েছ, তখন আর আমার কবিতা লেখার প্রয়োজন কি? যখন তোমার থেকে দূরে থাকবো, তখন না হয় চেষ্টা করে দেখা যাবে।'

'তোমার সঙ্গে কথায় আমার বারেবারেই হার হয়।'

'কিন্তু জীবনে তো তোমারই জয় হল।'

'কেন?'

'তুমি আমাকে সম্পূর্ণ জয় করে নিয়েছ। আমাকে তোমার হারাবার ভয় নেই। কিন্তু তোমাকে আমার হারাবার ভয় প্রতি মুহূর্তে।'

এর উত্তরে সোনালী বলতে পারতো: 'না গো তোমার ভয় নেই। আমি চিরকালের জন্যেই তোমার।' কিন্তু না। ওকথা বলতে ইচ্ছে করলো না। ওকে নিয়ে ইন্দ্রজিতের মনে একটু ভয় থাক না! আশা-আশঙ্কায় মেশানো ঐ দুরুদুরু অনুভূতি-টুকুই তো ভালোবাসাকে রাখে বাঁচিয়ে। মানুষের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অপ্রাপনীয়ের দিকে চলে তার নিগূঢ় আত্মার নিত্য অভিসার...

'একটা গান গাও না, জিৎ। আশেপাশে তো কেউ নেই।' ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালো সোনালী।

সত্যিই এখন আশেপাশে কেউ নেই। কি করেই বা থাকবে? শহরের বাইরে বেশ খানিক দূরে চলে এসেছে ওরা। চারদিকে শুধু সোনালী আলোয় ঝলমল করা পাইন, ফার, বার্চের বন, আর অজস্র নাম-না-জানা জংলা ফুলের ঝাড়। ইন্দ্রজিতের জীপটা দাঁড়িয়ে আছে খানিক দূরে পথের ধারে। শুধু পাখীদের কিচিরমিচির ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না

'গান? আমি তো মিলিটারী ম্যান্ আমি দুখানা গানই জানি, এক—দেশ দেশ নন্দিত করি, আরেক—ইট্ ইজ্ এ লং লং ওয়ে টু টিপারারি...' দুষ্টুমি করেই দুটো ওয়ার-সং-এর উল্লেখ করে ইন্দ্রজিৎ।

'তুমি গান জানো আমি জানি।'—চোখে চোখ রেখে হাসে সোনালী—'মাঝে মাঝে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে গুন্‌গুন করে গানের সুর ভাঁজো আমি দেখেছি। আর তোমার গলাও বেশ ভালো, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ, নিজেকে শোনাবার পক্ষে বেশ ভালো, আমিও স্বীকার করি।'—মুখ টিপে হাসে ইন্দ্রজিৎ—'তবে পরকে শোনাবার পক্ষে নয়।'

'আমি কি তোমার পর?'

'না, তুমি আমার পরম আপন।'

সোনালীর একখানা হাত হাতে তুলে নেয় ইন্দ্রজিৎ, তারপর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে গাইতে সুরু করে: ড্রিঙ্ক টু মী ওন্‌লি উইথ্ দাইন্ আইজ্, লীভ্ বাট্ এ কিস্ ইন দি কাপ্...

বাঃ, বেশ মাজা গলা তো ইন্দ্রজিতের। আর শুধু মাজাই নয়, মাদকতায় মাখানোও বটে। গানের কথা, সুর, ওর গাওয়ার ভঙ্গি, সবকিছু মিলে সৃষ্টি করে একটা পরিবেশ। ওর চোখের দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকে সোনালী।

'ড্রিঙ্ক টু মী ওন্‌লি উইথ দাইন আইজ' শেষ হতেই একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরে ইন্দ্রজিৎ: সখি জাগো, সখি জাগো, সখি জাগো, মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখী...

এখন ওর গাওয়ার মুড্ এসে গেছে,

বুঝতে পারে সোনালী। তাই ও অনুরোধের অপেক্ষা না করেই আরেকটা গান ধরলো।

তারও পরে আরেকখানা গান ঃ মনে রবে কিনা রবে আমারে, সে আমার মনে নাই মনে নাই...

গাইতে গাইতে ইন্দ্রজিতের গলায় সজলতার ছোঁয়া লাগে। সুরের বেদনা স্পর্শ করে সোনালীকেও...

গান শেষ হবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনে। তারপর হঠাৎ সোনালীর একখানা হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করে ইন্দ্রজিৎ।

নিজের গালের ওপর, চোখের ওপর হাতখানা রেখে খেলা করে ইন্দ্রজিৎ, তারপর নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে পিষতে থাকে। সোনালী বাধা দেয় না। শুধু চারদিকে তাকিয়ে দেখে লোকজন আছে কি না। নাঃ, কেউ কোথাও নেই...

হঠাৎ সোনালীকে ঘাসের ওপর শুইয়ে ফেলে ইন্দ্রজিৎ, তারপর ওর ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে নিজের ঠোঁট।

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সোনালী। দুহাত দিয়ে সে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করে ইন্দ্রজিৎকে। কিন্তু দুয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পরই হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। ইন্দ্রজিতের বলিষ্ঠ, উষ্ণ পুরুষস্পর্শে কি একটা অজ্ঞাত অনুভূতি ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে তার সর্বাঙ্গে।

পুরুষের কাছে এমন নিরুপায় আত্মসমর্পণ জীবনে এই প্রথম সোনালীর। ইন্দ্রজিতের ঐ প্রকান্ড বলিষ্ঠ দেহের নীচে সে একটা ছোট্ট নরম ঘুঘুপাখীর মতই অসহায়...

ইন্দ্রজিৎ কিন্তু বেশিদূর যায় না। সোনালীর উদ্ধত, সুগঠিত দেহটিকে নিষ্পিষ্ট পেষণে পিষে ফেলবার নিদারুণ ইচ্ছা সে সংবরণ করে। এক মুহূর্তের অসংযম যদি সোনালীকে চিরদিনের জন্যে বিরূপ করে তোলে তার প্রতি? যদি তার ধারণা হয় ইন্দ্রজিৎ একটা বর্বর পশুমাত্র? সোনালী যে অনভিজ্ঞা, অপাপবিদ্ধা কুমারী।

'আমার সোনালিয়া, আমার গোল্ড-বার্ড, আমার অরিয়েটা...' সোনালীর মাথাটা দুহাতে ধরে আদর করতে থাকে ইন্দ্রজিৎ।

এত বিচিত্র নামে কি কেউ কখনো ডেকেছে সোনালীকে? এমন সোহাগের বন্যায় কেউ কি কখনো ডুবিয়ে দিয়েছে তাকে?...

'তুমি কি সুন্দর, সোনালী! কি সুন্দর তোমার চোখ! কি নরম তোমার গাল!' বলতে বলতে সোনালীর কপালে, গালে, ঠোঁটে অজস্র চুম্বন করে ইন্দ্রজিৎ।

'কি সুন্দর তোমার হাতদুটো! মনে হয় যেন মাখনের মত মসৃণ!' সোনালীর বাহুতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে ইন্দ্রজিৎ।

লজ্জায় চোখ বুজে আসে সোনালীর, মুগ্ধ পুরুষদৃষ্টির নীচে শুয়ে। ইচ্ছে করে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায় কোথায়, কোনোমতে নিজের নারীদেহটাকে লুকিয়ে ফেলে ইন্দ্রজিতের চোখের সামনে থেকে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই ঐ পুরুষটির সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি কি তার আছে এই মুহূর্তে? না, নেই। এটাই নিদারুণ সত্য। সোনালী যে ওকে ভালোবাসে, তা এই মুহূর্তে যেমন করে বুঝতে পারছে, তা এর আগে কখনো পারেনি। ভালো না বাসলে এখন সোনালী তার সমস্ত দেহে-মনে অনুভব করছে কেন যে ইন্দ্রজিৎই কর্তা, আর সে শুধু কর্ম? নিজেকে ঐ প্রকান্ড বলিষ্ঠ পুরুষটির হাতে ক্রীড়নক মনে হয়...

কান্না পায়। কান্না পায় সোনালীর। পুরুষের কাছে একি নিদারুণ পরাজয় তার। এমন অসহায় পরিস্থিতির মাঝখানে কোনোদিন তাকে পড়তে হবে একি সে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল?...

'একি সোনা, তুমি কাঁদছ?'

সোনালীকে ছেড়ে দিয়ে ঝট্ করে উঠে বসে ইন্দ্রজিৎ।

'সোনালী, তোমায় কি আমি দুঃখ দিয়েছি? বলো, বলো, আমি কি অজান্তে কিছু অন্যায় করেছি? তাহলে আমাকে ক্ষমা করো।' ইন্দ্রজিতের মুখ বেদনার্ত দেখায়।

'তোমার কোনো দোষ নেই।' রুমালে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে সোনালী।

'তাহলে? তাহলে কাঁদছ কেন তুমি?'

'জিজ্ঞেস কোরো না, ইন্দ্র, বোঝাতে পারব না। দয়া করে আমাকে কাঁদতে দাও।'

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে সোনালীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না লক্ষ্য করে ইন্দ্রজিৎ। আর বহুদিন আগে দেখা ডি এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের একটি বিশেষ উক্তি এই মুহূর্তে মনে পড়ে তারঃ নারীচরিত্র অপূর্ব প্রহেলিকা!

খানিক পরে চোখ মুছেটুছে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে সোনালী। তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসে।

যাক! এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ। মেয়েদের কান্না সে একবারে সহ্য করতে পারে না। কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে।

'চলো, একটু ঘুরে আসি।' হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ইন্দ্রজিৎ। সোনালীর মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চায় সে।

ইন্দ্রজিতের প্রস্তাবে কোনো আপত্তি করে না সোনালী। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়।

চারদিকে বনফুলের দল উচ্ছ্বসিত হয়ে নুয়ে পড়ছে বসন্তের হাওয়ায় বারবার। তারই মাঝখান দিয়ে ওরা হাঁটে, উঁচু-নীচু পায়ে-চলা পথ বেয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পড়ে একটা ঝর্ণার ধারে।

ছোট্ট ঝর্ণা। কিন্তু কি দুরন্ত বেগ! প্রচন্ড বিক্রমে লাফ খেয়ে নামছে বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে। উৎক্ষিপ্ত জলকণার দলে সূর্যালোক পড়ে নানান রঙের ঝিকিমিকি চোখকে মুগ্ধ করে দেয়।

'এসো, এখানটায় বসে লাঞ্চটা সেরে নিই।' নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটুখানি উঁচু জমির ওপর বসে পড়ে ইন্দ্রজিৎ।

টিফিন কেরিয়ার, ওয়াটার বটল্ আর ফ্লাস্ক্ সঙ্গেই ছিল। ওয়াটার বটল্ খুলে হাত ধুতে শুরু করে সে।

সোনালীও হাত ধুয়ে নেয়। খিদে পেয়েছে তারও।

খাবারের ব্যবস্থা বেশ ভালোই করেছে ইন্দ্রজিৎ। নিজের জন্যে এনেছে ফ্রুট স্যান্ডউইচ, ভেজিটেবল কাটলেট, আর সোনালীর জন্যে এনেছে এগ স্যান্ডউইচ আর মাটন কাটলেট। এ-ছাড়া দুজনের জন্যেই এনেছে সন্দেশ, কাজুবাদাম, নোনতা বিস্কুট আর ফ্লাস্কভর্তি ওবলটিন।

খেতে খেতে ইন্দ্রজিৎ বলে ঃ 'আমার ওপরে আর রাগ নেই তো?'

'আমি রাগ করিনি তো।' ঝর্ণার বুকের ওপর বিচ্ছুরিত জলকণার গায়ে গায়ে লীলায়িত রামধনুর রং দেখতে দেখতে জবাব দেয় সোনালী।

সোনালীর মুখ একটুখানি লক্ষ্য করে ইন্দ্রজিৎ। তারপর বলে ওঠে ঃ 'পসিবিলি আই শুড নট হ্যাভ ডান হোয়াট আই ডিড। এনিওয়ে, যা হয়ে গেছে তাতো হয়েই গেছে। তবে ভবিষ্যতে আর কখনো এমন ব্যাপার ঘটবে না।'

ইন্দ্রজিতের মুখ দেখে বোঝা যায় সে সত্যি কথাই বলছে। আর একথা শুনে সোনালীর নির্ভয় হবার কথা, আশ্বস্ত হবার কথা।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সোনালী আশ্বস্ত হয় না। পুরুষের অ্যাগ্রেসিভনেস মেয়েদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে, এমন কি বিদ্রোহও জাগায়। কিন্তু তাই বলে কোনো পুরুষ যদি খৎ লিখে দেয় যে সে কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই অ্যাগ্রেসিভ হবে না, তবে তাতে আশ্বাস বা আনন্দ পায় কোন্ মেয়ে, যদি সে তাকে ভালোবাসে? যেখানে ভয় নেই, কোনোরকম রিস্ক্ নেই, সেখানে রোমাঞ্চই বা কোথায়?

নিজের মনে তলিয়ে সোনালী দেখে, আজকের এই চুম্বন ব্যাপারটা একই সঙ্গে তাকে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করছে। ইন্দ্রজিৎ তাকে কাছেও টানছে, দূরেও ঠেলে দিচ্ছে।

কথাবার্তা খুব আর জমে না আজ ওদের মধ্যে। দুজনের মাঝখানে থমথম করে একটা অবোধ্য গাম্ভীর্য আর দূরত্ব। সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না দুজনের কেউই।

খানিক বাদে সোনালীকে 'মহাকাশ' হোটেলের সামনে পৌঁছে দেয় ইন্দ্রজিৎ।

'আচ্ছা, কাল আমি শিলিগুড়ি যাচ্ছি। পরশু আবার দেখা হবে।' বিদায়ের মুহূর্তে বলে ইন্দ্রজিৎ।

'আচ্ছা।'

কাল দেখা হবে না। ইন্দ্রজিৎ চলে যাবার পরই কথাটা যেন ঠিকমত মাথায় ঢোকে সোনালীর। আর সঙ্গে সঙ্গেই আসে কেমন একটা শূন্যতাবোধ।

আশ্চর্য! যতক্ষণ ও কাছে ছিল, ভালো করে কথাই বলে নি সোনালী। কতরকম দার্শনিক জল্পনা আর তর্কবিতর্ক মাথায়

আসছিল। এমন কি ইন্দ্রজিৎ ওকে জোর করে চুমো খেয়েছিল যে মুহূর্তে, সেই মুহূর্ত থেকে অনেকবারই সোনালীর মনে হয়েছে, আগামীকাল সে আর ওর সংগে দেখা করবে না। একটা গোটা দিনের জন্যে সে শাস্তি দেবে ওকে। যদিও কিসের শাস্তি, তা ঠিক নিজেও জানে না সোনালী। ইন্দ্রজিৎ তো ওকে শুধু চুমোই খেয়েছে, আর কিছু করে নি। আর সেই চুম্বন কি ওর নিজেরও ভালো লাগে নি? তবে?

কাল দেখা হবে না। এ ব্যবস্থা সোনালী করে নি। আত্ম-অস্বীকৃতির গৌরব বা আনন্দ এর মধ্যে নেই। এ শুধুই ঘটনাচক্রের ব্যাপার।

নাকি, ইন্দ্রজিৎ মিথ্যা বললো? সত্যিই কি ওর কাজ আছে কাল শিলিগুড়িতে? নাকি, সোনালীকে এড়াবার জন্যে

হয়তো ও ভুল বুঝেছে। ভেবেছে সোনালী ওকে ভালোবাসে না। কিম্বা হয়তো ভেবেছে, সোনালী ওর ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। এমন ভাবাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

কতদিন পরে দেখা হল। তবু এই সামান্য সময়টুকুও পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে জানে না সোনালী। অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্বে নিজে দুঃখ পায়, অপরকেও দুঃখ দেয়......

(৯)

সন্ধ্যের শোতে একটা ইংরিজী বই দেখে 'ক্যাপিটল' সিনেমা-হল থেকে বেরিয়ে আসছিল সোনালী, এমন সময় দেখা হয়ে গেল দেবব্রতর সঙ্গে।

'চলুন, একসঙ্গে চা খাওয়া যাক।' প্রস্তাব করলো দেবব্রত।

'চলুন।' সানন্দেই সায় দিলো সোনালী। আজ সে একা। দার্জিলিং-এর এমন আলো-ঝলমল বাসন্তী সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গতা অসহনীয়।

'চলুন আজ আপনাকে একটা বাঙালী রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই।'

ইচ্ছে করেই অনেক হাঁটলো ওরা। একটু বেড়াবার উদ্দেশ্যে চললো ঘুরপথ দিয়ে।

চলতে চলতে সোনালী একসময় বললে: 'আচ্ছা, বিশ্বাসবাবুর খবর কি বলুন তো? কদিনের মধ্যে দেখিনি অফিসে।'

'বিশ্বাস? ও তো এখানে নেই। ওর বাড়ীর কেউই নেই। ওরা সবাই চলে গেছে কলকাতায়।'

'ছুটি নিয়েছেন উনি, নাকি?'

'ছুটি ফুটি নয়। ওর কাজ চলে গেছে। বদ্ধপাগলকে অফিসে কেন রাখবে, বলুন? আর ছুটি ওর পাওনা কিছুই ছিল না। যতদিন সম্ভব কোনোরকমে টিঁকিয়ে রেখে-ছিল অ্যাড্রিউ সাহেব। সাহেব তো এই দিন চার-পাঁচ হল অফিসে জয়েন করেছে। তার আগেই বিশ্বাসরা চলে গেছে।'

সামান্য ছোট্ট একটা খবর। অফিসের কারও তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু গোটা পরিবার কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল?

মানুষের মৃত্যুর সংবাদও অন্যেরা এমন সহজভাবেই নেয়। হয়তো একটু চমকে ওঠে প্রথমটা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর সব যেমনকার তেমন। কোনো ক্ষতি যতক্ষণ না আমাদের নিজেদের স্পর্শ করে, ততক্ষণ সেটার গুরুত্ব আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি না। তাই খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা যুদ্ধ, ভূমিকম্প, প্লাবনের সংবাদ আমাদের রোমাঞ্চিত করে। নিতান্তই বিবেকের তাড়নায় একটু আহা-উহু করি বটে, কিন্তু ওগুলোই যে সবচাইতে আকর্ষণীয় গরম খবর, তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি?...নিজের মনেই এসব কথা ভাবে সোনালী, হাঁটতে হাঁটতে।

'এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন যে হঠাৎ?'

দেবব্রতর কথায় চমকে উঠে সোনালী বলে: 'কিছু না। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, থাকগে। কি বলছিলেন বলুন।'

'কিছু বলছিলুম না তো আমি!'—হাসে দেবব্রত—'আমি যে চুপ করে ছিলুম এতক্ষণ তাও আপনি লক্ষ্য করেন নি, এতই অন্য-মনস্ক!'

'এখন আর অন্যমনস্ক নই। সব কিছু দেখতেও পাচ্ছি শুনতেও পাচ্ছি। কি বলবেন বলুন।'—হাসি হাসি মুখে দেবব্রতর দিকে তাকায় সোনালী।

এই মুহূর্তে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে! ভাবে দেবব্রত। সোনালী দেখতে ভালো একথা প্রায় সবাই বলবে। কিন্তু দেবব্রত শিল্পী। সাধারণো সুরূপ বলে পরিচিত অনেককেই তার চোখে সুন্দর ঠেকে না। আবার যাদের সে সুদর্শন বলে মনে করে তারাও সব মুহূর্তে সুন্দর ঠেকে না তার চোখে। সৌন্দর্য ধরা দেয় শুধু দুর্লভ মুহূর্তে। যখন সে আসে বিস্ময়ের হাল্কা চমক নিয়ে। প্রাত্যহিক পরিচয়ের দরুণ একঘেয়েমির পর্দাটা সেই মুহূর্তে হঠাৎ সরে যায়।

আজ এই মুহূর্তে সোনালীকে তার মনে হচ্ছে অপরূপা। এই তো পথ দিয়ে কত লোক চলছে। কত মেয়ে হাঁটছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা সবাই জনতার অংশ। আর সোনালী যেন সম্রাজ্ঞী। কি আশ্চর্য মায়া ওর স্বপ্নিল চোখের বড় বড় কালো পাতায়, কি অপরূপ সৌকুমার্য ওর ঠোঁটে, কি রাজ্ঞীজনোচিত মহিমা ওর দেহের গড়নে, ওর চলায়......

বটল্-গ্রীন রঙের শাড়িতে আর ব্লাউজে সোনালীর উদ্দাম যৌবন উপচে পড়ছে। ওর দেহের অপরূপ ভঙ্গিমা রোমক ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়...

'কি হল, বোবা হয়ে গেলেন যে একবারে!' বলে সোনালী।

'বোবা হইনি! অনেক কথাই মনে আসছে। কিন্তু ভয়ে বলতে পারছি না।'

'ভয় কেন? খারাপ কিংবা রূঢ় কথা বুঝি?'

'না না, ওসব নয়। আমার মনে যা আসছে তা হচ্ছে একটা বন্দনাগীতি গোছের। কিন্তু আপনি শুনে কি বলবেন তা জানি না।'

'বন্দনা-গীতি? সে আবার কি?'

'অনেকটা তাই। আপনাকে দেখে এই মুহূর্তে আমার বায়রন মনে পড়ছে:
শী ওয়াক্‌স্ ইন্ বিউটি লাইক দ্য নাইট
অব্ ক্লাউডলেস ক্লাইমস্ অ্যান্ড স্টারি স্কাইজ,
অ্যান্ড অল দ্যাটস্ বেস্ট অব ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইট্
মীট ইন্ হার অ্যাসপেক্ট অ্যান্ড হার আইজ্।'

দেবব্রত বুদ্ধিমান, রুচিবানও বটে। না ভেবে পারে না সোনালী। সোজাসুজি ও যদি বলতো 'আপনাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে', তবে সোনালীর কাছে ওর কথা হত আর পাঁচজন পুরুষের কাছ থেকে শোনা কথারই পুনরাবৃত্তি। এবং বড্ড ডাইরেক্ট বলে সেকথা শুনতে তেমন ভালো লাগতো না। রুচিতে একটু আঘাত দিতো। মনে হত যেন খোসামোদ। কিন্তু দেবব্রতর বলবার ভঙ্গি এবং ভাষায় বিশেষত্ব আছে......

তবু লজ্জা সোনালী পেলো ঠিকই। আত্মস্তুতি শুনলে লজ্জা পায় মানুষমাত্রই। বিশেষ করে সে স্তুতি যদি হয় দেহসৌন্দর্য সম্পর্কে।

'এই যে এসে গেছি। আসুন।' একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো দেবব্রত।

বাঙালী রেস্তোরা! সোনালী ভেবেছিল এখানকার খাবার-দাবার বুঝি অন্য জায়গার থেকে ভালো হবে।

কিন্তু খেতে গিয়ে দেখলো মোটেই তা নয়। সবতেই নুন বেশি। এমন কি চা-টাও খুব অযত্নে তৈরী। এর থেকে কোনো সিন্ধী কিংবা নেপালী রেস্তোরাঁয় ঢুকলে ভালো ছিল।

দেবব্রতর কিন্তু অন্য মত। শুধুমাত্র বাঙালীর দোকান বলেই এখানকার সব কিছুতে ওর একটু বিশেষ পক্ষপাত। বলে: 'এখানে জিনিসের দাম একটু সস্তা। তাছাড়া এখানে খাবারের প্রিপেয়ারেশন ভালো করে।'

'ওটা আপনার কল্পনা!'—হাসে সোনালী—

'আপনি এমন প্যারোকিয়াল, কেন বলুন তো? বাঙালীর জিনিস বলেই ভালো হতে হবে?'

'না, সত্যি আমি একা না, আরো অনেকেই বলে এখানকার জিনিস ভালো এবং শস্তা।'

'যারা বলে তারা সবাই বোধহয় বাঙালী? ওটা হচ্ছে বাঙালীর ওপর বাঙালীর পক্ষপাত।'

'পক্ষপাত নয়। ওটা হচ্ছে ভালোবাসা। আপন জাতের প্রতি ভালোবাসা। যেটার জন্ম হচ্ছে আত্মসংরক্ষণের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে।'

'বাঙালী বাঙালীকে ভালোবাসে, এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না। বাঙালীর বাঙালিয়ানার মধ্যে গোঁড়ামি যতটা তার শতাংশও স্বজাতিপ্রেম আছে বলে আমি প্রমাণ পাইনি। তবে প্রাদেশিক স্বজাতিপ্রেমও বেশিদূর গেলে তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা প্রথমে ভারতীয়, তারপরে বাঙালী কিংবা মাদ্রাজী কিংবা গুজরাটী।'

'আপনার ঐ উচ্চ আদর্শ মেনে ক'জন চলছে?'

'ক'জন চলছে তা জানি না। তবে সবারই চলা উচিত। ন্যাশনাল সারভাইভাল-এর জন্যেই। এবং ন্যাশনাল সারভাইভাল-এর সঙ্গে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল সারভাই-ভ্যাল জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা হবে না।'

'জাতীয়তাবোধটা সত্যিই আমাদের বড় কম।'

'শুধু তাই নয় আমাদের দেশের বহু বুদ্ধিমান লোকও জাতীয়তা শব্দটার অর্থই জানে না। তারা ভাবে, জাতীয়তা মানে হচ্ছে পুরনো সংস্কার এবং অভ্যাসকে আঁকড়ে ধরে থাকা। কোনো জাত যে তার অতীত অভ্যাসগুলোকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলেও জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে, তা আমরা বুঝি না। আমরা জানি না যে, জাতীয়তা মানে হচ্ছে জাতির স্বার্থ সম্পর্কে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রাচীনের প্রতি অন্ধ ভক্তি নয়। জাতীয়তাবাদী হতে হলেই আমাদের মনুপরাশরকে ধরতে হবে, তা নয়। যুগোপযোগী পরিবর্তনের সমস্ত ঢেউকে মেনে নিয়েও আমরা জাতীয়তাবাদী হতে পারি। তবে হ্যাঁ, জাতীয়তা যেন অত্যধিক উগ্র হয়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জাতীয়তা জিনিসটা হচ্ছে কি জানেন ন্যাশনাল ইগো। ইন্ডিভিজুয়াল ইগো যেমন মানুষের আত্ম-রক্ষা এবং আত্ম-বিকাশের জন্যে প্রকৃতিদত্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান, জাতির আত্মরক্ষা এবং আত্ম-বিকাশের জন্যেও তেমনি প্রয়োজন হচ্ছে ন্যাশনাল ইগো। কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ইগো যেমন বড় বেশি প্রবল হয়ে উঠলে ব্যক্তির পক্ষে এবং তার পারিপার্শ্বিক মানুষ-দের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, ন্যাশনাল ইগোও তেমনি অত্যুগ্র হয়ে উঠলে জাতির এবং পৃথিবীর পক্ষে ক্ষতিকর।'

কথার মাঝখানে হোটেলের বয় এসে দাঁড়ালো।

বিল চুকিয়ে দিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। 'মহাকাল' হোটেলের সামনে সোনালীকে পৌঁছে দিয়ে দেবব্রত বললে: 'আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না। তাই অনেক ভাগ্যে আপনার দেখা মিললো।'

'কেন? অফিসে রোজ দেখেন না আমাকে?'

'ও:, ও কি আর দেখা!'

আরো দু-চারটে কথার পর বিদায় নিলো দেবব্রত। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠেই সোনালী দেখতে পেলো অনুপমাকে। অনুপমা পায়চারি করছিলো আপন মনে। সোনালীকে দেখতে পেয়ে বললে: 'হোটেল থেকে আপনার খাবার দিয়ে গেছে। আপনার ঘর তো বন্ধ ছিল, তাই আমার কাছেই রেখে গেছে টিফিন কেরিয়ারটা।'

টিফিন কেরিয়ার নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল সোনালী। খাওয়া-দাওয়া সেরে বই পড়লো খানিক। তারপর এসে দাঁড়ালো বারান্দায়।

আশ্চর্য জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল রাত্রি। এখন চারদিক নিস্তব্ধ। সামনের ঢালু সর্পিল পথটা নির্জন। পথের দু-ধারে দীর্ঘ পাইন, ফার, বার্চ দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মাথা তুলে।

সোনালীর ঘরটা হোটেলের একান্তে। এঘরের সামনে দাঁড়ালে বড় রাস্তা বা রেল-লাইন চোখে পড়ে না, দার্জিলিং শহরের বৈদ্যুতিক আলোগুলোও নয়। এখান থেকে দেখা যায় 'ধীরধাম'-এর মন্দির, দেখা যায় নীচের দিকে নেমে যাওয়া অতিদীর্ঘ, অচেনা গাছের শেষহীন অরণ্যানী আর তারও ওপারে বনের-মাথা-ছাড়িয়ে-ওঠা অনেক উঁচু গিরিশৃঙ্গের পর গিরিশৃঙ্গ...

সামনের আকাশে পূর্ণচন্দ্র জ্বলজ্বল করছে। আশেপাশে সোনালী আর রুপোলী তারাদের ভিড়।...নীচে আলুলায়িত নির্জন পথ জ্যোৎস্নালোকে সম্মোহিত...

এমন স্বপ্নময়ী বিমুগ্ধ রাত্রি কি কল-কাতায় দেখা যায় কখনও? এই রাত্রির ছায়ার মন আপনি প্রসারিত হয়। আসক্তির গ্রন্থিগুলো যায় আলগা হয়ে। একটা অদ্ভুত ভাব মনে আসে সোনালীর। বোধহয়, সে যেন কারো নয়, কোথাওকার নয় মানব-সমাজের সে কেউ নয়। সে যেন ওই দূর কোনো নক্ষত্রলোকের অধিবাসী, কোনো অজানা কারণে হঠাৎ ছিটকে এসে পড়েছে এই পৃথিবীতে। পরিচিত মানুষদের একটা মিছিল যেন তার মানসচক্ষের সামনে দিয়ে চলে যায়—দেবব্রত, অনুপমা, ইন্দ্রজিৎ...এরা তার কেউ নয়। না, ইন্দ্রজিৎও নয়। এরা সবাই শুধু স্বপ্ন। এই জীবন, সোনালীর এই দার্জিলিং-এ চাকরী করতে আসা, এই এতলোকের সঙ্গে পরিচয়, সবই ঘটছে যেন একটা তন্দ্রার ঘোরে। কিছুই সত্য নয়। এই যে ইন্দ্রজিৎকে তার ভালো লাগছে, তার অদর্শনে বেদনাবোধ হচ্ছে, এ সব কিছুই যেন একটা খেলার মত। খেলাটা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ মনে হয় যেন সেটা জীবন-মরণের ব্যাপার। কিন্তু যেই সেটা শেষ হয়ে যায় অমনি হঠাৎ উপলব্ধি হয়, ওটা শুধু খেলাই। তার বেশি নয়।

জীবনটা হয়তো একটা খেলাই। তবু খেলা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তার হারজিৎ, তার সুখ-দুঃখ মানুষকে স্পর্শ করবেই...

অবশ্য কোনো কোনো মুহূর্তে সম্পূর্ণ ডিট্যাচমেণ্ট বা বিচ্ছিন্নতার একটা ভাব আসে। যেমন এই মুহূর্তে সোনালীর এসেছে। কিন্তু এ ভাবটাকে ধরে রাখা যায় না বেশিক্ষণ...

তাই চন্দ্রালোকিত বহির্বিশ্বের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরের অন্ধকারে এসে প্রবেশ করার মুহূর্ত পরেই অন্য অনেক অনুভূতি আর চিন্তা এসে ছেঁকে ধরে সোনালীকে।

ঘুমের ঘোরে এলোমেলো স্বপ্ন দেখে। সে যেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলেছে একটা ছোট্ট ভেলায় করে ঢেউয়ের মাথায় মাথায়, আর দুধার থেকে অনন্ত অগাধ জলরাশি তাকে গিলে খেতে আসছে। অনেক দূর, অনেক দূর কোনো অজানা দেশের সন্ধানে চলেছে সে—দিকচিহ্নবিহীন জলপথে। হঠাৎ দূরে দেখা গেল একটা কালো বিন্দুর মত কি। বিন্দুটা ক্রমে বড় হল, হতে হতে একটা জাহাজে পরিণত হল। জাহাজটা কাছে এল, খুব কাছে। এখন দেখা গেল ক্যাপটেনকে। অস্পষ্টভাবে। সুস্পষ্ট মূর্তি নয় কোনও। শুধু একটা আভাস। অনেক চেষ্টা করেও মুখের রেখাগুলো ভালো বোঝা যায় না...

ক্যাপ্টেনের আদেশে নাবিকেরা ভেলা থেকে টেনে তুললো সোনালীকে—জাহাজের ডেকের ওপর। এবার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে চোখাচোখি। প্রথমে একটি চেনা মুখের আভাস। কিন্তু সে আভাস ফুটতে না ফুটতেই বিলীন। এবার একটি অন্য পরিচিত মুখের আভাস। কিন্তু নাঃ, সে আভাসও টিকলো না। ঝাপসা হয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর চারদিকে আর কিছুই দেখা যায় না। শুধুই অকূল জলধি...

স্বপ্নের পর স্বপ্ন। অর্থহীন অথচ অর্থময়। অনেক টুকরো টুকরো স্বপ্নের দীর্ঘ একখানা মালা...

এমনি করে সোনালী যখন তন্দ্রার গভীরে নীল হয়ে যাচ্ছিলো, আরেকজনের চোখে তখন ঘুম ছিল না। সে দেবব্রত।

নির্জন বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়েছিল সে। সামনে দেবদারু গাছের ডাল দুলছিল বসন্তের ঝর্ঝরানো হাওয়ায়। বারান্দার রেলিং-এর গায়ে তারই ভাঙা ভাঙা ছায়া আর চাঁদের আলো মিলে কেটে চলছিল কালো আর রুপোলীর আঁকিবুকি। ...ঘরের ভিতরকার রেডিওগ্রাম থেকে ভেসে আসছিল সরোদ দরবারী কানাড়ার অপূর্ব মূর্ছনা......

এই চন্দ্রালোকিত, পূর্ণযৌবনা অথচ নিঃসঙ্গ, স্তব্ধ রাত্রির বিপুল, ভাষাহীন বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে দরবারী কানাড়ার ক্রন্দনে, মনে হচ্ছিলো দেবব্রতের। ঐ কান্নার মধ্যে তার নিঃসঙ্গ আত্মা খুঁজে পাচ্ছিলো একধরণের মুক্তির স্বাদ।

সরোদের ঝঙ্কার একসময় থামলো। কিন্তু দেবব্রতর মনে হতে লাগলো সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি স্পন্দিত করে এখনো চলেছে দরবারী কানাড়ার গুমরে গুমরে ওঠা কান্নার গভীর রণন। সে রণণ যেন মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে, সমস্ত আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করে, তার ওপারে ঐ দূর নক্ষত্রলোক ছাড়িয়ে চলে গেল, মিশে গেল অজানা, অতলান্ত কোন্ অন্ধকারের রাতে।

সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে যেতে লাগলো। পূর্ণিমার চাঁদ ক্রমেই পাণ্ডুর হল, তারারা একে একে নিবে গেল। শেষ রাতের ঠাণ্ডা অন্ধকার গ্রাস করলো পৃথিবী।

এবার দেবব্রত ঘুমোতে গেল।
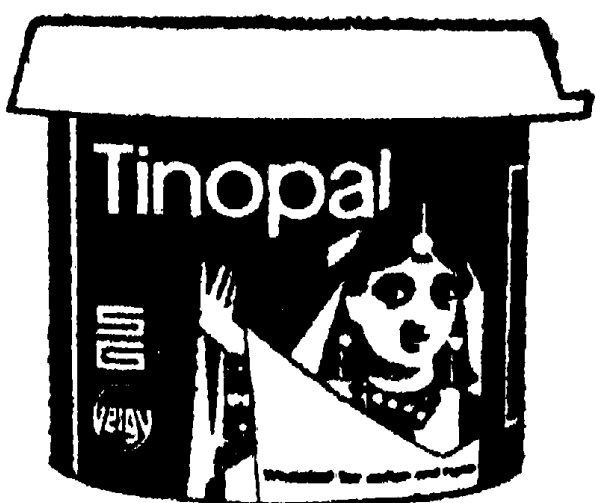
(ক্রমশঃ)

নিশ্চই আছে

যদি ফিট সার্টিফিকেট চান…

নেহেরু সরণি, লিন্ডসে স্ট্রীট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, তিন মিনিটে কভার করে বাঁয়ে টার্ণ নিয়ে পার্ক স্ট্রীটে সাততলা রয় কোর্টের সামনে ট্যাকসি থামাল মনোজ। মুখ না ঘুরিয়েও বুঝতে পারল ব্যাকসীটে রাস-লীলা চলছে তখনো। সারাটা পথই নায়িকার খিল-খিল হাসির ফাঁকে-ফাঁকে 'ওহ...নো...প্লীজ' গানের ধুয়ার মত ঘুরে-ফিরে কানে এসেছে। তখনো তার রেশ কাটে নি। শা...লা। ইচ্ছে হল, দরজা খুলে লাথি মেরে আপদ দুটোকে এখুনি রাস্তায় বার করে দেয়।

এক লাফে দরজা খুলে, চট করে সামনে দিয়ে গাড়িটা ঘুরে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ব্যাকসীটের দরজাটা খুলে দিল মনোজ—রয় কোর্ট স্যার। লীলা খেলার মাঝপথে বাধা পেয়ে বিরক্তিতে পাঁচু সেনের ভোজালি ভুরু জোড়ার বাঁ দিকটা তিনসুতো নেমে গেল। খোলা দরজায় মুখ বাড়াতেই চোখে পড়ল লাল, নীল, হলদে, সবুজ নিয়ন সাইনে সাজানো-গোছানো রয় কোর্টের একতলার অফিস, বার, রেস্তোরাঁ, সেলুন, সাঁলো। পাঁচু সেন বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে, পেছনে-পেছনে আঁচল সামলাতে-সামলাতে নায়িকা। মনোজ এক গাল কৃতার্থের হাসিতে মুখটা ভাসিয়ে গদ-গদ গলায় বলল—তাহলে চলি স্যার।

চলি স্যার, নেড়ি কুত্তার মত পাঁচু সেনের চোয়াল জোড়া খেঁকিয়ে উঠল—চলবে কি অ্যাঁ? আমি ওপরে যাচ্ছি। যতক্ষণ না আসি এইখানেই থেকো। কোথাও যেয়ো না। বুঝতে পারছ ছোকরা?

ছোকরা বুঝতে পারল কি পারল না সেদিকে একবারও না তাকিয়ে নায়িকার কোমর জড়িয়ে লোকভর্তি রাস্তায় প্রায় নাচতে-নাচতে রয় কোর্টের ভেতরে চলে গেলেন পাঁচু সেন। বোবা মুখে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মনোজ। কি আর বলবে? বেশ বুঝতে পারছে একটা সন্ধ্যা বরবাদ হয়ে গেল। করার কিছু নেই।

করার নেই কিছু কিন্তু ধনা মিত্তির ছাড়বে না। রাত্রিবেলা গাড়ি গ্যারেজে পুরে, সারা দিনের হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে, কড়-কড়ে পঁয়ত্রিশটা টাকা মালিকের হাতে জমা দিয়ে যখন বাড়ি ফেরে মনোজ তখন প্রায় দিনই স্ট্যাণ্ডে বাস পায় না। হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়। মাঝে-মধ্যে যেদিন আর পা চলে না, একটা রিকসা নেয়, আশীটা পয়সা গচ্চা যায়। কিন্তু আজ যে গচ্চা দেওয়ার মতোও আর কিছু পকেটে থাকবে না। ধনা মিত্তিরকেই বা কি দেবে?

বুক পকেটে হাত চালিয়ে আধ-ময়লা তেড়া বেঁকা নোটের একটা ছোট গোছা বার করে আনল মনোজ। থুতুতে আঙুলের ডগা ভিজিয়ে-ভিজিয়ে গুণতে লাগল—দুই, সাত, আট, নয়, চোদ্দ...উনিশ, কুড়ি, ত্রিশ... একত্রিশ, বত্রিশ। কিছু খুচরো আছে ঝুল পকেটে। সকাল সাতটা টু দুপুর দুটো, একটানা খেটে এই কটা টাকা রোজগার হয়েছে আজ। এর থেকে পেট্রোল, মবিলের দাম চোকাতেই যাবে ষোল-সতেরো টাকা।

দুপুরে ঘন্টা দুয়েক রেস্ট নিয়ে ফের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল মনোজ। ধনা মিত্তিরের বাড়ীর সবাই আজ একটা হিন্দী বই দেখতে এল ধর্মতলায়। তাদের পেঁৗছে দিয়ে ম্যাটিনী ভাঙ্গার ভিড়টা ধরার আশায় মেট্রোর উল্টো দিকে শকুনি চোখে অপেক্ষা করছিল মনোজ। পর-পর দুটো পার্টি ফিরিয়ে দিল—এক দল যাবে বরা-নগর, অন্যটা টালিগঞ্জ। যেদিকেই যাও ফিরতি পথে প্যাসেঞ্জার মিলবে না, খালি-খালি পেট্রোল পুড়বে। তার ওপর চিৎপুর বা টালিগঞ্জের ট্র্যাফিক জ্যামে পড়লে তো আর কথাই নেই। তিনটি ঘন্টা স্রেফ নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। অথচ সন্ধ্যার এই ঘন্টা তিন-চারের আয়েই সমস্ত খরচা মিটিয়ে মনোজের পকেটে দশ-পনেরোটা টাকা আসে। এই টাকা কটাই ওর একমাত্র সম্বল। রোজ গাড়ি পায় না। পর-পর দু-দিন চালিয়ে একদিন রেস্ট নেয়। কাল ছুটি। তাই আজ চুটিয়ে পার্ক স্ট্রীট, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী, ভিকটোরিয়া, গঙ্গার পাড় ঘুরে-ঘুরে স্ফূর্তিবাজ সওয়ারীদের তুষ্ট করে দু পয়সা কামিয়ে নিতে হবে। সেই ধান্ধাতেই মিটারে লাল শালুর টোপর চড়িয়ে সুখের পায়রাদের আশাতেই বসে-ছিল মনোজ। আর ঠিক তখুনি চোখে পড়ল পাঁচু সেন আসছেন, আড়াআড়ি রাস্তা ক্রস করে। সঙ্গে আবার একটা মেয়েছেলে।

পোড়া কপাল। পালানোর পথ পেল না। সামনে-পিছনে গাড়ির লাইন। সেন সাহেবও আর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা ওর ট্যাকসিতেই এসে ঢুকলেন। অর্ডিনারী প্যাসেঞ্জারদের যা হোক একটা তাপ্পি মেরে কাটান দেওয়া চলে, কিন্তু গাবতলার পাঁচু সেন জানেন সব। গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ওঁরাই ইস্যু করেন। কোন ধাপ্পা চলবে না।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লাল শালুর ঘোমটা সরিয়ে মিটারটা নামিয়ে ভেতরে এসে স্টার্ট দিতে-দিতে মনোজ জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাব স্যার? স্যার তখন নায়িকার গায়ে গা ঠেকিয়ে ফিস-ফিস করে কি কথা বলছিলেন। বাধা পেয়ে বিরক্তিতে মুখ ব্যাজার করে ছুঁড়ে মারলেন কথা কটা—রয় কোর্ট চেনো? পার্ক স্ট্রীটে?

ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে বার কয়েক হর্ণ বাজিয়ে লাইন ক্লিয়ার করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মনোজ ছুটল পার্ক স্ট্রীটে। রয় কোর্ট চেনে না আবার। ও বাড়ীর অন্ধি-সন্ধি সব মুখস্থ। সাততলা বাড়িটার নীচের কটা তলা জুড়ে নানা রকম অফিস, বার, দোকান, রেস্তোরা। পাঁচ, ছ তলায় ফ্যামিলি কোয়ার্টার। টপ ফ্লোর জুড়ে দিদি-মণিদের আস্তানা। কলকাতার টপ-টপ বাবুরা আসেন এই আস্তানায়। কত সন্ধ্যায় এই বাড়িটায় বাবু-বিবিদের পেঁৗছে দিয়ে মোটা বখশিস আদায় করেছে মনোজ। রাত বেশী হলে বখশিসের রেটও [illegible] মোটা। কিংস কোর্ট, ইসাবেলা ম্যানসন, কুইন্স ইনের খদ্দের পেলে কপাল খুলে যায় ট্যাকসি ড্রাইভারদের। কিন্তু আজ যে কতক্ষণে ছাড়া পাবে সেই চিন্তায় আকুল হয়ে গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কুল-কুল করে ঘামতে থাকে মনোজ।

এর মধ্যে তিন-চারটে পার্টি ঘুরে গেছে। সব হটিয়ে দিয়েছে মনোজ। একটা পার্টি আবার নাছোড়বান্দা। চল্লিশ টাকা দেবে, ঘন্টা দুই শুধু চৌরঙ্গী, ভিক্টোরিয়া, আউট্রাম ঘাট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পাক খেতে হবে। বিবিজীর সখ, তাই বাবুজী ছাড়বেন না কিছুতেই। চেহারা দেখে মনে হোল সেলর। জাহাজ ভিড়েছে ঘাটে, আর সেই সুযোগে একটুখানি চাখতে বেরিয়েছেন বাবু। কথা বলতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। পা টলছে। পাশে দাঁড়ানো বিবিজীর আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। চল্লিশ কেন, চাপ দিলে ষাট টাকাও আদায় করে নিতে পারত মনোজ। কিন্তু তখুনি মনে পড়ে গেল পাঁচু সেনের কথা—বুঝতে পারছ ছোকরা?

খুব বুঝতে পেরেছে মনোজ। সেন সাহেব গাড়ীতে ওঠার আগেই নম্বরটা দেখে নিয়েছেন। এখন পালালে আর রক্ষা নেই। গাবতলার হাঁড়িকাঠে নির্ঘাৎ জবাই

হয়ে যাবে মনোজ। তাই কোন রিকোয়েস্টই আর গায়ে মাখল না। শাল্ দিয়ে মিটারটা ঢেকে ঢুকে ফের গাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসে রইল। ঢাকতে গিয়েই চোখে পড়ল আড়াই টাকা উঠেছে। মেট্রো টু রয় কোর্ট উঠেছিল এক টাকা দশ, বাকিটা ওয়েটিং চার্জ। অর্থাৎ প্রায় আধ ঘন্টা ওর গাড়ী বেকার বসে আছে।

কি করবে মনোজ? আজ যদি পালায় তাহলে পাঁচু সেনের ডায়রীতে ঠিক মনোজের গাড়ির নম্বরটা লেখা হয়ে যাবে। তারপর যখন ফিটনেস সার্টিফিকেট আদায় করতে গাড়ী নিয়ে যাবে গাবতলায় তখন গলায় গামছা দিয়ে আজকের শোধ তুলবেন পাঁচু সেন। এ সব ব্যাপারে সেন সাহেবের কোন ভুল হয় না। গতবারই দেখেছে কোন এক ব্যাটাকে সাতদিন ধরে ঘুরিয়ে নাকানি-চুবানি খাইয়ে শতখানেক টাকা ঘুষ আদায় করে তবে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করেছিলেন পাঁচু সেন। দোষের মধ্যে লোকটি রাস্তায় পাঁচু সেনকে চিনতে না পেরে ভাড়া আদায় করেছিল।

জেনেশুনে তো আর মনোজ বাঘের খপ্পরে মাথা গলাতে পারে না। ওর গাড়ি পুরোনো। সিক্সটি ফোর-এর মডেল। ছ-মাস অন্তর গাবতলায় সাড়ে সাতটাকা জমা দিয়ে, গাড়ীর জানলা, দরজা, মিটার, ব্রেক পরীক্ষা করিয়ে তবে রাস্তায় বেরোনোর অনুমতি পায়, গাড়িটার বয়স পাঁচ বছরের কম হলে, বছরে একবার গাবতলায় গেলেও চলত। তবে একবারই যাও আর বছরে দুবারই যাও ইন্সপেক্টর পাঁচু সেনের খাঁই না মেটালে সার্টিফিকেট পাবে না। মিটারের সিলটি কেটে নিয়ে গাড়ী চালানোর পথটি মেরে রেখে দেবেন। তখন কি করবে কর! জেনেশুনে তো আর সেন সাহেব পাব্লিকের ক্ষতি করতে পারেন না। গাড়ির দরজায় কেন ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছে? যাও সারিয়ে আনো। দরজা সারালে তো আবিষ্কার হোল স্টিয়ারিং-এ গণ্ডগোল। স্টিয়ারিং-এর ঝামেলা মিটলো তো ব্রেক গেল জাম হয়ে। একটার পর একটা নতুন ফিকির ঠিক ওরা খুঁজে বার করবেনই। একদিনের মামলা এক মাসেও মিটবে না। ক্ষতি কার? ড্রাইভার আর গাড়ির মালিকের। তাদের রুজি-রোজগারে টান পড়ে। অবিশ্যি গোড়াতেই প্যালা মিটিয়ে দিলে এত সব ঝামেলা পোহাতে হয় না। তাছাড়া সেন সাহেব খুব কনসিডারেট। বেশী নেন না—পুরোনো গাড়ী হলে ফি বারে দশ, আর নতুন গাড়ীর বেলায় বিশ। তবু তো পাঁচু সেন লোক ভালো, দশ-বিশেই সন্তুষ্ট। গোপাল রায়, বিজন ঘোষ, লোকু দত্তরা পঁচিশ-ত্রিশের কমে কথাই বলেন না।

এদিকে ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া রাস্তায় বেরোনো চলে না। অ্যাক্সিডেন্ট-ফ্যাক্সিডেন্ট হলে বা মোবাইল চেকিংয়ে ধরা পড়লে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো যে কোন অ্যামাউন্ট ফাইন করে দেবে। তাই সবাই ধর্না দেয় গাবতলায়। পরীক্ষা করে গাড়ীর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তবে সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু ঘুষ না দিলে যেমন সর্বাঙ্গ সুন্দর গাড়ীও সার্টিফিকেট পায় না, তেমনি ঘুষ দিলে কানা খোঁড়া, বোঁচাও যায় পরীক্ষা বৈতরণী পেরিয়ে। আর সেই টাকাতেই আড়াই শো টাকা মাস মাইনের ইন্সপেক্টর পাঁচু সেন রয় কোর্টে আসেন মজা লুটতে। অথচ আজ রাত্তিরে যদি বরাদ্দ পঁয়ত্রিশ টাকা মনোজ ধনা মিত্তিরকে না দিতে পারে তাহলে আর পরশু গাড়ী পাবে না।

ধনা মিত্তির কড়া লোক। মুখে মিষ্টি, কাজের ব্যাপারে সেয়ানা। এক পয়সা এদিক ওদিক হওয়ার জো নেই। খাতির করে না কাউকে। নীতি একটাই মেনে চলে—ফেল কড়ি মাখ তেল। যে বেশী কমিশন দেবে, সেই পাবে গাড়ী। আর একবার কনট্রাক্ট ফেল করলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে। সে তুমি যতই পুরোনো আর বিশ্বাসী হও না কেন। দু বছর মনোজ ধনা মিত্তিরের গাড়ী চালাচ্ছে। মালিককে ভালো করেই চেনে। আজ যদি টাকা দিতে না পারে, তাহলে পরশু তার কনট্রাক্ট বাতিল হয়ে যাবে।

গাড়ী না পেলে খাবে কি মনোজ? কি খাবে ওর বুড়ো মা, বাবা, আর ছোট ভাই-বোনেরা। সবাই যে ওর মুখ চেয়ে বসে থাকে। ঐ মুখগুলোর দিকে তাকিয়েই গোঁফের রেখা স্পষ্ট হওয়ারও আগে স্টিয়ারিং ধরার বিদ্যেটা শিখতে হয়েছে ওকে। আট বচ্ছর গাড়ী চালাচ্ছে মনোজ। আট বছরে আটটা টাকাও জমাতে পারে নি যে একটা দিন বসে খাবে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। একটা গোটা সুন্দর আলো ঝলমলে সন্ধ্যা ওর হাতের মুঠো দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই সন্ধ্যায় দু দিনের খোরাকী খরচ অনায়াস তুলে নিতে পারত। সন্ধ্যার শাঁসালো মক্কেলটাকে পাকড়াতে পারলে হয়তো কাল সকালে একটা আস্ত ইলিশ কিনে এনে বাড়ীর সবাইকে চমকে দিতে পারত মনোজ।

কিন্তু কিছুই হোল না। বসে বসে সময় ও সন্ধ্যা দুই-ই ফুরিয়ে গেল। রাস্তা-ঘাটে ভিড় ফিকে হয়ে এল। শুরু হোল বৃষ্টি। ঝিরঝিরে শ্রাবণ ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল পার্ক স্ট্রীটের পিছল মিশকালো রাস্তায়। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ নানা রংয়ের জলের সরু মোটা ধারা ফুটপাথ বেয়ে রাস্তার কোল ঘেঁষে তোড়ে বয়ে চলল হাইড্রেন্টের দিকে। আর সেই নানা রংয়ের স্রোতে চোখ ভাসিয়ে আবোল-তাবোল চিন্তার জট ছাড়াতে ছাড়াতে মনোজ কেমন অনামনস্ক হয়ে গেল। তার মনেও রইল না কি করে আজ রাতে ধনা মিত্তিরের পাওনা মেটাবে। যদিও লাল শালুর ঘোমটার আড়ালে মিটার থেমে নেই। কম করেও আটটা টাকা উঠেছে। আরো কত উঠবে কে জানে? সেন সাহেবের কাছে তো আর ভাড়া চাওয়া যায় না। সেই কেসটা যে এখনো চোখের সামনে ভাসছে। মনোজ আস্তে আস্তে চোখের পাতা বন্ধ করে সিটের গায়ে অবশ দেহটা এলিয়ে দিল।

—সম্বিৎসু

পাথরে এখন ফাটল ধরেছে ॥

তারক চক্রবর্তী

তারা স্তব্ধ হয়ে পাথরের উপর বসেছিল
বালির ওপারে হাওয়া হাওয়ার ওপারে বালি
দু পাশে ক্ষেতের ফসল একটা চারা খেজুর গাছ
ফিরে আসতে তাদের অনেক রাত হয়েছিল।

শুনতে পেলাম পাথরে এখন ফাটল ধরছে
চিড় খেয়ে গেছে দুটো মুখ
আচমকা একটা সূর্যের রশ্মি নিয়ে
বিকট শব্দে ভেঙে আসছে প্রকাণ্ড সব চাঁই
আমরা তখন চড়াই পেরিয়ে যাচ্ছি।

গাছ-গাছালি ঘাসের ফুল ছাগল চষার ক্ষেত
লালটালি থানা, বিলের মাটি মাখা নরম জল
আবার ঘাসের ফুল, ছাগল চষার ক্ষেত
এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফিরে এসেছি
স্বাতী তারায় আলোয় দুপুর রাতে।

ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোমাখা ধু ধু পথটা
বাঁক পেরিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল
ডোরাকাটা দুটো সৈনিক উত্তপ্ত বালুকণায় এসে
আলোয় আলোয় মিলিয়ে যেতে চাইল
বিকট শব্দে পাথরে এখনও ফাটল ধরছে
আমরা তবুও চড়াই পেরিয়ে ছুটে চলেছি।

শামুকেরা ঝিনুকেরা এবং আমি ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শামুকেরা ঝিনুকেরা বোধ হয় নিজের নিজের সঙ্গেই সব সময় কথা বলে। বোধ হয় তাতেই ওদের আনন্দ। আমার বেলাতেও তাই। আমিও নিজের সঙ্গে কথা বলে যত আনন্দ পাই তেমন আর কারো সঙ্গে কথা বলেই পাই না। অন্য সবার বেলাতেও বোধ হয় সেই একই কথা। আসলে শামুকেরা ঝিনুকেরা এবং আমরা সকলেই যে নিজের সত্তাকেই সব চেয়ে বেশি ভালোবাসি এ তারই প্রমাণ। গাছেরাও সব নিজের নিজের সঙ্গেই কথা বলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে, তাতেই তাদের সীমাহীন আনন্দ। আসলে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকেই বেশি ভালোবাসি, তা' না হলে এত ভালোবাসার জন থাকতেও নিজের সুখের কথা এত বেশি করে আমি ভাবি কেন? কেনইবা নিজের আনন্দ-মৌচাকে মন-মৌমাছি বার বার এমন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়? আসলে আমরা প্রত্যেকে নিজেকেই বেশি ভালোবাসি— শামুকেরা ঝিনুকেরা গাছেরা এবং আমি, আমরা সবাই।

নেয়া যায় না ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

ইচ্ছে হলেই সকল কিছু নেয়া যায় না
কিছু কিছু থেকেই যাবে
নেয়া যায় না, সকল কিছু নেয়া যায় না।

ইচ্ছে হলেই কাড়তে পারো
বসতবাটি, ক্ষিধের থালা, মাঘের সূর্য
যখন খুশি যেমন খুশি বাঁধতে পারো
চলার রাস্তা, ফুলবাগানের সেবাযত্ন,
তবু রক্তে চলকে ওঠা ক্রোধের হা-হা
কাড়তে পারো?
বাঁধতে পারো বুকের আগুন
সমস্তক্ষণ মশাল জ্বালা
ইচ্ছে হলেই নিতে পারো আমার সকল বেঁচে থাকা,
লক্ষ হাতী লেলিয়ে তবু
বাঁচার ইচ্ছে কাড়তে পারো?

ইচ্ছে হলেই সকল কিছু নেয়া যায় না।
কিছু কিছু থেকেই যাবে
নেয়া যায় না, সকল কিছু নেয়া যায় না।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২২)

সোনা সারা রাত ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখল, সেই এক বড় সমুদ্র যেন, বালিয়াড়িতে কারা একটা বড় কাঠের ঘোড়া টানতে-টানতে নিয়ে এল। কি উঁচু আর লম্বা ঘোড়া! মানুষগুলো চলে গেলেই সে দেখতে পেল, ঘোড়াটা কাঠের নয়, ঘোড়াটা জ্যান্ত ঘোড়া। ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। সে একা ছিল না, কমলা অমলা ওর সঙ্গে আছে। ঘোড়াটা ওর কাছে এসে ঠিক পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল—যেমন মুড়াপাড়ার হাতিকে সেলাম দিতে বললে অথবা হাঁটু গেড়ে বসতে বললে হাতি, তেমনি শুয়ে পড়ে তেমনি ঘোড়াটা এসে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সে কমলা এবং অমলা পিঠে চড়তেই ঘোড়াটা ছুটতে থাকল। ঠিক বালিয়াড়ির শেষে সমুদ্রের প্রায় হাঁটু জলে নামতেই ঘোড়াটা আবার কেমন কাঠের হয়ে গেল, নড়ছে না। সে, অমলা কমলা নামতে পারছে না। ক্রমে ঘোড়াটা উঁচু হতে-হতে একেবারে আকাশ সমান হয়ে গেল। মেঘ ফুঁড়ে ওরা এত উঁচুতে উঠে গেছে যে, নিচের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে মুঠো-মুঠো মেঘ ছিঁড়ে খেতে থাকল, কি মিষ্টি আর সুস্বাদু, ঠিক মেলাতে সে যেমন আঁশ-আঁশ চিনির তৈরি তুলোর বল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়, সে ঘোড়ার পিঠে উঠে তেমনি সেই মেঘ ছিঁড়ে মোয়ার মতো হাতে নিয়ে গোল করে-করে অমলা কমলাকে দিতে থাকল, আর তখন নিচের দিকে তাকাতেই মনে হল, কারা যেন সেই হাজার লক্ষ হবে, পিল-পিল করে ঘোড়ার পা বেয়ে উঠে আসছে। ঠিক যেন ওদের স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি মিলে গেছে। সে এখন কি করবে ভেবে পেল না। এত হাতের কাছে আকাশ, আর একটু পৌঁছাতে পারলেই আকাশ ফুঁড়ে মাথা গলিয়ে দিতে পারবে, এবং দেব-দেবীদের রাজত্বে কার্তিক গণেশ অথবা শিব ঠাকুর কিভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, দেখতে পাবে, কিন্তু কি আশ্চর্য যেই না এমন ভাবা ঘোড়াটা আবার ছোট হতে-হতে একটা ছোট খেলনা হয়ে গেল। সে, কমলা অমলা এখন সেই খেলনার ঘোড়া বুকে নিয়ে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে উঠে আসছে এবং উঠে আসার মুখেই মনে হল, বড় জ্যাঠামশাই আশ্বিনের কুকুর নিয়ে হেঁটে-হেঁটে কোনদিকে চলে যাচ্ছেন। সহসা জ্যাঠামশাই বিরক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন, গ্যাৎ চোরৎ শালা! সঙ্গে সঙ্গে সোনার এমন সুন্দর স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ওর মাথায় কাছে, ঠিক জানালায় শরতের সূর্য, সোনালি জলের রঙ যেন, ওর পায়ের নিচে সূর্যের আলো, সে ধড়ফড় করে উঠে বসল।

প্রথম সে বুঝতেই পারল না কোথায় সে আছে। ওর মনে হচ্ছিল, সে বাড়িতে আছে। এবং বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছে। এখন মনে হল এটা কাচারি বাড়ি। এটা মেজ-জ্যাঠামশাইর বিছানা। সে মেজ-জ্যাঠামশাইর পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছে। সে এবার ভাল করে চোখ মুছল। অমলা কমলার কথা মনে হল। ওরা এখন কোথায়! তারপর রোদ উঠলে সে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই কোথায়? এত বড় কাচারি বাড়িতে কেউ নেই। সকলেই যেন নদীর পাড়ে চলে গেছে। দরজা পার হলে বারান্দা। বারান্দার পর সবুজ মাঠ। আর দিঘির দক্ষিণ পাড়ে বড় মঠ। সোনা গতকাল মঠ দেখতে পায় নি। সোনা বস্তুত রাত হলে এদিকটায় এসেছে। অমলা কমলা ওকে জ্যাঠামশাইর কাছে দিয়ে গেছে। বাড়ির উত্তরে থাকলে বোঝাই যায় না দিঘির পাড়ে এত বড় এক মঠ আছে। শুধু ছাদের উপর যখন সে দাঁড়িয়েছিল, অমলা কমলা বলেছে মঠের সিঁড়িতে একটা শ্বেত পাথরের ষাঁড় আছে। ষাঁড়ের গলায় মোথিফুলের মালা। আর সেই ছাদের অন্ধকারটা এখন যেন ওর কাছে এক রহস্যময় জগৎ। ঘুম থেকে উঠেই পূজার বাজনা কানে আসছিল। অর্জুন নায়েব নদী থেকে স্নান করে ফিরছে। রামসুন্দর কাঁধে লাঠি নিয়ে কোথাও যাবে বোধ হয়। লাল্টু পল্টু এখন কোথায়। এ-বাড়িতে এসে বড়দা মেজদাকে সে দেখতেই পাচ্ছে না। ওরা কোথাও আজ শিকারে যাবে। সকাল-সকাল হয়ত নদীর চরে শিকারের জন্য বের হয়ে গেছে। আর তখনই মনে হল মাঠ পার হলে দিঘি, দিঘির ওপারে এক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন চিনতে পারছে মানুষটাকে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না। অস্পষ্ট। লম্বা এবং স্থির প্রায় যেন সমুদ্রের বালিয়াড়িতে সেই ট্রয় নগরীর কাঠের ঘোড়া, শহরের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। সোনা দাঁড়াল না। ঠিক স্বপ্নের মতো, যেন স্বপ্নটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। সে পাগলের মতো ছুটতে থাকল। অর্জুন নায়েব বলল, সোনা কোনখানে যাইতাছ। তোমার জ্যাঠামশায় নদীতে সান করতে গ্যাছে। কে কার কথা শোনে এখন। সে মাঠ পার হয়ে, হরিণেরা যেখানে থাকে, তাদের নিবাস পার হয়ে, ময়ূরের ঘর ডাইনে ফেলে, ফুল-ফলের গাছ পার হয়ে এক ছায়াস্নিগ্ধ ঝাউগাছের নিচে এসে দাঁড়াল। আবার ঘাড় তুলে দেখল। ঠিক মিলে যাচ্ছে কিনা। কারণ সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। এদিকটায় বিচিত্র সব দেশী-বিদেশী ফুলের গাছ, ঝোপ-জঙ্গলের মতো জায়গা, সে গাছের ডাল পাতা ফাঁক করে দেখল সব ঠিকই আছে। দিঘি থেকে যা স্পষ্ট দেখতে পায় নি, এখানে এসে স্পষ্ট হয়ে গেল। সে আবেগে ছুটতে-ছুটতে ডাকল, জ্যাঠামশয়। বড় জ্যাঠামশয়! আমি সোনা। জ্যাঠামশয়-জ্যাঠামশয়। কি আকুল আবেগ! সে পড়ি-মরি করে ছুটছে! তার সেই আপন মানুষ মিলে গেছে। সে দেখল কুকুরটা পর্যন্ত সোনাকে দেখে আনন্দে লেজ নাড়ছে। জ্যাঠামশাই এতটুকু চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। স্বর্গের চাবিকাঠি তাঁর হারিয়ে গেছে। চাবিকাঠির জন্য এত বড় রাজপ্রাসাদে ঢুকতে পারছেন না, যুধিষ্ঠিরের মতো তাঁর প্রিয় আশ্বিনের কুকুর নিয়ে জল সাঁতরে চলে এসেছেন। হাতে-পায়ে ধানপাতার কাটা দাগ। জলে-জলে হাত-পা সাদা হয়ে গেছে। কখনও ঘুরে-ঘুরে কখনও জলে-জলে কুকুর নিয়ে তিনি একলাই বুঝি বের হয়ে পড়েছেন।

সোনা কাছে যেতেই কুকুরটা ডেকে উঠল, ঘেউ। এই সেই কুকুর, কবে থেকে বাড়ি উঠে এসেছে, বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, বড় অবহেলাতে এই কুকুর সংসারে বড় হচ্ছে। যা-কিছু উচ্ছিষ্ট থাকে, এই কুকুর খায়। বাড়িতে যে কুকুরটা থাকে বোঝাই যায় না। কেউ আদর করে না, কিন্তু এখন এই আশ্বিনের কুকুর সোনার কাছে কত মূল্যবান। তার কত নিজের জিনিস এসে গেছে। সে আর এখন কাকে ভয় পায়! সে, যেমন ট্রয় নগরীর বালকেরা কাঠের ঘোড়া টানতে-টানতে শহরের ভিতর টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি সে এই মানুষকে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে। এত দূরে এসেই পাগল মানুষের কেমন যেন লজ্জা এসে গেছে প্রাণে। সে যেতে চাইছে না ভিতরে। কারণ এত বড় বাড়ি দেখে—কি তার সেই দুর্গের কথা মনে পড়ে গেছে! একদিন সে একটা কালো রঙের টাই পরেছিল পলিনের উক্তি, তুমি নীল রঙের টাই পরবে মণি, তুমি সাদা অথবা কমলা রঙের টাই পরবে, কালো রঙ দেখলে তোমার

মতো মানুষকে কেমন নিষ্ঠুর মনে হয়। অথবা যেন এই যে বসন-ভূষণ এমন প্রাসাদের মতো বাড়িতে মানায় না। সে চারিদিকে তাকাতে থাকল। জলের লাল মতো শ্যাওলা, যেন মানুষ নন তিনি, তিনি এক জলের দেবতা, নানা রকম শ্যাওলা এবং গাছ লতাপাতা জলের, শরীরে গজিয়ে উঠছে। সোনা টানতে-টানতে নিয়ে যাবার সময় দিঘির সিঁড়িতে জ্যাঠামশাইকে বসাল। সে জল তুলে এনে অঞ্জলিতে শরীর থেকে শ্যাওলা, লতাপাতা পরিষ্কার করে দিতে থাকল। পাগল মানুষ যেন এই সিঁড়িতে পাথরের এক মূর্তি, বসে-বসে আকাশ দেখছেন। চোখ না দেখলে বোঝাই যায় না মানুষটার ভিতর প্রাণ আছে।

দিঘির অন্য পাড়ে কমলা বৃন্দবনীর সঙ্গে পুজোর ফুল তুলছে। ফুল তুলতে তুলতে দেখল, সিঁড়িতে সোনা কি যেন করছে। একবার লাফিয়ে-লাফিয়ে জলে নামছে আবার উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ির শানে এক মানুষ, সোনা মানুষটার শরীরে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। পাশে এক কুকুর। সে সোনার সঙ্গে ঘাটে এসে নামছে আবার সোনার সঙ্গে সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। কি এত কাজ করছে নিবিষ্ট মনে সোনা! কমল ছুটতে থাকল, সে সেই সব হরিণ অথবা ময়ূরের ঘর পার হয়ে সবুজ গালিচা পাতা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটল। তারপর সিঁড়িতে এসে দেখল, সোনা হাঁটু গেড়ে মানুষটার শরীর থেকে কি সব বেছে-বেছে দিচ্ছে। সে দেখল, সোনা শ্যাওলা বেছে দিচ্ছে। শাপলা-শালুকের পাতা বেছে দিচ্ছে। মানুষটা কে! কমলা সে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, উঁকি দিয়ে দেখছে, আশ্চর্য চোখে কুকুর এবং এই পাথরের মতো মানুষকে দেখছে—সোনা তা দেখেও কোন কথা বলছে না। কমল বাধ্য হয়ে বলল, কেরে সোনা!

—আমার জ্যাঠামশয়।

—তোর জ্যাঠামশাই।

—আমার বড় জ্যাঠামশয়।

—কথা বলে না!

—না।

—বোবা।

—না।

—তবে কথা বলে না কেন?

—কথা বলে—শুধু বলে গ্যাৎ চোরত শালা।

—আর কিছু বলে না?

—না।

—এ মা একি কথা রে। শুধু গ্যাৎ চোরত শালা বলে।

সোনা আর উত্তর করল না। সোনা নিবিষ্ট মনে হাত-পা থেকে শেষ শাপলা শালুকের পাতা, দাম এবং জলজ ঘাস তুলে বলল, ওঠেন জ্যাঠামশয়।

কমল বলল, জলে ভিজে গেছে কেন?

সোনা বলতে পারত, সাঁতার কেটে জ্যাঠামশাই এসেছে। ওরা ওকে নিয়ে আসে নি। তিনি কুকুর নিয়ে চলে এসেছেন।

—তোর জ্যাঠামশাই পাগল!

সোনা রেগে গেল। বলল, হ কইছে! পাগল কে কইছে!

—তবে কথা বলে না কেন!

সোনার কেন জানি ভীষণ রাগ হচ্ছিল। জ্যাঠামশাইকে পাগল বললে সে স্থির থাকতে পারে না। সে যেন তাড়াতাড়ি কমলের কাছ থেকে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে দূরে সরে যেতে চাইল। তখন কমল বলল, আসুন দাদু। আমি সোনার পিসি হই। সোনা আমি তোর পিসি হই নারে।

এবার যেন সোনা খুব খুশি। বলল, আমার কমল পিসি জ্যাঠামশয়।

মণীন্দ্রনাথ কমলকে দেখল। চোখ নীল কেন এ-মেয়ের। সে হাঁটু গেড়ে বসল। যেন কোন দৈত্য এখন হাঁটু গেড়ে বসে পুতুলের মতো ছোট্ট এক মেয়েকে দু হাতে তুলে চোখের কাছে নিয়ে এল। বলতে চাইল, তুমি কে মেয়ে! তোমাকে যেন চিনি!

এমন যে ডাকাবাজ মেয়ে তার চোখ পর্যন্ত ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সোনা ভিতরে-ভিতরে মজা পাচ্ছিল। সে প্রথম কিছু বলল না, কিন্তু দেখল কমল কেঁদে দেবে, সে বলল, ভয় নাই কমল। বলে সে জ্যাঠামশাইর দিকে তাকাল। আর তক্ষুনি সেই মানুষ, যেন মন্ত্রের মতো চোখ সোনার, চোখে রাগ, এতটুকু ছেলের এমন চোখ দেখে মণীন্দ্রনাথ কমলকে নামিয়ে দিল। হয়ত কমল ছুটে পালাত, কিন্তু সোনা কি নির্ভীক এখন, কমল নিজেকে খুব ছোট ভাবল সোনার কাছে। সোনা এতটুকু ভয় পাচ্ছে না, সে টেনে-টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এত বড় মানুষ সোনার একান্ত বশংবদ, সোনার ভয়-ডর নেই, কমলেরও ভয়-ডর থাকল না। সে বাঁ হাতটা ধরল, সোনা ডান হাত ধরেছে। কুকুরটা আগে-আগে যাচ্ছে।

ট্রয়ের ঘোড়া নিয়ে নাট-মন্দিরের সামনে ঢুকতেই প্রায় একটা সোরগোল পড়ে গেল। সেই মানুষ এসেছে আবার এই দেশে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ হাবাগোবা মুখ নিয়ে নাট-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্গা-ঠাকুর দেখতে থাকল। আর বাড়ির আমলা-কর্মচারী ছোট-ছোট বালক-বালিকা এমন কি মেজবাবু এসে গেলেন। তিনি ভূপেন্দ্র-নাথকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। বল গিয়ে ভূঞা কাকাকে, ওঁর বড়দা এসেছেন। শান্ত-শিষ্ট বালকের মতো মানুষটা এখন দাঁড়িয়ে দুর্গাঠাকুর দেখছে। উপরে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। তিনি ঘুরে-ফিরে সব দেখতে থাকলেন।

সোনা বলল, দুগগা ঠাকুররে নম করেন।

মণীন্দ্রনাথ একেবারে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। কেউ যেন ওঁকে আর এখন তুলতে পারবে না। দু হাত সামনে সোজা। বালকেরা হাসাহাসি করছে। সোনার এসব ভাল লাগছে না। সে এখন পারলে এখান থেকেও নিয়ে সরে পড়তে চায়। মেজবাবু অর্থাৎ অমলা কমলার বাবা ধমক দিলেন। সামনে কেউ দাঁড়িয়েছিল বোধ হয়, কর্ম-চারী কেউ হবে—মেজবাবু সকলকে চেনেন না—এই সময় পুজোর সময় দূর দেশের সব কাচারি বাড়ি থেকে নায়েব-গোমস্তারা চলে আসে, সঙ্গে পুজো-পার্বণের জন্য আখ, কলা, দুধ, মাছ যে অঞ্চলে যার যা কিছু শ্রেষ্ঠ পুজোর সময় সব নিয়ে হাজির হয় ওরা—ওদের একজনকে বললেন, ভূইঞা-কাকা এখনও আসছেন না কেন দেখ তো!

পাগল মানুষ তেমনি সোজা সটান। প্রণিপাতের মতো শরীর শক্ত। সোনা দেখল, জ্যাঠামশাই সোজা হয়ে শুয়ে আছেন। সোনা বুঝতে পারল, না বললে তিনি উঠবেন না। সে এবার নুয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, উঠেন জ্যাঠামশয়। আর নম করতে হইব না। বলে হাত ধরতেই তিনি উঠে পড়লেন। ভিজা কাপড়ে সব কাদা-মাটি লেগে আছে।

ভূপেন্দ্রনাথ এসে তাজ্জব। মণীন্দ্র-নাথ ভূপেন্দ্রনাথকে দেখেই সোনার দিকে তাকান। কি হবে সোনা! দ্যাখছ মানুষটা আমার দিকে কি-ভাবে তাকাচ্ছে! সোনার দিকে তাকিয়েই মণীন্দ্রনাথ বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। যেন তাঁর মনেই ছিল না, এখানে ভূপেন্দ্রনাথ থাকে। এখানে এলে তাঁকে ভূপেন্দ্রনাথের পাল্লায় পড়তে হবে। তিনি এবার হাঁটতে চাইলেন। ভূপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি হাত ধরে ফেলল। কোথায় কোনদিকে আবার চলে যাবে, ভূপেন্দ্রনাথ শক্ত হাতে ধরে রাখল। সে এবার সকলকে চলে যেতে বলল। ভিড় করতে বারণ করে দিল। সে কোন প্রশ্ন করল না। কি করে এই মানুষ এত দূর চলে এসেছে, জল সাঁতরে চলে এসেছে, কি সে পারে না এই মানুষ, সে ভাবতে-ভাবতে নিজের ভিতর কেমন দুঃখে ডুবে গেল। দুর্গাঠাকুরের দিকে মুখ তুলে তাকাল, মা মাগো বলার ইচ্ছা। দুর্গাঠাকুর বড় বড় চোখে দুই ভাইকে দেখতে দেখতে বুঝি হাসছিল। সে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়তে চাইল, কারণ সে জানত, নাটমন্দিরে দোতালার জ[illegible]-কাটা অন্দরে এখন শতেক চোখ প[illegible] আড়াল থেকে নিশ্চয়ই ওঁকে দেখতে এসেছে—এমন সুপুরুষ মানুষকে দেখে নিশ্চয়ই ওরা হা-হুতাশ করছে। কি চেহারা তাঁর। গৌরবর্ণ। লম্বা এবং শিশুর মতো সরল। নাবিক যেমন সমুদ্রে পথ হারিয়ে বিষণ্ণতায় ভোগে এখন এই মানুষের চোখে তেমনি এক বিষণ্ণতা। ভূপেন্দ্রনাথের এসব ভেবে কেন জানি চোখে জল এসে গেল।

জোটন সকাল থেকেই মুখ গোমড়া করে বসে আছে। আসমানে চাঁদ দেখলে, নীল আকাশ দেখলেই টের পায় জোটন শরৎকাল এসে গেছে। এখন দুর্গাপুজোর সময়। এই দরগায় বসেও তা টের পাওয়া যায়। দরগা ত নয় য্যান বিশাল বনের ভিতর বনবাসী জোটন। দু সাল থেকে, কি আরও বেশি হবে—সে বাপের ভিটাতে যেতে পারছে না। ফকির সাব নিয়ে যাচ্ছে না। শরৎকাল এলেই আকাশে চাঁদ বড় হয়ে দেখা দেয়। সারা রাত এই বনের ভিতর জ্যোৎস্না ছড়ায়। আকাশের দিকে তাকালেই মনের ভিতর কেমন করে। প্রতাপ চন্দের বাড়িতে

দুগগা ঠাকুর, ঠাকুরের মুখ-চোখ এবং নাকে নথ সব সে বসে মনে করতে পারছে। মনে হলেই ভিতরটা কেমন করে। কতবার ফকির সাবকে বলেছে, দ্যাশে লইয়া যাইবেন? মানুষটা তখন রা করে না। দিন-দিন ফকির সায়েবের শরীর ভেঙে আসছে। আর বুঝি সে বাপের ভিটাতে ফিরে যেতে পারবে না। মানুষটার কাছে দরগার এক কোণে ছোট ছইয়ের মতো নিবাসের যেন তুলনা নেই। ছইয়ের ভিতর বসে ফকির সাব কেবল হুঁকা খায় আর কি সব বয়াৎ বলে যা জোটন আদৌ বোঝে না। বাংলা করে দিলে জোটন কেবল হাসে।

—ফ্যাক-ফ্যাক কইরা হাসেন ক্যান?

—হাসলাম কৈ আবার!

—আপনে হাসলেন না?

—ঠিক আছে। হাসি পাইলে আর হাসমু না। বলে বিমর্ষ মুখ নিয়ে সে বসে থাকল।

ফকির সাব বলল, মন খারাপ ক্যান।

জোটন উত্তর করছে না।

—কি কথা কন না ক্যান।

—কি কমু কন?

—যা মনে লয়।

—মনে লয় দ্যাশে যাই।

—দ্যাশে গিয়া থাকবেন কৈ? আপনের কইছিলাম ত আবার সাদি করছে। নতুন মানুষ আপনারে চিনতে পারব।

—চিনতে পারব না ক্যান। গ্যালে ঠিকই চিনতে পারব।

—বড় দূর যে! এত দূর নাও বাইতে পারমু?

—নাও জলে-জলে মাঠে পড়লে না হয় আমি লগি ধরমু।

—মাইনষে দ্যাখলে কি কইব? বলেই ফকির সাব আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। পেটের ভিতরটা কেমন মোচড়াচ্ছে।

শরৎকাল বলে ঝোপ-জঙ্গলে এখন কীট-পতঙ্গ বাড়ছে। শরৎকাল বলে জলে এখন পচা গন্ধ উঠতে থাকবে। কারণ নদী-নালা থেকে,ঝোপ-জঙ্গল থেকে জল নামতে থাকলেই, ঘাস শ্যাওলা দাম সব পচে যাবে। দরগার চারপাশে শুধু হোগলার বন কত দূরে চলে গেছে। বনের ফাঁকে কোন পথ নেই এখন।

দরগা আসতে হলে নৌকা ঠেলে-ঠেলে নিয়ে আসতে হয়। দরগার পুবে বড় নদী মেঘনা, মেঘনার পাড়ে-পাড়ে এই বন নিশুতি রাতে নির্জন অরণ্যের মতো চুপ-চাপ। এমন কি কোন কীট-পতঙ্গের ডাকও ভয়াবহ লাগে। চারপাশে বড়-বড় রসুন গোটার গাছ, অশ্বত্থ গাছ আর নিচে তার হাজার বছর ধরে অঞ্চলের কবরখানা। কোথাও ভাঙা মসজিদ ভাঙা কুয়ো, বেদি। জীর্ণ অন্ধকূপের মতো সব ছোট-ছোট ইঁটের কোঠা, কোন-কোনটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আর লতাপাতা, গাছ-গাছালি এত ঘন যে দু পা যেতে লতা-পাতায় জড়িয়ে যেতে হয়। একটা সরু পায়ে-হাঁটা পথ গ্রীষ্মের দিনে দেখা দেয়। বর্ষা-কালে কেউ আর বনের ভিতর ঢুকতে চায় না। জলের কিনারে কবর দিয়ে চলে যায়। মানুষের ইন্তেকালের সময় কিছু মানুষজন চোখে পড়বে, দু ক্রোশ পথ হাঁটলে ক'ঘর বসতি আছে। পারতপক্ষে এদিকে কেউ মাড়ায় না। ওখানে এক ফকির সাব আছে, দুঃসময়ে শুধু দোয়া ভিক্ষার জন্য ফকির সাবের কাছে চলে আসে মানুষ। জমিতে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে ফকির সাব ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে নিচে নেমে মালা-তাবিজ যখন যা দরকার প্রয়োজন মতো দিয়ে আসেন। মানুষেরা কেউ বনের ভিতর এক অলৌকিক রহস্যের জন্য ঢুকতে চায় না। পাশে একটা লম্বা খাল আছে। মৃত অজগর সাপের মতো খালটা নিশিদিন শুয়ে থাকে। বর্ষা-কাল এলে এই খাল জেগে ওঠে, কিছু উজানি নৌকা পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য এই খালে উঠে আসে। খাল দিয়ে যায়, আর আল্লা অথবা ঈশ্বরের নাম নিতে-নিতে কোন রকমে এই কবরখানা ভয়ে-ভয়ে পার হয়ে যায়। সুতরাং সাধারণভাবে কোন মানুষ আসে না।

মানুষ মরলে ফকির সায়েবের পরবের মতো উৎসব। ফকির সাব তখন দু গণ্ডা মতো পয়সা পান। পান খান। আর মালা-তাবিজ গলায় ঝুলিয়ে আল্লা এক রহমানে রহিম বলতে-বলতে সেই মৃত মানুষটার চার পাশে ঘুরতে থাকেন, কখনও বনের ভিতর লুকিয়ে নানা রকমের খেলা দেখাতে ভালবাসেন। অর্থাৎ কবরখানায় মৃত মানুষ এলেই ফকির সাবের কেরামতি বেড়ে যায়। কালো আলখেল্লাতে পা পর্যন্ত ঢেকে, গলায় লাল নীল হলুদ রঙের রসুনগোটার মতো বড়-বড় পাথর ঝুলিয়ে, চোখে কালো সুর্মা টেনে এবং মাথায় ফেটি বেঁধে মনে হয় এক পীর এসে গেছে। সাদা কোঁকড়ানো চুল তার। ঊর্ধ্বমুখী বাহু তার। চাপ দাড়িতে রসুন গোটার তেল চপ-চপ করছে। যারা কবর দিতে এল, দেখল তারা এক ফকির সাব গাছপালা ভেদ করে মুসকিলা-শানের লম্ফ হাতে নিয়ে বনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকগুলি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলে বনের ভিতর থেকে মুসকিলাশানের লম্ফ নিয়ে সহসা উদয়। মনে হবে তখন তিনি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছেন। তারপর যার যা খুশী—দু গণ্ডা তিন গণ্ডা পয়সা এবং যার ইন্তেকাল হল তার কিছু তৈজস-পত্র মিলে গেলে এই মানুষের অন্ন-সংস্থান। জোটন তখন ছইয়ের ভিতর বসে মানুষটার এই কেরামতি দেখে ফিক-ফিক করে হাসে। দিনের বেলাতে কালো আলখেল্লাতে হাজার জায়গায় তালি মারতে-মারতে জোটন মানুষটার নাচন-কোদন দেখে। তখন দেখলে কে বলবে এই মানুষ নিরীহ জীব, কে বলবে অকপট সরল এই মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভিতু লোক। অথচ অন্ন-সংস্থানের জন্য কবরে মানুষ এলেই এই মানুষ অন্য মানুষ হয়ে যায়। পীর বনে যাবার লোভে মানুষটা সকলের চোখে ভিন্ন-ভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দেখাতে ভাল-বাসে। এই অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জন্য ফকির সাব দিন-রাত উপায় উদ্ভাবন করেন। আর ইন্তেকালের সময় মানুষের চোখে নিজের খেলা দেখান। রাতের বেলা গাছের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকেন।

সুতরাং কোথায় কোন দুর্গোৎসবের জন্য জোটনের প্রাণে দুঃখ জেগে থাকে, বোঝার উপায় থাকে না ফকির সাবের। সম্বৎসর এই দরগায় ছইয়ের ভিতর তিনি শুয়ে থাকেন। সময়ে অসময়ে তিনি রসুনের গোটা কোচর ভরে সংগ্রহ করে আনেন। মাচানের নিচে স্তূপীকৃত রসুনের গোটা। বড় বড় মাটের মতো হাঁড়িতে সব ভিজানো থাকে। ছেঁচা রসুন গোটা জলে পচলে এক-রকমের ঘন তেল, সেই তেলে ছইয়ের ভিতর-কার আলো জ্বলে, মুসকিলাশানের লম্ফ জ্বলে এবং কিছু তেল পাতিলে পাতিলে গাছের মাথায় বসিয়ে রাখেন। সময়ে অসময়ে ইন্তেকালের সময় যারা আসে, তাদের
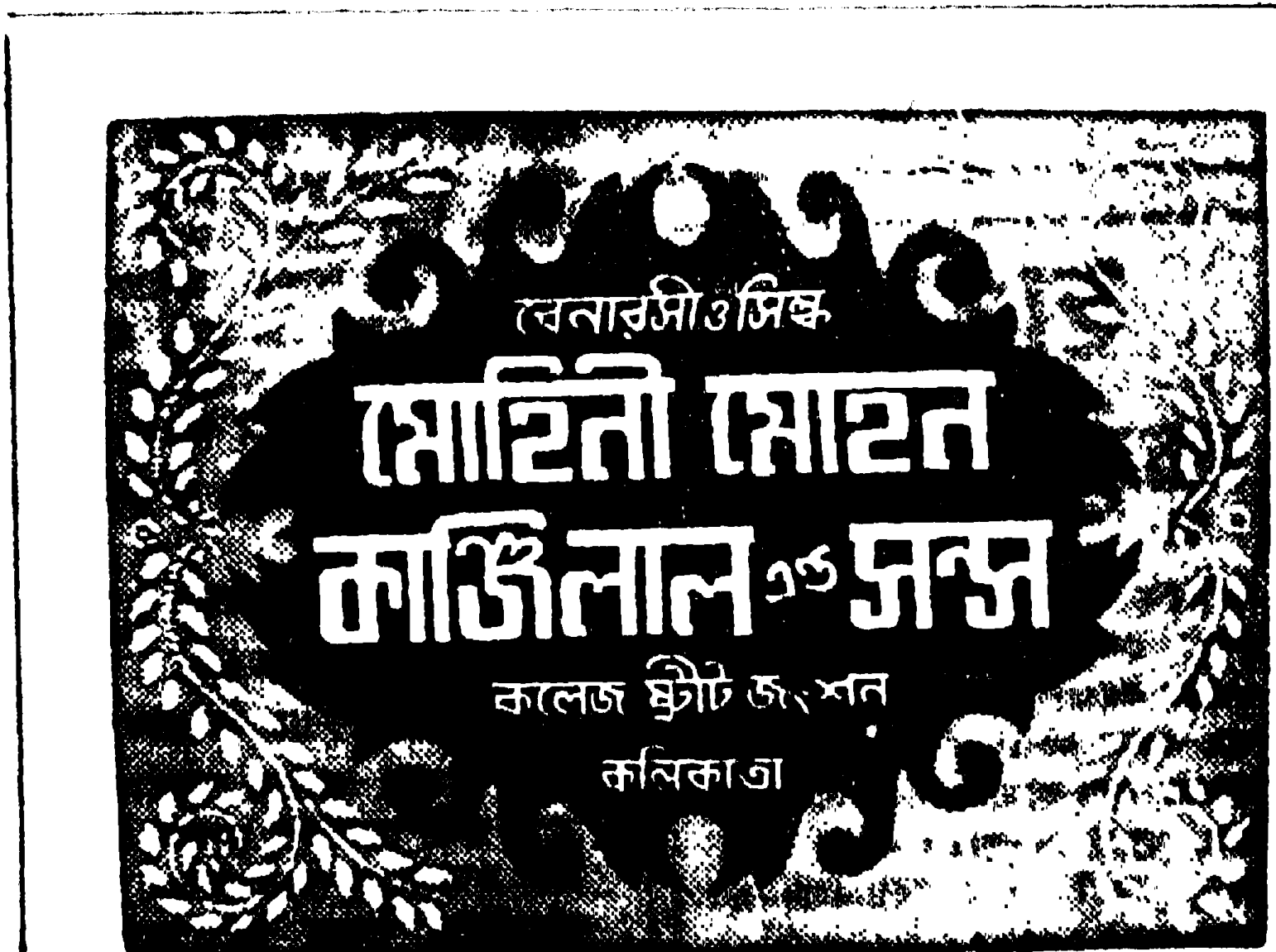
অলৌকিক কিছু দেখাবার জন্য গাছের মাথায় আগুন জেবলে বসে থাকেন। আরও কি সব কান্ড তার। প্রথম জোটন হেসে আর বাঁচত না। একটা হাড় রেখেছেন। কিছু জড়িবুটি রেখেছেন। সেই মাঠে দাঁড়িয়ে মানুষ হাঁক পাড়লে—হেই কে আছে, আমি এক নাচারি ব্যারামি মানুষ, তখনই ফকির সাব যেন অন্য মানুষ হয়ে যান, পীর হবার জন্য তিনি তাঁর সেই মুখস্থ বয়াং বলতে বলতে জড়িবুটি নিয়ে মাঠে নেমে যান। পয়সা চাই সোয়া পাঁচ আনা। দরগার থানে সিন্নি পরাবার জন্য এই পয়সা। সেই ফকির সাব কি করে বুঝবেন, জোটন, যার নিবাস ছিল হিন্দু পল্লীর পাশে, পরবে-পার্বণে যে চিড়া কুটে দিত, ধান ভেনে দিত কেন সে ব্যাজারমুখে কাঠ কুড়াতে বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

সূর্য উঠব উঠব করছে। গাছপালা এত ঘন যে সূর্য উঠলেও অনেকক্ষণ দেখা যায় না। সূর্যের আলো গাছের ডালপালার পড়ছে। বড় সন্নিবিষ্ট এই গাছপালা বৃক্ষ। জোটন দুহাতে বন-ঝোপ-লতাপাতা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সে অনেকগুলো কবর পার হয়ে খালের পাড়ে নেমে এল। তার-পরই সব হোগলার বন। এখন আশ্বিন-কার্তিক মাস বলে জলের কচ্ছপ পাড়ে উঠে আসবে। ডিম পাড়বে। এ-অঞ্চলে গ্রাম মাঠ নেই, ধানের খেত নেই, হিন্দুপল্লী নেই—যে জমিতে নেমে শামুকের খোলে কট করে ধানের ছড়া কাটবে, ডিম নিয়ে ঠাকুর বাড়ি উঠে যাবে, ডিমের বদলে পানগুয়া চেয়ে নেবে, এখানে শুধু এই নির্জনে গাছপালা বৃক্ষ। জোটনের জোরে জোরে ফকির সাবকে শুনিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ফকির সাব আর নৌকা বাইতে পারে না। ফকির সাব ক্রমে লবেজান হয়ে যাচ্ছে। ফকির সাব একটা কোড়া পাখি ধরার জন্য বিলের জলে আঁতর পেতে রেখেছিল, কোড়া পাখির কলিজা খেলে গায়ে বল ফিরে আসতে পারে। ফিরে এলেই জোটন বাপের ভিটাতে বেড়াতে যাবে। ভাবতেই মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। আর মন প্রসন্ন হতেই দেখল, দুটো শাদা পা যেন। হোগলার জঙ্গলে দুটো শাদা পা, কি

সুন্দর আর যেন দুর্গাঠাকুরের পা। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। পায়ের উপর সূর্যের আলো চিক চিক করছে। একটা ফড়িং কোত্থেকে উড়ে এসে বার বার পায়ের উপর বসছে। উপরে গাছপাতা নড়লে ছায়া পড়ছে পায়ে। ফড়িংটা ভয় পেয়ে তখন উড়ে যাচ্ছে। এই রোদ এবং পাতার ছায়াতে মনে হচ্ছিল, পায়ে মল বাজলে যেমন শব্দ দ্রুত বনের ভিতর হারিয়ে যায়, তেমনি এক শব্দ বুকের ভিতর বাজতে বাজতে কোন্ অতলে ডুবে যাচ্ছে জোটনের। জোটন দেখল পা-দুটো এখন যথার্থই দুর্গাঠাকুরের হয়ে গেছে। সেই যেন গৌরী, শিবের জন্য বনবাসে এসে হোগলা বনে লুকিয়ে আছে। অথবা চৈত্র মাসে নীলের উপোসে গৌরী নাচে, নাচের মুদ্রা পায়ে যেন খেলে বেড়াচ্ছিল। জোটন বড় বড় চোখে এ-সব দেখছে এবং এখন কি করবে স্থির করতে পারছে না। সে সামনে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। সে চিৎকার করতে চাইল, পারল না। এক যুবতী কন্যার পা দেখা যাচ্ছে। শুধু পা-দুটো, বাকি শরীর হোগলার জঙ্গলে। খুনটুন হবে হয়ত। কিন্তু এই দরগায়, পীরের থানে কার এমন সাহস আছে খুন করে! জোটন কাঁপতে কাঁপতে দু-হাতে হোগলার বন ফাঁক করে দিতেই দেখল, নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিলে, দশ হাত-পা দুর্গাঠাকুরের যেমন চিৎ হয়ে থাকে, পা টেনে, বাঁঝ অসুরনাশিনী, মা-জননী তুই, অ মালতী তুই চিৎপাত হইয়া পইড়া আছস, চুল খাড়া কইরা, চোখ উর্ধ্বমুখী কইরা পইড়া আছস, তরে নিয়া আইছে কে! সে প্রায় মায়ের মতো শিয়রে বসে মাথাটা কোলে তুলে নিল। বুকে, মুখে এবং শরীরের যেখানে যা-কিছু পুষ্ট সব হাতড়ে দেখল, না প্রাণ আছে। শুধু হুঁস নেই। নাভির নিচটা কারা সারা-রাত খাবলে খাবলে খেয়ে গেছে। মৃতপ্রায় ভেবে মালতীকে কারা ফেলে চলে গেছে। শরীরের কোথাও কোথাও দাঁতের চিহ্ন। রক্তের দাগ। সে আর দাঁড়াল না। যেন এক অশ্ব ছুটে যায়, বনের ভিতর দিয়ে জোটন ছুটতে থাকল। আর ডাকতে থাকল, ফকির সাব, অ ফকির সাব, দ্যাখেন আইসা পীরের থানে কি হইছে। তাড়াতাড়ি করেন ফকির সাব। হোগলা বনে কারা দুর্গাঠাকুর বিসর্জন দিয়া গ্যাছে। যেমন দুলাফে সে ছুটে এসেছিল ফকির সাবকে খবর দিতে, তেমনি দু লাফে সে তার ছইয়ের ভিতর থেকে একটা ডুরে শাড়ি বের করে বলল, আপনে আমার পিছনে আসেন।

জোটন একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, কি দ্যাখা যায়।

—দুই পা দ্যাখা যায়।

—কার পায়ের মত!

—দুর্গাঠাকুরের পা য্যান!

—তাহলে আপনে খাড়ন। বলে জোটন নিজে প্রথম হোগলার জঙ্গলে ঢুকে শাড়িটা দিয়ে মালতীকে ঢেকে দিল। তারপর বন ফাঁক করে ইসারা করে ডাকল, আপনে মাথার দিকটা ধরেন। আমি পা ধরি।

এমন জবরদস্ত লাস টানতে উভয়ের বড় কষ্ট হচ্ছিল। ওরা একটু গিয়েই গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর শুইয়ে রাখছে। আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফকির সাব বললেন, বিবি আপনের দুর্গাঠাকুর, তবে দরগাতে আইসা গেল। দ্যাশে গিয়া আর কাম কি!

জোটন হাঁপাচ্ছিল। সে উত্তর দিতে পারল না। ওর হাতে এখন রক্তে আঠাল পিচ্ছিল এক পদার্থে চ্যাট চ্যাট করছে। পাতা দিয়ে ঘাস দিয়ে সে-সব মুছে আবার টেনে নেবার জন্য তুলে ধরছে। মাঝে মাঝে মালতীর কাপড়টা লতায়-পাতায় আটকে সরে যাচ্ছে। এমন পুষ্ট শরীর যে সামান্য বাতাস লাগলেই কাপড় উড়ে পড়ে যায়। জোটন ফকির সাবের দিকে তাকাল। বলল, না না, এইটা ভাল না। আপনের চোখ গাছ-পালার দিকে দ্যান। এদিকে না।

ফকির সাব বলল, আমি ফকির মানুষ, আমার চোখে দোষের কিছু থাকে না।

জোটন বলল, আপনে পুরুষ মানুষ। চক্ষু আপনের এখন গাছপালা পাখি দ্যাখুক।

—আপনের যখন তাই ইচ্ছা বলে ফকির সাব চোখ বুঁজে থাকলে জোটন বলল কি কইলাম আর আপনে কি করলেন।

—কি কইলেন।

—গাছপালা পাখি দ্যাখতে কইলাম।

—তাই দ্যাখতাছি।

—চোখ বুইজা বুঝি দ্যাখা যায়।

—খুইলা রাখলে কম দ্যাখি, বুইজা রাখলে বেশি দ্যাখি।

—তাইলে খুইলাই রাখেন।

এবার জোটন ডেকে উঠল, মালতী অ মালতী দ্যাখ কৈ আইছস। আমার কাছে আইছস। চোখ মেইলা দ্যাখ একবার। মালতী মালতী! হুঁশ নেই। সুতরাং জোটন তাড়াতাড়ি কিছু জল এনে চোখেমুখে ছিটিয়ে দিল। হুঁশ কিছুতেই ফিরছে না। এখানে রোদ নেই। গাছপালা এত নিবিড় যে, সামান্য শিশির পর্যন্ত ঘাসের উপর পড়তে পারে না। আর একটু যেতে পারলেই ওদের ছই। মাচানে ফেলে পিঠে পায়ে এবং কোমরে গরমজলের সেঁক দিতে পারলে শরীরের ব্যথা মরে আসবে। তারপর সেই বিশল্যকরণীর মতো ফুলের রস—যেখানে যা-কিছু ক্ষত আছে এবং যেখানে যা-কিছু রক্তপাত হয়েছে রসুনগোটার তেলে ফুলের রস মিশিয়ে লাগাতে পারলে মালতী ফের চোখ মেলে তাকাবে।

ফকির সাবের কিন্তু কিছুতেই এতটু ব্যস্তভাব নেই। হচ্ছে হবে ভাব। কেমন নিরিবিলি এই কবরখানায় দুর্গাঠাকুর আইসা গেল ভাব। সাতে নাই পাঁচে নাই ফকিরসাবের তাড়াহুড়ো নাই। তিনি মালতীকে মাচানে ফেলে রেখে হুঁকা খুঁজতে থাকলেন।

—এখন আপনের হুঁকা খাওয়নের সময়!

—পানিটা গরম করেন। ইত্যবসরে হুঁকা খাই। হুঁকা খাইলে মাথাটা সাফ থাকে।

হুঁকা খাইলে মাথাটা সাফ থাকে এটা ফকির সাবের কথা। মনের কথা নয়। হয়ত এমনি মানুষটা। শত বিপদেও মানুষটার মাথা গরম হয় না। বেশ রয়েসয়ে বুঝেসুজে হুঁকা খেতে খেতে হাঁকল, কৈ গ পানি আপনের গরম হইল!

তৈজসপত্র বলতে জোটনের চারটা পাতিল, একটা পিতলের বদনা এবং সামান্য এক ভাঙা আর্শি। বড় মাটের মতো চারটা জালা আছে রসুন গোটা ভেজানোর জন্য। না হলে তাড়াতাড়ি এক জালা পানি এনে দিতে পারত ফকির সাব। বদনা করে পানি আনছে জোটন। বর্ষায় পানি বেশিদূরে নয়। ছইয়ের নিচে জল। উনুনে জল গরম হলে জোটন বলল, এদিকে আর আইসেন না।

—ক্যান! ফকির সাব হুঁকা খেতে খেতে বলল।

—ক্যান আবার খুইলা কইতে হইব!

—দুগ্গাঠাকুররে আপনে তবে খালি কইরা একলাই দ্যাখবেন।

জোটন কান দিল না। মানুষটার এই স্বভাব। সব জানবে, বুঝবে এবং এত বড় ইমানদার মানুষ, তবু মানুষটা ক্যান, কি হইব দ্যাখলে—আমি ত ফকির মানুষ আমার কাছে সব সমান এমন বলবে।

জোটন সমস্ত শরীর ভালো করে গরম জলে ধুইয়ে দিল। জোটন সব খুয়েমুছে মালতীকে আবার সেই বিধবা মালতী করে দিতে চাইল। সংসারে সব চাইলেই হয় না। সব চাইতেও নেই। কেন জানি বার বার মালতীর জন্য সুন্দর এক যুবা পুরুষের মুখ মনে পড়ছিল জোটনের। কবে থেকে মালতীর শরীর খোদার মাশুল তুলছে না—বড় কষ্ট এই শরীরের। ঈষদুষ্ণ জলে গা ধোয়াবার সময় জোটন মনে মনে নানা রকমের কথা বলছিল। কি পুষ্ট শরীর। জোটন হাত দিয়ে মালতীর কোমর থাবড়ে দিচ্ছে। উপুর করে মালতীর কোমরে জল ঢেলে দিচ্ছে। ডানদিকে বসে ধীরে ধীরে জল উপর থেকে ঢেলে থাবড়ে থাবড়ে মাজাতে যে সারারাত অমানুষের হাড়-হালুম গেছে থাবড়ে থাবড়ে তা ঝেড়ে দিচ্ছে জোটন।

এ-ভাবে মনে হল মালতীর কারা যেন তাকে একটা বড় জলাশয়ে ভাসিয়ে রেখেছে। শরীরে কে কি যেন মেখে দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল, নরম হাত ভালবাসার হাত—কিন্তু তাকাতে সে সাহস পাচ্ছে না। যেন তাকালেই সেইসব নরপিশাচের মুখ ভেসে উঠবে। সে তবু পালাবার জন্য ধড়ফড় করে উঠে বসলে জোটন চিৎকার করে উঠ[illegible] ফকির সাব আসেন। দ্যাখেন আইসা মালতী[illegible] হুঁশ ফিইরা আইছে।

মালতী চোখ খুলে দেখল জুটি ওকে ধরে বসে আছে। কি বলতে গিয়ে চোখমুখ কাতর দেখাল মালতীর। সে বলতে পারল না। সে মাচানে যেন কতকাল পর দীর্ঘ এক মরুভূমি পার হয়ে এক মরুদ্যানে উঠে এসেছে। মালতী কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে মাচানে ফের সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

জোটন এবার ফকির সাবকে উদ্দেশ্য করে বলল, প্যাটটা পইড়া আছে।

—কি দিবেন খাইতে?

—ইটু দুধ নিয়া আসেন। গরম কইরা দেই। যদি খায়।

ফকিরসাব দেরি করলেন না। হুঁকা খাবার পর নানা রকমের প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে। প্রথমত এই যুবতীকে কারা ফেলে দিয়ে গেল। কখন এবং ওরা কতজন ছিল। নানা রকমের সন্দেহ দেখা দিতে থাকল। মালতী ঘরে তার ফিরে যাবে কিনা, থানা-পুলিশ এবং অনেক ঝামেলা এর পিছনে রয়েছে। তিনি ফকির মানুষ। এখানে কত-দিন আছেন। এমন ঘটনা এখানে কোনদিন ঘটেনি। তবে একবার এক সাধু এসেছিল, ভৈরবী সঙ্গে ছিল। এই দরগায় ক' রাত ওস্তাদের ভোজ খেয়ে বেশ যখন সরগরম, তখন সেই ভৈরবী তিলকচাঁদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। ছিল ভৈরবী, হয়ে গেল পদ্মদীঘির ছোটবাবুর বহুরানী। তারপর সাধুবাবাজি বড় একটা রসুনগোটার মগডালে উঠে গলা দিল। ছোটবাবু মাথার উপর ছিলেন বলে সে-যাত্রা ফকিরসাব থানা-পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল—কিন্তু এখন, এ-বারে! ফকিরসাব বড় ঘাবড়ে গেলেন। তবু তিনি মুখ ফুটে কিছু বললেন না। জল ভেঙে বাগের ও-পাশে ওর দুই ছাগলের দুধ দুয়ে আনার জন্য জলে নেমে গেলেন। জল ভেঙে ওপাড়ে গিয়ে উঠবেন।

জোটন মালতীর মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকল। বনের ভিতর ডাহুক পাখি ডাকছে। নিচে সেই জল এবং শরবন। যত-দূরে চোখ যায় সে দেখল বাতাসে শরবন কাঁপছে। শরৎকালের রোদ পাখ-পাখালির মতো উড়ে এসে এই দরগায় এখন নেচে খেলে বেড়াচ্ছে। সামান্য হাওয়া ছিল জলে। কত রকমের লাল নীল ফড়িং উড়ছে। কত রকমের বিচিত্র কীট-পতঙ্গের শব্দ কানে আসছে আর কতকাল আগে ইন্তেকাল হয়েছিল তার বড় সন্তানের—এই কবরভূমিতেই এখন সে সন্তান পাথর হয়ে আছে। যেন মাটি খুঁড়লেই সেই সন্তান বের হয়ে আসবে। জোটন সব ভুলে মালতীকে মায়ের মতো চোখেমুখে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। চুলে বিলি কেটে দিতে থাকল। [illegible] জোটনের চোখ ফেটে জল আসছিল।

(ক্রমশঃ)

পক্ষপাতের মনস্তত্ত্ব

মিঃ আমেদের দুর্ভাগ্য

অন্য ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা পার্টির লোকের সংগে আচরণে বা ব্যবহারে আমরা সবাই অল্পবিস্তর প্রভেদ-বুদ্ধি প্রভাবিত। এই প্রভেদকারী আচরণের মূলে রয়েছে ইংরিজী 'প্রেজুডিস'-এর প্রতিশব্দ।

পক্ষপাতের কারণ ও ভূমিকা নিয়ে দেশবিদেশে নানাধরনের গবেষণা চলেছে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামা, বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত হিংসাত্মক কার্যকলাপ, আন্তর্পার্টি সংঘর্ষ ইত্যাদি ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের ভূমিকা মুখ্য না হলেও, অবহেলার নয়। তা ছাড়া, পক্ষপাত মতান্ধতার (ডগম্যাটিজম্) মত সামাজিক পরিবর্তনের বাধা হয়ে প্রগতির প্রতিবন্ধক হতে পারে। এ কারণেও পক্ষপাতের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উপনিবেশ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে জনসাধারণ সবরকমের ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেও মেতে ওঠে, আমরা জানি। সাম্প্রদায়িক দাংগার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে কয়েকজনের বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনা থেকে হাংগামার সূত্রপাত হলেও, বিবদমান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ সাময়িকভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে দাংগায় অংশ গ্রহণ করে।

মার্টিন লুথার কিংএর হত্যাকারীকে হয়ত টাকা দিয়ে কেনা হয়, কিন্তু নিগার-বিদ্বেষে সাদা চামড়ার আরো হাজার হাজার লোক হিংস্র অন্ধ হয়ে ওঠে, যাদের কোনো বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি বর্ণবিদ্বেষের কারণ বলে অনুমান করা যায় না। অন্য জাতি, সম্প্রদায় ও বর্ণের মানুষ সম্পর্কে পক্ষপাত-মূলক ধারণা পোষণ করার দরুণই এরা হিংসায় উন্মাদ হয়ে ওঠে;—মনোবিজ্ঞানীরা এই রকমই মনে করেন। বিবাদ-বিসম্বাদের সময় ইংরেজের চোখে সব জার্মানই হূন, জার্মানের চোখে সব ইংরেজই আর্যেতর। কালো চামড়ার লোক সাদাচামড়ার কাছে আগে নিগার, তারপর মিঃ কিংবা অন্য কেউ; সামান্য কিছু রং চামড়ায় থাকলেই সাদার কাছে সে ইতর বা ওপ্। এ সবের মধ্যেও রয়েছে পক্ষপাতেরই প্রকাশ।

পক্ষপাতের অস্তিত্ব মানবমনে আবহমান কাল থেকে বিদ্যমান। সম্প্রতিকালে পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে, আন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনেকগুলো গড়ে উঠেছে, ভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতিধর্মের লোক প্রায়শই সম্মেলন ইত্যাদিতে মিলিত হচ্ছে, দেশদেশান্তরে ভ্রমণকারীর সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে চলেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও, মনে হয়, পক্ষপাতের মানসিকতা থেকে মানুষ খুব বেশি মুক্ত হতে পারেনি। আঞ্চলিক যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামা বাধাতে বা চালাতে স্বার্থসন্ধানীদের খুব বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না। সামাজিক-অর্থনীতিক কারণকে ছোট না করেও বলা যায় যে পক্ষপাতিত্বের মনোভাব এই সব যুদ্ধ হাংগামাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করছে ও জীইয়ে রাখছে।

পক্ষপাতের মনোভাব উচ্চশিক্ষিত, সহৃদয় মানুষের মধ্যেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতন কিছু লোক সব ইংরেজকে ডায়ার বা ক্লাইভের সংগে সমীকৃত করেননি বলে অনেক ভারতীয়ের বিরাগভাজন হয়েছেন। 'নিগার'দের মন বা হৃদয় থাকতে পারে অনেক শ্বেতাঙ্গ শিক্ষিত মানুষ তা বিশ্বাস করেন না। এই সব উদাহরণ পেশ করে একদল মনস্তাত্ত্বিক পক্ষপাতের মানসিকতাকে ব্যক্তি-নির্জ্ঞানপ্রেষিত অথবা সমষ্টিনির্জ্ঞান-আশ্রিত বলে প্রচার করে থাকেন। তাঁরা আরও মনে করেন পক্ষপাত শ্বাশ্বত ও সনাতন বৃত্তি এবং এই কারণে অপরিবর্তনীয়। কাজেই জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ চিরকালই থাকবে, এবং মাঝে মাঝে রক্তক্ষয়ী লড়ায়ের রূপ নেবে।

—উপায় কি? প্রেজুডিস্ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

কয়েক বছর আগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বন্ধু এক সন্ধ্যায় আর্তস্বরে আমার কাছে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। বন্ধুটির নাম মিঃ আমেদ।

—জানেন, আমি কেন পাজামা টুপি পরে চলাফেরা করি? হিন্দু বন্ধুর কোন আড্ডায় গেলে যাতে ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা আমাকে চেনেন না, তাঁরা আমাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বলে চিনতে পারেন।

বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকালাম।

—বুঝতে পারছেন না? আপনারা যখন নিজেদের মধ্যে দিলখোলা হয়ে আলাপচারে ব্যস্ত থাকেন, তখন আমাদের মনে আঘাত লাগতে পারে, এমন অনেক উক্তি আপনাদের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য আপনারা উদারপন্থী প্রগতিবাদী মানুষ; ঠিক আঘাত করার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেন না,—আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তবুও আঘাত লাগে। আমি যদি নিজেকে চিহ্নিত করে রাখি তবে আপনারা অনেক সময়ে কথা বলেন, আলগা ফালতু কথাগুলো গলা অবধি এলেও জিভ-তালুর মারফত উচ্চারিত হয় না। নিশ্চিন্ত মনে আপনাদের আড্ডায় যোগ দিতে পারি।

সেদিন আর এক বন্ধু 'প্রেজুডিসের' আলোচনা প্রসংগে তাঁর বাড়ীর লোকদের 'বাঙাল' বিদ্বেষের কথা তুললেন। মেয়ে ও ছেলে দুজনেরই বিবাহের চেষ্টা করছেন। কিন্তু সুযোগ্য পাত্র-পাত্রী মিলছে না। পাত্র-পাত্রী পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা হওয়া চাইই। এই হয়েছে মুশকিল। তা না হলে বাড়ীর লোকরা কিছুতেই রাজী হবেন না। 'বাড়ীর লোক' এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী। শিক্ষিত ভদ্র এবং হৃদয়বতী এই ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি। শতকরা ষাটজন পাত্রপাত্রী তাঁর পক্ষপাতের ফলে ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকারী হতে পারছে না। এই পরিবারটি বাংলা দেশের এক নামকরা 'বামপন্থী' পরিবার। আজ যখন পূর্ববংগের অধিবাসীরা 'ক্যালকাটান ডায়ালেক্টে' পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, তখনও প্রগতিশীল পরিবারের এই ধরনের 'প্রেজুডিস'! অথচ এঁদের অন্য কোনো বিষয়ে কোনো রকম 'প্রেজুডিস' আছে বলে মনে হয় না। এঁরা 'অবসকিউ-র‍্যানটিস্ট' মানে পরিবর্তনবিরোধী নন। 'সনাতনিস্ট'দের দেশের সমাজের ও পৃথিবীর শত্রু মনে করেন। তবে এঁদের মনে এই এক বিষয়ে এই ধরনের পক্ষপাত-দুষ্ট [illegible]ভাব টিঁকে আছে কি করে?

এইবার দু'একটি পরীক্ষার কথা তুলব। পক্ষপাত জন্মগত, সহজাত বৃত্তি নয়, পুরোপুরি সমাজজাত; পক্ষপাত নির্জ্ঞানপ্রেষিত নয়, জ্ঞান ও বোধাশ্রিত। এই পরীক্ষার ফলাফল সেই রকমই নির্দেশ দিচ্ছে।

প্রথম পরীক্ষাটি দেশ সম্পর্কিত পক্ষপাতবিষয়ক। কয়েকটি ইংরেজ শিশুকে (৬-৭ বছরের) প্রথমে কয়েকটি নানা সাইজের কালো রং-এর প্ল্যাস্টিকের সমচতুর্ভুজ (স্কয়ার) দেওয়া হল। বলা হল, মাঝারি সাইজের একটা স্কয়ার ইংলণ্ডের পরিমাপক। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়ার আয়তনের পরিমাপক 'স্কয়ার'গুলো তারা সাইজ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুক। তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, ঐ চারটি দেশের মধ্যে কোন দেশটিকে সে বেশী পছন্দ করে, কোন দেশটিকে কম। তার পছন্দের মাত্রা অনুযায়ী দেশগুলোকে চিহ্নিত করতে বলা হল। দেখা গেল, দেশগুলোর আয়তন সম্বন্ধে ছেলেদের ধারণা তত পরিষ্কার নয়। তারা এই পরীক্ষায় এক-একজন এক-এক রকম উত্তর দিল। কিন্তু পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নে প্রায় সবারই উত্তর একরকম হল। তারা

বেশির ভাগই দেখা গেল, আমেরিকা ও ফ্রান্সকে, জার্মানী ও রাশিয়ার থেকে বেশি পছন্দ করছে। দশ থেকে এগার বছরের ছেলেদের এই একই পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল যে তারা চারটি দেশের আয়তনের উত্তর অনেকটা সঠিকভাবে দিচ্ছে; কিন্তু পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে কমবয়সীদের মতই তারা পক্ষপাতগ্রস্ত। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মন্তব্য করছেন যে এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পছন্দ-অপছন্দের বিচারবুদ্ধি আয়তন পরিমাপের বিচারবুদ্ধির থেকে অনেক অল্প বয়সে আয়ত্ত করা যায়। রক্তের সম্পর্ক বা সহজাত প্রবৃত্তি তাদের এই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেনি। শ্রেণীবিভাজনের জ্ঞান তারা পেয়েছে তাদের বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে। ভাল-লাগা, মন্দলাগার ওপর, পছন্দ অপছন্দের ওপর শিশুদের নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভর করে। বাবা মা ঠাকুমা আমাদের শিশু বয়স থেকেই শত্রু-মিত্র, ভাল-মন্দ শেখাচ্ছেন। ঘৃণার বস্তু, ভয়ের বস্তু থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিচ্ছেন। যে জার্মানীর সংগে দু'বার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামতে হয়েছে তার সম্বন্ধে ভাল ধারণা বেশির ভাগ বাবা-মাই পোষণ করবেন না, এটা সহজেই বোঝা যায়। তাদের বোধশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধারণা শিশুরা তাদের জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চয় করবে, এইতে স্বাভাবিক। নির্জ্ঞান, সহজাত প্রবৃত্তি, —ইত্যাদি দুরবকল্পনার সাহায্য না নিয়েই সহজে যে বিষয় বোঝা যায়, তার মধ্যে ম্যাজিক বুদ্ধি আমদানির কোনো প্রয়োজন নেই; বলেছেন গবেষক স্বয়ং। এইভাবেই তাঁদের লাল জুজুর ভয়, অর্থাৎ রাশিয়া-বিদ্বেষ শিশুদের মধ্যে তাঁরা সংক্রামিত করেছেন। নিজের দেশীয় সমাজের মতামত গ্রহণ করে শিশু ঐ বয়সেই অন্য দেশকে পছন্দ অপছন্দ করতে শিখেছে।

দ্বিতীয় পরীক্ষায় শিশুদের কুড়িটি যুবকের ফটো দেওয়া হল, সংগে চারটে বাক্স। তাদের গায়ে লেখা—(ক) খুব বেশি ভাল (খ) ভাল (গ) ভাল নয় (ঘ) খুব খারাপ। তাদের ভাল লাগা খারাপ লাগার মাত্রা অনুযায়ী ফটোগুলোকে বাক্সবন্দী করতে বলা হল। তারা তাই করল। কয়েক সপ্তাহ পরে ঠিক সেই কুড়িটি ফটো নিয়ে আবার তাদের কাছে যাওয়া হল। এবার দুটো বাক্স, একটার গায়ে লেখা—'ইংরেজ', অন্যটির গায়ে লেখা,—'ইংরেজ নয়'। বাচ্চাদের বলা হল কয়েকটা ফটো ইংরেজের, কয়েকটা ফটো অন্য জাতের। তারা যেন বাছাই করে ইংরেজদের ফটোগুলো, 'ইংরেজ' লেখা বাক্সে আর অন্যদের ফটোগুলো 'ইংরেজ নয়' লেখা বাক্সে তুলে রাখে। তারা অনুমান মত ফটোগুলোকে দুটো বাক্সে ঢোকাল। আর একদল বাচ্চাকে 'ইংরেজ', 'ইংরেজ নয়' বাছাই করা খেলাটা আগে দিয়ে পরে দেওয়া হল 'ভাল লাগা' 'মন্দ লাগার' খেলা। দেখা গেল শতকরা ৮০টি ক্ষেত্রে 'খুব বেশি ভাল' আর 'ভাল ফটোগ্রাফগুলো 'ইংরেজ' লেখা বাক্সটিতে পড়েছে।' আরো কয়েকটি দেশে এই পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শুধু ইংরেজ শিশুই দেশপ্রেমিক নয়; ঐ সব দেশের শিশুরাও 'ভাল' বলতে নিজের দেশের লোককেই বোঝে। পক্ষপাত ওদেরও কম নয়।

পক্ষপাত যদি সমষ্টিনির্জ্ঞানজাত বা নির্জ্ঞানপ্রেষণাপ্রণোদিত হয়, তবে আমরা হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইংলন্ড, আমেরিকা ইত্যাদি সব দেশের সব গ্রুপের মধ্যেই পক্ষপাতের সমান পরিচয় পাব নিশ্চয়ই। এক গ্রুপের মধ্যেকার সবার পক্ষপাতই গ্রুপের ভিতরের দিকে চলতে থাকবে। গ্রুপের সব শিশুই গ্রুপের সংগে একাত্মীভূত হয়ে নিজের গ্রুপের সব কিছুই ভাল মনে করবে। আর যদি সমাজজাত হয় পক্ষপাতিত্বের মনোভাব তবে সমাজের বড় গ্রুপের মনোভাব, পক্ষপাতী—মানসিকতা ছোট গ্রুপের অনেককে, বিশেষ করে শিশুদের প্রভাবিত করবে। যে-সব ছোট গ্রুপ সমাজের নীচের তলায়, যাদের সম্বন্ধে বড় গ্রুপ বা প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর মনে ঘৃণার এবং তাচ্ছিল্যের ভাব, তারা সব সময়েই বা সকলেই যদি নিজের গ্রুপের সম্বন্ধে উচ্চভাব পোষণ না করে, তবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যে, পক্ষপাত সামাজিক ধর্ম, শৈশবে পরিবেশ থেকে আয়ত্ত হয়। নিউ-ইংলন্ডের একজন গবেষক নার্সারী স্কুলের শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, সাদাদের শতকরা ৯২ নিজের গ্রুপ অর্থাৎ সাদার প্রতি পক্ষপাতগ্রস্ত, আর কালোদের মধ্যে নিজ গ্রুপের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২৬। তার মানে, সংখ্যা-গুরু ও প্রতিপত্তিশালী সাদার সমাজের প্রভাব এই ক্ষেত্রে দুর্বল সংখ্যালঘু কালো-সমাজের প্রভাবকে ক্ষুন্ন করেছে। নিউ-জিল্যান্ডে মাওরি শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা করেও ঐ রকমই ফল পাওয়া গেছে। নিজের গ্রুপের প্রতি পক্ষপাতী মাওরি শিশুর সংখ্যা সাদা শিশুদের সংখ্যার অর্ধেক। ব্রিস্টলের গবেষক ইস্রায়েলে তাঁর ফটোগ্রাফ পছন্দের পরীক্ষায় পক্ষপাতের সামাজিক ও পরিবেশগত ভিত্তির আরো সমর্থন পেয়েছেন। ইস্রায়েলে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশের লোকই আছে। দুই দেশের শিশুদের মধ্যেই তিনি ইউরোপের মানুষদের

প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন। ইস্রায়েলের সমাজে সাদা চামড়ার ইউরোপবাসীর কদর বেশি। সব দেশের, সব সমাজের, সব বর্ণের শিশ্বরাই অতিশয় অন্বভূতিপ্রবণ। বিশেষ করে, সামাজিক পরিবেশ তাদের অতিমাত্রায় প্রভাবিত করে। পরিবেশগত পক্ষপাত তাদের মধ্যে সহজেই সংক্রমিত হয়েছে। 'প্রেজ্বডিস' বা পক্ষপাত সমাজসঞ্জাত। এ বিষয়ে পক্ষপাতদ্বষ্ট ছাড়া আর কারো কোনোরকম সন্দেহ থাকবে না, যদি তিনি আজকালকার গবেষকদের পরীক্ষার ফলাফল গ্বলো ভালো করে বিশ্লেষণ করেন।

পক্ষপাত আমরা খানিকটা অভিভাবিত হয়ে গড়ে তুলি এবং সযত্নে লালন করি। সমাজে যে ধারণার প্রাধান্য সেই ধারণা আমরা শৈশবেই গ্রহণ করি এবং প্রায়ই অসংগত যুক্তি দিয়ে ধারণাটিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করি। পক্ষপাতের স্বপক্ষে বেশির ভাগ সময়েই কোনো বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি থাকে না। আবার শৈশবে সঞ্চারিত পক্ষপাত খন্ডনের বিপরীত যুক্তি ও সমাজ সহজলভ্য নয়। মানসিকতা পক্ষপাতদ্বষ্ট হওয়ার ফলে অন্য গ্রুপের সুযুক্তি ও গ্রাহ্য হয় না। কাজেই সময় সময় পক্ষপাতগ্রস্ত অদ্ভুত অসংগত যুক্তির সাহায্যে পক্ষপাতকে জোরালো করবার চেষ্টা করে।

এক এগারো বছরের অস্ট্রিয়ার ছাত্র তার রুশবিদ্বেষের কারণ হিসেবে একজন সমীক্ষককে বলে যে রুশরা হিটলারের নেতৃত্বে তার দেশ দখল করেছিল বলেই সে রুশদের ঘৃণা করে। নিজের বিদ্বেষকে যুক্তি দিয়ে সমর্থিত করে পক্ষপাতের অযৌক্তিকতা, অসংলগ্নতা দূর করতে সকলেই চেষ্টা করে।

পক্ষপাতের অসমর্থক সংবাদ পক্ষপাতগ্রস্ত সাধারণত গ্রহণ করে না। ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে না। জটিল সমাজ ব্যবস্থায় বাইরের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য যাচাই করা কঠিন; গ্রুপের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের পক্ষপাতী ধারণাকে তাই প্রশ্রয় দিতে পারি। হিসেবের ভুল, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভুলের জন্য আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়,—অন্তত গ্রুপের অন্য ব্যক্তির কাছে খাটো হতে হয়, কিন্তু বাইরের গ্রুপ, বিশেষ করে বিদ্বেষী গ্রুপ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষপাতমূলক ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও আমাদের কোনো কিছু লোকসানের ভয় থাকে না। বরং বিদ্বেষী গ্রুপ সম্পর্কে পক্ষপাতগ্রস্ত ধারণা ও আচরণের জন্য নিজের গ্রুপের কাছে সময় বিশেষে (যখন দুই গ্রুপের বিদ্বেষ খোলাখুলি বিবাদ-বিসম্বাদে পরিণত) বাহবা বাহাদুরি ইত্যাদি পরোক্ষ পুরস্কারই পেয়ে থাকি। এ-ছাড়া আগেই বলেছি পক্ষপাত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রক্ষোভ-তাড়িত হয়ে দেখা দিয়ে থাকে; সে সময় পক্ষপাতগ্রস্তের মন যুক্তিবুদ্ধি গ্রাহ্য থাকে না।

শিশু মনে পক্ষপাতের উদ্ভব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের পরীক্ষা ও মতামত শুনলেন। পক্ষপাতের শক্তি ও আপাত-দৃষ্টিতে অনড়ত্বের কারণও বলা হয়েছে।

পক্ষপাত মানসপটকে বিকৃত করে, শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের কাল্পনিক ছবির মধ্যে আমরা ব্যক্তিকে হারিয়ে ফেলি। মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় আমরা ব্যক্তিকে 'ক্যাটিগোরাইজ' করি। ছাঁচ বা 'স্টেরিওটাইপ' তৈরী করে ব্যক্তিকে তার মধ্যে ফেলে বিচার করি। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে ভুলে যাই বলে, ব্যক্তিকে বিমূর্ত করে ফেলি বলে, তাকে বিনাদোষে আঘাত করে অনুশোচনা বোধ করি না। কেন না সেত 'কংক্রিট' কোনো কিছু নয়। সেত 'ইনডিভিজুয়াল' নয়। তার দেহে বা মনে যে ব্যথা লাগতে পারে, আমরা তখনকার মত ধারণাই করতে পারি না।

মিঃ আমেদ অনেক দিন ধরে 'হাই-ব্লাড প্রেসার, এ্যাজমা, কার্ডিয়াক এনলার্জমেন্ট' ইত্যাদি নানাবিধ অসুখে ভুগছিলেন। অসুখের মৌলিক হয়ত মানসিক নয়, কিন্তু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সংগে মানসিক ক্ষোভ বিশেষভাবে জড়িত ছিল। দেশবিভাগের পর অনেক আত্মীয়-বন্ধু পাকিস্থানে চলে গিয়েছিলেন, তিনি যাননি। ছাত্রজীবন থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রামের সংগে জড়িত। রাজনৈতিক মতবাদে বামপন্থী প্রগতিবাদী। উচ্চশিক্ষিত ও কয়েকটি ভাষাবিদ। ১৯৫০ পর্যন্ত রোগের তীব্রতা ছিল না। আমার সংগে পরিচয় ১৯৬০ কি ১৯৬১ সালে। তখন অস্থা বেশ উদ্বেগজনক। ৫০ সাল পর্যন্ত দেশে নিজের সম্প্রদায়ের উদারপন্থীদের মধ্যেই বেশির ভাগ সময় কেটেছে। অন্য সম্প্রদায়ের বন্ধুদের সংগে মিলিত হয়েছেন মিটিং-এ, মিছিলে, সংগ্রামের প্রোগ্রামে, অথবা জেলে। খুব বেশি ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়নি, কাজেই মানসিক আঘাতের প্রশ্নও ওঠেনি। হিন্দু বন্ধুদের সাময়িক ত্রুটীবিচ্যুতি সংগ্রামের উত্তেজনায় লক্ষ্য করেননি। অথবা মুস্লিম লীগের অশোভন উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু বন্ধুদের 'মৃদু সাম্প্রদায়িক (বন্ধুদের মধ্যে সনাতনপন্থী কেউই বিশেষ ছিলেন না) মনোভাবকে উপেক্ষার চখে, ক্ষমার চখে দেখতে পেরেছেন। ৫০-এর পর কোলকাতায় এলেন। সহকর্মীদের বেশীর ভাগই হিন্দু। কাজেই ঘনিষ্ঠতা ও মেলামেশা বাড়তে লাগল। ত্রুটীবিচ্যুতিগুলো ঘন ঘন চখে পড়তে লাগল। মিঃ আমেদ ছিলেন দুর্বল নিস্তেজনাপ্রবণ মস্তিষ্কের অধিকারী। আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা ছিল কম। এ-ছাড়া নিকটতম আত্মীয়বন্ধু এ দেশে না থাকায়, নানা ব্যাপারে হিন্দু সকর্মীদের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। কাজেই অল্পেতেই বেশী আঘাত পেতে লাগলেন। জেলফেরত বেকার যুবকদের নিয়ে ব্যবসা করার দিকে ঝোঁক গেল। অবশ্য তাদেরই অনুরোধে। ব্যবসা করতে গেলে শক্ত হতে হয়, অনেক সময় বন্ধুবান্ধবকে স্পষ্ট কথা বলতে হয়, অনেক ব্যাপারে অনুরোধ উপরোধে অচঞ্চল থাকতে হয়,—এর কোনো কিছুই করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এরা রাজনৈতিক সহকর্মী, এদের বাধিত না করে তিনি পারেন না। সর্বোপরি আর এক ভয়, যদি এরা মনে করে মুস্লিমরা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না! এইভাবে চলতে চলতে দেনায় ডুবে গেলেন। ব্যবসা উঠে গেল। যারা নানা অজুহাতে ধার করেছিল, তারা টাকা ফেরত দেওয়া ত' দূরের কথা, দেখাসাক্ষাৎও বন্ধ করল। দেশের জমিজমা বিক্রী হয়ে গেল। কোলকাতার বাড়ী মর্টগেজ দিতে হল। এই অবস্থায় ভদ্রলোক আমার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। অবশ্য পুরো দায়িত্ব আমি নিতে চাইনি, তিনিও দিতে পারেন নি। মাঝে কিছুটা উন্নতি দেখা দিয়েছিল। বাড়ী বিক্রী ছাড়া দেনা মেটানোর যখন অন্য কোনো উপায় রইল না, সেই সময় একদিন আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটল। মোটামুটি বছর দুয়েকের মধ্যে তাঁর সংগে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

প্রগতিবাদী বন্ধুদের পক্ষপাতী মনোভাব, নিজের নিরাপত্তার অভাবের জন্য হয়ত তিনি বাড়িয়ে দেখেছিলেন। তাঁর মনের মধ্যেও বোধ হয় পক্ষপাতিত্বের অস্তিত্ব ছিল। তাঁর স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যও তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সহকর্মীদের ব্যবহার ও আচরণকে পরোক্ষভাবে তাঁর মৃত্যুর কারণ বলে আমি মনে করি।

তাঁরা স্বেচ্ছায় পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেছেন বা নিজেদের জ্ঞাতসারে তাঁকে আঘাত দিয়েছেন;—এ যেন কেউ মনে না করেন। পক্ষপাতদুষ্ট বুঝতে পারে না যে, সে পক্ষপাতদুষ্ট।

পক্ষপাতের আলোচনা প্রসংগে দু'একটি প্রশ্ন মনে উঠেছে। আন্তর পার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে পক্ষপাতের কোনো ভূমিকা আছে কি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের মধ্যে যে ফাটল দেখা দিয়েছে, সেখানে দেশজ পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন আছে কি? আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় পক্ষপাতের আলোচনা কোনো কাজে লাগতে পারে কি?

আমরা দেখেছি পক্ষপাতের অধিষ্ঠান সমাজ-অংগে। এই সমাজকে পরিবর্তিত না করে পক্ষপাতের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়ত সম্ভব নয়। তবে বিকৃত ইতিহাস, অসত্য সংবাদ, পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অজ্ঞাতপ্রসূত ধারণাগুলো হয়ত অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে। পক্ষপাত নিয়ে অন্যদেশের মত আমাদের এখানে গবেষণা হওয়া দরকার।

—মনোবিদ

পাখি

লীলা মজুমদার

(১৪)

সকাল থেকে এক কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু বড়-মা ওষুধ খেয়ে অবধি সমস্ত সময়টা ঘুমিয়ে কাটালেন। তবে একথা আমার অনেক সময়ই মনে হত যে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীটুকুর বাইরে কোনো কিছুতে তাঁর এতটুকু কৌতূহল ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের অবধি ছিল না। অ্যানির ব্যাপারের জন্য সে-দিন আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাই নি। তার উপর ভোর থেকেই টিকলির জন্য মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করছিল। বেলা এগারোটায় মিঃ সরকারকে নিচে নামতে দেখে আমিও টিকলির খাবারের পুঁটলি হাতে নিয়ে সঙ্গে গেলাম। সাহেবের স্নান হয়ে গেছে, সে বাড়িময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমাকে দেখেই বললেন, "বোনঝি কাল আসে নি দেখে বুঝি ভাবনা হচ্ছে? খাবারটা না হয় পৌঁছে দিলাম, কিন্তু তুমিও যাবে না কেন? আমাকে আগে নামিয়ে, গাড়ি ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করবে। তোমার কাজ হলে ফিরে এসো। ততক্ষণ সায়ন চৌধুরী আর মৌরির সঙ্গে ভাব করুক, মিসেস কস্টেলো ওদের একসঙ্গে খাইয়ে দেবে। এমনিতেই দেখে এলাম চৌধুরী মৌরির পিছন পিছন ভক্ত হনুর মতো বেড়াচ্ছে।"

সেই ব্যবস্থাই করে এলাম। বাসব সরকার হঠাৎ আমাকে তুমি বলাতে মনে হল একজন আত্মীয় খুঁজে পেলাম। তার উপর ওঁকে বাড়িতে নামানো হবে শুনে খুসি হলাম। বাড়ি মানে ঐ ঘুনো-বাড়ি। আমার ঘুনো-বাড়িটাকে কাছ থেকে দেখার বড় শখ। বাইরে থেকে এ-বাড়ি আর ও বাড়ি অবিকল একরকম হলেও, অ্যানির কাছে শুনেছি বাসব সরকার ওটাকে যেমন করেই হক, হস্তগত করে নাকি ভিতরটাকে চমৎকার করে সাজিয়েছে। অঢেল টাকা খরচ করেছে, কোথায় পেয়েছে কে জানে। অবিশ্যি সত্যি কথা বলতে হলে, এ-বাড়িটাকেও আগা-গোড়া খুব ভালো করে সারানো হয়েছে। আসছে বছর নাকি দুই বাড়ির বাইরেটা রঙ করা হবে। বেজায় মজবুৎ গাঁথনি, কে বলবে দেড়শো বছর আগেকার বাড়ি। বড় মাস্টারের ঠাকুরদা করিয়েছিলেন দুটোকে। তারপর আমার জানলা দিয়ে ঘুনোবাড়ির ছাদের কোনাটুকুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "কে জানে মামলার সময় হয়তো অনেক টাকা লেগেছিল, তখন ঘুনো-বাড়ি বিক্রি করা হয়েছিল। ওটা শুনতাম ছোট-ম্যাডামের বাড়ি, এটা বড়-ম্যাডামের। ছোট-ম্যাডাম নিজেই রইল না, তা বাড়ি রেখে কি হবে? আশ্চর্য ব্যাপার যে এত কাছে থেকেও ও-বাড়ির কোনো খবর এখানে পৌঁছত না।"

আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। "সে কি, অ্যানি! বাড়ি দুটি তো ব্রিজ দিয়ে জোড়া।" "তাতে কি হল। চারতলার দরজায় এখন-ও যেমন বড় তালা দেওয়া, তখনো তেমনি ছিল। বড়-মাস্টার ছাড়া কারো সে-তালা খোলার সাহস ছিল না। চাবি ওঁর কাছে থাকত। তবে সে-চাবি হয়তো বড়-মার নাগালের বাইরে থাকত না। শুনেছি ওদের পক্ষের উকীলরাও সেই কথাই বলেছিল।"

আমি বলেছিলাম, "কিসের মামলা, অ্যানি, খুলেই বল না।" অমনি যেন অ্যানির সম্বিৎ ফিরে এল। ঠোঁট চেপে বলল, "যে-ঘটনা তুমি হাঁটতে শেখার আগে চুকে-বুকে গেছে, তাই নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কি দরকার?" আমিও ছাড়ি নি। "চুকে তো যায় নি, অ্যানি, পাশের ঘরেই তো তার জলজ্যান্ত চিহ্ন রয়েছে। অমন নিখুঁৎ সুন্দরীর গালের কাটার দাগ-ও কি সেই সময়ের?"

অ্যানি চমকে উঠে বলেছিল, "গালের কাটার দাগের কথা কি বলছ, মালা? ও তো তুচ্ছ জিনিস। কাটা দাগ নিয়েও ম্যাডামের পায়ের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। সায়ন তো লক্ষ্যই করে না। কাটা দাগের জন্য বলছি না। একটা নির্দোষ মানুষের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল দেখলে, ভগবানে বিশ্বাস আলগা হয়ে যায়।" এর বেশি আর অ্যানির কাছ থেকে কোনোমতেই বের করতে পারি নি। বেশি অনুসন্ধান করতে গেলেই সে উঠে চলে যেত। হয়তো নিজের জিবকে বিশ্বাস করতে পারত না। বলা বাহুল্য এ-সব কথা হয়েছিল বড়দিনের উৎসবের আয়োজন করার ফাঁকে ফাঁকে।

তাই গোড়া থেকেই আমার ও-বাড়ি দেখার শখ। ব্রিজ দিয়ে জোড়া হলে কি হবে, সেখানে যেতে হলে, এই গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে, খানিকটা এগিয়ে সমান্ত-রাল আরেকটা গলি দিয়ে ঢুকে, তবে ও-বাড়ির ফটক পাওয়া যায়। দেখলাম আসলে বাড়ি দুটি পিঠো-পিঠি-তৈরি করা হয়েছে। মাঝখানে একটা পথ আছে বটে, প্রথম দিনই সেটা লক্ষ্য করেছিলাম। পথের উপর দিয়ে ব্রিজটা গেছে। এখন মনে হল ওটা প্রাইভেট রাস্তা হবে। দুই বাড়ির সদর ফটক তার উল্টো দিকে, একটা থেকে অন্যটাকে দেখা যায় না। তবে মাঝখানের গলিটাতে দুই বাড়ির খিড়কি দরজা আছে। ঐ দিক দিয়ে চাকর-বাকররা হয়তো যাতা-য়াত করত, অন্ততঃ যখন একই মালিক ছিল, তখন। তবে অ্যানি বলেছিল, সে এসে অবধি দেখেছে দুই বাড়ির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, ঐ বড়-কর্তার পুলটা ছাড়া। ও-বাড়ির কথা ম্যাডামের সামনে কারো মুখে আনার সাহস ছিল না।

আজ তার সামনের ফটক দিয়ে বাসবের গাড়ি ভিতরে ঢুকল, উনি নেমে গেলেন। আমাকে বললেন, কোনো তাড়া নেই। আজ রবিবার, যতক্ষণ খুসি থাকতে পার। সারা-দিন যদি থাক, তাহলে গাড়ি ছেড়ে দিও। কখন ফিরবে সেটুকু ড্রাইভারকে বলে দিলেই হবে।" কিন্তু আমি গতবারের কথা মনে করে শিউরে উঠেছিলাম। "না, না, আমি ঘণ্টা খানেকের বেশি থাকব না। অ্যানির উপর তিনটে ছেলেমেয়ের ভার চাপানো উচিত নয়।"

তাই বলেছিলাম বটে, কিন্তু ও বাড়িতে পৌঁছে যা দেখলাম, তাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফেরার কথা মনেও আনতে পারি নি। এমন কি গাড়িটা ছেড়ে দেবার কথাও ঘণ্টাখানেক পরে মনে হয়েছিল। তখনি তার হাতে বাসব সরকারকে একটা খবর দিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম খিড়কির দরজা হাঁ করে খোলা রয়েছে, কিন্তু নিচে কেউ নেই। রান্নাঘরেও হাঁড়ি চড়ে নি। উপর থেকে মেয়েলী কিন্তু কর্কশ কথাবার্তা আসছে। অশুভ আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি সরু পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখি অনিমাসির মেয়ে চারুদি অস্থিরভাবে দাদামশাইয়ের ছোট ছাদে খাঁচায় পোরা বাঘের মতো পাইচারি করছে, আর অনিমাসি একটা কাঠের চেয়ারে পা গুটিয়ে বসে মহা চ্যাঁচামেচি করছে। হঠাৎ আমাকে দেখে দুজনেই চুপ।

তারপর চারুদি জিজ্ঞাসা করল, "টিকলি কোথায়?" আমি আকাশ থেকে পড়লাম। টিকলির কথা আমি জানব কি করে? আমিও তো তারই খোঁজে এসেছি। কাল ওর নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু যায় নি বলে দস্তুরমতো ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। ওর খাবার নিয়ে এসেছি।" পুঁটলিটা দাদা-মশাইয়ের রঙ-জ্বলা গোল টেবিলটার ওপরে রাখতেই, চারুদি কাছে এসে, সীট-ছেঁড়া

আরাম-কেদারায় ধপ্ করে বসে পড়ল। মাকে বলল, "সব তোমার দোষ। মালার কাছে চা খেতে যাবে, তাতে বাধা দিলে কেন ?"

অনিমাসিও ফোঁস করে উঠল, "দিয়েছ কখনো লোকের বাড়ি যাবার যোগ্য একখানাও কাপড়-জামা ? পুজোর সময় পর্যন্ত বচ্ছরকার আটপৌরে কাপড় ছাড়া আর এক চিল্‌তে নয়। বড়লোকের বাড়িতে কি তাবা পরে গিয়ে আমার মাথা হেঁট করাবে ?"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমি তো এক মাস আগে একখানা সুন্দর সাড়ি কিনে দিয়েছি। সেটাই যথেষ্ট ভালো হত।" অনিমাসি একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "সেটা আমি তুলে রেখেছি। বিয়ের সময় অনেকগুলো নমস্কারি দিতে হবে না ?"

এত চটে গেলাম যে উত্তর দিতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "বঙ্কুদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছ ?" অনিমাসি তেড়িয়া হয়ে উঠল, "বঙ্কুদের বাড়িতে আমি যাই, না চিঠি লিখি ? এককালে ওর ঠাকুরদা আমাকে লুকিয়ে চিঠি লিখত বটে। তাও বাবার হাতে পড়াতে বন্ধ হয়ে গেছিল।" চারুদি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, "চল একবার সেখানে গিয়েই খোঁজ করি।" যাবার আগে একবার অনিমাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কখন থেকে তাকে পাচ্ছ না ? গেল কখন ?" "কি করে বলব ? কাল রেগেমেগে সকাল থেকে ঘরে ছিটকিনি দিয়ে ছিল, খায় দায় নি। এখনো বড়দিনের বন্ধ চলেছে, কাজেই ঘর থেকে বেরুবার কোনো দরকার হয় নি। বিকেলে বঙ্কু ডাকাডাকি করেছিল, দরজা ঠেলেছিল; চোখে দেখে না, কাজেই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ না বাইরে থেকে শিকলি তোলা, কিছুই দেখে নি। আজ ভোরে গঙ্গাধর সাধ্য-সাধনা করতে উপরে গিয়ে দেখে ঘর বাইরে থেকে বন্ধ। তখনি দোকান থেকে ফোন করিয়ে চারুকে আনালাম।"

চারুদি আর আমি বাক্য ব্যয় না করে নিচে গেলাম। ড্রাইভার আমাদের বঙ্কু-দের বাড়িতে ছেড়ে দিল। তাকে বলে দিলাম আমার কাজ হয়ে গেলে নিজেই ফিরে যাব, আমাকে নিতে আসতে হবে না।

বঙ্কুদের অবস্থা এককালে খুব ভালো ছিল। ওর ঠাকুরদার তেজারতি ছিল, তাতেই ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ওর বাবা সে-রকম সুবিধা করতে পারে নি। এখন তাদের পড়তি অবস্থা। বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকতেই সেটা বোঝা গেল। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি সেকালের সরকারি বাড়ির মতো লাল রঙের দেয়াল, সবুজ দরজা জানলা। তার বেশির ভাগই বন্ধ। দোতলার তিনতলার বারান্দা থেকে কাপড় ঝুলিয়ে শুকোনো হচ্ছে। নিচেটা পুরুষদের এলাকা। সামনের চওড়া বারান্দায় তক্তাপোষের উপর গেঞ্জি গায়ে আধা-বয়সী কয়েকজন পুরুষমানুষ বসে ছিলেন। আমাদের দেখে এমনি অবাক হয়ে গেলেন যে টের পেলাম পায়ে হেঁটে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে এখানে আসে না।

আমাদের দেখে তাঁরা কেউ উঠলেন না। সবাই ছোকরা-মতো একজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত সে-ই উঠে এসে বলল, "দেখুন, আপনারা ভুল করছেন, এখান থেকে কোনো চাঁদাটাঁদা দেওয়া হয় না। যা দেবার আমাদের গদীতে ফর্দ আছে, সেই অনুসারে দেওয়া হয়।"

চারুদি বলল, "চাঁদার জন্য আসি নি। একটু দেখা করতে চাই।" ছোকরা বলল, "আমাদের বাড়ির মেয়েরা যার তার সঙ্গে দেখা করেন না।" চারুদি বলল, "মেয়েদের দিয়ে হবে না। বাড়ির কর্তার সঙ্গে কথা ছিল।" ছোক্‌রা বেজায় বিরক্ত হয়ে বলল, "বড়-কর্তা বাইরের মেয়েমানুষদের সঙ্গে কথা বলেন না।"

চারুদির গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। খুব বেশি ধৈর্য তার কোনো দিন-ই ছিল না। গলাটা একটু তুলে সে বলল, "অন্য সময় হলে, আমরাও আপনাদের মতো লোকদের বাড়িতে আসি না। বিশেষ কারণ আছে বলেই এসেছি। আমরা গণেশ রায়ের নাতনি।" গণেশ রায়ের নাম শুনেই বয়স্করা দু তিন-জন উঠে এলেন। একজন হাতজোড় করে বললেন, "চিনতে না পেরে অভদ্রতা করে ফেলেছি, মাপ করবেন। গণেশ রায়ের নাতনিরা যে পায়ে হেঁটে খোলা রাস্তা দিয়ে আসতে পারেন, এ আমরা ভাবতেও পারি নি।—"

একটা গাড়ি এসে ফটক দিয়ে ঢুকল। মিঃ সিংহ নামলেন। সকলে শশব্যস্ত হয়ে উঠল, "এ কি, উকীলবাবু যে ! বলুন কি করতে পারি।' মিঃ সিংহ আমাকে বললেন, "তোমরা গাড়িতে উঠে বস। এ-সব জায়গায় একলা হেঁটে এলে মেয়েরা সম্মান পায় না, তাও জান না ?" বাড়ির পুরুষ মানুষেরা ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 'এটা কি রকম কথা হল, সিংহ সাহেব। চিনতে পারি নি ভাই—"

মিঃ সিংহ বাধা দিয়ে সংক্ষেপে বললেন, 'বঙ্কিম কোথায় ?' বঙ্কিম ? ও বঙ্কু, তাই বলুন। বঙ্কু !—অথাই বঙ্কু !" সবাই মিলে ডাকাডাকি করাতে চোরের মতো বঙ্কু এল। মিঃ সিংহ তার ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন "বল, টিকলি কোথায় ?" বঙ্কু বলল, "আঁ—আঁ—আমি—" জলদ গম্ভীর স্বরে মিঃ সিংহ বললেন, 'কোথায় আছে বল শীগ্‌গির, যদি ভালো চাও।" বঙ্কু বলল, 'ঠাকুমার কাছে।' বাড়িসুদ্ধ সবাই থ। ঠাকুমার কাছে আবার কি ? কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরুল যে বাস্তবিক-ই তাই। কাল সন্ধ্যেবেলায় টিকলি এসে উপস্থিত হতেই ক্ষেমি ঝির সঙ্গে দেখা। সে তাকে সটান ঠাকুমার জিম্মা করে দিয়েছে। বঙ্কুর নাম করতেই ঠাকুমা তাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে-ছেন। জল ছাড়া কিছু খেতে দেন নি। না হেসে পারলাম না।

মিঃ সিংহও কাষ্ঠ হেসে বললেন, "তাও ভালো। এবার তাকে আনা হক, আমরাও বিদায় হই।" ক্ষেমির সঙ্গে যখন টিকলি সত্যি সত্যি নেমে এল, তাকে দেখে চিনবার জো ছিল না। ভয়ে, ভাবনায়, অনাহারে, তার যে বঙ্কু-ব্যামো সেরে গেছে, সে বিষয়েও আমাদের কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। চারুদি কিছুতেই দাদামশাইয়ের বাড়ি গেল না। টিকলিকে নিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে চলল। সঙ্গে কোনো জিনিস আনে নি, ওবাড়ি যাবার কি দরকার ? আমি বললাম, টিকলির জিনিস ? চারুদি বলল ওর আবার জিনিস কোথায় ? কতকগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়া দেখলাম। সব নতুন কিনে দেব। আমাদের স্কুলে নতুন ক্লাসে ভর্তি করে দেব, বইটইও সেখানেই কেনা যাবে। আরো তো এক সপ্তাহ ছুটি আছে।"

আমি বললাম, টিকলির খাবারের পুঁটলি ? চারুদি বগল থেকে সেটাকে বের করে দেখাল। অমনি টিকলি সেটাকে ছিনিয়ে নিল। নাকি না খেলে মরে যাবে। ট্যাক্সি করে গিয়ে ওদের তুলে দিয়ে এলাম। চারুদি মিছিমিছি মিঃ সিংহকে কাছে বসে বাড়াতে চায় না বলল। মিঃ সিংহ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, কিন্তু তুমি কি করে ফিরবে, মা ? হাসলাম। আমার জন্য কেন ভাবছেন ? আমার একলা চলা ফেরা করার অভ্যাস আছে। একলা ট্যাক্সিতে—না না ট্যাক্সিতে কেন ফিরব ? সোজা বাস ধরব।

বুঝলাম ব্যবস্থাটা বুড়ো ভদ্রলোকের খুব মনঃপূত হল না। তবু কি আর করেন, আমাদের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে নামিয়ে দিয়ে বললেন ফেরার পথে ড্রাইভারকে দিয়ে তোমার মাসিমাকে একটা খবর দিয়ে যাব।

ট্যাক্সিতে উঠেই টিকলি বলল, "মা রাগ করেছ ? আমার জন্য ট্রেনে চা অর্ডার দেবে না ? বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে।"

হতাশ কণ্ঠে চারুদি বলল, "রাগ নিজের উপর। এত দিন তোমাকে মায়ের কাছে ফেলে রেখেছিলাম বলে। এবিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা কর না মা।" টিকলি ক্ষণেক কান্না, ক্ষণেক হাসি। চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে জেগে বলল "রবিবার কাপড়ের দোকান বন্ধ থাকে না ?

"না, সব দোকান বন্ধ থাকে না। তারপর কিছুক্ষণ ম্লানমুখে টিকলির দিকে চেয়ে বলল, "ওখানে কিন্তু যখন তখন বেরিয়ে যাবার উপায় নেই।" "তোমার সঙ্গেও না?" "হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যাবে বই কি।" টিকলি প্রসন্ন হল।

বাড়িতে ফেরার পথে কেবলি মনে হতে লাগল, বাঃ এদের সমস্যাও কেমন সহজে মিটে গেল। এবার অনিমাসি দিদিমার লুকনো মোহরগুলো খুঁজে পেলেই, তার সমস্যাও মিটবে। আমি তখন হাত পা-ঝাড়া হয়ে বড়মার কথা ভাবতে পারব। আর কোনো চিন্তা থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে দুটি মুখ মনে পড়ল।

(১৫)

বাড়িতে পেঁছিতে বেলা হয়ে গেল। অন্য দিন এই সময়ে সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকে যায়। হয় তো বেলা দেড়টা বেজে গেছিল। ভাবছিলাম জানুয়ারি মাসে নিজেকে একটা নববর্ষের উপহার দেব; একটা হাতঘড়ি কিনে ফেলব। আজও দেখলাম বাড়ি একেবারে চুপচাপ। উপরে উঠতেই অ্যানির সঙ্গে দেখা। "ভাগ্যিস মিঃ সিংহ খবর দিয়ে গেলেন, নইলে ভাবতাম আর সইতে না পেরে, তুমি বুঝি পালিয়ে গেছ। জোনাস বলছিল যদি সত্যিই পালিয়ে গিয়ে থাক, ও তোমাকে কোন দোষ দেবে না। নাকি এক বাড়ি পাগলের মধ্যে একজন প্রকৃতিস্থ মানুষের বাস করা খুব শক্ত! —চল লাঞ্চ খাই। জোনাস টৌবি মেরির অনারে ফ্রাইড রাইস করেছে। এসো খিদে পেয়েছে।"

আমি তো অবাক। সে কি, তুমি খাও নি অ্যানি? অনারা?" অ্যানি হাসল। "সবাই খেয়েছে। ছেলেমেয়েরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি খাওনি বলে আমি খাইনি। আমি খাইনি বলে জোনাস খায়নি। মালা, জোনাস সব জানে। নাকি আমাকে বিয়ে করবার আগে থাকতেই জানত। ম্যাডামের কাজিন ওকে বলে দিয়েছিল। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে জোনাস তোমার পরামর্শ চায়।"

জোনাস আর অ্যানির সঙ্গেই সেদিন খেলাম। জোনাস স্নান করে, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে অপেক্ষা করছিল। বললাম "ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে এখন আর কি স্থির করবে তোমরা? এখানে থেকে, ঐ স্কুলেই পড়বে, নাকি আগে অন্য স্কুলে পড়ত?" "অন্য স্কুলে পড়ত, সেখানেই বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছিল, প্রমোশনও পেয়েছে। কিন্তু পাঁচ মাসের মাইনে বাকি, নাম কাটিয়ে দিয়েছে। পাশের বাড়ির ফিরিঙ্গি মেমের কাছে সেই পাঁচ মাস ছিল ওরা। ফার্নিচার বিক্রি করে বাকি বাড়ি ভাড়া, ওদের খাইখরচ ইত্যাদি চলছিল। তারপর আর চলে না দেখে, পাদ্রী ওদের নিয়ে এসেছিলেন।

অ্যানি বলল, 'একটা খবর পর্যন্ত আমাকে দেয় নি।' জোনাস বলল, 'কি করে দেবে? তুমি তো তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখ নি। পাশের বাড়ির লেডি পর্যন্ত তোমার কথা জানতেন না।' অ্যানি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, কাল গিয়ে বাকি মাইনে দিয়ে এসো। জোনাসের সামনে বড়মার কথা পাড়তে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল, তাই সুযোগ পেয়েও কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। একবার মিঃ সরকারের কথা তুলল জোনাস। "দেবতা আর কাকে বলে? কোথায় কার দুর্বলতা সব বোঝেন উনি। মিঃ সিংহ-ও ভালো লোক, কিন্তু দুর্বলতার প্রতি ওঁর কোনো সহানুভূতি আছে বলে মনে হয় না। আমাকে যেন দেখতেই পান না, মদ খাওয়াকে এমনি ঘেন্না করেন।"

অ্যানি জিজ্ঞাসা করল, "তবে খাও কেন?"

"দুর্বলতা, অ্যানি, দুর্বলতা। সে তুমি বুঝবে না।"

অ্যানি অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বলল, "আমি না বুঝলে কে বুঝবে, জোনাস। আর ঐ মিঃ সরকার তো বুঝবেই, ওর নিজের কি কম দুর্বলতা! আউট অফ নাথিং, কেমন নিজেরটা গুছিয়ে নিয়েছে দেখেছ? ম্যাডাম আর ক দিন? দিনে দিনে টের পাই তাঁর হয়ে এসেছে। ম্যাডাম চোখ বুজলে সমস্ত সম্পত্তি ঐ সরকারের মুঠোর মধ্যে চলে যাবে না তো কি। প্রেম কি বলছিল সেদিন, মনে আছে জোনাস?"

আমি বললাম, "কে প্রেম?" অ্যানির গলায় অসহিষ্ণুতা, "আরে ম্যাডামের কাজিন, দেখেছ তো তাকে। একমাত্র তাকে সরকার ভয় পায়। দেখনি এ-বাড়িতে সে এলেই তাকে কেমন ধরে-বেঁধে বিদায় করে দেয়? কারণ সে যে সব কথা জানে। সেই মর্মান্তিক দিনে সে-ও এসে উপস্থিত হয়েছিল। বড় মাস্টারও তাকে দেখতে পারতেন না। বলতেন স্নীক—থিক্! তবু, ম্যাডামের একমাত্র রিলেটিভকে অমন দূর দূর করাটা কি শোভা পায়? ও যে এখানে আসে, সে কথাটা পর্যন্ত ম্যাডামকে বলা বারণ। নাকি আপসেট হয়ে যাবেন। মিঃ সিংহের উপর সরকারের কি হোল্ড আছে তাই ভাবি। সরকারের সুবিধা করে দেবার জন্য কেন তিনিও এই অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন বুঝতে পারি না।"

না বলে পারলাম না, "অথচ, অ্যানি, মিঃ সরকারই তোমার নাতি-নাতনিকে নিয়ে আসা সম্ভব করলেন।" অ্যানি চমকে উঠল, জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, "ভগবান জানেন আমি তার কাছে কত কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার কাছে সবার আগে ম্যাডাম। তিনিই আমার মা বাবা গুরু, যাই বল। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের সুবিধা করাটা আমি কি করে সমর্থন করব, মালা তুমিই বল।"

বাসব সরকারের নিন্দা আমি সইতে পারতাম না। "কত সম্পত্তি আছে বড় মার তো জান? এই সংসার চলে তাঁর মাসিক দেড় হাজার টাকার অ্যানুইটি থেকে। তার মানে, উনি চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। শুনেছি বড় কর্তা পূর্ব বাংলায় জমিদারি কিনেছিলেন। সে সব কোন কালে গেছে। নগদ টাকা বিশেষ কিছু নেই নিশ্চয়, নইলে তুমিই তো সেদিন বললে মামলার খরচ মেটাতে ঘুনো বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছিল। তবে রইলটা কি? এই দেড়শো বছরের পুরনো বাড়িটা আর বড়মার গয়না গাঁটি। তার জন্য মিঃ সরকারের মতো মানুষ এতবড় অধর্ম করবেন, সত্যি তাই মনে কর তুমি?"

বাসব সরকারকে এভাবে আমি ডিফেন্ড করব অ্যানি সেটা ভাবে নি। হাঁ করে আমার কথা শুনতে লাগল। তারপর বলল, "তোমাকেও পটিয়েছে দেখছি। তা আর পারবে না কেন, ম্যাডাম নিজেই যখন ওর কথায় ওঠেন বসেন।"

জোনাস বলল, "হ্যাঁ, তবে তিনি ঠিক প্রকৃতিস্থ নন। অন্ততঃ আমার বন্ধু হেম তাই বলে। সে নাকি সরকারকে একসপোজ করবার চেষ্টা করছে। তাই ম্যাডামের সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। এটা তুমি হয়তো করে দিতে পার, অ্যানি।"

অ্যানি বলল, "থাম, জোনাস, থাম। কি বল তার ঠিক নেই। এখনো নতুন চাকরিতে জয়েন কর নি। যার জন্য সে চাকরি, তাকে কিসের জন্য বিগড়ে দেবে? ঐ মোদো লম্পট হেমটার জন্য? এসব কথা শুনে মালাই বা কি ভাবছে বল তো? অবিশ্যি সে কখনো সরকারের কাছে আমাদের বিট্রে করবে না। বড় বেশী লোভকে সে ঘৃণা করে। কর না, মালা?"

আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে বসলাম, "তোমাদের কোনো ভয় নেই, অ্যানি, আমি কাউকে কিছু বলব না। কিন্তু লোভের চেয়েও ঘৃণা করি অকৃতজ্ঞতাকে।"

উঠে চলে এসেছিলাম। অমন ভালো কেকটা না খেয়েই। অবিশ্যি বিকেলে চায়ের সময় অ্যানি সেটি আমাকে না খাইয়ে ছাড়েনি। ক্ষমা চেয়েছিল, কেঁদেছিল। ছেলে-মেয়েরা তখন বাড়ি ছিল না। মিঃ সরকারের গাড়ি চড়ে জোনাসের সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিল।

এই সময় বড়মা উঠেছিলেন। অ্যানিকে তাঁর খাওয়া-দাওয়া, সাজ-গোজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। অ্যানি তাঁকে নাতি-নাতনির কথা বলে থাকবে। কারণ আমার যখন ও-ঘরে তলব পড়ল, বড়মা তখন বলছিলেন, 'খুব ভালো কাজ করেছ, উকীল। বড় ভালো লোক সে। দেখ তো আমাকে কেমন সুখ-শান্তিতে রেখেছে। ও-রকম আমার একটা ছেলে হত যদি, আমার কোনো দুঃখই থাকত না। কিন্তু থাকবে কি করে? জানিস, অ্যানি, আমার ভাজরা বলত আমাদের বংশের মেয়েরা যেমনি সুন্দরী, তেমনি বন্ধ্যা। কারো একটা ছেলেমেয়ে হয় না।" কাষ্ঠ হাসলেন বড়-মা। "নিজেদের অনেকগুলো কালো কালো ছেলেমেয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু কই তাদের কাউকে তো দেখি না। মরে গেছে নিশ্চয়। সন্তানবতীরা সব ছেলেমেয়ে সুদ্ধ নিশ্চয় মরে হেজে গেছে আর বাঁজা ননদ বেঁচে থেকে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে কোলে নিয়ে সিংহাসনে বসে হাসছে।"

বলতে বলতে হাসতে লাগলেন বড়-মা। সে কি সাংঘাতিক হাসি। আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। ঠিক সেই সময় বাসব সরকার সায়নের হাত ধরে ঘরে ঢুকলেন। একবার তাকিয়েই অবস্থাটা বুঝে নিয়ে, সায়নকে বড়মার কোলে বসিয়ে দিয়ে, তাঁকে বকতে লাগলেন, "ও কি, বড়মা, ও-রকম করে হাসতে হয়? ওতে কি আপনার ছেলের খুব কল্যাণ হবে মনে হয়?"

তখনি বড়মার হাসি থেমে গেল। সায়নের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আস্তে আস্তে মাথাটা ঠান্ডা হয়ে এল। আমাকে বললেন, 'নেতা, এই শীতেও ছেলেটা বড্ড ঘেমে গেছে, নিয়ে যা, কাপড়চোপড় ছাড়িয়ে শুইয়ে দে।' আসলে উত্তেজনার চোটে তাঁর নিজেরই হাত ঘামছিল। আমি পালাবার সুযোগ পেয়ে আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালাম না। সায়নকে কোলে তুলে নিয়ে অমনি প্রস্থান করলাম।

সায়ন আজকাল কোলে থাকতে চায় না। এই এক মাসেই তার শরীর অনেকখানি সেরেছে, ঘরের বাইরে এসেই খচমচ করে নেমে পড়ল। 'নিচে, মামো, নিচে।' নামিয়ে দিতেই দে ছুট। টোবি মোরির দারুণ ভক্ত সে। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। রোজ সন্ধ্যে হতেই সে ঘুমে নেতিয়ে পড়ে। তার আগে গরম জলে হাত-মুখ মুছিয়ে খাওয়ার পর্ব সারতে হয়। অ্যানি জোনাসের কোয়ার্টার থেকে তাকে গিয়ে ধরে আনলাম। একটু চ্যাঁচাল। তার-পরেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে, কাঁধে মুখ গুঁজল। খেয়ে-দেয়ে শুতে বেশি দেরিও হল না। শোবামাত্র ছোট একটা গোলাপী হাই আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

আমি মশারি ফেলে, বড় আলো নিবিয়ে, বাইরে এলাম। কেন জানি মনটা সেদিন ভালো ছিল না। দেখলাম বড়মার ঘরের দরজা ভেজানো। বসবার ঘরের পাশে ছোট পড়বার ঘরটিতে ডাক্তারবাবু, মিঃ সিংহ, মিঃ সরকার, সবাই রয়েছেন। আমাকেও অ্যানি ডেকে নিয়ে গেল। বড়মার অবস্থার যেন ক্রমে অবনতি হচ্ছে, তাই সকলে বড়ই বিষণ্ণ। আমাকে পৌঁছে দিয়ে, অ্যানি আবার বড়মার ঘরে গেল।

মিঃ সিংহ দুঃখিত স্বরে বললেন, 'বাইশ বছর আগে, আমি উপস্থিত থেকেও বড়মার সর্বনাশ বন্ধ করতে পারিনি। আইন তার উপর এত অবিচার করল, অথচ কেউ বাধা দিতে পারল না। ভেবেছিলাম এতকাল পরে যদি তার প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হয়—একটা জীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ সম্ভব এ আমি বিশ্বাস করি না—তবু যদি প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বড়-মা নিজেই সে-সবের বাইরে চলে যাচ্ছেন।'

'মিঃ সিংহ, মিঃ সরকার, ডক্টর, শীগ্‌গির আসুন—' অ্যানি ছুটে এসে এইটুকু বলেই, আবার ছুটে বেরিয়ে গেল। বড়মার ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। অ্যানি তাঁর গায়ের চারদিকে একটা কাশ্মিরী-ড্রেসিং-গাউন জড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেখেই বড়-মা মিঃ সরকারকে বললেন, 'উকীল, আমাদের গাড়িটা কেন জ্যাকে তোলা? ওটা না-সারাবার মানেটা কি? বড়-কর্তার সেই রকম হুকুম নাকি? যাতে আমি গাড়ি চড়ে ঘুনো-বাড়িতে গিয়ে, সেই মেয়ে মানুষটাকে আমার ছেলে দেখাতে না পারি? তাকে বল গিয়ে, কোনো ভয় নেই, আমি ওদিকে পা-ও দেব না। আমার ছেলের উপর তার চোখ যেন না পড়ে। বলে নাকি আমি তাকে হিংসে করি? যার এমন ছেলে সে-কি কাউকে হিংসে করে কখনো? উকীল, গাড়ি সারাবে কি না বল?'

মিঃ সরকার তাঁকে জড়িয়ে ধরে, বড় চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। দেখলাম বড়মার পা-দুটি থর থর করে কাঁপছে। বাসব সরকার বললেন, 'যদি সারানো সম্ভব হয়, সারাব নিশ্চয়। ততদিন পর্যন্ত আমার গাড়িতে করে আপনি যেখানে খুসি যাবেন। অবিশ্যি ডাক্তারবাবু অনুমতি দিলে তবে। জানেন তো আপনার হার্ট দুর্বল। সায়নকে মানুষ করতে হলে আগে আপনার শরীর সারানো দরকার।'

বড়মা ক্লান্তভাবে চেয়ারে ঠেস দিলেন। 'উকীল, তুমি যদি আমার গুহলে হতে, আমি পুষ্যি-ছেলে নিতাম না।' দেখলাম বাসবের হাত দুটি একটু একটু কাঁপছে। তিনি কিছু বলবার আগে মিঃ সিংহ অস্বাভাবিক রকম প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'মোটেই না। সায়নবাবু ওর চেয়ে ঢের সুন্দর, ঢের লক্ষ্মী।' বড়মা প্রসন্ন হাসলেন। তারপর উঠে অ্যানির কাঁধে ভর দিয়ে আবার গিয়ে শুলেন। ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকসন দিলেন। বড়মা ঘুমিয়ে না পড়া অবধি ওরা বাইরের ঘরে বসবেন শুনলাম। আমি ঘরে গেলাম। আমার দোর গোড়ায় যে মানুষটি দাঁড়িয়েছিল, তার এ-দিকে আসার কথা নয়। সে বুড়ো বামুন-ঠাকুর। আমাকে দেখেই আমার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। 'ও কি, বামুনঠাকুর, কি হয়েছে?'

'দিদি, সত্যি বলুন, বড়মা নাকি বাঁচবেন না?' বামুনঠাকুর কাঁধের গামছা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। 'অমন দেবতার মতো মানুষের কপালেও ভগবান এত দুঃখ লিখেছিল! উনি আমাদের মতো গরীব-দুঃখীদের মা। কোথাও এত দয়া পাইনি। আর ওনাকে নাকি পাগল ঠাউরে কুড়ি বছর বন্ধ করে রাখল! অমন মানুষ জন্মে দেখলাম না, দিদি। যেই ফিরলেন অমনি খবর দিলেন উকীলবাবু আর ছুটে এলাম। এখন তিনি না বাঁচলে হবে দিদি?'

আমি বললাম, 'বাঁচবেন না কে বলেছে? তবে বয়স হয়েছে, শরীরটা দুর্বল, মাথাটাও থেকে থেকে গরম হয়ে ওঠে, তাই খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওষুধ খাচ্ছেন, যত্নে আছেন, আমরা তো সবাই তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি।'

বামুনঠাকুর চলে গেলে, ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে, চুল বেঁধে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। আস্তে আস্তে মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরি হচ্ছে মনে হল। ঘটনাগুলো কিছুই জানি না; কুড়ি-বাইশ বছরের ইতিহাস আমার কাছে গোপন থাকা সত্ত্বেও যেন আবছায়া একটা ছবি ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আমি যে-মানুষকে রোজ দেখতে পাই, সেই ছবিতে সে-মানুষ অন্য রকম হয়ে দেখা দিতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তারপর আরম্ভ হলো নাটক। নানা অসুবিধার মধ্যেও এখানে নাটক অভিনয় হলো। অভিনয় ভালোই। চতুর্থ অংকের পর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুরোধ এলো, আমাকে কিছু বলার জন্যে। বললামও। নাট্য অভিনেতা হিসাবে যতটুকু বলা উচিত ঠিক ততোটুকু।

এর বাইরে আমি বক্তব্য রেখেছিলাম [illegible]

সেই এগার শ' টাকা চুরির জের এখনো চলছে। ধরা পড়েনি। এদিকে পুলিশ ইন্সপেক্টর আবার এলেন। নানা কথার মধ্যে তিনি জানালেন, বাড়ির প্রত্যেকের বাক্স সুটকেস সার্চ করবেন। এ ব্যাপারে আমি আপত্তি জানালাম। বললাম, টাকা গেছে যাক এ সবে আর দরকার নেই। শুনে পুলিশ ইন্সপেক্টর নিরস্ত হলেন।

সত্যি কথা বলতে, স্থানীয় পুলিশ এই টাকা চুরির ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে দারুণভাবে এগিয়ে এসেছিল। হেড কনস্টেবল তো প্রতিদিন আসতো আমার বাসায়। অনেক সময় থাকতো। তাদের ঐকান্তিকতায় খুশি না হয়ে পারি নি।

পুরীর দিন ফুরিয়ে এলো। পুজোর কদিন কাটলো ভালোই। থিয়েটারের মঞ্চে নানা রঙের সাজে নয়, প্রকৃতির কোলে কটা দিন বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

বিজয়ার পর স্থানীয় বাঙালীরা আমাকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে এলো। প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে পেলাম অকৃত্রিম শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। জীবনে এর চেয়ে বড়ো পাওনা আর কি আছে। কিন্তু ফিরে যাবার দিন এগিয়ে এলো। ৭ অক্টোবর রাতের গাড়িতে পুরী থেকে যাত্রা করলাম। পরদিন ভোরে আবার সেই পরিচিত হাওড়া স্টেশনে এসে দাঁড়ালাম। স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের বাইরে প্যান্ডে আমাদের অপেক্ষাতেই ছিল। ফিল্মের কাজের তাগিদে আমাকে ফিরতে হয়েছে বাধ্য হয়ে আবার আরম্ভ হলো দৈনন্দিন কাজের জের টেনে চলা।

কিন্তু কলকাতায় কিছুতেই মন বসছে না। থিয়েটার তখনো বন্ধ। এক ফিল্মের কাজ যা হচ্ছে। তাও এমন কিছু নয়।

এদিকে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন স্ত্রী, ছেলে, মেয়েরাও ফিরে এসেছে পুরী থেকে। বেয়াই শচীন বসুও এসেছেন।

আবার বাইরে যেতে মন চাইছে। শেষটা ঠিকও করলাম। এবারেও আমাদের যাওয়ার পথ উড়িষ্যা দিয়ে। গোপালপুরের সমুদ্রসৈকতে।

এবারেও চললাম সপরিবারে। এমন কি আমার ছোট শ্যালক ভানুও চললো আমাদের সঙ্গে। যাওয়ার তারিখ ছিল ২১ অক্টোবর।

চলতি পথে ট্রেন থেকে দেখলাম চিল্কা হ্রদের অনুপম নিসর্গশোভা। তখন রাত-শেষের চাঁদ দিগন্তপটে, তারপর কুয়াশার ওড়না জড়ানো রাত-জাগা প্রকৃতি-সুন্দরীর সর্বাঙ্গে—চলমান ট্রেনের জানালায় বসে দু চোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে দেখলাম—সুন্দরী চিল্কাকে।

শুধু আমি নই, আমাদের সবারই মুগ্ধ দৃষ্টি তখন চিল্কার বুকের দিকে।

রাতের বাকি সময়টুকু ফুরিয়ে গেল, চলমান ট্রেনের জানালায় বসে চলমান ছবি দেখতে দেখতে।

সকাল আটটায় পৌঁছলাম বহরমপুরে। ট্রেন থেকে নামলাম। রিফ্রেসমেন্ট-রুম থেকে চা-পানের পাট চুকিয়ে তারপর মোটরযোগে গোপালপুরের পথে পাড়ি দেওয়া।

বহরমপুর থেকে গোপালপুর—এমন কিছু দূরের পথ নয়।

গোপালপুরে সমুদ্রসৈকতে সুন্দর নবনির্মিত একটি বাংলো। নাম হলিউড বাংলো। এই বাংলোতেই আমরা উঠলাম।

বিকেল চারটে পর্যন্ত আমরা বাংলোতেই রইলাম। তারপর সবাই মিলে বেড়াতে বেরোলাম। সুধীরা, ভানু, আমার ছোট শ্যালক সবাই সঙ্গে আছে। গেলাম গোপালপুর মন্দিরে। মন্দিরের বিগ্রহটি অত্যন্ত প্রাচীন। মন্দিরটি কালে হয়তো সংস্কার হয়েছে।

তারপর আমরা এখানে-ওখানে বেড়িয়ে ফিরে এসেছি বাংলোয়।

রাতটুকু শেষ হবার অবসর দিতে রাজী নই, রাত থাকতে উঠে এসেছি সমুদ্র-সৈকতে সূর্যোদয় দেখবো বলে।

সূর্যোদয় দেখলাম। নানা রঙের আলপনা দেখলাম সূর্যোদয়ের মুহূর্তে।

সূর্যোদয় দর্শন করে ফিরে এসেছি বাংলোয়। বাংলোর বারান্দায় বসেও প্রকৃতিকে কাছে পাওয়া যায়। বাংলোর পিছনেই মনোরম পাহাড়তলী, যেখানে নানা সবুজ বৃক্ষের বিন্যাস।

ঐ দিন বিকেলেই 'ঝটকা' চেপে আমরা গেলাম বহরমপুর শহরটি দেখতে। বাইরে এসে শহর দেখতে মন চায় না, তবু দেখতে হয়। নইলে বাইরে আসার একটা দিক অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। 'ঝটকা'গুলো মন্দ লাগে না। ঘোড়ায়-টানা এই মধ্যযুগীয় যানে চলার মধ্যে একটা ধ্রুপদী আমেজ আছে।

আশপাশে দেখার মতো আর কি আছে। এই নিয়েই একদিন কথা হচ্ছিল ট্যাক্সী ড্রাইভারের সঙ্গে।

শেষটা ঠিক হলো 'তপ্তপানি' যাওয়া। গোপালপুর থেকে বহরমপুর হয়ে যেতে হয় তপ্তপানি। পাহাড়ের ওপর উষ্ণ প্রস্রবণ, তপ্তপানি নামে খ্যাত। কলিঙ্গ রোড ধরে আসকা পাশ দিয়ে তবে যেতে হয়। 'তপ্তপানি' প্রস্রবণে পৌঁছতে বেশ খানিকটা পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। সাগরপৃষ্ঠ থেকে সহস্রাধিক ফুট ওপরে এই প্রস্রবণ। শেষপর্যন্ত গাড়ি উঠতে পারে না। পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে গাড়ির পথ শেষ, সেখানে রয়েছে বন-বিভাগের মনোরম বাংলো। এই বাংলোর পর পায়ে হেঁটেই ওপরে উঠতে হয়।

ওপরে উঠেছি। 'তপ্তপানি'তে স্নানের পালা এবারে। সবাই স্নান করলো, কিন্তু আমি পারলাম না মূল প্রস্রবণে স্নান করতে। দ্বিতীয় কুণ্ডে, যেখানে জলের তাপ-মাত্রা কিছু কম, সেখানে কোনমতে স্নান করলাম। 'তপ্তপানি'তে স্নানে অপরিসীম তৃপ্তি। 'তপ্তপানি'তে দুটি সুন্দর বাংলো রয়েছে। স্নান করে আমরা বাংলোর কাছে ফিরে এলাম। মনোরম বাংলোটি দেখে আক্ষেপ হলো মনে, এ-যাত্রায় এখানে থাকতে পারছি না বলে। আগে জানলে বিছানাপত্তর সঙ্গে নিয়ে আসতাম। এমন একটা জায়গায় রাত কাটাবার সৌভাগ্য হলো না—তবু মনকে সান্ত্বনা দিলাম, আর যদি কখনো এ-পথে আসি, এখানেই উঠবো।

এর পরের দিনটা আমরা গোপালপুর ছেড়ে বাইরে যাইনি। গোপালপুরের মধ্যেই ঘুরে বেড়িয়েছি। ঐ দিনেই ঠিক করলাম, পরদিনের ভ্রমণসূচী। ঠিক হলো চিল্কা যাবার।

চিল্কা যাবার দিন গোপালপুরে অনেক সময় ধরে আমরা সবাই সমুদ্র-স্নান করলাম। সমুদ্রে স্নান করতে গেলে বরাবরই আমাকে এক ছেলেমানুষী পেয়ে বসে। ভুলে যাই আমার বয়স হয়েছে, ভুলে যাই এতো মাতামাতি আমার সাজে না। যতো সময় না ক্লান্ত হয়ে পড়ি ততো সময় সমুদ্রের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নিজের উচ্ছ্বাস মিশিয়ে দিয়ে স্নান করলাম।

সেদিন দীর্ঘ সমুদ্র-স্নানে সত্যিই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এবারে চিল্কা যাওয়ার পালা। 'রম্ভা' হয়েই আমরা চিল্কা এলাম। আমাদের আশ্রয় নির্দিষ্ট হলো 'রম্ভা' স্টেশনের কাছে একটি ডাকবাংলোতে।

চিল্কায় নৌকাভ্রমণ সত্যিই উপভোগ্য। চিল্কার ছোট ছোট ঢেউ-ওঠা জলে মরাল-গতি নৌকো, আর নৌকোর ওপর বসে চারদিকের দৃশ্যপট দেখা—এ আমার জীবনের এক আশ্চর্য উপলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমি অভিনেতা—চরিত্রে রূপদানই আমার ধর্ম। কিন্তু তার বাইরেও আমার আর এক জীবন আছে, যে জীবনের ধর্ম-বোধ স্বতন্ত্র।
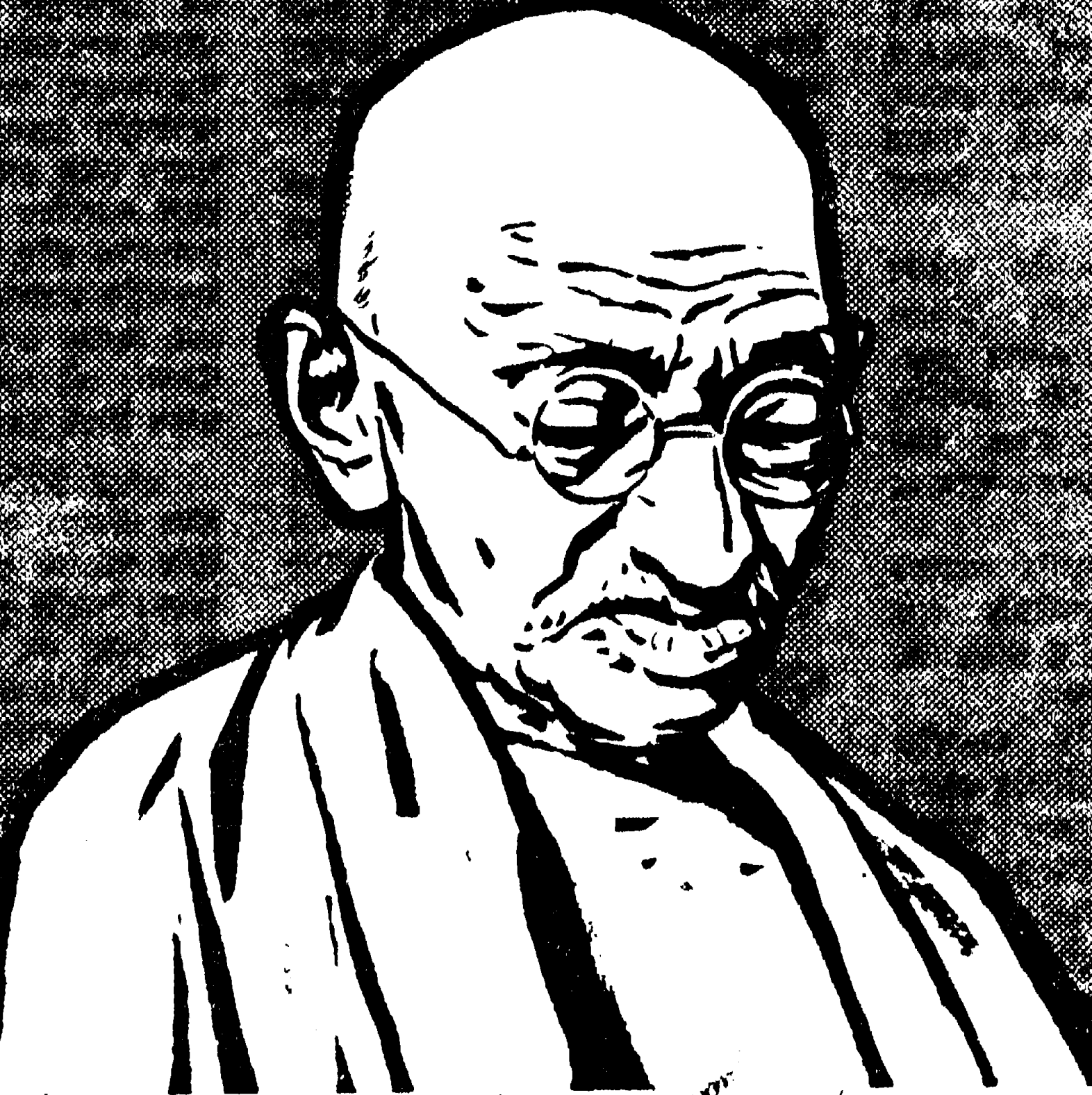
চিল্কায় নৌকোযোগে অনেক সময় ভ্রমণ করলাম। জলের ওপর ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে গেলাম—একেবারে 'বরকুণ্ডা' দ্বীপ পর্যন্ত। এ দ্বীপটিও সুন্দর। কিন্তু ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এরপর যে দ্বীপটিতে এলাম, এখানেই খাল্লিকোটের রাজার সুন্দর বাংলোটি রয়েছে। যে বাংলোটি আজ জীর্ণ হয়ে পড়েছে লবণাক্ত আবহাওয়ায়। আমরা এই বাংলোতেই দুপুরের আহার গ্রহণ করেছিলাম।

এর আগে বালুগাঁও থেকে চিল্কা দেখেছি, কিন্তু 'রম্ভা' থেকে চিল্কা দেখা আরো সুন্দর।

চিল্কা থেকে আবার গোপালপুর। গোপালপুর ছাড়ার আগের দিনে আমরা সমুদ্র সৈকতে পামবীচ হোটেল এবং তার আধুনিক পরিবেশটি দেখলাম। ভালো লাগলো। তারপর যথারীতি সাগরবেলায় বেড়িয়ে বেড়ানো, সমুদ্রের ছুটে-আসা ঢেউ-এর সঙ্গে মাতামাতি করা—কিংবা বালির ওপর শুয়ে থাকা। রাত না হলে আমরা কোনদিনই বাংলোয় ফিরতুম না।

ইচ্ছে ছিল গোপালপুর থেকে ওয়ালটেয়ার যাবো। তারপর সীমাচলম্। কিন্তু ওয়ালটেয়ারে আর থাকা হলো না। কেননা, অনেক চেষ্টা করেও ধর্মশালায় জায়গা পেলাম না। শেষটা একটা ট্যাক্সী পেয়ে গেলাম। সুতরাং আর অপেক্ষা নয়, সরাসরি সীমাচলম্।

এই আসার পথে পার্লিয়াকিমেডিতে গিয়েছিলাম। ছোট অথচ সুন্দর শহরটি। এই নামেই দেশীয় রাজ্যের রাজধানী এটি। পার্লিয়াকিমেডিতে নেমে কোথাও জায়গা পাইনি—শেষটা একটা রেস্ট হাউসে জিনিস-পত্তর রেখে জলযোগ সেরে শহর দেখতে বেরোলাম। রাজপ্রাসাদটি সুন্দর। অতীতের ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজার কাহিনীও শুনলাম। খেয়ালী রাজা। নিজেকে খেয়ালের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। শুনলাম, রেসখেলা এবং অনুরূপ কোনো-কিছুতে রাজার আগ্রহের কথা।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপারই আলাদা।

পার্লিয়াকিমেডির ভ্রমণসূচী ছিল সংক্ষিপ্ত। সীমাচলমে পাহাড়ের ওপর মন্দির। ১১০০ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। মন্দিরটির কারুকাজ সুন্দর। দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে গঠিত। মন্দিরে অনন্ত-নারায়ণের মূর্তি।

এই মন্দির দর্শনান্তে আমরা প্রধান মন্দিরে এসেছি। মন্দিরে বিগ্রহ নেই, শুধু মন্দিরের বাইরে পর্দা দিয়ে ঢাকা নৃসিংহ মূর্তি খোদাই করা। সুন্দর লাগলো নৃসিংহের খোদিত মূর্তি। দেখলাম। কিন্তু মন্দিরের বিস্তৃত অঙ্গনটি সবচেয়ে সুন্দর লাগলো। মন্দিরের সামগ্রিক পরিবেশ জুড়ে বিরাজ করছে গভীর প্রশান্তি আর পবিত্রতা।

সেদিন দেবতার ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করলাম। তিন রকমের ভোগ। দেবতার প্রসাদ। তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছি।

কোথাও স্থির থাকতে চাই না। সীমাচলম্ থেকে ভাইজাগে এলাম। সেখান থেকে ওয়ালটেয়ারে। বাকি ছিল অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখা—দেখলাম।

এখানে তালবনের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র-সৈকতে যাবার পথ। তারপরেই সমুদ্রকিনারে সুন্দর একটি হোটেল। সেখানে বসে আমরা ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ করেছিলাম।

ওয়ালটেয়ারেই থাকেন ডাক্তার ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে কথা হলো। এখানকার বাঙালী-দের ক্লাব এবং থিয়েটারের কথাও বললেন। দেখলাম, ভদ্রলোক বাংলার বাইরে এসেও বাঙালীর সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত।

এখানেই স্টেশনে রেলওয়ে রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজার এ কে গাঙ্গুলী আলাপ করতে এলো আমাদের সঙ্গে।

আলাপের আরম্ভেই সে বললে, আমাকে চিনতে পারছেন?

তারপরেই সে পুরোনো প্রসঙ্গ তুললে। আমরা একবার আদ্রায় অভিনয় করতে গিয়েছিলাম। তখন গাঙ্গুলী ছিল আদ্রার রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজার।

তারপর আরো বললে, আপনার দেশেই আমার বিয়ে হয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী বাগ-আঁচড়ার মেয়ে।

সুধীরা এবারে গাঙ্গুলীকে নিয়ে পড়লো। দূরদেশে এসে এমন একটি আত্মীয়তার গন্ধ পাওয়া—এ যেন দুর্লভ কিছু!

তাছাড়া গাঙ্গুলীর বিয়ে হয়েছে বাগ-আঁচড়ার অধিকারী বাড়ি, যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। সুধীরা গেল গাঙ্গুলীর বাড়িতে। সুধীরাকে তো জানি, তার মনটা মাতৃত্বের সুষমায় ভরা। দূরের মানুষকেও সে যে কতো সহজে কাছে টানতো তার ঠিক নেই। আর এ কে গাঙ্গুলীর সঙ্গে তো পরিচয়ের সূত্র বেরিয়ে পড়েছে। আর গাঙ্গুলীর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সুধীরারও পরিচয় আছে।

সেদিন গাঙ্গুলী সত্যিই আমাদের কাছে পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছিল। সেই টিকিট কালেকটর ভাদুড়ীকে বলে আমা-দের জন্যে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল।

গোপালপুর ফিরে কলকাতার কথা মনে এলো। কদিন তো কলকাতা ছাড়া—এবারে যেন ফিরে যেতে মন চাইছে। অথচ কাগজে দেখছি, কলকাতার অবস্থা এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। তাই বাড়িতে পাণ্ডে আর এদিকে চিত্র-পরিচালক বন্ধু মধু বসুকে তার করলাম কলকাতার খবর জানতে। উত্তরে মধু বসু জানালো, এখন কলকাতা মোটামুটি শান্ত, ফেরা যেতে পারে।

যদিও এরপরেও আরো দিনদুয়েক গোপালপুরে ছিলাম। গোপালপুর থেকে যেদিন কলকাতায় ফিরে এলাম সেদিন ৪ঠা নভেম্বর।

কলকাতার যে খবরই থাক, আমাদের কাছে থিয়েটারের খবরটাই আগে। থিয়ে-টারের খবর বলতে গেলে এক শ্রীরঙ্গম ছাড়া আর সব কটি থিয়েটার ততোদিনে খুলে গেছে। স্বাভাবিক অভিনয়ও শুরু হয়েছে।

কলকাতার আর-আর অবস্থা ভালোর দিকে গেলেও দাঙ্গার আগুনটা তখন বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিহারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার খবরটি তখন শিরোনামায় স্থান পাচ্ছে।

নভেম্বর মাসটা যেমন তেমন করে কাটলো। সামনে বড়দিনের মরশুম—থিয়েটারে কতো সমারোহ করে নাটক হবে, তা নয়—দিন-রাত শুধু অশান্তির প্রহর গোনা।

তবু এর মধ্যে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ২৭ তারিখে কালিকা থিয়েটারে একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন হলো। নাটকটির নাম হলো রামপ্রসাদ।

স্টারে সেই সময় সকালের দিকেও অভিনয় হয়েছে কেন না বিকেলের দিকে মানুষ বেরোতে ভয় পায়। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর কেউই আর বাইরে থাকতে চায় না।

১ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় স্টারে 'প্রফুল্ল' অভিনয় হলো নোয়াখালি দাঙ্গা-পীড়িতের সাহায্যের জন্যে। ঐ দিনের অভিনয়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথম যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ঐ দিনের অভিনয়ে আমি অভিনয় করেছিলুম রমেশের ভূমিকায়। ঐ দিনের ভূমিকালিপি ছিল আকর্ষণীয়। ভূপেন রায়, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, নরেশ মিত্র, কেষ্টধন সরযূ, রেবা—ভূমিকালিপি কম আকর্ষণীয় হয়নি এদের নামে।

এর মধ্যে একদিন চণ্ডী ব্যানার্জী আমাকে মিনার্ভায় মিশরকুমারীতে অভিনয় করার অনুরোধ করে ফোন করলো। কিন্তু আমি রাজী হলাম না।

এরপরেও চণ্ডী ব্যানার্জী এবং বিজয় রায়ের কাছ থেকে অনুরোধ এলো সাময়িক-ভাবে বড়দিনের মরশুমে অভিনয় করার জন্যে। কিন্তু রাজী হতে পারি না। কারণ আমার প্রাপ্য দক্ষিণা ওরা দিতে অসমর্থ। এই নিয়ে এন সি গুপ্তের কাছ থেকেও বার বার অনুরোধ এসেছিল।

তুলসী লাহিড়ীর বিখ্যাত নাটক 'দুঃখীর ইমান'—উদ্বোধন হবার কথা ছিল ১২ ডিসেম্বর। কিন্তু দাংগার জন্যে সেদিন নাটকটির উদ্বোধন হয়নি।

অনেকদিন পর বিজয় রায়ের কাছ থেকে ফোন পেলাম ২৪ ডিসেম্বর। আমার দক্ষিণা তারা দিতে সমর্থ—সুতরাং এবারে যেন আর অভিনয়ে আপত্তি না করি।

(ক্রমশঃ)
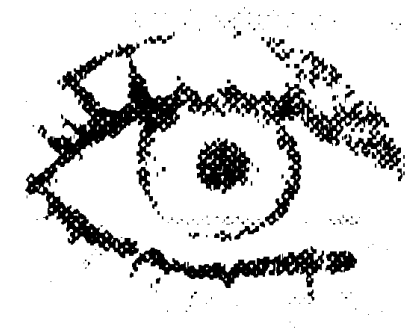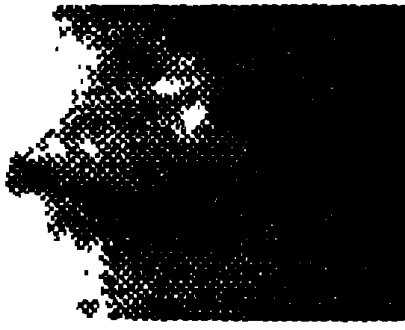
বিজ্ঞানের কথা

শরীর ও মগজ তাজা করবার জন্য ঘুম চাই

ভাবতে অবাক লাগে মানুষের জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ কাটে ঘুমিয়ে। একজন মানুষের পরমায়ু যদি ষাট বছর হয় তাহলে তার মধ্যে অন্তত কুড়িটি বছর হচ্ছে ঘুমের অবস্থা। বড়ো হওয়া, লেখাপড়া শেখা ও অন্য সমস্ত কাজ বাকি চল্লিশটি বছরের মধ্যে। আবার এই চল্লিশটি বছরের মধ্যেও কুড়িটি বছর কাটে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে, আরো দশটি বছর কাটে প্রাণ ধারণের চাহিদা পূরণ করতে ও রোগভোগে—তাহলে হাতে থাকে আর মাত্র দশটি বছর। এই দশ বছরেই তার যা-কিছু সৃজনমূলক কাজ। এই হিসেবটি সামনে রাখলে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঘুমের সময় কিছুটা কমিয়ে কাজের সময় কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া যাক না কেন। আসলে মানুষের পরমায়ুর হিসেবটা শুধু বছরের হিসেব নয়, কাজের হিসেবও। ষাট বছর পরমায়ু নিয়েও একজন মানুষ একশো বছর পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকার মতো কাজ করে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মানুষটি বছরের হিসেবে না হলেও কাজের হিসেবে শতায়ু। তবে অধিকাংশের বেলায় উলটো ব্যাপারটিই ঘটে—পরমায়ু বছরের হিসেবে বেশি, কাজের হিসেবে কম। এই দলের মানুষদের বেলায় হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে সারা জীবনে ঘুমের সময় তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশি। কিন্তু অন্য দল—যাঁরা আরো বেশি বেশি কাজ করতে চান—তাঁরা অবশ্যই চাইবেন কাজের তীব্রতা ও কাজের সময় বাড়াতে। কাজের সময় কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে?—প্রাণধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলো আরো কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে। আর? আর, ঘুমের সময় কমিয়ে। একটিমাত্র জীবনে বিপুল পরিমাণ কাজ করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের ঘুমের সময় অপেক্ষাকৃত কম। প্রচুর ঘুমিয়ে প্রচুর বড়ো কাজ করার সময় পেয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত একটিও নেই।

তবুও যত ব্যস্ত মানুষই হোন, কিছুটা সময় তাঁকে ঘুমোতেই হয়েছে, নেপোলিয়ন-কেও—ঘোড়ার পিঠে হলেও। না ঘুমিয়ে সারাটা জীবন কাটাতে পেরেছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিশ্বের ইতিহাসে একটিও নেই। ঘুমতাড়ানী বড়ি খেয়ে ঘুমকে সাময়িকভাবে তাড়ানো যায় মাত্র, তবে বড়ো বেশি তাড়াবার চেষ্টা করলে অনেক সময়ে চিরঘুমই পেয়ে বসে। বিশ্ব অলিম্পিকে এর নজির আছে।

মানুষ ঘুমোয় কেন? এক কথায়, শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য, শরীরকে তাজা করবার জন্য। যতোই খাওয়া-দাওয়া করা যাক, যতোভাবেই শরীরের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা হোক, শেষ পর্যন্ত খানিকক্ষণ না ঘুমোলে ক্লান্তির অবশেষটুকু থেকেই যায়, শরীর পুরোপুরি তাজা হয় না।

অতএব বেঁচে থাকতে হলে ঘুম চাই চাই-ই চাই। না খেয়ে বেশ কিছুদিন [illegible] চলে, না ঘুমিয়ে নয়। ঘুম সম্পর্কে [illegible] বতই তাই সব মানুষের [illegible] নায়িকাকে ঘুম পাড়িয়ে তার রূপ [illegible] করার সুযোগ নিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা [illegible]

জাগ্রত অবস্থা

এক সেকেণ্ড

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব
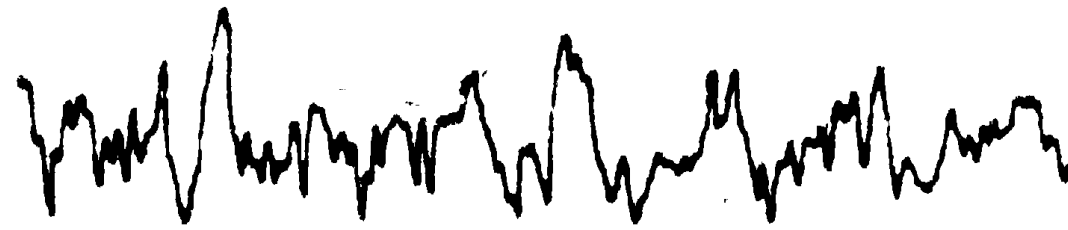
চতুর্থ পর্ব
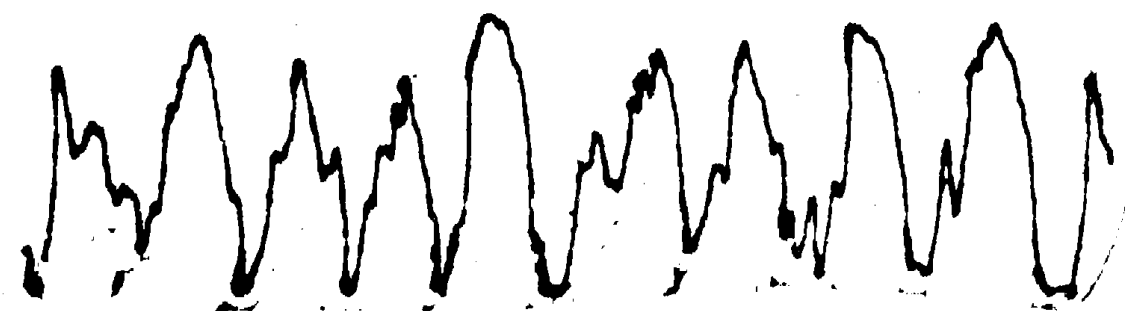
গবেষণার পাত্রপাত্রীকে ঘুম পাড়িয়ে মাপ-জোখ নেবার যন্ত্রপাতি চালু করেছেন। দুদলই কিন্তু ঘুম নিয়ে মাতামাতি করছেন ঘুমকে বিসর্জন দিয়ে।

এবারের বিজ্ঞানের কথায় ঘুম সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে কিছু আলোচনা তুলতে চাই।

ঘুম শরীরকে তাজা করে, অবসাদ দূর করে—এটা শুধু অভিজ্ঞতার ব্যাপার নয়, বিজ্ঞানীর মাপজোখেও প্রমাণিত। শরীর যখন বিকল হয়ে পড়তে চায় ঘুমের সাহায্যে তার মেরামত সম্ভব। শুধু তাই নয়, ঘুমের মধ্যে দিয়ে কোনো একটি সমস্যা সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবা যায়, নতুনভাবে বিচার করা যায়। হালের গবেষণায় ঘুমের এই ভূমিকার স্বপক্ষেও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

একটি অট্টালিকাকে মেরামত করতে হলে পুরনো মালমশলা দিয়েও তা হতে পারে। কিন্তু জীবন্ত অবয়বের মেরামতের জন্যে চাই নতুন উপকরণ, জীবন্ত অবয়বের বাড়বৃদ্ধির জন্যেও। এই নতুন উপকরণ কোত্থেকে আসবে? অবশ্যই মূলে কাঁচামাল থেকে তৈরি করে নিতে হবে। আমাদের শরীরের চামড়ার কথা ধরা যাক। চামড়ার স্বাস্থ্য বজায় থাকে নতুন নতুন কোষ তৈরি হবার ফলে (শেষ পর্যন্ত যা আবার খসে পড়ে যায়)। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কে যদিও নতুন নতুন কোষ তৈরি হয় না কিন্তু সেখানেও সব সময়েই অদলবদল। মস্তিষ্কের কাঠামোগত অংশের বিন্যাস দীর্ঘকাল একই রকম থাকতেই পারে না, সাজানো গোছানোর একটা প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, পুরনোর জায়গায় আসে নতুন।

এখন ধারণা করা হচ্ছে ঘুম এই উভয় প্রক্রিয়ারই সহায়ক। দুরকমের ঘুম দু-ভাবে সাহায্য করে থাকে। ঘুমের এই রকমভেদের ব্যাপারটা একটু বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

একজন মানুষ পুরোপুরি জেগে আছে—তখন তার মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হয় ছোট মাপের ও দ্রুত। যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে তখন প্রথমে তন্দ্রার অবস্থা (ছবিতে প্রথম পর্ব), তা থেকে আরো একটু গাঢ় ঘুম (দ্বিতীয় পর্ব), শেষকালে পুরোপুরি গাঢ় ঘুম (তৃতীয় পর্ব)। ছবি দেখলে বোঝা যাবে, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের গাঢ় ঘুমের সময়ে মস্তিষ্ক-তরঙ্গ হয়ে গিয়েছে বড়ো মাপের ও ধীর। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের ঘুমও মানুষকে জাগানো প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ঘুমন্ত মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত।

তবে এই গাঢ় ঘুমের অবস্থাটি একটানা বজায় থাকে না। ঘণ্টাখানেক গাঢ় ঘুমের পরেই শুরু হয় পাতলা ঘুম এবং তা মিনিট দশেক বজায় থাকে। তারপর আবার গাঢ় ঘুম। পুরো ঘুমের সময় ধরে এমনি পর-পর গাঢ় ও পাতলা ঘুমের ফিরে-ফিরে-আসা চলতে থাকে।

পাতলা ঘুমের সময়ে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এবং শরীরের আরো অনেকগুলো ক্রিয়াকান্ড একেবারে ভিন্ন ধরনের। এই সময়ে খুব ঘন ঘন চোখ নড়ে, শরীরের অধিকাংশ মাংসপেশী শিথিল ও অসাড় হয়ে যায়, হৃদস্পন্দন শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তচাপ অনিয়মিত হয়ে যায়। এবং এই সময়ে মানুষ স্বপ্ন দেখে।

এই হচ্ছে দু-রকমের ঘুম। গাঢ় ও পাতলা। সকল স্তন্যপায়ী জীব এই দু-রকমের ঘুম ঘুমিয়ে থাকে। রাত্রিবেলার ঘুমে মানুষের ঘুম বার পাঁচেক হয়ে থাকে গাঢ়, বার পাঁচেক পাতলা।

ঘুম নিয়ে যেসব বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন তাদের সিদ্ধান্ত : গাঢ় ঘুম (চোখ না-নড়া, স্বপ্ন না-দেখা, বড়ো মাপের ধীর তরঙ্গের ঘুম) শরীরের টিশু বা কলার বাড়বৃদ্ধি ও নবায়ণের পক্ষে সহায়ক এবং পাতলা ঘুম (ঘন ঘন চোখ নড়া বা স্বপ্ন দেখার ঘুম) মস্তিষ্কের পুষ্টি ও নবায়ণের পক্ষে সহায়ক।

মস্তিষ্ক কখনোই একই রকম থাকে না, একথা আগে বলেছি। মস্তিষ্কের কোষের উপাদানগুলো সব সময়েই নবায়িত হচ্ছে। এই উপাদানগুলো কী? অবশ্যই প্রোটিন। কোষে কিভাবে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে? অ্যামিনো এসিড থেকে। একদল ইঁদুরের মধ্যে তেজস্ক্রিয় অ্যামিনো অ্যাসিড প্রবিষ্ট করানো যাক। অ্যামিনো অ্যাসিড থেকেই মস্তিষ্কের কোষে প্রোটিন সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে—ফলে সংশ্লিষ্ট প্রোটিনে তেজস্ক্রিয় অ্যামিনো অ্যাসিডের কিছুটা অংশও এসে যায়। এবারে ইঁদুরগুলোকে যদি নির্দিষ্ট দিন পরে পরে হত্যা করে তাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রোটিনের তেজস্ক্রিয় অংশও নির্দিষ্ট মাত্রার কমে চলেছে। প্রায় মাস দুয়েক সময় লাগে সবটা কমতে। মস্তিষ্কের কোষের প্রোটিন নবায়িত হতে কতটা সময় লাগে তার একটা মাপ পাওয়া যায় এই পরীক্ষাকার্য থেকে। মোটামুটি দু-মাস। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেও জানা যায় যে, মস্তিষ্ক যদি কোনো রকমের চোট পায় তা হলে সেরে উঠতে মাস দুয়েক সময় লাগেই, তার কম কখনো নয়।

মস্তিষ্কের চোট বলতে সব সময়ে যে আঘাতজনিত বোঝায় তা নয়। এই চোট হতে পারে মানসিক বা রাসায়নিক ইত্যাদি। এবারে একটি মানুষের মস্তিষ্কের দিকে নজর দেওয়া যাক। বিশেষ ধরনের ওষুধ খাইয়ে মানুষটির মস্তিষ্কে রাসায়নিক চোট দেওয়া হল। এবারে মানুষটির ঘুম কি-রকমের হবে? এক সপ্তাহ পর্যন্ত দেখা গেল গাঢ় ঘুম, পাতলা ঘুম না-থাকার মতো। তারপরে টানা দু-মাস বেশির ভাগটাই পাতলা ঘুম, গাঢ় ঘুম না-থাকার মতো। মস্তিষ্কের চোটও সেরে উঠেছে এই শেষের দুটি মাসে।

একজন মানুষ বেশিমাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। তার ঘুম কি রকমের হবে? তিন-চার দিন কাটবার পরেই বাইরে থেকে দেখে মনে হবে সে বোধহয় পুরোপুরি সেরে

উঠেছে। কিন্তু তারপরে মাসখানেক ধরে তার ঘুম হবে বেশির ভাগটাই পাতলা।

চোট পাওয়া মস্তিষ্ক যখন সেরে উঠতে থাকে তখন সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঘুম পাতলা, গাঢ় ঘুম না-থাকার মতো। পাতলা ঘুমের সময়ে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ জাগ্রত অবস্থার চেয়েও অনেক অনেক বেশি।

মস্তিষ্কে চোট পাবার ফলে যদি কথা বলার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরবর্তী কয়েকটি সপ্তাহে ঘুম যদি পাতলা না হয় তাহলে কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

জন্মের একমাস কি দুমাস আগে থেকে পেটের ভিতরের বাচ্চার ঘুম হয় পাতলা। এই সময়েই বাচ্চার মস্তিষ্ক সবচেয়ে দ্রুত গড়ে ওঠে। আবার বার্ধক্যের ভীমরতিতে যখন ধরে, অর্থাৎ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া যখন লোপ পায়, ঘুমও তখন হয় গাঢ়—পাতলা নয়।

গাঢ় ঘুমের ব্যাপারটা তাহলে কী? বিকেলবেলা যারা ব্যায়াম করে বা দৌড়-ঝাঁপ করে, রাত্রিবেলা তাদের ঘুম হয় খুবই গাঢ়। অর্থাৎ দৌড়ঝাঁপের দরুণ শরীরের যতোটুকু খরচ হয়েছে তা এই গাঢ়-ঘুমের মধ্যে দিয়ে পূরণ হয়ে যায়। ব্যায়াম ও দৌড়-ঝাঁপের মতো থাইরয়েড হরমোনের দরুণও শরীরের খরচ হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যাদের শরীরে থাইরয়েড হরমোনের অভাব তাদের ঘুম কখনো তৃতীয় বা চতুর্থ পর্বের মতো গাঢ় নয়। আবার যাদের শরীরের থাইরয়েড হরমোনের আধিক্য (যার ফলে শরীর ভীষণ রোগা হয়ে যাবার সম্ভাবনা) তাদের ঘুমও তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের মতো গাঢ়। এমনি গাঢ় ঘুম শিশুদেরও, যখন তারা বড়ো হয়ে ওঠে। এ থেকে বোঝা যায় গাঢ় ঘুম শরীরের খরচ পূরণ করে।

যাই হোক, ঘুম পাতলাই হোক বা গাঢ়ই হোক, ঘুম যতোদিন হচ্ছে ভাবনার কিছু নেই। তবে ঘুমকে বাদ দিয়ে চলার চেষ্টা কখনো করবেন না। শরীর তাজা করবার জন্যে ঘুম চাই, নতুন ভাবনার জন্যেও ঘুম চাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে গিয়েছেন তিনি অনেক কবিতার লাইন অনেক গল্পের প্লটে সংকটের সমাধান স্বপ্নে পেয়েছেন। শুধু লক্ষ্য রাখবেন, স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়েছে কিনা। যদি বন্ধ হয় তো খারাপ। আর ট্রামেবাসে যদি কখনো বসার আসন পান আর তারপরে আপনার তন্দ্রা আসে—তাহলে সেই তন্দ্রার হাতে নিজেকে সঁপে দিন, সম্ভব হলে স্বপ্নও দেখুন, তাতে আপনার ভালোই হবে। তন্দ্রাটি ভাঙলে জগৎকে আরো ভালোভাবে বিচার করতে পারবেন।

খোরানার কৃত্রিম জীবন

বিজ্ঞানের কথায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে 'মানব মন' পত্রিকার নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যাটি (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭০) আমাদের হাতে এসেছে। 'মানব মন' হচ্ছে, সম্পাদকের ভাষায়, "মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।" কলকাতার পাভলভ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে থাকে। সুসম্পাদিত এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় 'খোরানার কৃত্রিম জীবন' সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের কথায় পাঠকদের জন্যে আমরা এই আলোচনাটি তুলে দিচ্ছি।

'জীবদেহ সৃষ্টির 'ব্লুপ্রিন্ট' লুকানো আছে কোষের ভিতরকার নিউক্লিয়াস-এর ক্রোমোসোমের মধ্যে। ক্রোমোসোমের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজানো আছে জীন। জীন 'এনজাইম'-এর মাধ্যমে দেহসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

বংশধারার মূল উপাদান জীন ডি-এন-এ (ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড) ও আর-এন-এ (রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড) এই দুই প্রকার অণুর সমন্বয়। ডি-এন-এ'এর মধ্যে থাকে দেহ-গঠনের সংকেত আর আর-এন-এ যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। দেহ-কোষের বৈশিষ্ট্য যা ডি-এন-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট—আর-এন-এর মাধ্যমে দেহকোষ সঞ্চারিত হয়। জীনকে দেখতে দুসুতোর জড়ানো মালার মত। একটি মানবশিশুর দেহগঠনের জন্য দশ লক্ষাধিক জীনের প্রয়োজন।

মাত্র গত বছর হার্ভার্ড-এর একদল গবেষক জীনকে বিচ্ছিন্ন করে বংশানুক্রমিকতার মৌলিক রহস্য উন্মোচন করেন। আর এ বছর উইসকনসিনের গবেষকরা ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার নেতৃত্বে এই প্রথম কৃত্রিম জীন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ঘটনাটি পারমাণবিক বিভাজনের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ খোরানা মাত্র ১৯৬৫ সালে এই গবেষণা শুরু করেন। সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের পরমাণু থেকে কৃত্রিম উপায়ে জীন সৃষ্টি করার সম্ভাবনা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। একটা ইয়েস্টের অণু খন্ড খন্ড করে দুসুতোর মালার মত করে গেঁথে ৭৭টি নিউক্লিওটাইড সংযোজিত জীন সৃষ্টি করেন।

ডঃ খোরানার এই যুগান্তকারী সৃষ্টির ফলে, আশা করা যাচ্ছে যে জীবন্ত প্রাণীর জৈবিক গঠনের পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। এরপর মনে হয়, রাসায়নিক উপায়ে যে কোনো জিনের কৃত্রিম কপি তৈরী করা যাবে আর ক্রোমোসমের উপর প্লাস্টিক সার্জারী করে সেই কৃত্রিম জীনকে অবাঞ্ছিত জীনের বদলে ক্রোমোসমে সংযোজিত করে দেওয়া চলবে। বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান ও চিকিৎসার ব্যাপারে নতুন পথ খুলে যাবে।

এইবার এই আবিষ্ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

(১) কৃত্রিম জীন প্রাকৃতিক জীনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, এ সম্বন্ধে কেউই সন্দেহ পোষণ করছেন না। এ থেকে নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে বংশগতির মূল উপাদান তথা সকলরকম জৈব পদার্থের উৎসই 'মেটিরিয়াল'। রহস্যবাদ বা ঐশীবাদ, ভাববাদের এই দুটি ধারা এই আবিষ্কারের ফলে একেবারে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

(২) অন্য সব বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতই—এই কৃত্রিম জীন মানুষের কল্যাণ এবং অকল্যাণ, সৃষ্টি এবং ধ্বংস—দুই কাজেই লাগতে পারে। সভ্যতার দেব এবং দানব সৃষ্টির সম্ভাবনার দরজা হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই খুলে যাবে। পারমাণবিক বিভাজনের ব্যবহার যেমন রাষ্ট্র এবং সমাজের বিশেষ সংগঠনের ও মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল, কৃত্রিম জীনের ব্যবহারও রাষ্ট্র সমাজের বৈশিষ্ট্যের প্রভাবাধীন হবে।

(৩) আমরা মনে করি যে অধিকাংশ জীন রোগলক্ষণ বা সিনড্রোম বিশেষকে একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না। রোগ প্রকাশের সম্ভাবনাকে প্রস্তুত করে। পরিবেশের গুরুত্বকে অবহেলা করা চলবে না। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দুই ধরনের পরিবেশই বংশানুক্রমিক রোগকে এবং রোগবাহক জীনকে প্রভাবিত করে। বংশানুক্রমিক রোগ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বংশধরদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কয়েক পুরুষ ধরে অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে বাস করার ফলে সুস্থ জীনের দুই একটিও অসুস্থতার বাহক হয়ে উঠতে পারে। কাজেই জীন পরিবর্তনের চেয়ে সমাজ পরিবর্তনের দিকে মানুষের বেশি নজর দেওয়া দরকার।

(৪) খোরানা মাত্র ৭৭টি নিউক্লিওটাইড সংযুক্ত জীন তৈরী করেছেন। মানবদেহের একটি কোষের নিউক্লিয়াসে এইরকম বহু সংখ্যক নিউক্লিওটাইডের অবস্থান। কাজেই গবেষণাগারে মানবীয় জীন তৈরীর এখনও অনেক শ্রম ও গবেষণা সাপেক্ষ। তবে প্রাথমিক পর্বের কাজের পর আনুষঙ্গিক কাজগুলো সহজতর হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

—অয়স্কান্ত

ক্ষেপা

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

উড স্ট্রীট থেকে আচমকা বাঁক ফিরে শর্ট স্ট্রীট ধরে ক্যামাক স্ট্রীট। তারপর একটু এগিয়ে আবার বেঁকলেই মিডলটন রো সোজা চৌরঙ্গী রোডে মিশেছে। নতুন মডেলের সাদা ঝকঝকে ফিয়াট গাড়ীটা প্রায়ান্ধকার রাস্তাগুলি পেরিয়ে ছুটে আসছিল। ছুটে আসছিল বললে ভুল হয়, প্রায় নিঃশব্দে ভেসে আসছিল মসৃণ পীচের রাস্তার উপর দিয়ে। সামান্য আওয়াজ কিংবা ঝাঁকুনিও বোঝা যায় না। নিপুণ হাতে গাড়ী চালায় নিরাপদ। দীপক জয়সোয়ালের বাড়ীতে ককটেল পার্টি ছিল। সুজাতাকে লুকিয়ে বেশ কয়েক পেগ হুইস্কি টেনেছে আজ ঝোঁকের মাথায়। অথচ সামান্য হাত কাঁপছে না। চোখে ঝাপসাও দেখছে না। পাশেই বসে আছে সুজাতা। নিবাত, নিস্পন্দ দীপশিখার মত। কেবল নিরাপদর ভারী নিঃশ্বাসের সংগে মেশান মদো গন্ধটা টের পেয়ে একবার চোখ তুলে সুন্দর ভ্রূ-ভঙ্গীতে মৃদু ভৎর্সনা করেছিল। এটা অবশ্য নিরাপদর ভালই লাগবে। স্ত্রীর উদ্ধত শাসনের চাইতে এই নীরব ও নরম প্রতিবাদ। একটু অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে অস্ফুট কিছু কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টার পরই স্বামী-স্ত্রীর পুরোনো ঘনিষ্ঠতাটা আবার ফিরে আসে।

মোড়ের মাথায় আসার অনেক আগে থেকেই নিরাপদ একসিলেটর থেকে পা তুলে গাড়ীর স্পীড কমিয়ে আনছিল। বাঁ দিকে গাড়ী ঘোরাবার সময় ঠিক ঘটল ব্যাপারটা। ফুটপাতের ধারে দাঁড়ান মেয়েটি হঠাৎ এগিয়ে এল। গাড়ীর গা ঘেঁসে দাঁড়াল একেবারে। বিদ্যুৎগতিতে স্টিয়ারিংটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে বড় রাস্তার মাঝামাঝি গাড়ীটা এনে নিরাপদ এক হেঁচকায় আবার বাঁদিকে ঘুরিয়ে নিল গাড়ী। পিছন থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছিল একটা ট্যাক্সি।

একচুলের জন্য পাশ কাটিয়ে স্যাৎ করে বেরিয়ে গেল। পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা অনেক দূরে গিয়ে মুণ্ডু বার করে বোধহয় গালাগালি দিল। নিরাপদর ফিয়াট গাড়ী জোরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে আবার অসূণ গতিতে এগিয়ে চলল। সুজাতা সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে দূরে সরে যেতে থাকা মেয়েটাকে একবার দেখল। নিরাপদ অনেক আগেই দেখেছিল। একপায়ে ভর রেখে, অন্যেক পা সামনে, কোমরটা একটু ভেঙে দাঁড়ান। সামনে জড়ো করা দু হাতে ভ্যানিটি ব্যাগটা ঝোলান রয়েছে। গ্রামের মেয়েরা ঘাটে জল আনতে গিয়ে কলসীটা দু হাঁটুর মাঝে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে যেমন গল্প করে, দাঁড়াবার ভঙ্গীটা ঠিক তেমন। হঠাৎ এগিয়ে এল গাড়ীর পাশে। কিন্তু নিরাপদ লক্ষ্য করেছিল, গাড়ীর ভিতরে চোখ পড়তেই পিছনে সরে গেল এক পা। সুজাতাকে বোধহয় আগে লক্ষ্য করেনি। মনে-মনে মৃদু হাসল নিরাপদ। রাত প্রায় পৌনে এগারটা। মেয়েটি বোধহয় আশা করেছিল গাড়ী থামবে।

নিরাপদর খুব চেনা লাগছিল দাঁড়াবার ভঙ্গীটা। অনেক দিন আগে কোন নারকেল-সুপারী বীথির অন্তরালে সবুজ বনছায়ার আড়ালে এক অখ্যাত গ্রামের টিনের চাল আর বাঁশে ছাঁচের বেড়া দেওয়া মাটির ভিতের বাড়ীর বারান্দায় হয়তো কেউ এমনি করে দাঁড়াত।

সামান্য শীত পড়েছে আজকাল। সুজাতার গায়ে খুব হাল্কা একটি পশমী স্কার্ফ। ঐ মেয়েটির গায়েও ফ্যাকাশে লাল রং-এর একটা র‍্যাপার মত বুঝি ছিল। নিরাপদর কিন্তু বেশ গরম লাগছিল। টেরিলিনের শার্ট, বুকের বোতাম খোলা। রোমশ চওড়া বুক হাঁ করে আছে। সুজাতার মধ্যে কোন কৌতূহল নেই। সেই তখন থেকে ধ্যানী বুদ্ধের মত বসে আছে। থাকবেও এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ীটা রিজেন্ট পার্কের বাড়ীর গেটে এসে না দাঁড়ায়।

নিরাপদ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হুইস্কির নেশার ঝিমটা একটু একটু করে তরল হয়ে আসছে। রাত্রে শোওয়ার পর সেটা ঘুমের স্রোতে ভেসে যাবে। সেই মেয়েটির কথা ভাবতে চেষ্টা করছিল। মুখটা ভালো করে দেখতে পায়নি। কিন্তু দাঁড়াবার ভঙ্গীটা অনেকদিন আগে যেন খুব চেনা ছিল। কালো পুরু ঠোঁটের কোণে এক টুকরো অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল। ব্যঙ্গ আর অনুকম্পার মাঝামাঝি হাসিটা। নিরাপদ ঘোষের অতীত বলে কিছু নেই। যা কিছু সব বর্তমান নিয়ে। আয়রণ অ্যান্ড স্টীল থেকে কেমিক্যাল ডাই, হাই পলিমার—নানান রকমের ব্যবসা ওদের কোম্পানীর। আড়াই শ টাকার সুপারভাইজার থেকে আড়াই হাজার টাকার ওয়ার্কস ম্যানেজার। এর পিছনে মিঃ মিত্র, মানে সুজাতার বাবার অবদান অবশ্য কিছু কম নেই। চোখে পড়ে গিয়েছিল নিরাপদ। শুধু মিঃ মিত্রেরই নয়। তার একমাত্র মেয়ে সুজাতা মিত্রেরও। কালো পাথরের উপর বাটালি দিয়ে কুঁদে গড়া পেটান বলিষ্ঠ চেহারা। এক মাথা ঘন কোঁকড়ান চুল। দোতলার ব্যালকনী থেকে লনে দাঁড়ান বাবার অফিসের অ্যাসিস্টান্ট নিরাপদ ঘোষকে লক্ষ্য করছিল সুজাতা। পরণে ধবধবে সাদা ট্রাউজার্স-এর উপর কটস উলের একটা রঙীন স্ট্রাইপড টি-শার্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত দেখাচ্ছিল নিরাপদকে। ঠিক ওদের ক্যাপ্টেন গারফিল্ড সোবার্সের মত।

নিরাপদ ঘোষের বর্তমান তখন থেকে শুরু! মাস-আষ্টেকের মধ্যেই মিঃ মিত্রের টনক নড়ল। টেবিলে পাইপটা ঠুকে, ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন একদিন কিছুক্ষণ। তারপর নিরাপদকে ডেকে পাঠালেন। মানুষের ডিসিশন নেবার ক্ষমতা লেবার সাইকোলজি, অ্যান্টিসেপশন ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ উপদেশ দিয়ে পিঠ চাপড়ে বেরিয়ে গেলেন। এনগেজমেন্টটা অ্যানাউন্স করে দিতে হবে। ইংরেজী খবরের কাগজগুলিতে।

গাড়ীটা মৃদু গর্জন তুলে রিজেন্ট পার্কের বাড়ীর গেটে ঢুকল। নেপালী দারোয়ান দরজা খুলে সেলাম করে একপাশে সরে দাঁড়াল। সুজাতা মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে উঠে গেল দোতলায়, পিছনে দৃকপাত না করে। নিরাপদ সন্তর্পণে এদিক-ওদিক বাঁচিয়ে গাড়ী গ্যারাজে ঢুকিয়ে ধীরেসুস্থে উপরে উঠল। ওদের চার বছরের মেয়ে টুটুল ঘুমিয়ে পড়েছে। খাটের দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে রইল নিরাপদ কিছুক্ষণ। তারপর, পিছনে সুজাতার উপস্থিতি টের পেয়ে মেয়ের উপর থেকে চোখ সরিয়ে গায়ের জামাটা একটানে খুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল ওয়ার্ডরোবের দিকে। সুজাতা এবারও বিরক্তিসূচক ভ্রূ-ভঙ্গী করল সুন্দরভাবে। অগোছালো নোংরামি তার একদম সহ্য হয় না। অস্ফুট গলায় কি একটা বলে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি বোলাতে বোলাতে আয়নার প্রতিবিম্বে নিরাপদর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিল।

নিরাপদ স্বভাবতই কম কথা বলে। ঐ কালো পাথরের মূর্তির সঙ্গে দৃঢ়নিবদ্ধ পুরু ও ভারী ঠোঁট দুটো সজীব হয় কখনও কখনো। বিয়ের পর গভীর রাত্রে তীব্র আসঙ্গের আশ্লেষে সুজাতাকে নিষ্পিষ্ট করতে করতে নিরাপদ আরণ্যক মুখরতায় উদ্বেল হয়ে উঠত। শ্বশুরের সঙ্গে ফ্যাক্টরী একসপ্যানসন প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতে করতে নিরাপদর উত্তেজিত সজীব মুখরতা সুজাতা লক্ষ্য করেছে। আর একদিন দেখেছিল নিরাপদর হিংস্র সজীব মুখ। নতুন বহাল ছোকরা বিহারী চাকরটা নিরাপদর দামী রোলেকস হাতঘড়িটা হাত-সাফাই করে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সন্দেহ হওয়াতে ছেলেটাকে চেপে ধরে ঘাড় ঝাঁকুনী দিতেই কোমরের গোঁজ থেকে ঘড়িটা টুপ করে মেঝেতে পড়ল। একটা জান্তব হিংস্রতায় ছেলেটিকে মেরে চলেছিল নিরাপদ। সুজাতা গিয়ে বাধা না দিলে মেরেই ফেলত। মেয়েকে আদর করার—বেলায় আবার সম্পূর্ণ অন্য চেহারা। টুটুলকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে দু'হাতে টুপ করে লুফে নিয়ে হা-হা করে হেসে উঠত। আবার কখনও উন্মত্ত আনন্দে মেয়েকে নিয়ে মেঝের কার্পেটের উপর গড়াগড়ি যেত।

সুজাতার এসব মোটেই মনঃপূত নয়। যে ধীর সমাহিত পুরুষ মূর্তিটা সে কল্পনা করেছিল, সেখানে দেখল একটি—প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি। যার বিরল আগ্নেয় উদ্গার মনেমনে স্পষ্টভাবে সে লক্ষ্য করেছে! সুজাতা নিরাপদকে পুরোপুরিভাবে গ্রাস করতে এগিয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে দূরে সরে গেছে। এতক্ষণ গাড়ীতে বসে সেই ভয় পাওয়ার অস্বস্তিটা মাথা চাড়া দিচ্ছিল।

নিরাপদর তেষ্টা পেয়েছিল। ট্রাউজার্স-এর বোতাম আলগা করে দিয়ে, আধো অন্ধকার ডাইনিং স্পেসের কোণে রাখা ফ্রিজিডেয়ারের পাল্লা খুলে ঠাণ্ডা জলের বোতল বার করে ছিপি খুলে ঢক-ঢক করে অনেকটা জল খেয়ে ফ্রিজ-এর উপর কনুই-এর ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল। ফ্রিজ-এর ভিতরের আলোটাতে নিরাপদর দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘায়ত হয়ে শোবার ঘরের সামনে গিয়ে পড়েছে। দূরে ঘরের কোণে দাঁড়ান সুজাতার নিদ্রালু চোখে মনে হল যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন অতিকায় দৈত্য পর্বতকন্দরের শিলাসনে বসে চিবুকে হাত রেখে কি ভাবছে। চোখ টান-টান করে সুজাতা নিরাপদকে দূর থেকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

সার্কুলার রোডের মোড়ে আবার দেখা হল। মাঝে দেখতে পেল নিরাপদ বিকেলে অফিসফেরৎ বাড়ী ফেরার পথে। এবার আর চাকাতে গাড়ীর মোড় ঘুরবার সময় নয়। ট্রাফিক সিগন্যালের রক্তচক্ষুর নিশানায় দু-তিনটে গাড়ীর পিছনে নিজের গাড়ীটাও দাঁড় করাতে হল। তেমনি পরিচিত ভঙ্গীতেই দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি। আরও দুটি মেয়ে একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ওদের ভাব-ভঙ্গী ও পথচারীদের উপর চঞ্চল দৃষ্টি দেখে একটু অভিজ্ঞ লোকের বুঝতে অসুবিধে হয় না। ইতিমধ্যেই কিছু গ্রাহক আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে করতে লোলদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। কিন্তু মেয়েগুলি ওদের গ্রাহ্য না করে গাড়ীগুলির উপর নজর রাখছিল। ফুটপাতের গা ঘেঁসে গাড়ী দাঁড় করিয়ে খট করে পাশের দরজা খুলে দেবে। নিতান্ত পরিচিতার মত মেয়েটি উঠে বসবে গাড়ীতে। যেন কতকালের চেনা। তারপর হুস করে গাড়ী বেরিয়ে যাবে পথচারী খদ্দেরটির লোলুপ দৃষ্টির সামনে দিয়ে। নিরাশ হয়ে লোকটা বিড়-বিড় করে গালাগাল দেবে।

নিরাপদ বেশ ভালো করে সময় নিয়ে লক্ষ্য করছিল। প্রায় দশ বছর আগেকার কথা তবু বেশ ভাল করেই চিনল। বরাবরি খাড়ুস্ত গড়নের ছিল। একটু মুটিয়েছে। কালো খসখসে চামড়া। তবুও এক ধরনের

যৌন আবেদন আছে চেহারায়। শেষ পর্যন্ত এই লাইনটাই বেছে নিয়েছে। দিব্যি সপ্রতিভ ভাব। মনে হয় অনেকদিন থেকেই এ কাজ করছে। মেয়েটি সামনের গাড়ীর আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ছিল। একজন অবাঙালীকে মুচকি হেসে চোখ টিপে ইশারা করল। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে সহযাত্রীদের কি যেন বলল। সংগে সংগে লোকগুলো হাসির হররায় ফেটে পড়ল। মেয়েটি বাধ্য হয়ে এক পা সরে এল পিছনে।

নিরাপদ সোজাসুজি তাকিয়ে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখল। আস্তে আস্তে অবধারিত ভাবেই চোখাচোখি হতে যাচ্ছিল। নিরাপদ অবলীলাক্রমে ঘাড় ফিরিয়ে নিল। প্রোফিলটা দেখা যাচ্ছে। কালো পাথরের উপর কোঁদা বলিষ্ঠ মূর্তি। ঘন কোঁকড়ান চুল, উন্নত নাক, গলা ও ঘাড়ের সুদৃঢ় মাংসপেশী তার নিচে বাটন ডাউন, লং পয়েন্ট স্টীফ কলার শার্ট। মেরুন রং-এর পোলকা ডট টাই। দূরে ডান দিকে নাগ-কেশর গাছটাকে অভিনিবেশসহকারে দেখতে দেখতে নিরাপদ ভাবতে লাগল সানি পার্কের যুগল ধিংড়ার স্ত্রীকে ওর বার্থ-ডে পার্টিতে কি উপহার দেওয়া যায়। দশের ভীড়ে হারিয়ে যাবার মত ছেলে নিরাপদ নয়। এমন কিছু উপহার দিতে হবে যাতে এন ঘোষকে মনে রাখে ওরা।

খিংড়া গ্রুপ অব ইণ্ডাস্ট্রিজ সারা ভারতে শিকড় গেড়ে বসেছে।

গাড়ীতে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে নিরাপদ তন্ময় হয়ে ভাবছিল। ট্রাফিকের আলো হলদে হয়ে গেছে। সামনের গাড়ী দুটো ধোঁয়া উড়িয়ে বেরিয়ে গেছে। পিছনের গাড়ীর তীক্ষ্ণ পিঁ-পিঁতে—চমক ভাঙল। নিঃশব্দ গর্জনে স্টার্ট নিয়ে নিরাপদর সাদা ফিয়েট গাড়ী মসৃণ ভঙ্গীতে বাঁক ফিরে ছুটে চলল দক্ষিণে। পুরোপুরি না তাকিয়েও—নিরাপদ বুঝতে পারল, সন্ধ্যার ধূসর আলোয় পরিচিত ভঙ্গীতে দাঁড়ান মেয়েটি বিস্মিতভাবে একদৃষ্টে তার অপসৃয়মাণ গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে আছে।

দোতলায় শোবার ঘরে মাথার কাছে জানালাটা খোলা থাকে। হাল্কা নীল পর্দার নিচের বিঘতখানেক ফাঁক দিয়ে ভোরের শির-শির হাওয়া এসে কপালে হাত বোলায়। তখনো আলো ফোটেনি। আবছা অন্ধকার আর কুয়াশায় মাখামাখি। ঘুম ঘুম চোখে নিরাপদ আলস্যভরে হাত বাড়াল। কি নরম আর তুলতুলে শরীর সুজাতার। মনে হয় একরত্তি হাড় নেই। নিরাপদর প্রবল নিষ্পেষণে একতাল নরম জোলমাছের মত অবয়বহীন হয়ে আত্মগোপন করতে চায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের প্লাবনে কোথায় যেন হারিয়ে যায় দূরায়ত তীর-ভূমির মত। আধোঘুমে আধোজাগরণে সেই খাটের চৌহদ্দীর মধ্যেই আর এক অনু-ভূতির সমুদ্রে নিরাপদ আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে থাকে।

পরদিন সকালে ছুটি ছিল। নিউ মার্কেটে কতগুলি টুকিটাকি কেনাকাটা শেষ করে নিরাপদ আর সুজাতা গাড়ীর কাছে ফিরে এল। টুটুল পিছনের সিটের এক কোণে চুপচাপ বসে একমনে চকোলেট খেয়ে চলছিল। হাতের জিনিসপত্র পিছনে চালান করে দিয়ে সুজাতা সামনে বসল। নিরাপদ সতর্ক চোখে এদিক-ওদিক দেখে পার্কিং থেকে গাড়ী বার করে নিঃশব্দে ড্রাইভ করে চলল। পার্ক স্ট্রীট ধরে গাড়ী ছুটে চলছিল। অ্যালেন পার্কের কাছে এসে হঠাৎ স্পীডের মাথায় ট্রাফিক আই-ল্যাণ্ডটাকে মাঝখানে রেখে নিরাপদ গাড়ী ঘুরিয়ে নিল। তারপর ডাইনে যাবে না বাঁয়ে যাবে স্থির করতে না পেরে গাড়ীটাকে পাঁকপাক খাওয়াল বার দুই। কাছাকাছি অন্য কোন চলতি গাড়ী ছিল না, তাই রক্ষা। নইলে নির্ঘাত অ্যাকসিডেন্ট হত। হতভম্ব পুলিশটা একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে এগিয়ে আসছিল। নিরাপদ বেপরোওয়াভাবে হঠাৎ সোজাসুজি গাড়ী চালিয়ে দিল। পুলিশটা বাপ বলে একলাফে পাশে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করল। তারপর কটমট করে তাকিয়ে পকেট থেকে নোটবই বার করে থুথু দিয়ে পেন্সিল ভিজিয়ে ওদের গাড়ীর নম্বর টুকে নিল। সুজাতা আগাগোড়া স্থির দৃষ্টিতে নিরাপদর ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করছিল। শেষের ব্যাপারটায় মনে মনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সে ভাব গোপন করে শান্ত গলায় বলল, তুমি হঠাৎ রং-সাইড দিয়ে ওভাবে গাড়ী বার করতে গেলে কেন? নিরাপদ নিঃশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। নির্লিপ্ত হিমশীতল চাউনি। সুজাতার বুকের ভিতরটা শির-শির করল। গায়ের স্কার্ফটা ভালো করে জড়িয়ে বসল সে।

আজ ওদের খাবার কথা ছিল মিঃ মিত্রের, মানে সুজাতার বাবার ওখানে। নিঃশব্দে চালিয়ে এনে নিরাপদ গেটের কাছে গাড়ী দাঁড় করাল। সুজাতা টুটুলকে নামিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল বাড়ীর ভিতর। কিছু দূরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল নিরাপদ চুপচাপ বসে আছে স্টিয়ারিং-এর সামনে। ফিরে এসে বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কই তুমি নামবে না? নিরাপদ ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, আমি একটু ঘুরে আসি, তোমরা খেয়ে নিও। তারপর গাড়ী স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল। অপসৃয়মাণ গাড়ীটার দিকে সুজাতা কিছু-ক্ষণ—অনিশ্চিত ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা ভ্রূ-ভঙ্গী করে উঠে গেল উপরে।

গাড়ী নিয়ে ছোট প্রাইভেট রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল নিরাপদ। একটা ট্রাম ছুটে আসছে ঘড়াং ঘড়াং ঘণ্টা বাজিয়ে। এপাশ থেকে হঠাৎ একটা ঠেলাগাড়ী হুড়-মুড় করে এসে পড়ল সামনে। সজোরে ব্রেক কসে অ্যাকসিডেন্ট কোনমতে এড়াল নিরাপদ। গাড়ীটা উল্টে গেলেও ঠেলাওয়ালা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে একটা ছোটখাট ভীড় জমে উঠল ওর গাড়ীর সামনে। নিরাপদর ইচ্ছা করছিল পার্ক স্ট্রীটের সেই পুলিশটার মতো এই লোক-গুলোর উপর দিয়ে গাড়ীটা চালিয়ে দেয়। কিন্তু সেরকম কিছুই করল না সে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সবিনয়ে বলল, দোষটা যে ঠেলাওয়ালার সে তো আপনারা নিজের চোখেই দেখেছেন। এবার আমাকে একটু যাবার পথ করে দিন, একটু তাড়া আছে আমার। দু-চারটে লিকলিকে চেহারার ড্রেন পাইপ প্যান্ট পরা মস্তান গোছের ছোকরা ওল্টান ঠেলাটার উপর পা রেখে বীরদর্পে দাঁড়িয়েছিল। সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে গাড়ী বার করে নিয়ে যাওয়ার ফাঁকে নিরাপদ শুনতে পেল। টেরচা চোখে তাকিয়ে একটি ছোকরা বলছে, শালার রোওয়াব দেখ, তাড়া আছে। দেব শালা হাম্প দিয়ে মাজাকি বার করে।

ফাঁকা নিরিবিলি রাস্তা ধরে গাড়ীটা ছুটেছিল গোঁ-গোঁ করে। প্রশান্ত মনে বসে আছে নিরাপদ স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই জানে না। চিন্তার স্তরগুলি পরস্পরের সীমা-রেখা হারিয়ে এলোমেলো হয়ে মিশে যাচ্ছে। বৃষ্টির ছাটলাগা কাঁচা রং-এর মত গলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে স্মৃতিবন্ধ ছবিগুলি। শহরের ট্রামলাইন দালান কোঠা পেরিয়ে গাড়ীটা ছুটে চলেছে। উইণ্ড স্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে হু-হু করে পাশ কাটিয়ে একের পর এক গ্রাম্য ছবি। টিনের চাল, বাঁশের খুঁটি, খড়ের ছাউনি, পাথরকুচি পাতার বেড়া। বায়োস্কোপের রীলের মত মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটানা ঘন্টাদেড়েক ড্রাইভ করে নিরা-পদ রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের সামনে থামল। একটা জীর্ণ খড়ের চালার নিচে নড়বড়ে কাঠের টেবিলে কাপ-ডিস সাজিয়ে রাখা, তোলা উনুনে কেটলিতে জল গরম হচ্ছে। বুড়ো মত একটা লোক ছোট ছোট কাঁচের গ্লাসে চা বিক্রি করে। বাবুদের জন্য কাপ-ডিসের ব্যবস্থা। সামনে পাতা একটা লম্বা বেঞ্চ। বেশীর ভাগ খদ্দের আশেপাশের গ্রামের লোক বা হাটুরে। পথ চলতি বা জিরিয়ে নেবার জন্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। অনেক সময় বাবুরাও গাড়ী থেকে নেমে আড়মোড়া ভেঙে ভীড় করে দাঁড়ায়। দু'হাতের তালুতে গরম চায়ের গ্লাস চেপে ধরে এক-পাশে দাঁড়িয়ে ছায়া-নিবিড় দূরের গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখে। তারপর একসময় হঠাৎ ঝনাৎ করে খুচরো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে। নীল ধোঁয়া ছেড়ে দেখতে দেখতে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে যায়।

নিতান্ত অসময়ের খদ্দের দেখে বুড়ো দোকানদার সচকিত হয়ে উঠল, নির্লিপ্ত গলায় চায়ের অর্ডার দিয়ে নিরাপদ বেঞ্চিতে বসল। দূরে এবড়ো-খেবড়ো ঢেউখেলান মাঠ মাঠ পেরিয়ে গ্রাম—গ্রাম পেরিয়ে আকা-শের সীমা নিরাপদ বেশ হালকা মেজাজে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। কলগুলি উনুন জ্বেলেছে সামনের জলা জায়গাতে [illegible] কি কুচো মাছ ধরছিল কত-[illegible] নিয়ে। নিরাপদের সাদা রাজ-হাঁসের মত ঝকঝকে গাড়ীটা দেখে কৌতূ-হলীভাবে চারপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। দোকানদারের তাড়া খেয়ে [illegible] পালাল। তারপর একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে তাকিয়ে রইল।।

প্রায় শীতের দুপুর। অকারণে অদ্ভুত নিরাপদর মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল। শ্বশুরবাড়ীতে দুপুরের খাওয়ার কথা মনে আছে। ঘড়ীটা উল্টে দেখল একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। মনে মনে একটু হাসল সে। খাবার টেবিলে মিঃ মিত্র গম্ভীর মুখে ঘন ঘন ঘড়ি দেখবেন। দূরে কোন প্রাইভেট গাড়ীর চাকার আও-য়াজ পেলে সুজাতার ভাত চটকাতে থাকা আঙুল একটু স্তব্ধ হয়ে তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে খেতে থাকবে ও। মনে মনে হয়তো একটু চঞ্চল হবে কিন্তু বাইরে প্রকাশ করবে না। নিরাপদর ঘড়ির কাঁটা ধরে চলার অভ্যাস। এই প্রথম ব্যতি-ক্রম।

কলসী কাঁখে একটি চাষী-বউ সামনের প্রায় শুকিয়ে আসা ডোবাতে জল আনতে আসছিল। নিরাপদ বেশ মনোযোগ দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করল। নিবিড় গোলগাল পুরুষ্ট চেহারা। একগলা ঘোমটার আড়াল থেকে পিটপিট করে নিরাপদকে দেখতে দেখতে চলে গেল। মেয়েদের কলসী কাঁখে হাঁটার ভঙ্গীটা পিছন থেকে দেখতে বেশ লাগে।

গাড়ী স্টার্ট দিয়ে নিরাপদ এগিয়ে চলল সামনে। নজরে পড়ল সামনেই বাঁ-

হাতি একটা চওড়া মেঠো রাস্তা বেরিয়ে গিয়ে দূরের গ্রামের গাছপালার ঘন ছায়ার আড়ালে হারিয়ে গেছে। গরু-মোষের গাড়ী স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে চাকার দাগ তুলে। হেঁচকা ব্রেক কসে গাড়ী ঘুরিয়ে নিরাপদ বড় পীচের রাস্তা ছেড়ে ঐ মেঠোপথ ধরল।

নিরাপদ মনে মনে ঠিক যেমনটি আশা করেছিল তাই। দু ধারের গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে মেটে ঘর খড়োচালা, বাঁশের খুঁটি। মাঝে মাঝে ইঁটের ভিতের উপর টিনের বড় আটচালা বাড়ী। মাথা উঁচু তাল-বিথী, এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পথ। তবুও এগিয়ে যাচ্ছিল। মাটির বাড়ীগুলোর সাম-নের উঠোনে গরীব গৃহস্থ ঘরের বৌঝিরা কেউ চাল বাচছে। কেউ তালপাতার চেটাই বুনছে। একে অন্যের মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে। কাচ্চাকাচ্চার দঙ্গল এদিক ওদিক হুটোপুটি করছে। গাড়ী দেখে হাতের কাজ ফেলে বৌ-ঝিরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর গাড়ীটা পার হয়ে গেলে নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে বলাবলি করতে লাগল। এ নিশ্চয়ই কুরু হালদারের নাতজামাই। হালদার পাশের গাঁ-এর বাঘা জোতদার। অমন দশাসই চেহারার লোকটা কেমন পাথরের মতো বসে আছে গাড়ীর মধ্যে।

আর একটু এগিয়েই পাথরের মূর্তি বিচলিত হল। টিনের চালের বাড়ীর বাঁশের আড়া ধরে ঝুঁকে দাঁড়ান নীলডুরে শাড়ীপরা একটি শ্যামলা-দীঘল মেয়ে। মাথায় একরাশ

কালো কোঁকড়ান চুল পিঠ ছাপিয়ে নিচে নেমেছে। বছর সতের-আঠার বয়স। বেলা পড়ে আসছে। কারও যেন প্রতীক্ষা করছে মেয়েটি, রোদের তেজ কমবে। বাদামী বিকেল আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে আসবে। তারপর আধো-অন্ধকারে একটু দূরের অতি পরিচিত সামান্য জিনিসও অচেনা ও রহস্যময় হয়ে উঠবে। ঠিক এমনি সময়ে ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত দেহে একটি বলিষ্ঠ যুবক বাড়ী ফিরবে। দরজার চৌকাঠে পা দেবার আগেই ঐ অলসভাবে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ান মেয়েটি কলকেল্‌ করে বলে উঠবে এত দেরী করে ফিরলে নিরাপদদা। আজ ভেবেছিলাম—ক্লান্ত অথচ খুশী গলায় যুবকটি বলবে, আজ কি? এদিক ওদিক সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ ছেলেটির একেবারে বুকের কাছে সরে এসে একটু নিচু গলায় ঘনিষ্ঠভাবে বলবে, একটা সিনেমা গেলে হত। গতকাল 'কলঙ্কী চাঁদ' রিলিজ করেছে এখানে। জায়গাটা শহরের উপকণ্ঠ, কাজেই সিনেমা দেখাটা বেমানান নয়। কিন্তু তক্ষুণি ঘরের ভিতর থেকে একটি হাঁপানিতে ভোগা ক্লিষ্ট খনখনে গলা টেনে টেনে বলে উঠবে, অমন বেহায়া মুখে নুড়ো জেনলে দিই পরের ছেলে সারাদিন খেটেখুটে বাড়ী এল আর ধিঙ্গী মেয়ের আদিখ্যেতার ঘটা দেখ।

টিনের চালের দেড়খানা ঘরের আধখানা ভাড়া নিয়ে থাকে বুঝি ছেলেটি। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স। উদ্যোগী ছেলে। দুপুরে কোন কারখানায় কাজ করে। রাত্রে নাইট কলেজে বি-এস-সি'তে ভর্তি হয়েছে। কলেজ না থাকলে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফেরে। রাস্তার টিউব-ওয়েলে স্নান সেরে স্নিগ্ধভাবে লুঙ্গী পরে গেঞ্জী গায়ে পড়াশোনা করতে বসে। সেই বেহায়া বাড়ন্ত গড়নের মেয়েটি কিন্তু সর্বক্ষণ আশে-পাশে ঘুরঘুর করে। রান্নাঘরে খুন্তি নাড়ার ফাঁকে ফাঁকে অবান্তর কথার ফুলঝুরির ছোটায়। এ-সব কিন্তু কেবল সেই ছেলেটির সঙ্গেই। ওর কলেজের বন্ধু-বান্ধব দু' একজন এলে সেই মুখর চঞ্চল মেয়েটিকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। লাজুক আর মুখচোরা মেয়েটিকে নিয়ে ছেলেটির বন্ধুরা হাসি-তামাশা করে। দূরে দরজার আড়ালে জড়োসড়ো ভঙ্গীতে দাঁড়ান মেয়েটিকে দেখে বলে, এতদিন ধরে আছে এখানে অথচ একেবারে আনস্মার্ট। ছেলেটি কিন্তু বিব্রতভাবে মেয়েটির পক্ষ টেনে কিছু বলবার চেষ্টা করে।

এমনি করে দিন গড়িয়ে রাত। অনেক দিন, অনেক রাত। ধরা না দিয়ে উপায় ছিল না মেয়েটির। ঐ পাথরে কোঁদা মূর্তির বলিষ্ঠ রোমশ বুকে মাথা গুঁজে আত্ম-সমর্পণ করেছিল। নরম ভেজা গলায় ছোট্ট একটা কথা, আমার যে আর কেউ নেই। হারিয়ে যাচ্ছিল ওরা দুজনেই। কোন অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছিল ওরা এক-জোড়া মসৃণদেহ সামুদ্রিক মাছের মত। এমনি শীতকাল। ভোররাত্রে দুজনে পরস্পরের দেহের নিবিড় উত্তাপে, কামনার আশ্লেষে মগ্ন থাকত। মেয়েটির রুগ্না মা ছাড়া কেউ সন্দেহ করতে পারে নি। তবুও তার কাছে ধরা পড়ে চাপা গলার তীব্র ভর্ৎসনা হজম করে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে চলে আসতে হল সেই যুবকটিকে একদিন। ঠিকানা কোথা থেকে জোগাড় করেছিল জানে না। কাঁচা হাতের লেখায় অজস্র বানান ভুলে ভরা মিনতিপূর্ণ অনেকগুলি চিঠি পেয়েছিল ছেলেটি তারপর। জবাব দেয় নি একটারও। পরীক্ষা সামনে, ওদিকে চাকরীর উন্নতির সম্ভাবনা চোখের সামনে ভাসছে। উদ্যোগী পুরুষ। সামান্য সুপারভাইজার থেকে উঠতে হবে উপরে, দুরূহ চড়াই সামনে। এ-সব ছোট-খাট সেন্টিমেন্টের প্রশ্রয় দিলে চলে না।

গাড়ী থামিয়ে অপলক দৃষ্টিতে নিরাপদ তাকিয়ে ছিল মেয়েটির দিকে। নীল ডুরে শাড়ীপরা কোঁকড়া চুল শ্যামলা দীঘল প্রতীক্ষারত মেয়েটি। থেলো হুঁকো হাতে একজন বুড়োমত লোক কাঁচুমাচু ভাবে এগিয়ে এসে গলা খাঁকারী দিয়ে বলল, মহাশয় কি কাউকে খুঁজছেন? নিরাপদ যন্ত্রচালিতের মত জবাব দিল, হুঁ। বুড়ো লোকটি উৎফুল্ল গলায় বলল, কি নাম বলুন তো? তার নিবাস কি এই পাথুরিপোতা গ্রামে?

—এই গ্রামের নাম বুঝি পাথুরি-পোতা?

—এঁজ্ঞে হ্যাঁ, এ গ্রামের নাম পাথুরি পোতা। পূবে দিকে মন্ডেশ্বরী আর দুই মাঝামাঝি ফাৎনাহাট। তা মহাশয়ের যাওয়া হবে কোথা? বুড়ো সন্দিগ্ধভাবে নিরাপদকে লক্ষ্য করল।

নিরাপদ কোন কথার জবাব না দিয়ে দূরে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ান মেয়েটিকে আর একবার দেখল। মেয়েটি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করছে। নিঃশব্দে স্টার্ট নিয়ে নিরাপদ গাড়ী চালিয়ে দিল সামনের দিকে। হুঁকো হাতে বুড়োটা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর বিড়বিড় করে কি বকতে বকতে ঢুকে গেল বাড়ীর ভিতর।

রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে কয়েকটা গ্রাম বেষ্টন করে আবার গিয়ে পড়েছে বড় রাস্তায়। ধুলো উড়িয়ে নিরাপদর গাড়ী ছুটে চলছিল। মাঠের মাঝখানে হঠাৎ গাড়ী দাঁড় করাল সে। প্রকান্ড থালার মত নিরুত্তাপ লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নিরাপদ প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু' পা ফাঁক করে জেদী ও উদ্ধত ছেলের মত নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে সূর্যটাকে লক্ষ্য করল। এক গোছা রুক্ষ কোঁকড়ান চুল ওর কপালের উপর এসে পড়েছে। ঝাঁকড়া ভুরুর আড়াল থেকে এক-জোড়া শাণিত দৃষ্টি ধক্‌ধক্‌ করে উঠল একবার। দু' এক পা এগিয়ে গেল নিরাপদ। তারপর কয়েকটা মাটির ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে সূর্যকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারতে লাগল। হাতের রসদ ফুরিয়ে গেলে আরও কয়েকটা ডেলা উবু হয়ে কুড়িয়ে নিল। ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে সূর্যটাকে একের পর এক ঢিল ছুঁড়ে মারতে লাগল নিরাপদ। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসল। পরিশ্রমে ও ঘামে রক্তাভ মুখ। মুখ ঘুরিয়ে গাড়ী নিয়ে ফিরে চলল উল্কাবেগে।

এদিকে ইলেকট্রিক আসে নি এখনও। রাস্তার দু' পাশের নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরে গাড়ীর হেডলাইটের তীব্র আলো সামনে পড়েছে। গাড়ীর ভিতরটা অন্ধকার। উস্কোখুস্কো এলোমেলো চেহারা, চোখে তীব্র দৃষ্টি নিরাপদর। মনে হয় একটা হিংস্র শ্বাপদ অন্ধকারে ওঁত পেতে ছুটে আসছে। গাছ-গাছালির ঝুপসি অন্ধকারে গাড়ীর উন্মাদ গতি না কমিয়েই নিরাপদ একটি সাংঘাতিক [illegible] বাঁক ফিরল। একটা নরম কিছুর উ[illegible] দিয়ে চাকাটা পিছলে বেরিয়ে এল মনে হল। তৎক্ষণাৎ একটি মরণাহত কুকুরের তীক্ষ্ম আর্তনাদ অন্ধকারের নৈঃশব্দকে খানখান করে ভেঙে দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে মিলিয়ে গেল বাতাসে। নিরাপদ কিন্তু ফিরেও তাকাল না। সেই উন্মাদগতিতে গাড়ী ছুটে চলল।

অনেক দূরে এগিয়ে এসে নিরাপদর খেয়াল হল। পিছন পিছন একটা লরী ছুটে আসছে তেমনি ঝড়ের বেগে। চাপা দেওয়া কুকুরটার জন্য নয় তো? নিরাপদ ভ্রূ-কুঁচকে ভাবল। ইনস্টান্ট ডেথ। সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় ফিরিয়ে লরীটাকে দেখল সে। প্রায় পাশাপাশি এসে গেছে। না, সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না। বিহারী ড্রাইভার পাশে বসা লোকটার কাছ থেকে আগুন নিয়ে বিড়ি ধরাল। বোধহয় পিছনে ফেলে আসা চৌ-রাস্তার মোড় ঘুরে অন্য দিক থেকে আসছে। নিরাপদ তেমনি অবাধ্য জেদী [illegible] মত ঠিক

করল লরীটাকে প্যাশ দেবে না। স্পীড বাড়িয়ে আগে আগে চলল। শহরের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। দু' পাশে আলোজ্বলা দোকান-পাট লোকজনের ভীড়। এত জোরে গাড়ী চালান বিপজ্জনক। লরী ড্রাইভার কয়েক বার প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন দিয়েও ফল পেল না। চৌ-মাথায় এসে দুজনেই গাড়ীর স্পীড কমাতে বাধ্য হল। কিন্তু ফাঁক বুঝে অধৈর্য লরী ড্রাইভার ও'র গাড়ীটা বার করে এগিয়ে যেতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে বসল। নিরাপদর নতুন ফিয়াট গাড়ীর মাডগার্ড জখম করে একজন ব্যস্ত সমস্ত পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে বেসামাল লরীটা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল পাশের নর্দমায়। নিরাপদর গাড়ীর খুব ক্ষতি হয় নি। লোকটাও সাংঘাতিক রকম আহত হয় নি বলে মনে হয়। কিন্তু দেখতে দেখতে একটা বিরাট ভীড় জমে উঠল। লরীর ড্রাইভার বেগতিক দেখে এক ফাঁকে চম্পট দিয়েছে। পাশে বসা লোকটার উপর কিছু চড়-থাপ্পর বর্ষিত হল। ট্রাফিক পুলিশটা এগিয়ে এসে নিরাপদর গাড়ীর নম্বরটাও টুকে নিল।

রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে গাড়ীটা রিজেন্ট পার্কের বাড়ীর গেটে থামল। বাড়ীর অবাহাওয়া থমথমে। সেই উস্কো-খুস্কো এলোমেলো চেহারায় রক্তাভ চোখে বাড়ীটা একবার দেখল নিরাপদ। তারপর দৃঢ় পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। নেপালী দারোয়ানটা সেলাম করে এক পাশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উড়ে চাকরটা অসময়ে ঘুম থেকে উঠে একটা বিকট হাই তুলছিল। মাঝপথে সাহেবকে দেখে বিস্ফারিত লাল চোখে তাকিয়ে রইল তার গমনপথের দিকে। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে সুজাতা উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। সমস্ত হাসপাতাল তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কোথাও নিরাপদর খোঁজ পাওয়া যায় নি। কোনও দিকে দৃকপাত না করে নিরাপদ সোজা গিয়ে বাথরুমে ঢুকল। শাওয়ার খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিচে চুপচাপ। পোষাক পরে বেরিয়ে এসে স্থিরদৃষ্টিতে ঘুমন্ত টুটুলকে দেখল কিছুক্ষণ তারপর গিয়ে ব্যালকনীর ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

খাবারের টেবিলেও অনেকক্ষণ অন্য-মনস্কভাবে বসে রইল নিরাপদ। ভাবলেশ-হীন নির্লিপ্ত চোখে চারদিক দেখল। মৈথিলী ব্রাহ্মণ ঠাকুর জড়োসড়োভাবে প্যানট্রি'র সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উড়ে চাকরটা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। সুজাতা বসে আছে সামনের চেয়ারে কোনাকুনিভাবে। এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জগৎ। বর্ষণমুখর রাত্রে কোন বৃষ্টিসিক্ত আশ্রয়হীন দরিদ্র পথচারী ধনী গৃহস্বামীর বদান্যতায় সৌখীন সাজান-গোছান ড্রইং-রুমে বসবার অধিকার পেয়েছে। সংকুচিতভাবে বহিরাগত আগন্তুকের মত নিরাপদ আবার চারদিক তাকাল।

সম্বিত ফিরে পেল নিরাপদ অনেকক্ষণ পর। তারপর ঘাড় গুঁজে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল। সুজাতা একটু আশ্বস্ত হল। ইশারায় ঠাকুরকে ফ্রিজ থেকে পুডিং-এর ট্রে-টা আনতে বলল। নিরাপদর প্রিয় খাদ্য। কিন্তু সুজাতার দৃষ্টি আবার স্থির হয়ে এল। খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণের জৈবিক কাজটা অস্বাভাবিক রকম দ্রুত সারতে আরম্ভ করেছে নিরাপদ। যেন নিচে অফিসের গাড়ী অধৈর্যভাবে হর্ন দিয়ে যাচ্ছে, এক মিনিটও দেরী করা চলবে না।

গভীর রাত্রে ঘুমে ঢুলে পড়েছিল সুজাতা। ঠাকুর চাকরকে নিচে বিদায় দিয়ে শোবার ঘরের খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। টেলিফোনে বাবাকে নিরাপদর ফেরার কথা জানিয়ে আসতে মানা করে দিয়েছে। সামান্য ব্যাপারে হৈ-চৈ নিরাপদ একদম পছন্দ করে না। বসবার ঘরে ডোমঘেরা টেবিল-ল্যাম্পের সামনে ঝুঁকে বসে নিরাপদ খুব নিবিষ্ট-ভাবে কতগুলি পত্র-পত্রিকা ঘাঁটছিল। পাতা উল্টে ছবিগুলো দেখছিল অভিনিবেশ-সহকারে। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার গর্ডন্ পার্কসের আফ্রিকান সাফারীর কতগুলি বিস্ময়কর ছবি, একটা ছবিতে চোখ আটকে রইল অনেকক্ষণ। একটি দন্ডায়মান পীনোদ্ধত সুঠাম নিগ্রো মেয়ের নগ্ন ছবি। ত্রিকশটে অসংখ্য রূপ নিয়েছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় চার-পাশ থেকে ওরা ঘিরে ফেলছে লোকটাকে। বেশ খুঁটিয়ে দেখল ছবিটাকে নিরাপদ। সুজাতাকে অনেকক্ষণ আগে শুতে যেতে বলেছে, কাজেই তাড়া নেই। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করল অনেকক্ষণ। তারপর আবার ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখতে লাগল।

পরদিন সকালে ব্যাগ হাতে সহাস্য মুখে ডঃ চৌধুরীকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল নিরাপদ। ডঃ চৌধুরী নামজাদা নিউরোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট। এক ধরনের অবসাদ বোধ করছিল বলে বিছানাতেই ব্রেক-ফাস্ট সেরে নিয়েছিল নিরাপদ। ডঃ চৌধুরীর সহাস্য অভিবাদনের উত্তরে কিছুই বলতে পারল না। ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইল শুধু।

ডঃ চৌধুরী অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন নিরাপদকে। চোখের তারা দুটো তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তার মুখভাব গম্ভীর হল। পরীক্ষা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পিঠ চাপড়ে ঘনিষ্ঠ গলায় বললেন, কি এত আকাশ পাতাল চিন্তা করছেন মশাই। ইয়ংম্যান, আপনার এমন মজবুত স্বাস্থ্য। আপনার তো আয়রণ নার্ভ হওয়া উচিত। কটা দিন চুপচাপ রেস্ট্ নিন। আর এই কটা অষুধ লিখে দিলাম, নিয়মিত খাবেন। তারপর স্মিতহাস্যে সুজাতাকে আড়ালে ডেকে নিলেন। প্রেসকৃপশন্ হাতে তুলে দিয়ে গলা নিচু পর্দায় নামিয়ে বললেন, ডিপ্রেসিড্ মেলানকোলিয়া। একটু নার্ভাস ব্রেক-ডাউন মত হয়েছে আর কি। এই

এস্কাজিন, লারগাকটিল, পেসিটেন ট্যাবলেটস্গুলো কিছুদিন নিয়মিত খেতে হবে। দরকার হলে সোডিয়াম পেন্টোথাল্ ইঞ্জেকশনও দিতে হতে পারে। বাড়ী থেকে বেরুতে দেবেন না এবং একটু চোখে চোখে রাখবেন। তারপর একটু অর্থপূর্ণ-ভাবে থেমে থেমে বললেন,—এরা সব পোটেন্শিয়াল ক্যান্ডিডেটস্ ফর—। কথা শেষ না করে তিনি ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন।

মিঃ মিত্র সব শুনে বিচলিতভাবে ঘরময় পায়চারী করছিলেন। হঠাৎ টেলিফোন তুলে ডঃ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করে ওদের চেঞ্জে পাঠানই স্থির করলেন। কাছাকাছি সী রিসর্ট দীঘা। ভারী চমৎকার জায়গা। মাত্র কয়েক ঘন্টার মোটর জার্নি। বেশী লটবহর নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা নেই। নিজের বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। সমুদ্রের ধারেই মিঃ মিত্রের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ী। কোনও অসুবিধে হবে না ওদের।

প্রথম কটা দিন ভালই কাটল। রোজ ভোরবেলায় সী-বীচে বেড়াতে যেত নিরাপদ। বীচটা পুরী বা গোপালপুরের থেকে অনেক বেশী দৃঢ় আর চওড়া। মোটর গাড়ীগুলো এধার থেকে ও-ধার শাঁ-শাঁ করে তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে। আবার চক্রাকারে ঘুরে আসছে। বেদিং কস্টুম পরা কতগুলো সাহেব-মেম লাল-নীল-সবুজ মেশান রঙীন রবারের প্রকান্ড বল নিয়ে বালির উপর দাঁড়িয়ে লোফালুফি করছে। তীরভূমির সীমায় ঢেউগুলি অস্ফুট গর্জনে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। নিরাপদ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বালিতটে। একটি ঢেউ সফেন রেখায় স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকে না। পরমুহূর্তে আরও বড় ঢেউ এসে সব ধুয়েমুছে একাকার

করে দিয়ে যায়। এক দণ্ডে বাঁচের উপর আছড়ে-পড়া ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে নিরাপদ। পাশ কাটিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে নামতে গিয়ে সাহেব মেমগুলো কৌতূহলী দৃষ্টিতে নিরাপদের দিকে তাকায়।

বিকেলেও সেই একই পুনরাবৃত্তি। অনর্গল কথা বলে টুটুল, কিন্তু বাবার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে অনেক দূরে পিছিয়ে পড়া মা'র কাছে ছুটে যায়। ড্রাইভার কাছাকাছি থেকে অজান্তে অনুসরণ করে নিরাপদর। শূন্য দৃষ্টিতে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে নিরাপদ সমস্ত বীচটা হেঁটে বেড়ায়।

সেদিন অন্ধকার হয়ে যাবার পর বীচের উপর মিষ্টি জলের কিয়স্কটার উপর উঠে কাঠের রেলিং-এ হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল নিরাপদ। একটা ফিকে জ্যোৎস্না ঢেউগুলির উপর খেলা করছে। সমুদ্রের ঢেউগুলি ছুটে আসছে অবিশ্রান্ত অবিরাম। নিরাপদর হঠাৎ মনে হল এক দঙ্গল ক্রোধান্ধ বুনো মোষ তাড়া করে আসছে তীক্ষ্ম শৃঙ্গের আঘাতে নিরাপদকে ধরাশায়ী করতে। অনুভূতিটা অস্বস্তিকর। নিরাপদ হাত দিয়ে চোখ আড়াল করার চেষ্টা করল। কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল বুনো মোষের দঙ্গল চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ফেলছে। জীবনে এই প্রথম ভয় পেল নিরাপদ। কাঠের রেলিং থেকে সরে এসে স্নানের কুঠুরীতে আত্মগোপন করতে চাইল। তারপর হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে তর্-তর্ করে নেমে সমুদ্রকে পিছনে রেখে দ্রুতপদে ফিরে চলল। আজই কলকাতা ফিরতে হবে।

রিজেন্ট পার্কের বাড়ীতে জানালার ধারে খাটের উপর আধশোওয়া অবস্থায় বসে এলোমেলো বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায় নিরাপদ। শান্ত দুপুরের ম্লান রোদ্দুর গাছের ঘন পাতার আড়ালে হারিয়ে যায়। টিঁ-টিঁ করে ডেকে ওঠে একটা পাখী। বেশ বাধ্য ছেলের মত সুজাতার হাত থেকে অষুধ-পত্র নিয়ে খায় নিরাপদ। কোন কথা বলে না সুজাতা। সামনে এসে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর উঠে যায় নিঃশব্দে।

একদিন সকালে বিছানায় ঐ আধ-শোওয়া অবস্থায় বসে একটা বাংলা খবরের কাগজ পড়ছিল নিরাপদ। একটা পাতায় চোখ আটকে গেল। পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে যুবতীর মৃতদেহ, শিরোনামা। নিচে ছোট একটি সংবাদ। পার্ক স্ট্রীট সংলগ্ন উদ্যানে গতকাল ভোরবেলায় আনুমানিক সাতাশ-আঠাশ বছর বয়েসের একটি দেহ-পোজীবিনী যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। দেহের নানা স্থানে ক্ষতচিহ্ন ছিল। পুলিশের অনুমান, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠান হয়েছে। এতদিনের ঘষা কাঁচের মত নিষ্প্রভ ভাবলেশহীন চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাত থেকে কাগজটা নামিয়ে বিছানা থেকে নেমে চটপট জামা-কাপড় পরে নিল নিরাপদ।

সুজাতা বোধহয় কাছেই কোন একটা দোকানে গেছে। নিরাপদ ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে চট্ করে চুল আঁচড়ে গাড়ীর চাবিটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ওর পরনে সাদা পা-চেপা ট্রাউজার্স, গায়ে ফিকে হলুদের উপর কালো লম্বা লম্বা স্ট্রাইপ দেওয়া হাওয়াই শার্ট, চোখে কালো সান্-গ্লাস। একটি আরণ্যক চিতার মত লঘু পায়ে সাবলীল ভঙ্গীতে নিচে নেমে এল নিরাপদ। গত রাত্রের শিকার করা হরিণীর সন্ধানে।

মেডিক্যাল কলেজের পিছনের গেট দিয়ে সোজা গাড়ী চালিয়ে এনে একেবারে মর্গের কাছে থামল। মাঝ-বয়েসী ডোমটা মদের নেশায় ভাম্ হয়ে দরজার কাছে বসে ঢুলছিল। লাল চোখ মেলে নিরাপদকে দেখে সেলাম করে উঠে দাঁড়াল। সান-গ্লাস খুলে ঝুঁকে পড়ে নিরাপদ নিচু গলায় ডোমটাকে বলল, কাল এখানে একটা জেনানার লাস এসেছে? ডোমটা ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, হাঁ-হাঁ, সাম্‌কো একঠো জেনানা লাস ফরেনসিক ডিপার্টসে ভেজ্ দিয়া ইধার পোস্টমর্টেম ভি হো গিয়া। নিরাপদ নিঃশব্দে ডোমটার হাতে একটা করকরে দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে চাপা গলায় বলল, ওহি লাস্‌ঠো হাম্‌কো দেখনা চাহিয়ে। ডোমটা ঘোলাটে দৃষ্টিতে নিরাপদকে এক নজর দেখল। তারপর নিয়ে গেল ভিতরে। একটা চিমসে পচা গন্ধ ভাসছে চার পাশে। নিরাপদ উদ্‌গ্রীব চোখে পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। এদিক-ওদিক খুট্ খাট্ করে ডোমটা মাঝামাঝি শেলফ্ থেকে একটা ট্রে টেনে বার করল। লম্বালম্বি শোওয়ান রয়েছে দেহটা। খোলাই পড়ে আছে ফর্মালিন মাখান অবস্থায়।

গভীর মনোযোগ দিয়ে একদৃষ্টে পারুলের মৃতদেহটা দেখল নিরাপদ অনেক-ক্ষণ। পাশে আটকান টাইপ-করা অটপ্সী রিপোর্টের কপি। আফ্‌টার সেক্‌সুয়াল ইন্টারকোর্স মার্ডার বাই অ্যাস্‌ফিক্সেশন। অ্যাব্রেশন অল ওভার দি বডি। মাইট বি দি জব অফ এ সেক্‌স ম্যানিয়াক্। যৌন-সংসর্গ করার পর শ্বাসরোধ করে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে। সারা দেহে ক্ষতচিহ্ন। কোন সেক্‌স-ম্যানিয়াকের কাজ বলে মনে হয়। গলার শ্বাসনলীতে আঙুলের বজ্র-মুষ্টির চিহ্ন রয়েছে। মুখে কিন্তু একটি গভীর প্রশান্তি ছড়িয়ে আছে। চোখের কোলে সামান্য জলের দাগ। কেঁদেছিল বোধহয়। নাকি সে-সময় পায়নি। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হয়তো চোখের জল বেরিয়েছে একটু।

নিঃশব্দে মর্গ থেকে বেরিয়ে এল নিরাপদ। চাবির রিংটা হাতে লুফতে লুফতে এগিয়ে এসে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল নীল আকাশ। চারপাশে ট্রাম-বাস-ঠেলা-গাড়ী আর ভিড়ের হট্টগোল। কাউকে না জানিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল নিরাপদ। নিপুণ হাতে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে এসে তেমনি নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে বাড়ী ঢুকল। গাড়ী গ্যারাজে ঢুকিয়ে একটা বিলিতী গানের সুর শিস্ দিতে দিতে হাল্কা পায়ে নিরাপদ উপরে উঠে গেল।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

রতনলালজি উদ্‌ভ্রান্তের মত চলে যাওয়ার পর···

ব্যাপারটা ত গোলমেলে হয়ে উঠল।

হোক গোলমেলে। রাত অনেক হয়েছে ঘুমোতে চলো। বিছানা তোমার তৈরী আছে।

বিছানায় শুলেই ঘুম এখন হবে? কয়েকটা কথা আগে বুঝতে চাই।

বিছানায় শুয়েই কৃত্তিবাস সেই কথাই তোলে।

শিউপ্রসাদজি ত নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছেন। তবে বাগানবাড়ি থেকে বার হবার সময় আমাদের বিশেষ করে···

তোমাকে মারবার এ চেষ্টা কেন?

মারার চেষ্টা নয় ওটা হয়ত তার ভান। নইলে অতদূর থেকে অন্ধকারে মারতে শব্দভেদী গুলি দরকার।

শব্দভেদী গুলি!

আচ্ছা, ভান না হয় মানলুম কিন্তু এ রকম মারার চেষ্টার ভান করবার উদ্দেশ্যটা কি?

ব্যাপারটা ঘোরালো করে সন্দেহটা গুলিয়ে দেওয়া।

সন্দেহ গুলিয়ে দেবার কি দরকার আছে এখানে? শিউপ্রসাদজি নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছেন। আর রতনলাল নিজের ওপর সন্দেহ টানবার মত আহাম্মক নিশ্চয়ই নয়। তা ছাড়া···

ভুতুড়ে হাত না বাড়াতে পারলে তোমার এখানে দশটা থেকে বসে অত শিউপ্রসাদজির বাগানে গুলি চালানো যায় না।

হ্যাঁ, এটা ভাববার কথা বটে!

ভাববার কথা আরো আছে। বাগানবাড়িতে গুলি করাটা যদি মারবার ভান হয়, আমাদের ফেরবার রাস্তায় এভাবে ছুরিটা, ঝোলার ওপর তার বেঁধে রাখার কি মানে?

ইউরোপের কনভেণ্টে ভারতীয় মেয়ে

সানডে টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে, ইউরোপের কনভেণ্টগুলিতে সন্ন্যাসিনীর ঘাটতি হওয়ায় তারা কেরলের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ১২০০ জনেরও বেশি কৃষক-বালিকা কিনেছে। বৃটেন, ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানীতে এমন সব কনভেণ্টের সন্ধান মিলেছে যারা ভারত থেকে মেয়ে আমদানির ব্যাপারে জড়িত এবং এরা প্রতি মেয়ে বাবদ দাম দেয় ৭২০ ডলার অর্থাৎ ৫৪০০ টাকা।

স্পেনের কনভেণ্টেও কেরল থেকে মেয়ে আমদানি করা হয়।

ভাটিকান থেকে এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করে জানানো হয়েছে যে, এপর্যন্ত ভারত থেকে এই উদ্দেশ্যে আমদানি করা মেয়ের সংখ্যা ১২০০ জন। কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধানে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, আসল সংখ্যা অনেক বেশি। দেড় হাজারের বেশি তো বটেই, দু' হাজার ছাড়িয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ভারত থেকে মেয়ে আমদানির ব্যাপারে গীর্জার তহবিলের ৩ লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ ৫৪ লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হয়েছে। আর এই কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ভাটিকানের কয়েকজন পুরোহিত। যাঁরা বয়সে প্রবীণ এবং পরিচয়েও বিশিষ্ট।

সানডে টাইমসের তথ্যানুসন্ধানকারী দল ইতালীর এমন ২৬টি কনভেণ্টের সন্ধান পেয়েছে যেখানে ভারত থেকে মেয়ে নিয়ে আসা হয়। এই চালানের ব্যাপারে জড়িয়ে আছেন কেরলের আটজন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হর্তাকর্তা। এই সঙ্গেই জানা গেছে যে, ইতালির কনভেণ্টগুলিতে কমপক্ষে এমন তিনজন ভারতীয় মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা বাড়ি ফেরার জন্য উতলা। এবং এরা মানসিক আঘাতের ফলে স্নায়ুর রোগে ভুগছে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এদের একজনকে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে।

ফ্লোরেন্সের একটি কনভেণ্ট একজন ভারতীয় পুরোহিতের মাধ্যমে মেয়ে সংগ্রহের এই কাজটুকু সমাধা করেছে। এই ভারতীয় পুরোহিতের হাতে সন্ন্যাসিনী হতে ইচ্ছুক ধর্মপ্রাণ মেয়ে রয়েছে প্রচুর। উক্ত কনভেণ্ট তার মাধ্যমে কুড়িটি মেয়েকে কিনে নেয়। অবশ্যই উপযুক্ত মূল্যে।

ফ্লোরেন্সের আরো একটি কনভেণ্ট এই নারী ব্যবসায়ী পুরোহিতকে কাজে লাগিয়েছে। এই কনভেণ্ট ১২টি মেয়ের অর্ডার দেয়। মূল্য বাবদ তিন হাজার পাউণ্ডের চেকও পাঠানো হয়। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে ১১টি মেয়ের চালান এখানে এসে পৌঁছায়।

ইতিমধ্যে একজন ভারতীয় পুরোহিতের নামও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি হলেন কেরলের ধর্মযাজক ফাদার সিরিয়াক। ধর্মচারণার অন্তরালে তিনিই এই জঘন্য ঘটনার পরিচালনা করে থাকেন। চার বছর আগে তিনি ইউরোপে যান এবং তখনই ব্যাপারটার ব্যবসায়িক সর্বাদি পাকাপাকি হয়। এই তথ্যটি ফাঁস করেছেন হাম্পশায়ার কাউণ্টির, আলটর্নস্থিত একটি কনভেণ্টের মাদার সুপিরিয়র মাদাম মাদেলিন। ডেইলি মিরর পত্রিকার প্রতিনিধিকে এই তথ্যটুকু জানিয়ে তিনি বলেছেন, তাঁর কনভেণ্টে ১০টি ভারতীয় মেয়ের জন্য ৫৪ হাজার টাকা দিয়েছেন। তবে এই টাকা সন্ন্যাসিনীদের রাহা খরচ ও অন্যান্য খরচের জন্যই দেওয়া হয়েছে। এবং কেরলের ধর্মযাজক ফাদার সিরিয়াকের নামেই এই টাকা পাঠানো হয়েছে। ভারত থেকে সন্ন্যাসিনী গ্রহণের জন্য তিনি মাদার জেনারেলের অনুমতি নিয়েছিলেন।

এই খবর নিয়ে এখন নিত্য হৈ-চৈ। খবরের কাগজ মুখর, লোকসভা তোলপাড়। সবাই এর আশু প্রতিবিধান চান। জনপ্রতিনিধিরা নানাভাবে তদন্তের পরামর্শ দিচ্ছেন। ভাটিকানও বিচলিত। তাঁরা ভারতীয় মেয়ে আমদানি আপাতত স্থগিত রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। সবই হলো কিন্তু আসল রোগ নির্ণয় হলো না। সেদিকে এখনো পর্যন্ত কেউ তাকাননি।

সমাজবিধানের অনেক পরিবর্তন অবশ্য হয়েছে। উচ্চ-নীচে ভেদাভেদ অনেকটা ঘুচেছে। শিক্ষাদীক্ষায় আমরা উদার হয়েছি। তাই আজ অনেকেই একত্রে পাত পাড়ছেন। কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে খবর আসে, নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত কাউকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আরো নানা ধরণের অত্যাচার তো আছে। এসব খুব একটা হামেশা ঘটনা নয়। তবু ঘটছে এবং সংবাদপত্র মারফৎ সকলের কানেও ঢুকছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে মামুলি প্রতিবাদ কিছু হয়েছে। কিন্তু জোরদার কোন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। সে-চেষ্টা কেউ করেছেন বলেও মনে পড়ে না। সরকার থেকে বে-সরকারী সবাই এজন্য দায়ী।

তাছাড়া আমাদের বিরাট অভাব। দেশ স্বাধীন হবার বিশ-বাইশ বছরের মধ্যেও এর কোন সমাধান হয়নি। এ-কথা তো সর্বজনস্বীকৃত। আর অভাবের এই খবর ঘরের বাইরেও অনেকেই জানে। ভাত ছিটোলে যেমন কাকের অভাব হয় না, তেমনি টাকা ছিটিয়ে এদেশে কাজ হাঁসিল হচ্ছে। নগদ টাকার লোভ সংবরণ করা এদেশের অভাবী লোকের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তা সে যে-কোন মূল্যেই হোক। আর এতো তবু ভাল কাজ। মেয়েরা দুঃস্থের সেবা করবে। অন্তত মা-বাবাকে মিশনারীরা এ-কথাই বোঝান।

মিশনারীরা অতীতে ধর্মান্তরিত করে বিদেশী শাসকদের সুবিধা করে দিতেন। এখন তাদের সে-প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এবার নতুন রণকৌশল তারা নিয়েছেন। আমাদের মেয়েদের পণ্যের মতো সে-দেশে পাঠানো হচ্ছে সন্ন্যাসিনী হবার জন্য। এই মিশনারী ফাদারেরা এজন্য প্রয়োজন মনে করেননি কারো আদেশ নেবার। ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যবসায় মেতে উঠেছেন। আর সুযোগ বুঝে হাত বাড়িয়েছেন দরিদ্র দেশের দরিদ্রতম মা-বাবার দিকে। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। এবার হয়তো বন্ধ হবে। অবশ্যই তা সাময়িক কিনা জানি না। তবে দারিদ্র্য যতদিন আমাদের পরিচয়ের অঙ্গ হয়ে থাকবে, ততদিন সবাই সুবিধা নেবে। যে যেভাবে পারে। আর ছুঁৎমার্গের বিতাড়নও একই সঙ্গে দরকার। শহর দিয়ে গ্রাম বিচার হয় না। শহরের লোকই গ্রামে গেলে জাতের বাছবিচার নিয়ে মেতে ওঠে। আজো এদেশে এমন অনেক জায়গা আছে যার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। তাই অভাব আর ছুঁৎমার্গ যদি আমরা দূর না করতে পারি, তাহলে বরাবর এমনি পণ্য হয়েই থাকবো। হয়তো যার প্রথম আভাষ, মা-বাবার চোখের সামনে মেয়ের পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হওয়া।

ইংরেজ আমাদের দেশে এসেছিল। পণ্ডিতরা বলেন, ও'রা জাহাজে করে সঙ্গে এনেছিলেন সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য সৈন্য আর রসিকচিত্তকে সিক্ত করার জন্য ইংরেজী সাহিত্য। কিন্তু তারা একটা কথা বলতে ভুলে গেছেন, তা হলো মিশনারী। বিদেশী শাসক বিদায় নিয়েছে। কিন্তু বিদেশী মিশনারীরা আজো আছে। এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ফাদারদের সম্পর্কে এবার আমাদের সতর্ক হতে হবে।

—প্রমীলা

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী : অমল চাকলাদার

গত ১০।১৫ বছরে ইংল্যান্ডের শিল্প জগতে একটা ছোটখাট বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। ভাস্কর্য এবং প্রিন্ট তৈরির ক্ষেত্রে এর বিশেষ ছাপ লক্ষিত হয়েছে। ২০ থেকে ২৭ তারিখে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে বৃটেনের চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের করা সমকালীন প্রিন্ট-এর প্রদর্শনীটি কয়েক বছর পূর্বে আয়োজিত সমকালীন বৃটিশ ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর মতই দর্শকদের কাছে উৎসাহের বস্তু হিসেবে পরিগণিত হবে। পশ্চিমবংগ নাটক সংগীত ও শিল্প আকাদমি, ললিতকলা আকাদমি এবং আকাদমি অব ফাইন আর্টস ও বৃটিশ কাউন্সিল আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ২০ জন শিল্পীর ১২০ খানি প্রিন্ট প্রদর্শিত হল। প্রিন্টগুলির অধিকাংশই সিল্কস্ক্রীণে করা অল্প কিছু এচিং ও লিথোগ্রাফও রাখা হয়েছে।

বৃটেনের আধুনিক শিল্পীরা যদিও সমকালীন ফরাসী ও মার্কিন শিল্পের প্রভাব এড়াতে পারেননি, তবু এঁরা একটা বৃটিশ শৈলীর সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য দিয়েছেন। মোটামুটি একটা নগরকেন্দ্রিক মনোভাব ও টেকনলজিক্যাল সভ্যতার প্রবল ছাপ এই প্রিন্টগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট দেখা যায়। পপ, অপ এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেসনিজমের প্রভাব সমগ্র প্রিন্টগুলির মধ্যে পরিস্ফুট এবং দৃষ্টিকে নাড়া দেবার মত রংয়ের বাহার ও বৈচিত্র্য প্রদর্শনীটিকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। নন ফিগারেটিভ কাজের প্রাচুর্য থাকলেও ফিগারেটিভ রীতি উপেক্ষা করা হয়নি। ডেভিড হকনির কৃত কাভাসির কবিতার ইলাস্ট্রেশনের এচিংগুলি এ বাবদে উল্লেখযোগ্য।

গিলিয়ান আয়ার্স-এর 'ক্রিভোল্লিজ রুম' ছবিতে রেনেসাঁস স্টাইলের ছবি থেকে একটি মডার্ণ ডিজাইন তৈরী করা হয়েছে। প্যাট্রিক কলফিল্ডের স্ক্রীন প্রিন্টগুলিতে জোরালো কালো রেখা ও ফ্ল্যাট উজ্জ্বল বর্ণে কতকগুলি চমৎকার স্টিল লাইফ তৈরী করা হয়েছে। গর্ডন হাউসের ছবিগুলির মধ্যে অত্যন্ত সরল ও জোরালো জ্যামিতিক ডিজাইন ও অসাধারণ রং-এর সজ্জা দেখা গেল। এডুয়ার্ডো পওলোজির কাজগুলিতে তাঁর ভাস্কর্যের মতই টেকনলজিক্যাল সভ্যতার যন্ত্রাদির প্রতীকের ব্যবহার প্রচুর। এবং এর ভেতর থেকেই তিনি কোথাও কোথাও এক-একটি রহস্যময় ডিজাইন সৃষ্টি করেছেন। যন্ত্রপাতি ও জীবজন্তু নিয়ে পিটার ফিলিপসের ডিজাইনগুলিও উল্লেখযোগ্য। কলিন সেলফ একটি মোটর গাড়ির বৃহৎ প্রিন্ট-এর মধ্যে শক্তি ও সৌন্দর্য আনতে চেষ্টা করেছেন। রিচার্ড স্মিথ জো টিলসন, উইলিয়াম টার্নবুল প্রমুখ শিল্পীরা কেউ বা লিথোগ্রাফ, কেউ বা স্ক্রীণ প্রিন্টের মাধ্যমে জ্যামিতিক রিলিফ ডিজাইন তৈরী করেছেন।

●

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর আয়োজনে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ১৩ থেকে ২৪ আগস্ট সমকালীন শিল্পীদের ছবি ও মূর্তির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। ৫৯ খানি ছবি ও মূর্তির মধ্যে এবারে জলরঙের কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবারে ছবিতে পুরস্কার পেয়েছেন চিত্রতা দে ও অমল চাকলাদার এবং ভাস্কর্যে কবি দত্ত। নব্যভারতীয় প্রথার কাজের ওপর যদিও সোসাইটি বেশী জোর দিয়েছেন তবু বিলিতী অ্যাকাডেমিক কাজের নিদর্শনের অভাব নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কাজেরই সাধারণ মান যথেষ্ট উঁচু নয়। ওয়াশের ছবিগুলি সম্বন্ধে এই কথা বোধহয় বিশেষভাবে বলা চলে। অমল চাকলাদারের ছবি তিনটির মধ্যে জলরঙে অনেকটা ওজন এবং ঘনত্ব আনার চেষ্টা দেখা যায়। তাঁর ময়ূর ও জানলা ছবি দুটির কম্পোজিশনের ডেকরেটিভ গুণ প্রশংসনীয়। শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মচারী মূর্তিটির রং এবং রেখার সারল্য ও পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করার মত। কিষণলাল ঘোষের গ্রামের দৃশ্য ও ডবলিউ আর কাপুরের পথের দৃশ্য আধুনিক জলরঙের রীতির প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। স্বপ্না সেনের 'সেতু' ভারতীয় প্রথায় করা পরিচ্ছন্ন জলরঙের কাজ। কবি দত্তের হেড স্টাডি ভাস্কর্য বিভাগে সবচেয়ে জোরালো মূর্তি। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের গড়া মুখ দুটি চলনসই।

—চিত্ররসিক

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী গত বছরের সেরা পরিচালক শ্রীমৃণাল সেন, (ভুবন সোম--এ ছবি বছরের সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদকও পেয়েছে) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (উর্বশী) শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (ভরত) শ্রীউৎপল দত্ত ও শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীশচীন দেববর্মণ

প্রেক্ষাগৃহ

শৈলজানন্দের 'মানে-না-মানা'-র হিন্দী অলংকৃত সংস্করণ

১৯৪৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নিউ সেঞ্চুরী পিকচার্স নিবেদিত ও শৈলজানন্দ (মুখোপাধ্যায়) পরিচালিত 'মানে-না-মানা'র ভূতনাথকে আজকের কজন দর্শক দেখেছেন এবং যাঁরাও দেখেছেন, তাঁদের কজনেরই বা আনুপূর্বিক তাকে মনে আছে, এ-প্রশ্ন আজ আর তুলব না। তবে বলব, এই অশিক্ষিত, সরলস্বভাব, সাংসারিক কূটনীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত পল্লী-যুবকের চরিত্রটিতে জহর গাঙ্গুলীর জীবন্ত অভিনয়কে আমরা আজও ভুলতে পারিনি। ইউনাইটেড প্রোডাকসন্স (মাদ্রাজ) নিবেদিত ও দোসানী ফিল্মস্ পরিবেশিত প্রস্পারিটি পিকচার্স-এর হিন্দী রঙীন ছবি 'গোপী'—যা নাকি ঐ 'মানে-না-মানা'র হিন্দী সংস্করণ, তার নায়ক আসলে হচ্ছে ঐ ভূতনাথ। 'গোপী' একে হিন্দী ছবি, তায় মাদ্রাজে তৈরী। কাজেই এর জাঁকজমক রীতিমত চোখ-ধাঁধানো এবং সর্বভারতীয় দর্শককে আকর্ষণ করবার অভিপ্রায়ে নাচ-গান এবং জোড়া খল-চরিত্রের দুষ্কৃতিপূর্ণ উত্তেজনাময় কার্যকলাপে ছবিটি ভরাট। কিন্তু যতই ঐশ্বর্যমণ্ডিত হোক না কেন, ছবিটির কাহিনীর মূলে শিকড়টি রয়েছে ভারতের পল্লী-জীবনের মাটির ভিতরে। তাই দুই সৎভাই গিরিধারী ও গোপীর (শিবনাথ ও ভূতনাথের) এবং বৌদিদি পার্বতী ও দেবর গোপীর মধ্যে অকৃত্রিম স্নেহের যে-ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে, যা নানা-রকম ছোটখাট বা বৃহৎ রকমের বাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও মন্দীভূত হয় না, তারই বিচিত্র প্রকাশ দর্শক-হৃদয়কে বারে বারে স্পর্শ করে তাকে মথিত, আলোড়িত ও নন্দিত করে। এদের সম্পর্ককে বিষাক্ত করতে চেয়েছে খলপ্রকৃতির ধনী লালা লক্ষ্মীচাঁদ, পার্বতীর দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী লীলাবতী। সাংসারিক কূটবুদ্ধির কাছে গোপী বারংবার পরাস্ত হয়েছে। বজরঙ্গীনাথ হনুমানের ভক্ত, সরল হৃদয় গোপী সাংসারিক বিষয়বুদ্ধির অভাবে নানা অশান্তির কারণ হয়ে বহুবার তার দাদার দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে, তবু বৈমাত্রেয় ভাইয়ের জন্যে দাদার প্রাণে ব্যাকুলতার অভাব হয়নি কোনোদিন। —অপরদিকে সারল্যেভরা, অমিতপ্রাণ বলেই গোপীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল স্বার্থসর্বস্ব লীলাবতীর ভাইঝি সীমা; পিসীর শত চেষ্টা সীমার মনকে গোপীর দিক থেকে লক্ষ্মীচাঁদের প্রতি ফেরাতে পারেনি। দুই ভাইয়ের মধ্যে শেষ সংঘাতের ফলে গোপী যখন তার স্নেহের ছোট বোনটির হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল এবং দৈবকৃপায় এক ভিন গাঁয়ের জমিদারনীর সানুগ্রহ দৃষ্টিলাভ করল, তখনও বাহ্যত ছাড়াছাড়ি হওয়া সত্ত্বেও দু ভাইয়ের প্রাণ কেঁদেছে পরস্পরের জন্যে। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সকল অশান্তির পরিসমাপ্তি ঘটে ভাইয়ের সঙ্গে ভাই মিলেছে, দেওরের সঙ্গে বৌদি এবং প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকা।

বাংলা 'সাগিনা মাহাতো'র নাম-ভূমিকায় দিলীপকুমারের অকল্পনীয় অসাধারণ অভিনয় দেখবার বিস্ময় কাটতে না কাটতেই আর এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন তিনি সারল্যেভরা অমিতবিক্রম 'গোপী'র ভূমিকায় প্রাণোচ্ছল অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। মনে হয়, তিনি আদৌ অভিনয় করছেন না, তিনি নিজেই যেন জীবন্ত গোপী। নাচে গানে, অভিনয়ে এমন অনায়াস ভঙ্গীতে জীবন্ত চরিত্র চিত্রণের নিদর্শন কচিৎ পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন প্রেমিকা সীমার ভূমিকায় সায়রা বানু। তাঁর অভিনয়ে এতখানি সাবলীলতা হিন্দী ছবিতে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। মনে রাখতেই হবে, মিত্রের সঙ্গে দিলীপের (স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর) এই প্রথম চিত্রাবতরণ হিন্দী ছবিতে। অবশ্য আমরা তাঁদের সম্মিলিত অভিনয় আগেই দেখেছি বাংলা ছবি 'সাগিনা মাহাতো'তে। [illegible] গিরিধারীর ভূমিকাটিতে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ওম প্রকাশ। চরিত্রটির অন্তর্নিহিত আনন্দ বেদনা স্নেহ ক্রোধ অভিমান মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয় মাধ্যমে। গিরিধারী পত্নী পার্বতীর চরিত্রটিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে নিরূপা রায়ের সংবেদনশীল অভিনয় মারফত। সহৃদয়া জমিদারনীর ভূমিকায় দুর্গা খোটের অভিনয়ও হয়েছে আন্তরিকতাপূর্ণ। গোপীর ছোট বোন নন্দিনীর চরিত্রে ফরিদা জালালের সুঅভিনয় দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দুর্বৃত্ত লক্ষ্মীচাঁদের ভূমিকায় প্রাণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয় করেছেন। এছাড়া ললিতা পাওয়ার (লীলাবতী), জনি ওয়াকার (রামু), সুদেশকুমার (জমিদারনীর ছেলে), মুখরী এবং অরুণা রায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে শিল্পনির্দেশনায় রুচির সঙ্গে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদক যদি ছবির অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে আরও কাঁচি চালাতে পারতেন, তাহলে ছবিটি আরও সুসংবদ্ধ হতে পারত। ছবির প্রায় সব কটি গানই সুগীত ও সুশ্রাব্য। মাত্র রাম-লক্ষ্মণ

সীতার সামনে গোপীর মুখের গানটিকে বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীতের রূপ দেওয়ায় ওর আকর্ষণী শক্তি কমে গিয়েছে।

দিলীপ-সায়রা অভিনয়দীপ্ত 'গোপী' জনপ্রিয়তা লাভ করবে তার সজীবতাগুণে।

সামাজিক ছবির ছড়াছড়ির মাঝে একটি পৌরাণিক চিত্র

পুণ্যশ্লোক নিষধাধিপতি নলরাজকে দৈবের বিড়ম্বনায় কিভাবে সমূহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং কিভাবে তাঁর পতিপ্রাণা স্ত্রী, বিদর্ভ রাজকুমারী দময়ন্তীর একাগ্র সাধনায় শেষ পর্যন্ত তিনি সকল বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে সগৌরবে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই কাহিনীকেই দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে জে এস ফিল্ম প্রোডাকসন্স-এর পৌরাণিক চিত্র 'নল-দময়ন্তী।'

মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্ভুক্ত নলোপাখ্যানকে যথাসম্ভব বজায় রেখে এই চিত্রটি গঠিত হয়েছে। শুধু স্বর্ণহংসের নল-হস্তে ধৃত হওয়ার পরে মুক্তিদানের প্রার্থনাটি এবং এই উপকারের বিনিময়ে বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তীর কাছে তাঁর দূতীগিরি করবার প্রস্তাবটি বর্জিত হয়েছে। পরিবর্তে দেখানো হয়েছে, হংসটির গায়ে দময়ন্তীর ছবি আঁকা রয়েছে অর্থাৎ বলা হয়েছে, হংসটিই দময়ন্তীর দূত হয়ে তাঁর কাছে এসেছে। চলচ্চিত্রের রূপান্তরের উদ্দেশ্যে আরও কিছু কিছু ঘটনার রদ-বদল উপেক্ষণীয়।

ছবির অভিনয়াংশে নায়িকা দময়ন্তীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় দৈবের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলার রূপটিকে হৃদয়-স্পর্শীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ধর্মাশ্রয়ী নলবেশে অসীমকুমার (যিনি হিন্দী ছবি সরস্বতীচন্দ্র-এর নাম-ভূমিকায় মনীশকুমার নামে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন) সংযত অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন। নলের ভ্রাতা পুষ্করের রাজ্যলোলুপতাকে বাচনে ও ভঙ্গীতে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সার্থক অভিনেতাটি চিত্রজগতে প্রবেশের দিনটি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এত বিভিন্ন রকম চরিত্রে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন যে, তাঁকে একজন বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা রূপে আমরা অভি-নন্দন জানাতে পারি নির্দ্বিধায়। বিদর্ভরাজ ও তাঁর মহিষীরূপে যথাক্রমে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনানী চৌধুরীর চরিত্রোচিত অভিনয় প্রশংসনীয়। রাজনটী মল্লিকা বেশে দীপিকা দাশ যেটুকু অভিনয় করেছেন, তা চরিত্রটির প্রকাশক। এছাড়া জহর রায় (বয়স্য উতঙ্ক), কালীপদ চক্রবর্তী (কলি), গঙ্গাপদ বসু (দ্বাপর), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (ব্যাধরাজ), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (নাগরাজ), গীতা দে (পুত্রের যথার্থ মা), লীলাবতী (পুত্রের নকল মা), সুনীলেশ ভট্টাচার্য (ইন্দ্র) প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছবির সম্পাদনা। পৌরাণিক ছবিতে একই চরিত্রের নানারূপে রূপপরিগ্রহ, সহসা দৃশ্যপরিবর্তন, চরিত্রদের আকাশপথে ভ্রমণ, সহসা অন্তর্ধান-পাত, বারিবর্ষণ প্রভৃতি নানা বিচিত্র ঘটনা দেখাবার জন্যে আলোকচিত্রশিল্পী সম্পাদকের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। বিশ্বনাথ নায়ক সম্পাদকরূপে তাঁর কাজকে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছেন। তার ওপর আবার যখন শুনি, আলোচ্য ছবিখানি বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে শেষ হতে পেয়েছে, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না, নানা রকম জোড়া-তালির কাজেও সম্পাদক বেচারাকে বহু শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে; তবে এ ব্যাপারটা দর্শকসাধারণের শোনবার ও বোঝবার কথা নয়। শিল্পনির্দেশক যে দক্ষতার সঙ্গে সেট-গুলি নির্মাণ করেছেন, তা উপযুক্তভাবে প্রশংসিত হতে পারত যদি আলোকচিত্র-শিল্পী তাঁর আলোছায়া রচনা ও ক্যামেরা সংস্থাপনার সাহায্যে সেটগুলির যথার্থ সদ্ব্যবহার করতেন। ছবিটি পৌরাণিক বলে এতে গানের সংখ্যা সাতটি। এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আরতি মুখোপাধ্যায় গীত 'নিভে যায় নিভে যায়' গানখানি সুর-যোজনা ও গাওয়ার গুণে যথার্থ পরিবেশ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। পৌরাণিক ছবিতে 'আমি তুষানলে জ্বইলা যে মরি' গানখানি ভাটিয়ালি সুরে গীত হয়ে ছবির ছন্দভঙ্গ করেছে। আবহসঙ্গীত পরিস্থিতি অনুযায়ী।

পল্লী বাংলার নর-নারী আজও রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে আদর করেন। তাঁদের কাছে 'নল দময়ন্তী' সবিশেষ সমাদর লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

স্টুডিও থেকে

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শিল্পী এমন জুটি বাংলা চিত্রজগতে হাতে গোনা যায়। তার সঙ্গে আরও একটি সংখ্যা বাড়ল বলতে পারি এখন। যখন শুনলাম দীনেন গুপ্তের নতুন ছবি 'আজকের নায়কে'র অন্যতম নায়ক প্রবীর রায় শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র নায়িকা জয়শ্রী রায়ের স্বামী। শ্রী ও শ্রীমতী রায়ের ছবি দুটিই তাঁদের অভিনয় জীবনের প্রথম চলচ্চিত্র। গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরীতে একটানা কয়েকদিন কাজ করেছিলেন শ্রীগুপ্ত। একদিন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। স্টুডিওর ফ্লোরে ঢোকার মুখেই দেখি কাজল গুপ্তের সঙ্গে বসে গল্প করছেন শ্রীরায়। সেখানেই আলাপ, শ্রীমতী রায়ও 'আজকের নায়ক' ছবিতে অভিনয় করছেন।

প্রবীর বাবু কলকাতারই ছেলে। ছেলেবেলার কিছুটা কেটেছে উত্তর বাংলায়, কিছুটা এই কলকাতায়। অভিনয়ে ঝোঁক ছিল ছোটোবেলা থেকেই, ইংরেজী বাংলা বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। কথা থেকে বুঝলাম অ্যাকটিং ব্যাপারটা তাঁর কাছে অভিনব কিছু নয়, পুরোনো। তবে এই প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়। একটু সেকী হওয়া অসম্ভব নয়!

হেমন্তকুমার তথা খ্যাতনামা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে গত সপ্তাহে এন-টির

মেঘ কালো/ সুচিত্রা সেন

দু নম্বরে নতুন পরিবেশে দেখলাম। এতদিন ল্যাবরেটারীতে মাইকের সামনে তাঁকে দেখেছি কখনও, কখনও দেখেছি প্রায় শতাধিক বাদ্যযন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে মিউজিক রেকর্ডিংয়ে, কখনও বা এপাড়া সেপাড়ায় জলসার আসরে তন্ময় হয়ে একের পর এক গান গেয়ে যেতে। 'রাহগীর'এর স্যুটিং এর সময় আবার দেখেছি অন্য সাজে অন্য সজ্জায়। তখন তিনি প্রযোজক। ব্যস্ত, চিন্তান্বিত কখনও বা দ্বিধাগ্রস্ত। তখন পাশে পাশে অবশ্য থাকতেন সমধর্মিণী শ্রীমতী বেলা দেবী।

সেদিন দেখলাম তাঁকে আর এক রূপ-সজ্জায়। মাইকের সামনে সেই ভরাট গলার স্বর নয়, মিউজিক রেকর্ডিংএর আচ্ছন্নতাও তখন তাঁর দেহে মনে ছিল না। জলসার আসরে গান গাইবার সময় সেই খোস মেজাজী মুখের চেহারাও তখন তাঁর ছিল না। ভিউ ফাইন্ডার গলায় ঝুলিয়ে ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে তখন তিনি সেটের শিল্পীদেরই শুধু নয়, ক্যামেরাম্যান, প্রোডাকশন বয়, মেকআপম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট প্রতিটি লোকের কাজকর্মের তদারকি করছিলেন। তিনি তখন আর গায়ক ছিলেন না, সংগীত পরিচালক ছিলেন না, তিনি তখন পরিচালক। 'রাহগীর'এর অসামান্য সাফল্যের পর হেমন্তবাবু নতুন বাংলা ছবি 'অনিন্দিতা'র শুভ সূচনা করেছিলেন মাস দুয়েক আগে। এখন কাজ চলছে পুরোদমে। আমার উপস্থিতির দিনে সেটের শিল্পী ছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও মৌসুমী। হেমন্তবাবু শুভেন্দুকে সিকোয়েন্সের গুরুত্বটা বোঝাচ্ছিলেন খাটের ওপর বসে। ক্যামেরাম্যান সেই সুযোগে আলোর ডেপথ্ মাপছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে সংগীতকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ওরফে হেমন্তকুমারের 'অন্যরূপ' দেখছিলাম। পরিচালক হিসাবে তাঁর এটি যদিও প্রথম ছবি প্রযোজক হিসাবে সম্ভবতঃ পঞ্চম। 'নীল আকাশের নীচে'র পর তিনি বম্বে চিত্রজগতে ছিলেন বহুদিন, ছবিও করেছেন তিনটে। কিন্তু হিন্দী ছবিতে কি আর মন ভরে? বিশেষ করে শিল্পীর! হেমন্তবাবু তাই শেষ পর্যন্ত আবার ফিরে এলেন বাংলা চিত্রজগতে। টালিগঞ্জের সেই চির নতুন চিরচেনা স্টুডিও পাড়ায়। তাঁর এ ছবির নায়ক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় আর নায়িকা মৌসুমী। এ লটের কাজের পর ছবির অর্ধেক কাজ শেষ। আউট-ডোরের কাজ আছে কিছু। তারপর আবার ইনডোর।

মঞ্চাভিনয়

সংক্রান্তি : নাট্যানুরাগীদের কাছে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' একটি অতি পরিচিত নাম। সম্প্রতি 'কর্নওয়ালিশ বিল্ডিং রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র শিল্পীরা এই নাটকের সার্থক মঞ্চরূপ পরিবেশন করলেন রঙমহলে। শ্রীগুণেন বসুর নির্দেশনায় নাটকটির দলগত অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও প্রাণবন্ত হয়। অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই মনে পড়ে 'শংকর' চরিত্রাভিনেতা শম্ভু কর্মকারকে; তাঁর অপূর্ব অভিব্যক্তি ও কণ্ঠস্বরের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। আর একটি অনবদ্য চরিত্রসৃষ্টি হয়েছে তারাশংকর বকসীর 'কালীনারায়ণ'। অমূল্যকুমার সাহার 'রতন', ও চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'নায়েব'ও সামগ্রিক অভিনয়ের ধারায় গভীরতা এনেছে।

গত ১৮ই আগস্ট অ্যালিম্পিয়ান রিক্রিয়েশন ক্লাব (র‍্যালিস ইন্ডিয়া লিঃ স্টাফ ক্লাব) স্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায় রচিত "সংক্রান্তি" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। পরিচালনা করেন শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায়। দলগত অভিনয় ভালই হয়েছে। তবে সর্বশ্রী শিবাজী গুপ্ত, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন বসু এবং দত্তা মুখার্জীর অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে।

খেলার কথা

ডেভিস কাপে আমরা

অজয় বসু

বাঙ্গালোরে অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার পর মনে হয়েছিল যে প্রেমজিতলাল ও জয়দীপ মুখার্জি বুঝি এতোদিনে সাবালক হলেন। কারণ কৃষ্ণাণ ছাড়াই, জয়দীপ-প্রেমজিতের সামর্থ্যে নির্ভর করে ভারত ডেভিস কাপে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে হারিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই ভুল ভাঙ্গলো। এখন আশঙ্কা হচ্ছে যে ডেভিস কাপে কৃষ্ণাণ-জয়দীপ-প্রেমজিতের যুগ বুঝি শেষ হয়েই গেল ! এই আশঙ্কার মূল কারণ, বলা বাহুল্য, আন্তঃ আঞ্চলিক সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মাণীর হাতে পরাজয়। শোচনীয় পরাজয়ই—ব্যবধান ৫—০ ম্যাচের।

বয়সের ভার, অনভ্যাসের জের এবং আনুসঙ্গিক নানা কারণে কৃষ্ণাণ আগেই সরে দাঁড়িয়েছেন। জয়দীপ ত্রিশ ছুঁতে চলেছেন, প্রেমজিৎ ছুঁয়েছেন। কৃষ্ণাণ-পরবর্তীকালের ভারতীয় টেনিসের এই দুই খুঁটির পায়ের নিচেকার জমি যে ক্রমশঃই সরে যাচ্ছে তাই বোঝাবার জন্যই যেন জার্মাণ তরুণ বুংগার্ট ও কুনকে পুনায় ভারতীয়দের অমন নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। অথচ গত কয়েক বছরের মধ্যেই বুংগার্ট, কুনকে, ইনডো, বুডিংয়ের জার্মাণীকে ভারত একবার নয়, বার দুয়ের হারিয়েছে। তখন অবশ্য কৃষ্ণাণ কোর্টে হাজির ছিলেন। তবু সব কৃতিত্বের ভাগীদার একা কৃষ্ণাণই নন। জয়দীপ, প্রেমজিতেরও ভূমিকা ছিল। কিন্তু আজ কৃষ্ণাণও নেই, আবার জয়দীপ-প্রেমজিতেরাও নিজেদের ক' বছর আগেকার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না। দৃষ্টান্তটি দেখে কি মনে হয়? বুংগার্ট ও কুনকের খেলার মান হয়তো বেড়েছে। সেই সঙ্গে জয়দীপ-প্রেমজিতের খেলার ধার ও ভার দুই কমেছে যে !

ও'দের ক্রীড়ামানে এই যে ভাটার টান দেখা দিয়েছে তার জন্যে জয়দীপ-প্রেমজিতের গলায় অপরাধের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া চলে না। সে চেষ্টা করা হলে অকৃতজ্ঞতারই পরিচয় রাখা হবে। যেহেতু জাতীয় টেনিস দলের প্রতিনিধি হিসেবে ও'রা দুজনেই ও'দের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। দলগত টেনিস ডেভিস কাপে ভারতের ভাবমূর্তির এক চিত্তাকর্ষক চেহারা আঁকায় তাঁরা সমকালীন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় খেলোয়াড় কৃষ্ণাণের সঙ্গে সমানে প্রাণপাত করেছেন। কৃষ্ণাণ-জয়দীপ ও প্রেমজিৎ, এই ত্রয়ীর আমলই যে ডেভিস-কাপে ভারতীয় টেনিসের স্বর্ণযুগ, একথা ভুললে চলবে না। সত্যিই, ওই কালের ডেভিস কাপের ইতিহাসই তো আমাদের, মানে ভারতীয়দের কাছে সবচেয়ে আনন্দদায়ক।

কৃষ্ণাণ-জয়দীপ-প্রেমজিতের সক্রিয়তাতেই ভারত একবার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে এবং বার ছয়েক আন্তঃ-আঞ্চলিক ফাইনালে খেলেছে। এশীয় অঞ্চলের প্রতিযোগীদের মধ্যে জাপানও চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে ভারতের অনেক আগেই। তবুও সাম্প্রতিক ফলাফলের মূল্যায়ণে ভারতকেই এশীয় শ্রেষ্ঠ টেনিস দলের স্বীকৃতি দিতে কারুরই দ্বিধা জাগবে না। যে কজন খেলোয়াড়ের দক্ষতাকে ভিত্তি করেই ভারতের পক্ষে এশীয় শ্রেষ্ঠের মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তাঁরা হলেন ওই কৃষ্ণাণ, জয়দীপ এবং প্রেমজিতলাল।

ও'রা ও'দের দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন। খেলতে খেলতে প্রত্যক্ষদর্শীদের সোচ্চার তারিফও আদায় করেছেন। ডেভিস কাপে ভারতীয় ঐতিহ্য গড়ায় সফলও হয়েছেন। কিন্তু ও'রা তো চিরদিন সেই ঐতিহ্য নিজেদের কাঁধে বয়ে বেড়াতে পারেন না। কেউই অনন্তযৌবন নন। কাজেই উত্তরসুরীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা এগোতে না পারলে যুগান্তের নৈরাশ্য যে ভারতীয় টেনিসকে ছেয়ে ফেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে সামনের দিকে তাকালে যে ছবিটি আমাদের নজরে পড়বে তা আশাপ্রদ নয়। জনকয়েক জুনিয়ার কয়েক ধাপ এগিয়েছেন বটে। তাঁদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়মিত বিদেশ সফরের ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতীয় টেনিসের প্রশাসনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন যে ওই জুনিয়ারদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। তবু মনে হয় যে ও'দের কেউই এখনই কৃষ্ণাণ-প্রেমজিৎ-জয়দীপের ছেড়ে যাওয়া আসনগুলি দখল করে নেবার জন্যে প্রস্তুত নন। জুনিয়াররা যে কতোদিনে উপযুক্ত হয়ে ওঠেন, সেইটিই লক্ষ্য করার বিষয়।

আজকের যাঁরা জুনিয়ার ও উঠতি তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে কৃষ্ণাণ-জয়দীপ-প্রেমজিতের ডেভিস কাপের ভূমিকা অতিক্রম বা স্পর্শ করতে পারবেনই, এমন নিশ্চয়তাও নেই। এবং এই অনিশ্চয়তার মেঘ যতোদিন না কেটে যায় ততোদিন ভারতীয় টেনিসের ভবিষ্যত ঘিরে শুভাকাঙ্খীদের উদ্বেগও কমবে না। ভারতীয় ক্রীড়ার শুভানুধ্যায়ীরা বাঙ্গালোরে অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার পর থেকেই বলতে সুরু করে দিয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় ভারতের গৌরবমণ্ডিত পরিচয় আঁকতে পেরেছে আমাদের মল্লবীরেরা, হকি এবং টেনিস খেলোয়াড়েরা। কিন্তু মুখে মুখে সে কথা ছড়িয়ে পড়ার মুখেই পশ্চিম জার্মাণীর কাছে হেরে যাওয়াতে সব যেন কেমন ওলোটপালট হয়ে যেতে বসেছে। ওলোটপালট খাওয়া এই পরিস্থিতিকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর করে তোলার দায়িত্ব সামনের দিকে আগুয়ান ভারতের জুনিয়ার টেনিস খেলোয়াড়দেরই।

অন্যান্য টেনিস প্রতিযোগিতায় না হোক, দলগত টেনিসে ভারতের উল্লেখযোগ্য যে পরিচয় সেই পরিচয় সম্পর্কে আজকের জুনিয়ার ভারতীয়দের সচেতন থাকতেই হবে। তাঁদের ভুললে চলবে না যে প্রায় বছর পঞ্চাশের চেষ্টায় পূর্বসুরীরা তিল তিল করে জাতীয় টেনিসের পরিচয় গড়েছেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রেই সেই পরিচয় অবিকৃত রেখে দেওয়ার ভার পড়েছে আজ জুনিয়ারদেরই ওপর। এক কথায়, এই সব জুনিয়ারদের সামর্থ্যের দিকেই ইতিহাস তাকিয়ে রয়েছে।

উনপঞ্চাশ বছর আগে, ১৯২১ সালে ভারত সব প্রথম ডেভিস কাপের আসরে নামে। বিশের দশকে সেরা ভারতীয় খেলোয়াড় মহম্মদ স্লিম, ১৯২১ থেকে ১৯৩৪ সালে পর্যন্ত তিনি ডেভিস কাপে জাতীয় দলের নেতৃত্ব করেন।

মহম্মদ স্লিম থেকে কৃষ্ণাণের আমল পর্যন্ত যে সব খেলোয়াড় ডেভিস কাপে জাতীয় দলের স্বার্থ আগলাতে মনে রাখার মতো ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন তাঁরা হলেন মদনমোহন, সোহনলাল, সোহনী, গাউস মহম্মদ, ই ভি বব, ইফতিকার আমেদ, যুধিষ্ঠির সিং সাবয়ে, সুমন্ত মিশ্র, নরেন্দ্রনাথ, দিলীপ বসু, জিম মেটা ও আরও কজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতার পর ১৯৫৩ সালে ভারত প্রথ[illegible] আন্তঃ আঞ্চলিক সেমিফাইনালে ওঠে [illegible] ১৯৫৯-তে প্রথম খেলে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে। ১৯৫৯তে ভারতীয় টেনিসে রমানাথন কৃষ্ণানের যুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তখন অবশ্য কৃষ্ণানের সঙ্গী নরেশকুমার।

প্রথমে নরেশকুমার, পরে জয়দীপ, প্রেমজিতকে নিয়ে কৃষ্ণান সেই থেকেই প্রায়শঃই জাতীয় দলকে ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে (১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৫) তুলে ধরতে থাকেন এবং ১৯৬৬তে তোলেন চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে।।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ওঠা এবং দুর্দ্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলাই আন্তর্জাতিক টেনিসে ভারতের সেরা কীর্তি। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ১—৪ ম্যাচে হারলেও ডাবলসে তদানীন্তন বিশ্বশ্রেষ্ঠ জুটি জন নিউকম্ব ও টনি রোচকে হারাবার সান্ত্বনা লাভ করেছিল। সেদিন ডাবলসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন কৃষ্ণাণ ও জয়দীপ মুখার্জি। তাছাড়া শেষ

দিনের এক সিঙ্গলসে জয়দীপ বিখ্যাত খেলোয়াড় ফ্রেড স্টোলিকে পাঁচ সেট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার পরই নতি স্বীকার করেন। অস্ট্রেলিয়া ও ভারত, কাগজে কলমে দু পক্ষে যে ব্যবধান ছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ১—৪ ম্যাচে হেরে যাবার নজীর আদৌ অগৌরবের নয়।

১৯৬৬ সালে দিল্লীতে, ১৯৬৮ সালে মিউনিকে ভারত পশ্চিম জার্মাণীকে হারিয়েছিল। সেই সব স্মৃতি বুঝি এবারেও মন থেকে সরে যায় নি। তাই পশ্চিম জার্মাণীকে আবার হারাবার স্বপ্ন হয়তো আমরা দেখেছিলাম। কামানের গোলার মতো উগ্র, খুনে সার্ভিস করে উইলহেলম বুংগার্ট এবং ডাইনে বাঁয়ে কোনাকুনি, পরিমিত ড্রাইভ হাঁকিয়ে বুনকে স্মৃতি থেকে দেখা সেই স্বপ্নের জালটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন।

এ প্রত্যাঘাত আচমকা। তাই শকটুকু সইয়ে নিতে সময় লাগছে। কিন্তু যতো সময় যাচ্ছে ততোই কি আমরা বুঝতে শিখছি না যে এই তো স্বাভাবিক? উত্থান ও পতনের পরিণামে সংঘটিত যে ঘটনা তা ঘটনাই, অঘটন নয়। হার জিৎ দুই তো সত্য। চিরদিন কেউ জিততে পারে না; হারেও। এবং তার হার থেকে যারা জয়ের মূলধন যোগাড়ে প্রেরণা পায়; বুঝতে হবে তারই ভবিষ্যত আছে।

এই প্রেরণায় ভারতীয় টেনিস কি উজ্জীবিত হতে পারবে না?

খেলাধুলা

দর্শক

ডেভিস কাপ

১৯৭০ সালের ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে আমেরিকা ৫-০ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৬৮-৭০) এবং মোট ২২ বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ জয়ী হয়ে প্রতিযোগিতার সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে সর্বাধিক যে ২২ বার ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড করেছিল আমেরিকা তাতে সেই রেকর্ড স্পর্শ করেছে।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

১৯৪৬ সাল থেকে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

বছর	বিজয়ী			বিজিত	
১৯৪৬	আমেরিকা	৫	ঃ	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৭	আমেরিকা	৪	ঃ	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৪৮	আমেরিকা	৫	ঃ	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৯	আমেরিকা	৪	ঃ	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪	ঃ	আমেরিকা	১
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়া	৩	ঃ	আমেরিকা	২
১৯৫২	অস্ট্রেলিয়া	৪	ঃ	আমেরিকা	১
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	৩	ঃ	আমেরিকা	২
১৯৫৪	আমেরিকা	৩	ঃ	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৫	অস্ট্রেলিয়া	৫	ঃ	আমেরিকা	২
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৫	ঃ	আমেরিকা	০
১৯৫৭	অস্ট্রেলিয়া	৩	ঃ	আমেরিকা	২
১৯৫৮	আমেরিকা	৩	ঃ	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩	ঃ	আমেরিকা	২
১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া	৪	ঃ	ইটালী	১
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৫	ঃ	ইটালী	০
১৯৬২	অস্ট্রেলিয়া	৫	ঃ	মেক্সিকো	০
১৯৬৩	আমেরিকা	৩	ঃ	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	৩	ঃ	আমেরিকা	২
১৯৬৫	অস্ট্রেলিয়া	৪	ঃ	স্পেন	১
১৯৬৬	অস্ট্রেলিয়া	৪	ঃ	ভারতবর্ষ	১
১৯৬৭	অস্ট্রেলিয়া	৪	ঃ	স্পেন	১
১৯৬৮	আমেরিকা	৪	ঃ	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৬৯	আমেরিকা	৫	ঃ	রুমানিয়া	০
১৯৭০	আমেরিকা	৫	ঃ	পঃ জার্মানী	০

ডেভিস কাপ ঃ আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড
সংক্ষিপ্ত ফলাফল ১৯০০-৭০

	মোট খেলা	জয়	পরাজয়
অস্ট্রেলিয়া	৩৭	২২	১৫
আমেরিকা	৪৬	২২	২৪
গ্রেট বৃটেন	১৬	৯	৭
ফ্রান্স	৯	৬	৩
ইটালী	২	০	২
স্পেন	২	০	২
বেলজিয়াম	১	০	১
জাপান	১	০	১
মেক্সিকো	১	০	১
ভারতবর্ষ	১	০	১
রুমানিয়া	১	০	১
পঃ জার্মানী	১	০	১

টেনিস খেলায় ব্যক্তিগত আয়

১৯৭০ সালের টেনিস মরসুমের গত তিন মাসে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়রা টেনিস খেলা থেকে কি পরিমাণ আয় করেছেন তার একটি হিসাব-তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকায় ১০ জন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়ের গত তিন মাসের খেলা বাবদ আয়ের হিসাব আছে। তালিকায় আয়ের দিক থেকে শীর্ষস্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব-বিশ্রুত ১নং খেলোয়াড় রড লেভার—যাঁর গত তিনমাসে আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩১,৭০৩ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৯,৮৭,৭৭২ টাকা। রড লেভার চলতি মরসুমে ৮টি সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। তবে তিনি বিশ্বের ১নং উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব পান নি। তালিকায় যে ১০ জনের নাম আছে তাঁদের মধ্যে আছেন অস্ট্রেলিয়ারই ৬ জন খেলোয়াড়।

রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)
—১৩১,৭০৩ ডলার

কেন রোজওয়াল (ঐ) —৮৭,৫৫৭ ডলার

রয় এমার্শন (ঐ) —৭৬,৪৫৫ ডলার

পাঞ্চো গঞ্জালেস (আমেরিকা)—
—৬১,৮৬৯ ডলার

টম ওক্কার (নেদারল্যান্ডস)
—৪৯,১৪০ ডলার

জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া)
—৪৬,২৮০ ডলার

টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া)
—৪৩,২৪৯ ডলার

ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া)
—৩৫,৬৩০ ডলার

রোজার টেলর (বৃটেন)—
—২৫,৫২৬ ডলার

আঁদ্রে জিমেনো (স্পেন)
—২৫,৪০২ ডলার

ইউনিভার্সিয়াড গেমস

গত ২৬শে আগস্ট ইতালীর তুরিন সহরে নবপর্যায়ের ৬ষ্ঠ ইউনিভার্সিয়াড গেমস ওরফে ওয়ার্ল্ড ইউনিভারসিটি গেমসের ১২দিনব্যাপী আসর বসেছে। এই তুরিন সহরেই নবপর্যায়ের প্রথম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের আসর বসেছিল ১৯৫৯ সালে। তারপর একবছর অন্তর আসর বসেছে ১৯৬১ সালে সোফিয়া (বুলগেরিয়া), ১৯৬৩ সালে পোর্টো এ্যালিগ্রী (ব্রেজিল), ১৯৬৫ সালে বুদাপেস্ট (হাঙ্গেরী) এবং ১৯৬৭ সালে টোকিও (জাপান) সহরে। ১৯৬৯ সালে লিসবনে ৬ষ্ঠ ইউনিভার্সিয়াড গেমসের আসর বসার কথা ছিল, কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়।

এই ইউনিভার্সিয়াড গেমসের যথেষ্ট আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে এই কারণে যে, অলিম্পিক স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী অনেকেই যেমন এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন আবার তেমনি এখানের পদক বিজয়ীরা পরবর্তীকালে অলিম্পিক পদক জয় করে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। তাছাড়া এই আসরে বহু বিশ্ব রেকর্ডও ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে। এখানে একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। ১৯৬৭ সালে টোকিও সহরে অনুষ্ঠিত ৫ম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের সাঁতারে ১০টি বিশ্বরেকর্ড ভেঙেগছিল। বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাই শুধু এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের অধিকারী।

আলোচ্য ৬ষ্ঠ ইউনিভার্সিয়াড গেমসে ৬০টি দেশের ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছেন। ক্রীড়াসূচিতে আছে অ্যাথলেটিকস, ভলিবল, বাস্কেটবল, জিমন্যাস্টিকস, টেনিস, সাঁতার, ডাইভিং এবং ওয়াটার পোলো। টোকিওতে ১৯৬৭ ওয়াটার পোলো। টোকিওতে ১৯৬৭ সালের গেমসে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ১৬টি। এত কম সংখ্যা হওয়ার কারণ উত্তর কোরিয়ার নাম বিকৃত করা নিয়ে জাপ সরকারের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার বাদ-প্রতিবাদ চলে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি আটটি সাম্যবাদী দেশ টোকিওর ৫ম ইউনিভার্সিয়াড গেমস থেকে শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

আলোচ্য বছরের ইউনিভার্সিয়াড গেমসে ভারতবর্ষ এই তিনটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছে—অ্যাথলেটিকস, ভলিবল এবং টেনিস। ভারতের প্রতিনিধি সংখ্যা ২৩ জন (অ্যাথলেটিকসে ৭, ভলিবলে ১২ এবং টেনিসে ৪ জন)।

ইতিমধ্যে চারদিনের সন্তরণ প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মোট অনুষ্ঠান ছিল ২২টি। স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে এই তিনটি দেশ—আমেরিকা ১৮টি, রাশিয়া ৩টি এবং যুগোশ্লাভিয়া ১টি। পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে আমেরিকা (স্বর্ণ ১৮, রৌপ্য ১১ ও ব্রোঞ্জ ৬) এবং দ্বিতীয় স্থান রাশিয়া (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৪)। আমেরিকা পাঁচটি রিলে অনুষ্ঠানেই স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে।

সাঁতারে ব্যক্তিগত সাফল্য

আমেরিকার দুই সাঁতারু— রিক কোলেলা এবং তাঁর বোন কুমারী লিন কোলেলা মোট ৬টি পদক জয়ী হয়েছেন—স্বর্ণ ৫টি (এর মধ্যে রিলেতে ২টি) এবং রৌপ্য ১টি।

রাশিয়ার এক সন্তানের জননী শ্রীমতী গিনা স্টেপানোভা ২টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

দুটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন আমেরিকার এই তিনজন সাঁতারু—১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে জন ফেরিস, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে অ্যান্ডি স্ট্রেঙ্ক এবং ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে মিচ আইভে।

অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স

আগামী ১৯৭১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ক্রিকেট সফরের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে। ইতিপূর্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল দু'বার ওয়েস্ট ইন্ডিজে সফর করেছে (১৯৫২-৫৩ ও ১৯৬১-৬২)। সুতরাং ১৯৭১ সালের সফর হবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তৃতীয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ১৯৫২-৫৩ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে চারটি খেলা ড্র যায় এবং একটি খেলায় ভারতবর্ষ পরাজিত হয়। ১৯৬১-৬২ সালের সফরে ভারতবর্ষ পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছিল। ভারতবর্ষ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে এ পর্যন্ত যে ২৩টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১২ এবং খেলা ড্র ১১। ভারতবর্ষ কোন টেস্ট খেলায় জয়ী হয়নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে গারফিল্ড সোবার্সকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত করেছেন। সদ্য সমাপ্ত ইংল্যান্ড বনাম বিশ্ব একাদশ দলের টেস্ট সিরিজে গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে বিশ্ব একাদশ দল ৪—১ খেলায় 'রাবার' জয়ী হয়েছে। গারফিল্ড সোবার্স একজন বিশ্ব-বিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং দক্ষ অধিনায়ক। তিনি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 'অল-রাউন্ডার'। ১৯৬৫ সালে স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের অবসর গ্রহণের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দল গ্যারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলছে। সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল এ পর্যন্ত যে ২৯টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে তার ফলাফল : ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ৯, হার ৯ এবং খেলা ড্র ১১। সোবার্সের নেতৃত্ব গ্রহণের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়—১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২-১ খেলায় (ড্র ২), ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-১ খেলায় (ড্র ১) এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২-০ খেলায় (ড্র ১)। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ উপর্যুপরি দুটি টেস্ট সিরিজে পরাজয় বরণ করে—১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডের কাছে ০—১ খেলায় (ড্র ৪) এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৩ খেলায় (ড্র ১)। ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ খেলায় (ড্র ১) টেস্ট সিরিজ ড্র করে পুনরায় ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের কাছে ০—২ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত হয়। ইংল্যান্ড বনাম বিশ্ব একাদশ দলের টেস্ট সিরিজ ধরে গারফিল্ড সোবার্স এপর্যন্ত ৮১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন (উপর্যুপরি)। এই ৮১টি খেলায় তাঁর মোট রান দাঁড়িয়েছে ৭৩৬৪ (এর মধ্যে বিশ্ব একাদশের খেলায় ৫৮৮ রান) এবং মোট উইকেট ৭১২৯ রানে ২১৬টি (এর মধ্যে বিশ্ব একাদশের খেলায় ৪৫২ রানে ২১টি উইকেট)।

সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড

সম্প্রতি আমেরিকার জাতীয় অপেশাদার সন্তরণ প্রতিযোগিতায় একাধিক নতুন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। তিনটি করে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন—পুরুষ বিভাগে গ্যারী হল এবং মহিলা বিভাগে কুমারী সুশী অ্যাটউড। ১৮ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র গ্যারী হল সর্বাধিক তিনটি বিষয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করার গৌরব লাভ করেছেন। গ্যারী হলের নতুন বিশ্ব রেকর্ড : ২০০ মিটার বাটারফ্লাই (সময় ২ মিঃ ০৫.০১ সেঃ), ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে (সময় ২ মিঃ ৯.৪৮ সেঃ) এবং ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে (সময় ৪ মিঃ ৩১-০৩ সেঃ)। শেষের দুটি অনুষ্ঠানে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গেছেন।

বড়দলৈ ফুটবল ট্রফি

গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত বড়দলৈ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং দল ৩-০ গোলে কলকাতারই খিদিরপুর ক্লাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার বড়দলৈ ট্রফি জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত ছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

পরিবারের সকলকে
সবল ও সুস্থ রাখতে
ফসফোমিন
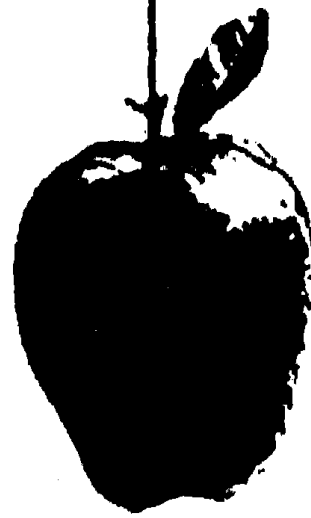
ফসফোমিন
• শরীরে শক্তি যোগায়
• ক্ষিদে বাড়ায়
• কাজ করার ক্ষমতা যোগায়
• সহজে রোগে কাবু হ'তে দেয়না।

SQUIBB
Phosformin
VITAMINS ELIXIR
There's health in Phosformin for all the family

ফসফোমিন—
ফলের গন্ধে ভরা সবুজ
রং'এর ভিটামিন টনিক।
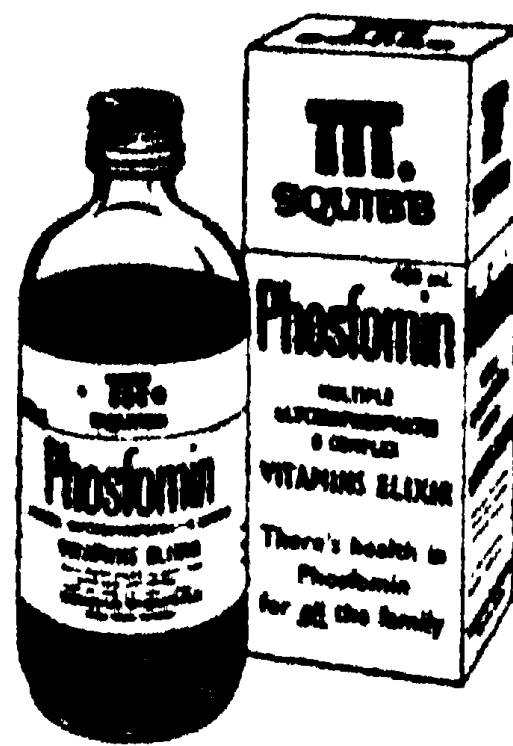
SQUIBB • TTT •
SARABHAI CHEMICALS

• ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিনিধি করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড।

shilpi HPMA-35A/70 Ben

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধাবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৩ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 9th Oct., 1970 শুক্রবার, ২২শে আশ্বিন, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীবাদল ভট্টাচার্য

চিঠিপত্র

মুখের মেলা

শ্রীআবদুল জব্বার, যাকে বলে একজন মৌলিক লেখক। তাঁর বিষয়-নির্বাচন, রচনাশৈলী, আলেখ্যের প্রস্তুতি, সমাপ্তি সবই অভিনব এবং চমকপ্রদ। শহরের ইঁট-কাঠের অপ্রশস্ত খাঁচায় পোরা মানুষগুলো ক্রমশঃই আড়াল-অন্তরালের মনোভাব আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। অপরপক্ষে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে লালিত গ্রাম্য মানুষজনের অকপট অভিব্যক্তির ভাষাই আলাদা। শ্রীজব্বার শক্তিমান সংস্কারমুক্ত লেখক সন্দেহ নেই—তাঁর কলমে আদিম প্রকৃতির মতই অযথা ভাবাবেগের আড়াল নেই।

একটি শুধু অনুরোধ তাঁর কাছে। চরিত্র-চিত্রণের সময়ে কোন একটি বিশেষ রসের উপর তাঁর পক্ষপাত যেন বেশী বলে মনে হয়, মানুষের একটি বিশেষ দুর্বলতার উপরই যেন ঝোঁকটা বেশী তাঁর। কিন্তু একটি পুরুষ একই সঙ্গে প্রেমিক, স্বামী, ভাই, ছেলে, দাদা, বাবা সবই তো হতে পারে। যেমন একটি নারী কারো স্ত্রী, কারো মা, কারো বা মেয়ে, বৌদি ইত্যাদি। গ্রাম-বাংলার পশ্চাদপটে মানুষের জীবনের আরও নানা ধরনের অন্তরঙ্গ রসের অবতারণা করতে পারলে শ্রীআবদুল জব্বার পাঠকের আরও বেশী সমাদর পাবেন মনে হয়। শরৎচন্দ্রের লেখায় মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের পরিশীলিত বিবরণ আমাদের এখনও মুগ্ধ করে। আবদুল জব্বার বরং নদী-জল-ধুলো-মাটির খুব কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর স্নেহ-ভালবাসা, ভক্তি-কর্তব্য ইত্যাদি নানাবিধ মানসিক বৃত্তির অকৃত্রিম আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনুন।

উষা মুখোপাধ্যায়
কোথাপেট, গুণ্টুর (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

তুষার ভেজা রাত প্রসঙ্গে

আমি জনপ্রিয় 'অমৃত' পত্রিকার একজন অনুরাগী পাঠিকা। অধীর আগ্রহের সঙ্গে 'অমৃত' পত্রিকাটি পড়ি, এবং আশাতীত আনন্দ পাই। এই পত্রিকাটির সর্বাঙ্গীন সুপরিচ্ছন্নতা আমাকে মুগ্ধ করে। প্রতিভাময়ী লেখিকা পারিজাত মজুমদারের 'তুষার-ভেজা রাত' পড়ে আমি এত বেশী মুগ্ধ হয়েছি যে, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ শুভেচ্ছা না জানিয়ে পারছি না। 'তুষার-ভেজা রাত' এই গল্পটি বাস্তবকে এত বেশী স্পর্শ করেছে যে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় ইন্দ্রজিৎ, দেবব্রত, এঞ্জেলা ও সোনালী এরা সবাই রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমি তাদের ব্যথা, বেদনা, আনন্দ সব অনুভব করছি। আশা করবো সম্পাদক মহাশয় এই ধরনের বাস্তবস্পর্শী বলিষ্ঠ, মননশীল গল্প প্রকাশ করে আমাদের আনন্দ দান করবেন।

দীপ্তি ঘোষ,
বেহালা, কলিকাতা-৩৪

মনের কথা

সুদর্শন ও কল্যাণীর মানসিকতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীযুক্ত মনোবিদ বলেছেন, আশৈশব পরিচিত লোকের সঙ্গে রোম্যান্টিক প্রেম জন্মাতে পারে না। সেই সূত্রে তিনি সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের মতামত উদ্ধার করে জানিয়েছেন, 'ছেলেবেলা থেকে পরস্পরকে জানে এমন স্ত্রী-পুরুষ কদাচিৎ বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।'

মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার আলোচনা ও অধ্যয়ন খুবই কম। তবে খুব বেশী পরিচিত থাকলে বিবাহবন্ধন সম্ভব নয়—এমন একটা কথা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমাদের দেশেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধে বাপ-মা ওদের খুব কম বয়সেই বাক্যদানে আবদ্ধ হতেন। এই সূত্রে অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিচয় স্থাপিত হত এবং সেই বাক্যদান অনুযায়ী বিবাহও হত। অথচ এই সমস্ত বিবাহই যে বিফল হয়ে যেত তা নয়। তাছাড়া মুসলমান সমাজে খুড়তুতো, মামাতুতো, মাসতুতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ হয় এবং যাদের বিবাহ হয়, তাদের অনেকেই আশৈশব পরস্পরের পরিচিত। অথচ এ-কথা বলা যেতে পারে না যে, এই সমস্ত বিবাহই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই আমার ধারণা আশৈশব পরিচিতি বিবাহবন্ধনে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে না। হিন্দুসমাজে পূর্বে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল তাতেও আশৈশব পরিচয়সম্বন্ধীয় এই কথাটাই বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়। অবশ্য আমি পূর্বেই বলেছি যে, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না, এবং সেইজন্যে আমার বিশেষ অনুরোধ শ্রীযুক্ত মনোবিদ এই সম্পর্কে দয়া করে আরো স্পষ্টভাবে কিছু আলোচনা করবেন।

সুধাংশুশেখর রায়,
ভদ্রক।

উড়োপাখির ছায়া

গত অমৃতের ২১ সংখ্যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'উড়ো পাখির ছায়া' গল্পটি পড়লাম। সৈয়দসাহেব আধুনিক গল্প-উপন্যাসে একজন বলিষ্ঠ লেখক। তাঁর লেখা গল্প খানিকটা ফিচারধর্মী, যার স্বাদ এ-গল্পটিতেও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বহু হিজলকন্যের দেখা মেলে কিন্তু তাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কথাবার্তা এবং মানসিক দিক নিয়ে আলোচনা খুব অল্প সংখ্যক লেখকই তুলে ধরেছেন। গল্পটি আমার ভাল লেগেছে। সেজন্য লেখককে অভিনন্দন জানাই।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় লেখকের কাছে সামান্য নিবেদন আছে। আমার মনে হয় গল্পটির শেষাংশ অর্থাৎ উপসংহারের শেষ প্যারাটি সংযোজিত না করতেন, তাহলে গল্পটির আকর্ষণ আরও দীর্ঘ হত। শুধু তাই নয়, শেষাংশের উপরিউক্ত প্যারা 'চোখ ছলছল করে ওঠে। ভারি হয়ে যায় মনটা। ক্লান্তি লাগে। উড়োপাখির ছায়া কতবার হয়তো আসবে-যাবে এমনি করে গায়ের ওপর। ধরে রাখা যাবে না। চেনাও যাবে না—কোন্ পাখিটা গো?'—পর্যন্ত ইতি থাকলে 'উড়োপাখির ছায়া' নামকরণ যথাযথ হত।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
কলিকাতা—১৩

চিঠিপত্র

পোড়ামাটির অপূর্ব নিদর্শন দেখতে আটপুর চলুন

আমি আঁটপুর মিত্র পরিবারের একজন। বার্ধক্য ও বার্ধক্যজনিত নানা ব্যাধি বশতঃ আজ ৪।৫ বৎসর আমি আঁটপুরে যেতে পারি নি, কিন্তু আঁটপুরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সেখানে আমার বাড়ী বাগান ও কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে।

গত ১লা আশ্বিনের 'অমৃতে'তে উপরোক্ত শীর্ষক প্রবন্ধ পড়লাম। মনে হল কয়েকটি লেখার মধ্যে ভুল আছে এবং কয়েকটি দেখার জিনিষ লেখা হয় নি।

ভুল : (১) স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর মামার বাড়ীতে (মিত্র বাড়ীতে) জন্ম গ্রহণ করেন ঐ ভিটার ওপর রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ মন্দির স্থাপিত। সেটি একটি ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত। স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় শান্তিরাম ঘোষের জামাতা শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু (অবসর প্রাপ্ত আই. সি এস) এর সভাপতি এবং আমি সম্পাদক। স্বামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় তুলসীরাম ঘোষের এক পৌত্র শ্রীশঙ্কররাম ঘোষ স্বামী প্রেমানন্দের বাড়ীতে বাস করেন।

(২) স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার মিত্র রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন।

দেখার জিনিষ লেখা হয় নি :

(১) আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরের সামনে এক বিরাট বকুল গাছ আছে। তার বয়স প্রায় ১০০ বৎসর। তাতে এখনও নিয়মিত ফুল ফোটে। তলদেশ ইট ও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো; পথিকদের বিশ্রামস্থান। তার নিকটেই গদাধরের (পরে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব) পদধূলি মথিত স্থান। ঐস্থানে একটি প্রস্তর ফলক পোঁতা আছে। এটিও দ্রষ্টব্য স্থান।

(২) আঁটপুরের নিকটবর্তী আনরবাটী গ্রামে শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের দ্বাদশ পাটের এক পাট আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব যখন এই পাটে শ্রীশ্রীপরমেশ্বর ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলেন, তখন এই গ্রাম 'বিশখালি' গ্রাম নামে অভিহিত ছিল। এই পাটের নিকটেই একটি প্রাচীন বকুল গাছ আছে। তলদেশও বাঁধানো। চত্বরটি পূর্ব ও পশ্চিমে লম্বা এবং বেশ বড়। এরই পশ্চিম দিকে শ্রীশ্রীপরমেশ্বর ঠাকুরের সমাধি বেদী আছে। প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমাতে তাঁহার তিরোধান উৎসব হয়। এছাড়া ঝুলন, জন্মাষ্টমী, অন্নকূট, রাস প্রভৃতি উৎসব এখনও হয়। অবশ্য অর্থাভাবে তেমন জাঁকজমক নেই। তবুও বৈষ্ণবপ্রধান স্থান হওয়ায় অনেক বৈষ্ণব ভক্তের সমাগম ঘটে থাকে।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
কলিকাতা—৪

বিজ্ঞানের কথা প্রসঙ্গে

আমি সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এর একজন নিয়মিত পাঠক। গত ২১শে শ্রাবণের অমৃতের 'বিজ্ঞানের কথা' বিভাগে অয়স্কান্তের লেখা 'চাঁদে কি নেই - কি আছে' শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করে খুবই আনন্দিত হলাম। এতে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে, তা অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার মতে তা প্রত্যেকেরই জানা উচিত। বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মনুষ্যবিহীন যান লুনা-১৬ এর সাহায্যে যেভাবে চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে এনেছেন, তা নিঃসন্দেহে চাঞ্চল্যকর এবং বিশ্ববাসীর কৌতূহলোদ্দীপক।

গত ১৮ই ভাদ্রের সংখ্যায় 'শরীর ও মগজ তাজা করবার জন্য ঘুম চাই' শীর্ষক নিবন্ধটি এবং 'ম্যবানার কৃত্রিম জীবন' পাঠ করে বেশ ভালো লাগল। খোরানার এই বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে নতুন দিগন্তের স্বর্ণদ্বার উন্মোচিত করে দেবে।

এই সমস্ত নিবন্ধ প্রকাশের ফলে পাঠক সাধারণ খুবই উপকৃত হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই 'বিজ্ঞানের কথা'র জন্যই প্রতিটি সংখ্যা গভীর উৎসাহ সহকারে পাঠ করি। এখন, সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি বিনীত অনুরোধ এই যে, তিনি যেন ভবিষ্যতে এমন একটি নিবন্ধ প্রকাশে যত্ন এবং চেষ্টা পান যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লম্বা হবার বিভিন্ন প্রণালী বিস্তৃতভাবে আমরা জানতে পারি। বিশেষতঃ প্রণালীগুলি যেন সহজ এবং স্বল্পব্যয়ী হয়। তা হলে আমাদের মতো হতভাগ্য কতকগুলো খর্বকায় মানুষ উপকৃত হতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ মজুমদার
শ্রীদিলীপ আচার্য
মদনপুর, নদীয়া

বইকুণ্ঠের খাতা

আমি আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত অনুরাগী পাঠক, বলতে দ্বিধা নেই আমি যে-কয়টি সাহিত্য-পত্রিকা পড়ি, তার মধ্যে অমৃতের স্থান প্রথম। এর কারণ অমৃতের বৈচিত্র্যময় রচনাসম্ভার। বেশ কিছুদিন ধরে অমৃতে শ্রীগ্রন্থদর্শী রচিত 'বইকুণ্ঠের খাতা' বিভাগে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকারের যে-বিবরণ তাঁদের বিশিষ্ট উপন্যাসের আলোচনাসহ প্রকাশিত হচ্ছে, তা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক শ্রীগ্রন্থদর্শী বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। বিশিষ্ট লেখকদের অনেক উপন্যাস আমি বা আমরা পড়েছি, কিন্তু তাঁরা কিভাবে লেখক হলেন বা লেখায় প্রেরণা পেলেন তা আমাদের মত সাধারণ পাঠকের ক'জন জানেন? শ্রীগ্রন্থদর্শীর মাধ্যমে আমরা লেখকদের মুখ থেকে তা বিশদভাবে না হলেও কিছুটা জানতে পারছি। এই প্রসঙ্গে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে—'সেই আমি সেই তুমি'র লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং 'আলোকপর্ণা'র লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দুটি। উভয় সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি লেখকদ্বয়ের, লেখক-জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাগুলি কি, বা তাঁরা কি ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে বেশী পছন্দ করেন, বা তাঁদের উপন্যাসে বাস্তব সমাজ-জীবনের প্রতিফলন কতখানি থাকে প্রভৃতি। আমি মনে করি কোন লেখককে সঠিকভাবে জানতে হলে, শুধুমাত্র তাঁর কয়েকটি উপন্যাস পড়লেই হয় না, কিসের পটভূমিকায় তিনি ঐ উপন্যাস লিখলেন বা কিভাবে বা কি দেখে ঐগুলি লেখার প্রেরণা পেলেন তা জানার প্রয়োজন আছে। তাই এই ধরনের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং 'অমৃত' সে প্রয়োজন মিটিয়েছে। আমি আশা করব অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থদর্শী আরো অনেক প্রবীণ ও নতুন লেখকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানালে বাধিত হব।

প্রশান্তকুমার দাস, সাহাভড়ং বাজার,
মেদিনীপুর।

শাদা চোখে

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপরেখা কি? এই প্রশ্ন নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনার সময় এসেছে। রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে বামপন্থীরা হয়ত এর একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটি সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রেখে চিহ্নিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রাথমিক স্তরে আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক বলে মনে হলেও দেখা যাচ্ছে এত স্তর থেকে ভিন্ন স্তরে উত্তরণের পথে গণতান্ত্রিক রূপ আর থাকছে না। হয়ত সহিংস মুষ্টিমেয় মানুষের আন্দোলনে পর্যবসিত হচ্ছে, নতুবা দলীয় স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে সর্বজনীনতা হারাচ্ছে। ব্যষ্টি সমষ্টির অশিক্ষিত গার্ডিয়ানরূপে গণতান্ত্রিকতার ধারা বজায় আছে বলে চীৎকার করতে থাকে। ফলে, আন্দোলন অচিরেই স্তিমিত হতে থাকে এবং অবশেষে স্বাভাবিকভাবেই নির্বাপিত হয়ে যায়।

বামপন্থী শিবিরে ভাঙ্গন ধরার ফলে পশ্চিম বাংলায় বস্তুতঃ পক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জমে উঠতে পারছে না বলেই মনে হয়। যে সমস্ত আন্দোলন বর্তমানে বিভিন্ন জোটের জঠরে জন্মলাভ করেছে তা গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করতে পারছে না। বরঞ্চ বিচ্ছিন্নকামী আন্দোলনের সীমারেখার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে মরছে। বামপন্থীরা হয়ত এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে যুক্তির অবতারণার চেষ্টা করবেন। যুক্তি হয়ত কিছু দল-প্রাণ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, কিন্তু সাধারণের মনে আশার আলো জ্বালতে পারবে না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে যে কার্যকলাপ চলছে বস্তুতপক্ষে তা একদল অপরকে কোণঠাসা করার পরিকল্পনা মাত্র। তাই সে আন্দোলন গতিবেগ হারিয়ে ফেলছে। প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে মোকাবিলায় বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রচারের মারফৎ সহধর্মীদের মুখোস খুলবার নামে হেয় করা যায় বটে কিন্তু তাতে আন্দোলনের সার্থক পরিণতি ঘটানো যায় না। আন্দোলনের নামে আন্দোলনকেই হত্যা করা হয়। এই রাজ্যে অতীতে এই কৌশল অনেকবার ব্যর্থ হয়েছে। সে অমাজনীর অবসান ঘটিয়ে যে শুক্লপক্ষের আবির্ভাব হয়েছিল তা আবার কৃষ্ণপক্ষের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেল।

অধুনা বামপন্থীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশী নির্যাতন হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তার স্বার্থকতা কোথায় সেই কথা বিচার করার জন্যই উপরিউক্ত বক্তব্য উপস্থাপিত করা হল। আন্দোলনের উপর পুলিশের অত্যাচার চলছে না, কিম্বা পুলিশের অত্যাচারকে সমর্থন করার জন্য এই উপক্রমণিকা নয়।

সহৃদয় পাঠকরা জানেন দীর্ঘ তের মাস পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট অর্থাৎ সকল বামপন্থীদলের সরকার গদীতে আসীন ছিল। যুক্তফ্রন্টের নীতি ছিল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ নিরপেক্ষ থাকবে। যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে অর্থ এই দাঁড়ায় যে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে', অবশ্য বামপন্থীরা যা বোঝাতে চেয়েছিলেন —পুলিশ পরোক্ষে সাহায্যই করবে। মনে হয় যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে পুলিশ 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের' তত্ত্বগত দিক ও রূপরেখা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর পুলিশ এখন এমন ঝাঁপিয়ে পড়ছে কেন?

অষ্টবামের শরীকরা পুলিশের বি[illegible] যে অভিযোগ আনছেন তার কারণ এইরকম। ফ্রন্টের শাসনকালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধুয়ো তুলে পুলিশকে সমাজবিরোধীদের দমনে পর্যন্ত নিরস্ত থাকতে দেখা যেত। তখন বর্তমানের অষ্টবামের অনেক অংশীদারই প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সে সময় অন্য কেউ কেউ হয়ত চুপ করে থাকতেন, নতুবা বুর্জোয়া সাংবাদিকদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা যে তাঁদের উদ্দিষ্ট পথে সঠিক পদচারণা করছেন সেকথা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। এক মাঘে যে শীত যায় না এই নিষ্ঠুর সত্যটি উপলব্ধি তখন করেন নি। কাজেই তাঁরই উপ্ত বিষবৃক্ষের বীজ তখন অঙ্কুরিত হয়ে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে মহীরুহে পরিণত হচ্ছে বলেই মনে হয়। তাই পুলিশও এখন কোনটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর কোনটা তা নয়, তার তত্ত্বগত চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস

আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিকভাবে বেরোবে
বিচিত্র স্বাদের উপন্যাস

তুলসী-চরিত

লিখেছেন

ননীমাধব চৌধুরী

এই ধরনের গদ্যরচনা ইদানিং কালে বিশেষ চোখে পড়ে না। সবুজপত্রের অওতায় প্রমথ চৌধুরী যে স্বতন্ত্র গদ্যরীতির প্রচলন করেছিলেন, এই রচনায় তারই স্বাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ননীমাধব চৌধুরী এক সময় ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর অন্তরঙ্গ এবং সবুজপত্র গোষ্ঠীর মনুষ। সেকালে মূল ফরাসী থেকে রাষ্ট্রদর্শনের দুরূহ গ্রন্থ রুশোর কন্ত্রা সোসিয়াল (সামাজিক চুক্তি) অনুবাদ করে গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছেন সাহিত্য আকাদমি। শ্রীচৌধুরীর 'ভারতবর্ষের অধিবাসী-পরিচয়' বইটি ১৯৭০ সালের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছে।

দেশে বিদেশে

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাৎ-এর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন। মিঃ কোসিগিন নাসেরের শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে কায়রো গিয়েছিলেন।

নাসেরের বিদায়

নাসেরের আকস্মিক, অকাল বিদায় সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এক অতি বেদনাদায়ক ঘটনা। আরব ভূমির আকাশে তাঁর আবির্ভাব যেমন ধূমকেতুর মতো তেমনি তাঁর প্রায় দুই দশকের শাসনকাল বহু ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত। ১৯৫২ সালে ফারুকের দুর্নীতিময় শাসন থেকে মিশরকে মুক্ত করে শুধু স্বদেশে নয়, সমগ্র আরব জগতে তিনি যে জনচেতনা জাগ্রত করে তোলেন, তার বিশাল ঢেউ আর ভূমির রাজ্যের পর রাজ্যে নতুন জীবনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। ১৯৫২ সালে মিশরে সমরনায়কদের যে অভ্যুত্থানের ফলে ইংরাজের সমর্থনপুষ্ট রাজা ফারুক সিংহাসন এবং স্বদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন, তার সম্মুখভাগে জেনারেল নেগুইব থাকলেও ফ্রি অফিসার্স মুভমেন্টের নায়ক হিসাবে কর্ণেল গামাল আবদুল নাসেরই ছিলেন তার অন্তরালবর্তী মূল নিয়ন্তা।

এর কিছু পরেই মিশরের শাসনতান্ত্রিক লক্ষ্য নিয়ে নেগুইবের সঙ্গে নাসেরের মতভেদ ঘটলে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে নেগুইব প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন যদিও তিনি প্রেসিডেন্টের পদে থেকে যান। এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন নাসের। এর তিনমাসের মধ্যেই তিনি বৃটেনকে মিশর থেকে সৈন্য অপসারণে বাধ্য করে স্বদেশকে প্রকৃতপক্ষে বৃটেনের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত করেন।

১৯৫৪ সালে নেগুইব মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ নামে সরকার বিরোধী এক গোঁড়া ধর্মীয় দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অপসৃত হলেন এবং নাসের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন যদিও প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য রইল। এরপর ১৯৫৬ সালে মিশরে যে নির্বাচন হলো তাতে তিনি সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

পর বছরই নাসের সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করে বৃটেন ও ফ্রান্সের মর্যাদার ওপর চরম আঘাত হানলেন। বৃটেন, ফ্রান্স ও ইস্রায়েল এরপর একযোগে মিশর আক্রমণ করলে মিশরীবাহিনী গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই সময়ে সোভিয়েট রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপই মিশরকে গুরুতর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। সুয়েজ জাতীয়করণ নাসেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অচিন্তাপূর্ব মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। নাসেরের সমগ্র শাসনকাল এক অমিত মনোবল, দৃপ্ত মর্যাদাবোধ দ্বারা চিহ্নিত। মিশর থেকে বৃটিশ সৈন্য বিতাড়ন সুয়েজ জাতীয়করণ, আমেরিকার পরিবর্তে সোভিয়েটের সাহায্য নিয়ে আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ—তার জীবনের বহু ঘটনাই আরব জগতে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি যে নিখিল আরব ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা যদিও নানারকম স্বার্থদ্বন্দ্বের জন্য সফল হয়নি তবু যে ঐক্যের বাণী তিনি বহন করে এনেছিলেন তা একেবারে নিস্ফলও হয়নি।

জোটনিরপেক্ষতার নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তিনি নেহরু ও টিটোর সঙ্গে সহযোগিতা করে বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে এক শান্তিকামী তৃতীয় শিবিরের অন্যতম স্রষ্টারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্ব পশ্চিম—উভয় শিবিরের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ যখন প্রায় লড়াইর কিনারায় পৌঁছেছে তখন এই তৃতীয় শিবির বিশ্বে শান্তিরক্ষায় কম সহায়ক হয়নি। '৬৭ সালে ইস্রায়েলের সঙ্গে ৬ দিনের লড়াইয়ে মিশরের সামরিক মর্যাদা ও রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা দুইই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। সেই জাতীয় অবমাননার জন্য সমগ্র দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে নাসের পদত্যাগ করেছিলেন। তবু মিশরবাসীর অবিচল আস্থা পদত্যাগের পরও তাঁকে আবার রাষ্ট্রপতির আসনে ফিরিয়ে এনেছিল।

কিছুদিন পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য মার্কিন সরকার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল তাতে সম্মতি জানিয়ে নাসের সম্ভবত ইস্রায়েলের সঙ্গে শান্তির পথের সন্ধানে নেমেছিলেন। জর্ডান ও আরব গেরিলাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হলেও নাসেরের সেই কর্মভার অসমাপ্ত রয়ে গেছে। মহানায়কের আবির্ভাব যেমন দীপ্তির বাহক তেমনি তিরোভাবের পিছনেও ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। আরব জগতকে হয়তো সেই অন্ধকারের মধ্যে নূতন করে আবার পথের সন্ধান করতে হবে।

*

উত্তরপ্রদেশের নাটকের চূড়ান্ত পর্বে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘোষণায় রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একজন বিশেষ দূত সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত কিয়েভে যান এবং স্বাক্ষরের পর পুনরায় শুক্রবার সকালে দিল্লীতে ফিরে আসেন। এর পরই ঘোষণা জারী করা হয়। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা অবশ্য ভেঙে দেওয়া হয়নি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছে।

এর আগের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে এই: চরণ সিং শাসক কংগ্রেস দলীয় যে ২৬ জন মন্ত্রীকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণের

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি বুলগেরিয়া সফরকালে একটি শিশুকে আদর করছেন।

জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল তা আংশিক মেনে নিয়ে তাঁদের মধ্যে ১৩ জনকে দায়িত্বচ্যুত করে তাঁদের কর্মভার মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন, কিন্তু বাকী ১৩ জন সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। এর পরই তিনি এক আদেশে চরণ সিংকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে বলেন। আদেশের পিছনে রাজ্যপালের যুক্তি এই যে, চরণ সিং এবং শাসক কংগ্রেস দলীয় নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠীর কাছ থেকে তিনি যে যে সব চিঠিপত্র পেয়েছেন তাতে দেখা যায় যে বর্তমানে কোয়ালিশনের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। শাসক কংগ্রেসই ছিল কোয়ালিশনের বড় শরিক। এ অবস্থায় চরণ সিংএর পদত্যাগই কর্তব্য।

রাজ্যপাল এই নির্দেশ দেওয়ার আগে ভারতের অ্যাটর্ণি জেনারেলের অভিমতও গ্রহণ করেছেন। অ্যাটর্ণি জেনারেলের মতে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী কোয়ালিশন ভেঙে যাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা কর্তব্য। চরণ সিং অবশ্য রাজ্যপালের আদেশ মেনে নেন নি। তার বদলে তিনি আদেশকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিহিত করে তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ

পুজাবকাশের জন্য ১৬।১০।৭০ তারিখের অমৃত বেরোবে না।

করেছেন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। চরণ সিংর-এর দাবী যে কোয়ালিশন ভাঙার পর তিনি সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র দলের সমর্থন লাভ করায় বিধানসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুন্ন হয়নি এবং ৬ই অক্টোবর অথবা তার পূর্বেই সভায় তিনি শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছেন। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজ্যপালের আদেশের বৈধতা সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তাও তিনি তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন।

এই অবস্থায় রাজ্যপালের সামনে দুটি পথ ছিল—প্রথম চরণ সিংকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করা। দ্বিতীয়—মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা। রাজ্যপাল দ্বিতীয় পন্থাই অনুসরণ করেছেন। সুপারিশের পিছনে তাঁর যুক্তি সম্ভবত এই যে সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সমর্থন সত্ত্বেও বিধানসভায় চরণ সিংএর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ নন। দ্বিতীয়ত গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও চরণ সিং রাজ্যে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন কি না সেবিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ গত তিন বছরে দুবার কোয়ালিশনভুক্ত দলগুলের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রপতি বর্তমানে মস্কো ও পূর্ব ইউরোপ সফরে গেছেন। তিনি যাতে নিজে সমগ্র অবস্থা অনুধাবন করার আগে কোনো নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর না করেন তজ্জন্য চরণ সিং ছাড়াও সংগঠন কংগ্রেস জনসংঘ ও স্বতন্ত্রের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে তার পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যপালের রিপোর্ট অ্যাটর্ণি জেনারেলের অভিমত এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশও তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল। এই অব[illegible]র সিদ্ধান্ত তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

কেরলে নতুন মন্ত্রিসভা

কেরলে শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে সি পি আইর নেতৃত্বে যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হতে চলেছে তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ ৪ঠা অকটোবর। মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিসভায় সদস্য থাকবেন বর্তমানে ন'জন। এ'রা হচ্ছেন : অচ্যুত মেনন, এন ই বলরাম, পি এস শ্রীনিবাসন ও পি কে রাঘবন (সি পি আই) সি এইচ মহম্মদ কয়া ও কে আবদু কাদের কুট্টি নাহা (মুসলিম লীগ), টি কে দিবাকরণ ও বেবি জন (আর এস পি) এবং এন কে বালকৃষ্ণ (পি এস পি)। নামের তালিকা রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে।

১-১০-৭০

সম্পাদকীয়

বাঙালীর শারদোৎসব

দুর্গোৎসবই বাঙালীর শারদোৎসব। বাঙালীর মনে যে স্নেহকাতরতা আছে শরতকালের উমার আগমনী গানে তারই স্পর্শ আমরা পাই। দুর্গোৎসবের এই রীতি বাংলার নিজস্ব। দেবী দুর্গার দশপ্রহরণ-ধারিণী মূর্তিকেই শুধু বাঙালী মানস ধ্যানে প্রত্যক্ষ করে নি। তার সঙ্গে মাতা দুর্গার পারিবারিক রূপটিকে বাস্তবায়িত করে বাঙালী তার মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছে। মাতা দুর্গার সঙ্গে তার সন্তানসন্ততিরা একসঙ্গে ভক্ত বাঙালীর পূজা পান। তিনি একাধারে শক্তি ও মমতার প্রতিমা। এই ভাবমূর্তি বাংলার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাকে দিয়েছে এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে আমরা পেয়েছি অপূর্ব উৎসব-আলেখ্য কমলাকান্তের দুর্গোৎসব। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনার রূপটি দেবী দুর্গার। যখন দেশ ছিল পরশাসন পীড়িত, অভাব ও দারিদ্র্যে জর্জরিত তখন বঙ্কিমচন্দ্রের মানসনয়নে যে দুর্গতিবিনাশিনীর প্রতিমা উদিত হয়েছিল তিনি দেবী দুর্গা। বাঙালীর কাছে তিনি মাতা, তিনি শক্তি, তিনি সকল দুঃখবিনাশকারিণী।

আজ এই উৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। শরতের আকাশে যখন শাদা মেঘের আনাগোনা সুরু হয়, ভোরের শিশিরে তৃণদল হয়ে ওঠে সিক্ত, বাংলার নরম মাটির রসে সিঞ্চিত শিউলি গাছে ফুল ফোটা সুরু হয় তখনি মন বলে, আগমনীর সময় উপস্থিত। এই আগমনীকে বাঙালীর মন নিজের কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে এক অনুপম মানবীয় মাধুর্য দান করেছে যার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

এই আগমনীর রূপকল্পনার সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালীই শৈশব থেকে সুপরিচিত। সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থীরা এই সময়ে আগমনীর গান গেয়ে আমাদের মনে এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করেছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি রায় প্রমুখ ভক্ত কবির দল বাংলার শাক্ত পদাবলীর যে অতুলনীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন তা উমাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও, কে না জানে, এ হল বাঙালীর নিজের জীবনধারারই এক প্রতিরূপ। কবি দাশরথি রায় যখন বলেন :

> গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
> ঐ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী।
> লয়ে যুগল শিশু কোলে, 'মা কৈ' 'মা কৈ' বলে
> ডাকছে মা তোর শশধরবদনী।

তখন এই কবিতার মধ্যে আমরা যে ছবিটি পাই তার সঙ্গে আমাদের নিজেদের পরিবারের স্নেহাতুর মায়ের ছবি মিলিয়ে নিতে কোনো কষ্ট হয় না। বাংলার দুর্গোৎসবের চিত্র তাই একান্ত মানবিক। এই কারণেই তার আবেদন সকলের কাছে।

বৎসরের এই সময়টিতে আনন্দময়ীকেই বন্দনা করা হয়। যেখানে যত বাঙালী আছেন তাঁরা এই উৎসবের দিনটির জন্য কতো আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকেন। প্রবাসী যাঁরা এই সময়ে তাঁরা ঘরে ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুল হন। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার এই তো শুভ মুহূর্ত। দূর প্রবাসী যাঁরা, সাগর পারে যাঁরা থাকেন, তাঁরাও আজকাল এই উৎসবের আয়োজন করেন। আমরা আজ লন্ডন, নূয়র্ক, কানাডাতেও প্রবাসী বাঙালীর দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানের খবর পাই। এই উৎসব উপলক্ষে সকলের মধ্যে হয় প্রীতি বিনিময়। এখানেই উৎসবের সার্থকতা।

বাংলাদেশে এবার অনেক দুর্যোগের মধ্যে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্লাবনে এবার বাংলার বহু অঞ্চল গেছে ভেসে। মানুষ হয়েছে গৃহহীন, আশ্রয়হারা, নিঃসম্বল। উৎসবের দিনে সর্বাগ্রে আমরা যেন তাদের কথা স্মরণ করি। মানবিকতাবোধই এই উৎসবের মর্মবাণী। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে উচ্চ নীচ, ধনী বিত্তহীন সকলের হয় মিলন। দুর্গোৎসব ব্যয়সাধ্য বলে সাধারণ মানুষ একা এই অনুষ্ঠান করতে পারে না। কিন্তু সেজন্য তার আনন্দের ভাগ নিতে বাধা নেই। সর্বত্রই মানুষের উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেবার দুয়ার উন্মুক্ত। শহরে ও অন্যত্র আজকাল সর্বজনীন অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে এই উৎসবকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার জন্যই। সকলের সহযোগিতায় এই উৎসব পূর্ণাঙ্গ। সকলেরই এতে অবাধ আমন্ত্রণ।

আমরা আশা করব, এই উৎসবের আবেদন বাঙালীর জীবনে ব্যর্থ হবে না। যে মানবিকতায় এই উৎসব উদ্বুদ্ধ তাকে অনুসরণ করে, উপলব্ধি করে বাংলাদেশের মানুষ জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ করে তুলবে। নানা বিরোধ, বিদ্বেষে আজকের জীবন জর্জরিত। বহু দুঃখ ও বেদনার আঘাতে আমাদের জীবনের প্রসন্নতা হয়ে গেছে বিবর্ণ ও রিক্ত। তাকে যেন আমরা এই উৎসবে আবার ফিরে পাই। আমরা যেন সকলের সঙ্গে প্রার্থনায় মিলিত হয়ে বলতে পারি, 'ভয় হতে তব অভয়-মাঝে নূতন জনম দাও হে।'

কেউ হাতে হাত রাখে।।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে কেউ হাতে হাত রাখে
অন্ধকার ঘরে, তার মুখ
দেখা যায় না; শতাব্দীর ঘনতমসাকে
মুখোশে রেখেছে তার। সে কি ভাবে সুখ

ট্রানসিটার-এ, হিলম্যান-এ, অথবা অস্টিনে
একক অথবা দ্বৈতে, কিংবা প্লেনে দূরের পাড়িতে,
নাকি জাহাজপ্যাটার্ন নিজের ছিমছাম বাড়িতে
কলহাস্যে, বিলিয়ার্ড-এ? যদি বর্ষাদিনে

নিরাশ্রয় গাছতলায়, মাঠে, ঘাটে ভিজে,
শীতে, গ্রীষ্মে—জীবনের শেষ প্রশ্নটিকে অনুচ্চার
রেখে, সত্য-অন্বেষায় সময়ের রাশ ধরতে হয়, নিজে
রিক্ততায় ডুবতে হয়, জীবনকে মৃত্যু থেকে আবিষ্কার

করা যাবে? হিংসা, ঈর্ষা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, ঘৃণা
ছাপিয়ে কী? আদম ইভের মনে কী ছিল জানি না;
জানি, অন্ধকারে তার মায়াময় স্বর অতি দূরে
দেশ কাল সমাজের অন্তরঙ্গতায় নিতে চায়।।

স্মৃতি পিপীলিকা।।

কাজল ঘোষ

যে কোন নির্দেশেই
বাম হাতের তালুতে
ছাপ রাখতে পারি ব্যাভিচারের।
অনেকদিনের পরে এ কথা ভাবতে
যখন কান্না পাবে,
যখন সব কিছু পেয়েও মনে হবে
বড় একা বড় নিঃসঙ্গ—
সে সময়ে ভিজে ঘাসে
লেখা থাকবে নাম।
ট্রামে বসে নিয়ন আলোর তলা
দিয়ে যেতে যেতে
মনে আঘাত করবে স্মৃতি'
এমনদিন আপনার জীবনেও এসেছিল!
একে এড়িয়ে চলা যায় না
একে এড়িয়ে থাকা চলে না।।

ধারণা যখন অস্পষ্ট থাকে।।

অমল ভৌমিক

ধারণা যখন অস্পষ্ট থাকে
বাঁকে-বাঁকে
নতুন সঙ্কল্প।

অল্প অল্প
হারানো প্রতিশ্রুতি
অনেকদিন
অর্থহীন
মনে হয়েছিল যা'
দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যাওয়ায়
আজকে সেটাই তাজা।

দু পা পেছনে

শংকর চট্টোপাধ্যায়

কনকলতা খুব মনোযোগ দিয়ে তরকারীর ভাগটা করছিলেন। আজ মাসের সবে দশ তারিখ এর মধ্যেই বাজার থেকে শুধু তরকারী আনতে শুরু করেছেন শম্ভুনাথ। তাহলে এ মাসের মত মাছের পালা শেষ। অথচ বিল্লুটাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা মাছ ছাড়া মুখে গ্রাস ওঠে না ছেলের, সেদিক থেকে ছোট্টুটা বরং ভালো। খাওয়া দাওয়ায় ঝামেলা নেই তেমন। আর রানী মেয়ে তো সংসারের দুঃখ বোঝে। তরকারীর মাপটা হিসেব করতে করতে কনক ভাবছিলেন বিল্লুকে আজ কী দিয়ে ভোলাবেন। ভাঁড়ারে এক দানাও চিনি নেই ওটা থাকলেও না হয় কথা ছিল। বড় রাস্তায় বোমা ফাটার শব্দ হল পরপর কয়েকটা। খুব হৈচৈ হচ্ছে আজ কদিন ধরে। ও ঘরে খুকী পড়ছে। স্কুল ফাইনালে তেমন ভালো করতে পারেনি এবার উঠে পড়ে লেগেছে। মেয়ের আবার সবদিকে চোখ খোলা। বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাড়ার টাইপিং স্কুলেও ভর্তি হয়েছে গত মাসে, মেলাই নাকি চাকরী পাওয়া যায় ওটা শিখলে। সপ্তাহে দুদিন যাচ্ছে সন্ধেবেলা।

কী দিয়ে পেট ভরাবে মানুষজন। কনক চাখ মেলে তরকারীর কাঁসিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই তো রুটি ডাল আর তরকারী এখন থেকে মাসভর এই চলবে। হঠাৎ মনে পড়ল লক্ষ্মীর পটের পেছনে কৌটোয় কয়েক আনা জমানো আছে। একটা ডিম আনতে দিলে কেমন হয়। রাত এখনও বেশী হয়নি, তেওয়ারীর দোকানটা খোলা আছে ঠিকই। কনক উঠে দাঁড়ালেন।

ওঘরে চৌকির উপর বসে শম্ভুনাথের মেজাজটা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। হারুর কথামত পাঁচ হাজার টাকা ঢালতে পারলে মাস গেলে তিনশ আসবে তাহলে তো বছরে গিয়ে দাঁড়াবে ছত্রিশ শ। তিন বছরে সেটা হবে দশ হাজার আটশ মতন। অথচ ঘণ্টা দুয়েক ধরে অনেক ভেবে চিন্তেও হাজার পাঁচেক ধার পাওয়া যাবে এমন একজন মানুষ তিনি খুঁজে বের করতে পারছেন না। কে অত টাকা ধার দেবে তাকে। অথচ হারুতো কথটা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েই খালাস। ফিসফিস শব্দ হতে চোখ বাড়িয়ে দেখলেন নীচের মাদুরে বিল্লু পড়ার নাম করে খাতায় ছবি আঁকছে আর ছোট্টু তাই দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

—গোঁফ আঁকলি না দাদা?

—হাঃ তোমাদের গোঁফ আঁকাচ্ছি আমি।

হুংকার দিয়ে উঠলেন শম্ভুনাথ।

রানী দেখছিল ধাড়ীটা কেমন চুপ করে শুয়ে আছে, সারা গায়ে কোনো সাড় নেই, মরে গেছে যেন, বিড়ালীটা উঁকি দিয়ে তাই দেখছে। বুকের ভেতর ছোটো মতন হাসি উঠছিল। একপা দুপা করে এগিয়ে এলেই মরবে মেয়েটা। যা চকচকে গা ওটার, ধাড়ীটা নির্ঘাৎ টেনে হিঁচড়ে ওর পিঠের ওপর চেপে বসবে। পরশু দিন-ই তো দেখেছিল কলেজ যাবার আগে। ক্লাশের পারুল বলল, পায়রাদেরও নাকি ওরকম। গলিতে দুরদাড় পায়ের শব্দ হচ্ছে, বোমা ফাটল দুটো। রানী চেয়ার ছেড়ে উঠে

জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। লাহাবাবুদের দেওয়ালে পোস্টারটা এখন ঝুলছে, অথচ আজ দুপুরেই লাগিয়েছে। কলেজ থেকে ফেরবার পথে চোখে পড়েছিল। এখন শুধু 'লড়াই করুন' কাৎ হয়ে ঝুলে আছে, কে যেন বাকি অংশটা ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। কত যে পার্টি হয়েছে আজকাল। হাঁকডাক কিন্তু সবার সমান। কলেজে তো মাসভর স্ট্রাইক লেগে আছে।

কনকলতা বারান্দা দিয়ে ঘরে যাবার মুখে শুনলেন ময়লাফেলা গলির মুখের দরজাটায় গুম গুম শব্দ হচ্ছে। শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন খানিক। ভাবলেন, কাউকে ডাকবেন একবার। তারপর তরতর করে নিজেই নেমে কলতলার পাশ দিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বছর কুড়ি একুশের একটা ছেলে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে চাপা গলায় বলে উঠল।

—দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন।

মুখ চোখের চেহারা রক্তশূন্য, চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা মতন, কপাল কেটে রক্ত পড়ছে, পরনে ময়লা লাগা শার্ট প্যান্ট। নীচু হয়ে কনকলতার পা দুটো ধরতে যাচ্ছিল তার আগেই গলিরাস্তায় একটা বোমা ফাটার শব্দ হলে সেই ছেলেটাই ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি দরজার হুড়কোটা লাগিয়ে দিল।

—ওরা আমাকে ধরতে আসছে...বাঁচান আমাকে।

গুছিয়ে কথা বলবার মত অবস্থা নেই, গলায় যেন রাজ্যের পাথর শক্ত হয়ে বসেছে। মরীয়া হয়ে কনকলতার হাতটা ধরে ফেলল সে।

এ পর্যন্ত কোনো কথার উত্তর দেওয়া হয়নি, এবারে শক্ত গোছের কিছু একটা বলার দরকার ভেবে মুখ খুলতে যাবেন কনকলতা দেখলেন পড়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতে দ্রুত বেড় দিয়ে ছেলেটার পিঠের দিকটা জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে রাখলেন।

বোমা ফাটার শব্দটা এখন থেমেছে, হল্লাটা কিন্তু চলেছে সমানে। শীতের সময় বড় খোকার গায়ে খড়ি উঠত, তেল মাখতে চাইত না আর স্নান করানোটা তো ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। ধরতে গেলে লুকিয়ে বসে থাকত চৌকির তলায়। আর কী রোগা ডিগডিগেই না ছিল। শাশুড়ি তখন বেঁচে, জপের মালা হাতে নিলে আর মুখ ফুটে কথা বলতেন না, খোকা গিয়ে তার কোলে চেপে বসত। কোলে বসে কি হাসি তখন জানি শর্করিলাগা কাপড়ে কনকলতা তাকে কোল থেকে টেনে নিতে পারবেন না। সে সব দিনে খোকার গায়ে কেমন একটা টক্ টক্ গন্ধ হত। তা শাশুড়ি গেলেন সে বছরের গোড়ার দিকে খোকা পুজো নাগাদ। দিন দুয়েকের জ্বরেই শেষ বুড়ো সুকুমার ডাক্তারও রোগটা ধরতে পারল না কিছুতে। ছেলেটাকে বুকের কাছে ধরে রেখে অনেকদিন বাদে গাটা কেমন শির শির করে উঠল।

মাথাটা ঘুরে যাচ্ছিল কনকলতার আঙুল দিয়ে কলঘরের লাগোয়া পায়খানাটা দেখিয়ে দিলেন।

—ভেতরে ঢুকে ছিটকিনিটা লাগিয়ে বসে থাকো।

তেমন একটা সাহসী বলে নাম নেই কনকলতার তবু কাজটা শেষ করতে পেরে পায়ে যেন খানিকটা বল পেলেন। হল্লাটা বাড়ছে। যতই ডাকাবুকো হোক গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে হামলা করতে সাহস পাবে না।। যদি তাও করে তবে সামনের ঘরগুলো তো আগে দেখবে? তেমন গন্ডোগোল বুঝলে কনকলতা না হয় কলঘরে বাসনের পাঁজাটা নিয়ে যাবেন।

বারান্দায় পা দিয়ে ভেবেছিলেন রানীর পড়ার আওয়াজ পাবেন। বড় খোকার পর ও। ঘরের ভেতর গলা বাড়িয়ে দেখলেন খুকী জানলায় দাঁড়িয়ে। কীভাবে খবরটা দেবেন ওদের? মাথার ভেতর ঝন্ ঝন্ করে শব্দ উঠছিল। শাশুড়ি বলতেন, বুদ্ধিমতী গৃহিণী থাকলে গৃহস্থের কল্যাণ হয়। কনকলতা মেয়েকে উদ্দেশ্য করে গলা নামিয়ে বললেন।

—তাড়াতাড়ি জানলাগুলো বন্ধ করে এ ঘরে আয়......কথা আছে।

বলেই আর দাঁড়ালেন না চট্‌পট্ সামনের ঘরটায় ঢুকে পরলেন। জাবদা হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে শম্ভুনাথ এখন তক্তোপোষে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। ছেলে দুটো যে যার মত কল্পে পড়ার নাম করে নিঃশব্দে খেলছে। কনকলতার পায়ের শব্দে খোলা বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ল। এ বাড়ির মানুষটা আবার একটু খেয়ালী কখন যে কীসের ভাবে থাকে নিজেই জানে। ঘরে পা দিয়েই এক পলকে ঠিক করে ফেললেন সব। খুকীর সঙ্গে আগে বাচ্চাগুলোকে রান্নাঘরে খেতে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর শম্ভুনাথের কাছে কথাটা ভাঙবেন। কনকলতা দ্রুত পা চালিয়ে আগে খোলা জানালা দুটো এক ঝটকায় বন্ধ করে দিলো। সদর দরজাটাও সেই সঙ্গে দেখে নিতে ভুললেন না। খিলটা তোলা আছে পুরোনো কাঠের খিল চট্ করে ভেঙে ঢুকতে বেগ পেতে হবে। তবু বলা যায় না উপর নীচের ছিটকিনি দুটো দিলেন ভালো করে। বিল্লু ছোট্টু কনকলতাকে তেমন ভয় পায় না, শম্ভুনাথ মুখ তুলতে তারা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কনকলতা মেয়েকে ওদের রাতের খাবার খাইয়ে দিতে বললেন।

মার গলার এমন স্বর আগে কখনও শোনে নি রানী। একটু অবাক হোলো। মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে ভরসা হল না তেমন বিল্লু যেতে চাইছিল না প্রথমে কনকলতা চোখ ঘুরিয়ে তাকাতে গুটি গুটি ছোট্টুর পেছনে গেল।

শম্ভুনাথের বুকের ভেতরটা থমথম করছিল। স্ত্রীর ভাবভঙ্গী দেখে বিছানায় উঠে বসলেন।

—দিন দিন দেশের কী যে হাল হচ্ছে। রোজ মারামারি।

কথাটা ভালো করে শেষ হোলো না দুম্ করে একটা বোমা ফাটল গলিতে। আর কনকলতা চোখে অন্ধকার দেখলেন। হল্লাটা এগুতে এগুতে একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও কথাটা বলা গেল না। মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যাচ্ছিল তার। মরীয়া হয়ে শম্ভুনাথের গা ঘেঁষে তক্তোপোষটার উপর বসে পড়লেন।

—শোনো একটা ছেলে এসে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।......ওকে বাঁচাতে হবে।

—কী...কী নিয়েছে...?

আচমকা নাড়া খেয়ে যেন জেগে উঠলেন শম্ভুনাথ।

—ওদের তাড়া খেয়ে এসে আমাদের বাড়িতে......।

—কাদের তাড়া......কে লুকিয়ে আছে?

দিশেহারার মত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন শম্ভুনাথ। দরজার বাইরে হল্লাটা বাড়ছে। গালের ওপর নিঃশ্বাসের হল্কা লাগছে। হাত বাড়ালেই গলাটা জড়িয়ে ধরা যায়, কপালে চিকচিক করছে ঘামের ফোঁটা।

—ঠিক আমাদের বড় খোকার মত দেখতে......।

কে...... কার মত ...?

বড় খোকার।

পাথরের গলায় যেন কথা বলছেন কনকলতা। দরজায় ঘা পড়ছে, অনেকগুলো মানুষের গলা হল্লা করছে। শম্ভুনাথ তক্তোপোষটা ছেড়ে লাফিয়ে নামলেন। এতক্ষণ তিনি কী সব দুর্বোধ্য সংলাপ শুনছিলেন। মেঝেতে পা রেখে প্রথম কথা বললেন।

—তাহলে।

—ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে।

—ওরা যদি বাড়ি সার্চ করতে চায়?

দরজার খিলটায় হাত রেখে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন শম্ভুনাথ। দরজাটা বুঝি ভেঙে যাবে এত জোরে ঘা দিচ্ছে বাইরে থেকে।

—আমরা বাধা দেবো।

সিমেন্টের গাঁথুনি করা মেঝেতে যেন পা ডুবিয়ে খাড়া দাঁড়িয়েছে কনকলতা। এককালে বাগবাজারের জিমন্যাশিয়ামে নিয়ম করে বক্‌সিং শিখতে যেতেন শম্ভুনাথ। গড়ের মাঠে খেলা দেখে ফেরবার পথে গোরাদের সঙ্গে মারামারি হল মেট্রোর সামনে, সে কী তুমুল হট্টগোল। একাই জনা তিনেকের মহড়া নিয়েছিলেন সেদিন। তারপর তো সপ্তাহ দুই পিসির বাড়িতে চন্দননগরে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হোলো। ফিরে এসে পাড়ায় সে কী খাতির, ঘোষদা স্বয়ং ডেকে পিঠ চাপড়ে দিলেন।

দরজার একটা পাল্লা খুলতেই হুড়মুড় করে জনা দশেক ছোকরা ঘরের ভেতর ঢুকে পরতে যাচ্ছিল, শম্ভুনাথ অন্য পাল্লাটা ডান হাতে ধরে টান হয়ে দাঁড়ালেন।

—কী চাই?

—একটা ছেলে ঢুকেছে আপনাদের বাড়িতে......বের করে দিন তাকে।

কী নিষ্ঠুর কর্কশ সব মুখ শম্ভুনাথের দৃষ্টিটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। গলির রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে, সবগুলো বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। এখন ডাকলে কেউ সাহায্য করতে

আসবে না। টুর্ণামেন্টে প্রথম রাউন্ডে টনির সঙ্গে লড়াই হয়েছিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোকরা। পাড়া ঝেঁটিয়ে একগাদা মেয়ে মদ্দ এসেছিল সে লড়াই দেখতে। ওরা সব শিষ দিচ্ছিল, রুমাল ওড়াচ্ছিল। তা প্রথম রাউন্ডটা ভালোই লড়েছিলেন শম্ভুনাথ। শেষ দিকে দমটা ফুরিয়ে গিয়েছিল।

—কী হল মশাই ....বের করে দিন ঐ কুইসলিংটাকে।

শম্ভুনাথ দ্রুত চিন্তা করছিলেন কী উত্তর দেওয়া যায়। তার আগেই কনকলতা বলে উঠলেন।

—কেউ তো ঢোকে নি আমাদের বাড়িতে।

—কেউ ঢোকে নি মানে.....তাহলে ও যাবে কোথায়।

—কোথায় যাবে তা আমরা কী করে বলব।

—বেশ আপনি দরজা ছেড়ে দিন আমরা খুঁজে দেখি।

দম ফুরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সময়মত ঠিক টের পেয়ে গিয়েছিল টনি। রাউন্ডটা শেষ হবার মুখে মোক্ষম ঘুষিটা ঝাড়ল। ডান ধারের চোয়ালটা প্রায় বেঁকিয়ে দিয়েছিল ঠিকমত গার্ড করতে পারেননি তিনি।

—মগের মুল্লুক পেয়েছো নাকি... ?

নিজের কানদুটোকে প্রায় অবিশ্বাস করলেন শম্ভুনাথ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন কনকলতা কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ঘোমটাটা খসে পড়েছে কাঁচাপাকা চুলের মাঝখান দিয়ে দগদগে লাল সিঁথি, বড় বড় চোখ দুটোয় থরথরে দৃষ্টি। স্ত্রীর এমন চেহারা কোনোকালে দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। শুধু অনুভব করলেন শরীরে যেন সাবেক কালের বল ফিরে এসেছে।

—কী ভেবেছো তোমরা.....গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে হামলা করবে?

শরীরের সমস্ত তেজটাই যেন গলায় উঠে আসছে নিজের গলার স্বরে নিজেই আলোড়িত হলেন শম্ভুনাথ।

—হুমকি দিচ্ছেন.....এখনো বলছি ভাল চান তো দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ান।

শম্ভুনাথ দেখলেন ছেলেটার গলায় মুখে ও হাতে সব শিরা জোঁকের মত ফুলে উঠেছে তার পেছনে সার সার কালো মাথা। গলিরাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। রাস্তার আলোর বাল্বগুলো ভাঙা বলে ঠিক ঠিক করছে অন্ধকার। টনির মার খেয়েই সম্ভবত যতবারই মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন ততবারই প্রচণ্ড কোনো ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেছেন রিং-এর বাইরে। নইলে সব কিছু পাকা হয়ে যাবার পরও অনাদি তাকে ডিঙিয়ে প্রোমোসান পায় কেমন করে? শম্ভুনাথ টের পাচ্ছিলেন, যা আগে কখনও হয়নি একটা ক্ষ্যাপা দমকা রাগ ঘূর্ণি ঝড়ের মত তার শরীরের গভীর থেকে উঠে আসছে।

—যাও......আমার বাড়ির দরজা ছেড়ে সরে যাও বলছি।

আর তখনই গলির মুখে পুলিশ ভ্যান ঢোকার শব্দ হল। ভীড়ের ভেতর চাপা একটা গুঞ্জন উঠল, ওদের কথাগুলো শুনতে পেলেন না শম্ভুনাথ, শুধু দেখলেন ভীড়টা পাতলা হয়ে যাচ্ছে নিমেষে। দরজা আটকে দাঁড়ানো ছেলেটা শুধু নড়েনি তখনো। গাড়ির হেড লাইটের আলোটা ঝাঁঝালো হয়ে লাহাবাবুদের দেওয়ালের গায়ে পড়তে ছেলেটা ঘুরে দাঁড়াল তারপর চাপা ভয়ংকর গলায় বলল।

—আমরা বাড়ির উপর ওয়াচ রাখছি...... ভাববেন না পার পেয়ে যাবেন......ঠিক শোধ নিতে আসব।

আর শম্ভুনাথের হাত পা হঠাৎ ঠাণ্ডা, হালকা হয়ে গেল যেন। পুরো অবস্থাটা এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। কী থেকে কী হোলো কেন হল? কনকলতা এগিয়ে এসে তাকে টেনে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন তারপর ঝটপট দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিলেন।

বিনু, ছোটু আর রানী অনেকক্ষণ দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কনকলতা ওদের যেন ঠিক দেখতে পাচ্ছিলেন না। শম্ভুনাথের হাতটা টেনে ভেতরের বারন্দাটায় নিয়ে গিয়ে মুখ খুললেন।

—ছেলেটাকে নিয়ে এখন কী করব?

এতক্ষণের উত্তেজনার পর শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল আবার গরম হয়ে উঠল।

—কী করবে তা তুমি-ই জানো। সাধ করে গণ্ডগোলটা তো তুমিই বাধালে।

আরও কয়েকটা শক্ত কথা স্ত্রীকে বলবেন ভেবেও মাথায় এলো না কিছু। অদ্ভুত একটা শূন্যতার বোধ আর উত্তেজনায় মাখামাখি হয়ে বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল শম্ভুনাথের। কনকলতা দেখলেন ছেলেমেয়েরা গুটি গুটি ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে সব। সবাই তার দিকে তাকিয়ে। ওদের কাছ থেকে আর কিছুই লুকোনো যাবে না এখন। আড়চোখে কলঘরের দিকটা দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর চাপা গলায় রানীকে বললেন,

—ওঘর থেকে টিনচার আইডিনের শিশি আর একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া নিয়ে আয় তো।

বলতে বলতে তরতরিয়ে নেমে গেলেন চাতালটায় তারপর কলঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে ডাক দিলেন।

—বেরিয়ে এসো......ওরা সব চলে গেছে।

ডাকটা বুঝি ঠিক মত শোনা যায়নি ভেতর থেকে। মিনিট কয়েক পর নিজে থেকেই আবার মাপ মতন গলার স্বরটা তুললেন তিনি।

এবারে খুট্ করে দরজায় শব্দ হল একটা, আর ছেলেটা বেরিয়ে এসে কনকলতার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে, মুখ-চোখের ফ্যাকাসে ভাবটা তেমনি আছে, কপালের কাটা জায়গাটা থেকে রক্ত পড়ে পড়ে সার্টটায় দাগ ধরে গেছে।

—এসো আমার সঙ্গে ... ভয় নেই।

এবার আর কোনো দিকে তাকালেন না সোজা রান্নাঘরটায় ঢুকে একটা পিঁড়ি পেতে দিলেন। ছেলেটিও এলো পেছন পেছন।

—বোসো।

বলেই ঘরের বাইরে এলেন। শম্ভুনাথ তখনও স্থির দাঁড়িয়ে বারান্দায়, বিনু, ছোটুর চোখের পলক পড়ছে না। শম্ভুনাথ নীচু গলায় বললেন।

—চোর ডাকাত নয় তো?

সে কথার কোনো জবাব দিলেন না কনকলতা। বালতি করে কলঘর থেকে জল নিয়ে যাবার ঢুকে গেলেন রান্নাঘরে। রানী ততক্ষণে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কনকলতা আর দেরী করলেন না নিজে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে ছেলেটার মাথাটা টেনে নিলেন কোলের উপর। তারপর জলের বালতিতে হাত ডোবালেন। বড় খোকাকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ একা একা বসে থাকতে হয়েছিল সেদিন। বাড়িতে কোনো লোকজন ছিল না আর পাড়া প্রতিবেশীরা তখনও খবর পায়নি, শম্ভুনাথ ডেথ সার্টিফিকেট আনবার জন্য ডাক্তারের বাড়িতে। সেদিন প্রতি মুহূর্তে চারপাশের জগৎটাকে মিথ্যে মনে হয়েছিল কনকলতার। মনে হয়েছিল এ রকম হয়না কিছুতে, এ ঘটনা ঘটতে পারেনা। চোখে পড়েছিল পাশের বাড়ির ভাড়াটে বউ-এর আদরের সুন্দরী বেড়ালটা জানলার উপর গুটি-সুটি মেরে বসে থাবা চাটছে। জিভে বুঝি তার আঁশের গন্ধ তখনও লেগে।

রক্ত জমে জায়গাটা থিকথিকে হয়ে আছে, ন্যাকড়ায় জল ভিজিয়ে পরিষ্কার করবার সময় আঙুলে আঠা আঠা লাগছিল। রক্ত দেখলে আগে এমন গা গুলোতো কনকলতার। সেজোকাকার সেবার অ্যাকসিডেন্ট হোলো, বাড়িতে ধরাধরি করে নিয়ে এল পাড়ার লোকেরা। গল গল করে রক্ত ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। তাই দেখে কনকলতার ফিট হয়েছিল। বড় কাকিমা বলেছিলেন।

—ঠিক বয়সে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছো না ঠাকুরপো......মেয়ের যে শেষে ফিটের ব্যামো ধরল।

রানী টিনচার আইডিনের শিশিটা খুলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। ছেলেটা কেমন চোখ বুজে শুয়ে আছে মার কোলে। —না না টিনচার আইডিন দেবেন না...বড্ড জ্বলা করে।

ছেলেমানুষের মত কোলের ভেতর ছটফট করে উঠলে কনকলতা এতক্ষণ পরে হেসে ফেললেন।

—জ্বালা তো করবেই। দস্যিপনা করলে অমন জ্বালা টালা তো সহ্য করতেই হবে। তারপর সে কী উঃ আঃ চীৎকার ছেলেটার রানীর হাসি পাচ্ছিল।

—তুমি থাকো কোথায়?

—ল' কলেজ হোস্টেলে।

—সে কোথায়?

মার প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করল রানী, বলল।

—আপনি মনীষদাকে চেনন।...মনীষ নন্দী।

—কোন ইয়ারের ?

সারা পাড়াটা এখন কেমন নিঃসাড় হয়ে আছে। কে জানে কত রাত। দরজার গোড়া থেকে নড়তে পারছিলেন না শম্ভুনাথ ঘরের মেঝেতে উবু হয়ে বিল্টু আর ছোট্টু বসে। নির্ভুল ঠিকানা জেনে ঠিক রাস্তায় হাটলে মানুষ লক্ষ্যে পেঁাছোয়, শম্ভুনাথের মনে হচ্ছিল ঠিকানাটা নির্ঘাৎ ভুল ছিল তার নইলে এমন হবে কেন? তাকে এমন মাঝ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে সবাই ঠিকঠিক পেঁাছে গেছে। হরির বাড়ি উঠছে সিঁথিতে সুধীরেব বড় ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেছে। মাস গেলে মোটা টাকা আনছে। সেদিন অফিসে বিনোদ হিসেব করছিল পুরোনোদের মধ্যে রিটায়ারমেন্টের কত দেরী ? হিসেব কষে হেসে বলল।

—শম্ভুদা আপনি তো প্রায় মেরে এনেছেন। আর মেরে কেটে পাঁচ বছর।

অফিসে ঢোকবার সময় রঘুমামা বাবাকে বলেছিল বয়সটা কমসম করে লেখাতে। মা তাই শুনে বলল।

—বালাই ষাট...খোকার যা বয়স তাই লেখাবে। কম লেখাতে যাবে কেন?

শম্ভুনাথ শুনলেন ছেলেটার সঙ্গে টক্‌টক্ করে কথা চালিয়ে যাচ্ছে রানী। ঐ এক গলার কাঁটা, দেখতে শুনতে তেমন মন্দ নয় কিন্তু ভগবান মেরে দিয়েছেন সেই গোড়াতেই। আট মাসে হয়েছিল। শোকতাপ গেল কনকলতার মন মেজাজ আর শরীরের বড় উচাটন অবস্থা হয়েছিল। ভরা মাসের আগেই হয়ে গেল। পুষ্টি হয়নি, ডান পাটা বাড়তে পেলো না ঠিকমত। ছোটো রয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে কেমন নিভে যাচ্ছেন টের পেলেন শম্ভুনাথ। একবার গলাটা কেশে নিয়ে কিছু বলতে গেলেন। মুখে ঠিকমত কথা জোগালোনা। দেখলেন থালায় করে রুটি তরকারী বেড়ে দিচ্ছেন কনকলতা।

—এটুকু খেয়ে নাও। শরীর দুর্বল আছে বল পাবে খানিক।

অনেক রাত্তিরে ছেলেটা মাথাতুলে কনকলতাকে উদ্দেশ্য করে বলল।

—আমি এবার যাই তাহলে।

—যাবে।

কনকলতার বুকের ভেতর বান ডাকছিল। একবার দরজার ও পারে টুল পেতে বসা শম্ভুনাথের দিকে তাকালেন। রানী দু হাঁটুর ভেতর মুখটা রেখে মেঝেতে বসে। বিল্টু ছোট্টু অনেকক্ষণ পর্যন্ত জোর করে চোখ চেয়েছিল এখন ঘুমুতে গেছে। সারা এলাকাটা এখন নিঃসাড় অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে।

কনকলতা দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে একবার গলিরাস্তাটা ভালো করে দেখলেন। রাস্তার আলো জ্বলছে না, কেমন থমথমে চার পাশ। খোকাকে যখন ওরা সবাই মিলে তার কোল থেকে তুলে নিয়ে গেল তিনি তখন অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে। সেদিনে রাস্তার চেহারাটা কেমন ছিল ভাববার চেষ্টা করলেন একবার। এমন খাঁ খাঁ শূন্য রাস্তায় কাউকে কি কখনও বিদায় দিতে আছে ? মনে হল ছেলেটাকে আজ রাতের মত এ বাড়িতে থেকে যেতে বলবেন। মাথার ভেতর সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছিল তার। আশ্রয়ের জন্য এধার ওধার তাকাতে গিয়েই চোখ পরল শম্ভুনাথ অফিসের জামাটা গায়ে দিয়ে ছেলেটার পেছন পেছন বেরিয়ে আসছেন। স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তে বললেন।

—যাই একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

বলেই মাথা নামিয়ে এগিয়ে গেলেন খানিক। আর পা বাড়াতে গিয়ে ছেলেটা যেন কী ভেবে একবার পেছনে ফিরল। তারপর সোজাসুজি কনকলতার চোখের দিকে তাকিয়ে আবছা ভাবে হেসে বলল!

—আবার আসব।

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না।

আর সেই মুহূর্তে প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজের মুখের ভেতর জিভটাকে যেন খুঁজে পেলেন না কনকলতা।

শুধু বুকের ভেতর শুনলেন কে যেন বলে উঠছে।

—দুর্গা...দুর্গা।

বড় রাস্তায় পেঁাছে চারপাশটা নজর বুলিয়ে দেখে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন শম্ভুনাথ।—সাবধানে যেও কিন্তু। ...মনে তো হচ্ছে ওরা এখন আর ঝামেলা করবে না। জনা পাঁচেক পুলিশ রাইফেলে ভর দিয়ে পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে। ওপারের গাড়ি বারান্দার তলায় কয়েকজন হিন্দুস্থানী কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে। শম্ভুনাথ দেখলেন দেওয়াল ঘেষে গুটি গুটি হেঁটে যাচ্ছে ছেলেটা। যাক নিশ্চিন্ত। বেশ একটা কান্ড হয়ে গেল যা হোক। বুকের ভেতর দিকটায় একটা চিড় ধরেছে অনুভব করতে পারছিলেন।

ফেরবার পথে টিউবওয়েলটির সামনে বিনোদ মিত্তিরের সঙ্গে দেখা শম্ভুনাথের। মহাবাতিকগ্রস্ত লোক, কুট কচালিতে ওস্তাদ। দিন রাতে চব্বিশবার করে পাই-খানায় যায় বলে রাস্তার কলে জল নিতে আসে। পেটের রোগ আছে মানুষটার।

শম্ভুনাথ ভেবেছিলেন বিনোদকে এড়িয়ে যবেন। দ্রুত হাঁটতে শুরু করে-ছিলেন। বিনোদই ডাকল পেছন থেকে।

—কাজটা ভালো হয় নি শম্ভুদা ওসব ছেলে ছোকরাকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নি আপনার। দেখবেন ঠিক ফাঁসিয়ে দেবে আপনাকে।

টনির ঘুষিটা খেয়ে মাটিতে পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল মরে যাচ্ছি। তা সেই একবারই পড়লুম আর তো কই মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে উঠতে পারলাম না। শম্ভু-নাথের মনে হল মাথার ভেতরটা ঝন-ঝন্ করছে।

ফট্‌ফট্ করে রিং এর আলোগুলো সব নিভে যাচ্ছে। টনি সদম্ভবলে গেট দিয়ে বেরিয়ে যচ্ছে হাসতে হাসতে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ক্ষমতাও যেন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে সেই সঙ্গে। শুধু তার মনে হল এখন নিজেকে খাড়া রাখার একটাই [illegible] উপায় আছে তার হাতে। ডান হাত তুলে প্রচন্ড জোরে বিনোদের মুখের উপর একটা ঘুষি মারলেন শম্ভুনাথ। চোখ তাকিয়ে দেখবার মত একটা আপার কাট্। জিমনা-সিয়ামের ঘোষদার মতই তারপর উল্লাসে বলে উঠলেন।—সাবাস।

এই আমাদের দেশ

পাপহরার তীরে ব্যাধিহরা শৈবতীর্থ

বক্রেশ্বর চলুন

আগেই বলেছি বীরভূমের মাটির একটা আলাদা টান আছে। সারাদিন টং টং করে ঘুরলেও ক্লান্তি আসে না। তারাপীঠ থেকে সিউড়ি হয়ে গিয়েছিলুম দুবরাজপুর। নামটা খুব মুগ্ধ করেছিল তাছাড়া এক বন্ধুর বাড়িতে এক রাত্তির কাটিয়ে বক্রেশ্বর যাব এজন্যও বটে। দুবরাজপুরে স্টেশন থেকে বক্রেশ্বর মাত্র মাইল ছয়েক। আর সিউড়ি থেকে চোদ্দ মাইল। রাস্তাও মোটামুটি ভাল। বক্রেশ্বরও একটি পীঠ-স্থান। দেবীর ভ্রূ-মধ্য পড়েছিল এখানে। শ্মশানের ওপর এই পীঠ।

দূর থেকে বক্রেশ্বরকে দেখলে মনে হবে দেবতাদের আলয়ে যাচ্ছি। ঝকঝকে তক-তকে গ্রাম। শুধু মন্দির আর মন্দির, মানুষের ঘরবাড়ি খুবই কম। কোন দেবা-লয়ে ঢুকলে যেমন শান্ত গম্ভীর এক পরি-বেশ মনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি ভাবগম্ভীর নির্জনতা ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামটি জুড়ে। অসংখ্য মন্দিরের একত্র সমাবেশ এর আগে কোথাও দেখিনি। ছোট-বড়-মাঝারি নানান আকারের। কিছু কিছু মন্দির একেবারে প্রাচীন কালের, জীর্ণ, ভাঙাচোরা। আবার কিছু এখনও বেশ অটুট অবস্থায় রয়েছে। সব মন্দিরেই যে বিগ্রহ আছে তা নয় তবে প্রায় সবগুলিই খাঁটি চারচালা ধরনের বাংলা মন্দির। বাংলা মন্দির ছাড়াও প্রচুর রেখ-মন্দির আছে। বক্রনাথের মূল মন্দিরটিও কিন্তু বাংলা মন্দির নয় উড়িষ্যার রেখ দেউলের মতন। বাংলা ও উড়িষ্যার মন্দির শিল্পের যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটেছে এখানে।

বক্রেশ্বর তীর্থ নিয়ে পুরাণকাহিনী আছে। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হিরণ্যকশিপুকে বধ করার ব্রহ্মবধজনিত পাপে ভগবান নৃসিংহদেবের নখে ভয়ানক জ্বালা হতে থাকে। একথা দেবতা সমাজে প্রচারিত হবার পর সকলেই এর একটা উপায় খুঁজতে থাকেন। অবশেষে অষ্টাবক্র মুনি স্বেচ্ছায় এই জ্বালা নিজের মাথায় তুলে নেন। কিন্তু অষ্টাবক্রকে নিদারুণ জ্বালা অনুভব করতে দেখে নৃসিংহদেবও স্বস্তি পেলেন না। তিনি অষ্টাবক্রকে পরামর্শ দিলেন গহ্বরে নেমে বক্রনাথকে স্পর্শ করতে। কিন্তু যেই মাত্র অষ্টাবক্র মুনি গহ্বরে নেমে বক্রনাথকে স্পর্শ করলেন অমনি গুহামধ্যে সব তীর্থবারি স্রোতের মত ছুটে এল। সেই তীর্থবারিতে স্নান সেরে তিনি জ্বালামুক্ত হলেন।

সাতটি উষ্ণ জলের প্রস্রবণও এই বক্রে-শ্বরে। মন্দির প্রাঙ্গণের উষ্ণ কুন্ডটির নাম শ্বেত সরোবর। শ্বেত সরোবর ছাড়াও আরও সাতটি উষ্ণ কুন্ড আছে। তাদের নাম অগ্নি-কুন্ড, ব্রহ্মকুন্ড, সৌভাগ্যকুন্ড, সূর্যকুন্ড, জীবনকুন্ড, ভৈরবকুন্ড ও খরকুন্ড। প্রত্যেকটি কুন্ডকে ঘিরে আবার গল্প আছে। সূর্যকুন্ড নিয়ে গল্পটি এইরকম। নারদমুনি একবার বিন্ধ্যপর্বতের সামনে দাঁড়িয়ে সুমেরু পর্বতের উচ্চতার প্রশংসা করেন। বিন্ধ্যপর্বত এতে অপমানিত বোধ করেন এবং রাগান্বিত হয়ে এমনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান যে সূর্যদেব ঢাকা পড়ে যান। সূর্যদেবের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে পৃথিবীতে হাহাকার ওঠে। পৃথিবীর মানুষ সূর্যের অভাবে মারা যাবার যোগাড়। বিপন্ন সূর্যদেব তখন কুন্ডে এসে এই দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণের জন্য শিবের তপস্যা করতে থাকেন। মহাদেব সূর্যের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিন্ধ্যপর্বতকে মাথা নিচু করান। সেই থেকে এর নাম হয়েছে সূর্য-কুন্ড।

জীবনকুন্ডের গল্প ঃ প্রাচীনকালে সর্ব ও চারুমতী নামে এক ধর্মপ্রাণ দম্পতি সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে থাকেন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সর্বকে বাঘে তাড়া করে এবং খেয়ে ফেলে। স্বামীর দুঃখে শোকমগ্না চারুমতী শিবের তপস্যা শুরু করেন। চারুমতীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব চারুমতীকে বক্রেশ্বরের কুন্ডের জলে তার স্বামীর হাড়গুলো ধুয়ে ফেলতে বললেন। হাড়গুলি কুন্ডের জলে ডোবানো মাত্রই সর্ব বেঁচে উঠল। কুন্ডের জলে সর্ব জীবন ফিরে পেল বলেই এর নাম জীবনকুন্ড।

ভৈরবকুন্ডের গল্পঃ আগে নাকি ব্রহ্মার পাঁচটি মুন্ড ও মুখ ছিলো। পঞ্চ-মুন্ডের অধিকারী বলে তিনি নিজেকে শিবের সমকক্ষ বলে দাবী করলেন। দেবা-দিদেব এতে ভয়ানক অপমানিত হন। ক্রোধে অধীর হয়ে তিনি তাঁর জটা থেকে একটি চুল ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন। সেই চুল থেকে সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেয় বটুক ভৈরব। জন্মের পরই বটুক প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় থাকে। দেবাদিদেব আদেশ দেন ব্রহ্মার একটি মুন্ড কেটে ফেলতে। যথা-রীতি বটুক সে আদেশ পালন করে কিন্তু কাটা মুন্ডটি বটুকের হাত থেকে আর নড়ে না। নিরুপায় বটুক তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোন সুরাহা হোল না। অবশেষে কাশী-বারাণসীতে এসে বটুকের হাত থেকে মুন্ড খসে পড়ল। মুন্ড খসে পড়ল বটে কিন্তু বটুকের হাতে দুরারোগ্য ক্ষত হোল। সে ক্ষতের জ্বালায় অস্থির বটুক এল বক্রেশ্বরে এবং কুন্ডে স্নান করার পরই সে নিরাময় হোল। এই-রকম গল্প প্রত্যেকটি কুন্ড নিয়েই রয়েছে।

প্রকৃতির নির্জন কোলে বক্রেশ্বর তীর্থের অবস্থিতি। এই নির্জনতা সাধকদের দিক থেকে হয়ত প্রয়োজন ছিল। বক্রেশ্বরের পূর্বে ও উত্তরে দুটি নদী, বক্রেশ্বর ও পাপহরা। শ্মশানের ওপর এই শৈবতীর্থটি গড়ে ওঠার ফলে তন্ত্রসাধকরা এটির গুরুত্ব দেন বেশি। তাছাড়া শ্মশানেরও বৈশিষ্ট্য আছে। নির্জন মন্দির এলাকায় একা ঘুরতে ঘুরতে শ্মশানে এসে পড়লে চমকে উঠতে হয়। প্রবাদ আছে বক্রেশ্বরের শ্মশানের চিতা কখনও নেভে না। পাপহরার তীরে বহু দূরদূরান্তরের গ্রাম থেকে শব দাহ করার জন্য এখানে আনা হয়। এজন্য মহা-শ্মশান নামে এর পরিচিতি। মহাশ্মশানের নির্জনতায় বসে অনেক তন্ত্রসাধক কঠোর তপস্যা করেছেন এবং ভয় ভাবনা লোভ জয় করে সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন।

শ্মশানের ওপরই ছিল বিখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ অঘোরবাবার আস্তানা। অঘোর-বাবা বহুদিন মারা গেছেন তাঁর উত্তর-সাধকরাও কেউ এখন জীবিত নেই। একজন সেবায়েত বললেন, আগেকার মত কঠোর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এখনকার কোন সাধকের মধ্যে দেখা যায় না। কখনও-সখনও দু-একজন সাধক বক্রেশ্বরের নাম শুনে এখানে আসেন, কয়েকদিন থাকেন আবার চলে যান। অঘোরবাবার সমাধিটি একেবারে শ্মশানের মধ্যে। এখানেই নাকি তিনি থাকতেন, সাধনা করতেন, চক্রে বসতেন নিশুতি রাত্রে। চক্রে বসে সাধনা করার সময় তিনি নাকি মড়ার মাথার খুলিতে কারণ পান করতেন। ক্ষিদের সময় খেতেন মড়ার মাথার উত্তপ্ত ঘিলু। ঝড়-বিদ্যুৎ দুর্যোগের রাতে যখন চামুণ্ডা-দের নিয়ে চক্রে বসতেন তখন ভৈরব-ভৈরবীরা বিবস্ত্র হয়ে শবাসনে বসে কারণ-বারি পান করে নাকি এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করতো। জলের মত কারণবারি পান করতেন অঘোরবাবা এবং সব সময়েই বিবস্ত্র থাকতেন। সে সময় বহু দূরান্তরের সাধক, ভৈরব ভৈরবীর সমাগম হত বক্রেশ্বরে।

বক্রেশ্বরের কুণ্ড মাহাত্ম্যের কথা সকলেই জানেন। ফুটন্ত জলের সঙ্গে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়। মন্ত্রতন্ত্রের যুগ চলে গেছে, অলৌকিক কিছুর ওপর মানুষের আস্থা কম তবে কুন্ডের জলে বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণের ফলেই রোগ নিরাময়ের সহায়ক হয়। বহু যাত্রী এখানে আসেন তীর্থ করতে, রোগ সারাতে। বাতের ব্যাধির রোগীই বেশি, চর্মরোগীরাও কুন্ডের জলে স্নান করে নিরাময় হতেই আসেন। প্রত্যেকটি কুন্ডের চারপাশ শান বাঁধানো। থাকার জায়গা বলতে মোহন্তের চটি। কিছু দূরে পাবলিক ওয়ার্কসের ডাক বাংলোও আছে। না হলে সিউড়ি ফিরে আসবেন।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মনুখের মেলা

ঘানি

চাষীর ঘরে জন্মানোর নিকুচি করেছে!

আজ ধান কাটতে যাও, কাল আখ কাটো, পরশু আনাজ নিয়ে হাটে বেচতে যাও। ধান বও, ধান ঝাড়ো, কোদাল কোপাও, কাঠ ফাড়ো, জাল ফেলে মাছ ধরো। গাছ ছাড়ানো হয়েছে, পাতা, নারকোল, চুপড়ির কুড়োও, গড়ু জ্বাল দাও। জনেদের মুড়ি নিয়ে যাও। হাজার কাজে লাট্টুর মতন ঘুরতে হয়। হঠাৎ বড়মামুর ফরমাজ হল : নদীনের ঘানা থেকে নারকোল শাঁস ভাঙিয়ে আনগে যা।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'শাঁস তো ভাল করে শুকোয়নি এখনো বড়মামু!'

বড়মামু ভীষণ রাগী লোক। চোখ দুটো দেখলে ভয় লাগে। কাছে এগিয়ে এসে কান ধরে কর্কশ স্বরে বললে, 'ফাঁকিবাজির মতলব? শাঁস শুকোয়নি কে তোকে বলেছে? ভাদ্দর মাসের রান্নাপুজোর দিন নারকোল কেড়ে দিয়েছিলি—এক মাস রোদ পেয়ে শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেছে। কাক-চিল, কুকুর-বেরাল, ইঁদুর-বাঁদরে খেয়ে কত নষ্ট হচ্ছে এক্ষুনি নিয়ে যা। সরষে আর তিলগুলো ভাঙিয়ে এনেছিলি?'

কিছু উত্তর নেই দেখে দিলে ঠাস করে এক চড়!

মা শুধু নীরবে চেয়ে রইল গরুর খড় কুঁচোতে কুঁচোতে।

নানী চেঁচাতে লাগল, 'মারিস কেন রা৷ হতভাগা—এই সবে 'পাঠশাল' থেকে এল। কিছু খাক, খেয়ে যাবেখন। দশটা বেলায় কি রান্না রেঁধেছিল তোদের সাধের বিবিরা? আয়, ভাত খাবি আয়।'

নানীর হাত ছাড়িয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ধামা বোঝাই করে নারকোল শাঁস আর তেলের কলসী মাথায় নিয়ে চললাম দেখে মা উঠে এসে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কি করবি বাবা, তোদের কপাল! বাপ মরে গেল তোদের ছোট রেখে, কোন চুলোয় আর যাব বল্!'

মা দুটো পাকা পেয়ারা দিলে বুকের কোঁচড়ের মধ্যে থেকে বার করে গোপনে। চোখ মুছে পেয়ারা দুটো খেতে খেতে বড়মামুর মার, মায়ের কান্না, নানীর ভাত খেয়ে যাবার জন্যে টানাটানি, অঙ্ক না পারার জন্যে ইস্কুলের মার সব ভুলে গেলাম—ভুলে গেলাম সবুজ ধানক্ষেতের মাথায় নতুন শীষ আসা দেখে, পথের দুধধবলে মাটি আর নীল আকাশে বিচিত্র মেঘের শোভা—কত চেনা অচেনা ঘাস-লতা-পাতা-ফুল কত ছেলেমেয়েরা খেলছে, নাচছে পথচলার নৈসর্গিক আনন্দে আমার আঠারো বছরের মন যেন কোথায় হারিয়ে গেল। অনাহার একদিন, দুদিন, তিনদিন গেছে, নতুন কিছু নয়।

মাইলখানেক পথ পার হয়ে দোকানঘরে এসে দাঁড়াতে কান চ্যাপ্টা একটু নাক বসা নবীনবাবু নারকোল মালার ফুটোয় আঙুল গলিয়ে খদ্দেরকে তেল মেপে দিতে দিতে হাঁক পাড়ে : 'এই বড়াই বুড়ী—বেদানা রে'—

'যাই বাবা'—

'শীগগিরী এসে শাঁসটা নামিয়ে নে।'

বেদানা ছুটে এসে আমার দিকে চেয়েই যেন কিছু লজ্জাবোধ করল। বছর পনেরো বয়েসের মেয়ে। দেখতে ঠিক বাপের মতন নয়। ফরসা না হলেও কালো নয়। গোলগাল চেহারা। গোলাকৃতি মুখ। নরুনচেরা চোখ। টিকোলো নাক। ঠোঁট দুটো

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

॥ বাঙালীর দুর্গোৎসব ॥

আজ মহানবমী তিথি। বাঙালীর জীবনের সবশ্রেষ্ঠ উৎসবের শেষ দিন। এই দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে পটুয়ারা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমা [illegible] গড়েছে। এই [illegible] [illegible] বহুদিন [illegible] [illegible], [illegible] জীবনের [illegible] প্রধান, তার সঙ্গে যুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] সাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোক-মালায় সজ্জিত [illegible] পাণ্ডেলে [illegible] [illegible] ভীড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]। এই ক'টি দিনের [illegible] [illegible] সকলেই [illegible] এবং মহানন্দের [illegible] [illegible]। এই ক'টিতে তাই আজ আর অন্য উৎসবের প্রসঙ্গের কথা চিন্তা করে, এবং সেই কারণেই উৎসবের সামগ্রীর সন্ধানে সকলকেই [illegible] হয়। ঘুরতে হয় পূজা উৎসবের অনেক দিন আগে থেকেই.

উৎসবের আগে এসেছিল বন্যা। সেই প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে কত মানুষের প্রিয়জনকে হারাতে হয়েছে, কতজনে হারিয়েছে, তার মাথার আশ্রয়, ক্ষেতের ধান। তাদের চোখের জল শুখাতে না শুখাতেই, 'শরত তপনে প্রভাত পবনে কি জানি পরাণ কি যে চায়' এই ভাব মনের মাঝে দোলা দিয়ে উঠেছে। শরৎ কালের এমনই মাদকতা। বসন্ত কখন আসে কখন চলে যায় তা ঠিক ধরা যায় না, তাই 'কখন বসন্ত এল এবার হোল না গান' এই আক্ষেপ মনে থেকে যায়, কিন্তু ভয়ংকরী বন্যা মরণ জ্বালা'র পিছনে কোথায় একটা শান্তির অভয় বাণী আছে, তাই শরতের শিশির ধোয়া কুন্তলে হৃদয়-আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই যে শরতের মোহন স্পর্শ এর থেকে আপনাকে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

আমরা বাঙালী যারা তীর্থ বরদ বঙ্গে বাস করি, তাই নানা রকমের অশান্তি আর হতাশার মাঝে কোথায় যেন একটা আলোর আভাস পাই শারদোৎসবের এই কয়েকটি আনন্দ উজ্জ্বল মুহূর্তে।

আজ থেকে অনেক বছর পূর্বে যেভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত আজ আর সেইভাবে হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। কালের পরিবর্তন ঘটেছে এই কথাটি সর্বদা স্মরণে রাখা কর্তব্য। স্বীকার করাই স্বাভাবিক।

দুর্গাপূজা বা নবরাত্রি উৎসব সর্বভারতীয় উৎসব। অবশ্য এ উৎসব হিন্দুদের উৎসব। বঙ্গদেশ ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গা পূজা নামে তিনদিন-ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্মরণাতীত কাল ধরে, এই উৎসবের সঙ্গে মিশেছে পৌরাণিক উপাখ্যান। শ্রীরামচন্দ্র অকাল-বোধন করেছিলেন, তাই এই অকাল বোধন উৎসব, নতুবা এ উৎসব সেই চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজার উৎসব ছিল। কিন্তু বাল্মিকী রামায়ণে এমন কোনো উল্লেখ নেই, অকাল-বোধনের কাহিনী বাঙালী কবি কৃত্তিবাস কল্পিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে অকালবোধন এবং ১০৮টি নীল পদ্মের মধ্যে একটির অভাব পড়ায় শ্রীরামচন্দ্র নিজের পদ্মপলাশ-লোচন স্মরণ করে সেই চক্ষুরত্নটি যে উপহার দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, এ কল্পনা বাঙালীর। উত্তর ভারতে এই সময় রাম-লীলা উৎসব হয় এবং শেষ দিনে মহাধুম-ধাম সহকারে রাবণের বিরাট কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে নবরাত্রি উৎসব, দশম দিনটির অর্থাৎ আমাদের বিজয়াদশমী দিবসে নাম দশেরা বা দশ-রাত্রি। মহীশূরের দশেরা উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য বাৎসরিক উৎসব।

বাঙালীর চিন্তা একটু স্বতন্ত্র। পণ্ডিতগণের মতে পূর্বে এই বাংলাদেশেও ঘট স্থাপনা করে ঘরে ঘরে নবরাত্রি পূজা সম্পন্ন হত, প্রতিমা নির্মাণ করে সাড়ম্বরে পূজা অনুষ্ঠান মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে প্রচলিত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্পীরা মৃৎ শিল্পে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করে, একথা এই সূত্রে স্মরণীয়। এরপর ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকে নতুন গড়ে ওঠা কলকাতা শহরের হঠাৎ ধনী, ইংরাজ বণিকদের তাঁবেদার বেনিয়ান মুন্সী প্রভৃতিরা মহাসমারোহে দুর্গোৎসব সুরু করলেন। এই কয়দিন নাচের হররায় তখনকার ধনী গৃহ মুখরিত হয়ে উঠত, সঙ্গে মদের ফোয়ারা খুলে দেওয়া হত। সাহেব সুবিগণ অনুগ্রহ করে নেটিভদের বাড়ি এসে পূজা উৎসবে যোগ দিতেন। পূজা যেমন হোক, আড়ম্বর এবং ঐশ্বর্যের জাঁকজমকটাই প্রবল হয়ে উঠত। সেই সব বৃত্তান্ত পুরাতন ইতিহাসে এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

এদিকে গ্রাম বাংলায় ছিলেন অজস্র জমিদার। কলকাতার সংবাদ সেখানেও যথাকালে পৌঁছাত, তাই তাঁরা কেউই প্রতি-পক্ষের কাছে ছোট হতে রাজী হতেন না, ফলে পূজা উৎসব ক্রমশঃ আর গৃহস্থ বাড়ির মৃন্ময় ঘটের মধ্যে আবদ্ধ রাখা গেল

না। ধনী এবং ধনীদের অনুকরণকারীদের মধ্যেই পূজা উৎসব প্রসারিত হল।

এর একটি অন্যদিকও ছিল। এখন যাকে বলে 'মাস কনট্যাকট', দুর্গাপূজো ছিল জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের একটি অবলম্বন। এই সময় ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচ কোনো ব্যবধান থাকত না। সেই কাল ছিল প্রাচুর্যের কাল, বাঙ্গালীর ঘরে ছিল গোলা-ভরা ধান, মনটাও ছিল উদারতায় পরিপূর্ণ। তাই কাঙ্গাল-গরীব, আত্মীয়-বান্ধব সকলেই সমান সমাদর লাভ করত। বাড়ির কর্তামশাই সকলের কাছে করজোড় করে অশ্রু গদগদ লোচনে বলতেন—এই কদিন, এ-বাড়ি তোমাদের সকলের, কেউ যেন বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ো না। তখনকার দিন ছিল অল্পে তুষ্ট হওয়ার দিন। তাই চিঁড়া-গুড়, ভাত আর ঝোল, কিংবা পাতলা ডাল সেই সঙ্গে শাকপাতার চচ্চড়ি আর শেষপাতে নারকোলের রসকরা, বোঁদে এবং অতি তরল দুগ্ধযোদই পেলেই সকলে কর্তাবাবুর জয় হোক বলে আনন্দ করে বাড়ি যেত। অনেকে আবার এই সময় একখানি কোরা কাপড়, গামছা বা চাদর উপহার পেতেন। সাটিনের জামার প্রচলন ছিল, তাই মধু-বিধু দুই ভাই আনন্দে দু হাত তুলে নাচত। এমনই ছিল অতীতের বাংলা এবং বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব। 'ডিভিসন অব লেবার', 'ডিস্ট্রিবিউসন অব ওয়েলথ' প্রভৃতি যে সব বড় বড় কথা এখন আমরা বলি তার অতি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত পুরাতন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। রসরাজ অমৃতলাল বসু বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যার মধ্যে আজ থেকে পঞ্চাশ একশত বছর পূর্বের গ্রাম বাংলা এবং শহর কলকাতার দুর্গোৎসবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক রচনায় দুর্গোৎসবের কথা লিখেছেন এবং তাঁর চিঠিপত্রে দুর্গোৎসব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আছে।

ক্রমে গ্রাম বাংলার নাভিশ্বাস ঘটল। শহরে কলকারখানার প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামের মানুষ শহরে ছুটে এল। গ্রামের ধনীদের অর্থের পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের পারদের মত দ্রুত নিম্নাভিমুখী হয়ে এল। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের দেহে ক্ষয়রোগের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দেশ-বিভাগের ফলে সেই কালব্যাধি সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে প্রায় অন্তিম মুহূর্তে নিয়ে এসেছে। ফলে পারিবারিক পূজা উৎসব এবং তার আনুষঙ্গিক উৎসব অনুষ্ঠান আজ প্রায় অন্তর্হিত। তার সেই শূন্য আসনে আজ সমাসীন সর্বজনীন দুর্গোৎসব। এ উৎসবে সবাই রাজা। এ উৎসবে সকলের সমান অংশ, এই উৎসবে আড়ম্বর আছে, আলো, আতস বাজি এবং বিসর্জনের হুল্লোড় অনুপস্থিত নয়, তবে মনে হয় দুর্গা পূজার এই আনুষ্ঠানিক আকৃতি আর কয়েক বছরে আরো রূপান্তরিত হবে, কালের প্রয়োজনেই এই রূপান্তর ঘটবে। মন্ডপ থাকবে, হয়ত মূর্তি থাকবে না। উৎসব থাকবে উপলক্ষ্য থাকবে না। আর সেই নিরাকার শারদোৎসবের দিকেই আমরা এগিয়ে চলেছি।

দুর্গা পূজার শাস্ত্রীয় দিকটি এই সূত্রে স্মরণীয়। দুর্গা আদ্যাশক্তি এবং মহাশক্তির আধার। এই আদ্যাশক্তি যখন সৃষ্টির দেবী, তখন তিনি মহাসরস্বতী, যখন তাঁর ভূমিকা পালনের তখন তিনি মহালক্ষ্মী আর যখন সেই আদ্যাশক্তি ধ্বংসের দেবী তখন তিনি মহাকালী। দুর্গাপূজা শক্তির পূজা। দুর্গাকে স্মরণ করলে সকল দুর্গতি থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়।

"দুর্গেস্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্য দুঃখভয়হারিনি কাত্বদন্যাঃ—
সর্বোপকার করণায় সদার্দ্রচিত্তা।।"

আমাদের সকল প্রকার দারিদ্র্য, দুঃখ এবং ভয় থেকে যিনি নিষ্কৃতি দান করতে পারেন, সেই দুর্গাদেবী বাঙ্গালীর কাছে সর্বদা স্মরণীয়।

—অভয়ংকর

সাহিত্যের খবর

বিদ্যাসাগরের সার্ধ শতবার্ষিকী ।। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারত ইতিহাসের এক বিস্ময়কর নাম, আমাদের নবজাগরণের স্রষ্টা এক মহাপুরুষ।' বিদ্যাসাগরের সার্ধ জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বাস্তবিক, বিদ্যাসাগরের মত এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি মানুষ উনিশ শতকে বিশ্ব ইতিহাসেও দুর্লভ। তাঁর সার্ধ জন্মশতবর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যমে দেশবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ২৬ সেপ্টেম্বর, তাঁর জন্মদিনে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি এক সভার আয়োজন করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁর মর্মরমূর্তিতে মাল্যদান করেন। এঁদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন, মুখ্য উপদেষ্টা বি বি ঘোষ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রমা চৌধুরী, মেয়র প্রশান্ত শূর, শিক্ষা-সচিব জে, সি, সেনগুপ্ত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়।

সন্ধ্যায় কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অপর একটি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন—"বিদ্যাসাগরের শিক্ষা, মনন প্রভৃতি সবই ছিল স্বদেশী। তার উপর বিদেশী উপকরণ মিশিয়ে তৈরী হয়েছিল তাঁর চরিত্রের ইমারত।" ডঃ রমা চৌধুরী বলেন যে, আমরা মেয়েরা যে পুরুষদের পাশাপাশি এখন চলছি, এ বিদ্যাসাগরেরই অবদান। সভায় শ্রীবিনয় ঘোষও ভাষণ দেন। 'বনফুল' বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি কবিতা পাঠ করেন। মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি, বি, ঘোষ সকলকে অভিনন্দন জানান।

আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল বিদ্যাসাগর স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ। শনিবার সকালে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীশের সিং আনুষ্ঠানিকভাবে ২০ পয়সা দামের এই ডাকটিকিটের অ্যালবাম কলকাতা ও রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্যদের উপহার দেন।

'লাইটহাউস' প্রেক্ষাগৃহে নিখিল ভারত বিদ্যাসাগর স্মারক সমিতির উদ্যোগে একটি সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—"স্বদেশী বনিয়াদের উপর তৈরী এই মানুষটির চরিত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ ছিল। তাঁকে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়।" শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"তিনি নির্বিচারে কিছু গ্রহণ করাকে কুসংস্কার মনে করতেন।" সভাপতির ভাষণে শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ বলেন—"বিদ্যাসাগর আমাদের চিত্তে যে স্থান অধিকার করে আছেন, তা চিরকাল অটুট থাকবে।" ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সমবেত অতিথিদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—"বিদ্যাসাগরকে এতদিন আমরা ভুলে ছিলাম। এর জন্য আমরা যে জাতীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি, একথা অস্বীকার করা যায় না।"

শান্তিনিকেতনে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয় ভোরে বৈতালিক গানে। তারপর সন্ধ্যায় আলোকমালায় সজ্জিত পৌর প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। বিকেলে 'বিচিত্রা' ভবনে

'বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন শ্রীবিনয় ঘোষ। তিনি বলেন—'রবীন্দ্রনাথই প্রথম বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মাহাত্ম্য নির্ণয় করেন।'

এ ছাড়াও বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীশের সিং উপস্থিত ছিলেন। এইসব অনুষ্ঠানই প্রমাণ করে আমরা বিদ্যাসাগরকে কতখানি মনের কাছে আনতে পেরেছি। তিনি আমাদের কত আপন।

প্রখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিকের পরলোকগমন ।। গত ২৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বাল্টিমোরে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জন পাসোস পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমেরিকান সাহিত্যের যে ক্ষতি হল তাতে সন্দেহ নেই।

জন পাসোসের জন্ম হয় চিকাগোর ইলিনয়ে ১৮৯৬ সালে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ খৃঃ তিনি স্নাতক হন এবং কিছুদিন পরেই স্পেনে চলে যান স্থাপত্যের সংস্কৃতির উপর পড়াশুনা করার জন্য। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি এর পর যোগ দেন। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানেও তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ওয়ান ম্যানস ইনিশিয়েসান' প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। এর পর 'থ্রি সোলজার্স' (১৯২১), 'ম্যানহাটন ট্রান্সফার' (১৯২৫) প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে "স্টেটস অব নাইট, 'দি গ্রান্ড ডিজাইন', 'দি স্টেট্ অব দি নেশান' প্রভৃতি। তাঁর উপন্যাস বা অন্যান্য রচনায় রাজনৈতিক মতাদর্শ খুব বেশি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে।

অনুবাদের কপিরাইট ।। অনুবাদ বর্তমান সময়ে একটি প্রয়োজনীয় সাহিত্য-কর্ম। যে কোন ভাষাতেই এখন পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে 'কপিরাইট' নিয়ে। অনেক সময় ভিন দেশী লোক হলে অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি নেওয়া হয় না। অসুবিধাও আছে অনেক। রাশিয়ায় কিন্তু এ ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কপিরাইট বোর্ডের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের উপাধ্যক্ষ একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে লিখেছেন ঃ 'সোভিয়েত ইউনিয়নে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের ব্যাপারটি কেবলমাত্র সেই লেখকের এক্তিয়ারভুক্ত বলে গণ্য নয়। অনুবাদে মূল রচনার সামগ্রিকতা ও তার অর্থ কোন রকম বিকৃত করা হবে না, এই শর্তে তা সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্য ভাষায় লেখকের অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে লেখক যদি দেখেন যে তার মূল রচনার সঠিকতা বা অর্থ অনুবাদে রক্ষিত হয়নি, তবে তিনি সেই অনুবাদের প্রচার বন্ধের দাবী জানাতে পারেন।' সাহিত্যের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির দিক থেকে অনুবাদ ব্যাপারে নিয়মটি সত্যই প্রশংসনীয়। কেননা, অনেক সময় লেখকের ঠিকানাও অনুবাদকের জানা থাকে না। অথচ অনুবাদের দিক থেকে রচনাটি অবশ্যই যখন অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে, তখন অনুমতি ছাড়াই অনুবাদ করা যেতে পারে।

প্রাগের বসন্ত ।। মিগুয়েল ডেলিবেস চিলির একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর পেশা অধ্যাপনা। এই সূত্রেই তিনি ১৯৬৮ সালে প্রাগে গিয়েছিলেন কয়েকটি বক্তৃতা দিতে। কিন্তু সেই সময়েই চেকোস্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। মিগুয়েল এই সময় সেখানকার বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং রাজনীতিবিদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। তাঁর এই বইতে সেই সব অভিজ্ঞতার কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে বইটা কোন রাজনৈতিক প্রপাগাণ্ডা নয়। সেখানকার জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই লেখক এই বইটি রচনা করেছেন বলে বইটিতে অনেক তথ্য এবং তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে।

—চার্বাক

ছোটগল্প (৯) আফ্রিকা

একটি দেশের উপনিবেশিকতাজনিত অনগ্রসরতার দরুন, পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর একদা পবিত্র দায়িত্ব ছিল সে-দেশটিকে করুণা করা। শাদা চামড়ার দৌলতে ইউরোপের একরূপ ধারণা হয়ে গিয়েছিল কালো-তামাটে এশিয়া-আফ্রিকার মানুষগুলোর উপর তাদের ছড়ি ঘোরাবার একচ্ছত্র অধিকার।

আফ্রিকা এমনি একটা মহাদেশ। সভ্যতার তথাকথিত বাইরে থেকে এ মানুষগুলোও স্বাজাত্যবোধে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে যে উত্থিত হতে পারে এটা আধুনিক ঘটনা।

এবং আফ্রিকার নিজস্ব সাহিত্যসৃষ্টিও এমনি একটি আধুনিক ঘটনা।

এককালে রোমাঞ্চকর আফ্রিকার 'জংলী' মানুষগুলো নিয়ে কেবলমাত্র বৈচিত্র্যের লোভে গল্পউপন্যাস লিখেছেন রুডিয়ার্ড কিপলিং কিংবা জোসেফ কনরাড।

কিন্তু আফ্রিকার বাস্তব চেহারা কী এসেছে সেসব রচনায়? শাদা-কালোর বর্ণ-বিদ্বেষে জর্জরিত মনুষ্যত্বের অধিকারহীন মানুষের প্রতিষ্ঠার দাবি?

অবশ্যই আসে নি, আসতে পারে না।

তাই আফ্রিকার শিল্পীসমাজ প্রকৃত দেশজ সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। এ-এক স্বমহিমায় নব-জাগরণের সাহিত্য।

অ্যালান প্যাটোন লিখলেন, বিখ্যাত উপন্যাস 'ক্রাই, দি বিলাভেড কান্ট্রি'। হ্যারি ব্লুম লিখলেন 'ট্রান্সভাল এপিসোড'। ফিলিস অল্টম্যান লিখলেন 'ল অব দি ভালচারস'। অজস্র গল্পের ঝর্ণাধারা উৎসারিত হল।

এদেশে সর্বাধিক পরিচিত গল্পকার রিচার্ড রাইভ। জন্ম ১৯৩১ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে। লালিত হয়েছেন কুখ্যাত ডিসট্রিক্ট সিক্সের কালো আদমির বস্তিতে। তাঁর গল্পে আছে এই পরিবেশেরই নির্মম স্মৃতি। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষের সীমাবদ্ধ অধিকার সত্ত্বেও তিনি বৃত্তি অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। কেপ টাউনের সাউথ পেনিনসুলা হাই স্কুলের ইংরাজি ও লাতিনের শিক্ষক। ছাত্রাবস্থাতেই লেখা শুরু। তাঁর গল্পগুলি প্রথমে সাউথ আফ্রিকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রকাশকেরাও তাঁর লেখা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

লেখা ছাড়াও খেলাধুলাতেও তিনি কৃতিত্বের অধিকারী। একদা দক্ষিণ আফ্রিকার হার্ডল রেস চ্যাম্পিয়ান, সুদক্ষ পর্বতারোহী এবং মৎস্য শিকারে নিপুণ।

দক্ষিণ আফ্রিকান আর্টস ইউনিয়নের সম্পাদক। লন্ডনের টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টের মতে ঃ 'যে কোনো শাদা চামড়ার লেখকদের চেয়েও শক্তিশালী লেখক।'

রাইভ-এর 'আফ্রিকান সংগ' গল্পগ্রন্থটি ১৯৬৩-এ প্রকাশিত হয়ে এদেশে প্রভূত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। '[illegible] কর্ণার' এবং 'বেঞ্চ' লেখকের উল্লেখযোগ্য গল্প।

ফিলিস অল্টম্যান অন্যতম শক্তিশালী লেখিকা। জন্ম জোহান্সবার্গে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছেন বর্ণবিদ্বেষ ও অসাম্য সামাজিক নির্যাতন এবং অপ্রীতিকর কথা। অশ্বেতকায় সঙ্গীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস, আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়বার সময়। সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের অধ্যাপক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মুক্তি ঘটালেন। বি এ ডিগ্রি ও

শিক্ষণ সার্টিফিকেট পাবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অশ্বেতকায় সৈন্যদের সেবার উদ্দেশ্যে যোগদান করলেন। বর্ণবিদ্বেষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রচিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি ল অব দি ভালচারস'। মিস্ অল্টম্যান ভিন্ন জাতি সংবলিত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কর্মী। অবকাশ সময়ে রাজনৈতিক রচনা, ছোটোগল্প এবং উপন্যাস লেখেন। 'সাটারডে আফটারনুন' গল্পটি বর্ণবৈষম্যের প্রেক্ষিতে রচিত।

জ্যাক কোপ্-এর জন্ম ১৯১৩ নাটালের জুলু-অধিবাসীদের মধ্যে। বাইশ বছর বয়সে লণ্ডনে রাজনৈতিক সংবাদদাতা হিসেবে যান। সারা ইউরোপ পরিভ্রমণ করে ১৯৪০-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে এসে সাহিত্যে ব্রতী হন। কবিতা, ছোটোগল্প, সমালোচনা, জীবনগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৫৪-এ তাঁর 'দি ফেয়ার হাউস' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন। তাঁর প্রচুর ছোটোগল্প ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত 'টেম্ অকস' গল্পটি জুলু অধিবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে রচিত।

নাডিন গোর্ডিমার-এর জন্ম ১৯২৩, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনি অঞ্চলে। জোহেনসবার্গে তিনি বড় হয়েছেন, এখন সেখানকারই বাসিন্দা। বিয়ে করেছেন, দুই মেয়ে ও একটি সন্তানের জননী। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসদ্বয় 'দি লাইং ডেস্' ও 'এ ওআর্ল্ড অফ স্ট্রেঞ্জারস'। তাঁর গল্পগ্রন্থ দুটি 'দি সফ্ট ভয়েস অব দি সার্পেন্ট' ও 'সিক্স ফিট্ অব দি কানট্রি'। ১৯৫৫ থেকে তিনি ইংল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি, আমেরিকা, ইজিপ্ট, গোটা আফ্রিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন। সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে তিনি সবিশেষ পরিচিত। লণ্ডন, নিউইয়র্ক থেকে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

'দি স্মেল্ অব ডেথ্ অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

স্যানি উইস-এর জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার এক খামারবাড়িতে। শিক্ষা ইংরেজিতে হলেও পারিবারিক ভাষা আফ্রিকান। জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করে তিনি দেখলেন ইংরেজি মাধ্যম তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি। এদিকে বিয়ে হয়েছে, সংসারেও বড়। ছেলেরা বড় হয়ে উঠলে তিনি লেখার জন্যে অবসর পেলেন। স্কেচ্ ও ছোটোগল্প লিখতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম বই যখন বেরুল, বয়স ৫২। লেখার বিষয়ে ভীষণ খুঁতখুঁতে। ছোটো দুটি উপন্যাস লিখে ছাপতে দিতে দ্বিধান্বিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প 'দি লাইটেঙ্গাল সিংস'।

উইস ক্রিগ-এর সাহিত্যপ্রতিভার পিছনে লেখিকা মা স্যানি উইস-এর প্রেরণা। কবি, নাট্যকার, ছোটো গল্পকার, সমালোচক, ভ্রমণ-কাহিনী লেখক, অধ্যাপক, রেডিয়ো-সমালোচক উইস গ্রাৎসিয়া লোরকার রচনারও কৃতী অনুবাদক। ১৯৩১-৩৫ সারা ইউরোপ তছনছ করে বেড়িয়েছেন। কখনো সাঁতারু, কখনো শারীর শিক্ষক, কখনো ফিল্ম-একস্ট্রা, কখনো হোটেলবয়, কখনো পেশাদার রাগবি খেলোয়াড়। জর্মানদের হাতে বন্দী হবার আগে পর্যন্ত তিনি সমর সংবাদদাতা। ইতালির কারাগার থেকে পলায়ন করেন। ১৯৪৪-এ আমেরিকান আর্মিতে যোগদান করে ইউরোপে যান। বি-বি-সি-তে পাঁচটি ভাষায় তিনি ব্রডকাস্ট করেন। উপন্যাস এবং ছোটোগল্পের জন্যে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি। ১৯৫৮-এ নাটাল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাহিত্যে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দেন। 'কফিন' ছোটোগল্পে পারিবারিক কাহিনীকে তিনি অনবদ্য রূপ দিয়েছেন।

এজিকিল মফাহ্লিলির জন্ম ১৯১৯, প্রিটোরিয়ার বস্তি অঞ্চলে। তেরো বছরের আগে লেখাপড়া করবার সুযোগ পাননি। শৈশব কেটেছে মায়ের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে দাসিবাঁদির কাজে। পরিবারের তিনটি সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদন ও ইস্কুল পাঠানোর জন্যে আর কোনো উপায় ছিল না। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও লেখক হাই ইস্কুলের পড়া শেষ করেন। বি-এ ডিগ্রির জন্যে ইংরেজি পড়েন। শেষ পর্যন্ত প্রশংসাসহ এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকা থেকে। থিসিসের বিষয় ছিল : 'দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজি উপন্যাসে অ-শ্বেতাকায় চরিত্র'। ইনি ইবাদানের ইউনিভার্সিটি কলেজের ইংরেজির লেকচারার। 'দি লিভিং অ্যান্ড ডেড' তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প। আত্মজীবনী 'ডাউন সেকেন্ড এভিনিউ' উচ্চপ্রশংসিত।

অন্যতম তরুণ লেখক জে আর্থার মেইমেন-এর জন্ম ১৯৩২, দক্ষিণ আফ্রিকায়। অ্যাংলিকান চার্চের মিনিস্টারের ছেলে। বি-এ ডিগ্রি লাভের পর সংবাদপত্রে কাজ নেন। সাহিত্যকেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ঘানায় বাস করেন। 'দি হাংরি বয়' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

নতুন আফ্রিকার লেখকদের গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠকদের যেটা সবচেয়ে মনে পড়বে সেটা হচ্ছে এই : জীবন্ত মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজের হীনমন্যতা দূর করতে গিয়ে তাঁরা অন্ধ জাত্যভিমানের বাঁধিতে দুষ্ট নন। মানুষের সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে [illegible] কালো চামড়ার সঙ্গে সাদা মানুষেরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন। কারণ [illegible] মানুষ, তিনি কালোই হোন আর সাদাই হোন একই আগুনে পুড়ছেন।

—[illegible] আচার্য

নতুন বই

মন্দাক্রান্তা—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশ ভবন; ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রবীণ-পরিণত কথাশিল্পী। শব্দ-চয়নের চমকে, ভাষার ব্যঞ্জনায় এবং কাহিনী-গ্রন্থনের অভিনবত্বে রবীন্দ্রোত্তর যুগের কথাশিল্পীদের মধ্যে তিনি একটি গৌরবময় স্থানের অধিকারী।

এ কাহিনীর নায়ক অতনু ঘোষাল ধনী ঘরের মেয়ে জয়তীকে ভালোবেসেছিল। জয়তী ঠিক প্রত্যাখ্যান করে নি এ ভালোবাসা। কিন্তু মুন্সেফী উপলক্ষ্যে অতনুর যখন কলকাতা ছেড়ে মফস্বল-বাংলার দুর্গম দূরবর্তী অঞ্চলে যাবার প্রশ্ন উঠল তখন ধনী পিতা শিল্পপতি সুপ্রকাশ চাটুজ্জের কথায় সায় দিয়ে নায়কের চাকুরী এবং কর্মক্ষেত্রের প্রতি সরাসরি অবজ্ঞাই প্রকাশ করেছে।

অচিন্ত্যবাবু দেখিয়েছেন, এ অবজ্ঞার পরিণতি শোচনীয় হয়ে উঠল শেষ অবধি। জয়তীর বিয়ে হল বিত্তবান এক চরিত্রহীন সতীকান্ত মুখোর্জির সঙ্গে; আর অতনু থাকল অবিবাহিত। মুন্সেফী করতে করতে মফস্বল বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াল সে; যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের আঙিনায় গিয়ে পৌঁছল। এদিকে দিন এগোল যত, অতনুর প্রতি জয়তীর আক্রোশও তত বেড়ে চলল। অচিন্ত্যবাবু দেখাতে চেয়েছেন, এ আক্রোশ নায়কের প্রতি তার অবরুদ্ধ প্রেমেরই ফলশ্রুতি। আর নায়ক যে জীবনে নিঃসঙ্গতাকে বরণ করে নিয়েছে, তারও মূলে ঐ প্রেম।

সংক্ষেপে বলতে হয়, অতনু ও জয়তীর এই প্রেমকথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। দুই মেয়ে বিয়ে দেবার পর সতীকান্তের লাম্পট্যও বিসদৃশ ঠেকেছে।

এই সতীকান্ত ব্যভিচারের অভিযোগে তার এক বান্ধবী অনুরাধাকে খুন করল; এই খুনের মামলা শেষ অবধি উঠল বিচারক অতনু ঘোষালের এজলাসে। এদিকে জয়তীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে সতীকান্তর এবং বিবাহ-বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে দুজনের সম্পর্ক যে জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নানাভাবে।

শেষ অবধি বিচারক অতনুর বাড়িতে প্রৌঢ়া জয়তীর নাটকীয় আবির্ভাব এবং আত্মসমর্পণ চিত্তাকর্ষক।

ফ্ল্যাশ-ব্যাকে সমগ্র কাহিনীটি বলে অচিন্ত্যবাবু এখানে গল্পরস জমিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অতনুর বাড়িতে জয়তীর

আবির্ভাবের সূত্র ধরে তিনি শুরু করেছেন কাহিনী। জয়তীর কাছে অতনুর চিঠি-লেখাকে উপলক্ষ্য করে নদীমাতৃক অবিভক্ত গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন জায়গার যে ছবি তিনি এখানে এঁকেছেন, সহৃদয় যে কোনো বাঙালী পাঠককে তা স্পর্শ করবে।

কালের যাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক—শঙ্খ ঘোষ। প্রকাশক—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবামাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়।' শ্রীশঙ্খ ঘোষ প্রধানতঃ এই উক্তির আলোকেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিচার করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাটকে কালের ব্যবহারকে কয়েকটি পর্যায়ে সাজিয়ে দেখেছেন তিনি। ডাকঘরে সান্তকাল থেকে অনন্তকালের দিকে উদাস ফাল্গুনী ও মুক্তধারা হয়ে কী করে রক্তকরবীতে আপাতসংহতির মধ্যে মুক্তি অন্বেষণ বাসনা, বিশ্লেষণধর্মী প্রাঞ্জল আলোচনার মাধ্যমে তা বোঝাতে চেয়েছেন। তবে নৃত্যনাট্যগুলিতে বন্ধনমুক্ত এক গতির সংহতির সন্ধান কী করে দিয়ে গেল, এবং সান্ত-অনন্ত মিলিয়ে নটী কী করে কালের মুক্তি ঘটিয়ে দিল, সে সম্পর্কে আলোচনা আরও একটু বিস্তারিত হলে ভাল হত। অবশ্য সব দিক মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নাটকের পটভূমিকায় লেখক নাট্যমুক্তি, নাটকে নাচ-গান, নাট্যমুক্তি ও ভাষা, নাটকে প্রতীক পটভূমি ও অভিনয় নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা প্রশংসার দাবী রাখে। 'নাটকে গান' প্রবন্ধটিতে তথ্য ও সাহিত্যিক দৃষ্টির সমাবেশ ঘটেছে।

অপারণীতা (উপন্যাস)—এন মুখোপাধ্যায়। দি বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২। দাম আঠারো টাকা।

বৃহদায়তন ১৬৭ পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড বই। আকারে আয়তনে অসংখ্য চরিত্রসৃষ্টিতে এ আর এক রামায়ণ। রায়পুরের রায়বংশ আর নারায়ণপুরের চৌধুরী বংশ দুই প্রাচীন জমিদার। বংশপরম্পরায় এই দুই জমিদার-বংশের মধ্যে রেশারেশি চলে আসছে। এই দুই বংশই 'অপারণীতা' উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমি। রামায়ণ-মহাভারতের মতো এই গ্রন্থে এই জগৎ এবং জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যার ওপর গ্রন্থকার আলোকপাত না করেছেন। জমিদার, নায়েব, জড়িগাছি, গুরুদেব, সন্ন্যাসী, অর্জুন, গীতা, চণ্ডী, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শ্রমতন্ত্র, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, দলগত সাম্রাজ্যবাদ, জড়বাদ, ধনবাদ, নিটশেবাদ, জন্মান্তরবাদ, কাম, প্রেম, নর-নারীর অসামাজিক সম্পর্ক, নর-নারীতত্ত্ব, [illegible]—সব বিষয়েই লেখকের তীর্যক মন্তব্য জুড়েই এই বিরাট গ্রন্থ। লেখক বিস্তর পড়াশোনা করেছেন, অভিজ্ঞতাও তাঁর প্রচুর। কিন্তু জীবনের সবকিছু একটা গ্রন্থে সমাবেশ করতে গিয়ে বিভ্রাট বাধিয়ে বসেছেন, কাহিনী হয়েছে এলোমেলো এবং অবান্তর। উপন্যাসের রীতি-প্রকরণ, কাহিনীর বিন্যাস ঘটনার সংস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে সাহিত্য-সমাজে প্রচলিত সুষ্ঠু রীতি তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। ফলে 'মুখর ভাষণে' ভরা এই বিরাট গ্রন্থ পাঠকের মনে আনন্দ উৎসুক্যের বদলে ভীতি ও বিরক্তির সঞ্চার করে। আকারে বিস্তারে 'অধিকন্তু ন দোষায়' হলেও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আতিশয্য একটি প্রকাণ্ড বাধা লেখক তা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছেন। যতি চিনাও যে একটা আর্ট তা তিনি ভুলে গেছেন। কড়া চোখে বিচার করে মুখর ভাষণ কিছুটা বর্জন করতে পারলে কাহিনীর অসংলগ্নতা এবং ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি দূর হয়ে 'অপারণীতা' একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত।

তবুও লেখককে অভিনন্দন জানাই জগৎ ও জীবন, দেশ ও সমাজ, রাষ্ট্রনীতি এবং দলনীতি সম্পর্কে তাঁর নির্মম উক্তি দৃষ্টিপাতের জন্যে এই বৃহৎ গ্রন্থ-বারিধি আলোড়ন করে যাঁরা হাঁসের মতো নীর থেকে ক্ষীরটুকু ছেঁকে পান করতে পারবেন তাঁরা অসাধ্য সাধন করতে পারলে উপকৃত হবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছাপা-বাঁধাই ভালো। মুদ্রণপ্রমাদ সংখ্যাহীন।

বিপ্লবী চে গুয়েভারা—জীবনী। সুনীল-কুমার ঘোষ। ভারতী প্রকাশনী, ২ কলেজ রো। কলকাতা ৯। দাম ছয় টাকা।

আজকের মানুষের কাছে একটি বিস্ময়কর নাম আর্নেস্টো চে-গুয়েভারা। আর্জেন্টিনায় জন্ম এই অগ্নিগর্ভ পুরুষ পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংকল্পে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন বিপদের সঙ্গে লড়াই করে। শত্রুর বুলেট বেয়নেট বিমান আক্রমণ করে লাতিন আমেরিকায় নতুন প্রভাতের জন্ম দিয়ে গেছেন। মাত্র উনচল্লিশ বছরের এই বিপ্লবী যোদ্ধা বলিভিয়ায় নৃশংসভাবে নিহত হন। তাঁর মৃত্যু ষড়যন্ত্রকারীদেরই হোক না কেন, তা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ। গুয়েভারার একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিপ্লব এবং পীড়িত মানুষের মুক্তি। সেই বিপ্লবের কল্পনা তিনি নিরাপদ দূরত্বে বসে করতেন না। গুয়েভারার অন্যতম কীর্তি লাতিন আমেরিকায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ। তিনি মনে করতেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ রাশিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি নয়। সেই মতবাদ দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করতে রাশিয়ার স্তাবকতা না করলেও চলবে। সমসাময়িক চিন্তাশীলদের সমাজে গুয়েভারা তাই একটি বিস্ময়। শ্রীসুনীল-কুমার ঘোষ গুয়েভারার জীবনকথা পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন তথ্য দিয়েছেন। নিপীড়িত মানুষের মুক্তিতে বিপ্লবের কৌশল বিষয়ে গুয়েভারার চিন্তাধারা ও নির্দেশিত পথ নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে সে সম্পর্কেও গ্রন্থকার সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

আন্তর্জাতিক (শারদীয় সংখ্যা) ঃ প্রধান সম্পাদক ঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়; পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ কর্তৃক ১৪৪ লেনিন সরণি, কলকাতা—১৩ থেকে প্রকাশিত; দাম ঃ তিন টাকা।

'আন্তর্জাতিক'-এর শারদীয় সংখ্যাটি বিষয়বৈচিত্র্যে এবং সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্যে খুবই প্রশংসার দাবী রাখে। কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (মস্কো চুক্তি এবং ইউরোপীয় শান্তি), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (যুগ সংক্রান্তির পরিক্রমায়), বসন্ত সরকার (কেরালের মধ্যবর্তী নির্বাচন ও বর্তমান রাজনীতি), বহ্নি চক্রবর্তী (ভিয়েতনাম ১৯৫৪-৭০), বিভূতি মুখোপাধ্যায় (আন্তর্জাতিক নাট্য-চিত্র ও আমাদের নবনাট্য), অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য (পশ্চিমসংস্কৃতি আন্দোলন প্রসঙ্গে), জ্যোতি দাশগুপ্ত (বঙ্গ পরিস্থিতি), গোপাল চট্টোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর ও ইয়ং বেঙ্গল), শংকর চক্রবর্তী (মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান জীবের সন্ধানে), টি এন সিদ্ধান্ত (এ আই টি ইউ সি-র পঞ্চাশ বছর)। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, ধনঞ্জয় দাশ, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বিষ্ণুপদ মাজী, অরুণ সেন প্রমুখ। গল্প লিখেছেন মিহির সেন, অখিলচন্দ্র সরকার, দিলীপ সেনগুপ্ত ও অসিত ঘোষ। এর অন্যতম উল্লেখ্য অনুবাদ সাহিত্য। আফ্রিকার কবিতা অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু দে, ইন্দোনেশিয়ার অচিন্ত্য সান্যাল এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাপানী লেখক কাওয়াবাতার একটি গল্প অনুবাদ করেছেন জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। একটি সাড়া জাগানো নাটক লিখেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য।

আনুপ্য (আগস্ট ১৯৭০)—সম্পাদক সুধীরকুমার পোদ্দার। ৫০।৮এ [illegible] লেন, কলকাতা—৪। এক টাকা।

এ সংখ্যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য'-এর চলচ্চিত্র রূপের ওপর একটি আলোচনা। লিখেছেন অনিল নন্দী। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন হো চি মিনের 'প্রিজন ডায়েরী'র কয়েকটি কবিতা। এবং সুধীর পোদ্দার লিখেছেন 'অ্যালিয়েনেশন ও মার্কস' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় দৃষ্টি ও রচনানির্বাচন প্রশংসার্হ।

বইকুণ্ঠের খাতা

হাজার বছরের বাংলা গান

উৎসবের সময় টের পাই, বিনা উৎসবেও বুঝতে পারি, বাংলাদেশ গানের রাজ্য। এখানে উৎসব শুরু হয় গান দিয়ে, শেষ হয় সমাপ্তি সঙ্গীতে। দুঃখ-শোকে, আনন্দে, বিষাদে গানের কমতি নেই। পাড়ায় পাড়ায় জলসা, রেকর্ডের গান— যেন দিনযাপনের সঙ্গী। পানের দোকানে বেতার সঙ্গীত।

কথাটা এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের মৌসুমী হাওয়ায় নাকি গানের সুর ভেসে বেড়ায়। নদীতে জল-তরঙ্গের ধ্বনি। দুর্গাপুজোর আগে আগমনী, শেষে বিজয়া।

এসব নিয়েই আমাদের সাঙ্গীতিক জয়যাত্রা। শুনেছি, এই বাংলাদেশেই নাকি প্রায় একশ বছর আগে, ঠুংরী গানের জন্ম হয়েছিল মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে।

হাজার বছরের বাংলা গান—

আলোচনা হবে হাল্কাভাবে শুরু করলেও শেষটায় এত হাল্কা মন নিয়ে শেষ করতে পারবো না। আমার হাতে এখন একটি গানের মূল্যবান সংকলন। তার দাবীকে উপেক্ষা করতে পারছি না।

দূরে-কাছে মাইকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

অথচ কলকাতা এককালে এমন ছিল না। তেরো চোদ্দ বছর আগে প্রমথ চৌধুরী যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা ছিল না, 'কলকাতার ভদ্র-সন্তানেরা একদম সঙ্গীত ছুট।'

তাঁর মা নাকি গান শুনতে ভালোবাসতেন। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও তেমন একজন গায়কের সন্ধান পাওয়া যেত না। শেষ পর্যন্ত এক বুড়ো চপওয়ালীকে ডেকে মাঝে মাঝে তিনি শ্যামাসঙ্গীত শুনতেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার গোস্বামী 'হাজার বছরের বাংলা গান'-এর একটি সুদীর্ঘ সংকলনের ভূমিকায় লিখছেন : এই হচ্ছে তখনকার বাংলাদেশের সঙ্গীতের অবস্থা। 'অবশ্য পল্লীঅঞ্চলে কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল ইত্যাদির প্রচলন ছিল; কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার ফলেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, এ জাতীয় সঙ্গীতেও একটু মন্দা পড়েছিল। অল্পসংখ্যক ধর্মমূলক গান ছাড়া ভদ্রসমাজে প্রচলিত গান বাংলা ভাষায় বলতে গেলে ছিলই না।'

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিশোরী চাটুজ্জের কাছে যে-গান শিখেছিলেন, তা কিন্তু ধ্রুপদী কিংবা ঠুংরী নয়—একেবারে দেশজ গান, পাঁচালি সঙ্গীত।

অথচ তার আগেই বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদী গানের রেওয়াজ ছিল। মেটিয়াবুরুজে ঠুংরীর প্রবর্তন হয়ে গেছে। রামনিধি গুপ্ত টপ্পায় খ্যাতি অর্জন করেছেন।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী সে ইতিহাস বিস্মৃত হন নি। ছেচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ বিশ্লেষণে তিনি বাংলা গানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন শিরোনামে। যেমন : (১) চর্যাপদ (২) জয়দেব ও গীতগোবিন্দ (৩) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন (৪) মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গলগীত (৫) বৈষ্ণব পদাবলী (৬) কীর্তন (৭) শাক্তপদাবলী (৮) বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা (৯) ব্রহ্মসঙ্গীত (১০) উমা সঙ্গীত (১১) বাউল ও দেহতত্ত্বের গান (১২) প্রেমের গান (১৩) দেশাত্মবোধক গান (১৪) প্রকৃতি ও ঋতুর গান (১৫) কাব্যের গান (১৬) উৎসব ও আনুষ্ঠানিক গান (১৭) হাসির গান।

আলোচনাপ্রসঙ্গে সম্পাদক কখনো ভোলেন নি যে, আদি ও মধ্য যুগে বাংলা গান ও কবিতার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। প্রায় সব গানই ছিল কবিতা, কিংবা সব কবিতাই লেখা হতো গান হিসেবে।

পূর্ববর্তী সংকলন-গ্রন্থ

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কবি ও গীতিকারদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। নিজেও কিছুকাল গান বেঁধেছিলেন কবিওয়ালাদের দলে ঘুরে ঘুরে। তখন তিনি সংকল্প করেছিলেন : 'এই সৎকার্য সাধনে যদ্যপি সর্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়, তথাচ আমরা এই কর্তব্যকল্পে কখনই ক্ষান্ত হইব না।'

তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি।

রামনিধি গুপ্তের মৃত্যুর আগেই বেরুলো তাঁর গানের সংকলন। উনিশ শতকের শেষের দিকে বেরুল 'কমলাকান্ত পদাবলী' (১৮৮৫), 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' (১৮৯৪), 'গীতরত্নমালা' (১৮৯৬) 'গীতাবলী' (১৮৯৬), 'প্রীতিগীতি' (১৮৯৮) ও 'সাধক সংগীত' (১৮৯৯) প্রভৃতি গ্রন্থ।

বিশ শতকের প্রথম দিকেও অনুরূপ সংকলন প্রকাশের ধারা অব্যাহত ছিল। তখন সিনেমার গান ছিল না। কিন্তু নাটকের গান সংকলনের দিকে অনেকের নজর পড়েছিল। বেরুল রাজকৃষ্ণ রায়, মনোমোহন বসু প্রভৃতি নাট্যকারদের লেখা গানের সংকলন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগেই বেরিয়েছিল দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'জাতীয় সংগীত'। বিশ শতকের প্রথম দিকে সেই ধারায় প্রকাশিত হলো আরো কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ। যেমন : উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বাংলার গান' (১৯০৫), নব্যভারত সমিতির 'জাতীয় রাখী সংগীত' (১৯০৫) প্রভৃতি।

কেন এই সংকলন?

বর্তমানে কবিতার সঙ্গে গানের সম্পর্ক অনেক দূরবর্তী। গায়কেরা অনেকেই কবিতা পড়েন না। তাঁরা আধুনিক কবিতার পাঠক নন। এখন কবিতার সংকলন বেরোয় সাধারণ পাঠকের জন্য। গানের তেমন পাঠক নেই। শ্রোতা এবং দর্শক আছে। স্বভাবতই দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষের চাহিদাকে পূর্ণ করছে কবিতা এবং গানের সংকলনগুলি।

হাজার বছরের বাংলা গান সেই উদ্দেশ্যে সংকলিত নয়। তার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। পাঠকও যেমন আধুনিক বাংলা-কবিতার যে অংশ গান হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, [illegible] এবং সংকলনে সংকলিত করেছে [illegible] সেইদিক থেকেই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি। একদিকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ সংকলন যেমন মূল্যবান, একদিকে সঙ্গীত রসিকের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজনীয়।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, গানের এতগুলি সংকলন থাকতে নতুন করে আবার সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের কি প্রয়োজন?

তার উত্তরে তিনি লিখেছেন : '[illegible] প্রশ্ন [illegible] বাংলা গান হাজার বছরের মধ্যে বিচিত্র বিভিন্ন [illegible] গানের একটি প্রাতিনিধিমূলক সংকলন গ্রন্থের [illegible] অনুভব করেছি।...বর্তমানে বহু সঙ্গীত বিদ্যালয় রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত গান অন্যতম পাঠ্য বিষয়।...। ঐ সমস্ত পাঠ্যক্রমের দিকেও আমি লক্ষ্য রেখেছি। এই গ্রন্থে যাতে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ধরনের গান পাওয়া যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা তো হয়েছেই, বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীতও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।'

অর্থাৎ এই সংকলনের এমন একটা সামগ্রিক দৃষ্টি আছে যা ইতিপূর্বে প্রকাশিত আর কোনো সংকলনে ধরা পড়ে নি। বইটি শুধু সঙ্গীত শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের নয়, সাধারণ পাঠাগারের পক্ষেও সংগ্রহযোগ্য একটি মূল্যবান সংকলন।

[illegible] —গ্রন্থদর্শী

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৭)

বিকেলের রোদ এখন জানালায়। বৃন্দাবনী সব দরজা খুলে দিচ্ছে। এই ঘরে আয়নার সামনে অমলা কমলা। এখন সাজবে। বারান্দায় অমলা কমলা দাঁড়িয়ে আছে। দূরে শীতলক্ষ্যার পাড়। পাড়ে পাড়ে কাঠি মাথায় নিয়ে যাচ্ছে যারা, অমলা কমলা তাদের দেখছিল।

বৃন্দাবনী ডাকল, বড় খুকুরানী আসুন।

ওরা দেখল বৃন্দাবনী বড় আলমারি খুলেছে। ওদের জামা বের করছে। এখন সে ওদের চুল বেঁধে দেবে। বেলা পড়ে আসছে। ওদের [illegible] লেগে রয়েছে। ওরা বিকেলে অন্যান্য বাবুদের বাড়ি ঠাকুর দেখতে যাবে। সঙ্গে যাবে রামসুন্দর। আর বৃন্দাবনী ডাকলেই ওদের যেন এক খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। মার্বেল পাথরের মেঝে — ধুলো একটা কোথাও ফোটা যায় না। অথচ এই দুই মেয়ে কি সুন্দর মসৃণ মেঝের উপর ছুটতে পারে। বৃন্দাবনী ডাকলেই — ওরা ছুটে পালাবে, কারণ সে ওদের চুল এত আঁট করে বেঁধে দেয় যে চুলে বড় লাগে।

সুতরাং বৃন্দাবনী আর ডাকল না। ডাকলেই ওরা পালাবে। সে পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে ধরে ফেলবে ভাবল। কিন্তু তার আগেই দুটো মেয়েরা টের পেয়ে গেছে। ওরা সেই খেলায় মেতে গেল—ঠিক যেন ওরা ছোট্ট দুটো পাখী হয়ে যায়—ওরা মেঝের উপর সুন্দর পা টিপে টিপে হাতের উপর অদ্ভুত ব্যালেন্স রেখে ছুটতে থাকে—ঠিক ব্যালেরিনা যেন। হাত তুলে, নদীর পাড়ে অথবা অদ্ভুত কায়দায় ওরা যেন ক্ষণে ক্ষণে মসৃণ বরফে পা তুলে তুলে নাচে। তখন বৃন্দাবনীর রাগ হয়। সে কেন ওদের ছুটে ধরতে পারবে! তখন সে অভিমান করে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলে না। ওর মুখ দেখলে ওরা টের পায় সে রাগ করেছে। তখন ওরা আর দেরী করে না। এসে ধরা দেয়। কারণ এই বৃন্দাবনীর কাছেই ওরা শিশুবয়স থেকে বড় হয়ে উঠছে।

অমলা বলল, আমি আজ চুল বাঁধব না পিসি।

বৃন্দাবনী একবার কাজের ফাঁকে চোখ তুলে তাকাল কিছু বলল না।

অমলার ইচ্ছা ওর চুল ফাঁপানো থাকুক। ঘাড় পর্যন্ত বব করা চুল। চুলটা পিঠের নীচে নামলেই কেটে ফেলা ঠিক নয়। এখন তোমাদের বয়স হচ্ছে মেয়ে। এই বয়সে চুল আর একটু বড় হতে দাও। আমি বেশ এঁটে বেনী বেঁধে দি। তবে চুলের গোড়া শক্ত হবে। মাথা থেকে বড় হয়ে ঝুর-ঝুর করে চুল উঠে যাবে না।

অথচ ওদের মুখ বব কাটা চুলে বড় সুন্দর দেখায়। তাজা ডেফোডিলসের মতো। কতবার ভেবেছে মাথা নেড়া করে দেবে, নেড়া করে দেবে শুনলেই ওরা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। বৃন্দাবনীর তখন কষ্ট হয়। মেজবাবুকে আর চুল কাটা নিয়ে পীড়াপীড়ি করে না।

মেজবাবুকে বৃন্দাবনী যেমন ছোট থেকে বড় করে তুলেছে, যে যত্ন এবং সেবা ছিল প্রাণে সেই যত্নে এই দুই মেয়ে বৃন্দাবনীর হাতে ক্রমে মানুষ হচ্ছে। ওরা ফের ছুটতে চাইলে বৃন্দাবনী ধমক দিল। রাগ করতে চাইল। দুমদাম আলমারির দরজা বন্ধ করে দিতে চাইল। মেয়েরা আসছে না। যে যার মতো সারা ঘরে ফের ছুটে বেড়াচ্ছে।

কলকাতার বাড়িতে হলে বৃন্দাবনী জোরে ধমক দিতে পারত। কিন্তু এখানে সে কিছু পারে না। কলকাতার বাড়িতে সেই সব। সে না থাকলে এই দুই মেয়ে মায়ের মতো ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অনাধুনিক হত। কি সুন্দর বাংলা বলে ওরা। পূজা আচায় অগাধ ভক্তি। পূজা এলেই ওরা কবে দেশের বাড়িতে যাবে এই বলে মেজবাবুকে পাগল করে দেয়। সন্ধিপূজোর সময় বাড়ির সব মেয়ের মতো করজোড়ে চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। মোষ বলি হলে রক্তের ফোঁটা কপালে, ফোঁটা দিলেই শরীরের সব পাপ মুছে যায়, শুধু তখন পবিত্র এক ভাব থাকে শরীরে। বৃন্দাবনী যেন ওদের মুখ দেখলেই তা টের পায়।

মেজবাবুর স্ত্রী এসব পছন্দ করেন না, করেন কি করেন না সেও সে ভাল করে জানে না, তবু, প্রতিবারে ওদের পুজো দেখতে আসা নিয়ে একটা মনোমালিন্য এবং ক্রমে তা প্রকট হতে হতে কখন জানি ওরা দুজনেই পরস্পর দূরের মানুষ হয়ে যান। বৃন্দাবনী টের পায় মেজবাবু ওদের নিয়ে স্টিমার ঘাটে নামলেই একেবারে সরল বালক, যেন কতদিন পর ফের আসা, নদীর পাড়ে নেমেই জন্মভূমিকে তিনি গড় হয়ে প্রণাম করেন, মেয়েদের বলেন, এই তোমার দেশ, বাংলাদেশ, এই তোমাদের পিতৃভূমি, তারপর চুপচাপ হাঁটেন। গাড়িতে তিনি বাড়ি উঠে যান না। চারপাশে নদীর জল, মাঠের ঘাস এবং সারি সারি পামগাছের ছায়ায় নিজের বাল্যকাল স্মরণ করে কেমন অভিভূত হয়ে যান। এই পথে তিনি কৈশোরে কতদিন ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে পাড়ে কতদূর চলে গেছেন!

বৃন্দাবনী দেখছে এই নিয়ে কোন বচসা হয় না। মেজবাবু কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে কদিন সকালে মহাভারত পাঠ করেন শুধু। সন্ধ্যায় ক্লাবে যান না। মেজবৌরাণী তখন গীর্জায় যান। ফাদার আসেন বাড়িতে। দক্ষিণের দিকে যে দোতলা সাদা মোজেয়িক হলঘর সেখানে ফাদারের পায়ের নিচে তিনি বসে থাকেন।

আর অমলা দেখেছে, বাবা পূজোর আগের কদিন মার ঘরের দিকে যাননি একবার। মার মুখ ভীষণ বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত। রাতে বাবা নিচের ঘরে শুয়ে থাকেন। দুপুর রাতে সহসা সহসা বাবা ফ্লুট বাজান। কেন যে এমন হচ্ছে দুজনের ভিতর —ওরা তা কিছুই অনুমান করতে পারত না। সকাল হলেই দু বোন চুপচাপ স্কুলে চলে যায়। স্কুল থেকে এসে আর সারা বাড়িতে ছুটতে সাহস পায় না। মার মুখ

বিষণ্ণ প্রতিমার মতো হয়ে গেছে। মা ক্রমে পাথর হয়ে যাচ্ছেন। এ-দেশে মা যেন বাবার সঙ্গে কিসের অন্বেষণে সমুদ্র পার হয়ে চলে এসেছিলেন। চোখ দেখলে মনে হয় তিনি তা পাননি। অথবা কখনও কখনও মনে হয় কোথাও তিনি কিছু ফেলে চলে গেছিলেন, এদেশে ফিরে আসার তা আবার তার মনে হয়েছে। তিনি সারাক্ষণ মাঠের দিকের বড় জানলাটায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঠ পার হলে সেই দুর্গ, দুর্গের মাথায় হাজার হাজার জালালি কবুতর উড়ছে। মা সেসব দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। কি যেন খোঁজেন সব সময়।

এই যখন দৈনন্দিন সংসারের হিসাব তখন বৃন্দাবনী দুই মেয়েকে বাংলা দেশের মাটির কথা শোনায়। শরৎকালে শেফালি ফুল ফোটে, স্থলপদ্ম গাছ শিশিরে ভিজে যায়, আকাশ নির্মল থাকে, রোদে সোনালি রঙ ধরে—এই এক দেশ, নাম তার বাংলা দেশ, এ-দেশের মেয়ে তুমি। এমন দেশে যখন সকালে সোনালি রোদে মাঠে, যখন আকাশে গগনভেরির পাখি উড়তে থাকে, মাঠে মাঠে ধান, নদী থেকে জল নেমে যাচ্ছে, দু পাড়ে চর জেগে উঠছে, বাবলা অথবা পিটকিলা গাছে ছেঁড়া ঘুড়ি এবং নদীতে নৌকা, তাল্লের অথবা আনারসের তখনই বুঝবে শরৎকাল এ-দেশে এসে গেল। তুমি অমলা কমলা এমন এক দেশে নীল চোখ নিয়ে জন্মালে, সোনালি রঙের চুল তোমার, তুমি যদি কোনদিন কোন হেমন্তের মাঠ ধরে ছুটতে থাক তবে তুমি এক লক্ষ্মী প্রতিমা হয়ে যাবে। এমন মেয়েরা দুষ্টুমি করে না। এস তোমাদের চুল বেঁধে দি।

বৃন্দাবনী ওদের এবার নিখুঁতভাবে সাজিয়ে দিল। ওরা যতক্ষণ সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে না গেল ততক্ষণ সে তাকিয়ে থাকল। ওরা ঘুরে ঠাকুমার ঘর হয়ে গেল। কাকিমাদের ঘরে দেখা করে গেল। মেজবাবু এই সংসারে ম্লেচ্ছ মেয়ে বিয়ে করার জন্য নানারকমের অবহেলা পাচ্ছেন—এই বলে হয়ত এই দুই মেয়ে যারা উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তির একটা বড় অংশ দখল করে আছে, অথচ কিছুই হয়ত শেষপর্যন্ত পাবে না—এমন কিছু ভাবভাবনা থাকায়, কিছু করুণা, কিছু ভালবাসা এই মেয়েদের প্রতি কম বেশি সকলের। ওরা এমন তাজা আর স্নিগ্ধ, এত বেশি অকারণ হাসে, আর এমন অমায়িক—মনে হয় কেবল দুই জাপানি কল দেওয়া পুতুল, কেবল হাত পা তুলে ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে। সুতরাং তারা নিচে নেমে গেলেই, কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে অন্দর।

ওরা ক্রমে নামছে, আর চারিদিকে তাকাচ্ছে। সোনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। একবার দুপুরের দিকে সিঁড়ির মুখে সোনাকে পেয়েছিল, কিন্তু কপালে মোমের রঙে ফোঁটা দিতে না দিতেই ছুটে পালিয়েছে। সে যে গেল কোথায়!

নিচে নেমে দেখল খালেক মিঞা গাড়িতে বসে নেই। হাতির মাহুত জসীম এসেছে গাড়ি নিয়ে। পিছনে রামসুন্দর তকমা এঁটে দাঁড়িয়ে আছে।

অমলা খালেককে না দেখে বিস্মিত হল। বলল, তুমি জসীম!

—হ্যাঁ, মা ঠাইরেন। আমি।

—খালেক কোথায়?

—অর অসুখ মা-ঠাইরেন।

—কি হয়েছে?

—জ্বর, কাশি।

সকালের রামসুন্দর আর এই রামসুন্দরকে চেনাই যায় না। এ-দিনের জন্য সে কারো বান্দা নয়। কেবল দেবীর বান্দা। কিন্তু যেই শুনেছে বড় খুকুরানী আর ছোট খুকুরানী যাবে পুজো দেখতে, অন্য বাবুদের নাটমন্দিরে যাবে, কুলিন পাড়ার ঠাকুর দেখতে যাবে—সে তখনই উর্দি পরে দৌড়েছে। এখন দেখলে মনে হবে রামসুন্দরকে সে দেবীর বান্দা আর বান্দা এই দুই মেয়ের।

রামসুন্দর নাগরা জুতো পরেছে, সাদা উর্দি পরেছে, কোমরে পিতলের বেল্ট। বেল্টের পিতলের পাতে এই পরিবারের প্রতীক চিহ্ন। ওর মাথায় নীল রঙের পাগড়ি, জরির কাজ করা পাগড়ি একটা বুলবুলি পাখির বাসার মতো। ভিতরটা উঁচু হয়ে টুপির মতো উঠে গেছে। সোনা এখন ওকে দেখলে বলত, রামসুন্দর তুমি কোন দেশের রাজা?

অমলা কমলা এ-সব কিছুই দেখল না। খুব গম্ভীর মুখে গাড়িতে উঠে গেল। বাড়ির দাসি বাঁদি অথবা ভৃত্যদের সামনে, অথবা বের হবার মুখে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, সে ভয়ে দুই বোনই একেবারে চুপচাপ পাশাপাশি বসে আবার চারিদিকে কাকে যেন খুঁজল। সোনা যে কোথায়? অথবা এ-অবেলায় সে কি ঘুমোচ্ছে! অমলার বলতে পর্যন্ত সাহস হল না গাড়ি কাচারিবাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। এখানে এলেই কিছু আইন কানুনে পড়ে যেতে হয়। যেখানে সেখানে একা একা গেলে ঠাকুমা রাগ করেন। যে বাবা ওদের এত ভালবাসেন তিনি পর্যন্ত অন্দরের বাইরে বের হতে দেখলে বলেন, তোমরা এখানে কেন। ভিতরে যাও। অথচ কলকাতার বাড়িতে এমন কিছু একটা নিয়মের ভিতর ওরা মানুষ হচ্ছে না। মালিদের ছেলেরা ওদের হয়ে কতরকমের কাজ করে দেয়। পুতুলের ঘর বানিয়ে দেয়। এবং ওরা বাড়িময়, সেও তো বড় বাড়ি, বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি, ছুটে শেষ করা যায় না, তেমন এক বাড়িতে ওরা মানুষ হচ্ছে বলে এখানে এইসব নিয়ম মাঝে মাঝে ওদের খুব দুঃখী রাজকুমারী করে রাখে। অমলার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল সোনাকে নিয়ে পুজো দেখতে যায়। দু বোনের মাঝে সোনা বসে থাকবে—কি যে ভাল লাগবে না, সোনার শরীরে চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে, এমন একটা গন্ধ সে যে পায় কোথায়! অথবা কেন জানি মনে হয়েছে, গত রাতে দাতাকর্ণের পালা হয়েছে, বৃষকেতুর সেই সুন্দর উজ্জ্বল মুখ, টানা লম্বা চোখ, ছোট মানুষ এবং কি অসীম পিতৃভক্তি, সোনা যেন ওর কাছে সারাক্ষণ বৃষকেতু হয়ে আছে। গত রাতে অমলা চিকের আড়াল থেকে দেখেছে, সোনা তার পাগল জ্যাঠামশাইর পাশে বসে ছিল আসরে। যাত্রা দেখতে দেখতে সে পাগল জ্যাঠামশাইর হাঁটুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কি আশ্চর্য সেই মানুষ পাগল ঠাকুর! সারাক্ষণ শক্তভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে বসেছিলেন। হাত পা এতটুকু নাড়াচাড়া করেননি। যেন হাত পা নাড়লেই সোনার ঘুম ভেঙে যাবে। আর অমলা দেখেছিল, ওদের পিসিরা অথবা কাকীমারা— সবাই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে পাগল মানুষটাকে দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়লণ্ঠনে তখন নানারকমের লাল নীল আলো জ্বলছিল।

গাড়িটা ক্রমে গাছের ছায়ায় নুড়ি বিছানো পথে বের হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ে ক্রুপ ক্রুপ শব্দ হচ্ছে। দীঘির নিরিবিলি জলে কিছু পদ্মফুল ফুটে আছে। আর শরতের বিকেল মরে যাচ্ছে। নীল আকাশ, গাছের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র মানুষ দেখা যাচ্ছে নদীর পাড়ে। সবাই ঠাকুর দেখতে বের হয়ে পড়েছে।

অমলা কেমন বিরক্ত গলায় বলল, সোনাটা যে কি না!

—কেন কি হয়েছে!

—ওকে দেখছি না কোথাও!

অমলা দীঘির এ-পার থেকে ও-পারের কাচারিবাড়ি লক্ষ্য রাখছে। মঠের সিঁড়িতে সে যদি একা বসে থাকে, অথবা ময়ূরের কিংবা হরিণের ঘরগুলো পার হয়ে সে যদি কুমিরের খাদে উঁকি দেয়। না কোথাও গাছের ফাঁকে পাতার অজস্র বিন্দু বিন্দু জাফরিকাটা খোপের ভিতর সে সোনাকে আবিষ্কার করতে পারল না। তখন কমলা বলল, সোনা আর আমাদের কাছে আসবে না।

এমন কথায় অমলার বুকটা কেঁপে উঠল।— আসবে না কেন রে!

—ও রাগ করেছে।

—আমরা ত ওকে কিছু বলিনি।

—রাগ না করলে এমন হয়। আমাদের দেখলেই পালায়।

অমলার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে গেল। সোনা আবার কমলাকে সব বলে দেয়নি ত!

এখন গাড়িটা নদীর পারে এসে পড়েছে। দুই সাদা ঘোড়া গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনি ক্রুপ ক্রুপ শব্দ ঘোড়ার পায়ে। তেমনি সূর্য অস্ত যাচ্ছে শীতলক্ষ্যার পাড়ে, তেমনি মানুষজন, গাড়ি দেখেই দুপাশে দাঁড়িয়ে এই প্রতিমার মতো দুই বালিকাকে গড় করছে। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। ঘোড়া দুটো নিঃশব্দে দুলে দুলে কদম দিচ্ছে।

অমলা বলল, সোনাকে কোথাও দেখলেই এবারে সাপ্টে ধরব বুঝলি। জোর করে ধরে আনব। দ্যাখি ও যায় কোথায়।

কমলা বলল, তুই ওর হাত দুটো ধরবি, আমি পা দুটো। চ্যাঙদোলা করে ছাদে তুলে নিয়ে যাব। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে সোনা কি করে দেখব।

অমলা ভাবল সোনাকে রাগালে চলবে না, ওকে তোয়াজ করে রাখতে হবে। সে যে কি করে ফেলল সোনাকে নিয়ে। সে এমনটা কমলাকে নিয়ে কতবার করেছে। কিন্তু সোনাকে নিয়ে! সে যেন আলাদা রোমাঞ্চ। আলাদা স্বাদ। ওর ভয়, সোনাকে কমলা না লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলে। সে বলল, ওকে চ্যাঙদোলা করে ছাদে তুলে আনব না। সোনা খুব ভাল ছেলে। ওকে আমি ভালবাসব।

কমলা দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, আমিও তবে ভালবাসব।

অমলা এমন কথায় কি যেন দুঃখ পেল ভিতরে। —তোর এটা স্বভাব কমলা। আমার যা ভাল লাগবে সেটা তোর চাই।

—আমার না তোর!

অমলা আর কথা বলল না। পিছনে রামসুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রায় একটা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সামনে শীতলক্ষার চর। চরে মনে হল সেই বড় মানুষ একা একা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে।

কমলা বলল, ঐ দ্যাখ দিদি সোনার পাগল জ্যাঠামশাই।

অমলা পিছনে দেখল সেই বালক, সঙ্গে সেই আশ্বিনের কুকুর। নদীর চর পার হয়ে ওরা কোথায় যাচ্ছে।

কমলা বলল, পিছনে সোনা না!

অমলা বলল, রামসুন্দর পিছনে কে, সোনা না!

রামসুন্দর বলল, আজ্ঞে তাই মনে লয়।

—জসীম গাড়ি চালাও। জোরে চালাও। বলে অমলা ফ্রক টেনে ঠিকঠাক হয়ে বসল।

পুরানো মঠ নদীর পাড়ে। মঠের ত্রিশূলে একটা পাখি বসে আছে। সোনা এবং তার পাগল জ্যাঠামশাই মঠ পর্যন্ত উঠে আসতে না আসতেই ওরা মঠের আগে উঠে যাবে। স্টিমার ঘাট পার হয়ে যাবে। এবং সোনা আর তার জ্যাঠামশাইকে ধরে ফেলবে। সোনাকে সঙ্গে নেবে, ওর পাগল জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকবে। ওরা চারজন, ঠিক চারজন কেন, রামসুন্দর জসীম আর আশ্বিনের কুকুর মিলে সাতজন, এই সাতজন মিলে বাড়ি বাড়ি দুগগা ঠাকুর দেখে বেড়াবে। সব শেষে যাবে পুরান বাড়ি, সে বাড়ির ঠাকুর দেখা শেষ হলেই ওরা ল্যান্ডোতে একটা বড় মাঠে নেমে যাবে। আশ্বিনের শেষাশেষি সময় বলে হিম পড়বে সাঁজ নামলেই। সাদা জ্যোৎস্না থাকবে। ওরা সকাল সকাল না ফিরে একটু রাত করে ফিরবে। সঙ্গে রামসুন্দর আছে—কি ভয়! সে উর্দি পরে একেবারে বীর-বেশে ল্যান্ডোর পিছনে কাঠের পুতুলের মতো সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।

আর তখন সোনাও দেখতে পেল, নদীর পাড়ে দুই ঘোড়া কদম দিচ্ছে। গাড়ির পিছনে যাত্রাপার্টির মানুষের মতো কে একজন সোজা দাঁড়িয়ে আছে। দূরে থেকে সোনা, রামসুন্দর যে এমন একটা রাজার বেশে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কল্পনা করতে পারল না। অমলা কমলা হাত তুলে ওকে ইশারায় ডাকছে।

সোনা তাড়াতাড়ি জ্যাঠামশাইর হাত টেনে ধরল। সোনাকে দেখেই পুরোনো মঠের পাশে ওরা ল্যান্ডো থামিয়ে দিয়েছে। যেন সোনাকে তুলে নেবার জন্য ওরা দাঁড়িয়ে আছে। সে আর ওদিকে হাঁটল না। আবার সে পিলখানা মাঠের দিকে উঠে যাবে। সে জ্যাঠামশাইর হাত ধরে ঠিক উল্টোমুখে হাঁটতে থাকল।

অমলা বলল, রাম তুমি যাবে। সোনাকে নিয়ে আসবে।

কমলা বলল, দেখলি, কেমন সোনা আমাদের দেখেই পালাচ্ছে।

রামসুন্দর গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল। সে সারি সারি পাম গাছের আড়ালে আড়ালে এসে সোজা চরে নেমে গেল। এখানে বাবুরা নদীর পাড় বাঁধিয়ে দিয়েছেন। সে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে কাশবনের দিকে ছুটতে থাকল।

সোনা দেখল, সেই রাজার বেশে মানুষটা চরের উপর দিয়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে। কাশবনের আড়ালে পড়ায় ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি জ্যাঠামশাইকে নিয়ে সেই কাশের বনে কোথাও লুকিয়ে পড়বে ভাবল। অমলা কমলা ওকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছে মানুষটাকে। কিন্তু সে লুকোতে গিয়েই দেখল কুকুরটা লেজ নাড়ছে, আর ঘেউ ঘেউ করছে। কুকুরটা রামসুন্দরকে তেড়ে যাচ্ছে।

সোনা আর লুকোতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি চরের উপর দিয়ে ছুটতে থাকল। সে কাচারিবাড়িতে উঠে গিয়ে মেজ-জ্যাঠামশাইর পাশে গদিতে বসে থাকবে চুপচাপ। সে কিছুতেই অমলা কমলার সঙ্গে আর কোথাও যাবে না, লুকোচুরি খেলবে না।

তখন বেশ মজা পাচ্ছিল আশ্বিনের কুকুর। পাগল জ্যাঠামশাই একা একা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তালের আনারসের নৌকা যাচ্ছে। হাঁড়ি পাতিলের নৌকা পাল তুলে যাচ্ছে। নৌকা যাচ্ছে উজানে। কেউ কেউ গুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওঁকে দেখলে মনে হবে, সোনাকে নিয়ে এই যে চরের ভিতর এখন ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, অমলা কমলা পর্যন্ত নেমে এসেছে—তিন-দিক থেকে তিনজন ধীরে ধীরে সাঁড়াশি আক্রমণ করে ওকে ছেঁকে তুলবে, তারপর ল্যান্ডোতে নিয়ে উধাও হবে—সে-সব তিনি খেয়াল করছেন না। তিনি যেন এখন নদীতে যে সব পালের নৌকা যাচ্ছে তা এক দুই করে গুনছেন।

মজা পেয়েছে আশ্বিনের কুকুর। সূর্যাস্তের সময় এ-একটা বিষম খেলা। সেও পাড়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। এদিক ওদিক ছুটছে সোনা, ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে। সোনার সঙ্গে সেও ছুটো-ছুটি করছে।

রামসুন্দর বলল, আপনেরা ক্যান নাইমা আইলেন!

অমলা বলল, এই সোনা, শোন। সে রামসুন্দর কি বলছে শুনছে না।

সোনা বলল, আমি যাব না।

—আমরা দুগগা ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি।

—যাও। আমি যাব না। সে তিনজনের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। ওর আর পালাবার উপায় নেই।

রামসুন্দর বলল, আপনে না গ্যালে ওনারা কষ্ট পাইব।

—আমি যামু না। সে কেমন একগুঁয়ে জেদি বালকের মতো একই কথা বার বার বলে চলল।

তখন অমলা ছুটে এসে খপ করে সোনাকে জড়িয়ে ধরল। —কোথায় যাবি!

আর আশ্চর্য সোনা, এতটুকু নড়তে পারল না! কি কোমল সুগন্ধ শরীরে, কি আশ্চর্য রঙ, চোখ মুখ, সব নিয়ে অমলা সোনাকে নদীর চরে জড়িয়ে ধরেছে। এমনভাবে জড়িয়ে ধরলে কেউ বুঝি কখনও কোথাও আর ছুটে যেতে পারে না।

—চল আমাদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাবি। ফেরার পথে বড় মাঠে নেমে যাব। সাদা জ্যোৎস্না থাকবে। তোকে তখন এক-রকমের পাখি দেখাব। কেবল পাখিগুলি উড়ে উড়ে ডাকে। কি সাদা রঙ পাখি-গুলোর! তুই দেখলে আর নড়তে পারবি না।

সোনা বলল, কিন্তু তুমি আমারে...।

বলেই সে অমলার মুখ দেখে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখে কি মিনতি মেয়ের, কি করুণ মুখ চোখ করে রেখেছে অমলা! সোনা যথার্থই আর কিছু বলতে পারল

মা। বলতে ভাল লাগল না। সে জ্যাঠামশাইকে ডাকল, চলেন আবার আমরা ঠাকুর দেইখা আসি। ল্যান্ডোতে যামু আর আমু।

পাগল জ্যাঠামশাই এবার মুখ ফেরালেন। সোনা মেজবাবুর মেয়েদের সঙ্গে উঠে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি নৌকা গোনা বন্ধ করে দিলেন যেন। তিনি সোনাকে ধরার জন্য উঠে যেতে লাগলেন।

অমলা বলল, তোর জ্যাঠামশাইকে সঙ্গে নিবি।

সোনা পিছন ফিরে দেখল, জ্যাঠামশাই সুবোধ বালকের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। সে বলল, যাইবেন?

কোন জবাব না দিয়ে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি।

কমলা বলল, তুই আমার পাশে বসবি।

অমলা বলল, যা সে কি করে হবে। বাকিটুকু বলতে না দিয়ে সোনা বলে ফেলল, আমি জ্যাঠামশাইর পাশে বসমু।

কমলা বলল, বসমু কিরে? বসব বলবি।

—বসব। সোনা কথাটা শেষ করতেই জসীম দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সোনা বলল, কি জসীম তুমি আমারে, জ্যাঠামশয়রে চিন না!

—আপনের মায় ক্যামন আছে?

সোনা ত জানে না মা তার কেমন আছে! এ কদিনেই মনে হয়েছে দীর্ঘদিন সে মাকে ছেড়ে চলে এসেছে। এবং মাঝে মাঝে ওর কেন জানি মনে হয় বাড়ি গিয়ে সে আর মাকে দেখতে পাবে না। সে গেলেই দেখবে, জ্যাঠিমা চুপচাপ ঘাটপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর কেউ নেই। কেন জানি এটা তার বার বার অমলার সঙ্গে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে মনে হয়েছে। সে কিছু জবাব দিতে পারল না। সে জোর করে বলতে পারল না ভাল আছে। —আমরা কবে যাব, এমনও সে বলতে পারছে না মেজ জ্যাঠামশাইকে। বার বার মেজদা বড়দা ওকে শাসিয়েছে, এসেই ভ্যাক করে কেঁদে দিলে চলবে না। বাড়ি যামু আমি, বললে চলবে না। যখন নৌকা ছাড়বে ঘাট থেকে তখন তুমি যেতে পারবে। সে বার বার কেন জানি আজ ঈশমের নৌকায় উঠে যাবে ভাবল। সেই নৌকায় গিয়ে বসে থাকলে ওর মনে হয়, সে তার গ্রাম দেশ মাঠের অনেক কাছাকাছি আছে।

জসীম সোনাকে জবাব না দিতে দেখে বলল, মার জন্য মনটা আপনের ক্যামন করতাছে।

জসীম ঠিক বলেছে। মার জন্য তার মনটা কেমন আশ্চর্য রকমের ভারি হয়ে আছে।

জসীম ফের বলল, আবার যামু আপনেগ দ্যাশে। শীতকাল চইলা আইলেই হাতী নিয়া চইলা যামু। আপনের মার হাতে পিঠা পায়েশ খাইয়া আমু।

সোনা এসব কিছুই শুনছে না। সে ঘোড়ার দিকে মুখ করে বসে আছে। দুই ঘোড়া, সাদা রঙের ঘোড়া, পায়ে ক্লপ ক্লপ শব্দ, পিছনে রাজার বেশে রামসুন্দর, মাথার উপর কত সব সবুজ গাছপালা পাখি এবং নিরন্তর এই ঘোড়া যেন তাকে নিয়ে কোন দূরদেশে চলে যেতে চাইছে। সে দেখল অমলা অপলক ওকে চুরি করে দেখছে। সে লজ্জা পেয়ে অমলার দিকে রাতের ঘটনা মনে করে ফিক করে হেসে দিল।

অমলাও হাসল। —আমার পাশে বসবি।

সোনা জ্যাঠামশাইর মুখ দেখল। মুখে যেন তার সায় নেই। সে বলল, না।

অমলা বলল, কাল দশমী। বাবা বিকেলে ফ্লুট বাজাবেন। তুই আমি আমাদের ব্যালকনিতে বসে বাবার ফ্লুট বাজনা শুনব।

সোনা এখন নির্মল আকাশ দেখছে। সে শুনতে পাচ্ছে না কিছু।

অমলা ফের বলল, বাবা ফ্লুট বাজাবে। কত লোক, হাজার হাজার মানুষ আসবে নদীর পারে। বাবার ফ্লুট বাজনা শুনতে আসবে। আমাদের বেলকনিতে তুই আমি আর কমলা। কি আসবি ত!

সোনা বলল, পিসি, পুরান বাড়ি কতদূর।

কমলা বলল, এ কিরে দিদি, সোনা তোকে পিসি ডাকছে।

অমলা কেমন গুম মেরে গেল। সে সংক্ষেপে বলল, অনেকদূর।

সোনা অমলার দুঃখটা যেন ধরতে পেরেছে। সে বলল, আমি বিকালে যাব।

কমলা বলল, বিকাল না রে, ওটা হবে বিকেল।

—আমি জানি।

—বলতে পারিস না কেন?

—মনে থাকে না।

—তুই আমাদের সঙ্গে কলকাতা গেলে কথা বলবি কি করে!

সোনা চুপ করে থাকলে কমলা ফের বলল, তুই এ-ভাবে কথা বললে, তোকে সবাই বাঙাল বলবে।

কলকাতার কথা মনে হলেই কোন রাজার দেশের কথা মনে হয়। কত বড় বড় সব প্রাসাদের মতো। হাজার হাজার বাড়ি, গাড়ি, ঘোড়া, দুর্গ, রেমপার্ট, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, হাওড়ার ব্রীজ, এ-সব ভাবতে ভাবতে একটা গোটা সাম্রাজ্যের কথা ভেবে ফেলে। রাজা পৃথ্বীরাজের কথা মনে হয়। রাজা জয়চন্দ্রের কথা মনে হয়। স্বয়ম্বর সভার কথা মনে হয়। সে যেন কোন বন উপবনে তার ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে। রাজকন্যা দেউড়িতে এসে মুক্তিতে মালাদান করলেই ঘোড়ার পিঠে তুলে সে দ্রুত ছুটবে। আর কেন যেন দৃশ্যটিতে একটা সাদা ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে সে এবং তার সামনে অমলা বসে রয়েছে। সে যেন অমলাকে নিয়ে নদী বন মাঠ পার হয়ে জ্যাঠামশাই-র নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে যাচ্ছে। সোনা এবার পাশের মানুষটির দিকে মুখ তুলে তাকাল। তিনি চুপচাপ নিরীহ শান্ত মানুষের মতো বসে আছেন।

সোনা বলল, অমলা তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান না?

কমলা বলল, এই ত বেশ কথা বলতে পারিস।

সোনা বলল, আমার জ্যাঠিমা কলকাতার ভাষায় কথা বলে।

—তা হলে তুই এতদিন শিখিস নি কেন।

—আমার লজ্জা লাগে।

কমলা বলল, দিদি খুব ভালো ঘোড়ায় চড়া শিখেছে। খিদিরপুরের মাঠে সকাল হলেই ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে যায় দিদি।

সোনা চুপচাপ। বাড়ি বাড়ি ঠাকুর দেখে ফের মাঠের পাশ দিয়ে বড় মাঠে নেমে যাওয়া। মাঠময় সাদা জোৎস্না পাশে নদীর চর, কাশ ফুল। অদূরে নদীর জল। আকাশে অজস্র নক্ষত্র। তার প্রতিবিম্ব নদীর জলে। ঘোড়া সেই সাদা জোৎস্নায় ছুটছে। ওদের গলায় ঘণ্টা বাজছিল। আশিবনের কুকুর সেই ঘণ্টার শব্দে নেচে নেচে আসছে। ওরা মাঠের ভিতর নেমে যেতেই ও-পারের বাঁশবন থেকে কিছু পাখি উড়ে আসছে মনে হল। ওরা গাড়িতে বসে রয়েছে। বড় বড় পাখি সাদা জোৎস্নায় উড়ে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর কক্ কক্ করে ডাকছে। কেমন ভয়ানক মনে হয়। অজস্র পাখি, এই রাতে যেন বিশ্ব চরাচরে উড়ে উড়ে কিসের নিমিত্ত শোক জ্ঞাপন করছে।

তখনই মনে হল নদীর চরে একটা ঘূর্ণি ঝড় উঠেছে। রাশি রাশি কাশ ফুল উড়ে আসছে। পাখিগুলো বনের ভিতর হারিয়ে গেল। পাখিদের আর কোন শব্দ নেই। শুধু কাশফুলের রেণু, অজস্র রেণু প্রায় তুষারপাতের মতো ওদের উপর এখন ঝরে পড়ছে।

কমলা বলল, সোনা চোখ বন্ধ কর!
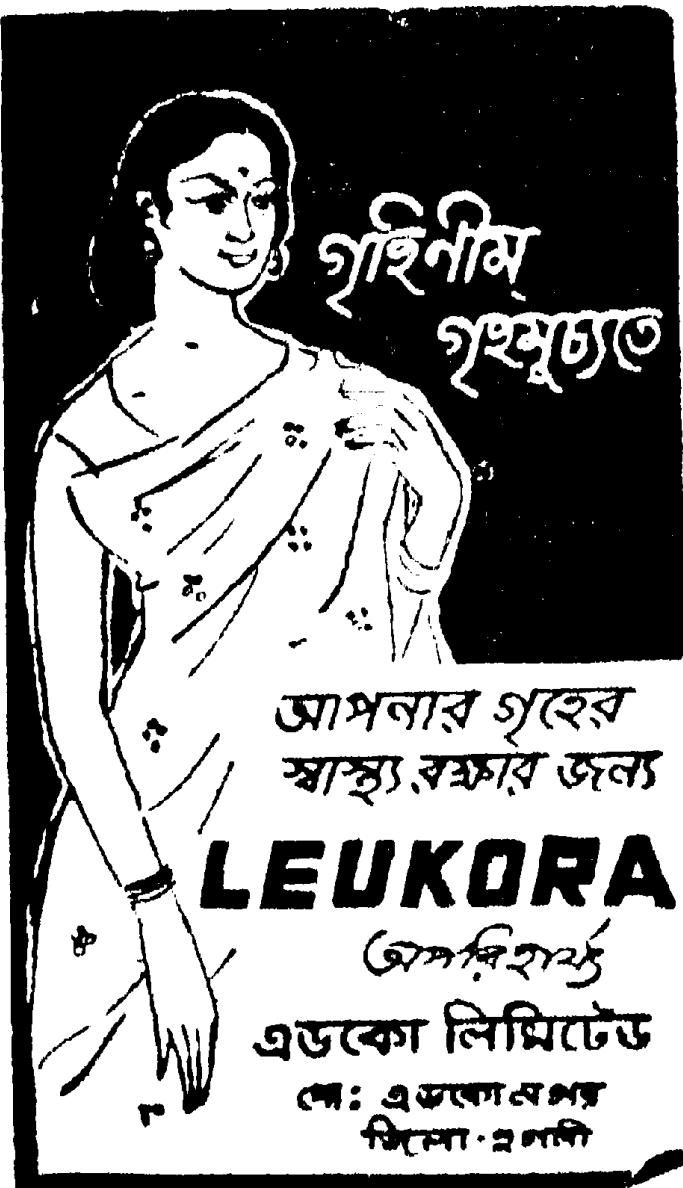
কাশ ফুলের রেণু চোখে পড়লে অন্ধ হয়ে যাবি।

সোনা চোখ বুজে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চোখ বুজে বসে থাকল। যতক্ষণ তুষারপাতের মতো এই কাশের রেণু বন্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ ওরা চোখ বুজে থাকবে। অমলা না বললে গাড়ি ঘুরবে না বাড়ির দিকে। অমলা সোনাকে একটা আশ্চর্য ছবি দেখাতে এনেছে। সে জ্যোৎস্নায় তার গাড়ি দেখল। স্টিমার আসার সময় হয়ে গেছে। স্টিমারের আলো এই মাঠে যখন পড়বে, ডান দিক অথবা বাঁ দিকে আলোটা যখন পাশের ডাঙা, নদীর চর খুঁজবে তখন মাঠে পাখিগুলির শরীরেও এসে আলো পড়বে। অদ্ভুত মায়াবিনী এক রহস্যময় দৃশ্য ফুটে ওঠে তখন। সে উজ্জ্বল আলোর ভিতর পাখিদের চোখ, নীলাভ চোখ, সাদা ডানা এবং হলুদ রঙের পা যেন গভীর নীলজলে অজস্র রুপালি মাছের মতো, একটা ঘূর্ণি স্রোতে মাছগুলো ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে — অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে। কি এক নেশায় পেয়ে যায়। দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে ইচ্ছা হয়—রূপকথার মতো ঘটনাটা। সোনাকে সে সেই দৃশ্য দেখাতে এনেছে। স্টিমারের আলো নদ থেকে দেখলেই ওরা মাঠের উপর চক্রাকারে উড়তে থাকে।

অমলা চোখ বুজেই বলল, সোনা তোকে আমরা আজ কত খুঁজেছি।

সোনা কিছু বলল না। সে চোখ খুলে তাকাল। আর দেখল সকলেই কেমন সাদা হয়ে গেছে। সে কাউকে চিনতে পারছে না। ওরা যেন সবাই অন্যদেশের মানুষ হয়ে গেছে। অমল যেন সে সে একটা ছবির বই দেখেছিল— ইংল্যান্ডের [illegible] দেশের বই, [illegible] পাইন গাছ [illegible] বরফ পড়ছে, এক দৃশ্য সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ছোট এক বালক দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরে, ওদের পোশাকের উপর, মাথায় বরফের কুচি পড়ে সাদা হয়ে গেছে — সে যেন দেখেছিল। সে একা কেন হবে, সকলে। জ্যাঠামশাই চোখ খুলছেন না, সোনা বললেই চোখ খুলবেন — তিনি সেই বুড়ো মানুষ হয়ে গেছেন। এতক্ষণ শুধু ঘোড়া দুটোই সাদা ছিল, এখন ঘোড়া, গাড়ি, রামসুন্দর, জসীম সকলে সেই [illegible] দেশের মানুষ। [illegible] সাদা হয়ে গেল!

তখনই সোনা দেখল এক অদ্ভুত আলো, চরপাশের ঘাস, নদী, নদীর চর কাশবন এবং মাঠের সব গাছপালা আলোকিত করে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সোনা চিৎকার করে উঠল, ঐ আলো, ইস্টিমারের আলো।

সকলে চোখ মেলে সেই আলো দেখল। ওদের গাড়িতে এসে আলো পড়েছে। মনে হয় হাজার ডে-লাইট যেন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে সর্বত্র, সেই আলোতে আবার বন থেকে পাখিরা উড়ে এসেছে। ওরা সাদা হয়ে গেছে, মাঠে সাদা জ্যোৎস্না, সাদা পাখি এবং নীলাভ চোখ, সোনা অপলক দেখছে, দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ নিজেকে দেখছেন। সে কি সহসা পলিনের দেশে চলে এসেছে! এত কাশফুল তুষারপাতের মতো, চার পাশে সাদা আর সাদা— আর নীলাভ চোখ পাখিদের। জ্যাঠামশাই সেই পাখিদের ধরার জন্য কেমন লাফ দিয়ে নামতে চাইলেন। জসীম বুঝতে পেরে বলল, এবারে গাড়ি ফিরাতে হয় মা ঠাইরেন।

রামসুন্দর বলল, তাই হয়।

কিন্তু অমলা কিছু বলছে না। ঘূর্ণি ঝড় এসে ওদের এমন একটা অন্যপার দেশের মানুষ করে দিয়ে যাবে সে নিজেও তা ভাবতে পারেনি। সে বলল, সোনা কি দেখছিস?

পাখি দেখছি।

— আলো দেখছিস না!

—দেখছি।

— আর কি দেখছিস?

সোনা বলল, ইস্টিমার।

কিন্তু অমলা পাগল মানুষকে কিছু বলছেন না বলে কেমন ক্ষেপে যাচ্ছেন তিনি। তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, তখনই মনে হল কি যেন একটা অতিকায় জীব উঠে আসছে চর থেকে। প্রথম ওরা কিছুই বুঝতে পারেনি. একটা সাদা রঙের জীব, প্রায় হাতির মতো উঁচু লম্বা, এই মাঠের দিকে উঠে আসছে। সোনা এবং সবাই হতবাক হয়ে দেখছে—ওটা কি জসীম! ওটা কে উঠে আসছে। আলোটা এতক্ষণে সরে গেছে। কিন্তু সকলের আগে পাগল মানুষ চিনতে পেরেই লাফ দিয়ে নেমেছেন—সেই হাতী, কাশফুলে সাদা হয়ে গেছে—সেই অজস্র বন কাশের। ফুলে ফুলে হাতিটা পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। এবং শেকল ছিঁড়ে সে ছুটে পালাচ্ছে। অথবা জসীম ওর কাছে যায়নি বলে সে জসীমের জন্য এই মাঠে উঠে আসছে।

সোনা তাড়াতাড়ি নেমে জ্যাঠামশাইর হাত চেপে ধরল। সে এ-ভাবে ধরলে তিনি কোথাও যেতে পারেন না। অথচ চোখে কি মিনতি তাঁর। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। হাতিতে চড়ে আমি আবার কোথাও চলে যাব।

সোনা পাগল মানুষের হাত ছাড়ল না। জসীম বলল, আমি চলিলাম [illegible]। সে রামসুন্দরকে উদ্দেশ করে বলল, আবার লক্ষ্মী আমার খেইপা গেছে। বলে সে লাফ দিয়ে নামল এবং হাতিটা যেদিকে ছুটে যাচ্ছে ক্রমে সে চিৎকার করতে করতে সেদিকে ছুটে গেল। আর ওরা দেখল জসীমের ডাক শুনেই হাতিটা কেমন সাদা জ্যোৎস্নায় পলকে থেমে গেছে, থেমে দাঁড়িয়ে আছে আর দুলে দুলে শুঁড় নাড়ছে!

সোনা বলল, জ্যাঠামশাই আমি বড় হলে আপনারে নিয়া কলিকাতা যামু গিয়া। আপনে এখন গাড়িতে বসেন।

এই শুনে মণীন্দ্রনাথও একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। চুপচাপ হাতিটা দেখতে দেখতে মগজের ভিতর নিরন্তর যে ছবি খেলা করে যাচ্ছে তা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখলেন—যেন সেই নদীর জলে ময়ূরপঙ্খী ভাসে, দুর্গের গম্বুজে পাখি ওড়ে এবং হুগলী নদীর দু-পাড়ে চটকলের সাইরেন—আর তখন ইডেনের নীল রঙের প্যাগোডার নিচে, পলিন তাকে পাশে নিয়ে বসে থাকে। হাতে হাত রেখে বলে— তুমি অনেক বড় হবে মণি। বাবা তোমার কাজে খুব খুশি। বাবাকে বলে তোমার বিলেত যাবার ব্যবস্থা করব। একবার ঘুরে এলেই তুমি কত বড় হয়ে যাবে, আরও বড় কাজ পাবে। কার্ডিফে আমাদের বাড়ি আছে। ক্যাসেলের গা ঘেঁষে ছোট্ট বাড়ি, তারপর রাউন্ড ইনজিনিয়ারিং ডক, এবং দূরে এক পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় লাইট হাউস। গ্রীষ্মের বিকেলে তুমি আমি লাইটহাউসের নিচে বসে থাকব। সমুদ্র দেখব। আমরা জাহাজে যাব, জাহাজে ফিরে আসব, মাই প্রিন্স। শুধু তুমি রাজি হলেই সব হয়ে যাবে।

এবং ঠিক তক্ষুনি অমলা এসে সোনার পাশে বসেছে। ওর শরীর থেকে কাশফুলের রেণু তুলে দিতে দিতে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। এবং ফিস ফিস করে কি বলছে। এই মেয়ের মুখ দেখলেই পলিনের অনুভূতি ফিরে ফিরে আসে—যেন তাঁর সামনে ছোট্ট পলিন. তিনি যে এখন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না—কারণ পলিন ওকে সন্ত মানুষের মত হাতে বলছে। পলিন সে রাতে অধীর আগ্রহে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। উজ্জ্বল সাদা রঙের সিল্কের গাউন পরেছিল পলিন। ওর চাঁপা ফুলের মতো নরম আঙুল কি দ্রুত চলছে! অধীর উন্মত্ত এক ইচ্ছা সে রাতে পলিন সারারাত ঘুমোতে পারেনি, আমাকে বাড়ি যেতে হবে পলিন। বাবা টেলিগ্রাম করেছেন। বাবা বড় অসুস্থ। এ-যাত্রায় তোমার সঙ্গে আমার বুঝি যাওয়া হল না। তারপর কি, তারপর আর জানা যাচ্ছে না—আবার সব ঘোলা ঘোলা অস্পষ্ট। সে কিছুতেই আর কিছু মনে করতে পারল না।

অমলা ওর আরও কাছে ঘেঁষে মুখ লাগিয়ে বলল, কাউকে বলিস না কিন্তু!

সোনা কেমন বোকার মতো অমলাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। জসীম হাতি নিয়ে পিছনে ফিরছে। রামসুন্দর বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। ওরা হাতি নিয়ে ঘোড়া নিয়ে মিছিল করে রাজার মতো ফিরছে।

—তুই না সোনা কিছু বুঝিস না!

তখনই পাগল মানুষ এক রহস্যময় কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন—

Still, still to hear her tender taken breath, And to live ever, —or else swoon to death, Death, Death—

বার বার পুনরাবৃত্তি—ডুগ, এবং ঘোড়ার পায়ে শব্দ, ঝপ ঝপ। হাতিটা সকলের পিছনে আসছে। [illegible] সকলের আগে যাচ্ছে। মাঝখানে সেই সাদা ঘোড়া, গাড়ি, প্রাসাদে যেন রাজা ফিরছেন। [illegible] সোনার উপকথার নায়কের মতো মনে হচ্ছে।

ক্রমশঃ

নির্ঘণ্টেই আছে

কাটথ্রোট কম্পিটিশন

পনেরো মিনিট অন্তর এই রুটে বাস পাওয়া যায়। দশটা, সোয়া দশটা, সাড়ে দশটা ও পৌনে এগারোটা—একই নিয়মে ভোর ছটা থেকে রাত দশটা অবধি। এ নিয়মের কখনো হেরফের হতে দেখে নি কানু। বাস-স্টপ থেকে বাসা মিনিট দুয়েকের পথ। ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিট আগেই ঠিক বেরিয়ে পড়ে। মোড় এসে ঠাকুরের দোকান থেকে এক প্যাকেট চারমিনার আর একখিলি পান কিনে চপর চপর করে চিবোতে চিবোতে ওয়েট করে বাসের জন্য, জানে এখুনি এসে পড়বে।

এসেও পড়ল ঠিক সময় মত। কানায়-কানায় ঘুড়ির মত এক বোন্দা ভিড়ের বোঝায় কাৎ হয়ে বর্ষায় ধুয়ে-মুছে যাওয়া খোঁদলানো রাস্তার টায়ার ঘসড়াতে ঘসড়াতে। ভেতরে বাইরে, ফুটবোর্ডে, পেছনে, পাইলটের নিজস্ব কামরায় কোথাও এক চিলতে জায়গা নেই। তবু কনডাকটর দুজন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—আইয়ে আইয়ে, সাপুর, তারাতলা, মাজেরহাট, বিদিরপুর, ধর্মতলা।

ধুস্—জায়গা নেই, তবু ব্যাটারা ছাড়বে না। বোঁটার চুণটুকু দাঁতে কেটে নিয়ে সাইডে সরে দাঁড়াল কানু। হাত ঘড়িতে ছোট বড় দুটো কাঁটা অ্যাকুইট অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে জানান দিচ্ছে দশটা বাজে। সাড়ে দশটায় হাজিরা। এই বাসটায় যেতে পারলে ঠিক টাইমে পৌঁছোত। কিন্তু যাবে কি? পা রাখবে কোথায়? পেছনের গেটের কন্ডাকটরটা প্রাণপণে এখনো লোক গাদাচ্ছে ভেতরে। কানু ভেবে পেলো না এরপর ও ব্যাটা নিজে দাঁড়াবে কোথায়? এক হতে পারে যদি লেডিজ সীটের পেছনে যে সরু ফালি রড কখানা আছে, যেখানে ব্যাপারীদের খালি চুবড়ি আংটায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাই ধরে ঝুলতে ঝুলতে যায়। তা এরা পারে—প্রাইভেট বাসের কন্ডাকটরদের চেয়ে বড় জিমন্যাস্ট কোন সার্কাসেও বোধহয় নেই। প্লাস্টিক গার্লদেরও লজ্জা দিতে পারে ওরা। কানু পেছনে সরে এসে কাঁচা ড্রেনটায় এক-দলা পিচ্ উগরে দিল।

আর ঠিক তখুনি আর একটা বাস হৈ হৈ করতে করতে, টিন পেটাতে পেটাতে, ঘণ্টি বাজিয়ে পেছন থেকে পাগলের মত ছুটে এল। আশ্চর্য! সামনের বাসে জায়গা নেই একফোঁটা, অথচ পেছনেরটা বিলকুল ফাঁকা। তাছাড়া নেকস্ট বাস আসার কথা সোয়া দশটায়—অথচ এখনো চোদ্দ মিনিট বাকী। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই সামনের বাসটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পেছনেরটা অসহিষ্ণু-ভাবে ভেঁপু বাজাচ্ছে। হয়তো এখুনি ছেড়ে দেবে। একজন কন্ডাকটর পানের দোকানের গায়ে টুল আর টাইমপীস নিয়ে বসে থাকা টাইম কীপারের সাথে উত্তেজিতভাবে কি যেন বকাবকি করছে। ওদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার আগেই বাসটা ছেড়ে দিল। কানু একলাফে রডটা ধরে, বডিটা বাসের দোকানের তালে তালে বার দুয়েক নাচিয়ে ভেতরে উঠে এল। পাশ ফিরে দেখলো এখনো সামনের গেটটা ফাঁকা—কন্ডাকটর মোড়ের মাথায়।

বাসটা পোস্টাপিস ছাড়ানোর আগেই একটা ফোর ফর্টি রেস রেকর্ড টাইমে কমপ্লিট করে কন্ডাকটর সামনের গেটে উঠে এল। সাইড বেঞ্চে বসে ড্রাইভারের কাঁধ আর পাঁজোড়ের ফাঁক দিয়ে কানু দেখতে পেল সামনের বাসটা সেকেন্ডের বৌস্কিন ওপর ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে উঠছে। তার বইবার ক্ষমতা নেই, মনে হয় এখুনি হাত-পাগুলো খসে যাবে, টায়ারগুলো পটাপট যাবে ফেটে, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়বে। অথচ এ বাসটায়, যেটায় কানু যাচ্ছে, এখনো দু[illegible]টো সিট খালি পড়ে আছে।

তিনটে স্টপ পেরিয়ে গেল। অথচ এখনো কোন কন্ডাকটর এল না টিকিট চাইতে। দুজনেই দুই গেটে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। গলার নলি যেন কাতার দড়ি হয়ে উঠেছে। গোটা বডি বাইরে হাওয়ায় পতাকার মত পত পত করে উড়ছে। অকথ্য ভাষায় সামনের বাসটাকে গাল পাড়ছে। সরু ঘিঞ্জি রাস্তাটার দু পাশে কাঁচা নর্দমা। শেষ বর্ষার কামড়ে রাস্তা ক্ষত-বিক্ষত। অফিস টাইমে দুদিক থেকেই গাড়ির স্রোত উজানে-ভাটায় বয়ে চলেছে। পদাতিক মিছিল মাঝে মাঝে স্লুইস গেটের মত সেই স্রোত দিচ্ছে আটকে। এত ঝামেলার মধ্যেও একই রুটের দুটি বাস প্রাণপণে পরস্পরকে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

এসব রেস-টেস ফাইন লাগে কানুর। বাঙ্গালীরা পারে না—পাঞ্জাবীদের এ ব্যাপারে যেন একটা ন্যাক আছে। গাড়ি ওদের হাতের

[illegible]। যা খুশী তাই করতে পারে। নইলে পারত কোন স্টেট বাসের ড্রাইভার এই ভিড়ের মধ্যেও এরকম বেপরোয়া গাড়ি চালাতে? বাঘের বাচ্চা!—মনে মনে সাবাস দেয় কানু। ন্যাশনাল কোর্স ফাঁড়ি থেকে সা-পুর কম করেও পাঁচ মিনিট লাগার কথা। অথচ কম্পিটিশন দিয়ে দু মিনিটেই ঐ পথটা পেরিয়ে এসেছে বাস দুটো। সামনে নিউ আলিপুর। ফাঁকা চওড়া পথ। কে আগে যাবে, তার জন্য দুটো বাসই উঠে পড়ে লেগেছে। পেছনেরটা প্রায় ধরে ফেলেছিল এমন কি ওভারটেকও করতে পারত সামনেরটাকে কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা খড় বোঝাই লরী প্রায় বারো আনা রাস্তা কভার করে উল্টোদিক থেকে ছুটে এসে সব মাটি করে দিল।

সেন্ট্রাল ব্যাংক, তারাতলা, মাঝেরহাট সব জায়গার প্যাসেঞ্জারই উঠেছে সামনেরটায়। পেছনের অর্থাৎ কানুর বাসটা যেন মাছি তাড়াতে তাড়াতে চলছে। এরপর গোটা বাসটাই প্রায় ফাঁকা। যা কিছু ভিড় হবে তা শুধু মোমিনপুর আর খিদিরপুরে। খিদিরপুরের ব্রীজ পেরোলেই গড়ের মাঠ। তারপর হয়ে, রেসকোর্স ডাইনে রেখে ট্রাম লাইন বরাবর বাস সোজা ছুটবে এস-প্ল্যানেডের দিকে। প্রায় মাইলটাক ঐ পথটায় কোথাও বাস দাঁড়ায় না। দাঁড়াবে কি—নামেও না কেউ উঠার প্যাসেঞ্জারও থাকে না।

ঠিক সামনের গেটের কাছে, সাদা দাড়ি-ওয়ালা কন্ডাকটরটা ডুকরে কেঁদে উঠল। একটানা চীৎকার করে, বাসের গায়ে জোরে জোরে থাপ্পড় মেরে, ঘণ্টি বাজিয়ে, গাড়িওয়ালাকে হুঁশিয়ার করে, পাগলের মত দাপাদাপি করে, শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে, তবু জেতা দুরাশা। সামনের বাসটাই ওদের হারিয়ে দিয়েছে। হাল ছেড়ে দিয়ে, ফুটবোর্ড ছেড়ে ভেতরে এসে পেছনের গেটের কন্ডাকটরকে কি একটা কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল ছোকরা। কত আর বয়স ওর? বড় জোর সতেরো আঠারো। এতটা টেনশন ওর সহ্য হয় নি। পেছনের গেটের কন্ডাকটর এসে ওর সামনে দাঁড়াল। ঝোলানো পাঞ্জাবীর খুঁট দিয়ে সকলের সামনে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে খুব আস্তে আস্তে কি যেন বলল। তারপর ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

পরের স্টপ মোমিনপুরে। কানু নেমে গেল। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই যেন ওর কাছে একটা ধাঁধা হয়ে রইল। তাই বাস থেকে নেমে রোজকার মত বাঁয়ের সরু গলিটি দিয়ে হন হন করে অফিসের দিকে না ছুটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মজার খেলাটার শেষটুকু যতক্ষণ দেখা যায় দেখতে লাগল। দুটো বাসই অনেকটা ধুলো, ধোঁয়া আর মুখ খিস্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। বাস দুটো চলে যেতে পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে শুনতে পেল—কী ভায়া? কোনটায় এলে? সামনেরটা না পেছনেরটায়?

ছাতা, টিফিনের কৌটা আর ঝোলা গোঁফ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে অফিসের অ্যাকাউণ্টস ক্লার্ক ননীদা। সিগারেটটা ধরিয়ে হেসে জবাব দিল কানু—পেছনেরটায়।

কেমন পনেরো পয়সার টিকিটে সিনেমা দেখলে বল তো?—খ্যাঁক খ্যাঁক হেসে ওঠেন ননীদা।

কিন্তু ব্যাপারটা কি দাদা এ রকম তো কোনদিন দেখিনি—হদিশ পাওয়ার কৌতূহলে কানু পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

সবই সময়ের খেলা!—হাঁটতে হাঁটতে গোটানো ছাতাটা দুলাতে দুলাতে একটু একটু করে জট ছাড়ান ননীদা—আমি এলাম সামনেরটায়। ওটা পৌনে দশটার বাস ছিল। যোধপুর পার্ক থেকে ঢিকির ঢিকির করে সব কটা স্টপের সব প্যাসেঞ্জার তুলতে তুলতে যখন ফাঁড়ির মোড়ে এল ততক্ষণে নেকস্ট বাস আসার টাইম হয়ে গেছে। কিন্তু হলে হবে কি, ততক্ষণে এদের ব্যাগ পয়সায় ফুলে উঠেছে আর পেছনেরটা বুড়ো আঙ্গুল চুষছে। এক মিনিট লেট হলে এদের ফাইন হয় আট আনা। পনেরো মিনিটের জন্য সাড়ে সাত টাকা। ঐ ফাইনের টাকাটা পাবে পেছনের বাস। কিন্তু ততক্ষণে ওরা প্রায় সাঁইত্রিশ টাকা কামিয়ে নিয়েছে। পেছনেরটাকে ঐ ফাইনের টাকা-কটা নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হবে। আর সামনেরটা আইনকে কলা দেখিয়ে বেশ দু পয়সা কামিয়ে নিল। বুঝেছ ব্যাপারখানা কি?

ব্যাপারটা কি কানু এখন বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে কেন ঐ বাচ্চা কন্ডাকটরটা কেঁদে উঠেছিল তখন। কমিশনের টাকায় এদের সংসার চলে। আগের বাস যদি সব প্যাসেঞ্জার তুলে নেয় তাহলে পরের বাসের ড্রাইভার কন্ডাকটর কটা টাকা পাবে টিকিট বেচে? তারপর মালিকের বাঁধা মাইনেয় কটা টাকাই বা পাবে এরা কমিশন? কি বিচিত্র ব্যবস্থা! ভাই ভাইয়ের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিচ্ছে—কোন দয়া নেই, মায়া নেই। তবে আইন বাঁচিয়ে বে-আইনী পথে যদি কেউ দু-পয়সা কামায় তাহলে কারই বা কি বলার আছে? কানু তো সাড়ে দশটার আগেই অফিসে পৌঁছেছে। তার বাঁধা মাইনের চাকরী। কামাই করলে বা লেট হলেও মাসের শেষে এক পয়সাও কম পাবে না মাইনে। কিন্তু ঐ বাচ্চা কন্ডাকটরটা? ওর কি হবে? লাইনের সেয়ানারা ওকে ঠকিয়ে যে দুটো পয়সা করল তার শোধও তো ও তুলবে। তারপর সবাই যখন সেয়ানা হয়ে উঠবে তখন? পরস্পর পরস্পরের গলা কাটবে—আর মাঝখান থেকে কানুরা ভিড়ের গাদায় দমবন্ধ হয়ে ঝুলতে ঝুলতে নিত্যদিন অফিস যাবে। কেউ এর প্রতিবাদ করবে না কোনদিন।

—[illegible]

চণ্ডী মণ্ডল

(দুই)

কতদিন পরে সে জানে না; সজন যখন আবার স্বাভাবিক স্মৃতি ফিরে পেল, দেখল যেন এক নতুন পৃথিবীকে সে দেখছে। সে নিজেও যেন অন্য এক সজন। কোথাও কল্লোল নেই। পৃথিবী শীতের মরা নদীর মত, এখানে জীবন বয়ে চলেছে আকাশের মেঘের মত শান্ত শব্দহীন। একটা অদৃশ্য অভাব হঠাৎ কখনো বিষাদ হয়ে তার অনুভূতিতে ধরা পড়ে। তখন সজনের নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হয়। পৃথিবীর জীবনের বিপুল আয়োজনে তার নিমন্ত্রণ নেই। অথচ তার এই বিষণ্ণতার কারণ আবিষ্কারে আত্মগভীরে এক পা এগিয়ে গেলেই বিজাতীয় উদ্বেগ তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। নিজের অবশিষ্ট পরিচয়টুকু থেকে যেন সে পিছলে পড়ে যেতে থাকে। সজন স্থির বিশ্বাসে নিশ্চিত হয় তার অনেক ক্ষয় ঘটে গেছে।

গভীর সান্ত্বনার মত তার বন্ধু প্রিয়-জনেরা আছে তার খুব কাছাকাছি। গভীর আশায় সে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। সকলে তাকে নতুন জীবনের প্রেরণা দেয়। একে একে সব ক্লান্তি সব বিষাদ ঝরে যায়। শীতের দীর্ঘ আত্মগোপনের পর জীবনের নতুন মরশুমে এখন সে নিজেকে আবার পৃথিবীতে প্রকাশ করে। জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল নিবিড় প্রতিশ্রুতি ছিল কিন্তু অনেকদিন বৃথাই কেটে গেছে। তার স্বপ্নের স্বরূপ সে সঠিক বোঝেনি তাই ভুল স্বপ্নে সে নিজেকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিল। এই যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতা, নিজেকে নির্ভুলভাবে জানতে এর হয়ত প্রয়োজন ছিল, কে জানে! তার হয়ত কোন ক্ষতিই হয়নি, কিছুটা সময় শুধু নষ্ট হয়েছে। কিন্তু জীবন যে সময় পেরিয়ে এসেছে এখন তার কী মূল্য আছে জীবনে! এখন কোন ভুল না করাই হবে তার জীবনের দায়িত্ব। বিশ্বাস করতে হবে জীবন কোন হেঁয়ালী নয়, সহজ বাস্তব। এই পৃথিবীতে বাস্তবের পথেই জীবনের স্বপ্নের সাফল্য আসে। দৃঢ় পায়ে সমস্ত সংশয় দূরে করে এই পথে এখন থেকে তাকে হাঁটতে হবে।

অনেক বড় হতে গেলে অনেক টাকা চাই, সজন ভাবল, টাকার ক্ষমতার কোন সীমা নেই। টাকা নতুন পথ তৈরী করে দেয়, পথের সমস্ত বাধা দূর করে দেয়। জীবনের সমস্ত স্বপ্নের সাফল্য যদি আমার কাম্য হয়, সজন নিশ্চিত হল, এ ব্যাপারে টাকাই আমাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে। সবচেয়ে সহজ উপায়ে সবচেয়ে বেশী টাকা কেমন করে পেতে পারি? যদি একটি বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করি তাহলে ইচ্ছা করলে অনেক টাকা পেয়ে যেতে পারি। তারপর সেই টাকা দিয়ে আরো অনেক টাকা পাওয়া যেতে

পারে। আর আমি ভালোবাসা চেয়েছিলাম, এখন আশা করা যায় যে যে-কোন একটি মেয়ে সে যেমনই হোক যেই হোক সে একটি মেয়ে, সুতরাং আমার প্রার্থিত ভালোবাসা সে আমাকে নিশ্চয়ই দিতে পারবে। আমার ভালোবাসার প্রেরণা যদি নারীই হয় তবে প্রত্যেক নারীর মধ্যে আছে সেই প্রেরণার উৎস। তাই স্বাভাবিক। আর এখনও যদি আমি রাত্রিকে ভুলে না গিয়ে থাকি তার কারণ আমি অন্য কোন নারীকে এখনও জানি না। যদি নতুন কোন নারীকে এখন আমি পাই তাহলে—। সময় এবং ভালোবাসা,—এদের একই চরিত্র। অতীত সে যতই দুরন্ত হোক যতই সে আসুক বর্তমানকে গ্রাস করতে, বর্তমান তাকে গ্রাহ্য করবে না। মনের সমস্ত মনোযোগ বর্তমানই শেষ পর্যন্ত অধিকার করবে। তেমনিই ভালোবাসা। নতুন ভালোবাসা অতীত ভালোবাসার কোন চিহ্ন কোন স্মৃতি কিছুই সহ্য করে না। জীবনে বর্তমান যেমন সত্য, বর্তমান ভালোবাসাও তেমনি জীবনের একমাত্র প্রার্থিত সত্য ভালোবাসা হয়ে ধরা দেয়। রাত্রির স্মৃতি মুছে যাওয়া না যাওয়া এ ব্যাপারে সজনের মনের কোন হাত নেই। সজন রাত্রিকে ভুলে যাবেই।

হঠাৎ কিছু একটা করতে গিয়ে সেই আবেগেই সে আমার ভেসে না যায়, সজন নিজেকে বার বার সচেতন করে দিল। একটি নারী, নারীর ভালোবাসা, এসবের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান আমার জীবন। আমার জীবন—আমার স্বপ্ন। আমার স্বপ্ন অনেক বড় হওয়া। কিন্তু আমি জানি স্বপ্নের সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে আমি চাই ভালোবাসা। চাই একটি নারী যার ভালোবাসার মধ্যে আমার অন্তরের অসীম ভালোবাসা ব্যাপ্ত করে আমি ভালোবাসার প্রখর তৃষ্ণায় চরম তৃপ্ত হব। পৃথিবীর যে কোন নারী কি আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে? পৃথিবীর অন্য কোন নারী কি রাত্রি হতে পারে? আমি আবার ভুল করছি, সজন ভাবিত হল, আসলে এখন আমার জানা উচিত রাত্রি নাম্নী কোন মেয়েকে আমি জানি, কোন রাত্রির সঙ্গে কখনো আমার পরিচয় হয়নি।

তার আরো মনে হয়, আমার যে স্বপ্নের কথা আমি জানি সেই স্বপ্নের স্বরূপ আমি ঠিক জানি না। তাহলে জীবন সম্পর্কে এত বেশী না ভেবে নিজেকে অযথা এত জটিল না করে জীবনে যা ঘটবে তাই ঘটবে অর্থাৎ যা হবার হবে, অর্থাৎ আর সকলের মত সহজভাবে জীবন-যাপন করতে পারি না কেন? আমি কি সকলের থেকে স্বতন্ত্র? সাধারণের পৃথিবীতে আমি কি ব্যতিক্রম? আমি অসাধারণ? কিন্তু নিজেকে এমন স্বতন্ত্র এত অসাধারণ ভাবার মধ্যে জটিলতা ছাড়া আর কী আছে? জীবন সম্পর্কে, জীবনের কোন কিছু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলেই উত্তর খুঁজতে হবে। তারপর ক্রমাগত প্রশ্ন বেড়ে চলবে কিন্তু উত্তরের সীমা আছে। তারপরই একটা অস্থিরতা একটা ভয়ংকর যন্ত্রণাকর পরিস্থিতি। জীবন যন্ত্রণার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন তা হবে? জীবনে প্রশ্ন বা উত্তরের কোন প্রসঙ্গই নেই, কোন অবকাশই নেই।

তবু জীবনে স্বপ্ন থাকতে পারে, অনেকের মত সকলের মত আমার জীবনে সেই স্বপ্ন—তা আছে, সজন বার বার আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে। আমি জানি জীবনে সার্থকতা নামে কিছু একটা আছে, তার জন্যেই এই জীবনযাত্রা। আমি একজন যাত্রী, বিশ্বাস আমার রক্তে, বিশ্বাস আমার আত্মার আত্মীয়, আমার যাত্রাপথের নিত্য সঙ্গী। আমি একদিন আমার নির্দিষ্ট সার্থকতার শ্রীধামে পৌঁছে যাব। আর এই খাওয়া-পরা সুখ-দুঃখ নারী—এই পার্থিব জীবনের নানান ঘটনা, এই ঘটনাগুলি দুঃখ-সুখের মধ্যে দিয়ে মানুষকে পার্থিব জীবনানন্দ দান করে জীবনের মোহে বন্দী করে, জীবনকে ভালোবাসায় আর এই ভালোবাসাই যে একদিন জীবনকে সেই নির্দিষ্ট সার্থকতায় পৌঁছে দেয়। সজন আত্মসচেতন হল, নিজেকে ধিক্কার দিল—আবার আমি জীবন জীবন খেলায় মেতেছি! নিজেই আবার নিজের মনকে প্রবোধ দেয় সজন, আমি যে জীবনেরই বাসিন্দা, জীবনরসিক। আর জীবনের সব রস মাটিতে, আকাশ শূন্যে মায়া ছলনা।

সজন একটি মেয়েকে বিয়ে করল এবং একসঙ্গে অনেক টাকা পেয়ে গেল। এই টাকা দিয়ে প্রথমে আরো অনেক টাকা তৈরী করতে হবে। তার জন্যে পৃথিবীতে পথের অভাব নেই। তারপর সে ইচ্ছা মত জীবনকে গড়বে। এখন মনে হয় জীবন একতাল নরম কাদা। তাকে যেমন খুসী রূপ দেবার কৌশল এখন তার নিজের হাতেই আছে। ভালোবাসা? মনে মনে খুব হাসল সজন। ভালোবাসা সে আর কিছুই নয়—জীবনের একটা সময়ের একটা বিশেষ সময়ের খেয়াল মাত্র। জীবনে এমনি কত কত সময় কত কত খেয়াল। এক-একটা সময় এক-একটা খেয়াল জীবন থেকে চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে যায় নতুন সময় নতুন খেয়ালের জায়গা করে দিয়ে যায় জীবনে। একটা কিছু শেষ হয়ে গেলে তার আর কী মূল্য থাকে! থাকে শুধু এই জীবন। যে পরিচয়ে জীবন জীবন হয়। মৃত্যুর পরও যা বেঁচে থাকবে অনন্তকাল, পৃথিবীতে মানুষের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। জীবনের সেই পরিচয়ে আমাকে উন্নীত হতে হবে। এই পরিচয়ের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে টাকা। আর আমি একজন কবি। আমার উচ্চ সামাজিক জীবন এবং আমার কবিজীবন পাশাপাশি চলবে। তারপর আমি একদিন পৌঁছে যাব—। হয়ত কোথাও পৌঁছবার নেই। শুধু চলব। শুধু কবি হয়ে পৃথিবীতে চলা যায় না, কবিকেও সামাজিক হতে হয় অভিজাত হতে হয়। যার টাকা আছে একমাত্র সেই সামাজিক এবং অভিজাত হতে পারে। আমার তা আছে। অবশ্য শেষপর্যন্ত কবি হিসাবেই হবে আমার পরিচয়। কিন্তু টাকাই হবে কবিতার প্রেরণা। টাকা দিয়ে আমি আমার কবি জীবনের ভিত্তি তৈরী করব। তখন সমাজ আমাকে স্বীকৃতি

দেবে—আমি কবি, জীবনে আমার অধিকার আছে।

যে মেয়েটিকে সজন বিয়ে করেছে তার নাম ললিতা। যে কোন পুরুষকে মুগ্ধ করার শারীরিক সৌন্দর্য মানসিক প্রস্তুতি সমস্তই আছে ললিতার। সজন তা জানে। কিন্তু ললিতার মধ্যে ভালোবাসা থাকার প্রয়োজন নেই কেননা আমার তা প্রয়োজন নেই, সুতরাং যা বাকী থাকে সেই শরীর যা আমার প্রয়োজন সুতরাং ললিতারও তা প্রয়োজন, সজন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল অবশেষে।

ললিতার চোখে সমুদ্রের রহস্য। তার গোলাপী রসাল ঠোঁট, কারুকাজময় সুশোভিত শরীরে সজন ভাবনাবিহীন শরীর সম্পর্ক গড়তে উদ্যত হয়। তার এই উদাসীন প্রেমে ললিতা মুহুর্মুহু বিষণ্ন হয়ে পড়ে। তখন বিছানায় অশান্তি ঘনিয়ে আসে। সজন উন্মন হয়ে পড়ে। ললিতা বালিশে মুখ লুকিয়ে কী ভাবে। সজন দুঃখ পায়। ললিতাকে ডাকে। ললিতা আবার হেসে মুখ মেলে দেয়। দুচোখ বন্ধ করে সজন অবিশ্রাম উথাল-পাথাল চুম্বন বর্ষণ করে, প্রার্থনা করে যেন ললিতার জীবনে শান্তি আসে। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিদিন ললিতা কান্নায় ঝরে পড়ে। সজন বুঝল ললিতার জীবনে আমার অভিজ্ঞতা নেই, সে এখনও ভালোবাসায় বিশ্বাসী।

সজন বিশ্বাস করেছিল ভালোবাসা তার জীবনের একমাত্র পরিচয় কিছুতেই নয়, তাকে সে কোন গুরুত্বই দেয় না, সুতরাং যে কাউকে সে ভালোবাসা দিতে পারে। কিন্তু ললিতা কেন আমার ব্যবহারে ভালোবাসার পরিচয় পায় না? সজন স্বীকার করে ললিতাকে ভালোবাসা আমার সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব এবং আমি আমার ধর্ম অনুসারে তাকে ভালোবাসি কিন্তু সে অভিযোগ করে আমি—। তাহলে প্রত্যেক নারীই স্বতন্ত্র এবং একজন পুরুষ, যেমন আমি, আমি যে কোন নারী, যেমন ললিতা, তাকে ভালোবাসতে পারি না। আমি বৃথাই চেষ্টা করি এবং ললিতা তাতে আরো অতৃপ্ত হয়। তাহলে সম্পূর্ণ বাস্তব ভেবে আবার সেই অবাস্তবতায় সেই আবেগে ভেসে গিয়ে আবার আমি ভুল করেছি। কিন্তু এখন আমার এই ভুলের জন্য শুধু আমাকেই নয় ললিতাকেও যে অপরিসীম দুঃখ পেতে হবে। ললিতা আমার সমস্যা বুঝবে না, বুঝতে পারে না। কিন্তু আমার সঙ্গে তার শাস্ত্রসম্মত শরীর সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে, তাকে তার প্রার্থিত সুখ তৃপ্তি ইত্যাদি দেওয়া আমার দায়িত্ব। এখন আমি স্বীকার করতে পারি যে ললিতা তার শরীর তার কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে না। তবু আমি নিজের মধ্যে ইচ্ছা তৈরী করে তার শরীরকে খুসী করতে চেষ্টা করেছি। তার মনের জন্য আমার কিছুই করার ছিল না। শেষপর্যন্ত তাকে শারীরিক সুখ দিতে হলে আমার মধ্যে যে নামমাত্র ইচ্ছারও প্রয়োজন হয় সেই ইচ্ছাও আমি কোনমতে তৈরী করতে পারি না।

সজন স্বীকার করল আমি নিজেকে আদৌ জানি না। তাই বার বার ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। পৃথিবীর যে পথকেই অবলম্বন করি সেই পথই পরিণামে ভুল হয়ে আমাকে আমার অজ্ঞতার শাস্তি দেয়। টাকা কোনদিনই আমি আসলে চাইনি। আমি জানি টাকা এত তুচ্ছ যে জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঙ্গে টাকার ন্যূনতম সম্পর্কও থাকতে পারে না। আমি কবি। আমি সমস্ত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে, সাধারণের অতীত—অসাধারণ। আমি স্বচ্ছন্দে প্রচার করতে পারি টাকার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না। টাকায় কিছুই এসে যাবে না। কেউ আমাকে অপরাধী ভাববে না। কিন্তু ললিতা, তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শরীর। তাকেই সে সেই শরীর দেয় যে তাকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ভালোবাসা তার চাই-ই। আর ভালোবাসাহীন শরীর সম্পর্কে সে হয় ধর্ষিতা, সে হয় ব্যর্থ। ললিতার এই ব্যর্থতার দায়িত্ব আমারই, সজন স্বীকার করল। সে ভাবল, কিন্তু এখন আমি কাকে বলব আমার অন্তরের একান্ত গোপন কথা। আমি রাত্রিকে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু জানতাম তাকে কখনোই ভুলতে পারব না। তাকে আমি আজীবন ভালোবাসব অথচ আমি কিছুই করতে পারব না। তাই আমি সমস্ত ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম। ভাঙার আনন্দে আমি তৃপ্তি পেতে চেয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে আমি হয়ত বা সহজ জীবনের সরিক হয়ে পড়ব, এও ভেবেছিলাম, হয়তবা ললিতাকে ভালোবাসতে পারব। কিন্তু তখন স্থির বিশ্বাসে জেনেছি সমস্ত ভাঙতে গিয়ে আমি শুধু নিজেকেই ভেঙে ভেঙে বিকৃত করে ফেলেছি, ফেলছি অহরহ। তবু শেষপর্যন্ত ললিতা যদি রাত্রি হত, তাহলে ললিতাকে তার প্রার্থিত সবই দিতে পারতাম।

সজনের বুক এক দুর্বোধ্য বেদনায় ভরে ওঠে। অনেক অনেক দূরে আছে এক স্বপ্নের দেশ, সে দেশের কল্পনার আকাশে আছে একটি স্বপ্নের নক্ষত্র, জন্মমুহূর্তে তারই সঙ্গে সজনের আত্মার আত্মীয়তা। সে কোথায় আছে কেমন আছে সজন এখন তার কোন সঠিক খবর জানে না। শুধু জানে শুধু বার বার স্বপ্নে কল্পনায় মনে পড়ে তাকে। সে এক তুলনাহীনা। তার দুর্লভ শরীরের অলৌকিক ব্যঞ্জনা, আধ্যাত্মিক গন্ধ চিরদিন মনে থাকবে। সেই আমার ভালোবাসা সে কী কেমন তার কিছুই সঠিক জানি না তবু তাকে আমি কোনদিন ভুলব না। সজনের চোখের অদূরে এই পৃথিবী হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সজন তার স্বপ্নের মুখোমুখি হয়।

সজন তার বিপর্যস্ত জীবনের মুখোমুখি। কিন্তু ললিতার অধিকার আছে জীবনের সহজ সকল কামনার চরিতার্থতায় পূর্ণ হয়ে ওঠার। সজন কী করতে পারে? সজন সারাদিন জনতার মধ্যেও নির্বাসনের যন্ত্রণায় ছারখার হয়। সকাল দুপুর-সন্ধ্যা পৃথিবীর কোন কিছুই তাকে ভাবায় না। দীর্ঘদিন সে রাত্রির কারো সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। যেন সমস্ত আশা তার নিঃশেষিত। আশা ছিল একদিন পৃথিবীতে সে পরিচিত হলে তখন রাত্রি নিজেই ফিরে আসবে তার কাছে। যতই সে সারা পৃথিবীর পরিচিত হোক কোনদিন আর ফিরে আসবে না। আমার জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে, সজন উন্মন হয়, কিন্তু তা কখনোই হতে পারে না। একটা কিছু আমাকে করতেই হবে। এই মিথ্যা জীবন থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে।

তার ঘুম আসে না। তবু কেমন করে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে পর্যন্ত সে একান্তভাবে কামনা করে যেন ঘুমের মধ্যে তার জীবনের অবসান হয়। অথচ দিনের পর দিন জীবন তাকে নির্বিঘ্নে যন্ত্রণা দেয়। প্রতিদিন জীবনেই তার মৃত্যু হয়।

একদিন সে একটা স্বপ্ন দেখল। কোথা থেকে একটা হাত এসে তার সামনে ভাসছে। আশ্চর্য নিপুণ গড়ন সেই হাতের। তার আঙুলের কারুকাজ অবাক হয়ে দেখার মত। আর তার লাবণ্য, সোনার ফেনার চেয়ে সূর্যের আলোর চেয়ে অনেক অনেক বেশী উজ্জ্বল। সেই গভীর বিস্ময়-বহ হাতখানির স্বর্গীয় সৌন্দর্যে একটি সুপ্ত গন্ধও ছিল। সেই অলৌকিক গন্ধ সজনের বুকের গভীরে নিদ্রিত একটি ইচ্ছার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তারপর সেই হাতের সৌন্দর্য আর গন্ধ সজনের

সুপ্তোত্থিত ইচ্ছার সামনে আকাশের ছায়াপথের মত একটা দৈবী আলোর পথ রচনা করে দিলে সেই পথের নিশানা ধরে দূরে দূরে আরো দূরে অনেক পৃথিবী পেরিয়ে অনেক আকাশ পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছল সজন একটা আকাশে। সেই আকাশে কত রঙের মেঘ, মেঘের পরে মেঘ সব স্থির নিথর, সমস্ত মেঘ পেরিয়ে তারপর একটা আকাশ সেই আকাশ জুড়ে একটা মুখ। সেই মুখের দিকে চেয়ে সজন ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল, আমি সজন বলছি, সজন, দেখ আমাকে, একবার তাকাও আমার দিকে, আমি তোমার কাছে যাব, কিন্তু দেখ না আমাকে কেউ মুক্তি দিচ্ছে না, আমি এখন কী করি, তুমি আমাকে দেখ না, আমি সজন, সজন বলছি, তুমি কথা বলছ না কেন তুমি কথা বলছ না কেন—আমি সজন-সজন-সজন-সজন—। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সজনের ঘুম ভেঙে গেল। সকাল হয়ে গেছে। ললিতার একটা হাত তার বুকের ওপর। সজন সযত্নে ললিতার হাত ললিতাকে ফিরিয়ে দিল।

বাইরে এসে দেখল সকাল হয়নি। বাঁধভাঙা জোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। দূরে আকাশ ঘন নীল। রাশি রাশি জুঁই ফুলের মত সাদা মেঘের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। দু-একটা তারা এই গভীর রাতেও জেগে আছে। চারপাশে ঝিঁঝির কণ্ঠধ্বনি আর মাটির বুকের স্পন্দনে সজন ঘুমন্ত পৃথিবীর শ্বাস-প্রশ্বাস জীবনের ছন্দ অনুভব করল। এমনি জোৎস্না রাত্রে মানুষের জীবনের অপূর্ণ কামনা-বাসনাগুলি যেন কণ্ঠ পেয়ে যায়, তারা গুমরাতে থাকে বলে যায়। চারপাশে অদৃশ্য কাদের সাংকেতিক কণ্ঠস্বর। আকাশ থেকে জ্যোৎস্নার ধারার মত শান্তি নেমে আসছে, দিনের সমস্ত কোলাহল সমস্ত রুক্ষতা ম্লান হয়ে যায়, অন্তরের অপূর্ণ ইচ্ছার ওপর ফুল গন্ধ সুর ঝরে পড়ে। এখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রাত্রির সৌন্দর্যের অঞ্চল পাতা, শিশিরস্নাত ঘাসের বুকে সজন গা মেলে দিল, সামনে অনন্ত আকাশ আকাশ জোড়া অনন্ত নীল-নীলিমা রাত্রির চোখের মত তার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল। আর সজনের অস্তিত্ব কার আশ্চর্য স্পর্শে আপ্লুত তরল হয়ে গেল। সজন সমস্ত বাস্তব ভেদ করে পৃথিবীর জীবনের গভীরে পৌঁছে গেল। তারপর সেই উপলব্ধি—যা কিছু মিথ্যা ভুল তাকে অস্বীকার করতেই হবে, জীবনের সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে হবে, তার জন্য কোন পথই অন্যায় নয় অপরাধ নয় পাপ নয়। আশ্চর্য প্রত্যয়ে সজন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ সজন চোখ মেলে দেখল দিনের আলো অনেকক্ষণ চাঁদের লাবণ্য কেড়ে নিয়েছে। ভীষণ লজ্জা পেয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল।

অনেক দ্বন্দ্বের পর সজন স্থির বিশ্বাসে অবিচল হল, ললিতাকে সে ভালোবাসতে পারে না, সুতরাং ত্যাগ—। সমাজের কাছে সমাজের তৈরী নীতির কাছে সমাজের তৈরী মনুষ্যত্ববোধের কাছে তাকে লাঞ্ছিত হতে হবে সে জানে। কিন্তু আমি এই সমাজ এই সমাজের কিছুই মানি না। সমাজ নীতি মানুষে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে আমি ভালোবাসতে পারছি না তার কি কোন বাস্তব কারণ আছে? বাস্তব কারণ একটা অবশ্যই আছে কিন্তু কেউ তার বাস্তবতা বিশ্বাস করবে না। আমি যদি বলি এই অবিশ্বাসের মূলে আছে অজ্ঞতা। সজন স্বীকার করল ললিতার জীবন আমি স্বীকার করি। কিন্তু যাকে আমি ভালোবাসতে পারি না তাকে আমি কোনমতেই ভালোবাসতে পারি না। সমাজ নীতি কোন কিছুরই অনুশাসনে কোন বাইরের তাড়নাতেই অন্তর নির্দেশিত হয় না। সমাজ নীতির কোন শাসন চলতে পারে না কারুর অন্তরজগতে। তবু যদি আমাকে বাধ্য করা হয় ললিতাকে ভালোবাসার জন্য, তাতে যদি সমাজ রক্ষা পায় মনুষ্যত্বের মর্যাদা যদি তাতে বাড়ে তবে আমি তা করতে পারি হয়ত, কিন্তু নিশ্চিত জেনো সেই ভালোবাসা হবে কৃত্রিম, ভালোবাসাহীন ভালোবাসা। সমাজ যদি নির্বোধ না হয় তাহলে সমাজও তা বুঝতে পারবে, বুঝতে পারবে সেই কৃত্রিম ভালোবাসা কত অপরাধ, কেননা তাতে ললিতার সমস্যা আরো অনেক বেড়ে যাবে। তাহলে ললিতা কী আশায় কোন স্বার্থের সার্থকতার আশায় সজনের ওপর নির্ভর করে থাকবে? জীবনের সুখ সার্থকতার জগতে তার স্বাধীনতা আছে। কেননা অন্য কারো সুখে সার্থকতায় তার সুখ বা আনন্দ হতে পারে না। সে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। তার এই ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশের পথে বাধা স্বরূপ সজনকে সে কেন উপেক্ষা করবে না? সে দুর্বল বলে? সে নিজের স্বরূপ সঠিক বোঝে না বলে? সজন তার স্বরূপ বোঝে। তাহলে নিজের স্বার্থের জন্যে সজন ললিতাকে ত্যাগ করলে ললিতারও কিছু কম মঙ্গল হবে না। প্রত্যেকটি জীবন স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি জীবন ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের পথে সার্থক হয়। সমাজ কারো জীবনকেই উপেক্ষা করতে পারে না। তাহলে সমাজকে হতে হবে মুক্ত—সমাজের নীতি নিয়মকে মানুষের জীবনের স্বার্থেই হতে হবে মুক্ত। সমাজ নীতি নিয়ম তৈরী করবে না, নীতি নিয়মের ক্ষেত্রে সমাজকে জীবনের অনুগত হতে হবে। কিন্তু যে সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে দুর্বল জনসাধারণের ওপর স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়ে পাহাড়ের মত অসীম ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত সেই সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে সজন কি নিজেকে শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে? কিন্তু সজন ভাবল কারো সঙ্গে যুদ্ধে তার জীবন কি সার্থক পাবে? সজন বুঝল তার দ্বন্দ্ব অসার্থক জীবনের সঙ্গে, ললিতার সঙ্গে। একটি জীবনের সঙ্গে আর একটি জীবনের নিশ্চিত সংঘাত, তারপর দুটি জীবনেরই নিশ্চিত মুক্তি। সজনের মুক্তি নিশ্চিত?

(ক্রমশঃ)

মনের কথা

ভর হওয়া, ভূতে পাওয়া কুন্তীর আসুরিক চিকিৎসা

'ভর হওয়া', 'ভূতে পাওয়া' রোগীদের মাঝে মাঝে হাসপাতালে বা মনের ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসার জন্যে আনা হয়ে থাকে। রোজার চিকিৎসায় ফল না পাওয়া গেলে আত্মীয়স্বজন খানিকটা দায়ে পড়েই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। 'ভর হওয়া' রোগীদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই জনই বিবাহিত মহিলা। বয়স ষোলো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। আমাদের দেশের এক হাসপাতালের রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। ইংরিজিতে এই অবস্থাকে বলা হয় 'পজেশন স্টেট' বা 'দখলীকৃত অবস্থা'। রোগীর মনোদুর্গ অন্য কেউ এসে দখল করে। দখলকারীদের মধ্যে কালী, দুর্গা, শিব ইত্যাদি কুলীন দেবদেবী ছাড়া স্থানীয় লোকদের আরাধ্য অকুলীন দেবতারাও আছেন। দেবদেবী ভক্তকে ভর করেন, ভক্তের মুখ দিয়ে নিজের বাণী প্রচার করেন। অনেক দিন অবধি এই সব রোগীর চিকিৎসার কোনো চেষ্টা করাই হয় না, এদের আত্মীয়স্বজন দেবদেবীর আসনে বসিয়ে এদের নিয়ে উপাসনা, আরাধনায় মেতে ওঠেন। ভূতে পাওয়া রোগীদের অদৃষ্টে কিন্তু সব সময়ে শ্রদ্ধা সমাদর জোটে না। শ্রদ্ধেয় আত্মীয়স্বজনের প্রেতাত্মা যদি দখলকারী হন তাহলে অবশ্য রোগীকে সমীহ করা হয়, কিন্তু দুষ্টপ্রেত যদি ভর করে তবে আর রোগীর দুর্গতি দুর্দশার অন্ত থাকে না। রোজার তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির সঙ্গে দৈহিক নির্যাতনের সাহায্যে চিকিৎসা চলে। প্রেতাত্মার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার পর অনেক দিন পর্যন্ত এই নির্যাতনের চিহ্ন রোগীর দেহে বিদ্যমান থাকে। এই সব চিকিৎসার পরও যদি দুষ্টপ্রেত তার দখলীস্বত্ব ছাড়তে রাজী না হয়, তবেই আত্মীয়স্বজনেরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ভর হওয়া ভূতে পাওয়া রোগীদের সম্পর্কে কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। এঁদের লেখা থেকে জানা গেল যে, প্রেতাবিষ্ট ও দেবাবিষ্টদের মধ্যে বেশির ভাগ ভুগছেন হিস্টিরিয়া ও সিজোফ্রেনিয়া রোগে। অল্পসংখ্যক 'ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ' রোগীও এদের মধ্যে আছেন। হিস্টিরিয়া একটা নিউরোটিক অবস্থা আর সিজোফ্রেনিয়া ও ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ উন্মাদ অবস্থা বা সাইকোটিক অবস্থা। কঠিন গোছের মনের অসুখকে সাইকোসিস বলা হয়, আর সহজে আরোগ্য-সম্ভব, এই ধরনের মনের অসুখকে বলা হয় নিউরোসিস। বর্তমানে এই মতাগত পার্থক্যের কথাই শুধু উল্লেখ করছি। গুণগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা সিজোফ্রেনিয়া প্রসঙ্গে করা যাবে।

এই সব রোগীদের মধ্যে বেশীর ভাগই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে এই অবস্থা দেখা যায় না। এইসব রোগীদের পরিবারে ধর্মপ্রবণতা প্রবল, কুসংস্কারও প্রচুর। হিন্দুদের মধ্যেই ডাক্তাররা এই রোগের প্রাদুর্ভাবের আধিক্য লক্ষ্য করেছেন। মেয়েরাই প্রধানত আক্রান্ত, পুরুষরা কম। পুরুষদের মধ্যে পুরোহিত ও দেবস্থানের সেবায়েতদের সংখ্যাই বেশী। রোগাক্রান্তদের অধিকাংশই বিবাহিতা পারিবারিক জীবনে এরা হয় অসুখী অথবা অতিমাত্রায় দায়িত্বভারপীড়িত।

মানসিক আরোগ্যশালার ডাক্তারদের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, মাঝে মাঝে 'ভর হওয়া' রোগ সংক্রামক ব্যাধির মত আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে, গণ-হিস্টিরিয়ার মত ব্যাপকভাবে দেখা দিতে পারে। রাঁচির উপকণ্ঠে পল্লী অঞ্চলে ১৯৬৬ সালে এই রকম গণ-হিস্টিরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ভার্মা, শ্রীবাস্তব ও সহায়-এর রিপোর্ট থেকে সংক্ষিপ্ত ভাবে এই গণ-হিস্টিরিয়ার বিবরণ তুলে ধরছি।

১৯৬৬, ২৭শে মে সন্ধ্যায় এগারো বছরের একটি মেয়ে কুয়া থেকে কলসী ভরে জল নিয়ে আসছিল। সঙ্গে ছিল তার দিদি। হঠাৎ তার হাত কাঁপতে লাগল, মাথা দুলতে লাগল, সারা দেহ ভারী মনে হল। 'আমি এসেছি আমি এসেছি' বলে সে চীৎকার করে উঠল। রোজা ডাকা হল। রোজা আসতেই মেয়েটি তাকে বকতে লাগল এবং তাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করল। গম্ভীরভাবে জানাল যে সে 'বড়িমা' বা দেবী। তাকে ত্যক্তবিরক্ত করলে শাস্তি পেতে হবে। রোজা শুনবে কেন? মেয়েটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে চেঁচাতে লাগল, তার থেকে আরো দ্রুত মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল, আর আগুনে জ্বেলে তার মধ্যে ধূপ-ধুনো ফেলতে লাগল। বড়িমা আর রোজার মধ্যে আরম্ভ হল বেশ একটা ছোটখাটো দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মেয়েটি তখন অগ্নিকুণ্ড থেকে এক মুঠো জ্বলন্ত কয়লা হাতে তুলে নিয়ে রোজাকে বলল—'এই নে প্রসাদ, আমাকে আর জ্বালাস নে।' সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল জ্বলন্ত কয়লা হাতে নেওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি নির্বিকার। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। হাত পুড়ল না, এমন কি ফোস্কা পর্যন্ত পড়ল না। তখন রোজার চৈতন্য হল। মেয়েটির পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। মেয়েটির বাবা-মা এবং উপস্থিত সকলেই ভয়ে ভক্তিতে অভিভূত হয়ে গেল। বড়িমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে অপরাধের মার্জনা চাইল। বড়িমা মার্জনা করলেন। মেয়েটি তার মাকে জানালো যে, তাঁরা মানত রক্ষা করেন নি, তাই বড়িমা নিজে তাঁর প্রাপ্য মানত নিতে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন। এগারো বছরের মেয়েটির মত কথা বলছে না এখন। বাবা মাকে নাম ধরে ডাকছে, সকলের সঙ্গে বয়োবৃদ্ধার মত ব্যবহার করছে। চালচলনে মুরুব্বিয়ানার ভাব ফুটে উঠেছে। কণ্ঠস্বরেও বিকৃতি ঘটেছে। সকলকে আদেশ করছে, নানারকম নির্দেশ জারী করছে। কেউ জুতো পরে বা চশমা চোখে দিয়ে তার ঘরে ঢুকতে পারবে না, লাল পোশাক কেউ পরবে না, তার সামনে কোনো কিছুই খাবে না। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের সব একেবারে ভয়ে উদ্বিগ্ন, ভীত ও সন্ত্রস্ত। তার বাড়ীর সামনে ভিড় জমে গেল, শাঁখ ঘণ্টা বাজতে লাগল। ঢাক ঢোল কাঁসর ও মাদল নিয়ে তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা চলল। দলে দলে লোক ভোগ জানাল, তাঁদের বাণী শুনল, নিজেদের সমস্যা সমাধানের পরামর্শ চাইল। পরের দিন ভিড় আরো বাড়ল। গ্রামান্তর থেকে, এমন কি রাঁচী শহর থেকেও দলে দলে লোক ছুটল বড়িমাকে দর্শনের আশায়। মেয়েটির উত্তেজনা তখন বেড়েছে, মাথা নাড়া আরো ঘনঘন হচ্ছে। এক ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করায় 'বড়িমা' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি উত্তেজিত হলেন একটি পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত মহিলা। তিনি এতক্ষণ বড়িমার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অসন্তুষ্ট লোকটিকে শাস্তি দেবার জন্য উন্মাদের মত ছোটাছুটি করতে লাগলেন; তাকে হাতের কাছে না পেয়ে শাপশাপান্ত করে তখনকার মত নিরস্ত হলেন। তাঁর ঘন-ঘন ফিট হতে লাগল। তিনি নিজেকে 'ছোটিমা' বলে ঘোষণা করলেন।

ক্রমশ এই ধর্মোন্মাদনা আরো ছড়িয়ে পড়ল। দুই মাতাকে একটি ছোট ঘরে মহাসমাদরে আশ্রয় দেওয়া হল। কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে লাগলেন। ঘরে দিনরাত ধূপধুনো পুড়তে লাগল। ৩০ মে আঠারো বছরের একটি কুমারী মেয়ের ভর হল। তার হল কালীর ভর। চার নম্বরের ভরগ্রস্ত রোগী একটি আট বছরের বালক। তাকে ভর

করলেন দেবাদিদেব মহাদেব। ৩১ সন্ধ্যায় বাইশ বছরের একটি বিবাহিত তরুণীর দেহে আশ্রয় নিলেন 'মাঝলী মাতা' বা মেজমা। সেই রাত্রে আর একটি তরুণী 'সাঁঝলি মা' বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। বড়মা, ছোটমা, মাঝলি মা, সাঁঝলি মা সবই স্থানীয় দেবী। শীতলা দেবীর ভগ্নী বলে এ'রা পরিচিত। ২৭ মে এই গণহিস্টিরিয়ার সূত্রপাত, ৩১ তারিখ চরমে উঠে ঘটল পরিসমাপ্তি। এক সপ্তাহের মধ্যেই দেবীরা স্বস্থানে প্রস্থান করলেন, এবং রোগীরা যে যার বাড়ী ফিরে এল।

রাঁচীর আরোগ্যশালার ঐ চিকিৎসকদের মতে সবক'টি ভরগ্রস্তই মনের সমস্যাভারে পীড়িত ছিল, কোন মতেই তাদের সমস্যার সমাধান মিলছিল না। ধর্ম উন্মাদনার সুযোগ নিয়ে তারা সাময়িকভাবে বাস্তব থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। ঐ এলাকায় ঐ সময় হাম-বসন্ত ব্যাপকভাবে (এপিডেমিক) দেখা দিয়েছিল। বসন্ত রোগকে স্থানীয় অশিক্ষিত অধিবাসীরা 'মায়ের দয়া' বলে মনে করে, রোগ বলে মনে করে না।

এই ধরনের অনেকে এক সঙ্গে ভরগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ খুব বেশি না থাকলেও গণ-হিস্টিরিয়ার অন্য ধরনের প্রকাশ সব দেশেই মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কোলকাতায় কয়েক বছর আগে এক সময় রাস্তাঘাটে হঠাৎ হাত-পা ঝিনঝিন করে অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়া অবস্থায় অনেক লোককে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হয়েছিল। প্রায় পাঁচ ছয় সপ্তাহ ধরে এই রোগ চিকিৎসক মহলে উৎকণ্ঠা আর সাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।

অজানা এই রোগের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা সফল হয় নি। সাধারণের মধ্যে 'ঝিনঝিনয়া' কথাটি বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় একটা নাটকও রচিত হয়েছিল 'ঝিনঝিনয়া' নিয়ে। যেমন আকস্মিকভাবে আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিকভাবে তিরোধানও ঘটল এই 'ঝিনঝিনিয়া' রোগের। সাজেসশন বা অভিভাবনের প্রভাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চিকিৎসকমহল থেকে 'কাউন্টার-সাজেসশন'-এর ফলে এই গণহিস্টিরিয়ার অবসান ঘটে।

'ভর' এপিডেমিক আকারে দেখা না দিলেও বিক্ষিপ্তভাবে সব সময়েই গ্রামাঞ্চলে দেখা দিয়ে থাকে। এই রকম এক রোগীর কথা বলছি।

বাগনানের কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে এক রবিবার সকালে চার-পাঁচজন মেয়ে-পুরুষ একটি সাতাশ আঠাশ বছরের বিবাহিত মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত। সিঁড়ি দিয়ে এক রকম টেনে-হিঁচড়ে তাকে দোতলায় তোলা হল। চেঁচামেচি, হৈ-হট্টগোলে বেশ একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে রাস্তায়। ট্যাক্সি থেকে নামাতেও বেগ পেতে হয়েছে। মেয়েটিকে যখন আমার কাছে হাজির করল, তখন তার অবস্থা শোচনীয়। কপালের এক জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, অনাবৃত দেহের কয়েক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। সে কিছুতেই 'পণ্ডিতে'র কাছে আসবে না, আত্মীয়েরাও ছাড়বে না। মেয়েটি আর্তস্বরে চীৎকার করছে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও, 'পণ্ডিতে'র কাছে আমি যাব না।' আত্মীয়ের দলকে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে বলে মেয়েটিকে অতিকষ্টে তার স্বামীর সাহায্যে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একটা 'সিকুইল' ইঞ্জেকশন দিলাম। মেয়েটি খুবই পরিশ্রান্ত ছিল, আশ্বাস ও অভয় দেওয়াতে মিনিট কুড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। আমাকে 'পণ্ডিত' অর্থাৎ রোজা ভেবে ভয় পাচ্ছিল। কয়েক দিনের মধ্যে দুই 'পণ্ডিতে'র চিকিৎসার চিহ্ন তার গায়ে মুখে দেখতে পেলাম। ভয় হওয়া স্বাভাবিক। এইবার অনন্ত মাজির কাছ থেকে স্ত্রী কুন্তীবালার 'ভর হওয়ার' ইতিবৃত্ত শুনলাম।

প্রায় বারো বছর আগে ওদের বিবাহ হয়েছে। অনন্ত মাজির বয়স তখন ২৪, কুন্তীর ১৬। অনন্ত কলে কাজ করত, মাস কতক হল ছাঁটাই হয়েছে। পাঁচটি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে এখন শ্বশুরের সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথি। শ্বশুরের বাড়ীতেই বর্তমানে আছে। বাগনানের বাসা তুলে দিতে হয়েছে। গাঁয়ের ভিটেতে বাসযোগ্য ঘর নেই; সবই ভেঙেচুরে গেছে। প্রায় দশ বছর অনন্ত গ্রামছাড়া। জমিজমা কিছু নেই, কাজেই কলে-কারখানায় কাজ করে সংসার চালাতে হয়েছে। আট মাস বেকার। মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাকে নাকি বরখাস্ত করা হয়েছে। সে আদালতে মামলা করে ক্ষতি-পূরণ আদায় করবে। মামলাও রুজু করে দিয়েছে। কিন্তু মামলা শেষ হয়ে ক্ষতিপূরণ পেতে অনেক দেরী। কাজেই উপায়ান্তর না দেখে মাস দুয়েক হল শ্বশুরের আশ্রয়ে আসতে হয়েছে। শ্বশুরমশাই-এর অবস্থা মোটামুটি ভালো। জমিজমা আছে, তেজারতির কারবার আছে, তবে পোষ্যও সংসারে অনেকগুলি। কিন্তু তিনি লোক ভালো নন। অনন্তকে মামলার তদারক ছেড়ে কাজ খুঁজতে বলছেন, তাঁর জমিজমার তদারক করার পরামর্শও দিয়েছেন। কুন্তী চায় না বাপের বাড়ীতে সে গলগ্রহ হয়ে থাকে। অনন্তেরও ঘরজামাই হবার ইচ্ছে নেই। অনন্ত কুন্তীকে কয়েক দিন ধরে বলছিল বাপের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার হিসেবে চাইতে। ঐ টাকা দিয়ে বাগনানে সে একটা মুদীখানার দোকান খুলবে। মামলা তদারকের সুবিধে হবে আবার শ্বশুরের গলগ্রহ হয়েও থাকতে হবে না। কুন্তীকে রাজী করতে না পেরে অনন্ত এক রাত্রে ওকে একটু বেশী বকাঝকা করেছিল এবং ওকে এখানে রেখে দেশান্তরী হবে বা আত্মঘাতী হবে মিছিমিছি ভয় দেখিয়েছিল। সেই রাত্তিরেই কালীর ভর হয়েছে কুন্তীর। শেষ রাত্তিরে বাইরে যাবার দরকার হতে উঠে দেখে দরোজা খোলা, কুন্তী নেই। শ্বশুরের দরোজায় ধাক্কা দিয়ে তাদের জাগালো। ছেলে-মেয়েগুলো ঘুম ভেঙে উঠে চেঁচাতে লাগল। চারদিকে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল। ভোর নাগাদ কুন্তীকে কালীবাড়ীর দরোজার সামনে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই সে উঠে তর্জন গর্জন সুরু করে দিল। অনন্তকে মহাদেব হয়ে তার পায়ের তলাতে শুতে বলল। বাপকে বলল, গড় করে প্রণাম করতে। মাকে বলল, চুল কেটে ফেলে মাথা ন্যাড়া করে কালীপূজোর আয়োজন করতে। সকলে তাকে নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাবা মা গড় করে প্রণাম করলেন, সাধ্যসাধনা করে ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কুন্তী যাবে না। যতদিন না তার মন্দিরের চূড়ো সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হবে ততদিন সে ঘরে ঢুকবে না, জলস্পর্শ করবে না। মন্দিরের পাশে তাল-পাতার ছাউনী করে কুন্তীর অস্থায়ী বাস-স্থান নির্মিত হল। প্রায় দিগম্বরী হয়ে সে অনবরত কথা বলে তখন তাকে দেখলে ভয়-ভক্তি না করে কারুর উপায়ান্তর ছিল না। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, এলোচুলে বুক মুখ ঢাকা, মাথাটা অনবরত ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরছে, হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। নিজের বাচ্চাদের চিনতে পারছে না। বাচ্চাগুলো ভয়ে ওদিকে যেতেই চায় না। তাদের কান্নাও বন্ধ। আশেপাশের গাঁ থেকে অনেক লোক দেখতে এল, অনেকে অনেক কথা বলল, কুন্তী কোনো কথার উত্তর দিল না। কালীবাড়ীর সেবায়েত শ্রীধর পণ্ডিত দিন তিনেক পরে গ্রামে ফিরে এলেন। এই তিন দিন কুন্তীর সামনে দুধ, সন্দেশ, কলা, বাতাসার পাহাড় জমে গেছে। হাজার মেয়ে পুরুষ গড় হয়ে ওকে প্রণাম করেছে। এয়োতিরা ওর মাথার সিঁদুর চেয়ে নিয়েছে। কিন্তু ঐ শ্রীধর পণ্ডিত ফিরে আসতেই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। এই তিন দিন তাঁর মন্দিরের সব পাওনাগণ্ডা তাল-পাতার ঘরের কুন্তীর সামনে জড়ো হয়েছে দেখে তিনি বোধ হয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি সরাসরি গিয়ে অনন্তর শ্বশুরমশায়কে জানালেন যে, কালী নয় প্রেতিনীতে ভর করেছে কুন্তীকে। এখনই ঝাড়-ফুঁক দরকার। অবিলম্বে ঝাড়ফুঁক আরম্ভ হয়ে গেল। জোর করে তালপাতার চালা থেকে কুন্তীকে বাড়ীতে আনা হল। দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে প্রেতিনীর সঠিক পরিচয় জানবার চেষ্টা করল। 'পণ্ডিতে'র জিজ্ঞাসা-বাদ পদ্ধতির কথা শুনলাম অনন্তের মুখে। টেগার্টের আমলের আই বি'র কর্তারাও বোধ হয় জিজ্ঞাসাবাদের ঐ রকম নিষ্ঠুর পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ফুটন্ত তেল ও গরম লোহা দিয়ে ওর পায়ের তলায় ও গায়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হল। তার আগে মৃদুতম পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঝাঁটা ও জুতোর আঘাত দিয়ে অবশ্য চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রেতিনীর যদিও বা পরিচয় মিললো, প্রেতিনী কুন্তীকে ছাড়তে চায় না। তখন দ্বিতীয় পণ্ডিত এলেন। প্রথম পণ্ডিতের বোধ হয় গুরু। দুজনে মিলে চব্বিশ ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করেও ফল পেলেন না। ঘনঘন ফিট হতে লাগল কুন্তীর। সে বলতে লাগল, 'আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও'। তবু পণ্ডিতেরা ছাড়েন না। ছেড়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁরা দেখতে চাইলেন। বাড়ীর সামনের আমগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়লে তাঁরা বিশ্বাস করবেন, প্রেতিনী সত্যি সত্যি ছেড়ে গেছে। প্রেতিনী ছেড়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রমাণ দেখাতে পারল না। লোকমুখে খবর পেয়ে বাগনান থেকে কুন্তীর ভাই কয়েকজন ছাত্র এবং একজন ডাক্তার এনে 'পণ্ডিত'দের হাত থেকে মেয়েটিকে অতি কষ্টে বাঁচালেন। না হলে হয়ত এই অত্যাচার আরো কিছুকাল চলত।

ঘণ্টা দেড়েক পরে কুন্তীর ঘুম ভাঙালো। মিনিট পনেরো তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখলাম তার মানসিক অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক। শারীরিক দুর্বলতা আছে। পণ্ডিতদের মারধোরের কথা তার মনে আছে। তার আগের চব্বিশ ঘণ্টার কথা কিছু মনে নেই। স্বামীর অন্যায় আবদারের কথা শুনে তার রাগ হয়েছিল। কোন মুখে সে বাপের কাছে টাকা চাইবে? এর আগে স্বামী আরো কয়েকবার তার বাবার কাছ থেকে নানা অজুহাতে টাকা নিয়ে ফেরত দেয় নি। স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাবার ভয় দেখাতে সে সত্যিই আতঙ্কিত হয়েছিল। ঘুম আসছিলো না। গভীর রাত্রে দরোজা খুলে মায়ের মন্দিরে সামনে লুটিয়ে পড়েছিল। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল। এরপর তার মনে পড়ে ঐ রোজার অত্যাচারের কথা। বুঝলাম আমার কাছে আসবার অনেক আগেই তার হিস্টিরিয়ার ভর কেটে গেছে। 'ভরের' সময়কার কোনো কিছুই তার মনে নেই। বলকারক পথ্য আর মৃদু ট্রাংকুলাইজারের ব্যবস্থাপত্র লিখে তাকে বিদায় দিলাম। অবশ্য তার আগে অনন্ত মাজিকে সংক্ষিপ্ত মনের কথা বলতে কসুর করি নি।

—মনোবিদ্

পাদুকা নিয়ে

শৈলেন রায়

দল ছেড়ে হঠাৎ ও একা বেরিয়ে এল। পুজো প্যান্ডেলে তখন লোকে-লোকারণ্য। চেঁচামেচি, হৈ, হল্লা। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। ও খুব কাছে সরে এল। এত কাছে যে মাথার তেলের গন্ধটাও নাকে এসে লাগল।

ও বলল, হাঁ করে কি দেখছো?' বলেই হাসল। বাঁ ঠোঁটের তিলটা ক্রমশ কানের দিকে সরে যেতে লাগল।

ইচ্ছে হল বলি, 'তোমাকে।' কিন্তু লজ্জা করল। সাতাশ আঠাশ বছর আগেকার কথা। তখন কথায় কথায় খুব লজ্জা হত। তারপর মাথার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় জল চলে গেল। লজ্জাজনক একটা দুর্বলতা একদা যে এই শরীরে বা মনে বাসা বেঁধে ছিল, তা বেমালুম ভুলে গেলাম।

ও একটা ছোট্ট ধমক দিয়ে উঠল, 'ওরা এক্ষুণি চলে আসবে। আমাকে দেখতে পায় নি। ওরা যখন আরতি দেখছিল, তখন সটকে পড়েছি।'

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'কেন?'

মুখ ভেংচালো। 'কেন! কচিখোকা, বোঝে না যেন।'

ভেংচি কাটলে যে মানুষকে সুন্দর দেখায় জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি হল।

সুন্দর শুধু নয়, দারুণ রকমের সুন্দর। ওর এই মুখ ভেংচানোটা, সত্যি করে বলতে কি, বহু দিন পর্যন্ত মনের মধ্যে গেঁথেছিল।

তারপর সেন্ট-মাখা রুমালের মত কখন গন্ধটা বাসি হতে হতে একদিন মিলিয়েই গেল।

ও বলল, 'মেয়ে হয়ে সেধে এলাম, আর উনি মেয়েদের মত বেগুনী হচ্ছেন।' বলেই ও খিল-খিল করে হেসে উঠল। আমার গায়ের রং নিয়ে যে ও কটাক্ষ করল, বুঝতে পারলাম। কিন্তু কী উত্তর দেব ভাবতে ভাবতেই ও আবার বলল, 'তোমার সেই বুড়োটে বন্ধুটা কোথায়, সেই যে জ্যাঠা-জ্যাঠা হাব-ভাব।'

'ও মোটেই জ্যাঠা নয়, ওর নাম তরুণ।'

'তরুণ!' বলেই ও ছোট্ট একটা শব্দ করে মুখে রুমাল চেপে ধরল। রুমালটা এতক্ষণ কোমরে গোঁজা ছিল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল। হাসির ভারে ওর শরীর নুয়ে পড়ল। ওর পিঠটা বেশ চওড়া আর মাংসল। অনাবৃত ঘাড়টা খুব ফর্সা। ওর কোঁকড়া চুলের ঝাঁপ মাথার এক পাশে হেলে পড়েছে। ওকে এভাবে হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে দেখে প্রথমটা বিস্মিত হলাম, পরে বিরক্ত।

বললাম, 'পৃথিবীর অনেক লোকের নামই তরুণ হতে পারে, এতে হাসার কিছু নেই।'

ও অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, 'তা নেই। কিন্তু ওর নাম তরুণ না হয়ে হরেকৃষ্ণ বা হরেরাম হলেই মানাত ভাল।' বলেই আবার হাসিতে ফেটে পড়ল।

'ও মোটেই বুড়ো নয়। ওর স্বাস্থ্য খুব ভাল। নিয়মিত ব্যায়াম করে, ছোলা গুড় খায়। ওর বয়স আঠারোর বেশী নয় কিছুতেই। স্বাস্থ্যবান ছেলেদের বয়স বোঝা যায় না।'

ওর হাসি ধীরে ধীরে কমে এল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে রগড়ে রগড়ে মুখ মুছতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ও যে কষ্ট করে হাসি চেপে রাখছে, তা ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সময় সময় দাঁত দিয়ে বেশ জোরে ও নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরছিল, যাতে করে ব্যথা পেয়ে হাসতে ভুলে যেতে পারে।

হঠাৎ ও পেছন ফিরল। আমার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওরা খুঁজতে শুরু করেছে। আমি যাচ্ছি। তুমি ঐখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। এমনভাবে দাঁড়াবে যেন আমাদের দেখতেই পাও নি। শুধু প্রতিমার দিকেই তাকিয়ে থাকবে; এদিক ওদিক তাকাবে না মোটেই, বুঝেছো।'

'কেন?'

ও আবার ভেংচে উঠল, 'কেন! বোঝে না কিছু, কচিখোকা!'

আবার ওকে দারুণ সুন্দর দেখাল। এত সুন্দর, যে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল, 'তুমি তো খুব সুন্দর।'

'খুব সুন্দর!' ও আবার মুখ বিকৃত করতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখলাম ওরা দুজনে এদিকে আসছে। সুট করে সরে পড়লাম।

ওরাই আমাকে খুঁজে বার করল। ওরা তিনজন। ও মাঝখানে। ডানপাশে লম্বা মেয়েটি—যার হাসির সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে আর শেষের দিককার একটা দাঁতের ওপর আর একটা দাঁতের অবস্থিতি নজরে আসে। মনে মনে ওকে গজদন্তী বলে ডাকি আমি। বাঁ-পাশের মেয়েটি না-বেঁটে না-লম্বা, না-রোগা না-মোটা, না-কালো না-ফর্সা। সব মিলিয়ে ওকে দেখতে না-খারাপ না-ভালো। ওর নাম দিয়েছিলাম না-না। মাঝের ওকে তিলোত্তমা বলে ভাবতে ভালো লাগে। ভালো লাগে, যেহেতু মটর-দানার মত তিলটা, ওর দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে। সাত আট মাস ধরে ওদের দেখছি, কিন্তু নাম জানা হল না। নামের কথা জিজ্ঞেস করলে শুধুই হাসে, আর কী সব বলে; এ বাড়ির ছাদ থেকে তা বোঝা যায় না।

মুখোমুখি দুটো বাড়ি। রাস্তার এ-পাড়ে আমরা, ও-পাড়ে ওরা। এপাড়ে বিরাট সংসার। বহু খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই-বোন, খুড়ো, খুড়ি, জ্যাঠা ইত্যাদি। জেঠিমা আগেই স্বর্গে গেছেন, না হলে সংসারে আর একজন লোক বাড়তে পারত। সংসারের কর্তা জ্যাঠামশাই, কড়া শাসনে বিশ্বাসী। ও-পাড়ে বহু সংসার। বড় বড় গোটা তিনেক বাড়ি নিয়ে পুলিশ ব্যারাক। এবাড়ির ঠিক মুখ বরাবর যে বাড়িটা, সেই বাড়ির বাসিন্দা ওরা। ওপরে নীচে মিলিয়ে তিনটে আলাদা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। যদিও সংসার আলাদা, ওরা এক। এক সাথে হাসে, কথা বলে, চেঁচায়, ছাদে উঠে তেঁতুলমাখা খায়, বীচি ছুঁড়ে রাস্তায় মারে। যার মাথায় পড়ে, এদিক ওদিক তাকায়। পাখির বিষ্ঠা মনে করে সন্তর্পণে মাথায় হাত বুলোয়। ওরা ছাদের পাঁচিলের আড়ালে গা-ঢাকা দেয়। গা-ঢাকা দিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে কয়লার গুঁড়োয় ভর্তি ছাদে গড়াগড়ি যায়। ওদের হাসি নীচে পৌঁছতে পারে না। মুখে শাড়ির আঁচল গোঁজা থাকে ওদের। সে আঁচল এদিক ওদিক হয় না। এ দৃশ্য আমার দেখা, যেহেতু এদিককার বাড়িটাও তিনতলা। এক ছাদের দৃশ্য আর এক ছাদ থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।

ইউরেকা বলার মত করে লাফিয়ে উঠল তিলোত্তমা, 'আরে এই যে!'

'আর আমরা—' বলল গজদন্তী।

'খুঁজে মরি।' চোখ ধমকে শেষ করল না-না। না-নার চোখ বেশ টানা টানা আর উজ্জ্বল, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারা দুটো নেচে ওঠে, আর সাদা জায়গাটার মধ্যে মধ্যে বন-বন করে ঘুরতে থাকে।

ওরা এক সঙ্গে শব্দ করে হেসে উঠল। ওদের হাসির সঙ্গে অনেকে প্রতিমা ছেড়ে এদিকে তাকাল। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেলাম। কিছু একটা বলা উচিত, অথচ কী যে বলব!

না-না দুপা এগিয়ে এসে ছোট্ট একটা ধমক দিল, 'বোকা শশীর মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এসো।'

গা জ্বলে গেল। ওর বলার ধরন মোটেই ভদ্রোচিত নয়। অবশ্য ওদের কোন ব্যবহারই ভদ্রোচিত নয়। এতদিন ধরে দেখে আসছি; অসম্ভব চেঁচায়, লাফায়, হাসাহাসি করে, তেঁতুল বীচি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। কোন কিছুই সংযতভাবে করার শিক্ষা পায় নি ওরা। অথচ বয়স এমন কিছু ছোট নয়।

ওরা এগিয়ে চলল। তখনও দাঁড়িয়েছিলাম।। তিলোত্তমা হাঁটতে হাঁটতেই পিছন ফিরে তাকাল। চোখের ইসারায় ওদের অনুসরণ করতে বলল। সে ইসারা অগ্রাহ্য করবার শক্তি আমার ছিল না।

পার্ক ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। ঢাকের বাদ্য যদিও কানে আসছে, লোকের ভীড় তেমন নেই এদিকটায়। একটু নির্জন আর অন্ধকার অন্ধকার মতন জায়গাটা। ওরা দাঁড়াল, খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। না-না সুর করে গেয়ে, 'সখি আর যে পারি না হাঁটিতে।'

তরুণ থাকলে নির্ঘাৎ বলে উঠত, হাঁটার প্রয়োজন কি, ট্যাক্সি ডেকে আনছি এক্ষুণি।' আমার পকেট গড়ের মাঠ। যে দু-চার আনা পকেটে পড়ে আছে, তার ভরসায় রিকসাও ডাকা চলে না।

গজদন্তী বলল, 'তুমি হাঁদারামের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ছাদে দাঁড়িয়ে তো কথার খৈ ফোটাও।'

বটু আমার খুড়তুতো ভাই। বয়সে আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। ইদানীং ওর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছে, যেহেতু দুজনের লক্ষ্যবস্তুই এক। ও-বাড়ির ছাদ। দুজনে ছাদে দাঁড়িয়ে ও বাড়ির দিকে চোখ রেখে খুব গল্প করি। গজদন্তী নিশ্চয় সেই কথা তুলে খোঁটা দিল।

হঠাৎ মনে খুব সাহস এসে গেল। বুক টান করে ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'বকর বকর করলেই বুঝি মানুষ হাঁদারাম হয়ে যায়।'

ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'যায়, একশো বার যায়। হাজার বার যায়।'

নিজের সাহসে নিজেই অবাক বললাম, 'বেশ এসো তাহলে বকর বকরই করা যাক।'

না-না ফোড়ন কাটল, 'দ্যাখ দ্যাখ সখি, এ যে পুরুষ রতন।'

ওরা খিল খিল করে হেসে উঠল। বিষম রাগ ধরে গেল। বলে ফেললাম, 'তুমি বুঝি কীর্তনীয়া।'

ওরা আরও জোরে হাসতে শুরু করল। তিলোত্তমা কোমরে গোঁজা রুমাল বার করে ঘন-ঘন চোখ মুছতে লাগল। গজদন্তী হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। ও নিশ্চয় জানে, হাসলে ওর মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সেই উঁচু দাঁতটাও। না-না দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরল। অনেকক্ষণ ধরে ওরা হাসল। দু-চারজন লোক যারা এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল, ঘুরে ফিরে ওদের দেখল। ওদের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সমানে হাসতেই লাগল। মানুষ যে এমন অমানুষিক হাসতে পারে ধারণাই ছিল না। হাসির মাঝেই তিলোত্তমা এক সময় বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি, হাসো না।'

হাসতে গিয়েই বাধা পড়ল। হঠাৎ বটুর কথা মনে পড়ে গেল। আজ সকালেই বটু বলেছিল, ওদের সঙ্গে যেদিন সামনা-

সামনি আলাপ হবে, সেদিন কিন্তু আমাকে আইসক্রীম খাওয়াবে ছক্কুদা।

বটুকে কথা দিয়েছিলাম; কিন্তু কথা রাখা অসম্ভব। [illegible] পয়সার টানাটানি, ট্রামের ভাড়া-বাঁচানো পয়সা দিয়ে বটুকে আইসক্রীম খাওয়াবার কথা মনে হতেই একটা কাঁটা যেন বুকে বিঁধতে লাগল। চেষ্টা করেও সেই কাঁটাটা উপড়ে ফেলতে পারা যাচ্ছিল না। সেটা ক্রমাগত বুকের মধ্যে খোঁচাতে লাগল। ঠিক এই সময় এ ধরণের একটা বাজে কথা মনে হওয়ার যে কী কারণ থাকতে পারে তা জানেন একমাত্র ঈশ্বর।

ওদের হাসি ক্রমশই কমে আসতে আসতে একসময় একেবারে থেমে গেল। ওরা আবার স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটু একটু হাঁপাচ্ছে। গজ-দন্তটি প্রথমে কথা বলল, 'যাঃ, ওকে শুধু শুধু হাসাতে বলিস না। ওর নিশ্চয়ই পেট [illegible]। দেখছিস না মুখটা কী রকম ফুলে গেছে।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই নানা [illegible] হেসে উঠল। 'মর যদি সেও ভালো, [illegible] আমি হেসে [illegible]।'

'অসভ্য!' দাঁত কিড়মিড় করে বলে [illegible]।

[illegible] একটুও [illegible] না। [illegible] রকম [illegible] হাত নেড়ে নেড়ে গেয়ে উঠল, '[illegible] যদি নিশ্চয়ই মরিব, কানু হেন [illegible] দিয়ে যাব।'

ওরা আবার শব্দ করে হেসে উঠল। [illegible] এসে [illegible]। [illegible] বলল 'তুমি এত বেরসিক কেন বলতো। [illegible] না।'

[illegible] বললাম, 'তোমরা যদি গোপিনী হও, [illegible] কে।'

ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'এ গোপিনী [illegible]।'

দাঁত নেড়ে নেড়ে বললাম, '[illegible] এক রাখাল এক রাধিকা।'

'ওমা, সব দেখছিস, [illegible] লোকটা। এই নাও তোমার রাধিকা।' বলে [illegible] গজদন্তটিকে [illegible] গায়ের ওপর ঠেলে দিল। সরে না গেলে ও নিশ্চয় এসে গায়ে পড়ত। পড়তে পড়তে সামলে নিল গজদন্তী। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, সরে গেলে যে। যদি পড়ে যেতাম!'

নির্বিকার মুখে বললাম, আমি তা হলে [illegible] হাসতাম।

'আমি তাহলে এই রকম করে হাসি বন্ধ করে দিতাম,' বলে ও দারুণ জোরে আমার নাকটা টিপে দিল। আচমকা এই আক্রমণে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরে ব্যথা করে উঠল। তারপর নাক সুর সুর করতে শুরু করল। পরপর অনেকগুলো হাঁচি দিয়ে ফেললাম। চোখ জলে ভরে উঠল।

যখন চোখে জল মুছে তাকালাম, দেখলাম ওরা অনেকটা এগিয়ে চলে গেছে। ওরা মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে। যদিও এতদূর থেকে ওদের মুখ খুব স্পষ্ট দেখা গেল না, তবু বুঝতে পারছিলাম, ওরা তিনজনেই খুব হাসছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম জীবনে আর ছাদে উঠব না, রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় রাস্তা ছাড়া আর কিছু দেখব না, পড়াশুনোর চিন্তা ছাড়া মনের মধ্যে অন্য কথা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করব না।

আবার নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। আজ ছুটির দিন। দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম, বটু এসে খাটের পাশে বসল। রাস্তায় একটা লোক আইসক্রীম ফেরি করছে। ওর ডাক কানে আসছিল, একটুক্ষণ চুপ থেকে বটু বলল, আইসক্রীম খাবে?

বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বললাম, 'নাঃ।'

না কেন, খাও না। আমি খাওয়াব।

বিরক্ত করিস নি, বলছি তো খাব না।

ওরা খাচ্ছে। চোখ না সরিয়েও বুঝলাম বটু হাসল।

গলায় জোর দিয়ে বললাম, ওরা খাচ্ছে বলেই আমি খাব না।

কেন? বটু যেন একটু অবাক হল।

ঠিক সে রকম নয় অবশ্য, ওরা খাচ্ছে বলেই আমাদের খেতে হবে তার কি মানে আছে।
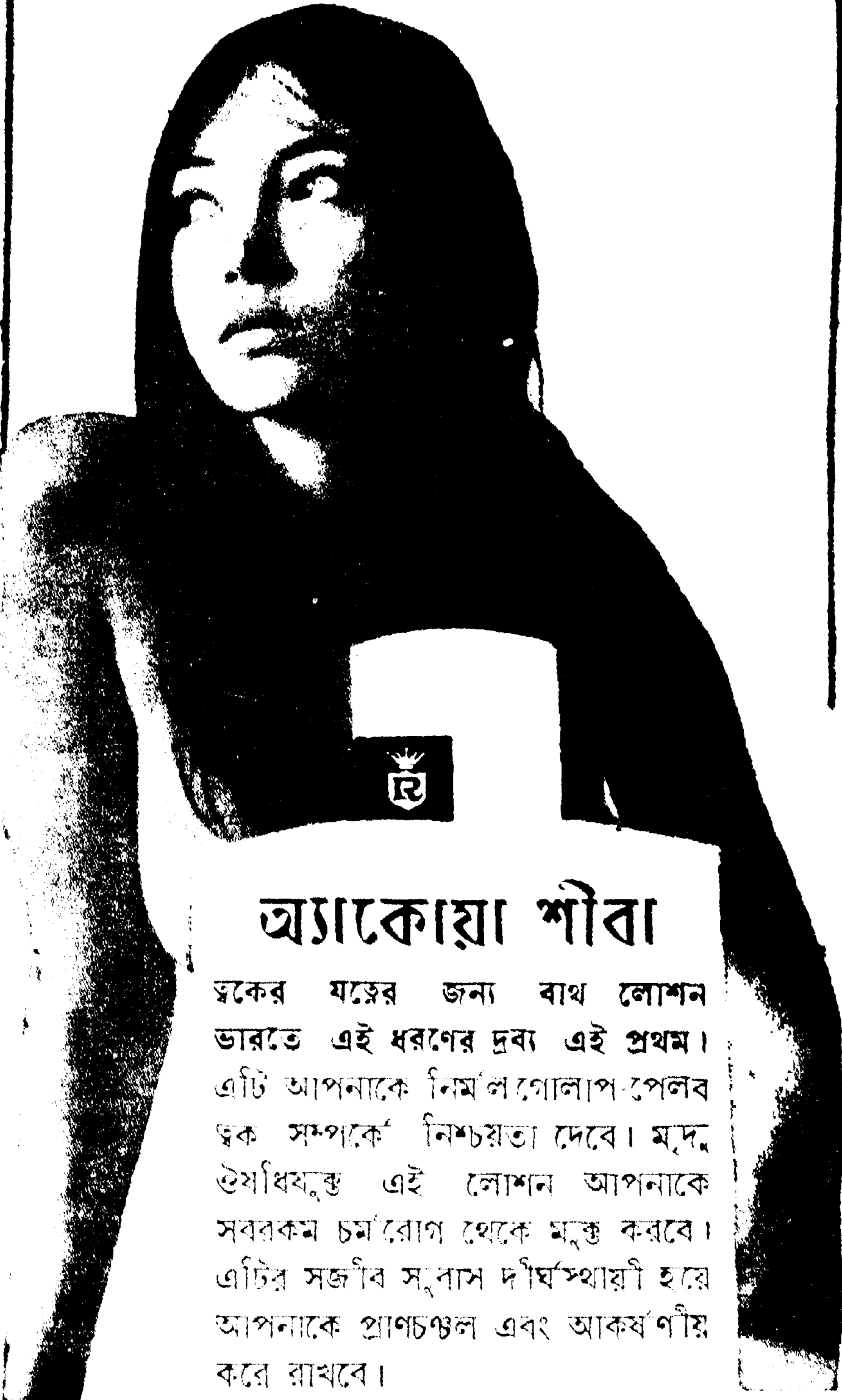
তা নেই। তবে—

তবে কি?

প্রথম দিন তো এই আইসক্রীম খাওয়া নিয়েই ওদের সঙ্গে চোখে চোখে আলাপ হল।

তুই বড্ড ডেঁপো হয়েছিস বটু।

বটু মাথা নীচু করল। একটুক্ষণ পরে সেইভাবেই বলল, আমি ওদের নাম জানি।

বই বন্ধ করে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললাম, আর নাম। নামের দরকার মিটে গেছে বটু। হঠাৎ গলাটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

কেন ছকুদা? বটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, সেদিন ওরা আমাকে দারুণ অপমান করেছে। আইসা জোরে নাক মলে দিয়েছে না। আর একটু হলে দম বন্ধ হয়ে যেত।

ইস্। বটু যেন আঁৎকে উঠল। পরক্ষণেই নিজের মনে মনেই যেন বলে উঠল, অথচ ওদের সে রকম মনেই হয় না।

উত্তেজনায় উঠে বসলাম, বললাম, ওরা ভীষণ অসভ্য ধরণের মেয়ে।

কিন্তু দেখে তো ফূর্তিবাজ বলেই মনে হয়। বটু এমনভাবে কথা বলছিল যেন আমার চেয়ে বয়সে কত বড় ও।

ফূর্তিবাজ না হাতী। ভয়ানক নিষ্ঠুর, আর—বলতে বলতে গলা ধরে এল, কথা আটকে গেল।

বটু চুপ করে বসে আছে। ও যেন ধীরে ধীরে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। এক সময় বটু চোখ বুজে ফেলল। ওর মাথা ঝুঁকে পড়ল। একটা আঙুল দিয়ে ক্রমাগত কপালে টোকা দিচ্ছে ও। বুঝলাম, খুব নিবিড়ভাবে কিছু চিন্তা করছে বটু।

একসময় বটু চোখ খুলল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'ঠিক হ্যায়, দেখ্‌ লিজিয়ে মজা, তুমি কিসসু ভেবো না ছকুদা। এ রোগের দাবাই আমার জানা আছে।' বটুর বাবা [illegible] রেলের বড় অফিসার। ছেলেবেলা বাবার সঙ্গে সঙ্গে বটু বহুদিন পশ্চিমে কাটিয়েছে। বেশ হিন্দি শিখেছিল তখন।

কিন্তু বটু যে এরকম কড়া একটা দাবাই বাতলাবে তা বুঝতে পারি নি। বুঝতে পেরে তাজ্জব বনে গেলাম। আর দুই হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

দিন কয়েক পরের ঘটনা। ওরা কিছুদিন ধরে লেকের দিকে খেলতে যেতে শুরু করেছিল। বিকেলের দিকে ছাদে ওঠা প্রায় বন্ধ। ওদের সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী সেপাই আসত। লোকটা ধুতি সার্ট পরত, আর ভয়ানক ভারী একটা জুতো পায়ে দিয়ে ঠকাঠক করে হাঁটত।

হঠাৎ একদিন বিকেল হতে না হতেই বটু এসে সামনে দাঁড়াল। বটু ফিক ফিক করে হাসছে। বললাম, 'কি রে?'

বটু উত্তর দিল না। শুধু হাসতেই লাগল। ওর ভাবটা যেন, খাঁচা বেড়ি, এখন চিড়িয়া ধরলেই হল। কথা বাড়ালাম না। বটুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

লেকের উঁচু ঢিবিটায় এসে দুজনে বসলাম। একটা গাছের আড়ালে। বসে বটুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মনে হচ্ছে কিছু একটা মতলব এঁটেছিস?'

বটু ভাল করে উত্তর দিল না। শুধু বলল, 'হাঁ।' ওকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ও যেন চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বললাম, 'কি এত চিন্তা তোর?'

বটু চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফিক করে হেসে ফেলল, 'চিন্তা তোমাকে নিয়েই। তুমি যেরকম ইয়ে, শেষ পর্যন্ত না সব গুবলেট করে দাও।'

বটুর থুতনিতে হাত দিয়ে চাপ দিতে দিতে বললাম, 'তোর প্ল্যানটা বল না বটু।'

বটু ঘন ঘন নীচের দিকে তাকাচ্ছিল। বলল, 'সময়মত বলবো। দেখতো ওরা আসছে কিনা।'

সত্যি সত্যি ওরাই। ওরা তিনজন। সার বেঁধে হাত ধরাধরি করে আসছে। পিছনে সেই লোকটা। এতদূরে থেকেও ওর জুতোর বিদঘুটে শব্দটা কানে আসছিল। বটু ফিস ফিস করে বলল, 'খুব সাবধান। ফার্স্ট, সেকেণ্ড রাউণ্ড আমি খেলব। লাস্ট রাউণ্ড তুমি। তোমার রিস্ক খুব কম, কিন্তু যদি একটু এধার ওধার হয়ে যায়, আমাকে দোষ দিতে এসো না কিন্তু।'

গদগদ গলায় বললাম, 'না না তোকে দোষ দিতে আসব না বটু, দেখিস।'

বটু নকল অভিমান দেখিয়ে বলল, 'সামান্য একটা আইসক্রীম খাওয়াতেও ভুলে যাবে তখন।'

'কী যে বলিস, এই নে।' বলে একটা টাকা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

বটুর চোখ ছলছল করে উঠল, 'তোমার এত কষ্টের জমানো টাকা যে দিতে চাইলে ছকুদা, তাই যথেষ্ট। তাছাড়া বটু ঘোষ কখনও অগ্রিম নিয়ে কাজ করে না। আগে কাজ হাসিল হোক, তারপর আইসক্রীম ফাইসক্রীমের কথা।'

ওরা ঢিবির নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। আগে থেকেই গুটিকয়েক মেয়ে সেখানে জমায়েত ছিল। সেপাইটা দূরের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো। একটু পরেই ওরা সোরগোল তুলে গাদী খেলতে আরম্ভ করল।

খেলা খুব জমে উঠেছে। ওদের চীৎকার হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ওপারে উঠে আসছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে লোক জমে উঠেছে। মেয়েদের খেলা দেখতে পুরুষেরা চিরদিনই ভালবাসে। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'দেখেছিস বটু, ওরা কী দারুণ অসভ্য। এতগুলো লোকের সামনে কী রকম দৌড়ে দৌড়ে খেলছে।'

বটুর মুখে স্নেহের হাসি ফুটে উঠল। নরম গলায় ও বলল, 'দৌড়ে দৌড়েই তো গাদী খেলতে হয় ছকুদা।'

লজ্জা পেলাম, বটুর কাছে যেন নিজেকে খুব ছোট মনে হল। বললাম, 'এতগুলো লোকের সামনে খেলছে কিনা, তাই—'

বটু সেইদিকে দৃষ্টি আটকে রেখে বলল, 'লোক জমেছে বলেই তো সুবিধা।' বলে বটু হঠাৎ উঠে পড়ল।

বললাম, 'আমি কি তোর সঙ্গে যাব?'

'না।' বটু পকেট থেকে একটা কালো চশমা বার করে চোখে আঁটল। একটা কাপড়ের টুপিও পরে নিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চেনা যাচ্ছে?'

সত্যি সত্যি বটুকে চেনা দুষ্কর। সামান্য দুটো জিনিসে যে ওর চেহারা এত পাল্টে যেতে পারে কোনদিন কি বুঝতে পারতাম। বটু এক গাল হেসে বলে গেল, 'উইস মি গুড লাক ছকুদা।'

মনে মনে সহস্রবার বটুর সাফল্য কামনা করলাম।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বটু গেছে, ফেরার নাম নেই। একা বসে নীচের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। ঐ তো গজদন্তী, দৌড়াতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সবাই হেসে উঠল। [illegible] কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিচ্ছে ভাল করে। তিলোত্তমা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও যেন কোন কিছুরই ভ্রূক্ষেপ করছে না। [illegible] দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা ছবির মত মনে হচ্ছে [illegible]। কোন ওস্তাদ শিল্পী যেন ওকে এঁকে রেখেছে।

সামনে ধপ্ করে [illegible] একটা [illegible] এসে পড়ল। চমকে উঠলাম। একটা [illegible] পাশেই দুটো পা। মুখ তুললাম। বটু। পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে বটুর মুখে পড়েছে। [illegible]

বটু [illegible] পড়ল। হাসি থামিয়ে এক সময় বলল, 'বলেছিলাম না [illegible] দেখো।' বলে থলিটা আমার দিকে ঠেলে দিল। মুখ খুলে দেখলাম, তিন পাটি জুতো।

বললাম, 'এ কি, তিনটে জুতো তিন রকম!'

'কারণ তিনজন মানুষ তিন রকম। এক একজনের এক এক পাটি। এখন একটা করে জুতো পায়ে দিয়ে বাড়ি যাও।' বটু আবার বিকট শব্দ করে হাসতে লাগল।

হাসি থামলে বটু নীচের দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। এইবার খেলা খতম, এক খেলা শেষ, আর এক খেলা শুরু। 'দ্যাখ না ছকুদা, ভয় কি, আমি তো আছি।' বটুর কথায় দস্তুরমত ভরসা পেলাম। গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে ভাল করে নীচের দিকে তাকালাম। অন্য সব মেয়েরা খেলা শেষ হতে না হতেই যে যার জুতো পায়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। চারদিকে জমে-ওঠা লোকগুলোও আর নেই। সমস্ত জায়গাটাই ফাঁকা। শুধু ওরা তিনজন নীচু হয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দাঁতে দাঁত পিষে বটু বলল, 'একটা একটা করে ঘাস উপড়ে ফেললেও জুতোর একটুকু চামড়া কোথাও পাবে না।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আর একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে বটু। ওদের বাবারা খুব রাগী। হয়ত মেরে টেরে বসবে।'

'মারুক।' দুরন্ত আক্রোশে বটু যেন জ্বলছে।

'আর কোনদিন বেরোতে দেবে না, চিরদিনের মত খেলা ঘুচে যাবে ওদের।'

'তাতে তোমার কি?' বলে বটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে বটুর মুখের রুক্ষ ভাবটা বদলে যাচ্ছে। ও কোমল হয়ে আসছে। এক সময় ওর গলা খুব নরম শোনাল, 'ঠিক হয়। ব্যবস্থা করছি।' তারপর আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'এখন তোমার খেলা শেষ, হাতে বি রেডি ছবুদা।'

বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল, 'আমার?'

'হ্যাঁ তোমার। কুছ পরওয়া নেহি, হাম হ্যায়।' আমার জলদস্যুর মত পা ফাঁক করে দাঁড়াল বটু।

ডাকলাম, 'বটু'। আমার চোখ ছলছল করে উঠল।

বটু কাছে এগিয়ে এল। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললাম, 'তুই আমাকে কত ভালবাসিস বটু। অথচ আমি—' আবেগে আমার গলা বুজে বুজে আসছিল। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বললাম, 'অথচ সাত রোজ ঠকিয়েছি বটু। সামান্য একটা আলু দাম, তাও ফাঁকি দিয়েছি।' লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি যে অনুতপ্ত হয়েছ ছবুদা, তাতেই তোমার দোষ কেটে গেল।' বটুর গলাটাও খুব খাদে নেমে এসেছে। একটুক্ষণ থেমে থেকে বটু আবার বলে, 'আইসক্রীম খাওয়া পরে হবে। আগে আসল কাজটা হয়ে যাক।'

আমার কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বটু ইঙ্গিতে ওর সমস্ত প্ল্যানটা আমাকে বলে দিল। আর থলিশুদ্ধ জুতো তিনটে নিয়ে ওদিক চলে গেল।

পা টিপে টিপে নেমে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ওরা তিনজন তখনও বিভ্রান্তের মত এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। ওদের হাতে এক এক পাটি জুতো। দূরের বেঞ্চিতে বসে সেপাই মহারাজ দেশওয়ালী এক ভাইয়ার সাথে গল্পে মেতে উঠেছে। এদিককার ব্যাপারটা তার কাছে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। এদিকে উঠে আসবার দরকারটুকুও বোধ করছে না। বা হয়ত সমস্ত ব্যাপারটা তার নজরেই পড়ে নি।

বটুর প্ল্যান মত গুটি গুটি ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। তিলোত্তমাই প্রথমে দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে আহ্লাদে চীৎকার করে উঠল, 'আরে তুমি!' ওরা দুজনও কাছে ছুটে এল। তিনজনে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল, যেন এক মহা অমূল্য রতন আমি।

বললাম, 'কি ব্যাপার, সন্ধ্যে হয়ে এল, বাড়ি যাওনি!'

না-না মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'আমাদের খুব বিপদ।'

'কি বিপদ সখি?' নিজের কথায় নিজেই মজা পেলাম।

'এ সময় ঠাট্টা করো না, সত্যি সত্যি আমাদের খুব বিপদ।' গজদন্তী এমনিতে শক্তপোক্ত মানুষ। এখন ওকে খুব অবসন্ন দেখাচ্ছিল।

'কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তো সেপাই রয়েছে, ওকে ডাকলেই পার।'

তিলোত্তমা বলল, 'ওকে নিয়েই তো বিপদ। আমরা না হয় কোন রকমে খালি-পায়ে বাড়ি চলে যেতে পারতাম, কিন্তু ঐ ব্যাটার নজরে ঠিক পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট। ব্যাটা রিপোর্টে খুব ওস্তাদ।'

'তোমাদের বাবারা বুঝি খুব রাগী?' ইচ্ছে করেই সময় কাটাচ্ছিলাম। অন্ধকার একটু গাঢ় হোক।

না-না কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, 'বাব্বা, আমার বাবা তো সব সময় হাঁপানির মত ফাঁস-ফাঁস করছে, কখন কাকে হাতের কাছে পাবে, আর পাম্প করে করে জীবন অস্থির করে তুলবে। আর ওর বাবার যা রাগ না। তোমাকে পেলে খুনই করে ফেলবে।' বলে না-না আঙুল দিয়ে তিলোত্তমাকে দেখাল।

হঠাৎ একটা ভয় মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে উঠল, 'আমাকে কেন?'

গজদন্তী বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি মার কেন।'

হঠাৎ তিলোত্তমা অধৈর্য গলায় বলে উঠল, 'তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে ডাকা হয়েছে, গল্প করতে নয়।'

ওদের নিয়ে খেলার ইচ্ছেটা তখনও মনের মধ্যে রয়ে গেছে। উদাসীন ভাবে বললাম, 'আমার মত অধম ব্যক্তি তোমাদের কীইবা সাহায্য করতে পারে।'

এর মধ্যে না-না মেয়েটিই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী। ও বলে উঠল, 'বিপদের সময় রাগ করতে নেই।'

'আমার আবার কি বিপদ?'

'তোমার না হোক, আমাদের খুব বিপদ, আর কিছু না হোক বন্ধু বলে ভাবতে পার না আমাদের।' বলল না-না।

গজদন্তী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইন-ডিড।'

তিলোত্তমা কিছুই বলল না। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ও যদি এ ধরণের কোন কথা বলত খুব ভাল লাগত।

'বেশ আমি তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার কথা শুনতে হবে।'

'যা বলবে সব শুনব।' একসঙ্গে না-না আর গজদন্তী বলে উঠল। তিলোত্তমা ওদের সঙ্গে যোগ দিল না। আড়চোখে তিলোত্তমাকে দেখে নিয়ে বললাম, 'দুই দলে জুতো খুঁজতে হবে। একদল খুঁজবে নীচে, আর একদল যাবে ওপরে।'

'আমি তুমি একদল, কেমন?' বলে না-না আমার দিকে এগিয়ে আসছিল।

মাথা নেড়ে বললাম, 'না, তুমি খুব কাজের মেয়ে। তুমি আর ও এক দলে।' বলে গজদন্তীর দিকে আঙুল দেখালাম।

তিলোত্তমা হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমার দলে যাব না। তুমি খুব নিষ্ঠুর মানুষ।'

বুকের ভেতরটা হঠাৎ বিষম মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না। শক্তহাতে নিজেকে ধরে রেখে বললাম, 'আমি তা হলে চললাম।' পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম, না-না আর গজদন্তী হাত মেলে আমাকে আটকাল।

'ওর কথায় দোষ ধরো না। বিপদে পড়লে ওর মাথার ঠিক থাকে না। তুই ওর সঙ্গে যা।' না-না যেন ওকে হুকুম করল।

ওরা নীচে রইল, আমরা ওপরে উঠে এলাম। তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। ওপরে যে দু চারজন লোক ছিল, তারাও নেমে গেছে। সমস্ত জায়গাটাই ফাঁকা। শুধু একটা গাছের নীচে সাদা সাদা কী যেন নড়ে উঠল। বুঝলাম, বটু কর্তব্য-পরায়ণ সৈনিকের মত নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে। আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে চলেছে।

ও হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার ভয় করছে। খুব নিরিবিলি।'

ওর একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেললাম, 'ভয় কি, আমি তো আছি।'

ও হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না। ওর হাতটা ভীষণ নরম। ভেজা ভেজা মতন। হেমন্তের মাঝামাঝি। সর সর করে বাতাস দিচ্ছে। এই বাতাসে রোঁয়ায় কাঁপুনি ধরায়। মনে নেশা ছড়ায়। বললাম, 'তুমি খুব ভীতু।'

ও উত্তর দিল না। আমার দিকে আর একটু সরে এল। মাথার তেলের মিষ্টি গন্ধটা নাকে এল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি তেল মাখো?'

ও উত্তর দিল না। ওর গায়ের স্পর্শ পেতে লাগলাম। বললাম, 'ইচ্ছে করেই তোমাকে আমার দলে টানলাম। নীচে বসে সারা রাত খুঁজে মরলেও ওরা জুতো পাবে না।'

এবারে ও কথা বলল। বলল, 'কেন?'

'জুতো নীচে নেই।'

'কোথায় আছে।'

ওদিকটা ঢালু মতন। নীচে লেকের জল চিকচিক করছে। বাঁকা মতন একটা চাঁদ উঠছে আকাশে। বললাম, 'ঐ দিকে।'

'ওদিকে তো জল।'

'পাড়ে যে নারকেল গাছ রয়েছে, তার একটার নীচে।'

ও কথা বলল না। চুপ করে হাঁটতে লাগল। ওর নরম আর ভেজা ভেজা হাতটা আমার হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে। গাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। ওরা যেন হাঁটছে। অথচ ওদের তো আমি চাই নি। যুগ যুগ ধরে আমি শুধু হাঁটতেই চাই। আর চাই নরম ভেজা ভেজা হাতটা, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো বাতাসটা, আবছা আবছা জ্যোৎস্নায় ভরা সন্ধ্যেটা।

গাছটা এসে গেল। সাদা থলিটা। হাত বাড়ালাম। থলিটা উঠে এল। মুখ খুললাম। তিন পাটি জুতো।

ও ফিসফিস করে বলে উঠল, 'দুষ্টু, ইচ্ছে করেই লুকিয়েছিলে।' ওর শরীরটা আমার দিকে হেলে পড়ল। বাঁকা চাঁদের আলোটা ঠিক ওর মুখ বরাবর। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জগৎ সংসার সব কিছু ভুলে গেলাম। হাতে ছোট একটা টান পড়ল। 'রাত হয়ে গেল। চলো।'

বটুর কথা মনে পড়ে গেল। সংগে সংগে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, আজ যত রাতই হোক, বটুকে আইসক্রীম খাওয়াবই খাওয়াব। বলতে গেলে আজই তো ওর সংগে সত্যিকারের পরিচয় হল।

হুটপাট করে পাঁচটা বছর কেটে গেল। তখন যুদ্ধ চলছে। বোমা পড়ছে, লোক মরছে, বাতাসে টাকা উড়ছে, হুড়োহুড়ি করে লোকে তাই কুড়োচ্ছে। হুটপাট করে বছর কাটছে।

বি-এস-সি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। পাশ করলাম। সংগে সংগে চাকরি। কিছুদিন চাকরি চলল। একদিন বোমা পড়ার মত বদলির হুকুম এসে মাথায় পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। তার আগেই ওদিকে অনেক কিছু ওলোটপালোট হয়ে গেছে। গজদন্তীরা জলপাইগুড়ি চলে গেছে না-না গেছে শ্বশুরবাড়ি। ও বালীগঞ্জ প্লেসে। বটরা নিজেদের নতুন বাড়িতে উঠে গেল। দুনিয়াটা ফাঁকা। সেই ফাঁকা দুনিয়ার মাঝে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

যাবার আগে ওর সংগে দেখা করলাম। ভেবেছিলাম বদলির কথা শুনে ও খুব দুঃখ পাবে। কিন্তু ও একটুও কষ্ট পেল না। ওর মুখে কচি বেগুনের পিছল হাসি। বলল, 'পুরুষমানুষের একটু বাইরে ঘোরা ভাল। জ্ঞান বাড়ে।'

ওর কথা শুনে সত্যি সত্যি নতুন জ্ঞান লাভ হল। বিশ্বসংসার তুচ্ছ জ্ঞান করতে শিখলাম। কার জন্যে এই মায়ার বন্ধন। যার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম, সেই কিনা খুশীমনে জ্ঞান বাড়াবার পরামর্শ দিল। তল্পিতল্পা গুটিয়ে একদিন ট্রেনে চেপে বসলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ও না ডাকলে আর কোনদিন ফিরব না।

অনেকদিন পরে সকালের ডাকে একটা চিঠি এল। বাড়ির চিঠি ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে খাম খুলে পড়তে যাচ্ছিলাম। বার বারই পরিচিত কথাটা, কল্যাণীয় অমুক, হারিয়ে যাচ্ছিল। বদলে ছোট্ট একটা কথা—এই। শরীরের সমস্ত রক্ত হঠাৎ গলার কাছে উঠে এসে, নাকে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম। মাথা ঘুরতে লাগল। গা বমিবমি করছে। থেকে থেকে পেটের মধ্যে যেন মোচড় দিচ্ছে। কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল জানি না। এক সময় বুকের শব্দটা, না বমি বমি, মাথা ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চোখ খুললাম, নীল কাগজে লেখা চিঠিটা মেঝেয় পড়ে আছে। তুলে নিয়ে পড়তে লাগলাম।

তোমার চিঠির উত্তর ইচ্ছে করেই এতদিন দিই নি। না চাইতে বৃষ্টি এলে সে বৃষ্টিতে মজা নেই। অনেক দিন বৃষ্টি না হলে, চারদিক যখন খুব খাঁ খাঁ করে, আর মনে হয় দারুণ গরমে সব জ্বলে পুড়ে যাবে, ভাবো তো, তখন যদি হঠাৎ শোঁ শোঁ করে বৃষ্টি নামে। চিঠি পেয়েই চলে এসো। এদিকে ঘোর ষড়যন্ত্র চলছে। একটা আধ-বুড়ো লোক আমাকে দেখে গেছে। আশ্বাস দিয়ে গেছে ও আমাকে বউ করবে। লোকটা সব দিক দিয়েই তোমার চেয়ে অনেক, অনেক বড়। চেহারা, টাকা পয়সা, বয়স, এমন কি ওর গাড়িটাও বিরাট। সবাই মহা খুশী। আমিও।

ছুটি পেলাম কি পেলাম না তা দেখবার সময় আমার হাতে নেই। পৃথিবীটা একটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মত আমার পায়ের সামনে পড়ে আছে। ইচ্ছে করলে লম্বা স্যুট মেরে ওকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেবার তাকৎ আমার শিরায় উপশিরায় বিদ্যমান।

এক লাফে কলকাতা।

অগতির গতি বটু ঘোষ। অদ্ভুত সাফ মাথা ওর। ওর পরামর্শে ও তরফের অনশন ধর্মঘট। দারুণ ফলপ্রাপ্ত। সহজেই বাজীমাৎ। ও বাড়ির লোক এ বাড়িতে এল। এ বাড়ির লোক ও বাড়িতে গেল। তারপর একদিন দু বাড়ির লোকেরা মিলে খুব হৈ চৈ করল। বাইরের থেকেও বহু লোক এসে তাতে যোগ দিল। সানাই বাজল। পুরুত মন্ত্র পড়ল। সংগে সংগে আমাকেও বলতে হল, যদেতং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।

আজ বউভাত।

বটু এসে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গেল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ও বাড়ির ছাদে তিনটে মাথা। বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। বটু বুঝল। হেসে বলল, 'লক্ষ্য করে দ্যাখ ওদের মুখে বিড়ি। কাজে ফাঁকি দিয়ে ওরা বিড়ি টানছে।'

'তোর মাথাটা দারুণ সাফ বটু।'

বটু একটা কাগজের মোড়ক আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আজ বউকে কিছু উপহার দিতে হয়। তুমি এটা দিও।

'কি রে?'

'খুলে দ্যাখ।

খুলে অবাক হয়ে গেলাম। এক জোড়া নতুন জুতো। বললাম, 'বৌভাতের দিন বৌকে জুতো দেব?'

বটু গদগদ কণ্ঠে বলল, 'এ জুতো সাধারণ জুতো নয় ছকুদা। এ হচ্ছে প্ল্যাট-ফর্ম জুতো। দেখছ না হিলটা কী রকম উঁচু থেকে নীচু হতে হতে এসেছে।'

'আফটার অল জুতো ইজ জুতো।' মন থেকে কিন্তু কিন্তু ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছিল না।

বটু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার ইয়েটা বড্ড মোটা ছকুদা। মনে নেই, সেদিন নারকেল গাছের নীচে ঠিক এ রকম একটা জুতো; মনে পড়েছে?' বটু সাগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। দুই হাতে বটুকে জড়িয়ে ধরে বললাম। 'তুই নেহাৎ ছোট ভাই বটু; না হলে তোর পায়ের ধুলো নিতাম। কী ওয়াণ্ডারফুল ব্রেন তো...'

বটু আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আজ সুখের দিনে ওদের ভুললে তো চলবে না। ভাবো তো, সেদিন যদি ওরা খেলবার সময় জুতো খুলে না রাখতো।'

ভাবতেই আতঙ্কে শরীরটা কেঁপে উঠল।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী
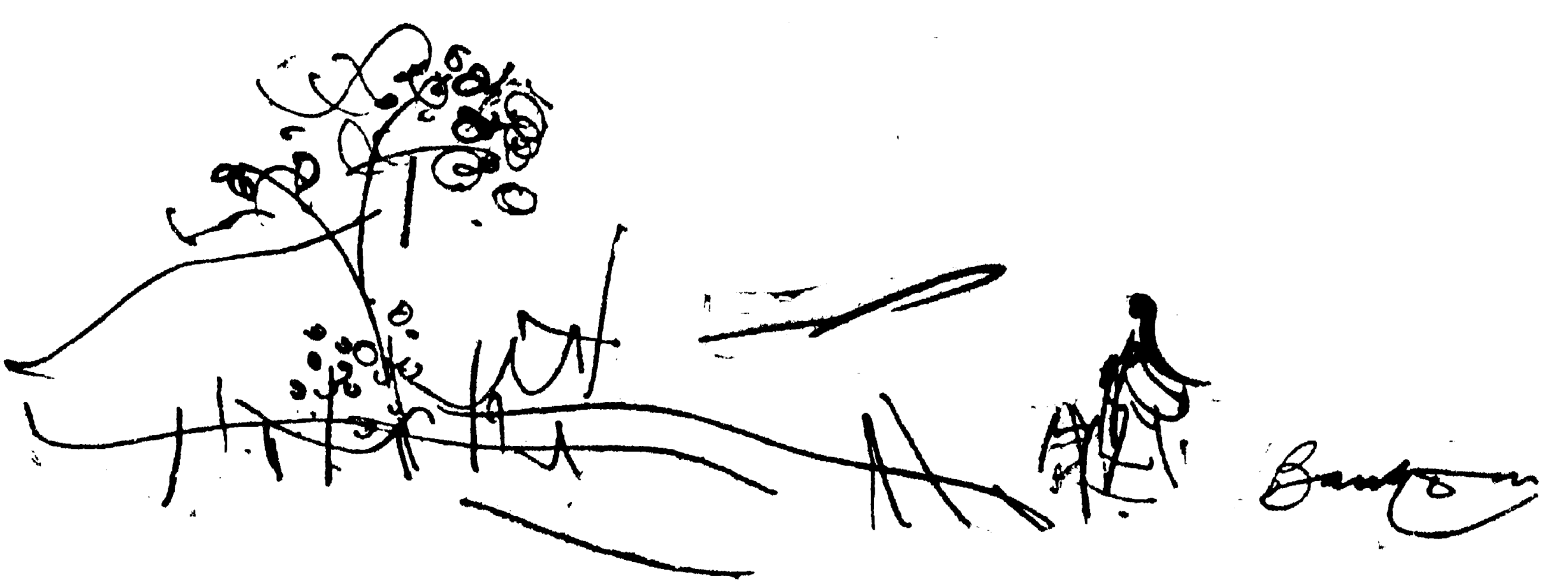
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিন শিশুদের মধ্যে আরো অনেকে শচীনবাবুকে পুষ্পস্তবক উপহার দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তারাশঙ্কর, সজনী দাস, দেবকী বসু, প্রফুল্ল রায়, মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, ধীরাজ ভট্টাচার্য, বি সি মল্লিক, সুধীরেন্দ্র সান্যাল প্রমুখ ছিলেন।

সেদিনের অনাড়ম্বর অথচ সুন্দর অনুষ্ঠানটির কথা ভুলবার নয়।

অনেকদিন পর ২৩ মে শ্রীরঙ্গম একটি নতুন নাটক উপহার দিল। নাটকটি হলো প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'তখত-এ তাউস'। এ নাটকের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন শিশিরবাবু স্বয়ং।

সে আমলের নামকরা অভিনেতা অহী সান্যাল। আলিপুর কোর্টে তাঁর মৃত্যু হলো ২৫ মে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার দরুন তাঁর এ মৃত্যু।

অহী সান্যালকে আজ হয়তো অনেকের মনে নেই, কিন্তু সে সময় অভিনেতা হিসাবে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। শুধু কি এক অহী সান্যাল, কতো শিল্পী আছেন যাঁরা পরিচয়ের আড়ালে হারিয়ে গেছেন। কাল বড়ো নির্মম।

মহেন্দ্র গুপ্ত যে হঠাৎ পুরোনো নাটক দেবলা দেবী নিয়ে স্টারের আসর জমাবেন —এটা আশা করা যায়নি। অবশেষে মহেন্দ্রবাবুও পুরোনো নাটক আরম্ভ করবেন, এটা প্রত্যাশার বাইরে ছিল।

সে আমলে শিল্পীদের মধ্যে বিরোধ ছিল না এমন নয়, তবু একাত্মবোধের অভাব ছিল না। পরস্পরের সম্মান রক্ষনীর অভিনয়ে সে কথা প্রমাণিত হয়। আবার অনেক সময় পারিবারিক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে সম্মিলিত অভিনয় হয়েছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। চণ্ডী ব্যানার্জীর মেয়ের বিয়ে হবে, তারই জন্যে ২৯ মে তারিখে গৈরিক পতাকা অভিনীত হলো মিনার্ভায়। সে অভিনয়ে অংশ নিলেন, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতিশ, ভূপেন রায়, মিহির ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী, জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা, প্রমুখ বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা। বলা-বাহুলো আমিও অংশ নিয়েছিলাম নাটকে। সেদিনের অভিনয় অনুষ্ঠানের আগে সীতা দেবী, রঞ্জিৎ রায়, প্রভৃতি গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানও হয়েছিল।

'পণ্ডিত মশাই' কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বহু পঠিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙমহলে উদ্বোধন হলো ৭ জুন তারিখে। শরৎচন্দ্রের কাহিনীর একটা নিজস্ব আবেদন আছে যা দর্শক সাধারণকে আকৃষ্ট করে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

নাটকের মানুষ হলেও, সংসার বাদ দিয়ে তো আমি নই। সংসারের অনেক কথা থাকে আমার ডায়েরীতে। আমার ছেলে ভানু যার পোশাকী নাম প্রীতীন্দ্র— সে বিজ্ঞানে এম এস পেলো শিকাগোর ইলিনয়েস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি থেকে। তার কয়েক দিন বাদেই সে পিটস-বার্গ হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনে কাজে যোগ দিলে। এটা নিঃসন্দেহে আমার পরিবারের কাছে সুখবর।

আজ অস্তিত্ব নেই বঙ্গীয় নাট্য সম্মেলনের। অথচ এই প্রতিষ্ঠান একদিন কলকাতার নাট্যোৎসাহী মানুষদের একত্রিত করেছিল।

যে সময়ের কথা বলছি, সময়টা হলো ১৯৫১ সালের জুন মাস। এই জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গীয় নাট্য সম্মেলনের বৈঠক বসলো নির্মল চন্দ্রের বাড়িতে। যে সম্মেলন আগে পরিচালিত হতো শিশির-বাবুর সভাপতিত্বে, সেই সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্বটা সেদিনের বৈঠকে আমার ওপর ন্যস্ত করা হলো। কারণ শিশিরবাবু বঙ্গীয় নাট্য সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। যাইহোক, এই দায়িত্ব পালনে আমি সক্ষম কিনা জানি না, তবু নির্মল চন্দ্র, হেমেন দাশগুপ্ত প্রমুখের অনুরোধ আমি এড়াতে পারি নি।

অভিনেতা প্রভাত সিংহ সে সময়ের দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। অমন কর্ম-চঞ্চল পুরুষ চরিত্র আমি কমই দেখেছি। ব্যক্তিগত জীবনে এই মানুষটির সঙ্গে ছিল নিবিড় সম্পর্ক। প্রভাতবাবুর মৃত্যুর খবরটা শুনে আমি বিচলিত হয়েছিলাম।

কিছুদিন আগে থেকে বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন প্রভাত সিংহ। ভর্তি হয়েছিলেন আর, জি, কর হাসপাতালে। ৯ই জুলাই রাত দেড়টায় তাঁর মৃত্যু হলো।

মানুষটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-জগত থেকে একজন বিরল ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটলো।

শরৎবাবুর নাটকেরই তো তখন বাজার। মিনার্ভায় চলছিল চন্দ্রনাথ, এবারে নতুন করে আরম্ভ হলো বিজয়া। বিজয়ায় আমি অভিনয় করলাম রাসবিহারী চরিত্রে, নরেনের ভূমিকায় ছিল ছবি বিশ্বাস। আর নাম-ভূমিকা ছিল সরযূবালার।

পনেরোই আগস্ট তারিখটি স্বাধীনতা দিবসরূপে চিহ্নিত। ঐ দিন বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন নাটকের অনুষ্ঠান। মিনার্ভায় অভিনীত হলো [illegible] চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের অভিনয়ের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাব্বিশে আগস্ট 'বিজয়া' নাটক দেখতে এসেছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় শেষে আমার সঙ্গে দেখা হলো। নানা কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করলাম, গণেশের গাঙ্গুলীর খবর কী?

খবর জানাতে গিয়ে যে এমন খবর পাবো, এটা কি ভেবেছিলাম। শুনলাম, গণেশ গাঙ্গুলী মারা গেছেন প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। মানুষ মরণশীল জানি, এ আর নতুন কথা কি। গণেশ গাঙ্গুলী আমার অনেক দিনের বন্ধু।

সেদিন থিয়েটার থেকে বাড়ি ফিরে এলাম ভারাক্রান্ত মনে।

চলতি দিনের মধ্যে যখনই কোন কাছের মানুষের হারিয়ে যাওয়ার খবর শুনি, তখনই একটা কথা মনে হয়, চারিদিক থেকে এমনি করে সবাইকে হারিয়ে যেতে হয়। আগে এমন করে ভাবতাম না, কিন্তু আজকাল ভাবি। নিজেকে [illegible] দিয়ে ভাবি। ভেবে কূল কিনারা পাই না।

মিনার্ভা থেকে ছবি বিশ্বাস কেন যে চলে গেল বুঝলাম না। তার জায়গায় এলো কমল মিত্র। এদিকে কর্পোরেশন কোন কারণে মিনার্ভার প্রদর্শনী বন্ধ করে দিল।

নাট্যমঞ্চের ওপর যখন এ সব আঘাত আসে, তখন মনটা স্বভাবতই [illegible] হয়। তবে এ-সব ঘটনার মধ্যে [illegible] আর নিজেকে জড়াতে চাই না।

শরৎচন্দ্রের [illegible] নাটক তো চলছে। আমার এই কাহিনীর চিত্ররূপ মুক্তি পেল [illegible] তারিখে। পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায়। [illegible] চরিত্রে রূপ দিয়েছে [illegible]। আমি অভিনয় করেছি [illegible] ভূমিকায়।

এছাড়া জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এঁরাও চিত্রের অন্যতম অভিনেতা।

দুর্গা পুজোয় সপ্তমীর দিনে মিনার্ভায় একটি নতুন ধরনের নাটকের উদ্বোধন হলো। নাটকটি হলো ইংরেজী স্নো হোয়াইট'-এর ভাবানুবাদ। নামও তুষার-কণা। বলা বাহুল্য নাটকটি এসেছে শচীন সেনগুপ্তের কলম থেকে।

কিন্তু পুজোয় আর তেমন নাটক কই? নাটকের ক্ষেত্রে এ-দুর্দিন কি ঘুচবে না?

নতুন নাটক নেই, সুতরাং পুরোনো নাটক নিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা। রঙমহলে নতুন করে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদ বিবি' অভিনয় আরম্ভ হলো।

কলকাতার প্রতিটি থিয়েটার চলছে, চলতে হয় চলার মতো। কোথাও উল্লেখ-যোগ্য কিছু নেই।

বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রজগতে প্রমথেশ বড়ুয়া নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় নাম। শুধু স্মরণীয় নয়, বরণীয়ও।

বাংলাদেশে এমন একটা সময় ছিল যখন চিত্রামোদীদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম 'বড়ুয়া'। 'বড়ুয়া'কে অনুসরণ করে একটা 'ফ্যাশান'-ও তখন চালু হয়েছিল। বিশেষ করে 'দেবদাস' ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়াকে যাঁরা নাম ভূমিকায় দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, শরৎচন্দ্রের দেবদাস আর প্রমথেশের মধ্যে কোথাও এতটুকু অমিল নেই। এই যে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এ একমাত্র সার্থক রূপকারের পক্ষেই সম্ভব।

প্রমথেশ বড়ুয়ার মৃত্যুর খবরটা যখন শুনেলাম, তখন মনে মনে একটি কথাই উচ্চারণ করতে চেয়েছিলাম, না—না—এ মিথ্যে, প্রমথেশের মতো শিল্পীর মৃত্যু নেই।

আভিধানিক অর্থে হয়তো একথা বলার কোন যুক্তি নেই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি—বাংলা তথা ভারতের চিত্রজগতে প্রমথেশ বড়ুয়া একটি অবিনশ্বর নাম।

উনিশ'শ একান্ন সালের উনত্রিশে নভেম্বর প্রমথেশের লোকান্তর গমনের তারিখ। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শহরের চিত্র ও মঞ্চ জগতের বিশিষ্টেরা গিয়েছিলেন স্বর্গত শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। এ ছাড়া সাধারণ মানুষও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন স্বর্গত শিল্পীর উদ্দেশ্যে।

অভিনয়জীবনে কতো না আজব ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আজ অবসরজীবনে যখন বসে বসে পুরোনো দিনের ঘটনা-স্মৃতি রোমন্থন করি, তখন সেই সব টুকরো ঘটনার কথা মনে আসে।

ডিসেম্বরের শীতের রাতে আরো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কদমতলায় গিয়েছিলাম শাজাহান অভিনয় করতে। কিন্তু কী বিপদ! সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু ড্রেসার কই, আর মেক-আপ ম্যানও তো আসে নি। সুতরাং কী হবে। শেষটা দর্শকবৃন্দ হৈ চৈ আরম্ভ করে দেবে। করবে বৈকি। তাদের তো কোন দোষ নেই। ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের মনে হলো না। শেষটা নিজেরা মেক-আপে বসে গেলাম। পোশাকও যে যার মতো নিজেরা পরে নিলে। নাটকও অভিনয় আরম্ভ হলো। কিন্তু রাত বারোটায়। তবু শেষ রক্ষে হলো শেষ পর্যন্ত।

এর কয়েক দিন বাদেই আবার আমরা কয়েকদিনের ব্যবধানে দু'বার কদমতলা গিয়েছিলাম সিরাজদ্দৌল্লা আর মিশর-কুমারী অভিনয় করতে।

আলমগীর নাটক প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৯২১-এর ১০ই ডিসেম্বর। ১৯৫১-র ১০ই ডিসেম্বর শিশির ভাদুড়ী নাটকের একত্রিংশ বার্ষিকী উদ্যাপন করলেন। এই উপলক্ষ্যে 'ত্রিশ বৎসরের কৈফিয়ৎ' শীর্ষক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন শিশিরবাবু।

অনেকদিন পর মিনার্ভায় একটি নতুন ঐতিহাসিক নাটক 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র'-র উদ্বোধন হলো একুশে ডিসেম্বর। নাটকটির রচয়িতা বেনারস প্রবাসী ইন্দু ভট্টাচার্য। আর পরিচালক রঞ্জিৎ রায়।

মিনার্ভায় অভিনীত স্বর্গত শরৎ ঘোষের 'জাতিচ্যুত' নতুন করে স্টারে অভিনয় শুরু হলো ২২শে ডিসেম্বর।

অভিনয়ের মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতেও যোগ দিতে হয়। আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভা ছিল তেইশে ডিসেম্বর। পৌরোহিত্য করলাম আমি। সেদিনের সভায় ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সুশীল মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, সন্তোষ সিংহ, শিপ্রা মিত্র, তুলসী লাহিড়ী, মলিনা, সুনন্দা, শিশির মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভেবেছিলাম বছরের শেষটা ভালোয় ভালোয় কাটবে। কিন্তু যা ভাবা যায়, তা হয় না। স্ত্রী সুধীরা অনেক দিন থেকেই ভুগছিল, এবারে সে একেবারে শয্যা নিল। বাড়িতে রেখে চিকিৎসা চালানো এ অবস্থায় সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে কারমাইকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো ২৯শে ডিসেম্বর।

বছরের বাকি দুটি দিন স্ত্রীর অসুখের চিন্তা নিয়েই কাটালাম।

শেষ হলো একটি বছর। পুরোনো দেয়ালপঞ্জীর শেষ পৃষ্ঠাটিও ছিঁড়ে ফেললাম।

বছরের প্রথম দিনটিতেই কোলকাতার বাইরে যেতে হলো কেদার রায় নাটকে অংশ নিতে। এমন কিছু দূরে নয়—হাওড়ার কদমতলায়। স্থানীয় কৃষ্ণশ্রী চিত্রগৃহে নাটক অভিনয় হলো।

বছরের প্রথম দিনে কলকাতার বাইরে নাটক অভিনয় করতে যাওয়া—এমনটি খুব ঘটে নি বললেই হয়।

পৃথ্বিরাজ কাপুর নামকরা অভিনেতা। এক সময় কলকাতায় তিনি অনেক নাটক অভিনয় করেছেন। ১৯৫২-র জানুয়ারীতে তিনি আবার সদলে কলকাতায় এলেন নাটক অভিনয় করতে। শহরের বিভিন্ন সিনেমা হলে, বিভিন্ন নাটক অভিনয় আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে পৃথ্বিরাজ কাপুরকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিনন্দিত করা হলো। আমি সভাপতিত্ব করলাম সেই সব অনুষ্ঠানে।

ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে শিশির-বাবু দেওঘর গেলেন। ঐ সময় শ্রীরঙ্গমেই একজন অভিনেতা শরদু মল্লিক, শ্রীরঙ্গম চালাতে আরম্ভ করলেন চরিত্রহীন নাটক নিয়ে। যে নাটকে আমি অংশ নিতাম উপেনের চরিত্রে।

চরিত্রহীন সে সময় মন্দ চলে নি।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে আমি কোন মঞ্চের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত ছিলাম না। বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করে চলেছি। শুধু কলকাতায় নয়, মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরেও যেতে হয়। কদমতলায় এর আগেও ক'বার গিয়েছি, আবার ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে গেলাম প্রতাপাদিত্য নাটক অভিনয় করতে। সেদিন সৌখীন অভিনেতাও আমাদের সঙ্গে নাটকে অংশ নিয়েছিল।

সৌখীন অভিনেতাদের সঙ্গে নাটকে অংশ নেওয়ার মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

পরদিন ৫ই ফেব্রুয়ারী 'নাট্য সঙ্ঘ' নামে একটি সৌখীন নাট্যসংস্থা আয়োজন করেছিল নাটকাভিনয়ের। নাটক হলো প্রফুল্ল। শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তী ছিলেন নাটকটির নির্দেশক। এ নাটকে অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম আমরা মঞ্চের কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনকড়িদাকে আমি গুরু বলে মানি। স্নেহ পেয়েছি, শিক্ষা পেয়েছি, শাসন সহ্য করেছি। তবেই তো পেয়েছি তাঁর আশীর্বাদ।

অভিনয়ের আগে তিনকড়িদা প্রসঙ্গে একালের নাট্যামোদীদের কাছে কিছু বক্তব্য রাখলাম। বক্তব্য বলতে শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তীর নাটক-জীবন প্রসঙ্গ। তিনকড়িদা নিজেই একটা যুগ—যে যুগকে আমরা তখন পেরিয়ে এসেছি।

যাইহোক, প্রফুল্ল সেদিন ভালোই জমেছিল। তিনকড়িদা যেখানে আচার্য—নাটক তো সেখানে জমবেই।

এইসব সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে [illegible] অংশ গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে অনেক সময় বৈচিত্র্যও খুঁজে পেয়েছি। স্থায়ী মঞ্চে যেটা দুর্লভ।

ডায়েরীর পৃষ্ঠায় কতো কথাই না লিখেছি। ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জের লোকান্তর গমনের তারিখটিও লিখে রেখেছি। তারিখটি ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ই।

আবার ওই দিনে আমার স্ত্রী সুধীরা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এলো, সে কথাও লিখে রেখেছি।

যে কথা আগেও বলেছি, সেই কথাই নতুন করে বলছি। কোন মঞ্চেই নতুন নাটক নেই। পুরোনো নাটক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় হচ্ছে। আমিও অনেক নাটকে অংশ নিচ্ছি। কিন্তু মন থেকে তেমন সাড়া পাই না। তেমন উন্মাদনাও জাগে না মঞ্চে দাঁড়ালে। যন্ত্রের নিয়মে অভিনয় করে চলা। তবে একটা দিক থেকে সব সময়ে সচেতন থাকি, যেন আমার কষ্টার্জিত প্রতিষ্ঠার আসন থেকে বিচ্যুত না হই।

এই সময়ে আরো মনে হতো, যে আমাদের দিন যেন শেষ হয়ে আসছে। এবারে পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

আগামীকালের পথিকরা যে পথ দিয়ে আসচে।

আবার একথাও ভাবি, কই—আগামী-দিনের পথিক তো তেমন কাউকে দেখছি না। যারা আমাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করবে।

অথচ বিগত যুগের আমরা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর তো আগের মতো উৎসাহ পাই না। দেহের সঙ্গে মনটাও আস্তে আস্তে স্থাবির হয়ে আসছে। জীবনে নানা আলোর রোশনাই থেকে এখন একটা ছোট বাতির শিখা দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে ইচ্ছাটুকুও তো পূর্ণ করতে পারছি না। আবার সেই মঞ্চের আকর্ষণেই ছুটে যাচ্ছি।

অভিনয় জীবন—কী এক যাদুর মায়ায় জড়ানো। নয়তো এখনো কলকাতার বাইরে অভিনয় করতে ছুটে যাওয়া।

এই তো সেদিন শিবরাত্রিতে গেলাম শ্রীরামপুরে। আগে জানলে কী যেতাম।

কী কুক্ষণে যে শ্রীরামপুরে এসেছিলাম—এমন ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে স্বপ্নেও ভাবি নি।

সারা রাত ধরে নাটকাভিনয় হবে স্থানীয় শ্রীরামপুর টকীজে। শিল্পীরা অনেকেই আগে থেকে এসেছে। তারাই উদ্যোগ আয়োজন করেছে। সকালে তাদের অনেক গাড়ী চেপে রাস্তায় প্রচারপত্র বিলি করে। চরম বেলেল্লাপনা করেছে মদ্যপান করে। তার মাশুল দিতে হলো সেই রাত্রে। দর্শক সাধারণ বর্জন করলো এই অনুষ্ঠান। শিল্পীরা দিনের আলোয় যা করেছে, রাতে না জানি তারা কি করবে—এই ভয়েই অনুষ্ঠান বর্জন। বেলেল্লাপনার খেসারত দিতে হলো সে রাত্রে। অনেকেই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বাঁচলো। এ প্রসঙ্গে বেশী বলা না লেখাই ভালো। শুধু একটি কথা বলতে পারি, সেদিন শ্রীরামপুরের মানুষ এই অনুষ্ঠান বর্জন করে তাদের [illegible] প্রকাশ করেছিল।

এই বিরূপ অবস্থার মধ্যে আমি আর কী করবো। নীরবে সহ্য করেছিলাম। শান্ত মনে ফিরে এসেছিলাম কলকাতায়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম পুরু মল্লিককে ডেকে, এ কী ব্যাপার কেন এমন হলো।

তারপর পুরু মল্লিকের কাছেই শুনে-ছিলাম আনুপূর্বিক ঘটনা। যে কথা না লেখাই ভালো।

অভিনেতৃ সঙ্ঘের তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারী শিশিরকুমারী অভিনীত হলো। ঐ দিনেই গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে একটা পার্টি দিয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ফ্রাংক কাপরার সহকারী। সেখানে আরো শিল্পীদের সঙ্গে আমিও উপস্থিত হয়েছিলাম।

এর পরের সপ্তাহে অর্থাৎ মার্চের দু তারিখে স্নেহাংশু আচার্যের বেকার রোডের বাড়িতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাশিয়া, চীন এবং রুমানিয়ার চলচ্চিত্র প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা জানানো হলো। চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে ঐ প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসেছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্টেরা উপস্থিত ছিলেন। দেবকী বসু, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখার্জী ছাড়া আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এই অনেকের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত কথাশিল্পী সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। আর ছিলেন বিখ্যাত চরিত্রা-ভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সেদিনের অনু-ষ্ঠানে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ভাষণ দিয়েছিলেন।

রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে মনোরঞ্জনবাবুর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। কেননা, কয়েক বছর আগেই তিনি রাশিয়া সফর করেন।

এই প্রসঙ্গে বলছি, রাশিয়ার প্রতিনিধি-গণকে এর পর শহরে আরো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করা হয়েছিল। এদেশের চিত্র ও মঞ্চ জগতের বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে আমিও যোগ দিয়েছি এইসব অনুষ্ঠানে।

প্রতিটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে যোগ দিতে হচ্ছে। এই মার্চের পাঁচ তারিখে ব্রিস্টল হোস্টেলে 'মিলনী'র ভোজসভায় যোগ দিলাম। এখানে দেখা হলো পুরোনো বন্ধু নীতিশচন্দ্র লাহারীর সঙ্গে। অনুষ্ঠানে চীনা অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে দেবকী বসু, শ্রীমতী কানন দেবী ও তাঁর স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফিল্ম ফেস্টিভল নিয়ে বেশ কটা দিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। উৎসব শেষ হলো ৭ই মার্চ।

অভিনেতা ছবি বিশ্বাস একটি সম্প্রদায় করলেন। নাম সুন্দরম। সুন্দরম সম্প্রদায় কোরিন্থিয়ান থিয়েটার, আজ যেখানে অপেরা সিনেমা হাউস, সেখানে 'বঙ্গ শক্তি' অভিনয় আরম্ভ করলেন। সুন্দরম গোষ্ঠীতে সরযূ-বালা, তুলসী লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, বিজয় কার্তিক প্রমুখ ছিলেন। সুন্দরমের উদ্বোধনের তারিখটি ছিল ১১ই মার্চ।

'সুবর্ণ গোলক' নাটকটির অভিনয় আরম্ভ হলো মিনার্ভায়। বীরেন ভদ্র এর নাট্যকার। ১৩ মার্চ-এর উদ্বোধনের তারিখ।

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস। এরই চিত্ররূপ কলকাতায় মুক্তি পেল ১৪ই মার্চ। আমি ছিলাম নাম-ভূমিকার শিল্পী।

পথের দাবী এর আগেও অনেক বার হয়েছে। পুরু মল্লিক শ্রীরঙ্গমে আবার পথের দাবী অভিনয়ের আয়োজন করলো। এ নাটকের শিল্পী তালিকায় সে আমলের বিখ্যাত শিল্পীদের নাম যুক্ত ছিল।

কী নাটকের ক্ষেত্রে, কী মঞ্চের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নিজস্ব আবেদন আছে। তাই তো বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন মঞ্চে দেখেছি, এই দুই ঔপন্যাসিকের কাহিনী নির্ভর নাটক অভিনীত হচ্ছে। নব-গঠিত সুন্দরম সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' মঞ্চস্থ করলেন। এই নাটকের পরি-চালক ছিলেন ছবি বিশ্বাস।

দিনগুলো কেমন যেন খুঁড়িয়ে চলছে। অভিনয় করছি—করতে হয় করা। স্টুডিও-য় যাচ্ছি ছবির কাজে— সে-ও যেন তেমনি। জীবনে যে অধ্যায় পেরিয়ে এসেছি, তার সঙ্গে বর্তমানের মিল খুঁজে পাই না। থাক না আমল—কিন্তু নতুন কিছু পাবো তো! তাই বা পাচ্ছি কই। সেই গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছি।

নাটক চলছে। পুরোনো নাটক। অভিনয়ও করছি না এমন নয়। তবে এ যেন সেই পুরাতনের জের টেনে চলা।

যে কথাটা এতোকাল ভাবি নি, সেই কথাই আজ ভাবতে শুরু করেছি। অনেক দিন তো নাটক আর অভিনয় নিয়ে জীবন কাটালাম—এবার অন্য জগতের পথে পা বাড়ালে কেমন হয়। কিন্তু যখনই ভেবেছি, সেই অন্য জগতটা কেমন—তখনই কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তবুও মনের মধ্যে সেই অদেখা জগতের খোঁজ নিতে চেয়েছি।

চলতি দিনগুলো নিয়মের মধ্যেই চলেছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি—নিয়মের চাকায় বাঁধা।

জীবনের দিনগুলোও একটা নিয়ম মেনে চলে।

এরই মধ্যে একদিন অপ্রত্যাশিত ফোন পেলাম স্টারের মহেন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে। শুনলাম, মহেন্দ্র গুপ্ত আর সলিল মিত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। কেন আসছেন, সে কথাটা কিন্তু তখনো জানতে পারি নি।

কয়েকদিন বাদেই সলিলবাবুকে নিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত আমার কাছে এলো। অনেক দিন বাদে সলিলবাবুকে দেখলাম। যখন দেখেছি, তখন সে ছিল নিতান্ত শিশু। আজ সে পরিণত যুবক।

আমাকে স্টারে যোগ দেওয়ার কথা ওঁরা বলতে এসেছেন। সেই প্রসঙ্গে কথাবার্তা হলো। আমি রাজী হলাম, স্টারে যোগ দিতে। এখন যে মাস আগামী জুলাই থেকে আমি স্টারের শিল্পী তালিকায় যুক্ত হবো এই কথাই হলো। তবে কী নাটক হবে, তা তখনো মহেন্দ্র ঠিক করে নি। তবে প্রথমটা পুরোনো নাটক কঙ্কাবতীর ঘাট কিম্বা অন্য নাটক অভিনীত হবে। তার মধ্যে মহেন্দ্র নতুন নাটক তৈরী করে নেবে।

সেদিন কথাবার্তা পাকা করে মহেন্দ্র আর সলিলবাবু চলে গেলেন।

'তুমি কি হবে—অভিনেতা?'—শীর্ষক একটি বেতার ভাষণ দিলাম ২৩ জুন তারিখে। এই পর্যায়ে অভিনয় জগতের আরো অনেকে ভাষণ দিয়েছিলেন।

এই জুন মাসের পঁচিশ তারিখে রঙমহলে 'জীবন সংগ্রাম' নামে একটি নাটকের উদ্বোধন হলো। নাটকটি ছিল অধ্যাপক শ্যামসুন্দরের লেখা।

নয়তো অন্য কোন মঞ্চে নতুন নাটক নেই। বিভিন্ন পুরোনো নাটকের অভিনয় চলেছে বিভিন্ন মঞ্চে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

লুনাঃ মহাকাশ গবেষণায় নতুন যুগ

মহাকাশ-গবেষণায় লুনা-১৬ এক অতুলনীয় কৃতিত্ব। পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে এর আগেও মহাকাশযান চাঁদের দেশে পৌঁছেছে, চাঁদের কক্ষপথে পাক খেয়েছে, চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নেমেছে, স-মনুষ্য মহাকাশযান চাঁদের মাটি থেকে রওনা হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরেও এসেছে—কিন্তু একটি মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নামা এবং চাঁদের মাটির নমুনা ও নানা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলাফল সহ আবার চাঁদের মাটি থেকে রওনা হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসার ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি, এই প্রথম। এদিক থেকে লুনা-১৬ নতুন ইতিহাস, মহাকাশ-গবেষণায় অনেকখানি অগ্রসর এক চিহ্নচিহ্ন। প্রথম স্পুৎনিক থেকে যেমন মহাকাশ-গবেষণার একটি যুগ শুরু হয়েছিল, লুনা-১৬ থেকেও তেমনি আরেকটি যুগ। অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ অভিযানের কৃতিত্বকে কিছুমাত্র খাটো না করেও একথা বলা চলে যে রকেটবিদ্যা ও মহাকাশ-গবেষণার প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান স্তরে লুনা-১৬ সার্থক পদক্ষেপ। ঘন্টায় হাজার পঁচিশেক মাইল বেগে যে রকেট ছুটছে তার যাত্রী হয়ে মানুষ বড়োজোর পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের দুটি গ্রহ মঙ্গল ও শুক্রে পাড়ি দেবার কথা ভাবতে পারে—তাও কয়েক বছরের ব্যাপার সৌরমণ্ডলের বাইরের কোনো লোকে তো দূরের কথা, সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ প্লুটোতেও একজন মানুষের পরমায়ু নিয়ে যাবার কথা ভাবা চলে না। এমনকি মাত্র আড়াই লক্ষ মাইল দূরের চাঁদে যাতায়াত করতে গিয়েও দেখা যাচ্ছে ঝুঁকি বিস্তর, খরচ প্রচণ্ড, বিপদ অভাবিতপূর্ব। বিশ্বের বহু বিজ্ঞানীর অভিমত, বর্তমান অবস্থায় মহাকাশ-অভিযান হওয়া উচিত মনুষ্যবিহীন, তাতে খরচ অনেক কম এ-কারণে শুধু নয়, স-মনুষ্য অভিযানের প্রস্তুতির জন্যই। তাঁরা মনে করেন, এখনো মহাকাশ সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানা দরকার, মহাকাশ-অভিযানের প্রযুক্তিও আরো অনেক সম্পূর্ণ করা দরকার—তবেই স-মনুষ্য অভিযান শুরু হতে পারে, তবেই স-মনুষ্য অভিযান সার্থক ও নিরাপদ হতে পারে। মহাকাশ-গবেষণায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রয়াস দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয় অভিযানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। লুনা-১৬ এই প্রয়াসেরই বিপুল সম্ভাবনাময় বাস্তব পরিণতি।
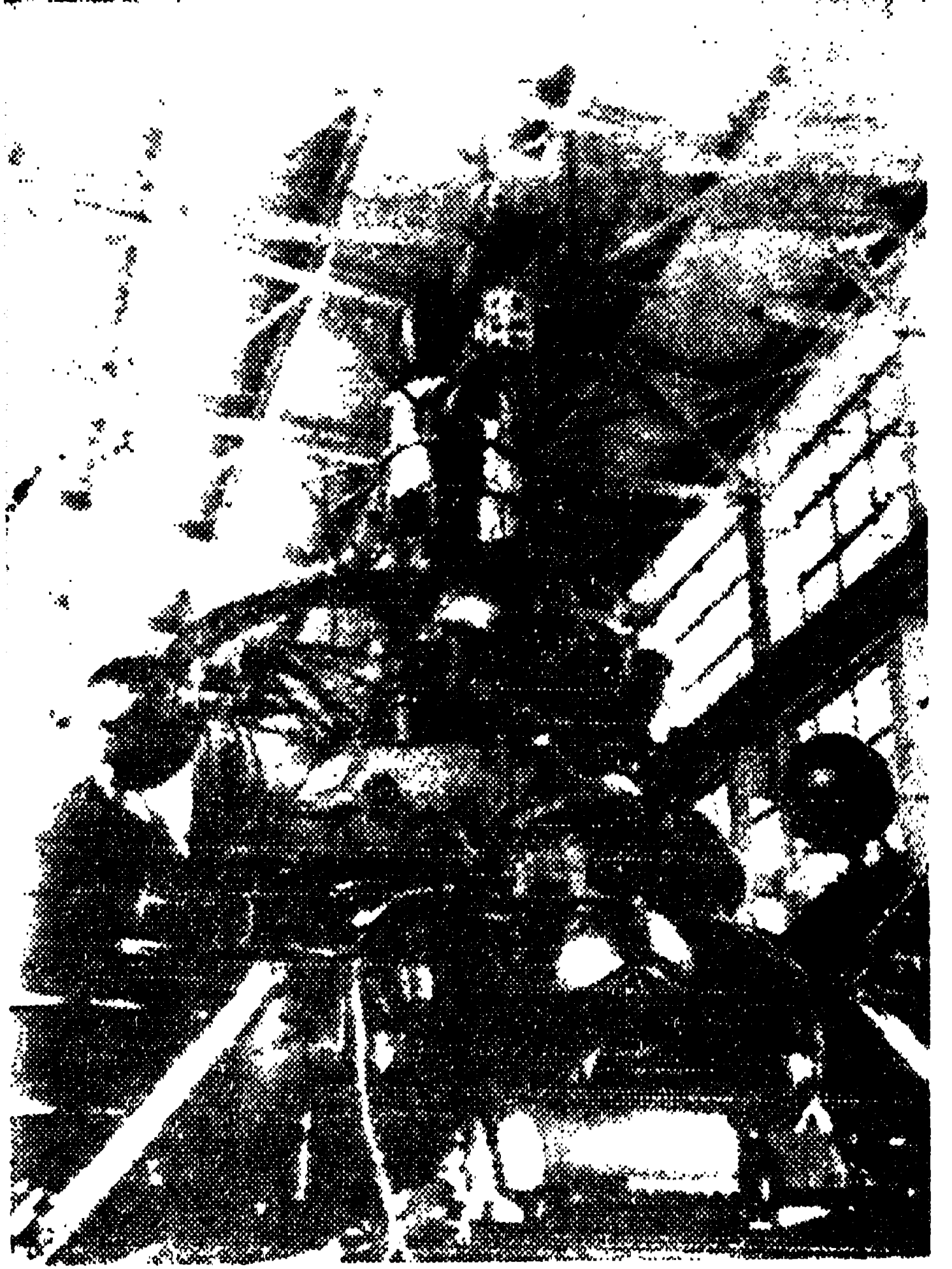
লুনা—১৬

ইতিহাসে প্রথম

মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে এই প্রথম একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পৃথিবী থেকে চাঁদে পাড়ি দিয়ে চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে, চাঁদের দেশে নানা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে, আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসতে পারল। মহাকাশযানে কোনো মানুষ ছিল না, মহাকাশযানের সমস্ত কাজই সম্পন্ন হয়েছে পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। পর পর ঘটনাগুলো এইরকমঃ

১২ সেপ্টেম্বরঃ লুনা-১৬ আকাশে ওঠে। ১৭ সেপ্টেম্বরঃ লুনা ১৬-কে চাঁদের চারদিকে বৃত্তাকার কক্ষে পাক খাওয়ানো হয় ও পরে এই বৃত্তাকার কক্ষকে করে তোলা হয় উপবৃত্তাকার। ২০এ সেপ্টেম্বরঃ চাঁদের উর্বর সাগর এলাকায় লুনা-১৬ আলতোভাবে নামে। মাটিতে নামার পরে পৃথিবী থেকে হুকুম পেয়ে একটি বিশেষ মাটি-খোঁড়ার যন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রায় ৩৫ সেন্টিমিটার গভীর থেকে চাঁদের পাথর সংগ্রহ করে একটি বায়ুরোধী পাত্রে ভরে। চাঁদের মাটিতে লুনা-১৬-র অবস্থান ২৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। এই সময়ে বিকীরণ ও উত্তাপের মাপ নেওয়া হয়। ২১এ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় সময় সকাল ১২টা ১৩ মিনিটের সময়ে ফিরতি যান সমেত একটি রকেট চাঁদের আকাশে ওঠে। চাঁদের মাটিতে নামার সময়ে লুনা-১৬-র যে অংশটি ব্যবহার করা হয়েছিল তার ওপরে ভর রেখেই রকেটটির যাত্রা। এক্ষেত্রে দুটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব রাখার প্রয়োজন হয়েছিল। এক, চাঁদের যে বিশেষ স্থানে লুনা-১৬ নেমেছিল তার স্থানাঙ্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করা। দুই, ঠিক কোন সময়টিতে ফিরতি যানের যাত্রা শুরু হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা। এই দুটি হিসেবের কোনো একটিতে সামান্যতম ভুল

হলেও ফিরতি যানটিকে পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে আনা শক্ত হত।

২৪-এ সেপ্টেম্বর লুনা-১৬-র রকেটটি পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পৌঁছয়। তখন তার বেগ লুনা-১৬-র নিষ্ক্রমণ-বেগের সমান। অর্থাৎ, পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে লুনা-১৬-কে যে-বেগে ছুটে দিতে হয়েছিল। তারপরে বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে প্রবেশ করার আগে ফিরতি যানটি রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাতাসের ঘর্ষণে ফিরতি যানের বেগ আরো কমে। আরো কিছুক্ষণ পরে প্যারাসুট ব্যবস্থা চালু হয়। প্যারাসুটের সাহায্যে ফিরতি যানটি ধীরে ধীরে নামতে থাকে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে ফিরতি যানটি প্রবেশ করে ভারতীয় সময় সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে। আরো চার মিনিট পরে হেলিকপ্টার থেকেই চোখে পড়ে প্যারাসুটের সাহায্যে ফিরতি যানটি ধীরে ধীরে নামছে। সকাল ১০টা ৫৬ মিনিটে ফিরতি যানটি পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে।

ধাপে ধাপে শিখরে

লুনা-১৬ একদিনে হঠাৎ যায়নি, লুনা-১৬-কে যদি একটি শিখরের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে এই শিখরে পৌঁছতে অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে আসতে হয়েছে।

প্রথম ধাপঃ মহাকাশযানকে প্রথমে পৃথিবীর কক্ষপথে তুলে আনা, পরে সেই কক্ষপথ থেকে চাঁদের দিকে যাত্রা করানো। এই ধাপে উত্তরণ ঘটেছিল ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান লুনা-৪-এর সাহায্যে। পরে লুনা পর্যায়ের কোনো মহাকাশযানই চাঁদের পথে সরাসরি পাড়ি জমায়নি, প্রথমে উঠে এসেছে পৃথিবীর কক্ষপথে।

দ্বিতীয় ধাপঃ পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে যাত্রা শুরু করার পরে যাত্রাপথ সংশোধন করা। লুনা পর্যায়ের অধিকাংশ মহাকাশযান ও জোন্দ পর্যায়ের কয়েকটি মহাকাশযানের যাত্রাপথ এভাবে সংশোধিত হয়েছিল।

তৃতীয় ধাপঃ মহাকাশযানকে চাঁদের কক্ষে পাক খাওয়ানো। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে লুনা-১০ অভিযানে প্রথম এ-ব্যাপারটি ঘটানো হয়, পরে আরো কয়েকটি লুনা পর্যায়ের মহাকাশযানে।

চতুর্থ ধাপঃ চাঁদের কক্ষে মহাকাশযান যখন পাক খাচ্ছে সেই অবস্থাতেই কক্ষের অদল-বদল ঘটানো, অর্থাৎ মহাকাশযানকে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে নিয়ে আসা। ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসের লুনা-১৫ অভিযানে প্রথম এভাবে মহাকাশযানকে চাঁদের এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মহাকাশযানকে চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে নিয়ে যেতে পারার সুবিধে এই যে তার ফলে চাঁদের যে-কোনো এলাকায় মহাকাশযানকে আলতো-ভাবে নামানো সম্ভব। চাঁদ সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানতে হলে চাঁদের কোনো এলাকাকেই পর্যবেক্ষণের আওতা থেকে বাদ দেওয়া চলে না। এ থেকে বোঝা যায় এই সুবিধে কত বড়ো সুবিধে।

পঞ্চম ধাপঃ মহাকাশযানকে চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নামিয়ে আনা। ১৯৬৬ সালে লুনা-৯ ও লুনা-১৩ অভিযানে আলতো অবতরণ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই সাফল্য ছিল আংশিক, কেননা দুটি মহাকাশযানই চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নেমেছিল পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে যাত্রাপথ থেকে সরাসরি। আর লুনা-১৬ চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নেমেছিল যাত্রাপথ থেকে সরাসরি নয়, চাঁদের কক্ষ থেকে। শুধু তাই নয়, লুনা-১৬-কে চাঁদের মাটিতে নামাবার আগে বার কয়েক তার কক্ষ পাল্টানো হয়েছিল। ফলে, লুনা-১৬ নিখুঁতভাবে নেমেছিল চাঁদের সেই বিশেষ এলাকাতেই যেখান থেকে চাঁদের মাটি সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা।

১৯৬৬ সালের লুনা-৯ ও লুনা-১৩ থেকে ১৯৭০ সালের লুনা-১৬ অনেকাংশেই পৃথক। তার সবচেয়ে বড়ো কারণ এই যে লুনা-১৬-কে আবার চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নামিয়ে মহাকাশযানকে আবার পৃথিবীর মাটিতে আবার ফিরিয়ে আনার কথা চিন্তা করাটা ১৯৬৬ সালে অসম্ভব মনে করা হত। লুনা-১৬ চাঁদের মাটিতে নেমেছিল ফিরে আসার আয়োজন সমেত (অর্থাৎ রকেট ও জ্বালানির সরবরাহ সহ)। লুনা-৯ ও লুনা-১৩ থেকে লুনা-১৬-র ওজন ছিল অনেক বেশি।

ষষ্ঠ ধাপঃ চাঁদের মাটির নমুনা সংগ্রহ করা, সেই নমুনাকে একটি আধারে ভরা ও আধারটি এঁটে বন্ধ করা। এ-কাজটিও আগে কখনো করা হয়নি।

সপ্তম ধাপ ঃ স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানকে চাঁদের মাটি থেকে যাত্রা করানো। এ কাজটিও আগে কখনো করা হয়নি এবং এ-কাজের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতাও নেই। কাজটি অতি দুরূহ তা আগে বলেছি, আরো একবার বলতে চাই। অভিযানের মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে চাঁদের মাটির আধার সমেত ফিরতি যানটিকে ফিরিয়ে আনা। মাঝখানের দূরত্ব ৪০০,০০০ কিলোমিটার। নির্দেশ পাঠাতে হচ্ছে সবই বেতারে। যন্ত্রপাতি সবই স্বয়ংক্রিয়। কোনো একটি নির্দেশ পাঠাবার পরে যদি টের পাওয়া যায় যে যন্ত্রপাতিতে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, তখন আর নির্দেশ স্থগিত রেখে ত্রুটি সারিয়ে নেবার কোনো উপায়ই নেই। চালু করার আগে পাকাপাকিভাবে জানা দরকার চাঁদের মাটিতে ঠিক কোন অবস্থানে ফিরতি যানটি রয়েছে, ঠিক কোন সময়ে রকেট চালু করাতে হবে এবং কতক্ষণ ধরে চালু রাখতে হবে। কোনো একটি হিসেবে ভুল হলে গোটা অভিযানটিই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা।

লুনা-১৬ অভিযানের কৃতিত্ব যে কী বিরাট তা এই দুরূহতার কথা মনে রাখলে খানিকটা ধারণা করা যায়। এত দুরূহতার মধ্যেও লুনা-১৬ অভিযানে যে সফল হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রস্তুতি কতখানি নিখুঁত।

অষ্টম ধাপঃ নিষ্ক্রমণ বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ও পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ। এটি কোনো নতুন ধাপ নয়। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান জোন্দ-৫ চাঁদ থেকে ফিরে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ও পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করেছিল। পরে জোন্দ-৬ ও জোন্দ-৭ মহাকাশযান দুটিও একইভাবে পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করে, একইভাবে লুনা-১৬ও। অন্তত এই অষ্টম পর্বে লুনা-১৬-কে দিয়ে অঘটিতপূর্ব কোনো কাজ করানো হয়নি।

বিরাট অগ্রগতি

মহাকাশ-অভিযানে লুনা-১৬ বিরাট এক অগ্রগতি। শুধু এই কারণে নয় স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক উপায়ে চাঁদের খানিকটা মাটি পৃথিবীতে আনা গিয়েছে। এই কারণেও যে একই উপায়ে আরো অনেক জটিল অনুসন্ধানকার্য চালানো সম্ভব হবে। পৃথিবী থেকে একটি বেতার নির্দেশ পাঠিয়ে অন্য একটি জ্যোতিষ্ক থেকে একটি রকেটকে যদি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে অজস্র পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হতে পারে। কয়েকটির উল্লেখ করা যাক।

লুনা-১৬ চাঁদের এক বিশেষ এলাকা থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে এনেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের অভিযানে শুধু একটি বিশেষ এলাকা থেকে নয়, সঞ্চরমান যানের সাহায্যে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে—শুধু মাটির নয়, চাঁদের আকাশের।

আর এ ধরনের অভিযান শুধু চাঁদের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? এমন দিন খুব দূরে নয় যখন স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান নমুনা সংগ্রহ করে আনবে মঙ্গলগ্রহ থেকে, শুক্রগ্রহ থেকে, গ্রহাণু থেকে ও সৌরমণ্ডলের আরো দূরে দূরে এলাকা থেকেও।

যে-কথা আগে বলেছি, লুনা-১৬ থেকে মহাকাশ-গবেষণায় এক নতুন যুগ শুরু হল।

কসমস ৩৬৪ ও ৩৬৫

মহাকাশ-গবেষণায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে কতখানি তৎপর তার আরো দুটি দৃষ্টান্ত কসমস ৩৬৪ ও ৩৬৫। প্রথমটি আকাশে তোলা হয়েছে ২২-এ সেপ্টেম্বর তারিখে, দ্বিতীয়টি ২৫-এ সেপ্টেম্বর তারিখে। দুটিই পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ। দুটিরই উদ্দেশ্য মহাকাশ-গবেষণা। সংখ্যার নম্বর দেখে বোঝা যাচ্ছে ইতিপূর্বে কসমস পর্যায়ের আরো ৩৬৩টি উপগ্রহ আকাশে উঠেছে।

—অয়স্কান্ত

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র

মানসী মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেমন বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মহান অবদানে পরিপুষ্ট হিন্দী সাহিত্যেও তেমনি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের দান অক্ষয় হয়ে আছে। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে হিন্দী সাহিত্যের নবজন্মের ইতিহাস পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত হরিশ্চন্দ্রের প্রগাঢ় দেশভক্তি ছিল। হিন্দী ভাষা তাঁর হাতে পরিমার্জিত হয়ে আধুনিক রূপ নিয়েছে। তিনিও অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে তরুণ লেখকগোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র মত হরিশ্চন্দ্রের 'কবি চলে সুধা' নামে একটি পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকায় তিনি তীক্ষ্ণধার লেখনীর দ্বারা জাতীয় চেতনা উন্মেষের অবিরাম চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন দেশবাসীর উন্নতি হলেই দেশের উন্নতি সম্ভব। সেই উন্নতির বাহক—হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি যোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। হিন্দী ভাষাশৈলী গঠনে, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায়, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি রচনায়, এক কথায় হিন্দী সাহিত্যের প্রত্যেক শাখায় তাঁর শ্রান্তি ক্লান্তিহীন অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর একক জীবনে মাত্র সতেরো বছরের চেষ্টায় হিন্দী সাহিত্যে যে পূর্ণতা এনেছিলেন স্বল্প কথায় সে অবদানের কথা বলতে চেষ্টা করব।

হরিশ্চন্দ্র ছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলের কুখ্যাত ব্যক্তি উমীচাঁদের পঞ্চম পুরুষ গোপালচন্দ্রের পুত্র। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫০ খৃঃ হরিশ্চন্দ্রের জন্ম। স্বভাবে ইনি দরবারী, রোম্যাণ্টিক এবং রসিক ছিলেন। আর উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সাহিত্য-প্রতিভা লাভ করেছিলেন। গোপালচন্দ্র 'গিরিধারীদাস' এই ছদ্মনামে তাঁর সময়ের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। পিতার অনুমতি নিয়ে হরিশ্চন্দ্র বাল্যবয়সেই একটি দোঁহা লিখেছিলেন। বাল্যাবস্থা থেকেই হরিশ্চন্দ্র হিন্দী, উর্দু এবং ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। পরে কলেজেও ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পিতার অকালমৃত্যু ও বিমাতার দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁর কলেজী শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়। তবে জ্ঞান চর্চায় ছেদ পড়েনি। অসীম উৎসাহে উপরোক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠী ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন; উক্ত ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় কবিতা রচনা করেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর হরিশ্চন্দ্র প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু ধনৈশ্বর্য তাঁকে বশীভূত করতে পারেনি। পূর্ব-পুরুষের অর্থলিপ্সার প্রতি অশ্রদ্ধা ও নিজের সৌখীন স্বভাবের জন্য তাঁর স্বল্পায়ু জীবনেই তা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে উপরন্তু তাঁকে শেষ জীবনে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল। তাঁর অমিতব্যয়িতার সংবাদ শুনে তৎকালীন কাশীর রাজা তাঁকে উপদেশ দিতে এলে হরিশ্চন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, 'জিস ধন্ নে মেরে পূর্বজোঁ কো খায়া হ্যায়, ওসে ম্যায় খা কর ছোড়ুঁগা' অর্থাৎ যে অর্থ আমার পূর্ব-পুরুষদের নিঃশেষ করে ছেড়েছে তাকে আমি নিঃশেষ করেই ছাড়ব।

হরিশ্চন্দ্র তাই নিজের ধনবৃদ্ধির চিন্তা ছেড়ে হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই মহৎব্রত তাঁর আত্মীয় বা পত্নী কারুরই ছাড়পত্র লাভ করতে পারেনি। পত্নীর বিরূপতায় হরিশ্চন্দ্র মনে হয় নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতেন।

বাঙালী সাহিত্যিক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক সাহিত্যের দ্বারা তিনি যে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর জীবনীকার একাধিকবার তা স্বীকার করেছেন।

হরিশ্চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দীতে একাধিক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পাঠ করার পর হিন্দীতে একাধিক দেশাত্মবোধক নাটক লিখে গেছেন। বঙ্কিমের মত তিনিও জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। ইতিহাসের ওপর রচিত ওঁর একাধিক প্রবন্ধ আছে। হিন্দী কাব্যে হরিশ্চন্দ্র বহুবার বাংলা ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

সুন্দর স্বভাব, সাহিত্য-প্রতিভা, দেশ ও সমাজসেবার জন্য হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁকে 'উত্তর ভারতের কবি' 'এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সমালোচক' ইত্যাদি বলে প্রশংসা করতেন। রামেশ্বরদত্ ব্যাস হরিশ্চন্দ্রকে চটাবার উদ্দেশ্যে 'সার সুধানিধি' পত্রিকায় ১৮৮০ খৃঃ মে মাসের সংখ্যায় প্রস্তাব করেছিলেন যে 'হরিশ্চন্দ্রজীকে 'ভারতেন্দু' এই নামে বিভূষিত করা হোক'। তখন থেকে হরিশ্চন্দ্র স্বনামের চেয়ে 'ভারতেন্দু' নামে হিন্দী সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত।

ভারতেন্দু-সাহিত্য সম্বন্ধে জানার আগে, সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু অবহিত হওয়া দরকার।

ইংরাজ শাসনের জড় তখন পরাধীন ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের ধন বণিকের জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। ১৮৫৭ খৃঃ পর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। জনসাধারণ ইংরাজ শাসনের ছত্রছায়ায়, তার অনুকরণে জীবনচারণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আবার ইউরোপীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের ইতিহাস ও ইউরোপীয় সাহিত্য বুদ্ধিজ্ঞ[illegible], ভারতবাসীর মনে নতুন আশা, উদ্দীপনা ও উৎসাহের উৎস খুলে দেয়। শিক্ষিত ভারতবাসী স্বদেশের দুরবস্থা ও বিজেতার শোষনব্যবস্থা দেখে যেন নতুন করে জেগে উঠেছিল। জনতা পেয়েছিল নতুন বাণী, নতুন পথ, নতুন সাহিত্য; সে সাহিত্য যেন জনজীবনকে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার সোনার কাঠি। হিন্দী সাহিত্যে এ সোনার কাঠির কাজ করেছিল ভারতেন্দুর সাহিত্য।

বিদেশী শাসন ও শোষণ ভারতেন্দুকে এত বেশি উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল যে ভারতেন্দু-সাহিত্য পড়ে অনায়াসে বলা যায় যে উনি আগে দেশভক্ত পরে সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে ছিল স্বদেশচিন্তা, তাই ভারতেন্দু সাহিত্যিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবক ও সমাজ সংস্কারকও বটে। পরাধীনতা, তা যে রকমেরই হোক, ভারতেন্দুর অসহ্য ছিল। দেশবাসীর আত্মগৌরব বিস্মরণ, পরাধীনপ্রিয়তা, পরানুকরণ প্রবৃত্তি,

সংস্কৃতির অধোগতি, সামাজিক অশিক্ষা, জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার, কুরুচির বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্য যেন ছিল চাবুকের মত। ভারতেন্দু-সাহিত্য হিন্দী সাহিত্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনা উন্মেষের এক জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন।

ভারতেন্দু শিল্পী সেই সঙ্গে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন একজন যুগনেতাও। সমাজসংস্কারক ও জাতীয় জাগরণ ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি দেশ ও সমাজের গতি-প্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছিলেন যে জাতীয় উত্থান ও অগ্রগতির জন্য সবার আগে চাই প্রচার; যার বাহন পত্র-পত্রিকা।

প্রথম হিন্দী পত্র-পত্রিকা হল ভারতেন্দু পরিচালিত 'কবিবচন সুধা'। কিন্তু প্রথমেই সমস্যা—ভাষা, হিন্দী গদ্য ভাষা।

হিন্দী ভাষার প্রথম রূপ ছিল পদ্য। ভারতেন্দুর পূর্বে হিন্দী গদ্যরূপ যা ছিল তা তার দুর্বল ভ্রূণাবস্থা। ভারতেন্দুর দ্বারাই হিন্দী গদ্যরূপ নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শৈলীর গদ্য রূপদান তাঁরই কৃতিত্ব।

তাঁর দ্বিতীয় পত্রিকা 'হরিশ্চন্দ্র ম্যাগাজিন' ১৮৭৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশেই 'নতুন হিন্দী'র সূত্রপাত। যা আধুনিক হিন্দী ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

গদ্য ভাষা-সমস্যার সমাধান এবং তার স্থিরীকরণ করার পর ভারতেন্দু পত্রিকা পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি 'একে চন্দ্র'।

ভারতেন্দুর সম্পাদকীয় বিষয়বস্তু ছিল সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক যার আলোচনায় তিনি জনসাধারণকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতেন। তবে উনি ছিলেন হাস্যরসের রাজা; হাস্যব্যঙ্গ মিশ্রিত তাঁর রচনা জনজীবনে চেতাবণীর সন্দেশ বহন করত।

তাঁর রচিত নানা নিবন্ধের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় রচনাগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। হিন্দী লেখকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে ইতিহাস লেখা ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে খোঁজখবর করার সূত্রপাত করেছিলেন। সাংস্কৃতিক প্রবন্ধে ভারতেন্দু জনতার অন্ধ বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ভ্রম, মানসিক দৈন্য দূর করে তাদের নতুন চেতনায় অনুপ্রাণিত এবং অতীত গৌরব সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। 'ভারতের উন্নতি কি করে হতে পারে' ওঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। জাতি ও ধর্মের ঝগড়া সম্বন্ধে ভারতেন্দু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, 'এখন ঝগড়ার সময় নয়। হিন্দু, জৈন, মুসলমান সব এক হোন। জাতীয় অহংকার ভুলে সবার আদর করুন। ছোট জাতের মানুষদের তিরস্কার করে ওদের মন ভেঙে দেবেন না।......' একটি সামাজিক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ছেলেদের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়ে তাদের আয়ু বলবীর্য বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হবেন না। বীর্য ওদের শরীরে পুষ্ট হতে দিন। নুন তেল কাঠ যোগাড়ের বুদ্ধি আগে হোক তারপর ওদের পা কাটবেন (অর্থাৎ বিয়ে দেবেন)। ভারতেন্দু স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, সমুদ্রযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন।

দেশের আর্থিক দুরবস্থায় চিন্তিত হয়ে ভারতেন্দু একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ছোটবেলা থেকে মেহনত করার অভ্যাস কর।...... বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী সব হাতে হাত ধর। তোমাদের টাকা যাতে তোমাদের দেশে থাকে তাই কর।'

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে ভাষা সম্বন্ধে ভ্রম নিরসন, ভাষা পরিমার্জন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতেন্দুর সাহিত্যসম্বন্ধীয় প্রবন্ধকে হিন্দীতে সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

প্রবন্ধগুলির ভাষা সহজ, সরল সুন্দর। ভারতেন্দু তাঁর ভাষায় ইংরেজী, উর্দু এবং কিছু কিছু প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এইভাবে অন্য ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে হিন্দী ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধে ভারতেন্দুর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। 'জাতীয় সঙ্গীত' প্রবন্ধে জাতীয় সঙ্গীতের (উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও লোকগীতি) বহুল প্রচারের কথা বলেছেন। ভারতেন্দু মনে করতেন সঙ্গীতের দ্বারা জনজীবনে নতুন চেতনা জাগিয়ে তোলা সম্ভব, তবে সে সঙ্গীতের ভাষা হবে জনতার ভাষা। এই প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন, '......আমি ভেবেছি যে জাতীয় সঙ্গীতের ছোট ছোট বই গ্রামে গ্রামে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হোক। সবাই জানেন, সাধারণের মধ্যে যে কোন বিষয় সর্বাধিক প্রচার করা যায়। এও জানেন সঙ্গীতের দ্বারা যত শীঘ্র শিক্ষা দেওয়া যায় কাব্য বা চিত্রের দ্বারা তত শীঘ্র নয়।'

ভারতেন্দুর ব্যঙ্গ নিবন্ধের মধ্যে 'অঁগ্রেজ স্তোত্র' বিখ্যাত। ইংরেজদের চাটুকারদের লক্ষ্য করে এই ব্যঙ্গ স্তোত্র লেখা। ইংরাজদের চাটুকারদের মুখ দিয়ে ভারতেন্দু বলাচ্ছেন:—

'হে বরদ! আমায় এই বর দাও, আমি মাথায় শামলা বেঁধে তোমার পেছন পেছন দৌড়ে বেড়াই। তুমি আমায় চাকরি (কালেক্টর) দাও আমি তোমায় প্রণাম করব।

'হে শুভঙ্কর! আমার ভাল কর, আমি তোমার খোসামোদ করব, আমায় বড় কর আমি তোমায় প্রণাম করব।

'হে মানদ! তুমি আমায় টাইটেল দাও, খেতাব দাও, আমি তোমায় ইত্যাদি—।

'হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করতে ইচ্ছা করি। ......আমি বুট প্যান্ট পরব, কাঁটা চামচে খাব। আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করে তোমার ভাষায় কথা বলব।'

দয়ানন্দজী ও কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গে স্থান হবে কিনা এই নিয়ে 'স্বর্গ মে বিচার সভা কা অধিবেশন' নামে ভারতেন্দু একটি হাস্যরসাত্মক রচনা লিখেছেন। ভারতেন্দু নিজে সনাতনী হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উদার। তাই দেখা যায় স্বর্গের সিলেকট কমিটির রিপোর্টে দয়ানন্দজী ও কেশবচন্দ্র সেনের কাজের প্রশংসা করা হয়েছে যে এঁরা দেশের অতীত গৌরবের প্রতি দেশবাসীকে সচেতন করেছেন এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি দূর করেছেন।

তাঁর পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় বহু বিদ্বান, বিদগ্ধ ব্যক্তির সহযোগিতা ছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্বামী দয়ানন্দজী।

ভারতেন্দু মহিলাদের জন্য 'বাল-বোধিনী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা করেছিলেন। 'বালবোধিনী'র প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭৪ খৃঃ। এতে মহিলা সংক্রান্ত রচনা ছাড়াও সাহিত্যের নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি থাকত। এই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠায় ভারতেন্দু নারী জাতির জন্য সমানাধিকারের দাবি জানিয়েছেন। 'বালবোধিনী' চার বছর চলার পর ইংরাজের কোপদৃষ্টিতে পড়ে বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। প্রতিবাদে ভারতেন্দু অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেছিলেন।

হিন্দী নাট-সাহিত্যের পুরোধাও ভারতেন্দু। হিন্দী নাট্যসাহিত্য হিন্দী গদ্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতাব্দীতে জন্মলাভ করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার পর সাহিত্যিকদের নাট্য রচনার প্রতি দৃষ্টি যায়। সাহিত্যিকরা তখন সংস্কৃত নাটক হিন্দীতে অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন।

ভারতেন্দুর পূর্বে হিন্দীতে যে কটি নাটক পাওয়া যায় তা সবই পদ্যবন্ধ। গদ্য ভাষায় তখন নাটক ছিল না। উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চও ছিল না। যা ছিল তাতে রাম-লীলা, পুতুল নাচ ইত্যাদি দেখান যেত। ফলে জনতার রুচিবোধও তেমনি ছিল।

এমনি পরিস্থিতির মধ্যে ভারতেন্দু হিন্দী গদ্য ভাষায় আধুনিক ভাবধারায় নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং

একাধিক নাটক লিখে হিন্দী সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক নাটক অভিনয়ের যুগোপযোগী রঙ্গমঞ্চও গড়ে তুলেছিলেন, যার মধ্যে বাংলা ও পারস্যের প্রভাব প্রভূত পরিমাণে ছিল। নিজ প্রদেশে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ গঠনের তিনি জন্মদাতা ছিলেন। ভারতেন্দু লিখিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা বারোটি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'ভারতদুর্দশা' 'ভারতজননী', 'বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি', 'অন্ধের নগরী' ও 'বিষস্য বিষমৌষধম'। অনূদিত নাটকের সংখ্যা ছটি। হিন্দী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার 'সত্য হরিশ্চন্দ্র' নাটককে মৌলিক বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে 'সত্য হরিশ্চন্দ্র' একটি বাংলা নাটকের অনুবাদ।

'বিদ্যাসুন্দর' নাটক সম্বন্ধে ভারতেন্দু নিজেই বলেছেন, 'মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য অবলম্বনে যে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক লিখেছেন তারই ছায়া নিয়ে আজ এটি হিন্দী ভাষায় লিখিত হল।

ক্রান্তিকালের সদাজাগ্রত শিল্পীর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ ও জাতীয় জীবনের অবক্ষয়ের ছবি জনমানসে তুলে ধরা ও জীবনে নতুন পথের দিশা দেওয়া হল তাঁর মহত্তম কাজ। ভারতেন্দু হিন্দী সাহিত্যে সে দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিজের হাতে নিয়েছিলেন। ভারতেন্দু-নাট্যসাহিত্যে আমরা তাঁর সে দায়িত্বের আলেখ্য পাই।

ভারতেন্দুর নাটকগুলি দু-ভাগে ভাগ করা যায়—আদর্শবাদী নাটক ও বাস্তববাদী নাটক। তাঁর বাস্তববাদী নাটকগুলিতে বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও রাগ দেখতে পাওয়া যায়। শাসনের নামে অত্যাচার, শোষণ, দেশের লোকদের পরানুকরণপ্রিয়তা, দেশীয় রাজা ও ধনিকদের চাটুকারিতা, , যুবকদের উশৃঙ্খলতা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। 'ভারতদুর্দশা' নাটকে বিদেশী সরকারের ও তার নোকরশাহীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। আবার ভারত-বাসীকে তার অতীত গৌরব সম্বন্ধে অবহিত হতে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তিনি কূপমণ্ডূক ছিলেন না, দেশবাসীর দোষত্রুটি যেমন অঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তেমনি অন্যের মধ্যে যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

মহারাণী ভিকটোরিয়ার ঘোষণার পর দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারতেন্দু কিছু আশান্বিত হয়েছিলেন। ইংরাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর তাঁর আস্থা ছিল। যথার্থ শিক্ষিত ইংরাজের কাছে নালিশ পৌঁছে দিলে হয়তো ভারতের দুর্দশার লাঘব হতে পারে, এই বিশ্বাসই 'ভারতজননী' নাটকের ভিত্তি।

নাটকে চরিত্রচিত্রণে ভারতেন্দু বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। 'বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি' নাটকে গণ্ডকী-দাসের চরিত্র আজকের দিনে তথাকথিত যে কোন সাধুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যেমন 'ও গুরুলোক, ধর্মের নামে কেবল তিলকমুদ্রা, পূজাপদ্ধতি হল লোক ঠকানো, ভক্তির সঙ্গে মূর্তিকে কখনো প্রণাম করে না কিন্তু মন্দিরে স্ত্রীলোক এলে হাঁ করে চেয়ে থাকে। এমনিতে নিজেকে রামচন্দ্র বা কৃষ্ণের দাস বলে কিন্তু স্ত্রীলোক সামনে এলে তখন বলে, 'আমি রাম তুমি জানকী, আমি কৃষ্ণ তুমি গোপী'।

উক্ত নাটকে যমালয়ের দৃশ্যে ইংরেজদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করেছেন। চিত্রগুপ্ত বলছেন—ওরে দুষ্ট! এ কী মর্তলোকের কাছারী পেয়েছিস যে তুই ঘুষ দিতে এসেছিস!' 'অন্ধেরী নগরী' নাটকে চৌপট্ট রাজার চরিত্র যে-কোন দেশীয় রাজার প্রতিচ্ছবি বলা যায়। 'বিষস্য বিষমৌষধম' নাটকে ইংরাজদের হাতে দেশীয় রাজাদের যেন সতরঞ্চ খেলার ঘুঁটির প্রতিরূপে করে দেখান হয়েছে। এই সতরঞ্চের ঘুঁটি সম্বন্ধে একটি কৌতুকপূর্ণ ঘটনার কথা ভারতেন্দু-জীবনীকার শুনিয়েছেন। কোনাকাতের প্রসিদ্ধ রাজা অপূর্বকৃষ্ণকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনারা কেমন রাজা?' রাজা উত্তর দিয়েছিলেন 'যেমন সতরঞ্চের রাজা, যেমন চালায় তেমনি চলি।'

ভারতেন্দুর লেখা নাটক যখন অভিনীত হতে থাকে তখন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তবে তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতেন্দু নাটক লেখার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জয়িনের নবীন নাট্যকার নিয়ে নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ফলে তখন নাটক লেখার ও তার অভিনয় করার উৎসাহের ঢেউ উঠেছিল।

ভারতেন্দু-পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে তাঁর প্রভাব অভাবনীয়রূপে দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দী কাব্যসাহিত্যে ভারতেন্দু একজন মহান কবি বলে আজো সম্মানিত। গদ্যের জন্য তিনি যেমন হিন্দীকে (হিন্দুস্থানী নয়) বেছে নিয়েছিলেন তেমনি কাব্যের জন্য তিনি ব্রজবুলি ভাষা পছন্দ করতেন। তাঁর বহু কাব্য ঐ ভাষায় লেখা।

ভারতেন্দু বল্লভ সম্প্রদায়ী ছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল ভক্তের। মধ্যযুগের ভক্তিভাব তাঁর মন জুড়েছিল। আবার রীতিকালের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ায় ভারতেন্দুর মধ্যে একজন প্রেমিক ও রসিক কবির দর্শন পাই। হাস্যরস পরিবেশনে তিনি তাঁর কালে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর কাব্যে আরো একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায় তা হল দেশপ্রেম যা তাঁর কাব্যে সবচেয়ে প্রবল। এর মূলে কাজ করেছে তখনকার ভারতের পরিস্থিতি, ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রভাব এবং প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ। ভারতেন্দু প্রকৃতিকাব্য, গীতিকাব্য, ভক্তিকাব্য, প্রেমকাব্য, দেশাত্মবোধককাব্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক হাসির-কাব্য লিখে গেছেন।

তাঁর ভক্তিকাব্যে তুলসীদাস, সুরদাস ও কবীরের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তবে কবীরের প্রভাবই সর্বাধিক।

ভারতেন্দু রাধাকৃষ্ণের ভক্ত হলেও এবং ভক্তিভাবপূর্ণ কাব্য লিখলেও তাঁর চোখে রাধাকৃষ্ণ শুধু অলৌকিক সৌন্দর্যের প্রতীকই ছিলেন না, লৌকিক অর্থে কখনো কখনো তাঁরা মানব-মানবী রূপেও প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্র করে শৃঙ্গাররসাত্মক। কাব্যগুলি তাই খুবই রসাল হয়ে উঠেছে। এই সব কাব্যে রাধাকৃষ্ণ শুধু মানব-মানবীই নয়, মানুষের আশা আকাঙ্খা-কামনা অনুভূতিসহ যেন আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছেন।

ভারতেন্দু তাঁর দেশাত্মবোধক নাটকের মত তাঁর দেশাত্মবোধক কাব্যের দ্বারা দেশবাসীর মোহনিদ্রা দূর করার চেষ্টা করেছেন।

রীতিকালের কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল ভক্তি, বীরত্ব, শৃঙ্গার রস ইত্যাদি। জনজীবন বা তার ভাবনা-চিন্তা কবিতায় স্থান পায়নি। অবশ্য কবীর তাঁর কালে তাঁর নিখাত দোঁহায় জনজীবনের বন্দনা ও ছবি কিছু কিছু তুলে ধরেছেন। কিন্তু কাব্যের সীমিত সীমাকে লঙ্ঘন করে নতুন অর্থ দান করে দিলেন ভারতেন্দু। জনসাধারণও তাঁকে আপন করে নিয়েছিল। ভারতেন্দু রচিত কবিতা বা গান তখন জনসাধারণের মুখে মুখে চলত। একটি ঘটনা—একবার ভারতেন্দু একা কোথাও যাচ্ছিলেন। একাওয়ালা তাঁরই রচিত গান গেয়ে একা হাঁকিয়ে চলেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যিনি এ গান লিখেছেন তাঁকে তুমি জান? সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো, জানি, এ গান ভারতেন্দুজী লিখেছেন।

ভারতেন্দুর দেশাত্মবোধক কাব্যগুলি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম—যাতে পরাধীন ভারতের দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়—যাতে দেশবাসীকে তার অতীত গৌরব ও বর্তমান সমস্যাগুলি সামনে রেখে চেতাবণী দিয়েছেন। তৃতীয়—দেশবাসীর পরানুকরণপ্রীতি স্বভাবের জন্য তীক্ষ্মভাষায় ব্যঙ্গের দ্বারা সজাগ করে তুলে দেশোদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যের সংক্ষিপ্তাংশ যেমনঃ—

অংগ্রেজ রাজ সুখ সাজ সজে সব ভারী।
পৈ ধন বিদেশ চলি জাত ইহে
অতি খরাবী।
তাহু পৈ মহংগী, কাল রোগ বিস্তরী।
সবকে ওপর টিকস (ট্যাক্স) কী
.... আফত আই।।

উঠ উঠ ভৈয়া কে'ও হারো
অপ্‌নে রূপ সুমিরো রী
রাম যুধিষ্ঠির বিক্রম কী তুম
ঝট-পট সুরত করোরী—
দীনতা দূরি ধররী।

•

উঠ উঠ সব কমরন বান্ধো
শস্ত্র (অস্ত্র) শান ধরোরী।
[illegible] নিশান বজায় বকরে
আগেই পাব ধরোরী।
আলস তেঁ কছু কাম ন চলি হায়
সব কুছ তো বিনসৌরী।
[illegible] গয়ে ধন বল, রাজপাট সব কৌ
নাম বচেরী।
[illegible] নহী সুরীত করোরী।।

●

[illegible] ভারত নাথ
[illegible] জাগ অব জাগ

•

[illegible] তুলসীদাস, সুরদাস মীরা-[illegible] কবিদের গীতিকাব্যে মধুর ভক্তিভাবই [illegible] ভারতেন্দু উক্ত কবিদের দ্বারা [illegible] হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গীতি-[illegible] এই সুরদাসের সরলতা, তুলসীদাসের [illegible] মীরার তন্ময়তা ও বিদ্যাপতির প্রেম-[illegible] ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তাঁর [illegible] স্বকীয়তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। [illegible] তিনি নতুন পথের দিশারী। তাঁর [illegible] মানবজীবনের বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে [illegible]।

ভারতেন্দু সাধারণ জীবনের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন এবং তা অতি [illegible] দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। তাই [illegible]জীবনের সুখদুঃখ হাসি-কান্না তাঁর [illegible] জুড়ে ছিল। তাঁর রচিত গীতিকাব্যে সাধারণ জীবনের অজস্র ছবি দেখতে পাওয়া যায়। লোকগীতির নানা রাগ-রাগিণীকে আত্মসাৎ করে তিনি তাঁর সাধারণকে নিয়ে লেখা গীতিকাব্যে আরোপ করেছিলেন। সামাজিক কুনীতি, অবিচার ও অধোগতি নিয়ে তিনি অনেক গীতিকাব্য রচনা করেছেন যার প্রয়োজন আজো ফুরিয়ে যায়নি।

ভারতেন্দুর আগে ইন্সাউল্লা খাঁ লিখিত 'রাণী কেতকী' 'চুরামী বৈধরোর বার্তা' 'রাণী সারন্ধা' ইত্যাদি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। কিন্তু সুবিন্যস্ত ভাবে উপন্যাস ভারতেন্দুই প্রথম আরম্ভ করেছিলেন পাশ্চাত্য লেখার রীতি তথা বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে তিনি হিন্দী সাহিত্যে যথার্থ এবং সুলিখিত উপন্যাসের অভাব বোধ করেছিলেন। তারপর নিজেই সেই দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অকাল মৃত্যুর শিকার হয়ে তিনি সে কাজ সুসম্পন্ন করে যেতে পারেন নি।

ভারতেন্দু তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক সব ক্ষেত্রেই হাত বাড়িয়েছিলেন। জনচেতনা জাগিয়ে তুলতে নাটকের মত তিনি উপন্যাসেও ঐ একই রীতি অনুসরণ করেছেন। উপন্যাসের ভাষা সহজ, সরল, সুন্দর।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজ সিংহ' উপন্যাসটি ভারতেন্দু অনুবাদ করতে আরম্ভ করে-ছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। 'রামলীলা' একটি গদ্য-পদ্যময় উপন্যাস, যা ভারতেন্দু সহজ চলতি ভাষায় অযোধ্যা কাণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'হম্মীরহঠ' এই কাহিনীর মাত্র কটি পরিচ্ছেদ লেখা হয়। 'কুছ আপবীতী কুছ জগবীতী' একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস। 'মদালসোপাখ্যান' উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া গেছে যদিও সমালোচকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তেমনি [illegible] আউর সাবিত্রী চরিত্র' সম্বন্ধেও সমা-লোচকরা এক মত নন।

'শীলাবতী আউর চন্দ্রপ্রভা পূর্ণ প্রকাশ' উপন্যাস ভারতেন্দুর লেখা বলা হয়। 'সজ্জন বিলাস' প্রেস থেকে প্রকাশিত এই উপন্যাসে ভারতেন্দুর নাম আছে লেখক হিসাবে। মূল মরাঠী থেকে অনূদিত এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল সামাজিক। এতে বালক-বালিকাদের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একটি বৃদ্ধের একটি নব-যুবতীকে বিয়ে করার ইচ্ছে নিয়ে এই উপন্যাসে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের বিবাহ করা সম্ভব হয়নি। সমাজ সংস্করণের প্রগতিশীল চিন্তাযুক্ত এটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

লেখক হিসাবে ভারতেন্দুর কিছু বিরূপ সমালোচনাও হয়ে থাকে। যেমন তিনি হিন্দী ভাষার উন্নতি এবং স্থির রূপ দান করলেও বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষাকে যে গঠনমূলক স্থায়ী রূপ দিয়ে গেছেন, তিনি ঠিক ততটা সার্থকরূপে দিয়ে যেতে পারেননি। তখনো হিন্দী ভাষায় কিছুটা শিথিলতা থেকে গিয়েছিল। 'ভারত জননী' নাটকে তাঁর কোন কোন অংশ রাজভক্তিদোষেদুষ্ট বলা হয়। রীতিযুগের কবিদের অনুকরণে তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু কবিতায় শৃঙ্গার রস থাকায় তিনি কোন কোন সমালোচকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর স্বল্পকালীন একক মহান অবদানের তুলনায় ওসব অনুযোগ নগণ্য, তুচ্ছ। বরং অন্নদাশঙ্করের ভাষায় বলা যায় হিন্দী সাহিত্য জগতে 'তাঁর পরেই প্লাবন।'

পলাতক

ছেলেটার হাত ফসকে বেলুনটা উড়ে যায়। 'আমার বেলুন' কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চা ছেলেটা ছুটতে থাকে। রতন ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে ওপরে ওঠা বেলুনটার দিকে তাকায় বিষাদময় দৃষ্টিতে। এক সময় আকাশের গভীরতায় হারিয়ে যায় বেলুন।

বহু বছর বাদে অফিস ছুটির পর রতন ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা অজ্ঞাতসারে শিকারী কুকুরের মত তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে পুরনো পাড়ায় এল। অজ্ঞাতসারে কেননা অফিস ছুটির পর নিয়মিতভাবে সে বাড়ি ফিরে যায়। একমাত্র সন্তান বিলুকে কোলে নিয়ে বাড়ির সামনে ছোট্ট উঠোনে পায়চারী করে। মাঝে মাঝে বিলুকে বুকে চেপে মনে মনে একটা গোপন ইচ্ছার কথা ভাবে। স্ত্রীর ডাকাডাকিতে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকায়। মনে হয় অচেনা কেউ একজন তার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখে। বাচ্চা একটি ছেলে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে ছটফট করে ওঠে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গাঢ় অন্ধকারে সে ব্যাকুলভাবে বিলুকে দুহাতে বাড়িয়ে খোঁজে।

শোভাবাজার স্ট্রিট ধরে রতন হাঁটতে থাকে। দু' পাশের দোকানে উজ্জ্বল আলো ঝকঝক করছে। এই সেই বিখ্যাত মার্বেল পাথরের বাড়ি। বাড়ির সামনে প্রশস্ত লন। এক সময়ে এই বাড়ির ছেলেরা তার সঙ্গে পড়ত। ওদের গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। একজনের নাম ছিল লালটু। মনে পড়ে এক-দিন স্কুল ছুটির পর লালটুর সঙ্গে ওদের

বাড় এসেছিল। লালটু আর সে দুজনেরই ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়ার নেশা ছিল। ফলে তাদের দুজনের মধ্যে ভাব হতে বেশি দেরী হয়নি। লালটুর আলাদা ঘর। ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় সেই ঘর কেমন রহস্যময় মায়াপুরী মনে হয়েছিল। লালটুর জন্যে এক প্লেট সন্দেশ রেখে গিয়েছিল চাকর। সে আর লালটু ভাগাভাগি করে খেয়েছিল।

রতন দরোয়ানের প্রশ্নে ভীষণ লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। ছিঃ ওভাবে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। এতদিন পরে লালটু তাকে দেখলেও চিনতে পারবে না। আর চিনলেও কথা বলত কিনা সন্দেহ। কেননা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম কমপ্লেকস তৈরী হয়। কে আর মনে রাখে কৈশোরের স্বপ্নময় নিষ্পাপ দিনগুলির কথা। রতন বাঁ দিকে ধীরেন কেবিনের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। একটি হাসিখুশি চেহারার যুবক কাউণ্টারে বসে। এখান থেকে বাবা মাঝে মাঝে ভেজি-টেবিল চপ কিনতেন। সে বাবার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নানারকম প্রশ্ন করত। না, দুপাশের দোকানগুলি ঠিক আগের মত নেই। উড়েদের তেলেভাজার দোকান......এক পয়সায় দুটো ফুলুরি, আর এক পয়সায় দুটো বেগুনি, বাকি দু পয়সার মুড়ি......। ঐ বাড়িটার দোতলায় সহপাঠী দিলীপ থাকত। বেঁটে গাট্টাগোট্টা চেহারা। ভাল ফুটবল খেলত। রোজ ভোরবেলা ডাকত দিলীপ ঃ রতন, এই রতন। কুমারটুলী পার্কে ফুটবল খেলা। সিঁড়িতে আবছায়া আলো; ফলে রতন অতি সন্তর্পণে ওপরে উঠতে থাকে। 'কাকে চাই?' পাতলা ছিপ-ছিপে একটি মেয়ে। রতন হতভম্বের মত একমুহূর্ত মেয়েটির মুখ দেখল। কে মেয়েটি? দিলীপের ছোট বোন কী? মেয়েটির কণ্ঠস্বরে এবার স্পষ্ট বিরক্তি।

—কী বললেন? না, ঐ নামে কেউ এখানে থাকে না। দড়াম করে রতনের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়।

মানুষের দীর্ঘ ছায়া রাস্তায় ফুটপাতে। রতন সাবধানে পা ফেলে এগোয়। এই বিশাল শহরে দিলীপ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ডানদিকে গলির ভিতর ঢুকল সে। আঃ একটা পরিচিত গন্ধ। রতন এদিক-ওদিক তাকায়। কোন পরিচিত চিহ্ন নেই। সব কেমন পাল্টে গেছে। তবু মনে হয় সব তার চেনা। গুদামের সামনে লরি দাঁড়িয়ে। মসলার গন্ধ। এরপর কাপড়ের কল। দড়ির খাটিয়ায় বসে সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর দেহাতী মজুররা গান করছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে এল গঙ্গার বুক থেকে।

বাড়ির ভিতর ঢুকতে গিয়ে রতন অজানা এক অনুভূতিতে কেঁপে উঠল। জলতরঙ্গের মত স্মৃতি...আল্লাহো আকবর... বন্দেমাতরম...কালীবাবু বিশাল চাতালে মালকোঁচা মেরে লাঠি হাতে বনবন করে ঘুরিয়ে হাস্যকর আস্ফালন...জানালা কপাট বন্ধ...[illegible]

রাত্রি...। প্রকাণ্ড লোহার গেট খোলা। তিন-তলা বাড়ি। ছত্রিশটা ফ্ল্যাট। দোতলার কোণের দিকে ফ্ল্যাটে তারা থাকত। দুখানা শোবার ঘর। লম্বা টানা বারান্দা। রান্নাঘর বাথরুম আলাদা। প্রশস্ত জানালা দিয়ে গঙ্গার হাওয়া হু হু করে ঘরে ঢুকতো। এখন রাত প্রায় আটটা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে রতন। তিনতলায় রেলিংয়ে বুক চেপে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। একবার চোখাচোখি হ'ল। সম্পূর্ণ অপরিচিতা। মেয়েটির মুখের আদল অনেকটা সাধনার মত। ছোটবেলার খেলার সঙ্গিনী সাধনা।

বন্ধ দরোজার সামনে রতন দাঁড়াল। বুকের ভিতর শির-শির করছে। কড়া নাড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে দরোজা সামান্য ফাঁক করে একজন প্রৌঢ় মুখ বের করলেন।

—কাকে চাই?

—সুরজিত সরকারকে। আমার মামাতো ভাই।

—এখানে ওনামে কেউ থাকে না।

—সেকি। রতন বিমূঢ় দৃষ্টিতে ভদ্র-লোকের দিকে তাকাল, আপনি কতদিন হল ভাড়া নিয়েছেন?

—কেন বলুন তো? ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে ওঠে, কোত্থেকে আস-ছেন আপনি?

রতন সামান্য ঘাবড়ে যায়, মানে...অনেক বছর আগে এই ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম ...আমরা উঠে যাওয়ার পর মামা ভাড়া নেন।

ভদ্রলোক অস্ফুটস্বরে কী যেন বললেন। তারপর সশব্দে দরোজা বন্ধ হোল। রতন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। কবে উঠে গেল সুরজিত দা? একটু এগিয়ে যায় সে। পাশের ফ্ল্যাটে দুলালরা থাকত। দরোজা বন্ধ। একবার দেখবে নাকি, এতদিনে জোৎস্নার বিয়ে-থিয়ে হয়ে বাচ্চা কাচ্চা...। উল্টোদিকে মাঝের ফ্ল্যাটে সিন্টুরা থাকত। সিন্টুর দাদা হরি ওকে খুব মেরেছিল। চোখের ওপর ঘুষি। আজ মনে নেই কী জন্যে মেরেছিল হরি। একবার দেখলে হয় সিন্টুরা আছে কিনা। পরক্ষণেই রতন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। যদি অপরিচিত কেউ দরোজা সামান্য ফাঁক করে বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কাকে চাই?

সিঁড়ি বেয়ে রতন তিনতলায় উঠল। চারিদিকে পরিচিত গন্ধ। বিবর্ণ রেলিং। বহু ব্যবহারে জীর্ণ। সাধনার ভাই ধ্রুব নাকি? প্রায় ডেকে উঠেছিল ধ্রুবের নাম ধরে। একে সে চেনে না। এর চোখমুখে সন্দেহের ছায়া। তাড়াতাড়ি রতন ছাদে উঠে যায়। কালো আকাশে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারা। দুদিকে দুটো বড় ছাদ। সে অন্ধকার ছাদে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। একটা ছাদে মেয়েরা খেলত। অন্য ছাদে তারা রবারের বল নিয়ে ছুটোছুটি করত। সুধাংশু দলের ক্যাপ্টেন। সুধাংশুরাও কী এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে?

বুক সমান উঁচু ছাদ। রতন ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল। এখান থেকে গোটা বাড়িটার চেহারা লক্ষ্য করা যায়। দোতলা তিনতলায় কোন কোন ফ্ল্যাটের সামনে বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে। কেউ একা গালে হাত দিয়ে। কোথায়ও দু' তিনজন মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে হাতমুখ নেড়ে...রেডিওতে নাটক, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সম্মিলিত শব্দ...। সে আর ঝণ্টু একসঙ্গে স্কুলে যেত। এক ক্লাসে পড়ত। একসঙ্গে কুমার-টুলী পার্কে গুলি খেলা, গঙ্গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চান, বাড়ি ফিরে রোজ কাকার হাতে প্রচণ্ড মার...ঝণ্টুর নাক দিয়ে কফ পড়ত, ওর দু'পায়ে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, মাসীমা খাইয়ে দিতেন ঝণ্টুকে, তখন হাসি চেপে রাখা দায় হোত...। ওইদিকের তিনতলার কোণের ফ্ল্যাট ঝণ্টুদের। ঝণ্টুর বড়দা অনিলদা ছিলেন আমেরিকান ফার্মের বড় অফিসার। সুন্দর লাল নীল সবুজ রঙের গুলি এনে দিতেন ঝণ্টুকে। সে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কখনও খেয়াল হলে দু' একটা গুলি ঝণ্টু দিত। ঝণ্টুরাও কী এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে?

খোলা দরজা। রতন একবার সাহস করে উঁকি দিল। বারান্দায় কেউ নেই। সে মৃদু-স্বরে ঝণ্টুর নাম ধরে ডাক দিল। কোন সাড়া-শব্দ নেই। ব্যাপারটা কী? এবার সে জোরগলায় ডেকে উঠল। এক পাঞ্জাবী ভদ্র-লোক বেরিয়ে এলেন। রতন হঠাৎ ছুটে নীচে নেমে এল। ভয় পেল সে। না, এ বাড়িতে এমন কেউ নেই যাকে সে চিনতে পারে। সবাই চলে গেছে—এ কী করে সম্ভব! সে কী ভুল করে অন্য কোথায়ও চলে এসেছে?

—রতন!

কে তুমি? গেটের কাছে আবছায়া আলোয় শীতলকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হোল না রতনের। শীতলের মুখে হাসি। সুসজ্জিত পোশাক পরনে। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। সে শীতলকে আলিঙ্গন করতে গিয়েও থমকে যায়। শীতলের দু'হাত জড়িয়ে সহসা আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার।

—কেমন আছিস রতন? শীতলের মুখে মৃদু হাসি, উঃ কতদিন পর দেখা!

—অনেক দিন। অনেক বছর। রতন আহত কণ্ঠে বলে, আমি ফিরে যাচ্ছিলাম। কেউ আমাকে চেনে না। সব নতুন মুখ। সুধাংশু ঝণ্টু নিত্য সুনীল ধ্রুব কালা—কেউ কী এ বাড়িতে থাকে না? কোথায় গেল সব?

ওর কথা বলতে বলতে গঙ্গার ধারে এল। উজ্জ্বল আলো গঙ্গার পারে। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াল ওরা। শীতল একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল। রতন কাঁপতে কাঁপতে সিগারেট ধরায়।

শীতল বলল, কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলি রতন?

—তোদের সবার সঙ্গে। রতন লাজুকে সুরে বলে, জানিস, ঝণ্টু আমাকে প্রথম বিড়ি খেতে শিখিয়েছিল। উঃ বাড়ি ফিরে ধরা পড়ার পর কী প্রচণ্ড মার খেয়েছিলাম! ঝণ্টু কোথায় থাকে এখন?

—যাদবপুর পার্কে। অনিন্দ্য বাড়ি করেছে সেখানে। তোরা তো যাদবপুরে আছিস, ওদিকটা শুনছি আজকাল বোমা-বাজী গণ্ডগোল...হ্যাঁরে রতন, বিয়ে করেছিস?

—হুঁ। তুই?

দূর! বিয়ে-ফিয়ের কথা ভাবিনি। অসুবিধে কীসের...পয়সা হলে 'ইয়ে' জুটে যায়। খাও-দাও স্ফূর্তি কর। শীতল হো হো করে হেসে উঠল।

রতন লক্ষ্য করল শীতলের দু' চোখের নীচে কালো দাগ। চোখের রং কেমন হলদেটে। ওর কথাবার্তার ঢং ভাল লাগল না। এক সময় শীতলের চোখমুখে কচি লাবণ্য ছিল। এখন মুখের চেহারায় সে পেলবতা নেই। বরং অত্যাচারের চিহ্ন প্রকট।

—কী দেখছিস শালা? শীতল দু'চোখ কুঁচকে বলে, অনেকদিন পর দেখা—চল একটু মাল খেয়ে আসি। খাওয়াবি?

—তুই ওসব বদনেশা কবে থেকে শুরু করলি?

—ভাগ শালা! জ্ঞান দিস না। খাওয়াবি কিনা বল।

রতন কোন জবাব দিল না। আহত দৃষ্টিতে শীতলকে দেখতে থাকে। এখন আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবুও ওদের কথা জানতে ইচ্ছে করে। এতদিন পর ওদের দেখবার জন্যে কেন যে ব্যাকুল হয়ে উঠল, জানে না সে। কীসের আকাঙ্ক্ষায় এখানে এসেছে? কোন্ প্রত্যাশায়?

—সুধাংশু কোথায়?

—ও শালা দিব্যি আছে। গার্ডের চাকুরী করছে। রামপুরহাটে।

—নিত্য?

—দমদমে থাকে। কী করছে জানি না।

——কালা?

—পুলিশে কাজ করছে।

একটা মেয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি শীতলকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমার সঙ্গে একটু কাশীমিত্র ঘাটে যাবেন শীতলদা? দু'-একটা জিনিস কিনবো।

—কী খাওয়াবে বল? শীতল মেয়েটির গা ঘেঁষে দাঁড়াল, সেদিন তোমার জন্যে টিকিট কেটে...চল রতন, হাঁটতে হাঁটতে গল্প করা যাবে। একে তুই চিনবি না। ওর নাম মিনতি। নতুন ভাড়াটে—মিন্টুদের ফ্ল্যাটটায় এসেছে।

—তুই যা শীতল। রাত হয়ে গেছে—এবার আমাকে ফিরতে হবে।

—চল মিনতি। শীতল রতনের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসল। মেয়েটি অস্ফুটস্বরে কী যেন বলল। শীতল বেশ জোরে হেসে উঠল।

রতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। গঙ্গার বুকে টিমটিম করে অসংখ্য আলো জ্বলছে। ঢেউ-এর শব্দ ছলাৎ ছলাৎ। ঠাণ্ডা বাতাস। দূরে ভোঁ ভোঁ শব্দে বাঁশি বাজিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছে। রাস্তায় প্রচণ্ডবেগে লরি ছুটছে। রিকশার ঠংঠং শব্দ। 'বেলফুল চাই' বলে একটা লোক ওর কাছে এসে দাঁড়াল। সে সদ্য ঘুম-থেকে-জেগে-ওঠা দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল।

বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে রতন একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। ভৌতিক নিস্তব্ধতায় গলিটা ধুঁকছে। কিছুক্ষণ আগে সেই ছেলেটা 'আমার বেলুন' কাঁদতে কাঁদতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সে হাঁটতে হাঁটতে সহসা টের পেল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে বুকটা। পায়ের নীচে মাটি ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টা করল নিজেকে সামলাতে। শেষ পর্যন্ত পারল না রতন। দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অঙ্গনা
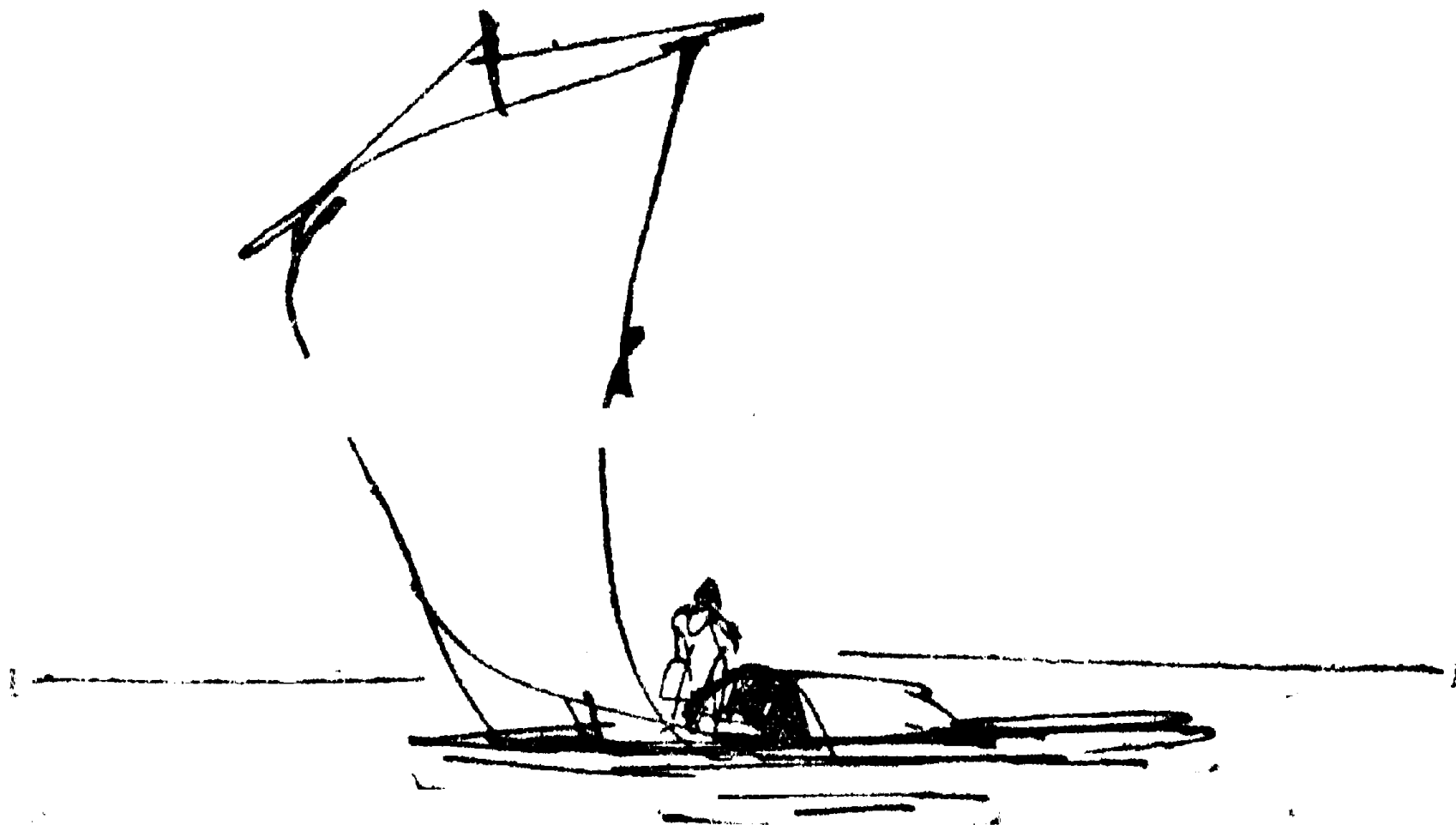
সম-অধিকার সম-মর্যাদা

সমানাধিকারের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমেরিকার নারীসমাজ প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়েছেন। সমানাধিকারে তাঁরা পুরুষের সমমর্যাদা দাবী করেছেন। মার্কিন সেনেটে আজো তাঁদের এই স্বীকৃতি নেই। দীর্ঘদিন পরে এই অধিকার স্বীকৃতির দাবীতে তাঁরা জোর আওয়াজ তুলেছেন। আধুনিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি আমেরিকার কাছে এ জিনিস প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত এমনি একটা ঘটনা সেদেশের নারীসমাজের যথার্থ অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

পুরনো ঘটনার পোস্টমর্টেম না করেও এই সাম্প্রতিক ঘটনা থেকেই অনুমান করা চলে যে, নারীর সমানাধিকার অর্জন সেখানে সহজপথে আসেনি। এজন্য তাঁদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। আবেদন-নিবেদনে কাজ না হওয়ায় বাধ্য হয়েই তাঁরা আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছেন। অনেক দুঃখকষ্ট এবং উপহাস-নির্যাতন সহ্য করেছেন। তবে স্বীকৃতি হয়েছে সমানাধিকার। অর্থাৎ ভোটাধিকার। প্রত্যেক নারী দেশের নাগরিক। অথচ সকলের ভোটাধিকার নেই। [illegible] বিক্ষোভের ফলে সকল নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হলো। কিন্তু সমানাধিকার অস্বীকৃতই রয়ে গেল। এবার সেই সমানাধিকার প্রসারণের জন্যই আমেরিকান মহিলারা বিক্ষুব্ধ এবং গ্রহণ করেছেন আন্দোলনের পথ।

শুধু আমেরিকা নয় ইউরোপের অনেক দেশেই নারীসমাজকে সমানাধিকারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। বিক্ষোভ প্রকাশ করতে হয়েছে। অবশেষে নেমে আসতে হয়েছে আন্দোলনের পাকা সড়কে। দুঃখের সঙ্গে মানতে হয় যে, সভ্যতাগর্বী ব্রিটেনও এই তালিকা থেকে বাদ যায় নি। এজন্য তাঁদের অনেক উপহাস-পরিহাস সহ্য করতে হয়েছে। সমসাময়িক কার্টুনিস্টরা অনবদ্য ভঙ্গীতে মহিলাদের সমানাধিকারের দাবীকে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু সঠিক পথ থেকে কোনোকিছুই তাঁদের বিচ্যুত করতে পারেনি। সমস্ত হাসা-পরিহাস উপেক্ষা করে এবং দুঃখকষ্ট জয় করে তাঁরা সংকল্পে অটল ছিলেন। অবশেষে রক্ষণশীলতার ঐতিহ্যপূর্ণ ব্রিটেনকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে তাঁদের দাবীকে। নারীর সমানাধিকার নিয়ে আজ সে দেশ গর্ব প্রকাশ করে। অতীত সংগ্রামকে ম্লান করে দিয়ে নিজেদের বাহাদুরীর জাহির করতে চায়।

পরবর্তীকালে পৃথিবীর অবস্থা অনেক বদলে গেছে। বলা চলে, আমূলে। তবুও এখানেই ইতি বলা চলে না। ভবিষ্যতের সূতিকাগারে পৃথিবীর নবরূপের যজ্ঞ চলেছে দেশে দেশে। তাই আজকের পরিবর্তন অচিরেই মূলোৎপাটিত হবে এমন সম্ভাবনা অমূলক নয়। খসে পড়া বা জীর্ণ পলেস্তারার উপর চূনকামে অনেকেই গররাজী। ভবিষ্যতের গর্ভে যাই থাকুক না কেন এই যে পরিবর্তনের স্রোতে আমরা ভাসছি তাও কম নয়। আর এই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েও ব্রিটেন কিন্তু মহিলা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন দেখতে ভরসা পায় না। হয়তো কোন এক মুহূর্তে এরকম কল্পনায়ও তাঁরা শিউরে ওঠে। প্রধানমন্ত্রিত্ব বাদ দিলে পররাষ্ট্র বা অর্থ-দপ্তরেও সেদেশে এতদিনের ঐতিহ্যে কোন মহিলাকে স্থান দেয়নি। বিদেশে দূতিয়ালীর ক্ষেত্রেও সে নিজের মহিলাদের সযত্নে সামলে রেখেছে। তাই দেখা যায়, সাধারণ কোন দপ্তরে মহিলা মন্ত্রী উপযুক্ত হলেই সেটাকে তাঁরা খবর হিসেবে গুরুত্ব দেন যথেষ্ট। এটুকু উপঢৌকন দিয়ে তাঁরা মহিলাদের বশে রাখতে চান। কিন্তু তাঁদের সামগ্রিক কর্মধারায় নারীসমাজের ওপর অনাস্থার ভাবই বেশি। নিশ্চয়ই আমেরিকান নারীসমাজের মতো ওঁরাও অচিরেই বিক্ষোভে ফেটে পড়বেন। সেদিন নিশ্চয়ই আর দেরী নেই।

তবু আমেরিকার উদারতা আছে। মহিলা রাষ্ট্রদূতের ব্যাপারে ওঁরা সংস্কারমুক্ত কিঞ্চিৎ। রাষ্ট্রসংঘে এই পর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিনিধি আছে সেদেশের একাধিক। দু'একটি দেশে মহিলা রাষ্ট্রদূতও আছে। কিন্তু আমেরিকান রাষ্ট্রপতি পদে মহিলার কথা আজো অচিন্তনীয়। সেই আগল যে কবে ভাঙবে তাও নিশ্চিত বলা যায় না। তবে আমেরিকান নারীসমাজের আন্দোলন আজ নতুন পথে পা বাড়িয়েছে। সমানাধিকারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেই সর্বশেষ সুরক্ষিত দুর্গটি অবহেলাক্রমে জয় করে নিতে হবে। তাই একেবারে নিরাশ্বাস হওয়ার কোন কারণ নেই।

ব্রিটেন-আমেরিকা সভ্যদেশ। দীর্ঘকাল এই দুই দেশ পৃথিবীর অনেক জাতিকে লৌহনিগড়ে বেঁধে রেখেছিল। কালের ভ্রূকুটিতে সেই মরচে ধরা শেকড় ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা সম্পদ আসছে ঘর আলো করে। আফ্রিকার দেশে দেশে এই আলোর বন্যা। লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই ওঁদের অস্তিত্ব। তাই সদ্যোমুক্ত এসব দেশ নারীর অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে শ্রদ্ধায়। কেনিয়া এবং আরো কয়েকটি দেশ বহির্দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বজায় রাখছে মহিলা রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে। এভাবেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ওঁদের যোগ্যতা স্বীকৃতি পাচ্ছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর প্রথম চোটেই এমন দুঃসাহস একমাত্র আমাদের দেশ ছাড়া আর কেউ দেখাতে পেরেছে বলে তো মনে পড়ছে না। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত রুশদেশে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। তারপর ব্রিটেনে হাই-কমিশনার। সমগ্র বিশ্ব তাঁর যোগ্যতাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভানেত্রীর আসনে বসিয়ে। এই ধারা আজো অক্ষুন্ন আছে। শ্রীমতী পন্ডিতের পথ ধরে এগিয়ে এসেছেন শ্রীমতী চোনিরা বেলিয়াপ্পা মুথাম্মা। সম্প্রতি তিনি হাঙ্গেরীতে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয় যে, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী হলেন রাজনৈতিক। অনেক দেশেই এরকম রাজনৈতিকদের নিযুক্ত করা হয় রাষ্ট্রদূত পদে। যেমন আমাদের দেশে নিযুক্ত ছিলেন স্পেন এবং সুইডেনে রাষ্ট্রদূতদ্বয় যথাক্রমে ডঃ জোহানা নেস্টর এবং আলভা মিরডল। কিন্তু শ্রীমতী চোনিরা বেলিয়াপ্পা হলেন কেরিয়র ডিপ্লোম্যাট। ফরেন সার্ভিসের পথ ধরে তিনি এসেছেন। ট্রেনিং শেষে প্যারিস, রেঙ্গুন এবং লন্ডনের দূতাবাসে যথাক্রমে থার্ড সেকেন্ড এবং ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। তারপর এই পদে তাঁর নিযুক্তিকরণ। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন বিশ্বের বেশ কয়েকটি দূতাবাসে আমাদের মেয়েরা রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হবে।

মেয়েদের অধিকার বিস্তৃতির সুযোগদানে এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। এই মহাদেশেই দুটি দেশে মহিলা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়ে দেশের সর্বোচ্চ শাসনকার্য চালাচ্ছেন। ভারত এবং সিংহল এক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দর নায়েক দুটি সমস্যাসঙ্কুল দেশে অদ্ভুত কুশলতায় সফল হয়েছেন। এই দুটি দেশ ছাড়া ইস্রায়েলে আছেন মহিলা প্রধানমন্ত্রী। শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার। আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। এছাড়াও আর একটি দেশে মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সম্ভাবনা ছিল। পাকিস্তানের মিস ফাতিমা জিন্না জঙ্গীশাসক আয়ুবের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হন। কিন্তু মুসলমান নারীসমাজের পক্ষে এ ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বোরখার অন্তরালে একদিন যাঁদের দূরে ঠেলা হয়েছিল আজ বোরখা ছিঁড়ে তাঁরাই এগিয়ে আসছেন নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে। এর মধ্যে সেই শুভ ইঙ্গিতই নিহিত আছে।

বিশ্ব জুড়ে আজ নারী জাগরণের জয়গান। অধিকার বঞ্চিত হয়ে আজ আর কেউ অবহেলিতের জীবন যাপন করতে রাজী নয়। এর বিরুদ্ধে সর্বত্র লড়তে হবে। শুধু আমেরিকা নয়। যেখানে সীমানা চিহ্নিতকরণের অপচেষ্টা হবে সেখানেই লড়াই।

কিন্তু বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা। খোদ আমাদের দেশেরই একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য বিবৃতি মারফৎ নারী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। এজন্য আইন প্রণয়ন করতেও তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থাৎ নারীকে তিনি আবার যবনিকার ওপারে ঠেলে দিতে চেয়েছেন। সেই রান্নাঘর আর সূতিকাগার। আজকের নারী প্রগতির দিনে এহেন দুর্গতির পঙ্কিলতায় নিক্ষেপ করতে চান যাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আমাদের জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। এই মানসিকতাকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে হবে। বিলম্ব হলেই তা শাখা-প্রশাখা [illegible] করতে পারে। শিকড় ও রস [illegible] চেষ্টা করবে। তাই আমাদের [illegible] চলবে।

আমেরিকান নারীসমাজ লড়ছে [illegible] কার বিস্তৃতির জন্য আর আমরা [illegible] অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য এবং [illegible] কারের মাধ্যমে সাফল্যের শীর্ষে [illegible] জন্য।

—প্রম

পরিবার ভাঙছে কে

পরিবার সম্বন্ধে আজ একটা প্রশ্ন সকলের মধ্যেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—আধুনিক পরিবার ভেঙে যাচ্ছে কেন? এ প্রশ্ন সচেতন মনকে নাড়া না দিলেও অবচেতন মনে সব সময়ই একটা ঢেউ সৃষ্টি করে। অতীতের পরিবারের রূপ ছিল ভিন্ন, এখনকার পরিবারের রূপ হয়েছে অন্য। তখন স্বামীর কাছে স্ত্রী ডার্লিং ছিল না। তখন শাশুড়ী বৌকে রান্না করে অফিসের ভাত দিত না, বৌ-ই সেবা করত শাশুড়ীর। আসল কথা তখন সংসারের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া এবং আন্তরিকতা বজায় রেখে বাস করার প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু এখন সে বোঝাপড়া শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে তো দূরের কথা, স্বামীর সঙ্গেও নেই।

আধুনিক পরিবারগুলো ভেঙে পড়ার কারণ একটু তলিয়ে দেখলেই পাওয়া যায়। অন্যতম কারণ হল মানিয়ে চলার অক্ষমতা। আজকাল মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু মা-বউ কর্মক্ষেত্রে নেমেছেন। আর্থিক সংকটই এর প্রধান কারণ। তবে এটাও ঠিক যে, সব মা অথবা সব বউ আজ আর্থিক সংকটের জন্যে কর্মক্ষেত্রে নামেন নি। নারী-কর্মী তিন রকমের—অভাবগ্রস্ত, অভ্যাসগ্রস্ত এবং ফ্যাশানগ্রস্ত। অভাবের সংসারে মায়েরা কাজে নামেন ছেলেমেয়ের মুখে একটু হাসি ফোটাতে, তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে। আবার অনেক মহিলা আছেন যাঁরা আইবুড়ো বেলায় বাপের বাড়ী থেকে চাকরী করে এসেছেন বলে বিয়ের পর বিত্তশালী স্বামীর ঘরে গিয়েও চাকরী ছাড়তে নারাজ। আবার অনেকে ভাবেন লেখাপড়া শিখে টেলিফোন ভবনে একটা চাকরী না পেলে বুঝি মানই থাকে না। বাড়ীতে এদিকে তিন মাসের ছেলে পরিচারিকার হাতে ঠিক সময় মত দুধ পেল কিনা সে খেয়াল তাঁদের থাকে না।

বর্তমান যুগে পরিবারগুলো যে স্থায়ীত্ব পাচ্ছে না তার আর একটা কারণ হল এযুগের মেয়েরা স্বাবলম্বী স্বাধীন। আগের যুগের স্ত্রীরা স্বামীর অধীনে থাকতেই ভালবাসতেন, তাতে তাঁদের মানসিক অশান্তি তো ছিলই না বরং স্বামীর কাছে তাঁদের একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। তাঁরা সেদিন শিক্ষিতা আধুনিকা হয়ে ওঠেন নি বটে তবু তাঁরা ছিলেন স্ব-বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী। সেকালের স্ত্রীরা অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করেও পরিবারের প্রধানা হয়ে পরিবারের স্থায়ীত্ব রক্ষা করতেন। কিন্তু আজকের স্ত্রীরা নিজেকে ছাড়িয়ে কাউকে উচ্চাধিকার দিতে নারাজ। তাঁরা ভাবেন—যেহেতু তাঁরা চাকরী করে সংসারে টাকা আনছেন সেহেতু তাঁদের আর মানিয়ে চলার প্রয়োজন নেই, অসুবিধা হলেই তাঁরা যখন-তখন নিজেদের আলাদাভাবে সরিয়ে নিতে পারেন। এদিকে স্বামীও অপমানের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরেন। তিনি শুধু নীরব দর্শকের মত দেখেন, স্ত্রী তাঁর ছুটির দিনে বড় সাহেবের বাড়ী ককটেল পার্টিতে অথবা কোন অফিসের পার্টিতে সাজছেন, আমোদ-আহ্লাদ করছেন। স্বামীরও যে স্ত্রীর সঙ্গে নেমন্তন্ন হয় না এমন নয়, কিন্তু স্ত্রীর প্রাধান্যই যেখানে বেশী সেখানে কোন স্বামী চাইবেন স্ত্রীর সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে বসে থাকতে?

আজকাল আমরা প্রায়ই আন্তর্জাতিক সহাবস্থানের কথা বলে থাকি। আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব রকম সামাজিক বিভেদ ভুলে বেঁচে থাকার এবং বাঁচতে দেবার নীতি অনুসরণ করতে চাইছি কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে আমরা প্রতি মুহূর্তে পরস্পরের কাছ থেকে যে দূরে সরে যাচ্ছি সে খেয়াল আমাদের নেই। শুধু স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ নয়, ভায়ে-ভায়ে, পিতা-পুত্রে, মাতা-পুত্রে ইত্যাদি প্রায় সমস্ত রকম আত্মীয়তার বন্ধন ছিঁড়ে আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জগৎ সৃষ্টি করে চলেছি। যে মেয়েরা পরিবারের সৌন্দর্য তারাই যদি আজ স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ে তাহলে সত্যিকারের সংসার বলে কি আর কিছু থাকবে? একান্নবর্তী পরিবার এখন অসংখ্য বিভক্ত পরিবারে এসে দাঁড়িয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল রেখে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অন্যদের সঙ্গে মেয়েরাও ছড়িয়ে পড়বে ঠিকই, তবে অকৃত্রিম সরলতা এবং হৃদয়ের পবিত্র প্রবৃত্তিগুলোকে বজায় রেখে। একে তো বেদ-পুরাণের আমল থেকেই মেয়ে[illegible] সংসার ভাঙার অপবাদ আছে, তার [illegible] আজও যদি আমরা তেমনিভাবে স[illegible] ভেঙে চলি, তাহলে সত্যিকারের স[illegible] মাধুর্য আর আমাদের থাকবে না[illegible] কিছু চিন্তা-ভাবনার পরেও মেয়ে[illegible] বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছ [illegible] ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে আলাদা [illegible] গড়তে।

সব স্ত্রীরই মনে রাখা প্রয়োজ[illegible] স্বামীকে ছাড়াও যেমন তার [illegible] আলাদা জগৎ আছে—সেটা [illegible] জীবনে একটি স্বাভাবিক সত্য, [illegible] তাকে ছাড়া স্বামীরও একটা আলাদা [illegible] আছে। সেখানে অনধিকার প্রবেশের [illegible] না করাই ভাল। কিন্তু আমরা [illegible] [illegible] না। [illegible] পর্যন্ত [illegible] [illegible] হয়ে সংসারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] অনেক [illegible] কারণ। পরিবারের [illegible] জন্য দায়ী। [illegible] একদিন [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] বিচ্ছেদের [illegible] পড়ে। [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] বিচ্ছেদের জন্য দায়ী।

জীবনের এই অশান্তি, এই [illegible] পরিণতি কোনদিনই ঘটবে না যদি [illegible] একটু সচেতন হয়। কারণ জীবনের [illegible] অবস্থার সঙ্গে পুরুষের চেয়ে [illegible] মানিয়ে চলতে পারে বেশী। [illegible] করতে পেলেই আসবে [illegible] সংসারে মান-অভিমানের পালা। [illegible] যদি আমরা আমাদের [illegible] হাসি মুখে মানিয়ে চলতে পারি [illegible] ছোট ছোট ঘটনা-দুর্ঘটনাগুলোকে [illegible] করে জীবনের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে [illegible] হাতে বধ করতে পারি তবেই আমরা নামগোত্রহীন ভাঙনের হাত থেকে [illegible] পারি। আর সে গুরুদায়িত্ব সমাজেরই।

—[illegible]

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

একই লোক ঢুকলাম শরীরের একটা খুঁতে। লোকটার ডান হাতের কড়ে আঙুলের একটা দাগ আছে —

আগের রাতে গাড়ির জানলায় লক্ষ্য করেছিলাম।

আজ পাইপ ধরাবার সময়ও দেখলাম।
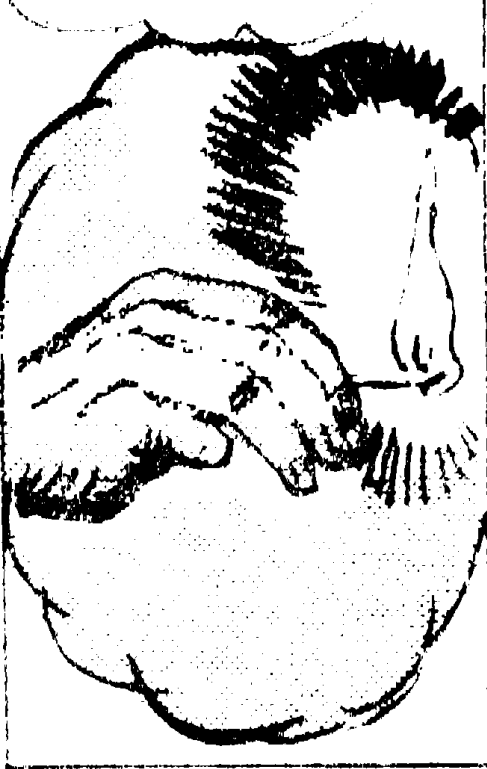
ট্যাক্সি ভাড়া করতে চাওয়ায় কোন দোষ নেই। তবু ঠিক যদি দেখে থাকে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। মানেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রতনলালজির বাড়িতে পৌঁছে পরাশর রামজীবনকে ছেড়ে দিতে চাইলেন।

আজ্ঞে। হতেও ত পারে। আমি বাইরেই থাকব।

রামজীবনের একটু অতি ভক্তি মনে হচ্ছে না? ওর সব কথা আমার বিশ্বাস হয়?

আগে হত না। ক্রমশঃ হচ্ছে।

রতনলালজি নিজেই নেমে আসেন অভ্যর্থনা করতে।

আসুন আসুন মিঃ ভর্মা! থানায় বলে এসেছিলাম। তবু আপনি আসবেন বলে ভরসা হচ্ছিল না।

বাইরের ঘরে গিয়ে বসবার পর ....

আমার এ বিপদে কোনো বন্ধু একটু খোঁজ নিতেও আসেনি।

একটা বিশেষ দরকারে আমাদের আসতে হল রতনলালজি। প্রথমে আপনার হাত দুটো টেবিলের ওপর একটু রাখবেন?

আমার দুটো হাত টেবিলের ওপর রাখব? এই বিশেষ দরকারে আপনি আমার কাছে ছুটে এসেছেন! আমার বিপদে ভরসা দিতে নয়?

প্রদর্শনী পরিক্রমা

সিমথসোনিয়ান আর্ট প্রোগ্রামের উদ্যোগে দিল্লীতে অধ্যাপক পল লিংগ্রেন যে প্রিন্টমেকিং ওয়ার্কশপ খুলেছিলেন তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রাফিক শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। সেখানকার শতাধিক শিল্পীদের কাজের একটি পরিচ্ছন্ন প্রদর্শনী ১০ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর আকাদমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দিল্লী, লক্ষ্মৌ, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আধুনিক শিল্পীদের কাজের এই প্রদর্শনীতে গ্রাফিক শিল্পের যে নমুনা পাওয়া গেল তাতে নিঃসন্দেহে কলকাতার শিল্পীদের কাজের প্রশংসা করতে হয় কারণ প্লেট তৈরীর কাজে এঁরা অনেকের চাইতে দক্ষতা অর্জন করেছেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ফোটোগ্রাফ প্রসেস ব্যবহার করেছেন। প্রদর্শনীর বেশীর ভাগ ছবিই একরঙা। অল্প কিছু রঙীন প্রিন্ট রাখা হয়। তবে এখানকার কাজের মধ্যে একরঙা ছবিগুলিই সাধারণত উৎকর্ষতা লাভ করেছে। নন-ফিগারেটিভ কাজের সংখ্যাই বেশী—সামান্য কিছু ফিগারেটিভ ঘেঁষা কাজ ছিল। শৈলেশ মিত্র লাল, শ্যামল দত্তরায় ও সুহাস রায়ের কাজে যথেষ্ট দক্ষতা দেখা গেল। শ্যামল দত্তরায় ও লালু শার দুটি নিসর্গ দৃশ্যের ওপর ভিত্তি করা অ্যাব-স্ট্রাকশন প্রশংসনীয়। হরেন দাসের গাছের প্যাটার্নটি চমৎকার—তবে পটভূমিকায় সুস্পষ্ট বড় ফটোগ্রাফ ঘেঁষা হওয়ায় প্রদর্শনীর একটি উৎকৃষ্ট ছবি বেশ খানিকটা ক্ষুন্ন হয়ে গেল। এছাড়া অমিতাভ ব্যানার্জি, অমিনা কর, সনৎ কর ও অশোক মিত্রের ছবিগুলিও উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইয়ের জ্যোতি ভট্ট এবং গুলাম শেখ এবং পাখি এবং পার্বত্য দৃশ্যের মোটিফ নিয়ে কাজ দুটি চোখে পড়ার মত। দিল্লীর প্রিয়া মুখার্জির চেরা আপেলের ছবি মার্কিনীর শিল্প আলোচনার বইয়ের পাতায় যেন দেখা গেছে মনে হল। পুনেন গাঙ্গুলীর একটি রিলিফ কম্পোজিশন মন্দ নয়। এছাড়া যতীন দাস, কৃষণ খান্না, মঞ্জুলা কৃষ্ণা, লক্ষ্মণ পাই প্রমুখ কয়েকজনের কাজ ভাল লাগল। আনন্দের কথা এই যে সমগ্র প্রদর্শনীর সাধারণ মান বেশ উঁচু রাখা হয়েছিল।

গত কয়েক বছর ধরে আর্ট এ্যান্ড সংস্থা শিশুদের একটি সুষ্ঠুভাবে শিল্প প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে আসছেন। ১৩ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত যত ছবি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল তার থেকে বাছাই করে ২৩৪খানি ছবির প্রদর্শনী করেন। ৫ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা ক্রেয়ন, পেন্সিল, প্যাস্টেল ও জলরঙের এই ছবি-গুলি বিষয় বৈচিত্র্য এবং রসের বৈচিত্র্যে দর্শকদের প্রীতি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। নিসর্গ দৃশ্য খেলাধুলো, চিড়িয়াখানা ভ্রমণ শহরের দৃশ্য ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে আঁকা ছবিগুলিতে শিশুদের সোজা-সুজি উপস্থাপনা ভঙ্গীর একটা সরল আবেদন মনকে মুগ্ধ করে।

২০ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর আকা-ডেমি অব ফাইন আর্টসে নীতিন বিশ্বাস, চন্দ্রশেখর আচার্য ও চণ্ডী পোদ্দার এই তিন তরুণ শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনী অনু-ষ্ঠিত হল। এর মধ্যে নীতিন বিশ্বাস ও চণ্ডী পোদ্দার তেল রঙে এবং চন্দ্রশেখর আচার্য জলরঙের ছবি এঁকেছেন। এঁদের কাজগুলি রিয়ালিস্টিক হলে অত্যন্ত অপরিণত। নীতিন বিশ্বাসের 'কার্ণিভাল' 'সার্কাস' 'বেদে' প্রভৃতি ছবির আবেদন রোমান্টিক, কমার্শিয়াল আর্টের অন্তরের নরম মলাটের বইয়ের পাতা থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। এরই তুলনায় চণ্ডী পোদ্দারের একখানি স্টিল লাইফ ভাল বলা যেতে পারে। শ্রীআচার্যের ফিগার স্টাডি স্কেচগুলি লাল কালো সবুজ হলদে ও নীলের রঙের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত প্যাটার্ন ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলা যায় না।

*

লক্ষ্মী দাস, নন্দা ডালমিয়া, তৃপতী বোস ও মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জি ২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর আকাডেমিতে যে স্কেচ ও পেন্টিং-এর প্রদর্শনী করলেন তাতেও বিশেষ উৎসাহজনক কাজ কিছু দেখা গেল না। এবারে বছরের লক্ষ্মী দাসও যেরকম রেখাসম্বল ক্ষিপ্র স্কেচ করেছেন অন্যান্য শিল্পীরাও তাঁর চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু উপস্থিত করেন নি। সব কাজেই একটা তাড়াহুড়োর ভাব পরিস্ফুট। মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জির মা ও ছেলের প্যাস্টেল স্কেচটি উল্লেখযোগ্য।

*

ক্যানভাস শিল্পীগোষ্ঠীর বারোজন শিল্পী ২৬খানি ছবি ও ভাস্কর্য ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত বিড়লা আকাডেমিতে প্রদর্শিত হল। [illegible] সকলেই তরুণ এবং গত কয়েক বছর ধরে যৌথ প্রদর্শনী করে আসছেন। [illegible] গোষ্ঠীর শিল্পী হলেও সবাই একরকম ছবি আঁকেন না। সবরকম আধুনিক রীতিতেই চর্চা করে থাকেন। এবারের কাজে বক্তব্যের গভীরতা বা চমকপ্রদ উপস্থাপনা না থাকলেও [illegible] হলেও সুগঠিত কাজ।

*

ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল বিড়লা আকাদমিতে ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁদের সদস্যদের তোলা ছবি ও রঙীন স্লাইডের প্রদর্শনী করেন। সবশুদ্ধ প্রায় ১৫০টির মত ছবি ছিল। ছবি সদস্যরা নিজেরাই নির্বাচিত করেন। একটু তাড়াহুড়ো করে প্রদর্শনী করায় ছবির মান ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি। ভাল পোর্ট্রেটের সংখ্যা খুব কম। এফেক্ট এর দিকে ঝোঁক বেশী। সমর ব্যানার্জি, সুব্রত চ্যাটার্জি, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সুভাষ নন্দী ও শম্ভু সাহার কয়েকটি ছবি উল্লেখযোগ্য।

—চিত্ররসিক

অজিত দে

খড়কুটো মুখে নিয়ে দুটো বাবুই পাখি কখন থেকে জাম গাছটার ফোকরে বাসা তৈরী করছে। এ ব্যাপারটা ওদের নতুন মনে হচ্ছে কেননা বাড়ীর পিছন দিককার এই খোলা সবুজ উঠোনটুকু যেখানে রোজ ভোরে ঘুম ভাঙার পর সোনা অন্তত একটিবারও খানিকক্ষণের জন্য এসে দাঁড়ায়, সেখানে এ পর্যন্ত কোনো পাখির বাসা তার চোখে পড়েনি, বাবুই পাখি তো নয়ই। অতি পরিচিত প্রাত্যহিক দৃশ্যের মধ্যে পরিবর্তন বলতে এইটুকুই যা, বাকি সব হুবহু এক, গতানুগতিক। জাম গাছের মোটা ডালটা, ঘন নিবিড় পাতার জন্য যেটাকে কেমন ঝুপসি অন্ধকার বলে মনে হয় ঠিক তার নীচ থেকে একেবারে বাঁদিকের নোনা ধরা পাঁচিলটা পর্যন্ত কয়েক হাজার ইঁট কতকাল ধরে তেমনি পড়ে আছে। অনেকগুলো বর্ষার জল লাগতে লাগতে ওই ইঁটগুলোয় কবে শ্যাওলা ধরে গিয়েছিল নিশ্চয়, পরে রোদে পুড়ে পুড়ে সেই শ্যাওলা শুকিয়ে এখন ইঁটগুলো কেমন কালো কালো হয়ে গিয়েছে। পাজা করা ইঁটের সামনে খানিকটা জায়গা জুড়ে বালির স্তূপ। বহু-কাল ধরে অনেক ধুলো কাঠ-কুটো গাছের পাতা উড়ে উড়ে এসে বালির স্তূপটাকে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছে যে এখন ওটাকে একটা উঁচু মাটির ঢিপি বলে মনে হয়, একেবারে কাছাকাছি গিয়ে না দাড়ালে বালি কি মাটি ঠিক বোঝা যায় না। দোতলা করবার জন্য ওই সব ইঁট বালি বাবা আনিয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ স্ট্রোক হোল বাবার, ট্রায়াল ব্যালান্স না কি সব বিদঘুটে হিসেবপত্তর নিয়ে কিছুদিন বাবা অফিসে তো বটেই এমনকি বাড়ীতেও অমানুষিক পরিশ্রম করছিলেন, রাত জাগাও বাদ যায়নি, ফলে অফিসের মধ্যেই একদিন বুক চেপে ধরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ডাক্তার বললেন, করোনারী অ্যাটাক, পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার। বাবা ছুটি নিলেন। সংসার খরচ কমিয়ে পোস্ট অফিসে সামান্য যা জমে-ছিল তা তুলে এনে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে ধার করে মাসের পর মাস চিকিৎসা চলল।

কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হোল না। মাথা ঘামানোর চাকরি অথচ সামান্য মাথা ঘামালেই বাবার বুকে যন্ত্রণা হোত, মাথা ঘুরে উঠত। অফিসের ডাক্তার তাঁকে ফিট সার্টিফিকেট দিলেন না, বললেন, আরও ছুটি দরকার। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানী অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে রাজী হল না, বিশেষ করে অ্যাকাউণ্টেণ্টের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল পদে বাবাকে আর বহাল রাখাটাও কোম্পানী যুক্তিযুক্ত মনে করল না। কোম্পানী আর ছুটি মঞ্জুর করতে রাজী হল না, বাবা চাকরী হারালেন।

অনেক আশা করে আনা ইঁট বালি অমনিই পড়ে থাকল। একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সোনা ইঁটের পাঁজা বালির স্তূপ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। মাথার ওপর করবী গাছের পাতা থেকে সবুজ ঘাসের ওপর টুপটাপ শিশির ঝরে পড়ছে এখনো। গুটিকয়েক প্রজাপতি আজও উড়ে উড়ে এই কখনো ঘাসের ওপর বসছে, এই আবার করবীর পাতায় গিয়ে বসছে আবার চোখের পলক না ফেলতেই দ্যাখো জাম পাতায় বসেছে। ওখানে চোখ পড়েছে কি ফের উড়ল, উড়ে উড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আসবে না বুঝি! কিন্তু না, ওই তো আবার এসেছে, এসে লেবু পাতার ওপর রঙীন পাখা নাড়ছে। আর উড়ল না কিন্তু এখন, বোধ হয় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। রোজ যেমনটি দেখা যায়, আজো শিশির ভেজা ঘাসের শীষের ওপর কয়েকটা ফড়িং তেমনি নাচছে।

চোখ সরিয়ে এনে সোনা পেঁপে গাছটার দিকে তাকাল। বেশ বড়োসড়ো হয়েছে গাছটা, পাতাগুলোও সতেজ সবুজ। অথচ আজ পর্যন্ত পেঁপে ধরল না একটা। ধরবে কি, বন্ধ্যা যে গাছটা! সোনার পায়ের কাছে ঘাসের ওপর অনেকগুলো হলদে করবী ফুল পড়ে আছে। ফুলগুলো এখনো তাজা, এরপর এগুলো বাসি হবে, রোদে পুড়ে শুকিয়ে যাবে, যেমন রোজ যায় তেমনি।

করবী গাছটার নীচে সোনা চিত্রাপিতের মতো দাঁড়িয়েছিল। একটুও নড়ছিল না, যেন সামান্য নড়াচড়া করলেও এই দৃশ্যটা এলোমেলো হয়ে যাবে, যেন এই স্নিগ্ধ সকালে নীল আকাশের নীচে সবুজ ঘাস গাছপালা পাখি ফড়িং প্রজাপতিরা ও সোনা নিজে এই খোলা উঠানের পটভূমিকায় যে আশ্চর্য নিখুঁত এক দৃশ্য রচনা করেছে সোনা এখন নড়ে উঠলেই সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃশ্যের ভিতর হারিয়ে যাবে। তা, বিবর্ণ ইঁটের সারিগুলো এবং ধুলোয় ঢাকা বালির স্তূপটাকে যদি বাবার দোতলা বাড়ীর আশাভঙ্গের প্রতীক হিসেবে ধরা যায়, বন্ধ্যা পেঁপে গাছ এবং সোনার পায়ের কাছে পড়ে থাকা অনাদৃত হলদে করবী ফুলগুলোকে মেজদি হেনার ও সোনার নিজের ব্যর্থ অচরিতার্থ তিরিশটি বসন্তের হাহাকারের নিঃশব্দ ব্যঞ্জনা বলে যদি ধরে নেওয়া যায়, তবে অনায়াসে এটাকে কোনো অতি আধুনিক নাটকের একটা প্রতীকী দৃশ্য বলে চালিয়ে দেওয়া যায় বইকী। এই দৃশ্যে অবশ্যই কোনো আবহ-সংগীত থাকবে না। তা বলে দৃশ্যটি আবার সম্পূর্ণ নিঃশব্দও হবে না। অনেকগুলো কাক এখন যেমন তারস্বরে ডাকছে, কাক ডাকার এই আওয়াজ দৃশ্যে অবশ্যই রাখতে হবে। তবেই ভোরের দৃশ্যটি বাস্তবানুগ হয়ে উঠবে। কাক ডাকার আওয়াজের সমস্যাটা হরবোলা দিয়েও মিটিয়ে নেয়া যায়, তবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে টেপ রেকর্ড করে নেওয়া। তারপর অভিনয়কালে যথাসময়ে বাজিয়ে দিলেই হোল।

থিয়েটারের বাতিক এখনো যায়নি দেখা যাচ্ছে। সোনা নিজের মনেই হাসল। কলেজে পড়বার সময় প্রত্যেকটি নাটকে তার জন্য নায়িকার ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল। সে এমন কিছু রূপসী না, বরং রূপে খাটো বলে তার জন্য স্পেশ্যাল 'মেক আপ' দরকার হয়েছে, তার চেয়ে ঢের ঢের সুন্দরী মেয়ের কিছু অভাব ছিল না কলেজে, কিন্তু তার মতো কণ্ঠস্বর বা বাচনভঙ্গী কিংবা সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত সজীবতা অন্য কোনো মেয়ের ছিল না। প্রতিটি নাটক অভিনয়ের পর বহুদিন কলেজের ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে তার অভিনয়ের তারিফ শোনা যেত, অধ্যক্ষ অধ্যাপকরাও বাদ যেতেন না। পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা থিয়েটার করলেও তার ডাক পড়ত, তাকে অভিনয়ের জন্য রাজী করাতে কতো সাধ্যসাধনা করত। তখন এ অঞ্চলে নায়িকা বলতে একমাত্র সোনাকেই বোঝাত, অন্য কেউ ছিল না। সাত আট বছর আগেও এখানকার তো দূরের কথা, মেয়েদের বাড়ীর বাইরে বেরোবার ব্যাপারেও প্রায় সব বাড়ীতেই একটা কিন্তু কিন্তু ছিল। হঠাৎই কয়েক বছরের মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষের মনোভাবের মধ্যে যেন বেশ বড়রকমের পরিবর্তন এসে গিয়েছে। বিধিনিষেধ অনেক আলগা হয়ে গেছে এখন, প্রয়োজন অপ্রয়োজনে মেয়েদের ইদানীং রাস্তাঘাটে বেশ দেখা যায়, ছেলেদের সঙ্গে ঘোরা মেলামেশা ইত্যাদিও এখন আর দৃষ্টিকটু নেই। সোনার চেয়ে রূপবতী লাবণ্যবতী বহু মেয়ে আজকাল ছেলেদের সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করবার জন্য এককথায় রাজী। তাদের বয়েসও কম, অভিনয়-কুশলতার অভাবটুকু কাঁচা বয়সের রূপ-লাবণ্য দিয়ে সহজেই পুষিয়ে দিতে পারে। কাজেই পাড়ার ক্লাব থেকেও এখন আর অভিনয়ের জন্য সোনার ডাক পড়ে না। কখনোসখনো মায়ের কি শাশুড়ীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য পাড়ার ছেলেরা সোনাকে এখনো মাঝে মাঝে বিরক্ত করে। একদিন যে নায়িকার ভূমিকা সোনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল তা যেন মনেই নেই পাড়ার ক্লাবের ছেলেগুলোর। ভুলেও তাকে কখনো কেউ এখন আর নায়িকার ভূমিকার কথা বলে না। জোর বরাত হলে বৌদির ভূমিকা পর্যন্ত, কিন্তু নায়িকা নৈব নৈব চ। হাজার সাধ্যসাধনা করলেও সোনা মা শাশুড়ী কিংবা বৌদির ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হয় না। হয়তো বয়েস হয়ে যাচ্ছে, যৌবন ফুরিয়ে আসছে বলে সোনা বয়স্কা মহিলার চরিত্রে অভিনয় করতে ভয় পায়। যেন মা শাশুড়ী কিংবা বৌদির ভূমিকায় অভিনয় করলে এখন আর অভিনয় এবং বাস্তবজীবনের মধ্যে কোনো ফাঁক থাকবে না, সে সত্যি সত্যিই বুড়ির দলে পড়ে যাবে। বয়েস হয়ে যাওয়ার জন্যই সোনার এখন ভয় ওইসব ভূমিকায় অভিনয় করলে কেউ আর তাকে যুবতী ভাববে না।

সকালের হাল্কা নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল করবী গাছের পাতায়, ক্রমে শিশির-ভেজা ঘাসে, সোনার ডান পায়ের ওপর। টুপটাপ করে এখন আর গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ছে না। সোনা উৎকর্ণ হল। একটু সময় কান পেতে থাকবার পর সে চায়ের কাপ চামচের পরিচিত টুং টাং আওয়াজ শুনতে পেল। চা হয়ে যাওয়ার সংকেত। এই আওয়াজ কানে এলেই সোনা রোজ এখান থেকে বাড়ীর ভেতর চলে যায়।

রান্নাঘরে বসে মা কেটলী থেকে সাজিয়ে রাখা কাপগুলোয় চা ঢালছিলেন। মাকে যেন আজ একটু খুশি খুশি লাগছে। আজ বিকেলে মেজদি হেনাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে, সেইজন্যই বোধহয় মায়ের মুখটা আজ সামান্য উজ্জ্বল, চা ঢালবার ভঙ্গীর মধ্যেও কেমন এক সজীবতা। সোনা কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দুটো কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, ওদের দিয়ে আয়।

ওরা মানে সোনার ঠিক পরেই যে [illegible] সে, অসীম যার নাম এবং তার স্ত্রী বনানী। ওরা সকালে ওঠে না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খেয়ে আবার ঘুমোয়। সকালের [illegible] বাসি হয়ে অনেকটা বেলা হলে তবে [illegible] থেকে ওঠে। রাতে দরজা বন্ধই থাকে [illegible] দেওয়ার সুবিধের জন্য ভোরে ঘুম [illegible] চোখেই অসীম না হয় বনানী খুলে [illegible] রাখে। ভোরে বাবুদের চা দেওয়ার [illegible] রোজ সোনাকেই সারতে হয়। নবাবী [illegible] গা জ্বলে যায় সোনার, ঘরের বউ হয়ে [illegible] কোথায় তুই নিজে সকালে উঠে চা [illegible] সবাইকে খাওয়াবি তা নয়, শাশুড়ী [illegible] তৈরী করবে, বড়ো ননদ মাথায় করে [illegible] দিয়ে আসবে, সোনা, সোনার মা [illegible] কতকালের কেনা দাসী-বাঁদী যেন। [illegible] গলায় সোনা বলল, বেগম সাহেবা [illegible] ওঠেন কি দুটো?

মায়ের চোখে মুখে [illegible] ভয়ের [illegible] নেমে এল, গলা নামিয়ে ফিসফিস [illegible] বললেন, আস্তে কথা বলতে পারিস [illegible] শুনতে পাবে যে!

—শুনতে পেলে কি করবে [illegible] পারব না আমি রোজ-রোজ চা [illegible] আসতে।

কথাগুলো বলবার সময় সোনার গলার স্বর আপনা থেকেই নিচু হয়ে এল। [illegible] কথাগুলো শুনতে পেলে বনানী যে [illegible] কালাম কাণ্ড বাধাবে সোনা তা জানে [illegible] মায়ের, শুধু মায়ের কেন, তার নিজের ভয়ের কারণটা যে কি সোনার তা অজানা নয়। মেজদি হেনা স্কুল মিস্ট্রেস [illegible] প্রাইমারী স্কুলের। তার একার সামান্য রোজগারে সংসার ভালভাবে চলতে [illegible] না। অসীমের চাকরীর দৌলতেই এখন পরিবারে কিছুটা সচ্ছলতা, কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। ছেলেটা হওয়ার পর থেকে অসীম যেন আরো বেশী স্বার্থপর [illegible] বিষয়ী হয়ে উঠেছে, বনানীর ভাবসাব একটুও ভালো না। ওরা দুজনেই এখন এই বাড়ী থেকে অন্য কোথাও [illegible] যেতে পারলে বাঁচে। অনবরত ছলছুতো

খুঁজছে, বনানী তো উঠতে-বসতে খোঁটা দেওয়া খোঁচা দেওয়া ছাড়া কথা বলে না। রোজগেরে ছেলে এবং রোজগেরে ছেলের বউয়ের মন-মেজাজ বুঝে যে চলতে হয়, সোনার মা-বাবা হেনা এমন কি সোনাও সেই সত্যটা ভালোভাবে বুঝে নিয়েছে। যে গরুটা দুধ দেয় তার লাথিটা-গুঁতোটা একটু সহ্য করতে হবে বইকি!

বেলা পর্যন্ত বনানীর বিছানায় শুয়ে থাকা, মায়ের তৈরী চা প্রতিদিন ওর শিয়রে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য সোনার সব রাগ-বিরক্তি যে নেহাতই মামশলী শূন্যগর্ভ আস্ফালন মাত্র, সোনা তা বুঝে গিয়েছে। মায়ের কাছে একান্তে গোপনে চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করা অব্দিই তার দৌড়। প্রকাশ্যে বনানী কি অসীমকে চটাবার সাহস তার নেই। অন্যের উপার্জনে ভাগ বসিয়ে যার অন্ন-বস্ত্র জুটছে তার মান-সম্মান বোধ অত টনটনে হলে চলে না। যেন সেই সস্তা ভাবালুতা ঝেড়ে ফেলবার জন্যই সোনা এমন দ্রুতপায়ে বনানীদের চা দিয়ে এল।

সোনার দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে মা বললেন, নে, তোর চা নে।

বাবা মেজদি এবং ছোট ভাই তাপসকে চা দেওয়া এখনো বাকী। কেটলী আর কাপ হাতে নিয়ে মা নিজেই উঠলেন। মা এখন চা খাবেন না, চান করে ঠাকুরের আসনে ফুল-জল দিয়ে তবে চা মুখে দেবেন। চা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু তাই বলে মা নিজের জন্য নতুন করে চা করেন না, তৈরী চা-টাই ফের গরম করে নেন। ঠাকুরের আসনের সামনে হাত জোড় করে রোজই মা বেশ খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে কি যে বকেন বোঝা যায় না। কোনো মন্ত্রতন্ত্র কি শ্লোক যে আবৃত্তি করেন না, সোনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত। সোনা অনুমান করতে পারে, ভাবে ভাষায় মায়ের প্রার্থনা সম্পূর্ণ বৈষয়িক। সংসারের ভালো হোক, মেয়েদের যেন তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় এই সব আর কি। আজ মা নিশ্চয়ই একটু বেশী সময় ধরে বিড়বিড় করবেন, পাত্রপক্ষ হেনাকে দেখতে আসছে, তাদের যাতে পাত্রী পছন্দ হয় সেই উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে প্রসন্ন করবার জন্য খানিকটা বেশী সময় তাঁকে তোয়াজ করতে হবে বৈকি।

কলতলায় ভাড়াটেদের মেয়ে রমলা শব্দ করে মুখ ধুচ্ছে। রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে সোনা রমলাকে দেখল। প্রতিদিন অনেকক্ষণ সময় নিয়ে রমলা চোখ-মুখ ধোয়। ঠাণ্ডা জল চোখে ছিটোতে-ছিটোতে পুরো এক বালতি জল শেষ করে দেয়। নিয়মিত ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে চোখ ধোয়া নাকি খুব ভাল, ওতে চোখ যেমন ভালো থাকে, শ্রী-সৌন্দর্যও তেমনি বাড়ে। চেহারার দিকে রমলার খুব নজর। স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য শ্রী-বৃদ্ধির প্রতিটি খুঁটি-নাটি নিয়ম রমলা মেনে চলে। মনে-মনে স্বীকার করতে আপত্তি কি এমনিতেই রমলা রীতিমতো রূপসী। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং। আয়ত দীঘল কালো চোখ, টিকালো নাক। কালো চুলের বাহারই বা কম কি। মাখনের মতো নরম শরীর স্বাস্থ্যে লাবণ্যে যেন টলমল করছে। অমন একটা রূপবতী মেয়ের দিকে পুরুষ-মানুষরা যে তাকাবে, তাকিয়ে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যাবে এ আর এমন বিচিত্র কি।

মা এসে রান্নাঘরের মেঝের ওপর কেটলীটা নামিয়ে রেখে বললেন, আমি চানটা সেরে আসি, তুই ততক্ষণ রুটিগুলো সেঁকে ফেল। আলুর তরকারীটা আমি এসে করব'খন।

রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় টাঙানো দড়ির ওপর থেকে শাড়ী গামছা পেড়ে নিয়ে কলতলার দিকে ফিরতে মা রমলাকে দেখতে পেলেন। রমলার হাত-মুখ ধোয়া তখনো শেষ হয় নি, ভিজে তোয়ালে ঘষে-ঘষে সে ঘাড় গলা কপালের ময়লা তুলছিল।

রান্নাঘরের কাছে ফিরে এসে আড়-চোখে রমলার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, হ্যাঁরে সোনা, আজ রোববার তো?

আজ যে রোববার একথা মা বেশ ভালো করেই জানেন, বিশেষ পাত্রপক্ষ বিকেলে হেনাকে দেখতে আসছে, এক্ষেত্রে বার সম্বন্ধে মার আদৌ ভুল হবার কথা নয়, তাই মার এই প্রশ্নে সোনা একটু অবাক হয়, বলে, হুঁ, কেন তোমার সন্দেহ আছে না কি?

—না, তা নয়। বলছিলাম আজ কার পালা—উৎপল না সৌমেনের?

মা মেয়ের চোখাচোখি হল। গূঢ় অর্থ-পূর্ণ এক টুকরো চাপা হাসি খেলা করছে মায়ের ঠোঁটে। সোনারও বেশ হাসি পাচ্ছিল কিন্তু মার সামনে হাসিটা তেমন শোভন হবে না ভেবে হাসি চেপে সোনা বলল, সৌমেনের। কেন?

মাকে এবার একটু চিন্তিত দেখাল, ঈষৎ বিচলিত অন্যমনস্ক স্বরে তিনি বললেন, তবে তো মুস্কিলের কথা রে সোনা। রমলার গানের দিন, আজ কি আর ও বেরোবে বাড়ী থেকে?

—রমলা বাড়ী থেকে বেরোক না বেরোক তাতে তোমার কি?

—তুই তার কি বুঝবি? চোখের সামনে রমলাকে দেখলে আমার হেনাকে কি আর কেউ পছন্দ করবে?

মার গলার স্বরে ভঙ্গিতে কেমন অদ্ভুত একটা হীনমন্যতা ফুটে উঠল। সোনা মার এই অসহায় দীনতা বরদাস্ত করতে পারছিল না, তার আত্মসম্মানে ভীষণ আঘাত লাগছিল। আহত অভিমানে সে চেঁচিয়ে উঠল, পছন্দ না হয় না হবে। তোমার অত দুশ্চিন্তা করতে হবে না। যাও, চানটা সেরে এস দেখি।

সোনার উগ্র মূর্তি দেখে মা আর কথা বাড়ালেন না, নিঃশব্দে ধীর পায়ে কলতলায় নেমে গেলেন। উনুনে আঁচ গনগন করছিল, সোনা তাড়াতাড়ি লোহার চাটু চাপিয়ে দিল। আটার লেচি করাই আছে, বেলতে আর সেঁকতে কতক্ষণ বা লাগবে। টিন দিয়ে ঘেরা বাথরুম থেকে জল ঢালার শব্দ আসছে, মা চান করছেন। রুটি সেঁকতে-সেঁকতে সোনার মনে হল, রমলার ব্যাপারে মায়ের আতংকটা একেবারে গুরুত্বহীন অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমনিতেই রমলা মেয়েটা মন্দ না, বেশ হাসি-খুশি, খুব একটা ঘোরপ্যাঁচেরও ধার ধারে না, কিন্তু নিজের রূপ নিয়ে ওর ভীষণ একটা বাড়াবাড়ির ভাব আছে। চেনা-অচেনা সবরকম মানুষকে রূপ দেখিয়ে বেড়ানো যেন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে রমলার। তার গায়ের রং, তার শ্রী সৌন্দর্য দেহসৌষ্ঠব দেখে পুরুষমানুষগুলোর চোখগুলো লোভে কি রকম চকচক করে ওঠে তা দেখাবার জন্যে সব সময়ই রমলার একটা দৃষ্টিকটু ব্যস্ততা থাকে। এমন কি সোনাদের ঘরে কখনো কেউ এলে, বিশেষ করে পুরুষ হলে তা সে প্রৌঢ় আধবুড়ো কিম্বা যুবক যাই হোক না কেন, রমলা কারণে-অকারণে বারান্দায় ঘুরঘুর করে, কখনো-কখনো কোন জিনিস নেবার অছিলায় ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ে এবং আগন্তুকদের বিমুগ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টি কুড়িয়ে নিয়ে তবে বেরোয়। বহুকালের পুরনো ভাড়াটে, অনেকটা একই পরিবারের লোক-জনের মত হয়ে গিয়েছে, যখন-তখন প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে ঘরে ঢুকে পড়লেও তাই সোনারা কিছু বলে না, ভেতরে-ভেতরে হাজার বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলাটা যেন কেমন অশোভন, অসঙ্গত বলে মনে হয়। কাজেই বিকেলে যখন পাত্রপক্ষ হেনাকে দেখতে আসবে এবং তাদের সামনে কোন-না-কোন ছুতোয় রমলার উপস্থিতি যখন অনিবার্য তখন সোনার মনেও এতক্ষণে যেন মায়ের মনের ভয়টা সংক্রামিত হচ্ছিল। বাস্তবিকই রমলার মতো রূপসী যুবতী মেয়েকে দেখার ঠিক পরই হেনাকে পছন্দ করা যে কোন পুরুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর, প্রায় অসম্ভব বলে সোনার মনে হতে লাগল। রমলার স্বভাবের মধ্যে যে বেহায়া-পনাগুলো লক্ষ্য করে বিরক্তির ভাব আসে সেজন্য সোনা কিন্তু রমলাকে এতটুকু দায়ী করতে পারছিল না। বাপ-মা প্রশ্রয় দিলে রমলার আর দোষ কি। যুবতী মেয়ে, বয়েস কুড়িও পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ, তার ওপর অমন চোখে জ্বালা ধরানো রূপ, তার মধ্যে একটু-আধটু ছটফটানি তো থাকবেই। কিন্তু শাসন দূরে থাক, বাপ-মা বরং দু-দুটো জলজ্যান্ত যুবকের সঙ্গে নিত্যদিন ঢলাঢলি করবার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে। কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কার-খানায় চাকরী করে যে ছেলেটা, উৎপল যার নাম পড়া দেখিয়ে দেওয়ার ছুতো করে সে আসে সপ্তাহে চারদিন, বাকী তিনদিন বরাদ্দ আছে সৌমেনের জন্য, সে গান শেখায়। একেবারে যেন পালা বেঁধে দেওয়া, যেদিন উৎপল আসে সৌমেন আসে না, সৌমেন এলে উৎপল সেদিন অনুপস্থিত। পড়াশুনো মন্দ হাতী, ধাড়ি মেয়ে এখনো কি

বছর স্কুল ফাইনাল দেবে-দেবে করে, দিয়ে আর উঠতে পারছে না, বেশীর ভাগ দিনই তো দেখা যায় সন্ধের দিকে উৎপলের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, কোন কোন দিন ফিরতে রাত দশটাও বাজে। তা বলে ফার্স্টইয়ার্সি সোমেনের সঙ্গেও কিছু কম না, ঘরের মধ্যে বসেই গান শেখার নাম করে ইয়ার্কি বেলেল্লাপনা পুরো মাত্রায় চলতে থাকে। বাবা-মা উঠোনের দিকে বারান্দায় বসে থাকে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারো মাস, শীতের দিনেও যেন কতো হাওয়া খাওয়ার দরকার!

চান শেষ করে বারান্দায় উঠে এসে মা গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ছিলেন। অসীমও কখন উঠে এসেছে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড়-মোড়া ভাঙছিল। অসীমকে দেখে মা সোনাকে বললেন, থলে দে অসীমকে, বাজারটা সেরে আসুক।

বিরক্ত মুখে অসীম বলল, কেন, রোজ আমি কেন, এক-আধ দিন বাবা তো অন্তত বাজারটাও করতে পারেন?

—হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে, মা পরিহাসের হাসি হাসলেন, হেসে স্বামী অবনীশের সংসারের কোন কাজ না করার যে অপরাধ তা লঘু করে দিতে চাইলেন, জানিস তো ওঁর মাথার অবস্থা, কি আনতে কি আনবেন তার ঠিক আছে? বাজার এনে হয়তো বলবেন, পেঁয়াজ দিয়ে ইলিশের ঝোল রাঁধো।

কথা শেষ করার সময় মা শব্দ করে হেসে উঠলেন, সোনাও হাসল কিন্তু অসীম একটুও না হেসে মুখ গম্ভীর করে বলল, দিন-রাত একটা মানুষ যে কি করে বসে থাকে বুঝি না। সকাল-বিকেল টিউশনি করলেও তো দুটো পয়সা আসে।

রান্নাঘর থেকে থলেটা নিয়ে এসে সোনা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, অসীমের মেজাজ দেখে থলেটা এগিয়ে দিতে সাহস করছিল না। গভীর বিরক্তির সঙ্গে অসীম নিজেই থলেটা সোনার হাত থেকে টেনে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোল তারপর হঠাৎই কি মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে সোনাকে বলল, মেজদির কাছ থেকে গোটা পাঁচেক টাকা চেয়ে রাখিস। বিকেলে লোক-জন আসবে, মিষ্টিফিষ্টি আনতে হবে। আমার হাত একদম খালি কিন্তু।

অসীম চলে যাওয়ার পর সোনা ঘরের ভেতর ঢুকল। হেনা তখনো বিছানায় শুয়ে, বেশবাস যদিও অসংবৃত এবং মাথার চুলও এলোমেলো তবু হেনা এখন ঠিক ঘুমোচ্ছিল না। বিছানায় পড়ে-পড়ে ছুটির দিনের আলস্য উপভোগ করছিল। মেজদির কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অপ্রিয় কর্তব্যটা ইদানীং সোনাকেই করতে হচ্ছে। সোনার ভালো লাগে না, সময়-সময় মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে, তবু তাকেই চাইতে হয়। এমন ছোটখাটো বিদ্রোহ মনের মধ্যে হরদম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, হামেশাই সেগুলো দমন করতেও সোনা এখন বেশ শিখে গেছে। অভ্যস্ত ভূমিকা করে সোনা বলল, মেজদি, একটা কথা বলব, আমার ওপর রাগ করবি না বল!

—টাকা চাইবি তো, শাড়ীটা গায়ের ওপর ভালো করে টেনে দিল হেনা তারপর নিষ্প্রাণ হেসে বলল, তা হঠাৎ এখন আবার টাকার দরকার পড়ল কিসে?

—লোকজন আসবে, মিষ্টি আনতে হবে না?

ম্লান হাসিটা তখনো হেনার ঠোঁটে লেগে ছিল, চোখদুটো এইবার ছল-ছল করে উঠল, অবরুদ্ধ গলায় সে বলল, লোক-জন আসবে, তাই মিষ্টির টাকাটাও আমাকে দিতে হবে? তা দিতে হবে বইকি, আমাকে দেখতে আসবে যে! এক-এক সময় মনে হয় কি জানিস, আমি মরে গেলে তোরা বোধ হয় সেদিনও আমার কাছে সৎকারের টাকা চাইবি।

কথাগুলো শেষ হওয়ার পর হেনা যেন বেরিয়ে আসতে চাওয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বন্দী করল। সোনার মনে হচ্ছিল, মেজদি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসটা ফেললেই বরং ভালো করত। অমন কতো নিঃশব্দ হাহাকার মেজদির ফুসফুসে জমা হয়ে আছে, ক্ষয়রোগের বীজাণুদের মতো কতো দীর্ঘনিঃশ্বাস অহর্নিশি মেজদির বুকের ভেতরটা কুরে-কুরে খাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত হেনা চুপ করে থাকল। তারপর সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল, কতো লাগবে?

—পাঁচ টাকা।

হেনা টেবিলের ড্রয়ার খুলে ছোট ব্যাগের ভেতর থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে সোনার হাতে দিল তারপর ব্রাসে খানিকটা টুথপেস্ট লাগিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টাকাটা হাতে নিয়ে সোনা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পিছের রাস্তাটা চোখে পড়ছে, রাস্তার ওপর বেশ কিছু মানুষকে চলতে দেখা যাচ্ছে এখন। বাজার ফিরতি লোকও দেখা যাচ্ছে কিছু-কিছু, কারো-কারো থলে থেকে শাকের ডগা উঁকি দিচ্ছে। মেজদির কথাগুলো মনে পড়ছিল সোনার, কথা তো নয় যেন কান্না। মেজদির বাজা কি, কোথায় ঘা লেগে মেজদির মুখ দিয়ে কান্নার মতো শব্দগুলো বেরিয়ে এসেছে সোনা তা জানে। এই সংসারের জন্য মেজদির ত্যাগ কিছু কম না। বাবার চাকরী যাওয়ার পর থেকে হেনা কত কষ্টই না করেছে। স্কুলের চাকরীর টাকায় সংসার চলে না বলে দুবেলা বাড়ী-বাড়ী টিউশনি করেছে, বাপ-মা ভাইবোন নিয়ে এত বড় একটা সংসারের ভার মাথায় ওপর নিয়ে মেজদি কতকাল একাই সকলের প্রতি কর্তব্যগুলি করে এসেছে। বাবার চাকরী যাওয়ার পর দুখানা ঘর অবশ্য ভাড়া দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা থেকে মাসে চল্লিশ টাকার বেশী কোনদিনই পাওয়া যায় নি। নিজের জন্য বাড়তি একটা ভালো শাড়ী কি স্নো-পাউডার পর্যন্ত কোনদিন হেনা কেনে নি, কিনলে কে আর তাকে আটকাতে পারত, কিন্তু সংসারের কথা ভেবে এমন ইচ্ছাই তার কোনদিন মনে আসে নি। ভাই-বোনদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে, অসীম কবে লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হয়ে চাকরী করবে, সে জন্যেই যেন দিন গুনছে মেজদি, যেন সেই দিনই মেজদির সময় হবে নিজের দিকে তাকাবার, সখ মিটিয়ে শাড়ী গয়না কেনবার। তা এত দায়িত্ব কর্তব্যবোধের বেশ ভালো পুরস্কারই এখন পাচ্ছে মেজদি। অসীম চাকরী পেল কিন্তু মেজদির দিকে একটুও তাকিয়ে দেখল না, দেখল না সংসারের ভার বইতে-বইতে মেজদির যৌবন ফুরিয়ে এসেছে, মেজদির বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করে ভাইয়ের কর্তব্য করবার কথা একবারও তার মনে এল না, মাথার ওপর যৌবন যায়-যায় অবিবাহিতা মেজদি হেনা এবং ছোড়দি সোনা যেমনকার তেমনি পড়ে থাকল, নিজে পুরো স্বার্থপরের মতো প্রেম করে বনানীকে বিয়ে করল, রেজিস্ট্রি বিয়ে করে হেনা সোনার সামনেই এই বাড়ীতে ওঠবার সময় অসীমের বিবেকে একটুও লাগল না, একটুকু লজ্জা হল না।

বাবার চাকরী থাকতে-থাকতেই ভাগ্যিস বড়দির বিয়ে হয়েছিল, না হলে তাকেও অবধারিত ব্রহ্মচারিণী সেজে থাকতে হোত। বিয়ের পর নিজের সৌভাগ্যে মশগুল হয়ে বড়দি হেনা সোনাদের ভুলে যায় নি। বাইরে এলাহাবাদে থাকতে হয় বলে সব সময় তাদের তত্ত্বতালাস করতে পারে না বটে, তবে বছরে একবার কি দুবার যখনি আসে, হেনার বিয়ের জন্য তাগাদা করে বড়দি সবাইকে অস্থির করে তোলে, তাছাড়া বড়দির এমন মুখ যে তার খোঁচার চোটে অসীম পর্যন্ত কেঁচো হয়ে থাকে। হেনার বিয়ের জন্য যা কিছু চেষ্টা ইদানীং হচ্ছে, অসীম যেটুকু গা মাখছে এখন তা সবই বড়দির ভয়ে। ঘটক লাগিয়ে সুবিধে হয় নি বলে খবরের কাগজে রোববার পাত্র চেয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তাও বড়দির বুদ্ধিতে। বিজ্ঞাপনের খরচ বাবদ যে টাকা লেগেছে তা অবশ্য হেনাকেই দিতে হয়েছে। যেন হেনার বিয়ের দায় তার নিজের। এমন কি মিষ্টির টাকাটা পর্যন্ত মেজদির কাছ থেকে আদায় করে তবে অসীম ছাড়ল। নিজেকে তিলে-তিলে নিঃশেষ করে কি নির্মম কি মর্মান্তিক পুরস্কারই না জুটছে মেজদির কপালে। সোনার নিজেরই যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল।

চোখ জ্বালা করছে, জল এসে দৃষ্টি ঝাপসা করে দিল যেন। সোনা এ ঘর থেকে বেরিয়ে ও পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল। তাপসের গলার একটানা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, পড়ছে মনে হচ্ছে। সোনা ঘরে ঢুকতে বাবাকে দেখতে পেল। যথারীতি সামনে ক্রসওয়ার্ড পাজল-এর ছক রেখে বসে আছেন। চাকরি যাওয়ার পর বাবা কারো সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলেন না, কাছে গিয়ে দাঁড়ালে শূন্য উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। একা-একা শব্দের জগতে ডুবে

থাকতেই ভালোবাসেন, কেউ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াক, কথা বলুক এটা তিনি চান না। তাঁর কাছে কেউ গেলে তিনি বিরক্ত হন, অস্বস্তি বোধ করেন। কবে একবার শব্দ মিলিয়ে পাঁচ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন সেই থেকে এই ব্যাতক তাঁকে আরো বেশী পেয়ে বসেছে। নিজের তৈরী জগত থেকে মানুষকে তাড়াবার জন্য ভারী অদ্ভুত একটা ফন্দিও অবনীশ এঁটে রেখেছেন! সোনা কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সেই অস্ত্রটাই তিনি নিক্ষেপ করলেন. আচ্ছা সোনা, তুই তো বি-এ পাশ করেছিস 'কনটেম্‌টমেন্ট' কথাটার প্রতিশব্দ কি কি হতে পারে বল দিকিনি?

যত্তো সব বাজে ব্যাপার। বিরক্ত মুখে সোনা অবনীশের কাছ থেকে সরে পড়ল। বেলা বাড়ছে, এর পর কলতলায় ভিড় বাড়বে. ছুটির দিন সবাই বেলা হলে তবে চান করতে যায়, তখন একটা ঠেলাঠেলি পড়ে যায় যেন। এখন একটু আগে-ভাগে কলতলায় গেলে বেশ সাবান-টাবান ঘষে সময় নিয়ে চান করা যাবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারতে বেলা দুটো বাজল। খাওয়ার পর হেনা এবং সোনা দুজনেই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছিল। চোখে ঘুম গাঢ় হচ্ছিল না কিছুতেই, একটা হাল্কা তন্দ্রার ঘোর দুজনকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমনি অবস্থায় ঘন্টাখানেক কাটবার পর হয়তো বেলা তিনটে বেজেছে তখন, হেনা কেমন অদ্ভুতভাবে কঁকিয়ে ওঠায় সোনার তন্দ্রার ঘোরটা হঠাৎ কেটে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে দু চোখ রগড়াতে রগড়াতে সোনা বলল, কি হয়েছে রে মেজদি, অমন করছিস কেন?

ডান গালের ওপর হাত চেপে রেখে মুখ বিকৃত করে হেনা বলল, উঃ, দাঁতে কি যন্ত্রণা করছে, সহ্য করতে পারছি না, আমার ব্যাগে ট্যাবলেট আছে, বের করে দে শিগগির।

সোনা তাড়াতাড়ি ট্যাবলেট বের করে হেনার হাতে দিয়ে বলল, ধর, আমি এখুনি জল নিয়ে আসছি।

ট্যাবলেট খাওয়ার পরও বেশ খানিকক্ষন মুখ বিকৃত করে হেনা কঁকাতে লাগল। দু-তিনটে দাঁত ফেলে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়। বয়েস তো আর কম হল না মেজদির, চৌত্রিশ চলছে, এখন আর দাঁত খারাপ হলে পুষে রাখবার উপায় নেই, ফেলতেই হবে। প্রায়ই এখন হেনার দাঁতে ব্যথা হয়, ট্যাবলেট খেয়ে-খেয়ে ব্যথা চেপে রাখে, বিয়ে হবে-হবে করে দাঁত আর ফেলা হচ্ছে না, দাঁত ফেলে বাঁধানো দাঁত অবশ্য পরা যায়, কিন্তু বাঁধানো দাঁত আবার মাঝে মধ্যে খুলে পরিস্কার করতে হয়, ফোকলা দাঁত দেখলে বর আবার কি ভাববে, অনেক বুড়ি মনে করবে নিশ্চয়ই, এই সব ভেবে খারাপ দাঁত কটাকে যন্ত্রণা ভোগ করেও পুষতে হচ্ছে, অথচ যে জন্য পুষে রাখা সেই বিয়েটাই ছাই হচ্ছে না, এমন কিছু কন্দর্প-কান্তি পাত্র আসছে না একজনও, কেবীর ভাগকেই কিষ্কিন্ধ্যার নাগরিক বলা যায় তাদেরও যেন কিছুতেই হেনাকে পছন্দ হয় না।

পাত্রপক্ষের আসতে একটু দেরী হল। সন্ধে পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে সবাই, সাড়ে সাতটার খবর শুরু হয়েছে রমলাদের রেডিও শুনে বোঝা যায়, এমন সময় পাত্র-পক্ষ হাজির হল। বয়েস হলে কি হবে, কনে যখন তখন একটু সাজগোজ করতেই হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হেনা মুখে ক্রীম ঘষছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ক্রীম ঘষেও হেনা নিজের মুখে এতটুকু মসৃণতা আনতে পারছিল না। চিবুকেও চর্বি জমেছে, মুখের খসখসে কঠিন চামড়ার ওপর ক্রীমের সাদা প্রলেপ, কালিপড়া চোখের কাজলের টান সব কিছু মিলিয়ে আয়নায় প্রতিবিম্বের মধ্যে হেনা যেন এক সস্তা দেহ-ব্যবসায়িনীর মূর্তি দেখল। বুকের মধ্যে কে যেন ডুকরে উঠল, দাঁতের গোড়ায় ফের ব্যথা করছে, তার চোখে জল আসছিল, ভেতরের বাইরের যন্ত্রণায় কাতর হেনা দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো সোনাকে বলল, শিগগির আর একটা ট্যাবলেট দে—

অলস দুপুরগুলো বড় বেশি দীর্ঘ মনে হয় সোনার, তখন সময়কে মনে হয় যেন কোনো ক্লান্ত বৃদ্ধ পথযাত্রী, লাঠি ঠুক ঠুক করে কোনোমতে এক পা এগোচ্ছে তো দম নেবার জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়াচ্ছে, আর এক পা এগোল তো ফের দাঁড়িয়ে পড়ছে, এমন করে কখন যে গন্তব্যে পৌঁছবে কে জানে। এখন এই বৈশাখের দুপুর রোদ্দুর খাঁ-খাঁ করছে চারদিকে, তীব্র তেজী রোদের আগুনে গাছের সবুজ পাতা কচি কচি আমগুলো ঝলসে যাচ্ছে, রাস্তার পিচ গলেছে, ঘরের মধ্যেও আগুনের হলকায় সোনার সারা শরীর যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। প্রতিদিন এই সময় বিছানায় একা শুয়ে সোনা ছটফট করে। চোখ বুজলেও ঘুম আসে না। অথচ গোটা বাড়ীটার অন্য সব কটি প্রাণীই দিব্যি দিবানিদ্রার আলস্যের মধ্যে ডুবে যায়, কোনো ঘর থেকে এতটুকু আওয়াজ কানে আসে না। বেলা দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে মেজদি, অসীম, তাপস, ওধারের রমলার বাবা যে যার কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে সমস্ত বাড়ীটা নিঝঝুম হয়ে যায়। আর আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণের মতো কতগুলো চিন্তা এই সব মুহূর্তগুলোতে সোনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেন নখে দাঁতে সোনার হৃদপিন্ডটা ছিঁড়ে ফেলতে চায়। সোনা একা-একা হাঁফিয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুই করবার নেই, রোজ সিনেমায় যাবার মতো পয়সা থাকে না, একা-একা সিনেমা দেখতেই বা কার ভালো লাগে, ট্রামে-বাসে পয়সা খরচা করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব যে করা যায় না তা নয়, কিন্তু তাও এখন [illegible] মনে হয়, বিশ্রী লাগে। ঘুরেফিরে একই কথার পুনরাবৃত্তি একই একঘেয়ে প্রসঙ্গ। যে বয়েসের যা, নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা কি, কোনো পুরুষের সান্নিধ্য, তার গলার আওয়াজ এসব ছাড়া কোনো মেয়ের কাছে আর সবকিছুই একঘেয়ে বৈচিত্রহীন হতে বাধ্য। সেই কোন কিশোরবেলায় চেতনার মধ্যে যা অস্ফুট থাকে, যৌবন আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বহমান রক্তস্রোতের মধ্যে প্রতিটি কণিকাই যে কোনো পুরুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় অধীর ব্যাকুল হয়ে ওঠে মেয়ে বলেই সোনাও তা টের পায়।

খুট করে একটা শব্দ হল। ভেজানো দরজা ঠেলে রমলা ঘরে ঢুকল, কাগজে মোড়া কিসের একটা প্যাকেট যেন তার হাতে। খুশিতে রমলার মুখ-চোখ বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

—আয়, আয় সোনা ডাকল, আজ যে ঘুমোস নি বড়?

—ঘুম আসছে না, যা গরম। রমলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যেন রোদের তীব্রতা দেখল তারপর বলল, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব সোনাদি।

কাগজে মোড়া প্যাকেটটা খুলল রমলা, একটা চামড়ার লেডিজ ব্যাগ বেরিয়ে পড়ল। সুন্দর কারুকার্য করা হালকা কমলা রঙের ব্যাগ।

—বাঃ, বেশ সুন্দর তো, কতো দাম নিয়েছে রে রমলা?

—কি করে জানব, আমি কিনেছি নাকি?

—তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস তো কতো দাম, আমিও একটা কিনব।

ঠোঁট উল্টে রমলা বলল, হুঁঃ, বাবা আবার আমাকে ব্যাগ কিনে দেবে! তবেই হয়েছে!

—তবে কে দিয়েছে?

গূঢ় অর্থপূর্ণ রহস্যময় হাসি হাসল রমলা, বলো তো কে দিয়েছে? ঠিক ঠিক বলতে পারলে সিনেমা দেখাব তোমায়।

রমলাকে এক পলক দেখল সোনা তারপর ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা বাড়িয়ে ধরে বলল, নে, ধর দেখি।

একটু অপেক্ষা করে রমলা সোনার তর্জনী চেপে ধরল। সোনা বলে উঠল, সোমেন।

—উহুঁ, রমলা ঘাড় নাড়ল, উৎপলদা।

জানালা দিয়ে সোনা বাইরে আকাশের দিকে চোখ ফেলল। নীল আকাশে ধোঁয়ার মতো আবছা সাদা দু-এক টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। বোশেখ মাস শেষ হতে চলল অথচ কালবোশেখীর কোন চিহ্ন নেই এখনো।

—আচ্ছা সোনাদি, তোমাকে কেউ কিছু দেয় না? রমলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

অন্যমনস্ক গলায় সোনা বলল, কে দেবে?

—কেন, তুমি তো থিয়েটার করছ আবার, কতো ছেলের সঙ্গে তোমার আলাপ হচ্ছে।

সোনা তখনো আকাশ দেখছিল। কালো একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে আকাশে,

বিন্দুটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে সোনা দেখল, না কালো নয়, বাদামী রঙে একটা চিল পাক খেতে খেতে নেমে আসছে। রমলার গলার সুরে বিজয়িনীর ভাবটা যেন বড় বেশী ফুটে উঠল, বাইরে তপ্ত গনগনে রোদের মতোই ঈর্ষায় সোনার বুকের ভেতরটা জ্বলতে লাগল, সেই জ্বালায় মুহূর্তের মধ্যে মিথ্যা দিয়ে সে তৈরী করে নিল এক কাল্পত মিনার তারপর সেই উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সোনা বলল, তা হচ্ছে বইকি। একজন তো একখানা টেরিলিনের শাড়ীও দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি, আমার প্রেস্টিজে লাগে।

রমলার ফর্সা সুন্দর মুখখানা কালো হয়ে আসছিল, লেডিজ ব্যাগটা হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, এখন তবে যাই সোনাদি, বড্ড মাথা ধরেছে।

রমলা চলে যেতে সোনাও উঠে দাঁড়াল। আজ শনিবার, রিহার্স্যাল আছে। শনিবারের রিহার্স্যালগুলো বেলা তিনটেয় শুরু হয়ে যায়, ভেঙেও যায় সন্ধ্যে ঘোর না হতেই। যারা চাকরি-বাকরি করে শনিবারের সন্ধ্যাটা তাদের কাছে বেশ দামী বলে সন্ধ্যার পর কেউ আর থাকতে চায় না। শাড়ী ব্লাউজ পাল্টে চুল বেঁধে সোনা সামান্য প্রসাধন করল। বেশি কতগুলো ক্রীম পাউডার ঘষলে তাকে আর এমন কিছু রূপসী দেখাবে না, প্রচণ্ড গরমে সেগুলো ঘামে ধুয়ে বরং তার মূর্তিটাকে আরো কিম্ভূতকিমাকার করে তুলবে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতে সোনার চোখে পড়ল, গাছের ছায়াগুলো বড় হচ্ছে, বেলা পড়ে আসছে বলে রোদের তীব্রতাও এখন অনেক কম। হেঁটে পথ চলতে চলতে নিজেকে বড় নিঃস্ব রিক্ত মনে হচ্ছিল সোনার, রমলার কাছে মিথ্যে বলে বাহাদুরি নেওয়ার পর এখন সোনা নিজের রিক্ততাকে শূন্যতাকে যেন আরো বেশি করে অনুভব করতে পারছিল। অনেক আঁতিপাঁতি করে খুঁজল তবু মনের মধ্যে কোনো পুরুষের ছায়া সোনা দেখতে পেল না। সোনার মনে হচ্ছিল যেন পুরুষ নামধেয় কোন মানুষ, তা সে যেই হোক না কেন যেমনই হোক না কেন, তার সঙ্গে যদি দুদিনের জন্যও অন্তরঙ্গতার মিথ্যে অভিনয় করে পরে তাকে উপেক্ষা করে চলে যায় তবু সেই ছায়া, কায়াহীন সেই স্মৃতিটা সে বুকে ধরে রাখবে, রেখে শূন্যতার মুহূর্তগুলিতে সেই ছায়ার সঙ্গে কথা বলবে, কাঁদবে হাসবে। কোনো একটা ছায়া একটা স্মৃতির কথা ভাবতে গিয়ে শুভেন্দুর কথাই মনে পড়ল সোনার, মনে পড়তে যেন এতক্ষণে সোনার শূন্য নিঃস্ব মনটা একটা অবলম্বন পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তীব্র হর্ণের শব্দে সোনা সচকিত হল। মোড়ে এসে পড়েছে, এখান থেকে বাস ধরতে হবে। বাস স্টপে লোকজন কম, বাস এলে সোনা দেখল বাসেও তেমন ভিড় নেই। তবে লেডিজ সিটগুলো প্রায় ভর্তি, ম্যাটিনী শোয়ের জন্যই বোধহয়। বাসের কণ্ডাক্টরগুলো যেন মুখিয়ে থাকে, সোনা সিটে বসেছে কিনা বসেছে অমনি এসে হাজির। টিকিট কেটে সোনা বাসের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, শুভেন্দুর কথা মনে পড়ায় তার নিজেকে খানিকটা সুখী পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছিল। শুভেন্দু অবশ্য বিবাহিত, শুধু বিবাহিত কেন, সোনা নিজেই বা এমন কি কচি খুকি, শুভেন্দুর মতো অমন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ অথচ অবিবাহিত কেন ছেলেই বা আলাপ জমাতে আসছে তার সঙ্গে। সন্ধের দিকে পাড়ায় যে টিউশনিটা সোনার বছরখানেক ধরে জুটেছে, সেই ছাত্রীরই দাদা শুভেন্দু। ভালো সেতার বাজায় শুভেন্দু, সোনা যে খুব একটা গান-বাজনার সমঝদার তা নয়, তবু একদিন পড়ানো শেষ হওয়ার পর বারান্দা দিয়ে ফিরে আসবার সময় সেতারের বাজনা শুনে সে মুগ্ধ চমৎকৃত হয়ে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার পা দেখা যাচ্ছিল কিনা কে জানে ভারী পর্দার আড়ালে সেতারের বাজনা থেমে গিয়েছিল হঠাৎ, দ্বিধাজড়িত পায়ে সংকুচিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকেছিল সোনা।

—বসুন, একটা চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে শুভেন্দু বলেছে, আপনি বুঝি গান-বাজনা খুব পছন্দ করেন?

সোনা সহজে আড়ষ্টতা কাটাতে পারছিল না, চেয়ারে বসবার পরও কেমন একটা অস্বস্তিতে তার গা কাঁপছিল, খুব কষ্টে মৃদু একটা হাসি মুখে ঝুলিয়ে সে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করতে করতে বলল,

না, খুব একটা নয়, তবে গান-বাজনা শুনতে কার না ভাল লাগে বলুন!

—নতুন একটা সুর তুলেছি, শুনবেন? উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই শুভেন্দু বাজনা শুরু করেছিল। অনেকক্ষণ বাজিয়েছিল সেদিন। তারপর বাজনা শেষ হলে সোনার চোখে চোখ রেখে শুভেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন লাগল বলুন?

সোনা হেসে বলেছিল, চমৎকার!

শুভেন্দুর সঙ্গে আলাপের সেই সূ... পাত। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই সো... বাজনা শোনার ডাক পড়ত। সঙ্কোচ ... গিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে সোনার সম্প... ক্রমশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠছি... এমনিভাবেই একদিন বাজনা শোনানোর ... আচমকা শুভেন্দু তাকে বলেছিল, আ... তো আগে থিয়েটার করতেন?

মৃদু হেসে সোনা বলেছিল, কে ব... আপনাকে?

—বলবে আবার কে! পাড়ায় কে ... জানে? যাকগে, আমাদের অফিস ... থিয়েটার করছে, পার্ট করবেন আপনি?

—আপনিও পার্ট করছেন ... সোনার গলায় কিছুটা কৌতুকের সুর।

—না, আমি মিউজিক দিচ্ছি, ক... না পার্ট করবেন কিনা? নায়িকার ... কিন্তু হবে না আগেই কন্ট্রাক্ট ... গেছে।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—অত ভাববার কি আছে, বলুন ... রাজী কিনা? ভয় নেই, বিনে পয়... আপনাকে খাটাব না আমরা। সহ-নায়িক... রোল, গোটা যাটেক টাকা পেয়ে যাবেন ...

সোনার মনে যে ইতস্তত ভাবটা ... সহ-নায়িকার ভূমিকা শুনে তা কেটে গে... তাকে যে শাশুড়ী মা কি বৌদি সা... হবে না এতেই সে খুশি। সহ-নায়ি... চরিত্রগুলো সাধারণত ... ছলনাময়ী ... বটে, তবে বয়সে যুবতী নিঃসন্দেহে।

—বেশ, আমি রাজী। খুশি ম... সোনা বলেছিল।

—তাহলে কাল ...কে রিহার্স্যা... আসুন।

—কিন্তু টিউশনির কি হবে? সকা... পড়াতে হয় তাহলে?

—সে ব্যবস্থা আমি করব।

গন্তব্যস্থলে এসে গিয়েছে, সোনা ... থেকে নেমে রাস্তা পার হল। ... বাড়ীটার দোতলায় রিহার্স্যাল হয়, ... কাউকে দেখতে না পেয়ে সোনা ... রিহার্স্যাল শুরু হয়ে গেছে। সিঁড়ি দি... ওঠবার সময় খলনায়কের পার্ট শুন... পাচ্ছিল সোনা।

সন্ধ্যা সাতটায় রিহার্স্যাল শেষ হল ... পথে বেরিয়ে শুভেন্দু বলল, চলু... টার্মিনাস অব্দি হেঁটে যাই, বাসে যা ভি... এখান থেকে উঠতে পারবেন না।

—চলুন।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল। সোনা ঠিক এখুনি বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। তার কেবলি মনে হচ্ছিল, কোথাও একটু বসতে পারলে ভালো হোত শুভেন্দুর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকার জন্য

তার সঙ্গে কথা বলে কিছুটা সময় কাটাবার জন্য একটা দুর্নিবার ইচ্ছা সোনার মনে জেগে উঠছিল। ত্রিকোণ পার্কটার কাছাকাছি এসে সোনা বলল, আর হাঁটতে পারছি না, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।

সোনার দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু কি বুঝল কে জানে, মৃদু হেসে বলল, তাহলে ঐ পার্কটায় বসবেন না কি একটু?

চলুন না!

পার্কের ভেতরটা অন্ধকার। অল্প পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে ল্যাম্পপোস্টগুলো মাথায়। সামান্য আলোয় এখানে-ওখানে কিছু কিছু মানুষের মূর্তি চোখে পড়ছে। একটু নিরিবিলি দেখে ঘাসের ওপর বসল দুজনে। অনেকক্ষণ কেউই কোনো কথা বলল না, বসবার পর শুভেন্দু যে সিগারেটটা ধরিয়েছিল এখন সেটা শেষ হয়ে এসেছে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে সে বলল, আচ্ছা, আপনি তো প্রাইভেট এম-এ পরীক্ষাটা দিলেও পারেন?

—দেব তো ভাবি, সোনা বলল, কিন্তু নোটস পাই কার কাছে?

—ইতিহাসে দেন তো চেষ্টা করে দেখি।

—দেখুন না।

এরপর আবার চুপচাপ, দুটি মানুষকে ঘিরে নৈঃশব্দ নেমে এল। অন্ধকার আকাশে তারা জ্বলছে, পার্কের ঘেরা গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় দুলছে, সিরসির শব্দ উঠছে পাতায় পাতায়, মাঠের ঘাস থেকে বুনো একটা গন্ধ হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। হাত মুঠো করে কিছুটা ছিঁড়ে শুভেন্দু বলল, এক এক সময় কি মনে হয় জানেন?

—কি? সোনা অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করল।

—মনে হয় অনেক আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হতো।

—অনেক আগে মানে?

—মানে যখন আমার বিয়ে-থা হয়নি সেই সময়।

সোনার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। সেই ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরার সময় ছেলেদের সঙ্গে কথা বললে, তাদের কাছাকাছি গেলে সমস্ত শরীরে যেমন শিহরন জাগত এখন সে যেন দেহের শিরায় শিরায় প্রতি রোমকূপে সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ অনুভব করে শিউরে উঠল, ধরা গলায় বলল, কেন, তখন দেখা হলে কি করতেন?

শুভেন্দু এ কথার কোন জবাব দিল না, মুখ নিচু করে একমনে হাত দিয়ে নরম ঘাসগুলো ছিঁড়ে আনছিল। শুভেন্দু আর কিছু না বললেও সোনা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল তখন শুভেন্দু সোনার আরো কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে পারত, তার মাথাটা শুভেন্দুর বুকে টেনে নিত কিংবা সোনা নিজেই শুভেন্দুর বলিষ্ঠ রোমশ বুকে মাথা রেখে ফিসফিসিয়ে বলতে পারত—

কাছেই কোন গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত আটটা বাজার শব্দ হল। সেই শব্দে শুভেন্দু চমকে উঠে বলল, ইস, ভুলেই গেছি একদম, আমার যে আজ ছেলেটাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

—কেন, কি হয়েছে আপনার ছেলের?

—না, তেমন কিছু নয়, কদিন ধরেই সর্দি-জ্বর মতো হচ্ছে। তবু ডাক্তারখানায় একবার না গেলে এই নিয়ে বাড়ীতে হুলুস্থুল বেধে যাবে।

বাড়ীতে কি কি হতে পারে সেই সম্ভাব্য আতংকে শুভেন্দু উঠে পড়ল। সোনাও উঠল।

শুভেন্দু জোর পায়ে হাঁটছিল। হাঁটছিল তো না, যেন দৌড়াচ্ছিল। সোনা শুভেন্দুর সঙ্গে হেঁটে পারছিল না, অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছিল। স্ত্রীর ধমকের ভয়ে, সোনার মনে হচ্ছিল, শুভেন্দু যেন পায়ে ঘোড়ার বেগ পেয়েছে। পেছনে থেকে সোনা দ্রুত এগিয়ে যাওয়া শুভেন্দুকে ধরবার জন্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু সোনা যতই এগোচ্ছিল, শুভেন্দুর সঙ্গে সোনার দূরত্বটা ক্রমশই বাড়ছিল। সোনার মনে হচ্ছিল, হাজার চেষ্টা করলেও সে আর এখন শুভেন্দুকে ধরতে পারবে না। শুধু এখন কেন, কোনোদিনই না।

এখন, গাছের পাতায় শেষ বিকেলের হলুদ আলো মরে আসছে যখন, শহরতলীর পথে হাঁটতে হাঁটতে সোনা যতই বাড়ীর কাছাকাছি হতে থাকল, ততই তার মনে হচ্ছিল ত্রিশ টাকায় শাড়ীটা কিনে সে একেবারেই ঠকে গিয়েছে। এমনকি রঙটাও, আসলে যে-রঙটার জন্যই শাড়ীটা তার ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়, এমন কিছু আহামরি নয়। শাড়ির যে-পাড়টা তার কাছে বেশ নতুন ধরনের বলে মনে হয়েছে, তাও হয়তো মেজদি হালফিলের ডিজাইন বলে মনে করবে না। আজ কত বছর হয়ে গেল সোনা নিজের শাড়ি কি ব্লাউজের কাপড় কখনো একা কিনেছে বলে মনে পড়ে না। শাড়ী-ব্লাউজ কি আরো সব মেয়েলী টুকিটাকি কেনাকাটার ব্যাপারে মেজদির রুচি-পছন্দের ওপরই ইদানীং কয়েক বছর ধরে সোনা নির্ভর করে আসছে। দরদাম বলো, রং কিংবা ডিজাইন বলো, এসব ব্যাপারে মেজদি ভীষণ চৌকশ। কিন্তু আপাতত মেজদির মনের যা অবস্থা, বিশেষ গত পরশুদিন পাত্রপক্ষ তাদের অপছন্দের কথা জানিয়ে দেওয়ার পর থেকে প্রায় সব সময়ই হেনার যে মনমরা ভাবটা সোনা লক্ষ্য করছে, নিতান্ত তুচ্ছ করলেও, হেনা যেভাবে বাড়ীর সকলের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছে, তাতে কাপড় কেনবার জন্য মেজদিকে সঙ্গে যাওয়ার কথা সোনা মুখ ফুটে বলতে পারেনি, বলা উচিতও না। অথচ হেনার মনের ভাব স্বাভাবিক হয়ে আসার জন্য সোনা যে আর দুটো দিন অপেক্ষা করবে এমন উপায় নেই। প্রায় সব শাড়ীগুলোই, শাড়ীই বা আর কটা, ছিঁড়ে এসেছে, যে দু' একখানা ফেঁসে যেতে কিছুদিন দেরী আছে, সেগুলোর আবার কেমন রং জ্বলে গেছে এরই মধ্যে। তাও না হয় একটু সাবধানে সাবধানে ওই শাড়ীগুলো পরেই কোনমতে কিছুদিন চালিয়ে দিত পারত সোনা, কিন্তু এখন যেমন-তেমন পোষাকে শুভেন্দুর সামনে গিয়ে কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না সোনা। ত্রিকোণ পার্কের অন্ধকারে ঘাসের, ওপর বসে শুভেন্দু তার বিয়ের আগে সোনার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে যে আক্ষেপ জানিয়েছে, তারপর থেকে শুভেন্দুর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার একটা অদ্ভুত ঝোঁক এসে গেছে সোনার। কোন লাভ নেই, শুভেন্দু বিবাহিত, ইচ্ছাপূরণের জন্য স্ত্রী-পুত্রের বন্ধন ছিন্ন করে শুভেন্দু যে কোনদিন সোনার সঙ্গে স্থায়ী কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে না, ততখানি দৃঢ়তা, ততখানি আবেগও যে শুভেন্দুর নেই এসবই সোনার জানা, তবুও শুভেন্দুর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে মেলে ধরতে সোনার ভাল লাগে। তাই ফ্যাকাশে পুরনো শাড়ী পরে শুভেন্দুর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা সোনা ভাবতে পারে না, শুভেন্দুর মুগ্ধ দৃষ্টিটা সোনার কাছে এখন অনেক অনেক মূল্যবান।

থিয়েটারে অভিনয়ের পারিশ্রমিক বাবদ সোনা ষাট টাকা পেয়েছে, হল থেকে বাড়ী পৌঁছনোর জন্য ট্যাক্সি ভাড়া মিলেছে আরো দশ টাকা। ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরতে সেদিন তার ছ' টাকা লেগেছিল, কাজেই কাপড় কিনতে ত্রিশ টাকা এবং এবং বাস-ভাড়া গোটা দেড়েক টাকার মতো ধরলে এখনও তার কাছে বত্রিশ টাকা ও কিছু খুচরো পয়সা রয়ে গেছে। দরকার হলে এখনো সে আর একখানা শাড়ি অনায়াসে কিনতে পারবে। সেই শাড়িখানা কেনবার সময় মেজদিকে অবশ্যই সঙ্গে নেবে সোনা, বোকার মতো ঠকে আসবার জন্য একা দোকানে যাবে না কিছুতেই।

বাড়ির দরজায় পা দিয়ে সোনা মনীশকাকার গলার আওয়াজ শুনতে পেল। বাবার ছোট ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মনীশকাকা। একটু আমুদে, বয়েস কিছু কম হয়নি, বাবার চেয়ে বড় জোর বছর ছয়েকের ছোট, এখনো বোধহয় সেইজন্যই চেহারায়ও তেমন বুড়োটে ভাব আসেনি, গলাও বড়ো, কোন কথাই আস্তে বলতে পারেন না। সোনা ঘরে ঢুকতে মনীশকাকা বললেন, এই তো সোনাও এসে গেছিস, তুইও শুনে রাখ। তোদের সকলের নেমন্তন্ন সামনের রোববার, মঞ্জুর বিয়ে।

মেঝের দিকে চোখ রেখে অবনীশ বসেছিলেন, মা আর মেজদি ছোটকাকার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ছোটকাকা অবনীর দিকে

তাকিয়ে বললেন, সদ্বংশের ছেলে, ভালো চাকরি, দেখতে-শুনতেও মন্দ না। এখন মঞ্জুর বরাত আর তোমাদের আশীর্বাদ।

মায়ের ঠোঁটদুটো এইবার নড়ে উঠল, কিছু না বললে ভালো দেখায় না যেন, সেইজন্যেই কোনমতে বললেন, ভালো ঘরে ভালো বরে মঞ্জুর বিয়ে হবে এ তো জানা ঠাকুরপো। তোমার মেয়ে বলে বলছি না, আমাদের আত্মীয়কুটুম্ব জানাশোনার মধ্যে মঞ্জুর মতো সুন্দরী মেয়ে কে আছে বলো?

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন ছোটকাকা, তারপর বললেন, এখন ভালোয় ভালোয় শুভ কাজটা হয়ে গেলে বাঁচি। মঞ্জুর বিয়ের পর আর আমাকে পায় কে? আমি মুক্ত। মেয়ের বিয়ের দায় যে কি সে তো তুমি হাড়ে হাড়েই বুঝতে পারছ?

অবনীশ ঘাড় হেঁট করেছিলেন, ছোট-কাকার কথাগুলো শোনবার পর যেন আরো একটু ঝুঁকে পড়লেন। ছোটকাকার ছোট মেয়ে মঞ্জু, বয়েস উনিশ পার হয়নি যার, তারও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, অথচ এতটা বয়েস হল তবু হেনা-সোনার কোনো ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত করতে পারলেন না, সেই লজ্জায় অবনীশ যে এখন বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন, অবনীশের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝের ওপর নড়ছে দেখে সোনা তা বেশ বুঝতে পারছিল।

ঘরের ভেতর কেউই কোন কথা বলছিল না, আড়চোখে একবার হেনা, একবার সোনার দিকে চেয়ে ছোটকাকা বললেন, মেজদার কাছে শুনেছিলাম হেনাকে নাকি কারা দেখে-টেখে গেছে, তা ঠিক হল কিছু?

—না, হল আর কই, শুকনো গলায় মা বললেন, মেয়ে পছন্দ হয়নি ও-পক্ষের।

ছোটকাকা বললেন, বয়েস হয়ে গেলে তখন কি আর কেউ সহজে পছন্দ করতে চায়?

ছোটকাকার কথার মধ্যে হয়তো কাউকে আহত করবার, কাউকে অপমান করবার কিছুমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর কথাগুলো হয়তো নিছক একটা সত্যের নির্দোষ আবৃত্তি মাত্র কিন্তু ওই কথাগুলোই যে হেনাকে ভীষণ নির্মম এক আঘাতে বিচলিত করে দিয়েছে, হেনার কালো হয়ে আসা মুখের দিকে তাকিয়ে সোনা টের পাচ্ছিল। মাথা নিচু করে হেনা ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাও যেন পালাবার চেষ্টা করছিলেন, এখন একবার রান্নাঘরে যেতে পারলে হয়তো হাঁফ ছাড়তে পারবেন, বোধহয় সেই উদ্দেশ্যেই কাকা যে চা খান না তা ভুলে গিয়ে বললেন, তুমি একটু বসো ঠাকুরপো, আমি এখুনি চা করে আনছি।

ছোটকাকা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, তুমি মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছ বৌদি, আমি চা খাই না সে তো তুমি জান। আমি আর বসব না, এখনো কত জায়গায় যেতে বাকি। যাকগে, তোমরা সবাই যাবে কিন্তু, দাদাকেও নিয়ে যেও। শ্রীরামপুর এমন কিছু দূর নয়।

ছোটকাকা ঘর থেকে বেরিয়ে জুতো পায়ে দিলেন। মা ছোটকাকার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত গেলেন। পাশের ঘর থেকে মেজদির চিৎকার শোনা গেল তখন। সমানে চেঁচিয়ে চলেছে, এ-ঘর থেকে কান খাড়া করে সোনা চিৎকারের মর্ম উদ্ধার করল। বিকেলে গা ধোওয়ার সময় হেনা কানের দুল খুলে টেবিলের ওপর রেখে-ছিল, এখন কে তার সেই দুল সরিয়েছে, এ-বাড়িতে কোনো জিনিস কোথাও রাখবার উপায় নেই, যখন-তখন সবাই ঘরের জিনিসপত্তর এলোমেলো করে রাখে, হেনার কোনো জিনিসের ওপর কারো এতটুকু দরদ নেই, গায়ের রক্ত জল করে হেনা ওই দুল-জোড়া কিনেছে, কেউ তাকে একটুকরো সুতোও আজ পর্যন্ত কিনে দেয়নি, এখন যদি সে ওই দুলজোড়া না পায়, তাহলে কাউকে ছাড়বে না হেনা, দিনের পর দিন এই অত্যাচার হেনা আর সহ্য করবে না ইত্যাদি। নিজের মনেই মলিন হাসল সোনা। আজকাল কি যে হয়েছে মেজদির, কিছুই মনে থাকে না। হেনার দুলজোড়া কেউ সরাতে যায়নি, নিজেই কোথায় রেখেছে তার ঠিক নেই, এখন ভুল করে টেবিলের ওপর খুঁজছে, খুঁজে না পেয়ে বাড়ি মাথায় করছে। সোনা গিয়ে দু-পাঁচ মিনিট খুঁজলেই আগেরবার যেমনি আংটিটা বালিশের তলা থেকে বের করে দিয়েছিল, এবারও দুলজোড়া বের করে ফেলবে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে সোনার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। জানালার বাইরে অন্ধকারে কালো কালো গাছগুলোর দিকে নির্ঘুম চোখ মেলে সে জেগেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল গাছের পাতায় মৃদু সিরসির শব্দ উঠছিল। পাশে মেজদি একভাবে শুয়ে আছে, কোন-

রকম উসখুস করছে না দেখে সোনার হচ্ছিল, মেজদি ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ে হাত দিয়ে সোনা মৃদু ঠেলা মেজদি, এই মেজদি, ঘুমোলি নাকি?

—উ-না, কেন? হেনা পাশ ফিরল

—মঞ্জুরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে!

—হওয়াই তো ভালো।

—সে কথা নয়, ছোটকা কেমন দিয়ে গেল দেখলি তো? যেন আম কেউ পছন্দও করবে না, বি করবে না।

—আমাদের বিয়ে হবে তুই ভা না কি এখনো? হেনার গলায় যেন বেজে উঠল, সে গুড়ে বালি। নে ঘুমো, আর বকাস নি।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হেনা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। হেনার ছ নিশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে তখনো জেগে রইল। হেনার নি সিদ্ধান্তটা সোনাকে কেমন আনমনা দিয়েছে, গাছের পাতায় সিরসির মতো সোনার বুকের মধ্যেও যেন গুলো দীর্ঘনিঃশ্বাস একটানা থাকল। অনেকক্ষণ পরে কালো ছায়ামূর্তির মতো গাছগুলোর মাথায় ফালি চাঁদ ভেসে উঠল, যেন হেনার মত একটুকরো ব্যঙ্গের হাসি উঠেছে আকাশের কালো মুখে।

সারাটা দুপুর কি অসহ্য গ এতটুকু হাওয়া নেই, গাছের পাতা একটুও নড়ছে না, আঁকা ছবির স্থির নিষ্পন্দ সব। সোনা ঘর্মা পুরো দুপুরটা বিছানার চাদর বালিশ ঘামে ভিজে একশা। তারপর গড়িয়ে গেলে বিকেলের দিকে কখন সময় ঘুমিয়ে পড়েছে সোনা আর ঘুম ভাঙল এই এখন, রাস্তার ল্যা পোস্টের খানিকটা আলো জানাল ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে যে আবছা আলোয় ঘরের সবকিছু মুহূর্তে অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে জেগে উ সোনার চোখের ওপর। ঘুম ভেঙে যাও পরও সোনার বিছানা ছেড়ে উঠতে করছিল না, কেমন এক ধরনের আ তার সারা শরীরে ভর করছি ট্যুইশনিতে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়ে কিন্তু নিজের ভেতর সে এতনা তাগিদ অনুভব করছিল না। অথচ ট্যুইশনিটাই তার সারাদিনের এক আকর্ষণ ছিল। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে গুলোতে শুধু প্রতিটি সন্ধ্যা ছিল সো কাছে বড়ো অপরূপ, কেননা ট্যুইশ সুযোগে ওই সময়ে খানিকক্ষণ শুভেন্দ সান্নিধ্যে থাকতে পারত সোনা, এক পুরুষ সেই সময় তার শরীরের কা ছুঁলেও ছুঁতে পারা যায় এমন কাছাকা এসে দাঁড়াত, তার সঙ্গে কথা বলত,

চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা, তার গলায় চাপা আবেগ। কিন্তু আজ কখন ট্যুইশানিতে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, তবু সোনা এতটুকু চাঞ্চল্য এতটুকু আগ্রহ অনুভব করতে পারছে না, বরং ভীষণ একটা অনিচ্ছা যেন তার মনের মধ্যে জেগে উঠছে, মনে হচ্ছে একদিন ট্যুইশানিতে না গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। থিয়েটার কবেই শেষ হয়েছে, কাজেই রিহার্স্যালের পালাও চুকেছে। তাই ফের সন্ধ্যার দিকেই ট্যুইশানিটা সারতে হচ্ছে সোনাকে। আজকাল কতক্ষণ ধরে সোনা ছাত্রীকে পড়ায়, বেশ রাত হয়ে যায় ফেরবার সময়, তবু শুভেন্দুর দেখা পাওয়া যায় না। কতোদিন সেতার ছোঁয় না শুভেন্দু, হয়তো সেতারের ঢাকনাটার ওপর কতো ধুলো জমে গেছে এতোদিনে। শুভেন্দুর শেষ সেতার বাজানো কবে শুনেছে সোনা মনে করতে চেষ্টা করল। তা দিন পনের তো নিশ্চয়ই, একদিন বেশি হবে তো কম না। কি একটা উপলক্ষে সেদিন অফিস-টফিস সব বন্ধ ছিল, মেজদিও স্কুলে যায়নি সোনার বেশ মনে আছে। ছাত্রীকে পড়ানো হয়ে গেলে সোনা শুভেন্দুর সেতার বাজানো শুনেছিল। সেদিন অনেক বেশিক্ষণ ধরে সেতার বাজিয়েছিল শুভেন্দু। বাজানো শেষ হলে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকবার পর চলে যাওয়ার জন্য সোনা উঠে দাঁড়াতে শুভেন্দু বলেছে, আজই হয়তো শেষবারের মতো বাজনা শোনালাম আপনাকে।

—কেন? শেষবার কেন? অস্ফুট স্বরে সোনা জিজ্ঞেস করেছিল।

—দিল্লীতে বদলী হয়ে যাচ্ছি, শুভেন্দু বলেছে, তবে একেবারে নিরামিষ বদলী না, প্রোমোশন পাচ্ছি। প্রায় শ'খানেক টাকা মাইনে বাড়বে আমার, এই বাজারে একেবারে কম না, আপনি কি বলেন?

শুভেন্দু খুশির ভাবটা চেপে রাখতে পারছিল না। সোনার মুখ ছাইয়ের মত সাদা ফ্যাকাশে হয়ে আসছিল, কি যেন একটা গুমরে উঠছিল বুকের ভেতর, তবু পুরনো কাপড়ের টুকরোর ওপর সূচীমুখে রঙীন ফুল তোলবার মতো মলিন মুখে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে সোনা বলল, সে কথা আর বলতে, খাওয়াচ্ছেন কবে তাই বলুন?

—মাইনেটা পেতে দিন, দেখব কত খেতে পারেন আপনি।

চলে আসবার আগে সোনা শুভেন্দুর মুখখানা ভালো করে দেখে নিয়েছিল, চোখ নাক ঠোঁট সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল, এমনভাবে যেন শুভেন্দুর মুখের আদলটা সহজে হারিয়ে না যায়, যেন চোখের সামনে থেকে শুভেন্দু সরে গেলেও সোনার বুকের ভেতর ওই মূর্তির ছায়াটা ঠিক ঠিক ধরে রাখা যায়।

অন্ধকারে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে সোনার আর ভালো লাগছিল না। মাথাটাও ঝিমঝিম করছে, হয়তো বিকেলে চা খাওয়া হয়নি সেজন্যেই। চায়ের জন্য ভেতরে ভেতরে তাগিদটা ক্রমশ বাড়ছিল, সোনা বিছানা থেকে নেমে দেওয়ালে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। বারান্দায় পা দিয়ে সোনা রান্নাঘরের দিকে এগোল। রান্নাঘরের পাশের ঘরের ভেতর সোনা অবনীশ মা হেনা, এমন কি যে বনানী খাওয়ার সময় ছাড়া বড়একটা নিজের ঘর থেকে বেরোয় না তাকেও দেখল। ধরে ঢুকে ব্যাপারটা বোঝবার জন্য সে জিজ্ঞাসু চোখে সকলের মুখের দিকে তাকাল, সকলেরই মুখ গম্ভীর, কেবল বনানীর মুখে একটু আলগা হাসি ফুটে আছে যেন বোঝা যায়। মুখে হাসিটুকু থাকার জন্য ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে বনানীকেই পছন্দ করল সোনা, চোখের ইসারায় বনানীকে কাছে ডেকে বলল, ব্যাপার কি?

সোনার কানের কাছে ফিসফিস করে বনানী বলল, খুউব সাংঘাতিক ব্যাপার। রমলার বোধহয় বাচ্চাকাচ্চা হবে, এই নাকি তিনমাস চলছে।

—ধ্যেৎ, তা কি করে হয়?

—তা কি করে হয়, বনানী ভেংচে উঠল, হয় না কেন শুনি? তুমি আর ন্যাকামি কোরো না, ছোঁড়া দুটো দিনরাত ওদের ঘরে পড়ে থাকত, দেখনি তুমি?

রমলাদের ঘরের দিকে তাকাল সোনা। কেমন থমথমে নিঃশব্দ ওদিকটা, দুটো ঘরেই আলো জ্বলছে অথচ কোন সাড়াশব্দ নেই, মানুষজন যে আছে এমন বোঝা যায় না। ওদিক থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে সোনা এবার নিজেদের ঘরের প্রত্যেকের ওপর চোখ ফেলল। অবনীশের শূন্য বোবা দৃষ্টির মধ্যেও কেমন একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে এখন। মা হেনাকে সোনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন, যেন ভীত সন্ত্রস্ত চোখে পরখ করে নিচ্ছেন হেনা বা সোনাও রমলার মতো কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলেছে কি না। মায়ের জন্য অবনীশের জন্য সোনার ভীষণ মায়া হচ্ছিল। ভয়ে হিম হয়ে গেছেন অবনীশ, আতংকে মায়ের গা কাঁপছে। অথচ বেচারীরা বুঝতে পারছে না তাঁদের এই আতঙ্ক কতো নিরর্থক, হেনাকে বা সোনাকে এখন আর ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। হেনার বয়েস চৌত্রিশ, সোনাও ত্রিশ পার হল গত সপ্তাহে, এখন আর তাদের দেহে বাসনারা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো উত্তাল হয় না কখনো, মরা নদীর মতো ইচ্ছেগুলো এখন তিরতির করে বয়ে যায়, শুধু। মনের মধ্যে কোনো শূন্যতা, কোনো নিরবলম্ব হাহাকার জেগে উঠলে হেনা এখন বড়জোর আংটি কিংবা কানের দুল কি স্যুটকেশের চাবি নিজেই কোথায় রেখে দিয়ে ভুলে যাবে, খুঁজে না পেয়ে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করবে। আর সোনা প্রতিটি শূন্যতার মুহূর্তে মনের ভেতরে বন্দী শুভেন্দুর ছায়ামূর্তিটার সঙ্গে কথা বলবে হাসবে কাঁদবে। এর বেশি কিছু না, এখন উত্তরতিরিশে এর বেশি আর কিছু করা যায় না।

প্রেক্ষাগৃহ

ভারতীয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অকল্পনীয় জোরালো বক্তব্য

শবরী চিত্রে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

একদা বলা হোতো, আজ বাংলা যা ভাবে, কাল সারা ভারত তার অনুসরণ করে। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, আজ আর সেকথা খাটে না। অন্তত একথা নির্দ্ধিধায় বলা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রকারেরা তাঁদের সামাজিক কর্তব্যকে দূরে পরিহার করে নিরাপদ পথে বিচরণ করাকেই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছেন বলে আজ আর তাঁরা স্বাধীন চিন্তার পথিকৃৎ রূপে সম্মানিত নন। নইলে জেমিনীকৃত **হিন্দী ছবি 'সমাজ কো বদল ডালো'র** অচিন্তনীয় জোরালো বক্তব্য আগে বাংলা ছবির মাধ্যমে ধ্বনিত হওয়া উচিত ছিল।

ভারতীয় সংবিধানে সকল ভারতবাসীর সমান অধিকারের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হলেও দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ঘোরতর অসাম্যের নিদর্শন। একজন ধনীর ঘরের যেমন-তেমন ছেলেকে উচ্চ-শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠাবার জন্যে যখন বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত আইন-কানুন কেমন যেন আপনা থেকেই শিথিল হয়ে যায়, ঠিক সেই সময়েই অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছাত্র অর্থের নিদারুণ অভাবের দরুণ ফিয়ের টাকা জমা দিতে না পেরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিতে পায় না। সম্ভ্রান্ত ভোজসভার উচ্ছিষ্ট ডাস্টবিন থেকে কাড়াকাড়ি করবার সময়ে মানুষকে দেশী কুকুরের মতো আচরণ করতে আজও হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তারস্বরে যতই সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করি না কেন, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের সাহায্য ও পৃষ্ঠ-পোষকতা মাত্র ধনিক এবং উচ্চ মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। দেশে একটি মানুষও নিরন্ন থাকবে না, প্রতিটি মানুষেরই স্বাস্থ্য ও গ্রাসাচ্ছাদনের ভার সরকারের—এমন শপথবাক্য আমাদের শাসনকর্তারা আজও গ্রহণ করেননি; স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ তেইশ বছর গত হওয়ার পরেও তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত নানাবিধ আইন-কানুন সত্ত্বেও যে সমাজ ব্যবস্থা ধনিককে অকুতোভয়ে শ্রমিকদের ওপর জুলুম চালাতে সাহায্য করে, যে সমাজ ব্যবস্থায় অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের জন্যে ভিক্ষাবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তিতে বাধ্য হয়, যে সমাজ ব্যবস্থায় দুঃখিনী বিধবা জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার ও পাবার জন্যে নিজের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে বিষমেশানো খাদ্য খাওয়াতে ও নিজে খেতে বাধ্য হয়, সেই সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে জেমিনীকৃত ইস্টম্যান কলার ছবি 'সমাজ কো বদল ডালো!' এই ছবিটির মাধ্যমে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নিদারুণ ব্যর্থতার কথা এমন সোচ্চার ও মর্মন্তুদ-ভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, ছবিটি দেখবার পরে আমাদের মনে বর্তমান সমাজের প্রতি একটি বিজাতীয় ঘৃণা না জন্মে পারেনি, আমরা অত্যন্ত লজ্জিত অনুভব করেছি এই ঘৃণিত সমাজেরই একজন নাগরিক রূপে। ছবিটি যে তার বক্তব্যকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আমাদের অন্তরে পৌঁছে দিতে পেরেছে, এই হচ্ছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ছবির কাহিনীকার থোপ্পিল ভাসি, সংলাপ রচয়িতা পণ্ডিত মুখরাম শর্মা এবং পরিচালক ভী মধুসূদন রাও—এই ত্রয়ীকে এমন একটি সোচ্চার বক্তব্য সার্থকভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করার জন্যে সাধুবাদ জানিয়ে বলব, ছবিটিতে বেদনা ও বঞ্চনার চিত্রকে মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরবার জন্যে বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা যুক্তিকে বিসর্জন দিয়েছেন। প্রথমেই দৌলতরাম সত্যনারায়ণ কটন মিল'-এর দুই অংশীদারের মধ্য যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল, সে কি মাত্র কর্মীদের দেওয়ালী বোনাস' দেওয়া উপলক্ষেই প্রথম জানতে পারা গেল? যেভাবে দৌলতরাম ও সত্যনারায়ণের মধ্যে অংশীদারির অবসান ঘটল, ব্যাপারটি বাস্তব ক্ষেত্রে কি তত সহজ? যে [illegible] বুদ্ধিতে সত্যনারায়ণ তাঁর ব্যক্তিগত হিসাব উকীল কুন্দনলালের হাতে ছেড়ে দিলেন, তাতে কি করে তিনি একটি বড়ো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মকুশল অংশীদার ছিলেন, তা ভেবে পাওয়া যায় না। প্রকাশ ছিল শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী। মালিকের গুন্ডা দ্বারা তার গোপনে খুন হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আততায়ীর হাতে তার শোচনীয় মৃত্যুর জন্যে ইউনিয়নের তরফ থেকে তদন্ত বা মামলা দায়ের না হওয়া অত্যন্ত বিচিত্র। প্রকাশের স্ত্রী এবং সত্যনারায়ণের কন্যা ছায়া যে বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল এবং নৃত্যগীতকুশলা ছিল, একথা জানা থাকার পরে সে মাত্র শ্রমিকনেতা প্রকাশের স্ত্রী হওয়ার অপরাধে কোনো রকম উপার্জনের পন্থা খুঁজে পেল না, একথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে মন চায় না। নিয়তি কারুর কারুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্মম মূর্তিতে দেখা দেয়। আমাদের নায়িকা ছায়ার

ক্ষেত্রেও হয়ত তাই, এই বলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া উপায়ন্তর নেই।

আবার প্রশংসা করি ওই ত্রয়ীকে—কাহিনীকার, সংলাপ রচয়িতা ও পরিচালককে যে, তাঁরা আধুনিক হিন্দী ছবির অযথা নৃত্যগীত বহুল প্রেমের দৃশ্য, ভাঁড়ামো এবং খল-নায়কের কুসংস্কারপূর্ণ অভিযান রূপায়ণে নিজেদের চিন্তা, শ্রম এবং অর্থকে অযথা ব্যয় না করে একটি যথার্থ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদকে তাঁদের ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন, অথচ ছবিটি মাত্র বক্তৃতামালার পর্যবসিত না হয়ে একটি চিত্তাকর্ষী শিল্পকর্মরূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। গোড়ারদিকে কিছুটা হালকা অংশ থাকলেও ছবিটি স্বাভাবিকভাবেই তার বেদনাময় গুরুগম্ভীর পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে দর্শক কৌতূহলকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করে। অবশ্য ছবিটির আবেদন শুধু দর্শকহৃদয়কেই মথিত করে না, দর্শকের মস্তিষ্ককেও আলোড়িত করে বর্তমানের অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে।

ছবিটিতে শিল্পীরা যেন আশ্চর্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই অভিনয় করেছেন। তবে ওরই মধ্যে উজ্জ্বল বর্তিকার মতো দীপ্যমান হয়ে রয়েছেন শ্রীমতী সারদা নায়িকা ছায়ার ভূমিকায় জীবন্ত অভিনয় করে। কলেজে পাঠরতা নৃত্যগীত পটীয়সী ছায়া থেকে বিষমিশ্রিত অন্ন নিজের সন্তানদের মুখে তুলে দেওয়ার পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানোর ভঙ্গীতে 'আই রে আই রে অই হিন্দোলে লেকে নিদিয়া কী রাণী' গান গাওয়া ছায়া অনেকখানি পথপরিক্রমা—সেই সুদীর্ঘ পথে শ্রীমতী সারদা সাজেসজ্জায়, মেক-আপে রংয়ের তারতম্য ঘটিয়ে আশ্চর্য সাবলীল অভিনয় করে অত্যন্ত সহজ বাস্তবভঙ্গীতে এগিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অভিনয় করছেন, আমাদের মনে হয়েছে, চোখের সামনে আমরা জীবন্ত ছায়াকেই দেখছি। ছায়ার বন্ধবী, উকীল কুন্দনলালের কন্যা বিমলার ভূমিকায় কাঞ্চনার অভিনয়ও হয়েছে চিত্তস্পর্শী। বিশেষ করে ছায়ার বিচার-দৃশ্যে তাঁর 'সমাজ কো বদল ডালো' বাণী দর্শকহৃদয়কে সমূলে নাড়া দেয়। মিলের শ্রমিক নেতা, নায়ক প্রকাশ বেশে অজয় সাহনী তাঁর বাচনে, ভঙ্গীতে চরিত্রটিকে জীবন্তভাবে রূপায়িত করেছেন।

আটাত্তর দিন পরে/সমিত ভঞ্জ এবং কাশী ব্যানার্জি।

আশ্চর্য একটি নতুন টাইপের সৃষ্টি করেছেন প্রকাশের বাৎসল্যময়ী মায়ের ভূমিকায় শম্মী। একটি চমৎকার 'সিংসং-স্টাইলে বাচনের মাধ্যমে একটি পরম প্রীতিকর চরিত্রকে তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রথমে পকেটমার, ঠক এবং পরে প্রকাশের অনুগত কর্মী পূরণের জীবনের অংশীদার চূরণ-এর ভূমিকায় অরুণা ইরাণী একটি স্বচ্ছন্দ, বেপরোয়া, প্রত্যুৎপন্নমতি পথচারিণীকে সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন। সৎপথের পথিক সত্যনারায়ণের ভূমিকায় নাজির হোসেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। মিল মালিক দৌলতরাম ও মিল ম্যানেজার শ্যাম-এর মদমত্ত কুটিল ভূমিকা দুটিতে স্বাভাবিকভাবে রূপদান করেছেন প্রাণ ও প্রেম চোপরা। দুষ্ট বুদ্ধি উকীল কুন্দনলালের ভূমিকায় কানহাইয়ালাল একটি বাস্তব রূপে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের একটি নতুন পরিচয় দিলেন। প্রথমে পকেটমার ও পরে প্রকাশের অনুরক্ত ভক্ত পূরণের ভূমিকায় মেহমুদ অনবদ্য, নিজস্ব ভঙ্গীতে তিনি অতুলনীয়। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে নায়ক-নায়িকার পুত্র ও কন্যার ভূমিকা দুটির অভিনয় ও গান হৃদয়গ্রাহী।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য; বিশেষ করে মনে পড়ছে, চালা-বাড়ীর পিছনে গাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের পটভূমিকায় ছায়ার ছেলে কোলে ঘুমপাড়ানী গানের সুন্দর দৃশ্যটি। ছবিতে সাতখানি গানের মধ্যে 'বিন পানি কী মছলী হৈ তু', 'তারো কী ছাওঁমে স্বপ্নোকে গাওমে' 'ধরতী মাকা মান হামারা', 'অম্মা এক

আবিরে রাঙানো/সুচন্দ্রা, অনিল এবং পরিচালক অমল দত্ত

রেটি দে'—এই চারটি গানই রচনা সুর-যোজনা এবং উপস্থাপনার দিক দিয়ে সার্থক। ছবির শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনাও যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

জেমিনীর 'সমাজ কো বদল ডালো' বক্তব্যের দিক দিয়ে একটি যুগান্তকারী চিত্র।

অন্যান্য বাংলা ছবির হিন্দী রঙীন চিত্ররূপ

১৯৬৭ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি (১ বৈশাখ) যখন হীরেন নাগ পরিচালিত বাংলা ছবি 'জীবনমৃত্যু' মুক্তিলাভ করে তখন বাঙ্গালী ও শিখ—এই দুই বেশে উত্তমকুমার বাঙ্গালী দর্শকদের হৃদয়কে নতুন করে জয় করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিটিও অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদে ডাঃ বিশ্বনাথ রায় রচিত ঐ একই কাহিনীকে অবলম্বন করে ঐ একই 'জীবনমৃত্যু' নামে যে রঙীন হিন্দী ছবিটি সেসাইটি এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো শুরু হয়েছে, তার প্রযোজক ও পরিচালক হচ্ছেন যথাক্রমে তারাচাঁদ বরজাত্যা ও সত্যেন বসু।

হিন্দী সংস্করণের চিত্রনাট্য ও সংলাপ যদিও গোবিন্দ মুনীসের রচনা, তবু আপাতদৃষ্টিতে আমরা বাংলা ও হিন্দীর কাহিনী বিন্যাসে খুব একটা পার্থক্য নজর করতে পারলুম না। সেই ব্যাঙ্কের নতুন কর্মচারীটির সহসা ম্যানেজার রূপে উন্নীত হওয়ায় কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণের চক্রান্তে হওয়া এবং তাদের কারসাজিতে ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বেশ কয়েক বছরের জন্যে জেলে যাওয়া, জেল থেকে বেরুবার পরে রেল দুর্ঘটনায় মৃত বলে প্রচারিত হওয়া এবং জনৈক ধনী দেশীয় রাজার সহায়তায় শিখের ছদ্মবেশে পূর্ব অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া সকল ঘটনাই বাংলা ছবির কার্বন কপির মতোই হিন্দী ছবিতেও ঘটেছে। প্রভেদের মধ্যে—বাংলা ছবিটি ছিল সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীতে তোলা হিন্দীটি রঙীন ইস্টম্যান কলারে অর্থের প্রাচুর্য হেতু এবং সুধেন্দু রায়ের মতো শিল্পনির্দেশক থাকায় ছবিটির দৃশ্যপট, সাজসজ্জা প্রভৃতিও অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। এবং পার্থক্য রয়েছে—শিল্পীদের মধ্যে।

নায়কের ভূমিকায় হিন্দীতে অবতীর্ণ হয়েছেন ধর্মেন্দ্র এবং অভিনয়ে তাঁর স্বাভাবিক নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এখানে কিছুতেই না বলে পারছি না, শিখবেশী উত্তমকুমারের চটক ছিল বেশী। শিখবেশী উত্তমকুমার যখন একে একে তাঁর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, তখন যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দীতে শিখরূপী ধর্মেন্দ্রের ভঙ্গী বা আচরণে সেই রোমাঞ্চের যেন অভাব থেকে গেল। হিন্দীতে নায়িকা দীপার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন রাখী (বিশ্বাস) প্রথম অবতরণে তিনি সার্থকতার যে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। অপরাপর ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত, অজিত কানহাইয়ালাল, রমেশ দেও, জয়রাজ কৃষণ ধাওয়ান, রাজেন্দ্রনাথ, জগীরদার, লীলা চিটনীস, পুণ্যদাস প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ছবির দুখানি গান (তৃতীয়টি প্রথমটিরই পরিবর্তিত রূপ) সুরচিত, সুন্দরভাবে সুরসমৃদ্ধ ও সুগীত।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

> আজি এ প্রভাতে রবির কর?
> কেমনে পশিল প্রাণের পর?
> কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
> প্রভাত পাখীর গান?

—এই কথাই বলে উঠেছিল রাজকুমারী মঞ্জরীর অন্তর, যেদিন তার সেলাই-শিক্ষিকা লাবণ্যদি'র ভাই নির্মল চৌধুরী তার মার্গসঙ্গীত শেখা সংস্কৃতিতে আঘাত হেনে গাইল—'তবু বলে কেন সহসাই থেমে গেলে, বল কি বলিতে এলে?' এ কী গান! এ যেন নতুন করে জীবনকে আহ্বান! নিয়মে চলা নিয়মে বসা, নিয়মে ওঠা, নিয়মে দাঁড়ানো, ঠাসবুনোন 'রুটিন'-মাফিক সর্বশাস্ত্রবিশারদ হয়ে ওঠার শিক্ষা এক মুহূর্তে জলাঞ্জলি গেল। যে-মাকে দেখা মাত্রই সে ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠত, সেই মায়ের মুখের ওপর দৃঢ়কণ্ঠে সে বলল—আমি নির্মলবাবুকে বিয়ে করব। মা বাধা দিতে গেলেন; কিন্তু পারলেন না। বিবাহের সমস্ত ঠিক; লগ্ন আগতপ্রায়। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল, বর—সেই অতি-প্রত্যাশিত নির্মল চৌধুরী এল না। ব্যথায় বেদনায় মুহ্যমান মঞ্জরী। রানীমা শোকে করলেন প্রাণত্যাগ। নির্মল চৌধুরী যেন মুছে গেল মঞ্জরীর জীবন থেকে, জগৎ থেকে। মঞ্জরী নতুন খেলায় মেতে উঠল। এক লম্পট; পানাসক্ত মথুরেশকে সে জীবনসঙ্গী করতে চাইল সকলের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে। বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। বধূরূপে সজ্জিতা মঞ্জরী। সহসা তার কানে গেল রেডিও মারফত সেই কণ্ঠঃ 'একি হোলো, কেন হোলো, কবে হোলো, জানি না।' কে-একজন ইন্দ্রজিৎ গাইছে। কিন্তু এই কণ্ঠ?—ছুটল মঞ্জরী। পেল কি তার ঈপ্সিতকে; প্রকাশ পেল কি, কেন নির্মল চৌধুরী সহসা তার জীবন থেকে মুছে গিয়েছিল?—এ সকল প্রশ্নের উত্তর আছে ছবির শেষের দিকের উত্তেজক দৃশ্যগুলিতে।

নির্মল কেন যে বিবাহ রাত্রে উপস্থিত হল না, এ-কথা মঞ্জরীর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রেখে কাহিনীকার-পরিচালক সলিল সেন হয়ত ছবির সাসপেন্সকে ডিটেকটিভ উপন্যাস-ধর্মী করে তুলতে পেরেছেন, কিন্তু ঐ সঙ্গে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন সুন্দর নাটকীয় পরিস্থিতি ও চরিত্রচিত্রণের সুযোগ। আমরা যদি দেখতুম, মোটর দুর্ঘটনার ফলে হাসপাতালে নীত হবার পরে যখন তার জ্ঞান হল, তখন সে মঞ্জরীকে দেখতে চাইছে; কিন্তু তার দিদি ও জামাইবাবু আসবার পর যখন ডাক্তার জানাল, সে চিরকালের জন্যে তার দুটি চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে, তখন নির্মলেরই সনির্বন্ধ অনুরোধ এল মঞ্জরীকে যেন জানানো হয় সে নিরুদ্দেশ হয়েছে।—অর্থাৎ মঞ্জরী জানবে না, নির্মল কেন বিবাহ করতে গিয়েও পিছিয়ে গেল এবং কেনই বা সে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে, অথচ দর্শক জানবে এই পরিস্থিতিতে চরিত্র-চিত্রণ আরও সুন্দর ও নাট্যসম্ভাবনা-পূর্ণ হয়ে উঠত এবং তখন কেমনভাবে উভয় পক্ষের মিলন সম্ভব হবে, সেইটিই হয়ে উঠত প্রকৃত নাট্যকৌতূহল।

কিন্তু কাহিনীকার-পরিচালক সলিল সেন এই সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ছবির দ্বিতীয় অংশকে করে তুলেছেন অনেকটা ডিটেকটিভধর্মী। এতে ছবির গভীরতা গেছে হারিয়ে এবং ছবির অনেকখানি হয়েছে অনুত্তেজক এবং শুষ্ক।

অভিনয়ে মঞ্জরীর ভূমিকায় তনুজা তার পরিবর্তনশীল চরিত্রটিকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে রূপায়িত করেছেন। নির্মলের ভূমিকা উত্তমকুমারের অভিনয়-গুণে হয়ে উঠেছে জীবন্ত। নিয়মকঠোর রানীমাকে ছায়া দেবী যথোচিতভাবে রূপায়িত করেছেন। উদারপ্রাণ মামাবাবুর ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল দরদী অভিনয় করেছেন। এছাড়া দীপ্তি রায় (লাবণ্য), অসিতবরণ (লাবণ্যর স্বামী), অজয় গাঙ্গুলী (মথুরেশ), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ও জহর রায় (ঘটকদ্বয়), তরুণকুমার (ম্যানেজার) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিশেষ প্রশংসনীয়। ছবির গানের সুরে বেশ অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। বিশেষ 'বন্ধন্ধারের অন্ধকারে থাকব না'—গানটিকে যে ভাবে বারে বারে আনা হয়েছে, তা' রীতিমত বিস্ময়কর হলেও অল্প উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেনি।

হেলেন-এর নাচ-গানের কি খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা ছিল?

উত্তম-তনুজা অভিনীত 'রাজকুমারী' দর্শকসাধারণের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

স্টুডিও থেকে

রাতের রজনীগন্ধা'য় উত্তমকুমার

পুজোর পরই রাধা-পূর্ণ ও অন্যত্র মুক্তি-লাভ করবে অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত এ-আর সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত রূপসী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচী। সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা, সুলতা, রবি, জহর, তপেন, চিন্ময়, জুই, সমিত ভঞ্জ প্রভৃতি ছবিটির প্রধান চরিত্রে আছেন।

সংবাদে প্রকাশ, শ্রীরায়চৌধুরীর তৃতীয় ছবি ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'রাতের রজনীগন্ধার' প্রাথমিক কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অজিত গাঙ্গুলী এই ছবি-খানিরও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আরও জানা গেল- রাতের রজনীগন্ধার নায়ক চরিত্রের জন্য উত্তমকুমার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এবং নায়িকা চরিত্রের জন্যে হিন্দী চলচ্চিত্রজগতের জনৈক জনপ্রিয়া অভিনেত্রী চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন বলে প্রযোজক জানিয়েছেন। এন এ ফিল্মস ছবির পরিবেশক। ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শীগগির শুরু হবে।

মঞ্চাভিনয়

বিপ্লবী ভিয়েতনাম : অশ্রু, রক্ত আর স্বপ্নে জড়ানো একটি নাম—ভিয়েতনাম। আধুনিক রাজনীতির রংগমঞ্চে এই দেশের বর্তমান ঝড়ের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতি-হাস যে আলোড়ন তুলেছে, তা থেকে বোধহয় মানবতাবাদী কোন দেশ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। ভিয়েত-নামীদের সরল সহজ জীবনে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিণ আর ফরাসীদের অত্যাচার নেমে এলো এবং হো-চি মিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য একটি বলিষ্ঠ দল গড়ে উঠলো তারই সংগ্রামী ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম'

অন্ধ অতীত/উত্তমকুমার, পরিচালক হীরেন নাগ এবং স্বরূপ দত্ত। ফটোঃ অমৃত

পালাটি। নিউ প্রভাস অপেরার শিল্পীরা সম্প্রতি এই পালাটি অভিনয় করে শুধু বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সংগে নিজেদের যোগসূত্রই প্রমাণ করলেন না। আজকের যাত্রা-শিল্পের বিষয়বস্তুতেও যথেষ্ট বলিষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান দিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ নাথ রচিত 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম' পালা হিসেবে নিঃসন্দেহে একটি নতুন পদচিহ্ন এঁকেছে, কিন্তু সম্পাদনায় রমেন লাহিড়ী আরো একটু তৎপর হোলে নাটকের সংলাপ ও কয়েকটি অপূর্ব নাটকীয় ভাবাবেগপূর্ণ মুহূর্ত রচনায় শৈথিল্য চোখে পড়ত না। সোয়াং-এর কন্ঠে একই সারিতে সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ আর সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম করে সুকান্তের কবিতায় আবৃত্তি ধ্বনিত হওয়ার কি খুব প্রয়োজন ছিল? আর তা ছাড়া আবৃত্তি যদি আবৃত্তির মতো না হয় তা হোলে রসের হানিই ঘটে, এ সত্যকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। প্রয়োগ পরিকল্পনার দায়িত্বও নিয়েছিলেন রমেন লাহিড়ী, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা প্রকাশে তিনি কোথাও পিছিয়ে থাকেন নি। কিন্তু একটি কথা। শুরুতেই দীর্ঘ নৃত্য পরি-বেশন ও নেপথ্যে কাজী সব্যসাচীর কন্ঠে ভিয়েতনামের পটভূমিকা বিশ্লেষণের কি কোনও উপযোগিতা আছে? আজ ভিয়েত-নামে কি হোচ্ছে, কি হয়েছে এর সংগে আমরা সবাই প্রায় নিবিড় ভাবে পরিচিত, এর জন্য আলাদা করে একটি ভূমিকার কোন প্রয়োজন করে না। তা ছাড়া সব্যসাচীর কন্ঠে সেই প্রত্যাশিত দৃঢ়তা মোটেই ছিল না, যা দিয়ে লোকের মনে সংগ্রামের আকুলতা জাগানো যায়।

যাই হোক, 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম'র সামগ্রিক অভিনয় বেশ প্রাণবন্তই হয়েছে বলতে হবে। অভিনয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন হো-চি-মিন রূপী পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। অদ্ভূত মানিয়ে ছিল শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে। চরিত্রের সংগে একাত্ম হয়ে এই প্রবীণ অভিনেতা সংযত অভিনয়ের একটি প্রদীপ্ত নজীর সৃষ্টি করলেন। 'হো-চি মিনে'র চরিত্র-চিত্রণ নিঃসন্দেহে তাঁর শিল্পী জীবনের একটি স্মরণীয় সংযোজন। এর পরে নাম করতে হয় অভয় হালদারের। থ্যাকার চরিত্রের দৃঢ়তা আর দুর্দমতাকে আশ্চর্য নৈপুণ্যে মূর্ত করে তিনি আর একবার প্রমাণ করলেন আজকের যাত্রা-জগতে তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। মোয়েন চরিত্রের চপলতা আর গভীরতা রীতা দত্তের স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে সুন্দর ভাষা পেয়েছে। অনাদি চক্রবর্তীর 'সোয়াং'ও হয়েছে স্বাভাবিক, কিন্তু 'ডাঃ হোত্তো'র ভূমিকাভিনেতা প্রত্যাশিত ছবি তুলে ধরতে পারেন নি। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন জয়ন্তকুমার (ইয়েন) অমূল্য ভট্টাচার্য (নান্হা), মহেন্দ্র ব্যানার্জি (ভিয়েট), রবীন চ্যাটার্জি (ওয়েষ্টমোর), বীরেন দেবনাথ (নিডেন্ডার), প্রফুল্ল ব্যানার্জি (বুথ), নিমাই দত্ত (জো), সুবল সামন্ত (স্মিথ), অলিনা ভট্টাচার্য (মাতং), অরুণা গোস্বামী (মাতুং), মঞ্জু ব্যানার্জি (থয়ং), ছবি দাস (ডুয়েন)।

পালাটির গানগুলো কিন্তু ভালো হয়নি। হয় সুর-সৃষ্টির, না হয় শিল্পীর কন্ঠের দৌর্বল্যে তা মনের গভীরে কোন ঢেউ তোলেনি। আলোকসম্পাতে অজাতশত্রু সূক্ষ্মতম শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। যুদ্ধ দৃশ্য পরিকল্পনা ও নেপথ্য থেকে ট্রেণ ছুটে যাওয়ার শব্দ প্রভৃতি সৃষ্টিতে পালাটির আঙ্গিক অনেক পরি-মানে অর্থময় হয়ে উঠতে পেরেছে।

আরো বেশ কিছু নাট্যমুহূর্তে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে, গানগুলোর মধ্যে বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত হোলে নিউ প্রভাস অপেরার 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম' পালাটি যাত্রা জগতে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি হোতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তরুণ অপেরার নতুন নাটক

তরুণ অপেরার অমর ঘোষ রচিত ও পরিচালিত 'নেপোলিয়ন' উদ্বোধন হয় ২৫ সেপ্টেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। বন্যা-ত্রাণের সাহায্যকল্পে এই রজনীর অভিনয়। আগামী ৪ অকটোবর মহাজাতি সদনে বন্যা-ত্রাণের সাহায্যকল্পে নেপোলিয়নের পুনরাভিনয় হবে। নাম-ভূমিকায় আছেন শান্তিগোপাল।

বড়দিদি : শরৎচন্দ্রের সংবেদনশীল উপন্যাস 'বড়দিদি'র একটি মনোজ্ঞ নাট্যরূপ সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'য় পরিবেশিত হোল। নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন হোম পাসপোর্ট (বিদেশী বিভাগ) রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুরাগী সভ্যবৃন্দ। উপন্যাসটির কাহিনীটিকে নাটকীয় সংঘাতে সাজিয়ে তোলেন মণি দত্ত, প্রয়োগ পরিকল্পনার দায়িত্বও ছিল তাঁর। বলা যায় শ্রীদত্ত তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পেরেছেন এবং সেই জন্য সেদিনকার প্রযোজনা মোটামুটি শৈথিল্যমুক্তই ছিল।

অভিনয়ে ব্যাপারে মমতা চ্যাটার্জি (বড়দিদি), তৃপ্তি দাস (শান্তি), উপেন সাহা (সুরেন্দ্রনাথ) কিছু স্বাতন্ত্র্যের নজীর সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেন মিতালী রায়, নিতাইহরি কর মজুমদার, নিশিকান্ত মান্না, সুনীল দেব, সুশীল দে ও জয়দেব সাঁতরা।

ওরা জাগছে : সম্প্রতি দুর্গাপুরে যুব সংঘ ক্লাবের সদস্যরা ডাঃ অরুণকুমার দে রচিত 'ওরা জাগছে' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন স্থানীয় নিজস্ব মঞ্চে। ছোট বড় নাটকীয় মুহূর্ত উপস্থাপনায় নাট্য-পরিচালক শ্রীসুজিত সান্যাল অসামান্য কৃতিত্ব, আন্তরিকতা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ছোট-বড় সব চরিত্রই শিল্পীরা ছিলেন সজীব ও প্রাণবন্ত। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী ধীরেন নিয়োগী, ভূতনাথ কুর্মি, রামানুজ ব্যানার্জি, শেখ জামাল, অজিত দত্ত, রণজিত কেশ, দিলীপ পাল, নারায়ণ দাস, অমল মণ্ডল, মহাবীর আগরওয়াল, ভৈরব দাস, শিশুশিল্পী বিমল দাস ও গোরাচাঁদ। মঞ্চসজ্জা ও আলোর কাজ ভালোই।

বিবিধ সংবাদ

পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত কল্পনালোক নিবেদিত ও রামমহেশ্বরী পরিচালিত 'নানক নাম জাহাজ হ্যয়' ইস্টম্যান কলার ছবিখানি তার কাহিনী, বিষয়বস্তু, বক্তব্য, গান, অভিনয় প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে এমনই চিত্তাকর্ষী হয়ে উঠেছে যে, পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান প্রভৃতি যে রাজ্যেই দেখানো হচ্ছে, সেখানেই জনপ্রিয়তার এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস রচনা করছে। মাত্র পূর্ব পাঞ্জাবেই ছবিখানি মাত্র ছ' মাসের মধ্যে প্রযোজককে দিয়েছে কুড়ি লক্ষ টাকা। ছবিটি প্রশংসিত হয়েছে সকল স্তরের লোকেদের দ্বারা। কলকাতার 'জনতা' সিনেমাতেও ছবিখানি প্রতিটি প্রদর্শনীতে পাচ্ছে 'ফুল হাউস'।

'বেগম মেরী বিশ্বাস'-এর বিশেষ অনুষ্ঠান

গেল বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বরূপার অসামান্য জনপ্রিয় নাটক 'বেগম মেরী বিশ্বাস' নাটকের বন্যাত্রাণে সাহায্যকল্পে একটি বিশেষ সাহায্যরজনী অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ অভিনয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ টাঃ ৪,০২৮-৫০ বন্যার্তদের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেন প্রতিষ্ঠান-পরিচালক রাসবিহারী সরকার।

জলসা

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের একক গানের আসর : ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানীর তরফ থেকে গত সপ্তাহে শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের একটি একক গানের আসর আয়োজিত হয় মহাজাতি সদন মঞ্চে। ব্রাসেল্‌সে লেক্‌স সিগারেটের বিজয়োৎসব পালনার্থেই এই উৎসব-সন্ধ্যার অবতারণা। সভার উদ্বোধক শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন বাণিজ্য দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি ব্রতী হিসাবে। জনপ্রিয় শিল্পীকে আশীর্বাদ করলেন তার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগের জন্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অফুরন্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে দ্বিজেনবাবু বেছে নিয়েছিলেন পূজা, প্রকৃতি ও প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত। অনুষ্ঠানের সুরু হয় পূজা নিয়ে, সমাপ্তি অনুষ্ঠান-লিপি অনুযায়ী 'প্রেম' দিয়েই হওয়ার কথা। কিন্তু শিল্পীজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির প্রসাদেই বোধ হয় শেষ করলেন 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' যে গানে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার প্রেমের আকুতি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আত্মনিবেদনের ছন্দে। মানবিক প্রেম চরমে পৌঁছলেই বুঝি সেই মহাপ্রেমময়ের চরণে পৌঁছায় তাই 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা' হয়ত এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই গানটি শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই হঠাৎ স্থান পাওয়া গানটি আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গতিবিহীন মনে হলেও খাপছাড়া নয়। 'পরজ-বসন্ত' রাগাশ্রয়ী 'আমি হেথায় থাকি' গানটি দিয়ে সুরু হওয়ায় পটভূমিকাটি মধুর হয়ে উঠেছিলো কোমল পর্দার চিত্তস্পর্শী শ্রুতিতে। তারপর 'কত অজানারে', 'বহে নিরন্তর' 'জননী তোমার করুণ', 'যেতে যেতে একলা পথে'র বিভিন্ন ভাবপর্যায় পার হয়ে প্রাণ ভরিয়ে 'তৃষা হারিয়েতে এসে থামল। তেওড়া, রূপকড়া, নবতাল, নবপঞ্চতাল, ষষ্ঠীতাল, ঝম্পক, কাহারবা-র বিভিন্ন ছন্দ সুপ্রদর্শিত এবং ছন্দ-বৈচিত্র্যে বজায় রেখেও শিল্পীর ধ্যানকেন্দ্রতা অনাহত ছিল এইখানেই শিল্পীর শিল্পকৃতি। ছয় ঋতুর মর্মভাব ছটি গানে যথোচিত বিশ্লেষিত। তবু বলব ঋতুসংগীতে আর একটু রঙের জোয়ার আশা করেছিলাম। গানগুলি অবশ্য দ্বিজেনবাবু নিজস্ব শান্তভঙ্গীতে সুন্দর করেই গেয়েছেন। 'প্রেম' অধ্যায়ের গানগুলিতে কবির পরিণত বয়সের 'সুনীল সাগরে', 'নিদ্রাহারা রাতে' ইত্যাদি ভাব-গম্ভীর গানগুলিতে সংহত প্রেমের গভীরতাকে শিল্পী যথাযথ রূপ দিয়েছেন। এ গান মনোধর্মী। এই সঙ্গে কবির প্রথম অধ্যায়ের প্রাণধর্মী আবেগ রঙিন কিছু গানও যদি থাকত, তাহলে বৈচিত্র্য ছাড়াও মানবিক আবেদনে উপভোগ্য হোতো। 'তুমি রবে নীরবে' এবং 'আজি সাঁঝের যমুনায়' গান দুটির গায়নশৈলী ভোলার নয়।

কমল সেনগুপ্ত বিভিন্ন তালের সংগতে লয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু পাখোয়াজের সুর মাঝে মাঝে নেমে যাচ্ছিল—এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত ছিলো। অমলদেবের তারসানাই ও সলিল মিত্রের বেহালা-সংগত সুন্দর।

সুরবাহারের বিচিত্রানুষ্ঠান : কলকাতার জনপ্রিয় সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র সুরবাহার সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। আকাশবাণী, কলিকাতা কেন্দ্রের 'যুব-বাণী' মারফৎ এই সংগীতানুষ্ঠান পুনঃ সম্প্রচারিত হয়। সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদের গান ও পল্লীগীতি পরিবেশন করেন—প্রবীর বসু, বিমল মিত্র, তপন মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, অনিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দুলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দা মুখোপাধ্যায়, ঊর্মিলা দত্ত, সুগতা মৈত্র, ছবি সুর, কল্পনা রায়চৌধুরী, সন্ধ্যা সাহা, রুণু চট্টোপাধ্যায় ও শাশ্বতী সাহা। একক কণ্ঠে নজরুল-গীতি, দ্বিজেন্দ্র-গীতি ও পল্লীগীতি গেয়ে শোনান যথাক্রমে বাণী সমাদ্দার ও কৃষ্ণা সমাদ্দার, সেতারে পিলু-ঠুংরী বাজিয়ে শোনান মঞ্জুলা মিত্র। সঙ্গতে অংশগ্রহণ করেন কমলেশ মৈত্র, সুনীল সাহা, প্রশান্ত সমাদ্দার ও মনোরঞ্জন সিংহ।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার কথা

এক অবিস্মরণীয় শীল্ড ফাইনাল

শঙ্করবিজয় মিত্র

ইংরাজদের কাছ থেকেই ভারতীয়রা ফুটবল খেলা শিখেছিল একথা অনস্বীকার্য। সংকল্প ও সাধনায় উত্তরপর্বে এই ভারতীয়রাই বাঘা বাঘা গোরা পল্টনের ওপর সমানে টেক্কা দিয়েছে। বাঙ্গালী-বাবুরা গোরাদের হারিয়ে ১৯১১ সালে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আই এফ এ শীল্ড জিতেছিল। পথিকৃৎ হিসাবে সেই জন্যে আজও মোহনবাগানের সেদিনের কীর্তি-কাহিনী সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এর পর মহমেডান দল ইংরাজদের একচেটিয়া আধিপত্য নষ্ট করে উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ বিজয়ী হয়ে যে রেকর্ডের সৃষ্টি করে আজও তা অম্লান হয়ে রয়েছে। ভারতীয় দলের মধ্যে ইষ্ট বেঙ্গলের উপর্যুপরি তিনবার শীল্ড বিজয় এবং মোহনবাগান দলের পর পর তিনবার ডুরান্ড কাপ এবং হায়দরাবাদ পুলিশের পর পর পাঁচ বার রোভার্স কাপ জয়ও ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। এর পর অনেক বিষয়ে অনেক রেকর্ড ভাঙ্গাগড়া হয়েছে। কিন্তু ২৫শে সেপ্টেম্বর ইষ্টবেঙ্গল যখন ইরাণের পুলিশ এ্যাথলেটিক ক্লাবকে (পাজ) পরাজিত করে ভারতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জন করল ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা সেকথা সহজে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

আই এফ এ শীল্ডের ১৯৬৭ সালের ফাইনাল খেলা ভন্ডুল হয়ে গিয়েছিল। ইডেনে আয়োজিত দ্বিতীয় ফাইনাল খেলাতেও ইষ্টবেঙ্গল ছিল ফাইনালিষ্ট। এবার তাদের প্রতিপক্ষ দল হচ্ছে বিদেশী দল। ফলাফল সম্পর্কে সকলে অনিশ্চিত। তাই দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে অনেকে হাজির হলেন ভারত ও ইরাণের মর্যাদার লড়াই দেখতে। খেলার মাঠে দর্শক উপচিয়ে গিয়েছিল। দর্শনীর দিক দিয়ে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে তাতে এর চেয়ে বড়সর স্টেডিয়াম গড়তে না পারলে এই খেলায় সংগৃহীত অর্থের রেকর্ড কোনদিনই ভাঙ্গা যাবে না।

আই এফ এ'র প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসব পালনের জন্যে তারা এবারকার শীল্ডের আসর বড় করবার জন্যে বিরাট অঙ্কের অর্থের ঝুঁকি নিয়ে কোমর বেঁধে আসরে নেমেছিল। বলতে বাধা নেই পশ্চিম জার্মানীর নিদারস্যাসেন ও ইরাণের পুলিশ এ্যাথলেটিক ক্লাব খেলার দিক দিয়ে জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে না পারলেও বিদেশী দল হিসাবে ধারে না হলেও ভারে কেটেছে অর্থাৎ অর্থের সমস্যার সমাধান পূর্ণ করে আই এফ এ ও রাজ্য সরকারের তহবিল স্ফীত করেছে।

খেলার দিক দিয়ে মন ভরাতে পারে নি সত্য, তবে ইষ্টবেঙ্গল দল এদিনের খেলায় বিজয়ী হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে। জার্মাণ দলের দলনেতা স্বীকার করেছেন তাড়াহুড়ো করে দল আনতে গিয়ে তাঁরা ভাল দল আনতে পারেন নি। এখানকার খেলার মান সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। তা সত্ত্বেও তাঁরা যে দল বাছাই করেছিলেন তার মধ্যে ছ'জন শেষ মুহূর্তে পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করায় তাঁদের যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দলনেতা আরও জানিয়েছেন যে, এই নিদারস্যাসেন দলটি গঠিত হয়েছিল তৃতীয় ডিভিসন লীগের অন্তর্ভুক্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে। তাছাড়া যে সমস্ত খেলোয়াড় এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনুশীলনের অভাব বেশি করে থেকে গিয়েছে। জার্মাণ দলটি শেষ দিনে ভাল খেলে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে, একথা অকপটে স্বীকার করতে হবে জল-কাদার মাঠে খেলায় তাদের অভ্যাস না থাইয়ে নিয়েছিল। তাদের অচরণ ও থাইয়ে নিয়েছিল। তাদরে আচরণ ও ক্রীড়াসুলভ মনোবৃত্তির দৃষ্টান্তের জন্যে তারা কলকাতার ক্রীড়ানুরাগীদের মন কেড়ে নিয়েছিল।

ইরাণের পুলিশ এ্যাথলেটিক ক্লাবের আচরণ হয়েছিল নাক্কারজনক। সেমি-ফাইনালে দলের কোচ ত খেলা চলাকালীন মাঠের মধ্যে ঢুকে পরে খেলোয়াড়কে প্রহার করে এক বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন, আর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে হেরে গিয়ে আসামে খেলার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিলেন। পরে আর্থিক দিকটার কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত ওড়িষ্যায় একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে জিতেও গিয়েছেন। খেলায় হেরে গিয়ে ম্যানেজার হোটেলের নৈশ ভোজে সাংবাদিকদের খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। বললেন অনেক অশালীন কথা। প্রথমেই বললেন ফলাফল যে এই ধরণের হবে তা নাকি বুঝতে পেরে আই এফ এ সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দলপতি ও ম্যানেজার গোল সম্পর্কে সোরগোল করেছেন। একথা স্বীকার করি যে, রেফারী ও লাইন্সম্যান সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অবস্থা ঘোরাল করে তুলেছিলেন। কই একথা ত স্বীকার করতে পারেন নি যে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তুলনামূলক বিচারে তাদের চেয়ে অনেকাংশে ভাল খেলেছে। এদিন ইষ্টবেঙ্গল গোলের যে সুযোগ পেয়েছে তাতে তাদের আরও বেশি গোলে জয়লাভ করা উচিত ছিল। সেদিনের নৈশ-ভোজে ইরাণের খেলোয়াড়েরা এক গোছা টাকা দেখিয়ে সেদিনের রেফারী ও লাইন্সম্যানের প্রতি যে অশালীন আচরণ করেছেন অ যে কোন খেলোয়াড়ী দলের পক্ষে কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে অভিহিত করলে মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না।

বেশ কয়েকটি ভাল সুযোগ অপচয় হবার পর খেলার অন্তিম মুহূর্তে হাবিব পায়ে আঘাত পেয়ে যখন মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন তখন ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকও তাদের জয়লাভ সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। খেলা শেষ হতে মিনিট দুয়ের বাকী এমন সময় নাটকীয়-ভাবে খেলতে নামলেন পরিমল দে। পরিমল দে যে এদিন খেলবেন তা কারুরই জানা ছিল না। খেলোয়াড়দের ঘোষিত তালিকায় তাঁর নামও তালিকাভুক্ত ছিল না। সূর্য তখন অস্ত যাবার মুখ। মেঘলা আকাশে সূর্যের আলো নিবু নিবু ভাব। এমন সময় ডান দিকে পাস এল স্বপন সেনগুপ্তের কাছ থেকে। পরিমল দে বল পেয়ে গোল তাক করছেন। তারপরে বিদ্যুতের গতিতে বলটি জালের মধ্যে জড়িয়ে গেল। দেড় ঘন্টার মেহনতে এগারজন খেলোয়াড় যা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি, মিনিট দুয়েকের ঝলকানিতে পরিমল দে তা সার্থক করে তুললেন। পরিমল দে'র ঐকান্তিক চেষ্টায় ইরাণের তেহরাণের কাছে

(১৯৭০ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল : প্যাজ ক্লাবের গোলরক্ষক মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোক চ্যাটার্জির মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন।

কলকাতার ইজ্জত বজায় রইলো। শীল্ডে বিদেশীরা আর নাম খোদাই করতে পারল না। শীল্ড জয়ের সূত্রে ইস্টবেঙ্গল এবার এক রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় দলের মধ্যে মোহন-বাগান ও ইস্টবেঙ্গল ন'বার করে শীল্ড জয় করেছিল। এবার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল দশবার জয়ী হয়ে এক নতুন নজীরের সৃষ্টি করেছে।

শীল্ড জয়ের আনন্দে আত্মহারা দর্শকরা খুসীর আনন্দে ভরপুর হয়ে দিকে দিকে কাগজের মোড়কে তৈরী হাজার হাজার যে খুসীর মশাল জ্বালিয়ে দিলেন তা এর আগে দেশে কেন, বিদেশেও আমার দেখার সুযোগ হয় নি। হাজার হাজার লোকের মশালের মেলায় সমগ্র স্টেডিয়াম উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তারপর চললো স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি। বিদেশী দলকে হারানর উচ্ছ্বাস ও আবেগে সোচ্চারে আকাশ ও বাতাসই কেবল মথিত হয়নি, চললো খেলোয়াড়দের কোলে পিঠে নিয়ে নাচানাচি। ভীড়ের মধ্যে চললো দর্শকদের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গন। ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় প্রাচীন-কালের অন্তর্জাতিক আই এফ এ শীল্ডের রেকর্ড ভাঙ্গাই ইস্টবেঙ্গলের পরম গৌরব নয়। স্বাধীন দেশের ফুটবল দল ইস্ট-বেঙ্গলই প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারতীয় ফুটবলের মর্যাদা উচ্চে তুলে ধরেছে। স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম বিদেশ থেকে জাতীয় ফুটবল দল হিসাবে খেলতে এসেছিল চীনের ওলিম্পিক ফুটবল দল। চমক লাগিয়ে ইস্টবেঙ্গল তাদের হারিয়ে দিল দু' গোলে। তারপর এল ইউরোপের (সুইডেন) গোটেবার্গ দল। ভারতের দ্বিতীয় দল হিসাবে তারা এই দলকে পরাজিত করতে দ্বিধা বোধ করে নি।

দেশের মাটি ছেড়ে তারা ১৯৫৩ সালে গেল বিদেশ সফরে। বুখারেস্টের প্রতি-যোগিতায় অস্ট্রিয়ার গ্রেজার ক্লাবকে হারিয়ে দুঃসাহস নিয়ে গেল সুদূর রাশিয়া অভি-যানে। সেখানে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান মস্কো টরপেডোর সঙ্গে সম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩—৩ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। ইউরোপীয়ান ও মহমেডান যুগের অবসানেই ইস্টবেঙ্গলের যুগ তুঙ্গে উঠেছিল একথা স্বীকার করি। কিন্তু ইউরোপীয়ান আধি-পত্যের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল কলকাতার ফুট-বলে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

আর পাঁচটি দল দীর্ঘকালের সাধনায় অনেক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। আত্মপ্রকাশে তারা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২০ সালে জোড়াবাগানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতান্তর হবার পর সুরেশ চৌধুরী, তড়িৎ রায় ও নসা সেন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়কে সভাপতি করে গড়ে তুললেন আজ-কের এই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে। ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছ'জনের প্রতিযোগিতায় তদা-নীন্তন ডিউক অফ কর্ণওয়ালিশের বি ও এ টিমকে হারিয়ে তারা প্রথম ট্রফি লাভ করে। পরের বছরে তাজহাট দল উঠে যাও-য়ায় তারা দ্বিতীয় ডিভিসনে তাদের শূন্য স্থানে ঠাঁই করে নেয়। তাজহাটের খেলো-য়াড়েরা ইস্টবেঙ্গলে যোগদান করায় তাদের স্থান হল তৃতীয় (চব্বিশটি খেলায় ৩২ পয়েন্ট)। শীল্ডের খেলায় সিনিয়ার ডিভি-সন লীগ চ্যাম্পিয়ান ডালহৌসীর সঙ্গে তিন দিন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে চতুর্থ দিনে বৃষ্টিতে সিক্ত ভিজা মাঠে হেরে গেল দু' গোলে। পরের বছরে লীগে চতুর্থ স্থান পেল।

শীল্ডে মোহনবাগান তদানীন্তন নাম করা দল ক্যালকাটার কাছে হেরে গিয়েছে। ভারতীয়রা একদিকে ম্রিয়মাণ অন্য দিকে দ্বিতীয় বিভাগ চ্যাম্পিয়ান তার জি এ'কে ৩—১ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল নিজেদের ত বটেই ভারতীয়দের মান রক্ষা করল। এরপর কাস্টমসকে এক গোলে হারাবার পর হারলো জামালপুর দলের কাছে দু' গোলে। ১৯২৪ সালে তৃতীয় স্থান অধিকার করে সিনিয়ার ডিভিসন লীগে খেলার স্বীকৃতি পায়।

১৯২৮ সালে ছিল ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এক দুর্দিন। ভাগ্য বিপর্যয়ে নেমে গেল দ্বিতীয় ডিভিসনে। ১৯৩১ সালে আবার উন্নীত হল প্রথম ডিভিসনে। এর মধ্যে মহ-মেডান দলের যুগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তা মন থেকে মুছে যাবার নয়। তারপর চললো তাদের বিজয় অভি-যান। ভারতের প্রধান প্রধান প্রতিযোগিতা— আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স, ডুরাণ্ড প্রভৃতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ট্রফি নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

এ দলে দিকপাল খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি গোলরক্ষক পূর্ণ দাস, মণি তালুকদার, হাফব্যাক ননী গোস্বামী, মণি দাস, প্রশান্ত বর্ধন, ধীরা মিত্র, সূর্য চক্রবর্তী, মোনা দত্ত এবং ফরো-য়ার্ড মোনা মল্লিক, মজিদ, লক্ষ্মীনারায়ণ, আপ্পারাও, ভেঙ্কটেশ, আমেদ, রমণ, নূর মহম্মদ, অজিত নন্দী, তাজ মহম্মদ ও রাখাল মজুমদারকে।

অতীতের সংগ্রামী দল হিসাবে পরি-চিত ইস্টবেঙ্গলের অতীতের অবিস্মরণীয় খেলাগুলি আমার চোখের সামনে ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে এলেও ২৫শে সেপ্টেম্বরের রেকর্ড সৃষ্টিকারী শীল্ড ফাইনাল খেলাটি কোনক্রমেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন না। জয়তু, ইস্টবেঙ্গল।

সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার 'হেভীওয়েট' বিভাগে স্বর্ণপদক বিজয়ী রাশিয়ার ইয়ান তলাটস। ইনি মোট ৫৬৫ কে-জি (১২৪৫ পাউন্ড) ওজন তুলেছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

অলিম্পিক ফুটবল

পশ্চিম জার্মানীর মিউনিকে অনুষ্ঠিত ১৯৭২ সালের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেকর্ড সংখ্যক ৮৪টি দেশ অংশ গ্রহণ করবে। গত ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। মিউনিকের অলিম্পিক আসরে ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবে মোট ১৬টি দেশ—গতবারের (১৯৬৮ সালের) ফুটবল চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী, ১৯৭২ সালের অলিম্পিক গেমসের উদ্যোক্তা পশ্চিম জার্মানী এবং প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে যে ৮২টি দেশ খেলবে তাদের থেকে বাছাই করা ১৪টি দেশ। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে ৮২টি দেশকে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এই পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে খেলানো হবে—(১) এশিয়া অঞ্চল, (২) আফ্রিকা অঞ্চল, (৩) ইউরোপ অঞ্চল, (৪) উত্তর-মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং (৫) দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল। এই পাঁচটি অঞ্চলের প্রতিটিতে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা এবং প্রতিটি অঞ্চল থেকে যে-সংখ্যক দেশ চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে তা নীচে দেওয়া হল।

অঞ্চল	দেশের সংখ্যা	যোগ্যতার সংখ্যা
এশিয়া	১৭	৩
আফ্রিকা	২০	৩
ইউরোপ	২৪	৪
উত্তর-মধ্য আমেরিকা ক্যারিবিয়ান	১৩	১
দঃ আমেরিকা	১০	২

এশিয়া অঞ্চল

এশিয়া অঞ্চলকে নীচের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ১৭।

পূর্বাঞ্চল : দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, জাতীয়তাবাদী চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া।

মধ্যাঞ্চল : ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল এবং ইস্রাইল

পশ্চিমাঞ্চল : ইরান, ইরাক, কুয়েত, লেবানন, সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের সুপার লীগের শেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ১-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে লীগ বিজয়ের পথ পরিষ্কার করেছে। একক লীগ খেলাতেও মোহনবাগানের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে জয়ী হয়েছিল। সিটি সিভিল কোর্টে আই এফ এ-র বিপক্ষে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কর্তৃপক্ষ এক মামলা রুজু করেছেন। বর্তমানে কোর্টের আদেশ ছাড়া আই এফ এ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের ফলাফল ঘোষণা করতে পারবেন না। সুতরাং ক্রীড়ামোদীদের বর্তমানে উল্লিখিত আদেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইতিপূর্বে ৫বার—১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০ (অপরাজিত অবস্থায়), ১৯৬১ এবং ১৯৬৬ সালে 'ডাবল' খেতাব পেয়েছিল

অর্থাৎ একই বছরে প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ এবং আই এফ এ শীল্ড জয়।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

জলন্ধরের নব-নির্মিত গুরুগোবিন্দ স্টেডিয়ামে ২৭তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে ২১টি দল—১৯টি রাজ্য-দল, সার্ভিসেস এবং রেলওয়ে। সেমি-ফাইনাল খেলা বাদে সমস্ত খেলা নক-আউট প্রথায় হবে। সেমি-ফাইনাল খেলা হবে লীগ প্রথায়—প্রতিদল দুটি করে ম্যাচ খেলবে। নতুন নিয়মানুসারে অমীমাংসিত খেলাগুলির ফলাফল নির্ধারিত হবে পেনাল্টি কিকের সাহায্যে।

গত বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দল নঈমের নেতৃত্বে প্রথম ম্যাচ খেলবে আগামী ১৬ই অকটোবর, মধ্যপ্রদেশ বনাম হরিয়ানার বিজয়ী দলের সঙ্গে। বাংলা দলে এই ১৭জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ঃ

গোলরক্ষক ঃ পিটার থঙ্গরাজ এবং সৈয়দ জোহা।

ব্যাক ঃ সুধীর কর্মকার, শান্ত মিত্র, নঈম (অধিনায়ক), চন্দ্র প্রসাদ, অশোক ব্যানার্জি, এবং লতিফ

হাফ ঃ কাজল মুখার্জি, প্রিয়লাল মজুমদার এবং বরুণ মিত্র

ফরোয়ার্ড ঃ সুভাষ ভৌমিক মহম্মদ হাবিব, শ্যাম সিং থাপা, বিমান লাহিড়ী, স্বপন সেনগুপ্ত এবং সুকল্যাণ ঘোষ-দস্তিদার।

ইউরোপিয়ান হকি প্রতিযোগিতা

ব্রাসলসের (স্পেন) হেসেল স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রথম ইউরোপীয়ান হকি টুর্নামেন্টের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানি ৩-১ গোলে হল্যান্ডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। বিরতির সময় খেলার ফলাফল সমান ছিল (১-১ গোল)।

প্রতিযোগিতায় ইউরোপের মোট ২০টি দেশ যোগদান করেছিল। এই ২০টি দেশকে সমান চার ভাগে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হয়। লীগ খেলার শেষে প্রতি গ্রুপের ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী দেশ নকআউট পর্যায়ের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। এই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল 'এ' গ্রুপ থেকে পশ্চিম জার্মানী (৮ পয়েন্ট) ও পোল্যান্ড (৭ পয়েন্ট), 'বি' গ্রুপ থেকে নেদারল্যান্ডস (৭ পয়েন্ট) এবং ইংল্যান্ড (৬ পয়েন্ট) 'সি' গ্রুপ থেকে ফ্রান্স (৭ পয়েন্ট) এবং স্পেন (৬ পয়েন্ট) এবং 'ডি' গ্রুপ থেকে বেলজিয়াম (৮ পয়েন্ট) ও সুইজারল্যান্ড (৫ পয়েন্ট)।

কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে ইংল্যান্ডকে, হল্যান্ড ১-০ গোলে পোল্যান্ডকে, স্পেন ২-১ গোলে বেলজিয়ামকে এবং ফ্রান্স ২-০ গোলে সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনাল খেলায় পশ্চিম জার্মানী ২-১ গোলে ফ্রান্সকে এবং হল্যান্ড ২-০ গোলে স্পেনকে পরাজিত করে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

আগামী ১২ই অক্টোবর থেকে পাটনায় আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলা শুরু হবে এবং ফাইনাল খেলা হবে ১৯শে অক্টোবর। পূর্বাঞ্চলের খেলায় যোগদানকারী ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পশ্চিম বাংলার এই ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে— কলকাতা, যাদবপুর, কল্যাণী, বর্ধমান, উত্তর বাংলা, বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রভারতী।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এই চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে— পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল। প্রথমে প্রতি অঞ্চলের খেলা হবে নকআউট প্রথায়। তারপর প্রতি অঞ্চলের বিজয়ী দলকে নিয়ে লীগ প্রথায় আন্তঃ আঞ্চলিক খেলার আসর বসবে। এই লীগ খেলার চ্যাম্পিয়ান দলকে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।

এশিয়ান গেমস

আগামী ডিসেম্বর মাসে ব্যাংককে ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের আসর বসবে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৩৮ জন (৪ জন মহিলাসহ) এ্যাথলীটকে ট্রেনিং ক্যাম্পে অনুশীলনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এ'দের থেকেই ভারতীয় এ্যাথলেটিক্স দল গঠন করা হবে। ভারতবর্ষের অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন নিম্নলিখিতভাবে যোগ্যতার ক্রীড়ামান নির্ণয় করে দিয়েছেন।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার—১২-৩ সেঃ; ২০০ মিটার—২৫-৩ সেঃ; ৪০০ মিটার—৫৭-৫ সেঃ; ৮০০ মিটার—২মিঃ ১২ সেঃ; ১০০ মিটার হার্ডলস—১৪-৫ সেঃ; ৪×১০০ মিটার রীলে—৪৮-৫ সেঃ; লং জাম্প—৫-৭৫ মিটার; হাইজাম্প—১-৫৮; সটপুট—১৩-৭১ মিটার; ডিসকাস থ্রো—৪১-৫০ মিটার; জ্যাভেলিন থ্রো—৪৫ মিটার, ১,৫০০ মিটার দৌড়—৪ মিঃ ৪৫-৩ সেঃ এবং পেন্টাথলান—৪০০০ পয়েন্ট।

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার—১০-৫ সেঃ; ২০০ মিটার—২১-৩ সেঃ; ৪০০ মিটার—৪৭-৫ সেঃ; ৮০০ মিটার—১ মিঃ ৪৯-৫ সেঃ; ১,৫০০ মিটার—৩ মিঃ ৪৮ সেঃ; ৫০০০ মিটার—১৪ মিঃ ২৫ সেঃ; ১০,০০০ মিটার—৩০ মিঃ ২০ সেঃ; ১১০ মিটার হার্ডলস—১৪-৫ সেঃ; ৪০০ মিটার হার্ডল—৫২-৫ সেঃ; ৩০০০ মিটার—স্টিপলচেজ—৮ মিঃ ৫৫ সেঃ; ম্যারাথন—২ ঘঃ ২৫ মিঃ; ৪×১০০ মিটার রীলে—৪১ সেঃ; ৪×৪০০ মিটার রীলে—৩ মিঃ ১২ সেঃ; লং জাম্প—৭-৫০ মিটার; ট্রিপল জাম্প—১৬ মিটার; হাইজাম্প—২-০৬ মিটার; পোলভোল্ট—৪-৫০ মিটার; সটপুট—১৬-৯০ মিটার; ডিসকাস থ্রো—৪৯ মিটার; হ্যামার থ্রো—৬৪ মিটার; জ্যাভেলিন থ্রো—৭০ মিটার এবং ডেকাথলন—৬৮০০ পয়েন্ট।

আগামী ৯ ডিসেম্বর ব্যাংককে ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠান শেষ হবে ২০ ডিসেম্বর। এ পর্যন্ত ১৮টি দেশ ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিভিন্ন খেলায় যোগদানের জন্য আবেদন করেছে। মোট খেলার সংখ্যা ১৩টি—অ্যাথলেটিকস, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হকি, সাঁতার, ভারোত্তোলন ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, সাইক্লিং, সুটিং এবং পালতোলা নৌকা চালনা। অ্যাথলেটিকসে ১৮টি দেশই অংশ গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষ সাঁতার এবং নৌকা চালনা বাদে বাকি ১১টি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে।

বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতা

বুলগেরিয়ার সোফিয়াতে আয়োজিত বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে পূর্ব জার্মানী এবং মহিলা বিভাগে রাশিয়া স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, রাশিয়া এই নিয়ে মহিলা বিভাগে পাঁচবার স্বর্ণপদক জয়ী হল; রাশিয়া পুরুষ বিভাগে ইতিপূর্বে [illegible]বার স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। উভয় বিভাগেই সর্বাধিকবার স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেছে রাশিয়া। গতবারের পুরুষ বিভাগের স্বর্ণপদক বিজয়ী চেকোশ্লোভাকিয়া এবার কোন পদকই পায় নি। প্রতিযোগিতায় দুটি পদক পেয়েছে একমাত্র জাপান—পুরুষ বিভাগে ব্রোঞ্জপদক এবং মহিলা বিভাগে রৌপ্য পদক। জাপান ছাড়া এশিয়া মহাদেশের আর একটি দেশ পদক পেয়েছে—মহিলা বিভাগে উত্তর কোরিয়া (ব্রোঞ্জপদক)।

পদক জয়ের তালিকা

পুরুষ বিভাগ ঃ স্বর্ণ—পূর্ব জার্মানী রৌপ্য—বুলগেরিয়া এবং ব্রোঞ্জ—জাপান।

মহিলা বিভাগ ঃ স্বর্ণ—রাশিয়া, রৌপ্য—জাপান এবং ব্রোঞ্জ—উত্তর কোরিয়া।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৪ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 23rd Oct., 1970 শুক্রবার, ৬ই কার্তিক, ১৩৭৭ **40 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : —শ্রীনিতাই ঘোষ,

চিঠিপত্র

মনোজ বসুর উপন্যাস

শারদীয়া অমৃতে মনোজ বসুর 'আমি সম্রাট' উপন্যাসখানি পড়লাম। ইদানীং বর্তমান কালের সমস্যা নিয়ে কোন সাহিত্যিকের এমনতরো লেখা পড়েছি কিনা মনে করতে পারছি না। সেই গতানুগতিক বস্তাপচা ও যৌনাবেগ সম্বলিত তথাকথিত 'বিপ্লবধর্মী' অত্যাধুনিক উপন্যাস না লিখে সাম্প্রতিককালীন যুবসমাজ তথা জাতির গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও সমালোচনা করেছেন আমার মতে তা অতুলনীয় ও বাংলা সাহিত্যে প্রথম। অনেক পাঠকের কাছে ঘটনাটি অতিরঞ্জিত মনে হবে। কিন্তু আমাদের কেউ কি হলপ করে বলতে পারি যে, এমন ঘটনা ঘটছে না। আজ হয়তো অলক্ষ্যে ঘটছে—কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থা আর কিছুদিন চললে নিজের চোখের সামনে নিত্য এ ঘটনা ঘটতে যে দেখতে পাবো না সে অবিশ্বাস করি না। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ অরুণরাই জানে এ সত্যিই গল্প না অন্যকিছু। লেখক তার লেখায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন একস্থানে যে ঘটনার পৌনঃপুনিকতায় অনেকে বিরক্ত হতে পারেন। নিজের কথা বলতে গেলে আমি গল্পের ছিটেফোঁটা বা বিন্দুবিসর্গও বাদ দিতে পারিনি। কথা হচ্ছে যদি পড়তে গিয়েই পাঠকের বিরক্তি জন্মে তাহলে যাদের জীবনে এ জাতীয় ঘটনার পুনঃপ্রকাশ নিত্যসঙ্গী তাদের জীবনটাকে কি দুঃসহ মনে হয় তা ভাববার অবকাশ রাখে।

'অন্যচিন্তার' লেখক-অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জি আশা করি এ উপন্যাসে কিছু খুঁজে পাবেন। ইচ্ছে করলে কিছু লেখক বর্তমান ব্যবস্থার উপর যে লিখতে পারেন দেখে হয়তো সান্ত্বনাও পেতে পারেন কিছুটা। লেখক যদিও সমস্যাটাই বড় করে তুলে ধরেছেন (বলতে গেলে সমস্তটাই সমস্যার বর্ণনায় ব্যয়িত হয়েছে) এবং সমাধানের কোন উল্লেখ করেননি তবুও আলোচ্য উপন্যাসটিকে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোড়নের প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। অশ্লীল যৌনাবেগই যে সমাজের গৌণ সমস্যা (অনেক লেখক তাই মনে করেন) নয় উপন্যাসটি তারই প্রমাণ। অক্ষয় হয়ে থাক সুব্রতা ও পলির মতো কয়েকজন মেয়ে। জন্ম নিক লক্ষ লক্ষ সুব্রতা, লক্ষ লক্ষ পলি।

যেহেতু আমার মতে সমাজের সর্বস্তরের লোকের উপন্যাসখানি পড়া দরকার সেইহেতু বই-এর আকারে বেরুলে বইখানি যাতে সহজলভ্য হয় সেইদিকে নজর দেবেন—এইটুকু আপনাদের কাছে অনুরোধ। কারণ যাদের নিয়ে লেখা তাদেরও তো পড়তে হবে। দরকার হয় 'পেপার ব্যাক'-এ প্রকাশ করবেন।

সরোজকুমার বড়ুয়া,
খড়্গপুর

'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে'

'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নিয়মিত পড়ছি। এত সুন্দর উপন্যাস আমি 'অমৃত' পত্রিকায় কমই পড়েছি। সুজলা-সুফলা মাটির গন্ধ উপন্যাসে খুব কমই মেলে। আমাদের শহুরে মানুষের কাছে এ এক নতুন উপলব্ধি। সবচাইতে বড় কথা উপন্যাসটিকে বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করাতে হয় না। কখন যে আপনি হতে হৃদয়ের দ্বার খুলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে টেরও পাওয়া যায় না। প্রথম চিঠিতে মনে শুরুতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম, ঠিকঠাক এত সুন্দরভাবে শেষ করতে পারবেন তো? এখন আমার সে সন্দেহ দূর হয়েছে। অতীনবাবুকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন আর সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই 'অমৃতের' সম্পাদকমন্ডলীকে এমন সুন্দর একটি উপন্যাস আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য।

দেবকুমার সরকার
কলিকাতা—২৮

'হিন্দী বাংলা অভিধানের জন্যে'

১০ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ২১ সংখ্যা অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীমতিলাল যাদবের 'হিন্দী বাংলা অভিধানের জন্যে' চিঠির অনুরোধ অংশটি পূর্ণসমর্থনযোগ্য।

শ্রীযাদব 'আমি কি কষ্টে বাংলা শিখেছি' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে জনৈক বিদেশী অধ্যাপককে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল 'আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কার কাছে?' উত্তরে দিলেন—'কার কাছে শিখেছি জিজ্ঞেস করবেন না। বরং জিজ্ঞেস করুন—'কেমন করে বাংলা শিখলেন?' আমি বলব কষ্ট করে শিখেছি।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে অল্পাধিক কষ্ট বোধহয় সকলকেই স্বীকার করতে হয়।

হিন্দী থেকে বাংলা বা বাংলা থেকে হিন্দী অভিধান পাওয়া যায় না শ্রীযাদবের একথা ঠিক নয়। হিন্দী বা অন্য ভাষাভাষী যাঁরা বাংলা শিখতে চান তাঁদের কাজে লাগতে পারে এমন কয়েকখানি বই-এর নাম উল্লেখ করছি। ১। হিন্দী বাংলা অভিধান, শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত শাস্ত্রী ২। ব্যবহারিক বাংলা-হিন্দী প্রতি শব্দকোষ শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ৩। ভারত কী পন্দ্রহ্ ভাষাএঁ প্রভাকর মাচ্ওয়ে ৪। লার্ন বেঙ্গলী-বিধুভূষণ দাশগুপ্ত, ৫। বাংলা ভাষা প্রবেশ, বিধুভূষণ দাশগুপ্ত।

শান্তি ঠাকুর
ঘাটশিলা, সিংভূম।

'নিকটেই আছে প্রসঙ্গে'

এক কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানুষ জীবনযাপন করছে। চারিদিকে বিভীষিকার মধ্যে যেন হারিয়ে ফেলছে আত্মবিশ্বাস, ধ্যানধারণা আর নিজস্ব নীতিকে। সবই যেন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। সমাজের উপর বিশ্বাস নেই। অবিশ্বাস যেন ঘিরে ধরেছে আমাদের। সবটাই ধাপ্পা আর ঠকানিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকার ধারাবাহিক সংযোজন 'নিকটেই আছে'তে এর সাবলীল এবং স্বচ্ছ সুন্দর উত্তর পাওয়া যায়।

কত ঘটনাই না ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, আমাদের মত ছাপোষা মানুষ হয়ত জানতে পারছে না সমাজের কৌশলকে, কিন্তু লোকচক্ষুর সামনে মনুষ্য সমাজকে ফাঁকি দিচ্ছে। এরই সুনিপুণ চিত্র পাচ্ছি সন্দিৎসুর 'নিকটেই আছে' রচনাগুলিতে। অবক্ষয় জর্জরিত সমাজে কত তরুণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানবিকতা মনুষ্যত্ব হারিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়েছে। গত ১৪ সংখ্যায় 'নিকটেই আছে'তে 'দোকানটা কিসের—চা না চোলাইয়ের' পড়ে অবাক হয়ে গেছি। মনে হয়েছে আমি আমার প্রতিবেশী একটি অবহেলিত যুবকের প্রতিচ্ছবি দেখছি। অধিকাংশ জায়গাতেই 'কেষ্ট' আছে, আর অধিকাংশ জায়গাতেই আছে ঐ ভানুর মত দিশেহারা, বেকার যুবকদের দল। ভানুর জন্য মনস্তাপ হবে সকলেরই। যেভাবে প্রতারক আর ঠকবাজদের দল সমাজকে ঘিরে ফেলেছে তা আজ আমাদের চিন্তার কারণ। লেখক সন্দিৎসু মশাই সেই ঠকবাজদের আর প্রতারকদের কালাকানুনকে আর কৌশলকে 'নিকটেই আছে'-তে তুলে ধরে যেভাব আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন এর জন্য প্রথমে সন্দিৎসু মশাইকে ধন্যবাদ জানাই আর সবশেষে এই সংযোজনের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

চঞ্চল সিংহরায়
হুগলী

চিঠিপত্র

বিদ্যাসাগর : জীবনে ও চিন্তায় প্রসঙ্গ'

'দয়ার সাগর' 'বিদ্যাসাগর' ইত্যাদি বলতে গিয়ে আমরা বীর্য ও দৃঢ়তার সেই তুঙ্গ গিরিকে অনেক সময় ভুলে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে সত্যনিষ্ঠার যে শৌর্য-দীপ্ত রূপটি জাগ্রত ছিল, তাঁর করুণা ও কোমলতার স্নিগ্ধমধুর ছায়ায় সেই রূপটি অনেক সময় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই বীর ঈশ্বরচন্দ্রের উজ্জ্বল রূপটি আমাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে অশেষ উপকার করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে তাঁর বীরত্বের দৃষ্টান্ত আরো অনেক পাওয়া যায়। আমরা সকলেই জানি তাঁর প্রাক শিক্ষক এক বালিকাকে বিবাহ করে যখন গৃহে আনলেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র কেমন করে তার বিরোধিতা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে ঠিক এই রকমের আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারলে বিদ্যাসাগরের বীরত্বের প্রায়বিস্মৃত ছবিখানি আরো উজ্জ্বল হতে পারত।

—সুধাংশুশেখর রায়
ভদ্রক

মনের কথা প্রসঙ্গে

মনোবিদের 'মনের কথা' মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বেশ আগ্রহী করে তুলেছে। কেসহিস্ট্রীগুলি বেশ তথ্যসমৃদ্ধ এবং বর্ণনাভঙ্গীও বেশ বিশ্লেষণধর্মী ও মনোজ্ঞ। গত ২৩ সংখ্যায় 'অমৃত'-এ 'ভর হওয়া ভূত পাওয়া কুন্তীর আসুরিক চিকিৎসা' শীর্ষক লেখায় তিনি কয়েকটি কেসের বর্ণনা দিয়েছেন। সবগুলিকে তিনি 'দখলীকৃত অবস্থা' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের কৌতূহল হয়েছে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'এই নে প্রসাদ, আমাকে আর জ্বালাসনে, সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল জ্বলন্ত কয়লা হাতে নেওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি নির্বিকার, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন পর্যন্ত নেই, হাত পুড়লনা, এমন কি ফোস্কা পর্যন্ত পড়ল না। এখন আমার প্রশ্ন, মেয়েটির হাতে ফোস্কা পড়ল না কেন? মেয়েটি যন্ত্রণাবোধ করল না কেন? আমাদের গ্রামে মনসা ও ভৈরবের পুজোর সময় ঢাক বাজার সঙ্গে ভক্তেরা ঠাকুর নামাল, প্রচন্ড পরিশ্রম হয় এবং লাফালাফির সময় বেশ আঘাতও লাগে, কিন্তু এরা নির্বিকার। ঠাকুর-ভর কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। ফাল্গুনে সংক্রান্তির সময় ভৈরবের পুজোর সময় ফুল খেলা হয়। 'ফুল খেলা' হল শালকাঠের আগুনে করে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে লাফালাফি করা এবং ওগুলোর ওপর গড়াগড়ি দেওয়া। ফুল খেলার পর দেখা গেছে ভক্তদের গায়ে কোন ফোস্কা পড়েনি। এই বারের পুজোর সময় বিজয়ার দিনে বাঁকুড়ায় একটি ১৪।১৫ বৎসরের মেয়ের উপর দুর্গার ভর হয়। পুজোর মন্ত্র পাঠে ভুল হয়েছে, অশৌচ অবস্থায় ঘটবারি আনা হয়েছে, নতুন করে পুজো করতে হবে, ঠিক মনোবিদের বড়মার মত কথাবার্তা বলতে শুরু করে। পুজো আবার নতুন করে শুরু হয়। প্রচন্ড ভীড় হয় মেয়েটি চার পাঁচদিন নামমাত্র খেয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে শারীরিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়নি। গত লক্ষ্মী পুজোর দিন ভর নেমে গেছে।

ভরের সময়কার কোন কিছুই রোগিনীর মনে থাকে না কেন? সেই অস্বাভাবিক অবস্থায় সে যা বলে বা করে তাতে তার একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। সেটা কি অবচেতন মনের ব্যাপার?

ধীরেন্দ্রনাথ কর
বাঁকুড়া

মুখের মেলা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি ঊষা মুখোপাধ্যায় তার চিঠিতে পরোক্ষভাবে আবদুল জব্বার মহাশয়কে অশ্লীল সাহিত্যিক বলে অভিযুক্ত করেছেন। আমার মনে হয় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যিকের স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ একজন সাহিত্যিক একজন দর্শকের থেকে বেশী গভীর করে দেখেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি সম্বন্ধে 'সাহিত্য পথে' বলেছেন, 'মানুষ সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায় মানুষ আপন সৃষ্টিকে যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছে তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোকে, লক্ষ-পতির কোষাগারে নয়, পৃথিবীরাজের জয়স্তম্ভে নয়'

পারিপার্শ্বিক গ্রামজীবনের সর্বহারা সম্প্রদায়ের হুবহু সত্য ঘটনা ব্যক্ত করছেন জব্বার মহাশয় তাঁর 'মুখের মেলা'য়। একজন সমালোচক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন, অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে উপলব্ধির বস্তু, হাত দিয়ে পরখ করার বা চোখে দেখার বস্তু নয়। সুতরাং কেউ যদি সেই সাহিত্যের অংশকে অশ্লীলসনে কান তবে শ্লীল নতুবা তার কাছে অশ্লীল। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় এককালে ফরাসীদের নিকট শেকস-পীয়ারের সৃষ্ট চরিত্র ওথেলোর রুমালখানি ছিল অশালীন। সুতরাং সেটা পাঠক বা পাঠিকার রুচিবিচারে পার্থক্য আসতে পারে তার জন্য লেখক দায়ী নয়।

তবে একথা বলা যেতে পারে সামাজিক জীবনবিন্যাস ও প্রচলিত নৈতিকতার কথা চিন্তা করে যেন সাহিত্যিক তাঁর চরিত্রগুলি বিন্যাস করেন। তাই পরিশেষে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত ব্যক্ত করে চিঠি শেষ করছি। প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'যুগে যুগে লোকের মনে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং সেকালের বিধি-নিষেধের একালে সার্থকতা নেই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়।'

—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
বার্ণপুর, বর্ধমান।

দু'পা পেছনে

গত ২২ আশ্বিন 'অমৃতে' প্রকাশিত শংকর চট্টোপাধ্যায়ের 'দু' পা পেছনে' গল্পটি সময়োপযোগী সার্থক গল্প হয়েছে। বস্তাপচা সস্তা প্রেমের গল্প অথবা অশ্লীলতার প্রাচুর্যে ভরা কোনও গল্প এটি নয়। তিনি একটি সংগ্রামী আদর্শবাদী পরি-বারের ছবি এঁকেছেন এই গল্পে। নিঃসন্দেহে লেখকের এটি একটি সাধু প্রচেষ্টা। গল্পটির মধ্যে শংকরবাবু স্বল্প যে কয়টি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটিই অপূর্ব সুন্দর। বিশেষ করে কনকলতার সহৃদয় মাতৃত্ববোধ পাঠককে অবশ্যই মুগ্ধ করে আর বাড়ীর কর্তা শম্ভুনাথ যার পায়ের নীচের মাটিটুকু নানাবিধ সমস্যাভারে প্রতিনিয়তই কম্পমান, সেই শম্ভুনাথও কি কম মনুষ্যত্ববান এবং হৃদয়বান মানুষ? শুধু মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যেই তিনি নির্বিবাদে যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন তা আজকের দিনে আমাদের সমাজে বিরল। গল্পের শেষাংশে বিনোদকে ঘুষি মারা শম্ভুনাথের উপযুক্ত কাজ বলেই মনে হয়েছে। কারণ বিনোদ মিত্তির এই গল্পে একজন সহানুভূতিশীল শয়তানের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সব মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে কিছু কম নয়। শম্ভুনাথ বিনোদ মিত্তিরকে ঘুষি না মেরে যদি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি ঘরে ঢুকতেন, তাহলে তাঁকে কাপুরুষ মনে হত। সর্বশেষে বলি শংকরবাবুর গল্পটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

—মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সিউড়ী, বীরভূম।

শাদা চোখে

পশ্চিমবাংলার রাজনীতি আবার বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে কি হবে না তার কোন স্থিরতা নেই। অথচ আবহাওয়াটা এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে যেন কয়েকমাসের মধ্যেই বুঝি একটি চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা সমাসন্ন। তবে একথা ঠিক মধ্যবর্তী নির্বাচন হউক বা না হউক আগামী সাধারণ নির্বাচনে কে কার মিত্র-দল হতে পারে তার জন্য বোঝাপড়া সুরু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও বর্তমানে যে দাপাদাপি চলছে তাও ১৯৭২ সালের নির্বাচনী বোঝাপড়ার মহড়া মাত্র।

সম্প্রতি এই রাজ্যে রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়ার মুখ্য কারণ হয়েছে ডান কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে পশ্চিমবাংলায় ঐ দলের শাখার ভূমিকা কি হবে সেই সম্পর্কে তিনটি গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, বর্তমানের অষ্টবাম জোটকে শক্তিশালী করতে হবে আর বাংলা কংগ্রেসকে ঐ জোটের অন্তর্ভুক্ত করে এই মোর্চাকে জোরদার করতে হবে। আর গণতান্ত্রিক বামপন্থী মোর্চাকে অধিকতর শক্তিশালী করবার জন্য শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে 'সমঝোতা' করতে হবে। সমঝোতার অর্থ হচ্ছে, একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া— পুরোপুরি ফ্রন্ট গড়ে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হওয়া নয়। এই শেষ বক্তব্যই ঝড় তুলেছে। অষ্টবামের চারটি শরীক যথাক্রমে ফরওয়ার্ড ব্লক, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ও বিদ্রোহী পি এস পি গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে বলেছেন, তাঁরা সকল বর্ণের কংগ্রেসকে ও বাম কম্যুনিস্টকে সমান তফাতে রাখতে চান। অর্থাৎ অষ্টবামের বিগত ২৪শে মের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁরা একচুলও নড়তে নারাজ। ২৪শে মে অষ্টবামের সিদ্ধান্ত ছিল ঃ আদি ও শাসক দুই বর্ণের কংগ্রেসই শ্রেণীশত্রু, অতএব, হাত মেলাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। বস্তুতপক্ষে এটা একটি বুনিয়াদি তত্ত্বগত পার্থক্য। আর বাম কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ছিল ঃ বাম কম্যুনিস্টরা বিচ্ছিন্নতাকামী, সংকীর্ণতাবাদী মুৎসুদ্দিয়ানায় মত্ত। অতএব, তাঁদের সঙ্গেও নৈব নৈব চ। এই পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নয়। তবে হাত না মেলাবার পক্ষে একটি আরও কারণ মাত্র। এই দুই সিদ্ধান্তই অষ্টবামকে (ডান কম্যুনিস্ট পার্টি সহ) একত্রিত হতে সাহায্য করেছিল, অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, অষ্টবাম তখনও পর্যন্ত কোন ফ্রন্টের রূপ নেয়নি। কারণ যে সূত্রে মিলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই সূত্র অর্থাৎ মধ্যবর্তী নির্বাচন আশু অনুষ্ঠিত হবার আশা নেই বলেই অষ্টবাম একটি ফ্রন্টে সান্নিবেশিত হয়ে যায়নি।

এই সঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার অষ্টবামের মধ্যে ডান কম্যুনিস্ট পার্টিকে তাঁদের পূর্বতন কমরেড বাম কম্যুনিস্টরা সরাসরি মিনিফ্রন্ট গঠনের চক্রান্ত নিয়েছিল বলে যখনই অভিযোগ করেছিল তখনই তাঁরা বলতেন—পশ্চিমবঙ্গে এ ধরণের প্রচেষ্টা চলতেই পারে না। কারণ তাঁরা অর্থাৎ ডান কম্যুনিস্টরা যুক্তফ্রন্টের কোন শরীক কি বাম কম্যুনিস্ট কি বাংলা কংগ্রেস কাউকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করবেন না। তারপর আরও একটা ধাপ এগিয়ে শ্লেষাত্মক সুরে বলতেন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে কোনপ্রকার সমঝোতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের শাসক কংগ্রেস দল হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর প্রতিভূ মাত্র। যখনই ডান কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক সততা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে তখনই তা নিরসনকল্পে পশ্চিমবঙ্গ নেতৃত্ব সন্দেহকারীদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বোরোলাগুঁড়ো রাজনীতি চলবে না—একথা বার বার ঘোষণা করেছেন। এটাই হচ্ছে ঘটনা।

সি পি আই তাঁদের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও পালটে দিলেন কেন—? এই প্রশ্ন যাঁদের মনে জেগেছে—তাঁদের বলছি সি পি আই তাঁদের নীতি বদলায়নি। এতদিন বিভিন্ন প্রদেশে বিক্ষিপ্তভাবে সি পি আই যে নীতি অনুসরণ করছিল তাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ জাতীয় ক্ষেত্রে একটি সুসংহত রূপ দিল মাত্র। কাজেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে বলে মনে করি না। এতদিন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে কথা বলা হচ্ছিল তা কৌশল মাত্র। শুধু বাম কম্যুনিস্টদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ব্যাফেল ওয়াল খাড়া করেছিল মাত্র সেই সমস্ত দলকে দিয়ে যাঁরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সি পি এম-এর হাতে নির্মমভাবে মার খেয়েছিল। অন্য কোন কারণে নয়। আরও একটু পুরানো দিনে ফিরে গেলে দেখতে পাবেন সি পি আই 'হ্যারেমে' বিপ্লব ঘটাবার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে প্রোগ্রেসিভ খুঁজে বার করছেন। এবং প্রোগ্রেসিভ পেয়েছেনও তাঁরা। শ্রীকৃষ্ণ মেননরা ছিলেন এখন শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব বা মালব্যজী ইত্যাদি আছেন। ইন্দিরাজীর কথা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার সংগে সংগে শাসক কংগ্রেস পুরোপুরিই প্রোগ্রেসিভ। তাই সি পি আই শ্লোগান দিয়েছিল—"আমাদের অংক মিলছে মিলবে- কংগ্রেস ভাঙছে ভাঙবে।' সত্যিই ওঁদের অংক মিলেছে। কাজেই সি পি আই বর্তমানে যে নীতির কথা বা কৌশলের কথা ঘোষণা করেছে তা নূতন কিছু নয়। অন্য কেউ না বুঝলেও রাজনৈতিক নেতাদের অনেক পূর্বেই তা ভেবে রাখা উচিত ছিল। বর্তমানে স্তম্ভিত হওয়ার কোন কারণ ত দেখি না। যা ঘটছে তাই লজিক্যাল।

এখানেও কৌশল পর্বের শেষ নয়। দিল্লী থেকে ছুটে এসে শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও শ্রীভবানী সেন অষ্টবামের শরীকদের বুঝোবার চেষ্টা করেছেন—যে প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তা শুধু 'সাজেসান' মাত্র। এবং এই কথা গুপ্ত মহাশয় বারম্বার নাকি জোরের সঙ্গেই বলেছেন। আবার এই প্রস্তাব রাখার কারণ সম্পর্কে নাকি গুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে, বর্তমানে রাজ্যের পারিপার্শ্বিক এর পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই নূতন করে দলগুলি সম্পর্কে মূল্যায়ণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে শাসক কংগ্রেসের সম্পর্কে কেন না তাঁদের সঙ্গে নাকি 'অসংখ্য মানুষ' আছে যাঁদের সঙ্গে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কোন রাজনৈতিক তত্ত্বদর্শীর সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব। কেন না তাঁরাও শিল্পী। কাদা মাটি পেলেই যদৃচ্ছ মূর্তি তৈরী করে দিতে পারেন। কাজেই এই প্রস্তাব সমর্থনে নিদেনপক্ষে সাতটি লেনিনের উটি উদ্ধৃত করে দেবেন এবং রাশিয়ার সেই সময়ে কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহামতি লেনিন এই উক্তি করেছিলেন তা অবলীলাক্রমে বলে দেবেন। অবশ্য একথা ঠিক মার্কস-লেনিন তখন সকলেরই। কি সংশোধনবাদী কি নয়া-সংশোধনবাদী বা কি মাওবাদী সকলেই তাঁদের ট্রেড মার্ক হিসাবে লেনিন সাহেবকে বাজারে চালাচ্ছেন! এখন লেনিনও তিন লেনিনে পরিণত হয়েছেন।

শ্রীভূপেশ গুপ্ত বার বার 'সাজেসান' হিসাবে উল্লেখ করলেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিলও কেন্দ্রীয় প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করে বলেছেন তাঁরা অগ্রপশ্চাত

বামকে সংহত করবেন, সুদৃঢ় রাখবেন আর 'গণতান্ত্রিক শক্তির' সঙ্গে মিতালির সূত্র বার করবার চেষ্টা করবেন। রাজ্য কাউন্সিল তার প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক শক্তি বলতে কারও নাম করেনি। কারণ শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে যখন এত হৈ চৈ হচ্ছে তখন নামটা বলার দরকারই বা কি? কাজেই নামটা উচ্চারণ না করে সাময়িকভাবে পর্দার আড়ালে রেখে দেওয়া হয়েছে। ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তির সুযোগকে ব্যবহার করে আক্রমণের তীব্রতাটাকে যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তবে মন্দ কি?

এই ব্যাখ্যা শুনে কি অন্টবামের শরীকরা সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন? তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন তাঁরা বিভ্রান্ত। আবার কেউ বলেছেন পশ্চিমবাংলায় নূতন শক্তিজোট গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা আরও বলবার চেষ্টা করেছেন যে, সি পি এম বিরোধীতা করার অর্থ এই নয় যে তাঁরা শাসক কংগ্রেসের বন্ধু হিসাবে পরিগণিত হতে চান।

কিন্তু সর্বভারতীয় দল হিসাবে ফ্রন্টে থাকার মধ্যে দুটি দলের ভূমিকা বহুমাত্রিক পরিবর্তনের রূপ নিয়েছে। একদিকে সি পি আই অন্যদিকে এস এস পি। কিন্তু অন্য যে কয়টি দল ফ্রন্টে আছেন তাঁদের সর্বভারতীয় রূপ না থাকায় [illegible] তাঁদের পরীক্ষা দিতে হয়নি। পশ্চিম বাংলাতেই তাঁদের পরীক্ষা দিতে হবে। তার মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি ও বিপ্লবী সি পি এম-এর কথা আলাদা। সি পি আই যেভাবে খোলাখুলি জোরের সঙ্গে এ সমস্ত প্রাদেশিক দলের ভূমিকাই [illegible] কংগ্রেসমুখী করে তোলবার চেষ্টা করছেন, তা সত্যিই রাজনৈতিক কুশলতার পরিচয় বহন করে। [illegible] বাধা সত্ত্বেও সি পি আই রাজ্য কাউন্সিল 'গণতান্ত্রিক শক্তির' আড়ালে থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাবার সংকল্প যেমন করেছেন। তাঁরা এখনই কংগ্রেসসম্পর্কে বিশ্বাসী এবং মনে করেন শাসক কংগ্রেস বস্তুতপক্ষে নব কলেবরে পুরানো কংগ্রেসের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাঁদের [illegible] সি পি আই-এর সঙ্গে সর্বাগ্রে বোঝাপড়া করা। কেননা একদিকে অন্য সাতটি বামপন্থী দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের প্রয়াস চললে—জনগণের ভুল বুঝবার সুযোগ থাকবে অনেক বেশী।

সি পি আই তাঁদের উদ্দেশ্য মত ঠিক পথেই চলছেন। যেমন মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের প্রতি তাঁদের বৈরীভাবকে আস্তে আস্তে জোটবন্দী হয়ে যেভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঠিক তেমনি কালক্ষেপণের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের সংগে পাকাপোক্তভাবে মিতালি করবার ভিত্তিভূমি তৈরী করতে সক্ষম হবেন বলেই মনে হয়। তবে একটি আশংকা যে নেই এমন নয়। সেটা হচ্ছে দলের রাজ্য শাখার মধ্যে আলোড়ন। যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর থেকে যখনই মিনিফ্রন্ট সরকার গড়ার কথা উঠেছে কেরালা-স্টাইলে তখনই সি পি আই নেতারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থাকে শুধু আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করেন নি, অধিকন্তু তাঁরা কতখানি শাসক কংগ্রেস বিরোধী তা প্রমাণ করার জন্য কংগ্রেসকে এই রাজ্যের বৃহৎ বুর্জোয়া ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতিভূ বলেছেন। ফলে দলের কর্মীদের মধ্যেও অনুরূপ একটি মানসিকতা তৈরী হতে বাধ্য। কিন্তু অজ রাতারাতি পশ্চিমবঙ্গের সেই বৃহৎ বুর্জোয়া ও একচেটিয়া মালিকদের প্রতিভূগণকে প্রগতিশীল বলে বুকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এই ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক পণ্ডিতেরা বলছেন যে, সি পি আই যদি তার প্রস্তাবিত নীতি পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করতে চান তবে এই রাজ্য দলীয় নেতৃত্বে রদবদল করতে হবে। রাজ্য নেতৃত্ব যদি [illegible] কেন্দ্রীয় প্রস্তাবকে সমর্থন করতে সক্ষম হন তবে শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও শ্রীভবানী সেনকে [illegible] আর শ্রীইন্দ্রজিৎ [illegible] প্রস্তাবের রূপ দেবার জন্য দিল্লী থেকে ফিরে আসতেন না। বলা বাহুল্য এরও একটা দরকার যে, [illegible] তাঁদের মধ্যে [illegible] তাঁরা রাজনীতিতে শিক্ষা নিয়েছেন সেই [illegible] রাজনীতির প্রতি তাঁদের [illegible] হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

যা হউক—সি পি আই প্রস্তাবে বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি [illegible]। তবে যাঁদের সঙ্গে মিতালির জন্য এত আপ্রাণ... পাটনায় সেই শাসক কংগ্রেস সি পি আই-এর সঙ্গে 'গ্র্যান্ড এলাইয়েন্সের' প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সি পি আই কেন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি চাইছেন? তাঁদের অন্য কোন পথ নেই। কেন না তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে অনেকে হয়ত ভাববেন চন্দ্রজিৎ যাদবের সংশোধনী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে কংগ্রেসের কম্যুনিস্ট বিরোধীতার ভূমিকা বেশ তীব্রই আছে। যাদব মহাশয় জেনে-শুনেই ঐ প্রস্তাব রেখেছিলেন। সংশোধনীটা যে তলিয়ে যাবে একথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনার ফলে অবচেতন মনে একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এভাবে বার বার আলোচিত হতে থাকলে যতটুকু কম্যুনিস্ট বিদ্বেষ শাসক কংগ্রেসের আছে তা কেটে যেতে বাধ্য। কাজেই যাদব সাহেব যে অতীব চতুরতার সঙ্গে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। শাসক কংগ্রেস নেতারা পাটনা মঞ্চে বার বার বলেছেন তাঁরা এখন বামপন্থী হয়ে গেছেন কাজেই বামপন্থী শক্তিগুলোকে সংহত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিচক্র জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র ও আদি-কংগ্রেসকে রুখবার জন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে যাদব সাহেবের প্রস্তাব অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সময়োচিত। আর শাসক কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে সি পি আই-এর সঙ্গে যখন একসঙ্গে চলছেন তখন যাদব সাহেবের প্রস্তাব না গ্রহণ করার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে? শুধু আদি কংগ্রেসের চার্জ যে নিরর্থক সেটা সাময়িকভাবে প্রমাণ করার জন্যই ইন্দিরাজী কালক্ষেপণ করছেন মাত্র। নতুবা তিনি যে নীতির উপর দাঁড়িয়েছেন তা ঠিক সি পি আই-এর অতীব নিকটেই নিয়ে গেছে মাত্র।

যা হউক, পশ্চিমবঙ্গে শাসক কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে থেকে হয়ত কিছুটা বিদ্রোহের ধ্বনি উঠতে পারে। কিন্তু সেটাও হবে সাময়িক। কারণ বাংলা কংগ্রেস-শাসক কংগ্রেস এখনও 'ইউ নট ইক্যুয়াল টু পাওয়ার'। সেখানে সি পি আই-এর প্রয়োজন আছে। সি পি আই অষ্ট পার্টি জোটের থেকেই গ্রহণ করবে। কেননা যে সমস্ত এলাকা থেকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন সেখানে বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেসের মদৎ পেলে অন্য সমস্ত বামপন্থী একত্রিত হয়েও তাঁদের কিছু করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তাঁদের নীতি বাঁচে, কৌশল কাজ করে বিধান সভার আসন সংখ্যাও ঠিক থাকে এবং হাতেনাতে বিপ্লব করার পথটাও প্রশস্ত হয়। অতএব মাভৈঃ!"

—সমদর্শী

তিন মাস ধরে বর্ষণের পর প্রচন্ড জল জমে যাওয়ায় মেকং অঞ্চলে সৈন্য চলাচল ব্যাহত হয়। জল কিছুটা নেমে যাওয়ার পর ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ সৈন্য চলাচল শুরু হয়েছে।

দেশে বিদেশে

পাটনার রাজেন্দ্রনগরে এবার শাসক কংগ্রেসের নিখিল ভারত কমিটির যে অধিবেশন হয়ে গেল সেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা আগেকার তুলনায় অনেক কম দেখা গেছে, একথা অনেক পর্যবেক্ষকই বলেছেন। শাসক কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ও গত জুন মাসে দিল্লীতে দলের কমিটির অধিবেশনে অনেক বেশী আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রাজেন্দ্রনগর অধিবেশনমণ্ডপ অধিকাংশ সময়েই ফাঁকা ছিল, যেটা এর আগে বোম্বাইয়ে বা দিল্লীতে দেখা যায় নি।

দলের সদস্যদের মধ্যে উৎসাহের এই অভাবের যে কারণই থাকুক না কেন, এটা ঠিক যে, এবার দলের জাতীয় কমিটির সামনে উপস্থিত করার মতো একটা সন্তোষজনক রেকর্ড দলের নেতাদের ছিল। কংগ্রেসের ভাঙনের অব্যবহিত আগে যেমন ব্যাংকগুলির রাষ্ট্রীয়ত্তকরণের সরকারী সিদ্ধান্ত দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল তেমনি এইবারও এ-আই-সি-সি সদস্যরা এটা দেখেই এসেছিলেন যে, প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলোপের যে প্রস্তাবটি দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেস ঝুলিয়ে রেখেছিল সেটি অবশেষে কার্যকর করতে চলেছেন শাসক সরকার। ইদানীংকালে কংগ্রেসের কথায় ও কাজে ফারাক যত বাড়ছিল দলের অধিবেশনে মঞ্চের উপর-বসা নেতাদের সঙ্গে মেঝেতে-বসা সদস্যদের ব্যবধানও তত বাড়ছিল। কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর শাসক কংগ্রেসের নেতারা অন্ততঃ সেই ফারাকটা কমাতে সমর্থ হয়েছেন।

রাজেন্দ্রনগরের অধিবেশনে অন্ততঃ এটা বোঝা গেছে যে, দলের সদস্যরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন, অর্থনৈতিক সংস্কারের যেসব কর্মসূচী দীর্ঘকাল কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে সেগুলির বাস্তব রূপায়ণের আশা এখন করা যেতে পারে। এখন দলের নেতাদের সামনে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে সেটা হল, সাধারণ সদস্যদের মনে একবার এই আশা জাগিয়ে তুলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাল সামলাতে পারবেন কিনা? রাজেন্দ্রনগরে দেখা গেল, নেতারা যতদূর এবং যে গতিতে এগোতে প্রস্তুত তার চেয়েও বেশী দূরে এবং দ্রুততর গতিতে এগোবার জন্য তাঁদের উপর চাপ আসছে। সাধারণ বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে কবে? শহরাঞ্চলে সম্পত্তির সীমা বেঁধে দেওয়ার কি হল? ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা পরিবারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে না কেন? মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁদের উচ্চসীমার বেশী জমি আছে তাঁদের বাড়তি জমি ছেড়ে দিতে বলা হবে কি? এইসব প্রশ্ন এই অধিবেশনে উঠেছে। এবং কোন প্রশ্নেরই খুব সদুত্তর অধিবেশন মঞ্চ থেকে পাওয়া যায় নি। 'এখনও সময় হয়নি', 'খুব ভালভাবে সব দিক ভেবে দেখতে হবে', 'সরকারের হাত বেঁধে দেওয়া ঠিক হবে না', ইত্যাদি বলে নেতাদের এই সব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হয়েছে।

কিন্তু তাহলেও এবার এ-আই-সি সি-র অধিবেশনে কয়েকটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিটি এই যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতিটি পরিবারের জন্য মাসিক অন্ততঃ ১০০ টাকা আয়ের সংস্থান করা হবে। অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবন বলেছেন যে, এই প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেস এই প্রথম কার্যত স্বীকার করে নিল, জীবিকার অধিকার জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। দ্বিতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ভারত সরকারের তরফ থেকে অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবন

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভারত সরকার ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। অছাড়া, আগামী বছরের শেষ ভাগের মধ্যে সমস্ত আবাদযোগ্য অথচ পতিত সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের বিলিয়ে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

এই সব অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, সাধারণভাবে এবার দলের নেতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত নরম সুর শোনা গেছে। সমাজতন্ত্রের সপক্ষে সেই প্রথম দিককার উচ্চনিনাদী কণ্ঠস্বর এবার অনুপস্থিত ছিল। তার একটা কারণ, পর্যবেক্ষকদের মতে, শাসক কংগ্রেসের নীতি বড় বেশী কম্যুনিষ্ট-ঘেঁসা হয়ে পড়েছে এমন ধারণা দূর করার জন্য দলের নেতারা উদগ্রীব হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম প্রভৃতি প্রায় সকলেই তাঁদের বক্তৃতায় বিশেষভাবে কম্যুনিষ্ট পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের পদ্ধতির পার্থক্যটা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। গত জুন মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিরা অভিযোগ এনেছিলেন যে, দলের নেতারা কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে নরম নীতি অবলম্বন করেছেন। এবার পাটনায় তেমন কোন অভিযোগ আসেনি, এটা লক্ষ্য করার বিষয়।

কম্যুনিষ্টদের কাছে থেকে তফাতে থাকার এই আগ্রহটা এবারকার এ-আই-সি-সি অধিবেশনে আরও একদিক থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাসক কংগ্রেসের 'তরুণ তুর্কীরা' চেয়েছিলেন যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও বামপন্থী চরম মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংহতির আহ্বান দেওয়া হোক। কিন্তু দলের নেতাদের বিরোধিতার ফলে এবার এই ধরনের কোন আহ্বান দেওয়া হয়নি। অথচ, শাসক কংগ্রেসের নিখিল ভারত কমিটির গত অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে এই ধরনের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কমিটির বামপন্থী-ঘেঁসা সদস্য শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব প্রস্তাব এনেছিলেন যে, দিল্লী প্রস্তাবে বামপন্থী দলগুলি যেভাবে সাড়া দিয়েছে তার একটা সপ্রশংস উল্লেখ প্রস্তাবের মধ্যে থাক। কিন্তু দিল্লী প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয়, এই যুক্তিতে কমিটির অধিকাংশ সদস্য শ্রীযাদবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 'তরুণ তুর্কী'দের সঙ্গে যোগ দিয়ে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেছিলেন যে, সি-পি-আই-য়ের সঙ্গে বোঝাপড়া কেরলের নির্বাচনে কংগ্রেস ভাল ফল দেখিয়েছে, এর একটা স্বীকৃতি অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে থাকা উচিত। তিনি নাকি আরও বলেছিলেন, আমরা অন্য দলের সহযোগিতা চাইব, অথচ তারা সেই সহযোগিতা দিলে আমরা সেটা স্বীকারও করতে চাইব না, এটা ঠিক নয়। কিন্তু এই যুক্তিও শাসক কংগ্রেস দলের নেতাদের মন টলাতে পারেনি। এই ঘটনাও একটা ইঙ্গিত যার থেকে পর্যবেক্ষকরা অনুমান করছেন যে, শাসক কংগ্রেস দলের নেতারা দলের ভাবমূর্তি কতকটা বদলে নিতে চাইছেন।

●

রাজেন্দ্রনগর অধিবেশনে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবের একটা কারণ এই হতে পারে যে, বিভিন্ন রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের সামনে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলির ছায়া এই অধিবেশনের উপর পড়েছিল।

বিহারের রাজধানীতে যখন এই অধিবেশন হচ্ছিল তখন ঐ রাজ্যের শাসক কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাই আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিহার বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্ত ৭২ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জন এ-আই-সি-সি অধিবেশন চলার সময়ে প্রধানমন্ত্রী, শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীচাবনের সঙ্গে দেখা করে দাবী জানিয়েছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী দারোগাপ্রসাদ রায়কে দলের নেতার পদ থেকে ইস্তফা দিতে অথবা দলের ভিতর ভোট নিতে বলা হোক। তাঁদের অভিযোগ হল, শ্রীরায়ের মন্ত্রিসভার আমলে বিহারের আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং ঐ মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা 'দুর্নীতিমূলক ও নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপে' লিপ্ত আছেন।

প্রকাশ যে, নেতারা এই বিদ্রোহীদের বিষয়টি নিয়ে এখনই খুব চাপ না দিতে পরামর্শ দিয়েছেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, অভিযোগগুলি তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন।

শোনা যাচ্ছে, বিহারের শাসক কংগ্রেস দলভুক্ত বিদ্রোহী সদস্যরা শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়কে সরিয়ে শ্রীভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী করার চেষ্টা করছেন। পি-এস-পি এর আগেই রায় মন্ত্রিসভা থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

●

উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেস দল ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে কিনা সে বিষয়ে রীতিমত সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিরোধী কংগ্রেস, ভারতীয় ক্রান্তি দল, জনসংঘ, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ও স্বতন্ত্র দল মিলে যে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠন করেছে তারা শ্রীটি এন সিংহকে কোয়ালিশনের নেতা নির্বাচিত করেছে। সংযুক্ত বিধায়ক দল দাবী করছে যে, তাদের সঙ্গে বিধানসভার ২৬২ জন

সদস্য আছেন এবং অপরপক্ষ তাদের দল ভাঙগাবার যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাদের সমর্থক সংখ্যা ২৩০-এর কম কিছুতেই হবে না। সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতারা ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ডঃ গোপাল রেড্ডির সংগে দেখা করে শ্রীসিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাবার দাবী জানিয়ে এসেছেন। সংযুক্ত বিধায়ক দলের মুখপাত্রের কথা যদি সত্য হয় তাহলে রাজ্যপাল তাঁদের এই দাবীর সারবত্তা মেনেও নিয়েছেন। অপরপক্ষে শাসক কংগেস দলের নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী ডাঃ রেড্ডির সঙ্গে দেখা করে বলে এসেছেন যে যেহেতু সংযুক্ত বিধায়ক দল পৃথকভাবে চিহ্নিত কোন একটি দল নয় এবং যেহেতু শ্রীসিংহের নির্বাচন শরিক দলগুলির প্রত্যেকটির দ্বারা পৃথক পৃথক-ভাবে অনুমোদিত হয়নি সেহেতু রাজ্যপাল শ্রীটি এন সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না, সেই আমন্ত্রণ বরং বিধানসভার একক বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে তাঁরই (শ্রীত্রিপাঠীর) প্রাপ্য।

●

আরও যে একটি রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের সামনে নেতৃত্বের সঙ্কট দেখে ওঠার আগেই মিটে গেছে বলে মনে হচ্ছে সেটা হল আসাম। সেখানে শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা স্বাস্থ্যের কারণে বিধানসভায় দল-পতি পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড তাঁকে সেই অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর জায়গায় কে দল-পতি (ও মুখ্যমন্ত্রী) হবেন তা নিয়ে একটা বিরোধ বাধার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীই শ্রীচালিহার জায়গায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

—পুণ্ডরীক

আরব গেরিলা লায়লা খালেদ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিমান ছিনতাইএ তাঁর অপর একজন সংগীর কথা শুনছেন। লায়লা বলেছেন যে, বিমান ছিনতাইর জন্য তিনি এখনো তৈরী আছেন।

কম্বোডিয়ার সরকারী সৈন্যরা গ্রামবাসীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করছেন। নাম পেনের ৩৫ মাইল উত্তরে কাউক চাঁপের অধিবাসী এরা।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

সকলকে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। প্রতি বৎসর আমরা এই উৎসবের লগ্নটির জন্য অপেক্ষা করে থাকি। উৎসব আসে এবং চলে যায়। থাকে শুধু তার স্মৃতি ও আগামী উৎসবের প্রতীক্ষা। পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শুভকামনা জ্ঞাপনই উৎসবের বাণী। আমরা সেই বাণীর কথাই আন্তরিকভাবে আজ স্মরণ করছি।

পশ্চিম বাংলায় এবারের উৎসব এসেছিল নানা ক্ষয়ক্ষতির পটভূমিকায়। প্লাবনে দেশের অনেকাংশ প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সেই আর্থিক ক্ষতির জের এখনো যায়নি। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ উৎসবের দিন কটি আনন্দ করেছে। উৎসবের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলন এবং আত্মীয়তার যে বন্ধন তাকে শত দুঃখ-কষ্টের স্মৃতিও একেবারে ছিন্ন করতে পারে না। বাঙালীর কাছে এ উৎসব সে কারণেই এত প্রিয়, এত অপরিহার্য।

বাংলাদেশের দিকে তাকালে অবশ্য আনন্দ করবার কিছু নেই। তার অর্থনৈতিক দুর্গতি আজ চরমে। নানা স্তোকবাক্য শোনা যায় ওপর মহল থেকে। কিন্তু কোনোটাই কার্যে পরিণত হয় না। বন্যার জন্য বাংলার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে প্রায় সোয়া একশো কোটি টাকার মতো। আপাতত সরকার মাত্র ৬০ কোটি টাকা প্রার্থনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। তাও মঞ্জুর হয়নি। অথচ বলার সময় সকলেই বলেন যে, বাংলার জন্য যথাসম্ভব করা হবে।

আসলে বাংলাদেশ আজ সকলেরই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার বেকার সমস্যা দিনে দিনে বাড়ছে। শিক্ষিত তরুণ ঘরে ঘরে বসে আছে কাজ নেই। চতুর্থ পরিকল্পনায় কিছু আশাভরসা দেওয়া হয়েছিল যে নতুন কর্মসংস্থান তাতে হবে। তার ছিটেফোঁটাও এখন পর্যন্ত বাংলার দিকে আসেনি। বরং অনেক কল-কারখানা বন্ধ থাকায় বেকাররা হতাশ হয়ে সেই রুদ্ধ দরজাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।

এদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা এমন একটি রূপ নিচ্ছে যা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সমাজবিরোধীরাও এর সুযোগ নিয়ে এক চরম অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে তুলেছে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহনীয় নয় মোটেই। কিন্তু যে-আমলারা প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য চালাচ্ছেন তাঁরাও এই গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছেন না যথাযথভাবে। পুলিশও অনেকটাই অপ্রস্তুত। তাদের সাহায্য করার জন্য আনা হয়েছে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ। কিন্তু তাতেও অবস্থার খুব উন্নতি হয়েছে বলা চলে না। সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিই এখন ঘোরালো।

রাজনৈতিক ফ্রন্টেও উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেরলের নির্বাচনের পর বাংলাদেশ সম্পর্কে দিল্লীর আগ্রহ বেড়েছে। এখানে কেরলের ধরণে কোনো ফ্রন্ট গড়া যায় কিনা তা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে। তাদের জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়ার কথা বলা হয়েছে। স্বভাবতই কেরলে কমিউনিস্ট পার্টি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যে সাফল্য লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গে তার পুনরাবৃত্তিতে তাদের আগ্রহ। কিন্তু পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া পৃথক। কেরলে মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার ফলে আর, এস পি দুভাগ হয়ে গেছে। সুতরাং তখনকার আট পার্টি জোট কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবের পর অস্ত থাকবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির এই রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিরোধিতা করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি, প্রমুখ জোটভুক্ত পার্টি।

কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য এটা আগেই অনুমান করেছিল যে আট পার্টির অনেক পার্টিই তাদের সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু তা হলেও কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ হিসেবে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে এই বোঝাপড়ার সিদ্ধান্তে কমিউনিস্ট পার্টি আর দ্বিধা করবে না। আট পার্টির অন্যান্য অংশীদার ফ্রন্টের আওতায় যত শক্তিশালী হয়েছিল ফ্রন্টের বাইরে তত শক্তি ওদের থাকবে না এটা কমিউনিস্ট পার্টি হিসেব করে নিয়েই বর্তমান রাজনৈতিক পরীক্ষায় ঝাঁপ দিয়েছে। অবশ্য শাসক কংগ্রেস কতটা আগ্রহে তাদের এই প্রস্তাবে সাড়া দেবে সেটাই হল দেখবার বিষয়। তবে যতদূর মনে হচ্ছে বোঝাপড়া একটা হবেই এবং বাংলাদেশে আরেকবার রাজনীতির এক আশ্চর্য খেলা জমবে।

সবাই বর্তমান অবস্থায় অতিষ্ঠ। এর অবসান হওয়া দরকার। কীভাবে তা হবে সেটাই হল বিবেচ্য বিষয়। নির্বাচন কবে হবে তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই। কিন্তু বিভিন্ন দলে রাজনৈতিক বিরোধ এখন যে পর্যায়ে এবং যে রূপ হিংস্র আকারে দেখা দিয়েছে তাতে এখন নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেও তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যাবে কিনা তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ। বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আগেও ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। কিন্তু বিরোধীকে খুন করে স্তব্ধ করে দেওয়ার রাজনীতি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। এত রক্তপাতে মানুষ আজ আতঙ্কিত। বাংলাদেশকে এই হিংসার আগুন থেকে কে রক্ষা করবে?

শুধু চিত্রকল্প নও ।।

কৃষ্ণ ধর

না, তুমি শুধু কবিতার চিত্রকল্প নও
যাকে নিয়ে মনের ভেতরে তৃপ্তি পাওয়া যায়
তুমি শুধু ছন্দ যতি অনুপ্রাস উপমার মিলে
অধরা বস্তুর মতো, ধরা দাও না তো
তোমাকে নিয়েই কাব্য, নাটকের শাণিত সংলাপ
পিকাসোর ছবি কিংবা বলাই পালের
লক্ষ্মীর পট আঁকা, শস্য বীজ নবান্নের সুবাসিত স্তব
তোমাকে নিয়েই হাসা কাঁদা।
তোমাকে রৌদ্রে চাই খাঁ খাঁ মাঠে নিঃসঙ্গ উত্তাপে
মধ্যরাতে কখনো বা উঠে
ডাক দিয়ে জানাই তোমাকে, তুমি আচম্বিতে জেগে
বিরক্তির ভান করে শোয় পাশ ফিরে
তোমাকে অন্যত্র দেখি কখনো বা খিন্ন অবসাদে
নিজের ভিতরে এক আয়নার বুকে
কখনো রক্তের ভিতরে একটানা বহমান স্রোতে
তোমাকে খুঁজতে যাই অস্তির সংঘাতে।
আমার সত্তাকে তুমি মৃদঙ্গের মতো বোলে বোলে
সজাগ সটান করো প্রখর চাটিতে
সখ্যে নয়, বৈরিতায় কখনো বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
আমাকে আহ্বান করো দুরন্ত স্বৈরথে।

সূর্য প্রতীক ।।

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা অনেক দূরে, আমরা একান্ত কাছে থাকি,
আকাশে বলাকা ওড়ে, এক আকাশ, একই নীল রঙ,
ঝাপসা চোখের আলো, তবু চোখ বুজি না, বরং
রুদ্ধ গৃহমাঝে বসে মনের দরজা খুলে রাখি।
কর্মক্লান্ত দিনশেষে কলোনীর ডোবাটার ধারে
হঠাৎ থমকে যাই, কানে গান—মনসা ভাসান।
মৃত্যুদূতে বাধা পায়, লখাইকে ফিরে দিতে প্রাণ
বেহুলা বাসর জাগে মানচিত্র সীমার এপারে।

প্রথম আমের বোল, মৃদুগন্ধে মন দুলে যায়,
ধূসর গঙ্গায় মেশে বন্যা-জাগা সবুজের ঢেউ,
মেঘনার কূলে কূলে শাঁখে ডাক দিল বুঝি কেউ,
কে যেন নক্ষত্র কন্যা দিগ্বলয়ে আবির ছড়ায়।

এখন গভীর রাত, সারারাত দৈত্য আনাগোনা,
এই রাত—দীর্ঘ রাত, তবু কাল সূর্য কি পাব না?

অবিশ্বস্ত সিঁড়ি ।।

শোভা মিত্র

ক্রমশই যেন সে বিশ্বাস হারিয়ে যায়
নিজের মধ্যে
একটা ভাঙা নড়বড়ে ঘোরানো কাঠের সিঁড়ির
অবিশ্বস্ত ধাপে ধাপে
রোজকার কি যেন এক অজানা ভয়,
সন্দেহ আর শঠতা বাসা বেঁধে থাকে।

দিনান্তে একঘেয়ে কর্মবিরতির পর
ঘরে ফেরার সাধ জাগে
উন্দাম বাসনা ঘেরা স্বপ্নের এক সুউচ্চ প্রান্তসীমায়
প্রতীক্ষারত এক বিশ্বস্ত হৃদয়ের
উত্তপ্ত নিবিড় ভালবাসার একান্ত সুখ সান্নিধ্যে
কর্মক্লান্ত মন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম চায়
অথচ রোজকার সে একই সিঁড়ির
অবিশ্বস্ত ধাপে ধাপে,
সন্দেহ আর শঠতা বাসা বেঁধে থাকে—
সেই একই ভয় অজানা আশঙ্কা তাই,
সে প্রান্ত-সীমায় পৌঁছবার।

রাজার শেষ ঘুম

মানব সান্যাল

সেই অনিবার্য মুহূর্তটি—তাকে ঘুম কিংবা মৃত্যু অথবা নিজের হাতেই খুব স্পষ্ট যতিচিহ্নের রেখে এঁকে দিয়ে এক দুর্দান্ত অশ্বরোহীর চল্লিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতার সমাপ্ত ঘোষণা—যে নামেই চিহ্নিত করা যাক না কেন—সেই মুহূর্তটি আসবেই এবং পরমেশ সেন অনেকগুলো স্লিপিং পিল একসঙ্গে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে খুব গাঢ় ঘুমের মধ্যেই কোন এক সময় এক গম্ভীর রাজকীয় মৃত্যুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ 'আমি পরমেশ সেন নামে এক রাজা মৃত্যুকেও রাজকীয় মহিমা দিলাম' এই সচেতন বোধ থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবেন—সেই পরম প্রার্থিত মহিমা-মণ্ডিত মুহূর্তটি আসতে আরও পাঁচ মিনিট নাকি আছে—হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে কথাটা মনে হতেই পরমেশ সেনের মনের মধ্যে ধূমপানের শেষ ইচ্ছাটা খুব প্রবল হয়ে উঠল।

এখন তাঁর বুকের মধ্যে আর কোন চাপ-ধরা ভাব নেই। বরং খুব জটিল এক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে যেমন হালকা খুশীর হাওয়া অস্তিত্বের চারপাশে ঘুর-ঘুর ক'রে বেড়ায়—পরমেশের মনে হচ্ছিল—তিনি সম্পূর্ণ হালকা হয়ে গিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পেরেছেন।

শিলপিং পিলের শিশিটা নাগালের মধ্যেই আছে। হাত বাড়ালেই মৃত্যু বুকের কাছে ঘন হয়ে আসবে নিঃশব্দ পায়ে। হয়তো মায়ের মত কোলে তুলে নেবে—কিংবা খুব বড়, বাঁকানো দুটো ধারালো শিং দিয়ে হৃদপিণ্ডটাকে ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে দেবে। অথচ পরমেশ সেনের চেতনায় তা ধরা পড়বে না।

আসুক এই নিঃশব্দ অচেতন মৃত্যুর ক্ষণ—পরমেশ সেনের কোন উদ্বেগ নেই—সেই মৃত্যুর চেহারা যতই ভয়ংকর হোক—পরমেশ সেন এখন সম্পূর্ণ ভয়হীন হয়ে গেছেন। হাত-ঘড়ির কাঁটা দুটো বারোটার ঘরে লম্বালম্বি, ওপর-নীচে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেই ......।

কি আশ্চর্য নির্বোধ, শান্ত এই মৃত্যু—সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল—অথচ পরমেশ সেনের চেতনায় তার কোন চেহারা নেই—ভয়ে সিঁটিয়ে নীল হয়ে যাওয়ার আর্ত-চীৎকার নেই—'আমি মরে যাচ্ছি', 'মৃত্যু আমার গলা টিপে ধরেছে', 'না, না, আমি করতে চাই না', 'মৃত্যুর বড় ভয়ংকর, 'কে আছ, ওগো আমাকে বাঁচাও'—ভয়ংকর সব কণ্ঠোচ্চারিত শব্দের পীড়ন নেই—পরমেশ যেন খুব ভয়হীন এবং শান্ত মনে বসেছিলেন হাত-ঘড়ির দিকে সতর্ক দুটো চোখ রেখে। শুধু মাঝে মাঝে 'সংখ্যা' নামে একটি নিরীহ শব্দ তাঁকে ভাবনায় ডুবিয়ে দিচ্ছিল। আজ আর একটা কিংবা দুটো ঘুমের বড়িতে কাজ হবে না। পুরো শিশিটাই মুখের মধ্যে উপুড় করে দিতে হবে। মোটমুটি একটা সহজ হিসাবে শিলপিং পিলের শিশিটার মধ্যে বাকি বড়িগুলোর সংখ্যা যা ধরা পড়ে—তা দশের কম তো হবেই না। অতএব আজ শুধু সংখ্যার হের-ফের—আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবস্থাগুলির আর কোন পরিবর্তন নেই। এক কিংবা দুই-এর বদলে দশ। শুধু সংখ্যাটাই পালটে যাবে। ব্যাস তারপর নাগর-দোলায় দোল খেতে খেতে অচৈতনার গভীরে ডুবে যাও—তাকে ঘুমই বল, আর মৃত্যুই বল তার চুলচেরা বিচার করার জন্য পরমেশ সেনকে তো আর পাওয়া যাবে না।

শুধু জবা-কুসুমের মত একটা টুকটুকে লাল সূর্য—যা ক্রমশঃই ঝাউ আর পাম গাছগুলোর শিশিরে-ভেজা পাতায় পাতায় বড় ঘাটটায় অজস্র মুক্তোর বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভেঙে পড়ে—সেই সুন্দর সূর্যোদয়ের প্রভাত আর কোনদিন ফিরে আসবে না। একে যদি মৃত্যু বলা যায়—তবে সেই মৃত্যুকে ভয় নেই।

আনুষঙ্গিক যে অবস্থাগুলো রোজই উপস্থিত থাকে— আজ তাদের কোন ব্যতিক্রম নেই। অন্য রাতগুলোর মতই পরমেশ সেন বেডরুমে ঢুকেই ফ্লাশ ডোরের পাল্লা-দুটো টেনে দিয়ে ল্যাচটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। বাইরে গুমোট ভাব থাকায় এয়ারকুলারটাকে ঠাণ্ডার দিকে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অভ্যাসমত ঘরের চারপাশে একবার দ্রুত দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তবে অন্যদিনের মত আজ আর বাতিটা নিভিয়ে দেননি। অপেক্ষা করেছেন সেই অন্তিম মুহূর্তের। বিছানার ওপরে বসেই হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে সময়কে সতর্ক পাহারা দিয়েছেন।

—আরও পাঁচ মিনিট সময় হাতে আছে। একটা গোটা সিগারেটকে বেশ মৌজ করে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে, বাতাসে রিং ছুঁড়ে শেষ করতেই হাতের সময়টুকু ফুরিয়ে যাবে। তারপর ডানলপের গদীতে শরীরটা ডুবিয়ে বেড-সুইচটাকে টিপে দেবেন। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। আজ আর ঘুম নিয়ে ভাবনা নেই! অন্ধকারে জেগে থেকে ভৌতিক সব ছায়া আর শব্দের অশরীরী অস্তিত্বের পীড়ন নেই। চাদরটা গায়ের ওপরে টেনে দিয়েই শিলপিং পিলের পুরো শিশিটাই মুখের মধ্যে চালান করে দেবেন। তারপর ঘুম—গাঢ়, গভীর ঘুম—ঘুমের মধ্যেই রাজার মত মহিমা-মণ্ডিত মৃত্যু।

পরমেশ সেন সিগারেটটাকে দুই ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরেছিলেন। ডানহাতের মুঠোয় লাইটারটাও তুলে নিয়েছিলেন।

আর ঠিক সেই সুন্দর পরিকল্পিত মুহূর্তটিকে হঠাৎ ভয়ংকর এক গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি পরমেশ সেনকে দারুণ চমকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা কোলের কাছে গুটিয়ে গেল। ঢং...ঢং...ঢং...হলঘরের দেওয়াল ঘড়ি থেকে একটার পর একটা ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসতে লাগল আর প্রত্যেকবার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ সেনের হৃদপিণ্ডটা লাফ দিয়ে দিয়ে ধক-ধক করে কানের পর্দায় ঘা মারতে লাগল।

বারোটা ভয়ংকর বুক-কাঁপানো শব্দের ঢেউ আছড়ে পড়ল হৃদপিণ্ডের ওপরে। তারপর আবার আগের মতই সব চুপ। কোথাও কোন শব্দ, এমনকি অশরীরী কোন ঘস-ঘস সন-সন শব্দও শোনা যায় না।

শুধু পরমেশ সেনের বুকের মধ্যে বেজে চলেছে সেই ভয়ংকর ঘণ্টাধ্বনি। নিজের কানে হাত রেখেই সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনে রক্তের মধ্যে শির-শির করে উঠল। পরমেশ সেন ডান হাতের মুঠোয় শিলপিং পিলের শিশিটা চেপে ধরলেন। বুকের বাঁদিকে কণ্ঠার ঠিক নীচেই যেখানে হৃদপিণ্ডটা খুব জোরে জোরে লাফ দিচ্ছিল—বাঁ হাতটা খুব জোরে খামচে ধরলেন।

তারপর দরজার মুখোমুখি ঘুরে বসতেই পরমেশের সারা দেহে কাঁপুনি ধরল। হঠাৎ খুব শীত করে উঠলে যেমন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, পরমেশ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

ঘাতকের দল নিশ্চয়ই এতক্ষণে দরজার গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এবার বন্ধ দরজায় অনেক ব্যস্ত হাতের ঘা পড়বে। ওদের কেউ একজন নিশ্চয়ই হেঁড়ে-গলায় চীৎকার করে উঠবে—ওহে পরমেশ সেন, আর প্রাণের মায়া কেন? আমরা যে এসে গেছি। এবার দরজা খোল।

পরমেশ সেন স্পষ্ট অনুভব করলেন—বুকের মধ্যে অবিরাম বেজে চলা সেই ঘণ্টার শব্দটা এখন খুব শীতল এক হিমের স্রোত হয়ে শির-শির করে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। হাত-পা সব যেন দারুণ ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ক্রমশঃই অবশ হয়ে আসছে। বাঁ হাতটা তখনও বুকের বাঁদিকে খামচে ধরা ছিল—হঠাৎ হাতটা খুব ভারী আর শিথিল হয়ে বুকের ওপর থেকে খসে পড়ল। ডান হাতের মুঠোটাও আলগা হয়ে এলো। পরমেশ সেন দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করেও মুঠোটাকে শক্ত করতে পারলেন না। শিলপিং পিলের শিশিটা শিথিল মুঠোর ফাঁক দিয়ে মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়ে ভাঙা কাচের টুকরো হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল।

পরমেশ সেনের দু-চোখের বোবা দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণের অসহায়তা ফুটে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রইলেন—সারা দেহে পক্ষাঘাতের অসাড়তা নিয়ে।

আশ্চর্য! ভয়টা তাহলে এতক্ষণ বুকের মধ্যেই ঘাপটি মেরে বসেছিল।

অথচ আজ সারাটা দিন—সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা অ্যাটর্ণি, ব্যারিস্টার, ইনকাম ট্যাক্স আর সেলস্ ট্যাক্স অফিসের লোকেদের আসা-যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ভয়টা যখনই শিং উঁচিয়ে ঢুঁ মারতে এসেছে, পরমেশ সেন জোর ধমকে হটিয়ে দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত তাঁর মনে হয়েছিল—ভয়টাকে একেবারেই তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বুকের মধ্যে হঠাৎ ঘণ্টার শব্দ বেজে ওঠার আগেও তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল—তিনি সম্পূর্ণ ভয়হীন হয়ে গিয়েছেন।

ঘাতকদের চিঠিতে দিন এবং সময়ের যে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, তাতে বুঝতে মোটে অসুবিধা হয়নি—আজ রাত বারোটায় হত্যার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। ফলে সারাটা দিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বিষয়-সম্পত্তির যাবতীয় ঝামেলার কাজ শেষ করতে বুকের মধ্যে হাঁপ ধরে গিয়েছে। সম্পত্তি তো কম নয়—দু' মাইল এলাকা জুড়ে বিশাল কারখানা, রাজপ্রাসাদের মত সাজানো বাড়ী, ব্যাঙ্কে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা—এতসব বিষয়-আশয়ের কি হবে, কাকে দিয়ে যাবেন উত্তরাধিকার—ভেবেই কূল পাচ্ছিলেন না। শেষপর্যন্ত মাসে মাসে বরাদ্দ চাঁদার খাতাটা বার করে একটা খুব ছোটখাটো অনাথ আশ্রমের নাম বেছে নিয়েছিলেন। একবার মনে হয়েছিল—বিষয়-আশয়, সম্পত্তি সব ঘাতকদের পায়ে সমর্পণ করে প্রাণভিক্ষা চাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সারা দেহে সপাং সপাং চাবুক চালিয়ে ফালা ফালা দাগ করে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। পরমেশ সেন নামে এক দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার সারাজীবন রাজার মত মাথা উঁচু করে সময়কে শাসন করেছেন। আজ ভিখারী বনে গিয়ে ঘাতকদের পায়ের নীচে মুখ থুবড়ে

পড়বেন নাকি? নাঃ, রাজার মতই মৃত্যুকে নিজের হাতে বুকের ওপরে তুলে নেবেন। পরমেশ সেন বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘটনার পারম্পর্যগুলি মনের মধ্যে ভেবে রেখেছিলেন।

ঘাতকের দল ঠিক রাত বারোটার দরজার গোড়ায় এসে হাজির হবে। হাতে নিশ্চয়ই উদ্যত ছোরা কিংবা ধারালো কোন অস্ত্র থাকবে। কিন্তু পরমেশ সেন মিনিট-পাঁচেক আগেই অনেকগুলো ঘুমের বড়ি একসঙ্গে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে চাদরটাকে মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে লম্বা-লম্বি বিছানায় ডুব দেবেন। ঘাতকেরা নিশ্চয়ই বন্ধ দরজায় ঘা মেরে মেরে শেষ-পর্যন্ত দারুণ ক্রোধে ফুঁসে উঠে দুমদাম লাথি মারতে শুরু করবে দরজায় পাল্লায়। ক্রাশ-ডোরের বিলাসী পাল্লাদুটো এক সময় ভেঙে পড়বেই। ঘাতকরা উদ্যত ছোরা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু পরমেশ সেনের শবদেহ কোপ মেরে মেরে এক ফোটাও রক্ত ঝরাতে পারবে না।

এই পৃথিবীটার কাছে চাইবার আর কিছুই নেই পরমেশ সেনের। ফলে মৃত্যুর আগে খুব সহজেই বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু একটি মাত্র দুষ্টু ইচ্ছা ছিল—দেওয়ালঘড়িটাকে শেষবারের মত হারিয়ে দিয়ে যাবেন। পরমেশ সেন সুপরিকল্পিত এক স্বেচ্ছা-মৃত্যুর আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখেননি।

সাতদিন আগেই চিঠিটা হাতে পেয়েই অনিবার্য মৃত্যুর কাছে পরমেশ সেন আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু হলঘরের প্রাচীন বৃদ্ধ দেওয়াল-ঘড়িটার মুখ থেকে অন্তিম মুহূর্তের ঘোষণা শোনা মানেই তো হেরে যাওয়া। সারাজীবন যে দুর্ধর্ষ সৈনিক সময়ের আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে —আজ সে সময়ের কাছে হেরে যাবে নাকি? মৃত্যু আসবেই, তাকে মেনে নিতে হবে—এটা একটা নিয়ম—দুর্লঙ্ঘ্য, অনিবার্য, কিন্তু তাই বলে প্রাচীন এক বৃদ্ধ ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে সময়ের জয় ঘোষণা করবে—আর পরমেশ সেন নামে এক পরাজিত অশ্বারোহী সেই জয়-ঘোষণা শুনতে শুনতে ঘাতকদের হাত ধরে মন্থর শিথিল পায়ে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাবে—পরাজয়ের এই করুণ দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করার জন্য বেঁচে থাকা যায় না।

পরমেশ সেন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রেডিওর সময় দেখে হাত-ঘড়িটাকে পাঁচ মিনিট এগিয়ে রেখেছিলেন। আর নিশ্চিত বিশ্বাসে হাত-ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায় রাত জেগে বসেছিলেন। দেওয়াল-ঘড়িটাকে হারিয়ে দেওয়ার কি সুন্দর পরিকল্পনা। দেওয়াল-ঘড়িটা তখনও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে টক্-টক্-টক্... পেন্ডুলাম দোলাতে থাকবে। সময় পড়ে থাকবে পাঁচ মিনিট পিছিয়ে। অথচ হাত-ঘড়ির কাঁটাদুটো বারোটার ঘরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে। পরমেশ সেন তখন টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছেন, চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন। ঘুম আসছে দু-চোখ ভরে। দেওয়াল-ঘড়িটা তখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সময়ের হাত ধরে চলছে। ঘাতকদের দল সে-ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

এখন দারুণ আফশোষ হচ্ছে। কেন যে হাত-ঘড়িটার ওপরে এতটা নির্ভর করেছিলেন? অথচ হাতঘড়িটা যে মাঝে মাঝে সময়ের আগে-পিছে হয়ে যায়—এ তো তাঁর নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

আর যখন তিনি নির্ভুল যোগ-বিয়োগের হিসাব সেরে দেওয়াল-ঘড়িটাতে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজতে আরও দশ মিনিট দেরী আছে—এই নিশ্চিত সান্ত্বনায় ধূমপানের শেষ ইচ্ছাটা মিটিয়ে নিতে চাইছিলেন—বুঝতে পারেননি রেডিওর সময় দেখে যে হাতঘড়িটাকে সকালবেলাতেই পাঁচ মিনিট ফাস্ট করে রেখেছিলেন, সেটা সারাদিনে একটু একটু করে পিছিয়ে দশ মিনিট স্লো হয়ে গিয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টার শব্দ হৃদপিণ্ডের মধ্যে দারুণ জোরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল।

তাহলে মৃত্যুটা এখন আর হাতের মধ্যে রইল না। দেওয়াল-ঘড়িটার মুখ থেকেই ঘাতকদের আগমন ঘোষিত হল। আর পরমেশ সেন নামে এক পরাজিত ঘোড়-সওয়ারকে এখন ঘাতকদের হাত ধরেই বধ্যভূমির দিকে হেঁটে যেতে হবে।

কত বয়স হল দেওয়াল-ঘড়িটার? পরমেশ সেনই তো প্রায় একুশ বছর ধরে ঘড়িটার সঙ্গে হার-জিতের খেলা খেলছেন। আর ঊনচল্লিশে যুদ্ধের বছরে যখন পার্ক স্ট্রীটের এক অকশান হাউস থেকে ঘড়িটা কিনেছিলেন, তখনই ওটার সারা দেহে চাঁদের মা বুড়ীর হিজিবিজি মুখ আঁকা। একুশ বছর ধরে এই জরাগ্রস্ত, প্রাচীন বৃদ্ধটি সময়কে সতর্ক প্রহরীর মত পাহারা দিয়েছে আর পরমেশ সেন যতই দুরন্ত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সময়ের আগে আগে এগিয়ে গিয়েছেন—এই বৃদ্ধটি দম নিয়ে থেমে থেমে দিনরাত ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছে।

কিন্তু কে শুনেছে বৃদ্ধ প্রহরীর সেই সাবধান-বাণী? পরমেশ সেন তখন দিগ্‌-বিদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন।

ঊনচল্লিশেই দুটো জেন-মেশিনের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন পরমেশ সেন। যুদ্ধের হাওয়ায় তখন বাজার দারুণ গরম। বড় বড় কণ্ট্রাক্টের দিকে হাত বাড়াবার ক্ষমতা ছিল না। পরমেশ সেন ছোটখাটো কণ্ট্রাক্টের ক্ষীণ আশা বুকে নিয়ে রোমান কোম্পানির পারচেজ অফিসারের পিছু পিছু হাতে ক্যাশ নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। অফিসার ভদ্রলোকটি কিন্তু সোজাসুজি বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেননি। পরমেশ সেনই শেষপর্যন্ত ভদ্রলোকের দুর্বলতার গোপন সূত্রটি ধরে ফেলেন। যুবতী স্ত্রী প্রৌঢ় স্বামীকে দারুণ লোভনীয় শরীরের আগুনে রুটির মত এপিঠ-ওপিঠ সেঁকেও গরম করতে পারে না। ব্যর্থতার লজ্জা ঢাকতে গিয়ে ভদ্রলোক স্ত্রীর খেয়ালখুশির তাঁবেদারি করেন।

নবনীতা—হ্যাঁ, নবনীতাই তার নাম—পরমেশ সেনের হাতে স্বর্গের চাবিটা তুলে দিল।

নবনীতা তাঁর কাছে কিছুই চায়নি। ভারী ভারী সোনার গহনা, বাড়ী, গাড়ি সবই তার ছিল। শুধু বেশ কিছুদিন পরমেশ সেনের শরীরটাকে ধার চেয়েছিল। মেয়েটা যেন ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত পরমেশ সেনের হাড়-মাংস চিবিয়ে রক্ত চুষে শরীরটাকে চেটেপুটে খেত।

কিন্তু রোমান কোম্পানির মাল সাপ্লাই-এর ব্যাপারটা পরমেশ সেনের একচেটিয়া কারবার হয়ে গেল। নবনীতাই অদৃশ্য সুতোয় টান মেরে মেরে পরমেশের হাতের মুঠোয় তুলে দিতে লাগল বড় বড় রুই-কাতলা কণ্ট্রাক্ট। সেই নবনীতা সুদৃশ্য বিলাতী ডাইনিং সেটের বায়না ধরেছিল।

কিন্তু জিদ ধরেছিল—পরমেশ সেনকে দাম দিতেই হবে।

পরমেশ সেন অকশান শপে গিয়েছিলেন বিলাতী ডাইনিং সেটের ভাবনা নিয়ে। কিন্তু একটা পুরানো দেওয়াল-ঘড়ি তাঁর মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল করে দিল। বিবর্ণ, পালিশ্যো রঙ-ওঠা ঘুণ-ধরা ঘড়িটা কিন্তু টক্-টক্-টক্ চলছে—দুটো কাঁটাতেই নির্ভুল সময়ের নির্দেশ। ঘড়িটার গায়ে প্যারিসের কোন অভিজাত দোকানের নাম খোদাই করা ছিল।

পরমেশ সেনের চোখের ওপরে কোন এক প্রাচীন রাজবাড়ীর বিশাল হলঘরের ছবি ভেসে উঠেছিল। সেরকম কোন হল-ঘর তিনি আদৌ দেখেছেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু স্মৃতিতে কোন অস্পষ্টতা ছিল না।

টানা লম্বা প্রশস্ত হলঘর, উঁচু ছাদ থেকে সোনালী শিকলে ঝোলানো ঝাড়-বাতিগুলোর গায়ে লাল-নীল-আলোর রঙ ঝলমল করছে। শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডা মেঝে, মাঝ-বরাবর নরম কার্পেট বিছানো গোলাপ-ফুলের মত টকটকে লাল রঙ—হাঁটতে গেলে পা ডুবে যায়। চারপাশের দেওয়ালে ফ্রেশ্কো। ওপর দেওয়ালে সার সার সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পাগড়ি-মাথা, পাকানো মোম-পালিশ গোঁফ, চোস্ত চাপকান-পরা রাজবংশের কীর্তিমান পুরুষদের বড় বড় লাইফ-সাইজ তৈলচিত্র।

আর মাঝ-দেওয়ালে খুব বড় একটা দেওয়াল-ঘড়ি, মসৃণ মেহগনি কাঠের বডিতে সোনালী জলের সূক্ষ্ম কাজ, পেণ্ডুলামটা এপাশ-ওপাশ দুলতে দুলতে ঝাড়-বাতিগুলোর লাল-নীল আলোয় ঝকমক করে জ্বলে উঠছে আর হঠাৎ গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনিতে ঝাড়-বাতিগুলোর রিনিরিনি, রুনু-ঝুনু শব্দকে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

পরমেশ সেন আর কিছু না ভেবেই নীলামের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। আশে-পাশে ক্রেতা ছিল না। মাত্র দশ টাকায় ঘড়িটা পেয়ে গিয়েছিলেন।

পরমেশ সেন নিজেও বোধহয় তখন রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে দিয়েছিলেন সাফল্যের ঘোড়াটাকে।

বছর-পাঁচেকের মধ্যেই শুধু রাজা নয়, সম্রাট বনে গিয়েছিলেন পরমেশ সেন। যুদ্ধের এলাকা যত এগিয়ে গিয়েছে—পরমেশ সেনের শিল্প-সাম্রাজ্যের সীমাও দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

কণ্ট্রাক্টে কণ্ট্রাক্টে ছয়লাপ। নবনীতার মুঠোভর্তি কোমর ছাড়িয়ে পরমেশ সেনের হাত তখন অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। মাল সাপ্লাই দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। কারখানাটাকে যতই বড় করেছেন, মনে হয়েছে—নাঃ, সাপ্লাই শর্ট হয়ে যাচ্ছে—আরও বাড়ানো দরকার।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই দু' মাইল এলাকা জুড়ে বিশাল কারখানা। অফিস, স্টাফ-কোয়ার্টার—এক বিশাল শিল্প-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি পরমেশ সেন টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন দুরন্ত গতিতে।

না, সুষমা তখনও রানী হয়ে তাঁর রাজপ্রাসাদে আসেনি। সুষমা—সুষি—সু... আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠলেন পরমেশ সেন। সুষমা, তোমাকে তো রানীর মত করেই ঘরে এনেছিলাম। বিশ্বাস কর তোমার মৃত্যু আমি চাইনি। কিন্তু তুমি কেন আমাকে থামিয়ে দিতে চাইলে? ঘোড়াটা যে তখন টগবগিয়ে ছুটছে। হঠাৎ লাগাম টেনে ধরলে যে নিজেই মুখ থুবড়ে পড়তাম।

পরমেশ সেনের মনে হল—জিব, গলা, ঠোঁট সব শুকিয়ে খট্খট্ করছে। জল চাই। পুরো এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল। বেড-সাইড টেবিলের ওপরেই জলের গ্লাশ। সহজেই হাতটা গ্লাশের দিকে এগিয়ে গেল। ঢক ঢক করে পুরো গ্লাশটাই গলায় ঢেলে দিলেন।

আঃ বাঁচলাম—বুকের বাঁ দিকে হৃদ-পিণ্ডের ওপরে আস্তে আস্তে হাত ঘষতে লাগলেন পরমেশ সেন।

ভয়টা আবার কোথায় যেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়েছে। হাত-পাগুলো সহজেই নড়াচড়া করা যাচ্ছে। হৃদপিণ্ডটা স্বাভাবিক গতিতে ধুকপুক ধুকপুক নড়ছে।

ঘাতকরা বুঝি শেষপর্যন্ত আর এলোই না। কিন্তু বেঁচে থেকেই বা কি লাভ? আর তো রাজা হয়ে বাঁচতে পারবেন না পরমেশ সেন। রাজা যে নিজের হাতেই রাজত্ব ঐশ্বর্য সব বিলিয়ে দিয়েছেন।

এত বড় রাজ্য কিন্তু বিলিয়ে দিতে কিই বা সময় লাগল? একটা পুরো দিন বৈ তো নয়।

অথচ রাজা হয়ে বেঁচে থাকার জন্য কি না করেছেন পরমেশ সেন। এমনকি সুষমা নামে কচি কলাপাতার রঙের কিশোরী মেয়েটি—যাকে তিনি রানী করে ঘরে এনেছিলেন—সেই বড় সাধের রানীর হাঁসের মত দীর্ঘ, পুষ্ট, নরম নধর গলাটাতে আঙুলগুলোকে একটু একটু করে চেপে বসিয়ে দিতে গিয়ে হাতদুটো একবারও কেঁপে ওঠেনি। লোভ! লোভ যাবে কোথায়? সাম্রাজ্য বিস্তারের দারুণ লোভে রানীকেও খুব ধারালো একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পরমেশ সেন।

রানী কিন্তু রাজাকেই আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চেয়েছিল। দৈত্যের মত মিলিটারী অফিসারটার হাতের থাবায় ধারালো দাঁতের কামড় বসিয়ে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে এসেছিল। সুষমার দু' চোখে তখন কি দারুণ ঘৃণা। কিন্তু উপায় ছিল না পরমেশ সেনের। আর এক রাজার সঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছে। রাণা বোস অ্যাণ্ড কোম্পানি তাঁর হাত থেকে দশ লাখ টাকায় একটা মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট ছিনিয়ে নিয়েছিল। পরমেশ তখন মরিয়া। অফিসারটাকে ঘুষ খাইয়েও কাবু করতে পারেননি। রাণা বোসের সাক্সেসের সিক্রেটটা ধরতে বেশী দেরী হয়নি পরমেশ সেনের। বাজারের মেয়েছেলেতে অফিসারটার যে মোটেই লোভ নেই—এ-খবরটাও তাঁর অজানা ছিল না। শেষপর্যন্ত সুষমাকেই কাজে লাগাতে হল। কিন্তু সুষমা তাঁর কথা শোনেনি। যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিলেন পরমেশ সেন। ছুটন্ত ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল সুষমা। অতএব সুষমাক শাস্তি পেতে হল। রাজা নিজের হাতেই রানীকে ফাঁসি দিলেন।

অথচ সুষমাকে তো একদিন রানীর মত করেই ঘরে এনেছিলেন পরমেশ সেন। জ্যোৎস্না রাতে রাজা আর রানীর সেই বাঘ-হরিণীর আশ্চর্য ভালবাসার খেলাও তো মিথ্যা ছিল না।

পরমেশ সেনের সাম্রাজ্যের সীমা তখন দু' মাইল বিস্তৃত। এক বিরাট রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন পরমেশ সেন। দু' বিঘা জমির ওপরে সেই বিরাট প্রাসাদ প্রচণ্ড দম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। ভোরের প্রথম সূর্যের আলো সোনার মুকুটের মত ঝকঝক করে জ্বলত সেই রাজপ্রাসাদের মাথায়। উঁচু প্রাচীর-ঘেরা কম্পাউণ্ডের চারপাশে সার সার ইউক্যালিপটাস, পাম আর ঝাউগাছগুলোর মাথায় মাথায় শন্-শন্ বাতাসের শব্দ উঠত।

পরমেশ সেনের রাজবাড়ীতে অনেক বাতাস ঘরে ঘরে হা-হা করে খেলে বেড়াত। কিন্তু সে-বাতাসে সৌরভ ছিল না। রাত যখন গভীর হত, ঘরে-ঘরে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠত, ঝাউ-পাম আর ইউক্যালিপ্টাসের মাথাগুলো অন্ধকারের ডানার নীচে ঘুমিয়ে পড়ত—পরমেশ সেন নামে এক নিঃসঙ্গ রাজা অন্ধকারেই হেঁটে বেড়াত আর নিঃশ্বাস টেনে টেনে বাতাসে রানীর অদৃশ্য শরীরের সৌরভ খুঁজত।

তারপর সুষমাকেই রানী করে ঘরে নিয়ে এলেন পরমেশ সেন। নোতুন-বৌ-এর হাত ধরে তর্-তর্ করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ছাদের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সুষমার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছিল। বুকের আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। পরিশ্রমে, উত্তেজনায় দারুণ হাঁপাচ্ছিল সুষমা। কুমারী বুকের ওপরে যেন সাগরের ঢেউ তোলপাড় করছিল। কচি কলাপাতার শরীরে জ্যোৎস্নার রং মাথামাখি। কপালে, গালে, নাকের পাটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম পোখরাজের দানা হয়ে জ্বলছিল।

পরমেশ সেন প্রসারিত দুই হাত ওপরে তুলে চাঁদটাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে সুষমার মাথায় মুকুটের মত বসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু চাঁদ আকাশেই ছিল। আর পরমেশ সেনের বুকের নীচে অপরিসর অন্ধকারের ছায়ায় ঢাকা চাঁদের রঙ মাখানো এক আশ্চর্য স্নিগ্ধ কচি কলাপাতার শরীরে দাউ দাউ করে আগুন ধরে গিয়েছিল।

পরমেশ সেনের রাজপ্রাসাদের বিশাল, প্রশস্ত ছাদটা ফুলের বাগান হয়ে গিয়েছিল। টবের ফুলের সে এক আশ্চর্য

পুষ্পোদ্যান। জ্যোৎস্না রাতে রাজা আর রানী হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত সেই ফুলের বাগানে। রাজা তার রাজ্যজয়ের গল্প শোনাত, রানী চুপ করে শুনত সেই কাহিনী।

রাত যখন আরও গভীর হত—জ্যোৎস্নার রুপালী আলোয় ফুলের গন্ধ ভেসে উঠত—রাজা আর রানী পুষ্পোদ্যানেই ফুলশয্যা পাতত। সারা দেহে ফুলের রেণু মেখে মেখে সে এক আশ্চর্য ভালবাসার খেলা। এত বড় সম্রাট পরমেশ সেন—মাঝে মাঝেই খেলায় হেরে যেতেন। সুষমার সে কি খিলখিল হাসি।
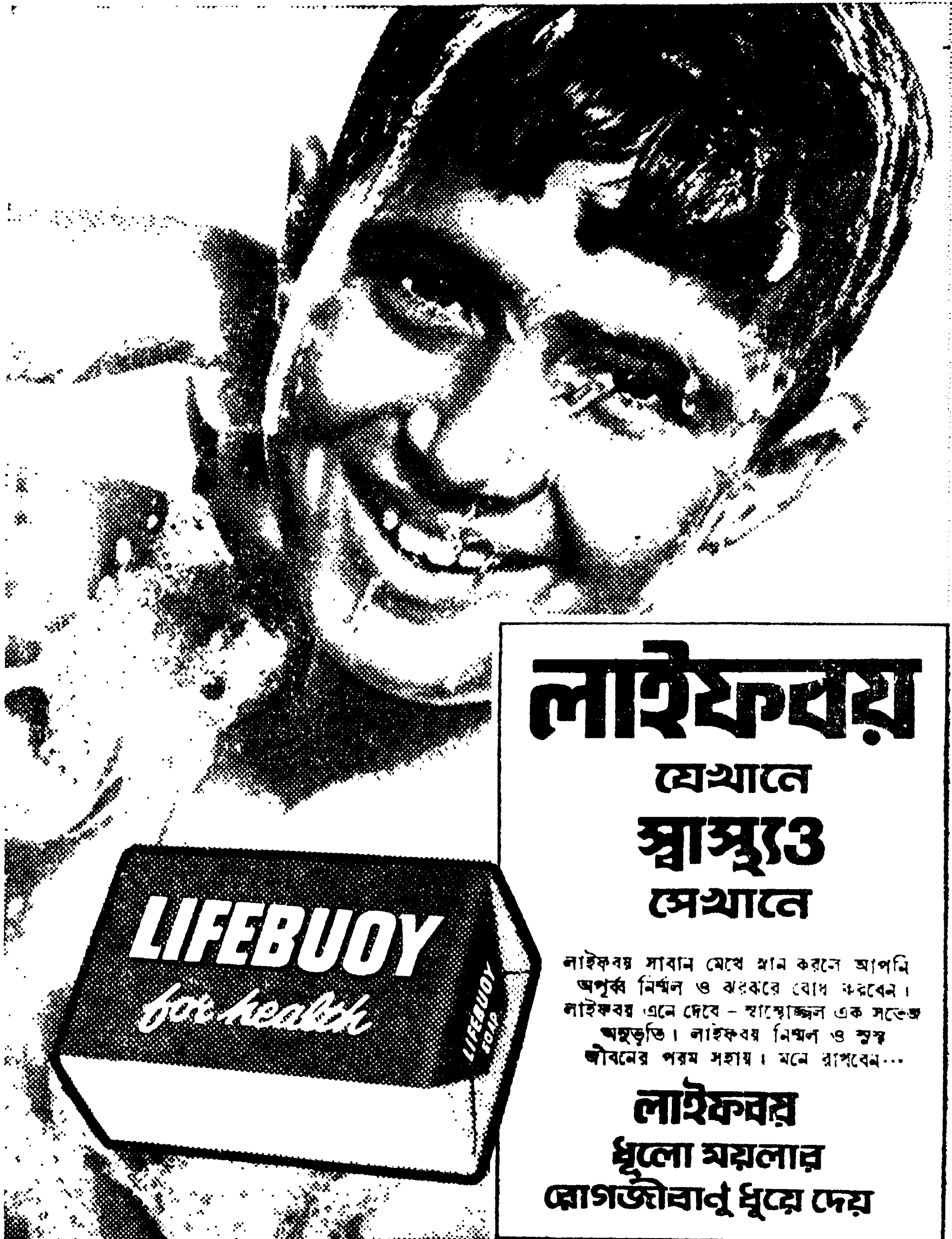
হেরে গিয়ে আরও দুর্দম, আরও দুর্দান্ত হয়ে উঠতেন পরমেশ সেন। সুষমা কিন্তু চঞ্চলা হরিণীর মত ছোট ছোট পায়ে ছুটে ছুটে পরমেশ সেনের বুকে হাঁপ ধরিয়ে দিত।

শেষ পর্যন্ত হরিণীকেই ধরা দিতে হত। সুষমাকে বুকের নীচে ফেলে বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে ধরতেন পরমেশ সেন। হরিণীর নধর শরীরটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে মাংস-ভক্ষণ করত এক হিংস্র ব্যাঘ্র।

সুষমার দু-চোখ জলে ভরে যেত কিন্তু ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি ফুটে উঠত। পরমেশ সেনের বুকের ওপরে ছোট্ট একটা ঘুষি মেরে বলত—তুমি সত্যিই একটা বাঘ। হাড়-মাংস চিবিয়ে খাও।

বাব্বাঃ, আর আমি কোনদিন জিততে চাই না।

বাড়ীটাকে সত্যিই রাজপ্রাসাদের মত করে সাজিয়েছিলেন পরমেশ সেন। সারা বাড়ীতে এক আশ্চর্য রাজকীয় গাম্ভীর্য গমগম করত। আর রাজবাড়ীর মতই টানা লম্বা প্রশস্ত হলঘরটাতে আজও রুণু-রুণু ঝুনুঝুনু ঝাড়বাতিগুলো বাতাসে দোল খায়। তাদের গায়ে লাল-নীল আলোর রঙ দেওয়াল জুড়ে সার সার টাঙানো পরমেশ সেনের লাইফ-সাইজ তৈলচিত্রগুলোর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে রাজকীয় গাম্ভীর্যের মহিমা-মণ্ডিত রূপ ফুটিয়ে তোলে।

ঘরে ঘরে কত সুদৃশ্য হাল-ফ্যাশনের দেওয়াল-ঘড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সে সব ঘড়িতে কোনদিন ঘণ্টা বাজেনি। পরমেশ সেন ইচ্ছা করেই আর কোন ঘণ্টা-বাজা দেওয়াল ঘড়ি কেনেন নি।

শুধু হলঘরের মাঝ-দেওয়ালে প্রাগৈতিহাসিক এক বৃদ্ধের মত সময়ের সতর্ক প্রহরায় জেগে আছে এক জরাজীর্ণ, বিবর্ণ দেওয়াল-ঘড়ি। রাজা হয়ে যাওয়ার পর পরমেশ সেন অতীতকে একেবারে মুছে দিয়েছিলেন। শুধু অকশান সপ থেকে কেনা সেই প্রাচীন ঘড়িটাকে কাছছাড়া করেননি। হলঘরের মাঝ-দেওয়ালে নিজের হাতে পেরেক ঠুকে ঠুকে দেওয়াল ঘড়িটাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বিশাল রাজকীয় হলঘরের অজস্র সমারোহের মাঝে প্রাচীন বিবর্ণ, পালিশের রঙ-জ্বলা দেওয়াল-ঘড়িটাকে বেমানান লাগে বৈকি। কিন্তু সুষমার অনুযোগে কান দেননি পরমেশ সেন। জীবনে সবকিছু মানানসই করে সাজাতে গেলে তো পরমেশ সেন নামে এক প্রায়-বৃদ্ধ থপথপে কোলাব্যাঙকে আজই নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়।

কোলা-ব্যাঙ—কথাটা মনে পড়তেই পরমেশ সেনের পেটের মধ্যে গুড়গুড়িয়ে হাসি উঠল।

কোলাব্যাঙ! বেশ মজার নাম। পেটে ভাত না জুটলে কি হয় রসবোধ আছে লেবারারগুলোর।

গতবার ধর্মঘটের সময় পরমেশ সেনের বাড়ী আর কারখানার দেওয়ালে কত যে সব পোস্টার সেঁটেছিল ওরা।

কোলাব্যাঙ পরমেশের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দাও।

পেট-মোটা পরমেশের গোঁফের ঘাটায় আগুন ধরিয়ে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি সব মজার পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিল কারখানা আর বাড়ীর দেওয়াল।

একবার স্টাইকের হুজুগ উঠলে হয়—সব এককাট্টা। গতবার স্ট্রাইকের সময় শুয়োরগুলো কি কম ভুগিয়েছে? ছেলে-বৌ-এর পেটের চামড়া শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে। খালি পেটে পথে পথে কৌটো বাজিয়ে চাঁদা তুলেছে। কিন্তু মিছিলের আওয়াজে একটুও ভাঁটা পড়ে নি।

এক মাস সতের দিন কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া ওঠেনি। স্ট্রাইক ভাঙার অনেক চেষ্টা করেছিলেন পরমেশ সেন। বেশ কিছু দালালও জুটিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ইউনিয়নের চাঁই গয়াপ্রসাদ খুন হয়ে গেল। কারা যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাত দুটোকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল।

উঃ, কি বীভৎস মৃত্যু। শিউরে উঠলেন পরমেশ সেন। ভয়টা বুকের মধ্যে আবার শিরশির করে উঠল।

লেবারারগুলো মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। আর কি সাংঘাতিক সব শ্লোগান—মার কা বদলা মার। খুন কা বদলা খুন। কোলাব্যাঙ পরমেশের রক্ত চাই। শালা পরমেশের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দাও।

কিন্তু পরমেশ সেনকে পাবে কোথায়? পাখি তখন শূন্যে উড়ে গিয়েছে। কারখানার গেটে লক-আউটের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে বি-ও-এ-সির প্লেনে চড়ে বসেছিলেন পরমেশ সেন।

অথচ সেদিনও বাড়ী থেকে বেরোবার আগে দেওয়াল-ঘড়িটা থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে পরমেশ সেনকে অনিবার্য পরাজয়ের লজ্জায় থামিয়ে দিতে চেয়েছিল—পরমেশ সেন, তুমি হেরে যাচ্ছ। সময় তোমাকে হারিয়ে দিচ্ছে। তোমার সাম্রাজ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে সময়ের স্রোত। তোমার ঘোড়ার মুখে গাঁজলা উঠছে। এবার তোমার ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়বেই।

কি লজ্জা। পরমেশ সেন এত সহজে হেরে যাবেন নাকি? তাঁর হাতে শক্ত চামড়ার চাবুক আছে। দুহাতের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে এখনও লাগামটা ধরে আছেন। ঘোড়াটা দু-পা সামনে তুলে চিঁহি চিঁহি করে ডাকছে। শুধু চাবুক মারার অপেক্ষা। ঘোড়া ছুটবে—দুরন্ত, দুর্ধর্ষ গতিতে সময়কে পিছনে ফেলে ছুটে চলবে। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের ধুলোয় সময়ের পথ অন্ধকার হয়ে যাবে। ছুটতে ছুটতে ঘোড়ার মুখে গাঁজলা উঠবে। দু-কষ বেয়ে সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ঘোড়া ছুটবে—খপ্-খপ্-খপ্—কিদপ-কিদপ-কিদপ।

পরমেশ সেন দু-হাত দিয়ে কান দুটো চেপে ধরে গাড়িতে উঠে বসেছিলেন।

সেই পরমেশ সেন—ঘোড়ার খুরে খুরে শব্দ তুলে, দিগ্বিদিক অন্ধকার করে যিনি সময়ের আগে আগে সারাজীবন ছুটে চলেছেন, হলঘরের মাঝ-দেওয়ালে এক বৃদ্ধকে সযত্নে পালন করে একুশ বছর ধরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন আর হার-জিতের এক দারুণ মজার খেলা খেলেছেন—আজ তাকে একেবারেই হেরে যেতে হল।

ঠক্...ঠক্...ঠক্—দরজায় কেউ যেন খুব সন্তর্পণে আঙুলের টোকা দিচ্ছে না? পরমেশ সেনের কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল।

তাহলে ঘাতকরা এসেই গেল। হৃদ্-পিণ্ডটা যে আবার লাফ দিতে শুরু করল। ভয়টা যে আবার শিরশির করে শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে। এখন কি করবেন? নিজের হাতেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিয়ে ঘাতকদের আমন্ত্রণ জানাবেন নাকি?

মৃত্যুটা যদি ঘাতকদের হাতেই সংঘটিত হয় তো কেমন হবে সেই মৃত্যু?

একটু একটু করে যন্ত্রণা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে নাকি ওরা? কিংবা খুব ধারালো একটা তলোয়ারের কোপ মেরে তাঁর দেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে ঘরের চারপাশে ছুঁড়ে দেবে নাকি? অথবা এমনও হতে পারে—ওদের কেউ একজন দুহাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরে একটু একটু করে আঙুলগুলো বসিয়ে দেবে। সুষমার মুখটা যেমন যন্ত্রণায় লাল হয়ে গিয়েছিল—চোখের মণি-দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, সরু রক্তের দাগ দু গাল বেয়ে চুঁইয়ে পড়েছিল—সেই ভয়ংকর, বীভৎস এক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি নিজেকে রাজকীয় গাম্ভীর্যে অবিচল রাখতে পারবেন তো?

আরও একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথাও মনে পড়ছে। কাল রাতে যে রাজকীয় মৃত্যুর দৃশ্যটি তাঁকে দারুণ ত্রাসে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছিল—ঘাতকদের কাছে সেই রাজকীয় মৃত্যুর মহিমা ভিক্ষা করলে কেমন হয়?

কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। রাজা ভিক্ষা চাইলে তো আর রাজাই থাকে না। ভিক্ষুক তো রাজকীয় মৃত্যুর অধিকারী হতে পারে না।

কাল রাতে স্বপ্নটা কিন্তু দারুণ জমজমাট ছিল।

সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠটায় শাদা জ্যোৎস্না ধু ধু করছিল। মাঠের মাঝখানে ফাঁসির মঞ্চ। মঞ্চের মাথায় লাল-নীল পতাকাগুলো জোর বাতাসে পত্‌পত্ করে উড়ছিল। দড়ির ফাঁসটা এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছিল। মঞ্চের দুপাশে উষ্ণীষ-ম প্রহরীর দল লাইনে বেঁধে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—কোমরে-বাঁধা খোলা তরবারীর রুপোর বাঁটে হাত ছুঁয়ে। লাল ভেলভেটের ইউনিফর্ম-পরা ব্যাণ্ড-বাদকের দল মাঠের চারপাশে ঘুরে ঘুরে মার্চ করছিল। সামনে দলের নেতা খুব জোরে জোরে কাঁধ নাচিয়ে লেফট রাইট লেফট রাইট করে হাঁটছিল আর দুহাতে বর্শার মত একটা রুপোর লাঠিকে বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কসরৎ দেখাচ্ছিল। ব্যাগ-পাইপে মন্থর টিমে-লয়ের সুর বাজছিল। বোধহয় কোন বিদায়-সঙ্গীতের সুর। ব্যাণ্ড-বাদকের দল থেমে থেমে সেই সুরের সঙ্গে তাল দিচ্ছিল। পরমেশ সেনকে রাজার মত দেখাচ্ছিল। লাল মখমলের পোশাকে সোনালী জরীর নকসা। মাথার চুল কিংবা শরীর থেকে খুব চড়া আতরের গন্ধ উঠছিল। বাতাসে অনেকদূর পর্যন্ত সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজা মাথা উঁচু করে মন্থর পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পাশে পাশে দড়-সড় একটা শাদা ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছিল দুজন প্রহরী। ঘোড়ার পিঠে লাল ভেলভেটের গদী ছিল। মাথায় লাল সিল্কের ওড়না। ঘোড়াটা

রাজার পাশে পাশে মন্থর-পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খুব জোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল।

রাজা ফাঁসীর মঞ্চের সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু-পাশে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীর দল খট্-খট্ জুতোর শব্দ তুলে রাজাকে স্যালুট দিল। ব্যাণ্ডের বাজনা দ্রুত হল। জোরে জোরে জয়ঢাকে ঘা পড়তে লাগল। ব্যাগ-পাইপে খুব দ্রুতলয়ের যুদ্ধের সুর বাজছিল। ব্যাগ-পাইপের সুর খুব দ্রুত হতে হতে এক সময় হঠাৎ থেমে গেল। বাদকের দল দু-পাশে হাত নামিয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই বিউগিলের তীব্র, তীক্ষ্ম আওয়াজ মাঠের সাদা জোৎস্নাকে কাঁপিয়ে করুণ এক বিলাপের মত বিলম্বিত লয়ে ওঠা-নামা করতে লাগল।

কালো কাপড়ে মুখ-ঢাকা হ্যাংম্যান রাজাকে মঞ্চের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিল। রাজা কিন্তু তখনও ভয় পাননি। নিজের হাতেই দড়ির ফাঁসটার মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিয়েছিলেন।

পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলানো কালো আলখাল্লা পরা, এক বৃদ্ধ ডান হাতটা মাথার ওপরে তুলে আকাশের দিকে আঙুল রেখে মঞ্চের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মাঠের বুকে জোর বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বৃদ্ধের মাথায় একরাশ সাদা চুল এলোমেলো উড়ছিল।

রাজা নির্ভয়ে ফাঁসটাকে গলায় জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু সেই বৃদ্ধ হাতটা নামিয়ে দিতেই উঃ...পরমেশ সেনের শিরদাঁড়া বেয়ে দ্রুত একটা হিমের প্রবাহ নেমে গেল। হৃদপিণ্ডটা ধক্‌ধক করে লাফাতে লাগল। চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললেন পরমেশ সেন।

কাল রাতে যে কি দারুণ ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সারা দেহে গল-গল করে ঘাম ঝরছিল। বালিশ, চাদর—সব ভিজে একশেষ।

দরজায় ঠক-ঠক—ঠক্ করাঘাতের শব্দটা থেমে গেল নাকি?

পরমেশ সেন দরজার পাল্লায় কান পাতলেন। নাঃ, এখন আর কোন শব্দ নেই। কিন্তু শব্দটা তো তিনি স্পষ্টই শুনেছেন। কে জানে হয়তো ঘাতকের দল দরজার গোড়ায় এসে ফিরে গেল। হয়তো তাঁকে ভয় দেখিয়ে খুব একটা মজার রসিকতা করল। কিংবা আজও হয়তো শব্দের প্রতারণার শিকার হলেন পরমেশ সেন। রোজই তো অনেক ভৌতিক শব্দ তাঁকে প্রতারিত করে। অফিসে তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব এয়ারকণ্ডিশনড্ অফিসঘরের মধ্যে যেখানে বাইরের জগতের আলো কিংবা শব্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ—মাঝে মাঝেই হঠাৎ মিছিলের চীৎকার শুনে চমকে ওঠেন পরমেশ সেন। রাতের বেলা বেডরুমের সুইচটা টিপে দিয়ে অন্ধকারেই যখন জেগে থাকেন নির্বাণ, দুর্লভ ঘুমের প্রত্যাশায় হঠাৎ সড়-সড় খস-খস সব ভৌতিক শব্দে বুকের মধ্যে ভয় ধরে। সাইকিয়াট্রিস্ট মিঃ সেন কি যেন সব ব্যাখ্যা দেন—হয়ত মনে পড়েছে—হ্যালুশিনেশন—পরমেশ সেন হ্যালুশিনেশনে ভুগছেন।

তাহলে দরজায় ঠক-ঠক, খট-খট শব্দগুলো বোধহয় মনের ভুল—হ্যালুশিনেশন।

কিন্তু এখন যে বাতাসে শন্‌শন্, শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে—তাও কি মনের ভুল না কি?

হঠাৎ এক ঝলক জোর বাতাস পরমেশ সেনের গায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাশেই কোন ঘরে দড়াম দড়াম শব্দে দরজার পাল্লায় ঠোকাঠুকি হল। নাঃ, এবার আর শব্দ শুনতে ভুল করেননি পরমেশ সেন। বাইরে নিশ্চয়ই ঝোড়ো বাতাস উঠছে। ইউক্যালিপ্টাস আর পাম গাছগুলো মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করছে। পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ করে দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ। যতক্ষণ জীবন আছে—শারীরিক কষ্টগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখই ভাল।

পরমেশ সেন জানালার সামনে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটোকে বন্ধ করে ফেলতে হল। জোর ঘূর্ণী হাওয়ার সঙ্গে ধুলোর ঝাপটা এসে দু-চোখে বিঁধে গিয়েছিল। চোখ না খুলেই পাল্লা-দুটো ঠেলে বন্ধ করে দিলেন। চোখ খুলতেই দেখলেন মেঝের ওপরে কয়েকটা শুকনো পাতার সঙ্গে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো এদিক-ওদিক নড়ে বেড়াচ্ছে। এক লাফে জানালার সামনে থেকে সরে এসে কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নিলেন। ঘাতকদের সেই দারুণ ভয় ধরানো চিঠিটার মতই হলদেটে খসখসে কাগজ, কি লেখা আছে কাগজটাতে? ঘাতকরাই কি তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রেখে চিঠি পাঠাল? কাগজের টুকরোটা চোখের সামনে ধরেই হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠলেন। পরমেশ সেন। কোন এক একশ-আট-শ্রীগুরুদেবের উপদেশামৃত। মোক্ষের অমোঘ দাওয়াই বাৎলিয়ে অং-বং সংস্কৃত-বাংলায় শিষ্যদের বেশ কড়া উপদেশ ঝেড়েছেন গুরুমহোদয়—হে শিষ্যগণ, তোমরা শ্রবণ কর—মানুষ অমৃতের পুত্র। দেহের মৃত্যু আছে। কিন্তু আত্মা অমর। দেহকে কঠিন সংযমের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ, বাসনা-কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে। আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত। দেহের বন্ধন থেকে আত্মাকে মুক্ত করে দাও। আত্মানং বিদ্ধি। দেহের মৃত্যু হলেই মৃত্যুকে ভয় কোরো না।

যত সব ট্র্যাশ, বাজে ভণ্ডামি। মানুষকে নিয়ে রসিকতা করার কত যে সব মজার ব্যাপার আছে সংসারে।

পরমেশ সেন খুব সন্তর্পণে বুকপকেট থেকে বার করলেন ঘাতকদের চিঠিটা। আরে, সত্যিই তো, এখন আর ঘাতকদের মৃত্যু তাঁকে ভয় দেখাতে পারছে না। গুরুমহোদয় পরমেশ সেনকেও শিষ্য বানিয়ে ফেললেন নাকি? হৃদপিণ্ডের গতি এখন বেশ স্বাভাবিক। ধুকপুক, ধুকপুক স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করে যাচ্ছে।

ঘাতকদের নির্ধারিত সময়টা যে পেরিয়ে গিয়েছে—তাতে আর কোন হিসাবের গণ্ড-গোল নেই। পরমেশ সেনকে ভয় দেখিয়ে বেশ একটা জোরদার রসিকতা করল কারা যেন। অথচ পরমেশ সেন সাতদিন আগে চিঠিটা হাতে পেয়ে কি দারুণ সাংঘাতিক একটা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। ওঃ চিঠিটা তাকে এমন ভয় দেখিয়েছিল, বলতে গেলে এই সাতটা দিন, তাঁকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। আরও পাঁচটা নিত্য-নৈমিত্তিক চিঠির মধ্যে একটা নিরীহ সাদা খাম—তার মধ্যে যে একটা সাংঘাতিক ভয় ওৎ পেতে বসে আছে, পরমেশ সেন বুঝতেই পারেননি। চিঠিটা চোখের সামনে খুলে ধরতেই ভয়টা বুকের ওপরে চড়ে বসে গলাটা কামড়ে ধরেছিল, নিঃশ্বাসটা কোনরকমে গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে আটকে গিয়েছিল। বছরখানেক আগে একটা মাইল্ড স্ট্রোকের অভিজ্ঞতা আছে। সেই বুকের বাঁ পাশে চাপ-ধরা বেদনা—বাঁ হাতটা ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসছে। অবসন্ন দেহটা চেয়ারের গদীতে এলিয়ে পড়েছিল। নিঃশ্বাসটা বুকের খাঁচা থেকে বেরোবার পথ না পেয়ে গলার কাছেই হাঁকুপাঁকু করছিল।

পরমেশ সেনের মনে হয়েছিল—ওটা চিঠি নয়—তাঁর মৃত্যুদণ্ড পরোয়ানা। একুশ বছর ধরে শ্রমিকদের রক্ত চুষে তাঁর মেদস্ফীত ভারী শরীর আর লালচে মুখে যত রক্ত জমেছে—সব রক্ত টেনে বার করে ফ্যাকাসে রক্তহীন শবদেহটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার দারুণ ভয় ছিল সেই পরোয়ানায়।

পরমেশ সেনের কানের পর্দায় তখন মিছিলের চীৎকার আছড়ে পড়ছিল—সেই শব্দের প্রতারণা মিঃ সেন যাকে হ্যালু-শিনেশন বলেন—মারকা বদলা মার, খুন কা বদলা খুন। পরমেশ সেনের রক্ত চাই।

তারপর সাতটা দিন শুধু ভয়ংকর ভৌতিক সব শব্দের প্রতারণা তাঁকে দিন-রাত পীড়ন করছে। মিঃ সেনের ওষুধের স্টকে যত ট্রাংকুলাইজার আছে সব একে একে পরমেশ সেনের গলায় চালান হয়েছে, কিন্তু সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে শব্দের অবিরাম প্রতারণা চলেছেই। পরমেশ সেন যত শব্দ শুনেছেন—সবই শুধু ঘাতকদের ভয়ংকর উপস্থিতির সম্মোহে হৃদপিণ্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জেলে বুকের ওপরে হাত চেপে বসে থেকেছেন বিছানায়। বাতিটা নিভিয়ে দিলেই শুধু অশরীরী সব ছায়া আর শব্দের হ্যালুশিনেশন, ঘুমিয়ে পড়লে ভয়ংকর সব যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর স্বপ্ন। কাল রাতেই শুধু এক গম্ভীর রাজকীয় মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে-ছিলেন। সেই স্বপ্নে যন্ত্রণা ছিল না। বরং স্বপ্নের মধ্যেই রাজা হয়ে গিয়েছেন ভেবে খুব সুখী মনে হয়েছিল নিজেকে। শুধু শেষ দিকটা সেই কালো আলখাল্লা পরা বৃদ্ধই সব মাটি করে দিল। আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরা ডান হাতের আঙুলটা মাটিতে নামিয়ে দিতেই রাজামশাই হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠে-ছিলেন। কিন্তু কান্নাটাকে গলার কাছে চেপে ধরেছিল দড়ির ফাঁস। কসাই-এর দোকানে ঝোলানো খাসীর মত রাজামশাই—

ওর দেহটা ফাঁসির দড়িতে লটকে গিয়েছিল আর রাজামশাই খাবি খেতে খেতে হঠাৎ সেই বৃদ্ধকে আলখাল্লার আড়াল থেকে একটা ঝকঝকে ছুরি বার করতে দেখে ভয়ে চোখদুটো বন্ধ করে ফেলতে চাইলেন।

কিন্তু স্থির এবং নিষ্পলক দুটো চোখের মণি ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল সেই বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধ হাতের ছুরিটা রাজামশাইয়ের চোখের সামনে তুলে ধরে বাতাসে শাদা চুল আর দাড়ি উড়িয়ে খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসেছিল—রাজামশাই, আরও কিছুক্ষণ যে একটু কষ্ট করে আমাদের কৃপা করতে হবে। তোমার রাজদেহের চামড়াটা আমাদের চাই। একটা ডুগডুগি বানাতে হবে কিনা। এত বড় এক রাজার মৃত্যু হল—অথচ প্রজাবৃন্দের কাছে সেই টাটকা খবর পৌঁছাবে না—তাই কখনও হয় হে? বৃদ্ধের ছুরির ঠাণ্ডা ধারালো ফলাটা রাজামশাইর মাথার খুলির চামড়ায় ঝিলিক দিয়ে উঠতেই পরমেশ সেন হঠাৎ চীৎকার করে ঘুম থেকে জেগে গিয়েছিলেন।

মাথায়, গলায় হাত বুলিয়ে ভিজে হাতটা অন্ধকারেই চোখের উপরে মেলে ধরেছিলেন। জিবের ডগাটা হাতের তালুতে ঠেকিয়েই নোনতা আস্বাদে চমকে উঠেছিলেন। হঠাৎ মনে হয়েছিল মাথায় গলায় রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

বেড সুইচটা টিপে দিয়েই চড়া-বাতির আলোয় সারা দেহে শুধু গলগলে ঘাম গড়িয়ে পড়তে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—নাঃ, ঘামের স্বাদ রক্তের মতই নোনতা।

নিজের মনেই হেসে উঠলেন পরমেশ সেন। ঘাতকদের সেই দারুণ ভয়-ধরানো চিঠি, সাতটা দিন অসম্ভব আতঙ্ক, যন্ত্রণা, অশরীরী শব্দ আর ছায়ার পীড়ন, ভয়ংকর বীভৎস সব মৃত্যুর স্বপ্ন এবং শেষ পর্যন্ত কাল রাতে এক গম্ভীর রাজকীয় মৃত্যুর মুখ, আতঙ্ক সবই যেন এক প্রহসনের মত তাঁর অস্তিত্বকে খুব জোর একটা নাড়া দিয়ে গেল।

এখন কী করবেন পরমেশ সেন? ইচ্ছা করলেই কাল সকালে দানপত্রের কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন, তারপর আবার রাজার মতই খুব জোরসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে যুদ্ধ জয়ে বার হতে পারেন।

কিন্তু কি হবে আর রাজা হয়ে! অসম্ভব ক্লান্তিতে দেহ-মন ভেঙে পড়ছে। আর বোধহয় শক্ত হাতে ঘোড়ার লাগামটা চেপে ধরতে পারবেন না। সামনে অনেক যুদ্ধ। রাজা হয়ে বাঁচতে গেলে আরও অনেক যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। পুজো বোনাসের হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গিয়েছে। হিসাবের কারচুপি দিয়ে আর তো শ্রমিকদের ভোলানো যাবে না। আবার স্ট্রাইক, লক-আউট, থানা, পুলিশ, অন্ধকারে দালালদের সঙ্গে ফিস-ফিস ষড়যন্ত্র।

নাঃ, তার থেকে মৃত্যুকেই কাছে টেনে নেওয়া যাক। খুব নিরুদ্বেগ, যন্ত্রণাহীন ঘুমের মত মৃত্যু এসে তাঁকে কোলে তুলে নিক। রাজা তো রাজত্ব, ঐশ্বর্য সব বিলিয়ে দিয়ে ভিখারী বনেই গিয়েছেন। ভিখারীর মৃত্যুকে রাজকীয় মহিমা দেওয়ার প্রহসনে আর লোভ নেই।

পরমেশ সেন ঘরের মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আর দু-হাতের মুঠোয় ছড়ানো ছিটানো ঘুমের বড়িগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে নিতে লাগলেন।

বিছানায় উঠে বসলেন পরমেশ সেন। তারপর চিৎ হয়ে লম্বালম্বি শুয়ে পড়লেন। ঘুমের বড়িগুলো মুঠোর মধ্যেই ধরেই ছিলেন। বেড-সুইচটা টিপে দিলেন। অন্ধকারেই কয়েক মুহূর্ত কান খাড়া করে রইলেন। নাঃ, এখন আর কোন শব্দ কিংবা ছায়ার পীড়ন নেই। ডান হাতের মুঠোটা সামনে তুলে ধরলেন। সহজেই ঘুমের বড়িগুলো মুখের মধ্যে চালান হয়ে গেল।

পরমেশ সেনের হাতদুটো থরথর করে কাঁপছিল। আস্তে আস্তে চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিলেন।

'কে—কে তুমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে?'

'আমাকে চিনতে পারছ না? আমি সুষমা।'

'কিন্তু তুমি তো নেই। তুমি মৃত। আমি নিজের হাতে তোমাকে ফাঁসি দিয়েছিলাম।'

'আমার দেহ নেই। কিন্তু আমি আছি।'

'আজ রাতে তো তোমার আসার কথা ছিল না।'

'আমি রোজই রাত গভীর হলে তোমার কাছে আসি। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। তুমি আমাকে দেখতে চাও না—তাই আমাকে দেখতে পাও না।'

'আজ রাতেও তো তোমাকে আমি দেখতে চাইনি।'

'তুমি যে এতক্ষণ রাজা আর রানীর বাঘ-হরিণীর খেলা নিয়ে কত কথা ভাবলে—বুকে হাত দিয়ে বলতো—আমাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে হয়নি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ তোমাকে রানীর মত করে সাজিয়ে দু-চোখ ভরে দেখতে সাধ হয়েছিল।'

'আমাকে তো দেখতে পাবে না। খুব জোরে নিঃশ্বাস টান। বাতাসে আমার গন্ধ পাবে।'

'হ্যাঁ—তোমাকে অনুভব করতে পারছি। ঘর জুড়ে ভুরভুর করছে তোমার শরীরের সৌরভ। কিন্তু তোমাকে কি আর কোনদিন দেখতে পাব না? লক্ষ্মী মেয়ে, শুধু একবারটি দেখা দাও। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুধু একটিবার আমার চোখের সামনে।'

'আগে আমার হাত ধর। আমার পাশে পাশে হাঁট। তোমার ছায়ায় আমার শরীর, মুখ সব একটু একটু করে ফুটে উঠবে।'

'কিন্তু ঘাতকের দল যদি হঠাৎ ছুটে এসে আমাকে ধাওয়া করে।'

'না, ওরা আর আসবে না। ওরা তো রোজ রাতেই তোমার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। দরজায় আঙুলের টোকা মেরে তোমাকে ডেকেছিল। আমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। ওরা যে তোমার ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে তোমার শরীর থেকে একটু একটু করে সব রক্ত টেনে বার করে নিয়ে বর্শার ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমাকে মেরে ফেলত। তুমি যে খুব ভয় পেয়ে ওদের পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে। ওরা তো তোমাকে রাজার মত মাথা উঁচু করে মরতে দিত না।'

'সুষমা, আমি যে রাজার মত মাথা উঁচু করেই মরতে চেয়েছিলাম।'

'না—না—তোমাকে আমি মরতে দেব না। তোমাকে বুকের ওপরে রেখে ঘুম পাড়িয়ে দেব। এসো, আমার হাত ধর। আমার হাত ধরে হেঁটে চল—আর এক মহিমমণ্ডিত ঘুমের রাজ্যে—সেখানে গাছে গাছে কত ফুল, পাখী, জ্যোৎস্নার রঙে কত সৌরভ। আমি তোমার হাত ধরে পৌঁছে দেব সেই আশ্চর্য পুষ্পোদ্যানে। তুমি আর তোমার রানী ফুলের রেণু মেখে মেখে বাঘ-হরিণীর লুকোচুরি খেলা খেলবে। তারপর ফুল-শয্যায় রানীর নরম বুকে মাথা রেখে সেই পরম প্রার্থিত ঘুমে ঢলে পড়বে।'

'সুষমা, রানী আমার, তুমি অত জোরে ছুটছ কেন? আমি যে তোমার হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটতে পারছি না।'

সুষমা ছুটছে তৃণাচ্ছাদিত সবুজ মাঠে পা ফেলে ফেলে। বুকের আঁচল মাটিতে খসে পড়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

সাদা জ্যোৎস্নায় চরাচর ধু ধু করছে। দূর থেকে দ্রিম দ্রিম ব্যাণ্ডের শব্দ ভেসে আসছে। ব্যাগপাইপে খুব দ্রুত লয়ে যুদ্ধের সুর বাজছে।

সামনেই বধ্যভূমি। ফাঁসির দড়িটা বাতাসে দুলছে। হঠাৎ দূর-সমুদ্রগামী কোন জাহাজের কান্নার মত বিউগিলের তীব্র তীক্ষ্ণ করুণ আর্তনাদ চরাচরব্যাপী শাদা জ্যোৎস্নার সমুদ্রকে কাঁপিয়ে দিল।

ব্যাণ্ডের বাজনা থেমে গিয়েছে। সুষমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু-চোখে কান্না টলটল করছে।

পরমেশ যেন শিথিল মন্থর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে। কালো আলখাল্লাপরা এক বৃদ্ধ বাতাসে সাদা চুল আর দাড়ি উড়িয়ে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসছে। হাতের মুঠোয় ছুরির ফলাটা ঝকঝক করছে।

ওগো, আমি হেরে গেলাম। তোমাকে ফুলের বাগানে নিয়ে যেতে পারলাম না—সুষমা খুব জোরে কেঁদে উঠল।

বৃদ্ধ তখনও খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসছে আর কালো আলখাল্লাটা দিয়ে একটু একটু করে ঢেকে দিচ্ছে চরাচরব্যাপী সাদা জ্যোৎস্না, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, সুষমার কচি কলাপাতার শরীর।

পরমেশ যেন ফাঁসির দড়িতে মাথা গলিয়ে দিয়েছেন। অন্ধকারেই বৃদ্ধের হাতের মুঠোয় ছুরির ফলাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

এই আমাদের দেশ

বিচিত্র মূর্তির সংগ্রহশালা
নলহাটি-ভদ্রপুর-বারাগ্রাম ঘুরে আসুন

বীরভূম ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছে না। বীরভূমের মাটি আঠাকাঠির মত আটকে ধরেছে পায়ে। শীতের আমেজ পড়েছে, ভোরের দিকে একটা চাদর মুড়ি না দিলে বেশ গা শিরশির করে। বেড়াবার পক্ষে শীতকালটাই অবশ্য ভাল। দুটো মোটা কম্বল সঙ্গে থাকলে যত্রতত্র আস্তানা পোতা যেতে পারে। সৌখিন বেড়ানো হলে একটু মুশকিল বটে, তবে বাইরে যখন বেরুবেন তখন সব কিছুকেই খানিক সইয়ে নিতে হবে। মনের খোরাক ঠিকমতন পেলে বাকীগুলো তেমন গায়ে লাগে না। আর খুঁতখুঁত করলে কোথায়ই বা যাবেন!

যেমন ধরুন বীরভূম ঘুরতে বেশ হাটাহাটি করতে হবে। সব জায়গায় বাস বা রিকসা পাবেন না। গ্রামের রাস্তাঘাট একটু খন্দখোঁদলও বটে। নলহাটি-ভদ্রপুর-বারাগ্রাম ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল সারা বীরভূমটাই বোধহয় তন্ত্রপীঠ, সিদ্ধপীঠদের জায়গা। ধরুন না, ওদিকে সাঁইথিয়া, লাভপুর, এদিকে নলহাটি, তারাপীঠ। তান্ত্রিক ধর্ম ও প্রতিপত্তির জোয়ার আগে ছিল প্রবল এখন অবশ্য ভাটা পড়েছে। এখন রয়েছে রোমাঞ্চকর কিংবদন্তী।

স্টেশনের পাশেই নলহাটি গ্রাম। নলহাটির পূর্বে ভদ্রপুর। ছোট্ট একটা টিলার ওপর নলহাটি পার্বতী মন্দির। বেশ পরিচ্ছন্ন। প্রথমটা দেখলে মনে হবে যেন টিলা ফুঁড়ে পার্বতী মন্দির গজিয়ে উঠেছে। সাধারণ চারচালা বাংলা মন্দিরের গড়ন। মন্দিরের ভেতর কোন দেবীমূর্তি নেই, পাথরের টুকরোকেই দেবীজ্ঞানে পূজা হয়। খুব অদ্ভুত লাগছিল। নিরাকার দেবীর পূজার্চনা করেও মানুষ কত খুশি। এখানে নাকি দেবীর দেহাংশ নলা (নুলো) পড়েছিল আবার কেউ বলেন এখানে পড়েছিল ললাট, ফলে এখানকার দেবীর নাম ললাটেশ্বরী। আর একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম। দেবী মন্দিরের খানিক দূরেই একটি মসজিদ ও সমাধি। পার্বতী ও পীরের সহাবস্থান এর আগে কোথাও দেখিনি। প্রাচীন আমলের হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি যেমন যত্নে রক্ষা করা হয়েছে ঠিক তেমনই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মুসলমান সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের ওপর।

পীঠস্থান হিসেবে নলহাটি কখন প্রাধান্য লাভ করে তার নাকি সঠিক কোন ইতিহাস নেই। তবে কেউ বলেন চোদ্দপনের পুরুষ আগে স্মরনাথ শর্মার স্বপ্ন দর্শনের পর এই পীঠস্থানের উৎপত্তি। সে সময় নলহাটির কোন সাহা জমিদার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেও সাড়ে তিনশো বছর আগেকার কথা। ঐতিহাসিকদের মতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে পীঠ নির্ণয়ের বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থেও নাকি পীঠস্থান হিসেবে নলহাটির উল্লেখ নেই।

নলহাটি থেকে ভদ্রপুর। লোহাপুর স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ভদ্রপুর গ্রাম। মহারাজা নন্দকুমারের জন্মস্থান বলে ভদ্রপুরের পরিচিতি। নন্দকুমার বংশের উত্তরসূরীদের কেউ কেউ এখনও এই গ্রামে বাস করেন। ভদ্রপুর বহু প্রাচীন গ্রাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নন্দকুমারের জন্ম এই গ্রামে। রাজবাড়ির অবশিষ্ট কিছু নেই বললেই চলে। ধ্বসে পড়া ইঁট স্তূপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে একজন বললেন, ওই ঘরেই নন্দকুমারের জন্ম হয়েছিল। প্রাচীন ইতিহাস চোখের সামনে দগদগে হয়ে উঠল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ নন্দকুমার যেন বিরাট অট্টালিকার মধ্যে ইংরেজ দাসত্বের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করছেন। চমক ভাঙলো একঝাঁক চামচিকির পাখা ঝাপটানিতে। নিরাপদ নির্ভাবনায় ওরা বসবাস করে যাচ্ছে কতকাল কে জানে!

ভদ্রপুরের গায়ে লাগানো আকালীপুরে দ্বিভুজা গুহ্যকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত। লোকে বলে মহারাজ নন্দকুমারই এই সর্পভূষিতা কালী প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণী নদীর ধারেই শ্মশান, শ্মশানের ওপরই কালীমন্দির। কথিত আছে এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় নন্দকুমার নিজে উপস্থিত থাকতে পারেন নি, পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তান্ত্রিক মতে কালী প্রতিষ্ঠা করতে। গুহ্যকালী প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে নন্দকুমার শক্তিসাধক ছিলেন। দেবীমন্দিরের দক্ষিণে একটি সিদ্ধাসন আছে, সেটা পঞ্চমুণ্ডের আসন বলে চলিত।

লোহাপুর স্টেশনের পাশেই বারাগ্রাম। শোনা যায় একসময় প্রচুর ব্রাহ্মণের বাস ছিল বারাগ্রামে। এখন প্রায় নেই বললেই চলে। মুসলমানপ্রধান গ্রাম। মুসলমান পীরের প্রচুর সমাধি ইতস্তত দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে ঢোকবার মুখেই লোহাজঙ্গ পীরের সমাধি। পাল যুগের ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। হঠাৎ মনে হতে পারে যেন কাছাকাছি সব কটি অঞ্চলের যেখানে যত মূর্তি আছে সব এই বারাগ্রামে জড়ো করা হয়েছিল আজ থেকে বহু বছর আগে। কারণ ভাঙাচোরা মূর্তি গ্রামের সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এবং তার অধিকাংশই নাকি চাষী মজুরদের কোদালের মুখে উঠে এসেছে। এখনও মাটি খুঁড়লে অনেক মূর্তি পাওয়া যেতে পারে বলে অনুমান করা হয়। মূর্তিগুলির অধিকাংশই বৌদ্ধ দেবদেবীর, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির সংখ্যাও কম নয়। এখানে ভুবনেশ্বরী নামে সিংহাসীনা এক দেবী মূর্তি এখনও পূজিত হন। মূর্তিটিকে কেউ বলেছেন 'ভুবনেশ্বরী দেবী', কেউ বলেছেন 'সিংহনাদ লোকেশ্বর', কেউ 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

আরও একটি বিচিত্র দেবীমূর্তি আছে। চতুর্মুখ দেবী মূর্তি, তিনটি মুখ সামনে, একটি পিছনে। একটি হাতও অবশিষ্ট নেই, সব ভাঙা। পদ্মের ওপর বজ্রাসনে বসে আছেন। মাথার মুকুটটি দেখতে চৈত্যের মত। মূর্তি বিশারদরা বলেছেন, কোন বৌদ্ধ দেবীমূর্তি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে, 'উষ্ণীষ বিজয়া' মূর্তি। যাহোক এনিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আপনি যদি যান বারাগ্রামে তবে মনে হবে মূর্তির খনিতে এসেছেন, এবং দিশেহারা হয়ে যাবেন।

মেড় সাজিয়ে ভদ্রপুর ঘুরে আসবার কথা বলব না। কারণ যাতায়াতের অসুবিধা প্রচুর। যাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলাদেশকে দেখতে চান তাঁদের কাছে নলহাটি-ভদ্রপুর-বারাগ্রাম খুবই উপভোগ্য হবে। সিউড়িতে আস্তানা পেতে বীরভূম পরিভ্রমণ করাই ভাল। সুবিধে অসুবিধে সবেরই হদিস সিউড়িতে মিলবে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলসীচরিত

মণীষবিব চৌধুরী

(১)

আমার গল্পের ভূমিকা।

একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু ইতস্ততের ভাব যাচ্ছে না। তাকে সামনে দেখে লোকে কি চোখে তাকাবে তার দিকে, কি ধরনের কথা বলবে, কি রকমের হাসি হাসবে অনুমান করতে পারছি না।

ভেঙ্গে চুরে তলিয়ে যেতে পারত সে অবস্থার চাপে, কিন্তু যায় নি। মস্ত বড় কথা এটা। আরও অনেক কথা আছে। সত্যি ভাল মেয়ে সে। তাকে অনাদর, অশ্রদ্ধা করলে মনে লাগবে।

তাই ভাবছি থাক না সে পর্দার আড়ালে। কি ক্ষতি হচ্ছে তাতে? তাকে ভালবাসি, তার কথা বলতে ভালবাসি বলে হাত ধরে টেনে কাউকে মধ্যে তারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দেখো, দেখো তোমার আমার পছন্দের এই মেয়েটিকে, একথা না বললে কি নয়?

থাক তাহলে, অপরিচয়ের পর্দা নাই বা সরালাম এখন।

নিষ্কৃতির মৃদু হাসি দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে হয়ত মনে করছ। বেশ। তোমার গল্পটা তোলা থাক, আমার গল্পটা বলব। তোমার যখন আসবার সময় হবে আমার গল্পের মধ্যে এসে পড়বে, কলমের তোড় ভাঙ্গবে তৎক্ষণে।

আমার গল্প আরম্ভ করতে গিয়ে মনে পড়ল আমার প্রাক্তন ছাত্র, নামকরা ব্যবসায়ী ও রোটারীয়ান শ্রীমান অশোক পাল আমার বায়োগ্রাফি লিখছেন কিছুদিন আগে বলেছিলেন। তাঁর লেখা এগিয়ে থাকলে তাঁর কথা দিয়ে গল্প আরম্ভ করব স্থির করলাম। খোঁজখবর করতে সপ্তাহ দুই কেটে গেল তারপর তাঁর লিখিত অংশের একটা ইনস্টলমেণ্ট হাতে পৌঁছল। এডিট না করে অবিকল তুলে দিচ্ছি সেই অংশ।

(২)

অশোকের প্রথম ইনস্টলমেণ্ট।

দেড় যুগ আগে অধ্যাপক প্রমথনাথ গাঙ্গুলীর কাছে কেমিস্ট্রি পড়েছিলাম তিন বছর। তখন তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ তিন চার বছরের বেশী নয়।

চমৎকার চেহারা, পণ্ডিত মানুষ, পড়াতেনও ভাল। কিন্তু তাঁর মধ্যে এত বেশী ভালমানুষি ভাব ছিল যার জন্য ছেলেরা মানতে চাইত না, বিরক্ত করত তাঁকে ক্লাস থেকে পালাত। ভাবতাম নিরীহ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোক একটু কড়া হতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তাঁর ভালমানুষি ভাব গেল না। তাঁকে পছন্দ করতাম আমি, শ্রদ্ধা করতাম, আবার একটু অবজ্ঞাও করতাম। মনে মনে বলতাম আপনি নাম করতে পারবেন না কখনও প্রোঃ পি এন জি, উন্নতিও বিশেষ হবে না, আপনার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ আপনাকে পেটভাতায় রাখবেন বরাবর।

একটা বাড়ী ছিল মাস্টারমশায়ের, কিন্তু অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কলেজে যা পেতেন তাতে চলবার কথা নয়, টিউশানি করতেন, নোট বই লিখতেন, কোচিং ক্লাস করতেন, মোট কথা খুব খাটতেন। নানা রকম করে কোন রকমে চালাতেন। জানতাম তাঁর বিয়ে হয়েছিল, দুএকটি সন্তান ছিল।

কলেজ ছাড়বার পরে দু' চার বার দেখা হয়েছে হয়ত, তারপরে ভুলে গিয়েছিলাম তাঁর কথা। খ্যাতনামা লোক হতে পারেন নি তিনি, কাগজে নাম বেরোত না, বেরোলে নিশ্চয় মনে পড়ত তাঁর কথা। বছর দুই আগে হঠাৎ রাস্তায় একদিন দেখা হয়ে গেল মাস্টারমশায়ের সঙ্গে। গাড়ী থেকে নেমে প্রণাম করলাম মিনিট পনের দাঁড়িয়ে আলাপ হল। শুনলাম টিউশানি, কোচিং ক্লাস ছেড়ে দিয়েছেন, একটা বড় কেমিকেল ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীর লেবরেটরীতে কাজ করেন বিকেলে, কিছু পান সেখানে। বললেন, চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

বললাম, টিউশানি, কোচিং ক্লাস থেকে আপনার ভাল আয় হত শুনেছিলাম, ছাড়লেন কেন?

এমনি কিছু আয় হত না। তাছাড়া টাকা আদায় করতে ঝামেলা পোয়াতে হত, অন্য রকমের অসুবিধাও হচ্ছিল। হেসে বললেন, আগে চলে যাচ্ছিল এখনও চলে যাচ্ছে। চলে যাবার বেশী কিছু হবে না আমার।

উপদেশ দিলাম নোট বই লিখুন মাস্টারমশাই, লেগে গেলে অনেক টাকা পাবেন।

লেগে যাবে মনে হয় না অশোক। এখন একটা কাজে হাত দিয়েছি—আচ্ছা, একটা কাজে যাচ্ছিলাম, দেরি হয়ে গেল, আজ চলি।

চলে গেলেন।

ভাবছিলাম তাঁর কথা। কোন রকমে চলে যাবার ওপরে উঠতে পারলেন না আপনি প্রোঃ পি এন জি—পণ্ডিত মানুষ হয়েও। পুশ না থাকলে সাজিনাল লাইনে থেকে যেতে হয় সারা জীবন। আপনার পুশ নাই, এলবো পাওয়ার নাই, নিরীহ ভাল-মানুষ আপনি, তাই এ দশা আপনার। আপনার ছাত্র তিন চান্সে পাশ করা অশোক পাল আজ গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে কল-কাতার রাস্তায়, বিজনেস করে, দুখানা বাড়ী করেছে। আপনি কিছুটা নির্বোধ সৎ মানুষ প্রোঃ পি এন জি, নইলে শেয়ার মার্কেটে টেনে আনতাম আপনাকে, লাক থাকলে কিছুদূর উঠে পড়বার চান্স পেতেন। কিন্তু যা স্বভাব আপনার আর বেশী কিছু হবার নাই।

বছর কেটে গিয়েছে এর পর। একদিন সকালে কাগজ খুলে চোখ বুলোতে গিয়ে দুয়ের পাতায় একটা হেড লাইন চোখে পড়ল। প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ অধ্যাপক প্রমথ-নাথ গাঙ্গুলীর নূতন ড্রাগ আবিষ্কার, চিকিৎসক ও কেমিস্ট মহলে চাঞ্চল্য, নূতন ড্রাগের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা।

বিস্মিত হলাম, কি ব্যাপার?

হেড লাইনের নীচের খবরটুকুতে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না।

তারপরে দেখলাম বিভিন্ন কাগজের করেসপণ্ডেন্স কলমে দু তিন দিন অন্তর গাঙ্গুলী এলিকসিরের সম্বন্ধে চিঠি বেরোচ্ছে। বেশীর ভাগ চিঠিতে ড্রাগের আনএথিকালিটির নিন্দা করে গালাগালি, দুঃখ সন্তাপ প্রকাশ, গবর্ণমেণ্টকে ড্রাগ কণ্ট্রোল আইন প্রয়োগ করবার অনুরোধ, দু একখানা চিঠিতে ড্রাগ এবং তার আবিষ্কারকের প্রশংসা। বিজ্ঞাপনও বেরোতে লাগল। গালাগালির দাক্ষিণ্যে প্রোঃ গাঙ্গুলী একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন দেখলাম।

বিস্মিত হয়ে বিজ্ঞাপন, চিঠিপত্রগুলো ভাল করে পড়তে বসলাম, দু চারজন কেমিস্ট ও ডাক্তারকে প্রশ্ন করলাম।

গাঙ্গুলী এলিকসিরের জনপ্রিয়তার কারণ, তার কমার্শিয়াল ভ্যালু সম্বন্ধে একটু আন্দাজ পাওয়া গেল। চমকে গেলাম। হায় হায় করতে লাগল মন, কেন যেদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল ভদ্রতা করে প্রাক্তন অধ্যাপককে লিফট দেবার জন্য জিদ

না করে ছেড়ে দিলাম হেঁটে চলে যাবার জন্য।

ডাক্তার ও কেমিস্টদের মতে গাঙ্গুলী এলিকসির সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার নয়, কতকটা সুপরিচিত এল এস ডি—২৫য়ের মত। এলিকসিরের মধ্যে লাইসারজিক এসিড ডিথিলামাইড আছে, অন্য জিনিসও আছে। অন্য কি কি উপাদান আছে এখনও সঠিক নির্ণয় করা যায় নি। অন্যান্য উৎপাদন যাই থাকুক গাঙ্গুলী এলিকসির এল এস ডি—২৫য়ের মত হলুসিনজিক সাইকেডেলিক মানে ইট প্রোডিউসেস হলুসিনেশন অফ ভিসন অ্যান্ড অফ হিয়ারিং। ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাদের নির্দেশে কতকগুলো কেস পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ইট প্রোডিউসেস এ গ্রেট সেন্স অফ ওয়েলবিয়িং লাইক এল এস ডি ২৫ বাট ইট ডাজ নট প্রোডিউস অ্যাস ডীপ ডিপ্রেসন অ্যাস এল-এস-ডি—২৫ ডাজ। স্বাস্থ্যের ওপরে এই ড্রাগ ব্যবহারের কোন অনিষ্টকর ফল লক্ষ্য করা যায় নি। ড্রাগ কন্ট্রোলের কর্তারা আরও রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন।

মেসকালিন, মারিজুয়ানা, হিরোইন এল-এস-ডি—২৫, য়ুরোপ আমেরিকায় চলে আসছে, এদেশে এগুলোর ব্যবহারের কারেকট রিপোর্ট পাওয়া যায় না। গাঙ্গুলী এলিকসির বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে ইট ইজ গোয়িং টু বি এ ডলার আর্নার।

প্রশ্ন করলাম এক ডাক্তার বন্ধুকে, গাঙ্গুলী এলিকসির ব্যবহারের ফলে মাতলামির কোন কেস পাওয়া গিয়েছে কি?

আরে না না মাতলামির মত ভালগার ব্যাপার এলকোহোলিক এডিকটদের একচেটে। আফিং ও গাঁজা এবং এ দুটো থেকে তৈরী চণ্ডু ও চরসের স্পিরিচুয়াল কোয়ালিটি আছে, ভাঙেরও স্পিরিচুয়াল কোয়ালিটি আছে, তত্ত্বজ্ঞানের ভাব এনে দেয় মনে। এল-এস-ডি—২৫য়ের আমেরিকান ভক্তরা দাবি করেন এই ড্রাগ ব্যবহারের ফলে তৃতীয় নেত্র বা দিব্যচক্ষু খুলে যায়, হিন্দুশাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে, ষট্‌চক্র ভেদ করে ভক্ত সমাধির স্তরে উঠে যান।

আমাকে হাসতে দেখে ডাক্তার বন্ধুটি বললেন, হেসো না অশোক, ইতিহাস খুঁজে দেখো দেখবে দুঃখকষ্টের মধ্যে হার্ড, ক্রুয়েল রিয়ালিটির মধ্যে বাস করে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য আনন্দের স্বর্গে বেড়িয়ে আসবার আশায় কত রকম বস্তুর সাহায্য নিয়েছে। স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজের সঙ্গে মদ, গাঁজা, ভাঙের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, হিন্দুর ছেলে হয়েও তুমি জানো না বলতে চাও?

হাসি থামিয়ে বললাম, গাঙ্গুলী ড্রাগ এল-এস-ডি—২৫য়ের নকল হতে পারে কিন্তু নেশা ভাঙালে ডিপ্রেশান আসে না এটা কি করে সম্ভব করেছেন প্রোঃ গাঙ্গুলী? লাইসারজিক এসিড ডিথিলামাইড ছাড়া আর যা পাওয়া গিয়েছে তার কেমিকেল এনালিসিস হয় নি?

হয়েছে, সঠিক ধরতে পারা যায় নি এখনও। এখনও সেটা প্রোঃ গাঙ্গুলীর সিক্রেট।

আচ্ছা এই ড্রাগ থেকে প্রোঃ গাঙ্গুলী কি রকম টাকা পাবেন?

ডাক্তার বললেন, অনেক টাকা পাবার কথা। কি রকম পাচ্ছেন তাঁর কোম্পানী, তিনি নিজে এবং ইনকমট্যাক্সওয়ালারা বলতে পারে।

বললাম, ওয়াণ্ডার ড্রাগ বের হল এক জাতমাস্টারের নিরেট মাথা থেকে। বড়-থলিওয়ালারা মারামারি করে কিনবে, হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা আসতে পারে রয়ালটি থেকে—উফ্! বাড়ীতে পাওয়া যায় না ভদ্রলোককে, বা কলেজে পাওয়া যায় না, কোম্পানীর অফিসে পাওয়া যায় না। প্রাণ অস্থির হয়েছে মাস্টার-মশায়ের পায়ের একটু ধুলো নেবার জন্য। কত গালাগালি যে করেছি মনে মনে, ডু-নাথিং গুড ফর নাথিং, অপদার্থ বলে। আচ্ছা আজ উঠি ডাক্তার।

ডাক্তার নিজের কাজে মন দিয়েছিল, বাঁ হাতের তর্জনী কপালে ঠেকাল, বলল, চিয়ারিয়ো!

(৩)

আমার প্রথম ইনস্টলমেণ্ট।

অশোকের প্রথম ইনস্টলমেন্টের পরে আমার প্রথম ইনস্টলমেন্ট শুরু হচ্ছে।

বানপ্রস্থের বয়েস হয়েছিল তবু বানপ্রস্থ নিতে দেরি হচ্ছিল নানা কারণে। যে বরাবর রুজি রোজগার করে আসছে তাকে অবসর দেবার কথা কেউ ভাবে না। সংসারের সকলের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের পাত্র যে, সব রকমের অভিযোগ যার একার বিরুদ্ধে করা চলে তাকে কি করে রেহাই দেয়া যায়?

দুটি ছেলে লেখাপড়া যতটা হবার শেষ করে কাজে ঢুকেছে। বড়টি সম্প্রতি লভ ম্যারেজ করে মায়ের সঙ্গে নন-কো-অপারেশন চালাচ্ছে। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়ীটা বাঁধা দিয়ে কিছু দেনা করতে হয়েছে এজন্য। ছেলেদের বললাম, তোমরা সংসার চালাও আমি দেনা শোধ করি, নয় তোমরা দু ভায়ে মিলে দেনা শোধ করো আমি যথাসাধ্য সংসার চালাচ্ছি। কোন প্রস্তাব তাদের মনঃপূত নয়, এক বছর ধরে তারা ভাবছে। যৌতুকের নানাবিধ তত্ত্বের ব্যাপার নিয়ে মেয়ে দুটি বাপকে চিঠিপত্রে খোঁচায় এখনও। গৃহিণী অনটনের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে ছেলেদের চাকুরি হবার পরে সুসময় হবার আশা করেছিলেন। আশা পূর্ণ হল না তাঁর বরাতের দোষে নয়, ছেলেদের বাপের কারসাজিতে।

সুখ উথলে উঠছিল গার্হস্থ্যাশ্রমে তবু বানপ্রস্থ নিতে দেরি হচ্ছিল। একটা বড় রকমের গলদ রয়েছে আমার স্বভাবের মধ্যে, কোন কিছুতে বিচলিত বোধ করি না। ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত, শোভন অশোভনের মধ্যে যে সীমারেখা টানা হয়েছে সেটাকে পার্মানেন্ট, অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় না আমার। যা হচ্ছে তাকে ফ্যাক্ট বলে মেনে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়েছি জীবনে। তুমি আমাকে তাচ্ছিল্য করো এটা হল ফ্যাক্ট, কেন তাচ্ছিল্য করো, আমি তোমার তাচ্ছিল্য পাবার যোগ্য না অযোগ্য এসব প্রশ্ন অবান্তর।

সুখে, সম্পদে, সফলতায়, সম্মানে আমার জীবন ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে নি, অভাব অনটনে, গঞ্জনায়, অকৃতকার্যতায়, তাচ্ছিল্যে বিড়ম্বিত বোধ করিনি। যা আমার সাধ্য করে যাচ্ছি; আর কি করতে পারি আমি?

ক্ষুদ্র মানুষ আমি, তুচ্ছ আমার জীবন-যাত্রা, কিন্তু জীবনে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য আছে। দু-একটা অভিজ্ঞতা ছাপ রেখে গিয়েছে মনে তাই অভিজ্ঞতার কথা তুললাম। সমালোচনা বা নিন্দা করা আমার অভ্যাস নয়। অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কিছু বাড়িয়ে বলছি বা পরোক্ষে কারো নিন্দা করছি এ সন্দেহ যেন কেউ না করেন।

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে কলেজের চাকরিতে ঢুকে দেখলাম বেতন সামান্য, বাড়তি কিছু রোজগার করা আবশ্যক। মাস্টারের পক্ষে প্রাইভেট টিউশানি বাড়তি রোজগারের সহজ পথ। তাই প্রাইভেট টিউশানি করতে আরম্ভ করলাম।

বছরের পর বছর অনেক ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়েছি। জন তিনেক ছাত্র-ছাত্রীর কথা অল্প কিছু বলছি। ছাত্রছাত্রীরা সকলেই

পয়সাওয়ালা ঘরের, নইলে একশো, দেড়শো টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারবে কেন?

আমার প্রথম ছাত্র সুপ্রিয়। বছরের পর বছর আই এস সি পরীক্ষায় ফেল করছে। অভিভাবিকা মাতা, পিতা পরলোকগত। তিনি নিজেই ইন্টারভিয়ু নিলেন। দেখলাম কিছু বয়স হলেও স্বাস্থ্য ভাল, সাজসজ্জা ভাল। দশ মিনিট ইন্টারভিয়ুর শেষে চা, প্রচুর খাবার আসল। বললেন, মিষ্টিমুখ করুন একটু, কাল থেকে কাজে যোগ দেবেন।

বললাম, আপনার ছেলে যাকে পড়াতে হবে সে কোথায়?

ক্রিকেট খেলা দেখতে বেরিয়েছে, ফেরেনি। কাল দেখতে পাবেন।

এক বছর সুপ্রিয়ের প্রাইভেট টিউটারি করলাম। পয়সাওয়ালা ঘরের শাসনবাঁধন ছেঁড়া স্ফূর্তিবাজ ছেলে, আলগা কথা বলতে অভ্যস্ত। নানা রকমের আলগা কথা বলত নিজের পরিবারের সম্বন্ধে, মাতার সম্বন্ধে, বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে নানা উপলক্ষে ছাত্রের বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ পেতাম।

একদিন সুপ্রিয় বললে, মাস্টারমশাই, পুজোয় মা আপনাকে যে ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর দিয়েছেন পরে মাকে দেখাবেন। সিল্কের পাঞ্জাবী ফার্স্ট ক্লাশ মানাবে আপনার চেহারায়। আমার মার টেস্ট আছে। আরেক দিন বলল, এতদিন পড়াচ্ছেন, এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছেন কোন ইম্প্রুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে না আপনার ব্যবহারে, কথাবার্তায়। অল্প অল্প করে মদ খাওয়া ধরুন। কিনে খেতে হবে না, আমি সাপ্লাই করব। জানেন মাস্টারমশাই, আপনার কাছে পড়তে বসলে আমার শীত শীত করে, তাই একটু খেয়ে এ ঘরে ঢুকি। আচ্ছা বসুন দু' মিনিট, আমি আসছি—

সুপ্রিয় আমি মদ খাইনে, মাথা ঘুরবে।

মাথা ঘুরলে মাকে বলব, তিনি গাড়ী করে আপনাকে বাড়ীতে জমা দিয়ে আসবেন, ভয় নেই।

সুপ্রিয় আই এস সি পাশ করল। তাকে বি এস সি পড়াবার অনুরোধ করলেন তার মা। অনেক রকম করে, অনেক কথা বলে যা মেয়েরাই পারেন, অনুরোধ করলেন, মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথাও বললেন।

সুপ্রিয় বলল, মাস্টারমশাই থেকে যান। আমাকে পড়াবার সময় কমিয়ে মাকে কিছুক্ষণ পড়াতে পারেন। আপনার পড়াবার সেন্স ভাল, চেহারাও বেশ ভাল। আপনার কাছে পড়তে রাজি হবেন মা। মাকে বলব?

বললাম, না সুপ্রিয়, বলো না। তুমি যদি বি এস সি পড়তে চাও, আরেকজন টিউটর দেখতে বলো তোমার মাকে, আমি পেরে উঠব না।

সুপ্রিয়ের প্রাইভেট টিউটরের কাজ রাখতে না পারলেও বসে থাকতে পারলাম না টাকা রোজগারের প্রয়োজনে। জানাশোনা এক বাড়ীতে কাজ জুটে গেল। পড়াতে হবে বি এস সি ক্লাশের এক ছাত্রীকে। ছাত্রীর নাম দেবযানী।

কদিন পরে ছাত্রী পড়তে বসে প্রশ্ন করল, মাস্টারমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?

মাথা নাড়লাম।

বলল, আশ্চর্য। তাহলে মাথা নামিয়ে বসে থাকেন কেন, অনভিজ্ঞ ছেলেদের মত? ইউ সুড লুক অ্যাট গার্লস বোল্ডলি ইন দেয়ার ফেসেস।

আচ্ছা, এবার বলো কেমিস্ট্রিতে কোথায় তোমার আটকায়।

ক্রমে দেখলাম কোথাও দেবযানীর আটকায় না, পড়াশোনায় ভাল সে, মেধাবিনী। আটকাতে লাগল আমার।

মাস তিনেক পরে একদিন বলল, আচ্ছা মাস্টারমশাই, বলতে পারেন আমি এত ভাবি কেন আপনার কথা?

চুপ করে রইলাম।

বলল, মনে হচ্ছে, আপনার প্রেমে পড়েছি। জানি আপনি বিবাহিত, কি হয়েছে তাতে?

গড়গড় করে অনেক কথা বলল দেবযানী, তার কথা বলবার স্টাইল ভাল।

চুপ করে রয়েছি তখনও। গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, ডোন্ট প্রিটেন্ড টু বি এ সেন্ট। মেট্রোতে ক্লিওপেট্রা হচ্ছে, চলো দেখে আসি। মার পারমিশন আনছি এখুনি, একটু বসো।

আজ থাক দেবযানী। মাথাটা ধরেছে।

ঝট করে চেয়ার ছেড়ে আমার চেয়ারের পেছনে এসে মাথা দু'হাতের মধ্যে ধরে বলল, আ-হা-হা, বলোনি কেন এতক্ষণ? বসো একটু, স্মেলিং সল্টের শিশিটা আনছি।

চলে গেল ভেতরে।

আমি উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

রাখা গেল না চাকুরি। বাকী মাইনের টাকাটা নেবার জন্য দেবযানীদের বাড়ীতে যাবার সাহস হল না। পরের মাসের চার তারিখে দেবযানী কলেজে এসে মাইনে দিয়ে গেল নিজে। কোন কথা বলল না, একটু হাসল শুধু।

মনে হলো মেয়েটি ভাল, কেন ওর বাপ-মা বিয়ে দিতে দেরি করছেন? চেহারায় খুঁত আছে সেটা ঢেকে দেবার মত টাকা আছে ওঁদের।

এর পরের এক ছাত্রের নাম অম্বর।

বি এস সির ছাত্র কিন্তু ঝোঁক সাহিত্যের দিকে। আমাকে ডি এইচ লরেন্স, মম, ফ্লবেয়ার, জোলার বই পড়তে দিত। জাপানী সাহিত্য, চীনা সাহিত্যের গল্প শোনাত। অনেক খবর রাখত অম্বর, বিজ্ঞানের নিউটন কলোনীর সাহেব মেমদের আচার-ব্যবহার কি রকম গল্প করত।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল একটা নূতন ব্যাপার আরম্ভ হল। দু-একটি করে মেয়ে, অম্বরের বয়সী, আসতে আরম্ভ করল পড়বার ঘরে, পড়াবার সময়ে। অম্বর পরিচয় দিত আমার বান্ধবী। অপত্তি জানাতে আমার পিঠ থাবড়ে অম্বর বলল, ওরা সবাই সায়েন্সের ছাত্রী, আমার কাছে আপনার পড়াবার সুখ্যাতি শুনে এখানে আসে।

বললাম কিন্তু ওঁরা গল্প করেন, পড়াশোনার ব্যাঘাত হয়।

অম্বর বলল, একটু আধটু হলই বা, কি হয়েছে?

বাড়ীর ব্যবস্থা কেমন জানি না, আমার অবস্থা ক্রমে কাহিল হয়ে উঠল। ছাত্রের বান্ধবীদের আড্ডা, ইয়ার্কি চলতে লাগল, আমার মাইনে বাকী পড়তে লাগল। দু' মাসের মাইনে বাকী পড়তে ছাত্রকে বললাম, আমি গরীব মাস্টার, চালাই কি করে? টাকাটা চেয়ে নিয়ে এসে দাও।

মাথা চুলকে অম্বর বলল, পনেরো দিন সময় দিন মাস্টারমশাই, একসঙ্গে সব টাকা পাবেন। জানেন কি, টাকাটা মাস মাস আমার হাতে এসেছে, আর্জেন্ট দরকারে খরচ হয়ে গিয়েছে। পনেরো দিনের মধ্যে দিয়ে দেব আমি।

টাকার আশা ছেড়ে দিলাম। দুখানা মেড ঈজির কাঁপ রাইট দুশো টাকায় বেচে দিতে হল দায়ে পড়ে।

পরপর আরও কটা টিউশানি করলাম ছাত্র-ছাত্রীরা সত্যি পড়াশোনা করতে চায় এবং করতে চায় না, দস্তুর হিসাবে প্রাইভেট টিউটর রাখে এমন ছাত্রছাত্রীও পেয়েছি। ছাত্রীদের মধ্যে আর দুজনের কথা কিছু মনে আছে। জয়শ্রী বেশ পড়াশোনা করছিল, মাস দুই পরে দেখলাম সিনেমায় পেয়ে বসেছে তাকে। সিনেমা লাইনে গেলে তার প্রসপেক্ট কি হতে পারে, তার চেহারায় নায়িকার পার্ট মানাবে কিনা, হলিউডের নায়িকাদের আয় কত, কে কতবার বিয়ে করেছে, এ ধরনের আলাপ করতে আরম্ভ করল পড়াশোনার সময়ে। গরীব প্রাইভেট টিউটরকে নায়ক ধরে নিয়ে নায়িকার হাসি, বাচনভঙ্গী অভ্যাস করতে লাগল। এক মাসের মাইনে বাকী ফেলে চাকুরি ছেড়ে দিলাম। দময়ন্তীকে এক মাসের বেশী পড়াতে পারিনি। কটা দিন মন দিয়ে পড়াশোনা করল তারপর কোন কনট্রাসেপটিভ ভাল, স্টেরিলাইজেশন করবার ফল স্বাস্থ্যের ওপরে কি রকম হতে পারে এ ধরনের প্রশ্ন করতে লাগল পড়তে বসে। আমার অধীত শাস্ত্রে এসব প্রশ্নের উত্তর ছিল না।

এরপর প্রাইভেট টিউশানি ছেড়ে দিয়ে কোচিং ক্লাশ নিতে আরম্ভ করলাম। সারা বছর চলতে না ক্লাশ, পরীক্ষার দু-তিন মাস

আগে বেশ ছাত্র হত, ছাত্রীরাও পড়তে আসত। মাঝে মাঝে একটু গোলমাল হত টাকা-পয়সা নিয়ে, অন্য রকমের গোলমালও একটু-আধটু হত, তবে বিশেষ কিছু নয়। সকালে, সন্ধ্যায় কোচিং ক্লাশ চলত পরীক্ষার সিজনে।

পরীক্ষার পরে বাড়তি রোজগার বন্ধ হত। তখন বাড়ীতে বসে 'মেড ইজি' লিখতাম। এই রকম মন্দার সময়ে একটা টিউশনির অফার এল।

ছাত্র নিজে আমার বাড়ীতে এসে দেখা করল। পরিচয়ও দিল। ঈস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেকটর মিঃ এন সি ভাদুড়ীর ছোট ছেলে, বি এস সি ক্লাসে পড়ছে। নাম বলল দেবাশিস।

দেখলাম বছর উনিশ কুড়ির অতি সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান ছেলে, ভদ্র, বিনীত ব্যবহার, কথাবার্তা।

প্রস্তাব করল অসুবিধা না থাকলে আজ সন্ধ্যার পরে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব পাকা করে নিতে পারি। জিজ্ঞেস করল, কখন যেতে পারবেন বলুন, গাড়ী পাঠিয়ে দেব।

বললাম, তোমার বাবা অফিস থেকে ফেরেন কখন?

বলল, ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে।

তাহলে আটটায় যাব, গাড়ী পাঠাতে হবে না।

আচ্ছা।

(ক্রমশঃ)

মুখের মেলা

দৌলত মিয়া ও পাহাড়ী যুবতী

'বাবু একটা বিড়ি দিবি?'

'বিড়ি আমি খাই না।'

'সিগারেট?'

'তা খাই। নেবে?'

'দিবি!' খুব উৎসাহ বোধ করে পাহাড়ী উপজাতীয় মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ধরল। সিগারেট দিতে মেয়েটি বললে, 'দেশলাই?'

ফোঁ করে কাঠি জেলে কালো যুবতী চেহারার মেয়েটি তার হাতের রঙিন চিত্তির আঁকা তালু আড়াল দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

ফাঁকা ছোট একটা স্টেশন। লোকজন নেই। কার্তিক মাসের শেষ দিক। কুয়াশায় চারদিকটা ঘোলাটে—প্রায় অদৃশ্য।

স্টেশন মাস্টার বললে, 'রাত বারোটায় একটা ট্রেন আসবে—তার আগে নয়। পথে গণ্ডগোল। ট্রেন আটকে ডাকাতি করছিল। ধরা পড়েছে।'

ছোট একটা ওয়েটিং রুম। একটা বেঞ্চিতে আমি বসে আছি। কি কুক্ষণেই না সভা করতে এসেছিলাম। এখন সেই রাত বারোটা পর্যন্ত বসে থাকো।

একটা বালব্ জ্বলছে ঘরের মধ্যে। ম্যাড়মেড়ে আলো। ময়লা কাঁথার মধ্যে একটা লোক আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে পড়েছিল। মেয়েটা দেওয়াল হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানল কিছুক্ষণ। তারপর লোকটাকে ঠেলা মেরে মেরে তুললে। আধখানা খাওয়া সিগারেট টানতে দিলে তাকে। মুখে ধরে দিলে। কারণ হাত নেই লোকটার। একটা হাতের কনুই থেকে কাটা। অন্য হাতটা কব্জি থেকে। লোকটার মুখের আদল দেখে মনে হল বাঙালী।

লোকটা বললে, 'এরই মধ্যে হিম পড়ে গেল বাবু—দোরটা বন্ধ করে দাও।' মেয়েটাই উঠে দোরটা বন্ধ করে দিলে।

'আপনি কোথা যাবে বাবু?'

'কলকাতায়।'

'আমরাও যাব।'

'তোমার নাম কি?'

'দৌলত মিয়া।'

'হাত কাটল কি করে?'

'সে বাবু অনেক কথা।'

ঘড়ি দেখলাম, মোটে ন'টা পনেরো। ঠায় তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। অথবা......

'সারারাতও এখানে কাটতে পারে বাবু। শালার 'টেরেনে'র কোনো ঠিক নেই।'

'তাই বটে। দোকান-পাট, ভেণ্ডারও সব বন্ধ। কেন বলত?'

'সন্ধ্যায় এখানে খুব মারামারি হয়েছিল। দুটো দল খুব একচোট লাঠি বাজি করেছিল। বোম পট্‌কা পড়েছিল। পুলিস ধর-পাকড় করে নিয়ে গেছে। তাই সব দোকান-পাট বন্ধ। ইস্টিশন মাস্টারও এতক্ষণে ঘুমোচ্ছে।'

'আমাকে বলেছেন রাত বারোটায় গাড়ি আসবে

'ও শালা বুড়োর ঐ 'রহম' আশা দেওয়ার কথা। আমাকে বলেছে রেলের পাটি তুলে ফেলেছে। সে সব বসাতে হবে।'

'ডাকাত ধরা পড়েছে নাকি?'

'হাঁ। তারা রেলের পাটি তুলে রেখেছিল।'

নিরাশ হয়ে পড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তি, অবসাদ যেন শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। সন্ধ্যার পর মিটিং শেষ হল। সামান্য কিছু মিষ্টি খাইয়ে ছেলের দল রকসার করে এই স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে পবিত্র কর্তব্য পালন করে চলে গেল। হাতের ফুলের মালাটার দিকে মেয়েটি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। সেটাকে দূর করে ওর গায়ে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল। ঠেলে সরিয়ে রেখে আমি একটু আড় হলাম। ব্যাগের মধ্যে শতখানেক টাকা আছে তা নিয়ে আর এক রকমের ভয়।

মেয়েটার চেহারা ভাল। তবে চোখের কোলে কালি। মুখে যৌনক্ষুধা প্রকট। মেয়েটা ফুলের মালাটা হাতে নিয়ে একবার গভীর শ্বাস টেনে শুঁকল। তারপর 'আঃ।' করে খুশীর শব্দ করল মুখ থেকে। আবার মালাটা রেখে দিলে।

দৌলত মিয়া বললে, 'হাত দুটো না গেলে আমি কি আর এই 'অবস্থায়' পড়ে থাকি বাবু? থোকা চারশো টাকা মাইনে পেতাম। জাহাজের বড় 'মিস্ত্রীর' ছিলুম। কত চোরাই-মাল সাপ্লাই করতুম জাহাজ থেকে। রেডিও, ঘড়ি, টাইপ রাইটার, ক্যামেরা কত কি? হরদম বিলিতি মদ খেতুম। আর 'রান্ডী-মান্ডী' করে পয়সা উড়োতুম। শেষে আমার মামু এসে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে শালা মোর সাদি দিয়ে দিলে। ছোটবেলায় মা বাচ্চা রেখে মারা গেলে মামুর বাড়ি থাকতুম। মামুর বাড়ি থেকে কুড়িটা টাকা চুরি করে ধরা পড়ে মার খেয়ে সেই যে আঠারো বিশ বছর বেলায় শহরে পালিয়ে এনু, আর যাইনি। পয়লা হোটেলের খানসামার কাজ করতুম খিদিরপুরে। চুরি করে বেশি 'গোস্ত' খেয়েছিনু বলে হোটেলওয়ালা একদিন মারলে। আমিও শালা পানির জগ ছুড়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে দে ছুট। তারপর হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের এক ঝালাই কারখানায় কাজ করনু এক বচ্ছর। সে কাজ ছেড়ে পেট ভাতায় মোটর কারখানায় কাজ শিখতে এলুম রাজা বাজারে। সেখানে এক বুড়ো জাহাজী মিস্ত্রির সঙ্গে মহরম-মহরম হল। সে আনলে ডকের কাজ শিখতে। এ-জাহাজ সে-জাহাজে কাজ। কাজে আনন্দ পেলুম। বুড়ো মদ খাওয়াতে শেখালে। তারপর মিস্ত্রির হয়ে গেনু মুই। তিন বচ্ছর বাদে বড় মিস্ত্রির 'ইন্তেকাল' করলে (মারা গেলে) আমি তার 'পোস্টে' পেয়ে গেনু। তখন ভাল একটা বাসা নিইচি। একজন কাওয়াল আমার বাসায় থাকত। তার কাছেই কাওয়ালী গান শিখি। একদিন মামুর বাড়ি গেনু হঠাৎ সের পাঁচেক মেঠাই নিয়ে। তারা খুব খুশী। মামু, রোজগার করছি শুনে সাদী দিয়ে দিতে চাইলে। আমিও মত দিনু। কেন না বাইরের বেউশ্যে মাগীতে সুখ নেই। সব সময় শালা বড় 'ডেন্জার'। কতবার সোডার বোতল ফেটেছে মাথার ওপরে। একটা নয়চা যুবতী মেয়ের টাট্কা 'যৌবন' পাবার আশায় মামুর হাতে দুশো টাকা তুলে দিয়ে এনু। মামু দিনক্ষণ ঠিক করে মৌলবী ডেকে সাদি পড়িয়ে দিলে। তিন দিনের কনে এল মামুর বাড়ি। দেখা হয়নি তার শরীল, মুখ। তারপর সে বাপের বাড়ি চলে গেল। ফের মাস চারেক বাদে বউ আনতে গেলুম মুই। বউ এনে একরাত মামুর বাড়ি রইনু। বউটার নাম আকলিমা। বড্ড লজ্জাটে ঘোমটা খোলে না।'

কথা শুনে দৌলতের সঙ্গের মেয়েটি হাসতে লাগল।

আমি ওদের দুজনকে আবার সিগারেট দিলাম। নিজে ধরাবার পর খালি বাকসটা ফেলে দিলাম দূরে করে।

দৌলত মিয়া সোঁ সোঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে নিয়ে জুত হয়ে একটু বসল। মেয়েটা গুরু নিতম্ব হেলিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল, আড় চোখে তাকাতে তাকাতে। ওর গায়ে একটা লাল কুর্তো, একেবারে খাটো। পরনে একটা নীল রঙের ছাপা শাড়ি। মাথার চুলগুলো খোঁপা বাঁধা।

দৌলত মিয়া বলতে লাগল, 'বউ বড্ড লজ্জাটে! কিছুতেই মুখ দেখাতে চায় না। নানীকে বললুম, নাক চোখ নেই নাকি? চাপা খোলে না কেন? নানী বললে, বাসায় 'লিয়ে' যেয়ে চোখ ভরসা করে দেখিস। দুটো 'লয়', চারটে চোখ আছে। যাই হোক একটা কালো রঙের 'সিলিকে'র বোরখা ঢেকে আমার 'পরিবার'কে নিয়ে তো শহরে আসব বলে বেরুলুম। রেল ইস্টিশনে টিকিট কেটে জয়নগর থেকে সোনারপুর জংশনে গাড়ি বাঁধল। বউ কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, 'পানি খাব।' আমি তাড়াতাড়ি একটা দোকান থেকে সোডা পানি এনে দিতে সে বোরখার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে খেতে লাগল। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই শালা, আর ফুরোয় না। বললাম তাড়াতাড়ি করো, গাড়ি ছেড়ে দেবে—ঘন্টা বেজে গেছে। তারপর বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে ভেন্ডারের দিয়ে ছুটে আসতে গেলাম। 'টেরেন' গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ কিসে ধাক্কা লাগল। হাতলটা ধরেও ধরতে পারলুম না শেষ কামরাটার। পড়ে গেলুম তলায়। হাত দুটো কখন কেটে গেল জানি নি। পড়বা মাত্তেরেই আমি মনে করেছিনু মরে গেছি। জ্ঞান হল হাসপাতালে, দুদিন পরে। বউ কোথা জিগেস করতে নার্সের মেয়েরা হাসতে লাগল। বোরখা ঢাকা সেই বউ আমার সাড়শো টাকার সোনার গয়না নিয়ে কোথায় চলে গেল তা কেউ জানে না। তারও মা বাপ কেউ ছিল না। মামুর বাড়ি মানুষ! তার মামুরাও খোঁজ পায়নি। আমার 'অবস্থা' দেখে সবাই আফসোস করতে লাগল। দিন কতক মামুর বাড়িতে রইলুম। তারপর তারা দূর ছি করতে লাগল।'

'মামী বলবে, 'ভিখ মাগো যেয়ে। রোজ রোজ কে বসিয়ে খাওয়াবে।'

'তাই ভিক্ষে করতে বেরুলুম। পথে চলতে চলতে খুব কাঁদলুম। আমার চারশো টাকার চাকরী—নতুন বোরখা ঢাকা গয়না মোড়া বউ—সব কোথায় চলে গেল। তারপর পথ থেকে পথে।'......

আমি শুধোলাম, 'তা এই মেয়েটি কে? কোথায় থেকে জোটালে?'

দৌলত মিয়া তার নুলো হাতটা দিয়ে তার মুখটা একবার মুছলে। বললে, 'ওর নাম পিয়াসী। ওদের একটা মাগীর দল ছিল। একটা বুড়ো ঢোলক বাজাত আর ওরা নাচ-গান করত। বুড়োর নাতনী পিয়াসী। আমি ওদের গান শুনে বললুম আমাকে তোদের দলে ঠাঁই দিবি—কাওয়ালী গাইতে পারি। আমার কাওয়ালী শুনে ওরা খুব আদর করলে। পিয়াসীও গাইতে পারে খুব ভাল। বাজাতে পারে। নাচতে পারে। আমার কাওয়ালীতে বেশ উপায় হতে লাগল। যখন আমি ওদের দলে ভিড়ি তখন সবে পিয়াসীর 'যৌবন' এয়েছে। ওর 'যৌবনে'র দিকেই মানুষের লক্ষ্য। ভদ্দর-লোকরা গান শোনে বটে কিন্তুন শালা ওর দিকেই চেয়ে থাকে!'

পিয়াসী চিত হয়ে শুয়ে হাতের একটা ধাক্কা দিলে দৌলতকে। তার শরম লেগে গেছে ওর কথায়।

'তা সত্যি কথা বলতে কি বাবু পিয়াসী শুনলে হয়তো চটে যাবে- আজ আমি বলছি একটা মস্ত পাপ আমি করেছিনু।'

কৌতূহলী চোখে পিয়াসী তাকাল দৌলত মিয়ার দাড়িভরা গুরুগম্ভীর মুখটার দিকে।

দৌলত বললে, 'গাছতলায় আমরা একদিন ঘুমুচ্ছিলাম। পিয়াসীর সঙ্গে তখন আমার দেহের মিল মনের মিল হয়েছিল। যুক্তি করেছিলুম দুজনে পালাব। দুজনের আলাদা উপায় বেশি হবে। সুখে থাকব। তিনটে 'যৌবন' যাওয়া আধ বুড়ীদের আমরা টানব কেন? আর আমি নিজে ভাবলুম—এই বুড়োটাকেই আগে সরানো দরকার। কি করে মারব ভাবতে লাগলুম। গাঁয়ের সেই নির্জন মাঠে রাত্তিরে হঠাৎ বুড়োর গলাটা পা দিয়ে চেপে ধরে, মুখে কাপড় চেপে মেরে ফেললুম। শালার বুড়ো জ্বরে ভুগছিল। কাহিল চেহারা। তবু বার দুই যে রকম গাঁক গাঁক করে উঠেছিল ভয়েই আমার?......'

পিয়াসী বললে, 'হারামী!' তারপর সে একদিকে বেঁকে বসে রইল।

দৌলত মিয়াও শুয়ে পড়ল কাঁথা মুড়ি দিয়ে। এগারোটা বেজে গেছে।

পিয়াসী কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

দৌলত বললে, 'শুয়ে পড়। নিদ যা। টেরেন আজ আসবে না।'

সিগারেটও নেই।

দোর খুলে বাইরে এলুম। চারদিকে কুয়াশা। একটু দূরে একটা আলো. অনেক শ্যামা পোকা জমেছে তার চারপাশে।

পিয়াসীও বাইরে এল। দাঁড়িয়ে রইল আলো-আঁধারীতে।

পিয়াসী কাছে এসে বললে, 'একটা টাকা দিবি বাবু?'

আমি দ্বিধায় পড়লুম। যেন শুনতে পাইনি এমন ভান করলুম। সে আবার বললে, 'ফুলের মালাটা তুমার বউকে দিবে?'

'না। তুমি নিতে পার।'

'আমারে দিবি বাবু তুই?'

'হ্যাঁ।'

'একটা টাকা দিবি?'

'দৌলত মিয়া কিছু বলবে না?'

'না।'

'দোব। তোরা গান শোনা তবে। গাড়ি আসবে না।'

ঘরের মধ্যে দুজনে [illegible] আবার।

পিয়াসী ঢোলক [illegible] নিয়ে বাজাতে শুরু করলে আস্তে [illegible] তার হাতের সবুজ লাল চুড়িগুলো [illegible] লাগল।

দৌলত বললে [illegible] কি করো বাবু?'

'কিচ্ছু না।'

'ব্যবসা আছে?'

'না।'

'তবে পুলুসের লোক নাকি?'

'তাতে ভয় কি?'

'না ন্যাংটোকে আবার বাটপাড়ের ভয় কিসের!'

'পিয়াসী বললে, 'বাবু গান শুনবে। তুই গা রে মরদ।'

দৌলত মিয়া গান ধরলে। কাওয়ালী গান। ঢোলক বাজাতে লাগল পিয়াসী। চমৎকার গায় দৌলত মিয়া। অপূর্ব গলা। মেয়েটাও গাইল। রাত একটা পর্যন্ত আমি তাদের গান শুনলাম। দুটো টাকা দিলাম তাদের। খুব খুশী হল তারা।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। আলোটা নিভিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ওরা নিচে পাশাপাশি দুজনে শুয়ে আছে। বাইরে পোকা মাকড় ডাকছে।

ওরা কি যেন বলা বলি করছে ফিস-ফিস করে।

সন্দেহ হল। আমি ঘুমোলে দুজন চেপে মেরে ফেলতেও ত পারে? টাকাগুলো নিয়ে পালাবে। পিয়াসীর ঠাকুরদা বুড়োটাকেও তো মেরে ফেলেছিল।

তবু ঘুমাবার ভান করে নাক ডাকাতে লাগলাম।

হঠাৎ ঘন্টা বাজতে লাগল।

ট্রেন এল তিনটের সময়। আলো জেলে দিলাম। ওরা অঘোরে অচেতনভাবে পড়ে ঘুমোচ্ছে। পিয়াসী একখানি হাত নিয়ে গলা জড়িয়ে আছে দৌলত মিয়ার। দৌলত মিয়ার কব্জি থেকে কাটা হাতটা পিয়াসীর গায়ে পড়ে আছে।

অপূর্ব দৃশ্য!

জগতে বোধহয় ওরাই সুখী।

তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে হবে। ওদের আর ডাকলাম না। চলে এসে ট্রেনে উঠলাম।

—আব্দুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

উৎসবান্তিক

আরেকটি দুর্গোৎসব কেটে গেল। কেটে গেল সেই সঙ্গে শ্যামছায়াঘন দিন। বর্ষণ-মুখরিত সদা সন্ত্রস্ত শহরের রূপই পালটে গিয়েছিল। প্রসাধন যেমন কুরূপাকে সুন্দরী করে তোলে, প্রাচীনা নগরীর সমস্ত কদর্যতা ঢেকে দিয়েছিল দুর্গাপুজোর উন্মাদনা।

তিন দিনের উৎসব, কিন্তু তার পিছনে প্রস্তুতি অনেক দিনের। প্রাচীনকালে এই প্রস্তুতিপর্বের সুরু হত রথযাত্রার দিন থেকে; এখন যে কবে থেকে হয় তা বলা কঠিন। দরজিরা সাজ-পোষাক সেলাই করতে বসে বৈশাখ মাস থেকেই, বোম্বাই-এর মিলওয়ালা কাপড় যোগান দিতে সুরু করে প্রায় ঐ একই সময় থেকেই। তারপর আছে জুতো-মোজা ইত্যাদি। জি[illegible]পত্রের দর বেড়েছে ভীষণ ভাবে, [illegible] ছেলে-মেয়েদের ফ্রক একালে পাঁচ[illegible]য় পাওয়া যায় না, আর জুতো[illegible] দামের [illegible]সে [illegible]ন-ছোঁওয়া। সাতাশ-আটাশ [illegible] শাড়ি, ধুতি ই[illegible]ায় চামড়ার সম্পর্ক নেই। [illegible]াদির কথা বাদ দিলে একখানি গামছার ক[illegible]থা যদি ভাবা যায় তাহলেই যথেষ্ট. একটি [illegible] যেমন-তেমন গামছার দাম তিন থেকে চা[illegible]র টাকা। কিন্তু এমনই মজা কিছুই পড়ে [illegible]াকে না, দোকানে ভীড় হয়। সিনেমাষ্টার-ব[illegible]ই বর্তমানকালে কলকাতার মর্তলোকে অমরাবতীর দেব-দেবী[illegible], তাই তাঁরা দোক[illegible]ন বসে সিগারেট ধরিয়ে কাপড় পছ[illegible] করছেন এমন বিজ্ঞাপনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। মোটকথা পুজোর উৎসব মানে কেনা-কেটার উৎসব। অর্থনীতির দিক থেকে ভালো কি মন্দ তার বিচার করবেন অর্থনীতিবিদরা। আমরা সাধারণ মানুষ তাই শাদা-চোখে সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠানের পিছনে একটি বহুদূর বিস্তৃত ব্যবসাদারি পরিকল্পনার সুনিপুণ ব্যবস্থা সহজেই দেখতে পাই। এক হিসাবে এই যে, উৎসবকেন্দ্রিক ছোট-খাটো কারবার তার মূল্য অসীম। কর্মহীন বাঙালীসমাজে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা সীমিত। সেইখানে এই ধরণের উৎসবকে কেন্দ্র করে যদি কিছুলোকের অন্ন হয় তাহলে উৎসবের মধ্যে একটা কল্যাণহস্তের স্পর্শ পাওয়া যায়। শুধু কি সাজ-পোষাক? আলু-পটল শাকসব্জি, মাছ-মাংস, মিষ্টান্ন এবং দধি প্রভৃতি বাঙালীজীবনের অতি আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলির দর এবং কদর যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা কি কেউ কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল? কিন্তু বাঙালীজীবনে সবটাই স্থূলরসের কারবার নয়, এর একটি সূক্ষ্ম দিকও আছে এবং সেই দিকটি গত কয়েক বছরে যেভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাতে বাঙালী মাত্রেরই আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে।

শারদীয় আনন্দকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সম্ভার পরিবেশনের রীতি নূতন নয়। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বেও শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই সব বিশেষ সংখ্যায় বিশেষ রচনাদি প্রকাশিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বর্গতঃ হেমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামক যে বাৎসরিক ছোটগল্প সংকলন প্রকাশ করতেন তা পুজোর সময় প্রকাশিত হত এবং অনেকেই জানেন রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা যেমন 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছে তেমনই প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা। এছাড়া সেকালের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা সেই 'কুন্তলীন পুরস্কারে' গল্প লিখতেন।

পরবর্তীকালে 'হিমানী' প্রসাধন দ্রব্যের আবিষ্কর্তা স্বর্গতঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় 'নিরুপমা পুরস্কার' বা বার্ষিকী প্রকাশ করতেন। ছবি-ছাপা এবং রচনা-সৌষ্ঠবে সেই বাৎসারিক পত্র ছিল অতুলনীয়।

'কেশরঞ্জন' নামক বিখ্যাত গন্ধ তৈলের প্রবর্তক স্বর্গতঃ কবিরাজ নাগেন্দ্রনাথ সেনের উদ্যোগে প্রকাশিত হত 'কেশরঞ্জন পুরস্কার'--। কেশরঞ্জন পুরস্কার কিন্তু সাময়িক পত্র নয়, এই বাৎসরিক পত্রটিতে একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস থাকত। সেই সব উপন্যাসগুলি লিখেছেন সেকালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসকার স্বর্গীয় হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের ব্যক্তিগত

সংগ্রহে এই সব গ্রন্থাদির প্রায় সবই সংরক্ষিত হয়েছে।

১৩২৩-২৪ সালে 'আগমনী' নামে একটি শারদীয় বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। সেই বার্ষিক পত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে সেকালের সকল বিশিষ্ট লেখকের রচনা ও অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের অনেক ত্রিবর্ণ চিত্র ছিল। এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সম্ভবতঃ ১৩২৮-২৯-এ বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের স্বর্গীয় সতীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় 'মাসিক বসুমতী' প্রকাশ সুরু হল। সম্পাদকীয় কাজকর্ম তখন দেখাশোনা করতেন বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ এবং সতীশচন্দ্র প্রকৃতিতে রক্ষণশীল হলেও, 'মাসিক বসুমতী'তে শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির রচনাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হত। 'বসুমতী'র উদ্যোগে 'বার্ষিক বসুমতী' কয়েক বছর প্রকাশিত হয়। সেই জাতীয় পত্রিকা একালে প্রকাশ করতে হলে তার দাম অন্ততঃ দশ টাকার কম হত না। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটক এবং কবিতা বার্ষিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অমৃত-লাল বসু, জলধর সেন প্রভৃতি সেযুগের প্রখ্যাত লেখক-লেখিকার গল্প-কবিতা এবং বিখ্যাত শিল্পীদের ছবিও প্রকাশিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক পত্রগুলির বিশেষ সংখ্যা একটু আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে নির্বাচিত রচনা-সম্ভারে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে বহুবর্ণে মুদ্রিত হয়ে। সংবাদপত্রের আলাদা কোনো সংস্করণ প্রথমদিকে হত না, দৈনিক পত্রিকার একটি সংখ্যা ৪০—৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেত। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের অবসানের পর ১৩৩২-৩৩ সাল থেকে কোনো কোনো সংবাদপত্র পূজোর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে সুরু করেন। এই সব সংখ্যাগুলি সাইজে প্রাত্যহিকের সংখ্যার অর্ধেক হত। কিন্তু সেই আকৃতিও ঢাউস। তথাপি সুনির্বাচিত রচনাবলীর গুণে সেই সব পত্রিকার মূল্য ছিল অসীম! 'বঙ্গবাসী' বা 'বাংলার কথা' নামক দৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সাহিত্য-সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয় সংখ্যার গোড়ার দিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং 'যুগান্তরে'র শারদীয় সংখ্যার প্রথম যুগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল।

সেকালের পত্রিকাগুলি একটি বাঁধাধরা ছক মেনে চলত। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে থাকত খ্যাতিমান নবীন ও প্রবীণ লেখকদের গল্প ও কবিতা। পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হত মহালয়ার দিন।

ক্রমে এই সব শারদীয় সংখ্যার চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকগণ পাঠক সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল রুচির সঙ্গে তাল রেখে পত্রিকার আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর রূপান্তর ঘটালেন। অনেক নতুন লেখক আবিষ্কৃত হল। শারদীয় সাহিত্যের ফসল বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করল। অনেক পরিচিত নাম যেমন হারিয়ে গেল অনেক নতুন নাম জেগে উঠল। অনেক নতুন গল্পকার অনেক নতুন কবির আবির্ভাব ঘটল।

রূপান্তর ঘটতে সুরু করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে। দেশবিভাগের পর সেই রূপ আরো পাল্টে গেল। বক্তব্য স্পষ্ট হল, চিন্তার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখা দিল। বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত আবিষ্কৃত হল।

সাহিত্যে বিকৃতি অবশ্য ঘটেছে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। সিনেমার প্রসারের সঙ্গে অল্পশিক্ষিত সমাজের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের পরিবর্তে মুখরোচক তেলে-ভাজা আমদানী করা হয়েছে। ফলে শারদীয় উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত সাহিত্য সম্ভারের সবটুকুই যে সাধু তা বলা যায় না। আর সিনেমা পত্রিকায় পূর্ণাঙ্গ উপ-ন্যাস দেওয়ার রেওয়াজ হওয়ার পরে সাহিত্য সাময়িকীগুলিতেও উপন্যাস দেওয়ার রীতি মেনে নেওয়া হয়। এখন সিনেমা পত্রিকায় যদি দশখানি উপন্যাস এবং পাঁচখানি উপ-ন্যাসোপম কাহিনী থাকে তাহলে সুরুচি-সম্পন্ন উচ্চাঙ্গ পত্রিকায় পাঁচখানি উপন্যাস দিতে হয়। এই রীতিরও সুফল আছে। শারদীয় উৎসবের অবকাশে আগামী একটি বছরে কি কি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে তার একটা হদিশ পূজোর সময় পাওয়া যায়।

মোটকথা শারদীয় উৎসব আমাদের হতাশাভরা বাঙালী জীবনে এক প্রসন্ন আশীর্বাদ। এই উৎসবের পরিশেষে আত্মীয় বন্ধু, অগ্রজ, অনুজ, শত্রু-মিত্র সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপনের রীতি আছে। আমরাও 'অমৃতে'র অগণিত পাঠকবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানাই।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

আফ্রো-এশীয় পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি সম্মেলন—আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে দিল্লীতে যে চতুর্থ আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, তার সমর্থনে গত ৪ ও ৫ অক্টোবর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসবে মুল্‌ক রাজ আনন্দ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট কবি লেখকরা। এক প্রস্তাবে এই সম্মেলনকে স্থায়ী সংগঠন করবার সিদ্ধান্ত সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রুশ সাহিত্যিকের নোবেল পুরস্কার লাভ—রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিন এ-বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করতে গিয়ে সুইডিশ আকাদেমি বলেছেন : 'আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন আমাদের কালের দস্তয়েভস্কি।' যাই হোক, সলঝে-নিৎসিন যে পুরস্কার পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। মস্কোতে একজন সুইডিশ সাংবাদিককে তিনি বলেন —'এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি স্টকহোমে গিয়ে নিজেই পুরস্কার গ্রহণ করবো।'

সলঝিনিৎসিনের জন্ম ১৯১৮ সালে। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। লেনিনগ্রাদ যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই প্রশংসনীয় এবং সেই সময়েই তিনি ক্যাপ্টেন হন। এর পরেই কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি স্তালিনের আমলাতান্ত্রিক কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাঁর এক বন্ধুকে একটি চিঠি লেখেন। শোনা যায়, এ-জন্যই নাকি তাঁকে আট বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সলঝিনিৎসিনের একটি মাত্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে স্বদেশে। আর বাকী সবগুলি উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছে বিদেশে। তাঁর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ফার্স্ট সার্কল' ও 'ক্যান্সার ওয়ার্ড' রাশিয়ায় প্রকাশের অনুমতি পায়নি। আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা 'সমিজদৎ'-এর হাতে লেখা সংখ্যাগুলির মারফৎ নাকি স্বদেশেও কিছু কিছু প্রচারলাভ করে। পরে সেগুলি গিয়ে পড়ে পশ্চিমের কোন সমালোচকের হাতে। তাঁরাই সেগুলি সুন্দরভাবে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। তাঁর একমাত্র উপন্যাস, যেটি রাশিয়ায় প্রকাশের

অনুমতি পেয়েছিল. তার নাম 'ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অব ডেনিসোভিচ'।

সুতরাং এই যার সাহিত্য রচনা নিয়ে অবস্থা, তাঁর নোবেল পুরস্কার লাভে যে সেই দেশের লোকেরা ক্ষুণ্ন হবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? পাস্তারনাকের নোবেল পুরস্কার লাভের পরেও অনুরূপ সমালোচনার ঝড় উঠেছিল এবং তিনি পুরস্কার নিতে পারেন নি। কারণ, রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাধা দিয়েছিল। সলঝেনিৎসিন-এর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যেই সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ এর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এই পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে রাজনৈতিক ব্যাপারটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অবশ্য পাস্তারনাক ও সলঝেনিৎসিনের মধ্যে এ-ব্যাপারে তুলনা করাটা ঠিক নয়। কেননা, পাস্তারনাক অনেক বেশি পরিণত ছিলেন এবং স্বদেশে তাঁর খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। ৫২ বৎসর বয়স্ক সলঝেনিৎসিনের তা নেই। তাছাড়া, তাঁর রচনায় পাস্তারনাকের মত মানবিক আর্তির প্রকাশ তত প্রখর নয়। প্রসঙ্গতঃ 'ক্যান্সার ওয়ার্ড' উপন্যাসটির কথা ধরা যাক। গত বছর এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনী অংশ গড়ে উঠেছে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার কোন একটি ভাঙাচোরা হাসপাতালকে নিয়ে। সেখানে বেডের চেয়ে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং অব্যবস্থার অন্ত নেই। ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্য কর্মচারীরা যেন রোগীদের মানুষ বলেই গণ্য করেন না। আর ডাক্তার এবং নার্সদের ব্যবহার খুবই অমানুষিক। টিউমার দেখলেই ডাক্তাররা সাঁড়াশী দিয়ে টান-হেঁচড়া শুরু করে দেয়। ফলে রোগীর অবস্থা আরো মুমূর্ষু হয়ে ওঠে। এইসব রোগীদের নিয়েই গড়ে উঠেছে এর কাহিনী অংশ। সলঝেনিৎসিন নিজেও ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বোধ হয়, এই ব্যক্তি অভিজ্ঞতা তাঁকে এই উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে। যাই হোক, এই কাহিনীর মধ্যে সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটির দিক অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। এইসব দিকগুলি যে সব সময় যথার্থ হয়, এমন নয়। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাগুলি বিশেষভাবেই মনে পড়ে। ভারতীয় জীবন ও সমাজের অসঙ্গতি এবং অপ-প্রচারমূলক ভারতীয় লেখকদের লেখা বইগুলিই মার্কিন পশ্চিমী দুনিয়ায় বেশি অভিনন্দিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অন্নদাশংকরের চেয়ে যেখানে খাটিয়াটার কদর বেশি। সুতরাং সব সময়েই ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক নয়। আসলে সাহিত্যিকের বিচার হবে তাঁর সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নে। সলঝেনিৎসিনকেও তাই এই হট্টগোলের বাইরে রেখে তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়নে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

একটি সাহিত্য সভা—গত ৭ সেপ্টেম্বর **বর্ধমানের মেমারিতে** 'নিমো রামকৃষ্ণ সাহিত্য পরিষদের' উনিশতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক বিনয় গুহ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসত্যকিংকর হাজরা। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক গুহ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির উপর তাঁর মন্তব্য উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে বর্ধমানের বিশিষ্ট কবি-লেখকরা তাঁদের স্বরচিত রচনা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা সপ্তাহও পালন করা হয় মেমারী ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের সৌজন্যে।

মোহিতলালের স্মরণে—প্রখ্যাত কবি-সমালোচক মোহিতলালের স্মরণে সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীকুমারেশ ঘোষ। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহিতলালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন—'রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা-সাহিত্যে মোহিতলাল অন্যতম প্রধান কবি-পুরুষ। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে তিনি দিয়েছেন নতুন দিগন্তের সন্ধান। সাহিত্য-শাস্ত্রকার হিসেবে তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরেই।' ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর ভাষণে মোহিতলাল ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁর কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। ডঃ উমা রায়, কবিপুত্র অধ্যাপক মনসিজ মজুমদার, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন। মোহিতলালের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোপা কাঞ্জিলাল, মঞ্জুষা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী সেন ও ধীরেন বসু।

বিদ্যাসাগর সাহিত্য-সভা— বেলঘরিয়ায় 'শিশুতীর্থে'র উদ্যোগে গত ৫ অকটোবর স্থানীয় মডেল কে-জি স্কুল ভবনে বিদ্যাসাগর সার্ধ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, শিশুরাই এর সব। সভাপতি থেকে বক্তা পর্যন্ত। শিশু-সদস্য নামস্বরূপ চ্যাটার্জি এতে সভাপতিত্ব করেন। গল্প, কবিতা, এবং বিভিন্ন রচনায় বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভাস্কর সেন, পিনাকী ব্যানার্জি, ত্রিদিব গোস্বামী, সন্দীপ গোস্বামী, প্রদীপ অধিকারী প্রমুখ। বড়দের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমনকুমার সেন ও শ্রীগোপাল দাস।

—চার্বাক

শারদ সাহিত্য

অভিনয় : সম্পাদনায় ছয় জনের সম্পাদকমণ্ডলী। ১৩১, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৬। দাম : ৪-০০ টাকা।

বাংলাদেশে নাটক নিয়ে যতো হৈ-চৈ হয়, নাট্যসংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা নিয়ে, বিশেষ করে সিরিয়াস কাগজ নিয়ে, তেমন কোন আলোচনা শোনা যায় না। অথচ নাট্য-আন্দোলনই শুধু নয়, সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এইসব পত্র-পত্রিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। 'অভিনয়' পত্রিকাটিও অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে সেই গুরুদায়িত্বই পালন করছেন। বর্তমান শারদীয় সংখ্যাটি নাট্যরসিকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয়। এ সংখ্যায় ৭টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, ৩টি একাঙ্ক নাটক, ৫টি প্রবন্ধ ও ১টি চিত্রনাট্য। লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিজন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ ধর, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, রঞ্জনকুমার ঘোষ, সত্যেন মিত্র, উজ্জ্বল মজুমদার, যোগেশ দত্ত, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

মানবমন (অক্টোবর সংখ্যা) সম্পাদক : ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩২।১ বিধান সরণী, কলকাতা—৩। দাম : ২-৫০ টাকা।

মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মানব মন'-এর বর্তমান সংখ্যাটি নানান কারণেই উল্লেখযোগ্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন কণাদ শর্মা, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এস পি ব্রাপেজনিকোভ, ভ্লাদিমির তিমাকোভ, পরিতোষ গুপ্ত, ভালেনতিন ইয়েকিমোভ।

ক্রান্তি : সম্পাদক—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ৭বি কলেজ রো, কলকাতা ৯, দাম : ২-৫০ টাকা।

বর্তমান সংখ্যাটিতে প্রধানত জৌন-বিষয়ক আলোচনাই প্রকাশিত হয়েছে। এবং বেশির ভাগ প্রবন্ধই বিতর্কিত। লিখেছেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সঞ্জয় চক্রবর্তী, রাজেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, ত্রিদিব চৌধুরী, মাখন পাল, অবিনাশ দাশগুপ্ত, বেলা দত্তগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সীমান্ত : সম্পাদক তরুণ সান্যাল ও গণেশ বসু, ৩২।২, হরতকিবাগান লেন, কলকাতা-৬। দাম : এক টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের নৈরাজ্যবাদ, অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের অন্যতম মুখপত্র 'সীমান্ত' সাহিত্য-ত্রৈমাসিকের বর্তমান সংখ্যাটি শারদ সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পটি হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিচারিণী। অন্যান্য গল্প যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন

মিহির আচার্য, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুভাষ সিংহ, আবদুল জব্বার, চন্ডী মন্ডল। প্রবন্ধ লিখেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ। রিপোর্টাজ রণেন মোদক। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, সত্য গুহ, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শিশির সামন্ত, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন রায়, বিপ্লব মাজী, ধনঞ্জয় দাশ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সুমিত চক্রবর্তী ও গণেশ বসু।

যুব-অভিযান : সম্পাদক গুরুদাস দাশগুপ্ত, ১০৭, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা।

যুবসমাজের পত্রিকা বলতে বিশেষ কোন কাগজ বাংলা দেশে নিয়মিত বেরোয় না। সেদিক থেকে যুব-অভিযানের প্রয়াস নিঃসন্দেহে আনন্দের। বর্তমান চতুর্থ সংখ্যাটি শারদ সংকলন হিসেবে বেরিয়েছে। প্রগতিশীল যুবসমাজের মুখপত্রের আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন সুকুমার মিত্র, দেবেন দাশ, অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য, দিলীপ বসু, মুহম্মদ আবুবকর, রণেন মোদক, কল্পনা দেব, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুকুমার মিত্র, গণেশ বসু এবং আরো অনেকে।

চিত্রাঙ্গদা : সম্পাদক : অজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, রহস্য ও রোমাঞ্চ কাহিনী, কবিতায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটিতে লিখেছেন বিনয় ঘোষ, পান্নালাল দাশগুপ্ত, নীরোদ রায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, পরিমল চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

শুকসারী : সম্পাদক মিহির আচার্য। ১৭২।৩৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪। দাম এক টাকা।

সাম্প্রতিক ছোটগল্প সম্পর্কে শচীন বিশ্বাসের আলোচনাটি মূল্যবান (এই সময়ের শিল্পরূপ : ছোটগল্প)। ফর্ম, টেকনিক ও কনটেন্টের বিচিত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কয়েকটি গল্প লিখেছেন অজিত মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু রায়, বাসুদেব দেব, মানবেন্দ্র পাল, রবীন্দ্র গুহ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল দাশ, সমরেশ দাশ, অমিয় চৌধুরী, আশিস সেনগুপ্ত, অশোককুমার সেনগুপ্ত ও গৌর বিশ্বাস। ইদানীংকালে প্রকাশিত গল্পপত্রিকাগুলির মধ্যে শুকসারীর রচনামান ও জীবনদৃষ্টি পাঠকের চিন্তাবোধকে নাড়িয়ে দেবে। একালের পাঠক হয়তো এমন একটি পত্রিকার জন্য অনুভব করবে গভীর মমতা ও আত্মসন্তুষ্টি।

বিশ্ববার্তা—সম্পাদক : কালীপদ চক্রবর্তী। ৪৪।৩, গরচা রোড। কলকাতা-১৯। দাম দু টাকা।

লিখেছেন রমা চৌধুরী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, মনোজ বসু, সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, সলিল সেন এবং আরো অনেকে।

মহিলা : সম্পাদিকা : আশা দেবী। ১২৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলকাতা-৬। দাম : আড়াই টাকা।

মেয়েদের এই মাসিক পত্রিকাটির শারদ সংখ্যা থেকেই চব্বিশ বছর শুরু। দীর্ঘদিন ধরে এ পত্রিকাটি নানাভাবে বাঙালী মেয়েদের সেবা করে আসছে। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, সাক্ষাৎকার, খেলা-ধুলো, রূপসজ্জা, সেলাইবোনা প্রভৃতির সমাহারে এই বিশেষ সংখ্যাটি মেয়েদের মনোরঞ্জন করবে সেকথা বলাই বাহুল্য। যাঁরা এই সংখ্যায় লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছেন : ডঃ রমা চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, হেনা হালদার, বেলা দেবী, সাধনা বসু, শিবানী বসু, রেণুকা দেবী, জয়ন্তী রায়, কনকলতা ঘোষ, সতীদেবী মুখোপাধ্যায়, হাসি গঙ্গোপাধ্যায়, সুজাতা প্রিয়ংবদা, হেনা চৌধুরী, লীলাবতী রায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, ইরা পাইন প্রমুখ।

কথাসাহিত্য—সম্পাদক : গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

সুবৃহৎ আকারে প্রকাশিত শারদীয় কথাসাহিত্যের রচনাবৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। সম্পূর্ণ ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত এবং সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

কবিতা লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নিশিকান্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণধন দে, উমা দেবী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, আনন্দ বাগচী, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় এবং অনেকে।

গল্প প্রবন্ধ অন্যান্য রচনা লিখেছেন অবধূত, কালিদাস রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, লীলা মজুমদার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রাণী রায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমিয়সূদন ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, প্রশান্ত চৌধুরী, আবদুল জব্বার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী। তাছাড়া সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ—দেবী চট্টোপাধ্যায় ও চন্দনা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত ডায়েরী।

কালি ও কলম—সম্পাদক : বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম—দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গল্প কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ আলোচনায় আকর্ষণীয়। বীরেন্দ্রমোহন আচার্য (বিভূতি স্মৃতি), সবিতা সেনগুপ্ত (উপন্যাস), মানিক ঘোষ, স্মরজিৎ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মালাকার, ওঙ্কার গুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র সরকার, তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, আশিস সান্যাল, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, মেজবাদউদ্দীন আহমদ খান, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (গল্প), অরুণকুমার সেনগুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ দাশ, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নমিতা চক্রবর্তী, সুনীল রায়, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়, চুনীলাল রায় এবং আরো অনেকে।

সারস্বত—সম্পাদক : অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরনী। কলকাতা-৬। দাম—দু টাকা।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সারস্বত'-এর বৈশিষ্ট্য শারদীয় সংখ্যাটিতে স্পষ্ট। প্রবন্ধ কবিতা এবং গল্প নির্বাচনে এঁদের রুচি স্বতন্ত্র স্বাদের। প্রবন্ধ লিখেছেন হারাণচন্দ্র নিয়োগী (প্রাচীন ভারতে সমৃদ্ধি চিন্তা ও নরবলি প্রথা), প্রভাতকুমার গোস্বামী (লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে), গণেশ লালওয়ানী (জৈন চিত্রকলা), রণেন নাগ (আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার সংকট—পুঁজিবাদী উৎপাদনের পরিণতি), কুমুদ দাস (রাজমহলের যুদ্ধ ১৫৭৬) এবং নারায়ণ চৌধুরী (সমাজের বিবর্তনের পটভূমিকায় রাগ সংগীত)। কবিতা ও গল্প লিখেছেন বিষ্ণু দে, সুশীল রায়, অরুণ মিত্র, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অমিতাভ দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মিহির সেন, মানবেন্দ্র পাল এবং তপোবিজয় ঘোষ। বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই বইটি হাতে নিয়ে তৃপ্তি পাবেন।

গল্পকবিতা— সম্পাদক : কৃষ্ণগোপাল মল্লিক। ১৭।১ডি সূর্য সেন স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম : এক টাকা।

এই বিশেষ সংখ্যাটিতে চিঠিপত্রে গল্প কবিতা নানা বিষয় লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রলয় সেন, সুভাষ সিংহ, রবীন্দ্র গুহ, রমানাথ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গণেশ বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, মৃণাল বসু চৌধুরী রঞ্জিত রায় চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

লেখা ও রেখা—সম্পাদক: ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। ১২।১সি পাইকপাড়া রো। কলকাতা—৩৭। দাম : দু' টাকা।

বাংলা দেশের অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত 'লেখা ও রেখা' প্রগতিশীল সুস্থ জীবন-দর্শনে অনুগত সাহিত্য-শিল্প পরিবেশন করছেন দীর্ঘ চৌদ্দ বছর। এটি হোল পঞ্চ-দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা। প্রবন্ধ লিখেছেন দেব-ব্রত মুখোপাধ্যায় (গৌড়), নন্দগোপাল সেন-গুপ্ত (সংস্কৃতি ভাবনা : দ্বিতীয় প্রসঙ্গ), অরবিন্দ পোদ্দার (বাংলার রেনেশাঁস : কয়েকটি মন্তব্য), অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (সত্যজিৎ রায়, একটি অবক্ষয়ের নিরীক্ষা) এবং রণেন নাগ (আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসঙ্গে)। গল্প এবং কবিতা লিখেছেন মনীশ ঘটক, মণীন্দ্র রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চট্টো-পাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, মনুজেশ মিত্র, শচীন বিশ্বাস, অশোককুমার সেন-গুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশিস সেনগুপ্ত। কয়েকটি গ্রন্থ সমীক্ষা করেছেন মৃণাল করগুপ্ত, সুশান্ত বসু, অশোক কুমার ভট্টাচার্য, রথীন ভৌমিক এবং কবি-রুল ইসলাম।

চতুষ্কোণ (আশ্বিন ১৩৭৭)—সম্পাদক-মণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত। ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দু' টাকা।

প্রবন্ধসমৃদ্ধ এই সংখ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা লিখেছেন দীপেন্দু চক্রবর্তী (শিল্পীর অধিকার), রণজিৎ-কুমার সেন (প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে চীন প্রসঙ্গ), বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বানানবিধির গোড়ার কথা) এবং আরো কয়েকজন। অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়ই বিগতকালের। গল্প লিখেছেন তপোবিজয় ঘোষ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ছবি বসু মানবেন্দ্র পাল, অশোক সেনগুপ্ত ও দেবদত্ত রায়। কবিতা লিখেছেন অরুণ মিত্র, কৃষ্ণ ধর, মণীন্দ্র রায়, আশিস সান্যাল, দুর্গাদাস সরকার, শ্যামসুন্দর দে, গণেশ বসু, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টো-পাধ্যায় এবং আরো অনেকে। কয়েকটি মূল্যবান ভাস্কর্যের ছবি পত্রিকাটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদ চমৎকার।

ছন্দিতা—সম্পাদক : অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় এবং গৌরগোপাল দাস। বি—৫৯ রবীন্দ্রনগর। কলকাতা—১৮। দাম : এক টাকা।

লিখেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, হেনা হালদার, বেলা দে, রজত রায়চৌধুরী, নির্মলেন্দু গৌতম, কৃষ্ণ ধর, গোপাল ভৌমিক, শান্তনু দাস, জয়ন্তী সেন এবং আরো অনেকে।

চিকিৎসক সমাজ: সম্পাদক: অমল ঘোষ হাজরা। ১৫১, ডায়মন্ডহারবার রোড। কলকাতা—৩৪। দাম : তিন টাকা।

এই আকর্ষণীয় পত্রিকাটির বিষয়-বৈচিত্র্য ইতিমধ্যে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিবিধ চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে বিদগ্ধ চিকিৎসকরা নিয়মিত লিখে থাকেন। শারদীয় সংখ্যায় গল্প কবিতা উপ-ন্যাস এবং চিকিৎসা সম্পর্কে নানা ধরনের আলোচনা আছে। লিখেছেন পশুপতি ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, সতুদাদা, আনন্দকিশোর মুন্সী, নির্মল সরকার, বিশ্বনাথ রায় এবং আরো অনেকে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান : সম্পাদক : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি—২৩ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট। কল-কাতা—৬। দাম : তিন টাকা।

লিখেছেন সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, বুদ্ধ-দেব ভট্টাচার্য, লীলা মজুমদার, রাসবিহারী রায়, অনুপরতন ভট্টাচার্য, অরুণকুমার রায়চৌধুরী, সূর্যেন্দুবিকাশ রায়, খগেন্দ্র-নাথ দাস, প্রিয়দারঞ্জন রায়, শ্যামসুন্দর দে এবং আরো অনেকে।

কম্পাস—সম্পাদক : পান্নালাল দাশগুপ্ত। ১৪, ক্ষুদিরাম বসু রোড। কলকাতা—৬। দাম : দেড় টাকা।

কম্পাস পাঁচমিশেলী পত্রিকা নয়। রাজ-নীতি পর্যালোচনায় পত্রিকাটির ভূমিকা বিশেষভাবে চিহ্নিত। নানান বিষয়ে লিখে-ছেন বিনয় ঘোষ, জিতেন সেন, রেজাউল করীম, পুলকেশ দে সরকার, প্রফুল্ল গুপ্ত, অসিত ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, রাখাল ভট্টাচার্য, অমিয়া সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু।

মধ্যাহ্ন—সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য। ৩৮ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম—পঁচাত্তর পয়সা।

কয়েকটি বিতর্কমূলক আলোচনা এই সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য। নৃপেন্দ্র গোস্বামী, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ বসু। কয়েক গল্প ও কবিতা আছে।

দুই বাংলার কবিতা—সম্পাদক : অঞ্জন সেন। পি ২৩৯ লেক রোড। কলকাতা—২৯। দাম এক টাকা।

ত্রৈমাসিক 'আমরা'র এই শরৎকালীন সংকলনে দুই বাংলার কবিদের কবিতা, কাব্যনাটক, প্রবন্ধ ও আলোচনা আছে। কবিতাপিপাসু পাঠকের কাছে পত্রিকাটি আদৃত হবে।

কিশলয়—সম্পাদক : নিখিলেন্দু চক্রবর্তী। নববারাকপুর।

কিশোর পাঠকদের উপযোগী গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ কাহিনী সমৃদ্ধ।

কৃশাণু —দীনেশচন্দ্র সিংহ। ৯৪ বিবেকানন্দ রোড। কলকাতা-৬। দাম এক টাকা।

শারদীয় গল্প সংকলন। লিখেছেন মিহির সেন, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, পিনাকী-রঞ্জন গুহ, মদন দাশ এবং আরো অনেকে।

প্রদীপণ : বিপ্রদাস পালচৌধুরী জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। কৃষ্ণনগর। নদীয়া। সম্পাদক : সুনীল সরকার। প্রবন্ধ, কবিতা গল্প বিচিত্র রচনায় পূর্ণ।

সেন্টপলস স্কুল পত্রিকা—কুমুদরঞ্জন আচার্য এবং প্রণবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেন্ট-পলস স্কুল। ৩৩।১, আমহার্স্ট স্ট্রীট। কলকাতা—৯।

প্রাপ্তি স্বীকার

ক্রমিক—সম্পাদক: গৌতম বাগচি এবং নৃপেন চক্রবর্তী। প্রেস কর্নার, ২৫, যোগীপাড়া লেন, কলকাতা—৬ থেকে ছাপা এবং ৯০ বাগুইআটি থেকে প্রকাশিত।

নিগম—সম্পাদক : ভাস্করনারায়ণ চৌধুরী। ৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড। কলকাতা—১৩। দাম : এক টাকা।

অভিনব অগ্রণী—সম্পাদক : দিলীপকুমার বাগ। ৮০, বৈষ্ণবপাড়া লেন। হাওড়া—১। দাম : এক টাকা।

উত্তরাণ—সম্পাদক : বাসুদেব বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ দে। দাম : ত্রিশ পয়সা।

তফাৎ তফাৎ— সম্পাদক : পরিতোষ ভট্টাচার্য। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। দাম : কুড়ি পয়সা।

কেতু—সম্পাদক: দিলীপ চক্রবর্তী এবং রণজিৎ দাশগুপ্ত। অ্যাপোলো প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। কলকাতা—নয়। দাম : ত্রিশ পয়সা।

জাহ্নবী—সম্পাদক : ত্রিশূল। পায়রা ডাঙা। নদীয়া। দাম : কুড়ি পয়সা।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৮)

সকাল থেকেই বিসর্জনের বাজনা বাজছে। দেবীর চোখে মুখে বিষণ্ণতা। তিনি আবার হিমালয়ে চলে যাচ্ছেন। আগমনী গান যে যার গাইবার এতদিন গেয়েছে। আর গাইবার কিছু নেই।

এইদিনে সব কিছুতে একটা বেদনার ছাপ। এত যে রোদ ঝিলিমিলি আকাশ, এত যে উজ্জ্বল দিন, কোথাও মালিন্য নেই—তবু কি যেন সকলের হারিয়ে যাচ্ছে। এই মণ্ডপের সামনে সকলেই এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। বড় হুজুর সকাল থেকেই নাটমন্দিরে একটা বাঘের চামড়ার উপর বসে আছেন। পরিধানে রক্তাম্বর। কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। এই দিনে—মা ভুবনময়ী, ভুবনমোহিনী, হে মা জগদীশ্বরী, তুই একবার নয়ন ভরে তাকা মা—হেন প্রার্থনা এই মানুষের।

মেজবাবু এবারেও প্রতিবারের মতো ফ্লুট বাজাবেন। নগেন ঢালি এসেছিল ঢোল নিয়ে। সে গতকাল হাটে-বাজারে-গঞ্জে ঢোল পিটিয়ে চলে এসেছে।

গ্রাম গ্রামান্তরে এই খবর রটে গেলে চাষী বৌ'র মুখের রঙ বদলে যায়। সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। সেই শীতলক্ষ্যার তীরে গাঁ। জমিদার বাবুদের সব দালান-কোঠা নদীর পাড়ে পাড়ে। আঁচলে একটা চৌ-আনি বেঁধে, পানে ঠোঁট রাঙা করে ঘোমটা টেনে মুখে দশহরায় যাবে, যাবার আগে দিঘির পাড়ে বসে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনবে। সকাল সকাল বের না হতে পারলে জায়গা পাওয়া যাবে না। নদীর পাড়ে পাড়ে যে সব পাম গাছ আছে, সে-সব গাছের নিচে রাত থাকতেই লোক এসে জমতে শুরু করেছে। চাষা মানুষেরা অথবা বৌরা সামিয়ানার নিচে যেতে পারবে না। কাছ থেকে দেখবে মেজ-বাবুকে এমন সখ এইসব দূরের চাষি বৌয়ের। কিন্তু সিপাইগুলো এমন করে, লাঠি নিয়ে এমন তাড়া করে কার সাধ্য ওরা সামিয়ানার নিচে গিয়ে বসে। কতবার চাষী বৌ ভেবেছে লুকিয়ে চুরিয়ে সে চলে যাবে সামিয়ানার নিচে, কাছ থেকে দেখবে মেজবাবুকে, ফ্লুট বাজনা শুনবে—কিন্তু তার মানুষ বড় ভীরু, সে কিছুতেই তার বৌকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। একটা ঝাউগাছের নিচে বসে ওরা বাবুর ফ্লুট বাজনা শুনবে। যতক্ষণ না নদীর জলে, সব গ্রামের প্রতিমা বিসর্জন হবে, ততক্ষণ মেজবাবু ক্রমান্বয় ফ্লুট বাজিয়ে যাবেন। একের পর এক সুর, সবই বড় তখন করুণ মনে হয়, নিরিবিলি এক জগৎ সংসারে কি যে কেবল বাজে, প্রাণের ভিতর কি যে বাজে—ফ্লুট শুনতে শুনতে তারা দুঃখী মানুষ হয়ে যায়।

সকাল থেকেই জায়গা নেবার জন্য দূর গ্রামান্তর থেকে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। আমলা কর্মচারিদের কাজের বিরাম নেই। মঞ্চ করা হয়েছে। দিঘির পাড়ে এক মঞ্চ, রসনচৌকি যেন বাজবে সেখানে। সে মঞ্চে তিনি শীতলক্ষ্যার ও-পারে সূর্য ঢলে পড়লেই উঠে যাবেন। কলকাতা থেকে তাঁর আরও দুজন শিষ্য এসেছে। ওরাও বাজাবে। এখন থালেক কোথায়! থালেক পীড়িত। কাছারি বাড়ি পার হলে এক অশ্বশালা আছে, কিছু ঘোড়া আছে, সাদা রঙের কালো রঙের ঘোড়া, সেখানে আস্তাবলের এক পাশে থালেকের ছোট্ট ঘর। আলো নেই, বাতাস আসে না। সূর্য দেখা যায় না। থালেক সেই ঘরে শীর্ণকায় মানুষের মতো অনাহারী, দুঃখী এবং মুখে চোখে ক্লিষ্ট এক ভাব। থালেক মিঞা শরীর শক্ত করে পড়ে আছে। থালেক আজই সূর্যাস্তের সময় মারা যাবে। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। হাত পা স্থবির। পাষাণের মতো ভারি লাগছে সব। দশমীর দিনে সেও ফ্লুট বাজায়। সেও মেজবাবুর পাশে বসে থাকে। আজ সে তার আঙুলগুলো এই দিনে নেড়ে নেড়ে দেখতে চাইছে—পারছে না। ভারি ভারি—পাষাণের মতো ভারি। ইব্রাহিম একবার দেখে এসেছে। ভূপেন্দ্রনাথ দুবার দেখে এসেছে। ওষুধ অথবা পথ্য সে কিছুই খাচ্ছে না। সে টের পেয়ে গেছে সূর্যাস্তের সময় ফ্লুট বাজলেই সে এক অদ্ভুত সুর লহরীর ভিতর ডুবে যেতে যেতে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ ভুলে যাবে। সে মরে যাবে। তবু সে এই দুঃসময়ে, এটা তার দুঃসময় কি সুসময়, সে মনে মনে এটা সুসময় জানে, সে যেন কার পদতলে বসে সারা-জীবন ফ্লুট বাজাবে তার জন্য তৈরি হচ্ছে।

যখন একটা মানুষ মরে যাবে বলে চিৎপাত হয়ে অশ্বশালার পাশে পড়ে আছে তখন একজন মানুষ, আদ্যিকালের এক তালপাতার পুঁথি সামনে রেখে পড়ে চলেছেন—জয়ং দেহি, যশো দেহি। এই মানুষ মহালয়ায় চণ্ডীপাঠ করেন না। বিসর্জনের দিন চণ্ডীপাঠ। এমন উল্টো ব্যাপার ভূভারতে কবে কে দেখেছে। তিনি পদ্মাসন করে বসেছেন। বাঘছালের উপর বসে। সামনে দেবীপ্রতিমা। বিসর্জনের বাজনা বাজছে। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, হে জগদম্বে, হে মা ঈশ্বরী বলে সুর ধরে যেন বলে চললেন, অপরাধ ক্ষমা করতে আজ্ঞা হয় মা। তুই আজ চলে যাবি, অ মা উমা, এই বুঝি তোর ইচ্ছা ছিল, বলে শিশুর মতো করজোড়ে তিনি কাঁদতে থাকলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে তিনি শুম্ভ নিশুম্ভ বধে চলে এলেন। কখনও মধু কৈটভ বধে। দেবীর গা থেকে কি তেজ বের হচ্ছে। শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। কি গ মা তুই ভয় পেলি, তিনি পাঠ

করতে মাঝে মাঝে এইসব স্বগতোক্তি করছেন।—হে মা তুমি এখন মধু পান কর। থেমে তিনি বললেন মধু পান নিমিত্ত শরীরে অপার শক্তি সঞ্চয় করেছ—যা দেবী সর্বভূতেষু, দেবী তোমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হাজার হাজার দেবসৈন্য সৃষ্টি হচ্ছে, তারা যে সব মুহূর্তে বিনাশ হয়ে গেল মা! মহিষাসুর নিমেষে সব ধ্বংস সাধন করছে। মা তোর বুঝি এই কপালে ছিল, মায়াপাশে আবদ্ধ করতে পারলি না! বলে তিনি যে সব ভক্ত পাশে বসে চণ্ডীর ব্যাখ্যা শুনছিল, তাদের ব্যাখ্যা করার সময়ই দেখলেন, এক বালক নাটমন্দিরের পশ্চিমের বারান্দায় বড় একটা থামের আড়ালে ঈশমের গল্পের মতো মনোযোগ দিয়ে চণ্ডী পাঠ শুনছে। সেই এক কিংবদন্তী, গর্জে গর্জে কে গর্জন করছে! দেবীর গর্জন না অসুরে।

এই বৃহৎ সংসারে তিনিই সব। অমলা কমলার ঠাকুর্দা প্রতাপশালী মানুষ। একমাত্র দেবীর সামনে এসে তিনি শিশু বনে যান। শিশুর মতো কাঁদেন। কেবল ক্ষমা ভিক্ষার মতো মুখ। সেই মুখে, চণ্ডীপাঠের সময় গর্জে গর্জে এমন শব্দ উচ্চারণে সে না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষণে মুখের কি পরিবর্তন সোনা আর নড়তে পারে নি। বললেন অঃ তুই। দেবী মহিমা শুনতে ভাল লাগছে।

সোনা ঘাড় কাত করে দিল।

—তবে দাঁড়া।

সোনা একটা থামের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ পরে হুঁস হল কমলা ওকে পিছন থেকে চুপি চুপি ডাকছে। —সোনা এখানে তুই কি করছিস।

সে বলতে পারল না চণ্ডীপাঠ শুনছে। ঋষি পুরুষেরা নানারকম কিংবদন্তী লিখে গেছে তালপাতার পুঁথিতে, এখন সে সবই দেবী মহিমা হয়ে গেছে। ওর কাছে প্রায় সবটাই ঈশমের সেই যে এক সূর্য আছে না, জলের নিচে এক রূপালি মাছ আছে, মাছটা সূর্য মুখে অথবা সেই মাছটা কি জালালি? যে কেবল বিল পার হয়ে নদী পার হয়ে সাগরে চলে যায় সূর্য মুখে। সকাল হলেই পূর্বদিকে সূর্যটাকে লটকে ডুব দেয় ফের। সাগরে সাগরে মহাসাগরে ঘোরা ফেরা তার।

সে বলতে পারত, ঋষি পুরুষেরা কিংবদন্তী লিখে গেছে তালপাতার পুঁথিতে। আমি তাই শুনছি। বলতে পারত, আমাদের ঈশম ওর চেয়ে অনেক বেশি ভাল ভাল কিংবদন্তী জানে। সে ভাবল বড় হলে তালপাতার পুঁথিতে সেও তা লিখে রাখবে। সুতরাং সে চণ্ডীপাঠ শুনেছে, না কিংবদন্তী শুনেছে পুরাকালের এখন এই মেয়ে কমলাকে তা প্রকাশ করতে পারল না।

সে না কিছু বলছে না দেখে ফের কমলা বলল, পাঁচটায় হাতী আসবে। হাতীতে আমরা দশরা দেখতে যাব। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি।

সোনা বস্তুত এখন ঈশমের সেই কাল-রাত্রি, মহারাত্রি বলা যেতে পারে—জালালিকে তুলে আনছে বিলের পার থেকে, এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত শীতে পাগল জ্যাঠামশাইর মুখ সাদা ফ্যাকাশে ঠিক জ্যোৎস্নার মতো রং, এখন সোনার সব মনে হওয়ায় সে কমলার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

—এই শুনছিস আমি কি বলছি?

—কি!

—আমাদের সঙ্গে হাতীর পিঠে দশরা দেখতে যাবি।

—যাব।

—একটু সকাল সকাল [illegible] চলে আসবি। আমরা তোকে [illegible] পাউডার মেখে দেব।

সোনা হাঁটতে [illegible]

—কিরে যাস [illegible]

[illegible]

[illegible]

—আমি, দিদি, সোনাদি [illegible]

—আর কেউ যাবে না?

—আর কে যাবে জানি না। তুই কিন্তু আগে আগে চলে আসবি। মুখে তোর পাউডার মেখে দেব।

সোনা তার এই বয়স পর্যন্ত মুখে পাউডার মাখেনি। সে বেটাছেলে। বেটাছেলে পাউডার মাখে না। বাড়িতে একটা এমন নিয়ম আছে। মা জ্যাঠিমাও কদাচিৎ মুখে পাউডার মাখেন। সে পাউডার মাখতে প্রায় দেখেইনি বললে চলে। দূরে দেশের আত্মীয় বাড়িতে যেতে হলে হেজলিন স্নো মেখেছে, শীতকালে মা তার মুখে স্নো মাখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই গরমের সময় সে পাউডার মাখবে এবং ওর মুখ আরও সুন্দর দেখাবে ভাবতেই লজ্জায় গুটিয়ে গেল।

সে বলল, জ্যাঠামশাই যাবে না?

—না।

—জ্যাঠামশাই না গেলে আমিও যাব না।

—তুই কিরে সোনা। যারা ছোট তারাই যাবে। বড়রা হেঁটে যাবে। ঠাকুমা তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। এই বলে সে যেমন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিল তেমনি দ্রুত উপরে উঠে গেল! সিঁড়ির মুখে অমলা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, কিরে পেলি সোনাকে?

—হ্যাঁ।

—কি বলল।

—বলল যাবে।

—বলেছিসত সকাল সকাল আসতে। পাউডার মেখে দেব মুখে বলেছিস।

—সব বলেছি। তুই না দিদি, কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। বাবা এদিকে আসছেন। বাবা একদিন ধুতি চাদর পরে একেবারে বাংলা দেশের মানুষ হয়ে যান। তারপর কলকাতায় যাবার দিন এলেই একেবারে সাহেব সুবো মানুষ। এখন তিনি বাংলাতে পর্যন্ত কথা বলেন না। তখন বাবাকে বরং বেশি পরিচিত মানুষ মনে হয় ওদের। ওরা বাবার সঙ্গে সহজেই তখন কথা বলতে পারে।

কিন্তু এখন ওরা পালাবার পথ খুঁজছিল। এই অসময়ে ওরা নাটমন্দিরের কাছে চলে এসেছে এটা ঠিক না। দেখলেই বাবা ধমক দিবেন। সুতরাং ওরা তাড়াতাড়ি সোনাকে কাছারি বাড়ির দিকে খুঁজতে গেছে, খুব সন্তর্পণে গেছে। এমন কি ঠাকুরের দাসী-বাঁদিদের চোখেও যেন না পড়ে। প্রায় লুকোচুরি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] লম্বা আবলুস কাঠের খাট। এবং পালঙ্ক বলা চলে, কতকাল থেকে পালঙ্ক খালি। বাবা এলে এই পালঙ্কে না শুয়ে ছোট একটা তক্তপোষে শুয়ে থাকেন। ডানদিকের ঘরটাতে বিলিয়ার্ড টেবিল। অবসর সময় বাবা একাই টেবিলে লাল-নীল রঙের বল নিয়ে খেলা করেন। আর দেয়ালে বাবার কেটের ছবি। গভর্ণরের সঙ্গে বাবার ভোজ খাওয়ার ছবি। বিলাতে লিঙ্কনে ইনে পড়ার সময়কার ছবি। মায়ের সঙ্গে তোলা ফটো—বোধহয় জায়গাটা ওয়েলসের কোন একটা গ্রামের। মামাবাড়িতে যাবার সময় বড় একটা কাসল পড়ে। একটা ক্যাসেলের ছবিও এ-ঘরে রয়েছে। ছাত্রাবস্থায় বাবার সেই সতেজ মুখ দেখার জন্য দুই বোন চুরি করে এই ঘরে ঢুকে যায়। বাবার কাছে ধরা পড়লে দু বোন ছুটে পালায়। সোনা বলেছিল বাবার ঘরটা দেখবে। অমলা বলেছিল দেখাবে। কিন্তু কি করে যে দেখানো যায়, সোনার বুদ্ধি নেই মোটেই, কেবল কথা বললেই হাসে, চুপি চুপি দেখে যে চলে যাবে তেমন সে নয়। এটা কি, ওটা কেন, এই লাল-নীল রঙের বল দিয়ে কি হয়? আমি দুটো বল নেব। অথবা সে ওসব দেখতে দেখতে এমন অন্যমনস্ক হয়ে যাবে যে ধরা না পড়ে যাবে না। সোনা এমন ছেলে যে, ওকে নিয়ে কিছু করা যায় না। পালানো যায় না। সে বোকার মতো বার বার ধরা পড়ে যায়।

সোনা তখন ভূপেন্দ্রনাথকে বলল, জ্যাঠামশায় আমি দশরাতে যামু। কমলা আমারে নিয়ে যাইব। হাতীতে চইড়া যামু কইছে।

দশমীর দিন এই হাতী আসে বিকালে। জসীম জরির পোষাক পরে। মাথায় তার জরির টুপি। বাড়ির বালক এবং বালিকারা সকলে মিলে দশরা দেখতে যায়। হাতীর শুঁড়ে শ্বেত চন্দনে ফুল-ফল আঁকা থাকে। কপালে পানপাতা এবং শরীরে নানারকমের কলকা আঁকা অথবা ধানের ছড়া এবং লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। গলায় কদম ফুলের মালা। যেইনা মেজ-বাবুর ফ্লুট বাজনা আরম্ভ হবে, হাতীটা নিয়ে জসীম রওনা হবে পিলখানার মাঠ থেকে। তারপর সোজা অন্দর মহলের দরজায়। সেখানে হাতীটা দাঁড়িয়ে থাকবে। কপালে চাঁদমালা তার। তখন বাড়ির বৌরাণীরা সোহাগ মেগে নেবে প্রতিমার। প্রতিমার পায়ে সিঁদুর ঢেলে নিজের নিজের কৌটায় পুরে রাখবে। সম্বৎসর এই সিঁদুর কপালে দেবে। আর মেজ বৌরাণীর জন্যও সিঁদুর আসে সোনার কৌটায়। সেটা মেজবাবু কলকাতা যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যান। মেজ বৌরাণী কপালে সিঁদুর দেন না। লম্বা গাউন পরেন। গীর্জায় যান। তবু এক ইচ্ছা এই পরিবারের বিশেষ করে বৌঠাকুরাণীর অর্থাৎ মেজবাবুর মার মন আদৌ মানে না। তিনি সব বৌদের জন্য সোনার কৌটায় দেবীর পা থেকে সিঁদুর কুড়িয়ে রাখেন তেমনি মেজ বৌরাণীর জন্যও সিঁদুর কুড়িয়ে নেন। মেজবাবুকে দেবার সময় অনুরোধ করবেন, একবার অন্তত সিঁদুরটা যেন কপালে ছোঁয়ায় বৌ। মেজবাবু তখন সামান্য হাসেন। তারপর যার জন্য দেবীর পা থেকে সিঁদুর সঞ্চয় করা—সে এই হাতী। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী এই পরিবারের। দশমীর দিনে কপালে নিজ হাতে বৌ-ঠাকুরাণী সিঁদুর পরিয়ে দেন। চাঁদমালা পরিয়ে দেন। তারপরই বাজনা বাজে। ঢাকের বাজনা, বিসর্জনের বাজনা। পরিবারের সব বালক-বালিকারা সেজে গুজে হাতীতে চড়ে বসে। প্রতিমা নিরঞ্জনের লোকেরা, জয় জগদীশ্বরী, জয় মা জগদম্বা সব জয় বাড়ির বড় হুজুরের—এইসব জয় দিতে দিতে প্রতিমা বের করে নিয়ে যায়। এইসব জয়ের ভিতর শোন যায় মেজবাবু মঞ্চের উপর বসে ফ্লুট বাজাচ্ছেন। দক্ষিণের দরজা দিয়ে প্রতিমা যায়, উত্তরের দরজা দিয়ে হাতী যায়। আর মাঝখানে বড় চত্বর। তারপর দিঘি। দিঘির পাড়ে রসুনচৌকির মতো মঞ্চ, ক্রমান্বয় এক সুর বেজে চলেছে। নদীতে এক দুই করে প্রতিমা নামছে। ক্রমে সন্ধ্যা নামছে নদীর চরে—কাশফুলের মাথায়। দশমীর চাঁদ আকাশে। আর ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। নৌকায় সারি সারি দেবী প্রতিমা, বিসর্জনের বাজনা, হৈ চৈ, আলো আঁধারির খেলা। হাউই পুড়ছে, আলো ফুটছে কত রকমের। থেকে থেকে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা—করুণ এক সুর এই বিশ্বচরাচরে অপার মহিমা নিয়ে বিরাজ করছে। মেজবাবু বুঝি এই সুরের ভিতর ফ্লুট বাজাতে বাজাতে স্ত্রীর ভালবাসার জন্য কাঁদেন।

আজ আবার সেই দিন এসে গেছে। নিত্যকার মতো ভূপেন্দ্রনাথ সকাল সকাল স্নান করে এসেছে নদী থেকে। নিত্যকার মতো ময়ূরের ঘর, বাঘের খাঁচা এবং হরিণেরা যে যেখানে থাকে সে-সব জায়গায় ভূপেন্দ্রনাথ ঘোরাঘুরি করছে। সাফ সোফ ঠিকমতো হয়েছে কিনা, এসব যদিও ওর দেখার কথা নয়—তবু এতগুলি জীব এই প্রাসাদে প্রতিপালিত, প্রতি মানুষের মতো তাদের সুখ দুঃখ বুঝে ভূপেন্দ্রনাথ নিজে দেখে শুনে সব বিধিমত ব্যবস্থা করে থাকে। তা ছাড়া আজ দেবী চলে যাচ্ছেন হিমালয়ে। কি এক বেদনা সব সময় সকাল থেকে প্রতিবারের মতো ওকে বিষণ্ণ করে রাখছে। তারপর নিত্যকার মতো মঠের সিঁড়ি ভেঙে ভিতরে ঢুকে শিবের মাথায় জল, বৃষের পায়ে জল এবং শেকল টেনে এক দুই করে শতবার ঘণ্টা ধ্বনি।

খালেকের অসুখ। কুলীন পাড়া থেকে ডাক্তার এসে দেখে গেছে। আর এখন যারা বিদায় চাইছে যেমন পুরোহিত এবং অন্য অনেকে, তারা এখন সবাই কাছারি বাড়িতে ভূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষায় বসে আছে। তাছাড়া গত সন্ধ্যায় যারা কাটা মোষ নিয়ে গিয়েছিল তারা আসবে নতুন কাপড়ের জন্য। যেসব প্রজাদের জমি বিলি করার সময় ঠিক ছিল, মায়ের পুজায় পাঠা অথবা মোষ এবং দুধ-কলা, আনাজ যার যা কিছু ফসলের বিনিময়ে দেবার কথা—তারা তা দিয়েছে কিনা, না দিলে তাদের ডেকে পাঠানো এসব কাজও ভূপেন্দ্রনাথের জন্য পড়ে থাকে। আর এমন সব কাজের ভিতরই ভূপেন্দ্রনাথের দুপুর গড়িয়ে গেল। কিছুই আজ তার ভাল লাগছে না। বিষাদ বিষণ্ণ প্রতিমার পাশে সে চুপচাপ অনেকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে ছিল। সে বড়বৌ এবং ধনবৌর জন্য দেবীর পা থেকে সিঁদুর তুলে নিয়েছে। আবার সেই নির্জনতা এই বাড়িকে গ্রাস করবে। একদিন কি ব্যস্ততা! কি সমারোহ! গোটা প্রাসাদ সারাদিন গম গম করছে। আজ কারো কোন ব্যস্ততা নেই। দিঘির চারপাশে সকলে জমা হচ্ছে।

বিকেলেই জসীম হাতিটার পিঠে পিল-খানার মাঠে চেপে বসল। তখন গরদের কাপড় পরছেন মেজবাবু। গরদের সিল্ক। হাতে হীরের আংটি। কালো রঙের পাম্পসু জুতো। মেজবাবু তার ঘর থেকে বের হচ্ছেন। তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন। আগে পিছনে পরিবারের আমলা কর্মচারি। আতরের গন্ধ সকলের গায়। সবার আগে ভূপেন্দ্রনাথ। পরে রক্ষিতমশাই এবং সকলের শেষে বাবুর খাস খানসামা হরিপদ। যেন একটা মিছিল নেমে যাচ্ছে দক্ষিণের দরজায়। ওরা নেমে এল নাটমন্দিরে। এখানে মেজ-বাবু গড় হলেন। দেবীর পায়ের বেলপাতা অঞ্জলির মতো করে নিলেন। ওরা বড় বড় থামের ও-পাশে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেলে সোনার মনে হল, দেবী এখন ওর দিকে তাকিয়ে নেই। দেবী তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। চোখমুখ কাঁপছে। ঘামের মতো মুখটা চকচক করছে। সে আরও কাছে গেল। দুর্গাঠাকুরের চোখে জল পড়ছে কিনা দেখার জন্য একেবারে মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে গেল।

সে প্রথম সিংহটাকে একবার ছুঁয়ে দেখল। দিঘির পাড়ে সকলে এখন যে যার জায়গা নিচ্ছে বলে কেউ আর মণ্ডপে নেই। এই সময়, সুসময়ও বলা চলে, একেবারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা দেবীকে। অসুর অথবা সেই বাচ্চা ইদুরটাকে। গণেশের পায়ের কাছে একটা কাটালতায় বসে আছে। সে সিংহের মুখে প্রথম হাতটা ভরে দিল। অসুরের বুক থেকে যে রক্ত একদিন গড়িয়ে পড়েছে সে সেটা হাত দিয়ে দেখল—কেমন শুকনো হয়ে গেছে রক্তটা। এবং সিংহটা খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে। ওর কেন জানি এই অসুরের জন্য মায়া হল। সে অসুরের মাথায় হাত দিয়ে কোঁকড়ানো চুলে আদর করার মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এবার মজা দেখাচ্ছি। সিংহটার চোখে সে একটা চিমটি কেটে দিল। কিন্তু রং উঠে এল নখে। দেবীর মহিমায় সিংহটা সোনাকে ভয় পাচ্ছে না। সে এবার উঁকি দিয়ে দেবীর চোখ দেখল, জল পড়ছে। তা তোমার এত কষ্ট যখন থেকে গেলেই হয়। সে দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাইল মনে মনে। ওর ভয় ছিল, কাছে গেলেই দেবী রাগ করবে। কিন্তু কি ভালবাসার চোখ! সে বলল, তা তোমার এমন জীব কেন বাহন মা। আমি আর সুরসুরি দেব নাকে। এই বলে সে ছোট একটা কাঠি যেই না নাকের কাছে নিয়ে গেছে অমনি এক শব্দ হ্যাচ্চা। কেউ নেই আশে-পাশে—অথচ হাচ্চা দিল কে। সিংহটা সত্যি তবে হাঁচি দিল। সে থতমত খেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে

দেখল পাগল জ্যাঠামশাই মণ্ডপের সিঁড়িতে। তিনি হাঁচি দিয়েছেন। পাগল মানুষের ঠাণ্ডা লাগে না। সোনা এই প্রথম জ্যাঠামশায়ের ঠাণ্ডা লাগায় ভাবলেন তিনি তবে ভাল হয়ে যাচ্ছেন। সে জ্যাঠামশাইর হাত ধরে বলল, আমি হাতীতে চড়ে নদীর পাড়ে যাম্।

দিঘির পাড়ে তখন মেজবাবু ফ্লুট বাজাচ্ছেন। সোনার মনে হল ওর দেরি হয়ে গেছে। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে ফেলে কাচারি বাড়িতে ছুটে গেল। জামা-প্যান্ট বদলে নিতে হবে তাড়াতাড়ি।

যারা প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নাটমন্দিরে এসেছে তারা সবাই গামছা বেঁধেছে কোমরে। ওরা ঠাকুর কাঁধে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। রামসুন্দর যাচ্ছে মাথায় ঘট নিয়ে। ঠাকুর নদীর চরে নামানো হবে। সেখানে আরতি হবে, ধূপধুনো জ্বলবে। বড়দা মেজদা ঠাকুরের সঙ্গে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। সে যেতে পারছে না। ওর জন্য অমলা কমলা বসে রয়েছে। সে যাবে হাতীতে।

ভূপেন্দ্রনাথ সোনাকে জামা-প্যান্ট পরিয়ে দিল। মাথা আঁচড়ে দিল। সোনা আর দাঁড়াতে পারছে না। সে কোন রকমে ছুটতে পারলে বাঁচে। সবাই সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওর জন্য কেউ বুঝি কিছু রেখে যাচ্ছে না।

এখন রোদ নেমে গেছে। সেইসব হাজার হাজার লোক নদীর পাড়ে বসে পাম গাছ অথবা ঝাউগাছের ছায়ায় নিবিষ্ট মনে ফ্লুট বাজনা শুনছে। হাজার হাজার মানুষ, মানুষের মাথা গুনে বলা দায় কত মানুষ—এসেই যে যার মতো জায়গা করে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনতে বসে যাচ্ছে।

অশ্বশালার পাশে এক মানুষ আছে—তার বুঝি ইন্তেকাল হবে এবার। সেও এক মনে, দু'হাত বুকের উপর রেখে সেই সুরের ভিতর ডুবে যাচ্ছে। সে চিৎপাত হয়ে, গঞ্জে শহরে যেমন সে ফ্লুট বাজাত, তেমনি বুকের উপর দু'হাত নাড়ছে। সেও বুঝি শেষবারের মতো মেজবাবুর সঙ্গে মনে মনে ফ্লুট বাজাচ্ছে। এমন আশ্বিনের বিকেলে এই পৃথিবীর বুকে সে ফ্লুট না বাজালে আর কে বাজাবে! সে দু'হাত অনেক কষ্টে উপরে তুলে রাখল। যথার্থই সে আজ ফ্লুট বাজাচ্ছে। তারপর হাত দুটো ওর ক্রমে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বুকের উপর হাত, চোখ বোজা,—মানুষটার দুনিয়াতে কেউ নেই, আছে শুধু দুই ঘোড়া এক ল্যাণ্ডো আর এই ফ্লুট। সে চুরি করে মেজবাবু না থাকলে নিশুতি রাতে নদীর চরে একা বসে ফ্লুট বাজাত। সে নানা রকম সুরের ভিতর তন্ময় হয়ে থাকত। তেমনি আজও সে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। চারপাশটা, দিঘিরপাড়, শীতলক্ষ্যার চর, নদী মাঠ সব যেন এই সুরের ভিতর হাহাকার করছে। সে মেজবাবুর ফ্লুট বাজনা শুনতে শুনতে চোখ বুজে, এক আল্লা, তার কোন শরিক নেই...শরিক নেই...নেই...সে আর শ্বাস নিতে পারছে না। অসহ্য এক যন্ত্রণা ভিতরে। সে হাত দুটো আর উপরে রাখতে পারলো না। অবশ হয়ে আসছে সব। এক আশ্বিনের বিকেলে ক্রমে এ-ভাবে মরে যাচ্ছে। কেউ খেয়াল করছে না।

তখনই সোনা ছুটেছিল। হাতীটা অন্দরে এসে গেছে। জসীম হাতীর পিঠে বসে প্রতীক্ষা করছে নিশ্চয়। সবাই ওর জন্য হাতীর পিঠে নদীর পাড়ে এখনও নেমে যেতে পারছে না। হাতী বুঝি ওকে ডাকছে। ফ্লুট বাজছে। দিঘির পাড়ে হাজার মানুষ। বিচিত্র বর্ণের মেলা। ইব্রাহিম কলের ঘরটাতে বসে আছে। সময় হলেই আলো জ্বেলে দেবে।

সোনা সে তার পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। যেন তার পাগল জ্যাঠামশাই, সে যা বলবে তাই শুনবে। জ্যাঠামশাই মেলায় চলে যাবে একা একা। সে জ্যাঠামশাইর সঙ্গে মেলাতে মেলা দেখবে। হাতীর পিঠে বসে থাকবে না। ফেরার সময় দুজন হেঁটে হেঁটে লাড্ডু খেতে খেতে ফিরে আসবে।

কিন্তু জ্যাঠামশাই না দিঘির ঘাটে, না সেই সব মানুষের ভিতর। এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। হাতীটা অন্দরে দাঁড়িয়ে এখন শুঁড় নাড়ছে। কান দোলাচ্ছে। অমলা কমলা বিরক্ত হচ্ছে। জসীমকে হাতী ছাড়তে বারণ করে দিচ্ছে বুঝি। সে প্রাণপণ কাছারি বাড়ির মাঠ পার হয়ে এল। দারোয়ানদের ঘর অতিক্রম করে, সেই নাটমন্দিরের উঠোন।। সে এখানে এসে শ্বাস নিল। দেখল পকেটের পয়সাগুলি পড়ে গেল কিনা ছুটতে গিয়ে। সে চোদ্দটা তামার চকচকে পয়সা পেয়েছে। দশরা দেখার জন্য বৌরাণীরা বাড়ির সব বালক বালিকার মতো ওর হাতে একটা করে তামার পয়সা দিয়েছে। সে বলেছে, সে একা নয়। ওরা দুজন। সে এবং
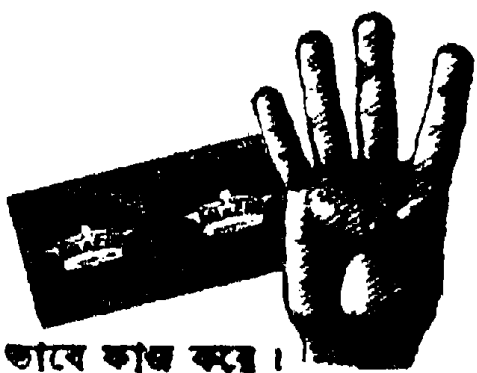
তার পাগল জ্যাঠামশাই। সে পাগল জ্যাঠা-মশাইর জন্য একটা একটা পয়সা গুনে ভিন্ন পকেটে রেখে দিয়েছে। মেলা দেখা হলেই জ্যাঠামশাইর পকেটে পয়সাগুলি দিয়ে দেবে। কিন্তু সে কোথাও জ্যাঠামশাইকে পেল না। ওকে খুঁজতে গিয়ে ওর এত দেরি হয়ে গেল। সে সিঁড়ি ভেঙে ছুটছে। ওর বড় দেরি হয়ে গেল। সে লম্বা বারান্দা পার হয়ে গেল রান্নাবাড়ির। এই পথে গেলে সে তাড়াতাড়ি উত্তরের দরজায় ঢুকে যেতে পারবে। ওরা ওর মুখে পাউডার মেখে দেবে—সে পাগল জ্যাঠামশাইর উপর মনে মনে ভীষণ রাগ করছে। মুখে ওর পাউডার মাখা হল না। দুঃখে ওর এখন কান্না পাচ্ছে। সবাই এখন নিশ্চয়ই উত্তরের দরজাতে আছে। সে অমলা কমলাকে তাদের ঘরে গিয়ে পাবে না ভাবল। সে পড়ি মরি করে জোর ছুটতে থাকল। আর পৌঁছেই দেখল, কেউ নেই। না হাতী, না জসীম। না অমলা কমলা। বাড়ির সব আলো জ্বলে উঠছে। সবাই ওকে ফেলে বুঝি চলে গেছে। সে একা পড়ে গেল। সে যে এখন কি করে! তবু একবার অমলাদের ঘরে খোঁজ নিতে হবে। দাসী-বাঁদি কেউ নেই যে বলবে, ওরা গেল কোথায়? সে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। বাড়ি ফাঁকা মনে হল। দু-একটি অপরিচিত মুখ। কেউ ওকে দেখে কথা বলছে না। সে ভয় পাচ্ছে। কোন রকমে অমলাদের ঘরটাতে যেতে পারলেই আর তার দুঃখ থাকবে না। অমলা কমলা ওকে ফেলে হাতীতে চড়ে মেলা দেখতে যাবে না। এমন সময়ই সে দেখল প্রাসাদের সব আলো নিভে গেছে। এত যে ঝাড় লন্ঠন, এত যে বৈভব সব কেমন নিমেষে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। দিঘির পাড়ে ফ্লুট বাজছে না। সেই ময়না পাখিটা তখনও অন্ধকারে ডাকছে, সোনা তুমি কোথায় যাও। কেউ নেই সোনা। আঁধার আঁধার।

এমন অন্ধকার সোনা জীবনেও দেখে নি। এক হাত দূরের মানুষটাকে দেখা যায় না। কেবল ছায়া ছায়া ভাব। ছায়ার মতো মানুষেরা ছুটোছুটি করছে। ওর পাশ দিয়ে একটা লোক ছুটে বের হয়ে গেল। প্রায় অদৃশ্যালোকে সে যেন এসে পৌঁছে গেছে। সে ভয়ে ভয়ে ডাকল, অমলা!

তখন একটা শক্ত হাত অন্ধকার থেকে বের হয়ে এল। এবং ওর হাত চেপে ধরল—কাকে ডাকছ?

—অমলাকে।

—তুমি কে?

—আমি সোনা।

—কোথায় যাবে?

—অমলার কাছে। ওরা আমারে নিয়া দশরাতে যাইব কইছে। আমার মুখে কমলা পাউডার মাইখা দিব কইছে।

—ওদের ঘরে তুমি যেতে পারবে না। বারণ। কেউ ঢুকতে পারবে না।

সোনা বলল, না, আমি যামু।

—না। সেই শক্ত হাত কার সোনা টের পাচ্ছে না। তবু সে যে স্ত্রীলোক সেটা সোনা বুঝতে পারল। সে বৃন্দাবনী হতে পারে। সোনা ভয়ে বিমূঢ়। রেলিঙে এসে দাঁড়াল। যদি কেউ ওকে দেখে এখন কাছারি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। মনে হল সিঁড়ির মুখে লন্ঠন। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল মেজবাবু উঠে আসছেন। সামনে ওর খাস খানসামা হরিপদ। সে ফের এখান থেকে ছুটে পালাতে চাইল। মেজবাবুকে ধরে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। শোকাচ্ছন্ন মুখ। সোনা অবাক। এই সে মানুষ, যাকে সে কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছে মঞ্চে নিবিষ্ট মনে ফ্লুট বাজাচ্ছেন।—এখন তিনি মূর্ছিত এক প্রাণ। সোনার ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। অমলা কমলার কিছু হয় নি ত! ওদের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতরে অমলা কমলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হাতীটা একা অন্ধকার প্রাসাদ থেকে ফিরে গেল। কেউ দশরাতে যেতে পারল না। কোন দুঃসংবাদ এ বাড়িতে চলে এসেছে। কি সেই দুঃসংবাদ কেউ যেন বলতে পারছে পারছে না। পরিবারের বিশেষ দু-একজন ব্যাপারটা জেনেছে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম। সে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। অন্ধকার প্রাসাদে সব বিসর্জন হয়ে গেছে, এখন একা এক নির্জন মাঠের ভিতর দিয়ে শুধু হেঁটে যাওয়া।

সোনা জেদি বালকের মতো বলল, অমলার কাছে যামু।

বৃন্দাবনী বলল, না। না।

সুতরাং সোনা বাইরের দিকে চলে এসে ওদের জানালার দিকে মুখ করে মাঠে বসে থাকল। আলো জ্বললেই ওরা জানালা থেকে সোনাকে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে সে হাঁটু মুড়ে ঘাসের উপর ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে। কি যেন এক টান তার এই দুই মেয়ের জন্য, সোনা মনে মনে ভাবছে, ওদের কিছু হয়েছে, সে সবটা না জেনে কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না ভাবল।

তখনও হাতীটা যায়। অন্ধকারে গাছ গাছালির ভিতর দিয়ে হাতীটা যায়। ইব্রাহিম কলবরে একটা টর্চ নিয়ে বসে আছে। কোথায় যে কি হল! সে আলোর ঘর অন্ধকার করে বসে থাকল। শুধু হাতীর কানের শব্দ ভেসে আসছে। হাতীটা এখন নদীর পাড়ে নীরবে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

আর কোথাও বোধ হয় প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছিল। পাগল জ্যাঠামশাই কোথায় আছে কে জানে! সোনা কারও জন্য জীবনে কিছু কিনতে পারল না। দু' পকেটে ওর চকচকে তামার পয়সা। উপরে জানালা বন্ধ। তখন নদীতে শেষ প্রতিমা বিসর্জন। নদীতে যে আলো, ধুপধুনো ঢাকের বাদ্য ছিল এবার তাও নিভে গেল। কোথাও আর কিছু জ্বলছে না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। উপরে আকাশ নির্মল আকাশে সেই অন্তহীন হাজার হাজার নক্ষত্র। নক্ষত্রের আলোতে সে যেন পৃথিবীর যাবতীয় শুভবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। জানালা খুলে গেলেই সে ওদের জন্য কিছু করতে পারে। সে ওদের মুখ দেখার জন্য ঘাসের ভিতর বসে আছে। দু' হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে বসে আছে।

বিসর্জনের পর ভূপেন্দ্রনাথের হুঁস হল। সোনা কোথায়! ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলের ফের অন্ধকারে ছুটোছুটি। রামসুন্দর আবিষ্কার করল সোনা মেজবাবুর দালানবাড়ির নিচে শুয়ে আছে। সোনা সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে অন্দর থেকে একটা চিঠি পেল সোনা।—আমরা ভোর রাতের স্টিমারে চলে গেছি সোনা। তোর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হল না।

কাছারিবাড়ির সিঁড়িতে সে সারাটা সকাল একা চুপচাপ বসে থাকল। তার কিছু আজ ভাল লাগছে না। তার মনে হল নদীর চরে কাশের বনে বনে কেবল কে যেন আজ চুরি করে ফ্লুট বাজাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

নিকটেই আছে

পুজোর চাঁদা নিয়ে

এমনিতেই সারাবছর আলো জ্বলে না এ গলিতে। খোদ কাউন্সিলার সাহেব শত চেষ্টা করেও পারেন নি। সিনেমা হলের লাগোয়া পান-বিড়ি-সিগারেট, চা, স্টেশনারী ও চানাচুরের দোকানের বুক চিরে বেরিয়ে আসা এই ফালি গলিটা গলিটা দুধারে দুটো ইমপরট্যাণ্ট রাজপথে গিয়ে মিশেছে। লম্বায় বড়জোর তিন-চারশো গজ। চওড়ায়, অফিসিয়্যাল মাপটা কি সঠিক না জানলেও, অনুমানে বলতে অসুবিধা নয় যে একটা দশ-বারো বছরের ছেলেকে শুইয়ে দেওয়ার পর বড়জোর বিঘৎখানেক জায়গা বাকী থাকবে কাঁচা ড্রেনটার গায়ে গড়িয়ে পড়তে। অষ্টমীর সন্ধ্যায় ঐ কাঁচা ড্রেনেই দু-দুটো উঠতি-উনিশ মুখ থুবড়ে পড়ল। সেই সংগে গোটা গলি জুড়ে পরানো আলোর সাতনরী হার টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। প্যান্ডেলে মা দুর্গা তার ছানাপোনা সমেত, আর ওদিকে পাড়ার ঘরে ঘরে দুয়ার আটকে নতুন জামা জুতোর সাজানো গোছানো একপাল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে মানুষজন থর থর করে কাঁপতে লাগল। একটু বাদেই মোড়ের মাথায় অ্যাম্বুলেন্স এল। লাশ দুটো উঠিয়ে নিয়ে গেল। আর অন্ধ ফালি-খাঁচাটার পাখিগুলোর বেরোনোর পথ আগলে পাহারা দিতে লাগল পুলিশ। পিন-ফোটানো বেলুনের মত আনন্দ-সাধ-আহ্লাদ সব এক নিমেষেই চুপসে গেল সে-রাতে।

নবমীর সকালে শুরু হল পোস্ট-মর্টেম। কেন এই হাঙ্গামা? পাড়ার বড়রা, যারা গত রাতে দরজার বাইরে পা দিতে সাহস করেন নি, তাঁরা লুঙ্গি পরে, সিগারেটের গোড়ায় কলকে টান বসিয়ে, মা দুর্গার পায়ের কাছে শতরঞ্চি বিছিয়ে চুলচেরা হিসেবে ব্যস্ত হলেন। কানু নেই। নেই মানে বুক আর তলপেটের মাঝখানে দেহের জরুরী অংশটা ওর বারুদে ঝলসে একদম ছাই হয়ে গেছে। হাবুটা বাঁচলেও বাঁচতে পারে। তবে তেরাত্তির না-পেরোলে ভরসা নেই। হাবুর বড়দা বিপিন দাস আর কানুর বাবা বলাই পাল দুজনেই হাসপাতালে গেছে। বলাই পাল পুজো কমিটির প্রেসিডেণ্ট। প্রেসিডেণ্টের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলার সাহেব প্রিজাইড করছেন সভায়।

হাজার খানেক টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। চাঁদা উঠেছে সব শুদ্ধ আড়াই হাজার টাকা। বস্তি, পাকা বাড়ী মিলিয়ে, কাউন্সিলার সাহেব বললেন, মোট দেড়শো হোল্ডিং আছে পাড়ায়। দেড়শো হোল্ডিং থেকে উঠেছে সাড়ে সাত শো টাকা। অবিশ্যি এর মধ্যে আমি দিয়েছি দেড়শো টাকা।

কাউন্সিলার সাহেব কত দিয়েছেন এটা প্রত্যেকেই জানে। শুধু টাকা নয়, সেই সঙ্গে মন্ডপের ও রাস্তার লাইটের বিল চোকানোর দায়িত্বও যে ও'র এটাও জানে সবাই। বড় রাস্তার দোকানগুলো থেকে উঠেছে সাতশোর মত। বাকী টাকাটা ছিল থান দশেক বড় বেবী ফুডের কৌটায়। ঐ টাকা থেকেই প্যান্ডেল, লাইট, মাইক, ও অন্যান্য খরচ-খরচা মেটানোর কথা ছিল। কৌটোগুলো ছিল কানুর কাছে।

গোটা সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরের খুচরো কটা দিন কানু, হাবু আর পাড়ার পুজো কমিটির ভলানটিয়াররা রোজ তিন টাইম সিনেমা হলের প'য়ষট্টি পয়সার লাইনের মুখে দাঁড়িয়ে কৌটো বাজিয়ে চাঁদা কালেক্ট করেছে। টিকিট পিছু দশ পয়সা। ফিক্সড রেট। দাও, সিনেমা দেখ। না-দাও, পেঁদানি দিয়ে বিন্দাবন ছুটিয়ে দেব। এই ব্যবস্থায় গত দু'বছরে বেশ পয়সা উঠেছে। তাই এবারও স্বাধীনতার মাসটা কাটতে না কাটতেই কৌটো-ফৌটো রেডি করে ভলানটিয়াররা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ব্যাপারটা বে-আইনী জেনেও কেউ বাধা দেয় নি। কারণ তার অনেক। পাশাপাশি অন্য পাড়াগুলোর তুলনায় এই গলির বাসিন্দাদের পকেটের অবস্থা যথেষ্ট খারাপ। তাই শুধু পাড়ার মানুষজন আর দোকানদারদের ভরসায় থাকলে ঠেলা করেই মা দুর্গাকে আসতে ও যেতে হবে। মন্ডপে মাইক বাজবে না। বছরে অন্তত চারটে দিনও গলিটার অন্ধকার দূর হবে না। গলিতে ঢুকবার মুখে গেট বানানো যাবে না। তাছাড়া মা দুর্গার ভোগের পেসাদে মুখটা আঠা আঠা হলে যে একটু অন্য কিছু ঢেলে জিভটা ছাড়িয়ে নেবে ভলান-টিয়াররা, তারও উপায় থাকবে না। তাই সব দিক বিবেচনা করে ছোটদের এই বাড়তি চাঁদা কালেকশানের নভেল আইডিয়াটা নীরবে অ্যাপ্রুভ করেছিলেন পাড়ার বড়রা।

না-করেও উপায় ছিল না কোন। কানু, হাবুকে বাদ দিয়ে, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে, এ পাড়ায় দাদাগিরি এমনকি বাবাগিরি করাও সম্ভব নয়। ব্যাপারটা সবার আগে বুঝতে পেরেছিল বলাই পাল আর বিপিন দাস। আর বুঝেছিলেন কাউন্সিলার সাহেব। পাড়া, সে যত ছোট যত দরিদ্রই হোক না কেন, তার ওপরে মোড়লী করার সুখ যে কি সে যে না করেছে সে বুঝবে না। কানুর বাবা বলেই তো বলাই পাল পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট। বিপিন দাস ট্রেজারার, হাবুর সুবাদে। বলাই পাল আর বিপিন দাস দশটা পাঁচটা কেরানীগিরির জীবনের অবসরটুকু কাউন্সিলার সাহেবের দোতলা বাড়ীর গ্যারেজে টু হার্টস, থ্রি ডায়মন্ডস, ডেকে ডেকেই কাটিয়ে দিচ্ছে। কাউন্সিলার সাহেবের গাড়ীটা বে-পাড়ার গ্যারেজে থাকে। মাস গেলে একশ টাকা গ্যারেজ ভাড়ার বদলে পাড়ার দেড়শো ঘরের ভোট চিরদিনের মত যে তারই হাতে বাঁধা থাকছে, পৌর-পিতৃত্বের চাবিকাটিখানি যে তাঁরই ট্যাঁকে ঝোলানো সেই আনন্দে নির্বাক সুখে বোবা হয়ে থাকেন কাউন্সিলার সাহেব।

কিন্তু নবমীর সকালে পান চিবুতে চিবুতে নতুন করে অ্যাকাউণ্টস মেলাতে বসে নিদেন-হাঁকা গলায় দরাজ হলেন কাউন্সিলার—এতবড় অন্যায় আর আমরা সহ্য করব না। কানু হাবু এরা পেয়েছে কি? হাতির পাঁচ পা দেখেছে? যখন খুশী যা ইচ্ছে তাই করবে? না তা হতে দেব না। এটা কি মগের মুল্লুক! গত বছর কৌটোয় প্রায় হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল। ওরা নিজেরাই তা কবুল করেছে। অথচ জমা

দিল কত? না, মাত্র দশ টাকা। তার আগের বছরও ঐ একই ব্যাপার। আর এ বছর ঐ টাকারই খরচা মেটাতে না পেরে বোমবাজি করতে গিয়ে পাড়ার এতবড় সর্বনাশ ওরা করল। গতকাল থানায় আমায় কি বলেছে জানেন?

একটু থামলেন কাউন্সিলার সাহেব। চালাও শতরঞ্চির এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা পাকা চুল মাথাগুলোর রি-অ্যাকশনটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। এখন একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত। পাড়ার বাদবাকী উঠতি কাঁচ-কাচারা দিন-কয়েক-এর মধ্যে আর মাথা তুলতে পারবে না। ওদের দুটো মাথাই কাল রাত্তিরের হুল্লোড়বাজিতে কাটা পড়েছে। একটার লাশ আজ দুপুর নাগাদ পুলিশ দেবে বলেছে। আর একটা.........। বলাই পাল আর বিপিন দাসকে আর কখনো খোসামোদ করাতে হবে না। গোটা পাড়াটাই এই এক আঘাতে কেমন বোবা হয়ে গেছে। জানে না কি করবে? এই সুযোগ। এবার ঠিক মত পাশার দান ফেলতে পারলে রাজ-মুকুটের জন্য আর কখনো কারুর সাহায্য চাইতে হবে না।

না, থাক, সে কথা আর বলতে চাই না। শুনলে আপনারা সকলেই দুঃখিত হবেন, গলাটা কেশেটেশে সাফ সুতরো করে ফের খেই ধরলেন কাউন্সিলার সাহেব। শুধু একটা কথাই বলব—পুজোর বাকী খরচ যা কিছু আছে, তা আট-নশ যাই হোক না কেন, সবই আমি বেয়ার করব। এবার আপনারা অনুমতি দিলে আমি একবার হাসপাতালে যাব। সেখান থেকে থানায়। কানুর লাশটা মানে ডেড বডিটা যাতে আমরা আজকের মধ্যেই পেতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাউন্সিলার সাহেব চলে গেলেন। ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে, মাইকের গলা ডুবিয়ে শ্লোগানে পাড়া কেঁপে উঠল। সহৃদয় পৌরপিতার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে সবাই মেতে উঠল পুজোর শেষ-রেশটুকু খাবলে-খুবলে চেটে-পুটে নিতে।

বিকেলে মিছিল বেরোল কানুর ডেড বডি নিয়ে। সবার সামনে কাউন্সিলার সাহেব। ফুলের মালায়, ধূপের গন্ধে আচ্ছন্ন ঠান্ডা কানু এক গভীর ঘুমের গহ্বরে শুয়ে যেতে যেতে জানতেও পারল না, তার বহু সুখ-দুঃখের একমাত্র সাক্ষী, অংশীদার হাবু ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় কি ভাবে পড়ে আছে? আর জানল না দশটা বেবী ফুডের কৌটো ঐ প্রচন্ড ডামাডোলের, হাঙ্গামা-হুজ্জুতির মধ্যে গোপনে কোথায় পাচার হয়ে গেল?

নবমীর রাত ফুরোনোর আগেই কে বা কারা পাড়ার একমাত্র তাসের আড্ডা, গ্যারেজ ঘরের কোলাপসিবেল গেটের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আড়ালে বসে সমস্ত খুচরো গুনে গেঁথে একটা চটের থলের ভরে, টুকরো কাগজে লিখে রাখল নশ তেতাল্লিশ টাকা ত্রিশ পয়সা। কৌটোগুলো হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ডাস্টবিনের নোংরা গাদায় গুঁজে দিল তারাই। কানু, হাবু, বলাই পাল বা বিপিন দাস কেউ জানল না ব্যাপারটা।

—সন্দীপন

মনের কথা

মায়া মোহের ইতিবৃত্ত

সমর-লীলা কাহিনী

'হ্যালুসিনেশন' ও 'ডিলুইশনের' শারীরবৃত্তিক ও বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমরা প্রথমে 'হ্যালুসিনেশন' (বাংলায় বলা হয় মায়া বা অমূলক প্রত্যক্ষ) নিয়ে আলোচনা করব, পরে 'ডিলুইশন' (বাংলায়—মোহ বা ভ্রান্তি)এর শারীরবৃত্ত ও বিকারতত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করব।

কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণা জন্মায় সংবেদন (সেনসেশন) থেকে। সংবেদন মৌলিক ইন্দ্রিয়-অনুভূতি ; বস্তুর খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন রূপ-গুণের প্রতিফলন। সংবেদন বস্তুর সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক ধারণা বহন করে না। শাদা-কালো, শক্ত-নরম, দুর্গন্ধ-সুগন্ধ, কটু-তিক্ত, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বাহিত ধারণা দিয়ে বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান জন্মাতে পারে না। শক্ত-শাদা বস্তু হাজার রকমের হতে পারে, নরম-দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু অজস্র আছে। দর্শন-স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ভিত্তিক সংবেদন বস্তুর একটা দুটো বা অনেকগুলো গুণের ধারণা দিলেও, বস্তুর সামগ্রিক রূপের ধারণা দিতে অক্ষম।

প্রতিফলন-ক্রিয়া সংবেদন-স্তরে থেমে থাকে না বলেই আমরা বহির্জগৎ সম্পর্কে অনেকটা সঠিক সামগ্রিক ধারণা করতে পারি। সংবেদিত গুণগুলোর বিচার, বিশ্লেষণ, সমন্বয়ের মাধ্যমে বস্তুর অখণ্ড বা সামগ্রিক সত্তার পরিচয় লাভ প্রত্যেকটি সুস্থ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'পারসেপশন' (বাংলায় প্রত্যক্ষকরণ, উপলব্ধি)। যা কিছু আমাদের চারপাশে রয়েছে বা ঘটছে, সবকিছুই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় সংবেদনের মাধ্যমে ; তা-বলে প্রত্যক্ষকরণ বা উপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়-সংবেদনের জটিল যোগফল ভাবলে, ভুল হবে। উপলব্ধি সংবেদনের থেকে উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া, সঠিক অবধারণার পথে নবতর পদক্ষেপ। যখন কোনো কিছু উপলব্ধি করি, তখন তার স্বতন্ত্র গুণগুলোও উপলব্ধি করি। কিন্তু উপাদানগুলো তখন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বস্তুর পূর্ণ প্রতিরূপের মধ্যে মিশে গেছে।

উপলব্ধির বস্তু সব সময়েই মস্তিষ্কে একটা ছাপ রেখে যায়। কোনো কিছু দেখলে বা শুনলে, তার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব মনের মধ্যে জেগে থাকে। বহির্বাস্তবের প্রতিফলনের মূর্ত উপলব্ধি। বাক্-স্ফূর্তির পর শিশুর প্রতিবিম্বের জগৎ বাড়তে থাকে। তার সাহায্যে মূর্ত উপলব্ধিগুলোকে সামান্যকৃত করা চলে। একই ধরণের প্রতিবিম্বকে এক সাধারণ নামে অভিহিত করা যায়। এইভাবে সাধারণ ধারণা বা কল্পনার উদয় ঘটে ; মূর্ত ধারণা সামান্যীকরণ ও বিমূর্তীকরণের ফলে 'কনসেপ্টে' পরিণত হয়। 'কনসেপ্ট' বা কল্পনার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে পারি, এ-ছাড়া এমন অনেক কিছু জানতে পারি যা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না। কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে সেগুলো প্রকাশ করা চলে। 'গাছ' বা 'চেয়ার' বলতে যে সামান্য বিমূর্ত কল্পনার প্রকাশ, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূত কোনো বিশেষ ছবির সংগে তাকে মেলানো চলে না। অথচ সবরকমের চেয়ার বা গাছের সংগে তার সম্পর্ক থেকে যায়। এই সাধারণ মূর্ত ও বিমূর্ত কল্পনা সৃষ্টি বিশ্বতীয় সাংকেতিক স্তরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

এরপর বিচারক্ষমতার উন্মেষ ঘটে। সংবেদন, উপলব্ধি, কল্পনা, সর্বোপরি বিচার-ক্ষমা ;—এই নিয়ে মানুষের অবধারণার জগৎ। 'আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি হতে পারে', ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, হয়ত কোথাও আগুন লেগেছে'—এই ধরণের কথাবার্তার মধ্যে মানুষের বিচার-ক্ষমতার পরিচয় মেলে। মায়া মোহ ইত্যাদির বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক অবধারণার শারীরবৃত্তের জ্ঞান অপরিহার্য, তাই এই ভূমিকা।

'হ্যালুসিনেশন' বা অমূলপ্রত্যক্ষের বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আগে বোঝা দরকার ব্যাপারটা কি? ভুল দেখা বা ভুল শোনা বললে সবটা বলা হয় না। 'ইলিউশন'-এর প্রতিশব্দও মায়া, ইলিউশন ও হ্যালুসিনেশন'এর মত উপলব্ধির বিশৃংখলা। কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে আছে মৌলিক পার্থক্য।

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরও দৃষ্টিবিভ্রম শ্রুতি-বিভ্রম ঘটতে পারে ; দৃষ্টি বা শ্রুতির বিশৃংখলা মাত্রেই 'হ্যালুসিনেশন' নয়। 'অপটিক্যাল ইলিউশন'এর সংগে স্কুলের ছাত্ররাও পরিচিত। একটা লাঠিকে জলে ডুবিয়ে রাখলে ভাঙ্গা মনে হয় ; জলের ভিতরের ও বাইরের অংশ আর অবিচ্ছিন্ন মনে হয় না। জল ও বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক (রিফ্রাকটিং ইনডেক্স) আলাদা হবার দরুন এইরকম দেখায়। অমনোযোগিতার দরুন ও উপলব্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। আলো কম থাকলে আমরা আগন্তুককে পরিচিত ব্যক্তি বলে ভুল করতে পারি। শোনা কম গেলে আমরা পরিচিত শব্দকে অপরিচিত বলে মনে করতে পারি ; এ-রকম ঘটে উদ্দীপনার মাত্রাল্পতার জন্য। ক্রোধ বা ভয়ের বশবর্তী হয়ে আমরা ভুল শুনে থাকি, ভুল দেখে থাকি। মানসিক রোগেও এই রকমের 'ইলিউসনের' সৃষ্টি হতে পারে। আবার শারীরিক পীড়াতে যদি কোনো কারণে চৈতন্যের বিশৃংখলা ঘটে, তা হলেও দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রম ঘটতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়প্রান্তিক উদ্দীপনার বস্তুর অবস্থিতি রয়েছে কিন্তু বস্তুটির উপলব্ধি ঠিকমত হচ্ছে না। ডাক্তারকে হয়ত খুনী মনে করে এবং স্টেথসকোপকে পিস্তল ভেবে রোগী ভয়ে আঁতকে উঠছে। 'হ্যালুসিনেশন'-এর ক্ষেত্রে উদ্দীপকের অবস্থিতির প্রয়োজন হয় না।

দুই-ই উপলব্ধির গোলমাল ; 'ইলিউশনের' বেলায় উপলব্ধির মূলে উদ্দীপক আছে, 'হ্যালুসিনেশনের বেলায়—ইন্দ্রিয়-প্রান্তকে উত্তেজিত বা উদ্দীপ্ত করার কোনো বস্তু নেই ;—উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের কোনো মূল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু 'হ্যালুসিনেশনের' রোগীর কাছে উপলব্ধি কখনও ভ্রান্ত মনে হয় না।

'তাই ত' সে দেখতে পাচ্ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার মৃত স্ত্রী জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ; এইমাত্র সরে গেল।' আতংকের দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে
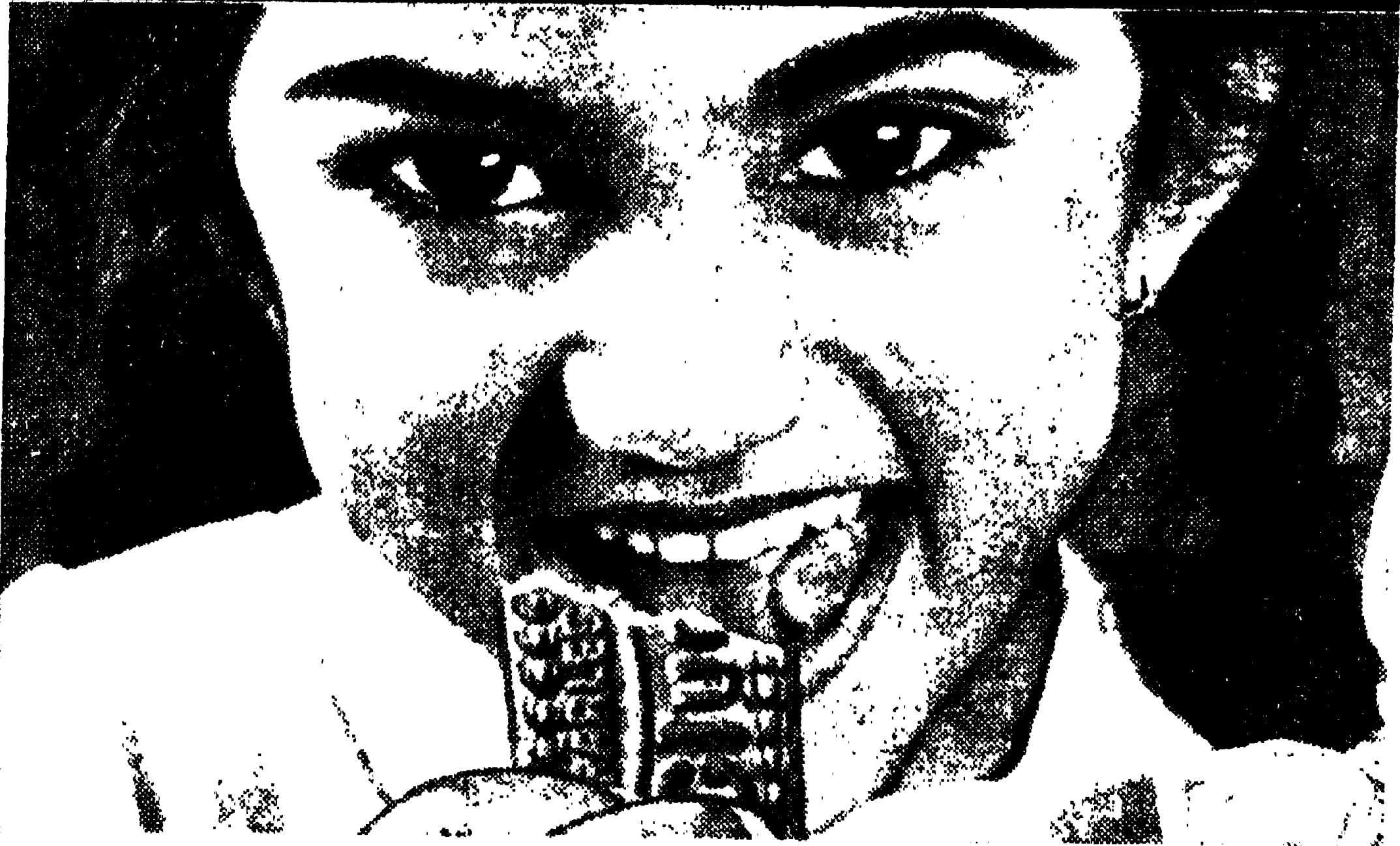
'হ্যালুসিনেশনের' রোগী এইরকম বলবে। অথবা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকবে। শ্রুতিজনিত অমূলপ্রত্যক্ষের (অডিটারি হ্যালুসিনেশন) রোগী কান চেপে ধরে ফিসফিস করে বলবে—'শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সুরু করে দিয়েছে: বলছে, ফিরে যাও, তোমার নিজের দেশে ফিরে যাও। অইত, ঘরের বাইরে থেকে ওরা আমার নাম ধরে ডাকছে, আর ফিরে যেতে বলছে।' 'হ্যালুসিনেশনের প্রকৃতি অনুযায়ী রোগীর ব্যবহার পাল্টায়। রোগী উত্তেজিত হতে পারে, ভয় পেতে পারে, আনন্দে অধীর হয়ে দুহাত তুলে নৃত্যগীত সুরু করে দিতে পারে। সুস্থ লোকের এ রকম ঘটতে দেখা যায় না। 'হ্যালুসিনেশন' বেশির ভাগ সময়েই অসুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোনো সময়েই ভ্রান্ত-উপলব্ধির জন্য দায়ী বস্তু রোগীর দৃষ্টিপথে, শ্রুতিপথে থাকে না। কিছু সুস্থ লোক দৃষ্টিমায়া শ্রুতিমায়ার দৌলতে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকেন। তাঁদের দাবী সম্পর্কে কোনোরকম বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালানো হয়েছে বলে শুনিনি। প্রায় সকল ধর্মের আদিগুরু ও প্রচারকরা শ্রুতি ও দৃষ্টিজনিত অমূলপ্রত্যক্ষ ক্ষমতার কথা বলেছেন ও এই ক্ষমতার বলে সাধারণের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ঈশ্বরকে দেখা ও তাঁর বাণী শ্রবণ করার জন্যই তাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিত বা নির্ধারিত প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হয়েছেন।

আগেই বলেছি, 'হ্যালুসিনেশনের' বিকারতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত।

ইন্দ্রিয়ের প্রান্তস্থ গ্রাহী অংশের অসুস্থতা বা বিশৃংখলের জন্যে দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রম ইত্যাদি ঘটে থাকে;—এই ছিল এক সময়কার প্রচলিত ধারণা। আধুনিক গবেষণায় এই তত্ত্ব অগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'হ্যালুসিনেশনের' রোগীদের স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের কোনো ত্রুটী পরীক্ষায় ধরা পড়ে নি। অডিটরী (শ্রবণসম্পর্কিত) নার্ভ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরও শ্রুতিজনিত 'হ্যালুসিনেশন' থেকে যায়; অন্ধ দর্শনইন্দ্রিয়ভিত্তিক 'হ্যালুসিনেশনে' ভুগে থাকে:—এই থেকে প্রান্তিক তত্ত্বকে (পেরিফেরাল থিওরি) সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা যেতে পারে।

জার্মান মনোরোগবিদ্‌ ভার্ণিকের 'কেন্দ্রীয় তত্ত্ব' (সেন্ট্রাল থিওরি) অনুযায়ী 'হ্যালুসিনেশন'এর জন্য দায়ী মস্তিষ্কত্বকের কোষবিশেষের উত্তেজনা। দর্শনকেন্দ্রের কোষগুলোর উত্তেজনা থেকে 'ভিসুয়্যাল হ্যালুসিনেশন' বা দৃষ্টিসম্পর্কিত মায়া, শ্রবণকেন্দ্রের কোষের উত্তেজনা আনে শ্রবণসম্পর্কিত মায়া। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কেন্দ্রে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে বিভিন্ন ধরনের 'হ্যালুসিনেশন' বা দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করা যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ কি ঘটছে সেটা জানা গেল, কিন্তু কেন ঘটছে সেটা বোঝা গেল না।

এরপর পাভলভ ও তাঁর সহযোগীদের আবিষ্ক্রিয়া 'হ্যালুসিনেশন' বুঝতে আরো খানিকটা সাহায্য করেছে। স্বপ্ন ও মায়ার ব্যাখ্যায় পাভলভের 'সম্মোহন পর্ব' (হিপনটিক ফেজ) 'প্রহরীস্তম্ভ' (গার্ড-পোস্ট) মতবাদ বিশেষ উপযোগী। নিদ্রাকালীন নিস্তেজনায় মস্তিষ্কের সব কোষ সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। কিছুসংখ্যক কোষের নিস্তেজনার মাত্রা কম থাকে; কিছুসংখ্যক হয়ত আদৌ নিস্তেজিত হয় না। সেই সব জায়গায় উত্তেজনার আধিক্য দেখা যায়। এই জায়গাগুলোকে পাভলভ 'গার্ড-পোস্ট বা প্রহরী-স্তম্ভ নাম দিয়েছেন। স্বপ্ন ও মায়ার মূলে আছে এই অল্পনিস্তেজিত ও উত্তেজিত কোষগুলোর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। পরবর্তীকালে ঔষধ প্রয়োগে কোষগুলোর উত্তেজনার জড়ত্ব বা অনড়ত্ব দূর করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্বপ্ন বা মায়া দূর করা সম্ভব হয়েছে। পাভলভের মতবাদ এইভাবে সমর্থিত হয়েছে।

ঘুমের অবস্থায় স্বপ্ন আর জাগ্রত অবস্থায় মায়া (হ্যালুসিনেশন), পাভলভের মতে একই ধরনের শারীরবৃত্তিক ব্যাপার। সম্মোহনের বিভিন্ন দশায় বা পর্বের মতবাদ মায়ার বিকারতত্ত্বের উপর আরো খানিকটা আলোকপাত করেছে। জাগ্রত অবস্থায় সব কোষগুলো সমানভাবে জেগে থাকে না। কিছুসংখ্যক কোষ আধাজাগ্রত আধাঘুমন্ত অবস্থা (উত্তেজনা-নিস্তেজনার মাঝামাঝি) থেকে ক্রমশ পুরো ঘুমন্ত অবস্থার দিকে যেতে থাকে। এই কোষগুলোর জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় সংক্রমণের প্রধান তিনটি পর্বের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে 'অমৃত' পত্রিকায় নিয়মিত পাঠকরা নিশ্চয়ই খানিকটা অবহিত। দ্বিতীয় পর্বে (যাকে বলা হয়, 'প্যারাডক্সিকাল ফেজ' বা স্ববিরোধী পর্ব) স্নায়ুতন্ত্র শক্তিমান উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না, অথচ অতি দুর্বল উদ্দীপনায় উদ্দীপনায় উত্তেজিত হয়। বহির্বাস্তবের জোরালো উদ্দীপনা যা মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় উপলব্ধি ঘটায়, এখন শক্তিহীন। অনেক আগেকার উপলব্ধির ছাপ বা প্রতিবিম্ব, যা স্বাভাবিক অবস্থায় শক্তিহীন, এখন শক্তিশালী হয়ে মায়া বা অলীক উপলব্ধির সৃষ্টি করছে। শুধু তাই নয়, উপলব্ধ বস্তু বাহির্জগতে অভিক্ষিপ্ত হয়ে অলীক উপলব্ধির বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে রোগীর মনে দৃঢ়প্রত্যয় এনে দিচ্ছে। স্বপ্ন ও মায়ার মধ্যেকার আসল পার্থক্য সকলেই জানেন। সুস্থ অসুস্থ সব মানুষই স্বপ্ন দেখে, কিন্তু মায়া বা 'হ্যালুসিনেশন' প্রায়শই অসুস্থ মস্তিষ্কের ধর্ম।

শ্রুতিবিভ্রমের রোগীর সাক্ষাৎ আমরা বেশি পেয়ে থাকি। এদের নিয়ে গবেষণাও বেশি হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে প্রথম সাংকেতিক স্তরের উত্তেজনা-প্রক্রিয়ার জড়ত্ব, 'প্যারাডকস' পর্বের আবির্ভাব, এবং শ্রবণকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের কিছু কোষের বিকার:—এই তিন কারণে শ্রবণভিত্তিক হ্যালুসিনেশন সৃষ্ট হয়। কেফিন ও ব্রোমাইড দিয়ে অনেক রোগীর শ্রবণভিত্তিক হ্যালুসিনেশন বন্ধ করা যেতে পারে।

এইবার সমরবাবুর কাহিনী থেকে 'হ্যালুসিনেশনের' মনস্তাত্ত্বিক কারণ বোঝবার চেষ্টা করা হবে।

সমরবাবুর বয়স বত্রিশ। স্ত্রীর সংগে চিকিৎসার জন্য এলেন। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, স্ত্রী সমরবাবুকে এক রকম জোর করে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এলেন। সমরবাবু শ্রুতিবিভ্রমে ভুগছেন, কিন্তু তিনি সে কথা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন এই রকম কথা বা নির্দেশ সবার কানেই আসছে। তিনি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবার দরুন নির্দেশগুলো শুনতে পাচ্ছেন, অন্যেরা শুনছেন বা শোনার চেষ্টা করছে না। তাঁর বন্ধুরাও নাকি নির্দেশ শুনে থাকেন।

সমরবাবু এক সরকারী সংস্থার গুদামরক্ষক ছিলেন। তিন বছর হল সেই গুদামের কিছু মাল চুরি হয় বা মালের হিসেব মেলে না। সেই সময় থেকে তিনি কথা বা নির্দেশ শুনতে পাচ্ছেন। প্রথমদিকে শুনতেন, পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছে। এক রাত্রে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে তিনি চেঁচামেচি হৈ-হল্লা করেন, তাঁকে জোর করে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে আনতে হয়। এর পর থেকে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। প্রথমদিকে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। তাঁর স্ত্রীর মুখে শুনলাম 'ট্রাংকুইলিজার' জাতীয় ওষুধে নাকি তাঁর উত্তেজনা বেড়ে যেত তাই হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা চলতে থাকে। হোমিওপ্যাথিতে কিছু ফল পাওয়া যায়। মাথা ঠান্ডা হল, রাগ কমল। কিন্তু কথা বা নির্দেশ তিনি শুনতেই থাকলেন। এখন আর পাশের ফ্ল্যাটে নয়, তাঁর সম্বন্ধে কোনো মানহানিকর আলোচনাও নয়; কথাগুলো আসতে থাকল অনেক দূর থেকে, নির্দিষ্ট কতকগুলো নির্দেশের আকারে। কাজেই আবার এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সুরু হল। এবার তাঁকে রাখা হল 'সিকিয়াট্রিস্টের' চিকিৎসাধীনে। কিন্তু এবারও 'ট্রাংকুইলিজারে' মাথা গরম হল, উত্তেজনা বাড়ল। আবার হোমিওপ্যাথিতে যেতে হল।

এই তিন বছরে তাঁকে দুবার বদলী করা হয়েছে। এখন আর তিনি গুদামরক্ষক নন গুদামের একজন কেরানী। মালচুরির ফয়সালা একরকম হয়ে গেছে। বিভাগীয় তদন্তে কয়েকজন অল্পবিস্তর শাস্তি পেয়েছে। সমরবাবুর বিরুদ্ধে কোনো চার্জ টেঁকে নি; তবে হয়রানি হয়েছে প্রচুর। প্রথমদিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল, পরে আবার তাঁকে চাকরীতে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথমদিকে কয়েক মাস অসুস্থতার জন্য তিনি নিয়মিত অফিস যেতে পারেন নি। এখন নিয়মিত অফিসে যান। সেখানেও নির্দেশ শোনেন, বাড়ীতে এসেও নির্দেশ শোনেন। মাঝে মাঝে রাস্তার লোকেরা তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর সম্বন্ধে দু'একটা খারাপ কথা বলে যায়। সেই সময় তিনি উত্তেজিত হয়ে তাদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকেন, অথবা মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলেন। তবে আগের মত রেগে গিয়ে গালমন্দ করেন না। রাত্রে প্রায়ই জেগে জেগে দূরাগত নির্দেশ শুনতে থাকেন।

আমার সামনে বসেও তিনি বললেন, তিনি নির্দেশ শুনতে পাচ্ছেন। কি ধরনের নির্দেশ? এক এক সময় এক এক ধরণের নির্দেশ শোনা যায়। একটি বা দুটি কথায় বহুদূর থেকে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়। সব সময়েই ইংরিজিতে নির্দেশ আসে। 'হল্ট'! 'সাইলেন্স'! 'লাভ দাই নেবার'! এই তিনটে নির্দেশই আজকাল বেশি শুনছেন। এর আগে শুনতেন অন্য ধরণের নির্দেশ। 'গো এ্যাহেড'- এগিয়ে যাও! এই নির্দেশটি বছর খানেক আগে শুনতেন। তার আগে আরো অনেক ধরনের কথা শুনেছেন; সব এখন মনে নেই।

প্রথম দিকে কি শুনতেন? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না। স্ত্রীর কাছে জানলাম, তখন তিনি মালচুরির ব্যাপার নিয়ে নানা কথা শুনতেন। কোনো সময় শুনতেন যে প্রতিবেশীরা তাঁকে দোষী মনে করছে, কোনো সময় আসল অপরাধীদের নাম তাঁর কানে বাতাসে ভেসে আসত। কোনো সময় আবার কে বা কারা যেন তাঁকে অন্যকে আঘাত করার নির্দেশ জানাত। বিভাগীয় তদন্তের পর আর এ ধরনের কথাবার্তা তিনি শুনছেন না। এখন যা শুনছেন তা অনেক দূর থেকে আসছে, মৃদু কিন্তু স্পষ্ট!

ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনবার সাক্ষাৎকারের পরও তাঁকে বোঝাতে পারলাম না যে তিনি ভুল শুনছেন। তবে এই নির্দেশ তাঁকে চঞ্চল করে, অস্থির করে, একথা তিনি স্বীকার করলেন। এই নির্দেশ বন্ধ হলে তিনি অখুশী হবেন না। এই নির্দেশের সঙ্গে মালচুরির ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, তিনি মানতে চাইলেন না।

সমরবাবুকে দেখে মনে হবে তিনি শান্তশিষ্ট স্বভাবের নির্বিরোধী মানুষ। চিকিৎসার প্রয়োজন নেই জেনেও স্ত্রীর অনুরোধে চিকিৎসা করতে আসছেন। স্ত্রীর উপর বিশেষ নির্ভরশীল। স্ত্রীকে মাঝে মাঝে আঘাত করতে চেয়েছেন (রোগের প্রথম দিকে), কিন্তু কোনোদিন আঘাত করেন নি। ওষুধপত্র স্ত্রীর নির্দেশে নিয়মিত খেয়ে আসছেন। এঁরা নিঃসন্তান। প্রায় আট বছর হল বিয়ে হয়েছে।

সমরবাবু শৈশবে বাবামাকে হারিয়ে মিশনারীদের কাছে মানুষ হন। তাঁর স্ত্রী ও তাঁরই মত মিশনারীদের বোর্ডিং স্কুলে থেকেছেন। দুজনেরই শৈশব কৈশোর বাংলার বাইরে কেটেছে। এঁরা দীক্ষিত নন, কিন্তু নিয়মমত বাইবেল পড়েন। একটা ছোট শহরের শান্ত পরিবেশে দিন কাটিয়ে কোলকাতা এঁদের কারুরই ভালো লাগছে না। আত্মীয়স্বজন বলতে বিশেষ কেউ আছেন বলে মনে হল না। অশান্ত অস্থির-মতি স্বামীকে এই তিন বছর ধরে ভদ্রমহিলা একাই সামলে এসেছেন। সে যে কত কঠিন কাজ সেটা আমি বুঝি।

সমরবাবু কোনো কিছু বলতে চান না। স্ত্রীর বয়স অল্প, তাঁর কাছ থেকে এঁদের পারিবারিক ইতিহাস বেশি কিছু জানা গেল না। আমার কাছ থেকে কিছু কথা যেন এঁরা গোপন করতে চান। ওষুধে কাজ হয় না কেন?—স্ত্রীর এই অনুযোগ। আর স্বামীটি তো ধরেই নিয়েছেন দূরাগত বাণী সবার কাছেই আসছে। কিন্তু শোনার ও বোঝার সৌভাগ্য সকলের হয় না। এদিক থেকে তিনি অন্যের থেকে বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী।

চতুর্থ দিনে সমরবাবু মুখ খুললেন। খুব অল্প মাত্রায় 'ট্রাংকুইলাইজারে' কাজ হয়েছে; মনে হল। আগে মাথা ঠাণ্ডা করার ওষুধ খেয়ে মাথা গরম হচ্ছে, উত্তেজনা বাড়ছে, শুনেই আমি বুঝেছিলাম ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক কোষগুলোর কিছু অংশ স্ববিরোধী (প্যারাডক্সিক্যাল) অবস্থায় রয়েছে। তাই স্বাভাবিক মাত্রার ওষুধে বিপরীত ফল হয়েছে। সমরবাবু দূরাগত নির্দেশের উৎস সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন।

মধ্য-ভারতের এক ছোট শহরের গির্জা-সংলগ্ন কবরখানা থেকে নির্দেশবাণী ধ্বনিত হচ্ছে। ফাদার ড্যানিয়েলের সমাধি থেকে নির্দেশ আসছে। এ গোপন কথা তিনি বিশ্বাস করে শুধু আমাকেই জানালেন। অন্য কাউকে একথা জানালে নরকের আগুনে জ্বলে মরতে হবে। কাল রাতে সমরবাবু আমাকে গোপন কথা জানাবার নির্দেশ পেয়েছেন। নীলাকে অর্থাৎ স্ত্রীকে এখনও জানালে চলবে না। আরও অনুতাপ, আত্মশুদ্ধির পর নীলা একথা জানার অধিকারী হবে।

সমরবাবু শুধু মায়া নয় মোহেও আচ্ছন্ন 'হ্যালুসিনেশন' ও 'ডিলুইশন' দুই-ই সমরবাবুকে পীড়িত করছে। রোগ-বৃত্তান্ত নিয়ে অগ্রসর হবার আগে ডিলুইসন এর স্বরূপ—জানা দরকার।

'ডিলিউশন' (বাংলায়—মোহ বা ভ্রান্তি) রোগগ্রস্তের মিথ্যা ধারণা বা মতামত। এই মিথ্যা ধারণা তর্ক করে বা ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে দূর করা যায় না। বস্তুর সঠিক বিন্যাস বা অবস্থান দেখেও 'ডিলুই-শনের' রোগী তার ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বাস্তবের বিকৃত প্রতিফলন থেকে ভ্রান্তির সৃষ্টি। অনেকে মোহ বা ভ্রান্তিকে প্রধানত প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মায়ার (হ্যালু-সিনেশনের) সঙ্গে সম্পর্কিত নয় যে সব ভ্রান্তি তাদের বলা হয় প্রাথমিক ও মায়া সম্পর্কিত ভ্রান্তিকে বলা হয় আনুষঙ্গিক বা সেকেণ্ডারী। সমরের ভ্রান্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে।

ভ্রান্তি অন্য দিক থেকে আবার সংবেদনমূলক ও ব্যাখ্যামূলক;—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সংবেদনমূলক ভ্রান্তি মূর্ত, স্পষ্ট, প্রথম সাংকেতিক স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত; আর ব্যাখ্যামূলক ভ্রান্তি যুক্তি-তর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিমূর্ত চিন্তা-রাজ্যের ব্যাপার, দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমরা আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি (ডিলুই-শন অফ রেফারেন্স) ও নিবর্তনমূলক ভ্রান্তির (ডিলুইশন অফ পারসিকিউশন) সঙ্গে সব থেকে বেশি পরিচিত।

আত্মপ্রাসঙ্গিক 'ডিলুইশনের' রোগী মনে করে আগে পাশের সব কিছুই তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সবাই তাকে দেখছে, তার সম্বন্ধে কথা বলছে, তাকে নিয়েই আলোচনা করছে, তার কথা ভেবেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করছে। চেনা অচেনা সকলেই তার প্রসঙ্গেই মত্ত। ও কেন ওর দিকে তাকিয়ে হাসল? ওরা কানে কানে কি কথা বলল? নিশ্চয়ই আমাকে নিয়েই কথা বলছে। সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরীর ওর কি সত্যিই দরকার ছিল? নিশ্চয়ই আমাকে উদ্দেশ্য করেই রিং তৈরী করছে। ও সেদিন বাঁ হাত দিয়ে আমার চাবিটা নিল। আমাকে অশ্রদ্ধা দেখানোর জন্য নিশ্চয়ই। ঘরে ঢুকেই দেখলাম সবাই হাসি থামিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। এর নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। এই রকম নানা ভাবে আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তির উপসর্গ রোগীর কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে। অতি তুচ্ছ বা সাধারণ ঘটনাকে বিকৃত করে তার থেকে আত্মপ্রাসঙ্গিক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বের করে 'ডিলিউশনের' রোগী।

নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি প্রথমদিকে আত্ম-প্রাসঙ্গিক রূপে দেখা দিয়ে পরে আরো জটিল রূপ ধারণ করে। সমরবাবু 'হ্যালু-সিনেশনের সঙ্গে নির্যাতনমূলক ভ্রান্তিতে ভুগছেন।

—মনোবিদ্

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কতোদিন পর স্টারে এলাম?

সেদিন ২ জুলাই সন্ধ্যে সাতটায় স্টারে এসেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়লো। এই স্টারের নাম তখন ছিল আর্ট থিয়েটার। সে কি আজকের কথা? ১৯২৩ সাল। এই আর্ট থিয়েটারেই আমার পেশাদারী মঞ্চ-জীবনের শুরু। এই মঞ্চেই প্রথম অভিনয় করেছিলাম কর্ণার্জুন নাটকে অর্জুনের ভূমিকায়।

পুরোনো দিনের স্মৃতি মনের পর্দায় ফুটে উঠলো। স্মৃতি নয়—আমারই অভিনয়-জীবনের প্রতিচ্ছবি।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আবার সেই পুরোনো মঞ্চে এলাম। সেদিনের আর্ট থিয়েটার আজকের স্টার।

গেলাম সলিলবাবুর কক্ষে। কথা হলো। আমি এখনই এই মঞ্চের শিল্পী তালিকায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেছি। গেলাম পুরোনো দিনের সেই কক্ষ-টিতে, সেখানে আমি 'মেক-আপ' নিতাম। দেখা হলো, পুরোনো দিনের অনেক কর্মী-কলাকুশলীর সঙ্গে। বেশ বুঝতে পারলাম, সময়ের সঙ্গে আমারও কতো পরিবর্তন। সেদিনের সেই উচ্ছ্বাস আজ স্তিমিত হয়ে এসেছে। আজ আমি শান্ত, ধীর, সংযত। তবুও সেই পুরোনো স্মৃতি মনে আনতে কখন যেন অন্য মনে অতীতের পটভূমিকায় হারিয়ে গেলাম।

সলিলবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ের কথা হলো। তারপর মহেন্দ্র গুপ্ত তার নাটক পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিং-এর কথা তুললো। এই নাটকে আমাকে অভিনয় করতে হবে নাম-ভূমিকায়।

এর ক'দিন বাদেই ১১ জুলাই রঞ্জিৎ সিং-এর অভিনয় আরম্ভ হলো। মহেন্দ্র গুপ্তই নাটকে কর্ণ সিং-এর চরিত্রে রূপ দিলে। সরযূ, পূর্ণিমা, ফিরোজা, রানীবালা—এরাও ছিল এই নাটকের শিল্পী-তালিকায়।

এদিকে মিনার্ভায় যে বাংলা নাটকের অভিনয় হতো, তা বন্ধ হলো। সংবাদটা নিঃসন্দেহে দুঃখদায়ক।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন 'বহুরূপী' সম্প্রদায় প্রায়ই নাটক অভিনয় করছেন। 'বহুরূপী'র সঙ্গে বাংলার নব-নাট্য আন্দোলনের একটা বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। শম্ভু মিত্র এই সংস্থার কর্ণধার। তারপর তুলসী লাহিড়ীর মতো প্রগতিশীল নাট্যকার এবং অভিনেতা এই সংস্থার আর এক উদ্যোগী পুরুষ।

ঐ সময়ে তুলসী লাহিড়ীর নাটক 'ছেঁড়া তার' রঙমহলে অভিনয় করেন বহুরূপী সম্প্রদায়। বলা বাহুল্য, 'সমকালীন' সমাজ-ব্যবস্থাই এই নাটকের পটভূমিকা। এই ধরনের নাটক লিখে তুলসী লাহিড়ী বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন।

এই সময়ের আর একটি সফল নাটক 'নতুন ইহুদী'—যেটি বহুরূপী সম্প্রদায় প্রায়ই অভিনয় করতো। রঙমহলেও ঐ সময়ে নতুন ইহুদীর নিয়মিত অভিনয় চলছিল।

স্টারের কথা বলতে বলতে অন্য কথায় চলে এসেছি। স্টারে যে শুধু রঞ্জিৎ সিং অভিনীত হচ্ছে, তাই নয়। মাঝে মাঝে মিশরকুমারী, গৈরিক পতাকা, শাজাহান প্রভৃতি নাটকও অভিনীত হচ্ছে।

চলতি দিনের মধ্যে একটি দিন, তিরিশে আগস্ট—অভিনয় শেষে আমরা নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের বাড়িতে গেলাম সহানুভূতি জানাতে। শচীনবাবু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন।

তিনকড়ি চক্রবর্তীকে আমি বরাবরই তিনকড়িদা বলে ডাকি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আমার অভিনয়-গুরু। কতো দিন পর তিনি আবার শ্রীরঙ্গমে অভিনয় আরম্ভ করলেন শিশিরবাবুর সঙ্গে। বৃদ্ধ মানুষ, ঠিক মতো পারবেন কেন চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে। বয়সের তো একটা ধর্ম আছে! শ্রীরঙ্গমের আরো নাটকে তিনি অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন। একদিন কোন এক অপেশাদার দলের হয়ে তিনকড়িদা শ্রীরঙ্গমে এলেন। সেদিন নাটক ছিল প্রফুল্ল। যে-মানুষ এক-দিন বাংলা রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার দর্শককে চমৎকৃত করেছেন, সেই মানুষ আজ কতো অসহায়। অভি-নয়ের পর পায়ে হেঁটে এলেন আমার কাছে। বললাম, একে চোখে কম দেখেন, তারপর এই শরীর—এভাবে আপনার পক্ষে পায়ে হেঁটে এত দূর আসা ঠিক নয়।

সেই দিনই বুঝলাম, তিনকড়িদার দুঃখের কথা। মানুষটি সর্বরিক্ত। ভাবলাম, কেন এমন হলো? বাংলাদেশের প্রতিভা-শালী অভিনেতা, যিনি নিজেই একটি যুগ—সেই মানুষটি আজ আর্থিক দিক থেকে কতটা অসহায়।

ভাবলাম, আমরা কি কিছু করতে পারি না। আমাদের দেশবাসী, আমাদের সরকার কি এমন কিছু করতে পারেন না, যাতে এই গুণী মানুষেরা জীবনের শেষদিনগুলো স্বস্তিতে কাটাতে পারেন। করুণা নয়, এই সব কৃতী পুরুষকে প্রণামী দিয়ে।

কিন্তু কে শুনবে আমার কথা, আর কাকে বা বলবো!

কতো দিন আর পুরোনো নাটক নিয়ে চলবে। স্টারের ভাবনাটা আমারও ভাবনা। নতুন নাটক কই! ক'মাস গেল—একনাগাড়ে একের পর এক পুরোনো নাটক নিয়েই চলেছি।

সর্বত্রই একই অবস্থা। এরমধ্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মিনার্ভায় শচীন সেনগুপ্তের নাটক 'কাঁটা ও কমল' অভিনয় আরম্ভ হলো। নাটকটির পরিচালক শচীন-বাবু নিজে, আর প্রযোজিকা ছিলেন অঞ্জলি রায়।

স্টার তখন বিভিন্ন নাটক নিয়ে চলেছে। কখনো মিশরকুমারী, কখনো শাজাহান, কখনো কঙ্কাবতীর ঘাট, কিংবা অন্য নাটক।

এই একঘেয়েমির মধ্যে একটি নতুন ধরনের নাটকের কথা শুনলাম। এই নাটকটি হলো রঙমহলে অভিনীত গণনাট্য সংঘের 'আবাদ'।

গণনাট্য সংঘ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সমাজবাদে বিশ্বাসী একদল প্রগতিশীল তরুণ—যারা এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত, তারা নাটকে, গানে একটা পরিবর্তন আনতে চায়। একদিক থেকে এই সব তরুণদের মধ্যে একটা সংগ্রামী মন ছিল।

নয়তো প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ব্যাহত হয়নি।

এখানে আর একটি নাটকের কথা বলি। নাটকটি হলো মিনার্ভায় অভিনীত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন'। যার পরিচালক রঞ্জিৎ রায়।

সেদিন তিরিশে অক্টোবর, স্টারে নাটক ছিল চন্দ্রশেখর, বাইরে লবীতে এসে দেখা হলো নাটুবাবুর সঙ্গে। খবর জিজ্ঞাসা করাতে শুনলাম, সরযূবালার কথা। সে নাকি আজই স্টার ছেড়ে চলে যাবে। কোন কথাই শুনবে না। বলছে, আজই তার স্টারের শেষ রজনী।

যে যাবে, তাকে তো ধরে রাখা যাবে না। এক মঞ্চ ছেড়ে আর এক মঞ্চে যাওয়া —এ-ঘটনা তো নতুন কিছু নয়।

কিন্তু প্রভা চলে গেল জীবনের রঙ্গ-মঞ্চ ছেড়ে। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারলো না। বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটা দীপশিখা নিবে গেল প্রভার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন তারিখ ছিল ৮ নভেম্বর। প্রভার মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো শহরে। বন্ধ হলো থিয়েটারের দরজা। অনুরাগীরা গেল প্রভাকে শেষদর্শন করতে।

পরদিন রঙমহলে যে শোকসভায় স্বর্গত প্রভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হয়, তাতে পৌরোহিত্য করেন শচীন সেনগুপ্ত। আর প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত কথা-শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরঙ্গমেও সেদিন অভিনয় অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রভার স্মরণে শিশির ভাদুড়ী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

নাটক আর অভিনয়ের কথার মধ্যেও নতুন পর্যায়ে ডি এল রায়ের দুর্গাদাস নাটকের উদ্বোধন হবে স্টারে। নাটকের শিল্পী-তালিকায় আমি ছিলাম ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায়, মিহির ভট্টাচার্য ছিল নাম-ভূমিকার শিল্পী আর মহেন্দ্র গুপ্ত ছিল দিলীর খান চরিত্রে। নারীচরিত্রে ছিল রানীবালা, বন্দনা ও পূর্ণিমা।

এই প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। আমি মিনার্ভায় এই নাটকের অভিনয় দেখেছি। দানীবাবু অভিনয় করতেন দুর্গাদাসের ভূমিকায়। সে-অভিনয়ের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আছে। সেদিনের অভিনয়ের কথা স্মরণে রেখেই মহেন্দ্রবাবুকে বললাম, দুর্গাদাসের ভূমিকাটা আপনি নিন। মিহিরকে দিন দিলীর খানের ভূমিকা। তাতে নাটকের অভিনয়ের দিকটা জোরালো হবে। কেননা, মিহিরের অভিনয়ে দুর্গাদাসের ব্যক্তিত্ব রূপ পায় না।

মহেন্দ্রবাবু সেই মুহূর্তে কিছু বললে না। তবে আমার কথাটা তাকে ভাবিয়ে তুললো বৈকি।

শ্রীরঙ্গমে অভিনয় বন্ধ হলো পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে। শুনলাম, পরবর্তী নাটক 'প্রশ্ন'-র প্রস্তুতি চলছে শ্রীরঙ্গমে।

বছরের যে-কটি দিন বাকি ছিল, একটা একটা করে সে-কটি দিনও ফুরিয়ে এলো।

জীবনের ওপর দিয়ে এমনি করে কতো বছর পেরিয়ে গেছে। প্রতিটি বছরের শেষের দিনটিতে পিছনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।

কিন্তু এবারে আর পিছনের দিকে নয় তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। নানা চিন্তার মধ্যে থেকে একটি নতুন চিন্তাকে আজ মনের মধ্যে স্থান দিয়েছি। সেটি হলো অভিনয়-জগৎ ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা। ভেবেছি, আর না—অনেক রঙ মেখেছি, অনেক চরিত্রে রূপ দিয়েছি, নাটকের অনেক সংলাপ উচ্চারণ করেছি—এবারে দেখতে চাই এ-সবের বাইরে কি আছে।

এই চিন্তার মধ্যেই ১৯৫২ শেষ হলো। যে ক্লান্তি, যে অবসাদ ছিল বছরের শেষ দিনটিতে, ঠিক সেই সুরটিই মনের মধ্যে ছিল বছরের প্রথম দিনটিতে।

মুক্তি চাইছি, তবু মুক্তি পাচ্ছি না। নিজের বন্ধনে নিজে জড়িয়ে আছি। নাটকের সংলাপ উচ্চারণ করবো না, এ-কথা ভাবলে কী হবে, তবু সেই একই মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় ঔরঙ্গজীবের রূপসজ্জায় অভিনয় করলাম আমি।

১৯৫৩ সালের ডায়েরীতে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে রেখেছিলাম, আমার ক্লান্তির কথা, অবসাদের কথা।

কদিন বাড়িতে বেশ সানন্দেই ছিলাম ভানুকে নিয়ে। কিন্তু তারও আবার সাগর-পারে যাবার সময় হলো। ১৮ জানুয়ারী এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে কলকাতা থেকে জুরিখ যাত্রা করলো। পরদিন দুপুরে তার ফোন পেলাম। জুরিখ থেকে সে তার পৌঁছনোর সংবাদ দিলে।

জানুয়ারী মাসের বাকি দিনগুলো একরকম কাটলো। তবে শেষের দিকে একটা বিশেষ খবর দিল্লীতে ফাইন আর্টস আকাদমির উদ্বোধন। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ স্বয়ং এর উদ্বোধক। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে কলকাতা থেকে শিশিরবাবু, শচীনবাবু এবং আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম; কিন্তু যেতে পারি নি। শচীনবাবু আকাদমির সদস্য মনোনীত হলেন, আর শিশিরবাবুকে ফেলোশিপ দেওয়া হলো। কিন্তু শিশির-বাবু আকাদমিতে যোগ দেন নি।

একটা কথা বলা হয়নি, জানুয়ারীতেই স্টারে অভিনয় হতে লাগলো গিরিশচন্দ্রের জনা। ঐ নাটকে আমি বিদূষক চরিত্রে অংশ নিতাম। এই সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটক দুর্গাদাসও চলছিল।

এই পুরোনো নাটকের ভিড়ে ছবি বিশ্বাস মিনার্ভায় একটি নতুন নাটক উপহার দিলেন। রচয়িতা মন্মথ রায়। নাটকটির নাম 'জীবনটাই নাটক'। নাটকের নামকরণটি বড়ো চমৎকার লাগলো।

মার্চের প্রথম পৃষ্ঠায় কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে একটি মানুষের মৃত্যুর খবর, যে মানুষটি হলেন কলকাতার মেয়র নির্মল চন্দ্র। বাংলা দেশকে যারা ভালো বেসেছেন, নির্মলচন্দ্র তাঁদেরই একজন। বাংলা দেশের জনসেবার ক্ষেত্রে তিনি একজন নীরব সেবক। এছাড়া মঞ্চের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁর। একসময় আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ছিলেন। নির্মল চন্দ্রের মৃত্যুতে সেদিন শহরে শোকের ছায়া নেমেছিল।

কদিন আগে ছবি বিশ্বাস মিনার্ভায় 'জীবনটাই নাটক' উপহার দিয়েছে। কদিন পরেই মিনার্ভায় ছবি বিশ্বাস 'ঝিন্দের বন্দী' অভিনয় সুরু করলে।

মিনার্ভায় ঝিন্দের বন্দীর উদ্বোধন হলো ৫ মার্চ।

ঐদিনই আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কেমন যেন দুর্বল, অশক্ত মনে হলো নিজেকে। স্নায়বিক দৌর্বল্য—এর আগেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে কিন্তু এমন অসহায় অবস্থায় পড়িনি।

আবার ঐ দিনেই ছিল শৈলজানন্দের কঙ্কাবতীর শেষ রিহার্সাল। জানালাম মহেন্দ্রবাবুকে, আমার পক্ষে নাটকে অংশ নেওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না।

তবু অংশ নিতে হলো। শরীর অশক্ত, মন অবসর নিতে চায়—তবু মুক্তি নেই। নিজেকে এক কঠিন নিগড়ে বেঁধে ফেলেছি।

৬ মার্চ উদ্বোধন হলো কঙ্কাবতীর। মঞ্চে নামতে হলো। তবে নিজেকে অব-লম্বন নিতে হলো। একটা লাঠি।

তবে কি এবারে সত্যিই বার্ধক্যের দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছি? এ প্রশ্ন আমার মনে। কিন্তু আমার মন তো এখনো সতেজ। এখনো সবুজের নেশায় ভরে আছে। তবে দেহটা হয়তো জীর্ণ হয়ে পড়ছে। পড়বে বৈকি। দেহটা তো যন্ত্রের সামিল। কিন্তু যন্ত্রী আমিটা তো অনা-জন। তার বয়স নেই। বয়সের রেখা সেখানে পড়ে না।

যেদিন কঙ্কাবতীর উদ্বোধন হলো, সেইদিনই অরোরার ছবি 'মুস্কিল আসান' মুক্তিলাভ করলো। সে ছবিতে আমিও অভিনয় করেছি।

শরীর অসুস্থ। তবু অভিনয় করে চলেছি। এদিকে চিকিৎসাও চলছে যথা-রীতি। কিন্তু মন চায় না, আর অভিনয় করি। অথচ ছাড়তে পারছি না।

এরই মধ্যে একদিন ডাঃ রাম অধিকারী তাঁর এক অধ্যাপক বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে এলেন। নানাকথার পর আমাকে পরীক্ষা করলেন।

ডাঃ অধিকারী বললেন, আমি তো জানি আপনার নার্ভ যেকোন মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। সুতরাং যেটুকু দুর্বলতা এটা কিছুটা পরিশ্রমের জন্যে।

সেদিন ডাঃ অধিকারী ব্যবস্থাপত্রও দিলেন আমার জন্যে।

কঙ্কাবতী তেমন জমলো না। মাঝে মাঝে অন্য নাটকও অভিনীত হচ্ছে স্টারে। ২ এপ্রিল পাষাণী, আর ৯ এপ্রিল দুর্গাদাস অভিনীত হলো। এই দুটি নাটকে আমিও অংশ নিতাম।

দিনগুলো একই ধারায় চলছে। নতুনত্ব কিছু নেই। সেই পুরাতনের পথ ধরেই চলা। এ যেন আর ভালো লাগছে না। মনে হয়, সব ছেড়ে দিনকতক কোথাও ঘুরে আসি।

এইরকম যখন মানসিক অবস্থা, তখনই একটি মনের মতো খবর শুনলাম। আমার মেয়ে জামাই, আর তাদের ডাক্তার বন্ধু দেবেশ মল্লিক সস্ত্রীক কাশ্মীর যাচ্ছে। শুনে স্থির থাকতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-জামাইকে জানালাম, তোমাদের সঙ্গে আমিও যাবো। সুধীরাও অবশ্য সঙ্গে থাকবে। সেই মতো টিকিট কাটাও হলো।

আমার মন তখন বাইরে যাবার জন্যে উন্মুখ। তবু যে কটা দিন মাঝখানে আছে সে কদিন কিন্তু আমাকে যথারীতি অভিনয় করতে হবে।

এই দুর্বল শরীরেও মিশরকুমারীর মতো নাটকে অভিনয় করতে হলো। ঐ নাটকে 'আবন' চরিত্রটি ছিল আমার। আমি তো জানি, ঐ চরিত্রটিতে যথাযথ রূপ দিতে কতোখানি শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি নেই—অথচ মঞ্চে দাঁড়ালে কী এক শক্তির গোপন উৎসমুখ খুলে যায়। নয়তো অভিনয় করবো কেমন করে।

কিন্তু অভিনয় শেষে যখন আমি মঞ্চের বাইরে এসে দাঁড়ালাম—তখনই মনে হতো আমি দুর্বল, আমি অশক্ত। এই মঞ্চে অভিনয়, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

স্টারে যোগ দিয়েছিলাম, কমাস আগে। এবারে স্টার ছেড়ে যাবার পালা। কর্তৃপক্ষ ছাড়তে না চাইলেও আমাকে ছাড়তে হলো।

আমাদের কাশ্মীর যাবার দিন আগে থেকেই ঠিক ছিল। ৫ মে। দিনটি দেখতে দেখতে এসে গেল।

যেদিন কাশ্মীর যাবো, ঐদিনই সংবাদপত্রে দেখলাম, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন পরিচালক হিসাবে।

কাশ্মীর যাবো—মনে তখন এই একটিই চিন্তা। আর একটু চিন্তা আমাদের সহশিল্পী ভূমেনের জন্যে। ভূমেন অসুস্থ, রোগটাও সামান্য কিছু নয়—সম্ভবতঃ টি, বি—মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, ভূমেন যেন সেরে ওঠে।

৫ মে আমরা কাশ্মীর রওনা হলাম। আমি, সুধীরা, কন্যা মীরা, জামাতা ডাঃ সন্তোষ বসু, এবং সস্ত্রীক ডাক্তার দেবেশ মল্লিক। নাতনী গৌরীও সঙ্গে আছে।

পথে যখন চলি, দুচোখ খুলে রেখে চলি। ঊর্ধশ্বাসে ছুটে চলা ট্রেনের জানালায় বসে চলমান ছবি দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

দিন গেল। রাত গেল। ৬ মে'র সূর্য ওঠা দেখলাম ট্রেনে বসে। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে। সেদিনও গেল চলতি ট্রেনে। ৭ মে একটু বেলা হতেই পৌঁছলাম পাঠানকোট স্টেশনে।

পাঠানকোটে ক্ষণিকের যাত্রা বিরতি। কিন্তু বিরতির ক্ষণ কতটুকুই বা। আবার আমাদের চলার সময় হলো। এবারের পথ সমতলভূমি ধরে নয়, হিমালয়ের পাদদেশ ধরে জম্মু পেরিয়ে পাহাড়ের দুর্গম পথ ধরে কাশ্মীর উপত্যকা।

পথে জম্মুতেও কিছুক্ষণের জন্যে অবসর পেলাম। অবসরের ক্ষণটুকু ভরিয়ে নিতে চাই। যতটুকু দেখার দেখে নিই। শহরের প্রাণকেন্দ্র রঘুদেওজীর মন্দির। দর্শন করলাম, কিন্তু দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার অবসর কই। তবু সংক্ষিপ্ত অবসরটুকু পূর্ণ করে নিই।

হিমালয়ের পাদদেশে জম্মু শহর। শহরটাকে যেটুকু দেখেছি তাতে প্রাণচঞ্চল মনে হলো।

জম্মু থেকে যাত্রা শুরু হলো। উধমপুরের নাম শুনেছি। এবারে চোখে দেখলাম। এখানে সেনাবাহিনীর বিরাট ছাউনী রয়েছে।

উধমপুর পার হবার পরেই হিমালয়ের বিরাট রূপের কিছুটা চোখে পড়লো।

পথটি দুর্গম হলেও মনোরম। পথের একদিকে পাহাড়ের দেয়াল, অন্যদিকে গভীর খাদ। সবুজ সরলবর্গীয় বৃক্ষের সমারোহ পাহাড়ের অঙ্গ জুড়ে।

চলতি পথে সন্ধ্যা নামলো। সবুজ বনভূমির রূপটা অস্পষ্ট লাগলেও এক বিচিত্র রূপে দেখা দিল। যেন প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা জলরঙের ছবি।

একটানা চড়াই পথ ধরে চলেছি। চলন্ত মুহূর্তগুলি সুন্দর। এবং রোমাঞ্চকর।

অবশেষে 'কুদ'-এ বাস দাঁড়ালো। এখানেই আজকের মতো যাত্রা বিরতি।

পাহাড়ের ওপরে মনোরম এই কুদ। চারদিকে পাহাড়ের হাতছানি, তারই মাঝে চলতি পথের সরাইখানা। অনেকগুলো পাঞ্জাবী হোটেল রয়েছে। যেখানে যাত্রীদের জন্যে সব রকমের খানা-পিনার ব্যবস্থা।

হোটেল থেকে রাতের আহার গ্রহণ করে আমরা স্থানীয় ডাকবাংলোয় এলাম। এখানেই রাত কাটাতে হবে।

কদিনের ক্লান্তিতে দেহে অবসাদ জড়িয়ে আছে। রাত এগারোটা বাজতে আমরা শয্যা গ্রহণ করলাম।

শুধু রাতটুকু। ভোরেই আবার কুদ ছেড়ে রওনা হবার পালা।

প্রাতরাশ সেরে যখন আমরা কুদ ছাড়লাম, তখন সকাল সাতটা।

এবারের পথ আরো দুর্গমে চলেছে। পথে একটি জায়গার নাম দেখলাম রামবান। যেখানে সামগ্রিক পরিবেশ জুড়ে রয়েছে সুরম্য বনভূমি।

এবারে আমাদের যেতে হবে বানিহালের সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে। এখন আমরা চলেছি সুউচ্চ বানিহাল পর্বতমালার ওপর দিয়ে।

মাঝে পড়লো 'চিনার' নদীর তীরে ক্ষুদ্র অধিত্যকা। তারপর আবার সেই চড়াই পথ ধরে ওঠা।

বানিহাল ট্যানেলের মুখে কিছুক্ষণের জন্যে বাস দাঁড়ালো। আমরা প্রায় ন'হাজার ফুট ওপরে এসেছি। এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে লক্ষ্য করি। দেখি, যদি কোথাও চোখে পড়ে 'স্বর্ণ ঈগলের' বাসা। শুনেছি

হিমালয়ের এই সব অঞ্চলে স্বর্ণ ইগলের সন্ধান পাওয়া যায়।

যদিও থাকে, তবে তারা কি মানুষের আসা-যাওয়ার পথের ধারে থাকবে? তারা নিশ্চয়ই আছে কোন নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। মানুষের পায়ের চিহ্ন যেখানে পড়ে না।

এবারে বানিহাল সুড়ঙ্গপথে আমাদের বাস ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো। দীর্ঘ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। ওপর থেকে অহরহ জল চুঁয়ে পড়ছে। ঠিক যেন বৃষ্টি ঝরছে। হেডলাইট জেবলে বাস চলেছে। ধীর গতিতে। কেমন যেন গা ছম-ছম করে এই সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করার সময়ে। সুড়ঙ্গ-পথ পেরিয়ে এলাম। পথের পরিবেশ এবং পটভূমিকা মুহূর্তে বদলে গেল।

ওপর থেকে বিহঙ্গ দৃষ্টিতে দেখলাম, নীচে রমণীয় উপত্যকা। মনে হলো, কে যেন একটি চিত্রায়িত সবুজ কার্পেট ছড়িয়ে রেখেছে। এবারে আমাদের পথ উৎরাই ধরে নেমে গেছে উপত্যকার সন্ধানে। অবশেষে উপত্যকার পথে নেমে এলাম। সমতল পথ চলে গেছে বিরি, আর সফেদ বৃক্ষের বিন্যাস দুপাশে রেখে।

পথের দুপাশে দৃষ্টিপাত করি। সবুজ ফসলের ক্ষেত, ফলের বাগান, ছায়াঘন চিনার বৃক্ষ তারপর মাঝে মাঝে জনপদ,

বসতি। দূরে দৃষ্টি দিই, যেখানে হিমালয়ের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুদূর ছুটে এসে আমরা রাজধানী শ্রীনগরে এসে পৌঁছলাম।

আমরা উঠবো মিস্টার কে. রায়ের বাসভবনে। সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিত। আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন রায় দম্পতি। সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন আমাদেরকে। আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি রাখেন নি রায় দম্পতি। মুহূর্তে ভুলে গেলাম পথের কষ্ট। মনেই হলো না, আমরা দূরদেশে এসেছি। শ্রীনগরে মিস্টার রায়ের বাসভবনে এসে একটি কথাই মনে হলো, যেন আমরা কোন আপনজনের কাছে এসেছি।

চিরকাল আমার ওই এক স্বভাব। কোথাও এলে বিশ্রামের কথা ভুল যাই। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। ক্ষণ-বিশ্রামের পর বেরিয়ে পড়লাম। যে ঝিলমের কথা শুনেছি, সেই ঝিলম চোখে দেখলাম। এই ঝিলমের ধারার সঙ্গে ভারত-উপমহাদেশের ইতিহাসের অনেক কিছু ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ঝিলমের তীরে বাঁধের ওপর নিবিড় বৃক্ষ-বিন্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সুসজ্জিত হাউস-বোটগুলোকে। দেখলাম, ভাসমান শিকারা। হাউসবোট আর শিকারা—এই দুয়ের মধ্যে কাশ্মীরের শুধু বিশিষ্টতা নয়, বৈচিত্র্যও মিশে রয়েছে। ঝিলমের তীরে ইতস্ততঃ বেড়িয়ে ফিরে এসেছি নির্দিষ্ট আশ্রয়ে। —দ্বিতীয় দিনের সকাল থেকে আরম্ভ হলো কাশ্মীর দেখার পালা।

ভোর হতে চা-পানের পর বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই গেলাম ঝিলমের তীরে। ঝিলমের তীরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দূরে তুষারাচ্ছাদিত গিরি-শিখর। দেখলাম, বিস্তৃত হিমালয়ের প্রচ্ছদপট।

দেখলাম, শহরের প্রাণকেন্দ্র ডালের তীরে শংকর পর্বত। ভারত-ঋষি শঙ্করাচার্যের স্মৃতিবিজড়িত শংকর পর্বতের ওপরে রয়েছে মন্দির। সোপান বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। ওপরে ওঠা আজই হলো না। তবে ইচ্ছে রইলো। এলাম ডালের তীরে। রমণীয় ডাল হ্রদ—হাউস বোট আর শিকারার ভিড়। দেখলাম, এপারে ওপারে নানা বৃক্ষের বিন্যাস। ডাল-এর তীরে মহারাজার প্রসাদ। রাজকীয় প্রাসাদ। যেদিকে তাকালেই মনে পড়ে, কয়েকটি বছর আগের কথা। যেদিন ওই প্রাসাদকে ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলা বসেছিল। এখনো সে খেলার শেষ হয়নি তবে সেদিনের মতো সে উত্তেজনা আজ আর নেই।

ডাল-এর রূপের তুলনা নেই। তবে এ রূপের মধ্যে প্রসাধনের চিহ্নটা সুস্পষ্ট। মানুষের হাতের ছাপ পড়েছে—কৃত্রিমতার চিহ্ন সেখানে। তবু ভালো লাগে, তবু মনে হয় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকি ডাল-এর পারে—আর কিছু না হোক, একটু তৃপ্তি তো পাবো। কাশ্মীরকে বলা হয়, ভূস্বর্গ। আমি তা বলতে চাই না। তবে এটুকু বলবো, কাশ্মীরের রূপের তুলনা নেই। যুগে যুগে কাশ্মীর উপত্যকাকে মানুষ নানা অলংকারে সাজিয়েছে। এখনো চলেছে তার সাজানোর পালা। কাশ্মীরের রূপের মধ্যে কোথাও বৈরাগ্যের চিহ্ন নেই। কাশ্মীর যেন নানা অলংকারে ভূষিতা বনিতা—যে যেমন ভাবে পারে, তার মনোরঞ্জন করতে চেয়েছে।

তাইতো কাশ্মীরকে এমন করে কাছে পাওয়ার বাসনা মানুষের। আমিও তার বাইরে নই।

যে কদিন থাকবো, অবসর পেলেও অবসর যাপন করবো না। দেখবো ঘুরে ঘুরে—যা কিছু দেখার। মনের মধ্যে তার ছবি এঁকে নেব।

ঐতিহাসিক মোগল উদ্যানগুলো দেখলাম। নিশাতবাগ, শালিমারবাগ, দেখলাম চশমাশাহী, দেখলাম টাঙ্গমার্গ। টাঙ্গমার্গ পেরিয়ে গেলাম সবুজ পাহাড়ের চড়াই পথে গুলমার্গ। ভালো লাগলো গুলমার্গের রমণীয় পরিবেশ। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখলাম, পাইনের বন, দেখলাম মরশুমী ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই, যেখানে মন্দির নেই। কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী মন্দিরের প্রসিদ্ধির কথা শুনেছি, দেখলাম। পুজো দিলাম, প্রসাদ গ্রহণ করলাম। রাজধানী শ্রীনগরের যা কিছু দর্শনীয় দেখেছি। তবু মনে হয় যেন দেখার শেষ নেই। সবচেয়ে সুন্দর লাগতো ডাল-এর বুকে সন্ধ্যা কাটানো। শিকারায় চেপে ডাল-এর বুকে ইতস্তত ভেসে বেড়ানো—মনে হতো যেন কোন স্বপ্নলোকে বিহার করছি।

আরো ভালো লাগতো যখন ডালের তীরে কোন নির্জন ভূমিখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতাম, পাইনের মর্মরধ্বনি। মনে হতো, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা এখানে। এই কাশ্মীরে।

মানুষের মন তো, স্বপ্ন সেখানে থাকবেই। স্বপ্ন বাদ দিয়ে জীবনকে চিন্তা করা যায় না।

আমি তো দেখেছি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন বস্তুবাদী মন নিয়ে জীবনকে চেয়েছি, তখন সে চাওয়ার মধ্যে সব পেয়েছি, কিন্তু আনন্দ খুঁজে পাইনি। আমার যা কিছু আনন্দ, সে যেন স্বপ্নের মধ্যে। আমার স্বপ্নলোকের চাবিটি খুঁজে পাই পরিচিত পরিবেশের বাইরে এলে। আর এরই জন্যে বোধহয় এমনি করে ছুটে চলার নেশা।

শ্রীনগর থেকে একদিন এলাম পহলগাঁও-এ।

নতুন করে বিস্মিত হলাম পহলগাঁও-এর সৌন্দর্য সুষমা দেখে। লীডারের পাহাড়ের পাদদেশে রমণীয় পহলগাঁও। এক নজর দেখলাম। পীর পাঞ্জালের পাদদেশে সাগরপৃষ্ঠে থেকে প্রায় সাত হাজার ফিটের ওপরে এই রমণীয় অধিত্যকা পহলগাঁও। পহলগাঁও-এর অর্থ নাকি 'মেষপালকদের গ্রাম'।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখলাম, চারদিকে পাহাড়ের প্রচ্ছদপট, চীর আর পাইনের বন। সবচেয়ে সুন্দর লাগে লীডারের দিকে তাকালে। অজস্র উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়ে চঞ্চলা লীডার ছুটে চলেছে। হয়তো ওরও মনে সাগরের নেশা। কিন্তু আমার দু'চোখে কীসের নেশা? হয়তো ভালোবাসার নেশা। প্রকৃতি এখানে যেন আমার পরমা।

পহলগাঁও থেকে গেলাম চন্দনবাড়ি। হিমালয়ের বিরাট রূপ যেখানে আরো স্পষ্ট। চন্দনবাড়িই শেষ জনপদ। এখানে আরণ্যক পরিবেশে কয়েকটি রমণীয় বাংলো রয়েছে। যেখানে ভ্রমণ-বিলাসী মানুষ এসে আশ্রয় নেয়। এই চন্দনবাড়ি হয়েই চলে গেছে অমরনাথের পায়ে চলা পথ। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, সামনে পিসু ঘাটির সেই চড়াই পথ। শ্রাবণী পূর্ণিমার প্রাক্কালে যে চড়াই পথ পেরিয়ে স্বামী অমরনাথের উদ্দেশে চলে যাত্রীর মিছিল।

যতো আগ্রহ-ই থাক, এখন তো উপায় নেই অমরনাথ যাবার। তবু, চন্দনবাড়ির পথের ধুলো মাথায় নিয়ে ভাবলাম, এই আমার তীর্থদর্শন। এই আমার পথের সম্বল। একটি বরফের সেতুও পেরিয়ে এলাম ওপারের পাহাড়ে। তারপর একটি পাথরখণ্ড কুড়িয়ে ফিরে এলাম।

চন্দনবাড়ি ত্যাগ করে আবার ফিরে এলাম পহলগাঁও-এ।

পহলগাঁও থেকে আবার শ্রীনগর।

আসা-যাওয়ার পথে দেখেছি অবন্তীপুর, দেখেছি কোকরনাগ, দেখেছি মার্তণ্ড মন্দির। ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত আরো কতো শহর, জনপদ দেখেছি। দেখেছি যা কিছু দেখার। ফিরে এসেছি শ্রীনগর। কিন্তু ফিরে যাবার সময় তো হলো—সুতরাং এবার ফিরে যাওয়ার চিন্তা।

দূরদেশে এলে জীবনে যেন নতুন উপলব্ধি আসে। জানি না এটা ক্ষণিকের কিনা। হোক না ক্ষণিকের তবুও এই ক্ষণটুকু তো সত্যি। কিন্তু উলারে এসে সবচেয়ে আনন্দ পেলাম। মনে হলো সুন্দর যদি কিছু থাকে তবে তা এখানে।

যে পথ ধরে এসেছিলাম, সে পথে নয়, বিমানে এলাম পাঠানকোট।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

চক্ষু রোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দতরঙ্গ

রেটিনা
অপটিক নার্ভ
লেন্স
কর্নিয়া
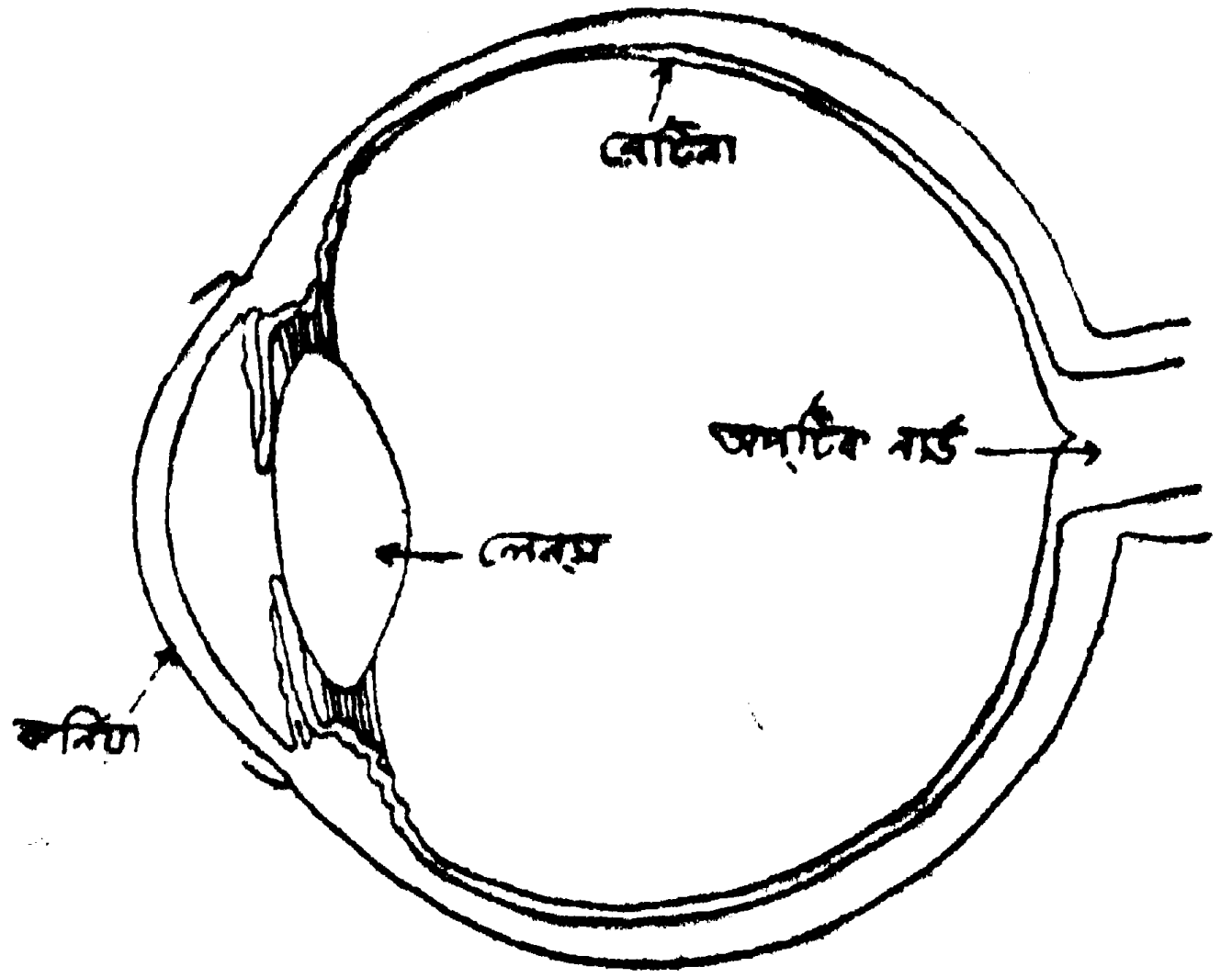
সব শব্দ আমরা শুনি না। শব্দ হচ্ছে এক ধরনের তরঙ্গ যা বাতাস বা অন্য কোনো বাস্তব মাধ্যমকে আশ্রয় করে আমাদের কানে এসে পৌঁছয়। এই তরঙ্গের কাঁপুনি সেকেন্ডে ত্রিশ হাজারের বেশি হলে আমরা আর তা শুনতে পাই না, যদিও শব্দের তরঙ্গের মতোই তরঙ্গ। এই শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গকেই ইংরাজিতে বলা হয় আলট্রাসোনিক বা সুপারসোনিক শব্দতরঙ্গ। আমরা ইংরাজি শব্দটিই ব্যবহার করব। শ্রবণাতীত মানে যা শোনা অসাধ্য। কথাটা শুধু মানুষের বেলাতেই সত্য। পশুপাখিদের মধ্যে অনেকেই এই শ্রবণাতীত শব্দ শুনতে পায়। বাদুড় তো অন্ধকার রাত্তিরে আকাশে উড়ে বেড়াবার সময়ে এই শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ ছুঁড়ে ছুঁড়ে হদিশ নেয় সামনে কোনো বাধা আছে কিনা, যদি থাকে তো তাতে বাধা পেয়ে শ্রবণাতীত শব্দের প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। পাখিরা যে অনেক আগে থেকেই ঝড়ের পূর্বাভাস পায় তাও এই শ্রবণাতীত শব্দ শুনতে পাবার ক্ষমতার জন্যে। কুকুরের কান যে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ তার মূলেও খানিকটা এই ক্ষমতাই।

কিন্তু মানুষ যদিও শুনতে পায় না কিন্তু আলট্রাসোনিক শব্দের খবর তার অগোচরে থাকে নি। শুধু তাই নয়, এই আলট্রাসোনিক শব্দকে কাজে লাগিয়ে বহু দুরূহ কাজ সে সম্পন্ন করে নিচ্ছে। আজকের বিজ্ঞানের কথায় চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু খবর জানাতে চাই। খবরগুলো নেওয়া হয়েছে কলিকাতাস্থিত সোভিয়েত কনসুলেট জেনারেলের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিনে ভিকতর রুমিকিনের একটি প্রবন্ধ থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সমুদ্রের এলাকায় জার্মানির ডুবোজাহাজের প্রবল প্রতাপ, মিত্রপক্ষ নাস্তানাবুদ। ডুবোজাহাজের হদিশ পাবার জন্যে একটা কিছু উপায় বার করা দরকার। ফরাসী সমর দপ্তর তৎকালীন একজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানের শরণ নিলেন। রুশদেশ থেকে একজন বিজ্ঞানী এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। প্যারিসে এই দুই বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার ঘটল।

রুশ বিজ্ঞানী প্রস্তাব করলেন, ডুবোজাহাজের হদিশ পাবার জন্যে আলট্রাসোনিক প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগানো হোক।

অর্থাৎ, সমুদ্রের জলের নিচে চারদিকে আলট্রাসোনিক শব্দ ছোঁড়া হতে থাকবে। জলের নিচে কোথাও ডুবোজাহাজ থাকলে তাতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে সেই আলট্রাসোনিক শব্দ। ডুবোজাহাজের হদিশ ধরা পড়বে এই প্রতিধ্বনি থেকে।

এই একই উপায়ে সমুদ্রের জলের নিচের মাছের ঝাঁকের হদিশও টের পাওয়া যেতে পারে।

ফরাসী বিজ্ঞানী কিছুদিনের মধ্যেই ডুবোজাহাজের হদিশ পাবার একটি যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন। আবার ডুবোজাহাজের হদিশ পাওয়া গেলে সেটাকে ধ্বংস করাটা বিশেষ শক্ত ব্যাপার নয়। তারপর থেকেই জার্মান ডুবোজাহাজের আধিপত্য শেষ হয়েছিল।

ফরাসী বিজ্ঞানী সে-সময়েই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আলট্রাসোনিক শব্দ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলবে। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিম জার্মানির চক্ষুচিকিৎসকরা চক্ষুর আভ্যন্তরিক রক্তক্ষরণে ও অন্য কোনো কোনো রোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দ প্রয়োগ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা এই চেষ্টা থেকে বিরত হলেন, কেননা আলট্রাসোনিক শব্দের প্রয়োগে রোগ নিরাময় হয় বটে কিন্তু চোখের ক্ষতিও করে। উপরন্তু আলাপ-আলোচনার পরে পশ্চিম জার্মানির চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের সমিতি থেকে চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হল।

মনে হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের এই নিষেধাজ্ঞাই চিরকালের জন্যে বলবৎ থাকবে। কিন্তু তা থাকে নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'না'-কে 'হাঁ' করার ও 'হাঁ'-কে 'না' করার ঘটনা বারে বারেই ঘটেছে। এবারেও এই নিষেধ অপ্রমাণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন সাহসী বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটল।

তাঁর নাম রস্তিস্লাভ মারমুর, ডি এস-সি, ওদেসা-স্থিত চক্ষুরোগ ও টিসু থেরাপির ফিলাতভ ইনস্টিটিউটের গবেষক বিজ্ঞানী। তিনি স্থির করলেন, চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দ প্রয়োগের যৌক্তিকতা তিনি প্রমাণ করবেন।

অবশ্য গোড়ায় তিনি গবেষণা শুরু করেছিলেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেখেছিলেন জন্তু-জানোয়ারের ওপরে প্রয়োগ করে টিসুর ওপরে ও সুস্থ চোখের ওপরে আলট্রাসোনিক শব্দের প্রভাব

পর্যবেক্ষণ করতে। এই গবেষণা নিয়েই তিনি বাকি জীবন কাটাবেন এমন কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু গবেষণা শুরু করতেই এমন সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হতে লাগল যার কোনো ব্যাখ্যা তখনো পর্যন্ত জানা ছিল না। তখন তিনি এই গবেষণার মধ্যেই পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জীবদেহে আলট্রাসোনিক শব্দের ক্রিয়া সম্পর্কে যা-কিছু পড়ার বিষয় ছিল পড়ে নিলেন। হাতে-কলমে প্রচুর গবেষণা করলেন। শেষ পর্যন্ত পূর্বসূরীদের ভুল তাঁর কাছে ধরা পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন, অন্যান্য ওষুধের প্রয়োগের মতো আলট্রাসোনিক শব্দের প্রয়োগও কড়াকাঁড় রকমের মাত্রাবদ্ধ হওয়া দরকার। চোখের ক্ষতি অল্পেতেই হয়ে থাকে, কাজেই দেহের অন্যান্য অংশে প্রয়োগ করার সময়ে যে-মাত্রা নিরাপদ চোখের বেলায় তা কিছুতেই নয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে রস্তিস্লাভ মারমুর চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দের তীব্রতার মাত্রা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

অতঃপর একটি শুভ যোগাযোগ ঘটল। রস্তিস্লাভ মারমুর যোগ দিলেন প্রখ্যাত চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডেভিড বুশমিচের সঙ্গে। দুজনে একযোগে গবেষণা শুরু করলেন এ-ব্যাপারটি জানতে যে কর্নিয়া বা অচ্ছোদ পটল পুনঃস্থাপনের পরে যে বিশেষ ধরনের চক্ষুরোগ দেখা দিয়ে থাকে তার চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দ কতখানি প্রযোজ্য। কর্নিয়া পুনঃস্থাপনের পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চোখের ওপর ছানি পড়তে শুরু করে এবং চোখের মণি ঢাকা পড়ে যায়। কর্নিয়া পালটানো এমনিতেই অতি দুরূহ একটি অপারেশন, কিন্তু তার পরেও যদি ছানি পড়ার দরুন রোগীর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। রোগীকে তখন আরো একবার কর্নিয়া বদল করার প্রস্তাবে রাজী হতে হয় কিন্তু তখনো আশঙ্কা থেকে যায় যে দ্বিতীয়বার কর্নিয়া বদলের পরেও দ্বিতীয়বার ছানি পড়তে পারে। আর দ্বিতীয়বার কর্নিয়া বদলের প্রস্তাবে রাজী না হলে চিরকালের মতো দৃষ্টিহীনতাকেই মেনে নিতে হয়।

রস্তিস্লাভ মারমুর ও ডেভিড বুশমিচ প্রমাণ করলেন যে এই বিশেষ রোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দের প্রয়োগে সুফল পাওয়া যেতে পারে। জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে দেখা গেল একেবারে গোড়ার অবস্থায় আলট্রাসোনিক শব্দ প্রয়োগ করলে ছানি-পড়া বন্ধ হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ছানি মিলিয়েও যায়।

চিকিৎসার এই পদ্ধতি অতঃপর ১২৬ জন রোগীর ওপরে প্রয়োগ করে দেখা হল। শতকরা ষাটজন রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসার সুফল পাওয়া গেল, দ্বিতীয়বার কর্নিয়া বদলের আর কোনো প্রয়োজন থাকল না। বাকি শতকরা যে চল্লিশটি ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যর্থ হল তা এই কারণে যে কর্নিয়া বদলের বহু পরে চিকিৎসা হয়েছিল, ততোদিনে চোখের ছানি হয়ে উঠেছিল ঠান্ডা আর শক্ত।

এই ঘটনার পরেই চক্ষুরোগের চিকিৎসায় আলট্রাসোনিক শব্দ প্রয়োগের যথার্থতা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল। শুধু এই একটি রোগের চিকিৎসাতেই নয়, ক্রমে ক্রমে আরো বহু-প্রকারের জটিল চক্ষুরোগেও।

চক্ষুরোগের চিকিৎসায় ভারতীয় বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব

ডাঃ এন এস কাপানি কুড়ি বছরেরও বেশি কাটিয়ে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। প্রায় ষাটটি গবেষণা-নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবিষ্কারকদের জাতীয় পরিষদের সদস্য ও বহু সম্মানের প্রাপক হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে এসেছেন এবং দিল্লীতে অবস্থানকালে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে চক্ষুরোগের চিকিৎসায় তাঁর আশ্চর্য পদ্ধতির কিছু বিবরণ দিয়েছেন।

চোখের রেটিনায় কাটা বা চেরা সারাতে হবে। তাহলে ডাঃ কাপানির বিবরণ অনুসারে ঘটনাটি দাঁড়াবে এইরকম : রোগীকে বাঁধাছাঁদার দরকার নেই, বিশেষ কোনো অবস্থানে নিয়ে যাওয়ারও দরকার নেই। তিনি এসে বসবেন একটি চেয়ারে, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। সামনে থাকবে একটি যন্ত্র, নাম 'লেসার ফটো কোয়াগুলেটর'। এই যন্ত্র থেকে লেসার আলোর রশ্মি এসে ঘা দিতে থাকবে রোগীর চোখের ওপরে, অতি দ্রুত, পঞ্চাশ থেকে একশো বার পর্যন্ত। চোখের রেটিনাটি [illegible] বাইরে বেরিয়ে আসবে ও প্রায় একটা [illegible]মান অবস্থায় পৌঁছবে। এই অবস্থাতেই রেটিনায় প্রয়োজনমতো মেরামত কার্য চলবে, অনেকটা দূর-নিয়ন্ত্রিত ঝালাইকার্যের মতো। পলকপাতের মধ্যেই চিকিৎসা শেষ, না দরকার হল রোগীকে অজ্ঞান করার, না রোগীর চোখের পাতা উলটোবার, না রোগীর চোখে গরম ছুঁচ ফোটাবার। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ রোগী পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে যেতে পারবেন।

চিকিৎসার এই পদ্ধতি ডাঃ কাপানির কল্পনা বা স্বপ্নের বিষয় নয়। গত দুই দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি রোগীর চোখে এ ধরনের 'পলকে অপারেশন' করা হয়েছে। যে যন্ত্রটির কথা বলা হল সেটি ও অনুরূপ আরো চব্বিশটি যন্ত্র ডাঃ কাপানি নিজেই আবিষ্কার করেছেন।

—অয়স্কান্ত

চণ্ডীমণ্ডপে

সজনের সকাল

(তিন)

সজন সত্যকে উপলব্ধি করেছে, জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে এবং মনুষ্যের আত্মার মুক্তির পথ সে তৈরী করেছে, তার বিশ্বাস ছিল মানুষে তাকে ভুল বুঝবে না। কিন্তু যখন সকলে তাকে ভুল বুঝল সজন ক্ষুব্ধ হল না কোন প্রতিবাদ করল না। নীরবে নিজের প্রতি তার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়ে দিল। আসলে কেউ আমাকে বুঝতে পারে না, সজন মনে মনে হাসল, এই সমাজের কেউ আমাকে বুঝবার উপযুক্ত নয়। সকলে বলে চলল সজন নিজের স্বার্থের জন্যে নিজের কুশ্রী স্বার্থের নগ্ন রূপটাকে আড়াল করার জন্যে এক অভিনব নীতিবিদের ভূমিকা নিয়েছে। যেমন করেই হোক ললিতাকে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়ে জীবনে অন্য নারীর জায়গা করে দেবার জন্যে সে এক অদ্ভুত জীবননীতি আশ্রয় করেছে। এবং সজন যে মনে মনে খুব একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করল একটা মহান দায়িত্ব সে পালন করেছে এই কথা বিশ্বাস করে, তার এই বিশ্বাস এবং আত্মতৃপ্তির যোগ্য পুরস্কার সমাজ তাকে দেবে—সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ দিল তাকে তাদের সমস্ত অবজ্ঞা। সজন সমাজের এই অবজ্ঞা পরম আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নিল। সমাজের এই অবজ্ঞা আর উপেক্ষা তাকে একটা মৃত সমাজের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের মৃত্যুসম বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছে। সকলে বুঝেছে সজনের মুক্তি চেতনার মূলে আছে তার প্রখর স্বার্থবুদ্ধি। সজন স্বীকার করল, ঠিক তাই। আমি একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, আমি কখনোই আমার মৃত্যুকে অভিনন্দন জানাতে পারি না। প্রত্যেকেরই আছে এই ব্যক্তিত্বের তাড়না। তাই ললিতাও আমাকে ক্ষমা করে নি। ললিতা অন্তত নির্বোধ ছিল না। তাই সে আমাকে ভালোবাসার চেষ্টা করে নি। অর্থাৎ সকলেই নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর দাঁড়িয়েই যা কিছু করার করে, যে দিকে চলা দরকার চলে। তাই ব্যক্তিত্বের স্বার্থে সে যা করেছে সজনের সন্দেহ নেই সে ঠিকই করেছে। সে বিশ্বাস করে না তার ব্যক্তিত্ব অন্য কাউকে আঘাত করতে পারে বা করেছে।

এ কথা সত্যি যে রাত্রির অবিচল অস্তিত্বকে সজন নিজের অন্তরে গভীরভাবে অনুভব করেছিল এবং নিশ্চিত জেনেছিল জীবন সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নে একমাত্র রাত্রিই তার অবলম্বন। সে অনেক আগেও জানত এখন আবার জানল ললিতার অর্থাৎ যে কোন কিছুর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজের প্রার্থিত সম্ভাবনায় নিজেকে মুক্তি দেওয়া এই হল তার উদ্দেশ্য। তাকে অনেক বড় হতে হবে, পৃথিবীতে পরিচিত হতে হবে। জীবন সম্পর্কে তার যে ধারণা সেইভাবে জীবনকে গড়তে হবে। আর কে অস্বীকার করবে ললিতা তার জীবনের এই চলার পথে একটা দুরূহ বাধাস্বরূপ ছিল! সেই বাধা পেরিয়ে রাত্রিতে আবদ্ধ হওয়া সে-ও একটা বাধা সজন মনে মনে জানত। কিন্তু ললিতা যখন ছিল বাধা তাকে দূর করার জন্যে মুক্তির পথ হিসাবে রাত্রিকে স্বীকার করতে হয়েছিল। এখন প্রার্থিত মুক্তির আনন্দে সজন নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না যে রাত্রি ও তার জীবনের পথে একটা দুর্বিসহ বাধা হয়ে উঠবে।

তবে রাত্রির প্রতি কৃতজ্ঞও কিছু কম নয় সজন। যে তাকে অনেক বড় হতে প্রেরণা দিয়েছে তাকে অসীমের স্বপ্ন দেখিয়েছে সে যে আর কেউ নয়, রাত্রি, সজনের চেয়ে বেশী আর তা কে জানে। এখন সজন তার সেই স্বপ্নের অনেক কাছাকাছি, সে প্রতিষ্ঠিত কবি—,দিনে দিনে এই প্রতিষ্ঠা আরো বেড়ে চলবে, তারপর—। সুতরাং এখন যদি রাত্রি আমার জীবনে নাও থাকে, সজন ভাবল, যদি আর কখনোই এই জীবনে আর কোনদিন রাত্রির সঙ্গে দেখা না হয় তাহলেও যে পরিচয় আমি লাভ করেছি, যে পরিচয় আমি লাভ করব (যদিও জানি, জানব আমার সমস্ত পরিচয়ের মূলে রাত্রি) তা রাত্রি আমার থেকে ফিরিয়ে নেবে না, এবং আমি আমার কিছুই

হারাব না আমার জীবনে রাত্রির মধ্যে যে সৌন্দর্য যে লাবণ্য যে তুলনাহীন পরিচয় আবিষ্কার করেছিলাম তার সমস্ত কৃতিত্বই আমার নয়! কে জানে হয়ত রাত্রির নিজের যে পরিচয় ছিল তা আদৌ ভাবার মত নয়। হয়ত নিজের প্রয়োজনেই আমি রাত্রিকে নিজের মনের সমস্ত ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে ভেবে আমি হয়ত বা নিজেরই অন্তরের অসীম ঐশ্বর্যের সাধনা করেছি।

কিন্তু একটা কথা, বিশ্বসংসারে এত অসংখ্য মেয়েই তো আছে তাহলে রাত্রিকেই, কেন সজন আশ্রয় করেছিল? রাত্রি নিশ্চয়ই ছিল অনন্যসাধারণ। সজন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা স্বীকার করল এবং মনে মনে একান্তভাবে কামনা করল রাত্রি সে যতদূরে যেখানেই থাক তার প্রতি রইল আমার অন্তরের অসীম শুভ কামনা। হে রাত্রি, বিদায়! এখন সজন নিজের দিকে তাকাবে।

নিজের অন্তরের প্রেম সৌন্দর্য আদর্শ দিয়ে পৃথিবীর কোন নারীকে গড়তে গেলে বিপন্ন হতে হয়। অথচ পৃথিবীতে জীবনে সৌন্দর্য এবং প্রেমের—ভালোবাসার অবকাশ না থাকলেও চলে না। পৃথিবীর কোন নারীকেই নিজের ইচ্ছার মত করে পাওয়া যায় না। তাই নিজের সমস্ত ইচ্ছা দিয়ে নারীকে গড়ে নিতে হয়। কিন্তু নারীকে নতুন করে গড়া যায় না। কাউকে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাবনা কল্পনা দিয়ে দেখা এ অন্যায় এ তার প্রতি অবিচার. এই অবিচার সে সহ্য করে না, সে বিদ্রোহ করে চলে যায়। সে যেমনটি যা তার আসল রূপে তাকে এতটুকু বিকৃত না করে ঠিক তার স্বরূপটিকেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই অন্তরের স্বপ্ন-বাসনা সমস্ত চিরদিন অপূর্ণ অতৃপ্তই থেকে যায়। জীবনের এই অপূর্ণতার কথা জেনে না জেনে সকলেই বেঁচে চলেছে অবিরাম। সংসারে জীবনের এই অভিনয়ে সজনকেও একটি সাধারণ ভূমিকা বরণ করে নিতে হবে।

যে সমাজ যে মানুষকে সে একদিন অস্বীকার করেছিল খুব একটা জোরের সঙ্গে, আজ সজন সেই সমাজ ও তার মানুষের কাছে নিজের জীবনের স্বীকৃতি চায়। ক্রমশ বয়েস বাড়ছে। জীবনের বায়বীয় কল্পনা অমূর্ত ভাবনা এবং বোহিমেনী আবেগ সমস্ত ক্রমশ নিভে যেতে থাকে। জীবনের সত্য একে একে কুয়াশা-মুক্ত হয়। এখন কিছু করার আগে সজন নিজেকে সঠিক বুঝতে চেষ্টা করে। এবার ভুল করলে সে নিজেই আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।

আসলে নারীর সম্পর্কে তার নিজের ভাবনা কল্পনাকেই সে ভালোবেসেছিল, রাত্রিকে নয় নিশ্চয়ই। আসলে ভালোবাসা মূলত কিছুই নয়। নিজের মনে যে সম্পর্কে একটা কুয়াশাময় ধারণা থাকে তারপর তাকেই সত্য ভেবে গভীর আবেগে একটি নারীকে আশ্রয় করা নিজের মনের ভালোবাসা দিয়ে তাকে অনুভব করা ভালোবাসা—এ সমস্তই একপ্রকার মানসিক বিকৃতি। মেয়েরা অন্তত এই সত্যটা বোঝে। তারা ভালোবাসাকে এমন গুরুত্ব কখনোই দেয় না যাতে ভালোবাসার জন্যে অন্য কিছুর ক্ষতি হয়। অন্য যে কোন কিছুর থেকে ভালোবাসা তুচ্ছ। অর্থাৎ জীবনে অনেক কিছুর স্থান আছে কিন্তু ভালোবাসার কোন স্থান নেই। যেমন ললিতার বেলায় যে ব্যাপারটা হল—সজন বিশ্বাস করেছিল ললিতা বুঝি তার কাছ থেকে ভালোবাসা চায় আর সে তা দিতে পারে না, ললিতাকে সে ভালোবাসা দিতে পারে না। এবং আশ্চর্য যে সে সত্যই বিশ্বাস করেছে ললিতার নারী শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্যগুলিও তাকে আকৃষ্ট করে না, তারপর নিজেকে সে অদ্ভুত অপরাধী কল্পনা করেছে ললিতার জীবনের এই বঞ্চনার জন্য সে-ই দায়ী। এখন সজন নিজের আসল অপরাধটা পরিষ্কার বুঝতে পারে।

এতদিনে সংসারের সমস্ত রহস্য যেন পরিষ্কার হল। জীবনের এই সত্য উপলব্ধিতে এমনি পৌঁছবার জন্যে অনেক অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। সজন এখন শেষ সন্দেহটুকু থেকেও মুক্ত হয়ে বেদের বাণীর মত নির্ভীকভাবে সত্য ঘোষণা করতে পারে যে নারী হল একটি শরীর মাত্র, একটি ভোগ্য শরীর; তার শরীরের বিচিত্র গঠনভঙ্গী অদ্ভুত শারীরিক প্রকাশ অনেক অলৌকিক অসীম কাব্য-কল্পনার প্রেরণা যোগাতে পারে কিন্তু এতে নারীর শরীরের কোন ক্ষয়-ক্ষতি বা লাভ কিছুই হয় না।

সজনের স্বীকারোক্তি—সামাজিক প্রতিষ্ঠা দৈহিক প্রয়োজন বা কোন স্থূল স্বার্থের তাড়নায় যে আমি রাত্রিকে ভুলে যাচ্ছি তা নয়। রাত্রিকে আমি কোনদিনই মনে রাখিনি। রাত্রি কেউ নয় কিছুই নয়, তার বস্তুরূপ বা ভাবরূপ কিছুই নেই, সে একটা মায়া, অস্বাভাবিক মনই তার উৎস। এই অস্বাভাবিক আবহাওয়া জীবনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জীবনের স্বার্থেই আমি জীবনের স্বাভাবিক সত্যকে স্বীকার করে নিলাম।

অন্যান্য সকলের মত স্বাভাবিক সহজ-ভাবে বাঁচতে গিয়ে যানা কারো মত অর্থ-হীন উদ্দেশ্যহীনভাবে বাঁচা নয়, জীবনে সত্যের সঙ্গে সার্থকতার সঙ্গে পরিচয় হবে একদিন সেই উজ্জ্বল পরম মুহূর্তের মুখোমুখি হবার জন্যেই সে এই সহজ জীবনকে সজন স্বীকার করে নিয়েছে। জীবনের এই চলার পথে একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর প্রয়োজন সে অনুভব করল। সত্যের উদ্দেশ্যে এই জীবনযাত্রার পথে যে বাস্তব দুঃখ-সুখ বিষাদ যন্ত্রণাগুলোকে এড়ানো যাবে না তাদের আঘাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হবে তার জীবনে, তার উপর একজনের—একটি স্নেহ-কোমল হাতের নিবিড় সান্ত্বনার হবে প্রয়োজন হবে, সজন সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুভব করল। সজন একটি মেয়েকে বিয়ে করল।

তার নাম লাবণ্য। লাবণ্যকে বিয়ে করার ঠিক পরেই কিন্তু সজনের মনে হল যে লাবণ্য রাত্রি নয়। লাবণ্যকে দেখলেই রাত্রিকে মনে পড়ে। সজন বিস্মিত হল। বিস্মিত হয়ে না থেকে সে ভাবল লাবণ্য সে লাবণ্যই হবে তাই-ই একান্ত স্বাভাবিক। কেন আমি লাবণ্যকে রাত্রির সঙ্গে তুলনা করতে চাই? আমি আবার ভুল করেছি? সজন ভীষণ জোরের সঙ্গে নিজেকে বোঝাতে চাইল না আমি কিছুতেই ভুল করিনি, না-না-না-না। কিন্তু কেন মনে হল আবার আমি ভুল করেছি? আমি ভুল করলে আমার আশা সব শেষ হয়ে যাবে আমি জানি। আমি জানি আমি আবার সেই ভুলই করেছি। কিন্তু সেই কথা সে ভুলে থাকতে চাইল।
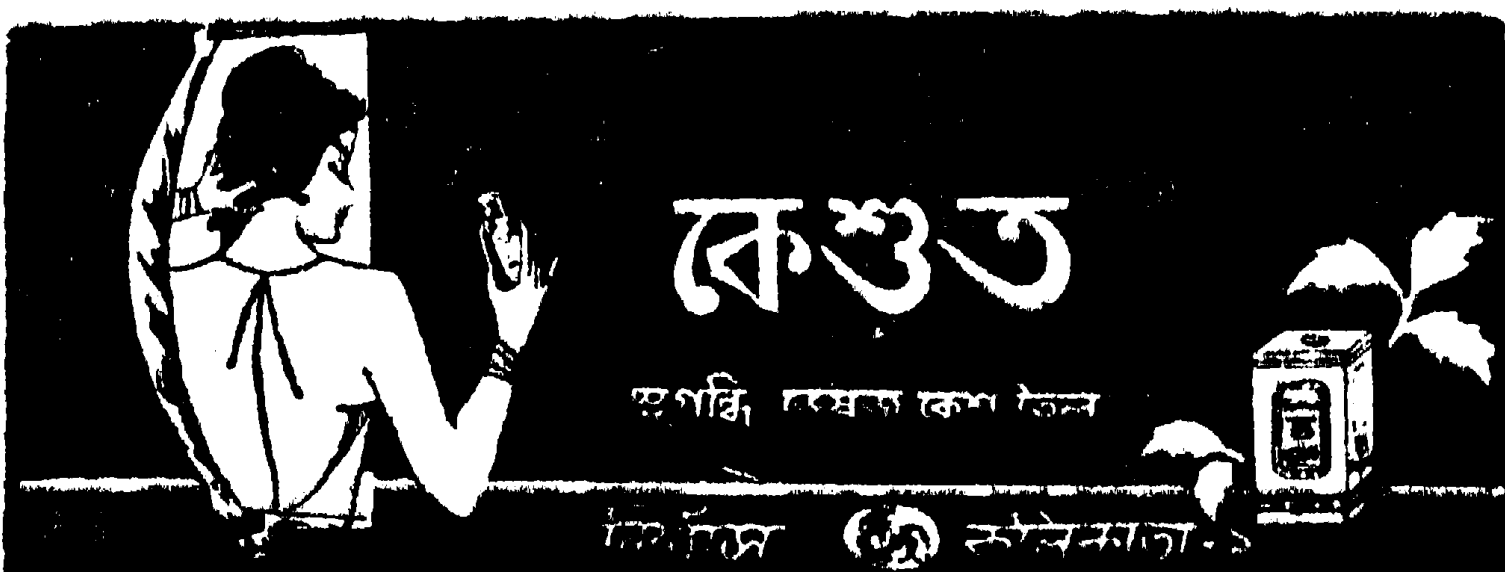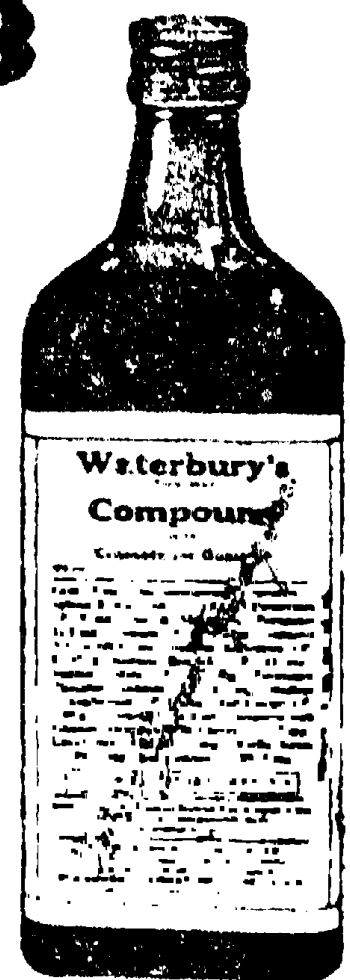
সজন লাবণ্যর শরীরে আশ্রয় পেতে গেল। লাবণ্যর শরীরের গভীরে আছে মন।

পৃথিবীর আর কোন নারীরই যদি মন না থাকে তবু লাবণ্যর তা আছে। একমাত্র লাবণ্য—সে অনন্য। তার আছে আশ্চর্য শারীরিক লাবণ্য। অনন্ত হৃদয় ধনে সে ধন্য। সে শুধু সজনেরই জন্য। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি পুরুষের জন্যে থাকে একটি বিশেষ নারী। সজনের জীবনে সেই বিশিষ্টা নারী লাবণ্য। লাবণ্য ও সজন দুজনের মিলিত স্পর্শে মিলিত পরিচয়ে দুজনই হবে পূর্ণ। কিন্তু লাবণ্যর শরীর মন সজনের মনে হয় সমস্তই রাত্রির। লাবণ্যর শরীর ব্যবহার করে মনকে আন্দোলিত করে সজনের শুধুই মনে হয় এই শরীর রাত্রির এই মন রাত্রির। এতে অবশ্য সজন সুখী হতে পারে না। সে জানে লাবণ্যকে রাত্রি ভাবলে রাত্রি জানলে তাতে লাবণ্যর কোন আনন্দ নেই। একদিন লাবণ্যর তা জানতে বাকী রইল না যে সে বঞ্চিত হচ্ছে। সে স্পষ্ট প্রতিবাদ করল। সজন অস্বীকার করে না লাবণ্যর অভিযোগ মিথ্যা নয়। সজন কেমন করে স্বীকার না করে পারে তার নিজের অন্তরকে! তার অন্তরের সত্য কামনাকে যে সে রাত্রিকেই ভালোবাসে।

কিন্তু আমার এই সমস্যা যদি লাবণ্যকে বোঝাবার চেষ্টা করি তাহলে লাবণ্য আমাকে আরো অক্ষম ভাববে। তাহলে আমি কী করতে পারি? সজন ভাবল, রাত্রি যদি লাবণ্যকে অধিকার করে তাহলে আমি কিছুই করতে পারি না। কিন্তু লাবণ্যর কাছে আমার পৌরুষের পরাজয় সেও আমি সহ্য করতে পারি না। তাহলে লাবণ্য হোক লাবণ্য ও রাত্রি। লাবণ্য নিজের প্রাপ্য পেয়ে খুশি হবে আর রাত্রি তার কথা শুধু আমিই জানব। লাবণ্য অবশ্য রাত্রির কথা কিছুই জানল না। কিছুতেই সেই সন্দেহ তার হল না যে রাত্রি নামের কেউ আবার তার মধ্যে অর্ধেক জায়গা দখল করে আছে। সে শুধু অনেক সহজে বুঝতে পারল যে সজনকে সে সম্পূর্ণ পাচ্ছে না। সে আবার তীব্র প্রতিবাদ করল। সজন বিস্মিত হল না, ক্ষুব্ধ হল না, খুব সহজভাবেই সমস্ত অপরাধ যে তার নিজের সেই কথা স্বীকার করে নিল। সজন বুঝল লাবণ্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমাকে নিবেদন করেছিল কিন্তু আমি তাকে সম্পূর্ণ লাবণ্য রূপে গ্রহণ করিনি, ফলে আমি তাকে যা দিতে গেছি তা লাবণ্যর কাছে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে অর্থাৎ লাবণ্য আমাকে পেয়েছে অসম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ সে আমাকে আদৌ পায়নি। আমি তাকে দিইনি কিছুই, তার শরীর মন নিয়ে শুধু অদ্ভুত খেলা খেলেছি। অর্থাৎ আমি লাবণ্যর নারীত্বকে করেছি ক্ষতবিক্ষত আহত অপমানিত। আর আমার এই অপরাধের পিছনে আছে আমার নিবুদ্ধিতা। তাই নিজের প্রতি আমার কোন মমতাও নেই। এখন সমাজের কাছে মানুষের কাছে আমি আমার নিরপরাধের যুক্তি দেখাব, আমার স্বাধীন বাক্তিত্বের স্বরূপ প্রকাশ করব সে জোর এখন আর আমার নেই। ফলে সমাজ মানুষ এবার আমাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করবে। আমার অস্তিত্ব হবে নিশ্চিহ্ন। সজন হতাশায় ভেঙে পড়ল। অসহায় দুর্বলের মত অনেক বিনীতভাবে সে অন্য কারো নয় নিজেরই সামান্য একটু সহানুভূতি প্রার্থনা করল। এই যে আমি এত সমস্যা তৈরী করেছি, আমার জীবনে এবং লাবণ্যর জীবনে, এতে কী আমি সুখী হতে পেরেছি? আমি কী শান্তি পাচ্ছি? তার নিজের মনও তাকে কোন সান্ত্বনার পথ বলে দিতে পারল না। বরং নিজের বিবেকের কাছে সে প্রচণ্ড আঘাত খেল। আমি কী নিজেকে নিয়ে জটিলতার খেলায় মাতিনি? সমস্ত সমস্যার জন্মই তো জটিলতা থেকে। এখন এই সমস্যার ভার যতই অসহ্য হোক আমি নিজে ছাড়া কে আর বইবে! সজন মাথা নিচু করে সমস্ত উপদেশ মেনে নিল। মেনে নিতে পারল পারল না। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। নিষ্ফল আক্রোশে শুধু মনে মনে জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। থাকত যদি আমার সেই বিদ্রোহী মনের তেজ তাহলে নিজের বিবেকের বেড়া ভেঙেই আমি নিজকে মুক্ত করতে পারতাম। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারতাম আমার কোন অপরাধ নেই, আমার কোন বিবেক নেই, নীতি নিয়ম কিছু নেই। আমার আছে [illegible] সত্য আমার জীবন। আমার জীবনের জন্য আমার জীবনের উদ্দেশ্যের জন্য আমার জীবনের প্রার্থিত সার্থকতার জন্য—আমি আমি আমি সজন-সজন-সজন-সজন—। সজন আর ভাবতে পারে না। রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সকলের জানা হয়ে গেছে আমি সজন, আমি জীবন নিয়ে খেলা করি সেই খেলায় নাকি আমার ভীষণ আনন্দ! এখন আমার সমস্ত খেলার অবসান হবে।

বাইরে, আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে। বাতাস বইছে হু-হু করে। কার খবর বাতাসে ভেসে আসে। সে কোথায় কত কত দূরে, তার ঠিকানা জানি না। সজন ভাবে, আমি এক হতভাগা ভাগ্যজীবী এক নির্বোধ জীবনজীবী। মলিন আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সজন আত্মপ্রকাশ করল, আমি আসলে লাবণ্যকে পেতে চাইনি। আমি রাত্রিকেই ভালোবাসি, তাকেই পেতে চেয়েছি। কিন্তু রাত্রিকে পাওয়া যায় না তাই লাবণ্যকে পেতে হয়েছে। তাই লাবণ্যকে রাত্রি ভেবেছি। কিন্তু লাবণ্য শুধুই লাবণ্য। তাই এই পৃথিবীর জীবন সে আমার জন্য নয়। পৃথিবীতে সকলেই থাকবে, সকলের স্বপ্নে প্রার্থিত বৃষ্টি নামবে। সকলের কামনা বৃক্ষ হয়ে উঠবে একদিন, ফুলে ফলে গন্ধে ভরে উঠবে সকলের জীবন। আর আমার হতাশা আমার যন্ত্রণা বুক বেয়ে কণ্ঠনালী বেয়ে সারাক্ষণ আমার মুখকে পাণ্ডুর করে রাখে। ব্যর্থতার ভারে জীর্ণ হয়ে হয়ে এই যৌবনেই যেন আমি জীবনের অন্তিমে এসে পৌঁছেছি।

একদিন খবর এল লাবণ্য অন্য এক-জনকে ভালোবাসে, সজনের জীবন থেকে যত শিগগীর সম্ভব সে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। সজন এক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সেই ভাবটা কেটে যেতেই সে ভাবল লাবণ্যর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। লাবণ্য যদি কাউকে ভালোবাসে এই প্রথম নিশ্চয় সে কাউকে ভালোবাসছে। এতে সজনের কিছুই এসে যায় না।

লাবণ্য একদিন চলে গেল। সজন ভাবল, লাবণ্যর এই চলে যাওয়া এ লাবণ্যর মুক্তি নয়, কেননা লাবণ্যর কোন বন্ধন ছিল না। সে ছিল সজনের জীবনে একটা বাধা। তাই লাবণ্য মুক্তির পথে মুক্তি দিয়ে গেল সজনকেই। গভীর আবেগে নিজের অন্তরকে সজন প্রশ্ন করল, কিসে আমার মুক্তি?

(ক্রমশঃ)

ভিনগাঁয়ের চিঠি

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
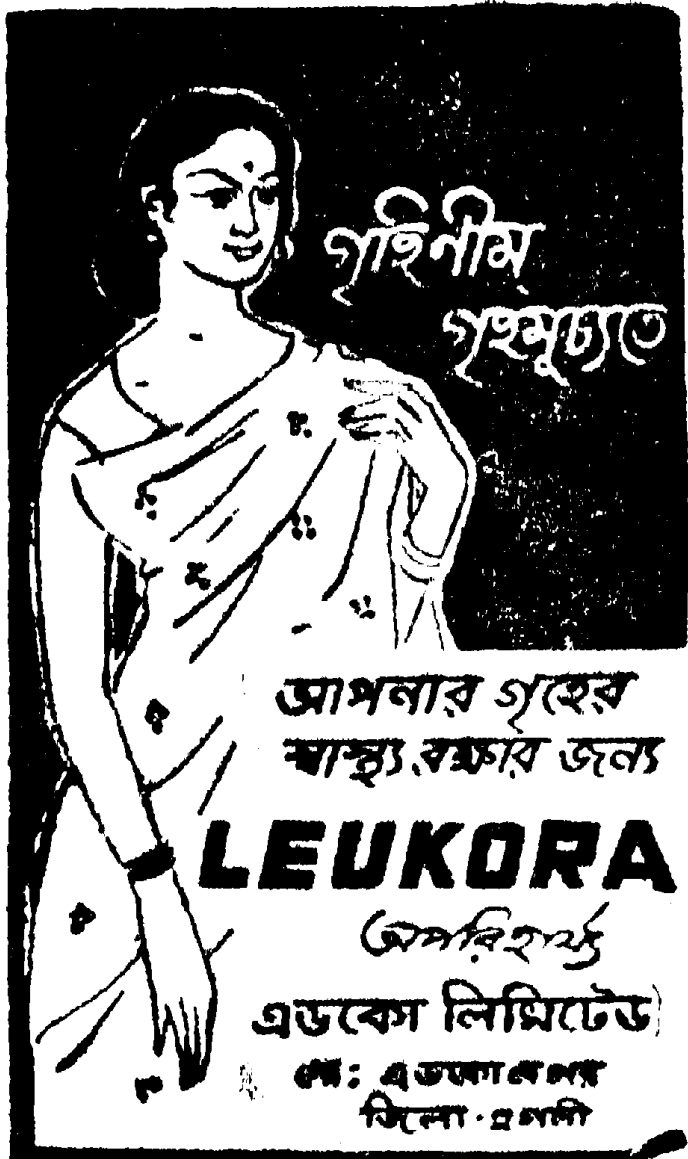
নিদাঘের দীর্ঘ উৎসবান্তে জনমানসের অবসন্নতা দূর করবার জন্যেই সম্ভবত বৃটেনে অগস্টের শেষ সপ্তাহে একটি ছুটির ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সাধারণ সপ্তাহ শেষের দুটি ছুটির দিনের সঙ্গে সোমবার জুড়ে তিনদিন ছুটি। সে-ছুটি শহর ছেড়ে বাইরে যাবার প্রতি বছরের শেষ হিড়িক। এরপরের ছুটি একেবারে খৃস্টমাসে। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারিবারিক মিলনে।---এবারের অগস্ট ছুটি যখন এলো তখন বাইরে কোথাও যাবো-কি-না-যাবো এই দ্বিধার মধ্যে আছি, তখন হঠাৎ টেলিফোনের ও-প্রান্ত থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধু-কণ্ঠের ডাক এলো। সেই দরদী পরোয়ানা এতই অতর্কিত যে, প্রথমে বুঝেই উঠতে পারলাম না যে, তা কি করে সম্ভব হলো। আমার বিস্ময় দেখে ও-প্রান্তে ওরা দুজনেই পুলকিত, অমিতাভ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী নীপা।

অমিতাভ চৌধুরী যুগান্তরের পাঠকদের কাছে অবিস্মরণীয় 'নিরপেক্ষ'। সেই উপলক্ষে একটি বাংলা সংবাদপত্র যে-আলোড়ন সৃষ্টি করে তার ঢেউ বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। অমিতাভ ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিলিপাইনের বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সারা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে একটি রবিবাসরীয় সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তুলতে ব্যস্ত। তিন বছর পরে এক মাসের ছুটি নিয়ে ইউরোপে বেড়াতে এবং সেই সঙ্গে কিছু কাজে এসেছেন।

সেদিন আমার বাড়ীও গুলজার। ছুটির মেজাজ নিয়ে কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু, কাশীর গান্ধী বিদ্যাপীঠের এবং বর্তমানে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের ভিজিটিং লেকচারার সুগত দাশগুপ্ত এবং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি দেবেশ দাশ, লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য ত্রৈমাসিক দর্পণের সম্পাদক এম এস সুলতান প্রভৃতিরা নিমন্ত্রণে এসেছেন। অমিতাভ ও নীপা আসাতে আসর জমে উঠলো।

অন্য অতিথিরা বিদায় নিলে অমিতাভ এবং নীপা প্রস্তাব করলেন যে, ক'দিন গাড়ী করে কোথাও ঘুরে আসা যায়। সে প্রায় আট বছর আগে আমি, নীপা ও আর দুজন সঙ্গী গাড়ী করে ওয়েলসের এক-প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরেছিলাম। রাস্তার মানচিত্র ছাড়া সেবার ভ্রমণের আর কোন পরিকল্পনা ছিল না। চলতে চলতে যেখানে সন্ধ্যা ঘনাতো সেখানে কোন চাষীর বাড়ীতে, কিম্বা সরাইখানা বা 'ইনে' রাত [illegible] বিহীন পাহাড়-বন-মাঠ, হ্রদ-ঝর্ণা ও সমুদ্র-তীর নয়নভরে দেখা, থামা ও চলা। তারপর কতবার কত আমন্ত্রণ ও প্রয়োজনেই তো ওয়েলস্ গেছি কিন্তু তার কোনটাই আর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে নেই। সুতরাং প্রস্তাব হলো তেমনিভাবেই উত্তর ইংল্যাণ্ডের কিম্বা স্কটল্যাণ্ডের হ্রদাঞ্চলে যাওয়া যাক। কিন্তু সময়ের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত মুলতুবী রইলো।

পরের দিন অমিতাভর পরিকল্পনা প্রস্তুত। আমরা পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের গ্লস্টারশায়ারের বাইবেরীতে গিয়ে ক'টি দিন কাটিয়ে আসবো। অবসারভার পত্রিকার প্রাক্তন সাহিত্য-সম্পাদক এবং বর্তমানে ওয়েস্টমিনস্টার প্রেস লিমিটেডের এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর জিম রোজ সেখানে কয়েকবার গিয়ে থেকেছেন। স্থানটি নাকি নিজস্ব সৌন্দর্যে নিরুপম। তিনিই সোয়ান নামে একটি ছোট হোটেলের সন্ধান বলে দিলেন। আর রবিবাসরীয় টাইমসের সম্পাদক হ্যারী এভানস কয়েক দিনের জন্যে ব্যবহার করতে দিলেন তাঁর মহার্ঘ, আরামপ্রদ ও অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় গাড়ী।

বাইবেরী একটি গ্রাম

লণ্ডন ছাড়তে আমাদের রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা হয়ে গেল। বাইবেরী প্রায় পঁচাত্তর মাইল পথ। হিসেব করে দেখলে ঘণ্টা-তিনেক লাগার কথা। সেই অনুযায়ী সোয়ান হোটেলে একটি ফোন করবার ব্যবস্থা করা হোল। কিন্তু অন্ধকারে, গ্রামের বিসর্পিল পথে এবং একটি হোটেলে রাতের আহার সমাধা করতে অনেক দেরী হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত বাইবেরীতে পৌঁছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সবাই একটু ঘাবড়েই গেলাম। রাত্রি তখন আড়াইটে। সোয়ান হোটেল খুঁজে পেতে দেরী হলো না। রাত্রির অন্ধকারেও বোঝা গেল যে, হোটেলটির পরিবেশ অনন্য। সামনে খরস্রোতা তটিনী, পেছনে অরণ্যাবৃত নীচু পাহাড়। কিন্তু হোটেলটি নীরব, নিথর, অন্ধকার। দেশলাইয়ের কাঠি জেলে সদর দরজা ও কলিং-বেল খুঁজে পেলাম। বেলটি অকেজো। তাই দ্বারে করাঘাত শুধু হলো। কোন সাড়া নেই। আবার দেশলাই-এর কাঠি জেলে এবং পথ-চলতি মটরের ধাবমান আলোয় চকিতে দেখে দেখে হোটেলটির চারপাশ ঘুরে পেছনে আঙিনায় গেলাম। ওপরে আলো জ্বলছে। একটি ঘূর্ণী সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। সাধ্য ও শোভনমত ধাক্কা ধাক্কি করা গেল। কিন্তু কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। [illegible] নিরুপায় সিদ্ধান্ত নিয়ে গাড়ীতে ফিরে আসা গেল।

তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে মাইলখানেক দূরে আরেকটি বৃহৎ হোটেলে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করা গেল। একটি ফোন বকস থেকে সোয়ান হোটেলে ফোন করে কারুর ঘুম ভাঙানোর জন্যে দূর থেকে বহুক্ষণ ঘণ্টা বাজানো গেল। কিন্তু মনে হলো সে-রাতের মত সবাই যেন গ্রামটা ছেড়ে চলে গেছে। শেষপর্যন্ত সোয়ান হোটেলের উল্টো দিকে, খরস্রোতা তটিনীটির ওপরে পাথরের সেতুটির ওপাশে একটি পার্কিং স্থানে গাড়ীটি রেখে রাত কাটানোর জন্যে প্রস্তুত হওয়া গেল। আকাশ নির্মম নীল, নক্ষত্র উজ্জ্বল। খানিক পরেই আমাদের পাশে এসে আরেকটি গাড়ী দাঁড়ালো। যাত্রীরা নামলো। বাবা-মা ও আঠারো-বিশ বছরের একটি ছেলে। গাড়ীটির বুট খুলে ওরা স্টোভ ও চায়ের আয়োজন নামালো। আমরা উৎসুক চোখে তাদের কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করতে লাগলাম। সেই রাত্রি-শেষে মটরাশ্রয়ে এক কাপ গরম চা কিম্বা কফির চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কী বা থাকতে পারে? —অমিতাভ কি মনে করে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে নেমে গেলেন। কী আলাপ করলেন তিনিই জানেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ওই গাড়ীর গৃহিণী এ-গাড়ীর দ্বারে এসে আমাদের চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন। রীতিমত বাহ্যিক আপত্তি জানিয়ে আমরা আন্তরিক উল্লাসের সঙ্গে নিমন্ত্রণরক্ষার জন্যে বেরিয়ে এলাম। আমন্ত্রণকারীরা ইয়র্কশায়ারের লোক। চলেছেন কর্ণওয়ালের সমুদ্রতীরে তাঁবু খাটিয়ে ছুটি কাটাতে। গাড়ীর ছাদে ও বুটে দুটি তাঁবু। রান্নার সব আয়োজন। তাঁদের সামনে শ দেড়েক মাইল। এতক্ষণ পরিবারের কর্তা গাড়ী চালিয়েছেন। চা-পান শেষে পুনর্যাত্রা সুরু হলে ছেলে গাড়ী চালাবে। তিনি বিশ্রাম নেবেন। ছেলেটি মোটাসোটা। তাকে নিয়ে মা বাবার নানান কৌতুক। চা তৈরী হলে তাঁরা চায়ের সঙ্গে বিস্কুট নেবারও অনুরোধ করলেন তিনি। একটি বিনিদ্র রজনী শেষে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। চা পর্ব শেষ করে তাঁরা গন্তব্যপথে যাত্রা করলেন। নাম পরিচয় তো দূরের কথা অন্ধকারে ভালো করে পরস্পরের মুখই দেখা হলো না। তবু একটি মধুর স্মৃতি পেছনে রেখে তাঁরা চলে গেলেন। অমিতাভ সারা পথটা গাড়ী চালিয়ে এসে ছিলেন। তাই পেছনের সীটে গিয়ে আধ শোয়া অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। হয়তো দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে ঐ চমৎকার অভ্যাসটিকে তাঁর আয়ত্ত করতেই হয়েছে।

আমি ও নীপা বিনিদ্র ভাবেই রাত কাটালাম। ক্রমশ পথ দিয়ে মটর চলা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে অদৃশ্য খরস্রোতা নদীটির তরল রব এবং তার বুক থেকে মাঝে মাঝে হাঁসের চকিত ডাক ছাড়া আর সব কিছু মৌন হয়ে গেল। আরো খানিক পরে আকাশের সব তারা নিভে গেল। অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে উঠলো। অবশেষে ক্লান্ত-বিলম্বিত প্রভাত এলো। কিন্তু আদিগন্ত কুয়াশা ঢাকা। আবার হোটেলের দ্বারে কারাঘাত। তখনো উত্তর দেবার মত কেউ জাগেনি কিম্বা আসেনি। প্রদোষ কাল থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ধর্ণা দেবার পর পেছন দিকের খিড়কি দিয়ে অনধিকার প্রবেশ করে দেখা গেল হোটেলের রন্ধনশালার একটি লোক সবে প্রাতঃরাশের আয়োজন সুরু করেছে। ধাক্কাধাক্কি করে তাকে বের করা গেল। আমাদের বিড়ম্বনার কথা শুনে সে খিড়কি দিয়েই আমাদের হোটেলের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। বললে, আটটার সময় সবাই এসে যাবে। ইতিমধ্যে সে আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করছে।

ঠিক আটটার সময় চকিতে হোটেলটি সরগরম হয়ে উঠল। মাত্র দিন-পনেরো আগে হোটেলটির মালিকানা হাত-বদল হয়েছে। বর্তমান মালিক ফরাসী। আমাদের বিপত্তির কথা শুনে প্রভূত আফশোস প্রকাশ করলেন। বললেন, এখনো সব ব্যবস্থা, এমনকি দরজা-ঘণ্টির ব্যবস্থাও করে উঠতে পারেননি। আমাদের জন্যে তখনই গরম ও স্বাদু প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা হলো। আমরা নিজের নিজের ঘরে গিয়ে উষ্ণ স্নান শেষে খানিক ঘুমিয়ে নিলাম।

দুই

সমগ্র অঞ্চলটির নাম কটস্‌ওলড্‌। নরম চুনাপাথরের নম্র পাহাড়, ঊর্মিল প্রান্তর, খরস্রোতা তটিনী, ওক-বার্চ ও পপলারের অরণ্যভূমি এবং আদিগন্ত পাকা ফসলের ক্ষেত। অথচ তার দিগ্‌দিগন্তের অতীতের অগণ্য শতাব্দীর মানুষের কর্মব্যস্ততার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। শুধু যেন বিংশ শতাব্দীকেই পরিহার করার চেষ্টা চলেছে। —এই অঞ্চলের বহু দ্রষ্টব্যের মধ্যে নটগ্রেভ লঙ্‌বারো নামক স্থানে খৃস্টপূর্ব ২৫০০ শতাব্দীর প্রাগৈতিহাসিক লোকেদের বিস্তীর্ণ কবরভূমি দেখা যায়। গ্রেট ওল-ফোর্ড এবং চ্যাসেলটনে দেখা যায় খৃস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লৌহ-যুগের মানুষদের দুর্গ। তবে এ-অঞ্চলের বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিশাল বিশাল রোমান ধ্বংসস্তূপ। তাদের প্রাসাদ, দুর্গ ও স্নানাগারের অতিকায় অবশেষ। বিলাসবৈভব, ক্ষমতাপ্রভুত্ব, সেই সঙ্গে মহান স্থাপত্য ও অত্যুন্নত সভ্যতার বিপুল স্মারক। আমাদের ওপর যারা প্রায় দুশো বছর প্রভুত্ব করেছিল, তাদেরই যে আর কেউ প্রায় পাঁচশ' বছর অধীন করে রেখেছিল, তা কল্পনা করে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। রোমানদের পর স্যাক্‌সন-নর্মান, টিউডর প্রভৃতি ক্রমন্বয় যুগের গীর্জা দুর্গ ও অট্টালিকা কটস্‌ওলডের ছোট ছোট গ্রাম ও জনপদগুলিতে ছড়িয়ে আছে। একদা কটস্‌ওলডের পশম ছিল বিখ্যাত। সেই পশম বোনার পুরোনো তাঁতবাড়ী ও বায়ুকলও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। গ্রামের বাড়ীগুলির অধিকাংশ ছাদ, প্রাচীর ও জলস্রোতগুলির ওপর সেতু কটস্‌ওলডের নানা জাতের নরম ও শক্ত পাথরে ছাওয়া ও গাঁথা।

ইউরোপের প্রায় সব দেশেই অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনে আদি বনভূমি উচ্ছেদের পর নতুন বনভূমির প্রয়োজনে দ্রুত বর্ধিষ্ণু লাভজনক ও সহজসাধ্য কনিফার বা ঝাউ জাতীয় সরলবর্গীয় বনভূমির সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী সেই বনভূমি দেখতে দেখতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে অনেক স্থানকেও নরওয়ের একাংশ বলে মনে হয়। কটস্‌ওলড তার ব্যতিক্রম। এখানে বৃটেনের সুপ্রসিদ্ধ ও সুষমা ওক-এলম্‌-বীচ ও প্র্যাশের দিগন্ত বিস্তার। শোভনে ও প্রয়োজনে ওকের তুল্য তরু উদ্ভিদ-রাজ্যে খুব কমই আছে। গৃহ-স্থালীর মহার্ঘ আসবাব থেকে জাহাজ তৈরীর কাজে তার সমান কদর। বস্তুত অতীতে ইংল্যান্ডের সপ্তসমুদ্র শাসনে ওকের অবদান কম নয়। তাই রাণী প্রথম এলিজাবেথের যুগে ইংল্যান্ড বিজয়ের জন্যে আর্মাডা পাঠাবার সময় স্পেনরাজ ফিলিপ ইংল্যান্ড পরাজিত হলে ওকের বনভূমিগুলির খাণ্ডব দহন করে তার নৌশক্তি চিরতরে খর্ব করার হুকুম দেন। ইংল্যান্ডে ওক গাছের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল মুনাফালোভী জমিদারেরা আর রক্ষক ছিল নৌ-সেনাপতিরা।

কটস্‌ওলডের ছোট নদী-বওয়া, ওক-দিনান্ত নয়নাভিরাম ভূচিত্র দেখতে দেখতে মনে হয় যেন কন্‌স্টেবলের কোন চিত্রপট বহুগুণে বেড়ে দিগ্‌-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তার নদীগুলি অগভীর, জল স্বচ্ছ, শয্যা পাথরের ইংল্যান্ডে ভ্রমণকারীদের প্রিয় কেন্দ্রগুলিতে যেখানে জলাশয় আছে সেখানে সাধারণত রাজহাস ও পেলিকান জাতীয় বিরল, বৃহৎ শুভ্র জমকালো জল-চারীদের ক্ষুদ্র বসতি স্থাপন করা হয়। কিন্তু তারা বহিরাগত। ক্রুসেডের রণক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় সিংহহৃদয় রিচার্ড রাজহংসদের সংগ্রহ করে আনেন। তদবধি তারা আইন-সংরক্ষিত হয়ে ইংল্যান্ডে বংশবিস্তার করেছে। তাই ভূচিত্রে তারা সংযোগ, স্বাভাবিক নয়। কটসওল্ডের নদীনালায় তাই তাদের স্থান নেই। তার জেলে নাকতা, মালার্ড, শিখা-শির ও সূচপুচ্ছ প্রভৃতি ছোট ছোট আটপৌরে হাঁস আর অঞ্চলজ ট্রাউট মাছ। ছুটি কাটাতে আসে ওই হাঁস ও মালেদের খাদ্য বিতরণ করা এক মহাকৌতুকের ব্যসন। একটুকরো রুটির জন্যে সহৃদয় মানুষের কাছে হাঁসেদের কত কসরৎ। আর সেই রুটির জন্যে স্বচ্ছজলে স্রোতের উজানে সাঁতরে আসছে ঝাঁক-ঝাঁক ট্রাউট। খাদ্য ধরতে গেলে স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কেটে আসাতেই তাদের সুবিধে।

হোটেলের সামনের নদীটি খানিকটা পাড় হোটেলবাসী মৎস্যশিকারীদের জন্যে সংরক্ষিত। কিন্তু কদিনের মধ্যে কাউকেই মাছ ধরতে দেখা গেল না। মেছেল মানেই তো আর মার্জার নয়! পরিবেশ তাদেরও তো পরিবর্তিত করতে পারে। মাছধরার পাড় ছাড়াও নদীটির তীরে হোটেল-বাসিন্দাদের জন্যে একটি ছায়া ঘেরা পার্ক আছে। মাটিতে তার নরম ঘাসের ঘনশ্যাম জাজিম, খানিকটা করে জায়গা জুড়ে মৌশুমী ফুলের উচ্ছ্বাস এবং নদীটির একটি বিভক্ত স্রোত তারই মধ্যেই ঝির-ঝির বইছে। পার্কটির ওধারেই ট্রাউট মাছের চাষের উপযোগী করে নদীটিকে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পাথরে বাধা দিয়ে, নাচিয়ে-ফেনিয়ে চলচঞ্চল করে রাখা হয়েছে। দূরে সেই জল খেতে ট্রাউটেরা অবিশ্রান্ত লম্ফঝম্প দিচ্ছে মিঠে রোদ্দুরে ঝলক দিয়ে উঠছে। দুপুরে বাইরেরবে বাইরে না গেলে, কিম্বা বাইরের থেকে ফিরে এলে আমরা সেই শুয়ে বসে গড়িয়ে কাটিয়ে দিতাম। আমাদের পাশাপাশি এসে পায়রা, ঘুঘু, চড়াই, ব্ল্যাকবার্ডরাও এসে নির্ভয়ে গড়াগড়ি খেতো রোদ পোয়াতো। হোটেল থেকে আমাদের জন্যে স্যান্ড-উইচ-কফি, চা-পেস্ট্রি এলে উঁকি-ঝুঁকি দিত। ভাগ পেলে উল্লসিত হতো। অনাহূত হয়ে ঝাঁকে বেঁধে আসতো মৌমাছিরা। জ্যাম জেলি পেস্ট্রির ওপরই তাদের বিশেষ লোভ। হয়তো দিনাদের বিদায়বেলা যে আসন্ন সে সম্পর্কে তারা সচেতন। তাই শীতের জন্যে মধুরসদ সংগ্রহে অত তৎপর!

প্রকৃতির একান্ত পক্ষপাতিত্বে সেই সঙ্গে মানুষের সচেতনতায় এই দ্বীপ-পুঞ্জে মশা মাছি নেই বা না থাকারই মত। সাপ নেই বিছে নেই। হালকা রোদ্দুর ও বৃষ্টিতে বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রকৃতি চোখ-জুড়নো মনমাতানো সবুজ। গ্রামে গাঁয়েও আধুনিক জীবনের সব উপকরণ, বিদ্যুৎ ফোন-টেলিভিশন। নালা নর্দামা ভূগর্ভে। ধুলো নেই, কাদা নেই। সব-কিছুর পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। আর আশ্চর্যভাবে নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ। আপাতদৃষ্টিতে প্রায় জনমানবহীন। বিকালে আমরা গ্রামের বিসর্পিল রাস্তার চড়াই-উৎরাই ভেঙে সেই অবাকস্তব্ধতার মধ্যে নিজেদের পায়ের প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুরে বেড়াতাম। আকাশে কনে-দেখা-আলোর সমুদ্রে সাঁতার কেটে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঘরে ফিরতো। ক্রমে দূরে ওক-বার্চ ও পপলারের বনে অন্ধকার জমাট বাঁধতো। অবশেষে মহাকাশ থেকে জ্যোতির্ময় সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও মুছে যেত। স্মৃতির মণিকোঠায় জমা পড়তো আলোকে-আনন্দে, সৌন্দর্যে সৌহার্দ্যে উজ্জ্বল এক-একটি দিন।

আয়না

রণজিৎ পাল

—আমার সঙ্গে চালাকি? আমি চৌধরী বাড়ীর তারাপদ! ভুলে গেছে আমি কে!

তারাপদ বক্‌বক্‌ করতে থাকে আপন-মনে। দুভাঁজ করে পরা কাপড়ের খুঁটটা দিয়ে নড়্‌বড়ে সাবেকি আয়নাটার কাঁচের ওপর ঘসতে থাকে। বিরক্তির ভাব তার চোখে মুখে।

ইস্‌ দ্যাখাই যায় না অ্যাক্‌কারে!

এদিক ওদিক তাকায়, আর মৃদু গলায় মনের ভাবনাগুলো এলোমেলো উচ্চারিত হয়।

—না এতে হচ্ছে না। এটা থাকাও যা, না থাকাও ...। না, থাক! তবু দ্যাখা যাচ্ছে।

NITAI GHOSH

খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকায় তারাপদ।

—বেলা তো তেমন বেশী হয়নি, কিন্তু গরমটা এরই মধ্যে জেঁকে বসেছে, বেওয়ারিশ ... যেন জবর দখল। বসন্তকাল শেষ হতে না হতেই—!

কাপড়টা খুলে ফেলে, বিছানায় তাল করে ছুড়ে দেয়। আয়নায় নিজের চেহারাটা অনেকবার দেখতে থাকে। পরনের আণ্ডার-ওয়ারটার দিকে নজর পড়ে।

—কি কালোটাই না হয়েছে, তেল চিট-চিটে। যাকগে! কিন্তু চেহারাটা, হাঁ, চাবুক অ্যাক্‌বারে—তেল-মাখানো। ডান হাতের গুলোটা দমবন্ধ করে ফোলায়, বাঁ-হাতের

আঙুল দিয়ে টেপে—শক্ত ইট। চৌধুরী-বাড়ীর নোনা ধরা ইট নয়, টোকা দিলেই ঝুরঝুরে ঝুরঝুরে—এ বাওয়া পবমিলের এক নম্বর, হুঁ হুঁ।

মানুষসমান উঁচু আয়নায় পুরো চেহারটা পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তারিয়ে তারিয়ে দেখে। তারিফ করে—খাসা! যেন সিনেমার কুমার টুমার। চান্স একটা লড়িয় দিলেই হয়। পটলটা বলে, লাল্ট-মার্কা চেহারা হলেই চলবে না রে—এস্‌মার্ট্‌, হ্যাঁ বাব্‌বা এস্‌মার্ট্‌ হওয়া চাই। ফিরি মুভ করতে হবে। —আচ্ছা দেখা যাবে, কোথাকার ঘাটার কোথায় গড়ায়।

ভাল লাগছে না তারাপদর কোন কিছু। কিছুতেই মন বসে না। আয়নার সামনে থেকে চলে আসে টেবিলটার কাছে। টেবিলের ওপর একটা পুরনো খবরের কাগজ—তাতে চা কোম্পানির চায়ের বিজ্ঞাপন। তারাপদর হঠাৎ চায়ের তেষ্টা পায়।

একটু চা পেলে হতো। বড্ড তেষ্টা। হঠাৎ রাগ হয় ভেতরে ভেতরে। চিন্তা করতে করতে সব রাগটা তার মায়ের ওপর গিয়ে পড়ে।

—মায়ের কম্মের মধ্যে ধম্ম। অ্যাক্‌কারে হাওয়া, সাত সকালে। ধম্মের নাম একবার হলেই হয়। আর জুটেছে ওই হরিপিসী। যতসব—

ধুতিটা আবার দোপাট্টা করে জড়িয়ে নেয় কোমরে। চায়ের তেষ্টা ওকে পেয়ে বসেছে। বিজ্ঞাপনের পাশের কলামে লেখা—'জোড়ামাথা অদ্ভুত মানবসন্তান'। হেসে ওঠে তারাপদ হাঃ হাঃ করে। পরক্ষণে হাসি থামিয়ে আয়নার সামনে এসে একটা ছোট্ট টুলে বসে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আবার হাসে আর বলে—আমার মা আমাকে বলে, 'মানব-সন্তান'—হ্যাঁ বাব্‌বা, জলজ্যান্ত মানুষের বাচ্ছা। আর রঞ্জা? ওটা একটা ... না কিস্‌সু নয় ... একটা বোকচণ্ডী।

—পটলা বলে, না-রে-না। তুই একটা আস্ত, তোদের ইন্‌জিরিতে যাকে বলে ইস্‌টুপিট।

—আঁ, আমি বোকা। আর তুই? খুব ধড়িবাজ। আরে ছোঃ।

—আমাকে আবার জ্ঞান ছাড়ে, লম্ভ্‌ ফম্ভ্‌ ছাড়, সব ভাঁওতা, তোকে খেলাচ্ছে, তোর মাথা খাচ্ছে।

ভেংচী কাটার ভঙ্গী করে বলে যায় তারাপদ—চুপ রে, আমার মাথা খাচ্ছে, খাওয়াচ্ছি, সবুর কর।

হাসি হাসি মুখটা তারাপদর মুহূর্তে পাল্টে যায়। নিজে নিজেই আঁতকে ওঠে।

—তখন কি হবে? ধম্ম-ধম্ম ভাবের মা আমার। রাতদিন ত খালি ঠাকুর সেবা। বাড়ীটাকে অ্যাকেবারে পেঠস্থান করে ছাড়লো। বাবা আমার পরম পুজনীয় বাবা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েও যে কটা রেখে গেছে, মায়ের পরলোকের কাজ করতে করতে দেখছি শেষ হয়ে যাবে। বলি মরণের পরে তো পরলোক। বলি, একি পরলোকের কাজ হচ্ছে না গঙ্গর ছেলেকে পরলোকে নিয়ে যাবার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। নির্ভেজাল পৈত্রিক সিন্দুকে কতই বা আছে? কে জানে! বাঞ্ছ ত ঘেঁসাই দায়—মা যেন অ্যাক্‌কেবারে, অশোকবনে সীতা পাহারা দিচ্ছে।

জানলার দিকে এগিয়ে যায়, দুটো গরাদে দুটো হাতের ভর রেখে একটু ঝুঁকে বাইরে তাকায়। —না গলাটা অ্যাক্‌কারে শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু চা...তলায় তাকায়। কাকে যেন খোঁজে। চোখ দুটো ঘোরে এদিক-ওদিক।

—রঞ্জাটা গেল কোথায়? এক কাপ চা করতে পারে না—বাদশার মেয়ে জাঁহানারা। সব তাতেই নবাবি। শুধু বসে বসে ন্যাজ নাড়া, খেটে খেতে পারেন না। ইদিকে আগ বাড়িয়ে বলা চাই, আমি তারাদাকে চা করে খাওয়াব জেঠিমা, আপনার কিছু ভাবতে হবে না।

চাঁদসোহাগী, আদরে গলে গেলেন। আদিখ্যেতা। পায়চারি করতে থাকে তারাপদ আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—মেয়ে আমার মুখে দড়। ভাবের আবেগে মুচ্ছ যায়। কাজের কাজী মোটেই না। সুযোগ সুবিধের ব্যাভার জানে না। আজকে সারা বাড়ীটা খালি। শুধু তুই আর আমি।

—সেদিনই দিতুম চিট্‌ করে, সিঁড়ির তলাটার অন্ধকারে। ধরেছিলুম কায়দামাফিক, সিলিফ করে বেরিয়ে গেল। স্রেফ একটা ব্লাফ। 'এই তারাদা, দেখ কে?' ...আচমকা চমকে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভেবেছি, মা বোধহয়, ব্যাস হাওয়া।

—হরিপিসির জন্যেদস্ত ট্রেনিং। কথার ঢং কি? কান ঝালাপালা করে ছাড়বে। মুখ-পোড়াটার সঙ্গে অত আলিত-গালিত কেন রে ছুঁড়ি। বলি, অপগণ্ডো, হাঁদা-চৈতন ছেলেকে পোষবার ক্ষেমতা আছে? মা যদি একটা কানাকড়ি না ঠ্যাকায় ত অগাধ জলে, বুঝলি।

—শয়তানের শিরোমণি মা যখন বাড়ী থাকবে দিদি-দিদিমণি।

—এদিকে আড়ালে ত বাব্‌বা, হাত করবে ছুঁড়ি ওই ডাইনি বুড়িকে। যখের ধন আগলে বসে আছে। ওরে নিজে চোখে দেখেছি, বসে খেলে সাতপুরুষেও ফুরুবে না।

—সেই কথা বল্‌। তোর মত সাত-সাতটা চাঁরদাসী আর তোর ভাইঝিকে কেনাদাসী করে রাখতে পারি। কেবল মা—

একটু চমকে ওঠে। ভাবে মা বুঝি আশে-পাশেই আছে শুনে ফেলবে, জেনে ফেলবে তার ইচ্ছেটা। ধ্যুত্তোর, কোথায় মা? এতক্ষণে দক্ষিণেশ্বরের বাঁধানঘাটে নেমে মুক্তির চান করছে।

ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে হাসির ভঙ্গী করে জানালার কাছে ঠিকরে চলে আসে। তলায় তাকায় মাথা খোলা বাথরুমের দিকে।

—রঞ্জাবতী, এদিকে পেছন ফিরে কেন? স্নান করছো। মোছ, মোছ।

জানালার খড়খড়িতে মাথা ঠুকে যায় তারাপদর—ঠক করে শব্দ হতে ওপরে জানালার দিকে তাকায় রঞ্জনা। চোখাচোখি হয়ে যায়। মুখভঙ্গী করে হাত তুলে মারবার ইঙ্গিত করে। মুখটা হাসি হাসি না রোষের আভাস মেশান বুঝতে পারে না তারাপদ। তারাপদ একটু দৃষ্টি সরাতেই টুপ করে বসে পড়ে ভাঙা টিনের আড়ালে।

—বারে! বেপত্তা! চক্ষের নিমেষে উধাও। ছলাকলা জানে চাড্ডি। আবার কিল দেখানো। হ্যাঁ বাপে বেটীতে তফাত আছে। বাপের সাত চড়ে রা সরে না—আর বেটী যেন জাতগোখরো—একটুতেই ফোঁস করে ওঠে। কেরানীর মেয়ের রোখ দ্যাখো-দিনি। হরিমতী পিসীটার হাতপুরো রেখেছে। আচ্ছা দ্যাখা যাবে, একটা কাজের বন্দোবস্ত হোক। আবার বলে কি—হবে না, তোমার মত বোকা লোকের চাকরী? আরে দেখবি, তোর বাবাই করে দেবে নিজের গরজে—সাহেবের পায়ে পরে। তখন বুঝবি কে চালাক তুই না আমি।

তারাপদ ফিরে আসে জানালা থেকে। গাটা, হাত-পাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে দুপাশে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

তেষ্টাটা চাগাড় দিয়ে ওঠে তারাপদর। সামান্য চা নিয়ে আসবে ত একটা কাপে এক কাপ। এসে বলবে, নাও ধর তারাদা। বলি, কুড়ি বছর বয়স হলো এখনও বুদ্ধি হলো না। শুধু চায়ে কি তেষ্টা মেটে? লম্বা পঁচিশ বছরের তেষ্টা। মা নয় বুড়ি, সে বোঝে না। কিন্তু তুই, তোর ত বোঝা উচিত। আর ধম্ম ধম্ম মা যেন কি একটা, এখনও ডাকবে, 'খোকা, ও খোকা'; খোকা আর খোকা—কানটা ঝালাপালা ধরে যায়।

সেদিন মা আবার হরিপিসীকে বললে, দেখ হরিমতী ছেলের বিয়ে দিলেই হবে না। আর বৌ ছেলেকে দুবেলা খেতে দিতে পারলেই ছেলে সক্ষম হয়েছে তা নয়। দেখতে হবে তার শিক্ষাদীক্ষা বুঝতে হবে পরে যে সব বাচ্ছা-কাচ্ছা আসবে তাদের মানুষের মত গড়ে তুলতে পারবে কিনা?

পাশ ফিরে শুতে গিয়ে লক্ষ্য পড়ে ঠাকুর্দা দেবনারায়ণের ছবিটার ওপরে।

—বলি, বুড়ো বাহাদুর ছিল বটে। কায়েত হয়ে বামনের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলো, স্রেফ টাকার জোরে। টাকা থাকলে কিনা হয়। সমাজ-ফমাজ সব উল্টে যায়। একালে যা হচ্ছে ওকালে তাই ছিলো। তবে লেগপুল কেন এসব নিয়ে।

লেগপুল কথাটায় তারাপদর হাসি পায় বারবার। কারণ রঞ্জনা তাকে প্রায়ই লেগপুল করে। বোধহয় ভাবে তারাপদ বোকা, ক্যাবলা।

—সত্যি বটে, আমি দেখতে ক্যাবলা—কিন্তু আসলে...? যতই লেগপুল কর রঞ্জাবতী রকবাজ ছেলেদের মত, আমি পড়াচ্ছি না। আর যদি পড়াতো তোমাকে নিয়ে পড়বো। আমি শালার ট্যারাপদ চৌধুরী—ফোর টয়েন্টি নট্‌-টু-হেয়ার। আমার সঙ্গে চালাকি করো না।

হঠাৎ ঠাকুর্দার ফটোর পাশে তার বাবার ফটোটা চোখে পড়ে। একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারাপদ। উঠে দাঁড়ায়। কাপড়টার একটা দিক ঝুলতে থাকে মেঝেতে। একটানে কাপড়টা খুলে ফেলে। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতে থাকে তার বাবার ফটোটা। বিরক্ত বোধহয় তার মায়ের ওপর।

—না, মায়ের জন্য সবই যেতে বসেছে। শেষে দেয়াল দিয়ে জল চুঁইয়ে ফটোটা দিলে সাবড়ে। তা ছাদের আর দোষ কি? আজকের বাড়ী? নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলের—কত জল না ঝরিয়ে থাকবে? মায়ের আমার আদিখ্যেতা করে বলা চাই—সব যাবেরে, সব যাবে। বহু লোকের চোখের জলে চুন-সুরকি ভিজিয়ে বাড়ী তৈরি। কত মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রতিটি ইটের ফাঁকে ফাঁকে জমে আছে, সে সব যাবে কোথায়? পূর্বপুরুষের জমান পাপ তাদের বংশধরকে এমনি করে তিলে তিলে প্রায়শ্চিত্তের করতে হবে।

বাবা এতোই যদি মনে ধর্মভাব তবে ছেড়েছুড়ে দিয়ে যাওনা—কাশীধামে, নয়তো স্বর্গধামে। মাঝে মাঝে মনে হয় বলি—আমাদের পূর্বপুরুষকেও শিখেছিল বলেই ত মাথা গুঁজে এত বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছ। আমাকে আবার উপদেশ দেওয়া—দেখ খোকা সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে সাধারণ জীবন কাটিয়েও অসাধারণ হওয়া যায়। আর বাপ-ঠাকুরদার নাম ভাঙিয়ে খেতাব জোরে গদী আঁকড়ে বসে নবাবি করা একমাত্র আমাদের দেশে চলে—অন্য কোথাও এর চল নেই।

—বলি আসল কথা কি জানো, মেয়ে-ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে নেই—শিখিয়েই ত দেশটা উচ্ছন্নে গেল। মা যে আমার বই-এর কীট। বই পড়ে পড়ে মাথাটা গোল্লায় গেছে। তা নইলে বলে খেটে খাও, মেহনত করে খাও। মেহনতী মানুষের মত যদি খেটে খেয়ে বেঁচে থাক, সেটা গৌরবের। কিন্তু তোমার বাপ-ঠাকুর্দা যে ঐশ্বর্য টাকা-পয়সা, ধনদৌলত রেখে গেছে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে প্রবঞ্চনা করে তোমার এক বংশধরের উচ্ছন্নে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তা দিয়ে তুমি হয় দেশের লোককে আরও শোষণ করবে, দেশের হোমরা চোমরা হয়ে নিজেকে জাহির করবে, তার বড়লোকের দল তোমায় নিয়ে লাফাবে। নয়তো তুমি নিজের মানবতাকে হত্যা করে উচ্ছন্নে যাবে তার কোনটাই আমি বেঁচে থাকতে হতে দেবো না।

—হঠাৎ মায়ের ছোট ফটোটার দিকে চোখ পড়ে যায় তারাপদর। তারাপদ ভয়ে শিউরে ওঠে—এর মনে হয় মা যেন সত্যিকারের সব কথা শুনেছে। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তার মত ছেলে এ ধরনের কথা বলবে—রায়বাঘিনী রাজনন্দিনী ক্ষমাসুন্দরী রাজা প্রদ্যুতনারায়ণের মেয়ে তাকে ছেলে বলে ক্ষমা করবে সে শিক্ষা তার মা পাননি। টোলের পন্ডিত মায়ের দাদামশাই-এর কাছে তার মা যে শিক্ষা পেয়েছে, তার জন্যে মা [illegible] —তার শিক্ষা নিজেকে

গোলাপের মত বিকাশ করে সকলের কাছে প্রিয় হওয়ার, প্রশংসা পাওয়ার শিক্ষা নয়, এ শিক্ষা কুলপ্লাবিনী স্রোতধারার মত শৈল-চূড়ার থেকে পাথর কেটে পথ করে নেমে আসা সমতলে—শস্য-শ্যামলা করতে বসুন্ধরার বন্ধ্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রটাকে। এ কাজ চালিয়ে করার শিক্ষা নয়, এ কাজ করার শিক্ষা এ তোমাকেও শিখতে হবে। আমি এ শিক্ষার বাস্তব রূপ দেখিনি, তোমার কাজের মধ্যে দিয়ে দেখতে চাই। একটু দম নিয়ে নেয়, আস্তে আস্তে বুজে আসে চোখ দুটো, বলতে থাকে কিন্তু তা হতে দিচ্ছে না, কারণ তোমরা এ দেশে জন্মেছ। এই দেশের দূষিত জল-হাওয়ায় মানুষ হয়েছো, সমাজ তোমাদের পঙ্গু করে দিচ্ছে দেহে আর মনে। সমাজে ঘুণ ধরেছে তোমাদের বাড়ীর কড়ি-কাঠের মত। তাই আমার সকল ঐকান্তিক চেষ্টা প্রতিধ্বনির মত ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে বারবার জীর্ণ নোনাধরা দেয়ালে আঘাত খেয়ে।

—আমার মায়ের বলবার কাপাসিটি আছে। একবার নয় দুবার নয়, বারবার এ-কথা বলেছে, আমার কানে গিয়ে অ্যাকেবারে নামতার মত মুখস্ত হয়ে গেছে। এখন আমি মায়ের মত করে হুবহু বলতে পারি। কিন্তু মায়ের মত অরিজিনালিটি থাকে না।

হঠাৎ চোখটার দৃষ্টি খোলা দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে, বেলাটা বাড়ছে একটু একটু করে। তারাপদর চায়ের তেষ্টাটা আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে।

—ধ্যাত্তেরি ছাই। রঞ্জাটা এখনও চাটা আনলে না। নিশ্চয়ই এখনো বাথরুমে বসে আছে। খালি গায়ে জল ঢালে ত ঢালতেই থাকে। বলি, এক গায়ের জ্বালা মেটায়! বাপু এত জ্বালাই বা কেন? একি দেহ-জ্বরের জ্বালা? হাঁ, দেহজ্বর! কোথায় যেন শুনেছিলুম কথাটা ও হ্যাঁ মনে পড়েছে —পটলাটা কিন্তু অন্য কথা বলে। যখন যা মনে আসে তাই বলে। মুখে আকৃ-ঢাকু নেই। কিন্তু কোয়ালিটি আছে। বুদ্ধিশুদ্ধি অ্যাকেবারে কেষ্টনগরের ছুরি-কাঁচির মত পাকা স্টিলের —সান দিলেই ঝলসে ওঠে রঞ্জার গায়ের রঙের মত। কিছুক্ষণ কি ভেবে নেয়। তারপর কান পেতে শোনে একটা আওয়াজ সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ। —এসো বাবা এস। এতক্ষণে সময় হলো। না আওয়াজটা থেমে গেলো যেন? না, কান-যন্ত্রটা গেছে—যাবে না, হিন্দী গান আর নেতাদের আওড়ান বক্তৃতা। কানের আর দোষ কি? পারোটা ত বাজবেই। একটা ফাংসান হোক, একটা জলসা হোক, সিনেমায় যাও, এমনকি রেডিওটা খোল—মুখ দিয়ে যা বললুম তাই তবে কায়দাটা এক এক জায়গায় এক এক রকম। আসলে কোন হেরফের নেই। না, হিন্দীটা না শিখিয়ে ছাড়বে না।

—বলি, শেখাও বাবা শেখাও। আমার মা মানবতা শেখাচ্ছে। তাতে যে রকমটি শিখছি ভবিষ্যত গড়তে, তেমনটি করে ভাষা শেখাও তোমাদের দেশের ভবিষ্যত গড়ে উঠবে গড় গড় করে—পাঁচশালার কারবারের মত। হিন্দী কেন বাবা যত ভাষা দেশে আছে সব শেখাও। আমিও শিখতে রাজী। কিন্তু চাকরী দেবে তো? ইংরেজেরা তো ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল বললে চাকরী ত দিতই, শুনেছি ত কাউকে কাউকে ডেপুটিও করতো। তেমনি বাওয়া হ্যায়, ম্যায়, খ্যায় শিখলে তোমাদের রাজত্বে একটা চাকরী মিলবে তো? এতে যদি চাকরী পাই, তাহলে সত্যিই বলছি, মায়ের লেকচারমার্কা ভাষায় কথা বলা ছেড়ে দেবো। সত্যিই বলছি দেবো।

এখন আবার রব উঠেছে, ছোঁড়াদের তিন তিনটে ভাষা শিখতে হবে। আমি হলে স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিতুম, দাঁড়িয়ে আমি ডুবতে পারব না ভাষার ত্রিবেণী সঙ্গমে। আবার এর ওপরে পটলাদের ভাষা।

—হ্যাঁ পটলার ঐ সাবলীল ভাষাটা শিখেছি, আরও শিখতে হচ্ছে। আর এই রাজত্বে কি কোন ঠিক আছে? আজকে এ-পার্টি, কাল সে-পার্টি, পরশু অমুক—তরশু তমুক, তার পরের দিন পার্টি নেই, একা একা। তারপর ভাগাভাগি—দেশ ভাগাভাগি, হয়তো হবে জেলা দুভাগ, গ্রাম দুভাগ। নিজেরাই ঠিক করে নেবে—একভাগে আমি আর এক ভাগে তুমি। এক একজনের ভাষা হবে এক এক রকম—চলা, বলা, গেলাগান, মায় রেকর্ডের গানগুলো। আমি তারাপদ, পটলার সাকরেদ হয়ে শেষে ফালতু কাজে নাক গলাতে হবে দেখছি।

—আবার যেন কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি সিঁড়িতে। না আবার হয়তো ভুল শুনে পারি আগের মত। দরকার কি? যে আসবার ঠিকই আসবে।

—ধ্যুত্তেরি। কিচ্ছু ভাল লাগে না—পড়াশুনোটা না ছাড়লেই হতো। আমার মায়ের কড়া কড়া নিয়ম। বলে—তোমার যদি পড়ায় মনোযোগ নাই থাকে ত নাই পড়লে। কাজের সন্ধান দ্যাখো, স্বাবলম্বী হও। টাকার জোরে কলেজের একটা সীট আটকে রাখা, কোন স্বাধীন দেশের লোকের উচিত নয়।

—কি স্বাধীন রে বাব্বা। আমি ত স্বাধীনতার গন্ধই পাই না। সন্ধ্যের পর এক পা বাড়ীর বাইরেই বেরুতে পারি না। কথায় কথায় হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিয়ে চলতে হয়। এই কিনা স্বাধীন? পটলাটা আবার অন্য কথা বলে—কিসের স্বাধীন রে তোরা। আমাদের তেরো নম্বারের লোক-গুলোর হাড়গিলে চেহারা দেখেছিস?—আমারও ওরকম হতো। আমি মাসে একটু পেটে ঢালি, আর কাটিক মিত্তিরের সিনেমা-হলটা আছে বলে। বুঝলি, আমি না থাকলে ও-হলটা আদ্দিন তোদের পোড়ো বাড়ীর মত হয়ে যেতো।

—মা, পটলাটা গুন্ডোমি করে টাকা নেয় বটে, মোটা-মোটা, কিন্তু [illegible] যাচ্ছে যে

ওর ন্যাকামির। তা নাহলে আমরা সিনেমা দেখতুম কোথায় টিকিট ব্লাক করে?

—পটলা বলে, ধ্যুত্ তোর, তোর বুদ্ধির কলকেতে মাল নেই। সাফা বাদ। খালি ব্লাক করা দেখলি—আর পঁচিশ-তিরিশটা লোক ওখানে কাজ করেই ত সংসার চালাচ্ছে। তা নইলে বাড়ীতেই ব্যবসা খুলতে হতো।

—যাচ্ছি বাওবা যাচ্ছি। অত ব্যস্ত কেন? মেঝে থেকে কাপড়টা তুলে দু ভাঁজ করে পরে তারাপদ তারপর আস্তে আস্তে আসে।

—বাব্বা, তলার ছিটকিনি ত আঙুলটা গলিয়ে খোলা যায়। সবই ত জানো—তবু ন্যাকামি ষোল আনা। আমাকে উঠিয়ে আনার জন্যে নকসা মারা হচ্ছে। আচ্ছা আমিও মজা দেখ—আ—। দরজাটা খুলেই চমকে ওঠে তারাপদ। যুগপৎ বিস্ময় ও বিরক্তির ভাব চোখে মুখে ফুটে বেরোয়।

—বামুনদি তুমি?

—হ্যাঁগো আমি, ওরকম আঁতকে উঠলে যে?

—এখন হঠাৎ কি মনে করে?

—বলছি, বলছি,—সব বলছি। আগে ভিতরে যেতে দাও।

—কেন, সকালে তোমাকে মা বলেনি, আজকে আর আসতে হবে না।

—বলেছে গো, বলেছে।

—তবে?

—আগে ভেতরের পানে যেতে দাও, তার পরে ত—।

ওর প্রায় ছ' ফুট লম্বা চেহারাটাকে পাশ কাটিয়ে, দরজার চৌকাঠে রাখা বাহুখানার তলা দিয়ে অক্লেশে গলে বারান্দা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঝড়ের মত। আসবার সময় ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ ঠেরে বলে আসে—

—দরজাটা এঁটে দিয়ে চলে এসো গো দাদা-বাবু,—

তারাপদ যন্ত্রচালিতের মত দরজাটা ঠেলে দিয়ে ঘরের ভেতর এসে ঢোকে।

বামুনদি চাপাস্বরে বললে—কিগো, তোমার গিয়ে সেই ঐ যে গো, ঐ তলার মা-খাকী মেয়েটা—।

রঞ্জার প্রসঙ্গ আচমকা আসতে তারাপদ একটু হতভম্ব হয়ে যায়—হাঁ করে বড় বড় চোখ পাকিয়ে বামনদির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঢোক গিলে নিজেকে সামলে নিয়ে বামনদি বললে—হাঁ করে তাকিয়ে আছ কি? ঐ যে তোমার হরিপিসীর ভাইঝি রঞ্জা না মঞ্জা, সে এখানে নেই তো? সে মেয়েটা তো আবার হুট হুট করে তোমার কাছে আসে।

তারাপদ একটু প্রতিবাদের সুরে বলে—কি যে বল, বামুনদি তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি অ্যাকেবারে নেই। দেখছ মা বাড়ী নেই, হরিপিসী নেই, ওর বাবা গেছে অফিসে আর ও একটা আইবুড়ো মেয়ে আমার কাছে—।

—থাক থাক আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। তোমার কথার ত কোন আক-ঢাক নেই। এখুনি কি বলতে কি বলবে

—যাক তোমার এখন আসার কারণটা বল দেখি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে, পেটের কাছের কাপড়ের একটা গিঁট যেন খুলতে চায়, হাত দুটো নিয়ে যায় পেটের ওখানে।

তারাপদ বামুনদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে। বামুনদির চেহারাটার জৌলুস যেন আরও একটু খোলতাই হয়েছে কালো নরুন-পেড়ে মিলের ধুতিটা পরে— দশ বছর কমিয়ে অ্যাকেবারে পঁচিশে নামিয়ে এনেছে। ভ্রমর কালো চেহারায় আটকে থাকা যৌবনটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বামুনদি একটু লজ্জা পেয়ে যায় মুহূর্তের জন্য। কিন্তু বহু লোকের দৃষ্টিতে স্পর্শে, স্বাদে, মন্থনে বহুবার মথিত হয়েছে বামুনদির কালো টলটলে ভরন্ত যৌবনবাহী দেহটা। সে ভয় পায় না তার এই ছোট্ট দাদাবাবুকে। আর দাদাবাবুর
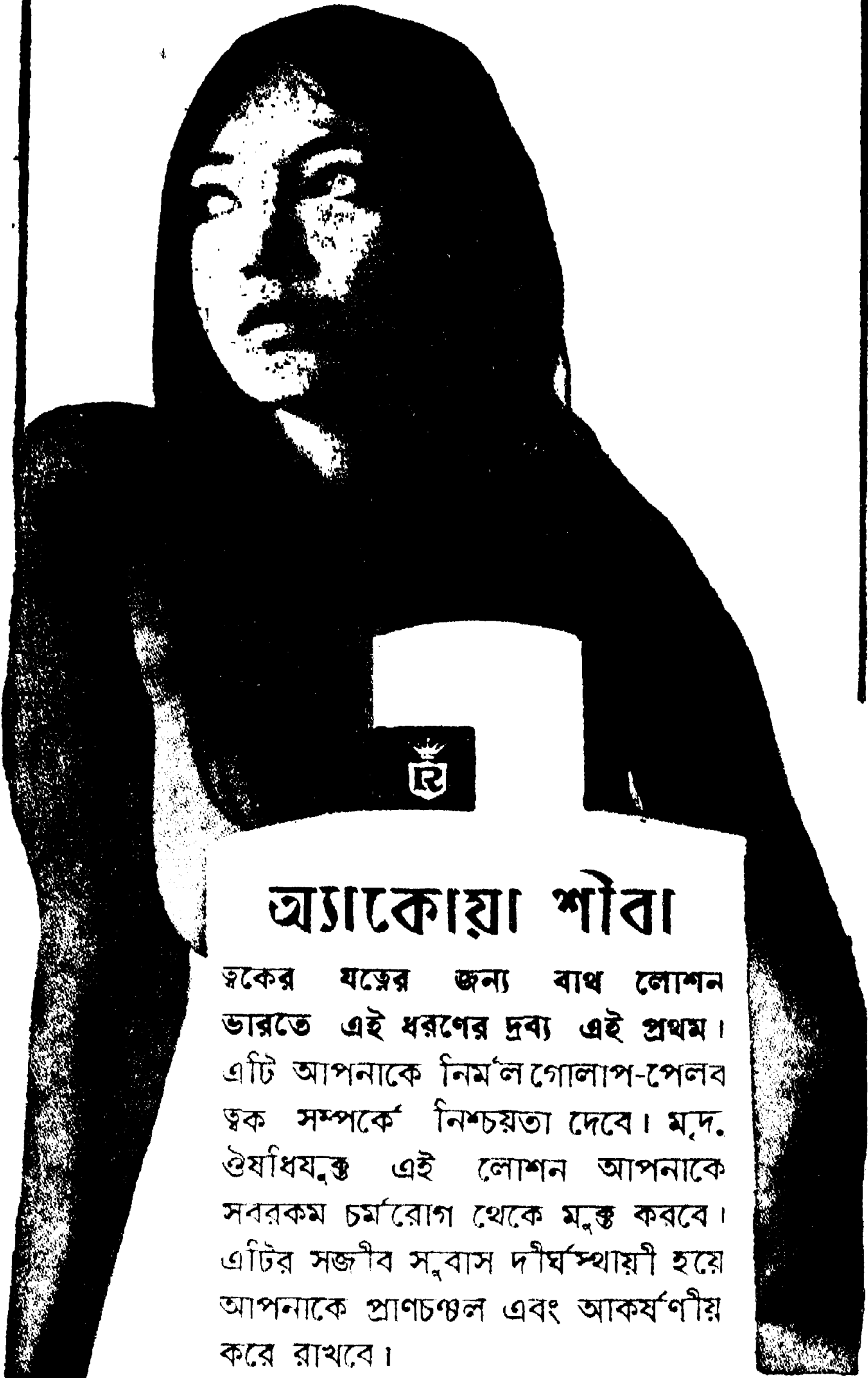
নিতে পটলাকে। দুজনকেই ছোটবেলা থেকে দেখছে বড় হতে তারই চোখের ওপর।

—চেহারা দেখেছ। পটলা ঠিকই বলে—বামুনদির চেহারাটা যেন খাই খাই করছে। কোমরের ওখানে বোধহয় গিঁট পড়েছে।

—কিরে বাব্বা কাপড়টা সত্যিই খুলবে নাকি? সেরেছে—এ আবার কি রসিকতা। শেষে কিনা কাপড় খুলে ঠাট্টা।

বামুনদি হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—হোয়েছে। দাঁড়াও আগে সব দেখাই তোমাকে।

—সেরেছে, কি দ্যাখাবে?

বামুনদি কোমরের কাছে আটকান কাপড়ের গিঁটটা খুলতে থাকে। আঁচলটা মাথার থেকে খসে পড়ে। কাঁধের থেকে আস্তে আস্তে আঁচলটা খসে পড়ে। বামুনদির খেয়াল থাকে না বোধহয়। ওর নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু কাল-কচুর পাতার ওপর ছোট্ট ফোঁটা শিশিরকণার মত জ্বলজ্বল করে।

—বামুনদির কসরত দেখে আমি যে ঘেমে যাচ্ছি রে বাব্বা। এ গরমে আবার সর্দিগর্মী না হয়? হাতে কাপড়ের টোপলায় একটা ন্যাকড়ায় জড়ান—পুঁটলীর মত। বামুনদি পুঁটলীটা বিছানায় রেখে বলে—দাদাবাবু, এগুলো আমার সাতসম্বল। আমার বের গওনা। এগুলো অনেক কষ্টে রেখেছি না খুইয়ে। আমার সব কিছু খুইয়েছি—কিন্তুন এগুলো আগলে রেখেছি যখের মত। কেন রেখেছি জানো? একটু থেমে আবার বলে—যখন খাটতে খাটতে পারব না তখন এগুলো দিয়ে আমার পেট চালাতে হবে।

—তা এগুলো আবার এখানে আনলে কেন?

—আগে শোন ত, সবই বলছি। আমি, দাদাবাবু, আমার শ্বশুরে গাঁয়ে যাবো। এগুলো রেখে যাই কোন চুলোয়। যেই পাবে সেই মেরে দেবে। শত্তুরের ত অভাব নেই। তোমার মা নেই, তাই তোমার কাছে রেখে গেনু। কাল-বাদ পরশু কাজে এসে নিয়ে যাব। তুমি এগুলো একটু সাবধানে রেখো। আর মা এলে বলো: আমার একটু তাড়া, আবার টেরেন ধরতে হবে।

তারাপদ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটো বুজে যায় আস্তে আস্তে। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকে, ঘটনাগুলো যেন আচমকা ঘটে যায়—কিছুক্ষণ বাদে নিজস্ব বুদ্ধিটা খেলে যায় মাথায়। চোখ খুলে দ্যাখে।

—যাক বামুনদি কেটেছে। তাজ্জব। এ অ্যাকেবারে তাজ্জব ব্যাপার।

—হ্যাঁ ঠিকই।

পুঁটলীটা হাতে তুলে নেয়, আস্তে ওঠায় আর নামায় হাতের তেলোতে রেখে।

—তা হবে বেশ, সের-দুই ত বটে। বাপ্পা এত গয়না তোমায় বিয়েতে দিয়েছে তোমার বাপ। বলিহারি তোমার বাপ। গ্রাফ দেওয়ার আর জায়গা পাও না আমাকে? যাক, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছি না। একবার যেকালে সুযোগ এসেছে হাতে, তাকে হ্যালা-ফ্যালা করে সব নষ্ট হতে দেবো না।

গহনাগুলো বিছানায় ঢেলে ফেলে বিছিয়ে দেয় এক এক করে।

মাগ্গী-গণ্ডার বাজারে তা হবে বেশ। এতেই চলে যাবে। পটলার প্ল্যান এবার নির্ঘাত সাকসেসফুল। দেবো পাড়ি। পটলাকে সঙ্গে নিতে হবে। নইলে ও-ব্যাটা সব প্ল্যান ভেস্তে দেবে। আর এগুলো ঝাড়ব কোথায়?

—ও তো অনেকবার বলেছে, মায়ের সিন্দুক ভাঙ। যা পাবি সঙ্গে সঙ্গে মাল বেপাত্তা করে দেব, বুঝলি—কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

—যাক এতে যা টাকা পাওয়া যাবে তাতেই পাড়ি দেওয়া যাবে বম্বে। তারপর সিনেমায় চান্সটা ত হাতের পাঁচ।

সবগুলো জড়ো করে, আবার ছড়িয়ে দেয় বিছানায়। হাতে করে তুলে নেয় মোটাসোটা বিছে হারটা।

—তা ভরি-আষ্টেক হবে। আর এই আংটিটা। এটা হীরে না মুক্তো—না হীরে। আরে শালা হীরের দাম কত? কে জানে? পটলাটা নিশ্চয় জানে। এটা কিরে বাব্বা, এটা ত সেরখানেক হবে। এটা আবার কোথায় পরে রে বাব্বা। হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি, কোমরে—মায়েরও আছে। আরে এটা কোমরে পরে কি করে? মাকে ত কোনদিন পরতে দেখিনি। মাকে ত কোনদিনই গহনাই পরতে দেখিনি। খালি একটা সরু হার আর দুগাছি বালা, হাতীর দাঁতের তৈরি, তাতে সোনার তার জড়ান জড়ান। বাস্। আবছা আবছা মনে পড়ে। বাবার মরণের পর তাও সব শেষ। মার সুন্দর নিটোল সাদা হাত সুন্দর, বেশ সুন্দর। গহনা পরলেও যা, না পরলেও তা।

ধ্যুত্তেরি ছাই যত বাজে চিন্তা। গহনাগুলোর সদ্গতি করি কি করে? পটলাটাকে ডাকতে হবে। ঐ যা করে করবে। ওই ত সেদিন বলেছে মুক্তোমালার প্রথম ছবি দেখে—আরে তেরো মুক্তোমালাকে পেতে কিসসু না, শুধু কিছু টাকা বাস। বম্বে গিয়ে ফাস্ট একটা ছবিতে নামা।

—তবে? এতে কি কিছু টাকা? বেশ কিছু আসবে বাব্বা—সুড়সুড় করে আসবে। একবার সিনেমার হিরো হলে তার থেকেও আসবে। তখন একটা ছোট্ট ছিমছাম বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। না বড় বাড়ী—লক্ষ্মী-কুমারের প্রাসাদের মত। আর দেখতে হবে না মুক্তোমালা, সুসুন্দরী, পটলাটা বলে, ছুছুন্দরী—আমার ফেবারিট আর্টিস্টের নামটাকে অ্যাকেবারে খাস্তা করে দিয়েছে। যাক, সকলকে নিয়ে যখন-তখন ঘুরবো, বেড়াবো। বাড়ীতে আনবো, হোটেলে নিয়ে যাবো—টাকা কত তখন? কারোর পরোয়া করি। পত্রিকায় পত্রিকায় ফটো নাম, জীবনী—জীবনী লিখবে কে? হ্যাঁ, আমি লিখবো, না কেবল আমার নামটা থাকবে, সুশীলাকে দিয়ে লেখাব। পড়ুয়ে হয়েছে—হিংসেয় তখন ফেটে মরবে রে। টাকা দিয়ে তোকে কিনে রাখব। টাকার জুতি মেরে—অঢেল টাকা, নামী দামী লোক টাকার জোরে নফর-চাকর বানিয়ে রাখব। দাসদাসী, চাকর-বাকর, সারভেন্ট-মেডসারভেন্ট—উঃ, কি হবে যে না আমার—সমস্ত গহনাগুলো ঠোঙার ভর্তি করে দুহাতে চেপে বুকের কাছে নিয়ে আসে—একটা লাফে সাবেকী আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, দ্যাখে।

—অনেক টাকা, রাজার ঐশ্বর্য। হ্যাঁ, তখন একটা বিয়েও করতে পারি। আরে ছোঃ রঞ্জা—ঐ বাঁদরটাকে। দু-একদিন কিছু টাকা দিয়ে নয় এদিক-ওদিক করতে পারি। তা বলে—।

—হ্যাঁ, মটর ত থাকবেই। একখানা হুডখোলা টু-সিটার শুধু সকালে হাওয়া খাওয়ার, সুইমিং পুলে যাওয়ার—ওটা ত ওনার ড্রাইভ। আর একটা 'ইমপালা' পিছনের সিটে বসে থাকব—মোড়ের বাড়ীর পরমিলার বাপ ঝুনঝুনওয়ালা, না রিকস-ওয়ালা—গজকচ্ছপের মত চেহারা, ওই শয়তানটার মত? আরে ছোঃ।

—তখন ওর গাড়ীটাই কিনে নেব—তা নইলে ফরেন মাল পাওয়া বড় শক্ত। ওর ফুলটাইম মাইনে করা ড্রাইভারটাকেও আর পেটমোটা অ্যালসেশিয়ানটাকে। কুকুরটাকে নিলে আবার ছুঁড়ীটাকে নিতে হবে। যা পেয়ার দুজনে যেন হৃদ-পীরিত। রাতে বেসামাল হলেও কোন ভয় থাকবে না।

—বাড়ীতে ত পার্টি হবেই। কখনও বা বাগান-বাড়ীতে, কখন বা হোটেল-মোটেলে। বাগানবাড়ীরটাই হবে মজাদার। ইংলিশ ড্রেস মোগলাই খানা। ইংরিজী কায়দা। ইংলিশ মিউজিকের সঙ্গে ড্যান্স। নাইস। ওয়াণ্ডারফুল। অ্যান্ড ড্রিংক এনজয় কর। যা খুশি কর। দি আইডিয়া—।

—কি আইডিয়া তারাদা?

তারাপদ ঠোঙাটা দেরাজটা টেনে তার মধ্যে রেখে দেয়। তারপর দেরাজটা বন্ধ করে দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে তাকায়। হাতের কাপ-দুটো দেয়ালের সঙ্গে ঠেসান দেওয়া সেগুন কাঠের টেবিলটার ওপর রাখতে রাখতে রঞ্জনা বলে—কি গো তারাদা, কি আবার আইডিয়া মাথায় ঢুকলো। জ্যেঠিমা বলে—তোমার মাথায় বালি আর গোবর ভরা আছে। একটুও ফাঁক নেই, তাতে আই-ডিয়াটা ঢুকলে কি করে?

কাপদুটো একটা কাগজ পেতে তার ওপর রেখে, ডিসদুটো চাপা দিতে দিতে

বললে—আইডিয়াটা যা ঢুকেছে, নিশ্চয়ই সিনেমার নায়ক হওয়া আর অগাধ টাকা রোজগার করে বড়লোক হওয়া। তা বেশ। ধনী হিসেবে নায়ক হিসেবে তোমার নাম-ডাক হলে আমার কথাটা মনে রেখো—অন্তত আজকের কথাটা। ঘুঁটের ধোঁয়া খেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার জন্য চা করে এনেছি। তোমার বড় কাপটা আমার ছোট কাপটা। অয়-যা কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল, তলায় তেল আর মশলা মাখা মুড়ির সরাটা—এতক্ষণে কাগে সাবাড় করে দিলো! যা মুখপোড়া কাগের দৌরাত্ম্য। আমাদের জায়গায় তারাই হয়তো কাঁউকাঁউ করে আরম্ভ করে দিয়েছে। ঝিলিক হাসি হেসে বেরিয়ে যায় রঞ্জনা।

—না মেয়েটা আমার হাড়মাস খেলে। নিস্তার নেই একটু স্থিরভাবে মাথা ঠাণ্ডা করে একটা চিন্তা করব—তা নয়, কোথা থেকে কোথা উড়ে এসে জুড়ে বসলো। রাবিস্। কথা জানে না। ম্যানার জানে না। জংলী। ঘুঁটে, ধোঁয়া, কান্না, ছোট কাপ, বড় কাপ। ননসেন্স। আবার তেল আর মশলা দিয়ে মাখা মুড়ি। ও একটা উইচ্। কাঁউ কাঁউ খাওয়ার মিউজিক দেখেছো? ইল্-লিটারেট, আনকালচারড্, প্রনানসেসান জানে না—কাককে বলে কাগ! যত সব।

—কিগো তারাদা আবার কি হল? বক-বক করছ কি? মুড়ির সরাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলতে লাগলো রঞ্জনা—বাঁল চোরের মত তাকিয়ে দেখছো কি? চুরি করে ধরা পড়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে। ভয় নেই আমি কাউকে বলব না গো, বলব না। এরকম সুযোগ আসলে দেবতাও সুযোগটা নেয়। আর তুমি ত মানুষ। দাঁড়াও জল নিয়ে আসি।

—বলে কি? সব দেখেছে। সব জেনেছে। একবার স্যায়না। এরকম শান্-সা মেয়ে হাজারে একটা মেলে। ভাগ চায় নাকি? গরীব কেরানীর মেয়ে টাকার গন্ধ পেয়েছে আর ছাড়ে। যাবে অর্ধেকটা। আবার পটলাটা ত আছেই। আমার কি হল শুধু বদনাম। তারপর আমার মায়ের কানে গেলেই হয়েছে। আর এ যা মেয়ে, ভাগ না দিলে, হয়তো মাকে সরাসরি বলেই দেবে। তবে ভাগের কথা এখন বলব না। শেষে দেখা যাবে।

—কি গো তারাদা, চুপ করে কেন, খাও। তোমার খুব ভয় হয়েছে না। তুমি বোকা, আমাকে তুমি বোঝ না? জ্যেঠিমার আদরে সোহাগে আর বুদ্ধির বলে বড় হয়েছ—নিজের বুদ্ধি খাটাতে হয়নি বলেই জীবন সম্বন্ধে অ্যাকেবারে অজ্ঞ। কে কি চায় তাই তুমি বোঝ না। আমি কি চাই তা তুমি বুঝতে পার না এখনও? আমি মেয়ে, তুমি পুরুষ। পুরুষের যা কাজ সে তা করে। কিন্তু তোমার উল্টো, তাই আমাকে লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে বলতে হচ্ছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলতে থাকে রঞ্জনা—তুমি মন খারাপ করো না, আমি জ্যেঠিমাকে কোন কথাই বলব না, আর বলা যায়ও না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধরা ধরা গলায় বলে—তোমার বয়েস হয়েছে, আমারও বয়েস হয়েছে। তোমার মনেতে যা চায় আমার মনেতে তাই চায়। তোমাকে না দেওয়ার আমার কিছু নেই, তোমাকেও কিন্তু দিতে হবে সবকিছু।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায় রঞ্জনা। তারাপদ ওর মুখের দিকে তাকায় চোখ বড় বড় করে। নোও ঠ্যালা! এখন বলে সবটা চাই। সব ওনাকে দিয়ে দিই তারপর আমি যেই তিমিরে সেই তিমিরে। আমার বদলে ওই তাহলে সবটাই জক দিতে চায়। আমিও টারাপদ চৌধুরী, কত ধানে কত চাল তাও আমার জানা আছে।

—তারাদা চা-মুড়ি খেয়ে নাও। কথা বলবে না বুঝি আমার সঙ্গে? তুমি এই রকম। তার মানে তোমার কাছ থেকে কিছুই পাব না! তুমি এই রকম?

দরকার নেই, যা ছিলুম তাই ভাল। রঞ্জনা মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসতে হাসতে উঠে এসে তারাপদর পিছনে দাঁড়ায়। তারাপদর কপালে তার হাতটা রাখে। তারাপদর মাথাটা রঞ্জনা তার বুকের ওপর চেপে ধরে। তারাপদ একটা নরম স্পর্শ অনুভব করে তার মাথায়। তারাপদর চোখটা বুজে আসে। মাথাটা পেছন দিকে আরো হেলিয়ে শিথিল করে দেয় শরীরটা। গালের মধ্যে দেওয়া মুড়ি চিবুতে যেন ভুলে যায়। মুখের মধ্যে আস্ত মুড়ি ভিজে নরম হয়ে যায়। রঞ্জনা মনে মনে একটা পুলক অনুভব করে। রঞ্জনা তার মুখটা তারাপদর মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

—ওরে ও খোকা কোথায় গেলি? গঙ্গাজলের ঘটিটা ধর ত দেখি, দুজনের চিন্তাধারা ছুটে যায় মুহূর্তে। রঞ্জনা মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে জ্যেঠিমার হাতের থেকে গঙ্গাজলের ঘটিটা নিজের হাতে নেয়। তারাপদ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, মায়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার শ্রদ্ধাভরে চোখ বুলিয়ে নেয়, নিজের মধ্যেই তারাপদর একটা পরিবর্তন এসে গেছে। মাও তার দিকে তাকিয়ে সেটা অনুভব করে। তারা-পদ বলে- সেকি মা, তুমি এর মধ্যে ফিরে এলে? চেতলা থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া-আসা হয়ে গেল এর মধ্যে—দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে।

ভক্তে কাপড়ের পুটলীটা ছেলের হাতে দিয়ে, দুটো হাত দুজনের [illegible] রেখে বলতে থাকেন—[illegible] বাপু, [illegible] টানলে যাওয়া যায় কি? অবশ্য গঙ্গাস্নান কালী-মায়ের দর্শন, পুজো দেওয়া [illegible] করলুম কালীঘাটে গিয়ে। উত্তরের বাস নাকি বন্ধ হয়ে গেছে গণ্ডগোলে। সেজন্যে কালীঘাটেই মায়ের কাজটা সারলুম। সবই সমান। এখানে যা, ওখানে তা—শুধু দরকার ভক্তি-নিষ্ঠা।

রঞ্জনা [illegible] নিজের মত করে নেওয়ার জন্যে বললে—জ্যেঠিমা চা খাবেন না?

দাঁড়া রে মা প্রসাদটা দিই। মাটির প্লেট থেকে প্রসাদ দিতে দিতে হঠাৎ তারাপদর মুখের দিকে অভিনিবেশসহকারে তাকায়, সন্দেহের সুরে বলেন— খোকা তোর মনটা এত উদ্বিগ্ন কেন রে?

মা ক্ষমাসুন্দরীর সামনে দাঁড়িয়ে অন্যায় চিন্তা তারাপদ আর করতে পারে না, তা কারোর চোখে পড়ুক না পড়ুক, তার মায়ের চোখকে এড়িয়ে যেতে পারে না তারাপদ।

হঠাৎ [illegible] করে তারাপদ তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে—মা, [illegible] একজোড়া সোনার গয়না আমার [illegible] রেখে গেছে—[illegible] গায়ে [illegible] পরার [illegible]

পরের জিনিস রাখলি কেন? যদি খোয়া যায়? যাক্ ওমা রঞ্জা, লক্ষ্মী মা আমার, হিটারটা ধরিয়ে এক কাপ চা করো তো মা। তোমার পিসি গেছে তোমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ী। পরে ফিরবে। ক্ষমাসুন্দরী আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়, রঞ্জনা ঘরের মধ্যে ঢুকে ভাঙা সাবেকী আয়নাটার সামনে দাঁড়ায়, পেছনে তারাপদ এসে আলতো করে ওর কাঁধে একটা হাত রাখে। রঞ্জনার সঙ্গে আয়নার মধ্যে দিয়ে চোখাচোখি হয়ে যায় তারাপদর। রঞ্জনার চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্‌ করে ওঠে। সাবেকী আয়নাটার মধ্যে দুজনের ছবি মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুজনের চোখে।

রঞ্জনা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায়—সরে দাঁড়ায়, এই তারাদা, হিটারটার প্লাগটা দিয়ে দাও, আমি কেটলিটা তলা থেকে নিয়ে আসি জল ভরে।

তারাপদ আমেরি চালে উত্তর দেয়—আমার বয়ে গেছে।

রঞ্জনা জিভ বার করে একটা ভেংচি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আয়নায় তার মুখ ভেসে ওঠে। তার মুখের আধুনিক হাসি ধরা পড়ে সাবেকী আয়নায়।

নেপালী লোকসাহিত্য

হরেন ঘোষ

লোক-সাহিত্য সম্পর্কে সম্প্রতিকালে আলোচনা ও গবেষণা চলছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সভ্য বিশ্বের প্রায় সর্বত্র আজ লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল। অথচ দীর্ঘদিন সাহিত্যের এই শাখাটি অনাদৃত অবহেলিত ছিল।

বাঙলা দেশের নানা প্রান্তের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট গবেষকবৃন্দ বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করছেন। এ বিষয়ে একাধিক সুলিখিত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। অথচ নেপালী লোক-সাহিত্য সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় রচিত কোন প্রবন্ধ চোখে পড়েনি। পশ্চিম বাঙলার উত্তরাঞ্চলে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য খণ্ডের তিনটি মহকুমায় অর্থাৎ দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং-এ নেপালী ভাষাভাষীর প্রাধান্য। নানা পার্বত্য অধিবাসী, যেমন তিব্বতী, ভুটানী, সিকিমী এবং ভারতের নানা প্রান্তের অধিবাসী এই অঞ্চলে বসবাস করলেও সংখ্যাধিক্য নেপালী ভাষাভাষীর। নানা উপ-ভাষা অধ্যুষিত বাংলাদেশে পাশাপাশি দুটি মূল ভাষা, বাংলা ও নেপালী—দুটি একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। একটু চেষ্টা করলেই যে কোন সুধী বাঙালী পাঠক নেপালী ভাষা বুঝতে পারবেন। উভয় ভাষার জননী এক—সংস্কৃত।

নেপালী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমার মমতা ও অনুরাগ আছে। আমি সব সময় স্মরণ রাখি বাংলা-সাহিত্যের আদি গ্রন্থ চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয় বা চর্যাপদ নেপাল রাজ-দরবারে সুরক্ষিত ছিল এবং সেখান থেকেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন। তুর্কী আক্রমণের সময় যখন বাংলা-দেশের অমূল্য সাহিত্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছিল, তখন বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাজ্য নেপাল সযত্নে বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রক্ষা করেছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নেপালী সাহিত্যের যোগাযোগ আজকের নয়, এক হাজার বছরের পুরোনো এ সম্পর্ক। বর্তমান প্রবন্ধে মূলে নেপালের লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে না—পশ্চিম বাঙলার উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য ভূখণ্ডের নেপালী ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত লোক-সাহিত্যের আলোচনা করা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ভাবে।

অলিখিত সাহিত্য মাত্রই লোকসাহিত্য। লোক-সাহিত্য প্রাচীন হলেও নতুন। প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের যোগসূত্র রচনায় লোক-সাহিত্যই একমাত্র উপায়। লোক-সাহিত্য লোকসমাজ সৃষ্ট সাহিত্য। সমষ্টির চেতনা ও চিত্ত নির্যাসে এর জন্ম। লোক-সাহিত্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের একক সৃষ্টি নয়, সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। লোক-সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। লোক-সাহিত্য মানবজাতির সংস্কৃতির একটি মূল্যবান উপকরণ। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিকাশে লোক-সাহিত্যের দান রয়েছে। কোন জাতির সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস যদি পরীক্ষা করতে হয়, তবে তার লোক-সাহিত্যকে বিচারের আয়ত্তে আনতে হবে।

নেপালী লোক-সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে লোক-সঙ্গীত ও প্রবাদ-প্রবচন। সরল ধর্মভীরু, সৎ গ্রাম্য নেপালী নর-নারীরা নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আনন্দে দিন কাটাতে ভালোবাসে। এরা উৎসবপ্রিয় জাতি, তাই যে-কোন উপলক্ষে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে চায়। থাকুক না অভাব অভিযোগ, দৈনন্দিন দুঃখ বেদনা তো থাকবেই, যতক্ষণ পারো হেসে-খেলে আনন্দে জীবনকে উপভোগ করে নাও। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, কর্মঠ, পার্বত্য জাতির হৃদয় কিন্তু পাষাণ নয়, সেখানে ফল্গু-ধারার মত প্রস্রবণের নির্মল রসনির্ঝর।

নেপালী লোক-সাহিত্যের মধ্যে লোক-গীতির স্থান মুখ্য। নেপালী লোকগীতি নানা পর্যায়ে বিভক্ত, নানা নামে পরিচিত।

ঝাউরে গীত—খুব সংক্ষিপ্ত প্রেম-সংগীত। নায়ক-নায়িকার মনোভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়। **সবাই গীত**—কাহিনী সংগীত। যে কোন বিষয়বস্তু নিয়ে কাহিনী গীত হয়ে থাকে। **মালসিরি**—প্রধানতঃ দুর্গাপূজার সময় গীত হয়। মহালয়া থেকে অষ্টমী পর্যন্ত গাওয়া হয়ে থাকে। অত্যন্ত জনপ্রিয় সংগীত। **জুয়ারী**—প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে কোন উৎসবে গাওয়া হয়। অনেকটা কবিগানের মত। তবে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হবে প্রেমিক-প্রেমিকা। **সাঙ্গিনী গীত**—গ্রামের বিবাহিত মহিলারা দলবদ্ধ ভাবে এই গান গেয়ে থাকে। যদি কোন বিবাহিতা মহিলা আহূত হয়েও এই গানের দলে যোগ না দেয়, তাহলে নাকি পরের জন্মে খোঁড়া হয়ে জন্মাবে। **রসিয়া গীত**—ক্ষেতে কাজ করার সময় সমবেত ভাবে এই গান গাওয়া হয়। **বালুন গীত**—রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী লোক-সঙ্গীতের সুরে গাওয়া হয়। **রত্যৌলি গীত**—বিবাহ বাসরে এই গান গাওয়া হয়। আদিরসপ্রধান এই গান। **নানী ভুলাউনে গীত**—বা ছেলেভুলোনো গান। এই গানে সুরের বৈচিত্র্য নেই, আছে আন্তরিকতা।

লোক-সঙ্গীতের রচয়িতার নাম জানে না কেউ, কবি বা রচয়িতা খ্যাতির জন্য লালায়িত নন—শুধু মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলেই তারা খুশি। নিজের মনের ভালোলাগাটুকু আর দশজনের মনে ছড়িয়ে দিতে পারলেই হল। নেপালী লোক-সংগীতে নগাধিরাজ হিমালয়ের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। ধ্যানমৌনী হিমালয়-বন্দনা অনেক লোক-সঙ্গীতের বিষয়। এ-ছাড়া প্রকৃতিবিষয়ক অজস্র সঙ্গীত আছে, যেখানে দেখি ঝর্ণার গান, কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়-চূড়োর ছবি, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, মাটি গাছ পাথর। আর আছে ধান, ভুট্টা—দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক খাদ্যবিষয়ক সংগীত।

এবার লোক-সঙ্গীতের আরো কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

লহরী লালী মাই—একটি জনপ্রিয় সংগীত। চৈত্র-বৈশাখে যখন ভুট্টার চারা লাগান হয়, তখন এই গান গাওয়া হয়। একজন একটি কলি গেয়ে যায়, তখন সম-স্বরে সকলে বলে—লহরী লালী মাই। দীর্ঘক্ষণ এই গান গাওয়া যেতে পারে।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ধান রোপণের সময় গাওয়া হয় **'অসারে গীত'**। নায়ক-নায়িকা কথোপ-

কথনের ভঙ্গিতে গেয়ে থাকে এই গান। যেমন নায়িকা বলেঃ—

ধান হৈ রোপন, ছুপুমা ছুপু
অসারকো মাসমা

বাজাকো বেটি মো কম্নে কেটি,
বাঁচনু ছ আশমা।'

কুমারী কন্যা আমি, কেমন জীবন-সঙ্গী পাব জানি না। ধান বুনছি আর আশায় আশায় দিন গুনছি।

অগ্রহায়ণ মাসে ধান মাড়াইয়ের সময় গাওয়া হয় **রাশি গীত।**

মারুণী গীত—বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। এই গানের সঙ্গে নাচ থাকবেই। এই নাচ ও গান কালী পুজোর অমাবস্যা থেকে একাদশী পর্যন্ত চলে।

মাদলে গীত বারো মাস গাওয়া চলে। গানের সঙ্গে মাদল বাজান হয়। সেলো বা **ডম্ফু গীত**—নেপালের উত্তরে হিমালয়ের কোলের আদিবাসী তামাংদের নিজস্ব সংগীত। যারা ভেড়া পালন করে সেই গোয়ালাদের নিজস্ব সঙ্গীতের নাম 'টুংনা'। দোতারার মত বাদ্যযন্ত্রের নাম টুংনা। সেটি বাজিয়ে এই গান গাওয়া হয়।

বিবাহের সময় বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের লোকদের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতা চলে কবিতার মাধ্যমে। এই গানের নাম **কবিত্ত।** পূর্ব নেপালের আদিবাসী রাই ও লিম্বু শ্রেণীর নিজস্ব সংগীত পালাম। এই গানকে কর্ম-গীতও বলা হয়। যে-কোন পুজো-পার্বণ বা যাগ-যজ্ঞের পর গাওয়া হয় খেঞ্জোর ভজন। মূলত ধর্ম-সংগীত, এবং পুরুষেরাই গেয়ে থাকে।

ভদৌরে বা তীজ—ভাদ্র মাসে বাড়ির মেয়েদের কুমারী বা বিবাহিতা—আদরযত্ন করে খাওয়ান হয় এবং এই গান গাওয়া হয়। আর কয়েকটি জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীতের নাম হল—সিলোক, ভজন, দোহা, লক্ষ্মৌর হাকপারে, খ্যালী, মুনধুম, চূড়াকে ইত্যাদি।
তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুপ্রচলিত দেওসী ও ভৈলো সংগীত। দেওসী উৎসবের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। একদল বলেন দেওসীর মূলে দেবশ্রী। রামচন্দ্রের সিংহল বিজয়কে কেন্দ্র করে এই উৎসব। অন্যদল বলেন, বলিরাজা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন —তোমার পা রাখ আমার শিরে। অর্থাৎ দাও শিরে। কালীপুজোর রাত্রে লক্ষ্মী-পুজো করা হয়। তার পরদিন থেকে চলে এই উৎসব। দল বেঁধে গাঁদাফুলের মালা গলায় পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাঙ্গলিক গান গায় ছোটবড় সবাই। দীর্ঘক্ষণ চলতে পারে এই গান। একজন মূল গায়েন আরম্ভ করে, আর সবাই সমস্বরে ধুয়ো দেয়—দেও শিরে। অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। নমুনা দেওয়া যাক—মূল গায়েন বলে—ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি, সঙ্গীরা বলে দেও শিরে। মূল গায়েন বলে—কেকো ঝিলিমিলি, সবাই বলে—দেও শিরে। এইভাবে চলতে থাকে। ফুলোকো ঝিলিমিলি—দেও শিরে, রাতো মাটো—দেও শিরে, চিপলো বাটো—দেও শিরে। চারিদিকে আলোর রোশনাই, শুভ শরৎকাল, তোমার দরজায় এসেছি আমরা, নিজেরা আসিনি, বলী রাজার আদেশে এসেছি—আমাদের দক্ষিণা দাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। এবার চলে আশীর্বাদের পালা। তুমি রাজা হবে দু-দশ টাকা ইঁদুরেও নিয়ে যায়, তুমি দাতাকর্ণ আমরা জানি—অতএব চটপট দিয়ে দাও। দলের সঙ্গে খোল করতাল মাদল থাকে অনেক সময়। লক্ষ্মীপুজোর রাতে মহিলারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভৈলো গান গায়। এটিও মাঙ্গলিক গান। সারারাত চলে এই গানের আসর। গানের মর্মার্থ খুব হৃদয়গ্রাহী।

নেপালী লোক-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শাখা লোকসংগীত। এ-ছাড়া আছে নানা গাথা, কিংবদন্তী, প্রবাদ প্রবচন ছড়া।

কথায় কথায় ছড়া কাটে এরা, প্রবাদ আওড়ায়। বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই বেশি ব্যবহার করেন। প্রবাদকে বলে উখান। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(১) অন্ধারো'কা কাম, খোলা'কো গীত—অন্ধকারে কাজ করা, ঝরণায় গান গাওয়ার মত অর্থহীন।

(২) আকাশলাই থুকা আপনৈ মুখমা ছিটা—আকাশে থুথু দিলে নিজের মুখেই পড়ে।

(৩) অখি সম্ঝে সদা সুখী, পছি সম্ঝে সদা দুখী—যে আগে চিন্তা করে সে সর্বদা সুখী হয়, যে পরে ভাবে সে সর্বদা দুঃখী।

(৪) অদুয়া খাই শহর পসনু, মূলা খাই বন পসনু—আদা খেয়ে শহরে প্রবেশ করবে মূলো খেয়ে বনে যাবে। অর্থাৎ আদার গন্ধ ভালো, মূলোর গন্ধ ভালো নয়। (৫) আফৈ বকাস, আফৈ ধামী—নিজেই ভূত নিজেই ওঝা। (৬) বন ডা'কো সবৈলে দেখছন, মন ডড়েকো কসৈলে দেখতৈন—বন পুড়লে সবাই দেখতে পায়, মন পুড়লে কেউ দেখে না। বড়ু চণ্ডী-দাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রাধার উক্তি মনে পড়ে যায়। রাধা বলছেন, 'বন পোড়ে আর বড়াই জগজনে জানি, মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভরের পনী'। (৭) ন হুনে মামা ভন্দা কানৈ মামা নিকো—নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। (৮) ধন হুনেকো মন হৈন মন হুনেকো ধন হৈন—ধনবানের মন নেই, যার মন আছে তার অর্থ নেই। (৯) কাটেকো ঘাউমাথি নুনচুক—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। এমনি অজস্র প্রবাদ প্রচলিত আছে। অধিকাংশ প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের মিল আছে।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে নেপালী লোক-সাহিত্যের আলোচনা শেষ করার আগে দুটি জনপ্রিয় নেপালী লোকসংগীতের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ দিচ্ছি। "মাটিই আমার মা, মাটিই আমার বাবা, মাটিই আমাদের অন্ন দান করে। আমি মাটিকে ভালোবাসি, সম্মান করি, মাটি-মা আমার ধন্য।" হিমালয় সম্পর্কে প্রচুর গান আছে। একটি সুপরিচিত গান—

'হিমালয় শিখরের অপর পারে
ঝরে বরফ জমবে—

প্রবাহিত জলধারা, উধাও মন আমার
কোথায় গিয়ে থামবে?

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

অঙ্গনা

মেয়েদের কর্মসংস্থান

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের তথ্য থেকে একটি পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে। যার বিষয়বস্তু কিনা চাকরি ও জীবিকার লড়াইয়ে মেয়েদের অগ্রগতি। তাতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যবিশেষে চাকরির প্রবণতায় মেয়েদের মধ্যে কিছুটা ফারাক। দেশের সর্বত্র মেয়েদের ঝোঁক এক রকম নয়। তাই দেখা যায়, যে, কেরলা ও আসাম অন্য রাজ্যের তুলনায় তাদের মেয়েদের চাকরির সুযোগ অনেক বেশি দিয়ে থাকে। অথচ রাজ্য দুটি শিল্পে অনগ্রসর। কিন্তু দুই রাজ্যই আবার বাগিচা শিল্পে সমৃদ্ধ। এবং যে কোন শিল্পের চেয়ে বাগিচা শিল্পে মেয়েরা অনেক বেশি কাজ পায়।

এ ব্যাপারে কিন্তু মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের চিত্র ভিন্ন। এসব রাজ্যে শিক্ষিত মেয়েরা বেশি করে ঝুঁকছে চাকরির দিকে। আবার শিক্ষিতের হারে কেরালা ভারতের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। তাই এই রাজ্যের শিক্ষিত মেয়েদেরও ঝোঁক চাকরির দিকে। সর্বশেষ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত মেয়েরা চাকরির ১৩-১ শতাংশ দখল করেছিলেন।

সর্বমোট হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, ভারতের সুসংহত সংস্থায় নিযুক্ত প্রতি দশজনের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা একের অধিক। কৃষি এবং বনাঞ্চলের কাজে নিযুক্ত প্রতি দশজনের মধ্যে প্রায় চারজনই মেয়ে। খনির অভ্যন্তরে মেয়েদের কাজ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বাইরের কাজে তাদের অংশ নিতে বাধা নেই। এ-কাজেও মেয়েদের হার খুব একটা খারাপ নয়। ৯-১ শতাংশ মেয়েরা এখানে নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে। এ পর্যন্তই মেয়েদের সব কাজের হিসেব সমাধা হলো এমন নয়। সর্বত্রই তারা ছড়িয়ে পড়েছে এবং নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। কোন কিছু তৈরি হয় এমন শিল্পে মেয়ে কর্মীর হার ৮-৫ শতাংশ।

এই হলো মেয়েদের সামগ্রিক কর্মসংস্থানের চিত্র। অনেকেই হয়তো এই চিত্র দর্শনে উঃ আঃ করবেন। মনে মনে ভাববেন অথবা চিৎকার করে গলা ফাটাবেন, ছেলেদের চাকরির সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। এই মনোভাবের বদল সম্ভব শুধু সমানাধিকারের সুপ্রয়োগে। সমানাধিকার চলছে কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা তেমন বাড়ছে না। তাই মেয়েদের চাকরিবাকরিতে অগ্রগতির সংবাদে অনেকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কেউ কেউ এটাকে সুনজরে দেখতেও রাজি নন। তাঁদের বক্তব্য, মেয়েরা গৃহকোণেই থাকুক। ছেলেমেয়ে সামলান, হেঁসেল ঠেলুন। বছর বছর আঁতুড়ঘর ঘুরে আসুন। আর সমাজ-সংসার এবং জীবন-জীবিকার দায়িত্বটা বরাবরের মতো বহন করুন বৃষস্কন্ধ পুরুষেরা।

কিন্তু আর তা হবার নয়। সমাজের তৈলচিত্রে নতুন প্রলেপ পড়েছে। এ অবস্থায় সবাইয়ে সবাইয় সংস্থান করে নিতে হবে। অপরের ভরসায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে কোন কাজ হবে না। তাতে বরং পস্তাতেই হবে। তাই আজ দ্রুত সবকিছু বদলে যাচ্ছে। অর্থনীতিক দিক থেকে মেয়েরা ক্রমেই সচেতন হচ্ছে। জীবন এবং জীবিকার লড়াইয়ে তাদের ন্যায্য পাওনাটা বুঝে নিতে তারা তৎপর। এক্ষেত্রে এখনো যেটুকু অস্পষ্টতা রয়েছে সেটুকুও কেটে যাবে। এবং সময়ের ধারানুসারে আমাদের আশা, সাফল্যের চিত্র আরও সমুজ্জ্বল হবে আরো অনেক মেয়ের কলহাস্যে।

জীবনধারণের জন্য প্রাণপাত সংগ্রাম চলছে। আর সে চিত্র পরিষ্কার করার জন্য চাকরি-বাকরির বাইরে দৃষ্টিপাত করতে হবে। তাহলেই সংস্কারের ভূতটা অনেকখানি হাল্কা হবে।

প্রতিদিন ফুটপাথে চলার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের। সেদিনও ফুটপাথে যেমন ভিড় আজও তেমনি। অবস্থার পরিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টা একটু বেড়েছে এই যা। হয়তো আরো বাড়বে। ফুটপাথে সেদিনও দোকান পশারের ভিড় ছিল। হকাররা ফুটপাথের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতেন। নানা পণ্য শোভা পেতো। আজও সে ছবি অক্ষুণ্ণ আছে। ঘটেছে কিছু নতুন সংযোজন।

ফুটপাথে পশরা সাজিয়ে বসতে সেদিন মেয়েদের দেখা যায় নি। এখন কিন্তু এমন চিত্র আর দুর্লভ নয়। বিশেষ, অফিসপাড়ার ফুটপাথে। চুপচাপ ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকলে নজর পড়বে একাধিক মহিলাকে। জীবন এবং জীবিকার সংগ্রামে যাঁরা রাজপথ বেছে নিয়েছেন। এঁদের অধিকাংশই হলো লটারির টিকিট বিক্রেতা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে লটারির টিকিট বিক্রি করছে। কোন সংকোচ বা জড়তা নেই। দিব্যি খদ্দেরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারপর চার্ট বের করে দেখিয়ে দিচ্ছে, এখান থেকে টিকিট কিনে ক'জনের ভাগ্য নতুন পথে মোড় নিয়েছে। এরকম অসংখ্য লটারির টিকিট বিক্রেতা মহিলার সন্ধান পাওয়া যাবে ফুটপাথে। শুধুমাত্র চাকরির পথ চেয়ে তারা থাকে নি। নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিতে চেয়েছে এবং সফলও হয়েছে।

আবার কেউ কেউ অন্যভাবেও নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখছে। তারা ফুটপাথের ভিড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে চায় নি। একই জীবিকায় ভিন্নতর পথ অবলম্বন করেছে। তারা অফিসে অফিসে ঘুরে বিক্রি করছে লটারির টিকিট। হয়তো আপনি চেয়ারে বসে আছেন, এমন সময় একটি মেয়ে আপনার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অনুরোধ করবে একটি লটারির টিকিট কিনতে। আপনি কিনতে রাজি না হলেও সে প্রায় নাছোড়বান্দা। নানাভাবে বুঝিয়ে টিকিট ঠিক বিক্রি করবে। সেলস গার্লের সব কায়দাই তার জানা। তাই টিকিট বিক্রি করতে তার বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়। হয়ও না।

এসব মেয়েদের অনেকেই লেখাপড়া জানা। এক এবং একাধিক পরীক্ষার চৌকাঠ অনেকে ডিঙিয়েছে। চাকরীর আশায় থেকে থেকে হন্যে হয়ে গিয়েছে। তারপর নিজের পথ নিজেই করে নিতে এগিয়ে এসেছে।

অফিসপাড়ায় এমনি কিছু মেয়ে আবার দেখা যায়, যারা খাবার বিক্রি করে। এদের সংখ্যা এখনো তেমন বাড়ে নি। তবু যে ক'জন আছে তারা বেশ জাঁকিয়েই ব্যবসা করে। অনেক খদ্দের তাদের নিয়মিত। টিফিন আওয়ার্সে খদ্দের সামলাতে তারা হিমসিম খায়। এরা আসে কলকাতার ধারকাছ থেকেই। এদের মধ্যে দু-একজন বিবাহিতও। তাদের স্বামীরা হয়তো কাজ করেন কলে-কারখানায়। আর সেই সুযোগে ফুটপাথে ব্যবসা করে স্বামীর আয়ে কিছু জোগান দিয়ে সংসার স্বচ্ছল করছে। না হলে সব অচল।

শুধু ফুটপাথে বসেই এরা ব্যবসা করছে না। কেউ কেউ অফিসে ঘুরে খাবার বিক্রি করে। তবে যারা ফুটপাথে বসে তারা সেখান থেকে কেউ নড়ে না। যারা ফুটপাথের ভিড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে রাজি হয় নি অথবা জায়গার অভাবে সুবিধা করতে পারে নি তারা যায় অফিসে অফিসে, টেবিলে টেবিলে। অনেকেই ইদানিং এই খাবার পছন্দ করছেন। ঘরে তৈরি খাবার দিয়ে ক্ষিধে মেটাতে সবাই চান। তাই এসব মহিলার পরিবেশিত খাবারকে সবাই স্বাগত জানিয়েছেন।

লটারির টিকিট আর খাবার শুধু নয়। কেউ কেউ আবার অন্যভাবেও ফুটপাথে লাক ট্রাই করছেন। রীতিমতো রেডিমেড জামা-কাপড়ের দোকান। এ রকম দৃশ্যও এখন চোখে পড়ে। অথচ এভাবে জীবন এবং জীবিকার লড়াই চালাতে হবে মেয়েদের সেকথা কারো জানা ছিল না। সমানাধিকার হওয়ার পরেও। কিন্তু নিরুপায় হয়েই নতুন উপায়ের ভাবনা ভাবতে হয়েছে বারে বারে। আর তারপরই অবশ্যম্ভাবী নতুন পথের নির্দেশ। এবারও ঠিক তাই হয়েছে। চাকরিবাকরির দরজা যখন একে একে দুরতিক্রম্য হয়ে উঠছে এখন মেয়েরা ভাবছে নতুন পথের কথা। এবং ভেবে ভেবে অফিসের আরামের আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে সরাসরি নেমে এসেছে ফুটপাথে। এক নিমেষে সব সংকোচ সব দ্বিধা দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে।

তাই মেয়েদের কর্মসংস্থানের অগ্রগতিতে এদের অলিখিত স্থান নির্দিষ্ট হয়ে রইলো। সে স্থান থেকে এদের কেউ সরাতে পারবে না। ভবিষ্যতে এখান থেকেই আসবে মেয়েদের নতুন পথনির্দেশ। আর সে নির্দেশই হবে আমাদের শিরোধার্য। সংকোচ এবং সংশয়ের দ্বিধা এরাই কাটিয়েছে। এরা তাই আমাদের নতুন পথের দিশারী। পথিকৃৎ।

—প্রমীলা

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

কল্পনা দিয়ে গড়া জীবনী আলেখ্য

স্ব-রচিত রামায়ণের সঙ্গে কবি কৃত্তিবাস যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখোপাধ্যায় বংশে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে রবিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল বনমালী ওঝা, মাতা মালিনী দেবী। পিতামহ মুরারি ওঝা সুপণ্ডিত ছিলেন। আরও জানা যায়, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বড়গঙ্গা পার হয়ে গুরুগৃহে গমন করেন এবং শিক্ষান্তে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করে তিনি গৃহে ফিরে আসেন। পরে কোনো এক গৌড়েশ্বরকে আটটি স্বরচিত শ্লোক উপহার দিয়ে তাঁর সভাকবির সম্মান লাভ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সংক্ষিপ্ত আত্মচরিতের ওপর নির্ভর করে কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনীচিত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এবং এটা জানা আছে বলেই **রামায়ণ চিত্রম-এর নিবেদন 'মহাকবি কৃত্তিবাস'-এর** কাহিনী-সংকলয়িতা মন্টুকুমার মিত্র তথ্যের চেয়ে ঢের বেশী নির্ভর করেছেন কল্পনাশক্তির ওপর। তাই তিনি ধরে নিয়েছেন, রামসীতার চিরবিরহের কাব্য রচনার জন্যে কবির নিজের জীবনে বিরহের প্রয়োজন আছে এবং সেই বিরহ আনয়নের জন্যে তাঁর আদরিনী স্ত্রী স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করেছিলেন। স্ত্রী-বিরহকাতর কৃত্তিবাস কিন্তু এর ফলে এমনই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি মনকে সংযত করে লেখনী ধারণ করতে পারছিলেন না কোনো-মতেই। এমন সময়ে তাঁর জীবনে দেখা দেয় দুঃখের সমুদ্রে অবগাহন-করা এক সদানন্দ পুরুষ, যে কবিকে সাহচর্য দিয়ে তাঁকে ঠিক পথে চালিত করে। ইতিহাস বলে, কবির আত্মচরিতের গৌড়েশ্বর হচ্ছেন আসলে তাহেরপুরের কংসনারায়ণ। কিন্তু ছবির কাহিনীকার তাঁকে করেছেন রাজা গণেশ। অবশ্য ছবির নব্বই ভাগ যেখানে কল্পনা-নির্ভর, সেখানে কিছুতেই কিছু যায় আসে না। বাঙালীর যেখানে কোনো তথ্যনির্ভর সামাজিক ইতিহাস নেই, সেখানে 'মহাকবি কৃত্তিবাস'-ছবিটিকে আমরা একটি সম্পূর্ণ কল্পনানির্ভর পৌরাণিক চিত্ররূপে দেখেই খুশী থাকতে বাধ্য। কবির জীবনে বিরোধ আনবার জন্যে কবিপত্নীর আত্মনির্বাসন এবং কালীমন্দিরের সেবিকার কাছে গোপনে অবস্থানের সময়ে সেখানে কবির আকস্মিক আগমনে তাঁর উদ্বেলভাব প্রভৃতি পরিস্থিতি রচনার মধ্যে কিছুটা নাটকীয়তা আনবার চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। তবে ছবিটির বিস্তার ঘটেছে মোটের উপর দৈববাণীর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে এবং সেই কারণে এটি কাহিনীই হয়েছে, নাটক হয়নি।

ছবিটিতে কোনো শিল্পীরই চূড়ান্ত রকম নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশের বিশেষ সুযোগ না থাকলেও কবিপত্নীর ভূমিকায় লিলি চক্রবর্তী প্রাপ্ত সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো দৃশ্যে তাঁর দরদী অভিনয় চিত্তস্পর্শী। নামভূমিকায় অসীম-কুমার কবির রূপটিকে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে। সদানন্দের ভূমিকায় সুমন মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। এছাড়া শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষাগুরু), তরুণ-কুমার (বনমালী ওঝা), পশুপতি কুণ্ডু (গোবিন্দ), কুমারী চিত্রাণী মুখোপাধ্যায় (বালিকা বয়সে কবি-স্ত্রী), গীতা প্রধান (কালীমন্দিরের সেবিকা), রবীন বন্দ্যো-পাধ্যায় (রাজা গণেশ), ভোলা পাল, পদ্মা দেবী প্রভৃতি স্ব-স্ব ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মধ্যমানের। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলার সাধারণ নরনারী ও রাজারাজড়ারা কি ধরনের পোশাকপরিচ্ছদ পরতেন বা তখন রাজপ্রাসাদ, সাধারণ গৃহস্থের বাসগৃহ প্রভৃতি কেমন ছিল, তা জানবার বোধ করি কোনোই উপায় নেই। তাই ছবিটিতে এমন পোশাক ও স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে, যা সচরাচর আমরা বাঙলা পৌরাণিক ছবিতেই দেখতে অভ্যস্ত। ছবিটির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। বিজনবালা ঘোষ-দস্তিদার দ্বারা বিশুদ্ধ তানলয়সমন্বিত সুরারোপিত গানগুলি মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে অত্যন্ত চিত্তহারী ও শ্রুতিসুখকর হয়েছে।

কম কিউ আউর কাঁহা/ববিতা

এখানে পিঞ্জর/অপর্ণা সেন এবং গঙ্গাপদ বসু। ফটো ঃ অমৃত

রামায়ণ চিত্রম-এর নিবেদন মহাকবি কৃত্তিবাস সংগীতসমৃদ্ধ ও ভক্তিরসপ্লাবিত হওয়ায় জনচিত্তগ্রাহী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দর্শকহৃদয়-জয়-করা পাঞ্জাবী ছবি

ভবনদী উত্তরণ হবার তরী হচ্ছে নামগান। **এস, দীক্ষিত-এর নিবেদন পান্না-লাল মাহেশ্বরী প্রযোজিত এবং রাম মাহেশ্বরী রচিত ও পরিচালিত কল্পনালোক-এর** পাঞ্জাবী ছবি 'নানক নাম জাহাজ হ্যায়' বলছে গুরু নানকের নামই হচ্ছে সংসার সমুদ্র পার হওয়ার একমাত্র জাহাজ। ছবির গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে এই কথাটাই শোনানো বটে, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবেন, ছবিটি আদৌ প্রচলিতভাবে ধর্মমূলক ছবি নয়। সোজাসুজিভাবে ছবিটিকে জুড়ে রয়েছে দুই বন্ধুর কাহিনী। বন্ধু হলে কি হবে, বয়সে বড় গুরুমুখ সিং ছোট প্রেম সিংকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতো দেখে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে গুরুমুখ প্রেমের বিবাহ দিল এক ধনীর বিলাসিনী কন্যার সঙ্গে এবং বিবাহের এক বিশেষ শর্ত অনুযায়ী ঐ ধনীকন্যার ভাই শংকাও এল বোনের সঙ্গে ওদের বাড়ীতে বাস করতে। শংকা ছিল ক্রুর প্রকৃতির। সে যখন দেখল, গুরুমুখের বাচ্চা ছেলে গুরমিতকে ওর বোন অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করতে শুরু করেছে, অথচ ওর নিজের কোনো ছেলেপুলে হচ্ছে না, তখন সে বোনকে আড়ালে ডেকে বললে, তোমার স্বামীর বিষয়সম্পত্তি সবই তো ওদের হয়ে যাবে; তোমার নিজের ছেলে হল না, গুরমিতকে নিয়ে তোমার আশের মিটবে? প্রথমটা শংকার কথায় কর্ণপাত না করলেও ক্রমেই প্রেমের স্ত্রীর মনে বিষক্রিয়া চলতে লাগল। এমনকি নিজের মাসীর মেয়ে চান্নির সঙ্গে গুরমিতের বিবাহের যে-প্রস্তাব সে নিজেই করেছিল তাও সে বানচাল করে দিতে চাইল এবং রাগের বশবর্তী হয়ে সে গুরমিতের হাত থেকে সরবতের গেলাসটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার এই কাজের ফলে গুরমিত তার চোখে আঘাত পেল এবং অন্ধ হয়ে গেল। এই ঘটনায় স্ত্রীর ওপর রেগে গিয়ে প্রেম তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে গুরুমুখ তাকে এই বলে নিরস্ত করল যে, সবই ভগবানের পরীক্ষা। এর ওপর গুরমিত যখন বললে, কাকী যাই করে থাকুন না কেন, তিনি তার মা, তখন প্রেমের স্ত্রী অবাক হয়ে গেল। তার জীবনে এল পরিবর্তন। সে বললে, বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে প্রার্থনা করে সে গুরমিতের অন্ধত্ব ঘোচাবে। চান্নি কাকীর অনুমতি নিয়ে ছেলের বেশে ওদের সঙ্গ নিল। হঠাৎ একদিন যখন গুরমিত বুঝতে পারল যে, যে-ছেলেটা সারা পথ ওর সেবা করে এসেছে, সে হচ্ছে চান্নি, তখন কাকী গুরমিতকে রাজী করালেন চান্নিকে বিবাহ করতে। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে চান্নি গুরমিতকে জানাল, সে ব্রত গ্রহণ করেছে, যতদিন না গুরমিত তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, ততদিন সে কৃচ্ছসাধন করবে এবং যদি গুরমিত তার চোখ ফিরে না পায়, তাহলে সে নিজে অন্ধত্ব বরণ করবে। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের দয়ায় অবশ্য গুরমিত তার চোখ ফিরে পায় এবং অপরাধিকে দুষ্ট শংকার চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

—এই গার্হস্থ্য কাহিনীটির আনন্দ-বেদনাকে একটি সুগঠিত চিত্রনাট্যের সাহায্যে এমন অপরূপভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে পাঞ্জাবী ভাষার অ-আ-ক-খ না জানা সত্ত্বেও ছবিটিকে বুঝতে এবং উপভোগ করতে আমাদের খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

ছবিটির আরম্ভ করা হয়েছে, সারা ভারতে অনুষ্ঠিত নানক জন্ম পঞ্চশত-বার্ষিকী উৎসবগুলিকে চিত্রিত করে। এই উৎসবে যোগ দিতে দেখা গেছে আমাদের রাষ্ট্রপতি ব্যাহগিরি ভেংকটাগিরি থেকে শুরু করে সীমান্ত গান্ধী খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁ পর্যন্ত। ওরই ভিতর থেকে প্রথম দেখা পাওয়া গেল ধর্মপরায়ণ গুরুমুখ সিংয়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবির কাহিনীরও হল আরম্ভ। শেষের দিকে যখন গুরমিতের কাকী তার অন্ধত্ব সারাবার জন্যে তাকে নিয়ে সকল শিখতীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন ভারতীয় গুরুদ্বারগুলি দেখে দর্শসাধারণ —বিশেষ করে শিখধর্মীয়রা—অত্যন্ত পুলকিত হন।

ছবিটিতে প্রতিটি শিল্পী অভিনয় ব্যাপারে যে আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। ধর্মের প্রতি চলচ্চিত্রশিল্পীদের কি অপরিসীম নিষ্ঠা, তার অকাট্য প্রমাণ এই ছবিটি। ছবির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে, সর্দার গুরুমুখ সিংয়ের ভূমিকায় ষাটোর্ধ পৃথ্বিরাজ কাপুরের প্রাণ-ঢালা অভিনয়। গুরুমুখ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু সংসারের উদ্যান থেকে রসআহরণে সে বিমুখ নয়। প্রেম সিংয়ের নবপরিণীতা স্ত্রীর আগমনে যুবকযুবতীরা যখন নেচেগেয়ে আনন্দে গা ভাসিয়েছে, তখন প্রৌঢ় গুরু-মুখও যেন তার বিস্মৃতপ্রায় যৌবনকে ফিরে পেয়েছে; সে তার স্ত্রীকে ডেকে গান ধরতে বলল। বুড়ো হয়ে মরতে চলেছ, রস যায়নি এখনও, বলে স্ত্রী দূরে সরে গেল। কিন্তু গুরুমুখের আনন্দ তার মধ্যেও সংক্রামিত হতে দেরী লাগল না। ওরা দু'জনেই নেচে-গেয়ে তরুণতরুণীদের আনন্দকে উদ্দাম করে তুলল। এবং আমরা অবাক হলুম এক নতুন পৃথ্বিরাজকে দেখে। এই ভূমিকাটি পৃথ্বিরাজের সুদীর্ঘ অভিনেতৃজীবনের একটি দিকস্তম্ভ হয়ে রইল। আমরা বুঝি না, এই ভূমিকাভিনয়ের পরেও তিনি এবছরের ভরত পুরস্কার পেলেন না কেন? গুরুমুখের স্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী বীণাও অসামান্য দরদী অভিনয় করেছেন। চান্নিরূপিণী ভিম্মী মাধুর্যোজ্জ্বলা; পুরুষবেশে সে চিত্তাকর্ষী। প্রেমের স্ত্রীর ভূমিকায় নিশি চরিত্রটির পরিবর্তনশীল রূপকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। প্রেম সিং ও গুরমিত বেশে যথাক্রমে সুরেশ ও সোম দত্ত চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। দুষ্ট শংকার ভূমিকায় আই, এস, জোহর এককথায় অনবদ্য; তাঁর ক্ষণে ক্ষণে আয়না দেখার বাই মনে রাখবার মতো। অপরাপর ভূমিকায় জাগীরদার, ডেভিড, তেওয়ারী প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কি বাহিদৃশ্য, কি অন্তর্দৃশ্য—ছবির প্রতিটি দৃশ্যকেই চূড়ান্তভাবে বাস্তব বলে মনে হয়েছে; সিনেমার কৃত্রিমতার ছাপ নেই কোনোওখানে। ছবির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। ভর্মা মালিক রচিত গানগুলিতে অনবদ্য সুরারোপ করেছেন এস, মহীন্দ্র। সুরকার হিসেবে তিনি যে অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন, তার প্রমাণ, তিনি এবারে শ্রেষ্ঠ সুরকার রূপে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন।

গুরু নানক প্রবর্তিত সদ্ধর্ম প্রচারের সঙ্গে প্রমোদোপকরণ কি আশ্চর্য কৌশলে মিশ্রিত করা যায়, তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ কল্পনালাকের নানক নাম জাহাজ হ্যায় চিত্র।

স্টুডিও থেকে

সংস্কার বা কুসংস্কার যাই বলুন —ঐ বস্তুটি টালিগঞ্জের ফিল্মল্যাণ্ডে আছে প্রচুর পরিমাণ। রাত-বিরেতে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সহযোগে এখানে ছবির শুভমহরৎ হয়, শুভমুক্তির সময়ও প্রায়শঃই প্রথম শ্রেণীর মুসাফিরখানায় খানাপিনার বন্দোবস্ত মন্দ হয় না। বাইরের চাকচিক্যে পুরোপুরি আপ-টু-ডেট আর কি! কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাঙ্গালীয়ানার সংস্কার (নাকি কুসংস্কার!) আছে পুরোপুরি।

তাই কোন পরিচালককে যখন দেখি টেক্ নেওয়ার পূর্বমুহূর্তে হাঁচি পড়ার জন্য কিছু সময়ের জন্য কাজ বন্ধ রাখেন বা কোনো শিল্পী যখন বিশেষ কোনো তারিখ বা দিনে স্যুটিং করেন না—তখন অবাক হই না, ভাবি এঁরা কাঁচের ঘরের মানুষ হলেও অন্তরে এঁরা বাঙালীই। সুচিত্রা সেন এ-পর্যন্ত কোনো ছবির মহরৎ-শিল্পী হয়েছেন বলে আমি দেখি নি। অন্ততঃপক্ষে সাম্প্রতিক কালে তো নয়ই। 'মেঘকালো' বা 'নবরাগ' দুটো ছবিরই মহরতে অন্য শিল্পী কাজ করেছেন। জানি না শ্রীমতী সেনের মহরতের দিন সম্পর্কে কোনো সংস্কার আছে কিনা।

থাকলেও তিনি তা কাটিয়ে উঠেছিলেন গত দোসরা অকটোবর। ঐদিন 'ফরিয়াদ' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে গল্পের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক বিজয় বসু। সহাস্যে তিনি ক্যামেরার পেছনে গিয়ে লুক থ্রু করার পর শ্রীমতী সেন মুহূর্তখানেকের জন্য যেন কি ভাবলেন। তারপর টেক হোল। একবারেই 'ও-কে' হতেই হবে। তারপর প্রসাদ বিতরণ ও মিষ্টিমুখ পর্ব ও আলোচনা ইত্যাদি।

মহরতের দিন স্টুডিওতে ভিড় কম হয় নি। সলিল দত্ত, গীতালী রায় (দত্ত), বিকাশ রায়, চিরতরুণ চিরঅম্লান, সদাহাস্যময় পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ অনেকেই এসেছিলেন। প্রযোজক শ্রীদেবনাথ রায় কোনো ত্রুটি রাখেন নি এই নতুন ছবির মহরৎকে একটা 'ইভেন্ট' করে তুলতে। মহরতের শর্ট সুচিত্রা সেনের আবির্ভাব ছিল অনুষ্ঠানের এক নম্বর ইভেন্ট, দু নম্বর ইভেন্ট হোল পাহাড়ীবাবুর হকচকিয়ে যাওয়া টপলেস পোশাক। এটা নাকি তাঁরই আবিষ্কার।

পোশাক পরিচ্ছদে পাহাড়ীবাবু নতুনের দিশারী বলা যায়। কিছুদিন আগে নাম বলী দিয়ে একটা শার্ট তৈরী করেছিলেন তিনি। বাটিকের ছাপা শার্টও দেখেছি তাঁর গায়ে কিছুদিন। মূর্তিমান চলন্ত পুরুষ ম্যানিকুইন তিনি। যদি কোনো দিন হিন্দুস্থান পার্কে তাঁর বাড়ী যান দেখবেন তাঁর শোবার খাটের পাশে নানা রং-বেরংয়ের নানা

আজকে মাসের পয়লা—মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত।

ডিজাইনের প্রায় শ'খানেক জামা প্যান্ট টাই স্যুট ঝোলানো।

একমাত্র পাহাড়ীবাবুরই বুঝি কোনো সংস্কার নেই। বাইরের আবরণে তিনি যেমন ঝলমলানো রঙীন, ভেতরেও তিনি একই রকম। যত্রতত্র যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখতে পারেন। গড়িয়াহাটের মোড়, টালিগঞ্জ ট্রামডিপো বা সিনেক্লাবের কোনো শোতে অথবা অ্যাঁনা ফ্রাঁসেজের কোনো বক্তৃতা অনুষ্ঠানে যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় পেয়ে যেতে পারেন এই সদাহাস্যময় জমাটি ভদ্রলোককে এগিয়ে আপনার পরিচয় দেবার দরকার নেই। উনিই হয়তো এগিয়ে এসে গাল-গল্প জমিয়ে তুলবেন আসর। তবে মাঝে মাঝে ছেদ পড়বে আড্ডা, তাঁর বাক্স থেকে পান মুখে দেবার সময়।

সংস্কারের কথা যখন উঠলো তখন বলা দরকার মৃণাল সেন বা সত্যজিৎ রায় কেউই 'মহরৎ'এর পক্ষপাতী নন। এঁরা অতর্কিতে একদিন ছবির কাজ শুরু করে দেন। ছবির প্রযোজকরা অনেকই দিনক্ষণ দেখে, ক্যামেরায় কালীঘাটের সিঁদুর আর মালা লাগিয়ে বেশ কিছু লোক জড়ো করে সাড়ম্বরে নতুন ছবির যাত্রা শুরু করার পক্ষপাতী হয়তো যাত্রাপথ শুভ হবে বলেই এত মানাগোনা। কিন্তু ব্যবসায়ের অলিগলির প্রতিটা বাঁকে যেখানে কোরাপ্‌শনে'র চোরাবাক্স সেখানে সংস্কারের হাঁড়িকাঠে বলি হয়ে কোরাপ্‌শনকে রোখা যায়কি? তবু।

তপনবাবু আবার ঘটা করে নতুন ছবির শুভসূচনা করার পক্ষপাতী। দিনদিন তার ছবির আর্থিক সাফল্যের নিশ্চয়তা যত বাড়ছে মহরতের অনুষ্ঠানও তত জাঁকালো হচ্ছে। 'আপনজনে'র চাইতে 'সাগিনা মাহাতো'র মহরতে জৌলুষ ছিল বেশী। (অবশ্য কারণও ছিল।) 'এখনই'র মহরতে ধূপধুনো প্রসাদী ফুল আর প্রসাদের অভাব হয়নি। অবশ্য এতসব খরচের কৃতিত্ব প্রযোজক মালহোত্রা আর কাপুর সাহেবের। শুনেছি বম্বেতে সম্প্রতি তিনি যে হিন্দী ছবির ('জিন্দগী জিন্দগী') শুভ সূচনা করলেন সেখানেও চোখ ধাঁধানো জাঁকজমকের ঘাটতি ছিল না। শুভ মহরতের দিন মেহবুব স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন নার্গিস, খাজা আহম্মদ আব্বাস, শচীনদেব বর্মন, ওয়াহিদা রেহমান, জালমিস্ত্রী (ক্যামেরাম্যান), সহ-প্রযোজক নরিম্যান ইরাণী প্রমুখ বম্বের ফিল্মল্যাণ্ডের ম্যাগনেট, ডজন দুয়েক সাংবাদিক আর ছিলেন ফিল্ম ম্যাগনেটদের শতাধিক সুহৃদ বন্ধু পরিবারবর্গ।

ঋত্বিকবাবুর কথা অবশ্য আলাদা। তিনি কোনো ছবির মহরৎ করেন আবার মর্জি ঠিক না থাকলে কখনো করেন না। ছবির শুভ মহরৎ করার পেছনে তাঁর যুক্তি সংস্কার নয়, আনন্দ। আর সত্যজিৎবাবু বা মৃণালবাবুর ছবির শুরুতেই শুভ মহরৎ না করার যুক্তি হোল অযথা অপব্যয় রোধ করা। তাঁদের বেশীর ভাগ ছবিই হলো বাজেটে ছবি তাই যতখানি সম্ভব ব্যয় কমানোই একমাত্র কারণ, সংস্কার নয়। বিপরীত দিকে প্রযোজক হিসাবে অসিত চৌধুরী, উত্তম কুমার প্রমুখদের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের কাছে ছবির সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি প্রচার। তাই শুভমহরৎ ... প্রসাদী ফুল ... জাঁকজমক।

●

প্রিয়া ফিল্মস নিবেদিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিটি খুব শিগ্‌গিরই—সম্ভবত ৬ নভেম্বর—মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করবে। নেপাল দত্ত এবং অসীম দত্ত কর্তৃক যুগ্মভাবে প্রযোজিত এই ছবিটি বর্তমান সমাজের একটি জীবন্ত চিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরবে। সুনীল গাঙ্গুলী লিখিত কাহিনীটির প্রতি সুবিচার করার জন্যে শ্রীরায় স্টুডিওর চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাঁর ক্যামেরাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন এবং চলমান কলকাতাকে ফিল্মের মধ্যে ধরেছেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেছেন দীঘার সৈকতভূমিতে। তাঁর শিল্পীদের মধ্যে আছেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণ বসু, দেবরাজ রায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চৌধুরী, শেফালী, ইন্দিরা রায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, শোভন লাহিড়ী, অশোক মিত্র প্রভৃতি।

চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে সৌমেন্দু রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও দুলাল দত্ত। ছবিটি পিয়ালী ফিল্মস দ্বারা পরিবেশিত হবে।

ভুবন সোম'এর কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের অব্যবহিত পরে প্রযোজক পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর বাংলা ছবি 'ইন্টারভিউ'এর কাজ শেষ করেছেন। বর্তমান কলকাতা শহরের

বিশৃঙ্খল জীবনস্পন্দনকে শ্রীসেন এই ছবির মধ্যে ধরবার চেষ্টা করেছেন। আশিস বর্মণ রচিত কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীসেন নিজেই। ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন কে, কে, মহাজন এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিজয়রাঘব রাও। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন রঞ্জিৎ মল্লিক, বুলবুল মুখোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। প্রযোজনায় সহযোগিতা করেছেন দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া। অকটোবরের শেষ সপ্তাহেই ছবিটিকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মঞ্চাভিনয়

লাকী গ্রুপ : ১২ সেপ্টেম্বর বরাহনগরের 'লাকীগ্রুপ' সংস্থার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সম্পন্ন করে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথমটি 'সম্রাটের মৃত্যু' এবং দ্বিতীয়টি পরিমল দত্তের 'শেকল ছেঁড়ার গান'। বিভিন্ন ভূমিকায় কৃষ্ণলাল সরকার নিখিল বণিক, দুলাল চক্রবর্তী, জয়ন্ত ভৌমিক, অসিত সাহা ও বিক্রমজিৎ রায় সু-অভিনয়ের দাবী রাখে।

শৌভিক : প্রবাসের এই নাট্যসংস্থা গত ৪ অকটোবর তরুণ নাট্যকার সঞ্জয় গুহঠাকুরতার 'আমরা বাঁচতে চাই' নাটকটি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই মঞ্চস্থ করেছে। অভিনয়াংশে উল্লেখযোগ্য, সলীল, শিবনাথ, সুতনু, রথীন, অসিত, বাচ্চু, সত্যদেব, সমীর, সন্দীপ, গৌর, অক্ষয়, অভিজিৎ, অমিতাভ, অশোক, শিশির এবং রাশনারায়ণ। নাটকটি পরিচালনা করেন সঞ্জয় গুহঠাকুরতা, ব্যবস্থাপনার ছিলেন প্রদীপ, প্রণব, অসিত ভৌমিক এবং অমিত চক্রবর্তী।

প্রধান অতিথি এবং সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এ আর বন্দ্যোপাধ্যায় (ডি সি) এবং অমলকৃষ্ণ বসু।

সাহানা : গত ৩ অকটোবর সন্ধ্যায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে সহানার প্রযোজনায় শ্যামা নৃত্যনাট্য বার্ষিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামার নাম ভূমিকায় প্রণতি মজুমদার, বজ্র সেন, ঝর্ণা পাল ও কোটালের ভূমিকায় শঙ্কর ভট্টাচার্য যথাক্রমে সঙ্গীতাংশে ছিলেন আরতি চক্রবর্তী, সুশীল মল্লিক ও নবগোপাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। সামগ্রিকভাবে শঙ্কর ভট্টাচার্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছিল।

অভিনয় পত্রিকা আয়োজিত চতুর্থ আলোচনা সভা আসছে ২৪ অকটোবর সন্ধ্যায় পত্রিকার দপ্তরে (১৩১, হরিশ মুখার্জি রোড) অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনার বিষয় 'নাটকে রাজনীতি।' প্রধান আলোচক শ্রীউৎপল দত্ত। সভায় সকলের প্রবেশাধিকার আছে।

পাটনায় পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা : গত বছরের মত এবারেও পাটনার শিল্পী সমিতি ইয়ারপুর হাউস ইয়ারপুরের ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী পর্যন্ত তৃতীয় বার্ষিক স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের যে কোন বাংলা নাট্য অনুশীলনকারী দল যোগ দিতে পারেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর যোগাযোগের ঠিকানা, সম্পাদক শিল্পী সমিতি, ইয়ারপুর হাউস, ইয়ারপুর, পাটনা—১।

গত ১২ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের খামারিয়ার এ টি এম অডিটোরিয়ামে নবগঠিত 'অশনি' নাট্যসংস্থা তাদের প্রথম অবদান হিসাবে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'উত্তাল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। একক এবং দলগত অভিনয়ে শিল্পিবৃন্দ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখেন। বিভিন্ন চরিত্রে সু-অভিনয় করেন অলোক দত্ত, বাসুদেব ভট্টাচার্য, গোবিন্দ দে, প্রদীপ ঘোষ, তপন ব্যানার্জি, ভবানী কুণ্ডু, জয়দেব রায়, সুভাষ চক্রবর্তী ও দ্বিজরাজ ব্যানার্জি এবং কাকলী সান্যাল। মঞ্চসজ্জা, আলো এবং আবহ সংগীতের কাজ মোটামুটি।

বিবিধ সংবাদ

৫ অকটোবর, পুণ্য দুর্গা পঞ্চমীর সন্ধ্যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও রাজা রাজবিষণ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে নবতম নাট্যগৃহ 'রঙ্গনার' শুভ উদ্বোধন করলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মঞ্চের সম্মুখে স্থাপিত একটি মৃৎপ্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করে। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বললেন, অভিনয়ের মহলা ও মঞ্চের ওপরই দেওয়া দরকার। সংস্কৃত নাটকের মহলা রঙ্গপীঠে দাঁড়িয়েই দেওয়ার রীতি ছিল। সভাপতিরূপে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই কলকাতা শহরে যদি থিয়েটার, সিনেমা, যাত্রা বা সংগীতের আসর না থাকত, তাহলে

বিপ্লবী ভিয়েতনাম পালায় কমারেড হো চি মিনের রূপসজ্জায় পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
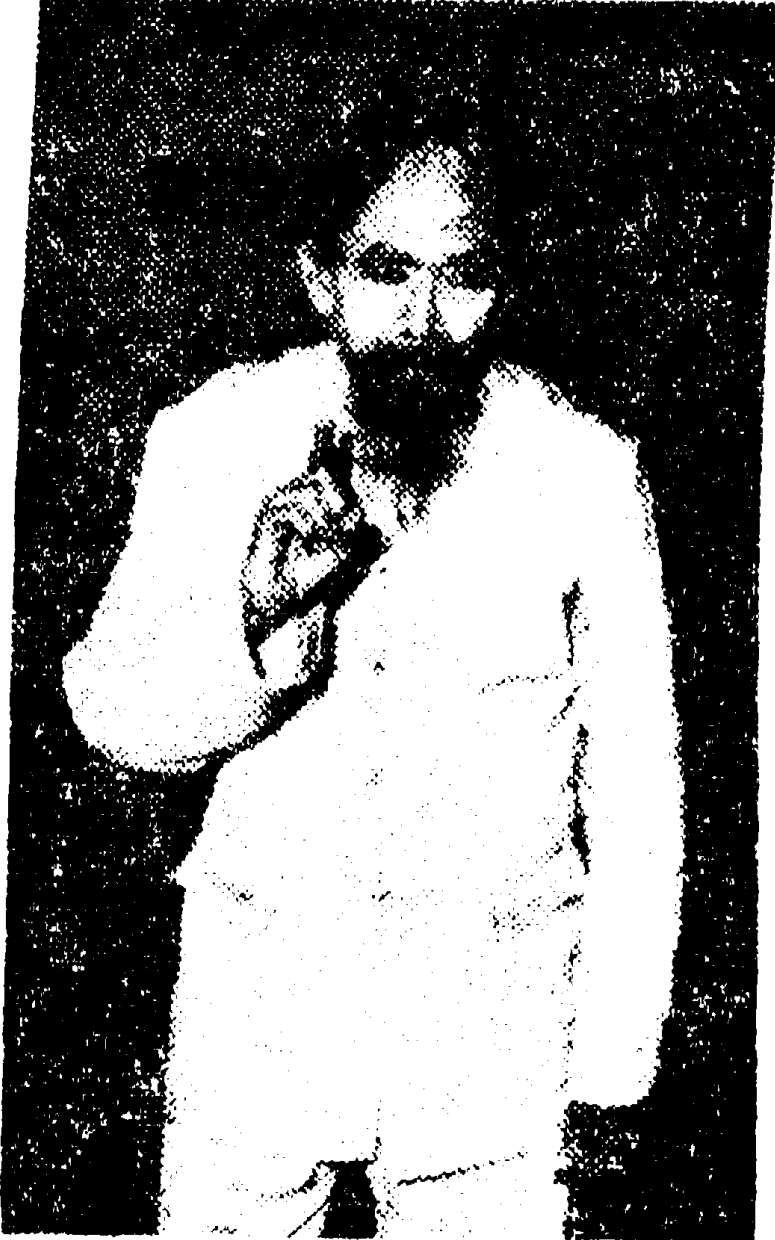
আমরা বাঁচতুম কি করে? অন্নকোষময় দেহের ভিতরে আছে আনন্দকোষময় সত্তা; তারও ভোজন প্রয়োজন।' স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, '১৯১৬।১৭ সালে প্রথম কলকাতায় এসে দেখি 'শাস্তি' কি শান্তি'তে দানীবাবুর অভিনয়। ঐ অভিনয় আমার জীবনকে নানা-ভাবে প্রভাবিত করেছে।' প্রধান অতিথি রূপে ভাষণ দেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সভানুষ্ঠানের পর শিল্পী-যাযাবর-এর প্রযোজনায় নিবেদিত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বিনি পয়সার ভোজ' এবং শ্রীমঞ্চ নাট্যসংস্থা পরিবেশন করেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র বিরচিত প্রহসন 'যায়সা-কা ত্যায়সা'।

রঙ্গনা মঞ্চে নিয়মিতভাবে অভিনয় করছেন নান্দীকর সম্প্রদায় ৭ অকটোবর, মহাসপ্তমীর দিন থেকে।

মূকাভিনয় : গত ৫ অকটোবর অ্যাকাদেমী অব ফাইন আর্টস মঞ্চে মূকাভিনেতা হিরণ্ময় একক মূকাভিনয় পরিবেশন করলেন। ঐ দিনের ফিচারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া, অকটোবর বিপ্লব, বোনাস ও পুরাতন ভৃত্য। হাস্যরসাশ্রিত ফিচার হিসেবে তিনি দেখালেন 'একটি অ্যারিসটোক্রেট মহিলার চরিত্র' ও 'ডেলী প্যাসেঞ্জারের জীবনী'।

শিল্পীর অভিব্যক্তির প্রকাশ, অঙ্গ সঞ্চালন ও মুদ্রার সুষ্ঠ প্রয়োগে চরিত্রগুলিকে মূর্ত করে তুলতে পেরেছে। আবহসঙ্গীতে নির্দেশনায় ছিলেন শুভ বসাক, আলো—কাশীনাথ পাল ও শিল্প নির্দেশনা—নির্মল গুহরায়।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরে : বাটানগর গত ৯ অকটোবর সন্ধ্যায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে ক্লাবের সৌজন্যে নৃত্যবিদ বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বিভিন্ন শাখার ছাত্রীদের দ্বারা উচ্চাঙ্গ ও লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীবসন্তকুমার সেন। অনুষ্ঠানে ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী চোলম, রাজস্থানি, সাঁওতালি, গুজরাটি, নাগা, তারকাসুর বধ (কথাকলি), বাংলার ধান্য উৎসব নৃত্যে রুক রায়, চিত্রা চ্যাটার্জি, রিংকু ভাদুড়ী, অরুণা দে, অনিতা ঘোষ, রুণু সেন, কৃষ্ণা ঘোষ, বিদুষী বাসু, মায়া ভট্টাচার্য, ইন্দ্রা রায়, শুভা ধর, অরুণিমা সেন, শিপ্রা সেন, মিত্রা পাল, বনানী চৌধুরী, পিংকু দত্ত, শান্তি চৌধুরী বিভিন্ন নৃত্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। লোকসঙ্গীতে নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্ত ও [illegible] মিত্র।

'হরবোলার ডাক' পরিবেশন করছেন হরবোলা শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়।

মূকাভিনয় : পদাবলী নিবেদিত রবীন্দ্র সদনে [illegible] মূকাভিনয় আগামী ২৫ অকটোবর রবিবার সন্ধ্যায়। আবহ সঙ্গীতে : হিমাংশু বিশ্বাস মঞ্চ ও আলো সুরেশ দত্ত ও তাপস সেন, রূপসজ্জা : [illegible] দাস, পোশাক : [illegible] চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত নতুন কয়েকটি মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন।

সম্প্রতি শ্রীমতী অমলা শংকরের জন্ম-দিবস পালন করা হয়। জন্ম দিনের কেক [illegible]

শান্তির জন্য এক কৌতুকপ্রদ অবদান

৭০ বছর বয়স্ক জার্মান লেখক এরিখ কাসনার, ছোট ও বড়দের জন্য লেখা যাঁর বই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তিনি সবসময়ই যে কোন ধরনের যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। ২০ বছর আগে পৃথিবী যখন অতীতের চেয়ে আরও ভীষণ এক যুদ্ধে লিপ্ত, তখন 'পশুদের সম্মেলন' নামে তিনি একটি গল্প লেখেন। লেখকের সঙ্গে সহযোগিতায় বর্তমানে এই গল্পটি নিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের জার্মান ট্রিক ছবি করলেন পশ্চিম জার্মানীর ট্রিক ফিলম্যার কারট গ্যানতা। কারট ১৯৬৭ সালে ফেডারেল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। গল্পটির মর্মকথা হল : পশুরা বিশ্ব সম্মেলনে বসে ঠিক করল যে, শান্তির জন্য মানুষকে বাধ্য করতে তারা মানুষদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে রাখবে যতক্ষণ না বড়রা শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়। কারট এই গল্পটিকে এক সংগীতবহুল হাসির নাটকরূপে উপস্থাপিত করেছেন। কাসনারের প্রগাঢ় রসবোধের দরুণ ছবিটি ছোট বড় সকলকে আনন্দ দেবে নিঃসন্দেহে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পরিবারে যুদ্ধের কারণ ও কী করে তার প্রতিকার করা যায়, সে সম্পর্কে ছবিটি সম্ভাব্য আলোচনার সূত্রপাত করবে।

জলসা

সুরদাস সংগীত সম্মেলন : এবার সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিকী সংগীতাসর পরিবেশিত হয়েছিলো আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে। উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ। তাঁর হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে সংঘসচিব শ্রীস্বদেশ সান্যাল ২৫১২ টাকা বন্যাত্রাণ তহবিলে অর্পণ করেন। সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীমানিক দাসের তবলা লহরা দিয়ে। ত্রিতালের ওপর গৎ ছাড়াও কায়দা, পরণ ও ঠেকার ওপর ইনি প্রশংসাযোগ্য দখল প্রদর্শন করেন। তারপরই ছিল শ্রীমতী টি এ রাজলক্ষ্মীর শিষ্যা নীরজা পালের ভারতনাট্যম নৃত্য। শিল্পীপ্রদর্শিত আলারিপু, বর্ণম, পদম, তিল্লানায় লয় ও সুষমামণ্ডিত পদক্ষেপ ও নৃত্যভঙ্গিমায় শিক্ষার ছাপ ছিল কিন্তু অভিনয় অঙ্গ আরো পরিশীলিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমতী সীতা রামচন্দ্রমের সুরেলা কণ্ঠসঙ্গীত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ উপভোগ্যতা এনেছে। যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে স্মরণযোগ্য শিল্পী ছিলেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাহাদুর খাঁ। বাহাদুর খাঁর 'হেমাবতী'-তে অভিজাত বন্দেজ, পাণ্ডিত্য লয় ও সুরের কারুকার্য ছাড়াও যে বস্তু রসিকচিত্ত জয় করে নিয়েছে সে হলো তাঁর কল্পনার বিস্তার। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীজনোচিত ধ্যানগম্ভীর্যে পরিবেশিত ললিত ও ভৈরবী সুর ও ছন্দের এমন এক মায়াময় ধ্বনিলোক সৃষ্টি করেছে যার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে প্রতিটি শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ—আপনাপন আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আব্দুল হালিম জাফরের 'চম্পাকলি'-তে রংতানের বাহার আনন্দদায়ক। তরুণ শিল্পী সুব্রত রায়চৌধুরীর 'বাগেশ্রী' প্রশংসনীয় একাধিক কারণে। প্রথমতঃ শিল্পীর নিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ পূর্বসূরীদের বাদনশৈলীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত স্বীকৃতি, তাঁদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবার মহৎ গৌরব—সর্বোপরি আত্মবিশ্বাস। আমজেদ আলি খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রহমৎ খাঁর সরোদে 'আহা মরি' করবার মত কোন উপাদানই ছিলো না। লয়ও দুর্বল। তবে উপযুক্ত রেওয়াজে অবিচলিত থাকলে শিল্পী হয়ে ওঠা এঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। কণ্ঠসঙ্গীতে ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁর খেয়াল ও তরানায় ওস্তাদের বয়সের বাধা অতিক্রম করেও রামপুর ঘরাণার অভিজাত ঐতিহ্যের নিশ্চিত স্বাক্ষর-চিহ্ন রসজ্ঞ শ্রোতার শ্রদ্ধা ও সম্মান আদায় করে নিয়েছে।

একই কথা প্রযোজ্য বেনারসের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা সিদ্ধেশ্বরী দেবী সম্বন্ধে। ঠুংরী নিছক চিত্ত-বিনোদনী লঘু-সংগীতের প্রকারই নয়। এ সংগীতের ব্যাপ্তি, বিস্তার ছন্দবৈভবেরও যে নিজস্ব একটা মেজাজ আছে—এ সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য সঙ্গীতাসরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মত শিল্পীর উপস্থাপনার প্রয়োজন।

কণ্ঠসংগীতে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সুরেশ চক্রবর্তীর পুত্র বিজয় চক্রবর্তীর। শ্যাম কোষের বিস্তার, তান ও সুরস্থিতিতে নানান ঘরানার প্রভাব হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত চমকপ্রদ ও ভাবসমৃদ্ধ করেছে। ওপরের পর্দায় কণ্ঠসঞ্চালন মাঝে মাঝে শিল্পীর পক্ষে আয়াসসাধ্য মনে হয়েছে। লয়টি সুন্দর। আরতি বাগচীর 'শঙ্করা' সংগীতে যে লয়ে সাধারণতঃ গান ছেড়ে দেওয়া হয় সেই লয়ে তাঁর দীর্ঘস্থিতি অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু লয়ের আন্দাজে সুর বড় কম বলেই বোধহয় ভারসাম্যতা রক্ষিত হয়নি। শিপ্রা বসু সতেজ কণ্ঠ, তানসৌকর্যে ও স্বতস্ফূর্ত আনন্দ শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, আলি আহমেদ

হোসেন এবং কেরামৎ খাঁ ও কানাই দত্ত প্রমুখ সংগীতিয়াবৃন্দ।

দক্ষিণায়নের বিচিত্রানুষ্ঠান : আগামী ২২ অক্টোবর দক্ষিণায়ন সংস্থা কলামন্দিরে একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, আরতি মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও যন্ত্রসঙ্গীতে খোকন মুলকী।

মণিপুরী নৃত্যে ভাস্বর প্রতিভা

দেবযানী চালিহা : পুজোর ঠিক আগেই কলামন্দিরে কে কে ভট্টাচার্য নিবেদিত শ্রীমতী দেবযানী চালিহার 'মণিপুরী নৃত্যে' প্রতিভাময়ী শিল্পীর নিষ্ঠাভরা শিক্ষা ও সাধনা ছাড়াও নিজস্ব ভাব ও ধ্যানের এক অপূর্ব কল্পনালোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো।

ভারতীয় নৃত্যগীতের প্রেরণার উৎস হোল অধ্যাত্মচেতনা। মণিপুরী নৃত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। মণিপুর রাজ্যটি ক্ষুদ্র হলেও প্রান্তীয় দেশ বলে চিরদিন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। তাই শিল্পকলা চর্চার বিস্তৃত অবকাশ মণিপুরবাসীর জীবনে ছিলো না। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও মণিপুরী নৃত্য যে আপন স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আজও অনাহত তার কারণ এ নৃত্য এদের ধর্মের অঙ্গীভূত বটেই তাছাড়াও লোকনৃত্য স্বরূপ। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার একে স্ব-মর্যাদায় সঞ্জীবিত রেখেছে। বিভিন্ন সংঘাতের বিভিন্ন অধ্যায়ে শৈব ও বৈষ্ণব দুই ধর্মের প্রভাব এই নৃত্যে পরিলক্ষিত। গুরু আমোবা সিং-এর সুযোগ্যা শিষ্যা শ্রীমতী দেবযানী চালিহা। মাইবি জাগোই, খুবেক ইশে, লীমা জাগোই, মন্দিরা চালমু, মাল তান্ডব, কৃষ্ণ অভিসার, গোপীনৃত্য—মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিক অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য ছাড়াও যে সম্পদে রসিক দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছেন সে হোলো তাঁর সংস্কৃতিমান মনের সাহিত্যবোধ ও দর্শন। শ্রীমতী চালিহা যে দর্শনের ছাত্রী চিন্তা-গভীর নৃত্যই তার প্রমাণ।

মাইবি জাগোই নৃত্য শিব যুগের। এই নৃত্য এদের প্রাচীনতম নৃত্য। মাইবি অর্থাৎ যোগীর আবাহনে দেবাত্মার জাগরণ ও ভক্তের আবাহনে দেবাত্মার জাগরণ ও ভক্তের অন্তরে অবতরণ এবং ভক্ত ও দেবতার একাত্মতাই এই নৃত্যের বিষয়বস্তু।

বন্দনা, ভঙ্গী সংগীত সর্বোপরি শিল্পীচিত্তের অনুভব দিয়ে লীলায়িত মধুর ছন্দে নৃত্যের ভাববস্তুকে শ্রীমতী চালিহা 'সহৃদয়-হৃদয় সংবেদ্য করে তোলেন। খুবাক ইশে তে বিস্ফবী উল্লাস করতালি ও পাদবিক্ষেপের সৌন্দর্য বিভোর ছন্দে উত্তাল হয়ে ওঠার পরই লীমা জাগোই নৃত্যে আত্মলীন উচ্ছ্বাস মন্দিরা নৃত্যে লয় ও ছন্দের কাব্য সুন্দর সমৃদ্ধ এবং আরো নানাভাবী নৃত্যের পর মণিপুরী আঙ্গিকে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমারে কে নিবি ভাই ও ধরণীর গগনের আপন সৃজন প্রতিভারই পরিচয় শুধু রাখেননি। কবিগুরুই যে বিশ্বসভায় নতুন করে মণিপুরী নৃত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে সত্য স্মরণ করিয়ে দেবার গুরু দায়িত্বও দেবযানী সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন। নিখিলেশ রায়ের পরিচালনায় শিবানী পাল ও অরবিন্দ বিশ্বাসের কণ্ঠসঙ্গীত এবং এল তেজমান সিং, নিখিলেশ রায়, সৌমেন বসু, সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যন্ত্রসঙ্গীত সংগতি অনুষ্ঠান সার্থকতার কারণ।

দেবযানী চালিহা

৯৫ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

৯৫ পল্লীর সভ্যবৃন্দ তাঁদের বিংশতিতম বর্ষে সপ্তাহব্যাপী এক মনোজ্ঞ বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীপূর্ণ দাসের বাউল সংগীত, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, যাদুবিদ্যা তৎসহ পোস্টার নাটিকা এবং বিশিষ্ট শিল্পীসমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে সংস্থার সভাবৃন্দ অতীব সাফল্যের সহিত শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। একক ও দলগত অভিনয়ে শিল্পীবৃন্দের স্বতস্ফূর্ত অভিনয় বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। সৌখীন নাট্যাভিনয়ে প্রতিটি চরিত্রের এত সুষ্ঠু রূপায়ণ খুব কমই নজরে আসে। অভিনয়ে সর্বাগ্রে নাম উল্লেখ করতে হয় সর্বশ্রী সৌরীন্দ্রনাথ চৌধুরী (ডি, এস, পি), মধুময় চক্রবর্তী (সোমনাথ), মানু সরকার (সুভাষ), বুদ্ধদেব রক্ষিত (কপিল) এবং শ্রীমতী গীতা মৈত্র (তরলা)। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন কার্তিক সরকার, প্রকাশ ঘোষদস্তিদার; পুলিন হালদার, বাচ্চু ঘোষ, বিভু ঘোষ, মিলন চক্রবর্তী, স্বপন রায় এবং আরতি মণ্ডল।

সামগ্রিক নির্দেশনা ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় শ্রীবিকাশ ঘোষ দস্তিদার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলাধুলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ছাই নিয়ে যুদ্ধ

মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব (সংক্ষেপে এম সি সি) চলতি অকটোবর মাসের ২৮ তারিখ থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের ১৯৭০-৭১ সালের ক্রিকেট সফর সুরু করবে। এই সফরে তারা চিরাচরিত প্রথায় ইংল্যান্ডের প্রতিভূ হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলবে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আর এক নাম 'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ' অর্থাৎ 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'। এই দুই দেশের ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠের টেস্ট ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করেই শেষ পর্যন্ত এই অভিনব 'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ' নামকরণ হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নাটকীয় আখ্যায় যে কয়টি টেস্ট খেলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাদের মধ্যে ১৮৮২ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাটি আপন মহিমায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এমন কি ভবিষ্যতের কোন টেস্ট ক্রিকেট খেলাও এই খেলার ঐতিহ্য ম্লান করতে পারবে না।

ওভাল মাঠে ১৮৮২ সালের ২৮ ও ২৯ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সেই ঐতিহাসিক টেস্ট খেলাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

অস্ট্রেলিয়ার ১৮৮২ সালের ইংল্যান্ড সফর তালিকায় মাত্র একটা টেস্ট খেলা ছিল—কেনিংটন ওভাল মাঠে। ফলে এই খেলার আকর্ষণ ছিল বহুগুণ। কিন্তু খেলার দিন সকাল থেকেই মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে খেলার জৌলুষ মাটি করে দেয়। বৃষ্টির বহর দেখে দর্শকরা প্রমাদ গুনলেন —এ রকম ভিজে মাঠে কোন মতেই বেশী রাণ করা সম্ভব হবে না। ক্রিকেট খেলায় প্রচুর পরিমাণ রাণ দেখার আনন্দই তো আসল।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডবলউ এল মার্ডোক টসের বাজিতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক এ এন হর্ণবিকে হারিয়ে দিয়ে প্রথমেই দলের পক্ষে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দর্শকদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ভিজে পিচে বল দেওয়ার সুযোগ পেয়ে বোলাররা ব্যাটসম্যানদের একহাত নিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ২০টা উইকেট পড়ে গেল—দুদলেরই ১০টা করে। প্রথম দিনে দুদলের মোট রাণ দাঁড়ালো ১৬৪—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৬৩ রাণ এবং ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ১০১ রাণ—অস্ট্রেলিয়ার থেকে ইংল্যান্ডের ৩৮ রাণ বেশী। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের দুই বোলার—আর জি বার্লো ১৯ রাণে ৫টা এবং পিট ৩১ রাণে ৪টে উইকেট পেলেন। অপর দিকে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার এফ আর স্পফোর্থ একাই পেলেন ৭টা উইকেট ৪৬ রাণ দিয়ে। প্রথম দিন খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় মাথায় মাথায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হওয়াতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম দিনে আর তাদের দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামেনি।

খেলার দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই আকাশভেঙে বৃষ্টি নামে। সেকি অবিরাম বৃষ্টিপাত! মাঠে উইকেটের ওপর কোন আচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং পিচের যে কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াবে তা দর্শকরা সহজেই অনুমান করলেন। খেলা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম জেনেও দলে দলে দর্শকরা মাঠে হাজির হলেন। মাঠ লোকারণ্য হল। এখন খেলা আরম্ভ হলেই তাঁদের এত কষ্ট করে মাঠে খেলা দেখতে আসা সার্থক হয়। নির্ধারিত সাড়ে এগারটায় খেলা আরম্ভ হল না। বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে দুজন আম্পায়ারকে মাঠে নামতে দেখে দর্শকরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা মন্দ হয়নি। মাসাই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে তাঁর ব্যক্তিগত ৫৫ রাণ তুলে আউট হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই ৫৫ রাণই হয়ে দাঁড়ায় উভয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১২২ রাণ সংগ্রহ করে—প্রথম ইনিংসের থেকে ৫৯ রাণ বেশী। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে এস পি জোন্সের 'রাণ আউট' নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা খুবই ক্ষুব্ধ হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার স্পফোর্থ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তিনি এর প্রতিশোধ নেবেনই।

দ্বিতীয় দিনে বেলা ৩-৪৫ মিনিটে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যান্ডের মাত্র ৮৫ রাণের প্রয়োজন। হাতে যথেষ্ট সময়; সুতরাং

ঐতিহাসিক মৃৎপাত্র-এর মধ্যে আছে ১৮৮৩ সালে মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যবহৃত উইকেট ও বেলের পবিত্র চিতাভস্ম।

জয়লাভের এই প্রয়োজনীয় ৮৫ রাণ সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব নয়।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হর্ণবি দলের ব্যাটিং অর্ডার বদলে গ্রেসের সঙ্গে স্বয়ং খেলতে নামলেন। স্পফোর্থ ইংল্যান্ডের ১৫ রাণের মাথায় হর্ণবির অফ স্টাম্প উড়িয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের পতনের উদ্বোধন করলেন। তাঁর শূন্য উইকেটে ব্যালো খেলতে নেমে পত্রপাঠ বিদায় হলেন। স্পফোর্থের প্রথম বলেই তিনি বোল্ড আউট। ইংল্যান্ডের মাত্র ১৫ রাণের মাথায় দুজন আউট। গ্রেসের সঙ্গে ৩য় উইকেটের জুটি বাঁধলেন উলেট। এই দুজন চমৎকার খেলতে থাকেন। দলের ৫১ রাণের মাথায় স্পফোর্থের বল খেলতে গিয়ে উলেট যে ক্যাচ তুলেন তা উইকেট-কিপার ব্ল্যাকহাম সহজেই ধরে ফেলেন। তিনটে উইকেট খুইয়ে তখন ইংল্যান্ডের রাণের ঘরে ৫১ রাণ জমা পড়েছে। জয়লাভের জন্য আর মাত্র ৩৪ রাণ দরকার। হাতে জমা ৭টা উইকেট এবং পর্যাপ্ত সময়। গ্রেস এবং লুকাস ৪র্থ উইকেটের জুটি খেলছেন। গ্রেস আরও ২ রাণ তুলে দলের ৫৩ রাণের মাথায় ব্যানারম্যানের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে বিদায় নিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গ্রেস ইংল্যান্ডের উভয় ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ (৩২ রাণ) করেছেন। গ্রেসের বিদায়ের পর লুকাসের জুটি হলেন লিটলটন। ইংল্যান্ডের ৬৬ রাণের মাথায় ৫ম উইকেটের পতন হল—লিটলটন বিদায় নিলেন। এদিকে হিসাব নিয়ে দেখা গেল ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ১৯ রাণ দরকার। হাতে জমা আছে ৫টা উইকেট। ইংল্যান্ডের হাতে অস্ট্রেলিয়ার হার অবধারিত ধরে নিয়ে ইংল্যান্ডের অনেক সমর্থকই মাঠে বসে সেই হার স্বচক্ষে দেখার থেকে বিজয়-উৎসবের আয়োজনের জন্য ঘরমুখো হলেন। ক্রিকেট খেলার ফলাফল কত অনিশ্চত এবং ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কত যে বোকামী তা জেনেও ইংল্যান্ডের সমর্থকরা দলের সুনিশ্চিত জয় ধরে নিয়েছিলেন।

আর মাত্র ১৯টি রাণ হলেই ইংল্যান্ডের জয়—উইকেটে খেলছেন ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি লুকাস এবং স্টীল। লুকাস ৪ রাণ যোগ করলেন—দলের রাণ দাঁড়াল ৭০। স্টীল এই ৭০ রাণের মাথায় স্পফোর্থের বল খেলে তাঁরই হাতে ধরা দিলেন। স্কোর বোর্ডে স্টীলের নামের পাশে গোল্লা থেকে গেল। হাতে ৪টি উইকেট জমা এবং ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ১৫ রাণ দরকার—

এফ আর স্পফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া)—৪৬ রানে ৭ এবং ৪৪ রানে ৭টা উইকেট পান।

খেলার এই অবস্থায় রীড খেলতে নেমে দলের এক রাণও বাড়াতে পারলেন না, স্পফোর্থের বলে বোল্ড আউট হলেন। রীডের পরিত্যক্ত উইকেটে বার্ণেস খেলতে নামলেন। উইকেটে খেলছেন ইংল্যান্ডের ৮ম উইকেট জুটি লুকাস এবং বার্ণেস। জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডকে আরও ১৫ রাণ তুলতে হবে। বার্ণেসের ২ রাণ এবং ৩টে বাই-রাণ—এই ৫ রাণ নিয়ে ইংল্যান্ডের মোট রাণ দাঁড়াল ৭৫। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৫ রাণ থেকে ইংল্যান্ড মাত্র ১০ রাণ পিছনে—এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের ৭৫ রাণের মাথায় স্পফোর্থের বলে লুকাস বোল্ড-আউট হলেন। লুকাস ৪র্থ উইকেটে খেলতে নেমে দলের ভাঙনের মুখে দীর্ঘ সময় আটকে ছিলেন। বার্ণেসের ৯ম উইকেটের জুটি হলেন স্টাড। ইংল্যান্ডের হাতে দুটো উইকেট জমা, অপরদিকে খেলায় জয়লাভ করতে আরও ১০ রাণ তুলতে হবে। বার্ণেস ধরা পড়লেন মার্ডোকের হাতে। ইংল্যান্ডের ৭৫ রাণ স্থির থেকে গেল। ইংল্যান্ডের শেষ খেলোয়াড় পিট ধীর পদক্ষেপে মাঠে নামলেন।

সারা কেনিংটন ওভাল মাঠ নিস্তব্ধ। ইংল্যান্ডের শেষ ১০ম উইকেট জুটি স্টাড এবং পিট খেলছেন। এঁরাই ইংল্যান্ডের জয়লাভের শেষ ভরসা। জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ১০ রাণ দরকার। বয়েলের বল লেগের দিকে পাঠিয়ে পিট ২ রাণ তুলে তার পরবর্তী বলেই বোল্ড আউট হলেন। ৭৭ রাণের মাথায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়াতে অস্ট্রেলিয়া ৭ রাণে জয়ী হল—ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার এই প্রথম জয়।

অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ বোলার স্পফোর্থ ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসে ৪৪ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার এই জয়লাভ ইংল্যান্ডের জনসাধারণ সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। জাতীয় ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ডের পরাজয়ে সারা দেশে যে শোকের ছায়া নেমে আসে তার প্রতিচ্ছবি খেলার পরের দিন বিখ্যাত 'স্পোর্টিং টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক অভিনব শোক-সংবাদ অধ্যায়ে ছাপার হরফে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শোক-সংবাদে ইংল্যান্ডের এই পরাজয়কে ইংলিস ক্রিকেটের মৃত্যুর সামিল করে বলা হয়েছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর চিতাভস্ম অস্ট্রেলিয়াতে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। এই চিতাভস্ম বহনের প্রস্তাব নিছকই কাল্পনিক ছিল। তবে ভিন্ন অবস্থায় ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় 'চিতাভস্ম' বাস্তবে পরিণত হতে মাত্র কয়েক মাস সময় লেগেছিল। ১৮৮২ সালের আগস্ট মাসে এই ঐতিহাসিক টেস্ট খেলার পরই ডিসেম্বর মাসে আইভন ব্লিগো (পরবর্তীকালে লর্ড ডার্ণলে) নেতৃত্বে ইংলিস ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে (১৯, ২০ ও ২২) মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২৭ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে খেলার ফলাফল সমান করে। এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার শেষে মেলবোর্ণের কয়েকজন মহিলা ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আইভন ব্লিগোর হাতে একটি মৃৎপাত্র উৎসর্গ করে পাত্রটি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। এই মৃৎপাত্রে ছিল মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ব্যবহৃত উইকেট এবং বেলের চিতাভস্ম। ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠের যাদুঘরে এই ঐতিহাসিক চিতাভস্মপূর্ণ মৃৎপাত্রটি সযত্নে সুরক্ষিত আছে। এই পবিত্র চিতাভস্মের সম্মানার্থে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার নাম দেওয়া হয়েছে 'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ'—অর্থাৎ 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'।
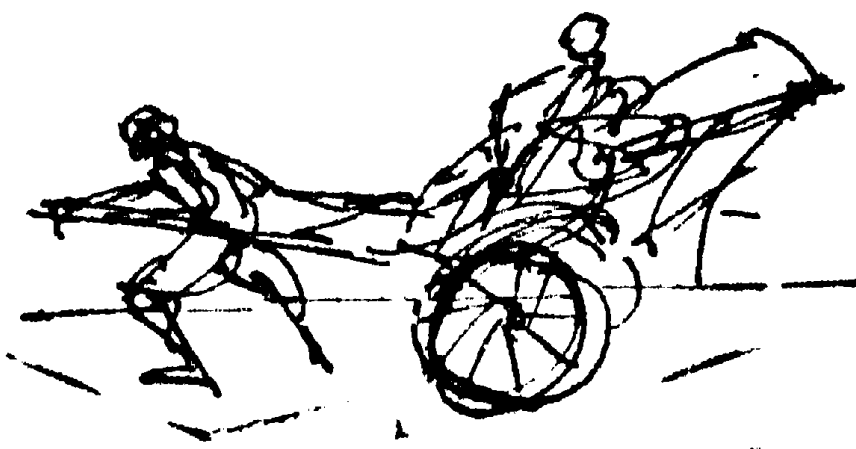
রিলে দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড : লণ্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার ৪×৮০০ গজ রিলে দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড (সময় ৭ মিঃ ১১-৬ সেঃ) স্রষ্টা কেনিয়া দল। বাঁদিক থেকে—হেজেকিয়া নিয়ম, নাফতালি বন, রবার্ট এডিকো এবং টমাস পাইসি।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরের উলসুরে সুইমিং পুলে আয়োজিত ২৭তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগে এবং মহারাষ্ট্র মহিলা বালক ও বালিকা বিভাগে দলগত গৌরব জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য সার্ভিসেস দল এই নিয়ে পুরুষ বিভাগে উপর্যুপরি ১০-বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং মেলভের ওয়াটার পোলতে এবার নিয়ে উপর্যুপরি ৯-বার খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। সাঁতারে অসাধারণ ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বৃটিশ সপ্তদশী কুমারী শিলানিস হিউম (মহারাষ্ট্র)। কুমারী হিউম মোট ৮টি স্বর্ণপদক পেয়েছেন—ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ৭টি এবং রিলেতে ১টি। তাছাড়া তিনি মহিলাদের তিনটি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন।

পশ্চিম বাংলা পুরুষ ও বালক বিভাগে ২য় স্থান এবং মহিলা বিভাগে ৩য় স্থান লাভ করেছে।

দলগত চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগঃ ১ম সার্ভিসেস (১৬২ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৬৭ পয়েন্ট) এবং ৩য় মহারাষ্ট্র (৬৬ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৮৭ পয়েন্ট), ২য় দিল্লী (৫৭ পয়েন্ট) এবং ৩য় বাংলা (২৭ পয়েন্ট)

বালক বিভাগঃ ১ম মহারাষ্ট্র (৭৩ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৫৯ পয়েন্ট) এবং ৩য়

খেলাধুলা

দর্শক

বালিকা বিভাগঃ ১ম মহারাষ্ট্র (৫৯ পয়েন্ট), ২য় দিল্লী (৩৭ পয়েন্ট) এবং ৩য় গুজরাট (১১ পয়েন্ট)

জাতীয় রেকর্ড

সদ্য সমাপ্ত ২৭তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মোট ১৫টি নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—পুরুষদের ৯টি, মহিলাদের ৩টি, বালকদের ২টি এবং বালিকাদের ১টি। এই ১৫টি নতুন রেকর্ড করেছে মাত্র এই দুটি দল—মহারাষ্ট্র (৯টি রেকর্ড) এবং সার্ভিসেস (২টি রেকর্ড)। তিনটি করে ব্যক্তিগত রেকর্ড করেছেন পুরুষ বিভাগে মহীন্দর সিং রাণা (সার্ভিসেস) ও টিঙ্গু খাটাও (মহারাষ্ট্র) এবং মহিলা বিভাগে বৃটিশ সপ্তদশী কুমারী শিলানিস হিউম (মহারাষ্ট্র)।

পুরুষ বিভাগ

২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল :
—মহীন্দর সিং রাণা (সার্ভিসেস)

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
—মহীন্দর সিং রাণা (সার্ভিসেস)
সময়ঃ ৪ মিঃ ৪৯-৮ সেঃ (হিট)

১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল :
—মহীন্দর সিং রাণা (সার্ভিসেস)
সময়ঃ ১৮ মিঃ ৫১-৫ সেঃ (হিট)

৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে :
—টিঙ্গু খাটাও (মহারাষ্ট্র)
সময়ঃ ৫ মিঃ ৩৮-১ সেঃ (হিট)

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই :
—টিঙ্গু খাটাও (মহারাষ্ট্র)
সময়ঃ ১ মিঃ ৬-৬ সেঃ

২০০ মিটার বাটার ফ্লাই :
—টিঙ্গু খাটাও (মহারাষ্ট্র)
সময়ঃ ২ মিঃ ৩৯-৪ সেঃ

৪×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রীলে :
—সার্ভিসেস
সময়ঃ ৯ মিঃ ২১-৫ সেঃ

৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রীলে :
—সার্ভিসেস
সময়ঃ ৪ মিঃ ১১-৮ সেঃ

৪×১০০ মিটার মেডলে রীলে :
—সার্ভিসেস
সময় ঃ ৪ মিঃ ৪৫-৯ সেঃ

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার বাটারফ্লাই :
—শিলানিস হিউম (মহারাষ্ট্র)

লণ্ডনের রয়্যাল এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ১০ রাউণ্ডের হেভিওয়েট মুষ্টি যুদ্ধে বৃটেনের জো বাগনার (ডানদিকে) এবং আর্জেন্টিনার ইডোয়ারডো করলেট্টি (বাঁদিকে)। লড়াইয়ে বাগনার ৫০—৪৭½ পয়েন্টে জয়ী হন।

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ঃ
—গিলনিস হিউম (মহারাষ্ট্র)
সময়ঃ ১ মিঃ ১৭-৭ সেঃ

২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলেঃ
—গিলনিস হিউম (মহারাষ্ট্র)
সময়ঃ ২ মিঃ ৫৬-৬ সেঃ

বালক বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল
—এম ওয়ালকার (মহারাষ্ট্র)
সময়ঃ ১ মিঃ ৩-৪ সেঃ (হিট)

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকঃ
—এম ওয়ালকার (মহারাষ্ট্র)
সময়ঃ ১ মিঃ ১৫ সেঃ

বালিকা বিভাগ

১০০ মিটার বাটার ফ্লাইঃ
—এস দেশাই (মহারাষ্ট্র)
সময়ঃ ১ মিঃ ২৯-৮ সেঃ

ভারত বনাম সিংহল দ্বৈত সন্তরণ প্রতিযোগিতা
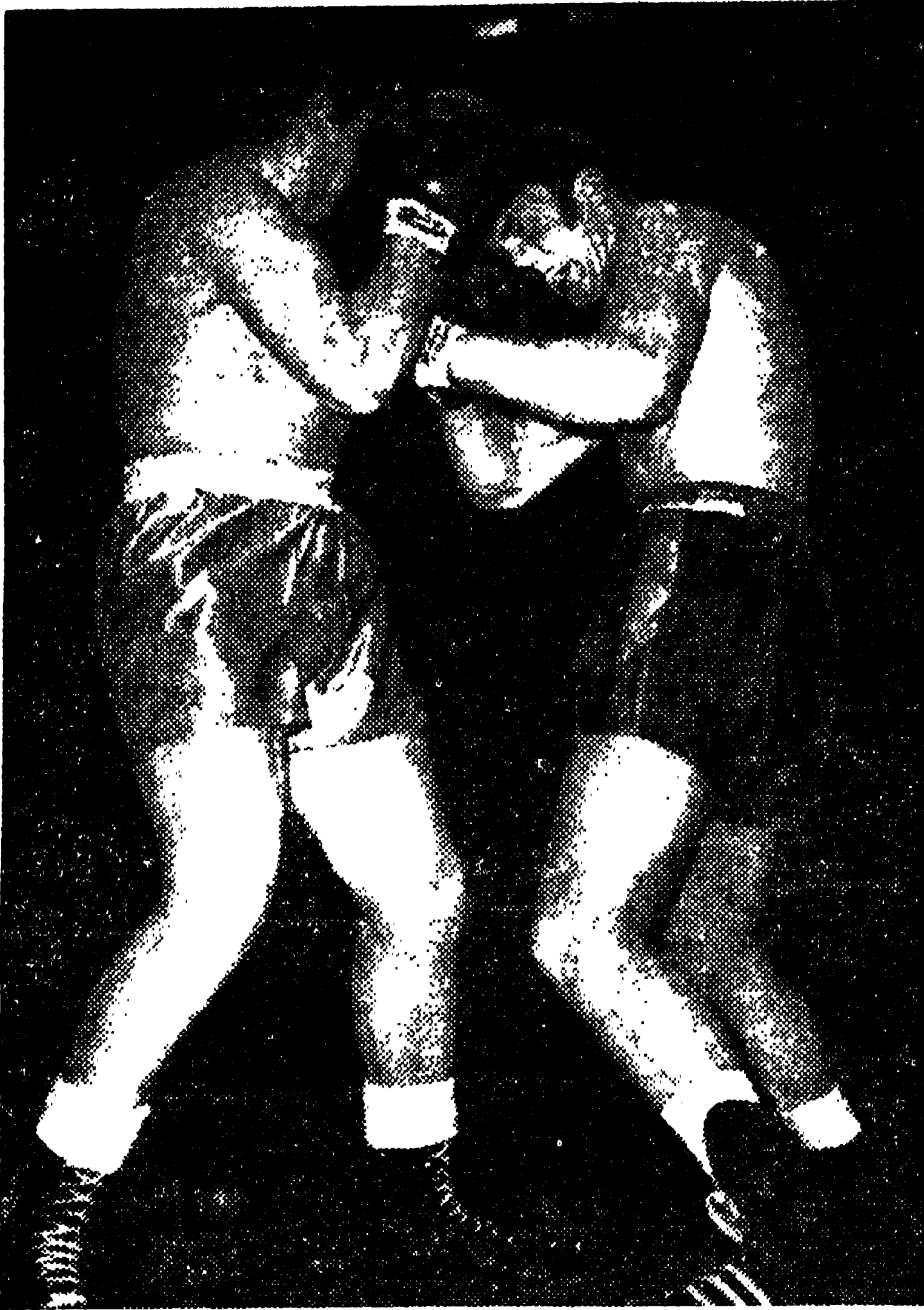
বাঙ্গালোরের **কেনসিংটন** সুইমিং পুলে **আয়োজিত ৫ম ভারত বনাম সিংহলের** দ্বৈত **সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ** ১৪৬-৯০ **পয়েন্টে দলগত খেতাব** জয়ী হয়েছে। **পুরুষ** বিভাগে **ভারতবর্ষ** ১১৪-২৬ পয়েন্ট এবং **মহিলা বিভাগে** সিংহল **৬৪-৩২ পয়েন্টে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে।** ওয়াটারপোলো টেস্ট **খেলায় ভারতবর্ষ ১ম** টেস্টে **১৮-২** গোলে **এবং ২য়** টেস্টে **৮-০** গোলে **জয়ী হয়।**

মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ

হায়দ্রাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্টেট ব্যাংক প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে মোট চারবার মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় স্টেট ব্যাংকের প্রথম ইনিংস ২৪৬ রানের মাথায় শেষ হলে হায়দরাবাদ কোন উইকেট না খুইয়ে ১৫ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে হায়দরাবাদের প্রথম ইনিংস ২০২ রানের মাথায় ফেলে দিয়ে স্টেট ব্যাংক ৪৪ রানে এগিয়ে যায় এবং বাকি ৬২ মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৩১ রান সংগ্রহ করে। হায়দরাবাদের প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন কিন্তু খুবই পাকাপোক্ত হয়েছিল। লঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ১২২ (১ উইকেটে)। খেলার এক সময় যেখানে ৩ উইকেটের বিনিময়ে তাদের ১৫১ রান ছিল সেখানে দেখা গেল তাদের বাকি ৭ উইকেটে মাত্র ৫১ রান উঠেছে। চা-পানের চার মিনিট পর ২০২ রানের মাথায় হায়দরাবাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। স্টেট ব্যাঙ্কের লেফট-আর্ম স্পিনার অশোক যোশী ৭২ রানে ৭টা এবং ভি কুমার ৪৯ রানে ৩টে উইকেট পান। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ৩য় ও ৪র্থ দিনের খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি।

অল ইংল্যাণ্ড স্কুল ক্রিকেট দল

আগামী নভেম্বর মাসের শেষদিকে অল-ইংল্যাণ্ড স্কুল-বয়েজ ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসছে। তারা ১৯৭০-৭১ সালের ভারত সফরে ১০টি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে—পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ এবং পাঁচটি আঞ্চলিক খেলা। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের সঙ্গে তাদের টেস্ট খেলার আসর বসবে এই পাঁচ জায়গায়—দিল্লী, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কটক এবং মাদ্রাজ। সম্প্রতি সফর তালিকার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। চতুর্থ টেস্ট খেলার আসর কলকাতা থেকে সরিয়ে কটকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পূর্বাঞ্চলের খেলার আসর বসবে কটকের পরিবর্তে গৌহাটিতে। সুতরাং কলকাতায় ইংলিস স্কুল বয়েজ ক্রিকেট দলের কোন খেলাই হচ্ছে না।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৫ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 30th Oct., 1970 শুক্রবার, ১৩ই কার্তিক, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

চিঠিপত্র

কলকাতার উন্নয়ন

সম্প্রতি কলকাতা উন্নয়ন নিয়ে যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কলকাতা পুরোন শহর। লোকসংখ্যাও বিপুল। এর সংকট নিরসনে পরিকল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অর্থব্যয় হয়েছে প্রচুর। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা খুব বেশী বেড়েছে বলে জানি না। সংবাদে দেখলাম কলকাতার পৌর এলাকার জঞ্জাল পরিষ্কার ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯৬৯-৭৪এর চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পনেরটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঁচ বছরব্যাপী এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য ১৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৯৭০-৭১এ নির্দিষ্ট ব্যয়ের অংক হল দু কোটি তিন লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত প্রকল্প পনেরটি বিস্তৃত তালিকা নিম্নরূপ ঃ—

কাশীপুর-দমদম জঞ্জাল পরিষ্কার পাতিপুকুরস্থ নগর এলাকার জঞ্জাল পরিষ্কার, টালীগঞ্জ পঞ্চান্নগ্রাম জলনিষ্কাশন মানিখালি - খড়দা- ক্যাওড়াপুকুর বৈঁচি-তলা জল নিষ্কাশন।

হাওড়ার অংশের জন্য ঃ জঞ্জাল নিষ্কাশনের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা। তোপসিয়া, পাগলাডাঙ্গা, কুলিয়া-ট্যাঙ্গরা বেলগাছিয়া মানিকতলা, মোমিনপুরের পাম্পিং ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কলকাতা পৌর সংস্থার প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি। কলকাতার জল নিষ্কাশন পথগুলির পুনর্নির্মাণ ও উন্নতির বিধান; কলকাতার অবহেলিত অঞ্চলগুলির জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থা, টালীগঞ্জ নর্দমা প্রকল্প, মানিকতলা জঞ্জাল নিষ্কাশন ও নর্দমা ব্যবস্থা কাশীপুর চীৎপুর জঞ্জাল ও জল নিষ্কাশন প্রকল্প, হাওড়ার নর্দমা ও জল নিষ্কাশন, হাওড়ার নর্দমা প্রণালীর উন্নয়ন, বরানগর-কামারহাটি গভীর নর্দমা ব্যবস্থা, কলকাতা এবং হাওড়ায় সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার ইত্যাদির নির্মাণ।

জঞ্জাল পরিষ্কার ও জল নিষ্কাশন সংক্রান্ত বাকী প্রকল্পগুলি পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বহির্ভূত রেখে পৃথকভাবে রূপায়নের আয়োজন করা হবে।

এই প্রকল্পগুলির তালিকা নিম্নরূপ ঃ কলকাতার সহরাঞ্চলের (আংশিক) জমাজল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, উত্তর-পূর্ব টালীগঞ্জের পয়ঃপ্রণালী, উত্তরপাড়া-কোতরং জল নিষ্কাশন, শ্রীরামপুর, জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থার উন্নতি ও বিস্তৃতি, কোন্নগরের নর্দমা ব্যবস্থার উন্নতি, চন্দননগর অঞ্চলের (চন্দননগর ও হুগলী-চুঁচুড়া) জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থা, টালী নালার উন্নয়ন, হাওড়ার জঞ্জাল সাফাই ব্যবস্থা—১ম ও ২য় দফা, কৃষ্টপুরভাঙগড় কাটাখালের পুনর্নির্মাণ, ভাটপাড়া ও টিটাগড়ের জঞ্জাল প্র-যোজন, কবরখানার উন্নয়ন, কুলটি গঙ্গা থেকে কৃষ্টপুর-ভাঙগড় কাটাখাল—নতুন কাটাখাল-সার্কুলার খাল হয়ে হুগলী নদী পর্যন্ত জলপথকে নাব্য করে তোলা, মানিকতলা অঞ্চলের জল-নিষ্কাশন (ফীডার খাল), খড়দা আঞ্চলিক জল-নিষ্কাশন (ফীডার খাল), চুরিয়াল আঞ্চলিক জল-নিষ্কাশন, বাঘের খালের উন্নয়ন, টালীগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রামের জল নিষ্কাশনের জন্য চৌভাগায় অতিরিক্ত পাম্প স্থাপন, খাটা পায়খানাগুলিকে স্যানিটারী পায়-খানায় পরিণত করার অগ্রপ্রকল্প, দমদম অঞ্চল জঞ্জাল পরিষ্কার ব্যবস্থা, সহরতলী অঞ্চলে (আংশিক) জমাজল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, কলকাতা পৌর অঞ্চলে জঞ্জাল পরিষ্কার ও জল-নিষ্কাশনের নয়া প্রকল্প।

এই যে চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প তা কতদূর সার্থরূপ পাবে জানি না। সাধারণ মানুষের জীবনধারণ এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির যদি কোন বাস্তব চেহারা দেখতে পাই, তাহলে নিশ্চয়ই সরকারী প্রকল্পের সহযোগিতায় জনসাধারণ এগিয়ে আসবে। পরিকল্পনা যেন ফাইল-বন্দী হয়ে না থাকে, এই অনুরোধ।

সিদ্ধার্থ চৌধুরী
বারাসাত

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অমৃত-র ৬ কার্তিক, ১৩৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত, শ্রদ্ধেয় নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' শীর্ষক স্মৃতিচারণে উল্লেখিত কয়েকটি তথ্য সম্পর্কে সবিনয়ে যা নিবেদন করতে চাই, তা এই রকম ঃ—

১। স্টারে রঞ্জিত সিংহ' নাটকে মহেন্দ্র গুপ্ত 'কর্ণ সিং' নয়, 'খড়গ সিংহ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২। ঐ নাটকে (অন্ততঃ প্রথম রজনীতে) রাণীবালা অংশগ্রহণ করেননি।

৩। ২২ জানুয়ারী, ১৯৫৩ তারিখে স্টারে নবপর্যায়ে গিরিশচন্দ্রের 'জনা-র' প্রথম অভিনয় রাত্রে নটসূর্য বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে স্মৃতি-চারণে উল্লেখিত হ'লেও সমকালীন সংবাদপত্রে দেখা যায় ঐ রজনীতে চরিত্রটির রূপ দেন সন্তোষ দাস নামক জনৈক অভিনেতা।

৪। ৬ মার্চ, ১৯৫৩ স্টারে শৈলজা-নন্দের 'কলংকবতী'র উদ্বোধন হয় 'কঙ্কাবতী' নয়।

শিশির বসু
কাঁচরাপাড়া

দিবস বিভাবরী

এবারে পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'দিবস বিভাবরী' উপন্যাসখানি পড়ে খুব আনন্দ লাভ করেছি। ঔপন্যাসিক যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপন্যাসখানি রচনা করেছেন তা সচরাচর দেখা যায় না, আমার কাছে এ উপন্যাসটা বেশ সুখপাঠ্য।

আজকাল প্রায় উপন্যাসে শ্লীলতা, অশ্লীলতার প্রশ্ন ওঠে। এতে সম্পূর্ণ-ভাবে অশ্লীলতা না থাকলেও যে ভাবগুলি তার মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তার ভাষা সংযত, সংহত, সুরুচিপূর্ণ। উপন্যাস-খানি পড়তে পড়তে কয়েক জায়গায় মনে হয় রাত্রির নিস্তব্ধতায় অনেক অবিন্যস্ত চিন্তা আমাদের মনে আসে, সেগুলো থেকে আমরা কোন সময়ে রেহাই পাই না, প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে লেখক মহাশয় ওর মনের চিন্তাটাকে নিয়ে একটু বেশী করেই মাথা ঘামিয়েছেন। তাই কোন কোন জায়গায় তাঁর মনের কথা বলতে গিয়ে এমন কয়েকটা নিজের উক্তি দিয়ে ফেলেছেন, (যথা (ক) আমরা ঘটনার দর্শক হিসাবে লেখককে ধরে (এই) তা খুব একটা ভাল লাগে নি। সেখানে কি রকম একটা খারাপ, খারাপ ভাব আমাদের মনের মধ্যে আসে।

ঘটনাকে লেখক যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে শ্যামলকে খারাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। একটা 'চাপা' মনের মানুষ কোথায় কি করে বসে কেউ সহজে তা বুঝতে পারে না। সেই একটা এক-কেন্দ্রিক চরিত্র বলে আমার মনে হয়। তার জনাই 'প্রকৃতি'র অন্তর্দ্বন্দ্ব আর প্রীতির সঙ্গে শ্যামলের গোপনে গোপনে প্রেম বিনিময়, প্রীতির সঙ্গে শ্যামলের গুপ্ত প্রেমের যে ইঙ্গিত এক জায়গায় দিয়েছেন আর একটা কি দুটো ইঙ্গিত দিলেই মনে হয় ভাল হত। আমার মনে হচ্ছে পুরো ঘটনাটা এখানে প্রকাশ পায় নি। প্রকৃতির মনের মধ্যে যেমন সংস্কার, বাধা আছে শ্যামল যে তাকে না পেয়ে প্রীতিকে একটা কর্তব্যকর্মের জন্য বিবাহ করল তার পূর্বে অন্তর্ধানের মধ্যে কি কোন দ্বন্দ্ব ছিল না? সে অন্তর্দ্বন্দ্বটি লেখক প্রকাশ করেন নি কোথাও।

চিঠিপত্র

যে সমস্ত সস্তা দামের উপন্যাস আজকাল বাজারে আমরা অহরহ দেখতে পাচ্ছি দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্র খুব কম দেখতে পাওয়া যায় এর একটা যেমন প্রীতি অন্যটা প্রকৃতি আর তেমনি একটা শ্যামল, সন্দেহ নেই শ্যামলও আমাদের মধ্যে কম নয়। তারাও এমনি করে একটা ভুল করে চলেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন তারা এরকমভাব করে চলেছে কেন? উপন্যাসটিতে শ্যামল যে প্রীতিকে বিবাহ করল তার মনেও কি কোন ব্যথা বা বেদনা ছিল না? একটা কর্তব্যবোধও মনের মধ্যে থাকতে পারে?

এমনিতেই বেশ ভাল লেগেছিল, কিন্তু শেষে ২৩ পরিচ্ছেদে এমন একটি দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন পাঠক মনের চিন্তাকে তা বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে প্রকৃতির অন্তরের হাহাকারটাই ব্যক্ত করা হয়েছে। সেইখানেই সবকিছু সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা পাঠক, আমরা চিন্তা করব কেন এমন হল? ধরুন, সকলে যেভাবে একটা জিনিসকে দেখে লেখকরা একটা বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে তাকে দেখেন—আমাদের অর্থাৎ পাঠকদের মনে সে রকমভাবে উপস্থাপিত করতে পারলেই তারা চিন্তা করলে—তারাই সমস্ত কিছু বিচার করলে? লেখক এমনভাবে ঘটনাটিকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন—তাতে একটা ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

হরিপদ রায়
মেদিনীপুর।

নিকটেই আছে প্রসঙ্গে

আজকাল সবাই হৈহৈ করেন। সকলের কণ্ঠে একই আক্ষেপ, ছেলেরা একদম বয়ে গেল, ঠগ-জোচ্চোরে দেশ ছেয়ে গেল, হা-হুতাশ করেই আমরা কর্তব্য সমাধা করি। তার বেশি আর নয়। আবার কেউ কেউ ভাসা ভাসা গভীরে ঢুকে আঁচড়কাটা মন্তব্য করেন, বেকারি, দারিদ্র্য, হতাশাই এসবের মূলে। ব্যস ঐ পর্যন্ত। আর পথ ভাঙতে আমরা কেউ রাজী নই।

এতো সত্যি ঠগ-জোচ্চোরে দেশ ছেয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত আমরা প্রতারিত হচ্ছি। বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ভীষণ চিড় খাচ্ছে। শক্তমাটি খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে নিশ্চিন্তে দু-দণ্ড দাঁড়ানো চলে। ঠকে ঠকে এখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। সহজ বিশ্বাসের ভাবটাই আমাদের মধ্যে থেকে উবে গেছে। এখন আমরা বিশ্বাসের বদলে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতেই লোকজনের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত। পাছে ঠকে আবার বেকুব বনে না যাই।

তাই অমৃত-এ যেদিন বিজ্ঞাপন দেখলাম, ঠগ-জোচ্চোর নিকটেই আছে সেদিন থেকেই উৎসাহিত হয়েছিলাম। ঠগ-জোচ্চোরদের স্বরূপ চিনে নেওয়ার জন্য। তারপর অসীম আগ্রহে 'নিকটেই আছে' ফিচারের উপরে হামলে পড়েছিলাম। সে ঘোর এখনো কাটেনি। প্রতি সপ্তাহে পড়ে যাচ্ছি নিকটেই আছে। যত পড়ছি ততই জানতে পারছি যে, ওরা সত্যি সত্যি চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে। কখন যে গোটা সমাজটা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে তার ঠিক নেই।

রেশন দোকানদারের সেই পোষা গুণ্ডা আবার পুজোর চাঁদা সংগ্রহের উদামী বয়াটে ছোকরা দুটো। ওদের দিয়ে কত লোক কত কাজ হাসিল করে নিচ্ছে। ইলেকসনে ওরা জান লড়িয়ে কাজ করে আবার বিপদে-আপদে আশ্রিতের ত্রাতার ভূমিকা নেয়। এর পরিবর্তে ওরা কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঘৃণাই কুড়োয় কৃতজ্ঞতা নয়। আর সকলের তো কথাই নেই। সবাই দিন গোনে, কবে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

এদের সম্বন্ধে আমরা জানছি—শুনছি। কিন্তু এদের স্বপক্ষে কোনদিন ভুলেও কিছু বলি না। সামনাসামনি বলার সাহস নেই। অথচ কিভাবে সমাজজীবনে এদের আবির্ভাব ঘটলো তা ভেবে দেখি না, দেখতে চাইও না। ওরাও যে আমাদের মতই মানুষ হয়ে জন্মেছিল, বাঁচার স্বপ্ন ছিল বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতো সেসব কথা ভুলেও কখনো মনে আসে না। কোন এক দুর্বল মুহূর্তের ত্রুটির সুযোগ নিয়ে সমাজের রুই-কাতলারা ওদের ব্যবহার করছে দাবার ঘুঁটির মতো। সুস্থ হয়ে বাঁচার অধিকার ওরা সেদিনই হারিয়েছে। আর এই মাশুল গুণতে হবে ওদের আমৃত্যু।

এ সম্বন্ধে কেউ আলোকপাত করবেন কি?

ছবি ব্যানার্জি
কলকাতা—৩৬

পূর্ববঙ্গের নতুন মানুষ

পূর্ববঙ্গ থেকে আবার অবিশ্রান্ত মানুষের স্রোত আসছে। তাদের দেখতে গিয়েছিলেন বসিরহাট অঞ্চলে আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। পশ্চিমবঙ্গের ওপর যে চাপ বাড়ছে, তাতে তিনি উদ্বেগবোধ করেছিলেন। এই সমস্ত 'উদ্বাস্তু'-দের সরকারী সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে বলে শুনেছি। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে তাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছি। এদের অধিকাংশই কৃষক অথবা মৎসজীবী। অধিকাংশ পরিবারে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং কোন রকম চাকুরী দিয়ে এদের বাঁচার পথ তৈরী করা যাবে না। যে ধরনের কাজ এরা করে এসেছে, সেই কাজই এদের দিতে পারলে সম্ভবত পরিবারগুলি বেঁচে যেত।

বাঙলা দেশের ভিতরে এখনও কোন কোন অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের বসতি দেওয়া যেতে পারে। জায়গাও আছে। প্রতিদিন ট্রেন ভর্তি হয়ে এসে নামছে শিয়ালদায়। আবার ট্রেন ভর্তি হয়ে চলেছে কোথায়, তা তারাও জানে না। বিতাড়িত মানুষদের জীবনকে বর্তমান সমস্যাকে আন্তরিক সহানুভূতি ও মমত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলে ভাল হয়। ওরা মানুষ, ওদের আছে বাঁচার অধিকার। না খেয়ে দিনের পর দিন এক অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের স্বাধীনতা আসে নি। ক্রমশ এদের নৈতিকমান ভেঙে পড়ছে এবং দুঃস্বপ্নময় ভবিষ্যৎ নিয়ে দিন গুনছে এরা। সবকিছুতে মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে আমরা তৃপ্ত। মনে রাখতে হবে, ওদের ওপর আমাদের দায়িত্বও কম নয়। ওরাও আমাদের প্রতিবেশী। একই মাটির মানুষ। সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আমার এই আবেদন।

অনুপকুমার বসু
কলকাতা—৩৪

এই আমাদের দেশ প্রসঙ্গে

দেশ দেখার আগ্রহ আমাদের সকলের। অথচ সামর্থ্য নেই তেমন একে পয়সাকড়ির অনটন তায় দেশ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব। ঠিক কোনখান থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করবো তা অনেকটা জানা নেই। আবার মাঝে মধ্যে দু-একদিনের ছুটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়া হয়তো চলে তবে টনটনে জ্ঞান থাকা চাই। সময় কম, সামর্থ কম। অথচ ঘুরতে হবে। ভেতর থেকে ধাক্কা আসছে। তাই স্পষ্ট একটা চিত্র পেলে অন্তত নিজের আশপাশটা খুটিয়ে দেখা যায়।

এতদিনের একটা মস্তবড়ো অভাব পূরণ হলো অমৃত-এ 'এই আমাদের দেশ' ফিচারটির সংযোজনায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফিচারটি পাঠককে টেনেছে। দেশ ঘোরার পক্ষে এ যেমন সহায়ক তেমনি দেশভ্রমণের নেশাও এতে অনেকটা মেটে। সম্পাদককে ধন্যবাদ।

তমাল লাহিড়ী
শিলিগুড়ি

শাদা চোখে

বাংলা কংগ্রেস প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রূপরেখা নির্ণয় করেছেন। নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ফ্রন্টের ছবি এঁকেছেন যুক্তভাবে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ধাড়া। ঘোষণার পূর্বমুহূর্তে তাঁরা শাসক কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ শাসক কংগ্রেসের তরফ থেকে 'কোন গূঢ় বিষয়ে' নিশ্চিত আশ্বাস পাওয়ার পরই বাংলা কংগ্রেস নেতৃদ্বয় তাঁদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করলেন।

প্রস্তাবিত এই ফ্রন্টের রূপরেখা কি হবে এটা আগেই অনেকে আঁচ করেছিলেন। কিন্তু তবুও আশাবাদীর মত কিছু কিছু বামপন্থী দল মনে করছিলেন যে বাংলা কংগ্রেস হয়ত আগের শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে কিছুসংখ্যক আসন ভাগাভাগির উপর জোর দিতে পারে মাত্র। একেবারে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার মত ঝুঁকি বাংলা কংগ্রেস হয়ত নেবে না। কারণ পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন এখনও প্রবল এবং জনতার মধ্যে কংগ্রেসবিরোধী প্রবণতাও এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অতএব এই পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে শাসক কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলার মত এত বড় ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করে যে ডান কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় কাউন্সিলে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি বোঝাপড়ার প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কংগ্রেস তার গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রূপরেখা টানবার জন্য সাহসী হয়ে উঠলেন। নতুবা তথাকথিত 'টপ সিক্রেটে'র কথা বলে বলে আরও কিছুদিন বাজার সরগরম রাখতে হত। শ্রীঅজয় মুখার্জি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে যখন পদত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করছিলেন তখনই বাংলা কংগ্রেস এই 'টপ সিক্রেট' কথাটা ব্যবহার করতে সুরু করেন এবং অদ্যাবধি পশ্চিম বাংলার মানুষকে সেই 'টপ সিক্রেটে'র নাগপাশ থেকে মুক্তি দেন নি। বরঞ্চ 'আসিতেছে, আসিতেছে' এরকম একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে দলের রাজনৈতিক উপযোগিতা সম্পর্কে গণমনে একটা আকুলতা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন। শ্রীমুখার্জির পদত্যাগের কথা 'টপ সিক্রেটে'র আচরণে রাখলেও সকল বঙ্গবাসী মাত্রই আগেই তা জেনেছিলেন। আর এবারের টপ সিক্রেট শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলনের কথা। রাজনীতি যাঁরা এতটুকু বোঝেন তাঁদের কারও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রূপরেখা জানতে কিছুই কষ্ট হয় নি। কেউ কেউ বলছেন শ্রীমুখার্জির 'টপ সিক্রেটে'র সব অংশ এখনও জানা যায় নি। যেটুকু বাকী আছে সেটুকু কোন রাজনৈতিক দলকে বেআইনী করবার জন্য সুপারিশ কিম্বা কোন তারিখে নির্বাচন হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত থাকতে পারে মাত্র। অন্য কিছু নয়। এসব 'টপ সিক্রেট' বাঙালীর জীবনে কিছু পরিবর্তন আনতে পারবে বলে ত মনে হয় না।

শ্রীমুখার্জি নয়াদিল্লীতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা পশ্চিম বাংলায় কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় সে সম্পর্কে নাকি কিছু সুপারিশ করে এসেছেন। সবিনয়ে শ্রীমুখার্জিকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। সেটা হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বলতে তিনি কি বোঝেন? এই প্রশ্ন অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষেও প্রযোজ্য, প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হলেই আইনশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়েছে একথা যেমন বলা চলে তেমনি শত সহস্র কালোবাজারি, মুনাফাশিকারী অহোরাত্র পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে আজ জনতার যে গলা কেটে চলেছে, এটাও কি আইনশৃঙ্খলার আওতায় পড়ে না? শুধু কালনেমির লঙ্কাভাগের মত অহর্নিশ কে কার সঙ্গে জোট বেঁধে লালদীঘির দপ্তরটা কুক্ষিগত করা যাবে, এই মতলব আঁটলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কাউকে ক্ষমা করবে বলে মনে হয় না। এই মূল্য বৃদ্ধির রোধ করবার জন্য শ্রীমুখার্জির কি 'টপ সিক্রেট' প্ল্যান আছে তা অবিলম্বে জনতা জানতে পারলে অনেকখানি আশ্বস্ত হতে পারতো।

যাক ও সব কথা আলোচনা না করে পুনরায় রাজনীতির আলোচনায় ফিরে আসা যাক। বাংলা কংগ্রেস এতদিন অষ্টবামের প্রতি যে বন্ধু-বন্ধু ভাব দেখাচ্ছিলেন তা একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন যে তাঁরা অষ্টবামকে স্বীকৃতি দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত নন। যদি দরকার মনে করেন তবে অষ্টবামের শরীকদের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করবেন। এই বক্তব্য অপমানসূচক হলেও অষ্টবামের মধ্যে একমাত্র এস এস পি ছাড়া অন্য কোন দল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত সাহস এখনো পর্যন্ত দেখান নি। এমন কি অষ্টবামের ঐক্যের উপরে জোর দেওয়ার প্রশ্ন তুলেও বাংলা কংগ্রেসকে অদ্যাবধি জানিয়ে দেওয়া হয় নি যে অষ্টবামের কোন শরীক পৃথক পৃথক ভাবে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করবেন না; যদি প্রয়োজন হয় বাংলা কংগ্রেস যেন অষ্টবামের প্রতিনিধিদের সঙ্গেই আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু সে কথা জানানো ত দূরের কথা, ইতিমধ্যেই তলে তলে ডান কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখার্জির বাসভবনে নৈশ অভিযান চালিয়েছেন, সাংবাদিকদের কাছে উভয়পক্ষই বলেছেন, দিল্লীতে শ্রীমুখার্জি ইন্দিরাজীর সঙ্গে কি কথাবার্তা বলেছেন তাই আলোচনা করেছেন মাত্র। কিন্তু আদপে তা নয়। ডান কম্যুনিস্ট পার্টির ধারণা, শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির চেয়েও শ্রীঅজয় মুখার্জির একটু বামপন্থী দুর্বলতা আছে। তিনি আদপে চান নি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোন এলায়েন্স করতে। অজয়বাবুর প্ল্যান ছিল নাকি বাংলা কংগ্রেস অষ্টবামের সঙ্গে সমঝোতা করবে, আর কিছুসংখ্যক আসন শাসক কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে একটি অলিখিত গ্র্যান্ড এলায়েন্স গড়ে তুলবে যাতে সর্বাত্মকভাবে সি পি এমএর ক্ষমতাদখলের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। বাংলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়ার নাকি, অবশ্য সি পি আইএর মতে, দক্ষিণপন্থী দুর্বলতা আছে। তিনিই নাকি বাংলা কংগ্রেসকে এক রকম জোর করে 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের' কান্ডারী করে তুলেছেন। শ্রীধাড়ার মতে নাকি সি পি এম ও সি পি আইএর মধ্যে গুণগত পার্থক্য খুব নেই, এবং ঐ দুই শক্তিই জাতীয়তাবাদী নয়। তাই শ্রীধাড়া নব কংগ্রেস, পি এস পি প্রভৃতি দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে আগ্রহী। শ্রীধাড়ার এই প্রচেষ্টাকে নাকি বানচাল করার জন্য সি পি আই নেতারা শ্রীঅজয় মুখার্জির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। এই যুক্তির কথা শুনলে যুগপৎ বিস্মিত ও হতাশ হতে হয়। সি পি আই কাউন্সিল রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে পশ্চিমবঙ্গে এখন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করার সময় এসেছে। এই সিদ্ধান্ত যদি তাঁদের ঠিক হয় তবে তাঁরা শ্রীধাড়াকে কেন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির জন্য দায়ী করছেন তা ত বোঝা যায় না। তাঁদের ঐ প্রস্তাবিত

গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলেই কি শ্রীধাড়া দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল হলেন ? যাহোক, বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগ্রেসিভ্ সেকসান খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই ধারণা। কারণ শ্রীধাড়া যেদিকে যাবেন শ্রীমুখার্জিও সেদিকেই যাবেন। তাঁরা অভিন্ন। অবশ্য, অষ্টবামে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা চালাচ্ছেন—এই বক্তব্যের আড়ালে যদি সি পি আই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের কৌশল ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোঝাপড়া করে আসেন সে আলাদা কথা।

অষ্টবামের অন্য শরীকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যে একেবারে হয় নি তা নয়। তাঁদের অনেকেই উপলব্ধি করতে সুরু করেছেন যে সংগ্রামের কথা, পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা ইত্যাদি বলে শুধু কালক্ষেপণের মাধ্যমে তাঁদের এক প্রকার প্রায় 'নাকে দড়ি' দিয়ে শাসন কংগ্রেসকে প্রগতিশীল বলে মেনে নেওয়ার জন্য টেনে নেওয়া হচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে এই অবস্থার অবসান চান। এবং শুধু তাই নয়; কংগ্রেস ও সি পি এমএর মধ্যে একটি তৃতীয় শক্তি গড়বার জন্য ইতিমধ্যে কথাবার্তাও সুরু করে দিয়েছেন। এই সম্পর্কে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে আর এস পি নেতা শ্রীমাখন পালের আশু বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। আবার অষ্টবামের অন্যতম শরীক এস এস পি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে ও বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে অষ্টবামের ভূমিকা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আর অষ্টবামের সভায় যোগ দেবেন না। এস এস পি আরও সিদ্ধান্ত করেছেন, যে ডান কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অষ্টবামের অন্য ছয় শরীকের সঙ্গে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন এবং জানতে চাইবেন যে শাসক কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁদের কোন দুর্বলতা আছে কিনা ? এস এস পি আর এস পি ও লোকসেবক সংঘের সঙ্গেও আলোচনা করে একটি প্রকৃত কংগ্রেসবিরোধী ফ্রণ্ট গঠনের পক্ষপাতী। এস এস পি মনে করেন, সি পি আই তাঁদের সর্বভারতীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারেন না। অতএব, তলে তলে তাঁরা আট পার্টিতে থেকেই বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি গড়ে নেবেন। কাজেই অষ্টবামের রাজনীতিক লাইন কি হবে সেটা পরিষ্কার ভাবে ঘোষিত হওয়া উচিত। এসব তালগোলপাকানো রাজনীতি আর চলতে দেওয়া উচিত নয়।

অন্যদিকে ষড়বামের সর্বাধিনায়ক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অষ্টবামের শরীকদের বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি ও এস এস পিকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, একই সঙ্গে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট বিরোধিতা করা চলবে না। কম্যুনিস্ট-বিরোধিতা বলতে শ্রীদাশগুপ্ত বাম কম্যুনিস্ট-বিরোধীতার কথাই বলেছেন। তাঁর মতে কম্যুনিস্ট পার্টি বলতে তাঁর দলই। অন্যরা ত সংশোধনবাদী ও প্রতিবিপ্লবী বা এডভেঞ্চারিস্ট মাত্র। শ্রীদাশগুপ্ত আবার গর্ব করে বলেছেন, কম্যুনিস্ট পার্টির অর্থাৎ তাঁর দলের বিরোধিতা করার জন্যই নাকি অন্য সব 'পেটি বুর্জোয়া' দলগুলি ভেঙে যেতে বাধ্য। শ্রীদাশগুপ্তর দল শ্রেণীভিত্তিক দল বলেই ভাঙছে না। অবশ্য নকসাল হয়ে যাওয়াটা দল ভাঙা কিনা সে কথা শ্রীদাশগুপ্ত বলেন নি। জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বলতেন তাঁদের বের করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। অন্য দল বের করে দিলে সেটা বের করা হয় না। সেটাকে ভাঙন বলে। তাই পাঁচ শত টুকরো হয়েও কম্যুনিস্ট পার্টি বা শ্রীদাশগুপ্তর দল ভাঙে নি। শ্রীদাশগুপ্তর কথা থেকে মনে হচ্ছে, তিনি অষ্টবামকে ভেঙে দিতে চাইছেন। কারণ তা হলে তাঁর দলের পক্ষে যাকে বলে ডিরেক্ট কনফ্রনটেশান সেটা করা যায়! এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অন্য ছোট দলকে, অন্তত যে-গুলো রাজ্যভিত্তিক, হয়ত সি পি আই এর সঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষে ভিড়তে হবে, নতুবা তাঁর দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে অস্তিত্ব বিলুপ্তির জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই আশা করেই শ্রীদাশগুপ্ত হয়ত হুমকি দিচ্ছেন যে, 'কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট বিরোধিতা একসঙ্গে চলবে না।' শ্রীদাশগুপ্ত কি মনে করেন যে তাঁর দলের এমন শক্তি পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে যে তার ফলে তিনি এককভাবে লড়াই করে ক্ষমতার সিংহদ্বারে উপস্থিত হতে পারেন ? কারণ তাঁদের এই দম্ভই কি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল না ? প্রমোদবাবুর হুমকি দেখে মনে হয় যেন অন্য দলগুলো কেবলমাত্র তাঁর হুকুম মানবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদের আদর্শও নেই বক্তব্যও নেই। কিন্তু তাঁদের তো উচিত পশ্চিমবাংলার অন্যতম বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে ধীরে সুস্থে কথা বলা। বাংলা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাকে কৌশলের সঙ্গে কাজে লাগানো। সকলকেই একই সঙ্গে আঘাত করে শত্রুতা বৃদ্ধি করা সুস্থ রাজনীতির পরিচয় কিনা ভেবে দেখা দরকার।

অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট কতখানি শক্তিশালী হবে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। শাসক কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস মিশলেই ভোটযুদ্ধে খুব সুবিধা হবে এমন লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। তাঁদের সহযোগী হিসাবে পি এস পিকে পাবেন বলে তাঁরা ধরে নিয়েছেন। এবং পি এস পির সঙ্গে সমঝোতা হলে পশ্চিম বাংলায় স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্রোহী পি এস পিকে বাইরে থাকতে হবে। আর শোনা যাচ্ছে এস এস পির কিছু লোক নাকি ঐ জোটে মদৎ দেবেন। তাঁরা কারা ? তাঁরা নাকি এস এস পির নারিকুলের ভগ্নাংশ। প্রকৃতপক্ষে নামেই তাঁদের অস্তিত্ব। সংগঠনে নয়। আর মুসলমানদের যে অংশ পাবেন তাঁরাও রাজনীতিতে এখন ফসিল মাত্র। অতএব, প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের উল্লেখমাত্রই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হাওয়া উল্টোদিকে বইতে সুরু করবে, এমন লক্ষণ এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র সি পি আই যদি গিয়ে ঐ জোটে ভেড়ে তবেই পালে একটু হাওয়া লাগতে পারে। নয়তো পরিস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক বলে ত মনে হচ্ছে না। কাজেই কিছু একটা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সব পার্টি জোটবন্দী হতে সুরু করবে, পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অবস্থা তত অনুকূল নয়। এখনো গঙ্গা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হবে। তারপর যদি রূপরেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সব দলই এখন কৌশলের খেলায় ব্যস্ত। আখেরে কে জেতে তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

—সমদর্শী

কলকাতা বন্দরের একটি নমুনা বা নকসার ফটো। শ্রীবিনয়ভূষণ দে এটি তৈরী করেন। কলকাতা বন্দরের প্রদর্শনীতে এটি একটি চিত্তাকর্ষক দ্রব্য। এই নমুনাটির মাপ হবে প্রায় ১২'×৯', এতে দেখান হয়েছে খিদিরপুর ডক, কিং জর্জেস ডক, হুগলী নদী, মালগুদামসমূহ, বন্দরের বিভিন্ন পূর্ত কার্য ও ইমারতাদি, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হেড অফিস ও অন্যান্য রেলওয়ে ভবন, কে পি ডক ও তথাকার ঝুলান সেতু প্রভৃতি, রেলওয়ে লাইন ও ইয়ার্ড, শেড প্রভৃতি আরও অনেক। এই প্রদর্শনী দেখতে বহু জনসমাগম হচ্ছে।
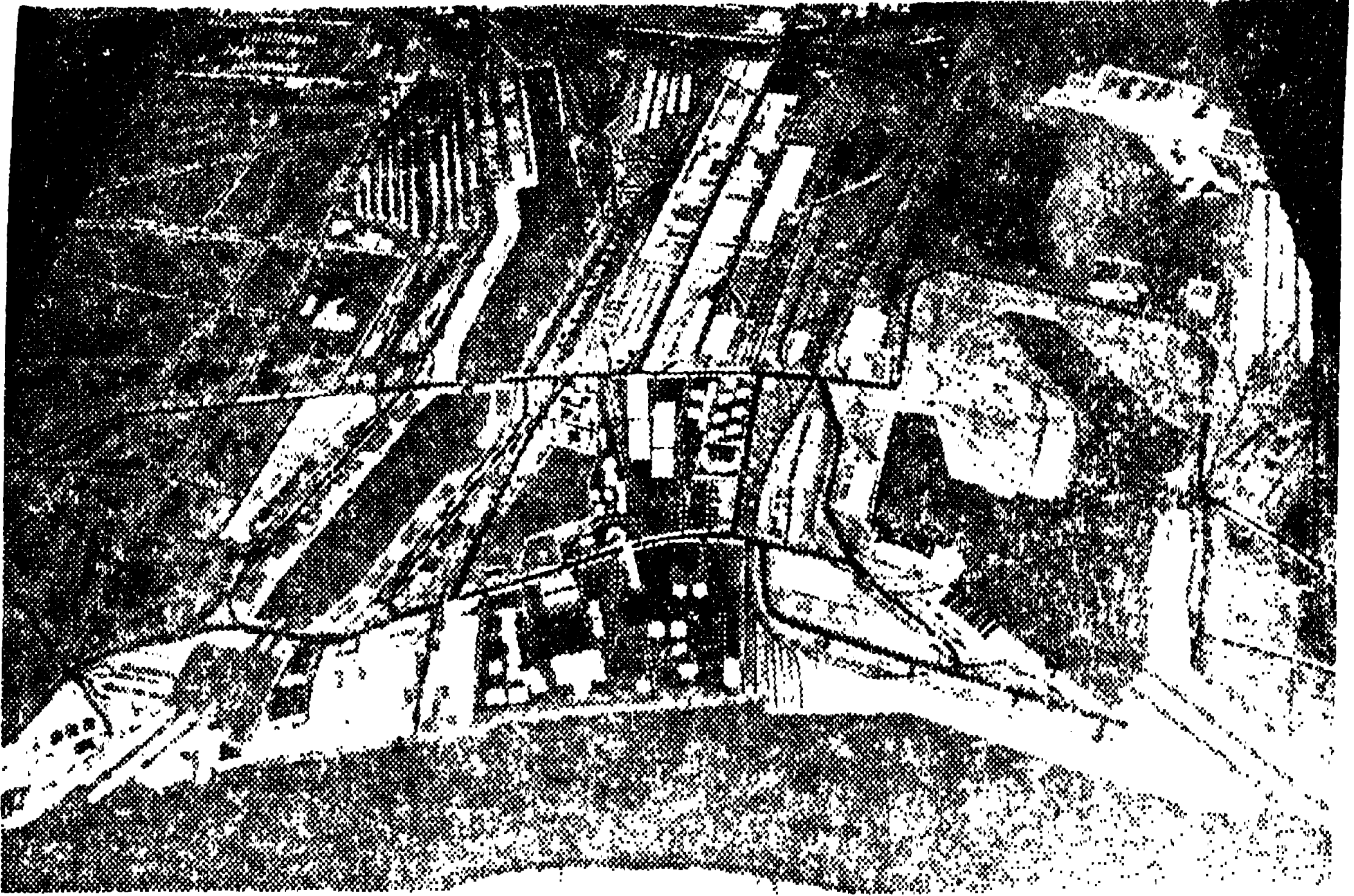
দেশে বিদেশে

উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজনীতির চাকা কি উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করল? লক্ষ্ণৌতে শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পর থেকে এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। লোকসভার ৫২০জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৮৫জন উত্তর প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন, অর্থাৎ লোকসভার প্রতি ছয়জন সদস্যের মধ্যে প্রায় একজনই হলেন উত্তর প্রদেশের। আর কোন রাজ্যই লোকসভায় মোট ভোটের এত বড় একটা অংশের মালিক নয়। একথাও মনে রাখা যেতে পারে যে, এ-যাবৎ যে তিনজন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা সকলেই উত্তর প্রদেশের মানুষ। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে নয়াদিল্লীতে শাসক কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা রাখতে হলে উত্তর প্রদেশকে হাতে রাখা দরকার। সম্ভবত রাজনীতির এই অঙ্ক মনে রেখেই শাসক কংগ্রেস দলের নেতারা ঐ রাজ্যে ভারতীয় ক্রান্তিদলের সঙ্গে কোয়ালিশন ভেঙে দিয়ে শ্রীচরণ সিংহের মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

কিন্তু শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অঙ্গ-রাজ্যে রাজনীতির এই অঙ্ক মেলাতে পারল না। দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; কিন্তু অন্য দলের সদস্যদের ভাঙিয়ে এনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহ সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিক দলগুলির সমস্ত এম-এল-এর দ্বারা নেতা নির্বাচিত হনান, এই অজুহাতে শ্রীসিংহকে ক্ষমতার আসন থেকে দূরে রাখার জন্য শাসক কংগ্রেস যে শেষ চেষ্টা করেছিল সেটাও রাজ্যপাল ডাঃ গোপাল রেড্ডি বানচাল করে দিলেন। ইদানীং-কালের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার যেসব তাৎপর্য এখনই পরিষ্কার হয়ে উঠছে সেগুলি হচ্ছেঃ (১) শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে হতাশা এবং কতকটা উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। (২) উত্তরপ্রদেশে শাসক কংগ্রেস মহলের কিছু অংশ শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার শাসক কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব ও ঐ রাজ্যে শাসক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব, দুটিই এখন শ্রীত্রিপাঠীর হাতে। এই দুই পদের একটি ছাড়বার জন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতারা চাপ দিচ্ছেন, এরকম একটা সংবাদ খুব ব্যাপকভাবে রটছে। (৩) রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জন্য সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি যে উদ্যোগ করেছিল সেটা এখন চাপা পড়েছে। রাজ্যপালের সুপারিশমত শ্রীচরণ সিংহের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আমন্ত্রণ করায় সেই সমালোচনা চাপা পড়েছে। কারও কারও বিশ্বাস যে, রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপেই শেষ পর্যন্ত শাসক কংগ্রেসের দাবী উপেক্ষা করে শ্রীসিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাবার সিদ্ধান্ত করা হয়। (৪) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে সংযুক্ত বিধায়ক দল গড়ে তোলার কথা উঠছে। লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ রামসুভগ সিং বলেছেন, 'উত্তরপ্রদেশের

গড়বেতা থানার কেশিয়া গ্রামের কংসাবতী ক্যানেলের 'এ্যাকুইডাক্টোর' উপর দিয়ে সেচের জল ছাড়া হয়েছে। এর ফলে ৬৫০০০ হাজার একর জমি জল পাবে। সেচের জল ছাড়ার প্রথম উদ্বোধন করছেন ১৯৫৯ সাল থেকে কর্মরত এক শ্রমিক দম্পতি শ্রীঅবিরাম হেমব্রম ও শ্রীমতী কালো হেমব্রম। এই ক্যানেলটির বৈশিষ্ট্য হল যে, নীচে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের রেলপথ এবং উপরে সেতুর মত ক্যানেল দিয়ে জল চলেছে, পাশে জীপ ও মানুষ চলাচলের পথ। ভারতবর্ষে এই ধরনের ক্যানেল দ্বিতীয় নেই।

আজকের রাজনৈতিক চিত্র ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যের এবং এমন কি কেন্দ্রেরও রাজনৈতিক চিত্র হয়ে উঠবে।' ভারতীয় ক্রান্তি দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডও এই ধরনের একটি সর্বভারতীয় সংযুক্ত বিধায়ক দল গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন এবার মাত্র এক পক্ষকাল স্থায়ী হয়েছিল। এর আগে আর কোথাও এত অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটেনি। রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথগ্রহণ করলেন শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং, যাঁর সঙ্গে ইদানীংকালে রাজনীতির বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। শ্রীসিং পরলোকগত লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, এককালে সাংবাদিক বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজাররূপে কাজ করেছেন এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর ও পরিকল্পনার সদস্য হয়েছেন। অতীতের কর্মজীবনের এই ধরনের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও শ্রীসিং সম্প্রতি কালে রাজনীতির সম্মুখের সারিতে ছিলেন না। উত্তরপ্রদেশের বিধানমণ্ডলীর সদস্যও তিনি নন, যদিও তিনি রাজ্যসভায় আছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিকদের সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একজন কাউকে নেতৃত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যবনিকার অন্তরালবর্তী এই মানুষটিকে রাজনীতির মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে এনে দাঁড় করান হয়েছে। নেহরু পরিবারের এককালের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বিপরীত শিবিরের নেতৃত্ব করতে দেখা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে বেদনাদায়ক।

শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহের মন্ত্রিসভায় আপাতত মাত্র আর দুজন সদস্য গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরা হলো বিরোধী কংগ্রেস দলের শ্রীগিরিধারী লাল এবং ভারতীয় ক্রান্তি দলের শ্রীবীরেন্দ্র বর্মা। জনসঙ্ঘ স্থির করেছে, তারা মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে। স্বতন্ত্র পার্টির সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায় নি। সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি যদিও সংযুক্ত বিধায়ক দলের অন্যতম শরিক তাহলেও তাদের মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রয়েছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মতে ন্যূনতম একটা কার্যসূচী পালন করা হবে, কেবলমাত্র এই সর্তেই কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেওয়া এস-এস-পির সাধারণ নীতি। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রেও পার্টি যদি সেই নীতি আঁকড়ে থাকে তাহলে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এস-এস-পির এই অনিশ্চিত ভূমিকা লক্ষ্য করেই উত্তরপ্রদেশের কম্যুনিষ্ট নেতা জেড এ আহমেদ বলেছেন, 'সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিই সংযুক্ত বিধায়ক দলের 'ডেমোলিশন স্কোয়াডে' পরিণত হবে।'

*

উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় যাঁরা ভারতীয় রাজনীতির প্রবাহে উল্টা স্রোতের টান লক্ষ্য করছেন তাঁরা বোম্বাই শহরে প্যারেল কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলেও অনুরূপ ধারা লক্ষ্য করেছেন।

এই উপনির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন শিবসেনা দলের শ্রীবামন মহাদিক ও কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রীমতী সরোজিনী দেশাই। শ্রীমতী দেশাই হচ্ছেন প্যারেল কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মহারাষ্ট্র বিধানসভার প্রাক্তন কম্যুনিস্ট সদস্য কৃষ্ণ দেশাইয়ের বিধবা পত্নী। কৃষ্ণ দেশাই কিছুদিন আগে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতেই প্যারেল কেন্দ্রের উপনির্বাচন হচ্ছিল।

এই উপনির্বাচনের গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করবার পর এই প্রথম শিবসেনা দল মহারাষ্ট্র বিধান সভায় প্রবেশ করবার চেষ্টায় নেমেছিল। এই প্রথম শিবসেনা দলকে সমস্ত বামপন্থী দল ও শাসক কংগ্রেসের সম্মিলিত বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সর্বভারতীয় দলগুলির মধ্যে এক মাত্র জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির কয়েকজন নেতা শিবসেনা প্রার্থীকে সমর্থন করছিলেন। বিরোধী কংগ্রেস দলনিরপেক্ষ ছিল।

ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, শ্রীমহাদিক পেয়েছেন ৩১৫৫১ ভোট আর শ্রীমতী দেশাই ২৯৯১৩ ভোট। অর্থাৎ শিবসেনা ১৬৭৮ ভোটে জয়ী হয়েছে। প্যারেল একটি শ্রমিক-প্রধান অঞ্চল, দীর্ঘকাল ধরে এই কেন্দ্র কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে

যুগলে স্ফীংস্ মিলন
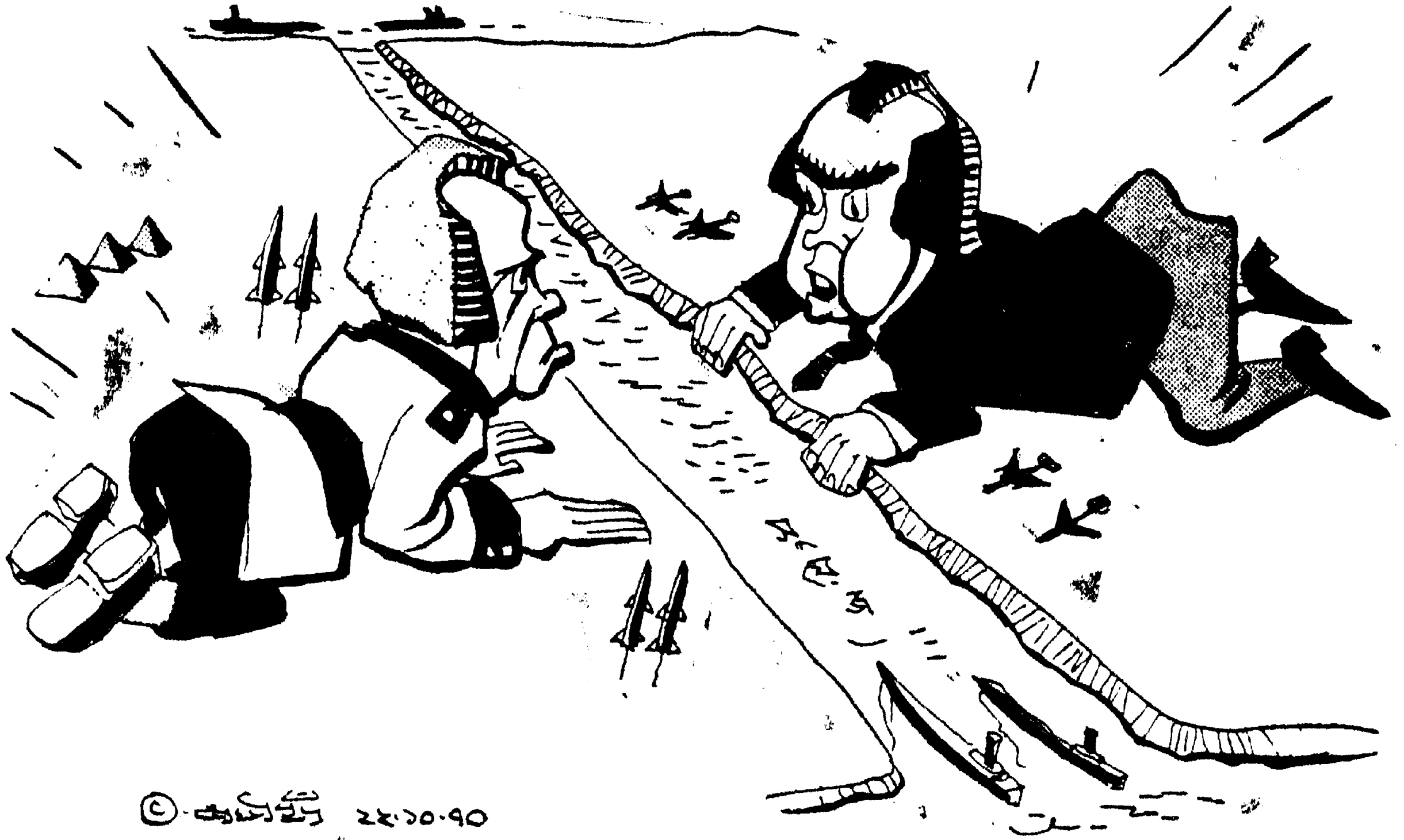
রয়েছে এবং এই কেন্দ্রে বিশেষ করে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীডাঙ্গের বিপুল প্রভাব রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের একটি নির্বাচকমন্ডলী থেকে বামপন্থী দলগুলি ও শাসক দলের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে একজন কট্টর দক্ষিণপন্থী প্রার্থীর জয়ী হওয়া একটি লক্ষ্য করার মত ঘটনা।

●

ক্যানাডার কুইবেক প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী ৪৯ বছর বয়স্ক পিয়ের লাপোর্ট তাঁর বন্দী দশা থেকে শেষ যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁর দুই ভাই মারা গেছেন, তাঁর বৃদ্ধা মা, ভগ্নীরা, স্ত্রী ও দুই কন্যা তাঁর উপর নির্ভরশীল; অতএব তাঁর জীবন রক্ষার জন্য যেন চেষ্টা করা হয়।

তাঁর সেই আবেদন নিষ্ফল হয়ে গেছে। মনট্রিয়াল শহরের একটি সবুজ রংয়ের শেভ্রলে গাড়ীর পিছনে মাল রাখার জায়গায় রক্তমাখা কম্বলে মোড়া অবস্থায় পিয়ের লাপোর্টের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ময়না তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটা লোহার শিকল গলায় জড়িয়ে তাঁকে দম বন্ধ করে মারা হয়েছে।

হতভাগ্য লাপোর্ট এইভাবে ক্যানাডার একটি উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের শিকার হল। এই আন্দোলনের সংগঠনের নাম এফ এল কিউ অর্থাৎ কুইবেক মুক্তি ফ্রন্ট। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরাসীভাষী কুইবেক প্রদেশকে ক্যানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। ক্যানাডায় ফরাসীভাষীদের অভিযোগ দীর্ঘকালের। সংখ্যায় তাঁরা ক্যানাডার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ, অথচ শিক্ষা, জীবিকা ইত্যাদি সুযোগসুবিধার দিক থেকে তাঁরা ইংরাজীভাষীদের তুলনায় বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। ১৯৬৪ সালে রাণী এলিজাবেথ যখন ক্যানাডা সফর করতে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার সংখ্যালঘু ফরাসীভাষীরা রাণীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দ্য গল ১৯৬৭ সালে ক্যানাডা সফর করতে এসে 'স্বাধীন কুইবেক জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহিত করে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে এই আন্দোলন যে ক্যানাডার পক্ষে এতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে সেটা টের পাওয়া গেল এফ এল কিউ-য়ের সন্ত্রাসবাদীরা এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর দুজনকে অপসরণ করে নিয়ে যাওয়ায়। প্রথমে অপহৃত হলেন ক্যানাডায় বৃটিশ বাণিজ্য দূত মিঃ জেমস ক্রস, তারপর মিঃ লাপোর্ট। কুইবেক মুক্তি ফ্রন্টের দাবীঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁদের দলের ২৩ জনকে সরকার আটক করে রেখেছেন তাঁদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে, তাঁদের নিরাপদে হয় কিউবায় বা আলজেরিয়ায় পাঠিয়ে দিতে হবে এবং মুক্তি শুল্ক হিসাবে পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা দিতে হবে। ঐ সব সর্ত নিয়ে একজন আইনজীবীর মারফৎ সরকারী মুখপাত্রদের সঙ্গে অপহরণকারীদের আলোচনা চলছিল। ক্যানাডা সরকার বলেছিলেন যে, অপহরণকারীরা ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে ছেড়ে দিলে এক ঘন্টার মধ্যে তাঁদের নিরাপদে কিউবায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ক্যানাডাস্থিত কিউবার দূতও বলেছিলেন যে, 'মনুষ্যত্বের খাতিরে' তাঁরা অপহরণকারীদের তাঁদের দেশে আশ্রয় দিতে রাজী আছেন। যে আইনজীবী ভদ্রলোক মুক্তি ফ্রন্টের তরফ থেকে সরকারী মুখপাত্রদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি এই সরকারী সর্তকে একটা অবিশ্বাস্য তামাসা' বলে অভিহিত করে আলোচনা ভেঙ্গে দেন।

তারপরই সবুজ রংয়ের শেভ্রলে গাড়ীর পিছনে পিয়ের লাপোর্টের রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মিঃ ক্রসের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা এখনও জানা যায় নি। তবে তাঁর কাছ থেকে সর্বশেষ যে চিঠি পাওয়া গেছে তাতে তিনি লিখেছেন, তিনি জীবিত ও সুস্থ আছেন; তবে পুলিশ যেন তাঁকে খুঁজে বার করার চেষ্টা না করে, কেননা, এই বিষয়ে পুলিশের সাফল্যের অর্থ হবে তাঁর নিজের মৃত্যুদণ্ড।

ক্যানাডা সরকার ইতিমধ্যে সারা দেশে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত আইন চালু করে পুলিশকে অভূতপূর্ব ক্ষমতা দিয়েছেন, সেনাবাহিনীকে রাস্তায় নামানো হয়েছে এবং দেশ জুড়ে ধরপাকড় চলছে।

—শ্রীপুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

চীন-ভারত সম্পর্ক

গত আট বছর ধরে চীনের সঙ্গে ভারতের সদ্ভাব নেই। এই দুই দেশের পক্ষে তো বটেই আন্তর্জাতিক দুনিয়াতেও এই অসদ্ভাব গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পঞ্চাশের দশকে চীন-ভারত মৈত্রীর বাণী প্রচার করে জওহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত পররাষ্ট্রনীতির গোড়াপত্তন করেন। পঞ্চশীল নীতির উদ্ভবও সেই সময়ে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে, চীন-ভারত মৈত্রী দীর্ঘস্থায়ী হল না। তিব্বতের দলাই লামাকে মানবিকতার কারণে আশ্রয় দেওয়াই এর একমাত্র কারণ নয়। ক্রুশ্চেভের ক্ষমতালাভের পর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের যে মতাদর্শগত বিরোধ শুরু হয় তখন থেকেই চীনের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন। ভারতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনও চীন সে সময়েই ছিন্ন করে উগ্র বৈরীরূপ গ্রহণ করে। ১৯৬২ সালে তা প্রকাশ্য ব্যাপক আক্রমণের আকার নেয়। ভারত-চীন সম্পর্ক তখন থেকেই অচলাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু ভারতের সঙ্গেই নয়, দুনিয়ার অনেক দেশের সঙ্গেই চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাল ছিল না। চীনা বিপ্লবকে আমেরিকা কোনোদিনই মেনে নিতে পারে নি। তাই ফরমোজাকে চীনা-রাষ্ট্র বলে তাঁরা চালাচ্ছেন। আমেরিকা ও তার অনুগামীদের বিরোধিতার জন্যই চীন রাষ্ট্রসংঘের সভ্য হতে পারে নি। চীনকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অবরোধের চেষ্টাও আমেরিকার তরফ থেকে হয়েছে। এ সমস্ত কারণ চীনের ক্ষোভ ঘটাতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে তার বিরোধের কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না। রাশিয়া ও চীন দুই-ই কমিউনিস্ট শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। চীনের বিপ্লবে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত ও সহযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না। বিপ্লব সমাধানের পর দশ-বারো বছর চীনের বৈষয়িক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে রাশিয়া অকাতরে সাহায্য করেছে। আজ সেই সহযোগিতার বদলে দুই দেশে রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটছে। সুতরাং চীনের বিরোধ শুধু ভারতের সঙ্গে নয়, কমিউনিস্ট চূড়ামণি, লেনিনের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গেও।

যাই হক, প্রত্যেক দেশই তার জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতির বিচার করে। চীন অতিবিপ্লবী হলেও অর্থনৈতিক কারণেই পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে দ্বিধা করে নি। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোও কমিউনিস্টবিরোধী হলেও বাণিজ্যের মুনাফা লুটবার জন্য চীনের বৃহৎ বাজারকে কখনো অচ্ছ্যুৎ মনে করে নি। এইভাবেই রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা চীন গত একুশ বছরের বিপ্লবকে সুসংগঠিত করে আজ পারমাণবিক শক্তিধর বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ভারতের দিক থেকে চীনের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে অনেকবারই আগ্রহ দেখানো হয়েছে। চীন এতদিন তার কোনো মূল্য দেয় নি। ভারতবর্ষের আভ্যন্তর রাজনীতি নিয়ে চীনা বেতারে অনেক কটূকাটব্য শোনা গেছে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন অংশটা সাচ্চা, কোনটা ঝুটা তাও চীনের মন্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীং যেন চীনা সরকারের তরফ থেকে এই নীতিপরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দুনিয়ার বহু দেশের সঙ্গে চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী। রাশিয়ার সঙ্গেও তার পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সঙ্গেও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে চীন সম্প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন না হলেও রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। বহুদিন পর গত মে দিবসে পিকিং-এ এক অনুষ্ঠানে ভারতের ভারপ্রাপ্ত দূতের সঙ্গে মাও সে তুং করমর্দন করে ভারতের জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। এর পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবার একটা প্রচেষ্টা চীনের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে। ভারতের ন্যায্য এলাকা চীনের অধিকৃত হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ভারত আগ্রহী। সম্প্রতি কায়রোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে চীনা উপ-রাষ্ট্রপতি মিং কয়ো মো জো-র দীর্ঘ সাক্ষাৎকার হয়। কুয়ো মো জো নাসেরের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেবার জন্য কায়রো গিয়েছিলেন। তিনিই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এই আলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য বলেন। আলোচনার ফল আশাপ্রদ হয়েছে বলেই ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা। চীনের সঙ্গে ভারতের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন এশিয়া তথা বিশ্বশান্তির পক্ষে সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। চীন ও ভারত এশিয়ার দুই বৃহৎ দেশ যার ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি পারস্পরিক মৈত্রীতেই একদিন উজ্জ্বল ছিল। রাজনৈতিক বিরোধ সেই মৈত্রীকে আচ্ছন্ন রেখে যে দুর্দৈবের সূচনা করেছিল তার অবসান সকল শান্তিকামী মানুষেরই কাম্য। চীন তার

নেই ।। আনন্দ বাগচী

দেউড়িতে যে রৌদ্র জ্বলতো প্রহরীর মত, অন্তপুরে
বিচিত্র ছায়ার অন্তর্বাস, অলংকৃত শ্রোণীভার,
দেওয়ালে নিহত পশু, দম্ভের উলঙ্গ তরবারী
ভয়াল মশাল রাত্রে, জলসাঘরে রংমশাল
যুদ্ধে বা জুয়ায় গেছে, শূন্য শেষ ফানুসের মত,
এখন মানুষ নেই, কোনোখানে মানুষের অবয়ব নেই
মাংসের ভিতরে হাড় চূর্ণ, ছায়া রৌদ্রের ভিতর,
রক্তের ভিতরে জল, হৃদপিণ্ড স্তব্ধতার ক্ষয়
দেউড়িতে হুতোম প্যাঁচা, কড়িকাঠে ঝুলছে দড়ি।।

চাঁদ খুন করে ।। রুদ্রেন্দু সরকার

এমনি এক অদ্ভুত আঁধারে তুমি ছিলে আমার পাশে
অথচ আজকের রাত তোমরা কেউ জানলে না।
এই বোবা রাতেই আমি চাঁদ খুন করে
অমাবস্যার সাধনা করেছি।
প্রপেলারের মাথায় বেঁধে আমি ওর কাটা দেহ
নুনের সমুদ্রে নিয়ে ফেলেছি।

ওর কথা ভেবে ভেবে নিশুন্দি গাছের পাতা
পচে পচে সার হয়ে গেছে
ওকে আর কোনদিন প্রচ্ছদে দেখাবো না!
সব স্মৃতি খুঁড়ে খুঁড়ে শেষ হয় আশা
তবু কেন
পুকুরে নোঙর ফেলে সমুদ্রের ঢেউ আশা করা।

পেলে না তো? ।। প্রতিমা সেনগুপ্ত

ভারি জানতে ইচ্ছে করে
কি তুমি পেলে না?
'কিছুই পেলাম না জীবনে'...বলে যে আক্ষেপ করো
তার মানে কি?
কি পেলে না তুমি সারা জীবনে?
আমি যদি বলি—
আমার তিন দিব্বি করে বলো
আর কেউ যেন আমায় নিতে না পারে
তার আগে ডবল ডেকারের তলায়...
তবুও কি বলবে কিছুই পেলে না?
তাহলেও কি শোনাবে (মনে মনে)...
'যতদিন আছে থাকুক আপত্তি কি?
তারপর চলে গেলেই হল?' .....
আর চলে গেলেই শুরু করবে—
বাণী দেবে...'কিছুই পেলাম না জীবনে'......
আশ্চর্য!
ভারি আশ্চর্য!
তোমরা!

স্বদেশে-প্রবাসে

মিহির আচার্য

সন্ধেবেলা আপিস থেকে ফিরে বাড়ির দরজায় পা দিতেই অমলের এখন মনে পড়ল আজ বিজয়ার আসার তারিখ। কথাটা স্মরণ হতেই অমলের নতুন করে ক্লান্তি আর অপরিচ্ছন্ন অবসাদ বোধ হল। চাকরিস্থল থেকে এই দীর্ঘ ছুটির দিনগুলোতে বিজয়ার সংসারে প্রত্যাবর্তন একটা হোঁচটের মতো সমস্ত চেতনাকে যেন নাড়া দেয়। পুরু চশমার কাচে ঈষৎ স্থূল বিজয়ার শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকাটুকু কঠিন বিচারকের মতো এ বাড়িতে যেন একটা অস্বস্তি রচনা করে। ঘরদোর, বিছানা আসবাব থেকে রান্নার ঘর পর্যন্ত বিজয়ার চোখে নিন্দনীয় হয়ে ওঠে।

অমলের তরফ থেকে জবাব দেবার অনেক কিছু থাকে। কিন্তু আজকাল চুপ করে উদাসীন থাকতে ভালোবাসে। বাইরে থেকে দুদিন এসে বিনা খরচে সমালোচনার অনেক কিছু থাকে। সম্ভবত এই সমালোচনাগুলোই বিজয়ার এক ধরনের আনন্দ। কিংবা ওর কাছে সংসার মানেই এই ঘরদোর, বিছানা আসবাব, রান্নাঘর, আর কিছু নয়।

ঘরের ভেতরে পা দিতেই বিজয়া এগিয়ে এল: 'এই যে। আজ আমি আসছি জেনেও...'

অমল নিঃশব্দে বিছানায় এসে বসল।

'আমার চিঠি পাওনি?'

'কোন চিঠি?' অমল ক্লান্ত চোখ তুলল।

'বা। তুমি দিন দিন...'

'কী?'

'না। কিছু নয়। চা খাবে তো?'

'দিতে পারো। বুবু কোথায়?' নিশ্বাস ফেলল অমল।

বিজয়া ডাকল: 'বুবু, বাবা ডাকছেন!'

বুবু খাটের পেছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। কত বয়েস হল বুবুর? বারো না তেরো? আবার নিশ্বাস ফেলল অমল। বুবু আমার মেয়ে, আশ্চর্য। ওকে কবে একদিন হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছিলাম। এই এতটুকু! তারপর ও বড় হল। ছ বছর? তাই বোধহয়। মার সঙ্গে চলে গেল। আরো দশজন ছাত্রীর সঙ্গে বুবুর পড়াশোনার গুরু দায়িত্বও বিজয়া একাই কাঁধে তুলে নিল। গ্রীষ্মের আর পুজোর ছুটি। অদর্শনে বুবু কখন বারো থেকে তেরোয় পৌঁছে গেল।

'রোগা হয়েছিস কেন?' অমল হাসল। বুবুও। 'আচ্ছা তোর কী বাবার কথা মনে পড়ে না। যদি আর কোনোদিন তোকে ছেড়ে না দিই? না! না থাক ওর মাস্টারি নিয়ে। অনেক ছাত্রী পাবে মানুষ করবার। 'সেবার তুই মিউজিয়ামে যেতে চেয়েছিলি। কালই নিয়ে যাব।'

বুবু বিব্রত হয়ে বলল: 'কাল? কাল যে মা মাসিমণির ওখানে যাবে।'

অমল হাসল। 'আচ্ছা।'

চা নিয়ে এল বিজয়া: 'কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে তোমাদের?'

অমল বলল: 'না কিছু না।'

'তোমার আদরে...' বিজয়া বলল।

অমল বলল: 'বোসো।'

'হাঁ এখন আমার বসবার সময় কিনা! মাংস চাপিয়েছি...'

'তবু বোসো।'

'কিছু বলবে?'

'না। তবু বোসো। আমি চাটা শেষ করি।'

'তুমি না আগের মতোই আছ—'

'আগের মতো! কী জানি।' অমল অন্যমনস্ক হল। 'এবার কতদিনের মেয়াদ?'

'প্রতিবার একই কথা জিগ্যেস করো কেন বলো তো?'

অমল হাসল। 'অভ্যেস।'

বিজয়া বলল: 'কী ভাবো এতো? এমন ভাবুক তো তুমি ছিলে না।'

'বয়েস হচ্ছে না? এ কিছু নয়। বয়েসের ভাবনা।'

'আমার বুঝি বয়েস বাড়ছে না?'

'আচ্ছা বিজয়া—'

'কী?'

'না। থাক।'

'সেই পুরনো অসুখ। তুমি এখনো মানিয়ে নিতে পারলে না।'

'মানিয়ে নিতে পারাটাই কী বড় কথা বিজয়া? মানিয়ে তো নিলাম, কী হল? আমাদের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু বুবু...'

'কেন? বুবু তো ভালোই আছে।'

'ও আমার কাছে লজ্জা পায়।'

'তোমার কেবল বানানো অভ্যাস। বাবার কাছে আবার মেয়ের লজ্জা কী।'

'সেকথা যদি তুমি বুঝতে।' অমল নিশ্বাস ফেলল।

'এই তো দেড় মাস তোমার কাছে থাকবে...'

'দে-ড় মা-স।' অমল স্বগত উচ্চারণ করল: 'তুমি কী মনে করো এইটেই যথেষ্ট। তারপর, তারপর কী হবে? আমার কথাটা কে ভাববে?'

'তোমার কথা।' বিজয়া আশ্চর্য হল। 'তোমার না একা-একা থেকে একটা কমপ্লেকস গড়ে উঠছে। তুমি...'

অমল বলল: 'সেটা কী অস্বাভাবিক? একা থাকব বলে তো সংসার করিনি।'

বিজয়া নরম হয়ে বলল: 'প্রতিবার একই কথা বলে আমাকে অকারণ কষ্ট দাও কেন বলো তো? শখের চাকুরি তো করিনে, প্রয়োজনেই...। মনে হয় আজকাল তুমি আমাকে অপরাধী করছ। অথচ যা হবার নয়।'

অমল চুপ করে রইল।

'গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, চাকরি করতে পারবে ভেবেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে। করোনি? আর আমার যখন কিছু ক্ষমতা আছে, বাড়িতে বসে না থেকে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে করবই-বা না কেন।'

অমল বলল: 'তুমি কী সুখী হয়েছ?'

'কী কথা?' বিজয়া হাসল: 'নিত্য অভাববোধই বুঝি আমাদের সুখী করত। ছেলেমানুষি।'

অমল বলল: 'কী জানি, বুঝতে পারিনে, স্বাচ্ছন্দ্য না সুখ কোনটা মানুষ চায়। প্রয়োজনের রাক্ষসটা প্রতিনিয়ত হাড়মাস চিবিয়ে খাচ্ছে। আমরা যেন ঠিকভাবে বাঁচতে পারছিনে। ওখানে তোমার একটা সংসার এখানে আমার একটা সংসার, কী আয় হচ্ছে? একটা স্বার্থপরতার বৃত্তে আমরা দুজনেই ঘুরপাক খাচ্ছি। তোমার ব্যাংকে আলাদা পাশবুক আমার ব্যাংকে আমার, সেভিংস বাড়ছে। কিন্তু কেন? আমার ও তোমার জমানো টাকা একদিন বুবু পাবে। অথচ আজ এই মুহূর্তে, বুবু তেরোতে পা দিল, ওর জন্যে আমরা কী আদর্শ ধরে রাখতে পেরেছি? বুবু বড়ো হচ্ছে, ও যদি বলে: আমি বাবা-মা দুজনকেই একসঙ্গে পেতে চাই...। কে জানে, ওর বাড়ন্ত মনের ইচ্ছাগুলো আমাদের এই পৃথকবাসে চূড়ান্ত বাধা পাচ্ছে কিনা।'

বিজয়া বলল: 'তুমি একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছ।'

অমল বলল: 'সেই ব্যাখ্যাটাকে তুমি উড়িয়ে দেবে কোন যুক্তিতে? প্রতিদিন বেঁচে থাকার অর্থটা সজ্ঞানে বুঝতে চাই। বুবুর জীবনে প্রতি মুহূর্তে তার বাবার অস্তিত্বটা কেন অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে না? আমারও তো ওর কাছে একটা মূল্য চাই। তেরো বছর বয়েস হল ওর, কৈশোর যৌবনের সেই দুরন্ত তরল কঠিন নতুন অভিজ্ঞতায় সে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।'

বিজয়া মূক।

অমল আবার বলল: 'কী করে তুমি বোঝাবে ওকে বাবার সর্বদা এই দূরে এড়িয়ে থাকার বিষয়টা? ও কোনোদিন আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। ওর অভিমান নিরেট পাথর হয়ে দুস্তর ব্যবধান রচনা করবে। হয়তো এতদিনে এই বিষ ওর মধ্যে কাজ করছে।'

'ও জানে বাবার চাকরির খাতিরেই দূরে থাকতে হয়।'

'আমার চাকরির সত্যিকারের কোনো মূল্য ওর কাছে আছে? নেই। ওর ভাবতে অসুবিধে কোথায় বাবা ওকে ভালোবাসে না। স্বার্থপর বাবা একাকী নির্ঝঞ্ঝাট আরামে থাকতে চায়। ও বড় হচ্ছে বলেই ব্যাপারটা আমাকে, আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। নিজেদের ছেলেবেলার কথা ভাবো। আমরা আরো পাঁচটা ভাইবোনের সঙ্গে মানুষ হয়েছি, কিন্তু বুবুর বাবা আর মা ছাড়া কে আছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি তুমি নিশ্চয় ওর বাবার ভূমিকায় একসঙ্গে অবতীর্ণ হতে পারবে না।'

বিজয়া ছটফট করে উঠল। 'যাই। ওদিকে মাংস বোধহয়—'

অমল বিছানায় চিত হয়ে সিগারেট ধরাল। আমি কী অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছি বিজয়ার ওপর? আজকের এই অবস্থাটার জন্যে একা ওকেই দায়ি করছি? বিজয়া প্রথমে চায়নি অতদূরে চাকরি করতে যেতে। ওর মনের গড়নটুকু আদৌ অমন ছিল না। সপ্তাহে-সপ্তাহে একদা ও চিঠি লিখত: পারছিনে। বিশ্রী ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। তাহলে এত কাদাজল ঘেঁটে তোমাকে বিয়ে করলাম কেন! সেসব দিনে এই আর্তি কী আমার কাছে রোমান্সের মতো লাগেনি? আর, মাঝে মাঝে বিজয়ার ফিরে আসার উত্তেজনা-আনন্দ-বিচ্ছেদ-সুখের দিনগুলো। এরি মধ্যে একদিন জন্ম হল বুবুর। বুবু এই বিচ্ছেদ-মিলনের অস্থিরতার ভেতরেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তারপর একদিন কচি মেয়েকে নিয়ে চলে গেল বিজয়া। আমি নিজেই তাদের রেখে এসেছি। এইভাবে একই নিয়মে দীর্ঘ কতকগুলো বছর ক্ষয় হয়ে গেল। এককালে ছুটিতে বিজয়ার ফিরে-আসা দিনগুলো উদগ্র পিপাসার মতো আমাকে মগ্ন করে রাখত। কিন্তু কোনোদিন ওই মা-মেয়ের জগতে আমার কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না। ওরা আসত নিজের নিয়মে, যেতও তাই। আমি ওদের আবির্ভাব এবং বিদায়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় ছিলাম। যেন ওরা আমার অতিথি, আমার এই সংসারের সভ্য নয়।

অমল জানালার বাইরে অবসন্ন সন্ধ্যাকাশকে দেখল। দু-একটি বিষণ্ণ তারা। আমি কী ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। ওরা না এলে আমার ক্লান্তির ভগ্নরূপটি এমন করে চোখে পড়ত না। আমার সব থেকে কেউ নেই। আম অভিশপ্ত যক্ষ। আমার অস্তিত্বের বৃত্তটা ক্রমশ ছোটো হতে-হতে আমাকে পিষ্ট করতে উদ্যত। বিজয়া কীভাবে, ওর কী কোনো ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। জীবনটা কী কখনো তার কাছে অর্থহীন পীড়ন বলে বোধ হয় না! অতীতে কখনো কখনো বিজয়ার মুখে উত্তপ্ত ক্ষোভ ফুটে উঠত। স্বামীর ওপর স্পষ্ট অনুযোগও ছিল। কিন্তু ইদানীং ওকে আর বোঝা যায় না। বিজয়া ভীষণ চাপা। অথবা ভিতরের প্রয়াসে দুঃখকে গোপন রাখবার প্রতিভা ওর জন্মগত। আমি প্রতিবার ওকে একই কথা বলি কেন। যখন জানি কিছু হবার নয়। বহুদিন আগেই ও এ সংসার থেকে বেরিয়ে গেছে এবং সেটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমরা কেউই সম্ভবত এর থেকে মুক্তি পাব না। তবু বার বার আমি বলে যাব, আর ও শুনে যাবে।

অমল নিশ্বাস ফেলল।

বিজয়া আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ফিরে এল।

'বোসে না থেকে চান করে নাও না। কী গুমোট গরম।'

অমল ওর দিকে শান্ত চোখে তাকাল। এতক্ষণ পর বিজয়ার পরিচ্ছন্ন বেশবাস আর ভারি দেহের ওপর মনোযোগ রাখতে হঠাৎ দিগন্তের বেদনার মতো অনুভূতি জড়িয়ে ধরল অমলকে। বিজয়া যেন স্থির, হ্রদের মতো আটকে পড়েছে। ওর প্রতি একটা আকর্ষণে অমল কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করল। বিজয়া একটা আকর্ষণ, ওর অস্তিত্ব তাকে নিয়ত অদৃষ্টের মতো টানে। অমল ভাবল এই অদৃষ্টের টান থেকে তার কোনো অব্যাহতি নেই। বিজয়াও বিষয়টা জানে। এবং সেইখানেই সে সম্রাজ্ঞী।

অমল হাসল।

বিজয়া লক্ষ্য করে ভ্রূ তুলল: 'হাসছ যে?'

অমল বলল: 'অমনি।'

'ওঠো না। শুয়ে শুয়ে কী কুঁড়েমি হচ্ছে?'

'বুবু কোথায়?'

'ও কী এতক্ষণ জেগে থাকতে পারে? খাইয়ে দিয়েছি। ওঘরে ঘুমোচ্ছে।'

অমল সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল বিজয়া বাধা দিল। 'অত সিগারেট গিলে কী হয়? ডাক্তার না তোমাকে বারণ করেছে?'

'আচ্ছা।' অমল তোয়ালে কাঁধে বাথরুমে চলে গেল। বিজয়া আমার স্বাস্থ্যের কথা মনে রাখে। সেদিন আপিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, বিজয়ার কী জানা আছে খবরটা, ডাক্তার বললেন, লো প্রেসার। নাঃ ওকে বলে কাজ নেই। ভয় পাবে। কিংবা, কিংবা ভাববে এটাও আমার একটা করুণ আবেদন। আমাদের সম্পর্কের একটা দিকে কারুর সমঝোতা নেই। অথবা আমরা প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাই। বিজয়াকে খবরটা দিলে কী হবে? রাগ করবে। কেন ভালো করে ডাক্তার দেখাচ্ছিনে, খাওয়া-দাওয়ার উন্নতি করছিনে, নিয়মের ঘড়ি ধরে চলছিনে কেন ইত্যাকার উপদেশে সে আমাকে পিষ্ট করে ফেলবে। ওকে বলা বৃথা। স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম বলতে সে ওইটুকুই জানে। আমাদের বেঁচে-থাকার ছোটোগুলো বাস্তিতার মোড়কে বাঁধা থাকবে। ঈশ্বর বিজয়াকে সুস্থ ও নীরোগ রাখুন।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রি ঘনিয়ে এল।

অমল শয্যায় গড়িয়ে পড়ল।

বিনোদের মা রাত্রির পাট চুকিয়ে বিদায় হলে বিজয়া সদরের দরজা বন্ধ করল। বুবুর মশারি ঠিক আছে কিনা দেখে এল একবার। তারপর এঘরে এসে দাঁড়াল। সজল চোখে শায়িত মানুষটিকে দেখল। বড় আয়নাটার দিকে ফিরে বিজয়া মুখে ক্রিম ঘষল। সৌরভ ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর পাউডারের কৌটো নিয়ে ভারি পায়ে বিছানায় উঠে এল বিজয়া।

'ইস কী ঘুম। একটু সরে শোও।'
অমল সরে গেল।

বিজয়ার সুবাসিত অস্তিত্বটা রক্ত-মাংসত্বক অমলের চেতনায় অনিবার্য হয়ে উঠল।

'আ বাঁচলাম।' জড়ানো গলায় স্বগত উচ্চারণ করল বিজয়া।

অমল চোখ বুজেও বলে দিতে পারে বিজয়া এরপর কী কী করবে। ওর গায়ের জামা সরানোর খশখশানি, শরীরময় পাউডারের ধুলো-বৃষ্টি। পাশ ফিরে অমলকে আক্রমণঃ একটু পাউডার মাখতে পারো না, গায়ে কী বিশ্রী গন্ধ...। অমল পাউডারের রেণুগুলো দেহের ওপর অনুভব করল। বিজয়াকে কী বলব আমার সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যের কথা? নাঃ বলা যায় না। বিজয়ার ঠাণ্ডা পাথরের বেদীর মতো দেহটা। হঠাৎ অমল নিষ্ঠুর, ঈর্ষা বোধ করল। এবং আক্রোশ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোরালো আবেগে খর হয়ে উঠল অমল। জীবনমরণের বদ আকাংক্ষাটা তাকে মরিয়া করে তুলল।

ঘরের সবুজ আলোটা নিবোতে দেয় নি বিজয়া। এই আলোতে বিজয়ার জলভরা চোখ দুটো সাপের মতো দেখাচ্ছে। পুরু গালে তার হাসির ঢেউটা এখনো অদৃশ্য হয় নি। এমন কি সামনের সেই আধখানা ভাঙা ধারালো দাঁতটা। বিজয়ার গায়ে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ উঠছে। বুবু ঘুমঘোরে হেসে উঠল।

'এই ভাবুকমশায়, তোমার ভাবনাগুলো এবার সরাও'

'না ভাবিনি।'

বিজয়ার মাথাটা অমলের গলায়, ও'র ঠোঁট দুটো স্তবের মতো নড়ছে।

'তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না।'

'কী করে বুঝলে?' হাসির আওয়াজ।

'মেয়েরা এমনিতেই বোঝে।' ওর মুখটা অমলের কপালে, চোখে।

'কী করলে ভালোবাসা হয়?'

'জানো না'?
'না।'

বিজয়ার স্খলিত চুলের স্পর্শ অমলের নাকে, চুলের গন্ধ। বিজয়ার দক্ষিণ বাহু অমলের কটিদেশে। রক্তমাংসত্বক, গন্ধের বন্যা। বিজয়ার ভিজে শরীরের ঢেউগুলো ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। বিজয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাত্রির আকাশটা হঠাৎ নৌকোর মতো উল্টে পড়ল।

ভিজে জবাফুলের মতো বিজয়ার দেহটা নাসারন্ধ্রে জড়িয়ে ধরছে।

'আমি তো যেতে চাই নে। বেশ তো ধরে রাখো না...' বিড়বিড় করে বলল বিজয়া।

'তোমার চাকরি ছেড়ে দাও।'

'দেবো।'

'জয়া—'
'উঁ?'

উলটোনো ভারি নৌকোটাকে ওরা প্রাণ-পণে বালিভূমিতে ঠেলে তুলছে। স্বেদ-উত্তেজনা-সংশয়-বিশ্বাস শ্রমে দুলছে।

আমি কী আমার অসহায়ত্বকে মুছে ফেলতে পারছি? অমলের মস্তিষ্ক মৌমাছির মতো গুন-গুন করে উঠল ঃ নাকি ওই অনুভূতিটা আমাকে বিশ্রীভাবে তাড়না করছে। অন্ধকার পেরোতে ভীতু কিশোরের মতো আমি দুর্গানাম জপছি। কে জানে আমার এই স্যাঁতসেঁতে ভয়টাই বিজয়াকে অন্য এক রোমাঞ্চে উত্তীর্ণ করছে। দামাল শিশুর দুরন্তপনাকে যেমন জননী উপভোগ করে। তাহলে আমি আমার নির্জন চেতনা-গুলো নিয়ে একা, ভয়ংকর একা। বিজয়া এতদিন পরে এসে সুদেভে তার পাওনা-গণ্ডাগুলো আদায় করে নিচ্ছে। আমি ওকে বাধা দিতে পারছি নে। কারণ বাধাটা আরো লজ্জার। তাহলে বিজয়া কী সবরকমে জিতে যাচ্ছে না? এইসব অন্তরঙ্গতার মুহূর্ত-গুলোতে? ওর প্রয়োজন মতো তাক থেকে তুলে এনে বাঁশিটাকে কে ফুঁ দিচ্ছে। বাজনাটাও ওর তৈরি। আশ্চর্য, আমি নির্ভুল বেজে চলেছি। যেন এরি জন্যে আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। বিজয়া আমার অভিমানের শেকড়টা যেন এইখানেই গ্রথিত দেখেছে। পুরুষ মানুষ আর কত দূর দেখতে পায়! দাম্পত্যের কর্তব্যে মোড়া বিজয়ার নিষ্ঠাবান মুখটা দেখতেও শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে আমার।

অমল হতাশায় যেন চিরে যেতে লাগল।

আয়ুর হিসেবে দেড় মাস আর কতটুকু আয়তন ধরে!

ঘুম ভেঙে গেল অমলের। বাথরুমে বিজয়ার স্নানের শব্দ। দীর্ঘ দশ ঘণ্টার জার্নিতে স্নান না করে নিলেই নয়। নটায় ওর ট্রেন। এখুনি হয়তো ট্যাকসির জন্যে ও তাড়া দেবে। বুবু কোথায়? বু-বু।

অমল অলসের মতো বিছানা আঁকড়ে রইল। কাল শেষ রাত্রি। অনেকক্ষণ তাকে জাগিয়ে রেখেছিল বিজয়া। 'বছরের মাঝা-মাঝি তো রেজিগনেশন দেয়া যায় না। মেয়েদের কষ্ট হবে। দেখো, সামনের বছরে নিশ্চয়ই...। এই রাগ করো না।' নাঃ রাগ করে নি অমল। তার চোখে আঠার মতো ঘুম নেমে আসছিল। 'শরীরের যত্ন নিও। সব সময় তোমার শরীরের জন্যে চিন্তা হয়। নাঃ একটুও ভুল শুধরোবে না। দুধ বাড়িয়ে দাও। আর টনিকটা তো তোমার স্যুট করেছিল, খাও না আরো কয়েক শিশি।' খাবে অমল, নিশ্চয়ই খাবে। 'আর কটা মাস। তারপরই তো পুজো। দার্জিলিঙে তোমার না কোন্ বন্ধু থাকে...

'এখনো শুয়ে আছ? আটটা বাজে।'
'হ্যাঁ। উঠি।'
'চট করে মুখহাত ধুয়ে নাও।'
'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'বুবু মোজা পায়ে দাও। জুতোটা পালিশ করা উচিত ছিল। এত বড় মেয়ে...' বিজয়া বকতে-বকতে সুটকেসে ছাড়া জামা-কাপড়গুলো পুরে নিল। ব্যাগ খুলে টাকা-গুলো দেখে নিল। 'তোমার অনেক খরচ করে দিয়েছি। এই টাকাগুলো রাখো। আহা।' আসন্ন যাত্রার উত্তেজনায় বিজয়াকে বিরক্ত এবং অকারণ ব্যস্ত দেখাচ্ছে।

ট্যাকসিতে কোনো কথা নয়।

টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়ে যেন নিশ্চিন্ত হল বিজয়া।

ট্রেনটা অনেক লেট করছে। কামরার ভেতরে বিজয়া আর প্ল্যাটফরমে অমল এই স্থলে অপেক্ষার বোঝায় যেন নাস্তজ হয়ে পড়েছে। দুজনেই চুপ। অমল দূরের সিগ-নালের দিকে চেয়ে পাথর হয়ে রইল।
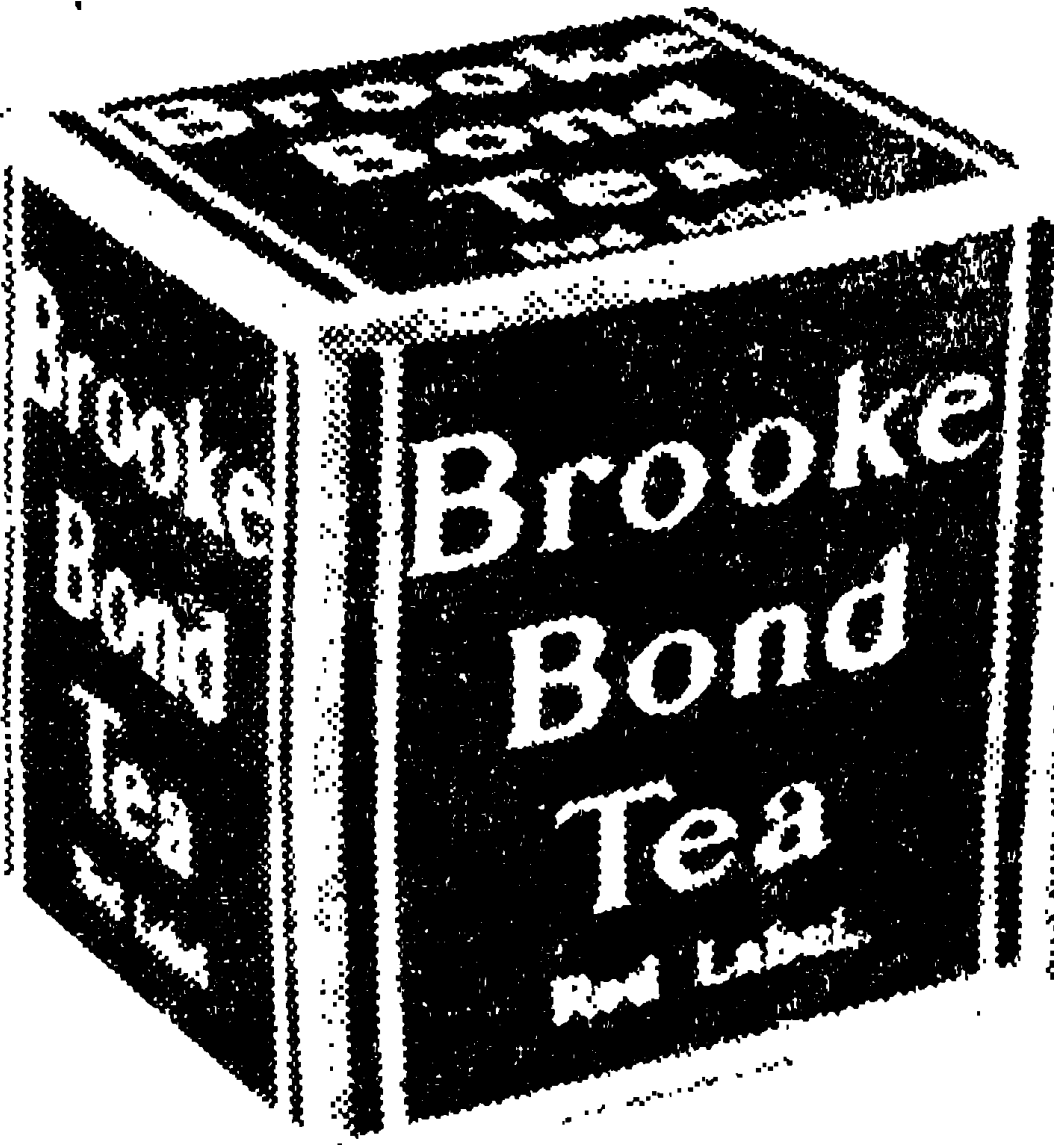
মুখের মেলা

পাগলা শশীকান্ত

পাগলা শশীকান্ত রায়—মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো সব চুল— গোঁফ-দাড়ি—চুলগুলো তার একটু কটা রঙের, লালচে—নাকখানা খাঁড়ার মতন—সুন্দর চোখ দুটোর কোণের ভাঁজ সরু হয়ে টেনে বেরিয়ে গেছে কানের দিকে—বয়স ছাপ্পান্নর কম নয়—রঙ পাকা গমের মতন—পরণে গেরুয়া কাপড় লুঙ্গির মতন করে পরা—এলো গায়ে শুভ্র উপবীত—গম্ভীর মেজাজে মোড়ের চা-দোকানের বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পাতার লেখাগুলো দেখছিলেন।

একটি ছেলে কতকগুলো গাছ-লতা-পাতা হাতে করে এসে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে রেখে পাশে বসল। কাগজ পড়া শেষ হলে, ইচ্ছে হল, তাঁকে জিগেস করবে, এগুলো কী গাছ শশীবাবু?

শশীকান্ত গাছগুলো হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে বেঞ্চির ওপরে রেখে দিলেন—পায়ের কাছে নয়—অবজ্ঞা করা হয়।

কাগজটা রেখে দিতে ছেলেটা শুধোলে, 'এগুলো কি কি গাছ বলে দিন তো শশীবাবু?'

'তোমার নাম কি?'

'নির্মলেন্দু সরকার। অমিয় সরকারের ছেলে। এই গাঁয়েই বাড়ি।'

'কি করো?'

'কলেজে পড়ি আর এমনি নিজেদের ক্ষেতখামারে কাজ করি।'

'তোমার হঠাৎ গাছ-গাছড়ার নাম জানবার বাতিক হল কেন?'

'বাতিক ঠিক নয় স্যার, পাশাপাশি আছি, ওদের পরিচয় জানব না?'

'হুঁ। শোনো এটা মুক্তোঝুরী গাছ, এটা আপাং, এই গাছগুলো বিল ঝনঝনি, ইঞ্চিরি, ভুঁই-কুমড়ো, বুড়ি-গোপানন, নিমুখী এইটা ওরে শালা, এযে জল-বিছুটি! তুই বুঝি তামাসা করতে চাস? এটা গায়ে লাগলে যে কিটোবে—আর ধুলে আরো বিপদ! একটুখানি লাগিয়ে দেখ—'

বলেই কিনা শশীকান্ত ছেলেটার হাতের এক জায়গায় ঘষে দিলেন!

কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর নির্মলেন্দু বললে, 'চিঁড়িং' 'চিঁড়িং' করছে। শোঁয়াপোকা লাগলে যেমন জ্বালা করে আর কিটোয়। জল দিয়ে কি দেখবো?'

'দেখ—আরাম পাবিখন! গোবর লাগালে আরো।'

জল লাগালে নির্মলেন্দু। বললে, 'এযে ফুলে গেল—ভীষণ কিটুচ্ছে—কি দিলে ভাল হবে?'

'কি দিলে ভাল হবে? তুলসী গাছের মতন সর্বাঙ্গ লাল একটা গাছ দেখেছিস, বেড়া হয়, বাবুরা বাগানে সুদৃশ্য কেয়ারী করে—গাছটার নাম বেলেডোনা গাছ—তার পাতার রস দিলে শিঙিমাছের কাঁটা মারার যন্ত্রণা ভাল হয়ে যায়। ভীমরুল, বোলতা, মৌমাছি কামড়ালে বেলেডোনা গাছের রস দিলেই সেরে যাবে।'

'সে গাছ আমাদের আছে, ঠাকুর-দা বসিয়ে রেখেছেন 'ঘাটকুলোর' কাছে—আমি জানি। এই বোমকেদার, নিয়ে আয় তো কুকুর-দৌড় দিয়ে গিয়ে।'

বোমকেদার বকসী এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এল গাছটার কতকগুলো পাতা

শশীকান্ত পাতাগুলো নিয়ে কর-জোড়ে নমস্কার করে হাতের তালুতে ঘষে ঘষে রস বার করে বিছুটিলাগা জায়গাটিতে লাগিয়ে দিলেন। ব্যস, আরাম হয়ে গেল!

একটি অসুস্থ লোক বললে, 'ঠাকুর-মশায় আমার মাথার তালুতে শুধু যন্ত্রণা হয়—একটা যেন দাহ—কিছু ওষুধ দিতে পারো?'

'মাথায় খানিকটা গোবর দিয়ে বসে থাকগে যা বেটা—অথবা ঘৃতকুমারীর পাতার শাঁস মাথায় দিগে যা। কিম্বা এতটা দোয়েল পাতাকে কচলালে পরে তা স্পঞ্জের মতন জমে গেলে মাথায় দে রোজ। আর তোর পিত্তি পড়ে। রোজ খালি পেটে এক বাটি করে হিঞ্চের রস খা। ছাগল-দুধ খাবি।'

একজন পাগলাঠাকুরকে রাগাবার জন্যে বললে, 'গাধার দুধ খেলে কি হয় ঠাকুর?'

'তোর মাসির এর্কাশিরে ভাল হবে শালা! —কেন গাধার দুধ খেলে কি রোগ সারে না—বসন্তরোগ সেরে যায়।'

নির্মলেন্দু শুধোলে, 'আপনি কি সব রকম গাছ চেনেন?'

'অনেক চিনি—সব চিনি না। কেউ তা জানে না।'

'ভগবান জানেন তো?'

'ভগবান' শব্দের অর্থ তুমি জান?'

'সাধু।'

'না, ঐশ্বর্যবান। তাঁর ঐশ্বর্যের খবর তিনি অবশ্যই রাখেন। ভগবান সম্বন্ধে বাজে কটাক্ষ করে আধুনিক বা সংস্কারমুক্ত হবার লক্ষণটা কিন্তু নির্বোধদের। নির্বোধরা নিজেদের চাইতে বড় অন্য কিছু আছে ভাবতেই পারে না। তুমি রবীন্দ্রনাথের নিন্দে করে তাঁর সমালোচনা করছ, তুমি কি তাঁর চাইতে বড়? ইডিয়ট?'

নির্মলেন্দু বললে, 'ভক্তি বা শ্রদ্ধার মধ্যে সচেতন কিছু সন্দেহ থাকা কি ভাল নয়?'

'ভাল কেজো স্বার্থপর লোকেদের জন্যে। আমার জন্যে নয়। আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করেও ঠকতে রাজি। কবির কথা, 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।'

'ভগবান তাহলে আছেন?'

'আছেন বইকি। তিনি হলেন প্রাণ, গতি, শক্তি। তোমার অপরিণত বয়স, অপরি-পূর্ণ মন তাই এখনো জাগ্রত ক্ষুধা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু অর্থাৎ সন্দেহ, ঘৃণা বা তাদের ভাবনায় নীতিস্পৃহ হবে কেন? এখন খেয়ে যাও—শিখে যাও—দেখে যাও—তবে মন্দ কাজের প্রতি আসক্তি রাখবে না—মন্দ খাদ্য খেলে শরীরের ক্ষতি করে যেমন মন্দ চিন্তাতেও তেমনি মনের স্বাস্থ্য পঙ্গু করে।'

অনন্ত ঘোষাল পুরুত বামুন। তাঁর স্বভাবটা একটু কুট-কচালে। বললে, 'মনের আবার স্বাস্থ্য—বোঝ ঠেলা— পাগলা আর কারে কয়!'

শশীকান্তর চোখে বিদ্যুৎ খেলল। বললেন, 'স্বাস্থ্য যেমন তোমার আছে অনন্ত, মনেরও আছে। অনন্ত মানে যার অন্ত নেই। তুমি কেমন অনন্ত! তোমার আবার স্বাস্থ্য কেন?'

'আমি যে মানুষ!'

'তুমি মানুষ? তুমি অনন্ত—তাই বুড়ো মাকে ভাত দাও না—কোনখানটাতে তোমার মানুষ দেখাতে পারো? তোমার মা এসে আমার কাছে কত কাঁদে। আহা, সন্তান ধারণে কত কষ্ট তা তুমি জানো না অনন্ত—আমার মাকে আমি রোজ প্রণিপাত হয়ে পুজো করি—তাই মাও আমাকে স্নেহ করেন—সন্তান দুঃখ পায় এমন তিনি কিছু বলবেনও না, করবেনও না। তুমি মায়ের শ্রদ্ধা হারিয়ে এখন অভিযোগ করলে তো হবে না যে মা অন্যায় করেন, অন্যায় বলেন। যা দেবে তাই ফিরে পাবে। আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে তেমন ব্যবহার পাবে—তার চাইতে ভাল ব্যবহার আশা করলে পাবে কোথায়?'

দোকানদার চারদিকে জলছড়া দিয়ে ধূপ-ধুনো জ্বালে। শশীকান্ত বলেন, 'এই জল ছিটোনো এরা সংস্কারের মতন অর্থ না বুঝে ছিটোয়—এর অর্থ হল ধুলো উড়বে না। ধুনোটা হল শালগাছের আঠা—ওর গন্ধে কলেরা ইত্যাদি রোগের জীবাণু মরে যায়। সুঘ্রাণও লাগে। সেটা ফুসফুসে গেলে সর্দির মধ্যে যদি বিষ থাকে ধ্বংস হয়। মুনি-ঋষিরা ভেবেচিন্তে মানুষের মঙ্গলের জন্যে এসব বিধান দিয়েছেন।'

চাষীবাসীরা পাগল শশীকান্তর কথা শোনে। পাগলাবাবাকে সবাই 'ক্ষেপামানা' করে। হঠাৎ তিনি বাউল সদানন্দকে দেখে বলে ওঠেন, 'ও বাবা সদু, একটা গান শোনা না বাবা—তোর গান তো রেডিওতেও বাজে'—

বাউল বলেন, 'আমার এখন 'মুড' নেই ঠাকুর।' রেগে ওঠেন শশীকান্ত, 'মুড' নেই! শালা বাউলের গায়ে আতরের গন্ধ! ছুঁড়িদের গান শেখাতে যাচ্ছে। দে তোর একতারাটা—আমি গান গাই।'

চুলে চুড়োবাঁধা আধুনিক আলখাল্লা-ধারী সদানন্দ বাউল তাঁর একতারাটা দিতে না চাইলেও শশীকান্ত ছিনিয়ে নেন। তার-পর বেহাগে সুর ধরে দেন। তাঁর গলা ভাল। বেশ মাজাঘষা। লোকজন তাঁর গান শোনে। গান শেষ হলে বলেন, 'অহংকার করো না সদু, তোমার এত সুখ্যাতি, হঠাৎ একদিন যদি গলাটা ধরে যায়?—স্বর আর না ফোটে—তখন?'

সদানন্দ কটাক্ষ হেনে বাস অসাক্তেই উঠে চলে গেলেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রপল্লীর ধনী বাড়িতে সুন্দরী কন্যাদের বাউল শেখাতে যান তিনি—দেশ-দেশান্তরে নাকি গানের দল নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

শশীকান্ত বলেন, 'সোনার তো কদর হবেই। তবে কিনা এক সাধু একটি ফুলের মালা পরা বেশ্যাকে দেখে বলেছিলেন, ভগবানের কি রসবোধ, নর্দমাকে সাজিয়েছেন ভেলভেট দিয়ে!'

নির্মলেন্দু বলে ফেললে, 'আপনি কি ওঁকে ঘৃণা করলেন?'

'সে ও'র ব্যবহারকে। উনি গুণী মানুষ—গুণী মানুষের বিপদ হল সে যখন অহংকারী হয়।'

'তো সময়ের দাম নেই, এখন যদি ও'র ঠিক নটার মধ্যে হাজিরা দেবার কথা থাকে!'

'বস তুই, ঠিক বলেছিস। শিল্পীর সময়ের দাম অনেক—নষ্ট করতে নেই। কিন্তু ও'র 'মুড' নেই : সৌখিন কথাটা সইতে পারলাম না। কে জানে, বেচারা মনে কষ্ট পেলেন কিনা!'

নির্মলেন্দু বললে, 'আচ্ছা, ওসব কথা থাক—আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম-রসের একটা গল্প শোনান—সেটা আমার মনে যেন সারাদিন বাঁশির মতন বাজতে থাকে। আপনি তো অনেক জানেন—মুড নেইও বলবেন না।'

'শোনো। সুফি সাধকদের নাম শুনেছ?'

'মোতাজেলা, সুফি সম্প্রদায়? যাঁরা গুরুবাদ মানেন? শুনেছি বইকি, খুব শুনেছি।'

শশীকান্ত বললেন, 'তবে রে বেটা, তুই ভগবান আছে কিনা জিগ্যেস করছিলি আগে? তাই বলছিলাম, যারা অপরিপূর্ণ তারা ওসব বলে। তারা বোকা, হামবাগ। সব ধর্মেই ভাল জিনিস, ভাল কথা, দর্শন কাব্য আছে, সেই সাধক কবির কথাই বলি, এমন মানব জনম রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা! 'আবাদ করো, ফসল পাবে। এ ফসল লুঠ করে, জোর করে নিশান পুঁতে দখল করা যায় না গো!'

'আচ্ছা আপনি এত ভাল লোক এত জানেন, তবে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে বনল না কেন, জানতে বড় আগ্রহ হয়।'

শশীকান্ত তাঁর পটল চেরা চোখ মেলে খানিকক্ষণ গম্ভীর মেজাজে নির্মলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি কি জানো নরনারীর প্রেম কি জিনিস?'

নির্মলেন্দু চুপ করে রইল।

'বলো, লজ্জা কি?'

'কলেজের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছে—তবে দৈহিক সম্পর্ক হয়নি শশীবাবু!'

'হুঁ! তাহলেও কিছুটা বুঝবে। সবটা নয়। স্ত্রীর রুচি যদি কাকের মতন হয়—যদি তোমার ভালবাসার সেই মেয়েটি বলে, ওগো তোমাকে ছাড়া আমি আর কাকেও স্বপ্নেও ভাবি না, আর গোপনে কলাপাতা চাটে—তুমি কি বলবে না—ছি—ওসব করতে নেই! মানুষ কুকুরের মতন হবে কেন?'

'হয়তো আপনার মধ্যেও কোনো কিছুর অভাব ছিল।'

'বোধহয়! ভগবান জানেন। তিনি ঐশ্বর্যময়, জানি না তিনি কোন ঐশ্বর্যের কমতি রেখেছিলেন আমার মধ্যে। তবু সে যেতেই চেয়েছিল বোধহয়, কেন না, আমার নির্দেশ ছিল আমার মাকে কখনো কটু কথা বলবে না। সে কিন্তু একদিন ঝগড়া করার পর আমার মায়ের চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে কাপড় চোপড় পরে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়—আমি আর তাকে

আনতেও যাইনি—সে আসেও নি। শুনি নাকি তার একটা বাচ্চা হয়েছিল—সে এখন অনেক লেখাপড়া শিখে ব্যারিস্টার হয়েছে।'

'ছেলেকে আপনি আদৌ দেখেন নি?'

'না!'

'স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি আর কখনো?'

'না।'

'স্ত্রী চলে যাবার পর থেকেই আপনি পাগল হয়ে গেলেন?'

'পাগল! কোন্ শালা বলে? আমি চাষ আবাদ করাই, খড় গুনে বেচে দিই, বাঁশ বেচি, একটা গাই গরু আছে, খড় কুঁচিয়ে দিই, সেবা করি, দুধ দুই নিজে—মা কত কাঁদেন আর সংসার করলাম না বলে'—

'আপনার ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?'

'আমার ছেলে?'

'তবে?'

'আমার ছেলে নয়। আমার স্ত্রীর। আমার হলে, আমার কাছে আসত।'

'যদি আমি আপনার ছেলেকে আনতে পারি?'

'তুমি?'

'হ্যাঁ। আপনার ছেলে আমাদের একজন প্রফেসার কবির বন্ধু। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি আসতে চান। এদিকের গাঁয়ের নাম তাঁর জানা আছে শুনে আশ্চর্য হই। তিনি বলেন, মাস্টার আমাকে বলেছেন ঃ বাবা নাকি সাধু অথবা পাগল হয়ে এই গাঁয়ে আছেন। আমি বলেছি এই গাঁয়ের পাশেই আমাদের গ্রাম। আপনার ফাদার কি শশীকান্ত রায়? বললেন, হ্যাঁ। কি অসীম আগ্রহ তাঁর আপনাকে দেখবার।'

শশীকান্ত নির্মলেন্দুর হাত ধরে উঠে পড়লেন। পথ ধরে অনেকখন হাঁটতে লাগলেন।

তাঁর চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। তিনি কাঁদতে লাগলেন।

নির্মলেন্দু কোনো প্রশ্ন করলে না। কাঁদুন উনি।

এক সময় শশীকান্ত বললে, 'না খোকাকে তুমি এনো না। তার মা শুনলে মনে কষ্ট পাবে।'

'স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তখন, তার সম্বন্ধে আপনি কি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ?'

'না। সেইটাই তো আমাকে পাগল করে দিয়েছে রে নির্মল। আমিই বোধহয় সন্দেহপরায়ণ ছিলাম। স্ত্রীকে এত বেশি ভালবাসতাম যে অন্ধের মতন ছিলাম—কেউ কথা বললে, তার সঙ্গে মাখামাখি করলেই চটে যেতাম। মনে করতাম আমার সন্দেশটায় বুঝি কাকে ঠোকর দিলে! আর আমার স্ত্রী ছিল ভয়ানক সুন্দরী। আমার ছোট-ভাইটা তার বড্ড 'ন্যাওটা' ছিল। স্ত্রী চলে যেতে ভাইকে বলি যে তুই বৌদিদির সঙ্গে গর্হিত পাপে লিপ্ত। শুনে সে সেই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল! এত সব ঘটলে কোন্ শালাই বা আর না পাগল হবে?' স্বরভঙ্গ হয়ে গেল শশীকান্তর। কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'না, খোকাকে আনিস না—যেটুকু পাগল হতে বাকি আছে —হয়ে যাবে আবার কোথায়?'

নির্মলেন্দু বললে, 'পাগল হতে হলে পুরোপুরি হওয়াই তো ভাল শশীবাবু।'

শশীকান্ত হঠাৎ মহা চটে গেলেন, 'তুষ শালা ছোকরা, তুই শালা বেরো! আমি এই নির্জন গাছতলায় বসে থাকি নরম ঘাসের ওপরে। আমি নির্ভাবনা হতে চাই। শালারা যত সব জ্বালাতন!'

নির্মলেন্দু হাসতে হাসতে চলে গেল। ও'র ছেলেকে একদিন সে ও'র কাছে এনে হাজির করবেই।

পাগলা শশীকান্ত তখন গান ধরেছে ঃ

'জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এসো।'

—আবদুল জব্বার

তুলসীচরিত

নীষবিব চৌধুরী

(৪)

অশোকের দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট।

যেখানে যাই গাঙ্গুলী ড্রাগের কথা। ড্রাগস ব্যবসায়ী মহলে, কেমিস্ট মহলে, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী মহলে নতুন ওয়াণ্ডার ড্রাগের কথা।

যে যা বলে কান পেতে শুনি, আশায় থাকি যদি কোন সূত্র মিলে যায় যে সূত্র ধরে ঠিক জায়গায় পৌঁছোবার চেষ্টা করা সম্ভব।

কেউ বলে বেদের সোমরস খুঁজে পেয়েছেন প্রোঃ গাঙ্গুলী হিমালয়ে মেলেনি, হিন্দুকুশ পর্বতে খুঁজে পেয়েছেন সোমলতা। কেউ বলে আফিংয়ের রস রিফাইন করা। আফগানি মশলা মেশানো, কি ফাইন টেস্ট দেখেছিস? কেউ বলে গাঁজার একস্ট্রাকট, কেউ বলে সিদ্ধির একস্ট্রাকট। কফি হাউজের মিশ্র মক্কেলরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। ড্রপার দিয়ে এক ফোঁটা জিভেতে লাগাতে হয়, বাস, সুপ্রামেণ্টাল ওয়ার্লডে পুরো আট ঘণ্টার ট্রিপ। মার্ভেলাস কথা সব মনে আসবে, তুরীয়ানন্দের মধ্যে ভেসে বেড়াবে। কানের কাছে রবিশঙ্করের সেতার শুনবে, শুনবে ওম তৎ সৎ, তত্ত্বমসি।

চিকিৎসক, কেমিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট মহলে শুনি আসলে এটা বাড ঞ্চিলার, Clan বাড়ায়, সেন্স অব ওয়েল বীয়িং বাড়ায়, অন্য বাড থ্রিলার ড্রাগ থেকে তফাৎ এই যে এই ড্রগ মনের সক্রিয়তা চরমে নিয়ে যায়, ইট স্টিমুলেটস দি মাইণ্ড টু দি হায়েস্ট ডিগ্রি। লাফালাফি করবার ইচ্ছা জাগায় না, আর সব চাইতে বড় কথা এফেক্‌ট শেষ হলে অবসাদ আনে না। একজন বললেন, ইট গিভস ইউ এ ট্রিপ টু দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড অফ অ্যালিস। আট ঘণ্টা আরামচেয়ারে বসে থেকে ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে বেড়িয়ে বেড়াবে। তারপর টুপ করে নিজের জগতে ফিরে আসবে।

গাঙ্গুলী ড্রাগের সম্বন্ধে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্ণালে, জার্ণাল অব কেমিস্ট্রি, মেডিকেল এসোসিয়েশনের কাগজে প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

কাটতি বাড়ছে দেশ-বিদেশে।

সমাজকল্যাণ-কামীরা, সনাতন ধর্মরক্ষাকারীরা সরকারের ওপরে চাপ দিচ্ছেন জাতির জনকের দোহাই, এই নয়া উৎপাত গাঙ্গুলী ড্রাগ বিক্রি বন্ধ করো।

কলকাতা চষে ফেললাম ওয়াণ্ডার ড্রাগের আবিষ্কারক প্রোঃ পি এন জির পায়ের ধুলো নেবার জন্য। কোথায় উধাও হলেন তিনি?

দুবছর হল বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি শুনলাম, বাড়ীটা স্ত্রীর নামে লিখে দিয়ে। কোথায় আছেন এখন বাড়ীর কেউ, ছেলেমেয়েরা, স্ত্রী কেউ জানেন না বললেন। কলেজের চাকুরি এক বছর হল ছেড়ে দিয়েছেন। কেমিকেল, ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীর রিসার্চ লেবরেটরীর দুটো দারোয়ান টিপস পেয়েও ভেতরে ঢুকতে দেয় না, কবুল জবাব দেয় গাংগোলী-সাব নোকরি ছোড় দিয়া।

একজন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনীওয়ালা মধ্যবয়স্ক, হঠাৎ বিখ্যাত ব্যক্তি এভাবে হাওয়া হয়ে গেলেন? মনে পড়ল তাঁর স্ত্রী একটু হিন্ট দিয়েছিলেন, উনি গেরুয়া নিয়ে হিমালয়ে চলে গিয়েছেন বোধহয়। অসম্ভব কথা। চিরকালের অভাবী মাস্টারমানুষ, টাকা আসছে ছপ্পর ফুঁড়ে, এই কি হিমালয়ে যাবার সময়? চিন্তা করতে লাগলাম ধর্মভাবের কোন পরিচয় আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন কি? স্বল্পভাষী কেমিস্ট্রির অধ্যাপক, ভালমানুষ বোঝা যেত, ভক্তমানুষ কিনা বোঝা যেত না।

কোন পাত্তা মেলাতে পারলাম না।

এই ক'বছরের মধ্যে আমার অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। শেয়ারবাজারে উপরি উপরি ক'টা মার খেয়ে যা করেছিলাম সব গেল। স্ত্রীর বেনামিতে করা ছিল বলে ছোট বাড়ীটা কোনমতে বেঁচে গেল। বড় বাড়ীটা, গাড়ী, রেফ্রিজারেটর, রেডিয়ো সব কিছু গেল দেনার দায়ে। মানে একেবারে গরীব হয়ে গেলাম আমি। ছোট বাড়ীর অর্ধেকটা ভাড়া দিতে হল, পেট চালাবার জন্য এক মাড়োয়ারী ফার্মে সামান্য মাইনের চাকুরি নিতে হল।

পথচারীদের পথের ধুলো খাওয়াতাম এতকাল গাড়ী ছুটিয়ে, এখন নিজে পেটভরে পথের ধুলো খেতে খেতে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম রাস্তায় রাস্তায়।

অনেক কষ্ট করে দশ পাঁচ টাকা সঞ্চয় করছিলাম মাঝে মাঝে আবার লাক ট্রাই করব বলে। যে বাজার পড়েছে পুঁজি বাড়বে কি পুঁজি ভাঙ্গাতে হয় মাঝে মাঝে।

দুঃখ-কষ্টের স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে ক'টা বছর কেটে গেল, চুলে পাক ধরল অকালে।

একটা ছুটির দিনে শহরতলির একটা জায়গায় গিয়েছিলাম কোন কাজে। তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম বাসের রাস্তায় পৌঁছবার জন্য; সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল প্রোঃ পি এন জীর সঙ্গে।

গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় দিলাম, কেমন আছেন মাস্টারমশাই?

(৫)

আমার দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট।

দেবাশিসের সঙ্গে কথামত সন্ধ্যা আটটার সময় তাদের বাড়ীতে গেলাম তার বাবার সঙ্গে কথা কইতে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া করপোরেশনের কর্তা মিঃ এন সি ভাদুড়ী নামকরা বড়লোক, প্রতিপত্তিশালী লোক জানতাম। দেখলাম ধনবানের মত বড় বাড়ী, রুচিবান বড়লোকের মত সাজানো।

একটু বিস্মিত হলাম যখন দেবাশিসের সঙ্গে ঝকঝকে সাজানো ঘরে ঢুকতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন, নমস্কার করে বসতে বললেন, আমি না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। কথাও বললেন বাংলায়।

বললেন, দেবাশিস আপনার কথা বলেছে আমাকে। সে নিজে যখন আপনাকে খুঁজে বের করে বাড়ীতে এনেছে বেশী কথা অনাবশ্যক। দেবাশিস কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি এস সি পড়ছে, কেমিস্ট্রির কোন একটা বিভাগে স্পেশালাইজ করতে চায়। পড়াশোনায় সে ভাল। আশা করি আপনার বিশেষ অসুবিধে হবে না তাকে নিয়ে।

তারপর প্রশ্ন করলেন, সপ্তাহে ক'দিন পড়াতে পারবেন?

বললাম, তিন দিন, দরকার হলে চার দিন পারব।

বেশ, সপ্তাহে চার দিন আসবেন। পড়ানোর ব্যাপার রুটিনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের উন্নতির সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবেন যাতে ছাত্রের সায়েন্টিফিক আউটলুক বিকাশের সাহায্য হয়।

আচ্ছা, সে চেষ্টা করব।

আপনার বেতন এখন দুশো টাকা হলে অসুবিধে হবে কি?

বললাম, না, চলে যাবে।

দেবাশিসের মা এলেন ঘরে। মিঃ ভাদুড়ী পরিচয় দিয়ে বললেন, প্রোঃ গাঙ্গুলী দেবাশিসকে পড়াবেন কাল থেকে, ইনি দেবাশিসের মা।

নমস্কার বিনিময় করে একটু তাকিয়ে দেখলেন।

দেবাশিসকে বললেন, তোমার পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে মিনিট পনেরো আলাপ করো। একটু চা খেয়ে যাবেন প্রোঃ গাঙ্গুলী। উঠে দাঁড়ালেন।

হাত জোড় ক'রে বললাম, রাত হয়েছে, এখন কিছু খেতে চাইনে।

বললেন, আচ্ছা, থাক তবে।

দু'জনকে নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম দেবাশিসের সঙ্গে।

পরদিন থেকে কাজে লাগলাম।

দেবাশিস আমার প্রাইভেট টিউটরের জীবনের শেষ ছাত্র। প্রায় তিনটি বছর তাকে পড়িয়েছি। এম এস সি ক্লাসে ভর্তি হয়ে ক'মাস পরে বিলাতে চলে গেল সে।

এই তিন বছরে তার বাবা, মা, পরিবারের আর সকলের সম্বন্ধে যে সব খবর পেয়েছি দেবাশিসের কাছে এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলব না, শুধু জানিয়ে রাখতে চাই তার মা ধর্মচর্চায় খানিকটা সময় কাটাতেন প্রতিদিন এবং তাঁর একজন গুরুদেব ছিলেন।

বাইরটা দেখে ভেতরের কথা অনুমান করতে গেলে কতটা ভুল হতে পারে দেবাশিসের ইতিহাসের যতটা দিতে পারছি এখন তা থেকে বোঝা যাবে। ভদ্র, বিনয়ী, বুদ্ধিমান, অতি সুদর্শন ছেলে দেবাশিস, তাকে প্রথম দেখে এই ধারণা হয়েছিল, এবং এ ধারণা পরিবর্তন করবার কোন কারণ ঘটেনি তিন বছর তাকে পড়াবার সময়ে। পড়াশোনা সে মন দিয়ে করত। দু'চার মাস যেতে বুঝতে অসুবিধে হল না যে, কোন প্রাইভেট টিউটর না রাখলেও ভাল করে পাশ করতে তার আটকাবার কথা নয়।

প্রায় এক বছর কেটে গেল রুটিন মত পড়াশোনায়। দেবাশিসের মত ছাত্র পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম। দ্বিতীয় বছরে পড়াশোনায় খানিকটা সময় দিয়ে বাকী সময়টা সে অন্য নানারকম প্রসঙ্গের আলোচনায় ব্যয় করতে আরম্ভ করল দেখলাম। রোজ নয় মাঝে মাঝে এ আলোচনা হত। এই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেবাশিসের আরেকটা চেহারা ক্রমে পরিস্ফুট হতে লাগল। সে চেহারা অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর, আকর্ষক আর অস্বস্তিকর।

দু'জনের বয়সের মধ্যে প্রায় পিতাপুত্রের বয়সের মত পার্থক্য, দু'জনের সম্পর্ক শিক্ষক ও ছাত্রের। কিছুদিন পরে অনুভব করলাম সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। দেখলাম তার ক্ষুরধার বুদ্ধির তুলনা নাই, তার চিন্তার দুঃসাহসের তুলনা নাই। অত্যুক্তি না করে বলতে পারি আমাকে স্তম্ভিত, অভিভূত করেছিল দেবাশিস। জীবনে একটা নূতন জিনিস আবিষ্কার করছি এই রকমের মুগ্ধভাব নিয়ে তার কথা শুনতাম।

আমার পরের কথাগুলো কিছু এলোমেলো মনে হবে। উপায় নাই, গুছিয়ে এ ধরণের কথা বলা শক্ত।

একদিন পাঠ্যপুস্তক সরিয়ে রেখে বলল, মাস্টারমশাই, বাবা পার্মিশান দিয়েছেন খানিকটা সময় আমরা আলোচনায় ব্যয় করতে পারি আমার বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশের সহায়তা করবার জন্য। কেমন তো?

মাথা নাড়লাম।

বেশ। আমি জানবার জন্য প্রশ্ন করব, আপনি বলবেন।

যতটা জানি বলব।

আচ্ছা, এবার বলুন লাইফ কি?

লাইফ যার আছে তাকে বলে প্রাণী। জন্ম, বংশবৃদ্ধি, জরা, মৃত্যু লাইফের লক্ষণ।

বায়োলজি, বায়ো-কেমিস্ট্রি যা বলে তার কিছু সংক্ষেপে বললাম।

বলল, আপনি বডি মেকানিকস, বডি কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে বলছেন, প্রোসেস অব লাইফ, ফাংশান অব লাইফ সম্বন্ধে বলছেন। আমার প্রশ্ন লাইফ সম্বন্ধে এ সব বিজ্ঞান যা বলছে তা থেকে কি সিদ্ধান্তে আসা চলে?

বললাম, লাইফ ইজ এ কন্টিনুয়াস প্রোসেস, এই সিদ্ধান্ত করা যায় না কি?

দেবাশিস বলল, কন্টিনুইটি ছাড়া আর কোন মানে নাই, সার্থকতা নাই যার সেটা মিনিংলেস প্রোসেস। কি ক্ষতি হবে এক সময়ে এই কণ্টিনুইটি ভেঙ্গে গেলে? যা চলছে তাই চালিয়ে যাওয়া ছাড়া বড় কোন লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছে না যে প্রোসেস সেটা অর্থহীন, বাজে ব্যাপার নয় কি?

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম এক মিনিট, বললাম, কন্টিনুইটি ভেঙ্গে দিতে চাও নাকি?

হেসে বলল, ইচ্ছে থাকলেও পারছি কই মাস্টারমশাই?

বললাম, জমা করা এটম, হাইড্রোজেন বোমাগুলো একসঙ্গে ফাটতে থাকলে তোমার ইচ্ছা সফল হতে পারে।

বলল, অসম্ভব। সবগুলো ফাটলে দশ-বিশ লাখের জায়গায় দশ-বিশ কোটি মরবে হয়ত, দশ পনেরো বছরের মধ্যে ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। ধরুন যদি সব মানুষে যায়। ছোট বড় জন্তু জানোয়ারগুলোও যায়, যা অবাস্তব কল্পনা, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ থাকবে, ব্যাকটেরিয়া, ভিরাস থাকবে। এরা কন্টিনুইটি রক্ষা করে রাজত্ব করবে পৃথিবীতে।

হেসে বললাম, নিশ্চিন্ত হয়ো না, আবার মানুষ দেখা দেবে।

হাসতে লাগল দেবাশিস।

তারপর বলল, আমার ফাইন্ডিং কি জানেন মাস্টারমশাই, লাইফ একটা বিস্ময়কর নিয়ম-বদ্ধ ব্যাপার, আর কিছু নয়। নিয়মানুবর্তিতা সত্যি বিস্ময়কর, কিন্তু লাইফ, বিশেষ করে যে শ্রেণীর জন্তুর মধ্যে ব্রেন ডেভেলপ করেছে, মানে মানুষের মধ্যে, লাইফ বাজে ব্যাপার। লাইফকে সিরিয়াসলি নেয় যাদের ভাত, কাপড়, আশ্রয় নিজেদের সংস্থান করে নিতে হয়, অর্থাৎ গরীব লোকেরা। যাদের এগুলোর সংস্থান আছে বা সহজে সংস্থান হয়ে যায় তারা লাইফকে সিরিয়াসলি নেয় না, তারা মানুষের জীবন, মানুষের শাস্ত্র, তাদের কষ্ট করে অর্জন করা সম্পত্তি নিয়ে খেলা করে।

মাস দুই পরে একদিন পড়তে পড়তে দেবাশিস উঠে গেল, বলল এখুনি আসছি।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এল দু'হাতে দু'টো ডিশ নিয়ে। দেখলাম চারটি করে চপ। একজন ভৃত্য এল দু' কাপ কফি নিয়ে।

বলল, আজ বিকেলে আমি খাইনি মাস্টারমশাই, ক্ষিদে পেলে খাব বলেছিলাম। এতক্ষণে ক্ষিদে পেয়েছে।

বললাম, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে খেয়ে নাও। আমার তো ক্ষিদে পায়নি, বাড়তি ডিশ কেন?

আমি খাব আপনি না খেয়ে বসে দেখবেন এটা ভারি দৃষ্টিকটু হবে। খান মাস্টারমশাই। বেশীটা প্রোটিন, একটু কার্বোহাইড্রেট, একটু ফ্যাট দিয়ে তৈরী এই চপ নামে পরিচিত খাবার, পেটের গোলমাল হবে না

ডিশ ও একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে অনুনয়ের দৃষ্টিতে চাইল।

খেতে হল।

খেতে খেতে দেবাশিস বলল, আমি একটা থিওরী গড়বার চেষ্টা করছি মাস্টারমশাই, প্রোটিন প্লাস এলকোহল বেসড্ সভ্যতা এবং কার্বো-হাইড্রেট প্লাস ওয়াটার বেসড্ সভ্যতা, এ দু'টোর মধ্যে কোনটা মানুষের পক্ষে বেশী উপযোগী।

কি সিদ্ধান্তে এসেছ?

আসতে পারিনি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তা ছাড়া সিভিলাইজেশন কথাটার মানে নিয়ে খটকা রয়েছে মনে।

কি খটকা বলো তো।

বড় খটকা এই যে, সিভিলাইজেশন কথাটার মানে যদি পিসফুল, হেলদি, স্যাটিসফ্যাক্টরী প্রোগ্রেসিভ কন্ডিসন্স অফ একসিস্টেন্স হয় আমার ধারণা মানুষ কোনদিন সভ্য হতে পারবে না। তার লাইফ প্রোসেসের মধ্যে এমন সব জিনিস রয়েছে যে মানুষ কোনদিন পুরো সিভিলাইজেশনের স্তরে পৌঁছতে পারবে না, চেষ্টা করতে করতে পৃথিবীর আয়ু শেষ হয়ে যাবে।

পৃথিবীর আয়ু বলে কিছু আছে বলে তোমার ধারণা?

নিশ্চয় আয়ু আছে। তা না হলে সূর্য থেকে এতগুলো উপগ্রহ হয়ে সোলার য়ুনিভার্স হল কি করে? একদিন পৃথিবী ভাঙ্গতে শুরু করবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তারপর?

মানুষের বাসভূমি পৃথিবী একটা অপরিণত উপগ্রহ, খালি ভাঙ্গছে, ভূমিকম্পে ভাঙ্গছে, জলে ভাঙ্গছে, বরফে ভাঙ্গছে, ঝড়ে ভাঙ্গছে। আবার দেখা যায় প্রাণীজগতে খেয়োখেয়ি ব্যাপার লেগে রয়েছে। পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপের মধ্যে খেয়োখেয়ি মানুষের মধ্যেও তাই। ম্যান ইজ বর্ণ উইথ দি ভাইরাস অব সেলফ-ডেসট্রাকসন, তার দেহের উৎপত্তি ধ্বংস হবার জন্য, তার তৈরী সভ্যতার জন্মও ধ্বংস হবার জন্য। মানুষ কোনদিন পুরোপুরি সিভিলাইজড হতে পারবে না।

বললাম, দেবাশিস, নিজে চিন্তা করে এ সব কথা বলছ?

হ্যাঁ মাস্টারমশাই, এ ধরণের চিন্তার উৎপত্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি না।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

মাস কয়েক পরে একদিন লক্ষ্য করলাম দেবাশিস পড়ছে কিন্তু মন লাগাতে পারছে না। চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে বলল, মাস্টারমশাই, একটা কথা বলব?

বলো, যদি পড়ায় মন দিতে না পারো।

হেসে বলল, সত্যি পারছিলাম না মন দিতে। পরশু একটা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম চার্লি চ্যাপলিনের ছবি, ডিক্‌টেটর।

ভাল লাগল?

ফানি, বেশী ভাল লাগল না। প্রোপ্যাগান্ডা আছে, সুপারম্যানের মাইন্ডের ওয়ার্কিং দেখাতে পারেন নি চ্যাপলিন, অনেকটা মেকানিকেল হয়েছে।

তাকালাম তার দিকে, বললাম, তোমার আইডিয়ার সঙ্গে মেলে না?

না মাস্টারমশাই, মেলে না।

তোমার আইডিয়া কি?

মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল দেবাশিস।

সেই ফাঁকে তার খোলা পার্কারের পেনটা বন্ধ করে টেবিলের ধার থেকে সরিয়ে মাঝখানে এনে রাখলাম। তাকিয়ে দেখল।

বলল, মাস্টারমশাই, আমার একটা বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে সব জিনিসের কি, কেন ভাবা। এটা না থাকলে হয়ত ভাল ছেলে হতে পারতাম।

তুমি তো ভাল ছেলে দেবাশিস।

না মাস্টারমশাই, আমি ভাল ছেলে নই। আচ্ছা, এবার বলছি। আমি চিন্তা করে দেখেছি মানুষের মধ্যে যে আশ্চর্য ব্রেণ ডেভেলপমেণ্ট হয়েছে তার ফল কি হল। চুনকাম ও পালিশ করবার আর্ট আয়ত্ত করেছে মানুষ, আত্মরক্ষা ও শত্রুবিনাশের উপায় বাড়িয়েছে, অপরকে দাবিয়ে তাঁবেদার বা স্লেভ করতে শিখেছে। এত যে রকেট, স্যাটেলাইট ছাড়বার, স্পেস কংকোয়েস্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার মধ্যে শায়েন্স ও টেকোনোলজিকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার অভিপ্রায় বেশী দেখা যায়। টাকা চায় মানুষ টাকা ছড়িয়ে, বহু লোককে হাতের মুঠোয় আনবার জন্য। ক্ষমতা চায় স্লেভ স্টেভ চালাবার জন্য। যে ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষকে গরু-ভেড়ার মত হত্যা করতে পারে, লোভের কল টিপে, মৃত্যুর ভয়, নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে, ধর্ম, আইডিয়ালিজমের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে বহুসংখ্যক মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে নির্বোধরা তাকে সুপারম্যান বলে পুজো করে। আসলে কিন্তু সমাজের ব্রেনিয়েস্ট রাসকেল, সাকসেসফুল স্কাউন্ড্রেল ছাড়া সুপারম্যান আর কিছু নয়।

তুমি কি সুপারম্যান হতে চাও দেবাশিস?

না মাস্টারমশাই, চাই না। সাধারণ মানুষ এত শাস্তি ভোগ করেছে ও করছে সুপারম্যানদের হাতে যে—

হেসে বলল, সুপারম্যান ছাড়া মানুষের চলেও না দেখতে পাই। নতুন সুপারম্যানের আবির্ভাব হতে দেরী হলে পুরনো সুপারম্যানগুলোকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে পুজো করতে বসে যায় বোকরা।

মনে একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরলাম। অসম্ভব মাথা যাক, এই একুশ বাইশ বছরের ছোকরাকে যদি টাকার নেশায়, ক্ষমতার নেশায় ধরে তাহলে তার ফল কি হবে?

(৬)

অশোকের তৃতীয় ইনস্টলমেন্ট।

গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, মাস্টারমশাই, আপনাকে কত যে খুঁজেছি।

কেন বল তো? তোমার গাড়ী কই?

বললাম, গাড়ী বাড়ী সব গিয়েছে মাস্টারমশাই। আমিও যাবার দাখিল।

শেয়ার মার্কেটের চোরাবালির কথা সবিস্তারে বললাম।

এখন কি করছ

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। কিছু ক্যাপিটেলের অভাবে সুবিধা করতে পারছি না।

হেসে বললেন, ক্যাপিটেলের জন্য আমার খোঁজ করছিলে কি? আমার অনেক টাকা হয়েছে শুনেছ বাজারে?

তা শুনেছি কিছু মাস্টারমশাই।

ভুল শুনেছ। কিছু টাকা পেয়েছিলাম বটে, সেটা খরচ হয়ে গিয়েছে দেনা শোধ করতে আর একটা ছোট বাড়ীর পেছনে। মাস মাস কিছু পাই, চলে যায় কোনরকমে।

সে কি কথা মাস্টারমশাই? শুনেছি হাজার হাজার টাকা রয়েলটি পাচ্ছেন ওয়ান্ডার ড্রাগ থেকে।

ওটার ফরমুলা বেচে দিয়েছি অশোক কিছু নগদ টাকা ও মাস মাস কিছু টাকার বিনিময়ে। লাভ যা হচ্ছে সেটা কোম্পানীর।

বিশ্বাস হল না কোন সুস্থ মানুষ সজ্ঞানে এমন গাধার মত কাজ করতে পারে। নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলছেন মাস্টারমশাই টাকা ধার চাইব ভয়ে। বললাম, কেন এমন কাঁচা কাজ করলেন আপনি?

কাঁচা কাজ? হয়ত তাই। কি আর করা যাবে?

বললাম, আর একটা কিছু বের করুন মাস্টারমশাই, যাতে প্রচুর কাঁচা টাকা হু-হু করে আপনার পকেটে আসে সে রকম বন্দোবস্ত করে দেব আমি। বিজনেসের মাথা না থাকলে টাকা ঘরে আনা যায় না।

তোমার তো বিজনেসের মাথা আছে অশোক।

আমি করছিলাম ফাটকাবাজি, ট্রেচারাস জিনিস। আপনার ওয়ান্ডার ড্রাগের মত একটা সিওর সাকসেসের জিনিস হাতে পেলে দেখিয়ে দিতাম বিজনেস কাকে বলে।

হাসলেন মাস্টারমশাই, কিছু বললেন না।

আমার কেমন মনে হল মাস্টারমশাই আর আগেকার মত ভালমানুষটি নেই। বেশভূষা আগেকার চাইতে খারাপ হয়েছে কিন্তু চোখ-মুখে একটা নূতন এলার্টনেস লক্ষ্য করা যায়। নিজের আবিষ্কারের ফরমুলা বেচে দিয়ে নিজের প্যায়ে কুড়ুল মেরেছেন যিনি তাঁর এই এলার্টনেস জেনুইন হতে পারে না, এটা নকল জিনিস। জেনুইন হলে ধরতে হবে ফরমুলা বেচবার কথা ধাপ্পাবাজি, ধাপ্পা দিয়ে আমার মত শুভাকাঙ্ক্ষীকে বোকা বানাতে চান।

বললাম, নতুন একটা বাড়ী করেছেন বলছিলেন, কোথায় বাড়ী করলেন, আপনার নিজের বাড়ীর কি হল?

সেটা আমার স্ত্রীকে দান করেছি। এসব কথা থাক, তুমি কি কোন কাজের খোঁজ করছ?

হ্যাঁ মাস্টারমশাই। কোন কাজের সুযোগ পেলে একবার চেষ্টা করে দেখব ভদ্রভাবে খেয়ে পরে থাকবার উপায় করত পারি কিনা।

তা পারতে পারো যথাসাধ্য খাটলে, লোভ সংযত করে চললে। আচ্ছা, দিন পনেরো পরে তুমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের কর্তা মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে পারো তাঁর পক্ষে তোমাকে কোন কাজ দেয়া সম্ভব কিনা জানবার জন্য। আমি এর মধ্যে তাঁকে তোমার কথা বলে রাখব।

বিস্মিত হলাম প্রস্তাব শুনে। মিঃ ভাদুড়ীর মত বড়লোকের সঙ্গে এত খাতির মাস্টারমশায়ের? হবেও বা, মাস্টারমশাই তো এখন টাকাওয়ালা মানুষ।

বললাম, দয়া করে একখানা চিঠি যদি দেন দুটো কথা বলে—

যদি হবার হয় ঐতে হয়ে যাবে। কিন্তু অশোক, তোমার পুরনো বিজনেসের চাল বদলে নতুন মানুষ হতে হবে। এফিসিয়েন্ট, অনেস্ট লোক পছন্দ করেন মিঃ ভাদুড়ী।

আবার গড় হয়ে প্রণাম করলাম, আপনার আশীর্বাদে একটা চান্স পেলে যথাসাধ্য চেষ্টা করব মাস্টারমশাই।

আচ্ছা, এসো তাহলে।

কি ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন মাস্টারমশাই, পান বা সিগারেট কেনবার পয়সার জন্য পকেটে হাত দিলেন।

বুঝলাম তিনি কোন দিকে যান, কোথায় যান আমাকে জানাতে চান না। নিজের পথ ধরলাম।

এবার নিশ্চিত বুঝলাম মাস্টারমশাই আর গোবেচারী ভালমানুষটি নাই। টাকায় কত পরিবর্তন আনে মানুষের চরিত্রে চোখের ওপরে দেখলাম।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভিয়েতনাম ! ভিয়েতনাম !

হিরোসিমার ছবি যেমন সমগ্র মানব জাতির মনে এক নিদারুণ বিভীষিকা সৃষ্টি করে, তেমনই করে **ভিয়েতনামের** ছবি। মানবিক দুর্গতির আকৃতি সর্বত্র সমান। যুদ্ধকবলিত দেশে মানুষের যা অবস্থা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানবেরও সেই একই অবস্থা, বোমা আর বুভুক্ষার তীব্রতা কোথাও কম নয়। মানুষের দৃষ্টি কিন্তু ক্ষমা করে না, তাদের চোখে অপরাধীরা অভিযুক্ত, তারা ক্ষমার অযোগ্য। এই সব অত্যাচারিত কোটর প্রবিষ্ট চোখে ভয়ের ছাপ, আতংকের বিহ্বলতা, কিছু চোখ শুখনো আবার কতকগুলি চোখ জলে ভরা। ভিয়েতনামে এই চোখ হয়ত কোনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখ, রক্তাক্ত শিশুর মৃতদেহ দেখে তারই প্রতিবাদে আত্মাহুতি দান করছেন, কিংবা কোনো ধরা পড়া **ভিয়েৎ কং**, কিংবা কোনো লাঞ্ছিতা রমণী—

> "Who has both arms burned off by naplam and her eyelids so Ladly burned that she can not close them."

ফেলিকস গ্রীন ক্যালিফোর্ণিয়ার অধিবাসী, অবশ্য জন্মেছেন ব্রিটিশ হিসাবে। গ্রীন মনে করেন যে কোনো যুদ্ধ মানবিকতার বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধ। ফেলিকস গ্রীনের ভিয়েতনাম! ভিয়েতনাম! একধারে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ঘৃণিত নিষ্ঠুরতার চিত্রময় বিবরণ বা ফোটোগ্রাফিক রিপোর্ট আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি সংক্রান্ত কিছু তথ্যভিত্তিক দলিল। ফেলিকস গ্রীন এই গ্রন্থটি একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা করেছেন। ভিয়েতনামের প্রকৃত পটভূমি সম্পর্কে মার্কিন মুল্লুকের মানুষকে অবহিত করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য—

> "If the people of the United States only knew more of the background to the war in Viet-nam, and what is being done there in their name, they would and could effectively insist on the war being at once broght to an end."

ভিয়েতনামে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে একথা কেউ আজ অস্বীকার করে না। ভিয়েতনামে পোনে এক মিলিয়ন মার্কিন সেনা লড়ছে। তথাপি এই যুদ্ধ এক অঘোষিত যুদ্ধ আর এই যুদ্ধ ফেলিকস গ্রীনের মত যে—সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিবেকে কাছে তাঁরা এই জাতীয় গ্রন্থাদির সহায়তায় পৃথিবীর মানুষকে প্রকৃত অবস্থাটা যে কি তা জানাবার চেষ্টা করছেন। গ্রীনের এই বিবরণ যে নৈর্ব্যক্তিক তা তিনি বলেন নি, তিনি একটি পিঠের ছবি দেখিয়েছেন, তাঁর এই গ্রন্থ—

> "Condemns without qualification, the policies pursued by the political and military leaders of the United States in Vietnam."

সমগ্র তথ্যাবলী অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম ১১১ পৃষ্ঠার ফটো চিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি অতি সাধারণ, কিছু বীভৎস এবং কয়েকটি মধুর—এই সব ছবিগুলির মাঝে মাঝে মন্তব্য এবং সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। শ্লেষটুকু কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই।

একটি ফটোগ্রাফে যুক্তরাষ্ট্রের বোমারু বিমানের পাশাপাশি সাজানো হয়েছে একটি শিশু আর তার মা, সেই সঙ্গে দেওয়া আছে জনসনের একটি উদ্ধৃতি—

> "Our course is resolute....our conviction is firm....we shall not be diverted from doing what is necessary in the cause of free-dom."

একটি চিত্রে ভিয়েতকংদের নির্যাতনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে; তার নীচে আছে গ্রেহাম গ্রীনের একটি উদ্ধৃতি, যা মর্মে বেঁধে—

> "The strange new feature about the photographs of torture now appearing is that they have been taken with the approval of the torturers and published over captions that contain no hint of condemnation."

এর শেষাংশটুকু আরো তীব্র এবং তীক্ষ্ণ।

ভিয়েতনাম! ভিয়েতনাম! এই সুরটিকে নিয়ে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে, আর সমগ্র গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই সুর-ই অনুরণিত। প্রবল যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দমনীয় শক্তির পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে ভিয়েতনামের মানুষের দারিদ্র্য। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল শক্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে তার নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র যথা ঃ আচ্ছন্নকারি ধারা বা টক্সিক স্প্রে, এই ধারা বর্ষণ করা হয় ধানের ক্ষেতে, যাতে ধান নষ্ট এবং বিষাক্ত হয়। ন্যাপলাম আগুনে বোমা এবং বায়ু চালিত মিশাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র। এর পাশাপাশি দেখানো হয়েছে ভিয়েতনামের মানুষের আদিম যুগের অস্ত্র আর সেই সব [illegible] অস্ত্রে [illegible] যুদ্ধের জন্য প্রাণ-

পণ লড়াই। ছবির ধারা এই বৈপরীত্য প্রদর্শন করা হয়েছে।

গ্রন্থটির শেষ খণ্ডে ভিয়েতনামে মার্কিনী হস্তক্ষেপের দুঃখকর ইতিহাস বিধৃত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে ফরাসীদের স্থানচ্যুত করেছে, দিয়েমের আধিপত্যের কালের নৃশংস অত্যাচার, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের উদ্ভব। দিয়েমের নিধন এবং তার পরিবর্তে উপযুক্ত কাউকে পাওয়া গেল না। সাতটি বিভিন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এলেন জেনারেল কাই (এঁর একমাত্র পূজনীয় নেতা হলেন এডলফ হিটলার)।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত উপকরণ দেখে গ্রীনের মনোভংগী যে কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট একথা মনে হতে পারে। গ্রন্থের অজস্র উধৃতি সকল প্রকার সম্ভাব্য ক্ষেত্র থেকে আহৃত। এই জাতীয় একটি উধৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেওয়া গেল—

"My solution? Tell the Vietnamese they have got to draw in their horns and stop aggression or we're going to bomb them back into the stone age."—General Courtis Le May.

পরিশিষ্ট অংশে কর্তৃপক্ষ কি বলেছেন এবং কি করেছেন তা পাশাপাশি সাজিয়ে দেখানো। যুক্তরাষ্ট্র যে জেনোসাইড বা গণহত্যার অপরাধে অপরাধী তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে মার্কিন সংবাদপত্রাদির প্রত্যক্ষদর্শী রিপোর্টারদের উক্তি উধৃত করে। এই পরিচ্ছেদটি (১৬০-১৬৫ পৃঃ) অতিশয় পীড়াদায়ক।

পরিশেষে গ্রীন বলেছেন এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একটা নৈতিক বিপর্যয় এবং এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জয় অসম্ভব কেননা বিজয়ী হতে হলে প্রতিটি ভিয়েতনামীকে হত্যা করতে হবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে ভিয়েতনাম থেকে সরে এসে তাঁদের জাতীয় ইতিহাসের কলংকিত অধ্যায়কে রুদ্ধ করুন।

ফেলিকস গ্রীন নর্থ ভিয়েতনাম বা চীনের প্রতি সপ্রশংস মনোভাব সম্পন্ন হলেও তিনি স্বয়ং একজন কম্যুনিস্ট নন। তিনি উদারনীতিক। তাঁর বিবেকে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। যেমনটি দেখা গেছে প্রখ্যাত মার্কিন লেখক নরম্যান মেইলারের ক্ষেত্রে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে এযুগের এই বিশিষ্ট মার্কিণ লেখকের নেতৃত্বে আজ যুক্তরাষ্ট্রে এক বিরাট যুদ্ধ বিরোধী সংগঠন গড়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থে কোনো রকম ভিয়েতকংগ নৃশংসতার ছবি নেই, অথচ 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত' এই নীতি যে যুগে প্রচলিত সেই যুগে অপর পক্ষেও নৃশংসতা ঘটে থাকতে পারে।

এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম আমেরিকার ফুলটন পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ আমেরিকায় নিষিদ্ধ নয় এবং গ্রন্থটির বহু সহস্র কপি সেই দেশে বিক্রী হয়েছে। এইদিক থেকে মার্কিন উদারনীতির প্রশংসা করতে হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা সে দেশে আজো আছে। প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে যে সে দেশে দৃঢ়হস্তে রুদ্ধ করা হয় না এটা আশার কথা।

আমাদের কাছে ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের নাম 'ভিয়েতনাম—ইনসাইড স্টোরী অব দি গেরিলা ওয়ার'—এই গ্রন্থের লেখক উইলফ্রেড জি বুরচেট একজন আমেরিকান এবং গ্রন্থটির প্রকাশক নিউ ইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স।'

এই সব প্রতিবাদ চিন্তাশীল মানুষের মনকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করবে এবং একদিন হয়ত শুভবুদ্ধির উদয় হবে।

এই গ্রন্থের প্রকাশকেরা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

—অভয়ংকর

● **VIETNAM! VIETNAM! By Felix Greene. Penguin Books Ltd (London). Price: 12s. 6d. only.**

সাহিত্যের খবর

করুণানিধির সম্মান লাভ ।। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. করুণানিধি যে একজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক, একথা মাদ্রাজের বাইরে তেমন পরিচিত নয়। কিন্তু তামিলভাষী শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত। তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্ব কবিতার সেবা করার জন্য 'দি ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল' ১৯৬৯ সালের বিশেষ পুরস্কার তাঁকে প্রদান করেছেন। এই পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে : তামিলনাড়ুর খাটি কবিশ্রেষ্ঠর মত আপনি আপনার জাদুময় কবিতাগুলির মধ্যে তামিল ভাষার সমস্ত দীপ্ত মহিমা মিশিয়েছেন এবং ৬টি মহাদেশের ৬ কোটি তামিলভাষী আপনাকে তাদের ৬ হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতির অজেয় সমকালীন নেতা হিসেবে দেখে আনন্দিত। এই পুরস্কার প্রদানের জন্য উক্ত সংস্থার সভাপতি প্রখ্যাত আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ডঃ আরভিল সি. মিলার মাদ্রাজ আগমন করেন।

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে শ্রীকরুণানিধির চেষ্টার অন্ত নেই। কিছুদিন আগে প্যারিসে কলেজ দ্য ফ্রান্স-এ তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানেও বিশেষ অতিথি হিসেবে শ্রীকরুণানিধি উপস্থিত ছিলেন।

সাঁওতালি ভাষার জন্য রোমান লিপি ।। গত ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর দুমকায় 'সারা ভারত সাঁওতালি সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন পরিষদে'র দুইদিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনটি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, এখানে বাংলা, বিহার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, নেপাল, সিকিম ইত্যাদি রাজ্যে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন প্রচলিত সাঁওতালি ভাষার মধ্যে একটা ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্য, এখন থেকে রোমান লিপিতে সাঁওতালি ভাষা লিখবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবেন। কারণ, এর চেয়ে বিজ্ঞানসম্মত আর কিছু হত বলে মনে হয় না। তবে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যদরদীদের অবিলম্বে আরো কিছু করণীয় আছে। যেমন—(১) সাঁওতালি লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং গ্রন্থ প্রকাশ, (২) সাঁওতালি ভাষার ইতিহাস এবং (৩) রোমান লিপিতে একটি পত্রিকা প্রকাশ। এতে আধুনিক সাঁওতালি ভাষায় রচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে না চললে কোন ভাষাই গতিশীল হতে পারে না। মনে হয়, উক্ত সংস্থা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ভেবেছেন।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিহারের এম-এল-এ শ্রীকামেশ্বর হেমরম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় উপশিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅমিয়কুমার কিসকু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীনাথানিয়েল মুরমু। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীকিসকু বলেন—'সাহিত্য আকাদমীর মত এমন একটি সংস্থা গঠনের কথা আমরা ভাবছি, যা আদিবাসী ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নতিতে সহায়তা করবে।'

হিন্দিতে অস্ট্রেলিয়ান কবিতার অনুবাদ ।। বিশিষ্ট তরুণ কাশ্মীরী কবি শ্রী আর. এম. কৌশিক একালের ৫০ জন অস্ট্রেলিয়ান কবির কবিতা হিন্দিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তিনি এই বইয়ের একটি কপি ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান রাষ্ট্রদূতের

হাতে উপহার হিসেবে দেন। এর আগে তিনি হিন্দিতে কানাডিয়ান কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, এভাবেই আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বিকাশ ঘটবে।

একটি সুইডিস উপন্যাস ।। ১১ জুলাই, ১৮৯৭ সাল। সলোমন অগাস্ট এন্ড্রী নামক একজন সুইডিস ইঞ্জিনীয়র দু'জন বন্ধুকে নিয়ে বেলুনে চড়ে এক দুঃসাহসিক যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। তাঁরা আর কোনদিন দেশে ফিরে আসেননি। তেত্রিশ বছর পরে এক সাগরদ্বীপে ভগ্ন অবস্থায় তাঁদের বেলুনটি পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে পাওয়া যায় একটি মূল্যবান ডায়েরী। প্রখ্যাত সুইডিস ঔপন্যাসিক পার ওল্ফ সুন্দ্রম্যান এই ডায়েরীটিকে কেন্দ্র করে এণ্ড্রীর সেই দুঃসাহসিক অভিযানকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখেন। সুইডেনে বইটি বছরের সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের সম্মান লাভ করেছে এবং গত বছর সাহিত্যে 'নরদিক' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। বইটির জর্মন অনুবাদ বেরিয়েছিল গত বছর। এ বছর প্রকাশিত হল ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজিতে বইটির নাম হয়েছে 'ফ্লাইট অব দি ঈগল।'

উপন্যাসটির একটি সমালোচনায় একে ডকুমেন্টারীরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সমালোচক বইটির রচনাভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যদিও লেখক ডায়েরীতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর যথাযথ অনুসরণ করেছেন, তবু রচনার গুণে বইটি বিশিষ্ট সাহিত্য মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। উপন্যাসে কাহিনীটি গল্প বলার ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে। তিন বন্ধুর মধ্যে সবশেষে মৃত্যু হয়েছিল কার্ণ্ট ফ্রাকেন-ফেলের। উপন্যাসে তারই মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে এই দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। তাদের এই করুণ পরিণতির জন্য তারা আত্মসমালোচনা করেছে। মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে এই করুণ আত্মসমালোচনার জ্বলন্ত কাহিনীই উপন্যাসটিকে এত স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে।

সরোজিনী নাইডুর জীবনী তাজাক ভাষায় ।। তাজাক ভাষায় সরোজিনী নাইডুর জীবনী প্রকাশের একটি উদ্যোগ চলছে। শ্রীমতী মালচেট শাহাবোভা এই জীবনী রচনায় অগ্রণী হয়েছেন। তিনি নিজেও একজন কবি এবং তাজিকীস্থানের বিদেশী ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান। এর মধ্যেই তিনি শ্রীমতী নাইডুর জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন।

বাংলায় গর্কির রচনা সম্বন্ধে ।। গর্কির যে সমস্ত রচনা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, তার উপর কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এতদিন পর্যন্ত ছিল না। সম্প্রতি সে অভাব দূর করেছেন শান্তি ভট্টাচার্য। তিনি বাংলায় গর্কির অনূদিত গ্রন্থাবলীর উপর একটি বিজ্ঞানসম্মত মূল্যবান দলিল রচনা করেছেন। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলেছেন—'গবেষণা কর্মটি এমন বহুসংখ্যক মূলে তথ্যের সন্ধান দিয়েছে, যার অনেকখানিই এই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত হল। গর্কি চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।' রবীন্দ্র পুরস্কার বিজয়ী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ভেরা নভিকভা বলেছেন : 'এই গবেষণা আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞানকে নতুন নতুন তথ্য, মন্তব্য এবং সিদ্ধান্তে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে।' এই গবেষণার ভিত্তিতে লেনিনগ্রাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের আকাডেমিক কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে শান্তি ভট্টাচার্যকে ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রার্থী-সদস্যসূচক ডিগ্রি দিয়েছেন।

জব্বলপুরে বিচিত্রার শারদ সাহিত্য সভা ।। গত ১৭ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমতী অশ্রু রায় ও শ্রীশ্যামল মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের বাংলা সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'সাতপুরা' কার্যালয়ে 'বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের' শারদ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অশ্রু রায়ের উদাত্তকণ্ঠের 'ভোরের হাওয়া এলো ঘুম ভাঙাতে কী নয়নে চুম হেনে...' উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে সাহিত্য সভার কাজ আরম্ভ হয়। স্বরচিত গল্প পাঠ করে শোনালেন হেনা হালদার, শ্যামাচরণ মিশ্র, তারাপ্রসাদ বসু, শ্যামল মুখোপাধ্যায় ও অশ্রু রায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সাহিত্যসভাকে কবি সম্মেলনের রূপ দিলেন। সাহিত্যিক 'বিমল মিত্র' ও বিমল মিত্রের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেন 'বিচিত্রা সাহিত্য বাসর' সম্পাদক কুসুম-বিহারী চৌধুরী। সাতপুরার শারদীয়া সংখ্যার একটি প্রদর্শনী সাহিত্য বাসরের সভাকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলেছিল। সভান্তে সাতপুরা কর্তৃপক্ষ জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করেন।

—চার্বাক

শারদ সাহিত্য

সাহিত্য ও বিজ্ঞান : প্রধান সম্পাদক : মুরারিমোহন চক্রবর্তী। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪ পরগণা। দাম : এক টাকা।

শহরতলীর এই ত্রৈমাসিক সাময়িক-পত্রটি ইতিমধ্যে সাহিত্যপাঠকের প্রশংসা-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার সুনির্বাচিত রচনাগুলির জন্যে। এই সংখ্যায় গল্প-কবিতা প্রবন্ধ-নাটক ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ্য হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'বনফুল'-এর উপন্যাসে সমাজচেতনা, অশোক সরকারের বাংলা নাটকে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম আভাস : শরৎ-সরোজিনী, মৃত্যুঞ্জয় সুরাইয়ের গল্পগুচ্ছ : বালিকা বধ, দীপ্তিকুমার সেনের দৈনন্দিন জীবনের বিজ্ঞান, প্রদীপ চৌধুরীর শনিগ্রহের বলয়, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের এনজাইম বিক্রিয়ার গতিবেগ, রসায়নবিদের ভেষজ বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক উপাদান বনাম কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদান—প্রবন্ধগুলি। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক এই প্রবন্ধগুলি সিরিয়স পাঠকবর্গের নিঃসন্দেহে প্রশংসাধন্য হবে। এছাড়া লিখেছেন : পলাশ মজুমদার, দিব্যেন্দু লাহা, গোপাল ভৌমিক, দিব্যেন্দু পালিত, কবিশেখর কালিদাস রায়, উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব রায় প্রমুখ।

রাজধানী—সম্পাদক নিশিনাথ সেন।। ৩৪ ডাঃ নরেন ঘোষ লেন, কলকাতা ৩১। দাম—দু' টাকা।

অনিয়মিত কবিতার ত্রৈমাসিক। দুই বাংলার শতাধিক কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। আধুনিক কবিতার আদর্শ সম্পর্কে সুনীলচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধটি মূল্যবান। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, মঙ্গলচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শান্তনু দাস, শান্তি লাহিড়ী, আশিস সান্যাল, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, দিনেশ দাস এবং আরো কয়েকজন। কবিতা ও প্রবন্ধের মান উন্নত। ইদানীংকালে এত সুন্দর আর কোনো কবিতার কাগজ বেরোয়নি।

তরুণিমা (শারদীয়া সংখ্যা) : প্রধান সম্পাদক হরিদাস ঘোষ, ৪০।১, বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

শারদীয়া তরুণিমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি শুধু নাটকের সংকলন। স্থান পেয়েছে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট চারটি নাটক : বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের দিব্যচারিণী; অগ্নিমিত্রের চার্বাকের জন্ম; গীরাটলালের ভাঙছি, নিয়ম ভাঙছি; এবং রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের নিমজ্জিত ধ্বনির মাস্তুলে। তরুণিমার উদ্দেশ্য হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে এ পর্যন্ত বাংলা নাট্যধারার একটা সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরা। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, নাট্য-আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করে তুলতে হলে বিশেষভাবে প্রয়োজন প্রতিভাবান নাট্যকারের অনুসন্ধান এবং সেই সঙ্গে গুণগত উৎকর্ষ সাধন। এদিকে লক্ষ্য রেখে আশা-করি তরুণিমা পত্রপত্রিকার আসরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনন্য হয়ে উঠবে।

প্রাশ্নিক ঃ সম্পাদক স্নেহাশিস শুকুল ও বরেন ভট্টাচার্য।। ৫০, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম—ষাট পয়সা।

রুচিসম্মত ক্ষীণ-আয়তনের সাহিত্যপত্র। ছাপা ও অঙ্গসজ্জা চমৎকার। লিখেছেন সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুধাংশু ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, শচীন বিশ্বাস ও আরো অয়েকজন।

কবিকণ্ঠ ঃ সম্পাদক অসীমকৃষ্ণ দত্ত।। রবীন্দ্র সরণী, আসানসোল।। দাম ঃ এক টাকা।

দেশী-বিদেশী কবিতায় ঠাসা। আলোচনা-সমালোচনা কিছুই ছাপা হয়নি। লিখছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সেন এবং আরো অনেকে।

ত্রিবৃত্ত—সম্পাদক রণজিৎ দেব।। ১, ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার।। দাম—এক টাকা।।

সুদূর উত্তর বাংলার মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য কাগজ। নির্বাচিত কবিতা ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ। গোষ্ঠীচেতনার দ্বারা অনাচ্ছন্ন। লিখেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, অশ্রুকুমার শিকদার বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আলোক সরকার, শংকর চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। একটি কাব্য-নাটক লিখেছেন রণজিৎ দেব।

অর্বাণ—সম্পাদক বিনয় গুহ ও সোমেশ ভট্টাচার্য।। পল্টনবাজার, শিলংপুর, গৌহাটি, আসাম।। দাম—এক টাকা।

আকার আয়তনে বড় না হলেও অর্বাণের এ সংখ্যাটি সুনির্বাচিত গল্পে সমৃদ্ধ। লিখেছেন আশিস সান্যাল, হায়াৎ সিংহ, সতীশচন্দ্র শিকদার, হোমেন বরগোহাঞি, শংকর দাশগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন। আসাম থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে অর্বাণ এরই মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

বিচিত্রা—সম্পাদক নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা ও জীবন ভৌমিক।। ৬৫, তর্কসিদ্ধান্ত লেন, বালি, হাওড়া।। দাম—এক টাকা।

সাহিত্যের কাগজ হলেও কবিতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। লিখেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিমল গুপ্ত, সুনীল ভট্টাচার্য দীপক রুদ্র, রঞ্জিত সিংহ, সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

কান্দী বান্ধব—সম্পাদক সত্যেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।। বাসন্তী প্রেস, পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।। দাম ঃ এক টাকা।

কান্দী-বান্ধব মফস্বল থেকে না বেরিয়ে কলকাতা থেকে ছাপা হলে হৈ হৈ পড়ে যেতো। মূল্যবান প্রবন্ধে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম ভুবনমোহিনী প্রতিভার কবি নবীন মুখোপাধ্যায়ের (ডঃ অমলেন্দু মিত্র), ভাষার উদ্ভব বৈচিত্র ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্য, (শিশিরকুমার সিংহ), কান্দী মহকুমা চণ্ডীমঙ্গলের উৎপত্তি স্থল (প্রভাত মুখোপাধ্যায়), এক মসজিদ এক মন্দির (ফজলুল হক), দক্ষিণ কালীর আজন (মোহিতকুমার বন্দোপাধ্যায়) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও লালাবাবু (ভাবগ্রাহী), মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকা ইত্যাদি। এমন একটি শারদীয়া সংখ্যা উপহার দেবার জন্য আমরা সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই।

বহুমুখী—সম্পাদক স্বরাজ সেনগুপ্ত।। জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।।

কয়েকটি পুরনো লেখার পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই সুলিখিত। উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। আয়ানেস্কোর অনুসরণে একটি নাটক লিখেছেন স্বরাজব্রত সেনগুপ্ত।

দুর্গাপুর বাণী—সম্পাদক কালিদাস মুখোপাধ্যায়।। প্রজেক্ট প্রেস, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—১৩।।

নবীন-প্রবীণ লেখকদের লেখায় পত্রিকাটি আকর্ষণীয়। তবে অধিকাংশ লেখাই প্রাচীনধর্মী। লিখেছেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ এবং আরো অনেকে।

বাংলা সাহিত্য পত্র—সম্পাদক উমাশংকর বন্দোপাধ্যায়। ২৬, বাবুপাড়া, ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা। দাম—চল্লিশ পয়সা।

বাংলা ইংরেজী দ্বিভাষিক কবিতাপত্র। লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত, কেনা হালদার, পরেশ মণ্ডল, নচিকেতা ভরদ্বাজ, চণ্ডী হালদার এবং আরো কয়েকজন। ইংরেজী প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন মিস জুডি ফিলালিংস ও নির্বাচন নিয়োগী। সুধাংশু সেন লিখেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে সবুজ বিপ্লবের পদধ্বনি।

এবং—সম্পাদক অমিয় সিংহ ও গৌরী বন্দোপাধ্যায়। ২৩।১, সব্জীবাগান লেন, কলকাতা-২৭। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

ঘোষণায় বলা হয়েছে, সত্তর দশকের গল্পপত্র। লিখেছেন নির্মলেন্দু গৌতম, শান্তনু দাস, জয়ন্ত দত্ত, গৌরী বন্দোপাধ্যায়, অমিয় সিংহ এবং সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পরিচয়—**সম্পাদক** ঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং তরুণ সান্যাল। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭। দাম—আড়াই টাকা।

পরিচয়ের পুরোন বৈশিষ্ট্য শারদীয় সংখ্যায় স্পষ্ট। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বিপ্লব, আবেগ ও প্রজ্ঞা), অন্নদাশংকর রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মার্কসবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি গোড়ার কথা), দিলীপ বসু (বৈজ্ঞানিক এঙ্গেলস), চিন্মোহন সেহানবীশ কল্যাণ দত্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, শংকর চক্রবর্তী, বাসব সরকার এবং সত্যপ্রিয় ঘোষ (সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য কি প্রগতিশীল?)। গল্প লিখেছেন অসীম রায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মিহির সেন, গুণময় মান্না, অমলেন্দু চক্রবর্তী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র নিয়োগী এবং অসিত ঘোষ। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, মংগলচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, তরুণ সান্যাল, লোকনাথ ভট্টাচার্য রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, চিত্ত ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন শান্তিকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শান্তনু দাস, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আশিস সান্যাল, তরুণ সেন, সত্য গুহ, অনন্ত দাস, গণেশ বসু, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন দাস এবং আরো কয়েকজন।

আলোছায়া—সম্পাদক —মাধবলাল মল্লিক। ১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—৩৲।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যশস্বী লেখকের উপন্যাস ও গল্প, কুণাল চট্টোপাধ্যায় বোম্বানা বিশ্বনাথন, আবু আতাহার, খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ অবনী সিংহ, অজিত দে, যাদুকর পি সি চৌধুরী প্রমুখ লেখকের নানা বিচিত্র ধরণের বহু লেখায় সমৃদ্ধ ও চিত্র ও মঞ্চ শিল্পীদের নানাবর্ণের চিত্রে শোভিত এই শারদীয় সংখ্যাটি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলেই বিশ্বাস রাখি। সম্পাদকের বিষয় নির্বাচন ও রুচিজ্ঞান প্রশংসনীয়।

অন্বিষ্ট—সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।। ৯।১।১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৩।। দাম দু টাকা।।

এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রচনা এলিয়ট সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকার। লিখেছেন প্রশান্ত দাঁ। বাংলাদেশে এলিয়টের কাব্য-নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন পুলক চন্দ অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন অশোক দাস, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, দীনেন বন্দোপাধ্যায়, প্রণব রায় ও আরো কয়েকজন পত্রিকাটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রবন্ধগুলি মূল্যবান।

সাহিত্য সেতু—সম্পাদক শুভেন্দু সেনগুপ্ত। সংগঠন সম্পাদক ভগবন্ধু কুন্ডু। বাঁশবেড়িয়া কুন্ডু গলি, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। দাম—তিন টাকা।

গল্প কবিতা আলোচনা সমালোচনা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে সাহিত্য সেতুর এই বিশেষ সংখ্যাটি আকর্ষণীয়। লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, জয়ন্তী সেন, রণজিৎ দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, আবু আতাহার, শান্তিলাল রায়, ভোলানাথ ঘোষ, শ্যামল গুপ্ত, দীপ্তি রায় প্রমুখ। প্রচ্ছদ ভালো। রচনা নির্বাচন উন্নতমানের।

সহজিয়া—সম্পাদক দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শংকর দাশগুপ্ত। ৫৪এ, মিডল রোড, কলকাতা-১৪। দাম—এক টাকা।

ছোটগল্পের ত্রৈমাসিক। প্রতিটি গল্পেই সকলের চিন্তার ধারক। লিখেছেন দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর দাশগুপ্ত, আবদুল জব্বার, মুকুলিকা দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর দাস, সাগর চক্রবর্তী, সমীর রক্ষিত, অজয় সেন, উদয় ভট্টাচার্য, জীবন সরকার, প্রলয় সেন, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন ঘোষ।

সাতপল্লা—সম্পাদক শ্যামল মুখোপাধ্যায়। ৩১২, পূর্ব ঘামাপুর, জব্বলপুর, মধ্য প্রদেশ। দাম—এক টাকা।

প্রবাসী বাঙালীরা এই পত্রিকার লেখক লেখিকা। শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরে থেকেও সাহিত্যের প্রতি সমান আগ্রহী। দু' একজন কলকাতার লেখক অবশ্য তাঁদের সারস্বত সাধনায় অংশ নিয়েছেন। এ সংখ্যায় লিখেছেন শম্ভুনাথ রায়চৌধুরী, শোভন সোম, হেনা হালদার, তারাপ্রসাদ বসু, উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রু রায়, সুনীল বসু, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনময় দত্ত প্রমুখ।

সীমান্তিক—সম্পাদক দেবাশিস ঘোষ, বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত, রণজিৎ দাস। উত্তরবঙ্গ প্রেস, টেম্পল স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি। দাম—এক টাকা।

লিখেছেন দেবল দেববর্মা, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অসীম বর্ধন, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গণেশ সেন, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ।

পাপু (শারদীয়া) —সম্পাদক : সুশীল মন্ডল। ৭৯, শ্যামনগর রোড, কলকাতা ৫৫। পঁচিশ পয়সা।

ছোটদের উপযোগী রচনাসম্ভারে পত্রিকাটি সত্যিই আকর্ষণীয়। চমৎকার প্রচ্ছদ। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের একটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর ও গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা তিনটি চমৎকার। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন পরিমল ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অজয় নাগ, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন।

স্বস্তিকা—সম্পাদক : সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বস্তিকা প্রকাশন ট্রাস্ট। কলকাতা ও আগরতলা থেকে প্রকাশিত।

ছোটগল্প, বড় গল্প, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, অন্যান্য প্রবন্ধ, বিশেষ রচনা, পূর্ণাঙ্গ নাটকের রস-রচনা, কবিতা।

কবিতাৰিতা—সম্পাদক : কল্যাণশংকর সেনগুপ্ত। ২ রাজা কালীকৃষ্ণ লেন। কলিকাতা-৫। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

অভিনব রীতির কবিতা পত্রিকায় লিখেছেন মনুজেশ মিত্র, অসীমকৃষ্ণ দত্ত, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, দুর্গাদাস সরকার, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, সুনীল সরকার, রুদ্রেন্দু সরকার। আলোচনা, সাক্ষাৎকার কয়েকটি আছে।

খেয়া : সম্পাদক—মলয়কুমার দাশ। ২৬৪, ডায়মন্ড হারবার রোড। কলকাতা-৩৪। দাম পঁচিশ পয়সা।

প্রায় একশ পাতার মিনি পত্রিকা খেয়ায় আছে গল্প, কবিতা, শব্দজব্দ, কুইজ, কৌতুক, খেলাধুলা, চলচ্চিত্র এবং আরো অনেক কিছু।

পরিচিতি (শারদ সংখ্যা) সম্পাদক : সত্য মণ্ডল ও পরিমলকুমার গুপ্ত। ৭৭এ ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলকাতা—৩২। এক টাকা।

প্রবোধকুমার সান্যালের একটি চিঠি দিয়ে শুরু হয়েছে পত্রিকা ছাপা। প্রচ্ছদে ঘোষিত হয়েছে : 'নতুনদের একমাত্র সাহিত্যপত্রিকা'। লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আছেন গোরাচাঁদ দে, সমর ভট্টাচার্য, বৃন্দাবন গোস্বামী, তারাশংকর আদিত্য এবং আরো অনেকে। কিন্তু রচনানির্বাচনে নতুনত্ব কম।

প্রাপ্তিস্বীকার

শ্রী (শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদক আশিস দাশগুপ্ত।। অভিযান সংস্কৃতি সংস্থা, আতাবাগান, গড়িয়া, ২৪ পরগণা।। চল্লিশ পয়সা।।

পিপাসা : সম্পাদক বিশ্বনাথ ঘোষ, ভূপাল সিংহ রায়, সামসুল আলম সরকার।। চাঁপারুই জি টি রোড, দিগশুই (মগরা), হুগলী।। এক টাকা।।

স্ফুলিঙ্গ—(শারদীয়া ১৩৭৭) —সম্পাদক রমেন চক্রবর্তী, পবিত্র জানা রায়, পান্নালাল মল্লিক।। কাছারীপাড়া, বসিরহাট।। এক টাকা।।

আধুনিক কবিতা (চতুর্বিংশ সংকলন)—সম্পাদিকা রেখা দত্ত।। ৪, মিডল রোড, কলকাতা-৩২।। দাম ৫০ পয়সা।।

পদাতিক (শারদীয়া)—সম্পাদক শ্যামল সাহা।। হালিশহর (নবনগর), পোঃ মালঞ্চ, ২৪ পরগণা।। এক টাকা।।

বহ্নিদূত (শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল।। গরিফা, পোঃ হালতু, ২৪ পরগণা।। এক টাকা।।

স্বধারা (শারদ সংকলন)—সম্পাদক রণজিৎকুমার মজুমদার ও পাঁচুগোপাল রায়।। বিশালাক্ষীতলা, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। পঁচিশ পয়সা।।

কার্ত্তিক (শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদিকা পারুল দাস।। অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।। ১-৫০ টাকা।।

খামখেয়ালী (শারদীয়া ১৩৭৭)—সম্পাদক রাজেন্দ্রকুমার মিত্র।। ১১বি, গোকুল মিত্র লেন, কলকাতা-৫।। দাম ১-৫০ টাকা।

প্রতীকী : সম্পাদক দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা।। ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯।। ষাট পয়সা।।

রবিবাসরাৎ : সম্পাদক কালাচাঁদ রায়। ৩১, রাজা রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।। পঞ্চাশ পয়সা।।

উত্তরীয় : সম্পাদক শ্যামল ধর।। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।। এক টাকা।।

বনলতা : ২০ দমদম রোড, ব্লক নং এন-১, ফ্ল্যাট নং-৫, কলকাতা-৩০।। ৪০ পয়সা।।

কণ্ঠস্বর : সম্পাদক সত্যরঞ্জন বিশ্বাস।। ৪১।এল।৭ নারকেলডাঙ্গা (নর্থ রোড) কলকাতা—১১।। এক টাকা।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা
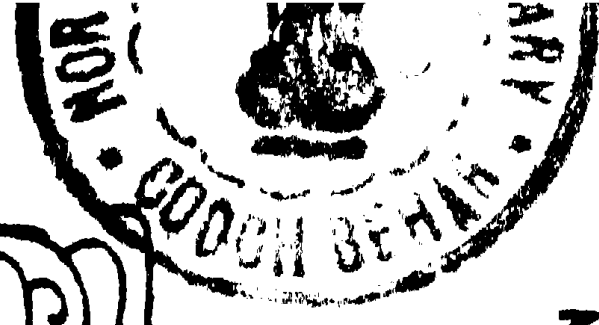
ছোট গল্প

আমাদের এ-সময়ে, সত্তরের দশকে এসে, এই আর্থ-রাজনৈতিক সামাজিক পরিমণ্ডলে সাহিত্যের পক্ষ থেকে ফলাও করে কিছু বলতেও যেন সংকোচ হয়। সন্দেহ হয়, সমাজ-মানসে সাহিত্যের কোন স্বাতন্ত্র্য এবং বিশিষ্ট ভূমিকা আছে কিনা। সাহিত্য সমাজ মানসের দর্পণ, এতে দেশ কাল পাত্রের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়, মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার পথ দেখতে পায়—ইত্যাদি কথা বাজার-চলতি প্রচলিত বুলি কিনা তাও চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশে ইদানীং পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে, ঘরে ঘরে এখন খবরের কাগজ রাখা হয়, অনেকেই পত্র-পত্রিকা কেনেন, সাহিত্যের সম্মেলন ও আলোচনা হয়। তদ্‌সত্ত্বেও মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োজন কতটা বোধ করে; লেখকগণই বা সমাজ-জীবনের কতটা কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, একালের সাহিত্যিক মানুষকে, সমাজ-সভ্যতাকে কোন সত্যে বিধৃত দেখতে চান। এসব জিজ্ঞাসা গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং তর্কসাপেক্ষও বটে। আসলে জীবনযাত্রার বহুতর ক্ষেত্রে যে গোঁজামিল, অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব এবং সমস্যা থেকে যাচ্ছে, যে বিচ্ছিন্নতা জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে সমাজ-মানুষে বর্তমান, সাহিত্যও তার থেকে মুক্ত নয়। লেখক-পাঠক সম্পর্কের ফাটল ও দূরত্ব ঠিক একই কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একে আমরা আধুনিককালের অন্যতর বৈশিষ্ট্যও বলতে পারি।

শারদোৎসব ও সাহিত্য—

তবুও সাহিত্য আছে এবং থাকবে। আর সময়ও পরিবর্তিত হয় বৈকি। মধ্য-ষাটের কোন একটা বছরের সঙ্গে সত্তরের বর্তমান সময়ের পার্থক্যও বিস্তর। এজাতীয় আলোচনার কথা ভাবাও যেত না, হয়ত প্রয়োজনও ছিল না, সময়টা যদি ৬৪ কি ৬৭ সাল হতো। এখন আমরা ভাবছি। অর্থাৎ সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক জীবনযাত্রার যোগসূত্র আর একবার স্পষ্টতর হয়ে উঠতে চাইছে বলে আমাদের ধারণা,—গত শারদ মরশুম থেকেই যার ভূমিকা প্রস্তুত হচ্ছিল, এ বৎসর নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য উত্তরণ। বাংলা দেশে শারদীয় পত্র-পত্রিকার বিপুল ও বিচিত্র সমারোহ বহুকালের ঐতিহ্য। মাঝে ষাটের দশকে নানা কারণে সেই সমারোহ কিঞ্চিৎ স্তিমিত হলেও অতি-সাম্প্রতিককালে শারদ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এমন ব্যাপক সাহিত্য-সৃষ্টি এবং প্রচারের আয়োজন আমাদের দেশের অন্য কোন ভাষাতে ত হয়ই না, এমন কি পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও হয় কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশের বহুতর নিজস্বতার মধ্যে শারদ সাহিত্য অন্যতম। সাহিত্য পাঠে বিশেষ অনাগ্রহী পাঠকও এ-সময়ে একখানা শারদীয় সংখ্যা কিনে থাকেন, পুজোর বাজেটে অন্য সব কেনা কাটার মধ্যে দুই-একখানা পত্র-পত্রিকাও ধরা থাকে।

ছোটগল্প : পত্র-পত্রিকার ভূমিকা—

বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতর শাখা ছোট গল্প পত্র-পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ। পুস্তকাকারে ছোটগল্পের চাহিদা কিছুটা কম হলেও সাময়িক ও সাহিত পত্র-পত্রিকায় তার চাহিদা ও গুরুত্ব আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। একালের মানুষ তার বহুবিধ সমস্যা ও কর্মের ক্ষণ-অবসরে পত্রিকার পৃষ্ঠায় মন দেয়। স্বভাবত ছোটগল্পের আকার-প্রকার তার আকর্ষণ ও

পর্যবেক্ষক

জনপ্রিয়তার হেতু, একমুখী সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুও অন্যতর কারণ। বস্তুত পত্র-পত্রিকার পরিচালনগত সুবিধা এবং সম্পাদকের তাগিদ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ছোটগল্পের সমুন্নতিতে সহায়ক হয়েছে। গত শতাব্দীর একেবারে শেষ কয়েক বছরের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভারতী পত্রিকাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনায় হাতে খড়ি দেয়। তারপর শিলাইদহের পদ্মার বুকে বোটে বসে অনেক গল্প লেখেন হিতবাদী-সাধনার জন্য। 'হিতবাদীতে তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ছোটগল্প লিখিয়া দিতে লাগিলেন: বোধহয় ছয় সপ্তাহে ছয়টি লেখেন।... সাধনার টানে ছোটগল্প পুনরায় দেখা দিল; প্রথম বৎসরে প্রতি মাসে একটি করিয়া গল্প লেখেন'—(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড)। বাংলা ছোটগল্প কনিষ্ঠতর হলেও সত্তর-পঁচাত্তর বছরের বয়স্ক ও পরিণত রূপে বিশ্বসভায় সে তার নিজের আসন করে নিয়েছে মোপাসাঁ চেকভ, গর্কি, হেমিংওয়ে, সমরসেট মমের সঙ্গে। আর এই অগ্রগতি ও পুষ্টির পেছনে নীরব ভূমিকা পালন করেছে নানা-শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে ছোট-বড় সাহিত্য-পত্রিকাগুলি। সুতরাং আজও কোন পত্র-পত্রিকা একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প পাঠকদের উপহার দিতে পারলে খুশি হয়, গর্ব অনুভব করে। সেদিক থেকে ভারতী হিতবাদী সাধনা যে ভূমিকা পালন করেছে প্রাথমিক স্তরে, কল্লোল কালি-কলম ও প্রগতি যে ভূমিকা পালন করেছে তিরিশের যুগে, সমকালে বা কিছু পরের প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী বা শনিবারের চিঠির যে ভূমিকা, ঠিক সেই ভূমিকাই পালন করে চলেছে একালের বেশ কিছু, একান্তভাবে ছোটগল্পের পত্রিকা সহ অসংখ্য নামী অনামী বিভিন্ন ধরণের পত্রিকা।

এ সময়ের শারদ সংখ্যা পত্রিকার সঠিক হিসাব করা দুরূহ। কোলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলা শহর এমন কি পল্লী অঞ্চল থেকেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

প্রবীণ গল্পকারগণ—

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সচেতন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পর যুদ্ধোত্তরকালের ব্যাপকতর সমাজ পটভূমি, নতুন যুগের সমস্যা, মন ও মননের অধিকার নিয়ে এলেন তিরিশের যুগের তরুণ গল্পকারগণ। দীর্ঘ ৩০।৪০ বছরের অনলস সাহিত্য চিন্তার পরিণত ছোটগল্প যাঁদের কাছ থেকে এখনও সামান্য দু-একটি পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর, মনোজ বসু প্রমুখ অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে বা আগে পরে যাঁদের আবির্ভাব সেইসব প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ গল্পকারদের কাছ থেকেও আমরা ছোটগল্প পাই। প্রবীণ লেখকদের মধ্যে সকলেই প্রায় বছরের অন্যান্য সময়ে গল্প রচনায় ততটা আগ্রহী নন, উপন্যাস, বা অন্যান্য রচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কেবল শারদ মরশুমে তাঁদের কিছু কিছু নতুন গল্প আমাদের পড়ার সৌভাগ্য হয়। কেবল পত্রিকা-সম্পাদকের তাগিদেই এঁরা ছোটগল্প লেখেন, এটা ভাবলে মনে হয় ভুল হবে। উপরন্তু আমাদের মনে হয়, এদেশের কথা-সাহিত্যিকদের প্রায় প্রত্যেকেরই প্রিয় আর্ট-ফরম ছোটগল্প। জীবনের আন্তরিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা তাঁরা ছোটগল্পের মাধ্যমে বলতেই ভালবাসেন। তবুও কেবল ছোটগল্প লিখেই লেখক টিঁকে থাকতে পারেন না, কেননা ছোটগল্পের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তার থেকে খ্যাতি ও

অর্থ প্রাপ্তি উপন্যাস লেখকের তুলনায় অতি নগণ্য।

তিরিশের যুগের গল্পকার

বাংলা ছোটগল্পের খ্যাত-কীর্তি রূপকার প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'গল্পের নায়কের সিংহাসন উল্টে গেছে। যাবারই কথা। কিন্তু মানুষের মিছিল সেখানে থামবার নয়।' (অমৃত সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৭)। এবারের শারদীয় ছোটগল্প পড়ে যে কোন সচেতন পাঠকই এই মন্তব্যের যথার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর নিজের কয়েকটি গল্পেও এই সময়ের অস্থির মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে, চাওয়া-পাওয়া আশা-হতাশাকে জীবন্ত রূপদান করেছেন। এক পড়ন্ত বড় বাড়ির এক খেয়ালী বৌঠাকুরাণীর চরিত্র-ঐশ্বর্য ঐ বিরাট রহস্যময় বাড়িটার মতই উন্মোচিত করেছেন 'অসমাপিকা' (অমৃত) গল্পে। আছে পাশে পরিপূরক কিছু মানুষের মুখ। 'নিজের অসহায় মূঢ়তায় গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেওয়া জীবনের কথা লেখকের গল্প বলার অসামান্য জাদুস্পর্শে পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এক মহিলার দুই পুরুষ-কেন্দ্রে আকর্ষণের গল্প 'স্বৈরিণী' (সীমান্ত) আধুনিক বাঙালী সমাজে স্বীকৃত বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্ধকারের দিক প্রেমেন্দ্র মিত্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে দেখিয়েছেন। তিনি উল্টোরথ, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকাতেও লিখেছেন। তাঁর গল্পে বিষয় গৌরব, বিষয় উপযোগী ভাষা, প্রকাশের মুন্সিয়ানা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি সর্বদাই স্বাদ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এবারের গল্প-গুলিতেও সে-বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন আছে। অচিন্ত্যকুমারের 'বিকেলের সানাই' (অমৃত) বা দ্বিতীয়া (যুগান্তর)-র মুখ্য উপজীব্য প্রেম। পুরাতন প্রেম-সম্পর্ক বয়স্ক মন ও মননে গভীর, স্মৃতি-বিস্মৃতিতে রহস্যময়। এক যাযাবর স্বভাবের বাগদি মেয়েকে ভালবেসে প্রাণ দিল সাপুড়ে যুবক। সে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। বিহঙ্গীকে কি খাঁচায় আটকানো যায়। এবারের বেতার জগতে প্রকাশিত সুন্দর প্রেমের গল্প শৈলজানন্দের 'বন-বিহঙ্গী।' নারী মনস্তত্ত্বে সম্ভবত সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—যৌবন সম্পদ। তারা-শঙ্করের 'সখী ঠাকরুণ' (আনন্দবাজার)। গল্পের এলোকেশী ষোল থেকে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য ও সংযমী জীবন আচরণের মধ্য দিয়ে দেব সেবায় নিয়োজিত থাকলেও আজ তাকে সরে যেতে হবে তার কারণ সে বিগত-যৌবনা। বৎসর গুনতি হিসাবেই কি যৌবন বিচারের সব? এতকাল ধরে যে আশ্চর্য সতর্কতা ও সাধনায় যৌবনকে রক্ষা করে এলো তার মূল্য কি কিছু নেই। এ-গল্পে তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব গল্প-রীতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। তাঁর অন্যান্য গল্প 'আলোছায়া' 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত। বনফুল তাঁর নক্শা ও চিত্র-ধর্মী গল্পে যথারীতি শ্লেষাত্মক ও তির্যক ভঙ্গী অক্ষুন্ন রেখেছেন। 'লেখক ও মিথিবাবু' (যুগান্তর) ছোট্ট দর্পণে এ-সময়ের সমাজ-জীবনের ছায়া পড়েছে। কথা-সাহিত্য, দেশ উল্টোরথ প্রভৃতি পত্রিকায় আরও লিখেছেন তিনি। বর্তমান অস্থির সময়ে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে উচ্চ শিক্ষিত বড় অফিসারের মানসিক টানা পোড়েনের গল্প অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ধারুণী' (অমৃত)। শ্রীযুক্ত রায়ের গল্প মনন প্রধান। মনোজ বসু তাঁর ছোট্টগল্প 'ভূমিকম্পে' বসুমতী সাপ্তাহিক জনৈক পদ্মভূষণ উপাধি প্রাপ্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, আন্তরিকতাহীন লোক-দেখানো অনুষ্ঠানকে। তিনি যুগান্তর সিনেমা জগৎ ইত্যাদি পত্রিকাতেও লিখেছেন। তাঁর গল্পে রূঢ় বাস্তব এবং সরস বাক-ভঙ্গী লক্ষণীয়।

চল্লিশের যুগ : যুদ্ধোত্তর কাল

প্রবীণ লেখকদের মধ্যে বেশ কিছুদিন পরে গল্প লিখলেন সুবোধ ঘোষ। এক রূপসী মধ্য বয়স্কা মহিলার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের অপপ্রয়োগে একটি সদ্য বিবাহিত দম্পতির জীবন কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তারই আকর্ষণীয় কাহিনী 'অধীশ্বরী' (দেশ)। অনেকদিন পর গল্প লিখলেন সতীকান্ত গুহ-ও। এ-কালের একজন উচ্চ শিক্ষিত বিবাহিত তরুণ অধ্যাপকের রুচিশীল সংযমী মনে এক 'হীরের টুকরো' 'লাভলি অ্যান্ড ডিফিকল্ট' তরুণী ছাত্রী ঝড় তুলেছিল। 'জীবন যত নির্মমই হোক কোথাও না কোথাও কবিতার মত কোন না কোন একটা মিল থেকেই যায়।' শিক্ষক-ছাত্রীর 'দূরতম-নিকট' সম্পর্কের মধ্যে তা ব্যক্ত হয়েছে। লেখকের 'সুভদ্রার রথ' (অমৃত) গল্পে। এই দুটি গল্পেই আধুনিক বুদ্ধি-দীপ্ত উচ্চ-বিত্তের পরিমণ্ডল। উভয় ক্ষেত্রেই মার্জিত তীক্ষ্ণ ভষা ও প্রকাশভঙ্গী পাঠকের ভাল লাগবে।

মধ্যবিত্তের সামাজিক ও মানসিক সমস্যা ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যে সব প্রবীণ লেখক গল্প লেখেন তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ অন্যতম। স্বল্প পরিসরে তির্যক ভঙ্গীতে লেখা একটি নতুন ধরনের গল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'স্বনামধন্যা' (কালান্তর)। একুশ বাইশ বছরের সুদর্শনা দীর্ঘাঙ্গী গৌরী মেয়ে, পোশাকে, আচরণে কথাবার্তায় জড়তাহীনা, লেখকের কাছে মিনি কাগজের জন্য লেখা চাইতে এসেছিল। মেয়েটির সবখানিই যেন স্বরচিত, তার রচনা নামটা থেকে জীবন-পরিবেশ পর্যন্ত সব। লেখকের চিন্তা, এদের তুলনায় তাঁর পঞ্চাশোর্ধ জীবন কতখানি স্বরচিত। শ্রীমিত্র কথা সাহিত্য, দেশ, বিচার, সুন্দর জীবন, সিনেমা জগৎ প্রভৃতি পত্রিকায় এবার লিখেছেন। একটি বধূর মরফিয়া ইনজেকশন নিয়ে নেশা করার কাহিনী দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'মরফিয়া' (যুগান্তর), আর একজন মননশীল বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকের একা-কীত্বের বেদনার অন্তরঙ্গ চিত্র 'দুঃখী বাদশা' (সাপ্তাহিক বসু-মতী)। শ্রীযুক্ত বসুর সহজ সরল গল্প বলার ভঙ্গী পাঠককে আনন্দ দেয়। তিনি কথা-সাহিত্য, বিচার-এ গল্প লিখেছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সমান্তরাল (অমৃত) মনস্তত্ত্বনির্ভর কাহিনী। বেশী বয়সে বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উপর সন্দেহ করেছেন, শেষে একে অন্যের উপর বড় বেশী নির্ভরশীল, দুজনে মিলে নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের একমাত্র মেয়ে কোন ফাঁকে অন্য এক পৃথক বিন্দুতে অবস্থান করে স্পষ্টত এক সমান্তরাল রেখায় স্থাপিত করেছে নিজেকে। স্বামী-স্ত্রী যখন এই দূরত্বের কথা বুঝতে পারল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এক প্রকার শূন্যতা-বোধের বেদনা এই গল্প পাঠককে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে। সাপ্তাহিক বসুমতী, বেতার জগৎ, কালি ও কলম, মৌসুমী প্রভৃতিতে শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন। পিতা-মাতা অভিভাবকের ধমক ও শাসনের দাপটে ছোট ছেলে কিভাবে ভীত আতঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে দেখিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'আতঙ্কিত' (অমৃত) গল্পে। মহিলা গল্পকারদের মধ্যে আশাপূর্ণা অনলস এবং নিয়মিত গল্প লেখেন। কথা সাহিত্য, রমা-রাণী, যুগান্তর প্রভৃতিতে লিখেছেন। মধ্য-বিত্তের ঘরোয়া জীবন, প্রেম ও অন্যতর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন সমথনাথ ঘোষ (যুগান্তর, অমৃত) আশা দেবী (অমৃত, বেতার জগৎ, সাপ্তাহিক বসুমতী) বাণী রায় (যুগান্তর) সুশীল রায় (দেশ, যুগান্তর, বেতার জগৎ), হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (বিচার, বেতার জগৎ, আলোছায়া), লীলা মজুমদার (বেতার জগৎ)।

উল্লেখযোগ্য হাস্য-কৌতুক ও সরস গল্প লিখে শিবরাম চক্রবর্তী (দেশ, মৌসুমী) এবং পরিমল গোস্বামী (অমৃত) পাঠকদের এবারও আনন্দ দিয়েছেন।

এ-সময়ের অবক্ষয়, বেহিসাবী জীবন-যাপন, হতাশ-শূন্যতা বোধ প্রেম-যৌনতার উপর গল্প লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রমুখ। 'বেঁচে থাকা থেকে পরিত্রাণ পেতেও আমরা তেমনি যে যে-দিকে পারি ছুটেছি।' দুই রাত্রির (দেশ) নায়ক ছুটেছে বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে। পরস্পরের উষ্ণ সান্নিধ্য ও যৌন সম্ভোগের গল্প। মাঝে মাঝে মনে আসে উত্তম পুরুষের একটা গল্প। গল্প? না, গল্পের মত।' কবিতা-গল্পের মাঝামাঝি একটা চিন্তা-প্রবাহ 'নোট বুক থেকে' (অমৃত)। মারাত্মক রূপসী স্ত্রীর রূপ-যৌবনে কোন এক যুবক উত্তেজিত, অসহিষ্ণু, অস্থির—শেষে উন্মাদ-প্রায়। অথচ কি যে সে চেয়েছিল ভাল করে যুবকটি বুঝতেও পারল না। জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 'চাওয়া' (প্রসাদ) গল্পটি লিখেছেন। শ্রীনন্দী এবারে সিনেমা ও যৌন বিষয়ক পত্রিকাতেই

বেশী লিখেছেন। বিমল কর তার 'টোকা' (প্রসাদ) গল্প দেখিয়েছেন সুখী বিবাহিত জীবনে অতীত স্মৃতি অতর্কিতে টোকা দিতে পারে এবং সে টোকার শব্দ স্বামী-স্ত্রীর কানে দুরকম মনে হতে পারে।

এই সময়ের রূপ : প্রবীণদের গল্প

এবার শারদ মরশুমের ছোটগল্পে সবিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এই যে, বর্তমান বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের আলোড়ন ও অস্থিরতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থ-বৈষম্য, শরিকী সংঘর্ষ, খুন জখম রাহাজানি, দারিদ্র্য ও বেকারী, শহরে-গঞ্জে-গ্রামের নতুন চেতনা, মাঠ জমি কৃষক, এক কথায় অভিনব সাম্প্রতিক জীবন-ধারা ছোটগল্পের বিষয়-বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন তরতাজা ঘটনা, সমস্যা ও সংঘাত নিয়ে যে গল্প হতে পারে, হওয়া উচিতও বটে, তা ইতিপূর্বে এমন ব্যাপক-ভাবে অনুভূত হয়নি। সাধারণভাবে শ্রমিক কৃষক কর্মচারীর জীবনও আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। সংকট বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়-ও। সমাজ জীবনে এ-সব আমাদের নিত্য চিন্তা ও শিরঃপীড়ার কারণ। সম্ভবত এখন আমরা স্পর্শকাতরতা কাটিয়ে সাবালক যখন, স্বভাবতই চাইব আমাদের নিত্য-দেখা জীবন সাহিত্যে প্রতিফলিত হোক। আমরা যে সময়ের মাটিতে পা ফেলছি, সাহিত্যের ফসলও সেই মাটি থেকেই ফলুক। আশার কথা, অসংখ্য তরুণ এবং এ-কালের সক্রিয় অনেক কথা-শিল্পীর গল্পে আমরা তা পেয়েছি ; আরও আশার কথা প্রবীণ লেখকদের কারো কারো রচনাতেও তার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিছু কিছু গল্পের কথা আগেই বলা হয়েছে। আর দুজনের গল্পের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয় ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এ-জাতীয় গল্প সর্বাধিক আগ্রহের বস্তু।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবার বেশ কিছু গল্প পড়ার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন। তাঁর 'ফিউজ' (অমৃত) 'ছোরা' (আনন্দবাজার) 'করাতের শব্দ' (কালান্তর) 'কে যে লোকটা' (দেশ) 'কেরিকেচার' (প্রসাদ) 'ওরা' (সাপ্তাহিক বসুমতী) প্রভৃতি গল্পগুলি এ-সময়ের চলমান জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র চিন্তা ও ঘটনার প্রতিচ্ছবি। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় সর্বদাই সমসাময়িক ঘটনা তাঁর গল্পের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন, এবার তাঁকে সবিশেষ সচেতন মনে হবে। শরিকী সংঘর্ষ আজকের বাংলার রাজনৈতিক জগতের অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। আর যেহেতু রাজনৈতিক ঘটনা সমাজ-জীবনকেও প্রভাবিত করে, সুতরাং এই সমস্যা আজকের সমাজ-জীবনের সাধারণ সমস্যা বলেও গণ্য। সেদিক থেকে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে প্রবীণ গল্পকার গজেন্দ্রকুমার মিত্র একটি সময়োচিত কর্তব্য করেছেন তাঁর 'বন্ধুমেধ' (অমৃত) গল্পে। 'ওদের দল ছেড়ে যেদিন চলে গেছে, সেইদিন থেকেই অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে, আর এ অপরাধের একমাত্র শাস্তিই হলো—এ-পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।' অন্তরঙ্গ বন্ধুকে রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের হেতুতে খুন করে জনৈক যুবকের পলায়ন, আশ্রয় লাভের চেষ্টা, রাতের অন্ধকারে বনে-প্রান্তরে আত্মগোপন করে কষ্ট ভোগ ও তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার পুঙ্খানু-

পুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে শ্রীমিত্র গল্পটিকে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ করে তুলতে যত্ন করেছেন।

নবীন ও তরুণ গল্পকারগণ

স্বাধীনতা-উত্তরকালে পঞ্চাশ বা ষাটের দশক থেকে যাঁরা লিখছেন তাঁদের অনেকে বয়সে তরুণ হলেও ইতিমধ্যে কেউ কেউ পাঠক মহলে পরিচিত এবং খ্যাত-ও বটে। কেননা বেশ কয়েক বছর বাংলা দেশের গল্পের আসর মুখ্যত এঁরাই অধিকার করে আছেন। আগেই আমরা দেখেছি পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনে কিভাবে গল্পকারদের তৎপর হতে হয়। আর প্রবীণরা যেহেতু গল্প বেশী লেখেন না, নামী অ-নামী হরেক রকম পত্র-পত্রিকার সারা বছরের ভরসা এই সব তরুণ ও নবীন গল্পকারগণ। এঁরা গল্প-ভাবনায় নতুনকালের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন, প্রকাশ-ভঙ্গীতেও অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন। বিষয়, ভাষামাধ্যম ও টেকনিক মিলে ছোটগল্প-অর্টিফরমে একটা নবতর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হচ্ছে। কল্লোলকালের লেখকদের অভিনব বিষয়-নিষ্ঠ ছোটগল্পের পর আমাদের গল্প-ধারায় আরেকটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কাল যদিও সম্ভাবনা তার শেষ প্রান্ত স্পর্শ করতে পারেনি, যেহেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল এখনও শেষ হয়নি।

একালের তরুণ ও নবীন লেখকগণ বেশী লিখতে পারেন না। এঁদের অনেকেই একটি গল্প নিয়ে অধিক দিন চিন্তা করেন, সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজও চলে দীর্ঘদিন ধরে। অর্থাৎ গল্পের সম্ভাবনার দিকগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হন। একালের লেখক সমবেতভাবে বেশী লেখেন, একা নয়। এবারের শারদ-মরশুমেও তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে হয় না। তবুও কেউ কেউ বেশী পরিশ্রমী, সক্রিয় মনে হবে। তাঁদের মধ্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (অমৃত, পরিচয়, কালান্তর, সীমান্ত) মানবেন্দ্র পাল, (সাপ্তাহিক বসুমতী, চতুষ্কোণ, শুকসারী, সারস্বত, গল্প-ভারতী), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (লেখা ও রেখা, সীমান্ত, অমৃত, বেতার-জগৎ, জীবন-যৌবন), মিহির সেন (সারস্বত, পরিচয়, আন্তর্জাতিক, ঘরোয়া), তপোবিজয় ঘোষ (সারস্বত, লেখা ও রেখা, চতুষ্কোণ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই এ-সময়ের সমাজ-বাস্তবতা, সম-সাময়িক কালের তরতাজা ঘটনা, সমস্যা ও জিজ্ঞাসা বিষয়বস্তু হিসাবে এসেছে। বিচ্ছিন্নতা-বোধ ও অবক্ষয়ের উপর লিখেছেন মতি নন্দী (আনন্দবাজার), শীর্ষেন্দু মুখো-পাধ্যায় (দেশ), সুধাংশু ঘোষ (অমৃত) এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষুধা-তাড়িত মানুষের জীবনযাপনের চিত্র যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের গল্প (অমৃত)। শেষোক্ত গল্পকারদের রচনা এবার কোন সাহিত্য (লিটল) পত্রিকাতে তেমন চোখে পড়েনি। একালের বিশিষ্ট গল্পকারদের মধ্যে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টো-পাধ্যায় আদৌ গল্প লেখেননি। সমরেশ বসুর গল্পও চোখে পড়েনি। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য দীর্ঘদিন লেখেন না। বেশ কিছুদিন পরে বীরেন্দ্র নিয়োগীর কয়েকটি এবং গুণময় মান্নার একটি গল্প পড়ে পাঠক খুশি হবেন। শ্রীনিয়োগী কালান্তর, আন্তর্জাতিক, পরিচয় ও শ্রীমান্না লিখেছেন পরিচয়ে। মিহির আচার্যের গল্পটি (সীমান্ত), একটি মাত্র গল্পই লিখেছেন তিনি, পাঠককে ভাবাবে।

কোলকাতা ও শহর জীবনের কথা

বহু তরুণ গল্পকার এবার কোলকাতা ও শহর জীবন, আধুনা চিন্তা-ভাবনা, বেকারী-জীবিকার সমস্যা, আইন শৃঙ্খলা, ছিনতাই-ডাকাতি প্রভৃতি তাঁদের গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জীবন-জীবিকা, শিল্প ও কর্তব্যবোধের গল্প অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপন্ন মানুষ' (অমৃত)। যাত্রাদলে নাচ-গান অভিনয়ের জন্য অফিস কামাই করে লোকটা। ফলে তার চাকরীও যায়। লোকটা আত্মহত্যার কথাও ভেবে-ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার চাকরীও থাকে এবং আত্মহত্যা করারও প্রয়োজন হয় না। চাকরীতে রাখবার মালিককে তার প্রেমিকা চিঠি লিখেছিল, 'গণেশের পালা গান গাইবার নেশা আছে, তোমার যেমন আমার প্রতি নেশা আছে। ওকে কাজে নিয়ে নিও।' অতীনের তলিয়ে দেখুন (কালান্তর) কোলকাতায় অস্থির উপদ্রুত জীবন-যাপনের কথা। বোমা, টিয়ারগ্যাস, গুলী ট্রাম-বাস বন্ধ ভয় আতঙ্ক-মিলে দুঃসহ জীবন। অথচ এরই মাঝে কেউ কেউ দিব্বি আরামে থাকা কিছু স্বার্থপর মানুষ। এক অস্থির যুবকের গল্প দেখুন ফুল ফোটে কিনা (সীমান্ত) দুর্ঘটনার সাক্ষী কোন অস্বচ্ছল দম্পতির জীবন-কথা দুর্ঘটনা (পরিচয়)। নীতি ও সমসাময়িক সমস্যার উপর একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের মানসিক টানাপোড়েনের গল্প সুভাষ সিংহের লড়াই (কলেজ স্কয়ার)। সুভাষ সিংহ সীমান্ত, অরণি, স্বদেশ প্রভৃতিতে লিখেছেন। কোলকাতার রকবাজ বেকার ছেলেদের জীবনাচরণের চিত্র মিহির পালের 'রকবাজ' (এষা) ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার গল্প। 'হাত সাফাই' ছবি বসুর শহর কোলকাতায় কৌশলে বেঁচে থাকার কাহিনী। সমীর রক্ষিতের কোল-কাতা বিষয়ক গল্প 'এখন বন্ধুরা' (অন্বিষ্ট) জনৈক উচ্চশিক্ষিত চাকুরে যুবকের এই সময়ের জীবনাচরণ। ব্যাঙ্ক-ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত বন্ধুর পাল্লায় পড়ে তাকেও বিলক্ষণ হেনস্তা সইতে হয়েছিল। সুভাষ সমাজদার লিখেছেন 'চিন্তাহরণের আজকাল পরশু' (সাপ্তাহিক বসুমতী)। ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগে ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে পিতার মনে হয়ে-ছিল, পায়ের তলায় মাটি নেই। একটু একটু করে অন্ধকারের সমুদ্রে সে হারিয়ে যাচ্ছে, আর দূরে বহু দূরে আদর্শ বিশ্বাস মূল্য-বোধ মনুষ্যের মহত্ত্ব, উদারতা এক এক টুকরো বুদ্বুদের মত ভেসে চলেছে।' জটিল রোগ বহন করে চলেছে একটা মানুষ; অথচ রোগের কথা সে কাউকে বলতে পারে না—'স্বপ্নের কঙ্কাল' (অরণি) আশিস সান্যালের এই দুঃখী মানুষটার কথা। কল্যাণ সেনের 'যেদিন' (অণুক্ষণ)র নায়ক ভাবছে 'আসলে আমার কিছু ঠিক মত করার অভ্যাস নেই।' কর্মহীন বেকার তরুণের শূন্যতাবোধের চিত্র অজয় সেনের 'অন্ধকার পেরিয়ে' (সহজিয়া)। ঐ একই প্রকার তরুণদের সমস্যা সমাজ পটভূমিতে স্থাপন করে তীব্র করে তুলেছেন দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৃত্ত (সহজিয়া) গল্পে। 'লেখাপড়া শেখেনি বলে সুজনের কোন কষ্ট নেই।' কষ্ট ছিল না ঠিকই, কিন্তু হলো, যেদিন তার হাতে একখানা চিঠি এলো এবং সে তা পড়তে পারল না—উদয় ভট্টাচার্যের গল্প সুজনের দিনকাল (শিলীন্ধ), আশিস সেনগুপ্তের আমার দুঃখ আমার রক্ত' (শুকসারী)র বিষয় শিশু-পরিবেশ; বর্তমান শহুরে মলিন পরিবেশ থেকে শিশুকে কৃত্রিমভাবে বাইরে রাখলেই সে কি মানসিক সমুন্নতি পাবে। সামান্য একটা কুকুরের বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য বরেন ভট্টাচার্যের আপ্রাণ (প্রাশ্নিক)-এর ড্রাইভার বাসশুদ্ধ লোকের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। পরবাসে তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন শেষের সেই দিন। অন্বিসেট অতীন্দ্রিয় পাঠকের কোলকাতা বিষয়ক গল্প লোকটা বিজয় ও আমি। আমাদের মত মেয়েদের পরিণতি ত দেখছি চোখের সামনে' ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ আশার জগতে ঘুরপাক খায় সি আই টি ফ্ল্যাটের দুই বান্ধবী—বর্তমান শহুরে সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের আশা-হতাশার কথা লিখেছেন অমল হালদার আশাবরী পত্রিকায়।

শেষোক্ত গল্পকারদের মধ্যে অনেকেই অতি তরুণ এবং উল্লিখিত পত্রিকাগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষীণ কলেবর। তা হোক, এখান থেকেই অনেক সম্ভাবনার জন্ম। সাহিত্য পত্রিকার আর্থিক সঙ্গতি বেশী নয়। এদের উদ্যমই এদের পাথেয়।

দীন দুঃখী দরিদ্রের সংসার

অভাব অনটন দারিদ্র্য আজ সাধারণ মানুষের নিত্য সঙ্গী, দুঃখী মানুষ আজ অনেকেই, অর্থের জন্য, প্রতিষ্ঠা-অস্তিত্বের জন্য, প্রেম-ভালবাসার জন্য, এমন কি মন-মননের জন্যও বটে। কিন্তু দরিদ্রের অর্থা-ভাবের দুঃখ, ক্ষুধার কষ্টের বোধহয় তুলনা হয় না। চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'হারাণের শ্বশুরবাড়ি' (কালান্তর)-র হারাণের কথাই ধরা যাক। লোকটা বেকার এবং কপর্দক-

শুশ্যা। বৌ ছেলেমেয়েকে সে শ্বশুরবাড়িতে রাখে দু'টি ভাতের জন্য, একটু আশ্রয়ের জন্য। তিনমাস পরে তাদের দেখতে আসার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য বিসকুট কিনে আনার পয়সাটাও তার নেই। হারাণের দুঃখের কথা পড়তে পড়তে পাঠক মন নিশ্চিত কাতর হয়ে উঠবে। গুণময় মান্নার 'অহোরাত্র' (পরিচয়) ও দীন দুঃখী এক মৎসজীবী পরিবারের দিনযাপনের কাহিনী। ক্ষুধার্ত পিতা ছেলেমেয়ের দিকে না তাকিয়ে 'এই মুঠোটাক ভাত' খেয়ে নেয়। ক্ষুধা মানুষকে বিচিত্র পথের সন্ধান দেয়। ন্যায়-নীতি মানে না, মানুষকে মতলববাজ ভাঁড়ে পরিণত করে। আমাদের ফেলে আসা দেশ পূর্ববঙ্গের নাম ভাঙিয়ে পয়সা আদায় করে এক বন্ধের বেঁচে থাকার কাহিনী বীরেন্দ্র নিয়োগীর 'পুঁজি' (আন্তর্জাতিক)। সমাজের নিম্নবর্গের কোন এক মনুষ্য সম্প্রদায়ের মড়ক ও আকালের সময়ে অভিশপ্ত পাশব জীবনযাপনের কাহিনী জয়ন্তেন্দু চক্রবর্তীর কিংবদন্তি (পরিচয়) পাঠককে আতঙ্কিত করে তুলবে। যশোদাজীবনের মাতৃষ (অমৃত) গল্পটার কথা মনে পড়ে যায়।

ক্ষুধা মেটানোর ভয়ংকর সিদ্ধান্তের গল্প সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'জননী' (লেখা ও রেখা)। 'ই ছেলেটো দেখ-ইটি মা বোলে না বাপ বলে না শুধু গুণে। ইটা মা বাপের জন্য কাঁদে না, ভাতের জন্যেতে কাঁদে। ভাত মিটলে ইটার বড় সুখ।' ক্ষুধার জ্বালায় দিশেহারা জননী ছেলেটাকে নিলামে তুলেছে, বিক্রী করে দিতে চায়। গাম [illegible] নিম্নবর্গের বাসিন্দাদের গল্প অসিত ঘোষের 'পদাতিক' (পরিচয়)—রোজ আনে রোজ খায়, কোন রকমে বেঁচে থাকাটাই তাদের [illegible]। রবীন্দ্র গুহের 'দুর্দৈব' (আলোক সরণি)-ও এক অভাবের সংসারে দুই বোনের বেঁচে থাকার কাহিনী।

এই জাতীয় গল্পে লেখকদের আন্তরিক মানবিক সহানুভূতি ও ভালবাসা পাঠক মন স্পর্শ করবে।

প্রেম ভালবাসা যৌন জীবন

এই সেদিন পর্যন্ত তরুণদের অনেকের গল্পে প্রেম ভালবাসা আবেগ যৌনবোধ বা অবক্ষয়-বিচ্ছিন্নতার যৌথ জটিলতা মুখ্যস্থান লাভ করত। এবার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। প্রেম-ভালবাসাদির গল্প যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আবদুল জব্বার অন্যতম। জব্বারের 'প্রথম বর্ষণ' (সহজিয়া) সদ্য যৌবনে পা দেওয়া দুই যুবক-যুবতীর প্রথম বর্ষার জলে পাট ক্ষেতের মধ্যে মাছ ও যৌবন ধরার গল্প। অমজুমনের শরীরের এই প্রথম পুরুষের আগুন লাগে। জব্বারের অন্য গল্প 'কাপুরুষ' (অমৃত)-ও প্রেম-ভালবাসার স্বাদে-গন্ধে সুখপাঠ্য। সদ্য যৌবনে পা দেওয়া এক নিঃসঙ্গ ছেলের প্রথম প্রেমের সুখ-দুঃখের কথা প্রণয় সেনের 'ভালবাসার রং' (সহজিয়া)।

নারীর রূপ-মোহ কিভাবে পুরুষকে বিপথগামী করতে পারে এবং পুরুষ হিংস্র হয়ে কত জঘন্যতম কাজ করতে পারে তারই দৃষ্টান্ত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গতর' (জীবন-যৌবন)। সুবাসলতার সুন্দর ও সুঠাম দেহ ভদ্রলোক এমন কি জমিদার বংশের লোকেদেরও আকর্ষণের ব্যাপার। সুবাসলতা বলেছিল 'কি গো, বাবুরা ছোট লোকের কাকড়া গুগলি খাওয়া গতরখানা একবার দেখুন—তেতো না মিঠে।' সিরাজের 'নায়িকার জন্মেও' (বেতার জগৎ) ভালবাসার রূপ রং ছড়ানো আছে।

শ্রমিক জীবন ও অন্যান্য জীবিকা

শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারিদের জীবন নিয়ে এবার অনেক গল্প লিখেছেন তরুণ ও নবীন লেখকগণ। উল্লেখযোগ্য গল্প সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিচারের কাহিনী (শুক-সারী) এবং কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'ঝগড়া' (নন্দন)। শ্রমিকদের একঘেয়ে কাজের শ্রম, নানা প্রকার শোষণ ও অত্যাচার, নিত্য অভাবের সংসার, মিল বস্তির শ্রীহীন জীবন-যাপন, সুদখোর মহাজন, শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও সংগ্রাম, তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা, প্রাদেশিকতার বিষ ছড়ানোর চেষ্টা মিল শ্রমিকদের জীবনের বাস্তব চিত্র এইসব গল্প। শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের জীবন-যাত্রা, চিন্তা ও সংগ্রামের উপর দু'টি গল্প লিখেছেন কপোতিবিজয় ঘোষ। 'সামান্য স্কুল শিক্ষক তিনি ছানাপোনা নিয়ে এত বড় সংসার তাঁর এখানে ইচ্ছা করলেই কার কোন শখটা

তিনি পূর্ণ করতে পারেন।' এই বৃদ্ধ শিক্ষকও ('ঘ্রাণ' চতুষ্কোণ) দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে সামিল হতে কার্পণ্য করেননি। 'ফুলের শত্রুরা' (লেখা ও রেখা) এক কেরানীর যুবকের অনটনের জীবন-যাপন, এখানেও সে ইচ্ছামত সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারে না। না পারারই কথা। কেননা শিক্ষক বা সরকারী কর্মচারীর বাঁধা-সীমিত বেতনে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সেখানে বাড়তি সখ, ফুল কিনে ফুলদানি সাজানোর ইচ্ছা কিভাবেই বা পূর্ণ হতে পারে? নরককুণ্ডের দারোগা (সীমান্ত) আব্দুল জব্বারের চটকল শ্রমিকদের জীবন-যাত্রা ও সংগ্রামের চিত্র। একালের শ্রমিক তাদের ম্যানেজারকে বলতে ভয় পায় না, 'আপনার মাইনে তিন হাজার টাকা আর আমাদের মাইনে এক শো চল্লিশ টাকা।' এবং তাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তারা মিলও বন্ধ করে দিতে পারে, দেয়ও।

এই সময়ের তরতাজা ঘটনা-প্রবাহ

বর্তমান সময়ের আইন-শৃংখলা, সমাজ-বিরোধী দৌরাত্ম্য খুন জখম রাহাজানি, শরিকী-সংঘর্ষ, রাজনৈতিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উপর অনেকে গল্প লিখে সময়োচিত কর্তব্য করেছেন। খুন-গুণ্ডামি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ পুলিশের তল্লাসি, আসল দোষীর বদলে নিরীহ ছেলেদের ধরে মার দেওয়ার গল্প তপোবিজয় ঘোষের 'এখন এই সময়' (সারস্বত)। অসীম রায়ের গল্প 'শ্রেণীশত্রু' (পরিচয়) শরিকী সংঘর্ষের পটভূমিতে লেখা। পাড়ায় পাড়ায় বন্ধুদের মধ্যে শ্রেণীশত্রু বানিয়ে রক্তক্ষয়ী বন্ধুযুদ্ধের যজ্ঞ চলছে আজকের সময়ে ('বন্ধুযোদ' স্মরণীয়)। বৃদ্ধ শিক্ষক মশাই বলেছেন, 'তোরা রাজনীতিতে এসেছিস কিসের জন্য? রাজনীতির চেহারা পাল্টে দেবার জন্য। তোরাই ত আশা। তোরাই ত বিশ্বাস আনবি লোকের মনের মধ্যে।' গল্পের নায়ক শত্রুদের ঠিক চিনেছে' কিন্তু বন্ধুদের ব্যাপারে মনস্থির হতে এখনও বাকি।' মহাশ্বেতা দেবীর কান্না (প্রসাদ)-র ক্ষুদে নায়কেরা পরীক্ষা দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে খুনখারাবি করে। মায়ের দুঃখ ওরা এই খুনের মধ্যে অস্বাভাবিকতাটুকুও দেখতে পায় না। ছিনতাই পার্টির খুন ও লুটের চিত্র মানবেন্দ্র পালের 'চেনা মুখ' (সাপ্তাহিক বসুমতী)। জনবহুল কোলকাতার হ্যারিসন রোডের উপরে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, ভয়ে কেউ দরজা খোলে না। 'আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, কেউ বাধা দিতে পারলাম না।' শহরের জীবনযাত্রায় এই বাস্তব ঘটনা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছি। 'কোনটা রাজনৈতিক কোনটা ব্যক্তিগত আক্রোশ আর কোনটাই বা গুণ্ডামি এ তফাৎ করা মুশকিল এখন।' রাজনীতির পরিমণ্ডল সংস্থাপিত উৎপল গুহের 'অভিন্ন মণ্ডল' (পত্রিকা) সাম্প্রতিক [illegible] আবরণে এক [illegible] একদা একজন মন্ত্রী [illegible] দশানোকার ড্রাইভার কিভাবে নিজেকে সামিল ভাবছে, তারই চিত্র।

মিহির সেনের 'সেই আঙগুলেটা' (সারস্বত) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে কৃষি ফ্রন্টে কাজ [illegible] এক [illegible] ও নেতৃত্ব সংগ্রামের কাহিনী। যে আঙুল দিয়ে সে কৃষকদের শত্রু চেনাত সেই আঙগুলের একটি যায় অনেক আগে, [illegible] এ-দেশে এসে বর্তমান সময়ে, শরিকী সংঘর্ষের সময়ে। কৃষকদের নিজেদের মধ্যে 'আত্মঘাতি সংঘর্ষ থামানোর' চেষ্টা করেও সফল হননি তিনি।

মিহির আচার্যর গল্প 'জামায় রক্তের দাগ' (সীমান্ত)। এ-কালের নতুন ভাবনায় আলোকপ্রাপ্ত যুবকের গল্প। ইউনিভারসিটির 'ব্রিলিয়ান্ট' কেরিয়ারসম্পন্ন যুবক বড়লোক পিতা, 'চৌষট্টি টাকার একটা চোখ ধাঁধানো ঠাট্টার' সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ করে বেরিয়ে যায় যেহেতু 'যতদিন বেঁচে আছি, জীবনের তাৎপর্য আমাকে খুঁজে পেতে হবে।' সে ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে যে মানুষ অনায়াসে সে তারে অস্তিত্বের দ্বন্দ্বকে অন্যভাবে মিটানোর সুযোগ পেত। এই যুবক 'একটা ধাবমান অস্থির সময়, মহিষের বাঁকা শিঙের মতন ক্রুদ্ধ, ক্ষমতাহীন, নিষ্ঠুর, শত্রুর আক্রমণে কার্ণিসের শূন্যে ঝুলে পড়েও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করেছে।

মাঠ জমি কৃষক : বৃহত্তর বাংলা

বাংলাদেশ সম্পর্কে আজও আমাদের কাছে যেটা রূঢ় বাস্তব সত্য তা হলো আমাদের বেশীরভাগ লোক গ্রামবাসী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খেত-খামারের সংগে যুক্ত। একালের জমি ও কৃষক এক বিরাট জিজ্ঞাসা। যদিও বাংলার পল্লী ও কৃষি-জীবন নিয়ে ব্যাপক সাহিত্য সৃষ্টি এখন দেখা যায় না, তবে আমাদের ধারণা সাহিত্য আরেকবার তার প্রাণ সম্পদ বাংলার মাটি থেকে আহরণ করবে।

এবারের শারদ মরশুমে গ্রাম-বাংলা ও কৃষি-জীবন নিয়ে যে কটা গল্প পাওয়া গেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল রায়ের বাঁচার জন্য (অমৃত), মহাশ্বেতা দেবীর পিপাসা (অমৃত), মনোরঞ্জন হাজরার 'এই ছবি' (নন্দন), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গ্রাম পুরুষ' (সীমান্ত), যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের মহিষ (অমৃত), নির্মলেন্দু গৌতমের 'চাঁদমল্লীর টিবি' (বৈতানিক), অসিত ঘোষের 'সখী-যুগল' (আন্তর্জাতিক), বাসুদেব দেবের 'সবুজ দলিল' (শুকসারী), আশিস সেনগুপ্তের 'কুলজান' (লেখা ও রেখা) চণ্ডী মণ্ডলের পুষ্পচয়ন (কালান্তর) নমিতা চক্রবর্তীর 'জোতদারের ছেলে' (কালি ও কলম), অশোককুমার সেনগুপ্তের মানুষের হাত (চতুষ্কোণ), কুমার মিত্রের 'প্রবাহ' (আলোক সরণি) প্রভৃতি।

আজ তিনদিন কাজ নেই বিষ্টুপদের। কাজ নেই, কাজেই রোজগারও নেই। তার মতন ভূমিহীন দিন-মজুরের ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি সোনাদানা জমানো থাকে না যে বসে বসে খেতে পারবে। দু-চার দানা যা চালটাল ছিল, কাল পর্যন্ত চলেছে। আজ যদি কিছু জোটাতে পারে, বউ ছেলেপুলে খেতে পাবে। নইলে উপোষ।' জমি নেই অথচ কৃষক, ভাগ্যের এ-এক নিদারুণ পরিহাস। 'জমিন কুথায় পাব?' 'মজুর খাটি' শুধু গতরের উপর ভরসা করে তাইলে বাঁচা প্রফুল্ল রায় তাঁর 'বাচার জন্য' (অমৃত) গল্পে ক্ষুধার্ত দুই ভূমিহীন নারী-পুরুষের ক্ষুধা-মেটানোর সংগ্রামকে লিপিবদ্ধ করেছেন। মেয়েটির স্বামী জোতদারের সংগে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। সুতরাং নিরুপায় অসহায়ভাবে তাকে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয় খাদ্যের আশায়। এই দুই যুবক-যুবতী বুনো শুয়োরের সঙ্গে লড়াই করে খায় আলু সংগ্রহ করে। গল্পটির মধ্যে গ্রামের ভূমিহীন চাষীদের জীবন সংগ্রাম, বিশেষ করে ক্ষুধার জন্য এই দুই অপরিচিত নারী পুরুষের একত্রে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঁচার জন্য গভীর আন্তরিক ইচ্ছার দিক ফুটে উঠেছে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ভীষ্মের পিপাসা' (অমৃত) কৃষকের স্বপ্ন-সাধ ও বঞ্চনার চিত্র, 'এ পিপাসা জলের নয়, ধানের পিপাসা।' পিপাসা আর ক্ষুধা যশোদাজীবনের গল্প মহিষেরও (অমৃত) কেন্দ্রবিন্দু।। 'যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল ধু ধু করা পাথুরে বাদ, যে বাদে জল মেলে না, ফুল ফোটে না, ফসল ত কোন ছার।' এমনি এক দুর্যোগের দিনেও এক যুবককে 'রোদ মাথায় করে ঘুরে বেড়াতে হয়। মরার বাড়া গাল নেই, পেটের বাড়া দুষমন নেই মানুষের।' ক্ষুধা আজ গ্রামের মানুষের সম্মুখে বিরাট সমস্যা। ক্ষুধা মানুষের জীবনাচরণেরই অন্য নাম। গ্রামের মানুষের খাদ্য জমি কৃষিঋণের চাহিদা মেটাতে আসছেন ভাগ্য বিধাতার বেশে মহাশক্তিধর গ্রাম পুরুষ। তিনি এলেন গ্রামের লোকদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনলেন বক্তৃতা দিলেন, অতঃপর অমীমাংসিত সমস্যাদি রেখে উধাও হলেন। সিরাজের 'গ্রাম পুরুষ' (সীমান্ত) গল্পের শক্তিমান পুরুষটি অবশ্য বুঝতে পারছেন, এই বারংবার যাওয়া-আসার পর কবে একদিন কোথাও আগুন জ্বলে উঠবে। দূরে মহানগরীতে ভয়াল আগুনের শিখা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে আসবে জাতীয় মহাসড়ক বেয়ে চারপাশের জনপদে তারপর পৃথিবীতে সে এক নতুন দিনের সূর্য।

এবারের ছোট গল্পে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আশা করি পাঠক বুঝতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে আমাদের এ-সময়ের গল্পে মানুষের জীবনের বাস্তব ঘটনা, বেঁচে থাকার তাৎপর্য ও সম্ভাবনার দিক বেশী প্রভাব বিস্তার করছে। যৌনজীবন, অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতার কথা মানুষের সংগ্রামী চেতনার পাশে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাটা আবার স্মরণীয় 'মানুষের মিছিল সেখানে থামবার নয়।'

নিকটেই আছে

দাবাই

এপাশে ভুটিয়ারা সোয়েটার, কম্বল, রং-বেরং-এর বীডের মালা সাজিয়ে বসেছে; ওধারে রেলিং-এর গায়ে বুনো গিরগিটির চর্বি জ্বাল দিয়ে বাতের ওষুধ বানাচ্ছে ছত্রিশগড়িয়ারা—মাঝে শহরের হৃৎপিন্ডের কেন্দ্রে টুল ফিট করে মাইক-ফাটানো গলায় শতখানেক প্রসপেকটিভ বায়ারের সামনে দাঁড়িয়ে চোস্ত হিন্দীতে নিজের ওষুধের প্রশস্তি গাইছেন সুশীলদা—আমাদের চেতলার আদি অকৃত্রিম সুশীলদা।

কোই মাদুলী লেতা হ্যায় নোকরীকে লিয়ে, কোই তাবিজ লেতা হ্যায় ছোকরীকে লিয়ে, মগর—মগর এই রকেটের যুগে বঙালকা শিক্ষিত্ আদমী যেন কোভি ভুলে না জান যে পেট-ই সব। এই পেটের ধানধায় মানুষ সব করতে পারে, করেও। এই পেট যাতে ভুখা না মরে তাই সবাই চাকরী,বেওসা, হরেক কিসমের রোজগারের ফিকিরে দিনরাত পরিশ্রম করে। কিন্তু কি হবে পরিশ্রম করে যদি পেটই গড়বড় হয়ে যায়। তাই মেরা বঙালকা ভাইলোগ আপনাদের জন্য, শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আমার কোম্পানী আমায় পাঠিয়েছে—মন দিয়ে শুনুন, কেন পাঠিয়েছে।

আপনারা সবাই একটু কাছে এগিয়ে আসুন। আমি ডাকদারী কিতাব থেকে ছবি তুলে তুলে দেখাব কেমন করে এই পেট থেকে বাহাত্তর রকমের অসুখ হয়। বলতে বলতে স্মাইট কাত হয়ে টুলের পাশে দাঁড়ানো সহ-কারীর হাত থেকে একটা অত্যন্ত পুরোনো নোংরা রেজিস্টার্ড খাতা টেনে নিয়ে পট পট করে খানকয়েক পাতা উল্টে-পাল্টে দেখিয়ে দিলেন ভেতরে কি বস্তু আছে। তিন চার সেকেন্ডের ব্যাপার। তাতেই চোখে পড়ল গোটাদুয়েক বোঁচকা-নাকি চীনে মেম ও এক-জোড়া বিলাতী সাহেব মেম সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের অ্যানাটমির অন্দর-বাহারকা খেল দেখাচ্ছে। ছবির খাতাটা হাতে তুলে নিতেই দেখলাম ভিড়টা বেশ খানিকটা সুশীলদার দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে তোড়ে নেকস্ট রাউন্ডের গলাবাজী শুরু করে দিয়েছেন দাদা।

ইয়ে কোই ম্যাজিক নেহি হ্যায়—ইয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। ইয়ে শুননে কা বাত হ্যায়। ম্যায়নে হিন্দুস্থানকা তামাম শহর, সিটি, টাউন দেখা হ্যায়। সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, ত্রিবান্দ্রম, দিল্লী, কাশ্মীর, শ্রীনগর, ইউ-পি, লক্ষ্ণৌ, কাটমাণ্ডু, নেপাল, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, আসাম, গৌহাটি হরজায়গা ঘুরে পর কলকাত্তায় এসেছি। এ কথা খুবই সত্যি। ছোটবেলা থেকে দাদাকে জানি। এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। সুশীলদার বাবা ছিলেন কবিরাজ। নামডাক না থাকলেও মোটামুটি সংসার চালানোর মত আয় ছিল। একমাত্র ছেলে সুশীলদাকে কোবরেজ-জ্যাঠার ইচ্ছে ছিল অ্যালোপ্যাথি পড়াবেন। তা পড়াবেন কাকে। সে তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিনই পাড়া-বেপাড়ার সিনেমার লাইনে মাস্তানীতে ব্যস্ত। তাছাড়া কি শনিবার গড়ের মাঠে আর টালিগঞ্জে অশ্বকোষ্ঠি বিচার করে টিপস বলে দেওয়ার মত গুরুতর দায়িত্ব খুব ছোট-বেলা থেকেই দাদা পালন করে আসছেন। সব দেখেশুনে, ছেলের কিছু হবে না জেনে খুব হতাশ হয়েই কোবরেজ-জ্যাঠা কার্তি-কের এক উজ্জ্বল সকালে হাঁপানির টানে অস্থির হয়ে টুক করে কেটে পড়লেন। সুশীলদা বাড়ী ছিলেন না। বাস্তুহারা বাজারের গায়ে আদিগঙ্গার ওপর কাঠের ব্রীজের তলায় বসে চেলা-চামুন্ডাদের নিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পেসাদ মাথায় ঠেকিয়ে বুকভরে টানছিলেন। খবরটা শুনে গম্ভীর-ভাবে উঠে এলেন।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর দেখি একদিন সুশীলদা এলেন স্কুলে। নেড়া মাথা, পরনে ফুলপ্যান্ট আর কলারতোলা গেঞ্জি। হেডমাস্টার গোপীবাবুকে প্রণাম করে বললেন—আমার আর পড়াশোনা হবে না স্যার। খুব সংক্ষেপে বিশাল গোঁফজোড়া নাচিয়ে হেডস্যার বললেন—তা জানি। কিন্তু কি করবে এখন সুশীল? তুমি তো ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারলে না। যে তিনবারেও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে না, সে আর কি করবে? আমরা, মানে ক্লাস সেভেনের বুলু, সুকুমার, বসন্ত আর আমি অফিস ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে হেডস্যার ও সুশীল-দার ঐ ঐতিহাসিক কনভারসেশন শুনছিলাম। এরপর সুশীলদা জবাবে কি বলেন তাই শুনতে উৎকর্ণ হতেই, কানে এল—ব্যবসা করব স্যার। স্বাধীন দেশ, আমরা ইয়ং জেনারেশন। এই কেরানীগিরি পড়াশোনা না করে, ব্যবসা......। বাকী কথা-কটা আর শুনতে পাই নি। গোটা স্কুলবাড়ী কাঁপিয়ে হেডস্যারের বাজখাই ধমকের ওয়েভটা বড় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ার অর্থই আমরা অফিস থেকে হুড়মুড় করে ছুটে পালিয়ে গিয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়েছি।

অবাক কান্ড। অতবড় দাবড়ানি খেয়েও কিন্তু সুশীলদা একটুও দমলেন না। সত্যি সত্যি ব্যবসা করতে শুরু করলেন। আর সুশীলদার ব্যবসার বিনিপয়সার সেলসম্যান ছিমাল আমরা। আমরা ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের দুপিঠে ছাপানো হ্যান্ডবিল পাড়ায় পাড়ায় বিলি করতাম। হ্যান্ডবিলের মাথায় পাসপোর্ট সাইজের একটা ফোটো—নেড়া মাথা, গালবোঝাই দাড়ি। তলায় লেখা সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দাড়িটা পেলেন কোথায়? উত্তরে সুশীলদা বলেছিলেন, মা কালীর মন্দিরের সামনে যে ফোটোর দোকানগুলো আছে ওখানে দাড়ি কেন, যদি বৌ চাস তো পাশে দাঁড় করিয়ে ওরা তোর ফোটো তুলে দেবে। পাছে সত্যি সত্যি তাই করে, সেই ভয়ে হাজার ইচ্ছে সত্ত্বেও ঐ দোকানগুলোর একটাতেও ঢুকতে সাহস হয়নি কোনদিন।

কিন্তু সুশীলদার কি প্রচন্ড সাহস! শান্তিবটি, জহরবটি আর অমরবটি—তিনটি অসাধারণ গুণসম্পন্ন ওষুধ আবিষ্কার করার কথা হ্যান্ডবিলে ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। এক ফাইল এক টাকা। তিন ফাইল একসঙ্গে নিলে কনসেশন মিলবে আট আনা। প্রতি ফাইলে আছে একুশটা বড়ি। সকালে খালি পেটে ঈষদুষ্ণ জলের সঙ্গে একটি আর রাতে খাওয়ার পর একটু দুধের সঙ্গে দুটি বড়ি। ব্যস আর দেখতে হবে না। সাতদিনেই বাত, আমবাত, স্নায়বিক দৌর্বল্য, অজীর্ণ, ধাতুর দোষ, মাথাধরা, মচকানো ব্যথা, পিলে, জ্বর,—জাগতিক সব অসুখেরই উপশম হবে। আর তিন ফাইল খেলে তো কথাই নেই। তাহলে একুশ দিনের মধ্যে সব অসুখ দূর হয়ে নির্ঘাৎ তিন সের ওজন বাড়বে। আপনি হবেন অজেয় স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত শক্তির অধিকারী। হ্যান্ডবিলের উল্টোপৃষ্ঠায় সেই অজেয় স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত শক্তির একটি জ্বলন্ত উদাহরণের মত নিদারুণ পোজে দাঁড়ানো সুশীলদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেওড়াতলা ব্যায়ামাগারের বাদলদা।

বাদলদার সর্বাঙ্গ বয়ে মাসলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এপিঠে-ওপিঠে সুশীলদার আর বাদলদার দুরন্ত দুই পোজ—আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে হ্যাণ্ড বিলিয়ে দেয়ালে দেয়ালে ভাতের আঠা দিয়ে সে'টে প্রচারের কাজটা এগিয়ে দিচ্ছিলাম। এমন সময়, আমরা তখন ক্লাস এইটে উঠব, খবর পেলাম সুশীলদা হাওয়া। পুলিশ নাকি সুশীলদার কবিরাজি-ফ্যাক্টরী রেড করেছে। সেখানে কোবরেজ জ্যাঠার ওষুধের খান ত্রিশেক খালি বড় বড় বোয়াম, কিছুটা গোলা তামাক, দুটো বড় বড় শিল নোড়া আর হামানদিস্তা ছাড়াও নাকি আধপোয়াটাক আফিম পাওয়া গেছে। সেই যে সুশীলদা বেপাত্তা হোল তারপর আর কোন খবর পাইনি।

কানে এল, সুশীলদা ছবিগুলো দেখিয়ে বড়ির ফাংশনটা বোঝাচ্ছেন। রাবড়ি, মালাই, দহি, রোটি, মছলি, মানস ভাল ভাল যত খাবারই খান না কেন আপনি, যদি পেট গড়বড় করে তাহলে কিছুতেই তাগদ আউর তন্দুরস্তি আসবে না। ইসি লিয়ে শহরমে যিতনা আংরেজ আউর বিলাইতি সাহেব আছে সবাই সপ্তাহে একদিন করে অন্তত পেট সাফ করে জোলাপ নিয়ে। কিন্তু আমরা, হিন্দুস্থানের যারা বাসিন্দা, তারা কি করি? কিছু না। আর করি না বলেই, এত খেয়েও আমাদের স্বাস্থ্য ভাল যায় না, গায়ে তাগদ পাই না। ছাতি আউর শিনা দুবলা হয়ে পড়ে। আর তাই ঘরে ঘরে এত ঝগড়া।

ভাইলোগ, ঘরের বউকে যদি ঘরেই বেঁধে রাখতে চান তো পেট সামলিয়ে তুলুন। মনে রাখবেন এই পেটই সব। আর পেটের গোলমাল হলে কিছুতেই কিছু হবে না। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেও তখন আর গায়ে বল পাবেন না। আর গায়ে তাগদ না থাকলে, আপনার বৌ আপনার কাছে থাকতে চাইবে না। হাঁ।

ইয়ে মামুলি বাত্ নেহি। ইয়ে আসলি বাত। বলতে বলতে সুশীলদা একটু থামলেন। তারপর টুলের পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীর হাত থেকে সবুজ কাগজে মোড়া একটা বড় পার্শেল নিয়ে বললেন—এই পার্শেলের মধ্যে আমার কোম্পানীর ওষুধ আছে। একটি ছোট প্যাকেট বার করে সবাইকে দেখিয়ে বললেন—আমার ওষুধ কিনতে হবে না। আপনারা এগিয়ে আসুন। আমি প্রত্যেককে ফ্রিতে দুটো করে বড়ি দেব। আজ রাতে খেয়ে দেখুন। যদি ফল পান, তবে কাল বিকালে আসবেন। আমি রোজ এখানে আসি।

ফিতে বড়ি পাওয়া যাবে শুনে ভিড়টা সুশীলদার টুলের ওপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সুশীলদা একটা প্যাকেটের মুখ ছিঁড়তে ছিঁড়তে চেঁচাতে লাগলেন—ফ্রি স্যাম্পেল, ফ্রি স্যাম্পেল। লেকিন এক শর্ত পর। আমকা আবার আউর ইমলিকা খাট্টা, দয়া করে কেউ খাবেন না। তাতে আমার ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি কেউ বলেন এই ওষুধ খেয়ে ফল পান নি, তাহলে আমি মিট্টি সমঝকর এই সমস্ত ওষুধ জলে ভাসিয়ে দেব। অবাক হয়ে দাদার কেরামতি দেখতে লাগলাম। ফ্রি স্যাম্পেলের লোভ দেখিয়ে ভিড়টাকে কাছে টেনে নিয়ে ওষুধের গুণকীর্তনে মেতে উঠলেন দাদা। সাত প্রকম দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া আর ধাতুর সাহায্যে এই ওষুধ তৈরী। লোহা ভস্ম, সফেদ মুসলী, ব্রাহ্মী বটি, ত্রিফলা, শিলাজিৎ, মুলাজুম, বটকা আদা,—তামাম হিন্দুস্থান চুঁড়ে কর বহুৎ দাম দিয়ে দাদার কোম্পানী এই সব জিনিস সংগ্রহ করেছে। আর তারই ফসল এই শান্তিবটি, জহরবটি, অমরবটি। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে কোম্পানীর নাম ঠিকানা লেখা আছে। ইচ্ছা করলে আপনারা কোম্পানীর অফিস থেকেই এই ওষুধ সংগ্রহ করতে পারেন। অথবা প্রচারকে লিয়ে রোজ বিকেলে আমি আসি এখানে—আমার কাছেও আপনারা পাবেন। প্রতি প্যাকেট দু টাকা। প্রত্যেক প্যাকেটে আছে একুশটা বড়ি—সাতদিনের ব্যবস্থা। ফুলকোর্স—তিন প্যাকেট, একুশ দিনের। আইয়ে আইয়ে লিজিয়ে লিজিয়ে।

তারপর শুরু হয়ে গেল পি সি সরকারের ম্যাজিক। ডজন ডজন হাত শূন্যে টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর সুশীলদা একহাতে টাকা নিয়ে অন্য হাতে বড়ির প্যাকেট সাপ্লাই দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। দেখলাম যারা ফ্রিতে ওষুধ পাবার আশায় এগিয়ে গিয়েছিল তারা আগাম দাম দিয়ে মাল নিয়ে গেল। ফ্রি স্যাম্পেলের কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

ভিড়টা পাতলা হতে হতে রাজভবনের গম্বুজের আড়ালে আগুনের লাল গোলাটা কখন যে টুপ করে খসে পড়েছে টেরও পাইনি। হ্যাজাক, হ্যারিকেন জ্বলে উঠেছে এসপ্ল্যানেডের ফেরিওয়ালাদের রাস্তার-দোকানে। হাজার হাজার ব্যস্ত মানুষ চারদিকে বাড়ী ফেরার তাড়ায় ট্রাম ধরার আশায় ছোটাছুটি করছে। একজনেরই দেখলাম কোন তাড়া নেই। সে টুলের ওপর বসে এক গোছা দলাপাকানো নোট আঙুলের টানে ইস্ত্রি করে গুনে গেঁথে নিচ্ছে। পাশে সঙ্গীটি দাঁড়িয়ে একটা হ্যান্ড ব্যাগে উদ্বৃত্ত ওষুধের প্যাকেটগুলো ভরছে। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একবার চোখ মেলে তাকালেন সুশীলদা। তারপর ঝরঝরে বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন—তোকে আগেই দেখেছি কান্তু। দাঁড়া একটু। টাকা কটা গুনে নিই।

টাকা গুনে নিয়ে সঙ্গীটিকে বাড়ী চলে যেতে বলে আমার পিঠে হাত দিয়ে সুশীলদা বললেন—চ, একটা দোকানে বসে একটু চা খাই। এত বছর পরে দেখা। অথচ সুশীলদার ভাব-ভঙ্গীতে একটুও বিস্ময়ের চিহ্ন নেই। যেন রোজই আমাদের দেখা হয়।

চা খেতে খেতে শুনলাম গত আঠারো বছরে তামাম হিন্দুস্থান চষে বেড়িয়েছেন দাদা। তার ওষুধ এখন দারুণ চলছে আসাম আর ত্রিপুরায়। মাদ্রাজেও চলছে মন্দ নয়। তারপর আমাদের সবার খোঁজ-খবর নিলেন। কে কি করছি? কেমন আছি? তারপর পুরোনো পাড়ার খবর কি?

আধঘণ্টা বাদে চা-টা খেয়ে উঠে পড়লাম দুজনে। সুশীলদা উঠেছেন চীৎপুরে। বৌদিকেও নিয়ে এসেছেন নিজের মুলুক দেখাতে। এক তিন দর্জি পারেশ জুই সার্ভ করছেন। রথও দেখাবেন, কলাও বেচবেন। আজকাল নিজে আর ওষুধ বানান না। সারাদিন ঘুরে প্রচার করে হাঁপিয়ে ওঠেন। বৌদিই তাই ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ধকলটা পোহান। রাস্তায় বেরিয়ে বললেন—একদিন আয় না আমার বাসায়। আর বেশীদিন থাকছি না। দেখলাম দাদার উচ্চারণটাও কেমন পাল্টে গেছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী মেশানো বাংলায় বললেন—তোর বৌদি কিন্তু এদেশী নয় রে। হিন্দুস্থানী। তোকে দেখলে খুব খুশী হবে। আসবি তো?

বললাম—নিশ্চয়ই যাব। ততক্ষণে দাদা একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছেন। ভেতরে ঢুকতে যাবেন, ঠিক তখুনি বিকেল থেকে যে প্রশ্নটা মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল, সেটা ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে পড়ল—তোমার ওষুধ তো দেখলাম দারুণ চলছে। মশলার ভাগটা কি সেই একই আছে? হাসতে হাসতে জবাব দিলেন সুশীলদা—ভাল ওষুধ, যাতে উপকার হয় তা কিনতে আমার কাছে কে আসবে বল। তাই ঐ আফিম মেশানো গুলিই বেচি। এক প্যাকেট শেষ করতে না করতেই নেশা ধরে যায়। তখন পাগলের মত খুঁজে বেড়ায় শান্তিবটি, জহরবটি, অমরবটি। দেখ না এবার কলকাতাতে একটা অফিস পার্মেণ্টলি খুলে যাব। একটা ভাল লোক ঠিক করে দে না, যে অনেস্টলি ব্যবসাটা দেখবে। মোটা কমিশন দেব।

—ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। জানলার কাঁচের আড়ালে পরিষ্কার আয়নার মত ঘামে ভেজা তেলতেলে দাদার মুখটা সাফল্যের চর্বিতে দারুণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। দাদার ব্যবসাটা সাংঘাতিক রকম জমে উঠেছে।

—সন্ধিৎসু

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৯)

এবার ওদের ফেরার পালা। ঈশম সকাল সকাল দুটো রান্না করে খেয়ে নিয়েছে। সে খুব সকালে গোটা নৌকার পাটাতন ধুয়েছে। গলুইতে জল জমে ছিল, সব ফেলে দিয়ে একেবারে নৌকা হাল্কা করে রেখেছে। পালে যেখানে যেখানে সামান্য ছেঁড়া ছিল গতকাল সারাটা দিন সেখানে সযত্নে সুচ-সুতো দিয়ে মেরামত করে নিয়েছে। কোন কারণেই যেন নৌকা চালাতে কষ্ট না হয়। গুণ টানার দড়ি ঠিক-ঠাক করে সে বসে থাকলে দেখল, মেজকর্তা আসছেন সকলের আগে। মাঝে সোনা লালটু পলটু, পাগল কাকা, আশ্বিনের কুকুর পিছনে।

এখন স্টিমার ঘাটে খুব ভিড়। যে যার মাতো পুজোর দিনগুলি গ্রামে কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এই গ্রাম প্রায় শহরের সামিল। এখানে হাইস্কুল আছে। পোস্টঅফিস আছে। বাজার-হাট, আনন্দময়ীর কালীবাড়ি আর বড় বড় জমিদারদের প্রাসাদ মিলে এক জাঁক-জমক এই পুজোর কটা দিন—তারপর ফের বাবুদের কেউ ঢাকা চলে যান, কলকাতায় যান, গ্রাম থেকে একে একে সবাই চলে গেলে—পুরি খাঁ-খাঁ করে।

ভূপেন্দ্রনাথের এমনই মনে হচ্ছিল। ওরা চলে যাচ্ছে। সকাল সকাল ওরা সেদ্ধ ভাত খেয়ে নিয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিল। যতক্ষণ নৌকাটা শীতলক্ষ্যার বুকে দেখা গেল ততক্ষণ সে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর আর কেন জানি এ সময় কাছারিবাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা হল না। সে হেঁটে হেঁটে কালীবাড়ির দিকে চলে এল ভাবল, চুপচাপ সে বারান্দায় বসে মাকে দর্শন করবে। পুরোহিত কালু চক্রবর্তী মাঝে মাঝে এসে নানারকম কুশল সংবাদ নিলে হুঁ হাঁ করবে। আর বারান্দায় বসলেই সেই ভাঙা প্রাচীন শ্যাওলা ধরা দুর্গের মতো বাড়িটাতে কোন মন্দিরের সাদৃশ্য খুঁজে পায় কিনা। কি সাহস মৌলভিসাবের. সে এখানে হাজার লক্ষ মানুষ নিয়ে এসে নামাজ পড়তে চায়। কোরবাণী দিতে চায়। এসব করলেই এ অঞ্চলে আগুন জ্বলে উঠবে। সে বলল, মা তুমি শক্তিদায়িনী। তুমি শক্তি দিও মা। সে মনে মনে যেন কোন ধর্মযুদ্ধের স্বপ্ন দেখছে। যেন এই মা, আনন্দময়ী, শক্তিদায়িনী মা হাজার হাজার দেবসৈন্য তৈরি করবে শরীর থেকে। এবং মহিষাসুর বধের মতো সব বধে উদ্যত হবে। যুগে যুগে মা তুমি মুণ্ডমালা ধারিণী।

তারপর ভূপেন্দ্রনাথ মনে মনে হাসল। অবলোয় ওর মুখ কুঁচকে উঠল। থানার দারোগা, পুলিশসাহেব সদরের, মায় ম্যাজিস্ট্রেট সব বাবুদের হাতে। একটা তার করে দিলেই স্টিমার বোঝাই করে সৈন্য-সামন্ত হাজির হবে। সে অবহেলায় মুখ কুঁচকে রাখল। ভিতরে ভিতরে সে এত বেশি উত্তেজিত যে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছে। সে যেন একটা রণক্ষেত্রের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

তখন ঈশম হালে বসে সোনাকে বলল, কি গ' কর্তা মুখ কালা ক্যান।

সোনা মুখ ফিরিয়ে রাখল। যেন ঈশম ওর মুখ দেখতে না পায়।

—আর কি, এইবারে নাও ঘাটে লাগাইয়া দিমু। আপনের মায় ঠিক ঘাটে খাড়াইয়া থাকব। গেলেই আপনারে কোলে তুইলা নিব।

পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ নৌকার গলুইয়ে বসে আছেন। রোদ মাথার উপর। ঈশম বারবার অনুরোধ করেছে ছইয়ের ভিতরে বসতে—তিনি বসেন নি। একেবারে অচঞ্চল পুরুষ। পদ্মাসন করে বসে আছেন। রোদে মুখ লাল হয়ে গেছে। সোনার এখন এসব ভাল লাগছে না। সে বাড়ি যাচ্ছে। অমলা কমলা এখন কত দূরে। সে বাড়ি গিয়ে মাকে কেমন দেখবে। কেমন এক পাপ বোধ ওকে সেই থেকে দুঃখ দিচ্ছে। অমলা কমলার কান্না, অথবা সেই রাত্রি ওকে যেন আরও বেশি সচেতন করে দিয়েছে। কেউ যেন বলছে, তুমি এটা ভাল করনি সোনা। সে যে জন্য চুপচাপ সারাক্ষণ বসেছিল নৌকায়।

বাড়ির ঘাটে নৌকার শব্দ পেয়েই ধন-বৌ ছুটে এসেছিল। বড় বৌ এসেছে। সে খবর পেয়েছে পাগলমানুষ, সাঁতার কেটে, কখনও গ্রামের পথে হেঁটে মুড়াপাড়া চলে গেছে। যেদিন সোনা ওরা ফিরব সেদিন তিনিও ফিরবেন।

সোনা নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নেমেই মাকে জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণ যে মনটা ভারি ছিল, এখন তা একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে।

বড় বৌ বলল, কি সোনা মার জন্য কাঁদিসনি ত!

সোনা ঘাড় কাত করে না করল।

—ঠিক কেঁদেছিস? তোর চোখ মুখ বলছে। কিরে লালটু সোনা কাঁদে নি।

—না, জ্যাঠিমা।

—তাহলে আর কি, এবার জ্যাঠামশাইর মতো হয়ে গেলি। যেখানে খুশি চলে যাবি। কারো জন্য মায়া হবে না।

বড়বৌ যেন এই কথায় পাগল মানুষকে সামান্য খোঁচা দিল। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথও যেন সে খোঁচা ধরতে পেরে তাকালেন বড়বৌর দিকে।

বড়বৌ বলল, এস। যেন বলতে চাইল, তুমি কোথাও চলে গেলে আমার ভারি কষ্ট হয়। ভয় হয়। আমার আর কে আছে!

সোনা প্রায় যেন বিশ্ব জয় করে ফিরেছে। তার নূতন অভিজ্ঞতা, হরিণ, ময়ূর এবং বাইস্কোপের বাকস এসব তার সকলকে দেখাতে না পারলে অথবা বলতে না পারলে সে মনে মনে শান্তি পাচ্ছে না। প্রথম মালতী পিসিকে সে এসব দেখাবে ভাবল। গোপাটে ফাতিমা এলে তাকে দেখাবে ভাবল।

সোনার মনে হল কত দিন পর সে যেন এখানে ফিরে এসেছে, যেন সে দীর্ঘদিন এখানে ছিল না। সবাই'র সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না। সে প্রথমে বড় ঘরে ঢুকেই ঠাকুমা ঠাকুরদাকে প্রণাম করল। তারপর উঠোনে নেমে এলে বড় বৌ বলল, সোনা জামা-প্যান্ট ছেড়ে খেয়ে নাও।

সোনা এসব শুনল না। ওরা সেই কখন খেয়ে বের হয়েছে, সুতরাং ক্ষুধা পাবার কথা। বড়বৌ, ওরা হাত পা ধুয়ে এলেই খেতে দেবে। কিন্তু কেউ খেতে আসছে না। সোনা দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে গেল। অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়াল। দক্ষিণের ঘরে আবেদালি বসে আছে। ছোট কাকা বাড়ি নেই। পালবাড়ির সুভাষের বাবা নেই। হারান পালের বাড়ি খালি। সোনা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করল।

শুধু জলে এখন মালতীপিসির পাতি-হাঁস সাঁতার কাটছে। সে পুকুর পাড় ধরে কয়েদ বেল গাছটার নিচে চলে গেল। এখান

থেকে শোভা আবুদের বাড়ি চোখে পড়ে। সে হাটুজলে নেমে সোজা ওদের বাড়ি উঠে দেখল নরেন দা বাড়িতে নেই। সব কেমন খাঁ-খাঁ করছে। শোভা আবু নেই। ওর মা নেই। এমন কি সে মালতী পিসিকেও দেখতে পেল না। কেবল মনে হল ওদের তাঁতঘরে কেউ বসে বসে তামাক কাটছে।

সোনার কেমন ব্যাপারটা ভূতুড়ে মনে হল। কেউ নেই। সে একা। সূর্য অস্ত গেছে। অথচ বাড়ির পর বাড়ি সে দেখছে খালি পড়ে আছে। হয়ত এক্ষুণি একটা লম্বা হাত, শোভা আবু, সেই যে গল্প সে শুনেছে, শোভা আবুর লম্বা হাত, এ-ঘর থেকে ও-ঘর পার হয়ে যাচ্ছে—সে তাড়াতাড়ি উঠোন পার হয়ে বাড়ির দিকে ছুটবে ভাবল, আর তখন দেখল মালতীপিসি একটা পিটোকলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। একা। নির্জনে কার সংগে যেন কথা বলছে।

সে কাছে গেল। অন্য দিন হলে মালতী-পিসি ওকে জড়িয়ে ধরত, আদর করত। কিন্তু আজকে মালতীপিসির চোখ কঠিন। চুল বাঁধে নি। কেমন রুক্ষ চোখ-মুখ। মাঝে মাঝে থু-থু ফেলছে। মাঝে মাঝে ঠিক নয়, যেন এক অশুচি ভাব সারাক্ষণ শরীরে—সব সময়ই সে থু-থু ফেলে শরীর পবিত্র রাখতে চাইছে। আর কার সঙ্গে বিড়-বিড় করে কথা বলছিল, সোনাকে দেখে আর কথা বলছে না। একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে যে সোনাকে চেনে এমন মনেই হচ্ছে না। গাটছার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। দক্ষিণের ঘরে সোনা এসেছিল ওর বাইস্কোপের বাকস দেখাতে, আর এখন এমন একটা চেহারা দেখে সে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। মালতীপিসির কি একটা অসুখ হয়েছে। অসুখ হলে মানুষের চোখ-মুখ এমন হয়। সোনা আর দাঁড়াতে পারল না। সে ছুটে এসে জ্যাঠিমাকে বলল, মালতীপিসি গাছের নিচে...সে বলে শেষ করতে পারল না। জ্যাঠিমা বললেন, ওর কাছে যাবে না। ওকে বিরক্ত করবে না।

সে জ্যাঠিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ছোট-কাকা তারা কোথায়? শোভা আবু, নরেন দাস কোথায়? পালবাড়ির সুভাষের বাবা নেই কেন! এসব শুনে বড়বৌ এক ফকিরের দরগায় মেলা বসেছে এমন বলেছিল। গ্রাম ভেঙ্গে মানুষ-জন মেলা দেখতে গেছে।

সোনার মনে হল এই পৃথিবীতে আবার একটা কিংবদন্তী সৃষ্টি হচ্ছে।

এ এক অলৌকিক ক্রিয়া। কারণ এক রাতে দুটো ঘটনা ঘটে কি করে! ঘটে না, ঘটতে পারে না। রাতের মাঝামাঝি সময় ফকিরসাবের অলৌকিক আবির্ভাব নরেন দাসের বাড়িতে। সাক্ষাৎ মালক্ষ্মী, অথবা জননীর মতো ফকিরসাব মালতীকে রেখে গেল। আর আশ্চর্য, দরগার মানুষেরা অথবা যারা ইন্তেকালে এসেছিল কবর দিতে তারা দেখেছে, ফকিরসাবের বিবি, লম্ফ জেলে সেই রাতে বসে আছে। পাশে কফিনের ভিতর ফকিরসাবের মৃতদেহ। অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে এমন হয় না। দশ ক্রোশের ফারাক—নদী নালার দেশ। জোয়ারের জল কখন আসে কখন যায় কেউ টের পায় না। সেই জলে জলে ফকিরসাবের বিবি দিনমানের পথ মুহূর্তে পাড়ি দিয়েছিল। মানুষের মনে তেমন একটা অবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে নি। গ্রাম মাঠের জায়গা, নদীনালা দেশ, খবর পৌঁছতে সময় লাগল না। নরেন দাস সকলকে ফকির-সাবের অলৌকিক আবির্ভাবের কথা রটিয়ে দিয়েছিল। মধ্য রাতে, আল্লা রহমানে রহিম বলে সেই উঁচু লম্বা মানুষের আগমন, এবং মৃত্যুর খবর শুনতেই নরেন দাসের মনে হয়েছিল, যোজন দূরে মাথা উঠে গেছে ফকিরসাবের, দুঃখিনী মালতীকে তিনি আলখেল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা পুতুলের মতো বের করে দিয়ে নিমেষে হাওয়ায় লীন হয়ে গেছেন। এই ঘটনায় ফকিরসাব রাতে-রাতে পীর বনে গেলেন। আবার কিংবদন্তী। ধর্মের মতো, অথবা সেই তালপাতার পুঁথির মতো কেবল কিংবদন্তী। বিশ্বাস নিয়ে নিরন্তর বিবদমান দুই সাম্রাজ্য। একপাশে সে। মাঠ পার হলে গোপাট, গোপাটের ওপাশে ফতিমা।

ফতিমা এলেই সোনা সেদিন সেই সন্ধ্যায় বাইস্কোপের বাকস তাকে দিয়ে দিল।

—কেডা দিল সোনাবাবু।

—অমলা।

—ক্যান দিল।

—খুব ভালবাসে আমারে।

ফতিমা অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে চুপচাপ বাবুর মুখ দেখল। তারপর বলল, বাইস্কোপের বাকস আমার লাগে না।

সোনা বলল, ক্যান লাগে না!

—লাগে না। আমি নিমু না।

সোনা বলল, ক্যান নিবি না?

ফতিমা কথা বলল না। সে সোনা বাবু মুড়াপাড়া থেকে ফিরে এসেছে শুনেই জল ভেঙ্গে চলে এসেছে এখানে। এখন জল বেশি নেই গোপাটে। পায়ের পাতা ডুবে যায় এমন জল। ফতিমা বাবুর সঙ্গে কথা না বলে শাড়িটা একটু তুলে উপরে, জলে নেমে গেলে সোনা বলল, অমলা আমার পিসি হয়।

ফতিমা ঘাড় কাত করে তাকাল এবং উঠে এসে বাইস্কোপের বাকসটার জন্য হাত পাতল।

সোনা দেবার আগে ফতিমাকে কাচে চোখ রাখতে বলল। সে ছবি পাল্টে পাল্টে দেখাচ্ছে। ফতিমা এই ছবিগুলোর ভিতর আরব্য রজনীর রহস্যময় জগত আবিষ্কার করে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। যেন এবার ওর চোখ তুলে বলার ইচ্ছা—সোনাবাবু এতদিন কোথায় ছিলেন। তারপর ওর চোখ মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়, সে বিকেল হলেই ওদের পুকুরপাড়ের পেয়ারা গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই গাছটার নিচ থেকে মাঠের এপারে এই অর্জুন গাছ স্পষ্ট। অর্জুন গাছের নিচে কেউ এসে দাঁড়ালেও স্পষ্ট। কেবল পাট গাছগুলো জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বড় হয়ে গেলে দুটো গাছের নিচই ঢাকা পড়ে যায়। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়ালে এ-পারে অর্জুনের ছায়ায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা বোঝা যায় না। পাট কাটা হলে সব আবার খালি। সারা বৎসর ফতিমা বিকালে গাছের নিচে দাঁড়ালেই টের পায় সোনাবাবু কোথায়? সে বিকেলে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অথচ সে বাবুর মুখ দেখতে পায় নি একবার। কেমন একটা অভিমান ভিতরে ভিতরে ছিল। বাইস্কোপের বাকসটা দিতেই সে অভিমান ওর জল হয়ে গেল।

ফতিমা বলল, নানী কইছে একবার যাইতে।

সোনা বলল, বলবি, নানী বলেছে যেতে

—এটা ত বইয়ের ভাষা।

—বইয়ের ভাষায় কথা বলতে শিখবি।

—আমার লজ্জা লাগে।

—আমারও। বলে সে হাহা করে হেসে উঠল। অমলাপিসি জ্যাঠিমার মত কথা বলে।

আমাকে বলে সোনা যামু কিরে, যাব বলবি।

—আপনে কি কইসেন

—কইলাম লজ্জা লাগে।

—আমারও লাগে। বলেই ফতিমা ছুটে নেমে গেল জলে, তারপর সারা মাঠে জল ছিটিয়ে ফতিমা মাঠের ওপারে উঠে গিয়ে পেয়ারা গাছটার নিচে হাত তুলে দিল। সোনাও হাত তুলে দিল। সিগনাল পেয়ে যার যার গাড়িতে যে যার বাড়িমুখো রওনা দিল।

সোনা দক্ষিণের ঘরে ঢুকে দেখল, অলিমদ্দিও নেই। আবেদালি শুধু বসে রয়েছে। অলিমদ্দি এবং ছোটকাকার ফিরতে দেরি হবে। ফকিরের দরগায় গেছে ওরা। সুতরাং এতবড় বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ থাকবে না, রাতে চোর-ছ্যাঁচোরের উপদ্রব, সে জন্য শচীন্দ্রনাথ আবেদালিকে রেখে গেছে বাড়ি পাহারা দিতে। আবেদালি থাকবে, খাবে, এবং বাড়ি পাহারা দিবে। সোনা নিজে একটা হ্যারিকেন এনে বৈঠকখানার দাওয়ায় রেখে দিল।

সোনা আবেদালিকে বলল, আপনে গ্যালেন না?

—কোনখানে?

—ফকিরসাবের দরগায়।

—কাইল যামু।

কারণ ঈশম যখন এসে গেছে তখন আর তার থাকবার কথা নয়। সবাই যাবে দরগাতে। সময় পেলেই চলে যাবে।

কোথাও যাবার নাম শুনলে সোনারও যাবার ইচ্ছা হয়। মেলার কথা মনে হলেই সেই সার্কাসের কথা মনে হয়, দুই বাঘের কথা মনে হয়। সে কি ভেবে এবার হ্যারিকেনের উপর ঝুঁকে বসল। আজও পড়া থেকে ওদের ছুটি। কাল থেকে, ঠিক কাল থেকে নয়। কোজাগরি লক্ষ্মীপূজা শেষ হলে রাত দিন জেগে পড়া। স্কুল খুললেই পরীক্ষা। সুতরাং সে একটু সময় পেয়ে আবেদালির মুখ দেখছে।

আবেদালি কেমন নির্জীব মানুষ হয়ে গেছে। জব্বর এখনও নিখোঁজ। আবেদালির শরীর ক্রমে ভেঙে আসছে।

জালালি মরে যাবার পর থেকে দ্বিতীয় পক্ষের বিবিটা ওর অভাব অনটন বুঝতে চায় না। কেবল খাই-খাই ভাব। যা রাঁধবে, নিজে একা খাবে, ওকে পেট ভরে খেতে দেবে না। সে এই বাড়িতে আজ রাতে পেট ভরে খেতে পাবে। ওর কাঁচাপাকা দাড়ির ভিতর পেট ভরে খাবার লোভী মুখটা ধরা পড়ছে। কেবল চোখ দেখলে টের পাওয়া যায় জব্বরটা ওকে বড় ছোট করে দিয়ে গেছে। থানা পুলিশ হত, কিন্তু ফকিরসাবের এমন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের পর সবাই সব ভুলে গিয়ে দরগায় মেলা নিয়ে মেতে উঠেছে।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য এই মালতী। সে সে-রাতে ফিরে এলে হল্লা করে লোক জড় করল নরেন দাস। চেঁচামেচিতে বোঝা দায় সব—তবু ওর যা কথা, তাতে বোঝা যাচ্ছে—ফকিরসাব, আর সাধারণ মানুষ ছিলেন না। যুসমন্তরে জ্বলে উঠেছিল এক অগ্নিশিখা—শিখার প্রচণ্ড আলোতে ঋষিগণের সহস্র মুখ যেন সারা উঠোন ভেসে বেড়াচ্ছিল—যেন বলছেন ফকিরসাব, আমার জননীরে কেহ অসতী করে নাই নরেন দাস। তারে তুমি তুলে লহ। প্রায় গোটা ব্যাপারটা নরেন দাসের কাছে সীতার বনবাসের মতো মনে হয়েছিল।

মালতী অন্ধকারে চুপচাপ। সে কোন কথা বলছিল না। পাষাণ প্রতিমার মতো তার শক্ত মুখ। চোখ দুটো কেবল জ্বলছিল। তাকে প্রশ্ন করলে কোন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। সে ক্রমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সে চুপ চাপ, অর্থহীন দৃষ্টি, সে বারান্দায় চিড়িয়াখানার জীবের মতো বসে থাকল। পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে দেখে যাচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। ফকির সাহেবের মতো শক্ত মানুষ হয় না। আল্লার বান্দা তিনি।

এভাবে একদিন গেল। দুদিন গেল। নরেন দাস তার বোনকে কেন জানি আর জল চল করে নিতে পারল না। জাতিতে যবন, এরা মানুষ না, ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে, সুতরাং বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, যবনে ছুঁলে ছত্রিশ, সে মালতীর জন্য ঢেঁকি ঘরের বারান্দায় একটা খুপরি করে দিল। সেই খুপরিতে ঠিক একটা পাতিহাঁসের মতো মালতী এক সকালে ঢুকে গেল।

আর আশ্চর্য খুপরি ঘরে এমন এক সুন্দরী বিধবা একা থাকতে সাহস পেয়ে গেল। শরীরে তার আর কি আছে যা মানুষ জোর করে কেড়ে নিতে পারে। সে এতদিন যা সোহাগে লালন করছিল, এবং আকাশে নানা রকম নক্ষত্রের ছবি দেখলে তার যার কথা মনে হত, সেই রঞ্জিত, যুবক এক, তাকে না বলে চলে গেছে, সে তাকে আর কিছু দিতে পারল না। এই উচ্ছিষ্ট শরীরের কথা ভাবলেই ওর মুখে থুথু উঠে আসে। সে সারাদিন জলে ডুবে থাকতে চায়। জলে নামলেই মনে হয় তার শরীর পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। জলে ডুবে গেলে মনে হয়, আহা কি শান্তি মা জননী জাহ্নবীর কোলে। সে ডুবে গেল কিনা, তার আঁচল অথবা চুল ভেসে থাকল কিনা, কি শীতের রাত, কি গ্রীষ্মের দাবদাহে শুধু তার যেন এক প্রশ্ন, তোমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখো, আমি ডুবে যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি দ্যাখো, সব চুল, আঁচল, এমন কি আমার সামান্য যা কিছু, সব ডুবে যাচ্ছে কিনা দ্যাখো।

প্রতিবেশী বালকদের এটা একটা খেলা হয়ে গেল। মালতী পিসি কেবল ভোঁস ভোঁস করে একটা উদবিড়ালের মতো ডুবত ভাসত। ওরা পাড়ে দাঁড়িয়ে খেলা করত অথবা ঠাট্টা তামাসা, পিসির আঁচল ভেসে আছে, অথবা চুল, না না চুল, না না তোমার পায়ের আঙুল দেখা গেছে, হাতের আঙুল, তোমার কাপড় জলের ভিতর বাতাস পেয়ে পাল তুলে দিতে চেয়েছে, তোমার সব ডুবে যায়নি, তুমি কেবল কিছু না কিছু নিয়ে জলের উপর ভেসে থাক, এমন যখন বলত বালকেরা, তখন মালতীর কি করুণ মুখ! আমার সব তবে ডোবে না, আমার কিছু না কিছু ভাইসা থাকে! দ্যাখ দ্যাখ সোনা ডুবে আছি কিনা দ্যাখ।

সোনা বলত, পিসি তুমি ডুইবা গ্যাছ।

তারপরই মালতী সারা ঘাটে জল ছিটিয়ে উঠে আসত। চারপাশে শুধু অপবিত্র এক ভাব। সে বাল্তি থেকে জল ছিটাত আর ঘরের দিকে এগিয়ে যেত। শুচিবাইগ্রস্ত মালতী এভাবে এসে জলে ডুবে থাকতে থাকতে এক সময় শ্রীহীন রুক্ষ, এবং পাগল প্রায় হয়ে গেল। সারা রাত অভিমানে চোখ ফেটে জল আসে। চোখে ঘুম থাকে না। সোনা যখনই ঘাটে এসেছে, দেখেছে মালতী পিসি জলে সাঁতার কাটছে। জল থেকে কিছুতেই উঠতে চাইছে না। মুখ বড় করুন। তার শরীর থেকে কারা যেন তার প্রাণপাখি নিয়ে পালিয়েছে। নরেনদাস বকে বকে জল থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে শরৎকালটা কেটে গেল সোনার। শশীভূষণ পূজার ছুটি শেষ হলে চলে আসবে। হেমন্তের দিনে পড়ার চাপ বেশি। ওকে সকালে এবং রাতে বেশিসময় শশীভূষণ নিজের কাছে পড়ার জন্য বসিয়ে রাখবে। পাগল জ্যাঠামশাই কিছুদিন হল কোথাও যাচ্ছেন না। সোনার ধারণা সেই জ্যাঠামশাইকে শান্ত এবং ধীর-স্থির করে তুলছে। জ্যাঠামশাই সেই যে হাতী দেখতে গিয়ে ভাল হয়ে যেতে থাকলেন, যেন ক্রমে তিনি সেই থেকে ভাল হয়ে যাচ্ছেন। সে মাঝে মাঝে জ্যাঠামশাইকে তামাক সেজে দেয়। তামাক খান তিনি। বসে বসে আপন মনে সেই কবিতা আবৃত্তি করেন। স্নানের সময় স্নান, আহারের সময় আহার। রাতে তিনি ওদের পড়ার টেবিলের একপাশে ছোট্ট পড়ুয়ার মতো সরল বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে বসে থাকেন। যেন খুব নিবিষ্ট পড়া শোনায়। তিনি কখনও সোনার শ্লেট নিয়ে পেন্সিলে নানা রকমের প্রজাপতি, অথবা শূন্য একটা সাঁকো, মাঠের ছবি আঁকেন। কাউকে তিনি আর বিরক্ত করেন না। সোনা লক্ষ্মী পূজোর জন্য টুনি ফুল আনতে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই নৌকা বাইছিলেন। এবং যেখানে এই দুর্লভ টুনিফুল পাওয়া যায় ঠিক সেখানে, তিনি তাকে পেঁৗছে দিয়েছিলেন। এই সব জীবনের ভিতর সোনা দেখেছে বড় জ্যাঠিমা খুব খুশী। তিনি সারাদিন সংসারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন। জ্যাঠামশাই বাড়ি থাকলে, জ্যাঠিমার আর কোন দুঃখ থাকে না। কপালে বড় গোল করে সিঁদুর, মাথায় লম্বা সিঁদুর, লাল পেড়ে কাপড়, কি ধবধবে এবং সাদা, তার শ্যামলা রঙের জ্যাঠিমাকে কখনও কখনও রামায়ণে বর্ণিত নারী চরিত্রের সঙ্গ তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।

এভাবেই কার্তিক পূজার দিন এসে গেল। ফতিমা অর্জুনগাছের নিচে এসে একদিন বলে গেছে, ওর জন্য এবার [illegible]
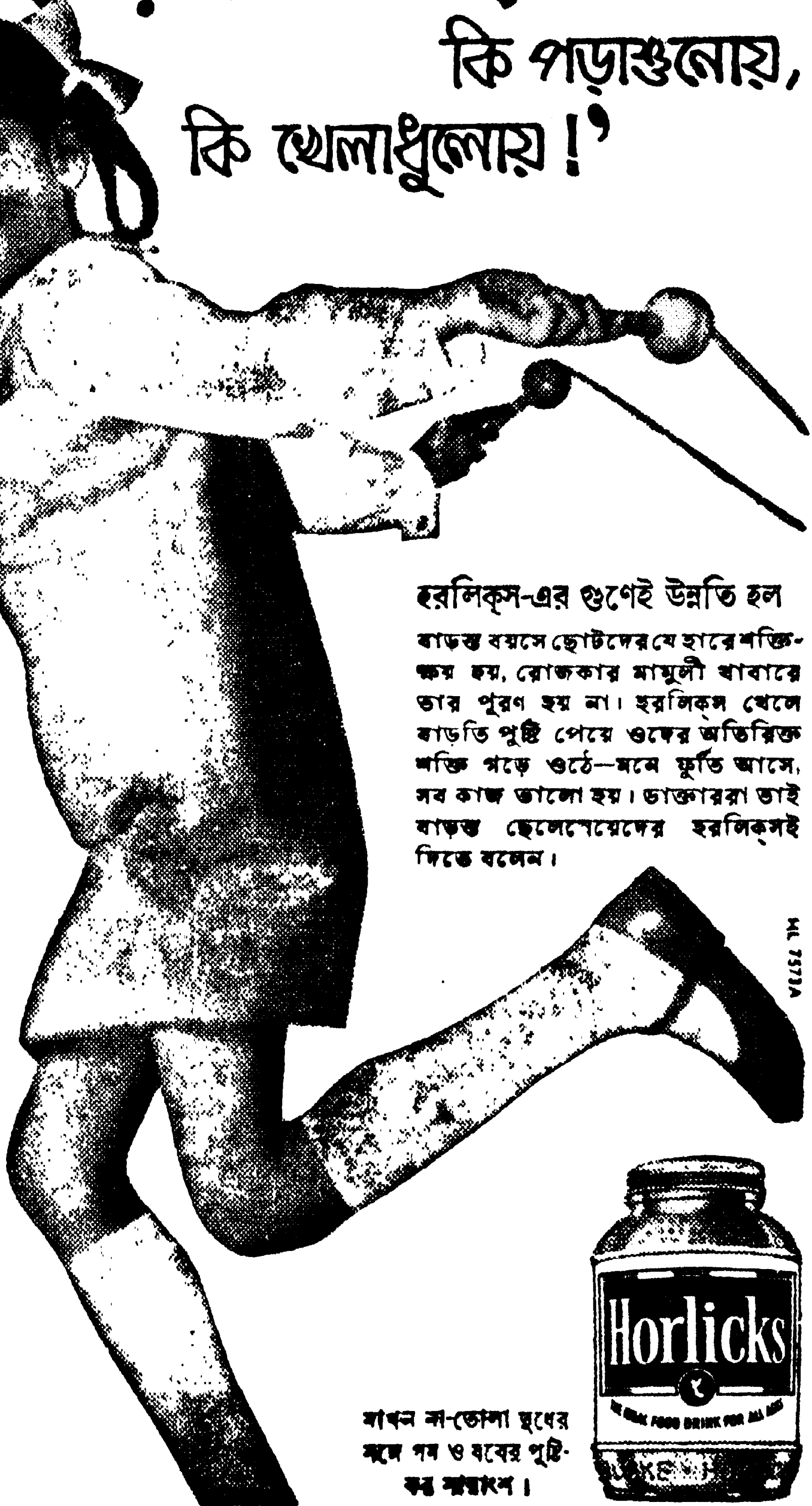
শ্রীঘট রাখতে হবে। সে মাকে বলেছে, জ্যাঠিমাকে বলেছে। সে ওদের প্রত্যেকের কাছ থেকে শ্রীঘট নিয়ে রাখবে। এবং কার্তিক পূজার পরদিন ফতিমা এলে দুটো নয়, এবার চারটা দেবে। যেমন অমলা-কমলা ওকে নানাবিধ দ্রব্য দিয়ে খুশী করতে চেয়েছে, সে তেমনি এই মেয়ে— কি যে মেয়ে, পায়ে মল, নাকে নোলক, ডুরে শাড়ি পরা মেয়ে তার জন্য অপেক্ষায় থাকে—সে তাকে কিছু দিতে পারলেই মহৎ কিছু করে ফেলেছে এমন ভাবে।

আর কার্তিক পূজার দিনই ঘটনাটা ঘটল।

ওরা বিকেলে গেছে মাঠে। সন্ধ্যার সময় চারপাশের জমিগুলোতে আগুন জ্বালানো হয়েছে। 'ভাল বুড়াতে' আগুন দিচ্ছে সবাই। সংসারের যাবতীয় পাপ মুছে, পরিবারের মানুষেরা হেমন্তের মাঠ থেকে পুণ্য তুলে আনতে গেছে। অলক্ষ্মী ফেলে লক্ষ্মী আনতে গেছে সবাই। সোনা লালটু পলটু তিনজন তিনটা 'ভাল-বুড়াতে' আগুন দিয়ে এখন মাঠের উপর ছুটছে। ওরা ওদের সবচেয়ে যে জমি ভাল ফসল দেয় সেখানে আগুনের দণ্ডগুলো পুঁতে দিল। তারপর চাই কার্তিক পূজার জন্য সবচেয়ে পুষ্ট ধানের ছড়া। এখন ওরা তিনজন এই হেমন্তের মাঠে সেই পুষ্ট ছড়ার জন্য জমি থেকে জমিতে ক্রমে সোনালি বালির নদীর চর পার হয়ে চলে যাবে। যে যত বড় ছড়া নেবে সে তত বেশি পুণ্য বহন করবে সংসারের জন্য। এভাবে এক প্রতিযোগিতা—সোনা একটা বড় ছড়া কেটে বলল, কি বড় দ্যাখ দাদা! আর তখন পলটু বলল, কৈ দ্যাখি। দেখে বলল, বড় না ছাই। বলে সে একটা বড় ছড়া দেখাল। এবং ক্রমে এভাবে ওরা ছড়ার জন্য দূরের মাঠে নেমে গেল। পছন্দ হচ্ছে না। মনে হয় এ জমি পার হয়ে গেলে বড় মিয়ার জমি, জমিতে ফসল হয় সবার সেরা, অথবা কোথাও এমন জমি আছে যেখানে তাদের জন্য পুষ্ট ছড়া নিয়ে মা-লক্ষ্মী অপেক্ষা করছেন। ওরা এখন মাঠে মাঠে মা লক্ষ্মীকে খুঁজছে।

ওরা তিনজন এভাবে অনেকদূরে চলে এল। পুষ্ট এবং বড় ধানের ছড়া না নিতে পারলে গৌরব করা যাবে না। বড় জ্যাঠিমা বুঝবেন না, দ্যাখ ধন তোর ছেলে কত বড় ছড়া এনেছে! এই মাঠে পুষ্ট ধানের ছড়াটির জন্য ওরা জমি থেকে জমিতে ঘুরছে। আবছা অন্ধকার। হেমন্তের মাঠ বলে সামান্য কুয়াশা। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না আকাশে বাতাসে। ওরা নুয়ে একটা একটা করে ধানের ছড়া দেখছে আর রেখে দিচ্ছে! হাত দিয়ে মাপছে। না, বড় ছোট! প্রায় হাত লম্বা না হলে কার্তিক ঠাকুরের গলায় মালার মতো ঝোলানো যাবে না।

তখন লণ্ঠন হাতে কারা যেন নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে এদিকে আসছে। লণ্ঠনের আলো দেখে মনে হল ওরা অনেক দূরে চলে এসেছে। ওদের খেয়ালই ছিল না, ওরা নদীর চর ভেঙ্গে হাইজাদির মাঠে পড়েছে। লণ্ঠনের আলো দেখে ওদের বাড়ি ফেরার কথা মনে হল।

কাছে এলে সোনা দেখল ফেলু যাচ্ছে। মাথায় বড় একটা ট্রাঙ্ক। সে এক হাতে মাথায় বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে যাচ্ছে। পিছনে সামসুদ্দিন। এবং সবার পিছনে ফতিমা। ফতিমা আজ শালোয়ার পরেছে। লম্বা ফুল হাতা ফ্রক সোনালি রঙের। কাল ফতিমার আসার কথা অর্জুনগাছটার নিচে। সে ফতিমার জন্য চারটা শ্রীঘট রেখে দেবে! এ-সময়ে কোথায় যাচ্ছে ফতিমা সেজেগুজে। সে ফতিমাকে দেখেও কিছু বলতে পারল না।

সামসুদ্দিন এত বড় মাঠে ওদের তিনজনকে দেখে কেমন একটু বিস্মিত হল। সে বলল, আপনেরা!

—ধানের ছড়া খুঁজতে আইছি।

সামসুদ্দিনের এতক্ষণে মনে পড়ল আজ কার্তিক পূজা। সবাই বের হয়ে পড়েছে পুষ্ট ধানের ছড়া খুঁজতে মাঠে। সে বলল, পাইছেন নি!

ওরা যা সংগ্রহ করেছিল দেখাল।

সামসুদ্দিন হাসল। —মা লক্ষ্মী এত ছোট হইব ক্যান। আসেন আমার লগে।

ওরা ফের হাঁটছিল। সোনা কিছুতেই কিছু বলছে না। সে ফতিমার পাশাপাশি হাঁটছে। তবু কথা বলছে না। ফতিমাও কিছু বলছে না। সে আর বেশিক্ষণ অভিমান নিয়ে থাকতে পারল না। বলল, তুই ছিরাঘট নিবি না।

—রাইখা দিয়েন। ঢাকা থাইকা আইলে নিমু।

—তুই ঢাকা যাইবি।

—আমরা সবাই ঢাকায় যামু। আমি স্কুলে পড়মু। বাড়িতে নানী একলা থাকব। সোনা বলল, কই তুই আগে কস নাইত!

—কমু কি! বাজি সকালে সব কইল।

সোনা জানে ফতিমার বাবা বাড়ি এলে সে কোথাও যায় না। সোনা আবার চুপ করে গেল। ফতিমাও কিছু বলছে না। সে বলল, সোনাবাবু আপনে আমারে চিঠি দিবেন।

—যা! চিঠি দিমু কিরে।

—আপনে কেমন থাকেন জানাইবেন।

—ছোট কাকায় বকব।

ফতিমা বলল, বিকালে আমি কান্দতে ছিলাম, বাজি কইল তুই কান্দস ক্যান?

—তর আবার কান্দনের কি হইল!

—কিছু হয় নাই!

তখন সামসুদ্দিন বলল, এই দ্যাখেন পুষ্ট ধানের ছড়া। সে বিলের জলে একটা গামছা পরে নেমে গেল। —এত বড় ধানের ছড়া কোনখানে খুঁইজা পাইবেন না। এই বলে সে তিনজনের হাতে তিন গুচ্ছ বড় বড় ধানের ছড়া দিয়ে বলল, জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। কি বলেন কর্তা, লক্ষ্মীরে আনতে গেলে কষ্ট লাগে। এই বলে সে গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেলুকে বলল, তরা হাঁটতে থাক। আমি আগ দিয়া আসি। অরা পথ চিনা বাড়ি উইঠা যাইতে পারব না।

সামসুদ্দিন অর্জুন গাছটা পর্যন্ত এল। পুবের বাড়ি সামনে এবং সেখানে মালতী আছে—জব্বর মালতীকে চুরি করার তালে ছিল, ফকিরসাব ওকে এখানে রেখে গেছেন—এবং জব্বর ওর দলের পাণ্ডা—সুতরাং এই অপরাধের জন্য সে কিছুটা দায়ী, ওকে দেখলে এমন মনে হয়। সামসুদ্দিন ভিতরে ভিতরে এই অসম্মানের জন্য পীড়িত। সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল। সে নানাভাবে মুসলমান মানুষের ভিতর আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, যা এতদিন নসিব বলে মেনে আসছিল সবাই, সে তা আঙুলে তুলে দেখিয়ে দিয়েছে—ওটা নসিব নয়। ওটা আপনাদের অসম্মান। আপনারা এতদিন তা গায়ে মাখেননি। কিন্তু জাতির আত্ম-প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে গেলে কিছু কঠিন উক্তি তাকে সময়ে অসময়ে করতে হয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে জব্বরের এমন ইতর কাজ! ভিতরে ভিতরে তার জন্য সে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছিল। সহসা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া নানা মানুষ নানাভাবে ব্যাখ্যা করবে। সে যাচ্ছে। যাচ্ছে, যেন এখানে থাকলেই ওর মালতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সে কিছু বলতে পারবে না। সে মাথা নুয়ে অসম্মানের দায়ভাগ কাঁধে তুলে নেবে শুধু। মালতীর সামনে পড়ার ভয়েই বোধ হয় সে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অবশ্য সে হাজিসাহেবের ছোট ছেলে আকালুকে দলের পাণ্ডা করে দিয়ে গেছে। শহরে কাজের চাপ তার বেড়ে গেছে। সে এখন থেকে শহরেই থাকবে।

সামসুদ্দিন আর উঠে আসতে সাহস পেল না। নরেন দাসের বাড়িতে কোন লম্ফ পর্যন্ত জ্বলছে না। সে একা দাঁড়িয়ে থাকল অর্জুন গাছটার নিচে। যতক্ষণ না ওরা উঠে গিয়ে বলল, আপনে যান, ততক্ষণ সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বার বার লক্ষ্য রাখছে নরেন দাসের বাড়িতে লম্ফ জ্বলছে কিনা। সে কেমন এখানে ভীতু মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বার বার লম্ফের আলোতে মালতীর মুখ দেখার ইচ্ছা। মালতী তুই আমার কসুর মাপ কইরা দেইস, এমন বলার ইচ্ছা। সে আবার মাঠের দিকে হেঁটে গেলে গাছের নিচটা কেমন খালি হয়ে গেল।

সোনা বাড়ি উঠে এসে দেখল দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। শশীভূষণ দেশ থেকে চলে এসেছে। ওদের দেখেই তিনি বললেন, কি তোমরা লক্ষ্মী ফেলে অলক্ষ্মী এনেছ। দেখাও তো লক্ষ্মীরে।

ওরা ধানের ছড়া আলোতে তুলে দেখাল।

—খুব বড় ছড়া দেখছি। কোথায় পেলে?

সোনা ওর ছড়াও দেখাল। ওরটা সবার বড় কিনা, না ছোট, সে তার মাস্টার মশাইর কাছ থেকে ছড়া দেখিয়ে তার সার্টিফিকেট চাইল।

শশীভূষণ সোনার ইচ্ছা বুঝতে পেরে বলল, সবার বড় সোনার ছড়া। সোনা সেই না শুনে ছুটে গেল ভিতরে। মা জ্যাঠিমা কার্তিক পূজোর ঘরে নানারকম আলপনা দিয়েছে। হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। জল-চৌকিতে কার্তিক ঠাকুর। নিচে সারি সারি স্রীঘট। ঘটে আতপ চাল, উপরে জলপাই। সে তার ধানের ছড়া মাকে দিল। মা দু হাতে ছোট্ট এই বালকের হাত থেকে ধানের ছড়া বরণ করে নিলেন।

কিন্তু শশীভূষণকে দেখেই সোনার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। সে আর খুব একটা এ পূজায় উৎসাহ পেল না। মাস্টার-মশাই বড় কড়া প্রকৃতির লোক। তিনি খুব সকালে উঠবেন। সবার দরজায় গিয়ে ডাকবেন, সোনা ওঠ। লালটু ওঠ। পলটু ওঠ। হাত-মুখ ধোবে। তিনি সবাইকে ঘুম থেকে তুলে মাঠে নিয়ে যাবেন। প্রাতঃ-কৃত্যাদি হলে, মটাকলার ডাল দেবেন। দাঁত মাজতে বলবেন। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাঁত মাজা হলে বলবেন, উঠে এস। তার জন্য একটা তক্তপোষ দিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ। বড় তক্তপোষ। সে সেখানে বাক্সের সব গাছ গাছড়া জড় করে রেখেছে। পেটের পীড়া, দাঁত ব্যথা, বাত এবং মাথা ধরা এবং অন্যান্য যাবতীয় রোগে সে ওষুধ দেবে। ওরা মুখ ধুয়ে এলেই ভিজা ছোলা দেবে গুনে গুনে, গুড় দেবে। এবং গুনে গুনে ফ্রি হ্যান্ড একসারসাইজ করাবে। পড়া হলে স্নান। তেল মেখে দেবে সোনার মাথায়। সকলকে নিয়ে সে পুকুরঘাটে সাঁতার কাটবে। তারপর গরম ভাত ডাল, ভাজা এবং হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাওয়া। শশীভূষণ এলেই ওরা একটা নিয়মের ভিতর আবার মানুষ হবে এমন ঠিক থাকে।

এই নিয়মের ভিতর শশীভূষণের যত রাগ লালটুর উপর। লালটুর উন-বৈঠক দুশ দশ বার। সোনার একশ দশবার। আর পলটুর তিনশ দশ বার। পলটু ঠিক ওঠা বসা করে কাজ সেরে নেয়। সোনাও। কিন্তু লালটু দেরি করে ওঠা বসা করবে। মাঝে মাঝে উঠতে বসতে ওর প্যান্ট হড়হড় করে নেমে আসে। শশীভূষণ তখন কান ধরে তুলে ধরে। এবং চিৎকার করতে থাকে, ধনবৌদি ধনবৌদি!

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ধনবৌ ছুটে এলে দেখতে পায়, লালটু উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঠতে বসতে ওর প্যান্ট খুলে গেছে। প্যান্টে ওর দড়ি নেই।

—এটা কি!

—আমি কি করমু কন! ওর প্যান্টে কিছুতেই ডোর থাকে না।

—আচ্ছা দেখছি। বলে তিনি পাট দিয়ে বেশ শক্ত করে সুতোলি পাকিয়ে ওর প্যান্টে ডোর ভরে দিতেন। লালটু ভয়ে ভয়ে আর প্যান্ট থেকে দড়ি খুলে ফেলত না। লালটু জব্দ এই মাস্টার মশাইর কাছে।

সোনা শশীভূষণকে দেখলেই এসব মনে করতে পারে।

মনে করতে পারে একটা উড়ো জাহাজের কথা। সেই প্রথম এ-অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ো জাহাজ উড়ে যাচ্ছে। ঢাকার কাছে কর্মিটোলাতে যুদ্ধের জন্য ঘাঁটি হয়েছে। যুদ্ধ ব্যাপারটা সোনার ভাল জানা নেই। মেজ-জ্যাঠামশাই বাড়ি এলে যুদ্ধের গল্প করেন। মাঠ থেকে উড়ো জাহাজ দেখে সে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন রাস্তায় দেখা।

—এই খোকা শোন!

সে বিদেশী শব্দ শুনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল।

—ঠাকুর বাড়ি কোন দিকে।

—সে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

ছোট করে চুল ছাঁটা মানুষটার। তিনি নবদ্বীপের মানুষ। এখানে তিনি হাই-স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে এসেছেন। বারদি থেকে হেঁটে এসেছেন বলে হাতে পায়ে ধুলো। সোনা বাড়িটা দেখিয়েই ছুটে হারাণ পালের বাড়ির ভিতর ঢুকে সোজা চলে এসে ছোট কাকাকে খবরটা দিল। দিয়েই সে আবার বার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকল—কতক্ষণে সেই মানুষ উঠে আসে।

শশীভূষণ বাড়িতে ঢুকে বলেছিল, এটা তোমাদের বাড়ি!

সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

—শচীন্দ্রনাথ তোমার কে হয়?

—কাকা।

একবার কাকাকে ডাকো দেখি।

ততক্ষণে শচীন্দ্রনাথ বার বাড়ির উঠোনে উঠে এসেছে। ওকে দেখেই শশী-ভূষণ নমস্কার করেছিল। বলেছিল, এলাম।

—আসেন। শচীন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় নিয়ে ওকে বসিয়ে দিল। —এই আপনের ঘর এই তক্তপোষ। আর এই তিন বালক।

সোনা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছিল, ওদের স্কুলের হেড মাস্টারমশাই—যার আসার কথা অনেকদিন থেকে, যিনি বরিশালের কোন অঞ্চলের শিক্ষকতা করতেন সেকেন্ড মাস্টারের, এখানে হেড মাস্টারের চাকরি পেয়ে চলে এসেছেন। শচীন্দ্রনাথই এ-ব্যাপারে বেশী খেটেছে। এবং কথা ছিল হেড মাস্টার মশাই তার বাড়িতেই থাকবেন খাবেন। এবং এই তিন বালকের প্রতি নজর রাখবেন।

শচীন্দ্রনাথ বলেছিল, তোমরা মাস্টার-মশাইকে প্রণাম কর।

ওরা সেদিন কে কার আগে প্রণাম করবে—ঠেলেঠেলে প্রণাম করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পায়।

প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, তোমাদের দাঁত দেখি।

সোনা দাঁত দেখাল।

—ভাল করে দাঁত মাজা হয় না। বলে তিনি নিজে হাত পা ধুয়ে আসার সময় এক রাস মটকিলার ডাল কেটে আনলেন। এবং সবাইকে একটা একটা করে দিয়ে—কি ভাবে দাঁত মাজতে হয়, দাঁত নিচ থেকে উপরে মাজতে হয়, এই দাঁত মাজা আমরা আদৌ জানি না, দাঁত থেকেই সব রোগের উৎপত্তি এসব বলতে বলতে তিনি একটা খাঁটি ডেমন স্ট্রেসন দিয়েছিলেন।

সোনা লালটু পলটু বাইরে এসে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছিল।

সেই মাস্টার মশাই এসে গেছেন। সোনা আর এখন যখন তখন পড়া ফেলে অর্জুন গাছের নিচে ছুটে যেতে পারবে না। সোনা হারিকেন নিয়ে হাত পা ধুতে ঘাটের দিকে চলে গেল সে কেমন বিমর্ষ। ফতিমা নেই। এবং সে অন্যমনস্ক। অন্যমনস্ক না হলে সে একা একা ঘাটে হ্যারিকেন নিয়ে হাত পা ধুতে আসতে পারত না। ওর ভয় করত।

সে ঘাটে নেমে গেল। হ্যারিকেনটা তেঁতুল গাছের গোড়ায় রেখেছে। সে পা ধোওয়ার জন্য জল তুলতেই সামনে কি দেখে ভয় পেয়ে গেল। জলের উপর ঠিক মাছ-রাঙা পাখির মতো এক জোড়া পায়ের পাতা ভাসছে। লাল। যেন সিঁদুর গুলে পায়ের পাতায় কেউ মা লক্ষ্মীকে জলে ভাসিয়ে গেছে। লক্ষ্মীর পায়ের মতো দু পা জলে ভাসিয়ে নিচে কেউ ডুবে আছে। সে দেখেই লাফ দিয়ে ছুটে পালাল। হ্যারিকেন পায়ে লেগে পড়ে গেল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে কেমন তোতলা বনে গেল।

শশীভূষণ মুহূর্তে আর দেরি করল না। শচীন্দ্রনাথ এবং নারেন দাস ছুটে এল। শশীভূষণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিচে মনে হল মাথার কাছে একটা শক্ত কিছু লাগছে। সে ডুব দিয়ে তুলে আনল দেখল, মালতী। গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। পায়ে আলতা পরেছে। কপালে সিঁদুর আর হাতে গলায় ওর যত গয়না ছিল সব পরে সে জলের নিচে অন্তর্ধান করতে গেছে।

শচীন্দ্রনাথ নাড়ি টিপে বুঝল, প্রাণটা ভিতরে এখনও আছে। চোখ দুটো বোজা। মালতী অজ্ঞান হয়ে আছে গল গল ক'রে জল বমি করছে। ফ্যাকাশে মুখ। কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, পায়ে আলতা। চার পাশে যে এত ভিড় শচীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করল না। সে অপলক অভাগিনী মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা নুন দিয়ে ওর শরীর ধীরে ধীরে ঢেকে দিতে থাকল। মেয়েটা চোখ বুজে এখন নুনের নিচে বুঝি নিভৃতে ঘুম যাচ্ছে। সকাল হলেই জেগে উঠবে। সেই আশায় সকলে আলো জ্বালিয়ে চারপাশে বসে থাকল। সোনা সে রাতে ঘুম যেতে পারল না। শিয়রে সেও জেগে বসেছিল। বার বার রঞ্জিত মামার কথা তার মনে পড়ছে। তার কেমন জানি রঞ্জিত মামার উপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

(ক্রমশঃ)

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

অথ কালীঘাট মন্দির কথা

বন-জঙ্গল আর খরস্রোতা গঙ্গার কোলে একদা গড়ে উঠেছিল কালীঘাট। অরণ্যে ছিল বাঘ আর নদীতে কুমীর। অনেক কিংবদন্তীর আলো-আঁধারিতে পথ ছিল দুর্গম। তবু অনেকের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই এর ইতিহাস আছে জড়িয়ে। সাবর্ণ চৌধুরীদের পারিবারিক গৌরব ও ঐশ্বর্য মিশে আছে কালীঘাটের আকাশে-বাতাসে। আর গোটা সহর কলকাতার ইতিহাস যে মা কালীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সে কথা ম্লেচ্ছ ইংরেজদের পর্যন্ত অজানা নয়।

মন্দিরে অধিষ্ঠিতা দেবীকে নিয়ে যেমন অনেক নাটকীয় ঘটনা শোনা যায়, শোনা যায় অনেক কিংবদন্তী, মন্দিরের ইতিহাসও সে চমক থেকে আলাদা নয়। একালের যে মন্দিরটি আমরা দেখতে পাই, তার নির্মাণের ইতিকথা গল্পের মতনই রোমাঞ্চকর। কিশোরী কলকাতা খেলা-ঘর থেকে তখনো বেরোয় নি। তাকে ঘিরে আবর্তিতে হচ্ছে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-স্বার্থপরতা, খেয়ালী বাবুদের বিলাস আর হঠাৎ-ধনীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার দুর্বার মোহ। কিশোরী কলকাতার কাছে এ সব ছিল একেকটি খেলনা। ঐ খেলনা দিয়েই একদা সে বানিয়ে চলল একটি মন্দির। কালীঘাটের মন্দির। আর মন্দির মানে গল্পের মত একটি নিটোল ইতিহাস।

এ গল্পের নায়ক কে?—এ ইতিহাসের রাজা?—বলা কঠিন। কখনো মনে হতে পারে হাটখোলার দত্তবংশীয় চূড়ামণিবাবুই এর নায়ক। অথবা তাঁর ছেলে কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের কথা উঠতেই চূড়ামণিবাবুই অনিবার্যভাবে আসে শোভাবাজারের রাজবাড়ি। ওঠে নবকৃষ্ণের কথাও। কিন্তু না, এঁদের সকলের কথাই ম্লান হয়ে যাবে যখন আমরা সাবর্ণ সন্তোষের কথা চিন্তা করব। সাবর্ণ পরিবারের সন্তোষ রায় কালীঘাটের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে কি কখনো আমরা মন্দির-নির্মাণের কথা আলোচনা করতে পারি?—তাই ইতিহাসের রাজা কে তা বলা কঠিন।

তবু এ কাহিনী আরম্ভ করতে হলে সন্তোষ রায়কে দিয়েই আরম্ভ করা ভালো। কেননা কালীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব কাছের। আর তাঁর জীবন নানারকম রোমাঞ্চকর ঘটনায় ভরা। পলাশীর যুদ্ধের বছর ষোল আগে যখন বাংলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা দেখা দেয়, তখন তিনি যুবক। বড়িশা-বেহালার তিনি আশ্রয়স্থল।—মারাঠা দস্যুরা সেদিন রাঢ়-বাংলার সৃষ্টি করেছে রীতিমত আতঙ্ক। গ্রামের পর গ্রামে ধরিয়ে দিচ্ছে আগুন। লুঠ করছে অবাধে। তখন মুর্শিদাবাদে নবাবীর তক্তে বসে ছিলেন যিনি, সেই আলীবর্দী হিমসিম খাচ্ছেন এদের সঙ্গে লড়াইয়ে। এবং অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত এদের এঁটে উঠতে পারলেন না। তাই মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে সন্ধি হল। 'চৌথ' দেবার স্বীকৃতিতে বাংলা দেশে শান্তি কিনলেন আলীবর্দী। নবাব আলীবর্দী। আর 'চৌথ' মানেই একরাশ টাকা। মুর্শিদাবাদের ধনাগারে এমনিতেই ছিল প্রচুর অপব্যয়। এখন বড়ো ব্যয়টি ঢুকল। ফলে রাজকোষ হয়ে উঠল নিঃশোষিত হবার মতন।

আলীবর্দী তাই বকেয়া খাজনা আদায়ে মন দিলেন। জমিদার আর রাজারাজড়াদের ওপর চাপালেন করের ভার। এ বোঝা বহন করতে যাঁরা অস্বীকার করলেন তাঁরা নবাবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়লেন। এমন কি কেউ কেউ বন্দীও হলেন। ঐ বন্দী হওয়া ব্যক্তিদের ভেতর পড়লেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং এবং আমাদের কালীর সেবক সন্তোষ রায়।

অবশ্য কিছুদিন পরেই এঁরা ছাড়া পেলেন। তবে তা অনেক কৌশলে। না, সন্তোষ রায়ের ব্যাপারটি কৌশল না বলে আপন মহিমায় বলা যেতে পারে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আপন জমিদারী দেখাবার জন্য নবাব আলীবর্দীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণের গঙ্গায়। বজরা করে ভেসে যেতে যেতে জঙ্গলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন নিজের জমিদারী। এ জমিদারী মানে গভীর বন। সে বনে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছিল বাঘের ডাক। কৃষ্ণচন্দ্র সে ডাক শুনিয়ে নবাবকে বলেছিলেন, 'হুজুর, ওরা আমার প্রজা। ঐ প্রজাদের কাছ থেকে কেমন করে খাজনা কীর বলুনত!' নবাব আলীবর্দী গোঁফে তা দিতে দিতে কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যাপারটি একটু বুঝেছিলেন। এবং মুর্শিদাবাদে ফেরার পর রেহাই দিয়েছিলেন রাজাকে।

আর সন্তোষ রায়? তাঁর কি হল?—নবাব তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন মুর্শিদাবাদের একটি বাড়ীতে। মানী ব্যক্তিকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েই রেখেছিলেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন আদেশ পালনের জন্য ভৃত্য এবং রান্নার জন্য পাচক। আর নবাবের কাছ থেকে প্রতিদিন প্রয়োজনমত আসত খাবার সামগ্রী। পাচক সেগুলিকে দিত রান্না করে।

সন্তোষ রায়ের চেহারা ছিল বিশাল। এবং খোরাকও ছিল বিপুল। নবাবের বরাদ্দ খাবারে ঠিক মত তাঁর কুলোত না। সর্বদাই তিনি ক্ষুধার্ত বোধ করতেন। একদিন সকালে হঠাৎ দেখলেন নবাবের ছাগরক্ষকেরা অনেকগুলি ছাগল নিয়ে চলেছে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে। সন্তোষ রায় তাঁর একজন চাকর পাঠিয়ে জোর করে ওখান থেকে ছিনিয়ে আনলেন একটি পাঁঠা। তারপর সেটিকে কেটে ব্যবস্থা হল রান্নার। আনন্দে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ফেললেন।

এদিকে নবাবের ছাগ-রক্ষক যথাসময়ে এ খবর পৌঁছে দিল নবাবের কানে। নবাব প্রথমে এ কথা বিশ্বাসই করতে পারলেন না। পরে কৌতূহলী হয়ে নিজে এলেন অনুসন্ধান করতে। সন্তোষ রায়কে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রায় মশাই আপনি আমার ছাগ-রক্ষকের কাছ থেকে পাঁঠা চুরি করে কি করেছেন?'

'খেয়েছি, হুজুর।'

'খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, হুজুর। আপনার পাঠানো খাবারে পেট ভরে না, তাই এ কাজ করেছি। গোটা পাঁঠাটিই আজ ভারি পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছি।'

'বটে! কিসের ইশারা খেলে যেন গেল আলীবর্দীর চোখে-মুখে। দাড়িটি চুমড়ে নিলেন। তা দিলেন গোঁফে। তারপর কটমট করে সন্তোষ রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক বলছেন তো?'

হ্যাঁ, হুজুর ঠিকই বলছি। অবিশ্বাস হলে হুজুর আমাকে আরেকবার খাইয়ে দেখতে পারেন।'

সন্তোষ রায়ের কথাটি সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন নবাব বাহাদুর। পরদিনই নবাব খাওয়াবার উদ্যোগ করলেন। এবং নিজে বসে বসে দেখলেন খাওয়া। সন্তোষ

রায় এদিনও অত্যান্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। না একটু ভাত, না এক-টুকরো মাংস—কিছুই পড়ে রইল না তাঁর পাতে। যা ছিল সব চেটে-পুটে খেয়ে নিলেন।

এই খাওয়া দেখে নবাব আনন্দে গদগদ হয়ে পড়লেন। সন্তোষ রায়কে বললেন, 'ভারি খুশি হলাম, রায়মশাই, আপনার এ খাওয়া দেখে। তা এতখানি যাঁর আহার, তিনি যে আমার রাজস্ব বকেয়া রাখবেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই আপনার বাকি খাজনা মকুব করে আপনাকে এখনই আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর আপনার যাতে কখনো আহারে টানাটানি না পড়ে তার জন্য আলাদা একটি মহল লিখে দিচ্ছি। এ হবে আপনার খোরাকী মহল।'

না, নবাব বাহাদুর আর দেরী করলেন না। ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি 'আবজা-খালী' নামে একটি মহল ছিল সেকালে। সেই মহলটি ব্রহ্মোত্তর হিসাবে তাঁকে দান করে দিলেন। লোকের মুখে মুখে এর নাম হয়ে গেল খোরাকী মহল।

এই হল সন্তোষ রায়। ইনি যে কেবল নিজে খেতে ভালোবাসতেন, তা নয়। এঁর আনন্দ ছিল সকলকে খাওয়াতে। তাই এঁর দান-ধ্যান ছিল অনেক। শোনা যায় লক্ষ বিঘে জমি ইনি দান করেছিলেন চারমেলের ব্রাহ্মণদের। এবং যথার্থ কুলীনদের। এই সব ব্রাহ্মণদের নিয়ে অত্যন্ত সরলভাবে তিনি যাপন করতেন জীবন। জাঁকজমক বা অকারণ আড়ম্বর সমারোহ কখনও তিনি পছন্দ করতেন না।

শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার কালীঘাটে এসেছিলেন রাজকীয় সমারোহে। আর সেই সমারোহ নিয়েই দেখা করতে এলেন সন্তোষ রায়ের সঙ্গে। মহারাজা ধীরে ধীরে এগোন। তাঁর আগে পিছে চলে আশা-শোটা, নকীব, বরকন্দাজ, হাতী-ঘোড়া-পাল্কি ইত্যাদি। সন্তোষ রায় সামান্য বেশে ও সাধারণভাবে দেখা দিলেন রাজার কাছে। সঙ্গে ছিল গুটিকয়েক আত্মীয় এবং দুয়েকটি চাকর। এ সরলতা দেখে রাজার তরফের কে একজন যেন বলে বসলেন 'কি ব্যাপার, সন্তোষ রায়ের এ অবস্থা কেন? লক্ষ লক্ষ বিঘে জমি যিনি দান করেন ব্রাহ্মণদের, মস্ত যাঁর জমিদারী, তাঁর এমন দশা? কোথায় গেল তাঁর আশা-শোটা, বরকন্দাজ আর হাতী-ঘোড়া-পাল্কি?'

প্রশ্নটি শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন সন্তোষ রায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক পাঠালেন চারমেলের ব্রাহ্মণদের। এনে হাজির করলেন কুলীন-সন্তানদের। দেখিয়ে বললেন, 'মহারাজ! এরাই আমার আশাশোটা আর বরকন্দাজ। এরাই আমার হাতী-ঘোড়া উট-পাল্কি।'

এরকম অভাবিত উত্তর যে পাওয়া যাবে, মহারাজ তা আদৌ আশা করেন নি। তাই লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

কালীঘাট মন্দির থেকে প্রত্যাবর্তন (একটি পুরোন ছবি)

যাই হোক, এই হল সন্তোষ রায়। অনেক কিংবদন্তীর তিনি নায়ক। অনেক গল্প তাঁকে ঘিরে। এবং বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সত্যিসত্যিই নানা নায়কোচিত গুণের সমাবেশ ছিল তাঁর চরিত্রে। ব্রাহ্মণদের প্রতি তিনি ছিলেন ভক্তিমান। দীনের আশ্রয়দাতা। আশ্রিতকে রক্ষা করতেন তিনি সর্বদা। দরকার হলে সকল শক্তি দিয়ে। আর কালীঘাটের কালীর ছিলেন তিনি একান্ত সেবক।

তাঁর আয়ুষ্কালও ছিল সুদীর্ঘ। আলীবর্দীর আমলে তাঁর যৌবন, আর তাঁর বার্ধক্য নেমে আসে কর্ণওয়ালিস-জনশোরের কলকাতায়। অনেক সামাজিক পরিবর্তনের তিনি ছিলেন সাক্ষী। দেখেছিলেন তিনি অনেক ওঠা-নামা। দিনে দিনে তাঁরই সামনে বিকশিত হতে দেখেছেন কালীঘাটের মহিমা।—তবে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরটি তখন ভালো ছিল না। একটু একটু করে আসছিল জীর্ণ হয়ে। সেবক সন্তোষ রায়ের ইচ্ছা ছিল তিনি মায়ের জন্য একটি সুন্দর মন্দির করে দেবেন, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তিনি তা পেরে ওঠেন নি। শেষ জীবনে এটুকুই ছিল তাঁর দুঃখের। অথচ সহর কলকাতায় আকাশে-বাতাসে সেদিন উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা। অজস্র টাকা। বাবুদের বিলাসে ও রাজাদের খেয়ালে কত টাকাই না ব্যয়িত হয়।

সে সব টাকার সামান্য একটু অংশ পাওয়া গেলেই মায়ের যে মন্দির তৈরী হয়ে যেতে পারত, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বৃদ্ধ সন্তোষ রায় দান করেই ফতুর। তবু মায়ের মন্দিরের জন্য কখনো এরকম চিন্তা করতেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

*

এদিকে সহর কলকাতায় সেদিন যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল, তার একটু সামান্য ইতিহাস নেওয়া যাক। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে জন কোম্পানী দিনে দিনে যেন ফুলে উঠতে থাকল। তার এ সমৃদ্ধির দিনে প্রায়ই সে আসত মায়ের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে পাঁঠা কোলে করে। বলি দান দেওয়া হত, আর পুজো দেওয়া হত জাঁকজমক করে। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিতেন এ পুজো এবং তাঁর কৃপাতেই কোম-পানি একদিন বসল রাজা হয়ে।

এ নতুন রাজার অনুগ্রহে অনেক সাধারণ লোকের ভাগ্যও বদলে গেল।

বনেদী বড়োলোকদের বাড়ির পাশে হঠাৎ বিকশিত হয়ে উঠল হঠাৎ-বাবুদের জমকালো ঐশ্বর্য। দেখা দিল নিত্য-নতুন বাড়ি। বাবুদের নতুন নতুন খেয়াল। এবং বিলাসিতা।

শোভাবাজারের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণের কথাই ধরা যাক। পলাশীর যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন সামান্য একজন ব্যক্তি। যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব থেকেই তাঁর বরাত খুলতে আরম্ভ করল। এঁর পূর্বপুরুষ মুখল সরকারের অধীনে কাজ করে উপাধি পেয়েছিলেন, ব্যবহর্তা। আনুমানিক সতেরোশ বত্রিশ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল নবকৃষ্ণের। ছেলেবেলাতেই তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফরাসী-উর্দু। পরে ইংরেজি। রাজা সুখময় রায়ের মাতামহ ধনকুবের লক্ষ্মীকান্ত ধরের কাছে প্রথম যৌবনে ইনি কাজ করতেন। ধর মশায় ছিলেন সেকালের একজন নামকরা ধনী ব্যক্তি। জবচার্নকের সঙ্গে হুগলী থেকে সুতানুটিতে এসে বসবাস করেন—এ ধরনের জনশ্রুতি আছে। পলাশীর যুদ্ধের আগে ক্লাইব সাহেব এঁর পোস্তার বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। আসতেন নানারকম কাজে, এমন কি কোমপানির হয়ে টাকা ধার নিতেও। শোনা যায়, ধর মশায় সেকালের কোমপানিকে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ন লাখ টাকা ধার দিয়েছিলেন। আর নবকৃষ্ণকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ক্লাইবের সঙ্গে। এবং এই ক্লাইবের মাধ্যমে নবকৃষ্ণ চেনেন ভ্রেক-হলওয়েল-ওয়ারেন হেস্টিংস্-কে।

এর ফলে জনকোমপানি ও নবকৃষ্ণ উভয়েই হলেন লাভবান। নিদারুণ দুর্দিনে অনেক বিপদের হাত থেকে কোমপানিকে বাঁচিয়েছিলেন এই নবকৃষ্ণ। মুন্সী হিসেবে ষাট টাকা মাইনে পেতেন ইনি প্রথমে। সে সময় অনেক গোপন চিঠি তিনি মুশাবিদা করেছিলেন। সতেরোশ ছাপ্পান্নতে সিরাজ-উদ্দৌলার হাতে মার খেয়ে ইংরেজরা যখন একান্ত অসহায় অবস্থায় আশ্রয় নিল ফলতায়, তখন এই নবকৃষ্ণই জীবন তুচ্ছ করে একটানা ছয় মাস ধরে রসদ যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাদের। আর তাঁরই পাঠানো গোপন খবরে নির্ভর করে কলকাতা উদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন ক্লাইভ।

সুতরাং দুর্দিনের এ বন্ধুকে ইংরেজরা কি ভুলতে পারে?—পারে নি। তাদের ভাগ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হল নবকৃষ্ণের ভাগ্যও। নবাবের ধনাগার লুণ্ঠনে ক্লাইব সাহেবের সঙ্গে তিনিও চললেন সঙ্গী হয়ে। জনশ্রুতি আছে, মুর্শিদাবাদের কোষাগার থেকে লুঠ করা কয়েক কোটি টাকা মূল্যের সোনা-রুপো মণি-মাণিক্যের অধিকারী হয়েছিলেন তিনিও। আরো নানা-রকম উপায়ে তিনি যে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন, সে সব কথা না তোলাই ভালো?

এইভাবেই দেখতে দেখতে অতি অল্প সময়ের ভেতর 'ব্যবহর্তা' বংশের ছেলে 'রাজা' হলেন। ক্লাইব সাহেব সত্যি-সত্যিই সম্রাট সাহ আলমের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি আনিয়ে দিলেন। শুধু কাগজে-কলমের রাজা নয়, পেলেন দশ হাজারী মনসবদারের অধিকার। ঘোড়াশালায় ঘোড়া হল, হাতীশালায় হাতী। তৈরী হল নতুন রাজার নতুন প্রাসাদ। এর নাম, শোভাবাজার। লোক-লস্কর, পাইক-বরন্দাজে এ বাড়ি সর্বদাই থাকত গমগম করতে।

সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বলল, হ্যাঁ, সত্যিসত্যিই রাজা বটে। বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এলেন। জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের মত জাকসাইটে পণ্ডিতেরা অলঙ্কৃত করলেন তাঁর সভা।

সবই হল। তবু তৃপ্তি নেই। তৃপ্তি নেই কেন? —কলকাতার বনেদী ধনী সমাজ এই হঠাৎ-রাজাকে স্বীকৃতি দিল না। রাজায় রাজায় রেষারেষি যেমন চলে, অন্তরঙ্গ হল সে রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একদিকে বনেদিআনা, অন্যদিকে হঠাৎ-বাবুদের খেয়ালিপনা। একদিকে অবজ্ঞা, আর অপর-দিকে প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বার দাবী, এই নিয়ে বেড়ে চলল উত্তেজনা। জমল নাটক।

সেকালে পোস্তার লক্ষ্মীকান্ত ধরের মতই ধনী ছিল হাটখোলার দত্তরা। যেমনি ছিল এঁদের অঢেল অর্থ, তেমনি ছিল অপরিমিত অপব্যয়। দত্তদের সারা বাড়িটি মোহা হত আতর দিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার জন্য এঁদের বাড়িতে ব্যবহৃত হত সোনা-রুপোর থালা বাটি। এবং সে থালাবাটি পেতল-কাঁসার মত যেখানে সেখানে পড়ে থাকত। বাবুরাও ছিলেন ভীষণ আয়েসী। পাড়ের কর্কশতায় তাঁদের বাবুআনি ব্যথিত হত বলে, তাঁরা পাড় ছিঁড়ে কাপড় পরতেন।

এই ছিল হাটখোলার দত্তদের অবস্থা। তাঁদের সংসারে থেকে কত লোক যে অবস্থা-গুছিয়ে নিত, তার হিসাব নেওয়া কঠিন। এবং দানে-দাক্ষিণ্যে দত্তরা ছিল সত্যি-সত্যি বদান্য। এঁদের বাড়িতে সামান্য কাজ কর'তে করতে কিভাবে একজন ধনী হতে পারেন. তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন রামদুলাল দেব ওরফে রামদুলাল সরকার।

এই রামদুলাল ছিলেন ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাবা। মদনমোহন দত্তের কাছে বিল সরকার হিসাবে কাজ করতেন পাঁচ টাকার মাইনেতে। কয়েক বছর পরে প্রমোশন হল। মাইনে হল দশ টাকা। তখন তিনি কাজ আরম্ভ করলেন জাহাজ সরকারের। টুল্লো কোমপানির অফিসে তিনি একদিন প্রভুর অনুমতি ছাড়াই একটি ডাক দিয়ে বসেছিলেন নিলামের। একটি জলমগ্ন জাহাজ বিক্রয় হচ্ছিল। চোদ্দ হাজার টাকায় প্রভুর পক্ষে সেটি কিনে নিচ্ছিলেন রামদুলাল। হঠাৎ সেখানে নাটকীয়ভাবে এক সাহেব ঢুকলেন। এবং কোমপানির ঘরে রাম-দুলালের টাকা জমা পড়ার আগেই, সেটি সাহেব রামদুলালের কাছ থেকে কিনে নিলেন এক লাখ টাকায়। রামদুলাল সেদিন খুব খুশি মনেই এ লাভের টাকা এনে দিলেন প্রভুর হাতে তুলে। একপয়সাও খরচ না করে এক লাখ টাকা রোজগার, একি কম কথা!

হাটখোলার দত্ত মশাই অবাক হয়ে গেলেন রামদুলালের সততায়। কেননা, এ টাকা রামদুলালের বুদ্ধিতেই অর্জিত। দত্তবাবুর অর্থে নয়। এবং এ টাকা কোনো জাহাজ-সরকারই প্রভুর হাতে তুলে দেয় না। দত্তমশাই তাই সন্তুষ্ট হলেন। সব টাকাটাই তিনি খুশি মনে তুলে দিলেন রামদুলালের হাতে। রামদুলালও অবশ্য মর্যাদা রেখেছিলেন এ টাকার। অনেক দান ধ্যান করেছিলেন। আর মৃত্যুকালে এই পাঁচ টাকা মাইনের বিল সরকার তাঁর ছেলেদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন এক কোটি বাইশ লক্ষ টাকা। আর রেখে গিয়েছিলেন দত্তদের প্রতি চিরকালীন আনুগত্য।

*

কালীঘাটের কালীমন্দিরের সঙ্গে এসব কাহিনীর অবশ্য কোনো যোগ নেই। বাবুদের যে ক্ষীণ যোগ ছিল, তা হল কালীর সঙ্গে। কেননা, এসব সেকালের বাবুরা মাঝে-মাঝেই ঢাকঢোল বাজিয়ে পুজো দিয়ে আসতেন কালীঘাটে। দেখতেন কালীঘাটের জীর্ণ মন্দির। নতুন করে সে মন্দির তৈরী করা দরকার এ সব ধনকুবেরেরা কোনোদিন ভাবতেন না। কোনোদিন না। আসতেন মল্লিকরা। পাইকপাড়ার রাজারা। কেউ দিতেন সোনার মুকুট। কেউবা রুপোর হাত। সোনার ছাতাও মা একবার পেয়েছিলেন।

শোভাবাজার থেকেও এ ধরনের পুজোই আসত। সে পুজোয় খুবই ঢাকঢোল বাজত।

কিন্তু কে জানত, বাবুদের কলহের ভেতর দিয়ে মন্দির তৈরীর ভূমিকা তৈরী হচ্ছে! কে জানত, এ রেষারেষির ভেতর এসে দাঁড়াবেন বুদ্ধ সন্তোষ রায় এবং হাটখোলার দত্তদের প্রতি কৃতজ্ঞ মানুষ রামদুলাল সরকার!

যাই হোক, আগের কথা আগে বলে নেওয়া দরকার। এবং সে কথা বলতে গেলে শোভাবাজারের রাজবাড়ির কাছেই হাট-খোলার দত্তবংশীয় যে চূড়ামণি দত্ত থাকতেন তাঁকে নিয়েও দুকলম লেখা দরকার।

হঠাৎ-রাজা নবকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করতেন না চূড়ামণি। কোনো রকমেই না। বরং সর্বদাই চেষ্টা করতেন যাতে নবকে হেয় করা যায়। তাই কারণে অ-কারণে বাঁধিয়ে বসতেন বিবাদ। লাগিয়ে দিতেন ঝগড়া। কায়স্থ সন্তান চূড়ামণি এ সব খেয়ালে পয়সা খরচ করতে দ্বিধা করতেন না। ভালোবাসতেন ঝগড়া।

একবার পারিবারিক একটি অনুষ্ঠান বসেছে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। সুন্দর করে সাজানো হয়েছে বাড়ি। ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে প্রাসাদ। অতিথিরা আসছেন একে একে। বহুমূল্য গালিচা, কিংখাপের সমারোহ এবং আলোর ঐশ্বর্যে অনেকেরই চোখ যাচ্ছে ধাঁধিয়ে।—সে সভায় চূড়ামণি দত্তের মেয়েও ছিলেন নিমন্ত্রিত। এলেন তিনি। আর কি আশ্চর্য, সে সভার চূড়ো দত্তের মেয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলে গেল গোটা মণ্ডপের। মাথার ওপর ছিল লাল রঙের সামিয়ানা। মুহূর্তের ভেতর সেটি ময়ূরপঙ্খীর রঙ ধারণ করল। আর চারদিক থেকেই বেরোতে থাকল এক আশ্চর্য জ্যোতি। সকলে অবাক। মহিলারা হতবাক। রাজা নবকৃষ্ণ নিজেও কৌতূহলী হলেন। এবং জানলেন যে চূড়ো দত্তের মেয়ের হাতে

একটি আশ্চর্য অঙ্গুরীয় আছে। তাতে খচিত আছে বহুমূল্য নীলকান্তমণি। সেই মণির প্রভাবেই ঘটেছে এ বর্ণবিপর্যয়।

রাজা নবকৃষ্ণ হাতে তুলে দেখলেন আঙটিটি এবং নীলকান্তমণি। তারপর অনেক প্রশংসা করে চূড়ো দত্তের মেয়ের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন সেটি।

এদিকে মেয়ে যথাসময়ে বাড়ি ফি'রে সব কথা চূড়ো দত্তের কাছে নিবেদন করলেন। চূড়ো দত্ত লুফে নিলেন সুযোগটি। পরের-দিন আরো পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে আঙটিটি উপঢৌকন পাঠালেন নবকৃষ্ণের কাছে। অর্থাৎ কানমলে যেন জানিয়ে দিলেন, 'বাছারে, এ সব জিনিসতো সাতপুরুষে দেখোনি। এখন দেখে চক্ষু সার্থক কর।'

রুচির সূক্ষ্ম লড়াইয়ে বেচারি নবকে হার স্বীকার করতেই হল।

আরেকবার এক ব্রাহ্মণ এসেছিল শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। হাতে একটি ছোট পাথর বাটি। রাজবাড়িতে ঢোকার পর তার দেখা হয়ে গেল নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গোপীমোহনের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ কাতর হয়ে রাজপুত্রের কাছে নিবেদন করল, 'প্রভু, আমার ছেলের কানে ব্যথা। সম্ভবতঃ কান পেকেছে। যদি এক ফোঁটা পচা আতরও দেন, তবে বড়ো উপকার হয়। বেচারি কানে লাগাতে পারে।'

ব্রাহ্মণের এ প্রার্থনা শুনে হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল রাজকুমারের মাথায়। কৌতুক করে বলল, 'ঠাকুর, এখানে এসে তোমার বেশ সুবিধা হবে না। তুমি বরং যাও চূড়ো দত্তের কাছে। বাবুর বাড়িতে অঢেল আতর। তবে তাঁর মেজাজটি বড়োই চড়া। ঐ ছোট পাথরের বাটি নিয়ে গেলে তিনি ভীষণ রেগে যাবেন। তাঁর কাছে যাও, তবে সঙ্গে নিয়ে যাও একটি কলসী।'

ব্রাহ্মণটি ছিল সরল চিত্ত। সে তাই করল। কলসী নিয়ে গুটি গুটি গিয়ে হাজির হল এবং সব কথা নিবেদন করল চূড়ো দত্তের কাছে।

চূড়ো দত্ত সে সময় তেল মাখছিলেন বসে বসে একটু বাদেই হয়ত যাবেন চান করতে ব্রাহ্মণের কথা শুনে হেসে উঠলেন তিনি হা-হা করে। তারপর আদুরে ছেলে কালীপ্রসাদকে ডাকলেন। বললেন, 'গন্ধী আতরওয়ালাকে এখনই ডেকে পাঠা, কালী। এখনই। এই ব্রাহ্মণকে এক কলসী আতর এনে দে। এ আতর দেওয়ার পর আমি চান করব।'

চূড়ো দত্ত বয়সে কিছু বড়ো ছিলেন নবকৃষ্ণের থেকে। তাই রাজা হলেও শোভা-বাজারের মালিককে তিনি নাম ধরে 'নব' বলেই ডাকতেন। এবার ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'দেখ ঠাকুর, তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে যে, ঐ গপ্পী ছেলেমানুষ। তুমি বরং এ আতরটা নবকে গিয়ে দেখিয়ে এসো; বোলো যে আমি দিয়েছি।'

যথারীতি ব্রাহ্মণ এ কলসী নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এলো নবকৃষ্ণকে। তারপর ফিরে এলো চূড়োর কাছে। চূড়ো ব্রাহ্মণকে বললেন, 'ঠাকুর, এত টাকার আতর নিয়ে কি করবে তুমি? এ আতরের দাম আড়াই হাজার টাকা। তুমি বরং আড়াই হাজার টাকা নিয়ে যাও, আর নিয়ে যাও প্রয়োজনমত সামান্য একটু আতর। এতে তোমার উপকার হবে।'

ব্রাহ্মণ তাই করল। বাড়ি গেল সে আশীর্বাদ করতে করতে। আর এদিকে রাজা ধমকাতে আরম্ভ করলেন গোপী-মোহনকে ডেকে।

এইভাবে নিত্য লেগে থাকত রেষা-রেষি। নিত্য। ছেলেদের মধ্যেও ছিল প্রতি-যোগিতা এবং তাও রোমাঞ্চকর। সেকালের বাবুরা যে ধরনের বাবুগিরি ও বিলাসিতা পছন্দ করতেন, এ'দের গতি ছিল সেদিকে। নবাবী জাঁকজমক আর আমিরী মেজাজ ভালোবাসতেন এ'রা।

সেকালের কলকাতায় বিবি আনার নামে ছিল এক পরমাসুন্দরী মুসলমান রমণী। সে বিবির রূপের রোশনাইয়ে অনেকেরই চোখ গিয়েছিল ধাঁধিয়ে। অনেক বাবুই চেয়েছিল সেই পঞ্চদশী বিবিকে আয়ত্ত করতে, কিন্তু সকলকে হটিয়ে দিয়ে তাকে করায়ত্ত করতে পেরেছিল যে সে আর কেউ নয়, চূড়ো দত্তের ছেলে কালীপ্রসাদ। লক্ষ্ণৌ ফ্যাশানে তার মত রপ্ত ছিল না কেউ সহর কলকাতায়। সে ছিল যেমনি বিলাসী, তেমনি কেতা দুরস্ত। চুড়িদার পায়জামা ও রামজামা পরে, কোমরে দো-পাট্টা বেঁধে এবং মাথায় বাঁকাটুপি হেলিয়ে দিয়ে বাবু কালীপ্রসাদ যখন পথে বেরত তখন পথের লোক 'আহা আহা!' করে উঠত। সাড়া পড়ে যেত খামটা ও বাইজী মহলে।

বিবি আনারকে নিয়ে বাবু কালীপ্রসাদ রীতিমত সাড়া তুলেছিল সেকালে। তার কাছেই অনেক নিশুতি রাত পর্যন্ত পড়ে থাকত বাবু। কখনো বা রাত কাটাত অকুস্থলেই। যবনীর সঙ্গে উত্তরোল হয়ে উঠত অনেক মধুর রাত।

ওদিকে নবকৃষ্ণের ঔরসজাত পুত্র রাজ-কৃষ্ণের যবনীবিলাসও ছিল নামকরা। চূড়োর ছেলে কালীপ্রসাদের সঙ্গে এ খেয়াল যেন চলত পাল্লা দিয়ে। কেবল যবনী সহবাস নয়, মুসলমান বাবুর্চি ছাড়া বাবুর আহার্য ভালো লাগত না। তাঁর সকল সভাসদ ও সহচর ছিল মুসলমান। শুধু কি তাই? গান লিখতেন তিনি মহরমের। এবং মহরমের শোভাযাত্রায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তিনি চলতেন সকলের আগে। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর উত্তরোত্তর বেড়েই গেল এ বিলাস।

যাইহোক পাল্লা দিয়ে বংশানুক্রমে এইভাবেই রেষারেষি চলছিল রাজবাড়িতে দত্তবাড়িতে। চলছিল মনকষাকষি। এই 'টাগ অব ওয়ার' যখন চরমে ঠিক সেই সময় শোভাবাজারকে অনাথ করে দিয়ে দুম করে মারা গেলেন নবকৃষ্ণ স্বয়ং। সেবার সতেরোশ সাতানব্বই সাল। শীতকাল। নভেম্বর মাসের বাইশ তারিখ। দুপুরে বেলা খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম কর-ছিলেন রাজা মশাই। হঠাৎ এলো ঘুম। কাল ঘুম। বেলা দুটো নাগাদ চাকর ডাকতে এসে দেখে যে রাজামশাই মরে কাঠ। ঠিক কখন যে মারা গেছেন তার ঠিক নেই।

সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ল চার-দিকে। রাজার সাতরাণী কেঁদে আকুল। কিন্তু ওদিকে! ওদিকে হাসতে থাকল শত্রু। কেননা, এ মৃত্যু সেকালে ছিল খুবই নিন্দনীয়। এ আবার মৃত্যু নাকি? অর্ধেক দেহ শোয়ান থাকল না গঙ্গাজলে, কানের কাছে নাম করল না কেউ ঠাকুর দেবতার,—অঙ্গে রইল না হরিনামামৃত, সুতরাং এ আবার মৃত্যু নাকি। —তাই রাজার এ মৃত্যুতে রাজবাড়িতে যতই শোকের ছায়া পড়ুক না কেন, বাইরেতে ছড়িয়ে পড়ল চাপা কেচ্ছা! এবং সে খবর যথাসময়ে পৌঁছুল গিয়ে রাজবাড়িতে।

এদিকে চূড়ো দত্ত দীর্ঘদিন ছিলেন অসুস্থ। তিনি নবকৃষ্ণের এ মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন চ্যালেঞ্জ হিসাবে। সার্থক মৃত্যু কাকে বলে তা দেখাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন মনে মনে।

কিছুদিন পরে যখন তিনি খুবই দুর্বল বোধ করলেন, তখন ডেকে পাঠালেন পুত্র কালীপ্রসাদকে। বললেন, 'বাবা, আমার কাল আরো ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কর।'

কালী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'কি ইচ্ছে, বাবা?'

চূড়ো দত্ত বললেন, আমার অন্তর্জলী যাত্রার ব্যবস্থা কর। আমি একটি গান লিখেছি, এ গানটি গাইতে গাইতে নিয়ে চল আমাকে শোভাবাজারের রাজবাড়ির সামনে দিয়ে।'

ব্যস, যে কথা সেই কাজ। ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চূড়ো দত্ত চললেন গঙ্গায়। বসানো হল তাঁকে কিংখাপের গদিতে, রূপোর চতুর্দোলায়। আগে পিছে চলল ঢাক-ঢোল আর খোল-কত্তাল। দলে দলে লোক চলল লাল পতাকা নিয়ে। চতুর্দোলার মাথায় রইল নামাবলীর চন্দ্রা-তপ। তুলসীমালার ঝালর। আর চারদিকে তুলসী গাছ। চূড়ো দত্ত রক্ত রংয়ের চেলী পরে, নামাবলী গায়ে জড়িয়ে এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন জপের মালা নিয়ে। ওদিকে কীর্তনের সুরে গায়করা গান ধরল:

জগৎ জিনিয়া চূড়া—যম জিনিতে যায়।
ও নবা, তুই দেখবি যদি আয়।
আয়রে আয়--নগরবাসী! দেখবি যদি আয়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়ো, যম জিনিতে যায়।
জপ-তপ কর কি, মরতে জানলে হয়।
ও নবা, তুই দেখবি যদি আয়!

রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে দত্তমশায়ের লোকেরা এ গান গাইল। নবকৃষ্ণের মৃত্যু

আত্মার প্রতি এ অবজ্ঞা এবং মৃত্যুর প্রতি কটাক্ষ অনেকের কাছেই হয়ে উঠল অসহ্য। তবু সেদিনের এ অপমান নীরবে সহ্য করল রাজবাড়ি। এবং প্রতিশোধের জন্য রইল অধীর প্রতীক্ষায়। উপযুক্ত মুহূর্তের সন্ধানে।

এদিকে বুড়ো চুড়ো দত্ত মারা গেলেন যথাসময়ে। আর তারপর সাজো সাজো পড়ে গেল শ্রাদ্ধের জন্য। বিবি আনারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে কয়েক দিনের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হন কালীপ্রসাদ।

*

সেকালের বাবুদের যা কিছু গৌরব তা সাধারণতঃ প্রকাশ পেত শ্রাদ্ধের আড়ম্বরে। লাখ লাখ টাকা ব্যয়িত হত এ অনুষ্ঠানে। অজস্র লোককে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করা হত। বিদায় দেওয়া হত দেশ-দেশান্তরের ব্রাহ্মণদের। মোট কথা, সে এক এলাহি ব্যাপার ঘটে যেত।

আর এ অনুষ্ঠানকে যদি কোন রকমে পণ্ড করে দেওয়া যেত, তবে তার থেকে শত্রুপক্ষের পক্ষে সুখের ব্যাপার আর কিছুই ছিল না। শোভাবাজার অন্য কোনো পথ না পেয়ে, বেছে নিল এই নিকৃষ্ট রাস্তা। বিবি আনারের সঙ্গে কালীপ্রসাদের সম্পর্ক তুলে তাঁরা এ শ্রাদ্ধ বয়কট করতে উদ্যত হলেন। সহরের ঘরে ঘরে আড্ডায় এবং বাবুদের আসরে আসরে উতরোল হয়ে উঠল কালীপ্রসাদের কুৎসা! এমন কি তৈরী হল নতুন নতুন গান। পাড়ায় পাড়ায় শোনা গেল, 'গেল গেল হিন্দুয়ানী!'

সহরের কায়স্থকুল বেঁকে বসল। কালীপ্রসাদ নিরুপায় হয়ে বসে পাড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। উপায়? —কি উপায় হবে? সবই কি তা' হলে পণ্ড হয়ে যাবে?

ঠিক এমনি যখন অবস্থা, তখন ডাক পড়ল দত্তবাড়ির সেই হিতৈষী মানুষটির। অর্থাৎ রামদুলাল সরকারের। রামদুলাল সে-দিন সমাজের মাথা। বিত্তেও তিনি অনেকের ওপরে। সব কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'বটে! এই ব্যাপার! কালীপ্রসাদকে নিয়ে ওরা চায় হাঙ্গামা বাধাতে? বেশ ঠিক আছে। দেখা যাবে।' তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে পাড়ার মাতব্বরদের ডেকে বলেছিলেন হেসে, 'ভায়া হে, জাত আমাদের বাকসের ভেতর। বাকস থেকে টাকা বের করে ছড়িয়ে দিতে পারলেই সব ব্যাটা চুপ!'

রামদুলাল কেবল কথা বলেই নিরস্ত থাকেননি, লেগে গেলেন কাজে। পরের দিন অতি প্রত্যুষে নৌকো করে পাড়ি দিলেন দক্ষিণের দিকে। প্রথমে গিয়ে পৌঁছুলেন কালীঘাট। সেখানে মায়ের পুজো দিলেন। তারপর সেখান থেকে সোজা গিয়ে উঠলেন কালীর সেবাইত ও পরমভক্ত সন্তোষ রায়ের কাছে। সেই সন্তোষ রায়, যিনি গোটা পাঁঠা খেয়ে চমকে দিয়েছিলেন আলীবর্দীকে। আর পেয়েছিলেন খোরাকী মহল।

সন্তোষ রায় তখন বৃদ্ধ। শালপ্রাংশু মহাভুজ সেদিন লোলচর্মধারী। তবু সন্তোষ রায় মানেই সন্তোষ রায়। মরা হাতী লাখ টাকা। তখনো তাঁর ডাকে হাজার হাজার লোক এসে একত্র হয়। ওঠে বসে তারা সন্তোষ রায়ের কথায়।

গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে তিনি শুনলেন সব কথা। রামদুলাল নরমে-গরমে পরিবেশন করলেন রাজবাড়ির শত্রুতার বিবরণী। কায়স্থ সমাজের বিরূপতার কথা। এবং সব তথ্য নিবেদন করে প্রার্থনা করলেন আশ্রয়।

আশ্রয় দিলেন সন্তোষ রায়। বললেন, 'চিন্তা নেই। আমার ব্রহ্মোত্তর ভোগী ব্রাহ্মণ আছে হাজার হাজার। তারা যাবে শ্রাদ্ধে।'

সত্যি সত্যিই হাজারে হাজারে ব্রাহ্মণ এলো শ্রাদ্ধের দিন। এলো অনেক কায়স্থ সন্তানও। রামদুলাল সরকার রসিয়ে রসিয়ে বললেন বড়ো বড়ো মাতব্বরদের: 'ভায়া হে, জাত আমাদের বাকসের ভেতর, কি বল? টাকা ঢাললেই সব মিটে যায়!'

স্বয়ং সন্তোষ রায়ও এলেন বড়িশা থেকে। কালীপ্রসাদ শ্রাদ্ধ শেষে সন্তোষ রায়কে প্রণাম করে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন ব্রাহ্মণ বিদায়ের জন্য।

সন্তোষ রায় হাহা করে হেসে উঠলেন। ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন, কালীপ্রসাদ আপনাদের বিদায়ের জন্য অনেক টাকা দিয়েছে। অনেক টাকা। এ টাকা কি আপনারা নেবেন? যদি নেন, লোকে বলবে টাকার লোভে পড়ে এই বামুনঠাকুররা এক পতিত-ব্যক্তির পণ্ড পিতৃশ্রাদ্ধ উদ্ধার করেছে। এই অপবাদ কি ভালো হবে? তার চেয়ে বরং একটি ভালো কাজে লাগানো যাক টাকাটা। —কি বলেন?'

কি ভালো কাজ? সকলের মনেই উদ্যত হয়ে উঠল এ প্রশ্ন।

সন্তোষ রায় বললেন, 'আসুন, এ টাকা দিয়ে আমরা কালীঘাটে মায়ের একটা ভালো মন্দির বানিয়ে দিই, কি বলেন?'

সন্তোষ রায়ের কথায় সকলে সাধু-সাধু' বলে উঠল। রামদুলাল বললেন, 'এই না হলে সন্তোষ রায়!' সন্তোষ রায় বললেন, রাদার হে, এই হল আমার আসার খোরাকি!'

*

এরপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। রাজায় রাজায় রেষারেষি এবং কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা এসে শেষ হল কালীঘাটের মন্দিরে। শ্রাদ্ধ যে মন্দির পর্যন্ত গড়াবে তা কে জানত? চুড়ো দত্ত বা নবকৃষ্ণ কেউই জানতেন না যে তাঁরা দলাদলি করে পরোক্ষ-ভাবে কাজ করে চলেছেন মায়ের। আর কালীপ্রসাদের নাম সার্থক হল মায়ের কৃপা থেকে বঞ্চিত না হয়ে। এবং মায়ের সেবার লেগে। প্রসাদ পেয়ে।

সেকালের মন্দিরের চারদিকে পঁচিশ পঁচানব্বই বিঘে জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেছিলেন সন্তোষ রায়। এখন সে মন্দিরের মাঝখানে আট কাঠা জায়গার ওপর তৈরী হল নতুন মন্দির। মন্দিরটি তৈরী হতে সময় লাগল আট বছর। এবং অর্থ লাগল তিরিশ হাজার টাকারও বেশি। ষাট হাত পরিমাণ করা হল মন্দিরের উচ্চতা। আর ভেতরে পরিসর রাখা হল পঞ্চাশ হাতের মতন।

এ মন্দির তৈরী করতে করতেই একদিন দেহ রাখলেন সন্তোষ রায়।

সন্তোষ রায়ের অসমাপ্ত কাজ সমাধা করলেন তাঁর পুত্র রামলাল রায়। এ ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন। এঁদের তত্ত্বাবধানে নির্মাণের কাজ শেষ হল। —সেদিনের তারিখ? —তখন উনিশ শতক এসে গেছে। সেদিনের তারিখ আঠারোশ ন সাল।

মায়ের নতুন ভক্তরা নতুন মন্দিরে চলল পুজো দিতে। এ পুজোর সময় সশরীরে চুড়ো দত্ত বা নবকৃষ্ণ কেউই উপস্থিত ছিলেন না বটে, ছিলেন না সন্তোষ রায়ও, কিন্তু তাঁদের বৈদেহী আত্মা যে এই পুজো দেখে তৃপ্ত হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কি?

মনের কথা

ভ্রান্তির শারীরবৃত্ত
সমরবাবুর পরিণতি

ভুল বিশ্বাস, ভ্রান্তি, মোহ (ডিলিউশন) আত্মপ্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ নির্যাতনের প্রসঙ্গে চলে যেতে পারে। কোনো সময় রোগী বলে যে বিশেষ কতকগুলি চেনা লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে, তার খাবারে বিষ মেশাচ্ছে; ইত্যাদি। কোনো কোনো রোগীর নির্যা-তনের ভ্রান্তি আবার অতটা স্পষ্ট নয়। তার ক্ষতি করবে, তাকে জব্দ করবে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে সবই বলবে, কিন্তু নির্যাতনকারী বা ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত করবে না।

আরো নানা ধরনের ভ্রান্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। হীনমন্যতার ভ্রান্তি, অপরাধ-বোধের ভ্রান্তি, প্রবঞ্চিত হবার ভ্রান্তি, রোগাতংকের ভ্রান্তি, বিশালতা বা চমৎ-কারিত্বের ভ্রান্তি, ইত্যাদি নানা ধরনের ভ্রান্তির রোগীর সংগে চিকিৎসকেরা পরিচিত। বিশেষ বিশেষ রোগীদের কাহিনী প্রসঙ্গে এই সব বিচিত্র ভ্রান্তির বিশদ বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব। বর্তমানে শুধু এই-টুকু জানানো দরকার যে আপাতদৃষ্টিতে ভ্রান্তিরোগ (ডিলিউশন) ও আবেশ (অবসেশন) অনেকটা এক রকমের মনে হলেও, এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য খুবে সহজেই নজরে পড়ে। 'অবসেশনের' রোগী স্বীকার করবে যে ধারণাটা ভুল কিন্তু সে তবু ধারণাটা ছাড়তে পারছে না। অন্য লোক তার পাগলামি নিয়ে আলোচনা করতে যাবে কেন? বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হয়; কিন্তু তবু বিশ্বাসটা বা অভ্যাসটা পালটাতে পারছি না। কিন্তু 'ডিলুইশনের' রোগী এ ধরনের কথা কখনও বলবে না। তার ভ্রান্তির মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। 'অবসেশনের' রোগীর মত সে আত্মসমালোচনা করে না অথবা ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হবার জন্য কোনোদিন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। যুক্তিতর্ক দিয়ে সাময়িকভাবেও তার ভ্রান্তি সম্পর্কে তাকে সজাগ করা যায় না।

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ও মাঝে মাঝে ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে অদ্ভুত আচরণ করে থাকে। মন প্রক্ষোভ-পীড়িত থাকলে তুচ্ছ ঘটনাকে আমরা অতি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ডিলিউসনের ভয়, রাগ, দ্বেষ অনেক সময়েই অবাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনাশ্রয়ী; কিন্তু এই তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষের ভ্রান্তির মূলে সামান্য কোনো কিছু থাকে যেটা সে অনেক বাড়িয়ে দেখে। বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে অবহেলিত হলে, কোনো দলের কাছে মতামতের জন্য সমালোচিত হলে, বা অন্য কারণে অন্তরে আঘাত পেলে, আমরা অনেক সময় সেই ঘটনাটিকে বড় ফলিয়ে দেখি এবং নিজের মনে অযথা কষ্ট পাই। এই সময় অন্য কোনো চিন্তা মনে আসে না। ঐ বন্ধু বা ঐ দল আমার প্রতি অন্য সময় যে ভাল ব্যবহার করেছে, ভালবাসা দেখিয়েছে, আমাকে নানা বিপদে সাহায্য করেছে, সে সব ভুলে গিয়ে আমরা আক্রোশের বশবর্তী হয়ে বন্ধুদের সম্বন্ধে অনেক অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করি, অন্যের কাছে মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে ওদের বিরুদ্ধা-চরণ করার চেষ্টা করি। তাদের প্রত্যেকটি হাবভাব, কথাবার্তা অভিসন্ধিপূর্ণ ও আমাকে অবহেলা করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত; এই রকম মনে করি। 'অবশেষণ'এর রোগী তার আবেশিক চিন্তা থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তি তার সন্দেহ অবিশ্বাস আক্রোশকে জীইয়ে রাখতে চায়। যখন যেখানেই থাকুক, যে কাজই করুক, এরা ঐ একই চিন্তাধারা তাড়িত হতে থাকে। 'ওরা আমাকে অপমান করেছে!' 'ওরা আমাকে দল থেকে তাড়াতে চায়।' 'ভদ্র-লোকটিকে তোমরা যেমন ভালমানুষটি মনে কর, উনি আসলে সে রকম নন। মতলববাজ ও স্বার্থপর।' ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে কয়েক মাস আগেও হয়ত সে বিপরীত মত পোষণ করেছে। এরা সুস্থ মানুষ হিসেবে সমাজে চালু; কিন্তু আমার মনে হয় এদের ঠিক স্বাভাবিক মানুষ বলা চলে না। এরা সব বিষয়েই, বিশেষ করে নিজের প্রসঙ্গে, অতি-রঞ্জিত ধারণা পোষণ করে।

ভ্রান্তি নানা ধরনের মানসিক রোগেই দেখা দিতে পারে। তবে ভ্রান্তির সংগে প্যারানইয়া রোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'প্যারানইয়া' শব্দটি গ্রীক থেকে এসেছে। গোড়াতে সব প্রলাপের রোগী 'প্যারানইয়া' রোগে ভুগছে, এই রকম বলা হত। পরবর্তী-কালে শৃংখলাবদ্ধ একমুখী ভ্রান্ত ধারণা বা চিন্তাকে 'প্যারানইক সিনড্রোম' বলে অভি-হিত করা হয়। প্রথমে এই শৃংখলাবদ্ধ এক-মুখী চিন্তার মধ্যে রোগীর চেনা-অচেনা নানা লোকের উপস্থিতি থাকে; [illegible] এই চিন্তার নাটকে কোনো ভূমিকা [illegible] করতে দেখা যায় না। [illegible] অনেক রোগী নিজেও জড়িয়ে পড়ে, নাটকে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশুদ্ধ প্যারানইয়া রোগীর মায়া (হ্যালুসিনেশন) থাকে না। তাদের ধারণার মধ্যে লজিকের অভাব দেখা যায় না। অবশ্য ধারণার সুরুতেই থাকে কোনো এক অবাস্তব কল্পনা; যেটাকে বাদ দিলে এদের বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে নাও হতে পারে। 'জানালাটা খোলা চলবে না। কেননা সামনের পার্কে সাদা পোশাকে পুলিশ ঘোরা-ফেরা করছে।' 'আমার পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক এক গোপন যন্ত্র বসিয়ে আমাদের পার্টির সকলের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে চলেছে।' আমি 'ক্যানসার'এর প্রতিষেধক অব্যর্থ এক ওষুধ আবিষ্কার করেছি, কিন্তু প্রয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছি না।' এই রকম ধরনের অবাস্তব চিন্তা বা ধারণা দিয়ে সুরু হয়, তারপর কিন্তু রোগীর চিন্তাধারা ও বক্তব্য পুরোপুরি লজিক মেনে চলে। আবার এমন কতকগুলো ধারণা বা বিশ্বাসের কথা রোগী বলতে পারে, যা ডাক্তারের পক্ষে ভ্রান্ত কি সঠিক নির্ণয় করা দুরূহ। শ্যামল-বাবু একজন পুলিশের গুপ্তচর বা সি আই এর এজেন্ট—অমলবাবুর একথা 'ডিলিউশন' না সঠিক:—এ বিচার করা চিকিৎসকের পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। কয়েকদিন কথা বলার পর, এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে আরো বিশদ খবরা-খবর জানবার পর বোঝা যায় একথাগুলো 'প্যারানয়েডের ডিলিউশন' না সন্দেহবাতিকের সন্দেহের অভিব্যক্তি। 'স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত আছে'—স্বামীর এই অভি-যোগ সত্য না মিথ্যা ডাক্তারের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অন্য আচরণের বা কথা-বার্তার অসংগতি না থাকলে এই সব রোগীর রোগ নির্ণয় রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে। 'ডিলিউশন' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় লেখবার চেষ্টা করব। বর্তমানে এর উদ্ভবের কারণ নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক।

'হ্যালুসিনেশন' 'ডিলিউশন' ইত্যাদির উদ্ভব সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট কোনো ধারণায় আসতে পেরেছেন, বলে মনে হয় না। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণায় পৌঁছু-নোর [illegible] পাওয়া গেছে বলে অনেকে মনে করছেন। 'হ্যালুসিনেশন' সম্পর্কে [illegible] সংখ্যায় কিছু বলা হয়েছে, [illegible] চিন্তারাজ্যে বিশৃংখলা সম্পর্কে কিছু বলছি। তা না হলে, সমরের

রোগউপসর্গ আমাদের কাছে রহস্যাবৃত থেকে যাবে।

চিন্তার বিশৃঙ্খলা, অদ্ভুতত্ব, ভ্রান্তি সম্পর্কে পুরনো মনোবিজ্ঞানীরা নানাধরনের মতবাদ পোষণ করেন। উন্মাদের প্রলাপ আদিম মানুষের চিন্তার সংগে তুলনীয়,—এই তত্ত্ব একসময় খুবই প্রচলিত ছিল। পূর্ব-পুরুষের স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে উন্মত্ততায়, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের ঘটে বিপরীতমুখী প্রত্যাবর্তন। খুবই রোমান্টিক এই তত্ত্ব। এই ভাববাদী তত্ত্বের পাশাপাশি চালু ছিল চৈতন্যের সংকোচন' তত্ত্ব। 'সাইকিক টোন' বা নার্ভের গ্রাহীক্ষমতার হ্রাস ঘটে তাই ভ্রান্ত ধারণা ও চিন্তার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়ে থাকে। আর একদল মনে করেন মস্তিষ্কের 'ফ্রন্টাল লোবে' (সামনের দিকে) অসুস্থ পরিবর্তন ঘটার ফলে চিন্তার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় আর 'টেমপোরাল লোবে' পরিবর্তন ঘটার দরুণ ভ্রান্তি বা 'ডিলিউশন' উদ্ভুত হয়।

এই সব ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক নয়। মানসিকতার শারীরবৃত্তিক কারণ সম্বন্ধে এ'রা উদাসীন। বাস্তব পরিবেশকে এ'রা আমল দেন না। মস্তিষ্কের উপর বহির্বাস্তবের প্রতিফলন থেকে যে সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার উদ্ভব; দ্বান্দিক বস্তুবাদের এই মতবাদকে অগ্রাহ্য করার ফলে এ'রা বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো তত্ত্বের কাছাকাছি যেতে পারছেন না।

চিন্তার বিশৃংখলা, বিশেষ করে 'অবসেশন' সম্পর্কিত পাভলভীয় ধারণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে কুকুরের উঁচু জায়গার আবেশিক আতংক (অবসেশিভ ফোবিয়া) সৃষ্টি করার বিবরণ আমাদের জানা আছে। অনড় উত্তেজিত কোষগুলোর পাশের কোষগুলি নিস্তেজিত হয়, এও আমরা জানি। এই নিস্তেজনা যদি মস্তিষ্কের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তবে ভুল ধারণা সম্বন্ধে আর সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ রোগীর 'ক্রিটিক্যাল অ্যাটিচিউড' নষ্ট হয়; আত্মসমালোচনা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। 'অবসেশনের' রোগী নিজের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু 'ডিলিউশনের' রোগী নিজের ধারণা সম্পর্কে একেবারে স্থির নিশ্চয়। মস্তিষ্কের অন্য অংশের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, অর্থাৎ যুক্তিতর্ক ইত্যাদি নিস্তেজনা তরঙ্গের ব্যাপ্তি ও গভীরতার জন্য অনড় অংশকে কোনো মতেই প্রভাবিত করতে পারে না।

মস্তিষ্কের অন্য একটি অবস্থা যাকে বলা হয় অতিস্ববিরোধী বা আলট্রাপ্যারা-ডক্সিক্যাল ফেজ' ভ্রান্তির পোষক ও ধারক। এই অবস্থায়, আমরা জানি, সদর্থক উদ্দীপনা নঞর্থক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যারা ভালবাসে তাদের শত্রু মনে হয়, যারা মংগলাকাঙ্ক্ষী তাদের উপর অবিশ্বাস সন্দেহের উদ্রেক হয়। বেনারস থেকে কোলকাতাগামী ট্রেনে চড়ে রোগী মনে করে সে উল্টোদিকে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাচ্ছে।

পাভলভের মতে ভ্রান্তি দুটি শারীরবৃত্তিক ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ ভ্রান্তি বা ডিলিউশনের উদ্ভবের মূলে আছে প্রথমত কোষের বিকারগত অনড়ত্ব, আর দ্বিতীয়ত অতিস্ববিরোধী অবস্থা। এই দুটি ব্যাপার একসংগে বা পর পর ঘটতে পারে। সেই অনুযায়ী উপসর্গের হেরফের ঘটে থাকে।

পাভলভ তত্ত্ব 'হ্যালুসিনেশন' 'ডিলিউশন'এর সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও, প্রাকৃত বিজ্ঞান অনুমোদিত পথে উন্মাদ রোগের দুই গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ বোঝবার প্রথম পদক্ষেপ।

এইবার সমরবাবুর উপসর্গগুলোর তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। সমরবাবুর ভ্রান্তিভ্রমের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমদিকে তিনি গো-ডাউনের চুরির আসামীদের নাম শুনতেন। আসামীদের মধ্যে তাঁর নামও ছিল। তাই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। একবার পাশের বাড়ীর লোকদের অপমান পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল আশেপাশের সকলেই তাঁকে চোর মনে
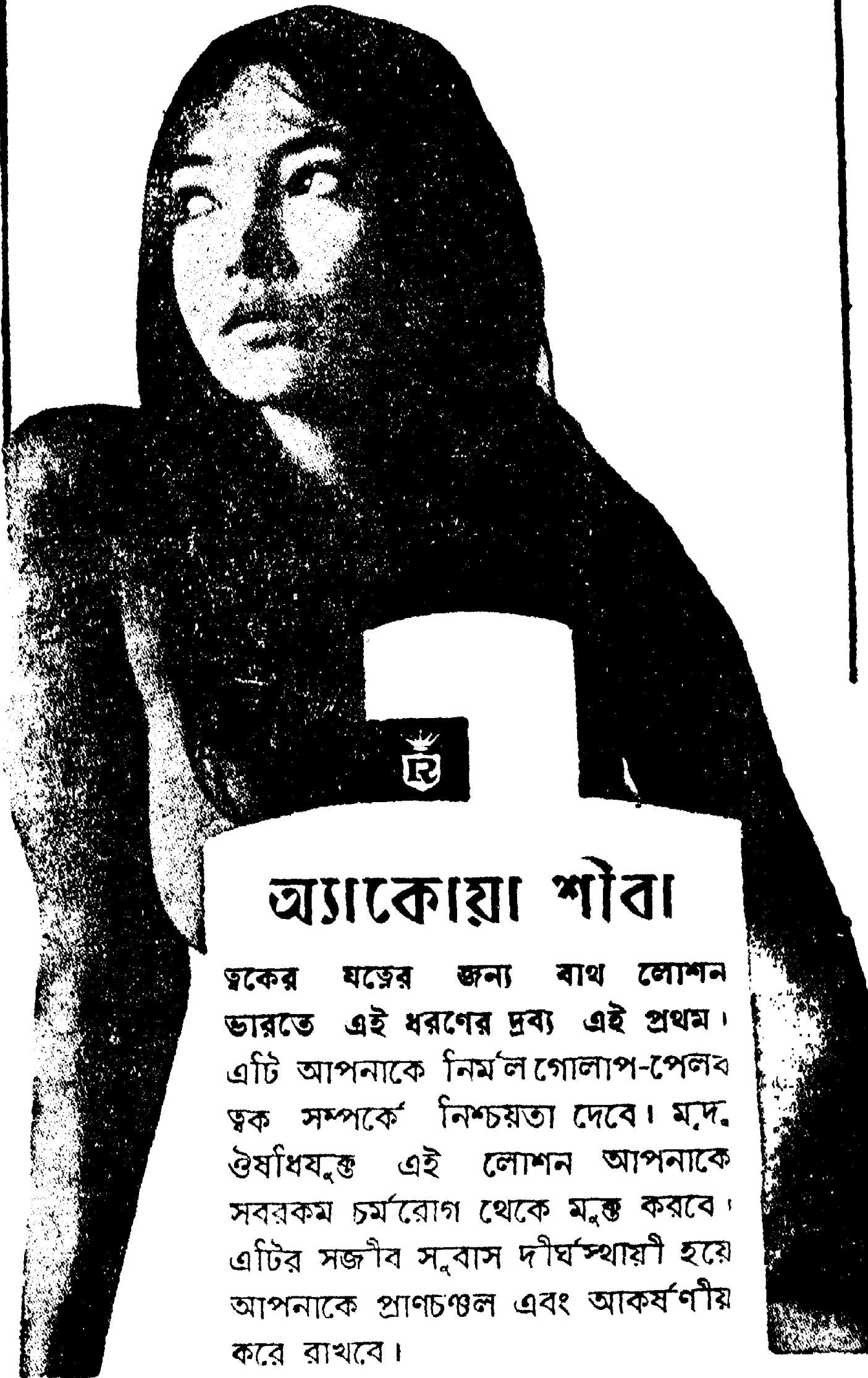
করছে। শ্রুতিভ্রমের সংগে ভ্রান্তি, মায়ার সংগে মোহ যুক্ত হয়ে তাঁকে অস্থির ও অসুস্থ করে তুলেছে। 'হ্যালুসিনেশন' ও 'ডিলিউশন' একই সংগে তাঁকে পীড়িত ও প্রভাবিত করছে। প্রথম দিকে 'হ্যালুসিনেশন' এর প্রভাব 'ডিলিউশনের' থেকে বেশি ছিল; অবশ্য এটা আমার অনুমান। কেননা সেই সময়কার কোনো বিস্তারিত বিবরণ আমি পাইনি। বর্তমানেও হ্যালুসিনেশন শুনছেন; কিন্তু অস্পষ্টভাবে কথাগুলো কানে আসছে। ফাদার ড্যানিয়েল নির্দেশ দিচ্ছেন;—হল্ট! সাইলেন্স! লাভ দাই নেবার! থাম! চুপ কর! প্রতিবেশীকে ভালবাস। শ্রুতিতম বা অডিটারী হ্যালুসিনেশনের উৎসটি তাঁর নিজস্ব কল্পনা, ভ্রান্তি বা ডিলিউশন।' এখন ফাদার ড্যানিয়েল সম্বন্ধে এবং স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছেন, যেগুলো তাঁর মানসিকতাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করছে। ফাদার ড্যানিয়েল সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রী কোনো আলোকপাত করতে পারলেন না। মধ্যভারতের সেই ছোট্ট শহরের ড্যানিয়েলের কোনো সমাধি আছে কিনা; এ সম্পর্কেও কোনো সঠিক তথ্য মিলল না। ড্যানিয়েলের নির্দেশ স্ত্রীকে শোনানো চলে না, কেননা সে অনুতাপ করে শুদ্ধ হয়নি।

আমার মনে হল ভদ্রলোকের রোগ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে এসেছে। গো-ডাউনের চুরির ব্যাপার মিটে যাওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয়েছে। প্রথমদিকের নির্যাতনভিত্তিক 'ডিলিউশন' এখন স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি সন্দেহভিত্তিক 'ডিলিউশনে' রূপান্তরিত হয়েছে। স্ত্রীকে সরাসরি সন্দেহের কথা তিনি বলেননি। কেননা, স্ত্রীকে সন্দেহ করছেন আবার স্ত্রীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করছেন। স্ত্রীর উপর সন্দেহের কারণ; মস্তিষ্কের অতিস্ববিরোধী অবস্থা। যখন পাড়া-প্রতিবেশী অফিসের সকলে তাঁকে গো-ডাউনের চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে, (তাঁর মতে) তখন স্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, সর্ব-প্রকারে সাহায্য করেছেন। স্ত্রীর ভালবাসা ও বিশ্বাস এখন তাঁর মস্তিষ্কে বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করেছে। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার চিন্তা মনে আসবার আগেই ফাদার ড্যানিয়েলের সংকেতবাণী কানে ভেসে আসছে। হল্ট! থাম! স্ত্রীকে সন্দেহ সংক্রান্ত কোনো কিছু বলবার চিন্তা মনে আসতেই শুনতে পাচ্ছেন ড্যানি-য়েলের নির্দেশ, সাইলেন্স! চুপ! কোনো কথা নয়। প্রতিবেশী পুরুষদের সংগেই স্ত্রী ভ্রষ্টা, প্রতিবেশীরাই তাঁকে চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে; কাজেই প্রতিবেশীদের ঘৃণা করার বা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা মনে আসার সংগে সংগেই কানে বেজে উঠছে ড্যানিয়েলের উপদেশ—প্রতিবেশীকে ভাল-বাস। সন্তান না হবার কারণ হিসেবে সমর-বাবু আমাকে প্রথমে স্ত্রীর জরায়ু সংক্রান্ত রোগের কথা বলেছিলেন। পরে স্ত্রী স্বামীর সামনেই আমাকে জানালেন যে তিনি স্ত্রীর সংগে বহুদিন সহবাস করেননি। স্ত্রীর সান্নিধ্য সমরবাবুকে আর উত্তেজিত করছে না, তাঁর দেহ-মনের উত্তাপ অন্তর্হিত।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শৈশব থেকে মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত। সমরবাবুর মস্তিষ্ক দুর্বল নিস্তেজনাপ্রবণ। প্রথম বা দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের কোনোটিরই বিশেষ প্রাধান্য নেই। নীরস কর্তব্য পালন ও কঠোর নিয়মশৃংখলার মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে অনেকখানি যান্ত্রিক ভাবাপন্ন। সব কিছুর প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ কম। ন্যায়-অন্যায় নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ছক কাটা ছিল। চুরির ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্তের সময় তাঁকে নানারকমভাবে জেরা করা হয়। কোনো কোনো অফিসার স্পষ্টভাবে না হলেও পরোক্ষে তাঁর সততার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। সমরবাবুর দুর্বল অথচ নীতিবাগিশ মনের উপর এই সব মন্তব্য অশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এর প্রতিক্রিয়াতেই তিনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েন ও অপরাধজ্ঞাপক 'হ্যালুসিনেশন' শুনতে থাকেন।

চুরির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার পর রোগের গতি পরিবর্তিত হল কিন্তু রোগ সারল না। 'গো-ডাউন' রক্ষকের পদ থেকে অপসারিত হয়ে অন্যত্র বদলি হওয়ায় অবমাননার জ্বালার উপশম ঘটল। না। 'হীনমন্যতার ডিলিউশন' ভদ্রলোককে পীড়িত করতে লাগল। তারই অভিব্যক্তি স্বরূপে স্ত্রীর প্রেমে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। 'আমি অপদার্থ, আমার এমন কোনো গুণ নেই যার জন্যে স্ত্রী আমাকে ভাল-বাসতে পারে বা শ্রদ্ধা করতে পারে।'—এই কথা স্পষ্টভাবে একদিন সমরবাবু আমাকে জানালেন। তাছাড়া আমি শক্তিহীন, আমি বীর্যহীন। আমার উপর এতবড় একটা অবিচার করা হল, অথচ আমি প্রতিবাদ করতে পারলুম না। চাকরী ছাড়বার শক্তি নেই, উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে মামলা করারও ক্ষমতা নেই।'

সমরবাবু এই নগরীর কোলাহল ছেড়ে শৈশবের সেই শান্ত শহরটিতে ফিরে যেতে চান। কিন্তু শহরটিতে এখন নাকি অনেক লোকের বসতি, সেখানে গিয়েও স্বস্তি পাওয়া যাবে না, শান্তি পাওয়া যাবে না। শহরটির এক প্রান্তে শান্ত নিরালা পরি-বেশ আছে। সমাধিস্থান। সমরবাবুর মন সেই সমাধিস্থানের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করছে। শুধু তাই নয়, সমরবাবু মনে মনে নিজেকে কফিনের মধ্যে স্থাপিত করেছেন। কফিনটি উদ্যানের এক কোণে রাখা হয়েছে। মাটির তলা থেকে অনেক আত্মা উঠে এসেছে। নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। এই-বার সমরের কফিনটি কবরের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু নামানো গেল না। ফাদার ড্যানিয়েলের নির্দেশ শোনা গেল,—হল্ট! সবাই থেমে পড়ল। যে-যার কবরের মধ্যে আবার ঢুকে পড়ল। 'প্রতি-বেশীকে ভালবাস।' ড্যানিয়েলের কণ্ঠস্বর সমরবাবু ছোট্ট শহরের কবরখানা থেকে আবার ফিরে এলেন জনাকীর্ণ কোলকাতার পথে। নীলা অনুতপ্ত হোক, নীলা শুদ্ধ হোক। তাহলেই ওকে সমরবাবু গ্রহণ করতে পারেন। নীলার সংগে এক শয্যায় শয়ন করা চলে না। আবার তাকে পরি-ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। নির্দেশ আসবে, একদিন ড্যানিয়েলের নির্দেশ আসবে, নীলাকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবেন ড্যানিয়েল। সেইদিন সমর জানতে পারবে নীলা শুদ্ধ হয়েছে। অনুতাপের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছে। নীলাকে, নীলার দেহকে গ্রহণ করা যাবে।

আমার সামনে বসে একদিন বিড়বিড় করে এই ধরনের কথা, এই ধরনের অভি-লাস ব্যক্ত করলেন। ফলে, আমার কাছে ওঁর মনের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। নীলার কাছে সমরবাবু নিজের হৃত সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁর ধারণা হয়েছে স্ত্রীর কাছে, প্রতিবেশীর কাছে তাঁর সম্মান চলে গেছে, তাই তাদের অন্যভাবে অভিযুক্ত করে নিজের সমপর্যায়ে আনতে চাচ্ছেন। বর্তমানকে এড়িয়ে অতীতে পলায়ন করার ইচ্ছে মনে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর নিজের কফিনটা সমাধিস্থ করা যায়নি। অর্থাৎ বর্তমানের কোলাহল-মুখরিত জীবনকে তিনি গ্রহণ করতে চান, কিন্তু সামর্থ্যের অভাব বোধ করছেন। তাঁর সত্তা এখনও পুরোপুরি খণ্ডিত হয়নি। জীবন-মুখীন চিন্তাধারার প্রাধান্য লক্ষিত হচ্ছে। ড্যানিয়েল কে? সমরবাবু জানেন না। ন্যায়-বিচারের প্রতীক কি ড্যানিয়েল? ড্যানিয়েলের নির্দেশ কি কালের অমোঘ নির্দেশ। সমরবাবু বলতে পারেন না। 'ডিলি-উশনের' রোগীরা সব ব্যাপারে সংকেত প্রতীকের সন্ধান খোঁজে। ড্যানিয়েলের বাণীর মধ্যে কোনো বিশেষ প্রতীক খুঁজে পাচ্ছেন না কেন সমরবাবু? সমরবাবুর 'হ্যালুসিনেশন' আরো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ড্যানিয়েলের নির্দেশ কিছুদিনের মধ্যেই শ্রুতিগম্য রইল না। স্ত্রীর উপর সন্দেহের তীব্রতাও কমের দিকে। হয়ত এটা একটা অসুস্থ সন্দেহ,—এই রকমও একদিন বললেন। সমরবাবু আরোগ্যের পথে চলেছেন। সমরবাবু ভাল হয়ে যাবেন।

চুরির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্ক কোষে ভয়ের দরুণ যে উত্তেজনা ঘটেছিল, সেই উত্তেজনার অনড়ত্ব ক্রমশ দূর হয়ে যেতে লাগল। এতদিন ধরে স্নায়ুতন্ত্র 'প্যারা-ডক্সিক্যাল' ও 'আলট্রা-প্যারাডক্সিক্যাল' ফেজের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ওষুধের ক্রিয়ায় ও অভিভাবনের প্রভাবে ক্রমশ মস্তিষ্কের এই বিকার দূর হল, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। তবে এই দুর্বল মানুষটি আর যে-কোনো সামান্য আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, এই সম্ভাবনা রয়েই গেল।

—মনোবিদ

সজনের সকাল

(চার)

সজন অনুভব করল কোথাও তার মুক্তি নেই। তার জীবনে মুক্তি বলে কিছু নেই। সে মুক্ত। তার কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন স্বপ্ন কোন আশা কামনা বাসনা কিছুই নেই তার। তার কোন লক্ষ্যই নেই। কিছুই হওয়ার নেই। জীবনযাত্রা মানে নিরুদ্দেশ যাত্রা। পৃথিবী হল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অন্তহীন সমুদ্র এবং প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি নিঃসঙ্গ ভেলা। অন্তত সে নিজে তাই, সজন বিশ্বাস করে। তার হাতে কোন হাল নেই, সে শুধুই ভেসে চলেছে। চিরদিন এমনি চলবে, কখনো কোথাও পৌঁছবে না। এই অবিশ্রাম অকারণ চলার পথে স্বপ্ন, দুঃখ-সুখ আনন্দ বিষাদের বিচিত্র অনুভূতি—লৌকিক অলৌকিক। বিপন্ন বিপর্যস্ত হতে হতেই সে চলবে; কোনদিন জানবে না তার কী পরিণতি হতে পারে, তার শেষ পর্যন্ত কী হবে। একসময় সে হঠাৎ তলিয়ে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই-ই সম্ভবতঃ তার মৃত্যু। প্রত্যেকের মৃত্যুই একান্ত ব্যক্তিগত। একজনের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অন্য আর এক জনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আসলে কারোরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয় না। জীবন এবং মৃত্যু এই দুটি ঘটনার মাঝখানে যে সময় তা এত সংক্ষিপ্ত এত বেশী সূক্ষ্ম যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত থেকে কারো পক্ষেই মৃত্যুকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এবং মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার অবকাশও নেই যে মৃত্যুই জীবনের পরিণাম। কেননা, মৃত্যু অনন্ত চৈতন্যহীন অনস্তিত্বের অবস্থা, যে কোনরকম অবস্থাহীন অবস্থা, সেখানে জীবনের স্মৃতি স্মরণের কোন অবকাশই নেই। অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য জানার কোন সুযোগ নেই।

তবে বিশ্বসংসারের নানান অভিজ্ঞতার মনে হতে পারে যে মৃত্যু বা ঐ অনস্তিত্বই জীবনের উদ্দেশ্য। অনস্তিত্ব যার পরিণাম তার সূচনাও নিশ্চয়ই ঐ অনস্তিত্ব থেকেই। অসীম শূন্যতার মাঝখানে মানুষের জীবন অকূল সমুদ্র মধ্যবর্তী এক একটি দ্বীপের মত। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কামনা-বাসনাগুলি হল ঐ দ্বীপবাসী পাখিগুলির মত। ঐ পাখিগুলি দিনের পর দিন ঐ দ্বীপে বাস করে চলে তবু ঐ দ্বীপের ওপর তাদের কোন মোহ নেই। তারা যেন জানে অতল সমুদ্রের গর্ভ থেকে যে দ্বীপ একদিন জন্মেছে সে একদিন আবার ঐ সমুদ্রেই তলিয়ে যাবে। তখন ঐ পাখিগুলিকে ফিরে যেতে হবে সেই আকাশে,—অসীম শূন্যতায়, যেখান থেকে তারা একদিন এসেছিল। মানুষের কামনা-বাসনা ইচ্ছাগুলির পরিণাম ঐ পাখিগুলির পরিণামের মত। তাই দীর্ঘদিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তারা জীবনকে ভালোবাসে না।

জীবন কিছুই নয়, জীবনের এই অভিজ্ঞতার জন্যেও জীবন স্বীকার করে নিতে হয়। সজনও তাই করল। ধর্ম নীতি সমাজ আদর্শ সব মিথ্যা। সে ইচ্ছামত জীবনকে বেয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার ইচ্ছাই, সেই ইচ্ছা, যার কোন বন্ধন নেই। সজনের এই ইচ্ছাই তার জীবনকে বেয়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ তার জীবন আপনা থেকেই বয়ে চলবে। জীবনযাত্রায় সে চলছে অথচ সে জানবে সে যাত্রী নয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা শারীরিক মানসিক অসংখ্য সমস্যা তার আছে এবং অনেক সমস্যাকেই সমাধান করার চেষ্টা সে করবে কিন্তু সে বিশ্বাস করবে সে কিছুই করছে না। সে এবার উদাসীন জীবনযাত্রার শরিক হবে।

সজন কবিতা লেখা বন্ধ করল। তার বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলল: কী খবর সজন?

সজন মনে মনে বলল এরা আমার বন্ধু কেন?

প্রকাশ্যে বলল : কিসের কি খবর?

: তুই হঠাৎ কবিতা লেখা বন্ধ করলি কেন?

: কবিতার প্রয়োজন আছে কি? কবিতা কী?

: কবিতা কি তার কী প্রয়োজন তা এতদিন কবিতা লিখলি তুই জানিস না?

: জানি, তাই এখন আর কবিতা লিখি না।

: কিন্তু কী জেনেছিস যে কবিতা লেখার আর প্রয়োজন নেই জেনেছিস?

: জেনেছি যে কবিতা সবকিছুই, কিন্তু কোন কিছুই কিছু নয়।

: মানে?

: কোন কিছুর কোন মানে নেই।

: তাহলে ঐ কোন কিছুটা কী?

: ওটা কোন কিছুই নয়।

: ওটা কোন কিছু নয় কেন?

: ওটা কোন কিছু নয় বলে।

: নয় কেন?

: নয় তাই নয়।

: তুই পাগল হয়ে গেছিস সজন।

: কে বলতে পারে, যে পাগল নয় সে-ই হয়ত পাগল।

: তোর অসুখ করেছে সজন।

: কে বলতে পারে, সুস্থতাই হয়ত অসুস্থতার লক্ষণ।

: সজন জীবন নিয়ে তুই এত বেশী ভাবিস কেন।

: জীবন নিয়ে ভাববার কিছু নেই বলে।

: তুই এত ভাবিস কেন সজন?

: আমার কোন ভাবনা নেই বলে।

: তোর জীবন নেই?

: আমাকে তোরা একটু একলা থাকতে দে।

সজন প্রচন্ড ধাক্কা খেল। তার ভাবনালোকে যেন ভূমিকম্প ঘটে গেল। জীবন সম্পর্কে সে এত বেশী ভাবে কেন? সে বলেছে তার ভাবনা নেই। নেই হয়ত। কিন্তু তার কি জীবন নেই? তাহলে সে জীবন নিয়ে এত ভাবে কেন? সে জীবনকে জানতে চায় তাই? কিন্তু জীবনকে জানতে চাওয়া কেন? জীবন বিশ্বাস করে তাই। জীবনকে বিশ্বাস করা কেন? জীবন ভালোবাসি তাই। কিন্তু জীবন সম্পর্কে এত বেশী ভাবি, জীবনকে এত বেশী বিশ্বাস করি কেন? আমি জীবনকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি তাই। সজন নিজের স্বরূপ জেনে অবাক হল না। কেননা তার জীবনের শুরু থেকেই তার এই রূপের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়। সেই পরিচয় অতি বড় কোন দুর্ঘটনাতেও এতটুকু ম্লান হয়নি। জীবন কিছুই নয়, মাঝে মাঝে এই কথা বিশ্বাস করে আমি অনেক বেশী বিশ্বাস করাতে চেয়েছি যে জীবন অনেক বেশী কিছু। সজন এতেও তৃপ্ত হল না।

সজন কোথাও তৃপ্তি পায় না। সে এখনও তার জীবনের কোন সার্থকতায় পৌঁছতে পারেনি। পারে নি তাই জীবনের সার্থকতার উপর তার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। দুটি সত্য আছে। জীবন ও মৃত্যু। মৃত্যু সম্পর্কে কারো কোন অভিজ্ঞতা নেই। যদি কারো থাকেও বা সে পৃথিবীতে তার সেই অভিজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পায় না। মৃত্যু সম্পর্কে হাজার ভেবেও, মৃত্যুকে জানার জন্য মৃত্যু বরণ করলেও যখন মৃত্যুকে জানা যাবে না, তখন ভাবা যায় মৃত্যু ভয়ংকর সত্য হলেও তাকে অবহেলা করলে কেন ক্ষতি নেই। বরং অনেক লাভ। জীবনই একমাত্র সত্য হয়ে উঠবে।

সজন বিশ্বাস করল জীবনই একমাত্র সত্য। কিন্তু জীবনকে সে কতটুকু জেনেছে! জীবনকে অনেক বেশি জানলে সে জানবে জীবন আরো কত বেশি সত্য। সজন গভীর আবেগে আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল: আমার কামনার কোন সীমা নেই, আমার অনন্ত বাসনা, অসীম আমার স্বপ্ন, জীবনের তৃষ্ণা আমার আকণ্ঠ আমার দু-চোখে জীবনের উগ্র নেশা। আমি জীবনের উদ্দেশে মাতাল।

এটা একটা চমৎকার সজ্জিত পৃথিবী। জীবনের উদ্দেশ্যে আয়োজন এখানে অপরিসীম। উত্তেজনায় সজন ঠিক বুঝতে পারে না কেমন করে কীভাবে সে শুরু করবে তার ভোগ। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করল জীবনযাত্রার যতরকম পদ্ধতি প্রচলিত আছে সে সমস্ত তো বটেই, যদি প্রয়োজন হয় তো সে নিজেই নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেগুলিও সে অনুসরণ করবে। ভোর থেকে সকাল, সকাল থেকে দুপুর, বিকেল সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি গভীর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সজন ঘুরে বেড়ায় আর জীবনের কত বিচিত্র ভঙ্গীই না সে দেখে। দেখে আর আরো দেখার নেশা বেড়ে যায়। উত্তেজনায় কোন রাত্রেই তার ঘুম হয় না।

কলকাতা একটা বিরাট বিজ্ঞাপনশালা মনে হয়। এখানে প্রতিদিন বিজ্ঞাপিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শ্রেণীর জীবন, জীবনের সম্ভব অসম্ভব সমস্ত ভঙ্গী। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শ্রেণীর ও প্রকৃতির নারীরা এখানে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিয়মিত। এক-একটি নারী এক এক শ্রেণীর যৌনতার বিজ্ঞাপন। এখানে পৃথিবীর পরম প্রাচুর্যের বিজ্ঞাপন এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা ও অপমৃত্যুর বিজ্ঞাপন পাশাপাশি। সুখ-দুঃখ আনন্দ বিষাদ, জন্ম-মৃত্যু সমস্ত পাশাপাশি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। সজন বিজ্ঞাপিত প্রায় সমস্ত জীবনের শরিক হওয়ার চেষ্টা করল। প্রেম, অপ্রেম লক্ষ্য, লক্ষ্যহীনতা আশা আশাহীনতা, তৃপ্তি অতৃপ্তি সংগ্রাম সংগ্রামহীনতা, জীবনের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা জীবনের প্রতি প্রখর তৃষ্ণা এখানে সমস্তই জীবনের পক্ষে। সকলেই এক-একটি আদর্শকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলেছে, বেঁচে থেকে কেউ বেঁচে চলেছে, আত্মহত্যা করে কেউ বাঁচতে চাইছে। এর মধ্যে কোন পথটি সজনের জন্যে নির্দিষ্ট, শেষ পর্যন্ত সজন সেই পথ আবিষ্কার করতে পারল না।

তার আগে আবিষ্কার করতে হবে আমি কী পেতে চাই। সজন ভাবল, আমি যা পেতে চাই তা কখনো পাইনি। তাকে কি কখনো পাওয়া যায় না? যাকে কোনদিন পাওয়া যাবে না সে কে, কেমন সে? সে কি এই পৃথিবীর কেউ, না অপার্থিব?

কতদিন পরে রাত্রিকে মনে পড়ল। রাত্রিকেই সজন পেতে চেয়েছিল। তারপর তার সেই ব্যর্থতা থেকে প্রথম ভুলের জন্ম তারপর আবার ভুল, তারপর আবার বার-বার। সজন এই ভুলের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছে এমনি অসংখ্য ভুলের মধ্যে দিয়েই তার জীবন কেটে যাবে। রাত্রিকে পাওয়া যাবে না, তাই ললিতা, লাবণ্য এরাও হয়েছে মিথ্যা। তখন সজন জেনেছে তার নিজের জীবনটাও মিথ্যা। জীবন মিথ্যা এইটাই জীবনের সত্য। জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই, নিরুদ্দেশই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপরই সেই প্রচন্ড ধাক্কা। অলীক কল্পনা বিলাসের ওপর জীবনের হৃদয়হীন বাস্তব তার আঘাতে। এই আঘাতের জন্যই সজন দিনে দিনে অলৌকিক ভাব কল্পনায় বায়বীয়-রূপ-এ রূপায়িত

হচ্ছিল। বায়ুরোগ নিমেষে বাতাসে মিলিয়ে গেল। দীর্ঘ উপবাসের পর সজন সমস্ত অনুভূতি নিয়ে জীবনের মুখোমুখি হল। তবু শান্তি পেল না। শেষ পর্যন্ত একই আতৃপ্তি। অথচ স্থির বিশ্বাসে উপলব্ধি করেছে জীবনের উদ্দেশ্য একটা আছেই এবং জীবনের সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে একদিন না একদিন কোন একদিন তার মিলন হবেই হবে।

কিন্তু রাত্রি, সে কোথায় কত দূরে? আমি তাকে কোথায় পাব? সজন সংসারের প্রতি আবার উদাসীন হয়ে গেল। সে জেনেছে, সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝেছে, এই পৃথিবী এতদিনে সেই গোপন কথাটি আমাকে বলেছে, বলেছে রাত্রিই নাকি আসল পৃথিবী আমার।

সজন তার কোন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করল। বলল : আমি রাত্রির খবর চাই।

বন্ধুটি অবাক হয়ে বলল : রাত্রি! সে কে?

রাত্রির নাম শোনেনি এমন কেউ আবার পৃথিবীতে থাকতে পারে এবং সজন আবার তা বিশ্বাস করবে! এ-নিয়ে তর্ক করলে রাত্রির অস্তিত্বের প্রতি অসম্মান করা হয় এই ভেবে সজন খুব সহজভাবে রাত্রিকে বলল। তারপর বলল অনেকদিন আগের সেই ঘটনার কথা।

বন্ধুটি বলল : হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে। সেই রাত্রি, মেয়েটির নাম রাত্রি ছিল কী? অচ্ছা সে যাই হোক, কিন্তু তোর এখনও তাকে মনে আছে? মনে হচ্ছে তুই তাকে রীতিমত ভাবিস। শুধু ভাবিস বললে বোধহয় ভুল বলা হয়। আচ্ছা মজার ব্যাপার তো! কিন্তু আমি তো তার কোন খবর জানি না-রে! তুই অন্য কারো কাছে—।

সজন : অন্য আর কে জানে?

: আমি তা-তো জানি না-রে।

: তুই যা জানিস তাই বল।

: সজন, আমাকে বড় মুশকিলে ফেললি রে। তবে আমার একটু একটু মনে পড়ছে। তোর সেই দুর্ঘটনার খবর সম্ভবত সেই মেয়েটি—কী যেন নাম—রাত্রি, হ্যাঁ সে শুনেছিল বটে। কিন্তু তারপর যে কী হল তা-তো জানি না।

: তারপর রাত্রিকে তোরা আর কোনদিন দেখিসনি?

: না, কোনদিন আর তো দেখিনি। দেখিনি বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে একটা কথা; তখন এই কথাটা মনে হয়েছিল কিনা জানি না কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে যে সেই মেয়েটি সম্ভবত ভেবেছিল সে-ই বুঝি তোর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। আর তুই বললি, বললি না—ঠিক তার আগের দিনেই তুই,—সে যাক। তবে একটা কথা তোকে বলি সজন, তুই এবার এই পাগলামোটা ছাড়। অহেতুক তুই দুঃখ ডেকে আনছিস। কী দরকার তোর সেই মেয়েটাকে এখন?

সজন : আমার জন্যে ভেবে তোদের আর দুঃখ পেতে হবে না তো, তুই থাম, এবার তোর কথা বল।

বন্ধুটি : আমরা সাধারণ মানুষ ভাই। আমাদের শোনাবার মত কোন কথা নেই। নেই বলে আমাদের কোন দুঃখও নেই। তুই তো আবার ভাববি আমাদের এই কোন দুঃখ নেই বলে তোর দুঃখ হয়!

সজন : তোরা তাহলে আমাকে রীতিমত ভাবিস বল?

বন্ধুটি : ভেবে তোকে বুঝতে পারি কিনা জানি না, তবে এটা তুই ঠিক জানিস সজন, তোর জন্যে খুব কষ্ট হয়। আমরা তোর বন্ধুরা তোর জন্যে কিছুই করতে পারি না।

তোরা নিশ্চিন্ত থাক, আমার জন্যে যা কিছু করা দরকার তার জন্যে আমি নিজেই যথেষ্ট—এই বলে সজন আবার নিজের কাছে ফিরে এল। তার স্বরূপে।

সজন বিশ্বাস করল রাত্রি নিশ্চয়ই তাকে ভালোবেসেছিল। সে এখন কোথায় আছে আবিষ্কার করতে হবে। সেও হয়ত ভুল জীবনের বন্ধনে বন্দী হয়ে তিলে তিলে ক্ষয়ের যন্ত্রণা সহ্য করছে। আমার ভালোবাসা ছাড়া তার জীবনও পূর্ণ হতে পারবে না। সজন যেন অলৌকিক এক বার্তা পেয়েছে, রাত্রির কাছে পৌঁছে যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এবার স্বপ্নের সফলতার মরশুম শুরু হবে তার জীবনে। সারাদিন সারারাত সে রাত্রির পৃথিবীতে এখন বাস করে। মনে হয় রাত্রি তার খুব কাছে কোথাও আছে, বাতাসে তার শরীরের গন্ধ, তার পদধ্বনি মধুর সংগীত হয়ে বাজে ওঠে সজনের অনুভূতিতে। সজন সজাগ হয়ে ওঠে। পথে চলতে চলতে প্রত্যেকটি মেয়ের মুখ লক্ষ্য করে গভীরভাবে, এমনি হঠাৎ একদিন রাত্রিকে সে আবিষ্কার করবে। কখনো মনে হয়, রাত্রি তার অন্তরে পৌঁছে গেছে, এবার সে বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে। ততক্ষণ সজন অন্তরের রাত্রির সঙ্গে কথা বলে। অনেক কথা বলে। তার নিজের ব্যর্থতা দুঃখের কথা, তার এতদিনের কত অভিজ্ঞতার কথা, কেমন করে সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে রাত্রির জন্যে তার মুক্তির দিন গুনেছে সেই কথা, আরো অনেক কথা, যে-কথা সে নিজেও জানে না। পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সৌন্দর্যের প্রকাশ আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র, নদী পাখি আলো, অন্ধকার মানুষ-জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্য সমস্ত কিছুর সঙ্গে সজন গভীর আত্মীয়তা অনুভব করে। অনুভব করে বিপুল বিশ্ব জুড়ে এক অন্তহীন প্রাণের প্রবাহ বয়ে চলেছে অবিরাম অবিশ্রাম। সেই প্রাণের স্পন্দিত সংগীতের মধ্যে কত বিচিত্র সুর সেই সুরের ঐকতান মূর্চ্ছনায় সজন বিস্মিত বিহ্বল হয়ে যন্ত্র ভালোবাসার নিবিড় সঙ্গ লাভ করে সেই ভালোবাসা, আমার কবিতা, কবিতা আমার জীবন, আমার জীবনের মূলে আছে একটি নারী, সে আর কেউ নয়, রাত্রি। সজন এই জীবন-রসে আচ্ছন্ন আপ্লুত হয়ে যায়।

যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই বলে, 'কী আশ্চর্য, তুমিই সেই সজন? তুমি এ কী হয়ে যাচ্ছ? তোমার তো এত বয়েস নয়। ভেতরে কোন অসুখ বিসুখ—তা নিজেকে এ-রকম অবহেলা করা তো তোমার উচিত হচ্ছে না সজন। একজন ভাল ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে একবার ভেতরটা পরীক্ষা করিয়ে নিলে কি ভাল হয় না? দেখ—যা ভাল বোঝ—। তবে তুমি বড় বেশি ভাবাচ্ছ সজন। এবার একটু বোঝ।'

সজন বেশ বোঝে যে সে ভাল আছে। তাকে কেউ বোঝে না তাহলে এটা কী করে সকলে বুঝল যে সে কী-রকম হয়ে যাচ্ছে, ভুগছে? তাকে যে সত্যিই কেউ বোঝে না এটা আরো ভাল করে বোঝা যাচ্ছে। সজন মনে মনে বলল, আমি তো আমাকে জানি। আমি জানি যে আমি যেমন, আমি তেমনই আছি। আমি রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করছি। রাত্রি কবে আসবে, তা রাত্রিই জানে। রাত্রির তো আমার প্রতি দায়িত্ব আছে। আমি তাকে ভালোবাসি এটা তো আর মিথ্যা নয়, তাহলে আমার ভালোবাসা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। রাত্রি নিশ্চয়ই আসবে। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব মৃত্যু পর্যন্ত। রাত্রি যদি কোন ব্যক্তিগত জরুরী কারণে একান্তই আসতে নাও পারে কিন্তু আমি তো মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করব রাত্রি এই এল বলে। তারপর মৃত্যু একবার হয়ে গেলে আমি সমস্ত আশা-নিরাশা সার্থকতা ব্যর্থতার অতীত। তাহলে আমার মৃত্যু আমি যত পিছিয়ে দিতে পারব জীবনকে যত বেশি দীর্ঘ করতে পারব ততই আমার আনন্দ। আমি জানি আমার কোন অসুখ করেনি। আমি জানি যে আমার বয়েসের তুলনায় আমি অনেক বেশি বয়স্ক হয়ে যাইনি। আর সত্যিই আমার এমন কিছুই হয়নি যে খুব তাড়াতাড়ি আমার মৃত্যু হবে। সজন বারবার নিজেকে বলতে লাগল আমার তেমন কিছুই হয়নি। আমি তো জানি আমার কিছুই হয়নি। আমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি না। আমার কোন ভয় নেই।

কিন্তু রাত্রি এখনও আসছে না কেন? সজন হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। আমি কেন নিজেকে বারবার বোঝাতে চাইছি আমার কোন ভয় নেই? তাহলে নিশ্চয়ই কোন ভয়ের কারণ আমার মধ্যে ঘটেছে। তাহলে আমার কিছু একটা হয়েছে। আমার কী হয়েছে? আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন? আমার অসুখ করেছে। আমার কী অসুখ করেছে? আমার কী হবে? সজন ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বুকে যেন একটা চাপা তীক্ষ্ণ ধাক্কা লাগল। তারপরই সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে যেতে লাগল। মাথাটা যেন হু-হু করে জ্বলে উঠল। তীব্র যন্ত্রণাকর অসংখ্য উদ্বেগ ঝাঁক ঝাঁক পোকার মত তার অনুভূতিতে চরে

বেড়াচ্ছে। সজন যেন একে একে অন্য আর একজনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছে! সে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল। সকলে ছুটে এল, কী হয়েছে সজন? কী হয়েছে তোমার? এই তো আমরা—আমরা তোমার আত্মীয়-বন্ধু, বল তোমার কী হয়েছে, কী হচ্ছে, কী কষ্ট হচ্ছে, তুমি ভাল আছ কিছু হয়নি তোমার এই দেখ, দেখ দেখ আমরা, আমাদের চিনতে পারছ না? তুমি খুব ভয় পেয়েছ? তোমার কোন ভয় নেই—তুমি শুধু একটু দুর্বল হয়ে পড়েছ, আর তা হবে না! নিজের ওপর কী অত্যাচার না তুমি করেছ! যা হবার হয়ে গেছে—। এখন থেকে আর একটুও ভাববে না। সব ভাল হয়ে যাবে। সজন নিজেকে নদীর পাড়ে একলা বসে থাকতে আবিষ্কার করল।

কিন্তু আর সে নিজেকে উপেক্ষা করল না। অভিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করল। ডাক্তার যা বলল—ক্ষয়ে ক্ষয়ে আপনার শরীর মন প্রায় শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে গেছে দেখছি। এ-যাত্রা হয়ত বেঁচে গেলেন, তবে এ-যাত্রায় সত্যিকারের বেঁচে যাবার জন্যে কিছুদিনের জন্যে এই কলকাতা, কলকাতার আবহাওয়া, কলকাতার জীবনকে গুড়বাই আপনার না জানালেই নয়। সজনবাবু, ভাবিত হবেন না, চলে যান কোন ধারে-কাছের সমুদ্রে,—গুড বাই। উইস ইউ এ হ্যাপি ফিউচার।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত হবে)

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী
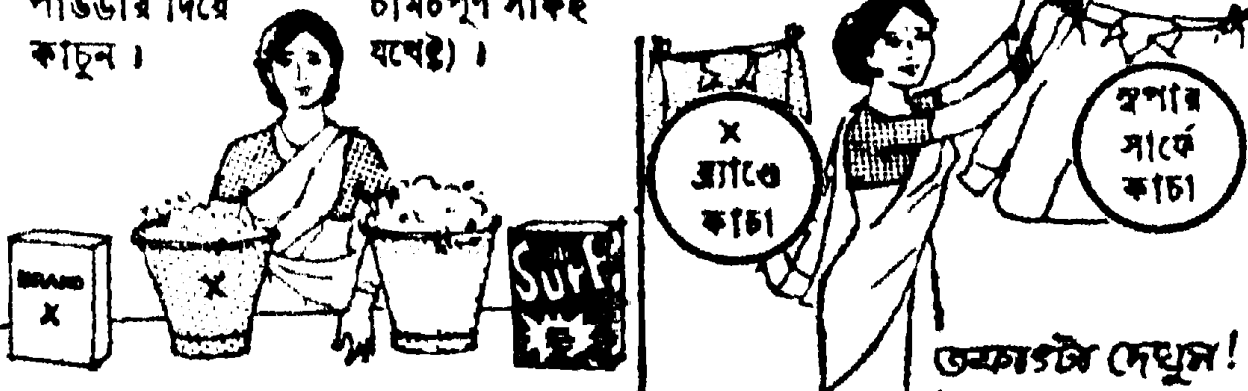
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোথাও আসতে যতো আনন্দ, আবার ফিরে যেতে ততো বেদনা। পথের মতো আনন্দ-সঞ্চয় সবই তো পথেই ফেলে যেতে হয়। সঞ্চয় তো কিছুই থাকে না। শূন্য পাত্র পূর্ণ করে নিই পথের সঞ্চয়ে। আর সে সঞ্চয় কখন যেন পথেই হারিয়ে যায়। ফিরে আসি আরো শূন্যমনে।

কিন্তু ভ্রমণে এখনো পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নি। এখনো বাকি রয়েছে অমৃতসর যাওয়া। সেখানে স্বর্ণমন্দির দেখবো, আর দেখবো শহীদতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ।

অমৃতসরের কথা শুনেছি, পড়েছি—কিন্তু চোখে দেখা এই প্রথম।

মন্দিরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে এক নজরে চারিদিকের পরিবেশ লক্ষ্য করলাম। ভালো লাগলো। এবারে ভিতরে যাবার পালা। ভিতরে যাবার আগে জুতো খুলে রাখতে হলো। তারপর হাত-পা ধুয়ে মাথায় রুমাল জড়িয়ে এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে। এখানকার বিধি এই। মুক্তমস্তকে মন্দির প্রবেশ নিষিদ্ধ।

প্রথমে পরিক্রমা করলাম অমৃতসাগর। এটি কৃত্রিম জলাশয়। জলাশয়ের চারদিকে প্রশস্ত পথ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর ঐতিহাসিক স্বর্ণমন্দির দেখার পালা। যে স্বর্ণমন্দিরের কথা শুনেছি, পড়েছি—আজ শিখতীর্থ সেই স্বর্ণমন্দির প্রত্যক্ষ করলাম। এখানে বিগ্রহ নেই। গ্রন্থসাহেব এখানে দেবতা। প্রথম থেকেই মনে কৌতূহল ছিল, পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের স্মৃতির কোন নিদর্শন এখানে দেখতে পাবো কিনা। পেলাম না তেমন কিছুর সন্ধান। স্বর্ণমন্দির দর্শনান্তে এসেছি ভারতের মুক্তিতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে। অপরিসর পথ ধরে গেলাম সেই চিহ্নিত স্থানটিতে, যেখানে মিশে আছে ভারতের শাসক ইংরেজের কলঙ্ককথা। জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতের আর এক তীর্থ। বিগ্রহ যেখানে ভারতের নর-দেবতা। প্রার্থনা যেখানে স্বাধীনতার শপথ-মন্ত্রে। অঞ্জলি যেখানে আত্মদানে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, যেখানে একদিন ইংরেজের নির্মম বুলেট এসে বিঁধেছিল নিরস্ত্র ভারতবাসীর বুকে। যেদিন যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই হিংস্র-বর্বরতায় বোধহয় পশুও লজ্জা পায়।

মনে মনে ভারতের মুক্তিতীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা ভেবেছি—আজ সেই তীর্থ দর্শন করে ধন্য হলাম।

দেখলাম, দেয়ালে সেই নির্মম বুলেটের ক্ষতচিহ্ন, দেখলাম সেই অন্ধকার ইঁদারা, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষ। দাঁড়িয়ে রইলাম। কান পেতে শুনলাম, ইতিহাসের কথা। উপলব্ধিতে স্পষ্ট শুনেছি, সেদিনের কণ্ঠস্বর। নর-নারী শিশু বৃদ্ধের মিলিত কণ্ঠস্বর—'আমাদের রক্তে তোমরা শপথ নাও, ভারতের মুক্তির। তোমাদের মুক্তিতে আমাদের মুক্তি।'

—কী ভাবছো?

সচকিত আমি ফিরে তাকালাম। সুধীরা ডাকছে। মীরাও রয়েছে তার মায়ের পাশটিতে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে এসেছি যখন, তখন আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। দেখলাম, ছোট ছোট গাছগুলির সবুজ পাতা ঝলসে গেছে প্রচণ্ড দাবদাহে। দেখলাম, চারদিকের পরিবেশ জুড়ে কেমন যেন তৃষ্ণার্ত আবহাওয়া।

এর পরেই এলাম রামবাগে। যেখানকার জল শুধু সুপেয় নয়, টনিক বিশেষ। সেই জল পান করলাম।

রামবাগ থেকে এসেছি অমৃতসর স্টেশনে। স্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে মনে মনে ক'দিনের হিসেব করছিলাম। কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, আবার কোথায় যাবো?

কিন্তু যাবার ঠিকানা তো একটাই। জীবনে যতোই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাই না, তবু তো ঘরের চৌহদ্দিতেই বার বার ফিরে যেতে হয়। তবু ভালো লাগে এই বাধা বন্ধনহীনভাবে ছুটে চলতে। এর মধ্যে জীবনকে আর একভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। ফিরে যেতে হবে সেই পুরোনো পরিবেশে। ফিরে যেতে মন চায় না। যে বিহঙ্গ একবার আকাশে ডানা মেলেছে, সে কি আর খাঁচায় যেতে চায়! কিন্তু আমি তো বিহঙ্গ নই। আমি মানুষ। আমার নির্দিষ্ট নাম আছে, নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে—যে নামে আমার পরিচয়, যে ঠিকানায় আমার আশ্রয়। চিন্তায় ছেদ পড়লো। ডাউন অমৃতসর মেল প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে এসেছি কলকাতায়। সেই পুরোনো ঠিকানায়। পথের ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। বাড়ি ফিরে আজ আর কোন কাজ নয়, নিশ্চিন্তে বিশ্রাম।

কিন্তু বিশ্রাম চাইলে কি পাওয়া যায়! দুপুরের পর ফোন এলো। বিজয় ফোন করছে। রাসবিহারী সরকার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বললাম, আজ কোন কাজ নয়, কথা নয়—বরং আগামীকাল কথা হবে। রাসবিহারীবাবুকে জানিয়ে দিও, কাল যেন আসেন।

পরদিন। ডায়েরীর পাতায় সেদিনটি চিহ্নিত ১৮ মে বলে। সেদিন রাসবিহারীবাবু এলেন। সঙ্গে নাটকার শচীন সেনগুপ্ত আর সীতানাথ মুখার্জী। ওঁরা আমাকে নতুন করে থিয়েটারের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চাইলেন। কিন্তু আমি নাটক বা থিয়েটারের ব্যাপারে আজকাল তেমন উৎসাহ পাই না। তবে সেকথা বাইরে বলার নয়। সেটা আমার মনের কথা। অথচ আমি তো জানি, আমি এখন ছুটি চাই—নিজের কাছে ফিরে যেতে চাই। দিনের সঙ্গে আমার মানসিক চেহারা অনেক বদলে গেছে। হয়তো আরো যাবে।

ঐদিনে মিঃ এন. সি. গুপ্ত এলেন। এঁর পরিচয় বোধহয় আগেই দিয়েছি কোন সময় কথা প্রসঙ্গে। মিঃ গুপ্ত থিয়েটারে অনেক সময় অর্থ লগ্নী করতেন।

মিঃ গুপ্ত তাঁর কথার মধ্যে এক সময় বললেন, আপনার ছেলের সঙ্গে জুরিখে আমার আলাপ হয়েছিল। বড়ো ভালো আপনার ছেলে।

যাই হোক, বাড়িতে ফিরে আসার পরেই আবার পুরোনো কথা, পুরোনো

[illegible]

এর কদিন বাদে ২১ মে স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের নতুন নাটক রাজনর্তকীর শুভ উদ্বোধন হলো। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাকে মহেন্দ্রবাবু কিছু জানান নি। তাঁর কাছ থেকে একটা ফোন অন্ততঃ আশা করেছিলাম। তবে স্টারের অনিল বসু আমাকে ফোন করে মহেন্দ্রবাবুর অসুবিধের কথা জানিয়েছিলেন।

মে মাসের শেষদিকে শিশিরবাবুর ভাই হৃষীকেশ ভাদুড়ী আমাকে ফোন করলেন, শ্রীরঙ্গম থেকে। জানালেন, পরদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অথচ কারণ কিছুই বললেন না।

পরদিন ২৯ মে হৃষীকেশবাবু এলেন। যে কথা ফোনে বলেন নি সেকথা সাক্ষাতে বললেন।

শ্রীরঙ্গমে শিশিরবাবু প্রফুল্ল অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। তাঁর ইচ্ছে আমি এ নাটকে রমেশের ভূমিকায় অভিনয় করি।

একটু চিন্তা করে বললাম, শিশিরবাবু আমাকে ডেকেছেন, এ-তো আনন্দের কথা। কিন্তু—বলে চুপ করে গেলাম।

হৃষীকেশবাবু বললেন, কোন কিন্তু নেই। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।

বললাম, ঠিক আছে, বড়োবাবুকে জানাবেন আমি অভিনয় করবো।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার শিশিরবাবু থিয়েটার জগতে বড়োবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের সবার কাছে বড়োবাবু।

বলা বাহুল্য শ্রীরঙ্গমে পর পর দুদিন প্রফুল্ল অভিনীত হয়েছিল। শিশিরবাবুর সঙ্গে অনেকদিন বাদে আবার একসঙ্গে মঞ্চে নামলাম।

সেদিন ১লা জুন। ইস্ট এণ্ড ফিল্মসের ছবির কাজে স্টুডিও গিয়েছিলাম। ছবির নাম ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে একটা কথা মনে আছে সেদিন স্টুডিও ফ্লোরে একটি নতুন মেয়েকে দেখেছিলাম, যার নাম সুচিত্রা সেন।

অনেকদিন পর একটি মুখের রেখায় সম্ভাবনার আভাস পেলাম, যদি নিষ্ঠা থাকে, তাহলে এ মেয়ে একদিন চিত্র-জগতের শিরোনামায় স্থান পাবে।

৩ জুন তারিখটির মধ্যে বিশিষ্টতা আছে। ঐ দিনেই শ্রীরঙ্গমে গেলাম। দেখা হলো শিশিরবাবুর সঙ্গে। দীর্ঘদিন পরে দেখা। এক যুগ হয়ে গেছে। সেই ১৯৪০-এর প্রথমদিকে মিনার্ভায় মিশর-কুমারী অভিনয়ের মঞ্চে দেখা হয়েছিল, তারপর আজ এই দেখা। অথচ আমরা পরস্পরের কতো কাছের মানুষ।

দেখা হতেই পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে দুজনের মনের সঞ্চিত আবেগ উজাড় করে দিলাম।

তারপর দুজনের মধ্যে আরম্ভ হলো অন্তরঙ্গ আলাপ।

৬ জুন তারিখে শ্রীরঙ্গমে অভিনয় হলো প্রফুল্ল। দর্শকপরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সেদিনের অভিনয়ের কথা ভুলবার নয়। শিশিরবাবু অভিনয় করলেন যোগেশের ভূমিকায়। আর রমেশ চরিত্রটি ছিল আমার। নামভূমিকার শিল্পী ছিল সরযূ-বালা। রেবা দেবী, নিভাননী, নিরোদা, ইন্দুবালা এরাও ছিল সেদিনের অভিনয়ে।

পরদিনও প্রফুল্ল অভিনীত হলো। সেদিনেও অগণিত দর্শকসমাগম হয়েছিল।

এরপর আবার শ্রীরঙ্গমে শাজাহান অভিনীত হলো ১৩ ও ১৭ জুন। দুদিনে অজস্র দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল প্রেক্ষাগৃহ।

কী জানি কেন, নতুন করে যেন উৎসাহ পেলাম। মনে হলো, এখনি ছুটি নয়, এখনই অবসর নয়—এখনো মঞ্চ আমাকে আকর্ষণ করে, এখনো মুক্তির প্রহর আসে নি।

শ্রীরঙ্গমে অভিনয় চলতে লাগলো। একই মঞ্চে শিশির ভাদুড়ি আর আমি। এছাড়া অন্যান্যরা তো আছেনই।

অনেকে বলে থাকেন, শিশিরবাবুর সঙ্গে আমার বরাবর একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তাঁরা জানেন না, আমাদের মধ্যে কতো নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তফাৎ যেটুকু ছিল, সেটুকু পারস্পরিক চিন্তার। বাইরে থেকে অনেকে যাকে দ্বন্দ্ব বলে মনে করতেন। কিন্তু এখানে আমি দ্বিধা না রেখেই বলতে পারি, আমাদের মধ্যে কোথাও দ্বন্দ্ব ছিল না। তবে দুজনের মধ্যেই ছিল আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ। এখানেই ছিল আমাদের মিল, আর যতো অমিল তাও এখানে।

বাংলা দেশ তথা ভারতের মানুষের কাছে ২৩ জুন তারিখটি চরম দুঃখের। ঐ দিনেই বাংলার বরেণ্য সন্তান, ভারতের জনপ্রিয় লোকনেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে অন্তরীণ অবস্থায় পরলোকগমন করলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি বেদনাদায়ক। তাছাড়া এই মৃত্যুর মধ্যে সেদিন রহস্যের গন্ধ পেয়েছিল মানুষ। যে রহস্য আজো ভারতবর্ষের একদল মানুষের মনে।

এর কদিন পরে ২৯শে জুন বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি জ্যোতিষ্ক খসে গেল। ভূমেন রায় মারা গেলেন। ভূমেনের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের তো কমদিনের নয়। অনেকদিনের। একই সঙ্গে অভিনয় করছি, একই সঙ্গে সুখ-দুঃখের অংশ নিয়েছি—কিন্তু আজ সে সব ছেড়ে চলে গেল।

এই প্রসঙ্গে বলবো, প্রথম জীবনে [illegible]

ভূমেন, পরে স্থায়ীভাবে মঞ্চে যোগ দেয়। এবং আপন নিষ্ঠার জোরে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল অল্পদিনের মধ্যেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তার শান্তি ছিল না। আমি জানতাম, তার এই অশান্তি কেন। কিন্তু আজ যে সব অশান্তির বাইরে চলে গেছে, আজ তো তার কাছে শান্তির অভাব নেই।

ভূমেনের মৃত্যুতে ব্যথা পেলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে, সে যেন স্বর্গে স্থান পায়।

বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন নাটক চলছে। চলতে হয় চলা। নয়তো নতুন এমন কোন নাটক আসছে না যা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার ছেড়ে চলে গেল। কেন সেই জানে। ভাবলাম, হঠাৎ সে স্টার ছাড়লো কেন? তাছাড়া তখন সে করবেই বা কি। তবে একটা কথা বুঝেছিলাম, মহেন্দ্রের মধ্যে অস্থিরতা পেয়ে বসেছে।

চলতি দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, এক শ্রীরঙ্গমে চিরকুমার সভার অভিনয় ছাড়া। শিশিরবাবু নেমেছিলেন রসিকের ভূমিকায়, আর আমি ছিলাম চন্দ্রবাবুর চরিত্রে। কিন্তু কী জানি কেন সেদিন নাটক তেমন জমেনি।

আজকাল প্রায়ই শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করছি শ্রীরঙ্গমে। একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠছে বড়োবাবুর সঙ্গে।

এমনি করে দিন, মাস কাটছে। অভিনয় করছি। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না। মঞ্চের মায়া আর আমাকে ধরে রাখতে পারছে না। তবু সেদিন রথযাত্রার তারিখটি ছিল আমার ব্যক্তিগত জীবনের স্মরণীয় দিন। তিরিশ বছর আগে আমি এই দিনটিতে প্রথম পেশাদারী মঞ্চে অভিনেতা রূপে যোগ

দিয়েছিলাম। প্রথম নাটক ছিল অপরেশবাবুর কর্ণার্জুন। আর আমার ভূমিকা ছিল অর্জুনের।

মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছি, ত্রিশ বছরের পথ পিছনে পড়ে রয়েছে। যে পথে রয়েছে নানা ঘটনার স্মৃতি।

এতোর মধ্যেও সামনের দিকে তাকালে তেমন উৎসাহ পাই না। মনে হয়—আর অভিনয় নয়, এবারে জীবনে ফিরে যেতে হবে।

আর এই জীবনে যতো ফিরে যেতে চাই, ততোই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আবার হারিয়ে যাওয়া আমাকে নতুন করে আবিষ্কার করি।

এই যখন মানসিক অবস্থা, ঠিক সেই সময় নেপাল যাওয়ার চিন্তাটা মাথায় এলো।

আমি নেপাল যাবো শুনে অনেকেই নিষেধের বাণী উচ্চারণ করলেন। বিশেষ করে কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, আর ডাক্তার রাম অধিকারী বললেন, এই ঠাণ্ডায় নেপাল যাবেন? না যাওয়াই উচিত।

কিন্তু বাইরে যাবার ডাক এলে আমি কোন বাধাই মানি না। আর এ কথাও ঠিক—বাইরে বেরোলে আমি যেন বদলে যাই। মনে হয় না, আমি দুর্বল, আমি অশক্ত।

অক্টোবর মাসের উনত্রিশ তারিখ সকালে আমি নেপালের উদ্দেশে দমদম বিমানবন্দর থেকে রওনা হলাম। পথে পাটনায় ক্ষণিকের যাত্রাবিরতি। তারপর কাঠমাণ্ডুর পথে যাত্রা শুরু।

আগে থেকেই কংগ্রেসনেতা অতুল্য ঘোষের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে কাঠমাণ্ডুতে সামশের জং বাহাদুর রাণাকে পাঠিয়ে ছিলাম। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে নেপালের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এম পি কৈরালার কাছে গুরুত্ব দিয়েই বলা হয় যে কলকাতা থেকে মিঃ অহীন্দ্র চৌধুরী আসছেন, তাঁকে যেন বিমানঘাঁটি থেকে সরাসরি সরকারী অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী মিঃ প্রধান, গৌচর বিমানঘাঁটি থেকে আমাদেরকে নিয়ে এলেন সরকারের অতিথিশালায়। সেই দিনই আমি তাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, যে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, তিনি যেন আমার জন্য সে ব্যবস্থাটুকু করেন।

প্রথম দিনেই দুপুর পর্যন্ত বিশ্রামের পর, চা-পানান্তে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরোলাম। বেশি দূর নয়, এলাম বাগমতীর সেতু পর্যন্ত। দেখলাম, কয়েকটি মন্দির—প্রতিটি মন্দিরের গঠনশৈলী এক। প্যাগোডার মতো।

আজ আর বেশী সময় নয়, সন্ধ্যা হতেই ফিরে এলাম।

ইচ্ছে ছিল পরদিন প্রথমেই শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের মন্দিরে যাবো দেব-দর্শন করতে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সব সময় সব কিছু হয় না। কিন্তু রাত্রেই ফোন পেলাম মিঃ প্রধানের কাছ থেকে, আগামী কাল সকালে প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

যাই হোক, পরদিন সকালে ট্যাকসী করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এলাম। প্রবেশ-পথেই সান্ত্রী, আমাকে আটকালো। মুখে বললেও ওরা কিছু শুনলে না। শেষটা মিঃ প্রধানের কাছে আমার নামের কার্ড পাঠালাম। এবারে মিঃ প্রধান নিজে এলেন আমাকে ভিতরে নিতে।

ভিতরে এলাম। প্রশস্ত হলে রাজকীয় সাড়ম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এম পি কৈরালা উপবিষ্ট। তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। বুঝলাম, এঁরা সবাই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি। ঘরে ঢুকবার সময় মিঃ কৈরালা এক নজরে আমাকে দেখেছিলেন।

এবারে মিঃ কৈরলা উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে সানন্দে কাছে ডাকলেন। পাশেই একটি সোফা। বসতে অনুরোধ করলেন।

প্রথমেই চিন্তা হলো, কী ভাষায় কথা বললো, ইংরেজী না হিন্দী। এমন সময় মিঃ কৈরালা পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথম কথা—আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না, তারপরেই বললাম, বাঃ আপনি এতো চমৎকার বাংলা বলেন।

মিঃ কৈরালা হেসে বললেন, আমি আপনাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। অনেকদিন কলকাতায় ছিলাম।

তারপর বেশ খানিক সময় কথাবার্তা বলে, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এলাম মিঃ প্রধানের সঙ্গে।

অতিথিশালায় এসেই আবার সুধীরাকে নিয়ে ... [illegible]

ট্যাকসী নিয়ে সরাসরি শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

জীবনে পশুপতিনাথের কথা কতোবার শুনেছি। শুনেছি হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ড থেকে তীর্থযাত্রীদল শ্রীশাগিরি, চন্দ্রাগিরির চড়াই পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে আসে পশুপতিনাথ দর্শন করতে।

মনের মধ্যে চাপা কৌতূহল নিয়ে মন্দিরের তোরণ পেরিয়ে এলাম। সামনেই বিরাটকায় নন্দীবৃষ আর গরুড়স্তম্ভ—তারপরেই সুবর্ণশীর্ষ পশুপতিনাথের মন্দির।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। দেবতা নয়—মন্দিরের দিকে। মন্দিরের কারুকার্য দেখে অভিভূত হতে হয়। তারপর রাজৈশ্বর্যের প্রলেপ জড়িয়ে মন্দিরের সর্বাঙ্গে।

লক্ষ্য করলাম, পশুপতিনাথের গঠনশৈলী প্যাগোডা ধাঁচের। অবাক হয়ে দেখছি সব কিছু।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সুধীরার জিজ্ঞসা, দেব-দর্শন করবে না?

—ও, হ্যাঁ। মুহূর্তে নিজেকে সহজ করলাম। —চলো। মন্দিরে এলাম। দর্শন করলাম, ভগবান পশুপতিনাথকে। যুগ যুগ ধরে মন্দিরে বিরাজ করছেন ভগবান। তাঁর দর্শন-মানসে কতো যুগ যুগ আগে থেকে হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ছুটে এসেছে মানুষ। দর্শন করেছে দেবতা। কী পেয়েছে জানি না, তবু মানুষ এসেছে দেবতার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করতে।

আমরা করজোড়ে প্রণাম করেছি। পুজো দিয়েছি। কিন্তু কিছুই চাইতে পারিনি। সর্বরিক্ত দেবতার কাছে কী চাইবো। চাইবার তো কিছু নেই। শুধু একটি কথাই বলতে চেয়েছি মনে মনে, হে ভগবান—তোমাকে বিশ্বাস করে যেন শান্তি পাই। আর কিছু নয়।

মন্দির দর্শনান্তে বাগমতীর কাছে এলাম। বাগমতীর ওপর দিয়ে সেতু। ওপারে যাবার পথ। ওপারে টিলা পাহাড় পেরিয়ে সতী-পীঠ গুহ্যেশ্বরী। গুহ্যেশ্বরী এখানে ভৈরবী আর ভৈরব পশুপতিনাথ।

সিঁড়ি পথ দিয়ে টিলায় উঠতে হয়। টিলার ওপরে গোরক্ষনাথজীর মন্দির শুধু নয়, আরো ছোট-বড়ো মন্দির। কেমন যেন শূন্যতা এই সব মন্দিরের পরিবেশ জুড়ে।

এসেছি গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে। পুজো দিয়েছি। দর্শন করেছি দেবীকে। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহের গুহ্যদেশ পড়েছিল এখানে।

মন্দিরের দেশ নেপাল। এতো মন্দির, এতো দেবতা কোথাও দেখিনি। আর প্রতিটি মন্দিরের গঠনশৈলী একই ধাঁচের। একমাত্র [illegible]

স্বয়ম্ভূ মন্দির। স্বয়ম্ভূ মন্দিরের আর এক নাম 'বোধনাথ'।

দেখেছি কাঠমাণ্ডু ঘিরে যতো শহর আর জনপদ। অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, আর একটি কথাই ভেবেছি, দেশটা এখনো অতীতের ঐতিহ্যের কথা ভুলতে পারেনি। সর্বত্র প্রাচীনত্বের ছাপ আর অতীতের গন্ধ। ভালো কি মন্দ জানি না, তবে একটা কথা ঠিক—যদি প্রাচীনত্বের মধ্যে কোন কিছু বৈচিত্র্য থাকে, তবে সে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে নেপালে।

হিন্দু সংস্কৃতি, বিশেষ করে তন্ত্রের পীঠভূমি নেপাল। যদিও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি এমন নয়। তবুও হিন্দুত্বের ছাপটাই এখানে সুস্পষ্ট।

কতো মন্দির দেখেছি। তার মধ্যে শহর থেকে দূরে দক্ষিণা কালীর কথাটাই আগে মনে পড়ে। এখানে ডিম পর্যন্ত পূজো দেওয়া হয়। এর মধ্যে আমি নির্বিকারত্বের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি।

আর একটি মন্দির—দেবতা যেখানে ভদ্রকালী, সেটি শহরের প্রাণকেন্দ্রেই অবস্থিত। মন্দির বলতে প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে চতুষ্কোণ জায়গায় ছোট একটি মন্দির। সেখানে অধিষ্ঠিতা ভদ্রকালী। যেখানে প্রতিদিন সকালে ও রাত্রেই দেবীর উদ্দেশে নানা ধরনের ভক্তিগীতি এবং রাগ সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সকালে এই সঙ্গীতের আসরে আমি প্রায় নিয়মিতভাবে একবার যেতাম।

মন্দিরের মধ্যে বালাজু মন্দিরের প্রসিদ্ধি আছে। পাহাড়ের পাদদেশে এই মন্দিরটি। এখানে জল-শয্যায় শায়িত নীলকণ্ঠের বিশাল মূর্তি—দেবতার প্রতীক।

মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির শহর থেকে বেশ দূরে ভাতগাঁও-এ। আর এই মন্দিরের যাওয়ার পথটি অত্যন্ত বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ ধরেই গাড়ী চলে। 'নাথ পন্থী' সম্প্রদায়ের অন্যতম পীঠ এই মচ্ছেন্দ্রনাথ। এই সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলা দেশেও বেশ কিছু আছেন। গোরক্ষনাথজী এঁদের ধর্মগুরু।

কাঠমাণ্ডুর প্রতিটি মন্দির দেখেছি, দেখেছি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি। শহরের হনুমান ঢোকা, উপকণ্ঠে ললিতপুর বা পাটন, ওদিকে ভকতপুর—সবই দেখেছি। দেখেছি ললিতপুরের প্রাচীন দরবার গৃহ। যার কারুকার্যের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তাছাড়া সবচেয়ে আকর্ষণীয় এইসব প্রাচীন ভবনগুলিতে কাঠের কারুকাজ। কতো দিন গেছে ইতিহাসের কতো উৎথান-পতন, তবু তার মধ্যেও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো দিনের এই সব মন্দির, ভবন, আর প্রাসাদ।

পুরোনো দিনের অনেক নিদর্শন দেখা যায়, মিউজিয়মে। যেখানে অতীত ইতিহাসের অনেক স্মৃতি বর্তমান।

তন্ত্রের দেশ নেপালে কালীপূজো দেখলাম। মহা সমারোহে [illegible]

পূজো অনুষ্ঠিত হয় এদেশে। এই শুভ দিনটিতে পশুপতিনাথের মন্দিরে গেলাম, দেব দর্শন করতে। এদিনে দেখলাম, দেবতার শৃঙ্গার বেশ। বহুমূল্যে রত্নখচিত নানা অলঙ্কারে ভূষিত দেবতা। জানি না, সর্বত্যাগী শঙ্করকে এ বেশে মানায় কিনা। তবুও দেখলাম। দেখলাম শয়নারতি। তারপর এলাম বাগমতীর তীরে, যেখানে অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসীদের ধুনি জ্বলছে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে গেলাম, সুন্দরী জল ঝর্ণা দেখতে। শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এই সুন্দরী জল। যেখান থেকে কাঠমাণ্ডু শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

এই দিনে যাওয়ার পথে লক্ষ্য করলাম, নেপালের প্রতিটি জনপদ, গ্রাম যেন উৎসবে মেতেছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া রূপ নিয়েছে সার্বজনীন লোক-উৎসবের। ছেলেমেয়েরা মালা পরেছে, কপালে দিয়েছে চন্দনের টিপ—পথ চলছে গান গাইতে গাইতে। এ উৎসব যেন এক খুশীর উৎসব। তারপর জায়গায় জায়গায় দেখলাম দোলনা করা হয়েছে। দোলনায় দোল খাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা—হাসছে, গান গাইছে। নেপালের প্রতিটি ঘরে উৎসবের স্পর্শ।

সুন্দরী জল ঝর্ণা এলাকা সংরক্ষিত। কারণ, এখান থেকে শুধু জল সরবরাহ হয় না, বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় শহরে। তবুও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছুটা দেখার সুযোগ করে দিলে।

শহরে, শহরের বাইরে যা কিছু দর্শনীয়, প্রায় সবই তো দেখা হলো। বাগমতী পেরিয়ে গ্রামীণ পরিবেশে টিলার ওপর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির, তা-ও দেখেছি। যতো মন্দির, যতো কিছুর সন্ধান পেয়েছি সবই দেখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু নেপালে যদি কিছু মুগ্ধ করে থাকে, তবে তা হলো এর প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, আর মনোরম প্রকৃতিক পরিবেশ। শহরে-জনপদে দেখেছি ইতিহাসের চিহ্ন আর দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখেছি হিমালয়ের প্রচ্ছদপট। দেখেছি তুষারমৌলী গিরিশিখর, দেখেছি সবুজ অরণ্য। দেখেছি পার্বত্য নদী, ঝর্ণা। আর দেখেছি, উপত্যকার পথে ফসলের ক্ষেত, দেখেছি পরিশ্রমী চাষী কেমন করে পাহাড়ের গায়ে সব্জী ফলায়, দেখেছি দেহাতী কাঠুরিয়া দূরের পাহাড় থেকে কেমন করে কাঠ বয়ে আনে শহরে।

কিন্তু রাজধানী কাঠমাণ্ডুর বাইরের ঐশ্বর্য দেখে যতোই মন ভরুক না তার চেয়ে অধিক বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। দারিদ্র্যের এমন নির্মম চেহারা যেখানকার সাধারণ সমাজে, সেখানে মুষ্টিমেয় পরিবারের ঐশ্বর্যের প্রকাশে কী আসে যায়।

সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাস হয়তো একদিন নেপালের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

কাঠমাণ্ডুর দিন ফুরিয়ে এলো। এবারে ফিরে যাবার পালা।

নভেম্বরের শীতের সকালে গোচর বিমানঘাটি থেকে আমরা পাটনার পথে রওনা হলাম। ঐ দিনই বিকালে পাটনা থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কলকাতায় ফেরার পর দিনই ঋষি ভাদুড়ীর ফোন পেলাম। সবে বাইরে থেকে ফিরছি—নাটকের কথায় মন নেই, তবু আবার নাটক নিয়েই কথা আরম্ভ হলো।

বাইরে থাকলে সব কিছু ভুলে থাকা যায়। কিন্তু ফিরে এলই আবার সেই নানা ঘটনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা।

যাত্রাজগতের নামকরা অভিনেতা এবং সুখ্যাত নাট্যকার ফণী রায় মারা গেল ১৭ নভেম্বর। 'বান্ধব সমাজে' সে অভিনয় করতো। এক সময় অনেক যাত্রার পালাও সে রচনা করেছে।

পরদিন ১৮ নভেম্বর, শ্রীরঙ্গমে এলাম। শিশিরবাবুর সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হলো। আমার কাছ থেকে নেপালের কথা আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। তারপর শিশিরবাবু বললেন, মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের সঙ্গে জাতীয় রঙ্গশালা নিয়ে আলোচনার কথা। এ ব্যাপারে শিশিরবাবু দৃঢ় মত—সরকার কখনো জাতীয় নাট্যশালার চিন্তাকে রূপ দিতে পারবে না। তবে কথা হচ্ছে হোক।

আমি এ বিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করি। শিশিরবাবুকে সে কথা বললামও। জাতীয় রঙ্গশালার এই পরিকল্পনা, পরিকল্পনা হয়েই থাকবে।

যাই হোক, শিশিরবাবুর সঙ্গে শ্রীরঙ্গমে বিভিন্ন নাটকে অংশ নিচ্ছি। কখনো শাজাহান, কখনো রঘুবীর কিংবা অন্য কোন নাটক। যার আকর্ষণ আছে।

একই মঞ্চে শিশিরবাবু আর আমার অভিনয়—এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় এবং নাট্যামোদী মহলে নানা ধরনের আলোচনা প্রকাশিত হতে লাগলো। কারণ আর কিছু নয়—শিশির ভাদুড়ী আর অহীন্দ্র চৌধুরী, একই নাটকে একই মঞ্চে অভিনয় করা, এ-রকম ঘটনা আগে খুব বেশী ঘটে নি। বরং আমরা যেন সাধারণের কাছে বিপরীত শিবিরের অভিনেতা হয়ে উঠেছিলাম। এ-সম্পর্কে আমার কথা, আমরা একই শিবিরের, আমাদের একই পরিচয়—অভিনেতা। তবে মত আলাদা হলেও পথ আলাদা নয়। ধর্ম আলাদা নয়।

শ্রীরঙ্গমে থাকতে প্রায়ই শিশিরবাবুর সঙ্গে নানা ধরনের সুখ-দুঃখের কথা হতো। শিশিরবাবুর সঙ্গে কথা হওয়া মানে, মঞ্চ কিংবা নাটক নিয়ে। আমাদের দুজনেরই তো নাটকঅন্তপ্রাণ। এই সময়ে কতো কথা হতো। মনে আছে, শিশিরবাবু তখন চোখে কম দেখতেন, অথচ অভিনয়ের সময়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালে কে বলবে যে, উনি চোখে কম দেখেন। এক-একদিন পর্দা পড়লে, ওকে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হতো। দেখতাম, হয়তো ওঁকে হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক সময় কেউ দাঁড়িয়ে থাকতো না। তবে তার জন্যে কারো ওপর উনি অনুযোগ

মনে আছে, সে রাত্রে রঘুবীর নাটকের অভিনয় ছিল। রঘুবীর চরিত্রটিতে শিশিরবাবুর অভিনয় ছিল অসাধারণ। আমি করতাম অনন্ত রাও। রঘুবীর চরিত্রে শিশিরবাবু যে দরদ দিতেন, তার তুলনা মেলে না। কিন্তু আজ-কাল বেশ কষ্ট হয় তাঁর। তবুও করেন। মঞ্চে দাঁড়ালে অভিনেতার জীবনে যে এক শক্তি ভর করে! যাই হোক, এই অভিনয়ের সময়ে, মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন, ব্রাদার—দেখছো, দৃশ্যপটগুলোর অবস্থা। কী যে কষ্ট হয় আমার। কিন্তু কী করবো। মনের জোর আছে বলেই চলছি। এক-একদিন বলেছি, এই দুরূহ চরিত্র আর করেন কেন? বলেছেন, কী করবো। এছাড়া যে দর্শক হবে না। তাই মৃত্যুপণ করে অভিনয় করি।

তারপর আরো কতো কথা হতো এই সময়। প্রায়ই অভিনয়ের অবসরে আমরা কথায় বসতাম। কতো কথা। যেগুলো এখনও মনের মধ্যে বাজে।

জীবন গাঙ্গুলী সে আমলের নামকরা অভিনেতা। বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন। মারা গেলেন ২৮ ডিসেম্বর। অনেক দিন থেকেই টি বি'তে ভুগছিলেন। তারপর ছিল অর্থাভাব। যদিও নানাভাবে সাহায্য তুলে তাঁকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তবুও কোন ফল ফললো না। হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হলো।

জীবন গাংগুলীর মৃত্যুতে ব্যথা পেয়েছিলাম সেদিন। আর এ ব্যথার মুহূর্ত তো আমার জীবনে কম আসে নি। আমি তো দেখছি, চোখের সামনে দিয়ে এক-এক করে কতো জন চলে গেল। কিন্তু আমি বসে আছি, যেন তাদের স্মৃতি বহন করার জন্য।

নানা রঙের দিনের মধ্যেও কতো বেদনার রঙ। তবু তার মধ্যে দিন ঠিকই কেটে যায়।

বছরের যে কটা দিন বাকি ছিল কেটে গেল। শেষ হলো ১৯৫৩। বছরের শেষ দিনটিতে বসে বসে একটি কথাই ভাবছিলাম, কবে আমার নাটক নিয়ে খেলা শেষ হবে। আমি আর পারছি না। অভিনয় তো অনেক করেছি, আর কেন?

নতুন বছর যে এমনি দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু হবে, এ কী আগে ভেবেছিলাম।

আমার নট-জীবনের আচার্য তিনকড়ি চক্রবর্তী পরলোকগমন করলেন ২ জানুয়ারী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

তিনকড়িদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতের এক অধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে গেল। মনে পড়ে পুরোনো দিনের কথা, ভবানীপুরের সেই বান্ধব সমাজের যাত্রাভিনয়ের কথা। যেখানে আমার অভিনয়জীবনের শুরু। তারপর বান্ধব সমাজ থেকে তিনকড়িদার সঙ্গে আর্ট থিয়েটারে যোগ দেওয়া, এবং মঞ্চে অভিনয় শুরু—সবই মনে পড়ে।

তিনকড়িদার মৃত্যুতে আমি দারুণ মর্মাহত হয়েছিলাম।

পরদিনই আর এক দুঃসংবাদ—আমার শ্বশ্রুমাতার মৃত্যু। খবর পেয়েই ছুটে এলাম শ্বশুরালয়ে। শবানুগমন করে এলাম কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। শেষকৃত্য সমাপনান্তে ফিরে এলেম ভারাক্রান্ত মনে।

সময়ের সঙ্গে সব দুঃখই মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু সাময়িকভাবে সে দুঃখ যেভাবে জড়িয়ে থাকে, তাতে বড়ো কষ্ট হয়।

কিন্তু নটজীবনের আনন্দ বোধহয় বাইরের সব দুঃখ কষ্টকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আমার নট-জীবনের শেষ অধ্যায় চলেছে। এখন মনস্থির করে ফেলেছি এবারে অবসর নেব।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন শ্রীরঙ্গমে চন্দ্রগুপ্ত, আর স্টারে সমারোহের সঙ্গে শ্যামলী অভিনীত হচ্ছে। শ্যামলীর অন্যতম আকর্ষণ উত্তমকুমার আর সাবিত্রী চ্যাটার্জি। এরই মধ্যে অভিনেতা রবি রায় যোগ দেবা জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। তারই কাছে শ্যামলীর সাফল্যের কথা শুনলাম।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের অন্যতম সৃষ্টি 'বলিদান'। বলিদান নতুন করে শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হলো। যাতে করুণাময় চরিত্রে ছিলেন শিশিরবাবু স্বয়ং, আর আমি ছিলাম রূপচাঁদের ভূমিকায়।

আগেই বলেছি এ বছরটা শুরু হয়েছে দুঃসংবাদ নিয়ে। আবার মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম ২১ জানুয়ারী। নাট্যকার অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হওয়াতেই তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু। চোখের সামনে দেখছি, এক-এক করে কতো জন চলে যাচ্ছে। কতো পরিচিত মুখ আজ হারিয়ে যাচ্ছে মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলো থেকে। কিন্তু আমরা যারা আছি, তারা এদের স্মৃতিভার বহন করবো জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

জীবনে পরিচিত মানুষদের হারিয়ে কেমন যেন নিঃসংগ মনে হয়। মনে হয়, আমারো থাকার অধিকার যেন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু তো থাকতে হবে। ছুটি চাইলেও তা ছুটি পাওয়া যায় না। এই তো মনে করছি; অভিনয়জগতে ছেড়ে যাবো তাই বা পারছি কই। কতো জন জীবনের মঞ্চ ছেড়ে অন্য জগতে চলে যাচ্ছে।

ছেড়ে যাবো বলছি, অথচ অভিনয় করছি, বিভিন্ন নাটকে। কখনো মিশরকুমারী, কখনো ভোলামাস্টার কখনো অন্য কোন নাটক।

এরই মধ্যে পশ্চিমবাংলার প্রচার অধিকর্তা প্রকাশস্বরূপ মাথুরের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। চিঠিতে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তেইশে এপ্রিল রাইটার্স বিল্ডিংসে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে গেলাম। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন প্রকাশস্বরূপ মাথুর, জহর গাঙ্গুলী, চীফ সেক্রেটারী এস এন রায়, ডঃ ডি এম সেন। এখানে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু হলো। ডাঃ রায়ের ইচ্ছা, সঙ্গীত, নাটক আকাদমীর আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হোক কোলকাতায়। আর নাটক শাখার দায়িত্বটা যাতে আমি গ্রহণ করি, সে অনুরোধও এলো। ডাঃ রায়ের ইচ্ছায় আপত্তি করলাম না। তারপর ডাঃ রায় জানালেন, নাট্যশিক্ষার জন্যে একটা পাঠ্যক্রম তৈরী করা হোক। আর সে দায়িত্বও আমার ওপরই পড়লো।

সেদিন ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলোচনান্তে বাড়ি ফিরেছি। ভাবলাম, হয়তো এবারে সংগীত নাটক আকাদমী উপলক্ষ্য করে অভিনয়জগত ছাড়তে পারবো।

এরই মধ্যে আকাদমীর জন্যে নাটকের সিলেবাস তৈরি করে প্রচার-অধিকর্তা মাথুরের কাছে দিলাম। তার কদিন বাদেই আবার একদিন রাইটার্সে গেলাম মাথুরের কাছে। যেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর এবং অমলাশংকর। সেদিন নানা আলোচনার মধ্যে নাট্য-চর্চার জন্যে অধ্যাপক নিয়োগ সম্পর্কে কথা হলো। ঠিক হলো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হবে। সে দায়িত্বটাও আমার ওপর।

যাই হোক, আকাদমীর প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল। ভালোই হলো, এবারে আকাদমী নিয়ে পড়বো। এতোদিন মঞ্চজগৎ ত্যাগ করবো ঠিক করেছি, এবারে সত্যি ত্যাগ করতে পারবো।

আজকাল মাঝে মাঝে নানা অনুষ্ঠানেও আমাকে যোগ দিতে হয়। সেদিন ৯ আগস্ট দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় গিরিশ তর্পণ অনুষ্ঠানে গেলাম। সে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বর্ষীয়সী অভিনেত্রী নীরদা সুন্দরী। যিনি গিরিশচন্দ্রের কাছে অভিনয়ে হাতেখড়ি নিয়েছেন, সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক ডঃ হেমেন দাশগুপ্ত ছিলেন অন্যতম বক্তা।

সেদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে। আমি কি ভাষণ দেব, ভাবি নি। অথচ ঠাকুরকে স্মরণ করে ভাষণ শুরু করেছিলাম। নিজেই বুঝতে পারিনি, কোন প্রেরণায় সেদিন অমন ভাষণ দিতে পেরেছিলাম। সত্যি, সেদিন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, কোন ঐশী প্রেরণা ভিন্ন এ ধরনের ভাষণ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

অনুষ্ঠান আজকাল লেগেই আছে। কদিন বাদেই আবার লান্সডাউন রোডে ইউ এস এ থিয়েটার আর্টসের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা সভায় আমাকে যেতে হলো। যেখানে সভাপতি ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ।

মাথার মধ্যে আকাদমীর চিন্তাটাই বড়ো। তবুও নাটকের ভাবনা নেই এমন নয়। বেশ বুঝতে পারছি এবারে সত্যিই অভিনয়জগতের সঙ্গে আমার বন্ধনটা শিথিল হয়ে আসছে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কে

পৃথিবীটা ক্রমেই মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। আর সেজন্য দায়ী অন্য কেউ নয়, মানুষ। বিষয়টি নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল আলোচনায় মুখর। নানা জনে নানা পালটা ব্যবস্থার কথা বলছেন। বলা বাহুল্য, যে-যে কারণে পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের অনুপযোগী মনে করা হচ্ছে তা দূর করাটাই আসল কথা, যদি অবশ্য মানুষের সাধ্যাতীত না হয়। প্রধান কারণ দুটি—পরিবেশ বদলে যাওয়া ও জলবায়ু দূষিত হয়ে যাওয়া। পরিবেশ কেন বদলাচ্ছে? জলবায়ু কেন দূষিত হচ্ছে? মানুষ কি এখন ইচ্ছে করলেই পরিবেশের বদল ও জলবায়ুর দূষিত হওয়া বন্ধ করতে পারে? বিজ্ঞানীদের মতে, পুরোপুরি নয় তবে এমন মাত্রা পর্যন্ত নিশ্চয়ই যাতে এই পৃথিবী মনুষ্যবাসের অনুপযোগী না হয়। বিষয়টির গুরুত্ব আমাদের দেশের পক্ষেও সমধিক। কেননা, পরিবেশ বদলানো ও জলবায়ু দূষিত করার ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা অবিবেচনার পরিচয় দিয়ে থাকি যে মনে হতে পারে আমরা ধরেই নিয়েছি মনুষ্যের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যখন বিষয়টি নিয়ে সোরগোল তোলেন তখন বুঝে নিতে হয় যে যা-কিছু ব্যবস্থা নেওয়া মনুষ্যের সাধ্যের মধ্যে তা নেবার পরের অবস্থার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

পরিবেশ বদল

ভূপৃষ্ঠের বিরাট বিরাট এলাকা জুড়ে মানুষ বসতি গড়ে তুলছে, এ-দৃশ্য আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশটি অতি দ্রুত বদলে যায়। বসতি মানে তো শুধু বাসস্থান নয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকে খামার ও কল-কারখানা। ফলে বিরাট এলাকা জুড়ে অরণ্য লোপ পায় ও কল-কারখানার দূষিত রাসায়নিক পদার্থে বায়ুমণ্ডল কলুষিত হয়ে ওঠে। গত কয়েক-শো বছরে এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠের পরিবেশে বড়ো রকমের বদল ঘটে গিয়েছে। পরিবেশগত এই বদলকে বড়ো রকমের একটি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ-বিপ্লব প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি, ঘটছে মানুষেরই কার্যকলাপের ফলে। পৃথিবীরই জীব মানুষ—যে প্রাকৃতিক পরিবেশে তার জন্ম ও বড়ো হয়ে ওঠা, তার জীবন-ধারণের তাগিদেই তার অস্তিত্ব লোপ পায়।

এ-ধরনের ব্যাপার এই প্রথম ঘটল তা নয়, পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে তুলনীয় নজির পাওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসের গত একশো বছরের ইতিহাসে এমনি বিপ্লব একাধিক। এমন কথাও বলা চলে, অতীতের ইতিহাসে প্রাকৃতিক পরিবেশের বদল ঘটেছে আরও অনেক ব্যাপকভাবে। তবে এত দ্রুত কখনোই নয়।

ডাঙায় উদ্ভিদ জন্মাতে শুরু করেছিল আজ থেকে প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে। কিন্তু কার্বনিফেরাস কালে (৩০ থেকে ৩৫ কোটি বছর আগে) ডাঙার জমিতে যেমন এসেছিল প্রাচুর্য তেমনি বৈচিত্র্য। মাটির নিচে বড়ো বড়ো কয়লার খনি তৈরি হওয়ার সূত্রপাত এখান থেকেই। প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে ভরা এই উদ্ভিদ-জগতের লোপ পাবার কারণ কি? পরিবেশ কি বদলে গিয়েছিল? বিজ্ঞানীদের মতে, তাই। প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ সৃষ্টি হবার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অকসাইডে টান পড়েছিল, সমুদ্রের লবণীয়তা বেড়ে গিয়েছিল—সম্ভবত এই কারণেই আজ থেকে ২২-৫ কোটি বছর আগে এমন অস্বাভাবিক রকমের ব্যাপক একটি ধ্বংসকাণ্ড।

এ-ধরনের ঘটনা আরো অনেক।

জীবের বৃদ্ধি ও ক্রিয়াকলাপের ফল কী, এক-একটি বিশেষ কালের সেডিমেন্ট বা পললে তার ছাপ পাওয়া যায়। ৩০০ কোটি বছর বা তারও আগের পাললিক শিলার সন্ধান পাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার নয়, তখন থেকে শুরু করে যে-সময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপরে জীব-জগতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়তে শুরু করে—এই গোটা সময়কালেরও।

ভূ-পৃষ্ঠের বড়ো এলাকা জুড়ে রয়েছে এই পাললিক শিলা। ফসিল থেকে যে জ্বালানী পাওয়া যায় তার উদ্ভব এই শিলায়। বহু প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদও পাওয়া যায় এই শিলা থেকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে ফসিল সেডিমেন্টকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে জানা দরকার অতীতের ও বর্তমানের পরিবেশে জীবের ক্রিয়া কতখানি।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আলবার্টার তৈল ও গ্যাসের ক্ষেত্রটি উদ্ভব ৩৬ কোটি বছর আগেকার ডেভোনিয়ান কালের 'প্রবাল-চর' থেকে। কিন্তু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে টের পাওয়া যাবে, আজকের দিনের প্রবাল-চর একেবারেই পৃথক। বিষয়টির বিচার হওয়া দরকার ক্রম-বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

পাললিক শিলার স্তর থেকে জীব-জগতের ক্রম-বিকাশগত তথ্যগুলো সংগ্রহ করে করে যদি একটি ছকের মধ্যে ঢেলে ধরা যায়, তাহলে চোখে পড়বে, ক্রম-বিকাশের ব্যাপারটি খুব একটা নিয়মবদ্ধ ব্যাপার নয়। জীব-জগতে অনেক বড়ো বড়ো দল একেবারেই লোপ পেয়েছে, অথচ কেন লোপ পেয়েছে তার ভালো কোনো ব্যাখ্যা নেই। কখনো কখনো এমনও চোখে পড়বে, নতুন যারা আসছে তারা বাতিল-হওয়া দের চেয়ে কোনদিকে শ্রেষ্ঠ তার স্পষ্ট কোনো হদিশ নেই। কখনো কখনো একদল জীব লোপ পাচ্ছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শূন্য স্থানে অপর একদল জীবের আবির্ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে না। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আজ থেকে ৬০ কোটি বছর আগের একদল জীবের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যাদের বলা হয় আর্কিওসিয়াথিডা। দেখতে অনেকটা স্পঞ্জের মতো। তারা একসময়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আবার এক সময়ে শেষ হয়ে যায়। আর্কিওসিয়াথিডার অবশেষ থেকেই সাইবেরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার শত-শত ফুট চুনাপাথরের সৃষ্টি। ক্যামব্রিয়ান কালের মাঝামাঝি সময়ে (আজ থেকে প্রায় ৫৪ কোটি বছর আগে) এই জীবগুলোর অস্তিত্ব শেষ। কিন্তু উষ্ণ ও অগভীর সমুদ্রের যে এলাকাটি এই জীবের অধিকারে ছিল তা পরবর্তী আট কোটি বছর ধরে শূন্য থেকে যায়। একেবারে গোড়ার দিকের প্রবালের আবির্ভাব তারও পরে।

যে-কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল সব ক্ষেত্রেই জীবের ক্রিয়ার ফলে পরিবেশের বদল ঘটেছে বটে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই পরিবেশের ওপরে জীবের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। মানুষ নামক জীবের ক্রিয়ার ফলেও পরিবেশের বৈপ্লবিক বদল ঘটেছে, কিন্তু এবারে পরিবেশের ওপরে এই জীবটির কিছুটা কর্তৃত্বও থেকে গিয়েছে। কাজেই পরিবেশের এই বৈপ্লবিক বদল মানুষ নামক জীবকে কোন পরিণতির

আর্কিওসিয়াথিডস-এর ফসিল, সেই সঙ্গে চুনা পাথর। নীচের দিকে জীবন্ত অবস্থায়।

দিকে ঠেলে দেবে, তা কৌতূহলের বিষয়। নতুন কোনো পরিবেশগত বিন্যাস কি আসন্ন? কেননা পরিবেশ হচ্ছে মূলত জৈবিক ক্রিয়া-কলাপেরই ফল।

জলবায়ু দূষিত হওয়া

বসতি গড়ে ওঠার ফলে জলবায়ু দূষিত হচ্ছে এ এক ভয়ংকর খবর। অতএব এই মুহূর্তেই কিছু করা দরকার। এই একটি কাজ এখনো থেকে গিয়েছে যা নিয়ে কারও বিপরীত মত থাকার কথা নয়। পুজোর আগে কলকাতার মেয়র কলকাতাকে আবর্জনামুক্ত করার কাজে হাত দিয়ে সকলেরই সমর্থন পেয়েছিলেন (আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা, যতোদিন কলকাতায় লোক ডাব খাবে ও শালপাতার ঠোঙা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবে, ততোদিন কলকাতাকে আবর্জনামুক্ত করা কিছুতেই সম্ভব নয়।)

তথাপি কলকাতা তথা বিশ্ব যদি আবর্জনামুক্ত হয়, তাহলে তার চেয়ে কাম্য আর কিছু হতে পারে না। অথচ খানিকটা দূরদৃষ্টি, খানিকটা উদ্যম, খানিকটা সংযম ও সঠিক চিন্তাশীলতা নিয়ে অগ্রসর হলে এই বিশ্বকে অবশ্যই আবর্জনামুক্ত করা চলে—যে অবস্থা বর্তমানে নেই, অতীতেও ছিল না।

বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো আবর্জনা হচ্ছে নিউক্লিয়র শক্তি উৎপাদনের জন্যে যে নিউক্লিয়র বিস্ফোরক ব্যবহার করা হচ্ছে তার দরুন সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তা। ক্রিকেট নব-জাতকের বাসযোগ্য করে যেতে হলে এই আবর্জনাকে সবচেয়ে আগে পরিষ্কার করা দরকার।

তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ বড়ো ভয়ংকর ব্যাপার, আরো বিশেষ করে ভয়ংকর এ-কারণে যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বিপদ সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি না। অথচ যন্ত্রের সাহায্য নিলে অতি সহজেই অবহিত হওয়া যায়। যন্ত্রের নাম গাইগার কাউন্টার, তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ-টুকুও এই যন্ত্রে ঠিক ঠিক সাড়া জাগায়। এও ভীষণ এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যাচ্ছে না অথচ গাইগার কাউন্টারে ঠিক ঠিক সাড়া জাগাচ্ছে!

আবার এটা একটা স্বস্তির ব্যাপারও। যন্ত্র দিয়ে যা ধরা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সতর্কতা কেন সম্ভব হবে না? সামান্য একটা যন্ত্র দিয়ে যা ধরা যাচ্ছে তাকে ঠেকিয়ে রাখাটাও খুব একটা অসামান্য ব্যাপার হবার কথা নয়।

বিপদের কথাই যদি ওঠে তাহলে জীবনের চেয়ে বিপজ্জনক আর কী আছে! জীবাণুর কথা ধরা যাক। দুটি জীবাণু হয়তো চেহারায় অভিন্ন কিন্তু ক্রিয়ায় বিপরীত। একটি থেকে হয়তো ওষুধ তৈরী হচ্ছে, অপরটি থেকে বিষ। অথচ দুয়ের মধ্যে রাসায়নিক পার্থক্য হয়তো পারমাণবিক বিন্যাসের সামান্য হেরফের। তবুও, কোনটির ক্রিয়া কী প্রকারের, তা জানাটা বহু বছরের গবেষণা সাপেক্ষ।

তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ নিয়ে কিন্তু এতটা ঝামেলা নেই। ধরা যাক কোনো একটি কোষে তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ লেগেছে। তার ফলটি কিন্তু সকল ক্ষেত্রে একই প্রকারের—সেই ছোঁয়াচ আলফা কণা বা বিটা কণা বা গামা কণা বা কসমিক রশ্মি বা অন্য যে-কারণেই হোক। কাজেই তেজস্ক্রিয়তার ফলগুলো অনেক বেশি সহজে এবং অনেক বেশি সম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ভাবে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

এখানে একটি কথা পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়া দরকার। পৃথিবীর জীব কোনো সময়েই তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে নি—এখন তো নয়-ই, অতীতেও নয়। এমনকি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যারা গাছের ডালে বাস করত বা চার পায়ে ঘুরে বেড়াত বা সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটত—তারা সকলেই কিছু না কিছু মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচের মধ্যে পড়েছে। কোথাও সামান্য একটু বেশি, কোথাও সামান্য একটু কম, কিন্তু কোথাও এমন মাত্রায় নয় যা ক্ষতিকর। পৃথিবীতে মানুষ আসার পর থেকে এতকাল পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তার মাত্রায় মোটামুটি কোনো হেরফের ঘটে নি। মোটামুটি স্থির একটি মাত্রা বজায় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের মতে এই মাত্রা দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

অতএব আমাদের করণীয় এটুকু যে তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচকে এমন একটি মাত্রায় ধরে রাখা যাতে তা ক্ষতিকর না হয়। জলবায়ুকে পরিষ্কার রাখার এই হচ্ছে একটি উপায়—যতোই কেননা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরমাণু শক্তি উৎপন্ন হোক।

নিষিদ্ধকরণের কথা বলা হচ্ছে না। তাহলে তো অনেক কিছুই নিষিদ্ধকরণের করতে পড়ে। মোটরগাড়ি চলতে দেওয়া চলে না, কলকারখানা বন্ধ করতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে ছোটোখাটো শিল্প মাত্র বজায় রাখা চলে।

আশা করা চলে ভবিষ্যৎ তার চেয়েও উজ্জ্বল। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, বিদ্যুৎ হবে অনেক শস্তা, বিদ্যুতের সাহায্যেই মোটরগাড়ি চলবে ও উত্তাপ সৃষ্টি হবে, তেল ও কয়লা পোড়াবার কোনো প্রয়োজন থাকবে না। বিদ্যুতের সাহায্যে আরো শস্তায় ও পরিষ্কার পদ্ধতিতে সস্তার অ্যালুমিনিয়াম তৈরি হতে পারবে।

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে, জল ও হাওয়াকে পরিষ্কার রাখতে হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হওয়া চাই প্রচুর পরিমাণে ও অল্পমূল্যে। তা হতে পারে পারমাণবিক তেজের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলে। পারমাণবিক চুল্লীর উদ্দেশ্য যদি হয় শান্তিপূর্ণ তাহলে তা অবশ্যই কাম্য—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই তার প্রয়োজন আছে।

—অয়স্কান্ত

সামান্য ভালোবাসা

অজিত মুখোপাধ্যায়
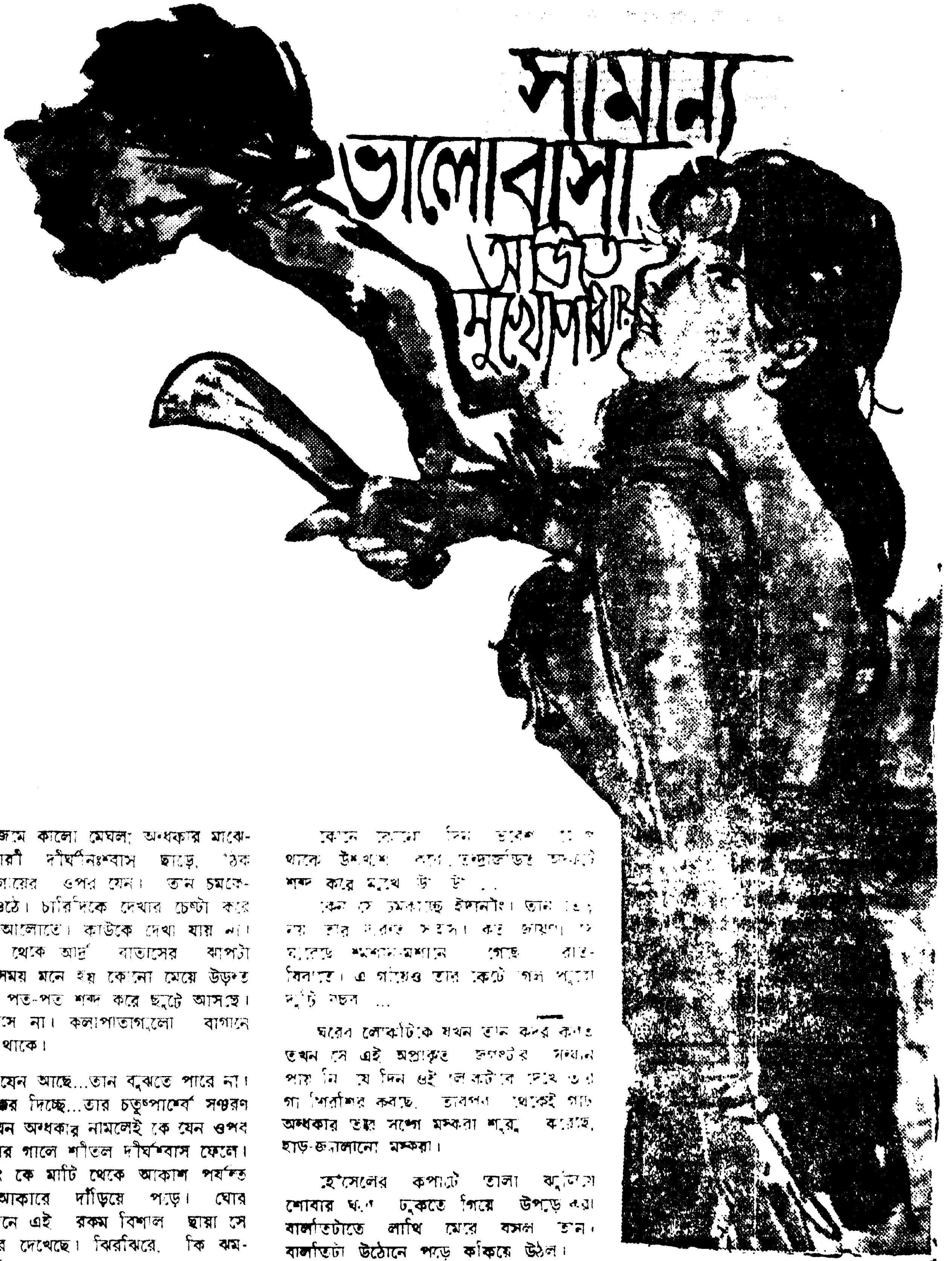
জমজমে কালো মেঘলা অন্ধকার মাঝে-মাঝে ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, ঠিক তিনির গায়ের ওপর যেন। তিনি চমকে-চমকে ওঠে। চারিদিকে দেখার চেষ্টা করে লম্ফের আলোতে। কাউকে দেখা যায় না। বায়ুকোণ থেকে আর্দ্র বাতাসের ঝাপটা আসার সময় মনে হয় কোনো মেয়ে উড়ন্ত আঁচলের পত-পত শব্দ করে ছুটে আসছে। কেউ আসে না। কলাপাতাগুলো বাগানে কাঁপতে থাকে।

কে যেন আছে...তিনি বুঝতে পারে না। তাকে চক্কর দিচ্ছে...তার চতুষ্পার্শ্বে সঞ্চরণ করছে...ঘন অন্ধকার নামলেই কে যেন ওপর থেকে তার গালে শীতল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

হঠাৎ কে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বিশাল আকারে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘোর বর্ষার দিনে এই রকম বিশাল ছায়া সে অনেকবার দেখেছে। ঝিরঝিরে, কি ঝমঝমে বর্ষায় রাত্রে লম্ফ হাতে যখন একা-একা হেঁসেলের পাট চুকোতে থাকে তখন সে কতবার বলে ওঠে, কী, কী বলছ?

ঘরে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করে, তুমি ডাকছিলে, না?

উত্তর আসে ভবেশের নাসিকাগর্জন।

কোনো কোনো দিন ভবেশ [illegible] থাকে উসখুস [illegible] [illegible] শব্দ করে মুখে উঁ উঁ ...

কেন যে চমকাচ্ছে ইদানীং। তিনি [illegible] নয় তার [illegible] সইস। কত জায়গায় [illegible] ঘুরেছে শ্মশানে-মশানে গেছে রাত-বিরেতে। এ গাঁয়েও তার কেটে গেল পুরো দুটি বছর ...

ঘরের লোকটিকে যখন তিনি কদর করে, তখন সে এই অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান পায় নি। যে দিন ওই লোকটাকে দেখে ওর গা শিরশির করছে, তারপর থেকেই গাঢ় অন্ধকার তার সঙ্গে মস্করা শুরু করেছে, হাড়-জ্বালানো মস্করা।

হেঁসেলের কপাটে তালা ঝুলিয়ে শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে উপুড়-করা বালতিটাতে লাথি মেরে বসল তিনি। বালতিটা উঠোনে পড়ে কাঁকিয়ে উঠল।

মশারীর পর্দা তুলে মুখ বাড়াল ভবেশ, কনুইয়ে ভর দিয়ে শব্দের কারণ অনুমান করার প্রয়াস পেল। নেমে পড়ল বিছানা থেকে।

বারান্দায় এসে ভবেশ বললে, সাহায্য করব।

তানের হাতে এঁটো বাসনের বাণ্ডিল। আজকাল হেঁসেলে কিছু রাখার জো নেই রাত্রে চুরির ভয় বেড়েছে খুব......

তান যেন শুনতেই পায় নি......

ভবেশ আবার প্রশ্ন করল, কী, সাহায্য করব।

থাক্। আমাকে আর সাহায্য করতে হবে না......

তানের গলার বিরসতা ভবেশ টের পেয়ে লঘু স্বরে বললে, আমাকে সাহায্য কে করে!

তোমাদের অবসর আছে...ছুটি আছে... শরীর খারাপ আছে...আমি আর পারছি না...আমাকে পিসির বাড়ি পাঠিয়ে দাও!

এই চাষের সময়।

হ্যাঁ...চাষের সময়।
দপ করে রেগে উঠল ভবেশ, চিরকেলের মত যাবি?

চিরকেলের মত।

কিছুক্ষণ ভবেশ নিজের থুতনিতে চিমটি কাটতে লাগল, পরে সে পুব দিকের কপাটে হাঁসকল দিয়ে আবার এল তক্ত-পোষের কাছে। কোলঙ্গা থেকে হাত বাড়িয়ে বিড়ি নিয়ে তানের হাতে-ধরা লম্ফের আলোর শিখায় বিড়ি ধরাতে লাগল।

কপালের ঘামে চোখ করকর করবে, চাষের সময় চাষী সে-ঘাম মুছে ফেলার সময় পাবে না। চাষী-বোও কাঁচ শরীরে জামা চাপাতে পারবে না, পরিশ্রমের তাতে। শক্ত চাষীর ঘরের লোক চাই সমান শক্ত। নইলে চাষ উঠবে লাটে।

সামনের দুয়ারে পাটার পর পা ধুয়ে এল তান। রগড়ে-রগড়ে গামছায় পা মুছল। ওপাশের চালা থেকে বুড়ি শাশুড় নীরদার নাসিকাগর্জন ভেসে আসছে। কদম গাছের ডগায় শকুনের পাখসাটের

শব্দ, ঝিঁঝির ও ব্যাঙের ডাক আকাশ জুড়ে।

লম্ফটা কোলঙ্গায় গুঁজে দিয়ে তান সরল দৃষ্টিতে ভবেশকে বলল, নথ এনেছ?

গাল চাপড়ে ভবেশ বলল, হাই দ্যাখ!

আধ-ছেঁড়া মাদুরটা টেনে নিয়ে তান ভিতর দুয়ারে পাতল ফরফর শব্দ করে, ছুটে গেল ভবেশ তানের পিছু-পিছু। তানের চিবুক আকর্ষণ করে ওর মুখ ফেরাতে গেল ভবেশ। ভবেশের হাত কামড়ে ধরল তান।

ছাড়-ছাড়, ছাড় বৌ...আর্তনাদ করে উঠল ভবেশ।

ঘরে গিয়ে লম্ফের আলোতে ডান হাতটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল ভবেশ। দাঁতের দাগ বসে গেছে। দাগের কোলে-কোলে ফুলে উঠেছে মাংস।

নথের জন্য এই সাজা!. বাঁ হাতে লম্ফ নিয়ে বাইরে আসতে-আসতে স্বগতোক্তি করল ভবেশ।

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তান...ওর মুখের পাশে লম্ফ নিয়ে গেল ভবেশ। তান মুখ দেখাতে চায় না...বারবার সে মুখ লুকোচ্ছে। সজোরে ভবেশ তানের কাঁধ চেপে ধরে আলোটা নাকের দিকে তুলে ধরতেই ভবেশ দেখতে পেল, তান কাঁদছে।

কী দিয়েছ তুমি? তোমার তো একটা বিনি মাইরে ঝি আছে, যা বলবে করবে তাই! কী দিয়েছ...একটা নথ...যার কুনো দাম নাই! সেটা পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলে না!

পারনু না, পারনু না কে কইলে?

এনেছ? এনেছ কিনা বল।...উঁচু পর্দায় তান চেঁচিয়ে উঠল।

পরের হাটে......

আর কুনো হাটে আনতে হবে না। যদি আন তো ছেলের মাথা খাও!

হো-হো করে হেসে উঠল ভবেশ... আজ অবধি তাদের কোনো সন্তানই হল না।

তানের হাত ধরে ভবেশ মৃদু আকর্ষণ করল...চ...চ বৌ! ভূতে ধরবে। তোর আবার উদলা চুল......

চুল বাঁধে নি তান, সিঁদুর পরে নি কপালে অথবা সিঁথিতে...চোখে কাজল টানে নি...সময়ের অভাবে নয়, স্বেচ্ছায় সে নিজেকে সুসজ্জিত করতে চায় নি।

ঘরে চিড়-বিড়ে গরম। আমি ঘরে শুতে পারব না...তান মাদুরে বসে শরীর এলিয়ে দিল...মাটির বারান্দা...চুলগুলি ধুলোয় আর কাদায় লুটোপুটি খেতে [illegible] দিশেহারা বাতাসে। সন্ধ্যেবেলার

প্রবল বর্ষণের ছাটে মাটির ঘরে বারান্দায়— সর্বত্রই, কোথাও না কোথাও, ডোবাগুলিতে জল জমে কাদা হয়েছে।

হাতের লম্ফটা ইতস্তত সঞ্চালিত করতে-করতে তীক্ষ্ণ স্বরে ভবেশ আচমকা বলল, কেঁনদাই। কেঁনদাই গো!

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল না তান। অথচ কেন্নাই ব্যাঙ বা কেঁচো প্রভৃতি কিম্ভূতদর্শন প্রাণীগুলিকে সে বড় ঘেন্না করে।

তান বিবাগী গলায় বললে, থাকুক গে......

বেশীক্ষণ সে চুপচাপ পড়ে রইতে পারল না। মাথা তুলে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল...শেষে কেন্নাইটাকে শাড়ির আঁচল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

দালান পিটতে হবে না? টালি বসাতে হবে না?...কৈফিয়ৎ পেশ করল ভবেশ।

সে তো কবে থেকে শুনে আসছি!... ধীর গলায় বলেই তান সহসা ঝাঁঝিয়ে উঠল, একটা নথের জন্যে তোমার দালান কি ঠুঁটো হয়ে থাকবে। ভাব তুমি...ভেবে দ্যাখ ঠাণ্ডা মাথায়......

কাদাতে শ্যাওলাতে তোরই কষ্ট। তুই-ই তো মাটির ঘরে দু-বেলা কাঁদিস। কাদা প্যাচপ্যাচ করবে না...ইঁদুরে ডোবা-ডক্কর করবে না...কেঁনদাই চলবে না...সে জন্যেই তো......

অমন দালানের ছাঁচায় আগুন! চাই নে অমন দালান! নথের জন্যে তোমার দালান আটকে যাচ্ছে! আমাকে আর বোকা বুঝিও না।...তুমি আমাকে কিছু দেবে না... কোথাও নিয়ে যাবে না...আমার কপালে আনন্দ নাই!

তোকে কিছুই দিই নি! গভীর বিষণ্ণ সুরে ভবেশ বলল।

না, দাও না! দাও নি...ভেবেই দ্যাখ না।

বেঁচে আছিস কী করে!

দুবেলা দু-মুঠো খেতে, আর সম্বচ্ছরে দুটো পরতে সবাই দেয়। একটা নথের দাম কত, অ্যাঁ? কত...সোনার না, রুপোর না, পেতলের নথ?

সত্যি, আজ ভুলে গেছি।

এটা নিয়ে ক'বার ভুললে খেয়াল আছে? চারবার!

ভোরবেলা মনে ছিল ভবেশের। কিন্তু দু মাইল দূরে আউশো জমি। ছুটে গিয়ে ফুটি কাঁকুড় পটল ঝিঙে ছিঁড়ে বাজার ভরেছে...সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে পায়ে চলার পথে হাট...মাথায় ভারী বাজরা বয়ে ভিজে-ভিজে ছুটে গেছে হাটে...আজ অতিবৃষ্টির ফলে হাট বসতে দেরী

হয়েছে...তাই বিক্রি শেষ হতেও গাঁ ফিরতে রাত...সেই দুপুরে হাটে কয়েক খাবলা মুড়ি গিলেছে, শুকনো মুড়ি। ফেরার পর ঘাড় কনকন করে...আর যাবার সময় ছোটে এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে...যা খামখেয়ালী বাজার দর!

তোর সুখ তোর সাধের জন্যেই তো, আমি দিন-রাত খেটে মরছি!...আর্তস্বরে বলে উঠল ভবেশ।

আর বেশী মুখ নেড়ো না। ওসব ভুজুং-ভাজং আগে বিশ্বেস করতুম। যাও, শুতে যাও...চোখ টেনে আসছে...রাত দুপহরে আর ভ্যাজ-ভ্যাজ করো না!

তানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ভবেশ। তার হৃদয় ক্রমশই বাষ্পাচ্ছাদিত হতে লাগল। খেটে-খেটে ভবেশের শরীর শুকনো বাঁশের মত খটখটে হয়ে যাচ্ছে...সারা দিন তার চিন্তায় একটা মরীচিকা বাসা বেঁধে থাকে...কখন ঘরে ফিরে দু দণ্ড হাত-পা ছড়াবে, কখন তানের সঙ্গে গল্পগুজব করবে...কখন শ্রাবণের কচু ডাঁটার মত তানের সতেজ অস্তিত্ব দিয়ে নিজেকে আচ্ছন্ন করবে।

তির্যক কচু পাতার মত পেছল তানের মন...সংসারের যাবতীয় বস্তু গলে গিয়ে তানের মনে ঝরে পড়লেও লেগে থাকে না।

যাবি না বউ?...ঘড়ঘড়ে গলায় ভবেশ বললে, কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মা জমে গিয়েছিল, সাফ করল কেশে।

ডান বাহুতে মাথা রেখে তান হাঁটু দুটো তার বুকের কাছে চেপে ধরছে...কোনো শব্দ করল না।

তোকে আমি কত ভালোবাসি......

তানের বাঁ হাতের ঝাপট ভবেশের কথা মাঝপথে স্তব্ধ করে দিল।

ভবেশ তানের বাঁ হাতটা তার কোলে টেনে নিয়ে আঁকড়ে ধরল। আবার বলতে লাগল, হ্যাঁরে, তুই জানিস না.....

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তান, তার চোখ দুটো ঘৃণায় টসটস করছে, কত আর যাত্রা করবে, অ্যাঁ?

ভবেশের সত্তা থেকে কে যেন অকস্মাৎ স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিল। একেবারে মুখ বন্ধ করে টলতে-টলতে উঠে গেল তার ঘরে। এবং সশব্দে কপাট বন্ধ করে হাঁসকলটা তুলে দিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর তার বুকের ভিতরে অসহ্য চাপ ক্রুদ্ধ বেড়ালের মত ফুলতে লাগল।

ভয়ে তান অন্ধকারে উঠে বসল... অদূরবর্তী গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে কারা লণ্ঠন দোলাতে-দোলাতে তাল কুড়োতে যাচ্ছে... আলোগুলো মেঘের আড়ালে চলে যেতেই আকীর্ণ অন্ধকারের বর্ধমান তোলপাড় উপলব্ধি করতে লাগল তান...তার চোখের উপর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল কে...ভয়ে চোখ বন্ধ করল...আসন্ন বর্ষণের, প্রথমে ক্ষীণ এবং তারপর ক্রমশ প্রমত্ত শব্দ বয়ে আনল ঝোড়ো বাতাস...অনতিবিলম্বে প্রবল বর্ষণ শুরু হল...বৃষ্টির ছাটে এবং আর্দ্র হাওয়ায় তানের শরীর ক্রমশই সেঁতিয়ে যেতে-যেতে এক সময় উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

শেয়াল-ডাকা ভোরে ভবেশ লাঙ্গল-কাঁধে গরু হাঁকাল...নীরদাকে বলে গেল, বৌকে বলে দিও, আজ তিনটে জোন (জন) হবে......

অম্বলের নিত্য রোগী নীরদা বিছানা ছাড়ে খুব ভোরে...কাজকর্ম করতে পারুক আর নাই পারুক। মুখটি চলে তার সারা দিন। অবশ্য আর সব শাশুড়ির মত তানের সঙ্গে অকারণ খটামটি করে না বলে তান নীরদাকে কিছুতে হাত লাগাতেও দেয় না। বিশেষ, ভারী কাজ।

আজ ঘর নিকিয়ে গোয়াল কাড়তেই তানের দেহ আলগা হয়ে এল। ঝুড়িতে সার-খড় বোঝাই করে ঘুণলাগা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য দিন অসংখ্য বিহঙ্গের কলধ্বনিতে কান পেতে থাকে। কখন পাপিয়া সুর ধরবে, কখন দোয়েল বাঁশি বাজাবে, চাতক দম্পতি ধুয়ো তুলবে...সব তানের স্মৃতিদর্পণে লিপিবদ্ধর মত আবদ্ধ। কোনো দিন ভোরে পাপিয়ার স্বর না শুনলে তানের ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে পড়ে ...অজস্র কাকলীর ধ্বনিপুঞ্জে তানের সঙ্গে অলৌকিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অতি-প্রাকৃত ব্যঞ্জনা কাকলীর মাধ্যমে তানের স্নায়ুতে বিচিত্র ঝঙ্কার তোলে...তান তাদের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে না, কারণ বোঝাতে পারবে না। কিন্তু এই গ্রামটাকে সে কাকলীর শব্দপুঞ্জ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছিল...আজ কোথাও তানের কান নেই...কোনো শব্দ কোনো দৃশ্য তার ইন্দ্রিয়গুলি আজ গ্রহণ করতে পারছে না... আজ যেন তান আর নিজের মধ্যে নেই।

কি রে, ঝুলন দেখতে যাবি?

ভবেশদের গোয়ালের পাশেই সরকার-দের গোয়াল। ওখান থেকে সরকারদের বিধবা বড় বউ কালো গরুটার দুধ দুইতে দুইতে প্রশ্ন করল।

কী! কী বলছ দিদি...খুঁটি ছেড়ে তান সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বালাগড়ে আজ ঝুলন, জানিস না?

বড় জাঁকের পুজো রে...

যাচ্ছ তোমরা?

দেখছিস না? গাড়ি তো তোর চোখের সুমুখে।

সত্যিই তো। ছই বেঁধে খড় কম্বল বিছিয়ে গাড়িটা সাজানো। তাগড়া বলদ দুটি তেল-সিঁদুর মাখা চকচকে শিঙ নাড়ছে...

ছুটতে ছুটতে তান ঝুড়ি-ফুড়ি ফেলে ঘরে গেল। নীরদাকে তড়বড় করে কী বললে। নীরদা খ্যানখেনে গলায় কী যেন ক্যাঁ ক্যাঁ করলে। চোখের পলকে তান বাসি কাপড় ছেড়ে চওড়া সোনাপেড়ে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে কালো জামাটা গলিয়ে নিজের তোরঙ্গ থেকে বিয়ের সময় পাওয়া সাত টাকা একুশ পয়সা বাঁধা পরিষ্কার ন্যাকড়ার ছোট্ট পুঁটলিটা কোমরে গুঁজেই, মা আসছি গো। ...বলেই ছুট।

সরকারের কিরষেণ দেউল তখন গরু জুতেছে, নিজে চেপে বসতে উদ্যত...গরু ঠেলে দিয়ে এক লাফে হুড়মুড় করে তান সরকার গিন্নির কোলের উপর উঠে বসল... সরকার গিন্নি তানের পিঠে দুমদাম চড় বসিয়ে দিল...তরতর করে ছুটে চলল গাড়ি।

সারা মেলা হাটকিয়ে তিনটে জমজমাট পুঁতির মালা ও চারটে চার রঙের পাথর বসানো নথ কিনল তান। সাদা লাল আর সবুজ মালা ও নথ কেনার পরেই তার উৎসাহ নিভে গেল। ঘরে চার-চারজন সমর্থ পুরুষ ও বুড়ি শাশুড়ির রান্না কে করবে! নীরদাকে আজ রান্না করতে হলে কাল ওকে খাটে তুলতে হবে।

তানের গা ভোর থেকেই গরম ছিল... কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল...সরকার গিন্নির কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করতে লাগল।

বললে, আমি এখুনি বাড়ি চল্লু দিদি...

সরকার গিন্নি পাড়ার কর্ত্রী...তানের গায়ে হাত ঠেকিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, এক-গা জ্বর নিয়ে তুই হেঁটে যাবি!

ঝুলন তো সেই সাঁঝের পর? তান বললে বিমূঢ় কণ্ঠে।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে …আকাশ মেঘে থমথম করছে। ভ্যাপসা গরমে প্রাণ ফেঁপে উঠছে. কৃষ্ণর মন্দিরে আটচালায় ছুঁড়ি মন্দার ঠেলাঠেলি…কে যে কার গায়ে পড়ছে তার হুঁশ নেই।

তিনটে জোন আছে যে গো…তান বললে, আমি চন্নু…অ কিছু হবে না… মেয়ে মানুষের হাড়…এ বড় কঠিন বস্তু…

কানের কাছে আর কত ঘ্যানঘ্যানানি সওয়া যায় ? সরকার গিন্নি ফরমাস জারী করলে. আমার কুনো দায় নেই কিন্তুক…

তান কৃষ্ণর মন্দির ছেড়ে মাঠের আল-পনে এসে পড়ল, আর মেঘ বললে আজ্ঞ বই আর কাল নামব না। মাথার চুল থেকে দেহের প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত ভিজতে লাগল…তিন কোশ রাস্তা কি সহজ কথা। যখন বাড়ির দুয়ারে বাঁশের খুঁটিটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল… তখন তানের মনে হল ঘর পর্যন্ত তার দেহটা টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। দাঁতের পাটি দুটি এমন জোরে এবং দ্রুততালে ঠোক্কর খাচ্ছে. মনে হচ্ছে দাঁতগুলি যে কোন মুহূর্তে পাউডার হয়ে যেতে পারে।

বিকেল নেমে গেছে, হেঁসেলের চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া বাদল ঠেলে ওপরে উঠতে পারছে না…কাঁপতে কাঁপতে কয়েক পা এগিয়ে উঁকি মারল তান…নীরদা উনুনে জনাল ঠেলছে…ভাত ফোটার টগবগ শব্দ আসছে মৃদু মৃদু…তাহলে ভবেশ মাঠ থেকে ফিরে নিজেই রান্না চাপিয়েছে…

ভবেশ কলাপাতা কাটার জন্যে দুয়ার পেরিয়ে যেতে যেতে কটাক্ষে দেখলে তানকে…কিন্তু কোনো কথা না বলে হেঁসোটা নিয়ে নেমে পড়ল ভবেশ…কোনো রকমে ঘরে ঢুকে কাঁপতে কাঁপতে তান শাড়ি বদলাল।

রাস্তায় আসার সময় তান মনস্তাপে কাতর হয়ে পড়ছিল…ভবেশকে দেখেই তানের মনে অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা আশ্রয় নিল …আবার দ্বিধায় সে চঞ্চলচিত্ত হারিয়ে বসল। কাঁপুনি কিন্তু সমানে তার দেহ ছত্রখান করে দিচ্ছে…প্রায় বেহুঁশভাবে তক্তপোষ পর্যন্ত গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং কম্বল দিয়ে সারা শরীরটা পুলিন্দার মত যথাসাধ্য কষে মুড়ে দেবার চেষ্টা করল। চোখ বন্ধ করতেই তানের মনে হল তক্তপোষটা ক্রমশই ক্লান্ত হয়ে হয়ে তার বুকের উপর চেপে বসছে… ঝাঁকড়া ছায়া তাকে নিয়ে লোফালুফি করছে…সে দামোদরের বন্যায় অকূলে অন্ধকারে ভেসে চলেছে…

বাইশ বছরের যুবক ভবেশ অন্য সব কাজে উৎসাহী ও পটু একমাত্র রান্নাবান্না ছাড়া। ফ্যান গালতে গিয়ে হাতে ফ্যান ছিটকে পড়ল ভবেশের…মাথায় রাগ নেচে উঠল। তানের মাথার চুল ছিঁড়ে দেবার জন্যে ছুটে গেল ঘরে…তানের মাথায় হাত লাগতেই থমকে পড়ল…ইঃ, এ যে পুড়ে যাচ্ছে। তানের গালে দেখল হাত ঠেকিয়ে, আগুন! নিজের খাওয়া শিকেয় উঠল… জোনদের খেতে দিয়ে নিজে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে লাগল তানের মাথায়।

দশ দিন পরে জ্বর ছাড়ল তানের… ডাক্তার ডেকে আনতে হয়েছিল…নিয়মিত ওষুধও এনে দিয়েছে ভবেশ। কিন্তু তান জানলা গলিয়ে ওষুধগুলো আশশ্যাওড়া ও কচুর জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই শেষ করেছে…

ক্রমশ তানের দেহ সুস্থ হয়ে উঠল… কিন্তু মেজাজ হারাল ভারসাম্য। ঘটি-বাটি ইত্যাদি যা আড়ালে পায়, তান ঠুকে ঠুকে তাল-তোবড়া করে রাখে। মুখে স্বীকার করে না…মুখ দেখে ধরারও উপায় থাকে না।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে তানকে নিয়ে গেল ভবেশ। ডাক্তার কিছু দামী-দামী টনিক লিখে দিলেন…ধার-দেনা করে টনিক কিনে আনল ভবেশ।

সারা গেরস্থালীর কাজ করে তান… কিন্তু অন্ধকারে সে একা বেরোতে চায় না …দিনের বেলা রোদ হেলে পড়লে কাল-কাসুন্দের জঙ্গলে একা একা দিব্যি পড়ে থাকে মাদুর পেতে…নানান বিচিত্র পাখী ভিড় করে তার কাছে। তার হাতের উপর বসে বসে ফিঙে শিস দেয়, খোঁপা বুলবুলে ফড়ফড় করে মাথার উপর। আর সবার অলক্ষ্যে আঁচলের গেরো খুলে মুঠো মুঠো চাল ছড়িয়ে দেয় তান নিজের চারদিকে… যে-চাল ভবেশ দেড়া শোধ দেবে বলে ধার করে এনেছে।

নীরদা গজগজ করে, বউ তো আমার ডোকলা…এ নিশ্চয় মহাজনদের হাতসাফাই …ছেলে আমার খুবই সরল যে…

ভবেশ বলে, তাই বলে তিনদিনের চাল দু'দিনে যাবে না! এত ঠকাবে!

মনে ধন্দ লাগে ভবেশের…কূলকিনারা ঠাউরাতে পারছে না…জলখাবার বেলায় তালগাছের ডগায় তাল দেখতে দেখতে মুড়ি চিবোচ্ছিল ভবেশ…পুকুর পাড়ে জিয়ল গাছের মাথায় পাখীর দল ভিড় জমাচ্ছিল ওরা উড়ছিল চঞ্চলভাবে…হলুদ-কালো গা আর লাল ঠোঁট একটা পাখী হঠাৎ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দে আর্তনাদ করতে লাগল…

ভবেশ ডাকল, বৌ…অ বৌ…

নীরদা বসে বসে ঢুলছিল, বলল… পুকুর গেছে…চাল ধুতে…

কী রকম সন্দেহ হল…মুড়ির থালা ফেলে উঠে পড়ল ভবেশ। পা টিপে টিপে এল পুকুর পাড়ায়।

তানের পাদুটো পুকুরের জলে… হাতের মুঠোয় ওই হলুদ-কালো গা লাল ঠোঁট একটা পাখী। পাখীটার দুটো ঠোঁট নির্মমভাবে ফাঁক করে দিয়ে তান চাল গুঁজে দিচ্ছে…আর বলছে ঃ খা, গিলে খা …তোর বর তোকে এমন করে খাওয়ায়? খা না…। পাখীটা ভয়ে ঝটপট করছে।

বৌ…ভবেশ গর্জন করে উঠল।

তান চমকে ফিরে তাকাতেই তার বাহু-পঞ্জরে আবদ্ধ চালের পোথেটা ঝুপ করে উল্টে পড়ল পুকুরের জলে।

কাঁড়ি কাঁড়ি খরচা করনু এই জন্যে… ডাক্তার রে আর ওষুধ রে করে তোর প্রাণ বাঁচানু এই জন্যে! আমাদের সব্বনাশ করবি বলে!

পোথেটা জল থেকে তুলে নিয়ে তান ধুতে লাগল ছপ ছপ শব্দ করে। ডান হাত ভবেশের এঁটো…ও ছুটে গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে পোথেটা কেড়ে নিল। বলল, হাত-পা মেলে শুয়ে থাক…তোকে আর কুটোটি দু'খান করতে হবে না…

ক্যানে? আমি কি কুঠো?

কুঠো হলেই বাঁচতুম…আমাদের এমন সব্বনাশ করতে পারতিস না…

করব…সব্বনাশ করব…

তান মাথা ঝাঁকাতে লাগল. তার খোলা চুলগুলি ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখদুটি বারবার ঢেকে দিতে লাগল।

কেন, কেন তুই সব্বনাশ করবি? আমরা তোর কী সব্বনাশ করনু?

করেছ। তুমি আমার সব্বনাশ করেছ। তুমি আমাকে অসতী করেছ!

অসতী!

হ্যাঁ, অসতী। বিনা পিরীতের লোকের সঙ্গে ঘর করলেই তো অসতী!

আমি তোকে পিরীত করি না?

না সাত-সাতটা দিন বিছানায় পড়ে রইনু, ক-দণ্ড আমার পাশে বসেছিলে? চৌ-পহর কাৎরেছি, ক দেখেছি চৌপহর যাতনায় আমার সারা অঙ্গ জ্বরিয়ে যাচ্ছিল …তুমি দু-দণ্ড আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছ?

ডাক্তারের ওষুধ এনে দিয়েছি…খাইয়ে দিয়েছি…

ক দাগ ওষুধ খেয়েছি…

যখনই অবসর পেয়েছি, খাইয়ে দিয়েছি …তা পরে তুমি খেয়েছ কি খাওনি, তার আমি কী জানি!

তুমি তো কিছুই জানো না। আমার কী হয় না-হয় তার তুমি কী জানবে!

সংসার আছে না? এদিকে ছুটি তো ও-দিক ঢিলে; এ-দিকে যাই তো ওদিকে বারোটা বাজে। একা মানুষ ক-দিক সামলাই…তুই সুদ্ধু দেখবি, তবে চাদ্দিক সামলাতে পারব!

আমি তোমার সংসার দেখতে পারব না…আমাকে কে দ্যাখে, অ্যাঁ?

কার সংসার?

তোমার। আমার নাকি? এ-সংসারে আমি কে! আমি তো বিনি-মাইনের ঝি, আমি পিসির বাড়ি যাব…

তোর পিসির নিজেরই দিন চলে না… তার ঘাড়ে চাপলে যে দুজনেই মরবি।

কী, আমার পিসির দিন চলে না! তুমি চালিয়ে দাও তোমার ঠেঙে হাত পাততে আসে!

তানের পিসি খুবই গরীব। লোকের বাড়ি বাড়ি ঝি খেটে কোনো রকমে একা পেট চালায়। নিত্যি খেতেও জোটে না। আজকাল পেটভাতে লোক পোষার ক্ষমতা ক'জনার! বেশির ভাগ লোকেই ঠিকা মাইনের ঝি রাখে। পিসির দারিদ্র্যের জন্যই তান রাগ করে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিসির বাড়ি যেতে পারে না। আর, তানের পিসি ছাড়া কেউ নেই-ও তার তিন কুলে।

অত গরীব ঘরের মেয়ে আনতে রাজী ছিল না নীরদা...গরীব ঘরের মেয়েদের মন নাকি বড় ছোট হয়...কিন্তু ভবেশ তানের রূপটা দেখেই মজে গিয়েছিল।

ধৈর্যের প্রান্তে এসে পড়ল ভবেশ। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, আমি তো বলেই দিয়েছি, তেজ দেখিয়ে পিসির বাড়ি গেলে আর ফিরে আসতে পাবি না...

রাত্রে আবার সংঘর্ষ বাধল। আকাশ মাঝে মাঝে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের আঘাতে...চাপ চাপ অন্ধকার ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে...ব্যাঙ ঝিঁঝি প্যাঁচা তক্ষক ও শেয়ালের পাল একসঙ্গে ডেকে উঠল...লম্ফের আলোয় আরশিতে মুখ দেখে তান গলায় ঝোলাল সবকটি পুঁতির মালা এবং আরশোলার ডিমের মত লাল রঙের পাথর বসানো নথটা এঁটে দিল নাকে, তারপর দাঁতাল হেঁসোটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে কী মনে পড়ে গেল, সিঁথিতে মোটা দাগে এবং কপালে বড় ফোঁটায় সিঁদুর পরল। শোবার ঘরে গেল সন্তর্পণে...

নাক ডাকছে ভবেশের...

মশারী ফেলা।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, ঘুমোচ্ছ?

সাড়া পাওয়া গেল না। তান লম্ফটা রাখল মেঝেতে।

মশারীর পর্দা তুলে ধরল সাবধানী হাতে...আস্তে আস্তে ভবেশের গালে ঠোঁট নামাল...তারপর গলায়, তারপর আবার গালে, কপালে এবং ঠোঁটে...চোখে জল এসে পড়তেই দ্রুত বেরিয়ে এল মশারী থেকে। আর, অস্থিরতা এবং তীব্র বীতশ্রদ্ধায় তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল... সুন্দর মুখের রেখাগুলি দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত হয়ে যেতে লাগল...মৃত্যু চিন্তায় তানের কপাল ও মনের চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে...পা টিপে টিপে কপাট খুলতে গিয়ে আপাদমস্তক শিউরে উঠল। না সে মরবেই...ওই লোকটা তাকে ভালোবাসে না... ও কেবল নিজের উন্নতির জন্যে মুখে রক্ত তুলে খেটে মরছে...সারা পৃথিবীটা জ্বলে-পুড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করলেও, ও নিজের তালে এগিয়ে যাবে...কারুর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবে না লোকটা।

আর একবার মশারীর পর্দা তুলে ভবেশের গলায় নিজের ঠোঁটটা ডুবিয়ে নেবার ইচ্ছে জাগল...মাত্র একবার...কিন্তু নিজের গালে চড় মারল তান...নিজের হাত কামড়ে ধরল তারপর দ্রুত হাতে হাঁস-কলটা খুলতে গিয়ে লম্ফটা পড়ে গেল মাটিতে...নিভে গেল দপ করে...ঘর অন্ধকার...

কে কে!

প্রশ্ন করল ভবেশ বিছানা থেকে.. পাশের শূন্য স্থানটি হাৎড়ে আবার বললে, তান?

শুকনো নীরস গলায় তান সাড়া দিল ধীরে ধীরে।

মশারীর পর্দা থেকে মাথা বের করে শুয়ে শুয়ে দেশলাই জ্বালল ভবেশ...নিভে গেল কাঠিটা সামান্য জ্বলেই...ভবেশ নামল বিছানা থেকে, জ্বালল আবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি...কাঠিটা ছোঁয়াল লম্ফের পলতেয়...

বলল ভবেশ, বাইরে যাবি?

বিহ্বল চোখে তান ভবেশের দিকে তাকিয়ে রইল...তার কপালের সিঁদুরে সারা মুখে লেপে গেছে...কপালের ঘাম এসে ঝুলছে নাকের ডগায়...ঠোঁটদুটো ঈষৎ কম্পমান...ভাষা বেরোচ্ছে না...ভবেশ ক্ষিপ্র নজর বুলিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল তানকে। তানের জানুর কাছে কী যেন চিকচিক করছে...তানের আঁচল সরিয়ে ভবেশ খপ করে হেঁসো-সুদ্ধ কব্জিটা চেপে ধরল।

চাপা স্বরে তান বললে, ছাড়...ছেড়ে দাও...

না, কী করবি?

যা করি করব।

বল আগে কী করবি। তোর মতলব তো ভালো ঠেকছে না!

যা করি করব, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী!

ধস্তাধস্তি করার চেষ্টা করল তান... ভবেশের ক্ষমতার সঙ্গে সে কতক্ষণ লড়বে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হেঁসোটা কেড়ে নিল ভবেশ।

তান গজরাতে লাগল, তুমি আমাকে ঠেকাতে পারবে?

কী করতিস তুই? হেঁসোটা নাড়াচাড়া করতে করতে ভবেশ প্রশ্ন করল, লম্ফের আলোয় একটা জাতসাপের মত হেঁসোটা ঝকমক করছে...ভবেশ কাতর কণ্ঠে আবার বললে, আমাকে খুন করবি?

একটা জানোয়ারকে খুন করব? না।

আমি জানোয়ার! আকাশ থেকে পড়ল ভবেশ।

যে মরদ ভালোবাসতে জানে না, সে জানোয়ার।

আমি ভালোবাসতে জানি না?

না না...জানো না। জানো না।

কী করে ভালোবাসা যায় শিখিয়ে দিবি?

জানোয়ারকে শিখানো যায় না...

দাঁতে কড়মড় শব্দ করছে তান...সে হাঁসকল খুলে বাইরে পা বাড়াল...ভবেশ হেঁসোটা নিজের বালিশের তলায় লুকিয়ে বাইরে এল। বলল খুব মধুর স্বরে, সোনা-দানা দিলেই কি ভালোবাসা হয় রে?

থামো! একটা পেতল দিয়েছ কখনো? আমি কি রাজার মুকুট চেয়েছি, না রানীর হাতের অনন্ত চেয়েছি! না এই চোথা নথ আর মালা চেয়েছিনু!

আচমকা গলার মালাগুলি দু'হাতে দিয়ে ছিঁড়ে তান ছড়িয়ে ফেলে দিলে অন্ধকার কচুবনে...হঠাৎ তান টলে উঠেছিল, খুঁটি ধরে তাল সামলাল, তার মস্তিষ্কে রক্তের সহস্র শিখা তাতা থৈথৈ নৃত্য শুরু করে দিয়েছে...কিছুক্ষণ খুঁটিটা জড়িয়ে ধরে বাহুর উপর মাথা রেখে ঝিমুনিটা থিতিয়ে নিল তান, তারপর মুখ ঘুরিয়ে রক্তবর্ণ চোখে আগুন ঝরাতে লাগল।

লম্ফ হাতে ধীরে ধীরে ভবেশ তানের কাছে গিয়ে চাপা ও দৃঢ়কণ্ঠে বললে, তান, তুই জানিস না, আমি তোকে কত ভালো-বাসি।

হিহি...হিহি...হিহি... পাগলের মত দমকে দমকে হেসে উঠল তান।

তুই জানিস? আবার ভবেশ বলল ক্রমশ তার অক্ষিগোলক স্ফীততর করতে করতে; মাথাটা নামিয়ে আনল তানের মুখের সম্মুখে।

আমি তোকে কত ভালোবাসি তুই জানিস না...এই গেরামে, এই গেরামে কেন, তিন ভুবনে আমার মত কেউ ভালোবাসতে পারবে না, এই তোকে বলে দিনু...

হিহি...হিহি...হিহি...হিহি বেশ যাত্রা করছ তো...হিহি...হিহি...হিহি...হিহি বেশ করছ, বেশ যাত্রা করল। তানের চোখে উন্মত্ততার ঘোর ক্রমশই স্পষ্ট হতে লাগল। ঘৃণা অশ্রদ্ধা নৈরাজ্য ইত্যাদি একত্রীভূত হয়ে তানের মস্তিষ্কের স্বরগ্রাম বিপর্যস্ত করে দিতে লাগল। হয়তো তান একেবারে পাগল হয়ে যেত, যদি না শেষ রাত্রির সাঁই-সাঁই অন্ধকারে কেউ আর্তনাদ করে উঠত...তানের শরীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল একদল কবন্ধ ছায়া...আঁচল দুলিয়ে পতপত শব্দ করে ছুটে পালাল কে...চোখের সম্মুখে ভবেশের নিজ হাতে তৈরি, দালানের জন্য পোড়ানো পাঁজার ইঁট, ভাঁটি থেকে বয়ে এনে থাক দেওয়া; স্তূপী-কৃত অন্ধকার যেন। ইঁটের রাশির উপরে ঝুঁকে পড়েছে ঝাঁকড়া আমগাছের বিরাট মোটা ডাল। মাটি থেকে আকাশে একটা অতিকায় ছায়ামূর্তি ওখানে দাঁড়িয়ে...ওই ছায়ামূর্তিটা আমন্ত্রণ করছে তানকে : আয় না, আয়, কাছে আয়। ভয়ে তানের বুক শুকিয়ে গেল, চোখ বন্ধ করল। কিন্তু একটু পরেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে খুলতে হল চোখ...আবার ছায়াটা তাকে ডাকছে। তান সম্মোহিতভাবে উঠে পড়ল, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মূর্তিটার দিকে।

ছায়ামূর্তিটা ক্রমশই মানুষের আকার ধারণ করতে লাগল এবং শেষে গলায় দড়ি এক ঝুলন্ত মানুষই হয়ে গেল...প্রত্যূষের প্রথম অবিস্পষ্ট আলোটা সামান্য উজ্জ্বল হতেই সিঁদুরের ছাপ দেখা গেল মূর্তিটার গালে ও ঘাড়ে...

কিছুক্ষণ পরেই তানের বেহায়াপনা দেখে দেশসুদ্ধ লোক মস্করা করবে বুঝেও, তান সিঁদুরের ছাপগুলি মুছে দিতে এগিয়ে যেতে পারল না।

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

পরাশর কথা বলতে হঠাৎ থেমে যায়
আরো কি বেয়াড়া প্রশ্ন আছে শুনি।
আজ্ঞে, ভেজাল ওষুধের মামলার সময় উনি আপনার বিপক্ষে.
অমন ভাবে কি দেখছেন, মিঃ ভর্মা?
মনে হচ্ছে আপনার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, রতনলালজি!

চোর! কোথায় দেখলেন?
ওই জানলার বাইরে দেখলাম।
আপনার ছোট বাগানের দেয়াল টপকে একটা লোক চলে গেল। মুখটা তার চাদরে ঢাকা..

আমার বাগানে চোর ঢুকবে কেন?
আবার মুখ-ঢাকা চোর!
তাইতেই ত অবাক হচ্ছি!
এটা কি রতনলালের আঙুল দেখবার একটা মিথ্যে ফিকির!
আঙুলগুলো ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক!
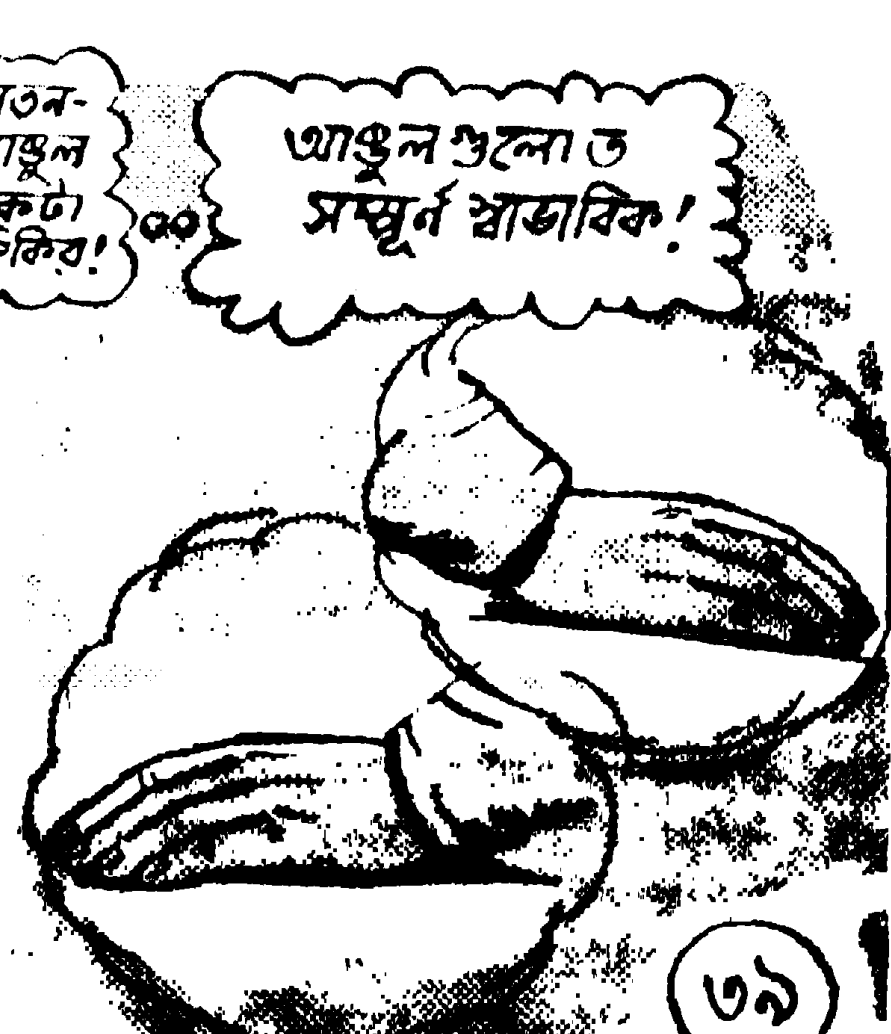
অঙ্গনা

একটি গাঁয়ের কথা

বর্ষায় গাঁয়ের রাস্তা জলে ভাসে, চলতে ফিরতে হাঁটু কাদায় ডুবে যায়। এই কাদা মেশানো জলই গিয়ে আবার জমা পড়ছে পাতকুয়োয়। তাই হচ্ছে সুপেয়। এই তো এদেশের গাঁয়ের জীবন। সেই কবে থেকে এভাবে নেঙচাতে নেঙচাতে চলে আসছে। কিন্তু আজো পুরোপুরি খোঁড়া হয়ে যায় নি। আর সুন্দর করে বলা চলে, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে স্বাধীনতার একুশটি স্বর্ণ সকাল। কিন্তু সেই সোনা রঙের খুব সামান্যই এসব গ্রামের ভাগ্যে জুটেছে। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছিটে-ফোঁটা। আদর্শ গ্রাম গড়ে উঠেছে। ইঁট বাঁধানো রাস্তা, পাকা নর্দমা, টিউবওয়েল, ইন্দারা আর সুন্দর সুন্দর বাড়ি। ছবির মতো গ্রাম। সারা দেশ চষে ফেললে এরকম দৃশ্য যে নজরে পড়বে না তা নয়। কিন্তু প্রদীপ শুধু একাই। আর তার বিস্তীর্ণ অন্ধকারে ডুবে আছে কত নাম না জানা গ্রাম। তাদের সবই আছে। নেই শুধু কোন সংস্কার। সেই বাপপেতামোর আমল থেকে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এখন শুধু ধুঁকছে' ধ্বসে পড়ার প্রতীক্ষায়।

এমনি একটি গ্রামের এক অধিবাসী দেবী সহায়। নিজের গাঁয়ের জরাজীর্ণ দশা দেখে আসছে সে কবে থেকে। সেই যেদিনে স্বামীর ঘর করতে এলো। দিনে দিনে তার বয়স বেড়েছে। গ্রামের কেমন চেহারার আদলে লালচে ভাবটা পাঁশুটে মেরে গেছে। তার শক্তসমর্থ ছেলেরা গাঁও ছেড়ে শহরে চলে গেছে। ক্ষেতখামার দেখা শোনা করেন তাঁর বুড়ো স্বামী। ছেলেরা মাঝে মধ্যে আসে। এটুকুই যা সুখ। অথচ দেবী সহায় একদিন ভাবতো, স্বাধীন হলো দেশ। এবার জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় খলখলিয়ে উঠবে তাদের গাঁও। আবার সব দেহাতী ঘরে ফিরে আসবে। তার ছেলেরাও। হাসিখুশিতে গাঁয়ে নতুন প্রাণ প্রবাহ বয়ে যাবে। কিন্তু তা আর হয়নি। অনেকদিন পথ চেয়ে চেয়ে বসে সে ও এবার আশা ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধুই অন্ধকার। আর স্বপ্ন দেখা চলে না।

উত্তরপ্রদেশের এই অজ গাঁ তবু একদিন গড়ে উঠলো। প্রায় ওদের গা ঘেঁষে তৈরি হতে শুরু হলো বিরাট ইমারত। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির কানপুর শাখা। এজন্য দেবী সহায়দের অনেককেই অনেক জমি জায়গা ছেড়ে দিতে হলো। চোখের সামনে সেই চোখ জুড়ানো বিরাট অট্টালিকা দেখে ওদের মনে হলো: গাঁটা এবার আরো নীচে পড়ে গেল। আমরা আর উপরে উঠতে পারবো না। দেবী সহায়ের খেদোক্তি। বরং এগিয়ে আসছে নিঃশেষের পথ। একদিন এই বাড়ি আমাদের গ্রাস করে বসবে। নিজের প্রয়োজন মেটাতে সে নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য বিস্তার করবে। এই তো দেবী সহায়ের অভিজ্ঞতা। জমিদাররা এমনিভাবেই বাগান করতো, পুকুর কাটাতো। না হলে এ গাঁয়ের উন্নতি হচ্ছে না কেন? গাঁ থেকে পা বাড়ালেই জি টি রোড। আর পাশ দিয়ে চলে গেছে মিটার-গেজ রেলপথ। সোজাসুজি আগ্রা যাবার রাস্তা। তবু গাঁয়ের কোন উন্নতি হয়নি। আর এবার তো পুরোপুরি অবলুপ্ত।

দেবী সহায় তখনো জানতো না যে, জীয়ন কাঠির ছোঁয়া এবার গ্রামে লাগলো বলে। অভাব আর অসুখ ওদের নিত্য সঙ্গী। এই নাগপাশ থেকে ছাড়া পাবার কোন উপায় ওদের নেই। ইতিমধ্যে এলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে এক বিদেশী অধ্যাপক। আর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা ডাক্তার। নাম তাঁর বোর-ওয়ানকার। আমেরিকান এই মহিলা দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণায় ডুবে ছিলেন। এখানে এসে তিনি যেন নতুন প্রাণ পেলেন। অসুখে বিসুখে আর অভাবে জীর্ণ লোক-গুলির চিকিৎসার সুযোগ পেলেন তিনি। সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ওদের দায়িত্বে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। সেই তাঁর ধ্যানজ্ঞান, সাধনার সিদ্ধি।

এখানেই যেন জীয়ন কাঠির ছোঁয়া লুকিয়ে ছিল। এতদিন গ্রামের শতখানেক পরিবার অদৃষ্টের উপর নিজেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। ভবিষ্যত পরিণতির জন্য নিজেদের তৈরি করছিল। কিন্তু বিদেশী ডাক্তার ভদ্রমহিলা একদল ছাত্র নিয়ে এসে দিনরাত ওদের জন্য কাজ করতে শুরু করলেন। এবার গ্রামবাসীরা নড়েচড়ে বসলো। দিনে দিনে গ্রামের চেহারা বদলাতে লাগলো। আর গ্রামবাসীদের মুখচোখে একটা নতুন জীবনের অনুভূতি ক্রমেই স্পষ্ট হতে শুরু করলো। ছেলেগুলো যেন লকলকিয়ে উঠলো। ওদের ক্ষুদ্র জীবনে এই বোধহয় প্রথম জল সিঞ্চন হলো।

তিনি প্রথমেই নজর দিলেন গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নয়নে। সেই কাদা থকথকে রাস্তা আর পানীয় জলের দুরবস্থা দূর করার জন্য তিনি এগিয়ে এলেন সর্বাগ্রে। বর্ষায় কাদায় হাঁটু ডুবে যায় আর সেই হলো পানীয় জল। বৃষ্টি হলে একবার আর রক্ষে নেই। তাই অসুখবিসুখের প্রকোপ থেকে এদের বাঁচাতে হলে শুধু ওষুধে চলবে না। সর্বাগ্রে চাই এই পঙ্কশয্যার দূরীকরণ। এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা এবং স্থানীয় স্যানিটারি ইঞ্জিনীয়ার। ও'দের সকলকে নিয়ে তিনি গ্রামের উন্নয়নের জন্য একটা পরিকল্পনা খাড়া করলেন। তারপর শুরু হলো কাজ। রাস্তাঘাটের দিকে প্রথম নজর। যাতে বর্ষায় জলকাদা আর না জমে। পাকা রাস্তা তৈরি হলো। ইঁট পেতে পেতে রাস্তা তৈরির কাজ চলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চললো জল নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন। নর্দমাও তাই পাকা। এবার বর্ষায় জলের সুব্যবস্থা। ইন্দারার ব্যবস্থা হলো গ্রাম জুড়ে। চাপিয়ে দেওয়া রোগগুলি গাঁ ছাড়া হবার পথ পেলো না।

প্রথমে কিন্তু কাজ শুরু হয়েছিল খুবে ছোট করে। টাকা জুগিয়েছিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং ছাত্ররা। তাই দিয়ে কাজ আরম্ভ হলো। গ্রামের বড় রাস্তায় প্রথম হাত দেওয়া হলো। মাত্র একটি কুয়োর দেয়াল তৈরি সম্ভব হলো। আস্তে আস্তে বড় রাস্তা তৈরি শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চেহারাও গেল বদলে। যারা এতদিন হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, এ গ্রামের কিছু হবে না। তাদেরও চোখ ফুটলো। অনেকেই এগিয়ে এলেন। এ ভাবেই পরিচয় ঘটলো রোটারী ক্লাবের স্থানীয় শাখার সঙ্গে। ও'রা প্রতিশ্রুতি দিলেন, গ্রামের আরো উন্নতির জন্য টাকার অভাব হবে না।

তিনি এই টাকার ভরসায়ই বসে রইলেন না। তিনি ফেটের ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে টাকার জন্য আবেদন করলেন নিজের দেশবাসীর কাছে। সৎকর্মে টাকার অভাব হয় না। টাকা আসতে লাগলো। সুদূর সানফ্রান্সিসকো থেকে এলো টাকা গ্রামের উন্নয়নকল্পে তাঁর প্রশংসনীয় কাজের প্রতি সমর্থন জানাতে।

গ্রামের চেহারা এবার দ্রুত মোড় নিলো। দেখতে দেখতে সব রাস্তা পাকা হলো। সেই সঙ্গে পাকা ইন্দারা। আর কোনক্রমেই পানীয় জল দূষিত হওয়ার আশংকা নেই।

উন্নয়ন কাজ তা বলে থেমে নেই। গ্রামের জীবনকে স্বনির্ভর করার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। একটি ছোটখাটো ডাক্তার-খানা এবার অসুখবিসুখের আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্ত প্রহরীর মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। তাকে পেরিয়ে রোগাক্রমণ খুব একটা সহজ হবে না।

অনেক উন্নতির সঙ্গে গ্রামের লোকদের জীবনে আনন্দের ছোঁয়াচ দেবার জন্য [illegible]

চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। একটি প্রমোদ কেন্দ্রও গড়ে উঠলো। আর সেই সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার। গ্রামের ছেলেবুড়ো ভিড় করে এলো এই গ্রন্থাগারে। গান বাজনায় মুখর হয়ে উঠলো প্রমোদ কেন্দ্র। এবারে তিনি পরিকল্পনা করেছেন একটি কো-অপারেটিভ ডেয়ারীর। এতে গ্রামবাসীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি। কারণ গরুবাছুর মোষের আস্তানা হবে গ্রাম থেকে দূরে একটি শেডে।

গ্রন্থাগার, প্রমোদ কেন্দ্র আর রাস্তাঘাটের উন্নতি সবই গ্রামে নতুন জীবনের সূচনা। আবার কো-অপারেটিভ ডেয়ারীও হচ্ছে। তাই গ্রামবাসীরা হাসিতে ঝলমল। আর সব পরিবর্তনের মধ্যে এটাই হলো মুখ্য। ওদের জীবনের গতি ছন্দে এখন অনক পরিবর্তন হয়েছে। এ যেন ওদের নবজন্ম। এবার নিজেদের উন্নয়নে ওরা নিজরাই হাত লাগিয়েছে। আর পারস্পরিক সহযোগিতায় নতুন সেতুতে শুরু হয়েছে ওদের অবাধ যাতায়াত।

এবার দেবী সহায়ের মুখে হাসি ফুটেছে। সত্যি ওরা অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং নতুন উল্লাসে বাঁচতে শিখছে। এবার ছেলেরা হয়তো গাঁয়ে ফিরে আসবে। ছেলের বউরা। হাসিতে হাসিতে গ্রাম উৎসব-মুখর হয়ে উঠবে। অপ্রত্যাশিত একটা জীবনকে তারা ছুঁয়ে ফেলেছে। এতো অনেক কাছেই ছিল। তবু কতদূরে মনে হতো। এবার সব দূরত্বের অবসান। আর এই কৃতিত্বের সবটুকু পাওনা সেই বিদেশী ভদ্রমহিলার। যিনি ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে গ্রামময় ঘুরে বেড়ান। ঘরে ঘরে তিনি প্রিয়। এখনো তার মাথা ঠাসা নানা উন্নয়ন চিন্তায়।

—প্রমীলা

পরিবার পরিকল্পনা ঃ নীরব সামাজিক বিপ্লব

জনগণের কাছে পরিবার পরিকল্পনার বার্তা আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি কিনা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গত বছর রাষ্ট্রসংঘের একদল পর্যবেক্ষক ভারতের জনসাধারণের কাছে তাদের বিবৃতি গ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষকদল অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৭৫জন লোক অশিক্ষিত সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরো মাত্রায় সচেতন রয়েছেন।

পরিবার পরিকল্পনার গণ-সমর্থন

আলাদা মাপকাঠিতেও পরিবার পরিকল্পনার সচেতনতা দেখানো যেতে পারে। এবছরের জুন অবধি এদেশে ৭৫০ লক্ষ নরনারী নির্বীজকরণ অথবা বন্ধ্যাকরণের জন্য অস্ত্রোপচারের সাহায্য নিয়েছেন, ৩৪ লক্ষ মহিলা লুপ ধারণ করেছেন এবং পনর লক্ষ লোক জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পথ বেছে নিয়েছেন। এই হিসেব থেকেই বোঝা যায়, ভারতে একটি নীরব বিপ্লব শুরু হয়েছে—যার ফলে দেশের সুদূর-প্রসারী সুখ ও সমৃদ্ধি আসবে।

এই বিপ্লবে আমাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যথা প্রথমতঃ এপর্যন্ত যার কোন না কোন পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে এক কোটি লোককে সর্বদা দেখাশোনা করতে হবে এবং তাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রতি বছর পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। তৃতীয়তঃ চলতি দশকের মধ্যেই যাতে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করা যায়, সেজন্য সব ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছি তা আলোচনা করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাবলীর মূলমন্ত্র হল স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং মাতৃ ও শিশুকল্যাণের ব্যাপক প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে প্রতি ৮০ থেকে ১০০ হাজার লোকের জন্য একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য একটি করে সাহায্যকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্য একটি বিভাগ হল দম্পতি পরিসংখ্যান কেন্দ্র। প্রতিটি প্রজননক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখা, প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়াই হবে এই সংস্থার কাজ। পরিবার পরিকল্পনার অনেক উপায় আছে। যে দম্পতির কাছে যেটা উপযুক্ত কিংবা যারা যেটা পছন্দ করেন সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ—তাদের সেই অবাধ স্বাধীনতা আছে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করা গেছে ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের দম্পতিরা পরিবার পরিকল্পনার পথ বেছে নিচ্ছেন।

ধারণা সঠিক নয়

অনেকে মনে করেন যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে গ্রামবাসীরা উৎসাহী নয়। কার্যতঃ ভারতে পরিবার পরিকল্পনা ২/৩ অংশেরসাফল্যের মূলেই গ্রামের অবদান রয়েছে। এ বিষয়ে গ্রামাঞ্চলে লোকেদের আগ্রহ এবং ইচ্ছাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আশার কথা

যে বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে তা হল, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। এই প্রচেষ্টার বিশ্বজনীন আবেদনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে কেউ এর বিরোধিতা করেন নি।

গত কয়েক বছরে নির্বীজকরণ বা বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচারের সংখ্যা কমলেও নিরোধ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।

মহৎ সহায়তা

পরিবার পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও শিল্প সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতে পরিবার কল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীর সংস্থার সংখ্যা অনধিক ৪০০। বিভিন্ন সংগঠিত শিল্প সংস্থাও আমাদের দেশের সামাজিক অভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এই সমস্ত শিল্প সংস্থা পরিবার পরিকল্পনার অংশ গ্রহণকারী শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। আয়করের দিক থেকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিলে আরও অনেক শ্রমিক এ-ব্যাপারে অংশ নেবে বলে আশা করা যায়। এই সমস্ত সংস্থার সঙ্গে সরকারী ব্যবস্থাপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার বাণী বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে জন-মানসে আবেদন রাখছে। এর পেছনে আমাদের শিল্পীদের দান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। পরিবার পরিকল্পনার স্মারক দুটি শিশু সন্তান নিয়ে পিতা-মাতার ছবি, আর বাচ্চা এখনই নয়—দুই বা তিনের পরে কথাই নয়, প্রভৃতি শ্লোগান আশাতীত সাড়া জাগিয়েছে। বিভিন্ন নৃত্য ও নাট্য সংস্থা, পুতুল নাচের দল গ্রাম্য গীতি পরিবেশক দলের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার বাণী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ সমস্যা শুধু আমাদের নয়

জনবিস্ফোরণের সমস্যা শুধু ভারতেরই নিজস্ব সমস্যা নয়—এ সমস্যা সারা বিশ্বের তবে আমাদের দেশই প্রথম যে সরকারীভাবে এই সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছে। এর যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান। ১৯২০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৫-১ কোটি; আর এ-বছর এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪ কোটিতে। দেশের সম্পদ ও আয়ের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা দ্রুততর বেড়ে চলেছে। এই হার হল বছরে ২-৫ শতাংশ। জনসংখ্যার এই হার যদি বজায় থাকে তাহলে কেমন করে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে পারব?

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কিষণ মহারাজ এবং কালিদাস সান্যাল

সুনন্দা পট্টনায়ক

জলসা

সদারং সংগীত সম্মেলন : 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ—তবু রঙ্গে ভরা'—এ সত্যকে নতুন করে অনুভব করলাম এবার সদারং সঙ্গীত সম্মেলনের সমাপ্তি রাত ও প্রাতে। রাত ও প্রাতে একসঙ্গেই বলছি এজন্য যে অনুষ্ঠান সুরু হয়েছিলো ১ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এবং শেষ হয় ২রা অক্টোবর বেলা সাড়ে এগারটায় এবং বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দে লক্ষ্য করলাম এত বেলাতে অনুষ্ঠান প্রলম্বিত করে রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত শ্রোতাদের বসিয়ে রাখতে শিল্পীরা সঙ্কুচিত, কিন্তু শ্রোতারা অক্লান্ত। বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ও নাছোড়-বান্দা—ভজন ও ঠুংরী না শুনে তারা সুনন্দা পট্টনায়ক ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়বেনই না। আজকের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো সংকটের মধ্যেও বাঙ্গালীর রস-পিপাসা অনাহত। সৌন্দর্য-তৃষ্ণার ব্যাকুলতা এতটুকুও মন্দীভূত নয়, এ অভিজ্ঞতা সত্যিই গৌরবের। মনে পড়ে গেল অমৃতের প্রতিনিধির কাছে লতা মঙ্গেশ-কারের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস বাঙ্গালীর **মত সংগীত প্রেমী জাত** আমি সারা ভারতবর্ষে কোথাও দেখিনি। সারারাত ভোর জেগে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গান শুনতে একমাত্র বাঙালীই পারে'। এবার সদারং সংগীত সম্মেলন উদ্বোধন করলেন মহম্মদ দবীর খাঁন, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সঙ্গীতশাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী।

সম্পাদকীয় ভাষণে কালিদাস সান্যাল বলেন—**সর্বভারতীয় সদারং সংগীত সম্মেলন** হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভিত্তি ধ্রুপদকে অন্যান্য বারের মত এবারেও যথা-যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছে। সেইজন্যই বাংলাদেশে সেনী ঘরাণার প্রবীণ ধ্রুপদী দবীর খাঁর সঙ্গে লাহোরের ভগবতস্বরূপ ঠাকুরকেও আহ্বান জানানো হয়েছে। গত বছর সদারং-এর উদ্বোধন সভায় প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের ধ্রুপদী যন্ত্র পাখোয়াজকে পূর্ব-কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব স্মরণে আমরা এবার রামা-শীষ পাঠকের স্বতন্ত্র একটি পাখোয়াজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া সু-প্রতিষ্ঠিত তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীদের যথাযোগ্য সুযোগ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তৃতীয়তঃ উদীয়মান তরুণ তবলাবাদকদের শীর্ষ-স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে একটি করে অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। এতে করে এঁরা উৎসাহ এবং শিক্ষার সুযোগ দুটোই পাবেন বলে আমরা মনে করি।

ধ্রুপদ—সেনী ঘরাণার প্রবীণ শিল্পী মহম্মদ দবীর খাঁর ধ্রুপদ দিয়ে অনুষ্ঠান হয়। দাগার বাণী অঙ্গে আলাপ জোড় ধামারের মর্যাদা গম্ভীর ভক্তিভাবের প্রকাশে সারা প্রেক্ষাগৃহ যেন মন্দির হয়ে উঠেছিলো। রাগের শুদ্ধ ভাব, বিশেষ করে রেখাবের প্রয়োগবিধিতে বেহাগ ও কল্যাণের মিলন ও আপনাপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধার সংগে লক্ষ্য করার বস্তু। এঁর সঙ্গে চৌতাল ও ধামারে পাখোয়াজ সঙ্গত করেন রামাশীষ পাঠক।

ধ্রুপদে এবার এক নতুন শিল্পীকে শোনা গেল। ইনি লাহোরের শিল্পী, পণ্ডিত ভাগবতস্বরূপ ঠাকুর। লাহোরের গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে ১৯৩১এ এঁর সংগীত জীবন সুরু হয়। এ-ছাড়াও পণ্ডিত গজানন রাও এবং ধুন্দীরাজ পালুসকার (গোয়া-লিয়র), ফিরোজ নিজামী (কিরাণা ঘরাণা)র কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং বিষ্ণুপুর ঘরাণার গোবিন্দদাস পাকড়াশীর সংগে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাঁর পরিচালনা ও নির্দেশে ধ্রুপদে আত্মনিয়োগ করেন।

এই ব্যাপক শিক্ষার সু-বিস্তীর্ণ পট-ভূমিকা ছাড়াও শ্রীঠাকুরের নিজস্ব সংগীত-চিন্তা ও পরিবেশনা-শৈলীর মূল্যও যথেষ্ট। তারই ফল-শ্রুতি সেদিনের অনুষ্ঠান 'মেঘ' রাগের ধ্রুপদ। রাগ-গাম্ভীর্য ছাড়া স্ব-সৃষ্ট মাধুর্যের ছোঁয়াও এ অনুষ্ঠানের উপ-ভোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। বাংলার তরুণ ধ্রুপদ গায়ক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেহাগ' রাগে ধ্রুপদানুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিদীপ্তই শুধু নয়। তার আগের অনুষ্ঠানের তুলনা-মূলক বিচারে প্রশংসনীয় অগ্রগতি আনন্দদায়ক।

খেয়াল—খেয়ালের অনুষ্ঠানে প্রধান দুই আকর্ষণ ছিলেন দুই বিতর্কিত

শিল্পী প্রাজ্ঞ প্রবীণ শিল্পী ওস্তাদ আমীর খাঁ ও জনপ্রিয় তরুণ শিল্পী সুনন্দা পট্টনায়ক।

আমীর খাঁ সাহেব নামেই শুধু আমীর নয়— পরিবেশনা-শৈলীতেও আমীর—এ সত্য যেন নতুন করে অনুভূত হয় এবারের অনুষ্ঠানে। তাঁর গায়কী ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করেও বলা যায়—আপন মেজাজ, সংগীতভাবনা, ধ্যান ও ধারণার উপযোগী যে পদ্ধতি তিনি সৃষ্টি করেছেন—সে বস্তু এঁকেই মানায়। কিন্তু তাঁর মত অসামান্য সংগীতব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাধরকে যা রত্নহারের মত সাজে প্রতিভাহীন অনুকরণ-দুষ্ট শিল্পীর কন্ঠে তার বিকৃত প্রকাশকে তাঁর খ্যাতির ওপর ছায়াবিস্তার করতে দেওয়া উচিত নয়। স্বল্পবিস্তার তানের মধ্যে ভাবের অসীম আকাশকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতায় আমীর খাঁর জুড়ি দুর্লভ। 'শ্রোতাদের হাততালি দেবার সুযোগ না দিয়েই আমি রাগ থেকে রাগান্তরে চলে চাই'—সংগীতালোচনা প্রসংগে অমৃত প্রতিনিধিকে তিনি জানান। এবার তিনি শোনালেন বাগেশ্রী কলাশ্রী ও মালকোষ। কন্ঠ-লাবণ্য হয়ত আগের তুলনায় ম্লান। ওপরের দিকে শ্রুতিমধুরও নয়—কিন্তু শিল্পীর ধ্যান-সমাহিত প্রশান্তি, স্বপ্নময় ব্যঞ্জনার ইসারা এবং ভাব-গভীরতা তাঁকে রাজকীয় স্বাতন্ত্র্যে অচলপ্রতিষ্ঠ রেখেছে। 'ভজন আমি আলাদা করে গাই না, কারণ গাইতে পারলে ভক্তির অনুভাবে খেয়ালই ভজন হয়ে উঠতে পারে—খেয়াল মানেই লয়ের মারামারি ও তানের চাকী-বাজী, আমি তা মানি না। আমার 'তারাণ''তেও আমি শান্তভাব বজায় রাখি।—বলেন আমীর খাঁ। এ-সংগীত-দর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলো তাঁর এবারের অনুষ্ঠানে—তাঁর সঙ্গে সুযোগ্য তবলা সংগত করেন উদীয়মান তবলিয়া গোবিন্দ বসু।

আর এক সংগীত-দর্শনের স্মরণযোগ্য উদাহরণ পেশ করেছেন সংগীতালংকার সুনন্দা পট্টনায়ক। আমীর খাঁর শান্ত রসাশ্রিত বুদ্ধিদীপ্ত সংগীতরস যেমন শ্রদ্ধাভরে রসিক শ্রোতারা গ্রহণ করেছেন—তেমনই উচ্ছ্বসিত আনন্দে অভিনন্দন জানিয়েছেন সুনন্দা পট্টনায়কের আবেগ-রঙিন তান বিস্তার, তান-বৈচিত্র্য ও তারাণা সমৃদ্ধ খেয়াল। উভয়েরই সংগীতের মূলভাব ভক্তি। কিন্তু আমীর খাঁ আবেগ-সংযমে বিশ্বাসী, কোনো প্রতিদান কামনা না রেখে হৃদয়ের নিবিড়তম সুরের অর্ঘ্য সুরলক্ষ্মীর চরণে পৌঁছে দেওয়াই যেন তাঁর লক্ষ্য।

সুনন্দা আত্মহারা নিবেদনের অর্ঘ্যকে হৃদয়ের সংঘাত বেদনা আনন্দ ও ঐশ্বর্যে সাজিয়ে নিবেদন করেই শুধু ক্ষান্ত নন। বরধন্য অন্তর সংগীতলক্ষ্মীর প্রসন্ন আশ্বাসের প্রত্যাশী। তাই অন্তর-সম্পদ-দীপ্ত তাঁর গানে প্রশস্ত আলাপ ছাড়াও দরদ ভরা মীড়, গমক, তারনার বিদ্যুদ্বেগ গতি স্বর-কম্পনের উন্মাদনা ত্রি-সপ্তক পরিক্রমার নানারঙা বাহার। এ বাহারে চিত্ত দুলে না উঠে পারে না।

প্রতিবারের মত এবারেও প্রথম দিনে তিনি একটি স্ব-সৃষ্ট রাগ 'লক্ষ্মেশ্বর'—উপহার দেন। মহম্মদ দবীর খাঁ, সংগীত-শাস্ত্রী বীরেন্দ্রকিশোর প্রমুখ গুণীজনের সংগে আলোচনায় জানা গেল—গিরিজা শংকর চক্রবর্তী, নগেনবাবু, বাদল খাঁ—এই ধ্রুপদী প্রথায় খেয়াল গাইতেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বোলতানের বিস্তার। দ্বিতীয় দিনে ইনি কোষি-ভৈরব ও বিশেষ অনুরোধে 'যোগী মত্ যা' গেয়ে শোনান। প্রথম রাতে বিশ্বনাথ বসু ও লড্ডন খাঁ দ্বিতীয় প্রভাতে কেরামতুল্লা খাঁ ও সগীরুদ্দিন খাঁ যথাক্রমে এঁর সংগে তবলা ও সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন। আগ্রা-ঘরানার আঙ্গিকে স্থানীয় শিল্পীদ্বয় রবি কিচলু ও বিজয় কিচলুর গীত 'পূরবী' সুগীত, তবে আরো বেশী ভালো লেগেছে এঁদের বারোয়া। ঐ রাতে একই ঘরানার অপর শিল্পী সরাফৎ হোসেন খাঁর 'ভৈরব' রাগের খেয়ালও বেশ জমে উঠেছিল। গমক-জোড় এবং তানে শক্তিমত্তার পরিচয় অবশ্যই ছিল। কিন্তু তান-বাহুল্য ও চাঞ্চল্য 'ভৈরব' রাগের শান্ত গম্ভীর ভাবকে অনেকাংশে ক্ষুন্ন করেছে। শ্রোতাদের বিশেষ আগ্রহে গাওয়া 'বাবুল মেরা'—কোন বিশেষ রস সৃষ্টি করতে পারেনি। আর এক আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন এম আর গৌতম। তাঁর গাওয়া 'গুঞ্জি কানাড়া' সুরের মাদকতায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে।

মুণাব্বর হোসেন খাঁর 'শুধ-কল্যাণ' শিল্পীর আপন যোগ্যতায় তারিফ পেয়েছে। সুরের ওপর তিনি ক্রমশঃ কায়েমী হচ্ছেন দেখে মনটা খুসী হয়ে উঠলো।

মালবিকা কাননের 'মধুকোষ' তাঁর স্বভাবানুগ মাধুর্যে বিস্তৃত হয়েছিলো। দামোদর হোতার কন্ঠ-মাধুর্যের অভাব সত্ত্বেও প্রশংসা পাবেন 'মল্লার'-এ রাগ-শুদ্ধতা সু-রক্ষিত হয়েছে বলে। এ ছাড়া টি এন রানার শিষ্যা কল্পনা চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস সান্ন্যালের শিষ্যা নমিতা চট্টোপাধ্যায়, গোয়ালিয়র মরাণায় জয়রাম সিং-এর শিষ্যা জয়ন্তী রায়চৌধুরীও প্রশংসাযোগ্য অনুষ্ঠান করেছিল।

সদারং-এ যন্ত্রসংগীতের ধারা অনুসরণ করে দেখা গেল অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সেতার। দিকপাল শিল্পী ছাড়াও প্রতিভাসম্পন্ন বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীর আবির্ভাব আমাদের আশান্বিত করেছে। এর মূলে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ বিলাতে খাঁ ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণার অবদান অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ মণিলাল নাগ, ইমরাৎ খাঁ ও রহিম খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। মণিলাল নাগ বাজান 'কৌষি-কানাড়া' রবিশঙ্কর ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাদন-শৈলীর সংগে নিজস্ব শিক্ষা, চিন্তা প্রকাশভঙ্গির মিলনজাত রস ও আবেদন এক জম-জমাট পরিবেশ রচনা করে। আরো জমেছিলো কিষণ মহারাজের তবলা-সংগতের দরুণ।

ইমরাৎ খাঁ দুদিনের অনুষ্ঠানে যথাক্রমে 'ইমন' ও যোগ বাজিয়ে শোনান। বাজের দাপট, তানের দক্ষতা গমক ইত্যাদি সকল অলংকারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা চমক লাগাবার মত। এই সঙ্গে রাগের অন্তর্গত সাহিত্যের প্রতি একটু নজর থাকলে তাঁর সম্বন্ধে বলার কিছু থাকত না। রইস খাঁর সেতার অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী হয়েছিল—আগের বাজনার তান-চাঞ্চল্য ও আঙ্গিক কুশলতা প্রদর্শন প্রয়াসী মনের এবারে সংযত অন্তর্মুখীতা রূপান্তরের করেন। যন্ত্রের ওপর দখল ছাড়াও সংযত অভিব্যক্তি তাঁর বাজনাকে প্রথম থেকে আকর্ষণীয় করেছে। টোড়ি' রাগে সোজা-সুজি পঞ্চমের প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি।

বাহাদুর খাঁর শিষ্য মনোজশংকরের বাজনায় সু-শিক্ষার স্বাক্ষর ছিল।

আশা টাণ্ডনের অনুষ্ঠানে উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত। যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যমণি রূপে জ্বলজ্বল করছিলো বাহাদুর খাঁ ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরোদ ও সেতার। ধ্রুপদী অঙ্গের আলাপ জোড় ও তারপরনে বাহাদুর খাঁর পাণ্ডিত্য এবং গতের অঙ্গে লয়কারী ও বৈচিত্র্য ছাড়াও কল্পনার রং স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আলি আকবর খাঁর পরের সরোদী তাঁরই সুযোগ্য ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'ভাটিয়ার' রাগের আলাপ ও 'বসন্ত মুখারী' রাগের গৎ একাধারে গায়কী অঙ্গ, তথা বীণকার ঘরানার আঙ্গিক-শৈলীতে স্বরব্যঞ্জনার বিশুদ্ধতার মাধুর্য ছাড়াও যে বস্তু বিশেষ উল্লেখের দাবীদার তা হোল তাঁর "High tone of seriousness.

শ্রীমতী মীরা দাশগুপ্তর পরিচালনায় 'নৃত্যের তালে তালে'' প্রতিষ্ঠানের 'কথক-নৃত্যের আঙ্গিকে 'রাধাকৃষ্ণের লীলা' উপাখ্যান দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে: পণ্ডিত কিষণ মহারাজের বেনারসী মেজাজের তবলা—পরিবেশকে মাতিয়ে তুলেছিলো।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রতিদ্বন্দ্বী/ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণা বসু। পরিচালনা/সত্যজিৎ রায়

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নিশিপদ্ম'

পল্লীগ্রামের ইতিকথার নগ্ন বাস্তব রূপ তুলে ধরার কৃতিত্বে বিভূতিভূষণের লেখনী স্মরণীয় হয়ে আছে। একদিকে পাড়াগাঁয়ের রোজকার জীবনের শঠতা সংস্কার, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ইত্যাদির ছবি আঁকতে তিনি যেমন কুশলী, তেমনি স্মরণীয়-বরণীয় চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি সমান নিপুণ। 'নিশিপদ্মে'র অনঙ্গ (উত্তমকুমার) ও পুষ্প (সাবিত্রী) তাঁর অন্যতম সুন্দর সৃষ্টি বলা যেতে পারে। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের 'নিশিপদ্ম'কে চিত্রায়ণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন বুঝি ঐ দুটি চরিত্রেরই আকর্ষণে। এবং তাঁর সেই প্রীতি পর্দায় যথার্থ রূপ পেয়েছে বলেই সাধুবাদ জানাব শ্রীমুখোপাধ্যায়কে। বিভূতিভূষণের অনঙ্গ বা পুষ্প পর্দায় এসে কেউই হারিয়ে যায়নি। বরং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বলা যায়।

বৈষ্ণবের মেয়ে পুষ্পর বিয়ে যদিও হয়েছিল ছোটোবেলায়, কিন্তু স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের দরুন নিঃসন্তান পুষ্পকে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে হয়। সামাজিক সংস্কারের চাপে বেঁচে থাকার কোনো সামান্যতম উপায়ও না পেয়ে আত্মহত্যার পথই তাকে বেছে নিতে হয়। কিন্তু অর্থলোলুপ পাড়ার এক কাকা তাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে শহরে নিয়ে এসে পতিতার বৃত্তি নিতে বাধ্য করে। পুষ্পের নতুন জীবন শুরু হয়। মক্ষিরাণী পুষ্প তখন অনঙ্গর প্রাণপ্রতিমা। ধনী কিন্তু বিবাহিত জীবনে অসুখী অনঙ্গ পুষ্পের মধ্যে তার অচরিতার্থ স্বপ্নের ছবি দেখতে পায়। নাটক জমে ওঠে তখনই যখন অপুত্রক পুষ্প তার এক প্রতিবেশী গাঁয়ের দাদার শিশুপুত্র ভুতোর প্রতি মাতৃস্নেহ নিয়ে এগিয়ে যায়। নষ্ট মেয়ের সঙ্গে ভুতোর মেলামেশা তার বাবা-মা সহ্য করতে পারেন না। বাড়ী বদলে চলে যান তাঁরা অন্যত্র। হারিয়ে যায় পুষ্প। পনের বছর বাদে ভুতো শহরে এসে নতুন রূপে পুষ্পকে (সে তখন বিধবা) আবিষ্কার করে, অনঙ্গর সাথে দেখা হয়।

বিভূতিভূষণের কাহিনী-বিন্যাসকে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় সামান্য পরিবর্ধন ছাড়া মোটামুটি মেনেই চলেছেন। আলগা চিত্রনাট্যের জন্য ছবির গতি প্রথমাংশে ব্যাহত হলেও, শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠায় ও অভিনয়ে 'নিশিপদ্ম' সুঅভিনীত ছবি বলা চলে। অনঙ্গ চরিত্রে উত্তমকুমার শুধুমাত্র তাঁর স্বভাবজ নিপুণতার পরিচয়ই তিনি দেননি, রঙে, রসে, গাম্ভীর্যে, গভীরতায় চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অনঙ্গ তাঁর অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। পুষ্পর চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সাবলীল, সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রে অনুপকুমার, গঙ্গাপদ বসু, অসীম চক্রবর্তী, তপতী ঘোষ, মাঃ মলয়, জহর রায় চিত্রনাট্যের প্রয়োজন মিটিয়েও দর্শকের মনে ঠাঁই করে নেবেন বলা যায়।

নচিকেতা ঘোষের সুরে মান্না দে-র দুটি গান জনপ্রিয় হবে আশা করা যায়। সুখ-দুঃখ, হাসি-গান, ব্যথা-বেদনা সবকিছুর সুষ্ঠু সমন্বয়ে বলতে পারি চিরন্তন চিত্রের 'নিশিপদ্ম' আকর্ষণীয়, চিত্তবিনোদনকারী ছবি হিসেবে সার্থক।

স্টুডিও থেকে

পুজোর ক'দিন ঝিমিয়ে থাকার পর টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়া আগের মত আবার জেগে উঠেছে। কাজ কাজ আর কাজ। যেখানেই গেছি চোখে পড়ছে শুধু কর্মব্যস্ততা। এন টি-র এক নম্বর থেকে শুরু করে পুটিয়ারীর খালের পাড়ে ক্যালকাটা মুভিটোন পর্যন্ত সবক'টা স্টুডিওয় একই দৃশ্য।

পিনাকী মুখার্জির 'আলো আমার আলো', কনক মুখার্জির 'শহরটির নাম কলকাতা', নবেন্দু চ্যাটার্জির 'রাণুর প্রথম ভাগ', সলিল সেনের 'খুঁজে বেড়াই' ও আরও কয়েকজনকে কোনো না কোনো স্টুডিওয় ব্যস্ত দেখেছি নিজেদের ছবি পরিচালনার কাজে।

যাঁরা এখানে নেই, তাঁরাও ব্যস্ত অন্যত্র। হীরেনবাবু গেছেন 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'র ইউনিট নিয়ে সুদূর উত্তর ভারতে। তরুণ মজুমদার রূপনারায়ণের

পাড়ে কাজ করছেন (ইতিমধ্যে ফিরেও এসেছেন সম্ভবতঃ) 'নিমন্ত্রণ' ছবির। হেমন্তবাবু সম্প্রতি ফিরে এসেছেন 'আনিন্দিতা'র কাজ শেষ করে। শুনেছি দীনেনবাবু পুজোর মধ্যেই কোনো এক প্যান্ডেলে তাঁর নতুন ছবি 'আজকের নায়কে'র কিছু দৃশ্যগ্রহণ করেছেন। স্টুডিওতে তিনি এখন অনুপস্থিত।

দু'দিন ধরে সবক'টা স্টুডিও ঘোরার পর যা দেখলাম, যা শুনলাম তাতে এটাই বুঝলাম, টালিগঞ্জ যেন বলতে চায় 'রিং আউট দি ওল্ড, রিং ইন দি নিউ'। নতুনের জয়গান আর নবীনের কলহাস্যে মুখর তাই আজ টালিগঞ্জ। তাই ভুলেও চোখ কখনো দেখতে পায় না সুশীল মজুমদারকে, দেখে না চিত্ত বসুকে, রাজেন তরফদারকে। শুনেছি সুশীলবাবু বম্বে পাড়ি দিয়েছেন, চিত্তবাবুর খবর জানা নেই আমার। সবচাইতে দুঃখ হয় রাজেনবাবুকেও চোখে পড়ে না বলে। একাধিকবার শুনেছি তিনি

আজকের নায়ক/পরিচালনা দীনেন গুপ্ত/জয়শ্রী রায়। ফটো ঃ অমৃত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা গল্প 'সংসার সীমান্তে'কে চিত্ররূপ দেবেন। অদ্যাবধি তার কোনো পাকাপাকি সংবাদ না পেয়ে একদিন সশরীরেই হাজির হয়েছিলাম রাজেনবাবুর বাড়ীতে। 'অন্তরীক্ষ', 'গঙ্গা'র স্রষ্টা তিন বছর যাবৎ কেন নীরব সেটা ভাববার মত বটে।

আসল ব্যাপার আর পাঁচজন পরিচালকের মত রাজেনবাবু জীবিকানির্বাহের জন্য শিল্পের এই দশম কলাটির ওপর চাপ সৃষ্টি করেননি। ছবি করা না করা তাঁর কাছে পুরোপুরি মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপার। তাই ছবি করার একঘেয়েমি থেকে রিলিফ পাবার জন্যই স্বেচ্ছাকৃত এই বিরতির আয়োজন।

তাঁর সর্বশেষ ছবি 'আকাশ ছোঁয়া' মুক্তি পেয়েছে বছর-তিনেক আগে। তারপরই শুনেছি তাঁর 'সংসার সীমান্তে'র খবর। এখনও শুনছি। তিনি বললেন—

'এ-গল্পটার চিত্রায়ণের কথা ভেবেছি অনেক আগেই। চিত্রনাট্যও শেষ করেছি বহুদিন আগে। একটা চোর ও একটা বেশ্যার প্রণয়-ঘটিত কাহিনী নিয়ে ছবির গল্প।' অনেকদিন আগে থেকেই ফাইনান্সিয়ার খুঁজছিলেন তিনি। গল্পও শুনিয়েছেন তাঁদের। কিন্তু কেউই রাজী হননি। কারণ, সমাজের নীচের তলার ওরকম দুটো চরিত্র নিয়ে রসালো জমজমাট কোনো ছবি করতে না পারলে আর্থিক অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা নাকি নেই-ই। কাজেই 'সংসার সীমান্তে' তৈরীর খবর খবরই রয়ে গেছে। ফ্লোরে এখনও গিয়ে উঠতে পারেনি।

রাজেনবাবুও অনন্যোপায় হয়ে হাজির হয়েছিলেন ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছে। কাগজে-কলমে তাঁরা মঞ্জুর করেছেন দু' লক্ষ টাকা। হাতে এখনও পাননি। পেলেই কাজ শুরু করবেন। এখন চলছে শিল্পী-নির্বাচন পর্ব। প্রথম দিকে স্থির হয়েছিল

বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় প্রধান চরিত্র-দুটি করবেন। রাজেনবাবুর কাছ থেকেই শুনলাম ওঁরা ছবিতে কাজ করছেন না। সম্পূর্ণ নতুন মুখ নিয়ে তিনি কাজ করবেন।

নতুনদের নিয়ে কাজ করায় আর্থিক সাফল্যের অনিশ্চয়তার কথা জানালে তিনি বললেন—'নতুনদের নিয়ে ছবি করলেই যে সে-ছবি বক্স-অফিসের আনুকূল্য পাবে না—এ-ধারণা ঠিক নয়। তার প্রমাণ হাতের কাছে অনেক আছে। তাছাড়া নতুনদের নিয়ে কাজ করার সুবিধেও অনেক, পুরোনোদের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, ডায়ালগ ডেলিভারীর কায়দাকানুন দর্শকের চোখে অতিপরিচিত, আমার চোখে তো বটেই। আসল ব্যাপার খ্যাতনামা শিল্পীরা অনেকেই নিজেদের ইমেজ পেরিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করে উঠতে পারেন না। এর জন্য দায়ী অবশ্য দর্শকরাই। তাঁরাই অভিনীত চরিত্রের চাইতে শিল্পীকে অন্তরে স্থান দেন বেশি।

'আমার মতো যাঁরা ছবি করাকে শিল্প-মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তাঁরা স্বভাবতঃই এ-ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাই নতুনদের নিয়ে কাজ করতেই হয়। দৈবাৎ কখনো-সখনো পুরোনোদের নিয়ে কাজ করা হয় সেখানে সেই শিল্পীর ইমেজটা বদলে নিতে চেষ্টা করি আমরা।'

এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল 'গঙ্গা'র পামলী পাঁচিকে (সন্ধ্যা রায়) আর 'আকাশছোঁয়া'র সুপ্রিয়া চৌধুরী অভিনীত চরিত্র দুটোর কথা। পামলী পাঁচির সন্ধ্যা রায় তখন নবাগতা আর 'আকাশছোঁয়া'র সুপ্রিয়া চৌধুরী তখন রীতিমত স্টার। অথচ দুটো চরিত্রই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এখনও। কারণ আর কিছু নয়, পরিচালকের সৃজনীক্ষমতার বৈচিত্র্য!

রাজেনবাবু তাঁর আগামী ছবি 'সংসার সীমান্তে'ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় হাজির করতে পারবেন বলে তিনি আশা করেন। 'গঙ্গা'র পর তাঁর অন্য কোনো ছবি আর সেরকম কি আর্থিক, কি শৈল্পিক সাফল্য কেন পেলো না সে সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন—'এ-ব্যাপারে কংক্রিট কিছু বলা সম্ভব নয়। চেষ্টা তো করেছি সাধ্যমত। তবে কিনা 'গঙ্গা' আমার 'গঙ্গা'ই। ওর সঙ্গে কারও তুলনা করতে পারি না। 'গঙ্গা'র মত দ্বিতীয়টা সৃষ্টি করতে পারিনি—সেটা আমারই অক্ষমতা। মহৎ সৃষ্টি তো ভূরি ভূরি হয় না। অতর্কিতে একটা-দুটোই হয়। সত্যজিৎ-বাবুর 'পথের পাঁচালী' একটাই হয়েছে! আর হবে কি?'

এই রাজেন তরফদারকে এখনও পর্যন্ত টালিগঞ্জের পাড়ায় দেখতে পাচ্ছি না। তিনি নবীন নন নিশ্চয়ই, আবার প্রবীণের দলেও তাঁকে ফেলতে পারি না। তাই স্টুডিও পাড়ার নতুন ঝোড়ো হাওয়ায় তাঁকে দেখতে পেলে খুশি হতাম। বাংলার দর্শকরা আরও খুশি হবে তাঁর কাছ থেকে 'সংসার সীমান্তে' পেলে।

মঞ্চাভিনয়

সারথীর নাট্যানুষ্ঠান: গত ২০ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার প্রথিতযশা নাট্যসংস্থা সারথী মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে প্রমথ-নাথ বিশীর 'ভূতপূর্ব স্বামী' নাটকটি অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। একক ও দলগত অভিনয়ে দীপিকা দের নিষ্ঠা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। নাটকের উপস্থাপনা ও কয়েকটি নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টিতে নাট্য পরিচালক কার্তিক চন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অভিনয়ে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় অজয় কয়রাল (পরাশর)। শিল্পী নিষ্ঠার সংগে পরাশরকে মঞ্চে উপস্থিত করেন। সহজ স্বচ্ছন্দ বাচন-ভঙ্গি ও অভিব্যক্তিতে পরাশত মূর্ত। সমীর ঘোষের (চন্দ্রভানু) সুন্দর। মানসিক দ্বন্দ্ব ও অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গি সর্বস্তরে সুষ্ঠু উপস্থাপনার জন্য চরিত্রটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন বাসুদেব চক্রবর্তী (পুরুষত্তম), কার্তিক চন্দ্র (গোপাল), শংকর লাহিরী (রাখাল)। স্ত্রী চরিত্রে সুঅভিনয় করেন জ্যোৎস্না নিয়োগী (পূর্ণিমা), তৃপ্তি দাস (মল্লিকা), রাখী মিত্র (মিস গুপ্তা), মালা দাস (সুপ্তি)।

তরুণ অপেরা: ১ নভেম্বর পার্ক সার্কাস ময়দানে কল্যাণ সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শম্ভু বাগ রচিত অমর ঘোষ পরিচালিত হিটলার অভিনীত হবে। শ্রেষ্ঠাংশে শান্তিগোপাল এবং বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় এদেরই রমলা সার্কাস অভিনীত হবে। রচনা এবং পরিচালনা অমর ঘোষ। শ্রেষ্ঠাংশে শান্তিগোপাল এবং বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বড়দিদি: গত ৭ সেপ্টেম্বর হেম পাশ-পোর্ট (ফরেণার্স সেকশান) রিক্রিয়েশন ক্লাবের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শরৎ-চন্দ্রের বড়দিদি নাটকটি বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ করা হয়। নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীমণি দত্তের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দের একাগ্রতায় নাটকটি উপ-ভোগ্য হয়। বড়দিদির ভূমিকায়—মমতা চট্টোপাধ্যায়, শান্তির ভূমিকায়—তৃপ্তি দাস, এলোকেশীর ভূমিকায়—আশা বোস সু-অভিনয় করেন। পুরুষ চরিত্রে সুরেন্দ্র-নাথের ভূমিকায়—উপেন সাহা, মথুরানাথের ভূমিকায়—রয়েছেন সাত্তিকা, শিবনাথের ভূমিকায়—তপন চক্রবর্তী, ধর্মদাসের ভূমিকায়—প্রণব মুখোপাধ্যায়, পরাণ মণ্ডলের ভূমিকায়—সুদর্শন বড়াল, সন্তোষের ভূমিকায়—ওয়াচেন আলী এবং সুরেন্দ্রনাথের ইয়ারগণের ভূমিকায়—দিলীপ চন্দ, দিলীপ দাস এবং ননী রায় ইত্যাদি সু-অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় যথাযথ।

অষ্টম বার্ষিক প্রকাশ স্মৃতি বাংলা পূর্ণাঙ্গ সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা: লাখনউ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অষ্টম বার্ষিক সর্ব-ভারতীয় প্রকাশ স্মৃতি পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা এবার খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সুরু হচ্ছে আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে। প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য ধার্য হয়েছে ৪০ টাকা। যথারীতি অন্যান্য পুরস্কার ছাড়াও শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য প্রথম পুরস্কার ৫০১ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য ২৫১ টাকা দেওয়া হবে। দলের নাম পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, ১৯৭০ স্থির হয়েছে। ১৯৭০ সাল সমস্ত মানব জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ বছর রাষ্ট্রসংঘের জন্মের ২৫ বছর পূর্ণ হল। যে মহান সমন্বয়, প্রীতি ও প্রগতির ভাবনা নিয়ে এই মহাসংঘের ভিত্তিস্থাপনা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যয়ে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতার দ্বারা, সুস্থ নাটক পরিবেশনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছাই এবছরের নাট্য উৎসবের তাৎপর্য। নিয়মাবলী ও অন্যান্য অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:— ১। সম্পাদক, বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি, ২০, শিবাজী মার্গ, লখনউ-১। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর—ফোন: নং ২৭৯২০। ২। দিনয় দাশগুপ্ত, ৯০।৩, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৫, ফোন: নং ৫৫-২১২৬।

বিবিধ সংবাদ

'প্রতিদ্বন্দ্বী' মুক্তি পেল: সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তি পেয়েছে পূজো পুজোর দিন মিনার বিজলী ছবিঘর সহ অন্যান্য চিত্রগৃহে। সাময়িক কালের একটি ঘটনা এই চিত্রের উপজীব্য। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যুবকদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হচ্ছে তারই আলেখ্য এই কাহিনী চিত্র।

অভিনয়ে আছেন কয়েকজন আনকোরা শিল্পী: ধৃতিমান চ্যাটার্জী, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণা বোস, দেবরাজ রায়, শেফালী, ইন্দিরা দেবী, ধারা রায়, মমতা চ্যাটার্জী এবং অন্যান্য। সঙ্গীত পরিচালনা এবং চিত্র-নাট্যের দায়িত্ব পরিচালকের।

সত্যজিত রায়ের অনন্য সম্মান: সত্যজিত রায় ২৮ অকটোবর সান-ফ্রান্সিস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেছেন। সেখানে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয় ৩০ অকটোবর। এই উপলক্ষ্যে 'দিবা রাত্রির 'অরণ্যের দিনরাত্রি' চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

কলাবিদের সম্বর্ধনা: গত ৭ অকটোবর শনিবার ভারত চেকোশ্লোভাক সংস্কৃতি সংস্থা প্রখ্যাত চেক প্রাচ্যকলা বিশেষজ্ঞ ডঃ লুবোর হায়েককে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে ডঃ হায়েক বলেন শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রাচ্য দেশের যে অফুরন্ত সম্পদের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তা বিস্ময়কর। বিশেষত বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী শিল্পীদের সম্পর্কে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও আশা পোষণ করেন। সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক সুনীল কর ডঃ হায়েককে একটি বিশেষ স্মারক ও কতগুলি তৈলচিত্র উপহার দেন। উপস্থিত অভ্যাগত-দের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন এম-এল-এ ডঃ এ এম গণি, অভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যাল,

অদ্রিজা মুখার্জী ও দিলীপ বসু প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন নমিতা মুখার্জি, সুমিত ধর ও অন্যান্য।

সুরে সুরে তালে তালে

সম্প্রতি ঘরোয়া সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত অবলম্বনে নৃত্য সহকারে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান 'সুরে সুরে তালে তালে' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে। সঙ্গীতে, নৃত্যে এবং কথনে অপূর্ব গ্রন্থনা এই 'সুরে সুরে তালে তালে' সাম্প্রতিক সংস্কৃতি জগতের তথাকথিত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত এক আশ্চর্য সুন্দর অনুষ্ঠান। সবচেয়ে বড়ো কথা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করে মানব-মনে তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া এমন নিপুণ শৈলিকে দৃষ্টিতে গ্রন্থক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন যা সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। এবং নিজ কন্ঠে তিনি ত, অর্থাৎ পদাংশ আবৃত্তি করে পরিবেশটিকে যথাযথই রাবীন্দ্রিক করে তুলতে সফল ভূমিকা নেন। সঙ্গীতে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন সংগীত নির্দেশক শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আর নৃত্যে দেন পুরুষের ভূমিকায় চামেলী চক্রবর্তী ও নারীর ভূমিকায় দীপালি চক্রবর্তী। গানে ও নাচে অন্যান্য যাঁরা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন অঞ্জনা মিত্র, অশোক দাশ, গৌরী গুহ, মঞ্জরী দত্ত, প্রভাত ঘোষ, ছবি ঘোষ, শেফালি চক্রবর্তী, চন্দ্রা সিংহ প্রমুখ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রভাত ঘোষ ও দীপালি চক্রবর্তী।

উপভোগ্য অনুষ্ঠান

বিহারঃ কাতরাসগড় (ধানবাদ) শারদীয়া সম্মিলনীর নিজস্ব প্রাঙ্গণে গত ১৫।১০।৭০ অভিনেতা ধীরেন দে (বাদল) ও পীযূষকান্তি দত্তর (নাড়ু) যুগ্ম পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সভাপতি রসিকলাল পাঠক, সাংবাদিক তরুণ ঘোষ ও অভিনেতা ধীরেন দে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। কোলকাতার বহু শিল্পী এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন, মানসকুমার, শম্ভু মুখোপাধ্যায়, গুল মহম্মদ সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দেন। হাস্যকৌতুক অভিনেতা শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যকৌতুক ও অমল চট্টোপাধ্যায়ের কৌতুকগীতি প্রশংসার দাবী রাখে।

কোলকাতার 'ইউরেকা ও শিশির শ্রীরঙ্গম নাট্যগোষ্ঠী যথাক্রমে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' ও বিমল রায় রচিত 'অভিনয়' দুটি একাংক নাটক মঞ্চস্থ করেন। তরুণ ঘোষ নির্দেশিত ও অভিনীত 'নানা রঙের দিন' নাটকটি সকলে উপভোগ করেন। দর্শকমন্ডলীর অত্যধিক চাপ থাকায় প্রাঙ্গণটি সম্পূর্ণ ভরে যায়, এমন কি বহু দর্শক বাড়ীর ছাদে নিজেদের স্থান করে নেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। স্থানীয় যুবকবৃন্দের সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হয়। শব্দ সংযোজনায় অসীমকুমার পাল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বর্গী এলো দেশে

বিহারঃ কাতরাসগড় (ধানবাদ) রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক গত ৮ অকটোবর অষ্টমী পূজার দিন পালাকার ব্রজেন দে রচিত 'বর্গী এলো দেশে' পালাটি নিজস্ব মঞ্চে অভিনীত হল, উল্লেখযোগ্য অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন 'দিবাকর', গঙ্গারাম, ও বিশুর ভূমিকায় যথাক্রমে অমিয়কুমার মল্লিক, বিশ্বনাথ মুখার্জী ও শ্রীমান বিলু। এছাড়া ভাল অভিনয় করেন সুকুমার চ্যাটার্জী (ভাস্কর পন্ডিত), গঙ্গাসাগর সাহা (সিরাজ) ও নারায়ণচন্দ্র রায় (আলিভাই)। স্ত্রী চরিত্রে কুমারী মঞ্জুশ্রী দাস (কাকলী) ও অনিমা ব্যানার্জী (মেহেরউন্নিসা) সাবলীল অভিনয় করেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে অংশ নেন—ডাঃ হরনাথ মুখার্জী, মুরারী চাটার্জী, হরি-শংকর পাল, সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী, অনিল সরকার, সত্যরঞ্জন প্রামাণিক, সুধাংশু দাস, ও আরো অনেকে, শব্দ-সংযোজনায় সুধাংশু দাস, ও আরো অনেকে, শব্দ-সংযোজনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অসীমকুমার পাল।

অশনিঃ সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ছাউনীতে বয়েজ রেজিমেন্ট ট্রেনিং সেন্টারে বাঙ্গালীদের সার্বজনীন পূজোয় অষ্টমীর রাত্রিতে 'অশনি' নাট্যসংস্থা সতীশ নিয়োগীর 'উত্থাল তরঙ্গ' মঞ্চস্থ করেন। বর্তমান বাংলার সমস্যা কন্টকিত যুব-সমাজের বিপথগামী প্রবণতাকে পাগল-বাবার আত্মোৎসর্গের দ্বারা সৎপথে আনবার প্রচেষ্টা—এই বক্তব্যকে সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় নৈপুণ্যে 'অশনি' গোষ্ঠী তুলে ধরতে পেরেছেন। চা-অলা দোকানী জীবনের নাম-ভূমিকায় গোবিন্দ দে, সুরেশবাবুর ভূমিকায় তপনকুমার ব্যানার্জি, ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় অশোককুমার দত্ত ও ইন-স্পেকটারের ভূমিকায় সুবীরকুমার রায়ের অভিনয় বিশেষ প্রশংসিত হয়। দৃশ্যসজ্জা ও আবহসংগীত সুন্দর। সর্বশ্রী প্রবীর সেন, রবীন পাল মধু চৌধুরী ও শ্রীমতী ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জির।

'অশনি'র আসন্ন পরবর্তী আকর্ষণ এবং ইন্দ্রজিৎ।'

[illegible] ভট্টাচার্য

খেলার কথা

ময়দানের অবক্ষয় ও আমাদের দায়িত্ব

অকটোবরের শুরুতেই ফুটবল তার আসর গুটিয়ে নেয় কলকাতার মাঠ থেকে। এখন অকটোবরের শেষ। নভেম্বরের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে যাবে ক্রিকেটের মরশুম। খেলাধুলার জগতে এই অকটোবর মাসের একটা বিশেষত্ব আছে। অনেক ক্রীড়ারসিক এই মাসটাকে 'মরা মাস' বলে অভিহিত করে থাকেন। কারণ এ মাসে গড়ের মাঠ বা ময়দানে খেলাধুলো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। অকটোবরের প্রথম পনের দিন ময়দানে কোনরকম খেলাধুলো করা আইনত নিষিদ্ধ। আর বাকি কদিনও কোন খেলা হয় না। যাঁরা শুধুমাত্র প্রাণচঞ্চল ময়দানের রূপ দেখতেই অভ্যস্ত, এ সময়ে ময়দানের দিকে গেলে তাঁরা কিছুটা আশ্চর্য নিশ্চয়ই হবেন। কদিন আগেও ফুটবলের হাঁক ডাকে যে জায়গাটা সরগরম ছিল, সেখানে হঠাৎ যেন নেমে এসেছে মৃত্যুর স্তব্ধতা। বছরে এই একটি মাসই বিশ্রাম পায় মাঠ এবং এই সময়টুকুতে চলে সারা বছরের জন্য মাঠ তৈরীর কাজ।

ভালো খেলতে গেলে যেমন শুধু অনুশীলন বা ক্রীড়াকৌশল রপ্ত করার দিকে নজর দিলেই চলে না শরীর তৈরী এবং শরীরের যথোপযুক্ত বিশ্রামের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, তেমনি খেলার মান বাড়াতে গেলে মাঠকেও সেই অনুপাতে উপযুক্ত করে তুলতে হয়। খেলোয়াড়দের যেমন প্রয়োজন সময়মত বিশ্রামের তেমনি মাঠেরও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই এক মাসে সারা বছরের নানান রকম খেলাধুলো করার জন্য উপযুক্ত ভাবে মাঠ তৈরী কি সম্ভব ?—না, কিন্তু সময়ই বা কই ?

নভেম্বরের গোড়ার দিকে ক্রিকেট মরশুমের শুরু। এ মরশুম চলে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এর পরই হকির আসর পাতা হয়ে যায়। হকির জন্যে বেশী সময় না গেলেও, মে মাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল আরম্ভ হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফুটবলের সমস্ত টুর্ণামেন্ট শেষ করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং মাঠ তৈরীর জন্য যথেষ্ট সময় দিতে চাইলেও তা' সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই ক্রিকেটের অনুপযুক্ত, উঁচু নীচু কাদা পাঁচে খেলার ফলে খেলোয়াড়দের নিজেদের আসল প্রতিভার প্রকাশ ঘটানো তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ছে।

ফুটবলের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এইতো সেদিন ভারতের বাইরের দুটি দল আই এফ এ শীল্ডের খেলায় অংশ নিতে এসেছিল। শীল্ড খেলায় এরা আমাদের কাছে পরাজিত হয়েছে। এটা সত্যিই আনন্দের কথা। কিন্তু বহিরাগত দল দুটির খেলার কথা ভাবতে গিয়ে এই কথাটি বারবার মনে হয়েছে, তাদের খেলার আসল পরিচয় কি আমরা পেলাম ? তাদের খেলার আসল চেহারাটি কিন্তু এমন নয়। অনেক সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

তাদের যথার্থ খেলা দেখতে না পাওয়ার জন্য আমাদের দেশ কিছুই নিতে পারলো তাদের কাছ থেকে। এটা কম দুঃখের নয়। দেখেশুনে শেখার এবং নিজেদের মধ্যে তার ক্রমবিকাশ ঘটানো জীবনের সর্বস্তরেই প্রযোজ্য।—বড়ো হওয়ার মূলধন। আর এই মূলধন জোগাড় করবার জন্যই আমরা এতো খরচ করে বাইরের নামী ও দামী দলগুলিকে এদেশে এনে থাকি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয় না কেন ? এর জন্যে যাকে বিশেষভাবে দাবী করা যায়, সে হল আমাদের দেশের মাঠ।

আমাদের দেশের মাঠ ও আবহাওয়ার সঙ্গে ইরাণের প্যাজ ক্লাব যদিও বা কিছুটা মানিয়ে নিতে পেরেছিল, জার্মানীর নীদার স্যাসেন ক্লাব তা পারেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মাঠ যে কতো অনুপযুক্ত এইটাই কি তার বিরাট প্রমাণ নয় ? আমাদের দেশের ক্রীড়ামানের অগ্রগতির পথে এটা একটা বিরাট বাধা। এই সমস্যাকে আরও বেশী প্রকট করে তুলতে সাহায্য করেছে স্টেডিয়ামের অভাব।

ব্যাপারটাকে একটু খুলে বলাই বাঞ্ছনীয়। বাংলা দেশে কোন স্টেডিয়াম নেই, অথচ দর্শকসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং দর্শকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা ফুটবলের আসরকে ইডেনে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছি। বড় বড় খেলাগুলি ওখানেই খেলাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এতে হচ্ছে কি, বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত যে একটিমাত্র মাঠ, সেই ইডেন মাঠটিও দিন দিন ক্রিকেটের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। এছাড়া ইডেনের যা চরিত্র, তাতে করে সেখানে ফুটবলের আসরপাতা মানে খেলার মান নীচে নামাতে একরকম বাধ্য করা। এঁটেল মাটির তৈরী ইডেন ক্রিকেট খেলারই উপযোগী। কিন্তু বর্ষার সময়ে ইডেন হয়ে ওঠে আঠালো ও পিচ্ছিল। তাই এই মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে স্বভাবতই নিজের দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে খেলা কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব নয়।

একদিকে যেমন ইডেন ফুটবল খেলার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত অপরদিকে শুধুমাত্র দর্শকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে একমাত্র উপযুক্ত এবং ঐতিহ্যপূর্ণ ইডেনকে ক্রিকেটের পক্ষেও অনুপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। এর ফলে ফুটবল এবং ক্রিকেট দুয়েরই মান নীচে নেমে যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলার খেলাধুলোর জগতে এটা একটা বিরাট সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? এমন কিছু কি করা সম্ভব নয় যাতে, কেবল ক্রিকেট এবং ফুটবলের জন্য কায়েমী করে মাঠ নির্দিষ্ট করে রাখা যায়? যেখানে ফুটবলের জন্য নির্দিষ্ট মাঠে ফুটবল এবং ক্রিকেটের জন্য নির্দিষ্ট মাঠে ক্রিকেট ছাড়া আর কোন খেলা হতে দেওয়া হবে না। এটা যদি সম্ভব হয়, তবে মাঠকে বিশ্রাম দেওয়ার সময় আমরা যেমন পাবো তেমনি মাঠকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তৈরী করারও সময় পাবো।

আজ এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা এবং তাকে যথাযথভাবে রূপদান করার সময় এসেছে। আশা করবো, আমাদের দেশের ফুটবল এবং ক্রিকেট কর্তৃপক্ষরা এ ব্যাপারে সতর্ক এবং সচেষ্ট দৃষ্টি রাখবেন। দুঃখের বিষয় দেশের সরকারও যথেষ্ট নীরব। সরকারকে এ ব্যাপারে উপযুক্ত সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমার মতে যে খেলায় যে রকম মাঠ দরকার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সেই রকম মাঠ তৈরী করতে হবে। ইডেনের মতো আন্তর্জাতিক খেলার মাঠকে কদাচ বিনষ্ট করা নয়।

মুষ্টিযুদ্ধের একটি দৃশ্য ঃ ইতালীর প্রাক্তন ইউরোপীয়ান মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ান কার্লো ডুরান (ডানদিকে) ব্রেজিলের জুয়ারেজ লিমার প্রচণ্ড ঘুষিতে ঘায়েল হয়েছেন

খেলাধুলা

দর্শক

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

জলন্ধরের গুরুগোবিন্দ স্টেডিয়ামে ২৭তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। ফাইনালে খেলেছিল মহীশূর এবং পাঞ্জাব। ফাইনাল খেলা হয়েছিল দু দিন। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় পাঞ্জাব ৩—১ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

মহীশূর এবার নিয়ে ৮ বার ফাইনাল খেলল। ইতিপূর্বে তারা ৭ বার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে (১৯৪৬, ১৯৫২, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮)। অপর দিকে পাঞ্জাবের এই প্রথম ফাইনাল খেলা।

সেমি-ফাইনালে মহীশূর ২—২ ও ২—১ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছিল। অপর দিকে গত বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা বনাম পাঞ্জাবের সেমি-ফাইনালে খেলা ০—০ ও ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। শেষ পর্যন্ত নতুন নিয়ম অনুযায়ী পেনাল্টি কিকের সাহায্য নিতে হয়। এই ব্যবস্থায় পাঞ্জাব ৪—২ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই তিনটি বিষয়ে বাংলার রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে—সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা (মোট ২১ বার), সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয় (মোট ১২ বার) এবং উপর্যুপরি সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয় (৪ বার— ১৯৪৭, ১৯৪৯—৫১)।

আন্তঃ রাজ্য স্কুল ক্রিকেট

জামসেদপুরের কিনান স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তঃ রাজ্য স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (কোচবিহার ট্রফি) পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে বাংলা ১০ উইকেটে বিহারকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের ১৭ মিনিট আগে বিহারের প্রথম ইনিংস ১১৭ রানের মাথায় শেষ হলে বাকী সময়ে বাংলা কোন উইকেট না খুইয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করে। লাঞ্চের সময় বিহার দলের রান ছিল মাত্র ৩২, ৪ উইকেট পড়ে। নেয়াস এবং যোধ সিংয়ের জুটি ৮৯ মিনিটের খেলায় দলের যে ৫৩ রান তুলেছিলেন, তার ফলেই বিহারের মুখরক্ষা হয়। বাংলার মুকুল দাস ২০ রানে ৪ উইকেট এবং বরুণ বর্মণ ১৯ রানে ২টো উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের বিরতির কিছু আগে বাংলার প্রথম ইনিংস ১৯৮ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮৪ রানে অগ্রগামী হয়। বাংলার উদয়ভানু ব্যানার্জি উভয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বাধিক ৫৯ রান করেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলপতি এস চৌধুরী এবং উদয়ভানু ব্যানার্জি দলের ৬০ রান তুলে দেন। বিহারের অধিনায়ক এস সোম ৬৫ রানে ৬টা উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকী সময়ে বিহার দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেটের বিনিময়ে ২৫ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে চা-পানের বিরতির ৪৭ মিনিট আগে বিহার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১০২ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় মাত্র ১৯ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না-খুইয়ে ১৯ রান তুলে দশ উইকেটে জয়ী হয়।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি

রে ইলিংওয়ার্থের নেতৃত্বে এম সি সি গত ২৮শে অকটোবর থেকে ১৯৭০-৭১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু করেছে। তাদের অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ খেলা শুরু হবে ১৯৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। এবারের সফর-তালিকায় মোট খেলার সংখ্যা ২৬টি—৬টি টেস্ট খেলা নিয়ে। ইংল্যাণ্ড-

কুয়ালালামপুরে আয়োজিত আসন্ন মহিলাদের এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ভারতীয় মহিলা বাস্কেটবল দল

অস্ট্রেলিয়ার একটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ইতিপূর্বে পাঁচটির বেশী টেস্ট ক্রিকেট খেলা কখনও স্থান পায় নি।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়েছে আজ থেকে ৯৩ বছর আগে, ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে। এই দুই দেশের এই টেস্ট খেলার সূত্রেই পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূচনা। এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৩টি—আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাই ২০০ সংখ্যায় পূর্ণতা লাভ করেছে। বর্তমানে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ২০৩, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০, ইংল্যান্ডের জয় ৬৬ এবং খেলা অমীমাংসিত ৫৭। টেস্ট সিরিজের ফলাফল : মোট সিরিজ ৪৯, অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ২২, ইংল্যান্ডের 'রাবার' জয় ২১ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ৬। ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়া ১—০ খেলায় (ড্র ৪) ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' খেতাবে জয়ী হয়েছিল। এর পর ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থাকায় বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার হাতেই 'এ্যাসেজ' খেতাব থেকে গেছে।

১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট খেলা

১ম (ব্রিসবেন) : নভেম্বর ২৭—ডিসেম্বর ২
২য় (পার্থ) : ডিসেম্বর ১১—১৬
৩য় (মেলবোর্ণ) : ডিসেম্বর ৩১—জানুয়ারী ৫
৪র্থ (সিডনি) : জানুয়ারী ৯—১৪
৫ম (এডিলেড) : জানুয়ারী ২৯—ফেব্রুয়ারী ৩
৬ষ্ঠ (সিডনি) : ফেব্রুয়ারী ১২—১৮

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

আগরতলায় আয়োজিত ১৬শ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলা চারটি বিষয়ে চ্যাম্পিয়ান এবং তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভের সূত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পশ্চিম বাংলা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ফুটবল, বালকদের সাঁতার, বালিকাদের বাস্কেটবল এবং টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায়। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে বালকদের বাস্কেটবল, বালকদের টেবল টেনিস এবং বালিকাদের সাঁতারে।

চূড়ান্ত ফলাফল

ফুটবল : ১ম পশ্চিম বাংলা, ২য় বিহার, ৩ দিল্লী।

বাস্কেটবল (বালক) : ১ম রাজস্থান, ২য় পশ্চিম বাংলা, ৩য় পাঞ্জাব।

বাস্কেটবল (বালিকা) : ১ম পশ্চিম বাংলা, ২য় দিল্লী, ৩য় গুজরাট।

সাঁতার (বালক) : ১ম পশ্চিম বাংলা (৭০ পয়েন্ট), ২য় ত্রিপুরা (২৪ পয়েন্ট), ৩য় মণিপুর (৪ পয়েন্ট)।

সাঁতার (বালিকা) : ১ম ত্রিপুরা (৩৩ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিম বাংলা (১৯ পয়েন্ট), ৩য় গুজরাট (২ পয়েন্ট)।

টেবল টেনিস (বালক) : ১ম দিল্লী, ২য় পশ্চিম বাংলা, ৩য় পাঞ্জাব।

টেবল টেনিস (বালিকা) : ১ম পশ্চিম বাংলা, ২য় এম-পি, ৩য় পাঞ্জাব।

কাবাডী : ১ম এম পি, ২য় গুজরাট, ৩য় পাঞ্জাব।

খো-খো : ১ম এম পি, ২য় গুজরাট, ৩য় ত্রিপুরা।

ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম বাংলা ১—০ গোলে বিহারকে পরাজিত করে।

এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

ম্যানিলায় আয়োজিত দশম এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ফিলি[illegible] অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ভারতবর্ষ পেয়েছে ৩য় স্থান—জয় ২ এবং পরাজয় ৫। ভারতবর্ষ অপ্রত্যাশিতভাবে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৮১—৮[illegible] পয়েন্টে এবং তাইওয়ানকে ৮৯—৮[illegible] পয়েন্টে পরাজিত করে।

ওয়ার্ল্ড সুটিং চ্যাম্পিয়ানসীপস্

আরিজোনার ফোনিক্সে আয়োজিত ৪০তম 'ওয়ার্ল্ড সুটিং' প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম রাশিয়া (১,৫১[illegible] পয়েন্ট), ২য় ফিনল্যান্ড (১,৫১[illegible] পয়েন্ট), ৩য় পশ্চিম জার্মানী (১,৫০[illegible] পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম রাশিয়া (১,১১[illegible] পয়েন্ট), ২য় পশ্চিম জার্মানী, ৩[illegible] আমেরিকা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ

৩য় খণ্ড

অমৃত

২৬ সংখ্যা

মূল্য

৪০ পয়সা

Friday, 6th November, 1970. শুক্রবার, ২০শে কার্তিক, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল সাহা

চিঠিপত্র

শারদীয় অমৃত প্রসঙ্গে

সুলেখনীর ডালি দিয়ে যাঁরা 'শারদীয় অমৃত'কে সাজিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের লেখনী খুব বেশী দাগ কেটেছে, সেগুলি হল,—সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'আমি সম্রাট' উপন্যাসটি। যুগোপযোগী একখানা সাহিত্যকারের সার্থক এই উপন্যাস। 'আমি সম্রাট' একটা বাস্তব ও জীবনধর্মী উপন্যাস। পড়তে পড়তে আজকের যুগের নিত্যদিনের এ ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। আজকের যুবক সমাজের প্রতিভূ অরুণের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

নিজেদের চারপাশের এই সমাজকে আরও বেশী করে চিনলাম। তাছাড়া মিহির আচার্যের 'দিবস বিভাবরী' ও ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত আনদুকের 'অশ্রু রক্ত ও স্বপ্ন' উৎকণ্ঠায় ভরা ও রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মত সহজ ও সাবলীল লেখনী। গল্পের মধ্যে শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের 'বাঁচার জন্য' একশ্রেণীর লোকের জীবনালেখ্য। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মানুষ ও মেয়েমানুষ' ভাল লেগেছে এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সমান্তরাল' পড়ে আমার কি মনে হয়েছে, সেটা আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারব না।

শুভেন্দু চক্রবর্তী
এস. এস. কলেজ
হাইলাকান্দি, আসাম

(২)

শারদীয়া 'অমৃতে' শ্রীবিমল মিত্রের 'রাগভৈরব' আমি একটানা পড়ে ফেললুম। অনেকদিন পর—বলতে গেলে 'সাহেব-বিবি-গোলামের'র পর, আমার মনে হয়েছে, আমরা আবার যেন নতুন করে শ্রীমিত্রের দেখা পেলুম। তাঁর সেই নিজস্ব চমকপ্রদ ভঙ্গীতে তিনি আজকের সমাজ-জীবনের বিপর্যস্ত অভিশাপকে আমাদের সামনে ছবির মতো তুলে ধরেছেন। আজকে যখন জাতির তরুণসমাজ নানা কারণে বিক্ষুব্ধ এবং বিভ্রান্ত, তখন উপন্যাসের মূল চরিত্র ভৈরব চক্রবর্তী—তার পুরোনো মানবিকতা এবং মূল্যবোধ নিয়ে তাদের সামনে তীব্র প্রতিবাদের মতো রুখে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই বিভ্রান্ত সমাজের প্রতি তার সহানুভূতি এবং ভালোবাসাও কিন্তু কম নয়। ভৈরব চক্রবর্তীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। কিন্তু তখন হত্যাকারীদের চোখে জল। বিমলবাবু এখানে কী ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে—প্রতিহিংসাপরায়ণ তরুণসমাজও যে মানবিকতা হারিয়ে ফেলেনি—এটা যেন তারই ইঙ্গিত।

গোটা উপন্যাসটিকে কোথাও উপন্যাস বলে মনে হয়নি। এ যেন লেখক স্বয়ং এসে পাঠকের কাছে বর্তমান সমাজের কথা বলে যাচ্ছেন বিনা আড়ম্বরে। সুতরাং 'রাগভৈরব' কেবলমাত্র উপন্যাস নয়—আজকের সমাজের মূল্যবান দলিল। পড়া শেষ হলে আমি বুঝতে পারলুম একটা ভয়ানক দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার বুক চিরে বেরিয়ে এল। এবং তা ঘুণ পোড়ার মতো সারাঘরে ঘুরতে লাগল। সত্যি বলতে কি—এই উপন্যাসের জন্য আমি বিমলবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি। এবং 'অমৃতে'র সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই—তিনি এরকম একটি যুগোপযোগী আলেখ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন বলে।

সম্পূর্ণ গোস্বামী
স্টেশন রোড, ব্যারাকপুর

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

'আসলে জীবনযাত্রার বহুতর ক্ষেত্রে যে গোঁজামিল, অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব এবং সমস্যা থেকে যাচ্ছে, যে বিচ্ছিন্নতা, জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে সমাজ-মানসে বর্তমান, সাহিত্যও তার থেকে মুক্ত নয়।' পর্যবেক্ষক-এর শারদ সাহিত্য পরিক্রমা প্রসঙ্গে এ ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। ঠিকই তো, 'মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োজন কতটা বোধ করে?' আমাদের এ-সময়ের জীবনযাপন থেকে সাহিত্যকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ক্ষতি কি! সাহিত্যিক কি জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কাছাকাছি আসছেন, না খেয়ালখুশি মত যাহোক লিখে যাচ্ছেন। এসব কথা ভেবে দেখবার সময় প্রায় অতিক্রান্ত। যাঁরা আজও পাঠক ঠকানোর জন্য জাল পাতেন, রহস্য রোমাঞ্চ, প্রেম যৌনতার মাদকতা দিয়ে আজও যাঁরা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চান, তাঁদের স্বরূপ আমরা চিনতে পেরেছি। যাঁরা অবক্ষয় হতাশার নাম করে মানুষের অধঃপতিত রূপের বাস্তব (?) চিত্র এঁকে দুপয়সা করছেন তাঁদেরও আমরা চিনি। পাঠককে কি তাঁরা পুতুল বানাতে চান?

আশার কথা, এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আজ, অতি সম্প্রতি—জীবনের দিকে মুখ রেখে লিখছেন, এ সময়ের জীবনকে—সমস্যা ও সংগ্রামের চিত্রকে, দুঃখ দারিদ্র্যের রূপকে ফুটিয়ে তোলার সৎ চেষ্টা করছেন। পর্যবেক্ষক মশাই ঠিকই লিখেছেন, সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক জীবনযাত্রার যোগসূত্র আর একবার স্পষ্টতর হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু তার উদাহরণ সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে না। পাঠক হিসাবে আমাদের সেখানেই হয়তো বড় দুর্বলতা। আমরা যেমন অসৎ সাহিত্য পড়ে নিন্দা করি, সৎ সাহিত্য পড়ে সেইরূপ উৎসাহ দেই কি? আসলে সচেতনভাবে মিলিয়ে পড়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই নেই। প্রায় লটারীর মত দু'-একখানা শারদীয় সংখ্যা অতি ব্যস্ততার মধ্যে শিয়ালদার স্টল থেকে কিনে নিই। তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে ট্রেন ধরি। সেই পত্রিকাতে ভাল কিছু পেলে খুশী হই, না পেলে অভিযোগ করি না। সেক্ষেত্রে আমরা অসহায়ের মত বঞ্চিত হই। এ ছাড়া প্রবন্ধের লেখককে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় সৎ সাহিত্য চেনবার চেষ্টা করেছেন। বহু অনামী সব গল্পকার রয়েছেন যাঁদের কথা আমরা জেনেই দেখি না। আজকে যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একদিন নবীন ছিলেন। আজকের নবীনদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই জাতীয় রচনা প্রকাশের জন্য লেখক ও আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গোপাল সামন্ত
সোদপুর

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

গত অমৃতের ২৩শ সংখ্যায় প্রেক্ষাগৃহের সংবেদনশীল প্রতিবেদন পড়লাম। বিশেষ করে ভালো লাগলো এই দেখে যে, আজকের প্রায় বন্ধ্যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যেও যে একটুখানি আশার ঝলক দেখা দিয়েছে—তার প্রতি লেখক সম্পূর্ণ সুবিচার করেছেন। প্রথমেই তাই লেখককে অভিনন্দন জানাই আন্তরিকভাবে।

সেই সঙ্গে পরিপূরক হিসাবে বোধহয় আরও কিছু তথ্য জানানো যায় জেমিনীর 'সমাজ কো বদল ডালো' চিত্রটি মূল মালয়লম চলচ্চিত্র 'তুলাভরম্'-এর হিন্দী রূপ। লেখক তোপ্পিল (থোপ্পিল নয়) ভাসী। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে, এই মালয়লম চিত্রটিতেই সু-অভিনয়ের জন্য শ্রীমতী সারদাকে ১৯৬৮ সালে উর্বশী পুরস্কার দেওয়া হয়।

তোপ্পিল ভাসী কেরালার স্বনামধন্য নাট্যকার। তাঁর প্রথম এবং জনপ্রিয় নাটক 'তুমি আমায় কম্যুনিস্ট করেছ' কিছুদিন আগে মুক্তিলাভ করেছে। খুব সম্ভব বইটির বঙ্গানুবাদও আছে। এই চলচ্চিত্রটিও এখানে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া তাঁর জনপ্রিয় নাটকগুলির

চিঠিপত্র

কয়েকটি 'নূতন আকাশ, নূতন পৃথিবী', 'মূলধন', 'মুক্তসাক্ষী'। শ্রীভাসীর নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো বলিষ্ঠ বক্তব্য। অথচ এগুলির কোনটাই 'পোস্টার' নাটিকা হয়ে ওঠেনি। তাঁর শিল্পকৃতির বৈশিষ্ট্যই এখানে।

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতূহলোদ্দীপক খবর না দিয়ে পারছি না। শ্রীতোপিল ভাসী কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একজন সমর্থক। একজন কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সংযোগ না থাকলেও একসময়ে (১৯৫৮—১৯৫৯) তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নায়ক ছিলেন। এখন তিনি পুরোপুরিভাবেই নিজেকে চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন।

[illegible] সরকার,
[illegible]।

অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিকী

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ শাখা উদ্যোগী হয়ে আগামী (১৯৭১) অতুলপ্রসাদ জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। উত্তর প্রদেশের মহামান্য রাজ্যপালও এই পরিকল্পনায় পৃষ্ঠপোষকতা দানে স্বীকৃত।

অতুলপ্রসাদ সুদীর্ঘ দিন এখানে কাল এই শহরে বাস করেছেন এবং শেষ নিঃশ্বাসও ফেলেছেন এখানেই। তাঁর জীবিতকালে ত বটেই মরণোত্তরকালেও সম্প্রদায় নির্বিশেষে এখানকার বহু প্রতিষ্ঠান আজও তাঁর স্মরণ নিয়ে ধন্য। একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, সমাজসেবক, দানবীর, দরিদ্রবন্ধু ও কর্মবীর অতুল-প্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য লক্ষ্ণৌ শাখা সমস্ত সম্প্রদায় এবং অতুল-প্রসাদের বন্ধুস্থানীয় ভক্তজনের সমবায়ে একটি আড্‌হক কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির প্রথম অধিবেশন আগামী ৮ নভেম্বর, ১৯৭০ খৃঃ স্থানীয় বাঙালী ক্লাব ও যুবক সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির আলোচনার জন্য নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি রাখা হয়েছে :

(১) অতুলপ্রসাদ স্মরণী ডাকটিকিট প্রকাশের ব্যবস্থা, (২) আকাশবাণীতে অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণ, (৩) অতুলপ্রসাদের অতিপ্রিয় মুশায়রা, কবি সম্মেলন ও লক্ষ্ণৌয়ের বিশিষ্ট গীতি-শৈলীর ব্যবস্থা করা, (৪) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৯৭৬ খৃঃ অধি-বেশন লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত করা। কারণ অতুলপ্রসাদকে কেন্দ্র করেই ১৯২২ খৃঃ এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সম্মেলনের ৫ এপ্রিল ১৯৭০ খৃঃ পরি-চালক পরিষদের বৈঠকে লক্ষ্ণৌতে ১৯৭১ খৃঃ সম্মেলনের অধিবেশন করা সর্ব-সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়েছে, (৫) অতুল-প্রসাদের স্মৃতিরক্ষার্থে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা, (৬) অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত ভাব-ধারার প্রসারণের জন্য তাঁর গানগুলির যথাযথ হিন্দী, ইংরাজী ও উর্দু অনুবাদ করা।

বাংলা দেশে ও বাংলা দেশের বাইরে সকলের কাছেই লক্ষ্ণৌ শাখার নিবেদন যে তাঁরা যেন এই পরিকল্পনায় সর্বান্তকরণে সাহায্য করেন। যাঁরা ১৯৭১ খৃঃ এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত বা আলোচনার মাধ্যমে যোগদান করতে চান অবিলম্বে নাম ও ঠিকানা পাঠিয়ে যোগাযোগ করুন। অনু-ষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের তালিকা এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় বিষয় :

(ক) অতুলপ্রসাদ গীত রেকর্ড, (খ) তাঁর সঙ্গে পত্রালাপের প্রতিলিপি, (গ) তাঁর বিষয়ে কোনও প্রবন্ধ, (ঘ) অতুল-গীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে কোনও লেখা বা কথোপকথনের প্রামাণিক তথ্য, (ঙ) তাঁর বিষয়ে কোনও বৈঠকী গল্প বা কাহিনী, (চ) অতুলগীতির গ্রামোফোন রেকর্ডের সংকলন;

এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অন্য কোনও সহৃদয় পরামর্শ থাকলে তাও সাদরে গৃহীত হবে। কলকাতায় অনুরূপ অনুষ্ঠানে যাঁরা ব্রতী হবেন তাঁদের কর্তৃ-পক্ষের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করতে উৎসুক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল
১০ সরোজিনী দেবী লেন
লক্ষ্ণৌ—১

(২)

ছত্রিশ বছর হয়ে গেল অতুলপ্রসাদ সেন পরলোক গমন করেছেন। এই বিশিষ্ট মানুষটির নানামুখী অবদানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর দীর্ঘ-জীবনের কর্মক্ষেত্র লক্ষ্ণৌ শহর তাঁর নামে একটি রাস্তা ও মর্মরমূর্তি স্থাপন করে হয়তো কিছুটা ঋণমুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'আ-মরি বাংলা ভাষা'র গীতিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ আশ্চর্যভাবে উদাসীন। সম্প্রতি রেডিও ও গ্রামোফোনের মাধ্যমে তাঁর কিছু গান প্রচারিত হওয়ায় সঙ্গীত-রসিক ও কৃষ্টিবান মহলের দৃষ্টি, রবীন্দ্র-নাথের সমসাময়িক অথচ সম্পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত এই বিদগ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এটা আশার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু গান রচনা ও সুরসৃষ্টি যে অতুলপ্রসাদের একমাত্র পরিচয় নয় একথা বিস্মৃত হলে বাঙালী জাতির পক্ষে সেটা ক্ষতি। কারণ দীর্ঘ-দিন প্রবাসী থেকেও অতুলপ্রসাদ তাঁর সমস্ত কাজ ও চিন্তাধারায় খাঁটি বাঙালী রয়ে গেছেন। সেই জন্যেই তাঁর গানের ভেতর, তা ভক্তিমূলকই হোক বা স্বদেশ-মূলকই হোক—বাঙালীর প্রাণের সুরটা বড়ো হয়ে বেজেছে। এই মানুষটিকে আমাদের মনে রাখা দরকার। আর ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২০ অক্টোবর তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। বাংলা দেশ কিভাবে সেটি পালন করবে তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতির দরকার। দেশের চিন্তাশীল এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমরা এ বিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ করছি।

সোমেন গুপ্ত,
কলকাতা—২৯

মুখের মেলা প্রসঙ্গে

আমি আপনার বিখ্যাত এবং সুধী-সমাজে জনপ্রিয় 'অমৃত'-এর নিয়মিত গ্রাহক এবং অনুরাগী পাঠক। বেশ কিছু-দিন যাবৎ 'অমৃত'-এর কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাস যেমন—আজকের সমাজ, বিশেষ করে 'মুখের মেলা' পড়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। কারণ আমরা সুদূরে পল্লীগ্রামে বসবাস করে, এই ধরনের গল্প এবং উপন্যাস পড়তে সুযোগ পাই না। কিন্তু 'অমৃত'-এর প্রতি সংখ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা পড়ে অনেক আশা মিটেছে। আশা করি এই ধরনের গল্প, উপন্যাস আরো অনেক পড়তে সুযোগ পাব। তবে আমি বা আমার মত পাঠক অনুরাগীর জানবার আশা বা স্পৃহা চরিতার্থ হবে।

শিবশংকর ভট্টাচার্য,
২৪-পরগণা।

শা[illegible]চোখে

বিচ্ছিন্নতাকামী বামপন্থীর সঙ্গে সমঝোতা করার চেয়ে দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদী শক্তির সঙ্গে জোটবাঁধা অনেক নিরাপদ। কারণ, মনোলিথিক সংগঠনের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতা প্রবণতার ঝোঁক বাড়তে থাকলে সেই শক্তিকে সংহত করে শৃঙ্খলার সঙ্গে বিপ্লবের পথে পরিচালনা করা দুষ্কর। আর ঐ শক্তি যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, তবে তাকে পরাস্ত করে বিপ্লবের প্রকৃত আবহাওয়া সৃষ্টি করা আরও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। কিন্তু দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদী শক্তি যদি ক্ষমতা পায় তবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামো বজায় থাকে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আবহাওয়া বিপ্লবী পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল। আর ঐ পরিবেশে বিপ্লবী শক্তিকে সংগঠিত ও সংহত করাও অতীব সহজ।

এই তত্ত্বগত যুক্তিকে গ্রহণ করলেই দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের মিতালীর অর্থ নিরূপণ করা মোটেই কঠিন নয়। কাজেই যেখানেই বিচ্ছিন্নতাকামী বামপন্থী শক্তির প্রাবল্য থাকবে অর্থাৎ ক্ষমতা দখল করার মত শক্তি থাকবে সেইখানেই—যাঁরা প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি বলে নিজেদের দাবী করেন তাঁরা দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদীদের দিকে স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়বেন। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র বামপন্থীরাই যে বিবর্তনবাদী দক্ষিণপন্থী শক্তির পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করছে, শুধু নির্বাচনের পটভূমিকায় নয়, সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও সমাজজীবনেও তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে। তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে এ তথ্য সত্য।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আদৌ কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় কি? এই রাজ্যের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী দলের শক্তির তুলনামূলক বিচার করলে উত্তরটা সহজেই মিলবে। বিগত মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলকে মাপকাঠি হিসাবে ধরে নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে বিচ্ছিন্নতাকামী বামপন্থী দল অর্থাৎ সি পি এম '(সমদর্শী' একথা বলাহ না, সি পি এম-এর একদা সহযোগী দলগুলিই তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন) যে সংখ্যক আসন দখল করেছিল তা এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করলেও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির মিলিত শক্তির সমান নয়। গণতান্ত্রিক শক্তির কথা বাদই দিলাম। আর দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদী কংগ্রেস ক্ষমতাবিচ্যুত শুধু হয়নি অধিকন্তু সামান্য সংখ্যক আসনই পেয়েছিল। সেই নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের শরীকরা এই রাজ্যের আমজনতার কাছে তাঁদের সেবার খাতিয়ান রেখে গেছেন। কাজেই নির্বাচন ও সরকাররোত্তর পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। নির্বাচনের পূর্বে এই রাজ্যে একমাত্র আওয়াজ উঠেছিল, কংগ্রেসকে পরাস্ত করো। কংগ্রেস দল সেই উত্তাল জনতরঙ্গের আঘাত সহ্য করতে পারে নি। ফলত, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল হিসাবে বাংলা কংগ্রেস যুক্তভাবে নতুন পথের দিশারী হিসাবে এই রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশে উদিত হয়েছিল। তার পরের ইতিহাস কারও অজানা নয়। এবং আজকের কোঁদলের ভাব ও ভাষা সকলেই অবগত আছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় সি পি এম একার পক্ষে বা তাঁদের সঙ্গে যাঁরা জোট বেঁধে আছেন সেই যুক্তশক্তির পক্ষে বাংলার মসনদ অধিকার করা কি সম্ভব? এককথায় উত্তর হচ্ছে, না। কেননা সরকারে যোগ দেবার পর সি পি এম যে শক্তি সঞ্চয় করেছে তার জোরে নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা দখল করার মত অবস্থা আসেনি। উপরন্তু, সরকারে থাকাকালীন যে পন্থা অবলম্বন করে তাঁরা বিপ্লবের শর্টকাট তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। নির্বাচন হলে এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। অন্যদিকে রাজ্যের এমন অবস্থারও উদ্ভব হয়নি যে জনতা আবার কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়বে। মনে হয় এটাই বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থা। অতএব, ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরিভাবে এখনও নির্ভর করছে সেই সমস্ত দলগুলির ঐক্যের ওপর, যাঁরা বিচ্ছিন্নতাকামী বামপন্থীর বিরোধী আর দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদী শক্তির পুনরুজ্জীবনের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিতে চান।

এই সূত্রের বা তথ্যের যাঁরা ধারক ও বাহক সেই সমস্ত দলগুলি হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক আর এস পি, এস এস পি, এস ইউ সি, বিদ্রোহী পি এস পি, আর সি পি আই, লোকসেবক সঙ্ঘ ও গোর্খা লীগ। সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস ও পি এস পি-র কথা উল্লেখ করা হল না। এই কারণে যে তাঁরা উগ্র বামপন্থীকে রুখবার জন্য দক্ষিণপন্থী বিবর্তনবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে উৎসুক। তবে সি পি আই ঐ তত্ত্বে শুধু বিশ্বাসী নয় বরঞ্চ [illegible] ঐ নীতি অনুসরণের জোরদার প্রস্তুতি [illegible] এবং সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। কিন্তু [illegible] বঙ্গে এসে ঐ নীতি [illegible] উপস্থিত হয়েছে। এই রাজ্যে, আগেই বলেছি, উগ্রবামপন্থার শক্তি এত বেশী নয় যে ক্ষমতা দখল করতে পারে। কাজেই দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝোঁকবার প্রশ্নটা জনতা সহজে মেনে নিতে পারবে না। তাই সি পি আই একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

কিন্তু ডান কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাঁচাবার জন্য অন্তর্বামের কিছু শরীক নীরবে রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য সি পি আইকে বাঁচাবার জন্য বললে একটু বেশী বলা হয়ে যাবে। বরং যদি একটু কঠোরভাবে বক্তব্য রাখি তাহলে প্রশ্নটা এই দাঁড়ায় আসনের দিকে লক্ষ্য করেই সমস্ত রাজনৈতিক মতিচ্ছন্ন যুযুৎসুর প্যাঁচ দেওয়া হচ্ছে। সি পি আই-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শাসক কংগ্রেসের সঙ্গেও মিতালি করবে আর যুক্তফ্রন্টকেও জোরদার করবে। অন্তর্বামের মিলনের পটভূমিকা বিচার করলে সি পি আই-এর এই সিদ্ধান্ত কন্ট্রাডিক্‌শানে ভরপুর। তা সত্ত্বেও অন্তর্বামের কিছু শরীক অন্তর্বামের সংস্থাটাকে একটি কার্যকর যুক্তফ্রন্টে রূপায়িত করবার জন্য ঘরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং এই ফ্রন্টের একটি রাজনৈতিক বক্তব্যের খসড়াও তৈরি করেছেন। সমস্ত শরীকদের কাছে এর অনুলিপি পাঠানো হয়েছে মতামত চেয়ে। এবং একজন মুখপাত্র এ আশাও প্রকাশ করেছেন যে আগামী ১৩ই নভেম্বরের সভার পর অন্তর্বাম আর অন্তর্বাম থাকবে না, একেবারে 'সংযুক্ত বাম-

পন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' নাম ধারণ করে একাত্ম হয়ে যাবে। আশা করলেও আশংকা যে বিদ্যমান, সেই বক্তব্যটা এখন পেশ করা প্রয়োজন।

এস ইউ সি নেতা শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্বামের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তাকে দূর করে এই রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি ফ্রন্টে সুসংহত করে আনার মানসে উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক ও বিদ্রোহী পি এস পি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নাকি এই খসড়া দলিল তৈরি করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে দলিলটি সুন্দর ও স্বচ্ছ মনে হবে। কারণ রাজনৈতিক বক্তব্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট। কি কারণে এই তৃতীয় জোট গঠন করা একান্ত প্রয়োজন তার জন্য যে আর্গুমেন্ট করা হয়েছে তাও প্রণিধানযোগ্য। এই স্বচ্ছতা সত্ত্বেও একটি বক্তব্য এই খসড়া দলিলে সন্নিবেশিত হয়নি। সেটা হচ্ছে, শাসক কংগ্রেসকে নিয়ে যদি কেউ ফ্রন্ট করে সেই ফ্রন্টের সঙ্গে এই ফ্রন্টের সম্পর্ক কি হবে। এই প্রশ্নেই যথেষ্ট ফাঁক থেকে গেছে। যদিও দলিলটা খসড়ার স্তরেই আছে, যে তিনটি দল এই ডকুমেন্ট রচনার জন্য দায়ী তাদের মনে হয় এই প্রশ্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জেনে শুনেই ঐ ফাঁকটা রেখে দিয়েছেন। ঐ ফাঁকটা থাকলে সি পি আই-এর পক্ষে ফ্রন্টে [illegible] অসুবিধা [illegible] হবে না। কারণ তাঁরা তাঁদের জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারবেন। আর এই খসড়া দলিল যেমনটি আছে সেইভাবে গৃহীত হলে শাসক ও বাংলা কংগ্রেসের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করার পথেও কোন বাধা থাকবে না। অবশ্য এই খসড়া দলিলের প্রণেতারা যুক্তি দেখাবেন যে দলিলের বক্তব্যে [illegible] সঙ্গে সমঝোতা করা যাবে না এমন কথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। অর্থাৎ দরকার হলে [illegible] সঙ্গেও হাত মেলানো যাবে। এই যুক্তির অবতারণা করে আসল উদ্দেশ্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হবে বলেই অনেকে আশঙ্কা করছেন। অদূ-পরে যদি গণতান্ত্রিক শক্তি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গেই অন্তর্বাম সমঝোতা করে তবেও দোষের কিছু হবে না। কারণ খসড়া দলিলে শুধু বাম কম্যুনিস্ট ও শাসক কংগ্রেসের কেন বিরোধিতা করা হবে সেই বক্তব্যই অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্বগত দিক থেকে পেশ করা হয়েছে। কাজেই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারলে পরোক্ষে শাসক কংগ্রেসকে মদৎ পৌঁছানো গেল আর প্রস্তাবিত ফ্রন্টকে অতীব শক্তিশালী করে তোলা গেল। ফলে, লালদীঘির দপ্তর কব্জার মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ সাপও মরল লাঠিও ভাঙ্গল না। আর তাত্ত্বিকদের তত্ত্বও রক্ষা পেল, বিচ্যুতি ঘটল না। এস ইউ সির অবিসম্বাদিত নেতা শ্রীশিবদাস ঘোষও নাকি এই তত্ত্বের সঙ্গে একমত। তিনিও নাকি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'লেফট সেকটেরিয়ানিজম্‌কে' পরাস্ত করা আশু কর্তব্য এবং সেজন্য দরকার হলে রাইট রিফরমিজম্‌-এর সঙ্গে হাত মেলানো যায়। তাতে বিচ্যুতি ঘটে না। এটা একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। ফরওয়ার্ড ব্লকও মার্কসবাদী। অতএব, তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরাও যে এই বুনিয়াদি বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! কাজেই এই তিন দল থেকে খসড়া-লিপি উপস্থিত করা হয়েছে বলে অন্যরা 'বাঃ বা, বাঃ বা' বলে মেনে নেবেন এই আশাই হয়ত তাঁরা করছেন।

এই খসড়া-লিপি একেবারে দোষমুক্ত, রচয়িতারা একথা না বললেও তাঁদের প্রত্যেকের দলীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁদের শাসক কংগ্রেস বিরোধিতা মেকি নয়। ফরওয়ার্ড ব্লক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা শাসক কংগ্রেস ত দূরের কথা শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি-করা-কোন-দলের সঙ্গেও সমঝোতা করবে না। অনুরূপ কথা এস ইউ সি ও বিদ্রোহী পি এস পিও বলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যে দলিল প্রণয়ন করলেন তাতে এই বক্তব্য রাখলেন না কেন—সেটাই বিস্ময় লাগছে। কিন্তু এত প্যাঁচ কিসের জন্য? এস এস পি-কে জোটে রাখবার জন্য নাকি? এস এস পি-র শক্তি সামান্য হলেও অন্তর্বামের মধ্যে তাঁরা তৃতীয় স্থানে আছেন। অধিকন্তু ঐ রকম কায়দা করে চললে আর এস পি ও লোকসেবক সংঘকেও পাওয়া যেতে পারে।

পাল্টা সম্ভাবনা হিসাবে বলা যায়, এস এস পি, আর এস পি ও লোকসেবক সংঘের সঙ্গে বাম কম্যুনিস্টদের সমঝোতা হবার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এস এস পি ও বাম কম্যুনিস্টদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে শ্রীঅজয় মুখার্জির গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পটভূমিকায় একদফা আলোচনাও হয়ে গেছে। কেরলের কথা ভেবে দেখলে পশ্চিমবঙ্গেও যে ঐ নাটকের পুনরাভিনয় হতে পারে তা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি যাদের সঙ্গে জোট বেঁধে আছে তাঁদের নিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারবে না, একথা যেমন সত্য—তেমনি এস এস পি, আর এস পি ও লোকসেবক সংঘের সঙ্গে সমঝোতা হলে কি হবে সে-কথা বলাও মুশকিল। কারণ তখন ঐ শক্তিজোটই নির্ভেজাল বামপন্থী মোর্চা হিসেবে জনতার কাছে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর আজ অবধি কংগ্রেসবিরোধী যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তার পুরো হাওয়াটা ওদেরই পালে লাগতে পারে।

এই সম্ভাবনাকে তিরোহিত করার জন্য অন্তর্বামের উচিত কোন কৌশল না করে সোজাসুজি যেভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন, তার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হওয়া। তাহলে বামপন্থী হাওয়াটা পুরোপুরি বাম কম্যুনিস্টরা কাজে লাগাতে পারবে না। অন্তর্বামের পালেই তা বেশীর ভাগ লাগার কথা। আর সেক্ষেত্রে বাম কম্যুনিস্টদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাও কমে যেতে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থাটা এরকম হলে অবাক হওয়া চলবে না।

—সমদর্শী

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা চিকিৎসার জন্য পাকিস্থান থেকে ভারতে এসে পৌঁছেছেন। হরিদাসপুর চেকপোস্ট দিয়ে সীমান্ত অতিক্রমের কালে তাঁকে স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে।

দেশে বিদেশে

আগামী ৯ই নভেম্বর সংসদের শীত-**কালীন** অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা **আছে**। তার আগেই লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে **নতুন** নির্বাচন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী **গান্ধী** রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবেন **কিনা** তা নিয়ে আবার জল্পনাকল্পনা শুরু **হয়েছে**। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেরকম **একটা** সম্ভাবনার কথা মনে রেখে প্রস্তুতি **করছে** বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে।

যাঁরা মনে করছেন যে, শ্রীমতী গান্ধী **অন্তর্বর্তী** নির্বাচনে নেমে পড়তে পারেন **তাঁদের** যুক্তি হল : উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত **বিধায়ক** দলের সাফল্য শাসক কংগ্রেসকে **বিচলিত** করে তুলেছে। ঐ রাজ্যে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা যদি স্থায়ী হয়ে **বসে** সরকারী ক্ষমতা কাজে লাগাবার সুযোগ **পান** তাহলে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে **সেখানে** শাসক কংগ্রেস দলকে বিলক্ষণ **অসুবিধায়** পড়তে হবে। ভবিষ্যতে ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য উত্তর **প্রদেশের** উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। সুতরাং সেখানে শ্রীমতী গান্ধীর দল অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উত্তর **প্রদেশের** সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিরোধী **কংগ্রেস** দল অন্যত্র **একই কৌশলে শাসক** কংগ্রেস **দলকে** ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার **জন্য** উঠেপড়ে লেগেছে। বিরোধী কংগ্রেস দলের সভাপতি **শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা** পাটনায় গিয়ে শ্রীদারোগা রায়ের মন্ত্রিসভার সংকট উস্কে দিয়ে এসেছেন। সেখানেও উত্তর **প্রদেশের ধরনের** একটি সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের **সম্ভাবনা** যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। উত্তর প্রদেশের ঢেউ এমনকি কেন্দ্রেও এসে **পৌঁছাচ্ছে**। যে মহাজোট গঠনের চেষ্টা **করে** বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতারা **কিছুকাল** আগে পিছিয়ে এসেছেন সেই **মহাজোটেরই** নাম বদল করে এখন **পার্লামেন্টের** ভিতর 'সংযুক্ত বিধায়ক দল' গঠনের **চেষ্টা চলেছে**।

সুতরাং শাসক কংগ্রেস দলের সামনে এখন **প্রশ্ন** দেখা দিয়েছে, প্রতিপক্ষকে আর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে এখনই নির্বাচনে নেমে পড়াটা শাসক কংগ্রেস দলের **পক্ষে** বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা। তৃতীয়ত, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত ও প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা বিলোপ করার পর এখন শাসক **কংগ্রেস** দলের পালে যতটুকু হাওয়া আছে তা ভবিষ্যতে আর না থাকতে পারে। ভাল ফলনের সৌভাগ্য কতদিন থাকবে তাও **বলা যায়** না। অতএব, যা করার এখনই। **চতুর্থ** আর একটা যুক্তি হল, একবার লোকসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের **হার** হয়ে গেলে তাঁদের আর কিছুই করার থাকবে না। শোনা যাচ্ছে যে, বহু প্রাক্তন রাজন্যরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁরা শাসক **কংগ্রেস** থেকে সদস্য ভাঙ্গাবার জন্য **বিশেষভাবে** চেষ্টা করছেন। প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা **ও** অন্যান্য বিশেষ সুযোগসুবিধা লোপ **করার** আগে এ বিষয়ে সরকার সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ নিন বলে শাসক কংগ্রেস **দলের** অনেক এম-পি যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল, লোক-সভায় শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে **প্রাক্তন** রাজন্যদের প্রভাব বা তাঁদের প্রতি **সমর্থন** অথবা সহানুভূতি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। যেভাবেই হোক লোকসভায় **একবার যদি** শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের **পরাজয় ঘটে** তাহলে রাষ্ট্রপতি পরাজিত **সরকারের**

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন না।

মাস কয়েক আগে আর একবার যখন এই জাতীয় রটনা হয়েছিল তখন প্রধানমন্ত্রী নিজে বিবৃতি দিয়ে সংশয় নিরসনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই কথাকেই শেষ কথা বলে রাজনৈতিক মহল মেনে নিতে চাইছেন না।

*

ভারতবর্ষস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য পালাম বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন না তার দ্বারা তিনি কি কূটনৈতিক পদ্ধতিতে তাঁর সরকারের তরফ থেকে ভারত সরকার সম্পর্কে তাঁদের কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করতে চেয়েছেন? অনুরূপভাবে, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নিকসনের ভোজসভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু কূটনৈতিক ভর্ৎসনা করতে চেয়েছেন?

যদিও দুই পক্ষই এই ঘটনাগুলির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছেন না তাহলেও সন্দেহবাদীরা অন্যান্য কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে এই দুটি ঘটনাকেও যুক্ত করে দেখাতে চাইছেন যে, ভারত-মার্কিন সম্পর্কে অবনতির লক্ষণগুলিই নানা দিক দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত কিটিং তাঁর কৈফিয়তে বলেছিলেন যে, দূতাবাসের একজন কেরানীকে বলে রাখা হয়েছিল, তিনি যেন ভোরবেলায় রাষ্ট্রদূতের ঘুম ভাঙিয়ে দেন। কিন্তু তাঁকে যখন ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হল তখন শ্রীমতী গান্ধীর বিমান রওনা হয়ে গেছে। বেচারা কেরানীটি সাসপেন্ড হয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের আর বিমানবন্দরে যাওয়া হয় নি। এই খবর বেরোবার পর রাষ্ট্রদূত কিটিং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গোটা কয়েক অ্যালার্ম ঘড়ি উপহার পেয়েছেন। এবং কানপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটুট অব টেকনোলজির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী দেশে ফিরে এসে বলেছেন, এরকম একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে এতখানি হৈ-চৈ করা হচ্ছে দেখে তিনি বিস্ময় বোধ করছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করতে যান নি। গিয়েছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দিতে।

শ্রীমতী গান্ধী একথাও বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট নিকসনের ভোজসভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ যে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তারও কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। এই ভোজসভায় যোগ দিতে হলে তাঁকে আরও একটা দিন বিদেশে কাটাতে হত। সেটা তিনি করতে চান নি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্কে যে রজত জয়ন্তী অধিবেশন হয়েছিল তাতে যোগ দেওয়ার জনাই শ্রীমতী গান্ধী গিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী

স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের অদূরে বৃটিশ পেট্রোলিয়াম সংস্থা উত্তর সমুদ্রে তৈল উত্তোলনের জন্য পরীক্ষা কার্য চালাচ্ছে। এখানে নাকি প্রচুর পেট্রল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
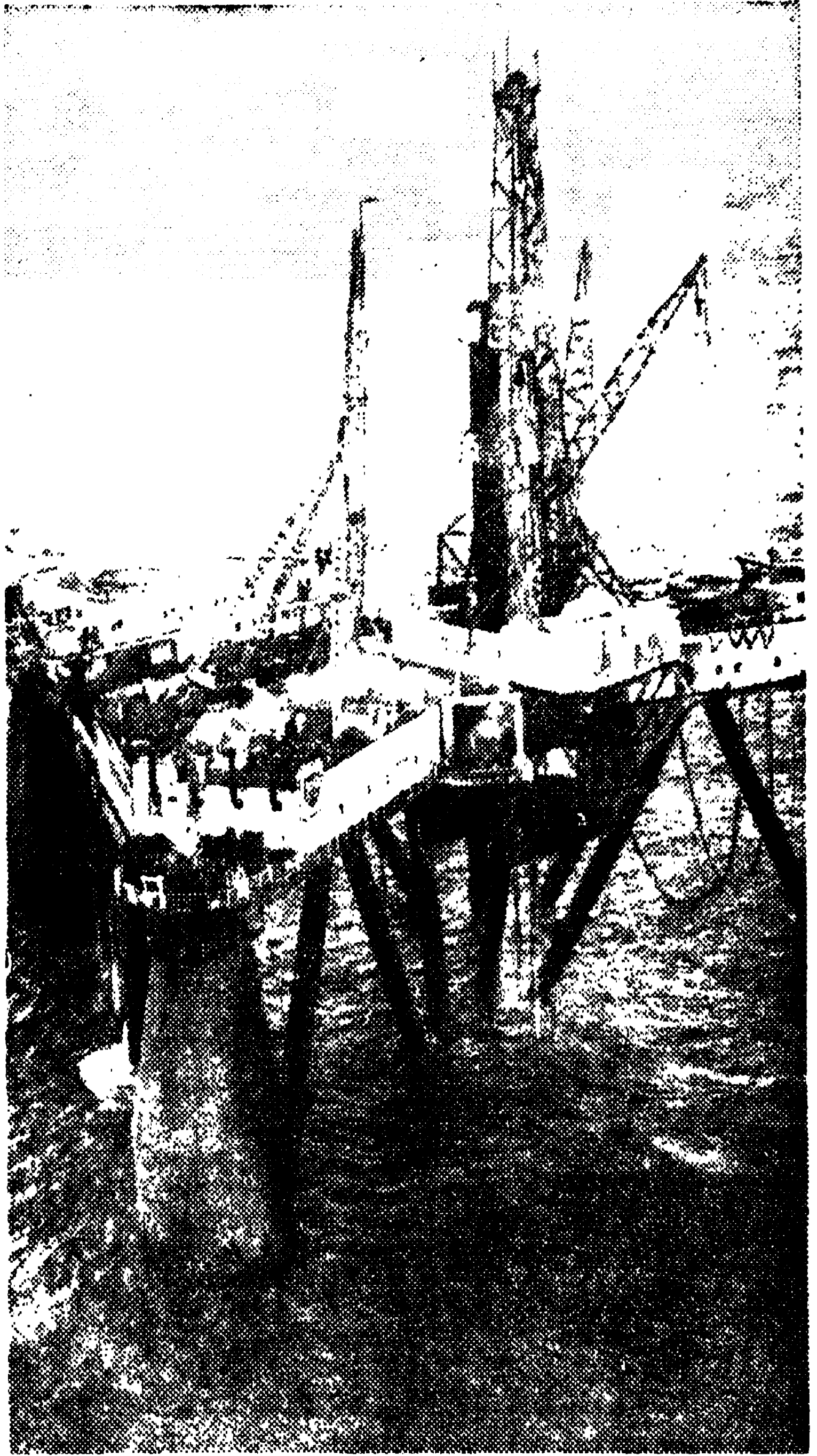
গান্ধীর মতো আরও অনেক রাষ্ট্র অথবা সরকারের প্রধানই নিউইয়র্কে সমবেত হয়েছিলেন আর এইসব রাষ্ট্রনায়ককে আপ্যায়ন করার জনাই প্রেসিডেন্ট নিকসন ঐ ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ভোজসভাটি তেমন জমে নি। কারণ, ভারতের মতো আফ্রিকা ও এশিয়ার আরও অনেক রাষ্ট্রের নেতারাই ঐ রাত্রে হোয়াইট হাউসের রাস্তা মাড়ান নি। জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ কেনেথ কাউন্ডা প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ডাঃ কাউন্ডার ভাষায় "প্রেসিডেন্ট নিকসন বোধহয় আমাদের কুৎসিত মুখগুলি দেখতে চান না বলেই" তিনি সেই সুযোগ পান নি। পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ ম্যাকারিওস, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাতো, রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট চৌসেস্কু প্রভৃতির সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার সময় ও সুযোগ কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসনের হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নিউইয়র্ক সফরের সময় ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতির কথাটা যে কারণে বিশেষ করে উঠেছিল সেই কারণটা হচ্ছে এই যে, তাঁর এই সফরের অব্যবহিত আগেই পাকিস্থানকে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী করার ব্যাপারে

ভুবনেশ্বরে ৫ নভেম্বর 'উড়িষ্যা-৭০' প্রদর্শনীর উদ্বোধন হচ্ছে। শত শত শিল্পী, অ-শিল্পী এবং কর্মী এই প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করেন দিবারাত্র। উড়িষ্যা সরকারের শিল্প অধিকর্তার পরিচালনায় এই বিরাট শিল্প প্রদর্শনীতে ভারী শিল্প ছাড়াও আরও বহু দর্শনীয় জিনিস থাকবে।
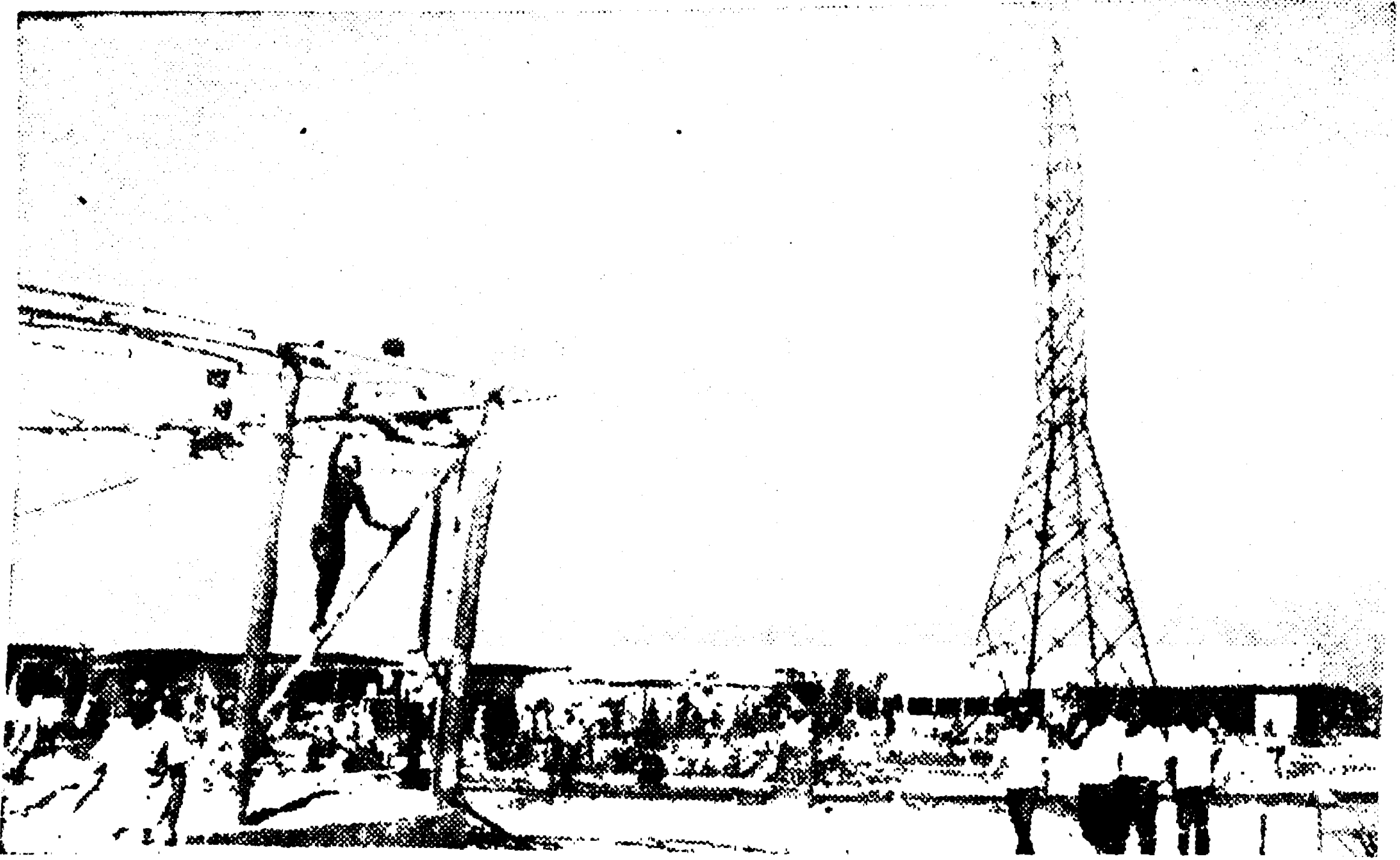
ভারতে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও আমেরিকায় এই বিষয় ভারতের মনোভাব সেখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাতে কসুর করেন নি। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম রজার্সের সঙ্গে এ বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিংয়ের কথা হয়েছিল। শ্রীসিং শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে গিয়েছিলেন। প্রকাশ যে, রজার্স তাঁদের বলেছেন যে, পাকিস্থানকে এই একবারই অস্ত্র সরবরাহ করা হল। এর দ্বারা এমন বোঝায় না যে, এবিষয়ে যে নিষেধ বলবৎ করা হয়েছিল মার্কিন সরকার তা তুলে নিয়েছেন। টেলিভিশনে মার্কিন সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারেও শ্রীমতী গান্ধী প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মার্কিন সরকারের এই সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষের মানুষ বিচলিত হয়েছে।

*

রাষ্ট্রসংঘের রজত জয়ন্তী অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতেও মার্কিন কর্তৃপক্ষের খুব খুশী হওয়ার কথা নয়।

তিনি বলেছেন যে, বৃহৎ শক্তিগুলি অন্যান্য বহু দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং 'প্রযুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত নয়া উপনিবেশবাদ' চালিয়ে যাচ্ছেন। শক্তিমানদের ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন যে, এরা নানাভাবে নিজেদের প্রভাব খাটাচ্ছে এবং নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকা বাড়াবার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী গান্ধীর মতে, লীগ অব নেশনস্‌কে যেমন বিভিন্ন জাতির নিজেদের স্বার্থ পোষণের কাজে লাগান হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটছে।

শক্তিশালী জাতিগুলি "উন্নতিশীল দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য যেসব সর্ত দেয় এবং দরিদ্র জাতিগুলিকে যেভাবে তাদের বাজার থেকে সরিয়ে রাখে" তার জন্যও শ্রীমতী গান্ধী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "মনুষ্যজাতির পক্ষে বিচিত্র পরিহাস এই যে, আমাদের হাতে উপায় আছে, আমরা স্বপ্নও দেখি, কিন্তু জোর কদমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে ইচ্ছাশক্তি ও বিশ্বাসের প্রয়োজন তা আমাদের নেই।"

সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীমতী গান্ধীর এই বক্তৃতা রাষ্ট্রসংঘে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর বক্তৃতার পর অনেক প্রতিনিধি নিজেদের আসন থেকে উঠে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে আসেন।

*

যদিও রাষ্ট্রসংঘের এই রজত জয়ন্তী অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায় ৫০টি দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীরা নিউ-ইয়র্কে এসেছিলেন তাহলেও এই অধিবেশন যতটা আশা করা গিয়েছিল ততটা গুরুত্ব লাভ করে নি। তার প্রধান কারণ, বৃহৎ শক্তিবর্গের শীর্ষ নেতারা এই অনুষ্ঠান থেকে তফাতে ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার কোসিগিন এই অধিবেশনে আসেন নি। প্রেসিডেন্ট নিকসনও শুধু অধিবেশনে এসে একটি বক্তৃতা দিয়েই চলে গেছেন।

রাষ্ট্রসংঘের ২৫ বছর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে স্বভাবতই এই বিশ্বসংস্থার অতীত ও ভবিষ্যৎ, তার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সমবেত প্রতিনিধিরা সকলেই একথা স্বীকার করেছেন যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ২৫ বছর আগে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। ভিয়েতনামে এবং পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আগুন এই মুহূর্তে রাষ্ট্রসংঘের সীমাবদ্ধতাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে। কিন্তু একথাও কোন প্রতিনিধি বলতে পারেন নি যে, রাষ্ট্রসংঘের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সকলের হয়ে শ্রীমতী গান্ধী আশা প্রকাশ করেছেন, "সকলের সম্মতিতে রূপান্তরের এক নূতন যুগ সৃষ্টি করার জন্য, ন্যায়বিচার ও শান্তির একটা নবযুগ আনয়নের জন্য রাষ্ট্রসংঘ চেষ্টা করে যাক।"

৩০-১০-৭০ —পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

দেশবন্ধু প্রণাম

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মশতবার্ষিকী আজ সারাদেশে উদযাপিত হচ্ছে। এই মহান দেশপ্রেমিক, লোককল্যাণব্রতী, কবি ও জনদরদীর উদ্দেশে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি। দেশবন্ধুকে বাংলা তথা ভারতবাসী হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। ত্যাগে ও সেবায় তিনি ছিলেন অনন্য। সে কারণেই তাঁর দেশবন্ধু নাম। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ভাস্কর। সুভাষচন্দ্রের মতো মহানায়কের তিনি ছিলেন গুরু। গান্ধীজী তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এক মহান নেতারূপে। তাঁর জন্মশতবর্ষে এই অনন্যসাধারণ লোকপ্রিয় নেতার জীবনী ও কর্মসাধনা আজ বিশেষভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। দেশবন্ধু ইতিহাসের মানুষ। তিনি নিজের জীবন দিয়ে এই দেশকে, সমাজকে, এই দেশের মানুষকে মহত্তর সার্থকতায় মহিমান্বিত করে গেছেন।

চিত্তরঞ্জনের কর্মজীবন ছিল গৌরবদীপ্ত। চৌখস ব্যারিস্টার। কলকাতার অভিজাত মহলে পয়লা সারির লোক তিনি। ভারতজোড়া তাঁর খ্যাতি। অর্থের কোনো চিন্তা নেই। সেই বিপুল খ্যাতি নিয়ে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা অরবিন্দ, বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের মামলার কৌঁসুলী হলেন। বোমা মামলায় জড়িয়ে ইংরাজ শাসকরা এই তিন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেবার জন্য যে-ষড়যন্ত্র করেছিল আইনবিদ চিত্তরঞ্জনের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় ও নিষ্ঠায় এই তিন বিপ্লবীকে তিনি মুক্ত করে আনলেন। আলিপুর বোমা মামলার সেই কাহিনী আজ ইতিহাস হয়ে আছে। সন্ন্যাসী-বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে মামলা হয় তাতেও উপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে তীক্ষ্ণ আইন-বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন।

এই আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার, শৌখীন জীবনে অভ্যস্ত চিত্তরঞ্জন একদিন সর্বত্যাগী হলেন দেশের জন্য। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের পর এমন দানশীল করুণা-হৃদয় জননায়কের সাক্ষাৎ বাংলাদেশ পায়নি। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, স্বতন্ত্রবাদী ও দূরদর্শী, নীতির প্রবক্তা। বিলাসী চিত্তরঞ্জন দেশের ডাকে বিলাতী দ্রব্য বর্জন করলেন এক কথায়। সন্ন্যাসীর ত্যাগ ব্রতে তিনি দীক্ষা নিলেন। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ১৯২২ সালে গয়া অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করলেন, জনসাধারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় স্বরাজের জন্য জাতিকে সংগঠিত করতে হবে। অসহযোগের প্রশ্নে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ হল। ১৯২৩ সালে তিনি কংগ্রেসের মধ্যেই গঠন করলেন স্বরাজ্য দল। কাউন্সিলে, কর্পোরেশনে প্রবেশ করে ইংরেজের আইনেই বৃটিশ ক্ষমতাকে জব্দ করার নীতি গ্রহণ করলেন তিনি। মতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা হলেন তাঁর সহযোগী। চিত্তরঞ্জনের এই নীতি ভারতের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন। কংগ্রেসকে পরে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক পন্থাই অনুসরণ করতে হয়েছিল। অসহযোগ চিরস্থায়ী হয়নি। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তা দেখে যেতে পারেননি। ১৯২৫ সালে অকালে চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণ ভারতবর্ষের রাজনীতির পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। চিত্তরঞ্জনের স্থান আর পূর্ণ হয়নি। বাংলার দুর্দশার সূত্রপাত তখন থেকেই। ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশ তখন থেকে স্থান নিল পিছনের সারিতে। বাংলা বিভাগের মধ্য দিয়ে হল তার সকরুণ বিয়োগান্তক পরিণতি।

সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনের বাসভবন রূপান্তরিত হল চিত্তরঞ্জন সেবাসদনরূপে। রবীন্দ্রনাথ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' এ দানের তুলনা নেই। স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জনকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল তাতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি, তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই, তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না। সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাজকেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্বলোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল।'

আজ এই মহাপ্রাণ নায়ককে আমরা স্মরণ করি। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই জাতির ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে দিয়ে যায়। চিত্তরঞ্জন শুধু দেশনায়ক নন, তিনি দেশবন্ধু। দেশের এই দুঃখের দিনে দেশবন্ধুকেই তো জাতি সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করে। দেশবন্ধুর স্মৃতি অমর হোক।

হাওয়ার ভেতরে ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

হাওয়ার ভেতরে আর আর্দ্রতা পাই না যেমন অনেকে পায়।
জলের ভেতরে শীতলতা...যেরকম অনেকের বুকে।
পাহাড়চূড়ার ওই মন্দিরের শীর্ষে দেবতাকে
দেখি না, যেমন অনেকেই
অনায়াসে দেখে নিতে জানে। সারাক্ষণ
জ্বলন্ত অঙ্গারে পোড়ে ভয়ার্ত দিনের ছবি। শ্যাওলায়

পুকুরের চোখ ঢেকে আছে। দূর্বাদলে
দস্যুর পায়ের ছাপ, স্তব্ধ বৃক্ষমূলে
সাপের খোলস। আমি আনন্দিত বাক্যালাপে
একদিন ভরিয়েছিলাম
কৈশোর, যৌবন। আজ সারা কৈশোরের যৌবনের চোখে
তিক্ততার তেজ আর জ্বালা; অতএব
হাওয়ার ভেতরে কোনো আর্দ্রতা খুঁজি না।।

পুবালী ঝড় ॥

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

সুস্পষ্টে হাজির দোরে
জীবন ইসারা
স্নায়ুতে লেগেছে আজ
চেতনার ছোঁয়া।
স্বৈরিণী কড়িতে ভরা
বৃদ্ধ জনপদ
মৃত্যুর দুর্গন্ধে ভরা
নারকীয় খাদ।
মোহিনী কুহকে বন্দী
চক্রী দরবার
লুব্ধ পতঙ্গেরে ডাকে
দগ্ধ চুল্লী দ্বার।
মরিয়া মানুষ কোঁসে
মরণ যন্ত্রণা
শোক ঘৃণা থেকে ক্রোধ
প্রাণের নিশানা।
পুবালী ঝড়ের বেগ
ব্যর্থ কভু নয়
উদ্দীপ্ত প্রদত্ত প্রাণ
সুনিশ্চিত জয়।

বড়বাজারে জ্বর ॥

সাধনা মুখোপাধ্যায়

যেমন করে লোকে পুরীর সমুদ্রের হাওয়া
ফুসফুসে টেনে নেয়
কৃপণের মতো কলকাতায় গিয়ে খরচ করতে
সেই রকম আমি সুলভ কচুরীপানা
কলা বা নারকোল গাছ দেখলেই
চোখের চুম্বকে সব রক্ত টেনে নিই
বড়বাজারে দুর্লভ সবুজ কোন
ঘুসঘুসে জ্বরে
বারো মাস ভুগে ভুগে মরতে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : কর্মে ও চিন্তায়

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমাদের দেশ দরিদ্র বলে দানশীলতা জিনিসটাকে আমরা খুব বড় করে দেখি। কিন্তু সমাজ কাঠামো যদি অপরিবর্তিত থাকে, যদি শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে, ধনী-দরিদ্রে জীয়ন্ত থাকে দুরতিক্রম্য দূরত্ব, তাহলে ব্যক্তিগত বদান্যতায় আমরা কতটুকু হিত করতে পারি দেশের? সত্যিকার হিতসাধন যদি লক্ষ্য হয় আমাদের, তাহলে সেজন্যে চাই সমাজ সংগঠনের আমূল পরিবর্তন। এই সামূহিক পরিবর্তনই চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। একথা ঠিক যে তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চাকেই মনে করতেন প্রশাসনের অভিপ্রেত আদর্শ, কারণ সাম্য বা সমাজতন্ত্র তখন রাশিয়ায় পরীক্ষার স্তরে থাকলেও তার দিকে সপ্রীতি দৃষ্টিতে তাকান নি তিনি। তা সত্ত্বেও সাম্যের মূল ভিত্তিটা স্বীকার করতেন তিনি এবং দুঃখব্রতী ও শ্রমকারী সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান চেয়েছিলেন একাগ্র নিষ্ঠায়।

ভাবী সমাজের গড়ন কেমন হবে, তা ব্যাখ্যা করে তিনি একটি বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁর পরিকল্পিত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ শূদ্র থাকবেন না, থাকবেন না ধনী দরিদ্র। রক্তকৌলীন্য ও ধনকৌলীন্য মানুষে-মানুষে যে ভেদের প্রাচীর রচনা করেছে, তা গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে এমন এক সুবিচার ও সমদর্শিতাপূর্ণ পটভূমি যেখানে কর্মই হবে মানুষের মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি। সমাজকে যিনি শ্রম, সেবা ও চিন্তার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করবেন তিনি যে পদ বা পদবীরই মানুষ হন, তাঁকে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে তাঁর ন্যায্য পাওনা। যে সমাজে কেউ সুবিধার আসনে বসে হুকুম করছেন, কেউ নীচে দাঁড়িয়ে হুকুম তামিল করছেন, কারো কুকুর দুধ খাচ্ছে, কারো শিশু দুগ্ধাভাবে মারা যাচ্ছে, সে সমাজকে ধ্বংস করতে হবে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাম্যবাদের যা গোড়ার কথা, তার সঙ্গে এ বক্তব্যের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু লক্ষ্য শুভ ও সুন্দর হলেও তাতে পৌঁছানর পথটা কি হবে? বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে সমস্ত প্রতিরোধের বাধা চূর্ণ করে, কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের সমূলে উৎখাত করেই কি সেই ভাবী সমাজের বনিয়াদ তৈরী করতে হবে? চিত্তরঞ্জনের কবিমন এতে সায় দেয় নি। সেখানে তিনিও গান্ধীজীর মতই হিতবাদের সমর্থক। তিনি বলেছেন, অন্যায় ও অশুভের পথ ধরে কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। যাঁরা স্খলিতনীতি, ভ্রষ্টবুদ্ধি, বিকৃতদৃষ্টি, তাঁরাও দেশের মানুষই। তাঁদের অন্যায়কে দমিত করতে হবে, তার জন্যে তাঁদের অনাচরণের বিরুদ্ধে অভিযানও চালাতে হবে। কিন্তু তবু তাঁদের ঝাড়েবংশে নিপাত করা নীতিজ্ঞানসম্মত নয়। এমন সমাজের শাসন চাই, যাতে অন্যায়ের আবাদ সম্ভবই হবে না।

একথার মধ্যে ঊনিশ শতকী উদার মানবতাবাদের প্রভাব হয়ত উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু তাই বলে চিত্তরঞ্জন বিপ্লববিরোধী ছিলেন এবং সশস্ত্র সংঘাতকে তিনি সর্বাবস্থায় বর্জনীয় ভাবতেন মনে করলে ভুল করা হবে। পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুল করে কোন সওদাগরী অফিসের ম্যানেজারকে হত্যা করায় যখন গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়, গোপীনাথের দেশপ্রেমকে প্রশংসা করে তাঁর উদ্দেশে শোক-প্রস্তাব গ্রহণের দাবী কংগ্রেসে তুলেছিলেন তিনিই। স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ভাষায় তিনি বলেছেন তাঁর একটি বক্তৃতায় যে সূক্ষ্ম বিচারের তুলাদণ্ডে হিংসা-অহিংসার মূল্য যাচাই করে বৃথা সময় নষ্ট করা মূঢ়তা। দেশকে বন্ধনমুক্ত করার কাজে কোন পথই নগণ্য নয়। রাণাপ্রতাপ, গুরুগোবিন্দ সিং ও ছত্রপতি শিবাজী অহিংসাবাদী ছিলেন না বলে কি তাঁদের অদেশপ্রেমিক বলব?

অনেকে ভাবেন কবিকর্মে ও স্বভাবধর্মে চিত্তরঞ্জন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদর্শের অনুগামী ছিলেন বলে, রাজনীতিক কর্মপন্থাতেও তিনি স্থিতাবস্থারই সমর্থক ছিলেন এবং চলতি সমাজের ঠাট বজায় রেখে শুধু সদবুদ্ধির আবেদনে তিনি জনমনস্তত্ত্বে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে চাইতেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ তাঁর সম্বন্ধে ভুল বিচার ত বটেই, অবিচারও। প্রথমত ব্যক্তির অভিরুচি ও লাভালাভের প্রশ্নকে তিনি জাতীয় স্বার্থ ও সম্ভ্রমের পাশে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করতেন। দ্বিতীয়ত দেশের স্বাধীনতাকে তিনি এত বড় করে দেখতেন যে, তার পথে বাধা সৃষ্টি করবে বুঝলে তিনি ধর্ম ও সাহিত্যশিল্পের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হতেন না। প্রথম জীবনের গৃহীত প্রত্যয় আর পরবর্তী জীবনের রূপান্তরিত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তাঁর যে বিরাট একটা পার্থক্য ঘটে গিয়েছিল, এ অনেকে তলিয়ে দেখেন নি।

কিন্তু নিজের মানসিক বিবর্তনের এই রূপটি তিনি মোটেই অস্বচ্ছ রেখে যান নি। তিনি বলেছেন, আমি কি চাই, আপনি কি বিশ্বাস করেন, সেটা বড় কথা নয়। সমস্ত দেশের সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, সুবিধা, বিশ্বাস ও অভিরুচিগুলো বলি দিতেই হবে। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের নালিশ খাড়া করে জাতীয় অগ্রযাত্রার পথ রোধ করা চলবে না। ইতিহাসই দেবে না তা করতে। ... ... সাহিত্য জীবনের প্রকাশ সন্দেহ নেই। ধর্ম মানুষের চরম আশ্রয়ও হয়ত। কিন্তু প্রয়োজন হলে সাহিত্য ও ধর্মকে বর্জন করব, কিন্তু মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের দাবীকে কোন অবস্থাতেই ছাড়তে পারব না। সাহিত্য ও ধর্মের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই সাহিত্য ও ধর্ম। কত সাহিত্য লুপ্ত হয়ে গেছে, কত ধর্ম মুছে গেছে। কিন্তু মানুষের প্রবাহ অব্যাহতই আছে, থাকবেও চিরদিন। এই খণ্ড-খণ্ড বক্তব্যের মধ্যে মানুষ চিত্তরঞ্জনের যে অখণ্ড ব্যক্তি স্বরূপটি ফুটে ওঠে, আমাদের সেদিনকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীতে কোথাও তার জুড়ি পাওয়া যাবে না। অন্তর্লোকে এই রকম সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন বলেই তিনি গান্ধী নেতৃত্বের সার্বিক অভ্যুদয়ের দিনেও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে স্বরাজ্য দল গড়তে পেরেছিলেন। স্বয়ং গান্ধীজী তাঁর এই অসম সাহসিক ভিতরের রূপটি চিনেছিলেন, তাই তাঁর নমনীয় অনুগামীদের চেয়ে এই বিদ্রোহী অনুজকেই বেশী সম্মানের অধিকারী করেছিলেন তিনি। চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের অল্প পরের একটি আলোচনায় তিনি লিখেছিলেন, ন্যায় ও সত্যের তিনি ধৃতব্রত সৈনিক ছিলেন। কোন প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের খাতিরেই যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধ পথে পা বাড়াতেন না তিনি। তাঁর এই সংগ্রামশীল সৌহার্দ্যই তাঁকে আমার এতটা প্রিয় করেছিল।

আজ চিত্তরঞ্জন জন্মশতবর্ষের সূচনায় তাঁর ভেতরের সেই বিদ্রোহী সত্তাটিকে জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া দরকার। কারণ তা হলে এই অমিত শক্তিমান মানুষটিকে কোন দিনই আমরা চিনব না। সুরেন্দ্রনাথ ও নৌরজীদের আপোষপন্থী নেতৃত্ব নাকচ করে গান্ধীজীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই একটি তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংসাপন্থী নেতৃত্বের ওপরে চিত্তরঞ্জনের সংগ্রামশীল নেতৃত্বও কম গণনীয় ঘটনা নয়। কিন্তু দুঃখের কথা যে, চিত্তরঞ্জনের অকাল প্রয়াণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আমাদের রাজনীতিক চিন্তাধারায় দ্রুত পরিবর্তন, ইংরেজ শাসনের অবসান ও দেশের স্বাধীনতা লাভ...একের পর এক দ্রুতলয়ে ঘটেছে এবং তার অনিবার্য ফল হিসাবেই চিত্তরঞ্জনের চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়নে এসেছে খানিকটা অনবধানজনিত অবিচার, যার জন্যে তিনি অনুচিতভাবেই গিয়ে পড়েছেন সনাতনী শিবিরে, যা তিনি নন।

নিজের রাজনীতিক লক্ষ্যবস্তু ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, ইংরেজ যদি স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে না যায়, দরকার হলে আমরা বিদ্রোহের পথে দেশ স্বাধীন করব। আর স্বাধীন দেশকে কলুষ-মুক্ত করব বিপ্লব ঘটিয়ে। অন্যায় শাসনের মতই অন্যায় শোষণও দেশের পরম শত্রু। নিছক স্বাধীনতা লাভের পুণ্যেই সে শত্রু নিপাত হবে না। স্বাধীনতা লাভের দুই দশকেরও বেশী আগে জীবনান্ত হয়েছে চিত্তরঞ্জনের। তখন তিনি যে কথা বলে গেছেন, স্বাধীনতা লাভের দুই দশকের পরেও আজ আমরা বুঝছি তা কত সত্যি কথা। শুধু স্বাধীনতাই যে সব নয়, তাকে জনজীবনের সহায়ক করাই যে আসল কাজ এবং তা যে সমাজ বিপ্লবের দ্বারা ভিন্ন সম্ভব নয়, এ আমরা বুঝেছি কি আজ পর্যন্ত? এখনো কি ধারণা হয়েছে আমাদের যে, বিদ্রোহ আর বিপ্লব এক নয়? প্রথমটা দ্বিতীয়টার ভূমিকামাত্র এবং সেখানে থেমে দাঁড়ালে প্রতিবিপ্লব এসেই সমস্ত গঠনকে গ্রাস করে?

দেশবন্ধুর কণ্ঠস্বর

১
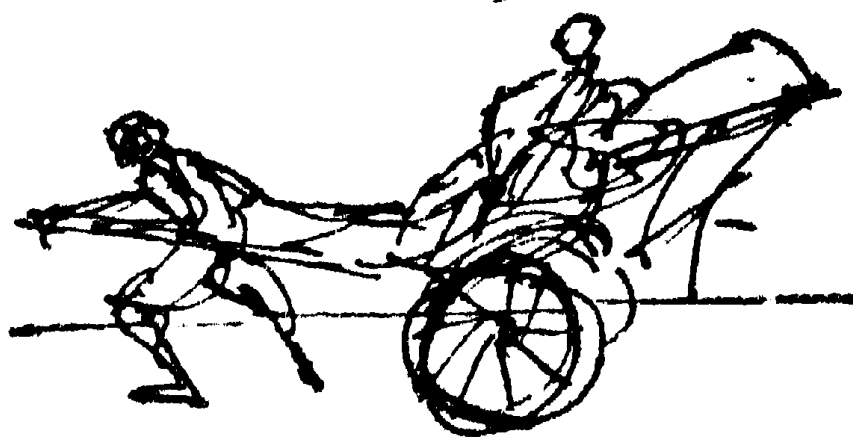
এক ।।

আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অভিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবন সঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন—ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির একমাত্র কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায় এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের অঙ্গমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদের চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণ-বিবরে এক আশ্চর্য অপূর্ব স্বাধীনতা-সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না?

'আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাসে বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হয়। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনো মিলিবে না।

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদের অনেক দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সেকথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে একদিন আমরা ইংরাজের বাকচাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধুমাত্র তাহার মুখের কথার উপর আমাদের মান আশা-ভরসার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলাম। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের ক্ষমতা দেখিয়া আত্মপ্রভাব হারাইয়াছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়ত প্রতারিত হইয়াছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। মহারাণীর যে ঘোষণা (Proclamation) লইয়া আমরা এত গর্ব করি, তার মধ্যে যে আমাদের সকল আশা-ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য 'So far as it may be —' এই মারাত্মক বাক্যটি লুক্কায়িত ছিল, তাহা একবারও অনুভব করিতে পারি নাই। কার্জন বাহাদুরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরাও এখন ভাল করিয়া মহারাণীর ঘোষণার এই গূঢ় তত্ত্ব মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ভগবান আমাদের সহায় হউন, এই সত্যজ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, Pax Britanica-র প্রসাদে ভারতে এখন মহাশান্তি বিরাজ করিতেছে। হায়রে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তি, হায় আমরা অভাগা আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে এই দেশব্যাপী নিস্তব্ধ শান্তি আমাদের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিবার উপায় মাত্র। ইহা যদি শান্তি হয়, আমি বলিব ইহা মৃত্যুর শান্তি। ইহার উপরে কোনদিন কোন কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ঈশ্বরের প্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ-ছায়ারূপী এই কুহেলিকা অপসৃত হইয়াছে। এই নব উন্মোচিত জাতীয়তার প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নব-আন্দোলন আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়; ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের প্রথম পদক্ষেপ। আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত বন্দে মাতরম্ মন্ত্রেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্ত হতভাগা।

[১৯০৬ খৃঃ অক্টোবরে দার্জিলিং হিন্দু হলে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতার অংশ]

দুই ।।

...সমগ্র জীবনটাকে টুকরো টুকরো করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং ধারকরা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাংলা দেশের সমগ্র বাঙালী জাতির একটা সর্বাঙ্গীণ সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া, এই সব মন-গড়া জীবনখণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর-বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবনখণ্ড ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের

সব দিক দিয়া কি দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?...বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজা-প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা।

কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, বাঙালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে একটু অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙালীকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাংলাকে জানে না।

আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সব দিক দিয়াই দেখিতে হবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই আজ এই মহা-সভায় কয়টি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃস্টান হউক, বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে।

তিন ।।

...আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিপদ যে, আমরা ক্রমশই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার অনেকটা ইংরাজভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা Politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এই দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কিনা, তাহা ত একবারও ভাবি না, ...ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে ও কোরানে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিঃশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি এই-বার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়, বক্তৃতার ব্যাপারমাত্র। আমরা বক্তৃতা করিয়া, তর্ক করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার-করা কথার ছাব লাগাইয়া দিই। যাহা স্বভাবত সহজ সরল তাহাকে মিছামিছি বিনাকারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না; বাংলার কথা, বাঙালীর কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই; এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না।

...বাংলার কথা যেন অচিরে বাঙালীর কার্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবনযজ্ঞ ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্মনির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তিসংগত, ন্যায়সংগত, আমাদের স্বভাবধর্মসঙ্গত। এই অধিকার হইতে কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।'

[ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ১৯১৭ খৃঃ এপ্রিল।

চার ।।

দেশই আমাদের ধর্ম, আমার চির-জীবনের আদর্শ—ঐ দেশ। দেশ বলিলে আমি আমার সম্মুখে আমার ভগবানকে দেখিতে পাই।...আপনারা দেশ ও রাজনীতি পৃথক করিবেন না। আপনাদের শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যথেষ্ট সংশ্রব আছে। উহা আপনাদের ধর্মের অভিব্যক্তি। এদেশের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, মানবজীবন পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত। তাঁহাদের মতে রাজনীতি স্বতন্ত্র পদার্থ। তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, মানুষের আত্মা সর্বত্র সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা যেমন এক জাতির প্রাণও তেমনি এক।

[ময়মনসিংহ বক্তৃতা ১৯১৭ খৃঃ ১০ অকটোবর]

পাঁচ ।।

স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অধিকার দিবেন, কতটুকু অধিকার চাহিলে তাহা গভর্ণমেণ্ট শুনিবেন তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহাই চাহিতে হইবে—ভীত হইবেন না, দেশের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা নির্ভয়ে দাবী করিতে হইবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ যে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন স্বার্থ, অশিক্ষিতের সংখ্যাবাহুল্য স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে নির্দেশ করেন, আমি বলি সেইজন্যই স্বায়ত্তশাসন চাই। এই জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত বৈষম্য দূর করিতে ও দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যই আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই—এই সমস্ত অনৈক্য দূর করিতে স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র পন্থা।

[ঢাকা বক্তৃতা ১৯১৭ খৃঃ অকটোবর]

আমি আগেও বলেছি আবার এখনো বলছি যে, আমি রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা যে কোন প্রকারের হিংসাত্মক কাজের বিরোধী। আমি মনে করি ইহা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষারও বিরোধী। আমি সুনিশ্চিতভাবেই অনুভব করি যে, যদি হিংসাত্মক কার্য আমাদের রাজনৈতিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে, তাহলে স্বরাজ্যের পথ চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এখন আমরা দেশে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে আমি এর অবসান কামনা করি।

আমি আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি যে, আমি সকলরকম সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং হিংসাত্মক কার্যের মতো আমি এই জাতীয় অত্যাচারকে ঘৃণা করি। অত্যাচার দ্বারা রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যা কখনো বন্ধ হয় না। এবং অত্যাচারের ফলে ইহার পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিক নয়। আমরা স্বরাজ-লাভের জন্য দৃঢ়সংকল্প এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্মানজনক অংশীদারত্ব ও সমতার ভিত্তিতেই আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই। হয়ত এই সংগ্রাম সুদীর্ঘ হবে, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করার জন্য দৃঢ়সংকল্প।

বাংলার তরুণদের আমি বলি—স্বরাজ-লাভের জন্য তোমরা সংগ্রাম কর, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সংগ্রাম কর। তোমাদের অভীষ্টের উপরে যেন কলঙ্ক আরোপিত না হয়। কঠিন ও অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পথে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। স্বরাজলাভ করতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলো।

[১৯২৫ খৃঃ ২৯ মার্চ]

ছয় ।।

মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, স্বরাজের আদর্শ অপেক্ষা স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। ইহা সত্য যে স্বাধীনতার অর্থ অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মূলতঃ অভাবাত্মক কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্মক (positive) কিছু স্বতঃই আমরা নাও পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি না যে, স্বাধীনতা ও স্বরাজ পরস্পর বিরোধী অথবা ইহার একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য-বিধান হইতে পারে না। এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয়—

ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে, যদি যে-কোন উপায়েই হউক ইংরাজরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বরাজলাভ একটা বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা। সেই বস্তুটি কি? কি উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন এবং সত্যই ইহা সুস্পষ্ট উত্তরের দাবী আমাদের নিকট করিতে পারে। স্বরাজের স্বাধীনতার আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? স্বরাজের আদর্শে কি আছে যাহা স্বাধীনতার আদর্শে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ।

কেবল স্বাধীনতায়ই স্বরাজলাভ হইবে না। স্বরাজের আদর্শ আরও মহত্তর। ইংরাজ চলিয়া গেলে অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। পক্ষান্তরে ইংরাজ থাকিয়াও যদি জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভে কোন বাধা না জন্মে, তবে ইংরাজ থাকুক, তাহাতে আপত্তি কি? স্বরাজ আর স্বায়ত্তশাসন এক নহে। আমার স্বরাজের আদর্শের সহিত শাসন প্রণালী—তাহা ঘরেরই হউক অথবা পরেরই হউক—কোন রূপেই সংশ্লিষ্ট নয়। তবে যে স্বায়ত্ত-শাসন আত্মকল্যাণের জন্য বিধিবিধান, তাহা কতকটা স্বরাজের আদর্শের নিকটবর্তী। জাতীয় সর্বাঙ্গীন বিকাশলাভের অবাধ প্রয়াসই খাঁটি স্বরাজ সাধনা।

[ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন সভাপতির ভাষণাংশ ১৯২৫ খৃঃ ২ মে]

দেশবন্ধুর জীবনপঞ্জী

১৮৭০ খৃঃ ৫ নভেম্বর—জন্ম।

১৮৮৬ খৃঃ—এণ্ট্রান্স পাশ।

১৮৯০ খৃঃ—বি. এ, পরীক্ষায় পাশ ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য লণ্ডন গমন।

১৮৯১-৯২ খৃঃ—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা অসমাপ্ত রাখেন।

১৮৯৩ খৃঃ—ডিসেম্বর—ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান।

১৮৯৫ খৃঃ—প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' প্রকাশ।

১৮৯৬ খৃঃ—পিতৃঋণের জন্য আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত।

১৮৯৭ খৃঃ—৩ ডিসেম্বর বাসন্তী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

১৮৯১ খৃঃ—পুত্র চিত্তরঞ্জনের জন্ম।

১৯০৫ খৃঃ—স্বদেশীমণ্ডল স্থাপন ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান।

১৯০৬ খৃঃ—ইন্‌সলভেন্সি কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ।

১৯০৬ খৃঃ—বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাব রচনা।

১৯০৭ খৃঃ—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের মামলায় তাঁদের পক্ষ সমর্থন। এঁরা রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন।

১৯০৭-৮ খৃঃ—রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত বিপ্লবীদের পক্ষ গ্রহণ।

১৯০৯ খৃঃ—আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন। ডুমরাঁও মামলা গ্রহণ।

১৯১০ খৃঃ—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাসের পক্ষ অবলম্বন।

১৯১১ খৃঃ—দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড গমন ও 'সাগর-সঙ্গীত' রচনা।
—সেন্সাস কোর্টে ভাষণ।

১৯১৩ খৃঃ—দেউলিয়া থেকে নিষ্কৃতিলাভ। মাতা নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যু।

১৯১৪ খৃঃ—দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী-পক্ষের পক্ষ অবলম্বন।
—'নারায়ণ' প্রকাশিত।

১৯১৭ খৃঃ—ভারতসচিব মন্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
—ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি।
—বাঁকিপুর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯১৮ খৃঃ—বোম্বাইএ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান।
—দিল্লী কংগ্রেসে রাউলাট কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা।

১৯১৯ খৃঃ—ময়দানের জনসভায় সত্যাগ্রহের শপথ গ্রহণ।
—ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান।
—কংগ্রেস-পরিচালিত জালিয়ান-ওয়ালাবাগ তদন্তকার্যে যোগদান।
—অমৃতসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান এবং নতুন শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও প্রস্তাব উত্থাপন।

১৯২০ খৃঃ—কলকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ-নীতির বিরোধিতা।
—নাগপুরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে যোগদান ও অসহযোগনীতির সমর্থন।
—২০ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাব এনকোয়ারি কমিটিতে সাক্ষ্যদান।
—১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
—১৮ জানুয়ারি ওরিএন্টাল জীবনবীমা কোম্পানির সেক্রেটারী শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত 'দেশবন্ধু' আখ্যা দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন। সেই থেকে 'দেশবন্ধু' নামে পরিচিত।

১৯২১ খৃঃ—আইনব্যবসায় ত্যাগ।
—বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ।
—দেশবন্ধুর অধীনে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের যোগদান।
—সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তারবরণ।
—আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২২ খৃঃ—ছয় মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড।
—গয়া কংগ্রেসের সভাপতি।

১৯২৩ খৃঃ—মতিলাল নেহরুর সহযোগিতায় 'স্বরাজ্যদল' গঠন।
—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের সভাপতি।
—ইংরেজি দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশ।

১৯২৪ খৃঃ—কলকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত।
—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাজ্য দলের প্রথম দলপতি।
—তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পরিচালনা।
—সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান।
—কলকাতায় নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের সম্মিলন।
—শেষবারের মত কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে যোগদান।

১৯২৫ খৃঃ মে—ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি।

১৯২৫ খৃঃ ১৬ জুন—দার্জিলিং-এ মৃত্যু।

[হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'দেশবন্ধুর স্মৃতি' এবং মণি বাগচীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রন্থ থেকে]

দেশবাসীর অভিনন্দন

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রীকরকমলে—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তিপথযাত্রী যত নরনারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে সবিস্ময়ে নমস্কার করি। সুজলা সুফলা শ্যামলা মা আমাদের অবমানিতা শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনিগণের উদ্দেশে স্বতঃউচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু সে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজো সে তেমনই গোপন শুধু তোমাদের জন্যই থাক। কিন্তু, আর একদিন এই বাংলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া, বরণ করিয়াছিল। সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাংলার নিগূঢ় মর্ম-স্থানটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত কাহারো রুদ্ধদ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ সেখানে মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। সেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্বপনে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই, তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের স্বাধীনতার মূল্য প্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বহু বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জনালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইতে হইল—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই ত তোমার ব্যথা। এই তো তোমার দান।

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না,—তাই বাংলা যখন তোমাকে 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতা কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই। সমস্ত স্বদেশ, তাইত আজ তোমার করতলে। তাইত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙ্গালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টা, গুজরাটি যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনি করিয়াই মানব-জীবনের দেনাপাওনার পরিশোধ হয়, এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতি সর্বদেশ, সর্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোন-মতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোন-দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘবাণী—স্বদেশে বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব—বাঙ্গালী তুমি, তাইত সমস্ত বাংলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ, তুমি চিরজীবি হও, তুমি জয়যুক্ত হও।

—তোমার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ।

[দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর ২৬ শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩২৯ সালে হেদুয়া পার্কে সম্বর্ধনা সভায় পঠিত মানপত্র। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।]

দেশবন্ধু

এক ।। প্রফুল্লচন্দ্র রায়

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আজ বাংলায় এমনকি সমগ্র ভারতে হাহাকার পড়িয়াছে কেন? রাজা মহারাজা বল, নরমপন্থী চরম-পন্থী বল, দোকানী পশারী বল, সকলের মধ্যেই ক্রন্দনের রোল কেন? যাঁহারা রাজ-নীতিক্ষেত্রে কখনই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এমনকি বিপরীত মতা-বলম্বীও ছিলেন, তাঁহারাও আজ সমস্বরে তাঁহার মৃত্যুতে যে কেবল শোক প্রকাশ করিতেছেন তাহা নয়, তাঁহার গুণকীর্তনেও শতমুখ। আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া আমি বাংলার রাজনীতি আলোচনা দেখিতেছি। অনেকেই ইঁহার পূর্বে এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু দেশবন্ধুর ন্যায় অনন্যকর্মা ও সর্বত্যাগী হইয়া স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে এই প্রকার আত্মোৎসর্গ করিতে কদাপি দেখি নাই। যিনি ভোগ-লালসা ও বিলাসিতার মধ্যে আশৈশব মানুষ হইয়াছিলেন, এবং পরিণত বয়সেও তাহাতে ডুবিয়া ছিলেন; তিনিই এক মহাশুভ মুহূর্তে, দেশের পক্ষে এক মহামাহেন্দ্রক্ষণে, সকল ছাড়িয়া রিক্ত হইয়া বহু শতাব্দী পূর্বেকার কপিলাবস্তুর রাজ-পুত্রের ন্যায় পরিণাম বিবেচনা না করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন। হয়ত তিনি আর্তা, বিপন্না, লাঞ্ছিতা দেশমাতার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। দেশের কাজে এ-প্রকার আত্মোৎসর্গ, এ-প্রকার জীবনাহুতি কখনও দেখি নাই—আর দেখিব কিনা তাও জানি না। সকলেই আজ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন—হ্যাঁ, বাঙ্গালীর ঘরে একটা মানুষ জন্মিয়াছিল বটে! যিনি নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, লাভ লোকসান গণনা না করিয়া, সর্বস্ব পণ করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দেশের সেবায়, স্বরাজসাধনায়,

তাঁহার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন, আর সেই নিয়োগের ফলেই আজ এমন অসময়ে তাঁহার বিয়োগ ঘটিয়াছে। দেশবন্ধু প্রকৃত প্রস্তাবে মরেন নাই। তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মে ও বাষ্পে পরিণত হইয়া পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাঁহার অমর ও সাধু দৃষ্টান্ত আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। এই প্রকারের মানুষ মরিয়াও অমর হয়। ভগবান করুন, যেন তাঁহার চিতাভস্ম সমগ্র ভারতের আকাশ-বাতাসে মিলাইয়া গিয়া নিঃশ্বাসের সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ভারত-বাসীকে তাঁহার সুমহান আদর্শে ও অনুরাগে, প্রদীপ্ত প্রতিভা ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলে। ভারতের জননীগণ যেন এই প্রকার সন্তানই গর্ভে ধারণ করেন।

'সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে;
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।'

শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লেখা চিঠি

(দেশবন্ধুর কারাবরণের সময় লেখা)

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সাইন্স
১৪-১২-২৭

প্রিয় ভগিনী

আমার হৃদয় এরূপ উদ্বেলিত হইয়াছে যে, আমি আমার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বোমার মামলার সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের

পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই হইতে তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অসীম বদান্যতা, তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও দুর্বলকে আশ্রয়দান বরাবরই আমাদের বিস্ময় ও ভক্তি উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যে বাঙ্গলার ও ভারতের যুবকবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যাঁহাদের মত-বিরোধ আছে, তাঁহারাও তাঁহার অপূর্ব স্বার্থত্যাগে বিস্মিত না হইয়া পারেন না। তাঁহার বর্তমান পরীক্ষার সময় আমার মন তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমি জনসাধারণ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন আছি; সুতরাং আমার মনে হয় আমি হয়ত তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কবি বলিয়াছেন—বৈজ্ঞানিকেরা পার্থিব গৌরবকেই অধিক ভালবাসিয়া থাকে। সারাজীবন আমি আমার প্রিয় বিষয়ে নিবিষ্ট থাকাতে হয়ত আমার অন্তর্দৃষ্টি কতকটা নষ্ট হইয়াছে। আমার মানসিক শক্তিও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

প্রিয় ভগিনী, আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার প্রিয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্য দিয়াই আমি আমার দেশের সেবা করিব। আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই এক। ভগবান জানেন আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আপনি বীরের মত হাসিমুখে সমস্ত বিপৎপাত সহ্য করিতেছেন, এবং আপনি বর্তমান বঙ্গদেশের নারীজাতির নিকট এমন এক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, যাহা রাজপুতদের সেই গৌরবের দিনের পর হইতে আজ পর্যন্ত আর কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যাকাশ যে ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে, এবং আপনার স্বামীও আমাদের নিকট শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

দুই ।। **সুভাষচন্দ্র বসু** ।।

দেশবন্ধু বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্মসম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (Pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে দর-কষাকষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে, আপোশে মিটমাট না করিয়া লড়াই করিলে মানুষ এক-দিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্যসমাজও একদিনও টিকিতে পারে না।

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না—অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। সেইজন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে শুধু তাহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালোবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি কালচারের দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ-শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। স্বরাজ জনসাধারণের জন্য, একথা পৃথিবীতে নূতন নয়। য়ুরোপে বহুকাল পূর্বে এ মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ কথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনি ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।

বাংলার সভ্যতা ও শিক্ষার সারসংকলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার গুণ বাঙ্গালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব ছিল যে তিনি বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বাংলাকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাংলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাংলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাংলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। দেশবন্ধুর সময়ে বাংলা স্বরাজ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিল। তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

তিন ।। **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** ।।

কর্মীদের উপর তাঁহার অসীম ভালবাসা। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী এত লোককে তিনি যে এক উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণই এই। হিংসা ও অহিংসা, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, শ্রমিক ও ধনিক প্রভৃতি হাজার বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক ও মতভেদ হইত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিবার সময় সর্বদাই একথা মনে থাকিত যে এ সমস্ত মতভেদ অবান্তর; আসল কথা এই যে তিনি দেশের প্রতি অগাধ ভালবাসার জোরে আমাদের সকলকে পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে অনেক গবেষণা শুনিয়াছি। দুই একখানা ফিরিঙ্গী সংবাদপত্র একথাও বলিয়াছে যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে উহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেন। এসব কথা যে কতদূর হেয়, তাহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানি। আমি যখন স্বরাজ্য দলের সংশ্রবে আসি তখন তিনি আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে অহিংস সম্বন্ধে স্বরাজ্য দলের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী আমি নিজে মানিয়া চলিব, এবং এমন কোন লোককে স্বরাজ্য দলে টানিয়া আনিব না যিনি ঐ আদর্শে আস্থাবান নহেন। আমি একথা ভাল করিয়াই জানি যে অহিংসাকে তিনি নিজে creed হিসাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন।

চার ।। **ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী** ।।

নেতার যেসব গুণ থাকার প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। দেশের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা তিনি করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাই অবস্থা বিশেষে তিনি Policy change করিতেন। সকল মতের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর খাঁটি দেশপ্রেমের জন্য সকল দলই তাঁর নিকট মাথা নত করিয়াছিল।

পাঁচ ।। **মৌলানা আবুল কালাম আজাদ** ।।

অন্যান্য গুণাবলীর সহিত দেশবন্ধুর অসাধারণ কর্মশক্তি এবং অসাম্প্রদায়িক উদারতায় আমি সর্বদাই মুগ্ধ থাকিতাম। এইরূপ উচ্চাঙ্গের উদারতা ভিন্ন হিন্দু-মুসলমান সমাধান অসম্ভব। আমরা উভয়ে যখনই এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতাম, তিনি ভুলিয়া যাইতেন তিনি হিন্দু, আমি ভুলিতাম যে আমি মুসলমান। বেঙ্গল প্যাক্ট সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত অত্যধিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার ফল।

ছয় ।। **হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত** ।।

চিত্তরঞ্জন বীর-সাধক ছিলেন। যখনই যে কাজ ধরিতেন, ধ্যাননিষ্ঠ তাপসের ন্যায় তাহাতে জীবনপাত করিতেন। কি আইন ব্যবসায়ে, কি লোকহিতকর অনুষ্ঠানে, কি স্বদেশসেবায় হৃদয়ের একপ্রাণতার জন্যই সর্বদা জয়লাভ তাঁহার করতলগত থাকিত।

আলোর উৎসে

বীরেন্দ্র দত্ত

হঠাৎ দপ্ করে সমস্ত আলো নিভে গেল। বিরাট হলঘরের একদিকে ঠিক আগের মতই বাজনা বেজে চলেছে। নিরুপম একভাবে চেয়ারে বসে রইল। মনে নিরুপমের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভারী, অনড়। নিরুপম নিশ্চুপ। ওর পাশের চেয়ারে একটু আগেই বসে ছিল মধুমিতা। মধুমিতার দু'গাল বেয়ে মদ অর্ধ-উন্মুক্ত বুকের খাঁজে ফোঁটা ফোঁটা জমছিল। আর বসে বসে সারা শরীর দেখিয়ে নিরুপমকে ভালবাসার আহ্লাদে ভেঙে পড়ছিল। আলো নিভতেই উঠে গেছে। নিরুপমের মনে হল, বিরাট হলঘরের মেঝেটা অন্ধকার-ঢালা জলে-ভর্তি সরোবর হয়ে গেছে! আর শীতল সাপেরা দু'টি দু'টি করে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে খেলার বিলাসে ভীষণ মেতে উঠেছে। যেন কখনো বা জল থেকে লাফিয়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠতার উল্লাসে। চারপাশে সাপগুলির সমবেত নিঃশ্বাস, গোপন পদশব্দ! নিরুপমের গা শির শির করে উঠল। অথচ চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোন চেষ্টাই নেই ওর।

আলো জ্বলে উঠল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজনা থেমে গেল। নিরুপম তখনো নির্বিকার। দেয়ালে আটকানো নকল গির্জাটির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে ফাঁকা হলঘরের দিকে তাকাতেই নিরুপম ভীষণ চমকে উঠল। হলের মধ্যে অপরিচিতদের কেউ নেই। সব পাশের ছোট ছোট ঘরগুলোয় লুকিয়ে পড়েছে, আর মাত্র কয়েকজন নিরুপমকে নিয়ে খেলার সুখে মাতাল। নিরুপম ওদের সকলকে চেনে — মধুমিতা, বল্লরী, তনুশ্রী, কল্পমায়া, বাসন্তিকা, সোনালি, আরও কে কে যেন! নিরুপম ভয়ে কাঠ হয়ে একভাবে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। ওরা সবাই নগ্নদেহ। প্রত্যেকের শরীর দুধের সর দিয়ে মাজা, পরিচ্ছন্ন। মুখ, বুক, গ্রীবা, নিতম্ব, নাভি-রেখার নিম্নদেশ, জানু থেকে পায়ের পাতা — সমস্ত কিছু দিয়ে নিরুপমকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরছে, নিরুপম এখানে, এই চেয়ারে বসে ভয়ে স্থির, নির্জীব। ওখানে নিরুপম বড় পুলকিত, আবিষ্ট। এখানে নিরুপম একা, বিষণ্ণ। একে ওরা কেউ চেনে না।

নিরুপম ওই রমণীগুলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওদের শরীর এত পরিচিত! এতবার হাতের মুঠোর মধ্যে ছোট-হয়ে-আসা গন্ধহীন ফুল ওরা! এখন ওদের দেখে নিরুপমের এতটুকু বিস্ময় বা শিহরণ জাগছে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিরুপম ভীষণ বিরক্ত বোধ করল। নতুন একটা মদের বোতলের মুখে হাত রেখে

ছিপি খুলতে লাগল। ছিপি কেবল ঘুরিয়েই যাচ্ছে, কিছুতেই খুলছে না। নিরুপম মনে মনে বিড়বিড় করল, রমণীদেহ ঈশ্বরের নিজের হাতে তৈরী যেন! ওরা কি সেই দেহে অত্যাচার বা ছলনা অথবা শুধুমাত্র লোভ মিশিয়েই নিরুপমকে এমনভাবে বিরক্তিকর আকর্ষণে ধরতে চাইবে? ওরা কি বাঁধতে জানে না? হঠাৎ দূরের রমণীগুলি যেন খেলায় হেরে গিয়ে চেয়ারে বসে-থাকা নিরুপমের দিকে এগিয়ে আসছে।

নিরুপম চকিতে উঠে দাঁড়াল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে নিরুপম। বড় সুইং দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। গভীর রাতের চৌরঙ্গীর নির্জন রাস্তা। সামনে ফাঁকা ময়দান। যুদ্ধকালীন বিপদসঙ্কেতে যেন সমস্ত আলোর মাথায় ঠুলি পরানো। একটা দমকল চলেছে তীব্রবেগে দক্ষিণ দিকে। নিরুপম দৌড়তে লাগল। ভীষণ জোরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে। এমন তেত্রিশ বছর বয়সে নিরুপম কখনো দৌড়য়নি। পিছন ফিরে না তাকালেও নিরুপম বুঝতে পারছে, রমণীগুলি ওর পিছু নিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে গঙ্গার ধারে এসেই নিরুপম ঘাসে-ঢাকা মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ভিজে মাটি আর কাঁচা সবুজ ঘাসের গন্ধ নাকে আসছে। কোথাও বুঝি ফুল ফুটে আছে। নিরুপম হঠাৎ তারও গন্ধ পেলো। 'এই যে, ওঠো নিরুপম, আমার হাত ধরো!' নিরুপম উপুড় হয়ে থেকে ওপর দিকে তাকাতেই ভয়ে সিঁটকে গেল। অসিতা ওকে ডাকছে। ও এখানে এলো কি করে! 'ভাবতে হবে না এখন, ওঠো।' হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অসিতা। ওকে তুলতে চাইছে। 'উঠছি দাঁড়াও।' নিরুপম উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। নিরুপম ঘামছে ভীষণ। উঠতে পারল না ও। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে নিরুপমের। ঘাসে মুখ গুঁজে নিরুপম অসহনীয় শ্বাসকষ্টে ছটফট করছে। নিরুপম বুঝি মরে যাবে......

ঘুম ভেঙে গেল নিরুপমের। বুকের ওপর দুটি হাত উপুড় করে পড়েছিল। নিরুপম স্বপ্ন দেখছিল। সরাতে গিয়ে হাতদুটো ব্যথায় টন টন করে উঠল। দরদর করে ঘাম দিচ্ছে। মাথার বালিশ ভিজে গেছে। গায়ের ভেজা গেঞ্জীও যেন অসহ্য গরমে পুড়ছে। স্বপ্নের চাপা ভয়ে নিরুপমের বুকের মধ্যে শব্দও যেন কিছু অনিয়মিত। ঘরের চারপাশ দেখে নিয়ে নিরুপম বিছানার ওপর উঠে বসল। মাথা ভার হয়ে আছে এখনো।

দুদিন জ্বর না থাকলেও শরীরের দুর্বলতা যায়নি। মাথার কাছে টেবিলে পিসিমা জল রেখে গেছেন। এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে নিল নিরুপম। এখন ক'টা বাজে? টেবিলের ওপর হাতঘড়ি দেখল। চারটে বাজেনি এখনো। সেই দুপুর থেকে ঘুমোচ্ছে নিরুপম। এমন অসহ্য গরমে পাখা ঘুরলেও ঘুম আসার কথা নয়; শুধু দুর্বলতা আর নিঃসঙ্গ অসহায় চিন্তার ভাবে নিরুপম ঘুমিয়ে পড়েছিল। গেঞ্জি খুলে পাশে রেখে দিল। বালিশের ঘামে-ভেজা দিকটা উল্টে মাথায় দিল। টান হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। ফুল স্পীডে ঘোরা পাখার বাতাসও অসহ্য।

এতদিন পরে নিরুপম এমন অদ্ভুত স্বপ্নটা দেখল কেন? মধুমিতাদের সঙ্গে তো অনেকদিন দেখা করা বন্ধ করে দিয়েছে? অসিতার স্বপ্নও এদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল কেন? নিরুপম ভয় পেলো। একটা কালো অন্ধকার ছায়া ওর শূন্যতার মধ্যে ভেসে এল। কয়েকদিন আগে পার্ক স্ট্রীটের এক সন্ধ্যেয় যেন সোনালিকেই দেখেছিল নিরুপম গাড়ির মধ্যে। পাশে এক সুদর্শন পাঞ্জাবী যুবক! নিরুপমের মনে পড়ে, এই সোনালির সঙ্গেই শেষ সন্ধ্যাটুকু কাটাতে হয়েছিল ওকে!

'হ্যালো নিরুপম!'

মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নিরুপম, ওর গা ঘেঁষে সোনালির গাড়ি।

'এমন অন্যমনস্ক হয়ে কোথায় চলেছ?' নিরুপমের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, 'কি পোষাক পরেছ! সো পুওর!' গলা নামিয়ে বলল, 'অবশ্য তোমাকে যে-কোন পোষাকেই দারুণ মানায়।'

নিরুপম শান্ত নিরুৎসাহ চোখে তাকিয়ে রইল সোনালির দিকে।

'উঠে এসো গাড়িতে, কথা আছে।'

'না, আজ থাক।' নিরুপম সোনালিকে স্পষ্ট করে দেখল। না, ও আজ মদ খেয়ে বেরোয়নি।

'কেন, দেখে তো মনে হচ্ছে কোন কাজ নেই!'

'কাজ না থাকলেও বাড়ি ফেরা দরকার।' নিরুপম এড়িয়ে যেতে চাইল।

'এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি! স্ট্রেঞ্জ!' নিরুপমের দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করল। 'এমন ঠান্ডা মেরে যাচ্ছো কেন? ওঠ তো।' বলেই সোনালি ওর পাশের দরজা খুলে দিল।

নিরুপমকে বাধ্য হয়েই উঠতে হয়েছিল। রাস্তার চারপাশে উৎসুক পথচারীদের দৃষ্টি ওকে বিরক্ত করছিল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল সোনালি। 'তোমার ক'মাস পাত্তাই নেই নিরুপম! ব্যাপার কি বলতো? শুনলাম, তুমি নাকি মদ খেকে শুরু করে একেবারে সবকিছুই ছেড়ে দিয়েছ! মিঃ সেন, মিঃ বাগচী—তোমার সব বন্ধুরা তোমার বাড়ি গিয়ে হতাশ হয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছে। আমিও তো ক'দিন ফোন করেও পাইনি। অবশ্য তোমার মা-বাবার স্যাড নিউজের কথাটাও ভেবেছি।'

গাড়ি আস্তে আস্তে চলেছে। নিরুপম বাইরে তাকিয়ে ছিল। 'কথাটা ঠিকই। আমার কিছু ভাল লাগছে না।'

সোনালি খিলখিল করে হেসে উঠল। নিরুপমকে কয়েক মুহূর্ত নিবিষ্ট চোখে দেখে নিয়ে স্বগতোক্তির মত বলল, 'আহ্, সো লাভলি ইউ আর, নিরুপম!' নীরব থেকে কি যেন ভাবল। 'হোটেলে যাবে? চল, ওখানেই কিছু খেয়ে নেবে। দেখবে, এই সব রাবিশ চিন্তাগুলো আর থাকবে না।'

'না মিস্ গুপ্ত।' নিরুপমের গলা ঠান্ডা, ঈষৎ কঠিন।

'কতদিন তোমাকে একা পাইনি নিরুপম! তুমি এত নটি হয়ে উঠছ!'

'তুমি কোথায় বেরিয়েছ বল। সেখানে গিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।'

সোনালি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। গাড়ি পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে লাল আলোয় থেমে গেল। সোনালি স্টিয়ারিং-এর ওপর হাতদুটো অলসভাবে রেখে বলল, 'আজ আমি ভীষণ লোনলি নিরুপম। তোমাকে পেয়ে যেন স্বর্গ পেয়েছি। আমাকে একটু সঙ্গ দাও।'

সোনালি ওর পুরনো কোন দুঃখ শোনাতে বসবে ভেবে নিরুপম সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমি কিন্তু হোটেলে যাব না। চল, বরং ভিক্টোরিয়ার সামনে একটু বসি। ওখানে বসে বসেই গল্প করা যাবে।'

'না, ওখানে ভীষণ ভিড়। নিরুপম তার চেয়ে বরং আমাদের বাড়ি চল। সন্ধ্যেটা মন্দ লাগবে না।' সোনালি নীল বাতি জ্বলতেই গাড়ি সোজা চালালো।

'আমাকে কিন্তু ভাল লাগবে না সোনালি, দেখো, ভীষণ বোরিং লাগবে। আমিও আজকাল ঐ চার দেয়ালের মধ্যে একটুতেই হাঁপিয়ে উঠি।'

সোনালি নিরুপমকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'জানি, তুমি ভীষণ কোল্ড, ক্যালাস হয়ে পড়ছ নিরুপম। চল তো, দেখবে, আমার কাছে থাকলে তোমার এক মুহূর্তও বোরিং লাগবে না। আমারও না।' বব চুলের একটা গুচ্ছ বাতাসে ঠোঁটের ওপর পড়ছিল। মাথা ঈষৎ নেড়ে ঠিক করে নিয়ে বলল, 'বলো, আমার কাছে থেকে সত্যি কোনদিন কি তুমি বোরড ফিল করেছ?'

নিরুপম নিজের মধ্যে চমকে উঠেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় সোনালির বাড়ি ওর মা, বাবা, ভাই-বোন কেউ ছিল না। এমন নির্জন হবে, নিরুপমের ধারণায় ছিল না। সোনালির ঘরে বসে সোনালি বার বার অনুরোধ করলেও মদ খায়নি সেদিন। সোনালি নানা কথায় এক সময়ে নিরুপমের পাশে এসে বসেছিল।

'নিরুপম!'

'চল সোনালি, বাইরে বেড়াই। এই ঘর ভাল লাগছে না। মাথা ঝিম ঝিম করছে।' নিরুপম বিষণ্ণ গলায় বলল।

'ভাল লাগবে, তুমি আমার কাছে এসো।' সোনালি নিজেই সরে এসেছিল নিরুপমের কাছে। নিরুপমকে তখনো নীরব, নিস্তেজ দেখে সোনালি জড়িয়ে ধরেছিল। 'নিরুপম, তুমি কি বুঝতে পারছ না, নাউ আই আম ডাইং ফর এ কিস। প্লীজ!'

নিরুপম তখনি এক শূন্যের মধ্যে ভাসছিল। 'আমাকে ছেড়ে দাও সোনালি, আমি সত্যি ক্লান্ত।'

সোনালি আর একটি কথাও বলতে দেয়নি। নিরুপমকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমুতে সারা মুখমণ্ডল ঢেকে দিচ্ছিল তখন। নিরুপম কাঠের মূর্তির মত স্থির, নিষ্প্রাণ। এক সময়ে পাশেই হাত বাড়িয়ে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল সোনালি। শরীরে কোন আবরণ রাখেনি। সোনালি ওর গাছ-গাছড়া, ডাল-পালা, পাতা-ফুল-ফল—সব দিয়ে নিরুপমকে ধরতে চাইছিল। জলে ভেজা শরীরে কচুরিপানার পাতা যেমনভাবে লেপটে থাকে, সোনালি সেইভাবে লেগে থাকছিল। নিরুপমের তখনি চিবোনো ডাঁটার কথা মনে হচ্ছিল। নিরুপম কাটা গাছের শক্ত গুঁড়ির মত বসেছিল। সোনালি গুঁড়িটার সমস্ত শুকনো ছাল সরাতে পেরেছিল এক এক করে। কিন্তু ভিতরের কাঠটা যে একেবারে রসহীন হবে, ভাবেনি। সোনালি অন্ধকার ঘরে লজ্জায়, অপমানে নির্লজ্জ শরীর ঢেকে ফেলেছিল। নিরুপমকে রাগে-দুঃখে এলোপাথাড়ি মারতে চেয়েছিল। নিরুপম অন্ধকারেই সমস্ত পোষাক এক এক করে পরে কোন কথা না বলে ওর বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। বল্লরী, মধুমিতা, কল্পনারা যে যার মত নিরুপমকে বুঝে নিয়েছিল। তাই গোপনেই তারা নিরুপমের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। সবশেষে সোনালি বুঝতে পেরেছে ভেবে নিরুপম সেদিন খুশী হয়েছিল খুব।

নিরুপম এখন ভেবে দেখল, এর পর আর কারো সঙ্গে দেখা করেনি ও। ওদের মধ্যে যাবার এতটুকু লোভও হয় নি। মিঃ সেন, বাগচী, লাহিড়ীদেরও সরাতে পেরেছে। এখন তাহলে কি রকম নিরুপম? শান্ত, শীতল, নুয়ে-পড়া এক বৃদ্ধের মত নির্বিকার, নিরাসক্ত। বহু ভোগের পর আর এক ভক্ত সাধু নয় তো? নিরুপম নিজে-নিজেই হেসে উঠল।

'ঘুম ভেঙেছে নিরুপম?' পিসিমা ঘরে ঢুকলেন। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'শরীর কি রকম?'

'ভাল', তবে মাথা ভার এখনো যায় নি।'

'দুর্বল থাকলে ওরকম মনে হয়। কিছু খেয়ে নে, ছাড়বে।' নিরুপমের গায়ে হাত বুলিয়ে তাপমাত্রা বুঝতে চাইলেন। হাত সরিয়ে বললেন, 'চিঠিটা নে। তোর চিঠি। বোধ হয় কোথাও চাকরীর ব্যাপার কিছু।'

নিরুপম চিঠিটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাম ছিঁড়ল। পড়ে নিয়ে বলল, 'শেষ যে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, সেখানেই চাকরীটা হল পিসিমা।' হাসল নিরুপম। 'তোমার কথাই ঠিক।'

'কবে জয়েন করতে হবে?'

'সামনের মাসের এক তারিখে।'

'তার আগেই তুই সেরে উঠবি। ভালই হল রে, মন খারাপ করে এখানে-ওখানে ঘুরেছিলি, এবার মন ভাল হবে।'

নিরুপম মৃদু হাসল।

'উঠে বস। মুখ ধুয়ে নে। খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।' পিসিমা চলে গেলেন।

নিরুপম দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। সিগারেট ধরালো। অসিতাও একদিন বলেছিল, 'দেখবেন, চাকরী পেলেই আপনার এই একা-একা থাকার অসুখটা চলে যাবে। দশটা-পাঁচটা ডিউটি, নতুন পরিবেশ। তখন আজে-বাজে চিন্তার সুযোগই পাবেন না!' তাই কি! নতুন পরিবেশ, নতুন পরিচয়ে নিরুপম তখন অন্য মানুষ! অফিসের পর মাঝে-মাঝে অসিতার দুটি ভাই তিতু-মিতুদের পড়াতে যাবে। ওর অতীত ওকে আর শূন্যের মধ্যে ফেলতে পারবে না! নিরুপম ঈষৎ উত্তেজিত বোধ করল।

অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট টানতে-টানতে নিরুপম সামনে আলমারীর বড় আর্শির দিকে তাকাল। ভাগ্য নিরুপমকে আবার কোথায় নিয়ে যাবে? নিরুপম বিড়-বিড় বলল। নিরুপম নিজেকে নতুন করে দেখলে। সত্যি সে সুন্দর, ফর্সা এক সুদর্শন যুবক। মুখ, চোখ তীক্ষ্ণ, স্মার্ট। মধুমিতারা তাই বলত। ওরা প্রত্যেকে গোপনে নিরুপমকে নিয়ে খেলা করেছে। ভয়ঙ্কর খেলা। আর নিরুপম মাতাল হয়ে সেই খেলায় ডুবে ছিল অনেক দিন।

নিরুপম আর্শির প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কিশোর বয়স থেকেই ভয়ংকর বিলাসে পরিতৃপ্ত মা নিরুপমকে ওদের সমাজের মত করে গড়ে তুলছিলেন। বিরাট এক কোম্পানীর ম্যানেজার বাবাও মায়ের ইচ্ছায় মত দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা-মা কোনদিন খোঁজ রাখেন নি, নিরুপম এ সবের মধ্যে কেমন তিল-তিল করে এক শূন্যের মধ্যে চলে আসছিল। নেশা থেকে কি ভয়ংকর এক ক্লান্তি, বিষণ্ণতা নিরুপমকে দুরারোগ্য ব্যাধির মত আক্রমণ করছিল। নিরুপম নিজের মনেই হাসল। এক বছর আগে লিভার পচে বাবার আকস্মিক মৃত্যু, তার পর কয়েক দিনের মধ্যে মায়ের সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে শেষ হয়ে যাওয়া, দেনার দায়ে বাড়ী-গাড়ী বিক্রী হয়ে যাওয়ার মত ঘটনাগুলি নিরুপমকে কি অদ্ভুত বাঁচিয়ে দিয়েছে!

নিরুপম ভাবতে-ভাবতেই বাইরে তাকাল। 'এই ভালো' নিরুপম নিজের মনে উচ্চারণ করল। বাবা-মার কাছে পিসিমা নানা উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞ ছিলেন। নিরুপম সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিসিমার কাছে বেশ আছে। পিসিমার দুই ছেলে বাইরে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। একেবারে ছোট, দশ বছরের ছেলে শন্তু যেন নিরুপমের বন্ধু। এই শন্তুকে স্কুলে ভর্তি করতে গিয়েই অসিতাকে প্রথম দেখে নিরুপম।

অসিতার কথা মনে হতেই আবার একটু আগে দেখা স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল। মধুমিতাদের স্বপ্নের সঙ্গে অসিতা কেমন জড়িয়ে গেছে! নিরুপমের মনে পড়ে, ও তখন একা চুপ করে বাড়ীতে বসে থাকত। নিরুপমের মধ্যে যেন চারপাশের কোন আকর্ষণ ছিল না। ফাঁকা, শূন্য মনে

হত নিজেকে। নানান ভাবনার মধ্যেই মাঝে-মাঝে মাথার যন্ত্রণা হত। নিরুপম দু চোখ বন্ধ করে এক অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়াত। শ্বাসকষ্ট হত ওর। পেটে একটা অকারণ যন্ত্রণা ঠেলে উঠত। নীরব থেকে নিরুপম তা সহ্য করত। আর সব যন্ত্রণা সরে গেলে নিরুপম ভীষণ অসহায়, ক্লান্ত, বিষণ্ণ বোধ করত। এটা ওর গোপন ব্যাধি ছিল. পিসিমা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই নিরুপমকে নানা কাজে-অকাজে বাইরে পাঠাতে চাইতেন।

মাস ছয়েক আগে শন্তুর নতুন ক্লাসে ওঠার ব্যাপারেই পিসিমা নিরুপমকে পাঠিয়েছিলেন ওর স্কুলে। ঐ স্কুলেই শন্তুর ক্লাশ-টিচার অসিতার সঙ্গে প্রথম দেখা। এর পর বেশ কয়েকবার নিরুপমকে যেতে হয়েছিল ওদের স্কুলে। অসিতাই শন্তুর ভর্তির ব্যাপার ঠিক করে দিয়েছিল। এই কদিনের দেখা হওয়ার মধ্যে নিরুপম-অসিতা দুজনের মুখ-চেনা হয়ে গিয়েছিল। অসিতা কোথায় থাকত, নিরুপম জানত না। নানা কথার মধ্যে একবারও জানার ইচ্ছে হয় নি। অসিতাও অন্য সব অভিভাবকদের মত নিরুপমকে মনে রাখতে চেয়েছিল। নিরুপম কোথায় থাকে, কি করে --এসবে ওরও কোন উৎসাহ ছিল না।

একদিন হঠাৎ স্বল্প-নির্জন গলির মধ্যে অসিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখন সন্ধ্যের অন্ধকার উঁচু বাড়ীগুলোর আলসে ঢাকছিল নিঃশব্দে। পরিচ্ছন্ন আকাশ দু-একটা নক্ষত্রের আলোয় কাঁপতে শুরু করেছিল। নিরুপম অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। পাশের মেয়েটিকে চেনা মনে হতেই নিরুপমের হাল্কা অন্যমনস্কতা সরে গিয়েছিল। নিরুপম থেমে যাওয়ার ভঙ্গি করে বলেছিল, 'নমস্কার! চিনতে পারছেন?'

'খুব চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে পড়ছে না তো!' অসিতা বলেছিল।

'আপনাদের স্কুলে!'

'হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে। কাকে যেন ভর্তির ব্যাপারে এনেছিলেন, তাই না? আপনার কোন পিসতুতো ভাই যেন!'

নিরুপম মৃদু হাসছিল। 'মনে পড়েছে! এখন সে আপনার ছাত্র।'

অসিতা হাসল। 'এবার বুঝেছি!' হাত-ঘড়ি দেখল অসিতা। ওর টিউশানিতে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছিল। বলল, 'কোন-দিকে যাবেন? এদিকে তো? আসুন, হাঁটা যাক।' অসিতা এগিয়ে চলল; নিরুপম পাশে।

'এদিকে কোথায় যাবেন?'

'কোথাও না। এমনি বেরিয়ে পড়েছি, কিছু ভাল লাগছে না।' নিরুপম সেদিন ভীষণ একা হয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে। খালাসিটোলায় চলে যেত হয়ত। 'আপনি কোথায়?'

'এই একটু এদিকে।' অসিতার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দূরে বড় রাস্তায় বোমা পড়ার শব্দ হ'ল। অসিতা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'কি আবার?' নিরুপম হাসল। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সামনে তাকাল। কিছু লোক এই গলির মধ্যে দৌড়তে দৌড়তে ঢুকছে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে জটলা করছে আর মজা দেখছে। 'এ একটা রাজনৈতিক মজা। জানেন, আগে শুধু গুন্ডারাই এই মজার খেলায় মাততো। এখন দেশের সমস্তরকম রাজনীতি খেলাটায় বেশ জমিয়ে বসেছে।' অসিতার দিকে তাকাল। 'যাবেন নাকি মজা দেখতে?'

'পাগল হয়েছেন?' অসিতা হাতঘড়ি দেখল। 'ইস্, বড় রাস্তাটা না পেরোতে পারলে দরকারী কাজে যাওয়া যাবে না। অথচ দেরীও হয়ে যাচ্ছে।'

নিরুপম বলল, 'আপাতত আসুন, পাশের রেস্টুরেন্টটায় বসি। একটু পরেই থেমে যাবে মনে হয়, তখন বেরুবেন।'

অসিতা নিরুপমের দিকে তাকিয়ে হাসল। রেস্টুরেন্টের ছোট কেবিনে মুখোমুখি বসল দুজনে।

চায়ের অর্ডার দিল নিরুপম। 'আর কিছু খাবেন?'

'কিছু না।' হাতের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'আপনার ছোট ভাইটি পড়ছে কি রকম?' সাধারণ কথা বলে অসিতা সহজ হতে চাইল।

'ভালই তো মনে হয়।'

'আপনি বুঝি কোন খোঁজই রাখেন না?'

'ছোট ছেলেদের দেখাশোনার, পড়ানোর কাজ তো পুরুষের নয়।'

অসিতা হাসল। 'তাহলে বড় বড় ছেলেদের পড়াতে ভালবাসেন, বলছেন? কিন্তু স্কুলের উঁচু ক্লাশের ছেলেদের সামলানো খুব ভয়ের। ওঃ, আজকাল যা হয়েছে ওরা বোমা পাশে নিয়ে পড়তে বসে। সে বাড়ির প্রাইভেট টিউটর বলুন, বা স্কুলের মাস্টার বলুন--সব জায়গাতেই।'

বেয়ারা চায়ের কাপ রেখে চলে যেতেই নিরুপম কাপ সামনে টেনে নিতে নিতে বলল, 'মনে হচ্ছে, আপনি খুব ভাবছেন ব্যাপারটা নিয়ে! ভেবে কি হবে? এ সমস্যা তো সমাজের এক ধরনের ক্যান্সার।'

'ভাবব না মানে!' অসিতা চোখ বড় করল। 'আমার দুটি ভাই পড়ে। ওদের জন্যেই সবচেয়ে বেশী ভাবনা।'

চায়ে চুমুক দিল নিরুপম। 'নিন চা খান। কোন্ ক্লাশে পড়ে ওরা?' নিরুপম আগের প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে ঘরোয়া হতে চাইছিল।

'একজন ইলেভন, আর একজন নাইন-এ। তবে এখনো ওরা তেমন তৈরী হয়নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ, বলুন? অথচ জানেন, ওদের মানুষ না করতে পারলে আমাদের সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।' অসিতা হঠাৎ যেন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।

নিরুপম অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অসিতার দিকে। 'সব কিছু মানে!'

অসিতা চায়ে চুমুক দিতে দিতে যেন দূরে থেকে আবার কাছে চলে এসেছিল। 'আমার পরেই এই দু'টি ভাই। ওদের দুজনকে দাঁড় করাতে না পারলে এদের পরের দু'টি বোন, ছোট ভাই দাঁড়াবে কোথায়? মাকেও তো দেখতে হবে!'

'আপনি একাই সব দেখাশোনা করেন?' নিরুপমের কেন যেন ভাল লাগছিল অসিতার বিষয়টা।

অসিতা হেসেছিল। 'তাতে আর কি? এখন ওরা মানুষ হলে তো!' একটু থেমে বলেছিল, 'জানেন, আজকালকার স্কুলে উঁচু ক্লাশগুলোর কোর্স এমন হয়েছে, একটা টিউটার না রাখলে চলে না। সব সময় তো তা সম্ভবও হয় না।'

'কেন! আপনি তো আছেন?'

'আমি!' অসিতা হেসে উঠেছিল। 'সামান্য বি-এ পাশের বিদ্যেতে তা হয় না।'

নিরুপমও হেসেছিল অসিতার সঙ্গে। 'নাকি ঘরামির ঘরেও জল পড়ার অবস্থা?'

'কিছুটা হয়ত তাই।' অসিতা চুপ করে চা নিঃশেষ করেছিল। নিরুপমকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি অফিসের পর কি করেন? একটু দেখিয়ে দিন না ওদের! এই যেমন ঘুরতে বেরিয়েছেন, এইরকম ঘুরতে ঘুরতেই কোন-কোনদিন চলে গেলেও কাজ হবে।'

নিরুপম একভাবে তাকিয়ে থেকে অসিতার কথা শুনছিল। অসিতা থামলে বলল, 'অফিস!' হেসে উঠেছিল। 'আমি বিশুদ্ধ বেকার। পিসিমার পয়সায় থাকি, খাই। বাবা-মার সামান্য যা পুঁজি ছিল, তা থেকে হাতখরচ চালাই। আর সন্ধ্যে হলে প্রায়দিনই—' নিরুপম থেমে গিয়েছিল।

'এক-আধটা টিউশানি করেন তো? তবে! আসুন না আমাদের বাড়ি। ভাইদের একটু না হয় দেখবেন।' হাসতে হাসতে বলেছিল, 'চা-টা খাবেন। আর কিছু যদি মনে না করেন, তা হলে বলি, ব্যাপারটা একেবারে নিরামিষ হবে না।'

নিরুপম তখনো হাসছিল। 'ওদের না হয় সন্ধ্যেটা কাটাতে গিয়ে একটু দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু—' নিরুপম চুপ করে গিয়েছিল।

অসিতাও চুপ করে থেকে নিঃশেষে চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল।

'আমাকে কিছু দিলে যে করুণা করা হবে!' নিরুপম একসময়ে বলেছিল।

অসিতা চোখ তুলে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'না নিলে আমাকেও তো এক ধরণের অনুকম্পা করা হয়।'

নিরুপম কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল অসিতার দিকে। হঠাৎ খুব সহজ হয়ে বলেছিল, 'দু-পক্ষেই যখন একটা অসুবিধে থেকে যাচ্ছে, তখন ব্যাপারটা একেবারে বাদ দিয়ে দিন। আমি তো টিউশনি করি না। আমরা দুজনে যখন এত পরিচিত হয়ে গেছি, তখন না হয় সময় কাটানো আর পুরোনো পড়াশুনোকে একটু ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যেই যাবো! সেটা কি খুব খারাপ দেখাবে?'

অসিতা নিরুপমের সহজ অন্তরঙ্গতায় খুশি হয়েছিল। ওর বাড়ি যাবার জন্যে ঠিকানা দিয়েছিল। নিরুপমের ঠিকানা নেয়নি। এত কথার পরও নিরুপম বেশ কিছুদিন অসিতাদের বাড়ি যায়নি। অসিতও কোন খোঁজ নেয়নি।

অসিতার কথা প্রায় ভুলতে বসেছিল নিরুপম। এরকম এক মানসিকতার মধ্যে নিরুপম হঠাৎ এক সন্ধ্যায় চলে গিয়েছিল অসিতাদের বাড়ি। ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ লাগছিল সন্ধ্যেটা। নিরুপম মদ খাওয়ার জন্যে মেট্রো সিনেমার পিছনে মদের দোকানে চলে যেতে পারত। হয়ত বা মধুমিতাদের মধ্যে গিয়ে পড়ত। এইরকম এক যন্ত্রণায় নিরুপম অসিতাদের বাড়ি গিয়েছিল। অসিতা বাড়ি ছিল না। টিউশানিতে গিয়েছিল। নিরুপম ওর মা, ভাই টিকু, মিতু ও ছোট ভাই-বোনদের মধ্যে কাটিয়ে চলে এসেছিল। এরপর যতবার গেছে দেখা হয়নি অসিতার সঙ্গে। টিকু, মিতুদের পড়িয়ে চলে এসেছে।

কেন ছুটির দিনে হঠাৎ অসিতাদের বাড়ি নিরুপম গেলে হয়ত দেখা হয়ে যেত অসিতার সঙ্গে। নিরুপমকে তখন নানা গল্প করতে করতে অসিতা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত। এইরকম সব মুহূর্তে নিরুপমকে চিনেছিল অসিতা। অসিতাকে একটু একটু করে বুঝতে পারছিল নিরুপম। নিরুপমের কেউ নেই, চাকরী খুঁজছে, মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ হলে মদ খায়, এসব অসিতা শুনেছিল। এসব শুনে অসিতা নিরুপমকে নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করেনি। শুধু একদিন বলেছিল, 'আর যাই করুন শরীরকে কষ্ট দেবেন না। দেখবেন, চাকরী আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। আর এতসব মানসিক অস্বস্তি, অশান্তি কেটে যাবে।' একটু থেমে বলেছিল, 'আপনার মত আমিও মানি। বাবার বড় বড় বন্ধু বা বসদের ধরে চাকরী খুঁজতে যাবেন কেন? ওদিকে গেলেই আপনি আবার কোথাও জড়িয়ে পড়বেন।'

নিরুপম কোনদিন মধুমিতাদের প্রসঙ্গ অসিতাদের বলেনি। বলার প্রয়োজন বা অবকাশ দেখা দেয়নি। অসিতা কি বুঝতে পেরেছিল, এভাবে চাকরী খুঁজলে নিরুপম মোটা মাইনের চাকরী পাবে, আর ওর কল্পনা আবার উঁচুতলার মেয়েদের মধ্যে ভেসে যাবে? নিরুপম নিভানো সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে চুপ করে বসে রইল। বাইরে তাকিয়ে থাকল। নিরুপম মনে মনে বিড়বিড় করল—অসিতার কোন দাবী বা অনুরোধ নেই ওর কাছে। মা, ভাই, বোন, স্কুল, টিউশনি—এসবের মধ্যে ডুবে থাকে অসিতা। বাবার পেনসন, গ্র্যাচুইটি, অল্প কয়েকটি টাকার ইন্সিওরেন্স আর ওর নিজের আয়ের টাকা যোগ করে কেবল কি হিসেব করতে থাকে, কিভাবে সংসারটাকে দাঁড় করাবে? এসব থেকে সরে এসে অসিতার কি কোন চিন্তা নেই? সুদর্শন নিরুপম যে কোন মেয়ের কাছে লোভনীয়—কই, মধুমিতাদের মত সেরকম ভাবে তো অসিতা কোনদিন ওর দিকে তাকায়নি? নিরুপমের একটি চাকরী হোক, নিরুপম যেন শরীরটাকে নষ্ট না করে, এই কথা কি শুধু ভদ্রতার? না, কোন এক সময়ে অসিতার নিজস্ব ভাবনার?

নিরুপম এতবার ওদের বাড়ি গেছে, অসিতা তো একবারও আসতে চাইল না? বাড়ির ঠিকানাও জিজ্ঞেস করেনি! অসিতার কি কোন নিঃসঙ্গতা নেই? আজ থেকে দিন-পনেরো আগে, ওর অসুখে পড়ার ঠিক আগের দিনেই নিরুপমকে বাসে তুলে দিতে আসার সময় অসিতাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি ছুটির দিনগুলোয় কি করেন?'

'কি আবার! নানারকমের সাংসারিক কাজ।'

'যেমন!'

'কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, ভাই-বোনদের দেখা! কিছু সেলাইয়ের কাজও পড়ে থাকে। তার ওপর স্কুলের পরীক্ষার খাতাপত্তর তো লেগেই থাকে।'

'বিকেলেও তাই?'

'কখনো বাড়ি বসে থাকি, কখনো ও'দের নিয়ে একটু বেরোই। টুকটাক বাজারও করতে হয়। এইভাবেই সময় কেটে যায়।'

'আমার কিন্তু যতই সারাদিনে কাজ থাক, রাতে বিছানায় শুলেই ঘুম আসে না। অনেক সময় তো ঘুমের বড়ি খেতে হয়। আপনি এদিক থেকে ভাল ভাগ্য করেছেন।'

'সবদিন তা হয় না।' অসিতা হেসেছিল। 'এত চিন্তা থাকে মাথায়!'

নিরুপম অবাক হয়ে বলেছিল, 'আপনি তখনো সংসারের চিন্তা করেন!'

অসিতা যেন অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলে নিরুপমকে দেখেছিল। হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল। বাস আসতে একটু দেরী হয়েছিল। যতক্ষণ অসিতা নিরুপমের পাশে ছিল, কেন যেন একটি কথাও বলেনি সেদিন!

নিরুপম আজও অসিতাকে বুঝতে পারে নি। কিন্তু কেন যেন মনে হয়, অসিতা বুঝি বা সোনালি মধুমিতা, বল্লরীদের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। আজকের স্বপ্নটা কি তাই এমনভাবে জড়িয়ে গেল?

'দেখ, কাকে এনেছি!'

নিরুপম চমকে সামনে তাকাল। দেখল, দরজার সামনে সদ্য স্কুল-ফেরত শম্ভু দাঁড়িয়ে পিছনে অসিতা। 'আপনি!' নিরুপম অবাক হ'ল 'আসুন। শম্ভু, চেয়ারটা পরিষ্কার করে দাও, উনি বসবেন।'

শম্ভু এগিয়ে এসে চেয়ারের ওপর থেকে কাপড়-জামা সরিয়ে রাখল। অসিতা বসতে বসতে বলল, 'আপনি তো ঠিকানাও দেননি। স্কুল খুলতে তবে এলাম।'

'গরমের ছুটির পর আজই স্কুল খুললো তা হলে!'

অসিতা চকিতে ঘরটায় চোখ বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি সেই যে সপ্তাহ-দুই আগে গিয়েছিলেন, তার পর আর দেখাই নেই। টিকু, মিতু তো আমাকে খেয়ে ফেলল। জানতামই না আপনার শরীর খারাপ। তা-ছাড়া ঠিকানাও দেননি, যে ওরা এসে একবার খোঁজ নিয়ে যাবে।' শম্ভুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'স্কুল খুলতে শম্ভুর কাছে শুনেই দেখা করতে এলাম।'

নিরুপম অসিতাকে দেখছিল। বলল, 'ভালই করেছেন।' শম্ভুকে বলল, 'তুমি যাও শম্ভু, স্কুলের জামা-প্যান্ট ছাড়ো। মাকে বলো, তোমাদের দিদিমণি এসেছেন।' শম্ভু চলে যেতে বলল, 'আজই সন্ধ্যের দিকে একবার আপনাদের বাড়ি যাবো ভাবছিলাম।'

'যেতেন কি করে? বিছানাই ছাড়েননি এখনো!'

হেসে উঠলো নিরুপম। 'ন, না, এত দুর্বল ভাববেন না। বেরুবার মত শক্তি আছে।'

"কি হয়েছিল?'

'কলিক পেনটা ভয়ঙ্করভাবে দেখা দিয়েছিল হঠাৎ। তার সঙ্গে জ্বর।'

অসিতা একটু অন্যমনস্ক হল। একটু বা গম্ভীর। কয়েক মুহূর্ত পরেই সহজ হয়ে বলল, 'আবার মদ খেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। মোটেই ভাল করেন নি!'

'নাঃ, ও পাড়ায় যাওয়া কবে ছেড়ে দিয়েছি! শরীরটাকে ভাল করতে হবে না?' নিরুপম হেসে হাল্কা করতে চাইল প্রসঙ্গটা।

'মাঝে-মাঝে আপনার এই কথা একটুও বিশ্বাস হয় না। আপনিই তো বলেন, ফাঁকা মনে হলেই মদের মত ওষুধ কিছুটা খেয়ে নিতে হয়। রোগ সেরে যাবে!' অসিতা মুখের ভাব নির্বিকার করে রাখল। ঘরের চার পাশ যেন খুঁটিয়ে দেখছে অসিতা।

অসিতা যেন অন্যমনস্ক। নিরুপমের তাই মনে হল। চুপ করে থেকে অসিতাকে দেখল। সেই পরিচিত পোশাক। হাতে বড় ব্যাগ আর ফোল্ডিং ছাতা। স্কুলের পর সারা শরীরে ক্লান্তি নিয়ে বসে আছে। মাথার দীর্ঘ চুলের ভারী অগোছালো খোঁপা যেন পিঠের ওপর এখনি ভেঙে পড়বে। মধুমিতাদের মত সুন্দরীও নয়, আবার চপলতাও কোথাও নেই! অসিতা সুশ্রী পরিচ্ছন্ন। এত ক্লান্তিতেও সেই সুশ্রী ভাব চেহারা থেকে এতটুকু মুছে যায় নি। চিবুকের দু পাশ থেকে মসৃণ চোয়ালের রেখায় এক ধরনের গাম্ভীর্য সব সময়েই অসিতার প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বকে স্পষ্ট করে রাখে।

নিরুপম কথা বলল, 'কিছু বলছেন না যে! আমার কথা বিশ্বাস না করে নিশ্চয়ই রেগে গেছেন।'

অসিতা ভিতরে চমকে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'সে কি! না, না, আপনার ওপর রাগ করব কেন?' অসিতার অন্য কি কথা মনে পড়ায় হাতঘড়ি দেখল। 'আমি এবার উঠব।'

'বসুন, বসুন, পিসিমার সঙ্গে পরিচয়ই হল না!'

অসিতা একভাবে বসে থেকেই বলল, 'আপনি কিন্তু আরও কদিন রেস্ট নিন। তিতুর তো রেজাল্ট বেরুবার সময় হয়ে এল। ওর আর তাড়া কি? মিতুকে বলব এখন, পরে যে কোন দিন আসবেন।'

'তা হলে ওদের আর একটা কথাও বলবেন, 'সামনের মাসের এক তারিখ থেকে একটা চাকরী পেয়েছি।'

'সত্যি!' অসিতা অবাক হল, 'কই আমাকে তো বলেন নি!'

'এই তো বললাম' নিরুপম হাসল, 'এটাও যদি বিশ্বাস না হয়, দেখুন।' নিরুপম চিঠিটা এগিয়ে দিল।

অসিতা হাসতে-হাসতে চিঠিটা নিল। মন দিয়ে পড়ে নিরুপমের দিকে তাকাল। 'খুব ভাল খবর নিরুপমবাবু। এই চাকরীই আপনাকে বাঁচাবে।'

'মাঝে-মাঝে মনে হয়, আপনার কথাই হয়ত ঠিক হবে। দেখা যাক।'

অসিতা নতুন করে যেন নিরুপমকে দেখতে লাগল।

পিসিমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর অসিতা সামান্য কিছু খেয়ে নিরুপমের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে সন্ধ্যের ভূমিকা। নিরুপম ওকে কিছুটা এগিয়ে দিল। ফেরার পথে নিরুপম একটা কথা ভাবল, এতদিন ওর চারপাশে এক ভয়ঙ্কর বর্ণহীন শূন্যতা ওকে ঘিরে রেখেছিল। ওকে যেন সমস্ত পরিচিত-অপরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এখন সে শূন্যতা নেই। যেন এক অন্ধকার-এর স্তূপ ঘন মেঘের মত অতিমন্থর গতিতে ভেসে এসে সেই ফাঁকটায় স্থির হয়ে গেছে। নিরুপমের এই প্রথম পাওয়া চাকরীর অনুভূতি, পুরনো মদের আকর্ষণ, অসিতার সান্নিধ্য, মধুমিতার স্মৃতি, নিরুপমের নিজেরই কয়েকটা ভাবনা—সব কেমন জটিলতম মিশ্রণে সেই অন্ধকারের মধ্যে পাক খাচ্ছে। নিরুপমের অনেক দিন পরে নিজেকে বড় অসহায় লাগছে। এখনি বাড়ী ফিরতে ভাল লাগছে না। দূরের এক সবুজ তৃণাচ্ছাদিত পার্কের দিকে পা বাড়াল নিরুপম।

একদিন সন্ধ্যেয় বৃষ্টি কিছুক্ষণ থেমে থাকায় নিরুপম অসিতাদের বাড়ী চলে এল। গতকাল সন্ধ্যে থেকে মেঘ জমতে শুরু করেছিল। বৃষ্টি হয় নি। আজ সকালেও মেঘ থমথমে, গুমোট ছিল চারদিকে। বৃষ্টি হয় নি। বেলা একটু বাড়তেই মুষল ধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে একটানা এক ঘন্টার ওপর। তার পর থেকে সারা দিনে বিরাম নেই। কখনো গুঁড়ি-গুঁড়ি, কখনো বা ভীষণ বেগে বৃষ্টি নেমেছে। সারা শহর জলে ভাসছে যেন।

নিরুপম সারা দিন বাড়িতে কাটিয়ে সন্ধ্যের দিকে বৃষ্টি বন্ধ হতেই বেরিয়ে পড়ল। নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল নিজেকে। অসিতাদের বাড়ীর বাইরের দরজা খোলা ছিল। নিরুপম বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

'আরে, আসুন!' বিস্মিত চোখে অসিতা নিরুপমকে দেখল। 'এই বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়েছেন?'

'এলাম। তিতুর খবর কি?' বলতে-বলতে নিরুপম অসিতার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

'ফার্স্ট ডিভিশন। আপনার জন্যেই কিন্তু!'

'ওসব কথা থাক।' ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটি মেয়ে বসে আছে। 'ওরা কারা? ছাত্রী নিশ্চয়ই!'

'আমার স্কুলের ছাত্রী। সবাই পাশ করেছে। এইমাত্র জেনেই দেখা করতে এসেছে।'

'এই বৃষ্টিতে! এলো কি করে?' নিরুপম ওদের দিকে তাকাল।

অসিতা উত্তর দিল, 'ওরা সব কাছাকাছি থাকে। তাছাড়া বুঝতেই পারছেন, আজ ওদের কি আনন্দের দিন! রিক্সা করেই চলে এসেছে।'

মেয়েগুলি লজ্জায় মাথা নিচু করল। নিরুপম ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। অসিতা মেঘ ডাকার শব্দ শুনেই বলল, 'শোন, তোমরা এবার যাও। মনে হচ্ছে এখনি বৃষ্টি নামবে। স্কুলে তো আসছ? দেখা হবে আবার।'

আবার অসিতাকে প্রণাম করে মেয়েগুলি বেরিয়ে গেল। ওরা চলে যেতেই নিরুপম অবাক হয়ে বলল, 'বাড়ীতে আর কাউকে দেখছি না কেন?'

'ওঃ, বলা হয় নি। সবাই আজ সকালেই দমদমে মামার বাড়ী গেছে। আজই ফেরার কথা, কিন্তু একটু আগে রেডিওয় যা বলল, তাতে তো দমদম জলের নীচে শুনলাম। কেউ আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তিতু তাহলে পরীক্ষার খবর এখনো পায় নি।'

অসিতা হেসে উঠল। 'নিশ্চয়ই ওখানে এতক্ষণে পেয়ে গেছে। আমার এক মামাতো ভাইও পরীক্ষা দিয়েছে।'

বাইরে জোরে বৃষ্টি নামল। 'ইস্, আপনি যাবেন কি করে?'

নিরুপম হাসল। 'আমি ঠিক চলে যাবো। কিন্তু কেউ না এলে আপনি একাই এ বাড়ীতে থাকবেন?'

'ঠিকে ঝিটাকে দুপুরে বলে রেখেছি, আমার এখানে আজ রাতটা থাকবে। খেয়ে-দেয়ে আসবে বলেছে।' বলতে-বলতে অসিতা একটা জানলার নীচের দিকটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। 'আপনি একটু বসুন। আমি বরং গাটা ধুয়ে আসি। ছাত্রীরা এসে পড়ায় দেরী হয়ে গেল। অবশ্য আপনার যাওয়ার তাড়া থাকলেও তো যেতে পারবেন না! যা বৃষ্টি!'

নিরুপম জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল একবার। 'ঠিক আছে, আপনি আসুন তো, আমি বসছি।'

দুটি ঘরের মাঝের দরজা দিয়ে যাবার সময় অসিতা কি ভেবে থমকে দাঁড়াল। 'তিতু পাশ করায় আপনার খাওয়া পাওনা আছে। আজ বাইরে থেকে কিছুই আনা

সম্ভব নয়। তবে ছাত্রীরা প্রণাম করতে এসে মিষ্টি দিয়ে গেছে। ভাগ্য আমাদের ভালই। ওটাকেই বরং দুজনে মিলে কাজে লাগানো যাবে। বসুন!' নিরুপমকে একবার দেখে নিয়ে অসিতা চাপা উল্লাস নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিরুপম চুপ করে বসে রইল। অসিতার ব্যবহারের সহজ অন্তরঙ্গতা নিরুপমকে যেন কোন এক জায়গায় আশ্বস্ত করছে। শিশুকে শান্ত করতে মা যেমন করে মাথায় হাত রাখে, অসিতার কথা, আচরণ আত্ম-সংগোপনে নিরুপমকে সে রকম কোন তন্দ্রার আরামে শান্ত করছে।

নিরুপম সিগারেট ধরালো। মাথা ভার নিয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। এখনও কমে নি। বিকেল হলেই মাথা ধরে। আজ এই মাথা ধরায় নিরুপম যেন ভিতরে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। খালাসি-টোলা বা অন্য কোন মদের আড্ডায় চলে যেতে পারত। মাঝে-মাঝে মধুমিতাদের কথাও মনে হচ্ছিল। নিজের মধ্যে কেন যেন চাপা উত্তেজনা বোধ করছিল। বাড়ী থেকে বেরুবার সময়ও ভাবে নি এখানে আসবে। মাঝপথে হঠাৎ ঠিক করে চলে এসেছে।

অসিতার নির্জন ঘরে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইল। দৃষ্টি জানালার বাইরে। বৃষ্টির শব্দ বুঝিবা বাইরের সমস্ত কিছু থেকে নিরুপমকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে। হঠাৎ দমকা হাওয়া বইল। আর সঙ্গে-সঙ্গে মাঝের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এ ঘরে আলো। ও পাশের ঘরে অসিতা আলো জ্বেলে রেখে যায় নি।

কতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল, নিরুপম জানে না। পাশের ঘর থেকে অসিতার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনল, কি, আছেন তো, নাকি চলে গেলেন?' হাসছে অসিতা। 'এইবার যাচ্ছি। আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে, আপনি একা বসে আছেন।'

নিরুপম বুঝল, অসিতা এইমাত্র বাথ-রুম থেকে ঘরে এল। দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল ঘরের। নিরুপম নিজের মনে হাসল। সিগারেটের শেষ অংশটায় জোরে কয়েকবার টান দিয়ে ফেলে দিল।

আর মুহূর্তের মধ্যে আর একটা দমকা হাওয়া মাঝের দরজায় ধাক্কা দিল। একটা কপাট খুলে গেল। আর একটা কপাটের মাথায় ওপরের ছিটকিনি আটকে গেছে। নিরুপম চকিত দৃষ্টিতে ওঘরের দেয়ালে একটি নগ্নমূর্তির ছায়া দেখল। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকার পরেই ওঘরের আলো নিভে গেল। মাঝের দরজার এপাশের ঘর আলোকিত, ওপাশে ঘন অন্ধকার। শুধু অল্প কিছু আলোর রেখা চৌকাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘন মেঘ আর তুমুল বর্ষার ছায়ায় ঢাকা ওঘরের অন্ধকারকে এতটুকু তরল করতে পারে নি।

নিরুপম এমনভাবে বসে আছে, যেভাবেই হোক, ওঘরের অন্ধকার ওর চোখে পড়বেই। স্থির, চাপা অস্বস্তিকর অবস্থায় বসে রইল নিরুপম। ও ঘর নিঃসাড়। এমন নিস্তব্ধতা, অন্ধকার এ বাড়িতে কোনদিন নিরুপম অনুভব করে নি। এখন এ বাড়ীতে নিরুপম-অসিতা ছাড়া কেউ নেই। বৃষ্টি যেন ওদের দুজনকে এক দ্বীপের মধ্যে রুদ্ধশ্বাসে আটকে রেখেছে। সামনের অন্ধকার নিরুপমকে কি ভীষণ ভয় দেখাচ্ছে! নিরুপমের বুকের মধ্যে কয়েকটা অতিরিক্ত শব্দ হল যেন। অসিতা দরজাটা বন্ধ করছে না কেন? বাসন্তিকা বলেছিল, 'নিরুপম এমন বৃষ্টির দিনে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।' নিরুপমের চিবুকে বাসন্তি-কার নগ্ন বুকের স্পর্শ ছিল তখন। নগ্ন-দেহ সোনালি বিকেলের গা-ধোয়া শেষ করে কাছে এসে বলেছিল, 'দেখ, দেখ, নিরুপম, আমি কত সুন্দর! আলো জ্বলছে বলে ভয় পাচ্ছ? বেশ তো, আলো নিভিয়ে দিলাম। এবার দেখ। বৃষ্টিতে ধোয়া বাইরের আলোয় তোমায় কি সুন্দর লাগছে নিরু-পম। আহ!' মধুমিতা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। বিড়ালের মত পা ফেলে নিরুপমকে জড়িয়ে ধরে-ছিল। সদ্য গা-ধোয়ার সাবানের গন্ধ সারা শরীরে—'নিরুপম, এই নিরুপম, আমাকে একবার জড়িয়ে ধরো, প্লীজ, লক্ষ্মীটি। আমাকে একটু আদর করো। এমন বৃষ্টির দিনে এ ঘরে এখন কেউ আসবে না। নিরুপম, এই নিরুপম, এই, এই—'

'না, না, আমি ভিতরে মরে গেছি, লুকিয়ে গেছি। বিশ্বাস করো আমার কিছু ভাল লাগছে না।' নিরুপম দু হাতের মধ্যে মাথা রাখল। দু হাতের মুঠোয় চুলের গোছা জোরে টানতে লাগল। 'অসিতা, তুমি যাও, তুমি সরে যাও আমার কাছ থেকে। এভাবে এসো না। বিশ্বাস করো, আমি এসব ভাবিনি। না, তুমি এরকম কখনই হতে পার না!'

'এই যে নিরুপমবাবু, কি হল আপনার?' অসিতা সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনে হতেই নিরুপম আচমকা অসিতার দিকে তাকাল। 'আপনার কি মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে? শরীর খারাপ?' অসিতার কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন। সামনে একটু ঝুঁকল অসিতা।

নিরুপম অসিতাকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল। অপ্রস্তুত বোধ করতেই বলল, 'না, না, ও কিছু না, এমনি মাথাটা ধরেছে।'

'ওহ্, তাই বলুন। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দু-তিনবার ডেকে সাড়াই পাচ্ছিলাম না!' ভাবলাম, পেটের পেনটা বুঝি হঠাৎ আরম্ভ হয়েছে। আপনি যা চাপা, বলেন না তো!'

'তাই নাকি?' নিরুপম অসিতার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বিকেলের গা-ধোয়ার পর অসিতাকে অত্যন্ত স্নিগ্ধ, মধুর লাগছে। নিরুপম অসিতার সান্নিধ্য থেকে সাবান আর প্রসাধনের গন্ধ পাচ্ছে। নিরুপম হাসল।

'বসুন, চা করি। বেশী দুধ দিচ্ছি বরং। আদা দিয়ে চা খাবেন? মাথাটা কিন্তু ছেড়ে যাবে। আমি তো যখনি মাথা ধরে, আদা দিয়ে চা খাই। ওসব ট্যাবলেট আমার সহ্যই হয় না।'

'তাই করুন।' নিরুপম চেয়ারে হেলান দিল। নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল।

অসিতা রান্নাঘরে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে নিরুপমের দিকে তাকাল। 'আপনি খুব সিগারেট খান। এত খাবেন না। আপনার পেটের পেনটা কিন্তু খুব খারাপ!'

'আপনার ডাক্তারটি অবশ্য খারাপ নয়। আমি দেখেছি, কিছুটা মেনে চললে উপকার হয়।'

অসিতা হেসে উঠল। 'ঠাট্টা করছেন? পরে বুঝবেন। আচ্ছা বসুন, এখনি চা করে আনছি।'

চা সামনে নিয়ে নিরুপম অসিতা অনেকক্ষণ গল্প করল। অসিতা ওর সংসার, স্কুল, ছাত্র-জীবনের সমস্ত কথা উজাড় করে বলল। নিরুপম মন দিয়ে শুনল। কথা বলতে-বলতে এক সময়ে হঠাৎ অকারণ ওরা দুজনেই চুপ করে গেল। কখন বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশে মেঘ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ভাসতে শুরু করেছে, বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, টের পায় নি দুজনেই। বাইরে ঝি-এর কড়া নাড়ার শব্দ কানে আসতেই দুজনে সচকিত হল।

নিরুপম হাতঘড়ি দেখল। 'ইস, রাত অনেক হয়েছে! দশটা? উঠি।' নিরুপম উঠে দাঁড়াল। 'আপনাকে শুধু-শুধু বসিয়ে রাখলাম।'

'বা, আপনি কোথায় বসিয়ে রাখলেন? আমিই তো আজে-বাজে সব বকে আপনাকে বিরক্ত করছিলাম।'

'দেখুন, বাইরে কখন বৃষ্টি থেমে গেছে বুঝতেই পারিনি আমরা।'

অসিতা হাসল। ঝি-এর কড়া নাড়ার শব্দে খিল খুলতে এল অসিতা। নিরুপম সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।
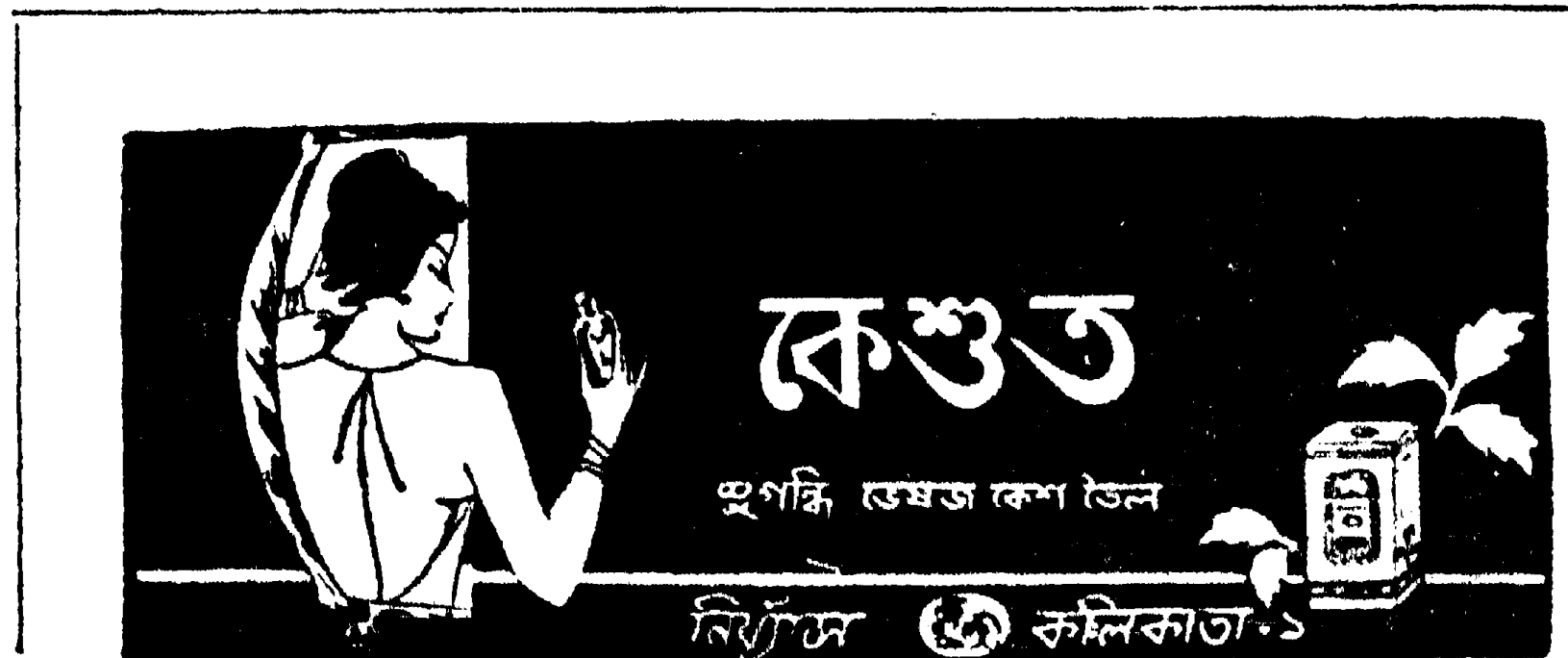
বাইরে পা দিয়ে নিরুপম বলল, 'চলি। তিতুরা এলে আসব।'

'নিশ্চয়ই। না এলে ওরাই ধরে আনবে আপনাকে। বাড়ি তো আমি চিনে গেছি, আর পালাতে পারবেন না।'

নিরুপম অসিতার ঘরোয়া ভঙ্গি দেখছিল। হাসল। অসিতাও মৃদু হাসল। নিরুপম আর দেরী না করে পা বাড়াল বড় রাস্তার দিকে।

চাকরীর প্রথম দিনেই নিরুপম অফিস থেকে সোজা চলে এল অসিতার বাড়ি। বাইরের দরজা বন্ধ। নিরুপম কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে নিরুপমকে দেখেই তিতু একটু অবাক হল। খুশি হয়ে বলল, 'আপনি এসে গেছেন, খুব ভাল হয়েছে।'

বাড়ির মধ্যে পা দিতে দিতে নিরুপম বলল, 'কেন বল তো?'

'দিদির জ্বর। বাড়িতে কেউ নেই। আমি আটকে পড়েছি। আপনি এলেন। আমি তবু একটু বেরুতে পারব।' নিরুপমের পিছনে কথা বলতে বলতে তিতু দিদির ঘরের দরজা পর্যন্ত এল।

'আর সব কোথায়?' নিরুপম ঘরে ঢোকার আগে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দুদিন হল মা আর সকলকে নিয়ে মামার বাড়ি গেছে। কাল ছোটমামার ছেলের অন্নপ্রাশন।'

নিরুপম ঘরে ঢুকল। অসিতা ওদের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল।

তিতু বলল, 'আমি তাহলে বেরুচ্ছি দিদি। ফেরার সময় ডাক্তারবাবুর কাছে ঘুরে আসব। তুমি যা বলেছ, ঐ বললেই হবে তো?'

অসিতা শুয়ে শুয়েই ঘাড় নাড়ল। 'তাড়াতাড়ি ফিরবি। এখানে অনেক কাজ আছে।'

তিতু বেরিয়ে গেল। বাইরের দরজা জোরে বন্ধ করার শব্দ এল। অসিতা বিছানার ওপর উঠে বসল। 'আপনি এসে খুব অবাক করে দিয়েছেন। আপনার আজ অফিসে জয়েনিং ডেট না?'

'ওখান থেকেই আসছি।' বিছানার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল নিরুপম। 'আপনার স্কুলে একটা ফোন করেছিলাম।'

'সেকি! কখন?' অসিতা সত্যি অবাক হল। মুখের ভাব এমন, কথাটা ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না যেন।

'বিশ্বাস করছেন না!' নিরুপম হাসল। 'গাইড থেকে নম্বর বের করে সত্যিই ফোন করেছিলাম। ওখানেই শুনলাম, আপনি স্কুলে গিয়েই চলে এসেছেন। শরীর নাকি খুব খারাপ? কি ব্যাপার!'

অসিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। 'কাল সকাল থেকেই শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল, আজ স্কুলে কোনরমে গিয়েছিলাম। মাইনেটা নিয়েই স্কুল থেকে বেরিয়েছি। কয়েকটা কাজ সেরে সেই যে শুয়েছি, এখন মনে হচ্ছে, আরও কিছুদিন শুইয়ে রাখবে।'

'কেন?'

'ভীষণ গা-হাত-পা কামড়াচ্ছে। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। ক'দিন জলে ভিজেছিলাম। ইনফ্লুয়েঞ্জাই ধরল।'

নিরুপম একটু ঝুঁকে পড়ল। 'আপনি বসে আছেন কেন? শুয়ে পড়ুন।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'না না, শোন তো, না হলে আমার খুব খারাপ লাগছে।'

অসিতা শুয়ে পড়ল।

'আমি যতদিন দেখছি আপনাকে, কোনদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুতে দেখিনি। কথাটা ভেবে মাঝে মাঝে খুব ভাল লাগত। অথচ আপনি কি ভীষণ পরিশ্রম করেন!'

'তাহলে আপনার অভিশাপেই—' খুক খুক করে হেসে ফেলল অসিতা।

নিরুপমও হাসল। 'অভিশাপ নয়, বলুন ছোঁয়াচে রোগ। আমাকে তো যখন-তখন বিছানা নিতে হয়। যেমন মিশছেন, তার ফল।' নিরুপম অসিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'অফিস করেছেন। কি রকম লাগল?'

'আপনার কথাই ঠিক হবে। মনে হচ্ছে, অফিস আমায় বাঁচিয়ে দেবে।' নিরুপম অসিতাকে দেখতে দেখতে বলল, 'আপনার চোখ ছলছল করছে, জ্বর বেশী বুঝি!'

'নাঃ, জ্বর বেশী না। তিতু তো থার্মোমিটারে দেখল। আসলে গা, হাতে ভীষণ যন্ত্রণা। মাথা ভার। জ্বর হয়তো পরে আসবে।'

'চা খাবেন? খুব গরম চা খান না!' নিরুপম হঠাৎ বলল।

'পাবেন কোথায়?' অসিতা উৎসুক চোখে তাকাল।

'কেন! আমি করে দিচ্ছি। আপনার মা বা আপনি যেরকম গোছানো, চা-এর সরঞ্জাম খুঁজে নিতে দেরী হবে না।' নিরুপম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'না, না, আপনি করবেন কি? কিছু জানেন না।' অসিতা অপ্রস্তুত বোধ করল। উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, 'তিতু আসুক না, ও আপনাকে চা করে দেবে এখন। তখনি খাব। আপনি অফিস থেকে আসছেন।'

'আপনি উঠবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন। আমি ঠিক করে আনছি। আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো? দেখুন, যদি দশটা-পাঁচটা নিয়মিত অফিস করতে পারি, ওভারটাইম করি, তবে দরকার পড়লে এসব কাজও করতে পারি।' নিরুপম আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অসিতা অবাক হয়ে নিরুপমের বেরিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করল।

চা করে নিয়ে নিরুপম যখন অসিতার ঘরে ঢুকল, অসিতা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরটাকে একটু ছোট করে পাশ ফিরে শুয়েছে। পায়ের বালিশটাকে জড়িয়ে নিয়েছে ঘন করে। নিরুপম আস্তে বেতের টেবিলটা টেনে আনল। চায়ের কাপদুটো টেবিলের ওপর রাখল। অসিতা ঠাণ্ডা চা খেতেই অভ্যস্ত। নিরুপম তাই এখনি ঘুম ভাঙাতে চাইল না। চুপ করে অসিতার সামনে চেয়ারে বসল।

নিরুপম এই প্রথম অসিতাকে পরিষ্কার করে দেখল। পাখার বাতাসে শুকনো চুল অসিতার নিদ্রিত মুখের ওপর মাঝে মাঝে উড়ে এসে পড়ছে। অসিতার সুশ্রী কোমল মুখে শান্ত স্বভাব মাখানো। গরমের দিনে ভিজে মাটির ওপর গাছের ছায়ার মত। তারই মধ্যে মুখের রেখায় নিরুপম কর্তব্য, দায়িত্ববোধ, অভিজ্ঞতা, ক্লান্তি, দুঃখ—সমস্ত কিছুর সূক্ষ্ম ছায়াগুলি লক্ষ্য করল।

আজ অফিসের পর নিরুপমের মাথা ধরেছিল। এক চাপা অস্বস্তিতে নিরুপম শূন্য বোধ করছিল। অসিতার বাড়ি আসার পথে মনে হয়েছিল, সেই শূন্যের মধ্যে চাপা অন্ধকার স্থির হতে শুরু করেছে। নিরুপম সেই জটিল অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন অসিতাকে দেখতে লাগল।

অসিতার ঘর নিখুঁত হয়ে চোখে পড়ল। সুন্দর গোছানো। টেবিলের ওপর এ-মাসের ইলেকট্রিক বিল। আজই জমা দিয়ে এসেছে। ধোবার খাতা খোলা। নানা-রকম অঙ্ক কষেছে। মাসের সাংসারিক হিসেবের খাতায় অসিতা কি সব লিখেছে যেন! বাড়ি ভাড়া, বাজার, সরকারী দুধ, তিতু-মিতুদের স্কুল-কলেজের মাইনে, ঝি-জমাদারদের টাকা, দোকান, টয়লেট মায়ের চশমার কাচ বদলানোর খরচ—আরও কত কি সব হিসেব করেছে। সবশেষে নিজের হাত-খরচ, অন্য কি সব খরচের অঙ্ক লিখেছে অসিতা। নানা হিজিবিজি কাটা। নিরুপম হাসল। ঘরের কোণে চারটি কফি রাখা। অসিতা ফেরার পথে কিনে এনেছে, এখনো রান্নাঘরে নিয়ে যায়নি।

নিরুপম অসিতার দিকে তাকাল। এই ঘরে বসে অসিতাকে বড় আপন মনে হল। অসিতা ঘুমোতে ঘুমোতে চাপা গোঙানির শব্দ করল। নিরুপম ঝুঁকে কপালে হাত রাখল। অসিতা চোখ মেলল হঠাৎ।

'কষ্ট হচ্ছে? তোমার গা কিন্তু বেশ গরম!'

অসিতা নিরুপমের দিকে তাকিয়ে থাকল। দু'চোখে বিস্ময়। হাসল ঈষৎ। কিছুক্ষণ নিরুপমকে দেখে বাঁ হাত দিয়ে নিরুপমের হাতটা কপালে চেপে ধরে থাকল। 'হাতটা এখানেই থাক, খুব আরাম লাগছে।' গলা নামিয়ে বলল অসিতা।

নিরুপম অসিতার ডান হাতটা হাতের মধ্যে নিল। নরম হাতের তলায় কোথাও কোথাও শক্ত লাগছে। কড়া পড়েছে অসিতার হাতে। নিরুপম উজ্জ্বল আলোয় আবৃত অসিতার মুখমণ্ডলে দৃষ্টি রাখল। বুঝিবা কিছু খুঁজছে। 'চা খাবে না? ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'থাক, পরে খাবো। তুমি খেয়েছো তো?' অসিতা বলল।

'তাহলে থাক, পরেই খাবো।'

চোখে চোখ রেখে দুজনেই মৃদু হাসল।

গীতি-গঙ্গার সঙ্গম
জয়দেব-কেঁদুলির মেলায়

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-
কোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিল-
কূজিতকুঞ্জকুটিরে

গীতগোবিন্দের পদাবলী দিয়েই কেঁদুলি দেখা শুরু করছি। যদিও বসন্ত এখন দোরগোড়ায় আসেনি, লবঙ্গলতাও বাতাসকে আলিঙ্গন করছে না, ভ্রমর-কোকিলও সুরে মেতে ওঠার অবকাশ পায়নি তবু কেবলই মনে হচ্ছে, জয়দেব-কেঁদুলিতে সব সময়েই সুর খেলা করছে। কেঁদুলি আসার এখন সময় নয়, এখন কেঁদুলি দেখে মন ভরবে না। আপনারাও এখন আসবেন না, পৌষ-সংক্রান্তির মেলার সময় আসবেন, তখন জমজমাট। শীতে ঠকঠক কাঁপতে কাঁপতে জয়দেবের গ্রাম দেখার আলাদা আনন্দ আছে। বীরভূম যখন এসেই পড়েছি, তখন ঘুরেই যাই এই ভেবে আসা।

বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে অজয় নদের তীরে এই গ্রাম। অজয়ের স্রোতধারার সঙ্গে সুরের ঝর্ণাধারা মিলেমিশে যেন এক হয়ে গেছে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন জয়দেব। সে আজ থেকে আটশো বছরের কথা। আটশো বছরের প্রাচীন গ্রাম কেঁদুলি এখনো তার ঐতিহ্য বুকে নিয়ে টিঁকে আছে। মেলারও প্রাচীনতা প্রায় একইরকম। এত পুরনো মেলা আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

এমনিতেই বীরভূমে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। ধর্মঠাকুরের প্রাধান্য এখানে বেশি। অবশ্য সিউড়ি শহরে উৎসবের জাঁকজমকটা বেশি। ধর্মঠাকুর নিয়ে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রায় দেড়শো বছর আগে নাকি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার খুব প্রভাবশালী উকিল ছিলেন। সে সময় সেহাড়াপাড়ায় ধুমধামে ধর্মপুজো হত। কী কারণে একবার মনের অমিল ঘটে। ত্রৈলোক্যবাবুর উৎসাহে আলাদা ধর্মপুজোর ব্যবস্থা হল। কোন একটা মুদিখানা দোকান থেকে বেশ ভারি একটা পাথর তেল-সিঁদুরে ডুবিয়ে এনে ঢাকঢোল বাজিয়ে ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়। ত্রৈলোক্যবাবু পুজো বাবদে এক টাকা চাঁদা দেন। অবশ্য তখনকার দিনে এক টাকায় পুজোর কোন অসুবিধে ছিল না। সেই থেকে ধর্মপুজোর সময় সর্বপ্রথম মুখোপাধ্যায় পরিবার থেকে একটি টাকা নেওয়ার প্রথা চলিত আছে।

এইরকম দলাদলি থেকেই ধর্মঠাকুরের সংখ্যা বীরভূমে প্রচুর। সিউড়িতে সাধারণত ধর্মপুজো হয় আষাঢ় বা শ্রাবণ পূর্ণিমায়। কিন্তু বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পূর্ণিমা পর্যন্ত বীরভূমের অন্যান্য জায়গায় ধর্মপুজোর ধুম পড়ে। মজাটা হোল যে পাড়ায় ধর্মপুজো হল বৈশাখী পূর্ণিমায়, পাশের পাড়ায় তখন সময় বদল করে আয়োজন হয় পরের কোন পূর্ণিমায়। প্রতিযোগিতায় কোন পাড়াই কম যায় না। পুজোর পনের কুড়ি দিন আগে থেকেই ধর্মতলা মাটির ভাঁড় ও ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়। পুজোর আগের দিন চোখে ঘুম থাকে না কারো। মশাল নিয়ে ঢাক বাজিয়ে ভক্ত্যারা পুকুরে স্নান সেরে মোটা সুতোর পৈতা পরেন। পরের দিন ভোরে ধর্মতলায় কাঠকুটো জড়ো করে অগ্নিকুণ্ড তৈরী হয়। সেই অগ্নি-কুণ্ডের আংরা অঞ্জলি ভরে তাঁরা ধর্মরাজের কাছে নিয়ে যান। তারপর শুরু হয় আগুন খেলা, কাঁটাখেলা। আগে বলিদানের রেওয়াজ ছিল এখন নেই। দুপুরবেলা পুজো। ধর্মরাজের মাথায় পদ্মফুল চড়ানো হয়, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করতে থাকেন। প্রচণ্ড জোরে ঢাক বাজতে থাকে, সকলে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করেন কখন ফুল পড়ে। ফুল পড়ার পর শোভাযাত্রা করে সকলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে থাকে। কয়েক বছর আগেও বিচিত্র সং বেরোত। এখন অবশ্য সং হয় কিন্তু তেমন বৈচিত্র্য নেই। এখন লাঠিখেলার প্রচলন আছে। বিভিন্ন জায়গার শোভাযাত্রা সিউড়িতে এসে জড়ো হয়। তখন সেখানে চলতে থাকে বেশ কয়েক ঘণ্টার নাচগান। বাজনদারেরা তুমুল উৎসাহে ঢাক বাজাতে থাকে, সমস্ত বীরভূম উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আগে মহাভারতের, রামায়ণের কাহিনী নিয়ে সং হোত, এখনকার সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে দিয়েও সং হয়।

আহম্মদপুর থানার বড় সাংড়ার ধর্ম-পুজো খুব মজার। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন পুজো। ধর্মরাজের নাম পুরন্দর। প্রথম দিন উপোস করে থাকার পর মূল ভক্ত্যার ভর হয়। ভরের মধ্যে তিনি পাড়ার কে কি অপরাধ করেছে সারা বছর তা বলতে থাকেন। দ্বিতীয় দিন উপোসের পর একটি কাঠের পাটাতনে লোহার শিক বিঁধে সেটিকে পুকুরঘাটে স্নান করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এটিকে বলে বাণেশ্বরী। বাণেশ্বরীর সংগে সকলেই স্নান করে। পুজোর পর বাণেশ্বরীর ওপর একজন ভক্ত্যা শুয়ে পড়লে তাকে কাঁধে করে মন্দিরে আনা হয়। অন্যান্যরা নিজেদের হাতে বাণ ফোঁড়ে। গভীর রাত্রে ধর্মরাজকে কাঠের ঘোড়ার ওপর বসিয়ে কয়েকজন ভক্ত্যা সেই ঘোড়া কাঁধে করে পাশের মালিগ্রামে যায়। সেখানেও ধর্মরাজ আছেন। দুই ধর্মরাজের মুখোমুখি দেখা হয়। তারপর বড় সাংড়ার ধর্মরাজ মালিগ্রাম থেকে আবার ফিরে আসেন। এই অনুষ্ঠানের নাম বনবেড়া। বনবেড়া অনুষ্ঠানের পর সকলে ফলজল খায়। তৃতীয় দিনও উপবাস। সকালে পুকুরে গিয়ে ঘট ভর্তি করে জল নেয় ভক্ত্যরা। সেই ঘট মাথায় নিয়ে এক জায়গায় সবাই দাঁড়ায়। তারপর প্রচুর ধূপধুনো জ্বালিয়ে জায়গাটিতে অন্ধকার করে দেওয়া হয় এবং তুমুল শব্দে ঢাক বাজতে থাকে। একে একে সমস্ত ভক্ত্যা অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এখন তাদের তুলে নিয়ে আসা হয় ধর্মতলায়, তারপর ধর্ম-রাজের পুজো আরম্ভ হয়। জয়দেব-কেঁদুলিতেও এই রকমের ধর্মপুজো প্রচলিত আছে।

কেঁদুলি আর পাঁচটা গ্রামের মতই সাধারণ গ্রাম। বলা যেতে পারে উপেক্ষিত। জয়দেবের জন্মস্থান হিসেবে যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। বছরের অন্য সময় কেঁদুলি নির্জন, দু'চারজন অতি উৎসাহী যাত্রী হয়ত জয়দেবের স্মৃতি স্মরণ করে বেড়িয়ে আসতে যান। ওখানে কিছু মোহন্ত আছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানা আছে তাঁরাও অধীর আগ্রহে বোধহয় প্রতীক্ষা করেন পৌষ সংক্রান্তির দিনটির জন্য। সে সময় কেঁদুলির চেহারা পাল্টে যায়। হাজার হাজার যাত্রী এসে জমা হন, আর জমা হন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাউলরা। একমাত্র বাউলদের আকর্ষণেই কেঁদুলির মেলায় যাওয়া যেতে পারে। কোন বাউলের সংগে আলাপ জমিয়ে একান্তে যদি গান শুনতে পারেন তো তন্ময় হয়ে যাবেন। সে-গান শহরের আধুনিক সুর মেশানো মিহি গলার নয়, দরাজ ভরাট গলায় প্রাণখোলা গান। বাণীর মধ্যে উচ্চারণের হয়ত কিছু ইতরবিশেষ থাকে কিন্তু সোঁদা মাটির স্পর্শ আছে তাতে। একতারাতে সুর উঠলে দারুণ শীতেও একটু অস্বস্তি লাগে না।

পৌষ সংক্রান্তিতে মেলার অন্যতম কারণ মনে হয় নতুন ফসল ওঠার জন্যে। যে-বছর ফসল ভাল হয় সেবছর মেলার জৌলস বাড়ে। কারণ মেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অন্নসত্র। হাজার হাজার যাত্রী জাতিবৈষম্যের কথা ভুলে গিয়ে অন্নসত্রের মেলায় একসংগে পাতা পেড়ে বসে খেয়েছেন। এ দৃশ্যের তুলনা নেই। গীতি-গঙ্গার সঙ্গম হিসেবে কেন্দুলিকে যেমন চিহ্নিত করা যায় তেমনি মুক্তাঙ্গনে অন্নসত্রের মধ্যে দিয়েও আন্তরিকতার অনুভূতি আসে। বিভিন্ন আশ্রম ও সেবা প্রতিষ্ঠানও এই অন্নসত্রে অংশ নেয়।

মেলাতে যেমন আসেন সাধারণ মানুষ নিছক মেলা দেখার আনন্দ পেতে, তেমনি আসেন পন্ডিত সুধীসমাজ তথ্য আহরণ করতে। অখ্যাত গ্রামের কোন এক কৃষক পরিবার বিশাল বটগাছের তলায় বসে যখন তাদের সিকনি নাকে ছোট্ট ছেলেটাকে একগাল ভাত খাওয়াতে ব্যস্ত তখন দেখা যাবে মেলার অন্য একপ্রান্তে ধোপদুরস্ত স্যুট পরে কোন একজন বাউলদের উদাত্ত গানের টেপ করতে ব্যস্ত। সারারাত্রিই চলে বাউলদের গানের আসর, কখনও বটগাছটিকে ঘিরে, কখনও ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ডের পাশে পা ছড়িয়ে দিয়ে। হয়ত কেবলমাত্র বাউলদের একতারার সুরেই জয়দেবের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরকাল।
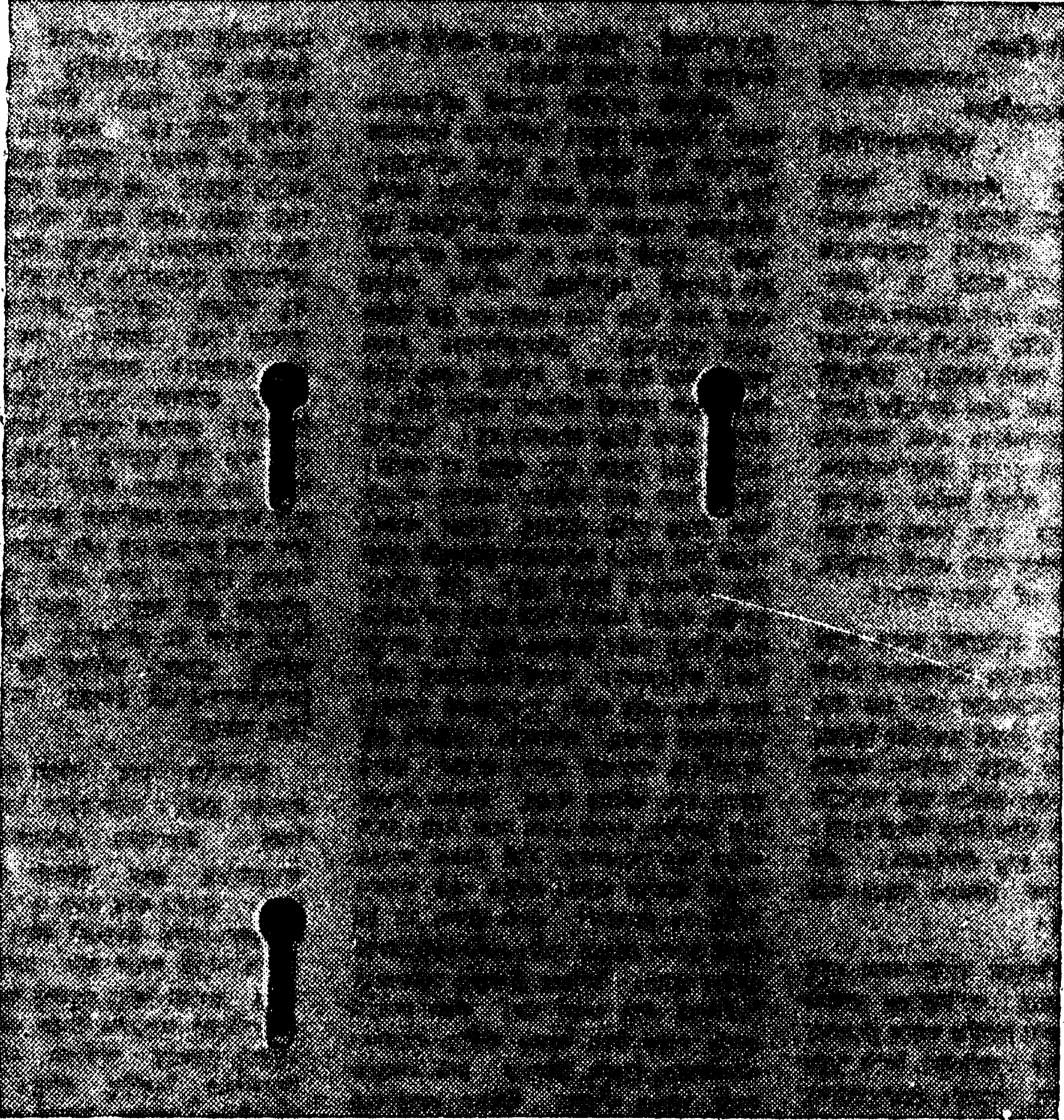
—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলসীচরিত

মনীষবিব চৌধুরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৭)

আমার তৃতীয় ইনষ্টলমেন্ট

আরেক দিন আলাপ হচ্ছিল।
প্রসঙ্গ আমি তুলেছিলাম।

বললাম, দেবাশিস, তুমি সেদিন বলেছিলে ম্যান ইজ বর্ণ উইথ দি ভাইরাস অফ সেলফ ডেস্ট্রাকশন; মানুষ জন্মেছে নিজের মধ্যে আত্মহননের বীজাণু বহন করে। কিন্তু আত্মসংবরণের বীজাণুও তো তার মধ্যে রয়েছে। অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ধীরে-ধীরে হলেও মানুষের সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে, মানুষের জীবনে আদর্শ ও মান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে একথা স্বীকার করতে হবে। অনেক অসাধারণ মনীষীসম্পন্ন, মহাপ্রাণ মানুষ জন্মেছেন যাঁরা অহিংসা, শান্তি, প্রেমের বাণী প্রচার করে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধবার জন্য নিজেদের জীবন ব্যয় করেছেন। গৌতম বুদ্ধের, যীশু খৃষ্টের বাণী—

দেবাশিসের মুখে হাসির রেখা দেখে কথা শেষ না করে থামলাম।

বললাম, হাসি পেল কেন তোমার?

বলল, এঁরা মানুষের মধ্যে অহিংসা, শান্তি, প্রেম প্রতিষ্ঠা করতে কতটা কৃতকার্য হয়েছেন। মাস্টারমশাই? এঁদের দুজনের প্রচারিত ধর্ম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম কতকগুলো মানুষকে একটা আলগা দাঁড়িতে বেঁধে দেয় মাত্র, মানুষের মৌলিক প্রকৃতির কোন পরিবর্তন করতে পারে না। তাঁদের শিক্ষা তাঁদের সমসাময়িক কালের পরিচিত অনেকের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। গৌতম বুদ্ধকে বিষাক্ত খাদ্য খাইয়ে মেরেছিল, তার পরিচিত গোষ্ঠীর মানুষ, যীশু খৃষ্টকে তাঁর নিজের জাত-ভাইরা ক্রুশে বিঁধিয়ে মেরেছিল। জুডা থেকে সে ধর্ম য়ুরোপে প্রচারিত হল কিন্তু ক্রীশ্চান য়ুরোপের জাতগুলো ধর্মের নামে যে সব কাণ্ড করেছে তা অহিংসা, শান্তি, প্রেমের, এক ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় দেয় কি? টাকা ও ক্ষমতার লোভে মানুষ যত অন্যায় এবং ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড করেছে, তার তুলনায় ধর্মের নামে মানুষ যে অন্যায় ও জীবননাশ করেছে তার ইতিহাস বেশী ভাল কি মাস্টারমশাই?

একটু হেসে বলল, নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাস আটিলা, চেঙ্গিজ খান, তৈমুর লঙের নাম করে। কিন্তু বহু পরবর্তী কালের বিশ শতাব্দীর সভ্যযুগের জহ্লাদদের তুলনায় এঁরা শিশু। খাঁটি আর্যবাদের প্রচারক ক্রিশ্চিয়ান এডলফ হিটলার লক্ষ-লক্ষ মানুষকে গ্যাস চেম্বারে ঠেলে দিয়েছে। আরেকজন খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান হ্যারী ট্রুম্যান দুটি এটম বোমা ফেলে সাড়ে তিন লক্ষ জাপানীকে কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে খতম করে দিয়েছে। বাংলা দেশের ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে আনুন মাস্টারমশাই। জাপানীদের হাতে পড়তে পারে বলে বাংলার চাষীদের ঘরের ধান-চাল কেড়ে নিয়ে শাসকগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীরা মিলে যে দুর্ভিক্ষ ঘটাল তার ফলে ত্রিশ লক্ষ মানুষ নিঃশেষ হয়ে গেল। অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছে কি সমাজ?

আড়াই থেকে দু' হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খৃষ্ট অহিংসা, শান্তি ও প্রেমের বাণী শুনিয়েছিলেন মানবসমাজকে। তাঁদের বাণী রক্তে আত্মহননের বীজাণুবাহী মানুষের মধ্যে কতটা কার্যকর হয়েছে সেকালে ও একালে?

হয় নি, কোন কালে হবেও না।

গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খৃষ্টের নামে দুটো ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। সম্প্রদায় ও দল সৃষ্টি হয়েছে, দু-চারজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের উপদেশ অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছে জীবনে, এর বেশী কিছু হয় নি।

মানুষের প্রকৃতিগত নিষ্ঠুর বর্বরতা অপরিবর্তিত রয়েছে।

বললাম, দেবাশিস, একটা ভুল তুমি বরাবর করছ। মানুষের মধ্যে আত্মহননের তাড়না যেমন আছে তেমনি শুভবুদ্ধির প্রেরণা রয়েছে। শুভবুদ্ধির প্রেরণা মানে নিজেকে বাঁচাবার তাগিদ। একক ও দলগতভাবে এ তাগিদ সকল শ্রেণীর জীবের মধ্যে রয়েছে। এই শুভবুদ্ধির প্রেরণা থেকে সমাজ, সংসার, ধর্ম ন্যায় ও নীতিবোধ, শান্তি, অহিংসা ও প্রেমেব কথা এসেছে।

ধর্মের গ্লানি দূর করবার জন্য ভগবান যুগে-যুগে আবির্ভূত হবেন এটা মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাসের কথা। শুভবুদ্ধির নামে মানুষকে আশ্বাস দেবার কথা।

নিজের মধ্যে আত্মহননের প্রবৃত্তির তীব্রতা ও দুর্দমনীয়তা দেখে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায় নি। বরাবর সে বাঁচবার চেষ্টা করেছে, করবে।

মুখ তুলে দেবাশিস বলল, হয়ত করবে।

একটু হেসে বলল, না করলেই বা এমন কি ক্ষতি হচ্ছে? মারামারি কাটাকাটি করে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে এই পৃথিবী গ্রহের কি ক্ষতি হবে তাতে? সৌরজগতে পৃথিবীর প্রতিবেশী আর কোন গ্রহের কি ক্ষতি হবে তাতে? মানুষের সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য সব ধ্বংস হলে, মানুষের সব বুদ্ধির গৌরব, এমোশনের ঐশ্বর্য ছাই হয়ে গেলে এক ফোটা চোখের জল ফেলবার জন্য এই অসীম বিশ্বে কাউকে পাওয়া যাবে না মাষ্টারমশাই।

মনে মনে শিউরে উঠলাম দেবাশিসের কথা শুনে।

আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে দেবাশিস আবার বলল, পদার্থবিজ্ঞানীরা পার্টিকলস ও অ্যান্টি-পার্টিকলস, ম্যাটার ও

অ্যাণ্টি-ম্যাটার-এর কথা বলেন। তাঁদের অনুসরণ করে ম্যান ও অ্যান্টি-ম্যানের কথা বলা চলে কি মাষ্টারমশাই? ম্যান ও অ্যাণ্টি-ম্যান সংঘর্ষ চলছে, এর শেষ কি হবে অনিশ্চিত। হয়ত সামগ্রিক ধ্বংস ঘটবে। তাতে কিছু যায় আসে কি?

জবাব বেরোল না আমার মুখ থেকে।

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, দুজন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার নাম করেছেন আপনি। আমি আরও দু-একটা কথা বলতে চাই এ সম্পর্কে। বলব কি?

বলো, আমি তোমার কথা শুনে যাচ্ছি।

ধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সব দেশে মোটামুটি এক রকম। প্রতিষ্ঠাতা উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁকে মূলধন করে ধর্মের কারবার চালু করে তাঁর লেফেন্টনান্ট দল। উদ্দেশ্য, মানুষকে বশীভূত করে ক্ষমতা লাভ করা। বিচার-বুদ্ধিকে, জিজ্ঞাসাকে morcotise করে অন্ধ বিশ্বাসকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করে ধর্ম। উপায়টা প্রিমিটিভ, কিন্তু মানুষকে বশীভূত করবার শক্তিতে এ উপায়ের তুলনা নাই।

কিছু মিরাকল, প্রধানত ব্যাধি উপসম সংক্রান্ত, দেখাতে হবে, তারপর দলে-দলে লোক পিছনে ছুটবে, যেমন যীশু খৃষ্টের জীবনে হয়েছিল। শেষের দিকে দেখা যায় মিরাকল দেখে অভিভূত ভক্তরা যীসাসকে সন অফ গড পদে অভিষিক্ত করল (এম ৮, ২৯), রিজারেকশনের পরে তাঁর উপাসনার প্রচার হল (এম ২৮, ৯)।

একটু হেসে বলল, যীশাস মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রেম, শান্তির কথা বলেছেন কিন্তু তিনি পুরোপুরি শান্তিবাদী ছিলেন না,

থিংক নট দ্যাট আই অ্যাম কাম টু সেণ্ড পিস অন আর্থ; আই কাম নট টু সেণ্ড পিস বাট এ সোর্ড (এম, ১০,৩৪)। তাঁর উদারতা সব মানুষের প্রতি নয়, শুধু তাঁর অনুচরদের প্রতি হি দ্যাট ইজ নট উইথ মি ইজ এগেনস্ট মি (এম ১২, ৯০)। এটা কি একজন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার কথা না সেণ্ট-পার্সেণ্ট সেমিটিক ট্রাইব্যাল লীডারের কথা?

মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল দেবাশিস, তারপর ধীরে-ধীরে বলল, প্রেমের কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা, মানুষের ইতিহাসে ক্ষীণ কণ্ঠে মাঝে-মাঝে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। এ যেন মানুষের হিংস্রতার বিরুদ্ধে তার নিজেরই প্রতিবাদ, আপনার কথায় নিজের শুভবুদ্ধির কাছে মানুষের আবেদন। কিন্তু আবেদনে কোন ফল হয় নি মাস্টারমশাই, ভাল কথা, ভাল আদর্শ নিয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারা মানুষের ভাল করতে কাজে লেগেছেন, তৈরী হয়েছে শুধু ডগমা সংঘ, সম্প্রদায়, তৈরী হয়েছে কলহ ও কাটাকাটি করবার নতুন উপলক্ষ্য।

আমি দেবাশিসের মাস্টারমশাই, কিন্তু স্বীকার করছি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোন বিষয় যুক্তিতর্ক দিয়ে তাকে বোঝাবার সাধ্য আমার নাই।

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে পাঠ্য বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যখন বাড়ী ফেরবার জন্য উঠলাম আমার মন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে।

(৮)

বয়স হলে নানারকম অভিজ্ঞতার ফলে বিস্মিত হবার মনোভাব নষ্ট হতে শুরু হয়। বিস্মিত হবার, খুশী হবার সামর্থ্য যদি যায় আনন্দ পাবার বারো আনা সম্বল চলে গেল জীবন থেকে। বয়সের ধাক্কা এই-ভাবে মনে এসে লাগে প্রথমে।

টিউশানির দু বছর শেষ হতে চলল। দেবাশিসের মত বা বিশ্বাসের আরও পরিচয় প্রকাশ পেতে লাগল। যে ধরনের কথা এতদিন শুনেছিলাম তার মুখ থেকে আমার মনে একটা ছক তৈরী হয়েছিল তা থেকে। তাই তার কথা-গুলো তেমন বিস্ময়কর মনে হল না, তার চিন্তাধারাও অপ্রত্যাশিত মনে হল না।

লক্ষ্য করছিলাম তার ব্যবহারের মধ্যেও ক্রমে পরিবর্তন আসছিল।

সুপার ম্যান সম্বন্ধে তার অভিমত প্রকাশ করবার পরে কমোন ম্যানের কথা তুলল দেবাশিস কোন সরকারী মুখপাত্রের বক্তৃতার আলোচনা প্রসঙ্গে।

বলল, কমোন ম্যান কথাটা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। যা কিছু করা হচ্ছে সব নাকি কমোন ম্যানের হিতের জন্য। এনা-লাইজ করলে দেখা যায়, কমোন ম্যানিজম হচ্ছে হিরো ওয়ার্শিপের উল্টো স্লেভ ওয়ার্শিপের রকমফের। যারা কমোন ম্যানকে ঘানিতে ফেলে সব তেল বের করে নিচ্ছে অথবা আষ্টে-পৃষ্ঠে শেকল পরিয়ে ক্রীতদাস করতে দ্বিধা করে না ফুল দুর্ব্বো নিয়ে তারাই আবার ওম কমোন ম্যানায় স্বাহা বলে অঞ্জলি দিচ্ছে। যেদিক থেকে দেখা যায় মনে হয় কর্তারা ভাঙ্গিয়ে খাবেন বলে কমোন ম্যানের সৃষ্টি এই ধারণা চালু হয়েছে।

হেসে বলল, ভাঙিয়ে খাওয়া মানে মাথায় হাত বুলিয়ে বা বেধড়ক পিটুনি দিয়ে দু রকমই হতে পারে।

মাস কয়েক কেটে গেল। কথাবার্তা থেকে মনে হল রুটিনমত পড়াশোনা করা ছাড়া সে নিজে কিছু পড়াশোনা করছিল। একদিন সংবাদপত্রের একটি খবরের প্রসঙ্গে মোরালিটি ইমমোরালিটির কথা উঠল। দেবাশিসের মুখে তার নূতন এথিকসের ব্যাখ্যা শুনলাম।

বলল, মোরালিটি একটা সোস্যাল চেক, গেরোস্থলোকের সেফটি ডিভাইস। মোরালিটি নেচারে নাই, পশু-পাখীতে নাই, মানুষের জীবনেও নাই। মোরালিটিতে বিশ্বাস রয়েছে এক শ্রেণীর ইন্টেলেকচুয়ালী রিটার্ডেড লোকের মধ্যে। মোরালিটিতে বিশ্বাস করে এবং জীব রাইজ করেছে এমন দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন কি মাস্টারমশাই?

বললাম, তুমি যে সব মত প্রকাশ করো সত্যি সে সব মতে তোমার বিশ্বাস আছে, সে সব মতানুসারে কাজ করতে পারো ধারণা থাকলে দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করতাম। আমার ধারণা তোমার মতগুলো ইণ্টেলেকচুয়াল এক্সপ্লোরেশনের ফল, তোমার কনভিকশান নাও হতে পারে।

ভেবেছিলাম এই নিহিলিস্ট যুবকের চোখে আগুনের ফুলকি দেখা যাবে, কিন্তু না, সে মুখ নামিয়ে একটু হাসল, বলল, আমি মাত্র একটা বিষয়ে অনেস্টিতে বিশ্বাস করি মাস্টারমশাই, সেটা হচ্ছে ইণ্টেলেক-চুয়াল অনেস্টি।

মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে, বলল, আমার কোন মতের জন্য ওরিজিনালিটি দাবী করি না। চিন্তার ব্যাপারে আমরা জানা ম্যাক্যাডেস করা প্লেন রাস্তায় ঠেলা গাড়ী, সাইকেল, বড়জোর মোটর গাড়ী চালাই, তাইতে আমরা অভ্যস্ত, পরিচিত জিনিস ছাড়া আর কোন দিকে চোখ যায় না। চিন্তার জগতে স্পেস ট্রাভল করে যারা, মানুষের পৃথিবীকে দূরে থেকে দেখতে পায়, মানুষকে তারা ক্লাসিফাই করে থিঙ্কিং ম্যাস্যাল বলে। সায়েণ্টিস্টের চোখ দিয়ে মানুষের উন্নতি, বৃদ্ধি, পারফর-ম্যান্স, পসিবিলিটি বিচার করে তারা। যারা শুধু টেকনোলজিস্ট তারা অবশ্য কোন ফালতু চিন্তাই করে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর একটু হেসে বলল, মোরালিটির কথা চলছিল।

আরও কিছু বলতে চাই এ-সম্বন্ধে, আপনি কিছু মনে না করলে।

বললাম, তোমার কথা শুনে যাই আমি, কিছু মনে করি না।

বলল, মোরালিটির কথায় সেক্স মোরালিটি এসে পড়ে।

পড়ে।

সেক্স মোরালিটি বলে সত্যি কিছু আছে কি মাস্টারমশাই? পৃথিবীর অসংখ্য শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে মানুষ একটি শ্রেণী মাত্র। তাদের মধ্যে যা নাই, মানুষের মধ্যে সেটা আসবে কোথা থেকে? সেক্সের উদ্দেশ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আমাদের দেহের সেলগুলো একটা ভেঙে দুটো, দুটো ভেঙে চারটে হয়। বংশবৃদ্ধির প্রবণতা লাইফের সেলের স্টেজ থেকে রয়েছে দেখুন। অসংখ্য সেলের সমষ্টি নিয়ে গড়া কীট-পতঙ্গ, মাছ, পাখী, সরীসৃপ, স্যামল ইত্যাদি জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য স্পেশালাইজড প্রসেস হল, সেক্স ডিফারেনসিয়েশন এল, স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে দৈহিক মিলন সংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে যাতে অরুচি না ধরে তার জন্য দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রবল, অতি শক্তিশালী, চুম্বকী আকর্ষণের বীজ ঢুকিয়ে দেয়া হল কতকগুলো টিসুর মধ্যে। সেক্সের কাজ সম্পূর্ণ মেকানিকেল। সেক্সের ব্যাপার এই কিনা মাস্টারমশাই?

হ্যাঁ। নতুন কথা বলছ কি?

না মাস্টারমশাই। অতি পুরনো কথা কিন্তু আমাকে জানতে হয়েছে নতুন করে। সেক্স সেন্সের উন্মেষ, সেক্স একসাইট-মেন্টের চেহারা, সেক্স পারফরম্যান্স, তার আনন্দ নতুন করে আবিষ্কার করে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ, রিপ্রোডাকটিভ টিসুগুলো সাহায্য করে এ-কাজে। দেহের অন্য টিসু-গুলোর কাজের সম্পর্কে মোরালিটি-ইমমোরালিটির প্রশ্ন ওঠে না, রিপ্রোডাক-টিভ টিসুগুলোর কাজের সম্পর্কেও ওঠে না। ওঠে কি?

বললাম, আমি তোমার কথা শুনছি। তোমার সঙ্গে তর্ক করছি না। তর্ক যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করছ কি?

না মাস্টারমশাই, করছি না। তর্ক যুদ্ধ করে কোন মীমাংসায় আসা যায় না এসব ফান্ডামেন্টাল বিষয়ে। আমি যা বলছি সেটা বিশ্বাস করি।

একটু থেমে বলল, সেক্স ডিজায়ার একটা ইনকিওরেবল স্কিন ডিজিজের মত, সব সময় ইরিটেট করছে কমপেলিং ওয়ান টু বিহেভ ইন আগলি, স্টুপিড ম্যানার। একটা ন্যাস্টি ব্যাপারকে এক রাশ থ্রিল দিয়ে মুড়ে এমন করা হয়েছে যে, তার বীভৎসতার দিক চোখে পড়ে না। মানুষ যে থ্রিল অনুভব করে পশুপাখীদের সেক্স থ্রিল থেকে কি সেটা আলাদা, না বেশী সিভিলাইজড? কিছুক্ষণ মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল দেবাশিস, তারপর বলল, এই নিছক দেহজ ব্যাপারে মোরালিটির স্থান কোথায়? ম্যান মেড মরালিটি হ্যাস নাথিং টু ডু উইথ নেচার মেড সেক্স পারফরম্যান্স অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন।

আরও কিছুক্ষণ পরে উঠে গেল সেদিনকার মত। অন্য দিনের মত ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিল না, আজ থাক বলে চলে গেল ভেতরে।

দেবাশিসের সম্বন্ধে আমার মনে ভয় ঢুকেছিল। যে দু-চারটে ব্যাপার চোখে পড়েছিল, যে দু-একটা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম তা থেকে ভয় হয়েছিল দি জায়েন্ট মে টার্ণ ইন্টু এ মনস্টার।

বুদ্ধিতে জায়েন্ট বটে। স্পেশালাইজড জ্ঞান নেই কোন শাস্ত্রে, প্রোফেশনালদের মত, যে চেষ্টা ও সময় ব্যয় করা প্রয়োজন, তার জন্য সেটা কিছু নয় দেবাশিসের কাছে। ইচ্ছা করলে, প্রয়োজনমত পরিশ্রম করলে যে-কোন প্রোফেশনের শীর্ষস্থানে ওঠবার মত মেরিট আছে তার। বুদ্ধিকে উত্তপ্ত লৌহ-শলাকার মত করে মানুষের বিশ্বাস নীতিধর্ম, হৃদয়বৃত্তি, দেহবৃত্তি, মননক্রিয়া, সমাজ-সভ্যতা, ইতিহাস সকলের মর্মস্থানে সেই তপ্ত, তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করে মূল পর্যন্ত দগ্ধ করে দিয়েছে সে, যে সব সংস্কার, বিশ্বাস, বাধানিষেধ পরিবার ও সমাজের ভিত্তিস্বরূপ, সেগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে হয়ত।

জীবনে কি করবে দেবাশিসের মত যুবক? বিজ্ঞানের গবেষণা করতে পারে, অর্থ-প্রতিপত্তি লাভের পথে যেতে পারে। সে সব ভবিষ্যতের কথা। উপস্থিত দেখা যাচ্ছে সে বহুপদ-পিষ্ট একটা পথে চলেছে। অর্থ আছে, সুন্দর রূপ আছে, যৌবনে পা দিয়েছে সে, বডি প্লেজারের তৃষ্ণা আসে এ-বয়সে। বুদ্ধির প্রখরতা, বিশ্লেষণের ছুরি রুখতে পারে না এ-তৃষ্ণাকে, তৃষ্ণা দেহের প্রতিটি জীবকোষের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আমার ভয় বুদ্ধির বন্ধনহীন, হৃদয়ের বন্ধনহীন ছেলে কোথায় চলে যাবে সেক্স-থ্রিলের নেশায়? জায়েন্ট কি সত্যই মনস্টারে পরিণত হবে?

রাস্তায় তার গাড়ীতে একাধিক অপরিচিতা মেয়েকে দেখেছি, দু-চারবার পড়িয়ে বেরোবার সময়ে গাড়ীতে বসে অপরিচিতা মেয়েকে অপেক্ষা করতে দেখেছি, দূরে দাঁড়িয়ে মিনিট-দশ পরে দেবাশিসকে বেরিয়ে এসে সে গাড়ীতে উঠতে দেখেছি।

এসব নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা করবার কথা নয়, আমি একজন প্রাইভেট টিউটর মাত্র। তবু প্রায় তিনটি বছর ভদ্র, বিনয়ী স্বভাব, পড়াশোনায় নিষ্ঠা, বুদ্ধির তীব্র ঔজ্জ্বল্যে দেবাশিস মোহমুগ্ধ করে রেখে-ছিল আমাকে, তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করা ঠেকাতে পারি না। কোন নীতিবোধ তার নাই, থাকলে না হয় দু-একটা কথা বলবার চেষ্টা করতাম।

কেমিস্ট্রি নিয়ে এম এস-সি ক্লাশে ভর্তি হয়েছিল দেবাশিস। আমি চাকুরি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করলাম, সে রাজি হল না। মাস-চারেক পরে হঠাৎ একদিন দেবাশিসের বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম লোক মারফৎ, সঙ্গে তিন মাসের বেতনের একখানি চেক। চিঠিতে জানিয়েছেন দেবাশিস কাল হঠাৎ বিলাতে রওনা হয়ে গিয়েছে। আগের দিন তার যাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে আমাকে জানিয়েছিল। সেদিন আপনার আসবার কথা নয়, কিছু জানাতে পারিনি, সম্ভবত দেবাশিসও আপনাকে কিছু জানায়নি। আগে আপনাকে জানানো হয়নি, এজন্য তিন মাসের বেতন পাঠালাম। অবসরমত একদিন আসবেন, কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবে।

বিস্মিত হলাম। হঠাৎ এভাবে চলে যাবার মানে কি? কিছু অনুমান করতে পারলাম না।

তারপরের দিন রেজেস্টারী ডাকে একখানা চিঠি পেলাম দেবাশিসের। লিখেছে, মাস্টারমশাই, হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি আমাকে দেশ ছাড়তে হল। বিলাতে কি করব তার বন্দোবস্ত করে তারপর যাব ইচ্ছা ছিল, সেটা সম্ভব হল না।

আমি কোন কথা না বললেও যে-ধরনের ব্যাপারে ক্রমে জড়িয়ে পড়ছিলাম, তার খানিকটা হয়ত জানতে পেরেছেন। এর সঙ্গে আমার না বলে দূরে চলে যাবার কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে আপনার পক্ষে অনুমান করতে অসুবিধা হবে না। ইমোশনাল হ্যাং-ওভার-এর উৎপাত সত্যি বেড়ে চলছিল।

বাবার কানে কিছু কথা পৌঁচেছে হয়ত। তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। টাকা যা দিয়েছেন বেশী দিন চালানো যাবে না। ওখানে গিয়ে কিছু করতে হবে।

আপনার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আমি। কতবার স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘন করেছি, আমার সব বাচালতা নির্বিকারভাবে সহ্য করেছেন। একটা লেসন এটা।

একটা অনুরোধ করছি, সম্ভব হলে রক্ষা করবেন। আর প্রাইভেট টিউশানি করবেন না, আপনার যোগ্য কাজ নয় এটা। বাবার মোটা টাকার শেয়ার আছে এমন একটা কেমিকেল এন্ড ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়েছি বাবাকে দিয়ে তাদের লেবরেটরীতে আপনাকে রিসার্চের সুযোগ দিতে। তারা রাজি হয়েছে বাবার অনুরোধে, হয়ত শীঘ্রই অফার পাবেন। মাসে মাসে কিছু দেবে।

এই সঙ্গে দুটো ফরমুলা পাঠালাম। নিজে করব বলে কিছু খরচ করে কিছু চেষ্টা করে সংগ্রহ করেছিলাম। আমি পারলাম না, আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন।

কোম্পানী থেকে অফার আসতে দেরি হলে বাবাকে একটু বলবেন। আমার প্রণাম নেবেন।

দেখলাম পিন দিয়ে আটকানো দুখানা শিটে দুটো ফরমুলা লেখা রয়েছে। এর জন্য চিঠি রেজেস্টারী করা দরকার হয়েছে বুঝলাম।

(৯)

আমার আশংকা হয়েছিল জায়েন্ট মনস্টারে পরিণত হচ্ছে। ভয়ংকর মনস্টারে পরিণত হয়েছিল দেবাশিস।

সে চলে যাবার তিনমাসের মধ্যে একটি মেয়ের সুইসাইডের খবর কাগজে বেরোল। লেকে ডুবে মরেছে। করোনারের রিপোর্টে জানা গেল অন্তঃসত্ত্বা ছিল। দেবাশিসের সঙ্গে এই আত্মহত্যার কোন সম্পর্ক আছে এ কথা কাগজে বেরোয়নি। প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্য মরবার আগে তার বাড়ীর লোকের জন্য যে চিঠি রেখে গিয়েছিল সে চিঠিতে দেবাশিসের নাম ছিল এবং বাড়ীর লোকেরা তাকে ধরবার জন্য তার বাড়ীতে গিয়েছিল এবং আশ্চর্যের কথা তার ঠিকানা পাবার জন্য আমার কাছেও এসেছিল। চিঠি পুলিশের হাতে গিয়েছিল এবং পুলিশ খোঁজ-খবর নিয়েছিল। এর মাস দুই পরে এবরশন করতে গিয়ে মৃত্যুর কেস পুলিশের হাতে এল। এ মেয়েটি শেষ স্টেটমেন্টে দেবাশিসকে জড়িয়েছিল। মেয়েটির বাপ ছিল না, ভাইকে পুলিশ এবরশনের প্ররোচনা দেবার অভিযোগে ধরেছিল, তার ফলে স্টেটমেন্টের কথা কিছুটা জানাজানি হল।

ভাবলাম হতভাগিনীরা প্রেম করতে গিয়ে গন্ডগোলে পড়ল কেন, বাজারে কি কনট্রাসেপটিভের অভাব হয়েছিল? ভাবলাম দেবাশিস কি বিয়ে করবার প্রলোভন দেখিয়েছিল এই মেয়েদের? মনে হয় না। একদিনের কথা মনে পড়ল। পড়তে বসে ছোট এলাচ চিবোচ্ছিল, সন্দেহ হল মদ খেয়েছে। নিজে থেকে মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা তুলে যা বলল তার অর্থ এই যে, একটি লোক বিয়ে করবে না জেনেও কোন মেয়ে যদি অবুঝ হয়ে তার পেছনে ঘোরে তাহলে সে কি করতে পারে? মোহমুদগর শোনালে কি তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব?

দেবাশিস মোরালিটি মানত না, মানবার ভানও করত না। যে দুটি মেয়ে প্রাণ দিল তারাও মোরালিটি মানত না। মোরালিটি মানত না কিন্তু প্রেস্টিজ নষ্ট হবার ভয়টুকু ছিল মনে। সন্তান গর্ভে আসবার পরে প্রেস্টিজ রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করেছিল নিশ্চয়, দেবাশিসকে ভয় দেখিয়েছিল হয়ত। বোকা মেয়েরা দেবাশিসকে চিনতে ভুল করেছিল। পাব্লিক স্ক্যান্ডেলের ভয় দেখিয়ে কোন বন্ধু হয়ত তাকে পালাবার পরামর্শ দিয়েছিল। নইলে হয়ত এখানে থেকে যেত সে এবং আদালত পর্যন্ত গড়ালে ঝাড়া জবাব দিত কোন বয়স্থা মেয়ে যদি বডি প্লেজারের জন্য একজন যুবককে তার সঙ্গে এক শয্যায় রাত কাটাবার জন্য তাকে ডাকে তাহলে সে কি করতে পারে? একাধিক জায়গা থেকে এরকম নিমন্ত্রণ আসতে পারে। যেখানে বিয়ের কথা নাই, উভয়ের আনন্দ লাভের জন্য অস্থায়ী মিলন মাত্র আছে সেখানে এই এনজয়মেন্টের ফলাফলের জন্য সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি স্বীকার করবার কথা কি করে ওঠে?

সম্ভবত তার জবাব শুনলে সমাজরক্ষক, ন্যায়দন্ড পরিচালক আদালত শিউরে উঠত, দেবাশিসকে এক নম্বর সমাজের শত্রু বলে ঘোষণা করত, নীতিকথাপূর্ণ বিজ্ঞ জাজমেন্ট দিত, আইনের বিধান অনুযায়ী কঠোরতম শাস্তি দিত।

স্ক্যান্ডেলের ভয়ে হোক, শাস্তির ভয়ে হোক দেবাশিস পালিয়েছে। তার পিতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, টাকা দিতে পারবেন না ছেলেকে একরকম জানিয়েছেন। পড়বার খরচটা দিলে ভাল হত, নিয়মিত পড়াশোনা করে একটা কিছু করতে পারত। যে দেশে সে গিয়েছে টাকা না থাকলে কেউ ফিরেও তাকায় না রাস্তায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কান্ড কিছু না করলে। তাহলে বিদেশে কি করবে দেবাশিস? ভগবান জানেন কি করবে। মনস্টার জায়েন্টকে শেষ করে দেবে না জায়েন্ট তার জায়েন্টত্ব প্রমাণ করতে পারবে?

আমি প্রৌঢ় হয়েছি, আমি গরীব গৃহস্থ, আমি মোরালিটি মানি, তবু স্বীকার করতে লজ্জা নাই দেবাশিসকে আমি ভালবেসেছিলাম। ভালবাসি এখনও। তার দুশ্চরিত্রতা, তার আইকনোক্লাজম, তার চিন্তার বরার নিলজ্জতা সব নিয়ে সে একজন অসাধারণ ছেলে। যদি তার চোখে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পায় সে তবেই তার বাঁচবার চান্স আছে, নইলে ঝলসে মরে যাবে।

দেবাশিস আজকার বিজ্ঞানীযুগের একজন একসপ্রিমেন্ট ইন্টেলেকচুয়াল। তার ভাষা কোট করে বলতে পারি তার দুশ্চরিত্রতা একটা চর্মরোগ বিশেষ, আর সব ঠিক আছে। তার প্রোব্লেম আজকার রিক্তবিশ্বাস, আশাভরসাহীন, অসুখী ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রোব্লেম। বিশ্বাসের অভাবে জীবনে আঁকড়ে ধরবার মত কিছু মেলাতে না পেরে তাদের কর্মের উদ্যম পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মন অন্ধকার, হৃদয়ের সব সরলতা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। তাই বেঁচে থাকবার অবলম্বন খোঁজে তারা সেক্স-প্লেজারে।

বিজ্ঞানী যুগের বন্ধুর পথে অসুখী, অসুস্থ পায়োনিয়ার দলের পুরোভাগে চলেছে সব দেশের দেবাশিসের মত উদভ্রান্ত ইন্টেলেকচুয়ালরা। কবে এরা সত্যের পথ দেখতে পাবে জানি না, সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি জ্যোতির্ময় আবরণের দ্বারা যে সত্যের স্বরূপ আবৃত রয়েছে সেই সত্য প্রতিভাত হোক তাদের নিকটে, প্রতিভাত হোক দেবাশিসের নিকটে।

জানি না সে সুদিন আসবে কিনা, যদি আসে যখন আসবে আমি তখন টিকে থাকব কিনা। না থাকলেই বা কি হয়েছে, মরবার সময়ে সুদিন আসছে মনে এই আশা নিয়ে দেবাশিসের মঙ্গলের প্রার্থনা নিয়ে মরব। (ক্রমশঃ)

মুখের মেলা

জনকের বাবা

'দশ বচ্ছরের 'চিগুনে,' তখন থেকে আমি লাঙলের 'মুঠে' ধরিছি—হাল করতে করতে গলা শুকিয়ে গেলে মায়ের দুধ খেয়েচি-বড় মামা যখন তেজ গরু দুটোর 'ন্যাজ' মলে সুনো-দড়ির চাবুক হেনে মই দৌড় করাতো তার কোমর জাপ্‌টে ধরে থাকতে হতো—ছেড়ে দিয়ে পড়ে পাকা ঢেলা-মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদলেই বড় মামা 'কানমুতো' ফাটিয়ে দিত কড়া-পড়া হাতের আষাঢ়ে চাপড় মেরে। বড় মামার গতর ছিল যেন পাথর! সে কব্জি চেপে ধরলে এ অঞ্চলে হেন লোক ছিল না যে আছাড় কাছাড় করে সাত ঘন্টাতেও হাত ছাড়াতে পারে! সেই মামার পাল্লায় পড়ে আমার গতরও পাষাণ হয়ে গেল। চাষের সব কাজ শিখে ফেললুম। জোয়ান বয়েসে কপাটি খেলায় কত যে 'মেডেল' পেয়েছিলুম তার ঠিক নেই। কাজের গুমোর তুমি আমার কাছে করো না পঞ্চানন! কোনো শালা আজ পর্যন্ত কোনো কাজেই আমাকে হারাতে পারে না। সে পাট-কাটা বলো, ধান-কাটা বলো, পাট-কাচা বলো, ধান ঝাড়াই বলো! পুকুর কাটা, জল ছেঁচা, ঘর ছাওয়া, পটলের ভাঁটি টানা, ধানের গোলা বোনা, জমি রোয়া, বীজতলা ভাঙা, বোঝা বওয়া, গাছে ওঠা, খেজুর গাছ কাটা, গুড় জনাল দিয়ে পাটালী করা, জাল বোনা, ঝ্যাংলা বোনা, দড়ি পাকিয়ে দোলা বোনা'—

'থাম শালা, হয়েছে, তোকে আর বাজোর 'বিধেন' দিতে হবে না। সব কাজ তুই পারিস ঠিকই, কিন্তু অনেক কাজ তুই পারবি না।'

পঞ্চাননের কথায় সোজা হয়ে বসল কানাই ঢেঁকি। বললে, 'কি, কাজটা কি শুনি?'

'তুই কি এঁড়ে গরুর দুধ দুইতে পারিস?'

'দুর শালা। এঁড়ে গরুর দুধ হয়?'

'তুই কি খোলাম-কুচির পিত্তি বার করতে পারিস?'

'না।'

'তুই কি ন্যাংটো হয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারিস?'

'না। এসব কাজ নয়।'

'তবে কাজের কথাই হোক। ঢেঁকি চাঁছতে পারিস?'

'পারি। বিশটা ঢেঁকি আছে এই সাতখানা গেরামে আমার হাতের। মা-মাসীরা ধান ভেনে খাচ্ছে তাতে।'

'আচ্ছা তুই ঘোড়া ছোটাতে পারিস?'

'শালা! ঘোড়ার সখ ছিল আমার কে না জানে? একটা ঘোড়া ছিল না, স্যায়দালী সেখের ঘোড়াটায় চড়ে কত রুমাল, ঘড়া, কাপ জিতে আনতুম। একবার রহিম খোয়াড়অলার খোঁয়াড়ে কারখানা অঞ্চলের হিন্দুস্থানীরা একটা ঘোড়া দিয়ে গেল তাদের 'গেহু' (গম) খেয়েছিল বলে। তিনমাস কেটে গেল, কেউ আর ছাড়াতে এল না। আমি ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বেড়াতুম। রহিম সেখ আমাকে ঘোড়াটা বেচতে চাইলে মাকে বললুম। মা বললে, 'হাঁরে হতভাগা, ন'গন্ডা টাকা তুই পাবি কোথা?' শেষে মা তার বাপের দেওয়া বহুকালের গোছে রাখা যখের ধন একটা সোনার টিকুলি বেচে এনে টাকা দিলে। নেই-ছেই একটা ছেলে, সাধ করেছে ঘোড়া কেনার...তা ঘোড়াটা কিনে ফেললুম। হরদম দৌড় করতুম। ঘোড়ায় চড়ার কি যে সুখ—কি যে আনন্দ, সে তুমি বুঝবে না পঞ্চানন! শেষবেলা শালা ঘোড়াটার পিঠে ঘা হয়ে গেল!'

পঞ্চানন জাল বুনছিল টকাটক 'কেঁড়ে' 'নালি' চালিয়ে। সন্ধ্যার সময় চা-দোকান সব জমজমাট। অনেকেই তাদের কথা শুনছিল। কেউ গাঁজায় দম দিচ্ছিল। কেউ-বা রেসের টিকিট বিক্রি করছিল দলবল জুটিয়ে নিয়ে 'লাকি জাকি' এইসব বলতে বলতে। চা-দোকানে রেডিও চলছে— হিন্দী সিনেমার লিথোয় ছাপা সস্তা ছবি দোকানের চারদিকে।। প্রায় উলঙ্গ বিখ্যাত হিরোইনদের অশ্লীল অসভ্য ছবির আড়ত যেন গাঁয়ের চা-দোকানগুলো। আর অশ্লীল কথার মৌতাত! এরই মধ্যে আবার মনসার পাঁচালী পড়ছে বট-তলার শান বাঁধানো চত্বরে বসে বিনয় সরদার। জয়দেব বাগের হাতে করতাল, অজয় মালিক হারমোনিয়াম ধরে বসে আছে, নকুড় বাবাজীর কোলে খোল। হরিনাম গাইবে ওরা। আট-দশটা চা-দোকানে লোকের ভিড়, মুদিখানায় বেচাকেনা চলেছে। ডাক্তারখানায় তাস পেটা চলেছে বাজি রেখে। ছুতোর মিস্ত্রিরা কাঠ চেঁছে চলেছে ঘ্যাসোর ঘ্যাসোর শব্দে।

যে যার কথায় মসগুল আছে। এর মধ্যে আবার রাজনীতির কর্তা-ব্যক্তিরা ভোটের জন্যে কর্মীদের পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে কি কি করা বা বলা কর্তব্য তার নির্দেশ দিচ্ছেন।

'চলে গেল, তেলেভাজা, পাঁপর ফুড়ুলি'—বলে মাঝে মাঝে চেল্লাচ্ছে স্বপন অধিকারী।

পঞ্চানন পন্দান হঠাৎ গম্ভীর মেজাজে কানাই ঢেঁকিকে শুধোলে, 'তা তোর ঘোড়ার পিঠে ঘা হল কেন শুনি?

কানাই বললে, 'হল!'

'হল কেন তাই বল্ না?'

কানাই চুপ করে হাসতে লাগল।

একজন লোক সে বলে, 'হাঁ গো বাবুরা, আমাদের বেগুন চুরির একটা সালিশি বসেছে—যাবে নাকি গো তোমরা?'

'বেগুন চুরি? কে চুরি করেছে? ধরা পড়ল কি করে? যে ধরা পড়ে সে আবার চোর কিসের? ' বললে কানাই।

পঞ্চানন বললে, 'তাছাড়া দু'কেজি বেগুন চুরির জন্যে তোমাকে এখন দশ টাকার চা-পান-বিড়ি খরচা করতে হবে সালিশি বসালে। যাও বাবু, দু'ঘা চড়-চাপড় দিয়ে, 'ন্য বালিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, চুরি করা মহাপাপ' বলে বিদ্যোসাগরী উপদেশ দিয়ে মুখে দুটো চুমু খেয়ে চোরটাকে ছেড়ে দাও। পেটের জ্বালায় কেউ দু'এক কেজি বেগুন পালং কলা মুলো হাতালে তোমরা যদি সালিশি ডাকো তাহলে দুনিয়া থেকে চোর নামক আদরের জীবটি পলাতক হন।'

পঞ্চানন পন্দান (প্রধান) কইয়েবাজ লোক। পেটে যা-হোক দু-এক ফোঁটা কালির আঁচড় পড়েছে। তাকে নইলে বিচার সালিশি হবে কেমন করে?

কিন্তু সে যেতে নারাজ হল। লোকটা চলে যেতে বললে, 'শালা পানবল্লভ' (প্রাণ-বল্লভ) মোড়ল নিজেই বজ্জাতের ঢেঁকি! ঢেঁকি বললুম বলে কানাই তুই যেন ভাই রাগ করিসনি তোর পদবি তুলে কথা বললুম মনে করে। ও লোকটা কি রকম জানো, প্রত্যেক বছর জমির আটন ঠেলবে, রাস্তা কেটে জমি বাড়াবে রাস্তার ধারে বাঁশ বসাবে, বন্ধুর বউকে নিয়ে পালিয়ে এসে মামলা-পুলিশ করে ছাড়ান-ছিঁড়েন হল—দেড় বচ্ছর কেটে গেল—এখন আবার বন্ধুর নামে তার বউয়ের নামে, ছেলের নামে—বন্ধুর বি-এ পাস শিক্ষিত তিন-চারটে শালার নামে মিথ্যে ডাকাতি কেসের ওয়ারেন্ট চাপিয়ে তাদের দেশছাড়া করেছে। বেগুন ওর গাছে হয়তো হয়ইনি, শালা, খালি খামখা কাউকে জ্বালাতন করছে।'

সবাই বললে, 'বাদ দাও, বাদ দাও।'

কানাই হঠাৎ বললে, 'আচ্ছা পঞ্চাদা, তুই ক'টা মাছের নাম জানিস?'

'জানি সবই—বলবার সময় কি মনে হয় আর? দেখলে চিনতে পারব। গাঙের বা সমুদ্দুরের অনেক মাছ আমরা চিনি না। জেলেরা জানে।'

কানাই বললে, 'আমি তো জেলে। অনেক কাল অবিশ্যি গাঙে জাল বাইতে যাইনি—জাত-ব্যবসা ছেড়ে গেছে ঠাকুরদা সাগরে 'শুকটি' মারতে যেয়ে বাঘের হাতে পরাণ দেবার পর। এখন আমরা চাষা হয়ে গেছি। তা আমি অনেক মাছের নাম বলতে পারি, শোন। তিমি, হাঙর, বোয়াল, ভেকটি (ভেকুট), শাল, শোল, ল্যাটা, মাগুর, শিঙি, কই, রুই, কাৎলা, মিরগেল, কাল-বোস, বাটা, কুরচিবাটা, ভাঙন, চেতল, ফুলই, পাবদা, নয়না, বা ভেদা, খোলসে, চ্যাং, পাঁকাল, বান, বেলে, কেকলেস, তারুই, চেলা, মৌরলা, পুঁটি, সরলপুঁটি, মোচা-চিংড়ি, বট-চিংড়ি, পাট্টি-চিংড়ি, গেঁটে-চিংড়ি, পুকুরে-চিংড়ি, নোনা-চিংড়ি, বাগদা-চিংড়ি, গলদা-চিংড়ি, গুঁতে, ট্যাংরা, আড়, সেলে, লোটাঘাগর, দোল, রুপোপাটি, তলোয়ার, তেলচাপাটি, নিহেড়ে, ইলিশ, চাঁদা, ভাজাতারুই, কুকুরাজিভে, পমফ্রেট, সিমুল, ভোলা, তপসে, গুড়জাওয়ালি, কালিন্দী, চ্যাক-চ্যাকালি, চুনো, ভুদকুড়ি বেলে, তেলা-পিয়া—সব মনে হওয়া সত্যিই মুস্কিল!'

পঞ্চানন বললে, 'বললুম তো, লিখে রাখলে মনে থাকে। এই যে কলা, কত রকমের আছে। কাঁটালী, বোম্বে, চাঁপা, কালীবউ, মর্তমান, ঢাকাই মর্তমান, কানাই-বাঁশি, রামকানাই, সিঙ্গাপুরী, কাবুলী। আখ আছে অনেক রকম: সামসোডা, বোম্বাই, কাজলী, খড়ি, রসখড়ি, কাঠ-বেড়ালী, বর্মী, হিংলী। পানের নাম: দিশি, ঢলদিশি, কাল্‌কে ডগা, মগাই, কড়াই, ছাঁচি, মিঠে, মজাল, গেছো, গাজিপুরী, ভাবনা-বাঙাল, হাতকে বাঙ্গাল, গুলে বাংগাল, ঢল বাঙ্গাল, বাগেরহাটি, ভেড়া-মারি, হরগৌরী, ঘনাগেটে। আম, কলাই, নারকোল, সরষে, বেগুন, মুলো, পালং সিম, বাঁশ, সবই অনেক রকমের আছে।

একই জিনিস মাটি, হাওয়া, আলোর জন্যে ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন রং বা চেহারাও হয়। যেমন আম—কিষেণভোগ অথবা হিমসাগর হুগলী জেলার হলে একরকম, মালদহের হলে অন্য রকম। আবার চব্বিশ পরগণার হলে কিছুটা টক হয়। একই তরকারী ভিন্ন ভিন্ন মেয়ে রান্না করলে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ লাগে। গরু ছাগল, মানুষ সবকিছুর চেহারা মাটি আলো-হাওয়ার গুণে নানা জায়গায় নানান রকম। বাঁশের শিকড় থেকে সুন্দর ছড়ি হয় একথা বললে ২৪ পরগণার লোক হাসবে, কিন্তু চট্টগ্রামে এমন একরকমের বাঁশ হয় যার শিকড় মোটা হয়ে অনেকখানি করে বড় হয়—তার কী যে সুন্দর ছড়ি হয়।'

কানাই তার গোঁফ দুটোয় পাক দিতে দিতে ছুঁচলো করে যাত্রাদলের রাজা'র মতন করে একটা ছেলের দিকে ভয় দেখানো ভাব দেখালে সে তার শিবঠাকুরকে ধরে দেখায়। সবাই হেসে ওঠে।

ওদিক থেকে হরিনাম শোনা যায়। রেডিও থেকে খবর পড়া হয়। পূর্ব বাংলায় নাকি ঝড়ের ক্ষতি-খাতরা আমাদের চাইতে অনেক বেশি হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বিস্ময়কর, রোমহর্ষক।

খবর শেষ হতেই আবার তারা চাষ-আবাদের কথায় ফিরে আসে।

খোঁয়াড়-অলা রহিম সেখ একটু 'গোলো' লোক। সে বললে, 'তোরা কত বড় মুলো হতে দেখেছিস?'

কানাই বললে, 'আমার দেওয়াল-ভাঙা মাটিতে চার কে-জি পর্যন্ত হতে দেখেছি।'

'আমার আধমণ মুলো হয়েছিল।' বললে রহিম বুড়ো।

পঞ্চানন বললে, হাঁ! চাচার মুলো তো!' রহিম বুড়ো রেগে গেলো; 'মুই কি তোদের সঙ্গে ইয়ার্কি কত্তিচি! মুই হনু তোদের দ্বিগুণ বয়েসের মুরুব্বি মানুষ!'

কানাই ঢেঁকি উরুতে চাপড় মেরে বললে, 'রহিমদা রেগেছে! দেখো দাদা, মাদী ছাগলের দাড়ি হলেও সে যেমন জ্ঞানী হয় না, তেমনি গাধা বা ঘোড়ার অনেক বয়েস হলেও সে মুরুব্বি হয় না।

সকলেই কানাইয়ের কথায় হো-হো করে হাসতে লাগল।

রহিম লাল চোখ বার করে বললে, 'আমার আধমণ মুলোটা থাকলে এখন এনে তোদের প্যাটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেই মানতিস—হাঁ বাবা—রহিমের মুলো বটে!'

পঞ্চানন বললে, 'তা হলে পারে। আধ-মণ কেন—একমণও হতে পারে। তেমন সার মাটি পড়লেই হবে। নইলে মাতৃজঠরে কুম্ভকর্ণ, ভীম, এঁরা জন্মালেন কি করে? তা চাচা, মুলোটা কাটলে কি দিয়ে—করাত দিয়ে কাটতে ক'দিন লাগল?'

হিম তখন রাগে চিংড়ি মাছের মতন ছটকাতে লাগল।

'শালারা সব আমাকে অপমান! আচ্ছা, তোদের গরু-ঘোড়া, হাঁস-মুরগী আমার খোঁয়াড়ে আসুক একবার। তোদের বউয়েরা এসে তখন 'কি হবে চাচা, তুমি আমাদের বাপ-সমান লোক' বলে প্যান-প্যানালে দূর করে তেড়ে দোব। তিন টাকা দিলে তবে তোদের গরু ছাড়ব—মনে রাখিস?'

রহিম শেখ গম ভাঙানো আটার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেলে কানাই মন্তব্য করে, 'লোকটা একটু বদরাগী বটে, কিন্তু মনখানা পরিষ্কার। সেদিন বলে, শালা সমরেজের কাণ্ড শুনিছিস ভাই কানাই, আমার কাছ থেকে একটা 'কদু' (লাউ) চেয়েছিল দিইনি বলে শালা মাঝামাঝি আধখেনা কেটে নিয়ে গ্যাছে—আর বাকি আধখেনা ছাদলা'র গাছে ঝুলছে! শুধু তাই নয় আমরা মেয়ে-মদ্দ'য় শুয়ে আছি আর শালা রাত্তিরে এসে মশারিটা খুলে নিয়ে পালিয়ে গ্যাছে! পাঁচসিকেতে বেচে ফেলে শালা চাল কিনে খেয়ে ফেলেছে। এখন তার আর মুই কি করি বল?'

সকলে হাসিতে ফেটে পড়ে। 'হা-হা-হা হো-হো-হো—হি-হি-হি—জিতা রহ ভাই সমরেজ—তুমি রহিমের বুড়ী বউটাকে নিয়ে গেলে না কেন!'

কানাই কিছুক্ষণ পরে বলে, 'উঠি ভাই সব, মনটা খারাপ! ঝড়ে আমার ঘরটা বেকল হয়ে হুমড়ি খেয়ে আছে। বউ ছেলে মেয়েদের সব জ্বর। যদি চাপা পড়ে তো সবাই মরবে।'

পঞ্চানন বলে, 'ঘরামির ঘর ফাঁকা। ভাল দেওয়াল দিতে পারিস, কাঠামো করতে পারিস তো তোর ঘরটা অমন কেন?'

'ঐ গরুর নেশায় আমার সব গেল। জুতসই হালের গরু করবার জন্যে ফি বচ্ছর গরু বেচে ফিলি। এ বছর ভাল হেসে জোড়াটা হল—ভাগচাষের দশ বিঘে জমি পেয়ে চাষ-আবাদ করলুম দেনাপাতি করে, কাবুলীর কাছ থেকে ঋণ করে, দয়াময় ভগবান সব ডুবিয়ে-পচিয়ে দিলে—আবার যা ছিল ঝড়ে পড়ে শিষ বেরোবার মুখেই কার্তিক মাসের গোড়াতেই শেষ হয়ে গেল। সামনের বচ্ছরে খাবে কি বালবাচ্ছারা ভাবনায় হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।'

পঞ্চানন সহানুভূতির স্বরে বললে, 'সবারই এক দশা কানাই। আমার ভহর জমিতে পান, কলস, ঘোটা-ব্যানা, সূর্য-মুখী, দুধ-কলম, পান-বাটি, হামাই—এই সব মোটা ধানু ছিল—সবে শীষ ঠেলছিল—বলতে গেলে ভরা পোয়াতি — সব পড়ে গেছে—জল পিয়ে তরতর করে মানুষসমান বেড়ে গেছিল—ঝড়ে পাটবন বিছিয়ে গেছে। হাত শুইয়ে কনুই থেকে সোজা করলে যেমন দেখায় তেমনিভাবে অনেক শিষ ঠেলে উঠে দাঁড়াবে বটে তবে নিচেরগুলো পচে যাবে। খড়েরও খুব দুরবস্থা হবে আগামী বছরে।'

হঠাৎ কার যেন ঘর পড়ে যাওয়ার হুড়-মুড় করে শব্দ হয় পূর্বদিকে।

কানাই চিৎকার করে ওঠে : 'ওরে! বোধহয় আমার সর্বনাশ হল রে! আমার ঘর পড়ে গেছে বোধহয়! বাপসকলরা তোরা ছুটে আয় সবাই।' অন্ধকারে ছুটতে-ছুটতে এসে কানাই ঢেঁকি দেখলে সত্যিই, তার সন্দেহ ঠিকই। ঘর পড়ে গেছে তার। চারদিক থেকে চিৎকার, আলো লোকজন ছুটে এল। ঘরের চাল, দেওয়ালের মাটি সরিয়ে ফেললে লোকজন। মরা লাস বেরুল চারটে। কানাইয়ের বউ, আর তিনটে ছেলে-মেয়ে। কানাই কিন্তু তখনো তার গরু নিয়ে পাগল! গরু দুটো তার মরে নি। পিঠের-ওপরে-পড়া উলুর চাল চাগিয়ে নিয়ে তারা নাকি দাঁড়িয়ে ছিল।

কিন্তু কানাই সব কটার রক্তমাখা মরা লাস দেখার পর চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ বললে, 'আমার জনক কোথায়? জনক, আমার ছোট ছেলে!'

খোঁজাখুঁজি করে জনককে পাওয়া গেল। আশ্চর্য, সে তখনো মরে নি। কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে উপরে দেওয়ালের মাটি পড়ে ঠেলে এসে চাপা পড়া তক্তপোষের নিচের ফাঁকটাতে। কানাই তাকে বুকে তুলে নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, ভয় কি বাবা, আমি আছি। গরু দুটো আছে—তুই বড় হবি—আবার ঘর বাঁধব—চাষ-আবাদ করব...'

পঞ্চানন পন্দান আর রহিম সেখ তার অবস্থা দেখে চোখের জল মুছতে লাগল।

—আবদুল জব্বার
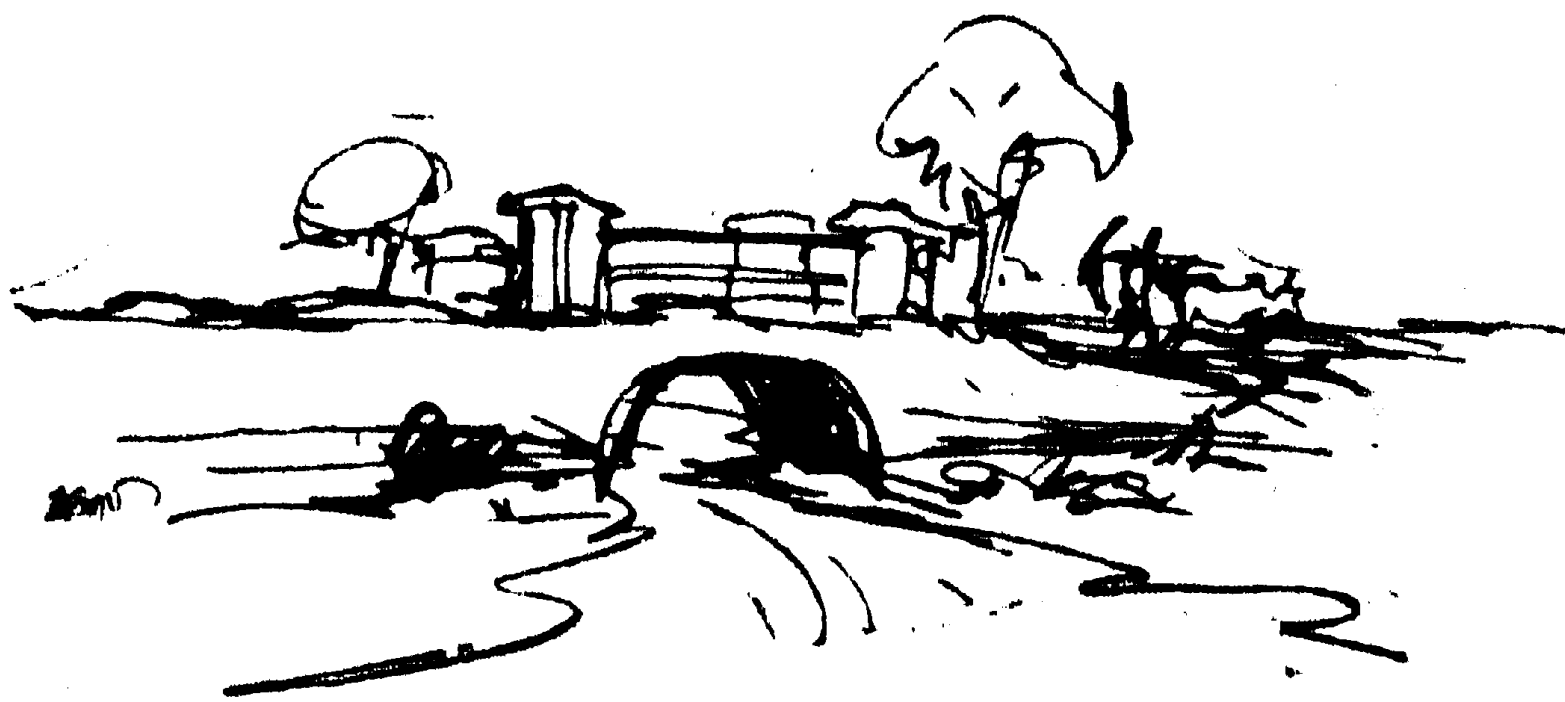
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মৃত্যুহীন প্রাণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্ম-শতবার্ষিকী এই সপ্তাহ থেকে ভারতে সর্বত্র প্রতিপালিত হবে। চিত্তরঞ্জন জন্মসূত্রে বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি মাত্র পঞ্চান্ন বছর কাল বেঁচে ছিলেন এবং সেই সামান্য কালটুকুর মধ্যে কি বিরাট কর্ম করে গেছেন তা আজ ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের এই অশান্ত কালে বসে পরিপূর্ণ বিচার হয়ত সম্ভব নয়। তবু অতীতের সব কিছুই পরিত্যাজ্য নয়। অস্বীকৃতি আর অসম্মানে অতীতকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। ইতিহাসের ধারা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটময় দিনে আধুনিক রাশিয়া এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করেছিল, তাই সেই কালে সোভিয়েত সরকার একটি প্রাচীর চিত্র প্রকাশ করেন। এই প্রাচীর চিত্রে ছিল ১৮১২ খৃষ্টাব্দের নেপোলিয়ঁ বিজেতা কুটোজভের ছবি। ছবিটির নীচে জ্বলন্ত লাল রঙের অক্ষরে স্তালিনের নিম্নলিখিত বাণী উধৃত করা ছিল :

'আপনার স্মরণীয় পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্য এই যুদ্ধে আপনাকে অনুপ্রাণিত করে তুলুক—'
১৯৪১-এর ৭ই নভেম্বর প্রদত্ত বক্তৃতায় স্তালিন এইসব পূর্ব-পুরুষদের নামোল্লেখ করেছেন—

আলেকজান্দার নেভস্কি, ডিমিট্রি ডনস্কয়, কুজমা মিনিন, ডিমিট্রি পোজো-হেরস্কী, আলেকসান্দ্রা সুভজেভ, ও মিখাইল কুটোজেভ—'

এঁদের কেউ-ই শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, অধিকাংশই রাজ বংশোদ্ভূত কুমার আর কুজমা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। এই সব ব্যক্তিরা রাশিয়াকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করেছেন, রাশিয়ার সংকটকালে তাকে ত্রাণ করেছেন। 'ডিমিট্রি ডনসকয়' নামক ১৯৪১-এ প্রকাশিত বোরোদিন রচিত উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনায় 'প্রাভদা' শিরোনাম দিয়েছিল 'রুশ জনগণের বরণীয় পূর্ব-পুরুষ সংক্রান্ত গ্রন্থ'।

এই কথাগুলি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বাঙ্গালীর বিচার করা প্রয়োজন। এই একই কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি ঐতিহ্যময় মনীষীদের স্মরণ ও মননের মধ্যে আছে জাতীয় দায়িত্ব, দেশকে এবং দেশের মানুষের পুনরুজ্জীবনে তাই প্রয়োজন মরণ-সাগর পারে যাঁরা অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে অতীতের পুনরাবিষ্কার।

২৬শে শ্রাবণ, শুক্রবার ১৩২৯ সালে দেশবন্ধুর এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ভবানীপুরের হরিশ পার্কে। এই সভার সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দেশবন্ধু ছ'টি মাস কারাদণ্ড ভোগ করে মুক্তি পেয়েছেন তাই এই সম্বর্ধনা। সেই সভায় যে সুদীর্ঘ অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয় সেটি রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—সেই অভিনন্দন পত্রের সামান্য অংশ উধৃত করা হল—

...'বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন; তোমাকেই সর্বলোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য প্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইতে হইল নান্যঃ-পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই ত' তোমার ব্যথা এই ত' তোমার দান।'

দেশবন্ধুর সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন 'সমস্ত স্বদেশ আজ তোমার করতলে'—সত্যই সেদিন দেশবন্ধু ছিলেন ভারতের মুকুটবিহীন সম্রাট।

শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চরিত্র বিশ্লেষণে আরও একটি কথা বলেছিলেন—'এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে—'

চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রাণতার কথা অনেকের পরিচিত, আজ শত-বার্ষিকী উৎসবে সে সব কথা আবার নতুন করে পরিবেশিত হবে, কিন্তু কবি চিত্তরঞ্জনের কথা বোধ হয় আর কারো তেমন স্মরণে নেই। কবি চিত্তরঞ্জন হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ সেই কালে যখন তিনি আইন ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠ। পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁর 'লাইফ্ অ্যান্ড টাইমস অব সি, আর, দাশ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'Chittaranjan was born an heir to the rich legacy of the emotional poetry of an earlier age and was temperamentally fitted to enjoy his spiritual heritage."

দেশবন্ধুর কাব্য গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রচুর নয়। চিত্তরঞ্জন যখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন, তখন জাহাজেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ 'মালঞ্চে'র কবিতাগুলি রচিত হয়। এই কাব্য-গ্রন্থ 'সাহিত্য' প্রেসে মুদ্রিত হয় এবং চিত্তরঞ্জন এই গ্রন্থটি 'প্রাইভেট সার্কুলেসন' হিসাবে অন্তরঙ্গ মহলে উপহার দিয়েছিলেন। এই কাব্যে তাঁর জীবন-যন্ত্রণার পরিচয় আছে। চিত্তরঞ্জনের 'প্রেম ও প্রদীপ' কবিতার একটি অংশ—

"তবু মনে হয়, তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্তস্বর, অন্তর মাঝারে!
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার,
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর আঁধারে।
জ্বালাগো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার!"

আবার 'মালঞ্চের'

"তোমার ও প্রেম সখী! শাণিত কৃপাণ'
দিবানিশি করিতেছে হৃদি রক্তপান।"

কিংবা—

"তোমার ও প্রেম সখী! ভুজঙ্গের মত
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত।"

প্রভৃতির মধ্যে আছে যৌবন বেদনা এবং নাস্তিক মনোভঙ্গী। তাঁর 'বারবিলাসিনী' কবিতাটি নিয়ে সেকালের ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই কবিতায়

কিন্তু মানবিক সহৃদয়তার পরিচয় আছে। এই কবিতার দুটি ছত্র স্মরণীয়—

'মর্মহীন কর্মহীন, কলঙ্কবাহিনী
চিরদিন যৌবনে যোগিনী।'

চিত্তরঞ্জনের 'মালা' কাব্য গ্রন্থটিতে দরিদ্রের জন্য তাঁর প্রাণের আকুলতার পরিচয় আছে। তিনি সেই কালেই লিখেছেন—

'অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,

বাসনার পত্র ভাঙি বিশ্বে ঢেলে দাও।'

উত্তরকালে কবি চিত্তরঞ্জন জীবনেও এই নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। কবি 'মালঞ্চের' একটি কবিতায় তাঁর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন, মানবিক বেদনার যে অশান্ত কল-রোল তাঁকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করেছে তার বীজ যেন এই কটি ছত্রের মধ্যে আছে—

'আনন্দে ধরিয়া হিয়া শান্তি নাই এতদিন
ক্রন্দন বন্যায়—
আজিকে হৃদয়ে বন্ধু নমিছে ধরণীর
[illegible]।'

তাঁর কবিতার মধ্যে মর্মজ্বালার পরিচয় যেমন আছে, তেমনই আবার আছে পথ সন্ধানের আকুলতা।

'যে পথেই লয়ে যাও যে পথেই যাই,
[illegible] আমি শুধু তোমারেই চাই।'

কিংবা—

'ভাবনা ছাড়িনু তবে—এই দাঁড়াইনু আমি
যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্যামী।'

'অন্তর্যামী'র আর একটি অংশ—

'যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোরে।
যেমন করেই হোক যেতে হবে মোরে।
পথখানি যেথা থাক, পাব আমি পাব
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব।'

অন্যত্র—

'ওই ছায়া মন্দিরের কোথা রে দুয়ার—
কোন্ পথে যেতে হবে?
কেবল আমায় কবে?
যেন হেরি মনে মনে বন্ধ চারিধার!
ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার!'

তারপর একটি কবিতায় তিনি যেন সহসা পথের সন্ধান পেয়েছেন মনে হয়, তিনি লিখছেন—

'সবকর্ম শেষে আজ, মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী।।'

চিত্তরঞ্জনের 'সাগর-সঙ্গীত' কাব্য গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এই গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গী আছে—

'তোমার এ গীত প্রাণে সারা দিনমান
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ!
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী—বাজাও আমারে
দিবস যামিনী ভরি আলোকে আঁধারে
বাজাও নির্জন তীরে—বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে
মায়ালোকে ছায়ালোকে তরুণ উষায়
বাজাও বাসনাহীন উদাস সন্ধ্যায়
ওগো যন্ত্রী, আমি যন্ত্র বাজাও আমারে—
তোমার অপূর্ব এই আলো অন্ধকার।'

চিত্তরঞ্জনের একটি মাত্র গল্প 'ডালিম' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই গল্পটির মধ্যেও তাঁর রচনায় মানব-প্রত্যয়ের অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন তাই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই অকটোবর তারিখে যখন বললেন—

'দেশকে সেবা করিলে, জাতিকে সেবা করিলে মানব-সমাজকে সেবা করা হয়। আবার মানব-সমাজের সেবাতে, মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।'

এই মনোভংগীই চিত্তরঞ্জনকে মৃত্যুহীন করেছে। বাঙালীর মর্মমূলে তাঁর আসন চিরস্থায়ী, সেই মর্মর বেদীর ভিত্তিপ্রস্তর সুদৃঢ়—তাকে কিছুতেই টলানো সম্ভব নয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অমর জীবনের একটি সামান্যতম অংশ তাঁর কবিজীবন।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

হোল্ডারলিনের দ্বিশতবার্ষিকী।। প্রখ্যাত জার্মান কবি ফ্রিডরিখ হোল্ডারলিনের নামের সঙ্গে এদেশের সাহিত্য পাঠকদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাতেও তাঁর কবিতার অজস্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বছরে তাঁর দ্বিশত-বার্ষিকী পালন করা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এই উপলক্ষে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন স্টুটগার্টের 'হোল্ডারলিন সোসাইটি'। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে হোল্ডারলিন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মার্টিন ভালসার, বের্নহার্ড বোশেনস্টাইন, ভোলফগ্যাংগ, ভিলফ্রিড প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মার্টিন ভালসারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'হোলডারলিনের উত্তরে'। 'হোলডারলিন সম্পর্কে' যত আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা। অন্যান্য বক্তারা জার্মান ও ফরাসী কাব্যে কবির অবদান, তাঁর ইতিহাস চেতনা এবং সোফোক্লেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উপর আলোচনা করেন। এ ছাড়াও জার্মানীতে সম্প্রতি আর কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়।

মারবাখের শিলার জাতীয় গ্রন্থশালা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রদর্শনীটি খোলা ছিল। এ-ছাড়াও এ বছর হোলডারলিনের উপর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ফরাসী জার্মান বিশেষজ্ঞ পিয়ারে বের্তোর বহু আলোচিত বই 'হোলডারলিন ও ফরাসী বিপ্লব' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ। হোলডারলিনের রচনা ও পত্রাবলীর দুটি খণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন ফ্রিডরিখ বাইসনার ও জোখেন স্মিট। আলফ্রেড বেক ও পল রাবে রচনা করেছেন কবির এক সমালোচনামূলক জীবনী। পূর্ব জার্মানী থেকে আউফবাউ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে চার খণ্ডে হোলডারলিনের জীবনী ও চিঠিপত্র।

নেপালী ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে— ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নেপালী ভাষার প্রচলন আছে। কয়েকজন বিশিষ্ট নেপালী লেখকও ঐ ভাষায় কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই কারণে, ভারতীয় সংবিধানে নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য নেপালীভাষীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছেন। ভূতপূর্ব সংসদ সদস্যা শ্রীমতী মায়াদেবী ক্ষেত্রী লোকসভাতেও এই ব্যাপারে দাবী উত্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে নেপালী ভাষাকে সংবিধানে স্বীকৃতির জন্য একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। বিবেকবান নাগরিক মাত্রেরই এর প্রতি সমর্থন থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সঙ্গে নেপালী সাহিত্য-দরদীদের আর একটি দিকের প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। তা হল, নেপালী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য নেপালী লেখক-দের এগিয়ে আসতে হবে। নেপালী লোক-সাহিত্য সংগ্রহ, নেপালী ভাষার অভিধান প্রকাশ এবং আধুনিক নেপালী গল্প, কবিতা প্রকাশের জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। এ-ছাড়া নেপালী-সাহিত্যের সঙ্গে অ-নেপালী-ভাষীরাও যাতে পরিচিত হতে পারেন, তার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

জার্মান প্রকাশকদের শান্তি পুরস্কার— এ-বছর 'পশ্চিম জার্মান প্রকাশন সংস্থার' শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন সুইডিশ

দম্পতি গুণার ও আলভা মিরডাল। কয়েকদিন আগে ফ্রাঙ্কফুর্টে যে বার্ষিক আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল, সেখানে এই এক হাজার মার্ক মূল্যের পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। এ-বছর উক্ত শহরের ঐতিহাসিক সেন্ট পলস গীর্জায় আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে পৃথিবীর ৬৯টি দেশের মোট ৩৩০৬টি প্রকাশক সংস্থা যোগদান করেছিলেন।

গুজরাটি কবির পরলোকগমন—প্রখ্যাত গুজরাটি কবি ভানুভাই আর ব্যাস গত ২৩ অকটোবর বোম্বাই শহরে পরলোকগমন করেছেন। গুজরাটি সাহিত্যে তিনি 'স্বপ্নস্থ' নামে কবিতা রচনা করতেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। বইটির নাম ছিল 'অচলা'। এ পর্যন্ত তাঁর গুজরাটি ভাষায় ১৬টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। গুজরাটি সাহিত্যে যাঁরা প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯৬৬ সালে তিনি 'সোভিয়েট ল্যান্ড নেহেরু' পুরস্কারে সম্মানিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বৎসর।

ইন্দোনেশিয়ার কবিতা — প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে আমাদের পরিচয় খুবই সীমিত। রাজনীতির দিক থেকে কিছুটা পরিচয় থাকলেও, শিল্প সংস্কৃতির দিক থেকে পরিচয় তেমন নেই। এই কারণেই বোধকরি, এই বৃহৎ মহাদেশে আমরা এত বিচ্ছিন্ন। আমাদের ভাষায় প্রতিবেশী এইসব রাষ্ট্রের শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয় নেই। বিশেষ অনুবাদ নেই এই সব দেশের। তবু মাঝে মাঝে ইংরেজি ভাষায় কিছু কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার কবিতার এমন একটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ সংকলন চোখে পড়ল। বইটি সম্পাদনা করেছেন বার্টন রাফেল। প্রকাশ করেছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস। এর থেকে ইন্দোনেশীয় কবিতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল।

বইটিতে চল্লিশের যুগ থেকে সম্প্রতি কালের কবিদের কবিতা অনুদিত হয়েছে। অনেক কবির কবিতাই স্থান পেয়েছে এতে কিন্তু মুখ্য স্থান অধিকার করেছেন মাত্র পাঁচজন। এই পাঁচজন কবি হলেন— আমীর হামজা, চৈরিল আনোয়ার, রিভাই এপিন, মিতর সিতুমোরং এবং ডবলু এস রেন্ড্রা। আমীর হামজার দুই-একটি কবিতা বাংলায় অনুদিত হয়েছে। তিনি অনেকের মতে একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দোনেশীয় কবি। 'ভাহাষা মালয়'-এ তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁর কাব্যে পারশ্য কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আনোয়ার আর একজন বিশিষ্ট কবি। মাত্র ২৭ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। এই স্বল্প-জীবনে কবিতা লিখেছেন তিনি মোট৭৫টি। তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সংকলন এর আগেই নিউইয়র্কের 'নিউ ডাইরেকসান' প্রকাশন সংস্থা স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করেছেন। আনোয়ার আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ করেছেন অনেক এবং তাঁর রচনায় ইউরোপীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 'ভাহাষা ইন্দোনেশীয়'তে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।

রিভাই এপিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ইন্দোনেশীয় কবিতার ইতিহাসে অনুধাবনযোগ্য। এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বোধকরি রেন্ড্রা। ১৯৩৫ সালে তাঁর জন্ম হয়। কবিতাগুলি সম্পাদনা করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট অনুবাদক। এশিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকদের কাছে বইটি একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

—চার্বাক

নতুন বই

নীলাঙ্গুরীয় (নবীন সংস্করণ)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী; ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—দশ টাকা।

নীলাঙ্গুরীয় শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতনামা সৃষ্টি। সম্প্রতি পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত এর এই নবীন সংস্করণ পাঠক মহলে যথারীতি সমাদৃত হবে, সন্দেহ নেই।

এ-উপন্যাসের নায়ক শৈলেন গৃহশিক্ষক। ধনী ও সম্ভ্রান্ত এক ব্যারিস্টার মিঃ রায়ের না বছরের মেয়ে তরুকে সে পড়াত। আর সে নিজে পড়ত এম-এ ক্লাশে। কিন্তু পড়া বা পড়ানোর কোনোটাই নয়, তরুর দিদি মীরার সংগে মন দেয়ানেয়ার খেলাতেই শৈলেন বিপর্যস্ত হল শেষ অবধি। মীরার কাছ থেকে সে পেল ঘৃণায়মেশান ভালবাসা। এরই মধ্যে অপরদিক থেকে বাল্যসখী সৌদামিনী এসে তাকে দিতে চেয়েছিল খাঁটি সোনা। কিন্তু সে নিতে পারে নি; কারণ, ভালবাসার নি-খাদ সোনা নিতে হয় নিখাদ সোনা দিয়েই। তার সুবর্ণ আগেই দেয়া হয়ে গিয়েছিল মীরাকে।

এদিকে মীরাকেও শৈলেন পায়নি। তার দুর্বলতা এবং বিশেষ করে মন স্থির করে উঠতে না-পারার ব্যর্থতা এজন্য দায়ী। দায়িত্ব হয়তো মীরার দিক থেকেও আছে। সব সময় নিজেকে সে ঠিক করে ধরতে পারে নি শৈলেনের সামনে। তাই শৈলেনও তাকে ঠিক চিনতে পারে নি, সর্বনাশ থেকে জোর করে টেনে নিতে পারে নি।

মীরা ও শৈলেনের এই ইতিকথা আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন লেখক। বর্ণনা ও বিশ্লেষণের গুণে অতি সামান্য ঘটনাকেও তিনি এখানে অসামান্য করে তুলেছেন।

লিন্ডসে ক্রেসেন্ট-এর টি-পার্টিতে মীরার হঠাৎ ভাবান্তর, ডায়মণ্ডহারবার রোডের ঘটনা, শ্রীরামপুর-সাঁতরায় মীরার হঠাৎ আবির্ভাব এবং রাঁচী থেকে মীরা ও শৈলেন উভয়েরই হঠাৎ চলে-আসা—এই সব কিছুর মধ্যেই লেখক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। মীরার মা স্নেহময়ী অপর্ণা চরিত্রটিও জীবন্ত আমাদের কাছে। সন্তানহারা ভুটানীকে আশ্রয় দেয়ার মধ্য দিয়ে বিলেতপ্রবাসী তার অপদার্থ পুত্রের প্রতি স্নেহই আমাদের সামনে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। আর এছাড়া, শ্রীরামপুর-সাঁতরায় শৈলেনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অনিলের সংসারটিও কম আকর্ষণীয় নয়। যেমন অনিল, তেমনি তার স্ত্রী অম্বুরী প্রথম-দর্শনেই অভিভূত করে দেয় পাঠকদের; অনিলের অদ্ভুত শৈলেন-প্রীতি এবং অম্বুরীর অন্ধ অনিলপ্রীতি পাঠকদের স্তম্ভিত করে।

অনিল ও শৈলেনের বাল্যসংগী সৌদামিনী এ-উপন্যাসের এক আশ্চর্য চরিত্র। সব সময় সে চলছে,—জ্বলন্ত অংগারের ওপর দিয়ে কখনও, আবার কখনও বা আমরুল গাছের ছায়ার ওপর দিয়ে চলেছে সে। তার জীবনের নাটকীয় পরিণতির জন্যে সে ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী তার নিষ্ঠুর-নির্দয় পরিবেশ। এ-ছাড়া, এ-উপন্যাসে কম-বেশী নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে সরমার স্নিগ্ধ-প্রেম ও ইমানুলের অন্ধ-প্রেম।

কিন্তু তবু বলবো, এ সব কিছুই বাহ্য এ-উপন্যাস সম্পর্কে। মীরার ঘৃণায় মেশান ভালবাসা, শৈলেনকে দেয়া মীরার একটি নীলা পাথর, বিষের রঙ-মেশান একটি হীরা, শৈলেন যা নাকি আংটি করে অনামিকায় ধারণ করেছে, তার স্মৃতি উপন্যাসটি শেষ করার অনেক পরেও ঝলমল করে। মনে হয়,—হ্যাঁ, ঘৃণায় মেশান ভালবাসার উপযুক্ত প্রতীক এই নীলাঙ্গুরীয়। ভালবাসা এখানে হীরার মতই নীল, হীরার মতই খাঁটি।

শারদ সাহিত্য

কিশোর ভারতী—সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম—ছয় টাকা।

প্রতি বছরের মত এবারের কিশোর ভারতীর শারদীয় সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয় আকারে বেরিয়েছে। অসংখ্য রঙিন ছবি ভর্তি সুদৃশ্য প্রচ্ছদসমৃদ্ধ সংখ্যাটিতে বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ এবং নতুন লেখকরা লিখেছেন। ছবি উপন্যাস লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ধীরেন্দ্রলাল ধর, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ঘোষ এবং সংকর্ষণ রায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার গল্প, শিবরাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধনের গল্প, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ঝুঁকোবাবুর গল্প, অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকথা এবং মন্মথ রায়ের নাটক সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ। তাছাড়া স্বপনগাথা, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, ভৌতিক গল্প, মজার গল্প, হাসির গল্প, সামাজিক গল্প করুণরসের গল্প, শিকার কাহিনী, দরদী গল্প, কবিতা, উপকথা, অভিযান জীব-জগতের কাহিনী, রহস্য গল্প, প্রাচীন সাহিত্যের গল্প, ইতিহাসনির্ভর গল্প, হাস্যরসাত্মক নাটক, নাট্য নকসা, সাগর তলের কাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, মিষ্টিমধুর গল্প, সংবাদবিচিত্রা, টুকরো হাসি, জাদুবিদ্যা, বিজ্ঞানসংবাদ, রূপরঙ্গ, খেলাধুলো, ছবিতে কৌতুক কাহিনী, ছবিতে গোয়েন্দা কাহিনী, ছবিতে বিচিত্র কাহিনী, প্রচুর আর্ট প্লেট এবং আরো অনেক কিছু আছে। লিখেছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্র দেব, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অদ্রীশ বর্ধন, প্রভাকর মাঝি, রণজিৎকুমার সেন, দুর্গাদাস সরকার, আশা দেবী, শৈবাল চক্রবর্তী, জ্যোতিভূষণ চাকী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ইন্দিরা দেবী, অমিয়কুমার চক্রবর্তী, স্বপনবুড়ো, কুমারেশ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং রমেশচন্দ্র দত্তের রচনার পুনর্মুদ্রণ আছে। সংখ্যাটির প্রয়োজন সাময়িক নয়—দীর্ঘদিন কিশোর পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ঝুমঝুমি—সম্পাদক : গীতা দাশ এবং সরল দে। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

ক্ষুদে পাঠকের ক্ষুদে পত্রিকা ঝুমঝুমি এবারের শারদ সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণ। সুন্দর ছাপা রঙীন ছবি এবং সম্পাদনায় সুরুচির পরিচয় ঝুমঝুমিকে কেবল ক্ষুদে পাঠকদের নয়, বড়দেরও প্রিয় করে তুলেছে। একটি উপন্যাস লিখেছেন মিহির সেন। গল্প লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বলরাম বসাক, শৈল চক্রবর্তী, আশা দেবী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, আনন্দ বাগচী, কার্তিক ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভূপতি ভট্টাচার্য, প্রবাস দত্ত, শৈলশেখর মিত্র, অশোককুমার মিত্র এবং গৌরী রক্ষিত। ছড়া এবং কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মৌমাছি, জ্যোতিভূষণ চাকী, মণীন্দ্র রায়, অমিতাভ চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, প্রীতিভূষণ চাকী, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সরল দে, সামসুল হক, চণ্ডী লাহিড়ী, শ্যামলকুমার চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু গৌতম, মনোজিৎ বসু, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার গড়গড়ি, তপনজ্যোতি মিত্র, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। লিয়রের বারটি লিমেরিক অনুবাদ করেছেন অশোককুমার মিত্র এবং শৈলশেখর মিত্র। মজার ছবি এঁকেছেন শৈল চক্রবর্তী এবং চণ্ডী লাহিড়ী। আরো অনেক ছবি এবং লেখা আছে। দশ বছরের শিল্পী কল্লোল ত্রিপাঠীর প্রচ্ছদ সকলকে আকৃষ্ট করবে।

পরাণু — সম্পাদক : অমিয় চট্টোপাধ্যায় এবং আশীষতরু মুখোপাধ্যায়। ১২২এ, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স। কলকাতা—১৯। দাম এক টাকা।

পরাণুকে পৃথিবীর প্রথম মিনি পত্রিকা হিসাবে দাবী করা হয়ে থাকে। মিনি হলেও, বাঙলা দেশের প্রখ্যাত লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পাঠক বিস্মিত হবেন। লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, পরমানন্দ সরস্বতী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, যেনাতে সি চাপেক, তুষার রায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, কাজল ঘোষ, কবিরুল ইসলাম, রেবন্তকুমার দ্রট্টোপাধ্যায়, আবু আতাহার, সমসুল হক। পূর্ব বাঙলার কবিতা লিখেছেন রোশীদুল হাসান, ওমর আলি, দাউদহায়দার, আলি মাহমুদ, সৈয়দ সামসুল হক এবং বিমলচন্দ্র সাহা।

সেঁউতি—সম্পাদক : গোপাল আচার্য। ৬৮।৪, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা—২৬। দাম পঁচিশ পয়সা।

সুন্দর ছাপা এই মিনি পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়।

বৈতানিক : সম্পাদক ভবানী মুখোপাধ্যায়। এস সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা ১২। দাম দু টাকা।

সাহিত্য ও শিল্পের ত্রৈমাসিক বৈতানিক সুনির্বাচিত রচনার সমাবেশে বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক আলোচনা সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটিতে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গোপিকানাথ চৌধুরী, শিশির নিয়োগী, তৃপ্তি বসু, মনোজিৎ বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দু চক্রবর্তী, নির্মল সরকার, বিভূতি রক্ষিত, নির্মলেন্দু গৌতম, দুর্গাদাস ভট্ট, ভবানী মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, সুশীল রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, আশিস সান্যাল, অজিত মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, সুধীর করণ এবং আরো অনেকে।

কল্পবাণী : সম্পাদক—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯, শ্যামপুকুর লেন। কলকাতা—৪। দাম এক টাকা।

একটি কাব্য-নাটক লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু। গল্প লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবদুল জব্বার, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, রমানাথ রায় এবং আরো কয়েকজন। কবিতা লিখেছেন এবং অন্যান্য আলোচনা করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, সুশীল গঙ্গোপাধ্যায়, আজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, ফিরোজ চৌধুরী, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, প্রতিমা সেনগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অজয় সেন, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

লা পর্যেজি : সম্পাদক—বার্ণিক রায়। ৫, গগন সরকার রোড। কলকাতা—১০। দাম দেড় টাকা।

বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সাহিত্যের একমাত্র দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'লা পর্যেজি'। রোমান হরফে বাংলা কবিতা মুদ্রণ সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুধেন্দু মল্লিক এবং বার্ণিক রায়ের কবিতা রোমান অক্ষরে ছাপা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ক্ষিতিশ রায়, বিবেকানন্দ রায়, সিদ্ধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বার্ণিক রায়। কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন মনীশ ঘটক, হরপ্রসাদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী, লোকনাথ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তি-

কুমার ঘোষ, শংখ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দাস, বিজয়া মুখোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রঞ্জিত সিংহ, বার্ণিক রায়, সুশীল রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, মনোজিৎ বসু এবং আরো অনেকে। কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ আছে।

চলার পথে—সম্পাদক : কমলা মুখোপাধ্যায়। ন্যাশনাল প্রেস। ১৮৮।২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

এই সংখ্যাটিতে লিখেছেন মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বীণা ভৌমিক (দাস), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, মায়া বসু, আশা দেবী, ভক্তি বিশ্বাস, জ্যোতির্ময়ী দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, উমা দেবী, বীণা গুহ এবং আরো কয়েকজন।

মিলনী — ৭৭। সম্পাদক — ভবেশচন্দ্র বসু। ২৫২এ, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা — ৩৯ থেকে প্রকাশিত। দাম : ১'০০।

বহু প্রখ্যাত প্রবীণ ও নবীন লেখকের রচনা সংকলন করে এই শারদ সংকলন গ্রথিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, রাণা বসু, মলয় ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, প্রদ্যোতকুমার ঘোষ প্রমুখ লেখকদের রচনাগুলি বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

প্রতিজ্ঞা : সম্পাদক — প্রদীপকুমার বসু মজুমদার, ৩২।ই।১, বাবুরাম ঘোষ রোড, কলকাতা—৪০, দাম : ২৫ পয়সা।

প্রায় ২৪টি কবিতা ও একটি গদ্য রচনা নিয়ে বিশেষ আকারে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির ছোট্ট সম্পাদকীয়ে যে বলিষ্ঠতার প্রত্যয় রয়েছে, কবি নির্বাচনে কিন্তু তা নেই। বরং খুশি হওয়া যেত যদি সত্যি সত্যিই নতুন কবি-কণ্ঠ তাঁরা আবিষ্কার করতেন। সম্পাদকীয়ের মর্যাদা রাখতেন। লিখেছেন আলোক সরকার, শংকর চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, নীরেন্দ্র গুপ্ত পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ রথীন্দ্র মজুমদার সহ নতুন কবিরা।

রাণার : সম্পাদক—মিলন দাশ, ১৪বি, বড় স্ট্রীট, কলকাতা — ১৯, দাম : এক টাকা।

ঝকঝকে ছাপা এই কাগজটির বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, বীরেন্দ্র দত্ত, অর্চনা মিত্র কমলেশ মিত্র, ইন্দ্রজিৎ বসু, সৈয়দ কওসর জামাল, মায়া বসু এবং আরো অনেকে।

তরুণের অভিযান—সম্পাদক সুনির্মল চট্টোপাধ্যায় ও নারায়ণ-দেবনাথ ।। ১৭, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা—২০, দু টাকা।

গল্প কবিতা ও অন্যান্য রচনা সমৃদ্ধ এই সংকলনে লিখেছেন অজয় সেন, জীবন সরকার মোহিত চক্রবর্তী, সুভাষ সিংহ, জয়ন্ত চক্রবর্তী, সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়, জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হারান রায় এবং আরো অনেকে। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা রুচিসম্মত।

বলাকা—সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি বিবেকানন্দ দাস ।। ঠিকানা : অনুল্লেখিত। দাম : ছাপা হয়নি।

ছয়জন সম্পাদকের যৌথ সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত। বলাকার মর্মকথা লিখেছেন বিজয়কৃষ্ণ বসু। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে অমিতাভ গুপ্ত, প্রলয় চৌধুরী, নিশীথ ভড়, দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবসম্ভু পাল, এবং আরো অনেকে।

বেশরোয়া—সম্পাদিকা শিপ্রা আদিত্য ।। ৮, ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলকাতা—১০ ।। দাম দু টাকা।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার প্রচ্ছদ ও অসংখ্য চিত্রে পত্রিকাটি উন্নতরুচির পরিচায়ক। লেখাগুলি সুনির্বাচিত। আগাগোড়া দু রঙে ছাপা। লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নারেন্দ্রনাথ মিত্র, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বাদল সরকার, মতি নন্দী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মিহির সেন এবং আরো অনেকে। আধুনিক সাহিত্য পাঠকের পক্ষে একটি পাঠযোগ্য সংকলন।

উত্তরণ—সম্পাদক কিরণশংকর সেনগুপ্ত ।। ৩১১, গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা—৪৭ ।। দাম : এক টাকা।

এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'আধুনিক কাব্য ও সুধীন্দ্রনাথ'। লিখেছেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের সার্ধশতাব্দী উপলক্ষে কয়েকটি কবিতা ও আলোচনা লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, দুর্গাদাস সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র অরবিন্দ পোদ্দার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সুশীল রায় এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য।

সমস্ত : সম্পাদক উৎপলকুমার গুপ্ত ।। গোয়ালপাড়া লেন, বহরমপুর ।। দাম : এক টাকা।

উন্নত মানের কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন উৎপল চট্টোপাধ্যায়, গোকুলেশর ঘোষ ও তপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দীপেন রায়, সৈয়দ কওসর, জামাল প্রমুখ। গল্প লিখেছেন নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, দিব্যেশচন্দ্র লাহিড়ী, দুর্গাদাস ভট্ট, অরুণকুমার মজুমদার, উদয় ভট্টাচার্য ও উৎপলকুমার গুপ্ত।

শিশুমেলা : সম্পাদক অরুণ চট্টোপাধ্যায় ৩৬, বৃন্দা বসাক স্ট্রীট, কলকাতা—৩৬ ।। পঁচাত্তর পয়সা।

ছোটদের উপযোগী ছড়া, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ। অঙ্গসজ্জা আকর্ষণীয়। লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, সরল দে, গোপাল ভৌমিক, স্বপনবুড়ো এবং আরো অনেকে।

আসর পত্রিকা — সম্পাদক : সত্যচরণ ঘোষ। যুগ্ম-সম্পাদক — সমরেশ ঘোষ। ২।১এ, নারায়ণ শূর স্ট্রীট, কলকাতা— ৫ থেকে প্রকাশিত। দাম ১'৫০।

প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা কবিতা ও নানা বিচিত্র বিবিধ রচনায় সমৃদ্ধ আসর পত্রিকার শারদীয়া অর্ঘ নানা স্বাদে খুবই আকর্ষণীয়। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের : মধুসূদনের একটি ইংরাজি প্রবন্ধ, শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষের : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যপ্রীতি, রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের পুরনো যুগের হারানো সাহিত্য—একটি নাটক : আচাভুয়ার বোম্বাচাক, মলয় ঘোষের গল্প : লক্ষ্মীর ঘর, মনোজ মিত্রর রম্য রচনা : ডঃ সাধনকুমার স্মরণে এবং নানা ধরনের আধুনিক কবিতার পরীক্ষানিরীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রাপ্তি স্বীকার

চলন্ত—সম্পাদক দিগ্বিজয় চৌধুরী। পি-১৯২ ইউনিক পার্ক, কলকাতা ৩৪। পঞ্চাশ পয়সা।

নান্দীমুখ—গৌরীশংকর দে কর্তৃক ৭/৯৯, শাহ্দিনগর, হালতু, ২৪ পরগণা। দাম—৫০ পয়সা।

প্রশন—সম্পাদক বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য। টাউন প্রেস, শিলচর-১।

সুপর্ণ — সম্পাদিকা ঐন্দ্রিলা চৌধুরী। ১৬২/৪ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা—৪৫। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

উৎসর্গ—প্রধান সম্পাদক অজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৫ নীলমণি মল্লিক লেন, ২৩৬—১।

চারুবাক—সম্পাদক রণজিৎ দাস। টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ স্পোর্টস ক্লাব। ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা—১৬।

নিমসাহিত্য—সম্পাদক সুধাংশু সেন ও বিমান চট্টোপাধ্যায়। ৩৩/৪৯ রামকৃষ্ণ এক্সটেনশন, দুর্গাপুর-৪। পঞ্চাশ পয়সা।

এষণা—সম্পাদক অনুপম রাহা। ২/২সি, ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা—৬। দাম ৩০ পয়সা।

বহুরূপা—সম্পাদক সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩বি/৭ গোয়ালপাড়া রোড, বেহালা, কলকাতা—৬০। দাম ৫০ পয়সা।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

উপন্যাস

শতাধিক বৎসরের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে বাংলা উপন্যাস আমাদের গর্বের বস্তু। আর এই সমৃদ্ধির পেছনে আছে ছোট বড় লেখকের অনলস চিন্তা ও পরিশ্রম। জগৎ-জীবনের রূপকার এই সব লেখকেরা সর্বদা সকলেই পাদপ্রদীপের সামনে এসেছেন এমন নয়। সেক্ষেত্রে অনেকের নীরব নেপথ্য ভূমিকাও কম নয়। অবশ্য বাঙালী পাঠক লেখকদের মূল্য দিয়েছেন, দিচ্ছেন। একজন লেখকের পক্ষে সেটাই হয়ত শ্রেষ্ঠ পাওনা। সেইজন্য লেখকের বড় চিন্তা পাঠক তাঁকে কেমনভাবে নিচ্ছেন। তাঁর ভাব-ভাবনার কথা, উপলব্ধি বা জীবন-দর্শনের কথা পাঠক কতটা গ্রহণ করেন, এ চিন্তা থাকে। যিনি বলেন, পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি না, তিনি হয়ত জনরুচির ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হতেও পারেন, কিন্তু সর্বদা এবং সকলের গ্রহণ ক্ষমতা নিম্ন-মুখী নয় নিশ্চয়ই। আসলে এ জাতীয় মনোভাবের পিছনে হয়তো একপ্রকার জীবন-বিমুখতা ও উৎকেন্দ্রিক অহংবোধও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে। সেটা আমাদের এ সময়ে বিশেষভাবেই কাম্য নয়, যেহেতু জীবনের সঙ্গে, সমাজ-মানসের সঙ্গে এ সময়ের লেখকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলতেই হয়। দূরে থেকে জীবন দেখা বা নিজের আত্মার সঙ্গে সংলাপের দিন বোধকরি শেষ হতে চলেছে।

এবারের শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস পড়তে পড়তে এসব কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল আরও এই জন্য যে, পাঠকের প্রত্যাশার অনেকখানি পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসে সমাজ-মানসের প্রতিফলন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলেও, এ-সময়ে সত্তরের দশকের পরিবর্তিত সময়ে সব লেখকই এ বিষয়ে সচেতন কিনা, সেই কথা ভেবে।

প্রথমেই স্বীকার করা ভাল, এবারের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত সব কটা উপন্যাসই পড়া হয়ে ওঠেনি। এই অল্প সময়ে সবগুলো পড়েছি বললে রচনার সংখ্যাল্পতাই স্বীকার করা হয়। আসলে সংখ্যার হিসাব অন্যরকম। যে কোন একখানা পত্রিকাতেই পাঁচ-সাত আট কি দশখানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বহুবিধ পত্রিকার দিকেই লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেছি। আমাদের মনে হয়, উপন্যাস রচনাতে লেখক ছাড়াও পত্রিকা-সম্পাদকেরও একটা দায়িত্ব থাকে। সেটা পত্রিকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। একটা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস কোন সিনেমা বা যৌন-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের থেকে ভিন্ন ত হবেই। বিষয়ে, রীতি-ভঙ্গীতে, আকারে-প্রকারে নানা পার্থক্য। দুঃসাহসী সম্পাদক গতানুগতিকতা ভেঙ্গে দেন, আবার অনেকে চলতি সাফল্যেরই সন্ধান করেন। সাধারণ অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই এই রকমই।

পত্র-পত্রিকার শারদ মরশুমে একাধিক উপন্যাস প্রকাশের রেওয়াজ বেশী দিনের নয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে, এমন কি পঞ্চাশের দশকের প্রথমাংশে খুব কম পত্রিকাতেই উপন্যাস ছাপা হত। এখন ত লিটল বা সাহিত্য পত্রিকাতেও উপন্যাস ছাপা হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ছে, সিনেমা-পত্রিকাই একাধিক উপন্যাস প্রকাশের প্রথা চালু করে। উপন্যাস বেশী ছাপলে সে পত্রিকা কি পাঠক বেশী কেনেন। খুবই সম্ভব। কিছুসংখ্যক বিশেষ বিষয়ে অনুরাগী পাঠকের কথা বাদ দিলে সাধারণ পাঠক গল্প-উপন্যাস পড়তেই ভালবাসেন। পুজোর ছুটি কাটাতে বিস্তৃত টানা গল্প

পর্যবেক্ষক

আকর্ষণের ব্যাপার। যে কোন একখানা ছোট উপন্যাসও পুস্তকাকারে চার পাঁচ টাকার কমে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে পাঁচ টাকায় একখানা পত্রিকা কিনলে একত্রে অনেকগুলি উপন্যাস পাওয়া যায়। পয়সার দিক থেকে বিশেষ সাশ্রয়। সপরিবারে পুজোর ছুটি কাটানোর একটা বাড়তি আকর্ষণও বটে।

সুতরাং শারদ সাহিত্যের মরশুমে পত্র-পত্রিকায় উপন্যাসের ভিড় বাড়ছে। শোনা যায়, যে সব লেখকের উপন্যাসের দাবিদার বেশি, তাঁদের একটা পুজো যেতে না যেতেই পরবর্তী পুজোর প্রস্তুতি নিতে হয়। খুবই স্বাভাবিক। এবারই তিন চারখানা উপন্যাস লিখেছেন এমন লেখকের সংখ্যা কম নয়। সঙ্গে গল্প প্রভৃতি অন্যান্য রচনা আছে। শিশুদের জন্যেও কিছু লিখতে হয়। পুজোতে একখানা দুখানা উপন্যাস অনেকেই লেখেন। তরুণ ও নবীন লেখকদের উপন্যাসের চাহিদাও ইদানীং বাড়ছে, এবং তা ক্রমবর্ধমান।

একটা প্রশ্ন বোধহয় প্রসঙ্গত ওঠে। পুজোয় যে সব উপন্যাস লেখা হয়, সংক্ষিপ্ত আকৃতি-যন্ত্রে। অনেকাংশে দ্রুততার জন্য গুণগত ব্যাপারেও এ সব রচনা উপন্যাস-পদবাচ্য, আদৌ কিনা, এ-অভিযোগ নিতান্তই অমূলক, এ কথা বলা যায় না। সম্ভবত লেখকরা নিজেরাও তা বলবেন না। দ্রুততা থাকে অবশ্যই, যতই আগে থেকে শুরু করা যাক না কেন। তারপর আছে সম্পাদকের তাগিদ, একাধিক দাবী মেটানোর ব্যাপার। তবুও লেখকগণ নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী চেষ্টা করেন নিশ্চয়ই। গুণগত উৎকর্ষ তার উপরেই নির্ভরশীল। আকার-প্রকার ছোট হলেই বা ক্ষতি কি। উপন্যাসে সর্বদা বিশাল পটভূমি, একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন বা একটা জীবনের নানা জটিলতা-দ্বন্দ্ব দেখাতেই হবে, এমন কি দাসখত দেওয়া আছে। জীবনের কোন একমুখী সরল কাহিনী নিয়েও উপন্যাস হতে পারে, হচ্ছেও। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে অধিকাংশ শারদ-উপন্যাসেই ব্যাপ্তি মিলবে না। সে চেষ্টা লেখকগণ অন্য সময়ে করবেন নিশ্চয়ই। তবে পাঠযোগ্য এবং উত্তীর্ণ রচনাই আগ্রহের বস্তু, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লেখকদের মধ্যে এবার যাঁদের আমরা পেয়েছি তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (অমৃত, নব-কল্লোল), বনফুল (নব-কল্লোল), প্রেমেন্দ্র মিত্র (যুগান্তর), সরোজকুমার রায়-চৌধুরী (সাপ্তাহিক বসুমতী), মনোজ বসু (অমৃত), সুবোধ ঘোষ (উল্টোরথ), নরেন্দ্র মিত্র (সাপ্তাহিক বসুমতী, রম্যা-বাণী), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (যুগান্তর, বেতার জগৎ, উল্টোরথ), বিমল মিত্র (অমৃত, গল্প-ভারতী), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (যুগান্তর, সিনেমা জগৎ), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (যুগান্তর, উল্টোরথ, ঘরোয়া), সমরেশ বসু (দেশ, সিনেমা জগৎ), আশাপূর্ণা দেবী (মৌসুমী, গল্প-ভারতী, বিচার), হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (মৌসুমী, রম্যবাণী), শক্তিপদ রাজগুরু (মৌসুমী), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (সিনেমা জগৎ), সত্যজিৎ রায় (দেশ), বিমল কর (দেশ), আংদ্রে-এর উপন্যাস, ভবানী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত (অমৃত), বুদ্ধদেব গুহ (আনন্দবাজার, সাপ্তাহিক বসুমতী), মিহির আচার্য (অমৃত)।

ঐতিহ্যের রূপান্তর • বয়স্ক মননে

এবারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তারাশঙ্করের 'গোপাল বাঁধের গল্পকথা' (অমৃত) লেখকের জগৎ ও জীবন দেখার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশিষ্ট। বাংলাদেশের ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত সামন্ত শ্রেণীর বিরাট-ব্যাপ্ত উত্থান-পতনের কাহিনী তারাশঙ্করের উপ-

ন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু। লেখক তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলাদেশের এক ঐতিহ্যের রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন, গভীরভাবে আত্মস্থ করে উপন্যাসে সুগ্রথিত করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসেরও কেন্দ্রীয় বিষয় ঐ একই ঐতিহ্যের রূপান্তর। তবে এই রূপান্তর পরিণতি লাভ করেছে ইদানীংকালের এক জাগ্রত-জিজ্ঞাসার মধ্যে এসে, ভূমিহীন চাষীদের জমি ও ধানের অধিকার সমস্যায় এসে। গোপালপুরের বিখ্যাত ঘোষ বংশের দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে জমিদারী, মামলা মোকদ্দমা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ গ্রামের সমাজ-নীতি রাজনীতি, এবং ব্যক্তিমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষা-চাহিদার সর্বপ্রকার আয়োজনই দেখা যায়। বংশপরম্পরায় এ-সবই যথারীতি রূপান্তর ও পরিণতি লাভ করেছে। চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষা ও ব্যক্তি-রুচির ব্যাপারেও এসেছে পরিবর্তন। গোপালপুরের ঘোষেরা জাতে ছোট হয়েও রূপেগুণে পয়সায় বা সম্মানে কারো থেকে ছোট নন—। ঐ বংশেরই মেয়ে, একালের শিক্ষা ও ভাবধারায় গড়ে ওঠা গোপা বৈধব্য সত্ত্বেও পছন্দমত বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ-পরিবারের দ্বন্দ্ব কামাখ্যাচরণ তাঁর মেয়ে গোপার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে একালের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন। কৃষকরা ধান কেটে নিচ্ছে, তিন-চারশ লোকের জমায়েত। এককালের ডাক-সাইটে মানুষ এখন জীবন-সীমান্তে এসে মেয়ের মুখ থেকে শুনেছেন, 'তুমি কি সত্যিই বলতে পার বাবা জমি তোমার?' কামাখ্যাচরণ শুনেছেন। কৃষকদের ধান কাটার দৃশ্যও দেখলেন দূরে থেকে। আজ কাউকেই ফিরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাঁর 'তাঁদের কাল তাঁদের ভালমন্দ সব দেউলে হয়ে গেছে।' এক পড়ন্ত ব্যক্তিত্বের বর্তমান মানসিক দ্বন্দ্ব, অতীত দীর্ঘ ঐতিহ্য। এ-কালের নব-জাগ্রত চেতনার পটভূমিতে স্থাপন করে হৃদয়গ্রাহী করে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। দীর্ঘ কাহিনী, বিরাট জিজ্ঞাসা ছোট পরিসরে সংহত করে 'গোপাল বাঁধের গল্পকথা'কে তিনি একটি অভিজাত মননশীল রচনার মর্যাদা দিয়েছেন।

মঞ্জরী অপেরার পর অভিনেত্রীর জীবন-কথা তারাশঙ্কর এবার লিখেছেন তাঁর 'অভিনেত্রী' উপন্যাসে (নব-কল্লোল)।

ভিন্নতর রূপে-রসে-বর্ণে ভিন্নতর কাঠামোতে একই কাহিনী বলেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'হাঁসের আকাশ' (বেতার জগৎ) উপন্যাসে। এখানেও পটভূমিতে আছে হতগৌরব সামন্ত প্রভুদের অতীত কীর্তিকলাপ, বংশপরম্পরায় সৃষ্ট তাঁদের ঘর-বাড়ি, রীতি-নীতি মাঠ-ঘাট ঐতিহ্য। এ-যেন অন্য জগৎ। কোলকাতা থেকে আগত দু'জোড়া উচ্চ-শিক্ষিত, উচ্চতর বিত্তসম্পন্ন দম্পতি এবং একজন স্কুলশিক্ষক বেড়াতে এসেছে এই একদা-জমিদারদের রাজত্বে। তাদের শিকার-যাত্রার গল্প এ-কাহিনীর অন্যতম আকর্ষণ। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বন-বাদাড় জঙ্গল, বাবলা হিজল বা বনতুলসীর বনের কথা নারায়ণবাবুর অনেক উপন্যাসে পাওয়া গেছে। 'হাঁসের আকাশে'র বিস্তীর্ণ রহস্যজনক পড়ো অঞ্চল, রোমাঞ্চকর জলা-বিল যা 'অটোমোবাইলে'র মত রহস্যময়, এ-উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ। শিকার শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ পটভূমিতে স্থাপিত নর-নারীর মানসিক টানা-পোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রাধান্য পেয়েছে। নারায়ণবাবুর ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক, তাঁর দেখা প্রকৃতি জীবন-বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং বলা চলে জীবনের অন্তর দিকগুলি সর্বদাই সেখানে অধিক অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করেছে। সমান দেবরায় নামে স্কুলের শিল্প শিক্ষকটি যখন সমরকে বলে, 'তোমাদের জমিদারীর বাহাদুরী আছে হে, কিন্তু আর রাখোনি, শখে সব ছিবড়ে করে দিয়েছ। কয়েকটা হাঁস-টাঁস এদের দু-চারজনকে দিয়ে দিলে পারতে, একটু প্রোটিন খেয়ে বাঁচত।'—তখন এক দীর্ঘ-লালিত ঐতিহ্যের নিম্নতম পর্যায়ও চমকে উঠে মুখ ফেরায়। সে মুখ এ কালের সমাজ-মানসের দিকেই ফেরানো।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যান্য উপন্যাস লিখেছেন যুগান্তর, উল্টোরথ পত্রিকায়।

ঐতিহ্যের সংকট বিমল করের অবনেশ্বরীর (দেশ) কেন্দ্রবিন্দু। অবনীমার নিম্নতর পর্যায়ে ঐ মহিলা সম্পর্কে যে মহান এবং আদর্শের মনোভাব ছিল তিল তিল করে গড়ে তুলেছে এবং তাঁর স্মৃতি-পূজার আয়োজন করেছে তা প্রত্যক্ষদর্শীর বাস্তব অভিজ্ঞতার আঘাতে বুঝি চূর্ণ হয়ে যায়।

পতিত-জীবনকথা

এ-সময়ের পতিত জীবনকথা অনেক লেখকের উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। আগেকার দিনের লেখকরাও এ-বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে অনেক। থাকারই কথা। এ কালের লেখকগণও বিষয়টিকে অনেকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। কেবল যৌন-জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন এমন লেখক যেমন আছেন, আবার এদের জীবনের পশ্চাদ পটভূমি ব্যাখ্যা করে আর্থ-সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এমন লেখকও আছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঃসন্দেহে শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক। 'যিনি বিধাতা' (যুগান্তর) নামক ছোট্ট উপন্যাসে তিনি একটি মেয়ের পতিত-জীবনকে আশ্চর্য সহানুভূতি ও সংযমের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে মেয়েটি কিভাবে বড় হয়েছে, পরবর্তীকালে মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে কিভাবে সে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, কেন একটা জীবন্ত মন থাকা সত্ত্বেও সে তার মানসিকতার কোন মূল্য পায়নি—সবই মেয়েটির জীবন ঘিরে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এই মেয়েটি জন্মের থেকেই দুঃখী। মেয়েটির 'প্রকৃত মা নিজের বিলাস জীবনের বিড়ম্বনা এড়াতে প্রথম যৌবনের অবৈধ প্রেমের সন্তানটিকে এই ধাত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিল।' এই যার জন্ম-রহস্য, তার পরবর্তী জীবন যে সুখের হবে না, সে ত জানা কথা। একজন ছেলেধরার খপ্পরেও পড়েছিল। 'জীবনটায় তারপরই অনেক পরিবর্তন এসেছে তা ঠিক।' এই পরিবর্তনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী 'যিনি বিধাতা'। অভিনয়-জীবনে নির্মলা দেখেছে, যে সব নাটকে অভিনয় করতে হয় তা জীবনের সঙ্গে মোটেই যুক্ত নয়। 'গোটাকত লাগসই বকুনির গ্রামোফোন।' নির্মলাকে এক সময় সন্ন্যাসিনী বেশেও দেখা যায়। তার চোখে কখনও মিথ্যা-মোহের অঞ্জন লাগে নি। সেখানেই 'যিনি বিধাতার বাস্তবতা ও সুস্থতার দিক।

ওরাও আছে......

দেশের জনসাধারণ সামান্য লোক, কিন্তু একটু খোঁজ করলেই বুঝবে, তারা সামান্য হলেও অসামান্য, নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও তাদের মধ্যে অনেকেই মহৎ থাকবার চেষ্টা করে। তারাই দেশের মেরুদণ্ড, তারাই দেশের ভরসা। উপন্যাসিক বনফুল তাঁর এবারের উপন্যাস 'ওরাও আছে' (নব-কল্লোল)তে সমাজের নিতান্ত সাধারণ মানুষের কথা অত্যন্ত সাদাসিধা ভাষায় ও সরল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। সাধারণ মেকানিক, ফেরিওয়ালা, ডাক্তার, গৃহস্থ বধূ—এদেরই জীবনকথা 'ওরাও আছে।'

প্রেম-ভালবাসা। দাম্পত্য জীবন

প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লেখক সরোজ-কুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস 'সূর্য-তামসী' (সাপ্তাহিক বসুমতী) লেডি ডাক্তার অসীমার জীবনের কর্ম ও প্রেম-ভালবাসার ঘরোয়া কাহিনী। অসীমা বিলেত থেকে সিগারেট খাওয়া অভ্যাস করে এসেছে এই জন্যে তার ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ টানাপোড়েনের কাহিনী। শেষাংশে দেখা যায়, অসীমা তার বস ডঃ মহলানবীশকে বিয়ে করে কেন্দ্রস্থ হওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক তখনই তার আগের স্বামীর কাছে যেতে হয়। কেননা সতীন মৃত্যুশয্যায়। আরও পরে অসীমা কোলকাতা ফেরে মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে। অসীমা ও বিশ্বতোষের হৃদয়-বিদারক বিচ্ছেদের চিত্র পাঠক-মনে ছায়া ফেলে 'প্লাটফরমের বাইরের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। বোঝা যাচ্ছিল, যন্ত্রণায় তার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।'

এক সময়ের পল্লিব্যাপ্ত সমাজজীবনের রূপকার সরোজকুমারের পরিণত মনের গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত উপন্যাস আমাদের প্রত্যাশা।

আন্তরিক ঘরোয়া-চিত্র সুবোধ ঘোষের 'পুনর্নবা' (উল্টোরথ)। জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত ও বিষণ্ন একটি তরুণী সুমিতার উজ্জ্বল পরিণতিতে আমরা খুশি হয়ে উঠতে পারি। সমাজ-জীবনে যেমন একটা অন্ধকারের দিক আছে, আবার আলোকিত দিকও আছে। সেই-জন্যই সবচেয়ে ভাল লাগে সুমিতার

সংযত আচরণ। সেই রকমই ভাল লাগে, নায়ক অনিমেষের চরিত্রটি। যদিও উপন্যাসের সামান্য অংশই সে অধিকার করেছে। আরও দুটি ছোট্ট চরিত্র ভাললাগবে—জনার্দন ও রঘুর মা। জীবনের সহস্র বিরোধিতা সত্ত্বেও লেখক যেন একটি বিশ্বাসকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করেছেন। এই বিশ্বাসের প্রতি আস্থা এর পূর্বেও সুবোধ ঘোষের মধ্যে দেখা গেছে। উপন্যাসটি মিষ্টি, এবং পড়তে ভাল লাগবে।

ঘরোয়া জীবন-চিত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'স্বন্দর' (সাপ্তাহিক বসুমতী) উপন্যাসও। শ্রীমিত্র মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখের দক্ষ রূপকার। 'স্বন্দর' অবশ্য অনেকটা উচ্চবিত্তের একটি একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা-গিন্নী, পুত্র-পুত্রবধুদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়ার কাহিনী। যেহেতু অর্থের চিন্তা নেই সুতরাং কিছুটা অলস চিন্তাবিলাস আছে, শিল্প সাহিত্য রাজনীতির অহমিকা আছে, আর মদ্যপানও আছে। কিন্তু এই পানাসক্তির প্রত্যক্ষ চলাচলি নেই। দ্বিতীয়ত 'স্বন্দর' উপন্যাসে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বড় ঘরের বড় কথাকে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী বা যৌন আবেদনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াননি লেখক। অবক্ষয়ের ক্লান্তিকর বর্ণনাও করেননি। বরং এখানকার চরিত্রগুলি প্রাণসম্পদে ভরপুর, সরল, রসিকও। শেষাংশে 'নির্মলের' ব্যাধিগ্রস্ততা মনকে তুলে ধরা এবং তার সম্ভাব্য নিরাময়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। শিক্ষিতা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী স্ত্রী অর্চনাই পারে তার রোগ সারাতে। 'তুমিই ব্যাধির শুশ্রূষা।' অর্চনা চরিত্রটি পাঠকের মনে দাগ কাটবে।

'আপনার গল্প আমার ভালো লাগে কেন জানেন? ট্র্যাজেডি হোক বা কমেডি হোক ভালবাসার প্রতি আপনার কিছু বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা আছে।' 'প্রণয় আদিম' (যুগান্তর)-এর শংকর আরম্ভের সংগে পাঠকও আশা করি একমত হবেন যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের উপন্যাস ভালবাসার প্রতি বিশ্বাসে আকর্ষণীয়। 'প্রণয় আদিম'ও নিঃসন্দেহে ভালবাসার প্রতি বিশ্বাসের ছবি। বনে-পাহাড়ের অরণ্য-কন্যা মাতিলদা। অর্ধ-নগ্ন বেশ-বাস। যৌবন সর্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছুরিত। কিন্তু সে সবে সম্পূর্ণ অসচেতন এই মেয়ে। সরল প্রকৃতির মতই সে সরলা। তার ভালবাসার পাত্র সভ্য সমাজের লোক। শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু মাতিলদার প্রেমে অনুরক্ত। সেই অনুরক্ত পুরুষের টাকার প্রয়োজন। 'সভ্য সমাজে ভালবাসা জিইয়ে রাখতে টাকার দরকার হয়, টাকা না থাকলে ভালবাসা মরে যায়, সব অন্ধকার হয়ে যায়।' মেয়েটি একথার অর্থ বোঝেনি। কিন্তু ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিজের সাবলো। প্রেমিকার লোভের ইঙ্গিতে সে ধরা দিয়েছিল। এতেই মাতিলদার জীবনের নিদারুণ পরিসমাপ্তি। কিন্তু মাতিলদা তার ভালবাসার পাত্রের জন্য তার বিশ্বাসকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধ্রুব করে রেখেছিল।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অন্য উপন্যাস, 'প্রণয়-পাশা' (উল্টোরথ) সার্কাস-জীবনের বিচিত্র ঘটনা। প্রেম-যৌনতা, আশা-ব্যর্থতার বাস্তব কাহিনী।

বুদ্ধদেব গুহ-র 'বাতিঘর' (আনন্দবাজার) এর মানুষটা বলেছিল, 'আমি একটি মেয়েকে আমার যা কিছু ছিল সব কিছু দিয়ে ভালবেসেছিলাম।' কিন্তু ভালবাসার মধ্যে এত বেদনা কেন। উপন্যাসের পটভূমিতে সাগরের অশান্ত গর্জন, বেলাভূমি, ঝাউবন। লেখকের অন্য উপন্যাস 'অনুমতীর জন্য' (সাপ্তাহিক বসুমতী)-ও প্রেম মুখ্য, পটভূমি আলমোড়া।

এখনও ডালহৌসীর অফিস পাড়ায় একটি মেয়েকে, নাম তার প্রকৃতি, দেখা যায়। 'মাথার পাতলা হয়ে আসা চুল, সাদা চওড়া সিঁথি, স্নায়ুঘটিত অসুখে ডান পা একটু টেনে চলে। কাঁধে ব্যাগ। হাতে এলাচের খোসা। ওর শরীরে শুকনো আভা, ওর বয়েস ধরা যায় না, পঁচিশও হতে পারে কিংবা বত্রিশ।' মিহির আচার্যের 'দিবস বিভাবরী' (অমৃত) নায়িকা এই মেয়ে, পরিণামী চিত্রটা তার ঐ রকম। বোঝা যায়, জীবনযুদ্ধে পোড়খাওয়া নিদারুণ ঝলসানো এই মুখ। বাবা মারা গিয়েছিলেন বি-এ পরীক্ষার শেষদিনে। তারপর নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াই। ঘরে এবং বাইরে। চাকরী সে একটা পেয়েছিল, কেরানীর চাকরী। কিন্তু যৌবনে পূর্ণ অন্তঃপুরে যে তখন দাউদাউ করে জ্বলছে, সে যৌবনকে তৃপ্ত করতে চেয়েছে নিতান্ত নামগোত্রহীন এক যুবককে দিয়ে। তারপর মন! মন কি ভরছিল। নিজেকে টুকরো টুকরো করে দিয়েও সে শেষরক্ষা করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত জীবনের হতশ্রী আত্মবঞ্চনার কাহিনী। মিহির আচার্য নগরকেন্দ্রিত জীবনাচরণের বাস্তব ভিত্তির উপর তাঁর কাহিনী স্থাপন করেছেন, ইদানীংকালের অনেক অভিজ্ঞ লেখকেরা যার রূঢ়তাকে একপ্রকার এড়িয়েই চলেন।

বেকার জীবন : বর্তমান সময়

মনোজ বসু তাঁর বহু উপন্যাসে বর্তমান সময়ের সমস্যা ও সংকটের কথা লিখেছেন। শিক্ষক-জীবনের কথা লিখেছেন যেমন চোরদের অন্তরঙ্গ জীবনের ছবিও তেমনি দক্ষতার সংগে চিত্রিত করেছেন। এবার তিনি লিখেছেন বেকার জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী তাঁর 'আমি সম্রাট' (অমৃত) উপন্যাসে। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে সে, লেখাপড়া শিখেছিল কষ্ট করে নিষ্ঠার সংগে। ইচ্ছা ছিল চাকরী করে রুগ্না মা ও অসহায় দাদাকে সুখে রাখবে। চাকরী পাওয়ার জন্য নানাপ্রকার টেকনিক্যাল নন-টেকনিক্যাল ট্রেণিং ও ডিপ্লোমাও সে নিয়েছে। কিন্তু কোন যোগ্যতাই তার কাজে লাগল না। একসঙ্গে পড়ত, অত্যন্ত চালাক এবং চালু মেয়ে তার স্ত্রী হয়ে চেষ্টা করেছে, দু'একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও চেষ্টা করেননি তা নয়, শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়েছে। বিচিত্র-বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছে ছেলেটির। 'বছরের পর বছর উমেদারি চালাচ্ছি।' সে বেকারই থেকে গেছে।

'আমি সম্রাট'-এ অরুণ সরল, সহজ সপ্রতিভ বুদ্ধিমান। বান্ধবীর সঙ্গে মেলামেশাতেও সে আশ্চর্য স্বাভাবিক, সরল এবং সংযমী। সে অর্থাভাব ও বেকারীর জন্য যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছে, কিন্তু সব কিছু সহনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কালোবাজার, পকেটমার বা গুণ্ডাদের দলে নাম লেখায়নি। এমনকি এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে একবারও বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ পর্যন্ত ঘোষণা করেনি। দীর্ঘ বাঁচার সংগ্রামের শেষে তাকে 'ঘরে ঝুলন্ত মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।' তার মৃত্যু-কালীন বক্তব্য : আমার মৃত্যুর জন্য রাজ্যশুদ্ধ দায়ী, কেবল আমি ছাড়া। সম্ভবত সে ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তার এই মর্মান্তিক পরিণাম দেখে পুলিশ মন্তব্য করেছে : 'শিক্ষিত লোক হয়ে আত্মহত্যা করলেন—ছিঃ।'

আমরা এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে আজ প্রায় অনিশ্চিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছি। এই সময়ের যথাযথ রূপ উপন্যাসে প্রতিফলিত দেখতে পেলে চেনা ঘটনা নতুনভাবে আস্বাদনের স্বাদ পাই। বিমল মিত্র তাঁর 'রাগভৈরব' (অমৃত) উপন্যাসে সমসাময়িক ঘটনা গ্রহণ করে সময়োচিত কর্তব্য করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালের মূল্যবোধের নীতিবোধের রূপান্তরের একটা চিত্র পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। বিমল মিত্র উপসংহার টেনেছেন এইভাবে : আমাদের সমাজেরও একটা স্কু হারিয়ে গেছে। আমাদের স্কু-ই হলো আমাদের চরিত্র। আমরা চরিত্রই হারিয়ে ফেলেছি।'

এই সময়ের অস্থিরতার চিত্র অন্যভাবে সমরেশ বসু তাঁর 'বিশ্বাস' (দেশ) উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। চারদিকে যখন অস্থির-

অরাজক অবস্থা তখন এই সময়ে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে জীবন যাপন কি সম্ভব। নায়কের স্বগত-চিন্তায় 'অবিশ্বাসের যে-সব ধর্ম, তার বুলি তার নামাবলী সবাই জানে চেনে, সেই ধর্মের কাছে বিশ্বাসটাই চোর, কখনই বিধর্মী হওয়া চলবে না। ...তথাপি বিশ্বাস আমার মধ্যে একরকম আন্ডারগ্রাউন্ড সাসপেন্সকে জিইয়ে রাখছে।' কিন্তু বিশ্বাসহীন আদর্শহীন মানুষ। অন্ধ রাজনৈতিক বিদ্বেষ তার প্রত্যয়ের উপর বার বার আঘাত করে। হয়ত সেইজন্যই লোকটা ব্যক্তি-জীবনে নীতিহীন, অসংলগ্ন এবং উৎ-কেন্দ্রিক। কোন রাজনৈতিক দলও তাকে ধ্রুব বিশ্বাসে পৌঁছে দিতে পারে না। কে পারে, প্রেম? নায়ক প্রেমের ব্যাপারেও খুব আধুনিক। সে একটা প্রেম করে বটে, সুযোগ পেলে অন্য এক ষোড়শী কিশোরীকে চুম্বন ও আদরটাদর করতে ছাড়ে না। 'বিশ্বাসে'র মেয়েরা প্রত্যেকেই কোন না কোন যৌনসংসর্গে লিপ্ত। আসলে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল উপন্যাসের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হলেও উপস্থাপন, চরিত্রচিত্রণ ভাষা ব্যবহারে 'বিশ্বাস' বিবরেরই পরিপূরক উপন্যাস।

ইতিহাস-আশ্রিত, গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনী

কয়েক বছর আগে ইতিহাসআশ্রিত উপন্যাস অনেকে লিখতেন। ইদানীং দুই-এক বছর মনে হচ্ছে, তার প্রচলন কমেছে। এবারে উল্লেখযোগ্য রচনা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাণী-কাহিনী' (যুগান্তর) কিছু ইতিহাস, কিছু কিংবদন্তি' কিছু বা কল্পনা। সহস্র বৎসর পূর্বে বাঙলা দেশের কামিল্লার নিকটবর্তী পট্টিকাবা রাজ্যের নৃপতি রণজমল্লদেব ও ব্রহ্মদেশের পগামের রাজপুরী সেবন্তীর প্রেম ও বার্তার কাহিনী। লেখকের রচনানৈপুণ্যে পাঠক এক রূপকথার রোমাঞ্চের পরিমণ্ডলীতে উপস্থিত হবেন।

সত্যজিৎ রায়ের 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' (দেশ) গোয়েন্দা ফেলুদার কীর্তি-কাহিনী। কাহিনীর ঘটনাস্থল সিকিমের গ্যাংটক শহর। বিচিত্র সব চরিত্রের সমাবেশ, এমনকি একজন হিপিকেও কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে। গোয়েন্দা গল্পের প্রথা অনুসারে এ-কাহিনীর বিভিন্ন পাত্র সম্পর্কে ক্ষণে ক্ষণে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। লেখকের কুশলী রচনার গুণে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল অক্ষুণ্ণ থাকে।

চিরঞ্জীব সেন একটি রহস্য উপন্যাস লিখেছেন 'মৌসুমী' পত্রিকায়।

একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একথা বলা বাহুল্য যে, এশিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা স্বয়ংসমাধা করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে।' এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য দীর্ঘকাল সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। আমরা জীবনা-চারণের প্রতি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলি সম্পর্কে যত আগ্রহ-সচেতনতা দেখিয়েছি, নিজেদের মহাদেশ সম্পর্কে তা দেখাইনি। সুখের বিষয় ইদানীংকালে রাজ-নৈতিক-সাংস্কৃতিক বহু ক্ষেত্রে সে ভাব বিনিময় হচ্ছে। সেদিক থেকে ভিয়েৎনাম সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। যতদূর জানা যায়, ভিয়েৎনামের প্রাণ-পুরুষ হো-চি-মিনের কিছু কবিতা এবং অন্যান্য ভিয়েৎনামী লেখকের দু-চারটি গল্পের অনুবাদ ছাড়া আমাদের দেশে ভিয়েৎনামী সাহিত্যের অনুবাদ নেই। ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত আঙ্ দুকের 'অশ্রু রক্ত স্বপ্ন' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ভিয়েৎনামের অপরাজেয় মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে সংগ্রামী মানুষের লড়াইএর বাস্তব চিত্র 'অশ্রু রক্ত স্বপ্ন' বাঙালী পাঠক এমনকি লেখকদের সামনেও এক নতুন জিজ্ঞাসা। এরূপ একটি মূল্যবান রচনা প্রকাশের জন্য 'অমৃত' ধন্যবাদার্হ।

তরুণ লেখকদের উপন্যাস

কয়েক বছর আগেও তরুণ কোন লেখকের একখানা উপন্যাস প্রকাশিত হলে পাঠক, বিশেষত তরুণ পাঠকমহলে খুবই আগ্রহের সৃষ্টি হত। এখন অনেকেরই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর, আগ্রহের মাত্রা স্বভাবত কম, তবুও প্রত্যাশা তরুণ লেখকদের উপন্যাসের ক্ষেত্র এখনও নিশ্চয়ই আছে। কারণ এদেশে যাঁদের আমরা তরুণ লেখক বলছি, স্বাধীনতা-উত্তরকালে, স্বাধীনতা এবং নতুনতর সমাজ-বাস্তবতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রথম চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। সুতরাং আজকের সমাজ এবং মানুষে পরিবর্তন এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনের চেহারা নিয়ে তরুণদের উপন্যাসের বিষয় হবে এবং হতে থাকবে সেটাই প্রত্যাশিত। দেশের দ্রুত পরি-বর্তনের সঙ্গে সমান তালে তরুণ শক্তিই সমতা রেখে চলতে পারে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যেই তরুণরা আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা মেটাতে পেরেছেন একথা বলা চলে না। কোথাও কোথাও বরং হতাশাই সৃষ্টি হয়েছে। তবুও তাঁদের উপন্যাস সম্পর্কে পাঠকের আশা আছে এবং থাকবেও।

বর্তমান শারদ মরশুমে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (রমাবাণী), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (আনন্দবাজার), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (মৌসুমী), মিহির মুখোপাধ্যায় (সাপ্তা-হিক বসুমতী), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (দেশ), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (অমৃত), তপোবিজয় ঘোষ (নন্দন), কার্তিক লাহিড়ী (এক্ষণ), সঞ্জীব সরকার (আলোক-সরণি), সবিতা সেনগুপ্ত (কালি ও কলম) প্রমুখ।

প্রেম-ভালবাসা, যৌন জীবন, বর্তমান অস্থির সময়, বাস্তুহারাদের প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক কৃষক, অবক্ষয়-হতাশা, বেকার, মধ্যবিত্ত—এ-সবই তরুণদের উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করছে। তবে কম বেশী সকলের লেখাতেই নতুনতর প্রকাশভঙ্গী ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'একক প্রদর্শনীর' (অমৃত) নায়ক এ-সময়ের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তরুণদের প্রতিভূ। কোন মেয়েকে চুমু খেয়ে যার কিছু মনে হয় না। এই সময়ের প্রভাব তাকে নিঃসঙ্গ করেছে। সে অবক্ষয়ের বেড়াজালে আবদ্ধ। তার হয়ত কখনও মনে হয় 'আমি একটা অবাস্তব।' গুরুতর ঘটনাকে সামনে রেখেও সে আশ্চর্য নিরাসক্ত নির্মোহ। সে একই সঙ্গে অশান্ত এবং শান্ত। এই সব আপাতবিরোধ নিয়েই সে মানুষটা, কিন্তু বিন্দুমাত্র ভান নেই সে অকৃত্রিম।

ঠিক ভিন্ন কোটির যুবকদের পরিচয় পাওয়া যাবে, তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' (নন্দন) উপন্যাসে। পার্টি কর্মী যুবকদের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কতকগুলি ক্ষুব্ধ যুবক-যুবতী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণায় সক্রিয় এবং সোচ্চার। তারা জগৎ-জীবনকে রাজনৈতিক দর্শকের দৃষ্টিতে দেখে। সুতরাং তাদের কাছে প্রতিক্রিয়া নয়, সক্রিয়তাই লক্ষ্য। এদের শরীর মন ও কর্মধারা সবই গতিশীল।

সন্দীপন বা তপোবিজয় দুই ভিন্ন কোটির লেখক হয়েও দুজনই এই সময়ের রূপকার। যেহেতু তাঁদের রচনার বিষয় এই সময়ের মাটির রস থেকে সংগৃহীত। আর প্রকাশভঙ্গীতে দুজনই মননশীল সংযমী এবং নিরাসক্ত। ভাষা কাহিনীর উপযোগী এবং উন্নত।

প্রবীণ ও নবীন অনেকের উপন্যাসেই বর্তমান সময়ের চিন্তা ভাবনার প্রভাব আছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখা দরকার, সনাতন-গতানুগতিক বিষয় ও কাহিনী বিস্তারের মাঝে হঠাৎ আচমকা কিছু সমকালীন ঘটনা বা বক্তব্য বলে দিলেই তা অভিনব ও এ-সময়ের প্রত্যাশিত রচনা হয়ে ওঠে না। মানুষে যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে বাঁচার জন্য অনবরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে, উপন্যাসের শিকড়ও যদি সেই মাটিতেই প্রোথিত থাকে, তাহলেই সে-কাহিনীর সঙ্গে পাঠক একাত্মতা স্থাপন করতে পারবেন। সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধও দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মনে সাড়া তুলছে নতুন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রেম, জীবিকা, মন-মননের কথা, দারিদ্র্য, বেকারী, বিচ্ছিন্নতা, অবক্ষয় কোনটাই আজ আর সমাজ-ব্যক্তির থেকে আলাদা কিছু নয়। সব কিছু এক কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। প্রক্ষিপ্ত নয়, স্বয়ম্ভুও নয়। বাংলা উপন্যাস যেন কোথায় একটা সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। একালে একটি ছোটগল্প বা একটি ছোট কবিতা পাঠককে যে প্রত্যাশায় পৌঁছে দিচ্ছে একখানি উপন্যাস তা পারছে না কেন, ভেবে দেখা দরকার।

বইকুণ্ঠের খাতা

মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

কলকাতার বইয়ের স্টলগুলি এখন নানারকম কাগজপত্রে ঠাসা। পুজোর উজ্জ্বলতা নেই। ধুলো ময়লা পড়েছে মলাটের ওপর। নতুন কাগজ বের না হওয়া পর্যন্ত ওরা থাকবে। তারপর শুরু হবে নিয়মিত কাগজের প্রদর্শনী। যাতায়াতের পথে কেউ উল্টে দেখবেন সূচীপত্র। কেউ কিনবেন, কেউ কিনবেন না। দু'একটা লিটল ম্যাগাজিনও বেরুতে থাকবে দুর্বল শরীর নিয়ে। বড়দিনের সময় বেরুবে দু-একটা ভালো স্বাস্থ্যের সিনেমা পত্রিকা।

সাহিত্যের প্রবহমানতায় সাময়িক পত্রের এটাই নিয়তি এবং পরিণতি।

এ জন্যে কেউ দুঃখিত নন। না লেখক, না পাঠক। সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে সাপ্তাহিকের চাহিদা থাকে না। মাস পেরুলে মাসিকের মর্যাদা নষ্ট নয়? পাঠক অপেক্ষা করতে থাকেন নতুন সংখ্যার জন্য। চাই আরো গল্প, আরো উপন্যাস। লেখক লিখতে চান আরো।

এই দৃশ্য প্রধানত কলকাতার।

তার বাইরেও সাহিত্যের আরেকটা জগৎ আছে — আরেকটা বাজার। তার অবস্থান কলকাতা কিংবা শহরতলীতে নয়, মফঃস্বলের প্রাণকেন্দ্রগুলিতে। ওখান থেকেও বেরোয় নানারকম পত্র-পত্রিকা। অধিকাংশই কলকাতাবিমুখ। কলকাতার ফুটপাথে সেই সব কাগজপত্রের বড়ো একটা দেখা-সাক্ষাৎ মেলে না। কালেভদ্রে এসে পড়ে।

বছর দুয়েক আগেকার একটা ঘটনার কথা বলি।

একটি গ্রামে গিয়েছিলাম একটা সাহিত্যসভার অতিথি হয়ে। পুজোর সামান্য আগে হবে বোধহয়। জায়গাটা যেতে হাওড়া স্টেশন থেকে বেশী সময় লাগে না। তবু সন্ধ্যার অন্ধকারে, গাছ-গাছালির রহস্যময়তায় অদ্ভুত লাগছিল। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে যেন কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। চারদিকে অপর্যাপ্ত ধানের ক্ষেত, আর সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে জলের ছপছপ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সভার শ্রোতারা আসছিলেন ঐ আলবাঁধা পথে। কেউবা এসেছিলেন পাঁচ-ছ মাইল দূর থেকে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কালো পীচের পথ ধরে।

কলকাতায় সাধারণত সাহিত্য-সভায় লোক হয় না। ওখানে হয়েছিল।

অদ্ভুত সারল্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, কলকাতায় সাহিত্যিকদের কথা। কলকাতার তরুণরা সাধারণত যাঁদের আদৌ পাত্তা দিতে চান না, তেমন কবি সাহিত্যিকরাই তাঁদের প্রিয় এবং পরিচিত। আমি কারুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম সংক্ষেপে কারুর বা বিস্তৃতভাবে। সভাশেষে লক্ষ্য করলাম, আমার শান্তিনিকেতনী ঝোলাটা বেশ পুরুষ্ট হয়ে উঠছে নানা ধরনের পত্র-পত্রিকায়।

ডজন দেড়েক শারদীয়া সংখ্যা পেয়েছিলাম সেদিন।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতো সব কাগজ বেরোয় নাকি এখান থেকে? অথচ কলকাতা থেকে আমরা এসব কাগজপত্রের কোনো খবরাখবর রাখি না! কাছাকাছি কোথাও ভালো প্রেস আছে?

জনৈক তরুণ কবি সসঙ্কোচে বললেন, নিয়মিত কোনো কাগজই বেরোয় না। মাঝে মাঝে বেরোয়। কলকাতার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু কেউ পাত্তা দেয় না। লেখা চাইতে গেলে টাকা চান। আমাদের কি আর সে সামর্থ্য আছে? ধরাধরি করে দু-একটা লেখা সংগ্রহ করি। অথচ জানেন তো কলকাতার লেখকরা না লিখলে মফঃস্বলের কাগজপত্র দাঁড়ায় না! এখানে কোনো ভালো প্রেস নেই। সিনেমায় হ্যান্ডবিল, রসিদ বই, ছোটখাটো বিজ্ঞাপন ছাপার মতো দু-একটা প্রেস আছে কোথাও কোথাও। আমরা পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চড়ে কিংবা বাসে যাতায়াত করে কাগজপত্র ছাপাই। সবই ট্রেডল মেসিন। পাতা হিসেবে দাম নেয়। একেক পৃষ্ঠা ছাপতে খরচ পড়ে সাড়ে তিন টাকা, চার টাকা। কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী নেয়। তিন-চার পৃষ্ঠার বেশী কম্পোজ করার মতো টাইপ পর্যন্ত অধিকাংশ প্রেসে নেই। গাঁয়ের প্রেস বুঝতেই পারছেন তো?

রাত্রিতে আমাদের থাকার জায়গা হলো, স্থানীয় একটি কলেজের হস্টেলে। কলকাতা থেকে অনেকের যাবার কথা ছিল। কেউ যাননি। আমি একা। স্বভাবতই আমার আদর বেশী। কেউবা দুঃখ প্রকাশ করছিলেন, প্রখ্যাতদের দেখা পাননি বলে।

খাবার টেবিলে পরিচয় হলো জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বয়সে প্রৌঢ়। ওকালতি করেন তমলুকে। কিন্তু যৌবনে সাহিত্যের নেশায় প্রায় সব খোয়াতে বসেছিলেন। এখনো সেই নেশায় মশগুল। যখনই কোনো সাহিত্য সম্মেলনের খবর পান, তখনই ছুটে যান সেখানে। বছর কয়েক ধরে একটি সাহিত্য পত্রের সম্পাদনা করছেন।

তিনি দুঃখ করে বললেন, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা এখন আর তেমন সাহিত্যের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। লেখা ছাপাবার জন্য তারা আসে। ছাপা না হলেই যোগাযোগ রাখে না। অথচ ত্যাগ স্বীকার না করলেও কি কেউ কখনো সাহিত্যিক হতে পারে?

বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি পরিচিত! কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ তাঁর কাগজে লিখেছেন এবং লিখছেন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছেন কয়েকবার। একটি বইও লিখেছেন রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে।

আমি পত্রিকাটি কখনো দেখিনি কলকাতার স্টলে। অথচ, সাহিত্যের অগ্রগতিতে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি বারবার স্মরণ করেন। বহু সাহিত্যিকের আবির্ভাব যে ঐ পত্রিকার মারফতে ঘটছে—সেজন্যেও তিনি গর্বিত।

এরকম সাহিত্যপ্রাণ গ্রামীণ সম্পাদকের সংখ্যা ইদানীং বিরল হয়ে আসছে। একটি পত্রিকার উদ্যোগে চুঁচুড়ায় একটি সাহিত্য সম্মেলনে একজন প্রৌঢ় সম্পাদককে দেখেছিলাম, একটি সংবাদ সাময়িকীর পৃষ্ঠা থেকে অতীতের সংবাদ পড়ে শোনাতে। প্রায় সত্তর বছর ধরে পত্রিকাটি বেরিয়ে আসছে নিয়মিত। আমরা কলকাতার পাঠক সেইসব পত্রপত্রিকার খবর রাখি আর কতটুকু?

আসলে, কলকাতা মফঃস্বল সম্পর্কে উদাসীন। লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলে গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্পর্কে কেউ আগ্রহ বোধ করেন না। অপরপক্ষে, কলকাতা সম্পর্কে মফঃস্বলের সম্পাদকদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। বেশ কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করছি, মুর্শিদাবাদ কিংবা কৃষ্ণনগরের, ধূপগুড়ি কিংবা দুর্গাপুরের দু-একটা কাগজের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছে কলকাতায়। বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাসাকেই সাধারণত সাব্যস্ত করা হয় 'কলকাতা কার্যালয়' হিসেবে।

এগুলি প্রকৃত মফঃস্বলী কাগজ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রচুর।

মফঃস্বল থেকে এমন দু'চারটে কাগজ বেরোয়, যার সম্পাদক প্রকৃতপক্ষে কলকাতার মানুষ। অধ্যাপনা কিংবা অন্য কোনো কার্যোপলক্ষে আস্তানা বেঁধেছেন দূর মফঃস্বলে কিংবা কলকাতা থেকে দূরবর্তী কোনো শিল্পনগরীতে। সাহিত্যের নেশাটা ওখানে গিয়েই তো নিঃশেষিত হয়ে যায় না। প্রকৃত নাগরিক মননশীলতা ও কলকাত্তাই ছাপ পড়ে সেরকম সাহিত্যের কাগজে।

বিশেষ করে, ভিলাই, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি শিল্পনগরী থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো প্রধানত শহুরে মানসিকতায় অভিব্যক্তিতে প্রায় কলকাতার সমধর্মী। তার কারণ, ঐসব অঞ্চলে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা কম। অনেকেই কলকাতা কিংবা উপকণ্ঠের বাসিন্দা। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি বিপদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁদের জীবনেও সমভাবে সম্প্রসারিত।

প্রকৃত মফঃস্বলী কাগজের চেহারা আলাদা। প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা, রচনা নির্বাচনে তা ধরা পড়ে। স্থানীয় কোনো স্কুলের শিক্ষক, কোনো সমিতির সেক্রেটারী, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কিংবা সমাজকর্মীর

উদ্যোগে সেসব কাগজ বেরোয়। বাহিরাগতের অভিরুচি প্রধান হয়ে ওঠে না। হয়তো কাগজের প্রথমেই ছাপা হয় কোনো অধ্যক্ষ কিংবা অধ্যাপকের গুরুগম্ভীর একটি সাহিত্যসম্পর্কিত মূল্যবান প্রবন্ধ।

এ জাতীয় কাগজপত্রের আর্থিক সামর্থ্য প্রায় নেই বললেই চলে। বন্ধু-বান্ধবেরা মিলে স্থানীয় ডাক্তারখানার বিজ্ঞাপন, জুতোর দোকান কিংবা বিড়ির দোকানের বিজ্ঞাপন জোগাড় করে। তা ছাড়া টেলারিং শপ, মুদির দোকান প্রভৃতির বিজ্ঞাপনও সংগ্রহ হয়ে যায় দু-একটা। কখনো কখনো স্থানীয় বীজ ও সারের দোকানের বিজ্ঞাপন জুটে যায়। মফঃস্বল শহরের কাগজে কৃষি-দপ্তরের কিংবা সমাজকল্যাণ বিভাগের বিজ্ঞাপনও বেরুতে দেখেছি কখনো-সখনো।

অজস্র অসুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও কাগজ বেরোয়। লেখা সংগ্রহের জন্য তাঁরা কলকাতায় ধাওয়া করেন। দু-একজন নামী লেখকের লেখা না হলে পত্রিকার মর্যাদা বাড়ে না।

আমি এ ব্যাপারে কলকাতার সাহিত্যিকদের মনোভাবটা জানি। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরনো লেখা ছুঁড়ে দেন সেসব কাগজে। কিংবা হেলাফেলা করে যা হোক দু-চার ছত্র লিখে দায়সারা গোছের একটা কাহিনী দাঁড় করান। খুব বড় ধরণের মুরুব্বি না থাকলে কেউ কলকাতার লেখা সংগ্রহই করতে পারেন না। অনেক সময় সেরকম মুরুব্বি জুটেও যায়। স্থানীয় কোনো স্কুলের শিক্ষক কিংবা ডেভেলাপমেণ্ট অফিসের কর্মচারীর মারফতে ছোট কিংবা মাঝারি গোছের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

কলকাতার সঙ্গে মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিনের পার্থক্যটা এখানেই। কলকাতার কোনো কাগজ সহজে মফঃস্বলের দিকে নজর দেয় না। মফঃস্বল কলকাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে সর্বদাই।

আমি এই প্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জনৈক তরুণ কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা কলকাতার লেখা সংগ্রহ করতে এত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কেন? নিজেরা লিখলেই তো পারেন!

ভদ্রলোক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, লেখা মানেই তো কিছুটা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। স্বীকৃতির প্রত্যাশা—তাই না? স্থানীয় কোনো কাগজে লিখে তা পাওয়া যায় না। হয়তো গাঁয়ের মানুষ তাকে নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু লেখক হিসেবে আমাদের কি তাতে সান্ত্বনা থাকতে পারে? কলকাতার কাগজে লেখা না বেরুলে মনে হয় কিছুই হল না। অমৃত, দেশ পত্রিকায় লেখা চাই। আমাদেরও অহং তৃপ্ত হয়। গাঁয়ের মানুষ ভাবে, হ্যাঁ লেখকের মতো লেখক বটে। আমি কত লেখা পাঠিয়েছি কত কাগজে! কেউ ছাপেনি। অথচ কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে বড় কাগজে না হোক, ছোট কাগজে লেখার জন্যে কোনো অসুবিধে হয় না।

আমি তাঁর মনোবেদনাটা উপলব্ধি করতে পারছিলাম বুঝি; বললাম, তবুও গ্রামের মানুষকে নিয়ে কি সাহিত্যের একটা সমাজ গড়ে তোলা যায় না। গ্রামের সমাজ ও সমস্যা নিয়ে গল্প লেখা যায় বলেই তো আমার ধারণা।

তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে তিনি বললেন, যায় না। কিছুকাল গ্রামে গিয়ে থাকলেই বুঝতেন আসল কারণটা কি? একে তো সাহিত্যের চর্চা নেই ওখানে। তার ওপরে জীবনের যে উত্তাপ উত্তেজনা এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলছে, তার ধারণ-ধারণটা শহরে কাছ থেকে আমাদের শিখে নিতে হয়। গ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে শহরে এসে সাহিত্য করা যায়, গ্রামে বসে করা যায় না। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ পেরেছিলেন কিন্তু অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পারেননি। তাঁদের কলকাতায় এসে বাসা বাঁধতে হয়েছে। প্রফুল্ল রায়ও কলকাতায় না এলে হয়তো আদৌ লিখতেন না। কলকাতা ওঁদের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আপনি বুঝতে পারবেন না, গ্রাম এককেজন শিক্ষিত মানুষকে কি রকম ভোঁতা করে দেয়। উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই। কলকাতার পত্র-পত্রিকার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমরা নিরুপায়।

মফঃস্বল শহরের লিটল ম্যাগাজিন-গুলো অবশ্য এতটা নির্জীব নয়। কলকাতার মতোই অস্থির, চঞ্চল এবং শহুরে রীতিতে অভ্যস্ত। হয়তো পুরোপুরি নয়। শিক্ষিতের হার কিছুটা বেশী বলেই কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসামের শিলং, আগরতলা, কৈলাশহর থেকে প্রকাশিত উত্তর কিংবা পূর্ব সীমান্তের কোনো কোনো কাগজে রীতিমত নাগরিক বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ ঘটেছে আশ্চর্য রকমে। কয়েকদিন আগে কোচবিহারের একটি কাগজের প্রচ্ছদে দেখেছি কয়েকটি লাইনঃ

(১) যারা সূর্য সাক্ষী রেখে কবিতা পড়েন, কবিতা পড়তে পড়তে গিন্নীর কাছে হাত বাড়িয়ে বাজারের থলি চেয়ে নেন, তাদের আমরা তৃণজ্ঞান করি।

(২) যে-সকল লেখক সম্পাদককে মদ্যপানে আপ্যায়িত করে কবিতা ছাপান, গোষ্ঠীচেতনাকে মনে-প্রাণে বেশী প্রাধান্য দেন, তাঁদের আমরা তৃণজ্ঞান করি।

নিঃসন্দেহে এই ঘোষণা মফঃস্বলী নয়। মফঃস্বলের শহরগুলিতে ক্রুদ্ধ, শান্ত, রাগী, ধার্মিক, অধার্মিক—নানা মেজাজের কবি সাহিত্যিকেরা সংখ্যায় বেড়ে চলেছেন ক্রমাগত। এমন একদিন আসবে যখন শহর-গ্রামের সাহিত্যের ব্যবধান নির্ণয় করা কঠিন হবে। এরই মধ্যে আঞ্চলিকতার সীমা ভেঙে যেতে শুরু করেছে।

এবার পুজোয় আমার হাতে এমন কতকগুলি কাগজ এসেছে, যেগুলি সত্যিই প্রশংসার্হ। কলকাতার সঙ্গে সেসব কাগজের কোনো যোগাযোগ নেই। আত্ম-সন্তুষ্ট সম্পাদকেরা নিজস্ব লেখক-গোষ্ঠীকে লাগিয়েছেন লেখার কাজে। লেখার বিষয় প্রায় প্রতিটিই বিগতকালের। কলকাতার 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' কিংবা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সঙ্গেই তার তুলনা চলে। দু-একটি লেখা নিশ্চয়ই দুর্বল। অধিকাংশই আঞ্চলিক এবং প্রাচীন সাহিত্যের বৈশিষ্ট সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা। স্থানীয় পত্রিকাগুলি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বাহন হয়ে উঠতে পারলে হয়তো উপকারই হতো।

মহকুমা শহরগুলি থেকে সারা বছরই কোনো না কোনো একটি সংবাদ সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক বেরোয়। পুজোর সময় শারদীয় সংখ্যা বেরোয় তাদেরও। এসব পত্র-পত্রিকাকে কলকাতা মুখাপেক্ষী বলা চলে না। পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকলেখিকারাই মূলত তাদের লেখক-লেখিকা। বিখ্যাত লেখকদের আশীর্বাণী ছাপা হয় পত্রিকার প্রথম দিকে।

এবার মফঃস্বলের কয়েকটি শহর থেকে ছোটদের উপযোগী কয়েকটি পত্রিকা বেরিয়েছে। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 'কাকলি' তাদের মধ্যে অন্যতম। উত্তরবাংলা থেকে প্রকাশিত 'সীমান্তিক'-এর লেখা কম্পোজ করেছেন পত্রিকার তরুণ সদস্যরা। কলকাতার সঙ্গে এঁদের কোনো বিরোধ আছে কিনা জানি না। মনে হয়, এসব কাগজ আত্মসন্তুষ্ট।

আমি কয়েকদিন আগে মফঃস্বলের কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, কিভাবে এই সব পত্রিকা বের হয়? কি তাদের উদ্দেশ্য? জানতে চেয়েছিলাম, এইসব কাগজপত্র না বেরুলে ক্ষতি কী?

তুখোড় জবাব দিয়েছিলেন জনৈক সম্পাদক, না বেরুলে কলেজ স্ট্রীটের হৈ-হুল্লোড় বন্ধ হয়ে যেতো। গ্রামে গ্রামে আমরা লাইব্রেরী বানাই, সাহিত্যে আলোচনা করি, গল্প-কবিতা লিখতে চেষ্টা করি। ভাবুন, যদি আমরা না লিখতাম, না পড়তাম—তা হলে বাংলা সাহিত্যের কি দশাটা হতো? কেউ বই কিনতো না, সাহিত্যের আলোচনা করতো না, সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠা বাড়তো না। কলকাতার পাঠক কেনে কম। আমরাই কিনি। এমন কি কস্তাপচা সাহিত্যের খদ্দেরও আমরাই। নিজেরা কাগজ করতে গিয়ে আরো দশটা কাগজের আলোচনা করি। কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা-গুলিতে কে কি লিখছেন না লিখছেন তার গবেষণা করে সময় কাটাই। মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিনগুলো কবি-সাহিত্যিক তৈরী করুক না করুক সাহিত্যের পাঠক ও খদ্দের তৈরী করে নিঃসন্দেহে।

অন্য একজন সম্পাদক কলকাতার সাহিত্যিক রাজনীতিতে দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, ওসব আপনাদের কচ-কচালি। আমরা সাহিত্য বুঝি, [illegible] ধরতে পারি না। একবার একজন সাহি-

ত্যিকের প্রশংসা করতে গিয়ে ভীষণ ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। খবরা-খবর আগে থেকে জানা না থাকলে হুট করে এক জনের প্রশংসা আরেকজনের কাছে করাও মুস্কিল। এদিক থেকে আমরা, মফঃস্বলের লেখক-লেখিকারা অনেক মুক্ত। লেখকের চেয়ে লেখাই আমাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য। এমনিতেই তো কাউকে চিনি না। অনেকের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ হয়। সেজন্যেই হয়তো ঝগড়াঝাটির প্রত্যক্ষ সম্পর্কটা কারুর সঙ্গেই গড়ে ওঠেনি আমাদের। আপনারা, যাঁরা সাহিত্যের সালতামামি লেখেন, তাঁরা যদি মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সমস্ত প্রবন্ধ আর কবিতার একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশের চেষ্টা করতেন, তা হলে দেখতে পেতেন কতো মূল্যবান রচনা কেবল অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার কাগজগুলো তবু অনেকের নজরে পড়ে। আমাদের লেখালেখির খবরাখবর রাখবার মতো আবার লোক পর্যন্ত নেই। বহু মূল্যবান প্রবন্ধ মফঃস্বলের কাগজে হামেশাই বেরোয়। কিন্তু সেসব লেখা গ্রন্থাকারে বেরুবে না কোনোদিনই।

ভাটপাড়া থেকে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য পত্র'-র সম্পাদক এখনো কলেজের ছাত্র। তিনি লক্ষ্য করেছেন : 'মফঃস্বলের কিছু কিছু পত্র-পত্রিকার একটি করে সম্পাদকমণ্ডলী থাকে। পত্রিকারম্ভে তাঁদের নাম ছাপা হয়। সভাপতি, প্রধান উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক বা ঐ রকম একটা কিছু পদে বিগ-গানদের নাম জ্বলজ্বল করে।'

তিনি সক্ষোভে লিখেছেন : "এসব নাম ঘোষণায় গৌরবটা কোথায়? আমার নাম কে ঘোষণা করে? তরুণ উঠতি লেখক ও সম্পাদকদের তাঁরা আদৌ স্বীকার করেন না। কাজেই আমার নিবেদন, বিগ-গানদের বাদ দিন। তাঁদের নামের ফলক তুলে চুনোপুঁটিদের নাম বসান। কেননা নতুনরা কি তাঁদের চাইতে কার্যক্ষমতায় কম? তাছাড়া, ছোটোখাটো পত্র-পত্রিকার সঙ্গে হোমরা-চোমরাদের নাম জড়িয়ে রাখাতেও কোনো লাভ নেই। পত্রিকার জন্যে যদি কিছু আর্থিক সাহায্য করতে বলা যায়, তাহলে তাঁদের পকেট থেকে একটা অচল সিকিও বেরুবে কিনা সন্দেহ।"

মাঝে মাঝে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, মফঃস্বলের কোনো কোনো লিটল ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন বেরোয় : 'অমুক পত্রিকার গ্রাহকেরাই প্রধানত লেখক। বাংলা দেশের একমাত্র গ্রাহক সাধারণের পত্রিকা। আপনিও গ্রাহক হয়ে লেখক তালিকাভুক্ত হোন।' কিংবা নিয়মাবলীতে একটি লাইন থাকে : 'এই পত্রিকায় গ্রাহকদের লেখা অগ্রাধিকার পাবে।'

সম্ভবত এই প্রশ্নটার আরেকটা ফলশ্রুতি হলো, গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত নানাধরণের কবিতা এবং গল্পের সংকলন। লেখকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে ছাপা হয় একেকটি 'উজ্জ্বল' ও 'সম্ভাবনাপূর্ণ' কবিতা কিংবা গল্পের বই। আমি একবার কয়েকজন তরুণের মুখোমুখি হয়েছিলাম, একটি কঠিন প্রশ্নের সমাধানের জন্য! তাঁরা সকলেই কফি হাউসী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিতে বিরক্ত। বললেন, "আমরা গাঁয়ের কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা পত্রিকা এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চাই। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখিয়ে দেবো, বাংলা দেশের সাহিত্যটা কেবল কলকাতার এক-চেটিয়া সম্পত্তি নয়। এতে গ্রামের লেখক-লেখিকাদের দান কম নয়।"

এই উদ্দেশ্যে তাঁরা আমার কাছ থেকে কিছু কবি সাহিত্যিকের ঠিকানা জেনে নিয়েছিলেন। শুনেছি, যোগাযোগের প্রাথমিক পর্বটা সম্পন্ন হয়েছিল। উপযুক্ত সাড়া পাননি বলে, তাঁদের সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

উত্তরবাংলার একটি কলেজের জনৈক অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মফঃস্বল বাংলার লিটল ম্যাগাজিনগুলোর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য কি আপনার নজরে পড়ছে? তাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এসম্পর্কে আপনার মতামত কি?

অধ্যাপকসুলভ দীর্ঘ বিশ্লেষণে ভদ্রলোক যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন, তা এই আলোচনার পক্ষে পুনরুক্তিদোষের কারণ বলে মনে হতে পারে। সংক্ষেপে আমি তাঁর প্রধান সূত্রগুলিই উল্লেখ করছি।

১। সাহিত্যিক হবার আকাঙ্ক্ষা এবং কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা নিয়েই প্রতিটি পত্র-পত্রিকার জন্ম।

২। কলকাতা থেকে নির্বাসিত তরুণদের উদ্যোগে কিংবা প্রেরণায় কোনো কোনো কাগজের সূত্রপাত।

৩। কলকাতার সাময়িকপত্র ও বড় পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে—আত্মপ্রকাশের চাহিদায় কেউ কেউ নতুন পত্রিকা বের করেন।

৪। অধিকাংশ কাগজই ক্ষীণায়ু।

৫। রুচি ও শিক্ষাভেদে পত্র-পত্রিকাগুলির চেহারা চরিত্রও নানারকম। যেমন, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের প্রেরণায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলি প্রায়শ প্রবন্ধপ্রধান, প্রাচীনপন্থী স্থানীয় প্রেস-মালিকের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, জেলা সংস্কৃতি পরিষদ জাতীয় সংস্থা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে রচনামুদ্রণে আগ্রহী, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি কবিতাপ্রধান—ইত্যাদি।

৬। প্রতিটি কাগজেই ভালো লেখার পাশাপাশি অত্যন্ত দুর্বল লেখাও স্থান পায় অসঙ্কোচে। স্থানীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা পেলে সহজেই তা মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করে।

৭। মফস্বলের কাগজগুলি আঞ্চলিক-ভাবে সাহিত্যিকদের সমবেত করে, সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। কলকাতায় এখন সাহিত্যের তেমন ভালো আড্ডা নেই। মফঃস্বল শহরগুলিতে কোথাও কোথাও আলোচনার কেন্দ্র গড়ে উঠছে।

৮। অধিকাংশ মফঃস্বলী কাগজই চরিত্রের দিক থেকে পাঁচমিশেলী। গল্প, কবিতা, সিনেমার খবর, খেলা-ধুলোর খবর, শিশুমহল, মহিলা বিভাগ ইত্যাদি নানারকম বিভাগে বিভক্ত। উদ্যোক্তারা একেকটা বিভাগের দায়িত্ব নেন। অতি পুরনো কোনো সিনেমার ব্লক সংগ্রহ করতে পারলে আলাদা কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করেন। অনেক সময় লেখকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁর ছবি ব্লক করিয়ে কাগজে ছাপেন। কলকাতার ব্যবসায়ী কাগজগুলোই তাদের আদর্শ।

৯। সংখ্যায় বেশী না হলেও ক্রমাগত গুরুত্ব লাভ করছে নগরমুখী সাহিত্যের পত্রিকাগুলি। দেশী-বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা অনুবাদ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন এইসব কাগজপত্রে সর্বাধিক। শহর ক্রমাগত গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট, বিজলী আলো ও শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শহুরে চিন্তা-ভাবনাও গ্রামের দিকে দ্রুত অগ্রসরমান।

১০। ইদানীং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভ্য ও সমর্থকরা শহর ও আধা শহরগুলি থেকে নানারকম সংবাদপ্রধান কাগজপত্র বের করেন। সেই সব কাগজে গণ-আন্দোলন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি বিষয়ে প্রবন্ধনিবন্ধ ছাড়াও সমাজবাদী গল্প, কবিতা, অনুবাদ

ইত্যাদি ছাপা হয় বিশেষ সঙ্কলনগুলিতে। দূর মফঃস্বল থেকে অবশ্য রাজনীতি-আশ্রয়ী পত্র-পত্রিকা এখনো বেশী বের হয় না।

কেবল বাংলাদেশ থেকে নয়, বহির্বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। ভারতবর্ষের বাঙালীপ্রধান শহরগুলি থেকে বেরোয় কয়েক শ কাগজ। বিহারের বিভিন্ন শহর থেকেই বেরোয় কম করে দশ-বারোটি কাগজ। বেরোয় পাটনা, রাঁচি, মজফ্ফরপুর থেকে, দিল্লী এবং জব্বলপুর থেকে। ত্রিপুরা এখন আলাদা রাজ্য। আসাম বাঙালীপ্রধান প্রদেশ। স্থানীয় জনসমষ্টি ও প্রধান ভাষার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্যই হোক, কিংবা সাহিত্যিক যোগাযোগের খাতিরেই হোক, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে প্রায়শ সেখানকার আঞ্চলিক ভাষার লেখার অনুবাদ কিংবা তার ওপরে প্রবন্ধ বেরোয়। যেমন, আসাম থেকে প্রকাশিত 'পূর্বভারতী' পত্রিকায় দেখেছি অসমীয়া সাহিত্যের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছাপা হতে। বিহার থেকে প্রকাশিত মিনি পত্রিকার মধ্যেও দেখেছি হিন্দী সাহিত্যিক-দের বাংলা রচনা কিংবা হিন্দী সাহিত্যের অনুবাদ।

—গ্রন্থদর্শী

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩০)

উপরে হেমন্তের আকাশ। নিচে ধানের মাঠ আর রাতের অজস্র তারার আলো এবং [illegible] ভিড় চারপাশে, মালতী নুনের [illegible] শুয়ে আছে। যেন ঘুম যাচ্ছে। সোনা [illegible] আর জেগে থাকতে পারে নি। [illegible] পাতা আছে দক্ষিণের ঘরে [illegible] এসে শুয়েছিল। কিন্তু কেন জানি [illegible] এবং সে ফের যখন [illegible] গিয়ে দাঁড়াল, আশ্চর্য দেখল, [illegible] একটা লাঠি হাতে ভিড়ের [illegible] দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট কাকা [illegible] কি সব বলছেন। রঞ্জিত মালতীর [illegible] কাছে এসে বসল। ওর এটাচিটা [illegible] বড় জ্যাঠিমাকে দিয়ে দিল। [illegible] ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি ক' রাত জেগে [illegible] হেঁটে এতদূর এসছে। ক্লান্ত [illegible] যাবে বলে উঠে এসেছিলেন। ভিড় এবং হ্যাজাকের আলো রঞ্জিতকে প্রথম বিস্ময় করেছিল, কিন্তু এই বিস্ময় প্রচণ্ড-ভাবে ওকে নাড়া দিয়েছে। ওর মনে হল নরেন দাসই এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী। নরেন দাস ওকে একটা খুপরিতে রেখে দিয়েছে। অথবা সেই জব্বর। সে এখন কোথায়! ওর অবশ্য এসব কথা ভাববার বেশি সময় ছিল না। সে ডান হাতটা নুনের ভিতর থেকে বের ক'রে আনল। নাড়ি দেখল। আলোর দিকে। সে পায়ের পাতায় [illegible] গরম আছে দেখার জন্য নুন সরাল। পায়ে আলতার দাগ। ভিতরটা রঞ্জিতের [illegible] কেঁপে উঠল। মালতীর মুখ দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে মুখ থেকে নুন সরিয়ে দিল। এখন শেষ রাত। এখন সে একা পাহারায় আছে। নুন সরাতেই ওর কেন জানি মনে হল সে বড় বড় শ্বাস ফেলছে। ওর কপালে সিঁদুর, মাথায় সিঁদুর। কে বলে মালতী বিধবা। মালতীর এই সুন্দর মুখ এবং শরীর দেখে রঞ্জিত নিমগ্নের মতো বসে থাকল। সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার কপাল দেখল। চিবুক দেখল। ভাগ্যিস সে বুঝিয়ে সকলকে ঘুমোতে যেতে বলেছে। সবাই এক সঙ্গে জেগে কি লাভ। সে মালতীকে চুরি করে ভালবাসার চেষ্টায় আকাশের দিকে তাকাতেই মনে হল ভোর হয়ে আসছে। সে এবার মালতীকে নুন থেকে একেবারে বাল্লা করে দক্ষিণের ঘরে নিয়ে গেল এবং সতরঞ্চিতে একটা বালিশে শুইয়ে দিল। ডাকল, মালতী আমি এসে গেছি।

বস্তুত এই জলা জমির দেশের মাটি আর মানুষ জলের নিচে আশ্রয় খোঁজে। মালতী প্রাণ ধারণে কোন আর উৎসাহ পাচ্ছে না। সে জলের নিচে তার সেই প্রিয় নিরুদ্দিষ্ট হাসিটিকে খোঁজার জন্য বুঝি ডুব দিয়েছিল। আমি আর ভাসব না জলে, জলের নিচে ডুবে যাব, এই ছিল তার আশা।

সকাল হলে রঞ্জিত থানা পুলিসের ভয়ে একবার শচীন্দ্রনাথকে থানায় যেতে বলল। দু' ক্রোশের মতো পথ। সুতরাং কিছুটা হেঁটে থানায় যাবার জন্য সে প্রস্তুত হল।

শচীন্দ্রনাথ থানায় চলে গেলে রঞ্জিত নরেন দাসের কাছে গেল। বলল, ওকে এ-ঘরে ফেলে রেখেছেন কেন?

নরেন দাস তানা হাঁটছিল। মালতী এখন ক্রমে গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে উত্তর করল না।

রঞ্জিত বুঝতে পারল নরেন দাসের ইচ্ছা নয় মালতী বড় ঘরে থাকুক। লক্ষ্মীর পট আছে, ধর্মাধর্ম আছে। নরেন দাস এখন এ-সবে মাথা ঘামাতে চাইছে না। রঞ্জিত আর কিছু বলতে সাহস পেল না। সে মালতীর কে! সামান্য খুপরি ঘরেই এখন থাকার আস্তানা মালতীর। তাকে আর ভিতর বাড়িতে নেওয়া যাবে না। জীবনে তার আর খোলা আকাশ, মুক্ত মাঠ, বর্ষার বৃষ্টিতে উদোম গায়ে ভেজা হবে না। সব তার হারিয়ে গেল।

স্টিমারেও একজন মানুষ বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে বিশাল মেঘনা নদী দেখতে দেখতে কেবল মালতীর কথা ভাবছে। দু' পারে কত মাঠ গাছপালা। স্টিমারটা যত এগুচ্ছে তত যেন এক কৈশোরের বালিকা গাছ-গাছালির নিচে নদীর পার ধরে ছুটছে। ওর চুল উড়ছে। খালি পা। কোমরে প্যাঁচ দিয়ে শাড়ি পরেছে। সে ক্রমান্বয়ে ছুটছে। দামোদরদির মাঠ পিছনে। সামনে এবার উম্ধবগঞ্জও পড়বে। কিন্তু মানুষটা কিছু দেখছে না— দেখছে শুধু নিরন্তর এক বালিকা মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। কি যেন ছুঁতে চাইছে; পারছে না। সামসুদ্দিন মালতী নিখোঁজ হবার পর থেকেই কেমন যেন ভেঙে পড়েছিল। জব্বর তার জাতভাই, লীগের পাণ্ডা। সামান্য অর্থের লোভে সে কাজটা করেছে। একটা ফুলের মতো জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। যে তার কৈশোরে সারা মাস কাল নানাভাবে ফুল ফুটিয়েছিল, সে এখন নির্জীব পাগল প্রায়। এবং যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে—সে ভয়ে ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখানেই সে নামবে। তার এখানে আজ আবার কিছু উৎকট হিন্দুবিদ্বেষী কথা বলতে হবে।

সে মঞ্চে উঠে যাবার আগে বলল, ভাইসব আমার শরীরটা আজ ভাল নয়। আমাদের মিঞাসাহেব ইকবাল আপনাদের আজ কিছু বলবেন। বলে সে মঞ্চ থেকে নেমে নদীর পাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে বসে থাকল। সে যে কি করতে যাচ্ছে নিজেও ঠিক তা যেন বুঝতে পারছে না।

তখন ফেলু তার বাছুরটা নিয়ে মাঠে নেমে যাচ্ছে। হেমন্তের সকাল। ধানের মাঠ শুধু চারপাশে। সে বাছুরটাকে এইসব ধানের মাঠের জন্য আলগা ছেড়ে দিতে পারছে না। আলগা ছেড়ে দিলেই ধান খেতে অথবা কলাই খেতে মুখ দেবে। এ মাসেই দুবার গৌর সরকারের বান্দা লোক আবদুল বাছুরটাকে খোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে। সে পঙ্গু বলে কেউ আর তাকে ভয় পাচ্ছে না। জীবনে সে বহু গুণাহ করেছে। আল্লা তার ফল হাতে-নাতে দিচ্ছেন এমনভাবে সব মানুষ। ওর মনে হয় তখন শালা এ-দুনিয়ার হালফিলে যত মাঝিমাল্লা আছে, সকলের রক্তে সে খোঁচা দিয়ে দেখে— কিন্তু হায় পারে না। হাতে তার শক্তি আর নেই। কালো-কড়ি তারে বাঁধা হাত মরার মতো শরীরের এক পাশে ঝুলে থাকে। একেক সময় মনে হয় দেবে এক কোপে শেষ করে। গলা হাৎ করার মতো শরীর থেকে হাতটা বাদ দিয়ে দেবে। কিন্তু পারে না। এই মরা হাতটার জন্যে তার বড় মায়া হয়। রোদে হাত নিয়ে বসে থাকলে হাতটাকে তার নিজের সন্তানের মতো মনে হয়।

সে দড়ি ধরে হাঁটতে থাকল। বাছুরটা কিছুতেই এগোতে চাইছে না। হাড় বের করা এই গরুর বাচ্চাটাকে সে কিছুতেই পেট ভরাতে পারে না। তার পঙ্গু হাত আর এই কাশি (ভাঙ্গা) বাছুর তাকে পাগল করে দিচ্ছে। আর দিচ্ছে আন্নু। সে তো [illegible]

ফেলু নেই, হা-ডুডু খেলোয়াড়ও নয়—বিবি তার এখন অন্য বাড়ি যায়—কারে সে কি কবে! রাতেরবেলা বিবি পাশে থাকলে চোখে ঘুম থাকে না। বিবি তার কোথাও রঙ্গ রসে ডুবে আছে। হাজি সাহেবের ছোট বেটা আকালু বাঁশবনে লুকিয়ে থাকে। সে বাছুর নিয়ে বের হলে অথবা ফসল চুরি করতে গেলে—এবং যখন সে দূরে দূরে মনের দুঃখে বনবাসে যায় তখন যুবতী তার রঙ্গরসে ডুবে থাকে।

অথবা এখন সে যে কি করে খায়, দু' পেটের সংসার, সে কোন কোন দিন মনের দুঃখে নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়ায়—বাছুরটা সঙ্গে থাকলে সে ছুটতে পারে না। সে বাছুরটা নিয়ে হাঁটে, এবং ফসলের শিস কেটে নেয়—ঠিক জোটনের মতো। কলাই গাছ তুলে আনে রাতে। যব গমের দিনে যব গম। সে একা পারে না। বিবি তার মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকে। বিবি তার জ্যোৎস্নারাতে মাঠের ভিতর চুরি করে ফসল কাটে আর সে আলে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে জমির আল থেকে হাঁক আসে, কে জাগে। শিস দেবার মতো জবাব আসে, আন্নু হাঁকে, আমি জাগি।

——মাঙ্গে কে জাগে।

—মিঞা সাব জাগেন। আন্নু খুশী থাকলে সে ফেলুকে মিঞাসাব বলে। আন্নু যেন এ-সময় তার নিজের আন্নু। পীরিত করে কার সনে—সে কথা তার মনে থাকে না। এই আন্নুকে নিয়ে ফসল চুরি করতে বের হলে ফেলু বুঝতে পারে, বিবি তার ঘরেই আছে। কিন্তু একা মাঠে নেমে এলে তার সন্দেহটা বাড়ে। বিবি তার চুরি কইরা অন্য বাড়ি যায়। সে তখন দুঃখে এবং অক্ষমতার জন্য বাগি বাছুরটার পাছায় লাথি মারে।—হালার কাওরা আমারে ডরায় না! এবং চার পাশে মাঠ, মাঠের দিকে তাকালেই এক মানুষ হেঁটে হেঁটে যায়। মাথায় তার নানা রকমের পাখি ওড়ে। সে তখন কর্কশ গলায় হাঁকতে থাকে, ঠাকুর তুমি আমারে কানা কইরা দিলা!

শুধু সে ডান হাত সম্বল করে বাছুরটাকে টানছে। বাছুরটা হিজল গাছটার নিচে এসেই শক্ত হয়ে গেল। ফেলু বাছুরটাকে টেনে এতটুকু হেলাতে পারছে না। এমন এক ছোট্ট জীবকে সে হেলাতে পারছে না। রাগটা তার ক্রমে বাড়ছে। বাছুরটা মাঠে কি দেখে ভয় পাচ্ছে! সে আবার চার পাশে তাকাল। হালার হালা খোদাই ষাঁড়। হাজি সাহেবের খোদাই ষাঁড়টা দু'পা সামনে দু'পা পিছনের দিকে ঠেলে লেজ খাড়া করে শিঙ দিয়ে মাটি তুলছে। ফেলুর বাগি বাছুরটাকে ভয় দেখাচ্ছে। অমিত তেজে সে যে ঘোরাফেরা করে—ফসল খায় কেউ কিছু বলতে পারে না, শিঙ দিয়ে মাটি তুলে তা পরীক্ষা করছে। ধারালো শিঙ। ছুরির ফলার মতো। চক্ চক্ করছে সব সময়। সে ছাড়া থাকে ধর্মের ষাঁড় বলে কেউ কিছু বলে না। রাজা বাদশার মতো এখন শিঙে ধার দিয়ে ঘাড় গর্দান লম্বা করে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। ধানের মাঠে এমন এক জীব, জবরদস্ত জীব দেখলে ফেলুর প্রাণটা শুকিয়ে যায়। বাগি বাছুরটাকে দেখলেই তেড়ে আসার স্বভাব। কোনদিন বাছুরটার পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে। সে তবু ফেলু বলে, (তার ভয় ডর নাই বলে মানুষ জানে) সামান্য এক জীবকে সে মনুষ্য কুলের কেউ বলে ডরায় না। ফেলু এমন একটা ভাব দেখাবার জন্য খোদাই ষাঁড়টাকে বলল, হালার পো হালা!

সে ধর্মের ষাঁড়কে হালার পো হালা বলল। তার কেন জানি কোরবানির চাকুটা পেলে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে জবাই করতে ইচ্ছা হয় ষাঁড়টাকে। এটা যে সে এখন কাকে ভেবে বলছে বোঝা দায়। কোন ষাঁড়টা বেশি বেইমান—এই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, না আকালু, কে—বড় দুশমন ওর, সে বলল, হালার কাওয়া। হালার আকালু। খোপকাটা লুঙ্গি পরে দাঁড়িতে আতর মেখে সে যায় উঠোন পার হয়ে। ফেজ টুপি মাথায়। লাল রঙের লম্বা ফেজ টুপি, কালো গুচ্ছ দাঁড়কাকের মতো, তুমি মিঞা আমার বিবির গায়ে হাত দ্যাও। হালার কাওয়া। উঠানের উপর দিয়া যাও কি কইরা দ্যাখি। বলেই সে উঠোনের উপর মান্দারের ডাল দিয়ে বেড়া দিয়ে দিল।—এডা পথ না মিঞা। এডা সদর রাস্তা না। কিন্তু সকাল হলেই ফেলু দেখেছিল, সব মান্দারের ডাল কারা তুলে ফেলে দিয়ে গেছে। সে তখন বিবির মুখের দিকে তাকাতে পারে না পর্যন্ত। যেন প্রশ্ন করলেই ফ্যাচ করে উঠবে—আমি কি কইরা কই, কেডা মান্দারের ডাল তুইলা ফ্যালাইছে আমি তার কি জানি!

—হালির হালি! তুই আবার না জানস কি! ফেলু তখন এমন চিল্লাচিল্লি করতে পারত। কিন্তু কাকে বলবে! সে যে পঙ্গু হাতে বিবিকে এখন ভয় পায়। সেই কবে জব্বর সবুজ রঙের ডুরে শাড়ি কিনে দিয়ে গিয়েছিল, গন্ধ তেল দিয়েছিল—বিনিময়ে জব্বর আন্নুর কাছ থেকে কি নিয়ে গেছে কে জানে। তবু সে হাত পঙ্গু বলে সব সে হজম করেছে। এখন বিবির এক গামছা আর ছেঁড়া শাড়ি সম্বল। মাঠে ফসল চুরি করতে যাবার সময় সে ছেঁড়া শাড়ীটা পরে যায়। আর দিনমান আতা-বেড়ার আড়ালে সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এক খাটো গামছা সম্বল। কখনও কখনও গামছাটা ভিজে গেলে আতাবেড়ার উপর শুকাতে দেয়। তখন আন্নু প্রায় নগ্ন। প্রায় কেন, সবটাই নগ্ন। আতাবেড়ার আড়াল, সামনে ঝোপ জঙ্গল, উঠোনের উপর দিয়ে গেলে কেউ টেরই পায় না আতা-বেড়ার ও-পাশে ফেলু অন্দরে বিবি তার উলঙ্গ হয়ে বসে আছে, ধান সেদ্ধ করছে, গম ভাজছে, কাওন জলে ভিজাচ্ছে। যখন-কার যা অর্থাৎ যা সব ফসল চুরি করে আনছে তা দিয়ে সম বৎসর খাবে এই ভেবে দিনমান কাজ করে যাচ্ছে বিবি।

যতক্ষণ বিবিটা এ-ভাবে উলঙ্গ হয়ে অন্দরে ঘোরাঘুরি করবে ততক্ষণ সে উঠোনে বসে থাকবে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানবে—আর মনোহর সব দৃশ্য, আতাবেড়ার ভিতর বিবির যৌবন কাঁচ কলাপাতার মতো, আর শরীরে তার নাকি, যেন নির্জন সোনালি বালির নদীর চরে এসে একটা বালিহাস বসেছে। অপটু হাতের ব্যবহারে সব নষ্ট করে ফেলছে ফেলু। ওর চুলে তেল থাকে না। চোখে সুর্মা টেনে দিতে পারে না। পার্বণের দিনে সে ধার করে তেল মেখে মাথায় মুখে তেল দিলে ফেলু যে ফেলু তার পর্যন্ত আন্নুকে কি নিয়ে নৌকা ভাসাতে ইচ্ছা হয়।

যতক্ষণ সে বাড়ি থাকবে, দাওয়ায় বসে থাকবে। সে পাহারায় থাকবে। কেউ এলে তুড়ি বাজাবে হাতে। দুবার তুড়ি বাজালেই আন্নু টের পায়। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে ডুরে শাড়ি পরে বসে থাকা। সব শস্যদানা হাঁড়ি পাতিলে ঢেকে রাখে। কেউ যেন টের না পায় ওরা রাতে বিরাতে ফসল চুরি করে আনছে।

এসব দৃশ্য দেখতে বড় মজা। সে চুরি করে আতাবেড়ার এ-পাশ দেখে আর মজা পায়। কখনও বিবির শরীরে জ্যাল জ্যাল গামছা—প্রায় চিকের মতো। হাজি সাহেবের ঘাটের ও-পারে ঝোপের ভিতর ফণা তুলে বসে ছিল মাইজলা বিবিকে দেখবে বলে সে ঘরের ভিতর তেমনি কখনও কখনও বসে থাকে। নিজের বিবির শরীর চুরি করে দেখতে ফেলু বড় মজা পায়।

এত অভাব অনটনেও বিবিটা যে কি করে এমন লাবণ্য জিইয়ে রেখেছে শরীরে—হায় তখন ফেলু আকালুর লম্বা শরীর শক্ত বুক, লাল রঙের ফেজ টুপি কেবল মরীচিকার মতো দেখতে পায়। খুসবু আতর মাখে দাঁড়িতে আকালু। আকালু বড় চালাক। সে যখনই রাস্তা দিয়ে যায়, আতর মেখে দাড়িতে যায়। বিবি আতরের গন্ধ পেলেই আতাবেড়ার এ-পাশে [illegible] উঠে। মানুষ তার এসে গেছে। সে টের পায় আতরের গন্ধে এক মানুষ এই রাস্তায় জানিয়ে গেল সে বাঁশবনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বিবিটা তখন সবুজ রঙের জব্বারের দেওয়া শাড়িটা পরে যায়—কই যাও তুমি! যাই গতিউরের কাছে। চিড়ার ধান ভিজাইছে। চিড়া ভাইজা দিলে দুই খোলা চিড়া দিব।

—আর কিছু দিব না!

—আর কি দিব!

—ক্যান চুমা দিব না তরে।

বিবি বুঝতে পারে মানুষটা ওকে সন্দেহ করছে। আতরের গন্ধ সে টের পেয়ে গেছে! তা আল্লা, মানুষটার শক্তি হরণ কইরা নিলা ঘ্রাণ হরণ কইরা নিলা না ক্যান! জ্ঞান হরণ কইরা নিলা না ক্যান! আন্নু কখনও কখনও ভালবাসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

ফেলু টের পায় এ-ভাবে আকালু তার বিবির ভালবাসা হরণ করে নিচ্ছে। [illegible] কোরবানির চাকুটার তালাসে থাকে তখন। কিন্ত কোনদিন দুপুরের রোদে সে দেখতে পায় মাঠের উপর আকালু, মাথায় লম্বা লাল রঙের ফেজ টুপি পরে, কালো রঙের

ফিনফিনে আদ্দি গায়ে খোপকাটা লুঙ্গি কোমরে—আকালু আর একটা ধর্মের ষাঁড় হয়ে গেছে। যেন তিন ষাঁড় তিনদিক থেকে ওকে পাগল করে দিচ্ছে। এক আকালু, দুই হাজি সাহেবের খোদাই ষাঁড়, তিন পাগল ঠাকুর। সে বাছুরটাকে ফের টানতে থাকল।

মাঝে মাঝে ফেলু কোরবানের চাকুটা চালাঘরের এ-বাতায় ও-বাতায় লুকিয়ে রাখে। আন্নু ওর গলা কেটে সটকে পড়তে পারে। নিশিদিন ঘরের ভিতর এক অবিশ্বাস, বাতায় অথবা চালের সনের ভিতর সে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে—ওটা ঠিক আছে কিনা, না আকালু বিবিকে দিয়ে ওটাও হরণ করে নিয়েছে।

সে এ-ভাবে বাছুরটাকে টেনেও লড়াতে পারল না। ধম্মের ষাঁড়টা একইভাবে চার-পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহান জীব যেন সে। কোনদিকে তার দৃকপাত নেই। মাঝে মাঝে ষাঁড়টা তার চোখের উপর মিঞা আকালুদ্দিন হয়ে যাচ্ছে। ষাঁড়টা তার বাছুরটাকে তেড়ে আসবে বলে লেজ তুলে দিচ্ছে।

ষাঁড়টা এবার শিঙ উঁচিয়ে এদিকে ছুটে আসতে পারে। ষাঁড়টা ছুটে এলেই বাছুরটাও ছুটবে। ছুটে বাড়ির দিকে উঠে যাবে। ফেলু দাঁড় ধরে থাকলে টানতে টানতে তাকেও নিয়ে বাড়ি তুলবে। ঐ শালা ষণ্ড, এক মহাজীব, জীবের চোখ লাল—যেন তার সামনে অথবা দূরে যা কিছু মাঠ,

যা কিছু ফসল এবং কচি ঘাস সব তার ভোজনের নিমিত্ত। আর কে আছে এ মহা-পৃথিবীতে আমার ফসলে ভাগ বসায়। আমার সামনে দিয়ে যায়। ফেলু জোর খিস্তি করল, ও হালা বাগি বাছুরে সামনা দিয়া যাইতে ডর পায়।

বাগি বাছুরের আর দোষ কি! ফেলু নিজেও ভয় পাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি একটা ছিটকিলার ডাল ভেঙে ফেলল। এক হাতেই সে ডাল থেকে পাতা ফেলে ওটাকে একটা পাচনের মতো করে নিল। সে হাতের উপর ডালটা ঘোরাতে থাকল। ষন্ডটা দ্যাখুক ফেলুর কি সাহস আর শক্তি! সে লাঠি ঘুরিয়ে এখন ষন্ডটাকে ভয় দেখাচ্ছে। এবং বাগি বাছুরটার কাছে সে নিজের প্রতিপত্তি কত বেশি, সে যে ফেলু, এক হাত গিয়েও সে ফেলুই আছে এমন বোঝাতে চাইছে। জীবটা কাছে এলেই থোতামুখ ভোঁতা করে দেবে।

একদিন ফেলু দেখছে ষন্ডটা ওর বাছুরটাকে তাড়া করে আসছে। সে পঙ্গু হাতে পেরে উঠছে না। বাছুরটা ওকে টেনে নিয়ে বাড়িতে তুলেছে। ষন্ডটা তখন মহা-মারির মতো তেড়ে এসে একেবারে উঠোনে উঠে গেছে। বাছুরটাকে সে চুরি করে ঘাস খাওয়াচ্ছিল। ষন্ডের প্রতাপ কত, ষন্ডটা উঠোনে উঠে এলেই হায় হায় রব। গেল গেল। চিৎকার চেঁচামেচি। বাছুরটা ঘরে ঢুকে গেছে। বোধ হয় ঢুঁস মেরে ফেলুর কুঁড়ে ঘর উড়িয়ে দিত। কিন্তু আন্নুর হাতে ছিল গরম ফ্যানের গামলা। সে জীবের রোষমূর্তি দেখে ভয়ে সব ফেনটা ছুঁড়ে দিল ষন্ডের মুখে। আর তখন জীবটা হাম্বা হাম্বা করে ডাক দিল। মুখটা পুড়ে গেছে। মহাষন্ড মাঠের উপর দিয়ে লেজ তুলে ছুটছে। সেই থেকে জীবটা তার সীমানায়। ফেলু নিজের সীমানায়। দুই সীমানায় দুই জীব। পোড়া মুখ ষন্ডের। এক চোখ গলে কপালের ভিতর ঢুকে গেছে। ফেলুর বসন্তে গেছে একটা চোখ। দুই জীব এখন এক চোখে সময় পেলেই লড়ছে।

কি যে ডর ফেলুর! তবু হাতে লাঠি থাকায় ডর কমে গেল। সে বাছুরটাকে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকল। ভাল ঘাস সে খুঁজছে। দেখল মাঝিদের মাঠে আলের উপর নরম ঘাস। সে বাছুরটার দড়ি ধরে বসল। চারপাশে ধান খেত। সে বাছুরটাকে আলে আলে ঘাস খাওয়াচ্ছে। ঘাস খেতে খেতে বাছুরটার দপ্ দপ্ শব্দ, ফুৎফাৎ শব্দ। লেজ নেড়ে নেড়ে বাছুরটা নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। এই ঘাস খাওয়া দেখতে দেখতে ফেলু কেমন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং কেন জানি তার গত রাতের কথা মনে হচ্ছে বার বার। সে কাল সারা রাত ভয়ে ঘুমাতে পারে নি। আন্নু সন্ধ্যার পর ঘরে ছিল না। ছেঁড়া ডুরে শাড়ি পরে বিবি তার যে কোথা গেল! সে তাকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি খুঁজেছে। সে হাজি সাহেবের বাড়ি যেতে পারে না। গেলেই মাইজলা বিবি, ওলো সই ললিতে ও-গানটা গায়। পাচনের গুঁতো মারতে পারে হাজি সাহেব। সে ফিরে এসেছিল। না কোথাও নেই। আন্নু যখন এল তখন রাত অনেক। মাথায় তার এক বোঝা কলাই গাছ। সে গাছ চুরি করে এনেছে হাজি সাহেবের জমি থেকে। এনেছে না, দোষ ঢাকবার জন্য এক বোঝা কলাই গাছ দিয়েছে আকালু সে বুঝতে পারছে না।

না বলে না কয়ে গেলেই ফেলুর মনে হয় বিবি তার মসকরা করতে গেছে। অথবা আকালুর সঙ্গে বনে মাঠে পীরিত করতে গেছে। গতকাল রাতে কোথাও যাবার কথা নেই অথচ না বলে না কয়ে চলে গেল। লালসা পেটে পেটে। ফেজ টুপি মাথায় আনধাইর রাইতে দাঁড়িতে খুসবো মেখে আকালু নেমে গেছে। বিবি, কোন অন্ধকারে খোপকাটা লুঙ্গি পরে আকালু দাঁড়িয়ে থাকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে টের পায়। সে সেদিন গৌর চন্দের বাড়ি। ফিরতে রাত হবে কথা ছিল। সেই ফাঁকে বিবিটা বনে মাঠে নেমে গেল।

না কি বিবি তার কাজ কারবার হয়ে গেলে, বাছুরের ঘাস নেই বলে আনধাইরে খামছে সব কলাই তুলে এনেছে জমি থেকে। কি যে হচ্ছে! গাঁয়ের মানুষও জানে জবরদস্ত ফেলুর বিবি এখন পীরিত করছে। জবরদস্ত ফেলুর এই অবস্থা। বিবি তার পীরিত করে অন্য জনার সঙ্গে। সে ভিতরে ভিতরে আগুন। বিবি ঘাস মাথা থেকে নামাতে পারে নি। কোমর বরাবর লাথি। পা তো তার আর পঙ্গু না। বরং হাতের শক্তি এখন তার পায়ে এসে জমেছে। লাথি খেয়ে আন্নু সামলাতে পারে নি। উল্টে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আন্নুকে মারলেই সে দাওয়ায় বসে আগে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদত। মড়া মারছে বাড়িতে এমন কান্না। কান্নার সঙ্গে নানারকম অশ্লীল শব্দ সুর করে বলে যাওয়া, মাঠের ধার দিয়ে কেউ গেলেই বুঝতে পারত শালা ফেলু আবার ক্ষেপে গেছে।

নিত্যকারের ব্যাপার বলে কেউ আসে না। আবার দ্যাখো কি পীরিত দুজনায়।

কিন্তু আজকাল সবাই যেন টের পেয়েছে আন্নু মতিহার সাদাপাতা দাঁতে মাখছে। আন্নু গতকাল মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েও কাঁদে নি। কোথায় সে একটা শক্ত জায়গা পেয়েছে পা রাখবার। কাঁদলে-কাটলে কটূক্তি করলে ফেলুর ডর থাকে না। আজ সে কোন কটূক্তি করছে না। কোনদিকে সে এবার যথার্থই চলে যাবে। ফেলু শুধু জানে সে তালাক না দিলে বিবি কোথাও [illegible] পারবে না। আকালু চায় ফেলু তালাক দিক। তালাক দিলে কিছু পয়সা পর্যন্ত মিলে যাবে ফেলুর এমন লোভ দেখিয়েছে আকালু। ফেলুর মুখ দেখলে তখন মনে হয় এই [illegible] কথায় কথায় মার ধোর করা সবই [illegible] তোলবার জন্য। কত দাম দিবা মিঞা। কিন্তু ফেলুর অন্তর জানে সে এ-সব [illegible] না। সে আন্নু না থাকলে মরে যাবে।

কিন্তু ফেলু যখন আন্নুর দাম দর [illegible] মাথা ঘামায়, এক চোখে মুচকি [illegible] বসন্ত দাগ মুখের চারপাশে [illegible] লুঙ্গির মতো এখানে সেখানে [illegible] ভিতর গোটা মুখ কি যে বীভৎস, [illegible] বরাবর হইয়া থাউক। সুবর্তীর [illegible] টাকা আসে। যতদিন বিবি আছে [illegible] অভাবে অনটনে টাকা [illegible] থাকলে শালা হারামের ছাও ফেলুকে [illegible] মাটি ছাড়া করত এতদিনে। [illegible] মাঝে ওর উঠোনের উপর দিয়ে [illegible] সহ্য করতে হয়। তখন ক্ষণে ক্ষণে [illegible] ফেলুর ভাঙা মরা ডালে মারে [illegible] শালার ইতরের বাচ্চার পীরিত [illegible] যাউক। পরক্ষণেই মনে হয় ওর [illegible] এক হাত সম্বল। তেড়ে গেলে [illegible] বাচ্চা ওর ঘাড়টা ধরে ফেলবে এবং [illegible] মোচড় দেবে পঙ্গু হাতে যে [illegible] পাগলা কুকুরের মতো চিৎকার [illegible] থাকবে। সেজন্য আকালু গেলে সে [illegible] হাসি মুখে বলবে—কে যান ভাইসা [illegible] ধান কেমন হইল। [illegible] ভাত কতকাল খাই না। ধান [illegible] পাঠাইয়া দিমু। দুই কাঠা ধান দিয়া [illegible]

আকালুর চোখে সর্ষে ফুল [illegible] ওঠে। ফেলুটা তক্কে তক্কে আছে [illegible] ধান উঠবে। সে কি বলবে ভেবে পায় [illegible] আন্নুটা কোথায়? আতাবেড়ার ফাঁকে [illegible] ঠেলে দেয়। সে কি তার দাড়ির [illegible] গন্ধ পায়নি। বাধ্য হয়ে আন্নুকে [illegible] জন্য উঠোনে দাঁড়ায়। কিছু কথা [illegible] হয়। সে চোখ এধার ওধার করতে [illegible] বলল, বিবিরে পাঠাইয়া দিয় মিঞা। [illegible] কাঠা ধান দিমু। গুয়া দিমু। তামাক পান যা লাগে দিয়া দিমু। তারপর আন্নুকে [illegible] চুরি করে দেখায় তালে আছে [illegible] পড়লেই মিঞার মুখে থুথু দিয়ে [illegible] যাবার ইচ্ছা। আন্নুর কি জ্বালা এই মানুষটা নিয়ে। কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছে না। কি করে কোথা থেকে যে এমন একটা [illegible] সুরত বিবি ধরে এনেছে কেউ জানে না বললে ঠিক হবে না, জেনেও জানে না [illegible] —এতদিনে এটাই নিয়ম হয়ে গেছে ফেলুর

বিবি আম্নু। ফেলু নিয়মমাফিক তালাক না দিলে সে ঘরে চলে নিতে পারবে না। পারে এক কোনদিকে চলে যেতে, আম্নুকে নিয়ে কোন গঞ্জে চলে গেলে কেউ টের পাবে না।

ফেলু যেন তখন টের পায় বিবি তার যথার্থই ভাগবে। শুধু ভাগবে না, যেমন সে হ্যাং করে মিঞা সাহেবের গলা দু ফাঁক করে দিয়েছিল, তেমনি বিবি তার গলা দু ফাঁক করে ভাগবে। এবং এই ভেবে বসে সে কেবল বিবির মুখ দেখছিল। একবার সে কাঁদল না। শক্ত হয়ে সারাক্ষণ কুপির আলোতে মুখ নিচু করে গোঁজ হয়ে বসে থাকল। ভয়ে ফেলু রাতের প্রথম দিকে ঘুম যেতে পারল না। হোগলা বিছিয়ে সে শুয়ে চুপিচুপি বিবির মুখ দেখছে। কঠিন মুখ, শক্ত চোখ বিবর্ণ। চোখ জ্বলছে। বাইরে তখন কি একটা পাখি ডাকছিল। হেমন্তের মাঠে শিশির পড়ছে। কোড়াপাখিদের ডিম ফুটে নিশ্চয়ই এতদিনে বাচ্চা হয়েছে। ফেলু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেই মনে হল বিবি নড়েচড়ে বসেছে। এবং এবার তার বুঝি একটু মায়া হল। বড় জোরে সে মেরেছে। সে বলল, কৈ গ্যাছিলি?

—মরতে গ্যাছিলাম।

—মরতে কই গ্যাছিলি?

—মাঠে।

—ক্যান, কি কামড়া মাঠে?

—ঘাস না আনলে তর সাধের বাছুরেডা খাইব কি। সারাদিন কি খাইতে দিব।

—দিমু কি হইরা! দিনের বেলা মাঠে মানুষজন ঘুইরা বেড়ায়।

আর রাইতের বেলা বাড়ি থাইকা পালাইয়া যান।

মনে হয় বিবির রাগটা কমে আসছে। সে উঠে বসল। —দে দুইডা খাইতে দে।

—পারমু না।

—ক্যান পারবি না। কেডা তরে ভাত দ্যায়। বলেই সে তেড়ে যাবে ভাবল। কিন্তু সেই রকমের গোঁজ হয়ে বসে থাকা দেখে সে উঠতে সাহস পেল না। বাতায় যেখানে কোরবানির চাকুটা লুকিয়ে রেখেছিল সেটা সেখানে ঠিকমতো আছে কিনা দেখল। কিন্তু চাকুটা নেই। সে উদ্বিগ্ন চোখে মুখে তাকাচ্ছে। একটা চোখে দেখতে হয় বলে ঘাড় পুরোটা না ঘুরালেও সে দেখতে পায় না। একবার মনে হল অন্য কোথাও রেখেছে। সে অযথা বিবির ওপর রাগ করছে। খুঁজে দেখলেই হবে। তা ছাড়া সে বিবিকে কি সুখটা দিল! ক্ষণে ক্ষণে মায়া পড়ে যায়। ক্ষণে ক্ষণে তার অবিশ্বাস। সে মায়া পড়ে গেলে কাছে গিয়ে বসল। পিঠে হাত দিয়ে আদর করতে চাইল। সাপ্টে ধরে আদর করতে চাইল। আম্নু যেন এবার গলা কামড়ে ধরবে, সাপের মতো ফুঁসে উঠছে। মিঞা তুমি আমারে দুই-বাসা। তুমি ইবলিশ। তুমি না-পাক।

—কি কইলি! আমি ইবলিশ, না-পাক মানুষ। ফেলু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ওকে যেন বিবি এতদিন পর চিনিয়ে দিচ্ছে—তুমি ইবলিশ তুমি শয়তান। তোমার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই।

ফেলুর পায়ের রক্ত চড়াৎ করে মাথায় উঠে গেল। সে বুঝি কঠোর কঠিন কিছু একটা এবার করবে। সে বাইরের অন্ধকারে নেমে এল। ঘরে থাকলে এক্ষুণি হত্যাকাণ্ড ঘটবে। সে চালের বাতায় সেটা খুঁজল। না নেই। আমি ইবলিশ, না-পাক মানুষ, সে খুঁজতে খুঁজতে এমন সব বলল। নামাজ পড়ি না, আল্লার নাম মুখে আনি না, আমার গুনার শেষ নাই। তা তুই এহনে এগুলান কবি। বলেই সে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে বিবির সামনে ধপাস করে বসে পড়ল। তারপর বাঁ-হাতটা ডান হাতে তুলে মরা সাপের মতো বিবির চোখের সামনে দোলাতে থাকল। বলল, বিবি তর সাহসের বলিহারি যাই। এডা আমার মরা হাত, হাত তরে সাহস দিছে। তুই আমারে না-পাক কইলি! না হইলে কার হিম্মত আছে, কাইন্দা মরে কত বান্দা লোক—তুইত মাইয়া মানুষ আম্নু! হাসুয়াড়া কোনখানে রাখছস! কোরবানের চাকুডা।

—ক্যান তুমি আমার গলা কাটবা?

—দিলে দেহন যায় গলা তর কাটে কি না!

আম্নু এবার আরও শক্ত হয়ে গেল। —এই আছিল তর মনে! বলে সে খড়ের ভিতর থেকে হাসুয়া এবং কোরবানির চাকুটা ফস করে বের করে ফেলল।—আইনা দিলাম। ইবারে চালাও দ্যাহি। করছ একখানা তবে বুঝি! বলে সে দুই চোখ বিস্ফারিত করে, যেন রণরঙ্গিণী, ডুরে শাড়ি খুলে ফেলে প্রায় উলঙ্গ আম্নু সামনে গলা বাড়িয়ে দিল।—হিম্মত মিঞা নই! পার না পোচাইয়া গলা কাটতে! বলেই সে ফের কেমন শক্ত হয়ে গেল। ফেলুর যা মেজাজ, এক্ষুণি সে গলা চেপে নলি কেটে দিতে পারে। এক্ষুণি সে কিছু একটা করে ফেলবে। কিন্তু আম্নু এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। কারণ চোখ দেখে সে টের পাচ্ছে—মানুষটার ডরে ধরেছে। সে আগের মতো দুই চোখ বিস্ফারিত করে, যেন আগুন জ্বলছে চোখে—মাঠের ভিতর স্বামীর হত্যার কথা শুনে সে যেমন হা হা করে হেসে উঠেছিল পালিয়ে আসার সময়, আজ আবার তেমনি পাগলের মতো হাসতে থাকল।

সঙ্গে সঙ্গে ফেলু তার মরা হাতের মতো নিস্তেজ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি অস্ত্র দুটো হাতের পিছনে লুকিয়ে ফেলল। সে গোপনে অস্ত্র দুটোকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখল অন্ধকারে। আম্নু কঠিন চোখে দেখছে জবরদস্ত মানুষটা ক্রমে রাতের পোকা হয়ে যাচ্ছে। সে কঠিন গলায় বলল, পারলা না মিঞা। জানে আর হেকমত নাই।

—নাই বিবি।

—তাহলে পোড়ামুখ মাইনসেরে আর দ্যাখাইয় না।

ফেলুর মনে হল সত্যি তার আর বাঁচার অর্থ হয় না। নিজের মুণ্ডু নিজে কেটে দণ্ড দিতে পারলে অথবা দু হাতে মুণ্ডুনিয়ে নাচতে পারলে যেন বিবির কথা সঠিক জবাব দেওয়া হত। কিন্তু অন্ধকার, ও-পাশের গোয়ালে বাছুরের চোখে এবং চুরি করে ধান অথবা ফসল কেটে আনা—সবই কেমন মায়াময়—সে কিছুতেই কাটা-মুণ্ডু নিয়ে এখন আর নাচতে পারে না। সে বিবির অলক্ষ্যে দুই অস্ত্র খড়ের গাদায় লুকিয়ে হোগলাতে শরীর টান করে দিয়েছিল। তারপর প্রায় সারারাত সে ঘুমুতে পারে নি। সে ঘুমিয়ে পড়লেই বিবি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বুঝি ভেগে পড়বে। এক পোড়া মানুষ, কুঁকড়ে থাকবে আগুনে—আগুনে হত্যার ছবি—ফেলু একেবারে পাগল বনে যেত, যদি সে না দেখত এক সময় বিবিটা আঁচল পেতে এক পাশে শুয়ে আছে। সে সন্তর্পণে কাছে উঠে গেল। দেখল আম্নু যথার্থই ঘুমোচ্ছে কিনা না ঘুমের ভান করে মটকা মেরে আছে। সে কুপির আলোতে দেখল আম্নু যথার্থই ঘুমাচ্ছে। ওর মনটা সহসা অদ্ভুত বিষণ্ণ হয়ে গেল। বিবিকে আদর করার ইচ্ছা হচ্ছে। সে মুখটা কাছে নিয়ে গিয়েও ফিরিয়ে আনল। ডর বড় ডর। নাগিনীর মতো ডর, আদর করলেই গলা কামড়ে ধরবে। সে বিবির পাশে গামছা পেতে শুয়ে পড়েছিল। এবং সকালে আম্নুই তাকে ডেকে দিয়েছে—বাছুরডারে মাঠে দিয়া আস।

মাঠে বাছুর নিয়ে নেমে এলে এই কাণ্ড। এই ষণ্ড চার পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল মাঠ, ধান খেত, সোনালি বালির নদীর চর উপেক্ষা করে ফেলুকে ভয় দেখাচ্ছে।

এবং হাজি সাহেবের ছোট্ট বেটা, যত লম্বা মানুষ না তার চেয়ে বেশি লম্বা হবার সখ। লাল রঙের টুপি মাথায়। খোপ কাটা লুঙ্গি পরে তাজা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে। দাড়িতে খুসবো আতরের গন্ধ। বিবি বেমালুম গত রাতের পাছায় লাথি ভুলে বাঁশ বনে হয়ত নেমে যাচ্ছে।

সে এবং ষণ্ড আর আকালুদ্দিন, পাগল ঠাকুর সবাই ক্রমে পরস্পর প্রতি পথ হয়ে যাচ্ছে। এক মহিমামণ্ডিত মানুষ হেমন্তের সকালে সোনালি বালির নদীর চরে শুয়ে আছে। কেবল তিনিই জানেন, ষণ্ডটা কত-বেগে ছুটলে ফেলুর পেট এফোঁড়ওফোঁড় করে দিতে পারে।

যেন ষণ্ডটা ফেলুকে দেখে, পায়ের উপর মরণ নাচন নাচছে। এবার ষণ্ডটা বুঝি ছুটবে।

(ক্রমাশঃ)

নিকটেই আছে

বড় বকুলপুরের হাটে

চারদিনের ট্যুর প্রোগ্রাম। আজই শেষ হল। কাল অনাদি ফিরে যাবে কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। ঐ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে কোম্পানীর সেলস প্রোমোশন স্কীম। অনাদির সাজেশন মত কাজ করে ফল পাওয়া গেলে তখন লার্জ স্কেলে গোটা দেশ জুড়ে সঞ্চয় বাড়াবার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত চাষী, তাঁতী, কুমোর, কামারদের লোন দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থাটাকে আরো সায়েন্টিফিক করে তুলবে ব্যাংক। গত একবছর ধরে সরকারী নির্দেশে চাষীবাসীদের ঢালাও ভাবে লোন দিয়ে ব্যাংকের এখন মাথায় হাত দেওয়ার জোগাড়। লাখ লাখ টাকা বেরিয়ে গেছে। কিস্তির পিরিয়ড পেরিয়ে গেলে একতোলা দিয়েও টাকা আদায় হচ্ছে না। কিস্তি তো দূরের কথা যে সেলস রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল, তা পর্যন্ত কোথাও জমা পড়ছে না। এভাবে আর কিছুদিন চললে শেষ পর্যন্ত হয়তো লাল বাতি জ্বালাতে হবে। আর তাই মার্কেট সার্ভে করার জন্য অনাদিকে পাঠিয়েছে কোম্পানী।

চারদিন ধরে এই জেলার সব ইমপরট্যান্ট টাউন আর হাট চষে বেড়িয়েছে অনাদি। কালিয়াপুর, কালীতলা, সজনেরহাট, বড় বকুলতলা, জংসন স্টেশন চিংড়ীহাটা, দেবীপুর, সোনাগঞ্জ, বিবিরহাট, তেঁতুলহাটি, কিছু বাদ রাখেনি অনাদি। ঘুরে ফিরে, দেখে শুনে অবাক হয়ে গেছে। আজো মানুষ কত সরল, কত সহজ, কত অনভিজ্ঞ, আর কত প্রচণ্ড পরিমাণে অসহায়! অথচ কত কাছে কলকাতা। কলকাতাই তাকে পাঠিয়েছে, এই দরিদ্র অসহায় মানুষগুলোর ভাতের হাঁড়ির সম্পর্কে সন্ধান নিতে। আর সেই সন্ধান নিতে গিয়েই এক বিচিত্র অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে আজ অনাদি। সেই অবস্থার কথাই যে কি করে গুছিয়ে গাছিয়ে রিপোর্টে লিখবে, তার হদিস না পেয়ে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চলেছে অনাদি। হোটেলের ছোকরা চাকরটা একটু আগে চা দিয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখল এরই মধ্যে একটা হাল্কা আলোয়ান গায়ে চড়িয়ে নিয়েছে কাপের ঐ বাদামী ট্যালটেলে জলটুকু। একটা শ্যামাপোকা উড়ে এসে পড়েছে ঐ আলোয়ানের ওপর। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। তার মধ্যেই, অনাদি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, পোকাটা বারকয়েক নড়েচড়ে চেষ্টা করল উঠে উড়ে পালাবার। পারল না, দম বন্ধ হয়ে মরে পড়ে রইল কাপের ভেতরে। আলোয়ানের গায়ে একটু ছেঁদা হয়েছিল। আস্তে আস্তে পোকাটা ঐ ছেঁদা দিয়ে ভেতরে গলে গেল। সেই সঙ্গে ঐ ফাঁকটুকু ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। উঠে দাঁড়াল অনাদি। ঘরের বাইরে মফস্বল শহরের প্রধান রাজপথে তখন হাজার সাইকেল রিকসা, লাউডস্পীকার আর দু'একটা লরীর আওয়াজ সব তালগোল পাকিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে উঠেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ইলেকট্রিক ট্রেনের তীক্ষ্ণ চীৎকার। একতলায় কে যেন কাকে বলছে, কাল আসব, দেখিস ঠিক আসব। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কাল অভিমন্যুর আসার কথা। কাল সাড়ে এগারোটার ট্রেনে অনাদি রওনা দেবে। তারই আগে ওর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবে কথা দিয়েছে অনাদি।

কিন্তু পারবে কি? অনাদির রিকোয়েস্টে একটা লোনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ব্যাংকের লোক্যাল ব্রানচের ম্যানেজার করে দেবেন। তাতে কি অভিমন্যুর সব প্রবলেম মিটবে? মনে তো হয় না। ব্যাংকের কাছ থেকে লোন পেলেও ও আবার ছুটবে গোবিন্দ বসাকের কাছে। এতদিনের পুরোনো হ্যাবিট, নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। এত আর সিগারেটের ছাই না যে টুসকি দিলেই ঝরে পড়ে যাবে। তা ছাড়া অন্য প্রয়োজনের দিকটাও তো দেখতে হবে।

ব্যাংক তো অভিমন্যুকে কাঁচা টাকা দেবে না। তার বদলে ও যেখান থেকে সুতো কিনবে সেই আড়তদার বা পাইকারী মহাজনের বিল মেটাবে ব্যাংক। তাহলে সংসার চলবে কি করে অভিমন্যুর! আর তখন সংসার চালানোর দায়েই বেচারা ছুটবে আবার বসাক বা সাধুখাঁর দোকানে।

তেঁতুলহাটি, বিবিরহাট, বড় বকুলপুর, সজনেরহাট, সব জায়গায় হাঁ করে বসে আছে বসাক, সাধুখাঁ আর সাহারা, অভিমন্যুর মত ছোট ছোট তাঁতীদের গেলবার আশায়। লাখ লাখ টাকার কারবার ওদের। বহুদিনের ব্যবসা। পুরুষানুক্রমিক চালিয়ে আসছে। তাঁতীদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেই সম্পর্কের জাল ফেলেই হাজার হাজার টাকার মাল এক-এক হাটে ঘরে তুলছে মহাজন। বিনিময়ে অভিমন্যুরা পাচ্ছে কি? কি আর পাবে— কচুপোড়া! ছ' হপ্তার কড়ারে হুণ্ডির চিরকুটখানা ট্যাঁকে গুঁজে ছোট কুশীদজীবী মহাজনদের দোরে।

বড় বকুলপুরের হাটেই গত বেস্পতিবার অভিমন্যুকে আবিষ্কার করেছে অনাদি। চিংড়িহাটা ব্রানচের ম্যানেজার বললেন, গোটা তল্লাটে কাপড়ের সবচেয়ে বড় কেনাবেচার সেন্টার ঐ হাট। কোন কোনদিন বারো তেরো লাখ টাকার বিক্রিবাটা পর্যন্ত হয় ঐ হাটে। এতগুলো টাকার লেনদেন হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ কিনছে, বেচছে, অথচ ব্যাংকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। শুনে চমকে গিয়েছিল অনাদি। বলে কি, এও কি সম্ভব! অন্ততঃ আজকের দিনে যেখানে এত টাকার ট্রানজাকশন হচ্ছে সেখানে ব্যাংকের নামগন্ধও নেই। এমন নয় যে আশেপাশে কোন ব্যাংক নেই। অনাদিদের ব্যাংকেরই ব্রানচ আছে চিংড়িহাটায় কাজিয়াপুরে। বড় বকুলপুর থেকে চিংড়িহাটা বড়জোর মাইল তিনেক। কাজিয়াপুর অবশ্য একটু দূরে হয়ে যায়। ট্রেনে বিশ বাইশ মিনিটের পথ। তবু এই ডামাডোলের বাজারে মানুষ কোন সাহসে এতগুলো টাকা নিয়ে কেনাকাটা করতে আসছে? একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।

সেই খোঁজ নিতেই গিয়েছিল বকুলপুরে। বেলাবেলি রওনা দিয়ে যখন পৌঁছল তখন প্রায় তিনটা বাজে। ব্যাংকের ম্যানেজার দু-একজন রইস মহাজনের নাম বলে দিয়েছিলেন। তাদেরই একজন ঐ গোবিন্দ বসাক। নোয়াখালির লোক। দু-পুরুষ এ বঙ্গে কাটালেও, উচ্চারণে পুরোনো টানটা এখনো লেগে আছে। কলকাতায় বাড়ী। কারবার সব এই জেলাতেই ছড়ানো। এক-এক হাটে এক-এক ভাই বসেন। বড় বকুলপুরে লেনদেনের পরিমাণটা বেশী

বলেই, স্বয়ং গোবিন্দ বসাক নিজেই বসেন।

ইচ্ছে করলে অনাদি পরিচয় দিয়ে খাতির যত্ন আদায় করতে পারত। কিন্তু তাহলে ব্যবসার রহস্যটা গোপনই থেকে যেত। কেউ আর মুখ খুলত না। চুপচাপ ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল অনাদি। দূর-দূর গাঁ থেকে, আশ-পাশের শহর গঞ্জ থেকে লরী, টেম্পো, গরুর গাড়ী, মানুষের মাথায় চাপিয়ে মাল নিয়ে এসেছে তাঁতীরা। পরিমাণ দেখলে চোখ ট্যাড়া হয়ে যায়। সে যে কত গাঁটরী শাড়ি আর ধুতী গুণে শেষ করা মুস্কিল। সবই তাঁতের। বহুদিনের পুরোনো হাট এই বকুলপুরে। বলতে গেলে এই হাটের জন্যই এই আধা-শহর আধা-গ্রামটা কোনক্রমে টিঁকে আছে। লোকাল লোক গোটা সপ্তাহটা হাঁ করে বসে থাকে বেস্পতিবারের আশায়। হাটে কারবারীরা আসে। তাদের যা ব্যয় সেটাই এদের আয়। মুদি, কলু, মনোহারী দোকানদার, মিষ্টির কারবারী সবাই যে যার ব্যবসাপাতির ঝোলা ঝেড়ে দুটো পয়সা রোজগারের ফিকির করে। আর সবারই লক্ষ্য ঐ তাঁতীরা। তবে আয়-ব্যয়ের মোটা ভাগটাই যায় বসাকদের পকেটে, সেটা সেদিন ভাল করেই বুঝতে পেরেছে অনাদি।

শাল কাঠের খুঁটির ওপর টিনের চাল বসানো, মেঝেটা সিমেন্ট করা। একধারে উঁচু বেদীর ওপরে বসে গোবিন্দ বসাক আর তার তিনজন কর্মচারী। উল্টোদিকে মেঝের ওপর টাল দিয়ে সাজানো ধুতি আর শাড়ীর বস্তা। ফাঁকে ফাঁকে উবু হয়ে বসে আছে তাঁতীরা। শালবল্লার আড়াল থেকে সব দেখছিল অনাদি।

গোবিন্দ বসাকের কাজ খুব নীট। মোটা খাতায় তাঁতীদের নাম লেখা আছে। একজন কর্মচারী নাম ডাকছে। ডাক শুনে নিজের গাঁটরী নিয়ে এগিয়ে আসছে তাঁতী। গাঁট খুলে সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছে ধুতি বা শাড়ী। অনেক দিনের কারবার। বসাক মশাই বা কর্মচারীরা জানেন কে কি বোনে। দু-তিন মিনিটেই দরদাম সারা। কলকাতায় যে শাড়ি পঁচিশ তিরিশ টাকায় বিক্রী হয়, পাইকারী রেটে তাই এখানে বসাক মশাই কিনছেন এগারো বড় জোর সাড়ে এগারোয়। খুব মসৃণভাবে সব চলছিল। কিন্তু অভিমন্যুই বাগড়া দিল। তেরোর কম দাম দিলে খরচাই পোষাবে না তো সংসার চালাবে কি করে? লোকটা একটু টেটিয়া টাইপের। রোখা-সোখা মানুষ। মানী লোক গোবিন্দ বসাকের মুখের ওপরই চ্যাটাং-চ্যাটাং করে বলে উঠল—বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িয়ে এসেছি বলে কি নিজের তৈরী মালের দামটাও জানি না কর্তামশাই। সুতোর দাম এখন কত জানেন? কলকাতার বড় কোম্পানীতে তো এখন স্ট্রাইক চলছে। দুনো দামেও সুতো মেলে না। তেরো টাকার কম পাঁচ কিনলে পোষাবে কি করে বলুন তো?

রোগা ছিলছিলে লোকটার পরনের ধুতিটি শুধু নোংরা নয় যথেষ্ট খাটো। হাড় পাঁজরা খালি চোখেই গোনা যায়। করমচার মত চোখদুটো লাল। বোধহয় গাঁজা-টাজা খায় মনে হল অনাদির। তবে মাথাটা খুব সাফ। কথাটায় ধার আছে। খোঁজ-খবরও রাখে।

গোবিন্দ বসাক হুঁশিয়ার লোক। মনসার মাথায় পা রেখে চলেন। তাই ধুনোর গন্ধ পেয়েই গোড়াতেই ফয়সালা করে দিলেন। এখনো অনেক তাঁতী বসে আছে। অভিমন্যুর উস্কানিতে যদি বাদ বাকী সবাই ব্যাগড়বাই শুরু করে, তাই আর ঘোঁট পাকাতে দিলেন না। কর্মচারীদের ট্যাকল করতে না দিয়ে, নিজেই গদী থেকে নেমে এলেন। থলথলে মোটা মানুষ। উঠতে বসতে কষ্ট হয়। তবু অভিমন্যুর খাতিরে সে কষ্টটুকু মেনে নিলেন। আড়তের একধারে টেনে নিয়ে কি ফুসমন্ত্র দিলেন কানে, অভিমন্যু গলে জল হয়ে গেল।

খানিক বাদে যখন অভিমন্যু আড়তের বাইরে এল, তখনই অনাদি চোখের ইসারায় ওকে ডেকে নিল। টেরিলিনের প্যান্ট সার্ট পরা, সিগারেট-ফোঁকা মানুষটাকে কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে চায় না অভিমন্যু প্রথমে। অনেক বলাকওয়ার পর, ব্যাঙ্কের লোক শুনে শেষ পর্যন্ত সহজ হয়েছে অভিমন্যু। আর তখনই ওর নামটা জানতে পেরেছে অনাদি। সেই সঙ্গে জেনেছে গোবিন্দ বসাকের কারবারের আসল রহস্য।

চব্বিশটা শাড়ি সাড়ে বারোর দরে বেচে তিনশো টাকার বদলে অভিমন্যু, কালীতলার নামকরা বংশের তাঁতী অভিমন্যু দাস পেয়েছে একটা চিরকুট মাত্র। চিরকুটে লেখা আছে ছ' সপ্তাহ পরে এর বদলে নগদ টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন গোবিন্দ বসাক। অর্থাৎ মাল আগাম, দাম পরে।

এই তল্লাটের সব হাটেরই এই এক ব্যবস্থা। তাঁতীরা কাপড় এনে জমা দেবে মহাজনের ঘরে, বদলে পাবে হুণ্ডি। এখন

এই হুণ্ডি ভাঙিয়ে খাও, মাল কেন, যা ইচ্ছে তোমার।

অভিমন্যুর মুখে সেদিন যা শুনেছে, চিংড়িহাটা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বললেন তার সবই সত্যি। ঐ হুণ্ডি ভাঙিয়েই খায় অভিমন্যুরা। ঐ হুণ্ডির দাম অসামান্য। ব্যাঙ্কের চেকের সমান দাপট ঐ হুণ্ডির। ইচ্ছা করলে অভিমন্যু ঐ হুণ্ডি বিক্রী করে সুতোর মহাজনের কাছ থেকে সুতো কিনতে পারে। তবে মহাজন প্রতি টাকায় দু-পয়সা করে কমিশন কেটে রাখবেন। আফটার অল হুণ্ডি তো আর নগদ টাকা নয়। তবে গোবিন্দ বসাকের বাজারে দারুণ সুনাম বলেই কমিশনের রেট মাত্র টু পারসেন্ট। সাধুখাঁদের হুণ্ডি সুতোর কারবারীরা ফাইভ পার্সেণ্ট কমিশনে কেনে। তাই সব তাঁতীই ছোটে বসাকদের গদীতে।

কিন্তু বাবু, সারা হপ্তা ধরে যে মাল বানাই তা তো আর সুতো কেনার জন্যে নয়। সবই যদি সুতো কিনি তালি খাব কি?—হাটের মাঝে চায়ের দোকানের চালির তলায় বসে কথা হচ্ছিল অভিমন্যুর সাথে। অনাদি বলল, কেন ঐ হুণ্ডির যখন এত দাম তখন ঐটা ভাঙিয়ে চাল, ডাল, তেল, নুন কেনো।

তাই তো করি বাবু—গরম চায়ের ভাঁড় থেকে মুখটা সরিয়ে এনে ম্লান হাসি হেসে বলল, অভিমন্যু—সে বেলায় যে মহাজন শতকরা দশ কখনো কখনো পনেরো ট্যাকা কেটে রেখে দেয়।

তার মানে?—চমকে ওঠে অনাদি।

তার মানি, ঐ যে দূরে বটগাছটা দেখতে পাচ্ছেন, ওরই তলায় চালা-ঘর-গুলোয় বসে আছেন সব টাকার মহাজন। এক-একটা কুমীর। ওরা জানেন আমাদের অবস্থার কথা। আমরা ছ' হপ্তা কেন দু ঘন্টারও অপেক্ষা করতে পারি না বাবু। এই আপনার সঙ্গে কথা শেষ করেই যাব ঐ মহাজনের কাছে। ওরা নগদ টাকা দিয়ে এই হুণ্ডি কেনবে। তিনশো ট্যাকার হুণ্ডি আমায় বেচতে হবে দু'শ সত্তর ট্যাকায়। তাও যে দুশো সত্তর পাব তা হুণ্ডিটা বসাকবাবুর বলেই। অন্য কোন কাপড়ের মহাজনের এত সুনাম নেই। তাদের হুণ্ডি বেচতে গেলে একশ ট্যাকাই পাই পঁচাশী কখনো আশী। আমাদের বাবু নগদ ট্যাকা ছাড়া চলে না, তাই বসাকবাবু কম দাম দিলেও ওর কাছেই কাপড় বেচি। অন্য মহাজনের কাছে বেচলি এক ট্যাকা দেড় ট্যাকা কাপড় পিছু বেশী পেতাম। কিন্তু ওদিকে যে টাকার মহাজনের কমিশনেই সব খেয়ে লেবে। তবে বসাকবাবুরা লোক বড় ভাল। গোবিন্দবাবু, বড় ভাই করেন কাপড়ের মহাজনী। মেজ ভাই ধম্মোবাবু করেন ট্যাকার। বড় ভাইয়ের কাছে কাপড় বেচে যে হুণ্ডি পাই তাই আবার ভাঙিয়ে নিই মেজ ভাইয়ের দোকানে। ধম্মোবাবু একশ ট্যাকায় দশ ট্যাকা কেটে রাখেন।

গোবিন্দ বসাক আর ধর্ম বসাক। একই হাটের দু-প্রান্তে বসেন দুজনে। একজন কাপড় কেনেন আর একজন কেনেন হুণ্ডি। যৌথ কারবারে ঘরের টাকা ঘরেই থেকে যায়। মাঝখান থেকে মোটা একটা প্রফিট আদায় করে নেন। ছ সপ্তাহে যদি দশ পার্সেন্ট সুদ গুনতে হয় চাষীকে তাহলে বাহান্ন সপ্তাহে অর্থাৎ এক বছরে প্রায় নব্বই পার্সেণ্টের বেশী সুদ দিতে হবে তাকে। অথচ মজার ব্যাপার মালটা আগাম দিয়েও গ্যাঁট গচ্চা দিতে হচ্ছে তাকে। যেহেতু অভিমন্যুরা অপেক্ষা করতে পারে না।

এই বসাকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি ব্যাঙ্ক পারবে? পারবে সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার গঞ্জে হাটে ছড়ানো এদের ব্যবসার মনোপলি ভাঙতে? তাহলে ব্যাঙ্ককে যা যা করতে হবে—না, না রিপোর্টে সে সব সাজেস্ট করতেও ভয়। অনাদি জানে সে সব সাজেশন একটাও ওপর-ওয়ালারা মানবেন না। হেসে উড়িয়ে দেবেন। তারা চান তাদেরই মনোমত, তাদেরই পুরোনো থিওরির মত সাজেশন—তার বাইরে কিছু বলতে গেলে অনাদির মাথার গণ্ডগোল হয়েছে বলে সবাই চাঁচাবে। তার চেয়ে অনেক সহজ অভিমন্যুর জন্য একটা লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। যদিও অনাদি জানে, তার পরেও অভিমন্যু আবার ছুটবে গোবিন্দ বসাকের আড়তে।

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে গিয়ে দেখল অ্যাসট্রের পাশেই চায়ের কাপটায় আরো গোটাকতক শ্যামা পোকা উড়ে এসে পড়েছে। কাপটা এবার গব গব করে ওদের গিলে ফেলবে। পেনটা বন্ধ করে, লাইট নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে পাতা বিছানায় নিজেকে টান টান করে মেলে দিল অনাদি। এখন আর রিপোর্ট নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

—সন্ধিৎস

মনের কথা
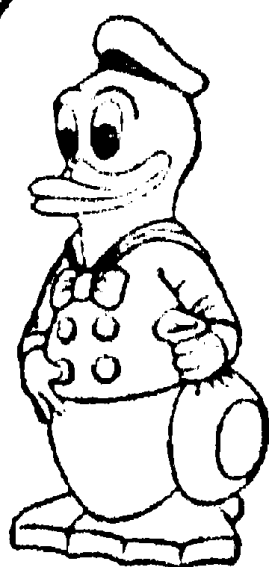
মায়ামোহের অনুবৃত্তি
রঙ্গলালের প্যারানইয়া

মায়ামোহ (হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন) ইত্যাদি নানারকমের উপসর্গের ব্যাখ্যা খুঁজতে আজকাল বিজ্ঞানীরা সিবারনেটিক্সের সাহায্য নিচ্ছেন। মানসিক রোগের অনুরূপ অবস্থা কুকুর-বানরের মধ্যেও ভেষজ সাহায্যে তৈরী করা হচ্ছে। ভ্রান্তিমূলক উন্মাদরোগীর বিবরণ পেশ করার আগে, এই সব সম্পর্কে সামান্য কিছু সংবাদ পরিবেশন করছি।

ইন্দ্রিয়পরিবহিত সংবাদ থেকে মস্তিষ্ককে বঞ্চিত রাখলে মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, এ খবর আগেই জানিয়েছি। কানাডার মনোবিজ্ঞানী ডঃ হেবের একটি পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকজন সুস্থ যুবককে ছোট একটা অন্ধকার শব্দরোধী শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে ছত্রিশ ঘন্টা থেকে দশদিন পর্যন্ত স্পর্শানুভূতি বঞ্চিত করে রাখার বন্দোবস্ত করা হল। হাতে দস্তানা পরিয়ে ও কার্ডবোর্ডের টিউব লাগিয়ে স্পর্শন অনুভূতি রহিত করা হয়েছিল। ছত্রিশ ঘন্টার পর থেকে নানারকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। এই নিঃসঙ্গ অবস্থা, এই ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা কোনো মস্তিষ্কই সহ্য করতে পারল না। হ্যালুসিনেশন ও ডিলিউশনের উপসর্গ সবার মধ্যে প্রকাশ পেল। মহাকাশ শারীরবৃত্তের অতি-আধুনিক গবেষণার ফলাফল থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্ককে ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে বঞ্চিত রাখলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। মস্তিষ্কের ১৪০০০ মিলিয়ন নার্ভকোষের সমন্বয়পূর্ণ ক্রিয়াকলাপের জন্যে ইন্দ্রিয়গুলি সচল ও সক্রিয় থাকা অত্যাবশ্যক। এই অবস্থায় স্বাভাবিক ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, ঘুম হয়, দুরূহ গাণিতিক প্রশ্নের উত্তরও সঠিকভাবে দেওয়া যায়। মস্তিষ্কের কোনো রোগ হয়েছে বলা চলে না, আবার মানসিক ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিকভাবে চলছে, একথাও ঠিক নয়।

ল্যাবরেটরীতে কুকুর ও বানরকে ভেষজ দ্রব্য ইনজেকশন দেবার পর তাদের নানাধরনের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। কোনোটা হয়তো মাতালের মত টলছে, কোনোটা ঘাড় গুঁজে বিচিত্রভংগীতে শুয়ে আছে, কোনোটা বা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা বানর শোয়া অবস্থা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে কোনো-কিছু শোনবার চেষ্টা করছে, অন্য একটা ভয়ে জড়সড় হয়ে খাঁচার কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের দেখে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে মানসিক রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অবশ্য পশুর উপর শারীরিক রোগের অনুরূপ অবস্থা তৈরী করা যতটা সোজা মানসিক রোগের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা তত সহজ নয়। মানবমন গুণগতভাবে পশুমন থেকে আলাদা, কাজেই রোগবৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র। এই সব পরীক্ষা থেকে এটুকুই শুধু বোঝা যায় যে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিয়ায় স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে উন্মাদরোগের কিছু কিছু উপসর্গের সৃষ্টি হতে পারে।

এক একসময় দেখা যায় যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তার নির্দিষ্ট কর্মসূচী পালন করার পরিবর্তে একই বৃত্তে ঘুরে চলেছে। বার বার করে একটা অপারেশনই করে চলেছে, পরবর্তী অপারেশন করতে পারছে না। যন্ত্রটার যেন মাথা খারাপ হয়েছে। অনেকে মনে করে, এই অবস্থার সংগে মানবমনের অবসেশন, ডিলিউশনের তুলনা চলতে পারে। কোনো কোনো মাদকদ্রব্য স্নায়ুপ্রবাহের অগ্রগতি রোধ করে তাকে এইরকম একই বৃত্তে বাহিত করতে পারে।

সাধারণত, একব্যাপারে বেশিক্ষণ মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা মানুষের থাকে না। এই রকম পুনর্বৃত্তি ঘটলে, একই ব্যাপারে বা একই চিন্তায় ডুবে যেতে বাধ্য হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্য সব চিন্তা ভাবনার পরিবর্তে একটি বদ্ধ ধারণা বা চিন্তা অনবরত মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে, ফলে নির্যাতনমূলক অথবা আত্মম্ভরী ভ্রান্ত ধারণার (ডিলুইশন অফ পারসিকিউশন অর ডিলিউশন অফ গ্র্যাঞ্জার) বশবর্তী হয়ে পরিবেশকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না। সিবারনেটিক্স বিশারদদের মতে মস্তিষ্কের সংবাদ পরিবহন ও সংবাদ সঞ্চয় প্রক্রিয়ার ত্রুটী থেকে মানসিক রোগের, বিশেষ করে হ্যালুসিনেশন ডিলিউশনের উৎপত্তি। অপ্রয়োজনীয় পুনর্বৃত্তির কাজে ব্যাপৃত থাকে অনেকগুলো নার্ভকোষ; কার্যকর কোষের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পায়; কাজেই তাদের দিয়ে মস্তিষ্কের সব রকম জটিল কাজকর্ম চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেসব খবর মূল্যহীন, যাদের বাতিল করা দরকার, তারাই স্মৃতিপটে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই সব স্মৃতি থেকে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক ঘটে। অস্তিত্ব নেই এমন সব জিনিসের প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে অভিক্ষিপ্ত হয়, অমূলপ্রত্যক্ষ বা হ্যালুসিনেশনের উদ্ভব হয়।

এবার পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। খাদ্যের সংগে অনেকবার শর্তাধীন উদ্দীপক (ঘন্টাধ্বনি বা আলোকপাত বা যে কোনো ইন্দ্রিয় উত্তেজনা) সংযুক্ত হলে, তবেই উদ্দীপকটি খাদ্যের সঠিক সংকেত বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে অবান্তর বা ভুল উদ্দীপনার উত্তেজনা থেকে মস্তিষ্ক নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। কেবলমাত্র সঠিক সংকেতে মস্তিষ্ক সাড়া দিয়ে থাকে। রিফ্লেক্সমাত্রেই বহির্বাস্তবের নিভুল প্রতিফলন। সুস্থ মস্তিষ্কের ধর্ম শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উদ্দীপনাকে, সঠিক সংকেতকে গ্রাহ্য করা, আমল দেওয়া। কোনো কারণে মস্তিষ্কের এই ক্ষমতা, কেবলমাত্র সঠিক সংকেতে সাড়া দেবার ক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, (যেমন ভয় পেলে বা মাদকদ্রব্য সেবনে হয়ে থাকে) অবান্তর উদ্দীপকগুলোও রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে। এইভাবে অপ্রয়োজনীয় সংবাদের ভিড়ে মস্তিষ্ক ভরাট হয়ে যায়, সঠিক সংবাদ গ্রহণ বহন বা স্মরণ করার ক্ষমতা কমে যায়। পরিবেশের ভ্রান্ত প্রতিফলন ঘটতে থাকে মস্তিষ্কে। অসমর্থিত সংকেত রুগ্ন রিফ্লেক্সের জন্ম দেয়। উদ্দীপকগুলো সঠিক রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে না, তার ফলে উদ্দীপকজাত স্নায়ুস্পন্দনগুলি পরস্পরের পিছনে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এছাড়া সঞ্চিত সংবাদের বিশৃঙ্খলা থেকেও ডিলিউশন হ্যালুসিনেশনের সঞ্চার হতে পারে। বিশেষ অবস্থায় প্রাণী খাদ্যের সংকেতকে তৃষ্ণার সংকেত বলে ভুল করতে পারে। এ-নিয়ে একটা পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা চলে।

ঘন্টার শব্দ শুনিয়ে ও আলো দেখিয়ে একটা কুকুরকে অনেক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পায়ের চাপে একটা যন্ত্র চালিয়ে খাবার উপায় শেখানো হল। ক্ষুধার্ত না হলে ঘন্টা ও আলোর উদ্দীপনায় সে সাড়া দেবে না। এখন তার গলায় খানিকটা খুব নোনতা মাংসের ঝোল ঢেলে দেওয়া হল। ক্ষুধার বদলে তৃষ্ণায় অস্থির হল

কুকুর। এই সময় ঘণ্টা বাজালে ও আলো দেখালে, কুকুর এই সংকেতকে তৃষ্ণা মেটাবার সংকেত মনে করে সাড়া দিল। তৃষ্ণার্ত মস্তিষ্ক বিশ্লেষণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তৃষ্ণা মেটাবার পুরনো রিফ্লেকস খাদ্য-সংকেতে চালু হয়েছে, আর একটি ল্যাবরেটরীতে তৈরী ভ্রান্তির অনুরূপ অবস্থা।

যন্ত্র ও পশু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবরের পর আবার মানুষের কথায় ফিরে আসা যাক। পরস্পর-সম্পৃক্ত প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি (সিস্টেমেটাইজড্ ডিলিউশন) 'প্যারানইয়া' রোগের প্রধান উপসর্গ। ম্যানিয়া ও স্কিৎজোফ্রেনিয়া রোগেও ভ্রান্তি দেখা দিয়ে থাকে। আমরা বর্তমানে প্যারানইয়া নিয়েই আলোচনা করব।

প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি কিভাবে উদ্ভূত হয়? মৌলিক ভ্রান্তির সংগে অন্যান্য ধ্যান-ধারণাকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা থেকে ভ্রান্তি পরস্পরসম্পৃক্ত ও প্রণালীবদ্ধ হয়ে থাকে। রোগী তার প্রধানতম মৌলিক ভ্রান্তবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঘটনার স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার সাহায্যে এর যাথার্থ্য ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তার নিজের ভুল-বিশ্বাসকে যুক্তিসহ করার প্রচেষ্টা প্যারানইয়া রোগীর বিশেষত্ব। নিজের ডিলিউশনের বাইরে রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হয়। ডিলিউশনের সংগে সম্পর্কিত ঘটনা বা ব্যাপারের বেলায় কিন্তু রোগী তার ডিলিউশন বা ভ্রান্তিকেই প্রাধান্য দেবে এবং এই সব সংশ্লিষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা করবে মৌলিক ভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে। এই ভ্রান্তির সংগে তার আবেগ অনুভূতি গভীরভাবে জড়িত থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সুবিধামত ব্যাখ্যা উদ্ভাবন তার পক্ষে সহজ হয়ে থাকে।

প্যারানইয়াকে একটা আলাদা রোগ বলে প্রথম মনে করেন ক্রেপলিন। তাঁর মতে অন্তর্জাত কারণের ফলে এই রোগের আবির্ভাব ঘটে। চিরস্থায়ী অনড় ভ্রান্ত বিশ্বাস সত্ত্বেও রোগী অন্য সবদিকে সুস্থ স্বাভাবিক থাকে। অন্য সব ইচ্ছা চিন্তা কাজের বেলায় সে যুক্তিহীন নয়। ক্রেপলিনের মতে এই রোগ সারে না।

আর একদল বিশেষজ্ঞের মতে ব্লুলার, ম্যাকডুগাল। প্যারানইয়াকে রোগ বলা উচিত নয়। তাঁরা বলেন যে, নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সকলেরই থাকে, স্বাভাবিক এই অবস্থার চরম অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় ডাক্তারদের কাছে আসা রোগীদের মধ্যে। নির্যাতনমূলক ও আত্মম্ভরিতার ডিলিউশন অল্পবিস্তর সবারই আছে, চরম অবস্থাতেও রোগী নিজের কাজকর্ম ভালভাবেই করে যেতে পারে। ব্লুলারের অভিমত এই যে, বিশেষ অবস্থায় সকল মানুষই আত্মপ্রাসঙ্গিক চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, প্রক্ষোভ-তাড়িত মানুষ মাত্রেই অন্ততঃ সাময়িকভাবে যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা যদি বার বার ঘটতে থাকে অথবা এই ভ্রান্তি যদি দূর করা না হয় তবেই ক্রেপলিন বর্ণিত 'প্যারানইয়া' রোগ দেখা দিয়ে থাকে। অন্তর্জাত কারণের থেকে বহির্জাত মানসিক কারণ প্রণালীবদ্ধ অনড় ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাদনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আসলে প্যারানইয়া ঘটনাবিশেষের প্রতিক্রিয়া। কোনো মানসিক আঘাত না পেলে, আয়ত্তাধীন নয় এমন অবস্থার মধ্যে না পড়লে, প্রণালীবদ্ধ ডিলিউশন দেখা দিতে পারে না। একটা কিছু বড়দরের কাজ করে নাম করবার ইচ্ছা অনেকেই মনে মনে পোষণ করে। বুদ্ধি বা চরিত্রগত দৈন্যের জন্য সাফল্য লাভ না করতে পারলে একদল লোক ভাগ্যকে দায়ী করে মনের শান্তি লাভ করে। যদি ভাগ্যকে দায়ী করা না যায়, অথবা নিজের দৈন্যকে স্বীকার করতে না পারা যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমরা পরিবেশের উপর দোষারোপ করব। অন্যের দোষে, অন্যের বাধা বা শত্রুতা-মূলক আচরণের জন্যে আমি অভীষ্ট লাভে অক্ষম হয়েছি,—তখন এই রকম চিন্তাধারাকে আমরা প্রশ্রয় দেব। এইভাবে নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি জন্মলাভ করে। আবার আমি যদি হালকা হাসিখুশি স্বভাবের লোক হই, তবে কল্পনায় অভীষ্ট লাভ করে বাস্তব থেকে সরে গিয়ে আত্মম্ভরিতা ও জাঁকজমকের ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরব।

ম্যাকডুগাল সুস্থ মানুষের ডিলিউশন ও রুগ্ন ডিলিউশনের মধ্যে কোনো প্রকার গুণগত পার্থক্য দেখতে পান নি। যখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে ভুল ধরতে পারা যায় না, বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে ভ্রান্তি দূর হয় না, যখন প্রণালীবদ্ধ ভ্রান্তি অনড় অচল হয়ে যায়, তখনই ম্যাকডুগালের মতে ডিলিউশনকে 'মর্বিড' বলা চলে। 'আমার বরাতটাই খারাপ', 'ভাগ্য চিরকালই আমাকে বিড়ম্বিত করেছে', 'সৎ ব্যক্তি কখনও সাফল্যলাভ করে না' ইত্যাদি অতি সাধারণ উক্তি আমরা অনেকের মুখেই শুনে থাকি। প্যারানইয়ার রোগীর মুখে এই সব উক্তিরই চরম অভিব্যক্তি শোনা যায়। 'সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে', 'কেউ আমাকে চায় না, সকলেই আমার অমংগল চায়'—প্যারানইয়া রোগীর এ-সব কথা প্রলাপের পর্যায়ে পড়ে।

দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মাত্রাগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। কাজেই তাঁরা প্যারানইয়ায় মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও প্যারানইয়াকে একটি প্রতিক্রিয়ামূলক অসুস্থতা মনে করেন। মূল কারণ দূর করা সম্ভব হলে পরিবেশকে সহনীয় করে তুলতে পারলে, প্যারানইয়া রোগ সারে। অবশ্য অনেক সময় সে সুযোগ থাকে না, অথবা দীর্ঘস্থায়ী ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর পক্ষে অবাঞ্ছনীয় হতে পারে।

ম্যাকডুগালের মতে প্যারানইয়ার রোগীর গোপনমনে পাপবোধ বা হীনমন্যতাবোধ লুকিয়ে থাকার দরুণ সে তার ভ্রান্তবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। অবদমনের ফলে আত্মসমালোচনা করতে অপারগ হয়; কাজেই ভ্রান্তি ক্রমশ সুসংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধ হতে থাকে। আমার সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, সবসময়ে এরকমটি ঘটে না। স্ত্রীর ব্যাভিচারে দৃঢ়বিশ্বাসী কয়েকজন রোগীর কথা আমি জানি যাদের অবদমিত কোনো কামেচ্ছার সন্ধান পাওয়া যায় নি। সাইকোথেরাপিতে তারা সুস্থ হয়েছে। পাভলভীয় পদ্ধতিতে তাদের চিকিৎসা করা হয়েছে। কতকগুলি কোষ উত্তেজনাস্তরে অনড় হয়ে রয়েছে, এবং সম্মোহনপর্বের 'আলট্রা-প্যারাডক্স' পর্যায়ে রয়েছে স্নায়ুতন্ত্র;—এই দুটি পাভলভীয় প্রত্যয়কে ভিত্তি করে চিকিৎসা চলেছিল।

নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি ও আত্মম্ভরিতা-কেন্দ্রিক ভ্রান্তি পরস্পরের পরিপূরক। একই রোগীর মধ্যে এই দুই ধরনের 'ডিলিউশন' দেখা দিতে পারে। সবাই রোগীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, এই ধারণার মূলেও রয়েছে আত্মম্ভরিতার ইংগিত। রোগী একজন বিরাট পুরুষ না হলে সকলে তার বিরুদ্ধে যাবে কেন? সকলে রোগীকে অপমান করছে, ভূতপ্রেতের উৎপাতে টেঁকা যাচ্ছে না, সব দল তার দলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে: এ সবই নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের নিদর্শন। রোগীর স্ত্রী ব্যাভিচার করছে,—এচিন্তার মূলেও রয়েছে নির্যাতনের ডিলিউশন। অন্য দেশের রাষ্ট্রনায়ক রোগীর চিন্তার হদিশ পেয়ে রোগীর দেশের পুলিশকে তার বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে; এই ধরনের বিশ্বাসের মূলে একই সংগে নির্যাতনমূলক ও আত্মম্ভরিতার ভ্রান্তি কাজ করছে। রোগীর শিক্ষাদীক্ষা পেশা ইত্যাদির সংগে তার ডিলিউশন বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

এইবার রোগ-ইতিহাসের বিবরণ দিচ্ছি।

রংগলাল যখন চিকিৎসার জন্য এল তখন তার বয়স পঁচিশ। অবিবাহিত ডাক্তার মামার সংগে এক বাড়ীতে থাকে, সরকারী এক গবেষণা সংস্থায় রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টের কাজ করে। ডাক্তার মামা কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছেন যে রংগলাল যেন কিছুটা বিভ্রান্ত। পাশের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত পায়চারী করে, মামা সেটা বুঝতে পারলেন। ঘুম হচ্ছে না: খাদ্যেও অরুচি। কর্মস্থলে যাচ্ছে: কাজকর্মও করছে, কিন্তু মনে শান্তি নেই। কয়েকদিন পরে মামার কাছে তার সমস্যার কথা বলল। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলেছে। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রবলপ্রতাপান্বিত প্রেসিডেন্ট, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। সংগে জড়িত আছে আরো অনেকে। রাত্রে সে জোর করে জেগে থাকে, অনেকবার কফি খেয়ে ও অন্যান্য ওষুধের সাহায্যে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করে। পায়চারী করার উদ্দেশ্য সজাগ থাকা। সজাগ না থাকলে সর্বনাশ ঘটবে। অতর্কিতে পুলিশ এসে

তাকে ধরে নিয়ে যাবে। গোপনীয় কিছু কাগজপত্র একটা কিটব্যাগে ভরে সারারাত সে পালিয়ে যাবার জন্যে তৈরী থাকে। পুলিশের আগমন সংবাদ টের পেলেই পাশের বাড়ীর ছাদ দিয়ে সে পালিয়ে যাবে। শেষ রাত্রের দিকে পুলিশ আসার সম্ভাবনা। কাজেই সে ঘুমুতে পারে না, ঘুমুতে সে চায়ও না। দিনের বেলায়, রাস্তায় অথবা তার কর্মস্থলে পুলিশ তাকে পাকড়াও করতে পারে, এ চিন্তা তার মনে আসে না। দিনের বেলায় মোটামুটি সুস্থ থাকে। ষড়যন্ত্রের কথা মনে থাকলেও ধরা পড়ার ভয় মনে আসে না। রাত জাগার ক্লান্তি ছাড়া, অন্য সব দিক থেকেই সে তখন প্রায় স্বাভাবিক। তার গবেষণাসংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ, দুরূহ গাণিতিক প্রশ্নের মীমাংসায় তার ভুল হয় খুবই কম। মামার ঘুমের ওষুধ সে খেল না। রাত্রের অস্থিরতা ক্রমে বেড়ে চলল। এই অবস্থায় মামার পরামর্শে আমার সঙ্গে দেখা করল। চিকিৎসার জন্যে নয়, পরামর্শের জন্য।

প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগেকার কথা। রঙ্গলাল প্রথম দিকে ষড়যন্ত্রের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই বলতে চাইল না। তার বিশ্বাস উৎপাদন করতে কিছুটা সময় লাগল। আমার উপর আস্থা স্থাপিত হলে তার পুরনো ইতিহাস জানতে পারলাম।

দেশ স্বাধীন হবার পর বছর তিনেক কেটে গেছে। রঙ্গলাল এক বামপন্থী পার্টির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। এই পার্টির বেশ কিছু সংখ্যক সভ্য এই সময় 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' যেতে বাধ্য হয়। রঙ্গলাল পার্টি সভ্য নয়, 'ফেলো ট্রাভেলার'। তার উপর পুলিশের নজর নেই। পড়ুয়া ছাত্র বলে তার সুনাম আছে। কাজেই মাঝে মাঝে দু'একজন সভ্য তার ঘরে রাত্রিযাপন করতে থাকে। কিছু কিছু গোপনীয় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ভার তার উপর বর্তায়। মনের ভয় চেপে রেখে এই দুঃসাহসিক রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে রঙ্গলাল। যে-বন্ধুর মারফত যোগাযোগ ঘটেছিল তার কাছে বাহবার মোহে রঙ্গলাল এই কাজে ব্রতী হয়। এ-ছাড়া বিপজ্জনক কাজ করার একটা নিজস্ব মাদকতা আছে। রঙ্গলালের তরুণ-মন তার দ্বারাও আকৃষ্ট হয়েছিল। এই সব ভয় বা বাহাদুরির মোহের খবর রঙ্গলালের গোপন মনে নির্বাসিত ছিল, মনে হয় না। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় খোলাখুলি সে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করল। এর পর পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। আত্মগোপনকারীরা আত্মপ্রকাশ করলেন। গোপনীয় কার্যকলাপের আর প্রয়োজন রইল না। কিছুদিন পরে রঙ্গলালের সরকারী চাকরী মিলল। আরো বছর দুয়েক পরে চাকরীটি স্থায়ী হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এখন সব কিছু নির্ভর করছে পুলিশ-রিপোর্টের উপর। ঠিক এই সময় রোগলক্ষণ দেখা দিল। পুরনো দিনের সঞ্চিত ভয় ও প্রপালীবিদ্ধ নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের পীড়নে রঙ্গলাল অস্থির হয়ে উঠল।

কেন এই সময়ে রঙ্গলাল অসুস্থ হল? কেন প্যারানইয়ার উপসর্গ তার মধ্যে দেখা দিল? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রঙ্গলালের স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতার বিশিষ্টতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দরকার।

রঙ্গলালের ইতিহাস থেকেই বোঝা গেছে যে সে ভীতুস্বভাবের ছেলে। 'ইন-হিবিটরী' টাইপের মস্তিষ্কে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের আধিক্য। সব কিছুকে, নিজের 'ডিলিউশনকে' বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ প্রসঙ্গে সে এক ধরনের নতুন যন্ত্রের কথা অবতারণা করল, যেটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও; একেবারে অসম্ভব পরিকল্পনা নয়। কথোপকথনের প্রত্যেকটি ধাপ সে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সমর্থিত করার চেষ্টা করল। মার্কসীয় দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক বিষয় নিয়েই যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা করে থাকে বোঝা গেল।

তার মধ্যে বড় হবার, প্রশংসা ও বাহবা অর্জন করার ঝোঁক খুব বেশী। যে দলের সভ্যদের আশ্রয় দিয়েছিল, সেই দলের সঙ্গে তার একাত্ম ঘটে নি। ব্যক্তিগত বাহাদুরীর মোহেই সে নিজের ভয়কে চেপে রেখে বিপজ্জনক কাজে নেমেছিল। ছাত্র হিসেবে তার সুনাম ছিল, কিন্তু ছাত্রমহলে লাজুক ও ভীরুস্বভাবের জন্য প্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। এই প্রতিপত্তি লাভ ছিল তার মনের প্রধান চালকশক্তি। সরকারী গবেষণা সংস্থায় চাকরীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে যখন তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন দুটো বিপরীত চিন্তা তাকে সমানভাবে পেয়ে বসল। অনুকূলে পুলিশ-রিপোর্ট যদি না হয় তবে চাকরী হারাতে হবে, বড় হবার সব আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। সরকারী চাকরী মানে বামপন্থী সরকারবিরোধী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ। চাকরী স্থায়ী হলে বামপন্থী পার্টির বন্ধুবান্ধবদের কাছে সে ছোটো হয়ে যাবে। সে যে মনে মনে 'কেরিয়ারিষ্ট' ছিল এইটেই প্রমাণিত হবে। আত্মগোপনকারীদের আশ্রয় দেবার সময় থেকেই ভয়ের অভিভাবনে সে পীড়িত। প্রতিরাত্রে সে কল্পনা করেছে সার্চ হবে, পুলিশ আসবে। এই ভয় ক্রমশ তার স্নায়ুতন্ত্রে সম্মোহনপর্বের দ্বিতীয়-তৃতীয় ফেজের (প্যারাডক্স, আলট্রাপ্যারাডকস) আবির্ভাব ঘটেছে, শেষ রাত্রের সার্চের বিভীষিকা তার কিছু মস্তিষ্ক কোষকে অনড় উত্তেজনায় আচ্ছন্ন রেখেছে; এইভাবে প্যারানইয়ার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। আবার এও ভেবেছে যে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কাগজে নাম বেরুবে; তার মত মেধাবী ছাত্র একটা আদর্শের জন্যে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি, এ নিয়ে নিশ্চয়ই জনসাধারণের মনে তার সম্পর্কে শ্রদ্ধার উদ্রেক ঘটবে। তার আত্মত্যাগের ইতিহাস বন্ধুদের কাছে তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা বাড়াবে। কিছুদিন আগেও তার মনে হয়েছিল যে রিপোর্টে যদি তার রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা প্রকাশ পায় এবং তার ফলে যদি তার চাকরী চলে যায়, তাহলেও তার সম্ভ্রম বাড়বে। কয়েকজন আত্মগোপনকারীকে আশ্রয় দিয়েছিল, এই সংবাদ এমন কিছু বড়দরের সংবাদ নয়। আত্মগরিমা চরিতার্থ হয় যদি বিরাট কোনো ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয় তাকে কেন্দ্র করে। রাতের বেলার ভয়ের মূলে রয়েছে সেই বন্ধুদের আত্মগোপনকালীন ভয়ের উদ্দীপক। এতদিন পরে এখন অসুস্থ হবার কারণ এখন তার চাকরীর স্থায়িত্ব ও পুলিশ-রিপোর্টের প্রশ্ন উঠেছে। প্যারানইয়া রোগের উদ্ভবের ব্যাখ্যাও মনে হয় পাওয়া গেছে।

প্যারানইয়া সম্পর্কে ফ্রয়েডের লিবিডো-ভিত্তিক প্রকল্প চিকিৎসক মহলে বিশেষ চালু। এ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ফ্রয়েড বলেন, নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের সাহায্যে রোগী নিজের সমকাম প্রবণতা থেকে আত্মরক্ষা করে। হোমোসেক্সুয়াল পার্টনার অর্থাৎ সমকামী ভালবাসার পাত্র হঠাৎ ঘৃণার পাত্রে রূপান্তরিত হয়ে নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের নায়ক হয়ে যায়। নির্যাতনের নায়ক খুব কম ক্ষেত্রেই একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। রঙ্গলালের বেলায় আমরা জানি নির্যাতনের কাল্পনিক নায়ক একাধিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবেশের সব কিছুর মধ্যেই রোগী তার নির্যাতনের নায়ককে দেখতে পায়, সমগ্র পরিবেশকেই সে ষড়যন্ত্রকারী শত্রু মনে করে। ম্যাকডুগাল মনে করেন নির্যাতনমূলক ডিলিউশন হোমোসেক্সুয়ালপ্রবণ ব্যক্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, একথা ঠিক। এইসব ব্যক্তি সমকামপ্রবণতাকে এমনকি হস্তমৈথুনকেও অপরাধ ও পাপ মনে করে, তাই এদের মধ্যে প্যারানইয়া রোগের আধিক্য দেখা যায়। পুরুষদের সমকাম-প্রবণতা আইনের চক্ষে অপরাধ (ম্যাকডুগালের সময়ে) বলে পরিগণিত হত, মেয়েদের সমকামপ্রবণতা ততটা ঘৃণিত মনে করা হয় না। তাই পুরুষদের মধ্যে প্যারানইয়া রোগীর সংখ্যাধিক্য। এছাড়া ম্যাকডুগাল অন্য একদিক দিয়ে ফ্রয়েডীয় প্রকল্পকে খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখেছেন যে সমকামবিকার যাদের মধ্যে জন্মগত, তাদের প্যারানইয়া রোগের সম্ভাবনা কম। যারা এই বিকারকে পরিবেশের চাপে অর্জন করতে বাধ্য হয়, তাদের মধ্যেই মানসিক দ্বন্দ্বদ্বনিরোধের ফলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ম্যাকডুগাল ও সমমতাবলম্বী চিকিৎসকেরা মনে করেন যৌনশক্তির স্বল্পতার দরুণ যে হীনমন্যতা জন্মায়, তা থেকে নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের উন্মেষ। অন্য রোগীর প্রসঙ্গে এ-নিয়ে আলোচনার ইচ্ছে রইল। —মনোবিদ

সজনের সকাল

চন্দ্রী মণ্ডল

সজন বলল, 'আপনার ভুল হয়নি। আমিই আসলে ভুলে গেছি। অপরাধী করবেন না যেন, সম্ভবত অনেক দিন আগে একবার আমাদের পরিচয় হয়েছিল। এতদিনে স্বাভাবিক ভাবেই আপনি নিশ্চয় অনেক বদলে গিয়ে থাকবেন। অথচ জানেন, আমার বন্ধুরা বলে মানুষ যে প্রতিদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিনিটে মিনিটে প্রতি সেকেণ্ডে কী অবিশ্বাস্যরকম বদলে যেতে পারে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমি—সজন। আর আপনি, আপনি আমাকে কত সহজেই চিনে নিলেন। আশ্চর্য। আপনার এই প্রতিভার কোন রকম প্রশংসা আমার মুখে শোভা পায় না। কেননা এই অদ্ভুত বিবর্তনশীল জীবটি এখনও আপনাকে ঠিক চিনতে পারেনি।' সজন সলজ্জ হাসল।

(পাঁচ)

এখনও সন্ধ্যা নামে নি। শুকনো নরম বেলাভূমির ওপর সজন দাঁড়িয়েছিল। সামনে শেষ সূর্যালোকশোভিত দিগন্তপ্লাবী অনন্ত সমুদ্রের গুঞ্জন। উপরে অসীম আকাশে দিনশেষের অপূর্ব মায়া। সমুদ্রচিলগুলি সারাদিন সমুদ্রের আকাশে ভেসে চলেছে কিসের নেশায়। সৈকতজুড়ে ছোট ছোট সাদা বাদামী সবুজ পাখিরা এখনও কিসের সন্ধান করে চলেছে। সজনের বুকের ওপর দুর্বোধ্য বার্তাবহ বাতাসের উথাল-পাথাল ঢেউ, অবিরাম অবিশ্রাম। চারপাশে স্বাস্থ্য-প্রেমিক নরনারীর মেলা। হঠাৎ সজন শুনতে পেল যেন কেউ তাকে ডাকছে। ভাবল সে ভুল শুনেছে, কেউ তাকে ডাকছে না। এখানেও আবার ভুলের দৌরাত্ম্য সজন আবার শুনতে পেল তার নাম ধরে কেউ যেন তাকে ডাকছে। ভাবল, এখানে তার নাম কে জানে যে তার নাম ধরে ডাকবে। ভাবল, আসলে আমার নিজের নাম আমার মনে পড়ছে আর কে কাকে ডাকছে আর আমার মনে হচ্ছে বুঝি নাম ধরে আমাকেই কেউ ডাকছে। কিন্তু আবার যেন কেউ তার নাম ধরে ডাকল। দেখল, একজন ভদ্রমহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভাবল ভদ্রমহিলা সম্ভবত ভুল করেছেন। তাই বলে সে ভুল করতে যাবে কেন। তাই সে ভদ্রমহিলাটির দিকে এমনভাবে তাকাল যার অর্থ—শুনুন, আপনি আসলে আমাকে ডাকছেন না। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে অনেক কাছে এসে গেছেন। সজন এবার তাঁর দিকে তাকিয়ে এই কথাই বলতে চাইল আপনি কি সত্যিই আমাকে ডাকছেন? ভদ্রমহিলাই প্রথম কথা বললেন: এতক্ষণ ধরে দূর থেকে আপনাকে ডাকছি—কী ব্যাপার বলুন তো, খুব কাছের কিছু ছাড়া আপনি কি আর কিছুই বিশ্বাস করেন না? আমাকে এখনও চিনতে পারলেন না?

সজন লজ্জিত হল, 'ক্ষমা করবেন। সত্যিই আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। তবে আপনাকে নিশ্চয়ই চিনি, না হলে আপনি আমাকে চিনলেন কী করে।'

'কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে আমার ভুল হয়নি। আপনাকে দেখেই মনে হল আপনাকে চিনেছি। অবশ্য সে অনেকদিন আগে আপনাকে দেখেছিলাম। কী জানি হয়ত আমারই ভুল হচ্ছে। তবে জানেন অনেকদিন আগে যাঁকে দেখেছিলাম তাঁকে আপনি ভাবলে প্রায় ভুল হয় না। তাঁর নাম ছিল সজন।'

'আমি রাত্রি।' রাত্রি তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসল।

'ও, হ্যাঁ—চিনতে পেরেছি। এখন মনে হচ্ছে অনেক আগেই আপনাকে চিনতে পারা উচিত ছিল। চিনতে যে একেবারে পারিনি তা ঠিক নয় জানেন—কী রকম যেন জোর পাচ্ছিলাম না, ঠিক সাহস হয়নি। তবে আপনার দান আমি অস্বীকার করব না। আপনি এত স্পষ্ট করে আপনাকে চিনিয়ে না দিলে—কার সাধ্য—, দেখলেন তো আমার সাধ্য।'

রাত্রি মুখ তুলে হেসে বলল, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' সমুদ্রের বাতাসের সহযোগিতায় রাত্রির কণ্ঠস্বর হল সঙ্গীতের মত।

'কোথাও তো ছিলাম না!' পরমুহূর্তেই সজন আত্মসচেতন হল, 'কলকাতায় আছি।'

রাত্রি: সে-ই কবে—তারপর কত দিন পরে দেখা হল। কী খবর আপনার বলুন—কেমন আছেন—আপনার কিন্তু এত বয়েস হয়নি। কী ব্যাপার আমাকে আবার ভুলে গেলেন নাকি—না অনেকদিন আগের চেনা লোককে এতদিন পরে এখন নিজের খবর বলতে আপত্তি? কী?

সজন ঃ কিছুই না। আপনি এখনও কবিতা পড়েন?

ঃ আপনি কবিতা লিখতেন না। মনে পড়ছে। এখনও কবিতা লেখেন? নিশ্চয়ই লেখেন। দেখলেই যে কারো মনে হবে। তাহলে আপনি কিন্তু এখন দার্শনিক। কবিরা শেষের দিকে পাগল অথবা দার্শনিক হয়। আপনি দার্শনিক তো? রাত্রি আবার হাসল।

সজনও হাসল। বলল ঃ আপনার খবর বলুন?

রাত্রি ঃ আমার স্বামী কলকাতার একজন ডাক্তার। দীর্ঘ অসুখভোগের পর চেঞ্জে এসেছেন।

সজন ঃ কী অসুখ আপনার স্বামীর? আপনাদের পারিবারিক—ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনাহূতের মত প্রবেশ করলাম, জানি না পুরস্কার কী তিরস্কার বা অন্য কী—;

রাত্রি ঃ কিছুই হবে না। আসলে শারীরিক নয় মানসিক—মনের অসুখ। উনি একজন মনের ডাক্তার। মনের ব্যবসায়ী বলা যায়, কী বলেন? সাংঘাতিক ব্যবসা, মানে একটু বেশি রিস্কী। একটু অসতর্ক অন্যমনস্ক হলেই হল—, চলুন কোথাও বসি, আপনার সঙ্গে কেউ—

ঃ না। আপনিও একাই এসেছেন বুঝি?

ঃ হ্যাঁ। সমুদ্র উনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। একথা শুনে তবু ডাক্তার ওঁকে সমুদ্রেই পাঠিয়েছেন। ফলে প্রায় সারাক্ষণই উনি ঘুমিয়ে চলেছেন। আপনি নিশ্চয় মনোবিজ্ঞান পড়েছেন?

ঃ আমার একটু একটু মনে পড়ছে, আপনি কিন্তু এত কথা বলতে পারতেন না। আসলে বলতেন না।

ঃ তা নয়। আসলে আমি সত্যিই বদলেছি অনেক। আপনি তো এখন দার্শনিক, বলবেন তা নয়,—মানুষ চিরদিন জন্মমুহূর্তেই থেকে যায়—, সময় বদলায় বাইরের পৃথিবী সংসার বদলায় আর তাই মনে হয় যেন মানুষও বদলায়।—ঠিক বলিনি?

সজন হাসল। ঃ আপনি তো কবি ছিলেন না, তাহলে দার্শনিক হলেন কেমন করে?

ঃ এক সময় কবিতা পড়তাম। আপনি কিন্তু, মনে আছে, আপনার একটা কবিতাও শোনাননি। কিন্তু কী চেহারা হয়েছে আপনার। ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। শরীরের একটুও যত্ন নেন না। বিয়ে করেন নি? বলুন—আমি একেবারে সাধারণ মেয়েলি কথা বলছি!

রাত্রি আবার বলল ঃ এবার সকলের যে যার হোটেলে ফিরে যাবার সময় হল। আজ যেন কী তিথি—চতুর্দশী, কাল পূর্ণিমা। দেখছেন কী রকম জ্যোৎস্না নেমেছে সমুদ্রে। জ্যোৎস্না-রাতের প্রতিভা আছে, চেনা চারপাশের পৃথিবীকে কেমন অচেনা মায়াময় করে তোলে। আপনি কবে এসেছেন? জানেন আমরা এক মাস হয়ে গেল এখানে আছি। সারাদিন আমি একা থাকি। ভালই লাগে, নিজেকে সব সময় নিজের কাছেই পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় নিজে কত কী আবার কিছুই যে নয়। আপনি কিন্তু আমার কথা শুনছেন না। তাহলে একটা কথাও বলছেন না কেন?

সজন ঃ চুপ করে বসে আপনার কথা শোনা আমার খুব দরকার। আমার খুব ভাল লাগছে।

রাত্রি ঃ প্রথম থেকেই দেখছি আপনি শুধু ভাবছেন। যেন ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না, আরো বেশি করে ভাবছেন। মনে পড়ছে—তখনও আপনি ঠিক এমন ভাবুক ছিলেন। কিন্তু সত্যিই বলুন তো কেন এত ভাবেন? এত ভাববার কী আছে? এত ভাবনা কি সত্যিই আছে? আপনারা প্রথম থেকেই ঐ যে নিজেদের কোন্ কার্যকারণযোগে একবার ভাবুক বলে ভেবে নিয়েছেন তারপর নিজের, অন্যের দুঃখ-সুখের কথা ভাবেন না, ভেবে ভেবে শুধু ভাবনা তৈরি করেন আর দুর্ভাবনা বাড়ান। আপনারা ভীষণ স্বার্থপর। নিজেদের এত ভালবাসেন—! মানুষ অন্যকে বিচার করে নিজেকে দিয়ে। এটা কি ঠিক? উনি—ডঃ মজুমদার, উনি নিজের মনের জটিলতা দিয়ে ওঁর রুগীকে বুঝতে গিয়েছিলেন—তারপরই সম্ভবত এই অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু ভাবছি আপনি কি ভেবেই নিয়েছেন কোন কথা বলবেন না?

সজন ঃ এখন আপনার কথা বলার সময়।—এখনও আপনার কথা শেষ হয়নি অথচ এখনই যদি আমি আরম্ভ করি তাহলে তো আবার অ্যাকসিডেন্ট অবশ্যম্ভাবী।

রাত্রি ঃ আপনার কথা আগে কিছু শোনান। আপনার অতীতের কথা বলুন, বর্তমানের কথাও বলুন।

সজন ঃ আমার অতীত বর্তমান কিছুই নেই।

রাত্রি ঃ কেন?

সজন ঃ নেই বলে তাই।

রাত্রি ঃ কী আশ্চর্য মিল, আমারও যে তাই মনে হয়। আমি ঠিক আপনার মত বিশ্বাস করি।

সজন ঃ কী বিশ্বাস করেন?

ঃ কিছুই বিশ্বাস করি না।

ঃ তাহলে?

ঃ তাহলেও তো দিব্যি বেঁচে আছি। এবং দিনের পর দিন বেঁচে যাচ্ছি। একে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার কী আছে?

সজন বলল ঃ ও আচ্ছা। একটু থেকে আবার শুরু করল ঃ অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে, অবশ্য অন্ধকার হতে পারেনি। তবু আপনার এখন হোটেলে ফেরার দরকার নেই?

ঃ না। আমাকে ডঃ মজুমদারের এখন দরকার নেই। উনি এখনও ঘুমিয়ে আছেন। আপনার বোধ হয় এখনই ঘুমোবার দরকার নেই। আছে নাকি? অবশ্য জানি না কী ঘটনা বা দুর্ঘটনার পর আপনি এখানে এসেছেন। তবু আপনি থাকুন আরো কিছুক্ষণ। ক-ত দিন পরে দেখা। আচ্ছা, আপনার সেই দিনটির কথা মনে পড়ে? কী ভীষণ ছেলেমানুষই না আপনি ছিলেন।—আমি যে তোমাকে ভালোবাসি রাত্রি,—আমি যে তোমার ভালোবাসা চাই—তুমি কি আমাকে ভালোবাসার কথা ভাববে না?—পাগল একটা! কেন অমন করেছিলেন? আপনি যেন কী রকম হয়ে গিয়েছিলেন। আমার শেষে এমন ভয় করছিল। কী হয়েছিল বলুন তো আপনার? মনে আছে সে সব কিছু? জানেন বাড়ি এসে মাকে আমি সব কথা বললাম। মার সে কী হাসি। বলল—তুই শেষে একজন পাগলের হাতে পড়লি। আমিও খুব হেসেছিলাম। পরের দিন শুনলাম আপনার নাকি কী অসুখ করেছে। একদিন আপনাকে দেখতে যাব ভবছিলাম। তারপর হঠাৎ আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এক মনের ব্যবসায়ীর সঙ্গে। উনি আর আমাকে নিজের ব্যবসার সঙ্গে জড়াতে চাইলেন না। আমি খেয়ে-ঘুমিয়ে সিনেমার ছবি দেখে দিব্যি বাঁচতে লাগলাম—বেঁচে গেলাম। আমার গল্পটি ফুরোল। এবার শুরু করুন কথা বলা।

সজন ঃ এক দেশে একটি লোক ছিল। সে প্রথম থেকেই ভেবে নিল আমি ভিন-দেশী। সে দিব্যি খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প পড়ে বাঁচবার লোক অথচ ভাবল একটা কিছু তো হতে হয়! কী হবে কী হবে? শেষ পর্যন্ত কবি হল। শেষ পর্যন্ত এমন হল ... আর কবিতা হচ্ছে না। সেই লোকটি ও ... সমুদ্রে এসেছেন কবিতার সন্ধানে।

রাত্রি ঃ কবিতা আর হচ্ছে না, সুতরাং অসুখ করেছে, ভদ্রলোক সমুদ্রে এসেছেন বড় যন্ত্রণায় বড় আশায় যদি কবিতার মোহ না কাটে যদি কাটে।

সজন ঃ ঠিক তাই। তারপর অতীতের পরিচিতা স্বনামধন্যা আপনার সঙ্গে নতুন করে পরিচয়। মানে কবিতার স্বরূপ সন্ধানী এক ক্ষ্যাপার হঠাৎ দেখা আপনার সঙ্গে।

রাত্রি ঃ গুরুত্ব এত কম দিচ্ছেন কেন? বলুন—আবিষ্কার।

সজন ঃ ঠিক। কিন্তু পরিণাম?

রাত্রি ঃ অন্য অনেক আবিষ্কারের যে পরিণাম হয়, আশা করা যায় মঙ্গলজনকই হবে।

সজন ঃ আপনি যে একজন শ্রেষ্ঠ আশাবাদী স্বীকার করছি।

রাত্রি ঃ অন্য কত জায়গা থাকতে ঠিক এই সমুদ্রে আপনার এই যে আসা—এটা

কিন্তু আপনার শ্রেষ্ঠ নিরাশাবাদীর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়।

সজন ঃ তা নয় মানছি। মানছি এখনও আশা আছে, অন্তত এই মুহূর্তে তো তাই-ই মনে হচ্ছে।

রাত্রি ঃ এবার কিন্তু মাটিতে ফিরে আসা যাক। কী বলেন? হাওয়ায় ভাসতে তো মনে হচ্ছে সেই আগের মত এখনও আপনার খুব একটা ক্লান্তি নেই। আমার কিন্তু শূন্যের আনন্দ ভোগের জন্যে কোন ডানা নেই। এক আধবার—চেষ্টা করে জানা কল্পনা করে—কিন্তু লজ্জা পেয়ে বা শূন্যের অত বাতাসেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবার ভয়ে মাটিতে নেমে বেঁচে যাই। সে যাই হোক এতক্ষণ প্রায় সারাক্ষণই নিজের কথা বলে গেলাম। ভাল লাগল কি কীরকম লাগল জানি না তবে আমার সম্বন্ধে যে অনেক কথা জেনে গেলেন তাতে সন্দেহ নেই। আছে নাকি? এবার বলুন দেখি আপনার কী হয়েছে?
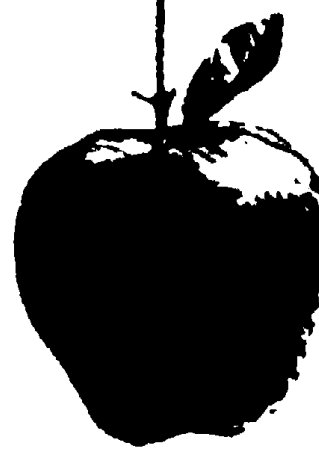
সজন যেন খুব অবাক হল, 'আপনি কার কথা বলছেন বলুন তো?'

রাত্রি বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি হঠাৎ সজন থেকে বিজন বা অন্য কেউতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন।'

'তা কেন হবে?'

'তাহলে আপনি সজনই? তাহলে আপনিই তো বলেছেন আপনার কবিতা আর হচ্ছে না—যাক। এই শুনুন, কাল চলে আসুন আমাদের অতিথিশালায়। নিন মান

রাখুন নিউ লাইফ ডিল্যুক্স হোটেলের পাঁচতলার ন' নম্বর স্যুট। সকালেই আসুন। এই শুনুন, আসবেন কিন্তু নিশ্চয়ই। আর শুনুন, ওঁকে কাইন্ডলি জানতে দেবেন না আপনার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ বা এখানেও যে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাও বলবেন না।'

'কিন্তু আমি যদি কোন কারণে আদৌ যেতে না পারি—মানে যদি—।'

'আশ্চর্য! অসম্ভব! আপনি আবার কী সব ভাবছেন মশাই আপনিই জানেন ভাল। আসলে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে জানলে উনি ভাববেন আমি ওঁর জন্যে রুগী সংগ্রহ করছি। আপনাকে তো প্রথমেই বলেছি উনি চান না ওঁর ব্যবসার সঙ্গে আমাকে জড়াতে।'

'কিন্তু আমাকে ওঁর ব্যবসার সঙ্গে জড়াচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'আমিই তা ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনাকে কেমন করে বোঝাব?'

'তাহলে?' সজন দেখল আকাশ ও সমুদ্রের পটভূমিতে জ্যোৎস্নার প্রভায় রাত্রিকে বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছে। রীতিমত সুন্দরী। অসাধারণ বলা যায়।

রাত্রির এই রূপ ভাবায়—নিশ্চয়ই ভাবায়।

রাত্রি বলল : তাহলেও ভাবনার কোন দরকার নেই। আপনি চলে আসুন মনে কোন দ্বিধা না রেখে। কথা দিচ্ছি আতি-থেয়তায় কোন ত্রুটি হবে না—। মনে আছে, সেই, সেই পাগলামির দিন চা খাইয়েছিলেন —অবশ্য শুধুই চা। তবু ভুলিনি। আজ যাই।

সজন হাসল, বলল : আপনি অনেক বদলে গেছেন।

রাত্রিও হাসল, বলল : সেটা অন্তত জানতে ডঃ মজুমদারেরই কাছে না-হয় আসুন যে আপনার ব্যাপারটা কী। চলি। আবার দেখা হবে। আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে।

সজনের মনে হল এতক্ষণ সে স্বপ্নের মধ্যে ছিল। কিন্তু কোনমতেই নিজেকে তা বোঝাতে পারল না। বুঝতেই হল, না, সে স্বপ্নের মধ্যে ছিল না। তাহলে এতদিন সে নিশ্চয়ই স্বপ্নের মধ্যে ছিল। এই সেই রাত্রি —যার জন্যে দিনরাত্রি আমি—সজন আর ভাবতে পারল না। এখন জ্যোৎস্না কুয়াশার মত চরাচরকে গ্রাস করছে। সমুদ্র ধূধূ— শুধু অশান্ত ক্রুদ্ধ গর্জন। বাতাসের বেগ অনেক বেড়ে গেছে। সজনকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলায় মেতেছে। চাঁদকে এত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে যেন কোন দুষ্ট ক্ষত হঠাৎ তার সমস্ত লাবণ্য গ্রাস করেছে। সজন শান্তভাবে দেখল একটা ভুলের মধ্যে দিয়ে কেমন করে তার জীবনের এত দীর্ঘদিন কেটে গেল। যেতে পারল। ক্রমশ জ্যোৎস্না আরো ধূসর হয়ে উঠেছে, অন্ধকার একটু একটু করে ঘনিয়ে আসছে, এই অনুজ্জ্বল মহিমাহীন চাঁদটাও এবার ডুবে যাবে। তখন নিরন্ধ্র অন্ধকার। কুয়াশাময় বেলাভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে সজনের মনে হল ঘনায়মান ঐ কালো রাত্রি আর কখনো কোনোদিন সকাল হবে না। তারও আর কিছুই করার নেই। চারপাশের শ্মশানসদৃশ নির্জনতায় দু'একটা কালো পাখি প্রেতের মত উগ্র সাংকেতিক ভাষায় চাপা চিৎকার করতে করতে সজনের মাথার উপর দিয়ে উড়ে আকাশের ধোঁয়ায় আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। একসময় মনে হল ঐ সাধারণ অতি তুচ্ছ রাত্রি ও একটি মেয়ে মাত্র আর কিছুই নয়, ঐ মেয়েটির জন্যে আমার জীবন মিথ্যা? না। রাত্রির সেই যোগ্যতাই নেই। আসলে আমার নিজের মধ্যেই আছে ভুল সেই ভুলই আমাকে এমন নিঃস্ব করেছে আমার এতবড় সর্বনাশ করেছে। আমার সেই ভুলকে প্রশ্রয় দিয়েছিল রাত্রি, না, রাত্রি কিছুই করেনি, আমিই রাত্রিকে কল্পনা করেছিলাম —আমি আরো ভুল করেছিলাম। আমার এই সব ভুল হওয়ার জন্যে আমি, একমাত্র আমিই দায়ী। মধ্যরাত্রিতে কুজ্ঝটিকাময় সমুদ্রের ওপর গর্জন শুরু হয়েছে। অসংখ্য অশান্ত প্রশ্ন নিষ্ফল আক্রোশে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তার কী তীব্র অনুশোচনা কী দারুণ গ্লানি! আত্মশ্লাঘা! সজন হতাশায় ভেঙে পড়ল, এই ভয়ংকর ভুলের থেকে মুক্ত হয়ে আবার আমি নতুন করে বাঁচতে পারি না, পারব না। আমার দীর্ঘ সময় অতি-বাহিত। আমি এখন শ্রান্ত ক্লান্ত, অবসন্ন উৎসাহবিহীন, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবার অপেক্ষায় আমি দিন গুনব। আমার আর কোন আশা নেই। না না না না না না......

ক্রমশ যেন আকাশে, সমুদ্রে, চরাচরে ভোর হচ্ছে। এখন দীর্ঘ অন্তর্দহনের পর সজন নিজের উদ্দেশ্যে বলেছে : জীবনের অনেক দিন বৃথাই কেটে গেছে। তবু তেমন অনুতাপ হওয়া সেও হয়ত ঠিক নয়। এখনো তো এ জীবনে সেই সার্থকতায় পৌঁছন হয়নি যার জন্য জীবন জীবন হয়, যার জন্য এতদিন কেটে গেল। বৃথাই কেটে গেল। কখন যে জীবন জীবন হবে কেউ জানে না, যখন একদিন তা হয়ে ওঠে তখনই তো জীবনজন্মের সার্থকতা— জীবনের সেই আনন্দের উদ্দেশ্যেই তো এই দিনরাত্রির জীবনযাত্রা। সেই সত্যের সঙ্গে এখনও তো তোমার পরিচয় হয়নি সজন। তুমি এখনও অপূর্ণ। তাই কোন ভুলই তোমার ভুল নয়, তোমার কোন মিথ্যাই মিথ্যা নয়—জীবনে যে সময় এতদিন ব্যয় হয়েছে তার কী মূল্য আছে! আর জীবন তো তোমার মিথ্যার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে না সজন। কারো জীবনই তো হয় না।

রাত্রিও শেষপর্যন্ত সকাল হল। সজন প্রথম ট্রেনেই উঠে বসল। ট্রেন ছেড়ে দেবার শেষ বাঁশি যখন বেজে উঠল বুকটা অতলে বাথায় হুহু করে উঠল। এতদিনের সুখ-দুঃখের জীবন চিরদিনের মত পিছনে পড়ে থাকবে! তাকে সঙ্গে নেওয়া হবে না। ছুটে চলে যাই রাত্রির কাছে তাকে একবার দেখে আসি। কিন্তু তখন আর সময় নেই, ট্রেন ছুটতে শুরু করেছে। নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছবার আগে কোন আবেগ দিয়েই একে আর থামান যাবে না।

(শেষ)

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
৮০ ইঞ্চির অধিক
৪০ হইতে ৮০
২০ " ৪০
১০ " ২০
১০ ইঞ্চির কম
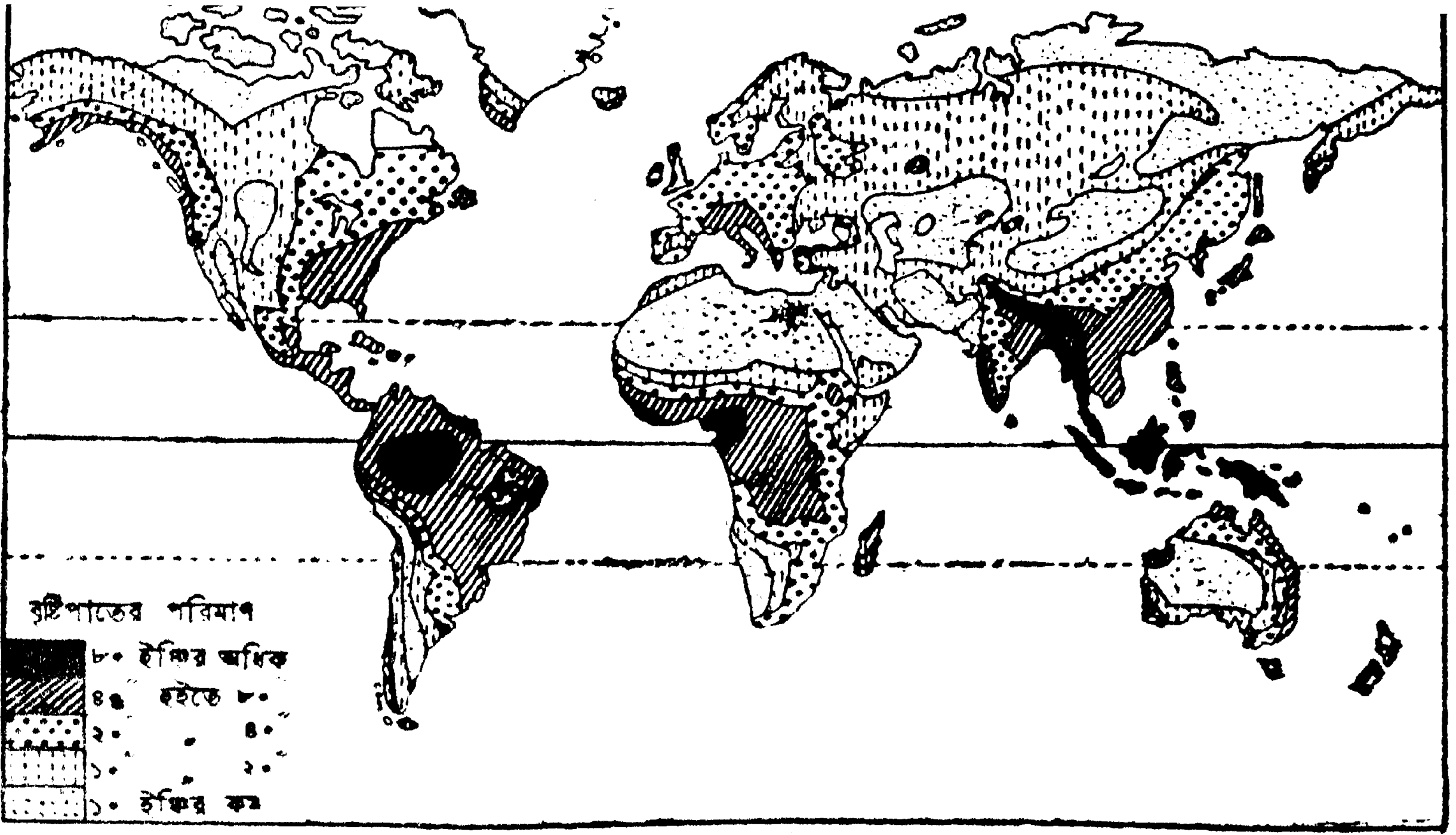
বিজ্ঞানের কথা

তিনভাগ জল একভাগ স্থলের এই পৃথিবীতেও জলের আকাল

শুনলে অবাক হতে হবে, এই পৃথিবীতে নাকি জলের আকাল দেখা দেবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হ্যাঁ, জলের আকাল, যদিও পৃথিবীতে মজুদ জলের পরিমাণ দেড় বিলিয়ন ঘন কিলোমিটার। বিলিয়ন মানে এক হাজার মিলিয়ন বা একশো কোটি, সংখ্যায় লিখতে হলে একের পর নটি শূন্য বসাতে হবে। এই বিপুল পরিমাণ জল মজুদ থাকা সত্ত্বেও আকালের আশঙ্কা করা হচ্ছে কেন? কারণ, মজুদ জলের পরিমাণ বিপুল বটে কিন্তু তার বেশির ভাগটাই নোনা—সমুদ্রের ও সাগরের জল, ব্যবহারের অনুপযোগী। টাটকা জলের পরিমাণ পৃথিবীতে খুব বেশি নয়, অনধিক ৩০-৫ মিলিয়ন ঘন কিলোমিটার। আবার এই টাটকা জলের সবটাই যদি মানুষের কাজে লাগত তাহলে কোনো কথা ছিল না। ৩০-৫ মিলিয়ন ঘন কিলোমিটার টাটকা জলের প্রায় সবটাই, সঠিক হিসেবে ৯৭ শতাংশ, জড়ো হয়ে আছে পর্বতের হিমবাহে ও মেরুদেশের বরফের অভ্যন্তরে। এই জল মানুষের কোনো কাজে লাগে না। বাকি থাকে ৩ শতাংশ বা ৮২৬,০০০ ঘন কিলোমিটার টাটকা জল। এই জল পাওয়া যায় নদীতে, হ্রদে ও মাটির নিচে। যে-জলকে বলা হয় মানুষের প্রাণ, এই হচ্ছে তার পরিমাণ, পৃথিবীর জলের মোট পরিমাণের ০-০৬ শতাংশ মাত্র। এই জলের ওপরে নির্ভর করেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে।

বিজ্ঞানীদের হিসেব থেকে জানা যায় বর্তমান পৃথিবীর মানুষের জলের প্রয়োজন বছরে প্রায় ৮,০০০ ঘন কিলোমিটার। তাই যদি হয় তাহলে, সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, যে-পরিমাণ টাটকা জল নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট।

তবুও কিন্তু টাটকা জলের আকাল দেখা দেবার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেন? এ-সপ্তাহের বিজ্ঞানের কথায় এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলতে চাই। তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে সোভিয়েত প্রচার দপ্তর প্রচারিত বুলেটিনে ওয়াই পভিলভের একটি প্রবন্ধ থেকে।

সকলেই জানেন, পৃথিবীতে টাটকা জলের একটি অবিরাম সঞ্চলন ঘটে চলেছে। সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়, বাষ্প জমাট বেঁধে মেঘ মেঘ থেকে বৃষ্টি, নদী-পথে বৃষ্টির জল আবার সমুদ্রে। এই ব্যাপারটি সবসময়েই ঘটে চলেছে, চক্রের মতো।

কিন্তু বৃষ্টি সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও বেশি কোথাও কম। বৃষ্টি বেশি হয়ে থাকে এশিয়ায়, আফ্রিকায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাঞ্চলে, ইউরোপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ আমেরিকায় ট্রপিক এলাকায়, কানাডায়। মোটামুটিভাবে বলা চলে বিশ্বের সমগ্র আর্দ্র এলাকায়। বহু পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাত খুবই বেশি। হিমালয়ের পাদদেশে কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টি হয়ে থাকে বছরে বারো মিটার। আর্দ্র এলাকায় অজস্র নদী প্রবাহিত হয়ে থাকে। পৃথবীর সমস্ত হ্রদ ও হিমাবাহও এই এলাকাতেই।

পৃথিবীর যে-সব এলাকাকে বলা হয় শুষ্ক বা অর্ধ-শুষ্ক এলাকা, সেখানে বৃষ্টি হয়ে থাকে খুবই কম, কোথাও কোথাও না হওয়ার মতোই। দশ বছরের মধ্যে মাত্র একবার বৃষ্টি হল, আফ্রিকায় এমন এলাকাও আছে।

ভূপৃষ্ঠের ডাঙার অংশে শতকরা প্রায় ৬০ শতাংশ শুষ্ক বা অর্ধ-শুষ্ক।

এই শুষ্ক বা অর্ধ-শুষ্ক এলাকাতেও রয়েছে বিশ্বের কয়েকটি অতি শিল্পোন্নত দেশ—যেমন, ব্রাজিল, চিলি, ইস্রায়েল, মেক্সিকো, ইরাণ, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, সৌদি আরব ইত্যাদি। এই দলে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডজনখানেক রাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি রিপাবলিক। এসব জায়গায় জলের যোগান কম, ফলে শিল্পগত ও কৃষিগত উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ থেকে সঙ্গে সঙ্গে যদি ধরে নেওয়া হয় যে জল সরবরাহের সমস্যাটি পুরোপুরি-

ভাবেই শুষ্ক বা অর্ধশুষ্ক এলাকার সমস্যা তাহলে ভুল করা হবে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশে টাটকা জলের ঘাটতি পড়েছে, এমন সব দেশেও যেখানে এই সেদিনও জলের সরবরাহ ছিল অঢেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি রাজ্য (ক্যালিফোর্ণিয়া, নিউ জার্সি, টেকসাস ইত্যাদি) 'জলক্লিষ্ট এলাকা' বলে ঘোষিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি এলাকায় টাটকা জলের সাংঘাতিক ঘাটতি। বিশ্বের কয়েকটি বড়ো বড়ো শহর—যেমন, নিউইয়র্ক, টোকিও, প্যারিস, সান পাউলো, বাকু, খারকভ ইত্যাদি—মাঝেমাঝেই জল-কষ্টে পড়ে যায়।

বিশ্বে জলের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু জলের যোগান বাড়ছে না। শিল্পে, কৃষিতে ও মানুষের ব্যবহারের জন্যে যে-পরিমাণ জল চাই, যোগান তার চেয়ে কম। আর জলের ঘাটতি দেখা দিলে অনিবার্যভাবেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, নতুন শিল্প গড়ে উঠতে পারে না, সবচেয়ে বড়ো কথা—মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে।

জলের যোগানে ঘাটতি পড়ার কারণ কি? কারণ, কলকারখানার ব্যাপক পত্তন, ক্ষেতেখামারে ব্যাপক জলসেচ, জীবনযাত্রার মানে উন্নতি এবং অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

মধ্যযুগে একজন মানুষ ব্যবহার করত দৈনিক ১০ থেকে ১৫ লিটার জল। এখন মাথাপিছু হিসেবে জল-ব্যবহার দৈনিক ১৫০ থেকে ৬০০ লিটার পর্যন্ত। তার ওপরে আছে শিল্পে ও কৃষিতে ব্যবহারের জন্যে জল। সব মিলিয়ে মাথাপিছু মোট জলের খরচ আরো বেশি। কোথাও কোথাও ৬,৫০০ লিটারের মতো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)।

বর্তমান কালে শিল্প দ্রুত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে জলের টান। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, এক টন রাসায়নিক তন্তু তৈরি করতে বিশুদ্ধ টাটকা জলের দরকার ২,০০০ ঘনমিটার। এক টন রবার বা অ্যালুমিনিয়ম তৈরি করতে ১,৫০০ ঘন-মিটার। এক টন ইস্পাত তৈরি করতে ১২০ ঘনমিটার। এক টন নিউজপ্রিন্ট তৈরি করতে ৯০০ ঘনমিটার।

কৃষির জন্যে আরো বেশি পরিমাণ টাটকা জল চাই। খাদ্যের ফলন বাড়াতে হলে আবাদের এলাকা বাড়াতেই হয়। ফলে জলের খরচও বাড়ে। যে-সব জমিতে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার সাহায্যে চাষ হয় সেখানে প্রতি হেক্টর জমির জন্যে বছরে জল দরকার হয় প্রায় ২,০০০ ঘনমিটার। এক টন দানা-শস্য ফলাতে জল চাই ১,০০০ ঘনমিটার। এক টন ধান ফলাতে ৪,০০০ ঘনমিটার। সারা পৃথিবী জুড়েই জলের চাহিদা এমনিভাবে প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছে। অথচ টাটকা জলের স্বাভাবিক যোগান বাড়েনি। ফলে যোগান আর খরচের মধ্যে বেশ বড়ো রকমের ফারাক।

সারা বিশ্ব জুড়েই তাই জলের আকাল দেখা দেবার আশঙ্কা। জাতিসংঘের য়ুনেস্কো তাই জল-সরবরাহের সমস্যাটির ওপরে খুব বেশি রকমের গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যতোখানি গুরুত্ব-পূর্ণ, য়ুনেস্কোর মতে জলের আকালের বিরুদ্ধে সংগ্রামও তার চেয়ে কম নয়। য়ুনেস্কোর হিসেব অনুসারে, বিশ্বের মোট অধিবাসীর তিনভাগের একভাগ যদি থেকে থাকে ক্ষুধার মধ্যে তাহলে অর্ধেক আছে জলের আকালের মধ্যে।

বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সামনে আজ একটি বড়ো প্রশ্ন: জলের আকাল রোধ করা এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে জলের ব্যবস্থা করা।

সঙ্গত কারণেই বিজ্ঞানীদের নজর গিয়েছে সবার আগে মাটির নিচের জলের সঞ্চয়ের দিকে। ভূ-বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মাটির নিচে বিরাট বিরাট এলাকা জুড়ে আছে জলাধার (আর্টেজীয় বেসিন), এমনকি সাহারার নিচেও। তবে এক্ষেত্রেও আশঙ্কার কারণ ঘটেছে। মাটির নিচের এই জল এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে যে শূন্যস্থানের টানে সমুদ্রের জল মহাদেশের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার আশঙ্কা।

ব্যবহারের পরের নোংরা জল বিশুদ্ধ করে নিয়ে আবার ব্যবহার করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়েছে, এটা খুব বেশি খরচের ব্যাপারও নয়, অসম্ভব ব্যাপারও নয়। নভশ্চররা যেদিন মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে পাড়ি দেবেন, তাঁদের জল-সরবরাহের সমস্যার সমাধানও এইভাবেই করা হবে ঠিক করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবহারের পরের নোংরা জল বারবার বিশুদ্ধ করে নিয়ে বারবার তাঁরা ব্যবহার করে চলবেন।

মেরুদেশের বরফ জলের একটি বড়ো উৎস। শুধু বড়ো নয়, বলা যেতে পারে সব-চেয়ে বড়ো উৎস। মাঝারি আকারের একটি হিমবাহ তৈরি হতে কোটি কোটি টন জলের দরকার—বড়োগোছের একটি নদী থেকেও সারা বছরে তার চেয়ে বেশি জল পাওয়া যায় না। মেরুদেশের জলে হাজার হাজার হিমবাহ ভেসে বেড়াচ্ছে। গরম আবহাওয়ার দেশের উপকূলে এই হিমাবাহকে টেনে আনার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে আর কোনো সমস্যাই থাকে না। সম্প্রতি এই ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞানীমহলে প্রচুর আলোচনা চলছে। ক্যালিফোর্ণিয়া, ব্রাজিল ও আমেরিকার কয়েকটি অঞ্চলের জলকষ্ট হিমবাহের জলের সাহায্যে দূর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

খাল কেটে কেটে এক এলাকার টাটকা জলের সরবরাহকে অপর এলাকায় নিয়ে যাবার কথাও বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। এক্ষেত্রে খরচ নির্ভর করছে খাল কতখানি লম্বা হবে এবং খাল দিয়ে কি পরিমাণ জলের যোগান যাবে তার ওপরে।

জলের সবচেয়ে বড়ো উৎস অবশ্যই সমুদ্র। বলা যেতে পারে, অফুরন্ত উৎস। তবে সমুদ্রের নোনা জলকে মিষ্টি জলে পরিণত করার উপায় থাকা দরকার। উপায় আছে দুটি। এক, সমুদ্রের জলকে গরম করে বাষ্পে পরিণত করা, এই বাষ্পকে ঠান্ডা করে জল। দুই, সমুদ্রের জলকে ঠান্ডা করে বরফে পরিণত করা, এই বরফ গলিয়ে জল। বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত প্রথম উপায়টি নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন।

সমুদ্রের জলে আছে নুন ছাড়াও বহু মূল্যবান পদার্থ—সোনা, টাইটেনিয়াম, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি। সমুদ্রের জল থেকে বিশুদ্ধ জলের অংশটুকু বার করে নেওয়ার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে এই পদার্থগুলোও বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে।

সামরিক প্রয়োজনে ব্যয়

স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইন্স্টিটিউটের ইয়ারবুকে বিশ্বের অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে সামরিক প্রয়োজনে বিশ্বের যে-পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করা হত এখন ব্যয় করা হচ্ছে তার ৩০ শতাংশ বেশি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ শতাংশ বেশি। ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত অন্য দেশগুলোতেও সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় বৃদ্ধি যথেষ্ট বেশি।

অন্যান্য এলাকাতেও কম নয়। আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় মধ্যপ্রাচ্যের এমন দেশগুলিতেও সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় যথেষ্ট বেড়েছে। আফ্রিকায় বাড়ছে প্রতি বছরে সাত থেকে আট শতাংশ হারে। সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় সামান্য মাত্রায় বেড়েছে একমাত্র ইউরোপের জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলিতে ও ল্যাটিন আমেরিকায়। বিশ্বে বর্তমানে যে-পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে তার সাত থেকে আট শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে সামরিক প্রয়োজনে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্যয় করা হত ৩-৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি পনেরো বছরে ব্যয়ের মাত্রা দ্বিগুণ হচ্ছে।

আধুনিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে উন্নত যুদ্ধাস্ত্র এখন আর তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতেও অপরিচিত নয়। এমনি উনিশটি দেশের সংগ্রহে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও আছে (১৯৫৭ সালে একটিরও ছিল না)। শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী (সুপারসোনিক) বিমান আছে তৃতীয় দুনিয়ার ৩২টি দেশে (১৯৫৫ সালে একটিরও ছিল না)। মোট সামরিক ব্যয় এই দেশগুলিতে যদিও অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশি। ষাটের দশকে বিশ্বের অস্ত্র-সরবরাহের ৭০ শতাংশ করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে।

—অয়স্কান্ত

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবুও মঞ্চের খবর রাখি বৈকি। স্টারে শ্যামলীর দ্বিশততম অভিনয়রজনীর স্মারক অনুষ্ঠান হলো ২৫ আগস্ট। তার পরদিনই ছিল ভাগ্যলক্ষ্মীর রাজপথ চিত্রের মহরৎ। যে মহরৎ অনুষ্ঠানে চিত্রজগতের অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো।

অভিনেতৃ সঙ্ঘের মিটিং ছিল বসুশ্রী সিনেমায়। মিটিং-এ নানা আলোচনার মধ্যে রাজ্যপালের যক্ষ্মা আরোগ্যভার নিকে-তনের সাহায্যার্থে, ভেটারেন বনাম অভিনেতৃ সংঘ ফুটবল ম্যাচের বিষয় আলোচনা হলো। প্রস্তাবিত ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১৮ সেপ্টেম্বর।

সেদিনের চ্যারিটি ম্যাচে অতীতের ফুটবলজগতের অনেক দিকপাল উপস্থিত ছিলেন। সুধীর চ্যাটার্জি ছাড়াও পুরাতন দিকপাল খেলোয়াড়দের আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এই চ্যারিটি ম্যাচে সংগৃহীত হয়েছিল চোদ্দ হাজার, ছ'শ দু' টাকা। যে টাকাটা রাজ্যপালের যক্ষ্মা আরোগ্যভার নিকেতনের তহবিলে দেওয়া হয়েছিল।

বেশ কিছুদিন পর আবার একটা ভ্রমণ-সূচী তৈরি হলো। এমন কিছু দূরে নয়—হাজারীবাগ যাওয়াই ঠিক। ১৬ অকটোবর রাঁচী এক্সপ্রেসযোগে রওনা হলাম। দলটিও খুব ছোট নয়, সপরিবারে চলেছি।

রামগড় পৌঁছলাম পরদিন ১৭ অকটোবর। ঐ দিনেই হাজারীবাগ।

একটি মনোরম বাংলো আমাদের আশ্রয়। এই হাজারীবাগের বাংলোয় অমৃতবাজার পড়তে গিয়ে একদিন নজর পড়লো একটি খবর—যেখানে সঙ্গীত নাটক আকাদমীর প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে একটি সংবাদ। পড়লাম, উদয়শঙ্কর নিযুক্ত হয়েছেন ডীন অব ড্যান্স। আর আমার নামও প্রকাশিত হয়েছে, ওই একই বিশেষণ নিয়ে। ডীন অফ ড্রামা।

বাইরে এসে কোথাও স্থির থাকতে পারি না। যেটুকু সময়, ভরিয়ে নিই ঘুরে বেড়িয়ে। যা কিছু দেখার সবই দেখি। এতো দেখি, তবু হয়তো অনেক কিছু অদেখা থেকে যায়।

ভিলাইয়া বাঁধ, রামগড় রাজের প্রাসাদ, প্রভৃতি আরো অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে চারদিকের পাহাড় আর অরণ্যকে। এই আরণ্যক পরিবেশে কোন পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও একটা অব্যক্ত আনন্দ মিশে থাকে, যে আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

জীবনে আমি এমন একটা জগৎ বেছে নিয়েছিলাম, কর্মক্ষেত্র হিসেবে—যেখানে সবই আছে, শুধু আপনাকে আত্মস্থ করার অবসর নেই। অথচ নিজের মধ্যে নিজেকে দেখার, একটু অবসর—এই তো খুঁজে বেড়িয়েছি সারা জীবন। এই অবসর যদি কোথাও পেয়ে থাকি, তবে তা জনকোলা-হলের বাইরে, হয় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রে না হয় কোন আরণ্যক পরিবেশে।

নানা জায়গায় বেড়াই। হাজারীবাগ এসে কাছেপিঠে যতটুকু দেখার দেখলাম। বোকারো দেখতে গেলাম একদিন। আধুনিক বিশ্বকর্মার বিরাট কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করলাম।

কিন্তু এতোর মধ্যেও নতুনত্বের স্বাদ পেলাম নরসিংহ স্থান মেলায়। হাজারীবাগ থেকে মাইল তিনেক দূরে একটি গ্রামের মন্দিরকে ঘিরে এই মেলা। মেলা উপলক্ষে দূর-দূর গ্রাম থেকে অজস্র নারনারী আসে। বিচিত্র এই মেলার চরিত্র। সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমন। মেলার সর্বাঙ্গীন মধ্যে সঙ্গতির চেয়ে অসঙ্গতিই যেন বেশী। তাই বোধ হয় মেলা এমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে।

হাজারীবাগ থাকতে একদিন গয়া গেলাম। গয়াতে এসে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ না করলে নয়। আমিও ফল্গু নদীর তীরে বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করলাম।

এতোদিন শুনে এসেছি রাজরাপ্পার ছিন্নমস্তা মন্দিরের কথা। এবারে দর্শনের সুযোগ পেলাম। দামোদরের ওপর, ভেরা নদীর প্রান্তের ধারে বিখ্যাত ছিন্নমস্তার মন্দির। শুনেছি, দেবী এখানে জাগ্রতা।

রামগড় গোলা রোড হয়ে আমরা সদলে এসেছি দেবী ছিন্নমস্তার মন্দিরে। দর্শন করেছি দেবী—পূজো দিয়েছি, গ্রহণ করেছি দেবীর প্রসাদ। মন্দির সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পাহাড়ের পটভূমিকা। দেখলাম গভীর ঘাসের ভিতর দিয়ে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে প্রপাতের জল ছুটে চলেছে। সত্যি, এখানেই মানায় দেবী ছিন্নমস্তাকে।

দেবী ছিন্নমস্তাকে নিয়ে নানা কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে আছে। সে সব কাহিনীর অবতারণা এখানে করতে চাই না—তবু মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো, আমরা যেন এক কিংবদন্তীর রাজ্যে এসে সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে এসে পৌঁছেছি।

হাজারীবাগের দিন ফুরিয়ে এলো। হয়তো কলকাতা থেকে বাবুলালজীর তার না পেলে আরো কয়েকটা দিন থাকতাম।

কিন্তু আর থাকার উপায় নেই। এখনো নির্মিয়মান ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছি—না গেলে তো চলবে না।

সতেরোই নভেম্বর হাজারীবাগ থেকে রওনা হয়ে পরদিন কলকাতায় এসে পৌঁছলাম।

আবার সেই পুরোনো পরিবেশ, আবার সেই দৈনন্দিন জীবনের গুরু টেনে চলা।

তবু একটা বৈচিত্র্য খুঁজে পেলাম, আকাদমী নিয়ে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল—কিছু অভিনেতা, অভিনেত্রীর জন্যে। দরখাস্তও এসেছিল। তাদের ইন্টার-ভিউ নেওয়া হলো ২০ নভেম্বর।

পরদিন সকালে নাট্যকার শচীন সেন-গুপ্ত, বীরেন ভদ্র, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এলেন আমার বাড়িতে। প্রায় ঘণ্টা-খানেক কাটলো নানা গল্পে।

আজকাল এ ধরনের বৈঠকী গল্প মন্দ লাগে না। কিন্তু গল্প করে কাটাবার মতো সময় কই। সামনে তো কাজের দিন পড়ে রয়েছে।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে রাজভবনে যেতে হলো ২৭ নভেম্বর।

বোম্বে এবং কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে একটি ক্রিকেট খেলার আয়োজন চলছে, উদ্দেশ্য রাজ্যপালের তহবিলে সাহায্য।

আবার ঐ দিনেই লোকরঞ্জন শাখার জন্যে কয়েকজনের ইণ্টারভিউ নেওয়া হলো। সেখানে আমি ছাড়াও পঙ্কজ মল্লিক এবং মাথুর উপস্থিত ছিলেন।

এ সবের মধ্যেও ছবির কাজ আছে। শ্রীমতী পিকচার্সের দেবত্র ছবির সুটিং ছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। শিল্পীদের মধ্যে কানন দেবী এবং গুরুদাসও ছিলেন।

অভিনেতা শরৎ চাটুজ্যের জীবন এভাবে শেষ হবে, এ স্বপ্নেরও অতীত। মৃত্যু তার আকস্মিক, কিন্তু দুঃখ তার জন্যে নয়, দুঃখ তার জীবনের শেষ দিনগুলোর জন্য।

শরতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তাকে তো দেখেছি, মানুষ হিসেবে সে ছিল সাধারণ মানুষের চেয়ে বড়ো। বিশেষ করে তার হৃদয় মনের ব্যাপ্তি ছিল অনেকখানি। স্বার্থপরতা ছিল না, এমন কথা বলবো না, কিন্তু হীন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে সে কখনো চলে নি। নিজে থিয়েটার করেছে, মালিক হয়েছে, অনেক গর্বও পেয়েছে—কিন্তু যতো না রোজগার করেছে তার চেয়ে খরচ করেছে অনেক বেশী। ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করা দূরে যাক, হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভাবেও নি। আর তারই জন্যে হয়তো এই পরিণতি।

যে মানুষ ছিল থিয়েটারের মালিক অভিনেতা, যে দামী গাড়ী ভিন্ন চড়তো না, দামী পোশাক ছাড়া পরতো না, খরচ করতো দু' হাতে—সেই মানুষে শেষটা যাত্রা করতে আরম্ভ করেছিল আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে।

অন্ন মরবার আগের রাত্রেও সে যাত্রাভিনয় করে ভোরে বাড়ি এসেছিল। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ বাদেই মানুষটা অচমকা ফুরিয়ে গেল।

শরতের মৃত্যুর খবর পেলাম স্টুডিও-য় বসে। মনটা খারাপ হলো। শিল্পী-জীবনের এমন মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি কোন শিল্পীই কামনা করে না। বিলাসের মধ্যে প্রাচুর্যের মধ্যে যার দিন কেটেছে, তার জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটালো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। আর এই দারিদ্র্যই বোধ হয়, তাকে এমনভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বছরটা শেষ হতে আর কদিনই বা বাকী। বাকী দিনগুলোর কথা আর কি বলবো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা, অভিনেতৃ সংঘ—এ সব নিয়েই কাটলো। এর মধ্যে দুটির ছবির কাজ অবশ্য করেছি, ছবি দুটো হলো ভারতলক্ষ্মীর রাজপথ আর শ্রীমতী পিকচার্সের দেবত্র।

শেষ হলো উনিশ শ চুয়ান্ন। নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে স্বাগত জানালাম প্রতিবারের মতো।

বছরের প্রথম দিনটিতে অনুরোধ এলো মহেন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে। মহেন্দ্রবাবু মিনার্ভা নিয়েছেন। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাহাঙ্গীর অভিনয়ের আয়োজন করছেন। মহেন্দ্রবাবু এলেন আমার কাছে। অনুরোধ, আমি যেন মিনার্ভায় যোগ দিই।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি আর পারবো না অভিনয় করতে।' আমার কথা আমি জোরের সঙ্গেই বললাম। নতুন করে আর জড়াতে চাই না যেটুকু জড়িয়ে আছি, তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি।

মহেন্দ্রবাবু চলে গেলেন। এ ব্যাপারে মণিলালবাবুও আসতে চেয়েছিলেন আমার কাছে। আমি না করলাম।

আর অভিনয় নয়—আর পারবো না। এবারে নতুন করে জীবনকে দেখতে চাই। জানি না আমার সে আশা পূর্ণ করতে পারবো না কিনা। কিন্তু আশা নিয়েই তো মানুষ বাঁচে। আমি তো তার বাইরে নই।

তবুও নাট্যজগতের খবর রাখি। শুনলাম, শিশিরবাবু শ্রীরঙ্গমে মিশরকুমারী করছেন। আর শিশিরবাবু অভিনয় করছেন আবনের ভূমিকায়। কিন্তু মিশরকুমারী কদিন চলেই বন্ধ হলো। আবার ঐ একই নাটক মিনার্ভায় অভিনীত হলো মহেন্দ্রবাবুর পরিচালনায়। সেখানে আবনের ভূমিকায় আছেন মহেন্দ্রবাবু।

ভারত-চীন সুহৃদ সমিতির সহ-সভাপতি ছিলাম আমি। সুতরাং চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের কলকাতা আগমন উপলক্ষে আমার কাজ কিছুটা বাড়লো বৈকি।

চীনা প্রতিনিধি দল হাওড়া স্টেশনে এলে তাঁদের স্বাগত জানাতে আমাকেও যেতে হয়েছিল। সেদিন তারিখ ছিল ৬ জানুয়ারী। ঐ দিনেই কলকাতার মেয়র নরেশ মুখার্জী চীনা প্রতিনিধি দলকে পৌর সম্বর্ধনা জানালেন। সেখানেও আমাকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

পরদিন ৭ জানুয়ারী চীনা প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা জানালো চীনা কন্সাল অফিসে। সেখানেও কলকাতার শিল্পীগোষ্ঠীর অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অর্ধেন্দু মুখার্জি, সুপ্রভা মুখার্জী, জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, সরযূবালা, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত প্রমুখ ছিলেন।

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। আর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আমি উপস্থিত ছিলাম।

অভিনেতৃ সংঘ যে চীনা প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধিত করেছিল, সেখানে শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে অভিনীত হয় শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌল্লা। নাটকে আমি ছিলাম গোলাম হোসেন, আর নামভূমিকায় ছিলেন ছবি বিশ্বাস।

পুরোনো দিনের কথা লিখতে বসলে, সব কিছুর যেন খেই হারিয়ে যায়। ছোট বড়ো কতো ঘটনা দিনপঞ্জীর পাতায় পাতায়। তার মধ্যে কতক লিখি, কতক লিখি না।

শ্যামলী সে সময়ের একটি মঞ্চসফল নাটক। ঐ নাটকটির তিনশত রজনীর স্মারক অভিনয় অনুষ্ঠিত হলো ১৫ই জানুয়ারী। ফেব্রুয়ারী মাসের এগারো তারিখে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ললিতকলা আকাদমীর উদ্যোগে 'হাঙ্গেরীর লোকশিল্প' প্রদর্শনীর উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল। এখানেই লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্তীর আলাপ করিয়ে দিলেন। শ্রীচক্রবর্তী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ।

দিল্লীতে যে ফিলম সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, তাতে বাংলাদেশ থেকে যোগ দেবার কথা ছিল ছবি বিশ্বাসের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেই যেতে হলো।

বাইরে যাবার নামেই আমি মানুষটা যেন বদলে যাই। দিল্লীর পথে রওনা হলাম ২৪শে ফেব্রুয়ারী। আমি একা নই—চলেছি সপরিবারে। এ ছাড়া আছেন দেবকী বসু, সৌরীন সেন ছাড়া আরো অনেকে। পথে মথুরা দর্শন করলাম। বৃন্দাবনও বাদ গেল না।

তীর্থস্থানে এলে সুধীরা তো কোন মন্দিরই বাদ দেয় না। বৃন্দাবনে যতো মন্দির সর্বত্র গেল। দেবতা দর্শন করলো। আমিও এ সবের বাইরে নই। তবুও সুধীরার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক তফাৎ। ও যখন দেবতার কাছে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করে, হয়তো আমি তখন মন্দিরগাত্রে কোন শিল্প-নিদর্শন দেখতে ব্যস্ত।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

চোরের খবরটা কি পুলিশে দেওয়া দরকার?
লাভ কি হবে তাতে? শুধু ঝামেলা বাড়বে। আমার আসল
চোরের ব্যাপারটা কি সম্পূর্ন বানানো?
বেশত করুন না প্রশ্ন। আঙুল দেখতে চাওয়ার মত আজগুবি প্রশ্ন নিশ্চয়ই নয়!
না, তা নয়। আপনি জামিনে ছাড়া পেয়েছেন, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে পুলিশের চার্জটা কি তা জানেন?

আমি ঠিক জানিনা, তবে ওদের জেরা থেকে মনে হচ্ছে খুনের প্রমান লুকিয়ে আমি খুনীকে আড়াল করছি— এই ওদের সন্দেহ। তা ছাড়া—
পুলিশে খবর দিইনি কেন, সেটাও একটা বড় অভিযোগ।
তখনই বলেছিলাম রতনলালজি, এই ভুলটার জন্যে আপনি বিপদে পড়বেন।
কিন্তু ভুলটা কেন যে করেছি তাত আপনি জানেন।
পুলিশকে যে কথা জানালে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগও বাড়বে। আচ্ছা, এখন চলি রতনলালজি, দেখি কি করা যায়!

চলে যেতে বলা সত্ত্বেও রতনলালজির বাড়ির বাইরে রামজীবনের ট্যাক্সি ঠিক খাড়া।
কি আশ্চর্য! রাম জীবন
পরাশরের চোরের গল্পটা বানানো নয় বলেও জানা যায়
এ বাড়ি থেকে আমাদের আগে কেউ বেরিয়েছে?
আজ্ঞে হাঁ স্যার, বড় অদ্ভুত ব্যাপার!
মুখে চাদর মুড়ি দেওয়া একটা লোক ওধারের দেওয়াল টপকে নেমে দৌড়ে গেল। গাড়ি ছেড়ে যাব কিনা ভাবতে ভাবতে সে ওদিকে উধাও।

অঙ্গনা

জনপ্রিয় শাড়ি-ওড়না

একটা কথা সেদিন ভাবিনি। কিন্তু আজ ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য এর মহড়া শুরু হয়ে গেছে চাল আমাদের বেচাল করার অনেক আগে থেকেই। চালের বদলে রুটি-সবজি খেয়ে খাদ্যাভ্যাসে বিপ্লব আনছি। সেটা নেহাত বিপাকে পড়ে। কিন্তু আরেক-দিক থেকে রমরমা সত্ত্বেও অন্যের মোহে অলরেডি মজে বসে আছি। তা হলো ট্রাউজার্স। এর প্রতাপে ধুতি এখন শহর এলাকায় ক্রমেই অদৃশ্য হচ্ছে। ট্রামে-বাসে আর রাস্তা-ঘাটে খুব কম লোকই ধুতি-শোভিত দেখা যায়। ট্রাউজার পরাটা ইদানিং একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই এ-ঘাটে মাথা মুড়োচ্ছেন। যাঁরা বাদ ছিলেন তাঁরাও। দেখতে দেখতে চোখটা পচে যাচ্ছিল। একদিন সরাসরি একজনকে জিগ্যেস করে বসলাম। কলেজে পড়ি। কো-এডুকেশন। এক সহপাঠী নিয়মিত ধুতি পরে আসতো। সেভাবেই তাকে দেখতে অভ্যস্ত। অত সহপাঠীর মধ্যেও ধুতি পরা জনাকয় সহজ মনোযোগ আকর্ষণ করে। হঠাং দেখি একদিন সেই ছেলেটি ধুতি ছেড়ে প্যান্ট পড়েছে। আশা করিনি। খারাপ লাগলো। কারণ জানতে চাইলাম। বাস-ট্রাম, চলাফেরা ইত্যাদি নানাকথা আউড়ে পরিশেষে টীকা জুড়ে দিল, ইকনমিক। পাশেই দাঁড়ানো আরেক সহ-পাঠী মন্তব্য করলো, ট্রাম-বাস ওসব কিছু নয়, তবে শেষের কথাটা কিছু সত্যি। ধুতি পরা সেই সহপাঠী প্যান্টের তুলনায় অনেক বেশি জ্বলজ্বল করছিল। আর সেই মুহূর্তে ওকে অসম্ভব স্মার্ট মনে হচ্ছিলো।

সেদিনই বোঝা যাচ্ছিল ধুতির বাজার শেষ। এবার এর রেশ হয়তো পাওয়া যাবে পালে-পার্বণে। কিন্তু সে আশাও নস্যাং হয়ে গেছে। এখন উৎসবের আলোয় সাজতে গিয়ে সকলের মনে পড়ে ট্রাউজারের কথা। ধুতি হলো তোলা পোশাক। তবে খুব কমই পরা হয়। আবার কারো কারো সব সময়েই তোলা থাকে। এভাবে এক বিদেশী পোশাকের দাপটে দিশী পোশাককে আমরা ভুলে বসে আছি। অন্যভাবে বলা যায়, ভুলতে বাধ্য হয়েছি।

প্রসঙ্গান্তরে কিছুটা আলোচনা হলো বটে কিন্তু অবস্থা আজকে এরকমই। এবার একটু অন্যদিকে নজর ফেরানো যাক। সম্প্রতি নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে, ভারতীয় ওড়না বিদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহের অন্যতম সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবছর ছয় কোটি টাকার ওড়না বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও অর্থমূল্যে যা ছিল মাত্র দুই কোটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ-খবরে সবাই উৎসাহিত হবেন। ভারতীয় পোশাক বিদেশী ললনাদের অঙ্গ আলো করছে একথা আমাদের জানা থাকলেও এতটা জনপ্রিয়তার তথ্য অবজ্ঞাতই ছিল। সেদিক থেকে বরং শাড়ি যে বিদেশে কেউ কেউ পোশাক হিসেবে পছন্দ করছেন সেটাই আমাদের বেশি জানা ছিল।

শাড়ি এবং ওড়না এই দুই পোশাকই বিদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে। আর সে দেশ-গুলির মধ্যে আছে ফ্যাশানে বিপ্লবসৃষ্টি-কারীরা পর্যন্ত। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ও'রা মেতেছিলেন। একই পোশাক কত-রকম ছাট-কাট করে নতুন ফ্যাশান হিসেবে ও'রা বাজারে ছাড়ার চেষ্টা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই ফ্যাশান কখনো হাঁটু ছুঁয়েছে। আবার কখনো হাঁটু ছাড়িয়ে গোড়ালির ওপর দিয়ে চলাফেরা করেছে। কিন্তু সে ফ্যাশানে সাময়িক আলোড়ন ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হয়নি। নতুন স্বাদ জোগানোর সকল চেষ্টাই বন্ধ জলাশয়ের মতো এপারে-ওপারে ধাক্কা মেরেছে।

তাই এবার ওদের আর একটা প্রয়াস দেখা গেল মিনির প্রবর্তনে। রাতারাতি মিনিতে বাজার ছেয়ে গেল। মিনি স্কার্ট আর মিনি জামা ছাড়া কোন পোশাক নেই। সেই ঢেউ আমাদের পর্যন্ত নাড়া দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সব পোশাককে খরচের খাতায় জমা করে এই নিয়ে আমরাও মস্ত হয়ে গেলাম। বেশি কিছু ভাববার ফুরসতও ছিল না। পিছিয়ে পড়ে আফশোষ করে লাভ নেই। তাই দিনের সঙ্গে তাল মেলাতে বাধ্য হলাম।

এখন আবার মিনির বাজার ঢিমে হয়ে এসেছে। পুরোপুরি রেশ কেটে না গেলেও অনেকেই নতুন কিছুর সন্ধান করছেন। বার্মিজ ঢঙে লুঙ্গি-কামিজ এবার ফ্যাশানে নতুন যোগান। এই ফ্যাশান তেমন বাজার অবশ্য এখনো পাচ্ছে না। তবে কেউ কেউ পছন্দ করছেন। হয়তো সবাই একবার অন্তত চেখে দেখবেন। নতুন কিছু না বের হওয়া পর্যন্ত এই ফ্যাশান চলবে।

উঠতি মেয়েদের মধ্যে চলতি ফ্যাশানই জনপ্রিয়। ওরা শাড়ির কথা বড় একটা ভাবে না। অথচ একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা বড় হয়ে শাড়ির কথাই ভাবতো। কবে শাড়ি পরতে পাবে সেই রঙীন ভাবনায় মশগুল হয়ে থাকতো। আর যেদিন অন-ভ্যস্ত শরীরে শাড়ি চাপাতে পারতো সেদিন তার আনন্দের কথা বলে বোঝানো যায় না। রাস্তা দিয়ে এমনভাবে চলাফেরা করতো যেন সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়িতে সবাই ঠাট্টা করতো, তোকে যে আর চেনা যাচ্ছে না। এবার বিয়ের চেষ্টা দেখতে হয়।

ঠিক এরকম আকাঙ্ক্ষা বোধহয় উবে গেছে। তার পরিবর্তে বাজার-চলতি ফ্যাশান সকলের মন টানে। এমনিভাবে এক্ষেত্রেও আমরা বেপাত্তা হতে চলেছি। ট্রাউজার ধুতির রাজ্য থেকে আমাদের উৎখাত করেছে। আর নতুন ফ্যাশানের ঢেউ এবার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শাড়ি থেকে। এরই মধ্যে বোমা ফাটানোর মতো খবরটা এসে পৌঁছুলো, বিদেশে শাড়ি-ওড়না ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে।

আদিম মানুষ বাকল পরতো। সেদিনও ফ্যাশান ছিল। তারপর বুদ্ধি-বৃত্তির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজ নিজ পোশাক রূপ নিয়েছে। আমরা পছন্দ করেছি শাড়ি। সারা শরীর ঢেকে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। অন্যান্যরা অন্যভাবে ভেবেছেন। আদিমতার লজ্জা ঢাকার জন্যই সারা শরীর আবৃত করেছি। সেই সৌন্দর্য কিছু কম নয়। সবকিছু অপ্রকাশ রেখেও এমন সুষ্ঠু সৌন্দর্য আর নেই।

দিনকাল বদলেছে। অনেকে এতে সন্তুষ্ট হয়নি। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দেহসৌন্দর্য প্রকাশ রেখে ফ্যাশান চাই। যোগানদার প্রস্তুতই ছিল। যা কিছু চাহিদার দরকার। সে চাহিদা যখন সৃষ্টি হলো আর দেরি নয়। বাজার আলো ফ্যাশান সব বেরুতে লাগলো। সুঠাম শরীরের নিখুঁত মাপে। সবই স্পষ্ট। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। এক-বারও ভেবে দেখার সুযোগ হলো না যে দিন দিন এভাবে এগুতে থাকলে যেখান থেকে আমরা উঠে এসেছি, আবার সেখানে ফিরে যাবো। সেই পরিণতিটা খুব একটা ভয়াবহ হবে না। কারণ সেই আগামী প্রত্যূষে সকলের তো একই অবস্থা। উন্মুক্ত আলোয় স্বচ্ছন্দ বিচরণ করা চলবে, গুহা খুঁজতে হবে না।

বিদেশে শাড়ি-ওড়নার জনপ্রিয়তায় মনে হচ্ছে, সেই অনিবার্য পরিণতি পিছিয়ে যাচ্ছে। ফ্যাশানের কোন বৈচিত্র্যে ওদের মন ভরেনি। তাই এবার বেছে নিলো শাড়ি। মিনিতে অনেক সুপ্রকাশ থেকেও ওদের ফ্যাশান-তৃষ্ণা ছিল অতৃপ্ত। খোলা-মেলার চেয়ে ঢাকাঢুকিতে যে বাহার আরো খোলে এ বোধেই ওরা এবার হাত বাড়িয়েছে শাড়ির দিকে। চিরন্তন এই ফ্যাশানই শেষপর্যন্ত বাজিমাৎ করলো দেখা যাচ্ছে।

তবু ট্রাউজারের মোহ কাটবে কি? ধুতির কাছাকাছি ফিরে আসার চেষ্টা করবেন কি উঠতি যুবকের দল? কারণ, ফ্যাশানে তারাও বিশেষ মেয়েদের চেয়ে কম নয়। তবে আশা করা যায়, বিদেশে শাড়ি-ওড়নার কদরের পর উঠতি মেয়েরা এ সম্বন্ধে কুতূহলী হবে। সবদিক থেকে বেপাত্তা হবার আশঙ্কা অন্তত কিছুটা দূর হয়।

—[illegible]

প্রেক্ষাগৃহ

বিলেত ফেরৎ/পরিচালক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত, ক্যামেরাম্যান, ধ্রুব বোস ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

চলচ্চিত্র ভাষার সার্থক প্রয়োগ :

একদিন ছিল, যখন দৈনন্দিন বাস্তব জগতের কঠিন নাগপাশ থেকে অন্তত কিছুটা সময়ের জন্যে মুক্তি পাবার লোভে লোকে সিনেমা গৃহে গিয়ে কাহিনী চিত্রের মধ্যে স্রেফ ডুবে গিয়ে তার মনের পলায়নী-বৃত্তির বা এসকেপিজম-এর চরিতার্থতা সাধন করত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে চলচ্চিত্র ক্রমেই সৃষ্টিধর্মী চিত্রকারদের তথা পরিচালকদের করায়ত্ত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালী ও ফ্রান্সে ব্যাপারটা শুরু হয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল **সত্যজিৎ রায় কৃত ও প্রিয়া ফিল্মস নিবেদিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী'** ছবি দেখে। যিনি এই অত্যন্ত আধুনিক ছবিখানি দেখতে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে তাঁর আগে দেখা আর পাঁচটা ছবির মতো এই ছবিটিরও কাহিনীর গল্প-রসাস্বাদন করবার আনন্দ উপভোগ করতে চাইবেন, তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন। কারণ, ছবিখানি শুরুতেই তাঁর মনকে সজোরে নাড়া দেবে এবং ছবি যত এগুবে, ততই তিনি তাঁর চেয়ারে সোজা খাড়া হয়ে বসে ছবিটির সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠতে চাইবেন। আজকের কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত ঘরের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা নিত্য বিপরীত সংঘাতের দ্বারা কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে তার মধ্যে বিরাট নৈরাশ্যের সৃষ্টি করতে পারে, সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রভাষার সাহায্যে শ্রীরায় সেটিকেই সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করেছেন। বাঙ্ময় ছবি ও ধ্বনির সুষ্ঠু সমন্বয়ে তিনি এই ছবিতে যে চলচ্চিত্রভাষার প্রয়োগ করেছেন, তার তুলনা পাই আন্তোনিওনির 'লা আভেঞ্চুরা'তে। ভারতে এই চিত্রভাষার সার্থক প্রয়োগ এই প্রথম দেখা গেল।

ছবিটির মূল কাহিনীকারের নাম বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা বলব, সত্যজিৎ রায় তাঁর চিত্রভাষার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে যেভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন, সেই বক্তব্যকে ঐভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করা আদৌ সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র যে সাহিত্য নির্ভর নয়, তার যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পসত্তা আছে, সেই কথাই সুপ্রমাণিত করেছেন শ্রীরায় তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' চিত্রের মাধ্যমে।

ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ চৌধুরীর মন অতীতের সঙ্গে যুক্ত। জীবনের সনাতন মূল্যমানকে সে সহজে উপেক্ষা করতে পারে না। অথচ তার বাড়ীতেই সে দেখছে, তার বয়স্থা অবিবাহিতা ছোট বোন সুতপার তার অফিস-বসের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোকে অন্যায় মনে করে না। তার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারাকে সে গর্বের জিনিস মনে করে। এই ছোট বোনের সঙ্গে কি সম্প্রীতিই না ছিল তার ছেলেবেলায়। ছোট ভাই টুনু আজ বেপরোয়া; সে সামাজিক আদর্শকে ভেঙে ফেলতে চায়, পুরোজনের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। সিদ্ধার্থ সারা দিন ধরে আপিসপাড়ায় মনের মতো চাকরীর খোঁজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পর বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে সে একটু চাঙ্গা হয়। কিন্তু 'রেডক্রস'-এর চাঁদাভরা টিনের কৌটা থেকে টাকা বার করে নেওয়া, মদ খাওয়া কিংবা সুলভা নারীর সঙ্গ লাভ করায় তার মন আতঙ্কে ওঠে। তাই ওর বন্ধুরা বলে, পেটে ক্ষিধে, মুখে লাজ। সিদ্ধার্থ মুখ বিকৃত করে অল্প পরিমাণে মদ খায়ও, কিন্তু সুলভা নারী লতিকার বেহায়াপনা তার কাছে অসহ্য; তাই সে নিমেষে দূরে সরে যায়। অথচ কলেজে পড়া শিষ্ট মেয়ে কেয়ার সান্নিধ্য তার ভালোই লাগে। এমন কি, যখন সে মেডিক্যাল সেলসম্যান হিসেবে বালুরঘাটে বসবাস শুরু করেছে, তখন সে সুদূর দিল্লীতে চিঠি লেখে ঐ কেয়াকেই।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে শ্রীরায় চিত্রগ্রহণে আগাগোড়া যে পরিমিত শট্‌-এর প্রয়োগ করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। শেষ ইন্টারভিউ-এর দৃশ্যে কর্মকর্তাদের অমানুষিকতার প্রতিবাদে সিদ্ধার্থ যখন সবকিছু তছনছ করে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে আমরা রাস্তায় ক্ষণিকের জন্যে দেখার পরেই দেখি, ক্যামেরার সামনে দিয়ে সবেগে

অপসৃয়মান নানা লেখা-ভরা দেয়াল এবং পরে কিছু জিগ-জ্যাগ ডিজাইন। এরই পরে একটি কনুই যেন দ্রুত চলমান ট্রেনের জানলায় ভর করে রয়েছে এবং তার পরই একটি গ্রামাঞ্চলের খোলারাস্তা পার হয়ে একটি সিঁড়ির ওপরে রাখা ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা যায় একটি মোটা মাথায় লোকের পিছনে উঠছে সিদ্ধার্থ—সোজা কলকাতা থেকে বালুরঘাট। এবং দৃশ্য-গুলিকে অত্যন্ত সংক্ষেপে দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবহ-সৃষ্টির জন্যে প্রয়োগ করেছেন সঙ্গীত ও শব্দের সংমিশ্রণ। এক এক জায়গায় বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টির জন্যে তিনি যে কি কৌশল অবলম্বন করেছেন, তা সহজে বোঝাই যায় না। কি বাঙ্ময় চিত্র, কি ধ্বনি প্রয়োগে—কলাকৌশলের দিক দিয়ে এতখানি উন্নত; টেকনিক্যালি এত অ্যাডভান্সড ছবি শ্রীরায় এর আগে কখনো করেন নি।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র শিল্পিতালিকায় প্রায় সকলেই নতুন। এবং এই নতুনের মধ্যে নায়ক সিদ্ধার্থের ভূমিকায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র, তার্কিকাগ্রগণ্য ধৃতিমান (সুন্দর) চট্টোপাধ্যায় এই প্রথম চিত্রাবতরণেই যে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। আড়ষ্টতা নেই কোথাও—সর্বত্র তাঁর সহজ, সাবলীল ভঙ্গী, ইংরেজী বাচন শোনবার মতো। বন্ধু অবিনাশের ভূমিকায় কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ও বাচনে, ভঙ্গীতে অনবদ্য। সিদ্ধার্থের ছোট ভাই টুনুর বেশে শ্রীমান দেবরাজ রায়ও স্বচ্ছন্দভাবে তাঁর চরিত্রটি চিত্রণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীমান সুখ্যাত নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা তরুণ রায়ের পুত্র। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পাশ করা ছাত্র ভাস্কর চৌধুরী বন্ধু শিবনাথের ছোট্ট ভূমিকায় বিশেষ কোনো নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পান নি। সুতপার ভূমিকায় কৃষ্ণা বসু চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে। কলেজছাত্রী কেয়া চট্টোপাধ্যায়কে সুন্দর ও মধুর ভাবে চিত্রিত করেছেন জয়শ্রী রায়। একটি মাত্র দৃশ্যে অফিস-বস-এর উপেক্ষিতা স্ত্রীর ভূমিকায় আবেগপ্রবণ অভিনয় করেছেন মমতা চট্টোপাধ্যায়। হাসপাতালের সেবিকা, সুলভ চরিত্রের মেয়ে লতিকার ভূমিকায় সার্থকভাবে প্রকট করেছেন শেফালি। সুতপার অফিস-বস এবং কেয়ার বাবার ভূমিকায় যথাক্রমে শোভেন লাহিড়ী ও পিসু মজুমদার উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন। ছোট সিদ্ধার্থ টুনু ও সুতপা রূপে যে বালকদ্বয় ও বালিকাটি অবতীর্ণ হয়েছে তারা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। অপরাপর সকল ভূমিকাই প্রয়োজনীয়ভাবে সুঅভিনীত হয়েছে।

ছবির কলা-কৌশল সম্পর্কে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্যজিৎ রায়ের সার্বিক নির্দেশে প্রতিটি বিভাগের কর্মীই অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যথাসাধ্য। তবু বিশেষ করে এই ছবিটিতে পাখীর ডাক থেকে শুরু করে ধ্বনির সমারোহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। এ বিষয়ে জে ডি ইরাণী ও দুর্গাদাস মিত্র নিশ্চয়ই প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

শহুরে সমকালীন সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হচ্ছে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। এমন আধুনিক ছবি আমরা শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, ভারতীয় চিত্রজগতে আগে কখনও দেখি নি। তবে ছবিটি সম্পর্কে আমাদের দুটি অভিযোগ আছে, এক, ছবিটিতে ইংরেজীর বহুল প্রয়োগ; দুই, ছবিটিকে অপ্রত্যাশিতভাবে নায়িকার প্রতি নায়কের চিঠির মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। এ দুই-ই পরিহার করা চলত।

'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবি ভারতীয় চিত্র-জগৎকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর করে দিল। এবং এর জন্যে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ সত্যজিৎ রায়কে।

স্টুডিও থেকে

জয়া ভাদুড়ীর পর বাংলা ছবির নতুন নায়িকার তালিকায় আরেকটি নাম বাড়ল। নতুন মুখ নিয়ে কাজ করতে এখন সত্যজিৎ-মৃণালই নয়, প্রবীণ নবীন সবাই-ই চাইছেন। পরিচালক হীরেন নাগ এ পর্যন্ত যে-কটি ছবি করেছেন তার সব কটিই টপ কাস্টিং-এর ছবি। নতুন ছবি 'অন্ধ অতীত'-এ উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, স্বরূপ দত্ত প্রমুখরা রয়েছেন। কিন্তু 'নিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'র প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন শুভেন্দু চাটার্জি আর মধুছন্দা চক্রবর্তী।

নতুন যে নায়িকার কথা বলছিলাম মধুছন্দা চক্রবর্তীই তিনি। ছেলেবেলা থাকেন বোম্বাইয়ে। হীরেন নাগের এ ছবিতে তাঁর অভিনয়ই প্রথম নয়। বম্বের বাসু চ্যাটার্জির পরীক্ষামূলক ছবি 'সারা আকাশ'-এর নায়িকা চরিত্রেই তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ।

পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি কিছুদিন আগে কলকাতায় এ ছবির এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন সাংবাদিকদের জন্য। তখনই সৌভাগ্য হয়েছিল ছবিটি দেখবার। ঐ ছবির নায়িকা চরিত্রে শ্রীমতী চক্রবর্তীর অভিনয় ছিল শান্ত অথচ প্রাণবন্ত। হীরেন নাগের নবতম ছবি 'নিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'র নায়িকা চরিত্রে মধুছন্দা চক্রবর্তীর নির্বাচন প্রশংসনীয়।

পুজোর আগে শ্রীনাগ উত্তর ভারতে গিয়েছিলেন ছবির আউটডোরের কাজে। সম্প্রতি তিনি ফিরে এসেছেন। কাজ সব শেষ না হলেও বেশীর ভাগ হয়েছে তা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে। হনুমান চটি, গোমুখ প্রভৃতি জায়গায় তাঁরা কাজ করেছেন।

*

মঙ্গল চক্রবর্তীর পরবর্তী ছবির নাম হলো 'তিমির লগন'। মহাশ্বেতা দেবী লিখিত ঐ নামের সাড়াজাগানো উপন্যাস অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী নিজে। [illegible] এ ছবির সংগীত পরিচালনা করবেন গোপেন মল্লিক। প্রধান দুটি চরিত্রের জন্য এ পর্যন্ত মনোনীত হয়েছেন উত্তমকুমার ও তনুজা। আগামী সপ্তাহ থেকে চিত্রগ্রহণ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

*

চলচ্চিত্র মঞ্চ ও সংগীত শিল্পীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল শিল্পী সংসদ বছর দেড়েক আগে। সংরক্ষণ সমিতি অভিনেতৃ সঙ্ঘ ইত্যাদি নিয়ে যখন প্রচুর জলঘোলা হয়েছিল তখনই জন্ম নিয়েছিল শিল্পীসংসদ।

সম্প্রতি জানলাম এই সংস্থা চিত্র প্রযোজনার কাজে হাত দিচ্ছে। বনফুল চৌধুরীর বিখ্যাত উপন্যাস 'বনপলাশীর পদাবলী'-কেই আপাততঃ সংসদ বেছে নিয়েছেন ছবি করার জন্য। চিত্রনাট্য লেখা ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংসদ সভাপতি উত্তমকুমারের ওপর। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সংসদেরই সভ্য পাঁচজন সংগীত

পরিচালক। তাঁরা হলেন হেমন্ত, শ্যামল, দ্বিজেন, মানব ও সতীনাথ। চরিত্রচিত্রণে থাকবেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, সুব্রতা চ্যাটার্জি, তরুণকুমার প্রমুখ ছাড়া সংসদের প্রায় সকল শিল্পী সভ্যবৃন্দ।

*

এ সপ্তাহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে মুক্তি পাচ্ছে মিত্র প্রোডাকসনের 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। রাজ্য সরকার চিত্তরঞ্জন শতবার্ষিকী কর্মসূচীতেও এই ছবিটি দেশের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রনায়কদের দেখাবার আয়োজন করেছেন। সরোজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রযোজিত এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখার্জি। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন অনিল চ্যাটার্জি, বাসন্তী দেবীর রূপসজ্জায় আছেন লিলি চক্রবর্তী। রঞ্জিত পিকচার্স পরিবেশিত এ ছবির অপরাপর বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন হারাধন ব্যানার্জি, চিত্রা মণ্ডল, নির্মল চ্যাটার্জি, অমর দত্ত, [illegible] সেন, [illegible] বিশ্বাস, আনন্দ মুখার্জি, দীপক মুখার্জি, বন্যা ভট্টাচার্য, [illegible] শঙ্কর, সমরকুমার, গৌরশী, আনন্দ মুখার্জি প্রমুখ শিল্পীরা।

*

[illegible] সরকার প্রোডাকসন্সের নবতম নিবেদন ভবানী[illegible] কাহিনী অবলম্বনে [illegible] চিত্রগ্রহণ কাজ গত ২৬ অক্টোবর থেকে নিয়মিতভাবে নিউ থিয়েটার্স এক নং স্টুডিওতে একটানা চলছে। ছবির নায়িকা [illegible]—ছবির চিত্রগ্রহণের জন্য গত ২৫ অক্টোবর কলকাতায় এসে পৌঁচেছেন। সলিল সেন ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—আর সংগীত পরিচালনা করবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। [illegible] চ্যাটার্জি ও [illegible] এই ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—[illegible] বসু, অরুণ মুখার্জি, গীতা নাগ, [illegible] দে, [illegible] প্রমুখ। পরিচালক শ্রীসেন ও পরিবেশক শ্রী[illegible]মল কাংকারিয়ার সঙ্গে আলাপে জানা গেছে—২।৩ মাসেই ছবির কাজ শেষ হবে।

মঞ্চাভিনয়

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য—২৩শে অকটোবর সন্ধ্যা সাতটায় পার্কসার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজা কমিটির (পার্কসার্কাস ময়দান) আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যবিদ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য সু-অভিনীত হয়। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন ভূমিকায় কৃষ্ণা রায় (প্রকৃতি), চিত্রা চ্যাটার্জি (মা), বিজন পাল (দইওয়ালা), সখী ও গ্রামবাসীদের ভূমিকায় মিতা পাল, পিকু দত্ত, বনালী চৌধুরী, শান্তি চৌধুরী, রিংকু ভাদুড়ী, শিপ্রা সেন, শিপ্রা দাশগুপ্ত, অরুণা দে, দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকৃতির জল তোলা দৃশ্যে শ্রীঅজয় গাঙ্গুলীর বিভিন্ন প্রকারের পাখির ডাক দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দান করে। শ্রীনির্মলেন্দু বিশ্বাসের পরিচালনায় স্বপ্না সেনগুপ্তা, মীরা চৌধুরী, কাজল বোস প্রভৃতি সুসংগীত পরিবেশন করেন।

শিশির একাংক নাটক প্রতিযোগিতা—ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস্ আয়োজিত ও শ্রীনাট্যম পরিচালিত ৪র্থ বার্ষিক শিশির একাংক নাটক প্রতিযোগিতা বারাকপুরের সুভাষ-মঞ্চে শুরু হচ্ছে আসছে ডিসেম্বর মাসে। সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগী সংস্থা ও শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০। যোগাযোগের ঠিকানা

১। আরকাইভস্ অফিস : (৫৫-১৬০০) : ৮৯, বিধান সরণি, কলকাতা—৪

২। শৈলেশ মুখোপাধ্যায় (২৪-৬৪৮০) পদ্মশিলা, সোদপুর।

৩। শ্রীনাট্যম, চন্দনপুকুর বারাকপুর।

ঘণ্টাফটক : কলকাতার অন্যতম মহিলা সাংস্কৃতিক সংস্থা চলন্তিকার দ্বিতীয় নাটক প্রশান্ত চৌধুরীর 'ঘণ্টাফটক' সম্প্রতি বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে অভিনীত হলো। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন—অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য ও মলিনা দেবী। সভাপতি ও প্রধান অতিথি বাংলা নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। সংস্থার সভাপতি প্রণব ব্যানার্জি অতিথি ও অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান। কেবলমাত্র মহিলা শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত নাটকটি প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ের গুণে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। খাসমহলের দর্পনারায়ণ (তমালিকা গুহ) ও বাঈ মহলের রত্নাবাঈ (অঞ্জলি ব্যানার্জি, যার প্রেম এই নাটকের পটভূমিকা। দুশ্চরিত্র গোপাল রক্ষিতের (দেবী গুপ্তা) দুরভিসন্ধির বাধা কাটিয়ে এই প্রেম জয়ী হল। অত্যাশ্চর্য অভিনয় করেছেন তপতী গুপ্তা, পঞ্চাননের ভূমিকায়। অঞ্জলি ব্যানার্জির রত্না বাঈ এক দুরূহ চরিত্র, দর্পনারায়ণের সঙ্গে আবেগময় মুহূর্তে ও পিসীমা পিয়ারী বাঈ বা (প্রণতা ভট্টাচার্য) সঙ্গে বেদনাময় উচ্ছ্বাসে তার অভিব্যক্তি দর্শকদের অভিভূত করে। অদিতি ঘোষ মুশকিল আসানে ও মালবিকা ঘোষের রক্ষিত মহাজন মনে রাখবার মত। জমিদারের ব্যক্তিত্ব যথাযোগ্য ভাবে ফুটিয়েছেন গীতা মুখার্জি। অন্যান্য চরিত্রে—দেবী গুপ্তা, শুভলক্ষ্মী, স্বপ্না মঞ্জু, পরী, মন্টু অভিনয় করেছেন। অবশ্য নাটকটির দোষত্রুটিও আছে, আবহসংগীত, গ্রন্থনা ও পরিচালনা নিম্নমানের। সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে, অভিনয়ের গুণে এই নাটকটি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ
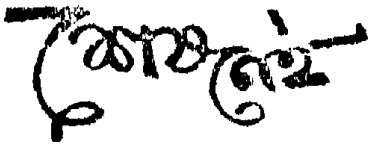
যোগেশ দত্ত ও মূকাভিনয় ঃ—গত ২৫ অক্টোবর সুপরিচিত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত দু ঘণ্টা ব্যাপী এক অনুষ্ঠানে তাঁর কলাশিল্প প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন। উপলক্ষ্য তাঁর শিল্পীজীবনের দ্বাদশ বছর পূর্তি পালন।

মূকাভিনয়কে নিজস্ব শিল্পভাবনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ, বিষয়বস্তুকে অধ্যয়ন ও আপন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভবের আলোয় মেলে ধরার প্রয়াসে শ্রী দত্তর নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিভার স্বাক্ষর অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রতিভাবান বলেই এই তরুণ শিল্পীর ওপর আমাদের আশা অনেক। তাঁর কয়েকটি বিষয়ের ওপর তাঁর দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি। সেদিনের অনুষ্ঠান তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো চলা, বাসযাত্রী, চোর, ফটোগ্রাফার, সীতা ও হনুমান, আধুনিকা ও জন্ম থেকে মৃত্যু।

চলা, বাসযাত্রী, চোর ও সীতা হনুমান-এ তাঁর মূকাভিনয় ও জীবন্ত অভিব্যক্তি বক্তব্য বিষয়ের ওপর যথাযোগ্য আলোকপাত করতে পেরেছে এবং এখানে যোগেশ দত্তর সংস্কৃতিমান, রসবোধের পরিচয় অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে। কিন্তু 'সোসাইটি লেডী' আরো অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। প্রথমতঃ 'সোসাইটি লেডীর' বাংলা অনুবাদ ঠিক 'আধুনিক' (অনুষ্ঠান পুস্তিকানুসারে) হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই অনুষ্ঠানে বর্ণিত 'সোসাইটি লেডি'কে শুধুমাত্র হাস্যকৌতুকের সামগ্রী করে তোলার কাজে শিল্পী তাঁর অভিনয় প্রতিভাকে ব্যয়িত না করে যদি 'সোসাইটি লেডি'র হাস্যোদ্রেকী কৃত্রিম সাজসজ্জা ও প্রতিভাটির অসামঞ্জস্য তার অন্তরালে রিক্ত জীবনের অশ্রুউদ্বেল কারুণ্যের দিনটির প্রতিও যথাযথ আলোকপাত করতেন তাহলে এটি একটি উচ্চাঙ্গের শিল্পবস্তু হয়ে উঠতে পারত। জীবনের বহির্মুখী হাল্কামোও শিল্পীর ধ্যান-নিবিড়তার স্পর্শে এক ঐশ্বর্যলোককে উদ্ভাসিত করতে পারে। যোগেশ দত্ত'র ধারণা ধ্যানের সম্পূর্ণতার সার্থক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাদীপ্ত এবং দীপ্তির পূর্ণপ্রকাশের জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব। হিমাংশু দত্ত'র আবহ-সংগীত রচনায় তাঁর কল্পনা রঙিন মনটির পরিচয় ছিলো। বিশেষ করে সীতা ও হনুমান ও জন্ম থেকে মৃত্যুতে সিন্ধুভৈরবীর ছোঁওয়া তারিফ করবার মত। কিন্তু 'সোসাইটি লেডি'তে পিলু রাগভিত্তিক সঙ্গীত সুখশ্রাব্য হলেও বিষয়বস্তুর ভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ খায়নি। এখানে আনন্দলহরী বা অন্যকোনো ছন্দপ্রধান কণ্ঠ দিয়ে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যেত। স্থানে স্থানে হিমাংশু বিশ্বাসের বাঁশী অপূর্ব সুরের আবেশ রচনা করেছে। এ-ছাড়াও অনুষ্ঠান-সার্থকতার কৃতিত্ব প্রাপ্য যাঁদের তাঁরা হলেন তাপস সেন (আলো) সুরেশ দত্ত (মঞ্চ) খালেদ চৌধুরী (সজ্জা) অনন্ত দাস।

গৌরচন্দ্রঘাট, চাতরা শ্রীরামপুর শ্যামাপূজা কমিটির বিচিত্রানুষ্ঠান ঃ—গৌরচন্দ্রঘাট, চাতরা, শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা কমিটির সভাবৃন্দ প্রতিষ্ঠযশা শিল্পী সমন্বয়ে আগামী ৭ নভেম্বর এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, মণ্টু ভট্টাচার্য (হরবোলা), দিলীপ চক্রবর্তী, পিণ্টু দত্ত (কৌতুক গীতি), অঞ্জনা নন্দী ও বাবলু, সুশীল চক্রবর্তী (হাস্যকৌতুক) ও তপন দত্ত (মূকাভিনয়)।

'হরবোলা' অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ঃ—জনপ্রিয় 'হরবোলা' বেতার শিল্পী শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষাসদন হতে সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ইন্সটিটিউটের অনুষ্ঠানে একক 'হরবোলার' অনুষ্ঠানের পর বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন স্কুলের নাট্যানুষ্ঠানে নেপথ্য থেকে নানান জন্তুর ডাকের মাধ্যমে কন্ঠের দ্বারা দৃশ্যের অবতারণা করেন চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটার-এর নাটকে। গত ১৫ অকটোবর পার্কসার্কাস আদি উদ্দীপনী-ক্লাবের অনুষ্ঠানে 'কৌতুক হরবোলা' হিসাবে প্রাণীদের কথা বলার ভঙ্গী নিজ কণ্ঠে দর্শকদের শুনিয়ে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। গত ২০ অকটোবর 'আদি নৃত্য-নাট্য সমাজ' ম্যাকসমূলার ভবনে 'মাথুর' নামক যে নৃত্য-নাট্যটি পরিবেশন করেন কন্ঠের সাহায্যে দৃশ্যের অবতারণা করার পর শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা গেল 'ম্যাকসমূলার ভবনের' আয়োজিত কয়েকদিন ব্যাপী শিশু উৎসবে নেপথ্য থেকে নানা শব্দের ও ডাকের মাধ্যমে শিশুদের উপযুক্ত 'চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটার-এর 'সোনালী সিং' ও 'নকল রাজা নামক' নাটকে বিভিন্ন দৃশ্যের শব্দ ফুটিয়ে তুলতে।

জলসা

'ভারতী' রেকর্ড কোম্পানীর অনুষ্ঠান —সম্প্রতি মহাজাতি সদন-মঞ্চে ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে এক সঙ্গীতোৎসবের আয়োজন করা হয়। দুই ঘণ্টা ব্যাপী এই আসরে যাঁরা গান গেয়ে শুনিয়েছেন—তাঁরা অনেকেই সুকণ্ঠ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। সমর গুপ্ত ত' প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ইনি ছাড়াও শ্রোতাদের খুসী করতে পেরেছেন যাঁরা, তাঁরা হলেন জয়ন্তী সেন, সুদীপ্ত সেন, মানসকুমার, প্রভাতভূষণ। জয়ন্তী সেন ও সুদীপ্ত সেন হিমাংশু বিশ্বাসের সুরে 'রাত হয়ে যায়' ও 'বকুলের ভাল লেগেছে'—মানসকুমার অলোকনাথ দে'র পরিচালনা স্ব-সৃষ্ট সুরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দুটি গান গেয়ে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে সুজিৎ দাসের রবীন্দ্রসংগীত, বিজন শেঠ, পাপিয়া দে বিদ্যুৎ দত্ত, রমা চট্টোপাধ্যায়, গুলে মহম্মদ, পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়, শিখা দে, কমল চক্রবর্তী, ছায়া মুখোপাধ্যায়, সজনী রায়, সলিল চাকলা, নিরুপম রায়ের আধুনিক গান, মজার মজার কৌতুক-নকসা ও মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীটার উপভোগ্য হয়েছে।

'দক্ষিণায়ন'-এর সঙ্গীতোৎসব : বৃহস্পতিবার ২২ অক্টোবর নবগঠিত সংস্থা 'দক্ষিণায়ন' প্রযোজিত সঙ্গীত সন্ধ্যা আনন্দমুখর এক কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন 'কলামন্দির' প্রেক্ষাগৃহে সুষ্ঠু অনুষ্ঠান পরিচালনার কৃতিত্ব প্রাপ্য শ্রী ও শ্রীমতী অসীমা ও দীপক ভট্টাচার্য'র। সংস্থার ধর্মেন্দ্রোতি 'চৌধুরী'র বক্তব্যে জানা গেল অশিক্ষিত তরুণ প্রতিভাদের রসিক সমাজের গোচরে আনা, মাঝে মাঝে সুযোগ্য শিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান দ্বারা কর্মক্লান্ত জীবনে রসসঞ্চার এবং এই সকল অনুষ্ঠান অর্জিত অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে দান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হয় অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠসঙ্গীত নিয়ে। উদীয়মান শিল্পী হিসাবে ইতিমধ্যেই তিনি সুপরিচিত। সেদিন 'বলেছি যখন আমি যাব গো' ও 'যদি জানতাম কেউ আসবে'-র প্রথমটি সুরপ্রধান ও দ্বিতীয়টি ছন্দপ্রধান। উভয় দিকটির প্রতিই দীপংকরবাবু যথোপযুক্ত আলোকপাত করতে পেরেছেন। পরিশীলিত কণ্ঠ, গাইবার আনন্দ এক কথায় শিল্পোচিত সকল গুণই এ'র মধ্যে আছে। অনুশীলনে একনিষ্ঠ থাকলে আশানুরূপ মানে পৌঁছতে এ'র দেরী হবে না। জনপ্রিয় শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে চিত্রগীতি 'ছায়া ছায়া আঁধার যখন' নাটকীয় রসসমৃদ্ধ 'খোলা আকাশের নীচে' এবং দেহাতী উপাখ্যান সঙ্গীত 'এক শৈশবে দেখা হোল দুজনায়'—ইত্যাদি বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ গানে গেয়ে আসর জমিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং শ্রোতাদের আব্দারে গত বছর ও এবছরের পুজোর দুটি গান—শুনিয়েছেন। এছাড়া মহম্মদ সগীরুদ্দিনের সুরে গাওয়া রাগাভিত্তিক সঙ্গীতও সাগ্রহে গৃহীত হয়েছে। কণ্ঠমাধুর্য ছাড়াও শিল্পীর প্রাণবন্ত পরিবেশনা আনন্দসৃষ্টির কারণ হয়ে উঠেছিলো।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—মঞ্চে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের উচ্ছ্বাস জানিয়ে দিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে আজও তিনি সগৌরবেই প্রতিষ্ঠিত। এবারের পুজোর গান 'সুকান্ত ভট্টাচার্য'র 'ঠিকানা', 'এই সুন্দর পৃথিবীতে' 'এবার নীরব করে দাওহে তোমার', 'রানার' পর্যন্ত প্রতিটি গানই প্রাপ্য অভিনন্দন পেয়েছে কিন্তু 'সবাই চলে গেছে শুধু একটি মাধবী তুমি আজও ফুটে আছ' মাধুর্য ভোলার নয়। এসব ছাড়াও প্রথমত অনুরাগীবৃন্দের অনুরোধে 'দুটি মন', 'খামোশী' ও পরিশেষে 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে' গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেছেন।

উত্তমকুমার 'ছিন্নপাতার ভাসাই তরণী' ও আরও একটি গান গেয়ে শোনালেন। গানটা এখানে মুখ্য নয়—দর্শকবৃন্দের উত্তমকুমারকে দর্শনের অধীর আগ্রহ মেটানোটাই প্রধান আকর্ষণ। এ তৃষ্ণা মিটেছে কিনা তারাই জানেন তবে উত্তমকুমারকে বেশ কিছুক্ষণ মঞ্চে উপস্থিত রাখার সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি ছিলো না। সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিলো মায়া দে'র। এ অনুষ্ঠান শোনা আমাদের হয়ে ওঠেনি। তবে কার্পণ্যহীন পরিবেশনায় ইনি ভক্তদের তুষ্ট করতে পেরেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়া ওয়াই এস মুলেকি ও খোকন মুখোপাধ্যায়ের আকিডিয়ান ও স্প্যানিশ গীটার সম্মিলিত অর্কেস্ট্রা এবং রবি ঘোষের কৌতুক-নকসা অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছে।

তবলা সঙ্গতে ছিলেন সর্বশ্রী রাধাকান্ত নন্দী, নরেশ ঘোষ, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীত চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্ত বসু।

খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী শ্রীবিমলভূষণের দুখানি আধুনিক বাংলা গানের একটি রেকর্ড সম্প্রতি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোং বের করেছেন। গান দুটি হল—শ্রীপ্রবোধভূষণের লেখা 'দুই ফোঁটা জল ঝরে' এবং শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়ের লেখা 'কি জানি কখন, এ দুটি নয়ন।' গান দুটিতে সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীহিমাংশু বিশ্বাস।

একক ছড়া গানের আসরে : সম্প্রতি 'মঞ্চলেখা' আয়োজিত একটি একক গানের আসরে প্রথিত-নামা শিল্পী শ্রীমতী জপমালা ঘোষের গান শোনার সুযোগ ঘটেছিল। 'ছেলে ভুলানো' ছড়া গানের নিজস্ব একটি আবেদন আছে এবং যথাযথরূপে পরিবেশিত হলে বড়রাও এ গান শোনার আনন্দ যে ঠিক ছোটদের মতই উপভোগ করে থাকেন তারই এক উল্লেখযোগ্য নজীর সেদিনের অনুষ্ঠান।

জপমালা ঘোষ

শ্রীমতী ঘোষ মোট ১৪ খানি গান গেয়ে শোনান। কোনটি সবচেয়ে ভালো বলা কঠিন। কারণ বিষয়বস্তু সুর ও তালের বিভিন্নতায় প্রতিটি গানের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত। সর্বশেষ এবং সকলের অনুরোধে গাওয়া তাঁর সুবিখ্যাত রেকর্ড নজরুলের মজার ছড়া গান 'লিচু চোর' দিয়ে অনুষ্ঠানের সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটে।

একক রবীন্দ্রসংগীতের আসর : গত ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার পিয়াসী ভবনে একক রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নির্ধারিত শিল্পী ছিলেন কুলটি উদয় চক্রের পরিচালক শ্রীসমীপেন্দ্র লাহিড়ী। পূজা, প্রকৃতি ও প্রেম পর্যায়ের একুশটি গান সুললিত ও দরদী কণ্ঠে পরিবেশন করে সমীপেন্দ্রবাবু অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বিশুদ্ধ গায়কী ও মেলোডিয়াস কণ্ঠ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেবে অনুপম। বিশেষভাবে 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে', 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে,' 'আমায় থাকতে দে-না আপন মনে' 'আমার যে গান তোমার পরশ পাবে' ইত্যাদি গানগুলিতে তিনি অসামান্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়। কলকাতার বুকে মফঃস্বলের একজন তরুণ শিল্পীকে নিয়ে এই একক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য পিয়াসী সংঘের সভ্যবৃন্দ অভিনন্দনযোগ্য।

শিল্পী সকাশে বৈজ্ঞানিক : বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত সংসদের এক অধিবেশনে প্রাচীন ধ্রুপদী যন্ত্র শোনবার জন্য উপস্থিত হলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

—চিত্রাঙ্গদা

অজয় বসু

খেলার কথা
খুশিরামের খোশমেজাজ

সার্থক নামকরণ—খুশিরাম!

খেলা দেখিয়ে সবাইকে খুশি তো রাখছেনই। উপরন্তু নিজেও সব সময়ে খোশমেজাজে রয়েছেন। ওই মেজাজের সন্ধান জেনে মানুষটিকে যেন আরও ভাল লাগলো।

ম্যানিলায় এশীয় ফেডারেশন আয়োজিত পঞ্চদলীয় বাস্কেট বল খেলে দেশে ফিরলেও ঘরে ফিরতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ডাক এলো বর্ধমানে যাবার। সেখানে আন্তঃ রাজ্য বাস্কেট বলের 'খ' অঞ্চলের খেলার আসর বিছানো হয়েছে। রাজস্থান গতবারের আঞ্চলিক বিজয়ী। বিজয়ীর মর্যাদা ধরে রাখার মস্তো দায়িত্ব ওই খুশিরামের ঘাড়েই। অতএব তাঁকে ম্যানিলা থেকে দিল্লী ফিরেই ছুটতে হলো কলকাতা হয়ে বর্ধমানের দিকে। সেখানেই হলো আমাদের একান্তে আলাপ। সন্ধান পেলাম তাঁর খুশি খুশি মেজাজের।

আমাদের দেশে খেলাধুলো ও খেলোয়াড়দের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার বিশেষ কিছু করছেন না, কবে যথার্থ কিছু করে সরকার খেলোয়াড়দের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবেন এবং ভারতীয় ক্রীড়ার মানোন্নয়নে সার্বিক পদক্ষেপ ঘটাবেন? এই অভিযোগ অধুনা খেলাধুলোর সব মহলেই সোচ্চার।

বাস্কেটবল অনুরাগী মহলে তো ওই অভিযোগ আরও উচ্চকণ্ঠে তুলতে পারেন। কারণ, জাতীয় সরকার এখনও বাস্কেটবলকে ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, হকির মতো 'মেজর গেম' বলে ভাবতে চান না, দেখেনও না তেমন স্নেহসিক্ত নজরে। কাজেই, বাস্কেটবল অনুরাগীদের মনের কোণে স্বভাবতঃই অনেক ক্ষোভ জমে রয়েছে।

হয়তো খুশিরামের মনের কোনো নিভৃত অঞ্চলে সেই ক্ষোভের উত্তাপও সঞ্চিত আছে। কিন্তু কই, সে কথা তিনি তো আমাকে একবার জানতেও দিলেন না! বল্লেন, এই 'মাইনর গেম' খেলেই, মানে খেলার মতো খেলে, আমরা নাম কিনবোই। আন্তর্জাতিক কোর্টে প্রতিষ্ঠা পাবোই। যেদিন পাবো সে-দিন কিন্তু কেউ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চাইবে না। সাহায্য, সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা, সব কিছুই তখন অকাতরে প্রসারিত হবে বাস্কেট বলের দিকে।

কথাগুলো আমার উদ্দেশ্যে বলা বটে। কিন্তু ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, খুশিরাম বুঝি আপন মনেই কোনো সংকল্প-বাক্য পাঠ করছিলেন। নিজের মনেই শপথ নিচ্ছিলেন। সত্যিই, খুশিরামের প্রত্যয় এমনিই নিটোল। নিজের বাহুবলে তাঁর বিশ্বাস সমুদ্রের মতো সীমাহীন। ভারতীয় দলের অন্য খেলোয়াড়েরা যদি খুশিরামের প্রত্যয়ে ভাগ বসাতে পারতেন কিংবা তাঁরই মতো অপত্যস্নেহে বাস্কেট বলকে জড়িয়ে ধরতে পারতেন, তাহলে, আমার ধারণা, আমাদের জাতীয় দলের ক্রীড়ামান এতোদিনে আরও উঁচুতে উঠে দাঁড়াতে পারতো। খুশিরাম বাস্কেটবলের পায়েই আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর 'ডেডিকেশন' ভেজালবিহীন। এমন খাঁটি জিনিসের বিনিময়ে তিনি নিজে যা (নাম, প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা) পেয়েছেন তাতেই

খুশিরাম

যেন পরিতৃপ্ত। ক্ষোভ ও অস্থিরতা, অভিযোগ ও অশান্তি যে কালের ধর্ম, সেই কালেই খুশিরামকে মস্তো এক ব্যতিক্রম বলে মনে হলো।

খুশিরাম ১৯৫৯ সাল থেকে জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলছেন। আন্তর্জাতিক আসরে তাঁর আবির্ভাব ১৯৬৪তে। সেই থেকেই খুশিরাম স্বদেশে দিল্লী-দিল্লী করছেন এবং বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন প্রায় বছর বছরই। স্ট্যাণ্ডার্ড ধরে রাখতে তাঁকে নিত্যই মেহনত করতে হয়। দিনের পক্ষে ঘণ্টাখানেক তো বটেই। এদিকে বয়সও বাড়ছে। বয়স কতো? খুশিরামের নিজের কথায়, চৌত্রিশ। দেখে মনে হবে, আরও বেশি। কিন্তু তবু ওঁর ক্লান্তি নেই।

একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর কতোদিন খেলবেন? অবসর নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম, সে রকম কোনো পরিকল্পনা নেই। যতোদিন পারবো, খেলবো। যতোদিন ভাল লাগে, ততো দিনই। ছাড়বো কেন?

সত্যিই তো, খুশিরাম এখন অবসর নেবেন কেন? বয়স বাড়ছে, তবু ওঁর দক্ষতায় এতোটুকু টান পড়ে নি। এই তো, কদিন আগে ম্যানিলার পঞ্চদলীয় বাস্কেট বলের আসরে ওই খুশিরামই সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেলেন। ম্যানিলায় ব্যক্তিগতভাবে সর্বাধিক পয়েন্ট সংগ্রহ করে 'বেস্ট স্কোরার'-এর এবং 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল' খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি অর্জন করলেন। তাছাড়া, বলা বাহুল্য যে ম্যানিলায় পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতা চলার সময় সর্ব-এশীয় দল গড়তে গিয়ে নির্বাচকেরা ওঁর নামটিই সর্বাগ্রে উচ্চারণ করলেন।

খুশিরামের আদিবাস হরিয়ানার ঝামরি। ঝামরি অজ পাড়াগাঁ। সেখানে বাসকেট বলের চলন কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই। তাহলে খুশিরাম কি করে বাস্কেটবল খেলতে শিখলেন?

প্রশ্নটি রাখতেই তিনি জানালেন, ছেলেবেলায় কিশোর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার সুবাদে বছর চোদ্দ বয়সেই তিনি বাস্কেটবল খেলতে শেখেন। শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা লাভ, সবই সেনাবাহিনীতে থাকার সময়। বছর দুয়েক হলো রাজস্থানের এক রেয়ন কলে চাকরী পেয়ে খুশিরাম সেনাবাহিনীর সংস্রব ছেড়েছেন। খেলার জন্যেই চাকরী। চাকরীতে খাটুনী আছে। আবার সুবিধেও আছে। ভারতীয় দলের হয়ে বিদেশে খেলতে যাবার সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের গাঁটের পয়সা খরচ করতে হয়। বিচিত্র, তবে এই তো রীতি। 'মাইনর গেমস' যাঁরা খেলেন তাঁদের এখনও অনেক ক্ষেত্রে এ জাতীয় কুবিচার সইতে হয়। খুশিরামকে অবশ্য কোনোদিন গাঁটের টাকা বার করতে হয়নি। ওই যে বল্লাম, চাকুরীতে সুবিধে আছে। ওর নিয়োগকর্তাই ওইসব টাকাকড়ির ঝামেলা পোহান ও মেটান।

হেসেখেলে কাটাচ্ছেন বটে, তবুও খুশিরাম ঘোর সংসারী। তিন সন্তানের জনক। ছেলেরা খেলতে চায় কিন্তু ওদের মায় আবার খেলায় যতো বীতরাগ!'

পোলভল্টে বিশ্ব রেকর্ড : গ্রীসের চারিস পাপানিকলাউ গ্রীস-যুগোশ্লাভিয়ার দ্বৈত আথলেটিক্স অনুষ্ঠানে ১৮ ফিট (৫৪৯ মিটার) উচ্চতা অতিক্রমের সূত্রে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

রামস্বামী (স্টীল প্ল্যান্ট) এবং ববি টমাস (মাদ্রাজ) ; ৪×৪০০ মিটার রীলে—পি সি পোনাপ্পা (স্টীল প্ল্যান্ট), বি এস বড়ুয়া (সার্ভিসেস), সুচা সিং (সার্ভিসেস) এবং আজমীর সিং (পাঞ্জাব) ; **লং জাম্প**—লাব সিং (সার্ভিসেস), কে রঘুনাথন (বিহার) এবং মাহীন্দর সিং (মাদ্রাজ) ; **ট্রিপল জাম্প** মাহীন্দর মাহীন্দর (মাদ্রাজ) ; **ডিসকাস থ্রো**—পারভিন কুমার (পুলিশ) এবং হরভজন সিং (স্টীল প্ল্যান্ট) ; **ম্যারাথন**—হরনেক সিং (সার্ভিসেস) ; সটপুট—যোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস) এবং গুরদীপ সিং (পুলিশ)

ডেকাথলন—এস চৌহান (বিহার) এবং এম জি শোধ ;

স্টিপলচেজ—গুরমেজ সিং (সার্ভিঃ) ;

মহিলা বিভাগ : ১১০ মিটার হার্ডলস—কুমারী মঞ্জিৎ ওয়ালিয়া (পাঞ্জাব) ; ৪০০ মিটার—কুমারী **কমলজিত সিন্ধ** (পাঞ্জাব) ;

ক্যাসিয়াস ক্লে বিজয়ী

ক্যাসিয়াস ক্লে (বর্তমান নাম মহম্মদ আলী) তৃতীয় রাউণ্ডের লড়াইয়ের মাথায় জেরী কুয়ারিকে টেকনিক্যাল নক্ আউটে পরাজিত করে সাড়ে তিন বছর পর পুনরায় আন্তর্জাতিক মুষ্টিযুদ্ধের আসরে ফিরে এসেছেন। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর হেভীওয়েট বিভাগের বিশ্ব খেতাবটি বাতিল হয়ে যায়। জেরি কুয়ারির বিপক্ষে ক্যাসিয়াস ক্লের আলোচ্য লড়াইটি ১৫ রাউন্ড পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা ছিল; কিন্তু ক্লে তৃতীয় রাউণ্ডের লড়াইয়ে কুয়ারিকে এক প্রচণ্ড ঘুসি মেরে জখম করেন কুয়ারির বাঁ চোখের ভ্রূতে বড় রকমের ক্ষত দেখা দেয় এবং তাঁর সারা মুখে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। আরও বিপদজনক অবস্থা হওয়ার আগেই রেফারী লড়াইটি বন্ধ করে ক্লেকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। এই লড়াইটি ৯ মিনিটে শেষ হয়। বর্তমান হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান জো ফ্রেজার আগামী ১৮ই নভেম্বর তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য বব ফস্টারের সঙ্গে লড়বেন। জো ফ্রেজার যদি এই লড়াইয়ে জয়ী হন তাহলে ১৯৭১ সালে তাঁকে ক্যাসিয়াস ক্লের সঙ্গে লড়তে হবে। এখানে উল্লেখ্য ক্যাসিয়াস ক্লে তাঁর গত দশ বছরের পেশাদার খেলোয়াড় জীবনে যে ৩০ বার জয়ী হয়েছেন তার মধ্যে নকআউটে ২৪ বার।

পোলভল্টে বিশ্ব রেকর্ড

গ্রীস-যুগোশ্লাভিয়ার দ্বৈত আ
লেটিক্স অনুষ্ঠানে গ্রীসের চারিস পাপা
কলাউ পোলভল্টে ১৮ ফিট (৫-৪৯ মি
উচ্চতা অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড
ছেন। এখানে উল্লেখ্য পোলভল্টে ১৮ ফি
উচ্চতা অতিক্রমের নজির এই প্রথম। পূর্বে
বিশ্বরেকর্ড ছিল ১৭ ফিট ১১ ই
(৫-৪৬ মিটার)—উলফগ্যাং নর্ডউইগ (প
জার্মানী)।

নেহরু হকি প্রতিযোগিতা

দিল্লীর শিবাজী স্টেডিয়ামে আয়োজি
নেহরু হকি প্রতিযোগিতার দ্বিত
দিনের ফাইনালে অল ইণ্ডিয়া পুলিশ
১—০ গোলে গত বছরের রানার্স-আ
নর্দার্ণ রেল দলকে পরাজিত করে নে
ট্রফি জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাই
খেলা গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাং
ছিল। সেমি-ফাইনালে অল ইণ্ডিয়া পু
দল ১—০ গোলে ওয়েস্টার্ণ রেল দ
এবং নর্দার্ণ রেল দল ৪—১ গোলে ক
কাতার সাউথ ইস্টার্ণ রেল দলকে পরা
করে ফাইনালে উঠেছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

"গুণ্ডামিতে কোন উদ্দেশ্য সফল হয় না"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৭ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 13th Nov. 1970. শুক্রবার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৭৭ 40 Paise

সুচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল

চিঠিপত্র

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে এবারে বিভিন্ন শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটগল্পের সুচিন্তিত ও বিস্তৃত আলোচনা পড়লাম। শ্রীপর্যবেক্ষক লিখিত এই আলোচনাটি ছোটগল্পের লেখক, তাঁদের আবির্ভাবের কাল ও বৈশিষ্ট্য, ছোটগল্পের বিষয় অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস, নবীন ও তরুণ গল্পকারদের ছোটগল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্র গতি-প্রকৃতির পরিচয় স্বতন্ত্র উপ-শিরোনামে চিহ্নিত করে এমন-ভাবে সাজানো হয়েছে যে সাধারণ পাঠকও এবারের ছোটগল্পের একটা সহজবোধ্য পরিচয় পাবেন। বাংলাদেশে শারদীয় পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বহু এবং তাদের চোখ ধাঁধানো রকমারী বিজ্ঞাপনের ডামাডোলের বাজারে কোন্‌টা সৎ সাহিত্যের এবং কোন্‌টা বা অসৎ সাহিত্যের প্রচারক তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝে ওঠাই দুরূহ। তাছাড়া আমাদের পক্ষে রকমারী বহু-বিচিত্র পত্র-পত্রিকার অনেকগুলো পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষত সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে এখনও ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। স্বভাবতই আমাদের এ সময়ের কথা কে কিভাবে বলছেন তা বিস্তৃতভাবে জানাও সম্ভব হয়না। পর্যবেক্ষকের বর্তমান আলোচনাটি সেদিক থেকে আমাদের যথেষ্ট প্রয়োজনীয় সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। প্রচুর গল্পের বিষয়বস্তু নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। আজকাল অধিকাংশ প্রবন্ধে যেমন অহেতুক বাগজাল বিস্তার দেখা যায় এবং অতি সাধারণ বিষয়ও জটিলতর করে তোলা হয় এই আলোচনাটি তা থেকে মুক্ত। অত্যন্ত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক প্রবীণ ও নবীন গল্পকারদের এ সময়ের গল্পের পরিচয় দিয়েছেন।

সবচেয়ে ভাল লাগল, এই সময় ও সমাজ-ভাবনা প্রবীণ ও নবীন লেখকরা কে কিভাবে তাঁদের ছোটগল্পের বিষয় করে তুলছেন তার আলোচনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ প্রবীণ গল্পকারেরাও যে বর্তমান সময়ের তরতাজা ঘটনা প্রবাহ নিয়ে ভাবছেন এটা খুবই আনন্দের বিষয়। নবীন ও তরুণ গল্পকার যেমন, মিহির আচার্য, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুস্তাফা সিরাজ, মিহির পাল, তপোবিজয় ঘোষ, অসীম রায়, মহাশ্বেতা দেবী, যশোদা জীবন ভট্টাচার্য, সুভাষ সমাজদার এবং আরও অনেকেই বর্তমান সমাজের সমস্যা, সঙ্কট এবং চাওয়া-পাওয়ার নানা দিকে আলোকপাত করছেন, এটা সামাজিক কর্তব্য করার মতই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সর্বস্তরে অসন্তোষ, সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ, সমস্যা ও জিজ্ঞাসার উপর আরও ব্যাপকতর আলোকপাত করে সময়োচিত কর্তব্য পালন করতে বিশেষ করে নবীন ও তরুণ লেখকরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠুন। কারণ তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অ-নে-ক। আজকের বিশৃঙ্খল এবং জীবনযুদ্ধে হতাশ মানুষ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে বাঁচার প্রেরণা পেতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে কারো কারো ইদানিং এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তেমন কোন লেখা দেখা যায় না। তাঁরা প্রেম ও মামুলি বিষয়ের উপর এত বেশী জোর দেন যে মনে হয় ঐসব বিষয় ছাড়া আমাদের সমাজ জীবনে আর কোন সমস্যাই নেই।

অমৃতের নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমি খুশি যে আপনারা বর্তমান সমাজ-ভাবনা বিষয়ক গল্প নিয়মিত প্রকাশ করেন, বিশেষ করে এবারের মূল্যবান শারদ সংকলনে অনেক উল্লেখযোগ্য গল্প প্রকাশ করেছেন। অসমাপিকা, সুভদ্রার রথ, বন্ধমেধ, বাঁচার জন্য, ভীষ্মের পিপাসা, মহিষ, বিপন্ন মানুষ প্রভৃতি গল্প একই সংকলনে পাওয়া নিঃসন্দেহে খুশি হওয়ার মত। পর্যবেক্ষকের প্রবন্ধে এই জাতীয় গল্পের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব স্থান পাওয়ায় গল্পগুলো সাধারণ পাঠকেরও বোঝবার সহায়ক হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের একটি গল্প (অনন্ত) এবং শচীন বিশ্বাসের দুটি গল্প (লেখা ও রেখা, প্রাশ্নিক) উক্ত প্রবন্ধে স্থান পেলে আমরা আরও খুশি হতাম।

ক্ষুদিরাম দাস
ধুবুলিয়া, নদীয়া

সংগীত সমালোচনা

সাপ্তাহিক অমৃতের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। প্রত্যেকবারের মত এবারও আমি সব সঙ্গীত সম্মেলনের সমালোচনাগুলি পড়েছি। এর মধ্যে সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের সমালোচনাটি খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার দাবী রাখে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শাস্ত্রে কণ্ঠসঙ্গীতকেই প্রথম যন্ত্রসঙ্গীতকে দ্বিতীয় এবং নৃত্যকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। শুধু এইভাবে বিন্যাসই নয় সমালোচনার মধ্যে সমালোচকের জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আমি কলকাতার সব সংগীত অনুষ্ঠানেই প্রায় যোগদান করি এবং সব সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাগজগুলির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিষয়ক সমালোচনাগুলিই দেখি। আপনাদের সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনাগুলিতে পক্ষপাতিত্বশূন্য এবং স্পষ্টবাদিতার ছাপ থাকে। সমালোচকের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জ্ঞানও যথেষ্ট আছে বলে মনে হয়।

নিরঞ্জন লাহিড়ী
কলকাতা—৩৩

দিবস বিভাবরী

এইমাত্র শারদীয় সংখ্যায় শ্রীমিহির আচার্য প্রণীত 'দিবস-বিভাবরী' উপন্যাসটি পাঠ করে আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এরূপ হৃদয়হীন নির্মম চিত্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বাংলা উপন্যাসে খুব বেশী দেখিনি। বর্তমান সমাজে কেরিয়ারের লোভে মধ্যবিত্তশ্রেণী যে দোদুল্যমানতার শিকার হয় নায়িকা প্রকৃতি ও সেই অন্ধ কেরিয়ার তৈরীর কানামাছি। এই পথে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদেরই অধিক জীবনের দাম দিতে হয়। প্রকৃতিও দিয়েছে। পরিণামে তার সর্বহারা জীবনে আমরা দুঃখিত হলেও একে অনিবার্য সিদ্ধান্ত বলে মনে করি। এমন নিষ্ঠুর কাহিনী বর্ণনে লেখক যে কোথাও ভাবালুতাগ্রস্ত হননি এর জন্যে তাঁকে পুনরায় ধন্যবাদ।

নিরঞ্জন নাথ
গরফা, যাদবপুর

বিমূর্ত দাহ

'অমৃত' ২৩শ সংখ্যায় শ্রীঅজিত দের 'বিমূর্ত দাহ' ছোট গল্পটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-যন্ত্রণা ও মথিত প্রাণের নিরুচ্চার বেদনাকে শ্রীদে দরদী মনের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। শিল্পীর সৃষ্টি তখনই সার্থক যখন সেই সৃষ্টি অন্যের মনে সাড়া জাগায়—সেই নিরিখের বিচারে শ্রীদে সম্পূর্ণ সফল। তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সোনা এবং হেনা, সোনার ত্রিশ পার হয়েছে, হেনার চৌত্রিশ। এই হেনাই নিজের জীবন যৌবন বিসর্জন দিয়ে অনুজ অসীমকে মানুষ করেছে। কিন্তু অসীম তার মানসীকে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছে—সোনা-হেনার কথা একবারও ভাবেনি। হেনাকে বিয়ের জন্য দেখতে এলে তার—আনুষঙ্গিক খরচও হেনারই দিতে হয়—অসীম এ ব্যাপারে উদাসীন। বার বার ব্যর্থ হয়ে হেনা বুঝেছে তার চির কৌমার্য ঘুচবে না। কিন্তু কার জন্য তার এ অবস্থা? তার নিজের সাধ-স্বপন কার জন্য সে বিসর্জন দিয়েছিল? যে সংসার তার সব নিয়েছে, তাকে সে দিয়েছে কি? এ

চিঠিপত্র

প্রশ্ন শুধু হেনার নয়, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের চিরকুমারীদের মনেই আজ এই নির্মম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সোনার জীবনে শুভেন্দুর ক্ষণিক আবির্ভাবও লেখক কৃতিত্বের সঙ্গে এঁকেছেন। যৌবন-সীমান্তে উপনীতা অনেক মেয়েই পুরুষ-সান্নিধ্য খোঁজে, যদিও ভাল করেই জানে তাদের মিলন সম্ভবপর নয়। রমলা চরিত্রটিও বাস্তবানুগ। অনেক অভিভাবক মেয়েদের নির্বাধ স্বাধীনতা দেন, তাঁদের দায়িত্ব এড়াবার জন্য তার ফল হয় ভয়াবহ। সবচেয়ে ভাল লেগেছে গল্পাংশের শেষ ভাগটি যখন হেনা এর কানের দুলের জন্য চীৎকার করছে। তার আগের মুহূর্তেই সে শুনেছে তার অষ্টাদশী খুড়তুতো বোন মন্তুর বিয়ে স্থির হয়েছে। ঐ ঘটনার স্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়াই হেনার মানসিক ভারসাম্যের অভাব। একটি ছোট গল্পের পরিসরে অজিতবাবু আশ্চর্য সুন্দর মুন্সীয়ানার প্রমাণ দিয়েছেন।

ঝরণা সরকার
কলকাতা—২

নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে

আপনার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় অতীন বন্দোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি নিয়মিত পড়ছি ও আশ্বিনের সংখ্যায় শিশুদের যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে, আমার কাছে তা অশ্লীল বলে মনে হয়েছে। শিশুর জীবনে যৌনবিকৃতি সহজাত বা উত্তেজনা-জনিত নয়, কুশিক্ষাজনিত। ঘটনাগুলি হয়ত মিথ্যাও নয় কিন্তু সেটা মনস্তত্ত্ববিদ বা চিকিৎসকের বিষয়। এটাকে সর্বজন-গ্রাহ্য সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই চিঠি।

গৌরগোবিন্দ চক্রবর্তী
দক্ষিণ গাড়িয়া
২৪ পরগণা

(২)

আমি সপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। শ্রীঅতীন বন্দোপাধ্যায় লিখিত ধারাবাহিক উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নিয়মিত পড়ছি। এত সুন্দর আর সহজ মাত্রার উপন্যাস 'অমৃত' পত্রিকায় খুব কমই পড়েছি। প্রতি সপ্তাহে যখনই নতুন পত্রিকা পাই আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ি নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস। যতই পড়ি ততই ইচ্ছা হয় আর একবার পড়ি। পড়তে পড়তে মনে করিয়ে দেয় আমাদের আগেকার ফেলে আসা দিনগুলির কথা। আমরা যতই বড় হচ্ছি ততই ভুলে যাচ্ছি সেখানকার ভাষা, সমাজ, পরিবেশ, আচার আচরণ। এমনি-ভাবেই লেখক সোনার চরিত্রকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। সোনা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আর মাতৃভাষা ছেড়ে কিছু কিছু বই-এর ভাষা শুরু করেছে। এত সুন্দর বাস্তবানুগ সহজ পদ্ধতিতে উপন্যাস লেখার জন্য অতীনবাবুকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

নীলকমল বিশ্বাস
রুইয়া, ২৪ পরগণা

'তিনগাঁয়ের চিঠি' প্রসঙ্গে

৬ই কার্তিকের অমৃতে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় "তিন গাঁয়ের চিঠি'তে বিলেতের একটা প্রসংগ উল্লেখ করেছেন যা সত্যি নয়। তিনি লিখেছেন "লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য ত্রৈমাসিক দর্পণ..."

জানি না বিশ্বনাথবাবু পত্রিকাটি পড়েন কিনা তবে সেটা সাহিত্য পত্রিকা নয়। তার পরিচয় পত্রে লেখা "স্বাধীন নিরপেক্ষ বাংলা সাময়িকী"। অবশ্য ওপরে সাহিত্য পত্রিকা লিখলেই সৎ সাহিত্য হয় না।

এই প্রসংগে আমার বক্তব্য লণ্ডনে এশিয়ানদের অনেক "সাময়িকী" আছে। বিভিন্ন ভাষায়। মায় ইংরাজীতেও। তবে সাহিত্য পত্রিকা একটি। সেটা বাংলা ভাষায়। নাম "সাগর পারে"। বাংলার দিকপাল সাহিত্যিকরাও তাতে লেখেন।

যাইহোক ভবিষ্যতে লণ্ডনের বুকে আরও সাহিত্য পত্রিকা গড়ে উঠলে সুখের কথা হবে।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য
সম্পাদক
'সাগর পারে'

'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গ

আমি আপনাদের 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠিকা। এই পত্রিকায় সংযোজিত 'নিকটেই আছে' বিভাগটি বর্তমানের জুয়োচুরি জালিয়াতিপূর্ণ আবহাওয়ায় খুবই যুগোপযোগী হয়েছে।

পথে-ঘাটে-স্কুল-কলেজে-চাকুরীর ইন্টারভিউয়ে সর্বত্র আজ প্রতারণার ফাঁদ-পাতা। সরল নিরীহ মানুষের একটু অসাবধানে সে ফাঁদে পতন অনিবার্য।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একরকম প্রতারণার কথা আপনাদের জানাচ্ছি। সেটি হ'ল অসৎ-অসাধু-অনামী পুস্তক প্রকাশক কর্তৃক তরুণ লেখক-লেখিকাদের প্রতারণার সংবাদ। ইদানিং কলেজ স্ট্রীটের পাড়ায় বেশ কিছু অসাধু প্রকাশক (বলা বাহুল্য কোনও নামী প্রকাশক নয়) গজিয়ে উঠেছে যাদের কাজই হ'ল তরুণ লেখক-লেখিকাদের ঠকানো। এ'রা পুস্তক প্রকাশনা বাবদ লেখকদের কাছ থেকে বেশ মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ করেন। তারপর খুব অল্প টাকায় নিকৃষ্ট চেহারায় সেই লেখক বা লেখিকার পুস্তক প্রকাশ করেন। এবং পরিশেষে দুই বছর পরে লেখক বা লেখিকাকে একটি নোটিশ দেন যে, "আপনার বই বৎসরে ৮০ কপির বেশি বিক্রি হচ্ছে না। অতএব "আন্ প্রফিটেবল" বলে ধরা হোল।" অর্থাৎ সোজা কথায় প্রকাশক কর্তৃক সেই লেখক বা লেখিকার সমস্ত বই 'বাজেয়াপ্ত' করা হ'ল।

তারপর সেই হতভাগ্য লেখক বা লেখিকাকে এই অবস্থায় অন্ধকারের কোন্ অতল তলে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—তা আশা করি সহজেই অনুমান করতে পারছেন।

অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণপুর, আমতলাহাট
২৪ পরগণা

রণজিৎ পালের আয়না

অমৃতের ১০ বর্ষ ২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রণজিৎ পালের 'আয়না' গল্প আধুনিক মননের তোলপাড়-চিন্তা। তারাপদ গল্পের সেই তোলপাড় চিন্তার ভাবুক আর রঞ্জা ভাবনা। আর এদের ভাবনাই মনস্তত্ত্বের তাত্ত্বিককে মৌনমনে ডুবিয়ে দেয় অপার সাগর জলে।

আধুনিক ছোট গল্পের পাঠক নিটোল মনস্তত্ত্বের তত্ত্বভাবনায় মশগুল হতে ভালবাসে। মানবমনের মর্মমূলে শত আঘাতের চঞ্চলতায় সেই হৃদয়তন্ত্রী কত সুরে ঝংকার তুলতে পারে তাই দেখতে চায় আধুনিক গল্প-পাঠক। আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আবদ্ধ সূক্ষ্ম প্রশ্বাস-নির্যাস যা প্রচণ্ড আবেগে দানা বেঁধে রয়েছে তার বহুত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর যাত্রা-পথ দেখানো আধুনিক গল্পকারের উদ্দেশ্য হলেই পাঠকের মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। রণজিৎবাবুর বলিষ্ঠ শিল্পীসত্তার গুণে এবং সম্পাদক মহাশয়ের নির্ভীক সত্য-পালনের ও যথার্থ শিল্পের চরিতার্থতায় সহায়তার গুণে আমাদের মানসলোক ধন্য হয়েছে একথা না স্বীকার করে পারলাম না।

কেশব আড্ডু
খালনা, হাওড়া

শান্ত চোখে

বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বার বার ঘোষণা করছেন যে তাঁর দলের আট পার্টি জোটে যোগ দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। শ্রীধাড়া কেন একথা বলছেন তা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। অষ্টবামের জোটে না গেলেও শ্রীধাড়া জানেন বা হয়ত বুঝতে পারছেন, তাঁর দল তাঁরই প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্ব দিয়ে পশ্চিম বাংলায় পুনরায় ক্ষমতা দখল করতে পারবে। হয়ত একথাও তিনি ভেবেছেন যে বামপন্থীদের সঙ্গে যেখানে প্রতি পদক্ষেপেই কার্যক্রম ও চিন্তার পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে আর একবার কোয়ালিশান সরকার করে হাত পোড়ানো উচিত হবে না। কাজেই বার বার 'সমভাবাপন্ন' দলগুলির সঙ্গে ঐক্যের কথা বলে শ্রীধাড়া ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলায় একটি গণতন্ত্রী মনোভাব গড়ে তুলবার মত অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলেছেন। শ্রীধাড়ার এই বক্তব্যের পর আট পার্টি জোটের বিদ্রোহী পি এস পি বলেছে তাঁরা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন। কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিদ্রোহী পি এস পি নিল তা বোঝা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার চারটি আসনের জয়-লাভের প্রশ্নটা অনেকখানি বাংলা কংগ্রেসের সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে। তাই সেখানকার পূর্বতন সদস্যরা চাপ সৃষ্টি করেছেন যে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত গড়তেই হবে। পি এস পি নেতৃত্ব এ দাবীকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি। কাজেই আসনের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের রাজনৈতিক লাইন ঠিক করতে হল।

অন্যদিকে আবার ডান কম্যুনিস্টরাও একটু বিপদে পড়েছেন। তাঁদের সর্বভারতীয় নীতি হিসাবে তাঁরা সোজাসুজি না হলেও বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালি করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর বাধা এসেছে শ্রীসুশীল ধাড়ার কাছ থেকে, এবং শাসক কংগ্রেসের নেতৃত্বের একাংশ ও যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে। এ বাধা আসাটা স্বাভাবিক। কারণ, ডান কম্যুনিস্ট পার্টি বর্তমানে যতই নীতি বদলাবার কথা বলুক না কেন, কংগ্রেসীরা তাঁদের সদিচ্ছায় সন্দিহান হতে বাধ্য। কম্যুনিস্টদের আন্দোলনের তীব্রতা পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী ছিল। আর কংগ্রেসকে সব সময়েই এ আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কাজেই তাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির সদিচ্ছাকে ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনের মতই মনে করছেন। অন্যান্য রাজ্যে কম্যুনিস্টদের আন্দোলন নেই বললেই চলে। অবশ্য কেরল ও অন্ধ্র বাদ দিয়ে। কাজেই সেই সমস্ত রাজ্যে নব কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে কম্যুনিস্ট ভীতিটা এত দানা বেঁধে ওঠেনি যে পরিমাণে পশ্চিম বাংলায় তা হয়েছে।

শ্রীসুশীল ধাড়া ও শ্রীঅজয় মুখার্জিও এক সময় কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। বিশেষ করে শ্রীঅজয় মুখার্জি ত এমন একদিন ছিল যখন কম্যুনিস্টদের 'মুখোস না খুলে' দিন কাটাতেন না। কেবলমাত্র শ্রীঅতুল্য ঘোষের রোষবহ্নিতে পড়েই শ্রীমুখার্জি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। শ্রীমুখার্জির এটা একটি কৌশল ছিল মাত্র। আদপে তাঁর সঙ্গে কম্যুনিস্টদের যে আদর্শগত পার্থক্য আছে তা তিনি ভোলেন নি। আর একসঙ্গে কাজ করার পর এতদিনের তত্ত্বগত পার্থক্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তবক্ষেত্রে আরও দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হল। তাই শ্রীসুশীল ধাড়া বার বার সমভাবাপন্ন দলগুলির ঐক্যের উপর জোর দিচ্ছেন। সি পি আই যত বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারিত করুক না কেন বর্তমানে বাংলা কংগ্রেসের মনোভাব দেখে মনে হয় কোন ক্রমেই তাঁরা সি পি আই-এর সংস্রবে যেতে রাজী নন। অধুনা মেদিনীপুরে সর্বত্রই যেভাবে বাংলা কংগ্রেস কর্মী ও সি পি আই কর্মীদের মধ্যে মৃত্যুপণ সংগ্রাম চলছে তাতে মনে হয় সমঝোতা থেকে শত্রুতার ক্ষেত্রেই বেশী পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। এমন কি ইতিমধ্যে বহু জায়গায় বাংলা কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয়েছে বলেও ঐ দলের পক্ষ থেকে সি পি আই-এর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনা হয়েছে। তদুপরি সবেমাত্র ধান কাটার মরশুম সুরু হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা করা যায় বিরোধের ক্ষেত্র এই সময় আরও প্রসারিত হয়ে পড়বে। কারণ, কৃষকের সমস্যার প্রতি দুই দলের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বুনিয়াদী পার্থক্য আছে।

শ্রীধাড়া ও তাঁর বাংলা কংগ্রেস চান ক্ষমতায় থেকে আইন করে আস্তে আস্তে যা কিছু পরিবর্তন তা নিয়ে আসা। বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের এখানেই দৃষ্টিভঙ্গীর বুনিয়াদী পার্থক্য। বামপন্থীরা চান ক্ষমতায় থেকে প্রশাসনিক যন্ত্রকে হাতিয়ার করে আইন ও গণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আনার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করা। গণশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রশ্নেই হিংসা ও অহিংসার কথাটা এসে পড়ে। এই গণশক্তিকে কাজে লাগাতে গিয়ে যে হিংসা হয় বামপন্থীরা তাকে স্বীকৃতি দিতে রাজী। বাংলা কংগ্রেসের মতে এখানেই হিংসা ঘটছে, এবং আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ছে। এই যেখানে পার্থক্য সেখানে বাংলা কংগ্রেস পুনরায় কি করে হাত মিলিয়ে পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির কাজে সাহায্য করতে পারে?

তাই শ্রীধাড়া—তাঁর সঙ্গে কোন দল একমত হচ্ছে কি হচ্ছে না তাকে উপেক্ষা করে—একলাই প্রায় পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আর এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য মুখ্যত তিনি তিন কংগ্রেস অর্থাৎ শাসক, আদি ও বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টির কাজে ইতিমধ্যেই গোপনে আত্মনিয়োগ করেছেন। বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেসের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন এটা চান, তখন পশ্চিমবাংলায় যাঁরা বাধা দেবার কথা ভাবছিলেন তাঁদের সরে দাঁড়াতেই হবে। এবং ইতিমধ্যে সরে গেছেনও। এখন বাকী রইল আদি কংগ্রেস। আদি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে শ্রীঅতুল্য ঘোষ। কারণ তাঁরই বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের পরিণতি হিসাবেই পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটেছিল। অতুল্যবাবু ছাড়া অন্য সকল কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের মধ্যে মোটামুটি একটু সম্প্রীতির ভাব এখনও আছে। কাজেই অতুল্যবাবুকে বাদ দিয়ে একবার এড হক কংগ্রেস করে অজয়বাবুকে ফিরিয়ে এনে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তখন তা সম্ভব হয়নি। কারণ অতুল্যবাবুর হাত তখনও সুদৃঢ় ছিল। কিন্তু বর্তমানে অতুল্যবাবু পর্দার আড়ালে চলে গেছেন। বস্তুতপক্ষে এখন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের উপরই পশ্চিমবাংলার আদি কংগ্রেস নির্ভরশীল। তদুপরি 'প্রফুল্লদা' সকলেরই প্রিয়। হালফিল কোন একজন শাসক কংগ্রেস নেতা নাকি প্রফুল্লবাবুকে 'দেশবন্ধু শতবার্ষিকী কমিটিতে' সদস্য হিসাবে গ্রহণ করবার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখনই শ্রীঅজয় মুখার্জি সহ অনেকেই নাকি তাতে বাধা দিয়ে বলেছেন তবে তাঁদেরও ঐ কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হোক। পরে যিনি শ্রীসেনকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার বিরোধিতা করেছিলেন তিনিই পশ্চাদপসরণ করেন। এখনও 'প্রফুল্লদার' প্রতি শ্রদ্ধার চিত্র হচ্ছে এই রকমই। কাজেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ যদি রাজনৈতিক অবসর গ্রহণ করেন তখন সমঝোতার পথে কাঁটা কোথায়? এই সমঝোতার জন্য ইতিমধ্যে সেন-মুখার্জি বৈঠকও হয়ে গেছে। আদি কংগ্রেসের বক্তব্য দেখলেও মনে হয়, তাঁরাও দলগতভাবে এরকম একটি প্রস্তাবের আদৌ বিরোধী নন। তাঁদের মুখপাত্র ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বলেছেন, সাম্প্রদায়িক দল, কম্যুনিস্ট বা জাতীয়তা বিরোধী দলগুলি ছাড়া তাঁরা অন্য সব দলের সঙ্গেই সমঝোতায় রাজী। আবার সঙ্গে সঙ্গে ২৮০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার বাসনার কথা বলেও আঁতাতটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। অন্যভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, আদি কংগ্রেস সমস্ত আসনে প্রার্থী দেবেন বলে ঘোষণা করে সমঝোতাটা যে হচ্ছে তা আপাত জনতাকে বুঝতে দিতে চান না। যে কোন কারণেই হোক প্রচারের ফলে

কেবলমাত্র আদি কংগ্রেসই 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে। অতএব তিন কংগ্রেস জোট বাঁধছে একথা তাড়াতাড়ি প্রকাশ হয়ে পড়লে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, এই আশংকায় হয়তো ডঃ চন্দ সকল আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সমঝোতা করবার জন্য তিনি যে সীমানা চিহ্নিত করেছেন তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দুই বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি স্পষ্ট হবে।

যা হোক ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল শ্রীঅজয় মুখার্জি ও স্বর্গত হুমায়ুন কবিরের কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ ও বামপন্থীদের সঙ্গে মিতালি। যুক্তফ্রন্টকে হেনস্তা করে গদী থেকে অপসারিত করার পরও ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের সমর্থন কমে নি। অন্যদিকে সমস্ত বামপন্থী দল, ইত্তেক শ্রীমুখার্জির বাংলা কংগ্রেস সহ সকলে একজোট হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তদুপরি সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দও বামপন্থীদের সঙ্গে ছিলেন। স্বর্গত হুমায়ুন কবির বামপন্থী-জোটের বিরোধিতা করলেও সেবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলান নি। ১৯৬৭ সালে গদী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই বামপন্থীদের প্রতি জনতার অনুরাগ ছিল। তদুপরি প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের সময় দেওয়া হয়নি বলেও কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের বীতশ্রদ্ধ ভাব থাকারই কথা। এতদসত্ত্বেও ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কংগ্রেসের সমর্থন ত কমেইনি বরঞ্চ বেড়ে গিয়েছিল। আসন কম পাওয়ায় গদী হারিয়েছিল মাত্র, ভোটের সংখ্যা বেশি পেয়েছিল।

কিন্তু ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর যুক্তফ্রন্টের তের মাসের খুব সুখকর কাহিনী নয়, যতই আস্ফালন করুন না কেন, শরীকী সংঘর্ষ পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার করেছে তা তখনও কাটেনি। এবং নির্বাচনী মেনিফেস্টোয় আমজনতাকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করা ত দূরের কথা, তাকে রূপায়িত করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা পর্যন্ত চালানো হয়নি। মাঝে মাঝে এই হচ্ছে, ঐ করা হবে, বলে ঘোষণা করে গণমনে আশার সঞ্চার করা হয়েছিল মাত্র। কাজেই আমজনতা বামপন্থীদের কার্যকলাপে খুবই যে উৎসাহিত বোধ করেছেন একথা বলা যায় না। জনতার হাবভাব খানিকটা যেন বুক ফাটে ত মুখ ফাটে না গোছের। ১৯৬৯ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস যে গণসমর্থন পেয়েছিল তা এখন হারিয়েছে একথা বলা যায় না। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার ফলে সমর্থকের মধ্যে হয়ত খানিকটা বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে মাত্র। যদি আবার সমঝোতার মাধ্যমে জনতার সামনে একটা ঐক্যের ছবি তুলে ধরা হয় তবে তাদের সমর্থনে ফাটল নাও ধরতে পারে। কংগ্রেস সংগঠনের দিক থেকে কোথাও বিশেষ শক্তিশালী নয়। তাদের যা সমর্থন তা হচ্ছে আমজনতার স্বাভাবিক অনুরাগের ফলশ্রুতি মাত্র। কাজেই এবার তিন কংগ্রেস যদি এক হয়ে ময়দানে নামে তবে রাজনৈতিক চিত্রটা যে অনেকখানি পাল্টাবে একথা বলা যায়। তদুপরি সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবের সমর্থনটা কম কথা নয়। কারণ, বদরুদ্দোজা সাহেব স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই একটানা কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। কাজেই তিনি যদি বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে যান তাতে আর কোথাও না হোক মুর্শিদাবাদে নিদেনপক্ষে একটি রাজনৈতিক ভূমিকম্প হতে পারে।

বাংলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়ার রাজনীতিটা এখানেই। তিনি এই সমগ্র চিত্রটা যথাযথ অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে পা বাড়িয়েছেন। কাজেই অষ্টবামের জন্য তিনি পরোয়া করবেন কেন? বরঞ্চ অষ্টবাম ও ষড়বামের মধ্যে লড়াইটা বজায় থাকলে তাঁর ফরমুলা কার্যকর যে হবে সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। কাজেই সি পি আইকে বাংলা কংগ্রেস কোনমতেই গ্রহণ করতে পারে না, এবং তাদের গণতান্ত্রিক শিবিরেও তিনি ভিড়তে দিতে পারেন না। সি পি আই ঐ শিবিরে ভিড়লে অষ্টবাম দুর্বল হয়ে যাবে এবং বাকী দলগুলির সি পি এম-এর সঙ্গে ভিড়ে যাবার আশংকা থাকবে। কাজেই অষ্টবামকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে শ্রীসুশীল ধাড়া তাঁর থিয়োরীকে বাস্তব রূপ দিতে চান। তত্ত্বগত দিক থেকেও তাঁর বক্তব্য ও ব্যবহারে কেউ অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন না। শ্রীধাড়া ক্রমেই যে রাজনীতিতে বিচক্ষণতার প্রমাণ দিচ্ছেন তাঁর বর্তমান ভূমিকাই তা প্রমাণ করে।

—সমদর্শী

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের বিবাহের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত গুণমুগ্ধ সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্তা বিভারাণী ঘোষ (শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের স্ত্রী), শ্রীযুক্তা শুভ্রা ঘোষ (শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের স্ত্রী), শ্রীলেখা বসু (শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের কন্যা) এবং সর্বশ্রী নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, চারু রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, সুমথনাথ ঘোষ, বিশু মুখোপাধ্যায়, নির্মল সরকার, মণীন্দ্র রায়, প্রিয় গুহ, তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, আশাপূর্ণা দেবী, নবনীতা সেন, সুপ্রিয় সরকার, সুশীল রায়, শ্রীমতী অনিমা সরকার এবং আরো অনেকে।

দেশে বিদেশে

উত্তর প্রদেশে শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহ ও বিহারে শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়, এই দুই মুখ্যমন্ত্রীর কারোরই স্বস্তিতে দিন কাটছে না। আসামে নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র-মোহন চৌধুরীও তাঁর মন্ত্রিসভার কাজ আরম্ভ করলেন একটা অস্বস্তিকর বিরোধের মধ্য দিয়ে।

এদিকে, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বিরোধী দলগুলিতে প্রস্তুতি চলেছে।

উত্তর প্রদেশে শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং তাঁর পূর্ণ মন্ত্রিসভা এখনও তৈরী করে উঠতে পারলেন না। তিন সপ্তাহ আগে তিনজনের মন্ত্রিসভা নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছিলেন, ইতিমধ্যে আরও দুজনকে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রীদের কবে নেওয়া হবে তার কোন হদিশ নেই। ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিংকে মন্ত্রিসভার বাইরে রেখে শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং ও বিরোধী কংগ্রেস দলের অন্যান্য নেতারা নিশ্চিত বোধ করতে পারছেন না। তাঁরা ও তাঁর নিজের দলের একাংশও শ্রীচরণ সিংকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বি-কে-ডি নেতা রাজী হচ্ছেন না। এদিকে, উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির ভিতরে গুরুতর বিরোধ দেখা দিয়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা ঐ মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার জন্য দলের পাঁচজন প্রতিনিধির নাম স্থির করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে! উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির কিছু সদস্য দলের এই মনোনয়নে মোটেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা দলের নেতা শ্রীরাজ-নারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তিনি "ডিক্টেটরের" মত কাজ করছেন।

বিহারে বিধানসভার শাসক কংগ্রেস দলের ভিতর শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের নেতৃত্বের বিরোধীরা দলের সর্বভারতীয় নেতাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, শ্রীরায়কে না সরালে সেখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠবে। তাঁদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে কিছু দেখছেন না বলে প্রশাসন অচল হয়ে যাচ্ছে, এমন কি চীফ সেক্রেটারীর মত একটা পদও মাসের পর মাস খালি রেখে দেওয়া হয়েছে।

"ভিন্নমতাবলম্বী" পাঁচজন সদস্য অবশ্য ইতিমধ্যে নয়াদিল্লীতে গিয়ে একটা মিটমাট করে এসেছিলেন, কিন্তু অন্য 'ভিন্নমতা-বলম্বীরা' বেঁকে বসেছেন। তাঁদের এক গোঁ—শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়কে নেতৃত্ব ছাড়তে হবে অথবা তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরাতে হবে। বিহার থেকে যাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর ?

যুদ্ধ দেবতা

মন্ডলীতে গেছেন তাঁদের মধ্যে একজন উপমন্ত্রী শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ এই দাবী সমর্থন করছেন। অন্যদিকে, আর একজন উপমন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্র শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়কে সমর্থন করছেন।

বিহার বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে শ্রীরায়ের সমর্থক কতজন আর বিরোধীদের সংখ্যা কত তা বোঝা যাচ্ছে না এবং তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বাদ দিয়ে কাকে নেতা করতে চান তাও পরিষ্কার নয়।

শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের অস্বস্তির আর একটি কারণ হল এই যে, ক্ষমতাসীন কোয়ালিশনের পাঁচটি শরিক—ঝাড়খন্ড পার্টি, হুল ঝাড়খন্ড পার্টি, বি-কে-ডি, 'পাল্টা' পি-এস-পি এবং শ্রীবি পি মন্ডলের নেতৃত্বাধীন শোষিত দল—একটি 'যুদ্ধ ফ্রন্ট' গঠন করেছে। এই যুদ্ধ ফ্রন্ট'-এর উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কার করে ঘোষণা করা হয় নি; কিন্তু তারা ইতিমধ্যে স্থির করেছে যে, কোয়ালিশনের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে তারা যোগ দেবে না।

আসামে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার বিদায় ও সেই পদে শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর অধিষ্ঠান খুবই নির্বিঘ্নে ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার সূচনা শুভ হয় নি। কারণ, প্রথমত আসাম প্রদেশ কংগ্রেস (শাসক) কমিটির সভাপতি শ্রীবিজয়চন্দ্র ভগবতী তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজী হন নি এবং দ্বিতীয়ত, তিনি মৈনুল হক চৌধুরীকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নিতে রাজী হন নি। প্রথমজনকে নেওয়ার জন্য মহেন্দ্রবাবু উৎসুক ছিলেন আর দ্বিতীয়জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (ও আসামের প্রতিনিধি) ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ তদ্বির করেছিলেন। শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী যেভাবে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাতে তিনি শ্রীভগবতী ও মৈনুলের সমর্থকদের চটালেন এবং দিল্লীর নেতাদেরও অসন্তুষ্টির কারণ ঘটালেন। এর পর তিনি কি করে সামলাবেন সেটা দেখার বিষয়।

•

ভারত ও নেপালের সম্পর্ক এমনিতেই ভাল যাচ্ছিল না, দিল্লীতে ভারত-নেপাল বাণিজ্য আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর সেই সম্পর্কের অবনতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

অথচ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা খবর পাওয়া যাচ্ছিল, আলোচনা সন্তোষজনকভাবেই এগোচ্ছিল। একদিকে ছিলেন বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্রের নেতৃত্বে ভারতীয়

শাসক কংগ্রেসের নেতারা ডায়মন্ডহারবার রোডে ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গিয়ে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমতী সেনগুপ্তা এখানে চিকিৎসার জন্য আছেন। বাঁদিক থেকে রয়েছেন—পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ও পার্লামেন্টের কংগ্রেস সদস্যা শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি।
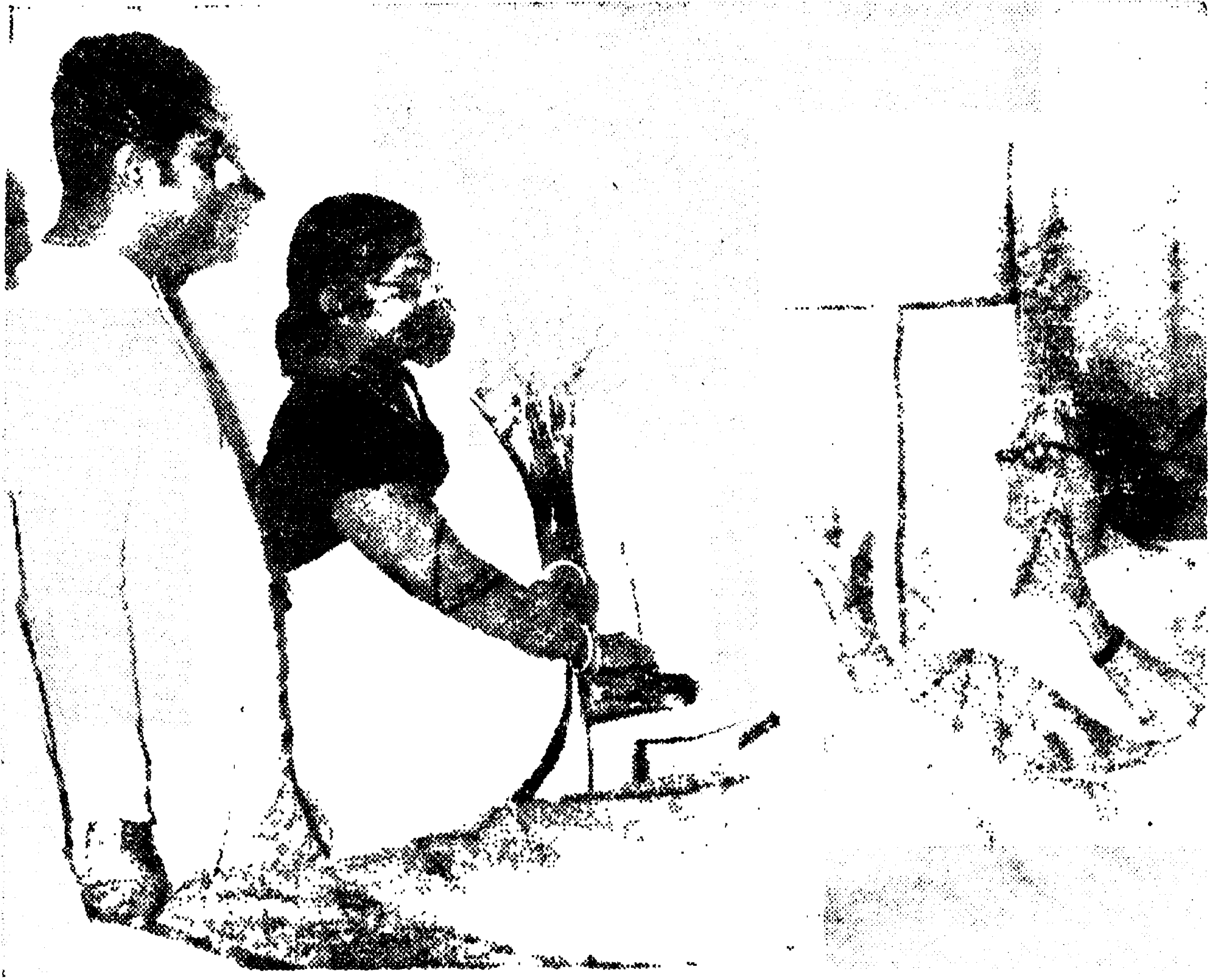
প্রতিনিধি দল, অন্যদিকে ছিলেন নেপালের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীনবরাজ সুবেদীর নেতৃত্বে সে দেশের প্রতিনিধিদল। কিন্তু যখন মনে হচ্ছিল যে আর কয়েক ঘন্টার ভিতরেই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তখনই জানা গেল যে, আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। যে সব বিষয়ে মতবিরোধের জন্য আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গেল সেগুলি হচ্ছে:—

(১) নেপাল দাবী করেছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুর দিয়ে রেলপথে ও সড়কে পাকিস্থানে নেপালী পণ্য পাঠাবার জন্য তাকে অবাধ সুযোগ দিতে হবে।

(২) স্টেইনলেস স্টীল ও রাসায়নিক তন্তুজাতীয় যে-সব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে নেপালে নামমাত্র 'প্রোসেস' করে ভারতে চালান দেওয়া হয় সেগুলির সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা চাই বলে ভারতের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছিল।

(৩) নেপালের দাবী ছিল ভারত-নেপাল বাণিজ্য সম্পর্কে এবং ভারতের উপর দিয়ে নেপালের যে-সব পণ্য তৃতীয় দেশে যাবে সেগুলির সম্পর্কে পৃথক চুক্তি করতে হবে।

(৪) ভারতবর্ষ প্রস্তাব করেছিল যে, নেপালের রপ্তানি পণ্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রায়ত্ত ট্রেডিং কর্পোরেশনের মারফৎ পাঠাতে হবে।

●

পর পর কয়েকটি বড় বড় রেল দুর্ঘটনা হয়ে যাওয়ায় রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারদের এবং নিরাপত্তা অফিসারদের এক সম্মেলন ডাকা হয়েছে।

দশ দিনের মধ্যে গোটা তিনেক বড় রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। মিটার গেজ লাইনে আমেদাবাদ থেকে দিল্লীগামী এক্সপ্রেস ট্রেন রেওয়ারীর কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। খুর্জায় আলিগড়-দিল্লী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল গাজিয়াবাদ থেকে আগত একটি মালগাড়ীর। আর পেরাম্বুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা কোচিন মেলের পিছন থেকে এসে ধাক্কা মেরেছিল ম্যাঙ্গালোর মেল।

এক দেশের রাষ্ট্রনায়কদের অন্য দেশে সফর এখন আন্তর্জাতিক কূটনীতির অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের সফর যে কখনও কখনও বন্ধুত্বের বন্ধন রচনা না করে অভাবিত বিড়ম্বনার কারণ ঘটাতে পারে সেটা করাচীর বিমানবন্দরে একটা অভূতপূর্ব ঘটনায় পোল্যান্ডের পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী জিগফ্রিড ওলসিয়াকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল। পাকিস্থানে সফররত পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট স্পাই-চালস্কি ও অন্যান্য বিদেশী অতিথিরা বেঁচে গেছেন বটে, কিন্তু পাকিস্থানের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ও দুজন প্রেস ফটোগ্রাফার বিমানবন্দরের মালবাহী ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে মারা গেছেন।

এই ঘটনায় পোল্যান্ড ও পাকিস্থানের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না; তবে এটা একজন উন্মাদের কান্ড অথবা এর ভিতরে একটা চক্রান্ত আছে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তদন্ত করে পাকি-স্থানকে পোল্যান্ডের আস্থা লাভ করতে হবে।

৭-১১-৭০ —পুন্ডরীক

সম্পাদকীয়

জঞ্জালের শহর

কলকাতাকে যখন পোড়ো শহর, মিছিল নগরী, বলা হয়েছিল তখন আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। বলেছিলাম কলকাতায় মিছিল চললেও তা প্রাণবন্ত। বলেছিলাম, এ শহর পোড়ো নয় বরং অতিমাত্রায় জনতাকীর্ণ। ধীরে ধীরে কলকাতার সব কিছুই বেড়েছে। তার লোক বেড়েছে, মিছিল বেড়েছে, বেড়েছে তার জঞ্জাল। এখন যদি এই শহরের নামে কেউ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, তার নোংরা-আবর্জনার স্তূপ দেখে শিউরে ওঠেন তাহলে আমাদের বলার আছে কি?

গত সপ্তাহে কলকাতা পৌরসভার মজদুররা পাঁচদিন ধর্মঘট করেছিল। সেই ধর্মঘট মিটেছে কিন্তু পাঁচদিনে যে পাহাড় প্রমাণ জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়েছিল তা সরানো একদিনের কর্ম নয়। তার ওপর প্রতিদিন আবার নতুন জঞ্জাল জমতে সুরু করেছে।

কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কমিটি গত সপ্তাহে জানিয়েছেন যে শীতের মুখে কলকাতা শহরে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। জঞ্জাল পরিষ্কার না হলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। শহরের নানাস্থানে পূতিগন্ধময় জঞ্জাল হয়ে আছে। তার ফলে অনেক জায়গায় ট্রাম-বাস চলাচলও বিঘ্নিত। এ সমস্ত খবর শহরবাসীদের জানা। তারা এর ভুক্তভোগীও। কিন্তু কলকাতার নাগরিকদের বোধ হয় প্রাণ-ধারণের ক্ষমতা একটু বেশি। ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বলা হত 'রেতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে কলকাতায় আছি'—এখনও তার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। কলকাতার অবস্থা দিনকে-দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এই শহরে প্রতিদিন যে ময়লা জমে তার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়—দু' হাজার টনের মতো। এই ময়লা পরিষ্কার করতে একজন হারকিউলিসের দরকার। এ যুগে হারকিউলিস তো একজন ব্যক্তি নয়। কর্পোরেশনের হাজার হাজার মজদুরে, শত শত লরী একজোট হলে নিশ্চয়ই হারকিউলিসের মতো শক্তি তাদের হয়। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে এই কাজটি সহজে হচ্ছে না। তাই শহর মাঝে মাঝেই 'গান্ধা' হয়ে পড়ে। তার জঞ্জালের স্তূপে শহরেরই চাপা পড়ে যাবার আশংকা।
কলকাতা পৌরসভার ব্যাপারই একটু আলাদা। ময়লা সরাবার জন্য তাদের হেফাজতে আপাতত শতাধিক লরী আছে কাগজে-পত্রে। কিন্তু স্টেট ট্রান্সপোর্টের মতো এখানেও অর্ধেক লরীই ঠুঁটো জগন্নাথ। গাড়ি আছে তো চাকা নেই। চাকা আছে তো ইঞ্জিন খারাপ। তা ছাড়া ড্রাইভারদেরও মাঝে মাঝেই অনুপস্থিতি কোনো না কোনো কারণে। তার ফলে এই গাড়িগুলোকে সচল অবস্থায় পাওয়া এক দুর্লভ ব্যাপার। যেগুলো কোনো রকমে সচল তারাও দুবারের বেশি ময়লা সাফাইয়ের ট্রিপ দিতে পারে না। এই ভাবেই কাজ চলছে। কর্পোরেশনের বাবুরা যেমন তার গাড়িও তেমনি হবে তাতে আর বিচিত্র কি? তার ফলে লরী ভাড়া করে জঞ্জাল সাফাই করতে হয়। লরী ভাড়ার কেলেঙ্কারী তো কর্পোরেশনের একটা ঐতিহ্যের মতো। এত সব কান্ড করে কলকাতার রাস্তার জঞ্জাল সাফ করা কি সহজ কথা? নেই শহরে জঞ্জাল জমে, নাগরিকরা চীৎকার করেন। কর্পোরেশন 'কাজ করছি' বলে এগিয়ে এসে দেখে যে তাদের করনীয় বেশি কিছু নেই। যেমন চলছিল তেমনি চলছে শহরের জঞ্জাল সাফাইয়ের মন্থরগতি। সুতরাং কলকাতার জন্য দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এই শহরকে প্রসাধন লাগিয়ে একটু সুন্দর করবার জন্য কাজে হাত দেবে বলে স্থির করেছে। তার এক্তিয়ার নিয়ে কর্পোরেশনের সঙ্গে তর্ক বেধে উঠেছে। কী কাজ করা হবে তার চাইতে কে কাজ করবে তা নিয়েই তর্ক। শহরবাসীরা হতভম্ব। কর্পোরেশন তার অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন। দেশবন্ধুর আমলে যে অধিকার কর্পোরেশন অর্জন করেছিল তার নজীর দেখিয়ে এখন শুধু অধিকারের সীমানা নিয়ে যুক্তিতর্ক কেমন যেন অলীক গল্পের মতো শোনায়। কলকাতাকে এক সময় প্রাচ্যের অন্যতম সুন্দর শহর বলা হত। বৃটিশরা এই শহরকে রাজধানী করেছিল। কিন্তু আজ কলকাতার দিকে তাকালে কার না দুঃখ হয়। আমরা আমাদের নিজেদের গর্বের ও গৌরবের শহরকে ধূলিমলিন জঞ্জাল পরিকীর্ণ করে ফেলে রেখেছি। এই অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতার কোনো যুক্তি দিয়েই কি আমরা খণ্ডন করতে পারি? কলকাতা ক্রমশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে এটাই সত্য। এবং না জেনেও তার প্রতিকারে সর্বশক্তিতে আত্মনিয়োগের কোনো প্রয়াস পৌর কর্তৃপক্ষের দেখা যাচ্ছে না। এ অভিযোগই আজ কলকাতার নাগরিকদের।

পরলোকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অতি প্রিয় কথাশিল্পী ও শিক্ষাব্রতী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মাত্র ৫৩ বছর বয়স হয়েছিল। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

গত শুক্রবার রাতে তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে সেদিন শেষ রাতের দিকে শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। অবস্থা আবার খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং সন্ধ্যার কিছু পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র উপস্থিত ছিলেন।

মাত্র ৫৩ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল দীপশিখার আকস্মিক নির্বাপনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের ছাত্র ও শিক্ষক মহলে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে আসে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রথম অধ্যাপনা জীবন আরম্ভ করেন জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে। সেখান থেকে কলকাতার সিটি কলেজে এবং তারপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'রীডার।'

ইদানীং অসুস্থ শরীরে মৃত্যুর কথা তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি মারছিল। সুনন্দর জার্নালে তিনি শেষ লেখা লিখেছেন : "অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় সুনন্দর পাতাটি যদি না থাকে, তা হলে জানবেন আর একটি কমনম্যান বাঙালীর অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল।' শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্কে আগামী সপ্তাহে লিখবেন শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর অবদান

রামমোহন প্রভৃতি জীবনী-চিত্র তিনি রচনা করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে গল্প' বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য তিনি ডি-ফিল উপাধি পান। উত্তর বঙ্গে মাহুতদের জীবনের উপর লেখা তার ছোট গল্প 'অঙ্কুশ' প্রথম চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন শ্রীতপন সিংহ। তিনি নিজেই এর চিত্রনাট্য লিখে দেন। বর্তমানে প্রদর্শিত 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' তাঁরই লেখা চিত্র-নাট্য।

সাহিত্যজীবন

পদ্মা-মেঘনা-কালাবদর আড়িয়ল খাঁর জীবন-তরঙ্গে উদ্বেলিত 'উপনিবেশ' নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। বরিশালের নদী মোহনায় সমুদ্রগর্ভ থেকে সদ্যোত্থিত সোনা-মাটির চরে মানুষের গড়ে তোলা প্রথম ঘর থেকে আরম্ভ করে ডুয়ার্স-তরাই ও আরাকানের হিংস্র অরণ্যভূমি পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য দৃষ্টি সমভাবে প্রসারিত ছিল। উপন্যাসের পটভূমি ও পরিবেশ রচনায়, অধ্যাপনায়, স্মরণশক্তিতে এবং বক্তা হিসাবে বর্তমান বাংলা দেশে তাঁর জুড়ি বিশেষ কেউ ছিলেন না।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম বাংলা ১৩২৫ সালে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে। আদি নিবাস বরিশাল জেলার বাসুদেবপাড়া। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ছাত্রাবস্থায় কাব্য রচনা দিয়েই সাহিত্য সাধনার আরম্ভ। প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'বীতংস' তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। উপন্যাস ও ছোট গল্প সংগ্রহের মধ্যে 'উপনিবেশ' (তিন খণ্ড), সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, স্বর্ণসীতা, মন্দ্রমুখর সূর্য-সারথি, বৈতালিক, শিলালিপি, ভাঙ্গা বন্দর, দুঃশাসন, জন্মান্তর, বনজ্যোৎস্না, ভোগবতী, কালাবদর উল্লেখযোগ্য। (দৈনিক যুগান্তর থেকে)।

দৃশ্যপট সামনে

দেবল দেববর্মা

প্ল্যাটফর্মে পা রেখেই সমীরণ বন্ধুকে খুঁজল। নিশিকান্তর আসবার কথা,—চিঠিতেও সে কথা লিখেছে। স্টেশনে নিশ্চয় হাজির থাকবে। অবশ্য দু-পাঁচ মিনিট দেরি হলে সমীরণ যেন না উতলা হয়। নিশিকান্ত পৌঁছবার আগে না ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

গাড়ি প্রায় এক ঘণ্টা লেট। হয়তো আর খানিক আগেই পৌঁছত। কিন্তু কপালে ভোগান্তি। লাইন ক্লিয়ার না পেয়ে অভিমানে মুখভার করে সেই যে দাঁড়িয়ে রইল, আর ছাড়বার নামটি নেই। প্রায় মিনিট পনের পরে, ফের কাঁপা কাঁপা হুইসিল বাজিয়ে গাড়িটা নড়েচড়ে উঠল। তারপর সার্কাস পার্টির বাঘ-সিংহ যেমন খুব অনিচ্ছুকভাবে গজরাতে গজরাতে খাঁচার দিকে এগোয়, অনেকটা তেমনিভাবে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

সমীরণের কপালে ধনুকের মত বাঁকা চিন্তার রেখা পড়ল। থুতনীতে হাত রেখে সে ভাবছিল, নিশিকান্ত এত দেরি করছে কেন? গাড়ি বেশ লেট। ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়লে অনেক আগেই তার পৌঁছ-বার কথা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সমীরণ একবার সময়ের হিসেব করল। তারপর শিশু যেমন ব্যাকুলভাবে জননীকে খোঁজে, অনেকটা তেমনি দ্রুত, সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফের হতাশ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন গিজগিজ করছে। এত বড় গাড়িটার পেট থেকে কম লোক তো নামেনি। পিলপিল করে সব গেটের দিকে এগোচ্ছে। কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে মেয়েপুরুষ চলেছে। কেউ বাচ্চার হাত ধরেছে। কেউ ঝাড়া হাত-পা নির্ঝঞ্ঝাট।

NITAIGHOSH

হাতে একটা ছোট সুটকেস কিম্বা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ নিয়ে হন হন করে হাঁটছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন এগিয়ে এসে তাকে শুধোল—'হ্যাঁ মশায়, ট্রেনটা কতক্ষণ এলো বলতে পারেন?'

সমীরণ নিজের কথা ভাবছিল। সে বিরক্তমুখে জবাব দিল,—'এই তো এলো। দেখছেন না এখনও লোকজন সব বেরোয় নি।'

লোকটি বেশ কালো। চোখে খয়েরী মোটা ফ্রেমের চশমা। সে সমীরণের মুখের উপর একবার নজর বুলিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় আচমকাই কাঁধের উপর একটা চাপড় মেরে বলল,—'কিরে, আমাকে চিনতেই পারলি না?'

মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সমীরণ একটা স্বল্পালোকিত ছায়া ছায়া দিনের কথা মনে পড়ল। বিস্ময়ে চোখদুটো বড় করে সে বলল,—'নিশিকান্ত, তুই?'

—'আমি জানতাম তুই চিনতে পারবিনে। তাই তো মজা করে শুধোলাম, ট্রেনটা কতক্ষণ এসেছে বলতে পারেন? তুই একবার আমার মুখের দিকে তাকালি, কিন্তু চিনতে পারলি নে।'

সমীরণ হেসে বলল—'বাপস্। চিনতে পারব কেমন করে? যা মুটিয়েছিস। তেমনি একখানা চশমাও হয়েছে। মুখখানা ঠিক যেন একটা হাঁড়ি—আমাদের সেই শশী মাস্টারমশায়ের মত গম্ভীর লাগছে।'

নিশিকান্ত হো হো করে হাসল। বলল,—'বেড়ে বলেছিস কিন্তু। ঠিক শশী মাস্টারমশায়ের মত। দেখিস, যমুনা শুনলে তোর মগজের তারিফ করবে। কথাটা গিয়েই আজ বলতে হবে ওকে।' ফের মুখ নীচু করে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে শুধোল—'কই রে? তোর মালপত্র সব কোথায়?'

সমীরণ ঘাড় ফিরিয়ে রেলের কামরার দিকে ইঙ্গিত করল। বলল—'ওখানেই আছে। তুই এলি না দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। নামিয়ে আনার উৎসাহ হয় নি।'

নিশিকান্ত আর দেরি করল না। একটা কুলি ডেকে হোল্ড-অল আর সুটকেসটা গাড়ির ভিতর থেকে বের করে আনল। একটু ব্যস্ত হয়ে বলল,—'আর গল্প নয়। তাড়াতাড়ি চল সমীরণ। নইলে ফেঁসে যাবি। ট্যাক্সি পেতে ঘন্টা কাবার হবে।'

সমীরণ অবাক হয়ে শুধোল,—'বলিস কি রে? ট্যাক্সি পেতে এক ঘন্টা লাগবে?'

—'অসম্ভব নয়।' নিশিকান্ত লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটার দিকে একনজর তাকিয়ে সে বলল, '—পাঁচটা বাজলেই মুস্কিল। তখন খালি ট্যাক্সি মানেই সোনার হরিণ। মাথা খুঁড়লেও তার দেখা পাবি না। তবে স্টেশনে একটা সুবিধে,—লাইনে দাঁড়ালে যখন হোক চান্স আসবে।'

ধোঁয়ার মত ভিড়টা আর নেই। এখন বেশ স্বচ্ছন্দে পাখির মত ডানা মেলেও হাঁটা যায়। একটা সৈন্যবাহিনীর মত এতক্ষণ যারা প্ল্যাটফর্মের উপর হাঁটছিল, তারা সব গেট পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে গিয়ে পৌঁছেছে। বন্ধুর পাশে যেতে যেতে সমীরণ বলল,—'তোর দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম বুঝি আর এলি না।'

'—পাগল। তুই চিঠিপত্র লিখে আমাকে সব ভার দিয়ে বসে আছিস। আর আমি না এসে পারি?' পরে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে সে বলল,—'দেরি কি সাধে? কলেজ স্ট্রীটে একপ্রস্থ বোমাবাজী হয়ে গেল। ট্রাম-বাস বন্ধ, মায় ট্যাক্সি পর্যন্ত যেতে চায় না। শেষে হাত ঘুরিয়ে নাক দেখার মতো এসপ্ল্যানেড হয়ে হাওড়া পৌঁছলাম।'

সমীরণ ভ্রূ কোঁচকাল। ভয়ে, আশঙ্কায় চোখ দুটি একটু ছোট হ'ল। সে শুধোল,—'আমরা এখন আবার কলেজ স্ট্রীট পেরিয়ে যাব নাকি?'

'—তার জন্যে দুশ্চিন্তা নেই।' নিশিকান্ত নির্ভয়ে কথা কইল। এতক্ষণ সব চুপচাপ. ট্রাম-বাস, মানুষজন ফের চলেছে। আসলে গন্ডগোল এখন গা-সহা ব্যাপার। সবাই জানে ও শরতের বিষ্টি। বড় বড় ফোঁটায় তড়বড়িয়ে যেমন নামে, তেমনি হুস করে চলে যায়। ফের নীল আকাশ। মানুষজন, ট্রাম-বাস সব বেরুবে। কেউ চিন্তাও করবে না, একটু আগেই এখানে কুরুক্ষেত্তর কান্ড হয়ে গেছে।'

ট্যাক্সি পেতে প্রায় এক ঘন্টার মত লাগল। মাঝারি লাইন।...জন কুড়ি পঁচিশ লোকের পিছনে নিশিকান্ত এসে দাঁড়াল। তবু সৌভাগ্য চলতে হয়। প্রথম দিকে ট্যাক্সি নেই। একটি, দুটি করে আসছিল। শেষ দিকে ছোট্ট এক ঝাঁক পাখির মতো সাত-আটটা ট্যাক্সি প্রায় একসঙ্গে এসে থামল।

ট্রেন জার্নির পর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে সমীরণের কোমরে ব্যথা,—পা দুটো টনটন করছিল। গাড়িতে উঠে পিছনের সীটে সে বেশ আরাম করে বসল। হাত দুটো ছড়িয়ে বলল,—'হোটেলটা কোথায় রে? তোর বাড়ির কাছেই নাকি?'

নিশিকান্ত মুচকি হেসে উত্তর দিল,—'খুব কাছে। একেবারে হাতের নাগালে।'

কথার ভাঁজে রহস্যের গন্ধ। সমীরণ বুঝতে পেরে সোজা হয়ে বসল। শুধোল, 'হাতের নাগালে? তার মানে কি?'

নিশিকান্ত খুলে বলল,—'মানেটা সহজ। হোটেলে রুম নেওয়া হয়নি। তুই আমার ওখানেই থাকবি।'

সমীরণ মৃদু প্রতিবাদ করল। 'দূর। তাই কখনও হয়? আমি দিন তিনেক থাকব। মিছিমিছি তোদের ট্রাবল দেওয়া হবে। আমাকে বরং একটা হোটেলে নিয়ে চল।'

নিশিকান্ত মাথা নেড়ে বলল—'অসম্ভব। যমুনা তাহলে ভীষণ রাগ করবে। আপাতত আমার ওখানেই চল। তারপর যদি অসুবিধে হয়, তখন হোটেলেই যাবি।'

সমীরণ অনুযোগ করল, 'আমি কিন্তু চিঠিতে হোটেলের কথাই লিখেছিলাম।'

নিশিকান্ত রাগল না। বন্ধু এখন অবুঝ। মনে লজ্জা এবং দ্বিধা দুই। তাই অনুযোগ ফেনিয়ে উঠছে। সে বলল—'বিশ্বাস কর, আমি হোটেল খোঁজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যমুনা ভীষণ অপোজ করল। ও বলল, তোমার বন্ধু দশ বছর পরে বাংলাদেশে এলেন। মোটে তিনটে দিন থাকবেন। আমরা থাকতে আবার মেস-হোটেলে কেন যাবেন?'

যুক্তি নয়,...সেন্টিমেন্ট। তবু কথার মধ্যে আর্দ্র কোমলতা,......একটা আন্তরিক রিনরিনে সুর। সমীরণ তাই দ্রব হ'ল। সে পিছনের সীটে ফের গা এলিয়ে বসল। বলল—'আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোদের কন্ট। বাড়িতে একজন গেস্ট থাকলে নানা ঝামেলা।'

'—ঝামেলা কিসের?' নিশিকান্ত মৃদু হাসল। 'তাছাড়া তোকে গেস্ট বলে ভাবতে আমাদের বয়ে গেছে। তিনটে দিন বইতো নয়। না হয় ঘরের লোকের মতই থাকবি। অবশ্য তোর যদি খুব অসুবিধে না লাগে।'

বাড়িটা পুরনো। সামনেটা কতদিন রং হয়নি কে জানে। বাইরে অত আলো।......ফুরফুরে সতেজ বিকেল। কিন্তু সিঁড়ির মুখে ঢুকতেই শীর্ণ ভিখারীর মেয়ের মত কুণ্ঠিত আঁধার। বন্ধুর পিছু পিছু সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে সমীরণ দোতলায় উঠল। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটটা নিশিকান্তর। দরজায় সাদা রঙের প্লাস্টিক বোর্ডের উপর কালো কালো নামের অক্ষর। উঁচুতে ডান দিকে কলিং বেল টেপার বোতাম। নিশিকান্ত আঙুলের ডগা দিয়ে সামান্য চাপ দিতে বেলটা ভিতরে বেজে উঠল।

দরজা খুলতেই একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল। সে খুব সলজ্জভাবে মৃদু হেসে তার দিকে তাকিয়ে মৌন অভ্যর্থনা জানাল। সমীরণের মনে হ'ল মেয়েটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মত হবে। পরণে আধময়লা শাড়ি। আঁচলের কাছে হলুদের ছোপ। হাতের আঙুলে মশলার দাগ। খুব সম্ভব, এতক্ষণ সে রান্নাঘরেই কাজ-কর্ম সারছিল। কলিং বেলের শব্দ শুনে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

তাকে নিয়ে নিশিকান্ত একটা ঘরে এসে ঢুকল। ঠাট্টা করে বলল,—'এই তোর ঘর। অপছন্দ হলে না হয় বল,—হোটেলের ব্যবস্থা দেখি।'

সমীরণ অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলার মত খুব দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চারদিক দেখল। ঘরটা নেহাৎ ছোট নয়। মাঝারি সাইজ, দক্ষিণ খোলা। বেশ বড় জানালা রয়েছে। পরিমিত আসবাব। ছোট্ট একটা পালঙ্ক,—তাতে একজনের স্বচ্ছন্দে শোয়া চলে। কোণের দিকে ছোট্ট একটা শো-কেস, তার নীচের তাকে অনেকগুলি বই। উপরের তাকে নানা রকমের পুতুল,—জন্তু-জানোয়ার।

সমীরণ হেসে বলল—'বেশ ঘর। পছন্দ হবে না কেন?'

নিশিকান্ত সুটকেস আর হোল্ড-অলটা একপাশে সরিয়ে রাখছিল। বলল—

তোর বিছানাপত্তর আর বের করে কাজ নেই। যেমন এনেছিস, তেমনি থাক। মিছিমিছি ঘাঁটাঘাঁটি করবার কি দরকার?'

পালঙেকর উপর খয়েরী রঙের সুন্দর বেডকভার। কোণের দিকে একটু সরে গিয়েছে বলে বকের পালকের মতো ধবধবে শাদা চাদরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। মাথার কাছে একটা ছোট তেপায়া টেবিল। তার উপর সুদৃশ্য একটা প্লাস্টিকের ট্রে। ইচ্ছে করলে সমীরণ ওখানে হাতঘড়ি, খুচরো পয়সা-টয়সা, টুকিটাকি আরো কটা জিনিস রাখতে পারে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সমীরণ দেখল নিশিকান্ত চায়ের টেবিলে অপেক্ষা করছে। সেই মেয়েটি চায়ের কাপ, জলখাবার সাজাচ্ছে। ডিসে ফুলকো লুচি, বেগুন-ভাজা। দুটি বড় সাইজের সন্দেশ। কাঁচের গ্লাসে কানায় কানায় ভর্তি টলটলে জল। গরম চা এখনও টি-পটে। কাপে ঢালা হয় নি। সমীরণ ভাবছিল মেয়েটি কে? ইতিমধ্যে কখন ও সেজেগুজে বেশ ছিম-ছাম, পরিচ্ছন্ন হয়েছে। ময়লা কাপড় বদলে হালকা গোলাপী রঙের একটা শাড়ি পরেছে। চুলে চিরুনি বোলানো। এবং অল্প একটু প্রসাধন করেছে বলে মুখখানি বেশ কচি কমনীয় লাগছে। ভালো করে তাকিয়ে সে নিশ্চিন্ত হল, মেয়েটি অন্য কেউ, নিশিকান্তর বউ নয়।

জামাটামা পরে সমীরণ এসে চেয়ারে বসল। শুধোল,—'মিসেস কোথায়? এখনও তার সঙ্গে দেখা হল না।'

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিশিকান্ত জবাব দিল—'এই তো মোটে ছটা বাজল। যমুনার ফিরতে এখনও ঢের দেরি।' পরিহাস করে ফের বলল—'ভাবনা কিসের? যমুনা নেই কিন্তু সামনেই নর্মদা রয়েছে। এর সঙ্গেই আগে আলাপ কর।'

সমীরণ উৎসুক চোখে তাকাল।

নিশিকান্ত পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল,—'ইনি শ্রীমতী নর্মদা। আমার পরমাত্মীয়া—'

সমীরণ হাত তুলে নমস্কার করল। মেয়েটি পটু হাতে টেবিলের উপর জিনিস-পত্র গোছাচ্ছিল। সমীরণের দিকে তাকিয়ে সে ফিক করে একটু হাসল। হাত তুলে ছোট্ট একটি নমস্কার সেরে ফের কাজে মন দিল।

নিশিকান্ত হেসে বলল,—'নর্মদার ভরসাতেই তোকে আনলাম কিন্তু এই ঘর-গেরস্থলী, রান্না-ভাঁড়ার সব ওর হাতে। যমুনা আর বাড়িতে কতটুকু সময় থাকে? সকালে নটা বাজলেই বেরোয়। ফিরতে সাতটা,...কোনোদিন আটটাও হয়। এরপর আবার উনোনের ধারে যেতে কার উৎসাহ থাকে বল?'

সমীরণ একটা ফুলকো লুচির গায়ে খানিকটা বেগুন ভাজা জড়িয়ে নিয়ে শুধোল,—'মিসেসের অফিসটা কোথায়? ডালহৌসীতে?'

'—দূর, তাহলে কি ফিরতে এত রাত হয়?' নিশিকান্ত খাবার খেতে খেতে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল। বলল,—'যমুনার অফিস আলিপুরে। ট্রাম-বাসের যা অবস্থা এখন। সকাল আটটা থেকে রাত্তির দশটা অব্দি বুক-চাপা ভিড়। অফিসটাইমে আর ছুটির পরে একটি মাছি গলবার পথ নেই। পুরুষমানুষই গলদঘর্ম,......নাজেহাল। তা মেয়েরা চটপট আসবে কেমন করে?'

অনুযোগ করে নর্মদা বলল,—'আপনার বন্ধু কিন্তু কিছুই খাচ্ছেন না নিশিদা।'

আড়চোখে এক নিমেষ তাকিয়ে নিশি-কান্ত মুচকি হাসল। বলল,—'মিথ্যে লজ্জা করছিস সমীরণ। এক হিসেবে তুই নর্মদারই গেস্ট। এই তিনদিন তোর দেখা-শুনো, যত্ন-আত্তি সব ওই করবে। সুতরাং ফ্রি হওয়াই ভালো।'

সমীরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে ডিসের উপর থেকে একটি সন্দেশ হাতে তুলে নিল। নর্মদার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলল,—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। খাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। তবে কি জানেন? আপনার নিশিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না। ভোজনে ও ভীষণ বেপরোয়া। একবার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়ে তিন কুড়ি রসগোল্লা খেয়ে সকলকে হতচকিয়ে দিয়েছিল।'

নর্মদার খুব হাসি পাচ্ছিল। সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। পরে বলল,—'বাব্বা। জামাইবাবু ভোজনরসিক জানতাম। কিন্তু তাই বলে এমনি পেটুক। কই নিশিদা, এ গল্প তো কোনোদিন আগে করেন নি।'

—'পাগল নাকি?' নিশিকান্ত একটা ছোট্ট ঢেকুর তুলল। 'তারপর পাঁচজনের কাছে এইসব বলে বেড়াও। আর লোকে আমাকে একটি ক্ষুদে বকরাক্ষস ভাবুক।' সে হা—হা করে হাসল।

চেয়ার ছেড়ে নিশিকান্ত উঠল। সামনেই কল,......মুখ ধোয়ার বেসিন। সে বার দুই-তিন কুলকুচো করল। দেওয়ালের গায়ে একটা চৌকো আয়না লাগানো আছে। নিশিকান্ত দাঁত বের করে মাড়ি-টাড়ি, ফাঁকগুলি পরীক্ষা করল। খাবারের কুচি-টুচি লেগে নেই দেখে সে নিশ্চিন্ত হল। নর্মদা একটি পরিষ্কার তোয়ালে আনলে সে আলতোভাবে মুখ মুছে শুধোল,—'আচ্ছা জিতেন কোথায়? এখনও ফেরেনি?'

নর্মদা মুখ নীচু করে উত্তর দিল—'শ্যামবাজারে কি বিশেষ দরকার, তাই গেছে। বেরোবার সময় বলে গেল, ফিরতে রাত হবে।'

নিশিকান্ত ভুরু কোঁচকাল। খানিকটা স্বগতোক্তির মত বিড়বিড় করে বলল,—'দরকার না ছাই। সারাদিন টো-টো করে কোথায় যে ঘোরে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।' একটু থেমে সে ফস করে শুধোল,—'কখন বেরিয়েছে বলো ত?'

'—ভাত খাবার একটু পরে। তখন বেলা একটা-দেড়টা হবে।' নর্মদা মুখ তুলে কথা কইল।

'—আশ্চর্য। একটার সময় বেরিয়ে এখনও ফেরার সময় হল না? ও কোথায় যায়, কি করে কোনোদিন খোঁজ নিয়েছ তুমি?'

নর্মদা নিরুত্তর। তার ঠোঁট নড়ল না।

নিশিকান্ত একটু উত্তেজিতভাবে বলল,—'ব্যাপারটা তোমার দিদিকে এলে বলো। দিনকাল সুবিধের নয় নর্মদা। জিতেন কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেলামেশা করে আমাদের জানা উচিত।'

নর্মদা ম্লান হাসল। বলল,—'জানতে চাইলেই কি সব কথা ও আমাদের বলবে নিশিদা? বড় ছেলে,—বেশী জোর করলে মিথ্যে উত্তর দেবে। কিম্বা ছল করে জবাবটা এড়িয়ে যাবে।'

নিশিকান্ত পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজল। খুলে দেখল আর একটি মোটে সিগারেট আছে। ঠোঁটের ফাঁকে সেটি চেপে ধরে নিশিকান্ত তাতে অগ্নি-সংযোগ করল। বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলল,—

তুই বস সমীরণ। আমি এক চক্কর বাজার থেকে ঘুরে আসি।'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে নিশিকান্ত নাক-মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া বের করল। তারপর ঠিক একটা স্টীম এঞ্জিনের মত হেলতে দুলতে দরজার দিকে এগোল।

চায়ের কাপ খালি। সমীরণ তাই উঠল। নর্মদা টেবিলের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সমীরণ হেসে বলল,—'আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। সুন্দর চা।' জলের কলের দিকে এগোবার আগে সে ফের যোগ করল,—'দেখুন, চা ভালো না হলে আমার কেমন মন ভরে না।'

নর্মদা সাগ্রহে শুধোল,—'আর এক কাপ খাবেন? আমি এখুনি বানিয়ে দিতে পারি।'

—'না না।' সমীরণ আপত্তি করল। মুখ-হাত ধুয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে সে মুখ মুছল। তারপর একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল,—'মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। নিশিকান্তকে লিখেছিলাম হোটেলে একটা ঘর ঠিক করে রাখতে। হঠাৎ এসে যদি সুবিধেমত জায়গা না পাই। কিন্তু ও একটি পাগল। স্টেশন থেকে সোজা এখানে নিয়ে এল। আপাতত আপনার দুর্ভোগ।'

—'ওমা! দুর্ভোগ কেন হতে যাবে? ছি ছি! এসব কি বলছেন আপনি?' নর্মদা মৃদু প্রতিবাদ করল। ফের মুখ নামিয়ে বলল, —'এসব কথা দিদি শুনলে কিন্তু ভীষণ দুঃখ পাবে।'

উত্তরে সমীরণ কিছু বলল না, শুধু হাসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে শুধোল, —'আপনার দিদির ফিরতে এখনও আধ-ঘণ্টার মত দেরি। তাই না?'

—'আধঘণ্টা তো কম বলছেন।' নর্মদা ঘাড় দুলিয়ে জবাব দিল। 'দিদির বাড়ি ফিরতে প্রায় সাড়ে সাতটা হয়, কখনও আটটা বাজে। সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে আমি যেন হাঁপিয়ে মরি। দিদি থাকে না, নিশিদা থাকেন না। বেলা একটা-দেড়টা হলে জিতুও বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যে পর্যন্ত যক্ষির মত আমি ঘর আগলাই। একা একা বিশ্রী লাগে।—'

—'আপনিও একটু বেড়িয়ে এলে পারেন।'

—'তা পারি। কিন্তু সময় কই বলুন? বিকেল হলেই জলখাবার তৈরি করতে বসি। সন্ধ্যের একটু আগেই নিশিদা ফিরে আসেন। কোন্ সকালে সেই দুটি খেয়ে যান। অত বড় মানুষটা। বাড়ি ফিরে খাবার জন্যে ঠিক ছেলেমানুষের মত হৈ-চৈ শুরু করেন।'

সমীরণ শুধোল,—'আচ্ছা জিতু কে? একটু আগে নিশিকান্ত ওর কথাই [illegible] বলছিলেন না?'

নর্মদা মুখে উজ্জ্বল করে বলল,—'জিতু আমার ছোট ভাই। ভালো নাম জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়। নিশিদা ওকে জিতেন বলে ডাকেন। ভীষণ চঞ্চল আর বকবকে। দেখবেন না আপনার সঙ্গে একদিনেই আলাপ জমিয়ে নেবে।'

—'জিতেন কি করে এখন? পড়াশুনো?'

—'পড়াশুনো করলে এত ভাবনা ছিল না।' নর্মদা ম্লান হাসল। একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে সে বলল,—'পাশ করেই হয়েছে মুস্কিল। আজ দু-বছর হল ভাইটি বেকার। কোনো চাকরি-বাকরি জুটল না।'

পরিচিত কারো মুখ থেকে হঠাৎ কোনো শোকসংবাদ শুনলে মানুষ যেমন দুঃখিত হবার চেষ্টা করে, সমীরণও তাই করল। কিন্তু সে কোনো কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবহাওয়াটা ক্রমেই গুমোট হচ্ছে। নর্মদা তাই লঘুস্বরে বলল,—'ওসব কথা থাক। আপনি রাত্তিরে কি খান বলুন তো? ভাত, না রুটি?'

সমীরণ ঈষৎ হাসল। সে বলল, —'আমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। আপনারা যা খাবেন, আমারও তাই চলবে।'

—'উঁহু।' নর্মদা ঠোঁট টিপে একটি সুন্দর ভঙ্গি করল। 'দিদি তাহলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। রাত্তিরে আপনি কি খান, তাই জেনে ব্যবস্থা করতে বলে গেছে।'

—'বেশ। রাত্তিরে আপনারা কি খান বলুন? ভাত, না রুটি?' সমীরণ পাল্টা প্রশ্ন করল।

নর্মদা হেসে বলল,—'তার কি ঠিক আছে? নিশিদা রুটি খান, জিতুও রুটি ভালোবাসে। দিদি অবশ্য ভাতই পছন্দ করে—'

—'আর আপনি?'

নর্মদা সলজ্জভাবে জানাল,—'আমি রুটি খেতে পারিনে। রাত্তিরেও আমার একমুঠো ভাত চাই।'

সমীরণ বলল,—'আমাকেও আপনার দলে নিন। দিল্লিতে অবশ্য রুটিই খাই। কিন্তু বাংলাদেশে এসে আর রুটি চিবোতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে নিখাদ ভেতো বাঙালী সাজি।'

—'বেশ তো, ভাতই খাবেন রাত্তিরে।' নর্মদা সায় দিয়ে বলল, 'কিন্তু ভেতো বাঙালী কলকাতায় আর ক'জন? সব বাড়িতেই মেয়েরা এখন রাত্তিরে রুটি গড়ে। ভাতের হাঁড়ি উনুনে বসায় না।'

•

মিনিট-কুড়ি বাদে ফের কলিং বেল বেজে উঠল। সমীরণ পাখার নীচে বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। বেলের শব্দ কানে যেতেই সে উৎকর্ণ হল।

দরজা খুলে নর্মদা বলল,—'দিদি, তুই? যা হোক বাবা, তবু একটু তাড়াতাড়ি এসেছিল। আমি এতক্ষণ ভেবে অস্থির। কি যে রান্না করব, তাই ঠিক করতে পারছিলাম না।'

—'ভদ্রলোক এসেছেন?' যমুনা চোখ নাচিয়ে শুধোল।

—'অনেকক্ষণ।' তেরছাভাবে ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে নর্মদা জবাব দিল।

—'চা-টা দিয়েছিস তো?' যমুনা ফিসফিস করে কথা কইল।

—'সব।' নর্মদা ঘাড় হেলিয়ে রইল।

—'তোর নিশিদা কোথায়?' যমুনা ফের শুধোল।

—'একটু বাজারে পাঠিয়েছি দিদি।' মনে হয় এখুনি ফিরবেন।'

যমুনা কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পিছু পিছু নর্মদা এসে বলল,—'ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবিনে দিদি?'

ভ্যানিটি ব্যাগটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে যমুনা বলল,—'মুখের চেহারাখানা দেখছিস তো? কি ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। একটু ফ্রেস না হয়ে কারো সামনে যাওয়া যায়?'

নর্মদা হেসে বলল,—'তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ভদ্রলোক খুব ব্যস্ত। কখন আসবি তাই অন্তত দু-তিনবার জিজ্ঞেস করেছেন।'

মাথার খোঁপাটা ভেঙে যমুনা চুলগুলি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিল। জামা-টামা আলগা করে বাথরুমে যাবার জন্য তৈরি হল। বোনকে চোখ টিপে বলল,—'তোর নিশিদা আসুক না। তার বন্ধু,—সেই নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দেবে।'

খানিক বাদেই নিশিকান্ত ফিরল। যমুনা তখন প্রসাধনে ব্যস্ত। ঘাড়ে, গলায়, পাউডারের পাফটা সে আলতোভাবে বুলিয়ে চলেছে।

চৌকাঠে পা রেখেই নিশিকান্ত চেঁচিয়ে উঠল। 'যমুনা কতক্ষণ ফিরলে? সমীরণের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

স্ত্রী মাথা নাড়তেই সে ব্যস্তভাবে বলল,—'আরে এসো এসো। তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে সমীরণ অপেক্ষা করে আছে।'

যমুনা আর দেরি করল না। স্বামীর পিছু পিছু সমীরণের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরিচয় হলে নিশিকান্ত বলল,—'ওকে একরকম জোর করেই নিয়ে এলাম যমুনা। হোটেলে রুম বুক করা হয়নি শুনে সমীরণ একেবারে খাপ্পা। ভীষণ চটে গিয়েছিল।'

যমুনা কিছু বলার আগেই সমীরণ তার বক্তব্য রাখল,—'না, না। আমি একটুও রাগ করিনি। তবে কি জানেন, এখানে এসে ওঠা মানেই আপনাদের ট্রাবল দেওয়া। মিছিমিছি অসুবিধের সৃষ্টি করা।'

যমুনা হেসে বলল,—'ওমা! অসুবিধে কিসের? আপনারা দুজনে পুরনো বন্ধু। এতদিন পরে কলকাতায় এলেন। বন্ধুর

ফ্ল্যাটে বাড়তি ঘর থাকতে আপনি কেন হোটেলে উঠবেন?'

নিশিকান্ত প্রস্তাব করল,—'চল সবাই মিলে ছাদে যাই। বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

যমুনা সায় দিয়ে বলল,—'সেই ভালো। ঘরের মধ্যে এই পাখার হাওয়া আর ভালো লাগে না।'

তিনতলার উপর কমন ছাদ, সিঁড়ি বেয়ে ওরা উপরে উঠে এল। নিশিকান্ত বলল,—'একটু চা পেলে ভালো হত। গলা না ভেজালে আড্ডা জমবে না।'

যমুনা হেসে বলল,—'সে আমি জানি। নর্মদাকে বলে এসেছি। মাংসটা উনুনে বসিয়ে চা নিয়ে আসবে।'

দূরে কোথাও এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। তাই বাতাসটা ভেজা,...স্পর্শে শরীরমন জুড়িয়ে যায়। আকাশে মেঘ আছে বটে,...কিন্তু ছেঁড়া কাপড়ের মতো ফুটি-ফাটা। ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ,...আংটিতে বসানো জ্বলজ্বলে পাথরের মত দু-একটি নক্ষত্রও চোখে পড়ে।

সমীরণ বলল,—'আপনার অফিস তো অনেক দূরে? আসতে-যেতে খুব কষ্ট, তাই না?'

—'আর বলবেন না।' যমুনা হাসল। 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস পৌঁছতেই এক-দেড় ঘণ্টা লাগে। ফেরার সময়ও তাই। যাতায়াত এক সমস্যা। পথে নেমে আজই কি দুর্ভোগ দেখুন না।—'
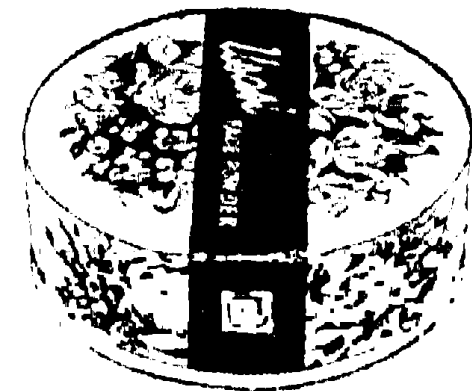
—'আজ আবার কি হল?' নিশিকান্ত প্রশ্ন করল, —'আজ তো তেমন দেরি হয়নি।'

—'ছাই।' যমুনা স্বামীর পানে কটাক্ষ হানল। ফের সমীরণের দিকে তাকিয়ে বলল,—'চেতলার ওদিকে বাস-কন্ডাকটরের সঙ্গে কি যেন চোটপাট হয়েছে। অমনি রুটের বাস বন্ধ করে দিল। সাড়ে চারটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে ঝাড়া দেড়ঘণ্টা স্টপে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত নেই।'

—'এলে কেমন করে?' নিশিকান্ত ব্যগ্র হয়ে শুধোল।

—'সে-কথা শুনে তোমার লাভ কি?' যমুনা বাঁকা চোখে তাকাল।

সমীরণ বলল,—'আমাকে তো বলবেন?'

যমুনা ফিক করে হাসল। বলল,—'একটা প্রাইভেট গাড়ি ছজন মেয়ে মিলে ভাড়া করে এসেছি। শেয়ালদা পর্যন্ত প্রত্যেকের দু টাকা করে ভাড়া।'

নিশিকান্ত পরিহাসের সুরে বলল,—'ড্রাইভারটা নেহাৎ বেরসিক। নয়তো নির্ঘাত খোজা। নইলে একসঙ্গে আধ-ডজন মেয়ে পেলে কেউ আবার ভাড়া চায়?'

যমুনা ভ্রূভঙ্গি করে বলল,—'রসিকতা রাখ। বরং চেতলার দিকে একটা বাড়ি-টাড়ি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ কর। নিত্যি-দিন এমনি হাঙ্গামা পোয়াতে হলে আমি কিন্তু চাকরিই ছেড়ে দেব।'

চায়ের ট্রে হাতে নর্মদা এসে দাঁড়াল।

নিশিকান্ত বলল,—'তোমার দিদি চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছে নর্মদা। দেখ চেষ্টা করে তুমি যদি ওটা বাগাতে পার।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে নর্মদা বলল,—'আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই নিশিদা। উনুনে মাংস বসিয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে গল্প জুড়লে রান্না কিন্তু আর মুখে দিতে হবে না।'

ঘরে ঢুকে নর্মদা দেখলে জিতেন নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলছে। তাকে দেখে মুখ উঁচু করে বলল,—'কোথায় গিয়েছিলি রে ছোড়দি?'

—'ছাদে।' নর্মদা মুখ ফিরিয়ে অন্য-দিকে তাকাল।

জিতেন ভ্রূ কুঁচকে শুধোল,—'মনে হচ্ছে খুব রেগে আছিস। কারণটা কি বাবা?'

নর্মদা মুখ ভার করে বলল,—'রাগ নয় জিতু। তবে নিশিদা আজ খুব বিরক্ত হয়েছেন। তুই দুপুরে ভাত-টাত খেয়ে বেরিয়ে যাস। রাত আটটা পর্যন্ত কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াবি, কার সঙ্গে মেলামেশা করিস, কিছুই ভাঙতে চাস না। এর কি অর্থ হয়?'

জিতেন মাথা চুলকে বলল,—'নিশিদা রাগ করেছেন তাহলে?'

নর্মদা ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল—'রাগ করাটা কি অন্যায় জিতু?' কথাটা তুই ভেবে দেখ।

জিতেন এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর ব্যাপারটা লঘু করবার জন্য হেসে শুধোল,—'তোর ঘরে কার জামা-প্যান্ট ঝুলছে রে ছোড়দি?'

—'সেই ভদ্রলোক দিল্লী থেকে এসে-ছেন যে—'

—'ওহো!' জিতেন সোৎসাহে বলে উঠল। 'তাই বুঝি তুই সন্ধ্যেবেলায় কোমর বেঁধে মাংস রাঁধতে লেগেছিস?'

নর্মদা কোনো জবাব দিল না। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

জিতেন ফের শুধোল,—'ভদ্রলোক কোথায় রে?'

—'ছাদে বসে গল্প করছেন। নিশিদা আর দিদিও আছে। ইচ্ছে করলে তুই যেতে পারিস।'

—'নারে ছোড়দি।' জিতেন মাথা নেড়ে বলল। 'এখন আর গল্প করতে ভাল লাগছে না।' একটু পরে সে বলল,—'নিজের ঘরটা তো অন্যকে ছেড়ে দিলি। তুই তাহলে শুবি কোথায়?'

—'দিদি বলেছে তোর ঘরেই এই ক'দিন আমার বিছানা করতে। গিয়ে দ্যাখ আমি সব ঠিক করে রেখেছি।'

—'আমার ঘরে ঘুমোবি? কিন্তু আমি যে অনেক রাত্তির অব্দি পড়াশুনো, কাজ-কর্ম করি। তোর অসুবিধে হবে না?—'

—'অসুবিধে হলেও উপায় নেই। কটা দিন কষ্ট করতেই হবে। বাড়িতে কি আর ঘর আছে?' নর্মদা মাংসের হাঁড়িতে খুন্তি নামাল।

জিতেন কোনো মন্তব্য করল না। সে গুন-গুন করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বাথরুমের দিকে এগোল।

*

যমুনা নিচে নেমে গেলে নিশিকান্ত ফের একটা সিগারেট ধরাল। ছাদের উপর থিকথিকে অন্ধকার। মেঘ সরে গেছে। তাই আকাশে পাথরকুচির মত কয়েকটি তারা। কলকাতার আকাশ স্বচ্ছ নয়। ধুলো আর ধোঁয়ার আড়াল। তাই নক্ষত্রের ভিড় কম...খুব বেশী চোখে পড়ে না।

সমীরণ হেসে বলল,—'তুই এবার বাড়ির খোঁজ কর। মিসেস তো নোটিশ দিয়ে গেলেন। অফিসের কাছাকাছি বাড়ি না পেলে চাকরি ছেড়ে দেবেন।'

—'তুই ক্ষেপেছিস!' নিশিকান্ত গা দুলিয়ে হাসল। 'যমুনা অমন বলে। বিশ মাইল দূরে অফিস হলেও ও চাকরি খোয়াবে না।'

—'সত্যি বলছিস?' সমীরণ অবাক চোখে তাকাল।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নিশিকান্ত ঘুরে দাঁড়াল। মুখখানা ছুঁচলো করে একটা চিমনির মত প্রচুর ধোঁয়া ছাড়ল। বন্ধুকে বলল,—'তুই বিয়ে-থা করলিনে। মেয়েদের মনের কথা কেমন করে বুঝবি? চাকরিটা তোর আমার কাছে সম্পদ, প্রয়োজন আর প্রলোভন দুই। কিন্তু মেয়েদের কাছে ওটা নেশা, প্রেমের মতো আকর্ষণ। একবার মন সঁপে দিলে মুখ ফেরানো কঠিন। রোজ বুড়ি ছুঁয়ে আসতেই হবে।'

নিশিকান্ত সিগারেটের ছাইটুকু সযত্নে ঝাড়ল। ফের বলল,—'বাড়ি পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? তিন মাসের ভাড়া সেলামি গুনে এই ফ্ল্যাটটা জোগাড় করেছিলাম। সে প্রায় তিন-চার বছর হল। অবশ্য ঠকিনি। তিনখানা ঘর,—মোটে একশ' প'চাত্তর টাকা ভাড়া। ছেড়ে দিলে এই ফ্ল্যাটই এখুনি তিনশ' টাকায় লুফে নেবে।'

সমীরণ মুখ তুলে বলল,—'তার মানে যাতায়াতের প্রবলেমটা থাকবেই। মিসেসের বাড়ি ফিরতে সাতটা-আটটা, কোনোদিন ন'টাও হতে পারে।'

—'খুবই সম্ভব।' সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশিকান্ত সৈনিকের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল,—'কলকাতায় এখন পদে পদে সমস্যা। ছোট-বড় পাহাড়ের মত সব ঘিরে রয়েছে। বেশী চঞ্চল হয়ে লাভ নেই। তাই যাতায়াতের সমস্যাটা আমার কাছে প্রবলেমই নয়। আসলে আমি যা সমস্যা বলে মনে করছি, সেটা অনেক বেশী গুরুতর।'

—'কি সমস্যা আবার?'

নিশিকান্ত ম্লান হাসল। বলল,—'সমস্যা নর্মদাকে নিয়ে। বেচারী আমার বাড়িতে রাঁধুনি সেজে বসে আছে। জিতেনের কথা ভাবলে আরো বেশী দুশ্চিন্তা হয়। তুই বোধহয় জানিস না জিতেন একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। দু' বছর আগে শিবপুর থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। বললে বিশ্বাস করবি নে, মাস-তিন-চার আগে আমি জোর করে ওকে দিয়ে ব্যাঙ্কের একটা কেরানীগিরির জন্য দরখাস্ত করিয়েছিলাম। কিন্তু এমনি কপাল, সেটাও ওর হয়নি।'

নিশিকান্ত ফের বলল,—'জানিস তো, অলস মস্তিষ্ক মানেই শয়তানের কার-খানা। জিতেনকে নিয়ে তাই আমার এত ভাবনা। ও যে কি করছে, কোথায় যায় কিছুই আমি বুঝতে পারি না। আচ্ছা তোদের কোম্পানীতে ওর একটা চান্স হয় না?'

—'আমি চেষ্টা করব।' সমীরণ সান্ত্বনা জোগাল। একটু থেমে ফের বলল,—'চাকরি একদিন হবেই। অত ভাবিস কেন?'

—'কি জানি', নিশিকান্ত একটা হতাশ ভঙ্গি করে ফের সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরল।

*

ন'টার আগে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অফিস বেরিয়ে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিতেন শুধোল,—'ভিতরে আসতে পারি?'

—'আসুন, আসুন', সমীরণ সাগ্রহে বলল। 'আপনার সঙ্গে এখনও ভালো করে আলাপই হল না।'

খাটের একপাশে জিতেন চেপে বসল।

—'কাল রাত্তিরে নিশিকান্ত আপনার কথাই বলছিল।' সমীরণ আলাপ শুরু করল।

জিতেন ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'নিশিদা আমার কথা বলেছেন বুঝি? তাহলে তো আপনি সবই জেনে ফেলেছেন। আমি পাশ-করা সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। দু' বছর ধরে নিষ্কর্মা, বেকার একটা কেরানীগিরি পর্যন্ত জোটাতে পারিনি। তারপর আমার চাকরির জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করবেন বলেছেন?'

—'হ্যাঁ, তা বলেছি।' সমীরণ একটু আশ্চর্য হল

জিতেন হা-হা করে হাসল। 'আমি জানি নিশিদার এই কাণ্ড। বন্ধু-বান্ধব কাউকে কাছে পেলেই বেকার শ্যালকের গল্প করবেন।' হাতের আঙুলের সাহায্যে প্রায় একটা মুদ্রা রচনা করে সে ফের বলল,—'বন্ধু, চাকরি পাবে কোথায়? বাংলাদেশে ওটা এখন মগডালের রোদ্দুর। মাঝে-সাঝে দেখা যায় এই পর্যন্ত। ছোঁয়া যায় না।

সমীরণ হেসে বলল,—'এত ভাবছেন কেন? চাকরি একদিন নিশ্চয় হবে।'

—'ভাবছি?' জিতেন আরো জোরে হাসল। 'চিন্তা-ভাবনা অনেক আছে মশায়। কিন্তু চাকরির জন্যে একটুও নেই। গ্রীষ্মে গরম, বর্ষায় বিষ্টি, শীতে ঠাণ্ডা পড়ার মতো এদেশে চাকরি না পাওয়াটা স্বাভাবিক!' নাটকের একটি চরিত্রের মতো জিতেন ফের বলে চলল,—'বুদ্ধদেবের সেই গল্পটা আপনার মনে আছে? মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে জননী এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থের কাছে। বলল,—তুমি দিব্যজ্ঞানী মহাঋষি। বরদান করে আমার মৃতপুত্রকে প্রাণ ফিরিয়ে দাও। সিদ্ধার্থ শোকার্ত জননীর দিকে চেয়ে ঈষৎ হাসলেন। বললেন, আমি নিশ্চয় তা করব। কিন্তু মন্ত্র পড়ার জন্য এক মুষ্টি সরষের বড় প্রয়োজন। শুধু একমুঠো সরষে? তাহলেই মৃত সন্তান চোখ মেলে চাইবে? জননী আনন্দে উদ্বেল হয়ে ছুটে যেতে চাইল। এর চেয়ে সহজ আর কি হতে পারে? বুদ্ধ বললেন, কিন্তু একটি কথা। যে বাড়িতে মৃত্যু কোনোদিন প্রবেশ করেনি, সেখান থেকে এই সরষে আনতে হবে। দ্বার হতে দ্বারে জননী ঘুরে বেড়াল। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ। সন্ধ্যের একটু পরে নিরাশ অন্তরে সে এসে লুটিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থের চরণে। বুদ্ধ শুধোলেন, সরষে এনেছ মা? মেয়েটি কোনো কথা না বলে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠল।'

সমীরণ শান্তকণ্ঠে বলল,—'আপনি ভীষণ হতাশ। দারুণ ফ্রাসট্রেটেড জিতেন-বাবু।'

—'একটুও হতাশ নই।' জিতেন পাল্টা জবাব দিল। 'আমি বাংলাদেশের সঠিক ছবি এ'কেছি মশায়। আজ ঘরে ঘরে বেকারী। শহরে-গ্রামে শিক্ষিত বেকার অসংখ্য।... অশিক্ষিত বেকারের অঙ্ক পরিসংখ্যানও বলতে লজ্জা করে। একমুঠো সরষের সন্ধানে যেখানে যাবেন, সেখানেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে। কিন্তু এই অবস্থাকে আমরা মেনে নেবো না। সবকিছু ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে দেব।'

—'ভাঙা তো সহজ,' সমীরণ মুচকি হাসল। তারপর গড়বেন কি করে?'

—'সে-কথা পরে ভাবা যাবে।' জিতেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

অনেকক্ষণ পরে সে নিজেই কথা শুরু করল,—'অবশ্য আপনার হাতে চাকরি থাকলে সেটা ছোড়দিকেই দেওয়া উচিত। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার জন্য ও অনেক করেছে।'

—'কি রকম?' সমীরণ কৌতুক করে বলল।

—'ধরুন এই ঘরখানা। আসলে এটা ছোড়দির। কিন্তু আপনি কাল আসবেন বলে ও বেচারী নিজের জিনিসপত্তর নিয়ে আমার ঘরে গিয়ে আছে। অবশ্য কেউ এলে গেলে এরকম শিফ্‌ট করতেই হয়। কিন্তু শুধু তাই নয়। কাল দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে, ও নিজে এই ঘরখানা ঝেড়েমুছে সাজিয়েছে। তারপর আপনার জন্যে যে স্পেশ্যাল ডিস-টিসগুলো তৈরি হচ্ছে, এসবই ওর পরিকল্পনা আর পরিশ্রম। সুতরাং আপনার হাতে চাকরি থাকলে ছোড়দির দাবি সর্বাগ্রে।'

—'তাতো বুঝলাম।' সমীরণ লঘু সুরে কথা কইল। 'কিন্তু যোগ্যতা?'

—'মাই গড্‌!' জিতেন গালের উপর তর্জনীর অগ্রভাগ চেপে ধরল। বলল,—'ছোড়দির কোয়ালিফিকেশন জানেন না আপনি? শী ইজ অ্যান এম-এ। ফিল-জফিতে মাঝারি সেকেণ্ড ক্লাস। কিন্তু বি-এ-তে অনার্স ছিল।'

—'বলেন কি?' সমীরণ চোখ বড়ো করে তাকাল।

জিতেন আশ্চর্য হয়ে শুধোল,—'এসব কথা নিশিদা বলেননি আপনাকে?'

—'কই, না তো—'

—'তাহলে বলতে লজ্জা পেয়েছেন।' সে হাসতে লাগল।

বেলা একটা নাগাদ জিতেন সাজগোজ করে বেরিয়ে গেল। সমীরণ বইয়ের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল।

নর্মদা এসে শুধোল,—'কি করছেন?'

সমীরণ আড়চোখে তাকাল। নর্মদার পরনে পাটভাঙা ডুরে শাড়ি। পিঠে এলো চুল গিঁট দিয়ে বাঁধা। ঠোঁটদুটি পানের রসে লাল। দেখলেই বোঝা যায় এই মাত্র খেয়ে-দেয়ে উঠেছে।

পত্রিকাটা সরিয়ে রেখে সমীরণ উঠে বসল। বলল,—'আসুন, আসুন। আমার জন্যে তো আপনার দুর্ভোগের শেষ নেই। এত রান্নাবান্না,—আবার নিজের ঘরখানা পর্যন্ত ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়েছে।'

—'ওমা! এ-কথা আপনাকে কে বলল? নিশ্চয় জিতেন?—'

—'যেই বলুক না, কথাটা তো সত্যি!' সমীরণ হাসল।

—'সত্যি হলেই বা কি?' নর্মদা ভ্রূ কুঁচকে রইল। 'বাড়িতে গেস্ট এলে অমন এক-আধটু হয়ে থাকে।'

—'কিন্তু আপনি আমার কাছে একটা খবর বেমালুম চেপে গিয়েছেন। নিশিকান্ত পর্যন্ত ভাঙেনি। সত্যি বলছি, একথা জানলে আমি কখনও আপনার বোঝা বাড়াতাম না।'

নর্মদা খুব অবাক হয়ে শুধোল,—'কথাটা কি আগে খুলে বলুন।'

—'আপনি যে যে একজন এম-এ, অনার্স গ্রাজুয়েট একথা তো আগে বলেননি?'

—'ও, তাই বলুন।' নর্মদা বেশ টেনে টেনে কথা বলল। 'আমি এম-এ পাশ মেয়ে। দুবেলা রান্না করে দিদির সংসারের জোয়াল টানছি ভেবে আপনার একটু করুণা হচ্ছে সমীরণবাবু, তাই না?'

—'ছি, ছি! এ আপনি কি বলছেন?' সমীরণ কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করল।

নর্মদা ম্লান মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে-ছিল। মুখ না ফিরিয়েই সে জবাব দিল,—'রান্নার কাজ না করেই বা উপায় কি বলুন? তিন বছর আগে এম-এ পাশ করেছি। এতদিনেও তো কিছু জুটল না।

এ তবু মাস গেলে পঁয়ত্রিশটা টাকা হাতে পাই। নেই মামার চেয়ে কানা মামাই বা মন্দ কি?'

—'তার মানে?' সমীরণ গলা বাড়িয়ে শুধোল।

নর্মদা ফের হাসল। শীতের মজা নদীর মত শীর্ণ হাসি। বলল,—'আমাকে দিয়ে রান্না করাতে কেউ চায়নি। দিদি নয়, নিশিদা তো নয়ই। রান্নার কাজটা আমি সেধে নিয়েছি সমীরণবাবু। বলুন তো, বসে বসে দু-আড়াই বছর তো কাটল। আর কতদিন নিষ্কর্মা হয়ে থাকা যায়? মাস ফুরোলে দিদি আমাকে ডেকে বলল, —কিছু মনে করিসনে নর্মদা, এই টাকাটা তোর কাছে রেখে দে। প্রথমে বুঝতেই পারিনি। দিদি বলল,—মাসে মাসে এই টাকাটা তো আমার লাগছিলই। কাজটা যখন তুই চালিয়ে দিচ্ছিস তখন টাকাটা তোরই প্রাপ্য।' একটু থেমে নর্মদা ফের বলল,—'সেদিন টাকাক'টা হাত পেতে নিতে খুব খারাপ লেগেছিল আমার, কিন্তু এই ক'মাসে আমিও যেন কেমন হয়ে গেছি। এখন দরকার হলে অনায়াসে দিদির কাছে টাকা চাই। মানে আগাম নিই বলতে পারেন।'

পরদিন সমীরণকে প্রায় চারকিবাজির মত ঘুরতে হল। সকাল দশটা থেকে রাত্রির আটটা পর্যন্ত কাজ। যখন বাড়ি ফিরল, তখন প্রায় ন'টা। দরজায় দাঁড়িয়ে নর্মদা পরিহাস করল, —'বাব্বা! এই নইলে কাজের মানুষ। সারাদিন কোথায় ডুব দিয়ে রইলেন বলুন তো?'

—'কি করবো?' সমীরণ কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করল, 'একদিনেই সমস্ত কাজ সারতে হয়েছে। কাল সকালেই তো আবার ট্রেন—'

—'তাই তো!' নর্মদা ভারী গলায় বলল, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি তো তুফানে যাবেন? সকাল দশটায় ট্রেন না?'

সমীরণ কোনো কথা বলল না। শুধু হাসল।

*

অনেক রাতে সমীরণের ঘুম ভেঙে গেল। বুকের উপর নরম আঙুলের চাপ.... কোমল, অথচ উষ্ণ স্পর্শ। কেউ যেন তাকে জাগাবার চেষ্টা করছে।

চোখ মেলেই সমীরণ নর্মদাকে দেখতে পেল। তার ভীত, ত্রস্ত চাউনি। প্রায় রক্তশূন্য মুখ। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে সে ছুটে এসেছে।

—'শিগ্‌গির উঠুন,' নর্মদা চাপা গলায় বলল, 'বাড়িতে পুলিশ এসেছে। ওরা ঘর-দোর সার্চ করবে।'

কথাটা সত্যি। বাইরে পা দিয়েই সমীরণ তা বুঝতে পারল। প্রায় জন-দশ-বারো পুলিশ। হাতে রাইফেল, পায়ে ভারী বুট। মাথায় লোহার টুপি। তাদের দলপতি একজন সাব-ইন্সপেক্টর। নিশি-কান্তর সঙ্গে সেই কথা বলছিল।

এগিয়ে গিয়ে সমীরণ শুধোল,—'ব্যাপার কি রে?'

—'কি আবার!' নিশিকান্ত শুকনো গলায় বলল,—'জিতেনকে এরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন।'

শুধু অ্যারেস্ট নয়। কম-বেশি সমস্ত বাড়িটাই ওরা সার্চ করল। দশ মিনিটেই ঘরদোরের বিপর্যস্ত তছনছ অবস্থা। কাজ শেষ হলে জিতেনকে নিয়ে ওরা ফের সিঁড়িতে পা বাড়াল।

নর্মদা কাঁদল। দিদির পিঠে মুখ গুঁজে সে বারবার কান্না চাপার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারল না। গাড়িতে ওঠার আগে জিতেন বলল,—'কাঁদিস নে ছোড়দি। তুই কাঁদলে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে নিশিকান্তও বলল—'কেঁদো না নর্মদা। কাল কোর্ট থেকে আমরা ওকে জামিনে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করব।' একটু থেমে সে ফের বলল, —'আমার বিশ্বাস জিতেন জামিন পাবে। তুমি দেখো—'

সকালে চায়ের টেবিলে বসে নিশিকান্ত বলল,—'আমরা এখুনি বেরুবো সমীরণ। উকিলের বাড়ি যেতে হবে, সেখান থেকে ফের কোর্টে। তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

—'তাতে কি হয়েছে?' সমীরণ চায়ের কাপে ঠোঁট ভেজাল। বরং আমার আজ থেকে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উপায় নেই, রিজার্ভেশান হয়ে গেছে।' সে একটা হতাশ ভঙ্গি করল।

চা শেষ করেই নিশিকান্ত উঠল। যমুনাও সঙ্গে যাবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তৈরি। যাবার সময় নিশিকান্ত বলল,—'তুমি তাহলে কোর্টে চলে এসো নর্মদা। সাড়ে দশটা নাগাদ এলেই হবে। কেমন?'

সাড়ে আটটা বাজতেই সমীরণও ট্যাক্সি ডেকে আনল। আর একটু পরেই গাড়ি পাওয়া কঠিন হবে। বিছানা বাক্স ট্যাক্সিতে তুলে সমীরণ দেখল সাজগোজ করে নর্মদাও বেরোবার জন্য তৈরি।

—'চলুন, আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।' সে নিজেই প্রস্তাব করল।

—'আপনি আবার কষ্ট করে কেন? মিছিমিছি—'

নর্মদা কোনো উত্তর না দিয়েই গাড়িতে উঠে বসল।

ট্রেন ছাড়তে দেরী নেই। লোকজন প্রায় সবাই উঠে গেছে। দরজার মুখে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের দল এখনও জটলা করছে। ঘড়িতে প্রায় দশটা—।

সমীরণ বলল,—'আপনার কোর্টে পৌঁছুতে দেরী হয়ে যাবে কিন্তু।'

নর্মদা অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে বলল, —'আজ আর কোর্টে যাওয়া হবে না।'

—'সে কি? ওরা তো আপনাকে কোর্টে যেতেই বলে গেল। জিতেনকে দেখবেন না?'

—'উপায় নেই।' দাঁত দিয়ে নর্মদা নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। 'আজ আমার একটা ইন্টারভ্যু আছে।' সে স্পষ্ট উচ্চারণ করল।

—'সত্যি? কোথায়? আগে তো বলেন নি—'

নর্মদা গলা নামিয়ে বলল,—'কেউ জানে না, কাউকে বলিনি। কাগজপত্রে এরা বিজ্ঞাপনও দেয়নি। আমার এক বন্ধুর বাবা এখানে চাকরি করেন। উনিই খবরটা দিয়েছিলেন—। পরশু চিঠি এসেছে।'

—'চাকরি হলে আমায় লিখবেন, কেমন?'

নর্মদা এক চিলতে হাসল। করুণ হাসি। শুধোল,—'চাকরি হবে আমার? বলুন না—'

সমীরণের মনে হল, তার সামনে নর্মদা নয়। এক মৃতবৎসা রমণী মলিন মুখ করে তাকিয়ে আছে। অন্তরের ইচ্ছা সব মৃত সন্তানের রূপ ধরে কতবারই তো মাটিতে এল। কেউ আলোয় চোখ মেলল না।

তবু সমীরণ বলল,—'চাকরি হবে বৈকি। নিশ্চয় হবে।'

আশ্চর্য। এই মুহূর্তে নর্মদা হাসছে। মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল। বন্ধ্যা মাটির বুকে একটি শ্যামল পৃথিবীর স্বপ্ন অল্প-ক্ষণের জন্য হলেও ধরা দিয়েছে।
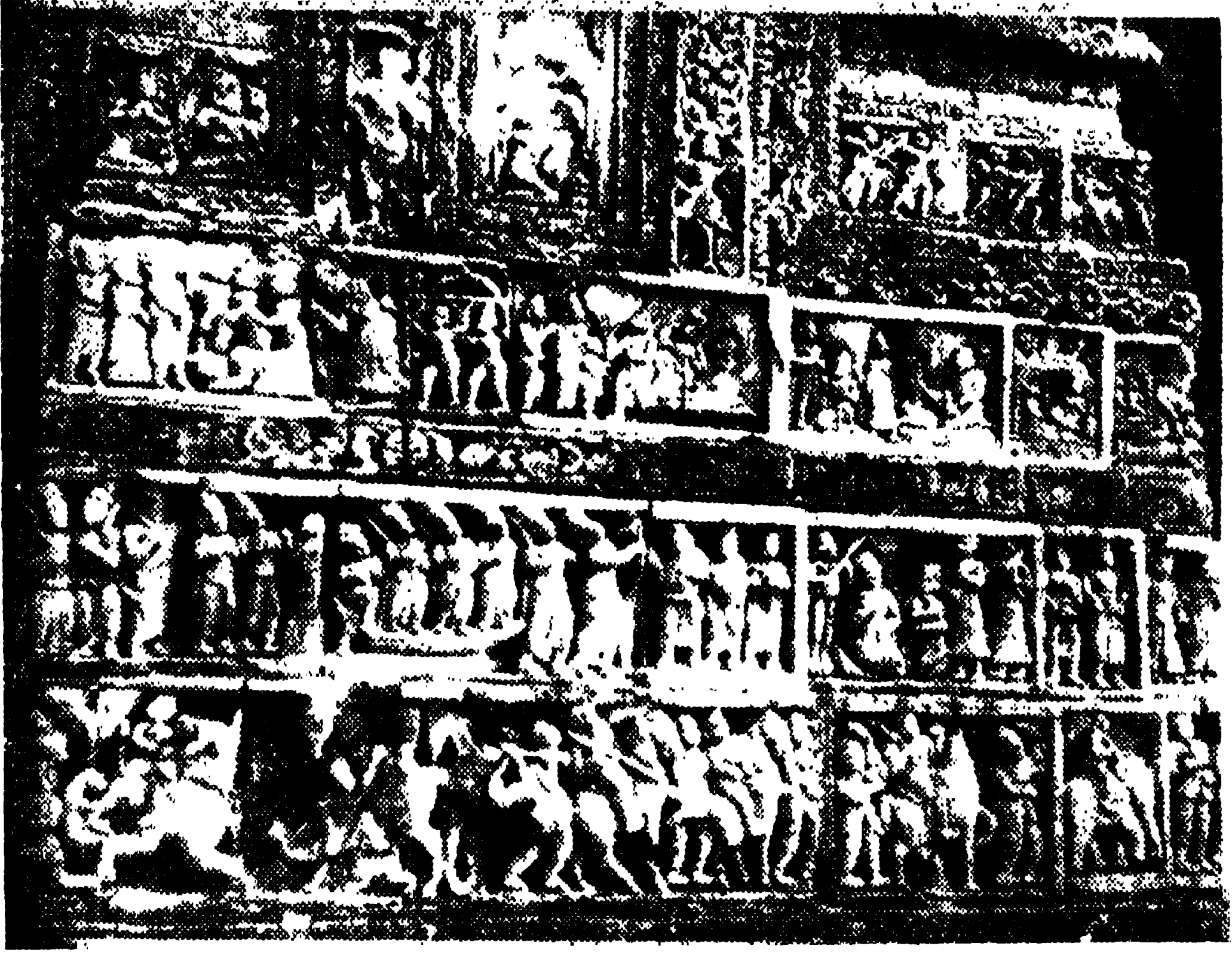
চার বাংলার মন্দিরের কারুকাজ। বড়নগর

ফটো : [illegible] মিত্র

এই আমাদের দেশ

রাণীভবানীর স্নেহধন্য বড়নগরের মন্দিরে মন্দিরে

রাতের ট্রেনে চড়ে বসলে আজিমগঞ্জ পৌঁছুবেন ভোরেরও আগে। বেশ অন্ধকার থাকবে। ট্রেনে রাত কাটানো একদিক থেকে ভাল, ভোর নাগাদ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলে সারাটা দিন হাতে পাওয়া যায়। স্টেশনে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে চা পর্বটা মিটিয়ে ফেলে ইচ্ছে করলে আশপাশ একটু টহল দেওয়া যায় সকাল হওয়া পর্যন্ত। জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়লেন বড়নগরের পথে। মন্দিরময় বড়নগর ঘুরিয়ে দেখতে বেশ সময় নেয়।

রাণী ভবানীর মন্দির দেখবার মত। স্থাপত্য শিল্পের নিপুণ ঐতিহ্য এখনও ধুঁকে ধুঁকে বয়ে বেড়াচ্ছে বড়নগর। বাংলাদেশে ভবানীশ্বর শিবের মন্দিরের মত এত উঁচু মন্দির খুব কমই চোখে পড়ে। আটটি প্রবেশপথ, চতুর্দিকে বারান্দা ঘেরা। বারানসীর ভবানীশ্বর মন্দির ও বড়নগরের মন্দির একই সময়ে তৈরী হয়েছে বলে শোনা যায়। আর আছে রাজরাজেশ্বরীর মন্দির ও মদনগোপালের মন্দির। ভবানীকন্যা তারাসুন্দরী গোপাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। আরও মুগ্ধ করবে চার বাংলার মন্দির। মন্দিরের গায়ের কারুকাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এখনও একটু টস খায়নি। সবই পোড়ামাটির কাজ। পৌরাণিক কাহিনীর অসংখ্য ছবি মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ। ছবিগুলি দেখে পুরো একটি গল্প চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মদনগোপালের মন্দিরটি রতনগড়ের প্রথম রাজা উদয়নারায়ণ স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া দেখবেন অষ্টভুজ গণেশের মন্দির, ভবানীর গুরুবংশীয় মঠবাড়ী রত্ন-

নান্দ সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত দয়াময়ী বাড়ির পাথরের কালীমূর্তি। রাণীর দত্তকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুন্ডের আসনটিও অনেকের কাছে দর্শনীয়।

মন্দিরময় বড়নগর আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারবে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বড়নগর এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হোত। এখনও সে বহরমপুরের খাগড়ার পেতল-কাঁসা-ভরনের বাসনের এত কদর তার মূলে কিন্তু বড়নগরের বাসন শিল্পীরা। টুকিটাকি বাসন কোসন সওদা করেও আনতে পারেন, কলকাতার থেকে খানিক সস্তা।

বড়নগর সেরে গঙ্গা পেরিয়ে জিয়াগঞ্জ। এখানে খাওয়া-দাওয়া সারতে পারেন। হোটেল আছে। অবশ্য মাঝারি গোছের। খুব একটা বাজে খাওয়াও না। তারপর জৈন মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়া। পুরনো দিনের জৈন মন্দিরগুলির শিল্প-সুষমা এখনও বেশ টানে। সেকালে জৈন বণিকরা নিজেদের দেশ ছেড়ে বাংলাদেশের মাটিতে আস্তানা পেতেছিলেন, মুখ্যত বাণিজ্যের লোভে, আর বাকীটা বাংলাদেশের মাটির টানে। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে মুর্শিদাবাদের রবরবা তখনকার দিনে অনেক বণিককেই টেনেছে। যা হোক এ দেশের বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, চালচলন জৈনরা বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

জিয়াগঞ্জের প্রাচীন নাম গাম্ভীলা। বিন্ধ্যাচলের এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী ভাগীরথী তীরে এসে বসবাস করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তরা গাম্ভীলা নাম বদলে রাখেন জিয়াগঞ্জ। কারণ এই সন্ন্যাসিনীর নাম 'জিয়া'। সেদিক থেকে গাম্ভীলা বৈষ্ণবদের কাছে খুব প্রিয় জায়গা। নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য পন্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী মশাই এখানে বসবাস করতেন। ঠাকুর নরোত্তমের তিরোধানের পর ভক্তরা এখনও তাঁর স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্রতি বছর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পর পঞ্চমীতে মেলা হয়। স্থানীয় কুমোররা নরোত্তম ঠাকুরের সন্ন্যাসমূর্তি তৈরী করে মেলায় বিক্রি করে।

জিয়াগঞ্জের লাগোয়া সাধকবাগ। মস্তরাম সাধুর আখড়া। এটিও দেখবার মত। তখনকার দিনে মস্তরাম সাধুর খুব নামডাক ছিল শারীরিক ও যৌগিক শক্তির জন্যে। লোকে বলে, তিনি নাকি পায়ে হেঁটে নিয়মিত ভাগীরথী পার হতেন। মস্তরাম সাধু মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দী ও নবাব সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক লোক। একবার নবাব আলিবর্দী একটি শাল ও কিছু স্বর্ণমুদ্রা তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। হয়ত এ ধরনের উপহার পছন্দসই হয়নি। ফলে শালটি অগ্নিকুন্ডে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ও মুদ্রাগুলি নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা শুনে নবাব আলিবর্দী ভয়ানক রেগে যান ও উপহার ফেরত চেয়ে পাঠান। মস্তরাম তখুনি সেই রকম দশটি শাল অগ্নিকুন্ড থেকে এবং পাঁচগুণ স্বর্ণমুদ্রা নদী থেকে বার করে আলিবর্দীকে তাক লাগিয়ে দেন। এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে নবাব আলিবর্দী মুগ্ধ হন, একটি ঢাল ও একটি তলোয়ার উপহার পাঠিয়ে দেন। নবাবের দেওয়া ঢাল-তলোয়ার এখনও সাধকবাগের আশ্রমে রাখা আছে। তাছাড়া মস্তরামের ব্যবহৃত ছড়ি, খড়ম ও অন্যান্য জিনিষপত্র কিছু আছে। নাটোরের মহারাণী ভবানী, বড়নগরের রাজা উদয়নারায়ণও মস্তরামের একান্ত অনুগত ছিলেন। রথযাত্রার সময় আখড়ায় ধুমধাম করে উৎসব হয়। এখনও বহু লোক কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আশায় ও রোগমুক্তির জন্যে আখড়ায় পুজো দেন।

ভবানীশ্বর মন্দির। বড়নগর। ফটো : শীতাংশু মিত্র

এরপর মুর্শিদাবাদ। বাংলার শেষ নবাবের স্মৃতিবিজড়িত মুর্শিদাবাদের পোকায়-কাটা ইতিহাসকে দুচোখ মেলে দেখে নেওয়া যাবে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সি-এম-ডি-এ

বিপ্র ঘোষ

পশ্চিমবংগ সরকারের উদ্যোগে হালে বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা বা সংক্ষেপে সি-এম-ডি-এ গঠন নিয়ে সরকারের সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের মতপার্থক্য দেখা দিতে বৃহত্তর কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়নের কথাটা আবার সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পাচ্ছে। কিন্তু সি-এম-ডি-এ বলতে কোন অঞ্চল বোঝায় তার সামগ্রিক উন্নয়নের অর্থ কী, এ-সব ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্যক ধারণা বিরল। প্রায়-বিপর্যস্ত নাগরিক জীবনের সমস্যার চেহারাটার আংশিক রূপ কলকাতা বা তার আশ-পাশের নাগরিকের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় খানিকটা ধরা পড়ে—যখন বাসে-ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে কর্মস্থানে যেতে হয়, বাসস্থানের সন্ধানে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরতে হয়, বাড়ীর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে যাযাবরের মতন ঘুরতে হয় আর চাকুরী অথবা জীবিকার অন্বেষণে শেষ অবধি হতাশ্বাস হতে হয়। কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতা, গভীরতা ও তীব্রতার প্রকৃত রূপ এককভাবে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। সমগ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করে আহরিত তথ্য একত্র করলে সেই ছবিটা খানিকটা পাওয়া সম্ভব। আর উন্নয়নের কথা অনুধাবন করতে গেলে সমস্যার অনুধাবন করাটাই প্রাথমিক কাজ। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য।

কলকাতার হুগলী নদীর তীর বেয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তীর্ণ প্রায় ৪৯০ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট, সংক্ষেপে সি এম ডি বৃহত্তর কলকাতা বলতে এই অঞ্চলই বোঝায়। কলকাতা শহরের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে গঠিত সি-এম-পি-ও বা কলকাতা মেট্রোপলিট্যান অর্গানিজেশন সরজমিনে ব্যাপক অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালাতে গিয়ে উক্ত অঞ্চলকে যে ঐরকম সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন তার একটা কারণও আছে। শিল্প-বাণিজ্য নিয়ে কলকাতা শহরের নাগরিক জীবন-যাত্রার ঢেউ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ঐ অঞ্চল পর্যন্ত। অর্থাৎ শহর কলকাতার ঐ অঞ্চল অবধি প্রসারিত হওয়ার প্রবণতা আছে। যাই হোক, ঐ অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব দিকে কল্যাণী শহর, আর দক্ষিণ-পূর্বে কল্যাণপুর। আর কলকাতার দিক থেকে হুগলী ওপারে উত্তর-পশ্চিমে বাঁশবেড়িয়া আর দক্ষিণ-পশ্চিমে উলুবেড়িয়া।

এই চার সীমানার চৌহদ্দিতে দুটি কর্পোরেশন, ৩৩টি মিউনিসিপ্যালিটি, ৩৭টি শহর-অঞ্চল, কিন্তু মিউনিসিপাল অঞ্চল সালের হিসাব অনুযায়ী সি-এম-ডি'র সালের হিসাবে অনুযায়ী সি-এম-ডি'র জনসংখ্যা মোট ৭৫ লক্ষ। আন্দাজ করা যায় চার বছরে নিশ্চয় কিছু বেড়েছে। এই ৭৫ লক্ষ মানুষের ৬০ লক্ষ লোক একেবারে ঠেসে ২১৭ বর্গমাইলের মধ্যে বসবাস করে। সামগ্রিকভাবে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ২৭,৬০০। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ব্যস্ত শহর কলকাতার জনবসতির ঘনত্ব পৃথিবীর অনেক সেরা শহরের চেয়েও বেশী। প্রতি বর্গ-মাইলে কলকাতায় যেখানে ৭৬,৪৯০ জন লোক বাস করে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শহর জাপানের টোকিওতে প্রতি বর্গমাইলে ৩৭,২১৫, প্যারিসে ৬৯,৯৭৬, ন্যু-ইয়র্কে ২৫,০৫৪ আর ভারতের বোম্বাই শহরে ৩০,২০৫ জন লোক বাস করে। সি-এম-ডি'র সমস্ত অঞ্চলটাই সমানভাবে শহুরে নয় অর্থাৎ কলকারখানা ও বাণিজ্যের ঘনত্ব একভাবের নয়। গোটা সি-এম-ডি'র শতকরা ৭২ ভাগ শহরায়িত অঞ্চল হচ্ছে হুগলী নদীর পূর্ব দিকে—কলকাতা আর তাকে কেন্দ্র করে ঘেরা অঞ্চলে। হুগলী-নদীর পূর্ব দিকে (কলকাতার দিকে) উত্তরে কাঁচরাপাড়া থেকে দক্ষিণে গার্ডেন রিচ পর্যন্ত একটানা শহরায়িত অঞ্চল বলা চলে। হুগলী নদীর পশ্চিমে (হাওড়ার দিকে) উত্তরে বাঁশবেড়িয়া থেকে খাস হাওড়া শহর পর্যন্ত-ও এই কথাটি খাটি। এই দুই সীমানার বাইরে হুগলী নদীর উভয় দিকেই মাঝে মাঝে শহরায়িত অঞ্চল, কলকারখানা, আবার মাঝে মাঝে গ্রামীণ জীবনযাত্রা।

এখন প্রশ্ন হোল, এত লোক এখানে এলো কোথা থেকে আর কেনই বা এল? এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে কল-কারখানা-শিল্প-বাণিজ্য এখানে এত জমাট বাঁধল কেন তার কারণ অনুসন্ধান করে। কেননা শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকার উদ্দেশ্যেই লোকে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে।

হুগলীর মোহনায় এত চমৎকার কলকাতা বন্দর থাকার জন্য বহি-বাণিজ্যের সুবিধা আর জলপথে কাঁচামাল দেশের অভ্যন্তর থেকে আনার সুযোগ থাকার ফলেই কলকাতা শহরে কলকারখানা আর শিল্প-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী কয়লা রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতায় আনতে খুবই সুবিধা—মাত্র ১০০ মাইল দূরে। কলকাতার সীমানায় পূর্বদিকে ঘি'র তারের জালের মত যে খাল আছে (এ' খালের অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে, কিছু কিছু বুজিয়ে ফেলা হয়েছে) সেগুলির হুগলী নদীর সংযোগ থাকার ফলে সুবিধা হয়েছিল খুবই। কাঁচাপাট আসত পূর্ববংগ থেকে। অর্থাৎ মূল কথা হোল হুগলী নদীর অবস্থিতি এবং পূর্বাঞ্চলের একমাত্র বন্দর হওয়ার ফলে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল হয়ে দীর্ঘকাল ধরে কলকাতা গড়ে ওঠে। কলকারখানা চালু রাখার জন্য, যন্ত্রপাতি ঠান্ডা করার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। হুগলী নদীর জল সে কাজেও লাগে। কলকারখানা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা এ' অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে সোজা হুগলী নদীর অবস্থানের জন্যই। হুগলী কথায় নদীর নাব্যতা, জলশক্তি ও তার থেকে উদ্ভূত বিদ্যুৎশক্তি এখানে শিল্পায়ন প্রচেষ্টাকে সুবিধা করে দিয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরে সি-এম-ডি অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারিত হতে হতে কী পরিমান আর্থনীতিক কর্মকান্ড এ-অঞ্চলে ঘনীভূত হয়েছে কয়েকটা টুকরো নমুনা হিসাব দিলে তার চেহারাটা স্পষ্ট হবে। সারা বাংলা দেশে বয়ন-শিল্পামিস (সুতির কাপড় ও চটের তৈরী জিনিস) ৩৯৬, তার মধ্যে ৩৩৯ খানি সি-এম-ডি অঞ্চলে অবস্থিত। রাসায়নিক কারখানার সংখ্যা ৬৬৭, তার মধ্যে ৬২৫ খানিই সি-এম-ডিতে। মেশিনারি তৈরীর কারখানা গোটা বাংলা দেশে ৫৫৪ তার মধ্যে মাত্র ২৭টি সি-এম-ডি অঞ্চলের বাইরে। সারা ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের শতকরা ১৫ ভাগ সি-এম-ডি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এই স্বল্প-আয়তন শিল্পের অবস্থান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অধিকর্তা বিভাগের উপরোক্ত হিসাবটি ছয় বছরের পুরোন হলেও খুব বড় রকমের একটা হেরফের ইতিমধ্যে হয়ে যায় নি।

সি-এম-ডি'র অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম শহর-বন্দর কলকাতা আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবংগের রাজধানী হলেও উড়িষ্যা, বিহার ও

যুক্তরাজ্যের পূর্বপ্রান্তবর্তী জেলা, আসাম, মণিপুর, নেফা অঞ্চল হোল কলকাতার বাণিজ্যিক পশ্চাদ্ভূমি। উক্ত অঞ্চলগুলির মোট প্রায় ১৫ কোটি লোকের জীবিকা, কর্মসংস্থান কলকাতা বন্দরের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সচলতার সঙ্গে আচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। সারা ভারতের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৩২-১ ভাগ কলকাতা বন্দর মারফত হয়েছিল ১৯৬৪-৬৫ সালে; ঐ একই বছরে সারা ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৪৩-৪ ভাগ হয়েছিল এই কলকাতা বন্দর দিয়েই। ভারতের ব্যাঙ্ক-শিল্পে বছরে যত টাকা লেন-দেন হয় তার শতকরা ৩৫ ভাগ হয় সি-এম-ডি অঞ্চলে। সি-এম-ডি অঞ্চলে কর্মরত মানুষ বছরে ২৮ কোটি টাকা বছরে মণি-অর্ডার করে বাইরে পাঠায়। সি-এম-পি-ও'র সমীক্ষা অনুযায়ী—

"The present economic dominance of the Calcutta Metropolitan District in the total economy of West Bengal needs little emphasis of the total income generated in the State—Rs 1,105.2 Crores—as much as Rs 641 crores or 58% are generated in the South Eastern districts which includes the Calcutta Contribution along the banks of the Hooghly of the total number of persons employed in the registered factories in the State, in 1961, 83% or 5,85,000 were employed in the four districts of Howrah, Hooghly, 24 Parganas and Calcutta which from het greater part of the C.M.D. Of the total industrial income 78.7% is derived from the Southeastern Region, Centred on Calcutta and Howrah. (Basic Development Plan 1966-86, P.28.)

এক কথায় বলা চলে, শিল্প-জগতে ভারতের সম্পদ সৃষ্টিতে ধমনী, অবয়ব ও অন্যতম হৃৎপিণ্ড হচ্ছে এই সি-এম-ডি। বর্ধমানের দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবংগের শিল্প-বিন্যাস অন্যধারে ছড়িয়ে পড়লেও সি-এম-ডি অঞ্চলের গুরুত্ব থেকেই যাবে।

আর্থনীতিক জগতে এই বিরাট কর্মকান্ডকে সচল রাখার জন্য বিপুল জনশক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য। কৃষি-কর্ম থেকে উদ্বৃত্ত লোক জীবিকার সন্ধানে দলে দলে কোলকাতায় এসেছে। তাছাড়া এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও বিশেষ করে কলকাতা-বন্দরের বাণিজ্যিক পশ্চাদ্ভূমি বলে চিহ্নিত অঞ্চল থেকে। সি-এম-ডি'র মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী হল পশ্চিমবংগ থেকে বহিরাগত। কর্মক্ষম ও কর্মসন্ধানী ব্যক্তির যোগদান এত বেশী হওয়ায় এখানে তুলনামূলকভাবে অল্প খরচে লোক-নিয়োগের সুযোগ অন্যদিকে মূলধন-নিয়োগকারীদের এখানে শিল্প-বাণিজ্য পত্তনের উৎসাহ দিয়েছে। তাছাড়া এসেছে দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু। দেশ-বিভাগের ফলে বেশ কয়েকটি বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রিক শহর ভৌগোলিক কারণে পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলকাতার উপর জনসংখ্যার চাপ পড়তে বাধ্য। কেননা কলকাতা ছাড়া আর বিকল্প শহর সেদিন পর্যন্ত ছিল না। (দুর্গাপুর অনেক পরে হয়েছে) সি-এম-ডি অঞ্চলে—বিশেষ করে কলকাতার উপকণ্ঠে কী দ্রুত-হারে জনসংখ্যা বেড়েছে কয়েকটি মাত্র হিসাব দিলেই যথেষ্ট। গত দশ বছরে উত্তর দমদমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২১৩ ভাগ; দক্ষিণ দমদমে শতকরা ৮১ ভাগ; পানিহাটির মত স্বল্প-পরিসর জায়গায় শতকরা ৮৯ ভাগ; বারাসতের মত জায়গায় শতকরা ৮২ ভাগ।
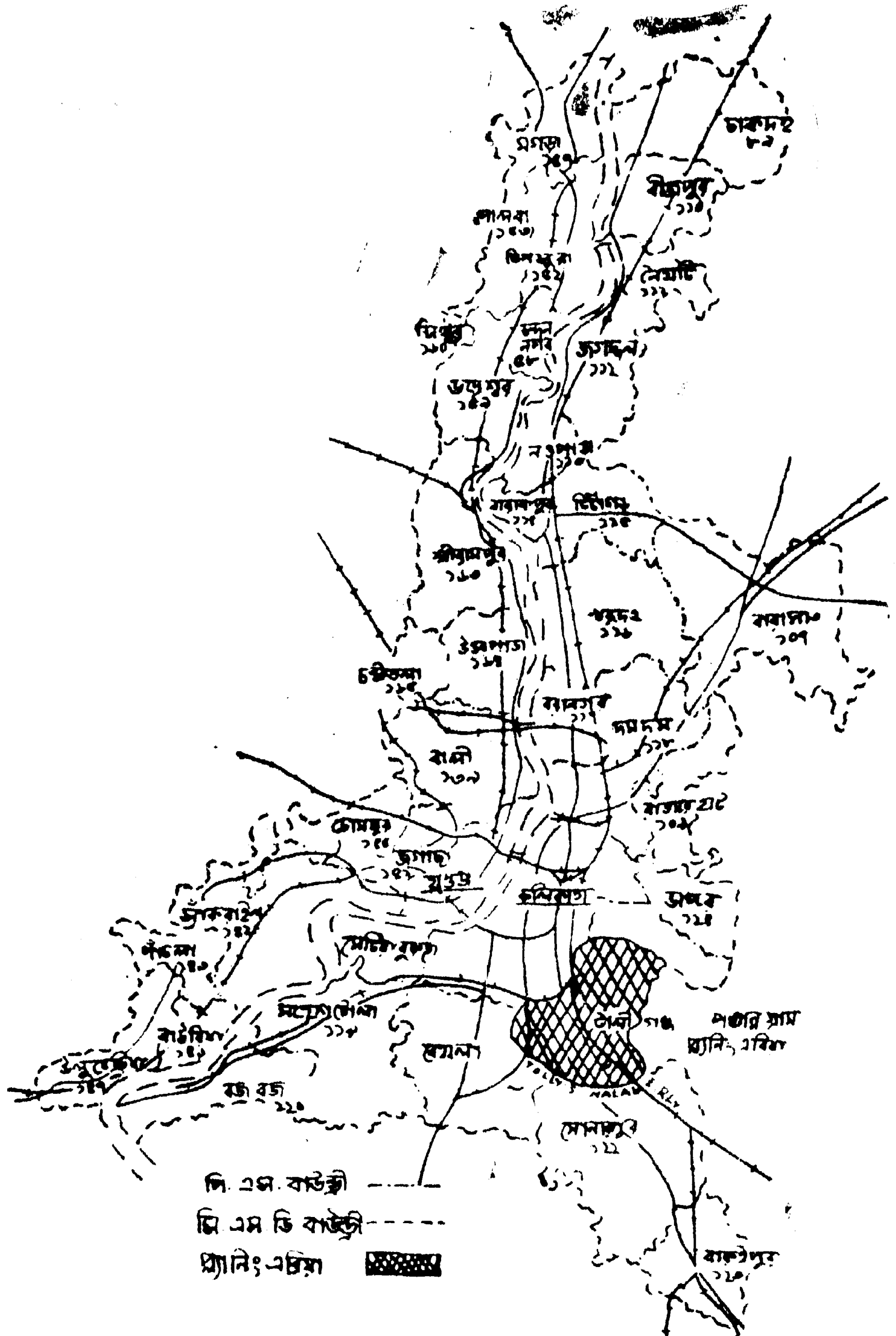
প্রথমে দেখা যাক এই বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ কীভাবে বসবাস করছে।

১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী সি-এম-ডি'তে ৬৭ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩,৬৬,০০০ বাস করে কোন বাসগৃহে নয়—হাসপাতাল, কলেজ, দোকানঘরে, ইত্যাদিতে। আর ৩০,০০০ বাস করে রাস্তায়, ফুটপাথে। মনে রাখতে হবে এই সংখ্যা আরও বেশী হওয়াই সম্ভব। কেননা এই জনসংখ্যাকে ঠিকমত পরিমাপ করা খুবই শক্ত। তাছাড়া এক-একটা সময়ে এই সংখ্যা অস্থায়ী অথচ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পায়। যাই হোক, বাকী ৬৩,২৫,০০০ লোক গৃহে বাস করে ১৩,২৯০০ গৃহ-ইউনিটে। (ইউনিট বাসস্থান পরিমাপের সুবিধার জন্য একটি নির্দিষ্ট একক ধরা হয়েছে) শুধু এই হিসাব থেকে প্রকৃত চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না; আরও দুটি তথ্য সন্নিবেশিত করলে খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে। ১৯৬১ সালের হিসাবে, সি-এম-ডি অঞ্চলে ইউনিটের গড়পড়তা সাইজ হল ১-৫৫ খানা ঘর। ঐ জায়্

গায় বসবাসী গড়পড়তা লোকসংখ্যা হোল ২-৯৯ জন অর্থাৎ প্রায় তিনজন লোক। হিসাবমত দেখা যায় শতকরা ৭৭টি পরিবার ১৯৫৭ সালে মাথাপিছু ৪০ বর্গ ফুটেরও কম জায়গাতে কোনরকমে থাকত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাসস্থানের আয়তন বন্টনটা খুবই অসম। খুব অল্পসংখ্যক লোক, আয় যাদের বেশী, তারা বেশী জায়গা ভোগ করে। তার অর্থ হোল যে জনসংখ্যার বেশীর-ভাগ অংশ মাথাপিছু ৪০ বর্গ ফুট জায়-গাও পায় না। উপরন্তু বসবাসের জায়গা মানুষের কতটা বাসযোগ্য সেটা বুঝতে হলে সি-এম-ডি অঞ্চলের বস্তিবাড়ী পর্যবেক্ষণ করা দরকার হবে। সি-এম-পি-ও'র হিসাবে কলকাতার জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ বস্তীতে বাস করে। আর হাওড়া শহরে ৫-১২ লক্ষ লোকের মধ্যে (১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) এক তৃতীয়াংশ লোক বস্তীতে বাস করে। (হিসাব পুরানো, আরও কিছু বেড়ে থাকা অসম্ভব নয়)।

শহর-জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস হোল বৃষ্টির জল ও দূষিত ময়লা নিষ্কাশ-নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা—পর্যাপ্ত পানীয় জলের যোগান। কলকাতা কর্পোরেশানের এলাকা-ভুক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ কলকাতা শহরের শতকরা ৫৪ ভাগ মাত্র জায়গায় পয়ঃপ্রণালী আছে। হাওড়ার মত শহরে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নেই-ই। আর শ্রীরামপুরে, ভাটপাড়া ও টিটা-গড়ে যা আছে তা নামমাত্র। কলকাতার অধিকাংশ জায়গায় ও সি-এম-ডি'র অন্যান্য অঞ্চলে দূষিত ময়লা অপসারিত হয় ময়লার গাড়ীতে। কলকাতা ও হাওড়া বাদে অন্য মিউনিসিপ্যাল শহরগুলিতে ১,২৬০০০ খাটা পায়খানা আছে। বর্ষার সময় বাস-স্থানের জায়গা, পুকুর ইত্যাদি খাটা পায়-খানার সঙ্গে মিশে গিয়ে যে সংহত বীভৎসতার চেহারা নেয় তা অচিন্ত্য-নীয়। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি বিপ-জ্জনক তা প্রতি বছরে সি-এম-ডি অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় কলেরা মহামারির আকারে দেখা দিয়ে জানিয়ে দিয়ে যায়। পরিশ্রুত পানীয় জলের যোগান কত অল্প তা সামান্য হিসাব থেকেই বোঝা যাবে। কলকাতা বাদে ৩৩টি মিউনিসিপ্যালি-টিতে, ২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে মাথাপিছু ১২·৩ গ্যালন পরিশ্রুত জল প্রতিদিন পায়। সি-এম-ডি অঞ্চলের ১০ লক্ষ ৭১ হাজার অধিবাসী পরিশ্রুত পানীয় জল বলতে এক ফোঁটাও পায় না!

যান-বাহন ব্যবস্থা সি-এম-ডি অঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতা, ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও হাওড়ায় কী ভীষণ আকার ধারণ করেছে তা সহজেই অনুমেয়। কলকাতা ও হাওড়া শহরে চাকুরী ও জীবিকার জন্য প্রতি-দিন বহু মানুষ আসেন। সারা বৎসরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ কোটি।

বাসিন্দা পরিবারের অপরিহার্য প্রয়ো-জন হল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ। ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী সমগ্র সি-এম-ডি'তে শতকরা ৩২ জন প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুযোগ পায় নি আর শতকরা ৫৬ জন জুনিয়ার সেকেন্ডারি শিক্ষার কোন সুযোগ পায় নি! শিক্ষা-দীক্ষার এই অপ্রতুলতার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে সি-এম-ডির বাসিন্দাদের অনিশ্চিত দুর্বিষহ জীবনযাত্রার ছবি সম্পূর্ণ আকারে আসে। সমগ্র সি-এম-ডি অঞ্চলে সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ৫·৬ ভাগ সম্পূর্ণ বেকার (১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী) ছিল অর্থাৎ কর্মপ্রার্থী ছিল অথচ কাজ পায় নি। নয় বৎসরের পরে এখনকার সমীক্ষায় আরও বেশী দাঁড়াবে এই সংখ্যা।
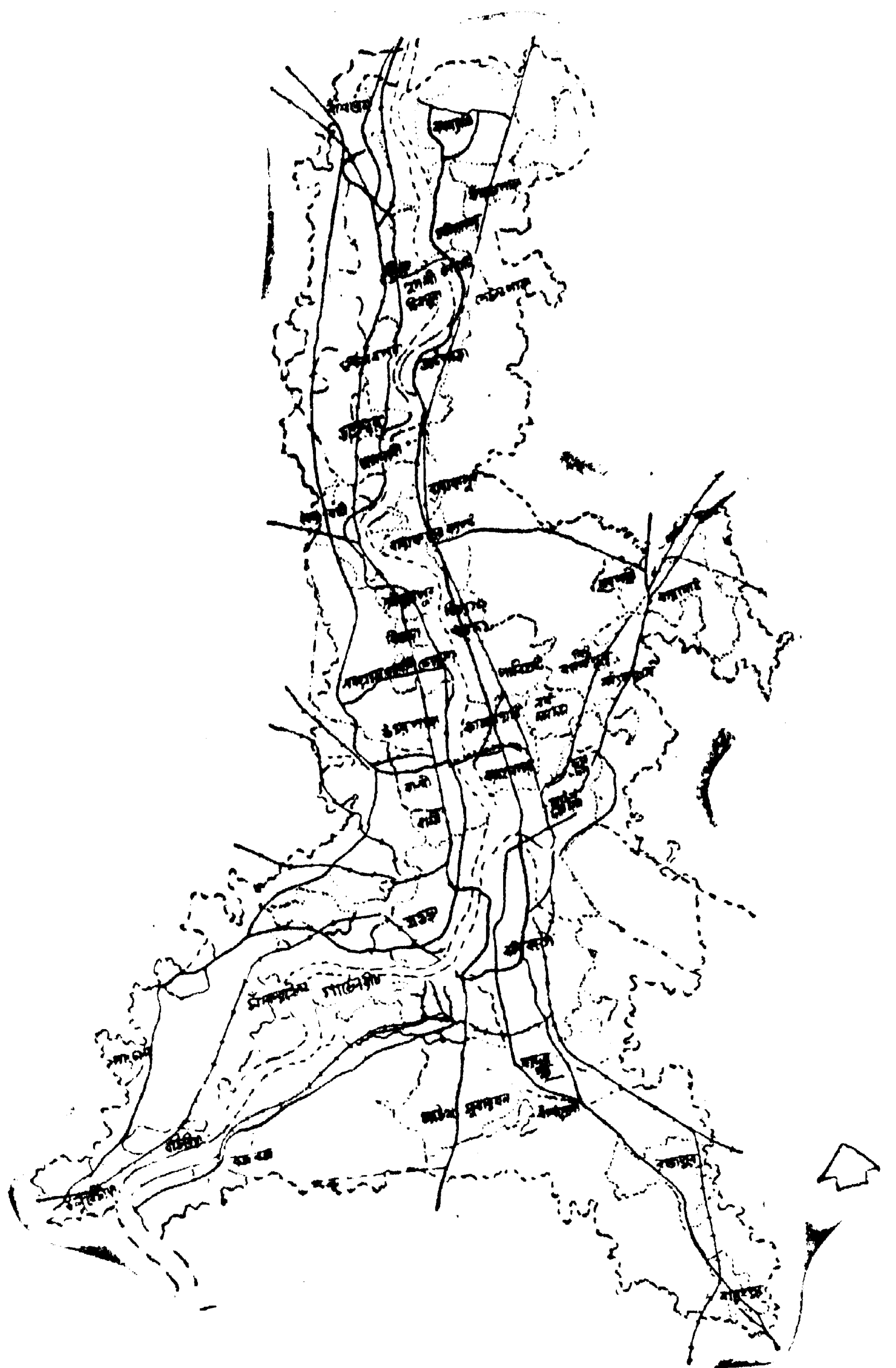
বহুমুখী সমস্যার যে চিত্ররূপ তুলে ধরা হোল তা খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রত্যেকটি দিক নিয়ে আরও বিশদ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু তা' হলেও সি-এম-ডি'র সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় তার একটা ছবি ছোট আকারে আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। সি-এম-ডি'র শিল্প-বাণিজ্যের বর্তমান উৎপাদন সামর্থ্য ও প্রসারের সম্ভা-বনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার উন্নয়নের একটি প্রধান কর্তব্য। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে সি-এম-ডি'র ওপর সামগ্রিক চাপ কমা-বার জন্য অন্য শিল্পায়িত অঞ্চল (যেমন দুর্গাপুর) গড়ে তোলা-ও দরকার দ্রুত-গতিতে।

আর এখানকার বাসিন্দারা মানুষের মত জীবনযাত্রা যাপন করে কর্মক্ষম ও সচল থাকে তার জন্য সমস্ত সমস্যাগুলির পরস্প-রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাধান অবশ্য-কর্তব্য।

তুলসীচরিত

নীষবিব চৌধুরী

(১০)

অশোকের চতুর্থ ইনস্টলমেণ্ট।
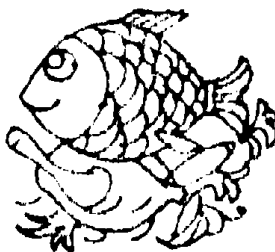
অনেক টাকার মালিক হয়েছেন মাস্টার-মশাই সন্দেহ নাই। টাকা হওয়াতে ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে। পায়ে হেঁটে বেড়ান, বেশ-ভূষায় ধনশালিতার পরিচয় নাই, এ সব চালাকি, ভন্ডামিও বলা চলে। টাকা কি সেকেলে কঞ্জুসদের মত হাঁড়িতে পুরে গর্তে লুকিয়ে রাখবার জন্য না একেলে কঞ্জুসদের মত ব্যাঙ্কে বসে ডিম পাড়বার জন্য হয়েছে? টাকা হলে ভাল খাবে ভাল থাকবে, ভালভাবে চলাফেরা করবে যাতে লোকে খাতির করে, মান্য করে। মাস্টার-মশায়ের গরীবী চাল ভন্ডামি। কেউ হ্যাণ্ডনোট চাইলে, সাহায্য চাইলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য এই ভন্ডামি।

ফরমুলাটা বেচে দিয়েছেন বললেন। মিথ্যা কথা। যে লেখাপড়া করেছে, যার বয়স হয়েছে, সারাজীবন যে কষ্ট করে চালাচ্ছে সে সোনার ডিম পাড়ে যে হাঁস তাকে বেচে দিয়েছে নগদ পাঁচসিকায়, আহাম্মকের মত এই কথা বলে দিলেন। সত্যিকার আহাম্মকের মাথার থেকে ওয়ান্ডার ড্রাগের ফরমুলা বেরোয় না, আহাম্মক নয়, ভন্ড মিথ্যাবাদী হয়েছেন এককালের ভালমানুষ মাস্টারমশাই।

এতটা ঘৃণা হল তাঁর ভন্ডামির পরিচয় পেয়ে যে ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনের কর্তা মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা করবার উপদেশ একটা ধাপ্পাবাজি বলে মনে হল। একখানা চিঠি দিলেও না হয় বুঝতাম এক ফোঁটা সিনসিয়ারিটি আছে উপদেশের মধ্যে। অফিসে দেখা করতে যাব দারোয়ান, আর্দালীকে টিপস্ দিয়ে দয়া করে কার্ডের জন্য হাত বাড়ালে স্লিপে লিখব, অশোক-কুমার পাল, নাম দেখেই মিঃ ভাদুড়ী সসম্মানে ডেকে পাঠাবেন বোধহয়? বাজে ভাঁওতা দিয়ে ভাগিয়ে দিলেন মাস্টারমশাই এ-ছাড়া আর কি বলব?

সিরীয়াসলি নিতে পারলাম না পরামর্শ। মাস দেড়েক কেটে গেল। রাগ খানিকটা পড়ে এল। মাস্টারমশায়ের রেফারেন্স দিয়ে একখানা দরখাস্ত পাঠালাম। তিন দিনের দিন চিঠি এল দেখা করুন। সত্যি বলতে কি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। মাস্টারমশাই তাহলে ভাঁওতা দেননি, কিছু বলেছেন মিঃ ভাদুড়ীকে।

দেখা করলেন, ভদ্র ব্যবহার করলেন, তিনটে কাজের নাম করে বললেন, এক সপ্তাহ কাজের জায়গায় ঘুরেফিরে দেখে একটা রিপোর্ট দিন। রিপোর্ট দেখে কোথায় দেয়া যেতে পারে আপনাকে স্থির হবে। সুপারভাইজারের বেতন পাবেন এ সাত দিন।

রিপোর্ট দেবার তিন দিন পরে কাজে নিযুক্ত হলাম। মিঃ ভাদুড়ী বললেন কাজে এফিসিয়েন্সি দেখাতে পারলে উন্নতি হবে।

মনে মনে প্রণাম করলাম মাস্টার-মশাইকে। পায়ের ধুলো নিলাম, বললাম হয়ত অত্যন্ত অভাবে পড়ে ফরমুলাটা বেচে দিয়েছেন আপনি, সেলস অরগানাইজেন সম্বন্ধে কিছু জানা নাই, পাব্লিসিটি অর-গানাইজ করতে পারতেন না, বেচে দিয়ে ঠিক কাজ করেছেন আপনি। অবিশ্যি বেশী না হোক টু পার্সেণ্ট রয়াল্টির সর্তটা করে নিলেও পারতেন। আপনাকে ভন্ড বলায় পাপ হয়েছে মাস্টারমশাই, দেখা হলে পায়ের ধুলো নিয়ে ক্ষমা চাইব।

গাঙ্গুলী ড্রাগ বাজারে বেশ চলছে খবর পাই। নতুন আর কোন জিনিস তিনি বের করতে পারলেন কিনা জানা গেল না, অনেক চেষ্টা করেও। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাঁর সংগে আবার দেখা করবার জন্য, ঠিকানা বের করতে পারিনি। মিঃ ভাদুড়ীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন, বললেন ঠিকানা জানেন না তিনি, দেখাসাক্ষাৎ হয় না।

বছর তিন কেটে গেল। মিঃ ভাদুড়ীর সুনজরে পড়েছি আমি। নতুন নতুন কাজের ভার আসতে লাগল হাতে। রোজগার অনেক বেড়ে গেল। ঘা খেয়েছি একবার, খরচপত্র সম্বন্ধে সাবধান হলাম, টাকা জমাতে লাগলাম। গাড়ী কিনতে হয়নি, অফিসের গাড়ী পেয়েছি। ভাড়াটে তুলে দিয়ে ছোট বাড়ীটা কিছু বাড়িয়ে, কিছু বদলে আমার বর্তমান পদ-মর্যাদার উপযোগী করে নিয়েছি। বড় বাড়ীটা উদ্ধার করবার ইচ্ছা ছিল, বিক্রি দামের ডবল দিতে ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু তাতেও পাওয়া গেল না। ঐ বাড়ীর আশা ছেড়ে দিয়ে শহরতলিতে কিছু জমি কিনলাম। ভাবলাম দু-চার বছর যাক, দাম বাড়লে কিছু বেচে দেব, খানিকটাতে একটা বাড়ী করব। শহরতলিতে বাড়ীর সংখ্যা, লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে। টাকাটা ব্লক হয়ে রইল, অপেক্ষা করলে সুদে আসলে উঠে আসবে।

আরও বছর-দুই কেটে গেল। শহর-তলির জমির অর্ধেকটা বেচে দেব কিনা ভাবছিলাম, একটা আশংকা মনে উদয় হওয়াতে বেচতে পারলাম না। ক'টা লক্ষণ দেখে ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনের ভবিষ্যৎ এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশংকার উদয় হয়েছিল।

নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে একটা ছোটখাট ইন্ডাস্ট্রি আরম্ভ করবার কথা মনে হল। জমিটা আর বেচলাম না। কাছাকাছি আরও কিছু জমি একটু চড়া দরে কিনে ফেললাম। কিছুদিনের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি চালু করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করায় হাত লাগালাম।

ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশংকার কথা বলছি।

মিঃ ভাদুড়ী যে তাঁর শ্রেণীর অন্য বড় বিজনেসওয়ালাদের মত ন'ন সেটা আবিষ্কার করতে বেশী সময় লাগেনি। তিনি বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল কর্মী পুরুষ, নিজের চেষ্টায় এতবড় কারবার গড়ে তুলেছেন। মানুষ হিসেবে অতি ভদ্র, সাধু-প্রকৃতির, কোন রকমের দোষ বা বদখেয়াল ছিল না। ক্লাবে যেতেন কারবারের খাতিরে, মদ ছুঁতেন না। বছর তিনের পুরনো হতে জানতে পারলাম, তাঁর স্ত্রী সাধন-ভজন করেন। তাঁর এক গুরুদেব আছেন, মাঝে মাঝে পাঁচ-সাতটি শিষ্য নিয়ে তিনি মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ীতে ওঠেন এবং রাজকীয় সমাদরে বাস করেন। এই গুরুদেবকে আমি দেখিনি কিন্তু মিসেস ভাদুড়ীর ক'টি গুরুভাইকে অফিসে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।

কিছুদিন আগে জানতে পারলাম স্ত্রীর প্রভাবের ফলে মিঃ ভাদুড়ী তাঁর গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তারপর থেকে তাঁর বাড়ী গুরু-ভাইদের স্থায়ী আড্ডা এবং তাঁর অফিস তাঁদের চরণক্ষেত্র হল। গুরু-ভাইরা অতি ধূর্তপ্রকৃতির সাধু বলে মনে হল আমার। ছোট-খাটো অনেক ব্যাপারে তারা নাক গলাতে আরম্ভ করল।

এরপর মিঃ ভাদুড়ীর বড় দুই ছেলের সংগে এদের কলহ আরম্ভ হল। পিতার কাছে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন ফল হয় না দেখে, দু-ভাই মিলে যতটা পারে সরাতে লাগল দু'হাতে, বাপ-মায়ের সংগে আলাদা হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। তাদের সংগে যোগ দেবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম আমি কিন্তু রাজি হতে পারিনি। চারদিকের অবস্থা দেখে চাকুরি ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিজস্ব কারবার আরম্ভ করেছিলাম আমি দু' ছেলেকে সংগে নিয়ে।

সাধন-ভজনের, বেশী ধর্মভাবের ফলে মানুষের মতিচ্ছন্ন হয় কিনা জানি না, কিন্তু ক্রমে দেখলাম মিঃ ভাদুড়ীর চোখের সামনে তাঁর গুরু-ভাইরা লুটপাট শুরু করে অতবড় কারবার নষ্ট করে দিতে আরম্ভ করল। তাঁর চেহারার কেমন একটা পরিবর্তন হয়েছে মনে হল।

শেয়ার হোল্ডাররা আন্দোলন করতে আরম্ভ করল, অডিটে অনেক রকমের গোলমাল প্রকাশ পেল। কোম্পানী লিকুইডেশনে গেল। গুরু-ভাইরা বাড়ীটা মিঃ ভাদুড়ীকে দিয়ে গুরুদেবের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল শোনা গেল।

এর আগেই ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনের সংগে আমার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। মিঃ ভাদুড়ীর মত সংলোকের দুর্দশা দেখে বড় কষ্ট হল কিন্তু আমার কিছু করবার ছিল না।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম মিঃ ভাদুড়ী সস্ত্রীক গুরুদেবের আশ্রমে চলে গিয়েছেন। তারপর খবর পেলাম গুরু-ভাইরা গোপনে বাড়ীর জিনিসপত্র জলের দামে বেচতে শুরু করেছে। একদিন গিয়ে কম দামে মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ীর দু-চারটে জিনিস সংগ্রহ করলাম। মাল বাড়ীতে পেঁছিলে দেখলাম ক'খানা ছবি অন্যান্য মালের সংগে এসেছে। একখানা ছবি একটি ছোকরার, খুব সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কাগজে মুড়ে চারখানা ছবি কারখানা-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম।

বছর-দুই কেটে গেল। কারবার ভাল চলছে। দু' ছেলেকে কারবারের মধ্যে ঢুকিয়েছি, দু' মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। হাতে কিছু টাকা জমেছে। শখ হল কারখানার কাছে যে জমিটা কিনেছি, সেখানে একটা বাড়ী করবার। দৌড়োদৌড়ি করতে হবে না। কাছে থেকে কাজ দেখা যাবে।

জমির ছোটখাট জঙ্গল কাটতে লোক লাগালাম। জঙ্গল কাটা হয়ে গেলে একদিন জমিটা মাপ করিয়ে তিন-চার মিনিটের পথ বড় রাস্তায় আসছিলাম, চোখে পড়ল একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি মেয়ের সংগে গল্প করতে করতে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকটির চেহারা চেনা-চেনা মনে হল। পেছন থেকে ধরতে পারছিলাম না ঠিক। পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে ভদ্রলোকটি তাকিয়ে দেখে একটু দাঁড়ালেন, তখনই আবার চলতে লাগলেন।

তিনি চিনতে না পারলেও আমি পারলাম, আমার প্রাক্তন মাস্টারমশাই, যাঁর জন্য এত অনুসন্ধান করেছি।

চিনতে পারলেও আমাকে চিনতে চাইবেন কিনা সন্দেহ হওয়াতে একটু দূরে থেকে যেন নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে চলেছি এইরকম ভাব দেখিয়ে তাঁর অনুসরণ করলাম।

সংগের মেয়েটি হয়ত তাঁর নাতনী হবে মনে হল। স্কুল কি কলেজে পড়ে বোধহয়। হাতে ক'খানা বই রয়েছে।

(১১)

আমার চতুর্থ ইনস্টলমেন্ট।

কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে কিছুকাল শখ হিসেবে ড্রাগ রিসার্চের কাজ করেছিলাম দু-একটা ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীর রিসার্চ লেবরেটরীতে। বিদেশী কোয়ালিফিকেশন বা বাজারে নাম না থাকলে পেটভাতা দিয়েও কোন কোম্পানী রিসার্চ ওয়ার্কার রাখতে চায় না, রিসার্চের সুবিধে দিতে চায় না। সংসার চালাবার জন্য আমার টাকার প্রয়োজন কাজেই বেশী দিন চালাতে পারলাম না। শখটা মরি মরি করে রয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে।

দেবাশিস কথাবার্তায় এ খবরটি জানতে পেরেছিল। বিশেষ কোন আলোচনা তার সংগে এ সম্বন্ধে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কথাটা সে ভোলে নাই বিদেশে যাবার মুখে ফরমুলা দু'টো পাঠানোতে একথা প্রমাণ হল।

দেবাশিস চলে যাবার মাসখানেক পরে বড় একটা কেমিকেল এন্ড ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীর অফিস থেকে চিঠি পেলাম। মিঃ ভাদুড়ীর একখানা চিঠিও পেলাম। চিঠিতে জানিয়েছেন, আপাততঃ দু'শো টাকা করে দেবে কোম্পানী, কাজ দেখাতে পারলে বাড়াবে। কোন অসুবিধে হলে ফোন করে তাঁকে জানালে তিনি অসুবিধে দূর করবার চেষ্টা করবেন।

দেবাশিসের একটা ফরমুলা নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করলাম। বছর খানেক লেগে গেল, তারপর নতুন ড্রাগ বাজারে বেরোল। ফরমুলা দেবাশিসের। ড্রাগের নাম হল গাংগুলী এলেকসির। মাস পাঁচ ছয় পাবলিসিটির পরে ড্রাগের কাটতি বাড়তে লাগল।

এক বছর রয়ালটি দিল কোম্পানী, তারপর প্রস্তাব করল কিছু টাকা নিয়ে ফরমুলা বেচে দিন, এই টাকা বাদে বছরে সাড়ে তিন হাজার দেয়া হবে আপনাকে পনেরো বছর। তাদের লেবরেটরীতে কাজ করতে পারব যতদিন ইচ্ছা, তার জন্য আলাদা কিছু দেয়া হবে।

দেখলাম একটা ড্রাগে আমার অদৃষ্ট ফিরে গেল। বললাম টাকার অঙ্কটা কিছু বাড়িয়ে দিন, নিজে একটা ছোটমত লেবরেটরী করতে চাই। কিছু বের করতে পারলে আপনাদের দেব কথা দিচ্ছি। প্রয়োজন মত আপনাদের লেবরেটরী ব্যবহার করব, তার জন্য মাইনে দিতে হবে না। কোম্পানী রাজি হয়ে গেল।

হাতে টাকা হতে দেখলাম স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের ব্যবহার বদলাতে লাগল। শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেন বহুদিনের পরিচিত সার্কেলের সংগে আমার যেন সদ্য পরিচয় হল এই রকম ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। পরিবর্তন আমার ভেতরেও ঘটল বুঝতে পারলাম।

ছাত্র হিসাবে ভালই ছিলাম আমি, উচ্চাশাও ছিল মনে। পাঠ্যজীবন শেষে হবার মুখে পিতার মৃত্যুর পরে দেখলাম বাড়ীটি মর্টগেজে আবদ্ধ, নগদ টাকা বাড়ীতে বাক্স প্যাটরায় নাই, ব্যাংকেও নাই। পিতা মারা যাবার আগে নাতির মুখ দেখবার আশায় রোজগারক্ষম হবার আগেই বিয়ে দিয়েছিলেন।

উচ্চাশা বিসর্জন দিয়ে এম এস সি পরীক্ষার ফল বেরোবার পরে কলেজের চাকুরিতে ঢুকতে হল। পিতার দেনাটা শোধ করে বাড়ীটা বাঁচাবার এবং ক্রমবর্ধমান পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টায় রোজগার বৃদ্ধির চেষ্টায় মন দিলাম। দু'চার বছর যেতে দেখলাম শুধু উচ্চাশা নষ্ট হওয়া নয় বুদ্ধির ধার এবং মনের উদ্যম জীবিকা সংগ্রহ সংগ্রামের ফলে ক্ষীয়মাণ ও ম্রিয়মাণ হয়েছে। বড় কথা, ভাল কথা ভাববার অবসর অমিল হয়েছে।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠতে নতুন ঝঞ্ঝাট শুরু হল তাদের নিয়ে। তাদের ওপরে চোখ রাখবার অবসর ছিল কম। ফলে চোখের সামনে যাদের চিনি না এমন ধরনের মানুষ হয়ে উঠতে লাগল তারা।

তাদের দাবীমত পোশাক-পরিচ্ছদ, থাকা-খাবার ব্যবস্থা করতে পিতার অক্ষমতা তাদের চোখে পিতার অকর্মণ্যতার পরিচয়, স্ত্রীর চোখে স্বামী সহজে অকর্মণ্যরূপে প্রকট হয় তাঁর নিজের ইচ্ছামত খরচ করবার উপযুক্ত অর্থের যোগান দিতে না পারলে। এক বাড়ীতে থেকে, এক হাঁড়ির ভাত খেয়ে বাড়ীর প্রত্যেকটি লোক যে যার মত হয়ে উঠলেও একটা বিষয়ে ঐকমত ছিল সকলে, কলেজের মাস্টার প্রমথ গাঙ্গুলী অতি অযোগ্য লোক, কোন দিক দিয়ে শ্রদ্ধার পাত্র নয়।

পঁয়তাল্লিশ বয়সে পৌঁছে দেখলাম আমি নিজের বাড়ীতে একজন আউট-সাইডার। ভুলে গেলাম আমি এক সময়ে নবীন যুবক ছিলাম, আমার মনে উচ্চাশা ছিল, স্বপ্ন ছিল, আমি ভালবাসতে, স্নেহ করতে জানতাম। প্রেম আমার জীবনে মধুর স্বপ্নের মত দেখা দেয়নি, স্নেহ, শ্রদ্ধা আমার প্রৌঢ় জীবনে মিষ্টত্ব আনে নি। সীমাহীন গভীর হতাশায় মন ভরে উঠেছিল।

হাতে টাকা হতে বাড়ীর আবহাওয়া বদলে গেল দেখলাম। প্রৌঢ়া গৃহিণীর বচন মধুমাখা হয়ে মুখ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল, স্বামীর প্রতি পরম ঔদাসীন্যের ছাঁন কেটে গিয়ে স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সুদৃষ্টি পড়ল। কড়া স্বরে নয় ভারি মিষ্টি হেসে তিনি নানা প্রয়োজনের কথা তুলে অতিরিক্ত টাকা চাইতে লাগলেন। দুটি বিবাহিতা কন্যার সংসারের কাজের চাপে এতদিন বাপের কথা মনে করবার সময় পেত না, হঠাৎ তারা বড় পিতৃভক্তি প্রকাশ করতে লাগল চিঠিপত্রে এবং শ্বশুরের, শাশুড়ির, স্বামীর কৃপণ স্বভাবের নিন্দা করে মাঝে মাঝে নানা অজুহাতে কিছু টাকা পাঠাবার আবদার জানাতে লাগল। দুই পুত্রের পিতৃভক্তিও হঠাৎ বিস্মৃতির জলগর্ভ হতে মাথা তুলল। সুশ্রাব্য ভনিতা করে বাড়ী মেরামত, আসবাব কেনা ইত্যাদি সাংসারিক প্রয়োজনে টাকা চাইতে লাগল। তারা নিজেরাও চাকুরি করত কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় তাদের রোজগারের টাকা ব্যাঙ্কে চলে যেত, তাদের নাবালকদিনের মত খাওয়া পরার খরচটা বাপকেই দিতে হত, হাতখরচের অনটন পড়লে সেটাও দিতে হত।

বৈরাগ্যবশে নয় সাংসারিক চিন্তা করে বাড়ীটা স্ত্রীর নামে লিখে দিলাম শহরতলিতে একটা ছোট বাড়ী কেনবার পরে। আমার পোষ্য সন্তানহীনা বিধবা ভগ্নীকে নিয়ে নতুন বাড়ীতে সরে এলাম স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, অর্থাৎ সবাইকে কিছু কিছু নগদ দক্ষিণা দিয়ে। আস্তে আস্তে একটা ছোট লেবরেটরী গড়ে তুললাম নতুন বাড়ীতে।

বৈরাগ্যবশে নয় বলেছি। এটা বানপ্রস্থের একটা এক্সপেরিমেন্ট। হয়ত একটুখানি আশা মনের কোন্ কোণে লুকিয়ে ছিল যদি জীবনের নষ্ট ঐশ্বর্যের কিছু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় গার্হস্থ্যাশ্রম ছেড়ে বানপ্রস্থ নেবার ফলে। জীবনের ঐশ্বর্য কি? প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতি, উদারতা যা মানুষকে মানুষের সঙ্গে বেঁধে দেয়।

নতুন বাড়ীতে আসবার বোধহয় বছর দেড়েক পরে হঠাৎ দেবাশিসের একখানা চিঠি পেলাম আমেরিকা থেকে।

(১২

চিঠি হাতে করে একটু পুলকের ভাব এল মনে। তাহলে দেবাশিস বেঁচে আছে? মাস্টারমশাইকে বলবার মত কথা এতদিন পরে খুঁজে পেল?

ধীরে ধীরে মন দিয়ে চিঠিখানা পড়লাম।

লিখেছে, বাবা তাঁর এক বন্ধুর মারফৎ যে টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে কলেজে ভর্তি হয়ে দু-তিন বছর পড়াশোনা চালানো অসম্ভব, বড় জোর বছর খানেক অর্ধাহারে থেকে বেঁচে থাকা চলে। কিছুদিন এ কলেজ সে কলেজ, এ আস্তায় সে আস্তায় ঘোরাফেরা করে যা হোক একটা চাকুরির চেষ্টায় হাই কমিশনারের অফিসে ধর্ণা দিয়ে একটা চাকুরি যোগাড় হল চেহারা ও পোশাকের জোরে। ভাল চেহারার সঙ্গে পোশাক যোগ করতে পারলে আনএক্স-

পেক্‌টেড দাম পাওয়া যায় এদেশে। এ সত্য আবিষ্কার করে অনেকগুলো পাউন্ড নষ্ট করেছিলাম পোশাকে। কিছুদিন লাগল হালচাল রপ্ত করতে। বিভিন্ন সার্কেলের ফিলোজফি ও বুলি রপ্ত করতে।
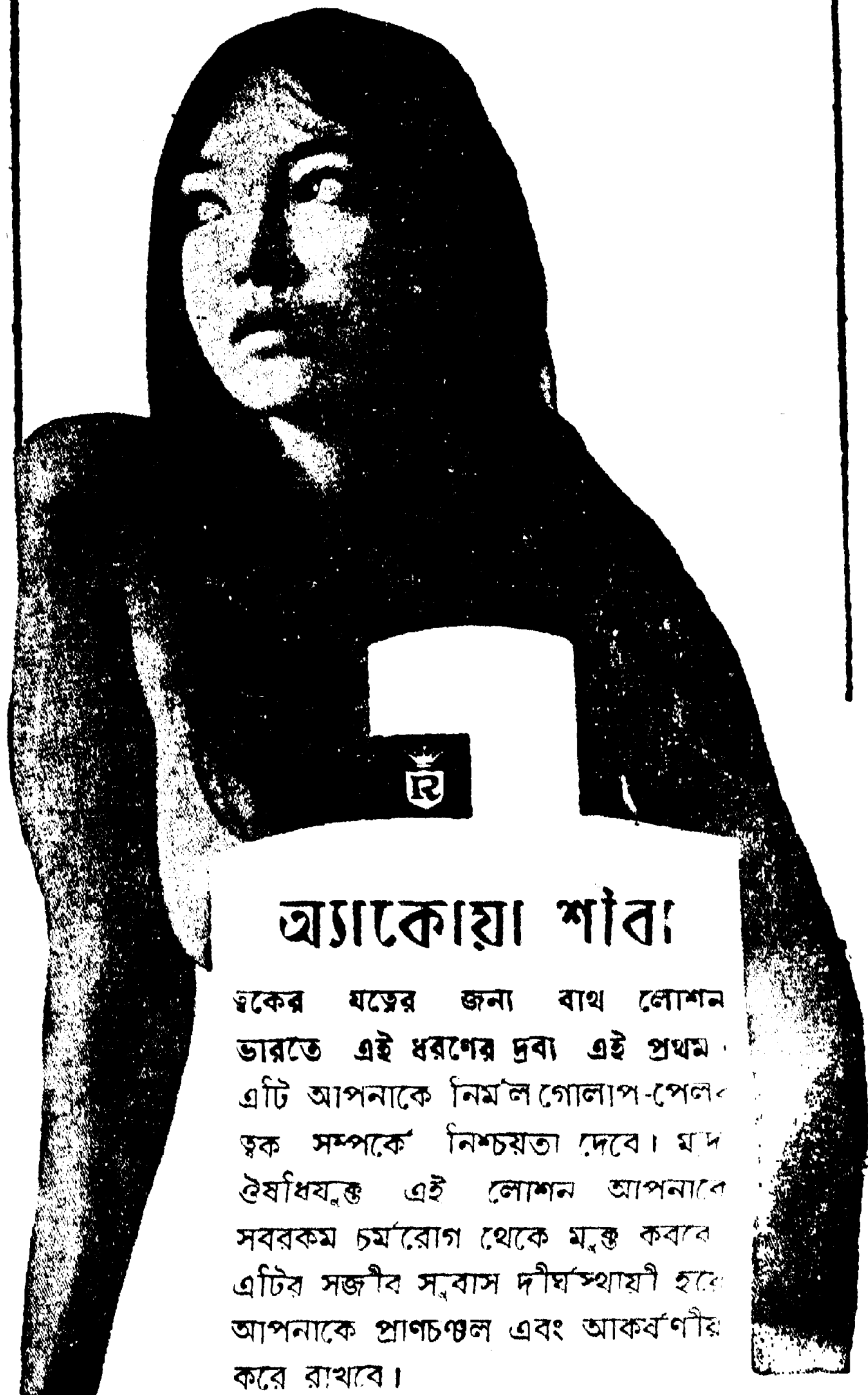
হাই কমিশনারের অফিসের একটা কাজ সোস্যাল ও কালচারাল ফাংশানের মাধ্যমে এদেশের লোককে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানে শাড়ি, গহনা পরবার স্টাইল, রকমারি বাদ্যযন্ত্র, নাচ ও গান, পিলাউ, মুরগী-মশল্লা, পান্তুয়া ইত্যাদি। দেশে থাকতে কোনরকমের নাচই জানতাম না, গানও জানতাম না, স্টেজে নেমে এক্‌টিং করিনি কখনো, দু-একটা বাদ্যযন্ত্রে টুং-টাং করতে পারতাম। দু-তিন মাসের মধ্যে সোস্যাল এন্ড কালচারাল ফাংশানের সব রকম ব্যাপার, মায় ভারতের শাশ্বত শান্তির আদর্শ এবং যোগ সিস্টেম সম্বন্ধে সংস্কৃত কোটেশান সহ বক্তৃতা দেয়া শিখে নিলাম। আমার ওপরে কর্তৃপক্ষের সুনজর পড়ল।

সুনজরে পড়লেও প্রয়োজনীয় টাকার প্রব্লেমের সুরাহা হল না। মাইনে যা দেয় খেয়ে পরে তা থেকে কিছু বাঁচানো যায় না। আমার অনেক টাকার দরকার, খরচ করে ভালভাবে থাকবার জন্য, জমাবার জন্য, টাকা না জমালে পড়াশোনা করব কি করে, এদের কাছ থেকে কিছু শিখে নেব কি করে? এ যদি না পারলাম তাহলে ইংলণ্ডে না এসে কাঠমণ্ডুতে বা ভুটানের গারোতে যেতে পারতাম।

বাড়তি রোজগারের কথা ভাবতে লাগলাম। বাড়তি রোজগারের দু-একটা অলিগলি চোখে পড়ল।

আমাদের দেশে মেয়েরা প্রেম করবার জন্য খরচপত্র কিছু করতে চায় না, বয়-ফ্রেন্ডরা খরচ করবে এক্সপেক্ট করে। বড় জোর রেস্তোঁরার বিলটা শোধ করে দু-একদিন, সিনেমার টিকেটের দাম দেয় দু-একবার। কিছুসংখ্যক মেয়ে বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে ঘোরে, আবার নাইট ক্লাবে ঢুকে কিছু কিছু রোজগার করে। মোট কথা বয়-ফ্রেন্ডদের এক্‌সপ্লয়েট করবার দিকে ঝোঁক দেখা যায় ওদেশের গার্ল ফ্রেন্ডদের মধ্যে।

ওদেশে সিচুয়েশন অন্য রকমের। সামাজিক স্বাধীনতা বেশী, লোকলজ্জা বা প্রেস্টিজের চড়া দাম দেয় না কেউ, মনকে আটকাবার তুক-তাক শাস্ত্র নাই, বায়োলজিকেল আর্জের স্যাটিসফ্যাকশানের, যাকে এক্‌স্‌পিরিয়েন্স অব লাইফ বলা হয় তার ক্যান্ডিডেট মেয়ের সংখ্যা বেশী। গার্ল ফেন্ডরা খরচ করে বয় ফেন্ডদের পেছনে, টাকা ধার দেয় বয় ফ্রেন্ডকে আদায় হবে না জেনেও। কেউ কেউ নিয়মিতভাবে ধার দেয়। এটা হল বয় ফ্রেন্ডের রিটেনিং ফি।

এ পথে ঘোরাফেরা করে সুবিধে হল না। কিছুদিন পরে সমস্ত জিনিসটা অতি বিস্বাদ লাগতে লাগল। মনের ভেতরে কোথাও খচখচ করতে লাগল। মনে হল এই কি টাকা রোজগারের উপায়? টাকা জমছেই বা কোথায়? য়ুনিভার্সিটিতে ঢোকবার আশা ছেড়ে দিতে হল।

কিছু করবার ব্যর্থ আশা মনে নিয়ে তিন বছর পরে হাই কমিশনারের একটা সুপারিশপত্র সংগ্রহ করে আমেরিকায় চলে গেলাম।

আমেরিকার কথা পরে লিখব। একটা য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছি, কিছু কিছু রিসার্চের কাজও করছি।

আপনার "এলিকসিরের" খবর এদেশে পৌঁছেছে, পপুলারিটি বাড়ছে খবর পাই।

(২৩)

দেবাশিসের চিঠি পড়ে খুশী হলাম। সে কি করছে না করছে বেঁচে থাকবার জন্য তা নিয়ে আমার শিরঃপীড়া নাই, সে কি করবে সেইটে বড় কথা। সকলের বড় কথা জায়েন্ট কি মনস্টারকে ঘায়েল করতে পারবে? এখনও সে সম্বন্ধে কিছু বলবার সময় আসেনি।

তার চিঠি আবার পাব এ সম্বন্ধে নিশ্চিত বোধ করলাম।

যেসব খবর পাচ্ছি মনে হয় দেবাশিসের বাবা মিঃ ভাদুড়ির বড় কারবার ডুবে যাবে। বড় কারবার ভেঙ্গে যাওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়, মিঃ ভাদুড়ীর মধ্যে যে শক্তি ছিল সে শক্তির অপব্যয় হল এইটে আপশোষের কথা। তাঁর কারবারকে স্থায়িত্ব দিয়ে পাঁচজনের জীবিকা নির্বাহের উপায় হয় এমন কিছু দিতে গিয়ে দিতে পারলেন না তিনি। সত্যিকার শক্তিমান মানুষের অভাব রয়েছে দেশে, শক্তির অপচয় হতে দেখলে কষ্ট হয়।

নিজের জন্মস্থান পৈতৃক বাড়ী এবং পরিবার-পরিজন পর সবাইকে ছেড়ে শহরতলিতে একটা ছোট বাড়ীতে সরে এলাম শখের বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করবার জন্য। এই শখের বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করবার মধ্যে দুটো আইডিয়া ছিল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবার দায় থেকে শাস্ত্রোক্ত বানপ্রস্থের বয়সে অব্যাহতি পেয়ে গেলাম ভাগ্যক্রমে। মনে করলাম দায়দেনা চুকিয়ে দিয়ে বসে নিজের পছন্দমত কাজ, মানে লেবরেটরীতে এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করব। আরেকটা কথাও ছিল মনে, সংসারের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার পরে জীবনের নষ্ট ঐশ্বর্যের কিছু পুনরুদ্ধার হয় কিনা দেখব। কথাটা আগে একবার বলেছি।

প্রথম আইডিয়া কাজে পরিণত করা নিজের হাতের মধ্যে। দ্বিতীয়টা পরের হাতে এবং ভাগ্যের ব্যাপার। শক্ত ব্যাপার।

সংসারে সকলে নিজের কাজে ব্যস্ত। জীবিকা অর্জন, সংসার প্রতিপালন সামাজিকতা রক্ষা। একটু ধর্মকর্ম, একটু কালচারের ছিটেফোঁটা, কিছুটা পলিটিক্সের কাইট-ফ্লাইং, কিছু পরচর্চা, আরও কত ব্যাপার নিয়ে মানুষে ব্যস্ত। আমাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়নি এখনও, রোগেশোকে কাতর হয়ে শয্যাশায়ী হইনি এখনও, কার দায় পড়েছে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? কেউ আসবে না। ভাবলাম না আসলে কি আর করা যাবে?

আমার বানপ্রস্থের সংসার চারজন লোক নিয়ে। আমি, আমার নিঃসন্তান ক'বছরের ছোট বিধবা ভগ্নী, সংসারের কাজে তাকে সাহায্য করবার জন্য একজন বৃদ্ধা ঝি এবং বানপ্রস্থের আশ্রম হলেও বাড়ীটা নৈমিষারণ্যে পরিণত না হয় দেখবার জন্য একজন লোক। সে এ কাজ করত, বাজার-টাজার করত। সেও আধ বুড়ো মানুষ, নাম অধর।

আমার ভগ্নীর নাম মহামায়া। নিরীহ মানুষ, অত্যন্ত ভালমানুষ। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর সংসারে ঠাঁই হল না, ভাতকাপড়ের বিনিময়ে উদয়াস্ত খাটুনির এবং নীরবে সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পরিপাক করবার অভ্যাস থাকলেও। তাকে খাটিয়ে নাকাল, গঞ্জনা দিয়ে নাকাল করবার জন্য সংসারের অধিকাংশ মানুষ স্বভাবজ আবেগ সংবরণ করতে পারতেন না। আত্মরক্ষায় অক্ষম, যে হতভাগ্য প্রকাশ করে তার নিস্তার নাই। মানুষের মধ্যে যে পাশবিক নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে থাকে তার হাত থেকে। শ্বশুরবাড়ী থেকে সরে এসে পিতার গৃহে, ভ্রাতার আশ্রয়ে থেকেও মহামায়ার যে অবস্থা হল হয়ত শ্বশুরের ভিটায় তার চাইতে সে ভাল ছিল। নিজের চোখে সব দেখেও কোন প্রতিকার করতে পারলাম না। অত নিরীহ ভালমানুষকে মাসোহারার ব্যবস্থা করে কাশী, বৃন্দাবনে পাঠাতে সাহস হল না, টাকা পয়সার স্বচ্ছলতা ছিল না।

টাকা আসতে আরম্ভ করলে তাকে কাশী পাঠাবার প্রস্তাব করলাম। মহামায়া বলল, এ সংসারে তোমাকে কে দেখবে দাদা? তোমার কাছে রয়েছি, আমার কোন কষ্ট নাই বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করলাম।

সংসার থেকে সরে পড়বার সময় যখন এল মহামায়াকে নিয়ে সরে এলাম। বললাম, যে কটা দিন আমি আছি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চলে ফিরে বেড়া।

আমার দেরি হল কাছেভিতে যে প্রতি-বেশীরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হতে, মহামায়ার দেরি হল না।

যত দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সে সহ্য করেছে জীবনে তার মনের ওপারে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। মানুষ নিমিত্ত মাত্র, সব আঘাত এসেছে ভগবানের হাত থেকে, ভগবান তাকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন তার বিশ্বাস খাঁটি না মেকী, এই হল তার কথা। কথাটা শুনতে মন্দ লাগে না হয়ত। মহামায়ার মতে সব মানুষ ভাল, মানুষের মধ্যে যেটুকু দুষ্টিকটু, বলে মনে হয় সেটা সাময়িক বিকার মাত্র। কারো ওপরে রাগ পুষে রাখতে নাই মনে, সবাইকে ভালবাসবার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিদানে কেউ তোমাকে ভালবাসেন, ভাল কথা, না বাসলে কিছু যায় আসে না, তুমি তো ঠিক রইলে ভগবানের চোখে।

মহামায়ার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল কম বয়সে। সব রূপ জ্বলেপুড়ে গিয়েছিল সংসারের প্রখর তাপে। পঁয়তাল্লিশ ছেচাল্লিশ বছর বয়সে আবার তার রূপ ফিরে আসছে দেখলাম। সদা প্রসন্ন, অনলস কর্মী, ধর্মপ্রাণা তপস্বিনীর রূপ। স্বল্পবাক, মুখে স্নিগ্ধ হাসি, শান্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন মূর্তি মহামায়াকে দেখে প্রতিবেশিনীদের কেউ কেউ যে আকৃষ্ট হয়ে নিজেরা এসে আলাপ পরিচয় করলেন, আসা-যাওয়া করতে লাগলেন এতে বিস্মিত হলাম না।

ক্রমে আমার সঙ্গেও দু' চারজন প্রতি-বেশীর আলাপ হল।

নানা জায়গা থেকে এসেছেন এঁরা আশ্রয় ও জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টায়। ভদ্রঘরের, কিছু কিছু লেখাপড়া জানা লোক সবাই, নানা রকম কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করবার চেষ্টা করছেন। শহর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে এখানে ঘরবাড়ী করে-ছেন এমন কিছু লোকও আছেন।

এঁদের সম্বন্ধে জানবার কথা, ভাববার কথা অনেক আছে হয়ত, সমাজকল্যাণকামী-দের। রাষ্ট্রের কিছু কিছু করবার আছে এঁদের সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বরাবর নিজের কাঁধের ভার নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলেছি, আগ্রহ কৌতূহল, হিতৈষণা সব চলে গিয়েছে আমার মন থেকে। সময়ও যে বেশী হাতে পাই তা নয়। কেউ দয়া করে এলেন, পাঁচ দশ মিনিট কথাবার্তা হল, যথাসময়ে এসে এক কাপ চা, দু'খানা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করতাম, এর বেশী পেরে উঠতাম না।

একটি পরিবারের সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা হল কিছুকাল পরে। ভদ্রলোকের নাম বরদাবাবু, বয়স আমার চেয়ে কিছু কম হবে। আগে একটা বড় ফার্মে চাকুরি করতেন, ভাল মাইনে পেতেন। ফার্ম লিকুইডেশনে গেলে অন্য একটা ছোট ফার্মে চাকুরি পেয়েছেন। বড় ছেলেটি এম-কম পড়ছে, একটা চাকুরিও করে। ছোট ছেলেটি স্কুলে পড়ে। মেয়েটি তার বড়, কলেজে ঢুকেছে। স্ত্রী আছেন, তিনি শিক্ষিতা, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে শুনেছি। বাড়ীটা করতে গিয়ে বরদাবাবুর কিছু দেনা হয়েছে শুনেছি। ছেলেমেয়ে দুটির পড়বার খরচ চালাতে হয়, সংসার চালাতে হয়। বড় ছেলেটি যা রোজগার করে পড়া চালাবার জন্য, কাপড়চোপড়, টিফিন, ট্রাম-বাসে চলে যায়, মার হাতে কখনো দু' পাঁচ টাকা দেয় মাত্র। কিছু ভাল-ভাবে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন বরদাবাবু, এখন টানাটানির মধ্যে চালাতে হয়। পকেটে ক্রনিক টানাটানি পড়লে কাপড়চোপড়ে, কথায়, ব্যবহারে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বরদাবাবুর কিন্তু দেখা দেয়নি মনে হয়। বেশ ফিটফাট চেহারা ও পোশাক।

সংসার চালান অবশ্য তাঁর স্ত্রী। কিছু বস্তু আছে তাঁর মধ্যে মনে হয় তাঁকে দেখে, এত টানাটানির মধ্যে চলেও মুখের হাসিটি শুকোয়নি। তাঁর সহজ, সরল ব্যবহার লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে। মহামায়ার সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়েছে। দুপুরের পর মাঝে মাঝে তার কাছে এসে বসতেন দেখেছি। তার পারিবারিক খবর যা দিলাম মহামায়ার কাছে পেয়েছি। আমার সঙ্গে দু' একটা কথাবার্তা চলবার মত অবস্থায় পৌঁছুতে বছরখানেক লেগে গেল। এই এক বছরের মধ্যে তাঁর দু ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, মেয়েটির সঙ্গেও আলাপ হল। ছেলেদের নাম সত্য ও ফণী। মেয়ের নাম তুলসী।

কিছু অপূর্ব সুন্দরী না হলেও তুলসী দেখতে বেশ ভাল। একটা মিষ্টি ভাব আছে বুদ্ধিদীপ্ত মুখের চেহারায়। সামনে এসে দাঁড়ালে তাকিয়ে দেখার ইচ্ছা হয়, তাকিয়ে দেখে মনে হয় শান্ত, ঠাণ্ডা মেয়ে নয়, একটু ছটফটে। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে আসে যায় দেখেছি। প্রথম যেদিন সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল একটা প্রণাম করে মাথা নামিয়ে দাঁড়াল।

বললাম, ভাল আছ? তুলসী তোমার নাম তো?

বলল, ভাল আছি। আমার নাম তুলসী।

চলে যায় একটু অপেক্ষা করে। আলাপ করতে চায় মনে হয়, একসঙ্গেলার বাতিক চায় এই প্রৌঢ়টিকে যার সম্বন্ধে নানা রকমের কথা হয়ত শুনেছে।

এরপর দেখলাম লেবরেটরী ঘরে কাজে ব্যস্ত থাকলে এক পা ভেতরে এসে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে চারিদিক, একটু পরে সরে যায়। বারান্দায় বসে কাগজ বা বই পড়েছি, এসে দু'তিন পা নড়চড়ে বেড়ায় একটু দাঁড়ায় তারপর চলে যায়। কোনদিন দু'চারটি কথা বলি, কোনদিন কথা হয় না।

মাস কয়েক কেটে গেল। দেখলাম তুলসী সাহস সঞ্চয় করেছে।

একদিন বারান্দায় বসে একখানা জার্ণালের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, চা খাবার কথা মনে হল। মহামায়া চা, সামান্য কিছু খাবার দিয়ে যায় এই সময়ে, আজ দেরি হচ্ছিল। ভাবলাম হয়ত কেউ এসে-ছেন তার কাছে, তাই দেরি হচ্ছে। একটু পরে চায়ের কাপ ও একটা ডিশ হাতে নিয়ে তুলসী কাছে এসে দাঁড়াল।

বললাম, তুমি কখন এলে তুলসী? তোমাকে চা আনতে হল কেন?

বলল, একটু দেরি হল, নিমকি ভাজ-ছিলাম।

বলো কি, নিমকি করতে জানো তুমি? কিন্তু করতে গেলে কেন? দু'খানা বিস্কুট হলে হয়ে যায় আমার।

হেসে বলল, একদিন না হয় নিমকি খেলেন।

বললাম, তুমি কষ্ট করে করেছ, আমি আরাম করে খাবো বইকি। কিন্তু কষ্ট করতে গেলে কেন তুমি?

কষ্ট আবার কি? দু'খানা নিমকি বানাতে কষ্ট হয় নাকি?

তোমার মতে হয় না, আমার মতে হয়। সে কথা যাক। যা করেছ সব দিয়েছ বোধ হয়। তোমার নিজের জন্য আছে?

করে নেব। আপনি খান তো।

বললাম, দেখো বাপু, পরের জন্য যারা কষ্ট করে নিজের জন্য তারা কষ্ট করতে চায় না। তোমার কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। দেখি কখানা আছে?

দেখুন, ছখানা মাত্র আছে।

বেশ, আরেকটা ডিশ আনো।

বলল, আমি করে নেব বলছি তো।

করে নিয়ো। তুমি ছেলেমানুষ নিয়ে দশখানা খেয়ো, এখন তিনখানা তুলে নাও।

বলল, আপনি ভারি অবুঝ মানুষ।

অবুঝ মানুষ, ঠিক ধরেছ। তুলে নাও তো তিনখানা।

মুখ ভার করে দু'খানা নিমকি তুলে নিয়ে চলে গেল।

ক্রমে তুলসীর সঙ্গে ভাব হল। আবিষ্কার করলাম তার মধ্যে কিছু বস্তু আছে। যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বস্তু থাকে তাদের আমি পছন্দ করি।

দেখলাম তুলসী আমার পছন্দমত মেয়ে। বেশ মেয়ে সে। বেশ থাকতে পারবে কিনা জানি না, তবে এখন বেশ রয়েছে।

উল্টাপাল্টা টানে পড়ে ছেলেমেয়েরা বদলে যায়, তুলসীও বদলাবে নিশ্চয়, জানি না তখন তাকে পছন্দ করতে পারব কিনা।

একদিন তাকে বললাম, তুলসী তুমি আমার পছন্দসই মেয়ে আমার কাছে ভয়, লজ্জা, সংকোচ রেখো না।

হাসল তুলসী চট করে উঠে আমার চেয়ারের পেছনে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে বলল, আপনাকে ভালবাসি জ্যেঠামশাই।

(ক্রমশঃ)

মধুখের মেলা

অরণ্য বিহার

কার্তিক মাসের জ্যোৎস্না-ভাসা সুন্দরবনের সৌন্দর্য স্বর্গাতীত। সবুজ সতেজ গোলপাতার আন্দোলন, সুন্দরী, হিজলী, গরাণ পাতার চকচকে নাচন, বাতাসের ঢেউ কী অপূর্ব অপরূপ! দুগ্ধধবল নদীর কী অবর্ণনীয় নৈসর্গিক শোভা!

ফণী-মনসা, মনসা, বাজবরণ, লঙ্কাশিরে, ম্যাড়ামারা লতা, গোলণ্ড, হেঁতাল, হয়কোচ, তেকাঁটাল, বনঝামা, পার্নাশিউলী, জল-ডুমুর, সেঁয়াকুল, বঁইচি, সোনাকাঁটা, কাশ, ধানীঘাস, সোঁ-করাতে ঘাস—জটিল ভয়ংকর কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের কাঁটা-ডাল-পাতা সব এখন জ্যোৎস্নার মায়ায় উদ্ভাসিত—একাকার। লঙ্কাশিরের গাছ যেন ফোয়ারার উচ্ছ্বাস।

চোখ ফেরাতে পারে না কৃষ্ণ রায়। গরাণ কাঠের পাকা শক্ত ডাল পুঁতে গরাদে করা জানালায় চোখ রেখে বন্দুকের নল বার করে চুপচাপ বসে থাকে।

মণীন্দ্র বসু আর একটি জানালায়। দুজনেই সুদর্শন কান্তিমান যুবক। স্টোভ জেলে রান্না করছিল মাধুরী আর কাবেরী। কাবেরী কৃষ্ণর বোন আর মাধুরী মণীন্দ্রর। দুজনেরই সিঁথি এখনো সাদা। গল্পের নায়ক-নায়িকাদের মতো এরাও এ ওর বোনকে ভালবাসে—আর সে ভালবাসা লুকোছাপা নেই। এক্স প্লটের মধ্যে গভীর অরণ্যের একটি আখড়া। চারদিকে শালের খুঁটি পুঁতে ঘের দেওয়া—মাথাটাও ঢাকা। বিপদমুক্ত গোলাকার গোলার মতো একটি আশ্রম। ভিতরে মাটির ঘর। হ্যারিকেন জ্বলছে দুটো।

দুজন পাথর-কালো তেল-চকচকে উদোম-গা গলায় তক্তি-বাঁধা বাউলী তাদের বিরাট মোটা বাবলা কাঠের গদার মতো খেঁটে পাশে রেখে গাঁজা টানছে মৌতাত করে।

'এই মাধু, আরে, আরে, দেখে যাও—ওটা কী!' মাধুরী ছুটে এসে কৃষ্ণর পাশে বসে বাইরের দিকে চোখ রাখলে। কাবেরীও এসে মণীন্দ্রর পাশে বসল। বাউলীকে ডাকতে একজন এসে উঁকি মেরে দেখে হা-হা করে হাসতে লাগল। বললে, 'সাপ রে বাবু, হে হে, মারিস না গুলী মেরে, উ কামড় দিবে না—অ্যার নাম কয় দুধে-কেউটে—ধবল কেউটিয়া।'

মাধুরী বললে, 'কী সুন্দর দেখ! গায়ে জ্যোৎস্না পড়ে কেমন ঝিকমিক করছে!'

সহসা বাঘের গর্জন শোনা গেল। মাধুরী আর কাবেরী আতঙ্কিত হয়ে ওদের জড়িয়ে ধরে বললে, 'পালিয়ে এস—জানালায় যদি লাফ দেয়।'

বাউলী লক্ষ্মণ সামন্ত বললে, 'বাঘ এয়েছে বাবু। আলো নিবিয়ে দে সব। থালে শালারা নজদিগে এসবেখনে। কাছ থিনে দেখা পাবি।'

'ও বাবা! আলো নেভালে যে ভয় লাগবে!' বললে কাবেরী।

লক্ষ্মণ সামন্ত নিজেই হ্যারিকেন দুটো নিভিয়ে দিলে একেবারে। স্টোভের সোঁ-সোঁ শব্দ শুধু। স্টোভের আলোর আভাকেও আড়াল করে দিলে গোলপাতার গোড়ার চওড়া খোল দিয়ে।

হঠাৎ আখড়ায় ভিতরে বাঘের ডাক শুনে চারজনেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এ ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ কৃষ্ণর মনে হল লক্ষ্মণ বাউলী নিজেই বাঘের ডাক নকল করে তাদের ভয় দেখাচ্ছে! খুব মজা পাচ্ছে ওরা দুজনে।

গহর বাউল এসে ফিসফিস করে বললে, 'শালা লক্ষ্মণ বাঘ ডাকতেছে—ঐ ডাক শুনে বাঘ এসবে—ভয় নেই। বাঘ এলে গুলী করিসনি বাবু। ঘায়েল হয়ে পালালে ফজিরে বিপদ হবে।'

অন্ধকার। বাতাসের মরমর শব্দ। কাছেই দুধের মতন সাদা সরু নদীর জল চকচক করছে। পাখীদের বিচিত্র কলকাকলী। দিনভ্রমে তারা মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে। পেঁচা পাতকোয়া ডাহুক ডাকছে ক্রমাগত। বাঁদর-হনুমানেরা ডাকছে। ফটাফট-ফটাফট শব্দঃ বাউলীরা বলে, 'ওটা 'গোহাড়গেল' বা গোসাপের ডাক।'

মোরগের চিৎকার শোনা যায়। ঝিঁঝির ডাক অরণ্যজোড়া। কোটি কোটি জোনাকি আলোর জাল বুনছে—শোভাময় করে তুলেছে বাবলা গাছগুলোকে।

হঠাৎ হা-হা-হা — হি-হি-হি — হো-হো-হো রবে দীর্ঘায়িত শব্দের লহরা। টানা ঝড়ের শব্দে তা ভেঙে ভেঙে যায়। দূরে সমুদ্র গর্জন। বাউলী বলে, 'এই হল বরিসাল ডাক বাবু। 'হঠাক' করে মনে হবে তোর নাম ধরি' কেউ যেন ডাকতিছে। তাতেই নতুন 'নোক' পথ ভুল করে—সি হল গে যাও 'অরণ্য-মরীচিকে'। চুপ—ঐ দেখ—একজোড়া বড় বাঘ এয়েছেন! ঐ যে, হিজলী গাছের গোড়ায়!' হঠাৎ জানালার কাছে মুখ এনে বাঘ ডাকতে শুরু করলে গহর আলী। অবিকল বাঘের ডাক। বাঘদুটো বেশ বড়। কী সুন্দর গোলগাল চেহারা! কালো ডোরাগুলো সাপের মতন কী ভয়ঙ্কর। পেটটা ঝুলছে—দুলছে। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে অঙ্গারের মতন। মাটি আঁচড়ে হ্যা-হ্যা করে শব্দ করবার পর ভীষণ মেঘগর্জনের মতো হালুম হালুম ডাক ছেড়ে এগিয়ে এলো কাছে। একেবারে নিকটেই।

টুলে বসা কৃষ্ণর প্রায় কোলে বসে কাঁপছিল মাধুরী।

মণীন্দ্রর কাছে কাবেরী।

মণীন্দ্র শুধোলে, 'গুলী করব একটাকে?'

বাউলী বললে, 'না। অদের খেলা দেখ্। মনিষ্যির সাড়া পেয়িছে, শালারা সহজে অ্যাখন সরবেনি।'

একটি বাঘ ফাঁকা জায়গাটিতে চার-পা একদিকে করে শুয়ে পড়ল। তার পিছনে বসে পুরুষ বাঘটি আদর করতে লাগল। আশ্চর্য দৃশ্য! এ-দৃশ্য কেউ দেখেনি।

মাধুরীর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাউলী লক্ষ্মণ সামন্ত। মাধুরীর মনে হচ্ছিল হাত নয়—বাঘের থাবা। হাতটা সে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলে।

হঠাৎ মাদী বাঘটা চিৎকার করে উঠে পড়ল। কামড়া-কামড়ি শুরু করলে দুজনে।

কৃষ্ণ বললে, 'বাউলী তুমি যাও—আমরা দেখছি।'

লক্ষ্মণ সরে গেল।

বলার কিছু নেই। উপভোগের, উপলব্ধির দৃশ্য!

হঠাৎ মণীন্দ্র পাঁচ সেলের ফ্ল্যাশ লাইট ফেলতেই তারা গর্জন করে উঠে দাঁড়িয়েই এক লাফ মারলে জানালার ওপরে।

'বাপরে!' বলেই চারজনে টুল থেকে নিচে পড়ে গেল। জানালায় আঁচড়াতে-কামড়াতে লাগল বাঘদুটো। বাউলী দুজন ছুটে এসে আলো জেবলে দিলে। মশাল জেবলে আগুনটা জানালার বাইরে ঘোরাতে শুরু করতে বাঘদুটো ভয় পেয়ে সরে গেল। দূরে গিয়ে গর্জন করতে লাগল।

তারপর নীরব চারদিক। ক্যাঁক—ক্যাঁক। পেলিকানের কণ্ঠস্বর বাতাস চিরে ভেসে আসছে মাঝে-মাঝে দূর থেকে।

কৃষ্ণ মণীন্দ্রকে বললে, 'তুই একটা ইডিয়েট। লাইট মারতে গেলি কেন? ওদের সুখে বুঝি তোর ঈর্ষা হচ্ছিল?

মণীন্দ্র বললে, 'ঐ বদ অভ্যাসটা আমার গেল না, যখন কেউ খুব মজা করে আমার যেন সহ্য হয় না—দিই খোঁচা!'

কাবেরী বললে, 'মারাত্মক লোক তাহলে তো তুমি! নিজের সুখেও অশান্তি কামনা করবে—তুমি তাহলে দুঃখবাদী।'

মাধুরী বললে, 'ঠিক, দাদা ওই রকম। কাবেরী রোগটা সারাস।'

খাওয়া-দাওয়ার পর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল চারজনে। মাধুরী আর কাবেরী এক জায়গায়—মণীন্দ্র আর কৃষ্ণ আর এক জায়গায়। বাউলী দুজন অন্য একটা ছোট কামরায় শুয়েছে। কম্বল গায়ে রাখা যায় না। মাঘ মাসের শীতের দিনেও সামান্য গরম থাকে সুন্দরবনে। কিন্তু বৈশাখের রাত্রে নদীতে নৌকোয় থাকলে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিতে হয়।

'কাবেরী ঘুমিয়ে পড়েছে, দাদার নাক ডাকছে—আমার চোখে ঘুম আসছে না, কৃষ্ণ তুমি সিগারেট টানছ—আমি কি করি—একটা গান গাইব?'

'ধ্যেৎ! চুপ করে ঘুমোও—না-হয় আমার কাছে চলে এস।'

'মরি মরি!'

'কেন? আপত্তি কিসের?'

'সত্যি! যাব?'

মাধুরী উঠতে যেতেই কাবেরী তার আঁচল ধরে টান দিলে।

'ওমা! তুই ঘুমুসনি!'

কাবেরী ফুলে ফুলে হাসতে লাগল।

মণীন্দ্র হঠাৎ যেন ঘুমে ঘুমে বকতে লাগল—'মানুষও ঐ শালা বাঘের মতন। পশুর মতন। অন্ধকারে। ভগবান, যদি জন্তু হতাম!'

চারজনেই হেসে উঠল। হাহা-হিহি—হিহি-হোহো।

বাঘদুটো আবার ডাক দিয়ে উঠল একটু দূরে থেকে। তাদের কামড়া-কামড়ি অথবা শৃঙ্গার-কলহের ধ্বনি শোনা গেল কিছুক্ষণ। তারপর...

সকাল হবার আগে তারা সত্যিই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাউলীরা তাদের ডেকে তুললে।

হালকা কুয়াশা কেটে যাবার পর আরো চারজন বাউলী এল খোঁটে কাঁধে নিয়ে। ডিঙিনৌকোয় করে এসেছে তারা।

প্রাতঃকৃত্য সেরে কফি, কলা কেক, বিস্কুট, চানাচুর ইত্যাদি খেয়ে নিয়ে ফ্ল্যাস্ক, ক্যামেরা, বন্দুক নিয়ে তারা বাউলী ছ'-জনের সঙ্গে অরণ্যচারণ করতে বের হল। গাছপালার নাম নোট করতে শুরু করলে মণীন্দ্র।

কাঁটাগুল্ম চারদিকে—তাই শাড়ি পরেনি মাধুরী আর কাবেরী। মিনিস্কার্ট পরেছে। অরণ্যের ডালে ডালে বিরাট মধুর চাক ঝুলে আছে। গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভনভন করে ডাঁস মাছি উড়তে থাকে। সেদো বা বাউলীদের এলো গায়ে বসে রক্ত চুষতে গেলে তারা চাপড় মেরে, মেরে ফেলে দেয়।

লক্ষ্মণ বলে যায়, 'এই ডাঁস মাছি সব একসঙ্গে ছেঁকে ধর্লে আগুন জ্বালাতে হয়। ওটা ঐ যে মস্ত পঁচিশ হাত উঁচু গোটা গাছজোড়া ভীমরুল 'চাপ'। ঐ দেখ, বড় বড় থালার মতন বোলতার 'চাপ'। শুকনো ডালে হাত দিবি না—কাঠপিঁপড়ে কামড়াবে। ঐ দেখ, গোসাপ দৌড়চ্ছে। ঐ হেঁতাল বনের মধ্যে বাঘ থাকতে পারে। শরখাড়ির জঙ্গলেও থাকে। মাটিতে বাঘের থাবার দাগ। বাঘের পেচ্ছাবের গন্ধ। যে-গাছে পেচ্ছাব পড়বে, সেই গাছে মানুষের গা লাগলে কিটোবে—চুলকোবার পর জ্বালা করবে। এটা হোগলা বন। তরোয়াল দুলতেছে যেন। রাজ্যের বালিহাঁস—জলপিপি—যেন শুকনো নারকোল ভাসতিছে।

দুটো বড় বড় বনমোরগ আর বালিহাঁস শিকার করলে মণীন্দ্র আর কৃষ্ণ। বাউলীরা কুড়িয়ে আনলো।

'হরিণ, খরগোস, বন্যবরাহ—এসব তো দেখছি না বাউলী?' শুধোলে মণীন্দ্র।

'আছে। দেখতে পাবিখনে। তবে কমে 'গ্যাছে'। বাঘ সব খেয়ে ফেলিছে। মোরাও মেরে লি-যাই। খাবার নেই বলে সোঁদর-বনের বাঘ মাছ অবধি খায় শালা। নদীর চরে—বালিয়াড়ি খাঁড়ির মধ্যে কুমীর, কচ্ছপ, সমুন্দুরে কাঁকড়া, সাগর-ঝিনুক আছে।'

'হঠাৎ যদি বাঘ সামনে পড়ে যায়!'

'ঠিক আছে, ভয় কী!' বললে গহর আলী। 'রায় দক্ষিণা রায়—বনদেবী মা বাঁচাবে—মোরা 'মুন্তর' জানি। বাঘ[illegible] [illegible] এই খেঁটেকে ভয় করে।'

কাঁটা খোঁচায় হাত-পা ছিঁড়ল সকলেরই।

এক রকমের সরু লালচে বাঁশগাছ—শিকড় বেয়ে চলেছে মোটা হয়ে। কত বিচিত্র গাছ! হাড়ভাঙা লতাগাছের মোচার মতন সাদা ফুল ঝুলছে। পাকা লাল মাকাল ফল ঝুলছে কত!

মাঝে মাঝে কাদা—নরম মাটি—চোরাবালির দহ। সারা বছরের ঝরাপাতা বর্ষায় ভেসে গেছে—নতুন পাতা ঝরে পড়েছে। মানুষের সাড়া পেয়ে ফড়ফড় করে ডানার শব্দ করে ডাকতে ডাকতে পাখিরা উড়ে চলে যায়। শাল, শোল, রোয়াল, ভেটকি, পোনা, কই-মাগুর—অজস্র মাছ আছে খাঁড়ির মধ্যে।'

'কি কি পাখী আছে এখানে—নাম বল?' কৃষ্ণ শুধোলে।

লক্ষ্মণ বললে, 'বালিহাঁস, জলপিপি, ডাহুক, পানকৌড়ি, শামুক-খোল, মানিকজোড়, বক, পান-পায়রা, বনমোরগ, হরিতাল, মাছরাঙা, কাদাখোঁচা—এইসব পাখীই বেশি এখানে। এ-সময় দক্ষিণ মহাসাগর থেকে বিরাট বিরাট পেলিকান রাজহাঁস আসে—সমুদ্দুরের ঢেউয়ে বিরাট ডানা মেলি' তীর বেগে তারা ছুটি' আসে—কেউটে সাপের পানা যেন ডং তুলি' আসে। একটা মারলি ৪।৫ কেজি মাংস হয়। এখন কাত্তিক মাসে এসে অরা অরণ্য ছেয়ে ফেলে—আবার শীত পড়লি পরে দক্ষিণ মেরুর 'দিগে' চলি' যায়। ঐ দেখ দেখ—হরিণের দল যেন উড়ি' চলিছে—'আগাশে'র 'ম্যাঘের' পানা ঢেউ খেলি' খেলি' যায়। কখন পা ফেলে দৌড়নোর সময় কেউ তা দেখতি পায় না। তাদের পেছনে বাঘ তাড়া করিছে। সাবধান—চারদিগে গোল হয়ে বাইরের দিগে মুখ করি দাঁড়াও। জঙ্গলে বাঘ তাড়া করলি বুনো বরাহও ছুটে এসে সামনে কিছু পড়লি শালা দাঁতাল গুঁতো মেরে ফেড়ে ফেলি দিবে। ঐ জলের ধারে কুমীর শুয়ে আছে—তেড়ে এলে গাছে উঠি পড়বি সবাই।'

মাধুরী বললে, 'সর্বনাশ, আমরা যে-গাছে উঠতে জানি না!'

সেদোরা হাহা করে হাসতে লাগল। ওরা খালি পায়েই চলে-হেঁটে বেড়াচ্ছে—কাঁটা ফুটলে গালাগালি করতে করতে টেনে বার করে ফেলে দিচ্ছে। হাঁটিতে হাঁটিতে তারা বিস্তীর্ণ একটা নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল। সামনে একটা দ্বীপ। কাঁটাগুল্মে ভরা। দুটো লাল নিশান তীরে পোঁতা আছে।

'লাল নিশান কেন ওখানে?' শুধোলে কাবেরী।

গহর বললে, 'ঐ লাঠিটার মাথায় লাল কাপড়ে এক মুঠো চাল আর পয়সা বাঁধা আছে। নিশান হল সাবধান চিহ্ন। দুটো নিশান মানে দুজন লোক এখান থিনে শালা বাঘের প্যাটে 'গ্যাছে'! কাঠুরেরা কাঠ কাটতি আসে, মউলেরা মউ ভাংতি আসে—তাদের জান গেলি পর ঐরকম নিশান পুঁতি দি-যায়।'

হঠাৎ দেখা গেল কালো কালো শত শত রাজহাঁসের দল যেন ঢেউ ভেঙে উড়ে আসছে সাগরের দিক থেকে। তারা মানুষ দেখে অন্য দিকে সরে জঙ্গলে চলে গেল। ক্যাঁক ক্যাঁক করে দীর্ঘ লয়ে ডাক শোনা যেতে লাগল শুধু তাদের।

বাঁদরগুলো গাছের ডালে লম্ফঝম্প শুরু করেছে দেখে বাউলারী কি যেন বলাবলি করতে লাগল। খেঁটে কাঁধে তুলে হেঁতালের বনটার দিকে তাকিয়ে রইল তারা।

মাধুরী কৃষ্ণর কানে কানে বললে, 'ধোৎ! এখানে রোমান্সের গন্ধ মাত্র নেই।'

কৃষ্ণ বললে, 'এই তো রোমান্স! রোমান্টিকতার স্থান অবশ্য সুন্দরবনে নয়। মনে হচ্ছে কোনো বিপদের গন্ধ পেয়েছে বাউলীরা।'

বাঘকে বিভ্রান্ত করে বাঁদররা। ধরা পড়বার লোভ দেখিয়ে মানুষকে বাঁচাতে চায়। পথ ভুলিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা না পারলে তারা চিৎকার জোড়ে। ডালে ডালে ছুটতে থাকে।

অতএব এ-দৃশ্যে সাবধান হওয়া দরকার। বাউলীরা তা জানালে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফেরার নির্দেশ দেয় লক্ষ্মণ সামন্ত। সে এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে।

অল্প একটু আসার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। শরখাঁড়ির জঙ্গল থেকে একটা বাঘ একেবারে হাত তিরিশ দূরে এগিয়ে আসছে, লোলজিহ্বা বার করে গাল চাটতে চাটতে।

মানুষ দেখে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়াল বাঘটা।

লক্ষ্মণ তাকে লক্ষ্য করে হেঁকে বললে, 'দাঁড়িয়ে যা শালা!'

বাঘটা দাঁড়িয়ে গেল।

লক্ষ্মণ আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। মাত্র হাত-বিশেকের ব্যবধান। বাঘটা হ্যা-হ্যা করে গর্জন করতে লক্ষ্মণও অবিকল সেই রকম নকল করে গরজাতে লাগল। তারপর গালাগালি শুরু করলে, 'শালা হারামী, খানকীর বাচ্ছা, তোর মায়ের মাথা ভেঙেছি, এই খেঁটের ঘায়ে—চুপ শালা, তোর বোনাই হই—চলে যা—মানুষের দেবতা দক্ষিণা রায়, তোর দেবতা কুন শালা?'

দাঁত খিঁচিয়ে উরুতে চাপড় মেরে ভয়ানক হাস্যকর ভঙ্গি করতে লাগল লক্ষ্মণ সামন্ত।

মণীন্দ্র বন্দুক আঁচ করলে বাউলীরা গুলী করতে নিষেধ করলে।

বাঘটা গোমরাতে গোমরাতে একদিকে চলে গেল। তার কুকুরের মতন ল্যাজ নাড়া দেখে মনে হল বোধহয় সে ভয় পেয়েছে।

কৃষ্ণ-মণীন্দ্র-মাধুরী-কাবেরীর তখন ভয়ে ঘাম গড়াচ্ছে শরীর থেকে, দরদর করে। কানদুটো গুলগুল করছে।

বাউলীরা হাসতে লাগল।

কৃষ্ণ মাধুরীর কানে কানে বললে, 'বাঘটার কোনো ঘটনাবোধ নেই। হঠাৎ আমাকে আর মণীন্দ্রকে মেরে ফেললে পাষাণ চেহারায় বাউলীরা তোমাদের নিয়ে যেতে পারত—তারপর 'বনদেবী' বলে পুজো করত!' হি-হি করে হেসে উঠল হঠাৎ মাধুরী।

মণীন্দ্র চটে উঠল, 'এখন হাসির কি আছে! ভয়ে বলে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া।'

আবার চলতে শুরু করলে সকলে। ছ'জন বাউলী মণীন্দ্রদের মাঝখানে রেখে চলতে লাগল।

লক্ষ্মণ বললে, 'একবার আমার বাপ অমনি বাঘের সামনে পড়ে। বাঘটা মানুষ খেয়েছ্যালো এগ্যে। মনিষ্যির মাংস-'অক্তে'র স্বাদ যি বাঘ পায় সি শালা সহজে নড়ে না। ওৎ পাতে। সেই বাঘটা গালাগালি শুনে সরি 'গ্যালো' বটে কিন্তুন ফের উল্টো দিগ থিনে এসে লাফ দিয়ে পড়ল। বাপের নাড়ীভুঁড়ি বার করি দিলে। আমি তার গালে খেঁটে মেরে দাঁত মাথা শালা ভেঙে দিনু। বাপকে কাঁধে তুলি বাঘের ল্যাজ ধরি টেনে আনুনু। বাপের প্যাটের নাড়ীটা ত্যাখন আমার পেছনে পেছনে টেনে টেনে চলেছে। গাছপালায় আটকাচ্ছে।'

কাবেরী বললে, 'চলো, পালাই এবার—আর নয় ঢের হয়েছে বাবা! এরকম রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়।'

'ওটা শালা কেঁদো বাঘ দিদি—ভয় নেই!' বললে গহর আলী।

আখড়ায় চলে আসার পর তারা যেন স্বাভাবিক প্রাণ ফিরে পেলে চারজনে। কৌপিন আঁটা বাউলীরা ভাত বসিয়ে গাঁজা টানতে লাগল।

হাঁস-মোরগের মাংস রান্না করে আরামসে খেলে সকলে।

আর একরাত থাকার কথা বললে মণীন্দ্র।

কাবেরী বললে, 'না। আজই চলে যাব।'

অগত্যা। নৌকোয় উঠে তারা ক্যানিং-পোর্টে চলে এল। টাকা নিয়ে বাউলীরা চলে গেল গোসাবার দিকে—তাদের বাড়ি-ঘরে।

'কার্তিক মাসের জ্যোৎস্নারাতে সুন্দরবন যে না দেখেছে তার বাংলাদেশের কিছুই দেখা হয়নি'—বললে কাবেরী।

মণীন্দ্র বললে, 'চলো না তবে আবার ফিরে যাই।'

কাবেরী বললে, 'ওরে বাপ! নমস্কার হে অরণ্য, সুন্দর, ভীষণ ভয়ঙ্কর!—সুন্দরবন, তোমাকে শতকোটি প্রণাম!'

—আবদুল জব্বার

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অর্বাচীনের উক্তি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে আজ বিশ্বের সাহিত্য ইতিহাসে এক অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত একথা সংস্কারমুক্ত বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃত। দীর্ঘকালের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালীর আজ যদি কোনো কিছু গর্ব করার মত থাকে, তাহলে তার নাম বাংলা-সাহিত্য। দুই বাংলার লেখকবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গ-ভারতীর বিজয়-যাত্রা সৌভাগ্যক্রমে আজো অব্যাহত। ঠিক এই মুহূর্তে কেউ যদি বলে বসেন 'বাংলা-সাহিত্য অপরিণত, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম, তাও আবার তাঁর রচনা আমাকে উত্যক্ত করে—' তাহলে সেই মন্তব্যটুকু যে নিছক অর্বাচীনের উক্তি এ-ছাড়া আর কি বলার আছে?

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান লেখক রাজা রাও এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলে ফেলেছেন। রাজা রাও দক্ষিণ ভারতের কাস্নাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন প্যারিসের সরবোণে, বর্তমানে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-দর্শন অধ্যাপনা করেন। তাঁর 'কন্ঠপুরা' নামক উপন্যাসটি ভারতীয় পটভূমিতে রচিত এবং বিদেশে প্রশংসিত। 'দি সার্পেন্ট অ্যাণ্ড রোপ' উপন্যাসটিতেও হিন্দু চিন্তা-ধারার প্রকাশ আছে তাই লরেন্স ডারেল বলেছেন, এই উপন্যাসটির দ্বারা কালের পরিমাপ করা যায়।

সবই উত্তম। আমেরিকার 'টাইম ম্যাগাজিন' রাজা রাও সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'এ ফ্যাসিনেটিং নভেলিস্ট'। সুতরাং তিনি একজন মনীষী ব্যক্তি, এবং নানারকম বাণী দেওয়ার অধিকারী।

দিল্লীর সাংবাদিক সুরেশ কোহলী এদেশে ভ্রমণরত বিদেশী সাহিত্যিকদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎকার করে নানারকম প্রশ্নাদির উত্তর জেনে তা এখানে-ওখানে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর অন্য কোনো পরিচয় আছে কিনা জানি না, তবে এইটুকু জানি তিনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কিছু ওয়াকিবহাল, এবং বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির কবিতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে মন্তব্য করে থাকেন তা লক্ষ্য করেছি।

সুরেশ কোহলী রাজা রাও সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—

> "What do you think is the future of Indo-English Literature? Don't you think our Universities like many American and British Universities, should take up this literature as a regular course of study and also is it not cynical on our part to look to the West for encouragement even in this field of literature?"

প্রশ্নটি অতিশয় স্পষ্ট। এর উত্তরে কিন্তু রাজা রাও সবিনয়ে বল্লেন—এ-দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। তবে আমার বন্ধুবান্ধব কোনো কোনো জায়গায় আমার বই পাঠ্য করেছেন।

> "I should say Indian Literature in English is still at a very formative stage. So is the case about Indian Literature in other Indian Languages. But we are not talking in terms of any language being superior. I do not know much of Bengali but from the little contact that I have I can say that it is immature, except Tagore. So I don't think even Bengali literature is a developed one".

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন মূল প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে অনুদার মন্তব্য করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তবে রাজা রাও সাহেব আকস্মিক ভাবে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এমন একটি উক্তি কেন করলেন। ভক্ষণ না করেই পিষ্টকের স্বাদটা কেমন তা বলা যায় না, আগে পিঠে খেতে হয়। রাজা রাও সাহেব নিজেই বলছেন 'ডু নট নো মাচ অব বেঙ্গলী', তেমন বিশেষ কিছুই জানি না কিন্তু 'বাট ফ্রম দি লিটেল কনট্যাকট, দ্যাট আই হ্যাভ'—এই সামান্য সংযোগটুকু কি ভাবে ঘটেছে তা তিনি ব্যক্ত করেননি। বোধ করি [illegible] ভারতীয় এই পরিচয় দেওয়ার কালে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন এবং সেই উত্যক্ত করা কবিটির কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ পাঠ করেছেন। কারণ, তিনি বলছেন—

> "Tagore was certainly a very authentic poet but he bores me. I'm afraid we have yet to produce the post-Tagorean literature which one can say is worthwhile for the Universities to get interested in".

রাজা রাও সাহেবের এই উক্তিটুকু বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, তাঁর মনের গহন কোণে ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা ভাষা যে প্রধান এই অবচেতন চিন্তা ছিল তাই কোনো হেতু না থাকলেও তিনি বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন 'ইভেন বেঙ্গালি লিটারেচার'—অর্থাৎ বাংলা ভাষা যে 'সুপিরিয়র' এই চিন্তা তাঁর মনে ছিল, আর সেই কথাটাই স্বতোৎসারিত ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তিনি তাই অনুগ্রহ করে বলেছেন 'একসেপ্ট ট্যাগোর'—কিন্তু ট্যাগোর একজন 'অ্যাথেন-টিক পোয়েট' হলেও তিনি রাজা রাওকে উত্যক্ত করেছেন—'হি বোরস মী'।

রাজা রাও অনুভব করেছেন যে, ঠাকুর-উত্তর সাহিত্য গড়ে তোলা প্রয়োজন ইত্যাদি।

এই সঙ্গে মনে পড়ছে আরেকটি সাক্ষাৎকারের কথা। এই সাক্ষাৎকারের প্রশ্নাবলীও সুরেশ কোহলীর এবং উত্তর দিয়েছেন বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা নাতালী সারোৎ। যিনি সম্প্রতি কলকাতা, দিল্লী প্রভৃতি ঘুরে গেলেন। নাতালী সারোৎ-এর প্রতিটি উত্তরের মধ্যে একটা নতুন চিন্তার সন্ধান পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে সেই উদারতার আভাষ যা সাহিত্যিককে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে গিয়ে বিশ্ব-মানবের সম্পত্তিতে পরিণত করে।

রাজা রাও সাহেবের এই উক্তির মধ্যে সংকীর্ণতার পরিচয় আছে আর সেই কারণে আমরা ব্যথিত। আজ কেউ যদি বলেন, বাংলা সাহিত্য 'অপরিণত' তাহলে বাঙালীর মনে কোনো ক্ষোভ জাগা অনুচিত। বাঙালীর একমাত্র কর্তব্য মুখ টিপে হাসুন অবজ্ঞার হাসি হাসা।

'টাইম ম্যাগাজিন' বা লরেন্স ডারেল রাজা রাও সাহেবকে যেমন সার্টিফিকেট দিয়েছেন এমন অজস্র সার্টিফিকেট বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সাহিত্যিকরা পেয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই দুই লেখক ভারতের বাইরে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছেন একথা সর্বজনবিদিত। পূর্ব-য়ুরোপের অনেকগুলি দেশে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থাবলী নতুন করে অনুবাদ করানো হয়েছে। এ-ছাড়া, শরৎচন্দ্র এবং তাঁর পরবর্তীকালের লেখক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য কর্মের সঙ্গেও আজ বিশ্বের পরিচয় ঘটেছে। রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিবৃন্দের অজস্র কবিতা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং যথোচিত সমাদর লাভ করেছে।

বাংলা দেশের ছোট গল্পকারগণ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা প্রবীণ এবং আজো আমাদের মধ্যে আছেন, তাঁদের অনেক গল্প বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীন অথচ শক্তিমান তাঁদের রচনাবলীর যথেষ্ট অনুবাদ এখনও হয়ত হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর সাম্প্রতিক সাহিত্যকাররাও যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বাঙালী মাত্রেরই গৌরব বোধ করার কারণ আছে।

এমন সময় কেউ যদি কিছু না জেনেই বলেন 'বাংলা সাহিত্য অপরিণত', তাহলে সেই উক্তি অর্বাচীনের উক্তি বলেই হেসে উড়িয়ে দিতে হবে। এই ব্যাপারের মধ্যে যে সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব প্রচ্ছন্ন আছে একথা বলা বাহুল্য।

—অভয়ংকর

RAJA RAO: The Man and the Mask: (An Interview) By Suresh Kohli: (Times weekly dated September 13, 1970).

সাহিত্যের খবর

আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধি ।। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে দিল্লীতে চতুর্থ আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমুলেকরাজ আনন্দ জানিয়েছেন যে, এই সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে প্রায় চারশত লেখক যোগ দেবেন। এতে বিভিন্ন আলোচনা ছাড়াও চারটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে প্রায় ত্রিশজন লেখক এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবিশ, প্রফুল্ল রায়, নিখিল সেন, ধনঞ্জয় দাস, প্রসূন বসু, তরুণ সান্যাল, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব মাঝি, আশিস সান্যাল এবং আরো কয়েকজন।

রো-রো-রো ।। নাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন না। আসলে এ হল জার্মানীর একটি জনপ্রিয় প্রকাশন সংস্থার চিহ্ন। আসল নাম : 'রোভোলটস, রোটেশানসে রোমানে ইন ক্লাইনফরম্যাট'—অর্থাৎ রোভোল্টের ক্ষুদ্রায়তন রোটেশন উপন্যাস। পকেট বই সিরিজে এর প্রথম বই বেরিয়েছিল আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। এই পরিকল্পনার সূচনা করেছিলেন আর্ণস্ট রোভোল্ট। ১৯৬০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক—এই 'রো-রো-রো' চিহ্নিত বই জার্মানীতে এখন খুবই জনপ্রিয়। এর কারণ, এই সংস্থা কম পয়সায় জনগণকে ভাল সাহিত্য পড়বার একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। সম্প্রতি এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই সংস্থার বিশ বছর পূর্তি উৎসব পালন করা হয়।

লেনিন পুরস্কার পেলেন জাভার গৌড় ।। সোভিয়েত ইউনিয়নের কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী ভি জাভার গৌড়কে লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই কথা ঘোষণা করা হয়। শ্রীগৌড় কানাড়া ভাষায় টলস্টয়ের যে অনুবাদ করেছেন, তার জন্যই এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। সম্প্রতি শ্রীগৌড় সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ করছেন। তাঁর এই সম্মান লাভে ভারতীয় সাহিত্য প্রেমিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন বলে আশা করি।

একটি সুইডিশ উপন্যাস ।। আইভর লো-জোহানসন সুইডিস সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নাম। বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ২২টি গ্রন্থ। সম্প্রতি স্টকহল্ম থেকে বেরিয়েছে 'মার্তারেণা' নামে একটি ছোট গল্প সংগ্রহ। এই গ্রন্থে সংকলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একদিক থেকে একটা মিল আছে। মিলটা হল, গল্পগুলি রচিত হয়েছে শহিদদের নিয়ে। প্রথম গল্পটি রচিত হয়েছে প্রাচীন রোমে ধর্মযুদ্ধে নিহত ক্রিস্টিনাকে নিয়ে। অন্যান্য গল্পগুলিও অনুরূপ চরিত্রের মানুষকে নিয়ে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, এই সব শহীদরা মৃত্যুকে বরণ করেছেন প্রধানতঃ তাঁদের বিশ্বাসের জন্য। ফলে তাঁর লেখা গল্পগুলি সেই পুরাতনের ভিত্তি ত্যাগ করে আধুনিক রূপ লাভ করে। কিন্তু এত মুন্সীয়ানা সত্ত্বেও গল্পের মধ্যে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তেমন জমাট বাঁধেনি।

অবজ্ঞার পরিণামে ।। ম্যাক হাইম্যান আমেরিকান সাহিত্যের একটি অবহেলিত নাম। পাঠকের কাছ থেকে পেয়েছেন কেবল অবহেলা আর বোধ হয় তারই পরিণামে একটা অনিশ্চিত অস্থিরতার মধ্যে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৯৬৩ সালে এমন সাহিত্য রচনা করেছিলেন তিনি, যাতে হৃদক্রিয়া বন্ধের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। কি এমন সাহিত্য রচনা করেছিলেন তিনি, যাতে পাঠক তাঁকে মনে রাখতে পারে? 'নো টাইম ফর সারজেন্ট' নামে একটি উপন্যাস, তিনটি গল্প এবং একটি প্রবন্ধ—আর মৃত্যুর পর বেরিয়েছে 'টেক নাও দাই সান' নামে আর একটি উপন্যাস। এত স্বল্প পরিমাণ রচনা এবং তাও তেমন অত্যাশ্চর্য হবার মত নয়—সুতরাং কেমন করে আর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন?

সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর চিঠিপত্রের একটি সংকলন। তাঁর বইয়ের চেয়ে এর আকর্ষণ পাঠকের কাছে অনেক বেশি এবং এর মধ্যেই বইটি বেশ হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছে। চিঠিগুলির সম্পাদনা করেছেন উইলিয়ম জ্যাকবার্গ এবং ভূমিকা লিখেছেন ম্যাকস স্টীল। এই চিঠিগুলির মধ্যে ম্যাক হাইম্যানের ব্যক্তি জীবনের অনেক খবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চিঠিগুলি পড়লে দেখা যায়, সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান ধারণা। তিনি যা রচনা করতে চেয়েছিলেন তা তিনি কখনই পারেন নি। লিখতে বসে মনে হয়েছে, যেন সে রকম করে লেখা যাচ্ছে না। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৬ সালে ম্যাক হাইম্যান ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সহপাঠী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই লেখক হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত। যেমন—উইলিয়ম স্টাইরন, ফ্রেড চ্যাপেল, এ্যানী টেলার প্রমুখ। কিন্তু সে সময়ে তাঁর লেখাই ছিল সকলের চেয়ে চিত্তাকর্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে তিনি কেবলই ঘুরে বেড়িয়েছেন জীবনের সত্য সন্ধানে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই তাঁর সেই সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। নিউ ইয়র্কের জীবন তাঁকে সান্ত্বনা দেয়নি। দক্ষিণের দেশগুলিও তেমনি। হিরোশিমার উপর বোমা বর্ষণ তাঁকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। কোথাও তিনি স্বস্তি পাননি। এই বেদনাকর জটিল অনুভবের কথা

এই চিঠিগুলির প্রতি বর্ণে সঞ্চারিত হয়েছে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ম্যাক্স স্টিভেন্স ভূমিকায় যথার্থই লিখেছেন : 'এই চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে একজন লেখকের নিভৃত মননের কথা আর তাঁর সত্যিকারের শিল্প মানসের পরিচয়।'

রেকর্ডে বাংলা কবিতা ।। বছর আড়াই আগে যখন আধুনিক বাংলা কবিতার লং প্লেয়িং রেকর্ড বেরিয়েছিল, তখন সকলেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেই প্রচেষ্টাকে। তারপরও অবশ্য কবিকণ্ঠে আধুনিক কবিতার এবং অন্য কণ্ঠেও আধুনিক কবিতার রেকর্ড বেরিয়েছে। কিন্তু সেগুলি হয়েছিল বিক্ষিপ্তভাবে। শোনা যাচ্ছে সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী এ ব্যাপারে আবার অগ্রণী হয়েছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে সকলেই অভিনন্দন জানাবেন আশা করি। কারণ, আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় করবার এ এক বাস্তব প্রচেষ্টা। তবে এই ধরনের প্রচেষ্টা ... প্রতিনিধিমূলক হওয়া প্রয়োজন। ... তার প্রভাব পাঠক ... দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর ... হয় তাছাড়া ... দিক দিয়েও এতে ... ভাবনা বেশি।

—চার্বাক

নতুন বই

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম : পাঁচ টাকা।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী, তা তাঁর ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিশুদের জন্য কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ ও আলোচনাই প্রমাণ করে। সাহিত্যে শিশুমন এবং শিশুদের সাহিত্য যে তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, 'রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য' গ্রন্থটির প্রকাশেই তার আর একটি প্রমাণ চিহ্নিত হল। বস্তুত আলোচ্য গ্রন্থটি শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়াস হয়েই থাকেনি এর মধ্য দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের আদিতম কথা, তার প্রবাহ, শিশুমনের বিভিন্ন দিক ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গকে স্পর্শ করেছে।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও প্রকাশের বিচ্ছিন্নতা গ্রন্থে সংকলনের বাধা হয়নি। শিশু-সাহিত্যিক রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বকে সামগ্রিক-ভাবে ধরা যায়। প্রবন্ধগুলিকে সাজানোর মধ্যে এবং আলোচনার ধারা স্পষ্টত প্রবন্ধকারের গবেষক-বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ, সে খাপছাড়া, ছড়া ইত্যাদির আলোচনা-গুলি তাঁর নাটক, কাব্য, গদ্য-গ্রন্থের পাশাপাশি রেখেই করেছেন। এতে প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তিক্রম প্রশংসনীয়। লেখকের আলোচনার ভাষা ও বহু মন্তব্য অভিনন্দন-যোগ্য। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণে মুন্সিয়ানা অভিনবত্ব আছে।

শিল্পিত স্বভাব : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। মূল্য : ৭·৫০।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত মূলত কবি হলেও তাঁর প্রবন্ধ ও গদ্যভাষা স্বভাব কবিতার আবেগধর্মিতা থেকে অনেকাংশে বিমুক্ত। বক্তব্য, যুক্তি-পরম্পরা, ভাষারীতি, শব্দ ইত্যাদির ব্যবহারে এবং স্থায়ী মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আলোচ্য লেখক স্বতন্ত্র মননের পরিচয় দিয়েছেন।

'শিল্পিত স্বভাব' গ্রন্থের 'প্রসঙ্গত' অংশে লেখক জানিয়েছেন—'প্রবন্ধ রচনা লিরিকের মতোই, কোনো একটি মুহূর্তের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তা সত্ত্বেও লিরিকে মুহূর্তই যখন প্রধান শর্ত, গদ্য গ্রন্থনায় তাকে বৃহত্তর পটভূমির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতেই হয়।' আলোচ্য লেখক সেই সন্ধিস্থাপনের দিকটিতে লক্ষ্য রেখেছেন প্রতিটি প্রবন্ধেই। প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থে সংকলিত হওয়ায় প্রবন্ধকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট হয়।

বস্তুত গ্রন্থটির অন্যতম বিভাব হল, 'সৃষ্টিধর্মী চর্যায়তার চরিত্র মানবের অভি-ব্যক্তি ও রূপান্তরের সংগ্রামী সমস্যাই' এবং সেক্ষেত্রে লেখকের রচনাগুলির তাৎপর্য 'কয়েকটি ধ্রুব বিষয় ও মুহূর্তের আস্বাদন এবং উদযাপন।' 'সন্ধিক্ষণের সাধক : ব্রজেন্দ্রনাথ শীল', 'উপেন্দ্রকিশোর', 'ভক্তি-বাদের কবিতা', 'প্রোতুসায়জ্য' ইত্যাদি প্রবন্ধ এ প্রমাণ করে। 'সুন্দর ও কার্ল মার্কস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনাটি বিশেষ অভিনবত্বের দাবী করে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতে রেক, শেকসপীয়র, অবনীন্দ্রনাথ, শিলার, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে নতুন করে ভাবতে ও বুঝতে হয়। প্রবন্ধ-গুলিতে লেখক যে ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন, যে সমস্ত শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করেছেন, তা প্রাবন্ধিক অলোকরঞ্জনের নিজস্ব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

মহামতি লেনিন : সম্পাদক : সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের বার্ষিক মুখপত্র।

লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বিদ্যালয়ের মুখপত্র যে এমন সুনির্বাচিত রচনা প্রকাশ করতে পারে—তা যেন ভাবাই যায় না। গভীর দায়িত্ববোধের সঙ্গে সম্পাদক লেখা নির্বাচন করেছেন। লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি দাশ, দুর্গাশংকর কুমার, অসিতকুমার সরকার, অমাদিনাথ সরকার, নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া, গেওরগি দিমিত্রভ, ম্যাক্সিম গোর্কি এবং আরো অনেক। বিদেশী লেখাগুলো স্বভাবতই অনুবাদ। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা চমৎকার।

ত্রিভুজ : সম্পাদক মানিক চক্রবর্তী, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, বিমল দেব। মায়া ভাণ্ডার, পোঃ কৈলাশহর, ত্রিপুরা। পঞ্চাশ পয়সা।

পূর্ব প্রান্তের ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত কবিতা-প্রধান এই সাহিত্যপত্রটি আধুনিক মননশীলতায় পাঠককে আকর্ষণ করবে। লিখেছেন—গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ফণিভূষণ আচার্য, বর্ণজিৎ দেব, বিজিতকুমার ভট্টাচার্য, সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, পীযূষ রাউত, মানিক চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

কবিতা

বাংলা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে এই সেদিন পর্যন্ত দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ছিল। এখন সুখের বিষয়, সে অভিযোগের কথা তেমন আর শোনা যায় না। তার কারণ এই হতে পারে যে, আধুনিক কবিতা পড়বার এবং বুঝবার শক্তি পাঠকদের বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা কবিরাই এ-ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন। আমাদের মনে হয়, দুটোই সত্য। সাম্প্রতিককালে কবি ও কবিতা পাঠকের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ষাটের দশকে কবিতার যে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটেছে তার অন্যতম হেতুও এখানেই সন্ধান করতে হবে। এ-বারের শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে বাংলা কবিতার অধুনা জনপ্রিয়তার হেতু স্পষ্টতর হবে।

যে-সময়ের মধ্য দিয়ে এ-কালে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছি তার স্বরূপ—সমস্যা সংঘাত, আর্থ-রাজনৈতিক আলোড়ন, দারিদ্র্য বেকারী, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের জীবন-সংগ্রাম, অরাজকতা শরিকী সংঘর্ষ এবং সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষের বাঁচার কথা এবারের কবিতায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রবণতার শুরু গত দশক থেকেই এবং ফলত কবিতা যাঁরা পড়েন সেই সাধারণ পাঠক পরিচিত জীবনযাত্রার প্রতিরূপ কবিতার মাধ্যমে পেয়ে খুশি হচ্ছেন। খুবই বিস্ময়ের কথা, সমকালীন জীবন-ভাবনা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আশানুরূপ ছাপ ফেলতে না পারলেও ছোটগল্প এবং কবিতার ক্ষেত্রে তার স্বাক্ষর অত্যন্ত স্পষ্ট। এবারের প্রবীণ এবং নবীন বহু কবির কবিতায় আমরা এই সময়ের ভাবনা চিন্তা সমস্যা সংকটের ছবি দেখেছি। কিছুসংখ্যক কবি অবশ্যই যথারীতি আত্মমগ্ন, মন্ময়; অনেকে রোমান্টিক প্রেমানুভূতির লিরিক লিখছেন, বিশুদ্ধ কাব্যিক অনুভবের ঐতিহ্য এ-সময়েও বিস্তৃত, কেউ কেউ বীট-হাংরি প্রজন্মের ধারাও বহন করছেন। অদল বদল কিছু ঘটেছে বটে, সেটা কবি বিশেষের বিচিত্র মুডের ব্যাপার। সাধারণভাবে এবারের কবিতার মোটামুটি বৈশিষ্ট্য এই রকমই।

কেবল কবিতার পত্রিকাই এবার বহু; কোলকাতার, মফস্বলের বাংলার বাইরের অনেক কবিতার কাগজ, লিটল ম্যাগাজিন আমাদের হাতে এসেছে। সেই সঙ্গে অগণিত প্রবীণ-নবীন কবির বিচিত্র কাব্য-ভাবনা।

একদা সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষ—কামার কুমার মুটে মজুর বা ছুতোরের জীবনে যে অকৃত্রিম শরিক হয়ে রক্তে তীব্র 'গতির নেশা' নিয়ে এসেছিলেন এবং যিনি দীর্ঘ চার দশক ধরে অনলস-ভাবে জীবনের পক্ষে লিখে যাচ্ছেন তিনি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। আর্ট-ফরমের নানা পরীক্ষা করেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর শিল্প-চেতনা ও জীবন-দর্শন মানুষের সুখ দুঃখ আর চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ধ্রুব সত্যে বিধৃত। কবির সূর্য-সন্ধান মানুষের প্রতি আন্তরিক আস্থায় উদ্ভাসিত। 'উদ্ভাসন' (আন্তর্জাতিক) কবিতায় তিনি বলেছেন—

> সূর্য খুঁজি কোথায়?
>
> ... ...
>
> খুঁজি এই মানুষের মধ্যে
>
> গহন পরম অনাদি সূর্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবার পরিচয়, বৈতানিক, রাজধানী, একক, অনুক্ত, সাপ্তাহিক বসুমতী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় কবিতা লিখছেন। তিন বুড়োর অবসরের সময়ের

পর্যবেক্ষক

মুখোমুখি বসে হিসাব নিকাশ করার চিত্র 'সময়' (বৈতানিক)। সময় এখন হাসা-হাসি করে। 'তা করুক।দামটুকু শুধু দিক।জীবনকে কষতে চাওয়ার সাহস।আর শাস্তির।' সময় অন্যভাবে এ-কালের তরতাজা ঘটনা বোমা বিস্ফোরণের শব্দে গতিশীল, 'বিস্ফোরণ' (পরিচয়) কবিতায়—

> সময়! সময়!
>
> কত বিস্ফোরণ চাই
>
> এ প্রাণের পরিসর একটু বাড়াবার?

প্রবীণ কবি বিষ্ণু দে-কেও আমরা পেয়েছি সমাজ-মানসের একনিষ্ঠ রূপকার হিসাবে। দীর্ঘকাল কবিতা লিখছেন তিনি। আর বয়স তাঁর মনে কোন স্থবিরত্ব আনতে পারে নি। তার প্রমাণ, এবার কবিতা রচনাতে যে কোন তরুণ কবিকেও হার মানিয়েছেন তিনি। অমৃত, পরিচয়, সীমান্ত, সারস্বত, আন্তর্জাতিক, আনন্দ-বাজার, সাহিত্যপত্র, যুগান্তর কালান্তর, অনুক্ত প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। লেনিন শতবর্ষে এবার উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু দের লেনিন প্রশস্তিমূলক কবিতা গুচ্ছ। সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেই বিরাট কর্মবীর রাষ্ট্রনেতা মানবিক গুণে গুণান্বিত লেনিনের কথা ভাবতে ভাবতে লেনিনের স্বপ্ন সাধে পৌঁছে যাবে—'শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই হ'য়ে যাবে শতায়ু লেনিন।' (সারস্বত)। তিনি অমৃত, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকাতেও লেনিন বিষয়ক কবিতা লিখেছেন।

এ-সময়ের শ্বাসরুদ্ধকারী অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন কবি বিষ্ণু দে-কে ভাবিত করে। সহজ লৌকিক ভাষা-শব্দে সে কথা বলতে তিনি সহজতর—'সাধ্যে সাধে' (আনন্দবাজার) কবিতায়—

> ছোট ঘর, অনেক মানুষ,
>
> গাছ ঘাস পুড়ে থাক ইঁট,
>
> হাওয়া কম, আলো ক্ষীয়মাণ
>
> দিনে টানে নিশি-পাওয়া গিঁট।

এই অবস্থায় নারী 'উদ্‌ভ্রান্ত ম্রিয়মাণ' এবং পুরুষেরা 'উদ্বায়ু পৌরুষে।' অথচ বাঁচার ইচ্ছায় আমরা সকলেই তৎপর। কবি 'রক্তের অবাক শক্তি' (কালান্তর) কবিতায় লিখেছেন—

> আমরাও মানুষেরা বেঁচে থাকি
>
> শ্যামাঙ্গীর প্রাণের পিয়াসে,
>
> যেমন সবুজ ধান হাওয়ায় হাওয়ায়
>
> দোলে মেঘের উল্লাসে,
>
> যেমন ঘাসের ফুল বর্ণময়
>
> অমরতা ছড়ায় শিরায়।

প্রবীণ আর যাঁরা উল্লেখযোগ্য কবিতা এবার লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ (পরিচয়, আন্তর্জাতিক, নব কল্লোল), অরুণ মিত্র (অমৃত, সারস্বত, চতুষ্কোণ), দিনেশ দাস (অমৃত, দেশ, রাজধানী), দক্ষিণারঞ্জন বসু (আন্তর্জাতিক, পরিচয়) প্রমুখ এই সময়কে তাঁদের কবিতায় ধরার চেষ্টা করেছেন। আমাদের এই অস্থির সামাজিক পটভূমিকায় বিমলচন্দ্র ঘোষের 'যুগ সঙ্কট' (আন্তর্জাতিক) কবি-মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বকেই ব্যক্ত করেছে। দীর্ঘকাল ধরে জীবনের অস্ত্যর্থক ভাবনাই যাঁর কবিতার প্রাণ, তিনি এখন লিখছেন, 'আমরা কি লিখব আজ?' কেন এই দ্বিধা। অরুণ মিত্র সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে: সেখানে 'সন্তানসন্ততির মুখ' আর অগণ্য দোসরের পাশাপাশি' তাঁরা কবির 'মমতায় সংলগ্ন' 'সেখানে কোনো আশা কখনো মরে না।' (সারস্বত)। অন্যত্র লিখেছেন, 'আমার' গর্ব ছিল এক প্রকান্ড সূর্যের, মস্ত প্রান্তরের, আসমুদ্র নদীর স্রোতের (চতুষ্কোণ)। 'কাস্তে' 'ভুখ মিছিলের' কবি দীনেশ দাস 'আমার সেই স্বপ্নের বীজটি

কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে?' (অমৃত)-তে কিঞ্চিত স্মৃতিজীবী। দক্ষিণারঞ্জন বসু পেছনে ফিরে স্মৃতিতে কল্পনাতে পদ্মাকে গঙ্গাকে দেখেছেন—'পদ্মাকে গঙ্গাকে আমি কোনোদিনই ভুলবো না।' কেননা—'পদ্মার বাতাসে প্রাণে আত্মার আনন্দের ঝড় ওঠে। গঙ্গার হাওয়ায় আমি জীবনের অমৃত গান শুনি' (আন্তর্জাতিক)। 'কালো পৃথিবীর মানুষ' (পরিচয়) কবিতায় দুনিয়ার শোষিত মানুষ, বিশেষত 'আফ্রিকার সেই কালো মানুষটি/আমেরিকার সেই নিগ্রো মেয়েটির জন্য কবি-মনের আলোড়ন দেখা যায়। এই আলোড়ন নিগৃহীত মানবাত্মার প্রতি গভীর ভাল-বাসারই প্রকাশ।

দ্বিতীয় যুদ্ধকালে চরম অর্থনৈতিক সংকট এবং সামাজিক বিপর্যয় প্রচলিত সমস্ত ধ্যান-ধারণার মূলে যে আঘাত হানল, তারই পটভূমিকায় কবিতার ক্ষেত্রে যাদের আবির্ভাব তাঁদের মধ্যে আজও কবিতা রচনায় অনলস মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলা-চরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রমুখ কবিগণ।

এ-সময়ের সুস্থ সমাজবোধ এবং মানুষের প্রতি অসীম বিশ্বাস ও ভাল-বাসায় একনিষ্ঠ রূপকার হিসাবে মণীন্দ্র রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-বৎসরের শারদ সংখ্যায় কয়েকটি দীর্ঘ কবিতাসহ বহু পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন তিনি। 'হতে পারে না' (অমৃত) ফসলের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যাশার কবিতা। 'জীবন/হারাবে বালিতে শুধু রক্তপান্তরের এই ?/—না, হতে পারে না হতে পারে না/...না।' মণীন্দ্র রায়ের কাছে কবিতা—

লাঙলে ওলটানো মাটি,
রোদ্দুরের তাপ বুকে নিয়ে
বীজ রোপনের মতো গূঢ় প্রজনন,
......(পরিচয়)

'স্বাধীন কিশোর' (বেতার জগৎ) এবং 'মানুষ মানুষ' (যুগান্তর) এবারের দুটি উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ কবিতা। এ-জাতীয় কবিতা একমাত্র মণীন্দ্র রায়ই লিখেছেন। শিশু ও কিশোরের মনোজগৎ ও তার চতুঃপার্শ্বস্থ কল্পনা-বাস্তবতার কাহিনী, স্বপ্নে-ঘেরা, রহস্যময় (স্বাধীন কিশোর), রূপসী বাংলার একটা শাশ্বত জীবন্ত ছবি ব্যাপ্ত মানসিকতায় বাঙময়। 'মানুষে মানুষ' কর্ম ও কল্পনার সম্মিলিত পৃথিবী। এই কবিতা দুটিতে কবি-হৃদয় স্মৃতি-বিস্মৃতিতে, বিস্তৃত কল্পনায়, রহস্যবোধে, বেদনায় আশায় ভীষণ আলোড়িত।

বাংলার প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবার কমই লিখেছেন বলতে হয়। 'পদাতিকের' কবি পরবর্তী জীবনের কবিতা শিল্পরূপ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এবারের দেশ, কালান্তরে দুটি ভাল কবিতা পেয়েছি। বিশেষ করে দেশের কবিতাটি খুবই ভালো। তবু বলব, সুভাষবাবু অন্যত্র আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেন নি। 'সফরী'তে (বেতার জগৎ) আট পৌরে ভঙ্গী জটিল ভাব, ঈষৎ ব্যঙ্গ—সবাই আছে সত্যি, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রত্যাশা আমাদের অনেক বেশি। 'হাত বাড়িয়ে রেখেছি' (কালান্তর)-তে 'শুধুই ঘুরপাক', 'মাথা ঠেকে যাওয়া' বা 'সংগ্রামের আরেক নাম যেখানে নিজেকে ভাঙা', তৃপ্ত করে আমাদের।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খুবই স্পষ্ট। আমাদের এ-সময়ের কাব্য-চিন্তায় সকলেই অগ্নি-মূর্তি হবেন এ প্রত্যাশা করা যায় না। কেবল সেজন্য কেউ আক্রমণের লক্ষ্য হবেন, তাও না হয় স্বীকার করা গেল; কিন্তু সেটা সর্বদাই রূপায়িত হবে ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে—এটাই কেমন যেন একঘেয়ে লাগে।

বীরেন্দ্রবাবুর 'প্যারি কমিউন,' 'বক্তের ভিতরে' (গণবার্তা) বা 'কুশবিদ্ধ মানুষের জন্য' (পরিচয়) বা 'তিনি কি শুধু' (কালান্তর) প্রভৃতি স্যাটায়ারের মধ্যে এ-কালের মানুষের কোন' প্রত্যাসা পূর্ণ হবে।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এ-সময়ের তর-তাজা ঘটনা, যেমন অবিশ্বাস শত্রুতা, শরিকী সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার উপর কবিতা লিখেছেন। শত্রু আজ ঘরে-বাইরে, শত্রু নিজের অন্তঃপুরে—

তারপর গলির মোড়ে ভাইকে ভাই-ছুরি
কালকের বন্দুকে আজ বোমা—
সব জিন্দাবাদ সব গলাগলি বন্ধুত্বের
মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব

এ-জাতীয় বস্তু-মুখ্য সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে কবিতা লেখার ঝুঁকি অনেক। মঙ্গলাচরণ অবশ্য খুব সাবধানে অগ্রসর হয়েছেন।

'আজ ভালোবেসে কথা বলবার তেমন প্রেমিক কোথাই নেই' 'ভালোবাসার কথা' (সাপ্তাহিক বসুমতী) লিখেছেন কিরণ-শঙ্কর সেনগুপ্ত। 'ভীষণ সময়' (লেখা ও রেখা) 'জন্মদুঃখী বাংলাদেশে এখন একটা ভীষণ সময়'-এর কবিতা। শুদ্ধসত্ত্ব বসু লিখেছেন অনিশ্চিত সময়ের কথা 'নিষ্ঠা' (একক)। 'আমি খুঁজি সেই আলো—ঘুচাবে যে আজ অবক্ষয়' (অমৃত) অবক্ষয় থেকে বাঁচার অন্বেষা।

স্বাধীনতার কিছু আগে পরে যাঁদের আবির্ভাব তাঁরা দেশ ভাগ এবং আনু-ষঙ্গিক সমস্যায় কখনও অস্থির কখনও ক্ষুব্ধ। এ'দের মধ্যে এবার উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন রাম বসু (সীমান্ত, অমৃত, পরিচয়, সাপ্তাহিক বসুমতী) কৃষ্ণ ধর (অমৃত, লাপয়েজি, চতুষ্কোণ, রাজধানী) সিদ্ধেশ্বর সেন (পরিচয়, কালান্তর) জগন্নাথ চক্রবর্তী (আনন্দ-বাজার, অমৃত, বেতার জগৎ, লেখা ও রেখা) প্রমুখ কবিগণ।

'যার শেষ নেই' (সীমান্ত) কবিতায় রাম বসু স্পর্ধিত ঘোষণা রাখেন—

সূর্যমুখী তুমি স্পর্ধা দাও
মাটি সূর্যের শরীর ছোঁড়া
মাটি কুমারী অরণ্য
সাজাও নিজেকে
তার ভালবাসা আরণ্যক পবিত্রতা
তার ভালবাসা ভূমিকম্প
সুন্দর মৃত্যুর জন্যে তৈরী হও।

একই সময়-চেতনা 'রোদে পোড়ে লাশ' (আন্তর্জাতিক) অথবা 'কানামাছি' (পরিচয়)-তে পাওয়া যাবে। রাম বসু তাঁর এই সময়ের বক্তব্য কথনে সাধারণ লৌকিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'তোমাকে যখন খুঁজি' (চতুষ্কোণ) কবিতায় প্রেমে-স্মৃতির অনুভূতিতে সার্থক। 'তোমাকে এখন সর্বত্র খুঁজি। আমি। হৃতসর্বস্ব হয়ে দেখি আমার মতই আরও সব মানুষ। চলেছে। চোখে তাদের যন্ত্রণার নীল ছায়া।' জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'অগ্নুৎ-পাতের পর' (লেখা ও রেখা) মনন-প্রধান, কিন্তু সমাজ ভাবনা তাকে সহজতর করে তুলেছে—'আমি উন্মুক্ত করেছি। তোমার স্বরূপ অন্ধকার থেকে। আলোয় নিয়ে এসেছি'— উপনিষদের মন্ত্রোচ্চারণের মত গম্ভীর ও আশাবাদী।

এই সময়ের কথা আরও যাঁদের কবিতায় সংকট-আশায় উচ্চারিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় দাশ (অমৃত, পরিচয়, সীমান্ত) সতীন্দ্রনাথ মৈত্র (পরিচয়, অমৃত), দুর্গাদাস সরকার (চতুষ্কোণ, বৈতানিক, রাজধানী) শচীন দত্ত (যুগান্তর, বৈতানিক, এষা), মৃগাঙ্ক রায় (অমৃত) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এ-সময়ে সমাজবাদী তরুণ কবিদের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তরুণ সান্যাল। তাঁকে এবার কবিতা রচনায় খুবই সক্রিয় মনে হবে। সীমান্ত, পরিচয়, দরবারী, অমৃত, আন্তর্জাতিক, একক, কালান্তর প্রভৃতি বহু পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। কবিতায় তিনি সজীব এবং গতিশীল। বর্তমানে বাংলাদেশের সাম্যবাদী অগ্রগণ্য কবিদের অন্যতম তরুণ সান্যালের কবিতায় ঐতিহ্যসম্মত ভাব ও ভাষার সঙ্গে প্রচলিত লৌকিক ভাব ও ভাষার আশ্চর্য সমন্বয়, ললিত ভাষার সঙ্গে লৌকিক ভাষার মিশ্রণে তিনি কবিতার ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করতে চান। 'চতুর্দিকে বজ্রের দ্রিমিক। রৌদ্রপাত গুণগুণ ভ্রমর' (অমৃত) কিংবা 'ঈশ্বর ঈশ্বর' (পরিচয়) কবিতায় 'অশ্রুপাত, রক্ত, লোনা সমুদ্রের ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্রিত বকুল ঝরে আছে' এর পাশে 'মায়ের কোলের কাছে মরা ছেলে, ফুট-পাথে রক্তের ছোপ' প্রভৃতি পঙক্তিতে কবির এই বৈশিষ্ট্য ধরা আছে।

সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে সব কবি পঞ্চাশের দশক থেকে লিখছেন এবং এবারেও বেশ সক্রিয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কবিতা লিখেছেন অমিতাভ চট্টো-পাধ্যায়। তিনি অমৃত, চতুষ্কোণ, উত্তর যুগ, সারস্বত, লেখা ও রেখা, দরবারী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় লিখেছেন: তার সমকালীন (চতুষ্কোণ) এ-সময়ের মানুষের পদক্ষেপের, অগ্রগমনের ক্ষেত্রে একটা

সাবধান-বাণীর মত কাজ করবে। 'তাই যেতে হলে সমুদ্র উম্ধারে। উপরের জলোচ্ছ্বাস ভেঙে তীক্ষ্ম নেমে যেতে হবে আবিষ্কারে...'

কেননা, শিখরে শীর্ষে মুহূর্তেই
সকল স্ফুরিত রৌদ্রোদয় লুপ্ত লীন
হ'তে পারে মেঘে। অন্ধ মৌসুমী
শাসনে, অন্ধকারে।

মানস রায়চৌধুরী (গণবার্তা, কবি-কণ্ঠ) অমিতাভ দাশগুপ্ত (সাহিত্যপত্র, দরবারী, পরিচয়, গল্প-কবিতা, আন্তর্জাতিক) এবং আরও কয়েকজন এবারের উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন।

নন্দন-উত্তরযুগ প্রভৃতি পত্রিকাকে ঘিরে যে সব প্রবীণ-নবীন কবিরা সংগ্রামী কবিতা লিখছেন তাঁরা পাঠকমহলে যথেষ্ট প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। এ'দের মধ্যে শ্যামসুন্দর দে, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, অমল চক্রবর্তী, সুনির্মল কুন্ডু, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন এবার। নব জাগ্রত গ্রাম-শহরের অধুনা আলোড়ন শ্যামসুন্দর দে-র কবিতায় দেখা যাবে। 'খবর এলো গ্রাম-নগর প্রাণ চঞ্চল / যুদ্ধজয়ের মৃত্যুপণ' (উত্তর যুগ), 'ক্রান্তিকালে : সুকান্তকে' (নন্দন), প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, পাঠককে ভাবাবে :

শিল্পীর তুলি হাতে তুমি এলে
রঙের পাত্রে শিমুল বন।

ষাটের দশকের যে সব কবির মধ্যে এই সময় এবং সমাজ-ভাবনা সক্রিয় এবং কবি-মানসে স্থানলাভ করেছে তাঁদের মধ্যে আশিস সান্যাল, গণেশ বসু এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য। আশিস সান্যাল এবার পরিচয়, অমৃত, চতুষ্কোণ, সীমান্ত, সারস্বত, আশাবরী, রাজধানী, জিগীষা, বৈতানিক, কালি ও কলম, একক, কবিকণ্ঠ প্রভৃতি বহু পত্রিকায় লিখেছেন। আশিসের কবিতায় এই সময়ের নানা অস্থিরতার মধ্যে সংগ্রামী প্রত্যয়ের কথা ধ্বনিত হচ্ছে :

কম্পমান পটভূমি, কোনদিকে আর
ফিরবার পথ নেই
চতুর্দিকে অবিরত
আসন্ন ঝন্‌ঝার ভয়াল বিপুল
শব্দ (পরিচয়)

গণেশ বসু অমৃত, সীমান্ত, পরিচয়, চতুষ্কোণ, সারস্বত, যুব অভিযান প্রভৃতি অনেক পত্রিকায় লিখেছেন। গণেশ বসুর কাব্য-ভাবনাতে সমাজচেতনা, মেহনতী মানুষের কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছে—

হাওয়ায় বারুদ বোল মৃদঙ্গের,
এ কোন যৌবন ছেঁড়ে খোঁড়ে,
যন্ত্রণায় দাপাই কাঁপাই
কবিতার লোনা ঘামে ক্ষোভে ক্রোধে
শ্রমের পলাশ।

(কালি ও কলম) এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কণ্ঠেও সম-উচ্চারণ—

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে রইলে
আমার বর্শাসহ হাতের দিকে
বললে : এবার সূর্যোদয় হোক।
(আশাবরী)

এ ছাড়াও যে কয়েকজন সমমনোভাবাপন্ন তরুণ কবি তাঁদের এবারের কবিতায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, তাঁরা হলেন, তুলসী মুখোপাধ্যায় (পরিচয়, চতুষ্কোণ, সীমান্ত, দরবারী, একক) চিন্ময় গুহঠাকুরতা (সীমান্ত, অমৃত), সত্য গুহ (পরিচয়, সীমান্ত) শান্তনু দাশ (পরিচয়, গঙ্গোত্রী, রাজধানী), তরুণ সেন (পরিচয়, কালান্তর), সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সীমান্ত, আন্তর্জাতিক, পরিচয়), শিবেন চট্টোপাধ্যায় (সীমান্ত, পরিচয়), দীপেন রায় (সীমান্ত, আন্তর্জাতিক) বাসুদেব দেব (দরবারী, পরিচয়, জিগীষা, আলোক সরণি, লেখা ও রেখা) সুমিত চক্রবর্তী (অমৃত, সীমান্ত) প্রমুখ। 'বেঁচে থাকতে হ'লে একটা আওয়াজ চাই'—এই বিশ্বাসের উচ্চারণ দেখা যাবে তরুণ সেনের কবিতায়, অনেকের কবিতায়ই।

যেকালে আমরা বাস করছি, সেই কালের কথা যদি কবিতায় প্রভাব বিস্তার করে, পাঠক খুশি হবেন। এবং সুখের বিষয় এবারের অনেক কবির কবিতায় সমাজভাবনার যথার্থ রূপ আমরা দেখেছি। কিন্তু সময় তার সমকালীন বস্তুরূপেই সব নয়; তার উত্তরণ এবং সম্ভাবনাতেই সার্থক। এবারের কিছু কিছু কবিতা ঘটনার চাপে বেশী বস্তু-প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে এই বস্তুপুঞ্জের ভিড় অতিক্রম ক'রে অনেক ক্ষেত্রে কবির জীবন-দর্শন ও বিশেষ মনোভঙ্গীর কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হয় না। বিশেষ করে তরুণতরদের কবিতায় কোথাও কোথাও বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে উত্তরণের পরিবর্তে বিষয়ের আবর্তে ঘুরপাক খেতেই দেখা গেছে। সেই পুরনো কথা বলা যায়, উপাদান উপাদেয় হ'য়ে ওঠেনি। আমাদের প্রত্যাশা পূরণের সূত্রপাত হয়েছে—এ-বিশ্বাসে অবশ্য আমরা আস্থা রাখছি।

উপরোক্ত কবি-সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অন্য আরেক কবি-সম্প্রদায়ও লিখছেন, যাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যক্তি-ভাবনা ও মন্ময় উপলব্ধি মুখ্যস্থান লাভ করেছে। এই শ্রেণীর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা পুরোধা তাঁদের অনেকেই এবার লেখেন নি। যে কয়জন লিখেছেন, তাঁরাও অত্যন্ত স্বল্প। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজিত দত্ত (দেশ, আনন্দবাজার, বেতার জগৎ), হরপ্রসাদ মিত্র (আনন্দবাজার, অমৃত, অনুক্ত), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (দেশ, রাজধানী, আনন্দবাজার, বিচিত্রা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, এবারেও তা লক্ষ্য করা যায়। একাধারে লিরিকধর্মী, অন্যদিকে গভীর জীবনানুভূতিতে তাঁর কবিতা সহজবোধ্য ও উজ্জ্বল। নীরেন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক কবিতা নিশ্চয়ই দীর্ঘকালের দুর্বোধ্যতার অভিযোগমুক্ত। 'আগুনের দিকে' (রাজধানী) কবিতায় দৃপ্ত পদক্ষেপ লক্ষণীয়—

আর তাই
চতুর্দিকে হাহাকার ধড়মুণ্ড
আলাদা করা শব
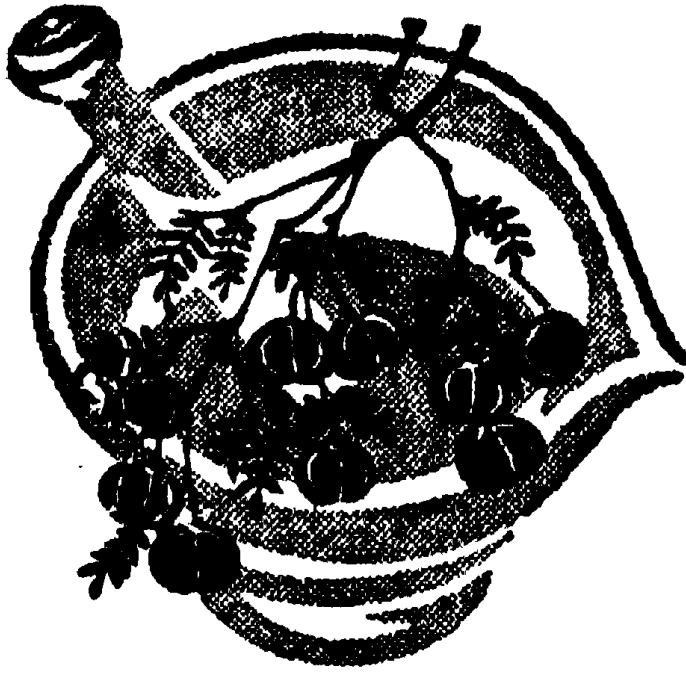
দেখেও আমাকে
এগিয়ে যেতেই হয়...
আগুনের দিকে
এগিয়ে যেতেই হয়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে কয়েকজন কবি মন্ময় লিরিক ভাবনা সমৃদ্ধ কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এবার লিখেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, (লেখা ও রেখা, অনুক্ত, অমৃত, দুই বাংলার কবিতা), আলোক সরকার (আনন্দবাজার, জিগীষা), শঙ্খ ঘোষ (দেশ, এক্ষণ, পরিচয়, অনুক্ত), সুনীলকুমার নন্দী, (অনুক্ত, চলচ্চিত্র, কবি ও কবিতা), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (দেশ, জিগীষা), সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার, দেশ, পরিচয়, একক, অমৃত), লোকনাথ ভট্টাচার্য (অমৃত, লাপয়েজি, পরিচয়), রাজলক্ষ্মী দেবী (দেশ, অমৃত, সাপ্তাহিক বসুমতী) কবিতা সিংহ (দেশ, রাজধানী), শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (পরিচয়, এক্ষণ, গল্প কবিতা) প্রমুখ কবিগণ। এরা একসময়ে কবিতা রচনায় খুবই সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে সামান্য কয়েকজন ছাড়া অনেকেই কম লিখছেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর মন ও মননের দৃপ্ত সতেজ ভঙ্গী কবিতায় ছড়িয়ে দিতে পারেন। বাচনভঙ্গীতেও স্বকীয়তা আছে। 'আমি এক চটুল জোনাকি। তোমার পায়ের কাছে আনি চিরায়ত উপহার', বা,

এখনো তোমার হাতে

শুভ নববর্ষের নিশান
চৈত্রের সংক্রান্তি শেষে শোভা পায়
(অমৃত)

প্রভৃতি পঙ্ক্তিতে অলোকরঞ্জনের কবি-মনের অনুভূতি ধরা যায়। আলোক সরকার কবি-হৃদয়ের আত্মকথনে দ্বিধাহীন। 'আমার কথা বলা অনেক সময়েই নীরবতা' আমি কেবল ভাবি। কেউ কি কান পেতে আছে, চমকে উঠছে কেউ? / কোথাও কোনো দৃশ্য নয়, কোথাও নয় আলোড়ন' (আনন্দবাজার)। শঙ্খ ঘোষ সহজ প্রতীকী ভঙ্গীতে লিখেছেন 'চিতা' (পরিচয়)। তাঁর কবিতাটি আপাত সহজ, আসলে অন্তর্নিহিত অর্থেই তার ব্যঞ্জনা ও উত্তরণ। 'সকাল থেকে কেউ আমাকে সত্যি কথা বলে নি। কেউ না। চিতা, জ্বলে ওঠো' (পরিচয়)। 'কলকাতায় আজো বসন্ত' (অমৃত) লোকনাথ ভট্টাচার্যের কোলকাতা-ভাবনার কবিতা। আজকের কোলকাতা, কৃষ্ণচূড়া কবিমনে বেদনার ছায়া ছড়ায়, কেননা কৃষ্ণচূড়া গাছটা আজ—'নিসর্গের চাবুক-কষা পরিহাস, আমার শহরের এ কী দিন এনে দিলে দরজায় — সব কথায় স্তম্ভিত অর্থহীনতার, ধেই ধেই মৃত্যুর মুকুটপরা শির অন্য আরেক কবিতা।' প্রকৃতি রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতাতেও অন্যভাবে, অন্যচিন্তায় আসে, 'প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি পড়ে থাকে গারদের অর্থহীন ছবি' (সাপ্তাহিক বসুমতী)।

সমমনোভাবাপন্ন তরুণতর কবিরা অনেকে অবশ্য বেশ সক্রিয়। তাঁদের মধ্যে রত্নেশ্বর হাজরা (লেখা ও রেখা, দেশ, অনুক্ষণ, প্রাশ্নিক, গঙ্গোত্রী) রাণা চট্টোপাধ্যায় (অনুক্ষণ, জিগীষা, ত্রিবৃত্ত) রবীন সুর (দরবারী, একক, কবিকণ্ঠ) মৃণাল বসু চৌধুরী (পরিচয় প্রাশ্নিক), রথীন ভৌমিক (রাজধানী, নিম সাহিত্য, জিগীষা, পরবাস), কালীকৃষ্ণ গুহ (দুই বাংলার কবিতা, দরবারী), সামসুল হক (একক, লেখা ও রেখা, রাজধানী), কবিরুল ইসলাম (লাপয়েজি) রবীন্দ্র গুহ (বৈতানিক, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রত্নেশ্বর হাজরা যখন বলেন 'দু'হাত ভরে শিশির ধরবো শাদা পদ্মে জমিয়ে রাখবো। পাথর কুঁদে রেখে যাবো কালপুরুষের ছবি' (লেখা ও রেখা) বা রথীন ভৌমিকের 'জন্মদিনের পরিচয় নিয়ে। আমি তোমার হ'য়ে রইলাম। শুকনো বুকে জমা হয়ে রইলো আমার ছেড়া তমসুক' (জিগীষা) শুনি, তখন তরুণ রোমান্টিক মন এবং ভাবনার স্পর্শ পাই। 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতার দিনলিপি' (কালান্তর) বা 'আমার কবিতা' (অমৃত)-য় পবিত্র মখোপাধ্যায় পাঠকমন স্পর্শ করেন ঠিকই, কিন্তু এবারে পবিত্র যেন কিছুটা নিষ্প্রাণ, কেন? বোধের ভারে নুয়েপড়া কবিতা আর নয়, মন্ত্রময় কবিতা, তা হৃদয় উৎস থেকেই আসুক, প্রাণস্পর্শী হোক, জীবনের কবিতা হয়ে উঠুক।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বীট কবি সম্প্রদায়ের মত আমাদের দেশেও একালে অনেকটা সমমনোভাবাপন্ন, কিছুটা বা প্রভাবিত বীট-হাংরি কবি সম্প্রদায় উঠেছিলেন। এ'দের পুরোধাদের যাঁদের কবিতা এবার দেখছি তাঁরা হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গল্প কবিতা, বেতার-জগৎ), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (শিলীন্ধ্র, কালান্তর, আনন্দবাজার, অমৃত), শরৎ মুখোপাধ্যায় (আনন্দবাজার) এবং এদের অনুসবণকারী আরও অনেক কবি যেমন তুষার রায় (আনন্দবাজার) বেলাল চৌধুরী (একক) দেবী রায় (গল্পকবিতা) অরুণ বসু (গল্পকবিতা) পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল (গল্পকবিতা) প্রমুখের কবিতা কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মলয় রায়চৌধুরী বেশ কয়েক বৎসর নীরব। এই কবি গোষ্ঠীর অনেকেই অবশ্য ইদানীং স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এখন গদ্য রচনাতেই অধিক আগ্রহী এবং ফলে কবিতার ক্ষেত্রে তিনি পূর্বের নিষ্ঠা রাখতে পারছেন না। শক্তি চট্টোপাধ্যায় অবশ্য কবিতায় অনলস এবং তাঁর কবিতা পাঠকমহলে আদৃতও বটে। তাঁর কবিতায় লিরিক-ভাবনা লক্ষ্য করার মত। 'দুই বাংলার কবিতায়' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লিরিক-ভাবনার প্রধান্য—

প্রচ্ছন্ন সুন্দর এসে কথা বলে
আমাকে একদিন নিঃশব্দ বিকেলে।

অন্যত্র 'এই নীল সভ্যতার ঘরের ভিতর' (আনন্দবাজার) কবিতায় কবি বর্তমান সভ্যতার অসম ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ ক'রে বলেছেন, 'কেন ভালোবাসা সকলের কাছে নয় সমান প্রত্যহ?' সংসারের বৃত্তাকার অনুসরণের কবিতা শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের নকশা ২২ (আনন্দবাজার), 'পরস্পরকে অনুসরণ ক'রে অন্তরঙ্গ। বৃত্তাকার।' শরৎকুমার অন্য উল্লেখযোগ্য কবিতা 'লা পয়েজিতে' প্রকাশিত।

এবারের শারদ পত্র-পত্রিকায় অনেক নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ'দের কেউ কেউ ষাটের উপান্ত থেকে, এমনকি কেউ কেউ সত্তরের থেকেও লেখা শুরু করেছেন। এ'দের অনেকেই আবার বয়সের দিক থেকেও খুবই তরুণ। এদের মধ্যে যাঁদের লেখা ভাল লাগবে, তাঁরা হলেন নগেন্দ্র দাশ (জিগীষা) অজয় সেন (দুই বাংলার কবিতা) শুভ মুখোপাধ্যায় (শিলীন্ধ্র) রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শিলীন্ধ্র) শিবাজী রায় (অনুক্ষণ) হেমন্ত আঢ্য (প্রাশ্নিক) তড়িৎ চৌধুরী (জিগীষা) উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যপত্র) সুদেষ্ণা মজুমদার (কবিকণ্ঠ) আলোক সান্যাল (উত্তর যুগ) চন্দন সেন (ফুল ফুটুক) বিপ্লব মাঝি (সীমান্ত) পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (গণবার্তা) জয়ন্ত সাহা (সিংহাসন) নিশিনাথ সেন (রাজধানী) সুচেতা মিত্র (বেতার-জগৎ) সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় (একালীন) সুদীপা ভট্টাচার্য (অন্বীক্ষণ)।

ইদানীংকালে আমরা পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতার স্বাদ অনুভব করবার সুযোগ পাচ্ছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। এবারেও কয়েকটি শারদীয় সংখ্যার পৃষ্ঠায় ও-পার বাংলার কবিতা আমরা পেয়েছি। সে সব কবিতা নিজস্ব স্বাদে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। পূর্ববঙ্গের মাঠমাটি এবং একালের ভাবনা-চিন্তার ফসল ও'দের কবিতা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। রাজধানী, একালীন, দুই বাংলার কবিতা কালি ও কলম প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় পূর্ববঙ্গের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের কবিতা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—তাঁরা হলেন মেজবাহউদ্দীন আহমদ খান, দাউদ হায়দার, সিরাজুল ইসলাম, শহীদ কাদরী, নূর মোহাম্মদ, আবদুল হাই মাশরেকী, আবু কায়সার, মীর আবুল খায়ের, আহসান খালীদ, আহসান হাবীব, আবুল হাসান, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ কবিগণ। দুই দেশের উঁচু প্রাচীর ইদানীংকালের কবিরা ভেঙে ফেলছেন পূর্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গই সেবিষয়ে তৎপর এবং সচেতন।

শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের হলে স্বর্গত শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ৯ নভেম্বর থেকে। মাত্র এক বছর আগে শিল্পী এ জগত ছেড়ে গেছেন। গত তিরিশ বছর ধরে আঁকা তাঁর ছবির একটি নির্বাচিত অংশ এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

জলরং তেলরং-এ আঁকা ছবি ছাড়াও কালি-কলমে আঁকা বেশ কিছু স্কেচ রাখা হয়েছে। কয়েকটি ছবির বিষয় বাদ দিলে অশোক মুখোপাধ্যায়ের সব ছবির বিষয়বস্তু মানুষ অথবা আরও বিশদ করে বলতে গেলে মানুষের মুখ। দুঃখ, ভয়, দ্বন্দ্ব, হতাশার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে এই সব ছবিতে।

তাঁর ছবিগুলি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল নয়—তিনি ফর্ম আর রং নিয়ে নানা হেরফের করে দেখেছেন। ডিসটর্শনের মধ্য দিয়েই তিনি নানা মুড ধরে রেখেছেন। তবু মনে হয় তাঁর প্রিয় রং ছিল ইন্ডিয়ান রেড আর ব্রাউন। জীবনের গভীর ভাব হয়ত এই রঙেই ফোটে বেশী। মুখের ডিসটর্শনের ছবির মধ্যে কালো মেয়ে (১৬), দি লাস্ট অফ দি রোমানস (১১) বা প্রাইড (২৩) উচ্চশ্রেণীর ছবি। আবার এর পাশাপাশি আছে শ্যামলী (৭১) বা বধূ বা যে কোন একটি গাছের ছবি স্নিগ্ধ প্রশান্তির ভাব এনে দেয়।

অশোকবাবুর তেলরঙের ছবির সংখ্যা এ প্রদর্শনীতে বেশী নেই। কিন্তু যে কটি ছবি রাখা হয়েছে প্রত্যেকটি রং ও রেখায় ব্যঞ্জনায় ও ভাবের গভীরতায় সমৃদ্ধ। ১৭৮ নম্বর ছবিটি ভারত সরকারের নির্বাচিত ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে বাইরে ঘুরে এসেছে।

এর পাশে আছে উড়িষ্যায় পটের রীতিতে আঁকা দুখানি ছবি। এগুলি দেখলে বোঝা যায়, যে হাতে তুলি চাবুক হয়ে ওঠে সেই হাত দিয়েই বর্ণাঢ্য অলংকরণও বেরোতে পারে। এই রীতির বেশ কিছু ছবি বিদেশীরা সাগ্রহে নিয়েছেন, উড়িষ্যা সরকারও কিনে নিয়েছেন।

অশোকবাবু ফর্ম নিয়ে বহু এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিশনের ছবিও কয়েকটি আছে।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অত নেই কিন্তু এক মুখই তিনি কত রীতিতে কতভাবে এঁকেছেন। কত বিচিত্র ভাবনা বহন করে এনেছে সেই মুখের মিছিল। শেষের দিকে এঁকেছিলেন যীশুখৃষ্টের কয়েকটি ছবি—তার দুখানি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এ দুটি ছবিতে অপার প্রশান্তি। শিল্পী যেন সব ক্ষোভ, দ্বন্দ্ব পার করে এই প্রশান্তিতে পেঁৗছে ছিলেন।

এ প্রদর্শনীর যাঁরা আয়োজন করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই—তাঁরা যে সুন্দর ক্যাটালগটি বার করেছেন তার জন্য। এতে শিল্পীর নিজের ছবির সঙ্গে তাঁর আঁকা সাতখানি ছবির ফটোগ্রাফ রয়েছে। এর লেখাগুলিও মনোজ্ঞ। শিল্পীর নিজের কথাও খুব সহজ অথচ জোরালো ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। অশোকবাবু বিশ্বাস করতেন যে শিল্পীকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সমাজের। আমাদেরও মনে হয় এমন একটি জোরাল হাতের কাজকে সম্মানিত করার দায় আমাদের।

বিশেষ প্রতিনিধি

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩১)

তখন মালতী হাসছিল। রঞ্জিতের কথা শুনে হাসছিল। এমন দুঃখ থাকে হাসিতে, রঞ্জিত মালতীর মুখ না দেখলে যেন টের পেত না। কি করুণ আর অসহায় মুখ মালতীর। কি কঠিন হাসি!

খুপরি ঘরটার ভিতর মালতী একটা পাতিহাঁসের মতো বসেছিল। হেমন্তের শেষ রোদ নেমেছে ওর ঝাপের দরজায়। হেমন্তের শেষ বলে শীতশীত করছে। একটা পাতলা কাঁথা গায়ে মালতী ছোট কম্বলের আসনে বসে আছে। অশৌচের শরীর যেন। অবজ্ঞা চারপাশে। নরেন দাস খড় রোদ থেকে তুলে এক জায়গায় জড় করছে। আভারাণী ধান ঝাড়ছে। শোভা আবু বাড়ি নেই।

মালতী সহজে ঘর থেকে আজকাল বের হতে চাইছে না। মাঝে মাঝে বাড়ির নিচে এক ছোট গাব গাছ আছে, সেখানে গিয়ে বসে থাকছে।

রঞ্জিত এলেই ঝাপটা খুলে দিয়েছিল মালতী। কারণ এই ঝাপ থাকলে অন্ধকার চারপাশে। সে ক্রমে অন্ধকার ভালবাসছে। চিড়িয়াখানার জীবের মতো আর বেঁচে থাকতে পারছে না। সে যে এখন কি করবে! ভিতরে তার কি যে হয়েছে! সারাক্ষণ শীত শীত, ভয় ভয়। বুকটা কাঁপে। কঠিন হাসি হাসলে নরেন দাস ভয় পায়। রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা হলেই বলা, যান, গিয়া দ্যাখেন পাগলের মত হাসতাছে।

এমন শুনেই রঞ্জিত এসেছিল। এলেই মালতী বিনীত বাধ্যের যুবতী হয়ে যায়। সে একটা জলচৌকি ঠেলে দেয় বাইরে। ওকে মাথা নীচু করে বসতে বলে। রঞ্জিত বসলেই যেন মালতী কেমন বল পায় শরীরে। তার এই একমাত্র মানুষ, যাকে সে কথাটা বলবে বলে স্থির করেছে। সে যে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছিল না বলেই চোখে মুখে দীনহীন চেহারা। সে কিছুতেই কথাটা বলতে পারে না। অন্ধকারে শরীর থেকে আলোর ভিতর সেই মানুষের মুখ দেখতে দেখতে মুহ্যমান হয়ে যায়।

রঞ্জিত বলল, তুমি এমন পাগলামি করলে চলবে কেন মালতী।

—কি পাগলামি ঠাকুর।

—মাঝে মাঝে তুমি গাব গাছতলায় ছুটে যাও। সেখানে চুপচাপ বসে থাক। কিছু খাচ্ছ না।

—কিছু খেতে ভাল লাগে না ঠাকুর।

—ভাল না লাগলেও চলবে না। খেতে হবে। বাঁচতে হবে।

—তোমারে ঠাকুর কইলাম একটা চাকু দিতে। তুমি কিছুতেই দিয়া গ্যালা না।

—আবার তোমার এক কথা।

—আমার আর কোন কথা নাই।

—তুমি এমন করলে নরেন দা কি করে তোমাকে নিয়ে!

—আমারে নিয়া কারো কিছু করতে হইব না।

—এমন বলে না। বলতে নেই। যেন অসুস্থ মালতীকে রঞ্জিত বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে।

—তোমার কি মনে হয় ঠাকুর আমারে ভূতে পাইছে।

—তুমি ত জানো মালতী এ-সব আমি মানি না।

—তবে তুমি দাদার কথা বিশ্বাস কর ক্যান?

—করি, কারণ তোমার মুখ দেখলে আমার ভয় হয়।

—কি ভয়?

—কেমন অস্বাভাবিক চোখ মুখ তোমার। তুমি ত এমন ছিলে না মালতী। তুমি মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক। তিনি তোমার সব ভাল করে দেবেন।

—ঠাকুর তোমার বিশ্বাস এত ভগবানে!

—এখন আমি আর কি বলব তোমাকে। আমার কেবল ভয় হয় তুমি কোনদিন আবার মরে যাবে।

—আমি মরতে চাই না ঠাকুর। বিশ্বাস কর আমি মরতে চাই না। তুমি কাছে থাকলে আমি মরতে পর্যন্ত সাহস পাই না। বলে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, কই চাকুটা দিলা। তোমরা আমাকে মরতে পর্যন্ত দিলা না। আমি এখন কি যে করি!

রঞ্জিতের মাথায় এখন হেমন্তের রোদ। আর কোথাও কোন পরিচিত পাখির ডাক, এই ঘরে যুবতী মেয়ে অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে রেখেছে। সে যেন দীর্ঘদিন থেকে রঞ্জিতকে কিছু বলবে বলে ঘুম যেতে পারছে না। চোখের নিচে কালি। হাত পা শীর্ণ। মুখে ক্লান্তি। এবং চারপাশে অদ্ভুত এক নির্জনতা। অথচ বার বার সে চাকুর প্রসঙ্গে ফিরে আসছে।

সে বলল, মালতী তুমি কপালে সিঁদুর দিয়ে ছিলে। পায়ে আলতা। কি যে সুন্দর লাগছিল!

মালতী জবাব দিল না।

—তোমার এমন সুন্দর চোখ মালতী। আমি কিছু পারছি না। তোমাকে আর কি বলব।

মালতী মাথা নীচু করে রাখল। কিছু যেন ভাবছে।

রঞ্জিত বলল, আমি যাব মালতী। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানি না। কবে দেখা হবে তাও বলতে পারব না। আমার অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেল। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

মালতীর চোখ বড় বড় দেখাচ্ছে। সে বলল, আমি জোরে জোরে পাগলের মত হাসি ক্যান জিগাইলা না?

—কি জিজ্ঞেস করব। কিছু করতে পারছি না। জিজ্ঞেস করে লাভ কি!

মালতী বলল, তোমার অজ্ঞাতবাস শেষ। মালতীর বুকটা বলতে গিয়ে ধড়াস করে উঠল।

—শেষ। পুলিশ খবর পেয়ে গেছে আমি এখন এ-অঞ্চলে আছি। আজ কি কাল পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার হতে পারে ভেবে পালাচ্ছি।

মালতী এনকাউন্টার শব্দটা বুঝল না। সে এখন নিজের যে এক অতীব দুঃখ আছে ভুলে যাচ্ছে। সে কেবল তার প্রিয়-জনের মুখ দেখছিল। এই মানুষ তার কাছে এলে কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। কারণ সে এই মেয়েকে কতদিন লাঠি খেলা ছোরা খেলা শিখিয়েছে। রঞ্জিত এক মহান আদর্শে নিমজ্জিত। সামান্য এক বিধবা যুবতী তার কাছে কিছু না। বরং মালতীর কঠিন চোখ মুখ সে এলেই সহজ হয়ে যায়। নরেন দাসের ধারণা এবং অন্য সকলের ধারণা মালতী রঞ্জিতকে ভয় পায়। আর এখন সেই যুবক যেন নিরুদ্দেশে যাবে। নিরুদ্দেশে গেলে তার আর থাকল কি। সে এখন সবই ওকে বলে দিতে পারে। অথচ কিভাবে বলবে! এমন একটা কথা, যা নরেন দাস জেনেও বেমালুম চেপে যাচ্ছে, এবং ক্রমে সংসারে এক কঠিন অবহেলা অথবা ক্রমে এই যুবতী তার ধর্মাধর্ম থেকে উৎক্ষিপ্ত হবে, তারপর কি হবে কেউ জানে না, জানে না বললে ঠিক হবে না, যেন চ্যাংদোলা করে সবাই ওকে

নদীর পাড়ে এক রাতে বনবাসে দিয়ে আসবে—মালতী এবার কান্না কান্না গলায় বলে ফেলল, ঠাকুর আমি মরতে চাই না। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল।

রঞ্জিত দেখল চোখ ফেটে জল পড়ছে মালতীর।

ক্রমে বিকাল মরে আসছে। মাঠ থেকে ধানের গন্ধ আসছিল। যেন মনে হয়, এই যে মাঠ চারিদিকে, ফসল সর্বত্র এবং কলাই খেতে নীলচে রঙের ফুলে এবং ধান উঠতে আরম্ভ করেছে, দূরের মাঠে ধান কাটার গান শোনা যাচ্ছিল—সবই অর্থহীন মালতীর কাছে। মালতী কি করবে এখন, শোনার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

এতদিন রঞ্জিত তার সমিতির নির্দেশে কত বড় বড় কাজ অবহেলায় সমাধান করেছে। কুমিল্লাতে সে হাডসন সাহেবকে খুন করে পলাতক। পুলিশের লোক জানে সে আগরতলা হয়ে শিলচর এবং শিলচর থেকে আসামের কোথাও উধাও হয়েছে। নিখোঁজ। তার শৈশবের পরিচয় দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও পুলিশ সংগ্রহ করতে পারেনি। সে রঞ্জিত. সেই সুখময় দাস, সেই কখনও চরণ মণ্ডল এবং সে যে নদী পার হতে একবার নীলের বাদ্যি বাজিয়ে ছিল গোপাল সামন্ত নামে—সে-সব পুলিশ খবর রেখেও রঞ্জিত নামে এক বালক এখানে কৈশোর কাটিয়ে পলাতক তা তারা জানে না। এ-অঞ্চলের মানুষেরা জানে রঞ্জিত দেশের কাজ করে বেড়ায়—এই পর্যন্ত। এখন মালতী তার সামনে গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে এবং জীবনপাত করে যে আদর্শ সবই অর্থহীন, মালতীর গোঁজ হয়ে বসে থাকা সে একেবারে সহ্য করতে পারছে না। সে বড় দুর্বল বোধ করছে।

তার সামনে কত বড় মাঠ, শস্য ক্ষেত্র। সে সামান্য ফসলের জমি নিয়ে কি করবে! মালতীকে সে কোথাও পৌঁছে দিতে পারছে না। এই নিয়তি মালতীর। কিছু বলতে পারল না। মাথা নীচু করে হেঁটে হেঁটে সে গাছপালার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালতী যেমন খুপরি থেকে একটা হাঁসের মতো বের হয়ে এসেছিল.

তেমনি সে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে বসে থাকল। একটু পরে এল শোভা। বাঁ হাতে ওর লণ্ঠন। ডান হাতে কলাই করা থালাতে খই এবং গুড়. মালতীর রাতের আহার। খেতে দিলেই মালতী ঝাপ বন্ধ করে দেবে। তারপর এক অন্ধকার নিয়ে, চোখ কোটরাগত করে সে শুয়ে থাকবে। ঘুম নেই চোখে কেবল মনে হয়, কোন মরু প্রান্তে একটা পত্র পুষ্পহীন বৃক্ষ হাতছানি দিচ্ছে।

রঞ্জিত হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ে চলে এল। সেই এক অর্জুন গাছ, গাছটা ডালপালা মেলে বড় হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে ক্রমে অন্ধকার নামছে। দক্ষিণের ঘরে শশীমাস্টার ছেলেদের পড়াচ্ছে। সোনা খুব জোরে জোরে পড়ে। সে তার কঠিন কঠিন শব্দ রঞ্জিত বাড়ি এলেই শুনিয়ে শুনিয়ে পড়ে। সে যে কত বড় হয়ে গেছে এবং কত সব কঠিন কঠিন শব্দ জেনে ফেলছে এই বয়সে সে রঞ্জিত মামাকে তা জানাতে চায়। সে এত দুঃখের ভিতরেও মনে মনে হাসল। সে চলে যাবে। এসব ছেড়ে যেতে ওর সব সময়ই কেমন কষ্ট হয়। দিদির কাছে সে মানুষ বলে, যা-কিছু টান এই দিদির জন্য। এবং স্বামী তার পাগল বলে সব সময়ই মনের ভিতর নানারকমের চিন্তা—মানুষটা এভাবে সারাজীবন বাঁচবে, আর কবিতা আবৃত্তি করবে, দিদির জীবনটা বড় দুঃখে কেটে গেল। এখানে এলে সে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে এমন ভাবে। সব মাঠঘাট চেনা। তাই যেন যাবার আগে সব ঘুরে ঘুরে একটু দেখে যাওয়া। পুকুরপাড় থেকেই সে দক্ষিণের ঘরের আলোটা দেখতে পেল। শশীমাস্টার দুলে দুলে পড়ান। ইতিহাস থেকে তিনি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী ছেলেদের বলার সময় কেমন মাটি এবং মানুষের নিমিত্ত তিনি উত্তাপ পান। শশীমাস্টার এই তিন ছেলেকে সন্তানের মতো স্নেহ করেন।

সে অন্ধকার থেকে এবার উঠে এল। সংসারে আপনজন বলতে তার দিদি। আর কেউ নেই। স্বামী পাগল মানুষ। সে সোজা বাড়ি উঠে এল এবার। নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টাল। ওর স্যুটকেসের ভিতর যা যা থাকার কথা ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। মহেন্দ্রনাথ নিজের ঘরে বসে আছেন। এ-সময় তিনি সামান্য গরম দুধ খান। দিদি নিশ্চয়ই মহেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসে আছেন।

সে দিদিকে বলে দুটো খেয়ে নিল। মহেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে প্রণাম করার সময় বলল। আমি আজই চলে যাচ্ছি।

বড়বৌ আর এখন এসবে বিস্মিত হয় না। সে কখন কোথায় থাকবে অথবা যাবে কেউ জানতে চাইলে চুপচাপ থাকে। আগে বড়বৌ এ-নিয়ে সামান্য অশান্তি করত রঞ্জিতের সঙ্গে। এখন আর করে না। অসময়ে কোথাও চলে যাচ্ছে বললে বিস্মিতও হয় না। বরং সেসব ঠিকঠাক করে দেয়। কথা বেশি বলে না। রঞ্জিত বুঝতে পারে দিদি তার এই চলে যাওয়া নিয়ে ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাচ্ছে। দিদি চুপচাপ থাকলে সে টের পায়, চলে গেলে নিশ্চয়ই দিদি তার কাঁদবে। সে যাবার আগে যেমন প্রণাম করে থাকে, এবারেও তা করল। তারপর বিষণ্ন মুখ দেখে যেমন বলে থাকে, কই তুমি হাসলে না। আমি যাব অথচ তুমি হাসলে না। না হাসলে যাব কি করে?

বড়বৌ জোর করে হাসে তখন। হেসে বিদায় দেয় এই ছোট ভাইটিকে।

—এই ত আমার দিদি। বলে সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রথম দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেল। শশীমাস্টারকে বলল, চলে যাচ্ছি। সোনার মাথায় কি ঘন চুল হয়েছে. সে চুলে হাত ঢুকিয়ে আদর করল সোনাকে। বলল, যাচ্ছি আমি। তোমরা ভাল হয়ে থেক। মার কথা শুনবে। জ্যাঠামশাইকে দেখে রাখবে।

শশীমাস্টার বলল, তাহলে আবার নিরুদ্দেশে যাচ্ছেন।

—যেতে হচ্ছে।

—ফিরবেন কবে।

—বোধ হয় আর এখানে ফিরতে পারব না।

—কেন?

—অসুবিধা আছে।

—আপনি স্বদেশী মানুষ, আপনাদের সব জানার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে আপনার মতো নিরুদ্দেশে যেতে ইচ্ছা হয়। জাতির সেবা করতে ইচ্ছা হয়।

—জাতির সেবা ত আপনি করছেন। এর চেয়ে বড় সেবা আর কি আছে।

—কিন্তু কি জানেন, বলে শশীমাস্টার উঠে দাঁড়াল। দেশ স্বাধীন যে কবে হবে বুঝতে পারছি না।

—হয়ে যাবে।

—হবে ঠিক। তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছি না বলে দেরি হচ্ছে।

রঞ্জিত এমন কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

—আপনার কি মনে হয়?

—কিসের ব্যাপারে বলছেন।

—এই দেশ স্বাধীনতার ব্যাপারে।

—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লে সংসার চলবে কি করে?

—তা ঠিক বলেছেন। কিন্তু লীগ যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে যে শেষপর্যন্ত কি হয়!

রঞ্জিত এ-কথার জবাব দিতে হবে বলেই অন্য কথায় চলে এল।—এরা কিন্তু আপনার খুব ভক্ত। এরা আজকাল যত্ন নিয়ে দাঁত মাজছে।

শশীমাস্টার বলল, দাঁতই সব। আপনার দাঁত দেখি।

অন্য সময় হলে রঞ্জিত কি করত বলা যায় না। কিন্তু এখন সে চলে যাচ্ছে বলে

খুব সরল সহজ হয়ে গেছে। মনে মনে সে আজ জীবনে যা ভাবেনি, যা-কিছু স্বপ্ন ছিল, সব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অন্য জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেশ উদ্ধারের চেয়ে কাজটা কেন জানি কিছুতেই কম মহৎ মনে হচ্ছে না। তাই সে কোন কুণ্ঠা প্রকাশ না করে শশীমাস্টারকে দাঁত দেখাল।

শশীমাস্টার লণ্ঠন তুলে সবক'টা দাঁত দেখল। যেন কুশলী ডাক্তার ওর দাঁত দেখছে। মাড়ি টিপে টিপে দেখল। তারপর পল্টুকে এক ঘটি জল আনতে বলে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকাল।—আপনার নিচের পাটির দাঁত কিন্তু ভাল না।

রঞ্জিত হাসতে হাসতে বলল, কি করলে ভাল হবে?

—রোজ রাতে একটা করে হরতুকি খাবেন। বলে সে বাইরে গেল। হাত ধুল। তারপর ফিরে এসে বলল, হরতুকিতে দাঁত শক্ত হয়। লিভারের কাজ ভাল হয়। সুনিদ্রা হবে। এবং পরিপাকে এত বেশি সাহায্য করবে...বলে একটু থামল। কি যেন খুঁজল বিছানার নিচে, খুঁজে খেরো-খাতাটা পেলে পাতা উল্টে গেল। 'হ' এই শব্দের পাতা থেকে হরতুকি কত নম্বর পাতায় আছে খুঁজে হরতুকির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে শুনাতে থাকল।

রঞ্জিত দেখল লম্বা খাতায় নানারকম আয়ুর্বেদীয় ফুল-ফলের নাম। তাদের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ। রঞ্জিত বলল, এদের এসব বলুন। এ-দেশের মাটিতে যা হয় পৃথিবীর কোথাও তা পাওয়া যায় না।

শশীমাস্টার বলল, কি লালটু-পলটু, মামা কি বলছেন! তোমার মামা ত আজ চলে যাবেন। প্রণাম কর।

সকলে একসঙ্গে উঠে এসে কে আগে প্রণাম করবে, দুপদাপ প্রণাম সেরে কে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে সবার আগে বসবে তার প্রতিযোগিতা যেন। রঞ্জিত বলল, পরীক্ষা পাশের সময় এটা চাই। সবার আগে যেতে হবে। সবকিছুতে জিততে হবে। এবং এ-সময়ই দেখল রঞ্জিত ও-পাশের অন্ধকার বারান্দায় বাড়ির পাগল মানুষ চুপচাপ বসে আছেন। সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, জামাইবাবু আমি আজ চলে যাচ্ছি। বলে সে দু'পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করার সময় বলল, আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন ভাল কিছু করতে পারি।

তিনি বসেছিলেন। বসে থাকলেন। কোন উচ্চবাচ্য নেই। তাঁর চোখ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবু বোঝা যায় সারা-জীবন ধরে মানুষটি এক সোনার হরিণের পেছনে ছুটছেন। মানুষটার দিকে তাকালেই রঞ্জিতের চোখ ছল ছল করে ওঠে।

সে তাড়াতাড়ি এবার পশ্চিমের ঘরে ঢুকে গেল। ধনবৌকে প্রণাম করার সময় বলল, ধনদি, আজ চলে যাচ্ছি।

ধনবৌ বলল, সাবধানে থাইক।

তারপর সে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে খুব ঘন অন্ধকারের ভিতর মাঠে নেমে গেল। শশীমাস্টার, সোনা, লালটু, পলটু, হ্যারিকেন নিয়ে পুকুরপাড় পর্যন্ত এসেছিল। তারপর আর যায়নি। রঞ্জিত নিজেই বলেছে, আপনারা ফিরে যান মাস্টারমশাই। অন্ধকারে আমি ভাল পথ দেখতে পাই। আলো থাকলে বরং চোখে ঝাপসা লাগে।

অন্ধকারে নেমে আসতেই আবার সেই মাঠ, সোনালী বালির নদী, তরমুজের জমি এবং উপরে আকাশ, চিত্র-বিচিত্র সব নক্ষত্র আর মাঠের এক নির্জনতা ওকে শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শৈশবে সে এবং সামসুদ্দিন আর মালতী—মালতীকে নিয়ে এরা নদীতে সাঁতার কাটত। সাঁতার কেটে ও-পারে উঠে যেত। গয়না নৌকার নিচে কখনও কখনও রঞ্জিত লুকিয়ে থাকলে মালতী ভয় পেত। সে ডাকত, ঠাকুর।

কে যেন তেমনি মনে হয় এখনও তার পিছনে ডাকছে। ঠাকুর তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে। তুমি দেশের কাজ করে বেড়াও, আমি কি তোমার দেশ না? তোমার এই জলা-জমি অথবা মাটিতে আমি বড় হয়ে উঠি না! আমার সুখ-দুঃখ তোমার সুখ-দুঃখ না! ঠাকুর, ঠাকুর কি কথা বলছ না কেন?

রঞ্জিত যত দ্রুত হাঁটবে ভেবেছিল, সে তত দ্রুত হেঁটে যেতে পারছে না। কে যেন তাকে কেবল নিরন্তর ডেকে চলেছে। আমি কি করি ঠাকুর। মনে হল সে যেতে যেতে কোন গাছের ছায়ায় অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে পড়ছে। যত তাড়াতাড়ি সে এ-অঞ্চল ছেড়ে যাবে ভেবেছিল, কেন জানি সে যেতে পারছে না। বস্তুত ওর পা চলছিল না। তার মাথার উপর বড় এক আকাশের মতো পবিত্রতা নিয়ে মালতী জেগে রয়েছে। সে আর এক পা বাড়াতে পারল না।

সে সেই অশ্বত্থ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্ধকার কি ঘন! আর কি প্রাচীন মনে হয় এই সব তরুলতা! সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছু প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করছে। বিন্দু বিন্দু সব আলো গাঁয়ের ভিতর জ্বলছে নিভছে। রাত এখনও তেমন গভীর নয়। ভুজঙ্গ এবং কবিরাজকে লাঠিখেলা, ছোরা খেলার সব নির্দেশ, আর কি আখড়া খুলতে হবে নূতন, সে গেলে কার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ রাখতে হবে সবই সে ঠিকঠাক বলেছে কিনা আর এক-বার এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল। কোথাও তখন কোন কুকুর আর্তনাদ করছে। শেয়ালেরা ডাকছে। জালালির কবরে এক ঝোপ কাশের বন সৃষ্টি হয়েছে এত-দিনে। সেই কাশের সাদাফুল এই অন্ধকারে এক ফালি জ্যোৎস্নার মতো দুলছে চোখে। বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ জীবন-সংগ্রাম ছিল জালালির। মৃত্যুর পর এক-খণ্ড ভূমি পেয়ে সে এখন কি মনোরম হাসছে। কারণ রঞ্জিতের মনে হচ্ছিল অন্ধকারে, না কাশ ফুল, না জ্যোৎস্না, যেন একখণ্ড জমির জন্য ভালবাসা ছিল জালালির। সে তা পেয়ে ছোট্ট শিশুটির মতো হাসছে। কাশ ফুলের মতো পবিত্র হাসিটি মুখে লেগে আছে জালালির।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে হল, এই এক-খণ্ড জমি সকলের প্রাপ্য। সবাইকে এই দিতে হবে। অভুক্ত এবং ভূমিহীন মানুষ, ভূমিহীন বলতে পায়ের নিচে মাটি নেই এমন মানুষ সে ভাবতে পারে না। তার ঘর থাকবে, চাষ আবাদের জমি থাকবে, সে কিছু খাবে, খেতে পাবে, খেতে না পেলে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ হয় না। স্বাধীনতা বলতে সে মানুষের এই বোঝে। তার কেন জানি এবার মনে হল, সে এক খণ্ড জমি মালতীকেও দেবে।

অথবা এই অন্ধকারে, ঘন অন্ধকারে দাঁড়ালেই সে কেমন সাহসী মানুষ হয়ে যায়। ওর মৃত্যুভয় থাকে না। রাতের পর রাত, এমন সব মাঠ-জঙ্গল, নদী-বন, যদি কোথাও পাহাড় থাকে, সিংহ-শাবকের মতো পাহাড় বেয়ে ওঠা, যেন নিরন্তর এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে অভিযান—দুঃসহ এইসব অভিযান তাকে মাঝে মাঝে বড় বেশি বাঁচার প্রেরণা দেয়। কিছু না করতে পারলেই মনে হয় সে মৃত। একেবারে জীবন তখন। বাঁচার কোন প্রেরণা থাকে না। উৎসাহবিহীন মানুষের মতো তাকে অধার্মিক করে ফেলে। হাডসন সাহেবকে হত্যার পর সে আবার নতুন কিছু করতে যাচ্ছে। প্রায় এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে অভিযানের মতো এই ঘটনা। অন্ধকার থেকে নরেন দাসের বাড়ি স্পষ্ট। বিন্দু বিন্দু আলো এখনও জ্বলছে। বোধ হয় নরেন দাস গোয়ালে গরু বাঁধছে। এবং আভারানী ঘাট থেকে বাসন মেজে এলেই সে এগুতে পারবে। ওদের এবার শুধু শুয়ে পড়তে দেরি। মালতীকে নিয়ে ভয়-ডর তাদের কমে গেছে। কারণ মালতীর শরীরে আর এখন ঘোড়া দৌড়ায় না। মালতী রুগ্ন, শীর্ণকায়, অবসন্ন। এবং শরীরের ভিতর মালতীর ধর্মাধর্ম এখন ঢাকঢোল বাজাচ্ছে। মালতীকে ঘরে জায়গা দিচ্ছে না নরেন দাস। মালতী এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে।

ক্রমে রাত বাড়ছে। ভোর রাতের দিকে ঠাকুরবাড়ি পুলিশে ঘিরে ফেলবে। এমন খবরই তার কাছে আছে। সন্তোষ দারোগা নারানগঞ্জে গেছে আর্মড ফোর্সের জন্য। সামান্য একজন মানুষকে ধরবার জন্য সন্তোষ দারোগা গোপনে গোপনে মহোৎ-সবের ব্যাপার করে ফেলছে। ভীষণ হাসি পেল দারোগার ভয় এত বেশি ভেবে।

কে সেই মানুষ, সে এখন ভেবে পাচ্ছে না—যারা তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে। এখানে তার কার সঙ্গে শত্রুতা। কয়েক ক্রোশ দূরে থানা। যেতে আসতে সময় অনেক। জলা-জায়গা বলে কেউ বড় এদিকটাতে আসতে

চায় না। সে এখানে বেশ অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু চুপচাপও বসে থাকা যায় না। সমিতির কাছে সে নির্দেশ চেয়ে পাঠাল। তাদের নির্দেশমতো একের পর আখড়া খুলে চলছিল গ্রামে গ্রামে। তারপর এক খবর, এক মানুষ বাউল সেজে চিঠি দিয়ে গেল—পুলিশ তার সূত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত। তাকে পালাতে হবে।

এবার মনে হল নরেন দাসের বাড়ির যে বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলছিল, তা নিভে গেছে। সে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছে। উপরে জহর কোট। কোটের নিচে হাত রেখে দেখল—না, ঠিক আছে। সে এবার সন্তর্পণে এগুতে থাকল। তার আর এখন কোন ভয় নেই। দেখল সামনের অন্ধকারে একটা জীব ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। সে রিভলবারটা চেপে ধরতেই মনে হল, ওটা বাড়ির আশ্বিনের কুকুর। সে চলে যাচ্ছে বলে তাকে বিদায় জানাতে এসেছে।

রঞ্জিত বলল, বাড়ি যা। এখানে কি।

কুকুরটা তবু পায়ে পায়ে আসতে লাগল।

সে বলল, তুই যা বাবা। আমি এত-দিনে একটা ভাল কাজ করতে যাচ্ছি।

কিন্তু কুকুরটা পাশে পাশে হাঁটছেই।

—কি বলছি যে শুনতে পাচ্ছিস না।

কুকুরটা এবার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

—হ্যাঁ হয়েছে। খুব হয়েছে। এবারে যা।

কুকুরটা যথার্থই এবার ছুটে পুকুর-পাড়ে উঠে গেল। এবং অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত কোনদিকে যাচ্ছে দেখল।

রঞ্জিত মালতীর দরজার সামনে সন্তর্পণে দাঁড়াল। ঝাঁপের দরজা। টর্চ জেলে সে ঝাঁপের দরজায় ফাঁক আছে কিনা দেখল। সে কোন ফাঁক খুঁজে পেল না। সুতরাং ধীরে ধীরে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, মালতী। মনে হল তখন ভিতরের জীবটা জেগে আছে। সামান্য ডাকেই তার সাড়া মিলেছে। সে উঠে বসেছে। গলার স্বর চিনতে পেরে মালতীর বুক কাঁপছিল। সে কাঁপা হাতেই ঝাঁপ খুলে দিল।

—আমি।

মালতী কথা বলল না।

—এবার আমরা যাব।

মালতী বুঝতে পারছে না—আমরা যাব বলে রঞ্জিত কি বুঝাতে চাইছে। সে মাথা নিচু করে ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার সঙ্গে তুমি যাবে।

—কোথায়? সহসা মালতী রঞ্জিতের মতো প্রশ্ন করল।

—যেদিকে দু'চোখ যাবে।

—কিন্তু আমার যে কথা ছিল ঠাকুর।

—এখন আর কোন কথা না মালতী। দেরি করলে আমরা ধরা পড়ে যাব।

—কিন্তু আমার ভয় করছে। তোমাকে সবটা বলতে না পারলে।

—রাস্তায় সবটা তোমার শুনব। তুমি তাড়াতাড়ি এস।

মালতী এবার খুপড়ির ভিতর ঢুকে দুটো সাদা থান, সেমিজ এবং পাথরের থালা নিল সঙ্গে।

—এত নিয়ে পথ হাঁটতে পারবে না।

সে পাথরের থালা রেখে দিল।

রঞ্জিত বলল, আমাদের রাতে রাতে গজারীর বনে গিয়ে ঢুকে পড়তে হবে।

ওরা নদীর চরে নেমে আসতেই শুনল টোডারবাগের ও-পাশে কারা টর্চ জ্বালিয়ে আসছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ। রঞ্জিত বুঝতে পারল, রাতে রাতে সন্তোষ দারোগা গ্রাম ঘিরে ফেলছে। সে মালতীকে বলল, জলে ঝাঁপিয়ে পড়।

পুলিশের লোকগুলি টর্চ এবার নিভিয়ে দিল। ওরা চলে যাচ্ছে।

রঞ্জিত বলল, জলে ডুবে থাক।

ওরা জলের ভিতর যখন ডুব দিল, তখনই মনে হল কেউ টের পেয়ে গেছে। সে বলল, মালতী সাঁতার কাটতে হবে। যত জোরে সম্ভব। বলে সাঁতার কেটে ওরা নদীর পাড়ে উঠলে দেখল টর্চের আলো এসে এ-পারে পড়েছে। বুঝি রঞ্জিত ধরা পড়ে গেল। টর্চের আলোতে বুঝি ওকে খুঁজছে।

রঞ্জিতের এমন একটা ভয়াবহ ব্যাপারে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। মালতীকে নিয়ে যা সামান্য অসুবিধা। সে মালতীকে বলল, বুঝতে পারছ ওরা কিছু টের পেয়েছে। ওরা আগে আগে এসে গেল।

মালতী কিছু বুঝতে পারছে না। সে বসে বসে এখন ওক দিচ্ছে।

—কি হয়েছে তোমার?

মালতী বলল, ঠাকুর তুমি পালাও। দেরি করলে ওরা ধরে ফেলবে।

রঞ্জিত যেমন স্বভাবসুলভ হাসে, তেমনি হাসল। সে বলল, এটা তুমি পার। এটা আমাকে বিপদ থেকে অনেকবার রক্ষা করেছে।

মালতী দেখল, কালো রঙের একটা বোরখা। ওরা বনের ভিতর ঢুকে পোষাক পাল্টে ফেলল। সে তার স্যুটকেস থেকে এক এক করে সব বের করল। বলল, এখানে টিপলে গুলী বের হবে। এই দ্যাখো। এটাকে বলে ট্রিগার। সে আলো জেলে সব বোঝাল। এই ট্রিগার। ভাল হোল্ডিং চাই। এমিও খুব তীক্ষ্ণ দরকার। কিন্তু একি মালতী, ওক দিচ্ছ কেন? মালতী ওক দিতে দিতে কথা বলতে পারছে না।

রঞ্জিত বলল, তোমার কি হয়েছে মালতী, তুমি ঠিক করে বল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মালতী যা এতদিন বলবে ভাবছিল, ঘৃণায় যা বলতে পারছিল না, এখন এই দুঃসময়ে রঞ্জিতকে সে তা মরিয়া হয়ে বলে ফেলল।

—ঠাকুর, আমি মা হইছি। তিন মানুষ আমারে জননী বানাইছে। আর কিছু বলতে পারছে না। মালতীও উপর্যুপরি ওক দিচ্ছে কেবল।

অন্ধকারে রঞ্জিত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মালতী পায়ের কাছে বসে ওক দিচ্ছে। ও-পারে অজস্র টর্চের আলো। বনের ভিতর আলো ঢুকছে না। সেই আলোর কণা শুধু বৃষ্টিপাতের মতো পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকছে। রঞ্জিত এবার হাঁটু গেড়ে বসল। মাথায় হাত রাখল মালতীর। বলল, আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে মালতী। আমরা কোথায় যাব জানি না। তুমি ওঠ।

এ-ভাবে নদীর পাড়ে যে বন, যে বন একবার পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে হাতীতে চড়ে অতিক্রম করেছিল, সে বনে মালতী এবং রঞ্জিত সারারাত সকাল হবার আশায় গাছের নিচে পাশাপাশি শুয়েছিল। রঞ্জিত আর একটা কথাও বলেনি। মালতী ভয়ে ঘাসের ভিতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। দুজনই সারারাত জেগে ছিল। এরপর কি কথা বলে যে আবার স্বাভাবিক হওয়া যায় রঞ্জিত ভেবে উঠতে পারছে না। কোথায় যাবে, কার কাছে নিয়ে যাবে এবং সে এমন এক মেয়ে নিয়ে এখন সে কি করে? গাছের শাখা-প্রশাখা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। শেষ রাতের জ্যোৎস্না গাছের পাতায় পাতায়। সেই যেন পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। অথবা কে যেন আবার উচ্চস্বরে পড়ে চলেছে—এট লাস্ট দি সেলফিস জায়েন্ট কেম। খুব সকালে আকাশ ফর্সা না হতে মালতীই ডেকে দিয়েছে। রঞ্জিতের চোখে ভোর রাতের দিকে ঘুম এসে গেছিল।

রঞ্জিত ধড়ফড় করে উঠে বসল। সে নিজে একটা লুঙ্গি পরল। সে তার স্যুটকেস থেকে আঠা এবং রঙিন কিছু পাট বের করে একেবারে সে অন্য মানুষ সেজে গেল। বোরখার নিচে বিবি, আর রঞ্জিত এক মিঞাসাব। ভাঙা ছাতি বগলে। মিঞা-বিবি মেমান বাড়ি যাচ্ছে এমনভাবে রঞ্জিত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল।

যেতে যেতে মালতী বলল, তুমি ঠাকুর আমারে জোটনের কাছে রাইখা যাও।

রঞ্জিত কথা বলল না। এ-অবস্থায় ওকে কোথায় আর নিয়ে যাওয়া যাবে। সে দরগার উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল। দিনমান হাঁটলে সে মালতীকে নিয়ে জোটনের দরগায় পৌঁছাতে পারবে। মালতীকে আপাতত জোটনের কাছে রেখে সে কোথাও চলে যাবে ভাবল।

আর সে হাঁটতে হাঁটতেই কার উপর আক্রোশে বনের ভিতর সহসা চিৎকার করে উঠল, বন্দেমাতরম। আক্রোশের প্রতিপক্ষ জব্বর, না সন্তোষ দারোগা ওর চোখমুখ দেখে তা ধরা গেল না।

(ক্রমশঃ)

নিকটেই আছে

সব খেলা খেলা না

শীত আসতে আর দেরী নেই বিশেষ। সরকারী স্কুল-কলেজে নাকি এরই মধ্যে শীত পড়ে গেছে—ফ্যান-ট্যান সব বন্ধ। ভাগ্যিস কলেজটা পুরোপুরি সরকারী নয়। স্পনসরড তাই রক্ষে। রেগুলেটরের কাঁটাটা ঘুরিয়ে 'অনে' দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রফেসর মিত্র। দরদর করে কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। সারা শরীর এখনো কাঁপছে। এতবড় স্পর্ধা লোকটার। বলে কিনা—আপনি তো নিলেন না স্যার, কিন্তু যারা নেবার তারা আপনাকে কলা দেখিয়ে দিল। গোড়ায় যদি আমার রিকোয়েস্টটা রাখতেন...। লোকটা অবিশ্যি আর এগুতে সাহস করেনি। বোধ হয় প্রফেসরের চোখ-মুখ ওর বিশেষ সুবিধার ঠেকে নি। তাই তাড়াতাড়ি সটকে পড়তে যাচ্ছিল। তার আগেই বাঘের মত গর্জে উঠলেন প্রফেসর মিত্র—গেট আউট, ইউ স্কাউণ্ড্রেল, আই সে, গেট আউট।

প্রফেসর মিত্রের গলার আওয়াজে প্রফেসরস রুমেই সবাই চমকে উঠেছিল। দু একজন তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিল। অনিল সেন, বিজয় ঘোষ এখন প্রফেসর মিত্রের কলিগ হলেও একদিন এই কলেজেই পড়েছে। ওরাই আগে এল। জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে স্যার?

জবাবটা দেওয়ার আগেই 'স্কাউণ্ড্রেলটা' চোরের মত ছুটে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সবাই জানতে চাইল কি ব্যাপার? কি হল প্রফেসর মিত্র? কি হয়েছে স্যার? হইল কি মিত্তির, অ্যাত চটলা ক্যান? সবাই তখন ছেঁকে ধরেছে প্রফেসর মিত্রকে। শান্ত নির্বিরোধী এই লোকটাকে কেউ কোনদিন রাগতে-টাগতে দেখে নি। বাড়ী-কলেজ আর কলেজ-বাড়ীর মধ্যেই যার জীবনের তেইশটা বছর কেটে গেল, মাইক্রো ইক-নমিকসের প্রবলেমের বাইরে আর কোন প্রবলেম যে মানুষের জীবনে থাকতে পারে এ কথা যার মুখে কেউ কখনো শোনে নি, সে কেন হঠাৎ এ রকম ক্ষেপে উঠল?

কিন্তু ততক্ষণে ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। ফোর্থ পিরিয়ডে থার্ড ইয়ারের একটা ক্লাস ছিল। ক্লাসের দোহাই পেড়ে এতগুলো লোকের অনুরোধ ঠেলে বলতে গেলে তখন এক রকম পালিয়েই বেঁচে ছিলেন প্রফেসর মিত্র। কিন্তু ক্লাসে গিয়েও লাভ হোল না কিছু। মনটা দারুণ অস্থির হয়ে পড়েছে। হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারলেন না। কথা ছিল আজ কস্ট অব প্রোডাকশন অ্যাণ্ড কস্ট কার্ভস পড়াবেন। যতবার পড়াতে গেলেন ততবারই মনে হোল এতদিন ধরে টেকস্ট আর রেফারেন্স বই ঘেঁটে কস্টের যে সংজ্ঞা আর সমাধান জেনেছেন, তা ঠিক নয়। বই-এর পাতার বাইরেও আরো অনেক ব্যাপার আছে বা থাকে যা নিজে জানলেও ছাত্রদের বলা চলে না। পড়াতেই পারলেন না। খানিক বাদে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। ফুলফোর্সে ফ্যানটা চালিয়ে দিলেন। তারপর চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন চেয়ারে। দু একজন কাছেপিঠে ঘুরঘুর করছে। বুঝতে পারছেন তারা জানতে চায় কেন প্রফেসর মিত্র এখন হঠাৎ অত চটে উঠলেন? কিন্তু একটা নোংরা ব্যাপার নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতেও ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে সব ব্যাপারটা প্রিন্সিপ্যালকে লিখে জানিয়ে এই বিশেষ দায়িত্বের বোঝাটা নামিয়ে রাখলে কেমন হয়?

স্বেচ্ছায় তো আর এই দায়িত্ব উনি নেন নি। বলতে গেলে একরকম জোর করেই বোঝাটা প্রিন্সিপ্যাল এবারের টিচার্স কাউন্সিলের মিটিংয়ে ওঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। নাহ, কেউ আর শান্তিতে থাকতে পারবে না। এতদিন প্রফেসর ব্যানার্জীই এই সব ঝক্কি ঝামেলা পুইয়েছেন। পুইয়ে-ছেন না হাতি। লোকটা যা যা বলেছে তার একাংশও যদি সত্যি হয়—ছিঃ ছিঃ। অধ্যাপক হয়ে কি করে প্রফেসর ব্যানার্জী এই নোংরামিতে নিজেকে জড়ালেন? আর তার ফল কি হয়েছে—না, এদের ধারণা সব অধ্যাপকই বুঝি ইয়ে। সবাই ইয়ে চায়। ছাত্ররাও সব জানে।

প্রফেসর ব্যানার্জী অনেকদিন ধরেই যাব যাব করছিলেন। স্মার্ট ইয়ংম্যান। শিক্ষকতাটা ওঁর ধাতে পোষায়নি কোনদিনও। নিরুপায় হয়েই এতদিন পড়ে ছিলেন। অবিশ্যি হাল ছাড়েন নি কখনো। চেষ্টাচরিত্র করছিলেন। যদি কোথাও ভিড়ে পড়তে পারেন। আর এমনই কপাল, যখন বাজারে এখন কোথাও কোন চাকরী নেই, ঠিক এই সময়েই বোম্বের ডাকসাইটে ফার্মে এক্সিকিউটিভ পোস্টে বহাল হয়ে গেলেন। মোটা মাইনে প্লাস বোনাস। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্বের চেয়েও আজ যা লোভনীয়। উনি চলে গেলেন।

আর চলে যেতেই যত ঝঞ্ঝাট বাধল। এতদিন প্রফেসর ব্যানার্জীই ছিলেন প্রফেসর-ইন-চার্জ অব গেমস। প্রিন্সিপ্যাল পড়লেন ফাঁপরে। কেউ আর ঐ দায়িত্ব নিতে চায় না। বলে, রক্ষে করুন, একেই টিচার্স-স্টুডেন্ট সম্পর্কটা খুব সুবিধের নয়, তারপর কি করতে কি করে বসব বা কি বলতে কি বলে ফেলব, তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে। তার চেয়ে অমুককে দিন, উনি মোর এফিসিয়েন্ট, স্টুডেন্টস-প্রবেলম-গুলো ভালো বোঝেন, ট্যাকলও করতে পারবেন।

একে একে সবাই যখন মুখ ঘুরিয়ে নিল, তখন করুণ মুখে প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মিত্রের দিকে তাকিয়ে রিকোয়েস্ট করলেন—এই ভাঙা সেশনটা আপনি দয়া করে চালিয়ে দিন। কথা দিচ্ছি নেকস্ট সেশনে আর কেউ যদি রাজী নাও হন, আমি নিজেই এ দায় সামলাব। আপনি আর কাইণ্ডলি 'না' বলবেন না। ...এরপর কি আর না বলা যায়? অন্তত প্রফেসর মিত্র পারেন নি।

আর তাছাড়া 'না' বলবারই বা কি আছে? ছেলেদের ব্যাপার, ছেলেরাই সব করবে, আপনি শুধু ওপর ওপর একটু দেখাশোনা করবেন, প্রিন্সিপ্যাল তখন এই সব বলেছিলেন। অবিশ্যি মিটিংয়ের শেষে অনিল, বিনয় ওরা অন্য কথা বলেছিল—এ দায়িত্ব আপনি না নিলেও পারতেন স্যার। অ্যাপারেণ্টলি কোন ঝামেলা নেই ঠিক, কিন্তু পরে দেখবেন ভেতরে অনেক গ্যাঁড়াকল। আমরা তো কয়েক বছর আগেও এই কলেজেই ছাত্র ছিলাম স্যার।

তা তোমরা বাবা কেউ দায়িত্ব নাও না। এই বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে কেন টানাটানি করছ। আমি এসব জানিও না, বুঝিও না—কেমন ভয় পেয়েই কথাগুলো বলে-ছিলেন প্রফেসর মিত্র।

স্যারের কথা শুনে অনিল সেন, বিজয় ঘোষ যেন চমকে উঠেছিল—না না স্যার। তবু আপনি বুড়োমানুষ বলে পার পেয়ে যাবেন। আমরা পারব না স্যার। তাছাড়া এখনকার আবহাওয়াটা স্যার রীতিমত ডেঞ্জারাস।

আবহাওয়াটা যে ডেঞ্জারাস, সে তো ভালো মতই জানেন প্রফেসর মিত্র। তবু নতুন দায়িত্বটার ডেঞ্জার তখন বুঝতে পারেন নি। পারলেন পুজোর ছুটিতে।

পুজোর কটা দিন কাটতে না কাটতেই একদিন ভোরে ছাত্রদের গেমস সেক্রেটারী সুবিনয় এল এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। পরিচয় করিয়ে দিল—উনি রাধেশ্যাম স্পোর্টসের সেলসম্যান। সামনে ক্রিকেট সীজন। আমাদের ব্যাট-ট্যাট সব স্যার

এদের কাছ থেকেই বরাবর কিনি। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

তা বেশ করেছ। তবে এখন তো ছুটি চলছে। ছুটি শেষ হোক, কলেজ খুলুক—তারপর তোমাদের যা যা লাগে লিস্ট করে দিও, আমরা কোটেশন কল করব। মোটামুটি ফেয়ার প্রাইসে যাঁরা দেবেন, তাঁদের কাছ থেকেই আমরা সাপ্লাই নেব।—ব্যাপারটা সহজ করে তুলতে চেয়েছিলেন প্রফেসর মিত্র। প্রিন্সিপ্যালই তাকে কলেজের নিয়মকানুন সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্পোর্টস ফান্ডের টাকাটা ছেলেদেরই। বছরে প্রায় হাজার নয়েক টাকার কেনাকাটা হয়। অলরেডি ফুটবলের জন্য তিন, সাড়ে তিন হাজার ব্যয় হয়ে গেছে। ওসব খরচপত্র প্রফেসর ব্যানার্জীর সময়ই হয়েছে। সামনে আছে বড় বড় দুটো খরচ—ক্রিকেট আর অ্যানুয়াল স্পোর্টস। একটু দেখেশুনে না চালালে ফান্ড সর্ট পড়তে পারে। আর তাছাড়া ছেলেরা বায়না ধরলেই সব কেনা চলে না, কারণ অত টাকা নেই।

সুবিনয় চলে গেল সেদিন। কিন্তু সেই যে কেউ লাগিয়ে দিয়ে গেল, সে আর ছাড়ে না কিছুতেই। নিত্য আসতে লাগল—সকাল, বিকেল দুবেলা। নানা রকম প্রাইস লিস্ট খুলে কোনটার দাম কত, কোনটা বেশী টেকসই, কোনটা কলেজ গেমের উপযোগী, সব বোঝাতে শুরু করল। প্রফেসর মিত্র ভদ্রতার খাতিরে তাড়িয়েও দিতে পারেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন। যত বলেন—দেখুন জীবনে আমি ক্রিকেট খেলি নি, কাকে আপনারা লং হ্যান্ডেল বলেন আর কাকে বলেন সর্ট হ্যান্ডেল সে সব কিছুই জানি না। যারা এসব জানে, তাদের এখন ছুটি চলছে। কলেজ খুলুক, ছাত্ররা আসুক। তারপর রিকোয়ারমেণ্ট বুঝে আমরা কেনাকাটা করব।

কিন্তু কেউ কি অত সহজে ছাড়ে? তার জানার পরিধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন প্রফেসর মিত্র। কবে কোন বছর তার কলেজ কোন স্পোর্টস গুডসের দোকান থেকে কি কি কিনেছিল, সে সবের দাম কত, তার মধ্যে কোনটা এখন কলেজে আছে, কোনটা ভেঙে গেছে বা সারানোর অযোগ্য, কোনটা মিসিং—হি নোজ এভরিথিং।

ঠিক আছে আপনার এই লিসটটা আমায় দিয়ে যান, বললেন প্রফেসর মিত্র, কলেজে গিয়ে এর সংগে মিলিয়ে আমাদের নতুন লিস্ট বলব। সেকেন্ড নভেম্বর কলেজ খুলবে, তার এক সপ্তাহ বাদেই না হয় আপনি দেখা করবেন। ইন দ্য মিন টাইম আমরা কোটেশন পাঠাব সব দোকানে। আপনারাও পাবেন একই সংগে।

সে তো স্যার পাবই। তবে কি, আপনি যদি একটু রাজি হন, তাহলে মিছিমিছি এসব কোটেশনের ঝামেলায় যেতে হয় না, আর অর্ডারটার সম্বন্ধে আমাদের কোম্পানীও নিশ্চিন্ত হয়।

লোকটার কথা বলার ঢংয়ে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন প্রফেসর মিত্র। বিরক্ত হওয়ার চেয়েও রাগই হয়েছিল বেশী। তুমি বাপু সেলসম্যান, তোমার সেলস নিয়েই থাকো, আমার কি করণীয় তা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই না। কিন্তু এসব বলতে চক্ষুলজ্জায় আটকায়, তাই ভদ্রভাবেই বলেছিলেন—আপনার কোম্পানীকে নিশ্চিন্ত করার চেয়েও কলেজের, ছাত্রদের ইন্টারেস্টটাই দেখা আমার উচিত নয় কি?

তাতো ঠিকই স্যার। তবে কি জানেন, প্রফেসর ব্যানার্জীর আমলে আমরা চিরকালই আগেভাগে অ্যাশুয়রড হয়েছি। বুঝতেই তো পারছেন বাজারের অবস্থা কি। স্পোর্টস গুডসের বাজারে প্রচণ্ড কম্পিটিশন। কোম্পানী স্যার ক পয়সা মাইনে দেয়। যা পাই তাতো আসে কমিশন থেকে। একশ টাকার মাল বেচলে আমাদের টুয়েলভ পার্সেণ্ট। আর সে তো আপনাদের দয়াতেই।

সারাজীবন কলেজে ইকনমিকস পড়াচ্ছেন প্রফেসর মিত্র। জিনিসের দাম, সাপ্লাই, ডিম্যান্ড, পারফেকট কম্পিটিশন, মনোপলি, কস্ট কার্ভের জটিল রহস্য-এর বাইরে যে জীবন তার পরিচয়, নিজের বাঁচার প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কোনদিনই জানতে চান নি বা পারেন নি। ইচ্ছে হোল জানতে, স্পোর্টস গুডসের একজন সেলসম্যান কত মাইনে পায়? কমিশন থেকেই বা আসে কত? কতগুলো কোম্পানী আছে এ লাইনে? কেনে কারা? বছরে কত টাকার ট্রানজ্যাকশন হয়? হাজারটা প্রশ্ন তখন মাথার ভেতরে জমে উঠেছে। আর ঠিক তখুনি কানে এল—।

আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা এক পাও এগোতে পারি না। বলতে বলতে ভদ্রলোক থামলেন একটু। তারপর একটা আলগা চতুর হাসি হেসে বললেন—এর জন্য স্যার আপনারাও ঠকেন না।

তার মানে!—যেন ভীষণ একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলেন প্রফেসর মিত্র।

মানে তো স্যার জানেনই। টাকা দিয়েই টাকা তুলতে হয়। এটাই বিজনেস ট্রিক।

কাঠ কাঠ কথাকটা শুনে লোকটা ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি প্রাইস লিস্ট আর অন্যান্য টুকিটাকি দু একটা কাগজ হ্যান্ডব্যাগে ভরতে ভরতে উঠে দাঁড়াল। তারপর গলার স্বরটা আন্তরিকতায় চুবিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল—স্যার প্রফেসর ব্যানার্জী নিতেন ফাইভ পারসেণ্ট। আপনাকে না হয় আর এক পার্সেণ্ট বেশীই দেব। আপনারা এ সীজনে আরো সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মাল কিনবেন ক্রিকেট আর স্পোর্টস মিলিয়ে। আমাদের কাছ থেকে নিলে আপনি নগদ—।

গেট আউট, আই সে, গেট আউট—সেদিনও এ রকম পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর মিত্র। বাবার উন্মত্ত চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে বড় ছেলে মণ্টু আর মেয়ে বুলা ছুটে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে বাবা? খোলা দরজার দিকে আঙুল উঁচিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেদিন প্রফেসর তাঁর ছেলেমেয়েদের বলেছিলেন—ঐ লোকটাকে কোনদিন আর এ বাড়ীতে ঢুকতে দিবি না।

কিন্তু কি লাভ হোল? নিজে ভালমানুষ সাজতে গিয়ে অজান্তে যে পাতা ফাঁদেই আজ আটকে গেলেন। পাছে কেউ কোনদিন এই অপবাদ দেয় যে প্রফেসর মিত্র ছেলেদের ঠকিয়েছেন, তাই কলেজ খোলার সংগে সংগে ক্লার্ককে বলেছিলেন ছেলেদের সংগে কনসাল্ট করে রিকোয়ারমেণ্টের তালিকা বানাতে। সেই অনুযায়ী কোটেশনও কল করা হোল। কিন্তু, কি করে কি হয়ে গেল, অর্ডারটা ঐ লোকটাই পেয়ে গেল। পরে অবশ্য টের পেয়েছেন কি করে পেল। কিন্তু এ সব নোংরা কারণ আর কি করে অপরকে বলবেন প্রফেসর মিত্র। তাই মনে মনে ডিসিশনটা পাকা করেই, দেরাজ থেকে নিজের লেটারহেডটা বার করে খসখস করে একটা আর্জির মুসাবিদা শুরু করে দিলেন—

"......কারণ জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার আন্তরিক অনুরোধ এই দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিন।"

—সন্দিৎসু

মনের কথা

ব্যভিচার ও অভিচার ভ্রান্তিরোগের বিশিষ্টতা

প্যারানইয়ার রোগীর ডিলিউশনে ব্যভিচার ও অভিচার-বিভ্রমের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্ত্রীর ব্যভিচারের বিশদ বিবরণ রোগী এমন নিপুণভাবে পরিবেশন করে যে চিকিৎসকের মনেও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ সংক্রমিত হয়ে পড়ে। অভিচার সম্পর্কে অবশ্য এ কথা বলা চলে না। তন্ত্রমন্ত্রাদি প্রক্রিয়ার সাহায্যে রোগীর শারীরিক বা মানসিক অনিষ্ট সাধন করা হচ্ছে—এই অভিচার-বিশ্বাস ডাক্তারকে আদৌ প্রভাবিত করে না। ব্যভিচার অভিচার, দুইই নির্যাতনমূলক ডিলিউশনের অভিব্যক্তি। স্ত্রীর ব্যভিচারকে রোগী আত্মমর্যাদা ও পৌরুষের উপর নির্যাতন মনে করে, অভিচারকে মনে করে শত্রুপক্ষের প্রত্যক্ষ নির্যাতনের প্রমাণ। প্রথমে ব্যভিচার-বিভ্রমের দুটি ঘটনা বিবৃত করছি।

মিশিরজীকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন তাঁর বন্ধুবান্ধব সহকর্মীরা। স্ত্রীর উপর তিনি উৎপীড়ন চালাচ্ছেন। তাঁর মতন সৎ ও শান্তপ্রকৃতির মানুষ স্ত্রীকে মারধোর করছেন জেনে তাঁর পরিচিত সকলেই বিস্মিত বোধ করছেন। অন্য কোনো দিকে তাঁর আচরণে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে না। তাঁর অতি-অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জানিয়েছেন যে স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত, তাকে সায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে তিনি শাসন করছেন। স্বামী হিসেবে এই শাসন করার অধিকার তাঁর আছে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে দুই সহকর্মীর অনুরোধে মিশিরজী আমার সংগে দেখা করলেন। মিশিরজী এক শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বয়স ৪৫, প্রায় ৩০ বছর কোলকাতায় আছেন। হিন্দীভাষী উত্তর-ভারতের লোক। প্রথমে কয়েক বছর দারোয়ানী করেছেন। এখন সারাক্ষণের ইউনিয়ন-কর্মী। নিজের চেষ্টায় হিন্দী উর্দু শিখেছেন। ইংরিজি বাংলাতেও কথা বলতে পারেন। সুবক্তা ও সংগঠক হিসেবে শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম। সংগীত রচনা করেন, নিজের লেখা গানে সুর আরোপ করেন ও ছোটখাটো সভায় সংগীত পরিবেশন করেন। নিজের গাঁয়ে বছরে একবার করে যাতায়াত করেন, সেই সময়েই স্ত্রী ও সন্তানদের সংগে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমানে কয়েক মাস ধরে স্ত্রী কোলকাতায় আছেন। একটা দুর্ঘটনায় মিশিরজী আহত হন, সেই সময় তাঁর স্ত্রী সেবাশুশ্রূষার জন্য এখানে আসেন। সেই থেকে তিনি কোলকাতাতেই রয়ে গেছেন। গাঁয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছেন না, কেননা তাঁর ভয় মিশিরজীর সান্দেহবাতিক তার ফলে হয়তো আরো বেড়ে যাবে। তা ছাড়া স্বামীকে এই অবস্থায় রেখে যেতে তাঁর মন সরছিল না। কিছুদিন আগে এক শ্রমিক বস্তীতে একখানা ঘরে মিশিরজী থাকতেন। সেই ঘরে ভিতর থেকে তালাবন্ধ করে চাবিটা মিশিরজী লুকিয়ে রাখতেন। তাঁর ধারণা তিনি ঘুমিয়ে পড়লে স্ত্রী বাইরে গিয়ে পরপুরুষের সংগে মিলিত হচ্ছিলেন, তাই এই ব্যবস্থা। দুর্ঘটনায় মিশিরজীর বাঁ হাতের হাড় ভেঙে যায়। এই সময় যন্ত্রণায় ভাল ঘুম হতো না। আধ ঘুমন্ত অবস্থায় শুনতেন পাশের ঘরের অবিবাহিত ছেলেটি থালা-বাসনের শব্দ-সংকেতে তাঁর স্ত্রীকে অভিসারের ডাক দিচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেলে মাঝে মাঝে স্ত্রীকে শয্যায় পেতেন না। বাইরে গিয়ে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে হাতে-নাতে পাকড়াও করার অদম্য ইচ্ছা তিনি অতি কষ্টে চেপে রাখতেন। এই ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করার বাসনা তাঁর ছিল না। তাছাড়া প্রেমিক ছেলেটি তাঁর একজন ভক্ত ও সক্রিয় নিষ্ঠাবান সহকর্মী। তার উপর সকলের অগাধ আস্থা। মিশিরজী তাকে ভালবাসেন ও কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার নামে কেউ এই ধরনের বদনাম দিলে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আজ আর সে বিশ্বাস নেই। তাহলেও এর এই দুর্বলতা অন্য লোকের কাছে প্রকাশ করতে তিনি চান না। ছেলেটি ইউনিয়নের কাজে মিশিরজীর দক্ষিণহস্ত। এই ঘটনা প্রকাশ করে ছেলেটিকে হারাতে তিনি চান না। সে যদি মালিক পক্ষের ইউনিয়নে চলে যায়, তাহলে মিশিরজীর ইউনিয়ন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই গোড়ার দিকে কাউকেও তিনি সন্দেহের আভাস দিতে চান নি। দরোজায় তালা বন্ধ করে তিনি স্ত্রীর পরপুরুষাসক্তি দূর করতে ও সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বেশীদিন ব্যাপারটাকে গোপন রাখা গেল না। দরোজা বন্ধের কারণ জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করাতে স্ত্রীকে জানাতে বাধ্য হলেন মিশিরজী যে তিনি তার গোপন মিলনের সব খবর রাখেন এবং প্রেমিককেও চেনেন। স্ত্রী স্তম্ভিত হলেন। নারী জাতির অভিনয়দক্ষতা সম্বন্ধে মিশিরজীর জ্ঞানের অভাব ছিল না। স্ত্রীর অবাক-কিম্ভূতাক্ষম অবস্থা দেখে তাঁর পূর্ববিশ্বাসে কোনো-রকম ফাটল ধরল না। প্রেমিকের নাম বলাতে স্ত্রী প্রথমটায় ভাবলেন স্বামী বোধ হয় তাঁর সংগে ঠাট্টা-পরিহাস করছেন; অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। কিন্তু স্বামীর মুখচোখের চেহারা দেখে একটু পরেই তাঁর ভুল ভাঙল এবং তিনি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। স্ত্রীর অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা দেখে মিশিরজী উগ্রমূর্তি ধারণ করে বললেন যে স্ত্রী অপরাধ স্বীকার করে দেশে ফিরে যেতে রাজী হন যদি তবে তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন। স্ত্রীর ভয় বাড়ল এবং স্বামীর মারমুখী অবস্থা দেখে তিনি ঘর থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইলেন। মিশিরজী দরোজা বন্ধ করে পথ রোধ করলেন। তাঁর তর্জনগর্জনে অন্যান্য ঘর থেকে লোক ছুটে এল। তারা দরোজায় ধাক্কা দিতে মিশিরজী আত্মসংবরণ করে দরোজা খুলে দিলেন। এরপর ব্যাপারটা আর গোপন থাকল না। আসল ব্যাপারটার অস্পষ্ট আভাস মিশিরজীর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁর মুখেই শুনলেন, আর অন্যরা অনুমান করলেন। মিশিরজী সকলকে ঘরে চলে যেতে বললেন। মিশিরজীর নির্দেশ মেনে নিয়ে দুঃখিত ও বিস্মিত হয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। এই রাত্রি থেকে নিঃশব্দে স্ত্রীর উপর তিনি অত্যাচার চালাতে লাগলেন। এক হাত প্লাস্টার করা, অন্য হাত খোলা। সেই খোলা ডান হাত দিয়ে স্ত্রীর হাত মুচড়ে ধরে তাঁকে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলতেন। স্ত্রী চেঁচিয়ে কাঁদতে পারতেন না। পাছে

পাশের ঘরের বাসিন্দার কানে শব্দ যায়, এই ভয়ে যতক্ষণ পারতেন সহ্য করে থাকতেন। তারপর চোখের জলে স্বামীর পা ভিজিয়ে শপথ করতেন যে আর ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন না। স্ত্রীর স্বীকারোক্তি ও শপথের পর মিশিরজী নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যেতেন। কয়েক রাত এই রকম চলার পর স্ত্রী একদিন মিশিরজীর এক বন্ধুর কাছে সব খুলে বললেন। বন্ধুটি সেইদিনই কয়েক মাইল দূরের এক পরিত্যক্ত বাগান-বাড়ীতে মিশিরজী ও তাঁর স্ত্রীকে রেখে এলেন। এই বাড়ীতে পুরুষ বলতে আছে শুধু অতি বৃদ্ধ এক মালী, কাজেই তাঁর মনে হল, এইবার মিশিরজীর সন্দেহবাতিক সারবে। কিন্তু মিশিরজী দু সপ্তাহের মধ্যেই বন্ধুকে জানালেন যে একবার ব্যভিচারে মত্ত হলে মেয়েদের কান্ডজ্ঞান বাছ-বিচার সবই লোপ পায়, ঐ অতিবৃদ্ধ মালীটিকেই স্ত্রী কন্দর্পকান্তি যুবক মনে করেছেন এবং তার সংগে সুযোগ পেলেই রতিক্রীড়ায় মেতে উঠছেন। এইবার ডাক্তারের পরামর্শ নেবার কথা মনে হল বন্ধুটির। ফলে ঘটল আমার সংগে যোগাযোগ।

এই ইতিহাস মিশিরজীকে দেখার আগে তাঁর বন্ধুটি আমাকে শোনালেন। এর পর ভদ্রলোককে দেখলাম। হাসাময় প্রশান্ত চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি।

—অনর্থক আপনার হয়রানি। এ-ব্যাপার নিয়ে ডাক্তার কনসাল্ট করার কি আছে আমি জানি না। শুনেছেন তো সব?

এই বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমিও হেসে উত্তর দিলাম।

—কিছুটা শুনেছি। হয়রানির কথা ভাববেন না। এ রকম হয়রানি আপনারও কম হয় না নিশ্চয়ই। আপনার লাইনের অনেক কিছু নিয়েই তো আপনার বন্ধু-বান্ধবরা আপনার সংগে সলাপরামর্শ করে থাকেন।

—তা ঠিক। কিন্তু এখানে ফয়সালাতো হয়েই গেছে। ও সবই স্বীকার করেছে। কিছুতেই দেশে ফিরতে চাইছে না। এই ব্যাপারে আপনি কিছু করতে পারেন কিনা দেখুন।

—তাহলে একদিন মিসেসকে এখানে নিয়ে আসুন। দেখা যাক, কিছু করা যায় কিনা?

মিশিরজী রাজী হয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

অধিকাংশ প্যারানইয়ার রোগীর মত মিশিরজী চিকিৎসা করাতে চান না। তাঁর কোনো অসুখ আছে বলে তিনি মনে করেন না। নেহাৎ দায়ে পড়ে, বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমার কাছে এসেছেন। মিশিরজীর সন্দেহ একেবারে ভিত্তিহীন বলে কিন্তু আমার মনে হল না।

পরদিন মিসেস মিশিরকে দেখে আমি হতবাক। ভদ্রমহিলা ঘোমটা দিয়ে আমার সামনের চেয়ারে এসে বসলেন, এবং আমার কথার জবাব দিতে লাগলেন। কিছু পরে আমার অনুরোধে ঘোমটা খুলতে তাঁর মুখশ্রী দেখলাম। মিশিরজী নিজে কয়েক মিনিট আগে এঁকে ঘরে এনে তাঁর স্ত্রী বলে পরিচয় করে দিয়েছেন। সংগের বন্ধুটিও অনুমোদন করেছেন। না হলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না আমার সামনে বসা মহিলাটি মিশিরজীর স্ত্রী! কাঁচাপাকা চুল, মুখে বলিরেখা, সামনের দুটো দাঁত নেই। ভদ্রমহিলার বয়স অন্তত ৫৫ হবেই। ভদ্রমহিলা নিজের মুখে বললেন তাঁর উমর কিঞ্চিৎ জেয়াদা। মিশিরজীর চেয়ে তিনি বারো বছরের বড়। মিশিরজী পাঁচ বছর বয়সে সতেরো বছরের উর্মিলার পাণিগ্রহণ করেন। ও'দের দেশে এই রকম সাদির রেওয়াজ আছে।

এতক্ষণে বুঝলাম মিশিরজীর বন্ধুরা গোড়া থেকেই তাঁর সন্দেহবাতিক সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন কি কারণে। মিশিরজীর স্ত্রীর জরাজীর্ণ দেহশ্রী দর্শনে অনুকম্পা ছাড়া কারুর মনে অন্য কোনো রসের সঞ্চার ঘটতেই পারে না। অসুস্থ মনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। মিশিরজী নিশ্চয়ই অসুস্থ, প্যারানইয়ায় ভুগছেন।

স্ত্রী ব্যভিচারিণী—এ ধারণা মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হবার আগে স্ত্রীর রূপযৌবন অন্য পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে মিশিরজী আচ্ছন্ন হয়েছেন। মিশিরজীর সংগে কয়েকদিনের আলাপ-আলোচনার ফলে মিশিরজীর ডিলিউশনের শারীরবৃত্তিক ও বিকারতাত্বিক কারণ-গুলোর হদিশ পাওয়া গেল মিশিরজীর বিশ্বাস উৎপাদনে আমি সক্ষম হয়েছিলাম বলেই মিশিরজী খোলাখুলি সব বিষয়ে আমার সংগে আলোচনা করলেন। মিশিরজীকে আমার ভাল লেগেছিল, সেই কারণেই বোধ হয় তিনি আমার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারলেন। মিশিরজী স্বভাবকবি। যে কোনো বিষয়ে মুখে মুখে উর্দু বয়েত তৈরী করতে পারেন। তার বয়েতগুলো সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করল। আমি তাঁর গুণগ্রাহী, এটা সহজেই তিনি বুঝলেন, এবং আমাদের মধ্যে সুস্থ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হতে দেরী হল না।

প্রথম যৌবনে যখন দারোয়ানী চাকরী করতেন, তখন এবং পরে কোনো বছরই এক মাসের বেশী ছুটি পেতেন না। বছরে এই একমাস মাত্র স্ত্রীসম্ভাষণ করবার সুযোগ হত। সমবয়সী বাঙ্গালী বাবুরা এই নিয়ে অনেক ঠাট্টাতামাসা করতেন। যারা বছরে একবার এক মাসের জন্যে বাড়ী যায় তাদের স্ত্রী এগারো মাস কিভাবে কাটায়—এই ছিল বন্ধুদের তামাসার বিষয়। মিশিরজী ঠাট্টা-তামাসায় যোগ দিতেন না বটে, কিন্তু কথাগুলো তাঁকে আহত করত। তিনি পিউরিটান টাইপের, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তা বলে কাম-উত্তেজনা থেকে রেহাই পেতেন না। আত্ম-সংযম করতে খুবই বেগ পেতে হত। সন্ধ্যার পর রামায়ণ পড়ে নিজেকে শুদ্ধ রাখবার চেষ্টা করতেন। তাছাড়া, এই সময় থেকে ইউনিয়নের কাজে নেমে পড়েন এবং বাবুদের কাছে পড়াশুনো করতে থাকেন। দিনরাতে ষোলো ঘন্টার বেশি মেহনত করতে হত। প্রথম দিকে পড়াশুনো, পরের দিকে আন্দোলন স্ট্রাইক গেট-মিটিং ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিনরাত কিভাবে কাটত, তিনি বুঝতেই পারতন না। আত্মচিন্তা করার অবসর খুব কমই মিলত। কামাবেগ তাঁকে বিচলিত করলেও নীতিভ্রষ্ট করতে পারেনি। তাঁর চরিত্রের এই যৌন নিরাসক্তির দিকটি সংগীসাথীদের কাছে তাঁকে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। তিনি মনে করেন, শ্রমিক মহলে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির মূলে তাঁর বাসনা চরিতার্থকরণে পরাঙ্মুখতা। বস্তি-বাসীরা এ ব্যাপারে সাধারণত উচ্ছৃংখল, তাই সংযমের প্রতি তাঁদের এই অতি সমীহ ভাব। আর এই শ্রদ্ধা যাতে বজায় থাকে সেদিকে মিশিরজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সব সময়েই সংগীসাথী চেলা-চামুন্ডারা ঘিরে রাখত, অন্যের অজ্ঞাত-সারে কোনো কিছু করার সুযোগও মিলত না।

কিন্তু স্ত্রীর কথা মনে পড়লেই তিনি শঙ্কিত হতেন। স্ত্রী লেখাপড়া জানেন না, গৃহকর্ম ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে আগ্রহ নেই। যৌন-সংযম তাঁর পক্ষে কি সম্ভব? যৌন-উত্তেজনার বিকল্প কোনো উন্মাদনা (ধর্মীয় বা রাজনৈতিক) সরযুকে প্রভাবিত করে না। কামচরিতার্থ করার সুযোগ-সুবিধাও তাঁর বেশী। রামায়ণ-মহাভারতে মিশিরজীর দখল আছে। রামায়ণ মহাভারত পড়ে তিনি জেনেছেন নারীর কামাবেগ পুরুষের আট গুণ বেশী। কড়া বিধিনিষেধের মধ্যে না রাখলে স্ত্রী মাত্রেই বিপথগামিনী হতে পারে। ভীষ্ম-দেব থেকে মনু, সকলেই নাকি এই রকমই

বলেছেন। এই সব চিন্তা মনে আসলেই তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। চিন্তা তাড়াবার জন্যে বয়েত আওড়াতেন কিংবা বিশ্বস্ত কোনো সহকর্মীকে নিয়ে বস্তি পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়তেন।

স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ মিশিরজী অনেকদিন ধরেই করে আসছেন। তবে সন্দেহের মেঘ মনের আকাশে বাসা বাঁধতে পারেনি এতদিন। নানা রকমের যুক্তিতর্কের হাওয়ায় মেঘ উড়িয়ে দিয়েছেন, কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সন্দেহ ভুলে থেকেছেন। দুর্ঘটনার পর স্ত্রী যখন কোলকাতায় এলেন তখন মিশিরজী হাসপাতালে। হাত ভেঙেছে, মাথায় চোট লেগেছে। যন্ত্রণায় অস্থির। ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। নানা রকমের স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে সেবারতা নার্সকে দেখছেন, স্ত্রী নার্স হয়ে তাঁকে সেবা করছেন, কোনো সময়ে নার্স স্ত্রী হয়ে তাঁকে আদর করছেন। এই পিরিয়ডে টেম্পারেচর ছিল ১০৪—১০৫ ডিগ্রী। দেহের উত্তাপ ও ঘুমের ওষুধ, এই দুয়ের প্রভাবে সব সময়ে এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তাঁর দেহমন ভরে থাকত। স্বপ্ন-কল্পনা-বাস্তব সব মিলিমিশে একাকার হয়ে গিছল। গভীর রাতে তন্দ্রার মধ্যে অস্ফুট প্রেমগুঞ্জন শুনতে পেতেন। তাঁর ওয়ার্ডের তরুণী নার্সকে কে যেন প্রেম নিবেদন করছে। সত্যই এ রকম ব্যাপার ঘটত না তিনি স্বপ্ন দেখতেন? হয়ত এ সব উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। কয়েকদিন পরে, (মিশিরজী তখন চলাফেরা করতে পারেন) অনেক রাত্রে তিনি একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলেন। করিডরের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ মেয়েটিকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। অস্পষ্ট আলোতে পুরুষটিকে চিনতে পারেন নি। দুদিন পরে নিজের আস্তানায় ফিরে এলেন।

এবার নার্সিং-এর ভার পড়ল স্ত্রীর উপর। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে স্ত্রীকে তরুণী নার্স বলে ভুল করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর থেকে ডিলিউশনের আবির্ভাব। মিশিরজী তন্দ্রার মধ্যে অস্ফুট প্রেম নিবেদন শুনতে লাগলেন। জেগে উঠে পাশের ঘরের ছেলেটির সন্দেহজনক সংকেত ইংগিত শুনতে পেলেন। তাঁর মনে হতে লাগল স্ত্রী ঘুমের ভান করে পড়ে আছেন। মিশিরজী ঘুমিয়ে পড়লেই সংকেত অনুযায়ী প্রেমিকের সংগে মিলিত হবেন। কাজেই দরোজায় তালা লাগাতে বাধ্য হলেন।

প্রেমনিবেদন-শ্রবণ অডিটারী হ্যালুসিনেশন নয়, স্বপ্ন। সংকেত ইংগিতগুলো পাশের ঘরের ছেলেটির চলাফেরা, বাসনপত্র নাড়াচাড়া শব্দের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা : ডিলিউশন। এই সব ইতিহাস কয়েকদিন ধরে একটু একটু করে বললেন মিশিরজী। এর মধ্যে মনঃসংযোগ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য মিশিরজী 'হিপনটিক সাজেশান' নিতে রাজী হয়েছেন। অভিভাবনের ফলে তাঁর অনেক কিছু পুরনো ঘটনা মনে পড়ছে, হাসপাতালে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার তিনি আমাকে গুছিয়ে বলতে পারছেন।

মিশিরজীর ডিলিউশনের সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা চলে কিনা দেখা যাক।

প্রথম জীবনেই মিশিরজীর মনে দুটি বিপরীতধর্মী আকর্ষণের আভাস দেখা দিয়েছিল। একদিকে শান্ত পারিবারিক জীবন, অন্যদিকে কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবন। নিজের সততা পরিশ্রম ও অন্যান্য মানসিক ধর্মের গুণে রাজনৈতিক জীবনে যত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে লাগলেন, পারিবারিক জীবন থেকে তত দূরে সরতে থাকলেন। স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ সন্দেহের রূপ নিতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের তরল পরিহাস, রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান, ভীষ্মদেবের মতামত, মনুর বিধান, সব মিলে সন্দেহ বাড়িয়ে দিল, সন্দেহ ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়ে উঠল। সন্দেহ এ সময় মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারেনি, কিন্তু মস্তিষ্কের কতকগুলো কোষ ধীরে ধীরে সন্দেহের উদ্দীপনায় উত্তেজিত অবস্থায় অনড় হয়ে যেতে লাগল। এর পর রাজনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় দেখা দিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটল স্তালিন যুগের অবসান। এক সময়কার পরমপূজনীয় পরম শক্তিমান নেতার ইমেজ ভেঙে পড়ার ফলে মিশিরজী অস্থির ও সন্দেহাকুল হয়ে উঠলেন। বিশ্বাসের ভিতটাই তাঁর নড়ে গেল। নিকটতম বন্ধু, পরীক্ষিত কর্মীদের উপরও বিশ্বাস রাখা কঠিন মনে হল।

এই সময় দুর্ঘটনার ফলে মিশিরজী জখম হলেন। শারীরিক আঘাত ও নিস্তেজক ওষুধের প্রভাবে স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ল। মস্তিষ্কে উদ্ভূত হল সম্মোহন পর্বের তৃতীয় দশা, যাকে বলা হয় অতি স্ববিরোধী অবস্থা (আলট্রা-প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ)। ডিলিউশন গঠনের প্রধান দুটি শর্ত প্রতিপালিত হল। মস্তিষ্কের কিছু কোষ উত্তেজিত অবস্থায় অনড়, আর নেমে এসেছে অতি স্ববিরোধী অবস্থা। হাসপাতালের দৃশ্যটি ও হাসপাতালের স্বপ্নগুলোও বিশেষভাবে ডিলিউশন সৃষ্টিতে সাহায্য করল। এই অবস্থায় বৃদ্ধাকে তরুণী মনে হওয়া, বাসনের শব্দকে প্রেমিকের সংকেত ভাবা মোটেই বিচিত্র নয়।

চিকিৎসার বিবরণ পাঠকদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক নাও লাগতে পারে জেনেও দুটো-একটা কথা বলতে হচ্ছে। ঘুমের ওষুধ বন্ধ হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের অবস্থা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন (হিপনটিক সাজেশন) সুস্থতাকে ত্বরান্বিত করল। অতিস্ববিরোধী অবস্থা কাটতে খুব দেরী হল না। লোলচর্ম পলিতকেশ বৃদ্ধার পক্ষে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, এটা মিশিরজী সহজেই বুঝলেন। আরো বুঝলেন যে, স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এই অস্থির রাজনৈতিক জীবনের প্রতি খানিকটা বিতৃষ্ণা এসেছিল, স্ত্রীর সেবা ও সান্নিধ্য শান্ত পারিবারিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে পারে, রাজনীতি থেকে পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে পারে; এই জন্যে অস্বস্তি। এর পর কয়েকদিন ধরে প্রেম, কাম, স্ত্রী-পুরুষের মানসিকতার পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে চলল বিস্তারিত আলোচনা। স্ত্রী-জাতির কামাধিক্য সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হল। মিশিরজী সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর কর্মস্থল নিজের জেলাতে স্থানান্তরিত করলেন। রাজনৈতিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে অনেকটা সংগতি স্থাপিত হল। ঘন-ঘন স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা হতে লাগল। চিকিৎসার প্রায় চার বছর পরেও তাঁকে সুস্থ দেখেছি। বর্তমানের খবর জানি না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি সংক্ষেপে বলছি।

ঘটনাটির নায়ক কুমুদবাবু। কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরী করেন। বয়স চল্লিশ, স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। স্ত্রীর বয়স আটাশ, সুন্দরী না হলেও সুগঠিত দেহবল্লরীর অধিকারিণী। কুমুদবাবুরা চার ভাই। যৌথ পরিবার। ছোট ভাই ছাত্র, আর সবাই রোজগার করেন। বাবা পেন্সনভোগী। বড় ভাই কুমুদবাবুর শিক্ষাদীক্ষা বুদ্ধি-রোজগার অন্য ভাইদের তুলনায় কম। মেজ ভাই সুরেশবাবু অধ্যাপক। তাঁর কাছ থেকে রোগের প্রাথমিক ইতিহাস জানলাম।

বছরখানেক ধরে রোগের সূত্রপাত। গত তিনমাস ধরে বাড়াবাড়ি চলছে। স্ত্রীর গায়ে হাত তুলছেন ও চেঁচামেচি শুরু করেছেন। আগে ছোট ভাই প্রবালকে সন্দেহ করতেন, বর্তমানে বাবাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। প্রবালের বয়স আঠারো, তার ছ' বছর বয়সের সময় দাদার বিয়ে হয়। বৌদির খুব বাধ্য ছোটবেলা থেকেই। একসঙ্গে লুডো খেলে, সিনেমায় যায়। বৌদি তাকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসেন। এক বছর আগেও দাদার উৎসাহে প্রবাল বৌদিকে নিয়ে সিনেমায় যেত। এখন প্রবালের দিকে তাকানোও বারণ। এ-ব্যাপারটা যতই কদর্য হোক, তবু কোনো-রকমে সহ্য করা গেছে। বর্তমানে দাদার অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। পাশের বাড়ীর লোকেরাও অনেক কিছু বুঝতে পারছে। বাবা-মা একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। পারিবারিক কেলেঙ্কারী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দাদার যে মাথা খারাপ হয়েছে, এ তিনি বুঝতে পারছেন না। অন্যেরাও বুঝবে বলে মনে হচ্ছে না। কি করে চিকিৎসার জন্যে আনা যায় তাও ঠিক করতে পারছেন না সুরেশবাবু।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হল যে, তাঁর 'এ্যার্মিবিয়াসিস্'-এর জন্যে চিকিৎসা দরকার। এটা তাঁকে বোঝানো হবে। ভদ্রলোকের এক বন্ধু এ্যামেচার হোমিওপ্যাথ। তাঁর উপর কুমুদবাবুর বিশ্বাস অগাধ। তাঁর সঙ্গে কুমুদবাবুকে আনা যাবে। কুমুদবাবু পেটের গোলমালের জন্যে আমার চিকিৎসাধীনে থাকতে রাজী হলেন।

ইতিমধ্যে কুমুদবাবুর স্ত্রী বাপের বাড়ী যাবার নাম করে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। ভদ্রমহিলাকে দেখে বেশ বুদ্ধিমতী মনে হল। তাঁকে আমার প্ল্যান খুলে বললাম। তাঁর স্বামী তাঁর ব্যভিচার-প্রবৃত্তি দূর করার জন্যে যদি আমার কাছে চিকিৎসার জন্য আনতে চান, তিনি যেন রাজী হয়ে যান। স্বামীর 'সন্দেহবাতিক' তর্ক করে বা কান্নাকাটি করে দূর করা যাবে না। তিনি যেন দোষ স্বীকার-অস্বীকার কিছুই না করেন। আমি তাঁকে ওষুধ দেব, সাজেশান দেব। ভদ্রমহিলা এই চিকিৎসার অভিনয়ে অংশগ্রহণে রাজী হলেন।

কুমুদবাবু 'এ্যার্মিবিয়াসিস্' চিকিৎসা-প্রসঙ্গে দু-একদিনের মধ্যে নিজের যৌন-দুর্বলতার কথা স্বীকার করলেন এবং স্ত্রীর চরিত্র-দোষের কাহিনীও বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। আমি মনোযোগ দিয়ে ভদ্রলোকের কথা শুনলাম তাঁর দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করলাম। আর বললাম, অতিরিক্ত কামপ্রবণতা একটা রোগ, এর চিকিৎসা আছে। কুমুদবাবু খুশী হলেন। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করাতে আমার উপর তাঁর আস্থা বাড়ল। তবে স্ত্রী চিকিৎসিত হতে চাইবেন বলে তাঁর মনে হল না। নিজের ব্যভিচারের ইতিহাস স্ত্রী গোপন রাখতে চান, কিছুতেই নিজের পাপ নিজমুখে স্বীকার করবেন না। তাহলে অবশ্য আমার আর কিছু করবার নেই, আমি জানালাম।

আমার নির্দেশমত স্ত্রী চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন এক শর্তে। স্বামী তাঁর মিথ্যা সন্দেহ দূর করার জন্য চিকিৎসিত হবেন; এই হল তাঁর শর্ত। কুমুদবাবু আমার কাছে এসে পরামর্শ চাইলেন। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করা উচিত, আমি পরামর্শ দিলাম। ভদ্রলোকও ভদ্রমহিলার মত চিকিৎসার অভিনয়ে অংশগ্রহণে রাজী হলেন। কেন রাজী হলেন? কারণ, তিনি স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল, স্ত্রীকে ভালবাসেন; দ্বিতীয়ত নিজের যৌনদুর্বলতা দূর করার জন্য আমার সাহায্যকে তিনি মূল্যবান মনে করেছেন।

সত্যিই কি তিনি যৌনদুর্বলতায় ভুগছেন? এ-দুর্বলতা স্বাভিভাবনের ফল; এর মূলে আছে তাঁর হোমিওপ্যাথ বন্ধুর অসতর্ক মুহূর্তের একটি কথা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান পাঁচ বছরের বেশী হলে ফল ভাল হয় না। এই মত কোনো এক সেক্‌স-সাইকলজির বই থেকে কুমুদবাবুকে বন্ধুটি একদিন পড়ে শুনিয়েছিলেন। আরো বলেছিলেন, পুরুষ পঞ্চাশ বছরের পর অকর্মণ্য (যৌনশক্তির ব্যাপারে) হয়ে যায়, কিন্তু মেয়েদের কামেচ্ছা নাকি পঁয়তাল্লিশ বছরের পর বৃদ্ধি পায়। কি বই, কে লেখক কিছুই কুমুদবাবু বলতে পারেননি। তবে এই থেকে তাঁর দুশ্চিন্তার সূত্রপাত এবং যৌনক্ষমতার অবনতি ঘটতে থাকে। আর একটা কারণও ছিল। 'এ্যার্মিবিয়াসিস্'-এর রোগীদের অনেক ক্ষেত্রেই 'প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশন' ঘটে থাকে।

ভদ্রলোক ভাইদের মধ্যে কম শিক্ষিত ও কম রোজগার করেন, আগেই বলেছি। এর ফলে ভাইদের সম্পর্কে একটু ঈর্ষার ভাব তাঁর বরাবরই ছিল। হীনমন্যতা দেখা দিচ্ছিল। যৌনশক্তির ক্রমাবনতি এই হীনমন্যতাকে বাড়িয়ে তুলল। যৌনক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করতে কুমুদবাবু মাদক দ্রব্যের সেবনে অভ্যস্ত হলেন। মাদক দ্রব্য সাময়িক উত্তেজনা আনল বটে, কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রকে নিস্তেজিত করে তুলল। ঘনঘন স্ত্রী-সহবাসের বাসনা হতে লাগল এবং সহবাস-সময় কমতে লাগল। শেষের দিকে স্ত্রী-সহবাসে রাজী হতেন না। দিনের বেলায় স্বামীর আহ্বান আসলে তিনি কোনো অছিলায় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রবালের সঙ্গে লুডো খেলতে বসে যেতেন। হীনমন্যতাবোধ ও মাদকের প্রভাবে এই সময় থেকে স্ত্রীর চরিত্রের উপর সন্দেহ হতে থাকে। তাঁর ডাকে কেন স্ত্রী সাড়া দিচ্ছেন না? ওঁকে নিজের উপযুক্ত মনে করেন না নিশ্চয়ই। স্ত্রী বিয়ের পর পড়াশুনো করে গ্রাজুয়েট হয়েছেন, স্বামীরই উৎসাহে। স্বামী বি-এ ফেল করে চাকরীতে ঢুকেছিলেন, আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। স্ত্রী বেশী শিক্ষিত, যৌবন-শক্তি তার বেশী। কমবয়সী ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই সব চিন্তা অস্থির করে তুলল কুমুদবাবুকে। মাদকের মাত্রা বাড়তে লাগল, স্নায়ুতন্ত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দিল। সন্দেহ এখন প্রণালীবদ্ধ ডিলিউশনের আকার ধারণ করল। স্ত্রীকে এই সময় নিজের সন্দেহের কথা জানালেন। স্ত্রী কুপিত হয়ে ঝগড়া করলেন। সন্দেহ বাড়ল। স্ত্রী যত ব্যভিচারের কথা অস্বীকার করতে লাগল, ততই স্বামীর মনে ব্যভিচার-বিভ্রম দানা বেঁধে উঠতে লাগল। স্ত্রী অপমানিত বোধ করে সহবাসে অস্বীকৃত হলে কুমুদবাবু মারধোর সুরু করলেন। ক্রমে বাড়ীর লোকেরা ব্যাপারটা জানল। বৃদ্ধ পিতার কানে কথাটা গেল। তিনি কুমুদবাবুকে ডেকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন, অশুচি মন নিয়ে ভদ্রলোকের পাড়ায় তাঁর বাস করা উচিত নয়। ভদ্রলোক স্ত্রীকে নিয়ে হোটেলে উঠে যেতে মনস্থ করলেন, কিন্তু স্ত্রী রাজী হলেন না। সেই থেকে পিতাকেও স্ত্রীর প্রেমিক মনে করে আক্রোশে ফুলতে লাগলেন।

হীনমন্যতাবোধ, স্বামীস্ত্রীর বয়সের পার্থক্য সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক ধারণা, সর্বোপরি মাদক দ্রব্যে আসক্তি, কুমুদবাবুর প্যারানইয়া রোগের প্রধান কারণ এই তিনটি। মনে হয় তাঁর মস্তিষ্কের নিস্তেজনা ক্ষমতা প্রথম থেকেই কম ছিল। একরোখা কোপন স্বভাবের লোক তিনি। যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগে কোনো কিছু বোঝবার চেষ্টা তিনি কম করতেন। এই সব মিলিয়ে মস্তিষ্কের মোহ বা ডিলিউশনের সৃষ্টি হয়েছিল। অফিসের কাজকর্মে বা বাইরের লোকের সংগে কথাবার্তায় কুমুদবাবুর কোনো রকম ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি। চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছিল।

কুমুদবাবুর চিকিৎসার জন্যে যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হল, সব ক্ষেত্রে ঐ রকম কৌশল সাফল্য লাভ করবে, এমন নয়। প্রত্যেকটি কেসই স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়, কুমুদবাবু আমার কাছে খানিকটা ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছিলেন। স্ত্রীর ভালবাসা ফিরে পাওয়া এবং নিজের যৌনক্ষমতা ফিরে পাওয়া—দুই-ই তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল।

—মনোবিদ

আমিষ নিরামিষ প্রাত্যহিক

প্রভাত দেবসরকার

বাজারের থলিটা বাঁ-হাতে বাগিয়ে ধরে ডান হাতের চেটোয় পয়সাগুলো গুনে নিতে গিয়ে শশধরবাবু যেন চমকে উঠলেন, এ কি, কত দিচ্ছ?

অম্লান বদনে দোকানদার বললে, ঠিক দিয়েছি, দেখে নেন্-ন্-ন্।

চমকটা বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল, শশধরবাবু বললেন, দেখে নেব কি, কত দিয়েছ তাই বল? এই তো—

খুচরো পয়সা সমেত হাতের চেটোটা শশধরবাবু দোকানীর মুখের ওপর বাড়িয়ে ধরলেন। যেন চোখে খোঁচা দিয়ে দেখাতে চান হিসেবের ভুলটা!

দোকানী যেন দেখেও দেখলো না, আর একজন খরিদ্দারকে সওদা মেপে দিতে লাগল। বড় ব্যস্ত!

আর বুঝি নিজেকে সামলাতে পারলেন না শশধরবাবু, চীৎকার করে বললেন, কত দাম নিলে 'হাফ' কিলোর জন্যে?

পঞ্চাশ্-শ্ পয়সা! দোকানদার আর একজন খরিদ্দারের দিকে মন দিলে।

কাল কত নিয়েছিলে? আজ বেশি নিচ্ছ যে। রুক্ষস্বরে শশধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

দোকানী তেমনি অম্লান বদন, বললে কালকের কথা ভুলে যান বাবু! দাম বেড়ে গেছে!

হাতটা মুঠো করে গজ-গজ করে শশধরবাবু বললেন, রোজ রোজ দাম বাড়ছে? যত সব চোর্-র-র!

ব্যস, পাটা ছেড়ে দোকানী লাফিয়ে পড়ে আর কি, আশপাশ থেকে সবাই মিলে ধরাধরি করে দুজনকে আলাদা করে দিলে, বাজারের মুখে ভিড় জমে গেল, হঠাৎ গোলমালটা কিসের?

শশধরবাবু সাক্ষী মেনে বললেন, রোজ রোজ দাম বাড়বে, ওজনে কম দেবে, এদিকে কিছু বলতে পারবে না। দেখুন দিকি মজা! চোর তো ভাল কথা, ডাকাত বলা উচিত!

ওজনে কম হোক, দরে বেশি হোক, তবু যেন ক্রেতার পক্ষে চোর-ডাকাত আখ্যা দিয়ে বিক্রেতাকে কিছু বলা উচিত নয়। শশধরবাবু তাঁর পক্ষে কাউকে উচ্চবাচ্য করতে শুনলেন না। দোকানদার বরং তার হয়ে বলবার

অনেককে পেল, দরে না বনে অন্যত্র দেখতে পারেন, দর করতে পারেন, তা বলে অকথ্য গাল দেবেন এ কোনধারা ভদ্রতা! দোকানীর গলা সপ্তমে উঠলো।

শশধরবাবু ভিড় কাটিয়ে মাথা নিচু করে চটের থলিটা বাগিয়ে একদিকে সরে যেতে যেতে বললেন, ভদ্রতা! ভদ্রতা শেখাতে এসেচে সব! কত সব ভদ্র জানা আছে। চোরের সাক্ষী—

বাজার নয় যেন রুটি-সেঁকা গরম চাটু, যাতেই হাত দাও ছেঁকা লাগে। আলু, কুমড়ো, শাক-পাতা সবই দিন দিন দুর্মূল্য হয়ে উঠছে। আজ এক দর, কাল আর এক। বলবার কিছু নেই, পোষায় নাও, নইলে শূন্য থলি হাতে ফুটবলে লাথি-খাওয়ার মত ঘুরে বেড়াও, খোসামোদ কর, ছেঁড়া-ছিঁড়ি কর। তরপর বাড়ী যখন ফিরবে তখন দুটো উনুনের আঁচ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! সরমা তো মুখিয়েই আছে, এদিকে কয়লা বেশি পোড়ার জন্যে টিক-টিক করবে, বাজার গেলে তো আর ফেরবার নাম কর না!

হ্যাঁ, নাম করে না বটে! মনে হয় আর বুঝি সশরীরে বাজার নিয়ে বাড়ী ফিরতেও পারবে না। শূন্য থলি শূন্যই থেকে যাবে। অদ্ভুত নিরানন্দ নিত্য-নৈমিত্তিকতা—আলুর পর, শাক; শাকের পর কুমড়ো কি লাউ, তারপর মাছ!—উঃ, যেন বারবার মেয়ে-মানুষের সূতিকাগারে যাওয়া, বারবার প্রতিজ্ঞা কি সঙ্কল্প করা, আর নয় এই শেষ! এই সুখ এই আনন্দ, এই জীবন?—না, চাই না!

আলুর বাঁধা দোকানগুলোর কোল ঘেঁসে সারি সারি সবজিওলা, গ্রামের চাষী। বাঁধা-দোকান নয় বলে হয়তো দু-চার পয়সা এদিকে সস্তা! কিন্তু লোক চলাচলের পথটা বড় সংকীর্ণ, ভিড় বেশি, ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি। তার ওপর পচা-ধসা আনা-জের গলিত আবর্জনা, শব-সাধনার মত মাড়িয়ে যাও!

আরে মশাই ঠেলছেন কেন? সামনের লোকটি ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন।

আমি ঠেলছি? দেখচেন না পিছন থেকে ঠেলা দিচ্ছে।

দেখাদেখির কিছু নেই, ওরই মধ্যে পথ করে নিতে হবে, আশপাশের সব্জি-ওলাদের সঙ্গে দরদস্তুরও করতে হবে। সামনে-পিছনে লোক, যেন পচা জলে নর্দমার মুখ আটকে আছে, থৈ-থৈ করছে!

পাঁকাল মাছের মত ভিড়ে পাঁক ঠেলে এক ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে শশধরবাবু চাষীদের কাছ থেকে কিছু সওদা করলেন। তারপর স্থিতিস্থাপকতায় ভিড়ের সঙ্গে মিশে হাঁটতে লাগলেন। মুখে বললেন, শালা বাজার নয়, নরক! অনেক পাপ করলে—

এই যে শশধরবাবু! বাজার হলো?

শশধরবাবু পরিচিত ভদ্রলোকের কথায় বাজারের থলিটা নাড়লেন। মুখোমুখি ভিড়টা যেন যুদ্ধ করছে। শশধরবাবু কাৎ হয়ে পাশ কাটালেন।

বাজারে পরিচিত অপরিচিত অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়, লোকগুলোকে কেমন যেন মনে হয়, বাজারকরা মানুষ আর পাড়ায়-হাঁটা মানুষ যেন এক নয়। ওই যে লোকটি আপ্যায়িত সুরে বললেন, বাজার হলো? ওঁকে কেমন যেন বাজার-বিরক্ত আর ব্যস্ত মনে হল, হাতভর্তি জিনিসে কেমন যেন ভারসাম্য রক্ষার জন্যে সচেষ্ট হয়ে আছেন। আর আশ্চর্য, স্পর্শকাতরতা ভদ্রলোকের! মাছের থলি শাক-সব্জির থলি দুটো দু'হাতে ধরেছেন যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, কে জানে ঘরের গৃহিণীর শুচিবায়ুগ্রস্ততার জন্য কিনা!

ভিড় ঠেলে অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁকা জায়গায় এসে বাজারের থলিটা দু' হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে কোমরের কাপড়টা শশধরবাবু ঠিক করে নিলেন। একটু নির্লিপ্ত হয়ে মৃত্যু-পরোয়ানা পাওয়া জয়দ্রথের মত কৌতূহলে বাজারের ভিড়টা অবলোকন করলেন। আশ্চর্য, এত ভিড়ে দিব্যি লোক-জন যাওয়া-আসা করছে কোন অসুবিধা হচ্ছে, না যেটুকু ঠেলাঠেলি বা ছোঁয়াছুঁয়ি যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়! এই জীবন, প্রাত্যহিক।

'বাজারটা যদি রোজ কেউ করে দেয়?' তাহলে কি, যেন বাজারের মধ্যে দিশাহারা ব্যস্ত হয়ে শশধরবাবু কিছুতে সঠিক উত্তর খুঁজে পান না কোনদিন।

শশধরবাবু হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন, আরে মশাই আপনার থলিতে কি আছে, গায়ে ফুটছে যে! আর!—সামলে নিন—

ভদ্রলোক 'সরি' বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে খোঁচাটা যেন আরো জোরে লাগল, শশধরবাবু যন্ত্রণায় উঃ করে উঠলেন। কিছু ঠাহর করবার আগেই থলির মালিক ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মাছের বাজারের দিকে পা-পা করে এগুতে এগুতে শরীরের খোঁচা লাগা জায়গা-টায় হাত বুলোতে বুলোতে কথাটা শশধর-বাবুর মনে পড়ে গেল—একখানি জীবনে নিত্য বাজার করার বিশেষ একটি দিনের এক অভিজ্ঞতা! তাঁর বাজারের থলি থেকে কোন ফাঁকে বেসেড়া মরা ট্যাংরা মাছের কাঁটা এক ভদ্রলোকের পাছার মধ্যে বিঁধে গিয়ে এক কাণ্ড বাধিয়ে ছিল—শেষটা দুজনকেই ডাক্তারখানায় গিয়ে সে-কাঁটা তুলতে হয়েছিল, মাছের দামের তিনগুণ ডিসপেনসারীর কম্পাউণ্ডারকে দিতে হয়েছিল। ইস্-স্ মাছ খাওয়ার সে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। ছবিটা এখনো যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে—ভদ্রলোক যেই উঃ করলেন, শশধরবাবু বাজারের থলিটা বাগিয়ে ধরে গা আড়াল দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অত সহজে ছাড়া পেলেন না, ভদ্রলোকও আঃ আঃ করতে করতে তাঁর পিছু পিছু ছুটে এলেন, আর মশাই কি করছেন? গেলুম গেলুম। আপনার থলিতে কি?

আর থলিতে কি, শশধরবাবু প্রমাদ গুনলেন—অনেক দরদস্তুর করে তিন দিনের বাসি ট্যাংরা মাছ কিনে থলির মধ্যে পুরে-ছিলেন, তখন ভাবেন নি চটের থলের মধ্যে সে ট্যাংরা মাছ জ্যান্ত হয়ে এমনি অঘটন ঘটাবে!

আর সেই থেকে শশধরবাবু প্রতিজ্ঞা করেছেন কখনো ট্যাংরা মাছ কিনবেন না, জ্যান্ত হোক, বাসি হোক, পচা হোক। সস্তা বা সুবিধা দরে পেলেও না।

হঠাৎ রাস্তার কুকুরে পথচারীর পা কামড়ে ধরলে পথচারী যেমন করে পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে তেমনিভাবে ভদ্রলোক শশধরবাবুর থলি ধরে টানাটানি করছিলেন আর ঘেয়ো কুকুরের মত অবস্থা হয়েছিল সেদিন শশধরবাবুর —ছি, ছি! বাজার শুদ্ধ লোকের সামনে লজ্জার এক শেষ!

স্ত্রী সরমাকে শশধরবাবু কিছুতে বুঝিয়ে উঠতে পারেন না, আজ-কাল মাছ খাওয়া অনেক ঝামেলা, মাছের বাজার আগুন! যে পয়সায় মাছ খাবে সেই পয়সায় অন্য কিছু খাও।

একেবারে নির্বোধ মেয়েছেলে, মুখো-মুখে তর্ক করবে, অন্য কিছু মানে তো ঐ কচু-ঘেঁচু? ভারি তো সপ্তায় দু'দিন মাছ কেনা, তার এত কারণ কাষ্যি! অত কথার দরকার কি; খাব না মাছ।

অনেকবার রাগ করে শশধরবাবু বলে-ছেন, খেও না! বাজার-হাট কর না! ...তো, তাহলে বুঝতে মাছ খাওয়া কি, ভাল মাছ খেতে গেলে কত পয়সার দরকার হয়!

না, শাসালেও যেমন হোক, যে করে হোক শশধরবাবু ঝোলার মধ্যে সপ্তাহে দু-তিন দিন মাছ নিয়ে আসেন, কোন কোন দিন বুঝি ব্যতিক্রমও হয়, চার দিনও হয়ে যায়, সেদিন নিজেকে খুব স্বচ্ছল উদার মনে হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সহজ হয়।

আজ দিন নয়, তবু মনটা যেন মাছের বাজারের দিকে কেমন টানছে। মনে হচ্ছে, সত্যি এমন কারণ কাষ্যি করে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। মাছ খাবে না, দুধ খাবে না, তা হলে আর কি খেয়ে মানুষ বাঁচবে? সরমা ঝগড়া করে মিথ্যে বলে না—খাওয়া না গেলো! যত কোপ বাজারের পয়সার ওপর! সব জিনিসের দাম বাড়ছে, মাছের দাম বা বাড়বে না কেন? আর সংসারের সব বাড়তি খরচের বেলায় ধার-দেনা যে করেই হোক টাকা বেরয়, কিন্তু বাজারের বেলায় পয়সার কারণ-কাষ্যি কাটছাঁট! কমাও 'ডেলী' বাজার,

ফটো : প্রদীপ সেন
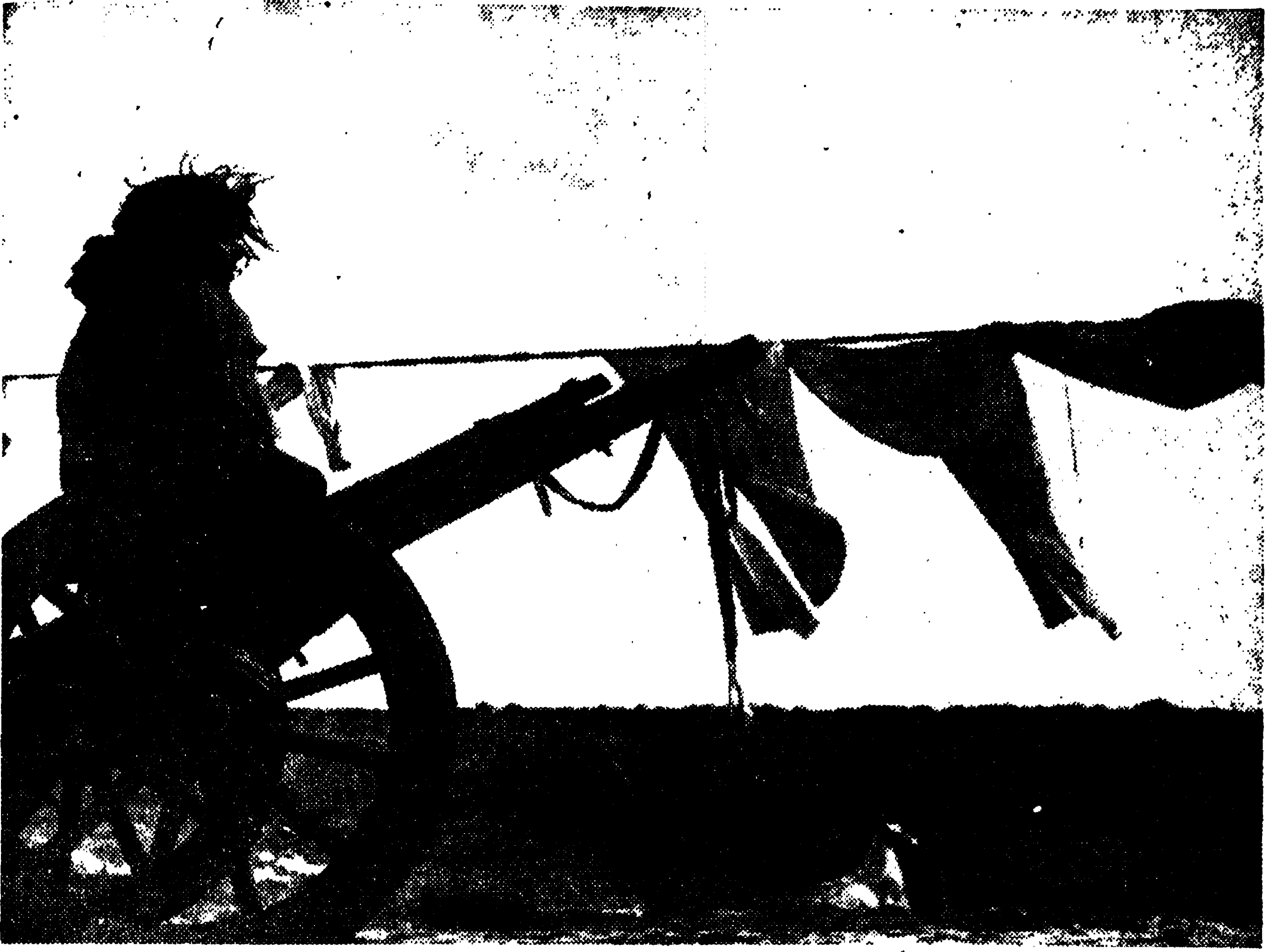
বাঁচাও পয়সা বাজারের। বুড়ো আঙুলে ঠেলে মানুষ কত ভাত খেতে পারে?

কিন্তু নিত্য বরাদ্দের আড়াই টাকায় মাছ হয় কি করে? আট দশ টাকা যার কিলো তার কতটুকু ঐ বরাদ্দে সংগ্রহ করা যায়? সেকথা আর কে বুঝছে!

না, আজ শশধরবাবু মাছ কিনবেন, সরমাকে অবাক করে দেবেন। বুঝবে কেবল কচু-ঘেঁচুই তিনি নিত্য সওদা করেন না। তবে—

বেশ স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যয় নিয়ে শশধরবাবু মাছের বাজারের দিকে এগিয়ে গেলেন। যেন নিত্য তিনি মাছ কিনে থাকেন, বিশেষ দিনে বিশেষ বরাদ্দ তিনি আমিষের জন্যে করেন না। রোজ মাছ-ভাত খান!

মাছের বাজার নয়, যেন মার-মার, কাট-কাট করে পরের জমির দখল-নেওয়া! এত দর তবু দেখ লোকগুলো যেন মৌচাকে মাছির মত মাছওলাদের ছেঁকে ধরেছে! মেছো কাকে দেয়, কাকে না দেয়। হৈ-হৈ, গোলমাল। শশধরবাবু অনেকক্ষণ এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন, কারো পায়ের ফাঁক দিয়ে কারো কুক্ষির রন্ধ্রপথে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মাছগুলো বোধ হয় টাটকা, ধারে-কাছে কোন পুকুর থেকে ধরে আনা হয়েছে! ক্রেতারা খুবই উল্লসিত, আহা এমন টাটকা মাছ বোধ হয় তারা কখনো দেখে নি। ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে শশধরবাবু যেন বাঙ্গালীর এই আমিষ লোলুপতার জন্যে মনে মনে মজা পেলেন! সাধে অর বলে মাছ-ভাতে বাঙ্গালী! মছলীখোর!

হঠাৎ কি হলো, অর্ধচক্রাকার ভিড়টা কেমন যেন ত্যাবড়াবেঁকা হয়ে গেল, মাছওলা যেন সামলাতে পারছে না, এদিক-ওদিক থেকে অধৈর্য ক্রেতারা এক-একটি মাছ তুলে নিয়ে বিক্রেতাকে ওজন করে দিতে তাড়া দিচ্ছে—মাছ ওজন করতে করতে মাছওলা যেন দিশাহারা হয়ে গেল, দৃষ্টি তার পাল্লার ওপর নিবদ্ধ!

শশধরবাবু হাত বাড়িয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। না থাক, সবার হোক, তরপর নেবেন, তাড়া নেই। কিন্তু ভাল মাছগুলো সব উঠে যাচ্ছে, যে যেমন পাচ্ছে নিয়ে মেছোকে তাড়া দিচ্ছে, কই নাও, নাও ওজন কর!

পুষ্করিণীর ধারে বৃদ্ধ বকের মত শশধরবাবু নিবিষ্ট মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মাছওলা লোকটাকে কোনদিন মাছের বাজারে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না, হয়তো সুবিধা মত মাছ পেয়ে বাজারে ছুটে এসেছে, ঠিক শহুরে মাছওলা বলে মনেও হয় না, তেমন চালাক-চতুরও নয়, পয়সার হিসেবও ঠিকমত করতে পারছে না। মুখে বসন্তের দাগ, মাথার চুলগুলো এলো-মেলো অযত্ন লালিত লতাপাতা যেন —গায়ের ফতুয়াটা বেশী জীর্ণ। ওজন করতে গিয়ে বারকতক দাঁড়িপাল্লার দড়ি ছিঁড়ে গেল, ক্রেতারা হৈ-হৈ করে উঠলো।

এদিকে বৃদ্ধ বক নড়েচড়ে উঠলো, কেউ লক্ষ্য করলে না। শশধরবাবু দম বন্ধ করে পেছন ফিরে যেন ছুট দিলেন। বাজারের মুখে পাটায় বসা আলুওলার সঙ্গে চোখা-চোখি হল। আলুওলা যেন কিছু বলবার জন্যে ইশারা করলে, শশধরবাবু গোঁ ভরে বাজার থেকে বেরিয়ে পড়লেন। শালা ফের!

সরমা অবাক হয়ে বললে, হঠাৎ এত মাছ? কি ব্যাপার? আজ তো—

শশধরবাবু কোন কথা বললেন না, স্ত্রীর হাত থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে এসে জামা খুলে বসলেন, তারপর চেঁচিয়ে বল-লেন, রোজ খাই না বলে একদিন বেশি

খাবার ইচ্ছা হয় না? কি ভাব আমাকে? মাছ কিনতে পারি না?

তর্ক করে লাভ নেই, সরমা মাছ কোটায় মন দিলে।...

সকালে আপিসের তাড়ায় আর শশধরবাবুর মাছ খাওয়া হয় নি। সরমা বলেছিল, রাত্তির বেলা মাছের কালিয়া করে খাওয়াবে, যত্ন করে রান্না করবে ঘি গরমমশলা দিয়ে—অনেকদিন পরে এতবড় মাছ এসেছে! সেই কবে খুকীর বিয়ের সময় বড় বড় মাছ এসেছিল, তাও কি নিজেদের মুখে উঠেছিল, পাঁচজনকে খাইয়ে নিজেরা হয়তো হাত চেটেছিল! তবু দেখে চক্ষু সার্থক, গর্ব, নিজেরা না খাক, পাঁচজনকে এত দরের মাছ খাওয়াতে পারছে। আর কথাটা মনে পড়লে এখনো সরমা কেমন লজ্জা পায়—কাজ-কর্মের বাড়িতে কোন্ ফাঁকে অতবড় লোকটা দুখানা ভাজা মাছ চুপিচুপি এনে কলঘরে ঢুকে বলে কিনা খেয়ে নাও, কেউ দেখবে না, আমি দাঁড়িয়ে আছি! সরমা কিছুতে ভাবতে পারে নি নিজের জিনিস নিয়ে সেদিন শশধর কেন অমন লুকোচুরি করেছিলেন।

মাছের কালিয়ার বাটিটা স্বামীর পাতের কাছে সাগ্রহে উপস্থাপিত করে সরমা বললে, আমরা সব ওবেলা দুখানা করে খেয়েছি, তুমি যেন আবার কারো জন্যে পাতে রেখো না।

শশধরবাবু আড়চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য খুশী খুশী, পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে আজ সরমাকে। যেন গৃহিণীপনায় আজই পরিপূর্ণ সুখ পেয়েছেন। যেন কোন অভাব বা অনটন নেই আর তাঁর সংসারে।

মাছের বাটিতে হাত দিয়ে কি ভাবলেন শশধরবাবু সামান্য মাছ তাঁর সংসারে আবহাওয়াটাই কেমন বদলে দিতে পারে! মাছের প্রতি এত—এত! ত! ত! কথাটা যেন মনের ভাবনায় মধ্যে হোঁচট খেলে। কত দাম হবে মাছটার? শশধরবাবুর কত দিনের দৈনিক বাজার খরচ চলে যেত? এ মাছ পয়সা দিয়ে কিনে তাঁর মত অবস্থার লোকের কি ক্ষতি হয়, কি বেহিসেবী খরচ হয়? পাঁচ দিন তিল তিল করে না খেয়ে একদিন এমন করে খাওয়ার কি কোন মানে হয় না? কে জানে।

স্বামীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে সরমা বললে, খেতে খেতে কি অত ভাবচো! সেই থেকে দেখছি—

মাছের বাটিতে হাত চুবিয়ে শশধর বললেন, ভাবছি নাকি, তাই মনে হচ্ছে?

চট করে সরমা মাছের বাটিটা স্বামীর পাতের ওপর ঢেলে দিয়ে বললে, নাও নাও খেয়ে-দেয়ে ভেবো। একদিন খাবে বাব্বা! কোথায় একটু স্ফূর্তি করে খাবে, তা নয় খেতে বসে যত রাজ্যের ভাবনা, যেন কি না কি খোয়া গেছে! কি না কি অন্যায় করেছো!

পাতের ওপর মাছের কালিয়ার ঝোল গড়িয়ে গেল, শশধরের যেন খেয়ালই নেই, ম্লান হেসে বললেন, কি আর খোয়া যাবে, আছেই বা কি!

তবে? সরমা তাড়া দিলে, নাও, খাও-ও!

শশধরবাবু আবার যেন থমকে অপেক্ষা করলেন, চারপাশ দেখে নিলেন, যতই আজ পাতে মাছ দিয়ে খাদ্যবস্তুর সমারোহ থাক, তাঁর ঘর-দোর-পরিবেশ তেমনি যেন দীন-হীন! কতকাল যে বাড়ীঘর চুনকাম করা হয়নি, কতকাল দেওয়ালের পলেস্তারা খয়ে গেছে, কতকাল—

কিন্তু বেশ অল্পে সন্তুষ্ট এরা, খেতে-পরতে পেলেই যেন বর্তে যায়। কি খাতির এখন, খাও-খাও, মাথা খাও। আহা, কি আমার আপনার জন সব! কত যেন মমতা, মায়া!—এদিকে অনুষ্ঠানের ত্রুটী হলে আর রক্ষা নেই, কত আক্ষেপ, কত দুঃখ আপন ভাগ্য আর একজনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বলে। কেবল হিসেব কি পেয়েছে, কি পায় নি, —কত আক্ষেপ নিরামিষাশীর গৃহিণী বলে!

হঠাৎ চোর রত্নাকরের কথাটা শশধরের মনে হল। বেচারা অত পরিশ্রম আর পাপ করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করলে, কেউ তার পাপের ভাগ নিলে না, না বাপ-মা, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে।

এই মুহূর্তে যদি শশধরবাবু বলে ফেলেন, তাঁর মনটা ব্যক্ত করেন, সকাল থেকে যে বিপরীত কাজের সমর্থনে মনের মধ্যে নানা যুক্তির জাল বুনেছেন তা প্রকট করেন, তাহলে সরমা কি বলবে, মানবে কি শশধরবাবু অন্যায় কিছু করেন নি? মানে, তাঁর কাজের অংশ ভাগ নিচ্ছে সে!

সরমা তাড়া দিলে সেই বসে আছ? কি গো একদিন বাজারে বেশি পয়সা খরচ করেছ বলে দুঃখ হচ্ছে? আচ্ছা লোক যা হোক!

শশধরবাবু আর অপেক্ষা করলেন না।

মাছ মুখে দিয়ে 'ওয়াক' 'ওয়াক' করতে করতে পাত ছেড়ে উঠে পড়লেন, পেট যেন তাঁর ঘুলিয়ে উঠতে লাগল। সরমা কি বলবে না বলবে ভেবে পেল না। দুঃখ পেল এমন একটা দামী পদে এসে বেচারার খাওয়া নষ্ট হয়ে গেল! ভাল খাওয়া বরাতে নেই, সে আর কি করবে। লোকটা যেন কি, চির-জীবন কেবল হিসেব করেই গেল।

তারপর সংসারের পাট চুকলে, ছেলে-মেয়েরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমে কাদা হয়ে গেলে, আলো নিবোন অন্ধকার ঘরে সরমা যেন স্বামীকে ফিসফিস করে কি বললে। খাটের বিছানায় শুয়ে তখনো শশধরবাবুর চোখে ঘুম আসে নি, যেন শুয়ে শুয়ে খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে বিচার করে দেখছিলেন, আলো অন্ধকারে ঘরজোড়া মেজের বিছানাটা কেমন যেন ব্লটিং কাগজে কালি জবড়ানো!

সরমার গলাটা ভৌতিক যেন, ... তোমার মাটি হল! আপিস যাবার ... যদি খেতে—

শশধরবাবুর ইচ্ছে করল, ... লাফিয়ে পড়ে ঘর থেকে ছুটে ... পালিয়ে এসেছিলেন সকালবেলা ... বাজার থেকে!

ফিসফিস গলাটা কেমন যেন কৈফিয়ৎ চাওয়ার মত মনে হল, অমন করলে কেন? ওয়াক তুললে, রান্না ভাল হয় নি।

পাশ ফিরে আনুনাসিক সুরে শশধরবাবু বললে, কেমন গন্ধ লাগল মাছটা, মনে হল—

কথাটা যেন অনেক আগে থেকে বলবে বলে সরমা ভেবে রেখেছিলেন, ছেলেমেয়েদের বিছানা ছেড়ে উঠে এসে স্বামীর গা ঘেঁসে শুয়ে বললে, তোমাকে বলবো মনে ... করেছিলুম, মাছটা তেমন ভাল ছিল ... গন্ধ আমারও লেগেছিল, কিন্তু তেমন ... নয়, দিব্যি খেয়ে নিলুম। পচা নয়, ... নরম যেন। ছেলেমেয়েরাও কিছু বললে না, সব দুখানা করে খেলে, কি খুশী! অনেকদিন পরে তো!

স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শটা যেন বিশেষ অস্বস্তির কারণ হল, দেহটাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে শশধর বললে, পচা মাছ খেলে তোমরা?

সরমা যখন স্বামীকে স্পর্শ করে বললে, পয়সা দিয়ে কিনে ফেলে দেবো? কি যে বলো!

শশধরবাবু দম বন্ধ করে উপুড় হয়ে বালিশ আঁকড়ে পড়ে রইলেন। সরমা অনেক চেষ্টা করে শশধরবাবুকে পাশ ফেরাতে না পেরে যেন রাগ করে বললে, তোমার একটুতেই ঘেন্না! গন্ধগন্ধবাই। এমন করলে যেন সত্যিকারের পচা মাছ তোমাকে রেঁধে দিইছি! বাবাঃ! যেন পোয়াতি মেয়ের 'ওয়াক তোলা' জল খেয়েও—

শশধরবাবু কোন সাড়া করলেন না। মাছটা পচা কি টাটকা সে বিচার করবার এখন আর কোন মুখ তাঁর নেই।

তারপর যেন ক্ষুন্ন হয়ে স্বামীর বিছানা থেকে নেমে যেতে যেতে সরমা বললে, কাল মাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করো কেন সে পচা মাছ দিয়েছিল। খুব করে ধমকে দিয়ো—চোবামির জায়গা পায় নি? যত সব চোর কোথাকার!

শশধরের ইচ্ছে হল সরমার মুখটা টিপে ধরে, রাতদুপুরে জ্ঞান দিতে এসেছে!

কিন্তু হায়, তাঁর সে শক্তিও যেন নেই!

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাই হোক যেতে হবে দিল্লী। সুতরাং তীর্থের আকর্ষণে আর বসে থাকা নয়।

দিল্লীর স্টেশনে পৌঁছতেই সেমিনার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমাদেরকে স্বাগত জানালো কিন্তু সবকিছুর মধ্যে আসল ব্যাপার হলো ভাবের আদান-প্রদান।

আগ্রায় এলেই মনটা কেমন একটা ব্যথায় ভরে যায়। হয়তো দু এক ফোঁটা জলও ঝরে পড়ে চোখ দিয়ে। মুহূর্তে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। মনে হয়, আমি অহীন্দ্র চৌধুরী নই—বৃদ্ধ শাজাহান, আগ্রা দুর্গে বন্দী। জীবনে আমার একমাত্র সান্ত্বনা ওই প্রেমের মন্দির তাজমহল। হয়তো শাজাহানের ব্যথাটা নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিলাম, বলেই বোধহয় আমার নাটকের শাজাহান ব্যর্থ হয়নি। আমি তো জানি, মঞ্চে শাজাহান অভিনয় করতে কখনো মনে হয়নি, আমি অভিনয় করছি, মনে হয়েছে সত্যিই আমি ভারতসম্রাট শাজাহান।

যাক সে কথা। আগ্রায় এসে উঠেছি আগ্রা হোটেলে। হোটেল থেকে তাজমহল স্পষ্ট দেখা যায়।

দেখলাম ইতিহাসের স্মৃতির স্বাক্ষর। আগ্রা এবং তার আশেপাশে যা কিছু দর্শনীয় দেখেছি। দেখেছি আগ্রা ফোর্ট দেখেছি, 'সেকেন্দ্রা' দেখেছি মৃতনগরী ফতেপুর সিক্রী। ফতেপুর সিক্রীতে গেলে মনটা কেমন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। মনে হয়, কোথাও প্রাণের উত্তাপ নেই, চারদিক জুড়ে শুধু ইতিহাসের ব্যর্থ কান্না।

আগ্রার দিন ফুরিয়ে এলো। ২১ মার্চ, আমরা আগ্রা থেকে রওনা হলাম কলকাতার পথে।

কলকাতায় এসেই আবার সেই নানা কাজের মধ্যে দিন কাটানো। আর ভালো লাগে না, এতো কাজ। তবু একেবারে তো কাজের বাইরে যেতে চাইছি না। থিয়েটার সিনেমা ছাড়তে চেয়েছি, হয়তো শীগগির ছেড়ে দেব। তখন সময় কাটানোর জন্যে অন্য কোন কাজ চাই তো। তাই আজকাল আমার নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর্বটা বেড়ে গেছে।

থিয়েটার সেন্টার এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করলে। আমাকে ভাষণ দিতে হলো অনুষ্ঠানে। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন অনুষ্ঠানের।

নীহারবালা সে আমলের বিখ্যাত অভিনেত্রী। মঞ্চে তাঁর জুড়ি ছিল না। কী অভিনয়ে, কী নাচে, গানে—মঞ্চে সে ছিল অদ্বিতীয়া। নীহারবালার মৃত্যুর খবর আমরা কেউই সহজভাবে নিতে পারিনি। নীহারবালার মৃত্যুর সঙ্গে সে আমলের সঙ্গে একটি যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

যে নীহারবালা জীবনে অভিনয়কে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যিনি অভিনেত্রী রূপে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন—সেই অভিনেত্রী একদিন শুধু মঞ্চ ত্যাগ করে নয়, একেবারে সমাজ-সংসারের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে। অভিনেত্রী নীহারবালার মৃত্যু হলো আশ্রমিকা রূপে। পণ্ডিচেরীর আশ্রমের পবিত্র পরিবেশেই তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়ে।

আমরা কলকাতায় বসে খবর পেলাম। দূর থেকে স্বর্গতা শিল্পীকে স্মরণ করলাম।

সংগীত-নাটক আকাদমীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বাংলা নববর্ষে। সেদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে বাংলা দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এর মধ্যে একদিন রাজভবনে শেকসপীয়র সোসাইটির একটি সভা হয়। রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন সেদিনের সভায়।

কঙ্কাবতীর ঘাট সে আমলের বিখ্যাত নাটক। এইটিই চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। যেটিতে আমি মিঃ মুখার্জির চরিত্রে রূপ দিয়েছিলাম। জীবনে যেসব চরিত্রে রূপ দিয়ে আনন্দ পেয়েছি, এইটি তার মধ্যে অন্যতম। চিত্রটি কলকাতায় মুক্তি পেল ১২ই আগস্ট।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ডাকনাম হাবুল। আর সেই নামেই সে থিয়েটার মহলে পরিচিত। পরিচিত মানুষটি হারিয়ে গেল, কিন্তু নামটা হারিয়ে যাবার নয়। হাবুল এক সময়ে মঞ্চে যোগ দিয়েছিল প্রম্পটার হিসাবে, পরে অভিনেতা হিসাবে নাম করে। সে ছিল প্রত্যেকের কাছে প্রিয়। এই সবার প্রিয় মানুষটির মৃত্যুসংবাদ পেলাম ১২ আগস্ট তারিখে।

জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে এক-এক করে কতোজন চলে যাচ্ছে। যাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি মঞ্চে, রং মেখেছি, সংলাপ উচ্চারণ করেছি—তারা যখন চলে যায়, তখন নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবি, আমাকে আর কতোকাল এখানে থাকতে হবে। কিন্তু যাবো বললেই তো আমি পালিয়ে যেতে পারবো না। ডাক যতোদিন না আসবে আমাকে থাকতে হবে। তবে একটা ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। অনেকদিন থেকেই মনে করছিলাম, মঞ্চ ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব অভিনয় করা—এবার সত্যি বোধহয় অভিনয়জগতের বাইরে আসতে পারবো। এতোদিন মঞ্চে আমার পরিচয় ছিল অভিনেতা। পরিচয় হারিয়ে যায়নি, তবে আগে মঞ্চে দাঁড়াতাম অভিনয়ের সাজে, আজকাল মঞ্চে দাঁড়াতে হয় বক্তা হিসাবে। একদিনের অভিনেতা, অন্যদিনের বক্তা। আর এই বক্তৃতার মঞ্চ, 'আকাদমী'। আমাকে নাটকের ছাত্রদের পড়াতে হয়, অভিনয়-কলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হয়। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী করছে মাস্টারী—মন্দ নয়।

অভিনেতার জাতবদল হয়েছে। আকাদমির কাজ তো আছেই তারপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হচ্ছে প্রায়ই। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীকে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হলো, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে। আমাকে সভাপতিত্ব করতে হলো। শিশিরবাবুকে সম্বর্ধনা জানিয়ে, কংগ্রেস একজন সত্যকার গুণীকে সম্বর্ধনা জানালেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে, ও সি গাঙ্গুলী, সজনী দাস, বিমল সিংহ, সুনীতি চ্যাটার্জি, নরেন্দ্র দেব, কালিদাস রায়, তারাশংকর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ-ছাড়া চিত্র ও মঞ্চ-জগতের অনেকেই ছিলেন সেদিনের উৎসব মণ্ডপে। সেদিনে শিশির সম্বর্ধনায় আমি 'শিশিরবাবুকে আমাদের অগ্রণী পথ-নির্দেশক' বলে অভিহিত করেছিলাম। কিছুদিন বাদেই নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তকে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্টুডেন্ট হলে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেখানে আমি ছিলাম প্রধান অতিথি।

বাইরে যাবার সুযোগ খুঁজছিলাম সুযোগ করেও নিলাম। এবারে যাবো রাজস্থানের পথে। ভারতের ইতিহাস-তীর্থ রাজস্থান—যেখানে ঊষর মাটিতে আকাশে,

বাতাসে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের নানা স্মৃতি।

রাজস্থান ভ্রমণ-সূচীর প্রথমেই এলাম বিখ্যাত জৈনতীর্থ মাউন্ট আবুতে।

প্রবাসে কোথাও এলে, স্থির থাকতে পারি না। এ অস্থিরতা আমার আজকের নয়। অনেকদিনের। আর এইজন্যেই বোধহয় ঘরের বাইরে ছুটে চলার এতো আগ্রহ আমার। তাছাড়া কোথাও বিশ্রামের অবসর যাপন করতে আসি না। মাউন্ট আবুতে এসে প্রথমেই আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে আশ্রয় নিলাম। তারপরই কোথায় কী দেখবো, তারও ছক ঠিক করে ফেললাম মনে মনে।

রাতটা হোটেলেই কাটলো নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। দারুণ শীতের রাত। যেন শেষ হতে চায় না। তবু শেষ হলো। রাত ভোরে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সূর্যোদয়।

সকালে আর কোথায় যাবো—হোটেলের কাছাকাছি রাস্তায় বেড়ালাম। ঘুরতে ঘুরতে একবার বাজারের দিকেও গেলাম। তারপর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিখ্যাত হ্রদ নক্কীতালাও দেখতে গেলাম। রমণীয় হ্রদ। পাহাড়ের মনোরম পাদদেশে পরম রমণীয় হ্রদে বিহার আর এক অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে হ্রদের বুকে ছোট ছোট দ্বীপখন্ডের পাশ দিয়ে যখন আমাদের স্পীড বোট-গুলো ছুটে চলছিল, তখন বারবার একটি কথাই মনে আসছিল, যদি এখানে এই নির্জন দ্বীপে দিনকতক থাকতে পারতুম। কিন্তু এ চিন্তা ক্ষণিকের। এ চিন্তাকে কোনদিন বাস্তবে রূপ দিতে পারবো না। সুতরাং স্বপ্নবিলাসী মনকে পিছনে রেখে বাস্তব চিন্তায় ফিরে এসেছি। বস্তুবাদী মন নিয়ে দেখেছি চারদিকের রমণীয় পরি-বেশ। দেখেছি, যা কিছু দর্শনীয়।

অচলগড়ের কথা শুনেছি, দেখার আগ্রহও অনেকদিনের। তাছাড়া ইতিহাস-বিখ্যাত স্থানগুলো দেখবার জন্যে মনের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ জমা হয়ে থাকে। চির-দিন নাটক করেছি, এবং ইতিহাস-আশ্রিত নাটকের চরিত্রে রূপ দিতে দিতে এমনই হয়ে গিয়েছি, যে ইতিহাসের কথা শুনলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ি।

শিরোহী রাজপুতদের দুর্গ ছিল এই অচলগড়ে। যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো বর্তমান।

দুর্গ দেখলাম। দুর্গের পাথরে পাথরে পুরোনো ইতিহাসের কথা। কান পেতে শুনি সেই অব্যক্ত কথা।

ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত এইসব দুর্গ দেখলে বারবার অতীতের রাজপুত শৌর্যের কথা মনে পড়ে। সে যুগ আমাদের চোখে অদেখা, কিন্তু এইসব জায়গায় এসে দাঁড়ালে সেদিনের অদেখা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আজকাল একটা ঝোঁক আমাকে পেয়ে বসেছে। ঝোঁকটা ছবি তোলার। যেখানেই যা কিছু সুন্দর—সব কিছুকে ক্যামেরায় ধরে রাখার ঝোঁক।

এবারে শারদোৎসবের দিনগুলি প্রবাসেই কাটছে। বাংলা দেশের পুজোর চেহারাটা এসব দেশে পাওয়া যায় না। তবে দশেরা উৎসবটি এসব দেশে জমকালো।

পুজোর মধ্যে একটি দিনে দিলওয়ারা মন্দির দেখতে গেলাম। এটি একটি জৈন তীর্থ। মর্বেল পাথরে নির্মিত এই মন্দিরটি সত্যই দর্শনীয়।

বলেছি তো, আমার ছবি তোলার ঝোঁক। অনেকগুলি ছবি তুললাম।

প্রতিদিনই অভ্যাস মতো বেড়াতে যাই। আজ এখানে, কাল সেখানে। প্রবাসের দিনগুলো নানা রঙে ভরিয়ে তুলি।

বিজয়াদশমীর দিনে পাহাড়ী পথ ধরে বেড়াতে বেড়াতে এলাম লক্ষ্মী তালাও-এ। এদিক-ওদিক বেড়িয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। তারপর ফিরে এলাম নির্দিষ্ট আশ্রয়ে।

বিজয়াদশমীর পর একটা কাজ হলো, পরিচিত প্রিয়জনদের বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানানো। অনেক চিঠি লিখলাম মাউন্ট আবু থেকে। দূরদেশে এলে কি হবে, পিছনের টান ঠিকই থাকে।

মাউন্ট আবু থেকে যোধপুরে রওনা হয়ে, যোধপুর এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।

স্টেশন থেকে সার্কিট হাউস। আশ্রয় নিলাম সার্কিট হাউসে। সুন্দর ব্যবস্থা। কোথাও কোনো অসুবিধে নেই।

আজ আর বেড়ানো নয়, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। রাত ন'টায় রাতের আহার্য গ্রহণ করে শয্যা গ্রহণ করলাম। শুধু রাতটুকু—রাত ভোর হতে আবার বাইরে যাবার নেশা। সকাল সাড়ে সাতটায় স্নান ও প্রাতঃরাশ সেরে যোধপুরের দর্শনীয় স্থানগুলি পরি দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম।

জীপে করে পরিক্রমায় বেরিয়েছি। সঙ্গে গাইডরূপে পেয়েছি ইসাককে। প্রথমেই এলাম মহামন্দিরে। মহারাজার গুরু-মন্দির এটি। পথে দেখলাম ঐতিহাসিক যোধপুরের নানা দৃশ্যপট। প্রাচীন রাজধানী দেখলাম। রাঠোর রাজপুতদের স্মৃতি-বিজড়িত এই প্রাচীন রাজধানী। দেখলাম, রাজবাড়ী। দেখলাম, বিরাট হলঘর—যেখানে বিরাজ করছে ঐতিহাসিক শূন্যতা। প্রাচীন রাজধানীর অনেককিছুর মধ্যে আমাকে আকৃষ্ট করলো 'জেনানা মহল'। জেনানা মহলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনু-ভব করলাম—এই প্রাসাদের পাষাণে পাষাণে কতো নারী-হৃদয়ের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস মিশে রয়েছে।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আরো যা কিছু দর্শনীয়, দেখলাম, রমণীয় উদ্যান, রমণীয় প্রাসাদ—সব আছে, কিন্তু সব কিছু আজ অতীতের স্মৃতি হয়ে গেছে। এখানে আর প্রাণ নেই, নেই উচ্চারিত কণ্ঠস্বর—যা আছে তা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো, রাণা অজিত সিংহের স্মৃতিসৌধটি দেখে এই কথাটাই মনে হলো।

যোধপুরে আর একটি স্থান সুন্দর লাগলো। এটি হলো কৃত্রিম হ্রদ 'বাল সমুদ্র'। মরুভূমির দেশে এই রমণীয় হ্রদের আকর্ষণ কম নয়।

এর পর এলাম যোধপুর দুর্গে। যেখানে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে রাজপুত যুগের নানা কাহিনী। আজ সবটাই অতীত, তবু বর্তমানের পথিক আমি, আগ্রহভরে সব কিছুই দেখি।

যোধপুর দুর্গ থেকে আমরা এলাম মহারাজা যশোবন্ত সিংহের স্মৃতি-বিজড়িত প্রাসাদ দেখতে। আমার অভিনয় জীবনে শাজাহান নাটকে এই চরিত্রটি উচ্চ কন্ঠে কতো কম্পিত সংলাপ উচ্চারণ করেছে—আজ চোখের সামনে ইতিহাসের সেই রাজপুত বীরের অনুচ্চারিত সংলাপ শুনলাম। যা নাটককেও হার মানায়। এখানে আমি অভিনেতা নই, এখানে ভারত সম্রাটের 'মেক-আপ' নিয়ে আসিনি। এখানে নির্বাক নাটকের দর্শক আমি। আমি দেখছি—আমি কান পেতে নয়, হৃদয়ের সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে শুনেছি, যশোবন্ত সিংহের জলদ গম্ভীর কন্ঠস্বর।

রাতের মধ্যে আমার কাছে শরতের কোজাগরী পূর্ণিমার রাতটাই সবচেয়ে রমণীয়। এই রাতের তুলনা নেই।

এবারে কোজাগরী পূর্ণিমার সৌন্দর্য আমি উপভোগ করছি রাজস্থানের ঊষর পরিবেশে।

রাজস্থানের মানুষের কাছে দিনরাতের কী মূল্যায়ন, তার খবর রাখি না—তবে আমার কাছে রাজস্থানের রাতের তুলনা নেই। রাত এখানে আমার কাছে একটা বিরাট সান্ত্বনা।

এই দিনে আমরা দর্শন করলাম বৈষ্ণবদের প্রিয় মন্দির—দেবতা যেখানে কুঞ্জবিহারী। তারপর দেখলাম এখানকার হ্রদসদৃশ একটি মনোরম জলাধার।

যোধপুর থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে দর্শনীয় স্থান ওসিয়াঁ। আমাদের ওসিয়াঁর সহযাত্রী প্রসাদবাবু এবং তাঁর এক ডক্টার বন্ধু।

বন্ধুর পথ ধরে আমরা চলেছি ওসিয়াঁর দিকে। পথের দুধারে ছড়িয়ে রয়েছে ঊষর এলাকা। যাকে মরুভূমি বললেও ভুল হয় না। মাঝে মাঝে দেখছি ছোট ছোট জনপদ, দেখছি সবুজ উদ্যানের স্পর্শ। দেখছি উটের মিছিল।

এই রুক্ষতা—তবু তার মধ্যে কী যেন এক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, যা রাজস্থান ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

চলতি পথে দেখলাম, একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এটি আর কিছু নয়—বিবাহের শোভাযাত্রা। রাজপুত যুবক চলেছে বিয়ে করতে। পরনে মূল্যবান বর্ণাঢ্য পোশাক—সঙ্গে যাঁরা চলেছে তারাও কম যায় না। দেখতে ভারি সুন্দর লাগলো। মনে হলো কোন ধ্রুপদী শিল্পীর আঁকা বহু বর্ণে রঞ্জিত ছবি দেখলাম।

বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যখন ওসিয়াঁ পৌঁছলাম তখন বেলা পৌনে বারোটা।

এখানে এসে প্রথমেই গেলাম চামুন্ডা মন্দিরে। সুন্দর মন্দির। চারদিকে দুর্গ-প্রাকারের মতো সুউচ্চ প্রাচীর-দেশ। দেখলাম মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। পুজো দিলাম—প্রণাম করলাম দেবীকে। তারপর এলাম অন্যত্র। যেখানে সুন্দর একটি দীর্ঘিকা। যেখানে 'গাগরী ভরণে' এসেছে রাজপুতবালারা।

রাজপুতেরা রং ভালোবাসে। তাদের পোশাকে তাই নানা রঙের বিন্যাস।

সত্যিই বিচিত্র এই ভারতবর্ষ। একটি বিরাট দেশ, বিরাট জাতি—যার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও এদেশে সমন্বয়ের সুর।

সুদূরে বাংলাদেশ থেকে রাজস্থানে এসেছি। দেখছি যা কিছু দেখার। সংগ্রহ করছি যা কিছু পাই। আমার সংগ্রহশালায় গোটা ভারতবর্ষকে বন্দী করার ইচ্ছা। যেখানে যা কিছু পেয়েছি, তার মধ্যে কিছু না হোক, একটি চিহ্নও সংগ্রহ করে এনেছি। রেখেছি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। আর কিছুর জন্যে নয়—জীবনে যখন চার দেয়ালে বন্দী হয়ে থাকবো—তখন এইসব চিহ্নের মধ্যে আমি ভারতবর্ষকে দেখবো এই ইচ্ছা। আরো একটি ইচ্ছা—হয়তো এই সবের মধ্যে আমি একজনকে আবিষ্কার করবো, যার পরিচয় পথিক অহীন্দ্র চৌধুরী।

চলতি পথে ছেদ চিহ্ন টানতে আমার মন চায় না। এবারে আমি চলেছি উদয়পুরের পথে।

উদয়পুর রাজপুত বীরদের স্মৃতি নিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর।

উদয়পুরের আকর্ষণ আমার কাছে কোন জায়গার চেয়ে কম নয়। রাজপুত রাণাদের উত্থান-পতনের বহু কাহিনী জড়িয়ে আছে এখানকার প্রাসাদে, রাজপথে, ঊষর মরুপ্রান্তে।

শহর দেখলাম। প্রাচীনত্বের গন্ধ সর্বত্র ছড়ানো। দেখলাম, রাণা অমর সিংহের প্রাসাদ, দেখলাম জয় সমুদ্র, রাজ সমুদ্র, দেখলাম রাণাদের পুজিত দেবতা এক-লিঙ্গেশ্বর। শহর থেকে এই মন্দির বেশ কিছু দূরে।

আরো দেখলাম, মোগল সম্রাট সাজাহানের সহেলীবাগ। যেখানে শাজাহান নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদে মত্ত থাকতেন। আজ সে সাম্রাজ্য নেই, নেই সম্রাট সাজাহান। কিন্তু তাঁর স্মৃতিটা এখনো জড়িয়ে আছে সহেলীবাগে।

সহেলীবাগ মনোরম উদ্যানে দাঁড়িয়ে মনে-মনে দেখছি সেদিনের কল্পিত ছবি। দেখছি, যেন সম্রাট এসেছেন সহেলীবাগে—তাঁকে ঘিরে ক্রীতদাসীরা, যার মধ্যে অজস্র সুন্দর মুখ রয়েছে, দেখছি—সুন্দরী নর্তকীরা শাজাহানকে ঘিরে আছে নৃত্যের মুদ্রায়, সম্রাটের নির্দেশ পেলেই শুরু হবে নৃত্য।

কিন্তু পরক্ষণে কল্পনার ছবিটা মন থেকে সরে যায়। মনে হয়, বাস্তবে যা ঘটতো—হয়তো আমার কল্পনা সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

বেশ কয়েকটা দিন উদয়পুরে কাটলো। দেখলাম অনেক কিছু। কিন্তু সমর সিংহের বিরাট প্রাসাদে এসে দাঁড়াতে একটা কথাই মনে হয়েছিল, ইতিহাস একবিন্দুতে স্থির থাকে না। ইতিহাস তলিয়ে যায়, তার স্বাভাবিক পথে। পড়ে থাকে ইতিহাস—শুধু স্মৃতি হয়ে।

চিতোরগড় দেখার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। সেই স্বপ্নের চিতোরগড়ে এসে পৌঁছলাম নভেম্বরের এক শীতের দুপুরে।

স্থানীয় ডাকবাংলোতে আমাদের আশ্রয় নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে এসেই অনেকের কাছ থেকেই একটি কথাই শুনলাম। যে ডাকবাংলোর চেয়ে রেলওয়ে রিটায়ারিং-এ থাকা ভালো। তখন সহকারী স্টেশন মাস্টার একজন বাঙালী যুবক। সে-ও বার-বার বলতে লাগলো, ডাকবাংলো যেখানে, জায়গাটা বড় নির্জন। তার চেয়ে রিটায়ারিং রুমে থাকুন। শুধু নির্জন নয়, রাতেরবেলা এখানে নানা রকম উপদ্রব ঘটাও অসম্ভব নয়।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ডাকবাংলোয় আর থাকা হলো না।

চিতোরগড় রাজপুত ইতিহাসের পাতায় একটি বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। রাজপুত বীররা এই চিতোরগড় রক্ষা করতে আত্মবলিদান দিয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সেই আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। চিতোরগড় শুধু রাজপুতদের কাছে নয়, সারা ভারতের দেশপ্রেমিকের কাছে শহীদ-তীর্থ। স্বাধীনতাকামী রাজপুতদের রক্ত ঝরেছে রাজস্থানের মাটিতে, বীরাঙ্গনারা জহরব্রত অবলম্বন করে বীরপুরুষদের অনুগামিনী হয়েছে।

নানা কথা মনের মধ্যে নিয়ে আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি। চিতোরগড়ের প্রধান ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালাম এক সময়। এখানে সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে সুরযমল আর বাদল প্রাণত্যাগ করে-ছিলেন। রাজপুতবীরদের রক্ত ঝরেছিল যেখানে, সেখানে রয়েছে স্মৃতিফলক। শুধু এক জায়গায় নয়, চিতোরগড়ে এমন অনেক স্মৃতিফলক রয়েছে। যেখানে পাথরে খোদিত রয়েছে সেই অমর বীরদের কথা।

নওলক্ষ ভান্ডার দেখলাম, দেখলাম রাণাকুম্ভের প্রাসাদ, দেখলাম ধাত্রীপান্নার মহল। দেখলাম পুজামণ্ডপ, দেখলাম দরবার গৃহ, দেখলাম অতীতের অনেক ধ্বংসাবশেষ।

মীরাবাঈ—ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাজ্ঞী। মীরাবাঈ-এর স্মৃতি-বিজড়িত গিরিধারী মন্দির দেখলাম। দেখলাম ভক্তি-মতী মীরার মর্মর মূর্তি। মনটা ভরে গেল।

চিতোরের জয়স্তম্ভটি আজ দু চোখে প্রত্যক্ষ করলাম। দেখতে পেলাম কালিকা মাতার মন্দির। দেখলাম সম্বা দেবী এবং চিতোরেশ্বরী। রাজপুতরাও ছিলেন শক্তির পুজারী।

এতো দেখলাম, এতো ঘুরলাম—কিন্তু পদ্মিনী মহলে এসে যেন আর এক জগতে হারিয়ে গেলাম। রাণী পদ্মিনীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি করুণ কাহিনী। তবুও দেখলাম। পদ্মিনী মহলের পাথরে-পাথরে কান পেতে শুনলাম, পদ্মিনীর অব্যক্ত কথা। তারপর ব্যথাতুর মন নিয়ে এলাম হাওয়াই মহলে। যেখানে এসে মনের ব্যথাটা দূরে সরিয়ে ফেললাম।

এতো দূর দেশে এসেছি। দেখছি কতো ঐতিহাসিক স্থান; কিন্তু এই দেখার মধ্যেও স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার জনৈক চৌধুরীর ছোট্ট সুন্দর সংসারটিও আমাকে কম মুগ্ধ করে নি।

চৌধুরীর ছোট্ট সংসার—ঘরে সুন্দরী তরুণী স্ত্রী। আর আছে এক রাজপুতানী—যে ঘর-কন্নার কাজে এদের সাহায্য করে। এই ছোট্ট সংসারের পরিবেশে এসে আমি বাংলা দেশকে খুঁজে পেলাম।

কতোদিন হয়ে গেছে, স্মৃতির দরজা খুললে এখনো দেখতে পাই—মনের কোণে ঠাণ্ডা পানীয় হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই তরুণী বাঙালী বধূটি। মুখে যার ভীরু লজ্জা মেশানো হাসি।

এই স্মৃতি নিয়ে আছি। স্মৃতির মধ্যেই নিজেকে আবিষ্কার করি। আমারই স্মৃতির দর্পণে, আমারই নানা রূপ—সে যেন এক অপরূপ দৃশ্য।

বেরিয়েছি ভ্রমণে। কোথাও আমি তখন স্থির নই। এবারে আমরা চললাম মহাতীর্থ পুষ্কর এবং সাবিত্রী দর্শন করতে।

পুষ্করে এসে প্রথমে দর্শন করলাম রনজীর মন্দির। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য রীতিতে গঠিত মন্দির। যেখানে রয়েছে বিরাট গোপুরম।

দেখলাম পুষ্কর হ্রদ এবং ব্রহ্মা মন্দির। ব্রহ্মা এবং গায়ত্রী—বিশ্বপিতা এবং বিশ্ব-মাতার প্রতীক। এখানে দেখা হলো ভাট-পাড়ার একটি দলের সঙ্গে। যাঁরা তীর্থ-দর্শনে বেরিয়েছেন। ও'রা আগ্রহভরে আমার ছবিও নিলে। দূরদেশে এসে বাংলা দেশের মানুষ দেখে আনন্দ হলো। আবার তাদের ছবিও আমি তুললাম।

এবারে সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠার পালা। আগে হলে হয়তো পায়ে হেঁটেই উঠতাম। কিন্তু এখন আর সে সামর্থ্য নেই। অগত্যা আমরা ডুলি করে নিলাম।

পাহাড়ের ওপরে উঠেছি। দর্শন করেছি মন্দিরের দেবীকে। এখানেও অনেক বাঙালী তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হলো।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অন্য চিন্তা

'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার গত ১লা অক্টোবরের সংখ্যায় গিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হ্যারল্ড এ ড্রেটন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির নাম 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না সামাজিক বিপ্লব?' ইংরেজি 'ফার্টিলিটি কন্ট্রোল'-এর বাংলা এখানে করা হয়েছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। যে-ব্যাপারটি তিনি বোঝাতে চাইছেন তা আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা নামে সাড়ম্বরে চলছে রয়েছে। লালত্রিকোণ মার্কা প্রচারের দৌলতে আমরা সবাই জেনে গিয়েছি, ছোট পরিবারই সুখী পরিবার, দুটি বা বড়ো জোর তিনটি সন্তানের বেশি কখনোই নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। উপায়টিও নাগাল ও সামর্থ্যের মধ্যে, মাত্র পাঁচ পয়সার একটি —নিরোধ! পরিবার পরিকল্পনার পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন জ্ঞানী চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিরাও। এ-অবস্থায় আমরা সাধারণ মানুষরা মোটামুটি এই ধারণা বদ্ধমূল করতে পেরেছি যে দেশের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। এ-বিষয়ে যে অন্য বক্তব্যও ঘটতে পারে তা জানার সুযোগ আমাদের বিশেষ নেই। অধ্যাপক ড্রেটন এই অন্য বক্তব্যকেই তুলে ধরেছেন যথেষ্ট জোরের সঙ্গে। এ-সপ্তাহে বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের সামনে এই বক্তব্যটি রাখতে চাই। গত ২২শ সংখ্যায় 'জনসংখ্যার তত্ত্ব ও তথ্য' শিরোনামায় যে আলোচনা তুলেছিলাম তা এইসঙ্গে মনে রাখলে অধ্যাপক ড্রেটনের বক্তব্যের জোর ও ধার আরো স্পষ্ট হবে।

ইতিহাসের পরিহাস বলতে হবে, ম্যালথাস যে-সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কামান দাগাতে শুরু করেছিলেন সে-সময়েই ক্যারিবীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ বাগানে নিগ্রো দাসদের ঘরে প্রতিটি শিশুর জন্মের জন্যে ভারপ্রাপ্ত ওভারশিয়ারদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল! বাগানের মালিকরা কখনোই বাগানে থাকতেন না, কিন্তু যেখানেই থাকুন এই পুরস্কার দেওয়ার জন্যে তাদের দেয় ট্যাক্সো থেকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হত। এই নীতির ফলে দাসদের ঘরে ঘরে প্রচুর সংখ্যায় শিশুর জন্ম হয়েছিল। এত প্রচুর সংখ্যায় যে পরে আফ্রিকা থেকে দাসদের চালান বন্ধ হয়ে যাবার পরেও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ব্রিটিশ বাগানে দাসদের সংখ্যায় ট পড়েনি।

এ-ঘটনা আঠারো শতকের শেষদিকের। ম্যালথাস বিচলিত হয়েছিলেন ব্রিটেনের জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য দেখে। প্রায় দুশো বছর পরে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে একই ধরনের দারিদ্র্যের ছবি, বিশেষ করে এশিয়ায় আফ্রিকায় ও ল্যাটিন আমেরিকায়। তিনি যেমন মনে করতেন যে ব্রিটেনের জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্যের মূলে কারণ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, তাঁর বর্তমান শিষ্যরাও তেমনি মনে করেন যে এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে (শ্রুতিমধুর একটি বিশেষণ প্রয়োগ করে যে-দেশগুলোকে বলা হয় 'উন্নতিশীল') জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচণ্ড চাপের দরুণই এত নিচু জীবনযাত্রার মান, এত বেশি দারিদ্র্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ম্যালথাস চেয়েছিলেন 'নৈতিক সংযম' আর নব্য-ম্যালথুসীয়রা চাইছেন 'নিরোধ'। এই নিয়ে এমন একটা প্রচারের দামামা চলেছে যে মনে হতে পারে নিরোধ চালু করাটাই আজকের দিনে প্রধান সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব।

অধ্যাপক ড্রেটন বলছেন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারকে এভাবে অগ্রাধিকার দেওয়াটা শুধু যে মানুষের উদ্যম দক্ষতা ও সময়ের অপচয় তাই নয়; বিপজ্জনকও। কেননা এর ফলে মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে যাচ্ছে, তারা দেখতে পাচ্ছে না যে দারিদ্র্যের মূল কারণ সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং খোলাখুলিভাবেই রাজনৈতিক। এই মূল কারণগুলোর ওপরে যতক্ষণ না হাত পড়ছে ততোক্ষণ বাচ্চার জন্ম বন্ধ করার উপায় যতো নিশ্চিতভাবেই প্রযুক্ত হোক না কেন সমস্যা থেকেই যাবে।

সাবেকী ম্যালথুসীয়দের যুক্তি ছিল এই রকম : জনসংখ্যা বৃদ্ধি যতো বেশি খাদ্য—উৎপাদন বৃদ্ধি ততো বেশি নয়, অতএব দুয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটবেই, অতএব অবশ্যম্ভাবী দারিদ্র্য। নব্য-ম্যালথুসীয়দের পক্ষে এই যুক্তি আশ্রয় করাটা কিছুটা অস্বস্তিকর, কেননা অতি-ফলনশীল বীজের কল্যাণে এমনকি এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতেও 'সবুজ বিপ্লব' ঘটছে, ভারতেও ঘটেছে (এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ভারতে একটি ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হয়েছে)। মেক্সিকো ফিলিপাইন, ভারত ইত্যাদি দেশে গম ও ধানের ফলন এখন আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-উৎপাদন ইচ্ছে করেই কমানোর চেষ্টা করা হয়, তা সত্ত্বেও সে-দেশে কৃষি-উৎপাদনে বিপুল উদ্বৃত্ত।

অধ্যাপক ড্রেটন এ-বিষয়ে বিশেষ অবহিত যে এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির অবস্থা একরকমের নয়, প্রত্যেকটি দেশেরই রয়েছে নিজস্ব অনন্যতা ও বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক সম্পদ ও উন্নতিলাভের উপকরণের প্রাচুর্য বা অনটনের দিক থেকেও দেশে দেশে প্রচুর পার্থক্য। কাজেই কোনো একটি দেশের সমস্যা বিশেষ করে সেই দেশেরই সমস্যা, তার সমাধানও তাই, সকল দেশের ক্ষেত্রে তা সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবুও অধ্যাপক ড্রেটন মনে করেন গিয়ানার ছবিটি তুলে ধরলে বর্তমান শতকের অনেকগুলো গরীব দেশের সামাজিক অভিজ্ঞতার চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

গিয়ানা পূর্বে ছিল ব্রিটিশ গিয়ানা, ব্রিটিশ উপনিবেশ। আয়তন ৮৩,০০০ বর্গমাইল, ব্রিটেনের আয়তনের প্রায় সমান। কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে ছ' লক্ষ। ইউরোপ থেকে সাজসরঞ্জাম আমদানীর ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কিছুটা উন্নতি ঘটে ১৯২০ থেকে। তারপর থেকেই মৃত্যুর হার কমছে, যদিও মাঝেমধ্যেই মহামারি দেখা দেয় ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বাড়ে—

ডঃ জুলিয়স অ্যাক্সেলরড (আমেরিকা) : ইনি সুইডেনের ডঃ উলফ্ ফন্ অয়লার এবং ইংল্যাণ্ডের সার বার্নার্ড কাটজের সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে (শারীরবৃত্তে) ১৯৭০ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

তখন আবার মৃত্যুহার মাত্রাছাড়ানো। কিন্তু আখের ক্ষেতের মজুররা সংখ্যায় কমুক আখের ক্ষেতের বর্তমান মালিকদের তা কাম্য নয়। ফলে ১৯৪৫ সালে ডি-ডি-টি অভিযান শুরু হতে না হতেই তার ফল প্রথম প্রত্যক্ষ হয় গিয়ানা এবং ম্যালেরিয়ার বাহন এনোফেলিস মশা ধ্বংস হয়। ম্যালেরিয়া লোপ পেতে মৃত্যুহারও ভীষণ কমে যায়। অন্যদিকে ম্যালেরিয়া লোপ পেতে বাচ্চার জন্ম দেবার ক্ষমতাও বেড়ে যায়, ফলে জন্মের হারও।

এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলবার বিষয় এই যে মৃত্যুর সংখ্যা হাজারে বাইশ থেকে হাজারে বারোতে কমিয়ে আনতে যেখানে ব্রিটেনে সময় লেগেছে সত্তর বছর, গিয়ানায় সেখানে মাত্র দশ বছর। বর্তমানে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৭-৭, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা তিন। জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বয়স পনেরোর কম। ১৯৬০ সালে কর্মক্ষম বয়সের প্রতি ব্যক্তির পোষ্যের সংখ্যা ছিল অন্তত এক, বর্তমানে সাড়ে-তিন। কর্মক্ষম বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২০ জন বেকার। মহিলাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৩ জন চাকুরিজীবী। জীবনযাত্রার বর্তমান মান বজায় রাখতে হলে (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা তিন ধরে নিয়ে) জাতীয় উৎপাদনের অন্তত ১৫ শতাংশ বরাদ্দ থাকা দরকার।

স্বীকার করতেই হবে অবস্থা গুরুতর, উদ্ধার পাওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও, যে-সব দেশকে বলা হয় 'ধনী', যে-সব দেশের জীবনযাত্রার মান উঁচু, সে-সব দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবার চেষ্টা করা যাক।

একটি বিষয়ে এই দেশগুলোর মধ্যে সাধারণ মিল : শিল্পোৎপাদনের ভিত্তিতে নগর-সংস্কৃতির পত্তন। শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে যন্ত্রের প্রবর্তন, কৃষিতে আমূল উন্নতি ও তার ফলে বিপুল ফলন, ভোগ্যপণ্যের ব্যাপক সমাহার, এবং সর্বোপরি মাথাপিছু উপার্জন বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানে উন্নতি, স্বাস্থ্যে উন্নতি, শিক্ষায় উন্নতি। আর কী চাই!

এই দেশগুলির জনসংখ্যা সম্পর্কিত ছবিটি কি রকম? শিল্পোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটেছে এমন প্রত্যেকটি দেশে (জাপান সমেত) গোড়ার দিকে মৃত্যুর হার কমেছে, তারপরে বছর পঞ্চাশেক সময় নিয়ে কমেছে জন্মের হার। এই দুটি পরিবর্তন কী কী কারণে ঘটেছে তার আনুপূর্ব একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা যথাযথ পেশ করতে পারবেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। জীবনের ও অবসরের পরিবর্তিত চরিত্র, জীবন থেকে বৃহত্তর প্রত্যাশা, মেয়েদের সামনে ভিন্নতর সুযোগ-সুবিধা ও ভিন্নতর সার্থকতার পথ—এমনি আরো অনেকগুলো কারণ রয়েছে এই পরিবর্তনের মূলে। তবে লক্ষণ দেখে মনে হয় এই পরিবর্তনগুলো ঘটাতে হলে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় পৌঁছানো চাই, যাকে বলা যেতে পারে নির্ধারক মাত্রা। গিয়ানা যতোক্ষণ না এই মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে, অর্থাৎ গিয়ানা যতোক্ষণ সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রাক-শিল্পায়ন পর্বে থেকে যাচ্ছে, ততোক্ষণ গিয়ানায় জন্মের হার থেকে যাবে 'কৃষিসমাজসুলভ' উঁচুমাত্রায়, যদিও অন্য-

দিকে মৃত্যু হারও নিচুমাত্রার। এ-অবস্থায় নিরোধ জাতীয় জন্ম বন্ধ করার উপায় নাগালের মধ্যে থাকলেও (যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তা ব্যবহার করার কায়দা সকলের জানা) এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে সাধারণ কৃষকদম্পতি তা ব্যবহার করতে চাইবেন।

তাহলে গিয়ানাকে কৃষিপ্রধান দেশ থেকে আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ করে তুলতে বাধা কী? অধ্যাপক ড্রেটন বলছেন, বাধা হচ্ছে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বিলি হবার ধরনগুলো, যা বজায় থাকার দরুন মুনাফা ও ডিভিডেন্ট গিয়ে পেণছয় বক্সাইট শিল্পের ক্ষেত্রে আমেরিকান ইজারাদারদের পকেটে, ক্ষেতবাগান দোকানপাটের ক্ষেত্রে ব্রিটেনবাসী মালিকদের পকেটে, কিংবা স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর পকেটে।

কাজেই ধরনগুলো যাতে বজায় থাকে তা এই মুনাফা ও ডিভিডেন্ট ভোগী সকলেরই স্বার্থ। দেশের প্রকৃত শিল্পোন্নতি কখনোই এদের কাম্য হতে পারে না। এদের পক্ষে যেটুকু সম্ভবপর তা বড়ো জোর কিছু ভুয়ো শিল্পপত্তন—টয়লেট পেপার বা বক্ষবন্ধনী বা টুথপেস্ট বা বীয়ার-হুইস্কি-জিন ইত্যাদি উৎপাদনের কারখানা। তাও এমনভাবে যাতে মজুরের সংখ্যা কম হয় ও আরো বেশি মুনাফা পকেটস্থ করার পথ খোলসা হয়।

এই মুনাফাভোগীরা শিল্পায়নের জন্যে পুঁজি লগ্নী করবেন এমন আশা করা চলে না, যতোই সুযোগসুবিধা দেওয়া হোক না কেন। বেসরকারী পুঁজি আকর্ষণের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, যেমন হয়েছে পুয়ের্টো রিকোয়, জামাইকায় ও ত্রিনিদাদে। ইউরোপের দেশগুলিতে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, শিল্পের পুঁজি এসেছে উপনিবেশের শোষণ থেকে ও দাসব্যবসায় থেকে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ানার পক্ষে তা আর সম্ভব নয়, গিয়ানার গভর্ণমেন্টকে অবশ্যই পরিকল্পিত একটি কর্মসূচী নিয়ে উদ্বৃত্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই কর্মসূচী যদি থাকে তাহলেই পরিবার পরিকল্পনার সার্থকতা থাকতে পারে।

গিয়ানার এই ছবি মোটামুটি ল্যাটিন আমেরিকার সব দেশেরই ছবি, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে বাদে। শেষোক্ত দুটি দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি যথেষ্ট উঁচুমাত্রার, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বছরে ১-৫। অন্য সবকটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা আড়াইয়েরও অনেক বেশি, আট-কোটি মানুষের দেশ ব্রাজিলে শতকরা ৩-৪, কোস্টারিকায় ৪-৩, গুয়াতেমালায় ৩-২। বর্তমান শতকের শেষদিকে দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যা সাতগুণ হবার সম্ভাবনা।

ল্যাটিন আমেরিকার জমির ৫ শতাংশ মাত্র আবাদী। বৎসামান্য পরিমাণের অনুর্বর কিছু জমিতে গরীব চাষীরা পুরুষানুক্রমে সব্জির চাষ করে থাকে, বাদবাকি জমিতে মালিক জমিদাররা (অধিকাংশই বিদেশে থাকে) আর সেই জমিতে ফলানো হয় রপ্তানীযোগ্য ফসল। যেমন, গুয়াতেমালা ও কোস্টারিকা থেকে রপ্তানী হয় কলা, ব্রাজিল থেকে কফি, ইত্যাদি। আর যদি কৃষি-সম্পদ না হয় তো খনি-সম্পদ— ভেনেজুয়েলা ও ত্রিনিদাদ থেকে তেল, গিয়ানা থেকে বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানীজ, ইত্যাদি। আর আমদানী সবসময়েই হয়ে থাকে উৎপন্ন সামগ্রী ও উচ্চমূল্যের খাদ্য।

ল্যাটিন আমেরিকার জমি খুব উর্বর বা বিনা আয়াসেই অনাবাদী জমি উদ্ধার করা যাবে এমন দাবি করা হচ্ছে না। কিন্তু কাজটা অসম্ভবও নয়।

দুটি বিষয়ে ভাববার আছে। ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে 'গেল! গেল!' বলে একটা রব তোলা হয়েছে। এই বুঝি জলহাওয়া বিষাক্ত হয়ে গেল! এই বুঝি জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটে গেল! তবুও সত্য কথা যা থেকে যায় তা এই যে এই দেশগুলির জীবন ও জীবনযাত্রার মান আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে, এই দেশগুলির পরিবেশ শুধু যে একশো বছর আগেকার তুলনায় অনেক ভালো তাই নয় আমাদের তুলনায় স্বর্গরাজ্য। যদি কারও সন্দেহ থাকে আমাদের দেশের বস্তি ও গ্রামের চেহারা স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেন।

দুশো বছর আগে দাসপ্রথার কালে একটি দাস-জননীকে বাচ্চা বিয়োবার জন্যে একটি কম্বল বা একটি রুপোর ডলার পুরস্কার দিলেই কাজ হত। কিন্তু এখন যদি বাচ্চা বিয়ানো বন্ধ করার জন্যে পুরস্কার দিতে হয় তাহলে কম্বল বা রুপোর ডলার নয়, তার জীবনে আনতে হবে নতুন সামাজিক বিন্যাস, তার জীবনযাত্রায় আমূল গুণগত পরিবর্তন। ইংলন্ডের স্ত্রী-পুরুষের হাতে তো নিরোধ জাতীয় পদ্ধতি বহু আগে থেকেই ছিল কিন্তু তার প্রয়োগ কেন শুরু হতে পারল এই বিন্যাস ও পরিবর্তন ঘটার পরে!

অতএব একটি সামাজিক বিপ্লব চাই। বিজ্ঞানীদের প্রধান কর্তব্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা ইত্যাদি জাতীয় ডঙ্কানিনাদের সঙ্গে সুর মেলানো নয়, সামাজিক পরিবর্তনের জন্যে গণ-তৎপরতায় সামিল হওয়া।

নোবেল পুরস্কার

এবছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজনঃ—গ্রেনোবলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নিউক্লিয়র গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লুই নীল (৬৫) ও স্টকহোম রয়েল টেকনিকাল হাই স্কুলের অধ্যাপক হানেস আলফ্‌ভেন (৬২)।

রসায়ন বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বুয়েনেস এয়ারেস-এর জৈব-রাসায়নিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক লুই লেলোয়া (৬৪)।

ভেষজবিদ্যায় পেয়েছেন তিনজন: মেরীল্যান্ডের বেথেসডার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ-এর ল্যাবরেটরী অফ ক্লিনিকাল সায়েন্সের প্রধান আমেরিকান বিজ্ঞানী ডঃ জুলিয়াস আকসেলরড, লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের জৈব-পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার বারনার্ড কাটজ ও সুইডিশ ক্যারোলিন ইনস্টিটিউটের শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুইডিশ বিজ্ঞানী উলফ ফন ইউলার।

শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন নরওয়েজীয়-আমেরিকান বংশোদ্ভূত ও আমেরিকা-নিবাসী ডঃ নরমান আর্নেস্ট বোরলাগ। অতি-ফলনশীল গম উদ্ভাবনে কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক নীলের গবেষণা কঠিন পদার্থের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কে। অধ্যাপক আলফ্‌ভেন-এর অতি-উত্তপ্ত গ্যাস বা প্লাজমা সম্পর্কে।

অধ্যাপক লেলোয়ার গবেষণা শর্করা নিউক্লিওটাইড সম্পর্কে।

ভেষজবিদ্যায় পুরস্কার স্নায়ুকোষে রাসায়নিক পদার্থ কিভাবে সঞ্চারিত ও জমা হয় এবং ক্রিয়া করে তা আবিষ্কারের জন্যে।

পরের কোনো সংখ্যায় এই বিজ্ঞানীদের জীবন ও আবিষ্কার নিয়ে বিশদ আলোচনার ইচ্ছে রইল। —জয়ন্তকান্ত
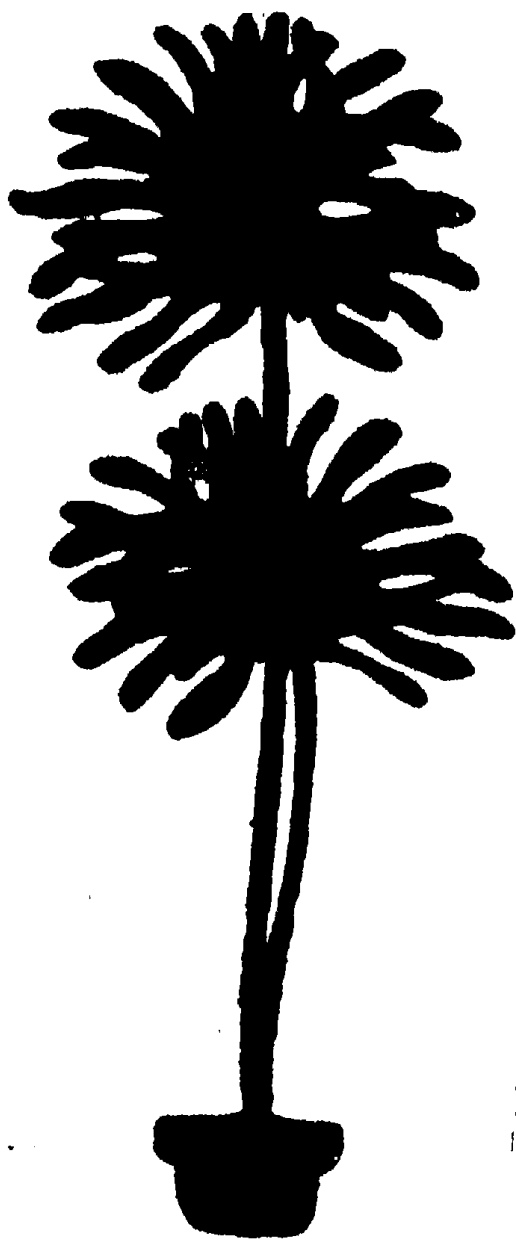
পিঞ্জর

সুভাষ সিংহ

NITAI GHOSH

সকালবেলায় খেয়েদেয়ে রাস্তায় বেরোবার পর ঝিমঝিম করে উঠেছিল সমস্ত মাথা। তেমন একটা গ্রাহ্য করেনি বিনয়। ভেবেছিল, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ার ফলে, শরীর ও মাথায় যন্ত্রণাবোধ করছে। কিন্তু এখন চারটে ক্লাস নেওয়ার পর, আর সে পারছে না; কপালের দু'-পাশের রগ দপদপ্ করছে, নাক দিয়ে জল ঝরছে অবিরত আর অসম্ভব ব্যথা চোখের নীচে, নাকের দু'পাশে।

বিরাট হলঘর। শ'দেড়েক ছাত্র ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। চুপচাপ। ওর ক্লাসে গণ্ডগোল হয় না। ছাত্রদের সঙ্গে সে সহজভাবে মেশার চেষ্টা করে। ফলে সে ওদের কাছে প্রিয়।

হেডমাস্টারকে জানিয়ে বিনয় বাইরে এল। আসার সময় দু' একজন সহকর্মীর সঙ্গে দু'চারটে কথার আদানপ্রদান হয়। ঠিক মনে পড়ছে না কী ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছে। এখন টের পাচ্ছে মাথার ভিতর অসংখ্য পোকা কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

—এই রিকশা! বেশ জোরে চিৎকার করে ডাকল বিনয়।

ব্রেক কষে থামাবার চেষ্টা করলেও কিছুদূরে এগিয়ে রিকশাটা থামল।

চুপচাপ সীটে বসে বিনয় আঙুল দিয়ে কপালের দু'পাশের রগ চেপে ধরল। অনেক চেষ্টার পর যা হোক একটা স্কুলে কাজ পেল, তা সে কলকাতার বাইরে। বাড়ি থেকে স্কুলে পৌঁছতে পাক্কা ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। ট্রেন জার্নি, বাস ট্রামের ধকল, বাড়ি পৌঁছবার পর প্রতিদিন মনে হয়, পরের দিন আর সে স্কুলে যেতে পারবে না!

ঠিক কীভাবে সে বাড়ি পৌঁছল স্পষ্ট মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে, আচ্ছন্ন অবস্থায় ট্রেনে চেপেছে, স্টেশন পেরিয়ে বাস ধরেছে, তারপর গলির মুখ থেকে কয়েক মিনিট হাঁটার পর বাড়ি।

—মা! বিনয় সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা'র স্নেহস্পর্শের জন্যে সে ভীষণ লালায়িত। কতক্ষণ চোখ বুজে অপেক্ষা করছিল সে খেয়াল নেই। মনে হয় অনেকক্ষণ।

দেয়ালে বড় ঘড়িটার ক্লান্তিকর টিক্-টিক্ শব্দ এখন অস্বস্তিকর। কেননা ঘড়ি সময়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেটা তার অপছন্দ। কারণ এখনও সে সময়হীনতার কথা ভাবে। যদিও ইদানীং ঐ ধরনের চিন্তা হাস্যকর মনে হয়। সে না চাইলেও বয়স তার বাড়ছে। বাড়ছে নাকি? 'ঠিক এইরকমভাবেই, উঃ মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে...' হরিবিলাস মিত্র, তার পিতৃদেব, কয়েক বছর আগে, এমনি সময় অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন; তখন তারা একটা কলোনীতে থাকত, বাড়ি ফিরে কয়েক দিনের অসুখে ভদ্রলোক মারা যান...। কত বছর আগে?

—মা! মা! বিনয় চোখ খুলে রাগ আর বিরক্তি নিয়ে তাকায়। এতবার সে ডাকল, তবু মার পাত্তা নেই। এত ঘুম মার!

—মাসীমা বাড়ি নেই।

শেফালী চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাতে চায়ের কাপ। টেবিলের ওপর কাপ রেখে তাকাল বিনয়ের দিকে। মুখে পাতলা হাসি।

—নিন। চা খান। মাসীমার ফিরতে সেই সন্ধে। মীরাদির বাসায় গেছেন। ওকি! আপনার চোখ দুটো অমন ছলছল করছে কেন।

শেফালী এগিয়ে এসে বিনয়ের কপালে হাত রাখল। তারপর চিন্তিত মুখে বলল, ইস্ বেশ গরম! জ্বর হয়েছে আপনার। চা খেয়ে চাদর দিয়ে গা ঢাকুন।

বিনয় নিঃশব্দে হাসল। তাকাল শেফালীর দিকে। তারপর কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে একটু উঠে বসল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আবার তাকাল। চোখাচোখি হতে শেফালী মাথা নত করল।

শেফালীর কোমর সরু, বুক ও নিতম্ব বেশ ভারী। চোখ দুটো বড় বড়। গায়ের রঙ ফর্সা। ফিগার ভালই বলতে হবে। সুশ্রী না বলে উপায় নেই। দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা। এর জন্যে মা

দায়ী। তাঁরই যাতায়াত বেশি। শেফালীকে উনি একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন। কত বয়স হল মেয়েটার? বছর তেইশ হবে। ওর মা বলেন কুড়ি। হাসি পেল বিনয়ের। এম-এ পড়ছে। বাংলায় এম-এ পাশ করে তার মত মাস্টারী করবে মফস্বলের কোন স্কুলে শেষ পর্যন্ত।

—হাসছেন যে বড়! শেফালী বুকের ওপর শাড়ি ভাল করে জড়ায়। মাঝে মাঝে বিনয়দার চাহনি বড় অস্বস্তিকর। ওই পর্যন্ত। আর কিছু না। না, ভয় সে করে না। অন্তত বিনয়দাকে। ন্যাকা মেয়েদের সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওদের ধারণা পুরুষদের কাছে গেলে তারা বাঘের মত লাফিয়ে পড়বে!

—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। বিনয় বলল, ওই চেয়ারটা টেনে বস। বেশ মুস্কিলে পড়া গেল। কখন মা ফিরবেন কে জানে।

—কী দরকার বলুন না। শেফালী অল্প হাসল, আপনি দেখছি এখনও ছেলে-মানুষ রয়ে গেলেন। মার আঁচল ধরে চিরকাল তো চলতে পারবেন না!

—তা পারবো না। তাই ভাবছি এখন থেকে তোমার আঁচল ধরে চলার চেষ্টা করবো।

শেফালী রাগ করল না। বিনয়দাটা ওই রকমই কথাবার্তা বলে থাকে। প্রথম প্রথম বেশ রাগ হোত। দু'কথা শুনিয়ে দিত। পরে ভেবে দেখেছে ওতে কিছু লাভ নেই। এখন তো ওদের মধ্যে সবরকম ঠাট্টাইয়ার্কি চলে। সেও ছেড়ে কথা বলার মেয়ে নয়।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল শেফালী, লোভ তো কম নয়। জানেন, আমার আঁচল ধরার জন্যে আপনার চেয়ে ঢের ঢের রূপবান গুণবান যুবক অপেক্ষায় রয়েছে!

—কে সেই ভাগ্যবান? বিনয় হাল্কা সুরে বলে, আশ্চর্য! মাথার যন্ত্রণাটা যেন আস্তে আস্তে কম যাচ্ছে। শুধু এক কাপ চা। কোন ওষুধ মিশিয়ে দাওনি তো?

শেফালী কোন জবাব দিল না। একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকে। একবার মৃদু হেসে তাকাল বিনয়ের দিকে। সত্যিই কী মাথা ধরেছিল?

—কই আমার কথার কোন জবাব দিলে না তো। আচ্ছা, এই যে তুমি একা আমার কাছে এ ঘরে রয়েছো, তোমার মা আবার ভাববেন না তো কিছু! তাঁকে জানিয়ে এসেছো?

শেফালী অবাক হওয়ার ভান করল কী আবার ভাববেন। হঠাৎ এ প্রশ্ন বিনয়দা?

বিনয় অন্যদিকে তাকায়। বুঝেছে প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে শেফালী। চালাক আছে মেয়েটা। সে মনে মনে হাসল। এখুনি সব চালাকি বের করে দিতে পারে। সব মেয়েই কম বেশি ভান বা অভিনয় করে থাকে। শেফালীকে এভাবে নির্জনে কোনদিন...।

আস্তে আস্তে বিনয়ের ভাবান্তর হয়। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। না, এর আগে কোনদিন, অনেক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, একটা চুমো অথবা জড়িয়ে ধরা...আসলে ভাল লাগে মেয়েটাকে, ওই পর্যন্ত, অন্য কোন বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেনি। না, প্রেম-ট্রেম জাতীয় কোন কিছু এখনও পর্যন্ত অনুভব করছে না।

—এমনি। বিনয় হাসল, তারপর হঠাৎ মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে, উঃ আবার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হচ্ছে! বলতে বলতে ওর সারা মুখ বিবর্ণ দেখায়। স্বগতোক্তি করল, কখন মা ফিরবেন কে জানে।

একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে মাথা ধরাটা ছেড়ে যেত। কিন্তু ঘুম এখন আসবে না। মা থাকলে কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন। তখন নিশ্চয়ই ঘুম আসতো তার। মাঝে মাঝে মনে হয় একমাত্র মাকে ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে বোধহয় জীবনে ভালবাসতে পারবে না। বিনয়ের মনে পড়ল দামুবৌদি ও অরুণার কথা। ভালবাসা নয় ওদের প্রতি ছিল তার নিছক যৌনাকর্ষণ। আজ সে সব বুঝতে পারে। কী ভীষণ সেন্টিমেন্টাল আর বোকা ছিল সে!

—আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন। মাসীমার ফেরার সময় হয়ে এল। শেফালী উঠে দাঁড়াল, ভাল কথা বিনয়দা, কই আমাকে পড়াশুনোর ব্যাপারে একটু সাহায্য করবেন বলেছিলেন, শুধু এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার জন্যে না হয় একটু সময় নষ্ট করলেন।

—আর একটু বসো শেফালী। বিনয় পাশ ফিরে তাকাল, বাজারে কত নোটবই রয়েছে, ওগুলো মুখস্থ করলেই তো পাশ করে যাবে। তাছাড়া তোমার সেই রূপবান গুণবান যুবকটিই তো রয়েছে। তার সাহায্য চাইছো না কেন! কে সেই ভাগ্যবান যুবক?

—জেনে আপনার লাভ কী হবে। শেফালী হঠাৎ অনুভব করলো ঘরের ভিতরটা বেশ অন্ধকার। এবং অন্ধকারে এভাবে বিনয়দার মুখোমুখি বসে থাকতে দেখলে যে-কেউ অন্য কিছু ভাবতে পারে। ফলে সে লাইট জেলে দেয়।

বাইরে পদশব্দ শোনা যায়। শেফালী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নীহার ঘরে ঢুকলেন। একটু আগে শেফালীকে বারান্দা দিয়ে যেতে দেখেছেন। হাসলেন মনে মনে। শুধু বিনয়ের জন্যে তাঁর একমাত্র চিন্তা। আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল বিনয়কে শুয়ে থাকতে দেখে। এমন অসময়ে।

—কী হয়েছে বিনু! নীহার বিছানার এক পাশে বসে কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন, কখন ফিরেছিস? এ যে দেখছি জ্বর!

বিনয় মার কোলে মুখ ডুবিয়ে বলল, ওসব কিছু নয়। মাথা ধরেছে খুব। সেই কখন ফিরেছি। শেফালী জানাল তুমি মীরার ওখানে গিয়েছো। মাথা টিপে দাও।

আঃ! বিনয়ের আরামে চোখ বুজে আসে। মাকে ছাড়া সে একদিনও থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। শেফালী ঠাট্টা করে বললো সে ছেলেমানুষ। বলুক। বিনয় জানে কী দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে তাদের আগলে রেখেছেন মা। কত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর এই মা দৃঢ় হাতে সংসারের সব কিছু ঝক্কি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রজতদার সঙ্গে মীরার বিয়ে, তার পিছনেও মা-র নেপথ্য ভূমিকার কথা বিনয়ের চেয়ে বেশি করে আর কেই বা জানে। সেই সময়ে মাকে তার ছোট মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ কয়েক বছর পরে, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে বুঝতে পারে, মা যা কিছু করেছেন সব তাদের মঙ্গলের জন্যে। এখন যদি কয়েক বছরের দাম্পত্যজীবনের পর হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় মীরা সুখী হতে পারেনি, রজতদাকে প্রথম দিকে যা ভেবেছিল, আসলে সে তেমনটি নয়; এর জন্যে মা দায়ী নন, মা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন যাতে সকলে সুখে বাঁচতে পারে।

অস্পষ্ট স্বরে শুনলো মা কিসব বলছেন। বিনয় মুখ তুলে তাকায়। সব চুল পেকে গেছে মার। মা যেন দুঃখের প্রতিমূর্তি। সব সময় সাদা মুখে বিষাদ ছড়িয়ে থাকে। এত বেশি চিন্তা করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে কি করে। কতদিন বলেছে অত চিন্তা করো না। তুমি সবার হাসিমুখ দেখতে চাও কিন্তু নিজে একবারটি হাসতে পার না। কেন এ আত্মত্যাগ! তোমার মতো কে দেবে? কেউ দেবে না। যে-যার আপন খেলায় মত্ত। কেউ তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না। মা, তুমি সব বুঝতে পার অথচ না বোঝার ভান করো। কেন?

—কিছু বলছো? বিনয়ের মনে হলো মা যেন চোখের জল গোপন করার চেষ্টা করছেন। [illegible] এক চোখের [illegible] ফেলছেন মা যে, সব [illegible] বুঝতে পারল ছোটখাট একটা [illegible] হয়ে গেছে।

নীহার বলেন, স্কুল থেকে ফিরে কিছু খেয়েছিস? শেফালীকে বলে গিয়েছি তুই ফিরলে একটু চা বানিয়ে দিতে।

—চা খেয়েছি। একটা কথা বলবো মা, রাগ করো না। শেফালী পরের মেয়ে, ওকে দিয়ে কাজ করানো ভাল দেখায় না। ওর মা বাবা এসব হয়তো পছন্দ নাও করতে পারেন।

চুপ কর বিনু! নীহার একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, এসব ব্যাপার নিয়ে তোকে মাথা না ঘামালেও চলবে। কত ভাল মেয়ে শেফালী। ও যে ঘরে যাবে সেই ঘর আলো হয়ে উঠবে। আমার খুব ইচ্ছে হয় তোর জন্যে এরকম একটা মেয়ে...। হাসছিস কেন? কেন বিয়ে কী কোনদিন করবি না ঠিক করেছিস? তোর আসল ইচ্ছেটা কী শুনি?

বিনয় কোন জবাব দিল না। শুধু নীরবে হাসতে লাগলো। এমনি গঞ্জনা মা প্রায়ই দিয়ে থাকেন। আর পাঁচটা বাঙালী মায়ের মত তিনিও চান পুত্রবধূ ঘরে

আসুক, ছোট ছেলেমেয়েদের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠুক সংসার। বিনয়কে সংসারী না করে যেন তিনি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না।

বিয়ে একদম করবে না এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বিনয় করেনি। বয়স কম হলো না। মাস্টারী আর টিউশোনী করে যা পায় তাতে যে বিয়ে করা একদম চলে না এমন নয়। অদূর ভবিষ্যতে তার উপার্জন এক লাফে অনেকদূর এগিয়ে যাবে সেরকম কোনও সম্ভাবনা নেই। যেভাবে চলছে অর্থাৎ মোটামুটি খেয়েপরে বাঁচতে পারছে, বাকী জীবনটাও এভাবেই কাটবে। তবে বিয়ের ব্যাপারে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? বিনয় নিজেও এর কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না' এটুকু বুঝেছে তার নিজের আগ্রহ খুব একটা নেই। তাছাড়া সে ভেবে দেখেছে কোন মেয়েকে ভালভাবে না জেনে বিয়ে করাটা ঠিক হবে কিনা। এই রকম সাতপাঁচ ভেবে একটির পর একটি বছর সে পার করে দিয়েছে। এভাবেই তার দিনগুলি কেটে যেত যদি না মাঝে মাঝে মা ঝামেলার সৃষ্টি করতেন। সহজে মাকে আঘাত দিতে চায় না।

রাগ করে মা উঠে যান। বিনয় খানিকটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। শেফালীকে খুব পছন্দ মার। ইঙ্গিতে অনেকদিন ওর কথা জানিয়েছেন। ওর মা বাবারও বোধকরি অমত নেই। থাকলে এভাবে যখনতখন মেয়েকে আসতে দিতেন না। শেফালী নিজে কী জানে?

জামাকাপড় ছেড়ে বিনয় বাথরুমে ঢুকল। ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধোয়ার পর বেশ ফ্রেস লাগছিল তার। ঘরে ফিরে দেখল টেবিলের উপর কফি আর খাবার রেখে চলে গেছেন মা। রেগে গেলে কথা বলেন না। নীরবে সব কাজ করে যাবেন। মার স্বভাব ভাল করেই জানে বিনয়। কিভাবে রাগের উপশম করতে হয় সে ফন্দীও তার জানা।

কফিতে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল বিনয়। অতীত জীবনের ধূসর দিনগুলি হানা দেয় মাঝে মাঝে। কিছুতেই সে ভুলতে পারে না। মনে হয় হাত বাড়ালেই সেই দিনগুলিকে মুঠোর মধ্যে ধরতে পারবে। একা থাকলেই সব এসে ভীড় করে। শুধু জাগরণে নয়, স্বপ্নেও তারা হামাগুড়ি দিয়ে আসে। সে যে শুধু দুঃখ পায় তা নয়, বিষাদমাখানো আনন্দও অনুভব করে। মনে হয় আবার যদি সেইসব দিনগুলি, সেইসব মানুষদের, যাদের প্রতি ওর ঘৃণা-ভালবাসা-স্নেহ-মমতা সব ছিল, একবার শুধু এক মুহূর্তের জন্যেও হাত দিয়ে তাদের স্পর্শ করতে পারতো!

খুব হালকা বোধ করল বিনয় নিজেকে। ড্রয়ার খুলে একটা ধূপকাঠি জেলে দেয়। একটু পরে সুন্দর গন্ধ অনুভব করল। চারিদিকে তাকিয়ে, তার নিত্যদেখা প্রতিদিনকার ঘর, আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে উঠল সমস্ত মন। এমনটি সে চায়। ছিমছাম ঘরের প্রতিটি জিনিস। বালিশে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। এখন আর মাথায় কোনরকম যন্ত্রণা নেই।

আবার মনে পড়ছে সব কথা। অতীত যুগপৎ আনন্দময় ও দুঃখজনক। হাসি পেল বাবার কথা ভেবে বিনয়ের। সেইসব রুক্ষ দিনগুলি, যখন সামান্য একটা চাকরীর জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল, বি-এ ক্লাশে ভর্তি না হওয়ার জন্যে কত তিরস্কারই না করেছেন! আজ বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হতেন, কেননা বিনয় চাকরী করাবস্থায় রাত্রে কলেজে পড়ে এম-এ পাশ করেছে। অবশ্য বাংলার এম-এ। আজকাল বাংলার এম-এ-দের নিয়ে কাগজে ঠাট্টা করা হয়। যেন বাংলা ভাষাটা খুব বাজে, ফেলনা।

নিজেকে তিরস্কার করল বিনয়: 'তোমার বাপু এত ভাবালুতা কেন!' সত্যি কেরানীর চাকরী করতে করতে সে যেন ক্রমশ ক্লান্ত, নির্জীব হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন চাকরী করার পর তার আবার পড়াশুনোর দিকে মন যায়। তখন তার একমাত্র চিন্তা যে-করেই হোক এই দশটা পাঁচটার প্রতিদিনকার একঘেয়েমি থেকে রেহাই পেতে হবে। বি-এ পাশ করার পর এম-এ পড়ার সময় তার শিক্ষকতার দিকে ঝোঁক চাপে। ভেবেছে এ লাইনে স্বাধীনতা আছে, কাজের তৃপ্তি আছে। আজ সে দেখছে শিক্ষার জগতও কলুষিত। এখানেও নোংরা রাজনীতি, স্বজনপোষণ, চাটুকারিতা, একে অন্যের পিছনে লাগা ইত্যাদি তো আছেই; তাছাড়া যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বপ্ন সে কৈশোর থেকে দেখে আসছে, বেশ ভালভাবেই বুঝেছে চিরকাল তা অনায়ত্ত থাকবে। জন্মের পর থেকেই মানুষ পরাধীন। মৃত্যু পর্যন্ত এই পরাধীনতার গ্লানি তাকে বহন করতে হবে!

তবু মাস্টারী করা অন্যান্য চাকরীর থেকে অনেক বেশি সহনীয়। বিনয় চেষ্টা করে অনেক বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকতে। কোন দলাদলির মধ্যে যায় না। যদিও একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এড়াতে পারে না। কাউকে খোসামোদ করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ গায়ে পড়ে আঘাত দেয়, ঠাট্টাবিদ্রূপও করে। প্রতিবাদ করে না সে। কয়েক বছর আগে হলে হয়তো ঝগড়া বেধে যেত। কিন্তু এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নরম হয়ে এসেছে। কোনকিছু করার আগে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করতে ভুল হয় না। ভুলের ক্ষমা নেই। সময় বড় নির্মম। আজ সামান্য একটা ভুলের জন্যে উপার্জনের পথ যদি বন্ধ হয়ে যায়, পাশে এসে কেউ দাঁড়াবে না। এর মানে এই নয় যে, সে চাকরী বাঁচাবার জন্যে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। তা নয়। শুধু চারদিক দেখে-শুনে চলতে শিখেছে। এতে নিরাপত্তা এসেছে খানিকটা।

খুব বেশি স্পর্শকাতর হওয়া ভাল নয়। আগে সব সময় মনে হোত তার অস্তিত্বটা বড্ড বেশি জরুরী। যেন সে না থাকলে পৃথিবীটাই উল্টে যাবে! ওসব কিছু নয়। অসংখ্য জনসমষ্টির সে সামান্য ভগ্নাংশ। অতএব অভিমান বা অহংকার... বিমলের সঙ্গে বহুকাল দেখা নেই, ও বোধ হয় এতদিনে পাক্কা একজন টিপিক্যাল কেরানী বনে গিয়েছে.....ফের দেখা হলে যদি ইনক্রিমেন্ট, মাইনে, ছেলেমেয়ের অসুখ, স্ত্রীর খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি......। এসব শুনতে তার ভাল লাগে না। তাই মনে হয় বিমলের সঙ্গে দেখা হলে সে নিশ্চিত ওকে এড়িয়ে যাবে।

মা মা মাগো! অস্ফুটস্বরে আপন মনে ডেকে উঠল বিনয়। একটু পরে টের পায় রান্নাঘরে খুন্তি নাড়ার শব্দ। মার মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন উদ্যমে পড়াশুনো করেছে। পাশ করে অনেক হাঁটাহাঁটির পর একটা স্কুলে (সরকারী অনুমোদিত) কাজও অবশেষে পেল। একটু যা দূর হয়ে গিয়েছে। যাক সুযোগ হলে কলেজেও কাজ জুটে যেতে পারে। মা তার একটি বিয়ে দিতে পারলেই...শেফালী মেয়েটি মন্দ নয়, চেহারাটি ভাল, সামনের বছর পাশ করে বেরোতে পারলে সেও একটা স্কুলে . দুজনের রোজগার, বাঃ ভাবতে বেশ ভালই তো লাগছে!

বিনয় পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। রান্নাঘরের দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে মাকে দেখল। একবার শুধু চোখাচোখি হয়। বেশ গম্ভীর মার মুখ। পরক্ষণেই মা মাথা নীচু করে মশলা পিষতে থাকেন। খারাপ লাগল বিনয়ের। একটা ঝি রাখার কথা কতদিন বলেছে। মা হেসে বলেছেন, 'মোটে দুটো লোকের জন্যে ঝি-চাকর—তোর খুব টাকা হয়েছে না বিনু?' সারা জীবনটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। শেষবয়সে একটু আরামে থাকবেন, তাই চেয়েছিল বিনয়।

নিজের ঘরে ফিরে এল বিনয়। সাদা আলোটা নিভিয়ে হাল্কা সবুজ আলো জেলে চেয়ারটা টেনে জানালার কাছে বসে। একটা সিগারেট ধরায়। গলিতে লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে নরনারী যাচ্ছে-আসছে। তাদের মৃদু কথার বা হাসির শব্দ শুনতে পেল। রাস্তার ধারে ঘর। প্রথম-প্রথম অসুবিধে হোত। স্কুলে কাজ পাওয়ার পরই এখানে চলে আসে মাকে নিয়ে। কলোনীর প্লটটা অবশ্য আছে। গ্রামসুবাদে দূরসম্পর্কের দরিদ্র এক আত্মীয়কে বসিয়ে এসেছে। ওখানে থাকার কোন স্পৃহা অনুভব করে নি। রঞ্জুদার সঙ্গে বিয়ের পর মীরা চলে যায়। তার আগেই বাবা গত। ওখানে থেকে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে মীরা আর রঞ্জুদাকে কেন্দ্র করে কুৎসা রটনা করেছিল প্রতিবেশীরা। তারপর যখন মুখল বাসা-ভাড়া করে থাকবার মত অবস্থা এসেছে। চলে এল এই হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে।

স্কুলে কাজ পাওয়ার পর হাতে বেশ সময় থাকে তার। সপ্তাহে তিন দিন টিউশোনী। সন্ধ্যার দিকে। আজ [illegible]

খাওয়া হলো না। সময় কাটানোর সমস্যা তার নেই। বই পড়তে ভালবাসে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মেম্বার। এক সময় একটু-আধটু লেখার বাতিক ছিল। এখন ওই রোগ থেকে রক্ষা পেয়েছে। লেখক হওয়ার মোহ আর নেই। বেঁচে গেছে। তবে পড়ার অভ্যেসটা আছে, বরং আরও বেড়েছে। অতএব সময় কেটে যায়। বন্ধু-বান্ধব বলতে এখন কেউ নেই। সে বন্ধুহীন, নিঃসঙ্গ। মাঝে-মাঝে অসহ্য বোধ হয়। বড় একা মনে হয়। খুব ছোট্ট গন্ডীর মধ্যে জীবনটা বাঁধা। অনেকেই তো কাছাকাছি ছিল। সব দূরে সরে গিয়েছে। সেই কী সরিয়ে দিয়েছে? রজতদাকে আর সে টলারেট করতে পারে না। এক সময়ের গুরুদেব রজতদা। আজ ভাবলে হাসি পায়। এমন কী আকর্ষণ ছিল যে, ওই লোকটাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতো! মীরা কী সুখী হয়েছে? রজতদা কী সুখী? সে জানে না সঠিক। এটা ঠিক ওর আর কোন সংশ্রব নেই রজতদার সঙ্গে।

—এখন খাবি?

সামান্য চমকে উঠল বিনয়। চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে মাকে জড়িয়ে বলে, তুমি কি রাগ করেছো? বাঃ মুখ ফেরালে চলবে না। কি অন্যায় করেছি?

নীহার বললেন, ছাড় বিনু। আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমাকে রেহাই দে। আর পারছি না!

—চল খেতে দেবে। মা, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। বিয়ে একদম করবো না কখনো বলি নি।

নীহার কোন জবাব দিলেন না। মার পিছন-পিছন রান্নাঘরে ঢোকে বিনয়। মনে হলো বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা হেস্ত-নেস্ত করা দরকার। আর দুঃখ দেওয়া উচিত নয় মাকে। মনে-মনে বলল, 'তোমার হাসিমুখ দেখতে চাই মা!'

।। দুই ।।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রজত টাই বাঁধতে ব্যস্ত। লক্ষ্য করল ধীরে-ধীরে একটি মুখ এগিয়ে আসছে। দর্পণে বিম্বিত হতে ও একবার মৃদু হাসল। বেশ গম্ভীর মীরার মুখ। ঝকঝক করছে ওর নিজের মুখ। কানের পাশে দু-একটা চুলে পাক ধরেছে। শেষবারের মত নিজেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে রজত ঘুরে দাঁড়ায়। এবার মীরার মুখোমুখি। আবার ওরা পরস্পরকে দেখল।

—না, আর দেরী করা চলবে না। রজত হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, তুমি ওভাবে তাকিয়ো না মীরা। ভাল লাগে না। কিছু বলবে?

নীচু অথচ কঠিন কণ্ঠে মীরা জবাব দেয়, আজ তুমি যেতে পারবে না। বলে এগিয়ে এসে রজতের টাই মুঠোয় জড়িয়ে ধরে আমার নিজের কথা বলছি না কিন্তু ছেলের কথাও কী একবার ভাববে না। সন্তানের জন্যে দেখছি এতটুকু মমতা নেই!

—কী হচ্ছে! রজত ধমক দিল, টাইটা ছেড়ে দাও। দিন-দিন বিশ্রী স্বভাব হচ্ছে তোমার।

—না, ছাড়বো না। মীরার সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে। চোখ বড়-বড় করে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে, রোজ-রোজ কোথায় যাও। সত্যি করে বলো কোন্ আকর্ষণে আমাদের এভাবে ভুলে যাচ্ছ। এত নিষ্ঠুর তুমি?

রজত খুব রেগে গেলেও অতিকষ্টে সংযত করল নিজেকে। খুব জোরে কথা বলা যায় না। আশে-পাশে ভাড়াটে রয়েছে। লোক হাসাতে চায় না সে। মীরার চোখে জল দেখে সে মোটেই বিচলিত হলো না। এখন কী করবে ভেবে পেল না। সাহস বেড়েছে মীরার। ওর অভিযোগ ভিত্তিহীন। পল্টু দিব্যি ঘুমুচ্ছে। এখন চেঁচামেচি করলে জেগে উঠতে পারে।

দু হাত দিয়ে সজোরে নিজের দিকে টেনে আনল মীরাকে। ওর দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে ছটফট করে উঠল মীরা।

—ছেড়ে দাও! থাক্ আর আদর করতে হবে না। ভেবেছো এতেই আমি গলে যাব।

ঠোঁটের উপর পর-পর কয়েকটা চুম্বন করল রজত।

আলুথালু বেশ মীরার। চুল ভেঙে পড়েছে মুখের ওপর। দু হাত দিয়ে পিছনে সরিয়ে মীরা ফুঁসে উঠল, একটা ছোটলোক তুমি!

—কী হয়েছে তোমার? রজত কুঁচকে-যাওয়া টাইটা টান করতে থাকে, তোমার মেজাজের কোন হদিশ পাই না। কী চাও তুমি?

রজতের দিকে নির্নিমেষে তাকায় মীরা। রজত কী জানে না সে কোন্ প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে আছে? সবচেয়ে খারাপ লাগে ওকে ছলনার আশ্রয় নিতে দেখলে। ইদানীং ভয় পাচ্ছে মীরা। এমনটি সে চায় নি। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের সম্পর্কের দৃঢ়বন্ধন আলগা হয়ে যাবে—জ্ঞাতসারে কোন পাপ সে করে নি সকলের মঙ্গল চেয়ে এসেছে। তবে কেন সে আজ এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন। একটু-একটু করে টের পাচ্ছে সব। রজত লুকোতে চায়। ওকে বোধ করি বোকা ভাবে। অনেক দিন ভেবেছে একটা বোঝা-পড়া হয় যাক। পল্টুর জন্যে থমকে দাঁড়াতে হয়। তখন ওর মাথা নুয়ে আসে। কিন্তু কতদিন ওর মুখ চেয়ে এই গ্লানিকর জীবন বয়ে বেড়াবে? বেশিদিন পারবে না। ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। মীরার মনে হলো বিস্ফোরণের আগের অবস্থা ওর।

—চুপ করে থেকো না। রোজ এ অশান্তি ভাল লাগে না মীরা। বলে রজত টাই-এর নট্ আলগা করল প্রথমে। পরে সম্পূর্ণ গলা থেকে নিক্ষেপ করল ড্রেসিং টেবিলের দিকে। দ্রুত পোশাক বদলে মুখোমুখি হলো মীরার। আজ সে শুনতে চায় তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে।

ভয় পেল না মীরা। একবার অদূরে ঘুমন্ত পল্টুর দিকে তাকাল। ছেলেটা বড্ড দুষ্টু হয়েছে। ওর দিকে তাকালে ও নিভে যায়। কিন্তু আর চুপচাপ থাকা যায় না। রজত ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বাইরে যেতে না পেরে ক্ষেপে উঠেছে। মদাপ কোথাকার! আরও কত গুণ আছে কে জানে। কেউ চিনতে পারে নি রজতকে। না মা না দাদা। ও নিজেও কী চিনতে পেরেছিল? তখন রজত ব্যবহারে কত হৃদয়বান। উপকারীর ভূমিকায় একটা পতনোন্মুখ সংসারকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল। দিনের পর দিন পাকা খেলোয়াড়ের মত অগ্রসর হয়েছে। মা কিছু বুঝতে পারেন নি। বরং নিজেই আগ্রহের সঙ্গে ওকে ঠেলে দিয়েছেন রজতের দিকে।

আজ সব পরিষ্কার। ওর প্রতি রজতের আর কোন মোহ নেই। তাই বাড়ীতে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। অজুহাত লেগেই আছে। মীরার দিন কাটতে চায় না। শুধু খাওয়া আর ঘুম। তবু পল্টুকে নিয়ে অনেকটা সময় কেটে যায়। কেবল স্বাচ্ছন্দ্য সে চায় নি। রজত একটু-আধটু মদ খেলেও, অনেক দিন রাত্রে পাশে এসে শোয়ার সময় তীব্র গন্ধ সে অনুভব করেছে কোনদিন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে নি। মীরা প্রথম দিকে কান্নাকাটি করেছে। লাভ হয় নি কিছু। এর চেয়েও বেশি মর্মান্তিক ব্যাপার হলো ওর প্রতি রজতের অনাগ্রহ। কী নিয়ে বাঁচবে সে?

সিগারেট ধরিয়ে রজত আড়চোখে তাকায়। মীরার মুখ দেখে বোঝবার জো নেই এই মুহূর্তে কী সে ভাবছে। মেজাজটা খিঁচড়ে দিয়েছে। এতক্ষণে বন্ধুরা ও অপেক্ষায় থেকে নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সারাদিন অফিস করে সন্ধেবেলায় ঘরে বসে থাকা ভাল লাগে না। কেন মীরা তো রয়েছে। কে যেন ফিসফিস করে ওর কানের কাছে বলে উঠল। রজত সামান্য অস্বস্তিবোধ করল। একা সে থাকতে চায় না। কারণ একা থাকলেই ওর মনে হয় অলক্ষ্য থেকে কারা যেন জেরার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারছে। বড় মারাত্মক সব প্রশ্ন। কোনকিছু অসত্য বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। আবার স্বীকার করার অর্থ হলো নিজেকে অপরাধী মনে করা। তার চেয়ে কাজের মধ্যে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ-হল্লা মদ্যপান ও স্ত্রীলোক সান্নিধ্য। ইদানীং কতিপয় সুন্দরী রমনীর সংস্পর্শে এসেছে, ভারী ইন্টারেস্টিং, বেশ জোরালো ও উত্তেজক। এই সব নিয়ে দ্রুত দিনগুলি রাতগুলি পার করে দেওয়া অনেক বেশী মোহময় ও নিরাপদ। না, কোন গ্লানি নেই। কেন থাকবে? সে তো মীরার প্রতি কোন অবিচার করছে না। সুন্দর ফ্ল্যাট দামী আসবাব ফুটফাট করছে মোটাসোটা পল্টু, অলঙ্কার ফ্রিজ আর কী অভাব থাকতে পারে মীরার? সেদিন বুঝতে পারেনি

রজত। মীরা আসলে আর পাঁচটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়ের মত। স্বামীকে পুরো পাওয়া চাই। স্বামী অন্য কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে গেলে (আসলে তাদের মধ্যে নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্ক) মাথা ঘুরে যায়, নানারকম সন্দেহ, আত্মহত্যার ভয় দেখানো, রাত্রে উপোস করা, বুকের ওপর এলোচুলে, কাজল-লেপটে-যাওয়া-চোখে আছড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

—কী ব্যাপার? তীব্র চোখে তাকায় রজত। বেশ হাসিমুখে ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মীরা।

—কিছু না। একটু কফি খাবে? বলে মীরা ওর উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

সোফায় কাৎ হয়ে অনেকটা শোবার ভঙ্গীতে রজত পাশের ছোট্ট টেবিলের ওপর থেকে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন তুলে নেয়। ঝাপসা কতগুলি অক্ষর। দূর ছাই! উঠে বসল সে। এখন স্ত্রীর মুখোমুখি বসে কফি পান করতে হবে। 'আজ স্ত্রীর প্রতি এত বিতৃষ্ণা কেন রজত!' ঝিমঝিম করতে থাকে মাথাটা। মাঝে মাঝে এমনি হয়। হয় সে শুনতে ভুল করে অথবা ব্যাপারটা নিছক মনগড়া। যাই হোক না কেন, নিজেকে সে অসুখী মনে করে। আর বিস্বাদ ঠেকে সবকিছু। তবে বেশিক্ষণ না, এই যা সান্ত্বনা। আবার নতুন উত্তেজনায় ডুবে ভুলে যায় সবকিছু।

মুখোমুখি বসে পট থেকে কফি ঢেলে কাপ এগিয়ে ধরে মীরা। এরই মধ্যে মনে হলো রজতের কফিতে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে তাকিয়ে একটু বিশেষভাবে সাজগোছ করেছে মীরা। মনে মনে হাসল। পল্টু হওয়ার পর চেহারাটা বেশ খারাপ হয়েছিল। এখন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অনেকদিন পর নতুন আবিষ্কারের মত মনে হলো, চেহারায় চাকচিক্য আগের চেয়ে ঢের বেশি। একটু মোটা হয়েছে। তাতে বেমানান হয়নি কিছু। গাত্রবর্ণের উজ্জ্বলতা বেড়েছে। তাহলে বেশ সুখেই আছে। তবে মাঝে মাঝে ওরকম বিসদৃশ আচরণ করে কেন। কী চায়? সম্পূর্ণ ওর খেয়ালখুশি-মত রজত চলবে, নিজের পৌরুষ ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে স্ত্রৈণ হয়ে যাবে! তাতেই বোধ করি শান্তি পাবে মীরা।

খুক করে হেসে মীরা বলল, ভাল লাগছে না বুঝি। মন পড়ে রয়েছে বাইরে। আমি সব বুঝতে পারি মশাই। তুমি কত বদলে গেছ। আজকাল হেসে একটা কথা পর্যন্ত বলো না। কেন অমন করছো?

—আই অ্যাম টায়ার্ড মীরা।

—জানি। কিন্তু কীসে তোমার ক্লান্তি। শুধু আমাদের কাছে থাকলেই, না? সারাদিন অফিস করে ফিরে এসে ফের বেরিয়ে যাও। অনেক রাত্রে ফিরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার তাতে সময় কাটে, বেশ ভালভাবেই তা জানি। কিন্তু আমার কথা কখনও ভেবে দেখেছো?

রজত কাঁধ নেড়ে বলল, সময় কাটানো তোমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি। কেন বইটই পড়তে পার না। কত ম্যাগাজিন রয়েছে। রেডিও আছে। তারপর পল্টু। তাছাড়া পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছে। মাঝে মাঝে গল্প করতে পার।

—থাম। মীরার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, তুমি সব বুঝেও না বোঝার ভান করো। আসলে আমি কী চাই জান না?

—কী চাও? স্পষ্ট করে বলো। তোমার হেঁয়ালী কথাবার্তা বুঝতে পারি না।

—থাক বুঝে কাজ নেই।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ার উপক্রম। তাড়াতাড়ি মীরা ট্রের উপর পট কাপ তুলে রান্নাঘরে চলে আসে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল। এভাবে অভিমান করে লাভ নেই। রজত ওকে এড়িয়ে চলছে। এখন চেপে না ধরলে পরে আর ধরে রাখতে পারবে না। একদম নাগালের বাইরে চলে যাবে। সে কী চায় স্পষ্ট করে বলতে হবে। প্রতারক কোথাকার! ক্রোধে মীরার সব শরীর কাঁপতে থাকে।

—মা, আজ কী ডিম রান্না করবো?

—যা ইচ্ছে হয় কর।

বিরক্তির সঙ্গে কথাটা বলে রামুর দিকে তাকাল মীরা। বড় বিশ্বস্ত রামু। বহুদিন আছে রজতের কাছে। রান্না বেশ ভালই করে। মীরার চেয়ে বরং রামুর রান্নাই বেশি পছন্দ রজতের।

ঘরে ফিরে দেখল, রজত ডিভানে শুয়ে রেডিও শুনছে। মীরা এগিয়ে যায়। রেডিওটা বন্ধ করে দেয় হঠাৎ। অসহ্য লাগছে সবকিছু। ইচ্ছে করছে সবকিছু ভেঙে তচনচ করে ফেললে কিছুটা স্বস্তি পায়।

—রেডিওটা কি দোষ করল? রজত মীরার থমথমে মুখ লক্ষ্য করে দরজার দিকে তাকায়। এক ছুটে পালিয়ে গেলে কেমন হয়!

—সন্ধ্যার সময় রোজ কোথায় যাও?

—কেন ক্লাবে। তুমি কী জানতে না? রজত অবাকদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকায়। বেশ কঠিন চোখমুখ মীরার। উঃ আর সে পারছে না সহ্য করতে। মীরা তাকে ইদানীং সন্দেহ করছে। খুব খারাপ। সহজভাবে কথা বললেও ক্ষেপে উঠছে। এখন সে কী করবে। রজত সাবধান হয়ে ওঠে।

—ক্লাবে কারা আসে। কী করো ক্লাবে?

—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করি। বিলিয়ার্ড খেলি কখনো।

—মেয়েরা আসে না?

—মেয়েরা নয়। আসে বন্ধুদের স্ত্রীরা বা তাদের বান্ধবীরা। যাবে একদিন আমার সঙ্গে?

—না। মীরা ঠোঁট উল্টে বলল, আমি গিয়ে কী করবো। তাছাড়া পল্টু রয়েছে। ওকে কে দেখবে।

রজত কোন জবাব দিল না। বুঝতে পারছিল মীরা কী বলতে চায়। হ্যাঁ, সন্দেহ ঢুকেছে মনে। বেশ চিন্তিত হলো সে। সন্দেহ রোগটা বড় খারাপ। এতে শরীর খারাপ হয়। মন-মেজাজ ভাল থাকে না। সবকিছু অস্বাভাবিক মনে হয়। এভাবে চললে মীরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিন্তু সে কী করতে পারে!

—চল না একটু ঘুরে আসি। মীরা এগিয়ে এসে ডিভানে বসে। নীচু হয়ে ঝুঁকে রজতের ঠোঁটে চুম্বন করে পরপর কয়েকবার।

রজত বেশ ঘাবড়ে যায়। মীরার ব্যবহার অদ্ভুত। কোনরকম উত্তেজনা অনুভব করল না সে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়'

—ওঠো। জামাকাপড় পরে নাও তাড়াতাড়ি। ডিভান থেকে সরে গিয়ে মীরা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কোথায় যাবে? রজত অল্প হাসল, পল্টুর কথা ভেবেছো। ও জেগে তোমাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদবে না? রামু কী পারবে ওকে সামলাতে? তার চেয়ে দুজনে গল্প করি। কাছে এসে বসো না।

হাসি ফুটল মীরার চোখমুখে।

ওকে সাময়িকভাবে খুশি করবার জন্যে রজত সম্মতি জানিয়েছে। এখন থেকে অফিস থেকে ফিরে বাইরে বেরুনো চলবে না। ঘরে থাকতে হবে। স্ত্রী ছেলে নিয়ে গল্পগুজব, কখনো কাছে পার্কে গিয়ে খানিকক্ষণ বেড়ানো, অথবা মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়া—পতি পরম গুরু, সুখী দাম্পত্য-জীবন, আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাহবা আর কী চাই! 'তোমাকে কাছে পেলেই আমার সব পাওয়া।' বলার সময় সোহাগে বিড়ালীর মত কেমন ফুলে উঠেছিল মীরা। ভেবে হাসি পেল রজতের।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসে মীরা হাসি-গল্পে মেতে উঠল। বহুদিন পর রজতকে কাছে পেয়েছে। এখন আর মনে কোন ক্ষোভ নেই। বরং মনে মনে সে অন্য কিছু ভাবছিল। যদিও খুব বেশি আশা সে করে না। কয়েকটা দিন দেখা যাক। রজত তার কথার মর্যাদা রাখে কিনা দেখতে চায়।

অন্ধকারে কেউ কারু মুখ দেখতে পারছিল না। বারবার তাকাচ্ছিল মীরা। কোলের উপর পল্টু ঘুমিয়ে। একটু পরে ছবি শুরু হয়। রজত পর্দার দিকে তাকিয়ে। ওর মুখের একটা দিক চোখে পড়ছে। মীরা টের পেয়েছে। ছবির দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করল। না, পারছে না সে। এভাবে রজতকে কাছে পেতে চায় না। আনমনা রজত। বেশ গম্ভীর। ওর ব্যবহারে আহত মীরা। কী অপমান! হ্যাঁ, তাচ্ছিল্য ছাড়া কী। পাঁচ কথা বললে তবে একটা কথার জবাব দেয়। ভেবে পায় না তার প্রতি রজতের অনাগ্রহের কারণ কী। সে কী বুড়িয়ে গেছে? নাকি বিগতযৌবনা? তা নয়। তবে? তবে কী রজত অন্য নারীতে আসক্ত? ভাবতেই দমবন্ধ হয়ে আসতে চায় মীরার। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। অথচ সব তার জানা দরকার। মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করবার মত মেয়ে সে নয়।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

সেদিন রামজীবনের ট্যাক্সিতে বাড়ি ফেরার পথে

ব্যাপারটা কিন্তু খুব আশ্চর্য লাগছে।

কি ব্যাপার?

TAXI

কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করছ? রতনলালজির বাড়িতে দিন দুপুরে এই চোর আসাটা আশ্চর্য নয়? কি চুরি করতে এসেছিল?

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

কি সেটা?

মুখে চাদর মুড়ি-দেওয়া চোর!

ঠিক বলেছ! চোর চাদর মুড়ি দিয়ে পালাল কেন?

খুব লাজুক চোর বোধ হয়!

না, না ঠাট্টার কথা নয়। চোর কি তাহলে রতনলালজির চেনা কেউ। তাই চাদর মুড়ি দিয়েছিল।

বেয়াদবি মাপ করবেন স্যার, একটা কথা বলতে পারি?

বলো না, নির্ভয়ে বলো।

TAXI

আমার মনে হয় স্যার, লোকটা আপনাদেরই চেনা। তাই অমন করে পালিয়েছে।

TAXI

আমাদের চেনা লোক এখানে চুরি করতে ঢুকেছিল?

না, না হাসির কথা নয়। খুব দামী কথা বলেছে রামজীবন। গাড়িটা এখুনি ঘুরিয়ে শিউ-প্রসাদজির বাড়ি যেতে হবে।

শিউপ্রসাদজির বাড়ি কেন? তিনি ত এখন হাজতে।

তিনি না থাকলেও আর কেউ ত থাকতে পারে।

অঙ্গনা

ডিজাইন সেণ্টার

'অঙ্গনা'র কাজে একাধিক শিল্প-কেন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছি। কত রকমের কাজ। সুন্দর সুন্দর ডিজাইন। সুদূর পাড়াগাঁ থেকে এই শহর। কোথাও বিফল মনোরথ হইনি। সুন্দরের স্পর্শ ঠিক পেয়েছি। কৃত্রিম হাসির বিকৃতি নয়, সহজ স্বাভাবিক আনন্দে চিত্ত সমুদ্ভাসিত। চোখেমুখে তারই আলাপন। রেখায় রেখায় সমুজ্জ্বল। কথা বেশি বলতে পারিনি। শিল্পকে মনে ধরবার চেষ্টা করেছি। মুগ্ধ-চিত্তে বেরিয়ে এসেছি। ওঁরা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন কিছু জিগ্যেস না করায়। মৃদু হেসেছি সেই উজ্জ্বল আনন্দে। মুখে বলেছি, কাজেই তো আপনাদের জানা হয়ে গেছে।

এক একটি ডিজাইন তুলতে অনেক সময় লাগে। সবাই প্রতীক্ষা করে থাকেন কি অধীর আগ্রহে। শিল্প এবার কি রূপ নেয় দেখার জন্য। সেই অনুযায়ী তৈরী হবে কাজের ছক। একজন জানালেন, সকালে এসে বসি। দুপুরে খাওয়ার জন্য একটু ছুটি। আবার বসি। উঠি যখন দিনের আলো গড়িয়ে যায়। একনাগাড়ে কাজ। তবু খুব একটা এগোয় না। মাথায় হয়তো একটা চিন্তা ঘুরঘুর করছে এমন সময় মেয়েরা এলো কাজ নিতে। ওদের সব বুঝিয়ে দিতে দিতে সেই চিন্তা ততক্ষণে অ্যাবাউট টার্ন করে বিদায় নিয়েছে। এরকম কতবার হয়েছে। এখনও হয়।

কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, তাঁর ডিজাইন বাজারে ছাড়ার পরই সবাই নকল করতে বসে যায়। এতে তিনি অসন্তুষ্ট। খুবই স্বাভাবিক। ওঁরা চেষ্টা করলে আরো নতুন কিছু হতে পারে। কিন্তু সন্তোষও আছে। তাঁর ডিজাইন বাজারে কদরসহ চলছে। প্রচার বাড়ছে। অবশ্য তাঁর নয়, তাঁর ডিজাইনের। এসব পণ্য আবার স্বদেশ ছেড়ে বিদেশেও যাচ্ছে। এ স্বীকৃতি খুব একটা ছোট ব্যাপার নয়।

এরকম শিল্পকেন্দ্রও কলকাতা এবং উপকণ্ঠে আছে যা শিল্পনৈপুণ্যে দেশ-বিদেশ একাকার করে ফেলেছে। সেই কাঁথা প্রতিষ্ঠানের কথা বড়ো বেশি মনে পড়ছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি শিল্প নতুন প্রাণ পেয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের সাধনায়। কাঁথা থেকে কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ। শাল, আলোয়ান পর্যন্ত। সূচের কাজে অনবদ্য। আমরা কাঁথার দেশের মানুষ। তাই এসব জিনিষ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না। কিন্তু আমেরিকায় এ বস্তুর কদর খুব। জোর চলছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মুদ্রাও আসছে।

'শিল্পশ্রী'র শ্রীমতী মীরা চৌধুরীও এমনি ডিজাইনের অভিনব পরিকল্পনা এবং বিন্যাসে দেশ-বিদেশ জয় করেছেন। প্রতি-বারই তিনি চেষ্টা করেন নতুন কিছু করার। প্রায়ই সফল হন। কাঁচ বসানো জামা-জুতো আর স্কার্ফে তিনিই অগ্রণী। এর আদরও হয়েছে খুব। অনেক বিদেশী দূতাবাসের মহিলা-পুরুষ তাঁর কাছে ছুটে আসেন নতুন ডিজাইনের জামার জন্যে। বাজার চলতি সব কিছুই তাঁর কাছে প্রায় অচল। নতুন ডিজাইন তোলেন। নিজে দিনরাত পরিশ্রম করেন। এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও খাটতে হয় খুব। তবে এ খাটুনিতে সবাই খুশি। নতুন ভাবনা যেখানে নিত্য বহমান পরিশ্রম সেখানে নিরুদ্বেগ আনন্দ।

স্পষ্ট মনে নেই। কোথাও কোথাও এমন ডিজাইনও দেখেছি যা চিরকালের জন্য শিল্পসদনে স্থান পেতে পারে। সম-সাময়িক মাদকতা ছাড়িয়ে একটি অনন্য শিল্পীমন সেখানে নিজের স্থান করে নিয়েছে। কালের চঞ্চলতায় হারিয়ে ফেলতে চায়নি নিজেকে। এরকম শিল্পসমৃদ্ধ ডিজাইন খুব বেশি হয় না। যা হয় তাই সংরক্ষণ করতে হয়। তাতে শিল্পী যেমন সম্মানিত হন তেমনি আগামী দিনের কাছেও বর্তমানের একটা আবেদন থাকে। এটুকু শিল্পীরও দাবী এবং ন্যায্য প্রাপ্য।

এমনি একটি ডিজাইন সেণ্টার আছে লণ্ডনে। পিকাডিলির কাছে হে মার্কেটে। একটি সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয় ১৯৪৪ সালে। মুখ্যত উদ্যোগ ছিল শিল্পপতিদের। সরকারের সমর্থন ছিল। এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল, ব্রিটিশ শিল্প সামগ্রীর ডিজাইনের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা। সেই ধারা আজো বজায় আছে।

এই ডিজাইন সেণ্টারের প্রতিটি সামগ্রীই কাউন্সিল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অনুমোদিত। এই শিল্প কেন্দ্রটিকে স্থায়ীভাবে পরিচালনার দায়িত্বও কাউন্সিল বহন করে। এটি একটি স্থায়ী কেন্দ্র। তা বলে কখনো কোণাকুণি বিন্দুতে পৌঁছে যায়নি। এর বৈশিষ্ট্যই হলো, নিয়ত রূপের পরিবর্তনে।

ঐতিহ্য সমন্বিত প্যাটার্ন ও তাদের আধুনিক রূপের বিবর্তনে দর্শককে সাহায্য করার জন্যে সেণ্টারের একটি সচিত্র সূচী রয়েছে। এই তালিকা থেকে ১০ হাজারেরও বেশি দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। এই কারণে সেণ্টারে দর্শক সমাগম প্রায় লেগেই থাকে। বৎসরের যে কোন সময়ই এখানে মেলার ভিড়।

এই ভিড় সামলানোর জন্য সারা বছর এই সেণ্টার খোলা থাকে। দর্শকদের সুবিধার্থে এখানে ঢুকতে কোন দর্শনী লাগে না। সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে এই সেণ্টার দেখতে। ১৯৬৮ সালে দর্শক সংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। প্রতি দিনের গড় হিসাবে ৩৮২৪ জন আসেন এই সেণ্টার পরিদর্শন করতে। এই বিপুল সংখ্যক দর্শক রেকর্ড বিশেষ।

অসংখ্য রকমের জিনিষের ডিজাইন এখানে উদ্ভাবিত হয়ে থাকে এবং তাদের পরিকল্পনায় এখান থেকে সাহায্য করা হয়। বিরাটাকার সামুদ্রিক জাহাজ এলিজাবেথ—২ থেকে শুরু করে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর অভিষেকের স্মারকপত্র, মিড ওয়াইফদের ইউনিফর্ম, হাঁপানি রোগীর সরঞ্জাম, বিমানে ব্যবহৃত বিশেষ টেবিল ক্লথ এবং আরো কত কি।

ব্রিটেনের নির্মাতারা তাঁদের শিল্পদ্রব্যকে সবসময়ই কার্যোপযোগী ও সুদৃশ্য করে তুলতে চেষ্টা করেন। তাঁদের তৈরী ক্যাশ ডিসপেনসারে শুধু আঙুল চালামোই সহজ নয়, তা চক্ষুকেও তৃপ্তি দেয়। এজন্যই এই শিল্পদ্রব্যের একটি নমুনা গত বছর ডিউক অব এডিনবরা পুরস্কার লাভ করেছে।

দ্রষ্টব্য বস্তুই বা কত। পলি প্রপিলিন, ব্রিফ কেস, পোস্টাল ফ্র্যাংকিং মেশিন, গ্যাসের হিটার দেয়ালে বসানো বৈদ্যুতিক কেটলি—সবই পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। কাজের উপযুক্ত আকারযুক্ত এবং এমনভাবে অলংকৃত নয় যে ধুলো জমতে পারবে।

মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয় এই ডিজাইন সেণ্টারের বিশেষ প্রদর্শনী। তখন দর্শকের চাপ খুব বাড়ে। এমনি একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল 'লাইটিং ফর লিভিং' নামে। ঘর ও কারখানা আলোকিত করার কৌশল প্রদর্শিত হয় এতে। বহু আগ্রহীর সমাবেশ হয়েছিল। আর একটি প্রদর্শনী হলো 'গোয়িং মেট্রিক'। এই প্রদর্শনী দর্শকদের শিখিয়ে দিল দশমিক পদ্ধতিতে চলতে। এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ্য যে সত্তরের দশকে ব্রিটেনে ওজন ও মাপজোখ চালু হয়ে যাবে দশমিক পদ্ধতিতে।

আমার মনে পড়ে আমাদের দেশের কথা। অসংখ্য শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কুটিরশিল্পের নানা প্রতিষ্ঠানও। নতুন ডিজাইন আজো মাথাভর্তি কিলবিলে পোকার তাড়নায় আজো গজাচ্ছে। আবার অতীতেও ছিল। সব নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে যায়নি। অথচ সেসবের সঙ্গে একই আসরে পরিচয়ের সুযোগ সেই জঙ্গলেই চলে। এরকম শিল্পসদনও আমাদের গড়ে ওঠেনি। শিল্পীদের জন্য দরদ আছে আমাদের। এটুকু হলে শিল্পের জন্য শিল্পীর দরদ মর্যাদা পায়। হাতের কাছে সব নিদর্শন পেলে শিল্পীর সৃজন ক্ষমতাও নতুন মুক্তির পথ পাবে।

কিন্তু সে সম্ভাবনার রুপোলী রেখা কবে দেখা যাবে?

—প্রমীলা

বাংলা ছোটোগল্পের গোপন সমস্যা

দুর্লভ চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের সাধারণ উৎকর্ষ কোন স্তরের, সে বিষয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু ভালো কিছু কবিতা আর ছোটো-গল্প যে লেখা হ'য়েছে, এ বিষয়ে সকলেই আমরা একমত। বিশেষ করে ছোটো-গল্পের এ ব্যাপারে একটা প্রধান জিত এই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও গল্প লিখেছেন, এবং বলা যায় তাঁর হাতেই ঘটেছে আধুনিক ছোটোগল্পের গোড়াপত্তন। তাঁর মধ্যবর্তিনী, নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, হালদার গোষ্ঠী বা পয়লা নম্বর ইত্যাদি গল্প পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের তুলনাতেই সামনের সারিতে আসন পাবার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ এই যে গভীর সুরে বাংলা ছোটোগল্পের তার বেঁধে দিয়ে গেলেন, তা বজায় রাখা বড় সহজ ছিল না। কিন্তু সুখের বিষয়, প্রভাত মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পরশুরাম এবং অনতিবিলম্বেই গল্পের আসরে যাঁরা যোগ দিলেন সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, তারাশংকর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের হাতে বাংলা ছোটোগল্পের বিচিত্রবীণা বহু স্বর-সংযোগে ঐকতানের মতো বেজে উঠল। কিন্তু আমি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি করতে বসিনি। কাজেই নামের তালিকা দিয়ে আপনাদের ভারাক্রান্ত করব না। দফা-ওয়ারি আলোচনার মধ্যেও যাব না। যাঁদের নাম আমি উল্লেখ করলাম এখানে, তাঁরা ছাড়াও আরো অনেক সার্থক গল্পলেখক সেকালেও ছিলেন আর একালে যে তাঁদের সংখ্যা কী পরিমাণে বেড়ে গেছে, কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ার শো-কেসগুলোতে একটু ইতস্ততঃ নজর বুলিয়ে নিলেই তা আন্দাজ করা যাবে।

বস্তুত ছোটোগল্প এখন বাংলা সাহিত্যের সব থেকে ফলবান বিভাগ। এবং এদিকে চর্চাও যেমন গভীর, তেমনি এর জনপ্রিয়তাও খুবই ব্যাপক।

কিন্তু এইখানেই একটা কথা ওঠে। ছোটোগল্প যে পাঠকদের খুবই পছন্দসই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর আর কোনো প্রমাণ বাদ দিলেও শুধু এবারকার শারদ সংখ্যাগুলোতে একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন প্রায় সব বড় কাগজেই ডজন-ডজন গল্প ছাপা হ'য়েছে। অর্থনীতির ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের তত্ত্ব অনুসারে নিঃসন্দেহেই বলা চলে, চাহিদা না থাকলে জোগান থাকত না। পাঠকেরা গল্প চান বলেই সম্পাদকেরা গল্প ছাপতে উৎসাহী হন। এবং লেখকরা, ধরে নেওয়া যাক যে তাঁরা নিজের প্রেরণাতেই গল্প লেখেন তবু সম্পাদকের মারফৎ পাঠকদের এই গল্প পড়ার আগ্রহ এবং সেজন্যে তাগিদ দেওয়া যে লেখকদেরও বেশ মাতিয়ে তোলে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তা না হলে এক-একজন লেখক শুধু শারদীয় মরশুমেই এক ডজন-দু' ডজন ক'রে গল্প লিখতেন না। কিন্তু তার পরেই ঘটে একটা অদ্ভুত কাণ্ড। পুজোর সময় এই যে কয়েক শ' গল্প বাঙালি পাঠকের চিত্ত-হরণ করে, পুজোর পর তার বেশির ভাগই পুরনো কাগজবিক্রিওয়ালার মারফৎ লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। এবং তখন ভালোলাগা গল্পগুলো কেবল পাঠকের মনেই উঁকিঝুঁকি দেয়, তাকে চোখের সামনে ধরে দ্বিতীয়বার পড়াও যায় না, পছন্দসই প্রিয়জনকে পড়ানোও যায় না।

কেন? কারণটা হল এই যে, বেশির ভাগ প্রকাশকই ছোটোগল্পের বই বার করতে উৎসাহী নন, কেননা, তাঁরা বলেন ছোটোগল্পের বইয়ের বিক্রি নেই।

জবাবটা যে অবাক ক'রে দেবার মতো তা মানতেই হবে। যে গল্প মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায়, কিম্বা শারদীয় সংখ্যায় পড়ে পাঠক তারিফ করেন, সেই গল্পই বই আকারে বেরোলে কেন তাঁরা উদাসীন থাকেন, তার কারণ খুঁজে পাওয়া সত্যিই বড় দুরূহ। তবে একালে বাংলা বইয়ের প্রধান পাঠক এবং প্রধান বিক্রয়-মাধ্যমের বিষয়ে একটু ওয়াকিবহাল হলে এই দুর্বোধ্য ধাঁধাও অনেকটা প্রাঞ্জল হয়ে আসে বটে।

বাংলা বইয়ের প্রধান পাঠক পুরুষ নন মেয়েরা। এবং বিক্রির প্রধান মাধ্যম হল লাইব্রেরী। একালে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্যে বাংলা বই কেনা প্রায় নেই বললেই চলে। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত এবং হাতে যাঁদের পয়সা আছে, তাঁরা ইংরেজি বই কেনেন। যাঁদের পয়সা নেই, বই কেনাটা তাঁদের পক্ষে মর্মান্তিক বিলাসিতা। অথচ বই পড়েন এই নিম্নবিত্ত সাক্ষর লোকেরাই। এবং পড়েন বলাবাহুল্য লাইব্রেরীর মারফৎ-ই। মুশকিল দেখা দেয়, লাইব্রেরীতে পছন্দসই বই পাওয়া নিয়ে; এবং পাঠিকা যেহেতু মেয়েরা সেজন্যে লাইব্রেরী থেকে পুরনো বই বদলিয়ে নতুন বই আনাও একটা সমস্যা —কেননা এ ব্যাপারে বাড়ির পুরুষদের শরণ নিতে হয়। এবং পুরুষরা স্বভাবতই প্রতিদিন বাড়ির মেয়েদের ফরমাস খাটতে রাজি নন। অথচ গল্পের বই পড়া হ'য়ে যায় চটপট, কাহিনীবিস্তারে জটিলতা এবং ব্যাপ্তি উপন্যাসের তুলনায় অনেক কম থাকে বলে তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করেও সময়টা ভরাট করে রাখা যায় না। কাজেই সব সমস্যার সমাধান হল, লাইব্রেরী থেকে গল্পের বদলে উপন্যাসের বই আনা, এবং বেশ মোটা সাইজের বই আনা—যাতে এক-বার আনলে সপ্তাহখানেকের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বাংলা ছোটোগল্পের বইয়ের চাহিদা কম হওয়ার একটা কারণ সম্ভবত এইরকমই।

এতে যে ছোটোগল্পের ক্ষতি হবে তাতে সন্দেহ নেই। লেখকরা ক্ষমতা থাক আর নাই থাক, বই ছাপানোর সুবিধে হবে বলে অনেকেই উপন্যাসের দিকে ঝুঁকবেন, এবং ছোটোগল্প থাকবে অবহেলিত। তারপর, আদিগঙ্গার মতো ছোটো গল্পের ধারাও যদি স্তিমিত হয়ে আসে, তাতেও অবাক হওয়া চলবে না।

কিন্তু সময়ে সজাগ হলে এ পরিস্থিতি থেকে আত্মরক্ষা করা একেবারে অসম্ভব তা বলা চলে না। বিশেষ করে আমাদের দেশের লাইব্রেরী সংগঠনগুলো যদি একটু সচেতন হন, তাহলে অনেককিছুই হয়তো করা সম্ভব।

প্রথমত, লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে হোম সার্ভিস প্রথার প্রচলন করা চলে। যদি লাইব্রেরী থেকে বই নেওয়া-দেওয়ার অসুবিধেই গল্পের বই না নেবার প্রধান কারণ হয়, তবে বাড়িতে বসে বই পেলে (হোম সার্ভিসের মারফৎ) ছোটোগল্পের বইয়ের পাঠকসংখ্যা বাড়তে পারে।

দ্বিতীয়ত, লাইব্রেরীর যিনি কর্ণধার তিনি যদি সক্রিয় হন, তাহলেও উপকার পাওয়া যেতে পারে। এদেশের বেশির ভাগ গ্রন্থাগারিকই শুধু হাতের কাছে বই জুগিয়ে দেবার মধ্যেই তাঁদের কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু তা না করে তিনি যদি সদস্যদের বন্ধু হিসেবে তাঁদের সঙ্গে বই পড়া উচিত এবং কোন কোন বই পড়লে বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে তাঁরা মোটা মুটি একটা ধারণা তৈরি করতে পারবেন, এ বিষয়ে আলোচনা করেন ও পরামর্শ দেন তাহলেও হয়তো ছোটোগল্পের বইয়ের প্রচলন বাড়তে পারে। কেননা, আগেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যের একটা প্রধান উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে। অন্তত, ছোটোগল্পকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের রূপরেখার বিষয়ে আন্দাজ করা যে শক্ত তাতে সন্দেহ নেই। এই জরুরী ব্যাপারটাই যদি গ্রন্থাগারিক তাঁর গ্রন্থাগারের সদস্যদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, তা হলে ক্রমে ক্রমে তাঁদের রুচি পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব নয়। তখন পাঠকেরা নিজেরাই এসে ছোটোগল্পের বই চাইবেন, এবং তারিফ করে পড়বেন। গল্প-লেখকরাও প্রকাশনের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভালো গল্প লিখতে উৎসাহী হবেন। আমার তো অন্তত এই মনে হয়।

প্রেক্ষাগৃহ

অমর অতীত/পরিচালনা : হীরেন নাগ/সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার।

ফটো : অমৃত

শতবার্ষিকীর প্রণাম

যাঁর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে কবিকণ্ঠ বলে উঠেছিল :

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেশমাতৃকার আহ্বানে যেদিন তাঁর অর্ধ লক্ষ মাসিক আয়ের ব্যারিস্টারী ছেড়ে বাঙলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেদিন থেকে তাঁর মহাপ্রয়াণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আপামর বাঙালীর মুকুটহীন সম্রাট। মধ্যগগনের প্রদীপ্ত ভাস্কর যদি সহসা অন্তর্হিত হয়, তাহলে তা যেমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারময় শূন্যতাব সৃষ্টি করে, দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণে সেই শূন্যতারই সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর দেশবাসীর মনে। ...১৯২৫-এর সেই বিষাদময় ১৭ জুনের সেই দারুণ দাবদাহপূর্ণ দ্বিপ্রহরটি আজও মনে আছে, যেদিন তাঁর মরদেহ শিয়ালদহ থেকে কেওড়াতলার মহাশ্মশানে নীত হয়েছিল। মাতৃপূজায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সর্বস্ব পণ করে। তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করে শুধু ইংরেজের আদালতই বর্জন করেন নি, বিলাতী বর্জনের জন্যে তিনি সকল রকম বিলাসিতা ত্যাগ করে দাশসাহেব থেকে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবীধারী খাঁটি বাঙালী চিত্তরঞ্জনে পরিণত হয়েছিলেন; এমন কি স্বাস্থ্য-হানির কারণ জেনেও তিনি চিকিৎসকদের সানুরোধ পরামর্শ উপেক্ষা করে তাঁর বহু-দিনের অভ্যস্ত মদ্যপান পর্যন্ত সম্পূর্ণ-রূপে পরিহার করেন। শুধু কি তাই? বিলাতী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে নারী স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেতৃত্ব করবার জন্যে তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে পথে নামবার নির্দেশ দেন এবং শেষপর্যন্ত রসা রোডস্থ তাঁর বসতবাড়ীটি জনকল্যাণের জন্যে দান করেন (বর্তমানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডস্থ চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠানটি তাঁরই বসতবাড়ী ভেঙে নির্মিত হয়েছে)। দেশের কাজে চিত্তরঞ্জনের মতো এমন-ভাবে সপরিবারে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এমন নেতা বাংলায় কেন, সারা ভারতেও বিরল।

গেল ৫ নভেম্বর এই দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জনের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবের দিনে মিত্র প্রোডাকসন্স তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ উপহার দিয়েছেন 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' নামে বাংলা ছবিটি। প্রযোজক সরোজেন্দ্রনাথ মিত্র যে এই দেশনায়ক দেশবন্ধুর জন্মশতবর্ষে তাঁর পূত জীবনী-চিত্রটি নির্মাণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তার জন্যেই তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

ব্যারিস্টারী পাশ করবার পরে চিত্ত-রঞ্জনের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে ছবির শুরু এবং দার্জিলিংয়ের 'স্টেপ অ্যাসাইড' বাড়ীটিতে তাঁর জীবনদীপ নির্বাণে ছবির সমাপ্তি। প্রথম জীবনে তাঁর ব্যারিস্টারীতে ব্যর্থতা, মফস্বল আদালতে আইনজীবী হওয়া, পাওনাদারদের জ্বালায় পিতা ভুবন-মোহন যখন দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখান তখন তাঁর অপমানের অংশীদার হয়ে চিত্তরঞ্জনেরও প্রোনোটে সই করা, মানিকতলা বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে তাঁর বহু অর্থ ঋণ করা এবং জয়যুক্ত হওয়া, কৃতী ব্যারিস্টাররূপে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা, পিতার ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা, অভাব-গ্রস্ত দরিদ্রদের অকাতরে সাহায্য করা, সাহিত্য চর্চা, সাধ্বী স্ত্রী বাসন্তী দেবীর আন্তরিক সহযোগিতায় সুখেদুঃখে অবি-চল থেকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা এবং শেষে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে স্বরাজ্য দল গঠন করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদলে আসন দখল করার মধ্য দিয়ে দেশের কাজে কারাবরণ করা, সুভাষচন্দ্রকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করা ও কারামুক্ত হবার পরেও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং দেশের চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া পর্যন্ত দেশবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবনকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার

প্রয়াস পেয়েছেন চিত্রনাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় যুগ্মভাবে। এর ফলে চিত্তরঞ্জনের জীবনের বহু তথ্য বর্তমান যুগের দর্শকদের জানানোর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই মিটেছে, কিন্তু ছবিটি পল মুনি অভিনীত 'এমিল জোলা', 'লুই পাস্তুর' বা 'ওয়ারেজ'-এর মতো নাট্যবিভূতিসম্পন্ন একখানি রসঘন চিত্রে পরিণত হতে পায়নি। বহু হৃদয়স্পর্শী ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও ছবিটি সমগ্রভাবে একটি অখন্ড শিল্প-সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়নি, এ সত্য না মেনে উপায় নেই। দিল্লী ন্যাশনাল থিয়েটারের অধিকর্তা মিঃ অল্ কাজিকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, গান্ধীজীর জীবনী অবলম্বনে কোনো নাটকের সম্বন্ধে তাঁর কি রকম উৎসাহ, তখন তিনি বলেছিলেন, গান্ধীজীর সমগ্র জীবনী নিয়ে কোনো নাটক তৈরী সম্ভব নয়, শ্রীজাভেরীকৃত গান্ধী জীবনী চিত্রের মতো তা মাত্র তথ্যমূলক হতে বাধ্য; কিন্তু যদি তাঁর জীবনের এমন কোনো ঘটনা অবলম্বন করে নাটক তৈরী করা যায়, যা তাঁর জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছিল বা অন্য কোনো রকমে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তাহলে তার অভিনয় দর্শকদের ভীষণভাবে আলোড়িত করবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনী সম্বন্ধেও সমান কথাই বলা চলে।

প্রতিবাদ ঃ/তনেশ্বরপ্রসাদ/সুলতা চৌধুরী ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

নাম ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় গৃহীত চরিত্রের মর্যাদা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েই চরিত্রটির রূপদান করেছেন। এবং বহু স্থানেই তাঁর চরিত্র চিত্রণ সাফল্য মন্ডিত হয়েছে। পিতা ভুবনমোহন বেশে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে চরিত্রটির আনন্দ ও বেদনাকে প্রকাশিত করেছেন। দেশবন্ধু সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীর ভূমিকায় লিলি চক্রবর্তী চরিত্রের সহধর্মিতাকে মাধুর্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্তরঞ্জনের ভগ্নী অমলা চরিত্রটিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন শমিতা বিশ্বাস। ছবিটিতে ভীড় করে রয়েছে বহু চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। তবে যাঁর সুস্পষ্ট আহবানে ব্যারিস্টার সি আর দাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হবার সাধনায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র ছবিটির মধ্যে অনুভূতিতেই থেকে গেছে, মূর্তি পরিগ্রহ করে উপস্থিত হননি। মনে হয়, এটা এক-দিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। গান্ধীজীকে রূপায়িত করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ছবিতে প্রদর্শিত বহু চরিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁদের মনে পড়ছে, তাঁরা হচ্ছেন ঃ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (সুব্রত সেনশর্মা), ব্যারিস্টার বি সি চ্যাটার্জি (আনন্দ মুখোপাধ্যায়), রাজা সুবোধ মল্লিক (বীরেন চট্টোপাধ্যায়), কাজী নজরুল ইসলাম (কৌশিকব্রত দত্ত), কুমারকৃষ্ণ মিত্র (জীবেন বসু), বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (অমরেশ দাস), অরবিন্দ ঘোষ (নির্মল চট্টোপাধ্যায়), সুভাষচন্দ্র (অমর দত্ত), বিপিন পাল (দীপক মুখোপাধ্যায়) এবং আরও কেউ কেউ।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সর্বত্র সমান নয়—কোথাও বেশ দক্ষতার পরিচায়ক, আবার কোথাও বা সাধারণ মানের। চিত্তরঞ্জনের ভূমিকার কেশবিন্যাসে ছবির শেষাংশে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি যে রোল্ড গোল্ড (বা সোনার) চশমা পরতেন, তা ছিল ডিম্বাকৃতি (ওভ্যাল শেপ্‌ড)। এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। ছবিতে বিভিন্ন পরিবেশে গান আছে এগারোখানি। এর মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজী নজরুল ইসলাম এবং স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের রচনা। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত তাঁর রচনা 'নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা' গানখানি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি', 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা' প্রভৃতি গান সম্বন্ধেও

প্রায় সমান কথাই বলা চলে। এছাড়া আবহ-সঙ্গীতরূপে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহারও বহু স্থলেই সার্থকতা লাভ করেছে।

মিত্র প্রোডাকসন্স-এর শতবার্ষিকীর প্রণাম 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' জনসাধারণকে দেশবন্ধুর চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ করে তুলবে।　—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

তপনবাবু এখন ভীষণ ব্যস্ত। বম্বে থেকে ফিরেই পুরোদমে কাজ শুরু করেছেন আবার। নভেম্বরের মধ্যেই 'এখনই'র কাজ শেষ করে ফেলতে চান তিনি। গত সপ্তাহে একটানা চার-পাঁচদিন একটি ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে চিত্রগ্রহণ করলেন। কলকাতায় 'এখনই'র কাজ শেষ করে বম্বেতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'জিন্দগী'র কাজ শুরু করতে চান।

বাংলা দেশের দর্শকরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তপনবাবুর 'এখনই'র মুক্তি কবে পাবে। সমসাময়িক যুব সমাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার ভিত্তিতে লিখিত রমাপদ চৌধুরীর এই উপন্যাস বহুপঠিত। 'সাগিনা মাহাতো'র পর 'এখনই' তপন সিংহের আরেকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হবে বলা যায়। বাংলার তিনজন খ্যাতনামা পরিচালক সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ ও মৃণাল সেন—তিনজনই একসঙ্গে যে ছবি তিনখানার কাজ করছিলেন তার প্রতিটিই **'কনটেম্পোরারী'** কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে।

মৃণালবাবুর 'ইন্টারভিউ' মুক্তি পাচ্ছে এ সপ্তাহে। একজন বেকার যুবকের একদিনের ইন্টারভিউ দিতে যাবার কাহিনীই এ ছবির আখ্যান। পরিচালক শ্রীসেন এ ছবিতে আধুনিক কনটেন্টেরই শুধু আশ্রয় নেননি, ফর্মের দিক থেকেও আধুনিকতার ছোঁয়াচ পাওয়া যাবে। শ্রীসেন কারিকুরিগতও বহু বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের পরিচয় রাখতে চেষ্টা করেছেন এই ছবিতে। এ সপ্তাহেই মৃণালবাবুর ছবি দেখবেন দর্শকরা।

তপনবাবুর ছবি 'এখনই' এখনও প্রস্তুতির পথে। তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন ছবিকে মেজাজে ও আঙ্গিকে আধুনিক করে তুলতে।

* o *

অজিত গাঙ্গুলী 'জননী', অজিত লাহিড়ীর 'আটাত্তর দিন পরে' ও অরবিন্দ মুখার্জীর 'ধন্যি মেয়ে' তিনটি ছবির নায়িকার চরিত্রেই এ নামটি দেখা যাবে। কিছুদিন আগে যখন ফিল্ম এ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিট্যুট অফ ইন্ডিয়ার সমাবর্তন উৎসব হয়েছিল পুণায় সেদিন বি আর চোপরার দীক্ষান্ত ভাষণের পর ডিপ্লোমা বিতরণের সময় জয়া ভাদুড়ীর নাম তিনবার ডাকা হয়েছে, প্রতিবারই সে ধীর পদক্ষেপে, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এগিয়ে গেছে ডায়াসের দিকে। অভিনয়ে গতবার একমাত্র জয়া ভাদুড়ীই প্রথম শ্রেণীর সম্মান পেয়েছিল, অন্য কেউ তার পাশে দাঁড়াতে পারেনি, না ছেলে না মেয়ে। যে তিনটি ছবিতে সে এখন কাজ করছে তার প্রত্যেকটাতেই আমার উঁকি মারা হয়ে গেছে একাধিকবার। কিন্তু সেটে একটিবারের জন্যও অকারণ গম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকতে দেখিনি শ্রীমতী ভাদুড়ীকে। হয়তো সেটের প্রতিটি কলাকুশলী ও সহযোগী শিল্পীদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন নয়তো পরিচালকের নির্দেশমত আপনমনে পরবর্তী টেকে নিজের কাজের কথা ভাবছেন, আপনমনেই সংলাপ আউড়ে চলেছেন। শিল্পীর কর্তব্যই তো তাই।

কলকাতায় জয়ার হাতে তো মাত্র তিনখানা ছবি, ওর বম্বেতে চাহিদা আরও বেশী। ওখানে ওর হাতে এখনও ছ'খানা ছবি আরও দু'একটার কথাবার্তা চলছে। হৃষিকেশ মুখার্জী যদিও তাকে সব চাইতে প্রথমে সাইন করেছিলেন, কিন্তু রাজশ্রী পিকচার্সের 'সমাপ্তি'র কাজ শুরু হয়েছে আগে। খ্যাতনামা শিল্প নির্দেশক সুধেন্দু রায় এ ছবির পরিচালক। এবং জয়ার বিপরীতে ছবির নায়কও কলকাতার—স্বরূপ দত্ত। 'ধন্যি মেয়ের সেটে শ্রীমতী ভাদুড়ী জানালেন যে রবিঠাকুরের গল্পটি খুব ছোট পরিচালক শ্রীরায় নতুন চিত্রনাট্যে তাই দু-একটি পরিবর্ধন করেছেন। গত সপ্তাহে জয়া কলকাতায় ছিলো না। অরবিন্দবাবুর ধন্যি মেয়ের আউটডোরের কাজে বাইরে গিয়েছে। এ পর্যায়ের আউটডোরে অংশ নিয়েছেন উত্তমকুমার, রবি ঘোষ, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, সুখেন দাস প্রমুখ। এ সপ্তাহেই অবশ্য তাঁরা ফিরছেন সবাই নয়, কেউ কেউ।

* o *

স্বদেশ সরকার এতদিন বাদে বুঝি ফিরে আসছেন আবার। একটি ছবি করেই দীর্ঘ বিশ্রামান্তের পর শুধু শ্রীসরকারই ফিরছেন না, আরও দুজন আসছেন, একজন হলেন 'দিবা রাত্রির কাব্য' ছবির অন্যতম পরিচালক শ্রীবিমল ভৌমিক আর অপরজন হলেন স্ব-নাম খ্যাত শিল্পী ও-সি ওরফে

মেট্রো রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত লবণাক্ত নাটকের একটি দৃশ্য।

ও-সি গাংগুলী। 'কিনু গোয়ালার গলি' উনি করেছিলেন প্রায় বছর ছয়েক আগে।

স্বদেশবাবু ও বিমলবাবু যে দুটি কাহিনী নিয়ে আগামী ছবির প্রস্তুতি চালাচ্ছেন সে দুটি গল্পেরই কাহিনীকার শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। একটি 'পদ্মপাতায় জল' অন্যটি 'ধ্বস।' দুজনেই চিত্রনাট্য তৈরীর কাজে ব্যস্ত। স্বদেশবাবু কিছুদিন আগে অবশ্য জানিয়েছিলেন 'পদ্মপাতায় জলে'র চিত্রনাট্য শেষ তিনি করে রেখেছেন এবং নায়ক-নায়িকা হিসাবে 'মাল্যদানে'র জুটি সৌমিত্র-নন্দিনীকেও বেছে রেখে-ছিলেন। এখন সম্ভবতঃ শ্রীসরকার চিত্র-নাট্যের কিছু পরিমার্জন করছেন। ও-সির নতুন ছবির কাহিনীকার তিনি নিজেই. চিত্র-নাট্যও লিখছেন তিনি। ফ্লোরে যেতে এখনও দেরী আছে কিছু। কারণ ছবির কাজ শুরুর আগে প্রাক-প্রস্তুতির কাজ এখনও বাকি অনেক। তার মধ্যে অন্যতম হলো শিল্পী নির্বাচন। যতদূর জানি সম্পূর্ণ না হলেও প্রধান চরিত্রগুলোতে নতুন মুখ নিয়ে কাজ করতে তিনি বদ্ধ পরিকর।

* * *

জয়া ভাদুড়ী যদি নবাগতাদের মধ্যে ব্যস্ততম নায়িকা হন, অর্পণা সেন তাহলে পরিচিত মুখের মধ্যে ব্যস্ততম। দু সপ্তাহ আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। টেক-নিসিয়ানের দু নম্বর ফ্লোরের সেটে বসে তখন তিনি একটি ছবির পরবর্তী টেকের অপেক্ষা করছেন। পরিচালক কিছুক্ষণ আগে তাঁর সংলাপের রিহার্সাল দিয়ে গিয়েছেন। আলোকনিয়ন্ত্রণের কাজে ক্যামেরাম্যানের সংগে পরিচালকও ব্যস্ত। সেই ফাঁকে শ্রীমতী সেন পরবর্তী দৃশ্যে তার সংলাপ ও ভংগী নিয়ে বসে বসে চিন্তা করছেন। অতর্কিতে অপর্ণার সেক্রেটারী এসে জানিয়ে গেল—'অমুক বাবু ফোনে জানালেন কাল ক্যালকাটা মুভিটোনে এগারটার সময় যেতে।' মুহূর্তের জন্য তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেও পুনরায় মনো-নিবেশ করলেন পরবর্তী দৃশ্যের চিন্তায়। আগামীকাল আবার অন্য ছবির কাজ। অন্য চরিত্র অন্য সিকোয়েন্স। এতটুকু ক্লান্তির চিহ্ন নেই মুখে। বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছেন। প্রতিটি ছবির ভিন্ন কাহিনী, ভিন্ন চরিত্র, ভিন্ন পরিচালক, ভিন্ন আবহাওয়া। অথচ এক অর্পণা সেনই একই সময়ে অভিনয় করছেন। শ্রীমতী সেনের হাতে এখন প্রায় এক ডজনের মত ছবি। এই মুহূর্তে যে কটা নাম মনে আসছে সেগুলি হোল দাবী, স্বীকৃতি, আজব শহর কলকাতা, এখনই, খুঁজে বেড়াই, জয়-জয়ন্তী, চিদানন্দ দাশগুপ্তের বিলাত ফেরত ইত্যাদি। সুতরাং অপর্ণা সেন আজকের কলকাতার ব্যস্ততম শিল্পী বলতে বাধা কোথায়।

মঞ্চাভিনয়

গত ২০শে অকটোবর ষ্টার রঙ্গমঞ্চে মনোজ বসুর 'নূতন প্রভাত' নাটকটি সুহাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় কমার্শিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব, চীৎপুর, ইস্টার্ণ রেল ওয়ের সভ্যবৃন্দের দ্বারা অভিনীত হয়। পরিচালকের সুষ্ঠু পরিচালনায় নাটকটি দর্শকবৃন্দের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

অফিস ক্লাবের দলগত অভিনয় পরি-চালনার গুণে যে সুন্দরভাবে অভিনীত হতে পারে, পরিচালক তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন। অভিনয়ে শ্রীমতী মালা দেবী এবং তাঁর কন্যা কুমারী রুণু বড়াল যে অভিনয় করেন, বহুদিন দর্শকেরা মনে রাখবে। পরিচালক শ্রীসুহাস ভট্টাচার্যের অভিনয় অতুলনীয়, এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় প্রত্যেকেই কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

প্রতিবারের মতো এ-বছরও পাটনা কালীবাড়ীর নাট্যোৎসব দেখতে দূর-দূর থেকে লোক এসেছিলেন। আগে এখানে ঐতিহাসিক নাটক হতো, এ-বছর সব-কটাই সামাজিক নাটক হয়েছে। নানাদলের ছেলেরা মিলে এখানে নাটক করে বলে অভিনয়ের মান বরাবরই এখানে উচ্চ হয়ে থাকে। এ-বছর তিনটি নাটক অভিনীত হয় এখানে। ২৯ অকটোবর বাছাই শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান হয় এবং তার সংগে অরুণকুমার দে লিখিত 'আগন্তুক' নাটক। নবীনেরা অভিনয় মন্দ করেন নি, তবে সংলাপ মুখস্থ বলার ব্যাপারে এঁদের আরো বেশি পরিশ্রম করার প্রয়োজন ছিলো। দলগত অভিনয় খুব ভালো না হলেও সেখানটি মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ

কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ক্যাস বিভাগের সদস্যদের দ্বারা অভিনীত 'জোড়া-দীঘির চৌধুরী পরিবার' নাটকের একটি দৃশ্য।

চক্রবর্তী বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দ্বিতীয় নাটকটি অভিনয় হয় ৩০ অক্টোবর—ধনঞ্জয় বৈরাগীর পরিচিত নাটক 'পুত্রবধূ'। নাটকটির গতি একটু শিথিল ছিলো বটে, তবু সব মিলিয়ে অভিনয় ভালোই হয়েছে বলা চলে। উপেন রায়, কালীপদ ঘোষ ও অসিত বিশ্বাস তেমনের অভিনয় না করলেও মন্দ নয়। গীতা রায় ও আইভি গোস্বামী সুঅভিনয় করেছেন। গোখেল রায় ছোট্ট একটি ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া মীনাক্ষী দে, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, অসীম সেনগুপ্ত ও সোনা রায় চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। তৃতীয় ও সর্বশেষ নাটক শচীন ভট্টাচার্যের 'কাঁটাতারের বেড়া' অভিনীত হয় ৩১ অক্টোবর। অত্যাধুনিক বিষয়বস্তু এবং 'বল হরি বোল' জাতীয় সংলাপ থাকায় (পূজোমণ্ডপের নাটক বলে) অনেকে বিরক্ত হন, কিন্তু উচ্চমানের অভিনয়ের দরুন কোনো কিছুই অসংলগ্ন মনে হয়নি। পাঁচটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করেন দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত, অর্ণব সরকার, সুশান্ত দাস ও শংকর আচার্য।

নাজমা হোসেন: সম্প্রতি ৩১ অকটোবর শনিবার বহুবাজার 'নিউ তরুণ সংঘের' শিল্পীরা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নাজমা হোসেন'। সুবুদ্ধি রায়, মেদিনী রায় ও জনার্দনের ভূমিকায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীরজনীকান্ত পরিড়া ও শ্রীবংশীধর পাত্র উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। স্ত্রী ভূমিকায় 'ভদ্রবতী' চরিত্রে শিবানী ব্যানার্জী, মন্দিরা ও কাদম্বিনীর ভূমিকায় প্রভাতী মিশ্র ও প্রীতিকণা দাস, সুনাম অর্জন করেন। রাধাকৃষ্ণ দাস, রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল, সুধাংশু রক্ষ, মানিক চ্যাটার্জি, জয়দেব বসাক খগেন্দ্রনাথ দে, মাস্টার গুণময় ও অন্যান্য শিল্পীদের অভিনয় প্রশংসনীয়। শ্রীশিবনাথ রায় ও শ্রীরজনীকান্ত পরিড়া নাট্য পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।

লবণাক্ত: শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজের কয়েকটি যুবকের আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশা ও মানবতাবোধের পটভূমিকায় রচিত 'লবণাক্ত' নাটকটি সম্প্রতি 'মেটকো রিক্রিয়েশন' ক্লাব বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করেন। নাটকটি সুপরিচালনা ও দলবদ্ধ অভিনয়ের গুণে দর্শকবৃন্দের কাছে বেশ সমাদৃত হয়। বিশেষ করে বিজয়, বিনয়, বাণীর ভূমিকায় যথাক্রমে পীযূষকান্তি দাশগুপ্ত, কার্তিকচন্দ্র ব্যানার্জী ও বাসন্তী চ্যাটার্জীর অভিনয় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য চরিত্রে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পান্নালাল অধিকারী, প্রবালকুমার দাস, শ্রীমতী অজন্তা চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসনীয়। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীশৈলেন মুখার্জী।

'টাকার রং কালো': গত মহানবমীর দিন রাত্রিতে দিল্লীর ডিফেন্স কলোনীর দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাঙ্গালী অধিবাসীরা মস্ত সফল হাসির নাটক 'টাকার রং কালো' অভিনয় করেন। স্থানীয় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী এবং দিল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই নাটক দেখেন। অভিনয়ের মান খুব উঁচু স্তরের ছিল এবং দর্শকবৃন্দ খুবই আনন্দ লাভ করেন। দিগম্বরের ভূমিকায় শঙ্কর ঘোষের অভিনয় হয়েছিল খুবই উচ্চাঙ্গের। শঙ্কর ঘোষের অভিনয়, চলাফেরা, বাচনভঙ্গী, চরিত্র চিত্রণ ইত্যাদি হয়েছিল চমকপ্রদ এবং দর্শকগণ সর্বক্ষণ অভিভূত হয়েছিলেন তাঁর অভিনয় প্রতিভায়। পশুপতির ভূমিকায় অমরেশ দত্ত এবং করালীর ভূমিকায় সুব্রতা ঘোষও ভাল অভিনয় করেন।

দিল্লীতে যাত্রাভিনয়—দিল্লীর দুর্গাপূজোতে বিশেষ আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি। আবৃত্তি, সঙ্গীত, চিত্র প্রতিযোগিতার সঙ্গে হুলুধ্বনি, শঙ্খবাদন, আলপনা, আরতি, নৃত্য-প্রতিযোগিতাও চলে। কিন্তু নাটকের অনুষ্ঠানগুলি খুবই জনপ্রিয়। এ-বছরে দিল্লীতে প্রায় পঞ্চাশটি দুর্গাপূজো হয়েছে। অধিকাংশ সার্বজনীন, দু একটি ঘরোয়া। যথারীতি বহু মণ্ডপে বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়। শৈলেশ গুহনিয়োগীর দাস, 'অমৃতলাল বসুর 'বাবু' এবং মনোজ বসুর 'নীলকণ্ঠের বিষ'—বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য এবং নাটক অভিনয়ও কিছু কিছু হয়েছে। উৎপল দত্তের 'রাইফেল' নাটক কয়েক জায়গায় থিয়েটার মঞ্চে এবং কোন কোন জায়গায় যাত্রার আঙ্গিকে অভিনয়ও জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যময় যাত্রা-নাট্যের একমাত্র অভিনয় করেন 'শ্রীমতী অপেরা' তাঁদের নবম নিবেদন 'লালবাঈ' নাটক মঞ্চস্থ করে। নাম-ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ সঙ্গীত নৈপুণ্য এবং সুন্দর অভিনয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাণী চন্দ্রপ্রভার ভূমিকায় দৃপ্ত এবং সাবলীল অভিনয় করেন শ্রীমতী মায়া মুখার্জি

বিভিন্ন ভূমিকায় নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, সুশীল চক্রবর্তী, রবি রায় এবং দিলীপ ঘোষ প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। মিষ্টি অভিনয় করে কাকলী রায় ও কাজলী রায় সকলের মন জয় করে নেয়। দিল্লীর যাত্রার ভগীরথ ফণি রায় তাতার নজরদারের ভূমিকায় অসাধারণ নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেন। কুশলী পরিচালকের নিপুণ হাতের চিহ্ন যাত্রার প্রতি দৃশ্যে দেখা যায়। বাংলার এই প্রাচীন সংস্কৃতিকে রাজধানীতে জাগিয়ে রাখার জন্য শ্রীমতী অপেরাকে ধন্যবাদ।

বিবিধ সংবাদ

বেহালা অঞ্চলের অত্যন্ত আধুনিক রুচিসম্পন্ন ৯৬০ আসনবিশিষ্ট 'ইলোরা' চিত্রগৃহটি বেহালা ট্রাম যেখানে শেষ থামে, তারই পাশে অবস্থিত। বেহালার রায়-পরিবারের সুসন্তান পার্লামেন্টের সদস্য বীরেন রায় এই চিত্রগৃহটির সমগ্র আয়কে নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যে ব্যয় করবার জন্যে এই চিত্রগৃহকে একটি ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত করবার ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যেই এর আয় থেকে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এছাড়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ন'টি স্কলারশিপ, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজে একটি স্কলারশিপ, স্যার পি সি রায় বিজ্ঞান ও নকসা প্রদর্শনীতে বার্ষিক ১০০০্ টাকা পুরস্কার এবং বেহালা অঞ্চলে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ওপর চব্বিশ পরগণা বন্যাত্রাণের জন্যে এককালীন দান হিসেবে ৫,০০০্ টাকা এবং কলকাতার শহরতলীতে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাদ্যসংস্থানের জন্যে ১,০০০্ টাকা দান করা হয়েছে। শ্রীরায় খাস কলকাতাতে আর একটি চিত্রগৃহনির্মাণের জন্য মনস্থ করেছেন যাতে তাঁর এই কল্যাণমূলক পরিকল্পনাকে আরও প্রসারিত করতে পারেন। আমরা শ্রীরায়ের চেষ্টাকে জয়যুক্ত দেখতে চাই এবং তাঁর এই বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করি।

নারী সেবাসংঘের গৃহ নির্মাণার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য আগামী ২৮ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তির একক নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে বলে সংঘ কর্মী—শ্রীমতী জয়া বিশ্বাস আমাদের জানিয়েছেন।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শিল্পী : সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপক ব্যানার্জি ও সুচিত্রা ব্যানার্জি উভয়ে গত ২৪ থেকে ২৮ অকটোবর ৪ নম্বর সানি পার্ক এক ঘরোয়া আবহাওয়ায় এচিং ও কাপড়ে বোনা ছবির প্রদর্শনী করেন। সব শুদ্ধ প্রায় চল্লিশখানি বর্ণাঢ্য কাজ। এচিংগুলি নানা ধরনের অ্যাবস্ট্র্যাকট ফর্মের পরীক্ষার নিদর্শন। ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে দীপক ব্যানার্জি প্যারিসে উইলিয়াম হেটারের স্টুডিওতে বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষার নিদর্শন কিছু কিছু দেখা গেল। মূলতঃ বিভিন্ন জ্যামিতির ফর্ম-এর ওপর তিনি কাজ করেছেন। কতকগুলি কাজ নিছক ডিজাইন ঘেঁষা। অন্যগুলি বিভিন্ন জ্যামিতিক ফর্মের কম্পোজিশন এবং কিছু কাজ আছে যা নিসর্গ দৃশ্যের অ্যাবস্ট্রাকশন। কয়েকটি সাদা কালোয় করা এচিং বেশ জোরালো। ১, ৩, ১৩ ও ৩৪ নম্বরের ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য।

সুচিত্রা ব্যানার্জির কাপড়ের ওপর করা ছবিগুলি লোকশিল্পের রং ও ফর্মে সজ্জিত। জগন্নাথ মূর্তি, গাছের তলায় রমনীমূর্তি এবং নানা ভারতীয় ডিজাইন ও উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ এগুলোকে সুদৃশ্য করে তুলেছে। প্রদর্শনীর সব কাজগুলিই মাপে ছোট তাই যে কোন গৃহকেই সুসজ্জিত করে তুলতে পারে।

এঁরা উভয়ে অবিলম্বেই প্রদর্শনীটি দিল্লীতে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানকার ত্রিবেণী আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনের জন্য।

•

ম্যাক্সমুলার ভবনে ২৪ থেকে ৩০শে অকটোবর শিশুদের জন্যে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন হল। প্রদর্শনীতে শিশুদের খেলনা, আঁকা ছবি ও বই প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া প্রতিদিন থিয়েটার, পুতুল নাচ, গল্প বলার আসর ইত্যাদির আয়োজনও ছিল।

এই প্রদর্শনীটি ভারতবর্ষে অবস্থিত ম্যাক্সমুলার ভবনের বিভিন্ন শাখা ও জার্মানীতে অবস্থিত হেড অফিসের সহযোগে করা হয়। উলমের ভাল খেলনা নির্বাচনের এক কমিটি এর খেলনাগুলি বেছে দিয়েছেন এবং মিউনিখের স্টুডিও অব দি ইণ্টারন্যাশনাল ইয়ুথ লাইব্রেরী থেকে বিয়াল্লিশখানি ছোটদের আঁকা ছবি আনা হয়। ছবিগুলি ১৯৭২-এর অলিম্পিকের ওপর আঁকা এবং প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ—যদিও এগুলির ডিসপ্লে অনেক ভাল হতে পারত। নানারকম খেলাধুলোর ওপর ছবিগুলি আঁকা। বেশীর ভাগ শিল্পীর বয়সই ৭ থেকে ৯এর মধ্যে। এঁরা প্রায় সকলেই প্যাস্টেল এবং জল রং ব্যবহার করেছে। ওয়াটার-পোলো, ফুটবল, ভারোত্তোলন, লাফানো ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর আঁকা ছবিগুলির রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করার মত।

ছেলেদের খেলনাগুলি চারটি ঘরে সাজানো ছিল। অবশ্য এগুলিকে ঠিক সাজানো বলা চলে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। বলা যেতে পারে—টেবিলের ওপর ছড়ানো করা ছিল। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের খেলনা রাখা হয়। কাঠের তৈরী নানারকম মোটর গাড়ি, রেল গাড়ি, মাটি তোলার যন্ত্র ইত্যাদিগুলি সুদৃশ্য কিন্তু বর্ণহীন। শিশুদের খেলনা একটু বর্ণাঢ্য হলেই ভালো হয়। এগুলি যেন বড়দের ঘরের রূপসজ্জার উপকরণ হিসেবেই মানায় ভাল। রঙ্গীন পুতুলের মধ্যে কাপড়ের তৈরী নানারকম সুন্দর সুন্দর পুতুল দেখা গেল। তার কয়েকটির মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হয় এগুলি যেন কোন রকম পসানালিটি প্রব্লেম থেকে ভুগছে। একটু বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলনার মধ্যে নানারকম যান্ত্রিক খেলনা ও যন্ত্রপাতি তৈরীর সাজসরঞ্জামগুলি সুন্দর।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা বলেন যে খেলনার প্রদর্শনীটি কেবলমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দদানের জন্যেই করা হয়নি এটি করা হয়েছে আরো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে—ভারতীয় খেলনা নির্মাতাদের শিক্ষার্থে। উদ্দেশ্য সফল করতে হলে ভারতীয় খেলনার একটি সর্বাঙ্গীন প্রদর্শনী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মাটি, কাপড়, কাঠ, তালপাতা ইত্যাদি নানা জিনিসের যতরকম পুতুল ও খেলনা আছে তার একটি সংগ্রহ প্রদর্শিত হলে ভাল হয়। সেখানে খেলনা নির্মাতারা জার্মান খেলনার রং রূপ ও নির্মাণ কৌশল থেকে কতখানি লাভবান হতে পারেন তা আলোচনা করতে পারেন।

লাইব্রেরীতে ছোটদের বইএর একটি ছোট প্রদর্শনী রাখা হয়। এখানে জার্মান ও জার্মান থেকে অনূদিত ইংরিজি ও বাংলা বইও রাখা হয়েছিল। বইগুলির মুদ্রণপারিপাট্য লক্ষণীয়। পাশাপাশি বাংলা ও ইংরাজীতে ভারতে প্রকাশিত কিছু ছোটদের বইও ছিল। তবে এগুলির চাইতে উন্নততর দেশীয় প্রকাশন একটু চেষ্টা করলে কলেজ স্ট্রীটেই পাওয়া যেত। প্রদর্শনীটি এরপরে মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, পুণা, বোম্বাই, নয়াদিল্লী ও রুরকেলায় দেখানো হবে।

—চিত্ররসিক

খেলাধুলার কথা

শঙ্করবিজয় মিত্র

ক্যাচ দেম ইয়ং

'ক্যাচ দেম ইয়ং' প্রবচনটি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই খাটি। লেখা পড়ায় বা খেলাধুলোয় গড়ে তুলতে হলে অল্প বয়স থেকেই সুরু করতে হয় শারীরিক ও মানসিক ছাঁচটা যখন নরম থাকে। অনেকটা শিল্পীর হাতে মাটির ঢেলা তুলে দেওয়ার মত, আর শিল্পী সেই মাটি দিয়ে সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরী করে উপহার দেন। সমস্ত তরুণের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, একাগ্রতার সঙ্গে লক্ষ্য করে সেই সম্ভাবনার মুখ খুলে দিতে হবে। তাহলে স্বচ্ছন্দ হৃদয়বৃত্তি সঠিক পথে চলে প্রতিভাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেবে। 'ক্যাচ দেম ইয়ং' এর আসল উদ্দেশ্যই তাই।

খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও এই প্রবচনটির সার্থক রূপায়ণ চলেছে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে এবং তারি ফলশ্রুতিতে এই সকল দেশের তরুণ প্রতিভার আবির্ভাব সকলকে চমৎকৃত করে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত কর্মসূচী অনুসৃত হয়। শহর থেকে দূরতম পল্লীর প্রতিটি ছাত্রকে শারীর শিক্ষায় দীক্ষা নিতে হয়। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলিতে শারীর শিক্ষার শিক্ষকরা তাদের জিমনাস্টিক শেখান। যেসব ছেলেমেয়ের স্কুলে যাবার বয়স হয়নি তাদেরও শিক্ষা দেওয়া হয় বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রে। এর জন্যে কোন ফি লাগে না। ছোটদের যার যেটি ভাল লাগে সেইভাবেই খেলাধুলো শেখান হয় তা সে সাঁতার থেকে স্কেটিং কিছুই বাদ যায় না। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে শারীর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন খেলাধুলো শিক্ষণ দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর বহির্ভূত বিষয় হিসেবে ক্রীড়া শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সুশিক্ষিত কোচ রাখা হয়। এইসব কোচদের শুধুমাত্র শারীর শিক্ষায় ডিগ্রি নিলে চলে না, চিকিৎসা শাস্ত্রেরও প্রাথমিক জ্ঞান প্রয়োজন হয়। দেশব্যাপী ছাত্র সমাজের ক্রীড়া-প্রতিভা বিকাশের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া এই বিরাট পরিকল্পনায় বছরের প্রায় সাতশো কোটি রুবল ব্যয় করে। ছাত্রছাত্রীদের ট্রেণিং-এর জন্য দেশব্যাপী প্রায় দু'কোটি প্রাথমিক ক্রীড়াকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ রকম ব্যাপক ও বিপুল কর্মসূচী আমাদের কল্পনাতীত। তাছাড়া আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে খেলাধুলো শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কলকাতার মত বড় বড় শহরেরও সব স্কুলে খেলাধুলোর কোন উদ্যোগই নেই। না আছে খেলার মাঠ, না আছে এজন্য কোন শিক্ষক। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে ত কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয় না। শিক্ষা বিভাগের এজন্য কোন মাথাব্যথা পরিলক্ষিত হয় না। তারই মধ্যে অতি সীমিত পরিসরে বিদ্যালয়ের তরুণরা খেলাধুলোর চর্চায় প্রবৃত্ত হয় এবং মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে প্রতিভাধর খেলোয়াড় ও এ্যাথলিটের আবির্ভাব ঘটে। তবে সম্প্রতি আমাদের দেশে যেন কিছুটা চৈতন্যের সঞ্চার হয়েছে এবং স্কুল কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে খেলাধুলো প্রসারের যে প্রয়োজন এবং তা জাতির স্বার্থেই প্রয়োজন এই সত্যটা উপলব্ধ হয়েছে। প্রতিভাধর ছাত্রছাত্রীদের অন্বেষণের জন্য সরকার একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। এই বছর থেকে তা চালু হবার কথা। এতে ১৪ থেকে ১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীকে খেলাধুলো চর্চার জন্য বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে খেলাধুলোয় প্রতিভাসম্পন্ন ও উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত করে এই ধরনের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা প্রচলিত রয়েছে বেশ কিছুকাল ধরেই এবং সেই সূত্রে আমরা সম্প্রতি তরুণ প্রতিভা আবিষ্কার করে জাতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে সমুন্নতি ঘটাবার প্রয়াসী হয়েছি বলা যেতে পারে। ভারতের সমস্ত রাজ্যের স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার নাম হল জাতীয় স্কুল ক্রীড়া। ভারতের সমস্ত স্কুল দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকে।

কয়েক দিন আগে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় শরৎকালীন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল আগরতলায়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় এক হাজার ছাত্র প্রতিযোগী এবং প্রায় তিনশো ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বিভিন্ন বিভাগীয় ক্রীড়ায় অনুষ্ঠানের জন্য শহরের আটটি জায়গায় প্রতিযোগিতাগুলির ব্যবস্থা করা হয়। বীরবিক্রম কলেজের মাঠে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার লেঃ গভর্নর শ্রীএ্যান্টনী ল্যান্সলট ডায়াস। বিভিন্ন বক্তা এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং জাতীয় জীবনে এর উপযোগিতার কথা বর্ণনা করেন।

ফুটবল, বাস্কেটবল, টেবল টেনিস, সাঁতার, কাবাডি, খো-খো প্রভৃতি ক্রীড়ায় তীব্র প্রতিযোগিতা হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা পূর্বের তুলনায় উন্নত মানের স্বাক্ষর রাখেন। বাংলার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিভাগে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রায় সকল বিভাগেই তাঁরা বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ফুটবল খেলার অনুষ্ঠানে এবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়েছে। এবারের ফাইনাল খেলা হয় বাংলা ও বিহারের মধ্যে। ফাইনাল খেলার আগে সেমিফাইনালে বাংলা একদিকে ত্রিপুরাকে ৩—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল বিহার দিল্লীকে ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। ফাইনালে বাংলা ও বিহারের খেলায় প্রায় সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পরিস্ফুট হয়। তীব্র প্রতিযোগিতার পর বাংলা কোনক্রমে

বিহার দলকে এক গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্যে সেমিফাইনালের বিজিত দুটি দলের মধ্যে যে খেলা হয় তাতে ত্রিপুরাকে দু গোলে হারিয়ে দিয়ে দিল্লী এই স্থানটি দখল করে।

ছাত্রদের বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে রাজস্থান। ফাইনালে রাজস্থান বাংলাকে পরাজিত করে এই গৌরবের অধিকারী হয়। এতে তৃতীয় স্থান পায় পাঞ্জাব। ছাত্রদের টেবল টেনিসেও এই একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। এতে চ্যাম্পিয়ান হয় দিল্লী। দ্বিতীয় স্থান নেয় বাংলা, তৃতীয় স্থান দখল করে পাঞ্জাব। বাংলার ছাত্রীরা এবার বাস্কেটবলে ও টেবল টেনিসে শীর্ষস্থান অধিকার করে চ্যাম্পিয়ান হয়।

এবার সবচেয়ে প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠান হয়েছিল সাঁতারের প্রতিযোগিতা। এতে বাংলার ছাত্র ও ছাত্রীরা বিশেষ কর্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করেছে। বাংলার ছাত্রছাত্রীরা ৭০ পয়েন্ট পেয়ে দলগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ত্রিপুরা ২৪ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং মণিপুর চার পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বাংলার ছাত্ররা পনেরটি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য এবং তিনটি ব্রোঞ্জ এবং ছাত্রীরা পেয়েছে একটি স্বর্ণ ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক। সাঁতারে যে সাতটি রেকর্ড ভাঙ্গাগড়া হয়েছে তাতে বাংলার ছাত্র ও ছাত্রীরা পাঁচটি রেকর্ড স্থান করেন। সঞ্জীব সাহা শত মিটারের চিত সাঁতার ও বাটার ফ্লাই স্ট্রোকে, সুধীর দাস ৪০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে এবং ছাত্রী কল্পনা মল্লিক ১০০ মিটার বুক সাঁতারে রেকর্ড করে সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

স্কুল ছাত্র ও ছাত্রীদের প্রায় সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠান বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

তবে দুটি অপ্রীতিকর ঘটনা এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে কলঙ্ক লেপন করেছে। দেশব্যাপী অস্বাচ্ছন্দের আবহাওয়ার মধ্যেও এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত স্কুল ছাত্ররা পরস্পর আদান-প্রদান ও সৌহার্দের এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। দুটি অনুষ্ঠানে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার মূলে ছিলেন ছাত্ররা নয় তাদের প্রশিক্ষক ও কর্তাব্যক্তিরা। প্রথম ঘটনা ঘটে ফুটবল খেলার অনুষ্ঠানে। বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের খেলায় পাঞ্জাবের একজন খেলোয়াড় বাংলার একজনকে বিশ্রীভাবে ফাউল করলে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে পাঞ্জাবের প্রশিক্ষক মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে দল-বল নিয়ে মাঠ ত্যাগ করে চলে যান। ছাত্রদের শান্তভাবে সুশৃংখলভাবে চলতে না দিয়ে তাদের এইভাবে বিপথে পরিচালিত করার জন্য পাঞ্জাবের কোচ ও ম্যানেজারকে আজীবন সাসপেন্ড করে স্কুল ক্রীড়া পরিচালকবৃন্দ একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আশা করি ভবিষ্যতে আর এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না।

কাবাডি প্রতিযোগিতায় ওড়িষ্যা ও মণিপুরের মধ্যে খেলার সময় মণিপুরের প্রশিক্ষক ও ছাত্ররা রেফারীকে শাসাতে থাকে। এর জন্যও কর্তৃপক্ষরা যখন বিচারের ব্যবস্থা করেন সেই সময় মণিপুরের কোচ তাঁর এই অশালীন আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় ব্যাপারটি আর বেশী দূর গড়ায় নি।

এবার সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচক মণ্ডলীর জনৈক সদস্য নিগৃহীত হওয়ায় বাংলার ম্যানেজার এবং জনকয়েক খেলোয়াড়কেও হাজতবাস করতে হয়েছে। ঘটনাটি কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ায় এখানকার ক্রিকেটের কর্ণধারদের জামসেদপুরে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহৃত হয়। পরে বাংলার যে সমস্ত খেলোয়াড় অশালীন ব্যবহার করেছেন তাঁদের পূর্বাঞ্চল দলে পাঠান হবে না ঘোষণা করে বাংলার ক্রিকেট কর্ণধাররা যে আদেশ জারী করেছেন সেই সিদ্ধান্ত সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

ছাত্রদের সুশৃংখল ও নিয়মনিষ্ঠ করে তোলার জন্যে কাজে ও আচরণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাদের কর্তব্য সেই কর্তাব্যক্তিরা নিজেরাই যদি উচ্ছৃংখল হন তাহলে তারচেয়ে আর পরিতাপের বিষয় কিছু নেই। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধের জন্য স্কুল ক্রীড়ার পরিচালকরা যে সচেষ্ট ও সক্রিয় হয়েছেন এটা খুবই সুবিবেচনার ও আশার কথা। ক্রীড়া জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি এঁদের এই কঠোর মনোভাবের অনুসরণ করা হয় তাহলে বহু ইতরামি বন্ধ হতে পারে।

খেলাধুলোয় বিভিন্ন স্কুল ছাত্রদের মধ্যে বহু নূতন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় এই সব অনুষ্ঠানে। উত্তরকালে তারা প্রবীণ ও দক্ষ খেলোয়াড়দের শূন্যস্থান পূরণে যে সমর্থ হবে শুধু তাই নয়, দেশের ক্রীড়ামান উন্নত করতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে জেলা ভিত্তিক যে সকল ক্রীড়ানুষ্ঠান স্কুল ছাত্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে এখানে বহু সম্ভাবনাপূর্ণ নিপুণ ক্রীড়া-কারিগরের সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু এদের প্রকৃত শিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা এ পর্যন্ত তেমন কিছু হয় নি বলে বহু সম্ভাবনাই অকালে শুকিয়ে যায়। সরকার ও ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ এদিকে যথাসময়ে নজর দিলে আমরা ক্রীড়ামানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারি।

যুগোশ্লাভিয়াতে আয়োজিত বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় জাপানের মহিলা প্রতিযোগিনী কায়োকা হাসিগুচি।

খেলাধুলা

দর্শক

স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল কাপ

লক্ষ্ণৌতে আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে গত বছরের রানার্স-আপ জামসেদপুরের রুসি মোদী একাদশ দলকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় মোহনবাগান ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২১৬ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগানের প্রথম ইনিংস ২৬৫ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে রুসি মোদীর দল প্রথম ইনিংসের ৯ উইকেট খুইয়ে ১৬৬ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে রুসি মোদী দলের প্রথম ইনিংস ১৭২ রানের মাথায় শেষ হলে মোহনবাগান ৯৩ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে এবং ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৬৫ রান সংগ্রহ করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি ৯০ মিনিট সময়ে রুসি মোদীর দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেটে ৭৫ রান তুলেছিল।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

ইছাপুরে আয়োজিত আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ২৪-পরগণা জেলা দল ১—০ গোলে চন্দননগর দলকে পরাজিত করে মোট ১২ বার 'ও মজুমদার ট্রফি' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। সর্বাধিকবার এই ট্রফি জয়ের রেকর্ড ২৪-পরগণা জেলা দলেরই। সেমি-ফাইনালে ২৪-পরগণা জেলা দল ১—০... ও ১—০ গোলে নদীয়া জেলা দলকে এবং চন্দননগর ২—০ ও ১—০ গোলে জলপাইগুড়ি জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল অশোক গান্ধোত্রার নেতৃত্বে তিন সপ্তাহের সিংহল সফর শেষ করে স্বদেশে ফিরে এসেছে। এই সিংহল সফরের ৬টি খেলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—জয় ২ (টেস্ট খেলায়), ড্র ২ এবং পরাজয় ২ (এক দিনের খেলায়)। সিংহল সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলকে প্রথম টেস্ট খেলায় এক ইনিংস ও ৪১ রানে এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় এক ইনিংস ও ১২২ রানে পরাজিত করে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল 'রাবার' জয়ী হয়েছে। টেস্ট সিরিজের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান সংগ্রহের গৌরব লাভ করেছেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের সুনীল গাভাস্কার। তিনি দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩১৫ মিনিটের খেলায় ২০৩ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন—২৬টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার বাউন্ডারী করেন।

টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর

প্রথম টেস্ট :

সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় : ৫০ রান (জাগদেল ১৯ রানে ৪ উইকেট) ও ৩০ রান (মহীন্দর অমরনাথ ৮ রানে ৫ ও কৈলাস ঘাটানী ১৭ রানে ৩ উইকেট)।

য়ুগোশ্লাভিয়াতে আয়োজিত বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে পদকবিজয়ী জাপানের সদস্যবৃন্দ। জাপান পুরুষ বিভাগে ১৬টি পদক (স্বর্ণ ৭, রৌপ্য ৫ ও ব্রোঞ্জ ৪) এবং ৫৭১-১০ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে।
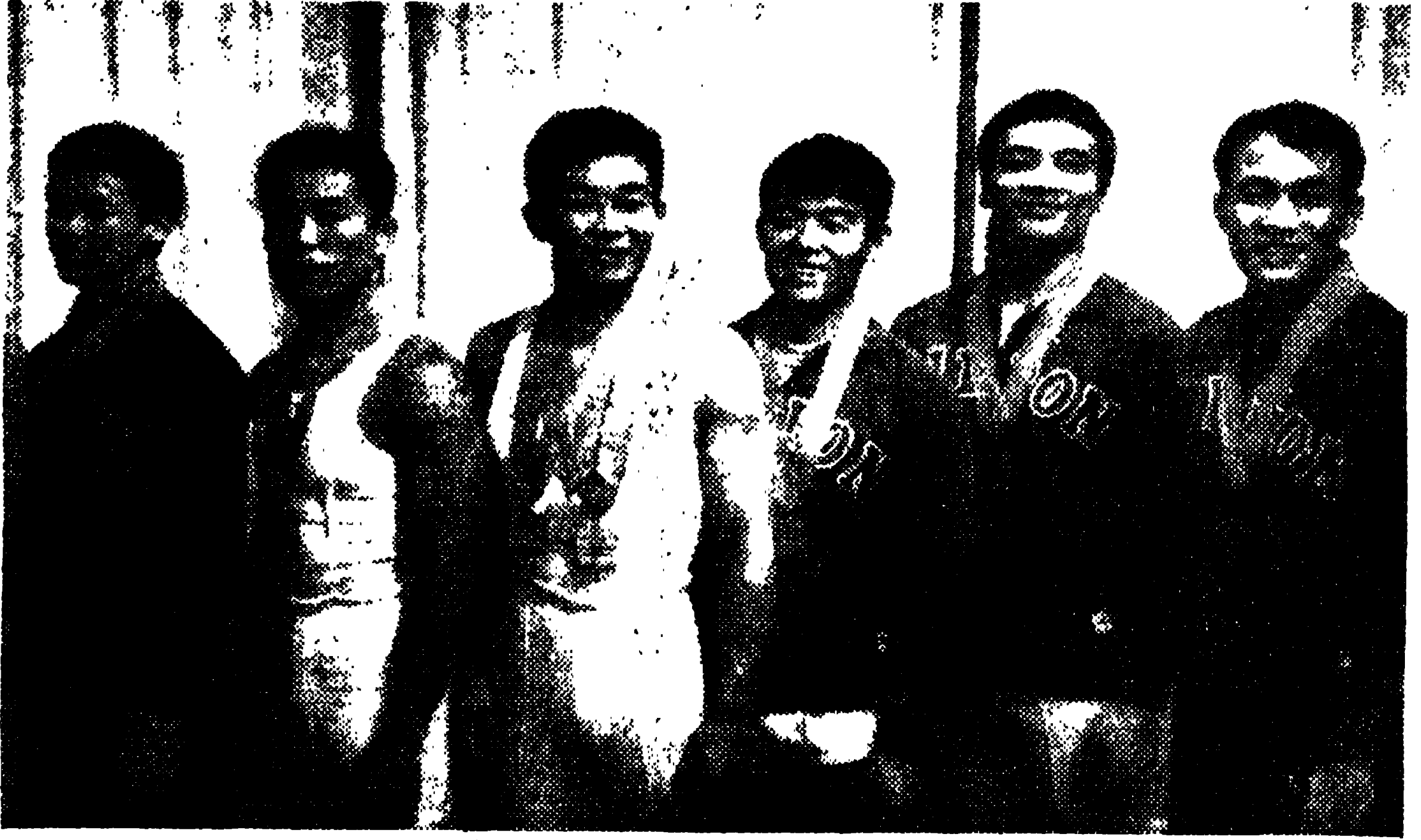
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ১২১ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)।

দ্বিতীয় টেস্ট :

সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় : ৮৩ রান (দোসী ৩০ রানে ৬ এবং জাগদেল ১৬ রানে ৩ উইকেট) ও ১৪৬ রান (দোসী ৪২ রানে ৫ এবং জাগদেল ৪৩ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ৩৫১ রান (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সুনীল গাভাস্কার ২০৩ নট আউট, জয়ন্তীলাল ৭৪, এস অমরনাথ ৫৩ নট আউট)।

বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা

য়ুগোশ্লাভিয়াতে আয়োজিত বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে জাপান এবং মহিলা বিভাগে রাশিয়া দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ :

দলগত : ১ম জাপান (৫৭১-১০ পয়েন্ট), ২য় সোভিয়েট ইউনিয়ন (৫৬৪-৩৫ পয়েন্ট) এবং ৩য় পূর্ব জার্মানী (৫৫৩-১৫ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত : ১ম ইজো কেনমোতসু (জাপান)—১১৫-৫ পয়েন্ট, ২য় ইতসু তুকাহারা (জাপান)—১১৩-৮৫ পয়েন্ট, ৩য় একিনোরী নাকায়ামা (জাপান)—১১৩-৮০।

মহিলা বিভাগ :

দলগত : ১ম সোভিয়েট ইউনিয়ন (৩৮০-৬৫ পয়েন্ট), ২য় পূর্ব জার্মানী (৩৭৭-৭৫ পয়েন্ট), ৩য় চেকোশ্লোভাকিয়া (৩৭১-৯০ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত : ১ম লুর্ডমিলা তুরচিচেভা (সোভিয়েট ইউনিয়ন)—৭৭-০৫ পয়েন্ট, ২য় ইরিকা জুচোল্ড (পূর্ব জার্মানী), ৩য় ভোরোনিনা (সোভিয়েট ইউনিয়ন)।

এশিয়ান মোটর র‍্যালী

গত ৭ই নভেম্বর ইরাণের তেহরাণ থেকে দ্বিতীয় এশিয়ান মোটর র‍্যালীতে যোগদানকারী মোটর চালকেরা পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ইরাণের দশ বছর বয়সের যুবরাজ রেজা পাহলভি। ১৫ই নভেম্বর ঢাকায় এই প্রতিযোগিতা শেষ হবে। তেহরাণ থেকে ঢাকার দূরত্ব ৬,৮০০ কিলোমিটার (৪,২৫০ মাইল)। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী মোটর চালকেরা ইরাণ, আফগানিস্থান, পাকিস্থান (পশ্চিম ও পূর্ব), ভারতবর্ষ এবং নেপাল—এই পাঁচটি দেশের রাস্তা দিয়ে যাবেন।

আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্ণামেণ্ট

জাপানের টোকিওতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্ণামেন্টে এই তিনটি দেশ যোগদান করেছিল—জাপান, ভারতবর্ষ এবং ইতালী। জাপান থেকে যোগদান করেছিল দুটি দল ('এ' এবং 'বি')। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়েছে জাপানের 'বি' দল, দ্বিতীয় স্থান জাপানের 'এ' দল এবং তৃতীয় স্থান ভারতবর্ষ। তিনটি খেলায় ভারতবর্ষের ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ১ (ইতালীর বিপক্ষে ২—১ খেলায়) এবং পরাজয় ২। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিলেন রমানাথন কৃষ্ণান এবং শিব মিশ্র।

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

আরিজোনার ফোনিক্সে আয়োজিত বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ১৬টি স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম স্থান এবং আমেরিকা ১১টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ ৩য় খণ্ড

অমৃত

২৮ সংখ্যা
মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 20th Nov. 1970 — শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭০ — 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৮ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 20th Nov. 1970 শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭০ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

চিঠিপত্র

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

শারদ সাহিত্য পরিক্রমায় গল্প ও উপন্যাস বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পড়লাম। শারদ সাহিত্য নিয়ে এমন ব্যাপক আলোচনা ইতিপূর্বে আমাদের চোখে পড়ে নি। এই পরিকল্পনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। শ্রীপর্যবেক্ষক অল্প পরিসর হলেও গল্প-উপন্যাসের দায়সারা নাম উল্লেখ না করে সুযোগ-সুবিধে মত আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান কথাসাহিত্যে বাস্তব জীবন ও সমাজ ভাবনা কোথায় কিভাবে কতটা ছাপ ফেলছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। আমাদের এ সময়ে যে সব সাহিত্য কর্ম হচ্ছে তা আমাদের মত সংসার-পীড়িত মানুষের পক্ষে পড়ে ওঠা সম্ভব হয় না। নানা সমস্যা ও সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। তবু আমি বিশ্বাস করি একটা দেশের, একটা জাতির নানা প্রকার সমস্যা সংকটের মধ্যে সাহিত্য ধ্রুবতারার মত জ্বলে। সাহিত্যের কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবী সততা। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, আমাদের দেশে একজন তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার যা মর্যাদা একজন ভাল সাহিত্যিকের সেটুকুও নেই। সাহিত্যের মাধ্যমে একালের দুঃসহ জীবন সংগ্রামের কথা আমরা পড়তে চাইতে পারি। বাস্তবধর্মী বিষয় নিয়েও যে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে তার প্রমাণ এবারের শারদ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত মনোজ বসুর 'আমি সম্রাট' ও মিহির আচার্যের 'দিবস বিভাবরী' উপন্যাস দুটি এবং বেশ কয়েকটি ছোট গল্প। পর্যবেক্ষক তাঁর উপন্যাসের আলোচনায় এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন। বাস্তব জীবন থেকে উপন্যাসে উপাদান গ্রহণ করলে তা 'সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ' না হয়ে কাম্য প্রত্যাশাই পৌঁছান সম্ভব মনে করি।

অমলকুমার দাস
রাণাঘাট

মুখের মেলা

'অমৃতের' (২৫ সংখ্যা ২০শে কার্তিক ৭৭) মুখের মেলায় আবদুল জব্বার সাহেব কিছু মাছের নাম উল্লেখ করেছেন। বাঙালীর 'মছলীখোর' দুর্নাম অনেক দিন হয় ঘুচে গেছে। আজ শুধু বাংলার নয়, ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই মাছের চাহিদা। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার 'নদীর ফল' অর্থাৎ মাছ পশ্চিমবঙ্গে আসছে না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও আমদানী কম। মাছ কেনা এখন প্রায় সাধারণ লোকের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বাজারে প্রত্যহ যা ওঠে তাই বিক্রি হয়ে যায়। কোন মাছের কি নাম এ সবের আর কে খবর রাখে? জব্বার সাহেবের লেখাটি পড়ে পরিচিত অনেক মাছের নামই মনে পড়ে গেল। আমার জানা, এবং পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার বাজারে চালু মাছের একটি তালিকা তাই দিচ্ছি। আড়, আমোদি, ইলিস, কৈ, কাঠ কৈ, কাজলি, কার্চাক, কাউন মাগুর, কোরাল, কালবোস, কাইকলা, কাৎলা, কালোবেলে, কুকুরজিভ, কৈভোল, খলিসা, খয়রা, খল্লা, খরশুলা, খড়চাদা, গুইলসা, গোলচাদা, গজার, গুলে, ঘন্না, ঘাগড়া, ঘাউরা, ঘিকলা, চেলা, চন্দনা, চাইপলা, চিতল, চেউয়া (লাল ও সাদা) চিংড়ি (৩-৪ প্রকারের পূর্ব বাংলায় সাধারণ নাম ইচা), ঝাইটকা, টাটকিনি, টেপটেপা, টাইট্টা ভাগনা, ট্যাংরা, টাকি (৩-৪ প্রকারের), ঢাইন (ঢাই), তাউরা (গুরজালি), তেলাপিয়া, তপস্বী (তপসে), তারাবাইম, তুলারডাটি, দাঁড়কিনা, পাংগাস, পোয়া (ভোলা), পমফ্রেট, পারদা, পারসে, পুটি, পাঁকাল, ফটক, ফ্যাসা, ফলুই, বোয়াল, বাচা, বেলে, বাঁশপাতা, বজুরি, বইচ্চা, বাটা, ভোলপোয়া, ভেদা, ভেটকি, মাগুর, মহাসের, ম্যাকরেল, মৃগেল, মেদ, মৌরালা, রাই, রিঠা, লাইট্টা (রোমলা), শোল (শাল), সাকুস (শঙ্কর), সরপুটি (সরলপুটি), সিলং, সিঙ্গি, সুবর্ণখড়কে, সূর্যপোনা (তেচোকো) ইত্যাদি। মনে হয় অনেকেই হয়তো নামগুলি পড়ে স্রেফ হাসবেন — কারণ এখন এসব জেনে আর কি লাভ?

চিত্তরঞ্জন কর্মকার
কলিকাতা—৩২

মনের কথা প্রসঙ্গে

১৫ আশ্বিন ও ২২ আশ্বিনের অমৃতে মনোবিদ রচিত ধারাবাহিক নিবন্ধ 'মনের কথা' প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুধাংশুশেখর রায়ের চিঠি পড়লাম। মনোবিদ মনস্তাত্ত্বিকদের মত উল্লেখ করে বলেছেন 'আশৈশব পরিচিত লোকের সঙ্গে রোমান্টিক প্রেম হতে পারে না। বয়সের সমতা থাকলেও নয়।' পত্রলেখকদ্বয় এই উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি, দক্ষিণ ভারতে মামা-ভাগ্নীর বিয়ে, মুসলমান সমাজে 'খুড়', 'মামা', 'মাসু' ইত্যাদি নানা ধরনের—তুতো ভাই-বোনের বিয়ে এবং পুরনো বাঙালী হিন্দু সমাজে শৈশববাকদানসম্ভূত বিয়ে প্রায়শই সার্থক, অতএব বাল্যপ্রণয় সম্ভব। তাঁদের অবগতির জন্য সবিনয়ে নিবেদন করছি প্রেম এবং নেগোশিয়েশন ম্যারেজ (আয়োজিত বিবাহ) এক জিনিস নয়। পূর্বপ্রেম ছাড়াও বিয়ে হয় এবং সেই সব বিয়ের অনেকগুলিই নিঃসন্দেহে সার্থক। সামাজিক প্রথানুযায়ী অভিভাবকদের উদ্যোগে সংঘটিত বিয়ের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আশৈশব পরিচিতি ও সেই সব বিয়ের ভবিষ্যৎ সার্থকতা সম্পর্কে মনোবিদ কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। তাঁর বক্তব্য বাল্য-প্রণয় সম্পর্কে। ছোটবেলা থেকে যার সঙ্গে পরিচিত অধিকাংশ সময়েই তাকে নিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রোমান্টিক ইমেজ গড়া সম্ভব হয় না। তার অন্তরঙ্গ খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অন্য পক্ষের অবাধ জ্ঞান স্বপ্নের ডানা ঝরিয়ে দেয়। মনোবিদ সম্ভবত এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

উষ্রী গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা—৫০

নিকটেই আছে

গত ১৩ কার্তিক সংখ্যার 'অমৃত' পত্রিকায় 'চিঠিপত্রে' প্রকাশিত ছবি ব্যানার্জির 'নিকটেই আছে প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম।

লেখিকা যে সমাজ-চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আলোকপাতের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তো মনে হয় না। আজ সব দিক দেখে-শুনে মনে হয়, কি বড়, কি ছোট— সকলেই আমরা ভাল-মন্দের বিচারবোধ হারিয়ে ফেলেছি। সামাজিক দায়িত্ববোধ আমাদের আজ আছে বলে তো মনে হয় না। শুধু ছাপার অক্ষরে কতকগুলো কথা লিপিবদ্ধ হলো, কাজের কাজ কিছু হোল না—এ অবস্থায় আলোকপাত করে লাভ কি? তবু বিষয়টি বড়ই বেদনাদায়ক, তাই ব্যথার ব্যথী হয়ে কিছু লিখতে প্রবৃত্ত হলাম।

প্রথমেই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা আমাদের দেশে নেই। এই না থাকার জন্য সামান্য কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ ছেলেকেই বেকার-জীবনের মত অভিশপ্ত-জীবন যাপন করতে হয়। বেকার-জীবনের যে কি নিদারুণ মর্মজ্বালা তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝবে! ছেলেরা যখন এভাবে দিনের পর দিন প্রবঞ্চিত হচ্ছে

চিঠিপত্র

তখন তারাও যে জাতিকে প্রবঞ্চিত করবে—এ আর বেশি কথা কী!

দ্বিতীয়ত, ছেলেরা যে আজ কুপথগামী, তারা যে আজ নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে চায় না, তার কারণ হোল—আর্থনীতিক। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় তাদের পড়াশুনার যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। আর্থিক অনটনের জন্য অনেক ছেলেকে দেখেছি শিক্ষা সমাপ্ত হবার অনেক আগেই ইস্কুল ছাড়তে। এর ফলে এরা আস্তে আস্তে বিপথে যায়, কুসংসর্গের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের চরিত্র কলুষিত করে। তখন এরা সমাজবিরোধী কাজে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেয় এবং পরিণামে সমাজে ডেকে আনে নিদারুণ বিপর্যয়।

অনেকে আমরা এ-বিষয়ে অভিভাবকদের দোষ দিই। কিন্তু একথা কারও অজানা নেই যে, বাংলা দেশের হাজার হাজার পরিবার আজ দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণে জর্জরিত। ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অনটনের জন্যে এই সমস্ত অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের ঠিকমতো দেখাশুনা করতে পারেন না। অন্নবস্ত্রের চিন্তাতেই তাঁদের সারাদিন কাটে, ছেলেদের দিকে নজর দেবেন কখন! এ কারণে অসুস্থ আবহাওয়ায় গড়ে-ওঠা ছেলেরা যখন লেখাপড়ার কাজে ইস্তফা দিয়ে বদখেয়ালে গা ঢেলে দেয় তখন অভিভাবকের শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

তৃতীয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম ও অবাঞ্ছিত দেশবিভাগের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন আজ বিপর্যস্ত। সমাজের সকল স্তরে আজ দেখি সুন্দরের জায়গায় অসুন্দরের স্থান। সমাজবোধ বলতে আজ আর কিছুই নেই, শুভবুদ্ধি বা চেতনার আজ অপমৃত্যু ঘটেছে। যে শক্তির উৎস থেকে আমাদের মনে কল্যাণবোধ জাগ্রত হয়, সেই শক্তি আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সারা দেশে আজ শঠতা, হিংসা, চাতুরীর জয়-জয়কার, সত্যের জায়গায় মিথ্যার বেসাতি চলেছে, ধর্ম আজ পর্যুদস্ত, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, কালোবাজারী আজ চারিদিকের আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছে। সমাজের সকল স্তরেই যখন নীচতা ও নোংরামি প্রকাশ পাচ্ছে তখন ছেলেদের কাছ থেকে সুন্দরের প্রত্যাশা করাটা বাতুলতামাত্র। আমরা বড়রাই প্রকৃতিস্থ নই। সুতরাং ছোটদের কাছ থেকে কি করে আমরা ভালটা আশা করতে পারি। ছোটরা বড়দের কাছ থেকেই তো সকল জিনিস আত্মস্থ করে।

বারিদচরণ ঘোষ
চুঁচুড়া,
হুগলী।

(২)

সুশীলদাকে চোখের সামনেই দেখছি, দেখেছি আবার দেখবো। অমৃতের প্রতি সংখ্যাই যেন এক একটা চমক। লেখকের লেখায় যেন একখানা ল্যান্ডস্কেপের রূপ দিয়েছে ধর্মতলা ট্রাম টার্মিনাসের বটগাছতলা। কোলকাতা থেকে এত দূরে থেকে যেন মনে হয় আমি সেই ধর্মতলার কোথাও বসে-বসে একাগ্রচিত্তে প্রতিনিয়ত ছবিগুলো দেখে যাচ্ছি। সুশীলদা আজকের ট্রেনের হকার, সুশীলদা আজকের হাটেবাজারের ভদ্র ফেরিওয়ালা। এমন সুশীলদার প্রাণবন্ত রূপ কত সুন্দর সহজ ভাষার মধ্যে তুলে ধরেছেন লেখক। সে ধন্যবাদ অবশ্যই পাবেন, কিন্তু তার আগে লেখককে অনুরোধ করব, তিনি যেন সেই সব প্রতারকদের হৃদয়ের কথাগুলোও লিখে আমাদের আশ মেটান। কেননা এভাবে লিখে চললে একতরফাই লেখা হবে, প্রকৃত চরিত্রগুলোকে আরও ভাল করে চেনা যাবে না।

আপাত দৃষ্টিতে মুখের মেলার চরিত্র এবং নিকটেই আছের চরিত্রর পার্থক্য অনেক। কিন্তু কতগুলো জায়গায় মুখের মেলার তুলনায় সুশীলদার কাহিনী অনেক বাস্তবতার ছোঁয়া এনেছে। কোথায় গল্পে বলা পাগল শশী কাওরায় আর কোথায় সেই ডাহা ধাড়িবাজ কবিরাজ সুশীলদা। এক্ষেত্রে ভাষার যতই তারতম্য থাক মুখের মেলার ঘটনা অপেক্ষা নিকটেই আছে অনেক বাস্তব মনে হয়েছে আমার। আশা করি আরও কিছুদিন বাস্তবতার স্পর্শ ছোঁয়া আরও কয়েকটি প্রতারকের চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হবো।

সঞ্জয় গুহঠাকুরতা
হাজারিবাগ।

মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

গত ২০ কার্তিক গ্রন্থদর্শীর লেখা 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' আলোচনাটি সুন্দর লাগল। মফঃস্বলের লেখক এবং সম্পাদকদের কাছে গিয়ে এবং নানা শ্রমস্বীকার করে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা অত্যন্ত সত্য। বিশেষ করে তাঁর লেখার মধ্যে একাধিক জায়গায় দেখতে পেয়েছি মফঃস্বলের কবি সাহিত্যিক সম্পাদকের একটিই অভিযোগ যে, তাঁদের দিকে কেউ তাকান না, অথচ বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে মফঃস্বলের দান চিরকাল সীমাহীন। একথা খুবই যুক্তিপূর্ণ। কারণ একালে ও বাংলা সাহিত্যের যাঁরা দিকপাল সাহিত্যিক তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন মফঃস্বল থেকে। নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যদি আজ তাঁরা সুযোগ না পেতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যকে অনেক পিছিয়ে থাকতে হত নিশ্চয় বলা যায়।

আমি নিজে একজন মফঃস্বলের তরুণ লেখক। সেই হিসাবে আমিও মফঃস্বলের বহু তরুণ কবি, সাহিত্যিক শিল্পীর সঙ্গে সহৃদয়ভাবে দীর্ঘদিন মিশেছি। সেখানে দেখেছি তাঁদের অভিযোগ একই। তাঁরা বলেন, দূরে বসে যতই ভাল লেখা যাক না কেন, কলকাতায় গিয়ে দলভারী এবং কিছু তদ্বির না করলে, লেখক হওয়া যায় না। তাঁদের এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে আগামীদিনের বাংলা সাহিত্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎটা কেমন হবে গ্রন্থদর্শীমশাই একটু চিন্তা করে দেখবেন কি? সবশেষে এই মূল্যবান আলোচনাটির জন্য গ্রন্থদর্শী ও সম্পাদক মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই। বারান্তরে মফঃস্বলের কবি সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের সমস্যা সম্পর্কে আরো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমার প্রিয় পত্রিকা 'অমৃতে'র পাতায় দেখার আশা রাখি।

মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সিউড়ী, বীরভূম।

আয়না প্রসঙ্গে

গত ৬ কার্তিক অমৃত সংখ্যায় রণজিৎ পালের 'আয়না' নামক গল্পটি পড়ে খুব ভাল লাগল। আধুনিক ধাঁচের গল্পের অনুকরণেই লেখা। লেখক এই গল্পটিতে বক্তা হিসাবে রেখেছেন গল্পের নায়ক তারাপদকে। নিজের প্রতিচ্ছবি আয়নায় দেখে নায়ক তারাপদ যে সব উক্তি নিজের মন থেকে ছুঁড়ে দিলেন, লেখকের এই টেকনিক প্রশংসার দাবী রাখে। নায়িকা রঞ্জনার মাধ্যমে সাধারণ মেয়েদের এক ছবি এই গল্পটির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অন্য দু-একটা চরিত্রও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে অঙ্কিত হয়েছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

আকবর কবীর
মুর্শিদাবাদ।

শাদা চোখে

ক্ষমতা অতি বিষম বস্তু। একবার আস্বাদ পেলে ত্যাগ করার কথা ভাবাও কণ্টকর। ক্ষমতা করায়ত্ত করবার জন্য কিম্বা আয়ত্তে রাখবার জন্য ক্ষমতাভোগী যে কোন উপায় অবলম্বনে দ্বিধাবোধ করেন না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এ বক্তব্য যেমন প্রযোজ্য, দলগত প্রশ্নেও আজকাল এ কথা ঘটছে। আবার দলের মধ্যেও ব্যক্তিবিশেষ দলের নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে ক্ষমতা আস্বাদনের জন্য পাগল হয়ে উঠেন। এবং এত নগ্নভাবে এই প্রচেষ্টা চালানো হয় যে, আদর্শের ক্লোক থাকা সত্ত্বেও নগ্নতা ধরা পড়ে। এই মন্তব্যকে জোরদার করার জন্য নিশ্চয়ই নজীর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা এর উদাহরণ অধুনা এত বেশী হয়েছে যে, শত চেষ্টা করলেও নজর এড়ানো যায় না।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতা দখল করে স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাকে রূপায়ণ করা। কিন্তু ক্ষমতা দখলের প্রশ্নেও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কৌশলকে কেন্দ্র করেই এই মৌল প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। অনেকগুলি দল আছে যাঁরা মনে করেন যে-কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করাই উচিত। কারণ, তাঁদের মতে গণমঙ্গলের কর্মসূচী রূপায়ণ করাটাই বড় কথা। এবং সেখানে সাফল্য লাভ করলে কি উপায়ে ক্ষমতা দখল করা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা বা তত্ত্বগত দিক নিয়ে তখন আর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অনেক দল আছে যাঁরা কোন হিংসাশ্রয়ী পন্থায় ক্ষমতা দখল করার কথা চিন্তাই করেন না। তাই আদর্শগত বিচ্যুতির ভয়ে তাঁরা শুধু পারিষদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী। এই দুই ভিন্ন কৌশলে বিশ্বাসী দলগুলির মধ্যে স্বভাবতঃই আদর্শগত পার্থক্য দুস্তর। এতদ্‌সত্ত্বেও, একমাত্র নকশালবাদী ছাড়া, অপর সকল দলই বর্তমানে প্রায় একাকার হয়ে গেছে। গান্ধীবাদী বলুন আর মার্কসবাদী বা লেনিনবাদীই বলুন না কেন কৌশল ও আচার-ব্যবহারে এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রকারভেদ করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা তাত্ত্বিক ছাড়া বর্তমানে অন্য কাহারও পক্ষে দলগুলির মধ্যে একটি বাস্তব সীমারেখা টানা খুবই কঠিন। ফলে, বিভ্রান্তি এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে যে, ভয় হয় গণতান্ত্রিক পন্থা শেষ পর্যন্ত না ফ্যাসিবাদের সড়ক হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষমতা আস্বাদনের রাজনীতি সুরু হওয়ার পর থেকেই এই অশুভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আদর্শের খোলস অনেক দলের ও নেতার খুলে পড়েছে এবং তাঁদের স্বাভাবিক চেহারাটা প্রকাশ হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

এই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি দল যে সুবিধাবাদী নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন তা আজ কারও অজানা নয়। যেন-তেন-প্রকারেণ প্রায় প্রত্যেক দলই লালদীঘির দপ্তর আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করেছেন। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। ঐ ক্ষমতা আস্বাদনের পর থেকে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলে যে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে এবং দলীয় নিয়ম নীতির ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিবিশেষ যে ব্যবহার করতে সুরু করেছেন তা জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্য এই ক্ষুদ্র ভূমিকা ও প্রয়াস। কারণ, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সমাজে ঘটে থাকে। আজকের অব্যবস্থা, অস্থিরচিত্ততা এবং বিশৃঙ্খলা পশ্চিমবাংলার বিভ্রান্তিকর রাজনীতিরই প্রত্যক্ষ ফল। অন্য কিছু নয়।

এই ক্ষমতা দখলের রাজনীতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কংগ্রেস দলের কথা টেনে আনতে চাই না। বক্তব্য শুধু বামপন্থী আদর্শবাদী দলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। যতদিন পর্যন্ত এঁরা ক্ষমতায় আসতে পারেন নি ততদিন এঁদের ভূমিকা খুবই সুস্পষ্ট ছিল, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। কমবেশী প্রত্যেক দলেই ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়েছে। এমন কি দলছুট ব্যক্তিদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্ষমতায় আসার পর যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বামপন্থী দলগুলির অনেকেই তা পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারেন নি। সোজা কথায় বললে এই দাঁড়ায় যে, নির্বাচনের মাধ্যমে এত সস্তায় যে কিস্তিমাৎ হবে, অনেক দলের পক্ষে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ফলে মানসিক প্রস্তুতি না থাকায় হঠাৎ ঝড়ের মুখে নৌকা পড়লে যে দশা হয়—পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী দলগুলির সেই হাল হয়েছিল। স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি এমন অনেক ব্যক্তিই রাতারাতি মন্ত্রী হয়ে গেছেন। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে তাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। তারপর গদী হারিয়েছেন—আবার পেয়েছেন—আবার হারিয়েছেন। এই খেলায় যে লোভের জন্ম তা এখন অনেকের মনকেই জাঁকিয়ে বসেছে। গদীর কাছে আদর্শ সেকেন্ডারী হয়ে গেছে। ফলে, দলের মধ্যে টানাপোড়েন সুরু হয়েছে, এবং সেজন্যই পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের তারিখ ঠিক হবার পূর্বে জোটবন্দীর চেষ্টা চলছে অবিরাম। এই জোটবন্দীর প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে লুকোচুরি খেলা চলছে তার কারণ হচ্ছে আসনসংখ্যা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া। আবার দলীয় নেতাদের আসনগুলো পাকাপোক্ত করা। সেই কাজগুলো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেই জোটবাঁধার নীতিও অবিলম্বে স্থির হয়ে যাবে। এতে আদর্শগত বক্তব্যের ধূম্রজাল সৃষ্টি হবে না।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে মনোলিথিক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বুঝি কোন আন্তর্দলীয় কোন্দল নেই বা মন্ত্রিত্বের গদীর জন্যও কর্মীদের মোহ নেই! কিন্তু আদপে তা ঠিক নয়। ঐ সমস্ত দলের মধ্যে যাঁরা সর্বক্ষণের কর্মী তাঁরাই সাধারণতঃ মন্ত্রিত্বের গদি পান। যদি না পান তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করতে সাহসী হন না। কেননা Party-wage হারাবার প্রচণ্ড ভয় থাকে। কাজেই অন্তরে দাবদাহের সৃষ্টি হলেও প্রকাশ্যে তা কেউ মুখ ফুটে বলতে পারেন না। দলের সমর্থকগণ দলীয় নিয়মশৃঙ্খলার বাহবা দিয়ে বলেন আমাদের দলের মধ্যে এসব জিনিষ ঘটে না। কারণ সকলেই আদর্শে বিশ্বাসী ও দলের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। কথাগুলি শুনলে এমন মনে হবে যে, ঐ দলের সদস্য হলে তাঁর মানবীয় বৃত্তিগুলি অকেজো হয়ে যায়। তিনি একটি দলীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে পড়েন। যতই ঢাকঢোল পিটিয়ে এসব কথা প্রচার করা হোক না কেন, আদপে যে তা সত্য নয় একটু খুঁটিয়ে দেখলে তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও এই মনোলিথিক দলগুলি থেকে পদত্যাগ ঘটেছে এবং ঘটবেও।

কৌশলের নাম করে যতই ডান-বাম করা হোক না কেন গদীর প্রতি মোহের ভাবটা প্রকাশ হয়ে পড়েই।

পশ্চিম বাংলায় সি পি এম অদ্যাবধি বৃহত্তম দল। সংগঠন মনোলিথিকও বটে। কিন্তু 'কি উপায়ে' নির্বাচনের মাধ্যমে গদী দখল করা যায় এই চিন্তা থেকে একটুও বিচ্যুতি ঘটেনি যদিও বা 'যে কোন উপায়ের' উপর জোর দিয়ে বিপ্লবী চরিত্রটা বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই 'কি উপায়' প্রশ্নটাই এখন দলের কাছে মারাত্মক হয়ে উঠছে। প্রথমে ধারণা ছিল দল ও তার সহযোগীরা মিলে ক্ষমতা দখল করতে পারবে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে বাস্তবের কঠোর আঘাতে সেই ধারণা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। দলের রাজ্য শাখার সম্পাদক এই বাস্তব অবস্থাকে নাকি মোটেই স্বীকৃতি দিতে রাজী নন। লড়কে লেঙ্গে ভাব নিয়ে নাকি তিনি এখনও অটল, অচল। কিন্তু তাঁর এই জঙ্গী মনোভাবকে অন্যরা অর্থাৎ যাঁরা গদীয়ান হয়েছিলেন তাঁরা মোটেই বরদাস্ত করতে রাজী নন। বার বার দলের মধ্যে প্রশ্ন তুলছেন তাত্ত্বিক যুক্তির ভিত্তিতে। তাঁরা বলছেন দল ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করতে চান তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন একথা ভাবলে চলবে কেন? তাঁদের এককভাবেই ত লড়াই করতে হবে। কিন্তু আসলে তা নয়। বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন তোলার অর্থ হচ্ছে জোটকে বড় করে যেন-তেন-প্রকারেণ পুনরায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা। আখেরে যা ঘটুক না কেন। তাই প্রকাশ্যে না হলেও অভ্যন্তরে যে ভীষণ টানা পোড়েন চলছে তা নেতৃবর্গের উক্তিগুলি থেকে বুঝা যায়। তাই না শ্রীসুন্দরায়া এস এস পি নেতা শ্রীমধু লিমায়ের নিকট চিঠি লেখেন।

যতই তাত্ত্বিক বক্তব্য রাখা হোক না কেন সি পি আই-এরও অবস্থাটা প্রায় সেইরকম। পশ্চিমবাংলায় শাসক কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধলে মন্ত্রিত্বটা নাও পাওয়া যেতে পারে। রাজ্যের জাগ্রত জনমত সহ্য করবে না—এ ধরণের মিতালি—বা পার্টির ভরাডুবি হতে পারে—এই দুই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে রাজ্য নেতৃত্ব একটি নয়া ফরমূলার উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। কারণ, আট পার্টির জোটে থাকলে নির্বাচনের পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়েও কেরালার মত অন্ততঃ একটি সরকার গঠনের সম্ভাবনা যে প্রবল হয়ে উঠবে তা অনেকেই আন্দাজ করছেন। অতএব, আগে ভাগে মুখ পুড়িয়ে লাভ কি? যদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই ঠিক হয় তবে রাজ্য নেতৃত্ব তার ফাঁক খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে কেন?

তারপর ধরা যাক্ ফরওয়ার্ড ব্লকের কথা। প্রস্তাবে শাসক কংগ্রেস ও সি পি এম-এর বিরোধীতা করলেও দলের মধ্যে এখনও অনেক নেতা কোন দিকে গেলে মন্ত্রীত্বটা পুনরায় হস্তগত করতে পারবেন তা নিয়ে শুধু গবেষণা চালাচ্ছেন এমন নয়, পরন্তু খানিকটা মনস্থির করে নিয়েছেন। তাই দলের অভ্যন্তরে লড়াইও নাকি সুরু হয়ে গেছে। হাওড়ায় এই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একদফা লড়াই হয়ে গেছে। তবে এই যুদ্ধ সি পি আইকে নিয়ে আট জোটে থাকা—না সি পি এম-এর সঙ্গে যাওয়া—এই প্রশ্ন নিয়ে। শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে যদি বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমেও সমঝোতার প্রশ্ন আসে তবে দলের গোটা উত্তরবঙ্গ শাখা বিদ্রোহ করবে। কারণ সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের কয়েকজন নেতার আসন হারাবার ভয় সর্বাধিক। এই অবস্থায় হাওড়া, হুগলী ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে বুঝাপড়ার ভাবটা খানিক বেশী হতে বাধ্য। তবে সি পি এম-এর আঁতাতের প্রশ্ন উঠলে উত্তরবঙ্গ নেতাদের পরিত্যাগ করে কর্মীরা অন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। কেননা লড়াইটা তাঁদেরই বেশী লড়তে হয়েছে। কর্মীদের চাপে সি পি এম বা কংগ্রেসের সঙ্গে যাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু নেতারা পড়েছেন বিপাকে। মুখে এই নীতির সমর্থক হলেও লালদীঘির কথাটা চিন্তা করে দলের অভ্যন্তরে এখনও কৌশলের নাট্ বল্টু এঁটে যাচ্ছেন।

তারপরে আর এস পির কথায় আসা যাক। কেরলে দলের রাজ্য শাখাকেই গদীর মোহ পেয়ে বসেছিল। তাই আর এস পি আজ কেবল বাংলা দেশেই সীমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে এখানেও সে টানাপোড়েন সুরু হয়েছে। বিশেষ করে সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবের বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথাটা পাকা হলেই মুর্শিদাবাদে আর এস পি দলের অভ্যন্তরে আত্মঘাতি প্রচেষ্টা নাকি সুরু হবার আশংকা রয়েছে। এই ন্যাক্কারজনক অবস্থা থেকে মুক্ত থাকবার জন্যে আগেভাগেই দলের কিছু কর্মী তাঁদের একজন সর্বভারতীয় নেতা রাষ্ট্রদূত হবার চেষ্টা করছেন বলে প্রচার চালাচ্ছেন। অন্যদিকে নয়া অবস্থায় মূল্যায়ন করে নূতনভাবে পার্টি থিসিস লেখা হচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। উদ্দেশ্য : দলের অভ্যন্তরে গদীলোভী সদস্যদের শৃংখলার নিগড়ে আবদ্ধ রাখা ও দলের অবলুপ্তি বন্ধ করা। দেখা যাক, কি পরিণতি ঘটে!

তারপর ধরুন এস এস পির অবস্থা। এই রাজ্যে বর্তমানে সোজাসুজি দুই মত চলছে। একদল বলছেন কংগ্রেস ও বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোন সমঝোতা নয়। একথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছেন শাসক কংগ্রেসের দিকে যদি পাল্লা ভারী হয়ে ক্ষমতায় আসার কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে দরকার হলে বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বুঝাপড়া হবে না এমন কথা বলতে পারা যায় না। অন্য দল বলছেন, না—বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোন মতেই নয়। বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গেই বুঝাপড়া করতে হবে। অর্থাৎ পরোক্ষে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলতে চান। এই দল মনে করেন সি পি আই তার সর্বভারতীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। অতএব বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করবে। ফরওয়ার্ড ব্লকও আখেরে আসতে বাধ্য হবে। অতএব, বাকী মাৎ, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঠেকায় কে? তখন মন্ত্রিত্বও রুখতে পারবে না কেউ। এক অংশ ইতিমধ্যে আবার সোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম দিয়ে বসেছেন। উদ্দেশ্য : দল হিসাবে এক। মন্ত্রিত্বের প্রশ্ন আসলে শেয়ার মিলবেই। ফলে, অনেকদিনের আশা পূরণের ক্ষীণ আলোও দেখা দিয়েছে।

এমনিভাবে, যদি নির্বাচন হয়, কিভাবে গদীতে যাওয়া যাবে তাই নিয়ে বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আন্তর্দলীয় কোন্দল সুরু হয়েছে। তাই বার বার আন্দোলন করার হুমকী দিয়েও কেউ জনতার দুঃখদুর্দশার দিকে দৃকপাত করার সময় পাচ্ছেন না। শুধু বিবৃতি দিয়ে দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করছেন মাত্র। আগে গদী পাবার পর লড়াই হয়েছে। এখন গদীতে কিভাবে যাওয়া যাবে তার জন্য লড়াই লেগেছে। আদর্শ, নীতি, কৌশল ইত্যাদি বলে যে চোখা চোখা বাণী দেওয়া হয় তা শুধু আভ্যন্তরীণ কুৎসিত রাজনৈতিক চেহারা ঢাকবার চেষ্টা মাত্র। আর এই ভণ্ডকতার জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দশা।

—[illegible]

দেশে বিদেশে

দলের মধ্যে বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে বিরোধী কংগ্রেস নেতারা আর একবার জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে একটা ব্যাপক বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে বিরোধী কংগ্রেস-জনসংঘ-স্বতন্ত্র আঁতাত গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। এর আগে এই 'মহাজোট' গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন বিরোধী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রী এস কে পাতিল, শ্রী অশোক মেহতা। সেবারও দলের ভিতর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তারপর বিরোধী কংগ্রেস নেতারা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন।

এবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালেই আবার নূতন করে এই জোট গড়ার কথা উঠতে থাকে। 'মহাজোট' বা 'গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স' কথাটি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে এবার বলা হতে থাকে যে, উত্তর প্রদেশের ধরনের একটা 'সংযুক্ত বিধায়ক দল' অথবা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গঠন করা হবে। প্রথম ধাপে পার্লামেন্টে একজন নেতার অধীনে তিন দলের জোট তৈরী করার কথা হয়। প্রস্তাবিত জোটের অন্য দুই শরিক, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টি, এই বিষয়ে খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, এই প্রস্তাব এবারও বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ সমর্থন পাবে না। এই প্রস্তাব যাঁরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ রামসুভগ সিং। তিনি চান যে, পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলির বিশেষ করে অকম্যুনিস্ট দলগুলির, কার্যকলাপের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা হোক। বিরোধী কংগ্রেস যদি শুধু দুটি বিরোধী দলের সঙ্গে আঁতাত করে তাহলে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে এই ধরনের সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হবে না। তার উপর আর একটি বিভ্রাট ঘটে গেল। স্বতন্ত্র পার্টির নেতা শ্রীমিনু মাসানি অভিযোগ করলেন যে, গুজরাটে স্বতন্ত্র পার্টি থেকে বহিষ্কৃত সদস্যদের দলে নিয়ে বিরোধী কংগ্রেস স্বতন্ত্র পার্টিকে বেকায়দায় ফেলেছে। কড়া জবাব দিয়ে ডাঃ রামসুভগ সিং বললেন, মাসানি তাঁর ভুল নীতির দ্বারা স্বতন্ত্র পার্টিকে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছেন; তাঁর কথা শুনে চলার কোন দরকার নেই।

এরপর যখন বিরোধী কংগ্রেস দলের পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় এই জোট গড়ার প্রস্তাব এল তখন কয়েকজন সদস্য প্রচন্ড বাধা দিলেন। যাঁরা বাধা দিলেন তাঁদের মধ্যে দলের চীফ হুইপও ছিলেন। একজন সদস্য প্রশ্ন করলেন, বিরোধী কংগ্রেস কি অন্য দুটি দলের সঙ্গে মিশে যাবে এবং একটা অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে নামবে? আর একজন বললেন যে, কেবল দুটি দলের সঙ্গে ফ্রন্ট গঠন করে বিরোধী কংগ্রেসের কোন সুবিধা হবে না।

পার্লামেন্টারি পার্টির এই সভাতেই বিরোধী কংগ্রেস-জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র জোটের উদ্যোক্তাদের প্রথম পরাজয় ঘটল। পার্টি এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না করে ওয়ার্কিং কমিটির উপর ছেড়ে দিল।

ওয়ার্কিং কমিটিতে গিয়েও কিন্তু মতানৈক্যের অবসান হল না। উপরন্তু ইতমধ্যে কয়েকজন সদস্য প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করা হোক। পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন এড়াবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি পার্লামেন্টে সংযুক্ত বিধায়ক দল গড়ার ও শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রাজ্য স্তরে বিভিন্ন দলের সঙ্গে সমঝোতা করার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। শুধু 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর উদ্যোক্তাদের মুখ রক্ষা করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে এইটুকু বলা হল যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'সঙ্ঘবদ্ধ চ্যালেঞ্জ'-এর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দল যাতে একত্র হয়ে কাজ করতে পারে সেজন্য শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ঐসব দলের সঙ্গে 'যতদূর সম্ভব বোঝাপড়া' করতে উদ্যোগী হবেন।

দলের পার্লামেণ্টারি পার্টি ও ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি সেই প্রশ্নটি শুধু সভাপতির দায়িত্বের উপর ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আসলে প্রশ্নটি আপাতত শিকায় তুলে রাখা, পর্যবেক্ষকরা এরকমই মনে করছেন।

বিরোধী কংগ্রেস দলের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোট নেওয়ার সময়। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাব যখন ভোটে দেওয়া হল তখন দেখা গেল, বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতাদের অনেকে লোকসভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন আর যাঁরা রইলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন, অন্যরা কোনদিকেই ভোট দেন নি।

অনাস্থা প্রস্তাবটি ৩৯-১৯১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এবারকার অধিবেশনে এই প্রথম শক্তি পরীক্ষায় সরকার পক্ষের বিপুল সাফল্য শাসক কংগ্রেস দলকে উৎসাহিত করেছে।

●

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কি উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্থানকে সামরিক সম্ভার বিক্রী করছেন? এবং এই সময়ে এই সিদ্ধান্ত করার বিশেষ তাৎপর্য কি?

পাকিস্থানকে আমেরিকান অস্ত্রসম্ভার বিক্রীর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেটা লক্ষ্য করে মার্কিণ সরকারের মুখপাত্ররা একথা বোঝাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে, আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের ফল যাই হোক না কেন, ওয়াশিংটন কোনরকম দুষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই সিদ্ধান্ত করে নি; ভারতবর্ষস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কীটিং নিজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সফর করে বিশেষভাবে এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকা কি ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পাকিস্থানকে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে?

রাজ্যসভায় এই প্রশ্ন উঠেছিল। জনসংঘের শ্রীকানোয়ারলাল গুপ্ত প্রশ্ন করেছিলেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া, এই দুই বৃহৎ শক্তিই কাশ্মীর ও পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধের ব্যাপারে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাকিস্থানকে সমরসম্ভার সরবরাহ করছে কিনা?

উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হোক অথবা সোভিয়েট রাশিয়াই হোক, কেউই এমন ইঙ্গিত দেয় নি যে, তারা যে সমরসম্ভার সরবরাহ করছে তার সঙ্গে এসব প্রশ্নের কোন সম্পর্ক আছে।'

আমেরিকার উদ্দেশ্য কি হতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা করেছেন নয়াদিল্লীর 'বিশ্ব রাজনীতি পরিষদে'র সঙ্গে যুক্ত পাকিস্থান সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ডাঃ মহম্মদ আয়ুব। তিনি সম্ভাব্য যেসব উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হচ্ছে: (১) আরব জগতে জর্ডান ও সৌদি আরবের মত পশ্চিম-ঘেঁষা রাষ্ট্রগুলির মনোবল বৃদ্ধি করা। (২) ইয়াহিয়া খাঁর হাত শক্ত করা। নির্বাচনের পর সামরিক শাসনের অবসান ঘটলেও তুরস্কের মতো পাকিস্থানেও সামরিক বাহিনী একটি বড় শক্তি হিসাবে থেকে যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা সিদ্ধান্তে এসে থাকতে পারে। (৩) পাকিস্থানের নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করা। ডাঃ মহম্মদ আয়ুব দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৪

সালে যখন আমেরিকার আর একটি সাধারণ-তন্ত্রী সরকার পাকিস্থানকে অস্ত্র যোগাবার প্রথম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন তখনও পূর্ব পাকিস্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তিনি আরও খবর দেন যে, ১৯৬৫ সাল থেকে যে নিষেধ বলবৎ আছে সেটা তুলে নিয়ে পাকিস্থানকে সমরসম্ভার যোগাবার সিদ্ধান্ত আমেরিকা গত মে মাসেই করেছিল। তখন কথা ছিল পাকিস্থানে নির্বাচন হবে অক্টোবর মাসে। পরে নির্বাচন ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই কারণেই আমেরিকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেও কিছুটা সময় নেওয়া হয়।

ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমাহিদা ইতিমধ্যে এই বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, পাকিস্থান আমেরিকা থেকে যেসব সমরসম্ভার পেয়েছে (৬টি এফ-১০৪ স্টার ফাইটার বিমান, ৭টি বি-৫৭ বোমারু বিমান, ৪টি সামুদ্রিক টহলদার বিমান ও ৩০০ সাঁজোয়া গাড়ী) সে-গুলির সাহায্যে সে ইজরায়েলের মতো চকিত আক্রমণ চালাতে পারে। শ্রীমাহিদা শুধু এই আশংকা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি এই ধরনের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অসামরিক প্রতি-রক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপদেশ দিয়েছেন।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধি-নায়ক অর্জুন সিং অবশ্য বলেছেন যে, এই ধরনের চকিত আক্রমণে পাকিস্থান ভারতের বিশেষ ক্ষতি করতে পারবে না।

●

ফরাসী জাতির পরিত্রাতা ও বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম মুখ্য নায়ক জেনারেল চার্লস আন্দ্রে জোসেফ মারি দ্য গল তাঁর নিভৃত পল্লীভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ৮০ বছর বয়সের দ্বারপ্রান্তে এসে একটি বর্ণাঢ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটল।

এই মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জেস পম্পিদু বলেছেন, "জেনারেল দ্য গল মারা গেছেন। ফ্রান্স বিধবা হল।"

ফ্রান্স ও জেনারেল দ্য গলের নাম দীর্ঘকাল ধরে একটা আর একটার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, ফ্রান্সের বিপুল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং যুদ্ধোত্তরকালে ফ্রান্সের অর্থ-নৈতিক পুনরভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই মানুষটির একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল : ফ্রান্স।

১২ বছর আগে ১৯৫৮ সালে এই মানুষ যখন ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন তখন সেদেশের অত্যন্ত দুর্দিন। তার পূর্ব-গৌরব অন্তর্হিত। উপনিবেশের সমস্যার ভারে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়ছে এবং সারা দেশ একটা গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে ইতিহাস-পুরুষ জেনারেল দাগল ফ্রান্সকে সেই প্রায় অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের কিনারা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। আলজেরিয়ায় নিজের উপনিবেশে যে জালে ফ্রান্স জড়িয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে তিনি তাকে উদ্ধার করে আনলেন, তাকে একটি পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত করলেন এবং ইউরোপের বারোয়ারী বাজারে ফ্রান্সকে মুখ্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই প্রথমবার নয়, ফ্রান্সের ইতিহাসে এর আগেও আর একবার সে দেশের পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন জেনারেল চার্লস দাগল। ফ্রান্স তখন হিটলারের বিজয়ী বাহিনীর পদানত, পরাজয়ের গ্লানিতে কলঙ্কিত। সেই অন্ধকার দুর্যোগের দিনে আশার বাণী, জয়ের আহ্বান নিয়ে ফরাসী জাতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জেনারেল চার্লস দাগল—সেই দাগল যিনি মিলিটারি আকাডেমি থেকে পাশ করে বেরিয়ে এসে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং ৪৯ বছর বয়সে হয়েছিলেন ফ্রান্সের বয়ঃকনিষ্ঠ জেনারেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পতন হওয়ায় ১৯৪০ সালের ১৭ জুন তারিখে জেনারেল দাগল বিমানে লন্ডনে যান। পরের দিনই তিনি আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার আহ্বান জানালেন এবং 'স্বাধীন ফ্রান্স' আন্দোলন শুরু করলেন। ফ্রান্স পুনরুদ্ধার করায় তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া এই তিন মিত্রশক্তির সাহায্য গ্রহণ করেছেন; কিন্তু এইসব মিত্রশক্তির নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় সর্বদাই ফ্রান্সের স্বার্থ বড় করে তুলে ধরেছেন এবং সেই স্বার্থের সঙ্গে কখনই আপোষ করেন নি। সেজন্য তাঁকে এই নেতাদের কারও কারও অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছে। উইনস্টন চার্চিল জেনারেল দাগল সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার যতগুলি ক্রস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বহ হচ্ছে 'লোরেনের ক্রস'। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে মিত্রশক্তি বাহিনী ফ্রান্সের নর্মান্ডি উপকূলে অবতরণ করার এক সপ্তাহ পরে জেনারেল দা গল ফ্রান্সের মাটিতে পা দেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুক্তিদাতা হিসাবে ফরাসী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেন। প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি ফরাসী রিপাব্লিকের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি জনসমর্থন হারাচ্ছেন, একথা উপলব্ধি করে ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারী তিনি পদত্যাগ করে তাঁর পল্লীভবনে অবসর যাপন করতে চলে যান।

১২ বছর তিনি অবসরেই কাটিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে যখন ফ্রান্স আলজেরিয়া ও ইন্দোচীনের উপনিবেশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন আবার তাঁর ডাক পড়েছিল।

১৯৬৮ সালে ফ্রান্স আর একবার সংকটের মুখে পড়ল। ছাত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ দেখা দিল। প্রেসিডেন্ট দা গল অনেক কষ্টে সেই আঘাত সামলাচ্ছেন। কিন্তু তিনি হয়ত বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর দিন ফুরিয়েছে। ১৯৬৯ সালে জেনারেল দা গল আর একবার গণভোট নিলেন; সেই গণভোটে ফরাসী জনগণ তাঁদের পরিত্রাতাকে প্রত্যাখ্যান করল। তখন থেকেই জেনারেল দাগল তাঁর নিভৃত ভবনে অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

আকস্মিক মৃত্যু এসে ভগ্নহৃদয় মানুষটিকে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

১০-১১-৭০ —পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

প্রতিবেশী, প্রতিদ্বন্দ্বী

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ কেনেথ বি কিটিং গত সপ্তাহে কলকাতা পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের বলেন যে, পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য দেওয়ায় ভারতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর দেশের সরকার সজাগ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে শুধু রাশিয়া ও চীনের প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য। রাষ্ট্রদূতের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না। আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো বিরোধ নেই। মার্কিন জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভারত ঈর্ষান্বিতও নয়। বহু বিষয়ে বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতাও বিদ্যমান। কিন্তু মার্কিন সামরিক নীতির সঙ্গে ভারত কোনোদিনই সায় দেয়নি। সম্ভবত মার্কিন সরকার কিছুতেই তা ভুলতে পারছেন না। পাকিস্তানকে নতুন করে অস্ত্র সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত সে কথাই আবার নতুন করে আমাদের মনে করিয়ে দিল।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে সেখানকার সরকার ভারতকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও বৈরী ভেবে আসছে। ভারতবিভাগ হবার পর পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে এটা ভারতের নেতারা মেনেই নিয়েছিলেন। পাকিস্তান তার ইচ্ছানুযায়ী পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ করবে, এ বিষয়েও ভারতের কিছু বলবার নেই। কিন্তু সে নীতির মূল কথা হয় যদি ভারত বিরোধিতা তাহলে ভারতকে সে সম্পর্কে সজাগ না হয়ে উপায় নেই। মার্কিন সরকার নিশ্চয়ই জানেন, ১৯৪৭ সালে ভারত-ভাগ হবার তিন মাসের মধ্যেই পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও রেগুলার সৈন্য পাঠিয়ে কাশ্মীরের ওপর আক্রমণ চালায়। ভারত একদিকে সেই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রসংঘের স্বারস্থ হয় সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য। রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকরা পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করলেও আজ পর্যন্ত পাকিস্তান কাশ্মীরের জবর-দখল-করা অংশ ছেড়ে দেয়নি। তখন থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি এবং এই কাজ পাকিস্তান সরকারের।

এর পরবর্তীকালে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারত জোটনিরপেক্ষ হবার পথ অবলম্বন করে। ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাতিতে জাতিতে সহাবস্থান ও কোনো সামরিক জোটে যোগ না দেবার নীতিকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে চলেন। সেই সময়ে কমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। সেই সুযোগে আমেরিকার তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস সামরিক জোট বাঁধার নীতি গ্রহণ করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ও চীনকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা। এই সর্বনাশা সামরিক জোট বাঁধার নীতি অনুযায়ী ইয়োরোপে গঠিত হয় উত্তর অতলান্তিক জোট বা 'নাটো', মধ্যপ্রাচ্যে গঠিত হয় 'সেন্টো' এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গঠিত হয় 'সিয়াটো'। অর্থাৎ লন্ডন থেকে শুরু করে, প্যারিস, বন, রোম, ইস্তাম্বুল, বাগদাদ, রাওয়ালপিন্ডি হয়ে সায়গন পর্যন্ত প্রসারিত এই লৌহদৃঢ় সামরিক বেষ্টনী পাতা হয় রাশিয়া ও চীনকে রুখবার জন্য। আমেরিকা ও তার মিত্ররা অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য ও অর্থ দিয়ে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম হল ভারত, যুগোশ্লাভিয়া, মিশর, সিংহল, বার্মা প্রভৃতি কটি দেশ। পাকিস্তান দেখল এই তার সুযোগ। সে আমেরিকার এই সামরিক জোটে যোগ দেয় প্রধানত ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি জোগাড় করার জন্য। যদিও ভারত কমিউনিস্ট দেশ নয় এবং মূলত কমিউনিস্ট দেশকে রুখবার জনাই এই চুক্তির সৃষ্টি।

পাকিস্তান এর একটি অস্ত্রও অন্য কাজে লাগায়নি। সে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে মৈত্রীভাব বজায় রেখে চলেছে। এবং তলে তলে বিশ্বাসঘাতকতা করে ১৯৬৫ সালে ভারত আক্রমণ করে বসে। বলা বাহুল্য ভারতের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে পাকিস্তান যে অস্ত্র, কামান, বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে তার সবগুলিই আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশ থেকে পাওয়া। সামরিক জোটে থাকার ফলে এই অস্ত্র আনতে তার এক পয়সাও খরচ হয়নি। প্রতিবাদ উঠলে বলা হল যে, পাকিস্তানকে আর অস্ত্র দেওয়া হবে না। কিন্তু পাঁচ বছর যেতে না যেতেই আমেরিকা আবার পাকিস্তানের অস্ত্রভাণ্ডার ভরে তুলছে। স্বভাবতই ভারত এই সংবাদে উদ্বিগ্ন। কারণ পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার অর্থ হচ্ছে এই উপমহাদেশে শান্তি বিঘ্নিত করা। পাকিস্তানে কোনো নির্বাচিত সরকার নেই। মিলিটারি শাসকরা এই অস্ত্রের জোরে নিজের দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে যেমন দাবিয়ে রাখছে তেমনি ভারতের বিরুদ্ধে রাখছে বন্দুক উঁচিয়ে। অথচ মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলছেন, চীন ও রাশিয়ার খপ্পরে যাতে না পড়ে সেজনাই পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে। এই ছেলেভুলানো যুক্তি কেউ বিশ্বাস করবে বলে কি মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনে করেন? পাকিস্তান অন্ধ ভারতবিদ্বেষে ক্রমাগত তার অস্ত্রের ভান্ডার বাড়িয়ে তুলছে। ভারতবর্ষ চায় এই দুই দেশ বন্ধুভাবে পরস্পরের সঙ্গে বাস করুক। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের পেছনে যদি তাঁদের মার্কিন বন্ধুরা এভাবে মদত দিয়ে চলেন তাহলে ভারতকে অবশ্যই তার আত্মরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল পথের কথা চিন্তা করতে হবে। শিশুর হাতে আগুন আর শয়তানের হাতে অস্ত্র দিয়ে কেই বা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে?

শ্মশানকিশোর॥ — গণেশ বসু

না-ঘুম রাতের দীর্ঘ জ্বালা নিয়ে প্রান্তরের শ্মশানকিশোর
স্মৃতির গভীরে বন্দী, ক্রুদ্ধ অভিমান বুকে দুরন্ত আবেগ
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নোনা স্বাদ চায়, ফায়ারিং স্কোয়াডের ঘোর
বিস্ফোরণ নিয়ে আসে, দুঃখ ঝরে, কেটে যায় পিছুটানমেঘ
ক্রেনের মাথায়, প্রান্তরের ঘুমে।

কোনখানে ছুটে যায় ছড়ানো ছিটনো হাড় মাড়িয়ে মাড়িয়ে
সব কিছু ঝেড়ে ঝুড়ে, সুবিধা ভোগের গ্লানি, লক্ষ অপরাধ
ছিঁড়ে ফেলে, ধ্বংসের গভীরে ধ্বংস। কোন দিকে এক-পা বাড়িয়ে
সমুদ্রের দাঁত ভাঙে, ঘূর্ণির উদ্ধত চোখে ক্লান্তি অবসাদ
সরে যায়, দীর্ঘতর রক্তের কুঙ্কুমে।

না-ঘুম রাতের দীর্ণ জ্বালা নিয়ে আন্দোলিত ক্রোধের গভীরে
বেঁচে আছি, স্বপ্ন গড়ি শব্দে ঘামে স্বরগ্রামে, প্রান্তর সীমায়,
শ্মশানকিশোর, দীর্ঘ আগুনের ছোরা খেলা, রুটি সেঁকি দামাল চিতায়!

ইদানীং রাতে॥ আরতি দাস

কয়েকটি সুন্দর; শোভন
সুচতুর মিথ্যেকথা শিয়রে সাজিয়ে
রোজ রাতে ঘুমে ডুবে যাই,
ভালবাসা, প্রীতি স্নেহ বন্ধুতার নামে,
ললিতমধুর কটি মিথ্যেকথা
লোভনীয় আখরে উজ্জ্বল।

মাঝ রাতে দাউ দাউ আগুন
ঘরময়, মশারির চালে
ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার প্রাণপণ সে মুহূর্তে
সব কটি মিথ্যেকথা,
বলার ভঙ্গীতে যার শোভনতা এবং চাতুরী
শিখা হয়ে জ্বলে,

সেই থেকে ভয়।

দারুণ সত্যের মত দাউ দাউ আগুনে
জীবন বিপন্ন বড়, একথা জেনেই
ইদানীং কোমল, লোভন
ললিতমধুর কটি মিথ্যেকথা শিয়রে সাজিয়ে
তেমন নিশ্চিন্তে আর ঘুমোতে পারি নে।

উল্টো খেয়ায় ফিরতে গেলে॥

শিশির ভট্টাচার্য

প্যাঁটরা খুলে
বেড়াই খুঁজে
জড়োকরা মুখোশ থেকে
উত্তরণে
অন্য কোন—

সময় খেয়াল
সবল দাঁড়ে
না জানিয়েই পৌঁছে দিল
গাঙের ওপার
কখন যেন—

হাতড়ে পকেট
মনে পড়ে
রঙমহলের ঠিক চাবিটা
ঘরের কোণে
পিঁজরাপোলে—

উল্টো খেয়ায়
ফিরতে গেলে
দপদপিয়ে বাতি নেভে
হঠাৎ বাজে
রেলের বাঁশী—

পরাজিত পরীক্ষা

শচীন্দ্রনাথ বসু

সেদিন সকাল থেকে দিল্লীতে লোকসভায় চাপা চাঞ্চল্যের ভাব। অধিবেশনের আগে সদস্যরা এদিকে ওদিকে জটলা করে উত্তেজিত আলোচনায় ব্যস্ত। সরকারের তরফ থেকে এক বড় খবর প্রকাশ করা হবে এ বিষয়ে সকলে একমত, কিন্তু খবরটি যে কি তা কেউ জানে না, শুধু এমন একটা ধারণা বাতাসে ভাসছে যে তা খুবই ভাল। ভারতের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে অতি আশ্চর্য ঘটনা, সুতরাং উত্তেজনার কারণ আছে বই কি।

অনুমান আর গুজবে সংসদের ঘর বারান্দা ছেয়ে গেছে। কেউ বলছে পাকিস্থান কাশ্মীর ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে, কারও আন্দাজ চীন ম্যাকম্যাহন লাইন মেনে নিয়েছে। ভারত মহাসাগরে আমাদের প্রথম আণবিক বোমা ফাটানো হয়েছে, রাজস্থানে মাটির নিচে বিশাল তেলের খনি আবিষ্কার হয়েছে, সরকার-পরিচালিত বিবিধ কারখানাগুলি গত বছর সব মিলিয়ে মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করেছে ইত্যাদি গুজবও শোনা গেল।

আসলে প্রকৃত খবরটি এ সব কিছুর চেয়ে বড়—এবং তা এল স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে। কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী মৃদুলা যোশী যখন লোকসভার কামরায় ঢুকলেন মোটা মোটা ফাইল হাতে নিয়ে তখন তাঁর চেহারা দেখে অনেকে অনুমান করলে ইনিই সে দিনের নায়িকা। শ্রীমতী যোশী কৃষ্ণাঙ্গী, মাথায় খাটো, বহরে কিছুটা বড়—অর্থাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল, যদিও সদস্যরা কেউ কেউ ঠাট্টা করে তাঁর নাম দিয়েছে পৃথুলা মৃদুলা। তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরেও তিনি বারে বারে ছোট্ট রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন, থেকে থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে কানে কানে কি বলছেন, ফিরে এসে নথিপত্র খুলে কি লিখছেন আবার। মন্ত্রীরাও সবাই হাজির, তাঁদের মুখে মৃদু মৃদু হাসি, পরম আত্মপ্রসাদের ভাব।

শ্রীমতী যোশীই প্রথম বক্তা। তিনি জানালেন দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি আশাতীতরূপে বশ মানানো সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৬ সালেই এর কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের তথ্য সংগ্রহ করে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভারতে জন্মহার ছিল হাজারে ৩৮, ভূতপূর্ব কংগ্রেসী সরকার তা কমিয়ে করতে চেয়েছিল ২৩, কিন্তু পঁচিশ বছরের চেষ্টায় এর কাছাকাছিও যেতে পারে নি। বর্তমান সরকার মাত্র পাঁচ বছরে এই লক্ষ্য অতিক্রম করে যে সংখ্যাটিতে পৌঁছেছে তা হল ১৮, এর থেকে মৃত্যুহার বাদ দিলে বৃদ্ধিহার দাঁড়াচ্ছে মাত্র পাঁচ—এতকাল তা ছিল পঁচিশের কাছাকাছি। এর তাৎপর্য এই যে দেশের লোক আরও ভাল খেতে পরতে পাবে, ফসল উৎপাদনে আর আমদানিতে ক্রমাগত বেশী অর্থ ব্যয় করে যেতে হবে না, এতকালের নিপীড়িত জনগণ মানুষের মত বাঁচবে...

ভাষণ শেষ করে শ্রীমতী যোশী নিজের আসনে বসে আবার রুমাল বার করলেন, কিন্তু ততক্ষণে তা একেবারেই অকেজো হয়ে গিয়েছে, অগত্যা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ও ঘাড় মুছলেন। পূর্ণ লোকসভা ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত, তার পর শুরু হল উত্তেজিত গুঞ্জন। সবারই প্রথম চিন্তা টলমলে কোয়ালিশন সরকার এইবার এক প্রবল অস্ত্র হাতে পেয়েছে, এদের সহজে সরানো যাবে না। সাংবাদিকরা ছুটল টেলিফোনের দিকে, দর্শকদের কলরব বন্ধ করতে দৌড়ে এল রক্ষী।

তার পর দেশে কয়েকদিন সবচেয়ে বড় আলোচ্য প্রসঙ্গ জনবৃদ্ধির দমন। ভারতের সত্যিই তা হলে সুদিন আসছে—এই আশা সবার মনে। যে লোক আছে তারা যে উধাও হয়ে যাচ্ছে না এই সত্যটি ভুলে গিয়ে অনেকে এমন কথাও ভাবলে যে আর রাস্তার লোক ঠেলাঠেলি করে চলতে হবে না, জিনিসের দাম কমবে, প্রত্যেকে নিজের নিজের জমি পাবে, ইত্যাদি। কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ বার হল, রেডিওর বক্তারা সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

মৃদুলা যোশী দেশময় সভায় সভায় আস্ফালন করে বললেন তাঁর দপ্তর জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিবিধ পদ্ধতির উপযুক্ত প্রচার করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য সরকারী নেতারাও নানা জায়গায় টহল দিয়ে একই সুর গাইলেন, জানালেন এতকাল দেশের লোক শুধু বড় বড় কথা শুনে এসেছে, এবার তারা দেখছে কাজ।

জনসাধারণও তাদের দাবি মেনে নিল। রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে এক শুধু গণসংঘের নেতা রামপ্রসাদ পানডে এক

সভায় বললেন, আমাদের শত্রু-দেশে লোক অবাধে বাড়ছে, ভারতের বৃদ্ধি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কমে গেলে শেষকালে আমরা যুদ্ধ করব কি দিয়ে! কিন্তু গণসংঘের প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় রয়েছে, সুতরাং বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়।

এই সময়ে দিল্লীর অনতিখ্যাত 'মিরার' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ ছাপা হল, হিমাচল প্রদেশ থেকে লিখেছেন অর্থনীতির তরুণ অধ্যাপক কোঠারি। স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সরকারী উদ্যোগের বিশদ আলোচনা করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বর্তমান সরকার এমন কি নতুন পন্থা গ্রহণ করেছেন যাতে জন্মহার এতখানি কমে গেল? লুপ, বড়ি, রবার দ্রব্য, অস্ত্রোপচারে বন্ধ্যাকরণ এই সবই আগে চলছিল, এখনও চলছে। গত কয়েক বছরে বড়ির অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এ দেশে তার প্রচার খুব বেড়েছে কি? এও সন্দেহজনক যে অন্যান্য কৌশলের ব্যবহার এতকাল পরে হঠাৎ এমন বেড়ে গেল যে বৃদ্ধিহার রাতারাতি এক-পঞ্চমাংশে নেমে এল। পরিশেষে অধ্যাপক কোঠারি ইঙ্গিত করলেন যে গদি রাখবার জন্য সরকার দেশের লোককে ভাঁওতা দিচ্ছে, আর তা যদি না হয় তবে পদ্ধতিগুলির প্রচার কি পরিমাণ বেড়েছে—বিশেষ করে গরীবদের মধ্যে—সে সম্বন্ধে সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করা হোক।

এই প্রশ্নগুলি স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর-ওয়ালা কর্মচারীদের মনে যে উঁকিঝুঁকি দেয় নি তা নয়, কিন্তু তাঁরা ভেবেছিলেন জল ঘুলিয়ে লাভ নেই। ফল দিয়ে হল কথা, সে সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ; ১৯৭৬ সালে জন্মহার দেশের সর্বত্র কমে নি, সেই কারণে তারা কিছু বলে নি—কিন্তু গত বছরের সংখ্যা প্রায় সর্বত্র হাজার প্রতি ১৬ ও ২০-র মধ্যে, সুতরাং এখন আর তাদের সন্দেহ নেই। কি উপায়ে হল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে, দেশের লোক বাহবা দিচ্ছে...

কিন্তু এক সেক্রেটারি রবিবারের অবসর মুহূর্তে কোঠারির প্রবন্ধটি পড়লেন, তখন থেকে তাঁর মনটা খচখচ করতে থাকল। পর দিন তিনি বাছা বাছা সহকর্মীদের এক গোপন বৈঠকে ডাকলেন, তাতে সমস্ত বিষয়টা বিশদভাবে আলোচনা হল, কিন্তু প্রশ্নের কোনও নির্ভরযোগ্য জবাব পাওয়া গেল না। অতঃপর নথিপত্র সংগ্রহ করে তিনি বাড়ি নিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার পর দিন কয়েক তা ঘেঁটে দেখা গেল পূর্ববর্তী তিন বছরে জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ সেই চিরাগত খাতেই চলেছে এবং একই বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। লুপ প্রয়োগের পর নজরে রাখা হয় নি বলে উপসর্গ দেখা দিয়েছে, স্বার্থান্বেষী লোক ফিশফিশ করে ভয় দেখিয়েছে ক্যানসার হবে অথবা অস্ত্রোপচারে যৌন প্রবৃত্তি কমে যাবে, গ্রামাঞ্চলে চাষী ও অন্যান্য পরিবারে এখনও পুত্র বৃদ্ধির প্রতি লোভ...

মৃদুলা দেবী তখন রাজধানীতে নেই, সফরে বেরিয়ে মাভৈঃ বাণী প্রচার করছেন। কানপুরে সর্বভারতীয় মহিলা সমিতির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিবিধ পদ্ধতির গুণের কথা বলে হাত ব্যাগ খুলে লুপ বার করলেন, তার পর তা শূন্যে তুলে বললেন এই সামান্য জিনিসটিই হয়তো আমাদের সর্বনাশের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে। তিনি দিল্লীতে ফিরলে সেক্রেটারি নাম্বিয়ার প্রথম সুযোগেই জানালেন নিজের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের কথা দেখালেন কোঠারির প্রবন্ধ। মৃদুলা ম . মৃদু হেসে বললেন, আমরা যে তথ্য প্রকাশ করেছি তাতে ভুল না থাকলে এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে, কিন্তু পরে সেক্রেটারির যুক্তি শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। নাম্বিয়ার বললেন, পত্রিকাটি অখ্যাত হলেও কেউ না কেউ তার প্রতি কোনও না কোনও বিরোধী দলীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই, সংসদের অধিবেশন আবার শুরু হলে তিনি নিশ্চয় কোঠারির সুর ধরে জানতে চাইবেন কেন জন্মহার এত কমল, সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশের দাবি জানাবেন—তখন সরকার কি বলবে? তা ছাড়া জন্মহার যদি দৈবক্রমে কমে থাকে তা হলে এই ধারা আবার দু দিনে বদলে যেতে পারে, তা হলে সরকার ভাঁওতার দায় কিছুতে এড়াতে পারবে না এবং দু দিনও টিঁকবে না।

মন্ত্রীমহোদয়া প্রধানমন্ত্রীকে সব কথা জানালেন, শুনে তিনি স্তম্ভিত। সরকারের কীর্তির কথা লোকসভায় প্রকাশ করতে তিনি যখন মৃদুলাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে
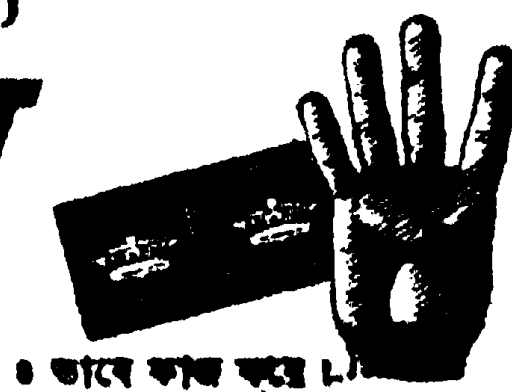
স্বাস্থ্য দপ্তর এর কোনও সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন প্রথম সুযোগেই মুদুলোর মন্ত্রিত্ব খতম করতে হবে। মুখে শুধু বললেন, সংসদ বসতে আরও তিন মাস দেরি আছে, এর মধ্যে একটা কিছু জবাব ভেবে রাখতে হবে। মুদুলো যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু না বলে, অন্যান্য মন্ত্রীদেরও না, এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা পূর্বোক্ত বৈঠকে ছিল তাদেরও মুখ বন্ধ করে দেয়।

সমস্যাটা এমন কিছু নয়, নথিপত্রে জায়গায় জায়গায় সংখ্যা কিছু বাড়িয়ে এবং বদলে দিলেই হয় এমন কথা কারও কারও মনে জেগে থাকতে পারে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মনে তখন ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন—বর্তমান বছরে জন্মহার কি হবে...এবং তার পরের বছর? জন্মনিরোধের কারণটা না বার করে উপায় নেই...দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলেন সংসদ না থাকলে দেশ শাসন কত সহজ হত! অনেক চিন্তার পর তিনি শ্রীমতী যোশীকে নির্দেশ দিলেন দেশের যেখানে যেখানে সরকারের উপদেষ্টা দপ্তর আছে সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে তাদের এলাকায় কত নরনারী বিবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, কত লোক করে নি, এবং এই দুই দলের কত কত সন্তান হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি মন্ত্রীদের জানালেন তাঁরা যেন জন্মনিয়ন্ত্রণের দাবি সম্বন্ধে আপাতত বেশী কথা না বলে।

খবরগুলি যখন নানা জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে পৌঁছাতে আরম্ভ করল তখন তিনি গভীর মনোযোগে তা পরীক্ষা করলেন এবং দুটো জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হলেন। প্রথমত, গত বছরের আগের বছর শুধু কোনও কোনও অঞ্চলে জন্ম হঠাৎ কমে গিয়েছে, এবং অন্যান্য এলাকায় আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় নি। দ্বিতীয়ত, যারা জন্মনিরোধ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে আর যারা করে নি গত বছর তাদের মধ্যে জন্মহার সমানভাবে কমেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে।

এই কারণের আভাস পাওয়া গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সরকার এ বিষয়ে গোপনে তদন্ত করছেন জেনে পাঞ্জাব সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগীয় এক উচ্চপদস্থ মহিলা কর্মচারী দিল্লীতে এসে শ্রীমতী যোশীর সঙ্গে দেখা করে জানালেন এক সংবাদ। জন্মনিরোধের আঞ্চলিক দপ্তরগুলিতে স্ত্রী কর্মীদের কাছে মেয়েরা মাঝে মাঝে অভিযোগ জানাচ্ছে যে তাদের স্বামীরা এখন দূরে দূরে থাকে, তাদের যৌন স্পৃহা অনেক কমে গিয়েছে। খবরটা প্রধানমন্ত্রীর কানে গেল, তিনি দেশের অন্যান্য স্থানে বিশ্বস্ত দূত পাঠালেন—অনেক জায়গা থেকে ঐ একই খবর পাওয়া গেল।

প্রধানমন্ত্রী গভীর চিন্তায় পড়লেন। একবার মনে হল নিজেরও যেন স্ত্রীর প্রতি... কিন্তু সন্দেহটা দ্রুত ঝেড়ে ফেললেন। এত বড় দেশকে চালাতে গেলে মানুষের আর অন্য কিছুর অবসর বা প্রবৃত্তি থাকে না। যাই হোক, ঘন অন্ধকারে একটুখানি আলোর রেখা দেখা গেল—কিন্তু তার পর? ভেবে চিন্তে তিনি বিশেষ কয়েকজন চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন গোপন বৈঠকে, তাঁরা সব শুনে একটা ছাড়া আর কোনও কারণ ভাবতে পারলেন না: দেশের ফসলে এমন কোনও বস্তু দেখা দিয়েছে যাতে পুরুষদের যৌন কামনা কমে যায়; নতুন জাতের গম, ধান ইত্যাদিতে খেত ভরে গিয়েছে, রকমারি সার ব্যবহার হচ্ছে, তারই পরিণতি বোধ হয় এটা। সব ফসলের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দরকার। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ, এবং সরকার যে বস্তুটি ব্যয় করতে পারে না তা হল সময়।

কিছুদিন পরে কাগজে ছোট্ট করে এক খবর বার হল। কলকাতার টালা ট্যাংকের কাছে একটি যুবক গ্রেপ্তার হয়েছে, রাত্রির অন্ধকারে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের অপরাধে। তার দুটি সঙ্গীকে ধরবার আগেই তারা পালিয়ে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে কয়েকদিন আর কোনও খবর প্রকাশ হল না। কিন্তু যুবকটির পকেটে একটি বিশেষ ধরনের ছোট্ট শিশি পাওয়া গেল যা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ব্যবহার হয়, তার মধ্যে হালকা বাদামি রঙের তরল পদার্থ। এই সব তথ্য যে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছাল, সেখানে সতর্ক প্রহরীর জিম্মায় বন্দীকে আনিয়ে রাজনীতিক অনুসন্ধান বিভাগ যে জেরা করলে, তাও সাধারণ লোকে জানল না।

কিন্তু অবিলম্বে সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল বম্বের কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে। বিবৃতি দিয়েছেন ডঃ বরুণ মিত্র, তিনি কাজ করেন পুনার এক গবেষণাগারে, কয়েক বছর আগে হরমোন সম্বন্ধে নতুন আবিষ্কারের জন্য সরকার তাঁকে ভাটনগর পুরস্কার দিয়েছে, বিজ্ঞান জগতে অনেকেই তাঁর নাম জানে। আমরা এই বিবৃতির সারাংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি।

"আমার মনে হয় দেশের লোককে কতগুলি গুরুতর কথা জানাবার সময় এসেছে। এই প্রয়োজন আরও বিশেষভাবে অনুভব করছি কারণ কলকাতায় অধীর মুখার্জীর গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাঁকে শত্রু-দেশের চর সন্দেহ করে নানারকম অত্যাচার করছে। এই সন্দেহ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইনি দেশের যা উপকার করেছেন তার জন্য বরং এঁকে এখুনি মুক্তি দিয়ে সম্মান জানানো উচিত। তা ছাড়া এঁর কার্যকলাপের জন্য দায়ী আমি।

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন মনে অনেক আশা নিয়ে আমরা ভেবেছিলাম এইবার আমাদের নানা সমস্যা নিরসনের প্রকৃত চেষ্টা হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা দারিদ্র্য, কিন্তু লোকসংখ্যা এত বাড়তে লাগল যে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হয়ে বরং অবনতি ঘটল। পরিবার ছোট রাখবার জন্য কর্তৃপক্ষ অনেক পরিকল্পনা করলেন, বড় বড় কথা বললেন, কিন্তু বছরের পর বছর বিশেষ কিছু ফল হল না। প্রথম দিকে কয়েক বছরের বহুমূল্য সময় নষ্ট হল মাসিক চক্র অনুসরণ পদ্ধতি প্রচলনের নিরর্থক চেষ্টায়।

চলতি বাস্তবিক উপায়গুলি গ্রহণ করতে করতে সমস্যা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এগুলিও আশানুরূপ সার্থক হল না। শিক্ষিত শহরবাসীরা সামাজিক কারণেই ছোট পরিবারের পক্ষপাতী হয়ে আসছিল, কিন্তু অগণিত অশিক্ষিত বা অপেক্ষাকৃত নির্বোধ জনতার কাছে জন্মনিরোধের আবেদন বা কলা-কৌশল ব্যাপকভাবে পৌঁছাল না। ফল হল এই যে এদের বংশ ক্রমশ তাদের স্থান দখল করতে থাকল যারা বিবেচনাশীল, যারা দেশের হিত বোঝে। এতে সাধারণ-ভাবে জাতীয় গুণ চলল অবনতির পথে। এদিকে সরকার মুখে পরিবার সংকোচনের কথা বললেও কাজের বেলায় অধিক সন্তানের জন্য আয়করের সুবিধা বজায় রাখল।

জাপানে এবং পশ্চিমের কোনও কোনও দেশে গর্ভ খালাস অনেকদিন ধরে সহজ করা হয়েছে, যদিও সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আমাদের মত জরুরী নয় তাদের। নিরুপায় হয়ে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত অনেক-খানি জল মিশিয়ে ঐ বিষয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করল সংসদে, কিন্তু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তা অগ্রাহ্য করলে—ভারতীয় নীতির পরিপন্থী বলে। এদিকে আমাদের জন্মহারের যে লক্ষ্য ধার্য হয়েছে, অনেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরেও তার কাছাকাছি আমরা যেতে পারি নি।

এই লক্ষ্যে পৌঁছালেও লোকসংখ্যা বাড়তে থাকবে, যেখানে আমাদের প্রয়োজন তা কমাতে না পারলেও অন্তত স্থির রাখা। তার জন্য দরকার প্রতি দম্পতির দুটির বেশী সন্তান নয়। সব লোকের সন্তান হয় না, কারও মৃত্যু হয় সন্তান জন্মের আগেই—এইসব কারণে দুইয়ের উপর সামান্য এক ভগ্নাংশ চাপানো যেতে পারে, তার বেশী নয়। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার করে না। আমেরিকার মত সমৃদ্ধিশালী দেশেও কোনও কোনও বিজ্ঞানী দশ বছর আগে বলেছেন জাতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত জন-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ রোধ।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমাদের নেতারা বিপদের গুরুত্ব যথার্থ উপলব্ধি করলেন না, অথবা করেও এই আশায় চোখ বুজে থাকলেন যে "ভারতীয় ঐতিহ্যের" হানি

না করেও, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত না দিয়েও কোনও প্রকারে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। যখন প্রলয় আসন্ন তখন তারা খড় কুটো দিয়ে বাঁধ বানাতে ব্যস্ত। এদিকে বিশ্বের চোখে ভারত হয়ে দাঁড়াল জনস্ফীতির আদর্শ উদাহরণ।

নিজের বাড়ির ঝি চাকরের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, বছর বছর তাদের সন্তান হয়, খেতে পরতে পায় না, অথচ সদ্‌বুদ্ধি দিতে গেলে ভান করে যে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই বিশাল জনতার ভার মুষ্টিমেয় বিবেচনাশীল লোকে আর কতদিন বইবে? মনে হল এ দেশের কি কোনও গতি নেই? ভেবে বুঝলাম সরকারী বা ব্যক্তিগত আবেদন নিবেদনে কোনও ফল হবে না, তার দিন চলে গিয়েছে, মানুষকে বাধ্য করতে হবে সন্তান উৎপাদন বন্ধ করতে। জন্ম দিতে ছাড়পত্র চাই (যেমন চাই রেডিও বা গাড়ি রাখতে), অন্যথায় কঠোর শাস্তি, এমন প্রস্তাব অনেকদিন হল পৃথিবীর অন্যত্র উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের সরকার বা জনমত তা গ্রহণ করবে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। মানুষের যৌন প্রবৃত্তি এত প্রবল যে তা কার্যকরী হবে কিনা তাও সন্দেহ।

ভেবে বুঝলাম যে করে হোক এই প্রবৃত্তির প্রশমন করতে হবে। তা করতে হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং অজান্তে, কারণ জেনেশুনে কম লোকেই এই ধরনের কাঁড় খাবে। সবচেয়ে সহজ হল পানীয় জলের সঙ্গে কোনও প্রকারে প্রতিষেধক ওষুধটি মিশিয়ে দেওয়া। বৃহৎ ক্ষেত্রে এর সার্থকতা প্রমাণ হলে তখন হয়তো দেশ বুঝবে এ ছাড়া গতি নেই। তারপর ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে মাত্রা ভেদে ওষুধটি ব্যবহার হবে।

কিন্তু এমন বস্তু আবিষ্কারের চেষ্টা হয় নি। সুতরাং আমিই উঠে পড়ে লাগলাম, দৈনিক কাজের শেষে নিয়মিত সন্ধ্যাবেলাটা এই নিয়ে গবেষণাগারে কাটাতাম। যৌন আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করে দেহে কতগুলি রসের ক্ষরণের উপর, চেষ্টা করলাম এমন বস্তু বানাতে যা পুরুষের ঐ হরমোন রসকে দমন করবে। নানা রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষা করলাম ইঁদুর ও খরগোশের উপর, প্রায় দু বছর পরে পেলাম এক বস্তু যা আশা জাগাল মনে: দেখি খাঁচার মধ্যে পুরুষ জন্তুগুলি সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, মাদিগুলি কাছে ঘেঁষলে তারা দূরে সরে যায়। একবার সেবনের পর এই প্রতিক্রিয়া বহুদিন থাকে।

এর পর পরীক্ষা হওয়া উচিত ছিল বানর নিয়ে, কিন্তু আবেগের বশে তা চালালাম নিজেরই উপর, তার পর কয়েকটি বিশ্বস্ত বন্ধুর উপর যারা আমার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী, যারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সব কিছু গোপন রাখতে। পরীক্ষার ফল হল আশার অতিরিক্ত ভাল। এর পরের ধাপে আমাদের দলের লোক কয়েকটি বাছা বাছা পাড়াগাঁয়ের পুকুরে মাত্রামাফিক ওষুধ ঢেলে দিয়ে এল রাত্রির অন্ধকারে। এক বছর অপেক্ষার পর দেখা গেল তার মধ্যে সন্তান হল অনেক কম, চার ভাগের এক ভাগও না। উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে আমরা দেশের বিভিন্ন অংশে বিশ্বস্ত কর্মীদল গড়ে তুললাম, তারা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে পানীয় জলাশয়ে ওষুধ মেশাল। এর ফল হল দেশব্যাপী, সরকারের নজরে পড়ল তা, তারা ভাবলে শেষ পর্যন্ত অভাবনীয় ঘটেছে তাদেরই চেষ্টায়। আসলে তা নয়, কৃতিত্ব আমার এবং আমার উৎসাহী সহকর্মীদের। কিন্তু এর জন্য আমরা কোনও পুরস্কার আশা করি না, আমরা শুধু চাই আমাদের আবিষ্কার প্রকাশ্যে গৃহীত হোক, দেশের এই সর্বগ্রাসী সমস্যার নিরসন হোক।"

ডঃ মিত্রর এই অত্যাশ্চর্য বিবৃতি অবশ্য অবিলম্বে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, শিক্ষিত লোকের মুখে এ ছাড়া কথা নেই, যদিও তাদের নানা মত। অনেকেই নিজের নিজের সাম্প্রতিক গার্হস্থ্য অভিজ্ঞতা স্মরণ করলে, স্ত্রীরা বুঝলে স্বামীদের অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ। কয়েকটি সভাসমিতি প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিল, যেমন গণসংঘ ও ধর্মীয় সংস্থা; এরা মনে করিয়ে দিল কয়েক বছর আগে ধর্মপিতা বাণী দিয়েছিলেন যে জীবনের ভোজে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না, যারা অনাগত তাদেরও স্বাগত জানাতে হবে।

কিন্তু আসল ঝড়টা উঠল লোকসভার বৈঠকে। রাশিয়া কোনও কালেই জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নয়, চীন মাঝে মাঝে একই সুর গায়, আবার কখনও অগণিত জনতার চাপে পড়ে উলটো সুর ধরে। ঠিক সেই সময়ে তার নীতি রাশিয়ার সঙ্গে মিলছে, সুতরাং সংসদের কম্যুনিস্ট সভ্যরা তীব্র প্রতিবাদ জানাল, শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে ভাই-ভাই হয়ে গেল এ বিষয়ে। সাধারণ মানুষের মত সদস্যরাও কেউ কেউ যৌনশক্তির আকস্মিক ভাঁটা লক্ষ্য করে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, যদিও তাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নি—এঁদের উষ্মা আসলে প্রকাশ পেল ব্যক্তিগত কারণে। এ ছাড়া দু একজন শাস্ত্র উল্লেখ করে বললেন, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এর সবগুলিরই যথার্থ স্থান আছে হিন্দুর জীবনে, কোনওটা বাদ দেওয়া চলে না, সুতরাং জন্মনিরোধের এই পন্থাও কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও প্রকাশ পেল যে এতে নারীরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রীমতী যোশী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যে সেদিন পর্যন্ত বড় গলায় জন্মনিরোধের কৃতিত্ব সরকারের হয়ে দাবি করেছিলেন তা নিয়ে বিপক্ষদলীয়রা চোখা চোখা কথা শোনাল, পত্রিকাগুলি ব্যঙ্গচিত্র ছাপল।

অধিকাংশ সদস্যের বড় অভিযোগ ব্যক্তিগতভাবে ডঃ মিত্রর বিরুদ্ধে। দেশের লোকের উপর গোপনে এত বড় পরীক্ষা চালাবার অধিকার কোনও ব্যক্তিবিশেষের নেই, বিজ্ঞানীদের এই ক্ষমতা দিলে এর শেষ কোথায় কে জানে? খবরের কাগজগুলিও এই সুর গাইল, সাধারণ লোকে অনেকে তার প্রতিধ্বনি করলে। প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তায় মনে হল সরকারী মতটাও ঐ রকম।

এর প্রায় এক মাস পরে আবার খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এক আশ্চর্য সংবাদ। ডঃ মিত্র গোপনে দেশ ছেড়েছেন, রোমের বিমানঘাঁটিতে তিনি সাংবাদিকদের যা বলেছেন তার মর্ম এই যে ভারত সরকার নিজেদের লজ্জা ঢাকবার জন্য তাঁকে শাস্তি দেবার কথা ভাবছিল, তাই তাঁকে দেশান্তরী হতে হয়েছে। মানুষের উপকারের জন্যই তিনি বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন, তার যে এমন হিতে বিপরীত পরিণতি হবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। তাঁর পরীক্ষার বিরুদ্ধে যা যুক্তি দেখানো হয়েছে তার সবই বর্তমান বিপদে তুচ্ছ। এতে তাঁর এই বিশ্বাসই দৃঢ় হল যে ভারতের নেতারা সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়েও সত্যকে মানতে নারাজ, তাঁরা কাল্পনিক আশ্বাসের আশ্রয়েই থাকতে চান। একথা অন্য কোনও কোনও দেশ সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু সুখের বিষয় কাগজে তার বিবৃতি প্রকাশ হবার পর কয়েকটি দেশ থেকে তাঁর কাছে সরকারী ও বেসরকারী আমন্ত্রণ এসেছে। এমন এক দেশেই তিনি যাচ্ছেন, তিনি মনে করেন সেখানে তার কাজের ক্ষেত্র অব্যাহত থাকবে, এবং আশা করেন ক্রমে পৃথিবীর অন্যত্র তার প্রয়োগ হবে।

ইন্দিরা গান্ধী

সবিতা সেনগুপ্ত

এলাহাবাদ। জুন মাসের এক উত্তপ্ত রাত্রি। একটি তরুণী জনবিরল রাজপথে হেঁটে চলেছে। কোলে তার ছোট্ট শিশু। এটি তার প্রথম সন্তান, এখনো বাবাকে দেখানো হয়নি নাতির মুখ। বাবা কত উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন নাতিকে দেখার জন্য। মা ত কবেই চলে গেছেন। খবর পেয়েছে, রাত্রে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হবে গাড়ি করে নৈনির রাস্তা দিয়ে। সেই রাস্তার এক পাশে সে দাঁড়িয়ে থাকবে ছেলে কোলে নিয়ে, যদি গাড়িতে যেতে যেতে এক লহমার জন্য বাবা তার নাতির মুখ দেখতে পান। তাই যে পথে বাবার গাড়ি যাবে সেই পথে নিঃশঙ্কিনী একা চলেছে শিশুটিকে বুকে নিয়ে।

কে এই তরুণী? কে তাঁর পিতা? প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পিতাকে দেখাতে চলেছেন তাঁর প্রথম পুত্রকে। ১৯৪২ সালের আগস্টে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রাক্‌কালে বন্দী নেহরু ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন আলমোড়া থেকে মুক্ত পান। তার আগে আহমদ নগর ফোর্ট থেকে নৈনি জেলে তাঁকে আনা হয় আলমোড়া যাবার পথে। খবরটি ইন্দিরা পান একজন সামরিক কর্মচারীর কাছে। তাই তিনি পুত্র রাজীবকে কোলে নিয়ে একা বেরিয়ে পড়লেন। পাঁচ ছয় মাইল দূরে নৈনির রাস্তা তাঁর গন্তব্যস্থল। সঙ্গে কাউকেই তিনি নিলেন না। চলতে চলতে এক গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন বাবার গাড়ির। রাতও কম হয়নি। মধ্যরাত্রি খুব বেশি আর দেরিও নেই। এক সময়ে দূরে দেখা গেল মোটরের হেড লাইট, বন্দী নেহরুকে নিয়ে গাড়ি এগিয়ে এল কাছে। গাছের উপর নিদ্রিত বিহঙ্গেরা চকিত হয়ে উঠল. চকিত হয়ে উঠল নিস্তব্ধ রাজপথ. বুঝিবা তারা খচিত উপরের আকাশও। নিদ্রোত্থিত নৈনির রাজপথ আর রাত্রির আকাশ ছাড়া এ দৃশ্যের আর সাক্ষী কেউ ছিল না।

ইন্দিরাকে দেখে গাড়ির চালক কি বুঝলো কে জানে সে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। খুব ধীরে ধীরে চলতে লাগল গাড়ি। প্রিয়দর্শিনী নিঃশব্দে ছেলেকে একটু তুলে ধরলেন, নেহরু তাকিয়ে রইলেন প্রিয়তম কন্যা ও নাতির মুখের দিকে। তাঁর মুখেও কথা ছিল না। খুব আস্তে গাড়ি এগিয়ে গেল সামনের দিকে!

সেদিনকার সেই শঙ্কহীনা নারী, যিনি একা আঁধার রাতে পথ চলতে ভয় পান না, যার মধ্যে ছিল সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, সেই নারী সেদিনকার প্রায় একুশ বছর পরে বিশাল ভারতের কর্ণধার হলেন। তাঁর ভিতরকার প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তার কথা তার আশেপাশের কারো যেন জানা ছিল না। সকলের ধারণা ছিল তিনি যেন খালি পণ্ডিত নেহরুর আদরের বেটি। তাঁর বুকের গোলাপের কুঁড়িটির মত নরম কোমল।

মনে পড়ে একটি দৃশ্য। জওহরলাল নেহরুর দেহাবসানের সংবাদে সারা দেশ গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত। তিনমূর্তির বাসভবনে ভেঙে পড়েছে শুধু দিল্লী শহরই নয়, সারা দেশের নানা জায়গা থেকে আগত অগণিত শোকার্ত নরনারী ছুটে গিয়েছে তাদের শোকাশ্রু নিবেদন করতে। শ্বেত মর্মর মূর্তির মত স্থির অচল হয়ে বসে আছেন ইন্দিরা গান্ধী পিতার মৃতদেহের পাশে। এক সময়ে নেহরু পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত অতিশয় বৃদ্ধ এক ব্যক্তি এলেন সেখানে। তাঁকে দেখে প্রিয়দর্শিনী আর স্থির থাকতে পারলেন না, কেঁদে উঠলেন। অশ্রুপূর্ণ চোখে বৃদ্ধ বল্লেন, 'বেটি, গুলাব তো মুরঝা গয়া, লেকিন মহক কভী লুপ্ত নহী হোগী। মত রো, তু গুলাব কী মহক্ হ্যায়।'

গোলাপ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সুগন্ধ লুপ্ত হয়ে যায়নি, কাঁদিস না বেটি, তুই ত সেই গোলাপের সৌরভ।

প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী সত্যিই সেই মূর্ছিত গোলাপের সুবাস।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই হল 'return of the rose bud' সারাদেশের অনুচ্চারিত ভাষা হল যে গোলাপ কুঁড়ির প্রত্যাবর্তন নয়, এক যেন resurrection পুনরুজ্জীবন। এই পুনরুজ্জীবনের প্রাণদ এবং সুখদ ধারায় সারা দেশের মুক্তিস্নান হোক।

*

দেশ তখনো পরাধীন; বালিকা বয়সে Letters from father to a daughter পড়ে প্রথম মুগ্ধ হই। কেমন এই মেয়ে যার বাবা এতখানি যত্ন নিয়ে প্রাণের প্রথম বিবর্তন থেকে শুরু করে বিশ্ব ইতিহাস কারাগার থেকে লিখে মেয়েকে পাঠিয়েছেন? এ মেয়ে যেমন তেমন মেয়ে হবে না। এ মেয়ে হবেন সাহস ও দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরসাধিকা। চাঁদ সুলতানা, রাণী দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণীর উত্তরসাধিকা। ভারতবর্ষ তখনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পেষণে পিষ্ট; অসহযোগ আন্দোলনে শত শত নারী নিঃশঙ্কচিত্তে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছে পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী হয়ে দেশোদ্ধার কাজে অংশ নেবার জন্য। যামিনীর নর্মসহচরী দিবসের কর্মসহচরী হতে সুরু করেছে বটে ঠিকই, তবু নারীর মূল্য লোকে সাধারণভাবে রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। নারীর পক্ষে এর বাইরে আর কিছু করণীয় বা বরণীয় থাকতে পারে, লোকে তা জানতও না মানতও না।

অত্যন্ত বিস্ময়বোধ হয়েছিল পণ্ডিত নেহরুর ছোট্ট মেয়ের কাছে লেখা চিঠির গুচ্ছ পড়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ

বাঙালী মেয়ের কথা বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

জানি নাই ত আমি যে কি
জানি নাই এই বৃহৎ বসুন্ধরা
কি অর্থে যে ভরা।

এই এক ভারতীয় পিতা বৃহৎ বসুন্ধরা যে কি, তা চিঠির মাধ্যমে ওই ছোট্ট মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন। শুধু বোঝানই নয়, তাকে ডেকেওছেন ইতিহাসের যজ্ঞশালায় মহান এক ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য। সেদিন নিজের চারদিককার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে ওই সৌভাগ্যবতীর কথা ভেবে একটা আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ আত্মার মধ্যে অনুভব করার চেষ্টা করেছি।

সেই মেয়েই আজ আমাদের এই বৃহৎ দেশের কর্ণধার।

ইন্দিরা গান্ধীর আগে সিংহলের সিরিমাভো বন্দরনায়েক পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তারপর ইন্দিরা গান্ধী এই বিশাল দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন।

আদি যুগ থেকে পৃথিবী তার ইতিহাসের চক্রতীর্থপথে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নানা দেশে সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয়েছে। এশিয়ার দূর প্রাচ্যেও সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বিশ্ব ইতিহাসে ভারতের একটা বিশেষ ভূমিকা তৈরী হয়েছে। কিন্তু তার আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি আজকের মত এমন জটিল [illegible] [illegible] হয়নি।

এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী জাতির কর্ণধার হয়ে আছেন। তরণী কোন ঘাটে ভিড়বে, নব উষরে স্বর্ণদ্বার খুলবে কিনা তা ইতিহাস জানে।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই ক্ষীণাঙ্গী নারীর।

উত্তর প্রদেশে শ্রীকমলাপতি মিশ্র শাস্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর আত্মজীবনী সংস্কৃতে অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। তাঁকে একবার বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতের কন্যা নয়নতারা সেগল লিখেছিলেন, লেখনীতে ইন্দিরাকে চিত্রিত করা অসম্ভব। তার বহুপ্রতিম ব্যক্তিত্বকে কলমে রূপ দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

আত্মজীবনীর সংস্কৃত অনুবাদ নিয়ে কয়েকবারই শ্রীকমলাপতি মিশ্র তিনমূর্তির বাড়ীতে গেছেন। তখন অনেকবারই ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর দেখা শোনা হয়েছে। প্রথমে মনে হয়েছে বুঝিবা প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত অন্তর্মুখিনতা এই মেয়ের। কিন্তু ক্রমে ভুল ভেঙেছে। মনে হয়েছে এঁর চেয়ে সহজ আর সৌহাদ্যপূর্ণ বুঝি আর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিরই ব্যবহার হতে পারে না। ইন্দিরা যা কিছু বলেন অন্তরে বুঝে বলেন, আর যা বোঝেন তাই তাঁর কার্যকলাপে পরিস্ফুট হয়। ভয় ডর জানেন না তিনি।

উচ্চ শ্রেণীর অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কঠিন সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাঁকে [illegible] প্রথম কারাগারে যান তখন ইন্দিরার চার বছর বয়েসও হয়নি। জীবনের গোড়ার দিকেই সম্পূর্ণ অনিয়মিত অসম্বন্ধ জীবনক্রমের মধ্য দিয়ে তাঁর কেটেছে।

জীবনের সেই কঠোরতম সময়ের ছায়াতেই ইন্দিরার ভাবী জীবনের রূপরেখা গঠিত হয়েছে। আজকের ইন্দিরা যেন মূর্তিমতী শক্তির অপরাজেয় আধার। এটি হয়েছে সেদিনকার সেই সময়ের গুণে।

যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় তিনি পিতার সেবাতে উৎসর্গ করেছেন। এ আত্মত্যাগ কি কম? কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ তাঁর ছিল না এই আত্মবলির জন্য। ইন্দিরা না থাকলে জওহরলালের এই দীর্ঘ আয়ু, সবল সুস্থতা, যুবকের মত প্রাণোচ্ছল জীবন কি সম্ভব হ'ত? রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে বলেছিলেন ঋতুরাজ বসন্ত। সত্তর অতিক্রান্ত তাঁর যৌবনরথের যে সবুজ জয়ধ্বজা সেটি প্রিয়দর্শিনী তপস্বিনী ইন্দিরারই।

কিশোর বয়সে ইন্দিরা গান্ধী কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে সুকুমার-কলা-প্রবণতা থেকে সুরু করে অনেক কিছু হয়ত পেয়েছেন, কিন্তু প্রিয়দর্শিনী তাঁর আবাসিক হস্টেল থেকে বিদায় নেবার পর তাঁর প্রভূত প্রশংসা করে নেহরুকে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন, ইন্দিরা ঠিক যেন তোমারই প্রতিকৃতি।

শৈশবকাল থেকে ইন্দিরার বিচিত্র ও বর্ণবহুল জীবনের মধ্য দিয়েই ত ইতিহাসের রথচক্র এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার দিকে। ইন্দিরার চোখের সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে। গান্ধী, নেহরু, সরোজিনী নাইডু, আজাদ, গফফর খাঁ প্রভৃতি স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কগণ ইন্দিরার নিতান্ত কাছের জন ছিলেন।

তারপর আস্তে আস্তে ইন্দিরার জীবন রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে পৌঁছাল।

কেনেডি, কোসিগিন, নাসের, টিটো, দ্য গল, ম্যাকমিলান ইত্যাদি বিশ্বনেতাদের সমপর্যায়ে বসে তিনি বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা করে এসেছেন।

স্বাধীনোত্তর কালেরই শুধু নয় তার আগে থেকেই ইন্দিরা একমাত্র মহিলা যিনি শাসনতন্ত্রের কোন পদ গ্রহণ না করেই এক চির সঞ্চরনশীলা রাজদূতিকারূপে বিশ্বের প্রতিটি মহত্বপূর্ণ দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং একজন অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ রাজনেত্রীর মত পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রতি ওখানকার রাজনেতা ও জনপ্রতিনিধিদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সফল হয়েছেন।

শুধু বাইরেই নয়, এই বিশাল উপমহাদেশই আজ একরকম তাঁর নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত। অনলসভাবে যেন নিদ্রা তৃষ্ণা সব জয় করে তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিশাল জনতার সঙ্গে নিজেকে একাকার করার দুরূহ ব্রতে তিনি ব্রতী হয়েছেন।

ইন্দিরা যেন জওহরলালের সজীব তপস্যা। ইন্দিরার জন্মের পর সরোজিনী নাইডু তাকে নতুন ভারত আত্মা বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। সেই ভারত আত্মার জয় হোক।

নিজের পিতামাতার কথা বলতে ইন্দিরা বলেছেন, মার কাছেই আমি বেশি ঋণী। বাবা আমাকে দিয়েছেন আকাশে ডানা মেলার শিক্ষা, কিন্তু মা দিয়েছেন এই ধরিত্রীর বুকেই পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকার শিক্ষা।

সাধারণত খুশিমতো জনসভায় তাঁকে বড় পিতার পুত্রী, বড় পিতামহের পৌত্রী ইত্যাদি বলে পরিচয় দেওয়া হয়। ভুপালে একবার তিনি বলেছিলেন, লোকে আমার বাপঠাকুরদার কথাই বলে, আমার মার কথা কেউ বলে না। আমার মার আত্মত্যাগ কোন দেশনেতার চেয়েই কম ছিল না।

সত্যিই ইন্দিরার মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসা। মায়ের কথা স্মরণ করে একবার বলেছেন সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কত সাধু মহাত্মা তাঁর কাছে আসত। তিনি মন্ত্র পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। বেলুড় মঠে ইন্দিরা মায়ের সঙ্গে অনেক গেছেন। গঙ্গাতীরে বসে কত সময় প্রবহমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডুবে গেছেন কিশোরী মনের চিন্তায়।

মার কাছ থেকেই ইন্দিরা পেয়েছেন সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ।

গৌতম পুত্র রাহুল। নামটার প্রতি ইন্দিরার ছিল ভারী আকর্ষণ। ভেবেছিলেন নিজের ছেলে হলে নাম রাখবেন রাহুল। কিন্তু ছেলে যখন হল নেহরু তখন জেলে। সেখানে আচার্য নরেন্দ্র দেব আনন্দ প্রকাশ করলেন দৌহিত্র লাভের খবর শুনে। নেহরু বল্লেন, দাদু দিদিমার নাম মিলিয়ে নাম দিলেন রাজীবরতন। রাজীব মানে কমল আর রতন হল জওহর।

কাশ্মীরীদের মেয়েদের নাম অনেকেরই স্বরূপ থাকে, বিজয়লক্ষ্মীরও বিয়ের আগের নাম ছিল স্বরূপকুমারী, তাঁর মায়ের নাম স্বরূপরাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। বিয়ের পর বিজয়লক্ষ্মীর স্বামী রঞ্জিত পণ্ডিত বল্লেন বৌকে ডাকব কি করে স্বরূপ বলে, শাশুড়ির নাম যে। তিনিই নাম দিলেন বিজয়লক্ষ্মী।

যাই হোক, ইন্দিরার অপর ছেলের নাম রাহুল রাখা হল না। তাঁর বাবা রাখতে দিলেন না। দ্বিতীয় ছেলেটির বেলাতেও রাজীবের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা হল সঞ্জীব। সঞ্জীবই লোকমুখে কেমন করে হল সঞ্জয়। রাহুল নাম রাখা আর হল না। কিন্তু নামটি ইন্দিরার কত পছন্দ। রাজীবের ছেলে হল সেদিন, ইন্দিরা নাতির নাম রাখলেন রাহুল।

ইন্দিরা মার কাছে শিখেছেন মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শিক্ষা, তা যত ঝড়, যত বিপর্যয় আসুক না কেন।

সমস্ত দেশ মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার প্রেরণা চাইছে আজ এই দেশনেত্রীর কাছে।

তুলসীচরিত

ননীমাধব চৌধুরী

(১৪)

তুলসীর বাবা বরদাবাবুর সঙ্গে আলাপ করে মনে হল আগে কেমন মানুষ ছিলেন তিনি জানি না, এখন হেজেমজে গিয়েছেন। হেজেমজে যাওয়া মানে মানি বুদ্ধির জাত হারিয়ে আবার ইনস্টিংকটে পরিণত হওয়া। ব্রেনসেলগুলো কমপিম্যুটরের কাজ করে, বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে সাহায্য করে না। সোজা কথায় বুদ্ধিমান মানুষে ধূর্ত মানুষে পরিণত হয়।

ধূর্ত মানুষ সবাইকে নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির যন্ত্রের মত দেখতে অভ্যস্ত হয়, মানুষকে স্টাডি করে সুযোগ-সুবিধার অন্বেষণে, অর্থাৎ কার কোন দুর্বলতা আছে আবিষ্কার করে কিছু আদায় হয় কিনা চেষ্টা করে। বরদাবাবুও এক্সপ্লোরেশন করছিলেন। একদিন খেদ প্রকাশ করে বললেন, বাজারের যে অবস্থা একলা মানুষ আর পেরে উঠছি না। ভাবছি তুলসীকে কলেজের পড়া ছাড়িয়ে টাইপিং শিখতে দেব। কিছু শিখে নিলে অফিসের কর্তাদের ধরে অফিসে ঢুকিয়ে দেব। তুলসী আপনাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, প্রায় আসে আপনার কাছে। তাই আপনার পরামর্শ চাইছি।

বললাম, ভাল প্রস্তাব।

আপনি সমর্থন করছেন এ প্রস্তাব?

বললাম, তুলসীর ভাল-মন্দের কথা চিন্তা করা আপনার কর্তব্য। আপনি যা স্থির করেন তাই হবে। আমি থার্ড পার্সন।

থার্ড পার্সন বলে আপনাকে মনে করি না দাদা। আপনি তুলসীর ওয়েল উইশার।

তা বটে, কিন্তু হেল্পলেস ওয়েল উইশার, কিছু করবার সামর্থ্য নাই।

মাসখানেক পরে একদিন তুলসী এসে সামনে বসে চোখ মুছতে লাগল। বুঝলাম অপ্রীতিকর কোন ব্যাপার নিয়ে এসেছে।

বললাম, বর্ষা নামল কেন চোখে তুলসী? বলে ফেলো কি বলবে?

ভাঙ্গাচোরা কথা জড় করে তুলসী যা বলল তার ভাবার্থ এই যে তার দাদার পরীক্ষার ফি যোগাড় হচ্ছে না, তাই তার বাবা তাকে ঠেলে পাঠালেন ফির টাকাটা আমার কাছে ধার করতে।

এই কথা বলতে গিয়ে কাঁদছ কেন? তুমি বললে টাকা দিতে পারি।

মাথা নেড়ে তুলসী বলল, আমি দিতে বলি না জ্যেঠামশাই। টাকা না পেলে বাবা খুব রাগ করবেন, হয়ত আমাকে আসতে দেবেন না আপনার কাছে।

বললাম, এসো না।

আমি কি করে থাকব জ্যেঠামশাই না এসে?

তা বটে। আমিই বা কি করে থাকব? তাহলে টাকাটা নিয়ে যাও।

না জ্যেঠামশাই। দাদার পরীক্ষার ফি সে যে করে পারে যোগাড় করুক, যোগাড় করবেও। তার পড়বার খরচ সে চাকুরি করে চালাচ্ছে। বাবা আমাকে আপনার কাছে টাকা ধার করতে পাঠালেন কেন?

কেন পাঠালেন হয়ত নিজেই বুঝতে পারছে খানিকটা, তাই এত খারাপ লাগছে। বললাম, তাহলে তোমার বাবাকে ব'লো টাকা আমি দিলাম না, তোমাকে এখানে আসতে না করেছি।

তুলসীর মুখ শুকিয়ে গেল দেখলাম। ঢোক গিলে বলল, আপনি আসতে মানা করছেন?

তুমি বোকা মেয়ে নাকি? কদিন এসো না এখানে। তোমার মা জানেন তোমাকে টাকা ধার করতে পাঠিয়েছেন তোমার বাবা?

বাবা বলেননি, আমি বলেছি।

কি বললেন?

বললেন, টাকা চাস যদি বুঝব তুই আমার মেয়ে নস। কি হবে জ্যেঠামশাই?

কিছু হবে না। তোমার দাদাকে একবার পাঠিয়ে দিয়ো আমার কাছে, তোমার বাবাকে বলো তাকে ডেকেছি আমি।

একটু হাসি দেখা গেল তুলসীর মুখে এতক্ষণ পরে।

বরদাবাবুর বড় ছেলে সত্যর সঙ্গে কথা হল।

তার পরীক্ষার ফির ব্যাপার শুনে রেগে গেল সে। বলল, বি-কম পাশ করবার পর থেকে আমার সব খরচ চালাচ্ছি আমি। একবেলা অফিসের ক্যানটিনে খাই, রাতে বাড়ীতে থাকবার ও খাবার জন্য বাবাকে খরচ দিই। আমার কোন ব্যাপারে বাবা মাথা ঘামান না, হঠাৎ আমার পরীক্ষার ফি যোগাড় করবার জন্য তাঁর মাথা ব্যথা হল কেন বুঝতে পারছি না। আমার সঙ্গে কোন কথাই হয়নি এ ব্যাপার নিয়ে।

তার কাছে শুনলাম বরদাবাবু আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কর্পোরেশনে ভাল মাইনের চাকুরি করতেন। কোম্পানী লিকুইডেশনে গেলে মিঃ ভাদুড়ীর বড় ছেলের অফিসে চাকুরি করছেন। তেমন বড় বিজনেস নয়, দুশো টাকা মাইনে দেয়। বলল, কষ্টে-সৃষ্টে চলে। কিন্তু বাবার বদভ্যাস হয়েছে, মদ নয়—কিন্তু নেশা হয় কি একটা ড্রাগ খেতে আরম্ভ করেছেন। মার সঙ্গে গোলমাল করেন শুনতে পাই।

রাগের মুখে সংসারের অনেক কথা বলে গেল। বলল, মা বললেন তুলসীর কলেজের পড়া বন্ধ করে বাবা তাকে টাইপ রাইটিং শিখিয়ে অফিসে ঢুকিয়ে দেবেন। অত ছোট মেয়েকে কেউ নাকি অফিসে চাকুরি করতে পাঠায়? মা বললেন তিনি স্কুলে চাকুরির চেষ্টা করছেন, চাকুরি পেলে তুলসীকে কলেজে পড়াবেন। বাবা মত না বদলালে মা তুলসীকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারেন মনে হল। বাবা খরচ না দেন তুলসী বাড়ীতে পড়ুক, প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হয়ে পরীক্ষা দেবে।

দেখলাম পোশাকে বেশ পরিপাট্য আছে সত্যর, কিন্তু সোজা কথার মানুষ।

এরপর থেকে বরদাবাবুর স্ত্রীকে আর মহামায়ার কাছে আসতে দেখি না, তুলসীও আর আসে না। তুলসীর আসবার পথ বরদাবাবু বন্ধ করেছেন মনে হল। মনের ভেতরে মাঝে মাঝে খচ-খচ করে। বুঝতে পারি তুলসীকে দেখতে না পেয়ে একটু কষ্ট হচ্ছে। কি আর করা যাবে?

মাস দুই পরে বরদাবাবুর সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হল।

বললেন, এই যে দাদা, অনেকদিন দেখা নাই, কেমন আছেন বলুন।

তাকিয়ে দেখলাম পোশাকের পারিপাট্য যেন কিছু কমেছে। বললাম, এই চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

ও কথা আমরা বলব দাদা, ভগবান আপনাদের ভালভাবে চলবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বাড়ীর দিকে ফিরছিলাম দুজনে কথা বলতে বলতে। নিজেই তুলসীর কথা ওঠালেন। বললেন, তুলসীকে টাইপ রাইটিং শেখাবার আইডিয়া ছেড়ে দিলাম দাদা। ক টাকা আর রোজগার করবে অফিসে টাইপিস্ট হয়ে? ভেবে দেখলাম সিনেমা লাইনে গেলে তুলসীর প্রসপেক্টস আছে। আমার এক শালা আছেন দু-চারজন সিনেমা ডিরেকটার প্রোডিউসারের সঙ্গে খাতির আছে, তাঁর একখানা বই বক্স-অফিস হিট করেছিল, নাম আছে বাজারে। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। তুলসী দেখতে ভাল, ভাল ফিগার, চেহারার স্টাইল আছে। কিছু এ্যাকটিং করতে পারে, গান কিছু জানে, চাই একটু সুযোগ মানে পুশ

করবার লোক, আর লাক। যদি লেগে যায়—আপনি কি বলেন?

ভাল প্রস্তাব।

তুলসীর নিজের একটু ইচ্ছা আছে, বলেনি আপনাকে?

না।

আসে না বুঝি আর? মেয়েটা একটু একগুঁয়ে, একটু অবাধ্য। কতবার বলেছি দাদার কাছে যাবে আগের মত, একজন আদর্শ পুরুষ দাদা। হাতে টাকা থাকতে দেশের সনাতন গরীব চালে চলেন। সোজা কথা না কি বাড়তি টাকার কামড় সহ্য করা। এ রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে স্পিরিচুয়েল উন্নতি হয়। বড় হচ্ছে, হয়ত লজ্জা করে বেশী আসতে। আচ্ছা, ওকে বলব আসবার জন্য, কথা বলে দেখবেন।

আমি কি কথা বলব?

বাপের কাছে লজ্জায় মনের ইচ্ছা স্পষ্ট করে বলে না। আমার বেটার হাফ আবার একটু পিউরিট্যান টেস্টের মানুষ, সিনেমা-ঠিনেমা পছন্দ করেন না আজকাল, কম বয়স করতেন। তুলসীর মনে উচ্চাশা জাগিয়ে দেয়া দরকার। আপনার সঙ্গে সব রকমের কথা হয়—

তাকালাম বরদাবাবুর দিকে, বললাম, বেশ, পাঠিয়ে দেবেন তাকে।

বাড়ীর কাছে পৌঁছে বরদাবাবুকে নমস্কার করলাম, তিনি বিদায় না নিয়ে আমার সঙ্গে আসতে আসতে বললেন, দু-চার মিনিট বসব আপনার কাছে, দু-চারটে ভাল কথা শুনব। বাড়ীতে ফিরতে ইচ্ছা হয় না, অন্ধকার বাড়ী—

কেন আপনার স্ত্রী কোথায়?

কদিন হল একটা উপলক্ষে পিত্রালয়ে গিয়েছেন, তুলসীও গিয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া চলছে কিভাবে?

ছোট ছেলেটা চালাচ্ছে, বুড়ো বয়সে আগুনের তাতে—

তার বয়স চৌদ্দ-পনের হবে, সে রেঁধে খাওয়াচ্ছে আপনাকে?

বললেন, বয়স কম হলে কি হয় দাদা রান্নায় সে দ্রৌপদী বিশেষ। প্রিন্স অব ওয়েলস সত্যবাবু ছোট ভাইকে একটু সাহায্য করবার ভয়ে হোটেলে ফাউল রোস্ট বিরিয়ানি খেয়ে রাত বারোটায় বাড়ী ফেরেন।

আরাম করে বসে সিগারেট টানতে টানতে অনেক কথা বললেন বরদাবাবু, চা-বিস্কুট খেলেন, ঘণ্টাখানেক পরে অনুগ্রহ করে বিদায় নিলেন।

বরদাবাবু চলে গেলে খানিকক্ষণ ধরে ভাবলাম। ছাই-ভস্ম ভাবনা। বাপের নজরে পড়েছে মেয়ে দেখতে ভাল, ভাল ফিগার, চেহারার স্টাইল আছে, সিনেমায় নামলে, একটু খাটলে টাকা আনতে পারবে হয়ত। আশা করে আছেন সিনেমা একট্রেস মেয়ে সে টাকার কিছুটা বাপের হাতে দেবে তাঁর ইচ্ছামত ড্রাগে বা এলকোহলে ব্যয় করবার জন্য।

এসব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে নিজের কাজে মন দিলাম। একটা নতুন য়্যান্টি-বায়োটিক ড্রাগের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। আরও কিছুদিন লাগবে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে, ফল সন্তোষজনক হলে বাজারে ছাড়া চলবে। এক্সপেরিমেন্টের জন্য কোম্পানীর রিসার্চ লেবরেটরীতে যেতে হয় প্রায়ই।

(১৫)

কয়েকদিন পরের কথা।

সেদিন একটু বেলাবেলি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে মহামায়ার কাছে এক কাপ চা চেয়ে নিয়ে বারান্দার একপাশে খাঁচা ঘরে ঢুকলাম।

বললাম, খাঁচাঘর, ভাল নামও দেয়া যায়, যেমন প্রাইভেট চেম্বার। তিন ইঞ্চি সিমেন্টের দেয়াল ও কাঠ, কাঁচের ব্যাপার। একটা ছোট ঘরের সাইজ। চেয়ার, টেবিল, আরাম চেয়ার, আরও এটা-ওটা আছে। তার মধ্যে পড়ে তিনখানা ছবি, একখানা বুদ্ধদেব ও এক নব-দীক্ষিতা শ্রমণীর, একখানা সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব ভিক্ষার জন্য তাঁর নিজের গৃহদ্বারে উপস্থিত, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভিক্ষা দেবার জন্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, একখানা ম্যাডোনার, শিশু যিসাস স্তন্যপান করছেন। উঁচুদরের ছবি কিনা জানি না, আমি আর্ট-অভিজ্ঞ নই। তিনখানা ছবি ছাড়া একখানা ফটো আছে, দেবাশিসের ফটো। এই ছবি ও ফটো কি করে আমার হাতে এল তার একটা ইতিহাস আছে। পরে বলব।

খাঁচাঘর হালে তৈরী হয়েছে। বাইরের কাউকে এঘরে ঢোকাই না, নিজেও যে রোজ ঢুকি তাও নয়। যেদিন খেয়াল হয়, রিসার্চের কথা ছাড়া অন্য কথা মনে আসতে থাকে, যেদিন বুঝি মন একটু ছুটি চাইছে খাঁচাঘরে গিয়ে বসি।

সেদিন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। চা শেষ করে কাপটা সরিয়ে রেখে আরাম চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিলাম। দেখ-ছিলাম নানা রকমের তত্ত্ব জিজ্ঞাসার খই ফোটবার মত অবস্থা আসছে মনে। মনকে বললাম, কেন বাজে মেহনত করবে? মানুষের জীবনের সব তত্ত্ব তথ্য হয়ে গিয়েছে, তত্ত্বের মধ্যে মিস্টির ভাব আছে একটু তথ্যের মধ্যে কিছু নাই। বার্লিনের ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক সোসাইটির গবেষকরা যে ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ তৈরী করেছেন তার সাহায্যে জীবকোষের মধ্যে মোলিকিউল এবং মোলিকিউলের মধ্যেকার এটমগুলো পর্যন্ত চোখে দেখা যাবে এরপর। তত্ত্ব কোথায় থাকবে অতঃপর? বিজ্ঞান জীবনকে ডিমিস্টিরাইজ করে। মানে—

চমকে উঠলাম। আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসার তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে দোর খুলে কে ঘরে ঢুকে বুকের ওপরে আছড়ে পড়ল।

বুঝতে দেরি হল না এই অনধিপ্রবেশ-কারী একটি মেয়ে। এত দুঃসাহস আর কার হবে?

বললাম, তুলসী উঠে চেয়ারে বসো।

বুকে মুখ গুঁজে তুলসী বলল, জ্যোঠামশাই!

ওঠো তুলসী, এরকম করতে নাই।

উঠে গিয়ে চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগল।

অন্ধকার হয়ে আসছিল, উঠে আলো জেলে দিলাম। বললাম, কার সঙ্গে এলে তুমি?

মুখ একটু উঠিয়ে বলল, একাই এসেছি।

টেবিলে মাথা রেখে তখনও কাঁদছে তুলসী। মনে মনে বললাম, এত আবেগপ্রবণ মেয়ে তুমি, দুঃখ আছে তোমার কপালে।

কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বললাম, এত কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

উত্তর দিল না।

বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে বুঝতে পারলাম।

বললাম, এবার কান্না থামিয়ে চোখ মুছে মাথা তুলে বসো দেখি। বাপের নিষেধ না শুনে পালিয়ে আসতে হল এখানে। কি কথা আছে তোমার শুনি।

কিছু কথা নাই, একটু যেন চটে গিয়ে তুলসী বলল, তোমাকে দেখতে এসে-ছিলাম, কান্না পেয়ে গেল। আমি কি করব কান্না পেলে?

হেসে বললাম, খানিকটা কেঁদে নিয়েছ তো বাপু, এবার একটু হাসো তো।

আমার হাসি পাচ্ছে না।

তাহলে হেসো না। কবে ফিরলে মামা-বাড়ী থেকে?

মুখ তুলে বলল, তুমি কি করে জানলে মামাবাড়ী গিয়েছিলাম? বাবা বলেছেন?

হ্যাঁ।

জ্যোঠামশাই, বাবার মাথায় একটা বড় পোকা ঢুকেছে। আমার পড়াশোনা আর হবে না, চার মাসের মাইনে বাকী পড়েছে, নাম কেটে দিয়েছে।

বললাম, তুলসী, তুমি কি সিনেমায় নামতে চাও?

হেসে বলল, বাবা মেজমামাকে বলেছেন আমার সিনেমা লাইনে যাবার খুব ইচ্ছা, তোমাকেও তাই বলেছেন বুঝি? কি হয়েছে বাবার জানিনে, এই সব বাজে কথা সবাইকে কেন বলে বেড়াচ্ছেন ধরতে পারছি না।

ধরা শক্ত নয়। তোমার নাম হবে, অনেক টাকা পাবে, তা থেকে তাঁকে কিছু দেবে আশা করছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, গোলমাল ঢুকেছে আমাদের সংসারে। ভেবেছিলাম ডাক্তারী পড়ব, তা হবে না। তোমাকে বলব না ভেবেছিলাম, মা বাবার ওপরে রাগ করে চলে গিয়েছেন। কদিন মামার বাড়ীতে থেকে একটা স্কুলে চাকুরি ঠিক করেছেন, মামাবাড়ীতে থেকে চাকুরি করবেন। বাবা এখনও জানেন না একথা। আমার কি হবে জানি না।

তুলসী, তুমি কি সত্যি ডাক্তারী পড়তে চাও?

বলল, পড়তে তো চাই, কি ওটা আকাশ-কুসুম আমার পক্ষে। আচ্ছা জ্যোঠা-মশাই, আমি যদি বাবার পক্ষে বেশী ভার হয়ে থাকি, আমাকে সত্যি পড়াতে না পারেন তাহলে বিয়ে দিয়ে ভার হাল্কা
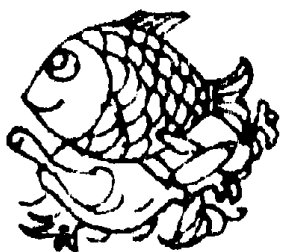
করবার চেষ্টা করছেন। না কেন? কি চান তিনি?

বললাম, এ পরামর্শ দিতে পারি কি তোমার বাবাকে?

দিতে পারো, বলবেন টাকা নাই মেয়ের বিয়ে দেবার।

যেখানে টাকা লাগবে না এমন জায়গায় চেষ্টা করা যেতে পারে। তুমি রাজি আছ বিয়ে করতে?

না, রাজি নই।

তাহলে কি করবে তুমি?

চিন্তিত মুখে বলল, জানি না।

উঠে পড়ল তুলসী, কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, তুমি আমাকে একটু ভালবেসো জেঠামশাই, তুমি ভালবাসলে ডুবে যাব না আমি।

আমি কিছু বলবার আগে বেরিয়ে গেল।

(১৬)

তুলসী একটা ধাক্কা দিয়েছিল আমাকে। পরের দিনও তার কথা মনে আসছিল। বিকালে একখানা চিঠি পেলাম, মন অন্যদিকে ঘুরে গেল। চিঠি লিখেছে দেবাশিস।

লিখেছে, মাস্টারমশাই, ওপরে ঠিকানা দিলাম, একটা জবাব দেবেন।

আমেরিকায় প্রায় তিন বছর হয়ে এল। একটা য়ুনিভার্সিটিতে রিসার্চ শেষ করে ডকটরেট পেয়েছি। বায়োলজি, বায়োফিজিকস, বায়োকেমিস্ট্রি, সেলুলার ও মোলিকিউলার বায়োলজি পড়তে হয়েছে। ক্লিনিকেল একসপেরিমেন্ট শিখতে হয়েছে। তারপর কেমিকেল রিসার্চ ও কেমিকেল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের কাজ শিখতে বছর দেড়েক গিয়েছে। ফার্মাকোলজি, সাইটোলজি, এন্ডোক্রিনোলজি, সিন্থেথেটিক ও কেমোথিরাপিউটিক ড্রাগের কাজ শিখতে বছর খানেকের ওপরে লাগবে। আমার ইচ্ছা যতটা পারি পাকা হয়ে নিতে হবে।

আমেরিকায় আসবার পর আমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু লিখছি।

ইংলণ্ডে যে সব জিনিস দেখেছিলাম এখানে তার অনেক জিনিস একজাজারেটেড চেহারায় চোখে পড়ে। মানে যেটা দৃষ্টিকটু সেটা আরও দৃষ্টিকটু দেখায়, যেটা ন্যাকামি সেটা আরও ন্যাকামি বলে মনে হয়।

দেশে থাকতে যে ইন্টেলেকচুয়াল ও মোরাল ভ্যোল্ট প্রকাণ্ড বস্তু বলে মনে হয়েছিল এখানে এসে কিছুদিন পরে দেখলাম সে ভিভোল্টের আইডিয়াগুলো স্ট্যান্ডার্ডাইজড, প্রোসেসড হয়ে অনেকদিন হল বাজারে চালু হয়েছে। তার ফল কি হয়েছে সময়মত পরে লিখব।

যে টাকা নিয়ে আমেরিকায় এসেছিলাম তাতে বছরখানেক থাকা খাওয়া চলতে পারে, যাত্র আর কিছু করতে হলে এর মধ্যে রোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এমব্যাসিতে ঘোরাফেরা করলাম, য়ুনিভার্সিটি মহলে ঘোরাফেরা করলাম, ভারতীয় মহলে, এন্টারটেনমেন্টের জায়গাগুলিতে ঘোরাফেরা করলাম। মাস তিন-চার পরে কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুর পরামর্শে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলাম। বক্তৃতা দিতাম ইণ্ডিয়ান রিলিজিয়ন কালচার, ফিলোজফি, যোগ সিস্টেম মিস্টিসিজম ইত্যাদি সম্বন্ধে, অর্থাৎ যেসব বিষয় সম্বন্ধে আমার বলবার অধিকার নাই অজ্ঞতার দরুন। ক্রিসপ বচনের সঙ্গে একটু হিউমার, একটু গাম্ভীর্যের, ডেপথের ভান থাকলে সব দেশের শ্রোতাদের মত এদেশের শ্রোতারাও কান বাড়িয়ে বক্তৃতা শোনে দেখলাম। আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেল।

মাস দু-তিন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার পরে দেখা করে প্রাইভেট আলোচনা করবার জন্য দু-চারজন করে লোক আসতে লাগল। দু-চারটে নিমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। নিমন্ত্রণকারীদের মধ্যে মধ্য বয়সের, শিক্ষিতা, প্রচুর অর্থশালিনী মহিলাও ছিলেন। আমি আমেরিকান লাইফ স্টাডি করতে আসিনি এখানে। এসেছি নিজের একটা ব্যবস্থা করে নিতে। আমেরিকান লাইফের ভেতরটা দেখবার যতটুকু ব্যক্তিগত সুযোগ হয়েছে তার কথা ছাড়া আর কিছু বলতে চাইনে।

মিলিওনেয়ারের সংখ্যা এখানে অগুনতি, তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা অনেক। মিলিওনেয়ার মেয়েদের মধ্যে বয়সে প্রৌঢ়া, বিধবা বা ডাইভোর্স, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কহীনা, নিঃসঙ্গী মেয়েরাও আছেন। শোনা যায় না এত টাকা ব্যাংকে হাউজ-হাইয়ের মত ডিম পাড়ছে। বিভিন্ন কারবারে খাটছে। কোন দুশ্চিন্তা নাই। নিশ্চিন্ত মনে নানা রকমের কাজ বা অকাজ নিয়ে এ'রা নিজেদের ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের বই পড়েন, পছন্দমত লোকের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন। এদের সযত্ন দেহচর্চা থেকে অনুমান করা যায় প্রৌঢ়া হলেও সেকস হাঙ্গার হয়নি, কিন্তু বয়সের দরুন চলতি উপায় গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন, তাছাড়া দেশীয় ছোকরারা ধরা দিতে চায় না। সেক্স এপিলকে কাল্ট হিসেবে চর্চা করবার দীক্ষা পেয়েছেন এ'রা যৌবনের শুরু থেকে, কবরে যাবার সময়ে গোটা কয়েক টেবলয়েড, রুজ, লিপস্টিক, নেল পোলিশ ব্যাগে পুরে নিয়ে যাবেন হয়ত।

সৌভাগ্যক্রমে এই ধরনের একজন মিলিওনেয়ার ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ ও কিছু ঘনিষ্ঠতা হল। হিন্দু ফিলোজফি ও যোগসিস্টেমের ভক্ত ইনি। বললেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চান তিনি, যৌগিক প্র্যাকটিসেস শিখতে চান। আলাপ হবার কিছুদিন পরে বললেন, তোমার কথাবার্তা আমাকে ইনসপিরেশন দেয়। হাতের কাছে হায়ার টপিকস সম্বন্ধে আলোচনা করবার পছন্দমত লোক পাই না, তোমার মত একজন কম্প্যানিয়ন খুঁজছিলাম আমি। যদি আমার ফ্ল্যাটে থাকতে রাজি হও তোমার সব খরচ দেব আমি।

বললাম, তিন বছর য়ুনিভার্সিটিতে পড়বার খরচ দেবে?

রাজি হলেন। বললেন, য়ুনিভার্সিটি কোর্স শেষ হলে তোমার দেশে ফেরবার যদি ইচ্ছে হয়, যদি আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই—

মাথায় করে নিয়ে যাব।

মিসেস কে-র দয়ায় তিন বছর কাটিয়ে দিলাম। হাতে টাকা জমেছে কিছু। মিসেস কে-বলছেন এখানে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাও আমার অর্ধেক টাকা তোমাকে দেব।

কি করব পুরোপুরি কাজ শেখবার আগে বলে কি হবে? বললাম, তোমার কথা শুনে রাখলাম।

ও'র ফ্ল্যাটে থাকি না এখন, আমার কাজের জায়গায় আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি। উনি মাঝে মাঝে এসে দু-চারদিন কাটিয়ে যান, ছুটি ছাটায় আমি ও'র কাছে যাই। দুজনে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমেরিকা ঘুরে দেখতে। মিসেস কে—সঙ্গী হিসাবে চমৎকার মানুষ, বন্ধু হিসাবে এফেকশানেট, মাদার্লি। পড়াশোনা করেছেন, অনেক খবর রাখেন। ব্রহ্মজ্ঞান চর্চা ও যৌগিক প্র্যাকটিসেস অনুশীলনে ভাটা পড়েছে, দেশ থেকে এক সেট বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য আনিয়েছি, অনুবাদ করে শোনাই। মিসেস কে-র মতে এমন মধুর সাহিত্য কোন ভাষায় আছে জানতেন না।

এদেশে কি করে চালাচ্ছি এতদিন বললাম। এখন কোন রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে ভাল মাইনের কাজ পেতে পারি ইচ্ছা করলে, কারবারের মধ্যে ঢুকে যেতে পারি। একটা পোজিশন হয়েছে এতদিনে, কিছু নাম হয়েছে।

আমেরিকায় এসে যা আমার ছিল না এমন একটা জিনিস পেয়েছি। সেটা হচ্ছে ফেথ, ফেথ ইন টেকনোলজি। টেকনোলজি আমেরিকার ভগবান। এই ভগবান অগাধ ঐশ্বর্য দিয়েছেন আমেরিকানদের। টাকার পাহাড় রচনা করে তার চূড়ায় বসে ডঙ্কা বাজাচ্ছে আমেরিকা।

বুদ্ধির চর্চা করছে তারা নূতন নূতন শক্তির সন্ধানে, টাকার পাহাড়কে আরও উঁচু করবার জন্য। শক্তির দাপটে পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টি করতে চায় তারা।

মাস্টারমশাই, আমি জাত কাফের, নতুন কনভার্ট হয়েছি কিন্তু নিও-কনভার্টের উদ্দীপনা খুঁজে পাচ্ছি না। যোড়শোর জায়গায় অষ্টাদশ প্লাস অষ্টাদশ উপচার সংগৃহীত হয়েছে হাতের কাছে, বিংশ শতাব্দীর এই নয়া ভগবান, যাঁর কৃপায় বোতাম টিপলে সব সুখ ঝরে পড়ে গায়ে, তাঁর পূজার জন্য, কিন্তু মন সংশয়-গ্রস্ত, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

টেকনোলজির পায়ে মাথা ঠুকতে থাকুক তারা যতদিন নতুন ভক্ত গায়ে জোর করে নিয়ে উঠে পড়ে চ্যালেঞ্জ না করে। সায়েন্স ও টেকনোলজির চর্চা কোন জাতির একচেটে নয়। টেকনোলজি ভগবানের নাকে-মুখে দু পোঁচ রং লাগিয়ে নতুন ভক্তরা দাবী করবে ইনি আমাদের নিজস্ব ভগবান, আমরা তাঁর পয়গম্বর, অতএব—

আজ এখানে শেষ করছি। হাতের কাজ শেষ হলে আবার চিঠি দেব। আমার প্রণাম নেবেন।

(ক্রমশঃ)

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সমস্যা

তারাপদ লাহিড়ী

দেউলিয়া রাজনীতি ও উন্মার্গগামী হিংস্রতার খবরে ভরা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কখনও কখনও এমন এক আধটা তৃপ্তিকর খবর প্রকাশিত হয়, যা' কালো মেঘের কিনারে উদ্ভাসিত রজত-রেখার মত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দৃশ্যমান কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জই দৃশ্যবস্তুর শেষ কথা নয়, তার বুকের তলায় আলোও লুকানো আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এই প্রকার একটি সংবাদের প্রতি সংস্কৃতি-প্রেমিক অনেকের দৃষ্টিই হয়ত আকৃষ্ট হ'য়েছে। এ সংবাদটি হ'চ্ছে এই যে—সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলা আকাদেমির' পঞ্চমবার্ষিক সাধারণ সভায় আকাদেমির সভাপতি জনাব সৈয়দ মুতওয়া আলি উভয় বাংলার মধ্যে বইপত্র আমদানী-রপ্তানির ব্যবস্থার অনুকূলে দাবী উত্থাপন করেন। ঐ সঙ্গেই এ সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে যে ঢাকাস্থিত এশিয়াটিক্ সোসাইটীর বার্ষিক সভায় ঐ সভার সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর হবিবুল্লাও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে বইপত্র আমদানীর উপর যে নিষেধবিধি প্রযুক্ত রয়েছে, তা প্রত্যাহারের দাবী জানান। সংবাদ পাঠে আমরা আরও জানতে পারলাম যে ঢাকাস্থিত বাংলা আকাদেমি ১৯৬৯ সালের জন্য পাঁচজন কৃতী পূর্ব পাকিস্থানী সাহিত্যিককে গবেষণা, নাটক, কবিতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য আকাদেমি পুরস্কার প্রদান করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, না লজ্জা না কি ব'লব জানি না—যে আমরা বাঙালী হয়েও বঙ্গ-ভারতীর ঐ পাঁচজন নিষ্ঠাবান ও কৃতী সেবকের রচনার সঙ্গে আজও সম্যক পরিচিত হ'তে পারি নাই। ভাসা-ভাসাভাবে ও'দের মধ্যে দু একজনের নাম শোনা আছে মাত্র। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যিখানে চর'। এপারে বঙ্গ-ভারতীর মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, তার ক্ষীণ আওয়াজ ওপারের সেবকদের কানে পৌঁছোচ্ছে। আবার, ওপারের উপাসকদের কণ্ঠ থেকে উত্থিত আজানের ধ্বনির রেশ এপারে ভেসে আসছে—কিন্তু 'মধ্যিখানে চর'। এপারের পূজারীরা ওপারের সেবকগণকে জানতে পারলো না। ওপারের লোকের কাছে এপারের পূজা-উৎসব সবই রহস্যাবৃত রয়ে গেল। নিষেধের চড়া পেরিয়ে পারস্পরিক জানাজানি ঘটতে পারছে না।

উভয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ শুধু যে বাংলা দেশটাকেই কেটে দুখানা ক'রেছেন তা নয়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে দেয়াল তুলে দুই অংশের মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনাকে দুটি পৃথক কোঠায় বন্দী ক'রে রেখেছেন। অথচ বিষয় এই যে, দীর্ঘদিনেও এই অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন একটা সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'ল না। তাই উপরে উল্লিখিত সংবাদটি পাঠ করে সত্য সত্যই একথা মনে ক'রে আনন্দ পেয়েছি যে—সবটাই মেঘ নয়, তার কিনারে আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। এপার-ওপার দুই পারের মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক-আউট সৃষ্টির পিছনে কি যুক্তি বা প্রয়োজন বা কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা বহু চেষ্টা করেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নাই। দুনিয়ার প্রায় সব দেশ থেকে মুদ্রিত পুস্তক, সাময়িকী ও সংবাদপত্র দুই বাংলায় প্রায় অবাধে যাতায়াত করে। অথচ পাকিস্থানে প্রকাশিত পুস্তক সাময়িকী বা সংবাদপত্র ভারতের মাটিতে প্রবেশ করলে, কিংবা ভারতে প্রকাশিত পুস্তক প্রভৃতি পাকিস্থানের নাগরিকদের দ্বারা অবাধে পঠিত হ'লে—ভারত বা পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ কিভাবে ক্ষুন্ন হ'তে পারে—তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। কেউ কি এই প্রকার আশংকা করেন যে ভারতে প্রকাশিত বই সংবাদপত্র পাঠ করলেই পাকিস্থানী নাগরিকবৃন্দ ভারতের অনুকূল রাষ্ট্রীয় মানসিকতায় দীক্ষিত হয়ে পড়বেন? অথবা পাকিস্থানের লেখক ও সাংবাদিকগণের রচনা পাঠ করলেই কোন ভারতীয় নাগরিকের মনে পাকিস্থানের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য জন্মাবে? ইংরেজ যেভাবে ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে 'সাংস্কৃতিক বিজয়' অর্জন ক'রে ইংরেজ শাসনের প্রতি ভারতবাসীর মানসিক আনুকূল্য উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল, বর্তমান যুগে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সেরূপ কিছু ঘটবার কোন সম্ভাবনাই নাই। বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকই তীব্ররূপে জাতীয়তা-সচেতন। দ্বিতীয়ত ইংরাজের তাৎকালিক কালচারাল কনকোয়েস্টের ভিত্তিভূমি ছিল, ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থার স্তরভেদ। অবক্ষয়জীর্ণ ভূস্বামীতান্ত্রিক সমাজের উপরে প্রাগ্রসরমান পুঁজিবাদী সভ্যতার জয়। পাশ্চাত্য দেশের তাৎকালিক প্রাগ্রসরমান পুঁজিবাদী ভাবধারা ভারতের অবক্ষয়জীর্ণ ফিউডাল মানসকে পরাজিত করেছিল। ইংরেজ উপলক্ষ মাত্র। তারপর দুটো শতাব্দী অতীত হ'য়েছে। সারা দুনিয়ার চিন্তাধারা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে দুটি পাশাপাশি অবস্থিত রাষ্ট্রের পক্ষে একের দ্বারা অপরের 'সাংস্কৃতিক বিজয়' সম্ভব নয়।
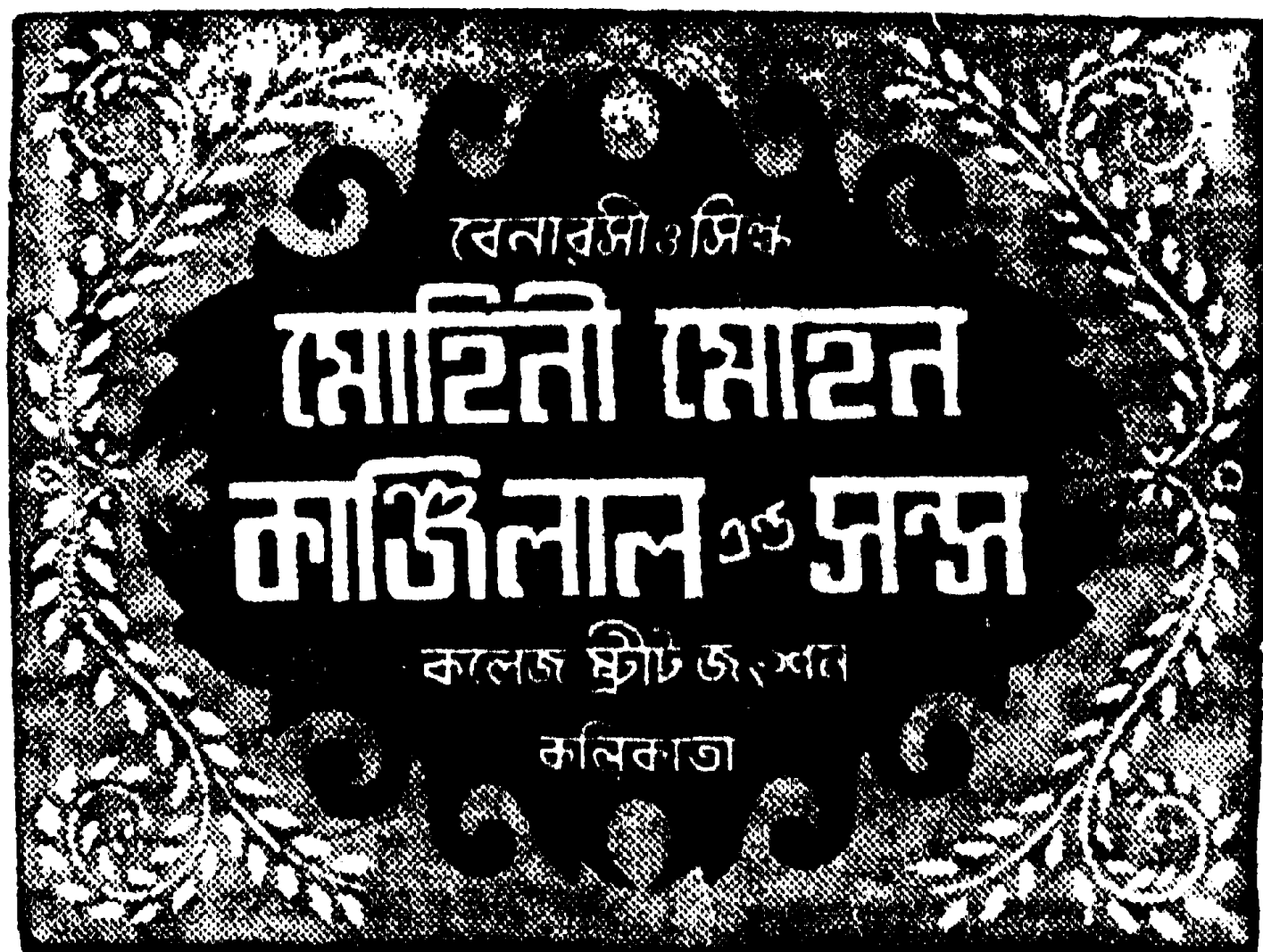
একই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্রোড়ে লালিত দুই দেশের মধ্যে এই প্রকার সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক-আউট উভয় দেশেরই পক্ষেই ক্ষতিকর। দেশ বিভাগ উচিত কি অনুচিত হয়েছে—কার স্বার্থে হয়েছে—ইত্যাদি বিতর্কমূলক প্রশ্নের আলোচনার দিন আজ নাই। ভালো হোক, মন্দ হোক বহুজনের আকাঙ্ক্ষার ছাপ নিয়ে যা ঘটে গিয়েছে তাকে খোলা মনেই গ্রহণ করতে হবে। দু ভাইয়ের হাঁড়ি পৃথক হয়েছে। মাঝখানে দেয়াল তুলে একটা পারিবারিক বাসস্থানকে দুটো পৃথক বাড়ীতে পরিণত করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তার পরে আমরা দুই বাড়ীর লোকেরা কি ভাবে চলবো? আরও স্পষ্ট করে বলতে হলে, কিভাবে চলা উভয় পরিবারের লোকের পক্ষেই হিতকর হবে? যদি পৃথক হয়েই পাশাপাশি বাস করাটা অবধারিত হয়, তা হলে দুই পরিবারের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ রাখলেই উভয়ের মঙ্গল হবে? না, পারস্পরিক মেলামেশা ও সহযোগিতার দ্বারা দুপক্ষই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেটা বেশী মঙ্গলদায়ক হবে? পৃথক হওয়ার সময়ে হৃদয়গত মিলন চীড় খেয়েছিল. স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহাওয়ায় দুপক্ষেরই মন কলুষিত হয়েছিল। কিন্তু সেই কলুষকে বিদূরিত করে পৃথক থেকেও পারস্পরিক সৌহার্দের পটভূমি রচনা করতে না পারলে কোনপক্ষই কল্যাণ অর্জন করতে পারবো না—এটা উপলব্ধি করা দরকার। এবং এটা অনস্বীকার্য যে এই সৌহার্দের সেতু রচনার ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে ক্রমাগত বর্ধিত করা এক অপরিহার্য উপায়। পশ্চিম বাংলার মানুষের ধ্যান, ধারণা, মনের গতি, তাদের চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূব বাংলার ভাইবোনেরা জানুন। আমরাও অনুরূপভাবে তাঁদের ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির সঙ্গে যথার্থরূপে পরিচিত হই। —এইভাবেই উভয়ের মনের কলুষ বিদূরিত হয়ে আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হতে পারব। যদি উভয়ের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকে, বা একের সম্পর্কে অপরে কোন ক্ষতিকর ধারণা পোষণ করে থাকে, তা হলেও খোলাখুলি বাদ-প্রতিবাদ ও জানাজানির মধ্য দিয়েই সেই অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকার হওয়া সম্ভব।

এই কারণেই দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর করে তোলা দুই পারের লোকেরই একটা প্রধান দায়িত্ব। আর সে দায়িত্ব উদ্যাপনের পক্ষে রাজনীতিকগণের দ্বারা সৃষ্ট এই সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক-আউট হ'ল প্রবলতম বাধা।

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় তেইশ বৎসর অতীত হয়েছে। ইতোমধ্যে উভয় বাংলায় নূতন তরুণ সমাজের উদ্ভব ঘটেছে। পূব বাংলার তরুণ সম্প্রদায় বাংলা ভাষার সম্মানরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য শুধু যে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে যাচ্ছেন তাই নয়, তাঁরা এই সাধনায় শাসকশক্তির হাতে প্রচন্ড লাঞ্ছনা বরণ করেছেন, এবং উজ্জ্বল আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পূর্ব বাংলার মুস্লিম তরুণরা 'তোমার বাংলা — আমার বাংলা' শ্লোগ্যানের মাধ্যমে এক নূতন ভাবধারার পত্তন করেছেন। যে সাম্প্রদায়িকতার দূষিত বায়ু এককালে দেশের উভয় অংশকে আচ্ছন্ন করেছিল, উভয় বাংলার তরুণদের নূতন জাগৃতির ফলে সেই সাম্প্রদায়িকতা আজ প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। যুবজনের মনোভঙ্গীর এই গুরুত্বপূর্ণ পারবর্তনের ফল সুদূর প্রসারী। গত তেইশ বছর ধরে পূর্ব বাংলার সাহিত্যকর্মিগণ বঙ্গ-ভারতীর ভান্ডারে যে সকল উজ্জ্বল সম্পদের সংযোজন করেছেন, আমরা এপারের পাঠকবৃন্দ তার কণামাত্র আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছি না। তেমনি গত ২৩ বছরকালের মধ্যে আমাদের এপারেও বাংলা সাহিত্যের সেবকবৃন্দ নব নব সৃষ্টির দ্বারা বঙ্গ-ভারতীর ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। নূতন মনোভঙ্গী, নূতন শৈলী, আঙ্গিক ও নূতন নূতন রসে এপারের সাহিত্যকর্মও প্রতিদিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। অথচ আমাদের ওপারের ভাইবোনদের কাছে আমাদের নব নব সৃষ্টির রস আমরা পরিবেশন করতে পারছি না। বঙ্গ-ভারতী যেন উভয়ত্রই হোমইল্যান্ড'। এ এক অসহনীয় অবস্থা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে যদিও প্রতিনিয়ত নানা আন্দোলনের ধুম-ধাড়াক্কা লেগেই আছে—তথাপি উভয় বাংলার ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথে যে রাজনীতি-সৃষ্ট বাধা রয়েছে তার অপসারণের জন্য আমরা এযাবৎ কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হই নাই।

কিছুদিন পূর্বে আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় মহারাজ যখন এপারে এসেছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তিনি শুধু যে সুবিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন তাই নয়, আদর্শনিষ্ঠা ও চরিত্রগুণে তিনি উভয় বাংলার প্রগতিশীল জনমন্ডলীর কাছে তুল্যভাবে সমাদৃত ছিলেন। সেই জন্য আমি তাঁর এককালীন শিষ্য হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করি যে দুই বাংলার মধ্যকার এই অবাঞ্ছিত সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক-আউটের অপসারণের জন্য উভয়ত্র জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি যেন সচেষ্ট হন। তিনি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে বলেছিলেন—তুমি খুব সঙ্গত প্রস্তাব করেছ কিন্তু এদেশে বা ওদেশে কোথাও শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে আপাতত এ বিষয়ে কোন রেসপন্স পাব বলে আমার মনে হয় না।' আমি বলেছিলাম, শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে কোন রেসপন্স যদি আপাতত না-ও পাওয়া যায় তবু উভয় দেশের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষেরা এই বিষয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করলে আজ না হোক ফলে হয়ত সুফল পাওয়া যাবে। এবং এই প্রকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা উভয় দেশের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষেরা পরস্পরের সান্নিধ্য অর্জন করতে পারব।' তিনি বলেছিলেন যে, এ বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হবেন। কিন্তু তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর পরপারের ডাক এসে গেল। দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের কাছে আমাদের দাবী, তাঁরা এই অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজে অগ্রণী হোন।

আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতি সমিতি করেছিলাম। কিন্তু তেইশ বছরের মধ্যে একটা ভারত-পাকিস্থান সংস্কৃতি সমিতি কিংবা অন্ততঃপক্ষে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে যে কোন একটি কার্যকর সংস্থা স্থাপনের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। এটা পরম পরিতাপের বিষয়। নানা দেশে সাংস্কৃতিক মিশন পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু উভয় বাংলায় সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের ব্যবস্থা হিসাবে সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণ বা আমন্ত্রণের দিকেও এ যাবৎ কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নাই। আমাদের মনে হয়, সরকারী এবং বে-সরকারী পর্যায়েও প্রতি বৎসর উভয় বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক মিশন বিনিময়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

দু ভাইয়ের হাঁড়ি পৃথক হয়েছে। সেটা মেনে নিয়েই আসুন আমরা দুই পরিবারের জীবনধারাকে সহজ স্বাভাবিক ও সুন্দর করে তুলি। এ বাড়ীতে রাঁধা অন্নব্যঞ্জনের ভাগ ওবাড়ীতে আসুক, ওবাড়ীর এবাড়ীর লোকের রসনাতৃপ্তি ঘটাক। উঠান ভাগ হয়েছে বলে উৎসবের কোলাকুলিটাও বন্ধ হবে?
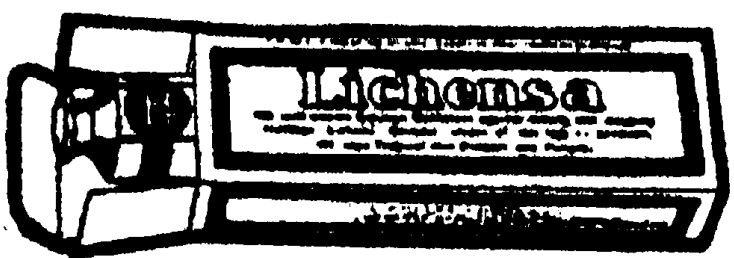
মুখের মেলা

আঁধারের প্রাণীরা

চারটে আনডা বেচে এক টাকা দিয়ে এক কেজি আটা কিনে এনে জল দিয়ে গুলে নিয়ে খোলাচি পিঠে করতে বসেছিল শের আলীর বউ লতিমন বিবি। প্রায় সামত্ত হয়ে-ওঠা মেয়েটা পাড়ার পাঁচজনের বাঁশবাগান থেকে বাঁশের খোল কুড়িয়ে এনে রেখেছিল ঝাঁকা ভর্তি করে— তাই দিয়ে উনুনে জ্বাল দিচ্ছিল সে। কালো কোকিলের মতন মেয়ে—'ডাবোন' করে কলকাতার মেয়েদের পানা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরেছে। পেট-বার-করা বগলেী একটা 'বেলাউজ' গায়ে দিয়েছে, কপালে এঁকেছে একটা শুকতারা, মুখে ঘষেছে মায়ের গম বেচে কিনে-আনা হিমানী-পাউডার। মেয়েটার নাম তোতামন। তোতামন এত সাজগোজ করলেও ঠোঁট দুটো শুকিয়ে তার কুল-আঁটি। কাল সকাল থেকে তো কারো কিছু পেটে পড়ে নি। কাল সকালে ঢ্যাড়োস ভাতে দুটি ভাত খেয়ে লতিমন পাঁচ কেজি চালের বুচকি নিয়ে শহরে গিয়েছিল। গ্রামের হাট থেকে একটু কম দামে চাল কিনে এনে শহরে বেশি দামে বিক্রি করে সেই টাকায় খিদিরপুরের ডক এলাকা থেকে চোরাই গম কিনে এনে গাঁয়ের মানুষের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে সে। সংগে যায় তার ছোট জা নুরেখাতুনও। নুরেখাতুন ধড়িবাজ মেয়ে, মুখের বচন শুনলে কাঁচা কাঠে আগুন ধরে যায়। তার চোখের চাউনি দেখলে আর বাসের কন্ডাকটররা ভাড়া চায় না। লাস্ট বাসে ফেরার সময় যখন সমস্ত যাত্রীরা উপশহরটাতে নেমে যায় গ্রামের অন্ধকার নির্জন পথে, কন্ডাকটররা বড় জ্বালাতন করে গাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিয়ে মাত্র হেড লাইটটা জেলে রেখে। ডালকুত্তার মতন যেন ছিঁড়ে খায় মদগেলা মদ্দমানুষগুলো। ভাড়ার ক-আনা পয়সার জন্যে শুধু নয়, চাল-গমটা তুলে ছাদে কিম্বা সীটের তলার বাক্সর ভেতরে।

ছ'টা ছেলে-মেয়ে যেন কাকের মতন হা-হা করে, মা'র পাশে বসে। কাল থেকে খায় নি সব। কড়া থেকে তুলতে না তুলতে 'আমাকে দে মা— আমাকে দে মা, উ-শালা মোদো তো ঘোষেদের নারকোল চুরি করে খেয়েছ্যালো—অকে দিবি কেন বেশি? তোতো তো রহমানদের চার কলসী পানি বয়ে এনে দিয়ে চাট্টি খুদ-চচ্চড়ি খেয়ে এয়েছ্যালো—মোরা কচি ছেলে কাল থিনে শুক্কে আছি—খালি আঁজলা -আঁজলা করে পানি খেইছি—দে মা আর একখানা পিঠে, তোর পায়ে ধরি।'

'খা, তোরাই খা, আমার আর প্যাটে কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই!' ঠুকে সব বসিয়ে দেয় লতিমন। পরণে তার একখানা মাত্র সায়া। গায়ে একখানা ছেঁড়া মশারীর টুকরো ফেলে বুকটা নামমাত্র আড়াল করা।

ছোট জা শঙ্খ-কাটা করাত চালানো গলায় তার কুঁড়ের দাওয়া থেকে বলে, 'অ্যা! ছোঁড়াগুলো যেন ভাগাড়ের শকুনি— গরু পড়েছে যেন! একটু আর সবুর সয়নে। মানুষটা কাল থেকে পুলিস গুহোর ব্যাটাদের খপ্পড়ে পড়ে তাদের কাছে রাত গুজরান করে এলো—একটু থাক—জিরোক—না, খেঁকাম্মেকি!'

মোদো তার ছোট চাচীকে বললে, 'তুই শালী চুম্মার! তুই বাঁধন দিস?'

'ছোঁড়ার মুখ দ্যাখ! মুই তোর শালী?

'হাঁ, তুই শালী, তোর মা শালী, তোর বাপ শালী!'

হা-হা—হি-হি করে ছোড়-চাচী হাসতে লাগল।

শের আলী খোঁড়া পা-খানাকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে সন্ধ্যার বাঁশবন-ঢাকা অন্ধকারে ভুঁইকুঁড়ের দাওয়ায় খুঁটি

হেলান দিয়ে বসে রেডিওর গান শুনছিল আর ওদের রকম দেখছিল। তার কোনো কিছু বলার ছিল না। বউ তাকে 'বাপ' বলেছে তিন-তিনবার। কাজেই নাকি তালাক হয়ে গেছে। সে আলাদা থাকে। আলাদা শোয়। কিছু চাল-ডাল জোগাড় করে আনলে মেয়েটা রান্না করে দিত আগে—লতিমনের তাও বারণ হয়ে গেছে। বঁটি দিয়ে কুঁচোবে নাকি তাহলে মেয়েকে।

শের আলী কাঁচা বয়সেই চটকলের 'সারভিস' তুলে নিয়ে দিন-কতক খুব খেলে-দেলে বউ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করে। মাছ গোস্ত দুবেলা ভাত রমারম চলল। দোকানের দেনা শোধ হল। মদ আর তাড়ি গিলে এসে মারামারি করে খুন-জখম হল পাশের বাড়ির ডাকাত চেহারার লোক সাহাদত আলীর হাতে। সাহাদত ছুটে এসে কপালে গাছ-কাটারী মারলে শের আলীর। ছুটে গিয়ে পুকুরে না পড়ে গেলে জবাই করে দিত। অথচ সামান্য ব্যাপার নিয়ে বচসা বাধল। ছোট বউ নাকি ঘোষেদের কাটা ধানের পাই থেকে এক চুবড়ি ধানের শীষ কেটে এনেছিল। ঘোষেরা সাহাদতদের ক্ষেতের ধান দেখতে বলে গেছে। তাদের বাস্তুর নিচেই জমি। ধান চুরির কথা বলতেই নুরেখাতুন গালাগালি শুরু করলে। 'কুন আঁটকুড়ির ব্যাটা বলে র‍্যা—মুই ঘোষেদের ধান চুরি করিচি! ঘোষেরা কি তাদের ভাতার হয়, না 'নাঙ' (নাগর) হয়?' তারপর দু বাড়ির মেয়েতে মেয়েতে পচাল গালাগালি—দুপুরে পুরুষরাও লেগে গেল। কুৎসিত চিৎকার, অশ্লীল কলহ।

শের আলী তাড়ি গিলে ঘরে ফিরে বললে, 'হাঁর‍্যা শালা, সাহাদত, তুই যেতি সাধু লোক হবি তবে তোর মাগকে লিয়ে রায়পুরের মেলা থেকে একসঙ্গে 'ফটক' (ফটো) তুলে ছেলি কেন রে শালা? লজ্জা করে না? মোর ভাই তোর বাপ হয় শালা—আয় না তোকে গাছ-কাটারী দিয়ে কুচোবো আজ।'

ঝগড়ার পরিণতি খুন-খারাবী। হাসপাতাল থেকে ফিরে মাত্র কোর্ট দুই মামলা হবার পরই হঠাৎ গাঁয়ের মোড়লের পোষা গুণ্ডা সাহাদত একশো টাকা দিয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিলে। কারণ মোড়লকে এর মধ্যে জড়াবার জন্যে মস্ত এক দালাল ঢুকেছিল।

সেই টাকায় ঘরের খোলা কিনলে শের আলী। সারভিসের টাকা ফুরোতে আবার ঘরের খোলা বেচে দিলে সে। ঘরের চাল ফাঁকা, বদলি কাজে যেয়ে-যেয়ে হঠাৎ এক দিন নিজ-কাজ পাবার লোভে ইউনিয়নের বিপক্ষে কোম্পানীর দালালদের প্ররোচনায় পড়ে মার খেয়ে সে ঠ্যাং ভেঙ্গে এসে পড়ল একেবারে 'হায় বাবা' হয়ে লতিমনের কোলে। ঘর ফাঁকা, শিয়ালে না বাঘরোলে কোলের তিন মাসের ছেলেটাকে রাত্রে তুলে নিয়ে পালাল। ঘর ফাঁকা, পেটেও দানাপানি নেই। কতদিন আর পেটের জ্বালা সহ্য হয়? শের আলীর ছোট ভাই কদম আলী গাছ-ছাড়ানো কাজ করে, নারকোল পাড়ে—তারও কাজ নেই সব দিন। এক রাত্রে বাবুজান কয়ালদের গাছ থেকে নারকোল চুরি করার সময় ধরা পড়ে কদম বেদম মার খেয়ে জেল-হাজতে চলে গেল। নুরেখাতুনেরও কোলে তিন-তিনটে ছানাপানা। দু জায়ে যুক্তি করলে চাল বেচতে যাবে শহরে। নইলে বাল-বাচ্ছাগুলো মারা যাবে ভুখে। হাঁস-মুরগী আর বকরী খাড়ী বেচে টাকা নিয়ে চাল কিনে কর্ডন পুলিশের চোখ এড়িয়ে তারা শহরে যেতে-আসতে লাগল। তাদের চলন-বলন পালটালো। পাড়ার মেয়েরা হাঁ করে তাদের কথা শোনে। শহরে নাকি কেউ কারু ধার ধারে না। মেয়েরা যাকে ইচ্ছে নিয়ে হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়! অন্ধকার বলে কিছু নেই সেখানে।

তারা মাঝে-মাঝে আপেল বেদানা কিনে আনে। মাংস কিনে আনে। নুরেখাতুনের গয়না হল। তার স্বামী জেল থেকে ফিরে এসে কিছুই আর করে না, শুধু ছেলেগুলোকে কাঁধে-কাঁখে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের সারাদিন দেখা-শোনা করে। সকাল বেলাতেই গরম ভাত চাট্টি খেয়ে নুরেখাতুন আর তার বড়জা লতিমন বিবি ভাল রঙদার শাড়ি-'বেলাউজ' পরে, মুখে পাউডার হিমানী ঘষে, স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে চালের বুচকি নিয়ে চলে যায়।

তারা পেশাদার হয়ে যাবার পর আর চাল-গমের পুঁজিও দরকার হয় না নাকি।

হঠাৎ সংবাদ ছড়ায় পাড়ার মানুষদের কাছে, লতিমন বিবি নাকি শহরের বাস স্টপের কাছে একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিল। তাতে একশো টাকা ছিল। সেই টাকা দিয়ে লতিমন 'বিবি একটা লোকাল ট্রানজিসটর সেট রেডিও কিনে আনলে। নুরেখাতুনের চেহারা ভাল, পাতলা সাঁখের মতন দেখতে। তার কাছেই নাকি চাল-গমের খদ্দের লাগে বেশি। তাই ঘোষেদের দোকানে তার সোনার হার, পেটি, রুলি বন্ধক যায় মাঝে-মধ্যে।

নুরেখাতুন বলে, 'রাজারও হাতটানা পড়লে হাতী বন্ধক দেয়!'

গতকাল আর নুরেখাতুন যায় নি বড় জার সঙ্গে। তার শরীর খারাপ। পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আরো কি সব নাকি ভয়ানক রোগ দেখা দিয়েছে। সুঁই ফুঁড়ে গেছেন ডাক্তার মানিক ভক্ত। সাবধান করে গেছেন যেন নুরেখাতুনের ছোঁওয়া জিনিস কেউ ব্যবহার না করে—কেউ যেন এঁটো-কাটা না খায়।

লতিমন নুরেখাতুনের গোপন ব্যাধির কথা শুনে মনে-মনে শঙ্কিত হয়। দু-তিন বছরের কুৎসিত অন্ধকারের চিত্রগুলো তার মনের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু পেট যে মহাকাল, সে যে কিছুই শোনে না।

উনুন নিভিয়ে এসে লম্ফের তেল শুকিয়ে গেছে বলে অন্ধকারে বসে থাকে খাওয়া-দাওয়া সেরে। জোনাকিরা আলোর জাল বোনে বাঁশবনের মধ্যে। কদম গাছটার ডালে অসংখ্য ফুল ফুটেছে—তার গন্ধে ম-ম করে চারদিক। ডাহুক ডাকছে ডোবাটার ওপারের বন থেকে। ছেলেরা কলহ করছে। ধাদাবাদি করে কিনে আনা তাদের রেডিওটাতে কদম জোর দিয়ে বিবিধ ভারতীর লোহা লক্কড় বিক্রির গান আর বিজ্ঞাপন বাজাতে থাকলে লতিমন নিজে রেডিওটা বন্ধ করে দেয়।

মেয়ে তোতামন মায়ের গায়ের ঘামাচি মারতে-মারতে শুধোয়, 'কাল কোথা রাত ছেলি হা মা?'

'গুহোর বেটা এক ব্যাটা ধরে তার 'কটোরে' (কোয়ার্টারে) লিয়ে গেল। মোর চালকটা লিয়ে রান্না করতে বললে। খাসীর গোস্ত আনলে মোকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে যেয়ে। লোকটার দুর্জয় পাহাড়-পানা গতর। ইয়া বড়-বড় ঝাঁটার পানা গোঁফ!'

বলে খিল-খিল করে হাসতে থাকে লতিমন। লতিমনের খাটো পাতলা চেহারা। সাত-আটটা ছেলের মা তাকে দেখলে কেউই বুঝতে পারে না। যৌবন এখনো অটুট। মেয়েও মায়ের কথায় হাসে। একটা অন্ধকার কালো সড়ক তার চোখে পড়ে যেন। মা তাহলে টাকা বাগিয়ে এনেছে লোকটার কাছ থেকে। তাকে গাঁয়ের মোড়ল টাকা দেয় দুটো একটা করে। আর লোকটা তাকে...

লতিমন বলে, 'লোকটা হিন্দুস্থানী। বললে দেশ-গাঁয়ে বউ-ছেলে জমি-জিরাত আছে। বলে শহরে কম্ম করে জীবনটা
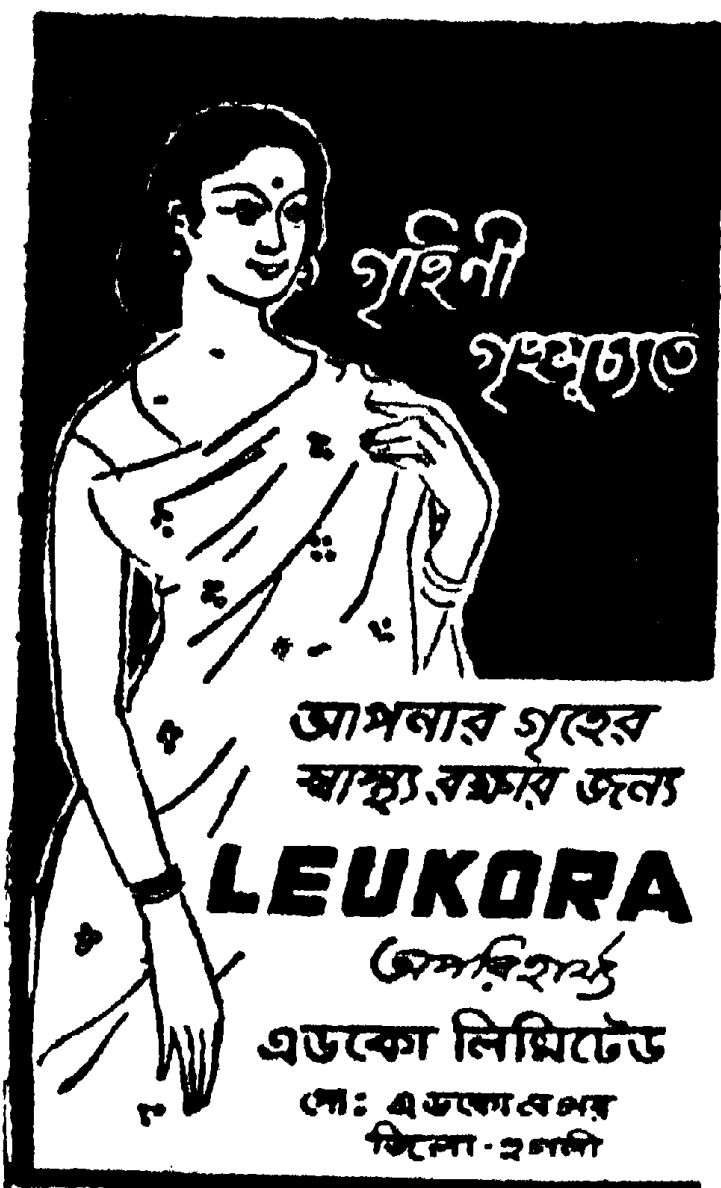
বিয়েখাই গেল। তার তক্তাপোষে কি ছার-পোকা রে বাবা। সারা রাত কি জ্বলালে!'

শের আলী বলে উঠল, 'ভাল! ভাল! 'নেকি'র (পুণ্যের) কাজ হচ্ছে!'

'তুই চুপ কর। তোর কথার কে ধার ধারে র‍্যা গোলাম! মুই কি অ্যাহন তোর কোলের মাগ আছি যে শাসাবি? মোকে তুই খাওয়াস, না 'পে'দাস' (পিন্ধন) যে বাঁড়িয়া-বাঁড়িয়া বাত মারবি, এইসা দিন গুজার গিয়া! আমাকে কি তুই 'তাল্লাক' (তালাক) দিবি, তোকে মুই তাল্লাক দিইচি 'বাপ' বলে—সাক্ষী রেখে। একেবারে তিন তাল্লাক—তুই মোর এখন বাপ 'সম্পর্কে'র—বাপের পারা চুপ করে থাক। তামুক টান ভুড়ুক-ভুড়ুক করে—বুড়ো-হাবড়ার মতন!'

'বেরো মাগী তোর আমার ভিটে থেকে? এটা কি তোর বাপকেলে ভিটে?'

'বাপকেলে লয়? তুই তো মোর বাপ, তোর নামে বক্সু!' বলেই হি-হি করে হাসতে থাকলে নুরেখাতুনও লতিমনের হাসিতে যোগ দেয়।

'বাপ বলা তোর আজ ঘোচাবো রাতের বেলা, দাঁড়া!'

'আসিস না কাছে, জোড়া পায়ের লাথি মেরে তোর 'চাবাকি' (দাঁতের পাটি) ছোড়িয়ে দোব তাহলে মুই!'

'আচ্ছা!' শের আলী উঠে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে অন্ধকারে নেমে গেল। আস্ত অন্ধকারের প্রাণী যেন সে একটা।

খানিকটা পরে কি যেন হাতে করে এনে বসে-বসে খেতে লাগল অন্ধকারেই; চাবুসে-চাবুসে শব্দ করে! পাকা কলার গন্ধ বার হচ্ছে।

ছেলেগুলো সচকিত হয়ে ওঠে। মেয়ো মায়ের কানে-কানে বলে, 'শালা, পাকা কেলা খাচ্ছে—একেবারে এক কাঁদি এনেছে। বোধ হয় ঘোষেদের বাগান থেকে কাঁচা কেটে এনে বন-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে-ছ্যালো। আজ পাকতে এনে আমাদের দেখিয়ে-দেখিয়ে খাচ্ছে। প্যাটে শালার 'পাশুল' হবে।'

মেয়েটা কাছে এসে তার পেট কাপড়ের ভেতর থেকে একটা পিঠে বার করে নিয়ে বাপের হাতে গুঁজে দিলে শের আলী খুশী হয়। এক ছড়া কলা পট করে ছিড়ে নিয়ে তার হাতে দেয়।

সে কলাটা এনে মাকে দেখায়। মা বলে, 'ফেলে দে। অর কেলা খেলে প্যাটে 'টাইফর' ব্যামো হবে। তিন-চার দিন প্যাটে অর কিচ্ছু পড়ে নে—সুরেমী খিবির কাছ থেকে 'আসাম' (ফেন) চেয়ে খেয়ে এয়েছে —আজ প্যাট ভরে খাক।'

আরো দু ছড়া কলা অন্ধকারে ছুঁড়ে দেয় শের আলী ওদের গায়ের ওপরে। ছেলেরা কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নেয় কাঁত-কোঁত করে।

তারপর সকলে শুয়ে পড়ে চট আর খেঁজুর পাতার চাটাই মেলে—ময়লা কাঁথা বিছিয়ে।

মশায় শের আলী সারা রাত ঘুমোতে পারে না। বসে-বসে গা চুলকোয়।

মশারীর ছেঁড়া জায়গাগুলো ঝাঁটা কাঠি গুঁজে সেলাই করে তার মধ্যে পড়ে ওরা সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

শের আলী রোজ ভাবে, রেডিওটা নিয়ে পালাবে সে—বেচে দেবে কাউকে পঁচিশ টাকা দিয়ে। পঁচিশ দিন কোথাও কাটাবে—তবু তো পঁচিশ দিন একটু খেয়ে-দেয়ে বাঁচা যাবে!

কিন্তু লতিমন গানটাকে মাথার কাছে নিয়ে শুয়ে আছে।

এক ছড়া কলা রেখেছে শের আলী লতিমনের জন্যে। অনেক লোভ সামলে, মনে একটা লোভ আছে আজ তাকে পাবার।

সবাই ঘুমোচ্ছে এখন অকাতরে।

ছোট বউ শুধু কাতরাচ্ছে মাঝে মধ্যে।

যদি লতিমনেরও ঐ রকম হয়? কাউকে বলে হাসপাতালে কাজ করি, কাউকে বলে চাল বেচতে যাই—আসলে ওরা দুজনে বেহালায় এক কামরা ঠিকে ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছে। ভাড়া ঠিক নয়। কমিশন ব্যবস্থা আছে মাসির সঙ্গে। খদ্দের আনলেই তার এক টাকা। আর খদ্দেরের কাছ থেকে বখসিস আদায় করে নেয় কাকুতি-মিনতি করে। মদ খাইয়ে বেশি টাকা নেয়। কুলী-কাবাড়েরা নাকি টাকা দিতে না পেরে মার খেয়ে অপমান হয়ে চলে যায় প্রায়ই। সারা দিন ওরা শিকারের খোঁজে এখানে সেখানে বেড়ায়। ফেরার মুখে চাল গম মাছ আনাজ কিনে আনে। লতিমনের কোমরের তবিলে বাঁধা আছে অনেক টাকা। কুড়ি-পঁচিশ টাকা পর্যন্ত।

আজ যা হয় হবে—লতিমনের কোমর থেকে হয় টাকা খুলে নেবে—নয়তো রেডিওটা। তারপর দে চম্পট কারখানার দিকে। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনোক্রমে দৌড়তে হবে অন্ধকারে। ধরতে পারলে বেদম মারবে ওরা। লতিমন বুকে বসে গলা টিপে ধরবে আর মোদোটা শুধু মুখের ওপরে ঘুঁষি চালাবে। একবার একটা মুরগী চুরি করে নিয়ে খেয়ে চাট করে পাশের গ্রাম থেকে তাড়ি খেয়ে আসতেই তাকে ধরে অমনি করে মেরে দাঁত ভেঙে দিতে সে রেগে-মেগে খুন হয়ে কেস করতে গেল পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে।

পঞ্চায়েতের বাবুরা তার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। কেস নিলে না। বললে, বউ দাঁত ভেঙে দিলে কেস হয় না শের আলী। মাথা কেটে নিলে কেস করে যেও—বিচার করে দোব!'

শালাদের কথা শোন! মানুষ না বোম্লেক সব!

শের আলী গুঁড়ি মেরে গুঁড়ি মেরে লতি-মনের বিছানার মধ্যে এগুতে শুরু করলে। লতিমনের কোমরের তবিলে হাত দিতেই সে জেগে গিয়ে খপ করে হাতটা চেপে ধরলে। বললে, 'কে তুই?'

'মুই রে, তোর শের আলী! এক ছড়া পাকা কেলা তোর জন্যে রেখেছি—খাবি? চেল্লাস নি, আল্লার কসম, তোর পায়ে ধরি!'

কলাটা নিয়ে মাথার ধারে রাখলে লতিমন। পাশ ফিরে শুয়ে বললে, চলে যাও, কেউ জানলে 'গোনা'র (পাপের) কাজ হবে।'

'কে আর দেখতেছে এখন! গায়ে নাকি ব্যথা, তোর পা টিপে দোব।'

লতিমন আপত্তি করলে না। এই দুর্বল অসহায় পাগল-ছাগল লোকটাকে তিরস্কার করতে এখন যেন বাধল। তার যেন কেমন এক রকম দয়া হতে লাগল আজ। পেটের ন্যাওটা ছেলেটার মতন যেন জ্বালাতন করতে এসেছে।

শের আলী লতিমনের বুকে মুখ ঘষে-ঘষে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ছোট বউ নুরেখাতুন অসহ্য যন্ত্রণায় তখন কাতরাচ্ছে শুনতে পেয়ে শের আলীর পিঠের ওপরে যেন আদরের হাত বুলোতে থাকে লতিমন।

ডাহুক ডাকতে থাকে গভীরে—কররুরর — কোয়াক কোয়াক — কোয়াক কোয়াক!

—আবদুল জব্বার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। যে স্বল্প কিছু মানুষের স্বাক্ষর তাঁদের প্রতিভার মহিমায় স্বর্ণাক্ষর হয়ে ওঠে, নারায়ণ তাঁদেরই একজন। নারায়ণ অকালে মাত্র তিপান্ন বৎসর বয়সে নিতান্ত আকস্মিকভাবে আমাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন। বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি হাহাকার যেন সামুদ্রিক ঝড়ের মত উঠে সমগ্র বঙ্গভূমিকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তানকে মথিত করে দিয়ে চলে গেল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর নেই। এ এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। সমগ্র বঙ্গে—পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমবঙ্গ চট্টলের প্রান্তভূম থেকে বালেশ্বরের সমুদ্রতট পর্যন্ত—উত্তরবঙ্গ থেকে আসাম পর্যন্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষাভাষীদের পরম প্রিয়জন ছিলেন। তিপান্ন বছর বয়সেই জনগণ মানসের এক অসাধারণ প্রীতির অধিকার অর্জন করেছিলেন।

বাংলা ছোটগল্পে, উপন্যাসে, সমালোচনা সাহিত্যে, রস রচনায়, রম্য রচনায় সাংবাদিকতা সাহিত্যে বলতে গেলে সাহিত্য-ক্ষেত্রের প্রায় সকল বিভাগেই নিপুণ দক্ষতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে বিচরণ করেছেন। জয়-পরাজয়ের কোন প্রশ্ন এখানে অবান্তর তবুও বলব বিজয় গৌরবে তিনি রথীর মর্যাদায় রথ-চালনা করেছেন। যাঁরা সর্বাগ্রগণ্য তিনি তাঁদেরই অন্যতম জন। বিনম্র তিনি চিরকাল; কিন্তু, মর্যাদার ক্ষেত্রে, সম্পদ বা পদাধিকারে নয়, স্বকীয় গুণ ও তপস্যা বলে একটি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাটকও তিনি লিখেছেন—রামমোহন তাঁর সুন্দর এবং সার্থক নাটক। এখানেও তিনি পিছনের মানুষ নন।

আবির্ভাব তার ১৯৩৮।৩৯ সালে। ছোটগল্প 'নিশীথের মায়া'ই বোধ করি প্রথম গল্প, বের হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। এই সময়েই তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে কলকাতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এতে ভর্তি হন। সে কালের 'শনিবারের চিঠি' বলবিক্রমে প্রতাপপ্রতিপত্তিতে সাহিত্য-সাধনার সুমহৎ তপস্যায় সে এক আশ্চর্য খ্যাতিতে অধিষ্ঠিত। শনিবারের চিঠির আক্রমণাত্মক সমালোচনার ধারার সঙ্গে তার সৃষ্টিমূলক সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে একটি অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সম্পাদক সজনীকান্ত সাহিত্যে এক বিক্রমশালী পুরুষ। আচার্য মোহিত-লালও তখন সজনীকান্তের অগ্রজ বা আচার্যের মত তাঁর সঙ্গে যুক্ত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বনফুল বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রমথনাথ বিশী পরিমল গোস্বামী স্বর্গতঃ ডাঃ সুশীল দে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক—সকলেই শনিবারের চিঠির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সংযুক্ত। এই শনিবারের চিঠিতেও আশ্চর্য স্নেহ সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যকে যদি মণি মাণিক্য হীরা পান্নার সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে সজনীকান্তকে বলব অভ্রান্ত জহুরী। নারায়ণকে এক-দৃষ্টিতেই চিনেছিলেন এবং তাঁর আসরে স্থান দিয়েছিলেন। এখানে বাংলা সাহিত্যে অন্যতম পণ্ডিত সমালোচক ও কবি জগদীশ ভট্টাচার্যের নাম করতে হবে। নারানের সঙ্গে আমাদের বয়সের পার্থক্যের সঙ্কোচ তিনিই কমিয়েছিলেন। নারায়ণ সসম্ভ্রমে আসন গ্রহণ করেছিল কিন্তু শনিবারের চিঠির মারাত্মক সমালোচনা ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নি। সে-কথা থাক। এখানে আমি আমার সঙ্গে নারানের সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা বলি। না, সেও আপাতত থাক, তার আগে বলে নি যে, সেটা সেই ১৯৪০।৪১ সাল আর আজ হল ১৯৭০ সাল, পরিমাপে তিরিশ বৎসর দীর্ঘ একটি কাল—এই দীর্ঘকাল নারায়ণ ক্রমান্বয়ে এক ঊর্ধ্বগ গতিতে গতিশীল ও নিরন্তর চলমান। আজ ১৯৭০ সালে নারায়ণের তিরোধান দিবসে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছি এই তিরিশ বৎসর কালে নারায়ণে গতিপথের রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়েই চলেছিল, কোথাও নেমেছে এমন একটি ঢাল বা খাঁজ তো চোখে পড়ছে না। নারায়ণ জীবিত থাকলে তার সাহিত্য কীর্তির একটি শৃঙ্গে উপনীত হতে পারলে সে শৃঙ্গে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের ছটা পড়ে নূতন কোন চিত্রকূট সৃষ্টি করত তাতে সন্দেহ নেই।

একাদিক্রমে তিরিশ বৎসর উপরের দিকেই উঠেছে যার পথ এবং যার যাত্রা সমাপ্ত হবার আগেই পথিমধ্যে যাকে গৌরবের মুকুট অঙ্গের বর্ম দিয়ে চির-বিশ্রাম গ্রহণ করতে হল তার তুলনা মহাভারতের সব্যসাচীর মহাপ্রস্থানের পথে শয়নের সঙ্গে তুলনা করলে কিছু আতিশয্য প্রকাশ করা হবে এটা সত্য—কিন্তু তা হোক তবুও ওই তুলনাটিই বারবার মনে আসছে। এবং তাই আমি ব্যবহার করছি। পার্থক্য, অনেকই আছে। আবার সাদৃশ্যও আছে। পার্থক্যের একটা কথা বেশী করে মনে হচ্ছে লেখার সময়। মৌষল পর্বে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অভাবে গাণ্ডীব তুলতে অক্ষম হয়ে লজ্জিত হয়েছিলেন, বেদনায় ভেঙে পড়েছিলেন, নারায়ণ তা পড়েন নি। তা ছাড়া পার্থক্য তো অনেক, নারায়ণ দেবতাশ্রিত জন নন, নারায়ণ রাজপুত্র নন, নারায়ণ অনেক কিছু নন অর্জুনের মত। তা না হন। বিনয় গুণে নারায়ণের তুলনা অনায়াসে মহাভারতের চিরনবীন নায়কটির সঙ্গে দিতে পারি। বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; বাঙালী ঘরের সরকারী চাকুরে পিতার সন্তান তথাপি তিনি বিংশ শতাব্দীর ভারতজীবনের স্বাধীনতার আবেগ এবং কামনাকে বুকে করে নির্ভয়ে জীবন তরীকে ভাসিয়েছিলেন: "বন্দরের কাল হল শেষ" বলে যে আদেশ ধ্বনিত হয়েছিল সে আদেশ তিনি শুনেছিলেন। যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন সমগ্র পৃথিবীতেই মানুষের মুক্তিকামী জীবনধারা আপনাপন দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের এক প্রান্তরের সমতলে নেমে এসে মিলিত হয়ে বিশ্বমানবের মুক্তি-গঙ্গায় পরিণত হতে চাচ্ছিল। যার সম্মুখে ছিল সাগর সঙ্গমের মত এক মহাতীর্থের স্বপ্ন বলুন স্বপ্ন পরিকল্পনা বলুন পরিকল্পনা। নারায়ণের জীবনের ভাবভাবনার পালে এই বাতাসের টান এসে লেগেছিল এবং সেই দিকেই মুখ ফিরিয়েছিল। ১৯১৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত ভারতের সকল মুক্তিকামী সাধকই এই সর্বমানব মুক্তির আদর্শকে—ভারতবর্ষের পরাধীনতা মোচনের আদর্শ ও তপস্যার সঙ্গে এক করে নিতেই চেয়েছিলেন। তরুণ লেখক নারায়ণ সারস্বত মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ মুখে সেই বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে জীবন-ভাবনাকে ওই মুখী করে নিয়েছিলেন।

শনিবারের চিঠি সাহিত্যে রাজ-নৈতিক চিন্তা বা তত্ত্ববাদকে প্রশ্রয় দিত না এটুকু সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে কম্যুনিজম তত্ত্ববাদসম্মত মতবাদ। নারায়ণ এখানে যখন এল এবং এই

মণ্ডলীর মধ্যে যখন সাদরে গৃহীত হল তখন থেকে সজনীকান্তের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোনদিন কোন একটি ক্ষেত্রেও নারায়ণের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক বা বিচ্ছেদ দেখা দেয় নি। তার প্রতিটি রচনাই সর্বমানব মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল; (কম্যুনিস্ট আদর্শ ইচ্ছা করে বলছি না) তথাপি শনিবারের চিঠিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হবার পথে কোন বাধা দেখা দেয় নি।

বাংলা সাহিত্যে এ দিক দিয়ে বিচার করলে অনায়াসে তিন ভাগ করা যায়—এক যাঁরা সাহিত্যে কোন রাজনৈতিক মতবাদকে স্থান দেন না, দিতে চান না। দুই যাঁরা দিতে চান, তিন যাঁরা এই স্থান দেওয়ার বিরোধী। নারান দৃঢ়ভাবেই তাঁর ওই মতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু কোনদিনই কোন দলের সঙ্গে কোন বিরোধ তাঁর হয়নি। শনিবারের চিঠির আসর থেকে প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দল পর্যন্ত তাঁর গতি ছিল অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ। মন্বন্তর এবং মহাযুদ্ধের পরিবেশের মধ্যে মানব ভাগ্যের চরমতম লাঞ্ছনার কালে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর পক্ষে নিছক রসবাদী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রগতির পথই ছিল তাঁর বিধি নির্দিষ্ট পথ।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমরা উভয়ে একটি পরম নিবিড় স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলাম। আমার জীবনের গতিপথ তার জীবনের গতিপথকে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। কিছুকাল একসঙ্গেই এক পথে চলেছি।

অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি ঐতিহাসিক নাম ও প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে আমি ১৯৪২ সালে যুক্ত হয়েছিলাম এ কথা সকল জনের জানা। মনে পড়ছে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল জলপাইগুড়ি। তখন সেখানে সে অধ্যাপনায় সবে ব্রতী হয়েছে। সেখানেই জানতে পারি সে সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রবাদ সামন্ততন্ত্রবাদ প্রভৃতির বিরোধী এবং সকল মানুষের সমান অধিকারে সে বিশ্বাসী। তার সাহিত্যে সে সেই আশ্বাসের সৃষ্টি করবার স্বপ্ন দেখে। হ্যালিডে পার্কে (বোধ হয় ১৯৪৪ সালে) অ্যান্টিফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠানটি নাম বদল করলে। প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন নাম নিতে চাইলে। তখন বহুজনের মনে যুদ্ধকালে এই সংঘের কিছু আচরণের জন্য প্রতিবাদ জেগেছে, সন্দেহ জেগেছে। আমার মনেও জেগেছে। হ্যালিডে পার্কে সংঘের প্রকাশ্য সম্মেলনে আমি আমার প্রতিবাদ ও মত জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। নারাণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন। বিমর্ষ মুখে সে দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। কয়েকটি কথা বলে চলে গিয়েছিল। পথ ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, মতপার্থক্য তো ঘটেই ছিল কিন্তু মনের মধ্যে প্রীতির সূর্য মুহূর্তের জন্যও রাহুগ্রস্ত হয় নি। এবং এই যে একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত এবং বিস্ময়জনক সত্য অর্থাৎ মতভেদ হল পথ ভিন্ন হল তবু মনের মধ্যে মালিন্যের বিভেদের কোন ছায়া বা দাগ পড়ল না—এর জন্য সকল উদারতা একক নারায়ণের নিজস্ব। সুদর্শন যৌবনসমুজ্জ্বল যুবক, একটি আশ্চর্য প্রসন্নতায় প্রসন্ন, রসকৌতুক বোধে সুদীপ্ত, নম্রতায় বিনম্র, মর্যাদায় অলঙ্ঘনীয়, রুচিতে সুমার্জিত, এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব নারায়ণ। তার কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের সুরের মিষ্টতা ছিল, বাকভঙ্গিতে সুরভিত মাত্রার ছন্দ ছিল—বাক্যবিন্যাসে মণিমাল্য রচনার শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ ছিল। পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল সে অসামান্য। বুদ্ধি ছিল তার সূক্ষ্মতম সূচের মত। বাগ্মিতায় তার তুল্য উজ্জ্বল কেউ ছিলেন না আমাদের বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে। তার হাসিটি আগে ছিল কিছু সলজ্জ। হাসলেই মুখের সামনে হাতের তালুর আড়াল দিত। এমন শালীনতা বোধ নেই দেখি নি সাহিত্যিক সমাজে। যাঁরাই তাঁর জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের সকলকেই তিনি দাদা বলতেন। এবং সম্বোধনের স্বরের মধ্যে একটি আন্তরিকতা আপনা-আপনি যেন উৎসারিত হয়ে স্পর্শ করত।

নারায়ণ সব মিলিয়ে অসাধারণ এবং সারস্বত মন্দিরে আরতির থালায় কর্পূরের আরতি শিখার মত পরমাকাঙ্ক্ষিত আলোকশিখা। অকস্মাৎ নিভে গেল।

এক সময় চার পাঁচটি তরুণ আমার কাছে আসত; প্রায় প্রতিনিয়তই আসত। তার মধ্যে চারজনকে "আমার কালের কথা" নামক বইখানি উৎসর্গ করা আছে। বইখানি লিখেছিলাম বিশেষ করে নারানেরই তাগিদে। তার বিবরণ বইখানির মধ্যেই আছে। আশ্চর্যের কথা;—না; আশ্চর্য কেন? একটু বিচিত্র সংঘটন; যে তিনজনের নাম তিন অক্ষর দিয়ে রচিত এবং একই অক্ষর দিয়ে নির্মিত। ন র এবং ন। নারায়ণ বা নারান, নরেন ও নীরেন। আর একজন ছিল সন্তোষ ঘোষ। আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের সামনের ঘরে বসে কত আনন্দময় প্রহর যাপন করেছি। ডাঃ নীহার গুপ্ত সেও নারায়ণের অন্যতম প্রিয় বন্ধু, তাকেও আমার কাছে নারায়ণই এনেছিল। ব্যক্তিত্বে সে সকল জনের পরমবাঞ্ছিত জন। এমন জন—এ-মানুষ বহু সহস্রের মধ্যে একজন। শতের গণনায় নারানের মত মানুষকে ধরা যায় না। বাংলা সাহিত্য তাঁকে নিয়ে অহঙ্কার করতে পারত। কিন্তু নিজের অহঙ্কার তাঁর ছিল না। অহঙ্কার তাঁর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়েছে। রসের ভিয়ানে তিনি ছিলেন সিদ্ধ শিল্পী। তিনি ছিলেন রসিক। তিনি এসেছিলেন আমার কুড়ি বছর পরে, চলে গেলেন আমাকে পিছনে রেখে। তাঁর অভাবে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক-রসরচনা রম্যরচনা গবেষণা সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সকল দিকে ও দিগন্তে একটি করে গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতার সৃষ্টি হল। এ শূন্যতা সহজে পূর্ণ হবে না। শুধু তো বর্তমানের অভাবই নেই এ শূন্যতার মধ্যে ভবিষ্যতের বৃহৎ প্রত্যাশাও যে ছিল নারায়ণের মধ্যে। সেই তো ছিল নূতন যুগের নূতন সমাজের কল্পনার রূপকার। নূতন যুগ সবে রূপ নিতে শুরু করেছে। ভাঙাগড়ার বিরাম নেই অন্ত নেই। বেদনা মর্মান্তিক—উল্লাস ও উৎকণ্ঠারও শেষ নেই। নারায়ণের দৃষ্টি ছিল সচেতন এবং সুদীপ্ত। পঞ্চাশ পার হয়ে সে জীবনের মধ্যাহ্নকালে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছিল। জীবনে পরিপক্কতার সঞ্চার শুরু হয়েছিল। মহৎ সৃষ্টির এই তো ছিল প্রকৃষ্ট লগ্ন। কিন্তু হল না। নারায়ণ চলে গেলেন। বাংলা সাহিত্যের আকাশে একটি অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে মধ্যপথে রাহুর মত মৃত্যু এসে গ্রাস করলে। আমরা যারা তার অনেক আগে জীবনের যাত্রা শুরু করে প্রায় আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি, তারা মর্মান্তিক বিচ্ছেদে কাতর হয়েছি। এই প্রস্থানের পথে অতি অকস্মাৎ সে আমাদের পিছনে রেখে অগ্রগামী হয়ে চলে গেলো। আজ সস্নেহে এবং গভীর শ্রদ্ধায় তোমাকে পরলোকে জ্যেষ্ঠত্বের অধিকার না দিয়ে উপায় কি? সেই বিশ্বাসে আমি তাকে প্রণতি জানাই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জীবনের প্রতিচ্ছবি

ফরাসী দেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পথের উদ্ভাবক। ফরাসী দেশের সাহিত্য ও শিল্পে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয় অচিরেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার ঢেউ জাগে। ফরাসী-ভাষার নব্য-রীতি উপন্যাস শৈলী নিয়ে আজ সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে এবং তার প্রভাব অন্য দেশের সাহিত্যেও পড়েছে। সম্প্রতি নাথালি সারোৎ এসেছিলেন এই দেশে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বর্তমান ফরাসী উপন্যাসের রূপ ও প্রকৃতি বিষয়ে যেটুকু জেনেছি সেই বিষয় এক সময় বিস্তারিত আলোচনার বাসনা আছে।

এইবারকার আলোচনায় যে আশ্চর্য উপন্যাসটি উল্লিখিত হচ্ছে তার লেখিকার নাম—'ভায়োলেৎ লেদুক'। এই লেখিকা জন্মসূত্রে অজ্ঞাতকুলশীল। এঁর পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত। নিদারুণ দারিদ্র্যে শৈশব ও যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে। তাঁর নিজস্ব শারীরিক আকর্ষণহীনতা এবং শারীরিক দৈন্য আবিষ্কার করে তিনি শিউরে উঠেছেন। আর সেই সব কথাই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক "La Batarde" নামক বহুল আলোচিত উপন্যাসে। এই নবীন প্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কামু, ককতো, সাঁ জিনে, সাত্রে। দ্য বুভোয়া প্রভৃতি ফরাসী সাহিত্যের প্রথম সারির লেখক-লেখিকাবৃন্দ।

এই উপন্যাসটির ভূমিকাও লিখেছেন মাদাম সীম দ্য বুভোয়া। তিনি বলেছেন—'১৯৪৫-এর গোড়ার দিকে লেদুকের একটি পান্ডুলিপি পাঠ করে আমি তার মৌলকত্ব, মনোভংগী ও রচনা শৈলীতে স্তম্ভিত হয়েছি। কামু লেদুকের "L'Asphyxie" তৎক্ষণাৎ তাঁর সাময়িকপত্রে প্রকাশ করলেন। জিনে, সাত্রে প্রভৃতি এই নতুন লেখিকার আবির্ভাব অভিনন্দিত করলেন। লেখিকার পরবর্তী বইগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, মনীষী লেখকবৃন্দের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। কঠোর সমালোচক-বৃন্দ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তথাপি এত সাফল্য সত্ত্বেও ভায়োলেৎ লেদুক প্রচ্ছন্ন রয়ে গেলেন। শোনা যায় এখন আর কোনো লেখকই অপরিচিত থাকেন না, কারণ যে কোনো ব্যক্তিই তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারেন। এইখানেই বিপদ। এর ফলে মাঝারি ধরণের লেখকরাই প্রতিপত্তি লাভ করেন, উত্তম বীজ আগাছায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাছাড়া অধিক ক্ষেত্রে সাফল্য ভাগ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আবার দুর্ভাগ্যেরও হেতু থাকে। ভায়োলেৎ লেদুক পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রয়াসী নন, বরং পাঠক আতংকিত হয়ে ওঠে, তাঁর গ্রন্থাবলীর নাম

> "L' Asphyxie" "L' Affamee" "Ravage"—

এই সব নাম আনন্দের বিপরীত। এইসব গ্রন্থের পাতা ওলটালে আপনারা পাবেন কলরব আর উত্তাপ, সেখানে প্রেমের নাম অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণা, জীবনের উচ্ছ্বাস হতাশার ক্রন্দনে বিস্ফোরিত। নিঃসঙ্গতার অভিশাপে সারা জগৎ একেবারে অপচারিত, দূর থেকে দেখলে মনে হবে সমস্ত রস নিঃশেষিত এক শুষ্ক মরুপ্রান্তর।

ভায়োলেৎ লেদুক মাদাম সীম দ্য বুভোয়াকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'আমি এক রসহীন মরু, আত্মকথনে মগ্ন।' মাদামের মতে তা সত্য নয়। লেদুকের রচনায় তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন, শুধু ধূসর মরু নয়, মরু পার হয়ে সৌন্দর্যের মুখোমুখি এসে পৌঁছবেন। মাদাম সীম দ্য বুভোয়া এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

> 'And whoever speaks to us from the depths of his loneliness speaks to us of ourselves. Even the most worldly or the most active man alive has his dense thickets, where no one ventures not even himself, but which are there: the darkness of childhood, the failures, the self-denials, the sudden distress as cloud in the sky."

এই উপন্যাসটিও তাই বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। জীবনের গোপন রহস্যালোকের গভীরে নেমে একটি নারী যে আশ্চর্য জগতের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে সে ঘোষণা করছে সেই অমৃত-লোকের বার্তা। যেন কেউ শুনছে না সেই কথা, তবু আন্তরিকতা পরিপূর্ণ এই ধারা-বিবরণী পরিবেশিত হচ্ছে।

গ্রন্থারাম্ভেই লেখিকা বলছেন—

> "My case is not unique; I am afraid of dying and distressed at being in this world I haven't worked, I haven't studies, I have wept, I have cried out in protest. These fears and cries have taken up a great deal of my time."

এই কথাগুলির মধ্যেই লেখিকার অন্তর্বেদনার পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি জানেন যেমনটি এসেছি তেমনই চলে যাবো শুধু যেসব অসম্পূর্ণতা আমাকে উৎপীড়িত করেছে সারাজীবন সেই অপূর্ণতার পূর্ণ হয়ে থাকব। মনে মনে ভেবেছি যদি পাথরের মূর্তি হয়ে জন্মাতাম। জীবনের অপূর্ণতা, অসাফল্য, ত্রুটি-বিচ্যুতি সারাজীবন আমাদের অন্তরকে দহন করে, সেই মর্মজ্বালা মনে নিয়েই আমরা এই জগৎ থেকে একদিন অন্য পারে পাড়ি দিই, কিন্তু প্রস্তরীভূত প্রতিমার ত' কোনো অনুভব নেই, জ্বালা নেই।

লেখিকা বলছেন—

"Virtues, good qualities, courage, meditation, culture. With arms crossed on my breast I have broken myself against those words."

এইভাবে আরম্ভ করে লেখিকা অতিশয় অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে জীবন-নাট্যের এক-একটি পাতা উলটিয়ে গেছেন।

"I am the unrecognized daughter of a son of good family."

বড়ঘরে ছেলের বিবাহবন্ধনের বাইরে জন্মানো এই মেয়েটির জীবনে অনেক কষ্ট। লেখিকা বলছেন, আমাদের ঘরখানি প্রায় ধ্বংসোন্মুখ, আমাদের প্রস্রাবের পাত্রটি ভোজনকালে সবজী রাখার আধার প্রকাশে তার এই রূপান্তর। ভ্যানিটি অব ভ্যানিটিস। আমার মা আর দিদিমা বুদ্ধিমতী—তাদের চরিত্র আছে। কুড়ি বছর বয়সেই তাঁরা জীবনের চাপে নিষ্পেষিত, আর সমস্ত দুর্ভাগ্য তাঁরা তাবিজ মাদুলি পরে কাটানোর চেষ্টা করছেন তাঁদের এই ছোট্ট মেয়েটির মাথায় রিবন বাঁধার কাজে এই তাদের অভিব্যক্তি। সাধারণ পার্কটি ও'দের রণক্ষেত্র। এইখানে ও'দের এই বাচ্চা মেয়েটি যেন বড়ঘরের উত্তম, লেহ্য-পেয় ভোজী ছেলেমেয়েদের হারিয়ে দিতে পারে। আর এক জায়গায় লেখিকা তাঁর প্রতিদিনের কাজকর্মের হিসাব নিকাশে করেছেন—

'প্রতিদিন প্রত্যুষে আমি উনানের ছাই পরিষ্কার করতাম। আমার শারীরিক আকৃতি সৌষ্ঠবহীন হয়ে গিছল, একেবারে যান্ত্রিক হয়ে গেছি। এই উনানের ছাইগুলির মত আমি শীতল হয়ে পড়ি কাজ সুরু করতে না করতেই।'

এরপর আছে এক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশনে চাকরী লাভের কথা। সেখানে অনেক মনীষী লেখকবৃন্দের আসা-যাওয়া চলে, ভায়োলেৎ তা লক্ষ্য করেন।

এই সময় তাঁর মার আবার বিবাহ হয়েছে। নতুন সৎ-পিতা তাকে ঠিক স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না। সে আর এক বিপদ। গাব্রিয়েলকে সে ভালোবাসে। সে তার শারীরিক অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন। একটি বহুমুখী বিপণীতে গিয়ে কয়েকটি প্রসাধন দ্রব্য চুরি করে ধরা পড়ে যায়।

এরপর জীবনে আসে বিচিত্র মানুষ। কত বিচিত্র নারী আর পুরুষ, তাদের রেখাচিত্র এ'কেছেন লেখিকা অতিশয় স্পষ্টাস্পষ্টি।

গ্রন্থশেষে ১৯৬৩-র ২১ আগস্টের কথা বলেছেন লেখিকা—

"This August day, reader is a rose window glowing with heat I make you a gift of it. it is yours." o

বাল্যজীবনের কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানেই লেখিকা তাঁর আত্মজীবনীমূলক কাহিনী শেষ করেছেন— এ এক আশ্চর্য শিল্পবস্তু। লেখিকা এক বাস্তব জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন বিচিত্র আঙ্গিকে কাব্যধর্মী ভাষায় এবং অতিশয় ইনটিমেট বা অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে, পাঠককে তিনি কাহিনী বলতে বসেছেন তাই পাঠকের কাছ থেকে কিছুই লুকানোর চেষ্টা করেননি।

সাম্প্রতিক ফরাসী উপন্যাসের নমুনা হিসাবে এই অসামান্য উপন্যাসটি বিশ্ব-সাহিত্যে আগ্রহী পাঠকের অবশ্য পঠিতব্য।

—অভয়ঙ্কর

LA BATARDE — (An Autobiography) by Violette Leduc. Translated by Derek Colman : Published by Peter Owen Ltd Great Britain. Price—135-6d. only

সাহিত্যের খবর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের মনে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সেদিনই হাসপাতালে তাঁকে শেষবারের মত দেখবার জন্য বন্ধু-বান্ধব, সাহিত্যিক এবং অনুরাগী ছুটে যান।

পরের দিন, ১০ই নভেম্বর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কেওড়াতলায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এমন শোক-বিহ্বল অনুরাগীর সমাগম কদাচিৎ দেখা যায়। সকলের চোখই যেন অশ্রুসজল। যেন প্রিয়জন-বিরহে কাতর। লক্ষ্য করেছি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কত প্রিয় ছিলেন সকলের। সুখলাল কারনানী হাসপাতালে সকাল আটটায় 'মোর্নাস কর্নারে' তাঁর মৃতদেহ রাখা হয় সকলের শেষবারের মত দর্শনের জন্য। সে কি করুণ দৃশ্য! লক্ষ্য করেছি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্র-তারকা, চিত্র-পরিচালক আর অগণিত ভক্ত পাঠক শোকে মুহ্যমান। সেখান থেকে তাঁর মৃতদেহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন। নারায়ণবাবু ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার। সেখান থেকে শোক-মিছিল সিটি কলেজ হয়ে তাঁর পুরোনো বাড়িতে যায়। সেখান থেকে শিয়ালদা হয়ে দক্ষিণ কলকাতায় মনোজ বসুর বাড়ির সামনে থামে। সেখানে ছিলেন তাঁর পত্নী আশা দেবী। এরপর রাসবিহারী এভিনিউ হয়ে মৃতদেহ আনা হয় কেওড়াতলায়। সেখানে এক বিরাট জনতা অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। এরপর পুত্র অরিজিৎ প্রথামত মুখাগ্নি করেন। সব শেষ। আর কোনদিন তিনি ফিরে আসবেন না। কিন্তু তবু তাঁর নাম বাংলার প্রতিটি সাহিত্যানুরাগীর মনে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

হাসপাতালে, শ্মশানে এবং পথিপার্শ্বে যাঁরা উপস্থিত হয়ে ব্যক্তিগত

শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি, তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মথ রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অজিত ঘোষ, পুলিনবিহারী সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিশু মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুমথনাথ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, আলোক সরকার, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সবিতাব্রত দত্ত, ধনঞ্জয় দাশ, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, পুলকেশ দে-সরকার, প্রসূন বসু, নীহার মুন্সী, নারায়ণ চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, গীতা মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, প্রমুখ আরো শত শত গুণমুগ্ধ পাঠক এবং সাহিত্যিক।

বিভিন্ন শোকসভায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। এই সব শোকসভার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ কর্তৃক যুগ্মভাবে আয়োজিত শোকসভাগুলি উল্লেখ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত শোকসভায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হরপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে এক সভায় তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। ১২ তারিখ সন্ধ্যায় কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের উদ্যোগে এক শোকসভা আয়োজিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সভায় ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—'নারায়ণ আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিল। তাঁর শোকসভায় আমাকে ভাষণ দিতে হবে, তা ভাবিনি। নারায়ণ এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। বাংলা সাহিত্য চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।' দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন—'নারায়ণবাবুর মৃত্যু সত্যি মর্মান্তিক। এত অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু হবে, এ কল্পনা করাও ছিল আমাদের পক্ষে কঠিন। প্রসংগতঃ তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, কেউ কেউ নারায়ণবাবু যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিলেন না, বলে উল্লেখ করেছেন। এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তা একালের ক'জন সাহিত্যিক পেরেছেন, তা জানা নেই।' অরুণ সান্যাল 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে বলেন—'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একালের অন্যতম বিশিষ্ট প্রগতিকথাশিল্পী। তিনি সাহিত্যে যে সমবেদনার সঙ্গে মানুষের দুঃখ-বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁর প্রগতিশীলতা প্রমাণ করে।' প্রসঙ্গতঃ বালজাক সম্বন্ধে এঙ্গেলসের উক্তি তিনি উল্লেখ করেন। মণীন্দ্র রায় তাঁর সংগে নারায়ণবাবুর দীর্ঘ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—'মাত্র কয়েকদিন আগে একই সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীতে একটা রেকর্ডিং-এ আমরা গিয়েছিলাম। তখন একবারও ভাবিনি, তিনি এত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর সাহিত্যে একালের সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা ফুটে উঠেছে।' মিহির সেন ও ধনঞ্জয় দাশও সভায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বলেন—'তিনি এত লিখেছেন, যা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অনেকে রবীন্দ্রনাথের অজস্র লেখনীর কথা বলে থাকেন, নারায়ণবাবুকে তাঁর সঙ্গে তুলনা না দিয়েও বলতে পারি, রচনার দিক থেকে তিনিও কম নন। আমরা একালে তাঁর যথার্থ অবদান নির্ণয় করতে পারবো না। কিন্তু ভবিষ্যৎ একদিন তাঁকে যোগ্যস্থানে বরণ করে নেবে।'

সভায় একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

—চার্বাক

নতুন বই

রবীন্দ্রসংগীত (আলোচনা) — প্রিয়ব্রত চৌধুরী। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট। কলকাতা-১৩। দাম—বারো টাকা।

রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুমুখী বৈচিত্র্য নিয়ে আজো আলোচনার শেষ নেই। কবি, সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, নট ও নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার, শিল্পী, দার্শনিক কত রূপেই না তাঁর পরিচয়। কোনটি স্বতন্ত্র নয়—সবই যেন যুক্ত একই সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং বিশিষ্ট ধরনের। রবীন্দ্রসঙ্গীত দেশীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই সৃজনকর্মে নিয়োজিত হয়েছিল। গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণকীর্তন, ব্রজবুলি পদকীর্তন, বিষ্ণুপদ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণের শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালী, জারি, সারি, গম্ভীরা, টপ্পা, খেয়াল, টপকীর্তন, রামায়ণগান, কথকতা—বাঙলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন গীতশ্রেণী থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, কাব্যসৌন্দর্যে অনন্য। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, "বাণী ও সুরের মিলনের পথে এ গান বহুবিধ নতুন নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। এর গভীরতা এবং বিশালতা গুরুদেবের অন্যান্য সমগ্র কর্মকৃতি থেকে কোনদিক দিয়ে নূন নয়। গুরুদেবের গান কেবল সঙ্গীতগুণীর বা সঙ্গীতজ্ঞের সুর-বিস্তার নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবি সাহিত্যিক দার্শনিকের মননসমৃদ্ধ দূরবগাহী চিন্তাধারার বিশিষ্ট ছাপ। সাহিত্যরসের অবদানে এই সঙ্গীত অতুলনীয়।" সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মমূলে পৌঁছতে হলে দরকার নিরলস শ্রম এবং পরিচ্ছন্ন সঙ্গীতচিন্তা।

ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী ঊনিশ বিশ শতকের বিরাট পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সুগভীর এবং সুবিস্তৃত সঙ্গীতচিন্তা ও সংগীতরচনার পরিপ্রেক্ষণ করেছেন। তাঁর অনলস অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলশ্রুতি 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থখানির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডিফিল উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা ও সঙ্গীতসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পক্ষে এই বইখানি অপরিহার্য। বিরাট প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিস্তার এবং তৎকালীন সঙ্গীতসংস্কৃতির আলেখ্য হিসাবে বইখানি মূল্যবান বিবেচিত হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (শ্রাবণ-আশ্বিন)—সম্পাদক ঃ সঞ্জীবকুমার বসু। চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ। ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট। কলকাতা—১। দাম—চার টাকা।

সুবৃহৎ আকারের এই বিশেষ সংখ্যাটি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গবেষক এবং জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই প্রয়োজন মেটাবে। সংখ্যাটিতে পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধবয়স্ক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের রচনাবলীর ওপর আলোচনা, গ্রন্থপঞ্জী এবং আলোকচিত্র সংকলিত হয়েছে। অনেকেই বাদ পড়েছেন। সম্পাদক জানিয়েছেন আগামী কোন এক সংখ্যায় তাঁদের ওপর আলোচনা থাকবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুশীল রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু,

আশাপূর্ণা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দের ওপর আলোচনা করেছেন যথাক্রমে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রলয়কুমার কুণ্ডু, কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, বিজিতকুমার দত্ত, অসীমা মৈত্র, সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত, দেবদাস জোয়ারদার, আশিস মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, দীপক চন্দ, মানবেন্দ্র পাল, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অলোক রায় এবং সুব্রত রায়। সম্পাদনায় সম্পাদকের সুরুচি এবং দক্ষতার পরিচয় স্পষ্ট। জীবিত সাহিত্যিকদের দু' একজনের ওপর মাঝে মাঝে আলোচনা চোখে পড়লেও, বিস্তৃতভাবে তাঁদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে কমই। সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বর্তমান সংখ্যাটির ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ।

আশীর্বাদ—সম্পাদক : অমিতকুমার দে। পাবনা কলোনী। চাকদহ। নদীয়া। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রভাতকুমার ঘোষ, বিজনকুমার ঘোষ, সুব্রত মহালনবিশ, রথীন্দ্রনাথ দেবরায়, অমিতকুমার দে এবং আরো অনেকে। সম্পাদক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

আরক্ষা (ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা)—সম্পাদক : সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সহঃ সম্পাদক : বিমলচন্দ্র রায়। ১৭ লেক এভিনিউ, কলকাতা২৬। দাম : আড়াই টাকা।

আরক্ষা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বাস্তবভিত্তিক অপরাধ, পুলিশী তদন্ত, বিচার কাহিনী ও সামাজিক সমস্যাবিষয়ক আলোচনার একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধটি মূল্যবান। যৌন সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সময়োপযোগী মন্তব্য করা হয়েছে। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বি এন মল্লিকের 'জনসাধারণ ও পুলিশের পারস্পরিক সম্বন্ধ', সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষের 'পানদোষ' এবং সরোজ মজুমদারের 'অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক প্রকারভেদ' শীর্ষক প্রবন্ধ কয়টি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য। তাছাড়া লিখেছেন সলিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডী সেনগুপ্ত, বি সিন্নাস', স্থবির জাতক, শশী রায়, প্রদীপ চ্যাটার্জি, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিন্টু দাশগুপ্ত, স্মৃতি চট্টোপাধ্যায় এবং আরো দু' একজন। পত্রিকাটি জনপ্রিয় হলে আমরা খুশী হবো।

নবজাতক (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)—সম্পাদিকা মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১, পাম এভিনিউ, কলকাতা—১৯। এক টাকা।

প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। লিখেছেন গিরীন্দ্রনাথ দাশ, ইভান আলুফ, বরুণ ধর, জীবন সরকার, দুর্গাদাস সরকার আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন, কবিরুল ইসলাম, শঙ্কর মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী, শীতল জোয়ারদার, মৈত্রেয়ী দেবী এবং আরো অনেকে। কয়েকটি অনুবাদ ও পূর্ব বাংলার ওপরে একটি আলোচনা পত্রিকাটিকে সংগ্রহযোগ্য করে তুলেছে।

রাঙামাটি (কার্তিক ১৩৭৭)—নগেন্দ্র দাশ। ৪।৭০, নেতাজী নগর, কলকাতা—৪০। এক টাকা।

রাঙামাটি সাধারণত বেরোয় হালকা চেহারায়। এ সংখ্যাটি তুলনায় বড় হয়েছে। বোধহয় বিশেষ বার্ষিক সঙ্কলন হিসেবে প্রকাশের জন্যই কিছুটা স্থূলতায়। ছাপা হয়েছে কবিতা বিষয়ে সাতটি প্রবন্ধ ও আলোচনা এবং যাটজন তরুণ কবির কবিতা। লিখেছেন নগেন্দ্র দাশ, মানিক চক্রবর্তী, ফণিভূষণ আচার্য, শামসুর রহমান, আজিজুল হক, আবদুল রশিদ খান, সাজ্জাদ কাদির, আবু কায়সার, অজয় সেন এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটির ছাপা ও অঙ্গসজ্জা ভালো।

দরবারী : সম্পাদক : কল্যাণ চক্রবর্তী। ৩০ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৪। দাম : দু টাকা।

প্রচ্ছদ শোভনতায় ও অঙ্গবৈচিত্র্যে 'দরবারী সাহিত্য' বরাবরই আকর্ষণীয়। এ সংখ্যার সূত্রপাতে বন্যাপীড়িত বাংলা দেশের উদ্দেশ্যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে : 'মানুষের জীবনে যে সংকট দেখা দিয়েছে, আমরা বিশ্বাস রাখি—প্লাবনের পর যেমন পলি জমে, তেমনি এই বিপদের মধ্য থেকেই প্রকৃত সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হবে।" কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, রণজিৎ দেব, সত্য গুহ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সেন, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রলয় সেন, দিলীপ সেনগুপ্ত, ও কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ। তরুণদের মধ্যে দিলীপ সেনগুপ্ত ও কল্যাণ চক্রবর্তীর গল্প দুটি ভিন্ন স্বাদের ও আকর্ষণীয়।

প্রেক্ষণ : সম্পাদক : স্বপ্নেন্দু ভৌমিক। ১০ কুণ্ড দাস পাল লেন, কলকাতা—৬। দু' টাকা।

পত্রিকাটির প্রধান সম্পদ তার ছবিগুলি। অনেক মূল্যবান আর্ট প্লেট ছাপা হয়েছে আর্ট পেপারে। শিল্পীদের মধ্যে আছেন চিন্তামণি কর, অনিট ঘোষ, বিমান দাস, নিরঞ্জন প্রধান, দিলীপ সাহা ও দেবব্রত চক্রবর্তী। মোহিতলালের কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি ছাপা হয়েছে পত্রিকারম্ভে। আলোচনা ও সমালোচনা লিখেছেন বিধুভূষণ কুণ্ডু, শিশির ভট্টাচার্য, তনুশ্রী তালুকদার ও গৌরাঙ্গ ভৌমিক। জেবার দ্য নেরভাল-এর একটি রচনার অনুবাদ করেছেন কমলকুমার মজুমদার। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অজ্ঞ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, তুষারাভ রায়চৌধুরী, পর্বানন্দ দাস, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, তীর্থজ্যোতি ভাদুড়ী প্রমুখ।

গঙ্গোত্রী (অক্টোবর ১৯৭০)—সম্পাদক : শান্তনু দাস। ৪।১, আফতাব মস্ক লেন, কলকাতা—২৭। দাম : এক টাকা।

গঙ্গোত্রী তার পুরনো শরীর বদল করেছে নতুনতর অঙ্গসজ্জায়। অসাধারণ ছাপা। যেন প্রতিটি পৃষ্ঠায় ঝকঝক করছে উজ্জ্বল হরফে। এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (কবিতা সভা), মণীন্দ্র রায় (কেন এই মোহিনী আড়াল), অমিয়কুমার সেন (রবীন্দ্রনাথ ও কুমারস্বামী), মুরারি ঘোষ (কবিতা ও কার্লস মার্কস), জগন্নাথ চক্রবর্তী, সুশীল রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত ও স্বাতী চক্রবর্তী। 'কান্তে' কবিতা সম্পর্কে দীনেশ দাশের সঙ্গে অনিমেষ সেনের সাক্ষাৎকারটি মূল্যবান। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, দীনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, তরুণ সান্যাল, দুর্গাদাস সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, তরুণ সেন, নৃপেন্দ্র সরকার, পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ, শান্তনু দাস এবং আরো অনেকে। প্রচ্ছদ চমৎকার। সম্পাদকীয় রুচি এবং কবিতার নির্বাচন উন্নত মনের। পাঠকের পক্ষে একটি সংগ্রহযোগ্য সঙ্কলন।

কিশলয় : সম্পাদক নিখিলেন্দু চক্রবর্তী। নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

কিশলয় সব পেয়েছির আসরের মুখপত্র। লিখেছেন শিশিরকুমার সাঁতরা, বিশ্বপ্রিয়, অনিল চক্রবর্তী, নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী, আশস বিশ্বাস, স্বপনবুড়ো এবং আরো অনেকে।

অন্ধকারে আলোর ঝলক

দক্ষিণারঞ্জন বসু

'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বার বার
করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন ঘন
মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে,
আফ্রিকা—'
—রবীন্দ্রনাথ

সেই আফ্রিকাকে বলা হতো 'ডার্ক কন্টিনেন্ট' বা 'অন্ধকার মহাদেশ'। শুধু কালো আদমির দেশ বলেই নয়, আফ্রিকা অন্ধকার মহাদেশ বলে অভিহিত এই কারণে, এ মহাদেশের সঙ্গে দীর্ঘকাল সভ্য পৃথিবীর পরিচয় ছিল না। জানিনি বলেই অন্ধকার। সেই অর্থেই আফ্রিকা এতকাল ধরে প্রচারিত ছিল অন্ধকার মহাদেশ বলে।

সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয় নি বলেই যে আফ্রিকা অসভ্য ছিল তা নয়; সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক আগে থেকেই আফ্রিকার নিজস্ব একটি সভ্যতার ধারা, নিজস্ব একটি সংস্কৃতি ছিল। আফ্রিকার যে লোকসংস্কৃতি তার লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার প্রাচীনত্ব এমন কি খৃস্টপূর্ব যুগের বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশে আফ্রিকা এই বিশ্বের আর দশটা সভ্য দেশের মতোই একটা বিবর্তনের ধারা ধরে এগিয়ে চলেছে। সেই বিশেষ ধারাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার।

সে ধারা আফ্রিকার নিজস্ব প্রাণরসে পুষ্ট। সে ধন তার বাইরে থেকে ধার-করা ধন নয়, সে ধন তার ফসলের মতোই তার মাটি থেকে পাওয়া। প্রাকৃতিক প্রতিবেশে আপনা থেকেই তা গড়ে উঠেছে, বাইরে থেকে গিয়ে তার ঘাড়ে চেপে বসেনি।

কিন্তু অবস্থা চিরদিন সমান থাকেনি, আর তা থাকা সম্ভবও নয়। মানুষের লোভ, মানুষের অনুসন্ধিৎসা একদিন মধ্য এশিয়া ও য়ুরোপের মানুষকে টেনে নিয়েছে অন্ধকার আফ্রিকা'র অভ্যন্তরে। আফ্রিকার অন্ধকার ঘরের দরজা খুলে গেছে সভ্য পৃথিবীর কাছে। গেছে মধ্য এশিয়ার মুসলমান শক্তি, পরে য়ুরোপের খৃস্টানরা। মধ্য এশিয়ার মুসলমান শক্তি উত্তর আফ্রিকার এক বৃহদংশ দখল করেছে, দখলে রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা সেখানকার অধিবাসীই বনে গেছে।

কিন্তু য়ুরোপের খৃস্টানদের বেলায় তা হয়নি। য়ুরোপের খৃস্টান মিশনারীরা ধর্মের আড়াল করে ডেকে নিয়েছে খৃস্টান রাজশক্তিকে, যে শক্তি প্রমত্ত, সাম্রাজ্যের ভিৎ গাথিবার দুরন্ত নেশা যার মনে। ভিৎ তারা গেঁথেছে, সাম্রাজ্য তারা গড়েছে। অন্ধকার আফ্রিকার পায়ে সভ্য য়ুরোপের লৌহ-শৃঙ্খল পড়েছে।

এ বন্ধন-যন্ত্রণা অন্ধকার আফ্রিকা সয়েছে বহুকাল। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। উত্তর আফ্রিকার কোন কোন দেশে মধ্য এশিয়ার মুসলমান শক্তি স্থায়ী-ভাবে বসে গিয়েছিল। কাজেই খাঁটি আফ্রিকাবাসীর সঙ্গে তাদের চলেছিল ভাবের বিনিময়। এই দেওয়া-নেওয়া, আদান-প্রদানের পথেই উত্তর আফ্রিকায় ঘটেছিল দুটি সংস্কৃতির সমন্বয়। মধ্য এশীয় মুসলমান সংস্কৃতির ও খাঁটি আফ্রিকান সংস্কৃতির।

উত্তর আফ্রিকার এই সমন্বিত সংস্কৃতির ভেতর খাঁটি আফ্রিকান খুঁজে পাওয়া যাবে না। খাঁটি আফ্রিকান সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যাবে আফ্রিকার খাঁটি অধিবাসীদের মধ্যে। মধ্য আফ্রিকায় ও পশ্চিম আফ্রিকায়।

অবশ্য আফ্রিকান সংস্কৃতিকে তার এই স্বাতন্ত্র্য, এই স্বধর্ম বজায় রাখতে কম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়নি। মুসলমান সংস্কৃতির ভূমিকা সেখানে গৌণ, মুখ্য হলো খৃস্টান সংস্কৃতি। খৃস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খৃস্টান মিশনারীরা আফ্রিকানদের ভেতর যেয়ে ঘর বাঁধলেন, গির্জার ভিৎ গাঁথলেন। য়ুরোপীয় খৃস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে আফ্রিকানদের ধীরে-বহা সমাজ-জীবনে য়ুরোপীয় যন্ত্রের বেগের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু এ বেগ বাইরের, সমাজ-জীবনের। সমাজ-জীবনের চৌহদ্দি পেরিয়ে এ বেগ আফ্রিকাবাসীর অন্তর-জীবনে সঞ্চারিত হতে পারেনি। সেখানে সে তাকে প্রতিরোধ করেছে। প্রতিহত করেছে। সেখানে সে আপন ভাবমন্ডলের, আপন ধ্যান-ধারণাকে, ভাবনা-চিন্তাকে দোরগোড়া পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দিতে রাজি নয়। আপন ভাবনাকে নাড়া দিতে রাজি নয়। কারণ এ ভাবনা তার রক্তপ্রবাহে বাহিত, তার হৃদ-স্পন্দনের সঙ্গে জড়িত। এ ভাবনাকে ছাড়লে সে নিজেই থাকে না, নিজেই বাঁচে না। এই ভাবনাই তার আফ্রিকানত্ব। এ ভাবনা থেকেই তার নিজস্ব জীবনদৃষ্টির জন্ম। এ ভাবনা তার নিজস্ব সংস্কৃতির উৎসমুখ।

আফ্রিকাবাসীর এই বিশেষ ভাবনাটি কি? বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি কি?

এ সম্পর্কে ডঃ পারিন্ডার তাঁর 'West African Psychology' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

> Force, power, energy, vitality, life, dynamism, these are the operative notions behind prayers to God, invocations of divinities, offerings to ancestors, everything that may be termed religion, including therein what we are pleased to designate 'magic' or 'medicine'. The aim of all these practices being to strengthen and affirm life....
>
> All things in the visible and invisible worlds possess some degree or type of force, whether we call it 'soul' or not, animate or inanimate.
>
> It is evident, then, that the whole tone of the philosophy of most African peoples is distinctly lifeaffairming. Here is no pessimism or other worldy of negation.'

সর্বভূতে এই জীবনারোপ, এই জীবন-তৃষ্ণাই আফ্রিকান দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। এ জীবনদৃষ্টিতে নৈরাশ্যের, হতাশার স্থান নেই, আছে আশা, আছে শক্তি আর জীবনের জয়গান। জীবনকে অস্বীকার করে, শক্তিকে, জীবনবেগকে পাশ কাটিয়ে এ দৃষ্টি অন্য-দিকে যেতে রাজি নয়। য়ুরোপীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে এ জীবনদৃষ্টির পার্থক্যটা কোথায়?

এ সম্পর্কে ডঃ পারিন্ডার উপরোক্ত গ্রন্থেই মন্তব্য করেছেন:

> It might be said that European philosophy assumes that the universe is inanimate, following the presuppositions of meterialistic science, whereas African philosophy assumes that there is life, or at least power, in all things, being thereby to the modern conception of all pervading energy.'

আফ্রিকান দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এখানেই পার্থক্য। বিজ্ঞানের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে য়ুরোপ সৃষ্টির সকল কিছুতে জীবন-সত্তার লীলাকে স্বীকার করে নিতে রাজি নয়। কিন্তু আফ্রিকানবাসীর জীবনদৃষ্টি বা জীবনদর্শন হলো ঠিক এর উল্টো। সে বলে, সৃষ্টির সকল বস্তুতে জীবন-রাখাল অহরহ তার বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। সেই বাঁশীর সুরেই সৃষ্টির সকল কিছু ছন্দিত ও স্পন্দিত। আমাদের চারপাশের এই যে প্রকৃতি একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের ভেতর দিয়ে প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছে, এর ভেতর জীবনের ছন্দ ও শক্তির উত্তাপ না থাকলে তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হতো না। কাজেই জীবন সত্য। এ সত্য, এ সত্তা সৃষ্টির সর্বজীবে, সর্বভূতে বর্তমান।

বইকুণ্ঠের খাতা

সময়ের ডাক

তারপরে এখন রাজা নেই। রাজপুত্রও নেই। আছে রাজকীয় শাসনের স্মৃতি।

অথচ এমন একটা দিন ছিল, যখন অসংখ্য ছোটবড় রাজায় ছেয়ে ছিল দেশটা। বড় বড় জমিদাররা 'রাজা' উপাধি ধারণ করে আঞ্চলিক শাসনের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বসতেন। কখনো তাদের উপরওয়ালা থাকতো, কখনো থাকতো না।

তখন তাঁদের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছিল একেকটি জনপদ—তার সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতি—বিচার-ব্যবস্থা ও জীবনযাপনের পদ্ধতি। গ্রামের মানুষ একই সংগে তাঁদের ভয় করেছে, ভালোবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে, ঘৃণা করেছে। হয়তো দীর্ঘকাল-ব্যাপী এই সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের অন্তরালে ছিল বহু অনাচার আর অত্যাচারের কাহিনী।

আবার তাঁদের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বহু 'মিথ'। বহু অলৌকিক গল্পের উৎস হয়ে উঠেছিল একেকটি পরিবার।

সময়ের সংগে সংগে তাঁরা পাল্টেছেন।

অদল-বদল হয়েছে সামাজিক ব্যবহারও।

যে-ইতিহাস একদিন তাঁদের রাজা বানিয়েছিল, সেই ইতিহাসই অবশেষে তাঁদের রাজাহারা করেছে।

রাজকীয় স্মৃতি ও পরিবর্তনশীল সময়

সম্প্রতি আমার হাতে একটি বই এসেছে। সুসং-এর মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের 'চেঞ্জিং টাইমস' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। বইটির প্রকাশক 'অ্যানথ্রোপোলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'।

প্রচলিত অর্থে হতো একে গবেষণামূলক রচনা বলা যাবে না। বলা উচিত, পারিবারিক স্মৃতি-মূলক রচনা। কেননা, লেখকের উদ্দেশ্য আর যাই থাক, উপলক্ষ্য তাঁর নিজের ও একটি অভিজাত পরিবারের ঐতিহ্য। ব্যক্তিগত স্মৃতির পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে বহু লোকায়ত জনশ্রুতি। আঞ্চলিক বিশ্বাসের দ্বারা সেগুলি লালিত হয়ে এসেছে দীর্ঘকাল।
ঐতিহাসিকেরা তাই নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারেন।

তবু সমাজতাত্ত্বিকের কাছে এইসব স্মৃতি, শ্রুতির মূল্য কম নয়। ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে এই গ্রন্থ হয়ে উঠেছে একটি সময় ও সমাজের ইতিহাস। আমার মতে, একটি অঞ্চল ও অধিবাসীদের পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার ধারাবিবরণী।

আমি বইটির পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম।

অনুভব করছিলাম, বিষয়ের সংগে বিষয়ীর আন্তরিক যোগাযোগের সূত্রটি। প্রথম অধ্যায়েই মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র বাল্য-স্মৃতির পুনরুদ্ধার করেছেন সহজ অন্তরঙ্গতায়। কখনো তাঁর ভাষা মন্ময়, কখনো তন্ময়, কখনো লক্ষ্য করা গেছে উত্তর-রীতির স্বধর্মবৈশিষ্ট্য।

সুসং-এ মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম উনিশ শতকের শেষের দিকে—১৮৯৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। তার মাত্র এক বছর তিন মাস আগে, ১৮৯৭ সালের ১২ জুন, এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেছে সুসং-এ। পুরনো রাজ প্রাসাদের সংগে মাটির নিচে চাপা পড়েছে প্রাচীন ভাস্কর্যের সমস্ত নিদর্শন।

মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন, পরোক্ষ ফলভোগী।
একটি পারিবারিক ঐতিহ্যের পতন ও অন্য একটি চেতনার অনিবার্য উত্থানকে তিনি উপলব্ধি করেছেন জীবনভর। ঐ প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প যেন তাকে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি একালের মানুষে পরিণত হয়েছেন।

তাঁর ভাষায় : 'দি আর্থকোয়েক অব এইটিন নাইনটি সেভেন, দাজ ইন এ ড্রামাটিক ওয়ে, সেট দি স্টেজ ফর দি ডিজইনটেগ্রেশান হুইচ আই ওয়াজ ডিজাইনড টু উইটনেস অল থ্রু মাই লাইফ।'

যেন একটি বিগত স্বপ্নের বিষাদ থেকে এ গ্রন্থের প্রতিটি পংক্তি লেখা। অথচ, যা আসন্ন এবং অনিবার্য, তার অভ্যর্থনার এতটুকু ত্রুটি কিংবা দ্বিধা নেই। সময়ের আহ্বান এবং ইংগিতকে তিনি উপলব্ধি করেছেন বারবার।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত বংশপঞ্জী থেকে জানা যায়, সুসং রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর পাঠক ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ। কান্যকুব্জ থেকে তিনি সুসং-এ আসেন ১২৮০ সালে। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছশো বছর ধরে তাঁর উত্তর পুরুষেরা রাজত্ব করে এসেছেন কখনো মুঘল সম্রাটদের অধীনে, কখনো ইংরেজ সরকারের অধীনে।

সেজন্যেই, বারবার তাঁদের খেতাব বদল হয়েছে।
কেউবা পেয়েছেন 'খান' পদবী, কেউবা পেয়েছেন 'মল্লিক'। অবশেষে স্থায়ী হয়েছে 'সিং' বা 'সিংহ' পদবী।

ষষ্ঠ পুরুষে রাজা রঘুনাথ সিংহ প্রথম মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অধীনে বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্ভবত 'রাজা' পদবীটা সেই স্বীকৃতিরই পুরস্কার। পূর্ববর্তী আর কারুর নামের আগে ভূপেন্দ্রচন্দ্র 'রাজা' ব্যবহার করেননি।

ঐ একই বংশপঞ্জী থেকে জানা যায়, গত তিন পুরুষের মধ্যে রাজ পরিবারের কোন সদস্য কিরূপ শিক্ষালাভ করেছেন। মনে হয়, তার আগে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি কেউ-ই। এই সময়ে অনেকেই পারিবারিক ঐতিহ্যের আশ্রয় ত্যাগ করে চলে এসেছেন বাইরের জগতে। অনেকে গ্রহণ করেছেন নানারকম সরকারী বেসরকারী চাকুরী, কেউবা যোগ দিয়েছেন স্বদেশী আন্দোলনে। অনেকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন শিক্ষকতা, কেরানীগিরি, ওকালতি প্রভৃতি কাজে।

হয়তো এছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। সময় তাঁদের অতি সাধারণ স্তরে টেনে নামিয়ে এনেছে। মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র উদাসীন দর্শকের মতো এই দৃশ্য দেখেছেন। তথ্য পরিবেশনে এতটুকু কারচুপি করেননি।

ছেলেবেলায় অন্দর ও অন্দর-বাহির

হয়তো বিগত স্বপ্নের মতো মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের মনে পড়ে ছেলেবেলার দিনগুলির কথা। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে মেয়েদের সংগে, অন্দর মহলে। বর্ধমান কিংবা কোচবিহারের মহারাজার মতো ইট, পাথরের প্রাসাদ ছিল না সুসংয়ে। অন্দর মহলে ছিল বাংলো প্যাটার্নের প্রকাণ্ড চারটে আটচালা। প্রতিটি আটচালার সংগে ছিল বাথরুম, হলঘর ইত্যাদি।

এইসব বাড়ী তৈরীর উপযুক্ত বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতি আসতো স্থানীয় বনজঙ্গল কিংবা নিকটবর্তী গারো পাহাড় থেকে।

তাছাড়া এই অন্দরের সংলগ্ন ছিল আরো কয়েকটি বাড়ী। ছিল রান্নাঘর, খাবারঘর, ভাঁড়ার ঘর, বিধবা পিসির জন্য বিশেষভাবে তৈরী টিনের ছাউনী দেওয়া একটি মাঝারি আয়তনের ঘর। অর্থাৎ একটি অভিজাত হিন্দু পরিবারের স্বচ্ছল ছবি। আত্মীয়-স্বজন, অতিথি অভ্যাগতের ভিড়ে জম-জমাট। ছিল ঢেঁকিশাল, হাতীশাল, চাকর-চাকরাণী, ছেলেমেয়েদের কোলাহল।
বাঁশ, কাঠের সুউচ্চ দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল অন্দর মহল।

ভেতরের লোক বিনা-উপলক্ষে বাইরে যেতে পারতো না। বয়স্ক পুরুষেরা অন্দর মহলে আমার আগে চাকর-চাকরাণীদের কেউ উচ্চৈস্বরে কর্তার উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে দিতো পূর্বাহ্নে। মেয়েরা বড় বড় ঘোমটা টেনে যে-যার বাংলোয় ঢুকে পড়তেন। এমন কি অন্দর মহলে বাড়ীর বিবাহিতা মেয়েরা বিনা ঘোমটায় চলাফেরা করতে পারতেন না।

কেবল বাড়ীর বউয়েরা এ ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীন ছিলেন। শাশুড়ী এবং স্বামীর বড় বোনের সামনে তাঁদের ঘোমটা দিতে হতো।

মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের এই শৈশব-স্মৃতির সময়-কাল বিশ শতকের প্রথম কয়েক বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছায়া পড়েনি তখনো বাংলাদেশে। য়ুরোপের সমাজ-মানসে তার গোপন প্রস্তুতি চলছিল হয়তো। তিনি স্মরণ করেছেন খর গ্রীষ্মের দিনগুলির কথা।

প্রায়ই আগুন লাগতো চাষীদের কুঁড়ে ঘরে, খড়ের গাদায়। মাঝে মাঝে আগুন লাগতো দূরের পাহাড়ে। রাজবাড়ীর অন্দর মহল থেকে দেখা যেতো সেই আগুনের শিখা।

ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে ঐ পাহাড়-গুলি ছিল, স্বর্গীয় পরীদের বিচরণভূমি। তারা বলাবলি করতো, যার মনে কোনো পাপ নেই, কেবল সে-ই দেখতে পায় পরীদের।

অন্দর মহলের সীমানা ছাড়িয়ে সহজে কোনো শিশুই বড়বাড়ী, মধ্যমবাড়ী কিংবা রংমহলে যেতে পারতো না। চাকর-চাকরাণী-দের হাতবদল হয়ে ছোট ছেলেরা বাইরে খেলাধুলো করতে যেতো বিকেলের দিকে। ধীরে ধীরে রপ্ত করতো ঘোড়ায় চড়ার কৌশল।

সান্ধ্য-প্রার্থনার পর বড়রা পুরনো দিনের গল্প করতেন,—ভূমিকম্প কিংবা হাতী ধরার কাহিনী। সকলেই সেসব কথা বিস্ময়ের সঙ্গে শুনতেন।

মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র এই পরিবেশে ক্রমাগত শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকেন। সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার, রাজকীয় আচার-আচরণ শেখাবার জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে রাজদরবারে নিয়ে আসা হতো।

এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ—ব্যবসায়ী খাজাঞ্চি, প্রজা ও অভিজাত প্রায় প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। অন্দরের প্রাচীর পেরিয়ে তিনি ক্রমশ এগোতে শুরু করেন বৃহত্তর মানব সমাজের অভিমুখে। শিকার করতে গেছেন হাতীর পিঠে চড়ে—বনে-জঙ্গলে, সোমেশ্বরীর ধারে। কখনো করেছেন বাঘ শিকার, কখনো করেছেন হাতী শিকার পরিচিত হয়েছেন লোকান্তরে মানব-সমাজ আদিবাসী ও নিম্নশ্রেণীর অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

রূপকথা, উপকথার দেশ এই সুসং। মৈমনসিং গীতিকার অন্যতম উৎসভূমি। মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র লৌকিক বিশ্বাসের নানা কাহিনীকে উল্লেখ করেছেন ঘটনাক্রমে।

নগরের ডাক

কিন্তু সময় থেমে থাকে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছাতেই হোক—সকলকেই তার আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। যে কারণে সুসংয়ের রাজকুমারেরা নগরমুখী হয়েছেন, ঠিক সেই কারণেই প্রজারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষ পেয়েছে ভিন্নতর চেতনার আলো। জাগরণ ঘটেছে ভেতরে-বাইরে।

১৯১৬ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ পড়ার সময় ভূপেন্দ্রচন্দ্রের পিতা মহারাজ কুমুদচন্দ্র মারা যান। রাজপদে অভিষিক্ত হলেন ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

চারদিক থেকে ডাক আসতে লাগলো।

রাতারাতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। সরকারী গেজেটে তাঁর নাম ছাপা হলো সুসংয়ের মহারাজা হিসেবে। উত্তর-সূরী হিসেবে পিতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান-গুলিতে তাঁর ডাক পড়তে লাগলো। হয়তো বা কিছুটা বিমূঢ় বোধ করছিলেন তিনি। ধারণা ছিল না সুসংয়ের রাজকীয় ধন-দৌলতের পরিমাণ সম্পর্কে। কলকাতার হাই-সোসাইটির মানুষ তিনি। সুতরাং নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য কিংবা সভাপতি কিংবা প্রধান উপদেষ্টা।

একজন অপ্রস্তুত মানুষের মতো বার-বার তাঁর ওপরে আরোপিত এই সম্মান ও নেতৃত্বের জন্য তিনি বিব্রত বোধ করতে থাকেন। এমন কি কলেজের ছাত্র, অধ্যাপকেরা পর্যন্ত তাঁকে আলাদাভাবে দেখতে শুরু করেন। তাঁর আধুনিক মন ও [illegible]

উপলব্ধি করেন বারবার। অধিকতর সহজ জীবন ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এইসব মিথ্যে সম্মানকে তিনি প্রতিবন্ধক বলেই মনে করেন।

ঐ সময়ে উপলব্ধি করেন, পূর্ববঙ্গীয় জমিদারদের সঙ্গে কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি প্রচ্ছন্ন বিরোধ চলছে ভেতরে ভেতরে। ইংরেজ সরকার হয়তো বা তাকে প্রশ্রয়ই দিচ্ছিলেন। তাঁরা চাইতেন সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের বদলে ধন-তান্ত্রিক আধিপত্য।

১৯২২ সালে মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের বিয়ে হয় উত্তর বাংলার এক জমিদার কন্যার সঙ্গে। কনের বয়স এগারো। দাদাশ্বশুরে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর ছেলে কুমার তুলসীচরণ গোস্বামী ছিলেন তাঁর সহপাঠী। ভদ্রলোক সেই সময়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সামাজিক জীবনে। বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি প্রথাভঙ্গ করে লর্ড এস পি সিনহার মেয়েকে বিয়ে করে বসেন।

বাংলাদেশের 'ব্রাহ্মণ সভা'র সভাপতি ছিলেন তখন মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র। সনাতনী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য সদস্যদের তাই নিয়ে দেখা দেয় তীব্র মতবাদ। অনেকে তুলসীচরণকে একঘরে করার পক্ষপাতী ছিলেন। মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্রের তা ভালো লাগেনি। ব্রাহ্মণ সভার সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি পেলেই যেন বাঁচেন—এমনি অবস্থা। অনেকে লর্ড এস পি সিংহের নামে পর্যন্ত কুৎসা ছড়াতে শুরু করেন।

তিনি লক্ষ্য করেন, প্রগতিশীল চিন্তা-ধারার সঙ্গে এই সভার সদস্যদের কোনো যোগাযোগ নেই। শাস্ত্রের চেয়ে সংস্কার তাঁদের কাছে বড়। ফলে, ক্রমশই ব্রাহ্মণ সভা প্রতিক্রিয়াশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু মানুষের একটি আড্ডাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

তাঁর এই মানসিকতার উৎস খুঁজতে গেলে হয়তো সবার আগে তাঁর বাবার নাম মনে পড়বে।

তিনি লিখেছেন যে, তাঁর বাবা যদিও সামন্ত ঐতিহ্যে লালিত, সুসংয়ের জনপ্রিয় মহারাজা ছিলেন। তবুও তিনি চাইতেন ভূপেন্দ্রচন্দ্রকে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে। কেবল গ্রীষ্মের ছুটি ছাড়া কখনো তিনি তাঁকে সুসং-এ যেতে দিতেন না। রাজ দরবারের সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা তাঁর হোক—এটা বোধহয় চাইতেন না তিনি। সেজন্য তাঁর বাবা তাঁকে উৎসাহ দিতেন নানারকমের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। যৌবনের দিনগুলিতে তিনি দেখেছেন, তার পিতার অন্তরঙ্গ মানুষদের। মহারাজ কুমুদচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে প্রায়ই আড্ডা বসতো। নানারকম আলোচনার উদ্দেশ্যে। তাতে প্রায়ই আসতেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশ সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিরা।

বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মালা তৈরী করে মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সেদিনের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন অন্তরঙ্গভাষায়। সামন্ত-তান্ত্রিক সংস্কারকে অস্বীকার হয়তো করতে পারেননি তিনি। অভিজাত একটি পরি-বারের ঐতিহ্যকে এড়িয়ে যাবেনই বা কি করে?

তবু পরিবর্তনশীল সময়ের আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে। তিনি হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করেছেন। এগিয়ে এসেছেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কাজে। অংশ গ্রহণ করেছেন, অসহযোগ আন্দোলনে। রাজ-পরিবারের আভ্যন্তরীণ জীবনও তখন বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ঢুকেছে মামলা-মোকদ্দমা, শরিকদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ।

তার ছায়া পড়েছে প্রজাদের ওপর।

রাজার বিবাদে তারা বিরক্ত। অনেকে জাগছে নতুন চেতনা নিয়ে। কেউ যোগ দিয়েছে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগে আন্দোলনে। কেউবা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের ব্যাপারে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আদিবাসী ও স্থানীয় জনসাধারণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি গিয়েছিলেন সুসং পরগণার অভ্যন্তরে, গারো পাহাড়ে। দেখেছেন আরেক দৃশ্য। কৃষক এবং আদিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সাম্যবাদী চিন্তাধারা। সরকারী উদাসীনতার ও ক্ষমতার অপব্যবহারে অসন্তুষ্ট প্রজারা সমবেত হচ্ছে কমিউনি-জমের ছায়াতলে। বিশেষ করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে কমিউনিস্ট আন্দোলন সাফল্যলাভও করেছিল।

কেন এই গ্রন্থ, কি তার প্রয়োজন?

পাঠকের দিক থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিগতকালের এই কাহিনী শুনে আমাদের কি লাভ? মহারাজের রাজত্ব গেছে কালের নিয়মে। আমরা তাই নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবো কেন?

কিন্তু ইতিহাস তাকে ভোলে না। আগামীকালের মানুষকে পথ চলতে সাহায্য করে।

মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র নিজের জীবন ও পারিবারিক ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সমকালীন সমাজের কথা বিস্মৃত হননি। হয়তো অনেকের কাছে তার সমস্তটাই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু একজন অনুসন্ধিৎসুর কাছে তার বিবরণ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

বইটির দ্বিতীয় অংশে লেখক সুসংয়ের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। জায়গাটি মৈমনসিং জেলার নেত্রকমা মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুর থানার অধীন। উত্তরে গারো পাহাড় পর্যন্ত তার সীমানা বিস্তৃত। প্রাকৃতিক কারণে সদর মৈমনসিং থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। নিকটবর্তী রেল স্টেশন জারিয়া-ঝাঁঝাইল থেকে নৌকোয় যেতে হলে সময় লাগে প্রায় পঞ্চাশ ঘন্টা।

স্বভাবতই এই অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকের কৌতূহল অপরিসীম।

প্রচন্ড মৌসুমী বৃষ্টির দেশ এই সুসং। বছরে বৃষ্টিপাত হয় দুশো ইঞ্চি। তার মাত্র সত্তর মাইল উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের জায়গা চেরাপুঞ্জি অবস্থিত। ফলে, হাওয়া কখনো তেমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না। শীতের সময়ে প্রচণ্ড শীত। একেবারে হাড় কাঁপিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে মনোরম।

বলা যায়, নিসর্গ আশ্রিত এখানকার মানুষ—তার সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থা। বৃহত্তর বাংলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার যোগা-যোগ প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটেছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। কিছুটা মিশনারীদের প্রভাবে। ফলে, ধর্ম, ঈশ্বর বিশ্বাস, রাজানুগত্য প্রভৃতি মৌল-বোধগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আদিবাসী সংস্কার ও রীতিনীতি—পীর, গাজীদের শিক্ষা ও লোকায়ত আচার-আচরণ।

এই গ্রন্থে সেই সমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত না হলেও, মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে তার মূল সূত্রগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথম অংশে তিনি লিখেছেন সমকালীন সুসংয়ের ঘটনাবলী এবং স্মৃতিচিত্র। দ্বিতীয় অংশে দিয়েছেন সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিচয়।

মুখবন্ধে নির্মলকুমার বসু লিখেছেন, বইটি কেবল চমৎকার পাঠযোগ্য আত্মজীবনী নয়, সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত পরিবর্তন-শীল ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ঘটনা-প্রয়ী বিবরণ।

সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বইটি মূল্য-বান। তাঁরা উপলব্ধি করবেন, শতাব্দীকালের ব্যবধানে একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ও পরিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি। শুনতে পাবেন, দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে নতুনতর মানব সমাজ। পুনরুক্তি করে বলতে ইচ্ছে হয়, এই গ্রন্থ একটি সময় ও সমাজের ইতিহাস।

—গ্রন্থদর্শী

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩২)

তখন ভালবাসার যৌবন হরণ কইরা নেয় আকালুদ্দিন। আন্নু ঘরের ভিতর। ফেলু বাছুর নিয়ে মাঠে গেছে।

ফেলু মাঠে নেমেই দেখল দুটো ঘোড়া পুকুর পাড়ে গোলাপজাম গাছটায় কারা বেঁধে রেখেছে। অনেক লোকজন ছুটে যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ি। বড়োকর্তার শরীর খারাপ হতে পারে। ঘোড়া তারিণী কবিরাজের হবে। ঘোড়ায় চড়ে শ্বাসকষ্ট নিরাময় করতে এসেছেন। অন্য ঘোড়া মাতি রায়ের হবে। ওরা বড়োকর্তার বড় যজমান। কিন্তু তখনই ফেলু দেখল কজন পুলিশ পুকুর পাড়ে কি খুঁজছে। নীল পাগড়ি মাথায় দুজন মানুষ ঘোড়া দুটোকে কি খেতে দিচ্ছে। বুঝি থলের ভিতর চানা দিয়ে মুখে বেঁধে দিয়েছে। সে দূরে থেকে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। হাতে চানা খাওয়াচ্ছে, না থলের ভিতর চানা। দফাদারের হাত চেটে দিচ্ছে না পিঠ চেটে চেটে দিচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দুই ঘোড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছে বোঝা যাচ্ছে।

আকালুদ্দিন বাঁশঝাড়ের নিচে টেনে এনেছে বিবিকে। লোকজন ছুটছে হিন্দু পাড়াতে, ছোট ঠাকুরকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এমন একটা সোরগোল শুনেই আন্নু শাড়ি পরে বের হতে যাবে তখন আকালুদ্দিন সামনে। আতর মেখে দাড়িতে হাজির। সারা রাত আজকাল আর আন্নু ঘর থেকে বের হতে পারে না। ফেলু মটকা মেরে পড়ে থাকে। ঘুমায় না। হাতের কষ্টে সে সারারাত ছটফট করে। কিন্তু আন্নুর মনে হয় ওটা হাতের কষ্ট নয়—ব্যাম ভিতরে সেই সন্দেহের কোড়া পাখিটা কুরে কুরে খায়। ঘুম আসে না মিঞার চোখে। আকালুদ্দিন মিঞা তার ঘুম হরণ কইরা নিছে। আকালুদ্দিন সামুর পরই এ-অঞ্চলে লীগের বড় নেতা। সামু গাঁয়ে বড় আসে না, একদিন দু একদিন থাকে তারপরই চলে যায়। আকালুদ্দিনের উপর সব ভার এখন। সে মুসলমান গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মানুষজনকে তার দলে টানছে। কারণ আবার নির্বাচন আসছে, যা শোনা যাচ্ছে এবারে পৃথক নির্বাচন হবে, কোন সালে হবে কে জানে। হক সাহেবের তেমন আর রবরবা নেই। আকালুদ্দিন মাঠে নেমে যাবার সময় খালি বাড়ি পেয়ে এক লাফে ঘরের ভিতর। বিবিকে টানতে টানতে একেবারে বাঁশবনের ভিতর। —আরে মিঞা কর কি, কর কি! সময় অসময় নাই!

—তুই চুপ কর দিহি! ঐ দ্যাখ মরদ তর মাঠে। খোঁড়া মুরগের মত হাইটা যায়।

আন্নু কাপড় তুলে উঁকি দিয়ে দেখল, সত্যি ফেলু মিঞা মোরগ বনে গেছে।

আকালু তখন আন্নুকে একটা জবরদস্ত মুরগী বানিয়ে ফেলল। মুরগী বানিয়ে আকালু আন্নুকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। সে সেই অবস্থা মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে হেসে উঠল, আমায় মরদ লাথি মারে মিঞা! নালিশ দিতে দিতে সে আরামে বার বার একটা পুষ্ট মুরগী বনে যাচ্ছে। আকালু দাড়ি ঘসে দিচ্ছিল ঘাড়ে। বড় আরাম বোধ হচ্ছে দুজনার।

সামান্য এক বাছুরও নাস্তানাবুদ বানিয়ে দিচ্ছে ফেলুকে। বাছুর লেজ তুলে ছুটছে ফেলুকে নিয়ে।

আকালু দাড়ির আতর তখন বিবির মুখে ঘসে দিচ্ছে। পিঠে হাত রেখে ঘাড় চেটে দিচ্ছিল। তারপর যা হয়, পরের বিবিকে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে বনে জঙ্গলে ভোগ করে একেবারে তাজা মানুষ আকালু। অথবা যেন সে মোল্লা বনে যায়। পান খায়, গুয়া খায় এবং বারে বারে নদীর পাড় দিয়া হাইটা যায়।

পরের বিবিকে মুরগী বানিয়ে আকালু হাঁটছে নদীর পাড়ে। সেও দেখতে পেল দুটো ঘোড়া গাছের নিচে বাঁধা। সে মনে মনে কপট হাসল। কারণ তখন ফেলুর বাছুরটা লেজ তুলে মাঠের দিকে না নেমে বাড়িমুখো উঠে যাচ্ছে।

কে যেন বলে, ফেলু তর মরণ! তর বিবির শরীরে আতরের গন্ধ। তুই আতরের গন্ধ টের পাবি বলে, তোকে বাড়িমুখো উঠে যেতে দেখলে বিবি তর ঝাঁপ দিবে পুকুরে। আর আছে বন্ড হাজি সাহেবের। সে তরে কেবল ভয় দেখায় চষা মাঠের উপর দাঁড়িয়ে। তর যে কি হবে ফেলু! তুই কি তালাক দিবি বিবিকে! ফেলু মনে মনে হাসে। সে আজকাল একা থাকলেই মনে মনে কথা বলে। ওর এটা ক্রমে স্বভাব জন্মে গেছে। তখনই তার মাইজলা বিবির জন্য মনটা টন টন করতে থাকে। —আমার আছেডা কি আল্লা! সে এক হাত উপরে তুলে নসিবের কথা আল্লাকে জানাতে চাইলে দেখতে পায় আকালুদ্দিন মিঞা নদীর পাড়ে হাঁইটা যায়। মিঞা যাবে বক্তৃতা দিতে। পরাপরদীর হাটে লীগের সভা। সকাল সকাল দলবল নিয়ে চলে যাবে। এখন গাঁয়ে গাঁয়ে সে চাষী মানুষ যোগাড় করতে যাচ্ছে। তারও ইচ্ছা হাটে সে যাবে একবার। তার এই লম্বা কথা শুনতে ভাল লাগে। গায়ে কাঁটা দেয় যখন আকালুদ্দিন বলে, দ্যাখেন মিঞারা, চক্ষু তুইলা দ্যাখেন! কি আছেডা আপনেগ! খানা নাই পিনা নাই, জানে নাই খুন, হিন্দুরা সব চুরি কইরা নিছে। তখন মনেই হয় না—অ-হালা হারামজাদা তার বিবির তালাকের জন্য বসে আছে। দশ কুড়ি দশ টাকার লোভ দেখাচ্ছে। তালাকনামা করে দিলেই সে তার মজুরা পেয়ে যাবে। তালাকনামা পেলে বিবি মল বাজিয়ে উঠে আসবে আকালুর উঠোনে।

ফেলু তখন হাসে! সেই এক নিষ্ঠুর হাসি। —আরে মিঞা এডা কি কও। বিবির দাম মিঞা খাবলা খাবলা জমির মতন। তারে কম মূল্যে বিচা লাভ ডা কি কও দ্যাহি! যতদিন আছে তাইন, আমি আছি ততদিন। আমার মুলোডা তোমার কাছে আছে। দশ কুড়ি দশ ট্যাহা একডা ট্যাহা! টাকা পয়সা সব জলে, বিবি যদি চলে যায় তবে ফেলুর থাকে কি! আমি যে মিঞা ফেলু শেখ, আমার হাত ভাইঙা দিছে পাগল ঠাকুর। ঠাকুর তুমি আছ এক ষণ্ড' তিন ষণ্ডের মোকাবিলা করতে পারি আমি এক ফেলু! এক ষণ্ড হাজি সাহেবের খোদাই ষাঁড়, অন্য ষণ্ড মিঞা আকালুদ্দিন, আর হাত ভেঙে দিয়ে পাগল ঠাকুর হয়ে গেছে তিন ষণ্ডের এক ষণ্ড। সে ফাঁক পেলেই এখন কোরবানীর চাকুতে ধার দিচ্ছে। কার গলা ফাঁক করবে তার আল্লা জানে!

তা যা আছে কপালে! দেবে পাড়ি একদিন মুড়াপাড়া। হাতের এই বাগি বাছুর কোরবাণী দিয়ে আসবে ভাঙা মসজিদের বেদিতে। মুড়াপাড়ার বাবুরা সাতটা মসজিদের খরচ দেয়, কাচারি বাড়ি থেকে খরচ যায়, তবু তোমরা মিঞা মা আনন্দময়ীর পাশে এই যে বল এক ভাঙা মসজিদ আছে, বন জঙ্গল আছে সেখানে নামাজ পড়তে পাবে না। মিঞা আকালুদ্দিন এই নিয়ে এ-অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। মোলভি সাব বাজারের, মুড়াপাড়ার বাজারে যার সুতার কারবার আছে সে এসেছিল একবার, সে এসে বলে গেছে, আল্লার দুনিয়ায় কাফের থাকুক, আল্লা তা চান না। বিধর্মী নিধন হউক। ইনসান আল্লা—পরবে পরবে জিগির দ্যাও, দেশ চাই পাকিস্তান। হিন্দুগ দেবী দুই ঠ্যাঙ ফাঁক কইরা কি যে কাণ্ড একখান্না— সোনার মুণ্ডমালা গলায় ট্যারচা চখে চাইয়া থাকে। পারেন না মিঞা কোরবাণী দিতে আল্লার নামে নিজের জান। নামাজ পড়তে পারেন না মিঞা ভাঙা মসজিদে! আপনেরা যদি আল্লার দরবারে জেরার মুখে পড়েন, কি জবাবডা দিবেন কন দিহি। আপনেরা আবার কন আল্লার বান্দা!

ফেলু মনে মনে কবুল করল, সত্যি আল্লার বান্দা এই নামে তবে কাম কি। তা তুমি মিঞা আকালুদ্দিন এত কথা কও, মঞ্চে উইঠা নাচন কোঁদন কর, তুমি মিঞা তবে জিগির দ্যাওনা ধর্মযুদ্ধের—কে আছরে মিঞা কোন গাঁয়ে কারা আছ আল্লার বান্দা দুনিয়ায় আইসা তবে কামডা কি, তা চল যুদ্ধে, ধর্মযুদ্ধে, হাতে বল্লম, শড়কি, বাঁশের লাঠি এবং তোমার যা আছে, যদি না থাকে তবে সুপারির শলা। দ্যাও ইবারে আল্লা-হু-আকবর বলে ধ্বনি একখানা!

কিন্তু তখনই মনে হল ধ্বনি উঠছে ঠাকুর বাড়ি। সবাই মিলে ধ্বনি দিচ্ছে— বন্দেমাতরম। কি কারণ এ-ধ্বনির! কারণ সন্তোষ দারোগা ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এসেছিল রঞ্জিতকে ধরতে, কিন্তু তাকে পেল না। নিজ বলে দারোগা সাহেব শমন থাড়া করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ঠাকুরকে। শশীভূষণ ধ্বনি দিচ্ছে, বন্দে-মাতরম! ধ্বনি দিচ্ছে, শচীন্দ্রনাথ কি, জয়! ধ্বনি দিচ্ছে, ভারতমাতা কি জয়! দেশের কাজে মানুষ জেলে যায়। ফেলু দুবার জেল খেটেছে। খুনের দায়ে জেল খেটেছে। আর শচী ঠাকুর খাটবে স্বদেশীর জন্য। সেও একবার এ-ভাবে জেলে যেতে চায়। ওদের দেখাদেখি সেও মাঠের এ-পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, আল্লা-হু-আকবর। হিন্দুরা কিছুতেই ওদের জন্য দেশটা আলাদা করে দিচ্ছে না। পায়ের তলায় রেখে কেবল মজা দেখতে চায়। হালার হালা কাওয়া! হালার হালা কাফের!

কিন্তু ফেলুর হাঁক এত আস্তে হল যে সে যেন নিজেই শুনতে পেল না। তবে কি ওর গলা বসে গেছে! গতকাল সে চিল্লা-চিল্লি করেছে বিবির সনে। বিবি তার দুই কাঠা ধান এনেছে। ধান এনেছে গতর খেটে। সে একবার বিল থেকে বড় মাছ ধরে এনেছিল—কারণ বিবি তার সব পারে, সব চুরি করে আনতে পারে, এই চুরি করার নামে বিবি তার মাঠে যায়—আর কতদিন পাহারা দিয়ে রাখবে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, বিবির খাইস মিটে না, পাল-খাওয়া গরুর মতো লাফায়, চোখ সাদা করে রাখে। তখন ওর ইচ্ছা হয় মাজায় একটা দুম করে লাথি মারে। লাথি মারলেই পাল থেকে যাবে, থেকে গেলেই গরু তার গাভিন, আর লাফাতে পারবে না। এত আর শরীরে তখন মোহব্বত থাকবে না। চোখ মুখ সাদা ফ্যাকাশে—আন্নু একটা উরাট জমির মতো খালি পড়ে থাকবে। আবাদ করতে কেউ আসবে না।

তখন হালার বাছুর একেবারে উঠানে। বাছুরটার পেছনে ফেলু ঠিক ছুটে আসবে। গালে মুখে আন্নুর আতরের গন্ধ। সে তাড়াতাড়ি বাছুর উঠোনে দেখেই মুখ ধুয়ে ফেলল। কিন্তু পিঠে, ঘাড়ে গন্ধটা লেগে আছে। ফেলু কাছে এলেই টের পাবে। বাছুরটা যত নষ্টের গোড়া। সে ভাবল উঠোনে নেমে ফেলু উঠে আসতে না আসতে আবার মাঠে তাড়িয়ে দেবে কিনা। এখন এটা না হলে মানুষটা আসত দুপুরে। যখন মাথার উপর সূর্য তখন ফেলু উঠে আসে। ঘাড়ে গলায় সামান্য পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ মেখে রাখে আন্নু। ফেলু টের পায় না আকালু বিবিকে ভোগ করে গেছে।

এখন আন্নু তাড়াতাড়ি কি যে করে! আর তখনই হিন্দুপাড়াতে আবার সেই ধ্বনি। সে যেন অনেকদিন পর এমন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। সে এতক্ষণ আকালুর সঙ্গে ঝোপেজঙ্গলে পীরিত করছিল বলে খেয়াল করেনি। কিন্তু আকালু চলে যেতেই একে একে হুঁস ফিরে আসার মতো সে শুনতে পাচ্ছে—হিন্দুপাড়াতে জয়ধ্বনি উঠছে। দলে দলে লোক যাচ্ছে হিন্দু পাড়ার দিকে। সে ঈশম এবং মনজুরকে চিনতে পারছে। মনে হল ছোট ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কারা। পুলিশের লোক! ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল। ফেলুটা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ওর য্যান পরানে ভয় ডর নাই। ছোট ঠাকুর মাঝখানে। আগে সামনে পুলিশ। সোনা লালটু পলটু অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পাগল মানুষ তরমুজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। নরেন দাস আভারানি মাঠে এসে নেমেছে। গৌর সরকার, বেনেপাড়ার সব লোক নেমে এসেছে।

একটা ফড়িঙ এ-সময় আন্নুর মাথার উপর এসে বসল। সে ফড়িঙটা উড়িয়ে দেবার সময়ই দেখল ফেলু উঠে আসছে। একেবারে কাছে এসে গেছে। এবার সে আতরের গন্ধ পেয়ে যাবে। কি করে! কি করে! সামনে ছিল হাজিদের পুকুর। সে পুকুরে ঝাঁপ দিল এবং জলে ডুবে গেল। ফড়িঙটা আন্নুর মাথার উপর বসার জন্য জল পর্যন্ত উড়ে উড়ে এসেছিল, জলের উপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। কিন্তু আন্নু জলের নিচে ডুবে গেলে কোথায় পাবে তারে। ফড়িঙটা আন্নুকে খুঁজে পেল না বলে আবার মাঠে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেলু পাড়ে দাঁড়িয়ে ফড়িঙের মজা দেখবে না বিবিকে ডাকবে—কি যে করবে ভেবে পেল না। সে একটা হাবা মানুষের মতো পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে বিবি কখন জল থেকে ভেসে উঠবে সে আশায় দাঁড়িয়ে থাকল।

হঠাৎ আন্নু মাঝ-পুকুরে একটা চিতল মাছের মতো ভেসে উঠল।

ফেলু হাঁকল, আমার বিবিরে।

বিবি ফের ডুব দিল জলে।

—বিবিরে পানির নিচে তর কি হারাইছে?

জলের নিচ থেকে তখন বুড়বুড়ি উঠছে।

পানির নিচে কার কি যে হারায়। আন্নু ডুবসাঁতারে এখন পুকুর পার হয়ে যাচ্ছে। ফেলু, বিবির ডুবসাঁতার দেখছে। ওর জলের উপর ভেসে ওঠা দেখছে। আন্নুর শরীর জলে ভিজে থাকলে ফেলুর বড় কষ্ট হয়। টানা টানা চোখ। বোরখার অন্তরালে সে এমন খুবসুরত বিবিকে রাখতে পারল না। ওর হাত না ভাঙলে বিবির কপালে কত সুখ ছিল। সে বিবির জন্য বাবুরহাটের শাড়ি কিনে আনত, আটচালা ঘর, এবং একটা ময়না পাখি কিনে দিতে পারত। পায়ে মল, হাতে বাজু এবং কপালে টিকলি আর গলায় বিছা হার। কোমরে রুপোর পইঁছি রোদে চকচক করত। এমন পুষ্ট শরীরে এসব থাকলে বিবি তার বেগম বনে যেত। হায় তার নসিবে এত দুঃখ। সে বলল, হালার কাওয়া! হালার পাগল ঠকুর।

হুপ! আম্বর চিতল মাছটা জলে শরীর ভাসিয়ে দিল। এবং পাখনা খেলিয়ে, চিং হয়ে অথবা কাত হয়ে সাঁতার কাটলে আন্নু এক যান রুপোলি মাছ। এই পুকুরের জলে একটা রুপোলি মোহ চোখের সামনে নাচছে। ওরও সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হচ্ছে, জলের নিচে মাছ হয়ে আন্নুকে ছুঁতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সে পারছে না। তার হাত ভাঙা। হালার কাওয়া। সে ডাকল, আন্নু তুই উঠ দিনি। বাছুরডা ছুইটা গ্যাছে। ধরতে পারতেছিনা।

আর কোন কোন দিন যখন সাঁজ নামে, যখন কুয়াশায় এই অঞ্চল ঢেকে যায়, যখন শীতের ঠান্ডায় পুকুরের মাছ, বিলের মাছ, নদী নালার মাছ এবং জলের তাবৎ জীব চুপ হয়ে থাকে তখন আন্নু যায় চুপি চুপি, পিছনে যায় ফ্যালু। সামনে শুধু মাঠ, মাঠে নাড়া এবং সর্ষে ফুল ফুটে থাকে। সর্ষে ফুল, বোঝা বোঝা নাড়া এবং ধনে-পাতা—এইসব মাঠময় পড়ে থাকলে বিবি আর সে রাতে চুপি চুপি তুলে আনে। এমনভাবে আনে, যেন সে বেছে বেছে আনছে। এক জায়গা থেকে সব তুলে নেয় না। ফাঁকে ফাঁকে তুলে আনে। জমি যার, সে আলে দাঁড়ালে টেরই পাবে না, ফাঁকে ফাঁকে কেউ ফসল চুরি করে নিয়ে গেছে।

অথচ এই অসময়ে জলে সাঁতার আন্নুর! ফেলুর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। বাছুরটা ষণ্ড দেখে দাঁড় ছিঁড়ে পালিয়েছে। কার জমিতে গিয়ে মুখ দেবে এখন! একমাত্র আন্নু সম্বল। সে বাছুরটা ধরে আনতে পারে। আর বাছুর যখন মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ায়, পিছনে আন্নু, কাপড় সামলাতে পারে না—বলিহারি যাই, আন্নু একেবারে তখন বনদেবী। সে হাঁকল, হালার কাওয়া! তর গরম বাইর কইরা দিমু।

আন্নু যেন টের পেল জলের নিচে, ফেলু হাঁক পাঁক করছে পাড়ে। সে উঠে বলল, কোনখানে?

ফেলু হাত তুলে দিলে আন্নু ছুটল। বাছুরটা অনেক দূরে। আন্নু দ্রুত ছুটছে। ভিজা কাপড়ে ছুটছে। চুল ভিজা, কাপড় ভিজা, সব লেপ্টে আছে গায়ে। শাড়িটা হাঁটুর উপর উঠে গেছে—সামনে সেই এক ধানের মাঠ, আন্নু ছুটছে সেই মাঠের উপর দিয়ে। বিবিকে দেখে বাছুরটাও ছুটছে আর দূরে ছুটছে আকালুদ্দিন। নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। নামাজের আগে পরাপরদির মসজিদে পৌঁছাতে হবে। নামাজ শেষে সে সব তার জাত-ভাইদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে, আল্লা-হু-আকবর।

কিছুদিন আগে এই দেশে ছোট ঠাকুর বড় এক সভা করেছিল। নেতা মানুষটির মাথায় গান্ধী টুপি। কালো বেঁটে মানুষ। আগুনের মতো তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সে এমন সব কথা বলছিল যে ক্ষণে ক্ষণে হাততালি পড়েছে। বক্তৃতার শেষে নেতা মানুষটি বললেন, আমরা এক অখণ্ড দেশ চাই। সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। এক দেশ, এক জাতি, হিন্দু মুসলমানের এক পরিচয় আমরা ভারতবাসী। আকালুদ্দিন গিয়েছিল সভাতে, কত লোক, কি রকম বক্তৃতা, সে মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে মনে হেসেছিল—এক জাতি, এক পরিচয়—আমরা ভারতবাসী!

আর তখন ঈশম গোপাট পর্যন্ত নেমে এল। কারণ সে বৌশদুর যেতে পারছে না। সে গেলে বাড়ি ঘর কে দেখাশোনা করবে। পাওনা গন্ডা কে বুঝে নেবে! সে না থাকলে, এই যে এক পরিবার থাকল, পাগল মানুষ থাকল, এবং বুড়ো মানুষটি—যিনি যে কোনদিন আপন নিবাস থেকে ঈশ্বরের নিবাসে গমন করতে পারেন, তাদের এখন দেখে শুনে রাখার সব দায় এই মানুষের। সোনা, লালটু, পলটু অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বড়বৌ ধনবৌ পুবের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। শশীমাস্টার অর্জুন গাছটার নিচে ওদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং নানা-রকম বোধ প্রবোধ দিচ্ছে—দূর বোকা কাঁদে নাকি। কত বড় সম্মান। দেশের কাজ করছে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। কত সম্পদ আমাদের। সব ইংরেজরা এখন সাগরপারে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের তাড়িয়ে দিলে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা যাবে না। আমাদের দেশ কত বড়, আর কি মহান এই দেশ। আমরা এই মহান দেশের মানুষ। আমাদের গর্বের শেষ নেই।

সোনা শশীমাস্টারের এমন সব কথা শুনে কান্না থামিয়ে দিল। সে চোখ মুছে বলল, কবে স্বাধীন হইব?

—তা আর দেরি নেই মনে হয়।

সোনার মনে হল স্বাধীন হলেই সব হয়ে যাবে। যেমন জালালি যে খেতে পেত না, স্বাধীন হলে খেতে পেত। জলে ডুবে মরতে হত না। ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল জালালির জন্য। সে আর দুটো দিন দেরি করতে পারল না। স্বাধীন দেশের মানুষ সে তবে হতে পারত। তার মনে হল এখন, ঠাকুরদাও একদিন মরে যাবে। তিনি আগে মরবেন, না পরে মরবেন, [illegible] মরলে সে একদিন ঠাকুর-দাকে তরমুজ খেত পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। বলবে, ঠাকুরদা আপনি ত সারা জীবন পরাধীন দেশের উপর দিয়ে হেঁটে গেছেন, এবার স্বাধীন দেশের মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আপনার ভাল লাগছে না? বাতাসটা পাতলা মনে হচ্ছে না! বুক ভরে নিতে পারছেন না! মনে হচ্ছে না এবার আপনি আরও বেশি দিন বাঁচবেন!

ঠাকুরদা নিশ্চয়ই সোনার মাথায় হাত রেখে বলবেন তখন, তোরা কত ভাগ্যবান। তোরা স্বাধীন দেশের মানুষ। কত সংগ্রামের পর এ স্বাধীনতা, জালিয়ানাবাগ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, দেশবন্ধু ওদের কথা সব সময় মনে রাখবি। ওদের জন্য এই স্বাধীনতা। ওদের ভুলে যাবি না। তোরা কতকাল বাঁচবিরে। আহা স্বাধীন, স্বাধীনতা এই শব্দ কি এক আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত কথা। সোনার চোখ বুজে আসছিল।

তখন শশীমাস্টার দেখল, ধানের জমির উপর দিয়ে এক যুবতী মেয়ে ছুটছে। কে যায়! ওঃ, সেই ফেলুর ডানাকাটা পরী যায়। কার গলা হ্যাত করে ধরে আনা বিবি। বাছুরটাকে ধরে ফেলেছে। ফেলু দাঁড়িয়ে আছে জালালির কবরের পাশে। কবরের সাদা কাশ ফুল দুলছে বাতাসে। কবরটার উপর সবুজ ঘাস। বৃষ্টিতে বর্ষায় কবরটা আর কবর নেই। মসৃণ মাঠ হয়ে গেছে। সেখানে আবার নতুন জীবনের উন্মেষ হচ্ছে।

আকালুদ্দিনের পরাপরদি পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা হয়ে গেছে। সে ফজরের নামাজে হাজির হতে পারে নি। জোহরের নামাজ সে সকলের সঙ্গে পড়তে পারবে। দূর দেশ থেকে বহুজন এসেছে। মসজিদের পাশে মাদ্রাসা। মাদ্রাসার সামনে বড় মাঠ, মাঠে শামিয়ানা টানানো। নিশান উড়ছে। সেই কবে একবার তার পীরের পাশে সামু-ভাই জালসা করেছিল, শীতের জন্য তামাম বড় বড় তেল আর তখন মুড়াপাড়ার হাতী এসে সব তছনছ করে দিয়েছিল—জালসা হতে পারে নি, কিন্তু এখানে কার হিম্মত আছে জালসা ভেঙে দেয়। সাহাদের ঘাট নদীর অপর পাড়ে—নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র, তার পাশে পুরানো ভাঙা সব বাড়ি, এক সময় এ-গাঁয়ের মতো জায়গায় সাহাদের প্রতিপত্তি ছিল কত! এখন সাহারা নারাণগঞ্জে তেজা-রতির কারবার করে বড় ব্যবসা ফেঁদেছে। গাঁয়ের পুরানো ভাঙা বাড়ি ফেলে চলে গেছে তারা। বড় বড় সব অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে পাঁচিলে। আর শুধু চার পাশে মুসলমান গ্রাম এবং নদী পার হলে এই মাদ্রাসা মৌলানা সাবের প্রাণ। এখানে
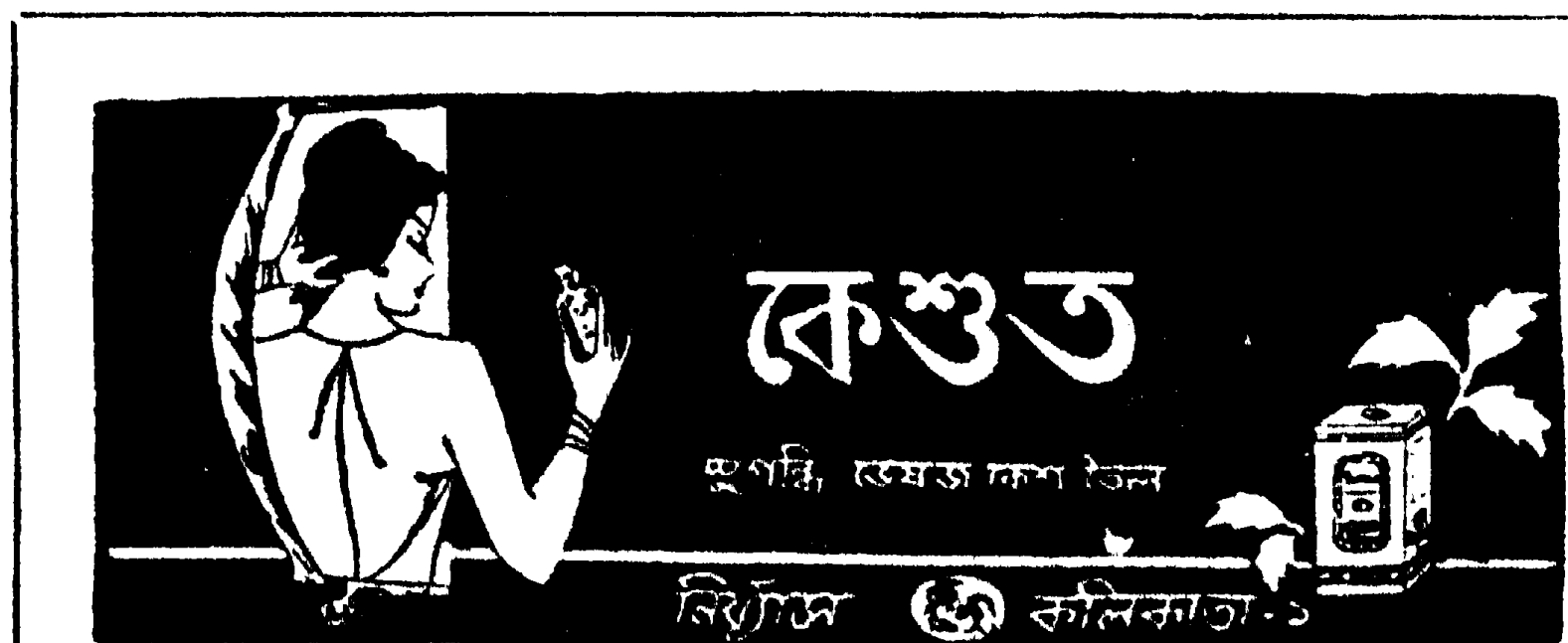
কলকাতা থেকে জনাব আলি সাহেব এসেছেন। তিনি যখন বক্তৃতা করেন কাঁচের গ্লাসে ফুৎ ফাৎ জল খান। আকালু ভাবল সেও জল খাবে কাচের গ্লাসে। তাহলে গলা শুকোবে না। কারণ এইসব নামী মানুষের সঙ্গে আকালুদ্দিন আজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তৃতা করবে। জল খেলে মাথায় বুদ্ধি আসে বুঝি। সামু ভাইও জল খান বারে বারে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জল খাওয়া বড় নেতার স্বভাব। সে এইসব নামী মানুষের সামনে কি আর বলবে! ভাবল, কি আর বলা যায়, শুধু প্রথমে বলা ইনসান আল্লা, তারপর কিছু হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে পড়া।

সে চারিদিকে দেখল নিশান উড়ছে। কোথাও ইস্তাহারে লেখা আছে নারায়ে তকদির অথবা লাল নীল সবুজ রঙের ফেস্টুন, ধর্মাধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, হিন্দু বিধবা রমণীর মুসলমান দর্শনে ঘৃণ্য মুখ, অস্পৃশ্যতার কঠিন দৃশ্য এবং কার কত জমি হিন্দুর শতকরা কতজন হিন্দু কত আয় করে, সেখানে অঞ্চল বিশেষে কত মুসলমান, তার আয় কত—এসব পরিসংখ্যা। সহসা দেখলে মনে হবে—শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দিয়েছে তারা।

এবং কবে প্রথম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা করেছেন তাদের ছবি। বিখ্যাত সব মসজিদের ফটো খামের লাল নীল মোড়া কাগজের উপর সাটা। এবং হজ্জ গেলে যেসব ছবি সংগ্রহ করে এনেছে হাজি সাহেবেরা মক্কা অথবা মদিনার—যেমন কাবা মসজিদের দৃশ্য, নানা রকমের দৃশ্য ঝুলিয়ে এইসব পবিত্র ইসলামের বাণী বহন করছে এই সভা। সামিয়ানার নিচে এইসব দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আকালুদ্দিন মোড়লের মতো হেঁটে যাচ্ছিল। সে মানীজনদের আদাব দিল। সালেম আলাইকুম, ওয়ালে কুম সালাম এইসব উচ্চারিত হচ্ছিল। সামিয়ানার দক্ষিণ দিকে বড় বড় উনুনে তামার ডেগ। যারা মানী-গুণীজন তাদের খাবার ব্যবস্থা। সে এখানে এসেই প্রথম খোঁজ করল সামসুদ্দিনের। সামুভাই থাকলে সে গলা ছেড়ে বলতে পারবে। সে মনে বল পাবে। সামুভাই যে কোন দিকে! কেউ বলল, অইন গোসল করতে গ্যাছেন। কেউ বলল, তিনি আলি সাহেবকে নিয়ে মাঠে নেমে গেছেন। এবং এইসব গ্রাম দেশের কি অসহায় দারিদ্র্য তাই দেখাতে নিয়ে গেছেন।

ওরা এবার সকালে রান্না হলেই আহার করতে বসবে। তারপর জোহরের নামাজ। নামাজে কে ইমাম হবে আজ! আকালুদ্দিনের কতকালের খোয়াব সে এমন এক বড় মাঠের জমায়েতে ইমাম হবে। সামুভাই থাকলে সে একবার অন্তত মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে পারত।

সে হন্যে হয়ে সামুভাইকে খুঁজছিল। আর খুঁজতে খুঁজতেই পেয়ে গেল। সামু সেই লম্বা সাদা পারজামা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজটুপি পরে মাঠ থেকে উঠে আসছে। পায়ে বুট জুতো। মোজা নেই। সঙ্গে এক দঙ্গল লোক। রোদে ওদের সকলের মুখ পুড়ে গেছে। জল তেষ্টা পেতে পারে বলে বদনা হাতে পাঁচ-সাতজন লোক সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে। ওরা এবার সকলে খেতে বসে গেল। পাটির উপর পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে গেল। বড় থালায় ভাত। ছ'সাতজন করে একটা থালার চারপাশে বসেছে। থালার মাঝে মঠের মতো ভাত সাজানো। কিনার থেকে যে যার মতো ভাত ভেঙে ডাল নিয়ে চেটে চেটে ভাত-ডাল গোস্ত খাচ্ছে। সামু, আকালু এক গাঁয়ের লোক। এবং যারা কাছাকাছি তারা পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। যে যার মতো একই থালায় ভাত ভেঙে মেখে খেয়ে উঠে মুখ ধুল। নদীর ঘাটে অজু করে এল। একসঙ্গে সার বেধে নামাজ পড়ল। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে আকালুদ্দিনের। সে ইমামের কাজ করেছে। তারপর মঞ্চে উঠে যে যার মতো বলে গেল। সবাই প্রায় কথার কথায় হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের কথা বলল। মাঠের দিকে হাত তুলে দেখাল। বলল, দুচার বিঘা জমি বাদে, সব জমি কার?

—হিন্দুর।

—[illegible]

—[illegible]।

—উকিল বলুন ডাক্তার বলুন কারা?

—হিন্দুরা।

—শিক্ষা-দীক্ষা কাদের জন্য?

—হিন্দুর জন্য।

—ওদের জমিতে খাটলে আপনি খান, আপনার নাম মুসলমান!

এবারে হাততালি পড়ল।

সামসুদ্দিন কিন্তু খুব যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে—এই যে আমরা মুসলমানেরা আলাদা একটা দেশ চাই—তার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা রাখল। সে একটা সালের উল্লেখ করে বাংলাদেশে হকসাহেবের পরিণতির কথা বলল। হিন্দু-মুসলমান একই রাষ্ট্রে একই পতাকার নিচে বসবাস করতে পারে না, তার কারণ ব্যাখ্যা করল। সে বলল, আপনেরা জানেন মিঞাভাইরা, আমার দিলের চাইতে আপন পীড়িতের মানুষেরা, আপনেরা জানেন ১৯৩৭ সালের কথা। হকসাহেবের কৃষক প্রজা দল যেহেতু মুসলিম প্রধান দল, তাকে নিয়ে কংগ্রেস যোথ সরকার গঠন করলেন না। আপনারা জানেন উত্তরপ্রদেশের মুসলিম লীগ দাবি করেছিল যোথ সরকারের—নেহেরুজী তা বানচাল করে দিলেন। আপনারা জানেন হকসাহেবের দল কেমন সাম্প্রদায়িক দল নন, সাধারণ মেহনতি মানুষ নিয়ে এই দল, কৃষক প্রজা নিয়ে এই আন্দোলন অথচ হিন্দুদের এমন মুসলিম বিদ্বেষ যে তারা কিছুতেই যোথ সরকার গঠন করলেন না। বরং কংগ্রেস হকসাহেবের সব প্রগতিশীল কাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকল। হকসাহেব এখন বুঝতে পারছেন তাঁর তখৎ-ই-তাউস পাখা, মেখলা, খুড়িগঙ্গায় ভেঙে পড়েছে। বলে সামসুদ্দিন একটু থামল। এক গ্লাস জল খেল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেমন ভিড় হয়েছে। তারপর ফের বলতে থাকল, আপনাদের কাছে আমি এখন পীরপুরের রিপোর্ট ধরে তুলব। কি প্রকট এই মুসলিম-বিদ্বেষ! কি অমানুষিক অত্যাচার! তাজা খুনের হোলি খেলেছে তারা। আপনার আমার খুনে ওরা গোসল করেছে। সে এ-সব বলে আবার জল খাবার সময় কি যেন এক ছবি, ছবিতে মালতীর মুখ, সেই করুণ মুখ, তুই সামু এডা কি কস, সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন গলা শুকিয়ে গেল। কোন রকমে তারপর বলল, আপনাদের ভিন্ন দেশ বাদে গতি নাই। সে নিজেকে বলল এবার, হে আল্লা এছাড়া এ-জাতির উদ্ধার নাই।

কি ভাবল সামান্য সময় ফের সামু। এমন ভিড়ে সে যে কেন বার বার সেই করুণ মুখ দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারছে না। যেন কেবল বর্ষার মালতী তার হারানো হাঁসটা খুঁজছে। এবং সে মালতীকে নিয়ে ধানখেতের আলে আলে লাগ বাইছে। মালতীর হাঁসটা খুঁজে পেলেই সে তাকে দিয়ে আসবে বাড়িতে।

এ সব সাময়িক দুর্বলতা। এতগুলি মানুষ তার মুখ থেকে আরও কিছু শুনতে চাইছে। সে এত কম বললে নিজের জাতির প্রতি বেইমানী করবে। সে গলা সাফ করে বলল, উত্তরপ্রদেশের খালিকুজ্জমান সাহেবের কি অনুনয় বিনয়, আমাদের সরকার পরিচালনায় সামান্য স্থান দিন। কে কার কথা শোনে। বল্লভভাই প্যাটেল সব অনুনয় যমুনার জলে ভাসিয়ে দিলেন। সে এবার ঘড়ি দেখল। পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে সময় দেখে বলল, আমার পরবর্তী অনেক বক্তা আছেন। তাঁরাও তাঁদের বক্তব্য রাখবেন আপনাদের কাছে। কেবল মেহেরবাণী করে আপনারা যাবার আগে মোতাহার সাহেবের কাছ থেকে একটা করে বই নিয়ে যাবেন। তারপর সাঁঝে যখন আজান শুনতে পাবেন, কুপির আলোতে পড়বেন এই রিপোর্ট। মুসলিম নিপীড়নের খুঁটিনাটি তথ্য পড়লে আপনাদের খুন টগবগ করে ফুটবে। সে বড় সহজ ভঙ্গীতে এবার হাতটা মুখের উপর একবার দুলিয়ে দিল।

আকালুদ্দিন বড় নিবিষ্ট মনে শুনছে এবং সামুর অবয়বে কি কি রেখা ফুটে উঠছে সে লক্ষ্য রাখছে। সেও এমনভাবে মুখের রেখার দ্বারা, তার ক্রোধ, উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা সকলের ভিতর ছড়িয়ে দেবে। শেষে সামু যেভাবে কথা শেষ করে হাত ঘুরিয়ে এনেছে দম্ভভঙ্গীতে, সেও অন্যমনস্কভাবে নকল করতে গিয়ে কেমন সকলের কাছে ধরা পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ হতেই সহসা হেঁকে উঠল, আল্লা-হু-আকবর।

জনাব আলি সাহেব বললেন, দেশটা ইংরেজরা আমাদের হাত থেকে নিয়েছিল।

আশা করব যাবার সময় ইংরেজ শাসনভার আমাদের হাতে দিয়ে যাবেন। গোলামের জাত দেশ শাসনের বোঝে কি।

সবাই হাততালি দিচ্ছে একসঙ্গে।

বড় মজার কথা বলেছেন সাহেব। ওরা খুব খুশী এমন কথায়।

বিকেলবেলা আকালু মসজিদের নিচু জমিটাতে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। এক এক করে এবার বিদায় নিচ্ছে সবাই। গয়না নৌকায় আজই সামুভাই নারায়ণগঞ্জে যাবে। কাল ঢাকা চলে যাবে। সে একটু সুবিধা মতো সামসুদ্দিনকে একা পাবার ইচ্ছাতে আছে। আলি সাহেব দুদিন থাকবেন মৌলানাসাবের বাড়িতে। এখন সবাই চলে গেলে কেবল থাকে সামুভাই। সামুর অঞ্চল এটা। সেই সবাইকে বিদায় দিচ্ছে। বিদায় দিয়ে সামু এদিকে উঠে আসছে। দুজন লোক পিছনে। ওরা সামসুদ্দিনকে সামিয়ানার নিচে পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সময়। সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলল, দ্যাশে যখন আইলেন, বাড়ি একবার ঘুইরা যাইবেন না!

—সময় খুব কম। কাইল আবার বন্দরে সভা আছে।

আকালু এবার সামুকে চুপি চুপি বলল, ছোট ঠাকুরকে ধইরা নিয়া গ্যাছে।

কেমন বিস্ময়ের গলায় বলল, ছোট কত্তারে!

—হ ছোট কর্তারে।

—কাব?

—আইজ। আইছিল ধরতে রঞ্জিতরে। পাইল না। ধইরা নিয়া গেল ছোট কর্তারে।

—রঞ্জিত কই গ্যাছে।

—রঞ্জিত মালতীরে নিয়া পালাইছে।

সামসুদ্দিনের মুখটা অদ্ভুত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সে আর কিছু বলতে পারল না।

আকালু কত কাজের, লীগের জন্য সে কতটা জীবন পাত করছে এমন দেখানোর জন্য বলল, দিলাম খবর থানায়। কইলাম একজন রাজনৈতিক কর্মী আত্মগোপন কইরা আছে।

—তর কি দরকার ছিল আকালু। তুই এমন করতে গেলি ক্যান!

—কাফের যত বিনষ্ট হয় তত ভাল না।

—না।

এমন চোখ মুখ দেখবে সামসুদ্দিনের সে আশাই করতে পারে নি। সামু আবার চুপ হয়ে গেল। সামিয়ানার নিচে হ্যাজাকের আলো। সে এক দরগায় যুবক, অথবা এক ফকির যায়, অর হাতে লণ্ঠন, কত দূর যে সে এভাবে যাবে কেউ যেন বলতে পারে না। আকালু শেষে বলল, আর কিছু কইবি?

সে কেমন থতমত খেয়ে গেল। সে আরও যা বলবে ভেবেছিল সামসুদ্দিনের মুখ দেখে কেমন ভুলে গেল।

পীরের মাজারে জোটন তখন সব করবী ফুল পরিষ্কার করছে। সে সাঁঝ লাগলেই মোমবাতি জ্বালায়। এবং মাজারের উপর গত সন্ধ্যা থেকে যে সব ফুল ঝরে পড়েছে সে সব ফেলে দিচ্ছে। তকতকে মাজার। চারপাশে সবুজ ঘাস। নিচে ফকিরসাব শুয়ে আছেন। আর উপরে এই করবী ফুলের গাছ। নিশিদিন ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার ঘরটার দিকে উঠে যাবে এবার। এখনও ভাল করে অন্ধকার হয় নি। কিসের শব্দে সে শরবনের দিকে তাকাতেই দেখল, বাতাসে সরবন কাঁপছে। এবং শরবন ফাঁক করে কেউ এদিকে উঠে আসছে।

এই অসময়ে মানুষ। এক মিঞা মানুষ। কিন্তু একি! পিছনে বোরখা পরে এক বিবি। এমন একটা অঞ্চলে এই মিঞা বিবি। সে কেমন বিস্মিত চোখে মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছে!

রঞ্জিত কাছে গেলেও জোটন কোন কথা বলতে পারল না। অপরিচিত মানুষজন আসে, সকালের দিকে আসে, পীরের মাজারে বাতাসা অথবা ফুল দিয়ে যায় কেউ। কেউ আসে জড়ি বুটি নিতে। সন্তান-সন্ততি না হলে কেউ আসে। আর আসে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগলে। কেউ তার গাছের প্রথম লাউ, কুমড়ো মাজারে দিতে আসে। ফকিরসাবের সব জড়ি-বুটির গুণাগুণ জোটন জেনে নিয়েছে। এই করেই জোটনের সংসার। সেও ক্রমে এই অঞ্চলের পীরানি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা নির্বাজিত জায়গায় একা থাকলেই, সে আর মানুষ থাকতে পারে না, জীন পরী হয়ে যেতে পারে অথবা পীর পয়গম্বর। ফলে জোটনের কিছু জমি হয়েছে। কেউ ফসল দিয়ে যায়। কেউ মুরগী দিয়ে যায়। সে মুরগী বেচে, ফসল বেচে তেল নুন নিয়ে আসে তিন ক্রোশ দূর থেকে। এক হাট আছে। হাটবারে এই দরগা ভেঙে মাইলখানেক হেঁটে গেলে হাটের পথ, হাটের মানুষেরা সে পথে যায়। যারা যায় তাদের হাতে সে মুরগী দিয়ে দেয়, ফসল দিয়ে দেয়। ওরা এসব বিক্রি করে তেল নুন ডাল এসব দিয়ে যায়। আজ হাটবার নয়। সে কাউকে মুরগী দেয় নি যে বেচে তাকে তেল নুন দিয়ে যাবে, এই সূর্যাস্তের সময় কেউ এমন নেই অঞ্চল বিবি নিয়ে এখানে চলে আসে। সুতরাং জোটন কি যে বলবে এই অপরিচিত মিঞাসাবকে বুঝতে পারল না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

রঞ্জিত দাঁড়ি গোঁফ তুলে বলল, আমাকে চিনতে পারছিস না জোটন!

চিনতে পারছে না জোটন। যে মানুষ খুদ কুঁড়া পেলেই কি খুশী, সে যে এখন পীরানি তা রঞ্জিত জানবে কি করে! কেবল জোটন বুঝতে পারল, এই মানুষ এসেছে তার বাপের দেশ থেকে। নতুবা তার নাম ধরে কে ডাকতে সাহস পাবে। বোরখার নিচে বিবি মুখ লুকিয়ে রেখেছে। বয়সে কত ছোট এই মানুষে, তার হাঁটুর সমান বয়সী। সে বলল, কোন গাঁ তোমার।

—আমি রঞ্জিত। গ্রাম রাইনাদী।

—আপনে রঞ্জিত ঠাকুর। অমা এডা কি কন তাইন। বোরখার নিচে কারে আনছেন? আপনে কত বড় হইয়া গ্যাছেন।

—মালতীরে।

—আরে এডা কি কন! মালতীরে! কই আছে।

মালতী বোরখা খুলে ফেলল।

জোটন মালতীর মুখ চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেল। কি শীর্ণ চেহারা! চোখ কোটরাগত। কঙ্কালসার। কি যুবতী কি হয়ে গেছে! জোটন বলল, ভিতরে আয় মালতী। কর্তা আসেন।

রঞ্জিত কি বলতে গেলে জোটন বাধা দিল। বলল, কর্তা ব্যাখ্যা লাগব না। পীরের থানে যখন আইসা পড়ছেন আর ডর নাই।

এই জোটন নিবাসী এই বনে, এবং বনের ভিতর এক রহস্য আছে। সেই রহস্যে সে ডুবে গেছে। এই দরগার ঝোপ-জঙ্গল, কড়ুই গাছ, রসুন গোটার গাছ ফেলে সে আর এখন কোথাও যেতে চায় না। বনবাদাড়ে অন্ধকারে একটা করবী গাছের নিচে কবরের পাশে বসে থাকলে মনেই হয় না মাটি কার? মাটি হিন্দু না মুসলমানের। সে এতদিন পর দুজন বাপের দেশের মানুষ দেখে খুশীতে ঝলমল করে উঠল, বলল, অ পীরসাহেব দ্যাখেন আপনার দরগায় কেডা আইছে! বলে সে দুই অতিথি নিয়ে হাঁটতে থাকল।

(ক্রমশঃ)

নিকটেই আছে

ক্লিনিকে একটি বিকেল

দোকানের ফোন নম্বরটা চেনা-জানা প্রায় সবাইকে দিয়ে রেখেছে বিনয়। নিজের ফোন নেই—নেই মানে, রাখার ক্ষমতাটাই নেই আসলে। অথচ ওটা ছাড়া আজকাল চলাই দুষ্কর। ইউনিয়নের পাণ্ডা হওয়া ইস্তক যন্ত্রটার গুরুত্ব আবিষ্কার করেছে বিনয়। অফিসের ফোনটা ইচ্ছামত ব্যবহার করে, অসুবিধে কিছু নেই তাতে। অসুবিধে এই যে অফিসটা মাত্র আট ঘন্টার। তারপর এপাশে ওপাশে যে আরো আট, আট ষোল ঘন্টা পড়ে আছে, সে সময় যন্ত্রটা পাবে কোথায়? ছোট ইউনিয়ন, সামর্থ্য নেই যে একটা ফোন করে নেবে। ফোন দূরের কথা, একটা ঘরই নেই ইউনিয়নের। অফিসের শেষে ক্যানটিনে বসেই রাজ্যপাট চালাত। কিন্তু তারপরেও থেকে যায় নানান ঝামেলা—

বাড়ীর উল্টোদিকেই ভজন রায়ের দোকান। সিমেন্ট, লোহার রড, অ্যাসবেসটস সব মিলিয়ে দোকানটা বেশ বড়। আট-দশজন কর্মচারী, জনা বিশেক কুলি-মজুর সর্বদাই খাটছে দোকানে। আর খাটছে ফোনটা। বিপদে আপদে, প্রয়োজনমত পয়সার বদলে ফোন করার সুযোগ দিয়েছেন ভজন রায় বিনয়কে। শুধু যে ফোন করতেই দিয়েছেন তাই নয়, যেদিন বিনয়ের বাসায় [illegible] মন্ত্রীমশাই এলেন, দু-চারজন পুলিশ বাসাটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গোঁফে তা দিয়ে গাড়ী-ঘোড়ার রাশ সামলাল, সেদিন থেকে ভজন রায় বিনয়কে ঢালাও পারমিশন দিলেন—আপনি কাজের আদমী। কত বড় বড় লোক আসে আপনার কাছে। যদি দরকার হোয় নম্বরটা জানিয়ে দেবেন ফুন এলেই হামার লোক ডিকে দিবে হাপনাকে।

সেদিন থেকেই একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ভজন রায়ের সঙ্গে। ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি ঘুচলেও, সম্পর্কটা টিঁকেই গেছে। আজকাল নেতারা বা চেলারা কেউ ফোন করে না। করে সব পুরোনো দিনের বন্ধু-বান্ধবরা। ভজন রায় তবুও ডেকে দেন। ফোনটোন হয়ে গেলে চা-টা খাওয়ান। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনা ঠিক নয়—বিনয়ের মতামতটাই জানতে চান। এরকম যদি আরো কিছুদিন যায় তাহলে তো বেওসাপত্তর সব গোটাতে হবে। আর কেতোদিন চলবে মনে হয় হাপনার বাবু।

বিনয় মনে মনে খুব বিব্রত বোধ করে। জাত ব্যবসায়ী ভজন রায়। অর মত চুনো-পুঁটিকে এ-হাটে কিনে ও-হাটে বেচে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। নেহাৎ বিনয় 'শিক্ষিত' আদমী, একসময় পোরাটাক নেতাও বনে গিয়েছিল ডামাডোলের বাজারে, তাই খাতির করে ভজন রায় বাবুর মতামত জানতে চান। তাপ্পি-টাপ্পি মেরে দেখেছে, ভজন রায় সবই বোঝে, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিন্তু বলে না, চুপ করে শুনে যায়। বিনয় নিজেই কি ছাই সব বোঝে, না বুঝতে পারে, যে এই ষাট বছরের ঝুনো নারকোলকে শাঁসের স্বাদ বোঝাবে।

তাই আলোচনার মোড় ঘোরানোর জন্য ভজনবাবুর স্বাস্থ্যের হাল-হকিকৎ জানতে চায় বিনয়। তেইশ বছর লোকটাকে দেখছে। খুলনা ছেড়ে আসা অবধি কলকাতার এই পাড়াতেই ওরা যে বাসা নিয়েছিল, তারপর আর বদলাবার সুযোগ আসেনি। দাদারা বদলি হয়ে মফঃস্বলে ছড়িয়ে গেছেন। পাঁচ ভাই-এর মধ্যে এখন ও একাই এই বাসাতে আছে। তেইশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে পাড়াটার। রাস্তার গ্যাসের আলোর জায়গায় এসেছে কর্পোরেশনের ইলেকট্রিক লাইট। পান-বসন্তে খোদলানো গালের মত খোয়া-বেরকরা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটা পিচ-ঢালাই হয়ে এখন চমৎকার মসৃণ। আর মসৃণ হয়েছে ভজন রায়ের চেহারাটা। ছোট্ট একফালি দোকান থেকে এখন দু-দুটো লরী, একটা জিপ, টালিগঞ্জ আর গড়িয়ায় দুখানা বাড়ী প্লাস দেশে, মানে ছাপরায় স্বনামে বেনামে কয়েকশো বিঘা জমি সবই হয়েছে। সেই সঙ্গে লম্বা হিল-হিলে রোগা কাঠা-মোটার ওপর দোমাটি ছেড়ে চৌমাটির পলেস্তারা পড়েছে। এখন হাঁটতে চলতে রীতিমত কষ্ট হয়। বুকে হাঁপ ধরে। রাতে ঘুম হয় না। সারাদিন বসে বসে ঝিমুতে ইচ্ছে করে। কি করি বলুন তো বাবু? সেই যুদ্ধের সময় একবার 'রাজরকসমা' হোয়েছিল সে তো ডাগদারবাবু ইলাজ দিয়ে সারিয়ে দিলেন, কিন্তু এবার তো কুছুতেই কুছু হোচ্ছে না।

আপনি কোন বড় ডাক্তারকে দেখান না—গম্ভীরভাবে পরামর্শ দেয় বিনয়।

উত্তরটা ভজন রায়ের বদলে তাঁর বাঙালী কর্মচারী গোবিন্দ চৌধুরীই দিল—একটা বড় ডাক্তারও আর বাকী নাই বিনয়বাবু, বেবাক ডাক্তারেই দ্যাখসেন ওনারে। হইল না তো কিস্যু। হ্যাদে এখন ঘোষ ডাক্তার দ্যাখতাসে। তাও প্রায় পাঁচ মাস হইল—কিন্তু সারে নায় মোটেও।

চৌধুরীকে মনে হোল খুবই উদ্বিগ্ন তো বটেই। কারণ ভজন রায়ের কিছু হোলে, সম্পত্তি-টম্পত্তি ব্যবসাপত্তর সব পাবে ওর ভাগনেরা। ভজন রায় ব্যবসা করতে করতে বিয়ের কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। ভাগনেরা খুব সুবিধের লোক নয়। মামার ভয়ে এখন মুখ না খুললেও চৌধুরীর আশঙ্কা ভবিষ্যতে সব বাঙ্গালী কর্মচারীকেই—ওরা ছাড়িয়ে দেবে, দেশোয়ালী ভাই-বেরাদরদের এনে বসাবে দোকানে। তখন এদের কি হবে? চৌধুরী, বেচা সাহা, তিনু ঘোষ, কার্তিক বাড়ুজ্যে, বিপিন মণ্ডল, তারানাথ ঘটক অচিন্ত্য গোঁসাই, রমণী সাধুখাঁ, কালু সাপুই—সব যাবে কোথায়? ওরা এক-একজন পঁচিশ-তিরিশ বচ্ছর এই দোকানে। বয়স হয়ে গেছে। অন্য কোন কাজ জানে না। টাকা নেই যে দোকান দেবে কোনো। একমাত্র ভরসা ঐ ভজন রায়। লোকটাকে যে কদিন টিঁকিয়ে রাখা যায়, সে দিনই নিশ্চিন্ত। তারপর?—ভাবতেও বোধহয় সাহস পায় না চৌধুরীরা।

দোকানের সব ক'জন কর্মচারী তাকিয়ে বিনয়ের দিকে। ভজন রায়ের বড় ভাগ্নেও জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। আর স্বয়ং ভজন রায় থলথলে চর্বির পাহাড়ের মত আলাভোলা বাবাজীর চেলা হয়ে বসে আছেন। বিনয় অনেক ভেবে-চিন্তে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শুনতে পেল চর্বির পাহাড় গমগম করছে—হাপনার অনেক জান-পহেচান আছে। হামার একটা ইলাজের বন্দোবস্ত করিয়ে দিন না বাবু!

কয়েকদিন আগে এক বন্ধুর মুখে সরকারী ক্লিনিকের কথা শুনেছিল বিনয়। ব্যবস্থাপত্র নাকি বেশ ভাল। ঠিক করল, ভজন রায়কে একবার ওখানকার ডাক্তারকে দিয়েই দেখাবে।

ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে শুক্রবার ভজন রায়কে নিয়ে বিনয় গেল ক্লিনিকে। বড় ভাগ্নেও, মামার ইলাজের দেখাশোনার ঠিকেদারী যাতে হাতছাড়া না হয়, তাই সঙ্গে গেল।

গভর্ণমেন্ট হাসপাতালের বড় ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করার সুযোগ নেই। সরকারী দেড় দু হাজারী মাসোহারা বাইরে আইনমত তাঁদের আয়ের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ডাক্তাররা গুমরোচ্ছিলেন। তাই সদাশয় সরকারমশাই দয়া করে কাউ আদায়ের এই ঢালাও কারবার খুলে দিয়েছেন। সকালে মিনিমাগনা রুগী দেখবেন ডাক্তাররা হাসপাতালে। বিকেলে ছ টাকা ফিতে বড্ড করে মধ্যবিত্তের রোগের দাওয়াই বাতলাবেন তাঁরাই এই সব ক্লিনিকে। তবে সব কটা বিকেল কেউ পায়

না। দুপুর তিনটে থেকে রাত নটা—দুটো করে সিফট। গড়ে এক-একজন ডাক্তার ম্যাক্সিমাম তিনটে সিফট পায়। এক-এক সিফটে পঁচিশজনের বেশী রুগী দেখার নিয়ম নেই। অর্থাৎ এক সিফট থেকেই দেড়শো টাকা আদায়ের বন্দোবস্ত। তিনটে সিফটে রুগী দেখলে সপ্তাহেই আসবে কম করেও সাড়ে চারশো টাকা। মাসে আঠারো'শ টাকা।

ডজন ডজন বড় ডাক্তার ফি মাসে মাইনে ছাড়াও এতগুলো একস্ট্রা টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। বিনিময়ে রুগী কি পাচ্ছে? কি পাচ্ছে সে তো বিনয় নিজের চোখেই দেখেছে।

দুটোর সময় ক্লিনিকে গিয়ে লাইন লাগাল। রিসেপসনের ভদ্রমহিলা নোটবই খুলে তারিখ দেখে ভজন রায়ের নামটা মিলিয়ে নিয়ে ডিরেকশন বাতলে দিলেন। পাঁচতলা বিশাল বাড়ীটার ওপরের চারটে তলা জুড়ে সরকারী দাক্ষিণ্যে মিনি নার্সিং হোম। একতলায় নার্সিংহোমের আউটডোর। ডাক্তারদের চেম্বার। চেম্বারে নার্স আর দুনিয়ার ডাক্তররা ভজন রায়ের রোগের বৃত্তান্ত শুনে একটা এক নম্বরী এক্সার-সাইজ খাতায় ওর নাম বয়স সেকস লিখে বলে দিলেন—টাকাটা আট নম্বরে জমা দিয়ে আসুন।

সেই টাকা জমা দিতে গিয়েই সব টের পেল বিনয়, কারবার কি সুন্দর চলছে। কাউন্টারের সামনে তিনটে লাইন। একটায়
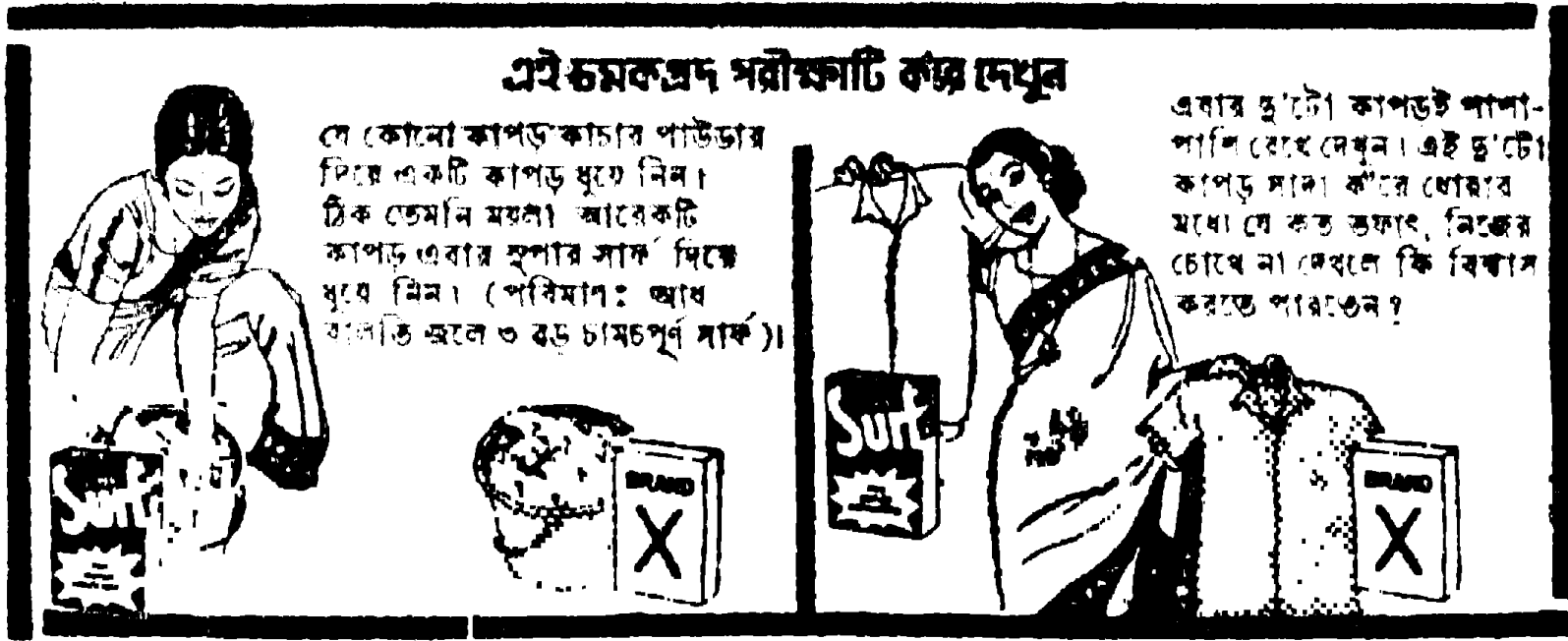
পুরোনো আর নতুন সব রুগীরই নাম রেজিস্ট্রি করানো হচ্ছে। আর দুটোতে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ টাকা জমা দিচ্ছে সবাই। প্রথম চারবার দেখানোর দক্ষিণা ছ টাকা করে। পরের চারবার রেটটা কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে যাবে। তারপরও যদি রুগীকে আসতে হয় তাহলে আবার দাও ছ টাকা করে।

রেজিস্ট্রেশনের লম্বা লাইনটা পাড়ি দিয়ে যখন কাউন্টারের সামনে এসে হাজির হোল বিনয় তখন ঘড়িতে বাজে প্রায় তিনটা। ডাক্তার আসার সময় হয়ে গেছে। অলরেডি কতজন টিকিট জমা দিয়েছে কে জানে। জমা দিতে যত দেরী হবে তত পরে ডাক্তারের ডাক আসবে। হয়তো পাঁচটার আগে ডাকই পড়বে না। কাউন্টারের গ্রিলের ভেতর দিয়ে খাতাটা বাড়িয়ে দিল সামনে বিনয়।

রেজিস্ট্রেশন ক্লার্ক বিনয়ের খাতাটা উল্টে-পাল্টে দেখে ফেরত দিয়ে বলল—আজ হবে না। ডাক্তার সেনের অলরেডি নতুন পুরোনো মিলিয়ে পঁচিশটা টিকিট আজ জমা পড়েছে। পঁচিশের বেশী পেশেন্ট আইনমত উনি দেখতে পারেন না। আপনি সরুন, পেছনের লোককে আসতে দিন।

তার মানে?—চমকে উঠল বিনয়।—আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছি। জুনিয়র ডাক্তার নিজে সব দেখেশুনে এই টিকিট লিখে দিলেন। আর আপনি বলছেন যে আজ আর হবে না।

হ্যাঁ। তাই তো বলছি। আইনে যা আছে তাই বলছি। একজন ডাক্তার একটা সিফটে পঁচিশজনের বেশী রুগী দেখতে পারেন না। ডাক্তার সেনের কোটা ফুরিয়ে গেছে—তাই আপনার নাম আজ আর রেজিস্ট্রি হবে না।

বেশী বয়স নয় ক্লার্কটির। পাতলা ছুঁচলো গোঁফ আর লম্বা জুলপিতে মুখটায় একটা হিরো হিরো ছাপ। লাইনে দাঁড়ানো মেয়ে-পুরুষদের শুনিয়ে শুনিয়েই বলল—আপনারাই তো ডাক্তারদের লাই দিচ্ছেন। এটা হাসপাতাল না। পয়সা দিয়ে দেখাচ্ছেন। পয়সা দিয়ে যখন দেখাবেন তখন একটু বেশী সময় নিয়ে ডাক্তার দেখুক তাই কি আপনারা চান না? বলুন তিন ঘণ্টার মধ্যে পঁচিশজনের বেশী পেসেন্ট একজন ডাক্তার দেখে কি করে? তাহলে হাসপাতাল আর ক্লিনিকে পার্থক্য আর রইল কোথায়?

যুক্তিগুলো একটাও অস্বীকার করতে পারল না বিনয়। কিন্তু একথাগুলো কি নার্স বা জুনিয়র ডাক্তার জানে না। তারা কি করে জেনেশুনেও টিকিট বানিয়ে দিয়ে বলল, যান টাকা জমা দিয়ে আসুন? তবে আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করারই বা দরকার কি? পাশে তাকিয়ে দেখল হাবলার মত ভজন রায় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। বড় ভাগ্নেটা কান খাড়া করে শুনেছে সব। ওর মুখে-চোখে একটা শেয়াল-শেয়াল হাসি। মাথাটা গরম হয়ে উঠল বিনয়ের। লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এল। ভজন রায়কে লম্বা করিডোরে সাজানো সোফায় বসতে বলে ছুটল আবার ডাক্তার সেনের চেম্বারে।

কি হল?—টাকা জমা দিয়েছেন?—জুনিয়র ডাক্তারের প্রশ্ন দুটো শুনেই বিনয়ের সন্দেহ হল, টাকা যে বিনয় জমা দিতে পারেনি, বা পারবে না তা ভদ্রলোক জানেন। ওর মত আরো দশ-বারোজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তারের টেবিলের সামনে। মিনিটে মিনিটে ভিড়টা বেড়েই চলেছে। দেখেশুনে, বিনয়ের মনে হল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটা ভরে যাবে ফিরিয়ে দেওয়া রুগীর ভিড়ে। বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে সবাই চায় রোগ সারাতে। অথচ আইন সে পথটাও মেরে রেখেছে। বাইরে এত সস্তায় এসব ডাক্তারের টিকিও মেলে না। তাই এখানে এত ভিড়। পাশের ঘরে ততক্ষণে রুগীর ডাক পড়তে শুরু করেছে। কানে এল—বিমল বিশ্বাস। ডাক্তার সাহেবের খোদ আর্দালী টিকিট দেখে নাম ডাকছে। আর একদল হতভাগ্য টিকিটের টাকা জমা দিতে না পেরে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে এই ঘরে, জুনিয়র ডাক্তারের সামনে।

দাঁড়ান। আপনাদের জন্য একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। ডাক্তারবাবু কাউকেই ফেরাতে চান না। কিন্তু কি করব বলুন, অফিসটা এত বেয়াড়া হয়েছে।—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন জুনিয়র ডাক্তার। পাশের ঘরের সবুজ ভারী পর্দা ফুঁড়ে তখন টুকরো টুকরো প্রশ্ন-উত্তর এঘরে ভেসে আসছে—'কদিন ভুগছেন?'—'এই তো তিন মাস ডাক্তারবাবু।'

খানিক বাদেই ডাক্তারবাবুর খোদ আর্দালীটি এসে হাজির হল এই ঘরে। জুনিয়র ডাক্তার আসেনি। একেই পাঠিয়ে দিয়েছে। কালো জামা, পাজামার ওপর একটা চাপ সার্ট গায়ে, চেহারাটা খুব চতুর চতুর ছোকরার। একপলকে গোটা ঘরটার চেহারা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল টাকা জমা নেয়নি তো কি হয়েছে? আমি ডাক্তারবাবুকে দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেব। তবে হাঁ, টাকাটা আমার কাছে জমা দিন। কাউকেই তাহলে আর ফেরৎ যেতে হবে না।

পঁচিশজনের ওপরে সেদিন বড় ডাক্তার আরো প্রায় বাড়তি চল্লিশটি রুগী দেখলেন। ভজন রায়ও বাদ গেল না। টাকাও জমা পড়ল। তবে গভর্ণমেন্টের ঘরে নয়, আর্দালীর তহবিলে। এই টাকাটার কোন হিসাব কোথাও লেখা হবে না। এর হিসাব আছে ঐ আর্দালীর কাছে। রুগী পিছু ওর শেয়ার এক টাকা। জুনিয়র আর নার্স পাবে দুটো টাকা। বাকীটা বড় ডাক্তা[illegible] আর তিন ঘণ্টায় পঁচিশজনের বদলে পঁয়ষট্টিজনকে দেখে দেড়শো প্লাস এক শ বিশ, মোটমাট পৌনে তিনশো একেবারে ফাউ এক বিকেলেই আদায় করে ডাক্তার চলে গেলেন।

ভজন রায় খুব খুশী। চৌষট্টি টাকার জায়গায় মাত্র ছ'টা টাকায় সব হয়ে গেল। এত শুধু বিনয়বাবুর কিরপায়। চৌধুরীরাও সুখী। তাদের কর্তার সুচিকিৎসা হচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন মাস দুয়েকেই সব সেরে যাবে। ভজন রায় একদম ফিট হয়ে যাবেন। কিন্তু বিনয় কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। নিজে একসময় ইউনিয়ন করত। অন্যায়ের প্রতিবাদে কতবার ডেমনেসট্রেশন করেছে। অথচ এখানে কেমন বোবা বুরবাক বনে গেল। ভজন রায়ের বড় ভাগ্নেটা সবই দেখেছে, শুনেছে। আজকাল ফোন করতে গেলে হাসতে হাসতে বলে—'বিনয়বাবু আপনি তো ইউনিয়ন করতেন। এসবের এগেনেস্টে কিছু করবেন না?' খাতির বজায় রাখার জন্য বিনয় বোকা বোকা মুখে শুধু হাসে, কোন জবাব দেয় না। দেবেই বা কি? ওর একার কিই বা ক্ষমতা?

—সন্ধিৎসু

মনের কথা

অভিচার বিভ্রম

তারক ও কৃতান্ত

ডিলিউশনের রোগীর ভ্রান্তির বিশিষ্টতা তার শিক্ষাদীক্ষা ও সুস্থ অবস্থার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। অভিচারের ডিলিউশন যার মধ্যে দেখা যায়, সুস্থ অবস্থাতেও তার অভিচারে বিশ্বাস ছিল। মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে, এই ধরনের বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত বা যুক্তিহীন হোক না কেন, ডিলিউশন বা রোগের পর্যায়ে পড়ে না। বহু সুস্থ ব্যক্তি মনে মনে এই রকমের ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন। আমাদের দেশে শুধু নয়, পাশ্চাত্যদেশেও ডাইনীবিদ্যা বা উইচক্রাফটে বিশ্বাসী লোকের অভাব নেই। অবশ্য, এই রকম মানুষের সংখ্যা বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমে আসছে। তন্ত্রমন্ত্র যাগযজ্ঞের বদলে এখন ডিলিউশন অনেক রোগীর বেলায় যন্ত্রভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ এক ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে ক বাবু আমাকে প্রভাবিত করছেন অথবা খ বাবু আমার মনের কথা জেনে নিচ্ছেন এবং আমাকে খারাপ কাজে উৎসাহিত করছেন;—এই রকম ধরনের অভিযোগ অনেক রোগীর মুখে শোনা যায়। এই সব ধারণা অভিচারিক ডিলিউশনের সমগোত্র। তন্ত্রমন্ত্রের বা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের ক্ষতি করা যায় এই বিশ্বাস না থাকলে এসব নিয়ে ডিলিউশনের সৃষ্টি হতে পারে না। যখন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে গ বাবু কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষ তাঁর ক্ষতি করছে মনে করেন এবং কোনো রকম যুক্তিতর্ক দিয়ে তাঁর ভ্রান্তি দূর করা যায় না; তখন এই অবস্থাকে মোহ বা ডিলিউশন বলে আমরা মনে করি। গ বাবু প্যারানইয়া রোগে ভুগছেন, বুঝতে পারি। আত্মীয়স্বজন অনেক দিন পর্যন্ত গ বাবুর ধারণাকে সত্য ধারণা বলে মনে করতে পারেন। সে রকম ক্ষেত্রে চিকিৎসায় ফল পাওয়া কঠিন। তারকনাথকে নিয়ে এই রকম মুশকিলে পড়েছিলাম।

তারকনাথের বয়স পঁয়ত্রিশ, বিবাহিত, তিনটি সন্তানের পিতা। কোলকাতার উপকণ্ঠে এক ছোট শহরের বাসিন্দা, সেই শহরের এক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ শ্রমিক। স্কুলের নীচু ক্লাশ অবধি পড়েছেন। বছরখানেক ধরে অসুস্থ। উপসর্গের মধ্যে সব লক্ষণই প্রায় বিদ্যমান। ঘুম নেই, ক্ষিদে নেই, শরীরে একেবারে শক্তি নেই, কয়েক মাস কাজে যাচ্ছেন না। কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই। নিরাসক্ত, নিস্পৃহ ও নিষ্প্রভ। প্রথম দিনে নিউরাসথেনিয়া বলে মনে হল। ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে পনেরো দিন পরে আসতে বললাম। নির্দিষ্ট দিনে তারকনাথের দেখা পাওয়া গেল না। আরো এক সপ্তাহ বাদে তারকের দাদা এক রকম জোর করে তারকনাথকে নিয়ে এলেন। তাঁর মুখে শুনলাম যে এতটা পথ জোর করে ট্যাকসিতে আনতে হয়েছে। কিছুতেই আসতে চায় না। আগের দিনে ট্রেন থেকে নেমে বাড়ী ফিরে গেছে। দাদা থাকেন অন্য এক জায়গায়; খবর পেয়ে চলে এসেছেন। দাদার আগ্রহেই চিকিৎসার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি ছাড়া বাড়ীর আর সকলেরই ধারণা যে তারকনাথকে প্রতিবেশী কৃতান্ত বাণ মেরেছে। ডাক্তারী-চিকিৎসায় কোন ফল হবে না। এই এক বছর ধরে অনেক দেবস্থানে মানত করা হয়েছে, একজন সন্ন্যাসীকে দিয়ে এক মাস ধরে হোম করা হয়েছে, কোনো এক শ্মশানচারীকে কাটানমন্ত্র পড়ানো হয়েছে। কিন্তু কৃতান্তের বাণের ক্রিয়া কেউই খতম করতে পারেন নি। দাদা কলেজে পড়েছেন, কোনো এক কারখানার ফোরম্যান। ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করেন না। এখন থেকে রোগীকে নিয়মিত হাজির করার ভার তিনিই গ্রহণ করবেন।

তারকনাথের সঙ্গে কথাবার্তার কিছুটা অংশ সরাসরি তুলে দিচ্ছি।

—সেদিন আসেন নি কেন?—আসতে দিল না?—কে?—কে আবার? যে এতদিন ধরে কষ্ট দিচ্ছে সে। ট্রেন থেকে জোর করে নামিয়ে দিল।—লোকটার নাম কি? ট্রেনে আপনার ভাইপো ছিল, আরো লোক ছিল, তাদের মাঝখানে জোর-জবরদস্তি করতে সাহস পেল কি করে?—সামনে এলে তো তাকে আটকানো যেত। সে কি আর সামনে আসে? ঘরে বসে পুরশ্চরণ করছে, বাণ মারছে। বাতাসের ধাক্কায় আমি ছিটকে ট্রেনের বাইরে পড়ে গেলাম।—আজ আটকালো না কেন? আজ এলেন কি করে? —আজ ও ঘুমিয়ে পড়েছে তাই আসা গেছে। কিন্তু এর ফল ভাল হবে না। আরো বেশী করে কষ্ট দেবে। হয়তো এবার ছেলেটাকে বাণ মারবে। মহিমঠাকুরের দেওয়া তাবিজ ছেলে-টার হাতে আছে, তাই রক্ষে।—আপনার ওপর রাগের কারণ কি? আপনার ক্ষতি করে ওর লাভ কি? আমি যে দেখে ফেলেছি।—কি দেখে ফেলেছেন?

তারকনাথ মুখ বন্ধ করলেন। অনেক সাধ্যসাধনা করেও জবাব পাওয়া গেল না। দাদার ধমকাধমকিতেও কাজ হল না। দাদাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বললাম। ভাবলাম হয়তো দাদার অসাক্ষাতে কিছু গোপন কথা বলতে পারেন, দাদার সামনে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছেন। কোনো ফল হল না। শুধু একটি কথা শুনলাম। কি দেখেছেন কিছুতেই বলা চলবে না। বললে ও'র সর্বনাশ হবে। আর বলার শক্তি ও'র নেই। বলতে গেলেই কৃতান্ত বাণ মেরে ওর মুখ বন্ধ করে দেবে।

দাদা জানালেন, তারকনাথ এ যাবৎ ওষুধ-পত্র কিছু খান নি। তারকনাথের মা, স্ত্রী এবং তিনি নিজে মনে করেন এটা চিকিৎসার ব্যাপার নয়। বাড়ীতে থাকলে চিকিৎসা হবে না, আবার হাসপাতালে দেবার মত পয়সাও ও'দের নেই। এ অবস্থায় কি করা যায়?

তারকনাথকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হলাম। ঘর অন্ধকার হতেই বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। কৃতান্তের বাণ কোলকাতা অবধি ধাওয়া করতে পারে কিনা, জানতে চাইলেন।

—আপনি ঠিক কোথায় আছেন জানতে না পারলে কৃতান্ত বাণ ছুঁড়বে কি করে? আপনাকে নিশানা করে তো বাণ ছোঁড়া দরকার।

আশ্বস্ত হলেন কিন্তু বিছানায় কিছু-তেই শুতে রাজী হলেন না। গত্যন্তর না দেখে দাদাকে বললাম তাঁর বাসায় নিয়ে ভাইকে রাখার বন্দোবস্ত করুন। আর এই কথা আর কেউ যেন না জানে। কৃতান্তকে

কিছুতেই তারকবাবুর ঠিকানা জানতে দেওয়া হবে না। অভিচারিকরা অধিষ্ঠান-বাসস্থানের সন্ধান না পেলে কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর তাছাড়া কৃতান্ত যদি বুঝতে পারে তারকবাবু তার ভয়ে বাড়ীছাড়া হয়েছেন তবে সে তার অভিচার বন্ধও রাখতে পারে। শত্রু মৃত বা পলায়িত হলে, তার বিরুদ্ধে সাধারণত এরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

তারকবাবুর সামনেই এইসব কথা হল। প্রথমটায় দাদা একটু হকচকিয়ে গেলেও পরে আমার কথার তাৎপর্য ধরতে পারলেন। তারকবাবু আরো একটু বেশি আশ্বস্ত হলেন। বাণ মারা, কাটান দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জ্ঞান আমার আছে, এটা বুঝতে পেরে আমার প্রতি তাঁর বোধ হয় ভক্তির উদ্রেক হল। একটা প্রণাম করে বিদায় নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আমার ব্যবস্থামত ওষুধ খেতে রাজী আছেন।

দিন সাতেক পরে দাদা টেলিফোনে জানালেন যে, ভাই নিয়মিত ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন এবং নিজে থেকে আমার কাছে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

তারকনাথ এলেন। আগেকার নিরাসক্ত নির্বিকার ভাবটা কমেছে। ঘুম হচ্ছে। ক্ষিধে কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু শরীরের শক্তি একটুও বাড়ে নি। চলতে ফিরতে কষ্ট, দাঁড়াতে কষ্ট, এমন কি বসে থাকতেও কষ্ট হয়। কৃতান্ত নতুন কোনো কিছু হয়ত করছে না, কিন্তু পুরনো বাণের ক্রিয়া এখনও চলছে। তেজ শক্তি সামর্থ্য সব চলে গেছে। রক্ত জলের চেয়েও পাতলা, ভালোবাসটুকু পর্যন্ত নেই। আমার ওষুধে শক্তি ফিরে পাবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তারকনাথ কাল রাত্রে সহসা বুঝতে পেরেছেন যে বাণ কাটানোর প্রক্রিয়া আমার জানা আছে। তিনি বিছানায় শুয়ে আমার কথামত ঘুমিয়ে পড়তে রাজী হলেন। আমি ইচ্ছে করলে ঝাড়ফুঁক করে কৃতান্তের বাণের বিষক্রিয়া দূর করে দিতে পারব; এই বিশ্বাস তাঁর হয়েছে।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোক সম্মোহননিদ্রায় অভিভূত হলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে অভিভাবন (সাজেশান) দিলাম। কৃতান্তের বাণ তারকনাথকে আর পীড়িত করবে না। কৃতান্তের বিষক্রিয়া আমার অভিভাবনে দূর হয়ে যাবে। শীগগিরই তারকনাথ তাঁর হৃতশক্তি ফিরে পাবেন এবং নিয়মিত কাজকর্ম করতে পারবেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে তারকনাথ দাদার সঙ্গে বাড়ী ফিরলেন।

এক সপ্তাহ পর তারকনাথ একা এলেন। দাদাকে বিশেষ কাজে দুর্গাপুরে যেতে হয়েছে, দুসপ্তাহ বাদে ফিরবেন। তারকনাথ নিজের বাসায় ফিরে গেছেন। তবু খুব বেশী বিচলিত মনে হল না। এই দিনে তাঁর রোগইতিহাস আরো বিস্তার করে বললেন। দাদা আগেই আমাকে কিছুটা জানিয়েছিলেন।

তাঁর দাদামশাই-এর বেশ কিছু জমিজমা ছিল। আর ছিল লাঠির জোর এবং মনের সাহস। লাঠিবাজি করে অনেক জমি দখল করেছিলেন ও মামলা-মোকদ্দমা করে অনেককে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছিলেন। তাঁর শত্রুরা তাঁকে ভয়ভক্তি দুই-ই করত। শত্রু বলতে জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইরা। তারা গায়ের জোরে কিছু না করতে পেরে এক তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হয়। তিনমাস ধরে মারণযজ্ঞ চালায় তান্ত্রিক। ফলে রক্তবমি করতে করতে দাদামশায় মারা যান। তখন তারকনাথের বয়স সাত কি আট। মায়ের কাছে এই কাহিনী তিনি অনেকবার শুনেছেন। সেই থেকে তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাকের ভয় পেয়ে আসছেন। সর্বস্বান্ত হয়ে বছর কুড়ি আগে তাঁরা পূর্ববাংলা ছেড়ে কোলকাতায় আসেন। দুঃখকষ্টে পড়ে তন্ত্রমন্ত্রের উপর ভয়ভক্তি আরো বাড়তে থাকে। স্কুল পালিয়ে শ্মশানে গিয়ে তান্ত্রিকের খোঁজ করতেন। তন্ত্রমন্ত্র শিখে নিজেদের অবস্থা বদলে ফেলার বাসনা নিয়ে শহরতলীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। স্কুলে সুবিধা করতে পারছেন না দেখে দাদা তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কারখানায় ভর্তি করে দেয়। কারখানার খাটুনি ভাল লাগত না। কোথাও কোনো নতুন সাধু এসেছেন, কোথাও কোনো সন্ন্যাসী আড্ডা গেড়েছেন, খবর পেলেই তারকনাথ সেখানে হাজির হতেন। প্রতিবেশী কৃতান্তবাবুও পাকিস্থান থেকে আসেন মাত্র বছর দশেক আগে। এর মধ্যে তিনি দোতলা বাড়ী তুলেছেন, জমিজমা করেছেন, ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তিনিও এসেছিলেন কপর্দকশূন্য অবস্থায়। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন, এ নিয়ে প্রতিবেশীদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। একটা ছোট দোকান থেকে আর কত রোজগার হতে পারে? তারকনাথের মা বলতেন কৃতান্ত তন্ত্রমন্ত্র জানে। লক্ষ্মী-বাঁধন, কুবেরবাঁধন মন্ত্র নাকি দাদামশাইও জানতেন। কৃতান্তের বাড়ীতে যাওয়া আসা এ বাড়ির সকলেরই ছিল। কৃতান্তকে পুজোআর্চা করতে কেউ দেখে নি। কিন্তু একটা ঘরে দেশ থেকে আনা বিগ্রহ থাকত, আর সেই ঘরটা দিনরাতই বন্ধ থাকত; এই থেকে তারকনাথের ধারণা হয়েছিল ঐ ঘরেই আছে কৃতান্তের হঠাৎ ধনী হবার চাবিকাঠি। ঐ বাড়ীর এক বাচ্চা চাকরের কাছে তারকনাথ শুনেছিলেন যে গভীর রাত্রে ঐ ঘরের বাইরের দিকের দরোজা খোলা হয়, অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে অনেক লোক যাতায়াত করে। রাস্তার ধারে গাড়ী থামে, গাড়ী থেকে বস্তা নামে, গাড়ীতে বস্তা ওঠে। 'বেলাকের' ব্যাপার। কালো রাত, কালো পোশাক পরা লোকজন, কালো কাপড়ে মোড়া বস্তা। এই সময় তারকবাবুদের কারখানায় একটা গণ্ডগোল ঘটে। দুই ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কিছু লোক আহত হয়। তারকবাবু খুব ভয় পান। কারখানা কিছু দিন বন্ধ থাকার ফলে ভয় আরো বেড়ে যায়। কারখানা খুললেও তিনি যেতে চান না। শরীর এই সময় থেকে খারাপ হতে থাকে। দাদা এসে বকাঝকি করাতে কয়েক দিন গিয়ে আবার যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। সারা দুপুর দরোজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতেন, সন্ধ্যার পর বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতেন। এক রাত্রে কোলকাতা থেকে ফিরতে খুব দেরী হল, বোধ হয় ট্রেনের বিভ্রাটে। রাস্তার মোড়ে একটা কালো রং-এর গাড়ী থেকে কৃতান্তবাবুকে নামাতে দেখলেন। গা ছমছম করে উঠল তারকনাথের। তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন গাড়ী থেকে একটা কালো বস্তা নামিয়ে নিল দুজন লোক। গাড়ীটা নিঃশব্দে চলে গেল। সেই রহস্যভরা ঘরের দরোজাটা খুলে যেতে এক ঝলক আলো এসে রাস্তায় পড়ল, বস্তাটা ইতিমধ্যে ঘরে চালান হয়ে গেছে। দরোজাটা বন্ধ হল। দুজন লোক (ওরাই বোধ হয় বস্তাটা নামিয়েছিল) কথা বলতে বলতে তারকনাথের পাশ দিয়ে চলে গেল। তাদের কথাবার্তার দু-এক টুকরো কানে যেতে তারকনাথ ভয়ে কাঁটা হয়ে গেলেন। কৌতূহল ভয়কে ছাপিয়ে গেল। পা টিপে টিপে তাদের পিছু নিলেন তিনি। তারা পাঁচমারীর শ্মশানের অবধূতের কথা আলোচনা করছিল। আগামী অমাবস্যায় ধড় মুড়ি আলাদা করে অবধূত বস্তাবন্দী করে গাড়ীতে তুলে দেবেন। কৃতান্তের পিছনে ফেউ লেগেছিল, তাকে সাবাড় করে দিয়েছে অবধূত। আর শুনতে পারলেন না তারকনাথ। পা টিপে-টিপে রুদ্ধশ্বাসে নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। স্ত্রী এবং মা অনেক সাধ্যসাধনা করেও তাকে জলস্পর্শ করাতে পারলেন না। পরদিন থেকে বাড়ীর লোকে জানাল তারকনাথকে বাণবিদ্ধ করা হয়েছে। তারকনাথের দৃঢ়বিশ্বাস গভীর রাত্রে গেরুয়া রং-এর পোশাক পরে কৃতান্ত অবধূতের সঙ্গে মারণযজ্ঞ করে। নানারকম শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, জপতপ, মাদুলীকবচ দিয়ে বাণ কাটানোর চেষ্টা চলছে সে থেকে। ফল পাওয়া যায় নি।

সেই রাত্রের ঘটনা অবশ্য তারকনাথ এই রকম খোলাখুলি আমাকে জানাননি। মা ও তারকবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে তাঁর দাদা আমাকে খানিকটা আভাস দিয়েছিলেন, খানিকটা কৌশলে জানতে হয়েছে। ভয়ার্ত তারকবাবুর বিবরণের সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো উপায় নেই। কবে থেকে ভদ্রলোক ডিলিউশনে ভুগছেন? তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন সেসব হ্যালুসিনেশন কিনা? এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানা পর্যন্ত তারকনাথের চিকিৎসায় ফল পাওয়ার আশা কম। এইসব প্রশ্নের মীমাংসার আগেই তারকনাথের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়। দাদা বাইরে যাওয়াতে নিজের বাসায় চলে যান। সেখান থেকে মাত্র একদিন আমার কাছে এসেছিলেন, তাও ভাইপোর পীড়াপীড়িতে। মা এবং স্ত্রীর কোনো রকম উৎসাহ ছিল না, কাজেই ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দু সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আগের অবস্থায় ফিরে গেলেন। দাদা জামশেদপুরেই থেকে যেতে বাধ্য হন। কাজেই পাঁচমারীর শ্মশানের এবং অন্যান্য জায়গার অবধূত তান্ত্রিকের চিকিৎসা চলতে থাকে। বছরখানেক পর দাদা একবার এসে-

ছিলেন। আমার পরামর্শে অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠান। তার পরের খবর আমার জানা নেই।

এবার তারকনাথের অসুস্থতার কারণ নির্ণয় ও বিকারতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যাক।

জ্ঞান-বুদ্ধি তারকনাথের সীমিত। দাদামশাইয়ের মৃত্যু-ইতিহাস এবং মায়ের ব্যাখ্যা তাঁর মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত। যুক্তি-তর্ক দিয়ে মারণ-উচাটন প্রভৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কোনোদিন করেন নি। শৈশব থেকে সাধু-সন্ন্যাসীর কৃপায় বরাত খোলবার চেষ্টায় নানাদিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তন্ত্রমন্ত্রের উপর জন্মেছে যেমন ভয় তেমনি শ্রদ্ধা। যে কোনো অঘটন বা আকস্মিকতার মূলে আছে তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব, এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল। কৃতান্তবাবুর আকস্মিক ধনলাভের মূলে এই রকম কোনো প্রভাব বিদ্যমান; এ চিন্তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। কৃতান্তবাবু কয়েক বছরের মধ্যে মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হয়েছেন, তারকনাথ জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন। কৃতান্তকে মনে-মনে হিংসা করেছেন। কৃতান্তের ব্যবহার ছিল সহৃদয়, আপদে-বিপদে পাড়া-প্রতিবেশীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন, তারকনাথকে দেশের লোক বলে বিশেষ খাতির দেখাতেন, তারকনাথের দাদামশাইয়ের নাম উল্লেখ করে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানাতেন। এই সব কারণে কৃতান্তকে ভাল না বেসেও পারতেন না তারকনাথ। তার অবস্থার জন্যে তাকে হিংসা করতেন, তার ক্ষমতার জন্যে তাকে ভয় করতেন, তার ব্যবহারের জন্যে তাকে ভালবাসতেন। কৃতান্ত আর তন্ত্রমন্ত্র; এই দুই চিন্তা নিয়েই তারকনাথের মন সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত। নিজের অবস্থার উন্নতির চেয়ে কৃতান্তের অবস্থা-বিপর্যয় ঘটলেই তিনি বেশী আনন্দ পাবেন; শেষের দিকে এই রকমই মনে হত। কারখানার গণ্ডগোলের মূলে কৃতান্তের হাত আছে, এরকম সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছিল। কারখানায় কৃতান্ত কিছু-কিছু জিনিস সাপ্লাই করতেন। কৃতান্তকে মাঝে-মাঝে দাদামশাই-এর মত শক্তিশালী মনে হত। শক্তিশালীকে লোকে ভয় পায়, তার ধ্বংসের জন্যে চেষ্টা করে। কৃতান্ত-নিধন যজ্ঞ হয়তো কেউ কোথাও করছে। একদিন হয়তো কৃতান্তবাবুর গলা দিয়ে রক্ত উঠবে। কেওড়াতলায় নতুন এক সন্ন্যাসী এসেছে শুনে তারকনাথ যেদিন তার সন্ধানে যায়, সেই রাতেই ফেরবার সময় কালো গাড়ী থেকে কৃতান্তকে নামতে দেখেন। সন্ন্যাসীকে হোম করবার জন্যে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। এর পর থেকেই তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, কৃতান্ত তারক-নিধন যজ্ঞ শুরু করেছেন। ঘরের মধ্যে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে আহুতি দিচ্ছেন। অন্ধকার রাত্রির কাহিনীর কতটা কাল্পনিক, কতটা সত্যি? আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কৃতান্তবাবু কালোকারবারী এবং গাঁজা-আফিমের চোরা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, এ সন্দেহ স্থানীয় অনেক লোকই করে থাকেন। পাঁচমারীর শ্মশানে এক অবধূতকে কেন্দ্র করে কয়েক মাস ধরে এক গঞ্জিকাসেবীদের আসর বসেছিল, এ খবর ও'র দাদা আমাকে দিয়েছিলেন। কয়েকজন হিপিকেও সেই আসরে দেখা যেত। একটা খুন হবার পর আসরটা ভেঙ্গে যায়। সেই খুনের সঙ্গে চোরাকারবারের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না। তবে খবরটা তারকনাথ জানতেন, ঐ অবধূতের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল, হয়ত কিছু পয়সা-কড়িও তাকে দিয়ে থাকবেন।

মোটামুটি আমরা ভেবে নিতে পারি যে, অল্পবুদ্ধি দুর্বলচিত্ত তারকনাথের মস্তিষ্কে মারণ-উচাটন সম্পর্কিত কয়েকটি আতঙ্ক প্রভাবিত, অনড় কেন্দ্র ছিল; কারখানার দাঙ্গায় বিশেষ ভয় পাবার ফলে মস্তিষ্কে আলট্রা-প্যারাডক্সিক্যাল পর্ব দেখা দেয়। কৃতান্ত-নিধন যজ্ঞ আত্মনিধন যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়, কৃতান্তের কালো পোশাক গেরুয়া হয়ে যায়, কালো বস্তা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠে। প্যারানইয়ার অন্যান্য যে সব রোগীকে আরো ভালভাবে জানবার ও বোঝবার সুযোগ হয়েছে, তা থেকে মনে হয় তারকনাথ সম্পর্কে আমার বিকারতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একেবারে দূরকাল্পনিক হয় নি।

প্যারানইয়ার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। তারকনাথ দুর্বল প্রকৃতি, 'ইনহিবিটরী' বা নিস্তেজনাপ্রধান মস্তিষ্কের অধিকারী। তার মস্তিষ্কে যদি উত্তেজনার আধিক্য থাকত, (যাকে আমরা 'কোলেরিক' টাইপ বলি), তবে এই নির্যাতনমূলক ডিলিউশন তাকে খুন-খারাবিতে প্রবৃত্ত করতে পারত। মাঝে-মাঝেই সংবাদপত্রে হঠাৎ খুনে, অকারণ খুনের খবর বের হয়। একজন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে পাঁচ-সাত-দশ জনকে খুন করে ফেলে। কোনো সময় শোনা যায় কোনো ভদ্রলোক নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এই সব কেসগুলো যথাযথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তারা প্যারানইয়ার ভুগছিল।... অন্যে তাকে আক্রমণ করবে, এই ভয়ে অন্যকে আঘাত করে বসেছে। এতো গেল বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা। সাম্প্রদায়িক ও দলগত হাঙ্গামার সময়ে আমরা জানি, অনেক সময় বিনা উত্তেজনায় ব্যক্তিগত আক্রোশ না থাকা সত্ত্বেও, মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। এখানে সাময়িকভাবে সম্প্রদায় ও দলভুক্ত সকলেই প্যারানইয়াতে আক্রান্ত হয়েছে, মনে হয়। বহুদিনের বন্ধু, পরিচিত প্রতিবেশী কিম্বা একেবারে অজানা-অচেনা লোককে হত্যা করতে এ সময় সম্প্রদায় ও দলের নিয়মনিষ্ঠ সভ্যরা একটুও বিচলিত বোধ করে না। যুক্তি-বুদ্ধি পাণ্ডিত্য দিয়ে ডিলিউশন থেকে মুক্ত হতে পারে না। 'অন্য দল বা সম্প্রদায় আমার দলকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করেছে, আমার নিজের ও আমার দলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ওদের আঘাত আমি করবই।' এই ধরনের চিন্তা এদের পেয়ে বসে। এদের মৌলিক নিরাপত্তা দল বা সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এই অবস্থায় অন্য দল বা সম্প্রদায়ের মানুষকে মানুষ মনে হয় না। সব দেশে মাঝে-মাঝেই এই ধরনের সামাজিক প্যারানইয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ অবস্থা সামাজিক প্যারানইয়ার জন্য দায়ী। এই অবস্থাতেও, মনে রাখা দরকার, সকলে হত্যাকারীর ভূমিকা নিতে পারে না। বিশেষ টাইপের মস্তিষ্কের অধিকারীরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে আর অন্যান্যরা তাদের মুক্তিদূত মনে করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে যায়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সমাজদ্রোহী অবাঞ্ছিত কিছু লোক সম্প্রদায়ের, দলের, এমন কি দেশেরও নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক বিশেষ পরিবেশ এবং তারকনাথের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ মানুষের একত্র সমাবেশ ঘটলেই বিপত্তির সম্ভাবনা।

—মনোবিদ

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মন্দিরে পূজো দিয়ে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। দুপুরে আহারাদির পর বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হলো না। রাজস্থানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী জয়-নারায়ণ ব্যাস আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে একজন বাঙালী ভদ্রলোক। বাঙালী ভদ্রলোক একজন ডাক্তার, কিষেণ-গড়ে ওঁর চেম্বার। ব্যাসজীর সঙ্গে আমার অনেক দিন আগেই পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে একটি হিন্দী নাটকের অভিনয় কালেই এই পরিচয় হয়।

বিশ্রাম আর হলো না। ওঁদের সঙ্গে চললাম কিষেণগড়ে বেড়াতে।

কিষেণগড়ের যা কিছু দর্শনীয় দেখলাম। জয়নারায়ণ ব্যাস এবং ডাঃ এস কে বসুর সঙ্গেই রয়েছি। দেখা-শোনার পর ব্যাসজীর বাড়ীতে এলাম। সেখানে এক দফা আপ্যায়নের পালা।

সেদিন গেল। পরদিন চিশতীর বড় দরগা দেখতে যাওয়ার পালা। সঙ্গে আছেন মিস্টার এন এন সেন।

দরগার সামনে বৃহৎ তোরণ। গম্বুজটি সোনার পাতে মোড়া। রামপুরের নবাবের দানে এই স্বর্ণগম্বুজ নির্মিত। দরগার কাছেই মুসাফিরখানা। যেখানে প্রবেশ পথে রয়েছে পোলাও ভর্তি দুটি বিরাট আকারের ডেকচি। সে পোলাও তীর্থ-যাত্রীদের জন্যে পরিবেশিত হয়।

নগ্ন মস্তকে দরগায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। অগত্যা আমরা মাথায় রুমাল বেঁধে নিলাম।

দরগা দর্শন করে গেলাম 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া' দেখতে। এটি আগে হিন্দু মন্দির ছিল। মুহম্মদ ঘোরী এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এটি নাকি নির্মিত হয়েছিল আড়াই দিনে। তাই এই নাম।

এক-এক করে দর্শনীয় স্থান পরিক্রমা করে চলেছি। তবে পাহাড়ের ওপর উঠতে গেলে ডুলিতে উঠি। এবারে উঠলাম তারা-গড় পাহাড়ে। এখানে দেখলাম প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

এর পর সাম্রাসাগর হ্রদ দর্শন করে ফিরে এলাম হোটেলে। সাম্রাসাগরের মার্বেল পাথরের সোপান দেওয়া ঘাট এবং সংলগ্ন উদ্যান নাকি সম্রাট শাজাহান তৈরী করেছিলেন। সম্রাট শাজাহান যে সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন সেকথা অনস্বীকার্য।

সম্রাট আকবরের স্মৃতিবিজড়িত দুর্গটি আজ মিউজিয়মে পরিণত। এখান-কার সংগ্রহও দেখবার মতো। মিউজিয়মের কিউরেটর একজন বাঙালী, নাম অমূল্য ভট্টাচার্য। তাঁর কাছ থেকেই নানা তথ্য সংগ্রহ করলাম।

তারপর এলাম মেয়ো কলেজে। এই কলেজটি নানা দিক থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ। শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা এখানে। একমাত্র নাটক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নেই। এই কলেজে কয়েকজন বাঙালী অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

যাই হোক, কদিনের ভ্রমণে যা কিছু দেখেছি, ভালোই লেগেছে। এবারে আমাদের জয়পুর যাওয়ার পালা।

জয়পুরে এসে ঐতিহাসিক 'অম্বর প্রাসাদ' দেখতে এলাম প্রথম দিনে। এর আগে ১৯৩৪ সালে একবার জয়পুর এসে-ছিলাম, কিন্তু সেদিনের জয়পুর দেখার স্মৃতি

মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। এবারে নতুন করে সেদিনের স্মৃতিটাকে মনের মধ্যে পাকাপোক্ত করে নিলাম।

ঐতিহাসিক প্রাসাদ দেখলাম, কিন্তু দুর্গে যাওয়া হলো না। দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবুও বাইরে থেকে দেখলাম।

এরপর বাদল প্রাসাদে এলাম। এখানেও নানা ইতিহাসের স্মৃতি জড়ানো। এলাম 'চন্দ্রলেখা' প্রাসাদে—যেখানে বৃন্দাবন থেকে আনীত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত সেটিও দেখলাম।

জয়পুর শহরে প্রাচীনত্বের ছাপ সর্বত্র। কিন্তু প্রাচীন জয়পুরের ওপর পড়েছে আধুনিকতার প্রলেপ।

এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে বলি, জয়পুরে যে হোটেলটিতে ছিলাম, সে হোটেলটি স্থানীয় মানুষের। কিন্তু ম্যানেজার ছিলেন একজন ইউরোপীয়ান। হোটেলটিতে আমাকে খুব যত্ন করে রাখা হয়েছিল। আমি এবং আমার স্ত্রী যখন খেতে বসতাম, তখন প্রধান পাচক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে থাকো কেন—আর এতো যত্ন করোই বা কেন।

ইংরাজীতে কথা বললাম। কিন্তু উত্তর পেলাম বাংলায়। লোকটি জানালো সে বাঙালী। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে এখানে চাকরী নিয়ে এসেছে। তা ছাড়া আরো বললে, সে আমাকে চেনে এবং জানে।

পরে আরো শুনলাম, সে আমার সম্পর্কে হোটেলের ম্যানেজারকে এমন করে বলেছে, যে ম্যানেজারও তাতে আমার ওপর বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে পারেনি।

হোটেলের প্রতিটি কর্মচারী আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করতো তা কোনদিন ভুলবো না। আমার দ্বিতীয় দফার জয়পুর ভ্রমণে এদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছিলাম।

এবারে দেওয়ালী উৎসবের রাতটি জয়পুরেই রইলাম। দেওয়ালী উৎসবের দিনে যে আলোকসজ্জা দেখলাম—তার স্মৃতি আমার কাছে চিরদিনের।

জয়পুর শহরের যা কিছু দর্শনীয় দেখা শেষ করে নিলাম কদিনে। বাকি ছিল গলতা এবং রামবাগ দেখা। তাও দেখলাম।

গলতা জায়গাটি সুন্দর এবং মনোরম। পাহাড়ের উপরে সূর্য মন্দিরটি দেখবার মতো। আর এখানে-ওখানে ছোট ছোট গম্বুজাকৃতি ছত্রীগুলিও পথিক-মানুষকে আকর্ষণ করে। ১৯৩৪ সালে এখানে এসে এই ছত্রীতে বিশ্রাম নিয়েছি কতো সময়।

কিন্তু রামবাগে যে ঐতিহাসিক পোলো গ্রাউন্ড রয়েছে, এটি নাকি পৃথিবীর বিখ্যাত এবং সুবৃহৎ পোলো গ্রাউন্ড। রামবাগের উদ্যানটিও দর্শনীয়।

কদিনের জয়পুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার চিরদিন মনে থাকবে। জয়পুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দু'জন বাঙালীর নাম, যাঁদের একজন হলেন বিদ্যাধর ভট্টাচার্য, যিনি জয়পুরের রাজা শিওয়াই জয়সিংহের আমলে জয়পুর শহরের পরিকল্পনা

করেছিলেন। তাঁরই পরিকল্পনা মতো গড়ে ওঠে জয়পুর। সেটা আজকের কথা নয়। পরবর্তী আর একজন বাঙ্গালী, জনৈক সেন যিনি রানার দেওয়ান ছিলেন। এই শহরে তাঁরও অবদান কম নয়। আর এই দুই বাঙ্গালীর কথা স্মরণ করে, জয়পুরে বাঙ্গালীরা সকলেরই প্রিয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানেও জয়পুর এবং বাংলার মধ্যে কিছুটা আত্মীয়তার বন্ধন জড়িয়ে আছে বৈকি। বর্তমান মহারাণীও তো একজন বাঙ্গালী মহিলা।

এবারে আবার ফিরে যাওয়ার পালা। জয়পুর থেকে আবার একদিন কলকাতার পথে রওনা হলাম।

কিন্তু পথে আমি আগ্রায় না নেমে পারলাম না, কী জানি কেন, আগ্রা আমাকে অহরহ আকর্ষণ করে। যখনই এপথে আসা যাওয়া করেছি, ততোবার আগ্রায় নেমেছি। হয়তো জীবনে শাজাহান চরিত্রে অভিনয় করেই বোধহয় তাজমহলের ওপর এই দুর্বলতা।

আবার সেই পুরোনো পরিবেশে ফিরে এলাম। তবুও কদিন বাইরে কাটিয়ে মনটা যেন আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়েছে।

এখন কর্মজগতের সঙ্গে চিন্তার জগতটাই অনেক বদলে গেছে। অভিনয় জীবন থেকে প্রায় অবসর নিয়েছি। যে কটি ছবির কাজ বাকি আছে, সেগুলি শেষ করলে ছবির জগত থেকে ছুটি। আর মঞ্চ? মঞ্চের মায়াও প্রায় কাটিয়েছি। এখন শুধু ছুটির ঘোষণাটুকু বাকি।

চিন্তা এখন আকাদমি নিয়ে। ২৮ নভেম্বর আকাদমির ক্লাস উদ্বোধন হলো। আমিই উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলাম। আরো যাঁরা শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা হলেন ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, সতু সেন এবং সুধাংশু সান্যাল। এ ছাড়া উনিশ জন ছাত্রকেও আমরা পেয়েছি।

পরদিন ২৯ নভেম্বর। ঐ দিনটি নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সোভিয়েত দেশের দুই প্রধান রাষ্ট্রনায়ক, মার্শাল বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভ ঐ দিন পশ্চিম বাংলায় পদার্পণ করলেন। ঐ দুই রাষ্ট্রনায়ককে বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল, তা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছিল। ঐদিন সম্মানিত অতিথিদের রাজভবনে যে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ছিল, সেটি বাতিল হয়ে যায়, কারণ অতিথিরা সেদিন ক্লান্ত ছিলেন।

রাশিয়ার এই দুই রাষ্ট্রনায়ককে কলকাতার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে যে অভিনন্দন জানানো হয়, সেটিও নানা কারণে ঐতিহাসিক। সেদিনের বিপুল জনসমাবেশে এই দুই রাষ্ট্রনায়কও অভিভূত না হয়ে পারেন নি।

সেদিন যে জনসমাবেশ হয়েছিল, সে রেকর্ড বোধ হয় আজো ভঙ্গ হয়নি।

এখন ব্যস্ত আছি আকাদমি এবং সভাসমিতি নিয়ে। ৩ ডিসেম্বর নেপালের রাজা এবং রানী এলেন আকাদমি পরিদর্শন করতে। আকাদমির পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলাম। আকাদমি দর্শন করে তাঁরা খুশীই হলেন।

কদিন বাদেই কৃষ্ণনগরের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলাম।

এর মধ্যে আর এক ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। উজবেক নৃত্য শিল্পী দল কলকাতায় আসছেন—তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে এ ব্যস্ততা। একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হলো লেডী রাণু মুখার্জিকে নিয়ে।

বছরের কটি দিন বাকি ছিল। দেখতে দেখতে কেটে গেল। এর মধ্যে যেটুকু চিন্তা, তা এক আকাদমি নিয়ে।

জীবনে অবসর চেয়েছিলাম, অবসর পেলাম না। চিত্র আর মঞ্চ ছাড়লে কী হবে, আকাদমী তো আছে, আমাকে এখন এই নিয়েই থাকতে হবে।

আমার জীবনে এ-ও এক নতুন অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীর মন নিয়ে এতদিন নাটকের সেবা করেছি, এবার আমাকে করতে হবে শিক্ষকতা।

এক জগত থেকে আর এক জগতে এলাম। জানি না, এর পর আবার কি কাজের দায়িত্ব এসে পড়বে আমার ওপর।

উনিশ শ ছাপান্ন সালের প্রথম দিনটিতে এলাম পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরে। কল্পতরু উৎসবের সঙ্গে সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অজস্র নর-নারীর শুভাগমন ঘটেছে। আমিও এসেছি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার কথা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্তের। কিন্তু তিনি এলেন না। অগত্যা আমাকে পৌরোহিত্য করতে হলো।

বছরে প্রথম দিনটিতে দক্ষিণেশ্বরে এসে ভালোই লাগলো। মনে হলো, হয়তো এটা কোন শুভ সূচনার ইঙ্গিত করছে।

আমার জীবনে নতুন বছর শুরু হলো।

রবি রায় আমাদেরই সমসাময়িক। অভিনেতা হিসাবে সে বিখ্যাত। শুধু তাই নয়, মানুষ হিসেবেও তার একটা স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল।

চোদ্দই জানুয়ারী সকালে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রবি রায়ের মৃত্যু হয়, রোগটা ছিল করোনারী থ্রমবসিস।

কালীশ মুখার্জির কাছ থেকে ফোনে খবর পেয়ে তখনই ট্যাক্সী নিয়ে স্টার থিয়েটারে গেলাম। সেখানে রবি রায়ের মরদেহ শায়িত রয়েছে ফুলের সমারোহে।

রবি রায়ের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হোল নিমতলা মহাশ্মশানে। শবানুগমন করলেন মঞ্চ ও চিত্র জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। যাঁদের মধ্যে শিশির মল্লিক, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, শ্যাম লাহা, সুশীল মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রবি রায় ছিল আমার একান্ত অন্তরঙ্গ। যদিও আমরা সাধারণভাবে একদলে ছিলাম না। ১৯২৩ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের বন্ধনটা অটুট ছিল।

চোখের সামনে দিয়ে এক এক করে কতোজন চলে গেল যারা ছিল আমার কালের পথিক। মনে হয়, হয়তো আমাকে সাথীহীন হয়ে আরো অনেক পথ পরিক্রমা করতে হবে।

উজবেকী নৃত্যশিল্পী দল হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলো ১৬ জানুয়ারী। তাদের স্বাগত জানতে আমাকেও যেতে হলো হাওড়া স্টেশনে।

আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ব্যাপার তো আছেই, তারপর আছে আকাদমির কাজ। আকাদমির সম্পর্কে ভাবতে হয়। আমি একা নয়, আরো যাঁরা আছেন, তাঁরাও চিন্তা করেন। কীভাবে আকাদমি চলবে। কী হবে তার কার্যক্রমের ব্যাপার। এছাড়া এর আয়োজনের সঙ্গে প্রয়োজনের দিকটাও দেখতে হবে। আকাদমি নিয়ে তাই প্রায়ই আমাদেরকে বসতে হয়।

শ্রীরঙ্গম বলতে শিশিরবাবুকেই বোঝাতো। শ্রীরঙ্গম আর শিশির ভাদুড়ী—এই দুটি নাম এক সঙ্গে জড়িয়ে। শ্রীরঙ্গমে 'প্রফুল্ল' চলছিল। বন্ধ হলো এবারে। আর বোধ হয় চালাতে পারবেন না শিশিরবাবু।

জীবনে কম নাটক তো দেখিনি। কিন্তু বিখ্যাত চীনা সাহিত্যিক লু সুনের কাহিনী নিয়ে তুলসী লাহিড়ী একটি একাংক নাটক লিখলেন, নাম 'নব বর্ষা'। নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব এসেছিল আমার ওপর। অনেক দিন পর একটি সার্থক একাংক অভিনীত হলো। সেদিন অভিনয়ে ছিলেন অনেক তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রী। সবিতাব্রত দত্ত, নিবেদিতা দাশ, তৃপ্তি মিত্র—এঁরা ছিলেন নাটকে। তুলসীবাবুও একটি চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন।

বিদেশী অতিথিরাও সেদিন নাটক দেখে আমাদেরকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের বরেণ্য সন্তান ডঃ মেঘনাদ সাহা। বিশ্বজোড়া খ্যাতির আসনে বসেছিলেন এই বাঙ্গালী বিজ্ঞানী। তাঁর মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি মর্মন্তুদ। দিল্লীতে একটি সভায় যোগ দেওয়ার সময় ট্যাক্সী থেকে ফুটপাথে নেমে চলতে চলতে তাঁর মৃত্যু হয়। ডঃ সাহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলাদেশ তথা ভারত জুড়ে নামলো শোকের ছায়া। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ডঃ সাহার লোকান্তর গমনের তারিখ। পরদিন কলকাতায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। ডঃ সাহার পরিচয় কেবল

একজন বিজ্ঞানী হিসাবে নয়, তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক।

২৫শে মার্চ থেকে সংগীত নাটক আকাদেমির উদ্যোগে রাজধানী দিল্লীতে 'নাটক সেমিনার' আরম্ভ হবে। এই সেমিনারে যোগ দিতেই ২২ মার্চ কলকাতা থেকে দিল্লীর পথে রওনা হওয়া।

দিল্লীর সপ্রু হাউসে ডঃ রাধাকৃষ্ণন সেমিনারের উদ্বোধন করেন। সেদিন মিসেস যোশীর অনুরোধে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিতে হলো আমাকে।

আটাশে মার্চ রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করলাম।

সেমিনারে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল কলকাতার পেশাদারী মঞ্চ সম্পর্কে। আমি ভাষণ তৈরী করেছিলাম, যাতে প্রমোদকর এবং নাটক আইনের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য ছিল।

সেমিনারের দিনগুলিতে নানাভাবে আমাকে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সেমিনার শেষ হয় উনত্রিশে মার্চ। ঐদিনেই প্রেমচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে লেখা হিন্দীতে 'গো-দান' নাটকটির অভিনয় দেখলাম সপ্রু হাউসে।

সেদিন রাত একটায় ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিলাম নির্দিষ্ট আশ্রয়ে।

একবার বাইরে আসার সুযোগ পেলে হয়, ফিরে যাবার কথা মনে থাকে না। দিল্লী থেকে সিমলা যাবো এ চিন্তা আগে ছিল না। কিন্তু সিমলায় এলাম, ভাবলাম এসেছি যখন কটা দিন ঘুরে যাই। আমার স্ত্রী সুধীরারও তাই ইচ্ছে।

সিমলায় এসে একটি অভিজাত হোটেলে উঠলাম। হোটেল থেকে দেখতে পেলাম সিমলার প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের বিস্তৃত পটভূমিকা।

এপ্রিলের প্রথম দিনেই আমরা গেলাম চৈল পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।......বাংলোয় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম, আপেলের বাগান, খোবাণী বৃক্ষ, দেখলাম সরলবর্গীর বৃক্ষের সবুজ শোভা। সেখান থেকে রওনা হলাম চেল-এর দুর্গম পথে। সতেরো মাইলের মত পথ অতিক্রম করে আমরা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছলাম। এখানে 'পাতিয়ালা প্যালেস।' এবং সংলগ্ন মনোরম উদ্যান, ঝর্ণা, আর বিচিত্র ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ দেখে মুগ্ধ হলাম।

দেখতে গেলাম ক্রিকেট গ্রাউন্ড। পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও সমতল থেকে এতো ওপরে ক্রিকেট গ্রাউন্ড নেই।

চেল দেখা শেষ করে হোটেলে ফিরেছি বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তারপর আর বেরোই নি।

পরদিন। জাকো হিলসের দিকে যাবো। যাওয়ার পথেই দেখলাম বাঙালীদের কালীবাড়ি, দেখলাম বিখ্যাত ফুটবল ময়দান, রাষ্ট্রপতি ভবন। তারপর আরো কিছু দর্শনীয়, দেখা শেষ করে হোটেলে ফিরলাম।

বাইরে এলে আমার মন এক জায়গায় স্থির থাকে না। নারকোণ্ডার দুরত্ব সিমলা থেকে চল্লিশ মাইলের মত। তিব্বত সীমান্তের এই জায়গাটি সাগর পৃষ্ঠ থেকে ৯১০০ ফুট ওপরে। এই পথটুকু যেমন সুন্দর, তেমনই মনোরম। কখন যে পেরিয়ে এলাম, বুঝতে পারলাম না। যেন সমস্ত পথটা আমরা সম্মোহিত হয়েছিলাম।

যতোবার আমি পাহাড় দেশে এসেছি ততোবার মনের মধ্যে আমার একটি চিন্তাই এসেছে, যদি কখনো নিশ্চিন্ত অবসর পাই, তাহলে আমি আসবো এই পাহাড় দেশে। কোন নির্জন বাংলোয় বসে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবো।

কিন্তু সে স্বপ্ন আমার কল্পনার মধ্যেই মিশে রইলো।

ফিরে এসেছি কলকাতায়। আবার সেই কাজের মধ্যে মিশে থাকা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য আকাদমীর নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপনা করলেন ১৮ মে। এইদিন যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

দিনগুলো চলছে একরকম। এই চলতি দিনের মধ্যে ১৩ জুন আমাকে প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথা পেতে হল। ডঃ শচীন বসু মারা গেলেন এই দিন। ইনি আমার কন্যা মীরার শ্বশুর।

আত্মীয় বিয়োগে ব্যথা পাওয়াই তো স্বাভাবিক, তারপর এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তবুও এ ব্যথা বুক পেতে নিতে হয়।

শচীনবাবু মারা গেলেন ১৩ জুন, আর ২০ জুন গেল সুপ্রভা মুখার্জি। অভিনেত্রী সুপ্রভা মুখার্জির পরিচয় নতুন করে দেবার নেই।

শ্রীরঙ্গমের মৃত্যু কোন ব্যক্তির মৃত্যু নয়—তবু একটি নামের মৃত্যু। যদিও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস শ্রীরঙ্গম বাংলা দেশের নাট্যশালার ইতিহাসে একটি অবিনশ্বর নাম। আর এই মঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যে মানুষটি, তিনি তো আর কেউ নন, শিশির ভাদুড়ী। যিনি বাংলা দেশের নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে এক অপ্রতিহত পুরুষ।

শ্রীরঙ্গম নামটি উঠে গেল। নতুন নামের ফলক সেখানে যুক্ত হলো। সে নাম 'বিশ্বরূপা'। বিশ্বরূপার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের তারিখ ২২ জুলাই।

এই তো কিছুদিন আগে শ্রীরঙ্গমে শিশিরবাবুর সঙ্গে রাতের পর রাত অভিনয় করেছি। আজ সেই নামটাই হারিয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ কাপুর ভারতের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। পৃথ্বীরাজ কলকাতায় এলেন। ২৬ জুলাই তাঁকে এবং সঙ্গের অভিনেত্রীদের আপ্যায়িত করা হল থিয়েটার সেন্টারে।

অনেকদিন পর কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে পৃথ্বীরাজ তাঁর নাটক অভিনয়ের আয়োজন করলেন ২৭ জুলাই। পৃথ্বীরাজ কলকাতার নাট্যামোদীদের কাছে একটি প্রিয় নাম।

বেতারে নাটক প্রচারে এতোদিন যে ব্যবস্থা চালু ছিল, সে ব্যবস্থা তো আছেই, একারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নাটক প্রচারের ব্যবস্থা হোল। এই ব্যবস্থার প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল'। এর সঙ্গে একটি মুখবন্ধও যুক্ত হয়েছিল। সেটি ছিল আমারই। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এটি প্রচারিত হয়েছিল।

এই দীর্ঘ স্মৃতিচারণে, আমার জন্মদিন নিয়ে কিছু বলেছি বলে মনে হয় না। আমার জন্মদিন একুশে শ্রাবণ। এই দিনটিকে স্মরণ করেছি আমার ব্যক্তিগত পরিবেশে। জন্মদিন নিয়ে মনের মধ্যে এমন কোন দুর্বলতা আমার নেই, যেটাও ফলাও করে ভাবতে হবে। প্রতিদিনের মতো জন্মদিনও ভাবতে আবার চলে যায়।

কিন্তু এবারে এই দিনটিও আকাদেমীর ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে নিয়ে ঘরোয়া একটি অনুষ্ঠান করবে। এটি ছিল আমার ৬০তম জন্মদিন।

নাটকের মানুষ আমি, কতো বদলে গিয়েছি। মনের দিক থেকে সত্যিই আমি সরে এসেছি মঞ্চ-চিত্রের মায়া ত্যাগ করে। তবু একথা বলবো না, আমি মঞ্চের বাইরের মানুষ। মনে-প্রাণে আজও আমি মঞ্চের অভিনেতা। এ যোগসূত্রটা অনেক পুরোনো। ছিন্ন হবার নয়।

নানা অনুষ্ঠানে আমাকে যোগ দিতে হয়, সেকথা তো আগেই বলেছি।

অভিনেতৃ সঙ্ঘ 'দুই পুরুষ' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন রঙমহল মঞ্চে। তারিখটা ছিল ৭ আগস্ট। অভিনয়ের আগেই একটি দুঃসংবাদ এলো। রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন।

বাংলা দেশের মানুষের কাছে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় কেবল সরকারী প্রধান হিসেবে নয়—তাঁর আসল পরিচয় একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসাবে। যে মানুষ শিক্ষার জন্যে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী এই মানুষটি বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেবার মধ্যে যদি কিছু গৌরব থাকে, তবে সে গৌরবের অধিকারী ছিলেন স্বর্গত মুখোপাধ্যায়।

যাই হোক, অভিনেতৃ সঙ্ঘের নাটক সেদিন অভিনীত হয়েছিল, তবে স্বর্গত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন সেদিনের শিল্পী এবং দর্শকেরা। এই প্রসঙ্গে বলি, রাজ্যপালের মৃত্যুসংবাদ শুনে দর্শকদের একটি অংশ আসনে বসেই ছিলেন। আর এক দল সংবাদ শুনেই উঠে চলে গিয়েছিলেন। আমি সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বলেছিলাম, দর্শকরা যদি চান অভিনয় বন্ধ হবে, আর যদি না চান তাহলে অভিনয় হবে।

(ক্রমশঃ)

ঠিকানা নেই

বোধিসত্ত্ব মৈত্র

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে চেরীকে মাঝে মাঝে বেশ আনমনা ঠেকছিল। ওর ঠিক বাঁ-পাশে কুশল আর ডান পাশে সুখেন্দু বসেছিল ঘেঁসাঘেঁসি করে। সত্যজিৎ বসেছিল সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে। ওদের ট্যাক্সি যাত্রায় বরাবর এই নিয়ম বাঁধা। কুশল যেমন অনর্গল কথা বলে, আর নিজেই নিজের রসিকতায় হেসে গড়াগড়ি দেয়, তেমনি চালিয়ে যাচ্ছিল। সুখেন্দু মুখিয়ে বসেছিল তার কথার খুঁট ধরে বাঁকা টিকা-টিপ্পনী কাটবার জন্য। সত্যজিৎ মাঝে মাঝে পিছন ফিরে, মাঝে মাঝে ড্রাইভারের সামনে ঝোলান আয়নায় ওদের মুখ দেখে নিচ্ছিল। দেখছিল চেরী যেন কি একটা ভাবছে আপন মনে।

রেস কোর্সের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কুশল চোখ বড় বড় করে বলে উঠল—আমরা তিনজন যেন ঐ রেসের মাঠের ঘোড়া। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি একটিমাত্র বাজীকে সামনে রেখে, তার নাম শ্রীমতী চেরী। তফাৎটা শুধু এই ওগুলো হল চতুষ্পদ জন্তু ঘোড়া। আর আমরা হলাম—

—দ্বিপদ ও গাধা। —টুক করে টিপ্পনী কাটল সুখেন্দু। সত্যজিৎ পিছনে না চেয়েই হো-হো করে হেসে উঠল।

চেরী তার ভাবনা থেকে জেগে উঠে বললে—তুমি বড় যা তা বল সুখেন্দু।

সুখেন্দু নিতান্ত ভাল মানুষের মতো মুখ করে বললো—আমি কুশলের মনের কথাটা মুখে জুগিয়ে দিলাম। তাই না কুশল?

কুশল গজ-গজ করে বললে—ড্যাম লায়ার।

চেরী এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বললে—তোমাদের এই ছেলেমানুষী ঝগড়া আর জীবনে গেল না।

সুখেন্দু চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—তুমি যতদিন ত্রিধারায় বইবে, ততদিন তো নয়ই চেরী। তুমি একমুখী হও, দেখবে এই তিনটি নাবালকের মুখে রাতারাতি গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে যাবে।

কথাগুলো বলতে বলতে সুখেন্দু আড়-চোখে চাইতে লাগল চেরীর মুখের দিকে। চেরী যেন কথাগুলো শুনেও শুনল না। সামনে সত্যজিতের দিকে ঝুঁকে বললে—জিৎ, তুমি সুখেন্দুর মাথা থেকে ভূতটাকে নামাতে পার? ইদানীং ভূতটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

সুখেন্দু এবার ঈষৎ শক্ত গবায় বললে—ভূত যদি সুখেন্দুর মাথায় সত্যি সত্যি থাকে, তবে জিৎকে দেখলে সেটা আরও বেশী লাফাবে।

বাঁ দিক থেকে কুশল চেরীর হাতটা তুলে নিয়ে আলতোভাবে তার গালের ওপর বোলাতে বোলাতে নরম গলায় শুধাল—তুমি কি স্থির করলে চেরী?

চেরী আগের মতোই হাসতে হাসতে বললে—এবার তুমিও সুরু করলে? জিৎ

তুমিই বা বাদ যাও কেন? ওঃ আমি বোধ হয় এবার পাগল হয়ে যাব।

বলে তার মুখে কপালে এসে পড়া ঝুমকো ঝুমকো চুলের গোছাগুলো দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগল।

—আমার পোস্টিং হচ্ছে সামনের আগস্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট কলেকটর হিসাবে। এই টাগ-অব-ওয়ার-এ হেরে গেলে আমি পোস্টিং নেব আন্দামানে, নির্ঘাৎ।

কুশলের কথায় এখন আর বিন্দুমাত্রও ছেলেমানুষী নেই। ভারিক্কে গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার গলার আওয়াজ।

সুখেন্দু নির্বিকার চিত্তে বললে—তা আন্দামান তো আজকাল ভাল জায়গা। পলিটিক্যাল হাঙ্গামা ওখানে অনেক কম। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালান তোমার পক্ষে ওখানে সহজ হবে।

সত্যজিৎ সামনের সিটে ওদের দুজনের দ্বৈরথ দ্বন্দ্বটা উপভোগ করছিল। আর আয়নার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিল চেরীর মুখটা। এক ঝলকের মতো সে দেখতে পেল চেরীর শিশুর মতো ঢলঢলে উজ্জ্বল মুখটায় বেদনার ছায়া নেমে আসছে।

চেরী বললে—আচ্ছা তোমাদের কি হয়েছে বল ত? স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকা থেকে আমরা চারে এক হয়ে আছি দুটি বছর। দুনিয়ার লোকের হিংসে কুড়িয়েছি, বদনাম কুড়িয়েছি তবু আমাদের বন্ধুত্ব আজও অটুট। এম-এর সময় আমরা ক'জনে একসঙ্গে বসে কিভাবে পড়াশোনা করেছি এই এক বছরের মধ্যে তা নিশ্চয়ই ভুলে যাবার কথা নয়। ইদানীং মনে হচ্ছে সেই বন্ধুত্বে যেন চিড় ধরেছে। তোমরা আর আগের মতো হাস না। ঠাট্টা, তামাসা যা কর তা বাঁকা বাঁকা। আর একসঙ্গে বসে আড্ডা-গল্প-গান তোমরা তো উঠিয়েই দিয়েছ। চারজন একসঙ্গে হলেই এই ক'মাস ধরে শুনেছি কেবল ঐ এক কথা।

চেরীর গলা ভারী হয়ে এল। সে বলতে লাগল—হয়তো কালই আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়তে পারি তার ঠিক নেই। যে কটা দিন একত্রে আছি, এসোনা একটু ভাল করে আড্ডা দিয়ে নিই। এই তো সবার সঙ্গে দেখা হল আড়াই মাস পরে।

সুখেন্দু হাইকোর্টের জজের মতো ভারিক্কে নিরাসক্ত গলায় বললে—এই ছ'বছর একসঙ্গে থেকেই তো বিপদটা বেধেছে। তিনজনের দাবী সমান সমান হয়ে উঠেছে।

সুখেন্দুর গলার ভারী আওয়াজ অগ্রাহ্য করেই চেরী চেঁচিয়ে উঠল—দাবী? কিসের দাবী?

—এই তোমাকে পাওয়ার দাবী।—রসিয়ে জবাব দিল সুখেন্দু নরম গলায়। সুখেন্দুর কথার ঢং এ সত্যজিতের ভিতরটা রি-রি করে উঠল। কিন্তু সে জানে এক্ষেত্রে কথাটি বলা চলবে না। কোন একটা সূত্র পেলেই সুখেন্দু তার ওপর বাঘের মতো তর্কযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। ওদিক থেকে কুশল কি একটা বলতে যেতেই সুখেন্দু তাকে হাত দিয়ে থামিয়ে চেরীকে বললে—আমরা তিনজনেই তোমাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পেতে চাই। মহাভারতের যুগ হলে এক দ্রৌপদীতেই পাঁচজনের কাজ চলত। এখন তো আর তা হয় না। কাজেই তোমাকে ঠিক করতে হবে আমাদের তিনজনের মধ্যে কাকে তুমি বেছে নেবে।

কুশল সুখেন্দুর সঙ্গে একমত হল। বললে—ঠিক কথা। তুমি চেরী, ওয়ানস ফর অল ঠিক করে ফেল আমাদের তিনজনের কার ঘরে তুমি যাবে। কার জীবনসঙ্গিনী তুমি হবে?

সত্যজিৎ আবার হুমড়ি খেয়ে আয়নার ভিতর চেরীর মুখখানা দেখে নিল। রক্ত-রাঙা, থমথমে হয়ে উঠেছে সে মুখ। গলায় রাজ্যের বিরক্তি এনে চেরী বললে—জীবন-সঙ্গিনী না ছাই। তোমরা চাইছ—

সুখেন্দু আগের মতোই নির্লিপ্ত গলায় বললে—জীবনসঙ্গিনী হতে হলে শয্যা-সঙ্গিনীও হতে হবে বৈকি! সচিব, সখী, প্রিয়শিষ্যা এবং সেই সঙ্গে সন্তানের জননীও।

চেরী দু কানে আঙুল দিয়ে বললে—ছি-ছি। রীতিমতো ভালগার।

ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠছে দেখে সত্যজিৎ এবার পিছনে মুখ ফেরাল। বাধা দিয়ে বললে—আপাততঃ ও প্রশ্নটা স্থগিত থাক না। বেশ কয়েক মাস পরে চারজনে একত্র হয়েছি। এমন বসন্তের সন্ধ্যাটা কথার কচকচিতে কাটিয়ে দিলে পরে আফশোষ করতে হবে। কুশল তুমি বরং একটা গান গাও।

সুখেন্দু গণ্ডারের মতো গোঁ ধরে বললে—কলকাতা থেকে বেশ অনেকটা দূরে জংগুলে রাজ্যে কলেজের অধ্যাপনা করি। তোমাদের মতো চেরী তো আমার পক্ষে আজকাল অত সহজলভ্য নয়। কাজেই কথাটা আপাতত তেতো শোনালেও, যদি তোমাদের সবার সামনে এই ব্যাপারটার ফয়শালা হয়ে যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাব সেই জংগলে। আঙুর ফলের দিকে তাকিয়ে বসে থেকে শৃগালের আর দিবা-রাত্র আশার মুহূর্ত গুনতে হবে না।

একটু থেমে বললে—কিন্তু চেরীর বলতে বাধা কোথায়?

বাধা যে কোথায় সেটা ওরা তিনজনে অল্পবিস্তর যে না জানে এমন নয়। সুখেন্দুর এই চাপাচাপির কারণটাও সত্যজিৎ আর কুশল ভালভাবে জানে। সুখেন্দু পড়াশোনায় চিরদিন ইউনিভার্সিটির এক নম্বর ছেলে। চেরী প্রত্যেকবারেই থাকে তার পিছনে পিছনে। সেই চেরীকে সুখেন্দু এম-এতে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল তার নিজের বহু পরিশ্রম করে তৈরী করা নোটগুলো দিয়ে। শিক্ষক ছাত্র সবাই অবাক হয়েছিল। কুশল আর সত্যজিৎ বিপদ গুনেছিল মনে মনে। ভেবেছিল এই এক চোটে সুখেন্দু টেক্কা মেরে দেবে ওদের দুজনের ওপর।

চেরীদের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সত্যজিতের বাবার বন্ধুর মেয়ে সে। বার্মা ফেরত রেফিউজি। পয়সা কড়ি সব ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিলেন চেরীর বাবা। এ দেশে এসেও বিশেষ কিছু করতে পারেননি। সত্যজিতের বাবা বেঁচে থাকতে বহুদিন খরচ চালিয়েছেন চেরীদের। তিনি মারা যাবার পর চেরী আর তার মায়ের হাত পাতবার জায়গা হল সত্যজিতের মা। যদিও মা-মেয়েতে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে কোন রকমে সংসার চালায়, তবু পরীক্ষার ফি জমা দেবার সময়, কি বড় একটা কিছু খরচের ধাক্কা এলেই চেরীর মাকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় সত্যজিতের মায়ের কাছে। চেরীরা টাকা নিত ধার হিসাবে। সত্যজিতের মারও দিতে কোন আপত্তি ছিল না। কারণ মনে মনে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন কর্তার বিপুল সম্পত্তি একদিন চেরীই ভোগ করবে জিতের বৌ হয়ে। ইদানীং চেরী রিসার্চ স্কলারশিপ পাবার পর তাদের হাতপাতাটা অনেক কমে গিয়েছিল। তবু সত্যজিৎ মনে মনে হিসাব করত চেরী যে রিসার্চটা এখন নিয়ে আছে, সেটা ধার যদি পরে সে বিলেত যেতেই চায় তবে [illegible] জানাও অন্তত তার কাছে, কিম্বা তার মার কাছে আসতেই হবে। আর যদি চেরী সেই সুযোগটা জিতের কাছ থেকে না নেয়—

এটটুকু ভেবেই জিতের মনে হত—না না চেরী কোনদিন এতটা বোকামী করতে পারে না।

কুশলের কথাটা সুখেন্দু কিম্বা সত্যজিৎ কেউই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে না। যদিও ওদের তিনজনের মধ্যে কুশলই হচ্ছে সবচেয়ে সুপুরুষ। লম্বা টুকটুকে চেহারা। স্বভাবে একটু মেয়েলী ধরনের। বেশ খানিকটা ছেলে-মানুষী মাখান। কুশল তার ওপর আবার কবি। ওরা দুজনে বেশ ভাল করেই জানে চেরীর মায়ের স্নেহটা তলায় তলায় অনেক বেশী করে বয় কুশলের ওপর। তার কারণও আছে। কুশলের মতো এমন রোগীর সেবা অনেক ভাড়াকরা নার্স দিয়েও সম্ভব নয়। একবার চেরীর বাবা বামায় থাকতে ওরা মা মেয়েতে শয্যাশায়ী হয়ে ছিল টাইফয়েডে। সুখেন্দু সত্যজিৎ যাতায়াত করে [illegible] যথেষ্ট ভরসা দিয়েছিল। জিতের [illegible] চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, আর সেবা করেছিল কুশল নিজে। কিন্তু ওরা জানত একমাত্র সেবার নুণ নিয়ে তো আর রমণীর মন, বিশেষ করে চেরীর মতো মেয়ের মন জয় করা যায় না। কুশল ওদের তিন-জনের ভিতর সবচেয়ে সেণ্টিমেণ্টাল। চেরীর মতো মেয়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেও ওকে যে স্বামী হিসাবে পছন্দ করতে পারে না, তা একটা অন্ধ লোকও টের পাবে। সুখেন্দু আর সত্যজিৎ দুজনেই ওকে এলেবেলে বলে মনে করে। কিন্তু তবুও কন্যা বরয়তে রূপং কথাটা যদি এতটুকুও সত্যি হয়। বলা তো যায় না।

সুখেন্দু আবার বলতে সুরু করল—আমি দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছি এই দিনটার জন্য। আমাদের তিনজনের মধ্যে একদিন মুখে মুখে যে চুক্তিটা হয়েছিল, শুধু তার সম্মান রাখবার জন্যই আমি চেরীকে এতদিন কিছু বলিনি। আজ তার একটা ফয়শালা হয়ে যাক।

—কিসের চুক্তি? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল চেরী।

বছর তিনেক আগে সুখেন্দু আর কুশলের হাবভাব দেখে সত্যজিৎ নিজেই

উঁজিয়ে এসে চুক্তিটা করিয়ে নিয়েছিল। সে বললে—আমরা এতদিন চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম এম-এ পাশ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি আমরা কেউই তোমার কাছে বিয়ের কথা তুলব না।

সত্যজিতের মনের ভিতর কিন্তু অন্য কথা তোলপাড় করছিল। যদিও সে নিজে থেকেই এ চুক্তিটা করিয়ে নিয়েছিল, তবু সে এটাকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করেনি। শুধু সুখেন্দু আর কুশলকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য এটা ছিল ওর একটা ছল। আর এ ছলটুকু সেদিনকার স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারী, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতা সত্যজিতের কাছে খুব একটা সাংঘাতিক কিছু ছিল না। ডিপ্লোম্যাসিকে খেলা বলে মনে করত।

সেবার ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিসাবে সত্যজিৎ ছাত্র শিক্ষকদের নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবার বন্দোবস্ত করেছিল। পাড়ি লম্বা, খরচও বেশী। অনেক ছাত্রই অবশ্য হটে গিয়েছিল খরচের ধাক্কায়। হটে গিয়েছিল কুশল, সুখেন্দুও। চেরীও যেতে রাজী হয়নি। সত্যজিৎ তার মাকে ধরে চেরীর জন্য খরচের ব্যবস্থা করিয়ে তাকে দলে টেনেছিল।

কাশ্মীরের এক নির্জন পাহাড় চূড়োয় একদিন তারা দুজনে বাজী ফেলে উঠে গিয়েছিল। (এটাও সত্যজিতের কৌশল)। চূড়োর উপর উঠে সত্যজিৎ চেরীকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু খেয়ে দিয়েছিল। মুখ তুলে নিতেই চেরী তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখটা ভালভাবে মুছে ফেলে, পাশের ঝরণার জলে কয়েকটা কুলকুচো করে এসে খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলেছিল—জিৎ তুমি কি হ্যাংলা। রাক্ষসের মতো হাঁ করে এমন চুমু খাচ্ছিলে—মাগো ঃ—

সত্যজিৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—সেকি! তোমায় আদর করলাম, তোমার ভাল লাগল না?

—ভাল লাগবে? দূরে দূরে! ছি-ছি। আমার মুখটা তুমি এঁটো করে দিলে। তোমার এঁটো আমি জীবনে খাইনি। ইনফ্যাকট কারুর এঁটো খেতে আমার গা ঘিন ঘিন করে। আর তা ছাড়া কী বিশ্রী সিগারেটের গন্ধ তোমার মুখে। বমি পাচ্ছে।

থুথু করে থুতু ফেলতে আরম্ভ করেছিল চেরী। সত্যজিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তার আত্মাভিমানে ঘা লেগেছিল। সে প্রশ্ন করেছিল—তুমি কি আমায় ভালবাস না?

—তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে ভালবাসি কিনা তা কি নতুন করে বলতে হবে? আর সেই সুবাদে কি তোমার চুমু খাওয়াটাও আমাকে ভাল লাগাতে হবে?

সত্যজিৎ চটে গিয়েছিল মনে মনে দারুণ ভাবে। তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেছিল—সুখেন্দু কি কুশলের চুমুগুলো নিশ্চয়ই আমার মতো তেতো নয়।। সুখেন্দু তো দিনে পাঁচ প্যাকেট চারমিনার খায়।

—ইউ ডার্টি ভালগার। জিৎ তুমি এতো বড় লোচ্চা হয়ে গেছ?—চটে উঠেছিল চেরীও। চড়া মেজাজেই বলেছিল—সুখেন্দু, কুশল, তোমার মতোই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার মতোই আমি তাদের ভালবাসি। তারা তো তোমারও বন্ধু জিৎ। কেমন করে তুমি তাদের সম্বন্ধে অমন কথা বলতে পারলে?

চেরীর চড়া মেজাজ দেখে সত্যজিৎ কুঁচকে গিয়েছিল। তবু সে সেদিন মরীয়া হয়ে প্রশ্ন করেছিল—আমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে তুমি বেশী ভালবাস কাকে?

—তিনজনই আমার সমান বন্ধু। বেশী ভালবাসাবাসির কথা উঠছে কেন? সত্যজিৎ বলেছিল—আমি যেমনভাবে তোমাকে পেতে চাইছি, কুশল কি সুখেন্দু কি তোমাকে তেমনিভাবে পেতে চেয়েছে কোনদিন? তোমাকে না হলে যে আমার সারা জীবন বৃথা চেরী। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই—

এবার চেরী মুখ ভরে কুল কুল করে হেসে উঠেছিল (চেরী খুব বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না, এটাই তার স্বভাব)। বলেছিল—সুখেন্দু কি কুশলের তো আর তোমার মতো মাথা খারাপ হয়নি। জিৎ তুমি ভাল করে একবার ডাক্তার দেখাও, সাইকোপ্যাথলজিস্ট। তোমার মাথার কোথাও কিছু গড়বড় হয়েছে।

—দ্যাখ, ব্যাপারটা অত সহজে হেসে উড়িয়ে দিতে চেও না। আমি তোমার কাছে এই মুহূর্তেই একটা কথা চাই।

—বিয়ের কথা তো? সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোন কথাই এখন দিতে পারব না। ও সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবিই নি।

—আমার মা যে তোমাকে ঘরে আনবার জন্য অনেকদিন ধরে ইচ্ছে করে আছেন।

—তিনি আমার কাকীমা। আমার মায়ের মতো। তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া আমি করব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—আচ্ছা বেশ, আজ তুমি আমাকে অন্তত এই কথাটা দাও, যদি কোনদিন বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে হয় তবে প্রথমেই আমার কথা ভাববে। আমি তোমার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করে থাকব।

চেরী সত্যজিতের মুখের ওপর একটা বিদ্রূপের হাসি হেনে বলেছিল—আরে বাসরে, একেবারে অনন্তকাল। বল কি জিৎ। আচ্ছা এসব নাটুকে ঢং কবে থেকে শিখলে তুমি জিৎ। ইদানীং তোমার সঙ্গীগুলো বোধ হয় ভাল জুটছে না। তুমি ইউনিয়ন ছেড়ে দাও।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তুমি আজ আমাকে একটা কথা দাও। অবশ্য বন্ধু হিসাবেই তোমাকে আমি অনুরোধটা করছি। তুমি আমাকে এ নিয়ে আর বিরক্ত কোরো না, কেমন। কিছু যদি স্থির করি তো আমি নিজেই তোমার কাছে আসব।

—কথা দিলাম।

কথাগুলো মনে পড়ে সত্যজিতের কান লাল হয়ে উঠেছিল। যদি এই মুহূর্তে চেরী সেই সব কথাগুলো সুখেন্দু আর কুশলকে বলে ফেলে। মনে মনে একটা অস্বস্তি তাকে পীড়িত করছিল বার বার।

ট্যাকসিটা ইতিমধ্যে গঙ্গার ধারে এসে পড়েছিল। শীতের শেষের মরা গঙ্গার ওপরে লাল সূর্যটা কলকারখানার ধোঁয়ার সমুদ্রে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগল। সুখেন্দু শুধাল—জানতে পারি আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—আঃ, প্রশ্ন কর কেন? চেরী আজ যেখানে নিয়ে যাবে মুখ বুঁজিয়ে চল। বললে কুশল।

—যদি নরকে নিয়ে যায়?—ফোঁড় তুলল সুখেন্দু।

—আমি সঙ্গে যেতে রাজী।—উত্তর দিল কুশল।

—তাহলে এ্যাসিস্ট্যান্ট কলেকটরের পোস্টটা মাঠে মারা যাবে।—সুখেন্দু আবার টিপ্পনী কাটল।

সত্যজিৎ এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মনে মনে। চেরী আর পুরোন কথার কোন উল্লেখ করল না দেখে। এবারে সে গলাটা ঝেড়ে জিজ্ঞেস করল—তা স্বর্গই হোক বা নরকই হোক, কোথায় আমরা যাচ্ছি চেরী?

অবশ্য ওরা তিনজনেই খুব ভাল করে জানে এ প্রশ্ন করা বৃথা। কারণ তিনজনেই জানে হাড়ে হাড়ে কি অসম্ভব খেয়ালী মেয়ে চেরী। এখুনি হয়ত বলতে পারে—সর্দারজী চালিয়ে ডায়মন্ডহারবার। কি কাকদ্বীপ। কি দূর পাল্লার আর কোথাও। কিম্বা হয়তো কিছুই না বলে সটান যেতে পারে হাওড়া স্টেশনে, সেখান থেকে টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসবে—বোম্বে কি দিল্লী, কি আর কোন জায়গার। ট্রেন ছাড়বার আগে হয়তো বলবে—কুশল মাকে বলে দিও আমি চললাম দেরাদুনে সোনা মাসীর ওখানে। এক সপ্তা পরে ফিরব। ও মেয়ে সব পারে। বাইরে বার হয়ে কখনও বলবে না কোথায় যাবে। জিজ্ঞাসা করলেই জবাব ঠিকানা নেই।

ওরা একবার বাজী ধরেছিল তিনজনে। চেরীর ডাকে ওরা সেবার গঙ্গার ধারে জুটেছিল কলেজ পালিয়ে। ভর দুপুর বেলায়। চারজনে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পর চেরী লাফিয়ে উঠে পড়ল।—বাদাম ভাজা কিনে আনি।

একটু দূরেই বসেছিল বাদামওয়ালা। চেরী গেল বাদাম কিনতে। সেই সুযোগে আমরা বাজী ধরলাম।

—বল এবার মহারাণীর কি হুকুম হবে।

কুশল বললে—কি আবার; লাইট হাউসে যে নতুন বইটা এসেছে তার জন্যে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। পকেট হাতড়ে দেখ রেস্তর কি অবস্থা।

সুখেন্দু বললে—আরে না-না। স্টীমারে বোটানিকসে যাবার মতলব আছে।

সত্যজিৎ বললে—নৌকোয় গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ।

একটু পরেই চেরী ফিরে এল। এক আঁচল বাদাম হাতে ধরে, কয়েকটা দাঁত দিয়ে পিষতে পিষতে এসে উত্তেজিতভাবে বললে—চল চল, এখুনি উঠে পড়, একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে আসি।

বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল জগন্নাথঘাটের দিকে। সেখানে গিয়ে হুড়োহুড়ি করে টিকিট কিনে আমাদের প্রায় হিড়হিড় করে টানতে টানতে এনে তুলেছিল একটা প্রায় ছাড় ছাড় স্টীমারে। উঠতেই স্টীমারটা ছাড়ল। আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলাম—যাচ্ছি কোথায়? বোটানিকসে;

—না। —একমনে বাদাম ভাগ করতে করতে জবাব দিয়েছিল চেরী।

—বজবজে?

—না। —বেশ ধীর সুস্থে জাঁকিয়ে ষ্টীমারের ডেকে বসতে বসতে জবাব দিয়েছিল চেরী।

—ডায়মণ্ডহারবারে?

—না, তাও না। আমরা আপাতত যাচ্ছি রাজগঞ্জে।

—রাজগঞ্জে? —আমরা তিনজনেই বিস্মিত প্রশ্ন করেছিলাম।

—হাঁ রাজগঞ্জে। এইমাত্র খবর পেলাম সেখানে একটা অদ্ভুত তালগাছ আবিষ্কার হয়েছে। সেটা সকালবেলা পুকুরের ওপর শুয়ে থাকে। কিন্তু রোদ চড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দিন-ভোর উঠে দাঁড়াতে থাকে। সন্ধ্যাবেলা একেবারে সোজা হয়ে যায়। অদ্ভুত নয়?

—তা এই অদ্ভুত তালগাছটির সন্ধান তোমারে দিল কে?

বাদামওয়ালার কাছে দুটো লোক দাঁড়িয়ে বলাবলি করছিল। ওরা নিজেরা দেখে এসেছে। আমি কান পেতে ঠিকানাটা পর্যন্ত শুনে নিয়েছি। চক্রবর্তীদের ইঁটখোলার পুকুর। রাজগঞ্জ ষ্টীমারঘাট থেকে দক্ষিণমুখো আধ ঘণ্টার রাস্তা।

—কিন্তু এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়? প্রশ্নটা করে ওরা তিনজনেই তাকিয়েছিল চেরীর মুখের দিকে একসঙ্গে ট্যাক্সির ভিতর।

—ঠিকানা নেই। হল তো।—চেরী বললে মৃদু হেসে।

—উঃ, এখন তুমি যেখানেই যাও, আজকে ঠিক করতেই হবে তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানা। কার ঘরে তুমি যাবে? —ওরা তিনজনে একসঙ্গে চেপে ধরল চেরীকে।

পরে সুখেন্দু তেতো গলায় বললে—যদি এই নাবালক তিনটি শিশুকে নিয়ে কানামাছি খেলার আনন্দটাকে বড় বলে মনে না কর।

চেরীর মুখের ওপর এবার প্রগাঢ় একটা বেদনার ছাপ পড়ল। মৃদুস্বরে বললে—এতো তাড়া কেন? আমি যে স্ত্রী হবার জন্য, মা হবার জন্য এতটুকু তৈরী হইনি।

কুশল মিন মিন করে বললে—তা হলে না হয় আজকে থাক। কিন্তু শিগ্‌গির এ সম্বন্ধে—

সত্যাজিৎ প্রায় ধমক দিয়ে উঠল কুশলকে। —না কুশল, চেরীর মন চেরী নিজেই জানে না। স্ত্রী হবার জন্য, মা হবার জন্য বাইশ বছরের কোন মেয়েকে নতুন করে তৈরী হতে হয় না। সে তৈরী হয়েই থাকে।

সুখেন্দু সায় দিল—বটেই তো। নেচারকে তো অস্বীকার করা যায় না।

চেরী নিশ্চুপ। গভীর চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গেছে সে।

সুখেন্দু আবার বলে উঠল—এ ব্যাপারে তুমি যতই সময় নেবে চেরী, দেখবে তুমি কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছ না। একটা ভয়, একটা দ্বিধা এসে তোমাকে বার বার সিদ্ধান্ত থেকে টলিয়ে দেবে। ওল্ড স্পিনিস্টারদের যা হয় আর কি!

কুশল এবার একটু গলা উঁচিয়ে বললে—আর কিছু সময় দিতে দোষ কি? চেরী যদি এখনও না ফুটে থাকে।—

সুখেন্দু মাতব্বরের মতো বলে উঠল—নেভার মাইণ্ড, বুকের তাপ দিয়ে আমি ফুটিয়ে নেব।

সত্যাজিৎ বলে উঠল—দেহের উত্তাপ না পাওয়া অবধি চেরী বোধ হয় ফুটবে না। তাছাড়া ফোটবার আগের মুহূর্তটিতে পর্যন্ত ফুল কি বুঝতে পারে তার পাপড়ী মেলার সময় হয়েছে?

ট্যাক্সিটা এতক্ষণে আউট্রাম ঘাটের কাছে এসে পড়েছিল।

চেরী ঝুঁকে পড়ে বললে—সর্দারজী ওয়াপস্ চলিয়ে। পরক্ষণেই তিনজনের দিকে ফিরে বললে—তোমাদের আজ যে কথা বলব বলে নিয়ে এলাম তা আমাকে তোমরা বলতেই দিচ্ছ না।

তার কথার আওয়াজে ঝাঁঝ ফুটে বার হয়ে এল। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়িটা পঞ্চম জর্জের স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল আবার। ওরা যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে চলল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গঙ্গার ওপর জাহাজগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তাটায় আলো অনেক কম, অন্ধকারই বেশী। নিঃশব্দে ওরা ক'জন বসে আছে ট্যাক্সির মধ্যে। কুশল, সত্যাজিৎ আর সুখেন্দু বোধ হয় অপেক্ষা করছে চেরী কি বলে তাই শোনবার জন্য। চেরীর মনটা ঘুলিয়ে উঠেছে দারুণভাবে। তাই সে যে কথাটা ওদের বলবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছিল, তা আর বলে উঠতে পারছে না। ওর মনের মধ্যে ওদের তর্ক-বিতর্কের রেশটা এখনও বেশ জোরেই বাজছে। ওরা একে অপরের মুখগুলো অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মাত্র। এক একটা লাইট পোস্টের কাছে সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, আবার অস্পষ্ট।

গঙ্গার ধারে লোকজনের ভীড় খুব বেশী নয়। ইদানীং সহরে খুন, রাহাজানি, স্ত্রীলোকদের ওপর হামলা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে এই সব জায়গাগুলোতে সান্ধ্য বায়ুসেবীদের ভীড় আর হচ্ছে না। নানা দিকে নানা কথা শোনা যাচ্ছে, তাই বিশেষ করে মহিলারা এই সব জায়গায় সন্ধ্যার পর যাতায়াত একদম বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছু ফুচকা আর আইসক্রীম ওয়ালারা নিতান্ত পেটের দায়ে এখানে ওখানে বসে আছে। খদ্দের নেই। এটা হল আউট্রামঘাট আর ম্যান-অব-ওয়ার জেটীর কাছাকাছি।

ট্যাক্সি যতই দক্ষিণে এগোতে লাগল ততই জনমানবশূন্য থমথমে অন্ধকার যেন সব কিছুকে গ্রাস করে বসে আছে মনে হল। শুধু এখানে সেখানে দু-একখানা প্রাইভেট কার নিঃশব্দে এসে দাঁড়াতে দেখা যেতে লাগল। আবার কোন রহস্যময় কারণে নিঃশব্দে তাদের চলে যেতেও দেখা যেতে লাগল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

ওরা প্রিন্সেপস ঘাটের কিছু দূরে এসে পড়ল। চেরী আদেশ করল—সর্দারজী ইঁহা রোক দিজিয়ে।

ট্যাক্সি থেমে গেল। গলা বাড়িয়ে টাকার অংকটা দেখে নিয়ে হাতের ব্যাগটা খুলে চেরীই গাড়ী ভাড়াটা মিটিয়ে দিল। তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললে—নাম এখানে।

কুশল একটু ইতস্তত করে বললে—এখানে এই নির্জন জায়গায়—

সুখেন্দু বলে উঠল—দিনকাল খুব ভাল নয়। আজকাল—

সত্যাজিৎ বললে—অন্য কোথাও গেলে হত না?

চেরী প্রায় ধমকের সুরেই বললে—কিসের ভয়, তোমরা তো তিনজন রয়েছ।

ওরা নেমে দাঁড়াল রাস্তার পাশে ঘাসের জমির ওপর। ট্যাক্সিটা হুস করে চলে গেল। চেরী ওদের তিনজনকে নিয়ে গঙ্গার পাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ওকে বড় গম্ভীর বলে মনে হচ্ছিল। জাহাজ থেকে এসে পড়া আলোতে ওর মুখখানা চারপাশের অন্ধকারের মতোই থমথমে লাগছিল।

ওরা চারজনে এসে গঙ্গার ঢালু পাড়ের ওপর বসল। দুপাশ থেকে সত্যাজিৎ আর কুশল চেরীর দুখানা হাত টেনে নিয়ে শুধুল—তুমি কি চটলে চেরী?

অত্যন্ত শান্ত নিস্পৃহ গলায় চেরী বললে—তোমাদের কথা শুনে প্রথমে খুবই চটেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম তোমাদের সঙ্গে কতকগুলো প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। নৈলে ভুল বোঝাবুঝি আরও বাড়তে থাকবে। তোমরা তো জান, কারুর সঙ্গে এতটুকু মনোমালিন্য আমার সহ্য হয় না। বিশেষ করে তোমরা তিনজন। তোমরা হলে আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু বোধ হয় সবচেয়ে বেশীদিন ধরে। আপাততঃ আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে তোমারা?

—কি বল?

—ছেলেতে মেয়েতে যৌন সম্পর্ক বাদ দিয়ে কি নিছক বন্ধুত্ব হতে পারে না? সুখেন্দু, তুমি কি বল?

সুখেন্দুর জবাবটা ছিলে ছেঁড়া তীরের মতো বার হয়ে এল—হয়তো হতে পারে, কিন্তু তাতে আমার আস্থা নেই।

—জিৎ, তোমারও কি ওই মত?

—ছেলে মেয়ের মধ্যে সে জাতীয় বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব। যৌন সম্পর্ক তাতে থাকবেই।

—কুশল, তোমারও কি ওই একই কথা?

—দেখ চেরী, বন্ধুত্ব মানেই হল একটা আকর্ষণ। আর দুনিয়াতে আকর্ষণের যে কটা বস্তু আছে তাদের গোড়ার কথাটাই তো হল সেকস্। তবে ইতর প্রাণী বা গাছেদের বেলায় যা হয় সেটা হল নিছক তাদের বংশ বৃদ্ধির তাড়নায়। মানুষের বেলায় তার এসথেটিক সেন্স একটা বহু অংশ নিলেও সেকসই তো সব কিছুরই মূলে। সুতরাং—

—বুঝলাম। কিন্তু আমার কথা কি জান? তোমাদের তিনজনকে আমি ভাল-

বেসেছি নিছক বন্ধুর মতো। এই দীর্ঘ ক' বছরের মধ্যে একবারও তোমাদের কারুর সম্বন্ধে আমার মনে যৌন আকর্ষণ বোধ করিনি আমি। নাওয়া-খাওয়ার মতো তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, বেড়াতে নিত্য অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি। এক মুহূর্তের জন্যেও আমি সন্দেহ করিনি যে তোমাদের মনের মধ্যে তোমরা আমার সম্বন্ধে একটা আসক্তি এত গুরুতরভাবে লালন পালন করে চলেছ এতদিন ধরে। অবশ্য একবার কাশ্মীরে—

সত্যজিৎ মনে মনে শিউরে উঠল।

একটু কি ভেবে নিয়ে চেরী বললে—যাক গে, সেকথা এখানে নাই বললাম। তবে সেটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলেও আমার মনে হয়নি। কিন্তু তোমাদের এই আসক্তিটা—

—ছিঃ ওটাকে আসক্তি বললে আমি খুবই দুঃখ পাব। ভালবাসা আর আসক্তি এক নয়। —বললে কুশল আহত স্বরে।

চেরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হাসল।

সত্যজিৎ এবার সাহস সঞ্চয় করে বলে উঠল—কিন্তু চেরী তোমাকে তো একসময় বিয়ে করতেই হবে। বিয়ে না করে তো তুমি থাকতে পারবে না। বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে।

—মাস্ট আই?

—অফকোর্স, নৈলে আমি কি আশায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাকে এম এতে জায়গা ছেড়ে দিলাম? আমার নিশ্চিত স্কলারশিপ, রিসার্চের সুযোগ সব ছেড়ে দিয়ে আজ জংগলে বাস করছি কি জন্যে?—ফুঁসতে ফুঁসতে বললে সুখেন্দু।

—সেকথা যদি বল তো চেরীর জন্য আমিও কিছু কম করিনি। লাফিয়ে উঠল কুশল অপর দিক থেকে।

চেরী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আবহাওয়া মুহূর্তের মধ্যে নিদারুণ থমথমে হয়ে উঠেছে। সামনে গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজটা অকস্মাৎ একটা গম্ভীর আওয়াজ তুলে ভোঁ দিল। পরক্ষণেই জায়গাটা আবার নিস্তব্ধতায় ভরে গেল।

চেরীর গলা থেকে একটা ক্লিষ্ট আওয়াজ বার হয়ে এল। —জিৎ, এবার তুমিও তো তোমাদের কাছে আমাদের ঋণের হিসাবটা দাখিল করবে—

সু সু সু শি-ই-ই। পিছন থেকে একটা লম্বা সরু তীক্ষ্ণ শিষের আওয়াজে চেরীর কথাগুলো কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ওরা চমকে পিছন ফিরে তাকাল। কালো কালো গুটিতিনেক মূর্তি ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে শিষ মারছে। সহরের চ্যাংড়া ছেলেদের দল একটা।

কুশল বললে—চেরীর মেজাজটা আজ তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না। চল এখান থেকে আজ যাওয়া যাক।

সুখেন্দু নীচু গলায় বললে—ছেলেগুলোর মতলব খুব ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। চল চেরী অন্য কোথাও যাই।

চেরী জিদ ধরে বসল—না, আমি এখান থেকে উঠব না।

—আরে সেই রংদার চিংড়িটা এখানে রে। তিন ব্যাটা চিংড়িটাকে নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছে। —একটা ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল।

কথাগুলো স্পষ্ট ওদের কানে এসে বাজল। সত্যজিৎ দাঁতে দাঁত পিষে বললে —ইস্ বেহদ্দ বদমায়েসের দল। চেরী ওঠ। এখানে আর এক মুহূর্তও বসা চলবে না।

—না, আমি উঠব না। তোমাদের সাহস থাকে তো ওদের এখান থেকে দূর করে তাড়িয়ে দাও।

—চেরী ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না। জান, ওরা আজকাল প্রায়ই ছুরি ছোরা পকেটে রাখে। রাখে বোমা। পিস্তল, রিভলবার থাকাও বিচিত্র নয়। কাগজে আজকাল দেখছ তো। চল ওঠো।

—না।

ছোকরাদের দলে আরও গোটাকতক চোঙা প্যান্ট পরা চ্যাংড়া এসে জুটল। অকথ্য ভাষায় তারা টিটকারী কাটতে লাগল একটু দূরে থেকে।

সত্যজিতের বোধ হয় এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। চেঁচিয়ে বললে—তোমরা এখান থেকে যাবে না, আমরা পুলিশ ডাকব।

—ওরে শালা, পুলিশের ভয় দেখায় রে! —খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল ছোকরারা।

—তোদের পেঁদিয়ে লাট করে দিলেও কোন পুলিশ বাবা তোদের উদ্ধার করতে আসবে না। আমরা ওয়াটগঞ্জের ছেলে। আমাদের নামে পুলিশ ভয়ে কাঁপে।

ছোকরাগুলো নিজেদের ভিতর কি সব বলাবলি করতে লাগল। কুশল এই ফাঁকে দৌড়ে চলে গেল রাস্তার দিকে। বলে গেল —আমি একটা ট্যাক্সি ধরি। সত্যজিৎ আর সুখেন্দু কাঠ হয়ে বসে রইল।

ছোকরাগুলো আরও কয়েক পা এগিয়ে এল ওদের দিকে।

—এই শালী, ব্যবসা ফাঁদবার আর জায়গা পাসনি? দলের মস্তানটা কটূক্তি করল। চেরী দু' কানে আঙ্গুল গুঁজে দিল। ছোকরার দল আবার খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল।

হঠাৎ চেরী ছিটকে উঠে দাঁড়াল। প্রায় এক লাফে এসে পড়ল মস্তানটার মুখো-মুখি।—তোমরা কী চাও? অসভ্য শয়তানের দল।

মস্তানটা চেরীর এই হঠাৎ আক্রমণে এক মিনিটের জন্যে থমকে গিয়েছিল। পর মুহূর্তেই দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—পাগলী খেপেছে রে। ধর জাপটে।

—একপা এগোলে আমি গঙ্গার ঝাঁপ দেব। আর যদি পয়সাকড়ি চাস তো এই নে। বলে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে সে মারল মস্তানটার মুখে।

মস্তানটা ব্যাগটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে দৌড় মারল রাস্তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটা তার পিছন পিছন ছুটল।—মোনা শালা সব নিয়ে ভাগল রে, ধর ধর শালাকে।

কুশল রাস্তায় একটা চলন্ত গাড়ী ধরে ফেলেছিল। সুখেন্দু আর সত্যজিৎও ইতিমধ্যে গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছিল চেরীর পাশে। চেরী আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে হেঁটে চলল। সঙ্গে সঙ্গে চলল সত্যজিৎ আর সুখেন্দু। ওদের কারুর মুখে কথা নেই।

গাড়ীটার কাছে এসে নীচু অথচ শক্ত গলায় চেরী বললে—ওঠ। ওরা একটু ইতস্তত করছে দেখে আবার বললে—ওঠ।

ওরা তিনজনে পিছনের সীটে উঠে বসল। সামনে ড্রাইভারের পাশে চেরী।

—চালিয়ে এসপ্লানেড।—গাড়ী চলতে শুরু করল।

চেরী মুখ না ফিরিয়েই বললে—তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম। আসছে কাল সকালের প্লেনে আমি দিল্লী যাচ্ছি। সেখান থেকে পরশু আমেরিকা। ইয়েলের রিসার্চ স্কলারশিপটা হঠাৎ পেয়ে গেলাম। আজ সকালে কেবল পেয়েছি। তোমাদের জানাবার আগে সময় হয়নি। কাকীমাকে যাবার আগে প্রণাম করে যাব, তুমি একটু বলে রেখ জিৎ। আজ রাতে আর যাবার সময় হবে না, গোছাতেই সময় লাগবে অনেকটা।

আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল চেরী।

গাড়ী এল এসপ্লানেডে। ড্রাইভারকে থামতে বলে চেরী সামনের দরজা খুলে টুপ করে নেমে পড়ল। ওরাও নামতে যাচ্ছিল। চেরী বাধা দিল।—আমাকে এখন একবার মার্কেটে যেতে হবে। তোমরা যাও। আচ্ছা আসি

এক মুহূর্ত থেমে সে বললে—শোন তোমাদের বন্ধু হিসাবে একটা পরামর্শ দিয়ে যাই। তোমরা কারুর স্বামী হতে চেও না জীবনে। আমার কথাটা মনে রেখ। পিছন ফিরে চেরী জনারণ্যে মিশিয়ে গেল।

বিজ্ঞানের কথা

পৃথিবীর কক্ষপথের মঞ্চ

পৃথিবীর কক্ষপথে একটি স্টেশন বা মঞ্চ স্থাপন করার জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। সয়ুজ চার ও পাঁচ ব্যোমযান একটির সঙ্গে অপরটি যুক্ত হয়ে এমনি একটি মঞ্চ তৈরি হবার মহড়াও হয়ে গিয়েছে। প্রস্তুতির পর্বটি মোটামুটি শেষ বলা চলে। এই লেখার সঙ্গে যে ছবিটি ছাপা হল তা এমনি একটি স্টেশন বা মঞ্চের। পৃথিবীর কক্ষে এই মঞ্চটি পাক খেয়ে চলবে। মনুষ্যবাসের উপযোগী করে এটি তৈরী। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনা অনুসারে, এই মঞ্চে নভশ্চররা পালা করে অবস্থান করবেন এবং নানা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালাবেন।

পৃথিবীর কক্ষে একটি মঞ্চ স্থাপন করার ওপরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তার কারণও আছে। তাঁরা মনে করেন মহাবিশ্ব মহাকাশ এবং আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কেও আরো বেশি জানতে হলে, এখনো পর্যন্ত এমনি একটি কক্ষীয় মঞ্চই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সহায় হতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক এমনি একটি মঞ্চ থেকে পৃথিবী সম্পর্কে আরো বেশি কী জানা যেতে পারে।

পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে ভূপৃষ্ঠে কতটুকু আমরা দেখতে পাই? বিমান থেকেই বা কতটুকু? একটি কক্ষীয় মঞ্চ থেকে গোটা পৃথিবীটাকেই চোখের ওপরে রাখা যেতে পারে। তার সবচেয়ে বড়ো লাভ—ভূপৃষ্ঠের বিন্যাসটি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারার সুযোগ পাওয়া; কোথায় জমি, কোথায় নদী, কোথায় অরণ্য, কোথায় সমুদ্র তা গোটা একটি ছবিতে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া। নদীর গতিপথ কোথাও বদলাচ্ছে কিনা, জলের স্তর ওঠানামা করছে কিনা, কোথাও অরণ্যে আগুন লেগেছে কিনা, কোথাও ধস নামছে কিনা, ফসলের ফলন কেমন, মাটির নিচে খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি—এসব খবর কক্ষীয় মঞ্চ থেকে সংগ্রহ করা যাবে গোটা একটি ছবির মতো পুরোপুরিভাবে।

খবরগুলো সামান্য নয়। সমুদ্রের কথাই ধরা যাক। কক্ষীয় মঞ্চ থেকে সমুদ্রকে যতো সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে ভূপৃষ্ঠ থেকে তা সম্ভব নয়। সমুদ্রের বিপুল সম্পদ আহরণ করার উপায়ের সন্ধান যাঁরা করছেন তাঁদের গবেষণা চালাবার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে কক্ষীয় মঞ্চ।

এমনি একটি মঞ্চের সাহায্য পেলে বিশেষ করে ভূ-বিজ্ঞানীদের কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠবে। যে-সব খবর সংগ্রহ করতে কয়েক বছর লাগার কথা তা এমনি একটি কক্ষীয় মঞ্চ থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই হস্তগত হবার সম্ভাবনা।

জীববিজ্ঞানীদের বেলাতেও সুবিধে নিতান্ত কম নয়। কক্ষ-পরিক্রমার ভারশূন্য অবস্থায় জীবের শরীর যতো অনায়াসে কাটাছেঁড়া করা যায় ভূপৃষ্ঠে তা আদৌ সম্ভব নয়। কক্ষীয় মঞ্চে জীববিজ্ঞানীও অনেক সহজে অনেক বেশি জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

আর শুধু পৃথিবীই বা কেন, কক্ষীয় মঞ্চ থেকে পর্যবেক্ষণের বিষয় হবে মহাকাশ ও মহাবিশ্বও। ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আমরা আমাদের এই বিশ্ব সম্পর্কেই বা কতটুকু জানতে পারি, মহাকাশ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে তো প্রায় কিছুই নয়। এমনি একটি কক্ষীয় মঞ্চ থেকে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ পেলে এই জানা-র সূত্রপাত হবে আশা করা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে তাকিয়ে একদিন আমরা যা দেখেছি তা আদৌ দেখা কিনা বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্য থেকে তাকিয়ে না দেখা পর্যন্ত সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। কোন কোন তারকা থেকে প্রচণ্ড তেজ নিঃসৃত হয়ে থাকে, ভূপৃষ্ঠের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে না-জানা না-বোঝা দিক অনেক, কক্ষীয় মঞ্চ থেকে সেটা না থাকারই সম্ভাবনা। এমনকি তখন হয়তো এই তেজ-নিঃসরণের রহস্যটুকুও পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। তাহলে তো তেজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার এই পৃথিবীতে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়।

এগুলো হচ্ছে মঞ্চ তৈরি করার সরাসরি সুবিধে। কিন্তু আনুষঙ্গিক সুবিধেও বড়ো কম নয়। তাও মাত্র তের বছরের মধ্যে।

নভশ্চারণা সম্ভব করার জন্যে দুটি বড়ো রকমের কাজ সম্পন্ন করার দরকার ছিল। একটি ব্যোমযানকে পৃথিবীর মাটি থেকে আকাশে তোলা, পুনরায় সেই ব্যোমযানটিকে আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনা। এ দুটি ছিল মূল কাজ, নভশ্চরের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার জন্যে অবশ্যই আরো অনেক অনেক কিছু। মাত্র তের বছরের মধ্যে মূল কাজ দুটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়েছে আনুষঙ্গিক শিল্পকেও। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত। আমাদের সবচেয়ে বড়ো লাভ হয়েছে অতি উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক কম্পিউটর, যে-যন্ত্রটির সাহায্য ছাড়া ব্যোমযানকে আকাশে তোলা, নির্দিষ্ট পথে চালিত করা ও পুনরায় পৃথিবীর মাটিতে ফিরিয়ে আনার কাজটি কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারত না। বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আমাদের এই যুগটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক কম্পিউটর, পরমাণু-শক্তি ও মহাশূন্য-অভিযানের যুগ। এই তিনটি ব্যাপার পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এবং এই তিনটি ব্যাপারের মিলিত ফল যে কী আশ্চর্য ব্যাপার সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞানীরা তারও কিছু কিছু আভাস দিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক লাভ হিসেবে অতঃপর উল্লেখ করা চলে প্রচণ্ড তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বিশিষ্ট মিশ্রধাতুর, প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বিশিষ্ট উপকরণের। যদিও মহাকাশ-অভিযানের প্রয়োজনে তৈরী কিন্তু এই মিশ্রধাতু ও উপকরণ পৃথিবীর মাটির বহু শিল্পেও কাজে লাগছে।

এমনি সুবিধে আরো অনেক। মাত্র তের বছরের মধ্যে এত বিভিন্ন দিকে এত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে আমরা অনেকে ধরে নিয়েছি এমনটি হবেই। কিন্তু মহাকাশ-অভিযানের তাগিদ যে এক্ষেত্রে একটি বড়ো রকমের তাগিদ তা মনে রাখা দরকার।

এক যুগের খতিয়ান—

চাঁদের দিকে অভিযান শুরু হয়েছে ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিক থেকে। লুনা-১ থেকে লুনা-১৬ পর্যন্ত প্রায় এক যুগের ইতিহাস। এই প্রথমটি ও শেষটির দিকে তাকিয়েও বারো বছরের অগ্রগতির একটা পরিমাপ পাওয়া সম্ভব।

লুনা-১ চাঁদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে দিয়ে। লুনা-১৬ প্রায় নির্ধারিত স্থানে চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নেমেছে। চাঁদের মাটি সংগ্রহ করেছে, পুনরায় পৃথিবীর মাটিতে প্রায় নির্ধারিত স্থানে ফিরে এসেছে। মাত্র বারো বছরের মধ্যে মাত্র ষোলটি লুনার অভিযানে কৃতিত্বের কতখানি পার্থক্য।

লুনা-২ একই বছরের শরৎকালে। এই অভিযানটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। সোভিয়েতের একটি প্রতীক-চিহ্ন সমেত লুনা-২ চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়ে।

আরো তিন মাস পরে লুনা-৩। এই অভিযানের কৃতিত্ব অসাধারণ। লুনা-৩ চাঁদের অদেখা দিকের আলোকচিত্র তুলে আনে। পৃথিবীর মানুষের কাছে চাঁদের অদেখা দিকের ছবি এই প্রথম।

জোন্দ-৩ (জুলাই, ১৯৬৫) অভিযানের একই সাফল্য, চাঁদের অ-দেখা দিকের ছবি তুলে আনা।

চাঁদের মাটিতে প্রথম আলতোভাবে নামতে পেরেছিল লুনা-৯। এটিও এক অসাধারণ ঘটনা। মানুষের তৈরী যন্ত্র অন্য একটি জ্যোতিষ্কে আলতোভাবে অবতরণ করছে—এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি। লুনা-৯-এর চোখ দিয়ে মানুষ এই প্রথম চাঁদের উপরিতলের গড়নের দিকে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেল। স্বয়ংক্রিয় অভিযান চালিয়ে বিশ্ব সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করার যে প্রয়াস শুরু হয়েছে লুনা-৯-কে বলা চলে তার সূত্রপাত।

লুনা সম্পর্কে—

লুনা-১০ ও লুনা-১২ চাঁদের চারদিকে কক্ষপথে পাক খেয়েছিল। এই দুটি অভিযান থেকে চাঁদের জমি সম্পর্কে অনেক খবর জানা গিয়েছিল।

লুনা-১৩ আলতোভাবে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে ও চাঁদের মাটির গড়ন সম্পর্কে অনেক তথ্য পৃথিবীতে পাঠায়।

মনুষ্যবাহী মহাকাশ স্টেশন
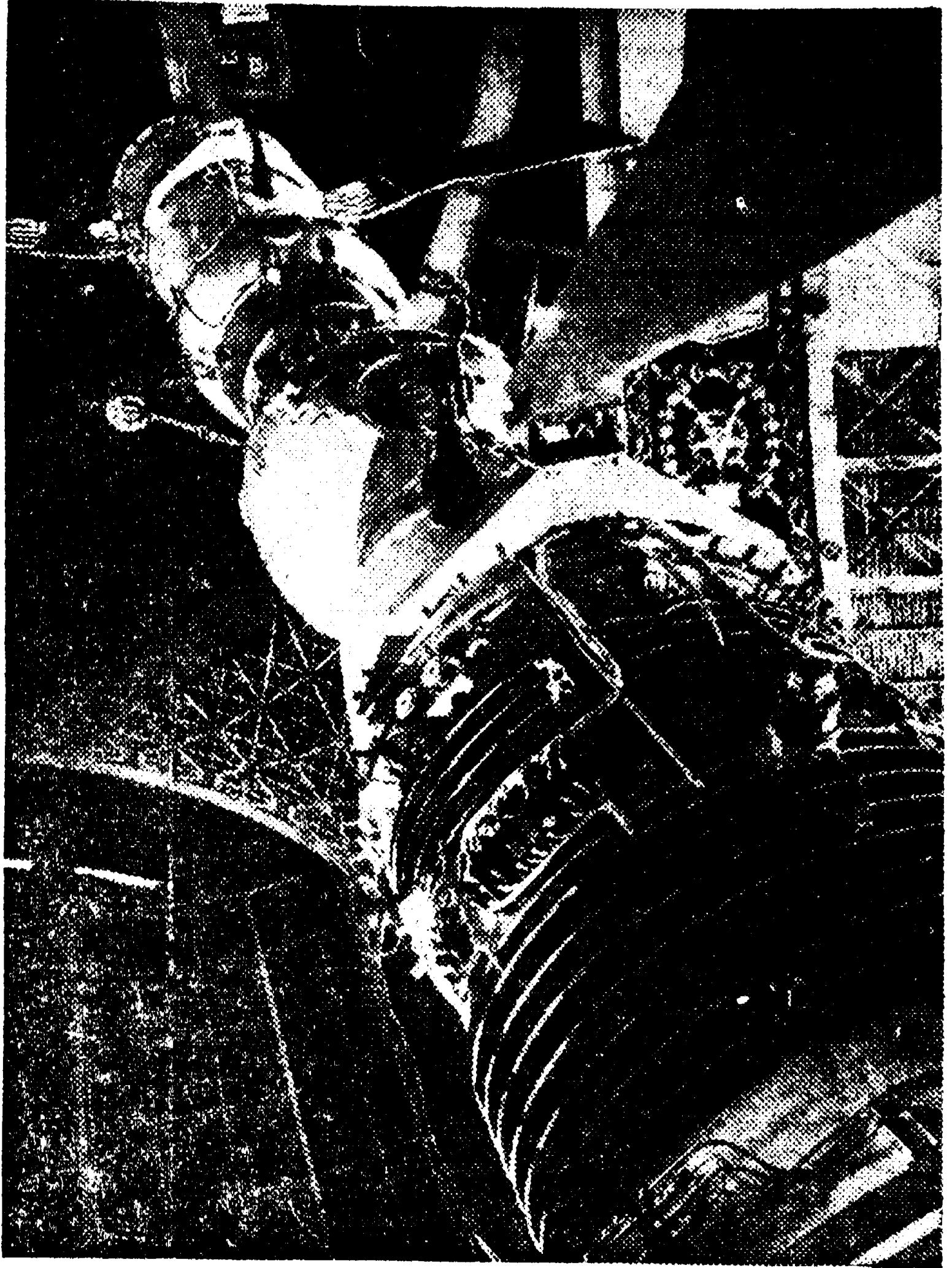
সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কেবল মানুষকে চাঁদের মাটিতে নামানোর চেষ্টা করেন নি বা তাঁদের কাছাকাছি এলাকায় পাক খাইয়ে আনেন নি। এ-কাজ সম্পন্ন করেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২— পরপর দুটি অভিযানে মার্কিন নভশ্চররা চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে ঘুরে বেড়ালেন, চাঁদের মাটি সংগ্রহ করলেন, তারপরে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে সবচেয়ে আশ্চর্য কৃতিত্বের সাক্ষ্য এই দুটি ঘটনা।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত চাঁদের রহস্য রহস্য-ই থেকে গিয়েছে। চাঁদের ধুলো আর পাথর হাতে পাবার পরেও বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত চাঁদের জন্ম সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি, চাঁদের বয়স ও চাঁদের গড়ন সম্পর্কেও নয়। এজন্যে তাঁদের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাথর ও ধুলো সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করেন বর্তমান অবস্থায় মনুষ্যবিহীন অভিযানের মাধ্যমেই এই সংগ্রহকার্যটি চলা উচিত। মনুষ্যবিহীন অভিযানের ঝুঁকি ও খরচ কম, অথচ সাফল্য কিছুমাত্র কম নয়। কথাটা যে কত সত্য লুনা-১৬ হাতেকলমে উপস্থিত করে তাঁরা প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

বারো বছরে যদি লুনা-১ থেকে লুনা-১৬ পর্যন্ত হয়ে থাকে তাহলে আগামী বারো বছরে যে কী হবে তা ভাবতেও কল্পনা হার মানে।

লুনা-১৭

এই লেখা প্রেসে যাবার সময়ে খবর পাওয়া গেল লুনা-১৭ চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে। মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত লুনা-১৭ চাঁদের মাটি ও চাঁদের আকাশ সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করবে এবং সম্ভবত আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসবে।

—[illegible]

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

শিউপ্রসাদজির বাড়িতে গিয়ে কিন্তু হতাশ হতে হ'ল। সে বাড়িতে তখন পুলিশ পাহারা।
ভেতরে যাবার তাহলে হুকুম নেই? ও বাড়িতে আছেন কে?
কেউ নেই। শুধু আমরা পাহারায় আছি।

ও, এই আপনারা দুজন শুধু? আচ্ছা এ বাড়ির দরোয়ান কোথায়?
দরোয়ান? কোনো দরোয়ান আমরা দেখিনি।
হুকুম মত এসে আমরা খালি বাড়িই পেয়েছি।
দরোয়ান তা হলে পালিয়েছে!

যাকে খুঁজছিলেন তাঁকে বুঝি পেলেন না, স্যার?
না, পাইনি, তবে আশা করছি পাব। হয়ত আজ রাত্রেই।
আজ রাত্রেই সে দরোয়ানকে পাবে? কোথায়?

পরাশরের বাড়িতে অবিরের কাছে একটা অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল ...
কাল থেকে এখনো বাসায় ফিরিনি!
কি অবির? দুজনের খাওয়া হবে?
আজ্ঞে খুব হবে। সাইকেলটা কিন্তু আমি দিইনি বাবু!

সাইকেলটা দিসনি?

কাকে দিসনি?
আজ্ঞে উনি যাকে আপনি পাঠিয়েছিলেন তা আমি বললাম, ও ইংরিজি চিঠিতে হবেনা। দিয়েছি বিদেয় করে।

বেশ করেছিস আমার বাংলা চিঠি না পেলে কারুর কথা শুনবি না!

এখানে সাইকেল নিতে এসেছে! সাহস ত কম নয়!
আমরা নেই জেনেই অবশ্য এসেছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সাইকেলটা ওদের কাছে ফেলনা নয়!

অঙ্গনা

সাইক্লিস্ট শিখা সেন

ইনিয়ে বিনিয়ে দীর্ঘ ভনিতার আড়ালে আসল বক্তব্য চাপা দেওয়ার চেয়ে অকপট বলাই ভাল যে, খেলাধুলোয় আমরা বড় পিছিয়ে আছি। প্রতি বছর এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাই আমাদের সম্বল। এরই মধ্যে এদিক-ওদিক ছিটকে দু'একটি ব্যতিক্রম যখন নজরে পড়ে তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। পরিচিত উচ্চতায় ওঁদের ধরতে পারি না। বড় অচেনা অচেনা ঠেকে। অথচ ওঁরা আমাদের আপনজন। এই বাংলাদেশেরই জল-হাওয়ায় মানুষ।

শিখা সেন এমনই ব্যতিক্রম। মাত্র বার বছরের মেয়ে। এরই মধ্যে খেলাধুলোয় সে একজন সর্বভারতীয় প্রতিভা। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিনিধিবিহীন সাইক্লিংয়ে শিখা নিজের চেষ্টায় আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে অনন্য সাফল্যে। এতদিন পর্যন্ত সোনার মেডেল পাওয়া মেয়ে সাইক্লিস্টের মুখ দেখতে পায়নি বাংলাদেশ। শিখা সে সাধ এবং অভাব পূরণ করেছে শুধু নয় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে অনেককে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। একবার নয় একাধিকবার।

জলের পোকা শিখা। সাঁতার কাটতেই ভালবাসতো। এখানেও তার জন্য অপেক্ষা করেছিল অনেক সম্মান। দু' একবার সে সাঁতার প্রতিযোগিতায় ভাল ফলাফল দেখাতেও কসুর করেনি। তাই সবাই ভেবেছিল, সাঁতারেই শিখা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। হয়তো শিখাও তাই ভাবতো। কিন্তু শিখার বাবার মন তাতে সায় দিল না। তিনি বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী। নিজে খেলাধুলোয় বড় বেশি একটা অংশ গ্রহণ করেননি। কিন্তু উৎসাহ খুব। খেলাধুলোয় যে একদম অংশ নেননি একথা বলা যায় না। রবীনবাবু বাস্কেট এবং ভলি বেশ ভালই খেলতেন। হকিতেও কৃতিত্বের সঙ্গেই অংশ নিয়েছেন। এতো গেল বাবার দিক। মায়ের দিক থেকেও শিখা সহজাত কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী। তার মা শ্রীমতী অমিয়া সেন এককালে খেলাধুলোয় বেশ নামকরা মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মহিলা হার্ডলস চ্যাম্পিয়ান। সেই আগ্রহ তাঁর এখনো আছে। শুধু নিজের মেয়েকে নয় আরো অনেক মেয়েকেই তিনি নিয়মিত খেলাধুলোয় উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। প্রখ্যাত ক্রীড়া সংস্থা 'শিশুমঙ্গল'-এর এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যুক্ত। এককালের খ্যাতনামা হার্ডলার শ্রীমতী নীলিমা ঘোষও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে এর সম্পাদক এবং ক্রীড়া সম্পাদক পদে আছেন এঁরা স্বামী-স্ত্রী। সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে খেলাধুলোর উদার প্রাঙ্গনে তাঁরা সকলকে নিয়ে নতুন জগত রচনায় ব্যস্ত।

কি যে হয়ে গেল শিখাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বাবা-মা বুঝলেন, শিখা সাঁতার ছেড়ে সাইকেল শিখুক। সেখানেই তার সম্ভাবনা বেশি। জলের মেয়ে উঠে এলো ডাঙায়। সেটা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাস। শিখার সাইকেলে হাতে খড়ি হলো। সবই বাবার তত্ত্বাবধানে। নিয়মিত অনুশীলন। কোন ত্রুটি নেই। একটুও ফাঁকির সুযোগ নেই। শিখা মন-প্রাণ ঢেলে দিল। ঘড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রবীনবাবু। সময়ের হিসেব নিচ্ছেন। দু'এক মিনিট এদিক সেদিক হলেই অস্থির হয়ে পড়েন। পথের কথা ভেবে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। এমনি একদিনের ঘটনা রবীনবাবুর বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ওঁরা যথারীতি স্টার্ট নিয়েছে। ঘড়ি হাতে সময় মেলাচ্ছেন তিনি। সময় পেরিয়ে গেল। অস্থির রবীনবাবু বেরিয়ে পড়লেন ওঁদের খোঁজে। দেখলেন বৃষ্টির জন্য ওঁরা সবাই এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। অথচ

[illegible] তখন বৃষ্টি নেই। এমন সময়ে দুর্ঘটনার কথাই বেশি করে মনে পড়ে। একবার দুর্ঘটনায় পড়তেও হয়েছিল শিখাকে। যথারীতি অভ্যাস করছিল রেড রোডে। এমন সময় অতর্কিত ধাক্কা। অবশ্যই গাড়ির। আঘাত খুব একটা গুরুতর নয়। কিন্তু সারা শরীরে। এজন্য ভুগতে ওকে হয়েছিল অনেকদিন। তাই টাইমিং-এর এদিক সেদিক হলে রবীনববুর মন দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে।

বাংলাদেশের সাইক্লিস্টদের অনুশীলনের কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তাই রেড রোড ধরেই ও'রা অনুশীলন করেন। দলে সবাই পুরুষ শিখাই একমাত্র মেয়ে। অথচ সে হুঁশ কারো নেই। শিখার অভিযোগ, সকালে রেড রোডে গাড়ির দুরন্ত গতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নতুন গাড়ি চালাতে শিখছেন যাঁরা তাঁরাও এসে ভিড় করেন এখানে। আবার সকালের দিকে রেড রোড সব ধরনের যান-বাহনের জন্য উন্মুক্ত। অবশ্যই এটা অলিখিত বিধান। কিন্তু আমাদের অনুশীলনের জন্য কারো কোন মায়ামমতা নেই। এই রেড রোডেই অনুশীলন করতে গিয়ে প্রাণ হারান সাইকেলে বাংলাদেশের বিরাট আশা জিয়াউল রহমান। এতেও কিন্তু ওদের শাস্তি হয়নি। সকালের রেড রোডে গাড়ি এখনো উদ্দাম গতিতেই ছোটে। আর একটি অনুশীলনের জায়গা আছে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম। মধ্য কলকাতার মেয়ে শিখার পক্ষে তার দূরত্ব অনেকটা। তবু রোজ বিকেলে সে যায় সেখানে। এভাবেই চলে সকাল-বিকাল অনুশীলন। প্রায় সারা বছর ধরে।

জানুয়ারী মাসে হাতে খড়ি। আর নভেম্বরেই প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণ এসে পৌঁছল শিখার কাছে। ১৯৬৮ সালে কেরলের ত্রিবান্দ্রামে জুনিয়ার ন্যাশনাল সাইকেল কম্পিটিশন। এখানে তার যোগদান খুব একটা সহজ হয়নি। অনেক চেষ্টা করে তবেই তাকে প্রতিযোগিতায় যোগদানের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে। কারণ, মহিলা প্রতিযোগীবিহীন ছিল এতদিন বাংলাদেশ। বেঙ্গল সাইক্লিস্ট অ্যাসোসিয়েশনও এ সম্বন্ধে নিস্পৃহই ছিল। হঠাৎ শিখার আবির্ভাবে ও'রা তেমন উৎসাহবোধ করেননি। যাহোক, চেষ্টাচরিত্র করে শিখা ত্রিবান্দ্রামে চললো প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে।

শিক্ষার এক বছর পুরো না হতেই প্রতিযোগিতা। এবং বৃহৎ প্রতিযোগিতা। শিখা একটিমাত্র ইভেন্টে যোগদান করলো। ফলাফল প্রথম যোগদানের ভীরুতায় কম্পমান। শিখা চতুর্থ হলো। কোন পদক তার গলায় দুললো না। দাঁড়ানো হলো না বিজয়স্তম্ভে। প্রথম প্রতিযোগিতার বিজয়-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন না। হয়তো এটাও শিখার পরীক্ষা। অনেক পদক তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মুষড়ে পড়লে তা

[illegible] ৭০'। এবছর হামবুর্গে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬টি দেশের ১০০০ প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে ভারতসহ দশটি দেশের পক্ষ থেকে একযোগে স্ব স্ব দেশের খাদ্য-**দ্রব্যের একটি প্রদর্শনী** হয়। এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীরা সবাই যে যার দেশের পোশাকে সজ্জিত।

হাতছাড়া হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরে, লড়াই করে তা ছিনিয়ে নিতে হবে।

এজন্য শিখাকে অপেক্ষা করতে হলো আরো কিছুদিন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই। শিখা যোগদান করলো। ফলাফল আশানুরূপ হলো না। একটি প্রতি-যোগিতায় সে যোগদান করলো। তৃতীয় স্থান। বিজয়স্তম্ভে দাঁড়ানো আর পদক লাভের বাসনা সফল হলো। এবারে বিজয়ী হস্ত না হলেও এতটুকু আকাঙ্ক্ষা তো শিখার নয়। তাই কিছুটা হতাশা নিয়েই ফিরে এলো।

এসেই আবার অনুশীলন। পুরোদমে। সকাল-সন্ধ্যা। সাইকেলই শিখার ধ্যান-জ্ঞান। এবার সর্বোচ্চ সাফল্য চাই। এবার কটকের বরবাটি স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শিখা সেন হাজির। দু'দুটি বিরাট প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা-ভাস্কর। এবার প্রতি-যোগিতার একটা বৈশিষ্ট্য শিখাকে অনুপ্রাণিত করলো আরো বেশি। সকল প্রতিযোগীর হয়ে শপথ নিলেন শ্রীমতী অলকা মিত্র। সে-বারই এ ঘটনা প্রথম। শিখা এতে আরো সাহস পায়। মনে মনে ভাবে এমন দিন আরো আসতে পারে।

সেবার প্রতিযোগিতায় শিখা সংকল্প-বদ্ধ। লড়াইয়ে বাজিমাৎ করতে হবে। তা সে লড়াই যতই কঠোর হোক না কেন। হলোও তাই। তীব্র প্রতিযোগিতার মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে শিখা বাজী জিতে নিলো। দুটি প্রতিযোগিতায় সোনার মেডেল। বিজয়স্তম্ভের সর্বোচ্চে শিখা। অনেকদিনের সাধ আর সাধনা তার পূর্ণ হলো। সেই

সঙ্গে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হলো সাইক্লিস্টের প্রতিনিধিত্বে। এবং তা সাফল্যে ভাস্বর। শিখার মনোবল আরো বাড়লো।

কটক থেকে ফিরে আবার অনুশীলন। কিন্তু হঠাৎ জলের নেশা পেয়ে বসলো তাকে। সারাটা বর্ষা সাঁতার কেটেই কাটালো। সাইকেল নিয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া করে না। কৃতিত্বের আসল অধ্যায়টা সে যেন ভুলে বসলো। সন্তরণ পটিয়সী শিখার ডাক পড়লো আগরতলায়। বাংলার প্রতিনিধিত্বের জন্য। এমনি সময়ে ফৈজাবাদে অনুষ্ঠিত হতে চললো সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নের অনুষ্ঠান। শিখা এবং ওর মা-বাবা ঠিক করতে পারলেন না কোনটা ফেলে কোনটা রাখবে। ইতিমধ্যে সাইকেলের অনুশীলন আরম্ভ হলো। অবশেষে ঠিক হলো, শিখা ফৈজাবাদ যাবে, আগরতলা নয়। সাঁতারের প্রথম বঞ্চনার অভিজ্ঞতা সে ভুলতে পারেনি। তাই সাইক্লিং-এর আসরেই সে যোগদান করতে ছুটলো।

ফৈজাবাদে তার একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। সকল প্রতিযোগীর হয়ে শিখা শপথ নিল। তারপর আরম্ভ হলো প্রতিযোগিতা। সবশুদ্ধ সাতটি ইভেণ্ট। ছটিতে যোগদান করলো শিখা। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য আর একটিতে অংশ নিতে পারলো না। প্রথম দুটিতে রৌপ্য পদক। একটু দমে গেল শিখা। এবার সংকল্প আরো তীব্র হলো। পরের চারটিতে স্বর্ণ পদক। শিখা হলো স্বর্ণশিখা। ইণ্টার-জোনাল এবং জুনিয়র সব মিলিয়ে শিখা ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন। শুধু তাই নয়, এবারে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন পেলটি জিতেছে।

আনন্দে ডগমগ শিখা এবার চললাম বোম্বেতে। আসছে ফেব্রুয়ারী মাসে সেই প্রতিযোগিতা। এখানে শিখার অনেক আশা। আমাদেরও তাই। শুধু স্বর্ণপদক বা চ্যাম্পিয়নশিপ না এবার রেকর্ড। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং সহজ সুন্দর এই কিশোরীর কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শিখাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সাইক্লিংয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের উৎসাহ কেমন? শিখা উত্তর দিয়েছিল, এখন সংস্কার কাটেনি। আশা করবো, শিখার দৃষ্টান্তেই সে সংস্কার তুচ্ছ হয়ে যাবে। অসংখ্য উৎসাহী অনুরাগীদের বাংলার মহিলা সাইক্লিস্টের প্রাঙ্গন গমগমিয়ে উঠবে।

—প্রমীলা

সংবাদ

২৬নং গৌরীমাতা সরণী (কলিকাতা—৪) অবস্থিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্নেহভাজন যোগিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা। তাঁর পালিতা কন্যা মাতা দুর্গাপুরী দেবী শ্রীশ্রীসারদামাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আশ্রমকে পূর্ণতা দান করেছেন। মাতা দুর্গাপুরী দেবী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং সংস্কৃতে সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ। মাত্র আট বছর বয়সে মাতৃ কৃপা-লাভান্তে তের বছর বয়সে একমাত্র তিনিই সারদা মাতার নিকট থেকে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। পরমহংসদেবের মতে ঈশ্বর অনুরাগ ব্যতীত সমাজকল্যাণ ব্রত সঠিক পালিত হতে পারে না। সেবার মূলমন্ত্র এই যে, প্রতিটি নরনারীকে ঈশ্বরের প্রতি-নিধিরূপে জ্ঞান করতে হবে। অন্যথায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে সেবাকার্য ব্যাহত হবে। আজন্ম ব্রহ্মচারিণী সাধিকা দুর্গামাতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ও অনুরাগিণী। স্বামীজী দুর্গামাতার পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। স্বামীজীর আদর্শ অনুসারে স্বার্থজ্ঞানশূন্য হয়ে সেবাব্রত দুর্গাপুরী দেবী ও সারদেশ্বরী আশ্রম অনুসরণ করেছেন।

সাধারণের অর্থে বিনা আড়ম্বরে আশ্রম পরিচালিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য বা প্রচার নেই। এই আশ্রমের তিনটি শাখা আছে—গিরিডি, কলকাতা ও নবদ্বীপে। আশ্রমের বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রাচীন ভারতের আদর্শভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। সূচী ও তাঁতশিল্পেও শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত আছে। দুর্গামাতা ও গৌরীমাতা আশ্রম বালিকাদের ঈশ্বর

দুর্গাপুরী দেবী

জ্ঞানে সেবা করেছেন। এই নীতি আজ পর্যন্ত অনুসৃত হচ্ছে। এইরূপে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে কন্যাদের আদর্শ মাতা, গৃহিণী বা কল্যাণব্রতী সন্ন্যাসিনীরূপে গঠিত করে এইরূপ সেবাকার্যে মাতা দুর্গাপুরী দেবী প্রকৃত নারী শিক্ষা উন্নয়নে সাহায্য করেছেন। মাতৃভাবময়ী এই সন্ন্যাসিনীর সান্নিধ্যে তাঁর অগণিত অনুগামী মাতা সারদা দেবীর অপরূপ চরিত্র অনুধাবনে সমর্থ হন।

পুষ্প পাল

কেরালার গ্রামসেবিকা শ্রীমতী সীমান্তি

কেরালার ঘরে ঘরে আজ শ্রীমতী সীমান্তির নাম। ১৯৬৯-৭০ সনে কেরালায় শ্রেষ্ঠ গ্রামসেবিকারূপে তিনি ৭৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। কাজাকুট্টমের জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের এই গ্রামসেবিকাটি গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি গঠন করে ঐ সকল সঙ্ঘের মাধ্যমে মেয়েদের সব্জী বাগান, আতুর সেবা, পচাই সার উৎপাদন এবং হাঁস-মুরগী পালন শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরই উপযুক্ত শিক্ষার জন্য আজ কাজাকুট্টম ব্লকের প্রত্যেক গৃহে ১০ থেকে ১৫টি হাঁস-মুরগী পালন করা হচ্ছে। তা ছাড়া ২৫০টি বাড়ীতে সব্জীর চাষ চলেছে এবং প্রায় ২০০ পচাই সারের আগার তৈরী হয়েছে।

শ্রীমতী সীমান্তির উৎসাহে গ্রামবাসীরা ডাকঘরে ৩৭৩টি সেভিংস ব্যাংক একাউণ্ট খুলেছেন। তাঁর পরামর্শে গ্রামের ৪০০টি গৃহে উন্নত ধরনের পায়খানা নির্মিত হয়েছে। সহজলভ্য কোন্ কোন্ খাদ্য গ্রহণ করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে গ্রামবাসীরা তাও ঐ গ্রামসেবিকার নিকট থেকে জেনে নিয়েছেন।

শ্রীমতী সীমান্তি ৯ বৎসর ধরে কাজাকুট্টম ব্লকে কাজ করছেন। তিনি একজন নিম্ন বিত্তশালী কৃষক পরিবারের মেয়ে; তার বিয়েও হয়েছে এক কৃষকেরই সঙ্গে। ৩৮ বছর বয়স্ক এই গ্রামসেবিকাটি বর্তমানে সমগ্র ব্লকের 'ছেচি' বা বড়দিদি।

কেরালার কাজাকুট্টম ব্লকটি ত্রিবান্দ্রম শহরে ১৮ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। ৫০ বর্গমাইল আয়তনের এই ব্লকটির জনসংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার। ৭টি পঞ্চায়েতে বিভক্ত এই ব্লকে ১৯৫৫ সন থেকে সমষ্টি উন্নয়ন কাজ শুরু হয়। শ্রীমতী সীমান্তি ৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪টির কাজ দেখাশোনা করেন। তিনি প্রত্যেক পঞ্চায়েতে দুটি করে মহিলা সমাজ গড়ে তুলেছেন যার মধ্যে দুটি এ পর্যন্ত ভারত সরকারের নিকট থেকে ৪০০ টাকা করে উদ্দীপনী পুরস্কার লাভ করেছে।

নিজের জীবনে যা করা সম্ভব তাই শ্রীমতী সীমান্তি অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁরও বাড়িতে একটি সব্জীর বাগান ও হাঁস-মুরগী রয়েছে। স্বামী ও দুটি সন্তান নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার খুবই সুখের।

পিঞ্জর

সুভাষ সিংহ

NITAI GHOSH

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হঠাৎ পল্টু কেঁদে উঠল। মীরা তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরল। কিন্তু এতে লাভ হলো না কিছু। পল্টু এবার জোরে কেঁদে উঠল। মীরা লজ্জিতভাবে রজতের দিকে তাকায়। ইতিমধ্যে আশেপাশের কিছু মন্তব্য ছিটকে আসে।

—আমি ওকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। বলে মীরা আবছা অন্ধকারে প্যাসেজ ধরে অগ্রসর হয়। ভেবেছিল রজত নিজেই উঠে পল্টুকে নিয়ে বাইরে যাবে। আশ্চর্য! স্বার্থপরের মত দিব্যি বসে ছবি দেখছে।

সারি সারি চেয়ার পাতা রয়েছে। মীরা একটাতে বসল। পল্টুর কান্না বন্ধ। কেমন টলমল করে চারিদিক দেখছে। ওর কান সামান্য মুচড়ে মীরা অস্ফুটস্বরে বলল, 'দুষ্টু ছেলে কোথাকার! তোর জন্যে কী শান্তিতে সিনেমা দেখতে পারবো না।' পল্টু কী বুঝল কে জানে। ওর গালদুটি ফুলে ওঠে। কান্নার পূর্বাভাস। মীরা ওর অভিমানী মুখটা বুকের উপর চেপে ধরে। মনে মনে বলে, 'লক্ষ্মী সোনামাণিক! কেঁদ না।'

হলের ভিতর ঢুকবে কিনা ভাবছিল মীরা। কেননা পল্টু এখন শান্ত। বহুদিন পর ছবি দেখতে এসেছে। ইদানীং বাইরে যাবার নাম করতো না রজত। বরং বলতো নানা অজুহাতে এড়িয়ে চলতো। ওর অনিচ্ছা দেখে সে পীড়াপীড়ি করতো না।

—থেমেছে ওর কান্না?

কোন জবাব দিল না মীরা। ওর নিজেরই কান্না পাচ্ছিলো। এতক্ষণে বাবুর মনে পড়ল ওদের কথা। আড়চোখে একবার তাকাল। মনে হলো রজত অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবছে।

—তুমি উঠে এলে কেন! মীরা আঘাত দিতে চায়, তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। অনেকগুলি সীন দেখতে পাবে না।

রজত কী বুঝল কে জানে। বলল তুমিও চল। দাও পল্টুকে আমার কাছে।

—না। মীরা একটু পিছিয়ে যায় আমার ভাল লাগছে না। বাড়ি যাব। তোমার ইচ্ছে হলে ছবি দেখতে পার। আমি চলে যাই।

—থাক। চল ফিরে যাই। আমি বাংলা ছবি বেশি দেখি না। শুধু তোমার জন্যে আসা।

রাস্তায় বেশ ভিড়। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। অল্প জল জমেছে। ট্রাম-বাস বোঝাই মানুষ বাদুড়ঝোলা হয়ে ফিরছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি পেল।

সীটের কোণে সরে বসেছে রজত। বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল। সাঁ সাঁ করে দোকান, পথচারী, যানবাহন, সিনেমার পোস্টার, আরও কত কী দ্রুত অপসারিত। একবার ওর ইচ্ছে হলো গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে। আবার যদি ফিরে পরিচিত গণ্ডীর, মীরার বিস্ফারিত চোখ-মুখ, ড্রেসিং টেবিল, খাট, দোলনা—রজত অস্থিরভাবে চুলে আঙুল চালায়!

কয়েকদিনের মধ্যে রজত হাঁফিয়ে উঠল। এভাবে রোজ অফিসে যাওয়া আর সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে মীরার মুখোমুখি বসে গল্প করা, ব্যাপারটা ক্রমশ ডিসগাস্টিং হয়ে উঠল। মনে হলো শান্তি ফিরে পেয়েছে মীরা। কথায় কথায় হাসি আর সর্বশরীরে খুশীর আমেজ ছড়িয়ে যখন তখন ঘরময় পায়চারী, কখনো আদরে গলে যাওয়া, পল্টুর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অজস্র কথা বলা—খুব বেশিদিন এসব তার ভাল লাগলো না। ইতিমধ্যে অফিসে ফোন আসছে, বন্ধুবান্ধবীরা খোঁজ করতে শুরু করেছে—রজত আর কত মিথ্যে বানিয়ে বলতে পারে। ওর মনে হলো এর পর সশরীরে ওরা অফিসে এসে হাজির হবে। এমন কি বাড়িতে পর্যন্ত। বিশেষ করে লতা।

অথচ মধ্যবয়সে পৌঁছে সে চেয়েছিল নীরব গৃহকোণ। আর মীরার মত একটি নরম মেয়ে। বিয়ে করেছিল স্বস্তি পাবে বলেই। হৈ চৈ তো জীবনে কম করেনি। ভালবাসার খেলাও কম হয়নি। তবে সে কী চায়! তবে কী সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে ভয় পায়? আজ শুধু মীরা একা নয়, পল্টুও রয়েছে। আস্তে আস্তে বড় হবে। সন্তানের প্রতি যথোচিত কর্তব্য তো তাকে পালন করতে হবে।

ছোট্ট সংসার, মীরা আর পল্টু—এদের নিয়েই তার সুখী হওয়া উচিত। কিন্তু পারছে না। অনবরত নেশার পিছনে ছুটছে। কীসের অতৃপ্তি তার?

দূর ছাই! রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল জানালার কাছে। শীতের নরম রোদ গালে অনুভব করল। বাইরে ব্যস্ততা। অসংখ্য গাড়ি আর মানুষজন ছোটাছুটি করছে। কেউ থেমে নেই। সেদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়ি ফিরবে কী? মনে পড়ল মীরা সেজেগুজে অপেক্ষা করবে। আজ যেন কোথায় যাবার কথা। মনে পড়ছে না। তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে মীরা।

কিছু না ভেবে রজত কোট গায়ে চাপিয়ে সুইংডোর ঠেলে বাইরে আসে। ওকে দেখে বেয়ারা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল।

—বড়বাবুকে বলো আমি একটা কাজে বেরুচ্ছি।

বেয়ারা ঘাড় কাৎ করে পুনরায় সেলাম ঠুকল। রজত আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করল না। লিফট দ্রুত নীচে নামছে। এ সময় গোটা শরীর শিরশির করে ওঠে। ওর মালিক মিঃ হনুমান প্রসাদ বুদ্ধিমান। তিনি কাজ চান। অযথা কোন ব্যাপারে মাথা গলান না। কাজকর্মের ব্যাপারে রজতের স্বাধীনতায় পারতপক্ষে হস্তক্ষেপ করেন না। রজত জানে সে তার কাজের দ্বারা কর্তৃপক্ষের সুনজরে আছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে রজত ফুটপাত ঘেঁষে হাঁটতে থাকে। মন্থর ওর গতি। অন্যমনস্ক-ভাবে সিগারেট ধরায়। দুপাশ দিয়ে স্রোতের মত নরনারী যাওয়া আসা করছে। কারুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল না। সে অন্য কিছু ভাবছিল। মীরার হাসিমুখ। পল্টু ভোরবেলা ওর চুল ধরে টানাটানি করে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। রেগে ধমক দিলে খলখল করে হেসে ওঠে। এইটুকু বাচ্চা, কিছু বোঝে না। হঠাৎ সে চমকে ওঠে একটা বাচ্চা ভিখিরির আনুনাসিক কণ্ঠস্বর শুনে। প্রথমে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠে ধমক দিতে গিয়েও থেমে যায়। এমনটি দেখা যায় না। নোংরা চেহারার মধ্যে চোখদুটি বড় সরল আর অসহায়তা মাখানো। সে কোটের পকেট থেকে কিছু খুচরো বের করে ওর প্রসারিত হাতের ওপর ফেলে দেয়।

সামনে অভিজাত একটা রেস্তোরা দেখে ঢুকে যায় রজত। ঘরময় নরম আলো। মাঝখানে সরু প্যাসেজ। দুধারে চেয়ার টেবিল। রজত একটা চেয়ারে বসল। একবার তাকাল চারিদিকে। মনে হলো কোনো পানশালায় এসে ঢুকেছে। না, এখন ড্রিঙ্ক করবার কোন বাসনা নেই। তাছাড়া বেশ কিছুদিন ছোঁয় না। ভেবেছে একেবারে ছেড়ে দেবে। কী হবে ওসব গিলে। শুধু উত্তেজনা ছাড়া আর কী আছে ওতে।

বেয়ারা কাছে এসে দাঁড়াতেই রজত একটা কোল্ড ড্রিংকের অর্ডার দেয়।

মুচকি হেসে বেয়ারা জানাল, শুধু কোল্ড ড্রিংক তো বিক্রী হয় না। লিকার নিতে হবে। কি দেব বাবু? হুইস্কী না রাম? নাকি ককটেল খাবেন?

—কিছু না। রজত উঠে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করল বেয়ারার মুখে চাপা বিদ্রূপের হাসি। ওর সর্বশরীর রী রী করে ওঠে। নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে হয়। ওর মনে হলো আশেপাশের অনেক কৌতূহলী চোখ ওর দিকে তাকিয়ে। কেমন দুর্বল ও নার্ভাস হয়ে ওঠে সে।

মিহি সুরে ইংরেজী গানের রেকর্ড বাজছে। বেশ জমাট সুর। রজত পায়ে পায়ে এগিয়ে পর্দাঘেরা একটা কেবিনে ঢুকল। ওর পিছন পিছন বেয়ারা আসছে টের পেল।

—দুপেগ রাম। রজত তাচ্ছিল্যের সুরে অর্ডার দেয়। পর্দা টেনে বেয়ারা চলে যায়। রজত একটা সিগারেট ধরাল। হারামীর বাচ্চা! তাকে কী কাপুরুষ ভেবেছে! জোরে জোরে সিগারেট টানল। আস্তে আস্তে উত্তেজনা কমতে থাকে। ব্যাস দুপেগ টেনেই বেরিয়ে পড়বে। তারপর? মনে পড়ল মীরা ওর অপেক্ষায় থাকবে। বাড়ি ফিরে তাকে আদর্শ স্বামীর ভূমিকার অভিনয় করতে হবে।

বাইরে হৈহল্লা একটু একটু করে বাড়ছে। হাতঘড়ি দেখল : পাঁচটা বেজে দশ। একটু পরে রাত শুরু হবে। তখন প্রকাণ্ড হলঘর জুড়ে শুরু হবে মদ্যপানের দিলখোলা হাসি, কথাবার্তা, নাচ গান, কেবিনে ফিসফাস আর গোপন ষড়যন্ত্র। মদ আর মেয়েমানুষের কেনাবেচা চলবে। সারারাত।

টেবিলের উপর ঠক্‌ করে গ্লাস নামিয়ে বেয়ারা চলে যায়।

এক চুমুকে অনেকটা পান করে রজত। বেশি সময় এখানে থাকতে চায় না। একটু রাত বাড়লে হৈ চৈ আরও বেশি করে শুরু হবে। তবে এসব জিনিস আস্তে আস্তে খেয়ে মজা। আর একটা সিগারেট ধরাল। এখন বেশ লাগছে। আস্তে আস্তে চুমুক দেয় গ্লাসে। হঠাৎ বিনয়ের কথা মনে পড়ল। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। ওকে আর সহ্য করতে পারে না বিনয়। কারণ কী তা সে জানে। বিনয়টা আসলে নিছক ভাবপ্রবণ একটি বঙ্গসন্তান! সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা বিনয়ের ধারণা। 'তুমি কী আমার গার্জিয়ান এলে!' মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করল রজত। এম-এ পাশ করে, তাও বঙ্গভাষায়, শেষকালে মফস্বলে স্কুল মাস্টারী করছে। কোন উচ্চাশা নেই। নিম্ন-মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কার আর অহংকারে ভুগছে। গোল্লায় যাক্‌ ছোকরা!

—আমি একটু বসতে পারি?

চমকে উঠল রজত। সস্তা প্রসাধনের হালকা গন্ধ। মেয়েটি ইতিমধ্যে তার উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছে। একনজরে দেখে নিল সে। পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে বয়স। ফর্সা গায়ের রঙ। বেশ উদ্ধত বুক। বারবার শাড়ির আঁচল দিয়ে বুক ঢাকছে। চোখমুখের চেহারা প্রসাধনের জন্যেই বোধকরি সুশ্রী মনে হচ্ছে।

—কী চাই? রূক্ষকণ্ঠে রজত বলল, আমি এখন উঠবো।

হাসল মেয়েটি। নিঃশব্দে। শুভ্র দাঁত ঝকঝক করছে। কালো দুটি বড় বড় চোখও যেন হেসে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, একটু বীয়ার খাওয়াবেন? বলে এবার চোখে কটাক্ষ হেনে রজতের পাশে এসে বসার চেষ্টা করল।

আঃ কী বিপদে পড়া গেল! রজত বেশ বিরক্ত। ভেবেছিল এইসব মেয়েদের আনা-গোনা শুরু হবার আগেই রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবে। কিন্তু পারল না। টের পেল মেয়েটি ওর গা ঘেঁষে বসেছে। ওর গ্লাস শূন্য। অল্প অল্প নেশা হয়েছে। কঠোর হতে গিয়েও পারছে না। মিষ্টি একটা গন্ধ মেয়েটির শরীর থেকে ভেসে আসছে। গন্ধটা কীসের বুঝতে পারল না।

আবার বেয়ারাটিও এসে হাজির। পায়ের শব্দ শুনে মেয়েটি একটু সরে বসেছে। এ রকম সময় বেয়ারাদের আসতে ভুল হয় না। সব ব্যাপারটাই রজতের বেশ পরিচিত লাগছে।

—দুপেগ রাম আর এক বোতল বিয়ার।

এবার সেলাম জানাল বেয়ারা। মৃদু হেসে পর্দা ভালভাবে টেনে বেরিয়ে যায়। একটু পরে ফিরে আসে। টেবিলের উপর গ্লাস রেখে ওদের দিকে চোরা চাহনি দিয়ে অদৃশ্য হয়।

মেয়েটি নীরবে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দেয়। আর মাঝে মাঝে তাকায় রজতের দিকে। সে যেন প্রতি মুহূর্তে কোন কিছুর প্রত্যাশা করছিল। রজত চুপচাপ। মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। টের পাচ্ছিল পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা নরম নারীদেহের উত্তপ্ত স্পর্শ। মেয়েটাকে একটু চেখে দেখবে কিনা ভাবল রজত।

—কোথায় যাবেন? গঙ্গার ধারে?

—কেন?

রজত সব বুঝতে পারছিল। মেয়েটির মুখ দেখে মনে হলো ও ভীষণ হতাশ হয়ে উঠছে। ভেবেছিল রজতই প্রথম বাইরে যাবার কথা তুলবে। মনে মনে হাসল রজত। ওর সম্পর্কে মেয়েটি কী ভাবছে আন্দাজ করতে পারল।

—তোমার নাম কী?

—রাধা। বলে মেয়েটি শুভ্র দাঁত বের করে হাসল। হয়তো ওর মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। কোন কিছুর প্রাপ্তি আশা না করে ফালতু কেউ মদ খাওয়ায়! বিশেষ করে ওদের মত মেয়েদের।

কথা বলতে রজতের ভাল লাগছিল না। রাধার সঙ্গে কী ধরনের আলাপ করতে পারে। একটাও সত্য কথা বলবে না। তারচেয়ে চুপচাপ পাশে বসে মদ্যপান করা

ঢের ভাল। কিন্তু মাথাটা অল্প ভার ভার ঠেকছে। একটু বিশুদ্ধ বাতাসের দরকার। মন্দ কি গঙ্গার ধারে রাধাকে সঙ্গে করে বেড়ানো। খানিকটা ঘুরে বিদায় দেবে মেয়েটিকে।

বাইরে মদির রাত্রি। ট্যাক্সীর ভিতর স্বল্প আলো। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় রজত স্বস্তি পায়। ওর কাঁধে মাথা রেখে রাধা চোখ বুজে। হ্যাঁ, সেই মিষ্টি গন্ধটা তাহলে চুলের। সে রাধার ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকিয়ে নরম স্তন মুঠোয় চেপে ধরল।

গঙ্গার ধারে এসে ট্যাক্সী থামল। রজত মৃদু ধাক্কা দিয়ে রাধাকে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি ? নামো।

খানিকটা হাঁটল রজত। পাশে রাধা। বার বার হাই তুলছে। আর অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে রজতের দিকে।

—ঘুম পেয়েছে ?

—না। আর কত হাঁটবেন। চলুন ঐ দিকটায় বসা যায়।

হ্যাঁ, জায়গাটি নিভৃত আলাপের পক্ষে মনোরম বটে। গাছের নীচে পাথরের একটা বেদি। এদিকটা আবছায়া অন্ধকার। সামনে বিশাল গঙ্গা।

পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে দুজনে। রজত গরম তেলেভাজা কিনে এনেছে। রাধা একটু ইতস্তত করে খেতে শুরু করে। রজত সামনের দিকে তাকিয়ে ঢেউ দ্যাখে। ভোঁ ভোঁ শব্দে জাহাজ পার হচ্ছে। ওপরে শহরের আলো মালার মত মনে হচ্ছে। হঠাৎ সে পাশে বসা রাধার উপস্থিতি টের পায়। কী চায় মেয়েটা ? গোটা দশেক টাকা দিয়ে বিদায় করে দেব। নাকি ওর দেহটাকে একটু মেড়েচেড়ে দেখবে। মন্দ হয় না আজ রাতটা ওর সঙ্গে শুয়ে থাকতে। কিন্তু মীরা, পল্টু......। আজ ওর তাড়াতাড়ি ফিরবার কথা ছিল। মীরা সেজেগুজে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। কোথায় যেন যাবার কথা ছিল। কোথায় ? মনে পড়ছে না। গোল্লায় যাক সব। রজত অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল।

—রাধা।

—কী ?

—চল অন্য কোথাও যাই। এখানে ভাল লাগছে না।

—কোথায় ?

—তুমি যেখানে থাকো।

সঙ্গে সঙ্গে রাধা উঠে দাঁড়াল। অনুচ্চস্বরে তীব্র গলায় বলল, আমার টাকা দিন। আমি এখুনি চলে যাব।

—তার মানে......। রজত দাঁড়িয়ে রাধার হাত শক্ত মুঠোয় চেপে কঠিন গলায় বলল, টাকা সস্তা ! চল আমার সঙ্গে।

রাধা কয়েকবার চেষ্টা করে হাত ছাড়িয়ে নিতে। পারে না। অল্প কাঁপছিল ওর দেহ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি চকিতে আলোর রেশ ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে। সেই সাময়িক আলোতে রাধার মুখচোখ লক্ষ্য করল রজত। তাতে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই।

--হাত ছাড়ুন। মজা লুটবেন—টাকা দেবেন না।

কোথায় আর স্ফূর্তি করলাম। সেই জন্যেই তো বলছি চল একটু স্ফূর্তি করা যাক। ভয় নেই তোমার প্রাপ্য টাকা পাবে।

—না। দেরী হয়ে গেছে বাড়ি ফিরতে হবে।

—এত তাড়াতাড়ি। ব্যঙ্গের হাসিতে রজত বলল, আমাকে বুঝি নতুন লোক ঠাওরেছো। তোমার মত মেয়েদেরকে আমি চিনি। দ্যাখ, ঝামেলা করো না। যা বলছি শোন, চল একটা হোটেলে। আজ রাতে তোমাকে নিয়ে শুতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

—কত টাকা দেবেন ?

—কত চাও ?

—পঞ্চাশ।

—বল কী ! সুযোগ পেয়ে খুব দর হাঁকাচ্ছ বুঝি। নিজেকে কী খুব সুন্দরী ভাব ?

রাধা রেগে যায়, আঃ হাত ছাড়ুন ! এখুনি লোকজন জড়ো হয়ে যাবে। নইলে আমাকে যেতে দিন। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। দুপুরে বেরোবার সময় দেখে এসেছি বাবার জ্বর।

হো হো করে হেসে উঠল রজত। এবার সে হাত ছেড়ে দেয় রাধার।

—হাসছেন কেন ? রাধা বিষাক্ত গলায় বলল, জানি বিশ্বাস করবেন না।

রজত বলল, থাক ওসব কথা। হ্যাঁ, টাকা পাবে। যা চেয়েছো তাই।

আবার ওরা ট্যাক্সীতে উঠল। রজত গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে। নিয়নের বিজ্ঞাপন। চোখঝলসানো লাল সিগন্যাল দেখে গাড়ি থেমেছে। অসংখ্য গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে। রজত বাঁ দিকে তাকিয়ে রাধাকে দেখল। চোখ বুজে রয়েছে। আঁকা ভ্রু। রক্তিম ঠোঁট।......মজা করবেন টাকা দেবেন না......বাবার জ্বর। দেখে এসেছি......মীরা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে......।

একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে পুনরায় গাড়ি চলতে শুরু করল।

বিচিত্র ধরনের শব্দ। অসংখ্য নর-নারী, হকার, ভিখিরি, দালাল, চোর, পকেটমার, বেশ্যা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রজতের চোখ জ্বালা করে উঠল। বড় ঘুম পেয়েছে। কোথায় যাচ্ছে কে ?

—সর্দারজী বাঁয়া রোখ্‌কে।

মৃদু শব্দ করে ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি থামে। রাধা প্রথমে নেমে দাঁড়ায়। তাকায় রজতের দিকে। কী ব্যাপার ? নাবছে না কেন। ওর সন্দেহ হয়। লোকটা কী পালিয়ে যাবে টাকা না দিয়ে ?

সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয় রজত। তারপর কয়েকটা দশ টাকার নোট রাধার দিকে ছুঁড়ে দরাজ গলায় ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে নির্দেশ দেয়।

পিছন ফিরে রজত দেখল রাধা স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে। একটু পরে নীচু হলো ওর দেহ। হয়তো ফুটপাত থেকে নোট কুড়িয়ে নিচ্ছে।

—কিধার যানা বাবুজী ?

—জাহান্নামে !

সর্দারজী দু'একবার ফিরে তাকাল। অবাক হলো না। এসব বাবুদের সে ভাল করে চেনে। তাই সে নীরবে গাড়ি চালায়।

রজত ঘুমঘোরে বাড়ি পৌঁছে যায়। ভাড়া মিটিয়ে অগ্রসর হয়। এমন কিছু রাত হয়নি। সত্যি কী মেয়েটির বাবা অসুস্থ ? সিঁড়ি ভাঙতে ক্লান্ত লাগছে। মীরাকে সে কোন্ কৈফিয়ৎ দেবে ?

কড়া নাড়ার শব্দে রজত নিজেই চমকে ওঠে। একটু পরে দরোজা খুলে যায়। রজত ভিতরে ঢোকে। মুখোমুখি হয় মীরার। চোখাচোখি হওয়ার ভয়ে ও মাথা নীচু করে পালিয়ে আসে পাশের ঘরে। এ ঘরে সে ঘুমোয়। বেশ কিছুদিন হলো তাদের পৃথক শয্যার বন্দোবস্ত হয়েছে। পল্টু হওয়ার পর থেকেই বোধ করি।

পোশাক বদলাবার সময় রজত প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে মীরা একরাশ প্রশ্ন ওর দিকে ছুঁড়ে মারবে। কিছু না, কোন সাড়া শব্দ নেই। বরং পাশের ঘর অন্ধকার। রজত বাথরুমে ঢোকে। চোখে জলের ঝাপটা দেয়। ঘর সংলগ্ন বাথরুম। বাথরুমের আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে। হালকা পোশাক পরে সোজা বিছানায় দেহ এলিয়ে দেয়। অবসাদ আর ক্লান্তি। চুপচাপ শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। সবুজ আলোয় ডিসটেম্পার করা দেওয়াল, আধুনিক চিত্রকরের আঁকা ছবি ওদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তোলা যৌথ ছবি, অলস দৃষ্টিতে এসব দেখতে থাকে সে। তাহলে খুব রেগেছে মীরা। নাকি অভিমান। থাকগে আর সে কিছু ভাবছে না। মেয়েটার, কী যেন নাম হ্যাঁ রাধা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছে গেছে। বাবার জ্বর। সত্যিও হতে পারে। দূর ! সব বাজে ব্যাপার। সব ছলনা। ঐ সব মেয়েদের কথা একদম বিশ্বাস করতে নেই। না, কোন গ্লানি নেই। যথেষ্ট নারীদেহ ভোগ করেছে। রাধার চেয়ে ঢের সুন্দরী মেয়ে, চোখ বুজলে কয়েকজনের মুখ মনে পড়ে, তারা সব কোথায় গেল !

বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল রজতের। দুই ঘরের মাঝখানের দরোজা খোলা। কোন সাড়া শব্দ নেই। অন্যদিন পল্টু এসে আধ আধ সুরে মাথার চুল টেনে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। ওরা সব গেল কোথায় ?

রজত একটু জোরে ডাক দিল, পল্টু পল্টু।

ওর চিৎকারের ধ্বনি প্রতিধ্বনি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওর দিকেই ফিরে আসে। একটু অপেক্ষা করে আবার সে ডাকল। এবার মীরার নাম ধরে। কোন সাড়া নেই। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রজত।

(ক্রমশঃ)

পরলোকে প্রখ্যাত গায়ক কালীপদ পাঠক

বাংলা এবং উত্তর ভারতের টপ্পা গানের অনন্য সাধক, কালীপদ পাঠক একাশি বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে টপ্পা গানের শেষ উজ্জ্বল শিখাটি অন্তর্হিত হল।

হাওড়া জেলার ব্যাটরার বদন রায় লেনে তাঁদের অনেককালের বাস। হাওড়া জেলায় তাঁর জন্মস্থান। তাঁর শরীর ছিল বেশ মজবুত, শরীর খারাপ হওয়া প্রায় একরূপ বারণ ছিল। যৌবনে তিনি কুস্তি লড়তেন, লাঠি খেলতেন। সারাজীবন তিনি মা-কালীর পূজো করে গেছেন। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে একবার তিনি রবীন্দ্রনাথকে টপ্পা গান শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে চণ্ডীদাস মাল, মায়া রায়, রাজেশ্বর মিত্র, ভূপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কালীপদ পাঠকের সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় একটু বেশী বয়সেই—প্রায় সতের-আঠার বছর বয়সে। বাড়ীতে গানবাজনার কোনো পরিবেশ ছিলো না। একদিন পাঠশালার ক্লাসে একা বসে বসে যাত্রার একটা গান আপন মনে গেয়ে চলেছেন। এদিকে গুরুমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, কি গান? উত্তর এল, যাত্রার গান। উত্তর শুনে গুরুমশাই রেগে আগুন—পিঠে বেশ কয়েক ঘা বেত বসিয়ে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এলেন। দাদামশাই সেদিন থেকেই গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কালীপদবাবু প্রথমে গান শেখা শুরু করেন গোবিন্দচন্দ্র নাগের কাছে। পরে, বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত গায়ক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের দুজনের কাছেই তিনি ধ্রুপদ শিখতে থাকেন কিন্তু তাতেও মনের আশা মিটলো না। অবশেষে হাজির হলেন বিখ্যাত টপ্পা গায়ক রামজান খাঁ-র কাছে। সহজাত প্রতিভাবলে বালক কালীপদ অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই রামজান খাঁর কেবলমাত্র প্রিয় শিষ্যই হয়ে উঠলেন না, হয়ে উঠলেন পরম আপনজন।

একথা স্বীকৃত যে, নিধুবাবুর টপ্পা এবং বড় মিঞার টপ্পায় সারা ভারতেই ছিল তাঁর অনন্য খ্যাতি। শিবপুরের নিকুঞ্জবিহারী দত্তের (নিকুলবাবুর) কাছ থেকে তিনি নিধুবাবুর টপ্পার তালিম নিয়েছিলেন। আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী ছিলেন কালীপদবাবু। ১৯৬৬ খৃঃ 'সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন'এ টপ্পা গান করেন। সঙ্গীত সম্মেলনে এই তাঁর প্রথম সংগীত পরিবেশন। যে-গান গেয়েছিলেন, তা হচ্ছে, 'কে তোমারে শিখায়েছে প্রেম ছলনা' ও 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহা-মহামণ্ডলে'। এর পরে বিভিন্ন আসরে তাঁর গান শোনার সুযোগ বাংলার শ্রোতাদের হয়েছে। বঙ্গ সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত শিল্পী ছিলেন।
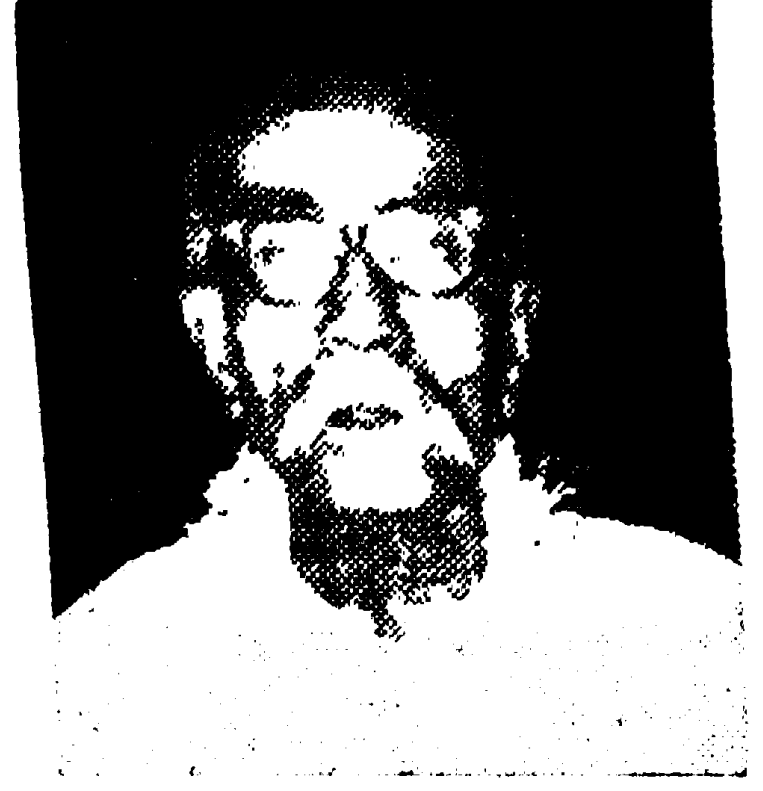
এইচ এম ভি থেকে 'ভালো-বাসি বলে ভালোবাসিনি' এবং 'মনোহরা নয়ন তোমার' এই দুটি গানের রেকর্ড বাজারে বছরখানেক আগে বেরিয়েছে। এছাড়া তাঁর আর কোনো রেকর্ড নেই।

কালীপদ পাঠকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সঙ্গীত-ধারার একটি যুগের অবসান হোলো।

জলসা

সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব : গত ৮ নভেম্বর অবিভক্ত বাংলার যশস্বী কণ্ঠশিল্পী শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের ৬১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে এক শুচিসুন্দর সংগীতোৎসবের আয়োজন করেছিলেন তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ। বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র এবং শ্রীবলাইচাঁদ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

প্রভাতী আসর সুরু হয় সমবেত কণ্ঠে গীত, বেদগান ও কাজী নজরুল ইসলামের 'সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি' গানটি দিয়ে। তারপরই পৌরসভার স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু এক সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাষণে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার পক্ষ হতে ভীষ্মদেবকে মাল্যদানের পরই সুরু হয় মনোজ্ঞ সঙ্গীত আসর। সকালের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী ভি জি যোগ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, তৃপ্তি চক্রবর্তী। তবলাসঙ্গতে ছিলেন কানাই ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি মজুমদার ও গণপতি মজুমদার। সান্ধ্য আসরের শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মালবিকা কানন, অনীতা মজুমদার। সারেঙ্গী ও তবলা সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে মহেশপ্রসাদ মিশ্র, কেদারনাথ মিশ্র, চন্দ্রভান ও দুলাল চক্রবর্তী। আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল এই যে সমবেত শ্রোতাদের অনুরোধে দুটি অধিবেশনেই ভীষ্মদেব তাঁর অননুকরণীয় আত্মগত অন্তমুখীনতাধর্মী সঙ্গীতের দ্বারা উৎসব সার্থক করে তোলেন।

এই উৎসবের জন্য ধন্যবাদার্হ হলেন সর্বশ্রী বিমান ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিকা মিত্র, নীলমণি চক্রবর্তী ও স্থানীয় যুবক সংস্থা।

সৌরভের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান : ২ অকটোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে কলামন্দিরে মঞ্চস্থ এক চিত্তা-কর্ষী অনুষ্ঠান সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'সৌরভ'-এর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। অনুষ্ঠান সুরু হয় সমবেত কণ্ঠে বেশ কয়েকটি ভজন গান দিয়ে। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং ললিতা ঘোষ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ৭০ জন ছাত্রী গীত এই ব্যাপক ভজনের অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে শ্রীআর কে ভোঁসলা শ্রীমতী ঘোষের হাতে ২৫১ টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। এরপর শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত এবং পরিচালিত 'মীরাবাঈ' নৃত্যনাট্যে ৮০ জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন। এতগুলি ছাত্রীকে একাধারে নৃত্য শিক্ষাদান ও চরিত্র রূপায়ণে ব্রতী করা সহজ নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজ কঠিন পরিশ্রমেই সম্পন্ন করে কলারসিক মণ্ডলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়। দলগত সাফল্য ছাড়াও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন নামভূমিকায় পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় ও মাধুরী কেশ-বেকার।

প্রধান অতিথি ডাঃ রমা চৌধুরী এবং সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র সৌরভের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মার্জিত রুচি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন তাঁদের কাব্যসুন্দর ভাষায়। প্রতিষ্ঠান কর্তা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান এবং অনুষ্ঠান বিরতিকালে সহ-সভাপতি শ্রীঅদ্রিজা মুখোপাধ্যায় লোক

টিকিট সিদ্ধান্ত ব্যাপারটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠান পুস্তিকা বিক্রয়ের ৩৫০ টাকা বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করা হয়।

ত্রিবেণী-র রাত্রি ঃ রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ সাম্প্রতিক রবীন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ত্রিবেণীর 'রাত্রি' এক ভাবনিবিড় সঙ্গীতোৎসব। কবিগুরুর নিজস্ব নৃত্যনাট্য ছাড়াও তাঁর সঙ্গীত অবলম্বনে নানা রঙের ভাববিস্তারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গত দু-এক বছর ধরে চলছে। ত্রিবেণীরই প্রযোজিত 'সুরের আকাশ' 'দিনান্তের গান' 'মেঘের পরে মেঘ' এই ধরনের প্রচেষ্টা রসিকজনের আনন্দের কারণ হয়েছে। এই তালিকার নতুন সংযোজনা 'রাত্রি।' সুমিত্রা সেনের পরিচালনায়— রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পীদের কন্ঠে সুনির্বাচিত গানে রাত্রির এক নিবিড় গভীর রূপ কখনও রহস্যে, রোমাঞ্চে, কখনও বেদনায়, কখনও বিরহে, কখনও বা মিলনের আর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাত্রির বিভিন্ন রূপ-কল্পনার ভিত্তিতে সঙ্গীত নির্বাচনের কৃতিত্ব ভাস্কর বসুর। মঞ্চ সজ্জা, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ধন্যবাদার্হ শুচিব্রত দেব, সুবীর পাল, অনিল সেন, মলয় সেন ও প্রভাত ভঞ্জ। যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন দেবব্রত বিশ্বাস। সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আরো ৬০ জন কলাকার। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন সলিল মিত্র, বিপ্লব মন্ডল, নির্মল বিশ্বাস, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও রবীন গাঙ্গুলী।

বিটোফেনের জন্ম শতবর্ষ ঃ বিশ্বের সঙ্গীত জগতে লুদভিগ ভন বিটোফেনের নাম কোন স্থানে তা সঙ্গীতরসিকদের তো অজানা নয়ই, সাধারণ লোকেরাও নয়। এই নমস্য মনীষীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পূর্ব জার্মাণী সারা বার্লিন শহরের বিভিন্ন স্থানে বিটোফেন সঙ্গীতের এক ব্যাপক প্রযোজনার আয়োজন করেছেন। আগামী ১০ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত জার্মাণ স্টেট অপেরা ও কমিক অপেরা বর্তমান জার্মাণীর খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যাঁরা অংশ নিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ওৎমার সুইৎনার, কুর্ৎ মাসুর, পিটার স্ক্রিয়ার, কুর্ৎ স্যান্ডার্লিং, লাইপজিগের একটি অর্কেস্ট্রা দল, বার্লিন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা, ড্রেসডেন স্টেট অর্কেস্ট্রা, লেনিনগ্রাদ ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা, বার্লিন রেডিও সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা।

বিটোফেনের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জার্মাণী থেকে বিখ্যাত কয়েকটি দল এ মাসেই কলকাতায় আসছে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে পূর্ব জার্মাণী দূতাবাসের সহযোগিতায় এক বিটোফেনের সঙ্গীত আসর বসবে কলকাতায়।

সম্বর্ধনা-সভায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়
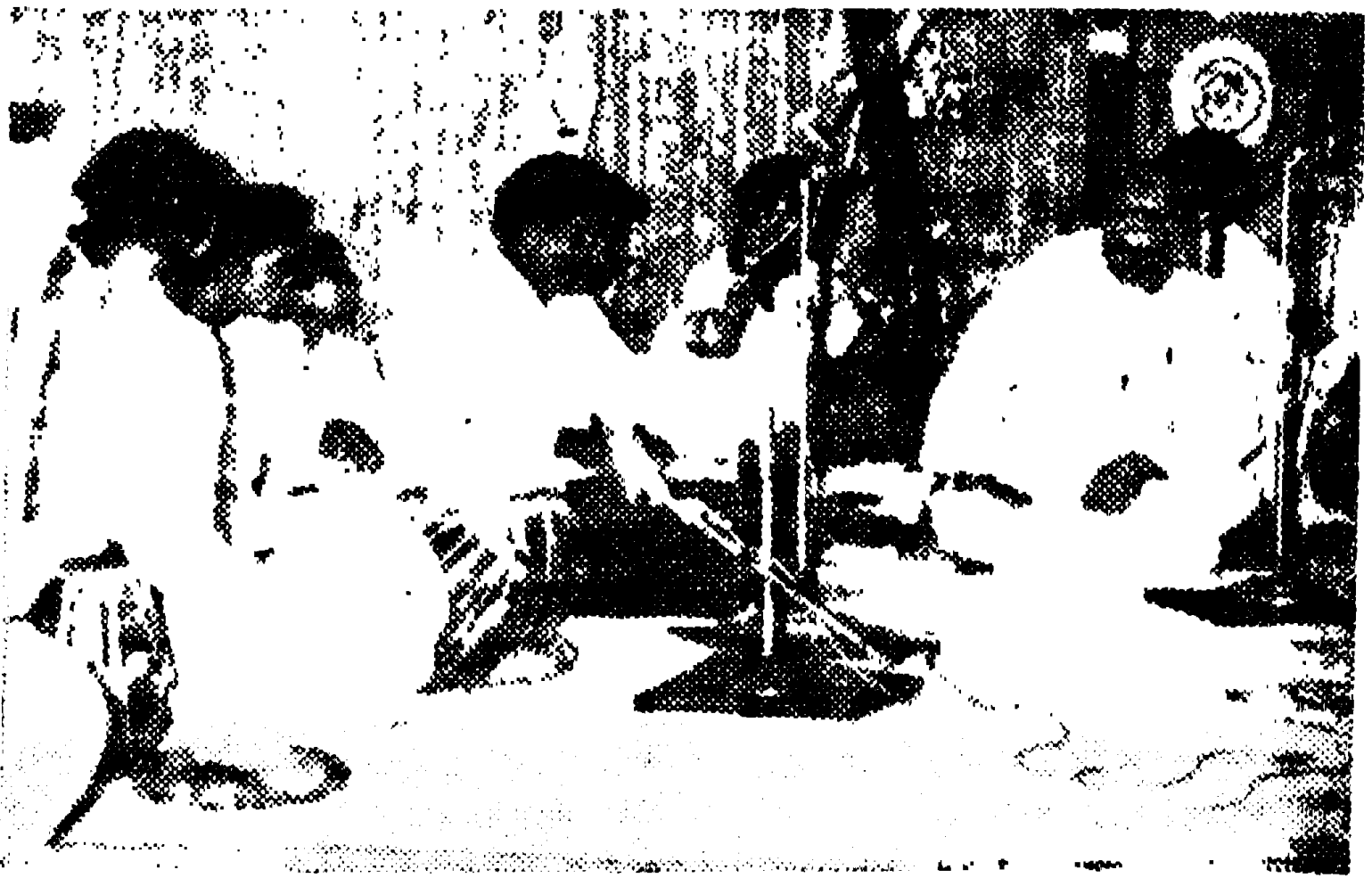
অষ্টবিংশ নিখিল ভারত মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ঃ উক্ত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০। বিষয়ঃ ১। কন্ঠ-সঙ্গীত—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, ভজন গীত, রাগ-প্রধান, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্যামাসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল গীতি, পল্লীগীতি, কীর্তন। ২। যন্ত্রসঙ্গীত—সেতার, এস্রাজ, সরোদ, বেহালা গীটার তবলা, পাখোয়াজ। ৩। নৃত্য—কথাকলি, ভারতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরী, মডার্ণ ফোক, রাবীন্দ্রিক। নিম্নলিখিত স্থানে প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে ও পাঠাতে হবে। ১। কার্যালয়—৯সি, দ্বারকানাথ ঘোষ লেন, কলিঃ—২৭। ২। এস চন্দ্র অ্যান্ড কোং, ৪নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিঃ—১৩। ৩। রাধাকৃষ্ণ শর্মা অ্যান্ড কোং, ৫৮নং বিবেকানন্দ রোড কলিঃ—৬।

ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর শারদ অর্ঘ্যঃ শারদোৎসবে ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত আধুনিক গান ছাড়াও কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত রসিকচিত্তের চির আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে। প্রথমেই মনে আসে সমর গুপ্তের গম্ভীর মধুর কন্ঠের দুটি গান 'এবার সখী সোনার মৃগ' এবং 'মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো'—একটিতে প্রেম-কৌতুক, অন্যটিতে তিমির-তলে গৌরবময়ের আহ্বান ব্যাকুলতা শক্তির ঐশ্বর্যে এবং বিনতির মাধুর্যে উৎসারিত। সমর গুপ্তেরই পরিচালনায় সুস্মিত সেনের কন্ঠে দুটি ভক্তিভাবের গান 'নিবিড়-ঘন আঁধার' এবং 'মোরে ডাকি লয়ে যাও' গান দুটি মন দিয়ে শোনবার মতই। এছাড়া সুজিত দাসের 'অধরা মাধুরী' ও 'জীবন যখন ছিল'—দুটি সুন্দর চয়ন। আধুনিক গান হিমাংশু বিশ্বাসের সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায় রেকর্ড করেছেন পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, প্রভাতভূষণ, বিষ্ণুপদ রায়, গুলে মহম্মদ। কথার ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর রচনার কারিগরী তারিফ করবার মত। সবগুলি গানই সুন্দর, তবে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায় ও জয়ন্তী সেন।

আলোকনাথ দের ও নিজস্ব সুরে দুটি গান গেয়েছেন মানসকুমার—'আজকে এমন মিষ্টি রাতে' ও 'কাল রাতে'। মানস কুমারের সুরে শিখা দে গেয়েছেন 'প্রজাপতি, প্রজাপতি মন আমার' ও 'রিন ঠিন, রিন ঠিন জলচুড়ি কার।' সুকুমার মিত্রের সুরে বিজন শেঠ-এর দুটি গান 'তুমি এসেছিলে সেকি' ও 'চোখে যার নেই বরষা', মানস-কুমারের সুরে পাপিয়া দের 'তোমার স্মৃতিটি' ও 'আজকে শুধু বৃষ্টি ঝরে' ছায়া মুখোপাধ্যায়ের 'সাগর সাগর ডাগর চোখে' ও 'পথে যেতে দেখা হলো', 'বকুল বকুল ফুলবনে' ও 'কিছু কথা কানে কানে' প্রতিটি গানই শুনতে ভালো লাগে।

তরুণ সুরকার গৌরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সুরে গেয়েছেন কমল চক্রবর্তী ও বিদ্যুৎ দত্ত। গানগুলি হোলো 'পলাশের রং দেখে', 'বড় দেরী করে এলে', 'ফাগুনে রজনী তুমি', 'দূরে থেকে দেখে।' প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্কর বসুর সুরে সলিল-চায়নার দ্বৈত-সঙ্গীত ও সজনী রায়ের 'নয়ন নয়ন রেখে' ও 'ছায়া ছায়া পথ যেতে'—গানগুলিও সুগীত। এ সিরিজের রেকর্ড সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল এই যে প্রতিষ্ঠিত সুরকারদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান তরুণ সুরকার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর বসুকে তাঁদের যোগ্যতা প্রদর্শনের বিস্তৃত অবকাশ দেওয়া এবং এঁরা তার যথোচিত মর্যাদাও রেখেছেন।

গীতিকারবৃন্দের মধ্যে আছেন—পুলক বন্দোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্ত রায়, সন্ধ্যা দে, অমিতাভ নাহা, জিতেন্দ্র বিশ্বাস, অশোক বসু, মণীন্দ্র ঘোষ। মলয় রহোর—'আমি যদি মন্ত্রী হই' ও 'কেলেঙ্কারীর আসর' কৌতুক নকশা এবং ইলেকট্রিক গীটারে মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজানো দুটি হিন্দী গানের সুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে।

সংগীত প্রতিযোগিতা : সারা বাংলার অপেশাদার সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য সোদপুর শিল্পী সংস্থা সারা বাংলা অপেশাদার সঙ্গীতশিল্পীদের জন্যে সঙ্গীতের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। নাম তালিকাভুক্ত করার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : শ্রীতপন চৌধুরী, 'মৌচাক', স্টেশন রোড, সোদপুর রেল স্টেশনের পূর্বদিক।

সংগীত সংসদের প্রথম অনুষ্ঠান :— সঙ্গীত সমাজের সুপরিচিত সংগঠক শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন অবদান সংগীত-সমাজের প্রথম সঙ্গীতোৎসব নিবেদিত হয় বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে। উদ্বোধনে সংস্থার উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশ চট্টোপাধ্যায় জানান বিরাট ঐতিহ্য-সম্পন্ন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাকে প্রবাহিত রাখাই তাঁদের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে বর্তমানকালের সঙ্গীতনায়কদের সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীদের সঙ্গীতাসরে উপস্থিত করা এবং সাংবাদিক মহলের সহযোগিতায় তাঁদের দেশবাসীর সংগে পরিচিত করার সংকল্পে এঁরা ব্রতী। অন্যান্য দেশের শিল্পীদের আসরে নিমন্ত্রণ এবং বাংলাদেশের শিল্পীদের অন্যান্য দেশে প্রেরণ। মাঝে মাঝে নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে 'শো-ম্যান-সিপের' অর্থ রপ্ত করা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংগীতধারার প্রতি পরস্পরকে শ্রদ্ধান্বিত করা। ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের ওপর তথ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন এবং সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থাগার স্থাপনার্থে অর্থ সংগ্রহের কাজে এঁরা আগ্রহী।

প্রধান অতিথি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ অধুনাকালে বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের সমাদরের উল্লেখ করে আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভাপতি কাওয়াসজী মেহতা সংস্থার এই উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানান।

রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রাও সঙ্গীতসেবার এই আদর্শকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন।

তরুণ শিল্পীদের উৎসাহদানার্থে প্রথম থেকে শেষ অবধি গানের আসরের সুবিখ্যাত শ্রোতা পাহাড়ী সান্যাল উপস্থিত ছিলেন এবং এটা যে নেহাৎ নিমন্ত্রণ রক্ষার উপস্থিতি নয় সে কথা বোঝা গেল শেষ অনুষ্ঠান অবধি তাঁর উচ্ছ্বসিত আনন্দে শিল্পীর তারিফ বর্ষণ দেখে।

তরুণ শিল্পীগোষ্ঠির এই আসরে আশান্বিত হবার মত অনুষ্ঠানই পেশ করা হয়েছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সংস্থাসম্পাদকের উদ্যম নিশ্চয় সার্থক।

প্রথমে দ্বৈত তবলালহরা বাজিয়ে শোনান মানিক পালের সুযোগ্য শিষ্যদ্বয় অসিত পাল ও দীপক চট্টোপাধ্যায়। গৎ, কায়দা, টুকরো, রেলায়—উভয়েরই সু-শিক্ষা ও দক্ষতার পরিচয় ছিলো।

ভীমসেন যোশীর শিষ্য বিশ্বনাথ দাস পুরিয়া-কল্যাণ রাগে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিল্পীর কণ্ঠ সুন্দর। গুরুর গায়কীর প্রতি আনুগত্যও তাঁর পরিবেশনা পদ্ধতিতে সু-পরিলক্ষিত। তানের অঙ্গ মাঝে মাঝে চমকপ্রদ কিন্তু শিল্পীর লক্ষ্য যতটা উঁচুতে—ঠিক সেখানে পৌঁছবার মত ক্ষমতা এখনও অর্জন করেননি। তাই মাঝে মাঝে ধারণার সঙ্গে পরিবেশনার অসামঞ্জস্য দেখা গেছে। এঁর সঙ্গে তবলা সহযোগিতায় ছিলেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেতারে পণ্ডিত রবিশঙ্করের শিষ্য দীপক চৌধুরীর একটি টোকাই জানিয়ে দিল কতবড় ঘরানার উত্তরসাধক এই উদীয়মান শিল্পী। ইনি বাজান 'বেহাগ'। —আলাপ, জোড়, ঝালায় সুশৃংখল ক্রমবিস্তারে চিন্তার ছাপ ছিলো। গতের সঙ্গেও তান-লয়-ছন্দ-সৌন্দর্য প্রশংসনীয় দক্ষতা প্রদর্শিত। —তবে আড়াচৌতালে বাজানো দ্রুত গৎ দীর্ঘ বিলম্বিতের কারণে অনেক অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি এসে গেছে যা না আসাই বাঞ্ছনীয়।

শিল্পীর সঙ্গে সমপর্যায়ে সঙ্গত করেছিলেন কিষণ মহারাজের শিষ্য অনিল পালিত। ঠেকা সাথ সঙ্গত ও সওয়াল জবাবে বলিষ্ঠ বেনারসী মেজাজ এক আনন্দ-ভরা পরিবেশ রচনা করেছে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠানে 'ছায়ানট' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান আগ্রা ঘরানার সুপরিচিত শিল্পী শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী। এ অনুষ্ঠান রাগ গাম্ভীর্য, সুষ্ঠু পরিবেশনা ও শুদ্ধতা শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। 'পাঞ্জ কালাংড়া রাগাশ্রিত একটি সুন্দর ঠুংরী দিয়ে শ্রীমতী চক্রবর্তী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

শিল্পীসকাশে বৈজ্ঞানিক : বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত-সংসদের এক অধিবেশনে প্রাচীন ধ্রুপদী যন্ত্র শোনবার জন্য উপস্থিত হলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রী রায় চৌধুরী বীণ বাজান 'দরবারী কানাড়া' ও ঝিনঝোটি' রাগ। ধ্রুপদী অঙ্গে বিলম্বিত, বিস্তার, লড়ী জোড়, গমক জোড়, ঠোক, ঝালা তারপরণ এবং সেনী ঘরানার নানান বন্দেজের গৎ বাজিয়ে শোনান। 'এসব জিনিষ আজকাল শোনা যায় না কিন্তু আমার বড় ভালো লাগে'—বললেন আচার্য সত্যেন বসু। তারপর তিনি নিজেও ধ্রুপদী চালের গান সুরু করে দিলেন। শ্রী বসু মার্গসঙ্গীতের এক অনুরাগী শ্রোতা এ খবর জানা ছিল। কিন্তু তিনি যে ধ্রুপদী সঙ্গীত এমন সযত্নে আয়ত্ব করেছেন এবং এখনও গাইতে পারেন এ কথা জেনে মনটা যেন আরো খুসী হয়ে উঠল। আপনভোলা বৈজ্ঞানিক আত্মভোলা শিশুর মত গান গেয়ে চলেছেন তার সঙ্গে বীণ সঙ্গত করছেন ধীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এ এক দেখবার মত দৃশ্য বটে। মনে হোল অতীত তার সম্মুখ আভিজাত্যে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লোকগীতি ও লোকনৃত্য : শিল্পী সংঘের প্রযোজনায় ও শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সম্প্রতি ইছাপুর এ টি এস হলে 'আন্তর্জাতিক লোকগীত ও লোকনৃত্য' উৎসব পালিত হয়। সংঘের শিল্পীবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-সংগীত ও রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিভিন্ন লোকগীতির সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করেন। নৃত্য শিল্পী সাধন গুহ, পলি গুহ, শম্ভু ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়। কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণকারী সংঘের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীদিলীপনারায়ণ বিশ্বাস, রূপা দত্ত মজুমদার, সমীর দত্ত, দিলীপ রায়, সনৎ চ্যাটার্জী, কাজল চক্রবর্তী, প্রশান্ত ব্যানার্জী, মানিকলাল ব্যানার্জী, ভারতী চক্রবর্তী, ভারতী দে, কবিতা মুখার্জী, রমা মুখার্জী, কৃষ্ণা দত্ত, স্বপ্না দত্ত, হেনা ব্যানার্জী, ও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

পিয়ানো এ্যাকোর্ডিয়ান শিল্পী : তরুণ পিয়ানো এ্যাকোর্ডিয়ান শিল্পী প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু বিচিত্রানুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। গত ১০ নভেম্বর দমদমের একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন। ইনি সম্প্রতি বেতারেও কয়েকটি নাটকে আবহসঙ্গীতে অংশ নেন।

বাউল শিল্পী কার্তিক দাস : সম্প্রতি কার্তিক দাস বাউল ছোট-বড় বহু বিচিত্রানুষ্ঠানে পল্লীগীতি ও বাউল সংগীত পরিবেশন করে ক্রমশঃই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। কয়েক মাস আগে ইনি উত্তরবঙ্গের একাধিক সাংস্কৃতিক মঞ্চে পল্লীগীতি ও বাউল সঙ্গীত শুনিয়ে শ্রোতাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন। শ্রীকার্তিক দাসের পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে 'ও জবেদালির মা' 'প্রেম প্রেম করোনা রে ভাই' 'রামকৃষ্ণ পরমহংস সাক্ষাৎ সে দেবের অংশ' প্রভৃতি।

বিজয়া সম্মিলনী : সম্প্রতি ঘাটশীলায় ডাহিগোড়া পুজো সমিতির পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীত ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী কল্যাণ মুখার্জী, পলাশ মুখার্জী, মাণিক সেনগুপ্ত, রবীন ব্যানার্জী রতনলাল মুখী, মনোজ রাউত, প্রণব চক্রবর্তী, পরিতোষ চক্রবর্তী, বুলবুল চক্রবর্তী ও মিনতি চ্যাটার্জী। পরিশেষে বিভূতি স্মৃতি গ্রন্থাগারের সভ্য সভ্যাবৃন্দ শ্রীশচীন ভট্টাচার্যের 'সোনার হরিণ' নাটকটি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অভিনয় করেন সর্বশ্রী কাজল চ্যাটার্জী, কালী ব্যানার্জী, সুব্রত গুহ, তাপস ঘোষ, অরুণ চৌধুরী, কল্যাণ ভট্টাচার্য, মৃণাল সোম, পীযূষকান্তি নামাত এবং শ্বেতার ভূমিকায় মজলো ধরের অভিনয় দর্শক প্রশংসনীয়।

বিজয়া সম্মেলন : গত ২৬ অক্টোবর আর আই সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে বিজয়া সম্মেলন পালন করলেন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তুষার গঙ্গোপাধ্যায় সংস্থার উদ্দেশ্যর কথা ব্যক্ত করার পর প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী স্বপন গুপ্ত পর পর কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আর আই সি-র কর্মী এবং সংস্থার সদস্য অসিত চক্রবর্তী, কালীপদ পাল, অসিত মুখার্জি, চন্দন ব্যানার্জি, কানাই গাঙ্গুলী, সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করার পর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ অভিনয় করলেন শ্রীপরশুরামের হাসির নাটক 'চিকিৎসা সংকট' নাটকটি। পরিচালনা করেন সন্তোষ চক্রবর্তী। সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীদাম সাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে ওঠে।

—চিত্রাঙ্গদা

নটসূর্যের নাট্যগ্রন্থশালা

১৯২৩ সালের জুন মাসের রথ-যাত্রার সন্ধ্যায় যে অহীন্দ্র চৌধুরী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দকে প্রথম অভিবাদন করেছিলেন, তিনি আর আজ ১৯৭০ সালের ২০ নভেম্বর অহীন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে পার্থক্য অনেক। সেদিনের যুবক অহীন্দ্র চৌধুরী দর্শকসমক্ষে কিছুটা সিনেমাধর্মী অভিনয়ের মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করে বাহবা লাভের লোভে ছিলেন যত্নবান। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝেছিলেন, অভিনয়ে যদি সিদ্ধিলাভ করতে হয়, বাংলা রঙ্গমঞ্চের যশস্বী শিল্পীদের সঙ্গে যদি স্থায়ী আসন লাভ করতে হয়, তাহলে অভিনয়কে সাধনাস্বরূপ গ্রহণ করতে হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের। শুরু হল তাঁর নিয়মিত-ভাবে বই কেনা: প্রথম বই তিনি কিনলেন : হ্যান্ডবুক অব অ্যাক্টিং। আমরা তাঁকে দেখেছি কলেজ স্ট্রীটের সেন ব্রাদার্স ও বুক কোম্পানী থেকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নিয়মিতভাবে বই কিনতে। কথায় আছে ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে। অহীন্দ্র চৌধুরী কিন্তু বই কিনেই ক্ষান্ত হতেন না; প্রতিটি বই যত্নের সঙ্গে পড়তেন এবং প্রয়োজন মত 'মার্জিনাল' নোটও লিখতেন। এমনই ভাবে গড়ে উঠল তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী। যাঁরা শ্রীচৌধুরীর গোপাল-নগর রোডস্থ বাড়ীতে তাঁর লাইব্রেরীটি সচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন, কি আশ্চর্য সুন্দর ও পরিপাটিভাবে সাজানো তাঁর লাইব্রেরী; প্রতিটি বইয়ের প্রতি তাঁর কি যত্ন! বর্তমানে এই লাইব্রেরীতে আছে ন্যূনকল্পে সাড়ে তিন হাজার গ্রন্থ এবং এর মধ্যে প্রায় দু' হাজারই বিদেশী গ্রন্থ।

প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নৃত্য-নাটক আকাদামীর নাট্য বিভাগের প্রধানরূপে এবং পরে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের ডীন-রূপে তিনি নাটকের পঠন-পাঠন সম্পর্কে যে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক (থিয়রেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল) পাঠ-ক্রম রচনা করে দিয়েছেন, তা থেকেই নাট্য বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের কঠিনতম শাখা হল নাট্য শাখা; তাই নাটককে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে। এই নাটক বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে মানুষকে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, সঙ্গীত, অঙ্কন ও ভাস্কর্য-বিদ্যা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হতে হয়। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এই রকম বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েই নাট্য-বিদ্যাবিশারদ হতে পেরেছেন। আজ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, বিদ্যাদায়ী বাণীর একনিষ্ঠ ভক্ত। ৭৫ বছরের এই জ্ঞানতপস্বী স্থির করেছেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নাট্য গ্রন্থাগারটি নাটক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভার্থী বা গবেষকদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেবেন। আপাতত রীডিং রুমে এক সঙ্গে ষোলজন পর্যন্ত পাঠার্থীর স্থান হবে। গ্রন্থাগারটি বর্তমানে তার আবাসগৃহের দ্বিতলে চারটি কক্ষ জুড়ে বিস্তৃত। কিন্তু ক্রমে যাতে সমস্ত বাড়ীটাই গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হতে পারে, এর জন্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদি তিনি ইতিমধ্যেই রেজেস্ট্রী করেছেন। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরীটির সুষ্ঠু পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি বিধানের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হবে, তার জন্যে তিনি কলিকাতাস্থ তাঁর অপর দুখানি বাড়ীর আয় এই লাইব্রেরীর অস্তিত্বেরই অনুকূলে দান করেছেন। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই এই লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন করা হবে। সার্থক নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্যসাধনা।

প্রেক্ষাগৃহ

আশা মরীচিকা

টাইয়ের 'নট' বাঁধাটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছিল না; তাও শেষ পর্যন্ত ছোট বোনের সাহায্যে বেশ চোস্ত রকম হয়ে ওঠবার যোগাড় হল। কিন্তু সুটের অভাবে টাই বাঁধার দরকারই হল না। লন্ড্রীগুলির ধর্ম-ঘটের দরুণ নিজের সুটটির আশা ত্যাগই করতে হ'ল; বাপের বেশী বয়েসের প্যান্টটি প্রায় ঢোলকের আকার; 'কোথায় সুট পাওয়া যায়, কোথায় সুট পাওয়া যায়' ক'রে হন্যে হয়ে ঘোরার পরে যদিবা এক বন্ধুর সুট প্রায়-চমৎকারভাবে গায়ে মানানসৈ হ'ল, কিন্তু চোখের সামনে একজন পকেটমারকে হাতে-নাতে ধ'রে ফেলে থানা পর্যন্ত যাবার ফাঁকে কখন যে নিজের হাত থেকে ঐ সুটের প্যাকেটটি উবে গেল, তার হদিস মিলল না কোনো মতেই। —কাজেই রঞ্জুকে—রঞ্জিৎ মল্লিককে ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়েই ইন্দো-ব্রিটিশ ফার্মের সেলস্-এর এক মন-মাতানো, চোখ-ধাঁধানো' চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে যেতে হ'ল নেহাতই ভেতো বাঙালীর মতো ধুতি-পাঞ্জাবী পরে। ফল যা হবার তাই হ'ল—চাকরীটি হ'ল না।

রঞ্জুর জীবনের এই একটি চরম ব্যর্থতার দিনের আগাগোড়া ছবি বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরেছেন মৃণাল সেন তাঁর দশ রীলে সম্পূর্ণ চিত্র 'ইন্টারভিউ'-এর মাধ্যমে। রঞ্জু যখন তার শেখরদার (শেখরদাই ছিল এই হবু-চাকরীর ব্যাপারে তার মুরুব্বি) মুখে শুনল চাকরীটা সে পাবে না স্রেফ ধুতি-চাদর পরে যাবার অপরাধে, তখন তার মানসিক প্রতিক্রিয়া ও তার বহিঃপ্রকাশকেও রূপায়িত ও শব্দায়িত করতে ভোলেন নি শ্রীসেন। উনিশ শো সত্তরের কলকাতার যুব-সম্প্রদায়ের প্রতীক রঞ্জু প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে শোকেস-এর কাঁচকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে খান খান ক'রে ভেঙেছে, যে-সুট পরার অভাবে সে তার আকাঙ্ক্ষিত চাকরী পায় নি, শো-কেসে রাখা কাঠের পুতুলের গা থেকে সেই সুটকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে খুলে ফেলে তাকে 'নগ্ন' ক'রে তৃপ্তি পেয়েছে।

'ইন্টারভিউ' ছবির মাধ্যমে মৃণাল সেন বর্তমান কলকাতার শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি নিদারুণ আক্রোশের কারণ কি, তারই একটা সঙ্গত উত্তর দেবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং এই প্রয়াসে তিনি সিনেমা-ভেরাইট বা ডিরেক্ট সিনেমার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

রঞ্জু মল্লিকের জীবনের একটি বিশেষ দিনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেমন যেমন ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ ঘটা সম্ভব ছিল, তাকেই তিনি চলচ্চিত্রের বিশেষ ভাষার সাহায্যে ধ'রে রেখেছেন। তিনি যে তাঁর ক্যামেরাম্যান ও তাঁর দলের অন্যান্যদের সহযোগিতায় রঞ্জুর জীবনের একটি দিনের

মঞ্জরী অপেরা/পরিচালনা : অগ্রদূত

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

উত্তমকুমার

জ্যোৎস্না বিশ্বাস

বিভিন্ন ঘটনাকে যথাসম্ভব চিত্রায়িত করে তাদেরই শব্দ ও যন্ত্রসংগীতের সংগে সমন্বিত করে তাঁর মনের মতো করে সাজিয়ে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন এবং সেটি যে প্রায় তথ্যচিত্রের আকারে, দর্শক-দের এ-কথা তিনি বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ছবির নায়ক রঞ্জন মল্লিক দর্শকদের দিকে সোজা তাকিয়ে বলেছে : মশাই, আমি একটা সাপ্তাহিক কাগজ চালাই, 'লেখা যোগাড় করা থেকে শুরু করে প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় করা পর্যন্ত সব কাজই করি; হঠাৎ শেখরদা' একটা বিলিতী ফার্মে খুব একটা মোটা মাইনের চাকরী পাবার জন্যে একটা ইন্টারভিউ-এর বন্দোবস্ত করায় আমায় ব্যস্তভাবে ছুটো-ছুটি করতে হচ্ছে এবং এই ব্যাপারটাকে সসম্প্রদায় মৃণাল সেন ছবির মাধ্যমে ধরে রাখবার জন্যে আমাকে সকাল থেকে ধাওয়া করে চলেছেন। —এই বলার ফলে ছবিটি যে ছবিমাত্র নয়, বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র—কলকাতার সমকালীন জীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, তা নিশ্চয়ই দর্শক বুঝেছেন। তাই রঞ্জুর বিচিত্র কল-কাতায় দেখা যায়, পথঘাট থেকে বিদেশী শাসকবৃন্দের প্রতিমূর্তিগুলি স্বস্থানচ্যুত হয়ে লরী করে অপসৃত হচ্ছে, আদিবাসীরা তীর ধনুক বল্লম নিয়ে গণ-অভিযান করছে, উগ্রপন্থী যুবকেরা বোমাবর্ষণ করে পুলিশের সংগে যুদ্ধ করছে।

ছবিটিতে সমকালীনতা ফুটেছে, সিনেমা ভেরাইট বা ডিরেক্ট সিনেমার পদ্ধতিও পরিস্ফুট হয়েছে এবং ছবি আসলে কাহিনী-চিত্র হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা তথ্যচিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু একই সংগে বিভিন্ন মূর্তিতে রঞ্জনের প্রেমিকাকে এবং বিভিন্ন দৃশ্যকে পর্দায় উপস্থাপিত করা এবং আরো অনেক বিজ্ঞাপন ও তথ্যচিত্রে অনুসৃত আধুনিক চমকপ্রদ পদ্ধতির প্রয়োগ ছবিটিতে কিছুটা কৃত্রিমতার স্বাদ এনেছে এবং মনে হয়েছে অপ্রয়োজনেই শুধু কিছুটা বাহাদুরী দেখাবার লোভে। ছবির কলাকৌশল ছবির বক্তব্যকে ছাপিয়ে যাবে না, এইটিই কাম্য হওয়া উচিত। তা' ছাড়া ডিরেক্ট সিনেমার সংগে এই ধরনের কলাকৌশল কতটা খাপ খায়, তাও বিবেচ্য।

ছবির নায়কের ভূমিকা অভিনয়কারী রঞ্জন মল্লিক যদিও বলেছেন, তিনি অভিনেতা নন, তবু বলব, শ্রীমল্লিক মৃণাল সেনের একটি উজ্জ্বল আবিষ্কার। এমন সহজ, সাবলীলভাবে তিনি তাঁর চরিত্রটি চিত্রণ করেছেন যে, মনেই হয় না তিনি অভিনয় করছেন। তার ওপর চোখ মুখও যথেষ্ট চলচ্চিত্রের উপযোগী, যাকে বলি ফোটোজেনিক। কিন্তু নায়কের প্রেমিকার ভূমিকাভিনেত্রী বুলবুল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে সমান কথা বলতে পারলুম না। তিনি ভূমিকার সংগে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে পারেন নি কোথাও; সব সময়েই মনে হয়েছে, তিনি সংলাপগুলিকে কোনো ক্রমে বলে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চান। নায়কের ভগ্নী বেশে মমতা চট্টো-পাধ্যায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দের সংগে চরিত্রটিকে বাস্তব করে তুলেছেন; তিনি যে অভিনয় করছেন, এ-কথা মনেই হয় নি। নায়কের মায়ের চরিত্রটি সার্থকভাবে চিত্রিত করে-ছেন 'পথের পাঁচালী'-খ্যাত করুণা বন্দ্যো-পাধ্যায়। শেখর চট্টোপাধ্যায় শেখরদা'র ভূমিকায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অন্যান্য যাঁরা এই ছবিতে দেখা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই এমন সুন্দরভাবে নিজেদের তুলে ধরেছেন যে, মনে হয়েছে তাঁরা বাস্তব জগতের নিউজ রীলে ধরা পড়েছেন, সাজা অভিনেতা বলে তাঁদের কাউকে মনে হয় না।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে সংবাদ চিত্রগ্রহণের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। ক্ষিপ্র হস্তের কাঁচি ছবির ঘটনাকে অবস্থানুযায়ী গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সাধারণভাবে জাঁকজমক বিমুক্ত কণ্ঠ-সংগীতের প্রয়োগ ছবির বাস্তবধর্মিতাকে বর্ধিত করেছে। কিন্তু প্রধানত পিটিয়ে-বাজানো যন্ত্রের সাহায্যে রচিত আবহ-সংগীত বহু স্থানেই অকারণে উচ্চ আওয়াজপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

দয়াশংকর সুলতানিয়া নিবেদিত মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' এমন একটি পরীক্ষা-মূলক সমকালীন চিত্র, যা চিন্তাশীল দর্শককে তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করবে। —নান্দীকর

আজব শহর/মীরা মুখোপাধ্যায় ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

তরুণ অপেরার নেপোলিয়ান/
নামভূমিকায় শান্তিগোপাল

স্টুডিও থেকে

রূপসী-র শুভমুক্তি : অরুণ রায়-চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ আর সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি রূপসী ৪ ডিসেম্বর রাধা, পূর্ণ ও অন্যত্র মুক্তিলাভ করবে। কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার অজিত গাঙ্গুলী এই ছবির পরিচালক। ছবিটিকে জনপ্রিয় করে গড়ে তুলতে পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী পরিশ্রমের কোন ত্রুটিই করেন নি। সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দোপাধ্যায়, জহর রায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, চিন্ময় রায়, অরুণ চৌধুরী, অনুভা ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, সুতপা চক্রবর্তী, যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায় ও শমিত ভঞ্জ ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন। গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। অনল বাগচীর সুরে কন্ঠ দিয়েছেন—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অনুপ ঘোষাল, আরতি মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, সুবোধ রায় প্রভৃতি। বহির্দৃশ্য প্রধান এই ছবিটি কাহিনী বৈচিত্রে আর ঝুমুরের নাচে-গানে, কবির লড়াই, ভাটিয়ালী গানে দর্শক মনে এক নতুন রসের স্বাদ দেবে।

*

সানফ্রান্সিস্কো উৎসবের কর্তৃপক্ষ এবার শ্রীসত্যজিৎ রায়কে সিনেমা জগতে তাঁর প্রতিভার ও কর্মের অস্বাভাবিক অবদানের জন্য এক বিশেষ সম্মানদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে শ্রীরায়কে সানফ্রান্সিস্কোতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল উৎসব কর্তৃপক্ষ। সত্যজিৎবাবুও যাবেন ঠিক ছিল। কালীপুজোর আগের দিন রওনা হবেন জানতাম। সেই মত 'প্রতিদ্বন্দী'র প্রেস-শো করা হল মঙ্গলবার। সেদিন সত্যজিৎবাবু আমাকে জানিয়েছিলেন 'পরশু যাচ্ছি।'

কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাওয়া বাতিল করেছেন তিনি। একটি প্লেনের অ্যাড-জাস্টমেন্টের জনাই শেষ মুহূর্তে যাওয়া ক্যান্সেল করতে হোল। সত্যজিৎবাবু বললেন—'দেখলাম ঐ ফ্লাইটটা না পেলে সানফ্রান্সিস্কোতে মাত্র একদিন থাকতে পারা যাবে। অতদূরে একদিনের জন্য গিয়ে ফিরে আসার মানে হয় না। তাই আর গেলাম না। পরবর্তী ছবির প্ল্যান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় বললেন—'এখনও ঠিক করিনি। দেখি এটার (প্রতিদ্বন্দী) ওপরই নির্ভর করছে অনেকটা।'

—শুনেছিলাম 'ঘরে বাইরে'র কথা।

: না। এখন ও-ছবি করার কোনো যুক্তি নেই, সময় তো বদলে গেছে। নেকস্ট ছবি আরম্ভ করতে জানুয়ারী হয়ে যাবে। আর কি করব তারই ঠিক নেই।

জননী/পরিচালনা অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ী এবং শমিত ভঞ্জ। —ফটো : অমৃত

এখন সত্যজিৎবাবু সিকিমের ওপর যে ডকুমেণ্টারী করেছেন, তার এডিটিং করছেন। তারপর রি-রেকর্ডিং ইত্যাদি অনেক কাজ বাকি। তারপর ফিচার ফিল্মের কথা।

ওয়াগন ব্রেকার একদল দুর্বৃত্তের রক্ত-ক্ষয়ী বাঁচার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অজিত লাহিড়ীর নতুন ছবি 'আটাত্তর দিন পরে'র কাহিনী বিস্তার করেছেন মৃগাঙ্কশেখর রায়। চিত্রনাট্যও শ্রীরায়ের লেখা। একটানা বেশ কিছুদিন ইন্দ্রপুরীতে চিত্রগ্রহণের পর ছবির কাজ প্রায় শেষ বলা চলে। কালীপদ সেনের সংগীত পরিচালনায় এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছেন শমিত ভঞ্জ, অনুপ-কুমার, জয়া ভাদুড়ী, চিন্ময় রায়, ভাস্কর চৌধুরী, গুণময় সিংহ, গৌতম চ্যাটার্জি, অলোক চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ সেন, ভারতী দেবী, সুরুচি সেনগুপ্ত, চন্দ্রাবতী দেবী, বীরেশ্বর সরখেল প্রমুখ।

•

তরুণ মজুমদারের রাহগীরের পরবর্তী ছবি 'কুহেলী' এখনও মুক্তি পায়নি, এখনও দেরী আছে। অথচ নতুন ছবি 'নিমন্ত্রণে'র কাজ চলছে পুরোদমে। পুজোর মধ্যেই তিনি হাওড়ার কয়েক জায়গায় বহির্দৃশ্যের কাজ করেছেন। এ ছবির নায়ক নায়িকা হলেন অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়। আগের ছবি 'কুহেলী'র নায়িকাও সন্ধ্যা রায়, নায়ক বিশ্বজিৎ। সুখী স্বচ্ছল শান্ত সাধারণ একটি মেয়ে অপর্ণা। প্রেমাস্পদ স্বামীকে নিয়ে একটি সুখী গৃহকোণ যে চেয়েছিল, আর কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃতি ও সংসারের অমোঘ কুটিল চক্রে তাও তার পাওয়া হোলো

রূপসী/বঙ্কিম ঘোষ এবং সন্ধ্যা রায়

না। অকস্মাৎ এ জগৎ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হোল। কিন্তু সরালে কে? কেন? —এসব প্রশ্নেরই জবাব দেবে তরুণ মজুমদারের নতুন ছবি 'কুহেলী'।

•

চিত্রযুগের ব্যানারে দিলীপ মুখার্জির পরিচালনায় 'এখানে পিঞ্জরের' সব কাজ শেষ হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে। এখনও মুক্তি পায়নি, কবে পাবে তারও স্থিরতা নেই এখনও। ইতিমধ্যে তাঁরা নতুন ছবির কাজ শুরু করার প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। অরবিন্দ মুখার্জির পরিচালনায় সে ছবির নাম 'মায়াজাল'। 'নিশিপদ্মের' অস্বাভাবিক সার্থক সাফল্যের পর অরবিন্দ মুখার্জী বাজার এখন তুঙ্গে। একটার পর একটা ছবি করে যাচ্ছেন। এখন তাঁর হাতে রয়েছে 'ধন্যি মেয়ে'। আগামী সপ্তাহে এনটিতে ছবির দৃশ্য গ্রহণ হবে আবার। সেই ফাঁকে তিনি গ্রামাঞ্চলে চলে গেছেন বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য। এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন পার্থ মুখার্জি ও জয়া ভাদুড়ী এবং একটি বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার।

এক মিনিটের চলচ্চিত্র

কতো রকমেরই না পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তে, তার কতটুকুই বা খবর আমরা রাখি। এই কলকাতাতেই বসে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী অজয়কুমার বসু বর্তমান কালকে অবলম্বন করে যে একটি মাত্র নব্বই ফুট দীর্ঘ পরীক্ষামূলক ছবি তৈরী করেছেন, তা তিনি নিজেই আমাদের না জানালে আমরা জানতেও পারতুম না।

ছবির বক্তব্য যে বেশ জোরালো, তা এর বিষয়বস্তু থেকেই উপলব্ধি করা যায়। একজন শিল্পী কিছু আঁকবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন; নেপথ্যে চলেছে ছন্দোময় তবলা-বাদ্য। যেমন তাঁর ব্রাশ ক্যানভাসটিকে ছুঁতে যাবে, অমনই তবলা পরিণত হ'ল রণ-বাদ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশের ছোঁয়ায় ক্যানভাসটি গেল কেটে। ক্ষণেকের জন্যে শিল্পী বিমূঢ়। আবার যেমন সে ব্রাশ তুলে ক্যানভাসের সামনে ধরেছে, অমনি কোথা থেকে আচম্বিতে বোমার আওয়াজ। ক্যানভাস আবার যেন ছুরির আঘাতে ফেটে গেল। কেউ যেন পাগলের মতো হাসছে। এবার দৃঢ়হস্তে শিল্পী তাঁর ব্রাশ দিয়ে নিজেকেই আঘাত করলেন—ঠিক যেমন করে লোকে আত্মহত্যা করে। শিল্পীর মুখে ফুটে উঠল মৃত্যুযন্ত্রণা এবং ক্যানভাস থেকে ঝরতে লাগল ফোটা ফোটা রক্ত। কোনো কথা নেই; শুধু নেপথ্য-ধ্বনি ও বাঙ্ময় ছবির সহযোগিতায় বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। এবং কিছুটা সাফল্যপূর্ণও বটে।

এ ছবির একমাত্র শিল্পী হলেন চিত্র-শিল্পী শ্রীনিতাই ঘোষ। ইনি বর্তমানে 'অমৃত' পত্রিকার অন্যতম অলংকরণশিল্পীও বটে।

বিবিধ সংবাদ

প্রতিযোগিতা : গত ২৬ অকটোবর পার্ক সার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পুজো কমিটি আয়োজিত (পার্কসার্কাস ময়দানে) নাটক প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেন 'আমরা খেয়ালী' কর্তৃক 'প্রতিচ্ছবি', ২য় স্থান অধিকার করেন রঙ্গরূপ কর্তৃক 'খুনী কে?' ও ৩য় স্থান অধিকার করেন যুবগোষ্ঠী কর্তৃক 'স্বর্গের সিঁড়ি'। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ ও পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীশ্যামলাল ঘোষাল মহাশয়।

মহিলা শিল্পী মহলের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি: বাৎসরিক সাধারণ নির্বাচনের পর মহিলা শিল্পী মহলের কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয়েছে এইভাবে—সভাপতি—শ্রীমতী মলিনা দেবী, সহ-সভাপতি—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী ও ভারতী দেবী সাধারণ সম্পাদিকা—শ্রীমতী মঞ্জু দে, সহ-সম্পাদিকা—শ্রীমতী নমিতা সিংহ ও আরতি দাস, কোষাধ্যক্ষা—শ্রীমতী কানন দেবী, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যাবৃন্দ—সর্বশ্রী ছন্দা দেবী, যমুনা বড়ুয়া, নীলিমা দাস, সাধনা রায়চৌধুরী, গৌরী মিত্র, তপতী দেবী, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুলতা চৌধুরী।

গৌরচন্দ্রঘাট, চাতরা, শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা কমিটির বিচিত্রানুষ্ঠান : গত ৭ নভেম্বর চাতরা গৌরচন্দ্রঘাট শ্যামাপূজা কমিটির

এখনই/পরিচালনা ঃ তপন সিংহ। অপর্ণা ও মহুয়া। —ফটো ঃ অমৃত

উদ্যোগে বিপুল দর্শকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় প্রতিটি শিল্পীর অনুষ্ঠান উচ্চাঙ্গের হয়। শ্রীমতী অঞ্জনা বসু, শ্রীমতী রীণা সরকার ও শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তীর সংগীতানুষ্ঠান ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে। পিণ্টু দত্তের বাংগগীতি এই অনুষ্ঠানকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। শিল্পীর গীত রচনা ও পরিবেশনা সময়োপযোগী। শ্রীসুশীল চক্রবর্তীর হাস্যকৌতুক সুন্দর। শ্রীগোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপ চক্রবর্তীর সংগীতানুষ্ঠান ও শ্রীঅরুণাভর আবৃত্তি উচ্চাঙ্গের হয়। মাস্টার স্বরূপকান্তি ঘোষের গীটার বাদন উচ্চপ্রশংসিত হয়। এ-ধরনের সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেন।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ঃ— কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ক্যাশ ডিপাঃ রিক্রিয়েসন ক্লাব গত ২৭ অকটোবর স্টারে প্রমথনাথ বিশীর 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' অভিনয় করেন। সুপরিচালক সুধীর মুস্তাফীর পরিচালনায় নাটকটি সকলের কাছে উপভোগ্য হয়। নাটকটির অভিনয়ে শিল্পীরা সুন্দর জোটবদ্ধ অভিনয়ের নজীর রাখেন এবং প্রতিটি শিল্পীই প্রায় নিজের নিজের ভূমিকায় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দেন। রণেন বসুর 'বেপ্পা' চরিত্র সমকালীন অভিনয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তার চরিত্র এত বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত, স্বচ্ছল অথচ শিল্পময় হতে পারে তার অভিনয় সে কথা প্রমাণ করেছে। এর পর 'পরন্তপ রায়' চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন নীহার মুখার্জী। প্রকৃতি ঘোষের 'উদয়নারায়ণ' চরিত্র প্রশংসার যোগ্য। এছাড়া নারীচরিত্রে বনমালা, চম্পা, ইন্দ্রাণী ও দ্রবময়ীর চরিত্রে যথাক্রমে প্রতিমা পাল, শিখা ভট্টাচার্য, আরতি ঘোষ ও চিত্রিতা মণ্ডল সুঅভিনয় করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন প্রেমাংশু বসু, গোষ্ঠ ব্যানার্জী, দীপক বসু, রবীন দে, ভূপতি সরকার, ব্রজগোপাল মিত্র, ভবানী কর ও অনিল সেনগুপ্ত।

শুভময়ের অভিনয়ঃ বিশেষ করে বাংলাদেশে আজকের দিনে নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে যখন কয়েকটি চিহ্নিত দল এই দুরূহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন সম্প্রতি মুক্ত অংগনে 'শুভময়' প্রযোজিত দুটি একাঙ্কিকার নির্বাচন এবং অভিনয় দেখে কোন বিষয়ই যে তাঁরা প্রচলিত গতানুগতিকতার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি সেটাই প্রমাণিত হোল। কিউবার রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক বিপ্লবের বিক্ষিপ্ত একটি ঘটনার মাধ্যমে বিপ্লবী চরিত্র, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এবং জনমানসে সংগ্রামী সচেতনতা একাঙ্ক নাটকে উপস্থিত করতে গেলে নাট্যকারের যে পরিমাণ দক্ষতা বা নিপুণতার প্রয়োজন 'ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে' নাটকে তা সম্পূর্ণ অবর্তমান। তথ্যকেন্দ্রিক এবং সংলাপসর্বস্ব নাটক দর্শককে কখনও ভাবায় না, নাড়া দেয় না। ঠিক সেই কারণেই প্রথম একাঙ্কিকাটি রসোত্তীর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় নাটক প্রণব মিত্রের 'আলো নেই' হতাশগ্রস্ত অবক্ষয়ী সমাজের আংশিক ছবি। অভিনয়াংশে গোয়েন্দা সচিব হিসাবে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রূকুটি কুটিল রূপটি যে পরিমানে সুচিন্তিত সে তুলনায় সুশান্ত কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। রণজিৎ গাংগুলীর পাগল যতটা সত্যনিষ্ঠ, ব্যালকানো ঠিক ততটা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। অবশ্য তাঁর স্বরভংগ হওয়ার জন্যই মনে হয় এই বিপর্যয়। শচীন মুখার্জির বৃদ্ধ মনোগ্রাহী। অশোক দাশের অভিনয় অতি অভিনয়ে দুষ্ট। বাবুলাল চরিত্রে শৈলেন দাস সজীব। অন্যান্য চরিত্রগুলি মোটামুটি চলনসই। সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে নির্দেশক অঞ্জন দাশগুপ্তের নিজস্ব স্বকীয়তার নিদর্শন মেলেনি বরং অভিনয় ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে অনুকরণ প্রবণতার স্বাক্ষর মিলেছে। আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা উল্লেখযোগ্য না হলেও যথাযথ। আবহসংগীত সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সব শেষে একটি কথাই কেবল মনে হয়েছে যে, এ নাটক দুটি প্রযোজনার যৌক্তিকতা বা সার্থকতা কোথায়?

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়া

গেল ২৪ অকটোবর, '৭০ বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে ইউথ পাপেট থিয়েটার, পুতুল নাচের মাধ্যমে তাদের সপ্তম বার্ষিক উৎসব পালন করেন। প্রধান অতিথি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যুগান্তর বার্তা-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পুতুল নাচের ইতিকথা বিবৃত করেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে আমাদের দেশে ইউথ পাপেট থিয়েটার এই সংস্কৃতি রক্ষা করার যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। প্রখ্যাত লেখক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ভাষণ দেন।

'গ্লাভস পাপেট' সিলহুটে পুতুল নাচ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। পরে, 'ম্যারিওনেটস' পতুল নাচের মাধ্যমে ফুল, প্রজাপতি পাখী ইত্যাদির যে জীবন ছন্দ পাপেট ফ্যানটাসিতে দেখান হয়, তা অপূর্ব। সবশেষে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ভোঁদড় বাহাদুর' পুতুল নাচ অভিনীত হয়। পুতুলগুলির সময়োচিত অংগভংগী, বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা, মধুর ও ছন্দোময় সুর-সংযোজনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

পুতুল নাচ সম্পর্কে ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এই ধরনের অনুষ্ঠান ভারতের অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা বলে অবশ্যই প্রশংসনীয়।

ক্ষেত্রনাথ রায়

খেলার কথা ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সমীক্ষা

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্রিকেট ক্লাব—এম সি সি (মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব) তাদের ১৯৭০-৭১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলা গত ৩০শে অকটোবর উদ্বোধন করেছে। তারা ইংল্যান্ডের নাম নিয়ে এই সফরের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামবে আগামী ২৮শে নভেম্বর। ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজটি হবে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৫০তম টেস্ট সিরিজ। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই দুই দেশের ২৬তম টেস্ট সিরিজ। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা নানা দিক থেকে নজির হয়ে থাকবে। যেমন ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে টেস্ট খেলা শুরু হয় তা দুই দেশের ১ম টেস্ট ক্রিকেট খেলা এবং পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট খেলার উদ্বোধন এই সূত্রেই। এর অনেক পর টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে প্রথম খেলতে নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮৮৯ সালের ১২ই মার্চ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে), ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯২৮ সালের ২৩শে জুন (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে), নিউজিল্যান্ড ১৯৩০ সালের ১০ই জানুয়ারী (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে), ভারতবর্ষ ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস মাঠে) এবং পাকিস্তান ১৯৫২-৫৩ সালে (ভারতবর্ষের বিপক্ষে)।

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া—এই দুই দেশের মধ্যে এ পর্যন্ত ২০৩টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা ছাড়া অপর কোন দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা আজও ২০০তম সংখ্যায় পূর্ণতা লাভ করে নি। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট মহলে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আকর্ষণই আলাদা। সারা পৃথিবীর ক্রিকেটঅনুরাগীরা অদম্য উৎসাহ, উত্তেজনা এবং উদ্বেগের সঙ্গে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা অনুধাবন করেন। বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আর এক নাম 'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ' অর্থাৎ 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ'। ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রাক্কালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ২০৩টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূত্রে যে উল্লেখযোগ্য রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তা নীচে দেওয়া হল।

টেস্ট খেলার রেকর্ড

১৮৭৭ (মার্চ ১৫) থেকে ১৯৭০ (নভেম্বর ২৭)

টেস্ট খেলার ফলাফল

		ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	
স্থান	খেলা	জয়ী	জয়ী	ড্র
ইংল্যান্ড	৯৬	২৬	২৫	৪৫
অস্ট্রেলিয়া	১০৭	৪০	৫৫	১২
মোট :	২০৩	৬৬	৮০	৫৭

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

		ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	
স্থান	খেলা	জয়ী	জয়ী	ড্র
ইংল্যান্ড	২৪	১২	১০	২
অস্ট্রেলিয়া	২৫	৯	১২	৪
মোট :	৪৯	২১	২২	৬

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ৯০৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) ওভাল ১৯৩৮ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ৭২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ), লর্ডস ১৯৩০

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরা ইনিংসের খেলা)

ইংল্যান্ড : ৪৫, সিডনি, ১৮৮৬-৮৭

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬, বার্মিংহাম, ১৯০২

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ৩৬৪ রান—লেন হাটন, ওভাল, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪ রান—ডন ব্র্যাডম্যান, লিডস, ১৯৩০

একটি সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

(ব্যক্তিগত রানের সমষ্টি)

অস্ট্রেলিয়া : ৯৭৪ (গড় ১৩৯·১৪)—ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

ইংল্যান্ড : ৯০৫ (গড় ১১৩·১২) ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, ১৯২৮-২৯

সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৯টি—ডন ব্র্যাডম্যান

ইংল্যান্ড : ১২টি—জ্যাক হবস

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

১৭টি (অস্ট্রেলিয়া ৯ এবং ইংল্যান্ড ৮), স্থান—অস্ট্রেলিয়া, ১৯২৮-২৯

খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ডের পক্ষে

১৭৬ ও ১২৭—হার্বার্ট সাটক্লিফ, মেলবোর্ণ, ১৯২৪-২৫

ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)

ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (ইংল্যান্ড)

১৯৬৮ সালে কেনিংটন ওভাল মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার শেষ পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একটি উত্তেজনা-পূর্ণ মুহূর্ত : অস্ট্রেলিয়ার জন ইনভেরারিটি তাঁর ৫৬ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের ডেরেক আন্ডারউডের বলে এল-বিডব্লু হয়েছেন। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের সমবেত আবেদন আম্পায়ার মঞ্জুর করেছেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ৬ মিনিট আগে ইংল্যান্ড নাটকীয়ভাবে অস্ট্রেলিয়াকে ২২৬ রানে পরাজিত করে শেষ টেস্ট পর্যন্ত টেস্ট সিরিজ ড্র রাখে।

১১৯* ও ১৭৭—ওয়াল্টার হ্যামন্ড, এডিলেড, ১৯২৮-২৯

১৪৭ ও ১০৩*—ডেনিস কম্পটন, এডিলেড ১৯৪৬-৪৭

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

১৩৬ ও ১৩০—ডবলিউ বার্ডসলে, ওভাল, ১৯০৯

১২২ ও ১২৪*—আর্থার মরিস, এডিলেড, ১৯৪৬-৪৭

---

* নট আউট

দলগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৫৩টি

ইংল্যান্ড : ১৪৩টি

লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (৩ জন) : ভি টি ট্রাম্পার (১০৪ রান), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯০২; সি জি ম্যাকার্টনী (১৫১ রান), লিডস, ১৯৩০; ডন ব্র্যাডম্যান (৩৩৪), লিডস, ১৯৩০

দ্রষ্টব্য : যে রান তুলে খেলোয়াড় আউট হন তা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

ইংল্যান্ডের পক্ষে : লাঞ্চের পূর্বে কেউ সেঞ্চুরী করেন নি

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৭টি (ইংল্যান্ড ৪ ও অস্ট্রেলিয়া ৩), নটিংহাম, ১৯৩৮

এক ইনিংসে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৪টি—ইংল্যান্ড (ই পেন্টার ২১৬ নট-আউট, সি জে বার্নেট ১২৬, ডেনিস কম্পটন ১০২ এবং লেন হাটন ১০০), নটিংহাম, ১৯৩৮

ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড)

ব্যক্তিগত ৩০০ রানের ইনিংস

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : (১) ডন ব্র্যাডম্যান ৩৩৪ রান (লিডস, ১৯৩০) [illegible] ৩০৪ রান (লিডস, ১৯৩৪); (২) [illegible]ব সিম্পসন ৩১১ রান (ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৬৪); (৩) বব কাউপার ৩০৭ রান (মেলবোর্ণ, ১৯৬৫-৬৬)

ইংল্যান্ডের পক্ষে : লেন হাটন ৩৬৪ রান (ওভাল, ১৯৩৮)

এক দিনের খেলায় সর্বাধিক রান

(ব্যক্তিগত রান)

৩০৯ **রান**—ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), লিডস, ১৯৩০ (আজও বিশ্বরেকর্ড হিসাবে গণ্য)

দ্রষ্টব্য : প্রথম দিনের ৩৪০ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার মোট ৪৫৬ রানের মধ্যে ব্র্যাডম্যানের ছিল নট-আউট ৩০৯ রান। প্রথম দিনে লাঞ্চের আগেই ব্র্যাডম্যান সেঞ্চুরী করেন।

লাঞ্চের সময় তাঁর রান ছিল ১০৫।

এক দিনে সর্বাধিক রান

(দলগত রান)

৪৭৫ রান (২ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়া, প্রথম দিন, ওভাল, ১৯৩৪

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যান্ড : ৪৬টি (গড় ৯.৬০)—জিম লেকার, ১৯৫৬

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬টি গড় (২৬.২৭)—এ মেইলী, ১৯২০-২১

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যান্ড : ১৯টি (৩৭ রানে ৯ ও ৫৩ রানে ১০)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ১৪টি (৪৬ রানে ৭ ও ৪৪ রানে ৭)—এফ আর স্পোফোর্থ, ওভাল, ১৮৮২

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যান্ড : ১০টি (৫৩ রানে)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ৯টি (১২১ রানে)—এ মেইলী, মেলবোর্ণ, ১৯২০-২১

হ্যাটট্রিক

ইংল্যান্ড : ডব্লিউ বেটস (মেলবোর্ণ, ১৮৮২-৮৩); জে ব্রিগস (সিডনি, ১৮৯১-৯২) এবং জে টি হিয়ার্ণ (লিডস, ১৮৯৯)

অস্ট্রেলিয়া : এফ আর স্পফোর্থ (মেলবোর্ণ, ১৮৭৮-৭৯), এইচ ট্রাম্বল (মেলবোর্ণ, ১৯০১-২) এবং এইচ ট্রাম্বল মেলবোর্ণ, ১৯০৩-৪)

টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলায় জয়

অস্ট্রেলিয়া ১৯২০-২১ সালের টেস্ট সিরিজে ৫—০ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে এই দুর্লভ সম্মান প্রথম লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলায় জয়লাভের নজির মাত্র চারটি আছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এই রকম জয়ের নজির নেই।

লেন হাটন (ইংল্যান্ড)

বব্ কাউপার (অস্ট্রেলিয়া)

দুই দিনে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি

অস্ট্রেলিয়া ১৯২১ সালে নটিংহামের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে (৩০শে মে) ইংল্যান্ডকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে।

রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া)

জিম লেকার (ইংল্যান্ড)

অসাধারণ জয়

১৯৪৮ সালে লিডস মাঠের ৪র্থ টেস্টে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৬৫ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করার পর অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০৪ রান (৩ উইকেটে) সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে জয়ী হয়। এখানে উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সমাপ্তি ঘোষণার পর তাদের বিপক্ষ দল শেষ পর্যন্ত খেলায় জয়লাভ করেছে এমন নজির মাত্র চারটি আছে।

প্রথম নজির

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার বিভিন্ন বিষয়ে যে-সব প্রথম নজির সৃষ্টি হয়েছে তারই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নজির নীচে দেওয়া হল।

প্রথম ব্যাটিং, প্রথম রান, প্রথম বাউণ্ডারী এবং প্রথম সেঞ্চুরী — চার্লস ব্যানারম্যান (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ মার্চ ১৫, ১৮৭৭

প্রথম 'ডাবল' সেঞ্চুরী—২১১ রান—ডবলিউ মার্ডক (অস্ট্রেলিয়া) ওভাল, ১৮৮৪

প্রথম 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী—৩৩৪ : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) লিডস, ১৯৩০

প্রথম 'হ্যাটট্রিক'—এফ আর স্পোফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ ১৮৭৯

প্রথম এক ইনিংসে ৫০০ রান : ৫৫১—অস্ট্রেলিয়া, ওভাল, ১৮৮৪

খেলাধূলা

দর্শক

কোচবিহার ট্রফি

দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে আয়োজিত ১৯৭০ সালের সর্বভারতীয় আঞ্চলিক স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল স্কুল দল ৭৯ রানে উত্তরাঞ্চল স্কুল দলকে পরাজিত করে কোচবিহার ট্রফি জয়ী হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল স্কুল দল শেষ ট্রফি জয়ী হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। সেমি-ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় পশ্চিমাঞ্চল দল ওয়াক-ওভার পায়। অপর দিকে সেমি-ফাইনাল খেলায় উত্তরাঞ্চল ৬৯ রানে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণাঞ্চলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১১৭ রানের মাথায় শেষ হলে উত্তরাঞ্চল দল ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করে। ফলে উত্তরাঞ্চল দল মাত্র ৪ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকে, হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট। পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস অল্প রানে শেষ হলেও উত্তরাঞ্চল দলকে গোড়ারদিকে বেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। মাত্র ১৪ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৫ম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক পারভিন ওবেরয় (৫২ রান) এবং অনিল মাথুর ৯৭ রান তুলে দলকে সংকট থেকে উদ্ধার করেন। অনিল মাথুর প্রথমদিনে ৩৯ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। উভয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেন পারভিন ওবেরয়। তাঁর ৫২ রানে ছিল ৬টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী।

দ্বিতীয় দিনে উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৪৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩২ রানে অগ্রগামী হয়। অনিল মাথুর ৫১ রান করে আউট হন। পশ্চিমাঞ্চল দল ৩২ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৭টা উইকেট খুইয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। ৭ম এবং অসমাপ্ত ৮ম উইকেট জুটি মোট ৭৯ রান (যথাক্রমে ৩৭ ও ৪২ রান) তুলে দেয়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল পশ্চিমাঞ্চল দল ১৩৭ রানে অগ্রগামী এবং তাদের হাতে জমা ৩টে উইকেট।

তৃতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৮ রানের মাথায় শেষ হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬৭ রান তুলতে উত্তরাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৮৭ রানের মাথায় শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল দল ৭৯ রানে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পশ্চিমাঞ্চল দলঃ ১১৭ রান (জগদীশ ভগতকার ৩৪ রান। পারভিন ওবেরয় ১১ রানে ৩ এবং অরবিন্দ মাথুর ২৬ রানে ৪ উইকেট)

ও ১৯৮ রান (রমেশ বোরদে ৩৬, এইচ কে শাহ ৩৪ এবং মহম্মদ ইকবাল ৪৭ নট আউট। অনিল মাথুর ৪৮ রানে ৪ উইকেট)

উত্তরাঞ্চল দলঃ ১৪৯ রান (পারভিন ওবেরয় ৫২ এবং অনিল মাথুর ৫১ রান। হানিফ কাদ্রি ৩২ রানে ৪ এবং বাকরানিয়া ৩৩ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৮৭ রান (বাকরানিয়া ২৪ রানে ৪ এবং থাকরার ৯ রানে ৩ উইকেট)

জাপানের জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

জাপানর জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই মার্টিন মুলিগান (ইতালী), মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই ক্যাথি হার্টার (আমেরিকা) এবং পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে জাপানের ডেভিস কাপ জুটি তাকেশী কোউরা এবং কাওয়ামোরী চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র জুন কোবী অপ্রত্যাশিতভাবে ৬-৩, ৭-৫ ও ৮-৬ গেমে ভারতের প্রখ্যাত প্রবীণ খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠেছিলেন। পুরুষদের ডাবলসের সেমি-ফাইনালে ভারতীয় জুটি কৃষ্ণান এবং শিব প্রকাশ মিশ্র ৬-৮, ৩-৬ ও ৬-৮ গেমে জাপানের কোউরা এবং কাওয়ামোরীর কাছে হেরে যান।

ডি সি এম ট্রফি

দিল্লীর কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে ১৯৭০ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইরানের তাজ ক্লাব ৩—১ গোলে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু বছর ডি সি এম ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। খেলার ৪৭ মিনিটের মাথায় অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল গোল দিয়ে ১—০ গোলে এগিয়ে যায়। খেলার শেষদিকে ৯ মিনিটের মধ্যে (৭৭,৮১ ও ৮৬ মিনিটের মাথায়) তাজ দল পর পর তিনটি গোল দেয়। তাজ দলের পক্ষে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় পারভিজ দুটি গোল করেন।

সেমি-ফাইনালে তাজ ক্লাব ৪—০ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স এবং অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ ২—১ গোলে নেপালের কাটামুণ্ডু একাদশ দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

এশিয়ান মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে আয়োজিত তৃতীয় এশিয়ান মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় গতবারের রাণার্স-আপ জাপান অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মোট ৯টি খেলায় জাপানের জয় ৯ এবং পয়েন্ট ১৮। জাপান ৫৮—৫৫ পয়েন্টে গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের প্রথম এবং ১৯৬৮ সালের দ্বিতীয় এশিয়ান মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় কোরিয়া চ্যাম্পিয়ান এবং জাপান রাণার্স-আপ হয়েছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১০টি দেশ যোগদান করেছিল। চূড়ান্ত লীগ তালিকায় সর্বশেষ স্থান পেয়েছে ভারতবর্ষ—সমস্ত খেলাতেই তাদের হার হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য এই তৃতীয় এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুবাদে জাপান আগামী বছর ব্রেজিলে আয়োজিত বিশ্ব মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশের পক্ষে যোগদানের যোগ্যতা লাভ করেছে।

প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মানলাভ করেছেন জাপানের তাকোকো আরকাকী। যোগ্যতার বিচারে বাছাই তালিকায় যে ১০ জনকে স্থান দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে জাপানের ৩ জন দক্ষিণ কোরিয়ার ৩জন, তাইওয়ানের ২ জন, মালয়েশিয়ার ১ জন এবং ইন্দোনেশিয়ার ১ জন খেলোয়াড় আছেন।

চূড়ান্ত লীগ তালিকা

	খেলা	জয়	হার	পয়েন্ট
জাপান	৯	৯	০	১৮
দঃ কোরিয়া	৯	৮	১	
তাইওয়ান	৯	৭	২	১৬
মালয়েশিয়া	৯	৬	৩	১৫
ইন্দোনেশিয়া	৯	৫	৪	১৪
তাইল্যান্ড	৯	৪	৫	১৩
সিঙ্গাপুর	৯	৩	৬	১২
হংকং	৯	২	৭	১১
ভিয়েৎনাম	৯	১	৮	১০
ভারতবর্ষ	৯	০	৯	০

এশিয়ান মোটর দৌড়

ইরাণের তেহেরাণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা পর্যন্ত—৬,৭০০ কিলোমিটার (৪,২৫০ মাইল) দ্বিতীয় এশিয়ান মোটর দৌড় প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রতিযোগী নাজির হোসেন (বোম্বাই) প্রথম স্থান লাভ করেছেন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন লাওসিয়ান দল এবং তৃতীয় স্থান পশ্চিম পাকিস্তানের মহম্মদ সানাউল্লা। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ৬২টি গাড়ীর মধ্যে ৪৯টি গাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৯ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 27th November, 1970 শুক্রবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমনোজ বিশ্বাস

চিঠিপত্র

'সজনের সকাল' প্রসঙ্গে

বাংলা সাহিত্যে স্বাদ বদলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নতুন কিছু দেয়ার ব্যাপারে 'অমৃত' চিরদিনই সর্বাগ্রগণ্য। এজন্যই 'অমৃত' পাঠক সমাজে এত সমাদৃত। এর পরিচ্ছন্নতা, বিষয় নির্বাচন এবং মৌলিকত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। সম্প্রতি আপনারা আরেকটি গল্প উপহার দিয়ে আমাদের চমকিত করেছেন। শ্রীচণ্ডী মণ্ডলের 'সজনের সকাল'-এর কথা বলছি, অস্বাভাবিক বাগ্রতায় এর প্রতিটি সংখ্যাই আমি পড়েছি। সত্যি কথা বলতে কি এমন মৌলিক বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠ মননশীল গল্প অনেকদিন আমি পড়িনি। বর্তমান-কালের অধিকাংশ গল্পই পড়ে শেষ করার পর আর মনে থাকে না, কিছু চিন্তা করারও থাকে না। কিন্তু বর্তমান গল্পটি পাঠকের মনকে সজোরে নাড়া দেয়। লেখক যেভাবে জীবন-জন্মের কথা বলেছেন, বর্তমানের এত হতাশার মধ্যেও যে আশার দীপাবলী জ্বালিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

জীবন-রসিক লেখকের জীবন-উপলব্ধি অপূর্ব। যেমন এক জায়গায়, '.....মানুষের জীবন অকূল সমুদ্র মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মত। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কামনা-বাসনাগুলি হল ঐ দ্বীপবাসী পাখীগুলির মত।.....ঐ পাখীগুলিকে ফিরে যেতে হবে...অসীম শূন্যতায়...মানুষের কামনা বাসনাগুলি ইচ্ছাগুলির পরিণাম ঐ পাখীগুলির পরিণামের মত।' তারপর আর এক জায়গায় বলছেন, 'জীবন ও মৃত্যু' এর মধ্যে 'মৃত্যু ভয়ংকর সত্য হলেও তাকে অবহেলা করলে কোন ক্ষতি নেই। বরং অনেক লাভ। জীবনই একমাত্র সত্য হয়ে উঠবে।' লেখকের কাছে 'জীবনের সব রস মাটিতে, আকাশ শূন্য মায়া ছলনা।' সজন যেন আমাদেরই চারপাশে রয়েছে। রাত্রিকে ভালবেসে সে জীবনকে উপলব্ধি করেছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে। এবংও কিন্তু সজনের জীবনে ট্রাজেডি এসেছে। ললিতা আর লাবণ্যকে বিয়ে করেছে কিন্তু তাদের সুখী করতে পারে নি। হতাশায় ভেঙে পড়েছে। জীবন-জন্মের সার্থকতা খুঁজছে। মুক্তির সন্ধান করেছে। এবং একদিন সমস্ত হতাশার সকালও হয়েছে। কিন্তু বড়ো দেরীতে। গল্পটি মার্জিত ভঙ্গিমা, সুললিত গতিছন্দ এবং সর্বোপরি সমাপ্তভঙ্গি অপূর্ব। এমন মননশীল বাস্তব-জীবনধর্মী গল্প আমাদের উপহার দেয়ার জন্য শ্রীমণ্ডলের সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়কেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্যামসুন্দর ঘোষ
বাটানগর, স্টেশন রোড।

(২)

'অমৃত'-এ 'সজনের সকাল' পড়লাম। পড়েই অবাক হয়েছি—অতি তরুণ লেখক শ্রীচণ্ডী মণ্ডলের সুন্দর উত্তরণে। চণ্ডী মণ্ডলের 'মৃত্যুর পথে দুঃখ' ও 'ধান কাটার পর গান'—ছোটগল্প দুটি বেশ ভালো লেগেছিল, অবশ্য অন্য পত্রিকায়। 'অমৃতে' সাপ্তাহিকে 'সজনের সকাল' মারফৎ তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ। সামান্য কিছু ত্রুটি বাদে 'সজনের সকাল' এককথায় সুন্দর। আশা করছি, এই তরুণ লেখক একদিন সত্যিই সার্থক হবেন।

—**আহসান জমিল**
মুর্শিদাবাদ

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

বিগত কয়েক সংখ্যা থেকে অমৃতে 'শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা' মনযোগ দিয়ে পড়েছি। বিশেষতঃ মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন পর্যায়ে গ্রন্থদর্শীর লেখাটি আমার কাছে অসম্ভব ভাল লেগেছে। ভাল লাগার কারণগুলি এই : (ক) প্রথমতঃ লেখক মফঃস্বল ও শহর এই দুইটি অঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একে অপরের নির্ভরতা ও অবহেলার কথা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করার উদার দৃষ্টিভঙ্গী। (খ) দ্বিতীয়তঃ তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর, বাকচাতুর্যহীন ঝরঝরে ভাষা। (গ) তৃতীয়তঃ মফঃস্বলের লিটল্ ম্যাগাজিনগুলোর প্রাণের কথা তুলে ধরার অপরিসীম আন্তরিকতা। (ঘ) চতুর্থতঃ অবহেলিত মফঃস্বল সম্পর্কে লিখতে বসে খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহে অসম্ভব পরিশ্রম।

কিন্তু পর্যবেক্ষক যখন কবি ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে মফঃস্বল ও বহির্বঙ্গের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন, তখন তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা হওয়া অস্বাভাবিক নয় কি? এই আলোচনায় দেখা যায়, পাবক, অভিযান, উত্তরদিগন্ত, ত্রিভুজ, সপ্তদ্বীপা, সীমান্তিক, প্রান্তরেখা, যন্ত্রণা, তরাইয়ের কল্লোল এই সকল পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠীর কারও সম্পর্কেই কোন আলোচনা বা মন্তব্য করা হয়নি। যদিও বা 'ত্রিবৃত্ত'কে মনস্তুষ্টি করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও এটুকু পরিষ্কার যে ঐ পত্রিকা-গোষ্ঠীর বিশেষতঃ উত্তর বাংলার লেখক-বৃন্দের কথা উল্লিখিত হয়নি। এই লেখায় (শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা পর্যায়) উত্তর বাংলার লেখক এবং বহির্বঙ্গের লেখকরা স্থান পেলেন না কেন? তবে কি এই পূজোয় এ-সকল অঞ্চল থেকে কেউই ভাল লেখেন নি, কিংবা লিখতে পারেন না? আমার মনে হয় ঠিক তা নয়। মফঃস্বলের সবগুলো কাগজ লেখকের চোখের আওতায় আসেনি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য উত্তর বাংলার রণজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, নীরদ রায়, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, অরুণেশ ঘোষ, দেবাশীষ চৌধুরী প্রমুখ তরুণতর কবি ইতস্ততঃ ভাল লিখে থাকেন। এবং আমি যতদূর জানি, রণজিৎ দেব ও নীরদ রায় এবার পূজোয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচুর ভাল কবিতা লিখেছেন। অমৃতে এই পর্যায়ে এই দুইজন কবির নাম উল্লেখ না দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলাম।

—**অর্ঘ্য ঘোষ**
তুফানগঞ্জ

(২)

আপনাদের 'শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা' আমার খুব ভাল লাগছে। সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ নিয়ে শারদ-সাহিত্য প্রসঙ্গে এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আর কোন পত্রিকায় চোখে পড়ে না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। কথাটা কবিতা-বিষয়ক। কবিতার আলোচনাটি খুবই সুচিন্তিত হয়েছে—অনেক পরিচিত অপরিচিত নাম দেখলাম। একটা নাম বোধহয় লেখার ভীড়ে আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—সাধনা মুখোপাধ্যায়। যুগান্তর, অমৃত, একালীন, নহবৎ, গঙ্গোত্রী আনন্দবাজার, দেশ, শনিবারের চিঠি, একক, উত্তরণ, গল্প-কবিতা প্রভৃতি কুড়ি-একুশ জায়গায় তাঁর কবিতা দেখলাম—প্রতিটি কবিতাই ছন্দের সৌকর্যে ও ভাবের আন্তরিকতায় নিটোল। অন্যান্য লেখার মধ্যে তাঁর লেখার স্বাতন্ত্র্য স্বতই চোখে পড়ে। বিশেষত যখন তিনি বলেন,

'তীরে বসে শুধু হল ছন্দের ঢেউ গোণাগর্ণে
ত্রিবিধ পয়ার আর মন্দাক্রান্তা ভুজঙ্গপ্রয়াত
শব্দ-নিথর সমুদ্রে মাত্রাহীন চারুতায় মজে
দেওয়াই হলো না আজও সফল ও
দুর্নিবার ঝাঁপ'...
(আড়বাঁশী—গঙ্গোত্রী)

চিঠিপত্র

কিম্বা—

...'নর্মদা প্রত্যঙ্গগুলো তাইতো কর্মে হয়ে
অসাড় ঘর্মে ফিরে আসে।...'

(রাত্রির শল্যবিদ—অনুক্ত)

শ্রীমতী মায়া রায়,
কলিকাতা—৩৩

(৩)

অমৃতের (১০ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৫শ সংখ্যা) 'শারদ সাহিত্য পরিক্রমা' বিভাগে কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় কয়েকজন তরুণ কবির উল্লেখ দেখলাম। এছাড়া বেশ কয়েকজন তরুণ কবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন—একথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন অমিতাভ গুপ্ত (কল্পবাণী, কল্পক) এবং নিশীথ ভড়ের (প্রতিভা, দুই বাংলার কবিতা) কবিতার অন্তর্জগত পাঠকমনকে স্পর্শ করে। 'নিশ্বাসই পৌঁছে দেয় স্থির পথে!' সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে পাঠককে ভাবিত করেন আপন ভাবনায় সমরেন্দ্রনাথ দাস (কল্পবাণী) সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়কে বিচলিত করে, তাই তিনি বলে ওঠেন—"এসো আমরা এবার পুরোণো বোধগুলো একবার ঝলসে নিই বিদ্রোহের আগুনে' (গঙ্গোত্রী)। গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি গীতি-প্রবণ কবিতা ভাল লাগল। তুষার চৌধুরীর (রাঙ্গামাটি, সত্তরের কবিতা) নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গী গড়ে উঠেছে। নিখিল বসু (কল্পবাণী), তপন মুখোপাধ্যায় (সত্তরের কবিতা) এবং গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কল্পক) কবিতায় আন্তরিকতা এবং গভীরতার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

অঞ্জন সেন
কোলকাতা—২৯

'দৃশ্যপট সামনে' প্রসঙ্গে

'অমৃত' ১০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যায় শ্রীদেবল দেববর্মার 'দৃশ্যপট সামনে' গল্পটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। লেখক এত সহজ ও সুন্দর ভাষায় গল্পটি লিখে অমৃত পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের সত্যিই মুগ্ধ করেছেন। এই গল্পে সমীরণ ও নিশিকান্তর মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্বের পরিচয় তা-ও সমাজ-জীবনে একটা রেখা টেনে দেয়। অপরদিকে মধ্যবিত্ত সমাজে চাকুরি না পেলে যে জীবন-যন্ত্রণা ও মথিত প্রাণের ব্যথা ফুটে উঠেছে জীতেন ও নর্মদার চরিত্রে, আজকের সমাজে পাশ করার পর চাকুরি জীবনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা ছেলে চাকুরি না পেলে কতটা বিপথগামী হয়ে পড়ে লেখক তা সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে, গল্পে নর্মদার চরিত্রটিও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কত সহজ ও সরলভাবে তিনি একজন অচেনা ব্যক্তিকে কাছে টেনে নিয়েছেন। নর্মদার মত মেয়ের আজও আমাদের সমাজে, বাড়ীতে, রান্নার কাজ ছাড়া অধিক কিছু জোটে না। নর্মদার জীবনে চাকুরি না পাবার হতাশাই বেশী দেখা দিয়েছে। 'চাকরি হবে আমার'! —এই অংশটুকু পড়ে আমরা তাই মনে করতে পারি। শ্রীদেববর্মা বলিষ্ঠ শিল্পস্বভাব গুণে গল্পের চরিত্র অঙ্কনে যে নতুন ভাবধারা নিয়ে পট-ভূমিকা রচনা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই ধরনের গল্প প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও লেখককে জানাই অভিনন্দন।

স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শালবনী, মেদিনীপুর।

'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গে

'সাবসিডি পাবলিশিং' আদর্শের ধ্বজাধারী এইসব ভণ্ড পুস্তক প্রকাশকদের সম্বন্ধে আমাদের কাছে যে সমস্ত সংবাদ আছে তা এই পত্রে জানাচ্ছি। যথা—এইসব অনামী অসাধু পুস্তক প্রকাশকেরা (বলা বাহুল্য কোনও নামী প্রকাশক নয়) লেখক-লেখিকা সংগ্রহের জন্যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। এবং বিজ্ঞাপনের উত্তরে শুধু কলকাতা নয়; দিল্লী-বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ প্রভৃতি সুদূর প্রবাস থেকেও আগ্রহী লেখক-লেখিকাদের উত্তর আসে। এদের মধ্যে কয়েকটি প্রকাশক আবার বিভিন্ন ভাষা-ভাষী নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচিত ইংরাজী উপন্যাস-গল্প কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির পুস্তকও প্রকাশ করে থাকেন।

তারপর কিভাবে সেই সব তরুণ লেখক-লেখিকাদের প্রতারিত করে পথে বসানো হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের পত্রেই ব্যক্ত হয়েছে। এদের ফাঁদে পড়ে বহু তরুণ লেখক-লেখিকা নিয়তই প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হচ্ছেন; আর সেই সব অনামী অখ্যাত পুস্তক প্রকাশকেরা অর্থ-প্রাচুর্যে দিন-দিন কেমন ফুলে-ফেঁপে উঠছে। অথচ তরুণ লেখক-লেখিকারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকায় এই 'প্রতারণার ব্যাপারটা' একরকম লোক-চক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে।

অমিতরঞ্জন বসু
বিষ্ণুপ্রিয়া বসু
চন্দননগর, হুগলী।

'অমৃত' প্রসঙ্গে

কয়েকটি রমনীয় সংযোজনে 'অমৃত' অভিনব ও অনন্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীমাধব চৌধুরী মহাশয়ের লেখা 'তুলসীচরিত' স্বগুণে সুন্দর, অতুলনীয়। আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিচিত্রণ আমার মতো পুরোন স্মৃতিকথা শুনতে ও শোনাতে ভালবাসেন এমন পাঠকদের পক্ষে আনন্দদায়ক। 'এই আমাদের দেশ' প্রসঙ্গটির জন্য শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এবারের প্রসঙ্গে (২৭ কার্তিক সংখ্যা) গাম্ভালা তথা জিয়াগঞ্জ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—জিয়াগঞ্জের অধিবাসীরা দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে সর্বাধিক দান করেছিলেন—স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী দান সংগ্রহে এসেছিলেন এখানে। এখানকার বিশিষ্ট অধিবাসী ছিলেন বিদ্যাসাগর-জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী, বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। তাঁর পৌত্র অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিকরূপে সুপরিচিত। খ্যাতনামা বিপ্লবী ও কবি শ্রদ্ধেয় শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী মহাশয় জিয়াগঞ্জের স্থায়ী অধিবাসী। বহু মনস্বী পুরুষ ও বিপ্লবী দেশব্রতীর জন্মভূমি জিয়াগঞ্জ।

গোরাচাঁদ মিত্র,
কলকাতা—৪।

ত্রুটি স্বীকার

গত ২৮ সংখ্যায় অমৃতে প্রকাশিত 'ঠিকানা নেই' গল্পের লেখকের নাম হবে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে আন্তরিক দুঃখিত।

শাদাচোখে

খুনোখুনি কলকাতার প্রাত্যহিক ঘটনা। শুধু খুন নয়, পরীক্ষা ভণ্ডুলের কিম্বা স্কুল-কালেজে হামলার খবরও এই রোজনামচার অন্তর্ভুক্ত। হিংসাশ্রয়ী কাজকর্ম বেড়ে যাচ্ছে বলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ বিশেষ বিচলিত বোধ করছেন এবং অনেকেই ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে 'টেররিজম' যে প্রকৃত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করে দিয়ে ফ্যাসিবাদের পথ প্রশস্ত করে দেয় সে সম্পর্কে হুঁশিয়ারও করে দিয়েছেন। বামপন্থী দলগুলির নেতাদের কাছ থেকেই এই তত্ত্বগত বক্তব্য এসেছে। এবং তাঁরা 'নকসালপন্থীদের' গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে কলকাতা ও শহরতলীর অগণিত অভিভাবক প্রতিনিয়ত এক উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন। শিক্ষায়তনসমূহে আক্রমণের ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিব্রত অভিভাবকরা তাঁদের পুত্র-কন্যাদের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ কি—এই প্রশ্নই আজ সকলের মনকে আচ্ছন্ন করেছে।

রাজ্য শাসনের দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা মনে করছেন আইনের অপ্রতুলতা বা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন আইন হাতে না থাকার ফলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' করতে পারছেন না। তাই পুলিশের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে এবং বিপন্ন পশ্চিম বাংলায় 'আইন-শৃঙ্খলা' ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জননিরাপত্তা বিল ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আর একটি বিল আনয়নের চেষ্টা চলছে। দেখা যাচ্ছে — বিল দুটি লোকসভায় বামপন্থী দলগুলির বিরোধিতার ফলে উত্থাপন করা যাচ্ছে না। তাই কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি নিয়ে অর্ডিনান্স হিসাবে বিল দুটি কার্যকর করার চেষ্টা করছেন।

ঐ বিল দুটির উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে কলকাতায় প্রতিনিয়ত যা ঘটছে অর্থাৎ যে খুনোখুনি চলছে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ, ঘটনার পারিপার্শ্বিক ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে প্রশাসনিক যন্ত্রকে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়ার আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা—তা যাচাই করা কঠিন হবে। একথা সত্য যে, কলকাতার রাস্তায় পুলিশ খুন হচ্ছে। এমন কি ইতিমধ্যে একজন সেক্রেটারী পর্যায়ের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী খুন হয়েছেন। সাধারণ নাগরিক হিসাবে দেখলে এই সমস্ত ঘটনা স্বভাবতই আতঙ্কিত করে তোলে। সঙ্গে-সঙ্গে আবার একথাও ভাবা দরকার যে, পুলিশের গুলীতেও ত অনেক তরুণ প্রাণ হারাচ্ছেন। দোষী-নির্দোষীর প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় অনেক মানুষই ত মরছে। এবং এটাই হচ্ছে ঘটনা। কখন কিভাবে পুলিশ গুলী চালাচ্ছে সেই তর্কের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মৃত্যুর খতিয়ানই প্রমাণ করছে কারা প্রাণ হারাচ্ছে।

এমতাবস্থায় এটা পরিষ্কার প্রণিধান করা যায় যে, পুলিশের হাতে এখনও প্রচুর ক্ষমতা আছে। আত্মরক্ষার্থে হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, দেখা যাচ্ছে পুলিশ গুলী চালাতে পারেন। ফলে, অনেকে প্রাণও হারাচ্ছেন। এরপরও যদি মনে করা হয় পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে নেই তবে একটু বেশী বলা হয় নাকি? পি ডি আইন অনুসারে বিনা-বিচারে বন্দী রাখা যেত। বর্তমানে যে সমস্ত ব্যক্তিকে সন্দেহবশতঃ ধরা হচ্ছে, তাঁদের আটকে রাখা যাচ্ছে না বলেই নতুন আইন করে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়েছে। যাহোক, অর্ডিন্যান্স হয়ে বিলগুলি আইনের রূপ নিলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নাকি বর্তমান অবস্থার অবসান ঘটাতে পারবেন বলে আশা রাখেন।

বামপন্থীদের উদ্বেগ এই কারণে যে, আইন দুটি কার্যকর হলে রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে প্রকারভেদ না করেই ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হবে। ফলে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাবে। এবং পুলিশের হাতে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হলে তাঁরা নাকি অধিকতর প্রমত্ত হয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাবেন। এই আশঙ্কাও অমূলক না হতে পারে।

বামপন্থীরা এর বিরোধিতা করছেন বটে। কিন্তু রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দিহান। শ্রীধাওয়ান কয়েকদিন পূর্বেই অষ্টবামের প্রতিনিধিবৃন্দকে বলেন যে, যুক্তফ্রন্টের আমলের পি ডি অ্যাক্ট পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় চালু করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকেই অভিমত দেওয়া হয়েছিল। শ্রীধাওয়ানের কথা শুনে অষ্টবামের প্রতিনিধিদের নাকি চেহারা পাল্টে গিয়েছিল, ভয়—হাটে হাঁড়ি ভাঙলো বলে। কিন্তু বুদ্ধিমান বামপন্থী নেতারা নাকি তখনই বলেছিলেন যে, যদি কোন মন্ত্রী নিজ দায়িত্বে আটক আইন পুনরায় চালু করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে থাকেন, তবে সে-দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের নয়। কারণ ফ্রন্টের তরফ থেকে ঐরকম প্রস্তাব রাখা হয়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন যুক্তফ্রন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়ই পি ডি অ্যাক্টের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। পি ডি অ্যাক্ট খারাপ সমদর্শী কখনও বলেনি, এখনও বলছে না। সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য এ হেন আইনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় আছে। তবে এর দোষ-ত্রুটি নির্ভর করে তাঁদের ওপর যাঁরা এই আইনকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন। পি ডি অ্যাক্টের কোথাও লেখা নেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন যাঁরা করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এই আইনের কঠিন ধারাগুলি প্রয়োগ করা হবে। বামপন্থীরা ভয় করছেন এই কারণেই যে, অতীতে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। কাজেই এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই যে, আবার তাঁরা এই আইনের শিকার হবেন না।

যাহোক, আইনদুটির বিরোধিতা তাঁরা করলেও বর্তমান অবস্থার প্রতিষেধক কি বা তার বিকল্পই বা কি এ-সম্পর্কে কেউ কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেননি। পশ্চিমবাংলার মুখ্য রাজনৈতিক দল সি পি এম নকশালপন্থীদের সমাজবিরোধী বলে আখ্যা দিচ্ছেন। আগে নকশালপন্থীদের সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, রাজনৈতিক উপায়ে জনসাধারণের কাছ থেকে উগ্রপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে ঐ কৌশল সম্পর্কে সি পি এম মোটেই সোচ্চার নন। বরং উগ্রপন্থীদের সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। অর্থাৎ পরোক্ষে পুলিশ একশানের কথা বলছেন। অন্যদিকে আবার পরীক্ষা চলুক এবং বিদ্যায়তনে হামলা বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি কথাও বলছেন। কিন্তু দলের তরফ থেকে কি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা অদ্যাবধি জানানো হয় নি। মুখে বললেও উগ্রপন্থীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অন্ততঃপক্ষে এই ইস্যু নিয়ে নামতে নিমরাজী বলে মনে হয়।

ডানপন্থী কম্যুনিস্টরা উগ্রপন্থীদের এক দফা উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা উগ্রপন্থীদের এই সমস্ত কাজ থেকে বিরত হয়ে গণ-আন্দোলনে মদত করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস এস পি, এস ইউ সি, সকল দলই বিদ্যায়তনে হামলা ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। আর জনসাধারণকে বলেছেন যে, এ সমস্ত হঠকারিতার প্রশ্রয় দেওয়া আদপে উচিত নয়। কিন্তু তাঁদের দলের তরফ থেকে কোথাও কোন প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলবার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে শুনা যায় নি। যেখানে প্রতিরোধ ঘটেছে তাও দলীয় নীতির ফলশ্রুতি নয়। দলের ব্যক্তিবিশেষ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে সেটা রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

গণতান্ত্রিক দল হিসাবে একমাত্র বাংলা কংগ্রেস উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অবশ্য, সব রকম খুন-জখমেরই তাঁরা বিরোধী।

চাষী-জোতদার সংঘর্ষে যদি জোতদারও নিহত হয় তাহলে তাকে তাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে আখ্যা দিতে নারাজ। বাংলা কংগ্রেসের বক্তব্য হচ্ছে, হিংসা ও খুনের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। কাজেই উগ্রপন্থীদের নিরস্ত করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন এটাও স্বাভাবিক। বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে বিদ্রোহী পি এস পি, শাসক কংগ্রেস এবং এস এস পির কয়েকজন নেতা (এস এস পি সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করলেও সরকারীভাবে বাংলা কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে নারাজ) এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, বাংলা কংগ্রেসের প্রচেষ্টার কি পরিণতি হবে জানি না—তবে একথা সত্য যে, তাঁরা যা বলেছেন সাধ্যমত তা কার্যে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করছেন। হয়তঃ বাংলা কংগ্রেসকে এজন্য একটি বড় রকমের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক-ভাবে মোকাবিলা করতে হলে গণ-প্রতিরোধ ত গড়ে তুলতেই হয়। নতুবা পুলিশের হাতে নিরাপত্তার ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়। অন্য উপায় কি আছে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে কি বামপন্থী বা কি দক্ষিণপন্থী সকলেই একমাত্র সেখানেও দেখা যাচ্ছে মিলিতভাবে কাজ করতে অনেক দলই নারাজ। শ্রীসুশীল ধাড়ার আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তরে শ্রীঅশোক ঘোষ বলেছেন বিনা-যত্নে হামলা বন্ধ করার জন্য বেছে বেছে রাজনৈতিক দলকে ডাকলে চলবে না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিসহ সকল দলকেই আহ্বান জানাতে হবে। এই প্রস্তাবে কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছে জানা যায় নি। তবে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, যে কোন কায়দায় জোট বাধার জন্য দলগুলি আঁকুপাকু করছেন। ফলে, ইস্যুর প্রতি সিনসিয়ারিটির অভাব দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছুদিন আগে ওয়ার্কার্স পার্টির তরফ থেকে এক-জন প্রতিনিধি সমস্ত বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিভাবে শারিরীক সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যায় তার জন্য একটি গোল টেবিল বৈঠকের আবেদন জানান। এই প্রস্তাবের মূলেও ছিল কিভাবে সি পি এম ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে পুনরায় এক জায়গায় মিলিত করে আবার আলাপ-আলোচনায় রাজী করানো যায়। ওয়ার্কার্স পার্টি সি পি এম জোটভুক্ত। সি পি এম বর্তমানে যে বিচ্ছিন্নতাময় পরিবেশে ভুগ-ছেন তা কাটানোর জন্য ঐ প্রস্তাব রচিত হয়েছিল বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। নতুবা যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকাল-মৃত্যু ঘটল সেই সমস্যা নিয়ে হঠাৎ এ রকম বৈরীভাবাপন্ন দল-গুলির মধ্যে মিলনের চেষ্টা চালাবার তাৎপর্য কি? আসল ব্যাপার হচ্ছে জোট বাঁধবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনা করা, অন্য কিছু নয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে কোন সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় বা আন্দোলনের কথা বলা হোক না কেন, সব কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই এক—জোটে টান, শক্তি বাড়াও। তাতে যা ঘটুক না কেন, একমাত্র ব্যতি-ক্রম দেখা যাচ্ছে, শুধু পি ডি এ্যাকট ও জন-নিরাপত্তা বিলের সমর্থনের ব্যাপারে। প্রতিটি দল নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী এই ব্যাপারে বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। পি ডি এ্যাকটের বিরোধিতার ব্যাপারে কেউ কাউকে আগে থেকে অনুরোধ করেন নি। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ভয় পায় তেমনিই বামপন্থী দলগুলি পেয়ে এক ঘাটে নৌকা ভিড়িয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের সেই ভয় নেই। আর বামপন্থী হলেও পি এস পি মনে করে পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে এ ধরণের আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। নতুবা ইন্দিরাজী যে সমাজবাদের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন তা বাস্তবে হতে বাধা। শাসক কংগ্রেসের প্রগতিশীল কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হলে দলকে শক্ত হাতেই আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে হবে। এ যুক্তি অস্বীকার করবার নেই। কিন্তু দুঃখ হয় সি পি আই-এর জন্য। তাঁরা কি করে ইন্দিরাজীর হাত শক্ত না করে বিরোধীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন, তা বুঝা কঠিন। অবশ্য সি পি আই-এর একটি মোক্ষম যুক্তি আছে। সেটা হচ্ছে তাঁদের নীতি হল প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ইন্দিরাজীকে শক্ত, সবল করা। এখন সেই প্রতিক্রিয়াশীলরা আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জনসংঘই যখন ইন্দিরাজীকে সমর্থন করছেন তখন সি পি আই-এর বিরোধী দলভুক্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? তাই বলছিলাম নিজ নিজ দলীয় কারণেই ভূমিকার ব্যতিক্রম ঘটছে। কাজেই বেকায়দায় পড়ে এক ঘাটে ভিড়লেও কিম্বা একসঙ্গে বাম-ডান করলেও জোট-বন্দীর কথা এই বিল দুটিকে উপলক্ষ করে উঠবে না। কারণ, অন্তরে অন্তরে সকলেই চান সতীনের ছেলেকে দিয়ে সাপ ধরাতে। নিজের ছেলের উপর বিপদ কে টেনে নিয়ে আসতে চায়? অনেকেই বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে ৪৮ ঘন্টার হরতাল করে ইন্দিরাজীর এবং তাঁর সরকারের এ-হেন অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

ভাঙা কংগ্রেস কি আবার জোড়া লাগবে?

শাসক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম বলছেন, 'আমাদের দরজা তো খোলাই আছে।'

বিরোধী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন, তাঁর দলের তরফ থেকে দুই কংগ্রেসের পুনর্মিলনে উদ্যোগী হওয়ার কথাই ওঠে না। আর দুই কংগ্রেসের ঐক্যসাধনে সহায়তা করার জন্য তাঁর দলের কারও রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করারও প্রশ্ন উঠতে পারে না। 'আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধী এখন পর্যন্ত যা করেছেন তার জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করবেন কিনা এবং তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক মনোভাব বদলাবেন কিনা।'

দুই তরফের নেতাদের কথা শুনলে অন্তত মনে হবে যে, এক পক্ষ দাঁতে খড় ধরে আত্মসমর্পণ না করলে ভাঙা কংগ্রেস আর জোড়া লাগবে না।

কিন্তু বিরোধী কংগ্রেস দলের কয়েকজন সদস্য ব্যাপারটাকে এতখানি অবাস্তব বলে মনে করছেন না। করলে তাঁরা দুই কংগ্রেসের মিলনের জন্য এভাবে প্রস্তাব দিতেন না। শুধু যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাই নয়, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিরোধী কংগ্রেস দলের মধ্যে রীতিমত একটা আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে।

এই ঐক্য প্রস্তাব কয়েকটি কারণে সবিশেষ তাৎপর্য লাভ করছে। কারণগুলি হল : ১। যাঁরা এই প্রস্তাব দিচ্ছেন তাঁরা নিতান্ত মামুলি সদস্য নন। এঁদের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য আছেন, এমন কি লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের চীফ হুইপও আছেন। তাছাড়া মহীশূরের দুজন মন্ত্রীও দুই কংগ্রেসের ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। ২। এই ঐক্যপ্রয়াসের পিছনে বিরোধী কংগ্রেস দলের কয়েকজন উপরতলার নেতার হাতও যেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গুজরাটে ঐক্যপন্থী বিরোধী কংগ্রেসীরা প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ এন ডেবরকে তাঁদের নেতা হিসবে পেয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। লোকসভার বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ রামসুভগ সিং ও উত্তরপ্রদেশের বিরোধী কংগ্রেস নেতা শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে বলে কোন কোন মহল অনুমান করছেন। ঐক্যপ্রস্তাবে অন্যতম স্বাক্ষরকারী লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীশিউনারায়ণ নিজে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের বিশেষ অনুগত। তিনি দুই কংগ্রেসের ঐক্যের আহ্বান জানানোতে ওয়ার্কিং কমিটি অখুশী হয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি আর একটি বিবৃতি দিয়ে দুই কংগ্রেসের ঐক্যের জন্য কাজ করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শ্রীশিউনারায়ণ নাকি ইতিমধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এবং এই সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীমতী গান্ধী নাকি শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের খুব প্রশংসা করেছেন। ৩। শাসক কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য ইতিমধ্যে এই ঐক্যপ্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন এবং দুই তরফের ঐক্যপন্থীদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বানেরও প্রস্তুতি চলেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গত এক বছরের মধ্যে কয়েকবার দুই কংগ্রেসের পুনর্মিলনের কথা উঠেছে। কিন্তু সে সব কথা কখনই খুব বেশী দূর এগোয় নি। এবারও যে এটা কথার কথাই হয়ে থাকবে না তা বলা যায় না। যদিও ব্যাপারটা এবার অনেক দূর গড়িয়েছে।

কংগ্রেসের ইতিহাসের বিয়োগান্ত পরিণতিটিকে মিলনান্ত পরিণতি দেবার এই চেষ্টা এখন নূতন করে শুরু হল কিনা তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কিছু কিছু জল্পনা-কল্পনা চলছে। একটি গবেষণা হল এই যে, দুই কংগ্রেসের রাজনীতি যে খাতে বয়ে চলেছে তাতে দুই তরফেরই কিছু কিছু সদস্য উদ্বেগ বোধ করেছেন। কংগ্রেসকে কম্যুনিস্টদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হোক এটা যেমন এক তরফের সদস্যরা চাইছেন না, তেমনি অন্য তরফের সদস্যরা চাইছেন না যে, কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়ুক। এই দুই বিপরীত প্রবণতা থেকে উদ্ধার করে কংগ্রেসকে মধ্যপথে রাখার আগ্রহেই হয়ত ঐক্যপন্থীরা আসরে নেমেছেন। দ্বিতীয় আর একটি অনুমান হচ্ছে, এই সব ঐক্যের কথা বলার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই কংগ্রেসের সম্ভাব্য বন্ধুদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা। দুধে-আমে মিশে গেলে অতঃপর আঁটি পড়ে থাকতে পারে—এই ভাবনায় সি পি আই, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ইত্যাদি সকলেই বেসামাল হয়ে উঠতে পারে, এই অঙ্ক কষেই হয়ত দুই কংগ্রেসের ঐক্যের কথা চালু করা হচ্ছে। তৃতীয় আর একটি অনুমান এই যে, বিরোধী কংগ্রেস দলের সাধারণ সদস্যরা অনেকেই দলের কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না এবং তাঁরা সময় থাকতে থাকতে শাসক কংগ্রেসে ভিড়ে পড়বার সুযোগ নিতে চাইছেন; তাঁদের ঐক্যপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলে তাঁরা শাসক কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার অজুহাত পাবেন।

*

এখন এটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, পূর্ব পাকিস্থানের সমুদ্রকূলবর্তী জেলাগুলির উপর দিয়ে যে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বয়ে গেছে সেটা মানবেতিহাসের না হলেও, বিংশ শতাব্দীর ভয়ংকরতম প্রাকৃতিক বিপর্যয়। খুলনা, নোয়াখালি, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় প্রকৃতির রুদ্ররোষ মহাপ্রলয়ের ধ্বংসস্বাক্ষর রেখে গেছে। কত গ্রাম যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কত মানুষ যে মারা গেছে তার কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব এখন পর্যন্ত তৈরী হয় নি। সর্বশেষ সরকারী হিসাবে বলা হচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যা ৪১ হাজার, কিন্তু বেসরকারী হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা পনের লক্ষের বেশী হতে পারে বলে বলা হয়েছে। যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরাও চারিদিকে গলিত মৃতদেহের মধ্যে বুভুক্ষায়, রোগে, মহামারীতে মৃত্যুর দিন গুনছেন।

এই ঘূর্ণিঝড়ের অব্যবহিত পরে বিধ্বস্ত এলাকার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একজন বিমানচালক সংবাদ দেন যে, বিধ্বস্ত এলাকার আয়তন হাজার দশেক বর্গমাইল এবং কতকগুলি অঞ্চলে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের খবর পাওয়া মাত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে পাকিস্থানে বাণী পাঠিয়েছেন। দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণকার্যের জন্য ভারত সরকার প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা

করেছিলেন, পরে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে এক কোটি টাকা করা হয়েছে।

ঘটনার চারদিন পরে সাংবাদিক সম্মেলনে একটি বিবৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্থানের রিলিফ কমিশনার বলেন যে, মোহানা এলাকার দ্বীপগুলিতে যে সব ত্রাণকর্মীর দল গিয়ে পৌঁছচ্ছেন তাঁদের প্রথম কাজই হচ্ছে হাজার হাজার মৃতদেহ কবর দেওয়া। পচা-গলা লাশের দুর্গন্ধের মধ্য দিয়ে এবং বাঁশ ও গাছপালায় বোঝাই জলপথের উপর দিয়ে পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে এবং নৌবাহিনীর জাহাজগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বিপর্যয়ে যে সব অঞ্চল সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হাতিয়া দ্বীপ। ঘূর্ণিঝড়ের চারদিন পরে তিনখানি জাহাজ ওষুধপত্র ও অন্যান্য সাহায্য নিয়ে ঐ দ্বীপে ভিড়বার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দ্বীপের চারদিকে সমুদ্রের ঘূর্ণিপাক এখনও এমন প্রবল যে, জাহাজগুলি তাদের মাল খালাস করতে পারে নি।

পাকিস্থান বেতারের একটি খবরে বলা হয়েছে যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী ২৮৩৮ বর্গমাইল এলাকায় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম বন্দরের অদূরে ১৩টি দ্বীপে একজনও বেঁচে নেই। ভোলা দ্বীপের উপর বিমানে উড়ে গিয়ে দেখা গেছে, দশ লক্ষ অধিবাসীর এই দ্বীপের প্রায় সবকিছুই বিধ্বস্ত হয়েছে, গোটা দ্বীপটাই বিস্তীর্ণ জলরাশিতে পরিণত হয়েছে, ঐ জলরাশির মধ্যে এখানে-সেখানে শুধু দুই-এক টুকরো জমির আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

মানপাড়া নামক দ্বীপে প্রথম ত্রাণকর্মী গিয়ে পৌঁছলে যে মানুষগুলি বেঁচে গেছেন তাঁরা ভেজা, ছেঁড়া জামাকাপড় পরে এসে খাবার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কাকুতি-মিনতি জানাতে থাকেন। পশুর লাশে সমস্ত জলাশয়ের জল দূষিত হয়ে গেছে। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, এই দূষিত জল ব্যবহার করে বিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষগুলি কলেরায় আক্রান্ত হচ্ছেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের ১৪ জন প্রতিনিধির একটি দল এই বিপর্যয়ের সময় পূর্ব পাকিস্থানের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সফর করছিলেন। প্রথমে কয়েকদিন তাঁদের কোন খবর না পাওয়া যাওয়ায় তাঁদের সম্পর্কে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছিল। পরে জানা গেল, তাঁরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন।

এই প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ এইচ পি ডুগান সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগ থেকে উদ্ধার পেয়ে ঢাকায় ফিরে এসে বলেছেন যে, তাঁরা যখন পাথরঘাট এলাকায় একটি বাঁধের কাজ পরিদর্শন করছিলেন (সমুদ্রোপকূলে এই বাঁধ নির্মাণে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সাহায্য দিচ্ছেন) তখনই ঘূর্ণিঝড়ের লক্ষণগুলি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। রেডিও শুনে আমরা বুঝতে পারি যে, দারুণ একটা কিছু হতে চলেছে।
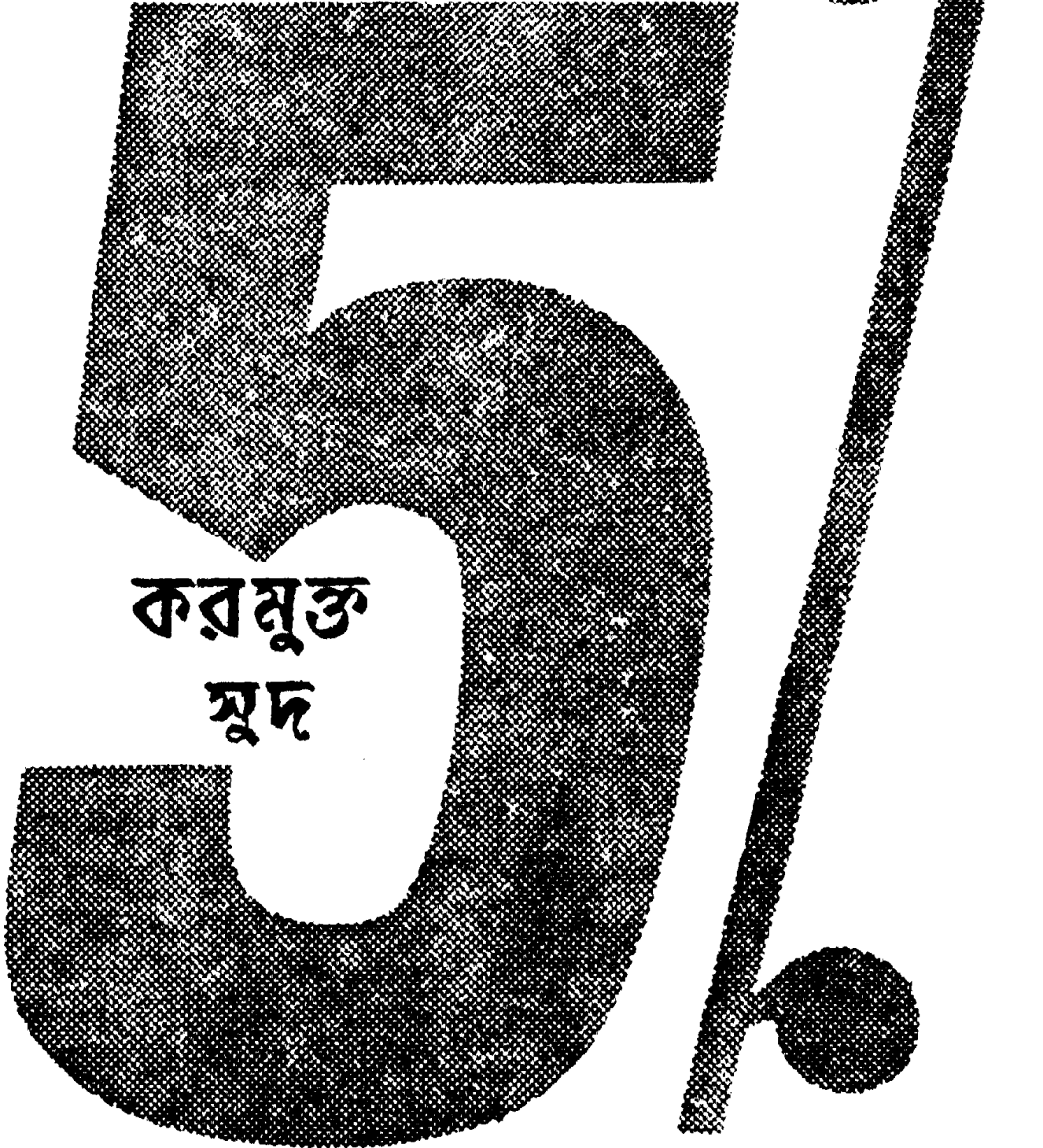
মিঃ ডুগান বলেন যে, ঐ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়েছিল তাই রক্ষা। ঝড়ের সময় তাঁরা নিকটবর্তী একটি বাংলোতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে বাংলোর একতলায় যখন ফুটখানেক জল দাঁড়িয়ে গেল তখন প্রতিনিধি দলের ১৬ জন (এঁদের মধ্যে বৃটেন, হল্যান্ড, স্পেন ও ক্যানাডার মানুষ আছেন) বাংলোর দোতলায় উঠে গিয়েছিলেন।

পূর্ব পাকিস্থানের এই উপকূলবর্তী জেলাগুলির উপর দিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ বারবার এই ধরণের বিধ্বংসী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ১৯৬০ সাল থেকে এই নিয়ে দশবার ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বান হল।

সবার (এমন কি রাজনীতির) উপরে তুফান সত্য! তাহার উপরে নাহি!

এর আগের নয়টি বন্যায় সবশুদ্ধ মোট ৫৫ হাজার জনের প্রাণহানি হয়েছিল।

এই অঞ্চলে ঝড় ও বানের সবচেয়ে পুরাতন উল্লেখ আছে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে। সেটা ১৫৬৪ সালের ঘটনা।

পাকিস্থানের এই প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য পৃথিবীর ছোট-বড় নানা দেশ থেকে টাকা-পয়সা ও ত্রাণ-সামগ্রী এসে পৌঁছচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ও প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড হ্যামব্রো সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রস, ইউনেস্কো, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও সাহায্যসম্ভার নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

এই সব সাহায্যসম্ভার ঢাকায় এসে জমা হলেও সেগুলি বিধ্বস্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষকে কতকটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তার কারণ, যথেষ্ট সংখ্যক বিমান ও হেলিকপ্টার নেই। বিমান ও হেলিকপ্টার দিয়ে সাহায্য করার জন্য পাকিস্থান বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

*

দক্ষিণ সমুদ্রের অভ্যন্তর থেকে উত্থিত এই ঝড় যখন পূর্ব পাকিস্থানের উপকূলকে আঘাত করছিল তখন পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ছিলেন পিকিং-এ।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চীন সফরের শেষে যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে সেটি একটি কারণে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই কারণটি হল এই যে, এই ইস্তাহারের কোথাও নাম করে ভারতের উল্লেখ করা হয় নি। অন্যান্য বারের মত এবারও চীন কাশ্মীরের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে এবং তদুপরি এবার আরও এক-পা বাড়িয়ে বলেছে যে, কাশ্মীর থেকে সৈন্য অপসারণ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা 'সকল দেশের সমর্থন পাওয়ার যোগ্য'। কিন্তু তাহলে ভারতবর্ষের নাম যে ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয় নি এটা অনেকে তাৎপর্য-পূর্ণ বলে মনে করছেন।

আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, গঙ্গার জল সংক্রান্ত বিরোধে চীন সরাসরি পাকিস্থানের মত সমর্থন না করে শুধু এইটুকু বলেছে যে, পাকিস্থান যে শান্তিপূর্ণভাবে এই বিরোধের মীমাংসা করতে চাইছে চীন তার তারিফ করে। ইস্তাহারে একথাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে যে, গঙ্গাজল সংক্রান্ত বিরোধের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিল পাকিস্থান।

কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন, এবারকার চীন-পাকিস্থান যুক্ত ইস্তাহারে এই বাকসংযম দেখান হয়েছে ভারতের কথাটা মনে রেখেই। চীন ভারতের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে সেই ধারণা চীন নষ্ট করতে ইচ্ছুক নয়। সেই কথাটাই সম্ভবত সে এই ইস্তাহারের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিল।

২০-১১-৭০ —পুণ্ডরীক

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের বৃহত্তম দুর্যোগ

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের জন্য আমরা আজ গভীর বেদনা বোধ করছি। প্রায় প্রতি বছরই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এবারে তার ক্ষতির কোনো তুলনা নেই। মানব ইতিহাসে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এত লোক একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। মৃত্যু তার নখরচিহ্ন রেখে গেছে সর্বত্র। ভোলা, হাতিয়া, চরজব্বর ইত্যাদি অঞ্চলে প্রাণের চিহ্ন নেই বললেই চলে। যারাও জীবিত আছে সময়মত সাহায্যের অভাবে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় এবং রোগে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের এই মর্মান্তিক দুঃসময়ে আমরা ভারতবর্ষের ও এই বাংলার মানুষ তাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। মানুষের দুর্দিনে মানুষ তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় এতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়। আজ শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর সকল দেশই এগিয়ে এসেছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সহায়তায়। ভারত তার সাধ্যমত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী পাঁচ লক্ষ টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছিলেন। পরে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির ভয়াবহতার বিবরণ জানবার পর এক কোটি টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছেন। প্রয়োজনের তুলনায় এ অঙ্ক নিতান্তই সামান্য। কিন্তু এর দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারতের জনগণের প্রীতি ও সৌহার্দ্যবোধই প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়া পাকিস্তানে বিমানযোগে সাহায্য পৌঁছুতে হলে ভারতের ওপর দিয়ে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন ভারত সরকার শিথিল করে দিয়েছেন। অথচ দুঃখের কথা এই যে, পাক-ভারত মৈত্রীবোধ ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের বি বি সি একটা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছিল যে, ভারত পাকিস্তানগামী ইরানীয় বিমান ভারতের ওপর দিয়ে যেতে দিতে অযথা বিলম্ব করেছে। এই সংবাদ নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে, পাকিস্তানগামী সমস্ত রিলিফ বিমানকে ভারতের ওপর দিয়ে যাবার সময় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুমতি দেওয়া হবে। তার জন্য আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের নিয়মের কড়াকড়ি প্রযোজ্য হবে না।

মানুষের দুঃখের দিনেও রাজনৈতিক অপপ্রচারের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা আশা করি যে, পাকিস্তান সরকার বিদেশীদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এবং ভারত সরকারের কাছে খোঁজ না নিয়ে পাক-বেতারে এ ধরনের ভারত-বিরোধী সংবাদ প্রচার করতে দেবেন না।

পাকিস্তান দুই প্রান্তে বিভক্ত হওয়ায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষেও ত্রাণকার্য ত্বরান্বিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ঝড়-বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণকার্য চালাবার জন্য দরকার হেলিকপ্টারের। মার্কিন সরকার ছটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের নিজস্ব হেলিকপ্টার পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় তা সময়মত সেখানে তাঁরা পাঠাতে পারলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীর যে-বিবরণ ঢাকার সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায় যে, ঘূর্ণিঝড়ের এক সপ্তাহ পরেও বিধ্বস্ত এলাকায় হাজার হাজার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। তার ফলে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে বাতাস ও জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। যারা জীবিত আছে তাদের কাছে রিলিফ কর্মীরা পৌঁছুতেই পারছেন না। জীবিতরা খাদ্যের অভাবে এবং ওষুধের অভাবে মারা যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সরকার মাত্র দেড় লক্ষ মৃতের সংখ্যা গণনা করতে পেরেছেন। ঢাকার সংবাদপত্রাদিতে মৃতের সংখ্যা দশ থেকে কুড়ি লক্ষ হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। বরিশাল, পটুয়াখালি, খুলনা ও দ্বীপগুলোর অবস্থা শোচনীয়। জীবিতরা বিবস্ত্র হয়ে পড়ায় মৃতদেহ থেকে কাপড়-জামা টেনে নিয়ে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করছে। এদের উদ্ধারকার্যের জন্য যে-জনবল ও প্রশাসনিক দক্ষতা দরকার তা পাকিস্তান সরকার দেখাতে পারছেন না বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। সামরিক বাহিনী কেন প্রয়োজনীয় বিমান সরবরাহ করতে পারে নি, পাকিস্তানের রিলিফ কমিশনার সে-সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক উত্তর সাংবাদিকদের দিতে পারেন নি।

গত ২০ নভেম্বর পাকিস্তানের সর্বত্র ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে। পাকিস্তানের এই দুর্দিনে আমরাও অন্তরের সমবেদনা জানাই। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রস্তাব এই যে, দুঃস্থ, আর্ত পূর্ববঙ্গবাসীদের সেবার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবীদল প্রেরণ করা হোক। পাকিস্তান সরকার যদি ভারতীয় রিলিফকর্মীদের পাকিস্তানে যাবার সুযোগ দেন তাহলে আমরা আশা করি এদেশ থেকে অনেক স্বেচ্ছাসেবী ও সেবা প্রতিষ্ঠান দুর্গত পূর্ব বাংলায় গিয়ে আর্ত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। পাক-ভারত মৈত্রীর এই সুযোগ যেন আমরা না হারাই। দুঃস্থের সেবাই মানবধর্ম। রাজনীতির প্রাচীর যেন সেই মানবধর্মের পথ রোধ করে না দাঁড়ায়।

পরলোকে রামন

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ সি ভি রামন গত ২১ নভেম্বর ব্যাংগালোরে মারা গেছেন। পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদান তাঁকে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির আকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। শেষদিনটি পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতির অদম্য প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং তরুণদের মনে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উৎসাহ জাগিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানই আমার ধর্ম এবং আমি এর শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে চাই।' তাঁর মৃত্যু যে আমাদের দেশের পক্ষে কি নিদারুণ ক্ষতি, তা অপরিমেয়। জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ সত্যেন বসু বলেছেন, রামনের মৃত্যু, 'এক বিরাট জাতীয় ক্ষতি এবং এর দ্বারা যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা পূরণ করা কঠিন।'

চন্দ্রশেখর ভেংকটরামন ১৮৮৮ খৃঃ ৭ নভেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশাখাপত্তনম-এর হিন্দু কলেজের গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। শ্রীরামন সর্বোচ্চ ডিস্টিংসনসহ ব্যাচেলার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তরুণ রামন শব্দবিজ্ঞান এবং আলোকবিজ্ঞানে মৌল গবেষণা শুরু করেন। ১৯০৬ খৃঃ 'নেচার' ও ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। তখন রামনের বয়স মাত্র ১৮ বছর।

১৯০৭ খৃঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রামন ভারতীয় অর্থ বিভাগে গেজেটেড অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন। এরপর দশ বছর তিনি ১৯১৭ খৃঃ পর্যন্ত ভারত সরকারের অফিসার হিসাবে কাজ করেন। কর্মস্থল বেশীরভাগ সময়ই ছিল কলকাতা। ১৯০৭ খৃঃ থেকেই রামন নেচার, ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন এবং ফিজিক্যাল রিভিউ-এ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করতে থাকেন।

১৯১৭ খৃঃ ভারতের বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি পড়ে রামনের প্রতিভার ওপর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নবসৃষ্ট পালিত চেয়ারের (পদার্থ) জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি খুঁজছিলেন। তিনি ডঃ রামনের সঙ্গে যোগাযোগ করে উক্ত পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ডঃ রামন সাগ্রহে এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। ডঃ রামনকে পালিত অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। সরকারী চাকুরীর মোহ ছেড়ে ডঃ রামন অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খৃঃ পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর সেক্রেটারীও ছিলেন। কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারেই ডঃ রামন তাঁর অধিকাংশ পরীক্ষামূলক কাজ সম্পাদন করেন।

১৯২১ সালে পালিত অধ্যাপক হিসাবে ডঃ রামন ইওরোপে যান অক্সফোর্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্যাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে।

এই সময়ই এক ঘটনায় ডঃ রামন তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূত্র পান। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে আকাশ ও সমুদ্র দুয়েরই রং নীল কেন? এই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসারই পরিণতি হয় তাঁর আবিষ্কারে, যা 'রমণ এফেক্ট' নামে খ্যাত। এ বছরই ডঃ রামন আলোর প্রক্ষেপণ সম্পর্কে কাজ শুরু করেন এবং ১৯২৪ সালের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। কানাডায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনাচক্র উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রিত হন।

১৯৩০ খৃঃ ডঃ রামন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বৃটেনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডকটরেট ডিগ্রী দেন। ডঃ রামন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দ্বিতীয় ভারতীয়। তাঁর আগে এই পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে।

বেশ কিছুকাল রামন তাঁর শিক্ষায়তন ও গবেষণাগার ডঃ রামনস্ ইনস্টিটিউটে বসবাস করতেন। গত একমাস তিনি তাঁর গবেষণা কাজ বন্ধ রেখেছিলেন। রামনস ইনস্টিটিউটের সামনের তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ডঃ রামনের মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

—সাংবাদিক

ফাঁদ

প্রলয় সেন

ছেলের দল রতনকে আবিষ্কার করেছিল শেষবেলায়। ওরা শহরতলীর দক্ষিণের মাঠে ফুটবল খেলছিল। মাঠের পুব-পশ্চিমে আড়াআড়ি, এদিকের রেললাইন থেকে দূরের বাসরাস্তা অব্দি মস্ত এক গড়খাই। বহুকাল হল সংস্কারের অভাবে অপরিচ্ছন্ন। তারপর বেশ কিছু উঁচুমত জায়গা। কয়েকটা বাজেপোড়া মাথাভাঙগা তালগাছ কালকাসুন্দে আশশেওড়া কাঁটাঝোপ আর ইতস্তত জংলা গাছ-গাছালিতে দুর্গম। তারও পরে নাবাল জমি, বর্ষায় জলডুবি, নিষ্ফলা, আদিগন্ত ধুধু। ওধারের জঙগলে এক শিরীষগাছে রতন ঝুলেছিল।

রতন ঠিক কখন ওধারে গিয়েছিল বলা মুস্কিল। শিরীষগাছের নিচের দিককার এক পুরুষ্ট ডালে পাটের ফেঁসো পাকিয়ে পাকিয়ে মোটা করে ফাঁসটা বেঁধেছিল রতন। তারপর ফাঁসে গলা ঢুকিয়ে ঝুলে পড়েছিল। এসব কাজ রতন ধীরেসুস্থে করেছিল। কেননা, জায়গাটা এতই নির্জন যে আত্মঘাতী হতে তাড়াহুড়োর কোন দরকার ছিল না। এদিকটায় লোকজন বড় একটা আসে না। শেয়ালের পাল দিনদুপুরেও ঘুরে বেড়ায়। বাতাসের সাড়া পেয়ে গোক্ষুর গর্ত থেকে বেরিয়ে ফণা তুলে হিসহিস শব্দ করে। কদাচিৎ এধারে যারা আসে তারা পেশায় মুদ্দাফরাস। এ অঞ্চলটা বহুকাল হল বেআইনী ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসে। ওরা হাড়গোড়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া, শীতের দিকে কিছু কাঠকুড়োনীকেও দেখা যায়। অজস্র বৃষ্টির দিনে কেউ এদিক মাড়াবে না—রতন জানত।

কণ্ঠনালীর মূল থেকে ফাঁসটা ওপাশের শিরদাঁড়ার গোড়া অব্দি চেপে বসেছিল। সময়টা শ্রাবণের শেষ। খেয়ালি আকাশ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এসে রতনের ঝুলন্ত শরীরে অজস্র নদীনালা এঁকে দিচ্ছিল। দূরের নাবাল জমি থেকে বাতাসের ঝাপটা থেকে থেকে ছুটে এসে সারাটা দুপুর রতনকে নাড়িয়ে দোদুল্যমান করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। দুপা জোড়া পায়ের পাতা গোড়ালি থেকে ফলার মত ঢাল হয়ে নেমে। চুলের ডগা কানের লতি নাকের ধার থুতনি এবং হাত পায়ের কুড়িটা আঙুল থেকে মটরদানার মত বৃষ্টিবিন্দু টুপটাপ ঝরে পড়ে নিচের ভাটজংগলকে চঞ্চল করে তুলেছিল। দুচোখ স্থির, অল্প নীল, ঈষৎ আয়ত দৃষ্টি যেন ভেতরের দিকে গোটানো। জিভের খানিকটা অংশ বাইরে বেরিয়ে যেন কেউ ইচ্ছের বিরুদ্ধে অদৃশ্য হাতে ভেতর থেকে টেনে বের করেছে। ঠোঁটের দুপাশে গ্যাঁজলা, বৃষ্টিধারায় ধুয়ে রুপোলি রেখার মত চিবুক অব্দি নেমে এসেছে। পরনে খাকির প্যান্ট, আদুল গা, কোমরের ঘুনসিতে একটা ফুটো পয়সা। বাঁ-হাতে মস্ত একটা উল্কি। চৌকো রুপের হাঁসুলিটা ফাঁসের নিচে কণ্ঠার দুই হাড়ের মাঝখানের গর্তে চেপে বসে। কিছু ডেঁয়ো পিঁপড়ে রতনের

শরীরের আনাচেকানাচে ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল। বৃষ্টি ধরে আসতে একবার একজোড়া মাছরাঙা গড়খাইয়ের পানা-দাম থেকে উঠে এসে রতনের কাঁধে বসে শরীর কাঁপিয়ে ডানা থেকে জল ঝেড়েছিল। তারপর ওর কণ্ঠার হাড়ে বারকয়েক ঠোঁট ঘসে জলডুবি নাবাল জমির দিকে উড়ে গিয়েছিল। রতনের মাথায় বৃষ্টির জলের সংগে কিছু কুটো পাখির খসা পালক পড়ে চুলে জড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি থেমে মেঘের কপাট ভেঙে সূর্যের আলো মাথার ওপরকার ছাতার মত প্রশস্ত গোলাকার শিরীষগাছের পাতার জাফরি ভেদ করে রতনের জলে ভেজা মসৃণ শরীরে ছোপ ছোপ আগুনের ফুলকির মত জ্বলছিল।

রতনদের আস্তানা এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। রেলস্টেশনে উঠে উত্তরদিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁদিকে বাজার ছাড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলে রেললাইনের ধার ঘেঁসে সারিসারি দরমাচটা প্লাইউডে ঘেরা খুপরি চোখে পড়বে। তারই একটায় রতন থাকত। রতনের বাপ নেই মা আছে। ওর যখন বয়েস বছর দুই কি তিন বাপ বিনোদ গড়াই নন্দরাণী আর তাকে নিয়ে দূরে কোন এক বানভাসি গাঁ থেকে হটে এসে এখানে ঠাঁই নিয়েছিল। বিনোদ গড়াই ট্রেনে মশলামুড়ি বেচত। কয়েক বছর আগেকার কথা, রতনের বয়েস তখন বড়জোর আট কি নয়, এ লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়নি, কামরা বদল করতে গিয়ে পা হড়কে চলন্ত গাড়ির তলায় পড়ে কেটে দুভাগ হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর দিনকয়েক আছাড়-পিছাড়ি করে শেষমেষ নন্দরাণী গোবিন্দ মণ্ডল নামে এক মরদকে ঘরে তুলতে বাধ্য হয়েছিল। বিনোদ গড়াই যখন মারা যায় নন্দরাণী তখন সোমথ বয়সের মেয়েমানুষ। সারা শরীরে যৌবন দগদগ করছে। সন্ধের পর গেরস্থপাড়ার তিকরমবাজ ছেলে-ছোকরারা বরাবর এই সব খুপরির আশেপাশে ঘুরঘুর করে। অন্ধকারটা একটু গেঁজে উঠলে খুপরি থেকে বেরিয়ে আসে কিছু জাঁহাবাজ লোক। তারপর, অনেক রাত পর্যন্ত রেললাইনের ধারে বসে ওরা মাটির খুরিতে দিশি মদ ঢেলে মোচ্ছব বসায়। ওদেরই এক বখে যাওয়া ছোকরার কুদৃষ্টি পড়েছিল নন্দরাণীর ওপর। শুধু রাতের অন্ধকারেই নয়, দিনেদুপুরেও রতনদের খুপরির চারপাশে ঘোরাফেরা করত। সুযোগ পেলে চোখ ঠেরে শিস দিয়ে অশ্লীল অংগভংগি করে নন্দরাণীকে ব্যতিব্যস্ত করত। উপায়ান্তর না দেখে শেষটায় গোবিন্দ মণ্ডলকে জুটিয়েছিল। গোবিন্দ দশাসই চেহারার জোয়ান মরদ। রীতিমত রাগীদাবি শক্তসমর্থ মানুষ।

ছেলের দল রতনের হদিশই পেত না, যদি না একবার বলটা বেমক্কা গোলপোস্ট ছাড়িয়ে গড়খাইয়ের কচুরীপানায় আটকে যেত। ছেলেদের মধ্যে একজন, হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি নেমে মাঠ জলকাদায় পিছল হয়ে ওঠায় খেলা তেমন জমছিল না বলে মনমরা ছিল। দুঃসাহসিক হয়ে ওঠার মত একটা মওকা পেয়ে সে তীরের বেগে গড়খাইয়ের দিকে ছুটে গিয়েছিল। বুকজলে নেমে এদিক-সেদিক কচুরীপানার ভেতর বুনোমোষের মত দাপাদাপি করার সময় ছেলেটি ওধারের শিরীষ গাছে ঝুলন্ত রতনকে দেখতে পেয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে ডাঙায় উঠে বলটা মাঠের দিকে আনতাবড়ি শট করে বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিল, বিল্-টু, বিল্টু—

বিনোদ গড়াই মারা যাবার পর থেকেই রতন ক্রমশ বিগড়ে যেতে শুরু করল। ঘরে মন বসত না। সারাদিন বাইরে বাইরে আগলবাগল ঘুরত। গোবিন্দর অসাক্ষাতে নন্দরাণী ছেলেকে ধমকধামক দিত। তাতে ফয়দা হয়নি কিছুই। বরং, দিনকে দিন কুসংগে পড়ে রতন নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। চায়ের দোকানে বয়ের কাজ, বাজারের মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রি, ছোটখাটো মোট বওয়া ইত্যাদি থেকে শুরু করে শেষটায় পয়সার লালচ বেড়ে যাওয়ায় তেরো বছরের ছেলে রতন দুর্দান্ত হয়ে উঠল। দলে ভিড়ে চোরাগোপ্তা ছিনতাই টুকটাক চুরি এমন কি পকেট কাটতে শিখে গেল। কানাঘুষোয় এসব কথা নন্দরাণী জানতে পারলেও গোবিন্দর কানে তুলত না কক্ষনো। লোকটা এম্নিতে চুপচাপ, সাতপাঁচ ঝুটঝামেলায় নেই, কিন্তু রেগে গেলে চণ্ডাল। তখন নন্দরাণীকেও ঘাকতক বসাতে কসুর করে না। নন্দরাণী রতনের কুকীর্তি ঢেকে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কখনো-সখনো তার আড়াল টপকে কিছু কিছু গোবিন্দর কানে পৌঁছুত। তখন রেগে গিয়ে গোবিন্দ রতনকে বেধড়ক পিটত। ছেলের হয়ে নীরবে চোখের জল মোছা ছাড়া আর কিছুই করার থাকত না নন্দরাণীর। প্রথম দিকটায় গোবিন্দ যে রতনের ওপর অকরুণ ছিল এমন নয়। বরং ছেলেটা অন্যের হলেও একদা নন্দরাণী ওকে পেটে ধরেছে এই ভেবে রতনকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করেছিল। তাছাড়া, গোবিন্দর প্রতি নানাকারণেই নন্দরাণী কৃতজ্ঞ ছিল। নন্দরাণীর ব্যাপারে লোকটার টানভালবাসা ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলতে যা বোঝায় সেটুকু ওই লোকটার দৌলতেই সে খানিকটা পেয়েছিল। গোবিন্দ পাকা ছুতোর মিস্ত্রি, ভাল আয়। বিনোদ গড়াইও লোক খারাপ ছিল না। তবে; তার রোজগারে সংসারের আসান হত না। নন্দরাণীকে আশপাশের ভদ্রবাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ করে সামাল দিতে হত। গোবিন্দর আমল থেকে রথের খাটুনি কমল। বাইরে বেরুতে হত না। যদিবা একটু সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছিল নন্দরাণী, গেরো বাঁধল অন্যদিক থেকে। পেটের ছেলে শত্তুর হয়ে তাকে কাঁদাতে লাগল।

ছেলেটির আকাশফাটানো চিৎকারে খেলুড়েরা সচকিত হয়ে উঠল। বিল্টু,—যে দলের পাণ্ডা, ভীষণ একটা কিছু ঘটে গেছে ভেবে, সকলকে ঠেলেঠুলে গড়খাইয়ের দিকে ছুটে এল। বলল, কি হলরে ভুটা, চেঁচালি কেন। সাপেটাপে কামড়ায় নিতো?—ভুটা দম নিতে গিয়ে বাক্যস্ফূর্তি না হওয়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে ওধারের শিরীষ গাছটার দিকে হাত তুলল। ততক্ষণে মাঠের ছেলেরা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিল্টু চোখ বড় করে বলে উঠল, তাই তো। একটা মানুষ মনে হচ্ছে—। সংগে সংগে পেছনের সবাই একযোগে গলা ছাড়ল, মানুষ! মানুষ!

বিল্টু শব্দ করে পিচ কেটে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি ছেলেকে বলল, স্যাণ্টো, তুই বলটা নিয়ে আয়—।—কথা শেষ করেই ছুটে এক লাফে রেললাইনে উঠল। ছেলের দল হই হই করে দলপতির পিছু নিল। গড়খাইটা গজ তিরিশেক হবে। রেললাইনে উঠে ওধারে যেতে আরো কিছুটা বেশি হবে। ছেলের দল নিমিষে রেললাইনের পথটুকু কাবার করে ওধারে পৌঁছল।

রতনকে আজ নন্দরাণী শেষবারের মত দেখেছিল বেলা বারোটা নাগাদ। এর কিছুক্ষণ আগে রেললাইন আর নয়ানজুলির মাঝখানের ঘাসজমিতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। গোবিন্দ বেরোয় ভোর ভোর। ফেরে মাঝবেলায়। তিলজলার এক কাঠ গোলায় ফুরনে কাজ করে। এসে নাকেমুখে যাহোক দুটো গুঁজে ফের ছোটে। সকাল থেকেই রতন ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। রতনকে এতটা মরীয়া হয়ে উঠতে নন্দরাণী এর আগে কখনো দেখেনি। গোবিন্দ আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও। গোবিন্দ অবলীলায় ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসে বেদম পিটিয়েছে। তারপর ঘরে এসে ভাতের থালা কাছে টেনে গম্ভীর মুখে বলেছে, দেখলে তো তোমার গুণধর ছেলের কাণ্ডটা। এরপরেও ওকে ঘরে জায়গা দিতে চাও?—নন্দরাণী রা কাড়েনি। রান্নাঘরে গিয়ে তরকারির বাটি নিয়ে আসবার ফাঁকে ছিঁটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে একঝলক বাইরে তাকিয়েছে। রতন ঘাসজমিতে দাঁড়িয়ে বুকটা হাপরের মত দমকে দমকে ফুলিয়ে গোবিন্দকে উদ্দেশ করে তখন অশ্রাব্য গালি পাড়ছিল। ওর চোখর কানাৎ বেয়ে খানিকটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। ধস্তাধস্তিতে ডানপায়ের হাঁটুর মুড়োর বেশ খানিকটা ছড়ে গিয়েছিল। রতন তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, আয় শালা বেরিয়ে। লজ্জা করে না শুয়ার আমার জিনিসে হাত দাও—

ঘরে ফিরে নন্দরাণী গোবিন্দর পাতে ডাল দিয়েছে। আজকের ঘটনাটার জন্য রতনের পক্ষ নিয়ে নন্দরাণী গোবিন্দকে দুকথা শোনাতে পারত। দুদিন আগে, যখন রতন বাড়িতে নেই, নন্দরাণীর নিষেধ কানে না তুলে,—কিছুটা গোঁয়ার্তুমি করেই গোবিন্দ অমন কাণ্ডটা বাঁধিয়ে না বসলে আজকে এমন একটা বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা ঘটত না। কিন্তু, ভয়ে নন্দরাণীর মুখে কথা ফোটেনি। একেই দিনকয়েক হল শরীরটা বেচাল ঠেকছে। উপরন্তু, কিছুক্ষণ আগে গোবিন্দ যেভাবে রতনকে পিটিয়েছে তারপর ভাতের থালা সামনে বেড়ে দিয়ে নতুন করে প্রসংগটাকে সে খুঁচিয়ে তুলতে চাইল না।

গোবিন্দ বেরিয়ে যেতে নন্দরাণী খুপরির

বাইরে এসে নিচুস্বরে বলেছিল, রতন, ঘরে আয় বাপ্। আর পাগলামি করিস না।

হাতের চেটো দিয়ে চোখের নিচের রক্ত মুছে নিয়ে রতন গর্জে উঠেছিল, আমি আর ওশালার ঘরে যাচ্ছি না। তুই বেরিয়ে আয়।

নন্দরাণী মলিন হেসে উত্তর করেছিল, যাব। তুই আগে ঘরে আয়। খেয়ে নে, তারপর—

সে কথা শুনে রতন হাত-পা ছুঁড়ে হেঁচকি তুলে বলেছিল, না! আমি কেন যাব? ও শালা আমার কে! তুই বেরিয়ে আয়। ওই শুয়োরটার সঙ্গে থাকতে তোর লজ্জা করে না!

রতনের কথার জবাব দিতে গিয়ে নন্দরাণীর দম আটকে গেছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্না চাপতে গিয়ে তার ভরন্ত শরীরটা থরথরিয়ে উঠছে।

রতন ততক্ষণে রেললাইনে। নন্দরাণী শুনেছিল রতন বলছে, শালাকে আমি খুন করব।

শিরীষ গাছের নিচে ডাঙ্গুলি খেলে হাঁটু ডুবিয়ে ছেলের দল গোল হয়ে দাঁড়াল। শ্রাবণের দীর্ঘতর বেলার অন্তিম সূর্য চূর্ণ চূর্ণ হয়ে শিরীষ গাছের পাতায় ছোটাছুটি করছিল। একজন রতনকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল আরে, এ যে দেখছি পকেটমার ছেলেটা।— আর একজন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমিও চিনি। ছেলেটাকে বাজারে চৌধুরীর চায়ের দোকানে কাজ করতে দেখেছি।— আর একজন, অত্যুৎসাহী, একটা কুটো দিয়ে সুড়সুড়ির ভঙ্গিতে রতনের পায়ের তলা ঘসে দিয়ে বলল, কিরে, ছোকরাটা কি একেবারে টেঁসে গেল নাকি রে!— ওর রসিকতায় ছেলের দল সমবেত হেসে উঠল। চিন্তিত দলপতি,—বিল্টু ধমকে উঠল, চুপ কর না তোরা। একটা সিরিয়াস ম্যাটার—, তারপর ঝুলন্ত রতনকে এধার-ওধার থেকে ভাল করে দেখে নিয়ে আত্মগত বলে উঠল ব্যাটাচ্ছেলে, মরবার আর জায়গা পেল না!

দিনতিনেক বেপাত্তা থেকে আজ সকালে রতন ঘরে ফিরেছিল। আগে এ নিয়ে নন্দরানীর রাতে দুচোখের পাতা জুড়ো হত না। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। ছেলেকে নিয়ে নন্দরাণীর দুর্ভাবনার অন্ত না থাকলেও এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত যে ছেলে যেখানেই থাক না কেন নিজেকে সামলাবার মত যথেষ্ট আত্মনির্ভর সে হয়ে উঠেছে।

রতন যখন ফিরল গোবিন্দ বাড়িতে ছিল না। নন্দরাণী পেছনের ডোবায়। স্নান কাঁচা-কাচ সেরে ঘরে এসে উনুনে ধরাবে কিছুক্ষণ বাদে। ভেতরে ঢুকে রতন নিজের ঘরে চলে এল। সামনের ঘরে নন্দরাণী আর গোবিন্দ শোয়। দরমার বেড়ার ওধারে রতনের মাথা গুঁজবার ঠাঁই। রতন নিজের ঘরে এসে গা থেকে তেল চিটচিটে জামাটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর দরজার বাঁদিকে চোখ পড়তে বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। পলকে রতন হাঁটু মুড়ে খাটের তলা দেখল। উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ ছড়াল। তারপর লাফিয়ে দাওয়ায় পড়ে প্রথমে গোবিন্দ মন্ডলের ঘর এবং পরে রান্নাঘরে ঢুকে কি যেন একটা বস্তু আঁতিপাতি করে খুঁজল। শেষে ফের পেছনের দাওয়ায় পড়ে এক লাফে ওধারের খোওয়াওঠা রাস্তায় নামল। নন্দরাণী তখন সাঁচি হেলেঞ্চার জট ছাড়িয়ে সবে ডুব দিতে যাচ্ছে। রতন ডোবার ধারে এসে চেঁচাল, মা, আমার মুরগীটা কই?

মাস কয়েক আগে কাছেভিতের কোন এক গেরস্থবাড়ি থেকে রতন একটা মুরগী চুরি করে এনেছিল। মুরগীটার তখন সবে রোঁয়া কেটে পাখা গজাচ্ছে। রতন প্রাণীটাকে দানা-পানি দিয়ে বড় কল্পে তুলেছিল। বাইরে বেরুবর সময় ওটাকে সঙ্গে নিত। মুরগীটা রতনের কাঁধে মাথায় চলন্ত অবস্থাতেই ঘুরত ফিরত। রাতে ঘুমুবার সময় রতনের বুকের ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে ওম্ দিত। কখনো-সখনো ওকে ঘরে রেখে বেরুলে রতন দরজার কাছের খুঁটিতে বেঁধে রেখে যেত। পাড়ার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো মুরগীটাকে একা পেলেই তাড়া করত,— এই ভয়ে রতন আদর করে ওকে ডাকত মুন্না—মনিয়া। মুরগীটা ঘরের মধ্যে দৌরাত্ম্য শুরু করলে এক-একদিন বিরক্ত হয়ে গোবিন্দ নন্দরাণীকে বলত, কি একটা আপদ ঘরের মধ্যে! একদিন ওটাকে দেব শেষ করে। —মুরগীটাকে ঘিরে নন্দরাণীর ভেতরেও ছেলের প্রতি একটা চাপা ভালবাসা টলটল করত। সে উত্তরে অলস হেসে জবাব দিত, আহা, তুমি কেন একটা তুচ্ছ মুরগী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো। ছেলেমানুষ, খেয়াল হয়েছে তাই পুষছে। কখন ও নিজেই একদিন—

নন্দরাণী স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে পাড়ে উঠে এল। রতন সমানে ঘ্যাঙড় ঘ্যাঙর করছিল, মা, আমার মুরগীটা।— নন্দরাণী ওর দিকে দৃকপাত না করে রাস্তা পেরিয়ে দাওয়ায় উঠল। তার চোখের সামনে তখন দুদিন আগেকার একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর ছবি ফুটে উঠছিল। এই দাওয়াতে বসেই গোবিন্দ মুরগীটার দুপা শক্ত করে ধরে চিৎ করে গলায় ছুরি চালিয়েছিল। অসহায় নন্দরাণী রান্নাঘরের চৌকাঠে পা রেখে বিন-বিন করে বলেছিল, এ তুমি কি করলে! ছেলেটা ফিরে এলে কি বলব।—ধড় থেকে মুণ্ডুটা একটানে ছিঁড়ে রক্তমাখা হাতে পালক ছাড়াতে ছাড়াতে গোবিন্দ গনগনে গলায় বলেছিল, আহ্, তুমি থামো তো। কি আবার বলবে।

রতন ছুটে দাওয়ায় উঠে ভেতরের ঘরে ঢোকার দরজা আগলে বলেছিল, মুরগীটা কই, বলো।

বাধা পেয়ে নন্দরাণীও মুখিয়ে উঠেছিল, পথ ছাড়্। আমি কিছু জানি না। রতন পাগলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে হুংকার ছেড়েছিল, বল্, বল্ শিগগিরই—নন্দরাণী ভিজে আঁচল কাঁধের দিকে টেনে নিয়ে গলা চড়িয়েছিল, কি, মারবি নাকি আমাকে!

রতন বুক চিতিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, মারবই তো।

নন্দরাণী হাত দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকেছিল। দড়ি থেকে একটা শুকনো কাপড় টেনে নিতে নিতে বলেছিল, হ্যাঁ, এইটুকুই যা বাকি আছে। কি সুখে যে তোকে পেটে ধরে-ছিলাম। এর চেয়ে ছেলেবেলায় মুখে নুন দিয়ে তোকে মেরে ফেললেই ভাল হত।

রতন ভেতরে ঢুকে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নন্দরাণীর চারপাশে পাক খেতে লাগল, আমি জানি গোবিন্দ শালাই আমার মুরগীটাকে কেটে খেয়েছে। আমি ওর জান নেব।

নন্দরাণী তেড়ে উঠল এ কথা তুই ছাড়া আর কে বলবে? এখনো ওর জোগানো ভাত যে তোর পেটে বজবজ করছে। নেমকহারাম, ছোটলোক! বেরো, বেরো ঘর থেকে—

রতন মাকে এতটা ক্ষিপ্ত হতে দেখে দপ্ করে নিভে গেল। কান্নাভেজা গলায় বলল, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি—। —তারপর খুপরি থেকে বেরিয়ে ওধারের ঘাস জমিতে এসে কিছুক্ষণ দম খিঁচে রইল। একসময় ফের জোরাজোরি শুরু করল।

দিনের আলো কমে আসতে দলপতি বিল্টু বলল, চল। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে

কি হবে। তার চেয়ে বরং পাড়ায় গিয়ে বড়দের খবরটা দিই।—ছেলের দল সতর্ক পায়ে ভাটবন আশশেওড়া কালকাসুন্দের ঝোপ পেরিয়ে রেললাইনে উঠে এল। তারপর, পাখির ডানার মত শূন্যে দুহাত প্রসারিত করে মুখে এক ধরনের অদ্ভুত আওয়াজ তুলে ছুটতে লাগল শহরতলীর দিকে।

একটু বাদেই আকাশ কালো হয়ে উঠল। এলোমেলো হাওয়া বইতে লাগল। ঘোর দুপুরে যখন রতন গাছের ডাল থেকে দুহাত ছেড়ে দিয়ে শূন্যে নিরালম্ব ঝুলে পড়েছিল, তখন হাওয়া বৃষ্টি কিছুই ছিল না। রোদ্দুরে চারপাশ মোহময় হয়েছিল। ফাঁসটা মুহূর্তে শব্দ করে শিরদাঁড়ার আগার হাড়টা ভেঙে দিয়ে এপাশে ক্রমশ কণ্ঠনলীতে চেপে বসছিল। হৃদ্‌পিণ্ডের ভেতর উষ্ণ রক্ত চলকে উঠে রতনকে শেষবারের মত ওম্ দিচ্ছিল। আর সে একটা আহত মুরগীর মত যন্ত্রণায় বারকয়েক হাত পা ছুঁড়েছিল।

এখন, যতক্ষণ না শহরতলীর কিছু মানুষ এখানে এসে ভিড় জমায়,— রতন বহুক্ষণ আগে নিস্পন্দ হয়ে গেলেও,—তার যন্ত্রণাটা দূরের প্রান্তর থেকে ছুটে আসা রাক্ষসী বাতাসের তালে তালে মাথার ওপরকার শিরীষ গাছের পাতায় পাতায় একটা রক্তাক্ত মুরগীর প্রাণপণ পাখসাটের মত অনবরত ছটফট করে যাচ্ছিল।

হাজারদুয়ারী/মুর্শিদাবাদ
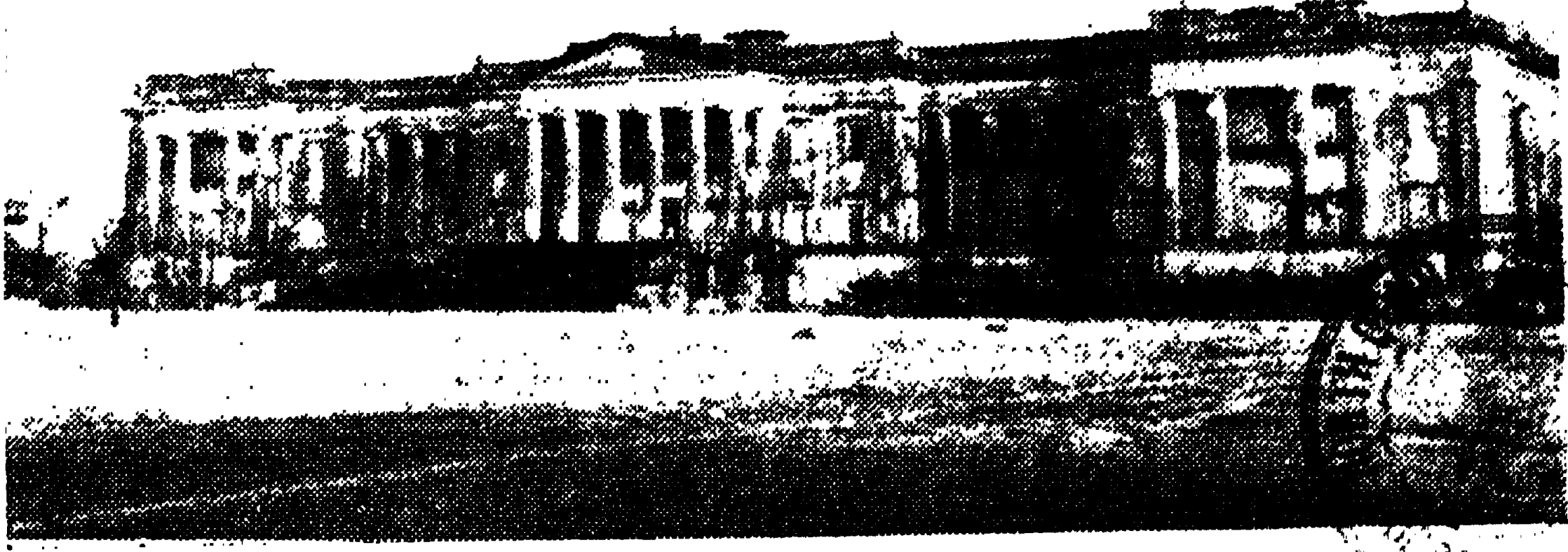
এই আমাদের দেশ

মিনারে, খিলানে, প্রাসাদে প্রতিধ্বনিত প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন মুর্শিদাবাদে
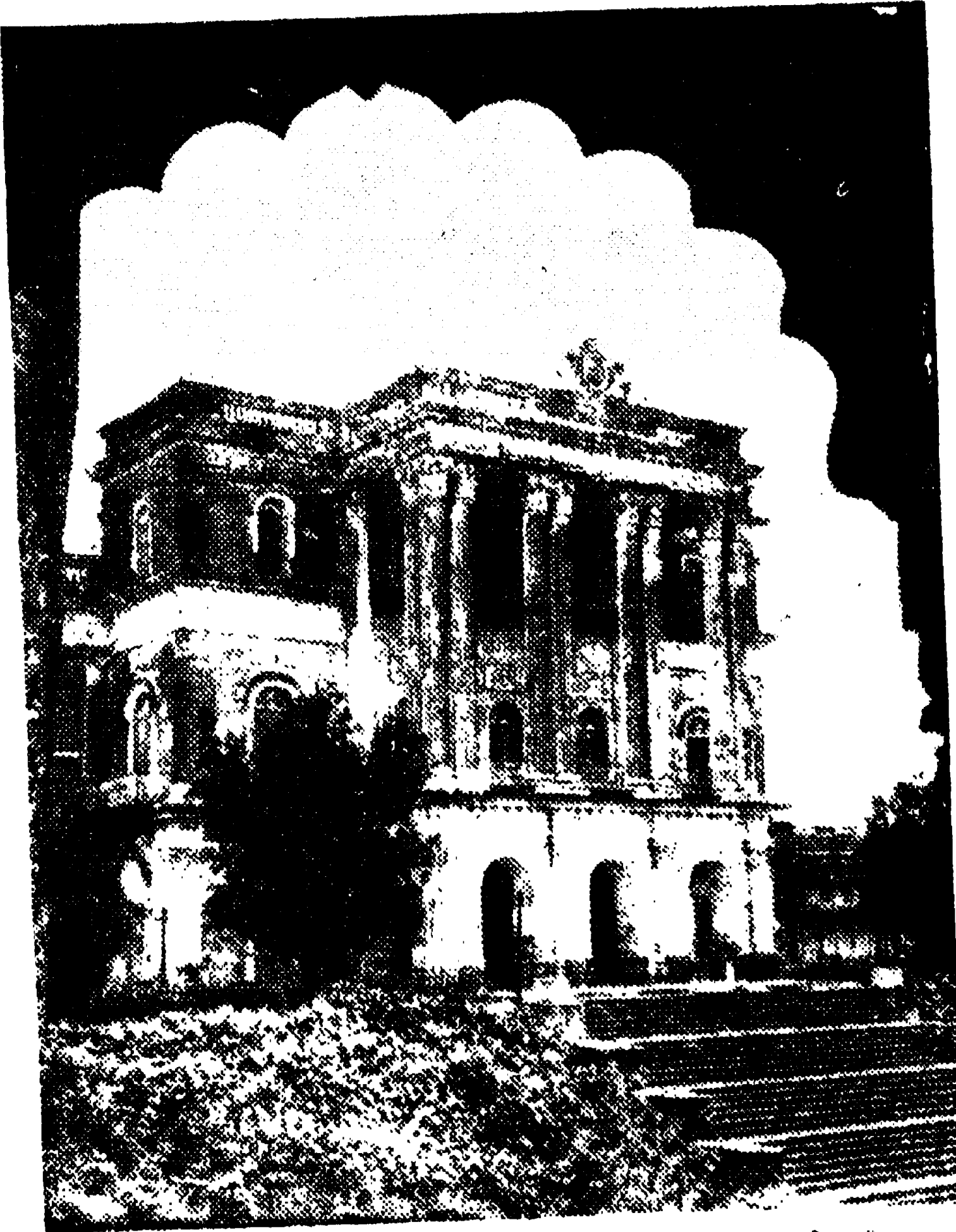
কাঠগোলার রাজবাড়ী/মুর্শিদাবাদ

জিয়াগঞ্জ থেকে বাসে গেলে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের মতো। একেবারে মুর্শিদাবাদ টাউন। কলকাতা থেকে গেলে রাতের ট্রেন। ভোর নাগাদ মুর্শিদাবাদ পৌঁছে যাবেন। পুরো একটা দিন সময় লাগবে সবকিছু দেখতে। বাংলার শেষ নবাবের স্মৃতিবিজড়িত মুর্শিদাবাদ আমার তো মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষেরই দেখে আসা দরকার। মহাকাল নিঃশেষে গ্রাস করে নিতে পারেনি বলেই এখনও কিছু স্মৃতি অবশিষ্ট আছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদকে রাজধানীর উপযুক্ত করে তৈরি করেছিলেন। বর্তমান নিজামত কেল্লা যেখানে ছিল, সেখানে তিনি প্রাসাদ, দরবারগৃহ তৈরি করেছিলেন। তাঁর দরবারগৃহে চল্লিশটি স্তম্ভ ছিল, এখন তার কোন চিহ্ন নেই। কাটরার মসজিদও তিনি নির্মাণ করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই সুজাউদ্দিন খাঁ বিহার ও ওড়িষ্যার সুবাদারী পান। আলিবর্দি খাঁ, হাজী আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি অভিজ্ঞ লোককে তিনি দেওয়ানী কাজে নিয়েছিলেন। আলিবর্দী খাঁ পরে বিহারের শাসক পদে নিযুক্ত হন। সুজা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সফরাজ খাঁ এক বছরের জন্যে নবাব হয়েছিলেন, কিন্তু হাজী আহম্মদ, জগৎশেঠ, আলিবর্দীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সিংহাসনচ্যুত হন ও পরে নিহত হন। এরপর আলিবর্দী মসনদে বসেন এবং দিল্লীর বাদশাহের কাছে বহু টাকার উপঢৌকন পাঠিয়ে বাংলা ও ওড়িষ্যার নবাবী পান। আলিবর্দী খাঁর একমাত্র স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন।

রাজ্যের জটিল কোন ব্যাপারে নবাব তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে নবাবের সঙ্গে তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন এবং অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন। এর কিছুদিন পরেই ইংরেজদের সঙ্গে তার বিবাদ শুরু হয়ে যায়, সিরাজদ্দৌলা কলকাতা দখল করেন। ক্লাইভ পরে কলকাতা ফিরে পান ও সিরাজের সঙ্গে সন্ধি হয়। কিন্তু সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য মিরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও ক্লাইভের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়। সিরাজ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বন্দী হন। অবশেষে জাফরগঞ্জের বাড়িতে সিরাজ নিহত হন। যে-জায়গায় সিরাজকে হত্যা করা হয়েছিল, সেটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে, এটি নিমকহারাম দেউড়ি নামে পরিচিত।

এবার মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো ঘুরে নেওয়া যাক। রেল-স্টেশন থেকে জেলখানার কাছে এসে পূর্ব দিকের রাস্তা ধরে মাইলখানেক গেলেই কাটরার মসজিদ পড়বে। এটি মুর্শিদকুলী খাঁ জীবিতকালেই নিজের সমাধিস্থান হিসেবে দু বছরের মধ্যে তৈরি করান। মসজিদে ঢোকবার সিঁড়ির নিচে একটি ঘর ছিল, শোনা যায় মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা পূর্বেই নাকি তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদ তৈরি হয়। দু পাশে ৭০ ফুট উঁচু দুটি মিনার এখনও ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখা যায়। আগে গম্বুজে উঠলে পাঁচ-ছ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যেত।

মুর্শিদাবাদে প্রচুর অট্টালিকা তৈরি করার জন্যে যে সমস্ত খাদের সৃষ্টি হয়, নোজেস মহম্মদ সেগুলিকে একত্র করে প্রিয়তমা পত্নী মেহেরুন্নিসার বসবাসের জন্য সুরক্ষিত অট্টালিকা তৈরি করান। এটিই মতিঝিল নামে খ্যাত। দৈর্ঘ্যে ৬৬ ফুট, প্রস্থে ২৪ ফুট ও ১২ ফুট উঁচু দরজা জানলাবিহীন ইঁটের একটি ঘর মতিঝিলের বিস্ময়ের জিনিস। অনেকে বলেন, এটি ঘসেটি বেগমের ধনভাণ্ডার ছিল, আবার অন্যমতে সিরাজ মতিঝিল লুঠ করে ঘসেটি বেগমকে নিজের হারেমে যখন নিয়ে যান, সেই যুদ্ধকালীন সময়ে নিহত অন্তঃপুর সহচরীদের এখানে কবর দেওয়া হয়।

স্টেশন থেকে সিরাজদ্দৌলা বাজারের মধ্যে দিয়ে মাইলখানেক গেলেই পড়বে হাজারদুয়ারী। প্রায় এক হাজারর মত দরজা আছে বলেই হাজারদুয়ারী নাম। হাজারদুয়ারী দৈর্ঘ্যে ৪২৫ ফিট, প্রস্থে ২০০ ফিট, একশো ফিটের মত উঁচু। ইতালীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব এতে রয়েছে। দোতলায় উঠতে ৩৭ ফুট লম্বা ১৫টি, ২৫ ফুট লম্বা ৩০টি সিঁড়ি ভাঙতে হয়। ভারতের দীর্ঘতম সিঁড়ির এটি নাকি অন্যতম। দেওয়ালের কারুকাজ

কাটরার মসজিদ/মুর্শিদাবাদ

ফটো : ডাঃ শীতাংশু মিত্র
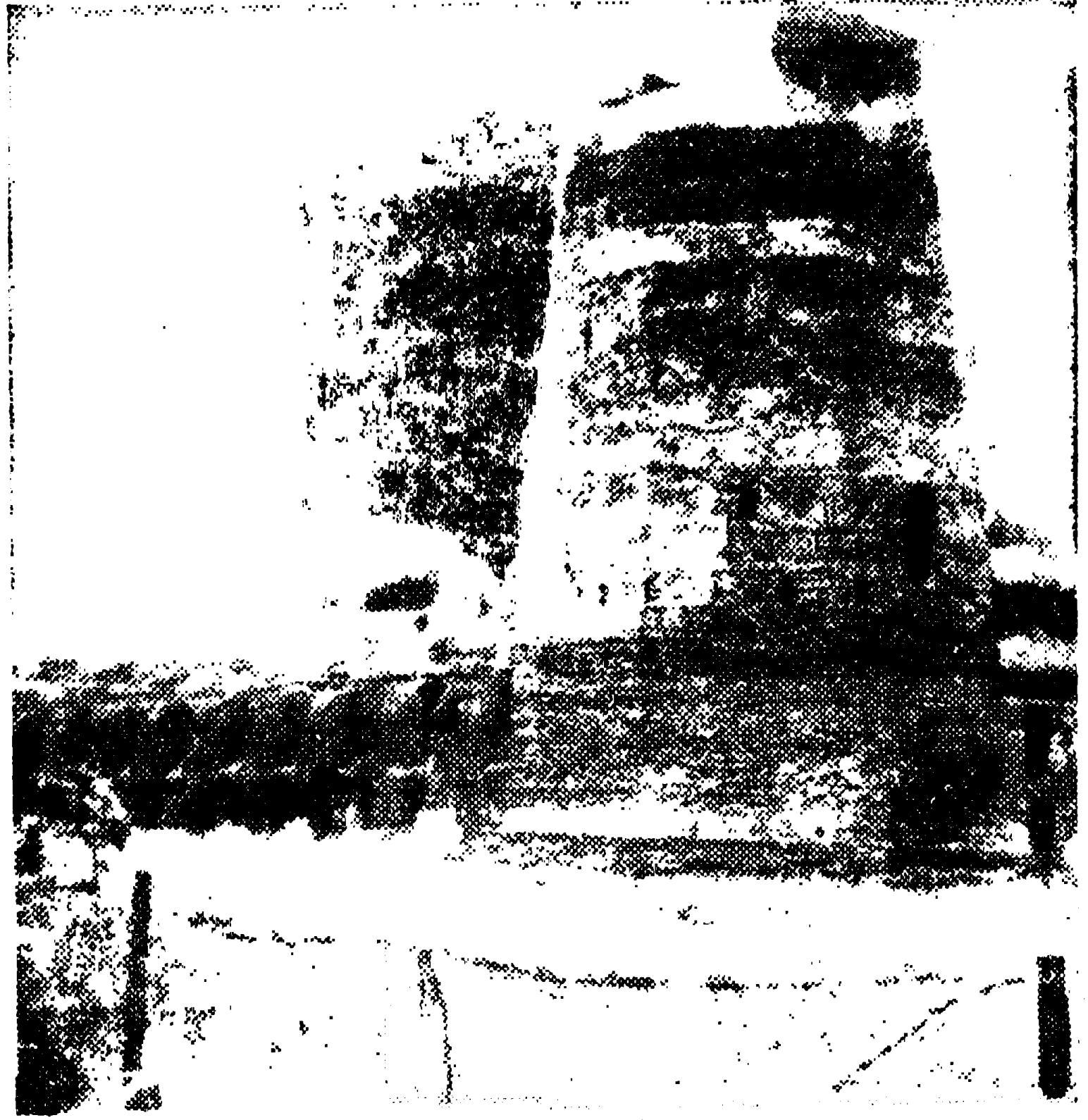
দেখবার মত। প্রথম শ্রেণীর মার্বেল পাথর এতে ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রশালায় রয়েছে র‍্যাফেল, মার্শাল, টিশিয়ান প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি। পাশের পাঠাগারটি এককালে নাকি প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বইপত্রে ভর্তি ছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন ফরাসী ও উর্দু পাণ্ডুলিপি এখনও অবশ্য রয়েছে। নীচের তলায় অস্ত্রাগার। পলাশীর প্রান্তরে যে কামানটি ফেটে মীরমদন মারা যায়, সেটিও এখানে আছে। তাছাড়া আলিবর্দী ও সিরাজের ব্যবহৃত তলোয়ার, সম্রাট নাদির শাহের ঢাল, বর্শা ও লৌহজালও নাকি রাখা হয়েছে। তাছাড়া পাথরের কাজ-করা ডায়নিং রুম, দরবার হল ও বিশেষ ধরনের কাঁচের তৈরি খাবার ডিসও আছে। খাবারে বিষ মেশানো থাকলে এই ডিসের রং নাকি বদলে যেত।

হাজারদুয়ারীর সামনেই ইমামবাড়া। সিরাজ নির্মাণ করেছিলেন কাঠের ইমামবাড়ি, আগুনে পুড়ে তা নষ্ট হয়ে গেলে নাজিম মনসুর আলি খাঁ বর্তমানের ইমামবাড়া তৈরি করান। তখনকার দিনে ৭ লক্ষ টাকা খরচে এক বছরের মধ্যে এটি তৈরি হয়। মহরমের শেষ দিন এখনও এখানে ছোটখাট অনুষ্ঠান হয়। ইমামবাড়া ও হাজারদুয়ারীর মাঝখানে মদিনা। এটি তৈরি করান সিরাজদ্দৌলা। মদিনা তৈরির সময় সিরাজ নিজে নাকি কারবালা প্রান্তর থেকে পবিত্র মাটি মাথায় করে এনে এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

লালবাগ খেয়াঘাট পার হয়ে মাইলখানেক গেলেই খোসবাগ। এটি আলিবর্দীর সমাধি। খোসবাগে আলিবর্দী, সিরাজ, লুৎফা সকলেরই সমাধি। সিরাজের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ঢাকায় নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন লুৎফা, পরে তিনি খোসবাগ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পান মাসিক কিছু টাকা বৃত্তিতে।

চকবাজার থেকে উত্তরে নসীপুর থেকে কিছু দূরে বিরাট বাগানবাড়ি, পরেশনাথের মন্দির। এটিই কাঠগোলার বাগান। এককালে এই বাগানে বহু মূল্যবান ফুলের গাছ এনে বসানো হয়েছিল। এখন এটির প্রায় শেষ অবস্থা। রাজবাড়িটি এখনও দেখবার মত অবস্থায় রয়েছে। কাটরা মসজিদের কাছেই তোপখানা। মুর্শিদকুলী খাঁ এখানে তাঁর অস্ত্রাগার নির্মাণ করান। এখানেই বিখ্যাত জাহানকোষা কামান রয়েছে। মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসার সময় কামানটি এখানে নিয়ে আসেন। ঢাকার জনার্দন কর্মকার এটি তৈরি করেন। দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট, বেড় প্রায় ৪ ফুট, দুশো মনের মত ওজন। এতে প্রতিবারে ২৯ সের বারুদ লাগত। ছোটখাট দেখবার মতো আরও অনেক কিছু আছে। যেখানেই যাবেন ইতিহাস আপনাকে আঁকড়ে ধরবে। মিনারে, মসজিদে, খিলানে, প্রাসাদে শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি, দিনান্তের শেষ আলো কবরখানার ওপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় কান পাতলে এখনও অনুভব করতে পারবেন হাজারো মানুষের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলসীচরিত

নীমবিব চৌধুরী

(১৭)

অশোকের পঞ্চম ইনস্টলমেন্ট।

ভাবলাম মাস্টারমশাই সত্যি চিনতে পারলেন না, না, না চেনার ভান করলেন? তখুনি মনে হল না চেনবার ভান করতে যাবেন কেন? এক সময় আমার দুঃস্থ অবস্থার কথা শুনে আমার পরম উপকার করেছিলেন। কল্পনাও করতে পারি নি মিঃ ভাদুড়ীর মত বড়লোক তাঁর কথার এত দাম দেবেন। আবার যে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, দুটো পয়সা করছি এ সবের মূলে রয়েছে মাস্টারমশায়ের স্নেহ। নির্লোভ, সাধু প্রকৃতির মানুষ তিনি, সত্যিকার জ্ঞানীমানুষ। অনেক দিন দেখেন নি, চিনতে পারলেন না তাই।

মিনিট দশেক হাঁটবার পরে একটা বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়ালেন তিনি, এক মিনিট কি কথা হল নাতনীর সঙ্গে, তারপর দুজনে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

দাঁড়ালাম ফটকের কাছে। বাড়ীটা চিনে নিলাম। এখুনি গিয়ে দেখা করে একটা প্রণাম করে আসব, না অন্য সময়ে আসব ভাবতে লাগলাম। ফটক পেরিয়ে ভেতরে চলতে লাগলাম ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে।

ফটক থেকে খানিকটা দূরে বাড়ীটা। কিছু দূর যেতে দেখলাম মাস্টারমশায়ের নাতনী ফিরে আসছে।

দাঁড়াল আমার সামনে, কাকে চান আপনি?

মাস্টারমশাইকে।

মাস্টারমশাই? মাস্টারমশাই কে?

প্রোঃ প্রমথ গাঙ্গুলী।

ওঃ, জেঠামশাই? আপনি বুঝি তাঁর ছাত্র ছিলেন? আচ্ছা, একটু আগে আপনাকে পথে দেখেছি না?

হাঁ। অনেক দিন দেখা নেই, মাস্টারমশাই চিনতে পারলেন না।

কোথা থেকে আসছেন।

থাকি কোলকাতায়। আসছি এখান থেকে।

এখান থেকে আসছেন মানে কি? আচ্ছা শুনুন, যদি দেখা করে কিছুক্ষণ কথা বলতে চান সকালের দিকে আসতে পারেন না? জেঠামশাই কি সব-কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন, লেবরেটরীতে ঢুকলেন, আমাকে বসতে দিলেন না।

বললাম, আপনি এ বাড়ীতে থাকেন না?

না, শ্রীগঙ্গা কারখানার কাছে আমাদের বাড়ী।

আচ্ছা, আজ আর মাস্টারমশাইকে বিরক্ত করব না। চলুন, আমিও কারখানার দিকে যাব।

আপনি এখানে কোথায় থাকেন?

এখনও থাকি না এখানে, কারখানাতে আসি।

কারখানাতে কাজ করেন বুঝি?

হ্যাঁ, কাজ করি কাজ দেখিও। কারখানাটা আমার।

আপনি কারখানার মালিক? তাহলে তো বড়লোক আপনি?

হাসলাম। চলুন।

চলুন। কিন্তু আপনি হাঁটছেন কেন? গাড়ী কই?

গাড়ী কারখানায় আছে। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল হল। কারখানার কাছে একটা বাড়ী করব ভাবছি।

তাই নাকি? জেঠামশাই খুশী হবেন শুনে তাঁর ছাত্র বাড়ী করছেন এখানে।

আচ্ছা, আপনি কি মাস্টারমশায়ের ছোট ভায়ের মেয়ে? কলকাতায় তো মাস্টারমশায়ের পৈতৃক বাড়ী আছে, আপনি এখানে থাকেন কেন?

কোন সম্পর্ক নেই, এমনি ওঁকে জ্যাঠামশাই বলি।

হাঁটতে হাঁটতে আরও আলাপ হল। নাম, বাবার নাম, পরিবারের কথা কিছু শুনলাম। আমাকেও বলতে হল আমার পরিবারের কথা।

কারখানার কাছে এসে দাঁড়াল, বলল, সন্ধ্যা হয়ে এল, সময় থাকলে আপনার কারখানায় কি কাজ হয়—দেখতাম।

বললাম, রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে, অন্য দিন যখন ইচ্ছা দুপুরে, বিকেলে আসলে দেখা যাবে।

আপনি থাকবেন তো?

না থাকলেও অসুবিধে হবে না, আমার ছেলেদের বলে রাখব, সঙ্গে করে সব দেখাবে। কবে আসবেন বলুন, আমি থাকবার চেষ্টা করব।

কবে? যেদিন জেঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করবেন।

আচ্ছা। চলুন বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

কোন দরকার নেই, ঐ যে বাড়ী। আচ্ছা, নমস্কার।

চলে গেল পা চালিয়ে।

তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। শিক্ষিত, কালচার্ড পরিবারের মেয়ে, বেশ ফরোয়ার্ড। কি পড়ছে শোনা হল না, নামটি কি শোনা হল না।

পরের পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় মাস্টারমশায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম বাইরের বারান্দায় বসে তিনি —কাগজ পড়ছেন।

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম।

মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, অশোক নাকি? বসো, বসো। আমাকে খুঁজে বের করলে কি করে?

পরশু আপনাকে রাস্তায় দেখেছিলাম, বাড়ীটা চিনে দিয়েছিলাম।

কি করছ এখন? মিঃ ভাদুড়ীর ওখানে কাজ করছিলে জানি—

হাতে এক কাপ চা নিয়ে পরশুর চেনা সেই মেয়েটি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। বলল, ও আপনি এসেছেন? চা খাবেন? বসুন, এনে দিচ্ছি।

মাস্টারমশাই বললেন, তুলসীকে কি করে চিনলে অশোক?

তুলসীর সঙ্গে আলাপের কথা, কারখানার কথা, বাড়ী করবার ইচ্ছার কথা বললাম।

আমাকে চা বিস্কুট দিয়ে নিজে চা খেতে খেতে শুনছিল তুলসী।

মাস্টারমশাই বললেন, তুলসীর বাবা বরদাবাবু, বরদা ভটচাজ, ইস্ট ইন্ডিয়া করপোরেশনে কাজ করতেন। চেনো না কি তাঁকে?

চিনলাম। বললাম, চিনি। এখন মিঃ ভাদুড়ীর বড়ছেলের অফিসে কাজ করছেন শুনেছি।

মিঃ ভাদুড়ীর কোন খবর জানো?

গুরুদেবের সঙ্গে তিনি সস্ত্রীক হরিদ্বারের ওদিকে কোন আশ্রমে চলে গিয়েছেন শুনেছি, আর কিছু জানি না।

তাঁর বাড়ীটা?

মামলা চলছে। এখন গুরুভাইদের দখলে রয়েছে শুনেছি।

বড় ভাল কথা সময় মত তুমি নিজের একটা কারবার গড়ে তুলতে পেরেছ। তোমার কারখানায় কি কাজ হয়।

ফাউন্ড্রির কাজ হয় বেশীর ভাগ। তেমন বড় নয়, মাঝারি কারখানা।

খুব ভাল কথা। যাব একদিন তোমার কারখানা দেখতে।

হাত থেকে চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রেখে তুলসী বলল, তা যাবে, আমি দেখে এসে রিপোর্ট দিই আগে।

তুই কি দেখতে যাবি? মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন।

ঘুরে ফিরে দেখে জেনে নেব আমার কোন প্রসপেকট আছে কি না কারখানায়।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম তুলসীর দিকে। বললাম, তুমি কি দুঃখে কারখানার মিস্ত্রি হতে যাবে? তুমি তো পড়ছ।

বলল, কি দুঃখে মিস্ত্রি হতে যাব? আমি খুব সুখে আছি মনে করেছেন?

মাস্টারমশাই ধমকালেন, জ্যাঠামি করো না তুলসী।

বকো, যত পারো।

উঠে দাঁড়াল তুলসী, বলল, আপনার কথা সেরে নিন আমি আসছি। আপনার সঙ্গে যাব। হাতে সময় থাকলে কারখানার কাজ দেখাবেন কিছুক্ষণ।

কাপ-ডিশগুলো তুলে নিয়ে ভেতরে গেল।

মাস্টারমশায়ের দিকে তাকালাম, হাসছিলেন তিনি।

বললাম, বরদাবাবুর মেয়ে তুলসী, একটু ছিট—

বললেন, কথায় একটু আছে, মাথায় নেই। বরদাবাবুর মাথায় ছিট আছে নাকি?

বললাম, কাজে সুনাম ছিল আগে। টাকা করবার জন্য নানা রকম প্ল্যান করতেন। ঘনিষ্ঠতা হয় নি, দেখা-সাক্ষাৎ নাই, অনেক দিন।

মাস্টারমশাই বললেন, মেয়েটি ভাল। বি এসসি পড়ছে। ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছা। বাপ খরচ দিতে পারবেন না, তাই নিজে রোজগারের উপায় খুঁজছে।

তাই বলে কারখানার মিস্ত্রি—
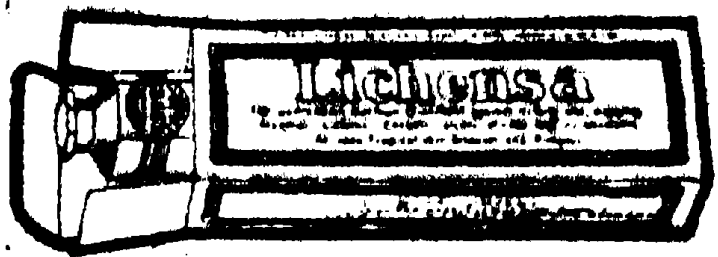
হেসে বললেন ওটা বাজে কথা। কারখানার কাজ দেখতে চায়। কি করে কি হচ্ছে। জানবার শেখবার কৌতূহল আছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলাম, আপনার অনুগ্রহে—

বাধা দিয়ে বললেন, অনুগ্রহ করবার আমি কে অশোক? তুমি আমার ছাত্র ছিলে, দুরবস্থায় পড়েছিল স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, খুব সুখের কথা নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়িয়েছ। উদ্যম, কাজের বুদ্ধি না থাকলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতে না। তোমার আরও উন্নতি হোক, অনেক লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হোক তোমার হাত দিয়ে—

প্রণাম করে বললাম, আশীর্বাদ করুন—

তুলসী এল।

মাস্টারমশাই বললেন, যারা কর্মী, কিছু করতে চেষ্টা করে তাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি আমি।

তুলসী বলল, আমিও কিছু করতে চাই—

বললেন, তোমারও মঙ্গল কামনা করি।

থ্যাঙ্ক য়ু জেঠামশাই। আমার দিকে চেয়ে বলল, চলুন।

মাস্টারমশাই বললেন, অশোক, সময় পেলে মাঝে মাঝে এসো এই রকম সময়ে।

আসব মাস্টারমশাই।

ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে কারখানার কাজ দেখল তুলসী। এই এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বসতে দেয়নি, চুপ করে থাকতে দেয়নি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে, উত্তর তার সন্তোষজনক না হলে জেরা করেছে। আমার বড় ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, মিনিট দশ পরে তাকে বলল, আপনার বাবা সঙ্গে আছেন, আপনার সাহায্য দরকার হবে না, নিজের কাজে যেতে পারেন।

তাই যেতে হল। তার মুখের অপ্রস্তুত ভাব দেখে মনে মনে হাসলাম। যাবার আগে এক কাপ চা খেয়ে যেতে বললাম। রাজি হল না, বলল, অনেক বেলা হয়েছে। নমস্কার করে, ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

যাবার পরেও কিছুক্ষণ ভাবলাম মেয়েটির কথা। বরদা ভটচায, যে ফাঁকি দিয়ে টাকা করবার কথা ভাবে শুধু তার মেয়ে এই তুলসী।

(১৮)

আমার পঞ্চম ইনস্টলমেন্ট।

শহর ছেড়ে, পরিবারপরিজন ছেড়ে বানপ্রস্থ নিয়ে শহরতলীতে এসে ছিলাম। ভরত মুনির গল্প মনে পড়ে, এক হরিণশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তাঁর ব্রহ্মচিন্তা ঘুচে গেল। একটি মেয়ের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আমার তৃতীয় আশ্রমিক উদাসীনতা ঘুচে গেল।

যতটা পারি দূরত্ব রক্ষা করে চলছিলাম এতদিন। তাই চালাতে পারতাম মেয়েটা যদি এতটা একগুঁয়ে না হয়ে একটু সুবোধ প্রকৃতির হত, বাপের খামখেয়ালিপনা মানিয়ে চলতে পারত। বলছি বটে এই কথা কিন্তু জানতাম সে পারবে না।

একদিন বলেছিলাম, তুলসী, তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ, ছেলে নও যে বাপের ওপরে রাগ করে কোথাও পালিয়ে যাবে। খানিকটা পরাধীনতা, পরাবলম্বন তোমাকে মেনে নিতে হবে। একটু নরম হতে শেখো।

দাঁড়িয়েছিল ঝপ করে বসে পড়ে পায়ের ওপরে মাথা ঘসতে লাগল, বলল, আমাকে লাথি মারো জেঠামশাই, আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তুমিও বকো না আমাকে, সংসারে আমি কত বকুনি খাচ্ছি, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করছি জানো না।

চমকে উঠলাম, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করছ!

উঠিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম, বললাম, কে তোমাকে অপমান করল বলো তো?

মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিছু বলতে চায় না মনে হল।

কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল।

এরপর থেকে তুলসীর আসা বন্ধ হয়ে গেল। আগে মাঝে মাঝে এসে পাঁচ দশ মিনিট কাটিয়ে চলে যেত, তাও আর আসে না। কলেজে যায় না আর শুনেছি, তার মা বাপের বাড়ী থেকে ফিরেছেন কিনা জানি না। বুঝতে পারলাম না তুলসী আসা বন্ধ করল কেন, বাড়ীতে কি হয়েছে।

মাস তিন কেটে গেল। তারপর একদিন বেরিয়ে পড়লাম খোঁজ নেবার জন্য।

বরদাবাবুর বাড়ীর কাছে তাঁর ছোট ছেলে ফণীর সঙ্গে দেখা হল। আমাকে দেখে সে পালাবার চেষ্টা করছিল হাত ধরে আটকালাম। বললাম, এসো আমার সঙ্গে।

বলল, ছেড়ে দিন, বাবা দেখতে পেলে মার লাগাবে।

তাহলে চলে এসো আমার সঙ্গে।

বাড়ীতে এনে বসালাম ফণীকে। প্রশ্ন করে করে অনেক খবর পাওয়া গেল।

দিদির সঙ্গে ফণীর ঝগড়া চলছে স্কুলে ফণীর মাইনে বাকী পড়েছিল ক'মাসের, নাম কেটে দিয়েছে। টেস্ট পরীক্ষা দিতে পারবে না। দিদি মার কাছ থেকে টাকা এনে তাকে দিতে এসেছিল, বাকী মাইনে শোধ করে দিয়ে পরীক্ষা দিতে বলেছিল, নেয়নি। সে জানত দিদিরও নাম কেটে দিয়েছে।

বলল, ছ'মাস পরে দিদির পরীক্ষা, ও নিশ্চয় পাশ করবে পরীক্ষা দিলে। তখন একটা চাকুরি যোগাড় করতে পারবে, তখন আমি আবার পড়ব। স্কুল ফাইনাল পাশ করে আমি কি কাজ পাব? কেন যে দিদি বোঝে না সোজা কথাটা জানি না। রেগে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে।

তোমার বাবা স্কুলের মাইনে দেন না!

না। বলেন টাকা নাই।

তোমার দাদার কাছে চাও না কেন?

দাদা চাকুরি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে। ত্রিশ টাকা করে পাঠায় দিদির নামে, বাবা সে টাকা কেড়ে নেয় দিদির কাছ থেকে। একদিন আমি আটকাতে গিয়েছিলাম। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। দিদিকে, আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে দিনরাত।

তোমার মা কি এখনও বাপের বাড়ীতে রয়েছেন?

হ্যাঁ। এখানে আসবে না আর। দিদি গিয়ে ত্রিশ টাকা করে নিয়ে আসত মার কাছ থেকে। এ মাসে যায়নি।

তোমার বাবা অফিসে যান কখন?

আজ দু'মাস হল বেরোয় না, বোধ হয় চাকুরি নাই। অফিং মিকশ্চার খেয়ে সারাদিন শুয়ে থাকে।

তারপর নিজেই বলল, মাসখানেক আগে বাবা একজনের বাড়ীতে গিয়ে টাকা ধার করে আনতে বলেছিল দিদিকে। লোকটা খারাপ বলে দিদি যেতে চায়নি। ভীষণ রেগে গিয়ে দিদিকে যা তা কথা বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনদিন পরে পাড়ার এক বুড়ী—তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল, বাবাকে খুব গালাগালি করল। তারপর থেকে দিদি খাওয়া প্রায় বন্ধ করেছে। বাড়ী থেকে বেরোয় না। আমাকে একদিন বলেছিল গলায় দড়ি দিয়ে মরবে সে। পাড়ার মেয়েদের স্কুলে একটা চাকুরির খবরের কথা শুনে তাকে দরখাস্ত দিতে বলেছিলাম এই সময়ে। সে গেল না, বলল পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না আমি।

অফিং মিকশ্চার? গাঙ্গুলী এলিকসির নয়তো?

একটু থেমে ফণী বলল, দিদিটা মরে যাবে। দিন পনেরো আগে খুব জ্বর হয়েছিল, কিছু খেত না। আমি এক ফ্রেন্ডের কাছে পয়সা ধার করে বার্লি এনে দিয়েছিলাম খালি জল খেয়ে রয়েছে দেখে, বার্লি খায়নি। শুয়ে থাকে সারাদিন, খুব কাশি হয়েছে। ক'দিন আগে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম আবার জ্বর হয়েছে। তাই নিয়ে রান্না করছিল। বাবা নিজে সারাদিন শুয়ে থেকে চেঁচিয়ে গালাগালি করে দিদিকে। একদিন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল উঠোনে, হাত হাঁটু, মাথা ফুলে গিয়েছিল। আমাকে বলল পড়ে গিয়েছিলাম। গরম জল করে সেঁক দিলাম। চার পাঁচ দিন হল আমি রান্না করছি, দিদি পারে না। খুব রোগা হয়ে গিয়েছে জ্বরে ভুগে ভুগে, না খেয়ে না খেয়ে। দিদি মরে যাবে মনে হয়।

এত কাণ্ড এই তিন চার মাসের মধ্যে! দেখলাম বাণপ্রস্থীর ধনে ক্রোধ রিপুর উদয় হয়েছে। হতভাগা, একগুঁয়ে মেয়েটা বেশ জানে সে যা খুশী চাইলে আমার না করবার উপায় নাই, তবু তার বাড়ীর প্রকৃত অবস্থার আভাস একদিনও দেয়নি। নিজে রোজগার করে পড়া চালাবার কথাটা বলেছে আগেও, সেটাকে বাজে বলে উড়িয়ে দিয়েছি আমি।

বরদাবাবুর ব্যাপারটা কি বুঝলাম না। সত্যিই কি চাকুরি গিয়েছে? খাওয়া চলে কিভাবে?

ফণী বসেছিল। হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মহামায়াকে বললাম, ফণীকে কিছু খেতে দাও। তুলসীর খুব জ্বর হয়েছিল, তাকে একবার দেখে আসতে পারবে?

ফণী বাধা দিয়ে বলল, না-না, আপনি যাবেন না আমাদের বাড়ীতে, বাবা দেখতে পেলে যা-তা বলবে হয়ত।

বললাম, তাহলে থাক, আমি যাব।

ফণী বলল, আপনি যাবেন না, আপনার ওপরে বাবার খুব রাগ।

কি করবেন তোমার বাবা? অপমান আমার গায়ে লাগে না।

না, না যাবেন না, ভারি বিশ্রী সব কথা বলতে পারে।

চিন্তিত হলাম। কি করা যায় তাহলে?

বললাম, তোমাকে একটা কথা বলব। খেয়ে নিয়ে আমার কাছে একটু বসবে বাড়ী যাবার আগে।

ফণী আসবার আগে আমার ভাবনা শেষ হয়েছিল।

ফণী আসলে বললাম, তোমার দিদিকে তুমি সত্যি ভালবাস ফণী?

হাসল ফণী, আর কি বলবেন?

বললাম, আজ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারবে এখানে? বলো, জ্যেঠামশায়ের খুব অসুখ, দেখতে চেয়েছেন।

ফণী বলল, বাবা জানতে পারলে খুন করবে আমাকে। দিদি আসবে না। এতদূর হাঁটতেও পারবে না।

রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে আসবে।

যদি আসে তাহলে জানতে পারবে আমি মিথ্যা কথা বলে তাকে এনেছি।

তা জানুক। সে আসলে তোমাকে মামাবাড়ীতে রেখে আসতে হবে তাকে।

ফণী বলল, আমার বড় মাসী থাকতে দেবে না তাকে। কোন কথা বললে মাকেও তাড়িয়ে দেবে। মা অনেক কষ্টে রয়েছে সেখানে। তা না হলে বাবা যখন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দিদিকে, সেখানে তাকে নিয়ে যেতাম আমি।

আবার ভাবতে হল।

বললাম, বাড়ীতে থাকলে তোমার দিদি মরে যাবে বলছিলে। দিদি মরে যাক চাও কি?

এমন কথা কেন বলছেন?

তাহলে আজ দুপুরে তোমার বাবা যখন ঘুমোন তোমার দিদিকে আমার অসুখের কথা বলে এখানে নিয়ে আসবে রিকসায় করে। তারপর কি হবে নিজে দেখতে পাবে।

খানিকটা ইতস্তত করে রাজি হয়ে ফণী বাড়ী গেল।

দেখলাম বানপ্রস্থীর মনে ক্রোধ রিপুর তার বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য ঝাপটা খেয়ে সরে যাচ্ছে।

সাড়ে দশটার সময় অশোকের কারখানায় গেলাম।

অশোক উঠে এসে অভ্যর্থনা করল, আসুন মাস্টারমশাই।

বসব না অশোক, একটু কাজে এসেছি। তোমার ফোনটা কোথায়?

ফোনে পাঁচ মিনিট কথা হল। কথা সেরে অশোককে বাইরে নিয়ে গিয়ে জানালাম দুপুরের পরে তার গাড়ীটা চাই ঘন্টা-দুয়ের জন্য, তাকেও চাই। দু'টো নাগাদ আমার বাড়ীতে যাবার কথা বলে বাড়ী ফিরলাম। বললাম, কেন গাড়ী নিচ্ছি পরে শুনবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় এসে বসলাম। অনেক রকমের কথা মাথায় আসছিল। তাদের কোন কোনটার চেহারা দেখে নিজের মনে হাসছিলাম।

দেড়টার কিছু পরে ফটকে রিকসার শব্দ পেয়ে ভেতরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, একটা চাদর টেনে গায়ে দিলাম।

চোখ বুজেছিলাম পায়ের শব্দ পেয়ে। খাটে বসে বুকে মাথা রাখল তুলসী, বলল, তোমার এত অসুখ—

পাশ ফিরে মিউ মিউ করে বললাম, খবর নিতে নাই একটু?

চুপ করে মাথায় হাত বুলোতে লাগল, মনে হল কাঁদছে। কাঁদুক হতভাগা, একগুঁয়ে মেয়ে।

বালিশের নীচে থেকে পয়সা নিয়ে ফণীকে বললাম, ভাড়া দিয়ে রিকসা ছেড়ে দাও।

মহামায়া ঘরে এল। তুলসীর চেহারা দেখে সে চমকে উঠল মনে হল। ওকে আগে সব বলেছিলাম। তুলসীকে জড়িয়ে ধরে বলল, আয় আমার সঙ্গে। ওকে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিতে বললাম বললাম, সহজে না খায়, জোর করে খাইয়ে দেবে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ীর শব্দ পেলাম। ফণীকে বললাম, দেখো তো অশোক এল কিনা।

অশোককে বাইরে বসিয়ে ফণী খবর দিল। তাকে বললাম, তোমার দিদিকে নিয়ে এসো।

বাইরে এসে অশোককে বললাম, একটি অসুস্থা মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে, মেয়েটি তুলসী।

মহামায়া পাশের দোর দিয়ে বেরিয়ে এল তুলসীকে নিয়ে, গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে বলল, ডাক্তার দেখাতে হবে, দাদা আসছেন। জেঠামশায়ের যে অসুখ পিসীমা।

মহামায়া বলল, তোকে দেখে তাঁর অসুখ ভাল হয়ে গিয়েছে।

ফণীকে তুলসীর পাশে বসিয়ে দিয়ে নিজে বসলাম, বললাম, এবার চলো অশোক।

সে নিজে গাড়ী চালাচ্ছিল।

বরদাবাবুর স্ত্রীকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না, স্কুলে যেতে হল, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল।

তাঁকে আসতে দেখে পথে আটকালাম, সংক্ষেপে সব অবস্থা এবং কি করতে চাই জানালাম। বললাম, আপনার কোন আপত্তি থাকে তো বলেন তুলসীকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

মৃদু কণ্ঠে বললেন, আপনার হাতে তুলসীকে দিলাম দাদা।

গাড়ীতে মেয়ের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন কিছুক্ষণ, কানে কানে কি বললেন। তারপর আমাকে প্রণাম করে ফিরে গেলেন স্কুলে।

চলো অশোক।

যে কেমিকেল ও ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীতে কাজ করতাম তার বড় কর্তার বাড়ীতে পৌঁছে খবর দিতে নিজে নেমে এলেন, সংগে তাঁর বড় মেয়ে।

মেয়েটি তুলসীকে নামিয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অশোককে বললাম, এবার তুমি ফিরে যাও। ফণী, তুমিও যাও। তোমার দিদি ক'দিন এখানে থাকবে, ডাক্তার দেখাতে হবে। বাবাকে বলো, তাকে মামাবাড়ীতে রেখে এসেছ। আমার যেতে একটু দেরী হবে।

এটা কাদের বাড়ী? ফণী প্রশ্ন করল।

বড়কর্তা হেসে বললেন, শুনলে না তোমার মামার বাড়ী।

দিদিকে দেখবেন আপনারা?

নিশ্চয় দেখব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাও। যখন ইচ্ছা এসে দিদিকে দেখে যেয়ো।

আচ্ছা।

অশোক আমার ছাত্র। আমাদের ওদিকে একটা কারখানার মালিক।

নমস্কার বিনিময় করে বললেন, পরে আলাপ হবে, আসুন প্রোঃ গাঙ্গুলী।

অশোক ফণীকে নিয়ে চলে গেল।

(১১)

বরদাবাবুর বড় ছেলে সত্যকে সব অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, কদিন পরে সে চিঠির জবাব হল।

লিখেছে, আপনার, মার, বাবার চিঠি পেয়েছি। তিনখানা চিঠি পড়ে কি হয়েছিল, কেন আপনি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে এভাবে হস্তক্ষেপ করলেন, বুঝতে পারলাম না। যা জানিয়েছেন আপনি তুলসীর ভার নিয়েছেন, বাবার অভিযোগ গুরুতর। তিনি আদালতে যাবেন লিখেছেন। আমি নূতন চাকুরিতে ঢুকেছি, ছুটি পাবার সম্ভাবনা নাই। নইলে নিজে গিয়ে তুলসীকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতাম। আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে শুনেছি, বয়সও যথেষ্ট হয়েছে, তুলসীকে বিয়ে করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, আপনি নিজে জানেন। কেন তাহলে তাকে এ-ভাবে কলংকের ভাগী করলেন? আমার অনুরোধ তুলসীর সুনামের কথা, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

তুলসীর পড়াশোনা আর হবে না বুঝতে পারছি। বাবাকে লিখছি, তুলসীকে যে টাকা পাঠাই ফণীর পড়াশোনার জন্য সে টাকা এখন থেকে ফণীর জন্য খরচ হবে।

সত্যর চিঠি পাবার আগে বরদাবাবু একদিন রুদ্রমূর্তি ধরে হানা দিয়েছিলেন আমার বাড়ীতে, তার আগে শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁর কথা থেকে জানতে পারলাম। এবডাকশান চার্জের আসামী করে আমাকে শ্রীঘরে পাঠাবেন, গুণ্ডা লাগিয়ে পাড়া থেকে আমাকে তাড়াবেন ইত্যাদি যা কিছু বলবার ছিল তাঁর, বলে গেলেন।

চুপ করে শুনে গেলাম। তাঁর উত্তেজনা দেখে ভয় হ'ল স্ট্রোক হতে পারে। স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে লক্ষ্য করলাম। নমস্কার করে বললাম, আপনার হার্ট এটাকের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, ঘণ্টাখানেক চুপ করে শুয়ে থাকুন বাড়ী গিয়ে। আর চেঁচালে মামলা-মোকদ্দমা করবার সুযোগ পাবেন না।

কিছুক্ষণ হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর উপযুক্ত মুখভঙ্গী সহ-যোগে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে উঠে পড়লেন।

সত্যর কাছে হয়ত কিছু সুবিবেচনার প্রত্যাশা করেছিলাম। সে নিজে এসে সব কথা শুনে যদি ভগ্নীর ভার নিতে চাইত, তার হাতে তুলসীকে ছেড়ে দিয়ে এই গোলমেলে ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াতাম। হয়ত না খেতে পেয়ে, অসুখে, নির্যাতনের ফলে তুলসীর অকালে মৃত্যু হত। কার কি ক্ষতি হত তাতে? ভাল ছেলে, ভাল মেয়েরা কি অকালে মরছে না? তুলসী মরে যেত, তার সব যন্ত্রণা শেষ হত, দু'চার মাস মনে মনে হায়, আহা করে ভুলে যেতাম তার কথা। কিছুদিন চোখ বুজে কানে তুলো দিয়ে মনকে রেফিজারেটরে পুরে রাখতে পারলে নিশ্চিন্ত হবার দিন এগিয়ে আসত, কারণ শুধু টিউবওয়েলের জলের ওপরে চলছিল তুলসী কিছুদিন ধরে।

এখন যা দেখছি, তুলসী হয়ে দাঁড়িয়েছে গলার কাঁটা। এ কাঁটা গলা থেকে তুলে নিজেকে বাঁচাই কি করে?

কয়েকদিন পরের কথা। তুলসীর চিকিৎসা চলছিল। তার অবস্থা ভালর দিকে, কোম্পানীর লেবরেটারীতে কাজ করছিলাম, বড়কর্তা এসে ঘরের দুজন এসিস্টান্ট যারা তখনও বাড়ী যায়নি, তাদের ভাগিয়ে দিয়ে বললেন, চলুন মশাই আপনার তুলসীর কাছে। কথা দিয়েছি তাকে আজ আপনাকে ধরে আনব। বুড়ো বয়সে কি বশ মন্ত্র খাটিয়েছেন জেঠামশাই বলতে অজ্ঞান, চোখে জল। মন্ত্রটাকে ফর-মুলায় ফেলে যদি একটা কিছু বের করতে পারেন লাল হয়ে যাবে কোম্পানী তা বেচে।

তাঁর বাড়ীতে যেতে হল তাঁর সংগে।

(ক্রমশঃ)

মনুখের মেলা

বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা

মহা রসের বুড়ো মহাদেব সাউ।

বুড়ো বয়েসে আবার টোপর মাথায় দিয়ে বিশ বছরের নয়-চা যুবতী মেয়েকে বউ করে এনেছে। বউটাকে দেখতে নাকি পরীর মতন।

পাড়ার বঙ্কিম সাধুখাঁ মহাদেবের এক গেলাসের ইয়ার। চাল্লিশ বচ্ছর 'ন্যাশা' করেছে এক সঙ্গে। দুজনে ধানবাড়ির জলে পড়ে মাতাল হয়ে সারা রাত পাক খেয়েছে, মারামারি করেছে, মামলা করেছে, আবার ভাব হয়ে গেছে, দুজন বিবির বাজারের একই বিবির কাছে গেছে কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা মহাদেব সাউ গোপন করলে কেন তাকে? মহাদেবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতেই সাধুখাঁ বললে, 'কি হে সুমুন্দি, খুব যে টেরি বাগিয়ে, কোঁচা দুলিয়ে, পাঞ্জাবি পরে, পান চিবিয়ে ঠোঁট রাঙা করে চা-দোকানের মোড়ে সন্ধ্যের আড্ডা জমাতে চলেছ? বলি মাল-টাল আজ টানা হবে?'

মহাদেব হেসে গালটা অনেকখানি টেনে রইল। তারপর বললে, 'টাকা নেই!'

'কেন, নতুন বউ কি টাকার ভাঁড়ারটা দখল করে ফেলেছে?'

'মাইরি! আমাকে শুদ্দু।'

'হু-হু-হু! টইটুম্বুর! গায়ে সেন্টের গন্ধ! আবার পায়ে আলতা?'

'দুপুরে ঘুমুচ্ছিলুম, পায়ে লাগিয়ে দিয়েছে, শালীটা বড় দুষ্টু! আর কালি দিয়ে আমার রাবণের মতন গোঁফ করে দিয়েছিল। বাইরে বেরুতে বড় গিন্নী জ্বলে উঠল : 'মরণ। গলায় দড়ি জোটে না! রাবণ সাজিয়েছে বুড়ো বলে? তবু কত আতিখ্যেতা!' —আয়না দিয়ে দেখি—তাই তো! মিথ্যে রাগ দেখিয়ে হাঁকলুম, বেদানা! একি করেছ? আমি কি তোমার ঠাকুদ্দা যে মস্কারা করেছ? বেদানা হেসে খুন! বড়গিন্নী চোখ বার করলে তাকে পাঁজা করে ধরে কোলে তুলে নাচাতে থাকে। সেও হেসে ফেলে। ভারী মজার মেয়ে!'

দুজনে কার্তিক মাসের শেষে ধান পাকা মাঠের মাঝ দিয়ে হাঁটতে থাকে।

সাধুখাঁ গম্ভীরভাবে বললে, 'ভাল কাজ করলি না। ঐ জোয়ান মেয়ের যৌবনের ভোগ দিবি কি করে এখন তুই? তোর এখন ছাপ্পান্ন বচ্ছর বয়েস। চুল পেকেছে। ভুঁড়ি গজিয়েছে। হাঁটুতে গেঁটে বাত। দুদিন বাদে কোমর আঁকড়ে ধরবে। সোমত্ত মেয়ে ঘরে, বড় ছেলে লেদ মেশিনের বড় মিস্ত্রি — ছ'শো টাকা মাইনে — তাদের বিয়ে দিবি কোথায় না নিজে বিয়ে করে আনলি? ঐ মেয়েটার সঙ্গেই তো তোর ছেলের বিয়ে দিতে পারতিস!'

'তাই তো দিতে চেয়েছিলুম হে। কনে দেখতে গেলুম [illegible] বাদল মাইতির সঙ্গে। বাদল কনেটার দাদা-মশায়। কনে আমাকে দেখে হাসতে লাগল। বাদল বললে, 'ও শালী ঐ রকম, সদাই হাসে! ওকে কনে সাজানো হয়েছে, তাই মজা পেয়ে [illegible]। ওকে তুই-ই না হয় বিয়ে কর। দশ বিঘে জমি লিখে দিবি খালি ওর নামে। তোর বুড়ী দেঁতুড়ি বউ নিয়ে সারা জীবনটা সুন্দরী মেয়ের পীরিতের খিদেয় কাল কেটেছে। ছেলের বউ হবে, আরো অনেক মেয়ে আছে। তাছাড়া বেদানা লেখাপড়া জানে না — তোর ছেলে ওকে নাকচ করে দেবে।' শালা, মাথা

এমন 'ঘুইরে' দিলে, আর মনে হয় পানের মধ্যে বশীকরণের ওষুধ দিয়ে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিল। দলিল লিখিয়ে টিপসই করিয়ে একেবারে বিয়ে দিয়ে কনে সমেত ঘরে তুলে দিয়ে গেল। বড় বউ আমাকে মারবে বলে গাছ-কোমর বেঁধে তেড়ে এলো, 'তবে রে ওনামুখো মিনসে, তোমার বিয়ের নিকুচি করেছে', তেড়ে এসে আমার গলা টিপে ধরলে, আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে শেষবেলা শালা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল! মেয়ে কাঁদতে লাগল, মাথায় জল চাপড়াতে লাগলুম। ওর হার্টের ব্যামো। ছেলেটা ব্যাগ হাতে নিয়ে 'যাচ্ছি বাবা' বলে কলকাতায় চলে গেল। দু সপ্তা আর বাড়িতে এলো না। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। বেদানার সঙ্গে সব্বাইয়ের ভাব। সংসার আনন্দে মাত করে রেখেছে। আমার ছেলের সঙ্গে ক্যারাম খেলে—লুডো খেলে। তাকে খাওয়ায়—মাথা আঁচড়ে দেয়।'

'হুঁ। চল মাল খেতে যাই আজ।'

'বেদানার মানা। তাছাড়া টাকা নেই।'

'তোর টাকা নেই কোন সুমুন্দি ও বিশ্বাস করবে না। পঁচিশ বিঘে জমি। ধান, আড়, পাট, আখ বাঁশ উলু পান কলাই কত জিনিস বিক্রি করিস। ঘি দুধ খাস। ফরসা শরীর টসটস করছে। খালি এখন চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। ক'দিন আর বাঁচবি ভাই সাউ মশায়, আজ মাল না খাওয়ালে—এই'...

'এই—মাইরি—না না—তোর পায়ে ধরি'...লাফ দিয়ে একেবারে পথের নিচে নেমে যায় মহাদেব সাউ। সন্ত্রস্তভাবে হাত দুখানা কাঁপাতে থাকে। কাতুকুতুকে তার ভীষণ ভয়। সাধুখাঁ সবে তার পাঁজরে একটু কাতু দিয়েছে—তো দে এক লাফ।

সাধুখাঁ খুব মজা পায়। আঙুল বাড়িয়ে ভয় দেখিয়ে বলে, 'এই দিলুম, এই'—

'এই শালা! না মাইরি!'

'এই'—

'এই ভাই না, মরে যাব মাইরি, তোর পায়ে ধরি, তোকে জোড়হাত করি।'—ধান বনের কাদায় জুতো সমেত নেমে যায় মহাদেব। একবার কচু-বনের মধ্যে ফেলেছিল সে ওকে। একেবারে লাফ দিয়ে পড়েছিল জলে। ভাঙা কাচে পা কেটে গেল। ঝুরঝুরে রক্ত বার হতে লাগল উঠে আসতে। সাতটা দিব্যি গালতে তবে জল থেকে ওঠে। পা বেঁধে দিতে চাইলেও মহাদেব নারাজ। ভয়, আবার যদি কাতুকুতু দেয়।

মহাদেব কাতরভাবে বলে, 'তোর নামে দিব্যি, অমন করিস নি। গালাগালি করব।'

ছেলেরা ছুটে এলো মজা দেখতে। হৈ-হৈ কাণ্ড!

সাধুখাঁ আরো নেমে গেল। তখন চিৎকার গালাগালি—[illegible]।

সাধুখাঁ বলে, 'ওরে শালা, তোর নতুন বৌয়ের সঙ্গে এত পীরিত—তার কথা গুবরেপোকা। আমি দু'কুড়ি বচ্ছরের ইয়ার—এখন মদ খাওয়াবে না? এবার নেমে শালাকে ধানবনের মধ্যে ফেলে বুকে চেপে খুব করে কুতকুতুনি দোব তোর বগলে আর পাঁজরায়। তোর দম বার করে দোব।' বলে সত্যিই বঙ্কিম সাধু খাঁ ধানবনের কাদায় নেমে যেতেই মহাদেব বললে, 'ওরে শালা, ওরে আমার সোনাই, চল তোকে মাল খাইয়ে আনছি।'

'আয় তবে!' হাত ধরে টেনে তুলে আনলে তাকে সাধু খাঁ। হাত-পা ধুয়ে বাসে উঠে চলে গেল মদ-দোকানে। দুজনে গলা পানি টেনে রাঙুন হয়ে এসে টলতে টলতে রিকসা থেকে নামল রাত ন'টার সময়। নেমেই টলে পড়ে গেল মহাদেব। তাকে তুলতে গিয়ে তার গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বঙ্কিম। মোড়ের লোকজন তাদের রগড় দেখতে লাগল। কেউ কেউ ছি-ছি করতে লাগল। ফারুকুল হোসেন অন্তরঙ্গভাবে কাছে এসে বললে, 'মহাদেববাবু, মান-ইজ্জত ডোবাবেন?'

'মান-ইজ্জত! কেন বাবা? জীবনটাকে উপভোগ করা কি অন্যায়? আমি তো শালা সাধু নই গেরস্থ!'

বঙ্কিম বলে, 'হাঁ গেরস্থ। একদম সাধু না।'

'নেশা আপনাদের খুব ভাল করে জমেছে। মাতলামি করছেন ইচ্ছে করে।' ফারুকুল চলে গেল।

টলতে টলতে নাচতে নাচতে হাতের তালি মেরে জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে বাড়ির দিকে চলে আসবার সময় দুজনেই পড়ে গেল। সাধু খাঁ কোনোক্রমে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে উঠে মহাদেবকে টানাটানি করতে গেল সে হুড়হুড় করে বমি করতে থাকে।

বঙ্কিম বলে, 'মর শালা, আমি চললুম। নেশার বারোটা বাজিয়ে দিলে—বমি হল তো সব 'ফুইরে' গেল!'

শীত পড়ে গেছে। গাঁয়ের উদোম হাওয়া ভরা মাঠে শুধু অন্ধকার আর আকাশে তারার দেওয়ালী। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। খানিকটা দূরের মুদি-খানার চাতালে এসে শুয়ে পড়ে থাকে বঙ্কিম সাধু খাঁ। আর বকতে থাকে।

মহাদেব তখন পথের পাশে পড়ে আছে। কুকুরে তার মুখ চাটছে। খবর শুনে মহাদেবের ছেলে পরাশর আর ছোট বউ বেদানা এলো অন্ধকারে টর্চ হাতে নিয়ে।

কুকুরটা মুখ চাটতে থাকলে তার গলা জড়িয়ে ধরতে যায় মহাদেব বুড়ো। আর বলে, 'বেদানা—আমার বে-দা-না—! তোমার দানা নেই। বীজ নেই। অপসরা!'...

কুকুরটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয় পরাশর।

বেদানা বসে পড়ে আঁচল দিয়ে স্বামীর মুখ মোছাতে থাকে। বলে, 'তুমি না মদ খাবে না বলেছিলে হাঁগো? মদ তুমি খেয়েছ, না, মদ তোমাকে খেয়েছে? চলো, ওঠো, বাড়ি যাবে।'

'কে বটে!' টলতে টলতে সাধু খাঁ এগিয়ে এল।

বেদানা আর পরাশর দুদিকের নড়া ধরে মহাদেব সাউকে টানতে টানতে নিয়ে এল বাড়িতে।

বড়গিন্নী বললে, 'ছেরন! মিনসের মুখে নুড়ো জেলে দে।'

পরাশর রাত্রে দোর বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। বেদানা, বাসন্তী, তার মা তরলা ডাকাডাকি করতেও সে আর দোর খুললে না। সকালে সুটকেশ হাতে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল।

বেদানা চোখ মুছতে লাগল।

মহাদেব হুঁকো টানে আর ভাবে, ছেলেটা বোধহয় আর ফিরবে না। ক্ষেতে জন লাগবে, লোকজন ডাকা দরকার, বেরুতে পারে না, কোমর আঁকড়ে ধরেছে, সোজা হয়ে চলতে পারে না। পানের বরোজ পড়ে গেছে।

তরলা বলে, 'লাঠি ধরো না। বাই কতো বুড়োর। এখন ক্ষেতের ধান ইঁদুরে বাঁদরে, চোরে-ছ্যাঁচোড়ে খাবে।'

তারপর মহাদেব সাউ হঠাৎ একদিন মারা গেল। বেদানার ঘরে, বিছানায় শুয়ে শুয়েই। কেন তা কে জানে, সকালবেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়েছিল—ঐ পর্যন্ত—বেদানা নাকি কিছু জানে না।

—আবদুল জব্বার

ইনকারা কি লিখতে পারতো
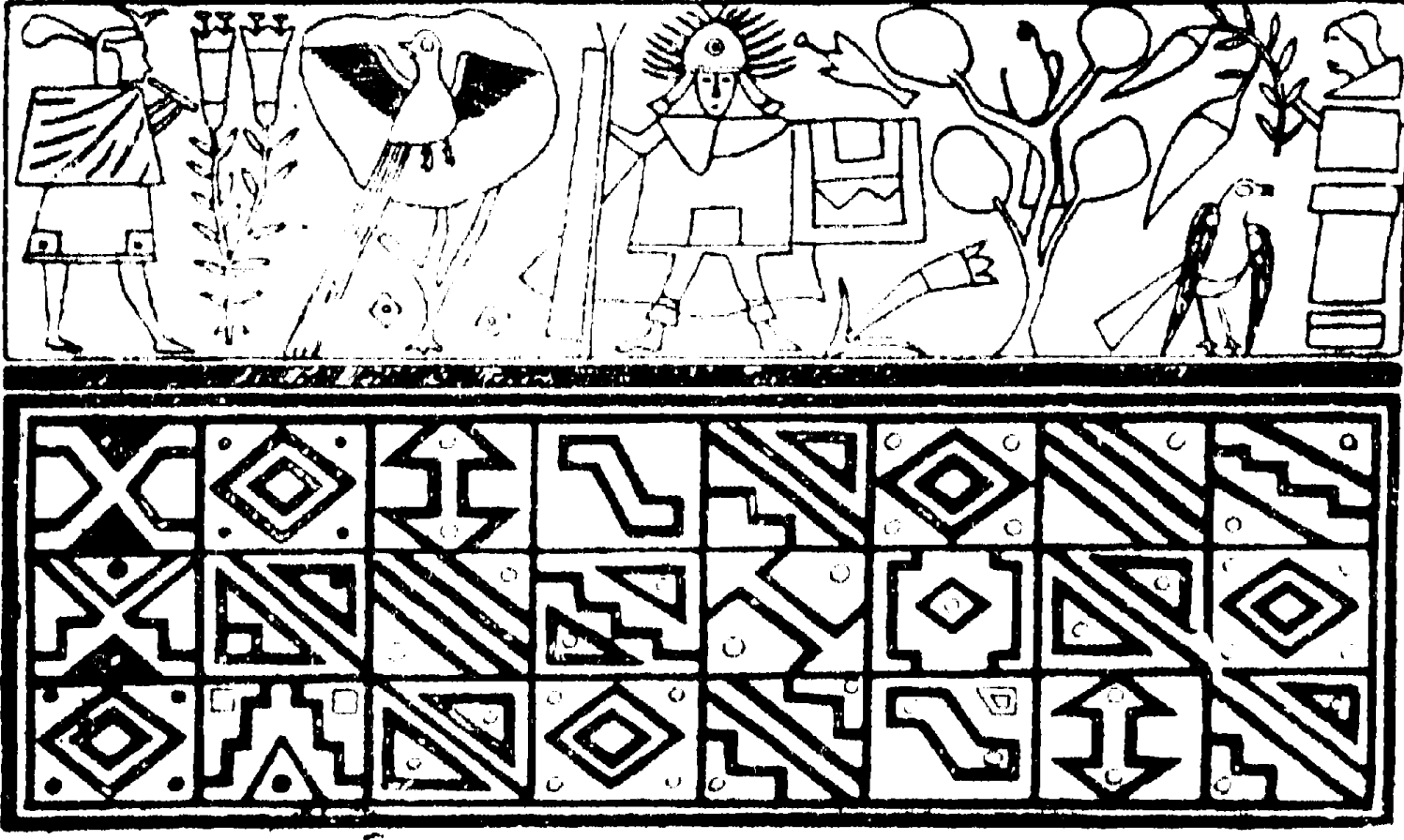
বহুকাল আগে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ছিল ইনকাদের শাসনে। এতোকাল মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, এই সুসভ্য জাতি লিখতে জানতো না। প্রাচীন লিপি বিশেষজ্ঞ জার্মান বিদুষী শ্রীমতী বার্থেল ইনকাদের পরিধেয় বস্ত্রে জ্যামিতিক অলংকরণ এবং পুজোয় ব্যবহৃত ঘটের ওপর আল্পনা থেকে মায়া লিপির মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমানে তিনি চারশো চিত্রের মধ্যে পঞ্চাশটির ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং চব্বিশটি পড়তে পারেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রতিবাদের সীমারেখা

পাশ্চাত্য খণ্ডে পয়সার অভাব নেই, খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য সবই প্রচুর, অথচ এই স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সেখানকার ছাত্র সম্প্রদায় আজ মারমুখী। তারা বিদ্রোহের পথে নেমেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আমাদের দেশে ছাত্র অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে. কিন্তু এদেশের ছাত্রদের মনোভঙ্গীর সঙ্গে ওদেশের ছাত্রদের উদ্দামতার মধ্যে মৌল-পার্থক্য অনেক দিক থেকে।

আমাদের ছাত্রদের বিদ্রোহের কারণ অজস্র, যথা — মরচে-ধরা শিক্ষা-পদ্ধতি, বেকারীর বিভীষিকা, সামাজিক কাঠামোর ভিতর যথোচিত মর্যাদার দাবী এবং গোঁড়া সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। এছাড়া আরও অসংখ্য কারণ রয়েছে। মোটকথা সামাজিক অব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাই আসল কারণ। একমাত্র উৎকট চরমপন্থী ভিন্ন 'এস্টাব্লিস-মেন্ট' বা 'সিসটেম' নামক নয়া-দুষমনের তেমন বিরোধী নন। বরং এই 'এস্টাব্লিস-মেন্ট' নামক ভৈরবীচক্রের পাঁচজনের মধ্যে একজন হয়ে মোড়োলী করার সাধ অনেকেরই। আর না-পাওয়ার বেদনাই অনেককে হতাশার সাগরে ভাসিয়েছে। বিভ্রান্তিজনিত অসন্তোষ ছাত্রদের কাঁধে বিদ্রোহীর পতাকা তুলে দেওয়ার কাজে সাহায্য করেছে।

ওদেশের ছাত্র প্রতিবাদের প্রকৃতি ভিন্ন। সেসব দেশের 'এস্টাব্লিসমেন্ট' বা 'সিসটেম' ছাত্র সমাজের জন্য কিছু পরিমাণে কল্যাণ-ধর্মী কর্ম করেছেন যথা—ছাত্র সমাজের বহুবিধ সুখ-সুবিধা বিধান, পাঠগ্রহণ পর্ব শেষ হলে সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান এবং নানা-বিধ হিতকরী (ওয়েলফেয়ার) ব্যবস্থা। ছাত্রদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য পশ্চিমের রাষ্ট্র-প্রধানরা বদ্ধপরিকর।

কিন্তু শুধু রুটিতেই ত মানুষ বাঁচে না, তদতিরিক্ত কিছু চাই। ওদেশের ছাত্র-সমাজ অসন্তুষ্ট কারণ এই 'সিসটেম' সেখানে পাপগ্রহ সমতুল। প্রতিযোগিতা-মূলক জড়বাদী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সিসটেম দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধারাকে নরকে রূপান্তরিত করেছে। জীবনের বিকাশ, তার উৎকর্ষতা হ্রাস পেয়েছে, জীবন-যাত্রার মান বাড়লেও জীবনধারা উন্নত হয় নি। সেখানে মানুষ 'কনসিউমার' নামক স্বয়ংক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত। রাষ্ট্রকর্তারা এক কাঞ্চন-কুলীন প্লুটোক্রাট গোষ্ঠীর হাতে ক্রীড়নক মাত্র। নরনারীর জীবন সেখানে এক শ্রেণীর 'পাওয়ার এলিট' বা শক্তিমান ভদ্র গোষ্ঠীর তাঁবে। ব্যুরোক্র্যাসির এঁরা চালক, জনসংযোগ ব্যবস্থার চাবিকাঠি এঁদের হাতে, আর যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের বিক্রেতা এই 'পাওয়ার এলিট' গোষ্ঠী।

অনেকে জানতে চাইবেন এ কি সত্য? কতটুকু সত্য। বামপন্থী র‍্যাডিক্যালরা কি অতিমাত্রায় অতিরঞ্জন করছেন না? তাঁদের যুক্তিগুলি অভিপ্রায়মূলক নয় কি?

প্রমাণ জানতে আগ্রহ যাঁদের আছে তাঁদের পিটার বাকম্যান রচিত 'দি লিমিটস অব প্রোটেসট' নামক সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য অনুরোধ করি। 'নিউ র‍্যাডিক্যালিজম' বা নয়া-রূপান্তরবাদ নামক আন্দোলনের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ, জন-মানসে এই আন্দোলনের প্রতিফলন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, শক্তি এবং সীমারেখা প্রভৃতি সকল দৃষ্টিকোণের বিচার করা হয়েছে বাকম্যানের এই গ্রন্থটিতে।

'র‍্যাডিক্যালিজম' বস্তুটির বক্তব্য কি, কিম্বা কি জাতীয় 'সিসটেম'কে ধ্বংস করা র‍্যাডিক্যালদের অভিপ্রায়?

রবার্ট হাইলব্রোণার 'দি ফিউচার এজ হিস্টরি' (১৯৫৯) মার্কিন সমাজের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"Among the 150 supercorporations, there are perhaps as many as 1,500 or 2,000 operational top managers, but as few as 200 to 300 families own blocks of stock that ultimately control these corporation".

বাকম্যান বলেছেন ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে রপ্তানী দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ উৎপন্ন হয়েছে মাত্র বারোটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে।

হল্যাণ্ডে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান মোট রপ্তানীর ৩৫ ভাগ রপ্তানী করেছে, তারাই আবার ঐ দেশের মোট শিল্প ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করেছে এক-তৃতীয়াংশ ভাগ এবং শতকরা বারো ভাগ উচদের কর্মসংস্থান করেছে। জার্মানীতে একটি বড়দরের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দেশের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর এক-তৃতীয়াংশের নিয়োগকর্তা এবং মোট উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশের জন্য দায়ী। দৃষ্টান্ত এইভাবে আরো বাড়ান যায়।

বড় ব্যবসাদার বা বিগ বিজনেসের সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর একটা সুদৃঢ় গাঁট-ছড়া বাঁধা আছে।

"Of eight Secretaries of State (in the US) since 1932, five have been listed in the SOCIAL REGISTER, while three of the five were corporation Lawyers. Of 13 Secretaries of Defence or of War since 1932, eight find a mention in the SOCIAL REGISTER, while the other five have been bankers or Corporation executives."

অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 'পাওয়ার-এলিটে'র কাঠামো মোটামুটি একই রকমের। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের উঁচুতলার পাব্লিক স্কুল—অকসব্রীজ-ইন্ডাস্ট্রি এবং হোয়াইট হলের যোগসাজস সর্বজনবিদিত।

পাওয়ার-এলিটের অকটোপাশসদৃশ বিস্তারিত বাহু শাসকগোষ্ঠী ছাড়াও আরো অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। ব্যবস্থা পরিষদে ওদের দলবল বেশ শক্তিমান—এ'রাই পাওয়ারফুল লবী গড়ে তোলেন। মাসমিডিয়া বা জনসংযোগের যন্ত্র যথা সংবাদপত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি এ'দের কুক্ষিগত। এছাড়া এই অদৃশ্য শক্তি চিন্তাশীল সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই সব চিন্তাশীল মানুষদের বহুমূল্য গবেষণার ব্যয়ভার বহন করেন এই সব সদাশয়-গোষ্ঠী। এর জন্য ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, স্কুল, কলেজ ও য়ুনিভার্সিটি হরিহরছত্রের মত চারদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর পরও অনেকে প্রশ্ন করবেন—বেশ ত এসব হয়ে থাকে ত কি হয়েছে? সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি ঘটে যদি তাহলে কে তার মূলধন যোগাচ্ছে সেই কথা চিন্তা করে কি লাভ?

এই প্রশ্নই র‍্যাডিক্যালদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে প্রচণ্ড বাধা। উপস্থিত এর একটি জবাব হল এই যে, অতিমাত্রায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যদি প্লুটোক্রেসী বা কাঞ্চনকুলীন সম্প্রদায়ের হাতের মুঠোয় থাকে, (প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রে এই জাতীয় জমায়েত অনিবার্য) তাহলে প্রকৃতপক্ষে জনগণকে আধা-সরকারী অপর এক চক্রের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হয়, যাঁদের ওপর জনগণের কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই, আর এই আধা-সরকারীচক্রের জনগণকে তাঁদের কীর্তিকলাপের জন্য জবাবদিহির দায়িত্ব নেই। এই চক্র প্রতিনিধিত্বমূলক নয়, এদের নির্বাচনে জনগণের কোন অংশ নেই, অথচ এই শক্তিচক্রের অবাধে জনগণের ওপর যা-কিছু বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতা আছে, সাধারণভাবে সমাজকে এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রকে চক্রের নিজস্ব অভিসন্ধি পূরণের কাজে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়।

ক্যাপিটালিস্ট ডেমোক্রেসী বা পুঁজিবাদী ধনতন্ত্র বড় গলায় গর্ব করে বলে থাকেন যে, তাঁরা কম্যুনিস্ট সরকারের চেয়ে অনেক মহৎ; কারণ তাঁরা জনগণকে অবাধ স্বাধীনতা এবং নির্বাচনী ক্ষমতা দিতে পেরেছেন। অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ দিয়ে অতিরেপ্রেনোর বা উদ্যোক্তাদের যথাসাধ্য করার সুযোগ দেওয়া হয় আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সাধারণ খরিদ্দার বা কনজিউমার লাভবান হতে পারেন; (আমাদের দেশে সাবান শিল্প এবং তার আনুসঙ্গিক ভেজিটেবল ঘিয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এই উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে গেছে; কারণ এই সব ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদকরা এসোসিয়েশন গড়ে তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য একটা নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দিয়েছেন। ফলে খরিদ্দার বা কনজিউমার প্রতিযোগিতা-জনিত কোন সুবিধার অংশীদার হতে পারেন না)।

এই সব শক্তিগোষ্ঠী অজস্র পার্টি গজিয়ে উঠতে সাহায্য করেন, কারণ এই সব পার্টি নানা ধরনের কার্যসূচী ভোটদাতাগণের সামনে ধরেন যার মধ্য থেকে পছন্দমত একটি পার্টি বেছে নিয়ে তাকে ভোট দেওয়া যায়; তাছাড়া চিন্তার স্বাধীনতা, নিজস্ব বিশ্বাসের স্বাধীনতা, মানবিক অধিকার এবং জনগণের একটি অংশ না হয়ে ব্যক্তিবিশেষ হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়ে থাকে।

থিয়োরীর দিক থেকে খাতায়-কলমে এসব কথা ঠিক; কিন্তু বর্তমান জগতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রায় সবটুকুই একছত্র অধিকারে রাখার ফলে জনসংযোগ যন্ত্র বা সংবাদপত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত থাকায় কার্যক্ষেত্রে জনগণের মানসিকতাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই শেষোক্ত বস্তুটির শক্তিবৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পক্ষে এক বৃহত্তর সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়েছে। জার্মানীর তৃতীয় রাইখ এই ব্যবস্থার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো যদি কাম্য না হয় তাহলে শক্তি কেন্দ্রীভূত না করে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ অধিকতর প্রয়োজন। এই জাতীয় কেন্দ্রীভূত শক্তি সঞ্চয়ের ফলে সরকার জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হয়ে ক্রমশ দূরে সরে যান। সুতরাং সরকার এতখানি নৈর্ব্যক্তিক না হয়ে যদি শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাব সরকারী কাজে সংযুক্ত হতে উৎসাহিত করেন এবং জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে পারেন তাহলে তার ফল ভাল হবে।

র‍্যাডিক্যালদের চোখে এই সমগ্র ব্যবস্থা একেবারে জরাজীর্ণ। এই জাতীয় এক-চেটিয়া অধিকার বা কাঞ্চনকৌলিন্যের প্রবণতা যে ক্ষমতার অপব্যবহার তাঁরা একথা স্বীকার করেন। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করলে যে সব ঠিক হয়ে যাবে একথাও তাঁরা মেনে নিতে রাজী নন। এ'রা নিছক সংস্কারবাদী নন, তাঁদের বিশ্বাস প্রচলিত পদ্ধতির এই ত্রুটি অন্তর্নিহিত সুতরাং তাকে সমূলে ধ্বংস করাই কর্তব্য, আর তাহলেই সমাজের কল্যাণ সম্ভব। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে অধিকতর মানসিক এবং আত্মস্বার্থহীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। র‍্যাডিক্যালরা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সম্পর্কে তেমন গদগদচিত্ত নন, যেমন বুর্জোয়া-ক্যাপিটালিস্ট গোষ্ঠীর প্রতিও তাঁরা অনুকূল নন। প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় কুৎসিত প্রতিযোগিতা নেই কিন্তু অল্প-সংখ্যক মানুষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত, এই অল্পসংখ্যক মানুষেরই নাম পার্টি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়ে এইখানেই ক্ষমতা অধিক পরিমাণে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং এই ব্যবস্থায়—

"the men are required to be conforming members of a monolithic mass rather than individuals'.

আর সম্ভবত ফ্রী ওয়ার্লডের সরকার-এর চাইতেও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের, সরকার জনগণের কাছ থেকে অনেকখানি দূরে সরে আছেন।

তাহলে র‍্যাডিক্যালরা কি অপরূপ বস্তু নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন? এই গ্রন্থের লেখক বাকম্যানের ভাষাতেই শোনা যাক—

"The kind of social organisation radicals would like to see is clear. Basically organised on socialist lines, with the means of production, distribution and exchange in the hands of these who work,

the new state would put technology to the service of its inhabitants rather than the reverse. Communities would be autonomous, on the principle of self

determination, and would be small enough to enable everyone in them to participate in the making of all decisions. The tyranny of minority over majority and majority over minority will be abolished. There would be no foreign wars. Ideally, there would be police force, no laws limiting personal freedom, and no censorship."

এ এক উদ্ভট পরিকল্পনা, কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তি হিসাবে তা প্রয়োগ করা যাবে না। আদর্শবাদ কোন সমাজেই অবজ্ঞার বস্তু নয় এবং এই আদর্শবাদ ভিন্ন কোন প্রকার কল্যাণকর পরিবর্তন সাধন করাও সম্ভব নয়।

যাই হোক, শ্রমিকের স্বপক্ষে সম্পূর্ণভাবে না টানতে পারলে এই জাতীয় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে পুনর্গঠন সম্ভব নয়। শ্রমিকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করাতে হবে যে, বর্তমান ব্যবস্থা অমংগলকর এবং মানবাত্মাকে নিষ্পেষিত করে, অন্ততঃ র‍্যাডিক্যালরা এই কথাই বলতে চান। কিন্তু যে 'সিসটেম' শ্রমিকদের একটি করে গাড়ী, রেফ্রিজারেটার এবং টি ভি সেট দিতে পারে সেই 'সিসটেম'কে সহসা দুষমন করে তোলা সহজ নয়।

মিঃ বাকম্যান ১৯৬৮-র মে-জুন মাসের উত্তাল দিনগুলিতে ফ্রান্সের নানতে কম্যুনে যা ঘটেছিল তার প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন—

> "The only concrete example demonstrating the possibility of a government of the workers based on the direct management of the economy by those who produce."

এই একবার শ্রমিক আর ছাত্র সমাজ একমত হতে পেরেছিল এবং একতাবদ্ধ হয়েছিল। কম্যুনের সাফল্য অবশ্য স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল, কারণ তার অবস্থা ছিল নিরন্তর অবরোধের। সর্বগ্রাসী বিপদের মুখে একতাবদ্ধ হওয়া সহজ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই একতা কতক্ষণ স্থায়ী হবে? শ্রমিক ও ছাত্রদের কমরেডত্ব কতক্ষণ অটুট থাকবে?

মিঃ বাকম্যান যুক্তরাষ্ট্রের কিছু-কিছু পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার সমর্থন করেছেন যথা, ফ্রী সিটিস, ফ্রী ইউনিভার্সিটিস, মুক্তাঞ্চল প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু গোষ্ঠীকে ফকিরের গোষ্ঠী বলা যায়, তারা আবার নির্ভরশীল দাতব্য ব্যবস্থায়, কিছু লোকের দান করার সামর্থ্য আছে তারা তাই কোন রকমে টিঁকে আছে।

এই সব প্রতিষ্ঠানের টিঁকে থাকার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সিসটেমের পরগাছা হিসাবে ঝুলে না থেকে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য অর্জন করা।

মিঃ বাকম্যান স্বীকার করেছেন র‍্যাডিক্যাল আন্দোলন নিজেদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত, ঐক্য সেখানে একটা চোখ-ভুলানো বস্তু। র‍্যাডিক্যালদের সর্বপ্রধান শত্রু সিসটেম নয়, তাদের শত্রু মানব-প্রকৃতি। এই নয়া-র‍্যাডিক্যালরা তাঁদের পূর্বসূরী আরো অনেক ইউটোপিয়ান গোষ্ঠীর মত একটা 'ব্রেভ নিউ ওয়ালর্ড' গড়ে তুলতে পারবেন মনে হয় না, কারণ মানব-প্রকৃতির রূপান্তর সাধনে তাঁরা অক্ষম।

—অভয়ঙ্কর

THE LIMITS OF PROTEST: BY PETER BUCKMAN
Published by VICTOR GOALLANEZ (1970) Price—50 shillings only.

নতুন বই

আধুনিক ভারতীয় কাব্য পরিক্রমা—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়। মোহন লাইব্রেরী; ৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম—পাঁচ টাকা।

১৯৫৬ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর ২৫শে জানুয়ারী দিল্লীর আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সর্বভাষা কবি সম্মেলনের ব্যবস্থা করে আসছেন। এই সম্মেলনে ভারতের প্রতিটি সংবিধান-স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষার একজন করে প্রতিষ্ঠিত কবিকে কবিতাপাঠের জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়। আলোচ্য সংকলনটি হল আকাশবাণীর এই ধরনের কয়েকটি কবি-সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনার সংগ্রহ। লেখক এই সব সম্মেলন নিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে ঐ আলোচনাগুলো করেছিলেন।

সুখের কথা, প্রতিটি আলোচনাই অতি সুন্দর সাহিত্য-সমালোচনার নিদর্শন। এরা সুন্দর হয়ে ওঠার কারণ, লেখক সত্যিকারের একজন কাব্যরসিক। এছাড়া, আকাশবাণীর সাহিত্য-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মূল কবিতাগুলো সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী, এ-বইটি পড়ে তাঁরা লাভবান হবেন। কারণ, এখানে উদ্ধৃতিসহযোগে বিভিন্ন কবিতার মর্মোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে যে তুলনামূলক নির্ভীক আলোচনা করা হয়েছে, তা' বাংলা কাব্য-সমালোচনার ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার কবিতায় বাংলার কবিদের প্রভাব-নির্ণয়ের প্রচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এবং সেই সঙ্গে আশাও জাগে এই কারণে যে, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ নন, রবীন্দ্র-পরবর্তী কোনো কোনো বাঙ্গালী কবিও অবাঙ্গালী সাহিত্যরসিক সমাজে বহুল পঠিত।

আলোচ্য কাব্যসমালোচনা-গ্রন্থটি সুধীসমাজে সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হলেও বিশেষ মূল্যবান।

মণিদীপা সেন (কাব্যগ্রন্থ)—দিলীপকুমার সাহা।। করুণা স্মৃতি প্রকাশনী।। ২২২।১এ, বাগমারী রোড, কলকাতা-৫৪।। দাম সাত টাকা।।

বইটি সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন: "শ্রীদিলীপকুমার সাহার 'মণিদীপা সেন' নামে কবিতার বই-এর অনেকগুলি কবিতা পড়ে দেখলাম। কবিতা লেখার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু অধিকার আর যোগ্যতা এক জিনিষ নয়। শ্রীসাহাকে তাঁর লেখা কবিতাগুলি বই আকারে ছাপতে যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁরা যোগ্যতার বিচার করেননি একথা পাঠকসাধারণ আশাকরি বলবেন না।" এই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় কবির যৌবন, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ, প্রেম ও রোম্যান্টিক আর্তি প্রকাশিত হয়েছে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

আবহ: অসিত গুপ্ত। ১২বি অহিরীপুকুর রোড, কলকাতা—১৯। দাম: এক টাকা।

গল্প-কবিতার কাগজ। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পগুলি লেখা। লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, শিপ্রা ঘোষ, অরুণ বসু, হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল বসাক, নগেন্দ্র দাশ, সুব্রত রাহা, বিমান চট্টোপাধ্যায়, বারীন ঘোষাল, অজয় সেন এবং আরও অনেকে। সম্পাদকের রুচিবোধ প্রশংসার্হ।

চারুবাক: সম্পাদক রণজিৎ দাশ। টাটা ইণ্ডাস্ট্রিজ স্পোর্টস ক্লাব। ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা—১৬।

পত্রিকাটি একটি বিশেষ সংস্থার মুখপত্র। কিন্তু লেখক-লেখিকারা অনেকেই তার সঙ্গে যুক্ত নয়, অনেকেই আমন্ত্রিত। এ সংখ্যায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন সূর্য মুখোপাধ্যায় (আগামী কালের কাব্যকাহিনী: লেনিন পর্যায়)। কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিশিনাথ সেন প্রমুখ। গল্পকারদের মধ্যে আছেন চিত্ত তরফদার, আশানন্দ চৌধুরী, সুধীন ঘোষ ও জয়তিলক গুহরায়। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ রুচিসম্মত এবং লেখাগুলি পাঠযোগ্য। অনেকের কাছে মূল্যবান বলে মনে হবে।

বইকুণ্ঠের খাতা

কবি, কবিতা ও কবি-ভাষ্য

কবিদের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানিয়ে শেলী তাঁদের সম্বোধন করেছিলেন, 'আনএকনলেজড লেজিস্লেটর্স অব দি ওয়ার্লড' বলে। কবিতার গুণাগুণ বিচার করে অবশ্য তিনি সে সম্বোধন করেননি। নানা শ্রেণীর কবিতা ও কবি-মানসিকতার বৈচিত্র্যই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সারা পৃথিবীর কবিকণ্ঠের উচ্চারণ কী বিপুল—সুদূর কী বিস্ময়কর এক ঐকতানের স্রষ্টা! কী সুদূর, কী বিস্ময়কর এক ঐকতানের স্রষ্টা!

কিন্তু একজন সম্পাদক, যিনি কবিতার সংকলন সম্পাদনা করেন, তিনি কাকে দেখবেন সবার আগে? কবিকে? না, কবিতাকে?

এ প্রশ্নের কোনো সরল উত্তর নেই। সার্বজনীন উত্তর হলো, কবি তুচ্ছ, কবিতাই একমাত্র বিচার্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ঘটনা অন্যরকম। কবিতার ওপরে প্রাধান্য লাভ করে কবির নাম। খ্যাতিমান কবির প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি প্রায়শ সম্পাদকের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে সীমাবদ্ধ করে—তাঁর বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে।

আমি এমন দু'একটা ঘটনার কথা জানি, সংকলনের উপযোগী লেখা সংগ্রহের জন্য সম্পাদকরা বারবার খ্যাতিমান কবিদের কাছে ধর্ণা দিয়েছেন এবং নতুন করে কবিতা লিখিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, তাঁদের লেখা বাদ দিলে সংকলনের মর্যাদাই শুধু ক্ষুন্ন হয় না, ব্যবসায়িক সাফল্যে বাধা পড়ে, পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

তবু যদি কোনো দুঃসাহসী সম্পাদক এই সব বাধাকে অতিক্রম করে কবিতার নির্বাচনে নির্মম হয়ে উঠতে চান, তাহলেও তাঁর সামনে দেখা দেয় আরো কিছু নতুন প্রশ্ন, আরো কিছু নতুন সমস্যা। সম্পাদক যাকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে সংকলনভুক্ত করেন, পাঠকের বিচারে অনেক সময়ই তা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। এমনকি লেখকের কাছেও তা কখনো কখনো অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে।

সম্পাদক ভেদে রুচির অদলবদল হয়, কবিতার নির্বাচনে তারতম্য ঘটে।

সম্প্রতি এই বিতর্ক এবং বিরোধের দায়ভাগ থেকে অব্যাহতি পাবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছেন শান্তনু দাস ও মুচুকুন্দ সরকার। তাঁরা কাব্যসংকলনের সম্পাদক হয়েছেন, কিন্তু কবিতা নির্বাচনের দায়িত্ব নেননি। কবিদের অনুরোধ করেছেন, 'স্বরচিত' 'প্রিয়' কবিতাটি চিহ্নিত করে দেবার জন্য। বোধ হয়, সেজন্যেই তাঁরা তাঁদের সম্পাদিত সংকলনের নাম রেখেছেন 'স্বনির্বাচিত'।

প্রকাশের আগে, পরে

কয়েকদিন আগে বইটি আমার হাতে এসেছে। উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। সম্পাদক দুজন কাছেই ছিলেন।

বললাম, কবিতার নির্বাচন তো নিজেরা করেননি দেখতেই পাচ্ছি, কবির নির্বাচনটা কি আপনারাই করেছেন? এবং সেটা কোন যুক্তিতে? কবিতা নির্বাচনের দায়িত্বই বা নেননি কেন?

উত্তর দিয়েছিলেন শান্তনু দাস। বললেন, যে-দায়িত্ব নিয়েছি, তাকে এড়িয়ে যাবার কোনো অভিপ্রায়ই আমাদের নেই। কবি নির্বাচন করেছি আমরাই। কেননা, কবিতার চেয়ে কবি নির্বাচনের কাজটা আরো দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের পর বহু কবি কবিতা লিখেছেন, জনপ্রিয় হয়েছেন। আমরা সেই জনপ্রিয়তার মানদণ্ডটাকে প্রধান বলে মানতে পারিনি। রবীন্দ্রোত্তরকালে বিভিন্ন সময়-পরিধির মধ্যে যে সব কবির মধ্যে আধুনিক জীবন চেতনার সর্বাধিক প্রকাশ লক্ষ্য করেছি, তাঁরাই এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের রচনা সম্পর্কে আমরা কোনো অশ্রদ্ধা পোষণ করি না। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর সংকলনে তাঁরা আছেন। কবিতা নির্বাচন করিনি দুটো কারণে। প্রথমত, আমরা এমন একটি সংকলন প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম, যার মধ্যে কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন পড়বে আগাগোড়া। দ্বিতীয় কারণটি ঐতিহাসিক। একালের সমালোচক ও আগামীকালের গবেষকরা এই গ্রন্থ থেকে এমন সব তথ্য পাবেন, যা স্বয়ং কবির দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। ফলে, এই সংকলন হয়ে উঠবে একটি দলিল গ্রন্থের সংগে সমমর্যাদাসম্পন্ন।

বললাম, এ ছাড়া কি আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না?

শান্তনু দাস বললেন, ছিল। আরো গুরুতর এবং গভীরতর একটা উদ্দেশ্য। অতীতে বাংলা কবিতার একাধিক প্রামাণ্য সংকলন বেরিয়েছে, কিন্তু কবির সংগে কবিতার যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তা কেউ ভেবে দেখেননি। আমরা উপন্যাসিক-দের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খবরাখবর রাখি, চিত্রতারকার অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন হই। অথচ, কবিরা কে, কি করছেন,—কি ভাবছেন—সে সম্পর্কে আদৌ ঔৎসুক্যবোধ করি না। আমরা কবিতার সংগে কবিকে সমান গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছি।

মনে পড়ে, প্রায় বছরখানেক আগেকার কথা।

একদিন শান্তনু দাস আমার সংগে দেখা করেছিলেন, একটা ছাপানো কাগজ নিয়ে। তখন বলেছিলেন, বাংলাদেশের জীবিত পঞ্চাশজন কবির কবিতা নিয়ে একটা কাব্য-

সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে তিনি দারুণ ব্যস্ত। সরস্বতী পুজোর আগেই বইটি বের করতে হবে। আমরা প্রয়োজনের সময় কোনো কবির একটা ফটোগ্রাফ পর্যন্ত খুঁজে পাই না, পাঠক চেনেন না তাঁর প্রিয় কবির মুখ। সেজন্যে প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে থাকবে কবির একটি চমৎকার ফটোগ্রাফ।

সেদিন, তাঁর পরিকল্পনা ছিল ছ' সাত ফর্মার মধ্যে সংকলনটি সীমাবদ্ধ থাকবে।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। রুদ্রেন্দু সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে শুরু করলো। কবির সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে বেড়ে হলো ছেষট্টি। ফলে, নির্ধারিত সময়ে বই বেরুলো না। পঁচিশে বৈশাখ পেরিয়ে গেলো উদ্যোগ আয়োজন শেষ হতে না হতেই।

'স্বনির্বাচিত' বেরুলো শরৎকালে। পুজোর সামান্য আগে।

শান্তনু দাসকে জিজ্ঞেস করলাম, বই প্রকাশে এই বিলম্বের কি স্পষ্ট কারণ আছে?

—পরিকল্পনাটা যখন মাথায় এলো তখন সব দিক ভেবে দেখিনি। কাজে নেমে দেখলাম, নানা বাধাবিপত্তি। কবিদের কাছে লেখা চেয়ে ঠিক সময়ে লেখা পাইনি। আবার যখন লেখা পেলাম, তখন দেখি অনেকেই ছবি পাঠাতে দেরী করছেন। কিছু প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছিলাম কবিদের কাছে। তাও ঠিক সময়ে পাইনি। একজন পাঠিয়েছেন তো, অন্যজন নীরব। ফলে, চিঠিপত্রে যোগাযোগ, বাড়ীতে যাতায়াত করতে করতে অনেক সময় লেগে গেছে। তার ওপর আছে প্রেসের সমস্যা। এমন একটি সংকলন যে-কোনো প্রেসে ছাপতে দিতে মন সায় দেয় না। সরস্বতী প্রেসে দিলাম। সাধারণ একটি প্রেসে ছাপলে যা খরচ পড়তো তার দ্বিগুণ খরচ করে ছাপাতে হলো লাইনো হরফে। ফলে, সতর্কতা অবলম্বন না করে পারিনি। যেখানে সম্ভব হয়েছে, কবিদের দিয়ে প্রুফ সংশোধন করে নিয়েছি।

একটু থেমে বললেন, এই দীর্ঘ প্রসেসের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের একটি প্রামাণ্য বই বের করতে হলে কি রকম অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়—তা তো বুঝতেই পারছেন। তাছাড়া বইটিকে আমরা সব চাইতে রুচি-সম্মতভাবে প্রকাশের ওপরেও জোর দিয়েছিলাম কম নয়। অন্তত দেখাতে চেয়েছিলাম, শুধু সম্পাদনার ব্যাপারে নয়—প্রকাশনার জগতেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ভূমিকা ও গ্রন্থনা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'বর্তমানকালের বাঙালী কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতার এই সংকলন-গ্রন্থের পরিকল্পনা দেখে বেশ ভালো লাগলো। এ পরিকল্পনা অভিনব।'

তিনি আধুনিক কবিতার পাঠক নন। মূলত ভাষাতাত্ত্বিক। ভূমিকায় তিনি সে কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে লিখেছেন: 'তা বলে আধুনিক কবিতা, আধুনিক লেখকদের রচনা—এ সবকে 'ন-স্যাৎ' করে উড়িয়ে দিতে পারি না। যদিও সবক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ঋষিদের মত, ইহুদী ভাববাদীদের মত, শেক্সপিয়রের মত, রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ভূমাস্পর্শী কল্পনা বা অভিজ্ঞতা এঁদের মধ্যে দুর্লভ—তবুও একথা মানতেই হবে, এঁরা 'আধুনিক', এঁদের পিছনে আছে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্বজ আর পথিকৃৎদের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি ধ্যান-ধারণা চিন্তা-বিচার, যার একটা বিশ্বজনীনতা একটা চিরন্তনতা আছে বলেই মনে করি। আর এই চিরন্তনতা, এই শাশ্বত মূল্য সম্বন্ধে একটা সাম্প্রতিক তথাকথিত 'অনীহা'—কেবল পঞ্চভূত-নির্মিত নির্মিত দেহকেই আঁকড়ে থাকে, আর তার বাইরের কোন কিছুর সম্বন্ধে উদাসীন অথবা অবজ্ঞাপূর্ণ, উপরন্তু যাঁরা আধুনিক কালের নানা মানসিক অস্থিরতার প্রকাশকে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখে সেটাকেই আধুনিক সাহিত্যের প্রাণবস্তু ভেবে, চিরন্তনকে ত্যাগ করে বা অস্বীকার করে নিজেদেরই বিড়ম্বিত করেছেন, যাঁদের দৃষ্টি বা মনন এই ধরনের, তাঁদের মধ্যেই সীমিত। মানব সমাজের ক্ষণিকের রীতিনীতি, ধনসম্পদ, উদ্দাম উদ্দেশ্যহীন 'প্রগতি' আর সুখ-দুঃখের মধ্যেই বিশ্বপ্রপঞ্চের গতিরেখা নিহিত,—তার বাইরে স্থিতিশীল বা গতিশীল আর কিছুই নেই, একথা বলি কি করে?'

এ সংকলনের কবিতাগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'আজ যা আধুনিক আর প্রগতিশীল হয়ে দেখা দিচ্ছে, আগামীকাল তা পুরাতন আর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বে,—মানুষের মন আর সমাজের গতি এত তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে। এই আধুনিককালের মধ্যেই আমরা রয়েছি, এই হেতু এর সম্বন্ধে চরম বিচার, সাহিত্য আদালতের ডিক্রি-ডিসমিস করে মত দেওয়া, আমাদের শক্তির বাইরে।'

বইটির 'গ্রন্থনা'-প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন লিখেছেন: 'একটি অভিনবত্ব গ্রন্থের নামের মধ্যেই আছে। স্বনির্বাচিত একক কবির সংকলন এর পূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বহু কবির একটি করে স্বনির্বাচিত কবিতার সংকলন এর পূর্বে আর বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রত্যেক কবিকেই তাঁর বিবেচনায় নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতাটি নির্বাচন করবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কবির মানসিকতাটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে। উপরন্তু কবিরা তাঁদের যে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে যেমন একদিকে তাঁদের বহিরঙ্গ পরিচয় আছে, তেমনি অন্তরঙ্গ পরিচয়ও আছে। জন্ম সময় এবং স্থান থেকে আরম্ভ করে কবিতা রচনার প্রেরণা, অন্য কবির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে কবির নিজের জবানিতে আমরা অনেক কথা শুনতে পাব। তাঁর ভালো লাগা, মন্দ লাগার জগতেরও পরিচয় পাব। সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কবিদের বিশিষ্ট দান সম্বন্ধে তাঁদের মতামতও সংগৃহীত হয়েছে। এই মতামত প্রকাশে কেউ স্বল্প-বাক, কেউ আবার বাক বিস্তারে কার্পণ্য করেননি। এরকম করে কবিদের মনকে পাঠক সাধারণের কাছে উন্মোচিত করে দেবার প্রয়াস এর আগের কোনো সংকলনে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কবিদের একটি করে প্রতিকৃতিও গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।...... কবিসত্তাকে বুঝলে যদি কোনো বিশেষ কবির কবিতা বোঝার সহায়তা হয়, তবে এই সংকলনটি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'সব মিলিয়ে এই সংকলনটিকে আমার একটি শোভাযাত্রার মতো মনে হয়েছে। শোভাযাত্রার পুরো ভাগে যাঁরা আছেন, তাঁরা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদের স্বকীয়তার আদর্শটি তেমন পরিস্ফুট নয়। এই পরবর্তী কবিরা যেন শোভাযাত্রার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছেন, দূর থেকে তাঁদের স্বকীয়তা তেমন করে চোখে পড়ে না। হয়তো অচিরেই তাঁদের অনেকে নিজস্ব মহিমায় শোভাযাত্রার পুরোভাগে অগ্রবর্তী হয়ে আসবেন।'

পাঠকের প্রতিক্রিয়া, সম্পাদকের সাফাই

বইটি বেরুবার পর পাঠকমহলে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ খুশি হয়েছে,

কেউ অসন্তুষ্ট। কেউবা এ ব্যাপারে নীরব থাকতে চান।

সেদিন জনৈক তরুণ কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমন লেগেছে 'স্বনির্বাচিত'? আপনার মতামত কি?

ভদ্রলোক প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলেন তৎক্ষণাৎ। বললেন, কিস্সু হয়নি। ও একটা পিঠ চাপড়ানো সংকলন। দেখতে শুনতে ভালো হয়েছে। কভারে কবিদের কাটামুণ্ডু, চোখ, মুখ, হাত, পা ছাপা হয়েছে—ভালোই। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এ সবের আয়োজন? ঐতিহাসিক বিতর্কের সূত্রপাত করা? না সম্পাদকদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা?

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, সংকলনটির উদ্দেশ্য কিন্তু সকলকে নির্বিচারে জায়গা দেওয়া নয়। নির্বাচিত কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতার সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের কিছুটা পরিচয় প্রদান। সে উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হয়নি?

কিছুটা শান্ত হয়ে তিনি বললেন, তা হলে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমি বড়ো কবি নই, কবিতা পড়ি এবং কবিতার বই কিনি। সংকলনটি হাতে নিয়ে আমি আরো কয়েকজনকে প্রত্যাশা করেছিলাম। বিশেষ করে, যাঁদের লেখা এ সংকলনে স্থান পেয়েছে, তাঁদের পাশাপাশি আরো অনেকের লেখাই থাকতে পারতো।

অন্য একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বনির্বাচিত' নাম রাখা হয়েছে কেন?
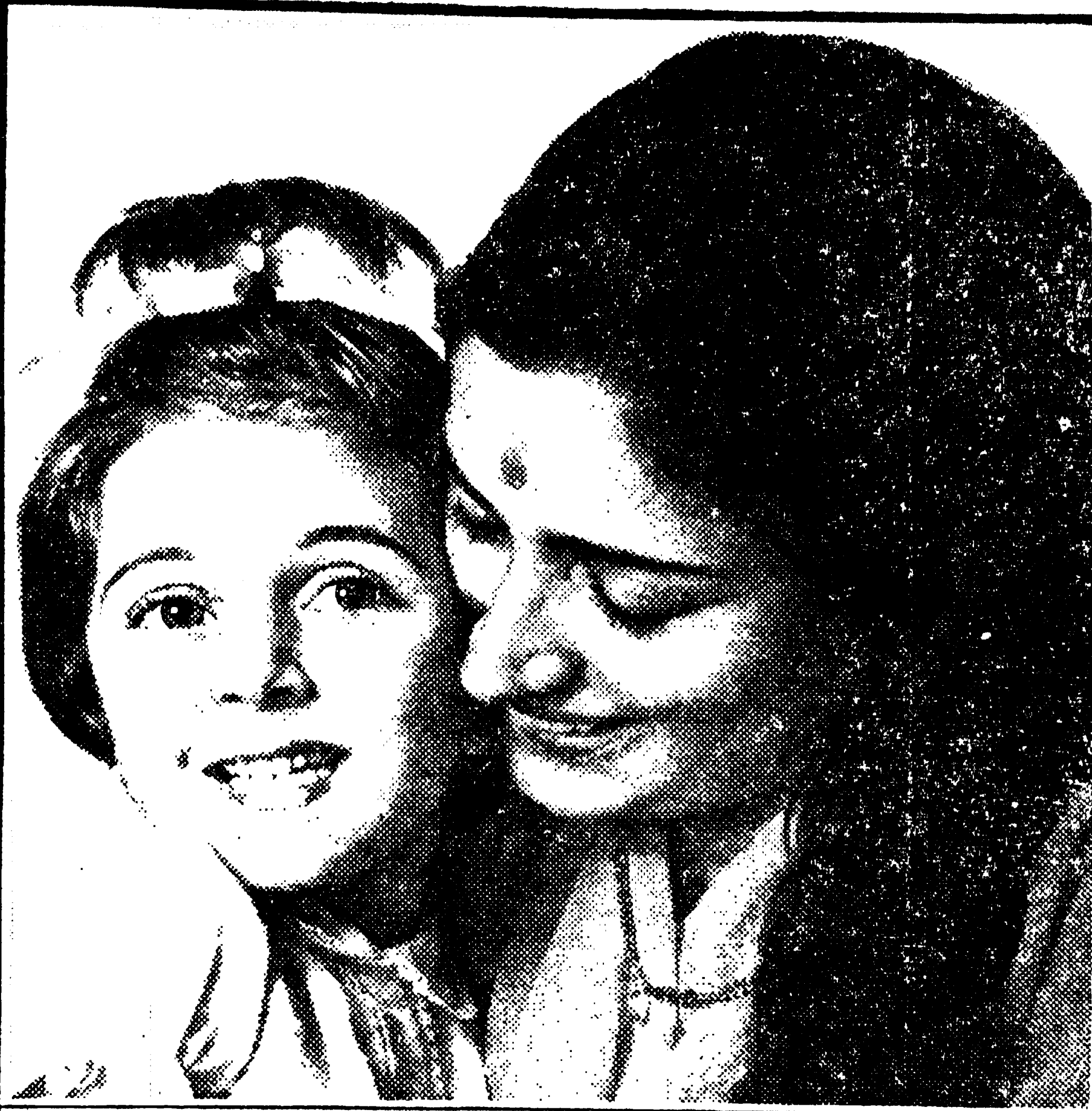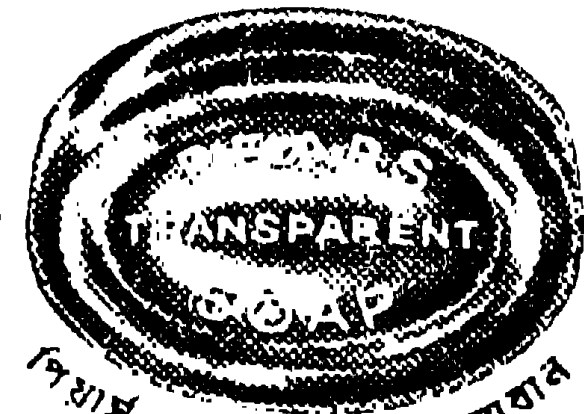
জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য কি মরণোত্তরকালে সম্পাদকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে কবিতা নির্বাচনে সাহায্য করেছেন? ও'দের বাদ দিলে আপত্তি ছিল কি?

আমি প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। শান্তনু দাস বললেন, রবীন্দ্রোত্তরকালে আধুনিকতার লক্ষণগুলি তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা সেজন্যেই তাঁদের বাদ দিইনি। ইচ্ছে থাকলেও বোধ হয় দিতে পারতাম না। আমরা তাঁদের কবিতা নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছি ঠিকই, তা বলে পাঠকের বিচার-বোধকে আঘাত দিইনি। কবিদের জীবিত-কালে গৃহীত কবিতাগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখী' কবিতা দুটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কবিমহলে। আমাদের ধারণা, তাঁরা বেঁচে থাকলেও এই কবিতাগুলিই নির্বাচন করতেন।

বললাম, জীবিত কবিদের কাছে আপনারা যে প্রশ্নগুলি করেছেন, তার উত্তর পরলোকগতদের কাছ থেকে কিভাবে আদায় করেছেন?

শান্তনু দাস বললেন, তারও প্রামাণ্য ভিত্তি আছে বইকি! কবিরা কবিতা সম্পর্কে যে-সব লেখা লিখে গেছেন, আমাদের প্রশ্নের উত্তর মিলেছে, সে সব সূত্র থেকেই। একটি শব্দও আমরা পাল্টাইনি বা অদলবদল করিনি।

বললাম, পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি কি শুধু চারজন? কেন?

—আমরা চারজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। আরো কবি আছেন। কিন্তু সীমান্তের ব্যবধানটার জন্য কারো কাছ থেকেই লেখা কিংবা প্রত্যাশিত জিজ্ঞাসার উত্তর সংগ্রহ করতে পারিনি। চেষ্টা করছি। যাতে পরবর্তী সংকলনে প্রতিনিধি স্থানীয় সব কবিকেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

একটু থেমে, দুঃখের সঙ্গে বললেন, সব সংকলনেরই কিছু কিছু দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা কোনো ভুলই করিনি।

'সবিনয় নিবেদনে সম্পাদক দুজন লিখেছেন : অনেক উপযুক্ত কবিকেই স্থানাভাবে আমরা আমাদের এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম না। এর জন্য তাঁদের পাঠকদের চেয়ে আমরাও কম মর্মাহত নই।......এপার বাংলা ওপার বাংলার কবিদের এই সংকলনটি তামাম বিশ্বের যত বাংলা ভাষার পাঠক আছেন, তাঁদের সকলের কাছে যাতে তুলে দেওয়া যায়, তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থব্যয়, অর্থনৈতিক লাভের দিকটা না ভেবে এই প্রামাণ্য গ্রন্থটিকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী করার চেষ্টা করেছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, বিক্রী-টিক্রি কেমন হচ্ছে?

উজ্জ্বল মুখে জবাব দিলেন শান্তনু দাস, খুব ভালো। এই মন্দার বাজারেও ক্রেতার আগ্রহ আমাদের বিস্মিত করেছে। আশা করছি, বাইরের অর্ডার পাবো। কবিরা অনেকেই বইটি হাতে পেয়ে খুশি হয়েছেন। তাতেই আমরা তৃপ্ত।

আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য

আমি বইটি হাতে নিয়ে বিস্মিত হয়েছি, তার প্রচ্ছদ ও অঙ্গশোভনতায়। কবিতার চেয়েও মূল্যবান মনে হয়েছে, সম্পাদকদের প্রশ্নের উত্তরে কবিদের উত্তরগুলি। আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, সৎ কবিতা হলে উজ্জ্বল, নইলে অন্ধকার।' বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতে জানা যাবে।' বিষ্ণু দে দিয়েছেন এড়িয়ে যাওয়া জবাব : 'আধুনিক সাহিত্যের মতোই।'

কিন্তু সকলেই সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেননি। বিস্তৃতভাবে বলেছেন কেউ কেউ।।

অরুণ মিত্র লিখেছেন : কবিতা বলতে আমরা এখন যা বুঝি, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আধুনিক বা অনাধুনিক যাই হোক। কোনো সমাজক্রিয়ার অথবা অন্য কোনো শিল্পের আশ্রয়ে হয়তো তার একটা ভূমিকা ভবিষ্যতে তৈরী হবে। নইলে কবিরা এবং তাঁদের কিছু বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউ কবিতা নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। যাঁরা বই পড়তে পারেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকজন বাদে বাকীরা যদি কবিতা পড়তে না চান, তাহলে কি বলব? পাঠকদের গলদ, না, কবিদের? সব দোষ পাঠকদের ঘাড়ে চাপিয়ে স্বস্তিবোধ করতে আমি অসমর্থ। গাঁয়ে যখন মানছে না, তখন আপনি মোড়ল সেজে লাভটা কি? কবিদের ভরসা পাবার একমাত্র কারণ তো আপাতত এই দেখছি যে, কোনো একদিন কলেজের মাস্টারমশাইরা হয়তো তাঁদের কবিতা ক্লাসে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।'

মণীন্দ্র রায়ের মতে : আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ, 'সীমাহীন—প্রায় মানব-জীবনের মতো। কারণ আধুনিক কবিতা জীবনেরই সহযাত্রী।'

এই বিস্ময়কর উত্তরগুলি কবি-মানসিকতার অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত। পাঠক হিসেবে আমি কেবল কবিকে পাইনি, কবিতার রহস্যজনক অতীত ভবিষ্যতেরও একটা আভাষ পেয়েছি। সম্পাদকরা অপরিসীম পরিশ্রম করে কিছু কবিতার আদি-ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কুক্কুট' কবিতাটির কথা।

শোনা যায়, যুদ্ধোত্তর আধুনিক ইংরেজী কবিতার বিষয় ও বৈচিত্র্য নিয়ে সুধীন দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বিতর্ক উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে তাঁকে বললেন, তাহলে মোরগের ওপর একটা কবিতা লিখে দেখাও, দেখি কি রকম উৎরোয়।

সুধীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, লিখবো। এবং সে কবিতা আপনার বিচারে উত্তীর্ণ হবে এমন আশা রাখি।

রবীন্দ্রনাথের বিচারে কবিতাটি উত্তীর্ণ হলো। 'কুক্কুট' নামে সেই কবিতা ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতে। যতদূর জানা যায়, এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

এমনি অনেক তত্ত্ব, তথ্য ও ঘটনার বিবরণে সংকলনটি বর্তমান সময়ের একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস তাকে উপেক্ষা করবে না। হয়তো দূর ভবিষ্যতে একটি দলিল-গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। আধুনিক কবিতার সংকলন শুরু হতো এতোদিন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। শান্তনু দাস ও রুদ্রেন্দু সরকার তাঁকে বর্জন করেছেন, কিন্তু সময়-সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন বর্তমানের দিকে। বোধ হয় এর আগে ষাটের কবিরা আর কোনো সংকলনে এমন গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হননি।

—গ্রন্থদর্শী

পুরোন শহরের পুরোন কাহিনী

গঙ্গার ধারে ফোর্টের কাছে চন্দর পালের মুদির দোকান। চন্দর পালের মৃত্যুর সন-তারিখ কেউ রাখেনি। তার মৃত্যুর পর দোকানটা যে কতদিন চলেছিলো তাও কেউ জানে না। অম্বরী তামাকের লোভে সাহেব ছোঁড়াড়া মৌচাকে ঝাঁপিয়ে পড়া মৌমাছির মতো চাঁদ পালের দোকানে ভিড় জমাতো। এটা ইংরেজ আমলের গোড়াপত্তনের সময়। চাঁদ পালের নাম নিয়ে সেই ঘাটটা এখনও টলছে।

চাঁদপাল ঘাট। বিলেতের পাল-তোলা জাহাজগুলো এখানেই ভেড়ে। ছোট ছোট নৌকা—বড় বড় বজরা তক্তা আঁটা ঘাটে বাঁধার সুযোগ পেলে কৌলিন্যের পংক্তিতে চলে যেতো। বিলেত থেকে কলকাতায় জাহাজ পৌঁছতে লাগতো প্রায় একটি বছর। ভাস্কো-ডা-গামার পথই তখন ভারতের পথ। আসতে হতো আফ্রিকা ঘুরে। ঢেউ-এর সঙ্গে নেচে উঠতো হাঙরের দল। কাল-কেতুর মত তীর-ধনুক নিয়ে সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াতো শিকারের লোভে অর্ধ-নগ্ন কালো কালো মানুষ। তাদের মাথায় পালক আঁটা। সুবিধে থাকলেও জাহাজ ভেড়াবার উপায় ছিল না। কলকাতায় আসা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কষ্টকর। জব চার্ণকের কলকাতা তখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে। চৌরঙ্গী পর্যন্ত সাহেবদের ছিল বাড়ীঘর আর অফিস। এটা ছিল হোয়াইট টাউন। এর পূবে নেটিভ টাউন—মারহাট্টা ডীচ তার শেষ সীমানা। রাস্তায় হাঁটু-ডোর কাদা বজবজ করছে আশেপাশে আসশেওড়া আর কেয়া-কাশের ঝোপ। বট আর বকুল রোদের ছাতা। তাদের বড় বড় ছড়ান ডালপালায় মুখ নিচু করে ঝুলতো অগণিত বাদুড়। এদের বিরামহীন চীৎকার অতিষ্ঠ করে তুলতো। চৌরঙ্গীর ধারের কাছে তেঁতুল গাছে শাখামৃগের উল্লম্ফন। এই ছিল তখনকারের কলকাতার রূপ। খানা ডোবা, জলা-জঙ্গলে ভরা নেটিভ টাউনে সাহেবরা বড় একটা কেউ আসতো না। ফিরিঙ্গীদের যারা চিকচিকে বউ পিট ফাটা জামা পরে নেটিভ বাজারে আসতো ডিম-মুরগী কিনতে সাহেবপাড়ার বাবুর্চি-দের নেকনজরে চড়া দামে বেচার লোভে। চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ভিড়বে—এ-খবর কোলকাতায় পৌঁছুলে সাহেব পাড়াটা চনচনে হয়ে উঠতো। ক্যাডেটদের বেরুবার উপায় ছিল না—কোর্ট মার্শাল হবে।

রাইটার্স'রা বেপরোয়া। কাজকর্ম ফেলে চেয়ার ঘুরিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতো যদিও সেখান থেকে গঙ্গা নজরে আসার এতটুকু সম্ভাবনা ছিল না। জাহাজ আসার দিন যতই ঘনিয়ে আসে, রাইটার্স'রা আরও বেশী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অন্য অফিসের সাহেবরা আশা-আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহী ছিল বটে কিন্তু তাদের উদ্দীপনা কেউ ধরতে পারতো না। একটু বয়স্ক লোক, রাইটার্স-দের মতো হৈ হৈ করা তাদের রুচির বাইরে ছিল কিন্তু তারাও বউ খুঁজতে চাঁদপাল ঘাটে চক্কর দিতো।

কলকাতায় জাহাজ আসার খবর এসেছে। সকাল না হতেই রাইটার্স'রা চাঁদ-পাল ঘাটে। ওপারের গঙ্গার ধারের গাছ-গুলোর মাথায় তখনও জমাট-বাঁধা ধোঁয়ার মেঘলা প্রভাতী সূর্যের নিষ্করুণ আক্রমণের আশঙ্কায় কিছুটা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বেলা বেড়ে উঠলো। এখনও জাহাজের পাত্তা নেই। গঙ্গার ভ্যাপসা হাওয়ায় সকলে যেন অস্থির হয়ে উঠলো। মেহগনীর সবুজ ছাওয়ায় কেউ কেউ মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়ালো।

হেমচন্দ্র ঘোষ

'ছোট হাজারী' কখন হজম হয়ে গেছে। চনচনে ক্ষিদে—তবু তারা দাঁড়িয়ে—আশা যদি বিলিতী বিবি মেলে! চন্দরের দোকানের শুকনো মুড়ি চিবুতে চিবুতে কেউ কেউ গঙ্গার ধারে পায়চারী করছে।

—হুর্‌রে! জাহাজ—জাহাজ! গড—মাই লর্ড!

ছুটলো সব্বাই ঘাটের দিকে। জাহাজ তখনও কিন্তু গঙ্গার মাঝ-বুকে।

—এই রাস্কেল! তুই এখানে—ফিরিঙ্গী।

জ্যাকো মুখখানা কাঁচুমাচু করে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

—নিকোলো!

রাইটার্সদের একজন ছুটতে ছুটতে এসে একটা লাথি দিয়ে বললে—নিকালো! রাস্কেল ফিরিঙ্গী! ঘাটে এসেছো বিবি খুঁজতে!

আবার এক লাথি। জ্যাকো আর সেখানে রইলো না।

গঙ্গায় তখন ভাটা। জল কেটে জাহাজটা আর এগুতে পারলো না। ডিঙ্গী দিয়ে ডাঙ্গায় ওঠার ব্যবস্থা হলো।

—আহা! মিঃ পড়ে গেলে। হাঁটু পর্যন্ত কাদায় বসে গেল যে!

স্মিথ তার দিকে শুধু একবার তাকালো।

—সারি! সাহায্য করতে পারলাম না—লোক সব ডাঙ্গায় উঠতে আরম্ভ করেছে।

কপালে গাঁটের একটা টোকা দিয়ে স্মিথ উঠে পড়লো—নাঃ, এ অবস্থায় কোন লেডির সামনে যাওয়া চলে না। এ-জাহাজটা ফস্কে গেল!

প্রায় সবাই নেমেছে। তাদের মুখে স্বস্তির ভাব। প্রায় একটি বছর টাল-মাটাল—ঢেউ-এর সঙ্গে যুঝে দেহের হাড়-গোড় যেন ব্যথায় নরমে গেছে। সব্বার শেষে নামলো একটা আধা-বয়েসী মেয়ে। চুলগুলো কটাশে তোবড়ান গালের দু'পাশ শোনের সুতোর মত ঝুলছে। ডাঙ্গায় উঠে চারদিকে একবার চোখটা ঘুরিয়ে নিল। রাইটার্সদের মধ্যে যারা এগিয়ে এসেছিল, তারা আর রইল না। মেয়েটির ছিরিছাঁদ দেখে তারা সরে পড়লো।

জন একটা মার্চেণ্ট অফিসের দালাল। সে এলো এগিয়ে।

—গুড মর্ণিং মিসেস!

মেয়েটির ডান চোখটা ছোট। সেটাকে আরও একটু ছোট করে বলল—আমি মিসেস নই—মিস লারকিণ!

—স্যা রি এক্‌সকিউজ মি মিস্!

মিস লারকিণ ছোট চোখটার কোণে একটু হাসি টেনে বললো—শুনেছি ইণ্ডিয়া একটা অদ্ভুত দেশ, তার ওপর আবার কোলকাতা। রেসের ঘোড়ার মত মনটা আমার ছুট দিল। এসে পড়লাম। এখানে একটা মেট তো চাই—খাওয়াবে—হাওয়া করাবে! কিন্তু মিস্টার—আপনাকে যেন বড্ড বুড়ো বুড়ো মনে হচ্ছে!

জন যেন একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললো—এটা যে গরম দেশ! চুলগুলো দেখতে দেখতে উঠে গেল—কি চুল না ছিল আমার মিস্ লারকিণ। আর দেহটা! রোদের ঝাঁজে শুকিয়ে হলো যেন পাঁকাঠি। তবু মিস্ লারকিণ, এখনও কিন্তু আমি খুব একটিভ।

মিস লারকিণের তোবড়ানো গালে একটু হাসি বেরুলো।

—হ্যালো জন!

জন ফিরে তাকালো।

—এটা তোমার কিন্তু খুবই অন্যায় পিটার। লেডির সঙ্গে কথা বলছি, বাধা দেওয়াটা খুব অভদ্রোচিত।

পিটার একটু হাসলো।

—ভদ্রতাটা তোমার কাছে নাই বা শিখলাম জন!

পিটার প্যাণ্টের পকেট হতে পিস্তলটা বার করলো

—ভয় দেখিও না, পিটার। ওটা আমারও আছে।

—একদিন তাহলে ড্যুয়েলটা সেরে ফেলি কি বল!

পিটার একেবারে যুবক না হলেও স্বাস্থ্যবান ও জনের চেয়েও কমবয়েসী—জোরালো।

লারকিণ এগিয়ে এলো পিটারের কাছে।

—জনটা একটা লোফার, কিইবা রোজ-গার, একটা মার্চেণ্টের দালাল!

—আর তুমি?

—আমি! আমি তো একটা মেরিন কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার। এদের জাহাজ সারা পৃথিবী ঘোরে।

মিস্ লরাকিণ পিটারের হাতটা ধরলো।

—তাহলে কোথায় উঠবো ডার্লিং?

জন অপমানে দিশেহারা। আক্রোশে তার শুকনো দেহটা কেঁপে উঠলো। রাগে ফুলে-পড়া জন পিটারের দিকে কড়া চোখে বললো—ড্যুয়েলের কথাটা যেন স্মরণ থাকে পিটার! সেদিন দেখা যাবে।

পিটার হেসে বললো—প্রস্তুত! বন্ধু! সব সময়েই প্রস্তুত।

স্পেন্সারস হোটেল —চৌরঙ্গীতে।

দুটো ছাতা ভাড়া করলো পিটার। ছাতাওয়ালারা স্পেন্সারে তাদের পোঁছে দিল।

—এখানে কোন গাড়ি মেলে না, পিটার? বেড়াবার। হোমে কত রকমের গাড়ি। বন্ধুরা গাড়ী করে দূরে দূরে বেড়িয়ে আনতো!

—গাড়ি মেলে, মিস লারকিণ, তবে কিনা চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

—লণ্ডনের হাইড পার্ক!

লারকিণ চোখটা বুজল, বলল—কি সুন্দর! হাইড পার্ক কখন দেখেছো, পিটার!

পিটার কখন হোমে যায়নি—তার জন্ম এদেশে।

একটু সুর টেনে বললো—হাঁ, দেখেছি বৈকি, তবে এত ছোট বয়েসে এখন তার আর কিছু মনে নেই।

—হাইড পার্ক! সেটা যেন একটা স্বর্গ! একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে মিস লারকিণ পিটারের দিকে তাকালো।

—সুন্দর কেয়ারী-করা ঝোপ। শত শত গোলাপ, শত শত টিউলিপ যেন আলো করে আছে। সন্ধ্যে হলেই মেয়ে-পুরুষ দলে দলে চক্কর দিচ্ছে। ঝোপের আড়াল থেকে কত রকমের হাসি। হাইড পার্ক—সুন্দর হাইড পার্ক—ফী লভের পীঠস্থান। গেটের ধারে কতদিন স্মার্ট হয়ে রইলাম। কখন জোরে জোরে, কখন ধীরে ধীরে চক্কর দিলাম। কিন্তু কেউ আমায় নিল না। ভাবলাম গলদ আছে—বোধহয় তাই। ইণ্ডিয়ায় এলাম ভাগ্যটাকে যাচাই করতে। ডার্লিং—মাই ডার্লিং পিটার! ইউরিকা!

মিঃ স্পেন্সার তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নামলো।

হ্যালো পিটার।

একটু থেমে বলল—এই লেডিটিকে তো চিনলাম না?

একটু হেসে পিটার বলল—সবেমাত্র আজই ল্যাণ্ড করেছেন।

মিস্ লারকিণের দিকে তাকিয়ে স্পেন্সার বলল—হোমের কথা শুনতে বড্ড ভাল লাগে—যেন পাগল হয়ে যাই। কতদিন যে দেশছাড়া! কিন্তু মিস্ আমি বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি—মিসেস স্পেন্সার গুরু-তর অসুস্থ। মনে হয় চৌরঙ্গীর আশে-পাশের ডোবাগুলোর পোকামাকড়ের কামড়েই অসুখটা হয়েছে। বয়েস তো আর বেশী নয়—মাত্তর তেত্রিশ।

লারকিণ একটু হেসে বলল—দেখছি আমার চেয়েও তিন বছরের ছোট।

স্পেন্সার তাড়াতাড়ি চলে গেল।

পিটার লারকিণের হাতটা একটু নাড়া দিয়ে বলল—কলকাতায় কারো সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করাই ভাল। শীতের দেশে জন্ম—এ-দেশে একটু কড়া হুইস্কি না খেলে কি শরীর রাখা যায়।

—মাত্তর তেত্রিশ! এরই মধ্যে শরীরটা ভেঙে গেল! তাহলে বেশীদিন আর থাকছি না এখানে!

লারকিণের মুখে হতাশার ছাপ। লারকিণ মনে মনে বলল—

—তাই তো যাবই বা কোথায়!

—পিটার!

—ডার্লিং।

মিঃ স্পেন্সার কি খুব বড়লোক?

—কিসের বড়লোক! আমরা আছি তাই কোনরকমে হোটেলটা চলছে।

এ্যাণ্টি চেম্বারে তখন ব্যাণ্ড বাজছে।

লারকিণ দাঁড়িয়ে উঠলো।

—কি চমৎকার! বিলিতী নোট—খাস বিলিতী! হা-হা। নাচতে ইচ্ছে করছে।

লারকিণের হাতটা জোরে টেনে ধরে পিটার বলল—বোসো—করছো কি! জেণ্টুরা দেখলে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসবে। আমরা রাজার জাত, আমাদের খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয়। এটা তো আর হোম নয় যে খুশিমতো চলবে।

লারকিণ ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—কেন? এদেশে কি কেউ নাচে না?

—জেণ্টুদের দলে যারা নাচে, তারা সবাই সমাজের বাইরে। তুমি তো জানো না জেণ্টুরা সন্ধ্যের পর হোয়াইট টাউনে ঢুকতে পায় না। যদি দৈবাৎ কেউ ঢুকে পড়ে, তাহলে হলওয়েল আমলের হুইপিং-এ তার চামড়া শাদা করে দেবে।

—নেটিভরা কি তাহলে শেভড?

—তা না তো কি? তবে কিনা ওদের হাতে রাখতে হয়।

আঙুল ঘুরিয়ে পিটার বলল—এই যে তামাম আপিসগুলো দেখছো এগুলো সবই নেটিভদের পয়সায়।

বিস্মিত লারকিণ তাকিয়ে রইল পিটারের মুখের দিকে।

—বড্ড আশ্চর্য মনে হচ্ছে—না?

—ওরা এত বোকা! টাকা দিয়ে তোমাদের বড়লোক করে দিচ্ছে।

—দেবে না তো কি! এদেশে এখন আমরা নবাব! উমিচাঁদ—একটা মুটকো ঘাড়ে-গর্দানে সমান প্রায় অচল—সেটা একটা টাকার কুমীর। তার শালা হুজরী-মল—ঐ বৌবাজারে থাকে—সেও একটা যক্ষী! এদের টাকাতেই তো ব্যবসা-বাণিজ্য—দু-পাঁচ বছরে এক-একটা নবাব।

মিস্ লারকিণ পিটারের দিকে তাকাল। তার মুখখানা আশার আলোয় চিকচিক করছে।

—ঐ যে দুটো নাম করলে—ওদের সঙ্গে দেখা করা যায় না?

গম্ভীর হয়ে পিটার বলল—উঁহু।

ভবিষ্যতে সে কোন্ পথ ধরবে বহু চিন্তা করেও লারকিণ ঠিক করে উঠতে পারেনি। উমিচাঁদদের মতো লোকের সংস্রবে আসলে হয়তো তার একটা সুরাহা হতো কিন্তু তাতো হবার নয়—পিটার তো বলেই দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লারকিণ বলল—চলো, গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি!

লারকিণ নামলো পিটারের হাত ধরে।

সিঁড়ির শেষে ফুটপাথ। কাছে ইলাইজা ইম্পের পার্ক। তার বাড়ীর ধারে জঙ্গলে বাঘ লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যের পর বড় একটা কেউ রাস্তায় নামে না। স্পেন্সারের সামনে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে জন। হাতে তার উদ্যত পিস্তল।

—হ্যালো পিটার! মনে আছে?

পিটার হেসে উঠলো।

ড্যুয়েল! তাই না! কিন্তু এই লেডির সামনে। এতে দুজনেরই ক্ষতি!

জন জোরে হেসে উঠলো।

—যাক্ লেডির দোহাই দিয়ে পৌঁছিয়ে গেলে। আমি কিন্তু ছাড়ছি না।

জনের কথাটা ভাঙ্গিলো ভরা।

—কথা দিয়েছো—আমিও দিয়েছি তখন হয় এসপার না হয় ওসপার। জীবন গেলেও কথা নড়বে না। বেশ—তাহলে কাল—এই সময়ে, এইখানে, কি বলো?

জোর করে হাসি টেনে পিটার বলল—আমি তো চ্যালেঞ্জ নিয়েছি—এখনও নিচ্ছি।

পরদিন লারকিণ পিটারকে বলল—আজ তো জনের সঙ্গে দেখা করার কথা।

একটু ভ্রূ কুঁচকে পিটার বলল—তুমি কি চাও আমার ক্ষতি হোক!

—কথা যে দিলে!

—হুঁঃ, ওর সঙ্গে আবার ড্যুয়েল। একটা লোফার। দুদিন পড়ে থাকলে ওর আহা বলার কেউ নেই। আর আমার! এখন অফিসে যে কি চাপ তা তোমায় কি বলবো! নিঃশেষ ফেলার সময় নেই। তিন-চারখানা জাহাজ সব রেডি। তার ওপর তুমি!

লারকিণ একটু হাসলো।

—ভাবনা আমার জন্যে! সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এসেছি। পথ আমার কাছে এগিয়ে আসবে।

পিটার গম্ভীর হয়ে গেল।

—মিস্ লারকিণ, আমাদের এই সম্পর্কটা কি তাহলে নিছক জুয়োখেলা?

—আমার যেটুকু দরকার তার বেশী কোনদিনই না। আমার কাছে আশা করো না।

পিটার ভীষণ দমে গেল। লারকিণের কথাগুলো পিটারের মনটাকে কাটায় বেঁধার মতো ছিঁড়ে দিল। তার চিন্তা—নারীর মন সত্যিই কি বিধাতারও অজ্ঞাত?

উভয়েই নীরব।

—রাগ করলে?

পিটারের হাতটা ধরে লারকিণ একটু নাড়া দিল।

—বড্ড গরম ঠেকছে। চল না একটু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে আসি?

পিটার নীরবে লারকিণের সঙ্গে নিয়ে চলল।

গোধূলি বেলা—তার সোনালি রঙ চারদিকটা রাঙিয়ে তুলছে।

গঙ্গার ঢেউগুলো পড়ন্ত সূর্যের রক্তাভ গোলক নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। নতুন বৌ-এর মতো আষাঢ়ের ঈপ্সিত অভিসার তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সবুজ ঘাসের ওপর তারা বসে পড়ল। লারকিণ পিটারের গা ঘেঁষে বসল।

—পিটার! মাই ডারলিং রাগ করলে? জানো তোমায় আমি কত ভালবাসি!

—রাগ! কার ওপর করব লারকিণ! তুমি—তুমি যে আমার জীবনসঙ্গিনী!

ডানদিকের ছোট চোখটা আরও ছোট করে লারকিণ শুধু একটু হাসলো।

—আজ আর স্পেন্সারে নয়।

—তবে?

—রানী মুদিনীর গলি!

—র‍্যানী মুডি! সে আবার কোথায়? কোলকাতায় তো! আমি কিন্তু কোলকাতার বাইরে যাচ্ছি না।

—স্পেন্সারের কাছাকাছি! ওখানে হুইস্কি খুব তেজি, দামও সস্তা।

—বিলেতে খুব অভ্যেস ছিল। এখানে স্পেন্সারে যতই খাওনা কেন, গা আর গরম হয় না। র‍্যানি—র‍্যানী—সেই ভালো। চীৎকার করে উঠল লারকিণ।

গ্যালো-গ্যালো নৌকোটা ডুবলো।

গঙ্গার দিকে দৃষ্টি দিয়ে পিটার একটু হেসে বললো,—ওরা, ওরা ডুববে না! ইন্ডিয়ার মাঝিরা খুব তুখড়। দেখ না ঠিক বাঁচিয়ে নেবে।

লারকিণ তখনও গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। —পিটার শোন! ব্রাইটনের ঢেউগুলো ঠিক এমনিতর। চোখটা বন্ধ করে লারকিন বলল, ব্রাইটন সুন্দর, ব্রাইটন লাভলি! পিটারের গলাটা কোলের দিকে টেনে নিয়ে বললো—সেখানকার ডিঙ্গীগুলো ঢেউ-এর সঙ্গে যেন ডান্স করে। সে ছবি কিন্তু ভুলতে পারছি না, পিটার! তুমি কখন গেছো। পিটার চুপ করে রইল। তার তো জন্ম এই দেশে—কলকাতায়।

—যাই নি। তবে রিটায়ার করে তোমায় নিয়ে ব্রাইটনে থাকার ব্যবস্থা করবো।

লারকিন হাসলো।

ফিটনের বড্ড ভাড়া। একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকলো পিটার।

—শুধু শুধু বেশী ভাড়া দি কেন? ঐ পয়সায় আরও দু পেগ!

লারকিণ বলল, তা না তো কি।

রাণী মুদিনীর গলি—সরু লম্বা সুরকীর পথ—গাড়ী ঢোকে না। গলির মুখে গাড়ীগুলো আশেপাশে রাখতে হয়। ভিতরে সারি সারি দোকান। সন্ধ্যে হলে তখন লোক চলাচল বাড়ে। শহুরেবাবু আর অ্যাংলো ফিরিঙ্গীর দলই বেশী। গলির মুখ মাড়ালেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ডালিগচানো ছোকরাদের মত হোটেল বয় তৎপর হয়ে ওঠে, সেলাম দেয়।

—মেমসাব! সরাপ বহুৎ আচ্ছা হয়।

লারকিণ একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল,—এঃ, এ-দেশের লোকগুলো কি নোংরা। চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে! কোথায় আনলে পিটার।

পিটার উত্তর দিল না।

রাস্তায় আলো নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার তখন বড় একটা কেউ রাস্তায় বেরুতো না। বাঘ-ভাল্লুক, চোর-দস্যুর ভয় তো ছিলই। চিৎপুর থেকে কালিঘাটের রাস্তা—তার পাশে মুন্ডহীন দেহ প্রায়ই দেখা যেতো। বেপরোয়া লোক এরাই ছিল তখনকার দিনে নৈশ কোলকাতার পথের অভিযাত্রী। সন্ধ্যের পর একমাত্র রাণী মুদিনীর গলি জম-জমাট হয়ে উঠতো। জেন্টুরাজার হোটেল—খাওয়া-দাওয়া খুব সস্তা। লোকের ভীড়ও বেশী। খুপরী খুপরী ঘরগুলো সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে জুয়াড়ী আর মাতালে ভরে ওঠে। চিৎকার আর হল্লা উচ্ছৃঙ্খলতার মূর্তি। ম্যানেজার ফিরিঙ্গী। মোটাসোটা কালা মিশমিশে লোক। কপালের ওপর লম্বালম্বি একটা বিরাট কাটা দাগ। এটা নাকি প্রহারের চিহ্ন। প্যান্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে বুক চিতিয়ে ম্যানেজার বলল, চিৎকার হল্লা রাজাবাহাদুর পছন্দ করেন না। আপনারা—টেবিল চাপড়ে লোকগুলো হো-হো করে চিৎকার করে উঠলো—জেন্টু রাজা! জেন্টুরাজাকে বোলো আমাদের চেয়ে সভ্য লোক আর মিলবে না—এক-এক জনে দু বোতল, তাতে আবার অর্ধেক জল মিশানো! নগদ দাম তো দি! এসো-এসো ম্যানেজার দেখে যাও! ম্যানেজারের আর এগুবার সাহস রইল না।

পিটার আর লারকিণ একটা টেবিলে। লারকিণ নাক সিঁটকে বলল, এঃ কি নোংরা —টেবিল-ক্লথটায় ঝোলের ছোপ।

পাশের টেবিলের একটা ছোকরা লারকিনের কথাগুলো শুনলো। তার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল,—এ আবার কি বিবি! গালটা গর্তে ডোবা, কোন কাজেরই না।

কথাটা পিটারের কানে গেল। সে আস্তিন গুটিয়ে চীৎকার করে বলল—ওহে ছোকরা! একজন লেডি সম্প্রতি বিলেত থেকে এসেছেন তাঁর সম্বন্ধে এই কটূক্তি! —একটা ভদ্রতা তো আছে।

যান যান মশাই! লেডি! লেডি কি আর রাণী মুদিনীর গলিতে আসে। আস্ফালনটা পকেটে রাখুন —পকেটে। বুঝেছেন।

সামনের টেবিলে তখনও চিৎকার-হল্লা চলছে।

—এই বয়! এই রাস্কেল। এদিকে আয়, তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দি! এটা কি?

একটা চিংড়ি উঁচু করে ধরল।

—পচা। এর দাম পাবি না।

—খটাং! ধোৎ, এই ছ্যাতাপড়া বিলিহাড়টা আর চলে না। আরে এই যে ম্যানেজার। কাল যদি টেবিল-ক্লথ না বদলাও তো তোমায় দেখে নেবো।

ম্যানেজার এগিয়ে এল।

—সাত দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থাই করা হবে। রাজাবাহাদুরের হুকুম। হোটেলটা নতুন করে সাজানো হবে। হারমারিকের মতো ইহুদি মেয়েরা ব্যান্ড বাজাবে।

—হুররে, জেন্টুরাজ। হুররে!

লারকিণের ভাল লাগছিল না।

—পিটার চলো, এখানে আর না।

—আর দু-এক পেগ।

—না-না, এ নরকে আর না!

এলো তারা হোটেলের বাইরে। রাস্তায় দু-চারজন লোকের আনাগোনা সুরু হয়েছে। মধ্যবয়েসী একজন লোক—মাথায় তার উড়ুনি জড়ানো। তার বিশ্বস্ত পা দুটি নির্ভরতা হারিয়ে ফেলেছে, জড়িতকণ্ঠে বললো—কে তুমি? লাল-লাল পাগড়ী! এই রাণী মুদিনীর গলিতে লা-আ-ল পাকড়ি বরাদস্ত করবো না—সরে পড়ো।

দু-হাত তুলে কনেস্টবলটার সামনে এসে বলল,—রাণী মুদিনীর গলি

সরাবের দোকান খালি। হাঃ হাঃ হাঃ।

রাণী মুদিনীর গলি। একদিন কোলকাতার সৌখীন বাবুদের —অ্যাংলো ফিরিঙ্গীদের আহার-বিহারের ভার নিয়েছিল। কিন্তু আজ এ নামের রাস্তা কলকাতার ডাইরেকটরীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে
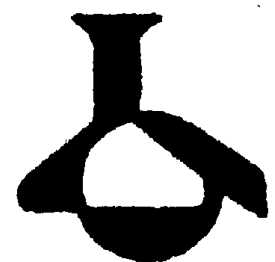
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৩)

সেদিনই শশী মাস্টার খবর নিয়ে গেল মুড়াপাড়া। শচীন্দ্রনাথকে সন্দেহে দারোগা ধরে নিয়ে গেছে। কিছু খোঁজ-খবর পেতে চায় রঞ্জিত সম্পর্কে। এবং শচীন্দ্রনাথের এখন কাজের সময়। কিছু কিছু রাজনৈতিক কর্মী এখানে ওখানে ধরা পড়ছে। জেলে নিয়ে যাচ্ছে। শচীন্দ্রনাথ, উমানাথ সেনের মতো বড় কর্মী নয়। সাধারণ সদস্য সে। সে যতটা না কর্মী তার চেয়ে বেশি সৎ এবং সাহসী মানুষ। এই অসময়ে ওকে ধরে নেবার কোন অর্থ হয় না। একমাত্র অর্থ থাকতে পারে সব কংগ্রেস কর্মীদের যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন ফাঁক বুঝে শচীন্দ্রনাথকেও একটু ঘুরিয়ে আনা। ওরা শচীন্দ্রনাথকে আগামীকাল নারাণগঞ্জে চালান করে দেবে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ যদি সহরে গঞ্জে গিয়ে উকিল ধরে জামিনে খালাস করে আসতে পারে—এমন উদ্দেশ্য নিয়ে শশী মাস্টার মুড়াপাড়া রওনা হয়ে গেল।

ছোট কাকা বাড়ি না থাকায় বাড়িটা খালি লাগছে। মাস্টারমশাই দুপুরে রওনা হয়ে গেলেন। এখন একমাত্র বাড়িতে পুরুষ বলতে ঈশম আর পাগল জ্যাঠামশাই। ঠাকুর পূজো কে করবে। জ্যাঠিমা বড়দাকে পশ্চিমপাড়া যেতে বলেছে। সেখানে আর এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার আছে। গোলক চক্রবর্তী খবর পেয়েই চলে এসেছে। ঠাকুমা পূজোর আয়োজন করে দিয়েছেন। শ্বেত চন্দন রক্ত চন্দন বেটে এবং কোষাকুষি ঠিক করে, ফুল ফল সাজিয়ে তিনি বসে আছেন। সোনা ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে রয়েছে। ছোট কাকা বাড়ি নেই। কাজ-কর্ম দেখে-শুনে করতে হবে। সে ঠাকুমা কি আনন্দে বলবে, কখন কি আদেশ করবে, সেজন্য বসে রয়েছে। ঠাকুমা আয়োজন করার সময় সারাক্ষণ স্তব পড়ছিলেন। এই মন্ত্র পাঠ সোনাকে মাঝে মাঝে বড় বেশি মুগ্ধ করে রাখে। জ্যাঠিমা আজ রান্নাঘরে। মার শরীর ভাল যাচ্ছে না। ক'দিন থেকে শুয়ে আছে কেবল। এবং ছোটকাকাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই কি যেন এক বিষণ্ণতা সারা পরিবারে ছড়িয়ে আছে।

ঈশম গরুগুলি গোপাটে দিয়ে এসেছে। সে জমিতে তরমুজের লতা লাগিয়ে দিয়েছে। এখন এই হেমন্ত পার হলে, শীতকাল আসবে, শীত পার হলেই বসন্ত। বসন্তের সেই বড় বড় তরমুজ। খড় রোদ, কাঠফাটা রোদে তরমুজের রস। এখন থেকে লতার যত্ন না নিলে গাছ বড় হবে না, লতা বাড়বে না। সে গাছ, লতা এবং মূলের প্রতি যত্ন নেবার জন্য মাথায় করে একটা ছই—যেমন নৌকায় ছই দেয়া থাকে তেমনি— সেই ছই চরের বুকে নিয়ে ফেলবে। কারণ বর্ষার আগে সে ছইটা তুলে এনেছিল ডাঙ্গাতে, এখন জল নেমে গেছে চর থেকে, সে চরের বুকে আবার মাথায় করে ছই নিয়ে যাচ্ছে। ছোট কর্তা বাড়ি নেই বলে ঈশম বড় বেশি লক্ষ্য রেখে কাজকর্ম করছে।

সোনা দেখল ছই মাথায় ঈশমদাদা নদীর চরে নেমে যাচ্ছে। কত যে কাজ সংসারে। সারাক্ষণ মানুষটা কোন না কোন কাজের ভিতর ডুবে থাকে। ছোটকাকা বাড়ি নেই বলে তার যেন আরও বেশি কাজ। সে আর সোনাকে দেখা হলেও কথা বলছে না। এ-বছর মামাবাড়ি যাবে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই মামাবাড়ি যাবার কথা। করে যাবে, সেও জানে ঈশম। সেই খবর আনবে, ফাওসার খাল থেকে জল নেমে গেছে কিনা। জল না নামলে ধনবৌ বাপের বাড়ি যেতে পারে না। বৌ মানুষ খালের জল ভাঙ্গে কি করে। এখনও বেহারা যারা আসে বিহার অথবা পূর্ণিয়া থেকে তারা আসেনি। ওরা আসবে পৌষে। ঈশমই খবর নিয়ে আসবে ওরা দক্ষিণ-পাড়াতে এসেছে কিনা। কিন্তু এবার খবর নিয়ে এলেও ওরা যেতে পারছে না। ছোটকাকা বাড়ি নেই। তিনি বাড়ি না থাকলে যাবার অনুমতি কে দেবে। সোনা কি ভেবে ছুটে গেল পুকুরের পাড়ে।

সে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে। সে মুড়াপাড়া থেকে চলে এল এবং সেই ফুটফুটে মেয়েরা, অমলা কমলার মুখ সব মনে পড়লেই এই অর্জুন গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, সে একা। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে ভিটা জমি ফসলবিহীন। ফাতিমা চলে গেছে ঢাকায়। সে বাড়ি থাকলে ওকে দেখতে পেত। দেখতে পেলেই চলে আসত চুপি চুপি। একা একা সে নানা-রকম গাছ-পালার ভিতর দিয়ে পালিয়ে চলে আসত। মনের ভিতর সেই রহস্যটা জেগে গেল। অমলা রহস্যের স্পর্শ দিয়ে সহসা উধাও। কমলা কি করছে এখন। কলকাতায় বড় বাড়ি, কি প্রাচুর্য—এসব মনে হলেই ওর রাতের কথা মনে হয়, লুকোচুরি খেলার কথা মনে হয়, ছাদের কথা মনে হয়। আর মনে হয় এমন যে মাঠ সামনে পড়ে আছে—অমলা কমলা যদি একবার এ-দেশে আসত! সে তাকে নিয়ে যেত নদীর চরে। তরমুজের খেতে দাঁড়িয়ে থাকত, বড় মিঞার দুই বিবি, বোরখা শরীরে—সেই যেন এক দুর্গা ঠাকুরের মুখ, ওর কেন জানি তেমন বাসনা, মনে হয় অমলা কমলা দুই বোরখা পরলে এবং সহসা কোন নির্জন মাঠে যদি পালকিতে ওরা বোরখা তুলে উঁকি দেয় তবে, যেন মনে হবে—সেই বড় মিয়ার দুই বিবির মতো, যা সে দেখে এক শৈশবে প্রথম গ্রামের বাইরে এসে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল।

অথবা মনে হয় সেই মালিনী মাছ—সে নদী থেকে একটা মাছ এনে তরমুজের খেতে বালিতে গর্ত করে নদীর জলে মাছ ছেড়ে-ছিল। মাছটা বাঁচল না। সে মাছটাকে একটা তরমুজ পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিল মাঠে। তখনই বুঝি যাচ্ছিল দুই-বিবি। বড় মিঞার দুই বিবি, বোরখা পরে যাচ্ছিল। সোনা বড় ভয় পেয়েছিল সেদিন। ওর কাছে ওরা মানুষ ছিল না। সে একা মাঠে এবং দূরে ছই-এর নিচে ঈশম। ঈশম ওদের দেখে কেমন লম্বা পা ফেলে বের হয়ে এসেছে। সে কোথায় ভয় পাবে তা না, সে ডেকে ওদের সঙ্গে কথা বলে-ছিল। সোনা ঈশমের পিছনে ভয়ে-ভয়ে দেখেছে দুই বিবিকে। দুই পদ্মকলির মতো মুখ। সোনা ভয় পাচ্ছে ওরা টের পেলে, ওকে মুখ থেকে বোরখা ফেলে বলেছিল, কর্তা কোলে উঠবেন।

সবই মনে হচ্ছিল তার। সামনের মাঠে তার নেমে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কারণ মার শরীর ভাল না। ওর কেন জানি কিছু ভাল লাগছে না। অথচ এই গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেই তার মনের ভিতর অদ্ভুত একটা আশা জাগে। কেউ যেন কোথাও ওর মতো বড় হচ্ছে। কোথাও কেউ ওর মতো ছুটছে। এবং নিত্যদিনের এই যে গাছপালা, সবাই তাকে ভালবাসছে। সোনার এভাবে এক মায়া বেড়ে যাচ্ছে। মায়ায়-মায়ায় সে গাছপালার ভিতর বড় হয়ে গেলে তাকে কোন নদীর পাড়ে চলে যেতে হবে

বুঝি। যেমন বাবা গেছেন দূরে দেশে। ন' মাসে ছ' মাসে আসেন। মা কেমন অসহায় চোখ তুলে ওকে দেখছিল সারা দিন। সে যে কি করবে!

তখনই দেখল হন-হন করে কে মাঠ ভেঙে এদিকে আসছে। কাছে আসতেই বুঝল সেই পোস্টম্যান মানুষটি। যে এ-গাঁয়ে আসে। রোজ আসে না। সপ্তায় এক-দিন। সবুজ রঙের থলে থেকে বাড়ি-বাড়ি চিঠি দিয়ে যায়। বাবার চিঠি, জ্যাঠা-মশাইর চিঠি। কখনও-কখনও মামাবাড়ি থেকে চিঠি আসে। সে চিঠি পাবে বলে ছুটে গেল গোপাটে। বলল, চিঠি আছে? চিঠি।

বলল সে, আছে।

তারপর একটা চিঠি। নীল খামে চিঠি। সে বলল, কার চিঠি! কারণ সে বিশ্বাস করতে পারছিল না এ-চিঠি কার! নীল খামে সুন্দর হস্তাক্ষরে কে লিখেছে, অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। কেয়ার অফ শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভৌমিক। তার নামে চিঠি! তার নামে চিঠি কে দিল! মানুষটি বলল, অতীশ দীপঙ্কর কার নাম?

—তোমার। যেন অপরাধ করে ফেলেছে সোনা। সে যে কি করে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেবে বুঝতে পারছে না। তার নামে চিঠি। ছোটকাকা এসে শুনলে কি ভাববে। মা, জ্যাঠিমা কি ভাববে! সে যদি চিঠিতে সেই কথা লিখে থাকে! ওর বুকটা কেমন কেঁপে উঠল।

তখন কবর ভূমিতে জোটনের ভিতরটাও কেঁপে উঠল। সে বলল, কর্তা কি কইলেন।

—যা বললাম জোটন তা সত্যি। তুই মালতীর মুখ দেখলেই টের পাবি। মালতীকে জব্বর জননী বানিয়ে গেছে।

জোটন আর কোন কথা বলতে পারল না। তার মুখ ভীষণ কান্নায় দেখাচ্ছে। মালতী কাছে নেই। বোধহয় ফকির সাবের কবরের পাশে সেই করবী ফুল গাছটার নিচে বসে রয়েছে। রঞ্জিত সামনে, একটা হোগলার আসনে বসে রয়েছে। ওর মাথার উপর ড্যাফল গাছের ছায়া। গাছে ফল নেই। পাতা ঝরে যাচ্ছে। গাছটা নেড়া-নেড়া। সূর্য এসে মাঠের ও-পাশে অস্ত যাচ্ছে। জোটন সব নিয়তি ভেবে বলল, তাহলে কি করবেন এখন?

—তাই ভাবছি। নরেন দাসের কাছে রেখে আসতে সাহস পেলাম না। হিন্দু বাড়ি, বিধবা যুবতীর পেটে জারজ সন্তান, সন্তানের বাপ যে কে, সুতরাং বুঝতেই পারছিস মালতীর অবস্থা। একবার কলসী বেঁধে ডুবে মরতে গেল, আমরা তাকে মরতে দিলাম না। সে আবার মরতে যাবে, তুই ত দেখেছিস ওদের বাড়ির নিচে বড় গাব-গাছটা, সারাটা দিন মালতী সেখানে বসে থাকত। বিড়-বিড় করে বকত।

ওরা দুজনই আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকল। রঞ্জিতের মুখে এখন দাড়ি-গোঁফ নেই বলে এই সমস্যায় সে কতটা চিন্তিত বুঝা যায়। জোটন বুঝতে পারল, মানুষটি মালতীকে বড় ভালবাসে। সেই শৈশবে সে দেখেছে মালতী এই মানুষের সঙ্গে কত দিন দালানবাড়ি থেকে স্থলপদ্ম চুরি করে এনেছে। কত দিন নৌকায় ঘোর বর্ষার মাঠে ছিপ দিয়ে দুজনে মাছ ধরেছে। গ্রীষ্মের দিনে ঝড়ের বিকেলে এই দুইজন, সঙ্গে থাকত সামু, তিনজন মিলে বাগের পিছনে বড় সিন্দুরে গাছের আম কুড়াতে গেছে। এই দুজন আবাল্য এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, তারপরে এই বড় মানুষের শ্যাকর্কাটি নিরুদ্দেশে চলে গিয়েছিল। এবং কবে ফিরে এসেছে সে তা জানে না। এখন মালতীর দুর্দিনে সে আবার ফিরে এসেছে। সে যে একবার, সেই প্রথম যখন ফকির সাব ওর বাড়িতে গিয়েছিল, সে না খেয়ে ফকির সাবকে সব কটা ভাত খাইয়েছিল, কি যে প্রাণের আবেগ, এই এক আবেগ সে এখন রঞ্জিতের মুখে ধরতে পারছে। সে দেখে-ছিল সেদিন বিধবা মালতী চুপচাপ ঘাটে তার হাঁসগুলি ছেড়ে দিয়েছে। এবং হাঁসের কেলি, অথবা বলা যায় যৌনলীলা সে ঘাটে বসে চুপচাপ চুরি করে দেখেছে। ওর কেবল মনে হয়েছিল—হায় খোদা, এমন যুবতী-শরীর বিফলে যায়। আল্লার মাশুল তুলছে না মালতী। বড় কষ্ট হয়েছিল তার। সে আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। সেই মালতী আবার এমনভাবে উঠে এল—কি বলবে এখন, কি করবে এখন জোটন বুঝতে পারছে না।

লোকালয় বর্জিত এই এক কবর ভূমি। মানুষজন দেখাই যায় না। দূরে হোগলার বন পার হলে অথবা শরবনের পর যে মাঠ, মাঠে কিছু গরু-বাছুর দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট এবং অস্পষ্ট ছায়ার মতো গরু-বাছুর। এটা টিলার মতো জায়গা বলে অনেক দূর দেখা যায়। এবং মনে হয় জোটন তার নিবাস দেখে-শুনেই সবচেয়ে উঁচু ভূমিতে তৈরী করেছে। এবং খুব দূরে দু-একজন চাষী মানুষ দেখা যাচ্ছে অথবা এই যে অঞ্চল, অঞ্চলের চার পাশে শুধু বেনা ঘাস, হোগলার বন, শরের জঙ্গল সব পার হয়ে মানুষের আসা খুব কঠিন। অগম্য স্থান। এমন একটা অঞ্চলে জোটন থাকে। সে শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ঢুকে গেছে, সুতরাং আর কোন ভয় নেই, মুখে-চোখে সেই নিশ্চিন্ত ভাবটাও কাজ করছে রঞ্জিতের। জুটির এখন আর সেই খেটে-খাওয়া চেহারা নেই। পীরের নিবাসে বাস করে ওর মুখে-চোখেও কেমন পীরানি-পীরানি ভাব। সে শরীরটা ড্যাফল গাছের গুঁড়িতে এলিয়ে দিল। সে যে এসব বলছে, মালতী শুনতে পাচ্ছে কিনা আবার এই ভেবে চারিদিকে তাকাতেই দেখল মালতী দূরে কবরের নিচে করবী গাছের ফুল তুলছে কোচরে।

জোটন আবার কথা আরম্ভ করল। —পানি আইনা দেই। গোসল করেন। ছাগলের দুধ আছে, আতপ চাউল আছে, সীম আছে। সিদ্ধ ভাত খান। আর খাইতে দ্যান। পরে ভাইবা যা হয় কিছু ঠিক করতে হইব।

জোটন এবার কবরের কাছে গেল। রঞ্জিত পিছনে-পিছনে হাঁটছে। একটা লাউ-এর টাল, সেটা অতিক্রম করে যেতে হয়। ওরা দুজনই টালের নিচে গুঁড়ি মেরে ওপারে উঠে গেল। জোটনের শীত-শীত করছে। সে ওর কাপড় দিয়ে শরীর ভাল করে ঢেকে নিল। ওরা দেখল কবরের ওপাশে দু পা ছড়িয়ে এখন মালতী বসে রয়েছে। কোচরে করবী ফুল। সে ফুলগুলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেবল কি খুঁজছে যেন। বুঝি সে তার যা হারিয়েছে তা ফিরে পেতে পারে কিনা, ফুলের ভিতর হাত রেখে তার অনু-সন্ধান। এখানে উঠে এসেই তার ফের মনে পড়েছে পেটের ভিতর এক বৃশ্চিক বাড়ে দিনে-দিনে। লেজে হুল, মুখে কাটা, দু পায়ে সাঁড়াসি। মাঝে-মাঝে এটা ওর চোখের সামনে এত বড় হয়ে যায় যে, যেন সেই নির্জন মাঠের উপর দিয়ে অতিকায় এক বৃশ্চিক, যার পা যোজন প্রমাণ, যার হুল আকাশে উঠে গেছে প্রায় হাতির সামিল এক জীব ওকে দলে-পিষে মেরে ফেলার জন্য ছুটে আসছে। অথবা সাঁড়াসি দিয়ে গলা টিপে মারবে। সে তখনই হাঁসফাঁস করতে থাকে। সে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে—না-না-না। যেন সেই হুল ভিতরে বারে-বারে দংশন করছে। আতঙ্কে সে শিউরে উঠছে। তার লাবণ্য আর নেই। সেও মরে যাচ্ছে বুঝি। আগামী শীতে এভাবে বাঁচলে সেও মরে যাবে।

জোটনের চোখ-মুখ ফেটে জল আসছিল। কি সুন্দর মুখ কি হয়ে গেছে! জোটন যতটা পারলে পায়ের কাছে গিয়ে বসল, ওঠ মালতি।

রঞ্জিত দেখল জোটনের কথায় মালতী উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং জোটনের সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটছে। সেও হাঁটছিল। কোন কথা নেই। পায়ের নীচে ঘাস এবং শুকনো পাতা। ওরা আবার লাউ গাছের টাল অতিক্রম করে এল। ড্যাফল গাছটা পার হলেই জোটনের চাটি। চাটির ভিতর ঢুকলে জোটন বলল, হাত-পা পানিতে ধুইয়া নে। কর্তা দুধ গরম কইরা দ্যাওক, তুই খা। খাইলে শরীরটা ভাল লাগব।

জোটন ছাগল দুয়ে দিল। নতুন মাটির হাঁড়িতে দুধ। সে তিনটে কচার ডাল কেটে আনল। তিনটে খোটার মতো পুঁতে উপরে দুধের হাঁড়ি রেখে সে বলল রঞ্জিতকে, ইবারে আগুনডা জ্বালান।

শুকনো ঘাস পাতা এনে দিয়েছে জোটন। এত বড় বনে জ্বালানির অভাব নেই। সে ঘর থেকে টিন বের করেছে। চিঁড়া বের করে দিয়েছে হাঁড়িতে।

মালতীকে জল আনতে বলেছে কুয়ো থেকে। জোটন সব কিছু বের করে দেবার সময় কত কথা বলছিল, এত-এত খাইছি ঠাকুরবাড়ি। ধনমামী বড়মামী কি না খাওয়াইছে। ঠাইনদি ভাল যা কিছু হইছে আমারে না দিয়া খায় নাই। অর্থাৎ এসব বলে জোটন পুরানো দিনের স্মৃতি স্মরণ করছে। সে কি করতে পারে তার মেমান-দের জন্য! এই মেমান এসেছে ঠাকুরবাড়ি থেকে। ঠাকুরবাড়িতে সে অভাবে অনটনে খেয়ে গেছে। খুদকুড়া যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, বড়মামী জোটনকে ডেকে দিয়ে দিত। সে যে এটুকু ওদের জন্য করতে পারছে সে যেন সবই আল্লার মেহেরবানি।

ওরা জোটনের অতিথি। জোটন এখন দু-চার-দশজনকে, ইচ্ছা করলে দু-দশ মাস ধরে খাওয়াতে পারে। যখন মেলা হয়েছিল, মানুষজন এসেছিল কত। দোকান-পসরা, লাল নীল বেলুন, তালপাতার বাঁশি, পীরের মাজারে কত পয়সা, বাতাসার থালায় কত চৌআনি টাকা। সে সবই পীরানির প্রাপ্য। সে এভাবে দু বিঘা ধানের ভুঁই—কারণ মোরল্লের বেটা হয় নি, পীরের মাজারে মানত করে বেটা হয়েছে, সে দুই বিঘা ভুই লিখে দিয়ে গেছে জোটনকে। সকাল-সকাল কেউ-কেউ আসে, ব্যারামি নাচারি মানুষ ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসে। জড়ি বুটি যা কিছু ছিল ফকির সাবের সে অসুখে-বিসুখে সে-সব ব্যবহার করে। কেউ এলেই দরগায় অনেক নিচে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, পীরের দরগায় মানুষ উইঠা যায়। হাঁক পেলেই জোটন তাড়াতাড়ি চটিতে উঠে যায়—কারণ জোটনের কাছে এই বন উদাসী এক জগৎ। ওর চোখে-মুখে পীরানি-পীরানি ভাব। বনের দিকে তাকালে মনে হয় আল্লা কিছুই দিয়ে পাঠায় নি কাউকে। শরীরের বসন-ভূষণ অধিক মানে হয়। লজ্জা নিবারণের কি আছে এত বড় বনে। বনের ভিতর একা-একা জ্যোৎস্নায় তার হিন্দুদের দেবীর মতো হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছা হয়। সে শরীরে বাস রাখে না। খালি অঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায় বনে, মানুষ দরগায় উঠে এলেই বেনা ঘাসের অন্তরালে উঁকি দেয়। তারপর হাঁকে—মানুষ উইঠা যায়। কেয়ামতের দিন কবে জানতে চায়। কে জাগে দরগায়?

পীরানি তাড়াতাড়ি তখন জোটন হয়ে যায়। বসন-ভূষণ পরে গলায় মালা-তাবিজ পরে সে তাড়াতাড়ি পীর সাহেবের ছইটার নিচে গিয়ে বসে থাকে। তারপর হাঁকে পীরানি জাগে। তখনই মানুষটা দরগায় উঠে আসতে সাহস পায়। নতুবা সে যতক্ষণ হাঁক না দেবে পীরানি জাগে—ততক্ষণ সেই জড়ি-বুটির জন্য যারা আসবে ঘাসের অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করবে। কখন বনের ভিতর থেকে ডাকটা ভেসে আসছে—পীরানি জাগে। পীর মুর্শিদ নিয়ে রঙ্গরস করা যা না, চুরি করে তাদের লীলাখেলা দেখা পাপ। সুতরাং সোজাসুজি কেউ দরগায় উঠে আসতে সাহস পায় না। কেবল বছরে যেদিন আশ্বিনের অষ্টমী তিথিতে মেলা বসবে সেদিন হাঁক দেবার নিয়ম নেই। সোজা তুমি দরগায় উঠে আসবে — এমন একটা নিয়ম এ ক'মাসেই চালু হয়ে গেছে।

জোটন মনে-মনে বড় প্রসন্ন। সে এই দুজন মেমান পেয়ে মালতী যে গর্ভবতী এবং রঞ্জিত যে পলাতক—ওরা দুজন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যে পালিয়ে এসেছে—সে সব ভুলে কোথায় কি পাওয়া যাবে এখন, যেমন সীমের মাচানে সীম, লাউয়ের মাচানে লাউ সে তুলে বেড়াচ্ছে। অতিথিদের রাতের খাবার ব্যবস্থা করছে। সে মালতীকে ডাকল, আয় দেইখা যা। সে তার হাতে লাগানো সীমের মাচান, লাউয়ের মাচান এবং পুঁই মাচায় হলুদ রংয়ের উচ্ছে ফুল দেখাল। সে যে এখন পীরানি, তার নসিব পাল্টে গেছে এবং বড় মায়ায় চারি-দিকে সে তপোবনের মতো আশ্রম গড়ে তুলছে সে-সবও দেখাল মালতীকে।

রাত হলে আর ভয় থাকে না জোটনের। কবর দিতে আসে যারা তারা পর্যন্ত পীরের দরগায় কিছু দিয়ে যায় অথবা মোমবাতি জ্বালাতে আসে কেউ। সে তখন রসুন গোটার তেলে প্রদীপ জেলে, গলায় মালা-তাবিজ পরে এবং মুসকিলাশানের লম্ফ জ্বালিয়ে অন্ধকারে চোখ রক্তবর্ণ করে বসে থাকে। মানুষের এক ভয়, মৃত্যুভয়। যম দুয়ারে দিয়া কাঁটা আমার ভাইয়েরে দিলাম ফোঁটা। জোটন যেন ভাইফোঁটার মতো বিড়-বিড় করে কি বলছে তখন। মানুষেরা অনেক দূরে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে। মানুষেরা তার কাছে পর্যন্ত আসতে সাহস পায় না তখন।

জোটন বলল, তর কোনে অসুবিধা হইব না মালতী। ল, তুই স্নান করবি।

রঞ্জিত মালতীকে দুধ গরম করে খেতে দিল। দুধটা খেয়ে মালতী স্নানের জন্য বসে থাকল। ছাগলটা আনতে গেছে জোটন। সে ছাগলগুলো বেঁধে রাখল ড্যাফল গাছে। বলল, ল যাই। স্নান করলে শরীর ঠাণ্ডা হইব।

জোটনের আছে বলতে এক ছই। আর চটিতে আছে দুটো ঘর। ভাঙ্গা ইঁটের পাঁচিল। সে ঘর দুটোর একটাতে ছাগল-গরু এসব রাখবে বলে করেছে। অন্য ঘরটা করেছে মেলার সময় তার বাপের দেশ থেকে কেউ এলে থাকবে। তার সারাটা দিন বনে-বনে কেটে যায়। কখনও সে ছইয়ের নিচে বসে নামাজ পড়ে। অথবা মালা-তাবিজের ভিতর পা মুড়ে কেমন মাথা নিচু করে বসে থাকে। ঘর দুটো তার ব্যবহারের দরকার হয় না।

যেটাতে এলে বাপের দেশের মানুষ থাকার কথা সে-ঘরে এখন চুপচাপ রঞ্জিত একটা কাঠের জলচৌকিতে বসে রয়েছে। জোটন মালতীকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরে থাকে না বলে কেমন এক বন্য স্বভাব জোটনের। রঞ্জিত এসেই যেন সেটা টের পেয়ে গেছে। সে রাতে ছইয়ের ভিতর থাকে এবং বাইরে রসুন গোটার গাছে মুশকিলা-শানের লম্ফটা সারা রাত জ্বলালে সে নির্ভয়ে ঘুম যেতে পারে।

জোটন কবর পার হয়ে এলেই কেন জানি মালতীকে একটু থামতে বলে আবার ড্যাফল গাছটার নিচে চলে গেল। বলল, কর্তা মালতীর কাপড়টা ঘাটের সিঁড়িতে রাইখা আসেন।

রঞ্জিত মালতীর পোঁটলা থেকে সাদা এক থান বের করল। জোটন ওদের কিছুই ধরছে না। হিন্দুর ধর্মাধর্ম এই। অন্য জাতি ছুঁলে জাত বাঁচে না। সে ছুঁয়ে দিলে মালতী সারা রাত না খেয়ে থাকবে। এমন কি সে যে সীম, বরবটি, লাউ এবং দুটো পেঁপে পেড়েছে — সব এক সঙ্গে আলাদা রেখে দিয়েছে। জোটন রান্না করার জায়গাটা গোবর দিয়ে লেপে দিয়েছে। গোবরে লেপে দিলেই সব পবিত্র হয়ে যায়। চার পাশটা গোবর ছড়া দিয়ে জায়গাটাকে একজন হিন্দু বিধবা রমণীর উপযুক্ত করে তুলেছে। অথচ পেটে মালতীর জাতক। গাছপালায় বাতাসের শন-শন শব্দ—জোটন নিরামিশাষী, ফকির সাবের মৃত্যুর পর সে মাছ-মাংস আহার করে না—যেন ফকির সাবের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মাছ-মাংস বলতে যে সম্পর্ক বোঝায় তা তার উবে গেছে। সে আর আল্লার মাশুল তুলছে না ভেবে বলে না, আমারে একটা পুরান-দুরান যা হয় ঠিক কইরা দ্যান। কিন্তু মালতীর এমন কাঁচা বয়স, রঞ্জিতের এমন সুন্দর মুখ এক ঘরে এক বিছানায়—মালতী এবং রঞ্জিতকে জোটন এক জোড়া হাঁসের মতো জলের উপর ভাসতে দেখল।

মালতী তার মেমান। রঞ্জিতও। ওর দিদি ক্ষুধার দিনে কত যত্ন নিয়ে খাইয়েছে তাকে। সে সব মনে পড়লে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে। সে রঞ্জিতকে বলল, সিঁড়িতে রাইখা দ্যান। মালতী কাপড় ছোঁবে না। জোটন একটা গাছে বিচিত্র নীল রংয়ের ফুল দেখাবার সময় মালতীকে ছুঁয়ে দিয়েছে। স্নান না করা পর্যন্ত মালতী পবিত্র হবে না। সে মালতীকে এক সরোবরে নিয়ে যাচ্ছে। চার পাশে সব বড়-বড় ঝাউ গাছ। গাছের নিচে কত সব বিচিত্র ঘাস ফুল। কাঠবিড়াল গন্ডায়-গন্ডায়। সাদা রংয়ের ডাহুক। ডাহুকের ছানা।

রঞ্জিত হাতে কাপড় নিয়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে গেল। জোটন আগে, মালতী মাঝে এবং রঞ্জিত পিছনে। ওরা টিলা থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এই পথেই জোটন সারা দিন মরা ডাল, শুকনো পাতা, গাছের ফল কুড়িয়ে বেড়ায়—সে এই পথেই নেমে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের আলো পাতার ফাঁকে ওদের মুখে পড়ছে। সেই সব গাছ বড় গরান গাছ, গজারি গাছ, রসুন গোটার গাছ—নিচে তিন মানুষ, এবং ক্রমে শুধু নেমে যাওয়া। যেন জোটন এবং রঞ্জিত এক বন্দিনী বনদেবীকে খোলা মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। দূরের বিল থেকে খাল থেকে হাঁস উড়ে আসে এ-সময়। কচ্ছপেরা উঠে আসে ডিম পাড়ার জন্য। এখানে সব জীবজন্তু এমন কি কচ্ছপেরা জোটনকে ভয় পায় না। জোটন তাদের মতো জলে-জঙ্গলে থাকে বলে বনের জীব হয়ে গেছে। রঞ্জিত যেতে যেতে দেখল দুটো কচ্ছপ খালের পাড়ে উঠে রোদ পোহাচ্ছে। রোদ পোহাচ্ছে কি ডিম পাড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। ওরা রঞ্জিত এবং মালতীকে দেখেই জলে নেমে গেল। একা থাকলে ভয় পেত না। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই কেমন ডেকে যাবার মতো বলে গেল, আমার মেমান। ডর নাই জীবেরা। তোমাগ কেউ অনিষ্ট করব না।

অদ্ভুত এক ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। আস্তানা সাবের দরগা এটা। মাঝে একটা জল-টুঙি। সেখানে আস্তানা সাবের কবর। পাশে ফকির সাবের দরগা। এক সময় আস্তানা সাবের দৌলতে এই সরোবর কাটা হয়েছিল এবং কথিত আছে এই সরোবরের ঠিক মাঝখানে জলের উপর বসে আস্তানা সাব নামাজ পড়তেন, খড়ম পায়ে জল পার হয়ে যেতেন. মৃত্যুর আগে তিনি মন্ত্রবলে জল-টুঙি বানিয়ে গেলেন একটা। সেই জলে-স্থলে তাকে সমাহিত করা হল। জোটন আস্তানা সাবের দরগায় ঢুকেই বলল, পীর সাহেব আপনের সরোবরে সান করাইতে আনছি মালতীরে। অরে মুক্ত কইরা দ্যান।

সিঁড়িতে উঠে রঞ্জিত মালতীর কাপড় রেখে দিল।

জোটন বলল, ডুব দেওয়নের সময় মনের বাসনা আস্তানা সাবের কাছে কইস।

মালতী ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে জলে নেমে গেল।

--তর যা বাসনা, তুই যদি সরোবরে ডুব দিয়া কস তবে বিফলে যাইব না।

জলে দাঁড়িয়ে মালতী কি ভাবছে। জলটা নাড়ছে। কি কাচের মত স্বচ্ছ জল! দুটো একটা মাছ ওর পায়ের কাছে এসে ঘোরাফেরা করছে। সে জলের নিচে এই সব ছোট ছোট মৌরলা মাছ দেখে জীবন এভাবে কতদিন আর, এমন ভাবছিল।

জোটন দেখল মালতী জলে ডুব দিচ্ছে না। সে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখল রঞ্জিত দাঁড়িয়ে আছে। জোটন কাছে এসে বলল, আপনে যান। মালতীর সান হইলে আমি নিয়া যামু।

রঞ্জিত হেঁটে হেঁটে চলে এল। এই কব্যভূমিতেই জব্বর মালতীর পিছনে ছুটেছিল। আর সেই লোকগুলি। মালতী বলেছিল, সে তিন চারজনের মুখ এক সঙ্গে পায়ের কাছে ভেসে উঠতে দেখেছিল। তিন চারজন মিলে সারারাত ওর উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। এই যে সন্তান জন্ম নিচ্ছে, সে কে! তার অবস্থা এখন কি! এ কোন দেবতার আশীর্বাদ! জন্ম নিলে তার পরিচয় কি হবে! জোটন কি এই অশুভ দেবতার হাত থেকে মালতীকে রক্ষা করতে পারবে না! সেত পীরানি। জুটি বুটি আছে তার। সে কি বলবে, জোটন এখন তুমি দ্যাখো কি করতে পার। একে তুমি রক্ষা কর।

তখন জলে ডুব দিল মালতী। যেন একটা মাছরাঙা পাখি জলের নিচে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল। কত বড় সরোবর। পাড়ে পাড়ে বিচিত্র সব গাছপালা। একটা অপরিচিত পাখি বার বার একই স্বরে ডেকে চলেছে। জোটন পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মালতী কেবল ডুব দিচ্ছে। জোটন বলল, উইঠা আয় মালতী। তর বাসনার কথা কইতে কিন্তু ভুইলা যাইস না।

জোটনের কথামতো ডুব দিয়ে তার বাসনার কথা বলল। --আমারে আস্তানা সাহেব মুক্ত দ্যান। যেন বলার ইচ্ছা--আমাকে আগের মালতী, পবিত্র এবং সুখী মালতী করে দিন। আমি আবার নদীর পাড়ে পাড়ে হাঁটি।

মালতী স্নান করে উঠে এলেই বড় পবিত্র লাগছে মুখ চোখ। জোটন বলল, কি কইলি!

ছল ছল চোখে মালতী বলল, আমারে মুক্তি দিতে কইছি।

জোটন আর তাকাতে পারছে না মালতীর দিকে। সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। বোধ হয় জোটন আর মালতীর সঙ্গে কথাও বলতে পারত না।

যদি না মালতী হেসে বলত, জুটি অন্ন একলা ডর করে না?

—না।

মালতীর এই হাসি জোটনকে কেমন সাহসী করে তুলল। বলল, আমার লগে আয়। তর কোন ডর নাই।

—কত বড় বন! আগের বার চোখ খুইলা সব দ্যাখতে পারি নাই।

—এই বনে ঢুইকা গ্যালে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না।

ওরা ফিরে এলে রঞ্জিত দেখল মালতী খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এমনকি মালতী ওকে স্নান করে নিতে বলেছে। এতটা পথের কষ্ট, স্নান করলেই দূর হয়ে যাবে এমনও বলেছে। মালতী আবার যেন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে কতক্ষণ! এই বন, নির্জনতা, এবং জোটনের কাছে সাময়িক আশ্রয়, জোটনের আতিথি-পরায়ণতা কিছুক্ষণের জন্য ওকে মুগ্ধ করে রেখেছে। পেটে যে একটা আজব জীব বাড়ছে এবং রক্তের অন্তরালে যে জীবটা, অতিকায় নৃশংস এক জীব, মুখ কেবল ব্যাদান করে আছে—সেই মুখ স্মৃতিতে ভাসলেই মালতী আবার অধার্মিক হয়ে যাবে। ভ্রূণ হত্যার জন্য সে নিজের শরীরের ভেতরে অন্য একটা শরীর খুঁজে বেড়াবে।

শুধু এই ভয় রঞ্জিতের। সে এই যুবতীকে নিয়ে যায় কোথায়। কারণ, এই অঞ্চল থেকে তার সরে পড়ার একমাত্র পথ নারাণগঞ্জে উঠে যাওয়া। এবং সেখান থেকে রেল অথবা স্টিমারে দূর দেশে সরে পড়া। কিন্তু সে জানে তাকে ধরার জন্য জাল পাতা আছে সহরে গঞ্জে। ওর সব বয়সের ছবি আছে পুলিশের ঘরে। সে একা থাকলে ভয় পেত না। কিন্তু এই যুবতী মেয়ে—পেটে হাত পড়লেই হিক্কা এবং বমির মতো ভাব, চারদিকে তখন পাগলের মতো থুতু ছিটাতে থাকে।

রঞ্জিতের ইচ্ছা এই সন্তান নাশের ব্যাপারে একটা পরামর্শ চায় জুটির কাছে। মালতী দলাদলা হিং খেয়েছে। আভারাণী এনে খাইয়েছে। কিছুই হয়নি। মূল এবং গাছের শেকড়-বাকড় আছে, তা ব্যবহার করা হয়নি। আভারাণী সাহস পায়নি এটা দু কান করতে। নরেন দাস যত বমি করছে মালতী তত ভাল মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। এখন জুটিকে বলার সময় নয়। দু চারদিন থাকার পর কথাটা সে তুলবে। আপাতত এই এক জোটন যে তাদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে আছে। প্রায় সে আত্ম-সমর্পণের মতোই এখানে এসে উঠেছে। এবং জোটনের এই আশ্রমের মতো জায়গায় মালতীর যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়! সে নিজে কথাটা পাড়তে পারছে না। জোটন এই নিয়ে কথা তুললেই সব পরিষ্কার করে খুলে বলতে হবে। তুই কিছুদিন ওকে রাখ জোটন। অন্তত সন্তান প্রসবের দিন কটা পর্যন্ত। তারপর আমি ওর আস্তানা

ঠিক করে নিয়ে যাব। আর তার আগে যদি গর্ভপাত হয়ে যায়, তবে ত কথাই নেই। আমি আর ও কোনদিকে চলে যাব। ঘর বাঁধব।

রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে জোটন বলল, এত ভাবছেন কি! বলে সে হা হা করে হাসল। বলে সে হাঁড়ি পাতিল সব বের করে দিল। সবই নতুন। কিছু থাদা পাথর। মেলা থেকে সে কিনেছে। থাদা পাথর সে কোনটা কত দিয়ে কিনেছে, তা এক এক করে বলছে। রঞ্জিত বসে বসে দেখছে সব। ওর শৈশবের কথা মনে পড়ছে। এই জুটি কচ্ছপের ডিম পেলে, হিন্দু গ্রামে উঠে যেত। সে শাকপাতা, যেমন গীমাশাক এবং গন্ধপাদাল, বেতের নরম ডগা কেটে হিন্দু বাড়ি উঠে কচ্ছপের ডিম, শাকপাতা দিয়ে খুদকুঁড়া চেয়ে নিত। ধান ভেনে চিড়া কুটে তার আহার সংগ্রহ। ওর স্বামী তালাক দিলেই আবেদালির কাছে চলে আসা। আবেদালির কথা মনে হতেই রঞ্জিত বলল, আবেদালির নয়া বিবি এখন ওকে ঠিকমতো খেতে দেয় না। যেন জোটন ইচ্ছা করলে আবেদালিকে কাছে এনে রাখতে পারে।

জোটনের মুখ বড় কাতর দেখাল। সে এটা পারে না। সে পীরানি। পীরানির ভাব ভালবাসা থাকতে নাই। সংসারে তার
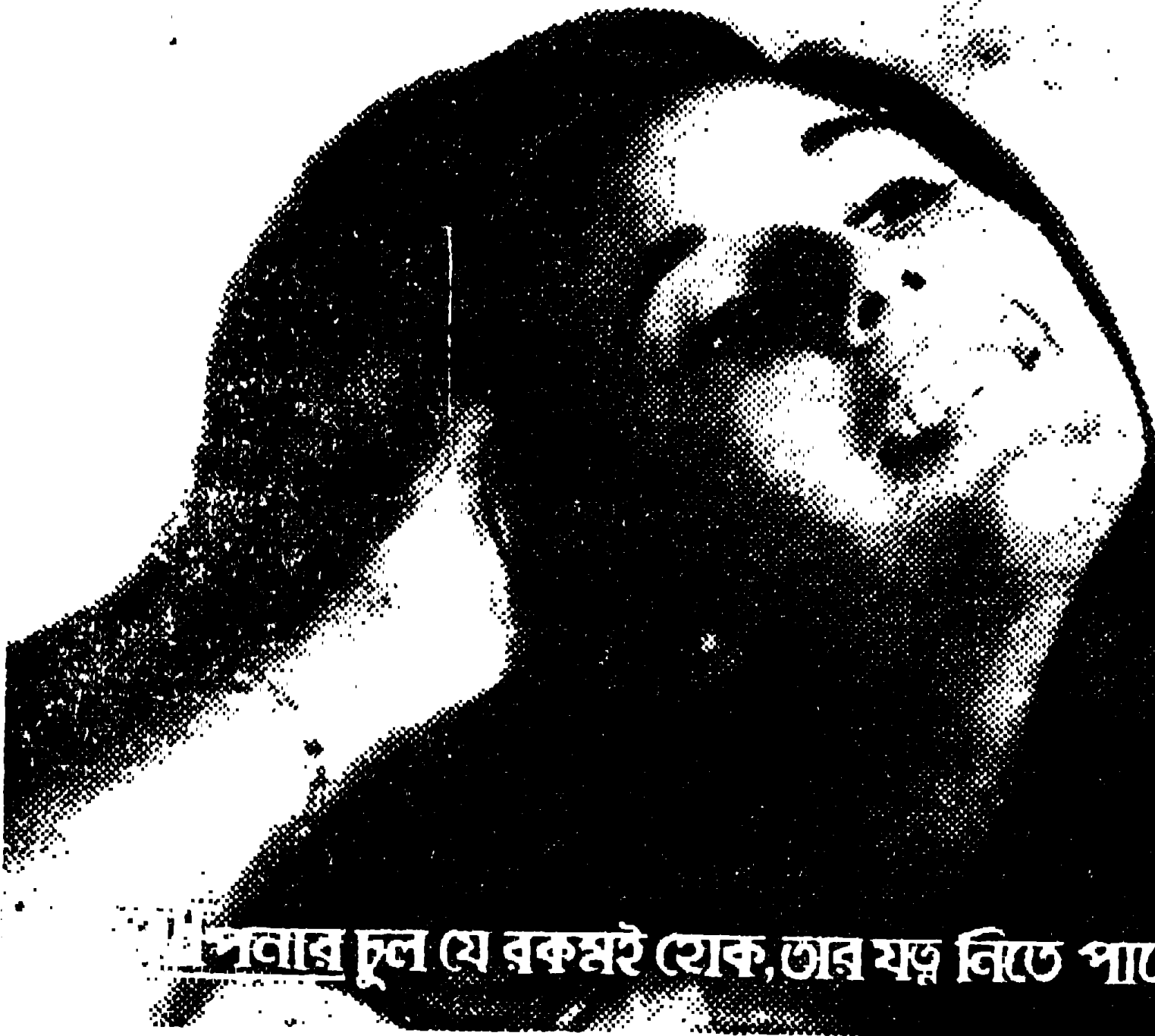
আপনজন থাকতে নাই। তার আপনজন সকলে।

—এই যে আমরা আইলাম।

—সকলে আমার আপনজন কর্তা। কিন্তু কোন মায়া নাই। অর্থাৎ কোন মায়ায় আর জড়িয়ে পড়তে চায় না জটি। সে একা। কেবল একা থাকতে চায়। আর আল্লা অথবা নবীদের নামে সে মনের ভিতর ডুবে থাকে। রাত বাড়লেই ছইএর নিচে ঢুকে কালো রঙের আলখেল্লা পরবে ফকিরসাবের। গলায় মালা তাবিজ ঝোলাবে এবং কোরানের পর পর বয়াত মুখস্ত বলবে মুসকিলাশানের লম্ফের দিকে চোখ রেখে।

রঞ্জিতকে মালতী রান্না করতে দিল না। জোটন ভাজা মুগের ডাল বের করে দিল। গরুর দুধের ঘি। তেল শিশিতে। তেল ঘিতে দোষ নেই। বাটনা বাটার শীলনোড়া আছে। ওটা জোটন ব্যবহার করে বলে দিল না। কোনরকমে রাতের রান্না আজ সেরে ফেললে কাল জোটন সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। মালতী হলুদ এক টুকরো আস্ত ডালে ফেলে দিল। হলুদ না দিলে রান্নায় ত্রুটি থেকে যায়। হলুদ দিতেই হয়। কোথায় এখন বাটা হলুদ পাবে। সে আস্ত হলুদ ফেলে দিল গরম ডালে। মেথি মৌরি তেজপাতা সম্ভারে মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, পেঁপে এবং সীম সেদ্ধ। আতপ চাউলের ফেনা ভাত। বড় কলাপাতা কেটে এনেছিল জোটন। ওরা খেলে পর যা থাকবে, একপাশে আলগা হয়ে সে খেয়ে নেবে। সে নিজের জন্যও একটা কলাপাতা কেটে রেখেছে।

জোটন খেতে বসে মালতীকে অপলক দেখছিল। জব্বর এই যুবতীকে বিনষ্ট করেছে। মালতী বছরের পর বছর আল্লার মাশুল না তুলে আছে কি করে! অথচ জব্বর জোরজার করে এক পবিত্র যুবতীকে অশুচি করে দিল। জোটনের নিজেরই কেমন শরীর গোলাচ্ছে। সে জব্বরকে শিশু বয়স থেকে বড় করেছে। জব্বর এই কাজ করেছে! অপরাধের দায়ভাগ জোটনের। সে ভিতরে ভিতরে জব্বরকে কাছে পেলে যেন গলা টিপে ধরত, এমন চোখ মুখ এখন। মালতী রঞ্জিতকে খাইয়ে আলাদা পাতায় যত্নের সঙ্গে ভাত এবং ডাল বেড়ে দিয়ে দিল জোটনকে। মালতী রঞ্জিতের পাতায় ভাত বেড়ে দিয়েছিল। ওরা আলগা হয়ে একটু দূরে বসে পরস্পর নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে। কিন্তু জোটন খেতে পারছে না। সে অপলক চুরি করে মালতীকে দেখছে। যেন সেই ঠাকুরবাড়িতে বসে সে খাচ্ছে। সে খেতে খেতে মালতীর রান্নার খুব তারিফ করল।

রঞ্জিত পাশে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার রাত। লম্ফের আলোতে দুই নারী মূর্তি বনের ভিতর চুপচাপ খাচ্ছে। এক সময় জোটন বলল, মামা-মামীরা কেমন আছে?

—ভাল। বস্তুত সারাদিন পর এই খাওয়া, একটু ঘি, সীমসিদ্ধ, বেগুন সিদ্ধ ভাত এবং মুগের ডাল বেগুন ভাজা অমৃতের সামিল। আর মালতীর এতদিন পর স্বপ্ন তার সফল হচ্ছে, সে তার প্রিয়জনকে দুটো রান্না করে দিতে পারছে, তার পাতে খেতে পেরেছে, পেটের ভিতর যে এমন একটা দানব দিনে দিনে বাড়ে চন্দ্রকলার মতো, সে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করছে না—ঘরে লম্ফ জেলে রেখে এসেছি জোটন—একই ঘরে আজ রঞ্জিত আর মালতী থাকবে। জটি সেই কবে থেকে প্রায় বলা যায় মালতীর জন্ম থেকে বড় হওয়া, ওর বিয়ে সব সে চোখের উপর দেখেছে। স্বামীর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর মালতীর ফিরে আসা। সেই শোক বিহ্বল চেহারা জোটন যেন ইচ্ছা করলে এখনও মনে করতে পারে—তারপর দীর্ঘকাল মালতী একা একা একটা গাছের নিচে সারাদিন বসে থাকত, কেউ এল না হাত ধরে নিয়ে যেতে—নদীর পাড়ে যাবার ইচ্ছা তার বার বার। কিন্তু সে একা। একটা গাছের পাতা কেবল সারা মাসকাল ওর মাথার উপর ঝরে পড়ছে। গাছের নিচে আজ তার আর একটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। মালতী আজ কিছুতেই রঞ্জিতের দিকে তাকাতে পারছে না। কেবল ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উচ্ছিষ্ট এক যুবতী সে। সোনার মতো মানুষ, তার কাছে দেবতার সামিল রঞ্জিত এখন ঘরে চুপচাপ হোগলার উপর শুয়ে আছে। সে গেলে মানুষটা আলো নিভিয়ে দেবে। অথচ ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। সে তার কাছে কিছুতেই যেতে সাহস পাচ্ছে না। তার হাত পা কাঁপছে।

এখানে থাকলে মালতী ঘরের ভিতর ঢুকবে না। জোটন সেজন্য তাড়াতাড়ি ছইএর নিচে ঢুকে যাবার জন্য কবর পার হয়ে চলে গেল। পিছনের দিকে তাকাল না। কেবল মনে মনে হাসল। মালতী তুই মনে করস আমি কিছু বুঝি না। তুই বিধবা বইলা তর বুঝি কিছু ইচ্ছা থাকতে নাই। মাচানে উঠেই জোটনের মনে হল সরোবরে আজ দুটো মাছ সারাদিন জলের নিচে ঘুরে বেড়াবে। সরোবরে দীর্ঘদিন একটা মাছ ছিল। জোয়ারের জলে আর একটা মাছ ভেসে আসতেই সরোবরের মাছটা লাফিয়ে জলে ভেসে উঠল। ওর কাছে সরোবরের মাছ মালতী। কি যে দুঃখ মেয়ে মানুষের স্বামী বিহনে জীবনযাপন—সে মর্মে মর্মে তা জেনেছে। জোটন মুসকিলাশানের আলোতে এবার নিজের মুখ দেখল। সে কেমন তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনীর মতো হয়ে যাচ্ছে। এক সুদূর আলোর রেখাক্রমে বড় হতে হতে গাছপালা ভেদ করে উপরে উঠে যাচ্ছে। মালতী ক্ষুধায় পীড়িত। একটা মানুষ তাকে আজ কি যে আনন্দ দিচ্ছে! আহা বসুন্ধরার মতো, অথবা আবাদের মতো, ফসলের জমি খালি ফেলে রাখতে নেই। আজ, আজ রাতে দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আকাশ ভেঙ্গে ঢল নামবে। ওর আরামে চোখ বুজে এল। সে ফকির জীবের উদ্দেশ্যে মাথা নিচু করে এবার বসে থাকল। মনে হচ্ছে সামনে সেই সোনালী বালির চর—আকাশ ভেঙ্গে ঢল নেমেছে। একটা সাদা বিনষ্ট পবিত্র ফুল সেই জলে চুপিচুপি ভিজছে। সে এবার মনে মনে উচ্চারণ করল, খুদা মেহেরের বান। সে বিনষ্ট হতে দেবে না ফুলকে। আবার পরিচ্ছন্ন করে তুলবে সব। মালতীর পেটে জারজ সন্তান। জারজ সন্তান পেটে রেখে সে কিছুতেই এমন নিষ্পাপ যুবতীকে বিনষ্ট হতে দেবে না। হাতে তার কত তন্ত্রমন্ত্র আছে, গাছ-গাছালি আছে—সে কি না পারে। কারণ তার নিজের মানুষ ফকিরসাব। মরার আগে সব তন্ত্রমন্ত্র ঝাড় ফুঁক ওকে দিয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সারাজীবন ধরে যে মাশুল আল্লার নিবার কথা, আজ সে তাই বিনষ্ট করতে যাচ্ছে। সে তার লাখোটিয়া চিজ সেই মাশুলের উপর ছুড়ে দেবে। তবু মালতী আবার পবিত্র হোক, নিষ্পাপ হোক, সুখী হোক। সে মুসকিলাশানের লম্ফ নিয়ে চুপিচুপি উঠে এল। এসে দেখল মালতী তখনও একা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জিত পরিশ্রান্ত। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে ডাকল, এই মালতী। মালতী কাছে গেলে বলল, ভিতরে যাস নাই।

—না।

—পানি আন।

মালতী ভেবে পেল না, কেন এ-সব! সে তবু জোটনের এমন রুদ্র চোখ মুখ এবং পীরানি পীরানি ভাবটা দেখে কেমন আবিষ্টের মতো এক ঘড়া জল নিয়ে এল। বলল, নে, হাত পাত। পানিতে গিলা খা। জলটা খেয়ে ফেললে বলল, যা ভিতরে। আর ডর নাই। বলেই সে যেমন এসেছিল সহসা তেমনি ছইয়ের ভিতর লম্ফ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে ছইয়ের নিচে বসে এই মুহূর্তে হাজার হাজার অথবা লক্ষ লক্ষ শয়তানের বিরুদ্ধে করতালি বাজাল; সে যে গোনা করল অর্থাৎ মহাপাপ, ভ্রূণ হত্যার মহাপাপ, সে জোরে জোরে হাঁকল, ফকিরসাব কবরে জাইগা আছেন? সে চিৎকার করে বলল, খুদা আমারে বেহেস্তে পাঠাইব না দোযকে পাঠাইব? কনত কি হইবে জবাবডা! বলেই সে লক্ষ লক্ষ সয়তানকে কলা দেখিয়ে কাঁথা-বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। তারপর খুব ফিস-ফিস গলায়, যেন ফকিরসাব কবরে নেই, মাচানে এসে তার পাশে শুয়েছে—জোটন এমনভাবে নালিশ দিচ্ছে—কি জবাবডা দ্যান! কিন্তু ফকিরসাব কিছু বলছেন না। পাশ ফিরে শুলেন। এবার তার যেন বলার ইচ্ছা, এই ভ্রূণ হত্যার জন্য দায়ী কে! আমি, মালতী, আপনি, না জব্বর! কেডা হইব কন। সে দু হাতে বুক চাপড়ে মাচানে পড়ে তার এই মহাপাপের জন্য কাঁদতে থাকল।

(ক্রমশঃ)

নিষ্কৃতি আছে

পাপ

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।

যিনি আসক্তি বিসর্জন করিয়া ও ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুবৎ কর্মফলে তাঁহাকে পাপ লিপ্ত হয় না।—পর পর দুবার এই শ্লোকটি আওড়ালেন পদ্ম মিত্র। আসক্তি বিসর্জন করিয়া. কৈ আর কোন আসক্তি আজ আছে বলে তো মনে হয় না। বিয়ে করেন নি, ছেলেপুলের বালাই নেই। ঈশ্বরে ভক্তি কোনদিনও টলে নি। লোকে বলে কর্মযোগী। এই ষাট বছরেও নিত্য ভোর পাঁচটায় বিছানা ত্যাগ করেন। পুরোনো ব্যায়ামপুষ্ট যন্ত্রটা যাতে তেল-জল ঠিকমত খায় তাই ভোরে উঠেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। হন হন করে মাইল দুয়েক হেঁটে আসেন। ফেরার সময় এই শীতেও ঘাম ঝরতে থাকে। আলোয়ানটা গা থেকে খুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে বগলদাবা করেন। তারপর নিত্য কর্মপদ্ধতির ক্রিয়া-কর্মগুলো একে একে সারেন। বাথরুম, স্নান, চা-জলখাবার সঙ্গে একটা দৈনিক কাগজ। সব সারতে সারতে আটটা বেজে যায়। সাড়ে আটটা থেকে লোক আসতে শুরু করে। তার আগে পুবের বারান্দায় ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে মাখো মাখো আলতা-ভায়োলেট রে তে গা ডুবিয়ে গীতার মনো-মত অধ্যায়গুলি পড়েন। পঞ্চম অধ্যায়টা সবচেয়ে প্রিয়। চমকে উঠলেন পদ্ম মিত্র। গীতাপাঠে তাঁর আসক্তি—আসক্তি তো তিনি বিসর্জন দিতে পারেন নি। ভাল লাগে পড়তে। কেন? তবে কি তিনি সোলেস খোঁজেন? নিশ্চয়ই তাই। নইলে বারবার ফিরে ফিরে কেন গীতার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চান। তাঁহাকে পাপ লিপ্ত হয় না। কাহাকে? তবে কি তিনি পাপকে ভয় করেন?

বারান্দায় সাজানো বাগানে নয়নতারার গাছটা থেকে ফুলগুলো ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাসে তির তির করে কাঁপছে। গাঁদা গাছটা বেঢপ বেড়ে উঠেছে। ওতে আর ফুল ধরবে বলে তো মনে হয় না। জবা গাছটায় একটাও কুঁড়ি ধরেনি। বারান্দার প্লাস্টিকের ছাড়তে শিবু চন্দনার খাঁচাটা ঝুলিয়ে দিয়েছে। পাখীটার বোধহয় শীত লাগে। শিবু পাখীটিকে ভালবাসে। তাই রোজ ওর নিজের খাকী ইউনিফর্ম দিয়ে পাখীর খাঁচাটা রাত্রিবেলা ঢেকে রাখে। পাখীটা ঠুকরে ঠুকরে ওর জামাটা ফুটো করে দিয়েছে। শিবুর কোন রাগ নেই। বললে, হাসে। ওর শরীলে ঠাণ্ডা লাগে বাবু—পাখীটার ওপর শিবুর খুব মায়া।

মায় মানেই তো আসক্তি। ছোকরাটা ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে পাখীটার ব্যাপারে। এরপর যদি কোনদিন পাখীটা মরে যায়—একটা পাতলা ঠাণ্ডায় গোটা গা শিউরে উঠল পদ্ম মিত্রের। মারা তো আমিও যাব। তবে কেন এখনো, এই বয়সে টিউবওয়েলের কনট্রাক্ট পাবার জন্য ছোটা-ছুটি করছি? বিশ বছরের কনট্রাকটরীতে তো কম কামাই নি। তবে কি আমিও আসক্ত? আরো কনট্রাকট, আরো টাকা, আরো কনট্রাকট। ধুর—এসব কি ভাবছি। আজ দশটায় ডি-এম-এর ঘরে মিটিং। জেলার সব কজন বি-ডি-ও আসবে। শীতের মরসুমে ক্যানালে জল থাকে না। চাষীদের ভরসা ডিপ টিউবওয়েল। একটা টিউব-ওয়েল ধরাতে পারলেই নীট হাজার সাতেক ঘরে আসবে। ছটা টিউবওয়েল বসবে এই লটে। মানে কম করেও প্রায় হাজার চল্লিশেক এক ধাক্কাতেই ঘরে তুলে নেওয়া যাবে। তিন চারটে কোম্পানী ঘুর ঘুর করছে। কিন্তু পদ্ম মিত্র ঘুঘু লোক। হাসি পেল —ঘুঘু তো একটা পাখী। মানুষ কি করে পাখী হয়, না কি হতে পারে। শিবু চন্দনাটাকে ভালবাসে। ভালবাসলেই তো আর ও পাখী হয়ে যাচ্ছে না। ওর হাত পাগুলো গুটিয়ে ডানা হয়ে যাবে না। তবে পদ্ম মিত্র কি করে ঘুঘু হবে?

লোকে বলে। পয়লা নম্বরের ঘুঘু পদ্ম মিত্র। পুরোনো পাম্প রং চং করে বিক্রি করাই নাকি তাঁর ব্যবসা। বলুক গে। ওসব কথায় কান দিলে চলে না। আর যদি ঘুঘুই হব তাহলে নানা ফাণ্ডে যখন তখন ৫ জার দু হাজার যে দান করছি—তার হিসেব রাখে কোন শালা।

ছি ছি—মন উত্তেজিত করলে চলবে না। এই বয়সে উত্তেজিত হওয়াটা ভাল দেখায় না। তাছাড়া মাল গছানোর ব্যবসায় উত্তেজনা-টুত্তেজনা যতটা সম্ভব বাদ-ছাদ দেওয়াই দরকার। টুং টাং টুং টাং...ভ্রইং রুমের দেওয়ালে ঘড়িটা নড়ে চড়ে উঠল। এখন সাড়ে আটটা। এখুনি বেরিয়ে পড়া দরকার। যেতে হবে প্রায় ছাব্বিশ মাইল। একবার ফ্যাকটরীটাও পথে ঘুরে যেতে হবে।

পাকা ক নটায় বেরোলেন পদ্ম মিত্র। বাড়ীতে রইল মিত্র কোম্পানীর মালিকের খাস বেয়ারা শিবু আর তার পোষা চন্দনা। শিবুর মাইনেটা কোম্পানী বেয়ার করে। শিবুকে অফিস বা ফ্যাকটরীতে যেতে হয় না কখনো। মাইনে, জুতো জামা সমস্তই কোম্পানীর দারোয়ান এসে বাড়ীতেই দিয়ে যায়। সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন পদ্ম মিত্র।

গড়িয়াহাটার মোড়ে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল কোনদিকে সার? একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন মিত্র সাহেব। গীতা-টীতা ভাল বই, তবে বড় ভাবিয়ে তোলে। এত ভাবনা-চিন্তা ভাল নয়। বেশী ভাবলে, এই বয়সে, মাথার রগটাই ছিঁড়ে যেতে পারে। হাজার ঝামেলা, ফ্যাকটরীর, অফিসের, বিডিওদের, গভর্ণ-মেন্টের, প্লাস লোকাল উটকো ঝামেলাও নেহাৎ কম নয়। এর পর নিজের কাজের ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে যে মাথার ঘায়ে পাগলা হয়ে যেতে হবে। নতুন কাজের ফাইলটা কোলের ওপরেই খোলা পড়ে আছে। এতক্ষণে খেয়াল হল একটি অক্ষরও উনি দেখেন নি। ঘড়ির দিকে তাকালেন—নটা দশ। ফ্যাকটরী হয়ে যেতে গেলে দেরী হয়ে যেতে পারে। ডি. এম-টি অল্পবয়সী—মেজাজ মর্জি একটু সাহেবী ধরনের। টাইম না রাখলে চটে যায়। পথের যা অবস্থা। যখন তখন ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেতে পারে। জেলার সদর অফিসের ঠিকানা বাতলালেন মিত্র সাহেব।

কম করেও চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। এর মধ্যে ফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। অক্ষয়কে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ছেলেটা নিটোল কাজটা করেছে। ওর একটা ইনক্রিমেন্ট ডিউ হল। পাঁচটা কোম্পানী কোটেশন পাঠিয়েছে। খামগুলো আজই খোলা হবে। সব কটা কোম্পানীকেই ডেকে পাঠিয়েছেন ডি, এম। আড়াই লাখ টাকার কাজ।

কাগজে কলমে প্রফিট চল্লিশ হাজার—ফোরটি থাউজেন্ড। কাগজ কলমের বাইরে?

চোখ বন্ধ করে গদির তোয়ালেয় গাটা ছড়িয়ে দিলেন মিত্র সাহেব। আজ পদা মিত্তিরকে লোকে সামনা সামনি বলে পদ্মবাবু, মিত্র সাহেব, মিস্টার মিত্র, কত কি? অথচ পার্টিশনের সময় মা, ভাই, বোন, আর বাবার মৃত দেহটা নিয়ে যখন বরিশাল এক্সপ্রেস থেকে শেয়ালদায় নেমেছিলেন তখন। কেউ চিনতো তাঁকে এই অচেনা অজানা বড় শহরটায়? স্কুল মাস্টার পদ্ম মিত্রকে কেউ সেদিন একটা চাকরী দিয়েছিল? কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কোথা থেকে এলেন? কোথায় উঠবেন? কি করবেন? খাবেন কি। তবে যদি আজ ইধার কা মাল উধার করে দুপয়সা কামান তাতে লোকের এত চোখ টাটায় কেন? আর এই শহরটা তো কোনদিন তাকে আপন করে নেয় নি। বাবার মরা দেহটা যখন পচে গলে মাটিতে থক থক করছিল তখন সৎকার সমিতির লোকেরা এসে মরা কুকুরের মত চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে দিয়েছিল গাড়ীর ভেতর। মা খেতে না পেয়েই এক রকম মারা গেলেন। বোন দুটো খিদের জ্বালা সইতে না পেরে কোথায় যে চলে গেল। ভাইটা গেল পাগল হয়ে। কেউ, কেউ দেখেনি সেদিন। তবে কেন আজ সুযোগ পেয়ে একহাত নেবেন না। এটা তো তাঁর দেশ নয়। দেশ তো পড়ে আছে বেনাপোলের উল্টোপিঠে।

সাব—আ গিয়া। ড্রাইভারের সম্ভ্রম ডাকে চোখ মেলে তাকালেন মিত্র সাহেব। সামনেই ডি, এম-এর কুঠি। ঘড়িতে দেখলেন সাত মিনিট বাকী দশটা বাজতে। তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। ড্রাইভার বাঙালী। তবু হিন্দীতে কথা বলে। মিত্র সাহেব দিশী উচ্চারণে আদেশ দিলেন—ক্যারিয়ারসে মাল উতারো। সাবকো অন্দরমে ভেজ দেনা। এক পেটি স্কচ হুইস্কী ঘাড়ে বয়ে ড্রাইভার ভেতরে চলে গেল। মিনিট দুয়েক বাদে ফিরে এল খালি হাতে। পদ্ম মিত্র তখন গাড়ীর ভেতরে যোগাসনে ধ্যানস্থ। গাড়ী এবার চলল অফিসের দিকে।

সন্ধ্যে হতে আর বাকী নেই বেশী। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশটা ছেয়ে গেছে। দম কেমন বন্ধ হয়ে আসে। একটু জোরে গাড়ীটা ছোটাতে পারলে হাওয়া আসত। কিন্তু ট্রাফিকের যা অবস্থা। সামনেই লাল আলোর সতর্ক পাহারা। একটা থুরথুরে বুড়ো কাশতে কাশতে ট্রাম রাস্তা পার হচ্ছে। পেছনে সার দিয়ে লরীর পাল। কখন শেষ হবে কে জানে?

যাক এখন আর কোন তাড়া নেই। ডি, এম-এর অফিস থেকেই কোনে ফ্যাকটরীতে খবরটা পাঠিয়েছেন। আড়াই লাখ টাকার কাজ। এক মাসের মধ্যে ইনসটল করে চালিয়ে দেখাতে হবে। অক্ষয়ের কাজ চমৎকার। দশো টাকাতেই সব শেষ করেছে। পুরোনো কোটেশনের জায়গায় নতুন কোটেশন চালিয়ে দিয়েছে। খোদ কর্তার অফিস থেকেই অন্য কোম্পানীগুলোর দামটাম সব বেরিয়ে এসেছে। মিত্র কোম্পানীর পুরোনো কোটেশনে রেটটা একটু চড়া ছিল। কম্পিটিশনে টিঁকত না। কিন্তু ফাইন ম্যানেজ করেছে অক্ষয়।

এখন বাকী দায়িত্ব ফ্যাকটরীর। হরিয়ানা যে টিউবওয়েলগুলো রিজেকট করেছে অকেজো বলে সেগুলোকেই ঝালাই ফালাই করে চালিয়ে দিতে হবে। সব ঠিকঠাক মত হলে, চল্লিশ হাজারের ওপর কম করেও আরো বিশ হাজার টেনে তোলা যাবে। অবিশ্যি টাকা তোলা যত সহজ এই টিউবওয়েলে, জল তত সহজে উঠবে না। রদ্দি মাল—ওপরের চেকনাইটা যা শুধু আছে। ভেতরের পার্টস-টার্টসগুলো পুরোনো লোহার দামেও বিকোবে কি না সন্দেহ। হাসি পেল মিত্র সাহেবের। ডি, এম, খুব একচোট ভয় দেখালেন—টিউবওয়েলের কাজ একটু বেতর হলে বিল তো আটকাবেনই। চেষ্টা করবেন যাতে ভবিষ্যতে কোম্পানী ফারদার কোন গভর্ণমেন্ট কনট্রাকট্ না পায়। ফুঃ, তুমি বাবা সেদিনের ছেলে। এখনো নাক টিপলে দুধ গলে। যাও বাড়ী গিয়ে কাঁচা হুইস্কী গিলে ক্লার্কগুলোকে ধমকাও। পদ্ম মিত্র তোমাকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারে। শালা দেশপ্রেম দেখাচ্ছে। চাষীদের দুঃখে চোখে আর জল ধরে না! তবে শালা মাল খাওয়ার এত বায়না কেন? তোমার ক্লার্ক কেন ঘুষ নেয়? ন্যাকা।

ক্যা সাব! হামকো কুছ বোলা—গাড়ী চালাতে চালাতে ড্রাইভার মুখ না ঘুরিয়েই সম্ভ্রম জানাল মিত্র সাহেবকে। একটু লজ্জিত হোলেন পদা মিত্র। আলটপকা মুখ ফসকে শব্দটা বেরিয়ে পড়েছে। না, না, কুছ নেহি, তুম চালাও।

গেট খুলে দুপাশে টেনে সরিয়ে দিল দরোয়ান। সেলাম ঠুকল। গাড়ী মোরাম বিছানো পথে কাঁকর ছিটোতে ছিটোতে পোর্চে এসে দাঁড়াল। আস্তে নেমে এলেন পদা মিত্র। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে চলে গেল গ্যারাজে। শিবুর হাতে ফাইল তুলে দিলেন। তারপর একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলেন একতলা বাংলোবাড়ীর বারান্দায়। সামনেই ড্রইং রুম। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন পদা মিত্র। শিবুটা একটা ইডিয়ট। সকালে ইজিচেয়ারে বসে পড়তে পড়তে গীতাটা ফেলে রেখে উঠে গিয়েছিলেন। সেটা সেইভাবেই পড়ে আছে। তোলেনি। বইটা চেয়ারের হাতলে উল্টে রেখে গিয়েছিলেন। তুলে নিলেন। তুলতেই দুটি লাইন চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠল—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণিসঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।

পাপে তিনি লিপ্ত হন নি। কারণ তাঁর তো কোন আসক্তি নেই। বইটা মুড়ে নিলেন। শিবু তখন এক হাতে ফাইল আর অন্য হাতে পাখীর খাঁচাটা নিয়ে ঘরে ঢুকছে। ছোঁড়াটা পাখীটাকে সত্যিই ভালবাসে। সারাদিন রোদ খাইয়েছে। এবার ওর জামা দিয়ে খাঁচাটা ঢেকে দেবে, যাতে শীত না লাগে। ব্যাটা একেবারে আসক্ত। পাপ ওর হবেই। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির টুকরো চেপে ধরে মাপা পায়ে বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন পদা মিত্র।

—অভিধংসু

মনের কথা

ডগমা ও ডিলিউশন

সীতা-সংবাদ

আবেগগ্রস্ত (অবসেশন) মানুষ তার অবসেশন সম্পর্কে প্রায়শ সজাগ। তাই সে অবসেশন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে অথবা অবসেশনের পক্ষে যুক্তি খোঁজে। তার মনে সর্বদাই দ্বন্দ্ববিরোধ বিদ্যমান। মোহগ্রস্তের (ডিলিউশন) বিশ্বাস বা মোহ নিয়ে তার মনে দ্বন্দ্বের ভাব খুব কমই দেখা যায়। তার ডিলিউশন তার কাছে অভ্রান্ত সত্য। যুক্তিতর্ক দিয়ে যারা তার ভ্রান্তি দূর করবার চেষ্টা করে, তাদের সে শত্রু মনে করে।

ভ্রান্তি বা ডিলিউশন সারাজীবন পোষণ করেও অনেকে সুস্থ বা স্বাভাবিক বলে পরিগণিত হতে পারেন। প্যারানইয়া রোগের প্রধান লক্ষণ ডিলিউশন, তা বলে ডিলিউশন থাকা মানেই প্যারানইয়া জাতীয় রোগাক্রান্ত হওয়া নয়। অন্ধ বিশ্বাস বা ডগমা অনেকের মনেই কমবেশী কায়েমীভাবে বিরাজ করে, ফলে তাদের বাস্তব বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি ব্যাহত হয় বটে কিন্তু কাজকর্মের কোনো অসুবিধা নাও হতে পারে। ডগমা ও ডিলিউশনের শারীরবৃত্ত (ফিজিওলজি) অনেকটা একই রকম, এই ধারণা বোধ হয় একেবারে কল্পনাভিত্তিক নয়। বিকারতত্ত্বের দিক থেকে ডিলিউশন ও ডগমার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, আপাতবিচারে সমাজতাত্ত্বিকের কাছে এ দুয়ের তাৎপর্য প্রায় একই। দল-কেন্দ্রিক, সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক, জাতি-কেন্দ্রিক, মনোবৃত্তির তীব্রতা ও সংকীর্ণতা ডগমার জন্মদাতা। বেশীর ভাগ মানুষই কোনো না কোনো দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে টিঁকে থাকতে পারে না। এই অন্তর্ভুক্তির ফলে অন্য দল বা সম্প্রদায় থেকে ব্যক্তি অল্পাধিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজনীয়তা যত অধিক হবে দলীয় বা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি তত বৃদ্ধি পাবে, অন্য দল ও সম্প্রদায়কে পর মনে হবে। নিজের দল বা গ্রুপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংগীভবনের ফলে অন্য দল বা গ্রুপের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই অবস্থায় নিজের দলের সংগে অভিন্ন একাত্মভাব বজায় রাখার প্রয়োজনে নিজের দল সম্পর্কে অনেক রকমের অলীক উচ্চ ধারণা ব্যক্তির মনে সঞ্চারিত হতে পারে, অন্য দল সম্পর্কে ঘৃণা বিদ্বেষের ভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। ভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত পৃথক সংস্কৃতি-সম্পন্ন দলের বিরুদ্ধে মানুষ সন্দিগ্ধ। মতবাদের ডগমা ক্রমশ ডিলিউশনে পরিণত হয়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। নিজের দল সম্বন্ধে মহিমান্বিত ধারণার আতিশয্য ডিলিউশন অফ গ্রাঞ্জারেরই অনুরূপ। এই ডিলিউশন ক্রমশ নির্যাতনের ডিলিউশনে (অন্য দল আমাদের উচ্ছেদ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে—এই ভয়) গিয়ে দাঁড়ায়। আত্মরক্ষামূলক হিংসাত্মক কার্যকলাপে এরা লিপ্ত হয়ে পড়ে। তবুও এরা প্যারানইয়া রোগাক্রান্ত হয়েছে, একথা বলা হয় না। বলা হয়, ডগমা এদের যুক্তিবিচারহীন করে তুলেছে। সমাজ-বিজ্ঞানীর ভাষায় এরা 'এথনোসেন্ট্রিস্ট' হয়ে গেছে। অন্তর্দলীয় (ইন-গ্রুপ) দরদ ও বহির্দলীয় বিরোধের মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে।

একটি সম্প্রদায় বা দল যখন অন্তর্বিরোধের ফলে দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখন কিন্তু বিভক্ত দল দুটির পারস্পারিক সম্পর্ক অনেক বেশী জটিল হয়ে ওঠে। এদের সংঘর্ষ প্রায়ই নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ী, সংগ্রামে পরিণত হয়। কিছুদিন আগেও যারা গুরু-ভাই বা সাথী ছিল, তাদেরই মনে হয় ঘৃণ্য নিকৃষ্টতম জীব। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত একই আচরণে অভ্যস্ত মানুষগুলোর মধ্যে অহিনকুলের সম্পর্ক দেখা দিয়েছে। এই সেদিন যারা অন্তর্দলীয় দরদের বশবর্তী হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বহির্দলীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারাই এখন পরস্পরের শত্রু। রাতারাতি এই মানসিকতা পরিবর্তনের কারণ কি? সিয়া-সুন্নী, ক্যাথলিক-প্রটেষ্টান্ট, হীনযানী-মহাযানীদের বিরোধের ব্যাখ্যায় তৎকালীন ইতিহাসের অবজেকটিভ কারণগুলো নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা দিয়ে কি আমরা যুযুধানদের, প্রায় সমধর্মী ভ্রাতৃসম ব্যক্তিদের পরস্পরের প্রতি বিশেষ বিরূপ মনোভাবের কারণ বুঝতে পারি? মস্তিষ্কের আলট্রা-প্যারাডকসিকাল পর্বের কল্পনা ছাড়া ভ্রাতৃঘাতী নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ব্যাপকভাবে সন্দেহ অবিশ্বাস ও যুক্তিহীন হিংসার প্রাদুর্ভাবের মৌলিক কারণ যাই হোক না কেন, ব্যক্তি-মানসে সাময়িক অসুস্থতার অস্তিত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্যারানইয়ার সংগে এই অসুস্থতার তুলনা করা চলে।

সমাজ ছেড়ে আবার ব্যক্তিমনের কথায় আসা যাক।

রাজেনবাবুর একমাত্র সন্তান সীতা। সীতাকে নিয়ে তিনি মুস্কিলে পড়েছেন। সীতা সুন্দরী, সীতা সুগায়িকা, সীতা শিক্ষিতা ও নানা গুণান্বিতা। সীতাকে নিয়েই রাজেনবাবুর সংসার। রাজেনবাবু অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, বয়স প্রায় সত্তর। নানা রকম অসুখে ভুগছেন, বুঝেছেন আর বেশীদিন বাঁচবেন না। সীতাকে পাত্রস্থ করে যেতে চান, কিন্তু সীতা কিছুতেই বিয়েতে মত দিচ্ছে না। বয়স পঁয়ত্রিশ পার হতে চলেছে। এরপর কেই বা ওকে বিয়ে করতে চাইবে আর বিয়ে করে নতুন জীবনের সংগে মানিয়ে বা নেবে কি করে? এ ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা জানতে চাইলেন।

—আমার তো মনে হয় না আমি কোনোভাবে আপনার সাহায্যে আসতে পারি। রোগের চিকিৎসা আমার কাজ। সেই সূত্রে হয়ত রোগীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মতামতকে খানিকটা প্রভাবিত করতে পারি। এর বেশি ক্ষমতা আমার নেই।

—মিসেস পাল বলছিলেন তাঁর ছেলেকে আপনি বিবাহ করাতে রাজি করিয়েছিলেন। ছেলেটি এখন পুত্রপরিবার নিয়ে বেশ সুখেই আছে।

—ছেলেটি নিজে থেকে চিকিৎসার জন্যে এসেছিল, চিকিৎসা করতে গিয়ে বুঝেছিল বিবাহ ছাড়া পুরোপুরি সুস্থ হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তার অনিচ্ছা দূর করতে পেরেছিলাম। তাছাড়া রাজেনবাবু, একটা কেসের সংগে অন্য কেসের তুলনা করা চলে না। আপনার মেয়ে যদি মানসিক বিশৃংখলার জন্যে আমার সাহায্য চায়, আর আমি যদি বুঝতে পারি তার মানসিক বিশৃংখলা বিয়ে না হলে যাবে না, তবেই হয়ত তাকে বিয়েতে রাজী করাতে পারি।

ভদ্রলোক হতাশ হলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। আমার উৎসাহের অভাব বুঝেও মেয়ের কথা বলে গেলেন। আমাকে আদ্যোপান্ত শুনতে হল। ....

—ওর বয়স তখন একুশ বাইশ। পোস্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্রী। ওর মার কাছে শুনলাম সীতা এতদিনে একজনকে পছন্দ করেছে। এবার বিয়ের আয়োজন করা যেতে পারে। পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার আমি। কোলকাতা, বর্ধমান, হুগলী নানা জায়গায় পোস্টেড হতাম! সীতাকে নিয়ে ওর মা কোলকাতাতেই থাকতেন। সীতার খবরাখবর রাখা সব সময় আমার পক্ষে সম্ভব হোত্তো না। শুধু ছুটীর দিনে দেখতাম সীতার অনেক বন্ধু, অনেক বান্ধবী। ওর মার কাছে তাদের পরিচয় পেতাম। ওর মা ভাবতেন ওরা সীতার গুণমুগ্ধ। আমার অন্য রকম মনে হোত্তো। ছেলেগুলো সীতার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করত। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর আমি বিয়ের কথা বলেছিলাম। ওর মা আমার কথা কানে তোলেননি। আজকাল অত কাঁচ বয়সে আবার কোনো মেয়ে বিয়ে করে নাকি? সীতাকে তিনি রামচন্দ্রের মত আদর্শ পুরুষের হাতে তুলে দেবেন, ভেবেছিলেন। অবশ্য একটি শর্ত। অগ্নিপরীক্ষা বা বনবাস দেওয়া চলবে না। ছেলেদের নিয়ে এত হৈচৈ, এত মেলামেশা আমার ভাল লাগত না। ওর মা এর মধ্যে দোষের কিছু দেখতেন না। উল্টে আমাকে সন্দেহপ্রবণতার জন্যে বিদ্রূপ করতেন। যাই হোক, প্রণবকে পুরোপুরি অবতার মনে না করলেও, তিনি মেয়ের প্রেমাবেগে বাধার সৃষ্টি করলেন না। সীতার সতীর্থকে তিনি ভাবী জামাতা কল্পনা করে যথোচিত আদর আপ্যায়ন করতে লাগলেন। প্রণবের সংগে সীতা জু, বটানিকস, সিনেমাতে যেত, অনেক রাতে বাড়ী ফিরত। আমি এসব খবর রাখবার অবকাশ পেতাম না, প্রয়োজন বোধও করতাম না। সীতা ও তার মায়ের ওপর সব দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। বিয়ের আয়োজনে চেক কাটা ছাড়া আমার আর বিশেষ কিছু করতে হবে না, জানতাম। কিন্তু চেক কাটতে হল না। আমাকে সীতার চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সীতার মা বিদায় নিলেন। তিন দিনের বেশি ভুগলেন না। চিকিৎসার সুযোগও দিলেন না। মৃত্যুর আগে যা দু-চারটে কথা বললেন, তা থেকে বুঝলাম সীতার ওপর তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন। সীতাকে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। ওকে নার্সিং হোমে রেখে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। প্রণব বোধ হয় বুঝতে পেরেই সরে পড়েছে। যেমন করে হোক মেয়েটার একটা গতি না করলে, আত্মহত্যা ছাড়া তার উপায় থাকবে না।

এক মিনিট চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আবার বলে চললেন।

—সেই মুহূর্তে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল, পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল। সাংসারিক সব ব্যাপারেই আমি অনভিজ্ঞ। লজ্জা ঘৃণায় কয়েকদিন সীতার মুখের দিকে তাকাতে পারিনি।...আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, এবার সংক্ষেপে বলছি। কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল সীতার মা যা সন্দেহ করেছিলেন, সেটা ঠিক নয়। সীতার এক বান্ধবীকে লেখা চিঠি পড়ে জানলাম, প্রণব জোরজবরদস্তি করার ফলে তার সংগে সীতার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সব ছেলেই নাকি ভাব করে ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। অনেক ভাল ভাল কথা, রোমান্টিক আলোচনা শেষ পর্যন্ত দেহক্ষুধা মেটাবার কাজে তারা লাগাতে চায়। প্রণবকে একটু বেশী প্রশ্রয় দেওয়াতে সে অনেক দূর অবধি এগুতে সাহস পেয়েছিল। পুরুষের ওপর সীতা বিশ্বাস হারিয়েছে। সীতার বান্ধবী আমাকে জানাল, আমি যেন সীতার বিয়ে নিয়ে পীড়াপীড়ি না করি। পাঁচ সাত বছর আমি বিয়ে নিয়ে আর চিন্তা করিনি। সীতা পাশ করেছে, কলেজে পড়াবার চাকরী নিয়েছে। আমি অবসর নিয়ে বাড়ী বসে আছি।

—ঐ রকম আঘাতের পর অনেক মেয়েই বিয়ে করে না। বিয়ে করলেও সুখী হয় না। আপনি কেন মেয়ের বিয়ে নিয়ে এত ভাবছেন? পুরুষ সংসর্গ ওরা সহ্য করতে পারে না।

ভদ্রলোক আমার কথায় আশ্বস্ত হলেন না।

একটু চুপ করে থেকে রাজেনবাবু আবার মুখ খুললেন।

—যদি নিশ্চিতভাবে বুঝতাম ওর জীবনে পুরুষের প্রয়োজন নেই, ও পুরুষ সংসর্গ চায় না, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি যে দেখছি পুরুষকে আকৃষ্ট করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। ঐ ঘটনার পর প্রথম পাঁচ সাত বছর কোনো ছেলের সংগে ওকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি, কিন্তু তার পর থেকে এই সাত আট বছরে, অন্তত পাঁচটি ছেলের সংগে ওকে অবাধ মেলামেশা করতে দেখেছি। একটা গানের স্কুলে কাজ নিয়েছে, সেই সূত্রে আমার মনে হয়, অনেক অবাঞ্ছিত ছেলে ওর বন্ধু হয়েছে। এক একটি ছেলে বন্ধু ওর জীবনে আসে, আর আমি আশা করতে থাকি এইবার বুঝি ছেলেটির তরফ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসবে। খোঁজ খবর নিয়ে দেখি, ছেলেটি বিবাহিত অথবা যাকে বলে একেবারে 'ক্রনিক কনফার্মড ব্যাচেলর'। হতাশায় ভেঙে পড়ি। কিছুদিন পরে রঙ্গমঞ্চে নতুন পুরুষের আবির্ভাব হয়, পুরনোটি তিরোহিত প্রস্থান করে। আবার আশা জাগে, আবার নিরাশ হই। সোজাসুজি এসব নিয়ে ওর সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে আমার লজ্জা হয়। যে ছেলের সঙ্গে যখন ভাব হয়, তাকে নিয়ে ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে। সেই জু, বটানিকস, সিনেমা, স্টিমার পার্টি। বিবাহিত ছেলেদের প্রেজেন্ট ও অতি সহজে গ্রহণ করে। আমার কাছ থেকে উপহারদাতার পরিচয় গোপন করে না। কিছুদিন পরেই তার নাম ও মুখে আনে না। কি ঘটে গেল, আমি জানতে পারি না, বুঝতেও পারি না। বিবাহ করা ওর পক্ষে বিশেষ দরকার। অন্তত আমি সেই রকম মনে করি।

মেয়েটি নিশ্চয়ই অসুস্থ। অসুস্থতা তাকে উন্মার্গগামিনী করেছে। এ অস্বাভাবিক আচরণের মূলে হয়তো প্রণবের ব্যবহার। কিন্তু আমি রাজেনবাবুকে সাহায্য করতে পারব না। যে নিজের অসুস্থতা বজায় রাখতে চায়, বা নিজে বুঝতে পারে না যে সে অসুস্থ, তার রোগ সারাবার কোনো উপায় নেই। চিকিৎসার জন্যে এলেও যে আমি তাকে সুস্থ করে তুলতে পারব, তাও মনে হয় না। অসুস্থতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সে স্বভাবে পরিণত করেছে। এ স্বভাব বদলানো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের সাধ্যের বাইরে।

—আমি আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারছি না, রাজেনবাবু। ভাল করে ব্যাপারটা বুঝতেও পারিনি। ওর কোনো অন্তরঙ্গ বান্ধবীর সাহায্য পেলে হয়তো ব্যাপারটা কিছুটা বোঝা যেত। কিন্তু তাহলেও ওকে বদলানো যেত কিনা সন্দেহ।

রাজেনবাবু যেন অন্ধকারের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো দেখতে পেলেন।

—বাসবীকে বলে দেখতে পারি। যে বান্ধবীকে প্রণবের ব্যাপারটা চিঠি লিখে জানিয়েছিল, তার নামই বাসবী। খুবই অন্তরঙ্গ ছিল একসময়। এখন বোধ হয় তত ভাব নেই। বছরখানেক আমাদের বাড়ীতে আসে না। বাসবীকে বলব কি আপনার সংগে দেখা করতে? খুবই ইনটেলিজেন্ট মেয়ে।

রাজী হলাম রাজেনবাবুর প্রস্তাবে। বাসবী এলেন। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। স্কুলে চাকরী করেন। স্বামী ডাক্তার। স্বামীকে নিয়েই বাসবী আমার সংগে দেখা করলেন। দুজনেই সীতার সব ইতিহাস জানেন। দুজনেই সীতাকে ভালবাসেন, তার মঙ্গলাকাংক্ষী। বাসবীর স্বামীই কথাবার্তা চালালেন। বাসবী মধ্যে মধ্যে দু-একটি কথা বলে স্বামীর ভুলত্রুটিগুলো শুধরে দিলেন।

—এ আপনারই কেস। কিন্তু খোলাখুলি বলা চলে। সীতা পুরোপুরি নর্মাল। ওর ভাল করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। চিকিৎসার জন্যে আসা তো দূরের কথা, পরামর্শের জন্যেও সে কোনো লোকের

কাছে যাবে না। একমাত্র বাসবীর কাছে নিজের সব কথা খুলে বলত, তাও আজকাল বলে না। আমাকে নিয়েই বাসবীর সংগে ঝগড়া হয়ে গেছে। এখন বাসবীকে বিশ্বাস করে না, আমাকে শত্রু মনে করে। আমাদের অপরাধ আমরা ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলাম। আমার ছোট ভাইয়ের এক বন্ধু আমাদের বাড়ীতে ওর চেহারা দেখে, গান শুনে মুগ্ধ হয়। বছর দুয়েক আগের কথা। মেয়েটিকে আপনি দেখেননি? সত্যিই চার্মিং। দেখলে মনে হবে না সীতার বয়স পঁচিশের থেকে বেশী। শান্তনু, আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু, কয়েক বছর বিলেত থেকে ফিরেছে। প্রাকটিস ভাল জমিয়েছে, বাপের পয়সাও আছে। শান্তনু ভারী ভালো ছেলে, যেমন স্মার্ট তেমনি এলিগ্যাণ্ট। বাসবী শান্তনুর হয়ে নেগোশিয়েট করতে রাজী হয়নি। সীতাকে ও ভালবাসে, কিন্তু চেনাশোনা কারুর সংগে সীতার বিয়ে হোক, এ ও চায় না। কারণ কি? কারণ সীতা মরবিড, সীতা এ্যাবনরম্যাল। আপনি আরো ভাল বুঝবেন। আমাদের কাছে ও একটা হেঁয়ালী। ছেলেরা প্রেম নিবেদন করলে, সব মেয়েই বোধ হয় খুসী হয়। কিন্তু সীতার খুসী হওয়াটা একটু উৎকট ধরণের। কোনো ছেলে ওর দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, পুরুষের আসঙ্গ লিপ্সা জাগাতে পেরেছে জানলে ও খুসী হয় কিন্তু কেউ ওর রূপে গুণে আকৃষ্ট হয়ে ওকে রোমান্টিক প্রেম নিবেদন করলে, ওকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখলে, কিম্বা ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, ও একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। এক কবি ওর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ওকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিল। সীতা আমাদের সামনেই তাকে অপমানিত করে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল। দু-চারটে ছোকরা অধ্যাপক অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াতে, তাদের সংগে ওর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অবিবাহিত ছেলেদের সংগে মিশতে চায় না। তারা কবিতা লেখে অথবা বিয়ের কথা তোলে। তাই ওর যা কিছু মেলামেশা অন্তরঙ্গতা দেহলোলুপ বিবাহিত পুরুষের সংগে। আপনি হয়তো ভাবছেন, সীতা বুঝি একটা কামার্ত পলিঅ্যানড্রাস টাইপের ঘৃণ্য স্বভাবের মেয়ে। না। মোটেই না। তাহলে বাসবী বা আমি ওকে ভালবাসা তো দূরের কথা, ওর সংগে কোনো সম্পর্কই রাখতাম না। পুরুষকে ও একটা নির্দিষ্ট সীমা অবধি এগুতে দেয়। এমনকি সেই নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করার জন্যে তাকে প্ররোচিতও করে। উৎসাহ দেয়। তারপর পুরুষের মধ্যে যখন পশুটা পুরোপুরি জেগে ওঠে, সীতার দেহটা এখুনি আয়ত্তে আসবে মনে করে যখন সে হাত বাড়ায়, তখন সীতার কাছ থেকে আসে শীতল রূঢ় প্রত্যাখ্যান। অচিন্তনীয় সীতার সেই মূর্তি। রতিদেবী সহসা মাতঙ্গিনী হয়ে যান। সেই নায়কের সেই দিন থেকে ঘটে অন্তর্ধান। দু-এক মাসের মধ্যে নতুন নায়কের আবির্ভাব। এই রকম এক প্রত্যাখ্যাত নায়কের নিজের মুখ থেকে ব্যাপারটা না শুনলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না এসব কথা, আর আপনাকে বলতেও সাহস পেতাম না। সীতা তাপসীকে নিজের মনের কথা অনেকদিন শুনিয়েছে। সেই সব শুনলে হয়তো আপনি ওর এই বিসদৃশ আচরণের, এই এ্যাবনরমালিটির ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন। সত্যিই অদ্ভুত নয় কি? ও বলে, সব পুরুষই কামার্ত পশু। সেই পশুটাকে যারা ছদ্মবেশে ঢেকে রাখে, তাদের ও অনুকম্পা করতে পারে, ভালবাসতে পারে না। তারা মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। যারা সোজাসুজি তাদের কামনা জানায় তাদের ও পছন্দ করে। তারা অসৎ নয়, ছদ্মবেশী নয়। তারা নাকি পুরুষ জাতির ট্রু রিপ্রেজেন্টেটিভ! বাসবীর প্রশ্নের উত্তরে সীতা সোজাসুজি স্বীকার করেছে যে সে পুরুষকে প্ররোচিত করে, উৎসাহিত করে। সে চায় আসল প্রস্তাবটা তাড়াতাড়ি করুক পুরুষ। যে পুরুষ শয্যাসঙ্গিনী হবার প্রস্তাব করতে দেরী করে, তাকে সে অবহেলায় পরিত্যাগ করে। যখন প্রেমিক উৎসাহিত হয়ে প্রস্তাব করে, তখন একদিকে জয়ের গর্বে ও গর্বিত, অন্যদিকে পুরুষ জাতির প্রতি ঘৃণায় সংকুচিত বিক্ষিপ্ত। এতদিন ধরে যাকে ভালবেসে নানাভাবে প্রেম জানিয়ে এসেছে, যার মৃদু স্পর্শে ওর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছে, তার দেহগন্ধে তখন ওর নাকি বমি উঠে আসে।

ডাক্তার এই বলে খানকয়েক চিঠি আমার হাতে দিলেন। সেই প্রত্যাখ্যাত নায়ককে লেখা সীতার প্রেমপত্র।

—এই প্রেমপত্রগুলো পড়ে দেখুন। সীতার প্রত্যাখ্যান আর নিমন্ত্রণের মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই কোনো সাইকোলজিক্যাল কারণ খুঁজে পাবেন। আমরা তো শুধু এ্যাবনরম্যাল বলেই খালাস। কেন এ্যাবনরম্যাল? কি জন্যে এ্যাবনরম্যাল? সেটা আপনিই বুঝবেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমি কেন শত্রু হলাম? শান্তনুর হয়ে বিয়ের প্রপোজালটা যখন দিতে যাই, তখন কলেজের গভর্ণিং বডির এক বিবাহিত সভ্যকে নিয়ে ও মেতে উঠেছে। তার গাড়ীতে তখন ওকে নানা জায়গায় দেখা যেত। আমার অপরাধ, আমি এই ব্যাপারটা বন্ধ করতে বলেছিলাম, অন্ততঃ লোক-জানাজানি যাতে না হয় এই অনুরোধ জানিয়েছিলাম। বাসবীর কাছে শুনেছিলাম কলেজে এ নিয়ে কথা উঠেছে। আর সবিনয়ে শান্তনুর প্রস্তাবটা পেশ করে তার হয়ে কিঞ্চিৎ ওকালতি করেছিলাম। ডাক্তার হয়ে ওকালতি করাটা আহাম্মুকির কাজ হয়েছিল, পরে বুঝলাম। এই সব ক্ষেত্রে যেটা স্বাভাবিক আমি সেই মতই চলেছিলাম। সীতার মন ভেজাবার জন্যে শান্তনুর রূপ গুণের সংগে ওর রূপ গুণেরও প্রশংসা করে ফেলেছিলাম।

সীতা মনে করল আমি ওর প্রেমে ঘাগড়া দিচ্ছি। কেননা ওর প্রতি আমি আকৃষ্ট। শান্তনুর কথাটথা সব বাজে। আসলে শান্তনুর নাম দিয়ে আমার প্রেমের অভিলাষই নাকি ওকে আমি জানিয়েছি। বাসবী আর একটু বোকা মেয়ে হলে আমাদের দাম্পত্যজীবন বিষময় হয়ে উঠত। এখন আমরা ওর পরম শত্রু।

প্রেমপত্রগুলো পড়লাম। কাব্যধর্মী পত্র। যে মেয়ে অন্যের কাব্য করাটা অপছন্দ করে, সে তার নায়ককে দিব্যি কাব্য করে চিঠি লিখেছে। চিঠি পড়ে বোঝা যায় ওরা খানিক দূর এগিয়েছে। মেয়েটি 'দাস ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার' বলে পুরুষকে আরো অগ্রসর হবার জন্যে বেন পরোক্ষ সাজেশান দিচ্ছে।

বাসবী আর তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম সীতা সত্যিই অসুস্থ। আমি যতটা ভেবেছিলাম, তার থেকেও বেশী অসুস্থ। অথচ এ-অসুস্থতা সমাজের অধিকাংশ লোক ধরতে পারবে না। পুরুষের প্রতি আকর্ষণ ও বিদ্বেষের মূল কারণ সীতার কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে যাবে। তার বাবা, তার বান্ধবী জানবেন সে এ্যাবনর্মাল। কিছুই করবার নেই। সীতা ডিলিউশনে ভুগছে। ডিলিউশন অফ গ্র্যাণ্ডার ও ডিলিউশন অফ পারসিকিউশন একই সঙ্গে তাকে প্রভাবিত করছে।

—মনোবিদ

ভোরাই ॥ সুরজিৎ দাশগুপ্ত

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ধরে
মেঘেরা ফেলেছে তাঁবু গগনের
সমস্ত বিশাল ভরে।

—

বুক কাঁপে ভয়ে সারাক্ষণ
তুমুল বৃষ্টিতে চলে সমুদ্রের
লাগাতর আক্রমণ।

যেন খ্যাপা মহিষেরা আসে
দলে, দলে বিদ্যুতের হল্কা ছোটে
তাদের গর্জিত শ্বাসে।

যখন সূর্যের চিতা বাঘ
নিঃশব্দে পেছন থেকে ক্ষিপ্র ওঠে,
ভোরে লাগে রক্ত-দাগ।
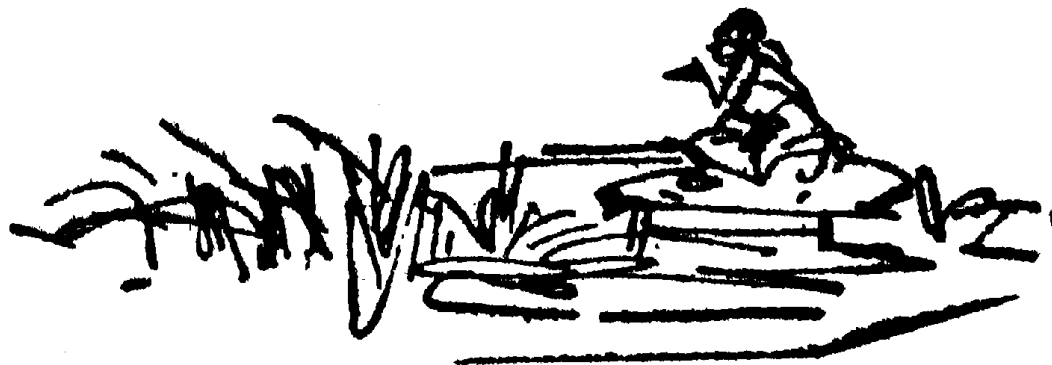
হঠাৎ হঠাৎ সপাট ॥

অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ হঠাৎ সপাট হাওয়ায়
আমার কপাট ভেঙে যায়
এবং আমার ঘরের মধ্যেই
ক্রমশ আমূল বদলে যাই আমি।
নিজের রুজি ভুলে
সেই দিনগুলোকে খুঁজি
যে দিনগুলো সেজের খেয়ালী আলোর মত
অসংখ্য ছবি সৃষ্টি করেছিল
আমাদের মনের দেয়ালে।

আমার ঘরের মধ্যেই
আমার পৃথিবী ধরে যায় তখন
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের খোলা দ্বারপথে
কিছু আত্মিক যোগ ঘটে
সেই অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সঙ্গে;
যে আমার মৃতদেহ আজ পর্যন্ত
সৎকার না করে অবিকৃত রেখেছে।

হঠাৎ হঠাৎ সপাট হাওয়ায়
আমার কপাট ভেঙে গেলে
আমার ঘরে প্রবেশ করে
পুরোনো দিনগুলো
আমায় মালা পরিয়ে দেয়;
আমায় ডাকে আর ডাকে...।
অবৈধ প্রেমের, নিষিদ্ধ পল্লীর
সুরবাহার, ঘুঙুর-ঘাগরার ঘূর্ণনে
চকিতে পৃথিবীর আর এক গোলার্ধে
আমি ঘূর্ণাপনদ্ধ হয়ে পড়ি
আমার সঙ্গে তার সঙ্গে।

সুদূরতমাসু ॥

পরমেশ মজুমদার

এর চেয়ে সাপের মুখেও
চুমু খাওয়া ঢের জানি সোজা :
সঙ্গে নেই সম্মানের বোঝা,
অঙ্গেও ঘৃণিত পরিধেয়।

হয়তো-বা তুচ্ছ বুঝি আরো :
ক্ষোভে-দুঃখে অন্ধ-রাগে দূরে
আমাকেও মারো, ছুঁড়ে মারো,—
যতদূরে ছুঁড়তে তুমি পারো!

অভ্যাসে সমস্ত নাকি বশ :
বজ্রপাতও তুচ্ছ মনে হয়।
তবু মিথ্যে দুর্নামের ভয়
ডেকে আনে বৃষ্টি-বন্যা-ধস।

তাই বুঝি দু'চোখে তোমার
নিঃশব্দে তর্জনী তুলে রাখো?
যেন দীর্ঘ জীর্ণ সেই সাঁকো,
সাধ্য নেই এগিয়ে যাবার!

সাধ্য নেই? আছে, তা-ও আছে :
ইচ্ছে হলে ভয়ংকর চাপ
ফুৎকারে উড়িয়ে, সেই সাপ
টেনে আনতে পারি খুব কাছে!

কিন্তু সেই আদি রমণীয়
ঘৃণায় বিষাক্ত চুম্বনের
মধ্যে যে তুমিও পাবে টের
ধমক মানে না ধমনীতে।।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলেছি তো, আমার জন্মদিন এবারেই প্রথম উদযাপিত হলো। ১২ আগস্ট তারিখে 'চিত্রবাণী'ও রঙমহল 'অহীন্দ্র জয়ন্তী' উদযাপিত করলে রংমহল মঞ্চে। সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। চিত্রবাণী পত্রিকা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনোজ বসু, তারাশঙ্কর, দেবকী বসু, শচীন সেনগুপ্ত, হরেন মুখার্জি ছাড়াও আরো অনেকে। এই অনুষ্ঠানে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন বীরেন ভদ্র, ফণী বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমার অনেক সহশিল্পী এবং সহযোগী বন্ধু-বান্ধবের হাত থেকে ফুলের মালা নিতে সেদিন সত্যি আমি অভিভূত হয়েছিলাম। সেদিন সত্যি মনে হয়েছিল, আমি যদি কিছু পেয়ে থাকি, তবে তা হলো বন্ধুজনের ভালোবাসা। আর এইটাই তো জীবনের পরম পাওয়া।

সেদিনের অনুষ্ঠানে অতীনলালের নৃত্যনাট্য 'কুমার সম্ভবম' পরিবেশিত হয়েছিল।

জীবনে অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি, কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল স্বতন্ত্র। যেখানে উপলক্ষ্য আমি।

কিন্তু এতো চাইনি। অথচ এসব কি আরম্ভ হলো আমাকে নিয়ে।

কদিন যেতে না যেতে আবার এমনি আর এক অনুষ্ঠানে আমাকে সম্বর্ধনা জানান হয়। অনুষ্ঠানটি ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের। কংগ্রেস তাঁদের 'গুণীজন সম্বর্ধনা' পর্যায়ের অনুষ্ঠানে আমাকে সম্বর্ধনা জানায়। চৌরঙ্গীতে কংগ্রেসের মণ্ডপে অজস্রের ভিড়ে আমাকে সম্বর্ধনা জানান হয়।

জানি না কেন, আমি যেন বিব্রত বোধ করতাম এই জাতীয় অনুষ্ঠানে, যেখানে কেন্দ্র-বিন্দুতে আমার নাম।

দিন কাটছে প্রত্যহের নিয়মে। এর মধ্যে আবার বাইরে যাবার ভাবনা আছে। ভাবছি, অকটোবরে যাবো। কলকাতার বাইরে।

কিন্তু অকটোবর আসতে তখনো দেরী।

ছেলের খবরের জন্যে মাঝে মাঝে ব্যস্ত হতাম। খবর পেলাম, সে সুইজারল্যান্ড থেকে লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক রওনা হয়েছে। দূর থেকেই শুভ কামনা করলাম। সে যেন নির্বিঘ্নে পৌঁছয় নিউইয়র্ক।

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী চলচ্চিত্র শিল্পের নির্বাক যুগের একজন। চলচ্চিত্র শিল্পে এই মানুষটির অবদান কম নয়। যাঁকে আমরা 'গাঙ্গুলী মহাশয়' বলতাম। ইনি মারা গেলেন ১২ সেপ্টেম্বর। তার কিছুদিন বাদেই অক্টোবরের প্রথম দিকে বিখ্যাত কৌতুক-শিল্পী আশু বোসও লোকান্তর গমন করলেন। আশু বোস চরিত্রগুণে সবারই প্রিয় ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

এক এক করে কতো জন চলে যাচ্ছে আমার সামনে থেকে। অথচ আমি আছি—হয়তো এখনো অনেকদিন থাকতে হবে। যে কদিনের মেয়াদ নিয়ে এসেছি সে কদিন থাকতে হবে পৃথিবীতে। এইটাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

আবার বাইরে যাবার দিন এসে গেল। অক্টোবরের ৯ তারিখে কলকাতা ছাড়লাম। এবারে যাবো ভুপালের দিকে।

পুজোর আগেই চলেছি কলকাতা ছেড়ে। বোম্বে মেলযোগে আমরা রওনা হয়েছি।

যাত্রাপথে একটি বিচিত্র চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছিলাম মোগলসরাই স্টেশনে। চরিত্রটি একটি বিবাহিতা তরুণীর। জানি না সে কেমন করে আমার সন্ধান পেয়েছে। এসেই জানালো, সে কলকাতায় সংগীত-নাটক-অকাদামিতে ভর্তি হতে চায়। এখানে সে থাকবে না।

মেয়েটিকে বললাম, তুমি এমন চিন্তা করছো কেন? বরং এখানে থেকেই চর্চা করো। জীবনে নতুন ঘর বেঁধেছো, এখন কি এসব শোভা পায়।

তবুও মেয়েটি শুনতে চায় না। শেষ পর্যন্ত আমি বলতে বাধ্য হলাম, এসব চিন্তা ছাড়ো।

জানিনা মেয়েটি আমার সম্পর্কে কী ধারণা করেছিল।

ভুপালের পথে ইটার্সী এসে পৌঁছলাম। একটু দেরীতেই পৌঁছেছে আমাদের ট্রেন। ভুপালগামী ট্রেন স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল।

ভুপালে এসে ঘটনাচক্রে একটা বাজে হোটেলে এসে উঠতে হলো। গাইড জানালো, সার্কিট হাউসে জায়গা নেই। সরকারী লোকদের নিয়ে সার্কিট হাউস পূর্ণ। সুতরাং এই বাজে হোটেলই ভরসা।

যাই হোক, আপাততঃ এখানে থেকেই ভুপাল দেখতে বাধ্য হলাম। একটা গাড়ী ঠিক করলাম শহর পরিক্রমার জন্যে। শহর, শহরতলী, পাহাড়ী পরিবেশ, হ্রদ—সব কিছুর ওপর দৃষ্টিপাত করা গেল এই পর্যন্ত। আরো কিছু সময় ঘোরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হলো না। আকাশে তখন জমাট-বাঁধা মেঘ।

পরদিন ১২ অক্টোবর ট্যাক্সীযোগে বিখ্যাত সাঁচী স্তূপ দেখতে এলাম। যে সাঁচী স্তূপের প্রধান তোরণটি স্থাপত্য শিল্পের একটি দৃষ্টান্ত—সেটি এবারে প্রত্যক্ষ করলাম। বিরাট স্তূপটির সঙ্গে অতীতের মুখর ইতিহাস জড়িয়ে আছে। চারদিকে চারটি প্রবেশ-পথ—স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। নিবিষ্ট মনে দেখলাম। ভালো লাগলো।

ভোজ রাজাদের প্রাসাদ নেই, আছে তার ধ্বংসাবশেষ। সেই ধ্বংস চিহ্ন থেকে অতীতকে খুঁজে বার কর, থাক, না থাক—আজ একথা ঠিকই, এসব দেখেই মনে হয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক সম্পদই আছে।

কিন্তু সাঁচীর মিছিল আমাকে সত্যিই বিস্মিত করলো। এই লৌকিক শোভাযাত্রা দেখবার মতো।

ভুপাল থেকে উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী দেখা আমার অনেক দিনের বাসনা।

উজ্জয়িনী নামের মধ্যে একটা ধ্রুপদী সুর লুকিয়ে আছে। জানি না এই নগরীর নামকরণ কে করেছিল, তবে এটা ঠিকই যে, এমন নামকরণ যার, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কবি-মনের অস্তিত্ব ছিল।

কাব্যে-গাথায় পড়েছি শিপ্রা নদীতটে উজ্জয়িনীর কথা, পড়েছি সেই মহাকাল মন্দিরের কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কটি লাইন তো মনের মধ্যে অপূর্ব এক মূর্ছনা জাগাতো। সেই শিপ্রা নদীতটে মহাকাল মন্দিরের মাঝে সে শঙ্খ-ঘন্টা বাজতো—সেই সুর অহরহ আমার মনের মধ্যে বেজেছে।

আজ চোখে দেখলাম শিপ্রানদীর তীরে উজ্জয়িনীর সেই মহাকাল মন্দির। শুনলাম—আরতির শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনি। কিন্তু কোথায় সেই স্বপ্নের প্রেয়সী 'মালবিকা'!

উজ্জয়িনীর আরো কতো মন্দির, আরো কতো দেবতা—সর্বত্রই একটা ধ্রুপদী পরিবেশ। সর্বত্রই একটা প্রাচীনত্বের ছাপ। যতো দেখি, ততোই বিস্ময় জাগে। মনে হয়, এই তো আমাদের ভারতবর্ষ, এই তো আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পুণ্য পীঠ।

দেখলাম, ঐতিহাসিক গোয়ালিয়র, প্রাসাদ, যেখানে বিচিত্রভাবে বাঁক নিয়েছে শিপ্রা। দেখলাম, অক্ষয় বট, ভোজ গুম্ফা, দেখলাম কালিকা মন্দির—আর অতীতের আরো কতো স্বাক্ষর। উজ্জয়িনীর টাঙ্গাগুলোর মধ্যেও কতো বৈচিত্র্য। মনে হয় যেন পুরনো যুগের রথের কোন সংস্করণ।

দিনের সঙ্গে কতো বদলে গেছে। নতুন করে শহর আর জনপদের পত্তন হয়েছে এই সব জায়গায়। ভূপাল তো এখন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। কিন্তু প্রাচীন ইন্দোর শহর—যেখানকার নগর-জীবনের ধারাটি প্রাচীন হলেও সুন্দর। রক্ষণশীলতার মধ্যেও প্রগতিশীলতা থাকে—ইন্দোর না দেখলে সে কথা বিশ্বাস করা যায় না।

ইন্দোর থেকে ধর, আবার ধর থেকে মাণ্ডু—সর্বত্রই গেলাম দুটি খোলা চোখ নিয়ে। মনের দরজাও খুলে রেখেছি—যদি কিছু পাই মনের মধ্যে ভরে রাখবো।

পথে যখন আসি, তখন কাঙালের মন নিয়ে আসি। যা কিছু পাই, মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখি। ভাবি, এই তো আমার ভবিষ্যতের পাথেয়। এই নিয়েই আমার দিন কাটবে।

কতোদিন হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো দু' চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই, শিপ্রা নদীতটে ঘাটে ঘাটে পদচারণা করছি আমি। সই রাম ঘাট, গদা ঘাট, ভর্তৃ ঘাট—সেই পাথরের সোপান বেয়ে শিপ্রার জল স্পর্শ করা।

যেমন নামের মাধুর্য উজ্জয়িনীর, তেমনি শিপ্রা নামের মধ্যে একটি ধ্রুপদী মধুরতা লুকিয়ে আছে।

শিপ্রা আমার কাছে স্বপ্নের নদী।

নানা দিক থেকে ধর এবং মাণ্ডু আমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। ইতিহাসের নানা স্মৃতি এখানে ছড়িয়ে আছে। আলমগীর গেটের কাছে দাঁড়ালে মনে হতো কালের সঙ্গে ইতিহাসের ধারা কতো বদলে গেছে। পাহাড় আর নিবিড় অরণ্য স্পর্শে জায়গাটির প্রাকৃতিক শোভাও অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু জাহাজ মহল, আর দুর্গ, কিংবা আলমগীর গেট—যাই দেখি না সব দেখার স্মৃতি মন থেকে হারিয়ে যায়, যখন শুনি রূপমতী আর রাজবাহাদুরের কথা। যে প্রেমের বিয়োগান্তক কাহিনী আজও শ্রোতার মনকে অভিভূত করে।

ইতিহাসের আরো কতো কাহিনী-স্মৃতির স্বাক্ষর এখানে ছড়িয়ে আছে। রাণা কুম্ভ, সম্রাট আকবর, হোসেন শা—এই সব ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনের কতো কথা এখানকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

কদিনের ভ্রমণে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। শরীরটা তেমন ভালো চলছিল না। বেশ বুঝতে পারি, পথের এই ধকল আর দেহ সহ্য করতে পারে না। শুধু মনের জোরেই চলি।

এই দুর্বল শরীরেই উজ্জয়িনী ত্যাগ করলাম ১৭ অক্টোবর।

চলতি পথে ট্রেনে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। সুধীরা আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বললাম, চিন্তা কোরো না। দুদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

উজ্জয়িনী থেকে এবারে চলেছি বম্বের দিকে। বম্বেতে কদিন বিশ্রাম নেবো ভেবেছি।

বম্বে সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছেই অজিত বিশ্বাসকে পেলাম। অজিত একসময় আমার ছোট ভাই পঞ্চুর সহকর্মী ছিল। এয়ার লাইনসের হোটেলে যাবার সময় সে আমাদের সঙ্গেই ছিল।

শরীর আরো দুর্বল মনে হলো। সেই সঙ্গে মনটাও। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দিলেন। এদিকে সুধীরাও বলতে লাগলো, শরীর খারাপ হয়েছে, দুদিনেই সেরে যাবে। মনের জোর হারিও না।

তবুও যেন মনের জোর ফিরে পাই না। মনে হয়, এবারে সত্যিই হয়তো অশক্ত হয়ে পড়বো।

এই অবস্থার মধ্যেও একেবারে চুপচাপ হয়ে থাকতে পারিনি। নানা কাজের চিন্তাও ছিল মনের মধ্যে। এসেছি আকাদমীর কাজে। যেসব ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পাবে, তাদের ইন্টারভিউ নেওয়াই হলো কাজ। আমি ছাড়া অন্ধ্রের অভিনেতা বন্দো কনক লিঙ্গেশ্বরও এসেছিলেন।

ডাক্তারের নির্দেশ, তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যাওয়ার। তবুও কলকাতায় যাওয়ার আগে একবার মাথিরা যেতে হলো। রেলপথটি পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথে উঠেছে।

পাহাড়ের ওপর মনোরম পরিবেশ বেশ কয়েকটি বাংলো কিছু বাড়ি-ঘর। আমরা উঠেছি রাগবী হোটেলে। এখানে তিন চার দিন থাকবো। যদি কিছু দেখার থাকে, দেখবো। তারপর বম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবো এই ইচ্ছে।

এখানে যদি সুন্দর কিছু দেখে থাকি, তবে তা হলো ক্যাথিড্রাল হিল। দেখতে বড়ো সুন্দর লাগে। ঠিক যেন একটি ক্যাথিড্রাল।...... হ্রদটিও সুন্দর। এখান থেকে জল সরবরাহ করা হয়।

তবে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার মুহূর্তটা অবিস্মরণীয়। সূর্যের অস্ত যাবার সঙ্গে চারদিকের দৃশ্যপট এক অপরূপ শোভা নেয়—যা শুধু দুটি চোখকে নয়, মনকেও ভরিয়ে দেয়।

দুর্বল-অশক্ত শরীর নিয়েও মনের এ দাবীটুকু আমি অপূর্ণ রাখিনি।

আবার ফিরে এসেছি বম্বের তাজমহল হোটেলে। এখনো কদিন থাকতে হবে। বিশ্ব থিয়েটার সম্মেলনে যোগ দিতে হবে আমাকে। শরীর দুর্বল হলেও যোগ দিলাম। বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ বিনিময় হলো।

এরই মধ্যে একদিন বলবন্ত রাও গার্গী, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধ এসেছিল আমাকে কিছু বক্তব্য রাখবার জন্যে। আমার বক্তব্যও আমি সেমিনারে পাঠ করেছিলাম।

এই সেমিনারে ভারতের অনেক বিদগ্ধজনের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। এবং কদিন বেশ ভালোই কেটেছিল। যদিও শরীর আমার তেমন ভালো ছিল না।

নভেম্বরের প্রথম দিনে আমরা বম্বে থেকে নাগপুরের পথ ধরে কলকাতার পথে রওনা হলাম।

কলকাতায় ফিরে আগে যেমন সিনেমা, থিয়েটারের চিন্তাটা বড়ো হয়ে উঠতো, এখন আর তা নয়। এখন চিন্তা আকাদমি নিয়ে।

জীবনের পটভূমিকা কতো বদলে গেছে। ছিলাম অভিনেতা, হলাম আচার্য। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে আসা।

তবুও মাঝে মাঝে অভিনয় যে করিনি, তা নয়। কিছু ছবির কাজ বাকি ছিল, সেগুলো করতে হচ্ছে। এগুলো শেষ হলে একেবারে ছুটি।

আকাদমি তো আছেই। তারপর আর একটি কাজ সভা-সমিতি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই কলকাতায় এলে তাঁকে পরিষদ ভবনের প্রাঙ্গণে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তাতেও যোগ দিলাম। প্রজাতান্ত্রিক চীনের বিপ্লবী নায়ককে দেখলাম।

আবার এর কদিন বাদেই চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা সভাতেও যেতে হলো।

আমার জীবনের পটভূমিকা বিস্তৃত কিনা জানিনা, তবে এইটুকু বলতে পারি—জীবনে আমি একটা বিরাট পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছি। যেখানে, যে পৃথিবীতে আমি একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নই।

দেখতে দেখতে কতো বছর পেরিয়ে এলাম। সেই জন্মের দিন থেকে আজ—দীর্ঘকাল জীবনের পথ-পরিক্রমা করেছি। কী পেয়েছি, হিসেব করে দেখিনি, কী পাইনি, তা-ও জানি না। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব তো একদিনেই মিটে যাবে—জীবনের শেষের দিনটিতে। কিন্তু তার আগে তো ঋণ মুক্ত হবার চিন্তা। পৃথিবীর কাছে অনেক ঋণ করেছি আমি—যা থেকে মুক্ত হতে চাই। পরক্ষণে ভাবি, থাক না এই ঋণ। হয়তো এরই জন্যে আবার আমাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে আসতে হবে। এই মাটি, জলের সুন্দর পৃথিবীতে।

কতো ঘটনা স্মৃতি মনে পড়ে পিছনের দিকে তাকালে। সেই ঘটনার মধ্যে থেকে নিজের পুরোনো দিনগুলোকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি। ভাবি, যে আমি বাবার কাছে 'বাঁশী কিনে দাও' বলে আবদার করেছিলাম, সেই আমি এখনো যেন এই আমার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে।

এ কথাগুলো চিন্তা করছিলাম, সেদিন ছিল আমার বাবার জন্মশতবার্ষিকী। বাবা নেই—পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে চলে গেছেন অমর ধামে। কিন্তু আমার অস্তিত্বের মধ্যে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করি।

পিতৃদেবের শতবার্ষিকীর দিনে আমার মধ্যে সেই পুরোনো শিশুটা ফিরে এসেছিল। বলেছিলাম অনুচ্চারিত কণ্ঠে, 'আমার একটা বাঁশী কিনে দেবে বাবা!'

মুহূর্তের চিন্তা, মুহূর্তেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

শেষ হলো উনিশ ছাপ্পান্ন সাল। এক এক করে জীবনের ওপর দিয়ে কতগুলো বছর পার হয়ে গেল। ভাবলাম, এমনি করে জীবনের আয়তনটাও সীমিত হয়ে আসছে।

তবুও চিরকালের নিয়মে স্বাগত জানালাম নতুন বৎসরটিকে। স্বাগত উনিশ শ সাতান্ন।

আজ প্রায় অবসর নিয়েছি বলতে গেলে। কয়েকটি ছবির কাজ হাতে ছিল, সেগুলো করছি। নয়তো মঞ্চ ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। তবুও অভিনয়ের কথা ভাবি, নাটকের কথা ভাবি।

দিনপঞ্জীর পৃষ্ঠাও শূন্য থাকে না। প্রাত্যহিকের যা কিছু লিখে রাখি। স্টার থিয়েটার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলো, সে কথাও লিখতে ভুলি নি। তাছাড়া বাংলা দেশের মঞ্চের কাছে এটা তো গর্বের বিষয়। একটি মঞ্চ সুন্দর হলো—একটি মঞ্চ দর্শক-সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকমের ব্যবস্থা করলো, এর চেয়ে ভালো কথা মঞ্চ-প্রেমিকদের কাছে আর কি আছে।

আজকাল নাটকে অংশ নেওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তবু অংশ নিলাম, বেতার নাটক 'শাজাহান'। যে নাটকটি আজকাল আর শোনানো হয় না। নাটকটি রেকর্ড করা হলো, ৯ জানুয়ারী! আমি অংশ নিয়েছিলাম নাম ভূমিকায়, ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় ছিলেন নীতিশ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বোস, সরযূবালা প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ নাটকে অংশ নিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, আজকাল আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এই তো সেদিন সোভিয়েট চিত্র প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে দমদম বিমান বন্দরে যেতে হলো। যেখানে উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্ত, বি এন সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেম।

এদিনের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান, বেংগল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সাউথ ক্লাবে। বাংলা দেশের চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। সেদিন অনেক সহকর্মী, সহমর্মীর সঙ্গে দেখা হলো। আনন্দ পেলাম। মনে আছে, সেদিন অনুষ্ঠান শেষে বিখ্যাত পরিচালক জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে পথ হেঁটে এসেছিলাম চৌরঙ্গী পর্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল একটা ট্যাকসী ধরা। ঐ দিনই কথা প্রসঙ্গে জ্যোতিষবাবুর কাছে শুনলাম, বাকুলিয়া হাউসের বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন কাশীধামে। শুনে মনটা খারাপ হলো।

কিন্তু তবু তো জীবন থেমে যায় না। এক-জীবনে কতো পরিচিত মানুষকে চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখলাম। কী হবে, এসব কথা ভেবে। আজ আমি আছি, একদিন আমিও থাকবো না—এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

অবসর চেয়েছিলাম। পেয়েছি। আর সেই উচ্চগ্রামে বাঁধা জীবন নয়—এখন পুরানো দিনের স্মৃতি নিয়ে এগিয়ে চলা।

আমার অভিনীত চিত্রের মধ্যে 'নীলাচলে মহাপ্রভু' শেষ ছবি। এরপর আর কোন ছবিতে অভিনয় করিনি। সংকল্প করেছিলাম, আর নতুন করে কোন ছবিতে অভিনয় করবো না। নীলাচলে মহাপ্রভু মুক্তিলাভ করলো ২৮ জুন।

জীবনে প্রথম ছবি বলে চিহ্নিত হয়ে আছে 'সোল অব এ স্লেভ'। আর শেষ ছবি 'নীলাচলে মহাপ্রভু'।

এবারে পুরোপুরি মন দিয়েছি আকাদমির কাজে। আকাদমি নিয়ে যতো চিন্তা। ভাবি, যদি কিছু ছাত্রকে তৈরি করে যেতে পারি, যদি তাতে আগামী দিনের নাট্যমঞ্চের কিছু কাজ হয়। অথচ পড়ানোর পথে নানা বাধা। না আছে তেমন পাঠক্রম, না আছে পাঠ্যপুস্তক। এ-ব্যাপারে অনেক বই ঘাটাঘাটি করতে হচ্ছে। দেশ-বিদেশের নানা ধরনের বই। মনে আছে, একদিন একটা বই পড়ছিলাম, বইটার নাম বোধহয় 'থিয়েটার অব দি ঈস্ট'। বইটাতে অনেক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তারমধ্যে এক জায়গায় দেখলাম, বাংলা দেশের থিয়েটার সম্পর্কে মন্তব্য। অবাস্তব, আর বিসদৃশ মনে হলো। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অনেকখানি বলা হয়েছে, শিশিরবাবুর সম্পর্কে। আমার নামেও বেশ কয়েকটি ছত্র রয়েছে। আর অভিনেত্রীর কথা। দুটি নাটকের কথাও বলা হয়েছে, একটি শ্যামলী অপরটি রামপ্রসাদ।

বইখানি পড়ার পর মনে হয়, এ ধরনের বই পড়ে বাংলা দেশের নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে বিদেশীদের কী ধারণা হবে না-জানি।

যাইহোক, এই রকম ধরনের অজস্র বই আমাকে পড়তে হচ্ছিল আকাদমির জন্যে।

এমনি করে দিনগুলো চলছে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। আকাদমির জীবন সত্যি আমার মনে নতুন করে সৃষ্টির উন্মাদনা এনে দিয়েছে।

তবুও এক-একবার পিছন ফিরে চাই। এই তো সেদিন আমি মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে অভিনয় করেছি, এই তো সেদিন নিজের রূপটাই বদলে দিয়েছি বিচিত্র রূপসজ্জায়। আর আজ আমি কতো স্বাভাবিক। মুখে কোন রঙের প্রলেপ নেই, পোশাকের সে রাজকীয় আড়ম্বর নেই, নেই আমার সামনে নানা-রঙের আলোর ইশারা, নেই সেই বিমুগ্ধ দর্শকের ভিড়।

এখন আমার পরিচয় আমি শিক্ষক, আমি ছাত্র পড়াই। রবীন্দ্রভারতীর সেই ক্লাশরুমে শিক্ষকের ভূমিকায় আমি, আর সামনে কয়েকজন ছাত্র। যারা নিবিষ্টমনে শোনে আমার কথা। আর আমি যাদের মুখের দিকে চেয়ে ভাবি, এরা আমার ছাত্র। এরা বড়ো হোক, এদের মধ্যেই আমি আমার ভবিষ্যতকে খুঁজে পাবো।

এরই মধ্যে একদিন এলো। যেদিন আমার জীবনের স্মরণীয় দিন।

মনে আছে একদিন অভিনেত্রী সংঘের সভায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জহর গাঙ্গুলী ও আরো অনেকের সঙ্গে। জহরবাবু আমাকে বলেছিলেন, দাদা—এ কী রকম হলো, একেবারে নিঃশব্দে অভিনয় ছেড়ে দিলেন?

বলেছিলাম, আর পারি না। তাছাড়া আমি তো নিঃশব্দেই অভিনয় জগতে এসেছিলাম, আবার নিঃশব্দেই যজ্ঞ থেকেই প্রস্থান করলাম।

জহরবাবু বলেছিলেন, সে হবে না। হতে দেব না। অন্তত একদিন আমাদের সঙ্গে অভিনয় করুন—আপনার কাছে না হোক, আমাদের কাছে সেইদিনটার অনেক দাম।

জহরবাবুর মুখেরদিকে চেয়েছিলাম।

তারপর আরো পরিচিত জনের কাছ থেকে একই অনুরোধ এলো। অভিনেত্রী সরযূবালাও সেই একই অনুরোধ করলো।

এবারে আর 'না' করতে পারিনি। অনেক ভাবনাচিন্তার শেষে বলেছিলাম, বেশ—তবে তাই হোক। একটা দিন তোমাদের সঙ্গে অভিনয় করি।

এরপর কথা হলো নাটক নিয়ে। কথা হলো প্রথমে মিশরকুমারী নিয়ে। কিন্তু জহর আর সরযূকে বললাম, দ্যাখো—মিশরকুমারীতে আবনের অভিনয় করার ক্ষমতা আর আমার নেই। তার চেয়ে শাজাহান করতে পারো—চেষ্টা করলে শাজাহান হয়তো করতে পারবো।

জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা, ওরা তাতেই রাজী হলো। জহর বললে, আপনার যে নাটক ইচ্ছে তাই হবে।

—কিন্তু একটা কথা, আমি কিন্তু তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই, যে আর আমাকে অভিনয়ের জন্যে অনুরোধ করবে না।

তাই হবে।

শুধু জহর নয়, সরযূও কথা দিলে যে ওরা আমাকে আর অনুরোধ করবে না অভিনয়ের জন্যে।

ঠিক হলো শাজাহানই হবে। আর একথাও ঘোষণা করা হবে এই আমার শেষ অভিনয়।

শেষ অভিনয়!

কথাটা ভাবতেই বিস্মিত হলাম। এরই মধ্যে শেষ!

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই। সত্যি আজ আমি ক্লান্ত, অবসন্ন। সত্যিই আমি অমিত-যৌবনের দিন পেরিয়ে এসেছি। পেরিয়ে এসেছি জীবনের সূর্য-ঝরা পথ। এবারে অপরাহ্নের পালা। সায়াহ্নের সূর্যের জন্যে প্রতীক্ষা করা।

শেষ অভিনয়ের দিন এগিয়ে এলো। এগারোই সেপ্টেম্বর।

সেদিন দিন শুরু হলো এক বিচিত্র অবসাদের মধ্যে। মনে হলো, অশক্ত আমি। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একটি মানুষ। আমি কি পারবো আজ মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ শাজাহানের চরিত্র-কে রূপ দিতে।

যে বিশ্বাস নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলাম, আজও সেই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করলাম।

যথাসময়ে মিনার্ভায় এসে পেঁৗছেছি। মঞ্চের ভিতরে বাইরে তখন অগণিত নর-নারীর ভিড়। বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

আমি তো জানি, টিকিটের জন্যে আজ আমাকেই কতোজনকে সুপারিশ করতে হয়েছে। যাঁরা ভালোবাসেন আমার অভিনয় যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আমার অভিনয় দেখে আসছেন—তাঁরা যখন আমার কাছে আমার অভিনয় দেখার জন্যে টিকিট চাইতে এসেছেন, তখন আমি কি সুপারিশ না করে পারি। কিন্তু তবুও কি সবার অনুরোধ রাখতে পেরেছি! আর তা সম্ভবও নয়।

যাই হোক, মিনার্ভায় আসতে দেখলাম, মঞ্চের বাইরে অজস্র মানুষ ভিড় করে আছে। আর ভিড় সামলাতে পুলিশদলও বেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছে।

নিঃশব্দে সাজঘরে এসেছি। বসেছি দর্পণের সামনে। দেখছি আপন প্রতিবিম্ব।

সেই আমি—আমার নাম অহীন্দ্র চৌধুরী। পরিচয়—অভিনেতা।

কতোদিন হয়ে গেল, মঞ্চে এসেছিলাম। দেখতে দেখতে কতো দিন পেরিয়ে গেল। বছর, যুগ—দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কতো পরিবর্তন! কিন্তু তার মধ্যে অভিজ্ঞতার জীবন যেন অপরিবর্তিত। সেদিনেও যার পরিচয় ছিল অভিনেতা, আজও সে সেই পরিচয় নিয়ে মিনার্ভার সাজঘরে।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়েছে আজকের অভিনয়ের কথা। কিন্তু একটি বাড়তি কথা যুক্ত হয়েছে সেখানে। আজ আমার শেষ অভিনয়। এর পর পরিচিত অভিনেতাকে আর মঞ্চে দেখা যাবে না।

সাজ-ঘরে বসে আছি, একটু যেন উন্মনা।

শাজহানের রূপসজ্জায় আমি। দর্পণের সামনে দাঁড়ালাম। এখন আমি আর অহীন্দ্র চৌধুরী নামে চিহ্নিত একজন মানুষ নই—আমি ভারত-সম্রাট শাজাহান।

এই মুহূর্তে নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হলো। মনে হয়, হয়তো আজ আমি হেরে যাবো।

কিন্তু না।

সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। মনটাকে ফিরিয়ে আনলাম। বিশ্বাসের মধ্যে। দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস। যে বিশ্বাস নিয়ে একদিন মঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সময় হয়ে এলো।

মঞ্চের পর্দা উঠলো। সম্রাট শাজাহান শায়িত। দারা পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান।

তাই তো এ-বড়ো দুঃসংবাদ দারা' নাটকের প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করলো সম্রাট শাজাহান। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

না—শাজাহান অশক্ত নয়, এখনো মনে তার অমিত শক্তি।

শুরু থেকে শেষ। জানি না, কখন শেষ হলো। জানি না, কখন যবনিকা পড়লো।

যবনিকা পড়লো আমার অভিনয়-জীবনের। শাজাহানের রূপসজ্জা থেকে আসল মানুষটা বেরিয়ে এলো। যার মুখের ওপর এখনো রংয়ের অস্পষ্ট রেখা।

আজ অভিনয়ের আগে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল। যে অনুষ্ঠানে পৌরো-হিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এ-ছাড়া বিমলচন্দ্র সিংহ প্রমুখ আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সেদিন একজন নাট্যোৎসাহী বক্তা আমার কথা বলতে, বলেছিলেন—এবারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নটসূর্য বিদায় নিচ্ছেন মঞ্চ থেকে। ডাক্তার রায় বলেছিলেন, সূর্য কখনো অস্ত যায় না। পৃথিবীর এক গোলার্ধে তার অস্ত, অন্য গোলার্ধে তার উদয়। নট-সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয়-জীবন থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু আর এক ক্ষেত্রে পদ-সঞ্চার করছেন তিনি। এখন তিনি নাট্যজগতের আচার্য—আকাদমি তাঁর ক্ষেত্র।

সাজঘরে দাঁড়িয়ে আরো ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, অগণিত দর্শকের কথা। যাঁরা আমার শেষ অভিনয়ের সাক্ষী হয়ে রইলেন।

সাজঘরের আয়নায় শেষবারের মতো নিজেকে দেখলাম। বড় ভালো লাগলো। নিজেকে এমন করে কোনদিন তো দেখিনি।

তারপর হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি সরে এলাম আয়নার সামনে থেকে।

এবারে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত। সহ-অভিনেতা, মঞ্চের কলা-কুশলী—সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মঞ্চের বাইরে এলাম।

বাইরে তখন অগণিত জনতার ভিড়। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে এসেছে।

রংগালয়েয় বাইরের উজ্জ্বল আলো-গুলো তখন নিবে গেছে। এ-দিকটা কেমন যেন অন্ধকার। নীরবে যন্ত্র-চালিতের মতো আসছি বাইরে। দু'ধারে অগণিত নর-নারী দাঁড়িয়ে আছে। আমি এগিয়ে যেতে হঠাৎ তারা হাততালি দিয়ে উঠলো। হাত জোড় করে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করলাম।

রাস্তার কাছে এসে দেখলাম, বিপরীত ফুটপাথে আধো-অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য দর্শক। স্পষ্ট দেখছি না, তবুও স্পষ্ট। ওরা দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে। হয়তো শেষবারের মতো অভি-নেতা-কে দেখতে চায়।

হাত জোড় করে নমস্কার জানাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে। কামনা করি আশী-র্বাদ। যেন আমি জীবনের বাকি দিন-গুলো শান্তিতে কাটাতে পারি। ঈপ্সিত শান্তি।

নীরবে গাড়ীতে এসে উঠলাম। এখনো আমার দৃষ্টিটা অপেক্ষমান জনতাকে স্পর্শ করছে।

দেখতে দেখতে অপসৃয়মান ছায়ার মতো সব কিছু সরে গেল।

গাড়ী বিডন স্ট্রীট পেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ পড়লো।

আমার মনের মধ্যে তখন একটি সুরই ভেসে চলেছে। মঞ্চ থেকে বিদায়ের সুর।

জীবনে চেয়েছিলাম, অভিনেতা হবো। হয়েছি। অভিনয় করেছি কতো না চরিত্রে। তার মধ্যে শাজাহান যেন আমার সব কিছু।

শাজাহান আমাকে অনেক দিয়েছে। মানুষ যা চায়—সব। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ—সব কিছুই পেয়েছি আমি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমি যেন কিছুই করতে পারিনি। চেষ্টা করলে হয়তো আরো সার্থক রূপ দিতে পারতাম শাজাহানের। শুধু শাজাহান কেন—হয়তো আমার অভিনীত চরিত্রগুলির জন্যে অভি-নেতা হিসাবে আরো কিছু করতে পারতাম যা আমি পারিনি।

চিন্তাটা আবার শাজাহানে ফিরে এলো। আমার জীবন-মন যেন মিশে আছে ওই ঐতিহাসিক চরিত্রটির সংগে।

শাজাহান আমাকে এতো দিয়েছে, কিন্তু আমি কি দিলাম।

কখন যেন চোখের জল, বিন্দু হয়ে ঝরে পড়লো।

শাজাহানের জন্যে এই দু' ফোঁটা চোখের জল দিলাম। আর অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, 'গুড নাইট সুইট প্রিন্স'।

তবু একবার পিছন ফিরে চাইলাম। যে পথ পিছনে রেখে এলাম।

কিন্তু পরমুহূর্তে দৃষ্টি প্রসারিত করি সামনের পথে। সামনে ছড়িয়ে আছে চৌরঙ্গীর আলোক-সরণি।

যে আলোক সরণি ধরে আমি বিদায় নিয়ে চলেছি, সেই পথ ধরে আসবে আগামী কালের পথিক অভিনেতা।

(সমাপ্ত)

আমার স্বামী দুপুরবেলা খাবার পর শিশি থেকে ভাজা মশলা বার করে চিবোতে চিবোতে কাজে ফিরে গেলেন। কিন্তু আমি আর রোজকার মত খবরের কাগজটা নিয়ে বিছানায় লম্বা হতে পারলাম না। বেশি নার্ভাস হলে আমার পেটটা আবার অল্প একটু ব্যথা করে। ঘাবড়ে গেলে কোন কাজে মন বসাতেও পারি না। তবু জোর

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

করে কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলাম, কারণ মিসেস মিত্র বলেন খবরের কাগজ অনেকটা ধারাবাহিক উপন্যাসের মত। এক-দিন বাদ পড়লেই সব খবরের খেই হারিয়ে যাবে। হয়ও আমার তাই। দুদিন ঝি কামাই করেছে কি খোকার সর্দিজ্বর হয়েছে অমনি তারপর আর কাগজ পড়ে কিছুই বুঝতে পারি না। ইতিমধ্যে কোন কোন দলে জোট বেঁধে কোথায় সরকার গঠন করে ফেললো, কোন রাজ্যে কি কারণে হরতাল শুরু হবে, সমস্ত তালগোল পাকিয়ে গেছে। বুঝতে বুঝতে আবার সাত দিনের ধাক্কা। ততদিনে হয়তো আবার পিশশাশুড়ীর নাতির অন্নপ্রাশনের দিন এসে গেছে—সেখানে গিয়ে দুদিন থেকে আসতে হবে। কি করে যে বিশ্বশুদ্ধ লোক খবরের কাগজের খুঁটিনাটি নখদর্পণে রাখে তা বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে।

আজকে কিন্তু খালি কাগজের ওপর চোখই বুলিয়ে যাচ্ছি। একটা কথাও মাথায় ঢুকছে না। মনের মধ্যে খালি ওই এক চিন্তা। উনি ওরকম একটা কথা বললেন কেন? আমের আঁটি চুষতে চুষতে কথাটা তো তিনি বলেই খালাস। এর ফলে আমার কি অবস্থা সেটা দেখবার ওঁর সময় কোথায়! এই যদি আমি ইংরিজি সাহিত্যের কোন চরিত্র হতাম, তাহলে আমার প্রত্যেকটি ভ্রূভঙ্গী ওঁর খাতায় নোট করা হয়ে যেত। আমার মন মেজাজের সব বর্ণনা সাইক্লোস্টাইল করা কাগজে ছেপে এতদিনে ছাত্রদের হাতে হাতে ঘুরতো। সেরকম তো আর ভাগ্য নয়—শেকসু-পীয়ারের নায়িকা না হয়ে হচ্ছি নেহাতই রক্ত-মাংসের মানুষ, তাও আবার নিতান্তই নিজের বৌ, কাজেই আজকের সমস্যাটা আমার নিজেই সমাধান করতে হবে। বড়জোর পাশের বাড়ি গিয়ে একটু মিসেস মিত্রের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ানরা কি খায় কে জানে। রান্না করতে তো আমি গররাজি নই—এক ঘন্টার নোটিসেও দশটা লোককে রেঁধে-বেড়ে খাইয়ে দেবো। কিন্তু এই সাহেব-টাহেবদের নেমন্তন্ন করেই উনি আমায় বিপদে ফেলেন। আয়ারল্যাণ্ডে শুনেছি খুব আলু খায়, ইংলণ্ডের লোকেরা সেদ্ধ-পক্ব খায় সেটুকু বুঝি আজকাল। ওঁকে জিজ্ঞেস করলে রেগে উঠে বলবেন তুমি যে কখনো বি-এ পাশ করেছিলে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বি-এ পাশের কোনো বইয়ে অস্ট্রেলিয়ানরা ভাত খায়, না পাঁউরুটি, মশলা খায় না আলুনি, এসব বৃত্তান্ত লেখা নেই সে কথা এ ভদ্রলোককে কে বোঝাবে। প্রতিবারেই এক কাণ্ড হয় এ নিয়ে। প্রতিবারেই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। একটা ফাঁড়া পার হয়ে একটু নিঃশ্বাস নিতে না নিতেই আবার একটা। যেমন আজ শাকভাজা দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে ভুলে যাওয়া কথা হঠাৎ মনে পড়ার মত করে বললেন, 'ও, প্রফেসর সীমন্সদের আজ রাত্রে খেতে বলেছি। বলেছিলাম না অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাঁচজন এসেছেন। আটটা নাগাদ ব্যবস্থা করে রেখো।' ব্যস হয়ে গেল দুপুরের ঘুম, হয়ে গেল খবরের কাগজ পড়া, আলিস্যি করা। কিন্তু তারপরে খাওয়া শেষ হবার মুখে যে কথাটা বললেন, তাতে যেন আরো ভাবনা বেড়ে গেল। কেন বললেন বুঝতে পারছি না।

ভাবনা কি একটা। রান্না না হয় হোলো, তাঁরা এলে তাঁদের বসাতে হবে,

দুটো কথা বলতে হবে। মিসেস মিত্র বলেন, তুমি লোকের সংগে কথা বলতে ভয় পাও কেন—এই আমার সামনে যেমনি ঘরকন্না সুখ-দুঃখের কথা বলো তেমনি বলে যাবে আজকে কি রকম গরম পড়েছে, ঝড়-বৃষ্টির জন্য দিল্লীর ট্রেন কাল সাত ঘণ্টা লেট ছিল, কাগজে দেখেছেন ইটালির এক মহিলার নাকি সাতাশটি ছেলেমেয়ে হয়েছে—দুমদাম করে যা মনে হবে বলে যাবে। একবার শুরু হলে দেখবে আর ভাবতে হচ্ছে না, বেশ কথার পিঠে কথা জুগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কার্যকালে আমার একটা কথাও মনে পড়ে না। এই গত শনিবার বরং তাও একটু কথাবার্তা বলতে পেরেছিলাম, কিন্তু সেও সবার সঙ্গে নয়। সেদিন এসেছিলেন তিনজন:—একজন বুড়োটে সাহেব, তিনিই বোধ হয় আসল লোক। কী যেন নামটা বলেছিল, প্রফেসার ম্যাক না কিছু একটা। সঙ্গে একটি মাঝবয়সী আমেরিকান মহিলা এসেছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম ওঁর স্ত্রী বুঝি। নাম শুনে বুঝলাম তিনি আলাদা—তিনিও বুঝি প্রফেসর একজন। আর অন্যটি কমবয়সী। এক গাদা চুলদাড়ি দিয়ে মুখখানা জংগল করে রেখেছে, কিন্তু ঠোঁট দুটো দেখলেই বোঝা যায় আসলে ছেলেমানুষ। তার নামটা মনে আছে। সে ছেলেটি নাকি কবি। রেডিওতে আর টেলিভিশনে কবিতা পড়ে শোনায়। তাছাড়া কি কাগজে কাজ করে। ও নিজেই এসব গল্প করলো। এই প্রথম একজন বিদেশী লোকের সব কথা বেশ বুঝতে পারলাম। উনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে খুশি হয়ে থাকবেন ও ছেলেটির কথার জবাবে আমি কি রকম পরিষ্কার জবাব দিতে পারছিলাম। বলেননি অবশ্য কিছু, ভালো কথা বলা ওঁর স্বভাবই নয়। দেখছি তো দু বছর ধরে।

উনি বরাবর বলেন, বি-এ টাতো পাশ করেছিলে—ইংরিজি বলতে পারো না একটু গুছিয়ে? বিয়ের আগে কোনদিন বলার দরকার হয়নি অবশ্য—তবু ভেবেচিন্তে দুচার কথা যে বলতে পারি না তা নয়। মিসেস মিত্রও তালিম দিয়েছেন খানিকটা। কিন্তু উনি যে সব থাজা সাহেবদের নেমন্তন্ন করে আনেন তাদের কথা বোঝা আমার বি-এ পাশ বিদ্যের কর্ম নয়। সেই প্রফেসর ম্যাক কি যেন—তিনি আলাপ হতে না হতে থাবার মত মস্ত হাত বাড়িয়ে দিলেন, দেখেই ভয় করে। তবে এসব শিখে গেছি আজকাল। ঠাণ্ডা, গাছের গুঁড়ির মত হাতের ছোঁয়া ভদ্রলোকের—ভদ্রমহিলার হাতটা মখমলের উল্টোদিকের মত খসখসে। ডন অ্যাশলি, দাড়িওয়ালা কবি, তার হাতটা একটু গরম, ভিজে ভিজে। এমনকি মিসেস মিত্রর শিক্ষামত 'আপনাদের সংগে আলাপ হয়ে খুশি হলাম' এটাও এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম। তারপরই হোলো বিপদ। প্রফেসর হৈ হৈ করে অনেক কথা বলে গেলেন, তার একটা অক্ষরও বুঝলাম না। ভদ্রমহিলাও নাকীসুরে ইঁয়াও কিঁয়াও করে কি কি বললেন। যতদূর মনে হোলো এঁরা আমার সম্বন্ধে ভালো ভালো কথাই বলছেন, ভদ্রতার কথা। আমিও ভদ্রতার হাসি মুখে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম বললেই ঠিক হয়। শুধু ডন অ্যাশলি কিছু বললো না। একটু দূরে থেকে চুপ করে আমাকে দেখতে লাগলো। কী কালো চোখ। সাহেবদের ওই রকম কালো চুল বা চোখ কখনো দেখিনি। অবশ্য সাহেব দেখেছিই বা কটা বিয়ের আগে।

উনি বিলেতটিলেতে থেকেছেন অনেক কাল। এদের সংগে যা গল্প করেন, তার অর্ধেকই এমন লোকেদের কথা যাদের আমি চিনি না। ওমুকে ওই বইটা লিখলো, তমুকে লেকচার দিতে ইওরোপ যাচ্ছে হেন তেন। এমনিতে ওঁর ইংরিজি আমি বেশ বুঝতে পারি—কিন্তু বিলেত থেকে লোক-টোক এলে ওঁর ইংরিজিটাও যেন কেমন বদলে যায়। পড়াশুনোর গল্পও হোলো সেদিন অনেক। আগের দিনের মীটিংয়ে কে নাকি একটা কথা ভুল বলেছে তার আলোচনা। তার মাঝখানে আমি কখনই বা বলবো কি গরম পড়েছে। ট্রেন লেট হবার খবর বা ইটালিয়ান মহিলার ছেলেপিলের কথা বললেই বা কেমন শোনাবে। তাই চুপ চাপ উঠে একে একে ঠাণ্ডা করা টোমাটোর রস এগিয়ে দিতে লাগলাম আর একটু করে হাসলাম। অনেকে বলে হাসলে আমাকে ভালো দেখায়। উনিও বিয়ের পর প্রথম প্রথম গালের টোল নিয়ে অনেক কিছু বলতেন। অবশ্য এখন ভালো দেখাবার জন্য হাসলাম তা নয়। কারু সঙ্গে কথা বলতে পারি না, বুঝতেও পারি না, কিছু তো একটা করতে হবে।

ডন অ্যাশলি ট্রে থেকে গেলাসটা ওঠালো। অনেকক্ষণ ধরে সমানে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঠোঁটের কোণে এমন অল্প একটু হাসলো যেন আমার সঙ্গে ওর কোন গোপন ঠাট্টা আছে। 'আপনার গ্লাসটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো নীচু আর ভারী গলায়। আমি পঞ্চম গেলাসটা তুলে নিয়ে ট্রেটা রেখে সাবধানে ভদ্রমহিলার পাশে গিয়ে বসলাম। এবার অন্ততঃ গ্লাসটা নাড়াচাড়া করে খানিকটা সময় কাটবে। ঘরের একদিকে আমার স্বামী আর প্রফেসার ম্যাক ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছেন। অন্যদিকের লম্বা সোফায় এক হাতে সিগারেট অন্য হাতে গেলাস নিয়ে ওই মহিলা—ধরে নিচ্ছি তাঁর নাম মিসেস বীচার। (আসলে অবশ্য মিসেস বীচার ওঁর নাম নয় এখনকার এক বিদেশী কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠানে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন একবার, তাঁর নাম)। মিসেস বীচারের পাশে জড়সড় হয়ে আমি। ডন অ্যাশলি ঘরের তৃতীয় দিকে একলা একটা চেয়ারে বসেছিল। হঠাৎ উঠে এসে আমার পাশে একটা মোড়া টেনে বসলো। মিসেস বীচার ভদ্রলোকদের সংগে একটা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন—ডন নীচু গলায় আমার সংগে আলাপ শুরু করলো। ভারতবর্ষে কি কি দেখেছে, কতদিন থাকবে, দেশে ও কি কাজ করে এই সব গল্প। বললো ভারতবর্ষের মেয়েদের মত চোখ ও কোথাও দেখেনি। আর কী আশ্চর্য এই প্রথমবার কোন সাহেবের কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হোলো না, এমনকি বেশি না ঘাবড়ে দু-একটা কথার জবাবও দিলাম ঠিকঠাক। আড় চোখে আমার স্বামীর দিকে চেয়ে দেখলাম উনি লক্ষ্য করছেন কিনা। আমি সহজভাবে গল্প করছি দেখলে খুশি হবেন। দেওয়ালে খোকার ছবি দেখে ডন জিজ্ঞেস করলো কত বয়স। আট মাস শুনে খুব খুশি হয়ে উঠলো। ওরও বুঝি একটি আট মাসের মেয়ে আছে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে ছবি দেখালো বৌ আর মেয়ের। জিজ্ঞেস করলো বাচ্চা কি ঘুমোচ্ছে? আহা, যেন নিজের বাচ্চাটির জন্যে বড্ড মন কেমন করছে মনে হোলো। তাই বললাম দেখবেন আসুন না। ওকে খোকার ঘরে নিয়ে গেলাম।

সেদিন কি কি রান্না করেছিলাম মনে করে দেখি। রান্নাটা কি সেদিন [illegible] হয়নি? মাংসটা বোধ হয় শক্ত ছিল [illegible] হলে আজ উনি অমন কথা বললেন [illegible] আর তো কিছু ভুলচুক হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। শেষকালে জনে জনে শুভরাত্রি জানিয়েছিলাম—ওঁরা আসাতে আমার [illegible] আনন্দ হয়েছে তাও নিয়মমাফিক বলে ছিলাম। একটা অবশ্য ভুল হয়েছিল এখন মনে পড়ছে। খেয়েদেয়ে উঠে [illegible] খেলেন। কফিটা ওঁদের সামনে না [illegible] রান্নাঘর থেকে বানিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। তারপর শুনি ওরা বুঝি কফিতে দুধ খায় না। তখন আবার সেই কফি ফেলে কালো কালো কফি বানিয়ে আনি। একটু দেরি হয়েছিল বানাতে। সেই কথা [illegible] উনি মনে রেখেছেন। আরো [illegible] হোতো যদি না ডন অ্যাশলি রান্না-ঘরে ঢুকে গিয়ে আমাকে সাহায্য করতো। আমি বারণ করছিলাম প্রথমে। [illegible] দিয়ে কি কেউ কাজ করায়। [illegible] বললো ওদের দেশে সবাই এসব [illegible] করে। ওর বৌ নাকি রান্না করে আর ও রোজ বাসন ধোয়। ওই দাঁড়িগোঁফওয়ালা ইয়া জোয়ান ছেলে কফির কাপ ধুচ্ছে সে এক মজাদার দৃশ্য। আমি তো হেসে বাঁচি না। হাসির শব্দ শুনে উনি উঠে এলেন। ততক্ষণে কফি করে ফেলেছি। উনি বলেন, আমি নাকি চটপট গুছিয়ে কাজকর্ম করতে পারি না। সেদিন ওরকম গোছানো কাজ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। ডন অ্যাশলি যে কাপ ধুয়ে দিয়েছিল সেটা উনি দেখেননি।

খাওয়া-দাওয়া সবই ঠিকঠাক হোলো। কথাবার্তাও যথাসাধ্য বললাম, তাহলে আজ উনি ওরকম বললেন কেন কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আম খেতে খেতে বললেন 'দেখো যেন আবার সেদিনের মত কাণ্ড কোরো না আজ।' বলেই আবার চুপ। কিসের কাণ্ড কি বৃত্তান্ত সেটা তো মানুষে একটু বুঝিয়ে বলে। তা না শুধু শুধু আমাকে ভাবানো। কাণ্ড কোথায়? আমি তো ওঁর পছন্দমত সবকটা কাজ করেছি সেদিন। ডন অ্যাশলির সঙ্গে খোকার ঘরে গিয়ে কতক্ষণ দিব্যি আলাপ চালিয়ে গেলাম। ও আবার ব্যাগ থেকে ও

নিজের কবিতার বই একটা বার করে দিল। নিজে হাতে আমার নাম লিখে দিল। হাতের লেখাটা কি রকম সুন্দর বাঁদিকে বেঁকানো। ধন্যবাদ জানিয়েছি তাকে. সেদিক দিয়ে কোন ত্রুটি নেই। উনি বলেন, অতিথিরা যে ভাষা বোঝে না সেই ভাষায় তাদের সামনে কোন কথা বলতে নেই। সেইজন্যে এই সব লোকজন এলে উনি আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলেন। আমি কখনো ও'র সঙ্গে ইংরিজি বলতে পারিনি, বড্ড লজ্জা করতো। সেদিন কিন্তু আমি তাও বলেছি। ভিনিগারের শিশির ছিপিটা এমন এঁটে গিয়েছিল কিছুতেই খুলতে পারছিলাম না। তখন ও'কে এসে ইংরিজিতে বললাম খুলে দিতে। তাতেও ও'র খুশি হবার কথা। এই দু' বছরে আমি কত কি শিখলাম নিজেই অবাক হই।

ছিপিটা অবশ্য সত্যিই বেজায় এঁটেছিল। উনিও খুলতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত ডন অ্যার্শলি খুলেছে। ওদের সব বাঁড়েন মাংস-খাওয়া স্বাস্থ্য তো। মিসেস বীচার আমার তৈরি খাবারের কত প্রশংসা করলেন। প্রফেসার মাক মাছের ফ্রাইটা দুবার চেয়ে নিলেন। তবু যে কোথায় গণ্ডগোল হোলো বুঝতে পারছি না। হয়েছে নিশ্চয় একটা কিছু, তা না হলে ও'র মত মানুষ একথা বলে? ভাবতে গেলে কত কি ছোটখাটো দোষ মনে পড়ে যাচ্ছে। উনি কোনটার কথা বললেন কে জানে। অ্যাশট্রেগুলো ঠিক জায়গায় রাখিনি—ফলে মিসেস বীচারকে মুখ ফুটে অ্যাশট্রে চাইতে হোলো। বাথরুমে ধোপার-বাড়ির ইস্ত্রি-করা তোয়ালে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। খাবার টেবিলের ফুলদানীটা খালিই পড়েছিল। কাঁটা-চামচগুলো সেদিন পালিশ করিনি। এর সবগুলোকেই কান্ড বলা যেতে পারে। এখন ভেবে লজ্জা করছে।

ভাবনার কোন শেষ নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোলো, খবরের কাগজটা পাট করে উঠলাম রান্নার জোগাড় করতে। বিছানাটা ঝাড়তে গিয়ে চোখে পড়লো ডন অ্যার্শলির কবিতার বইটা। কদিন থেকে মাথার বালিশের তলায় রেখেছি। কমলা রঙের সরুমত সুন্দর বইটা—নামটা বেশ মজার—'পোষা টিয়া ও অন্যান্য।' কখনো বইটা পড়ে দেখতে হবে। কিন্তু আজকে প্রথমে ছুরি-কাটাগুলো পালিশ করে ফেলি। বাথরুমে পরিষ্কার তোয়ালে দিই। যাতে উনি আজকের অতিথিসৎকারে কোনো দোষ না খুঁজে পান। আর একটু বিকেল হলে মিসেস মিত্রর কাছে গিয়ে ইংরিজি কথাবার্তাগুলো একটু ঝালিয়ে আসতে হবে।

চাঁদের মাটিতে গাড়ী : আট চাকার যে গাড়ীটি চাঁদের মাটিতে চলেছে শিল্পীর তুলিতে তারই কাল্পনিক চিত্র। সরকারী রুশ নিউজ এজেন্সী তাস এই ছবি প্রচার করেছে। এই স্বয়ংক্রিয় গাড়ীটির নাম দেওয়া হয়েছে লুনোখোদ —১। লুনোখোদ শব্দের অর্থ চাঁদের গাড়ী। চাঁদে এই সর্বপ্রথম এই ধরণের যন্ত্র নামানো হয়েছে।
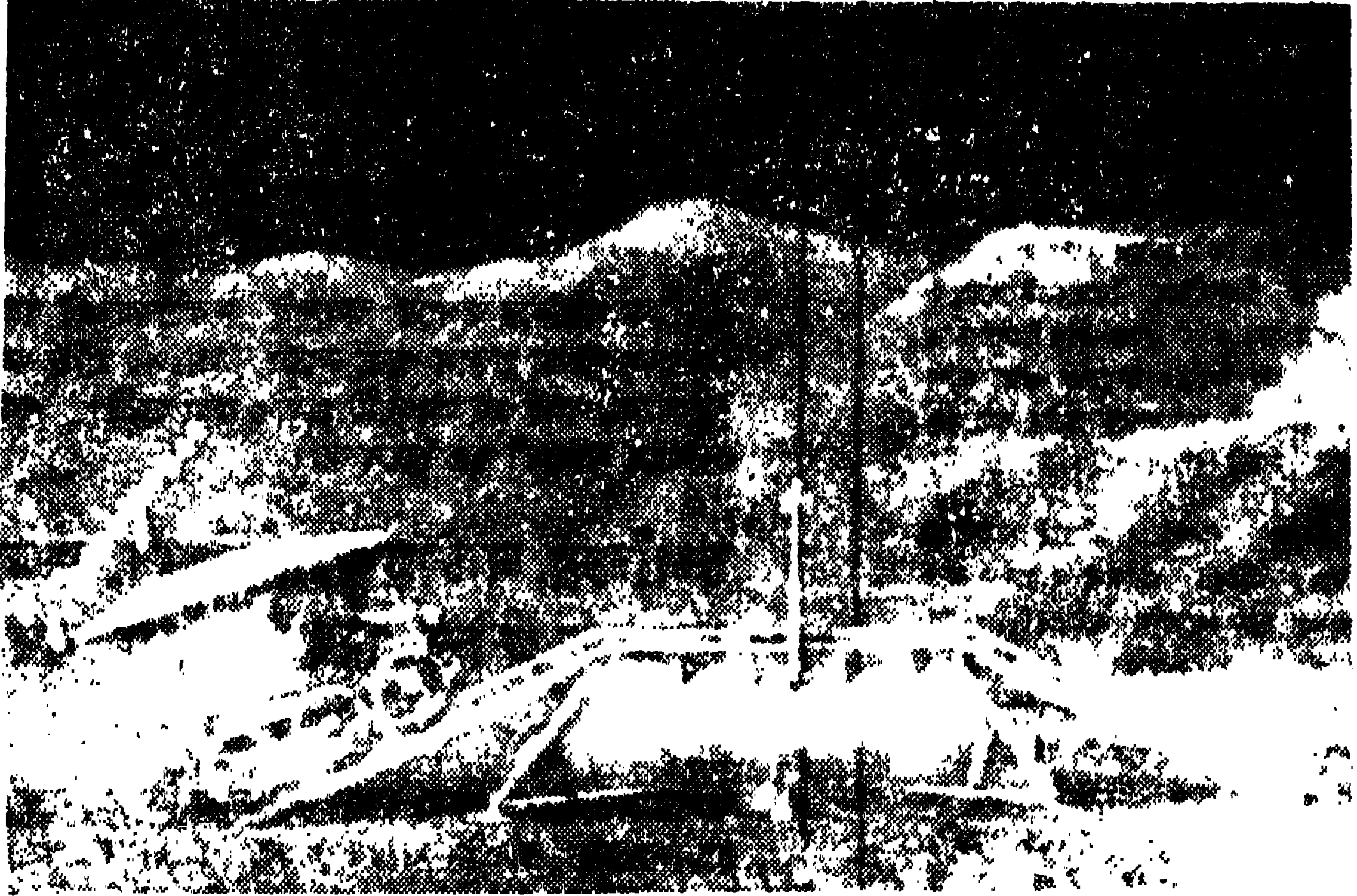
বিজ্ঞানের কথা

উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থা

দৈনিক কাগজে খবর বেরিয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে চলেছে। সকলেই জানেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা অনেক দিন থেকেই চালু। এ-ব্যবস্থার সুবিধে এত বেশি যে, বিজ্ঞানীদের ধারণা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গোটা বিশ্ব এই ব্যবস্থার আওতায় এসে যাবে। ভারতও আসছে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থা [illegible] সম্পর্কে কয়েকটি গোড়ার কথা প্রথমে বলে নিতে চাই। বিষয়টি বুঝতে তাহলে সুবিধে হবে।

সকলেই জানেন টেলিভিশনের প্রোগ্রাম প্রচার করার জন্যে একটি টাওয়ার বা উঁচু স্তম্ভ তৈরি করা হয়। কেন? টেলিভিশনের প্রোগ্রাম যেখান থেকে প্রচার করা হয় তা ভূপৃষ্ঠের যতোদূরে পর্যন্ত দৃশ্যমান ততোদূর পর্যন্তই ধরা সম্ভব। স্তম্ভ যতো উঁচুই করা যাক না কেন ভূপৃষ্ঠেরও বক্রতা আছে, ফলে একটা দূরত্বের পরে সেই স্তম্ভ আর চোখে পড়ে না। টেলিভিশন প্রোগ্রাম [illegible] নির্দিষ্ট দূরত্ব পরে-পরে পুনঃ-সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয়। এতে খরচ ও জটিলতা দুই-ই বাড়ে। কিন্তু একটি উপগ্রহ থেকে যদি টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়? তাহলে সেই উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠের যতোখানি এলাকা দৃশ্যমান ততোখানি এলাকায় সেই প্রোগ্রাম অনায়াসেই প্রচার করা সম্ভব, পুনঃ-সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছাড়াই।

এখানে টেলিভিশনের প্রচারকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা হয়েছে মাত্র, কেননা টেলিভিশনের প্রচারই সবচেয়ে জটিল। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে, উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা বজায় রাখার সুবিধে কতখানি।

কিন্তু উপগ্রহকে পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পাক খেতে হয়। গাগারিন যে বিশেষ কক্ষে পৃথিবীকে একটি পাক দিয়েছিলেন তাতে তাঁর সময় লেগেছিল নব্বুই মিনিট। কক্ষপথ পৃথিবীর যতো কাছাকাছি, পৃথিবীকে পুরো একটি পাক দিতে উপগ্রহের সময় লাগে ততো কম। কক্ষপথ পৃথিবী থেকে যতো দূরে, পুরো একটি পাক দেবার সময় ততো বেশি। কক্ষপথ যদি পৃথিবী থেকে বাইশ হাজার মাইল দূরে হয় তাহলে সেই বিশেষ কক্ষপথে পৃথিবীকে পুরো একটি পাক দিতে উপগ্রহের সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। আমাদের পৃথিবীও এই একই সময়ে অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায়, পুরো একটি পাক খেয়ে থাকে। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? পৃথিবী যে সময়ে একবার পাক খাচ্ছে উপগ্রহও সেই একই সময়ে একবার পাক খায়। এ অবস্থায় পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হয় উপগ্রহটি যেন আকাশের বিশেষ একটি বিন্দুতে স্থির। উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন করতে হলে গোড়াতেই চাই এমনি 'স্থির' উপগ্রহ। কেননা ভূপৃষ্ঠের নির্দিষ্ট একটি এলাকার কাছে এই 'স্থির' উপগ্রহটি সব সময়েই দৃশ্যমান।

একটি উপগ্রহ যখন পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে তখন কতখানি দূরত্ব পার হচ্ছে তার একটা মাপ কিলোমিটারে অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে এমন কথাও বলা চলে, পুরো একটি পাক খেতে উপগ্রহটিকে পার হতে হচ্ছে ৩৬০ ডিগ্রি। এই ৩৬০ ডিগ্রিকে সমান তিনটি ভাগে ভাগ করা যাক—এক-এক ভাগে ১২০ ডিগ্রি। এবারে এমন তিনটি 'স্থির' উপগ্রহ তৈরি করা যাক যাদের অবস্থান ১২০ ডিগ্রি তফাতে তফাতে। তাহলে? তাহলে মাত্র তিনটি 'স্থির' উপগ্রহের মাধ্যমেই সমগ্র ভূপৃষ্ঠ দৃশ্যমান। অর্থাৎ মাত্র তিনটি স্থির উপগ্রহের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

তিনটি মাত্র উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা? এটা তখনই সম্ভব যখন বিশ্বের আবহাওয়াটিও সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের হবে। নইলে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুবিধে দেবার নামে এই উপগ্রহকেই করে তোলা যেতে পারে প্রভাব বিস্তার, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যম। এ আলোচনায় পরে আসছি। এখানে শুধু এই কথাটি বুঝে নেওয়া দরকার যে, উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সমস্যাটি শুধু বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল নয়, রাজনৈতিকও। বরং, যতোটা না বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবার কথা নয়।

যে-খবর আগে বলছি, উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থার আওতায় ভারত এসে যাচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই। খবরটি জানিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের যোগাযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শের সিং। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, ভারত মহাসাগরের আকাশে যে 'স্থির' উপগ্রহ থেকে ভারতের বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তার নাম ইনটেলসাট-৩। সেটি ইতিমধ্যেই যথাস্থানে অবস্থান করছে। এজন্যে ভারতের মাটিতে থাকা চাই একটি গ্রাহক-যন্ত্রের কেন্দ্র, যাকে বলা হয় আর্থ্ স্টেশন। ভারতের এই আর্থ্ স্টেশনটি নির্মিত হচ্ছে আরভি-তে, ৭,৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে। বোম্বাইয়ের বিদেশ সঞ্চার ভবনের সঙ্গে আরভির এই আর্থ্ স্টেশনের যোগাযোগ স্থাপিত হবে মাইক্রো-ওয়েভ ব্যবস্থায়।

আরভি স্টেশনে থাকবে ৪৮টি কথা-বলার চ্যানেল, বলা বাহুল্য, টেলিভিশনও। এই ব্যবস্থায় উপগ্রহের মাধ্যমে সারা বিশ্বের টেলিভিশন প্রোগ্রাম ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হবে।

উত্তর ভারতের কোনো এক স্থানে, সম্ভবত দেরাদুনে স্থাপিত হবে ভারতের দ্বিতীয় আর্থ্ স্টেশন, ৬-৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে। এই নির্মাণকার্য শেষ হবে ১৯৭৪ সালের মধ্যে।

নিজস্ব উপগ্রহ তৈরি করে নেবার ক্ষমতা বিশ্বের সকল দেশের নেই। কাজেই উপগ্রহ তৈরি করার ক্ষমতা যে-সব দেশের আছে তাদের ওপরেই নির্ভরশীল হতে হয়। অথচ বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগ্রহ রয়েছে সকল দেশের।। এই অবস্থাতেই কতকগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। যে-কোনো দেশ এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে। ভারত এমনি একটি ব্যবস্থায় সামিল।

ভারত যে উপগ্রহটির সাহায্য নিতে চলেছে তার অবস্থান ভারত মহাসাগরের আকাশে। এটি ইনটেলসাট-৩। এই ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত আরো একটি উপগ্রহ তোলা হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের আকাশে—ইনটেলসাট- ৪। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তিনটি মাত্র উপগ্রহের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল জ্ঞান মানুষের আয়ত্তাধীন বাস্তবে তার প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। শুধু তিনটি নয়। যোগাযোগ- ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে অনেকগুলো উপগ্রহই তৈরি হয়ে গিয়েছে, আরো হবে।

এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। যোগাযোগ-ব্যবস্থা কব্জায় থাকলে আয়ত্ত করা যায় শুধু মোটা টাকা নয়, ক্ষমতাও। সেই প্রাচীন কাল থেকেই সবলের হাতে দুর্বলের ওপরে আধিপত্য করার একটি উপায় হচ্ছে যোগাযোগ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

অতএব, যেখানে লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে আগামী এক যুগের মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম হবে উপগ্রহ, সেখানে উপগ্রহকে অবশ্যই এমনভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা থাকবে যাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। আপাতদৃষ্টে নিরীহ ও নির্দোষ চুক্তির মাধ্যমেই হয়তো তা করা হবে।

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে উপগ্রহ যদি থাকত মাত্র তিনটি এবং বিশ্বের আবহাওয়াটি হত সম্প্রীতির ও সৌহার্দ্যের—তাহলে এসব প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠত না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব দূরে থাক, এক আটলান্টিকের আকাশেই একাধিক উপগ্রহের স্থান হবার সম্ভাবনা।

মনে করা যাক আটলান্টিকের আকাশে উপগ্রহ রয়েছে দুটি। তাহলে দুটি উপগ্রহের এলাকাও ভাগ করে নেওয়া দরকার। অনেক ভাবে তা করা যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ একটি লাইন টানা যেতে পারে। লাইনের পূর্বদিকের সমস্ত স্টেশন অন্তর্ভুক্ত হবে একটি উপগ্রহের, লাইনের পশ্চিমদিকের সমস্ত স্টেশন অন্য উপগ্রহের। কিংবা, লাইন টানা যেতে পারে পূব থেকে পশ্চিমে। কিংবা, এমন ব্যবস্থা হতে পারে যে অতি-ব্যস্ত আর্থ্ স্টেশনগুলো একটি উপগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হোক, কর্ম-ব্যস্ত আর্থ্ স্টেশনগুলো অন্য উপগ্রহের।

মনে হতে পারে, ভাগাভাগির ব্যাপারটা বুঝি এতই সাধারণ।

মোটেই নয়। ধরা যাক লাইনটি টানা হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য অংশের সঙ্গে আফ্রিকার দেশগুলির যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপিত হবে ইউরোপের একটি আর্থ্ স্টেশনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, ইউরোপের এই আর্থ্ স্টেশন থেকে যে-কোনো সময়ে আফ্রিকাকে বিশ্বের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যম হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেশন। ইউরোপীয়রা স্বভাবতই চাইবে লাইনটি এমনিভাবে টানা হোক যাতে আফ্রিকা থেকে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগালের বাইরে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রেত হতে পারে না।

কাজেই বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার। উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে কোন দেশের সঙ্গে কোন দেশের কী ধরণের চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে সে-দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

আশা করা চলে, ভারত সরকার সজাগ ও সতর্ক থেকেই বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের উপগ্রহ-ব্যবস্থায় সামিল হচ্ছেন।

নিউক্লিয়র শক্তি উৎপাদনে পাকিস্তান

জাপান ও ভারতের পরে পাকিস্তানও শক্তি-উৎপাদনে নিউক্লিয়র হতে চলেছে। করাচি থেকে ১৫ মাইল পশ্চিমে আরব সাগরের কূলে স্থাপিত হচ্ছে পাকিস্তানের প্রথম নিউক্লিয়র প্লান্ট। নির্মাণকার্য শেষ হবার মুখে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্লান্ট থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়ে যাবে। উৎপাদনের ক্ষমতা ১৩৭ মেগাওআট, নির্মাণের খরচ ৪০ কোটি টাকা, নির্মিত হচ্ছে কানাডার সহায়তায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ পড়বে প্রতি কিলোওআট ঘণ্টায় সাড়ে-চার পয়সা। জ্বালানী হবে ইউরেনিয়ম অক্সাইড।

১৯৭৫ সালের মধ্যে আরো একটি নিউক্লিয় প্লান্ট নির্মিত হতে চলেছে পূর্ব পাকিস্তানের রূপপুরে। এই প্লান্টের জন্যে চুল্লী সরবরাহ করছে বেলজিয়ামের একটি সংস্থা, খরচ দিচ্ছে বেলজিয়ামের কয়েকটি ব্যাঙ্ক। বৈদেশিক মুদ্রায় নির্মাণকার্যের খরচ পাঁচ থেকে সাড়ে-পাঁচ কোটি ডলার। হিসেব অনুসারে রূপপুর প্লান্টে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের খরচ পড়বে কিলোওয়াট-ঘণ্টায় মাত্র সাড়ে-তিন পয়সা।

নিউক্লিয়র শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের নোনা জলকে মিষ্টি জলে পরিণত করার জন্যেও পাকিস্তান আগ্রহী। যুক্তরাজ্যের পরমাণু শক্তি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে। করাচির আশেপাশের এলাকায় এমনিতেই জলের অভাব, তার ওপরে যে-হারে বসতি ও কলকারখানা বাড়ছে তাতে জলের রীতিমতো আকাল দেখা দেবার সম্ভাবনা। করাচির কাছে এমন এলাকাও আছে যেখানে এখনও করাচি থেকে জাহাজে করে জল আসে আর তার জন্যে দাম দিতে হয় প্রতি হাজার গ্যালনে পাঁচশো টাকা। এই চাহিদার কথা মনে রেখেই সমুদ্রের জল থেকে পানীয় জল পাবার জন্যে করাচির কাছে একটি ৬০০ মেগাওআটের নিউক্লিয়র প্লান্ট নির্মাণের কথা হচ্ছে।

পাকিস্তানে এখনো পর্যন্ত শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, (পশ্চিম পাকিস্তানে) জল-বিদ্যুতের কেন্দ্র থেকে, কয়লা ও তেল থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রধানত নির্ভর করতে হয় কয়লা ও তেলের ওপরে। পূর্ব পাকিস্তানের সমতল জমির জন্যে জল-বিদ্যুতের কেন্দ্র না-থাকার মতো। শক্তি উৎপাদনের জন্যে তেল ও কয়লা উভয় পাকিস্তানেই প্রচুর পরিমাণে আমদানী করতে হয়।

পাকিস্তানে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ আছে মোট ২২ মিলিয়ন ঘনফুট (পশ্চিম পাকিস্তানে ১৬-৪, পূর্ব পাকিস্তানে ৫-৫), কয়লা মজুদ আছে প্রায় ১২০০ মিলিয়ন টন। জল-বিদ্যুতের উৎস প্রায় সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ২৫,০০০ মেগাওয়াট। পূর্ব পাকিস্তানে আড়াই-শো মেগাওআটেরও কম। তেল পাওয়া যায় শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে অতি সামান্য পরিমাণে—বছরে ৩-৫ মিলিয়ন ব্যারেল।

হিসেব করে দেখা হয়েছে যদি প্রচলিত পদ্ধতিতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে চলে তাহলে বর্তমান শতক শেষ হবার মুখে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যুতের ঘাটতি পড়বে ১৬,৮০০ মেগাওআট, পূর্ব পাকিস্তানে ১২,০০০ মেগাওআট। নিউক্লিয়র শক্তি এই ঘাটতি পূরণ করবে আশা করা চলে।

তুলনা করলে ভারতের ছবিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতে রয়েছে প্রচুর মজুদ কয়লা, প্রচুর তেল ও প্রচুর জলবিদ্যুতের উৎস। ভারতের নিউক্লিয়র শক্তি উৎপাদনের কর্মসূচীটিও বিরাট। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে তারাপুরে ৪০০ মেগাওআটের নিউক্লিয়র স্টেশনটি পুরোপুরি চালু হয়েছে। একই উৎপাদন-ক্ষমতার আরো দুটি নির্মিত হচ্ছে—একটি রাজস্থান, অপরটি মাদ্রাজে।

একটি ধাঁধা

'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ৫ নভেম্বরের সংখ্যা থেকে একটি ধাঁধা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি। সঠিক জবাব ভেবে রাখুন।

বিচিত্র সাজপোশাক পরে বহু ছেলে-মেয়ে একটি আসরে উপস্থিত। সাজ-পোশাকের এমনই চটক যে কে ছেলে আর কে মেয়ে তা বোঝা যাচ্ছে না। খানিকটা বিরক্ত হয়ে পরস্পরের প্রায় অপরিচিত ছটি মানুষ আসর থেকে বেরিয়ে একটু ফাঁকায় এসে দাঁড়াল। মনে করা যাক এই ছ'জন মানুষ হচ্ছে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ। কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ক (চ-কে) : ঘ মেয়ে

খ (গ-কে) : ঙ আর চ হয় দুজনেই ছেলে কিংবা দুজনেই মেয়ে।

গ (ক-কে) : তুমি যদি ছেলে হও খ মেয়ে, তুমি যদি মেয়ে হও খ ছেলে।

ঘ (ঙ-কে) : এই তো সম্প্রতি ১৮০ মিটার হার্ডলস-এ খ অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

ঙ (খ-কে) : গ মেয়ে

চ (ঘ-কে) : মিকসড ডবল খেলায় আমার রোজকার পার্টনার যদি ছেলে হয় তো গ ছেলে, আমার পার্টনার যদি মেয়ে হয় তো গ মেয়ে।

এই ছ'জনের মধ্যে কোনো মেয়ে যখন কোনো মেয়ের সংগে কথা বলেছে, বা কোনো ছেলে ছেলের সংগে, তখন সত্যি কথা বলেছে। নইলে বলেনি।

এবার ভেবে বলুন এই ছ'জনের মধ্যে কে কী? পরের সংখ্যা 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকা কলকাতায় পৌঁছলেই সঠিক জবাবটি জানিয়ে দেব।

—অয়স্কান্ত

পিঞ্জর

সুভাষ সিংহ
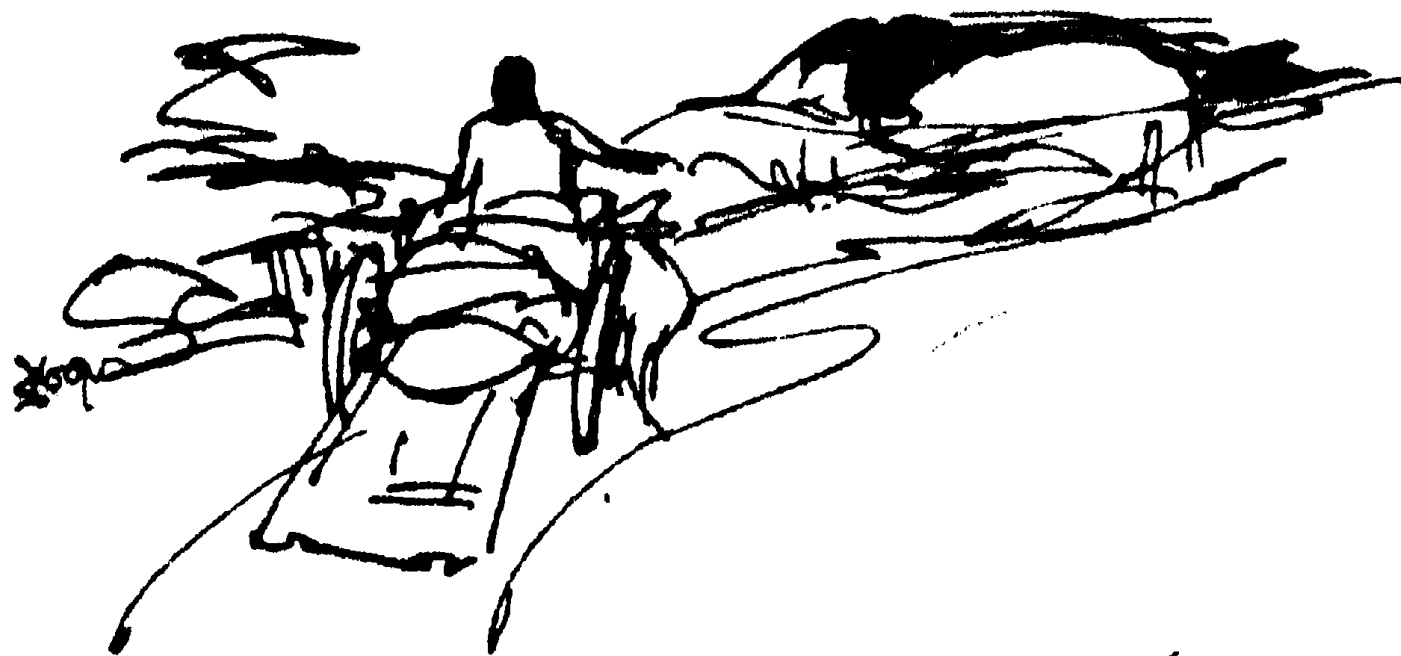
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাশের ঘর ফাঁকা। এদিক-ওদিক তাকাল রজত। ঘরের মধ্যে অঢেল রোদ। বিছানা খালি। আলনা খালি। চোখে পড়ল ড্রেসিং টেবিলের উপর একটা খাম। তাড়াতাড়ি এসে খামটা খুলে এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে। 'আমার খোঁজ করো না। মার কাছে ফিরে যাচ্ছি। যেখানে সম্মান নিয়ে বসবাস করা যাবে না, দিনের পর দিন সেখানে থাকা সম্ভব হলো না। নিজের জন্যে ভাবি না। পল্টু বড় হচ্ছে। ওর কথা ভেবে এই পথ গ্রহণ করতে হলো। ইতি মীরা।'

রজত টলতে-টলতে নিজের ঘরে ফিরে আয়। ধপ করে বিছানায় বসে। একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকে। এ কী সম্ভব? এভাবে মীরা চলে যেতে পারে! এত সাহস হল কোত্থেকে। এ যে দেখছি রীতিমত নাটক। পুরনো পচা নাটক। সম্মান নিয়ে বসবাস সম্ভব হলো না! তাই গৃহত্যাগ। খুব হাসি পেল রজতের। যত সব ন্যাকামি!

ঠিক আছে। দেখা যাবে কতদিন থাকতে পারে। রজত কোনরকম নার্ভাসবোধ করল না। ধীরে-সুস্থে সিগারেট টানল। দাড়ি কাটল। হিটার জ্বেলে চা আর ডিম সেদ্ধ খেয়ে জামা-কাপড় পরে ঘরে তালা লাগিয়ে বাইরে বেরোল। আজ ছুটি। কোথায় যাওয়া যেতে পারে, শিস দিল আপনমনে, সিঁড়ি ভেঙে নীচে অবতরণের সময় মনে হল : অতঃপর যা খুশী সে করে বেড়াতে পারবে, কোন জবাবদিহি থাকবে না, কোন চোখের জল, পিছুটান, সামাজিকতা, পারিবারিক ভদ্রতা ইত্যাদি। ভালই হলো। আবার আগের জীবন সে ফিরে পাবে। রাস্তায় পা দিয়ে বহু দিন পর ওর নিজেকে খুব হাল্কা মনে হলো।

।। তিন ।।

স্লিপ জমা দিয়ে বিনয় লম্বা-লম্বা পা ফেলে বাইরে এল। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে থাকে। সামনে বিরাট সবুজ মাঠ। একটা চারমিনার ধরিয়ে এগোয়। ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা খাবে। মাথা ঝিমঝিম করছে। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। একটা কালো রঙের গাড়ি, পিছনের সিটে বসে এক মহিলা, সুদৃশ্য প্যাকেটে মোড়া খাবার, বোধহয় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল থেকে, একবার তাকিয়ে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। চারিদিকে সবুজের বাহার। সবুজ রঙ নাকি চোখের পক্ষে ভাল। ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্পর্কে, ক্যান্টিনে ঢুকে এক কাপ চা এনে টেবিলের উপর রেখে, চারিদিকে তাকিয়ে বিনয় ভাবল, আর কোন মোহ নেই। অনেক টাকা জমা রেখেও বই পাওয়া যায় না। হয় আউট অফ প্রিন্ট অথবা দাম এত বেশী যে, তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয় না। ডিভ্যালুয়েশনের পর বই-এর দাম আকাশছোঁয়া। কারেন্ট বই তো পাওয়াই যায় না। তবে কী লাভ পয়সা খরচ করে এতদূর আসার!

সে যা ভেবেছে তাই হলো অর্থাৎ মীরা তার বাচ্চাকে নিয়ে চলে এসেছে। শেষ পর্যন্ত থাকতে পারল না। মা কান্নাকাটি করেন। কেঁদে কী হবে। বিনয় জোরে সিগারেটে টান দেয়। চারপাশে আড়চোখে তাকায়। না, পরিচিত কোন মুখ দেখছে না। দু-একজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে এখানে এলে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তারা আবার সাহিত্য-ফাহিত্য নিয়ে কচকচি করে। ভাল লাগে না সাহিত্য শিল্প নিয়ে কচকচি করতে। অন্তত এখন, এই সময়ে, যখন সে একটা গুরুতর চিন্তায় মগ্ন। হ্যাঁ, কেঁদে কী হবে। তুমি চোখের জল ফেললেই কী মা সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! মীরাকে ফিরে যেতে বলেন মা। মীরা স্পষ্ট জানিয়েছে যাবে না। খুলে কিছু বলতে চায় না। মা জেরার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন। বিরক্তির সঙ্গে জবাব দেয় মীরা। বিনয় কোন প্রশ্ন করে নি। সব তার জানা। আশ্চর্য! তার ধারণাই অবশেষে বাস্তবে পরিণত হলো।

একটা ব্যাপার দেখে বিনয় খুশি। মীরার কোন গ্লানি নেই। নেই ছটফটানি। স্বাভাবিক তার ব্যবহার। ভুলেও রজতদার নাম করে না। নিন্দা বা অভিযোগ কোন কিছু না। যেন তার জীবনে রজতদা বলে কোন ব্যক্তি ছিল না কোনদিন। সম্পূর্ণ

নিরভিমান আচরণ মীরার। বলে না, আমাকে দয়া কর। আমি বিতাড়িত, প্রত্যাখ্যাতা। বরং মাথা উঁচু করে জানায় মীরা, আবার সে চাকরী করবে, শুরু করবে নতুনভাবে জীবনকে।

হ্যাঁ, তাই করুক মীরা। নিজের পায়ে দাঁড়াক। সসম্মানে বাঁচতে চেষ্টা করুক। পল্টু রয়েছে, ওর কথাও তো ভাবতে হবে। বিনয় সব রকম সাহায্য করবে। ইতি-মধ্যে মীরা আবার টাইপ স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এবার শুধু টাইপ নয়, সঙ্গে সর্ট-হ্যান্ডও। আজকাল লেডিজ টাইপিস্ট-স্টেনোর বেসরকারী অফিসে, ভাল স্পীড হলে, চেহারাটা ছিমছাম হওয়া চাই, মোটা-মুটি ভদ্র মাইনের একটা চাকরী পাওয়া খুব অসম্ভব ব্যাপার হবে না। পেয়ে যাবে চাকরী। ধৈর্য আর অধ্যবসায় থাকলে কেন হবে না। সবচেয়ে বড় কথা বল মনের জোর। তাহলেই হবে।

ভদ্রবেশী প্রবঞ্চক প্রতারক! প্রথম থেকেই তার সম্মতি ছিল না। কেউ শোনে নি তার কথা। না মা না মীরা। সে চিনত রজতদাকে। তাই ভয় ছিল তারই সবচেয়ে বেশী। হাসপাতালে থাকার সময় অসহায়-ভাবে সে লক্ষ্য করেছে কিভাবে মা আর মীরা, একটু-একটু করে সম্মোহিতের মতো, যেমন করে হরিণ অজগরের নিঃশ্বাসে এগোয়, রজতদার মুঠোর মধ্যে ধরা পড়ে-ছিল। সে কোন বাধা দিতে পারে নি। শুধু নীরব আক্রোশে ফেটে পড়েছে। তখন মা অস্বাভাবিকভাবে বদলে গিয়েছিলেন। মীরাও। তাকে ওরা সহ্য করত না। ভাবত সে ওদের সুখের অন্তরায়। আজ কী মনে হয় তোমাদের? আমাকে তো তোমরা মোটে পাত্তাই দিত না। বরং শত্রু ভাবতো। কিছুই ভুলি নি।

আজ তোমাদের কী মনে হয়? মৃদু হাসল বিনয়। সেদিন আমার কথা খুব কর্কশ ঠেকেছে, তাই না? খুব সামান্য ব্যাপার নয়। তুচ্ছ কারণে মীরা এতটা রিকস নিত না। নিশ্চয়ই বিরোধটা চরম পর্যায়ে গিয়ে উঠেছিল। শেষকালে আর ঘর করতে পারল না, ছেলে কোলে করে এল পালিয়ে। সেই তো পালিয়ে এলি বাপের বাড়ি! কোন ভদ্র মেয়ে ঐ রকম একটা চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে বেশীদিন ঘর করতে পারে না। বছর তিনেক কিভাবে কাটাল মীরা, তাই ভেবে সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। দুশ্চরিত্র একটা মাতালের সঙ্গে!

চারধারে বিচিত্র ধরনের শব্দ। বিনয় একটু কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। কেউ জোরে কথা বলছে, কেউ আস্তে। কেউ মিহিসুরে হাসছে, কেউ উচ্চকণ্ঠে। সব-কিছুই বিচ্ছিন্ন দুর্বোধ্য মনে হলো। আসলে শব্দের কোন মানে নেই। কেমন অর্থহীন হয়ে উঠছে সবকিছু। বিনয় চারিদিকে তাকায় অথচ কোন মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় না। কোন মুখ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না ওর কাছে! দেখতে পায় টেবিলের ওপর কম্পিত আঙুলে। সিগারেট আর ধোঁয়া। এ কার আঙুল!

চামড়া পোড়ার গন্ধে চমকে উঠল বিনয়। বিকৃত মুখে চোখের সামনে আঙুল নিয়ে আসে। বারুদের গন্ধ। বমি আসে ওর। দম বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ। তার পর পায়ে-পায়ে এগিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সুপুরির কয়েকটা ছোট্ট টুকরো মুখে পুরে বেরোতে যাবে, সেই সময় 'বিনয়দা', ভারী মিষ্টি কণ্ঠস্বর, হ্যাঁ, উদ্ভাসিত চোখ-মুখে শেফালী দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আরো দুটি মেয়ে, বোধহয় ওর সহ-পাঠিনী।

—কখন এলে? বিনয় শেফালীর উদ্দেশ্যে সামান্য হেসে বলল, তুমি লাই-ব্রেরীর মেম্বার কোনদিন বলো নি।

—এ আর এমন কি খবর। আসুন পরিচয় করিয়ে দি। বলে অন্য দুটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল। এর নাম নীতা। আর ওর নাম লতিকা। আমার ক্লাসমেট।

তারপর নীতার দিকে একটু ঝুঁকে কিছু বলল শেফালী। বিনয় শুনতে পেল না। ওর সম্পর্কে কিছু বলছে। ওর পরিচয় দিচ্ছে। কী রকম পরিচয় দিল শেফালী?

বিনয় চলে যাবে কিনা ভাবছিল। এখন সে একটু একা থাকতে চায়। শেফালীর বান্ধবীরা আড়চোখে ওকে দেখছিল। এক-বার ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। সে চোখ ঘুরিয়ে নিল।

—চলুন বিনয়দা। এক কাপ চা খান। নাকি আপনার তাড়া আছে?

—তাড়া কীসের। তবে একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। পাঁচটায় লাইব্রেরী বন্ধ হবে। বই পেলে হয়। তুমি কী রিডিং-রুমের মেম্বার?

—হ্যাঁ। শেফালী তার বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে বলল, যা না চার কাপ চায়ের অর্ডার দে।

চা খেতে-খেতে আলাপ করে বিনয়। শেফালীর সঙ্গেই কথা বলছিল বেশি। মাঝে-মাঝে নীতা আর লতিকার সঙ্গে। বেশ সপ্রতিভ ওদের ব্যবহার। কোন জড়তা নেই। সাধারণ চেহারা মেয়ে দুটির। উল্লেখ করার মত বিশেষত্ব কিছু নেই।

একটু পরে ওরা বাইরে এল। বিকেলের রোদ ম্লান হয়ে আসছে। শীতের বিকেল। নীরবে ওরা হাঁটছিল। শেফালীর পাশা-পাশি বিনয়। নীতা আর লতিকা নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কিসব বলছিল। বিনয় একবার আড়চোখে তাকাল শেফালীর দিকে। এখন রোদের রঙ গোলাপী। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল শেফালীকে।

—তুমি এখন কোথায় যাবে? বিনয় স্পষ্ট চোখে তাকাল শেফালীর দিকে, তোমার বান্ধবীদের বিদেয় করে দাও।

—তারপর? শেফালীর মুখে মৃদু হাসি, ওরা কী ভাববে বলুন তো।

—কী আবার ভাববে। বিনয় মৃদুস্বরে বলল, আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। মিনিট পনেরো কি কুড়ি। তারপর দুজনে ঘোরা যাবে।

শেফালী কোন উত্তর দিল না। ও একটু দ্রুত হেঁটে এগোয়। বান্ধবীদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। বিনয় আস্তে-আস্তে হাঁটে। শেফালী যদি তার সঙ্গে যেতে অসম্মতি জানায়, সে হবে বড় অপমানজনক, কোন-দিন চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। কী দরকার ছিল ওকে এসব বলার? যেমন প্রতি-দিন একা কুয়াশা ভেদ করে বাড়ি ফেরে, পায়চারী করে ঘরে, বই পড়ে, এলোমেলো চিন্তায় সময় কেটে যায়; এরকম জীবন-যাত্রায় ক্রমশ অভ্যস্ত, তবে হঠাৎ কেন আজ শেফালীর প্রয়োজন হলো! সে কী এক-ঘেয়েমি থেকে কিছুক্ষণের জন্যে...।

পছন্দ মত বই পেল না বিনয়। হঠাৎ তার বিরক্তি আর রাগে রী-রী করে উঠল সমস্ত শরীর। একটু দূরে ওরা দাঁড়িয়ে। এবার সে বিদায় নেবে। সারি-সারি চেয়ার। প্রকাণ্ড লম্বা হলঘর। মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়নরত নরনারী। যুবক-যুবতীদের সংখ্যা বেশি। অলস দৃষ্টিতে সে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। ওদের আর কত দেরী। শেফালী যাবে কিনা স্পষ্ট করে কিছু বলছে না।

—দেরী হবে কি বেশী? বিনয় সোজা শেফালীর চোখের দিকে তাকাল।

—না। আর পাঁচ মিনিট। একসঙ্গে বেরোব।

একটু দূরে সরে দাঁড়াল বিনয়। কী ভাবল শেফালী কে জানে। একটু অবাক হয়েছে বোধহয়। কোনদিন বলে নি, যদিও তাদের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ সহজ, আর পরস্পরকে চেনে কম দিন হলো না—বলে নি, 'চল একটা সিনেমা দেখে আসি অথবা বেড়িয়ে আসি।' বলবে কি, বাইরে পরস্পরের দেখা হয়েছে কম, আর দেখা হলে একটু হাসি, দু-চারটে কথাবার্তা, এর বেশি কিছু নয়। কারণ বিনয় খুব একটা উৎসাহবোধ করে নি। তবে ভয়, পরিচয় একটু গভীর হলে, সে শেফালীকে নিশ্চয়ই বিছানায় পেতে চাইবে, আর কে না জানে বিছানা মানে ধর্মসাক্ষী করে পবিত্র বিবাহ! শেফালী আর যাই হোক সেই ধরনের মেয়ে নয় যাদের কিছু অর্থের বিনিময়ে বিছানায় টেনে তোলা যায়।

—চলুন।

বাসস্টপে পৌঁছে শেফালীকে তার বান্ধবীরা বিদায় জানায়। হাত তুলে ওদের নমস্কার করল বিনয়। এসব ফর্মালিটি ভাল লাগে না। ওরা অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে। ওদের মুখের চাপা হাসি টের পেয়েছে বিনয়। আস্তে-আস্তে বাঁদিকের মোড়ে নীতা আর লতিকা অদৃশ্য হয়ে যায়।

শেফালীর দিকে তাকাল বিনয়। অন্য দিকে তাকিয়ে। হাতে একটা বই। পরনে ছাপা শাড়ি। হলুদ রঙের ব্লাউজ। ফর্সা রঙে যা পরে তাই মানায়। আজ একটু বিশেষ কায়দায় মাথার চুল বেঁধেছে। দু

হাত খালি। শুধু ডান হাতে ঘড়ি। দু কানে রিং। কথা বলার সময় দোলে। এক নজরে এসব চোখে পড়ল বিনয়ের। এসেছে তাহলে শেফালী। শুধু খানিকটা সময় ওকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল।

—দেখুন কী ভিড় বিনয়দা।

গল-গল করে ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে যায় বাসটা। আরো অনেকে স্টপেজে দাঁড়িয়ে। একটু পর অফিস ছুটি হবে। পঙ্গপালের মত নরনারী ছুটে আসবে। ঠেলাঠেলি, চিৎকার, কলহ...।

চিৎকার করে ডাকল বিনয়, ট্যাকসী!

একটু দূরে গিয়ে ট্যাকসীটা থামে। 'তাড়াতাড়ি চলো শেফালী। নইলে অন্য কেউ...।' বিনয় একরকম ছুটে গিয়ে খপ করে হাতল ধরে। তারপর শেফালী সীটে বসলে সে সামনের সীটে বসবে না পিছনের সীটে বসবে এই সব দ্রুত চিন্তা, ড্রাইভারের মিটার পাল্টানোর 'টুং' শব্দে সামান্য চমকে এবং চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে এমনি চোখ-মুখের ভাব ও হাসি হাসি, ভিতরে ঢুকে নরম গদির উপর দেহ এলিয়ে মিনিট খানেক চোখ বুজে রইল।

—বিনয়দা!

—কি? চোখ খুলল বিনয়। না, কোন সংকোচ অথবা ভীতির কিছু নেই। নেই কোন জড়তা। সহজ তাকানো। সত্যি, এখন মনে হচ্ছে, শেফালীকে নিয়ে কোথায় সে ঘুরবে। কোথায় সে যেতে পারে? হোটেলে অথবা রেস্টুরেন্টে কি কোন পার্কে, গাছের নীচে আবছায়া অন্ধকারে পাশাপাশি বসা, চীনেবাদাম ভাঙার পট-পট শব্দ, শিস আর অশ্লীল হাসি অথবা অন্ধকার প্রেক্ষাগারে বাহুতে বাহু স্পর্শ। দোহাই এসব সে কিছুই চায় না। ভাল লাগে না। তবে কেন মিছিমিছি আটকে রাখল শেফালীকে।

—কোথায় যাবেন? শেফালী বাইরের দিকে একবার তাকায়।

—তুমিই বলো।

—বাঃ আমি কী বলবো! একটু ভেবে নিল শেফালী। তারপর হাসল, বাড়ি চলুন। দেরী হলে আপনার মা হয়তো ভাববেন।

—ভাববেন না। বলবো তোমার সঙ্গে ছিলাম। তোমাকে মা খুব ভালবাসেন।

—জানি।

—আর কী জান? বিনয় সোজা হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া বাইরে ছেড়ে দিল। গাড়ি সবেগে ছুটে চলেছে। বাঁদিকে আলোকের মালা। গ্রান্ড হোটেল। এখন মনে হচ্ছে সে যেন লণ্ডনের রাজপথে। এমনি চোখ ঝলসানো আলো অথবা এর চেয়ে বেশি এমনি সারি-সারি মোটর যান। সুসজ্জিত নরনারীর মিছিল, হোটেল, বার নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়।

বিনয় বলল, জান শেফালী, মা তোমার খুব প্রশংসা করেন। মনে হয় তোমাকে চিরদিন কাছে পেলে মা সুখী হবেন। আর মাকে সুখী দেখলে আর কিছু চাই না আমি। অনেক দুঃখ পেয়েছেন—আর কাঁদনই যা বাঁচবেন!

কোন কিছু ভেবে একথা বলে নি বিনয়। হঠাৎ মনে হতেই মুখ ফসকে যেন কথাটা বেরিয়ে যায়। শেফালী বাইরে তাকিয়ে। ওর কথার অন্য রকম অর্থ করল না তো? মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একটা কিছু উত্তরের প্রত্যাশা সে করেছিল বোধকরি। কিন্তু শেফালী নীরব। কি ভাবছে মনে-মনে কে জানে।

দ্রুত একটা কথা মনে পড়ল বিনয়ের। শেফালীকে বিয়ে করলে কেমন হয়! মা সুখী হবেন। আর সে নিজে? শেফালীর মনোভাব আন্দাজ করতে পারে। বোধহয় আপত্তি করবে না। কারণ ও কি আর কিছুই টের পায় নি? ওর মা-বাবার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই জানে। এত সব জানার পর, অসম্মতি থাকলে, ঘন-ঘন ওদের ঘরে আসতো না, ওর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতো। যদিও তারা পরস্পরকে ভাষার মাধ্যমে কখনো প্রেম নিবেদন করে নি, তবু এটা ঠিক একে অন্যকে পছন্দ করে, মিলিত হতে চায়। এ কী তার কল্পনা? যদি তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়? যদি ইতিমধ্যেই শেফালী অন্য কাউকে...।

—ঘুমিয়ে পড়লেন না কি বিনয়দা?

—না। একটা কথা ভাবছিলাম।

—আপনি যে ভাবুকে তা জানি। কী ভাবছিলেন বলবো?

মুচকি হাসল শেফালী। বিনয়দা গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতে সে এই প্রথম সামান্য সংকোচ আর লজ্জায় মাথা নীচু করল।

—বলো, কী ভাবছিলাম শেফালী। দেখি তুমি থটরিডিং জান কিনা।

—ভাবছিলেন একটা সাধারণ মেয়ের সঙ্গে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল।

বিনয় একটু জোরে হাসল, যাঃ কি যে বলো! পারলে না বলতে। আমাকে কী ভাব শেফালী, জানি না। তোমার ঠাট্টাও চমৎকার। যাক এবার বল, তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে?

—খুব ভাল নয়। চেষ্টা তো কম করছি না। ভাল রেজাল্ট করতে পারব কিনা জানি না।

—তুমি মাঝে-মাঝে সন্ধ্যের দিকে আসবে। যতটা পারি সাহায্য করব।

শেফালীর মুখ পলকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও হঠাৎ একটা হাত চেপে ধরে বিনয়ের, আপনি একটু সাহায্য করলে অনেক ভরসা পাই।

বিনয় মৃদু হাসল। এভাবে কোন দিন কেউ তার উপর নির্ভরশীল হতে চায় নি, না পুরুষ না রমণী। আর শেফালী তো জ্বলজ্যান্ত তন্বী এক যুবতী। চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ।

গলির মুখে ট্যাকসী থামলে মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দেয় বিনয়। একটু দূরে শেফালী দাঁড়িয়ে। ঘড়ি দেখল সে। প্রায় আটটা। একটু দূরত্ব বজায় রেখে শেফালী হাঁটছে। গ্যাসের মৃদু আলোয় শেফালীর মুখ দেখার চেষ্টা করল বিনয়। দূর থেকে জাহাজের সিটি শুনতে পেল। এখন একটু গঙ্গার ঘাটে গেলে কেমন হয়। পাশাপাশি শেফালীর সঙ্গে বসবে। দেখবে পূর্ণিমার চাঁদ কিভাবে চুইয়ে-চুইয়ে নদীর জলে মিশে যাচ্ছে। দেখবে রুপোলী ঢেউ। ছোট-ছোট নৌকো দুলে-দুলে চলছে। মাঝিদের উদাত্ত কণ্ঠে গান। ঝিরঝির করে হাওয়া।

—চলি বিনয়দা।

চমকে তাকাল বিনয়। শেফালী দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে। সে এক পলক দেখল। তারপর মন্থরভাবে সিঁড়ি ভাঙ্গতে শুরু করল। বিরাট বাড়ি। অসংখ্য ফ্ল্যাট। অসংখ্য মানুষের চিৎকার, গান, হৈ-হুল্লোড়। কোনকিছু স্পষ্ট নয়। সব তালগোল পাকানো। বিশৃঙ্খল। কোথায় শৃঙ্খলতা? কোথায় নির্জনতা?

।। চার ।।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে কাজল টানে মীরা। পাউডারের পাফটা ঘাড়ে গলায় বুকে ঘষে। চিরুনির উল্টো পিঠ দিয়ে সিঁথির মাঝখানে সামান্য সিঁদুরের স্পর্শ লাগাতে গিয়ে থমকে গেল। খানিকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবল। তারপর হাত নেমে আসে। পিছন ফিরে তাকাল। পল্টু ঘুমিয়ে। হাতঘড়ি দেখল। প্রায় দুটো। আর দেরী করা যায় না। আড়াইটে থেকে ক্লাস। সাড়ে চারটা পর্যন্ত। ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে ঝুঁকে পল্টুর কপালে চুমু খেল।

রান্নাঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে মীরা আস্তে-আস্তে বলল, যাচ্ছি মা।

নীহার এক পলক তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যান। স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ। এ কী অনাসৃষ্টি! কোনকিছু তাঁর নজর এড়ায় নি। অনেক দিন যাবৎ লক্ষ্য করছিলেন। একটু-একটু করে সিঁথির সিঁদুর অস্পষ্ট হয়ে আসছিল; মীরার আচার-আচরণকে কিছুতেই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এখনও পারছেন না। কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করে না। তাঁর ভূমিকা কী শুধু নীরব দর্শকের?

—শোন। এভাবে পথে বেরোস না। তোরা কী কিছুই মানিস না? ধর্ম-অধর্ম বলে কিছু কী নেই? ছি-ছি-ছি! নীহারের মুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠে।

মীরার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। আস্তে অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, মিথ্যে একটা সম্পর্কের বোঝা টেনে লাভ কি মা! তুমি এ নিয়ে বেশি ভেবো না।

—তা ভাববো কেন? তোমরা ছেলেমেয়ে যে যা খুশি করে বেড়াবে চোখের সামনে সব দেখেও অন্ধের মত থাকবো। তোরা কী আমাকে মানুষ হিসেবে দেখিস না?

—আঃ চুপ করো মা! মীরা সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমরা বড় হয়েছি। আমাদের আর কতদিন তুমি আগলে রাখবে। এখন আর কোন কথা শুনবো না! দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—এভাবে বেরোবি? যদি হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

—কী আর হবে। সব সম্পর্ক তো চুকিয়ে এসেছি মা। দোহাই তোমার চুপ করো! তুমি যদি এভাবে প্রত্যেকটি কাজে আমাক বাধা দাও, তাহলে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। তুমি যা চাইছো কিছুতেই তা হতে পারে না। কতদিন বলেছি এসব কথা তোমাকে। কেন আমার পিছনে লেগে আছ?

চোখের জল কোনমতে চেপে মীরা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসে। তরতর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামে। বিরাট চাতাল পেরিয়ে রাস্তায় পা দেয়। হন্‌-হন্‌ করে হাটতে থাকে। কোনদিকে তাকায় না।

এখানে আসার পর থেকেই রোজ-রোজ এক কথা শুনতে-শুনতে কান ঝালপালা হয়ে গেল মীরার। মার মুখে এখনও রজতের প্রশংসা লেগে রয়েছে। ভেবে হাসি পেল মীরার। মার ধারণা সব দোষ তার। সেই মানিয়ে চলতে পারে নি। অত তেজ দেখিয়ে চলে আসা উচিত হয় নি। পতি পরম গুরু! অতএব তার চরম অত্যাচার সহ্য করেও পায়ের নীচে পড়ে থাকতে হবে। কারণ তাই ধর্ম। মেয়েদের সহ্য

করতে হয়। কেন সীতাকে কী পরীক্ষা দিতে হয় নি? আদর্শ সীতা সাবিত্রী। বহুদিন এসব শুনিয়েছেন মা।

হাতঘড়ি দেখল মীরা। এখনো দশ মিনিট আছে। ইস লেট হয়ে যাবে! শোভাবাজারের মোড়ে পেঁছে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করতে হলো না। সঙ্গে-সঙ্গে পেয়ে গেল। সীটে বসে বটুয়া থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। টিকিট চাইলে মান্থলী আছে জানাল। তবু দেখতে চাইল কন্ডাকটটার। এই দ্যাখ বাপু। চোখের সামনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মেলে ধরল সে। হ্যাঁ, মার সঙ্গে খিটমিট লেগেই রয়েছে। দেখতে-দেখতে কয়েকটা মাস পেরিয়ে গেছে। পল্টু এই সামনের মাসে তিন বছরে পড়বে। বড় কথা শিখেছে ছেলেটা। মাঝে-মাঝে রজতের কথা বলে। তখন অস্বস্তি বোধ করে মীরা। ছিঃ দুষ্টুমী করে না। তোমার বাবা অনেক দূরে গেছে। লক্ষ্মী সোনা আমার। এই তো আমি। বুকে চেপে ধরলেও কাঁপুনি কী সহজে থামে!

প্রথম প্রথম অস্পষ্ট এক ধরনের আশঙ্কায় মুষড়ে থাকত মীরা। রাস্তায় ভীড়ের মধ্যে হাঁটার সময় সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকাত। হঠাৎ হয়ত রজত সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। প্রশ্ন করতে পারেঃ কেন চলে এসেছো মীরা? ফিরে চলো। বলে হয়ত হাত চেপে ধরতে পারে। লোকজন জড়ো হয়ে যেত। নানারকম প্রশ্ন, বিরক্তিকর মন্তব্য, এসব ভেবে অনেকদিন গায়ে কাঁটা দিয়েছে মীরার। অন্য আর এক ধরনের সম্ভাবনার কথাও সে ভেবেছে। ফট করে রজত তাদের বাড়ি চলে আসতে পারে। মার কাছে গিয়ে নালিশ জানাতে পারেঃ দেখুন, আপনার মেয়ে না বলে চলে এসেছে। ওকে বলুন ফিরে যেতে।

না, এসব কিছুই হয়নি। রজত আসেনি। আসবে কিনা তা সে জানে না। কৌতূহলও নেই। আসলেও সে তো আর যেত না। হাড়ে হাড়ে চিনেছে রজতকে। ভদ্রবেশী প্রবঞ্চক শয়তান! নিছক দয়া বা করুণার ওপর সে বাঁচতে চায় না। মিথ্যে স্বামী-স্ত্রীর ভান করে একত্রে বসবাস করা কেন! তার চেয়ে সেপারেশান ভাল। তুমি থাক তোমার পছন্দমত জীবন নিয়ে। যত খুশি বেলেল্লাপনা মদ্যপান কর। রমণীদের নিয়ে স্ফূর্তি কর। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। তোমার অস্তিত্বকে আমি অস্বীকার করি।

তবুও সব সম্পর্ক তো শেষ হয়নি। আইনের চোখে এখনও ঐ লোকটা তার স্বামী। আইনের জোরে যদি রজত অধিকার খাটাতে আসে। তখন? এদিকটাও ভেবেছে মীরা। বেশ, এসে দ্যাখ, মজাটা টের পাবে। তোমার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনবো আদালতে। সব কীর্তি ফাঁস করে দেব। ভেবেছো কিছুই জানি না। সব জানি। তোমার সব কীর্তিকলাপের খবর রাখি। অতএব জোর-জুলুম করে লাভ হবে না কিছু।

হাতিবাগানের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে মীরা দ্রুত হাঁটতে থাকে। কেন যে এসব বাজে চিন্তায় ভেবে মরছে। তার সামনে কত কাজ। শিগ্‌গির একটা চাকরী জোটাতে হবে। যা কিছু ভবিষ্যৎ পল্টুকে ঘিরে। একটু একটু করে বড় হবে তার ছেলে। মানুষ করতে হবে।

আর কতদিন সে চাকরীর জন্যে অপেক্ষা করবে? টাইপের স্পীডও প্রায় চল্লিশ। আসলে শুধু টাইপে হবে না, শর্ট-হ্যান্ডটা ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। এখন ডিকটেশন নিচ্ছে। ছমাসে আশি স্পীড। চাকরী পেতে হলে অন্তত একশ স্পীড দরকার। আরও বেশি হলে ভাল। বিশেষ করে বেসরকারী অফিসে বেশি স্পীড চায়। ইংরেজী জানা দরকার। অনর্গল বলার অভ্যেস থাকা চাই।

দাদা বলে, কিছু ভাবিস না মীরা। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। ইংরেজী খবর কাগজ নিয়মিত পড়। আমি মাঝে মাঝে ডিকটেশন দেব।'

বিনয়ের আশ্বাস অনেকখানি মীরার কাছে। পল্টুকে খুব ভালবাসে দাদা। এখনও বিয়ে করল না। ঐ মেয়েটা আজকাল প্রায় রোজ সন্ধের দিকে আসে। তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকে। কী যেন নাম। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। নামটা বেশ মিষ্টি। শেফালী। শুধু কী নাম। চেহারাটাও মিষ্টি। শিক্ষিতা মেয়ে। সামনের বছর এম-এ পরীক্ষা দেবে। প্রেম-ট্রেম কিনা বুঝতে পারছে না। বিয়ে করুক না মেয়েটিকে দাদা। একদিন সুযোগও তুলতে হবে কথাটা। দাদার মনোভাব কী বোঝা যাবে। বয়স তো কম হল না। আর কতদিন এমন ছন্নছাড়া জীবন কাটাবে?

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল মীরা। ঘরে ঢোকার আগে জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দখল। হ্যাঁ, মাস্টারমশাই ডিকটেশন দিচ্ছেন। জনা পাঁচ-ছয় ছেলে-মেয়ে ঘাড় নীচু করে খাতার ওপর ঝুঁকে।

সসঙ্কোচে একটা মেয়ের পাশে বেঞ্চির ওপর বসল মীরা। মাস্টার ইসারায় তাকে ডিকটেশন নিতে বললেন। পাশে বসা মেয়েটি, ফর্সা চশমা পরা, বছর কুড়ি-বাইশ হবে, নামটা মনে পড়লঃ রত্না—মুখ তুলে মুচকি হাসল। মেয়েটির সঙ্গে অল্প কয়েকদিন হল আলাপ হয়েছে। এখানে আসার আগে অন্য একটি স্কুলে শর্টহ্যান্ড শিখত রত্না।

—অত তন্ময় হয়ে কী ভাবছেন মীরাদি? চোখ-মুখের এক বিশেষ ভঙ্গী করে রত্না হাসল। বলল, আসুন একটু চা খাওয়া যাক।

এক কথায় মীরা রাজী। এর আগেও কয়েকদিন রত্না অনুরোধ করেছে। সে কৌশলে এড়িয়ে গেছে। সব রকম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। রত্নার কৌতূহলী দৃষ্টি সে লক্ষ্য করল। বারবার সিঁথির দিকে তাকাচ্ছে।

পর্দা ঘেরা কেবিনে ওরা মুখোমুখি বসল। চা খেতে খেতে টুকটাক কথাবার্তা হয় দুজনের মধ্যে। কথা বলছিল রত্নাই বেশি। সাবধানে জবাব দিচ্ছিল মীরা। বলা যায় না কখন অসতর্ক মুহূর্তে মুখ ফসকে রজতের কথা বলে ফেলে।

তাই এখন বেশি পরিচিত হতে চায় না মীরা। নিতান্ত সৌজন্য প্রকাশ, দেখা হলে দু-একটি কথার বিনিময়। এর বেশি অগ্রসর হয় না। অতীতকে সে ভুলতে চায়। তার সামনে এখন নতুন জীবন। অতএব নতুন-ভাবেই তার পরিচয় সুরু হোক।

রত্নার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে মীরা ট্রামে ওঠে। ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায়। অফিস ফেরত যাত্রী বোঝাই সমস্ত ট্রাম। লেডিজ সিটের সামনে গিয়ে দেখল একটাও খালি নেই। পুরুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখে কে বলবে তিন বছরের বাচ্চার মা! ভাববে পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী এক তন্বী যুবতী। যে যা খুশী ভাবুক। ফিক করে হাসল মীরা। রীতিমত রোমাঞ্চ। যেন সে ছদ্মবেশ ধারণ করে গোপন জীবনযাপন করছে!

গন্তব্য স্থানে পেঁছে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল মীরা। রাস্তায় দোকানে, সর্বত্র আলোর মালা। তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে সে। একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ায়। বিস্কুট আর চকোলেট কিনল। রোজ নিয়ে যেতে হয়। দোকানীকে পয়সা দিয়ে চলতে সুরু করে। ফিরলেই পল্টু কান্নাকাটি সুরু করবে। তখন বিস্কুট চকোলেট এগিয়ে ধরলে কান্না থেমে যায়। সব চালাকি! আপনমনে ফিক করে হাসল মীরা। তারপর গোপনে এদিক-ওদিক তাকাল। কেউ তাকে দেখছে না।

এখানে আসার পর একটা টিউশোনী সুরু করেছে। তিনতলায় থাকে ছাত্রী। সকালের দিকে ঘণ্টা দেড়েক পড়ায়। অনেক স্বস্তি পেয়েছে টিউশানী পেয়ে। দোতলা থেকে তিনতলা উঠতে যেটুকু সময় লাগে। এছাড়া নিরিবিলি সংসার। স্বামী-স্ত্রী আর একটি মেয়ে।

কারো মুখাপেক্ষী সে হতে চায় না। সে ভাই হোক আর স্বামী হোক। একটা চাকরী জোগাড় করতে পারলে তার আর পল্টুর খরচ সে বিনয়ের হাতে তুলে দেবে। দাদা নিতে না চাইলেও সে জোর করে দেবে। কোন অনুগ্রহ নয়, সসম্মানে বাঁচতে চায়।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় মীরা টের পেল এই বিরাট বাড়ির খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে—চারিদিকে মিশ্রিত কোলাহলের ক্ষীণ রেশ ভেসে আসছে। এক মুহূর্ত মাত্র থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর পদশব্দে চমকে

উঠে তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে দরোজার কাছে এসে কড়া নাড়ল।

প্রতিদিনের মত আজও মা দরোজা খুলে দেন। আজ তাঁর মুখ গম্ভীর ও থমথমে। একবার মীরার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকেন।

মনে মনে হাসল মীরা। তারপর দাদার ঘরের দিকে এগোয়। ভিতরে ঢোকবার আগে আপনা থেকেই শ্লথ হয়ে আসে তার গতি। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলের দু'দিকে দাদা আর শেফালী মাথা নীচু করে বসে। শেফালীর পিঠ ঘেঁষে পল্টু দাঁড়ানো। বড় বড় চোখে ওদের দিক তাকিয়ে।

চটি জুতোর সামান্য শব্দ করে মীরা মৃদু স্বরে ডাকল, পল্টু সোনা! দ্যাখ, তোমার জন্যে কী এনেছি।

শেফালী পিছন ফিরে তাকাল। একটু সলজ্জ ছাপ চোখ মুখে। আড়চোখে একবার বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন মীরাদি। জানেন, আজ পল্টু একটুও দুষ্টুমী করেনি। আমার কথা খুব শোনে।

ততক্ষণে পল্টু ছুটে এসে মীরাকে জড়িয়ে ধরেছে। মীরা পল্টুকে কোলে তুলে নেয়। বিস্কুট চকোলেট দেয়। তারপর হেসে বলে, একটু ভয় যা মামাকেই। দাদা, চা খাবে?

—নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। বিনয় মৃদু হাসল, মা খুব রেগে আছেন মনে হলো। কী করেছিস?

—ও কিছু নয়। যাই চা নিয়ে আসি।

সরে আসে মীরা। দাদার কোন কান্ডজ্ঞান নেই। শেফালীর সামনে সংসারের ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে তার ভীষণ আপত্তি। যতই অন্তরঙ্গতা থাক দাদার সঙ্গে, তবু শেফালী এখনও বাইরের লোক। ওরা দুজনে মাথা নীচু করে কী ভাবছিল? নাকি নীরব ভাষায় পরস্পরকে প্রেম নিবেদন করছিল?

পল্টু অনর্গল কথা বলছিল। মাঝে মাঝে চিৎকার। মীরা ধমকের সুরে বলে, ফের দুষ্টুমী সুরু করেছো! চুপ করো। তোমার কোন কথা শুনবো না। দুষ্টু কোথাকার!

কেঁদে উঠলে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে মীরা। তারপর রান্নাঘরের দিকে এগোয়। মা চিরটা কাল কী নিজের জেদের বশে চলবেন? তাঁর মনোমত কোনকিছু না হলেই মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। কথা বন্ধ। ফলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি।

কিছু ভাল লাগে না! ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মীরা। পল্টুর ফোঁপানী থেমেছে। দু'চোখ বুজে আসছে। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। পরে ডেকে খাওয়াবে। হাঙ্গামা হবে আর কি।

কতদিন বলেছে মাকে, 'তুমি বিশ্রাম কর। রান্নাবান্না সব আমিই দেখবো।' কিন্তু শুনতে চান না মা। যেন রান্নাঘর তাঁর সাম্রাজ্য। সেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার সহ্য করবেন না। এছাড়া কী! তুমি মা, আগের দিন ভুলে যাও। এখন তোমার অন্যায় আব্দার মানবো না।

—মা!

পর পর কয়েকবার ডাকল মীরা। মা উনুনের সামনে চুপচাপ বসে। একবার পিছন ফিরে মেয়েকে দেখলেন। পরক্ষণেই চোখ ঘুরিয়ে নেন। তীব্র বিদ্বেষে মনটা বিষিয়ে ওঠে মীরার। এমন করলে কতদিন এখানে থাকতে পারবে তা সে জানে না। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তাও টগবগ করে ফুটছে। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। আর টের পেল বুকের ভিতর ঢিবঢিব শব্দ। এবং একটা অসহ্য জ্বালা।

—তুমি ওঠ মা। আমি রান্না করছি।

—থাক! আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।

—মা! মীরা আহতকণ্ঠে বলল, কেন এমন ব্যবহার করছো আমার সঙ্গে। কী অপরাধ করেছি?

—তোমরা সবাই ভাল। মন্দ শুধু আমি।

আর কথা বাড়াবার প্রবৃত্তি হলো না মীরার। এখন কথা বলা মানে পরস্পরকে আক্রমণ করা। কুৎসিত ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। শেফালী শুনলে ভাববে কী!

—দাদা চা-এর কথা বলেছে। মীরা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সোজা গিয়ে ঢোকে শোবার ঘরে। পল্টুর পাশে শুয়ে পড়ে। শাড়ি-ব্লাউজ পাল্টাবার কথা ভুলে বিক্ষিপ্ত মেজাজ নিয়ে সে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

নীহার দু'কাপ চা টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে আসছিলেন। বিনয় বলল, মীরা কোথায়?

—জানি না। নিস্পৃহ উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

বিনয় হেসে তাকাল শেফালীর দিকে, চা খাও। এখনো মার রাগ কমেনি।

—কার উপর রাগলেন? বলে পরক্ষণেই শেফালী ভাবল তার হয়তো কথাটা জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি।

—কখনো আমার উপর রাগেন, কখনো মীরা। কারণ কী জিজ্ঞেস করো না। অধিকাংশ সময়ই কোন নির্দিষ্ট কারণ থাকে না। মা যুক্তি মানেন না। আবেগকে আশ্রয় করে চলেন। ফলে গন্ডগোল। তুলকালাম কান্ড ঘটে যায়।

শেফালী নীরবে শুনল। এদের পারিবারিক ব্যাপারে তার বলবার কিছু নেই। বলাও উচিত নয়।

সে কিছুটা শুনেছে। স্বামীর সঙ্গে মীরার বিচ্ছেদ, ছেলেকে সঙ্গে করে এখানে চলে আসা, টাইপ সর্ট-হ্যান্ড শেখা, চাকরীর চেষ্টা করা ইত্যাদি। বিনয়দা বলেছে। শুনতে চায়নি সে। এসব শুনতে তার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে ভাবে কেন এমন হয়? সংসারে এত অন্যায়, এত অবিচার কেন? সুখে থাকার জন্যে এত চেষ্টা নরনারীর, তবু তাদের বিচ্ছেদ হয়, তারা নিজেদের অসুখী মনে করে। ব্যাপারটা রীতিমত জটিল তার কাছে।

—কী ভাবছো শেফালী?

—কিছু না। সোজাসুজি তাকায় বিনয়দার দিকে। বিনয়দা যখন পড়ায়, সে নতচোখে শোনে। তবু সে টের পায় তার মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকা দুটি ব্যগ্র চোখের অস্তিত্ব। তখন সে অনুভব করে মৃদু কম্পন সমস্ত শরীরে। মনে হয় পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। বুকে ঢিবঢিব শব্দ। স্বীকার করতে লজ্জা হয়। তবু মনে হয় বিনয়দাকে সে......। ছি!

—চলো একটু গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি।

—এখন? শেফালী অবাক দৃষ্টিতে তাকায়, ছি! মাসিমা কী ভাববেন বলুন তো।

খানিকক্ষণ দেখল বিনয়দাকে। মুখে মৃদু হাসি। মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঠেকে ওর ব্যবহার। ইদানীং কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে যে আভাষ সে দেখতে পেয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। ভাবতেই শেফালীর সমস্ত দেহে ভূমিকম্প ঘটে যায়!

টেবিলের তলা দিয়ে কোলের উপর রাখা শেফালীর একটা হাত বিনয় মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে নিল। টের পেল থর থর করে কাঁপছে শেফালীর হাত। হেসে বলল, মা কিছু ভাববেন না। বরং খুশি হবেন।

—কেন? ভান করল শেফালী। সব সে জানে। জানে মা-বাবার মনোভাব। জানে মাসীমা কী চান। ইদানীং অনুভব করছে বিনয়দারও কিছু চাওয়ার আছে। সে কী এসব চায় না? যেন ঘুমের মধ্যে কে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। ফলে বিভ্রান্ত সে।

চাপাকণ্ঠে শেফালী বলল, হাত ছাড়ুন বিনয়দা। মাসিমা এসে পড়তে পারেন।

—আসুক। বিনয়ের তেমনি হাসিমুখ, দেখে তাঁর রাত্রের ঘুম আরও ভাল হবে।

—কেন? নিরীহকণ্ঠে শেফালী প্রশ্ন করল। বেশ ভাল লাগছে এরকম ছলনার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু স্পষ্ট হওয়া ভাল নয়। তাই বিনয়দা যখন আকার-ইঙ্গিতে অনেক কথা বলতে চায়, সে না-বোঝার ভান করে। যদিও ভালভাবে জানে তার এই ছলনা বা ভান সব টের পায় বিনয়দা।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

যখন শিশুরা খেতে চায় না

মায়ের আকাঙ্ক্ষা, সুস্থ-সবল এবং বলিষ্ঠ সন্তান। সন্তান ধারণের পর থেকেই হবু মায়ের মনে এই চিন্তা ঘোরাফেরা করে। যতদিন না সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ততদিন একই ভাবনা। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারে কোন বেবিফুডের বিজ্ঞাপনে নাদুশ-নুদুশ শিশুকে দেখে তিনি মনে মনে কল্পনা করেন, এমনি সন্তান তার ঘরও আলো করবে। সন্তানবতী রমণীর এছাড়া দ্বিতীয় চিন্তা নেই।

পরিপূর্ণ লগ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের চেয়ে সুখী বোধ হয় আর কেউ নেই। এবারে তাঁর ভাবনা মোড় নেয়। সন্তান দেখে চোখ জুড়িয়েছে। সন্তানকে মানুষ করে তোলাই এখন প্রশ্ন। সেই প্রশ্নেরও তিনি একটা সমাধান করে ফেলেন মনে মনে। এসব তাঁকে খুব একটা শিখিয়ে দিতে হয় না। সন্তান পেটে আসার পর থেকেই একে ঘিরে তার স্বপ্নের আনাগোনা। আর এখন তো পুরোপুরি মাতৃত্বের মহিমা। নিজের সন্তানকে মানুষ করার আনন্দে তিনি মশগুল। তারপর ঠেকাতে বুড়ী শাশুড়ী তো আছেনই।

রুটিন ঠিক হয়ে গেছে। সন্তান পরিচর্যার দায়িত্ব মায়ের নিজের হাতেই। নিয়নিত চান। ঘড়ি ধরে খাওয়ানো। ত্রুটি-বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র ফাকফোকর নেই। শিশু দিব্যি হেসে খেলে বড় হচ্ছে। মায়ের আনন্দ আর ধরে না। দু-দিন পরেই শিশু পৃথিবীর পাঠশালায় হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অবাধে নিজের জায়গা করে নেবে। একদণ্ড সুস্থির হয়ে চোখ বুজলে মা সেই স্বপ্ন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন। আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে সবাইকে অংশীদার করেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে বড় গোল বাঁধে। সময় মতো চলা। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে। তবু খাবার সময় সে বড় বেঁকে বসে। খেতে চায় না। তার হাজার বায়না মা পূরণ করতে রাজি। এমন কি আকাশের চাঁদ ধরে দিতেও পেছপা নন। শিশু তাতেও বাগ মানে না। সে যেন জেদ ধরেছে, কিছুতেই খাবে না এবার মাও প্রসঙ্গ বদলান। রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়া এসে উপস্থিত হল। শিশুকে গল্পে গল্পে নিয়ে হাজির করেন অচিনদেশের রাজকুমারীর কাছে। সেখানে রাক্ষস-খোক্কস। এবার শিশুর মন গলে। খেতে রাজী হয়। অথচ মায়ের চালাকির কাছে হেরে গিয়ে দেখে যে সবটুকু খাবার কখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

এক-একদিন সব চেষ্টাই ব্যর্থ। মায়ের কোন কায়দাই আর খাটে না। সে খেতে একদম নারাজ। মা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। মিষ্টিকথায় কাজ না হলে তিনি আসল ওষুধে হাত বাড়ান। এক ঘা বসিয়ে দেন শিশুর পিঠে। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে পাড়া মাথায় করে খেয়ে নেয়। আর সে তো খাওয়া নয় জোর করে গেলানো।

মায়ের জেদ জিতে যায়। খেয়ে তবে নিষ্কৃতি। খাওয়া দেখলেই অরুচি প্রকাশ করার কোন উপায় নেই। কারণ, মায়ের মনে তো সেই বেবি ফুডের বিজ্ঞাপনওয়ালা ক্যালেণ্ডারের শিশুটির কথাই ভাসছে। তাঁর শিশু যদি না খায় তবে ওরকম চেহারা হবে কি করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে যায় আশেপাশের বাড়ির সুপুষ্ট বাচ্চাগুলিকে। তাঁর শিশুও তেমনটি হোক। রোগা হাড়-জিরজিরে শরীর নিয়ে ওদের পাশে দাঁড়ালে সে কোন রকমে এঁটে উঠতে পারবে না। ওরকম না হলে কেউ আদর করে তাঁর শিশুকে কোলেও করবে না। সবাই দূরে-দূরে রাখতে চাইবে। তাতে মায়ের অপমান। ওবাড়ির বাচ্চাটিকে সবাই কি রকম কোলে নিয়ে আদর করে। ওর মায়ের কত গর্ব। তিনিই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন?

এই নিয়মের যাঁতায় পড়ে অনেক শিশুরই প্রাণ আইঢাই। শিশু অনিচ্ছা প্রকাশ করে। জোর-জবরদস্তির সামনে গিলেও নেয়। মা কিন্তু কোন দিনই শিশুর এই খাওয়া না খাওয়ার গোপন রহস্যটুকু ভেদ করার চেষ্টা করেন না। তাঁর কাছে এক কথা। সোজা কথায় তিনি যা বোঝেন, খেতে হবে। আর না খেলে শরীর হবে কি করে। তাই তিনি নিজের কাজ করে যান। সেই রুটিন ওয়ার্ক। একবারও তিনি বুঝলেন না যে, যার জন্য এত করা এতে আখেরে তার কোন লাভই হচ্ছে না। কিন্তু দু'দিন পরেই তিনি এর পরিণাম হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। শিশুর অবস্থা হবে সেদিন থলথলে চর্বির বস্তা। তখন মা কতটা খুশি হবেন বলা শক্ত।

শিশুদের জোর করে খাওয়ানোর প্রচেষ্টা আমাদের দেশে চলে আসছে দীর্ঘদিন। সম্প্রতি একটি ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, শিশুদের জোর করে খাওয়ানো অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এতে শিশুর ভালর চেয়ে খারাপই হয় বেশি। শিশুরা যখন খেতে চাইবে না তখন ধরে দিতে হবে এখন খাওয়ালে তা হবে তাদের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত। এবং এর কুফল ফলবেই। এই অভিমত হলো পশ্চিম জার্মানীর পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ও শিশু চিকিৎসক ডঃ জায়নার ভ্রোয়েসের। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে শিশুদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে গবেষণা করছেন। ডঃ ভ্রোয়েস ডর্টমুণ্ডে শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর। সারা পৃথিবীতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান একটি। শিশুদের কি খাওয়া উচিত বা তারা যা খায় তাতে তাদের অর্গানিজমে কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়ে মূলগত গবেষণা এখানে করা হয়।

তাঁর মতে, অত্যধিক আশাবাদী মায়েরা শিশুদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাওয়ান। মনে ভাবেন, শিশুরা মোটাসোটা হলেই স্বাস্থ্যবান হবে। তাহলে অসুস্থতা তাদের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। রোগা শিশুদের কি রকম সন্দেহের চোখেই না দেখা হয়। মনে করা হয়, হতভাগ্য বাচ্চাটা বোধহয় প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তা সত্ত্বেও কম খায় যেসব শিশু তারা মোটেই সমস্যাবহ হয়ে ওঠে না। বরং তাদের আচরণ থাকে পুরোপুরি স্বাভাবিক। সবকিছু মুখে দেয় সেসব শিশুই যাদের ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না।

ডর্টমুণ্ডের পরীক্ষাধীন বাচ্চারা তাদের খিদে অনুযায়ী কোন দিন কম বা কোন দিন বেশি খায়। ডঃ ভ্রোয়েসের বিশিষ্ট নীতি হলো, শিশুরা খেতে পারে। তার জন্য সব সময়ই তাকে খাওয়াতে হবে এর কোন মানে নেই। সেখানে শিশুদের সব সময় রাখা হয় নিয়ন্ত্রাধীনে। নিয়মিত মাপ ও ওজন করা হয়। এই অভিযানের লক্ষ্য হলোঃ প্রায় ২০ হাজার এরকম মাপ-জোখ ও ওজনের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একটি বলকারক খাদ্য পরিকল্পনা ও শিশুর পরিপূর্ণ বাড়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান সমন্বিত নতুন পথ্য তৈরী করা হবে। খাওয়ার ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টিকারী শিশুদের নিয়ে বিব্রত পৃথিবীর সব জায়গার মায়েদের সাহায্য করার জন্য ডর্টমুণ্ডের শিশু চিকিৎসকদের কতগুলি ভাল উপদেশ এবং নির্দেশ আছে।

তাঁরা বলেছেন, দুর্বল স্নায়ু বিশিষ্ট স্কুল শিশুদের জলখাবার খাওয়ার জন্য জোর না করাই উচিত। শিশুকে একলা খেতে না দিয়ে মা-বাবার উচিত তাদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া। শিশুদের থালাটি কানায় কানায় ভরে দেওয়া ঠিক নয়—সে আরও চাইতে পারে এমন সুস্বাদু এবং সুদৃশ্য খাদ্য দেওয়া উচিত। বিবেচনা করে পরিমাণ মত খাদ্য দেওয়াই ভাল। কখনো খাওয়ার জন্য জোর করা খুবই ভুল। শরীরে অত্যধিক চর্বি হওয়া শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আর মাঝে মাঝে শিশুর যে অরুচি লাগে তা একান্তই স্বাভাবিক এবং প্রায় প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়।

—প্রবীণা

গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

সাইকেলটার জন্যে অত গরজ কেন তা বুঝতে পারছি না। ও ত নড়বড়ে পুরোন একটা সাইকেল! এমনিতে কোন দাম নেই।

এরকম একটা সাইকেলের নম্বর দিয়ে মালিক বা কারুর হদিস পাওয়া অসম্ভব। ওতে আঙুলের ছাপ বা ভেতরে কিছু লুকোন থাকতে পারে?

না, তা নেই। তবে সাইকেলটা দিয়ে কিছু হদিস পাওয়া যেতেও পারে। চেহারা দেখে এটা ভাড়া খাটানো সাইকেলই মনে হচ্ছে। ও অঞ্চলের কাছাকাছি কটা গঞ্জে বাজারে সাইকেলের দোকানে খোঁজ করলে যে লোক ভাড়া নিয়েছিল তার একটু বর্ণনা অন্তত: পেতে পারি!

তুমি কি সেই খোঁজ এখন করবে নাকি?

না, আজ অন্তত: নয়। এখন খেয়ে দেয়ে ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। রাত্রে ঝামেলার কাজ আছে।

ঝামেলার কাজটার সুচনা দেখেই কৃত্তিবাস স্তম্ভিত। প্রায় মাঝরাতে রামজীবনের গাড়িটাই নির্জন এক জংলা জায়গায় এসে থামল।

এ বন বাদাড়ে নামবার মানে?

দেখতেই পাবে এখুনি। ইচ্ছে করলে তুমি চলে যেতে পার রামজীবন!

না, স্যার। আমি এই জঙ্গলের অন্ধকারেই ঘাপটি মেরে থাকব!

জঙ্গলের পথে কিছুদুর হাঁটবার পর-

কোথায় যাচ্ছি কিছুইত বুঝতে পারছি না।

গাছগুলোর ফাঁকে তাহলে চেয়ে দেখো।

এ তো শিউপ্রসাদজির বাড়ি! তুমি কি এই দুপুর রাতে ওখানে ঢুকবে?

সেইরকমই ত বাসনা। তুমি ইচ্ছে করলে এখনো গাড়িতে ফিরে যেতে পারো।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

জলসা

স্রষ্টা উদয়শঙ্কর থেমে নেই। মঞ্চনৃত্য ছাড়াও শঙ্করের রাজকীয় মর্যাদাপ্রাপ্ত 'রামলীলা', বর্ণসমৃদ্ধ 'বুদ্ধজীবনী' কবিগুরুর 'সামান্য ক্ষতি' ও 'প্রকৃতি আনন্দ' শুধু ভারতেরই নয়, সারা জগতের কলারসিক মহলে সমাদৃত হয়েছে। শিল্পী উদয়শঙ্কর ঐ সাফল্যে তৃপ্ত, কিন্তু স্রষ্টা উদয়শঙ্কর? তিনিও কি পূর্ণতায় পৌঁছনর আনন্দে স্তব্ধ? তারই উত্তর পাওয়া গেল গত সপ্তাহে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে উদয়শঙ্কর আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে। কীর্তিমান তাঁর কীর্তিস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে অতৃপ্ত ক্ষোভের সঙ্গে বার-বার চিন্তা করেছেন—এমনকি অভিনব শিল্পসৃষ্টি করা যায় যা কারো স্বপ্নে, কারো কল্পনাতেও স্থান পায়নি?

'গত কুড়ি বছর ধরে আমি শুধু ভেবেছি আর ভেবেছি। তারপর হঠাৎই একদিন মনে এল—মঞ্চ, পর্দা ও ম্যাজিকের সমন্বয়ে এই শিল্পকল্পনা—শঙ্করস্কোপ। যখন ভেবেছিলাম, তখন সারা পৃথিবীতে কোথাও-ই এর বাস্তব রূপায়ণ হয়নি। কিন্তু আমি অভাগা, অর্থাভাবে যা পারিনি এখন কোনো কোনো দেশ (চেকোশ্লোভিয়া, রাশিয়া) এ-কল্পনার বাস্তব রূপ দিয়েছে। তবে সান্ত্বনা এই আমাদের দেশে আমিই প্রথম এই চলচ্চিত্র ও নাট্যরূপের সমন্বয় মঞ্চস্থ করছি'—অসুস্থতা ও বয়সের বাধা অতিক্রম করে শঙ্করের দুই চোখে যেন তারুণ্যের দীপ্ত আলো জ্বলে উঠল। আবেগভরে তিনি বলে চলেন, 'এ শুধু স্টাণ্ট নয়। এর মধ্যে শিক্ষণীয় এবং সংস্কৃতিমান রসিক চিত্তের অনুধাবনীয় বহু বিষয় থাকবে।'

'চলচ্চিত্র ও মঞ্চের মিলন কিভাবে ঘটবে?—অমৃতের প্রতিনিধির এই প্রশ্নের জবাবে শঙ্কর বললেন—'আমার এখনও নাচতে ইচ্ছে করে এবং এখনও পারি। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ, তাই 'কল্পনা' চিত্র থেকে নেওয়া আমার একটি নাচ পর্দায় দেখানো হবে আর স্টেজে নাচবেন আমার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। এইভাবে সমান্তরাল ছন্দে পর্দা ও মঞ্চনৃত্য চলবে, একটি অন্যের পরিপূরক হয়ে।'

'আপনার কোন্ নাচ? জগদ্বিখ্যাত 'কার্তিকের নৃত্য' নয়ত?'

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে শিশুর মত সলজ্জ হেসে শঙ্কর বললেন, 'সেইটিই'।

'আর ম্যাজিকের ব্যাপারটা?'

'যেমন ধরুন, প্রথমে যৌবনোজ্জ্বল সুন্দরী তরুণীদের রূপ ফুলের মত পর্দার বুকে ফুটে উঠল, তারপর যৌবন-অন্তে তাঁরা প্রৌঢ়া হয়ে মঞ্চের বুকে দাঁড়িয়ে পর্দার ছবির দিকে চেয়ে সনিশ্বাসে গাইছেন 'আমরা ছিলাম সবাই সুন্দরী'—অথবা স্ত্রী স্বামীকে বলছেন 'আরে আরে টুপি না পরে বেরোচ্ছ যে?' বলে স্ক্রীনের স্ত্রী মঞ্চে দাঁড়ানো স্বামীকে টুপি পরিয়ে দিলেন। ছবির টুপি রিয়েল টুপি হয়ে স্বামীর মাথায় চলে এল।—এইরকম নানান মুভমেণ্ট।

শঙ্করস্কোপের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা গেল বহু বছর আগে 'রামলীলা' দেখার পর অমৃতবাজার পত্রিকার স্তম্ভলেখক পরলোকগত রয়জী উদয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করে বলেন 'মিঃ শঙ্কর যা দেখলাম অপূর্ব। কিন্তু একটু ভুল হয়ে গেছে। এর নাম হওয়া উচিত ছিল 'শঙ্করস্কোপ'। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যই আমার নতুন প্রোডাকসনের নাম রেখেছি 'শঙ্করস্কোপ।' উজ্জ্বল মুখে শঙ্কর বললেন।

শঙ্কর স্কোপের সংগীত পরিচালনায় আছেন উদয়শঙ্করেরই বহু বছরের আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিল্পী কমলেশ মিত্র। গান রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তাছাড়া সুমিত্রানন্দন পন্থেরও কিছু হিন্দী গান নেওয়া হয়েছে। 'মাত্র এক বছরে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও যে এতবড় কাজ আমি করতে পেরেছি তারজন্য আমি কৃতজ্ঞতাস

কংকালিয়ার অর্থানুকূল্যের কাছে ঋণী। তা ছাড়া আমার ট্রুপের প্রতিটি শিল্পী তাদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আনুগত্য দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন।

বিদেশ সফরান্তে ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য : ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সঙ্গে আমেরিকায় তাঁর 'আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক'-এ শিক্ষকতা করবার সহায়ার্থে গিয়েছিলেন তিমিরবরণের সুযোগ্য পুত্র—তরুণ সেতারবাদক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। গত শুক্রবার রক্সি মিনিয়েচারে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দ্রনীল তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিটের অনুষ্ঠানে সেতার বাজিয়ে শোনালেন। সঙ্গে তবলাসংগতে ছিলেন অমর দে। ইনি প্রথমে বাজালেন ইমন কল্যাণ। কল্যাণ ঠাটে আরম্ভটি সুন্দর এবং সময়োপযোগী। সংক্ষিপ্ত আলাপনে রূপাভাসের পর ইনি বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ বাজালেন তিন তালে। সময় সংক্ষিপ্ততার কারণেই বোধহয় শিল্পী বিস্তারের চেয়ে তানের অঙ্গেই মন দিয়েছেন বেশী এবং সফলও হয়েছেন। নানা ছাঁদের ছুট তানের চমক, সাপট-তান ও ঝটকায় শিল্পীর কঠিন রেওয়াজ-জাত যান্ত্র অনায়াসদক্ষতা ছাড়াও যে-বস্তু বিদ্যুৎ-ঝলকের মত উঁকি দিল, সে হোল বর্ণপিয়াসী মনের রঙিন কল্পনা। ইমন কল্যাণের উপস্থাপন-পদ্ধতিতে বিলায়েৎ খাঁর রীতির প্রভাব-ই সমধিক এবং ধ্রুপদাঙ্গের চেয়ে খেয়ালের অধিক বেশী। কিন্তু উপসংহারীয় 'কাফি' যেন প্রথম থেকেই রবিশঙ্করের কল্পনার আলোয় উজ্জ্বল। মীড়ের সূক্ষ্ম কাজ, রং-বাহারের জমজমা ও কৃন্তন আশের মাধুর্যে কাফির রোমান্টিক উচ্ছলতা যেন শতধারে উৎসারিত হয়েছে। জমজমা-সমৃদ্ধ টপ্পা অঙ্গে বাজানোর দরুণই বোধহয় কাফির যথার্থ রূপরূপটি ফুটে ওঠে। অমর দে-র তবলাসংগত যথাযোগ্য।

নানা সুরের মেলায় : মেগাফোনের এস পি রেকর্ডে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুটি গানে শিল্পীর সংগীতভাবনার এক বর্ণোজ্জ্বল রূপ যেন ফুটে উঠেছে। একটি হোল 'যদি সহেলী আমায়'—গানটিতে 'মিশ্র মান্দ'-এর পাহাড়ী ধুনে একাধারে বিষণ্ণতা ও ছন্দের নাটকীয়তায় শিল্পীর কারিগরীর এক নতুন দিক উদ্ভাসিত। 'না বলে কেন চলে যায়'-তে ভৈরবী ও চন্দ্রকোষের মিলনে একাধারে কারুণ্য ও মাধুর্যের আস্বাদ মেলে। গানদুটি লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীজায়া উৎপলা সেন (মুখার্জি) সতীনাথের সুরে গেয়েছেন বিরহ-উদাসতায় 'তুমি কত সহজে ভুলে গিয়েছ আমায়' এবং নচিকেতা ঘোষের সুরে 'কিংশুক ফুল হিংসুক ভারী'। শেষের গানটির ছন্দবৈচিত্র্য ও সহজ কথার শিল্প-সুন্দর প্রয়োগ মন টানে। শিল্পীর সুরেলা কণ্ঠে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানদুটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। হিমাংশু বিশ্বাস রচিত একটি গানের সুর মনকে যেন দুলিয়ে দেয়। গানটি হোল তরুণ শিল্পী শ্যামাশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের 'চুপিচুপি কাছে ডাকো', 'দরদী গো তোমায় ছাড়া' সুরটিতে হিমাংশুবাবুর রসাভাসের বৈচিত্র্যসৃষ্টি লক্ষ্য করবার মত। গান-রচয়িতা লক্ষ্মীকান্ত বসুরায়। এছাড়া বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীকে এঁরা সুযোগ দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রতিশ্রুতির আভাস আনন্দদায়ক। এঁরা হলেন অরুণ ঠাকুর ('দু'চোখে কি এত কথা' ও 'আমায় অমন করে ডেকো না' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলত এমন করেও তুমি বাতায়ন খুলে রেখো)। রঞ্জিত বসু (চারুলতা বনলতা ও বহুদিন পরে)। অমলেন্দু চক্রবর্তী (ময়ূরপঙ্খী নৌকা আমার ও তোমায় নিয়ে যাব ওগো) ছায়া মুখোপাধ্যায় ('আমার এ কাব্য' ও 'যদি আমি হতাম ওগো')—রচয়িতা ও সুরকার হিসাবেও অনেক নতুন নাম চোখে পড়ল। এ-প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয় নিশ্চয়। ই, পি রেকর্ডে, কানন দেবী-র অতুলনীয় কণ্ঠের চারটি চিত্রগীতি এক অমূল্য সম্পদ। কথা ও সুরের মিলন শিল্পীর পরিশীলিত উচ্চারণ যেন কথার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রতিটি শব্দকে জীবন্ত করে তোলে। এর সঙ্গে মিলেছে ত'র রঙিন মনের আবেগ ও স্বর-মাধুর্য। এতগুলি বস্তুর সমন্বয় বিরল বলেই মনে এমন দাগ কাটে তাঁর 'আমি বনফুল গো' 'যদি আপনার মনে', 'যদি ভাল না লাগে' ও শ্যামলের 'প্রেম যেন' তথা—শেষ উত্তর ও যোগাযোগের চারটি গান। রবীন মজুমদারের চারটি চিত্রগীতি সংকলন 'আমার আঁধার ঘরে প্রদীপ' 'আমার প্রেমগান' 'এই কি গো শেষ দান' তারে চিনি চিনি' তাঁর গৌরবোজ্জ্বল দিনের স্মারকরূপে বিশেষ মূল্যের অধিকারী।

পরলোকগত ভবানী দাসের ৪টি শ্যামাসংগীত সংগ্রহে সংগীত ও শিল্পী উভয়ের প্রতিই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শিত। ইলেকট্রিক গীটারে বাজানো বটুক নন্দীর ৪টি রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রুতিমধুর।

আর এক উল্লেখযোগ্য বস্তু হোল জহর রায়ের কৌতুকনক্সা 'ঘেরাও'। হাসির ভঙ্গীতে বর্তমান যুগের একটি সমস্যার প্রতি কৌতুক-করুণ আলোকপাতে জহর রায়ের চিন্তাশীল মনটি ব্যক্ত। এঁর সঙ্গে যথোপযুক্ত সহায়তা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরসভা : গত ১৩ নভেম্বর বালিগঞ্জ-স্থিত রবিতীর্থ ভবনে দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরসভার বিজয়া সম্মেলন শ্রীমতী অনিমা সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, হিমাংশুগীতি, শ্যামাসঙ্গীত, ভজন প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন সুস্মিতা রায়চৌধুরী, মণিদীপা শ্যাম, হাসি দত্ত, দীপ্তি রায়, প্রমীতা শীল, ইন্দিরা গুপ্ত, অমিতা গুপ্ত, শীলা সেনগুপ্ত, চিত্রা সিনহা, তোড়া সরকার, অদিতি বসু, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, রত্না রায়, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী ঘোষ ও উর্বশী নিয়োগী। সবশেষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে প্রথমে মালকোষ রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান কান্তি মৈত্র। এর পর গৌর বসাক নারায়ণী রাগে খেয়াল পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর আনন্দ বর্ধন করেন। এঁদের সঙ্গে তবলায় ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন দুলাল ভট্টাচার্য, কিশোর নন্দী, শম্ভু পাল, স্বপন মুখোপাধ্যায় ও রথীন চৌধুরী। হরিদাস দত্ত কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

বিচিত্রানুষ্ঠান : গত ১৩ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নবজাগরণের পরিচালনায় লালাবাগান ময়দানে একটি সারারাত্রিব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে যে-সব শিল্পী অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্যামল মিত্র চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, ইলা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, মীরা বিশ্বাস ও বুবাই বিশ্বাস, পিন্টু ভট্টাচার্য, লক্ষণ হাজরা, বনশ্রী সেনগুপ্ত, বাসুদেব ঘোষদস্তিদার, অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মাঃ তপন ঘোষ, মৃণাল মুখার্জি ও দেবব্রত বিশ্বাস। এছাড়া কৌতুক-গীতিতে মিন্টু দাশগুপ্ত, হরবোলা—শৈলেন লাহা, মূকাভিনয়ে তপন দত্ত, যন্ত্রসংগীতে লিট্‌ল বিট্‌লস। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সুপ্রকাশ বসু এবং এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারতের প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরী।

সাংস্কৃতিকী আগামী ২৯ নভেম্বর সুকুমার ভট্টাচার্যের বাড়ী, ১৬১, শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড, হাওড়া-৪ সন্ধ্যায় ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদের গান আলোচনাসহযোগে পরিবেশন করবেন শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

গীত / রাজেন্দ্রকুমার, মালা সিনহা

আর একটি বাংলা ডাবিং-করা পৌরাণিক চিত্র

মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে প্রস্তুত বহু রামায়ণ ও মহাভারতনির্ভর পৌরাণিক কাহিনী-চিত্র মূল তামিল বা তেলেগু ভাষাকে বাদ দিয়ে ডাবিং-করা সংলাপ ও গান যুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন চিত্রগৃহে বাঙালী দর্শকদের সামনে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। পৌরাণিক সাজ-সজ্জাধারী দক্ষিণী শিল্পীদের অভিনয়-ভঙ্গী যে সবসময়ে বাঙালী দর্শকদের মনঃপূত হয়ে থাকে, এমন কথা বলা যায় না। তার ওপর মূল ভাষাটিকে সরিয়ে দিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর ঠোঁটনাড়ার সঙ্গে মিলিয়ে ডাবিং-করার জন্যে লিখিত বাংলা সংলাপ ও গান লেখকের স্বাধীনতাকে যে যথেষ্ট ক্ষুন্ন করে, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতি পদে পদে। মনে হয়, সংলাপ ও গানের ভাষাটি ঠিক যেমন হওয়া উচিত, ছিল, তেমনটি হয়নি; যেন বেশী সাধু, যেন বাক্যগঠনে কেমন যেন আড়ষ্টতা, স্বাভাবিকতার অভাব।

কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও ছবিগুলি যে মোটের ওপর ভালো লাগে, তার কারণ প্রযোজনায় একান্ত নিষ্ঠার ফলে ছবি-গুলিতে বেশ একটি পৌরাণিক আবহাওয়া সঞ্চারিত হয়, যা আমাদের বাংলা পৌরাণিক চিত্রে কচিৎ দেখতে পাওয়া যেত। তার ওপর পৌরাণিক চিত্রে সাফল্য অর্জন করতে গেলে কলাকৌশলের, বিশেষ করে চিত্রগ্রহণে যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়োজন —যাকে বলি, ট্রিক-ফোটোগ্রাফী, তার নিখুঁত পরাকাষ্ঠা দেখা যায় এই দক্ষিণী ছবিগুলিতে। এরই সঙ্গে উপযুক্ত সুর সংযোজনার ফলে গানগুলি যদি শ্রুতি-মধুর হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

এমনই একটি ডাবিং-করা ছবি হচ্ছে **আলেয়া, রূপম সুরশ্রী** প্রভৃতি চিত্রগৃহে ২০ নভেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রীসুজাতা **মুভীজ-এর** নিবেদন এবং **রমেশ নাইডু** প্রযোজিত ও সুরারোপিত 'দক্ষযজ্ঞ'। ছবিটিতে যেসব দক্ষিণী শিল্পী অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। কিন্তু যিনি শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তাঁকে তারিফ না করে উপায় নেই। শিবের রূপ সম্পর্কে আমাদের মনে যে-ছবি আঁকা আছে, তিনি হুবহু তাই এবং একথা বলছি একটুও অতি-রঞ্জন না করেই। এবং তাঁর অঙ্গভঙ্গী ও সামগ্রিক অভিনয়ও হয়েছে অত্যন্ত চারিত্রো-চিত, স্বাভাবিক ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও চন্দ্র চরিত্রের অভিনেতারাও বহিরাকৃতির দিক দিয়ে ভূমিকা উপযোগী। শিব চরিত্রটির সংলাপ অত্যন্ত সার্থকভাবে বলেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃদ্ধ তপস্বীর ছদ্মবেশে তাঁর সংলাপ বিশেষভাবে মনে রাখবার মতো। দক্ষের দৃপ্ত ভূমিকার সংলাপ বলানো হয়েছে শেখর চট্টো-পাধ্যায়কে দিয়ে। অনেক স্থানে অযথা দ্রুত এবং অযথা ঝোঁক-দেওয়া সংলাপ তিনি বোধকরি বলতে বাধ্য হয়েছেন। সতী ও দক্ষপত্নী প্রসূতির সংলাপ সুন্দরভাবে বলেছেন যথাক্রমে মিতা চট্টোপাধ্যায় ও সাধনা রায়চৌধুরী।

শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, হরিবংশ এবং পুরাণে দক্ষ প্রজাপতির কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। এর মধ্যে প্রধানত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনীর উপর নির্ভর করেই ছবির কাহিনীটি রচিত হয়েছে। সতীতীর্থ প্রসঙ্গে কাহিনীটির অবতারণা করা হয়েছে এবং আবার সতীতীর্থেই শেষ করা হয়েছে। কাহিনীর অগ্রগতি সরল ও ঋজু। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ এবং সেই সংবাদ শ্রবণে শিবের রুদ্রমূর্তি ধারণ ও সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে তাণ্ডবলীলায় পৃথিবীকে ধ্বংস করবার উপক্রম করায় বিষ্ণুর চক্র দ্বারা সতীদেহকে কর্তন করে শিবের ক্রমে শান্তভাব ধারণে ছবির কাহিনীর সমাপ্তি। অবশ্য সতীদেহ কর্তনের দৃশ্যটি ছবিতে অনুপস্থিত; এ ঘটনাটি নেপথ্য কণ্ঠে গান দ্বারা বর্ণিত।

ছবিটির বিশেষ আকর্ষণীয় অংশ হল সতীদেহ কাঁধে নিয়ে শিবতাণ্ডবের রঙীন দৃশ্যাবলী—এতে আশ্চর্য রঙের খেলা আছে। বাংলা সংস্করণে সংলাপ ও গান রচনা করেছেন অরুণ রায় ও শ্যামল গুপ্ত এবং এর পরিচালনা করেছেন যুগল মিত্র।

আবার সেই অসামান্যা অভিনেত্রী ক্যাথারিণ হেপ্‌বার্ণ-কে দেখলুম

যা আর কোনো অভিনেত্রীর ভাগ্যে আজ পর্যন্ত ঘটেনি, সেই তৃতীয়বার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন ক্যাথারিণ হেপ্‌বার্ণ **'দি লায়ন ইন উইণ্টার'** ছবিতে রাজা দ্বিতীয় হেনরীর স্ত্রী ইলিয়েনর-এর ভূমিকায় অভিনয় করে। দ্বাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড-এর পটভূমিকায় দ্বিতীয় হেনরীর উত্তরাধিকারী নিয়োগকে উপলক্ষ করে হেনরীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর (যাঁকে সচরাচর কারারুদ্ধ অবস্থায় কাটাতে হয়) যে মতবিরোধ হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তুলেছেন এই ছবি প্রযোজক জোসেপ ই লেভিন। অ্যান্টনী হার্ভে পরিচালিত এই ছবিটি প্রায় শেক্সপীরিয় নাটকের ভঙ্গীতে অভিনয়কলা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে। এর বিভিন্ন ভূমিকার শিল্পীদের, যাদের মধ্যে প্রধান হলেন ক্যাথারিণ হেপবার্ণ ও পিটার ওটুল। আশ্চর্য নাট-নৈপুণ্যের নমুনা এই ছবির প্রতিটি দৃশ্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

স্টুডিও থেকে

শপথ নিলাম : ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাদের আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় কীর্তি চিরভাস্বর, সেই মুক্তিযোদ্ধা বীর সন্তানদের কর্ম-সাধনার দলিল 'শপথ নিলাম' মুক্তি-প্রতীক্ষায়। শৈলেশ দে-র কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন কৃষ্ণ মল্লিক। শচীন অধিকারী পরিচালিত ও সুকুমার মিত্র সুরারোপিত এ-ছবির গীত রচয়িতা অমিতাভ নাহা। কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী চরিত্রে রূপদান করেছেন : শমিত ভঞ্জ, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি দিলীপ রায়, মলিনা দেবী, শেখর চ্যাটার্জি, শমিতা বিশ্বাস, ভাস্কর চৌধুরী, মন্মথ, মৃণাল, নির্মল, বলাই মুখার্জি ও নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্তা। পরিবেশনায়—ইস্টার্ন ফিল্ম এক্সচেঞ্জ।

জননী: রাধেশ্যমল কাঙ্কারিয়া প্রযোজিত অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'জননী'র চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। জননীর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী স্বয়ং। জননী তাঁর স্নেহ-মমতা দিয়ে নিজের দুঃখ-কষ্ট অবহেলা করে যে সন্তান-সন্ততিদের চিরকাল আগলে রাখেন, তাদের সুখেই তাঁর সুখ, তাদের মঙ্গল দেখেই তাঁর আনন্দ। এই স্নেহময়ী মায়ের চরিত্রে আছেন সুলোচনা চ্যাটার্জি। তাঁকে ঘিরে আর যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন সুলতা চৌধুরী, সিলি চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, কালী ব্যানার্জি, সত্য ব্যানার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, শমিত ভঞ্জ ও জয়া ভাদুড়ী প্রভৃতি। শ্যামল মিত্র এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। অজয় মিত্র ও শিবসাধন ভট্টাচার্য যথাক্রমে এই ছবির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার ভার নিয়েছেন। শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ এই ছবির পরিবেশক।

অপর্ণা : সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত জরাসন্ধের কাহিনী অবলম্বনে 'অপর্ণা'র চিত্রগ্রহণ কাজ সলিল সেনের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। ছবিখানির চিত্রনাট্য পরিচালনা করেছেন শ্রীসেন নিজে। সুর দিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। এই ছবির দুটি বিশেষ প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অরুণ মুখার্জি, গঙ্গাপদ বসু, গীতা নাগ, গীতা দে, কল্যাণ, অরুণ চৌধুরী, তপতী ঘোষ, মাস্টার অরিন্দম প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্রে আছেন। শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ছবিটির পরিবেশক।

সংসার : নর্মদা পিকচার্সের ছবি মঞ্চ-সফল স্বীকৃত নাটকের চিত্ররূপ 'সংসার'-এর চিত্রগ্রহণ কাজ সলিল সেনের পরিচালনায় শেষ হয়ে এখন মুক্তির অপেক্ষায় আছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীসেন স্বয়ং। সুর দিয়েছেন—হেমন্ত মুখার্জি, গান লিখেছেন—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, নন্দিনী মালিয়া, বসন্ত চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, নির্মলকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, অমরনাথ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, হরিধন, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, মিন্টু প্রভৃতি। হেমন্ত ব্যানার্জি ও নির্মল ব্যানার্জি প্রযোজিত 'সংসার' কাহিনী-বৈশিষ্ট্যে বাংলার সর্বজন চিত্ররসিকদের অন্তর জয় করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

রাজেনবাবু বহুদিন বাদে ফ্লোরে আসছেন তাঁর 'সংসার সীমান্তে'র কাজ নিয়ে। নায়িকা চরিত্রে বহু নতুন শিল্পীর ইন্টারভিউ নিয়েও যখন মনোমতো কাউকে পেলেন না, তখন ঠিক করেছেন মাধবী মুখার্জিকেই নেবেন। আর নায়ক চরিত্রে থাকবেন (নামটা বলতে পারছি না) কলকাতার এক প্রখ্যাত নাট্য সংস্থার একজন কুশলী শিল্পী। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ ডিসেম্বরের গোড়াতেই ফ্লোরে আসছেন রাজেনবাবু।

বিবিধ সংবাদ

গেল ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় বেলভেডিয়ার (আলিপুর) কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার্সে বেলভেডিয়ার এস্টেট পুজো কমিটির উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এখানকার এই কলোনীর আবাসিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই ধরনের নাট্যানুষ্ঠান এই প্রথম। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নাট্য-উৎসবের উদ্বোধন করেন।

সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এবং সহযোগিতায়, বিশেষ করে ডাঃ বি সি সান্যাল মহাশয়ের একান্ত উৎসাহে, উদ্যোগে এবং অক্লান্ত কর্মপ্রয়াসে কলোনীর এই প্রথম নাট্যানুষ্ঠান আশ্চর্য সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সঞ্জীব সেনগুপ্তের পরিচালনাগুণে নাটকটি দলগত অভিনয়ের নৈপুণ্যে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আবহসঙ্গীত অনেক সময় দৃশ্যানুগ না হলেও একটি সামগ্রিক অপরূপ উজ্জ্বল প্রবহমানতায় দর্শকেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে থেকেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সার্থক চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে সকলেই নাটকটিকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন : নচিকেতা ভরদ্বাজ (মহারাজ নন্দ), সুকান্ত চক্রবর্তী (চন্দ্রগুপ্ত), ডাঃ বি সি সান্যাল (চাণক্য), বি লাহিড়ী (কাত্যায়ন), সুশীল সরকার (চন্দ্রকেতু), বিনায়ক ভট্টাচার্য (আলেকজান্ডার), বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় (সেলুকাস), শিবু সেন (অ্যান্টিগোনাস), শঙ্কর চক্রবর্তী (বাচাল), কবির মুখোপাধ্যায় (ভিক্ষুক), রুমা চৌধুরী (হেলেন), সুনন্দা ঘোষ (মুরা), সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছায়া), গীতালি লাহিড়ী (আত্রেয়ী)।

কৌশিকী : আগামী ২ ডিসেম্বর কৌশিকী তাঁদের নতুন নাটক 'আত্মপর্যাঙ্ক' বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ করবেন। নতুন আঙ্গিকে এই মনস্তত্ত্বমূলক নাটকটি পরিচালনা করবেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে আছেন আরতি ঘোষ, মণ্টু চক্রবর্তী, অরবিন্দ সেনগুপ্ত, নিতীন বিশ্বাস, শিশির মুখার্জি, নাণ্টু গাঙ্গুলী, সাগর সেন, গৌতম মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর চক্রবর্তী ও অমল মণ্ডল।

ক্যাপ্টেন হুররা : উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নক্ষত্র' আসছে ৯ ডিসেম্বর মুক্ত অঙ্গনে তাঁদের নতুন নাটক 'ক্যাপ্টেন হুররা' মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিরচিত এই নাটকে মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব নিয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী এবং প্রয়োগপ্রধান শ্যামল ঘোষ। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করবেন শর্মিষ্ঠা ঘোষ, অমল চক্রবর্তী, নিতাই দে, দিলীপ ঘোষ, শ্যামল চক্রবর্তী, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অসিত দে ও শ্যামল ঘোষ।

কোমল গান্ধার-এর 'ফাঁস'—গত কয়েক সপ্তাহ আগে উত্তর শহরতলীর এক নতুন নাট্যসংস্থা 'কোমল গান্ধার' স্থানীয় ক্ষীরোদ মিত্র পার্কে পিকলু নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাট্যরূপায়ণে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তরুণ পরিচালকদ্বয় দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে যোগদানকারী উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার বসু, অজয় বণিক, আনন্দা ভট্টাচার্য।

বোম্বাইয়ে বাংলার জুনিয়র ক্রিকেট দল এবং মহীন্দ্র স্পোর্টস ক্লাবের সম্মিলিত খেলোয়াড়বৃন্দ।

খেলার কথা

বাংলার তরুণ ক্রিকেট দলের সফর

বাংলা যেমন ফুটবলের পীঠস্থান, তেমনি ক্রিকেটের পীঠস্থান বোম্বে। ফুটবল বা ক্রিকেটের কথা উঠলে প্রথমেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বাংলা এবং বোম্বের ওপর।

বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন (সি এ বি) কিছুদিন আগে ভারতীয় ক্রিকেটের পীঠস্থান এই বোম্বেতে একটি জুনিয়ার ক্রিকেট দলকে সফরে পাঠিয়েছিল। ১৬ই অক্টোবর যাত্রা করে এই দল একুশদিনের সফর শেষ করে গত ১০ নভেম্বর কলকাতায় ফিরে এসেছে। সফর শেষ হয়েছে। এখন লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশের পালা। সফর ছোটবড় যেমনই হোক না কেন, খরচ আছেই। বিশেষকরে একুশদিনের লম্বা সফরে বেশ খরচ হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এত টাকা খরচ করে যে সফর, তা থেকে আমরা কি পেলুম ?

এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাকেই দিতে হবে। কারণ, এই জুনিয়র দলের 'ম্যানেজার' হিসেবে সমস্ত দায়িত্বই আমার ওপরে ছিল। এর আগেও আমি বাংলা দলের ম্যানেজার হয়ে কয়েকবার ক্রিকেট সফর করেছি। কিন্তু এবারের সফরের সঙ্গে আগের সফরের বেশ পার্থক্য আছে। কারণ বাংলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড়রা বেশকিছুটা অভিজ্ঞ। যে-কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে দলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের আছে। কিন্তু এবারকার সফরে বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই খুবই তরুণ। কলকাতার ময়দান ছাড়া তাঁদের নাম নেই। পরিচিত মুখের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন অম্বর রায়, টি জে ব্যানার্জি, দেবু মিত্র, গোপাল বোস। বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্কুল-কলেজের ছাত্র। তাই খুবই দুশ্চিন্তা ছিল দলে এতগুলি নানা বয়সের খেলোয়াড়, তাঁরা পরস্পরের ভাবভঙ্গী, চালচলন, চিন্তাধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন কিনা। কিম্বা দলের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবেন কিনা। কেননা, এগুলি মানিয়ে নিতে বা মেনে চলতে না পারলে স্বভাবতঃই সমস্ত দলের সংহতি ও সম্মান ক্ষুন্ন হবে। শুধু দলের সম্মান নয়, এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল সি এ বি তথা সারা বাংলা দেশের সম্মান। এসব

কমল ভট্টাচার্য

ছাড়া যে ব্যাপারে সব থেকে বেশী চিন্তিত ছিলাম তা হল আমাদের এই নবীন খেলোয়াড়রা বোম্বের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের সামনে দুর্বল হয়ে পড়বে না তো ?

সফর শেষ হয়েছে। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের ছেলেরা দল এবং বাংলার সম্মান অক্ষুন্ন রেখে ঘরে ফিরেছেন। এবং এজন্য সকলের সঙ্গে দলের ম্যানেজার হিসেবে আমিও নিশ্চয়ই যথেষ্ট গর্ব অনুভব করতে পারি।

যে পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে এই সফরের ব্যবস্থা হয়েছিল, তা হল তরুণ খেলোয়াড়দের মন থেকে অনভিজ্ঞতার গ্লানি দূর করা। শুধু তাই নয়, নামী ও দামী দলগুলোর সঙ্গে খেলতে গিয়ে তরুণদের মনে যে ভীতি বা জড়তা আসে তা কাটানোরও উদ্দেশ্য ছিল। সেদিক থেকে আমাদের সফর যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যেমন ধরা যাক, আমরা একুশদিনের সফরে মোট এগারোটা ম্যাচ খেলেছি। তার মধ্যে জিতেছি পাঁচটা খেলায়, আর ছটি খেলা ড্র হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, আমরা ওদের মত শক্তিশালী দলের বিপক্ষে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছি। কিন্তু স্কোর বোর্ডই কি সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড ? তা নয়—। শুধুমাত্র জয়-পরাজয়ই কোন সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

সফরের শুরুতেই আমরা মহীন্দ্র স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে খেলি। ক্রিকেট দল হিসেবে এদের খুব বেশী নামডাক নেই। তাই ধরে নিয়েছিলাম খুব একটা শক্তিশালী দল হবে না। কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, সফরের শুরুতেই একটা মাঝারি দলের সঙ্গে খেলে ছেলেরা যদি পাল্লা দিতে পারেন তাহলে পরে নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে তাঁরা যথেষ্ট সাহস পাবেন। এবং স্বভাবতঃই অসুবিধায় পড়তে হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হল। দুদিনের এই খেলাটা

অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে আমাদের ছেলেদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

আমরা বোম্বেতে যে দলগুলির সংগে খেলেছি তার মধ্যে দু'একটা বাদ দিলে প্রায় সবগুলিই অফিস ক্লাব। খেলার মানের দিক থেকে এরা কিন্তু কেউ কারও থেকে কম যায় না। বোম্বে সত্যিই ক্রিকেটের পীঠস্থান। কেননা, ইচ্ছে করলে রণজি ট্রফিতে খেলবার মত উপযুক্ত আরও দু-তিনটে দল গঠন করতে পারে। এদের খেলা দেখে মনে হয়, ক্রিকেটটা যেন ওদের জাতীয় খেলা।

বোম্বেতে ঘেরা মাঠ আছে দুটো। একটা 'ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার', অপরটা বোম্বে জিমখানার। আবার সি সি আই-এর মাঠে টেস্ট, আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক খেলা ছাড়া অন্য খেলা হয় না। ক্রিকেট খেলার জন্যে বোম্বের খেলোয়াড়রা বছরে সাত থেকে আট মাস সময় পান। শুধু তাই নয়, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা সাতটাতেও বোম্বেতে খেলার উপযোগী যথেষ্ট দিনের আলো পাওয়া যায়। এসব দিকে ভাগ্যদেবী ও'দের ওপর বেশ সুপ্রসন্না। ও'রা কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার ঠিকই করেন।

বোম্বে ক্রিকেট এসোসিয়েশন হলো বোম্বাইয়ের একমাত্র ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এই সংস্থা সবশুদ্ধ ছেচল্লিশটা টুর্ণামেন্ট একই সংগে পরিচালনা করেন। প্রদর্শনী খেলা ওখানে নেই বললেই চলে। যা-কিছু অনুশীলন তা এই প্রতিযোগিতামূলক খেলাগুলির মাধ্যমেই হয়।

ক্রশ ময়দান বা শিবাজী পার্কে এত পাশাপাশি খেলার আসর পাতা হয় যে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এক দলের স্লিপ ফিল্ডারের গা-ঘেঁসে পাশের একদলের বোলার রাণ-আপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-দলের ফিল্ডারই এ ওর বল কুড়িয়ে দিচ্ছে। সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয়, এই অসুবিধা সত্ত্বেও ওদের কিন্তু কারুও নিজেদের খেলায় মনোযোগের অভাব নেই।

কি টেস্ট খেলোয়াড়, কি স্কুল টিমের খেলোয়াড়—ছোট থেকে বড় সকলেই টুর্ণামেন্টগুলিতে অংশ নিয়ে থাকেন। প্রত্যেকে একই সংগে খেলছেন। সকলেই নিজেদের খেলা নিয়ে ব্যস্ত। নামকরা খেলোয়াড়দের সংগে খেলার সুযোগ পাওয়ার ফলেই ছোটদের মনে কোন ভয় বা জড়তা থাকে না। আর এই অভ্যাসই প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। অথচ বাংলার ক্ষেত্রে নামকরা খেলোয়াড় তো দূরের কথা, একটি প্রথম ডিভিসন দলের সংগে একটি দ্বিতীয় ডিভিসন দলের বছরে একবারও খেলা হয় কিনা সন্দেহ।

এর পরই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওখানকার মাঠের পিচ। ক্রিকেট খেলার পিচই আসল। ক্রিকেট খেলার মান যথেষ্ট নির্ভর করে এই পিচের ওপর। পিচ সম্পর্কে বোম্বের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট সচেতন। বোম্বাইয়ের প্রায় সব ক্রিকেট মাঠই ঘুরে দেখেছি; প্রত্যেকটি উইকেট বা পিচ অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আউট ফিল্ড নিয়ে তাঁদের তেমন মাথাব্যথা নেই। কোন কোন জায়গায় বড় বড় ঘাস, কোথাও বা মাটি উঁচুনিচু। কিন্তু উইকেট, প্রত্যেকটি আমাদের ইডেনের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। বোম্বের প্রত্যেক মাঠের পিচ তৈরী করে দেওয়ার দায়িত্ব বোম্বে কর্পোরেশনের। কিন্তু আমাদের এখানে?—যাক সেকথা।

এ'দের লাঞ্চ করার প্রথাটাও আমাদের থেকে আলাদা। কোন দলই কোন দলকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে না। আবার কোন কোন মাঠে দেখলাম খেলোয়াড়রা যে যার লাঞ্চ সংগে করে এনেছেন। সফরকারী দলের বেলায় অবশ্য আলাদা ব্যবস্থা। আমাদের সফরের শেষ-দিকে এই লাঞ্চ নিয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। বোরদের দলের সংগে পুণাতে খেলা। প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় চান্দু বোরদে হলেন আমাদের বিপক্ষ দলের অধিনায়ক। খেলায় একসময় লাঞ্চের বিরতি হল। আমরা অতিথি, তাই অপেক্ষা করে আছি কখন খাওয়ার ডাক পড়বে। এর আগে সব খেলাতেই আমরা নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছি।

অনেক সময় কেটে গেল অথচ খাওয়ার জন্যে কেউ ডাকতে এলেন না। দেখলাম ওদের সবশেষ খেলোয়াড়টিও দূরের রেস্টুরেন্টের দিকে চলে গেলেন। দুপুরবেলা। আমার দলের খেলোয়াড়দের মুখ দেখে বুঝতে কষ্ট হল না যে তাঁরা ক্ষিধেতে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন। আমি আর থাকতে না পেরে বারবার উঁকি মেরে আসছিলাম। কিন্তু হায়! হঠাৎ বোরদেকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখলাম।—কি ব্যাপার? তোমরা এলে না? তোমাদের ডাকতে এসে দেখি দরজা বন্ধ, ভাবলাম আগেই চলে গেছ। আর দেরি না —চল।'

ব্যাপারটা আমি আগেই বুঝেছিলাম। বিপক্ষ দলকে লাঞ্চে নেমতন্ন করার রেওয়াজ ওদেশে নেই। সম্ভবত তাই এ ভুল। এ ব্যাপারে তাঁরা আদৌ কুণ্ঠিত নন। কারণ তাঁরা খেলাটাকেই বড় করে দেখছেন, লাঞ্চটাকে নয়। খেলার প্রতি ও'দের এই নিষ্ঠা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

বোম্বের আরও একটা বিশেষ প্রশংসনীয়—ও'দের আম্পায়ারিং। এতদিন ধরে এতগুলো খেলা দেখলাম, কিন্তু কোনদিন কি আমাদের, কি বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে মনক্ষুন্ন হননি।

বোম্বের খেলা শেষ করে আমরা মহারাষ্ট্রের আর একটি শহর পুণায় সফর করেছিলাম। সেখানে কয়েকটি ম্যাচ খেলবার কথা ছিল। আশ্চর্য, পুণাতে কিন্তু আমাদের ছেলেরা বোম্বের থেকে অনেক ভাল খেলেছিলেন। অর্থাৎ বলা যায়, যত দিন গেছে ততই আমাদের ছেলেদের খেলার মান বেড়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের ক্রিকেট মরশুম শুরু হওয়ার আগেই আমরা সফরে বেরিয়েছিলাম। ফলে কোন খেলোয়াড়ই প্রয়োজনমত অনুশীলন করতে পারেননি।

আমার মতে, বাইরে ক্রিকেট দল পাঠাবার আগেই দলকে শক্তিশালী করতে খেলোয়াড়দের অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

আমাদের এই ক্রিকেট সফরের উদ্দেশ্য শুনে ভারতীয় ক্রিকেট দলের চাঁদু বোরদে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—একথা অনস্বীকার্য, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে না খেললে কোন দলেরই উন্নতি হতে পারে না। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই দেখে যে, তোমরা শক্তিশালী খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে তরুণদের নিয়ে এসেছ। এই তরুণ খেলোয়াড়রাই দেশের ভবিষ্যৎ।'

শ্রীবোরদে আরও বললেন—'তোমরা যদি প্রতি বছর সফরে যাও তবে বছর পাঁচেকের মধ্যে দেখবে তোমাদের খেলার মান কত বেড়ে গেছে।'

আমাদের ছেলেদের উদ্দেশ্য করে শ্রীবোরদে বলেন, 'খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের শক্তিকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু কখনো তাঁদের ভয় করবে না।'

শুধু বোরদেই নন, ভিনু মানকড, অশোক মানকড়, সোলকার, সেলিম দুরাণী প্রভৃতি খেলোয়াড়রা আমাদের সফরের উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছিলেন।

আমি লিখি, তাই যাঁরা লেখেন তাঁদের কথা দিয়েই আমার এই লেখা শেষ করবো। সফরের প্রথমেই কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক আমার কাছে এসেছিলেন। আলোচনা প্রসংগে তাঁরা বলেছিলেন, 'আপনারা এই ধরণের জুনিয়র দল নিয়ে বোম্বেতে খেলতে এসেছেন, খুব ভাল কথা, কিন্তু জানেন তো আমাদের খেলার মান অনেক উন্নত' উত্তরে আমি একটা কথাই বলেছিলাম, 'সেই জন্যেই ত এসেছি।' আমাদের উদ্দেশ্য হারজিত নয়, খেলার মান বাড়ানো।

সফর শেষে তাঁরাই আবার বলেছিলেন—'বেশ খেলেছে আপনার দলের ছেলেরা। সত্যি বলতে কি, আমরা কিন্তু এতখানি আশা করিনি।'

খেলাধুলা
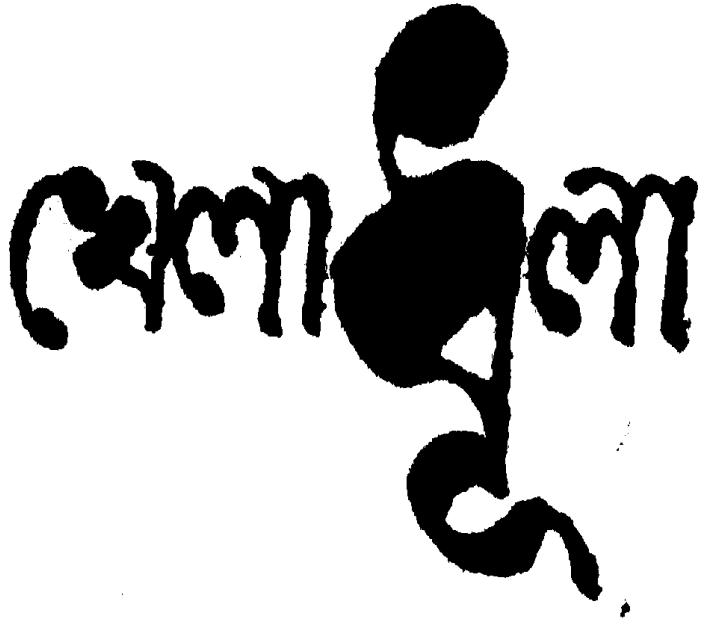
দর্শক

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন ক্রিকেট মাঠে ২৭শে নভেম্বর ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪৯তম টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের পাঁচদিন-ব্যাপী প্রথম টেস্ট খেলার আসর বসছে। এই খেলাটি উভয় দেশের ২০৪তম টেস্ট খেলা। অর্থাৎ ইতিপূর্বে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ২০৩টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়ে গেছে, যার ফলাফল দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০, ইংল্যান্ডের জয় ৬৬ এবং খেলা ড্র ৫৭। ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১-০ খেলায় (ড্র ৪) 'রাবার' জয়ী হয়ে যে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' খেতাব পেয়েছিল তা আজও তাদের হাতেই থেকে গেছে, যেহেতু পরবর্তী ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের ফলাফল সমান দাঁড়ায়।

ব্রিসবেনের আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলে যে ১২জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নবাগত খেলোয়াড় এই চারজন—ভিক্টোরিয়া দলের পেস বোলার এ্যালান টমসন, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকীপার রড মার্শ, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার স্পিন বোলার টেরী জেনার এবং দলের সহ-অধিনায়ক আয়ান চ্যাপেলের সহোদর গ্রেগ চ্যাপেল। অস্ট্রেলিয়া সফররত এম সি সি দলকে গত ৯ই নভেম্বর ভিক্টোরিয়া দল যে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল তার মূলে ছিলেন এ্যালান টমসন, যিনি খেলায় ৮০ রানে ৬টা এবং ১০১ রানে ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে টমসন যে ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় দলভুক্ত হবেন তা সকলেই জানতেন। কিন্তু ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার রড মার্শ উইকেট-কিপার হিসাবে যে দলে স্থান পাবেন তা কেউ কল্পনাও করেন নি। যদিও কুইন্সল্যান্ডের বিপক্ষে শেফিল্ড শীল্ড খেলায় মার্শ চারজনকে চমৎকারভাবে আউট করেছেন কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলস দলের অধিনায়ক টেস্ট উইকেট-কিপার ব্রায়ান টাবের সক্ষম থাকতে মার্শের দলভুক্তি সকলকে বিস্মিত করেছে। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে স্থান না পাওয়াতে টাবের খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন। তিনি যে দলে স্থান পাননি এ সত্য বিশ্বাসই করতে পারেন নি। এখানে উল্লেখ্য, ক্রিকেট খেলায় টাবেরের একটি বিশ্ব রেকর্ড আছে—একটি খেলায় ১২টি 'ডিসমিসাল'। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দুই ভাই আছেন—আয়ান চ্যাপেল এবং গ্রেগ চ্যাপেল। একই খেলার আসরে অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ক্রিকেট দলে দুই ভাইকে শেষ খেলতে দেখা গেছে ১৮৯৪-৯৫ সালে। এই দুই ভাইয়ের নাম এ বি ট্রট এবং জি এইচ ট্রট। সুতরাং সুদীর্ঘকাল পর ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় নির্বাচিত দুই ভাই—আয়ান চ্যাপেল এবং গ্রেগ চ্যাপেল ক্রিকেট অনুরাগী মহলে আজ যথেষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলে নীচের যে ১২জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া দলের ৫জন, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের ৩ জন, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের ২জন এবং নিউ সাউথ ওয়েলস দলের ২জন খেলোয়াড় আছেন।

ভিক্টোরিয়া দলের—বিল লরী (অধিনায়ক), রেডপাথ, শিহান, স্টাকপোল এবং টমসন (নবাগত); দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের—আয়ান চ্যাপেল (সহঃ অধিনায়ক), গ্রেগ চ্যাপেল (নবাগত) এবং টেরী জেনার (নবাগত); পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যাকেঞ্জী এবং উইকেটকিপার রড মার্শ (নবাগত); নিউ সাউথ ওয়েলসের—গ্লিসন এবং ওয়াল্টার্স।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়ার চারটি মাঠে এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে ১০৭টি টেস্ট

কুমারী এ্যাঞ্জেলিকা কার্ন (পশ্চিম জার্মানী) তাঁর নয়নাভিরাম দৈহিক সৌষ্ঠব এবং কৌশল প্রদর্শন করে গত বিশ্ব জিম ন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানী দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

মাঠ	মোট খেলা	ইংল্যান্ডের জয়	অস্ট্রেলিয়ার জয়	খেলা ড্র
মেলবোর্ন	৪০	১৫	২০	৫
সিডনি	৩৯	১৬	২০	৩
এ্যাডিলেড	১৯	৬	১১	২
ব্রিসবেন	৯	৩	৪	২
মোটঃ	১০৭	৪০	৫৫	১২

বিশ্ব গল্‌ফ প্রতিযোগিতা

আর্জেন্টিনার বুইনোস এয়ারেজে আয়োজিত বিশ্ব গল্‌ফে প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে (অতীতের কানাডা কাপ) অস্ট্রেলিয়া দলগত এবং আর্জেন্টিনা রানার্স-আপ খেতাব জয়ী হয়েছে। ব্যক্তিগত বিভাগের খেতাব পেয়েছেন আর্জেন্টিনার রবার্টো ডাইসেনজো। এবারের প্রতিযোগিতায় ৫৩টি দেশ যোগদান করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, পূর্বের ১৭টি টুর্নামেন্টে আমেরিকা ১০ বার দলগত খেতাব জয়ী হয়ে সর্বাধিক দলগত খেতাব জয়ের যে রেকর্ড করেছিল তা আজও অক্ষুন্ন আছে।

কলিঙ্গ ফুটবল কাপ

উড়িষ্যার বারবটী স্টেডিয়ামে আয়োজিত কলিঙ্গ ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অমীমাংসিত হওয়াতে কলকাতার বি এন আর দল এবং রাজস্থান দলকে শেষ পর্যন্ত যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও ১—১ গোলে খেলাটি ড্র যায়। এমন কি নতুন নিয়মে পাঁচটি পেনাল্টি কিকের ব্যবস্থা করেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। সেমি-ফাইনালে বি এন আর দল ৩—১ ও ২—১ গোলে কলকাতার বাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালের প্রথম খেলায় রাজস্থান ২—১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে। কিন্তু দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ৩—২ গোলে জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি কিকে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

হাইজাম্পে বিশ্ব রেকর্ড

'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী'র এক খবরে প্রকাশ, চীনের নী চীন-চীন হাইজাম্পে ২·২৯ মিটার উচ্চতা (৭ ফিট ৬½ ইঞ্চি) অতিক্রম করে রাশিয়ার ভ্যালেরী ব্রুমেল প্রতিষ্ঠিত ২·২৮ মিটারের ৫½ ইঞ্চি) বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন। জাম্পের বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা এবং সালের অলিম্পিক হাইজাম্পের বিজয়ী ব্রুমেল এই খবর পড়ে করেছেন, 'এই ঘটনা বিশ্বাস কর আমাকে আগে স্বচক্ষে তা দেখত নী চীন-চীনকে প্যারিস অথব এ্যাঞ্জেলসে গিয়ে তাঁর এই দক্ষতা জন্য ব্রুমেল প্রস্তাব করেছেন। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ফেড সংগে চীনের বর্তমানে কোন সম্প সেই কারণে হাইজাম্পে নী চ এই ২·২৯ মিটার উচ্চতা ঘটনাটি সরকারীভাবে গৃহীত হবে

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ

জো ফ্রেজার দ্বিতীয় রাউণ্ডে সেকেণ্ডের মাথায় স্বজাতীয় নিগ্রো যোদ্ধা বব্ ফোস্টারকে নক্ আউট হেভীওয়েট বিভাগে তাঁর বিশ্ব অক্ষুন্ন রেখেছেন। আগামী ৭ই ডি লড়াইয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে (বর্ত মহম্মদ আলী) যদি আর্জেণ্টিনা বোনাভেনাকে পরাজিত করেন ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মা ফ্রেজারের সংগে ক্যাসিয়াস ক্লের হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।